CUK-H4875-63-P35963

নটরাজন-এর চাঞ্চল্যকর রচনা

লালবাজার ১৬.

নার মাটি নোনা ১৬.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সার্থক উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮.

বাতী ও দীপু ১২.

বশ্বাসের বাইরে ৫.

। যৌবনলীলা এবং দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার কৃষ্ণলীলা-রকমা অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণ কাহিনী

শঙ্কু মহারাজ-এর

ন-দ্বারকায় ১২.

। শৈশব ও কৈশোবলীলা এবং বিশ্বের প্রাচীনতম পদ-র-পরিকমার ওপরে রচিত বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ঘনী, এই লেখকের

মধু-বৃন্দাবনে

স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সম্পূর্ণ তিন শ' পৃষ্ঠার। প্রতিটি ালোকচিত্র, মানচিত্র, পথপঞ্জী ও বিষয়সূচীসমৃদ্ধ। প্রতি পর্ব বারো টাকা।

শৈলেশ দে'র অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

ীজী ও নেতাজী ২০.

বজমাধব ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

ভুবনের বাইরে ১৮.

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫.

[চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

নারায়ণ সান্যালের

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

গজমুক্তা ১০.

সুবোধ ঘোষের

গল্প মণিঘর ১৪.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আকাশের আয়না ১০.

একাল চিরকাল ১০.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

গোমুখীর পথ ১৬.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

নিমাই ভট্টাচার্যের

অন্যদিন ৪.

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্নশিরি ২০.

দৃষ্টিহীনের

মঞ্চ ১০.

নিখিলচন্দ্র সরকারের

সজনে নির্জনে ১২.

দুঃখেসুখেবাঁচা ১০.

কলাছনের

খবরে প্রকাশ ১০.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮.

শ্রীহংস-এর

লাস্ট ওয়ার্ড ৮.

গাইনিক ওয়ার্ড ৮.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

সম্পূর্ণ ক্যাটগলের প্রয়োজন হলে লিখুন।

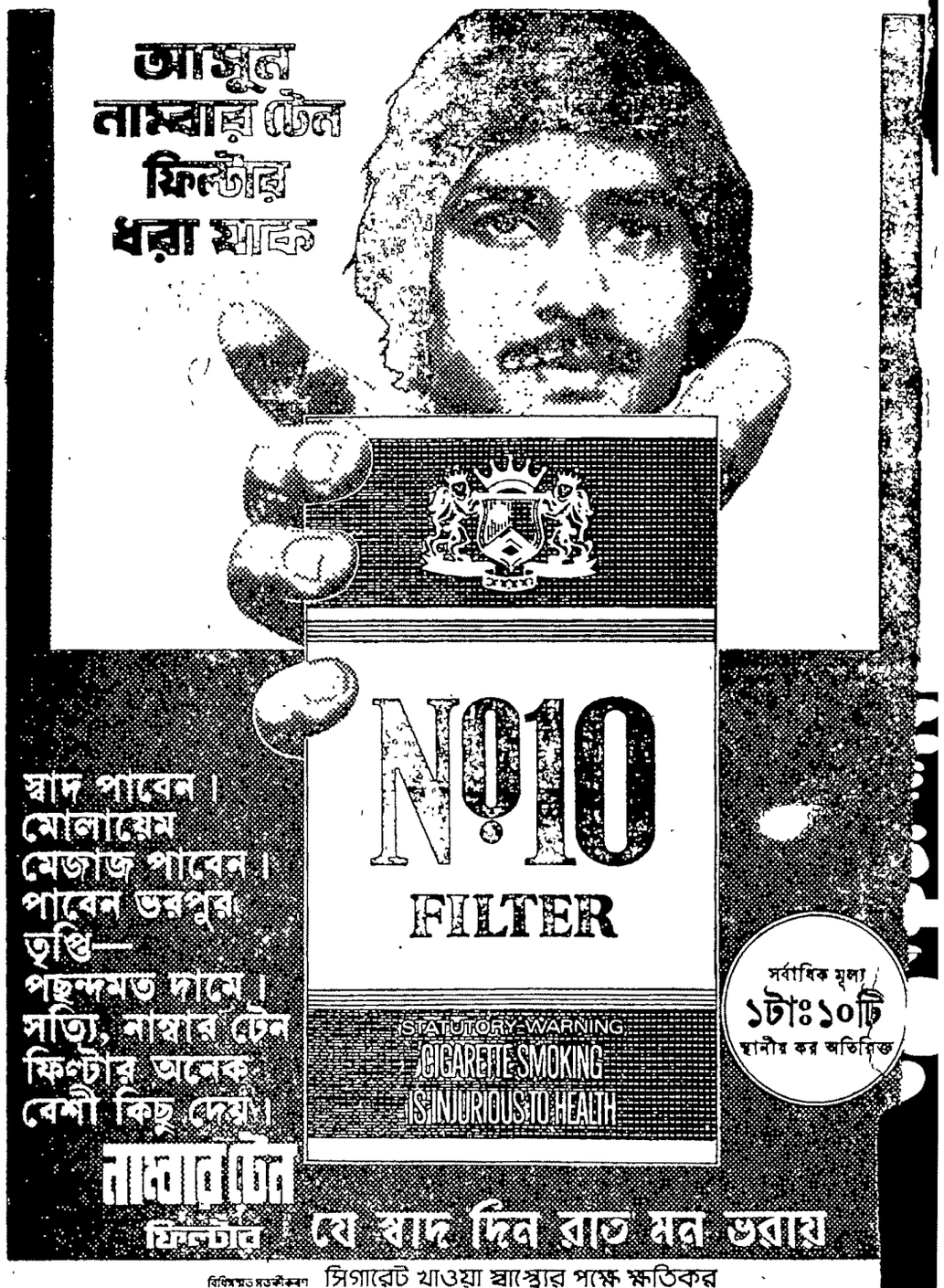

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

অমৃত
১৮ বর্ষ
১ম সংখ্যা
২৮ বৈশাখ
১৩৮৫
12 May, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
আমি কেমন আছি ? ৫
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ ও দুর্লভ ৭
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদকাহিনী ৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অমল আচার্য
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য
সমালোচনা ১৮
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ২০
পর্যবেক্ষক
দুই দিকপালের মুখোমুখি ২১
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ২৭
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
কাশেমের বিক্সা (গল্প) ২৭
বিকাশ রায়া
লালবাই-এর দেশে ৩৫
বেথা বড়ুয়া
হাওয়াগাড়ি (উপন্যাস) ৪০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
যাঁদের দেখেছি ৪৮ অনন্ত সিং
হৃদয়নন্দনবনে (উপন্যাস) ৫২
সোমেন্দ্রনাথ রায়
আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনী ৫৫
শৈবাল ঘোষ
চিঠিপত্র ৫৭
খেলা ৫৮
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদকাহিনী : বাঙালীবাবু
আশিস ঘোষের গল্প

P 35,963

কম কথায় পদক-দান

ইদানীং গোটা দুনিয়াকে যেন কথায় পেয়ে বসেছে। বাক-স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কাজেই কেউ যদি নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে চান তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু অনেকেই থেমে থাকেন না সেখানে, অন্যের বক্তব্যকেও খণ্ডন করার দায় গ্রহণ করেন। বলাই বাহুল্য, খণ্ডনেরও প্রতি-খণ্ডন থাকে, এবং পরিণামে যা ঘটে তা সুকুমার রায়-কথিত সেই 'কথায় কাটে কথার প্যাঁচ' ছাড়া আর কিছু নয়।

মুশকিল এই যে, কথার দ্বারাই এ সংসারে সব কাজ সম্পন্ন করা যায় না, মুখ বুঁজে কাজ করাও একই রকম জরুরী। রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে একবার বলেছিলেন, রেলগাড়ির যে শক্তি তাকে সামনে এগিয়ে নেয় সেই শক্তিই তার বাঁশিকেও বাজায়। কিন্তু ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তি যদি বাঁশি বাজিয়েই ফতুর হয়, গাড়ির চাকা তাহলে অচল হয়েই থাকবে।

কথার এই অনর্গল স্রোতোচ্ছ্বাস সম্প্রতি এমন প্রবল হয়ে উঠেছে যে, আমাদের সমস্ত রকম কর্মোদ্যোগেরই প্রার্থিত গতিসঞ্চারে বাধা ঘটছে। বহুকাল ধরেই সাধারণ মানুষের জীবন নানাভাবে উৎপীড়িত, বাজার দরের স্থিতিহীনতা তাকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

এই পটভূমিতে রাষ্ট্রপতি যে কম কথা বলে বেশি কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন তা খুবই সময়োপযোগী। তিনি অবিশ্যি সেই সঙ্গে কম কথা বলার জন্য পদক দেবার প্রস্তাব করেছেন। তাতে এটাই আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে প্রয়োজনটি খুবই জরুরী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের প্রসঙ্গেই প্রস্তাবটি উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রপতি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কাজের মানুষ তাও তিনি বলেছেন। যাঁরা এখনও সচেতন হতে পারেন নি, অবহিত হবেন। এবং কেবল কেন্দ্রেই নয় রাজ্যস্তরেও রাষ্ট্রপতির পরামর্শ একইভাবে প্রযোজ্য।

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : ১৯৪৭-এ কলকাতায় শুভাপ্রসন্নের জন্ম। ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্ট থেকে স্নাতক হয়েছেন ১৯৬৯ সালে। এখন কলকাতার সেন্ট পলস স্কুলের শিল্প শিক্ষক। ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন দ্য আর্টস জেনিভ এবং নিউ দিল্লির গ্যালারী-২৬-এর সদস্য। ১৯৭৪, ৭৫, ৭৬ এবং ৭৭ সালে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানীতে গিয়েছিলেন। দিল্লির আইষ্যাক্স ললিতকলা একাডেমী, কলকাতার অ্যাকাডেমী অফ ড্রামা, মিউজিক অ্যান্ড ফাইন আর্টস, বিড়লা একাডেমীর কনটেমপোরারী আর্ট এগজিবিশন ও বিভিন্ন বিখ্যাত প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। এ ছাড়াও বহু গ্রুপ প্রদর্শনীতেও যোগ দিয়েছেন। নিউ দিল্লির ন্যাশন্যাল গ্যালারী অফ মডার্ণ আর্ট, গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজ, কলকাতার বিড়লা একাডেমী, ব্রিটিশ কাউন্সিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে শুভাপ্রসন্নের শিল্পকর্ম রাখা হয়েছে।

সাহিত্য ইত্যাদি...

ট্র্যাভেলগ্ বনাম ট্র্যাভেল গাইড

মনস্তত্ত্বে আমার বিন্দুমাত্র দখল নেই, কিন্তু হলপ করে বলতে পারি, পৃথিবীর সব থেকে কুঁড়ে মানুষরাই সব থেকে বেশি ভ্রমণ সাহিত্য পড়ে।

বাস্তবিক ভেবে দেখুন, যে লোক নিজে সচল সে কেন আর অন্যের মুখে ঝাল খেতে যাবে? নিজেই তো সে চলে ফিরে নানা জায়গার নানা দৃশ্যের আস্বাদ নিয়ে দেখতে পারে, কষ্টসাধ্য বলে চুপ করে বসে থাকে না। গায়ে যার জোর কম সেই তো নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হাততালি দেয় আর মদৎ দেয়—ন্যাড়া, লড়ে যা—।

অবিশ্যি সকলেই যদি নিজে বেরিয়ে পড়ত, ভ্রমণে কারো উৎসাহ থাকত কিনা সন্দেহ। আমরা ধরুন, প্রতিদিনই বাজারে যাই, চাকরির ব্যাপদেশে কি বা দীঘা যাই। তাকে কি আর ভ্রমণ বলে? মোটেই না। কিন্তু যদি ডায়মন্ডহারবার যাই? একটু হল। যদি ফেজুরগঞ্জ যাই? আরো একটু। এইভাবে লোধিয়ানা স্বীপ পর্যন্ত গেলে সেটা হবে মোটামুটি একটা ভ্রমণের ব্যাপার। যদিও খুবই ছোটো মাপের। কিন্তু যদি আন্দামান-নিকোবর বা তারই কাছাকাছি কোনো নাম-না-জানা ছোট্টো স্বীপে গিয়ে হাজির হতে পারি, ব্যস্, কলম নিয়ে বসতে পারি লিখতে পারি একটা ট্র্যাভেলগ্। আর আপনারা, যেহেতু আপনারা বাজারে যাওয়া বা দীঘা যাওয়ার মত দল বেঁধে সকলে সেই ছোট্টো স্বীপে যাবেন না, যেতে চাইবেন না। অতএব নিরাপদ দূরত্বে বসে সে বই পড়বেন। এবং বইয়ের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, অমুক ইয়ের আর কোনো ইয়ে বেরিয়েছে? (অর্থাৎ ন্যাড়া, লড়ে যা—।)

আমার ধারণা, পৃথিবীর বেশির ভাগ ভ্রমণকাহিনীরই মূল রহস্য এটাই। এই গিভ্ অ্যান্ড টেক। অর্থাৎ অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায়, তুমি যেন শোনো আর আমি যেন বলি।

আগেকার যুগেও ব্যাপারটা প্রায় এক রকমই ছিল। তখন অবিশ্যি তা করা হত অন্য উপায়ে। যেমন ধরুন, কালিদাসের মেঘদূত কাব্য। সকলেই জানে এটি প্রেমের কবিতা। কিন্তু বিরহী সেই যক্ষ যখন আষাঢ়ের চলন্ত মেঘকে তার দূত হিসাবে প্রিয়ার কাছে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছে তখন রামগিরি পাহাড় থেকে হিমালয় পর্যন্ত গোটা উত্তর ভারতের মাঝ-বরাবর চিরে যাওয়া পথের এমন খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছে যে সেটা সেকালের মানুষের মনে নিশ্চয়ই শুধু কাব্যপাঠের আনন্দ নয়, ট্র্যাভেলগ পাঠেরও তৃপ্তি এনে দিয়েছে।

একালে অবিশ্যি অমন করে ঘুরিয়ে [illegible] দেখবার দরকার হয় না। দেশ দেখার বর্ণনা নিজের দাবিতেই সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত।

বাংলা ভাষায় আমি যে ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই, তার লেখক ছিলেন হলধর সেন। বইটির নাম বন্দুর মনে পড়ে, হিমালয়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের সেই আটআনা সিরিজের ছোট বই। কিন্তু সুখপাঠ্য বলা চলে না। তার পরেই পড়ি 'পালামৌ', সেকালের ম্যাট্রিক সিলেক-শানের সেই ছোট্ট প্যাসেজটুকু। কী ভালোই যে লেগেছিল কী বলব। বছরের পর বছর মনের মধ্যে লালন করেছি সেই সুখস্মৃতি। গোটা বইটি পড়ার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছি। তারপর বহুকাল পরে হাতে এসেছিল সঞ্জীবচন্দ্রের পুরো বইখানা। ভালো লেগেছিল। হ্যাঁ, ভালোই লেগেছিল, কিন্তু তার বেশি নয়। হায়, সমগ্র আমাদের সাড়া দেবার ক্ষমতাকে এমনভাবেই তোতা করে দেয়।

কিন্তু মস্ত একটা কাজ হয়েছিল সে বই পড়ে। বুঝেছিলাম যে, পা থাকলে চলা যায়, চোখ থাকলে দেখাও যায়, কিন্তু হাত থাকলেই লেখা যায় না। অন্তত ট্র্যাভেলগ নয়। সঞ্জীবচন্দ্রের এ ক্ষমতা পুরোপুরিই ছিল তা না বললেও চলে। কিন্তু তাঁর লেখা পড়েই বুঝতে পেরেছি, যা কিছু ঝকমক করে সবই সোনা নয়।

আসলে মুশকিলটা হল এই যে অনেকেরই ধারণা, কোনো একটা জায়গা থেকে অন্য একটি সুদূর কিম্বা দুর্বিগম্য জায়গায় গেলেই বুঝি ট্র্যাভেলগ লেখার অধিকার জন্মে। মোটেই তা নয়। ভ্রমণ পথ ও গন্তব্য স্থানটির বর্ণনা দিলে সেটা সব থেকে ভালো না হতে পারে তা হল উপকারী একটি ট্র্যাভেলগাইড। সে জিনিস সাহিত্য নয়। সাহিত্য (এবং ভ্রমণসাহিত্যও) হল সেই বস্তু যা বিশেষ একজন লেখকের বিশেষ এক মনের ভেতর থেকে অবগাহন করে ওঠে এবং প্রকাশিত হয়ে সহৃদয় মানুষের হৃদয়-সংবেদ্য হবার মতো ভাষায়। অর্থাৎ ব্যাপারটা হবে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন। খুব কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু সাহিত্য এই শক্ত কাজটি খুব সহজেই ঘটিয়ে দিতে পারে। এবং তা পারে বলেই তার এত আদর।

তা যাক, ভাববক্তৃতা ছেড়ে এবার কয়েকটি উদাহরণে আসি।

রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' অল্পবয়সের লেখা। কিন্তু অনবদ্য। পরে তিনি বড় হয়েছেন, শুধু বয়সে নয়, মান-সম্মান ও ব্যক্তিত্বেও। প্রায় সারা পৃথিবীতেই ভ্রমণ করেছেন এবং চিঠির আকারে ছোক আর [illegible]ভাবেই ছোক লিখেওছেন। তিনি সে সব অভিজ্ঞতার কথা লেখা হিসেবে তার অনেকগুলোই রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু য়ুরোপ প্রবাসীর আস্বাদ অন্যরকম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত রবীন্দ্রনাথ হন নি। শুধুই একজন উদীয়মান কবি এবং প্রধানতই তখন তিনি দেবেন্দ্র ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। অর্থাৎ মোটামুটি স্বচ্ছল ঘরের ছেলে হলেও একটা স্বাভাবিক মানুষ। তাঁর তখন কোনো বিশ্ব বিশ্রুত মানুষ-সুলভ অন্য দায়িত্ব নেই নবীন দুটি চোখ দিয়ে নতুন একটি দেশ সমাজকে কাছে থেকে দেখা, ও সে দেখা প্রতিক্রিয়া জানিয়েই তিনি মুক্ত। বইটি আসল জিৎ সেখানেই।

ঠিক এই একই জাতের লেখা অন্নদাশংকর রায়ের 'পথে প্রবাসে'। বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশংকরের স্থায়ী স্বাক্ষর। অল্পবয়সে বইটি যে কতোবার পড়েছি এবং মুগ্ধ হয়েছি বলা যায় না। আর আমার ধারণা, এখন যা পড়ি, একইরকম ভালো লাগবে। পরে তিনি আরো বিস্তৃত ভ্রমণ কথা লিখেছেন। জাপানে বইটির জন্যে একদমী পুরস্কার পেয়েছেন। নিশ্চয়ই সেটি একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু 'পথে প্রবাসে' কী বলব, বইটির স্বতঃপ্রবৃত্ত ভূমির প্রমথ চৌধুরী যা বলেছিলেন তারই রেশ টেনে বলা যায়, চোখ দুটি তো মানুষের চিরদিন 'অশ্বমেধের' থাকে না। দেখার যে টাটকা চ্যালেঞ্জ কি বারে বারে শোনা যায়।

এ ধারার সর্বশেষ যে বই আমার স্মরণীয় হয়ে আছে তা হল সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশেবিদেশে'। এমন সতেজ সরস এবং খানদানী মেজাজের ভ্রমণ আর কেউ লিখতে পেরেছেন কিনা নেই। কী তার ভাষা, কী তার উইট। এ একবার পড়ে আরো একবার পড়ার ই হয় নি যার, সাহিত্য না পড়ে তার কে নিবন্ধ পড়া ভালো। অথচ মজা এই মূলত এটা ভ্রমণকাহিনী, সেকথা এক মনে পড়ে না বইখানা পড়ার সময়।

আমার পছন্দ এই ধরনের নয়তো নিছক দেশ দেখার গল্প, এম অনিচ্ছুক পাঠককে বঁড়শি দিয়ে রাখবার জন্যে তরুণী সহযাত্রিণীর ঠারে ঠারে আশনাই চালানোর কাহিনী দেওয়া যে সব তথাকথিত ভ্রমণকা বাজারে দেখা যায়, সেগুলোর বিষয়ে আ সাহিত্যিকে উৎসাহ প্রায় নেই বললেই চ তবে পড়ি কি আর না পড়ি।

তা মাঝে মাঝে রেল কোম্পানীর টেবুল্ তো প্রড়ি।

প্রণবেন্দু

আমি কেমন আছি?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

আমি ম্যাকনামারাকে কোনোদিন চোখে দেখিনি। শ্রীলাও দেখেনি। সুমন্ত দেখেছে কিনা জানি না। আমরা কেবল দিনের পর দিন ভিয়েতনামের খবর শুনেছি। সেখান কার পাখি, ঝর্ণা, ফুল, মানুষ—সব কিছুকেই সাম্রাজ্যবাদ নষ্ট করে দিচ্ছে—এমন জানছিলাম। তবুও তাঁরা বেঁচে ছিল। ম্যাকনামারা হয়তো জীবনকে অতটা জোরালো দেখতে অভ্যস্থ নন। দুঃখী মানুষ বস্তিতে থাকবে, ঘেটোতে থাকবে, সন্তানের জন্ম দেবার কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী ঢাকার চেষ্টা করবে শুরনো টিউবওয়েলের সামনে হা পিত্যেশ করে বসে থাকবে আর ম্যাকনামারা তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেবেন—এটাই ম্যাকনামারার পক্ষে মানানসই ছিল। আমাদের কাছে ব্যাপারটা বেমানান লাগে না। সম্রাটের প্রথম জীবনটা কাটবে বকুতে ও হুণনে, পরে তিনি সন্ন্যাস নেবেন—এমনটাই আমাদের শেখানো হচ্ছে। আমরা মানুষের দানধ্যানটাই মনে রাখি, মামলা-মোকদ্দমার কথা ভুলে যাই। 'হাজার হাজার ফুল ফুটে উঠুক হাজার স্বপ্ন সার্থক হোক'—পরিতৃপ্তির গুমোট দেশে এসব কথাকে কেউ পাত্তা দিতো না। আমরা তখনো তা জানতাম না। হয়তো মনে মনে সবাই সবাই খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলাম। একটা অপদার্থ নোংরা সমাজকে ভেঙে ফেলতে আমাদের মতো দু দশজনই যথেষ্ট—এমন ধারণা মনে জন্মেছিলো। হয়তো তা ভুল, হয়তো সে ভুলের জন্যই কোলকাতার রাস্তাঘাটে, দেয়ালে দেয়ালে লেখা তরতাজা খরখরে, তীক্ষ্ণ লেখাগুলো মুছে গেলো ক্রমশ ক্রমশ। সব কথার শেষে তবুও কি যেন একটা থেকে যায়। রাজনীতি যে জীবনের মতোই দরকারী ত্রিনিষ—বাড়ির নিরাপদ পাঁচিলের বহুদূরে গড়ের মাঠের মিটিং-এ বা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের প্রতিশ্রুতির ভল্ডামিতেই তার শেষ কথা নয়—এটা তো অন্তত বোঝা গিয়েছিলো।

আর কিছু না হোক, এটা তো প্রমাণ হয়েছিলো যে পাঁচটা বা দশটা খেতে না পাওয়া, ঘরছাড়া, পুলিশের তাড়া খাওয়া তেজী অবাধ্য ছেলে অনেকগুলো বন্দুকের বেড়া টপকে, অনেক কন্ট্রোল টাওয়ারের সার্চ লাইটকে ফাঁকি দিয়ে যেখানে সেখানে রেড ফ্ল্যাগ পুঁতে দিয়ে আসতে পারে। আর কিছু না হোক, এটা তো প্রমাণ হয়েছিলো যে রাজনীতির পিছনেও থাকে কোনো গভীর জীবনদর্শন—কেবল নিজের কোলে ঝোল টেনে বোর জন্য, কেবল পুজোর বোনাস ছাঁটাই লে-অফ ছাড়াও আরো কোনো মহৎ আরো কোনো নিঃস্বার্থ স্বপ্নকে চিরস্থায়ী করতে চায় চেতনার প্রসার?

স্টেট অ্যান্ড রেভলিউশনের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তখন এদেশে ছিল কিনা জানি না। লেনিন কি বলতে চেয়েছিলে আমরা হয়তো তার সবটা বুঝিনি। হয়তো সব প্রশ্নের জবাব এখনো মেলেনি। কিন্তু এইটিনথ্ ব্রুমেয়ারে মার্কস যে দুর্বল সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করেছিলেন, হতাশা যখন মার্ক-পন্থার জন্ম দেয়, আপোষের জন্ম দেয়—সেরকমটা যে এদেশে ছিল তাতো নিজের চোখেই দেখেছি। অধৈর্য, অসহিষ্ণুতার আমার মধ্যে, আমাদের মধ্যে যদি আসে ক্ষোভ, যদি পালটে দিতে ইচ্ছে হয় বাস্তা-বাতি সবকিছু— এলোমেলো তো হয়ে যাবেই খানিকটা। অতনু তো এই জন্যেই বাঁচতে পারলো না। চাঁদের আলোয়, বৃষ্টি হয়ে যাওয়া গভীর রাতে অতনুদের কাঁধে রাইফেল নিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। দুনিয়ার সব-চেয়ে বড় সন্ন্যাসীও অতোটা ত্যাগের ছবি আমাকে দেখাতে পারেন নি। ভোরবেলা কুয়াশার ঘেরাটোপে ওরা কোত্থেকে কোথায় যেন পালাতো। প্রতিদিন পুলিশ ভ্যানের কালো রঙ অন্ধকারের সঙ্গে মিশে কেবল থরথরাতো—ভীষন অস্থিরতায়। অতনুরাও অস্থির হয়ে পড়েছিলো। আমিও। স্বাধীনতাকে ঝকঝকে লোহার মতো পাঁটি রাখতে ওপার বাংলার মানুষেরাও।

●

অতনুকে আমি অনেকটা চিনতাম। ছেলেবেলায় বেহালার বাসের মেলায় যখন রাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার পাশে মাটির তৈরী 'লেবে যুবকযুবতী' দেখতে দেখতে বন্ধুদের হদিশ হারিয়ে ফেলেছি, মেরি গো রাউন্ডের কাছে যখন পাঁপড়ভাজাওয়ালা ভীষণ ব্যস্ত-মুখে তেল ছাঁকছে, তাঁবুর মধ্যে যখন ইলেকট্রিক তরুণী কঙ্কালে বদল হয়ে যাচ্ছে আশ্চর্য মায়ায়—অতনু তার শক্ত হাতে আমার বাঁ হাত চেপে ধরেছে আবার সবার সঙ্গে আমার মিলিয়ে দিয়েছে। প্রথম সাইকেল চড়ালানো শেখার পর আমি, জ্যোতি, অতনু একসঙ্গে বেহালার আচেনা গলি ধরে চলে গিয়েছিলাম বহু দূরে। সেখানটায় জনবসতি নেই। আরো দূরে যেখানটায় সবে একটা ফ্ল্যাইং ক্লাব গড়ে

রবীন্দ্র-শরৎ উত্তরকালে শীর্ষস্থানীয় জ্যোতিষ্ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল কথাসাহিত্য যেমন বাঙালীর পরম গৌরবের ধন—তেমনই তাঁর নাটকগুলিও এক আশ্চর্য সৃষ্টি—প্রতিভাধর সৃষ্টার অসামান্য অভিজ্ঞতার ফসল। চিরন্তন মানবেতিহাসের শ্বাশ্বত দলিল।

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত এবং ভূমিকা সম্বলিত

তারাশঙ্কর নাট্য-সমগ্র

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

প্রতি খণ্ড গ্রাহকদের জন্য ষোল টাকা

কাদম্বিনী * দুই পুরুষ
পথের ডাক * দ্বীপান্তর
বিংশ শতাব্দী * চকমকি
কবি * আরোগ্য নিকেতন
কালরাত্রি * সংঘাত
যুগ-বিপ্লব * বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা
রহস্যময়ী * রায়বাড়ী
এবং অন্যান্য কয়েকটি।

• মাত্র ছয় টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হোন

অতি দ্রুত মুদ্রণ চলছে • অসামান্য শোভন গ্রন্থটির আয়তন এক হাজার পৃষ্ঠারও বেশী

দুর্গাপুরে গ্রাহক কেন্দ্র ঃ দুর্গাপুর বুক স্টল, বেনাচিতি, দুর্গাপুর।

লিপিকা, ৩০।১-এ কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

উঠেছে, হ্যাঙ্গারে ঢোকানো থাকতো ছোট ছোট এরোপ্লেন সেখানটায় পৌঁছে চুপচাপ গালে হাত দিয়ে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে থাকতাম। হলুদ রঙের প্রাইভেট প্লেনগুলো আকাশে উঠে নানানরকমের খেলা দেখাতো, গোঁত্তা খেতো আকাশে—তারপর একসময় নিভৃতভাবে নেমে আসতো এক জায়গায়। পাখীরা কখনো অতো চালাকি করতে পারে না মাঠ ও আকাশের সঙ্গে। সন্ধ্যে হলে সারা রাস্তা জুড়ে অনেকটা হাহা হোহো, হাওয়া, গাছে গাছে কিচির মিচির, ফ্ল্যাইং ক্লাবের আশপাশটা তখনো বেহদ্দ গরম। টুকরো টুকরো ধানক্ষেত, না জানি আকাশ থেকে কেমন দেখায় ও গাছ, ও ক্ষেত। উঁচু রাস্তার একপাশে সাইকেল জড়ো করে তিন জন কিশোর এক জায়গায় চুপটি করে বসে থাকতো অনেকক্ষণ। প্যান্টের পকেট থেকে ফিলটার টিপ্‌ড সিগারেট বেরোতো। তিনজন কিশোর, ইলেভেন সি, বেহালা বয়েজ স্কুল। সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে যাদের বাড়ি ফিরে আসা উচিত। দূরে আলপথ ধরে হারিকেন হাতে কেউ হেঁটে যাচ্ছে—ওইখানে আমাদের যাওয়া হবে না কোনোদিনও। অতনু পকেট থেকে বার করতো বত্যার ছবি। দুই বিনুনী, ভুরুর মাঝে টিপ, আধো হাসি আর লজ্জা-টজ্জা নিয়ে নিবিড় এক ভালোবাসাকে সিগারেটের আলোয় অথবা দেশলাই-এর হঠাৎ ঝলকানিতে আমাদের চিনিয়ে দিতো। অতনুই আমাদের মধ্যে প্রথম কারো ভালো-বাসা পেয়েছিলো। জ্যোতি এসব বুঝতো না, খুব ভয় পেতো। আমার গায়ের লোম-গুলো খাড়া হয়ে উঠতো। ধানকাটা মাঠের লম্বা লম্বা খড়ের মতোন।

•

আর একবার ওই সাইকেল চালাতে গিয়েই একটা বিপদ ঘটে গিয়েছিলো। সেবারেও ছিলাম আমরা তিনজন পাশাপাশি হাওয়ার উল্টোদিকে নিষেধ না মেনে। ফেরার পথে বাংলা-টিচার রবীনবাবুর মেয়ে রুমার সামনাসামনি হওয়ায় আমার হাত গেলো কেঁপে। সাইকেলের হ্যান্ডেল তখনো অতো রপ্ত হয়নি যে রুমার মতো সুন্দরীর সামনেও হাত ফাত কেঁপে যাবে না। বেহালা বয়েজের স্কুলের সেই কাজল কালো কবেকার এক পুরনো ঝিলের পাশে রবীনস্যারের বাসা। সেখানে হলুদ রঙের পর্দা ঝুলতো ঝিল-মিলভাবে। পরীক্ষার আগে এক একদিন রবীন স্যারের বাড়িতে গিয়েছি পড়ার ছুতোয়। আসলে রুমাকে দেখতে। রুমা যখন শাড়ি পরতে শিখলো আমরা তখন সাইকেল চালাতে শুরু করলাম। রুমার কোমরে গোঁজা থাকতো ধবধবে সাদা ছোট রুমাল। কোমরের কাছের কাপড়পলকা হওয়ায় দুলে উঠলে তা চোখে পড়তো। অন্তত আমার। আর, অতনুর। সে যা হোক যখন সাইকেলে আমার হাত গেলো কেঁপে যখন আমি সাইকেল সমেত রুমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছি, যখন রুমার মুখ অপমানে, কোন্ অপমানে কে জানে, লজ্জায় লাল—অতনু রাস্তায় ভিড় জমতে দেয়নি।

পরের দিন ক্লাসে এসে রবীনবাবু আর বৈষ্ণব পদাবলী পড়ালেন না। খুব শক্ত মুখ করে কোনো মতে আগের দিনের ক্লাসে রবীনস্যার চন্দ্রদাস পড়িয়েছিলেন।

কুচযুগ-গিরি কনক-গাগরি
উলটি পড়ল মেরু।।

অতনু কনই-এর ঠেলায় আমাকে অস্থির করে দিচ্ছিলো। বেঞ্চির তলায় মুখ গুঁজে আমরা হাসি সামলাচ্ছিলাম। জ্যোতি ভয়ে ভয়ে অন্য বেঞ্চে চলে গেলো। আমি আর অতনু জল খাবার ছুটি চেয়ে বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ হেসেছিলাম। কে জানে রবীনস্যারের শক্ত মুখের কথা মনে করে না রুমার শরীর কোমরে গোঁজা ধবধবে সাদা রুমাল জ্যোতি চোর-চোর মুখ—এসব মনে করে। রবীন স্যার ও ঘটনার পরদিন রোলকলের খাতা খুলে অনামনস্কভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ঠান্ডা, সরু গলায় আমাদের তিনজনকে ডেকে পাঠালেন। 'কাল রুমাকে তোমাদের তিন-জনের মধ্যে কে ধাক্কা মেরেছিলে?' একথার উত্তরে আরো ঠান্ডা গলায় অতনু জবাব দিয়েছিলো 'আমি স্যার।' রবীনস্যারের সঙ্গে ও তারপর অফিসে চলে গেল, ফিরলো অনেকক্ষণ পরে। চলি বে দীপংকর টি সি দিয়ে দিলো হেডস্যার'—অতনু লম্বা শরীরটা নিয়ে স্কুলের মাঠে, বোন্দুরের মধ্য দিয়ে ক্রমশ গেট পার হয়ে মিলিয়ে গেলো। সন্ধ্যেবেলায় ইস্কুলের মাঠে বসে আমি, আর জ্যোতি মিলে ঠিক করলাম পরের দিন স্কুলে স্ট্রাইক ডাকবো। জ্যোতির মতো ভীতু ছেলে কেমনভাবে যেন ভীষন সাহসী হয়ে উঠেছিল। পরদিন দশটার সময় ইস্কুল গেটের সামনে, রবীনস্যারের বাড়ির পাশে আমরা ক্লাশ ইলেভেন সির ছেলেরা জড়ো হলাম। রবীন স্যার রাস্তায় বার হননি। কার প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ছিল সেদিন আজও বুঝে পাইনা। হেডস্যার? রুমা? রবীনবাবু? ইস্কুলের নিয়ম? আজ ভেবে বলা মুস্কিল। কিন্তু অতনুকে আমি দিনে দিনে আরো ভালোবাসতে শিখে-ছিলাম। কেননা সেদিন রাত্রিতে আমাদের বাড়িতে এসে অতনু আরো এক রহস্যের গল্প শুনিয়েছিলো আমাকে। চুপিচুপি বাড়ির ছাদে গিয়ে আমরা দুজন যখন দাঁড়ালাম রবিবার দোকানের ঝাঁপ পড়ে গেছে তখন। রবিবার দোকান আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই। রাত সাড়ে নটা নাগাৎ একটা কাগজে আগুন ধরিয়ে সামনের চাতালের ওপর ফেলে দিতো রবিদা। আগুনটুকু নিভে যাবার আগে দোকানের ঝাঁপ পড়ে যেতো। তারপর বেশিরাত অবধি দোকানের মধ্যে আলো জেলে হিসেবের খাতা নিয়ে বসতেন রবিদা। সেসবও শেষ হয়ে গেছে কখন। দোকানের ভিতরের আলোও নিভে গেছে। এমন সময় অতনু আমাকে জানালো 'রুমা তোকে ভালোবাসে রে, আমি বুঝতে পেরেছি।' আমার মুখটা হয়তো কঠিন হয়ে উঠেছিলো, হয়তো দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছিলাম আমি ঘৃণায়। আমার মাথায় হাত রেখে অতনু বলেছিলো, 'এই এক অদ্ভুত ব্যাপার, এই ভালোবাসা বোঝা যায় না রে, কেবল টের পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। মেয়েরা এরকমই হয়। দেখলি না ও তোর নাম বলেনি স্যারের কাছে। ও তো তোকে চেনে, তবুও বলেনি। অথচ অপমানটাও ভোলেনি। কিরকম খাপছাড়া নারে? তুই সব মিটমাট করে ফেল।' আশ্বিনের হাওয়ায় তখন পুজোপুজো গন্ধ। উত্তরের বাবান্দায় ছোড়দির লাগানো বোগেনভেলিয়া অন্ধকারে কালো হয়ে হাওয়ার দুলছিল। ভোর রাতে শেফালির গন্ধ পাই। এমন সময়ে সব রাগ কমে যায়, কোথাও যেন একখন্ড জমির উপর গেরস্থালী গড়ে তোলে কেউ। উনুনে আঁচ ধরায়, গনগনে আগুনে ভাতের হাঁড়ি ফুটতে থাকে। অতনু যেন সে জায়গা চিনতো, কেবল পৌঁছোতে পারলো না কোনোদিন তাড়া-হুড়োয়।

প্রচুর ও দুর্লভ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হরলাল এবং হৈমবতীর বিবাহের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হোল। যখন বিবাহ হয় তখন হরলালের বয়স কুড়ি, হৈমবতীর বয়স তেরো, একটা কৌতুকী-যুগের স্মৃতি বৎসরান্তে একবার করে একটু স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবার খানিকটা বর্ণাঢ্য হয়ে ফিরে এল।

সেকালের সার্থক পরিণয়, দুটি লতা-পাদপ, মিলে একটি বিরাট সংসার প্রচ্ছায়ের সূত্রপাত—শাখাপ্রশাখায়, পত্রকিশলয়ে, ফলে-ফুলে। বরদম্পতির সাত পুত্র ও কন্যা। পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, তাদেরও সন্তান নিয়ে বিরাট পরিবার। একত্রে নয় অবশ্য। কন্যারা স্বভাবতঃই নিজ নিজ স্থানে, পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রদেরও অনেকে যুগধর্মে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন। তবে, এই পুণ্য দিনটিতে সাধ্য-মতো একত্রিত হয়ে ভদ্রাসনটিকে পূর্ণ করে তোলে। এবারে সুবর্ণ-জয়ন্তী, আরও করে তুলেছে।

একটু পূজার আকার দিল ওরা অনুষ্ঠানটিতে। প্রত্যেকবারই দেয়, এবার আরও একটু সাড়ম্বরে। স্নান সেরে দুজনে পট্টবস্ত্র পরে মাঝের পত্রপুষ্পে-সাজানো বড় ঘরটিতে এসে পাশাপাশি বসলে, মেয়ে-বধূরা যথাযোগ্য এবং যথারীতি চন্দন-সিন্দুর-অলক্তক দিয়ে সাজিয়ে দিল। পুষ্পসার মাখিয়ে দিল, তারপর দুজনের গলায় দুটি জুঁইয়ের গোড়ে পরিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে দিল।

শঙ্খধ্বনির মধ্যে বড়ছেলে সোমনাথ দুটি আংটির কৌটো দুজনের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলেন। এরপর বয়স আর অধিকারের অনুপাতে চলল প্রণাম, আশীর্বাদের পালা। কনিষ্ঠতমা পৌত্রী, কনিষ্ঠতমা সাতমাসের প্রপৌত্রকে বুকে নিয়ে যখন সর্বশেষ প্রণামটি নিবেদন করল, তখন স্মৃতির আলোড়নে দুজনের চক্ষু-পল্লবই সিক্ত। হরলাল তারই মধ্যে হেসে পৌত্রীটিকে পাশে টেনে নিলেন। হৈমবতী শিশুটিকে তুলে নিয়ে বললেন—'এ আমার কোলে থাকবে।'

যাওয়ার বেলা পিছু-ডাকা, চোখে আঁচল তুলে ধরলেন। এ পর্ব শেষ হতে আয়োজনে-সাধনে প্রায় ঘন্টা-খানেক লেগে গেল। কিছু আত্মীয়-কুটুম্বও এসেছেন, দুজনের কিছু বন্ধু-বান্ধবীও।

উঠে গেলেন ওঁরা।

সন্ধ্যার পর, দ্বিতীয় অঙ্কে অনুষ্ঠানটিকে একটু অন্য আকার ধারণ করল, নাতনি আর নাতবৌদের দল ঘিরে বসল বর-কনে দম্পতিকে, একেবারে অসপত্ন অধিকার। ঘন্টাখানেকে কুলোলও না। গীত, বাদ্য, নৃত্য, বাইরে থেকেও তো সব এসেছে নূতন-নূতন শিখে। পঞ্চাশ বছর পূর্বের সেই বাসরঘর। আজ আরও কত অভিনবত্বের সমৃদ্ধ। অভিনবত্বের কত অভিনব সম্ভারও আজ নতুন যুগ হাতে তুলে দিয়েছে।

'সেদিন তোমাদের দুজনের কি মনে হয়েছিল আমাদের বলতে হবে দাদু-দিদিমণি। দুজনকেই। না, ছাড়ছিনে আমরা .. .'—চেপে ধরেছে নাতনি নাত-বৌয়ের দল, ছেলেমেয়ে দুতরফের, ঘরের বাইরের।

একজন চোখ বড় বড় করে হঠাৎ উঠে পড়ল—'ওরে হয়েছে রে। ... না, এখন বলবে না দাদু—দিব্যি বইল—আমি আসছি, তারপর, .. '

একটু পরে টেপরেকর্ডারের একটা সেট হাতে করে উপস্থিত হোল। সেজছেলে বিদেশে রাষ্ট্রদূত-আফিসে কাজ করে, সাই-জারল্যান্ড থেকে নিয়ে এসেছে দামী সেট। বেশ একটু পুলকগুঞ্জন উঠল। ঠিক বুঝতে করতে মেয়েটি বলল—'আজ বললাম, তার-পর কাল বললাম—কৈ বাজিনি তো!—এ ফাঁকিবাজিতে একালের মেয়ে ভুলব না, অনেক প্রণাম-পাওনা আছে আমাদের হাতে।'

এখানেই কি রেহাই দিল? যখন শেষ হয়ে এসেছে এইবার সবাই একসঙ্গে বড় দালানে বসে আহার করবার ডাক আসবে, সবচেয়ে ছোট নাতিটি সে দিনের সবশেষ দুটি উপহার হাতে করে নিয়ে এল। বহুর তিনেকের বোধহয়, তবে বেশ বিহাসের্তল দেওয়া মনে হোল। বার দুই তিন ফিরে ফিরে দরজার দিকে বোধহয় ইঙ্গিত নির্দেশের জন্য চাইল বটে, তবে ভুল করল না।

দুটি নিতান্তই সাদামাটা মাটির পুতুল; একটি পুরুষের, একটি স্ত্রীলোকের। হাতের আন্দাজেই দ্বিতীয়টিকে হরলালের পায়ের কাছে এবং প্রথমটিকে হৈমবতীর পায়ের কাছে রেখে উল্লসিত করতালির মধ্যে নিজের প্রণাম নিবেদন করল মাটিতে কপাল রেখে।

একটি দিনেই পঞ্চাশ বছরের জীবন অতিক্রম করে যেন তার স্বর্ণ-শিখরটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন হরলাল। বেশ ক্লান্ত বৈকি। ওপরের খোলা ছাতে একটা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, আকাশে শুক্লা-ত্রয়োদশীর চাঁদ, পূর্ণিমা এসে গেল এবার এ-পক্ষের পূর্ণতা নিয়ে।

হাতে একটি উপঢৌকন, অন্ত যে দেশী-বিদেশী বিচিত্র উপঢৌকন, যার জায়গা হচ্ছে না, তার মধ্যে দীনতম আর মূল্যহীনটি। সেই নাতির হাতের মাটির দামের মাটির পুতুল, নিতান্তই সৌষ্ঠবহীন, কুটীর শিল্প একটি।

হাতে নিয়ে বসে আছেন হরলাল, যেন চোখ ফেরাতে পারছেন না; মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে দৃষ্টি কোন্ সুদূরে চলে যাচ্ছে, আবার এসে পড়ছে পুতুলটির ওপর।

সত্তর থেকে পাঁচ-ছয় বৎসর বাদ দিয়ে প্রায় চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বৎসর আগেকার কথা। —হাটের দিন গাঁয়ে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের ছেলে মার কাছে দুটি পয়সা পেয়ে বাড়ির চাকর মাখনের পেছনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কাতর আকুতি—হাট থেকে একটা বৌ এনে দাও মাখনকাকা—একটা পয়সা তুমিও নিও ..'

আশ্চর্য লাগছে, সেদিন ঠিক এই পুতুলই এনে দিয়েছিল মাখন—সে আজ নেই, নইলে সাক্ষী দিতে পারত। ভাবতে অবাক লাগছে হরলালের, আজ ঠিক সেই পুতুল নাতির হাতের সরস রহস্য-পুতুল হয়ে ফিরে এল। অবাক লাগছে, পুতুলের জগতে এত বিরাট পরিবর্তন—আকারে, উপাদানে—মাটি, চীনামাটি, প্যারিসলাস্টার, কতরকম ধাতু, রবার প্লাস্টিক, পলিথিন—তার বর্ণবিন্যাসে কী করে অত্যাশ্চর্য করে টিঁকে আছে এই মৃৎপুতলীটুকু। তার চেয়েও বিস্ময়কর এই ঘটনাবিন্যাস। একটি সরস রসিকতার আকারে যেন মনে করিয়ে দিতে এল—'সেই তোমার মাটির ঘর-পোষা হৈমবতী হয়ে এসে আজ তার জীবনের ভালা তোমার সামনে তুলে ধরেছে। বিস্ময়ের কূল পাচ্ছেন না হরলাল। আর সব সম্পদের ঠাঁই আছে, কিন্তু এ পরম সম্পদটুকু কোথায়, কি করে বাঁচিয়ে রাখেন?

বাংলায় এই প্রথম

মহিলাদের নিজস্ব মাসিক কাগজ

পদ্মা-গঙ্গা শিগগির বেরোচ্ছে

সম্পাদনায় :

মঞ্জুশ্রী নাথ ও শ্যামলী মহাপাত্র

উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ফিচার, রান্না-বান্না, সেলাই, বৈবাহিকী, গুপ্ত প্রণয়, খেলাধুলো, ক্যারিয়ার, ভাষাছবি বিষয়ে লিখবেন দেশ-বিদেশের মহিলারা। গ্রাহক চাঁদা সডাক বার/ছয়/তিন মাসে ১২, ৬, ৩ টাকা। এজেন্ট ও বিজ্ঞাপনদাতা আজই লিখুন। আপনার মূল্যবান লেখাটি এখুনি পাঠান। সম্পাদিকা—৩৩।৩ই, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলিঃ-৭০০০২৭।

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমি নাকি খুব উচ্চ চিৎকারে কেঁদেছিলাম। আমার জীবনের কর্ম ও সাধন ফলের মধ্যে তার চিহ্ন আছে কিনা মাঝে মাঝে আজ ভেবে দেখি আমি। সেদিন যাঁরা সূতিকা-গৃহের দুয়ারে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিরূপ হয়ে বলেছিলেন—যাঃ, মেয়ে হলো এত উঁচু গলা এ-মেয়ের!' আজও আমাদের দেশের বাড়ির গিন্নীরা বলেন—ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হবার সময় কম কাঁদে। মেয়েরা আসে জীবনে যে কান্না তারা কাঁদবে তারই সুর ধরে। কাঁদতেই আসে তারা।

লিখেছেন অমল আচার্য

রাঙা সূর্যের দিকে তাকালে চোখের মোম গলে গিয়ে জল কাটে, ফিনফিনে পাতলা অন্ধকার ঢেকে ফেলে মণি। চোখের কপাট বন্ধ হয়ে যায়। তিরস্কৃত ছেলে যেমন কঠোর বাবার সামনে নতচোখে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনভাবে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেও পা দেখা যায় না। চোখ এমনি ধাঁধিয়ে থাকে কিছুকাল। কিন্তু এই সূর্যই যখন পুব-পশ্চিমে ওঠা-নামা করে, তার রূপই আলাদা। শরীর মন জুড়িয়ে যায়। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের ব্যাকরণ একসূত্রে বাঁধা থাকলেও, তার ধরন আলাদা। ঘড়ের খেলা এক নিয়মে ঘটে না বরাবর। না ঘটুক, কিন্তু দিনরাত হতে বাধা থাকে না। দিন-রাতের আলো-অন্ধকারে জীবন কখনো দ্রুত, কখনো ধীর-পা এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে ইতিহাস, এগিয়ে চলে গোটা পৃথিবীর যা-কিছু। বীরভূম জেলার লাভপুরেও চলছিল ভাঙা গড়ার মরশুম। জমিদার প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় ঘুণ পোকা ধরেছে লাগসই। পচন শুরু হয়েছে তখন। পাশাপাশি শিল্প যুগের উদ্ভব ঘটছে ক্রমশ। জমিদারতন্ত্র শিল্পতন্ত্র অঞ্চল দখলের লড়াই-এ মুখোমুখি। আড়কলহ রেষারেষি, উল্টো পাল্টা খামখেয়ালী পণায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে মূল জমিদার বংশ, তা থেকে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য ছোটো-খাটো জমিদার। ফলত, বংশ গৌরবের সাবেকি ঐতিহ্য ছাড়া অবশিষ্ট কিছুই থাকছে না মা ভবানীর ভাঁড়ে। ওদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বণিক সম্প্রদায়, এন্তার অর্থ কৌলীন্যে ফুলে ফেঁপে উঠছে তারা প্রবল ভাবে, বস্তুত দিনকে দিন। ঘোড় দৌড়ের স্বল্পেন্দু জমিদার-বাবুরা আরো ছোটো হয়ে পড়ছেন ক্রমশ। আর হয়ে পড়ছেন দৈব নির্ভর। মনের জোর কমে গেলে, আত্ম বিশ্বাসে আগুন ধরলে, মানুষ ছোটে দেবতার সংসারে। বাছ-বিচারের প্রশ্ন থাকে না, সবার সামনেই তুলে ধরে ভিক্ষাপাত্র। লাভপুরের জমিদার-কুল তাই প্রায় সব রকম দেবদেবীকে মর্তে নামিয়েছিলেন শেষ বেশ। তাঁদের ভক্তির ঘাটতি ছিল না, জাঁকজমকেরও অন্ত ছিল না। হরেক-রকম পুজোআচ্চা লেগেই থাকত সারা বছর। দেবতারা কিন্তু প্রসন্ন হলেন না, মুখ ফিরিয়ে রইলেন। দ্রুত ঘটে যেতে লাগল, যা ঘটার। একদিকে সূর্যোদয়ের সমারোহ, উজ্জ্বল আলো ক্রমাগত গ্রাস করে ফেলছে লাভপুর, অন্যদিকে সূর্য পতন, লাভপুর ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারে। লাভপুরের স্নায়ু-স্বল্পেন্দুকালীন নবজাতক তারাশঙ্কর। জন্মকাল থেকেই বাতাসের সঙ্গে তাঁর হৃদপিন্ড ফুসফুসে ঢুকছে স্বল্পেন্দুর জীবাণু, রক্তে মিশে গিয়ে কোষে কোষে আটকে থেকেছে আমৃত্যু।

রাঢ়ের লালমাটিতে ভৈরবী আর রাধার পা

রাঢ়ের লাল মাটিতেও বিরোধের ছাপ। তার ভূগোল এবং প্রকৃতি এমন ভাবে তৈরি যাতে স্বল্পেন্দুর আভাস প্রতি মুহূর্তে। একদিকে বর্ধমান, যার গায়ে সবুজ চাদর বিনম্র বাতাসে বন্ধুর। অপরদিকে বীরভূম, গৈরিক গাত্রাবাসে কখনো দুরন্ত শাক্ত, কখনো বিনয়ী বৈষ্ণব। দোঁহে কাপালিকের মত রুক্ষতা শব-সাধনায় মাতোয়ারা। বীরভূমের মাটি থেকে রস শুষে নেয় সূর্য, মাঠের চামড়া ফেটে যায়, নদীর নাভিতে খসকি জমে। তৃষ্ণায় ফেটে যায় বীরভূমের ছাতি। বাতাসে মরুভূমির গন্ধ ভাসে। হিংস্র নেকড়ের মত ছুটে আসে দুর্ভিক্ষ, সঁচলো দাঁতের খাঁজে লুফে নেয় শিকার। আবার কখনো ক্রোধে ফুলতে ফুলতে মরুরাক্ষী দুকূলে শরীর এলিয়ে দেয়। বীরভূমের মানুষ কৃষি-নির্ভর। কৃষি ছাড়া তাদের অন্য কোনো বড় রকম জীবিকা নেই। সুতরাং অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি তাদের বাজীকর। বাজীকর ইচ্ছে মত পুতুল নাচায় সুতোর টানে। নাচতে নাচতে পুতুলদের মধ্যে

বিরোধ হয়, ঝগড়া হয়, রেষারেষি হয়। কোনো পুতুল জগচাষী, কোনো পুতুল সাঁওতাল। কম পয়সার বিনিময়ে অধিকতর শ্রম-দানের গোল্লাছুট শুরু হয়ে যায় পুতুলদের মধ্যে। তাও যদি বীরভূমের কৃষি তেজি হয়! দুর্বল কৃষি নিয়ে কাড়াকাড়ি, দাবি-দায় অনেক ভাগীদার অজস্র। কাজ নেই, মানুষ আছে। গ্রাম আছে, উপায় নেই। গ্রামের বাইরে গিয়ে কিছু করার টান টান জেদ নেই, আগ্রহও নেই। বসে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল ধরে যায়, বেতো রুগীর মত আলস্যের ক্রীতদাস হয়ে পড়ে। অলস মন শয়তানের বাপ। কাজ না থাকলেই অকাজ। রসদ নেই, অথচ রসদ না থাকলেও চলে না। দুনম্বরী খেল্ শুরু হয়ে যায় তখন অনিবার্যভাবে। কাহার, বাউরী সম্প্রদায় মানুষের মধ্যে তার স্বাভাবিক প্রমাণ মেলে। একই কারণে বাউল, কবির দল, ঝুমুরের দল, বোষ্টম-বৈরাগী এবং তাদের গোলমেলে ব্যাপারস্যাপার।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পাশাপাশি রয়েছে শাক্তসম্প্রদায়, একে অপরের বিপরীত। বীরভূমের জলবায়ুতে শাক্ত এবং বৈষ্ণব সমানভাবে বেড়ে উঠেছে। এই বীরভূমেই না কেঁদুলী এবং নান্দুর? আবার এখানেই আছে তারাপীঠ। বৈষ্ণবধর্ম লোকপ্রিয়, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে তার শেকড় পাতাল ছুঁয়েছে। কিন্তু সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর সম্ভ্রম আদায় করতে পারেনি মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম। উচ্চতর শ্রেণী শাক্তধর্মের বশ। বীরভূমের জমিদারকুল ছিলেন শাক্ত, তাঁদের প্রজারা ছিল বৈষ্ণব। এই হিসেব অভ্রান্ত না হলেও মোটামুটি নির্ভুল। খঞ্জনি, একতারা উদাসী বোল্, পদাবলী গানের সুর খই খই করত সারাক্ষণ। শাক্ত সন্ন্যাসীদের হুংকার 'চে-ৎ চণ্ডী। কালী কপালী, নরমুণ্ডমালী, বন্ধন কাট মা বন্ধন কাট' কোমল বৈষ্ণবী সুরফুর ছিঁড়ে দিয়ে রহস্যময় পরিমণ্ডল বানিয়ে ফেলত। এক-দিকে রাধাগোবিন্দ, বাসুদেব, গোপাল, নাড়ুগোপাল শালগ্রাম-শিলা, মহাপ্রভুর ভক্তশিষ্যের দল বীরভূমের কাঁকুরে মাটি তছনছ করে ঘুরত গ্রাম-গ্রামান্তর, অপরদিকে দেবী দুর্গা থেকে মনসা ওলাইচণ্ডী ভক্তঅনুরাগীরা একইভাবে পরিক্রমা করত গ্রাম থেকে গ্রাম। বাউল, বোষ্টম, শাক্ত সন্ন্যাসী ছাড়া মুসলমান ফকিররাও মানুষের দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াত। হাতে তৈরি সারেঙ্গী বাজিয়ে তারা দেহতত্ত্ব বা মা যশোদার গান গাইত, যা পরিমণ্ডল।

রাঢ়ের রুক্ষ মাটির ওপর নাগ-নাগিণীর বুকে হাঁটার শব্দ শব্দহীন ঈথারে মিশে থাকে। গোখরো, চিতি, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি বিষনীল নাগ-নাগিণীর ছোবল প্রায়শই বসে যায় তরুক ফুটো করে অমোঘ নিয়তির মত। তারা শাক্ত, তাদের কুটিল চোখের বলয়ে বৈষ্ণবী বিনয় ক্ষমাহীন বিদ্রূপে কাঁপে। তড়িৎ-প্রবাহের মত তাদের হিস্‌হিসানো জিভ হিম করে দেয় শরীরের রক্ত। রাঢ়ের ভূগোল এবং প্রকৃতিতে এই দ্বৈতভাব একরকম বৈজ্ঞানিক সত্য। এই দ্বৈতরূপী জলবায়ুতে তারাশংকরের শরীর এবং মন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনোলোকে দ্বন্দ্ব, তাঁর মানসিক জগৎ তাঁর দ্বন্দ্বময় থেকে গেছে জীবৎকাল।

মা, বাবা এবং অন্যান্য

মহানবমীর দিন বেলা একটার সময় তারাশংকর ইন্দ্র-পতন দেখলেন সচক্ষে। তাঁর বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেলেন। 'ইন্দ্রপতন' বললাম এই কারণে, তারাশংকরের জীবনে তাঁর পিতা ছিলেন ইন্দ্রের মতই বিশাল পুরুষ। পুরনো ধ্যান-ধারণা, সংস্কার এবং বোধাবোধে অহর্নিশ তপ্ত থাকলেও হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনোলোকে ছিলেন বিষণ্ণ পুরুষ। সঠাম পৌরুষ-দৃপ্ত বাহ্যিক চেহারায় সেই বিষণ্ণতার ছাপ অবশ্য চাক্ষুষ হত না,

তবে তার গোপন অস্তিত্ব দাগ কেটে বসেছে ডায়েরীর পাতায় পাতায়, তাঁরই লেখা ডায়েরী। তারাশংকরের পিতার জীবনে কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, অন্তত অনুভবতেন তিনি। বাল্যকালে প্রবল মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও, নানা কার্যকারণে, তাঁর জীবন থেকে পড়াশোনার পাট চুকে যায় অকস্মাৎ। এ-ক্ষোভ তাঁর আমৃত্যু ছিল। নিজের অপূর্ণ বাসনা পুত্রের মধ্যে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। ডায়েরীতে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে লিখে গেছেন তিনি : দেখ বাবা তারাশংকর—অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশ-প্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে।.... ব্যবসায় করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়— যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের।'

ডিগ্রী যদি শিক্ষার একমাত্র মাপক হয়, তাহলে তাঁর তোল্লা ভারি হয় না। কিন্তু শিক্ষার চাবি কাঠি যদি লক্ষ্মী থাকে জ্ঞানার্জনে এবং বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে, তাহলে তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন, তাঁর পড়াশোনার অন্ত ছিল না। সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় রচিত বহু রকম ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন তিনি। রামায়ণ, মহাভারত ভাগবত, নানারকম তন্ত্র গ্রন্থ পড়তেন নিয়মিত। মহাকবি কালিদাসের কাব্য থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপ-ন্যাস পর্যন্ত গভীর আগ্রহে পড়েছেন তারাশংকরের পিতা। এছাড়া সমকালীন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। হিন্দু পত্রিকা, বঙ্গবাসী, হিতবাদী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার পাঠক ছিলেন তিনি। আসলে জ্ঞানতৃষ্ণার প্রচণ্ডতা না থাকলে এ রকম আগ্রহ সৃষ্টি হয় না। তবু তাঁর মধ্যে দুঃখ ছিল, যা বলা যায় হীনমন্যতাবোধ। তখনকার দিনে দাপট হচ্ছে ইংরেজী ভাষার, যেহেতু ইংরেজী রাজভাষা। সদা দু পাতা ইংরেজী জানা সরস্বতীর লেটেস্ট সন্তান-সন্ততিরা ইংরেজী না-জানা বয়স্ক সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক স্বীকারেও গরবাচ্ছ, মূর্খ ভাবতেন তাঁদের। তাঁদের উপেক্ষা এমনি কুটিল ছিল যে তারাশংকরের পিতার মত বাক্তিত্বপূর্ণ উচ্চশির ব্যক্তিদের চওড়া বুকের পাটাতেও তা বিপুল ভাবে ঘা মারত।

আরো এক ধরণের দুঃখ ছিল তাঁর, যা তাঁকে কুরে কুরে খেত নিয়ত। তাহল, কুলাগত অর্থহীন হয়ে পড়ার দুঃখ। চোখের সামনে দেখছেন হঠাৎ ভুঁই ফোঁড় ধনীর আকাশ ছোঁয়া ঘর ঘর করে বেড়ে যাওয়া, আর তিল তিল অনুভব করছেন নিজের কুলিক নিঃস্বতার যন্ত্রণা।

তারাশঙ্করের পিতা বাস্তব জীবনে মর্মান্তিক পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। তাহলেও পিতার স্মৃতি তারাশঙ্করের মনে গভীর ভাবে চেপে বসেছিল, যদিও পিতার মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র আট।

তারাশঙ্করের মা প্রভাবতী দেবী ছিলেন পাটনার মেয়ে, আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির আচরণে চরিত্রবতী। শহুরে ভাবনা-চিন্তায় পরিচালিত প্রভাবতী পল্লীগ্রামের জীবন ও তার পরিমণ্ডল নিলিপ্ত ধ্যানে অপরূপ করে তুললেন এক আশ্চর্য প্রতিভায়। ছন্নছাড়া সংসারে শ্রী ফুটে উঠল। সাবেকি নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান, সাংসারিক রীতি নীতি এবং জিনিসপত্তর সব কিছুই রঙ পেল আধুনিকতার, পরিচ্ছন্ন রুচির এবং সীমাহীন মমতায়। পুরনো আদল নতুন রক্তযোগে ভাস্বর্যবান হয়ে উঠল, তার দীপ্তিই আলাদা। একটা নিঃশব্দ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল লাভপুরের একটা ছোটো-খাটো জমিদার গৃহে। প্রভাবতী ছিলেন অসীম সাহসী, তাঁর সাহসিকতার ও দুর্জয় মনোবলের অনেক চমকপ্রদ কাহিনী আছে। মায়ের জ্যোতির্ময়ী ভাবমূর্তি তারাশঙ্করের জীবনে নিঃশ্বাসের মত অমোঘ ছিল। মাবাবায়ের মানসিকতা রেল লাইনের মত সমান্তরাল হলেও বিরোধহীন, তারাশঙ্করের জীবনে 'অর্ধনারীশ্বর বিগ্রহ', তাহলেও এক অপরূপ স্বপ্নের জল ছবি এঁটে থাকে। না হলে, 'অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমীলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্ত দৃষ্টি শুভ্র বাস পরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ', তারাশঙ্করের একথা মিথ্যে হয়ে যায়।

পিসিমা শৈলজাদেবী তারাশঙ্করের জীবনে আরেকটি চরিত্র, যাঁর প্রভাব ধিকি ধিকি তাঁর রক্তে সেঁতে মিশে গেছে বরাবর। প্রভাবতী স্নেহময়ী, শৈলজাও স্নেহময়ী—তবে তাঁর স্নেহে আগুনের আঁচ ছিল, প্রয়োজনে যা লক লক করে ওঠে কঠিন অভিমানে। শৈলজার শরীর-মনে জমিদার বংশীয় দাপট, ধিক্কার এবং ক্ষিপ্রতা। মা প্রভাবতী এবং পিসিমা শৈলজার চরিত্রে বৈপরীত্য থেকেই যায়।

পিতৃহীন বালক তারাশঙ্কর মা আর পিসিমার স্নেহ ও শাসনে বেড়ে উঠছিলেন। কিন্তু ঘরের বাইরে যে আরেকটি জগৎ ছিল—তা বীরভূমের মাটির মতই রুক্ষ, রহস্যময়, নাগ-নাগিনীর মতই হিংস্র। প্রতিকূলতার ঘূর্ণিচক্রে তাঁর মন-মেজাজ বার বার আহত হয়েছে। সোনালী রোদ্দুরে যে অসংখ্য জীবাণু মিশে থাকে, এবং তাদের বিক্রম যে যথেষ্ট মারাত্মক, তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগলেন তারাশঙ্কর। ঘরের জগৎ এবং বাইরের জগতে যে কতখানি দ্বন্দ্ব, তা তাঁকে বুঝে নিতে হয়েছিল এক সময়। 'নিজের সংসারে মা-পিসিমার স্নেহ ছায়ার গন্ডী পার হলেই বিরূপ সংসার। আট বছর বয়সে যে ছেলে বাপকে হারিয়েছে সে তো হতভাগ্যই। সে বাইরে হয় বিরূপতা নয় অনুকম্পার পাত্র। জমিদার প্রধান গ্রামে সকলেই মৌখিক সমবেদনায়, অন্তরালে তীক্ষ্ণ লুব্ধ নখর উদ্যত করে বসে আছেন এই পুরুষ অভিভাবকহীন নাবালকদের জমিদারী ও ভূ-সম্পত্তি কেমন ভাবে গ্রাস করবেন তারই কল্পনায়।'

ঘর বাইরের দ্বন্দ্বময় সাহচর্যে বেড়ে ওঠা তারাশঙ্করের মধ্যে স্বাভাবিক তারাশঙ্কর এভাবেই বেড়ে উঠেছিলেন।

মানুষের নক্ষত্রমালা

নক্ষত্র মালার সঙ্গে মানুষের দূরত্ব, দূরত্বের বিশালতা হাতের মাপে ছোটো হয়ে যায় মানুষের বিস্ময়ভরা চোখের খেলায়। কিন্তু রহস্য ঘোচে না। রহস্য ঘোচে না বলেই এত কৌতূহল, কল্পনার উধাও ছুট। মানুষও নক্ষত্রের মতই রহস্য-জীব। কিন্তু তাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বোঝা যায়। হয়ত কেন, নিশ্চিত-ভাবে তাকে চেনা যায় বেশি করে—যদি সুযোগ থাকে। কেবল সুযোগ হলেই চলে না, প্রয়োজন অশেষীন আগ্রহ। মানুষের নক্ষত্রমালাকে চেনা-জানার সুযোগ এবং আগ্রহ দুইই প্রবল ছিল ছিল তারাশঙ্করের। তিনি যত রকমারি গ্রাম্য এবং লৌকিক মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, তেমন করে আর কেউ মেশেন নি আগে।

ধর্মের ধ্বজা বহন করে এক শ্রেণীর মানুষ পেট চালাত। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, আউল-বাউল, শাক্ত সন্ন্যাসী, মুসলমান ফকির, গরুমারা—এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। বিচিত্র তাদের ধরণ-ধারণ, পোশাক-আশাক, জীবন যাপনের পদ্ধতি—যা তারাশঙ্করকে গভীর ভাবে মনোযোগী করত। পটুয়ারা আসত। গান গেয়ে রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, গোবাঙ্গলীলার ছবি দেখাত। যমরাজার দরবার দেখাত। পাপী-তাপীরা নরকে কিরকম যন্ত্রণা ভোগ করে তার ছবিও দেখাত। বর্ষার সময় লাভপুরে দেশী বেদেরা আসত কেউটে সাপ ধরতে। সাপ খেলা ও বাঁদর নাচ দেখিয়ে তারা রোজগার করত। পুরুষ বেদেরা ছিল পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত, বেদেনীরা ছিল ইস্পাতের মত ধারালো। জাত বেদেরা বড় রকমের দল বেঁধে গৃহ পালিত জন্তু-জানোয়ারের বাহিনী নিয়ে এসে গ্রামের প্রান্তসীমায় তাঁবু খাটাত। তাদের চেহারাপাতি ছিল ঘোর দর্শন। শেয়াল, গোসাপ, ইঁদুর, খরগোস, সজারু নানারকম জীবজন্তু শিকার করে খেত তারা। মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করত। হাতে তৈরি জিনিসপত্তর বেচত। ইরাণের বেদেরা মোটা-মুটি সভ্য ছিল। মেয়েদের সাজ পোশাকে জৌলুষ ছিল, তারা দেখতেও ভারি সুন্দর। তাদের বেসাতি ছিল ছুরি কাঁচি। আরো এক রকম বেদে আনাগোনা করত। তারাও দল বেঁধে এসে ছাউনি ফেলত গ্রামের শেষ মুড়োয়। 'কপালে তিলক, গলায় তুলসী, রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমন্ডলু' নিয়ে এরা 'কেউ সাজত সন্ন্যাসী, কেউ সাজত ব্রাহ্মণ পন্ডিত।' এদের ভিক্ষের বুলি ছিল, 'সীতারাম, সীতারাম। বাড়ির মঙ্গল হোবে রাম। সাধু বিদায় করো রাম। রাজা পাবে, পুত্র পাবে, মনের মত পত্নী পাবে।' বীরভূম অঞ্চলে এক শ্রেণীর বাজীকর ছিল, তারা ম্যাজিক দেখিয়ে পয়সা রোজগার করত। মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে বের হত। মেয়েরা নাচ গান করত, পুরুষরা ঢোল বাজাত। সাজ-পোশাকে মেয়েরা ছিল শৌখীন, দস্তুরমত চটকদারী। নাচ গানে, ছড়া কেটে, কথার তোড়ে যেমন করেই হোক না কেন তারা কিছু না কিছু আদায় করে ছাড়ত।

তারাশঙ্করের কাল ছিল দরবেশ সাপুড়ে বেদে পটুয়ার সমাকুল। ভূত প্রেত ডাইন ডাকিনী দেশে তখন প্রচুর। স্বর্ণ তাঁর গাঁয়ের এক নামকরা ডাইন ছিল। নিরবন্ধব, সহায়সম্বলহীনা দরিদ্র স্বর্ণ গ্রামের চোখে ডাকিনী বনে গিয়েছিল এক সময়। তার সম্পর্কে রোমহর্ষক কত কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরত তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার বেদনার খবর রাখত না কেউ। তারাশঙ্কর তার সম্পর্কে বলেছেন, 'দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ, পৃথিবী পরিত্যক্ত স্বর্ণ।'

আরো বহু বিচিত্র মানুষ দেখেছেন তিনি। কাহার, বাউরী, কবির দল, ঝুমুরের দল, চাষী ভাগচাষী, সাঁওতাল, শ্রমিক কুলি-কামীন, জমিদার শ্রেণীভুক্ত প্রজা, ব্যবসায়ী দেশসেবক গ্রামসেবকের

বিপ্লবী প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে তাঁর ছিল নাড়ির যোগ। প্রতিদিনই এদের কারুর না কারুর বা কোন দলের না কোন দলের সঙ্গে দেখা হতই। আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড় করে এসেছে ঠিক এই কারণেই।'—বলেছেন তারাশঙ্কর।

মানুষের নক্ষত্রমালায় বিচরণ করতে করতে তারাশঙ্কর বিপরীত চরিত্রধর্মী মানুষকে সমান আগ্রহে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর চরিত্রগুলো কোনো এক বিশেষ তক্‌মামারা শ্রেণী থেকে আসেনি, এসেছে বিভিন্ন রকম থাকে। এখানেও সেই দ্বৈতভাব, যা তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে অনিবার্য।

আদি কবি

সাহিত্যের ঘরসংসারে ঢুকতে গেলে দোর আগলে বসে থাকে পদ্য। তাকে একটু আদরটাদর না করলে পথ ছাড়তে চায় না। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যিকের ঘরের খবর নিলে দেখা যাবে, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই একটু আধটু পদ্য লিখেছেন প্রথম জীবনে। তারপর তাঁরা পথ বেছে নিয়েছেন, গদ্য না পদ্য। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অনেক কাল আগের কথা, আদিকবি বাল্মীকি ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটিকে হঠাৎ হত হতে দেখে শোকাহত হন। তাঁর মুখ দিয়ে উৎসারিত হয়েছিল কবিতা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সেই থেকে তিনি আদিকবি। তারাশঙ্করও কবিতা রচনা করেছিলেন প্রায় অনুরূপ এক করুণ মুহূর্তে। তিন বন্ধুতে খেলছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেখলেন, একটা পাখির বাচ্চা পড়ে গেল মাটিতে। কাছেই গাছ, গাছে পাখির বাসা। বাচ্চাটিকে বাঁচানোর চেষ্টা হল অনেক, কিন্তু বাঁচল না; কবর খোঁড়া হচ্ছিল তার জন্যে। এমন—সময় পাখির মা এলো। পক্ষিমাতার শোক দেখে বিমূঢ় হলেন তারাশঙ্কর ও তাঁর বন্ধুরা। তাঁদের মত বুকে বিঁধল দুঃখ। তাঁর বন্ধু পাঁচু ঘরের দরজায় খড়ি দিয়ে দুলাইন কবিতা লিখে ফেলল :

তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি
তার মা আসি কাঁদিতেছে কেঁউ কেঁউ করি।

শোক উথলে উঠল তারাশঙ্করের বুকে। প্লাবিত হলেন তিনি। তিনিও তার নিচে লিখে দিলেন :

পাখির ছানা মরে গিয়েছে
মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
মাটির তলায় দিলাম সমাধি
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

আঠার থেকে বিশ বছরেরও বেশি পদ্যটি ঘরের দরজায় অম্লান ছিল। তারাশঙ্করের বয়েস তখন আটের নিচে। ব্যাপারটা সামান্যই। বাল্যকালে এরকম ছড়া বা পদ্যের টুকরোটাকরা অনেকেই লেখে বা মুখে মুখে রচনা করে। কিন্তু তারাশঙ্করের জীবনে এর একটা অন্য অর্থ ছিল। চার লাইন পদ্য লেখার পর থেকেই তাঁর মধ্যে নেশা ধরে গেল। গ্রামের নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় পুজোর সময় কাগজে কবিতা লিখে দেয়ালে সেঁটে দিতেন। পর বছর বাল্যবন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে আগমনী কবিতা রচনা করলেন তারাশঙ্কর। তার কয়েক লাইন এরকম ছিল :

শারদীয়া পূজা যত নিকটে আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল
... ...
চারিদিকে বাজিতেছে কত ঢাকঢোল।

আমাদের প্রকাশিত অমর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

কীর্তিহাটের কড়চা (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)—৩০-০০, গল্পনাবেগম—১২-০০
কীর্তিহাটের কড়চা (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে)—৩০-০০, সংকেত—১৭-০০,
১৯৭৮—৮-৫০, অভিযান—৯-০০, উত্তরায়ণ—৭-৫০, কবি ১২-০০,
রাধা—১৫-০০; যোগভ্রষ্ট—৯-০০, না—৬-০০, সন্দীপন পাঠশালা—৯-০০,
সখী ঠাকরুণ—২-০০, কালিন্দী—যন্ত্রস্থ

তারাশঙ্কর রচনাবলী

আনুমানিক ২৫টি খণ্ডে সমাপ্ত
এ পর্যন্ত ১৫টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।
লেখকের প্রতিকৃতিসহ প্রতিটি খণ্ড রয়াল সাইজে
সুন্দর ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই

প্রতিটি খণ্ডে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও মনীষীগণের সুদীর্ঘ ভূমিকা

১মখণ্ড—২০-০০, ২য় খণ্ড—২৪-০০, ৩য় খণ্ড—যন্ত্রস্থ, ৪র্থ খণ্ড—২৫-০০; ৫ম খণ্ড—২০-০০; ৬ষ্ঠ খণ্ড—২০-০০, ৭ম খণ্ড—২০-০০, ৮ম খণ্ড—২০-০০; ৯ম খণ্ড—যন্ত্রস্থ, ১০ম খণ্ড—২০-০০, ১১শ খণ্ড—২০-০০; ১২শ খণ্ড—২০-০০, ১৩শ খণ্ড—২০-০০, ১৪শ খণ্ড ২০-০০, ১৫শ খণ্ড— ২০-০০।

ষষ্ঠদশ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯। ৩৪৩৪৯২
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-৭৩ ৩৪৮৭৯১

এই কবিতা ছাপা হল কলকাতার সাহেব কোম্পানির ছাপাখানা 'কালি ডোনিয়ান প্রেস' থেকে। লক্ষ্মীনারায়ণের ঠাকুর্দা ছিলেন ওই প্রেসের বড়বাবু। কবিতাটি তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল লক্ষ্মীনারায়ণ। ছাপা হতে অসুবিধা হল না। ছাপানো কবিতা বিলি করা হল। সাহিত্যিক হিসেবে সবার সামনে আত্মঘোষণা করলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু সমান কদর, মিলল না। মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। তারাশঙ্করের পিতা তখন মৃত্যুশয্যায়। পদ্যটা পড়ে তাঁর ক্লিষ্ট পাংশুটে মুখে হাসি ফুটেছিল, প্রসন্ন হাসি। সস্নেহে জিজ্ঞেস করেছিলেন ছেলেকে : তুমি কতটা লিখেছ, নারাণই বা কতটা লিখেছে?' অনেকে বিদ্রূপ করেছিলেন বালক-কবিশেখরকে। যেমন : 'পদ্য! কবিতা! কে লিখে দিলে; কি থেকে টুকলে?' এরই মধ্যে ডিম ফুটে কালিদাস-হংস বেরুল নাকি?' তাঁর বন্ধু দ্বিজপদ পবের মুখে ঝাল খেয়ে তারাশঙ্করকে ভূষিত করল 'কপিবর' আখ্যায়। আবার এই দ্বিজপদই তাঁর কবিতার স্বপক্ষে ডিম্ পাড়ায় গিয়ে মাবদাঙ্গা করে ফিরে এলো। অবশ্য অনেকে মন খুলে প্রশংসা করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেকালের নামকরা নাটকোর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর দাদা অতুলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

মহাকালের রথের চাকা থেমে থাকে না আপন নিয়মে সবকিছু উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে। বালক তারাশংকরের মধ্যে সাহিত্যের যে ক্ষুধা জেগে উঠেছিল, তার সমাপ্তি তাঁর শারীরিক মৃত্যুতে শেষ হল। তিনি কবি হিসেবে আত্মঘোষণা করে থেমে পড়েননি, বরং এগিয়েই যেতে লাগলেন। তেরশো বত্রিশ সালে বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে কবিতা পাঠের মাধ্যমে তিনি স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে হাঁটা পথে নানুর হয়ে বাড়ি ফিরলেন। পথের অভিজ্ঞতা-বিষয়ক একটা কবিতা লিখলেন, 'নানুর পথে'। কবিতাটি জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ছাপা হয়। তার দু-পংক্তি এরকম :

কতদূর কতদূর, মধুগীতি ভরপুর
পরীরীতি-সায়র-তীরে মধুর নানুর।

তারাশংকরের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিপত্র' তাঁর শ্যালক চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রযত্নে উনিশশো ছাব্বিশ সালে ছাপা হয়। প্রকাশক চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা ছিল আট। বি, লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা। ছাপা হয়েছিল ইকনমিক প্রেসে, তেইশ মীরজাফর লেন, কলকাতা, মুদ্রাকর কানাইলাল দাস। লাল কালিতে ছাপা ষাট পাতার বই। মূল্য ছ' আনা। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

তখনকার দিনের মঞ্চসফল নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তারাশংকরের গ্রামের লোক। তিনি তারাশংকরকে স্নেহ করতেন খুব। তাঁর সাহচর্যে এসে এবং উদ্দীপনায় নাটক লেখায় ঝুঁকে পড়েন। অবশ্য গ্রামের আবহাওয়া ছিল নাটুকে। অনেকেই নাটক লিখতেন। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল। ঘন ঘন নাটক মঞ্চস্থ হত। তারাশংকর তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ নিয়ে একখানা নাটক লিখলেন—মারাঠাতর্পণ। গ্রামের মঞ্চে নাটকটি হই-হই করে অভিনীত হল। কলকাতার আর্ট থিয়েটারের তখন স্বর্ণযুগ। সেখানে নাটকটি অভিনীত করার জন্যে নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল। ভাবাবেগে বিচলিত তারাশংকর স্ক্রীপটি উনুনের আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন।

এবং সহ-সম্পাদক স্বয়ং তিনি, তাঁর 'সোতের কুটো' নামীয় গল্প প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে দ্বন্দ্বমুখর টানাপোড়েন পার হয়ে অবশেষে সঠিক পথের সন্ধান পেলেন তিনি।

যখন রাজনীতিক, প্রসঙ্গ : প্রশ্ন করো

যে মানসিক প্রস্তুতি তাঁর মধ্যে তৈরি হচ্ছিল অগোচরে, সেই প্রস্তুতি তাঁক্ষ্ণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করত না—যদি না রাজনৈতিক জীবনের মোহমুক্তি ঘটত তাঁর। সেটা ঘটল উনিশশো তিরিশ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল মুক্তির সময়। কিন্তু তার আগেরও ইতিহাস আছে।

তারাশঙ্করের জন্ম আঠারশো আটানব্বই-এ, বঙ্গ ভঙ্গের ঠিক সাত বছর দু মাস আগে। তাঁর সাত বছর দু মাসের জীবনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবাহ। গোটা দেশ জুড়ে সেই প্রবাহ ঘূর্ণির মত বয়ে গেছে। তাছাড়া আরেকটি ঘটনা তাঁর স্মৃতিপটে আটকে ছিল। গ্রামের ইংলিশ স্কুলের থার্ড মাস্টারকে অন্যায় ভাবে অপসারণ করা হল। স্কুল পরিচালন সমিতির সদস্য হিসেবে তাঁর বাবা এই কাজের ঘোর বিরোধিতা করলেন, এবং কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোঁ ছাড়লেন না, থার্ড মাস্টার অপসারিত হলেন। সেই স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। তাঁর পিতা অনুষ্ঠান বর্জন করলেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে বোঝানো হলো, রাজ প্রতিনিধিকে এটা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত অসম্মান দেখানো। ক্ষিপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট সদরে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতাকে হুকুমনামা পাঠালেন, স্থানীয় সেটলমেন্ট ডেপুটির সামনে তাঁকে স্কুল-প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ইংরেজ সরকারের খিদমদগার প্রবল প্রতাপশালী ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশ অমান্য করার সাহস পেলেন না তারাশঙ্করের পিতা। ক্ষমা চাইলেন। এই অপমানের জ্বালা তাঁর বুকে ক্ষত হয়ে রইল। ক্ষয়িষ্ণু অপমানিত জমিদার হরিদাস দেওঘরে গিয়ে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে কেঁদে বললেন—'রাজার হুকুমে এই অপমান, এর প্রতিকার তুমি ভিন্ন আর কে করতে পারে।' তাঁর অসহায় আত্মসমর্পন বালক তারাশঙ্করের চোখ ভিজিয়ে তুলে ছিল। তাই তারাশংকর বলেছেন : 'তারই প্রভাব আমার জীবনে কাজ করেছে। রাজার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী বিদ্রোহী মনোভাব এই ভাবে সৃষ্টি হল তার সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, এর মধ্যে হবে আমার জীবনের সার্থকতম বিকাশ।'

ইংরেজ প্রভুত্ব অপসারণ করে দেশকে স্বাধীন করার আগ্রহ জন্মে যায় তাঁর মধ্যে প্রবল ভাবে, যখন তিনি বিপ্লবী নলিনী বাকচির সাহচর্যে আসেন। তারাশঙ্কর রাজনীতির সংসারে ঢুকে পড়লেন। উনিশশো একুশ সালের গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গ্রাস করে নিল তাঁর মন। পুলিশের খাতায় নাম উঠল তাঁর। টিকটিকি লাগল পেছনে: লর্ড সিনহা রোডের বড়বাবু পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে মনোযোগী থাকলেন।

রাজনীতি, না সাহিত্য—এ নিয়েও তাঁর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল। একবার ভেবেছেন রাজনীতিই বুঝি তাঁর লক্ষ্য, তাই রাজনীতির সঙ্গে বিপুলভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন, গ্রুপ পলিটিকসে পর্যন্ত এবং তার ফয়সলার জন্যে ছুটতে হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র অবদি। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গ্রাম সেবা, সমাজ সেবা। আবার ক্লান্তি, আবার হতাশা। চূড়ান্ত মোহভঙ্গ।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

করে, বলা যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল হল, তবে কংগ্রেসের সভ্য থেকে গেলেন। রাজনীতির অশরীরী আত্মা তাঁর ঘাড়ে চেপেই রইল।

রাজনীতির প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তখন তাঁর সম্পর্কে একটা প্রশ্নের মীমাংসা সেরে নেয়া যাক। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার তারাশঙ্কর আলোচনা প্রসঙ্গে একজায়গায় বলেছেন, 'দশচক্রে ভগবান ভূত—দুই চারিজন অতি উৎসাহী আধুনিক 'প্রগতি'-বাদীদের দলে পড়িয়া মনে হয় এক সময়ে তারাশঙ্করও একটু মোহগ্রস্ত হইয়া, সহজাত রুচির মত তাঁহার মানসিক ধর্মের উপরে একটু কমিউনিজমের প্রলেপ লাগাইবার পথে চালিয়াছিলেন।' ভাষাচার্যের মধ্যে যে কমিউনিজমের জুজুর ভয় ছিল (থাকতেই পারে, অনেকে তো হাতীকেও সাপ কল্পনা করে), বা অহেতুক তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ব্যাপার ছিল কমিউনিজম, বা কমিউনিস্ট মাত্রই ব্যঙ্গের পাত্র এই সিদ্ধান্ত ছিল—তা স্পষ্টতই প্রমাণ হয়ে যায় উদ্ধৃত মন্তব্যে। তাতেও গোলমাল নেই, যেহেতু মানুষ নিজের পায়ে হাঁটে (ভাবশ্য পায়ে তাগদ থাকলে), নিজের বুদ্ধিতে চলে, বোধাবোধে জ্ঞানী হয়, কিন্তু 'মোহগ্রস্ত' হলেই 'মানসিক ধর্মের উপরে একটু কমিউনিজমের প্রলেপ' লাগাতে হয়—কোন্ বৈজ্ঞানিক সত্যের পর নির্ভর করে এই যুক্তি দাঁড়ায়? তবে কি ধরে নিতে হবে, পৃথিবীতে অকমিউনিস্টরাই একমাত্র মোহমুক্ত মানুষ?

তারাশঙ্করও কি এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন? হয়ত ছিলেন, না হলে তিনি বলবেন কেন,—'চৈতালী ঘূর্ণির ভবিষ্যদ্বক্তা সত্য হয়েছে বলেই মনে হয়। এ নিয়ে অনেকে আমাকে মার্কসবাদে প্রভাবান্বিত বলে ঠাউরেছেন। কিন্তু মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়িনি। এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র।'

অথচ তিনিই আবার বলছেন, 'হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম। উনিশশো ষোল-সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে এইটুকুই বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেইদিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম। সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখনকার গুমটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এর জন্যে মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে। তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু, জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত হবার অলংঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সেই শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে মানুষকে, সেই সত্যকে প্রথম জেনেছিলাম প্রথম—তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার

তারাশঙ্করের একটি ভাস্কর্য

তাঁর এই যুক্তিও কিন্তু মনের সংশয় সরিয়ে দেয় না। আমি যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, আমার কাছে তা সত্যই। তবে সেই সত্যে পৌঁছনোর পথ আমার বিচারে সঠিক-বেঠিক হতেই পারে। তাই বলে পুরো ব্যাপারটা কখনোই মিথ্যে হয়ে যায় না। যদি মিথ্যেই না হল তবে প্রতি বীতরাগ জন্মায় কি করে? বা, কেউ যদি তাকে সেই তত্ত্বে বিশ্বাসী বলে ঠাউরে থাকে, তাতে তাঁর বিচলিত হবারই বা কি কারণ থেকে যায়? কি এসে যায় তাঁর মত একজন স্পার্টাকান উচ্চতার শিল্পীর, লোকের ভাবনা ভাবতে? তবে কি তাঁর বিশ্বাস এবং স্বীকৃতির মধ্যে কোনো বিরোধ থেকে গেছে?

যখন সাহিত্যিক, প্রসঙ্গ ঃ পার্টাকান উচ্চতার পরিমাপ

এই বিশাল ব্যাপ্ত দ্বন্দ্বময় অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবশেষে তারাশঙ্কর সাহিত্য জগতে উঠে এলেন। যথার্থ অর্থে তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' তেরশো চৌত্রিশ সালে দীনেশরঞ্জন দাস সম্পাদিত 'কল্লোল'-এর ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নয়টি গল্পের সংকলন 'রসকলি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তেরশো পঁয়তাল্লিশ সালের বৈশাখ মাসে. পশ্চিম। দুই, মোহনবাগান রো, কলকাতা—হয়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউসের প্রযত্নে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়। 'রসকলি' গল্পগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন সজনীকান্ত দাস। আর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' তেরশো ছত্রিশ সালে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'উপাসনা' পত্রিকায় কার্তিক-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ পায়। অবশ্য তিনি 'চৈতালী ঘূর্ণি'র

ভাবে হয়েছে যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই, যা বিশ্বসাহিত্যের সমকক্ষ। তারাশংকরের সমগ্র সাহিত্য আলোচনা বর্তমান লেখকের লক্ষ্য নয়, তার সুযোগও কম। তাঁর উপন্যাসের কিছু লক্ষণ এবং বিষয় আমার আলোচনা ছুঁয়ে যাবে মাত্র।

(ক) তারাশংকরের অধিকাংশ মহৎ উপন্যাসের গল্প-কথায় পূর্বাপর একটা বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়, তা হল একটা পুরনো সুরে বাঁধা জীবনের পরিমণ্ডলে একট নতুন সুর বেজে উঠলে থিতু পরিমণ্ডলটাকে কিভাবে ভাঙচুরের পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং নতুন সুরবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে—তার পরিণতি দেখানো। নতুন পুরনোর দ্বন্দ্বে যে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তার পটভূমিকে ভিত্তি করেই তাঁর উপন্যাসের ন্যাবাস জমে ওঠে। ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, গণদেবতা, আরোগ্য নিকেতন এই মহৎ উপন্যাসগুলো পাঠ করলে প্রসঙ্গটির সত্যতা মিলবে। তারাশংকরের বিপুল অভিজ্ঞতা দ্বন্দ্বময়, দ্বন্দ্বময় পরিবেশে তার মানসিক গঠন, জীবনবোধের উদ্ভব—স্বভাবতই তাঁর সাহিত্যের কাহিনীবস্তুর মধ্যেও সেই একই দ্বন্দ্বময় অস্থিরতা। তার সফলতা অসফলতা দ্বন্দ্বময় অস্থির-তার সাহিত্যিক রূপায়ণে। কোথাও তিনি নতুনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, কখনো হাত আড়ষ্ট থেকে গেছে, কিন্তু পুরনোর প্রতি তাঁর মমতা আছে, থেকে গেছে দীর্ঘশ্বাস। এটাই স্বাভাবিক। কেননা, তার রক্তে মিশে আছে দ্বন্দ্বময় সন্ধি-ক্ষণের উপকরণ, যা বৈজ্ঞানিক সত্য।

(খ) তাঁর নায়ক চরিত্রগুলোও (কিছু ব্যতিক্রম আছে) ঐতিহ্যছিন্ন নয়। প্রাচীন বাংলা কাহিনী কাব্যের নায়কদের একটা প্যাটার্ন ছিল। তারা বীর্যবান, রূপবান, ব্যক্তিত্বময়, বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু—নানারকম গুণের মিশ্রণে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্র-নাথেও দেখি তার প্রতিভাস। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়করা অভিজাত, কেউ রাজা বা জমিদার, বা সমান মর্যাদাসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথের নায়করা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তারা বুদ্ধিবান, শিক্ষিত, মেধাবী, বুদ্ধিদীপ্ত বা আদর্শপরায়ণ। শরৎচন্দ্র আরেকটু সরে গেলেন। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো অ্যাভারেজ মানুষ। তারাশংকরের মধ্য-বিত্ত নায়করাও অভিজাত শ্রেণীর। তাদের চরিত্রে সবরকম গুণের সমাবেশ। শিবনাথ, প্রবীর, অহীন, দেবু, কৃষ্ণেন্দু প্রভৃতি চরিত্র সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে গ্রামীণ পরিবেশে লৌকিক জলবায়ুর মধ্যে তাঁর নায়করা বেড়ে উঠেছে বলে, তারা রূপকথার গল্পের আদল পেয়ে যায়। তবে যেসব নায়ক মধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসেনি—তারা স্বতন্ত্র ধরনের। ভালমন্দ মিশিয়ে তারা, অনেক ক্ষেত্রে প্যাগান—যেমন বনোয়ারি, নিতাই, গোষ্ঠ।

(গ) তারাশংকরের অধিকাংশ নায়ক অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাবে পীড়িত নয়। জীবনের পুরনো ফ্রেমে পরিবর্তনের আঘাত ঘটানোর জন্যই তাঁরা ব্যবহৃত হয়েছেন। পরিবর্তনের দলে পুরনো ফ্রেমে আঘাতের প্রতিক্রিয়া কতখানি তা বলার জন্যে তারাশংকর উন্মুখ। কিন্তু যারা রূপান্তর ঘটাতে চায় (করালী, অহীন, শিবনাথ ইত্যাদি) তারা থেকে যায় কিছু পরিমাণে অমনোযোগী। তাদের মনোলোকেও যে দ্বন্দ্ব টানা-পোড়েনের কিয়া-প্রতিক্রিয়া চলা সম্ভব, লেখক সে সম্পর্কে নীরব। এই জন্যই (সম্ভবত) হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, কালিন্দী—বনোয়ারি বা ইন্দু বাঘের গল্প থেকে যায়—করালী বা অহীন গৌণ হয়ে পড়ে। এই জন্যই আরোপিত গান্ধীবাদ গ্রহণ করে কেন, করালী কেন, দুটো বিষের মধ্যেও কোনো অপরাধ খুঁজে পায় না, অহীনই বা কেন মার্কসবাদ গ্রহণ করে তার কোনো উত্তর মেলে না। আসলে তারা-শংকরের নায়ক চরিত্ররা তাঁর নাটকীয়তার কাছে খুন হয়ে যায়। সে যুক্তির শৃংখলায় কালের নতুন রূপকে চেনা যায় এবং উপন্যাসে তাকে দেখানো চলে—তার যুক্তিময় পারম্পর্য তারা-শংকরের উপলব্ধিতে অমনোযোগী থেকে গেছে। বস্তুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে সামাজিক রূপান্তর ঘটে, এই সত্য পুরোপুরি গ্রাহ্য হয়নি। হলে, অন্যরকম হত। তবে কবি ও সপ্তপদীর নায়ক নিতাই এবং কৃষ্ণেন্দুর অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক এবং পরিপূর্ণ।

(ঘ) জীবন যদি শেষ পর্যন্ত কোনো মহৎ উপলব্ধির স্তরে না পৌঁছয়, তাহলে জীবনের স্তর পরিক্রমণ অর্থহীন হয়ে যায়—বিশ্বাস করতেন তারাশংকর। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। অবশ্য এই বিশ্বাসের মূলে ছিল কাল। তিরিশের কালটাই ছিল বিচিত্র। নগরজীবনের ব্যর্থতা, আর্থিক সংকট, রাজনৈতিক আন্দোলনের অসাফল্য মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-ভরসা চৌপাট করে দিতে পারে নি মোটেই। বরং একটা স্থির বিশ্বাস নিয়ে তারা এগোতে চেয়েছে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে তারা। 'সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিকূল ছকের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের আশা-প্রত্যাশার সংঘাতের রূপায়ণে এ-ই ব উপন্যাসের শিল্পকর্ম নিয়োজিত হয়েছে।' তারাশংকর তার ব্যতিক্রম নন। তিনি মনে করতেন, মানুষ বিশ্বাস খুঁজে পায় তার অন্তরে। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে বিস্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং তজ্জনিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। জীবনের অন্তর্নিহিত কোনো শক্তি তাকে সেই বিশ্বাসে পৌঁছে দেয়। প্রবীর, শিবনাথ, নিতাই, কৃষ্ণেন্দু—প্রত্যেকেই জীবনের উপান্তে অনুরূপ উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে গেছে।

(ঙ) হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, রাধা প্রভৃতি উপন্যাসের প্যাটার্নে রূপকথার আদল আছে। এই উপন্যাসগুলো লোকজীবনের সঙ্গে তারাশংকরের গভীর পরিচয় ছিল এটুকু প্রমাণ করেই শেষ হয়ে যায় না, উপরন্তু প্রমাণ করে লৌকিক সাহিত্যধারার সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। রূপকথার আদল কিভাবে এসে গেছে তার একটা নমুনা যেমন :

'নাগিনী কন্যাদের প্রবৃত্তি যখন উগ্র হয়ে ওঠে, তখন তারা উন্মাদিনীর মত নিশীথ রাত্রে ঘুরে বেড়ায় হিজলে ঘাসবনে। কখনও বাঘের হাতে জীবন যায়, কখনও হাঙর মুখীর থালে শিকার-প্রতীক্ষমান কুমীর অতর্কিতে পায়ে ধরে টেনে নেয়, নিশীথ রাতে হিজলের কূলে শুধু একটা আর্তচিৎকার জেগে ওঠে। আবার কোনো নাগিনী কন্যা শোনে বাঁশির সুর। দূরে হিজলের মাঠে চাষীরা কুঁড়ে বেঁধে থাকে। মহিষ গরুর বাথান দিয়ে থাকে সেখের গোষেরা, তারাই বাঁশি বাজায়। সে বাঁশি শুনে নাগিনী কন্যা এগিয়ে যায়, সুরের পথ ধরে।' (নাগিনী কন্যার কাহিনী।)

(চ) হাঁসুলি বাঁকের উপকথা পর্যন্ত তারাশংকরের উপ-ন্যাসের একটা ধারা শেষ হয়েছে। অন্য ধারা নগরজীবন কেন্দ্রিক, যদিও তার অস্পষ্ট সূচনা 'মন্বন্তরে' উঁকি দিয়ে গেছে এক সময়। তারাশংকর স্বক্ষেত্র ছেড়ে উপন্যাসের পটভূমি করলেন নগরজীবন। তারপর এসে তিনি যেন বদলে গেলেন কিছু। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় নগরজীবন তাঁর কাছে তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারেনি, যেমন হতে পেরেছিল রাঢ়অঞ্চল। আবার নগরকে অপরিহার্য পটভূমি হিসেবেও গ্রহণ করেন নি। তিনি কেবল দ্বন্দ্বময় নায়ক খুঁজছেন, হয়ত তিনি বুঝেছিলেন তাঁর উপন্যাসে দ্বন্দ্বময় নায়ক চরিত্রের অভাব থেকে গেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, জীবনের গভীরে গিয়ে তিনি কিন্তু দ্বন্দ্বের উৎস খুঁজলেন না, জীবনের সংবাদটুকু সংগ্রহ করেই তুষ্ট হলেন। 'আরোগ্য নিকেতন'-এর তুমুল বিতর্কের বীজ হয়ত এখানেই থেকে গেছে। 'সপ্তপদী' বা 'বিপাশার' ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণও হয়ত তাই।

উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ও প্রবাদ প্রবচন

তারাশংকরের হাতে বাংলা উপন্যাস নতুন সজ্জা পেল। লৌকিক সংস্কৃতির পটভূমিকায় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা,

সংস্কার বিশ্বাস, আচার-আচরণ, রীতিনীতি এক কথায় সামগ্রিক জীবনসংগ্রাম এত সোচ্চার হয়নি বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্করের আগে। তারাশঙ্করের মানুষ গ্রামীণ মানুষ, একান্তভাবে আঞ্চলিক। তারা অশিক্ষিত, নানারকম কুসংস্কারের দাস। সীমাহীন দারিদ্র্যে পীড়িত। সম্পূর্ণ আদিম। লৌকিক বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণে পুষ্ট। তারাই বাংলাদেশের বড় অংশ। তাদের কথাই তারাশঙ্কর কয়েকটি উপন্যাসে 'মোর দ্যান লাইফ' করে আন্তরিক মমতায় বলে গেছেন। উপন্যাসগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। যা তাঁকে স্পার্টাকান উচ্চতায় দাঁড় করিয়ে দেয়। এবং এই উপন্যাসগুলির মধ্যেই (গণদেবতা, বাধা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা) প্রচুর লৌকিক উপাদান এবং প্রবাদ-প্রবচনের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।'

নবান্ন, ইতুপুজো, ব্রতকথা, স্বপ্নদর্শন, ডাইনীতন্ত্র, ভৌতিক বিশ্বাস, পৌষ-সংক্রান্তি, লক্ষ্মীপুজো, আউরী-বাউরীর ব্রতকথা, দোঁটুপুজো, ষষ্ঠীপুজো (অশোক ষষ্ঠী, চন্দন ষষ্ঠী, অরণ্য ষষ্ঠী, বাঁশ ষষ্ঠী, লোটন ষষ্ঠী, পেটা ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী, অনন্ত ষষ্ঠী, বাঁশ ষষ্ঠী, লোটন ষষ্ঠী, পেটা ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী, অখণ্ড ওঝার ঝাড়ফুক, গাজন, অম্বুবাচী, ঝুমুর, কবিগান, খেউড় নিশি-ডাক, সর্প-অভিপ্রায়, সর্পপুজো, মন্ত্রশক্তি, হিজলের বনে মা মনসার আটন, লুতুন পুজো—এরকম অজস্র লৌকিক উপাদান ও সংস্কৃতির পরিবেশে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলো রচিত হয়েছে। পূর্বোক্ত পঞ্চ-উপন্যাসে তার প্রমাণ অজস্র।'

কিছু নমুনা দেয়া যেতে পারে।

(১) দেবুর মনে আছে, পনেরো বৎসর পূর্বেও লক্ষ্মী-পুজোর শেষে সমস্ত গ্রামের মেয়েরা এইখানে সমবেত হইয়া সুপারী হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিত। গ্রামের প্রবীণা কেহ ব্রতকথা বলিতেন। আর সকলে শুনিত। আজকাল সে বেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে, এখন দুই তিন বাড়ির মেয়েরা কোন এক বাড়িতে একত্রিত হইয়া ব্রতকথা শুনিয়া লয়। দেবুর বাড়িতেও এই ব্রতকথার আসর বসে। (গণদেবতা)

(২) কৃষ্ণদাসী নিজে অনেক সিদ্ধ বিদ্যা জানে। প্রেমদাসের বৈষ্ণবী আসামের মেয়ে ছিল। ডাকিনী বিদ্যা জানত। কৃষ্ণদাসীকে সে বিদ্যা সে দিয়ে গেছে। সাধনা করে ভগবান পেয়ে যে সিদ্ধি তা কেউ কাউকে দিতে পারে না, কিন্তু এসব বিদ্যা দেওয়া যায়। কৃষ্ণদাসী ঘরবন্ধন জানে, অস্ত্র বন্ধন জানে। ধারার আগে একমুঠো সরষে হাতে নিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে আখড়ায় চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে যাবে, ওই সরষের গণ্ডী লঙ্ঘনের সাধ্য কারুর নেই। প্রতিটি সরষে হয়ে উঠবে এক-এক সাপ। গণ্ডীর ভিতর পা বাড়ালেই ফণা তুলে দংশন করবে। মন্ত্র পড়ে মোহিনীর অঙ্গবন্ধন করে দিয়ে যাবে। সে অঙ্গ কেউ স্পর্শ করলে সে তৎক্ষণাৎ পড়ে মরে যাবে। (বাধা)

(৩) ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই, কিন্তু সঙ্গীত বাক-সাধিনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পরিচয় জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতি উপলব্ধি করে। (কবি)

৪। ধন্বন্তরী সাঁতালী পাহাড়ের সীমানায় গণ্ডী কেটে দিয়ে ছিলেন। ভূত, পেরেত, পিশাচ, রাক্ষস, ডাইন, ডাকিনী, বিষধর সেখানে ঢুকতে পারত না।' বিশেষ করে বিষধর, নাগ-নাগিনী, বিচ্ছু, বিছা, পোকামাকড়, জীবজন্তু, বোলতা এরা ঢুকলে কি সীমানার মধ্যে পা দিলে, নিশ্চিত মরণ ছিল—মরুবে নেউলে টুকরো টুকরো হয়ে ছেঁড়ে ফেলত। ধন্বন্তরী পৃথিবীর গাছপালা,

তারাশঙ্করের আঁকা কৃষ্ণেন্দু

লতাপাতা ফলমূল খুঁজে সাত-সমুদ্দুর তলা থেকে, স্বর্গলোকের ধন্বন্তরির বাগান থেকে পেয়েছিলেন যত বিষঘ্নী অর্থাৎ বিষঘ্ন গাছ গাছড়া—। (নাগিনী কন্যার কাহিনী)

৫। বাঁশবনে ঘপদাপিয়ে অর্থাৎ দপদপ করে জ্বলে বেড়ায় পেত্যি অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁকচুন্নির চিলের মতন ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া শিমুলের মাথা থেকে। বাঁশবনে ক্যা-ক্যাক-ক্যা ডাক ওঠে। কাহারেরা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায়—গেছো পেত্নী কি কোন ছোকরা ভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে, সেটা উঠে যাচ্ছে উপরে। (হাঁসুলি বাঁকের উপকথা)

এছাড়া তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে বহু প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটা সুন্দর তালিকা তৈরী করেছেন। তালিকার কিছু অংশ এরকম :

(ক) ডান ঠাণ্ডা লটর পটর, বাঁ ঠাণ্ডা খোঁড়া, যারা বাঁদা-নাথের ঘোড়া। —গণদেবতা

(খ) ফেল কড়ি মাখ তেল —গণদেবতা

(গ) দশে মিশে কবি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ—কবি

(ঘ) বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—কবি

(ঙ) হাসিস না লো কালামুখী আর হাসিস না, লাজে মরি গলায় দড়ি লাজ বাসিস না।—কবি

(চ) আমার বিয়ে যেমন তেমন, দাদার বিয়ে রাত বেলে, আর ঢকাঢক মদ খেয়ে।—(হাঁসুলি বাঁকের উপকথা)

'এইভাবে লোকসাহিত্যের বলিষ্ঠ ধারার সঙ্গে আত্মীয়তা এবং বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনার সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর ব্যক্তিপ্রতিভার সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্যের এক বিরল

খুঁজে পেলেন। এইটাই বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের নিজস্ব মহৎ দান।'

কি ভাবে লিখতেন

লেখক মাত্রেরই একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, যখন তাঁদের মুড তৈরি হয়। মেজাজ না হলে ভাল লেখা হয় না। কেউ সকালে লেখেন, কেউ রাতে। কেউ আছেন মুড এলেই হল—লিখতে বসে যান, সকাল দুপুর সন্ধ্যের কোনো ব্যাপার নেই। শুনেছি, কোনো এক বিদেশী লেখক কানের কাছে উত্তেজক মিউজিক না বাজলে লিখতে পারতেন না। তারাশঙ্কর লিখতে বসতেন সকাল আটটায়। তার আগে কিছু কাজ সেরে ফেলতেন তিনি। প্রাতঃকৃত্য ও চানটান সেরে পুজোর আসনে গিয়ে বসতেন। পুজো শেষে ইষ্টনাম জপতেন। তারপর চা পান, খবরের কাগজ পাঠ, দিনলিপি লেখা শেষ হলে লেখার ডেস্কে গিয়ে বসতেন। চেয়ার টেবিলে লিখতেন না। ফরাস জুড়ে গদির ওপর সামনে ডেস্ক রেখে লিখতেন তিনি। লেখার কাজ বারটা সাড়ে বারটা পর্যন্ত চলত। শেষ জীবনে বন্ধু শৈলজানন্দের বাড়ি গিয়ে চা আড্ডা সেরে তবে এসে লিখতে বসতেন। লেখার চাপ বেশি থাকলে সন্ধ্যেতেও লিখতেন তারাশঙ্কর। আমৃত্যু ছেদহীন নিয়মিতভাবে এই লেখার কাজ চলেছে তাঁর।'

লেখার ব্যাপারে খুঁতখুঁতে ছিলেন তিনি। কিছুতেই তৃপ্তি হত না তাঁর। বহু উপন্যাস তিনি তিন থেকে চারবার পুনর্লিখন করেছেন। লেখক মাত্রই নিজের লেখার প্রতি দুর্বলতা বোধ করেন। তারাশঙ্করের এমন কোনো দুর্বলতা ছিল না। ভাল না লাগলে নিজের লেখা তিনি অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলতেন। পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এরকম বহু গল্প পরবর্তী-কালে তিনি নিজেই নষ্ট করে গেছেন। নিজের লেখার প্রশংসা করতে কেউ কোনো দিন শোনেন নি তাঁর মুখে।

প্রথম উপন্যাসেই দ্বন্দ্বের বীজ

১৩৩৫ সালের 'কালিকলমে' তারাশঙ্করের 'শ্মশানের পথে' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পটি পরবর্তীকালে 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাস হয়ে প্রকাশ পায়। 'শ্মশানের পথে' গল্পটি যে অভিজ্ঞতার ফসল ছিল, সেই অভিজ্ঞতা হল—'পল্লীজীবন, পল্লীসমাজ জীর্ণ হয়েছে, ভেঙ্গে পড়তে গিয়ে কোন ক্রমে সেই ভাঙ্গা কাঠে বাঁশে ঠেক খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে ক্ষয়ক্লেশে—শ্মশান এগিয়ে আসছে। জমিদার মহাজন কাবুলিওয়ালার শোষণ ভাঙনা- মালেরিয়ার আক্রমণ; ঈশ্বরের নীরবতা—গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।' এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরবর্তীকালে যে অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছিল, সে অভিজ্ঞতা কলিয়ারির। এই দুই অভিজ্ঞতার ফল 'চৈতালি ঘূর্ণি'। দুই বিপরীতধর্মী জীবনচেতনা একটা পয়েন্টে এসে মিলেছে।

তারাশঙ্কর বলেছেন : জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলাম (১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে)। 'উপাসনা'র সম্পাদক কবি সাবিত্রী-প্রসন্নের সঙ্গে আলাপ আগেই হয়েছিল, এবার তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন। তাঁর 'উপাসনা'তেই 'চৈতালী ঘূর্ণি' বের হল।' অনেক পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তারাশঙ্করেরও একটু ভুল থেকে গেছে এখানে। কারণ তিনি জেলে ছিলেন উনিশশ' তিরিশ সালের শেষ তিন-চার মাস, আর 'চৈতালী ঘূর্ণি' উনিশশো উনত্রিশ সালের নভেম্বর থেকে উনিশ শ' তিরিশ সালের এপ্রিলের মধ্যে 'উপাসনায়' বেরিয়ে যায়। জেলে যেতে তখনো তাঁর অন্তত পাঁচ মাস বাকি। সুতরাং জেলে বসে তিনি 'চৈতালী ঘূর্ণি' লেখেন নি; জেলে বা জেলের বাইরে ও মুদ্রিত প্রুফের পরিমার্জন করে থাকতে পারেন মাত্র।

শ্রমিক ধর্মঘট এবং আন্দোলন 'চৈতালী ঘূর্ণি'র ফ্লাইমেক্স-অংশ হয়ে ওঠার পেছনে কতকগুলি ইতিবাচক কারণ আছে। প্রথমত, কলিয়ারির শ্রমিকজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সমকালীন দেশীয় এবং আন্তর্দেশীয় অভিজ্ঞতার প্রবাহ। ১৯২৮-এর যুগান্তকারী শ্রমিক ধর্মঘট, কলকাতা কংগ্রেসে শ্রমিকদের রঙ্গী আবির্ভাব, ১৯২৯-এ মীরাট মামলা উপলক্ষে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার, ধনতন্ত্রের পৃথিবীব্যাপী সংকট এবং পাশাপাশি রুশবিপ্লবের শিক্ষা—যেসব ঘটনায় শ্রমিক আন্দোলন সেদিনের রাজনৈতিক আলোড়নের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল—সবকিছুই তারাশঙ্করের চেতনায় আসন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে-ছিল। তাই শ্মশানের পথের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নবতর অভিজ্ঞতায় মিশ্রণ ঘটিয়ে নির্মাণ করলেন 'চৈতালী ঘূর্ণি'।

করলেও শ্রেণী-সচেতনতা 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে ক্ষীণ থেকে গেছে। কারণ শ্রেণীসচেতনতা বিষয়ে তারাশঙ্করের বোধাবোধের সঙ্গে মার্কসবাদী ধারণার দূরত্ব আছে। লড়াইয়ের লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য এবং প্রচারের রীতি মাপামাপি করলে এই ধারণায় আসতে অসুবিধে হয় না যে, 'চৈতালী ঘূর্ণি'র শ্রেণীবোধ চেতনার আদিমস্তর টপকাতে পারেনি। 'চৈতালি ঘূর্ণি'র লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য—মজুরি বাড়ানোর দাবি। আর্থিক লড়াই মার্কসবাদের একটা কৌশল, কিন্তু সব নয়। মার্কসবাদ চায় টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন লড়াইকে কেন্দ্রীভূত করতে, শোষণযন্ত্রকে অচল করে দেয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে এবং শ্রমিক সাধারণকে আত্মসচেতন করে তুলতে। আর্থিক অবস্থার ভাঙনায় গ্রামের চাষী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে, মালিক-শ্রেণীর সঙ্গে আর্থিক সংঘাতও বাধছে শ্রমিকের—এসব 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে আছে ঠিকই; কিন্তু তা আর্থিক স্তর অতিক্রম করে রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছয়নি—এমন কি বাউরি শ্রমিকদের সঙ্গে অন্য শ্রমিকদের জাতিগত ভেদাভেদও দূর হয়নি। শ্রমিক সংহতি পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকের দ্বন্দ্ব থাকলেও—শ্রমিকরা আত্মসচেতন শ্রেণীতে পরিণত হতে পারল না। তাদের শ্রেণীচেতনা আপাতিক, আবশ্যিক নয়। তাই তাদের দ্বন্দ্ব ক্ষণস্থায়ী—হঠাৎ জ্বলে ওঠার মত পর্যায়ে থেকে গেছে।

তাই 'চৈতালী ঘূর্ণি'র তারাশঙ্করের সমাজ বিশ্লেষণের সঙ্গে মার্কসবাদের নৈকট্য থাকলেও, ভিন্নমুখী। 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে অস্পষ্ট মার্কসবাদ এবং অস্পষ্ট গান্ধীবাদের (কোনোটাতেই তারা-শঙ্কর দীক্ষিত ছিলেন না) মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বময় পরিমণ্ডলে অবস্থান করেছেন তারাশঙ্কর, এবং বিশ তিরিশ দশকে ভারতবর্ষের অনেক রাজনৈতিক জ্যোতিষ্কের অবস্থান ছিল এরকম দ্বন্দ্বময়। 'ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের উৎপাদন ব্যবস্থায় নৈতিক মানসিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর অথবা শ্রমিক শ্রেণীর—কোনো মৌলিক শ্রেণীর অবিসম্বাদী অপ্রতিহত নেতৃত্ব কায়েম না হওয়া, এই অস্পষ্টতার মূলগত কারণ। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্ব 'চৈতালী ঘূর্ণি'র ভাবগত স্ববিরোধ ও অসংবদ্ধতার প্রাথমিক উৎস। আবার তার বিয়ালিজমের মৌলিক শক্তিরও উৎস এই আন্দোলন।' চাষীর প্রতি গাঢ় মানবিক সমবেদনা, তাকে দৃষ্টিমূলে স্থাপনের বাসনাও তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন গান্ধীজি প্রণীত জাতীয় আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের অন্তর্গত বামপন্থী ধারা থেকে।'

'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রকাশিত হবার পর সমকালীন কয়েকটি বিজ্ঞাপন :

(ক) পল্লীজীবনের দরদী কথাশিল্পী। তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের। চৈতালী ঘূর্ণি। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের উপন্যাস। মহা-কালের ইঙ্গিতে জাতীয়জীবনে যে নবধারা ধীরে ধীরে মূর্তরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে,—সেই রূপ পরিচয়।—'উপাসনা' ১৯৩২।

(খ) লেখকের অপর একখানি বই। চৈতালী ঘূর্ণি। কৃষক ও শ্রমিক জাগরণমূলক উপন্যাস। ।—পাষাণপুরী, প্রথম সংস্করণের ফ্লাই-লিফ, ১৯৩৩

(গ) চৈতালী ঘূর্ণি .... শ্রমিক জাগরণের আকুরের কথা—ছলনাময়ী', প্রথম সংস্করণের মলাট, ১৯৩৬

ডায়েরী/ছবি/চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপি

তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দিনলিপি লিখতেন, আগে উল্লেখ করেছি। তারাশঙ্করের ডায়েরী লেখার অভ্যেস ছিল, ধারাবাহিকতা ছিল না। ইংরেজি বছরের গোড়াগুড়িতে দুখানা ডায়েরী যোগাড় করা হত। তার একটাতে বিশেষ সংখ্যায় সবচেয়ে প্রথম তিনি ইষ্টনাম লিখতেন। তারপরে লেখা শুরু হত। বছরের প্রথম দিক একাজ নিয়মিত চলত। তারপরেই উৎসাহে ভাঁটা পড়ত। লেখা বন্ধ হয়ে যেত একসময়। তবে জানা গেছে, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে দিনলিপি লিখে গেছেন। সকালে সাহিত্য রচনার আগে তিনি দিনলিপি লেখা সেরে নিতেন। আমি তারাশঙ্কর-পুত্র সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম : আপনার বাবার ডায়েরী ছাপিয়ে প্রকাশ করছেন না কেন? আমাদের কৌতূহল থেকে গেছে। ছাপা হলে হয়ত তাঁর সম্পর্কে নতুন কিছু জানা যেতে পারে।

সনৎদা ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন : ওটার উত্তরাধিকারী আমি নই, আমার শ্যালক আনন্দময় ভট্টাচার্য। মৃত্যুর আগে বাবা তাঁর হাতেই ডায়েরীটা তুলে দিয়ে গেছেন।

কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

—জানি না। একটু থেমে বললেন : আমার ধারণা ডায়েরীতে 'ভেরি কনটীল ক্যানডিড' কিছু আছে। ওখানে বাবা আনসফিস্টিকেটেড। রেখে ঢেকে কিছু বলেন নি, নিজের সম্পর্কে তো নয়ই এমনকি তাঁর পরিচিত জন সম্পর্কেও নয়। হয়ত তাই—

এ পর্যন্ত বলে হাসলেন সনৎদা। তারপর বললেন : একদিনের ঘটনা বলি, শুনুন। বাবা সকালে লেখার ঘরে বসে দু পৃষ্ঠা ডায়েরী লিখে কি কারণে যেন ভেতরে গেছেন। আমি এসে সবে সেটা পড়তে শুরু করেছি, বাবা এলেন। খুব রুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন, আমার ডায়েরী তুমি পড়ছ কেন? কোনো দিন পড়বে না। —সেই থেকে বাবার ডায়েরী পড়ার চেষ্টা আর করিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : আনন্দময়বাবু ডায়েরীটা প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন না কেন?

—সময় হলে নিশ্চয় করবেন। দু-একজন প্রকাশক দেখা করেছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি রাজি হননি।

এতে তারাশঙ্করের ডায়েরী সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। জানি না কবে এই মূল্যবান দলিল গোপনীয়তার ফাঁস খুলে বেরিয়ে আসবে সাধারণের মধ্যে। তারাশঙ্কর সমসাময়িক আরেকজন বিস্ময়কর প্রতিভা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরী কিছুকাল আগে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা তাতে লাভবানই হয়েছি।

তারাশঙ্কর জীবনের শেষ দশকে ছবি আঁকা শুরু করেন। এর পেছনে ছোটখ একটা ঘটনা আছে। ১৯৬১তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিপক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তারাশঙ্কর। অনেক বক্তা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সৌমেন ঠাকুর, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। সভায় তাপ ছিল, তারাশঙ্কর বুঝতে পারেন। তাই তিনি বক্তাদের অনুত্তেজক বক্তৃতা করার অনুরোধ করেন। কোনো একজন বক্তা অন্যরকম বক্তৃতা দেওয়ার ফলে সভা উত্তেজনায় যেটে পড়ে। এতে তারাশঙ্কর খুব ক্ষুব্ধ হন। ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ি ফেরার পর তাঁর প্রেসার একশ তিরিশে নেমে যায়। নলিনী সেনগুপ্ত আসেন তাঁকে চিকিৎসা করার জন্যে। আধ ঘন্টা ছিলেন তিনি। এর মধ্যে তারাশঙ্করের প্রেসার একশ তিরিশ থেকে আশি, আবার আশি থেকে তিরিশে ওঠা-নামা করে। ডাক্তার পরামর্শ দেন, লেখালেখি বন্ধ রাখতে হবে কিছুকাল এবং দোতলার পরিবর্তে একতলায় থাকতে হবে। সেই থেকে তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা হল একতলার ঘরে, ঠিক লেখার ঘরের পাশে। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে ছবি আঁকার আইডিয়া তাঁর মাথায় প্রথম আসে।

সনৎদা আমাকে নিয়ে গেলেন তারাশঙ্করের শোবার ঘরে। দরজার পাশে দেয়াল যেখানে মেঝেতে মিশেছে, সেইদিকে আঙুল টিপ করে বললেন : কিছু দেখা যাচ্ছে?

দেখলাম এক ফুট উচ্চতার এক স্যাঁতস্যাঁতে সম্পত্তি, পেছনে তাদের ছেলে-দেখালে কালো রঙে আটকে আছে।

দক্ষিণ দিকের জানলার নিচে চোখ রেখে সনৎদা : ওখানে কিছু?

—হ্যাঁ ছবি।

—বাবার প্রথম ছবি।

সনৎদা তারাশঙ্করের লেখার ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন : ঘরের চারদিকটা দেখ ভাল করে।

দেখলাম তারাশঙ্করের অয়েল পেইন্টিং—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুলের হাফবাস্ট; অসাধারণ অসাধারণ নানা মাপের ল্যান্ডস্কেপ।

তারাশঙ্কর নতুন ডাইমেনশানে দাঁড়িয়ে পড়লেন সাম্যের সামনে।

নেশা

তারাশঙ্করের প্রধান নেশা ছিল চা সিগারেট। এমন সময় গেছে যখন বিশ তিরিশ কাপ চা খেতেন। জীবনের শেষ তিরিশ বছরে সেটা কমে গিয়ে দিনে দশ-পনের কাপে নেমেছিল। দিনে ষাট থেকে সত্তরটা সিগারেট খেতেন। উনিশশ তেষট্টি সালে ডাক্তারের পরামর্শে চার্চিল-ব্র্যান্ড চুরুট ধরেন, তাও দিনে বার-চোদ্দটা চলত। জীবনে মাত্র দুতিনবার ব্র্যান্ডি পান করেছেন, সর্বাধিক মাত্রা দু পেগ। শেষ তিরিশ বছর শারীরিক কারণে ক্ষমানোর জন্য প্রতিদিন দুটো থেকে চারটে অ্যানাসিন, বা সারিডন বা কোডোপাইরিন খেতেন। মাছ পছন্দ করতেন বেশি, নোনা মাছ না হলে চলত না। উনিশশ পঁয়ষট্টি সালে সম্ভবত দশই সেপ্টেম্বর গাড়ির মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে রাগারাগি হয়, এবং রাগ করে হাতের জ্বলন্ত চুরুট বাইরে ফেলে দেন। ওখানেই ধূমপানের ইতি। অবশ্য ধূমপানের নেশা ছাড়ার জন্য অনেক কষ্ট পোহাতে হয়েছে তাঁকে। ধূমপান করার তীব্রতা বাড়লে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে নিজের বাঁ হাতে ছেঁকা দিয়ে শাসন করতেন নিজেকে।

সমালোচন

কবিতার পকেট বই

কবিতার পকেট বই

একসঙ্গে ৬টি কবিতার পকেটবুক পাঠ করার পর মনটা অনেকক্ষণ আবিষ্ট হয়ে রইলো। ছ'জন তরুণ কবির প্রাণস্পন্দন, তাঁদের আবেগ আর ভাবনার মিলিত ঐকতানকে প্রকাশক সুন্দর বন্দী করেছেন। ছোট্ট কবিতা গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটির দাম এক টাকা। স্বল্পমূল্যে পাঠকের কাছে এইভাবে কবিতাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, বা বলা যায় অধিক জনপ্রিয় করে তোলার জন্য পত্রমিত্রর প্রাপ্য অভিনন্দন আগেই জানিয়ে দিচ্ছি।

তরুণ কবির কবিতা পাঠে মনের মধ্যে যে প্রত্যাশা থাকে, সেই প্রত্যাশা সর্বাংশে পূর্ণ না হলেও তারুণ্যের দীপ্তি পাঠকের নজর কাড়ে। সমীর মুখোপাধ্যায়ের মোমের মত পোড়ে কলকাতা'র একটি কবিমনকে আবিষ্কার করা গেলেও প্রশ্ন জাগে, তিনি কেন ছন্দবিমুখ? একটি ঘরে একটি মানুষ কবিতার যে দার্শনিকতার স্বচ্ছ উন্মেষ পাওয়া যায়, পরমুহূর্তেই 'এখন কবিতার ইয়ার্কি' দিয়ে কবি নিজেই পাঠকের বিমুগ্ধতা কেড়ে নেন। ভাবলে অবাক লাগে তিনিই 'মেঘলা দিনে'র মতো কবিতা লিখে পাঠককে মুগ্ধ করেছেন। সে তুলনায় প্রণব মাইতি অনেক সচেতন, অনেক পরিণত। বলা যায় এই কবিদের মধ্যে সর্বাধিক সার্থক শব্দ-শিকারীও বটে। 'কবিতা বোঝে না নারী, কবিতা হয়েই বুকে আসে'—প্রণব-রচিত এই পংক্তি সহজে ভুলে যাওয়ার নয়।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে কয়েকজন নবাগতের তুলনায় আর তত্তো তরুণ বলা না গেলেও তাঁর কবিতায় যৌবনের স্পর্ধা মন ভরিয়ে দেয়, উপলব্ধি করা যায় তাঁর পাণ্ডিত্যও। নিছক পাণ্ডিত্য কবিতায় কদাচিৎ রসহানি না করলে, আরো বেশি সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য ছিলো, শুধু আশ্চর্য লাগে, ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রথম পাতায় কবি বিনয় মজুমদারের সার্টিফিকেট-টির অনাবশ্যক সংযোজন দেখে। এরকম আত্মবিশ্বাসের অভাব, তাঁর থাকা উচিত ছিলো না, কারণ যে কোনো পাঠক তাঁর ছন্দনিপুণ, জীবনধর্মী কবিতা পড়ে এমনিতেই ভালো লাগার উপাদান খুঁজে পেতেন। 'রূপসা পেরিয়ে' তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। আর এরকম প্রসংশাপত্র অন্য কোনো কবি ব্যবহার করেন নি, অন্তত এই সিরিজে। পরবর্তী সংস্করণে এটি বাদ দিলে, আমার মনে হয়, পাঠকের প্রতি তিনি সুবিবেচনা করবেন।

ভালো লাগে প্রফুল্ল মিত্রের কবিতা, কিছু স্টান্ট আর বেহুলা ফ্যাশলেক্স' বাদ দিয়ে। প্রথম কবিতাতেই তিনি লক্ষ্যভেদ করেছেন। সপ্রতিভ কবিতা উপহার দিয়েছেন আদিত্য মুখোপাধ্যায়। যা বলতে চেয়েছেন, অকপটে বলেছেন। জীবন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেছেন কবিতাকে মাধ্যম করে। 'বেহারা বাতাস' সুযোগ পেয়ে। বেকার যুবকের মতো ঘরে চুকে বিজ্ঞাপন মারে'—এমন কবিকল্পনায় আদিত্য নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছেন। তবে ছন্দ মিল সম্পর্কে প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন আদিত্য। 'দরিদ্র' কবিতায় বোঝা যায়, ছন্দ মিলের বিষয়ে তিনি কত দরিদ্র! 'বৃষ্টি এলো' কবিতায় আশা জাগালেও জটিল এবং কষ্টকল্পিত কিছু উপমার ভিড়ে চিনতে কষ্ট হয় সীমা মিত্রকেও। 'নতুন ননীর মত প্রগাঢ় চেতনা কিংবা তেজী ঘোড়ার মত মার্বেল প্যালেস'-উপেক্ষা করলে সহজ কবিতাগুলিই সীমা মিত্রকে পাঠকের কাছে ঋণী হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

এঁরা সকলেই খুঁজতে চেয়েছেন কবিতার প্রাণ, কবিতার প্রেম। আরো অনুশীলন, আরো রচনার পরে এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ কবি হয়ে উঠবেন সুপরিণতির মাধ্যমে। তাঁদের সাধনার পথে এই সমালোচনায় হয়তো কিছুই যাবে-আসবে না, তবু, সকলকে অপেক্ষা করতেই হবে আরো কিছু সময়।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

সিন্ধুসারস—প্রফুল্ল মিশ্র, শূন্যে সেতু—আদিত্য মুখোপাধ্যায়, সুগত—সীমা মিত্র, অলবাতাসী—উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, মোমের মত পোড়ে কলকাতা—সমীর মুখোপাধ্যায়, ফুটপাতে পোটেট-প্রণব মাইতি। প্রতি কবিতা-গ্রন্থের দাম ১-০০, প্রকাশক হরিপদ ঘোষ, পত্রমিত্র, কলকাতা-৯।

স্বপন বুড়ো

শিশুসাহিত্যিক আখিল নিয়োগী 'স্বপনবুড়ো' নামেই তাঁর পাঠকমহলে সুপরিচিত। দীর্ঘকাল তিনি শিশু এবং কিশোর পাঠকদের জন্য সাহিত্যের ডালি সাজিয়েছেন। সে উপহারের ডালিতে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। কখনও ছোটদের জন্য লিখেছেন উপন্যাস কখনও গল্প। কখনো আবার হাসির কবিতা, ছড়া, গান আর নাটক।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে উপন্যাস গল্প, কবিতা, ভ্রমণকথা বাংলা শিশু অথবা কিশোর সাহিত্যে প্রচুর। নাটক তেমন সমৃদ্ধ নয়। শিশু চলচ্চিত্র সৃষ্টির মত শিশু ও কিশোর উপযোগী নাটক অভিনয়ের দিকে বয়স্কদের মোটামুটি অমনোযোগী। এদিকে নজর রেখে শিশু ও কিশোরদের একই সঙ্গে আনন্দ এবং শিক্ষা-দানের জন্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন।

এছাড়াও আরও আছে তাঁর উপহার—শিক্ষামূলক প্রবন্ধ আর ভ্রমণ কাহিনী। আজও তিনি লিখে চলেছেন তাঁর শিশু এবং কিশোর বন্ধুদের জন্য।

'স্বপনবুড়ো' এপর্যন্ত যা লিখেছেন বর্তমান প্রকাশক সেগুলি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশে উদ্যোগী। সে উদ্যোগের প্রাথমিক

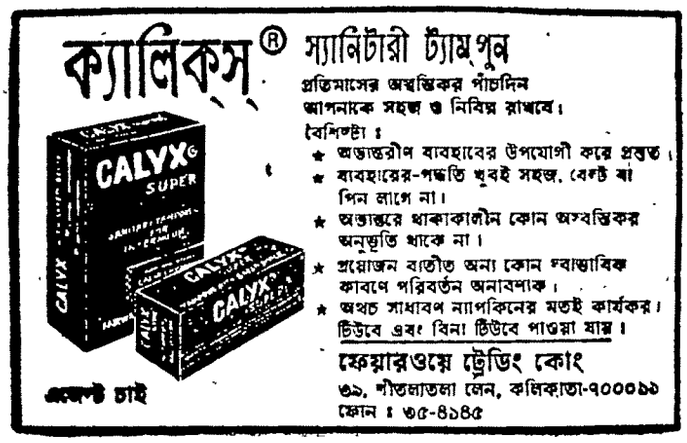

ফল 'স্বপনবুড়োর সাহিত্য সম্ভার'-এর প্রথম খণ্ড। এতে রয়েছে লেখকের পাঁচখানি উপন্যাস। পাঁচটি উপন্যাসই তাঁর পাঠক-মহলে বিশেষ পরিচিত। বিশেষভাবে পরিচিত 'বাবুই বাসা বোর্ডিং'। এই উৎকৃষ্ট কিশোর পাঠ্য রোম্যানটিক উপন্যাসটিকে অনেকেই স্বপনবুড়োর শ্রেষ্ঠ রচনা বলতে আগ্রহী। বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই 'বাবুই বাসা বোর্ডিং' সম্পর্কে বলেছেন, '.. বস্তুত এই ধরনের প্রচেষ্টা বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যে তাঁর পূর্বে আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। রচনাটিকে অখিলবাবুর শ্রেষ্ঠ রচনা বললেও অত্যুক্তি হয় না; আর এটি জনপ্রিয়ও বটে।' এছাড়াও প্রথম খণ্ডে রয়েছে 'বেপরোয়া' 'আমার মায়ের মুখ' আর 'শশী-শ্যামলের সাঁকো'। এগুলিও স্বপনবুড়োর শক্তির পরিচয় দেয়।

কাপড়ে বাঁধাই, ওপরে সোনার জলে 'স্বপনবুড়োর সাহিত্য সম্ভার' লেখা শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থার এ বইখানি শিশু এবং কিশোর পাঠকের সমাদর পাবে বলেই বিশ্বাস। তবে একটি কথা যেহেতু ছোটদের বই এবং কিছু স্কেচধর্মী ছবি রাখার সুযোগ ছিল সে কারণে মাঝে মধ্যে কাহিনী শেষকে টুকরো টাকরা ঘটনা বেখাস তুলে ধরলে বোধ করি অল্প বয়সী পাঠক পাঠিকাকে কিছুটা বাড়তি আনন্দ দেয়া যেত। ভবিষ্যতে প্রকাশক মহাশয়কে এবিষয়ে একটু ভেবে দেখতে বলি। ছাপা, বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপনবুড়োর সাহিত্য সম্ভার। শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থা এম, টি, ৭৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-৭। দাম সাড়ে বাইশ টাকা।

শুভ মুখোপাধ্যায়

'শৈশবের ঘুমন্ত প্রান্তর ফেলে চলে যাচ্ছি' অথবা 'বহতা নদীর কাছে ঋণী'—এভাবে কবি ছোট ছোট উপলখণ্ড গড়েছেন কবিতা প্রাণময়ীকে। তাঁর শিল্পনির্মাণে ভারবাহী শব্দের বাহুল্য নেই—পর্যাপ্ত বুদ্ধির কড়াভাজুনিতে তিনি সওয়ন্ন করেন না—শব্দ নিয়ে চকমকি পাথরের কারকোজে তিনি ব্যস্ত নন। এক অনাবিল প্রসাধনবর্জিত মুখের মতো তাঁর কবিতা লেগে আছে। মাঝে মাঝে কবিতায় প্রকৃত ছন্দের নিক্কণ শোনা যায়—যা খুব সুলভ নয় আমাদের কবিতাপাঠের কাছে। এক মায়াবী বিষণ্ণতার গভীরে তিনি নিয়ে যান আমাদের হাত ধরে, যন্ত্রণার মূল শিকড়টিকে চিনিয়ে দেন—সেই উপলব্ধ বিষাদ আমাদের দুঃখী করে তোলে—স্মৃতিনাশা ধৃত ভালোবাসা। এখন। বিষণ্ণ নিরালা তোর থাক।'

রক্তের মধ্যে কলরোল তুলে ছুটে আসে 'বন্ধু পাভেলস্কা'। তাঁর কবিতায় কলকাতা 'এক শীতের নদীর পাশে বাঁধা পড়ে' থাকে। শিরোনাম সম্বলিত কবিতাটিতে তাঁর নিজের দিকে প্রসারিত জিজ্ঞাসা আমাদের প্রশ্নের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। কবির একক নির্জনতা বিদ্ধ করে তাঁরই অনায়াস-ভঙ্গীর সৌজন্যে—'স্বপ্নের বিবাদে আমার কবরীকুসুম। আকাশের উতলে মাথা রেখে স্মৃতির শায়ক খুলছে একা।' আচ্ছন্ন সংকেতগুলি খুব গোপন সহমর্মিতায় কবিতাকে কাছে আনে।

কালানুক্রমিকভাবে কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে, ফলে কবির পদক্ষেপ—সেই পদক্ষেপের মাত্রাগত সৌন্দর্য সহজে প্রতিভাত। প্রথমাংশের কবিতাগুলিতে সরলীকরণ চোখ টানে—তারপরে ধীরে ধীরে কবিতার স্বভাব অনুযায়ী কিছু জটিলতা দখল করে বাকী অংশটুকু, যা একান্তই স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হয়। এই বুপান্তর আবেগধর্মী হয়ে উঠেছে কখনও—কখনও গাঢ় নিমস্বাদ ছুঁয়ে আছে জীবনকে, জীবনের চলমান বোধকে।

কিছু মুদ্রণপ্রমাদ অস্বস্তিকর। কমল-কুমার মজুমদার অঙ্কিত প্রচ্ছদ মানোত্তীর্ণ।

বসুন্ধরা বিশ্বাস

প্রতিদিন প্রাতরাশের বেলা ।। শুভ মুখোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম তিন টাকা।

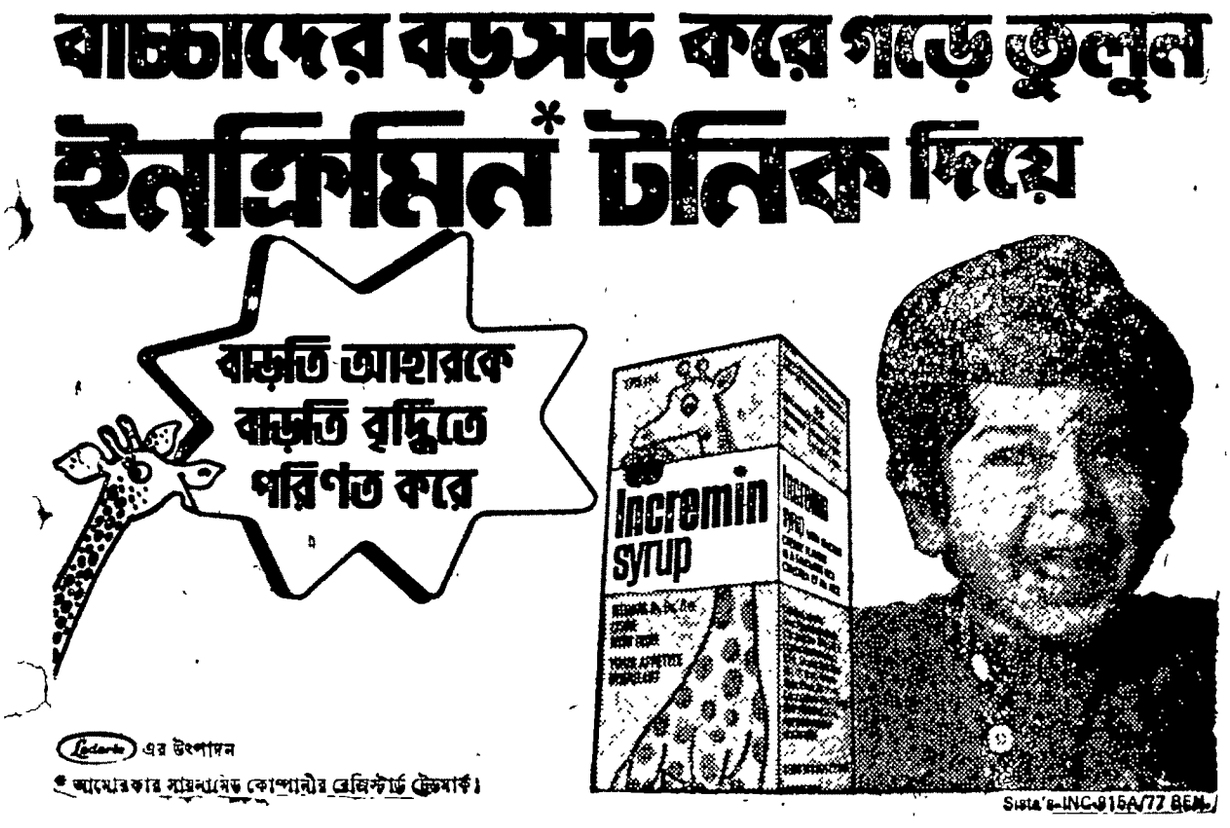

চরণকে পেছনে ফেলে জগজীবন

মোরারজী দেশাই সমেত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট জনতা পার্টির উচ্চ পর্যায়ের কমিটির দুজন হলেন প্রধান মন্ত্রীর কুরসিটির ভবিষ্যৎ দাবীদার। এঁরা হলেন চরণ সিং এবং জগজীবন রাম। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে এটা স্পষ্ট যে চরণ সিংকে পিছনে ফেলে এই নেপথ্য প্রতিযোগিতায় জগজীবনবাবু এগিয়ে যাচ্ছেন। ছয় মাস আগেও কিন্তু এগিয়ে ছিলেন চরণ সিং।

বছরখানেক হল নিতান্তই বিমর্ষ ছিলেন জগজীবনবাবু। চিন্তে কোন সুখ ছিল না। অনেকে বলতেন উনি এবার অবসর নেবেন। অবসর নেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে ভক্তবৃন্দ নিয়ে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ইদানীং নড়েচড়ে বসছেন জগজীবন রাম। সবুজ আলোর ইঙ্গিত যেন দেখতে পেয়েছেন উনি।

পুরোন ক্ষোভ ও অভিমান উনি এতোদিনে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। রাজনীতিতে এসব সেন্টিমেন্টের কোন স্থান নেই। এখানে কেবল কৌশলের নীতি পালটাতে হয় অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে। মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হবার পর জগজীবনবাবু যে ভালোমত দমে যান এবং আশপাশের অনেকের ওপর দারুণ চটেও যান সেটা চোদ্দ মাস আগেকার সেই তিন দিনের নাটক রোমন্থন করলেই বোঝা যায়। তখনও মোরারজীর সঙ্গে জগজীবন-বাবুরও দাবী ছিল প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটির জন্য।

সাতাত্তর সালের সেই ঐতিহাসিক সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেস ছরাডুবিতে জগজীবনবাবুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবু সেদিনের এই সি এফ ডি নেতা কিন্তু মোরারজী দেশাই, জর্জ ফার্নান্ডেজ, চন্দ্রশেখর, মধু লিমায়া, নানাজী দেশমুখের মত 'হিরো' হতে পারেন নি। 'হিরো' না হতে পারার একমাত্র কারণ হল সাতাত্তর

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

সালের পুরো জানুয়ারী মাস অর্থাৎ নির্বাচনের মাসখানেক আগে পর্যন্ত উনি ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক ছিলেন। কেন তিনি জরুরী অবস্থার সময়েও ইন্দিরা গান্ধীর অধীনে মন্ত্রিত্বের গদি আঁকড়ে ছিলেন তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি। যে-সব যুক্তি উনি খাড়া করেছিলেন তাতে জনতা পার্টির শরিক দলের অনেকেরই মন ভেজেনি। তবে রাজনীতিতে উনি এমনি চৌকস যে সেই বাজারেও এই অসুবিধা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটির জন্য জগজীবনবাবুর সমর্থকরা রাতারাতি একটি 'লবি' তৈরী করে ফেলেন। তাঁর সমর্থকরা সেদিন প্রস্তাবও তুলেছিলেন যে সংসদে জনতা পার্টির নেতা নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির করা হোক। এর অর্থ ভোটাভুটিতে জগজীবন রাম প্রধানমন্ত্রী না হতে পারলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিদেনপক্ষে দুই নম্বর স্থান উনি পাবেন। কিন্তু এর কোনটাই না হওয়ায় ত্রিশঙ্কে প্রথম রাজনৈতিক বিপাকে পড়লেন তিনি। হ্যামলেট-সুলভ দ্বন্দ্বের অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় যাবো কি যাবো না তাঁকে সেই সময় ক্ষণিক সংশয়ের মধ্যে ফেলেছিল। সংসদে প্রেশার গ্রুপ' হিসাবে কাজ করবার মত শক্তি সেদিন সি এফ ডি দলের থাকলে উনি সম্ভবতঃ ক্যাবিনেটে যোগ দিতেন না। কিন্তু মাত্র আঠাশ জন সদস্য নিয়ে সংসদে কোন রকম চাপ সৃষ্টি সম্ভব নয় বলে উনি অগত্যা মোরারজী মন্ত্রিসভায় শেষ পর্যন্ত তিন নম্বর হতে রাজী হলেন। তারপর থেকে জগজীবন রাম সি এফ ডি দলের নাম পর্যন্ত মুখে আনেননি। জরুরী অবস্থার সময় গোয়েন্দা পুলিশ এবং ইন্দিরা গান্ধীর অসংখ্য চরদের চোখে ধুলো দিয়ে ওড়িশার সংসদ সদস্য দেবেন্দ্র সতপথির নয়াদিল্লির লোদি এস্টেটের বাড়িতে রাত-ভোর করা মিটিং ও সি এফ ডি দল গঠন সম্পর্কে গুপ্ত সলাপরামর্শের রোমাঞ্চকর অধ্যায় ভুলে গেলেন বাবুজী। রাতের পর রাত জেগে নতুন দলের বিবৃতি ও খসড়া লিখলেন যে কে আর গণেশ তিনিও উৎসাহের অভাবে বসে পড়েছেন এখন। সি এফ ডি ভেঙে গেলো প্রধানতঃ জগজীবনবাবুর আশীর্বাদ ও আগ্রহের অভাবে।

বাবুজীর তাই আজ কোন দল নেই। অথচ সব কিছু খোলিয়ে তুলতে ওঁর এখন একটা দলের প্রয়োজন সবচাইতে বেশী। রাতারাতি দল গড়া, সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তিনি ইদানীং যে ভাবমূর্তি নিচ্ছেন তাতে ধুরন্ধর রাজনীতিকের বুদ্ধির ছাপের সঙ্গে আছে সামাজিক প্রগতিশীল তার এক পোঁচ রঙ। জগজীবনবাবুর খুবই ঘনিষ্ঠ মহলের বিশ্বাস চরণ সিংয়ের জামানায় নাকি হরিজনদের বিশেষ সুরাহা হবার নয়। আর তাই এই শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করে সাম্প্রতিকালিপত নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারেও জগজীবন বাবু অবশ্য ভেবেচিন্তে অগ্রসর হতে চান। ঝাঁপিয়ে পড়তে উনি মোটেই রাজী নন। বছরখানেক হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার ফলে হরিজনদের মধ্যে জগজীবনবাবুর ব্যক্তিগত প্রভাব খানিকটা নষ্ট হয়েছে। উনি তাই হরিজনদের মধ্যে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বয়েকটি পদক্ষেপ নিচ্ছেন। হরিজনদের স্বার্থে নানা স্থানে ইদানীং কয়েকটি জোরালো মন্তব্য করলেও, জগজীবনবাবু কেবল হরিজন রাজনীতির মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি জরিয়ে ফেলতে চান না। অথচ সংঘবদ্ধ হরিজনদের সমর্থন তিনি চান। তাঁর এই ইচ্ছার বাস্তব রূপায়ণে তাই তাঁরই অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত সংসদ সদস্য রামধন দেশের নানা অঞ্চলের হরিজনদের এককাট্টা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন।

কোন এক বিশেষ গোষ্ঠীর নেতা জগজীবনবাবু হতে চান না কেননা তাহলে তাঁর সর্বভারতীয় ইমেজ ঝাপসা হয়ে যাবে। এটা যাতে না হয় সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। কোন বিশেষ গোষ্ঠীর নেতার পক্ষে যে এখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্বের কুরসিটি তৈরী হয়নি সেটা তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন। সকলের সমর্থন দরকার এই উচ্চ শিখরে পৌঁছতে। সুতরাং তামিলনাড়ু মুখ্যমন্ত্রী এম জি রামচন্দ্রনের সঙ্গে জগজীবনবাবু ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। তামিলনাড়ুকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে একটি ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টায় উনি ইতিমধ্যে কিছুটা সফলও হয়েছেন। এছাড়া ইন্দিরা বিরোধী কংগ্রেস দল বাবুজীর এখন বড় সমর্থক। কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক, সফি কুরেশি এখন বলছেন: বাবুজী একজন ক্রান্তিকারী ব্যক্তি। বারবার দেশকে উনি সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। দেশ আজ ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সংসদে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য উত্তরপ্রদেশে জগজীবন রাম-বিরোধী মিছিল ও বক্তৃতার সমালোচনা করেছেন। কংগ্রেস দলের অনেকেরই এখন ধারণা যে এই সংগঠনের ভাঙন রুখতে গেলে জগজীবনবাবুর মত ব্যক্তির প্রয়োজন। বাবুজীকে দলে টানবার চেষ্টাও চলছে।

অপরদিকে জনতা পার্টির শরিকদের মধ্যে সংগঠন কংগ্রেস, সোসালিস্ট, চরণ তুর্কী এবং বি এল ডি দলের বিজু পট্টনায়ক ও পিলু মোদির জিজ্ঞাব গ্রুপের সদস্যরা জগজীবনবাবুকে মদত দিচ্ছেন ইদানীং। আর সর্বোপরি জগজীবনবাবুর জন্য আছে প্রধান-মন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের আশীর্বাদ॥

পর্যবেক্ষক

দুই দিকপালের মুখোমুখি

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

১৯৫১ সালের অগস্ট মাসে আমি বর্তমান পাইকপাড়ার বাসায় উঠে চলে এলাম তারাশঙ্করের কাছাকাছি। সজনীকান্ত দাস, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং ক্রমে গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ চৌধুরী, শিবনারায়ণ রায় সবাই এই তল্লাটে থাকি। কবি এবং তারাশঙ্করের জামাতা শান্তিশংকর মুখোপাধ্যায়ও থাকতেন। শুরু হল নতুন অধ্যায়। এই সময়েও তারাশঙ্কর সেই খুচরো প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ করেন। ড্রাইভার করালীর হাত দিয়ে চিরকুট আসে

গৌরীশংকর,

আমার কাছাকাছি এসে হয়তো ভুল করেছ ভাববে। উপায় নেই। তোমার ভুলে আমার ভুল সংশোধন হচ্ছে। কাল চেক্ জমা দিতে ভুলেছি। এর হাতে ২০্ কুড়িটি টাকা দিয়ো। দরকার হলে মন্তব্য কাছে নিয়ো। অবশ্য শূন্য হাতে বসে আছি ২০।২।৫২

তারাশঙ্কর

গৌরীশঙ্কর—

কাল হরতাল ঘোষণা করেছে। সুতরাং চিন্তিত হচ্ছি। তুমি যেন অবশ্য কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করো। আশা করি স্মরণে আছে যা বলেছি। প্রমথর সঙ্গে দেখা হলে বলো তার কথা আমি বলেছি। কথা অনুযায়ী কাজ হবে বলেই মনে করতে পারি ইতি টাল। ১৬।৭।৫২ তারাশঙ্কর

প্রথম : প্রমথনাথ বিশী।

প্রিয় গৌরীশঙ্কর ₹ 35963

টাকাকড়ির বিষয় আমি দেখিনে—তোমাকেও এ পর্যন্ত কোন কথা বলিনি। সনতের কাছে শুনলাম—আগামীকাল তোমার টাকা দেবার দিন আছে। আমি এইটুকু জানই যে, আমার অনেকগুলি টাকার প্রয়োজন। তোমার কাছে প্রাপ্য যেটুকু তোমার কাছে নিশ্চিত হিসাবে প্রত্যাশা করি। কাল রাত্রি পর্যন্তও তুমি আসবে এইটেই আমি ধ্রুব ধরে মনে করছি।

কল্যাণ কামনা করি—ইতি ২৭।৮।৫৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
পাইকপাড়া।

পাইকপাড়ায় আসার পর ইতিমধ্যে অনেকগুলি বছর পার হয়ে গেছে। মিত্র-

বিভূতিভূষণ

তারাশংকর

ঘোষের আস্তানা থেকে দোকান চলে এসেছে ১৯৫৬ সালে, ফলে খরচ বেড়েছে। ওদিকে তারাশঙ্করেরও সামাজিক দায় দায়িত্ব, মর্যাদা সব কিছুই বেড়েছে। তিনি আমার অক্ষমতা দেখে এক সময়ে প্রস্তাব দিলেন, মন্বন্তরের সর্বস্বত্ব তোমাকে দান করছি। তুমি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো এবং অন্য বইগুলি আমার ছেড়ে দাও, অন্য প্রকাশকেরা চাইছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু অহমিকা ও মর্যাদাবোধ তখনও চূর্ণ হয়নি, আমি রাজি হই নি। মন্বন্তরের আর আগের মত বাজার নেই, ও নিয়ে কি হবে। আর দানই বা নেব কেন? তিনি আমাকে নতুন বই দেবার প্রতিশ্রুতিস্বরূপ অগ্রিম টাকা নিয়ে রেখেছেন, বেশ কয়েক বছর আগে, কিন্তু তা পাই নি, উল্টে এই প্রস্তাব। অবশ্য আগাম টাকা তাঁর প্রাপ্যের সঙ্গে সামিল করে নেওয়া হল। তার পরও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল না, অর্থাৎ কারবার দিন দিনই অবনতির দিকে চলল। অবশেষে তারাশঙ্করের বই-গুলি একে একে ফিরোলো ও আমি নতুন মুদ্রণ প্রকাশ করতে না পারায় হাতছাড়া হল। আমি কেবলই দুরাশা করেছি যে একটু সামলে উঠে আবার প্রকাশ করতে পারব কিন্তু বাস্তবে তা হল না, দোষ আমারই। আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যের হাতে তুলে দেবার ইচ্ছে থাকলে অনেক আগেই সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তা পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন স্নেহাস্পদের হাতেই অর্পিত অধিকারটুকু বজায় থাকুক। ধৈর্য ধরে ক্ষতি স্বীকার করেও অপেক্ষা করেছিলেন যদি আমার সাধকে সাধ্যে উন্নীত করা যায়। তাঁর ব্যবসায়িক চরমপত্রটির বাংলা তারিখ ৩রা বৈশাখ ১৩৭৩। একেবারে সরকারী ভাষার সে চিঠি আজও চোখের সামনে ভাসছে : 'আপনাকে বার বার 'পঞ্চগ্রাম' চাহিয়া পাই নাই এবং কয়েকজন পুস্তক-প্রকাশকের নিকট অবগত হইয়াছি তাঁহারাও বই কিনিতে গিয়া পান নাই। কয়েকবার পুস্তকের হিসাব চাহিলেও পুস্তকের হিসাব দেন নাই। সেই হেতু আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যে, 'পঞ্চগ্রাম' ও 'মন্বন্তর' পুস্তক দুইখানি নিঃশেষিত হইয়াছে। সে সংবাদ ইচ্ছাপূর্বক আমার কাছে গোপন রাখিয়াছেন.. নানান্ দিক বিবেচনা করিয়া উক্ত পুস্তকগুলি অন্যত্র ছাপিবার বন্দোবস্ত করিতেছি।'

এর আগেই বলা হয়েছে যে, বিভূতি-ভূষণ প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করতেন এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান তাঁর

পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতেন। আর তারাশঙ্করের সাধনা ছিল মানুষের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নিজের সাহিত্যে প্রকাশ করা। শুধু সাহিত্যেই নয় সমাজের সর্বক্ষেত্রে তার যাতে প্রতিফলন ঘটে সে জন্যও চেষ্টা করা। এই কল্যাণব্রতের প্রথম ও প্রধান শরীক ছিল সমসাময়িক সাহিত্য-সাধক মানুষগুলি।

মাঝে মাঝে বলতেন : আমার আনন্দের দিনে আমি তোমাকে কাছে ডাকব, কেন না আমার আত্মীয় তুমি। সবার সঙ্গে মিলিত হলে তবেই আমার উৎসব সাঙ্গ হবে। আবার আমার বিপদে-আপদে তোমার কাজ হল আমার পাশে এসে দাঁড়ান, আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া, কাছে থেকে বল-ভরসা জোগানো। এটাই হল সমাজবন্ধন।

আমাদের বন্ধু নরেন্দ্রনাথ মিত্র তখন একটি ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ সাংসারিক বিষয়ের ঘোর-প্যাঁচ বোঝার মত চতুরতা তাঁর মোটেই ছিল না। কিন্তু যে পাসিং অফিসারের কাজ তাঁকে করতে হত তাতে রীতিমত প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সইসাবুদ পরখ করে তিনি ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করলে পার্টির পেমেণ্ট হত। একবার একটি সই জালের ব্যাপারে পাকেচক্রে তাঁকে এমনই জড়িয়ে পড়তে হল যে, চাকরি ত কোনোমতেই থাকবে না, অপরাধ প্রমাণিত হলে জালিয়াতীর প্রাপ্য সাজা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

তারাশঙ্করের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল এবং পরিচয়টুকু অবশ্য তারাশঙ্করেরই উদ্যোগে ঘটেছিল। সাময়িক পত্র 'চোর' গল্পটি পড়ে তারাশঙ্কর এমনই মুগ্ধ হয়ে ছিলেন যে, সনৎকুমারকে বলেছিলেন এই ছেলেটির হাত অসাধারণ এবং সনতের মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের কাছে নরেনের বিপদের কথাটা তারাশঙ্করের কানে পৌঁছতে তিনি রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারাশঙ্করের দৃঢ় বিশ্বাস নরেনের মত ছেলের পক্ষে এ ধরণের কাজ করা অসম্ভব, ডাক্তারেরও সেই ধারণা। অসম্ভব তারাশঙ্কর বললেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে। নরেন ও ধীরেন দুই ভাই তাঁর সঙ্গে দেখা করলে, তিনি কেশবচন্দ্র গুপ্তের কাছে বিশেষ অনুরোধ করে একখানি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন, যেমন করে হোক নিরপরাধ তরুণ সাহিত্যিককে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। সে সময়ে প্রায় সহায়সম্বলহীন, বিপন্ন ও স্বল্পপরিচিত নরেন্দ্রনাথের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সদাশয় আইনজীবী কেশব গুপ্তের কাছে তারাশঙ্কর দরবার না করলে নরেন্দ্রনাথের জীবনে হয়ত বিরাট বিপর্যয় ঘটে যেত।

আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমন আর একজনের কথা জানি, তিনি শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। নারায়ণ চৌধুরী মশাই আত্মাভিমানী এবং যে সময়ের কথা বলছি, তখন তিনি স্বীয় আদর্শবাদ আঁকড়ে থাকার জন্য ওপরওয়ালার সঙ্গে বিবাদ করে ভালো চাকরি ছেড়ে দিয়ে খুব অর্থ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। নারায়ণবাবু অত্যন্ত সৎ মানুষ, ভালো মানুষ কিন্তু গোঁড়া। তারাশঙ্কর গোটা ব্যাপারটা যখন জানলেন তখন আর কিছু ভেবে না পেয়ে, নিজের ছোট মেয়ে বাণীকে পড়ানোর জন্য নারায়ণবাবুকে অনুরোধ করলেন। যদিও বাণীর একজন প্রাইভেট টিউটর ছিলেন তবু এই ব্যবস্থা করা হল। সব চেয়ে মজার কথা, নারায়ণবাবু স্বভাব তার্কিক এবং তর্কের সময়ে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, নিজেরই সে খেয়াল থাকে না।

প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সময়ে ভাষার সংযমও তাঁর হারিয়ে যায়। আমাদের আড্ডায় নারায়ণ আর শিবনারায়ণের তর্ক-যুদ্ধে হাতাহাতিটুকু বাকী থাকত। তাঁর তারাশঙ্করের সঙ্গেও সাহিত্যের প্রসঙ্গ নিয়ে প্রায়ই উত্তেজনার সৃষ্টি হত। এবং তার অনিবার্য পরিণতি। নারায়ণবাবুর বাণীকে পড়াতে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। তারাশঙ্কর তখন সনৎকে পাঠিয়ে দিতেন—'যাও নারাণ হয়ত চটে গিয়েছে, তাকে ধরে নিয়ে এস।'

যে-কোনও সাহিত্যিক দুরবস্থায় পড়ে তাঁর শরণ নিলে ত কথাই নেই, না নিলেও নিজে উদ্যোগী হয়ে তাকে সাহায্য করা যেন তাঁর জীবনের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন। সেখানে মতাদর্শের পার্থক্য কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। বোধ হয় এই জন্যই তাঁর বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এমন নামজাদা মানুষদেরও দেখেছি তারাশঙ্করের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই-এর ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের এই বিশেষ দিকটির পরিচয় পেয়েছি।

কোনো এক বিকেলে তারাশঙ্কর আমাকে বই-এর দোকান থেকে বার করে নিয়ে এলেন। কারণটা ঠিক মনে নেই, কেন-না হামেশাই তিনি বিকেলে ওঁদিকে যেতেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম, কোনো কাজ থাক বা না থাক—এটাই ছিল রীতি। কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে তিনি হঠাৎ 'মানিক, মানিক, ও মানিক' বলে বেশ জোরে ডাকতেই স্বাস্থ্যবান, ঋজুদেহী, ময়লা রঙের, বুদ্ধিদীপ্ত এক ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন—'এই যে তারাশঙ্করদা ভালো আছেন ত?'

তারপর দু-একটা কথা বলে' ভদ্রলোক ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। কিছুক্ষণ সেই দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারাশঙ্কর বললেন—'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, গৌরী! মানিকের হাত ধরতেই সে আমায় কিছুতেই কাছে এগুতে দিল না, কেবল ঠেলে রাখছিল।'

আমি জবাব দেব কি! কিছু ত সেরকম মনে হয়নি। তাই কিছু না বলে প্রতীক্ষায় রইলাম। উনি বললেন—'পাছে ওর মুখে গন্ধ পেয়ে কিছু বলি। ওই জন্যে সাত-তাড়াতাড়ি পালাল। ও আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়।'

তারপর মানিকবাবুকে অনেক দিন দেখিনি। তবে তাঁর সম্পর্কে খবরাখবর যা শুনি তাতে মন খারাপ হয়ে যায়। তারাশঙ্কর একদিন বললেন—'মানিককে নিয়ে খুব মুস্কিল হয়েছে। এইভাবে চললে ওকে আর বেশি দিন বাঁচানো যাবে না। নিজের সর্বনাশ করলে কে কি করতে পারে বলো!'

মুখে যাই বলুন অতুল গুপ্ত মশাই-এর কাছে গিয়ে এবং সরকারী মহলে প্রভাব খাটিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থাও তাঁর পরিবারের বার বাবদ টাকা মঞ্জুর করিয়ে ফেলতে তাঁর মোটেই দেরি হয়নি। এমনি আরও কতজন যে তাঁর স্বভাব উপকৃত হয়েছেন তার হিসেবে দেওয়া অসম্ভব, কেননা সব সময় বলতেন না এসব কথা। কেবল যেখানে বেদনার ভার দুর্বহ হত সেখানেই সমবেদনার আশীর্বাদ হতে পারে এমন মানুষের কাছে মুখ খুলতেন।'

তিনি যে সাহিত্যিক সমাজের অভিভাবক সে শুধু বিশেষ বয়েকজনের উপকারের স্বভাবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এর আগে একটি চিঠিতে তিনি দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। ব্যাপারটা ছিল, রায়চৌধুরী মশাই তখন মাদ্রাজে গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস-এর অধ্যক্ষ। সেখানেই থাকেন। বছরে—দু বছরে এক আধবার কলকাতায় যখন আসেন তখন তাঁর হোটেলে মদ-মাইফেলের মচ্ছবে সাহিত্যিকরা শিল্পীরা মত্ত হন। সাহিত্য তাঁর নেশা। 'পিশাচ' নামে উপন্যাসখানি প্রকাশের ভার তারাশঙ্করের দৌত্যে আমার ওপরই পড়ে এবং প্রথম সংস্করণে প্রচুর মুদ্রণ প্রমাদের জন্য খুব ধিক্কারও ভাগ্যে জোটে। তারপর চিঠিপত্র ও কলকাতায় তাঁর আসা-যাওয়ার

শেক্সপীয়র — ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩০.০০
মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য — ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র ২০.০০
শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা — (সংকলন) — ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত ২৫.০০
• এছাড়া মুক্তধারা-র (বাংলাদেশ) প্রধান পরিবেশক
পুস্তিপত্র ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

মাধ্যমে আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 'মাংসলোলুপ' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিন পর লালবাজার থেকে চিঠি এল আমার কাছে। বই পাঠাও। অর্থাৎ শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তার আগে গজেনদা এবং আরও অনেকের রচনা সম্পর্কে লালবাজারে পরোয়ানা জারি হয়েছে। কোনো কোনো বইএর অংশবিশেষ কেটে বাদ দিয়ে নতুন 'পবিত্র' সংস্করণ প্রকাশের ছাড়পত্র মিলেছে, কারুর বা তাও জোটে নি। সাহিত্যিক ও প্রকাশকমহল পুলিশের এই পাইকারি হামলায় যুগপৎ বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত। কখন কার কোন্ লেখা অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে পড়ে তার ঠিক কি। এর মূলে তাবক সাধুর মত কোনও ব্যর্থ সাহিত্যসাধক রয়েছেন।

লালবাজার যখন 'মাংসলোলুপ' তলব করল তার আগেই দপ্তরীখানার কর্মচারীদের তৎপরতায় ওজন দরে ফর্মা সাফ হয়ে গিয়েছে। আমি তাই জানিয়ে দিলাম কিন্তু দেবীপ্রসাদ তখন কলকাতায় এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে চিঠিখানা দেখাতেই ওই বিরাট ব্যক্তিটি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই ধরনের অনাচারের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে আত্মরক্ষার জন্যই তাঁর মাথাব্যথা। দেখলাম মাদ্রাজে বাজা গোপালাচারীর বাজত্বে পাছে তাঁর চাকরির খাতায় লালকালির দাগ পড়ার ভয়েই তিনি অস্থির।' হোটেল ম্যাজিস্টিকে সন্ধ্যা লগ্নে সুরার আসরে চোখে রং ধরতে চাচ্ছে না। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গোপাল ঘোষ এবং আরও অনেকের সঙ্গে ওখানে আড্ডা দিলেও কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার এবং আমি ঘোল, বড়জোর কাটলেট পর্যন্ত খেয়ে হোস্টের মুখ রক্ষা করতাম। কি জানি সুরার রংটুকু ছাড়া আর কিছুই আমাকে আকৃষ্ট করেনি কখনও। হ্যাঁ, যা বলছিলাম তাঁর সুহৃদ পরামর্শ দিলেন, বেয়ারা বা কেরানীকে জলপানী দিয়ে ফাইল থেকে কাগজ সরিয়ে ফেলা হোক। সেদিন এখানে-ওখানে দু-একটা ফোন করেই মূলতুবী। পরদিন সকালে শুধু এই ব্যাপারের জন্যই দেবীবাবু আমায় যেতে অনুরোধ করলেন। যথারীতি আমি হাজির, ঘন্টাখানেকের মধ্যে ডজন দেড়েক ফোন বড়কর্তাদের কাছে। কিন্তু তাতে বিশেষ মুস্কিলআশান হল না। তিনি রণক্লান্ত। আমি বললাম—'আমার কথা শুনবেন?' তারাশঙ্করের নাম করতেই শিল্পীর চোয়াল অস্বাভাবিক শক্ত ও উঁচু হয়ে উঠল। অনুমান করলাম, কোনও কারণে অসন্তোষ জমেছে ভেতরে। শেষে বললেন—'করতে হয় তুমি করো।'

করলাম ফোন। উনি তৎক্ষণাৎ জানালেন—'দেবীকে ব্যস্ত হতে মানা করো। ডকটর রায়ের কাছে ডেপুটেশনে যাবার একটা কথাবার্তা চলছে। তুমি বরং কাল সকালে বাড়িতে চলে এস একবার। সামনাসামনি সব শুনবে।'

এরপর সাহিত্যিকদের একটি প্রতিনিধিদল রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডকটর রায়ের কামরায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তারাশঙ্কর দলের নেতা, আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী সজনীকান্ত দাস, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং কনিষ্ঠতম আমি আর সরকারী তরফে ছিলেন চীফ সেক্রেটারি ও হোম সেক্রেটারি।

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অভিযোগ—শিল্প ও সাহিত্যের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে পুলিশ সংস্থার অধিকার খর্ব করছে। সেই সঙ্গে এও বলা হল যে, যে আইনের বলে পুলিশকে যথেচ্ছ আক্রমণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে আইন ইংরেজের দমননীতির হাতিয়ার এবং স্বাধীন দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত।

বিধানবাবু সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। আধ ঘন্টার ওপর তর্কবিতর্ক হল। মূলতঃ তিনি আমাদের বক্তব্যই সমর্থন করলেন। হোম সেক্রেটারিকে নির্দ্বিধায় বললেন—

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

৮ মে থেকে ২২ মে

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২·৫০ টাকা বাদ দিয়ে—সমুদয় রবীন্দ্র-গ্রন্থ এবং বিশ্বভারতী-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোন পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুযোগ পাবেন।

এজন্য স্থানীয় পুস্তকবিক্রেতাগণ ৬ মে ১৯৭৮ থেকে অতিরিক্ত কমিশন পাবেন এবং এই কয়টি কেন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার, [illegible]

বিশ্বভারতী সমবায় সমিতি
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী, কলিকাতা [illegible]

বিজয়চাঁদ রোড, বর্ধমান

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯

ভারতী ভবন
গোবিন্দ মিত্র রোড, পাটনা ৪

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

অল ত্রিপুরা বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন
২৮ আশাউড়া রোড, আগরতলা

চিঠিপত্র, অগ্রিম ও মফস্বল থেকে অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ৭০০০১৭

২৭ এপ্রিল থেকে ১৬ মে ১৯৭৮ পর্যন্তপ্রাপ্ত মফস্বলের পুস্তক বিক্রেতাদের অর্ডারে যেগুলি ডাকে, রেলে, সড়কপথে ও বিমানে সরবরাহ করা হবে সেগুলিতে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া সম্ভব হবে।

কাগজ ছাপা ও বাঁধাইয়ের ব্যয়বৃদ্ধির জন্য পূর্বের চেয়ে বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত খন্ডগুলির দাম বাধ্য হয়ে বাড়াতে হওয়ায় অনেক পাঠক রবীন্দ্র-রচনাবলী সংগ্রহ করবার অসুবিধার কথা জানিয়েছেন—তাঁদের যাতে কিছুটা সুবিধা হয় সেজন্য ৮ মে থেকে ২২ মে ১৯৭৮ পর্যন্ত অচলিত সংগ্রহ দুটি খন্ড সমেত রবীন্দ্র রচনাবলীর বর্তমানে প্রাপ্তব্য সবগুলি খন্ড এক সঙ্গে কিনলে সর্বসাধারণকে ২০%, সাধারণ পাঠাগারকে ২২½% এবং স্থানীয় ও মফস্বলের পুস্তকবিক্রেতাদের ২৫% কমিশনে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

।। পুস্তকবিক্রেতাগণ মোট পুস্তকমূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ এবং সাধারণ ক্রেতাগণ শতকরা ৫০ ভাগ অগ্রিম পাঠাবেন।।

শুনুন তুমি কি মনে করো সে প্রেসকে অ্যাস্টাগনাইজ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো সম্ভব? তাছাড়া অবাসিনিটির বিচার এভাবে করা যায় না, একজন অশিক্ষিত পান-ওয়ালার দৃষ্টিতে যা অশ্লীল, শিক্ষিত আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে কিংবা কোনো চিকিৎসকের কাছে তা অনুসন্ধানের বিষয়, এখানে সেক্স বা সেন-স্যুয়ালিটি একেবারেই নেই!'

সেক্রেটারিদের সুর নরম হল। তাঁরা বললেন—তাহলে অ্যাসেমব্লিতে নতুন বিল এনে আইন পাল্টাতে হয়।

ডক্টর রায় কলারের বোতাম ঘুরোতে ঘুরোতে (এটা তাঁর অভ্যেস) বললেন—সে ত পরের কথা। এখন কি করা যায় সেটা ভাবতে হবে।

ভাবাভাবির জন্য সময় নষ্ট করা যায় না। অবশেষে স্থির হল, যেসব বই এখন বিচারাধীন সেগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া। অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিচারভার শুধু পুলিশের ওপর থাকবে না। এর জন্য বেসরকারী একটি কমিটি গঠন করে বিচক্ষণ সাহিত্যিক প্রতিনিধিকেও তার মধ্যে নেওয়া হোক। সত্যি তারপর থেকে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তারাশঙ্কর উদ্যোগী না হলে আর কেউ এগিয়ে এসে এই কাজের বোঝা ঘাড়ে নিতেন বলে আমার ত মনে হয় না।

বামপন্থী রাজনীতি থেকে সরে এলেও তারাশঙ্কর বামপন্থীদের সংঘবদ্ধতার তুলনায় দুর্বল কংগ্রেসের সংগঠনের ত্রুটী গুলো চোখ বুজে মেনে নিতে পারেন নি। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নেতাদের বার বার সচেতন করতে চেয়েছেন। বিশেষ করে উঠতি তরুণ সমাজকে যাতে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট করা যায় সেই উদ্দেশ্যের দিকে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন, শুধু মুখের কথা নয়, নিজেও সে চেষ্টায় এক সময়ে নেমে পড়েছিলেন। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রদের বাড়িতে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ ছিল। তারাশঙ্কর বললেন, কংগ্রেসের নাম যুক্ত থাকলে ছেলেমেয়েরা আসতে চাইবে না। দলীয় গন্ধটা মুছে দিয়ে ব্যাপক অর্থ বহন করে এমন নাম দেওয়া হল 'জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ'। পরিষদের দপ্তর অবশ্য চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে স্থাপিত হল। পরিষদের উদ্দেশ্য উঠতি সাহিত্য সাধকদের লেখা আহ্বান করা। তাদের মধ্যে থেকে শক্তির প্রতিশ্রুতি আছে এমন লেখকের লেখা পাঠ ও আলোচনা এবং পরিষদের তরফ থেকে মনোনীত লেখাগুলি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়ে প্রকাশের অনুরোধ জানানো। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিষদের বৈঠকে তারাশঙ্কর, প্রমথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, জিতেন চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যিক ও সমালোচকের সামনে লেখককেই লেখা পড়তে বলা হত, তারপর গুণাগুণ বিচার ও লেখককে প্রয়োজনীয় মার্জনার পরামর্শ দেওয়া হত। এই আসরে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক গল্প পড়তে দেখেছি। তবে পরিষদ খুব জনপ্রিয় হবার আগেই, কল্যাণী কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়ে গেল। ওই অধিবেশনে সাহিত্যিকদের ভূমিকা কি হবে, বাংলার লোক সংস্কৃতির সঙ্গে বৃহৎ ভারতের পরিচিতি ঘটানোর কথাও উঠল। নাচ, গান সব কিছুই পরিবেশনের কল্পনা-কল্পনা করে একটি কর্মসূচী পেশ করা হল। অতুল্যবাবুও খসড়া দেখে তাতে সায় দিলেন। সেই অনুযায়ী অনেকের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছে। কাজ অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর মাঝপথে অতুল্যবাবু একদিন তারাশঙ্করকে জানালেন, সংস্কৃতির জন্য খুব অল্প সময়ই বরাদ্দ করা যাবে, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কর্মসূচী ব্যাপক ও বিস্তর। ছাঁটকাট করে প্রায় কিছুই থাকে না দেখে তারাশঙ্কর খুব হতাশ হলেন। তারপর যেটা স্বাভাবিক তাই হল, তিনি ওই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ কংগ্রেসের সরকারী ছাপ মারা সম্পত্তি হয়েই থাকুক। সাহিত্যিকের স্বাধীনতা খণ্ডিত হতে দিতে তিনি নারাজ। তাঁর দৃষ্টিতে কংগ্রেস কেবল একটা দল নয়, বিশেষ আদর্শ। কংগ্রেস দলের সদস্য না হয়েও এই আদর্শে আস্থাশীল মানুষ সহগামী হিসেবে কাজ করতে পারে, তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেবল কলকাতার নাগরিকদের খাস দখলের পত্র-পত্রিকা আর রেডিও মঞ্চের সম্পত্তি নয় বাংলার গাঁয়েগঞ্জে কবি, সারি, জারি, টুসু, বাইবেঁশে, বাউল সকলের একইরকম অধিকার ও মানসিক ভোজের শ্রীক্ষেত্রে বিস্তৃত। সংস্কৃতি পরিষদ বলতে তিনি এটাই বুঝেছিলেন। এ কথা বলছি কেন না, পরিষদে যাবার সময়ে প্রায়ই তাঁর গাড়িতে গিয়েছি অথবা বৈঠকে তাঁর পাশে থেকে কাজ করেছি, নতুন নতুন শিল্পী ও সাহিত্যিক বাছাইএর ব্যাপারে নিজের পরামর্শ দিতেও বাধা ছিল না বরং তিনি জানতে চাইতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

সংস্কৃতি পরিষদের অস্তিত্ব ম্লান হল। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্ক বজায় রইল। তবে অতঃপর তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়ল, নিজে থেকে আর নতুন সূচী পেশ করতেন না, পরামর্শ চাইলে অবশ্যই দিতেন। কেন না এটুকু বুঝেছিলেন, ক্ষমতাসীন দলের সহায়তা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে দেশের মানুষের কল্যাণমূলক কাজ চলতে পারে না।

আগামী যুগের জন্য কিছু করে যাবার চিন্তা সব মানুষেরই থাকে এবং চেষ্টাও। তার প্রকাশ এক-এক সময়ে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন রকমেরই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তারাশঙ্করের সংসার বৈরাগ্যই মূল উৎস। মাঝে মাঝেই তিনি বাড়ির ওপর অর্থাৎ গৃহিণীর ওপর খুব রেগে যেতেন, সব পরিবারেই এটা ঘটে, কাজেই আমরা ওদিকটা যতটা লক্ষ্য না করে থাকা যায় সেই চেষ্টাই করতাম। কিন্তু সব সময়ে সেটা সম্ভব হত না। সনতের মা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন, এখনও করে থাকেন। বলেন—'তুমি আমার কাছে সন্তুর মতো। তবে সন্তান বড় হলে '। মায়ের কাছে সংসার আর সন্তানদের দাবি যখন বড় হয়ে ওঠে তখন স্বামীর ওপর থেকে প্রেম ভালবাসা কমে যায় না। আর তা যায় না বলেই সংসারের জন্য দাবিদাওয়ার মাত্রাও প্রয়োজনমাফিক বেড়ে যেতে বাধ্য। অধিকার খাটানোও আস্থার অভিব্যক্তি। টালার বাড়ি যখন তৈরি শুরু হয় তখন ছোটর মধ্যে দোতলা করার মতলব ছিল। উমা দেবী আবদার ধরলেন—'না, না, আমার কেউ একতলায় থাকবে, কেউ দোতলায় থাকবে, তা কি করে হয়।' অর্থাৎ বাড়ি হবে ত বড় বাড়িই হোক। তাঁর মনে সেই পুরনো দিনের জমা থাকা ধনী আত্মীয়দের অবজ্ঞাসঞ্জাত বেদনাই এর জন্য অনেকটা দায়ী।

কলহের পশ্চাতে এই ধরনের ছোট-বড়-মাঝারি বহুবের কারণই বেশি। তারাশঙ্কর খুচরো অশান্তি চান না, তাতে নিজের কাজের খুব ক্ষতি হয়। কিন্তু আর্থিক চাপ বড় সোজা ব্যাপার নয়। সে যা-ই হোক, কোনও কারণে তিনি একবার কাশী চলে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে দোকানে এসে আমার খোঁজ করলেন উদ্দেশ্য টিকিট কেটে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিতে হবে। ভাগ্যিস ছিলাম না সামনে, ওই বৃদ্ধ মূর্তির সামনে অবাধ্য হওয়া অসম্ভব ছিল।

ঠিক এরকম না হলেও প্রায় কাছাকাছি আর একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হল কোনও এক রবিবার। সকালের আড্ডা

গঙ্গোত্রী প্রকাশনীর একটি উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থ :—

সৈয়দ কওসর জামালের

নষ্ট অরণ্যে ইউক্যালিপটাস

এ দশকের গোড়ায় কাব্যচর্চা শুরু করে যে তরুণটি ইতিমধ্যেই বাংলা কবিতায় একটি নিজস্ব কণ্ঠস্বর তৈরি করতে পেরেছেন, তাঁর এই প্রথম কাব্যগ্রন্থে তাঁর বুকের শাণিত ছোরাটিকে বারবার ঝলসে উঠতে দেখা যাবে। শুভাপ্রসন্ন-র অসাধারণ প্রচ্ছদসহ এই কাব্যগ্রন্থটি প্রত্যেকটি কবিতাপ্রিয় মানুষের সংগ্রহে রাখার মতো। দাম চার টাকা।

পরিবেশক : দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সবে জমতে শুরু হয়েছে। হঠাৎ হাজির হলেন ভোলাদা (রমণীমোহন মিত্র) 'বড়বাবু ডাকছেন। চলুন।' একেবারে গেস্তারী পরোয়ানা। নিজের জীপেই তুলে সোজা টালা পার্কের বাড়িতে। তারাশঙ্কর খুব অধীরভাবে পায়চারি করছেন—'চলো চলো, বেলা হয়ে গেল।' কোথায়? চুঁচুড়া। বাড়িতে বলে আসি নি। দক্ষিণাকে ফোনে বলে দিচ্ছি বৌমাকে জানিয়ে দিক এবেলায় ফিরতে পারবে না।

বাস, আর যেন দুনিয়ায় আমার কোনো সমস্যাই থাকতে পারে না।

গাড়ি চালাচ্ছিলেন ভোলাদা নিজেই। ভদ্দরলোকের সঙ্গে তারাশঙ্করের চেহারার এমনই মিল যে, পাশা-পাশি থাকলে দুই ভাই মনে না হয়ে পারে না। আর যারা তারাশঙ্করকে ঘন ঘন দ্যাখে না তাদের তাদের কাছে ভোলাদাকে স্বচ্ছন্দে তারাশঙ্কর বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। আমরা তিনজন পাশাপাশি। কথায় কথায় জানলাম, চুঁচড়োয় যাওয়া হচ্ছে গঙ্গাতীরে একটি আশ্রম দেখতে। সন্ন্যাসীর আর্থিক অবস্থা ভালো নয় বিক্রি করতে চান। আর ইনি নগরের কোলাহল কৃত্রিমতা থেকে দূরে মাটি আর খাঁটি মানুষের মধ্যে নিরিবিলি শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে চান। চাইলে কি হয়, বাস্তবে যে তা সম্ভব হয় নি তার প্রমাণ তাঁর জীবন।

বিভূতিভূষণ গ্রামে ফিরে গিয়ে যেমন শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতেন তারাশঙ্কর শহরে বাস করে নিজ গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। অবশ্য গ্রামের কল্যাণকর অনেক কাজও করেছেন। গাঁয়ের লোকে তাঁকে পেলে জমানো মনের কথা জানাতে ছুটে আসতো। আপাততঃ সে কথা থাক। চুঁচড়োর রায়েরা বিখ্যাত পরিবার এবং সুযোধ রায় নিজে কবি তিনিই গোটা ব্যাপারটা তদারক করছেন। তাঁদের বাড়িতে সন্ন্যাসী এলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর আসল রং ফুটে উঠল। উনি হিংলাজ তীর্থ দর্শন করে এসেছেন এবং তার কাহিনী লিখেছেন। একেবারে হাতেখড়ি। নিজে ঠিক বুঝতে পারছেন না কেমন হচ্ছে। তাই তাঁর বড় ইচ্ছে আমাদের একটু শুনিয়ে মতামত যাচাই করার। আপত্তি কিসের শুরু হল। প্রথম কিস্তি ধামাচাপা রইল, স্নানাহারের পর সন্ন্যাসীর আশ্রমে যখন পৌঁছলো বাকীটুকু তখন। তার মানে ইনিই মালিক।

একেবারে গঙ্গার গর্ভেই বলা যায়। রাস্তা থেকে জোড়াঘাটের নেমে-যাওয়া সিঁড়ির একটা জায়গায় পাশ থেকে আশ্রমের প্রবেশ-পথ। কিন্তু প্রবেশ করার পথ থাকা মানেই পাকাপাকি প্রবেশাধিকারের পথ নয়। দরদাম ও অন্য কি কি কারণে শেষপর্যন্ত আশ্রমটা কেনার সঙ্কল্প চুঁচড়াতেই থারিজ হয়ে গেল। কিন্তু ওই হিংলাজের কাহিনী ভোলাদার গাড়িতে চড়ে বসল আমার সঙ্গে। ইতিমধ্যে বড়বাবু আমার ধারণার ধড়শরিক হয়েছেন অর্থাৎ লেখকের এটাই প্রথম লেখা নয় এবং কলমে বেশ দখল আছে। গাড়িতে ওঠার সময়ে পান্ডুলিপি নেওয়ার কথা খোদ বড়বাবুই বলেছেন। পথে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি ভেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? উনি বেশ জোর দিয়েই জবাব দিলেন, 'যেন, তোমার জন্যে তাও বোঝো নি।' তাঁর ভাবখানা এই যে কথাসাহিত্যের আমি অন্যতম সম্পাদক, সেখানেই অবধূতের মরুতীর্থ হিংলাজ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে এতে আর সন্দেহ কী। একজন সাহিত্যিককে আবিষ্কার করার প্রসন্নতায় তাঁর মেজাজ বেশ খুশি—আশ্রমবাস, মাটির কাছাকাছি নিরিবিলিতে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটানো, সেই খেয়াল তখন কোথায় উধাও কেই বা জানে। এই কাহিনীর শেষ এখানেই হতে পারত যদি গজেনদার আপত্তির ফলে অবধূতকে কথা-সাহিত্যের বদলে ভবঘুরের স্বপ্নে পত্রস্থ করার পরোক্ষ বন্দোবস্ত আমাকে করতে না হত এবং পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে বইটির জনপ্রিয়তা দেখে মিত্রঘোষের তরফ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য ছেড়ে দিয়ে তেতো ধরার জাল ফেলা না হত।

অবধূত ধূমকেতুর মত সাহিত্যের আকাশে গরম করে ফেললেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তার সঙ্গে লেখার মধ্যে বীভৎস রস ও আদিরসের এমনই মিশ্রণ বেড়ে যেতে লাগল

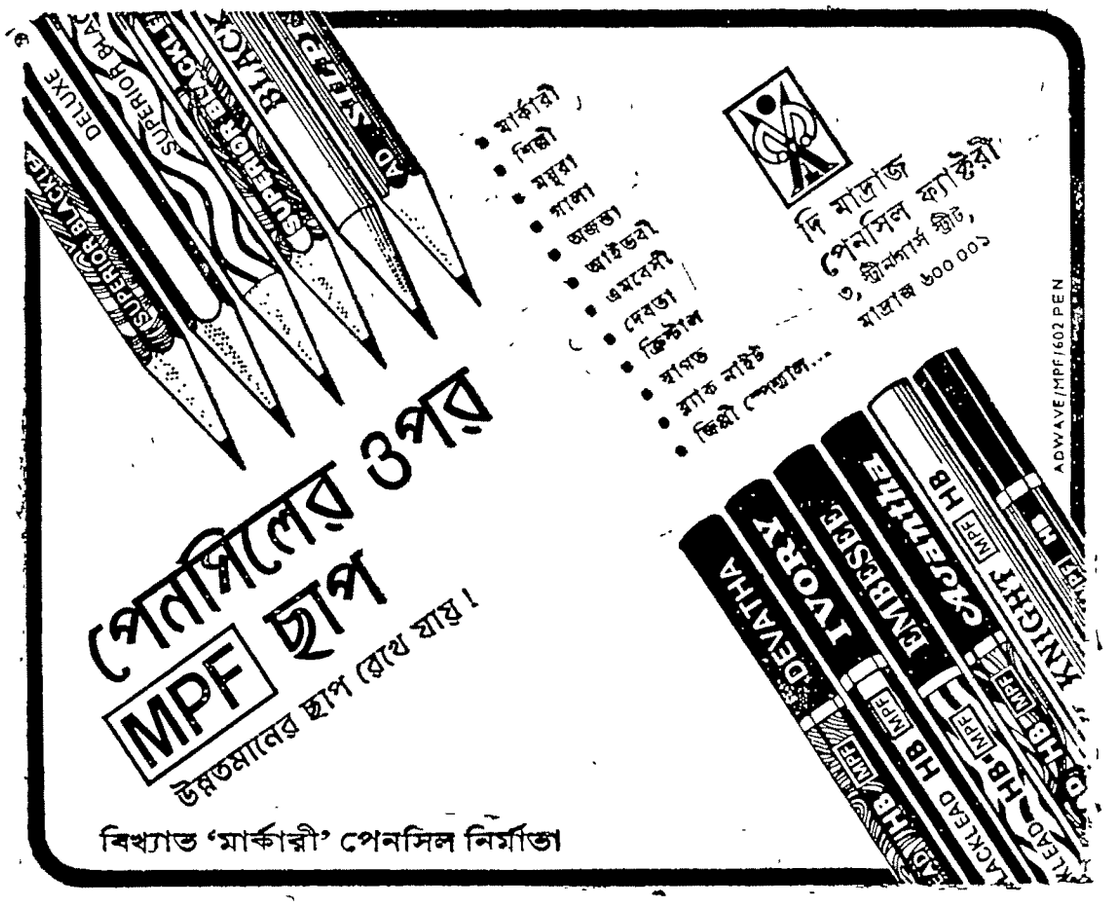

যে আমরা সবাই বিচলিত না হয়ে থাকতে পারলাম না। তারাশংকর অন্তরঙ্গ মহলে মন্তব্য করলেন—'আমার নাগিনী কন্যার কাহিনীতে যে মন্দতা দেখাতে হয়েছে সেটা প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়েছে। কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে পাবভার্সান ছাড়া বড় কোনো উদ্দেশ্য নাই।' কেউ কেউ এমনও ধারণা করে বসলেন, উনি নিজে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন তার ফলই ত এটা, 'উনি বোধহয় অবধূতের গপ্পলারিটিতে জেলাস' এমন আলাপচারিতাও শুরু হল। আসলে অবধূতকে তিনি যে স্নেহের আসনে বসিয়েছিলেন সেই অধিকারবোধ থেকেই বোধহয় সজনীকান্ত বাসের জন্মদিনের উৎসব সন্ধ্যায় সরাসরি আক্রমণ করলেন। অবধূত কি বলেছিলেন বা উত্তরের মধ্যে বাগবৈদগ্ধটা কিরকম হয়েছিল হুবহু বর্ণনা দিতে পারব না। ভিড়ের মধ্যে তারাশংকর অকস্মাৎ চলে গেলেন। যখন চুকেছিলেন তখন মুখে রুমাল চাপা ছিল, হাত তুলিয়ে ডেভিস্টেন্টের কাছ থেকে সরাসরি এসেছিলেন, তাঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তাই চলে গেলেন এটাই সবাই জানল। হাওয়াতে গোলমেলে গন্ধটা মাত্র পেলাম। পরে অবশ্য ব্যাপারটা জানা গেল। তারাশংকর নিজের অসংযত আচরণের জন্য দন্তের চেয়েও অন্তরের বন্দ্রণায় ছটফট করতে লাগলেন এবং খোঁজখবর নিয়ে বুঝলেন নিজের ভুল। সজনীকান্তের কাছে লিখিত একটি চিঠিতে জানালেন :

'আমি অবিশ্বাস্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে অপরাধ করেছি কিন্তু তাতে শ্রীঅবধূতের প্রতি অন্যায় বা অবিচারের অপরাধের স্খালন হয় না। এই অপরাধের জন্য আমার অশান্তির শেষ নাই। তোমার বাড়িতে এই উক্তি করেছিলাম সেই কারণেই তোমার কাছেই আমি শ্রীঅবধূতের নিকট আমার অকপট ত্রুটির স্বীকৃতি ও তার জন্য মার্জনা ভিক্ষা নিবেদন করছি। তাঁকে এটুকু জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।'

সজনীকান্ত অবধূতের কাছে একটি চিঠি লিখলেন :

ভাই অবধূত,

সর্বাগ্রে আমার.... আশীর্বাদ নাও।

আমার জন্মদিনে আমারই বাড়িতে যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল এবং যার ফলে তোমার বহু মনঃকষ্টের কারণ ঘটিয়ে আমিও লজ্জিত আছি, বড়বাবু অর্থাৎ তারাশংকর গতকাল স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি চিঠিতে তাঁর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি একাবণে অতিশয় অনুতপ্ত এই কথা জানিয়ে ঘটনাটির উপর যবনিকাপাত করেছেন। তোমার দেবতা অতি অল্পকালের মধ্যে তোমার মনকে গ্লানিমুক্ত করবার সুযোগ দিলেন এতে আমিও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি আবার তোমার প্রসন্নতা ফিরে পাও এই আমার আন্তরিক কামনা।

তারাশংকর লিখেছেন : .....' তারাশংকর যা লিখেছেন সেটুকু উপরে উদ্ধৃত করে দিয়েছি। সজনীকান্তের চিঠির পরবর্তী অংশ এই : '.....সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে তুমি যদি তাঁকে একখানি চিঠি লেখো তাহলে আমার চাইতে কেউই বেশি সুখী হবে না। আমিও তোমার পত্রের প্রত্যাশায় থাকব। আশা করি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল।

ইতি

প্রীতিধন্য সজনীকান্ত

সজনীকান্তের উপরোক্ত চিঠির একটি নকল কি করে যেন রয়ে গেছে। নকলটি গজেনদার হস্তাক্ষরের এবং শিরোদেশে 'টু কপি' লেখা। বোধহয় চিঠিখানি তাঁকে পাঠাবার পর তার এই প্রতিলিপিটি আমায় দেওয়া হয়েছিল, আমি যদি ইতিমধ্যে চুঁচুড়ায় যাই এবং অবধূত ডাকের চিঠি না পেয়ে থাকেন অথবা অবধূত আমার বাড়িতে এসে পড়েন ত তাঁর হাতে দিয়ে দেবার জন্য। তার আগেই এই সাময়িক বিস্ফোরণের ধূমজাল সামনাসামনি সাক্ষাতে মধুরভাবে মীমাংসিত হয়ে যাওয়ায় চিঠির নকলের কথা কারুরই স্মরণ ছিল না।

এর আগে আমরা দেখেছি সরকারের সঙ্গে লড়াই করে রচনার ক্ষেত্রে শিল্পী ও সাহিত্যিকের স্বাধীন অধিকারকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কিন্তু কারও কোনো রচনায় অশ্লীলতাকে পাঠকের মনে সুড়সুড়ি দেওয়ার মত নিছক অবান্তর প্রয়োগ দেখলে তিনি ক্ষেপে যেতেন। সেরকম ক্ষেত্রে সরকারী ফর্মালিটির অপেক্ষা লেখককে সরাসরি মৌখিক তিরস্কারে লাঞ্ছিত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না তাঁর। লেখককে হাতের কাছে না পেলে সেই পত্রিকার সম্পাদক বা বই-এর প্রকাশককেই প্রাপ্য তিরস্কারের পাত্র হত। আমি একবার দীপেনের জন্য রবীন্দ্রভারতীর অঙ্গনে এইভাবে ধিক্কৃত হয়েছিলাম, বেশ গল্প চলছিল—প্রেমেনদা, উমাশঙ্কর বোশী এবং আরও অনেকেই ছিলেন। ওঁদের দেখে আমি এগিয়ে গিয়েই ভুল করেছিলাম—উনিও আমার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে যা বললেন তার মর্মার্থ—এই যে আসামী হাজির' কিসের আসামী? দীপেনের যে গল্পে 'বাগুং' লেখা হয়েছে সেই গল্পগ্রন্থের প্রকাশক তুমি কিনা?

হ্যাঁ অবশ্যই।

কিন্তু—।

'কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি এ কথার অর্থ জানো আর নিজে একজন সাহিত্যিক।'

এরকম অবস্থায় একমাত্র সদুপায় চুপ করে থাকা। নইলে আরও কড়া এবং চড়া বচন তূণ থেকে বেরোতে থাকবে।

এই সঙ্গে এটাও বলে রাখা ভাল যে, সব সময়েই তিনি ছোট-বড় সকলের লেখা হাতে পেলেই পড়তেন। ছোট বড় কোনো কাগজ বা লেখক বাছাই করার চেয়ে ভালো ও মন্দ লেখা নিজে পড়ে যাচাই করতেন। এটা ভাবলে অবাক লাগে যে, এই মানুষটি নিয়মিত নিজের লেখার চাহিদা মেটাতে আর সরকারী-বেসরকারী কাজ, সভা-সমিতি। অতিথি-অভ্যাগত ইত্যাদি প্রচন্ড ব্যস্ততায় ঠাসা জীবনে অন্যের লেখা পড়বার জন্যে কোথা থেকে সময় জোগাড় করতেন। আমার পরিচিত বেশির ভাগ সাহিত্যিক অন্যের উপহার দেওয়া বইও অনেক ক্ষেত্রে পড়ার ফুরসৎ পান না। আর খুঁজে পেতে কে কি লিখচে সেদিকে নজর দেওয়া—আরও অকল্পনীয়।

নিন্দার মত প্রশংসাতেও ব্যঙ্গধর্মিতা অকপট ও উদার ভাব পরিচয়ও এই সঞ্চয়ের ঝুলিতে রয়েছে। একদিন সকালবেলায় কি খেয়াল হয়েছে কে জানে, হাঁটতে হাঁটতেই চলে এসেছেন এবং পরনে ধুতিও নয় লুঙ্গি। খুব চমকে উঠলাম—কোন অঘটনের সম্মুখীন হতে হবে? এর পরই হয়ত করালীকান্ত গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হবে—বাবু, বাড়ি চলুন। এবং উনি মেজাজ দেখিয়ে বলবেন—যা-যা তুই চলে যা, আমার সময় যখন হবে যাব। ইত্যাদি। অনিশ্চিত মেজাজটা আমলে না এনে লঘুভাবে বলি—বসুন। চা করতে বলি—

আমার কথাগুলো যেন কানেই গেল না। নিজের ভেতরের কথাটা তাঁর মন জুড়ে রয়েছে—কাল রাত জেগে বাপু পড়ে গেলাম একটানা! খুব চমৎকার লেগেছে। আপনা থেকে টেনে নিয়ে গ্যালো—

উনি কিসের কথা বলছেন তখনও মগজে প্রবেশ করেনি। শুনে যাচ্ছি। অবিশ্যি এর পরই জানা গেল আমার অ্যাল-ঝার্ট হল-এর প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে। খুশি ত হবোই আমি। কিন্তু এর পরই কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

(চলবে)

শুভ ১লা বৈশাখ বের হয়েছে

এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক রচয়িতা

ভবেশ দত্তের

সাধক রুইদাস ৫·০০

তারাপীঠের সাধক—৮·০০, সাধক তুলসীদাস—৫·০০,
প্রভু নিত্যানন্দ—৫·০০, শক্তিপীঠের সাধক—৬·০০।

ভোলানাথ প্রকাশনী : ৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিঃ—৯

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

[১। নয়]।

'পাথরে পাঁচ কিল'—রেগে গেলে পিসী বলত কথাটা। বলত, তোকে কিলোলে কি হবে, তার পাঁচ গুণ ব্যথা নিজের হাতে ফিরে আসবে। ফাঁক পেলেই অপমানের ব্যথা ও-রকম পাঁচ গুণ ফিরিয়ে দেবার গোঁ এখন বাপীর। ওকে এরপর বাংলোর গেটের কাছে দেখলেই দীপুদা তেড়ে মারতে আসে। মেমসাহেব মহারানীর সঙ্গে চোখা-চোখি হলেই ভ্রূকুটি। যেন বাইরের এই ল্যাম্পোটাও তার খাস দখলের। চাকরির লোভে আবু যখন তখন বাংলোয় যায়, মেমসাহেবকে ভেট দেয়, মিষ্টিকেও এটা সেটা দিয়ে যা জঙ্গলের গল্প বলে তোয়াজ করে। আগের মতো আবুও ওদের অত দোষ ধরে না। উল্টে ওকে উপদেশ দেয়, ভালো করে মন দিয়ে পড়াশুনা কর, মানুষ হ'—নইলে ওদের কেন—কারোই কোনোদিন পাত্তা পাবি নে।

বাপীর সব থেকে বেশি রাগ এখন মিষ্টির ওপর। ও না থাকলে তো সাপের পেটেই চলে যেত একেবারে। যে যা-ই বলুক, ওর তো কেনা হয়ে থাকা উচিত বাপীর কাছে। তা না, ওরও হাব-ভাব এমন, যেন দোষটা বাপীরই।

এর পরেও ছুটির দিনের দুপুরে এমন কি তেমন সুযোগ পেলে সকালেও বাংলোর দিকে হানা না দিয়ে পারে না। বকা-ঝকা মার-ধরের পরোয়া করে না। কিন্তু মিষ্টি সহজে কাছেই আসতে চায় না, দূর থেকেই মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দেয় আসবে না। বাপীর মাথার তখনই সব থেকে বেশি আগুন জ্বলে। রাগের চোটে

ভেংচি কাটে। ডবল বেগে গিয়ে মিষ্টিও জিভ ভেংচায়, তারপর মায়ের কাছে বা দাদার কাছে নালিশ করতে ছোটে। বাপী ওর রাস্তায় বেরুনোর অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকে। একলা পেলে মিষ্টিকে খেয়ে ফেলার কথা বলে, মিষ্টি খেয়ে জল খাবার কথা বলে, জিভ চকচক করে ওকে শোনায় মিষ্টি খেতে কত আরাম। তার ফলে বাবার কাছে বেদম প্রহার আবার একদিন।

দিন গেলে সব শাসনের কড়াকড়ি আপনা থেকে কমে আসে, সেই হিসেব বাপীরও আছে। ওই মহারানী কদিন আর মেয়েকে চোখে চোখে আগলে রাখবে? জঙ্গলের স্বাদ একবার পেলে তাকে বাড়িতে ধরা আর সহজ নয়। বিকেল হলে মহারাণী মেয়ের বাস্তায় আসা ঠেকাতে পারে না। আর ফাঁক পেলে ওই মেয়ে এখনো জঙ্গলে ঢুকে পড়ে—কিন্তু দূরে যায় না, খুব কাছাকাছির মধ্যেই থাকে। বাপীরও সেই সুযোগের অপেক্ষা।

ওকে দেখলেই মিষ্টি চোখ পাকায়, মা তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করেছে, কথা বলতেও বারণ করে দিয়েছে। যেন আমার সঙ্গে দেখলে তোমাকে বক্ষে রাখবে না বলে দিলাম।

এ-সব শুনলেই বাপীর মাথায় রক্ত ওঠে। আর মিষ্টির মাথাটা আচ্ছা করে কোনো গাছে ঠুকে দিয়ে পালাতে ইচ্ছে করে। অথচ মনের মতো পেয়ারা কুল কামরাঙা আচার-টাচার ঘুষ পেলে মিষ্টি নিজেই স্বীকার করে বাপীর কোনো দোষ নেই—ওর জন্যেই ওকে ময়াল সাপের পেটে ঢুকতে হয়নি। একদিন এ-ও কবুল করেছে যে বাপীর সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াতে ওর খু-উ-ব ভালো লাগে, কিন্তু মায়ের ভয়ে পারে না।

ওই মায়ের অবাধ্য হবার মতো এতটুকু সাহস নেই বলেই বাপী আরো বেগে যায়। ওকে বেইমান বলে, ভীতু বলে। বলে, ননির পুতুল—মায়ের আঁচলের তলায় থাকগে। ধরা পড়ার ভয় না থাকলেও মিষ্টি বারান্দা ছেড়ে গেটের দিকে আসতে না চাইলে কিল চড় দেখায়, জিভ ভেংচায়। এ-সব বললে বা করলে আদুরে মেয়েও বিষম রাগে ফোঁস করে উঠবেই। নিজেও যা-তা বলবে, পাল্টা কিল চড় দেখাবে, জিভ ভেঙাবে—আর তারপর মায়ের কাছে বা দাদার কাছে নালিশও করবে। এমনি নালিশের ফলে ওর মা মহারানী আবার একদিন ওকে ডেকে কান মলে দিয়েছিল। আর দীপুদা বোনের নালিশ শুনলেই গাঁট্টা মারতে ছুটে আসে।

এমনি করেই আরো একটা বছর কাবার। বাপী নতুন ক্লাসে উঠেছে। বরাত জোরে কিনা জানে না, মোটামুটি ভালই পাশ করেছে। ফেল করলে ওর নিজের অন্তত অবাক হবার কিছু ছিল না। কারণ পরীক্ষার আগে পর্যন্তও মনের অর্ধেকটা ওই সাহেব বাংলোর দিকেই পড়ে থাকত। আর পরীক্ষার পরের ছুটির দিনগুলোতে তো মিষ্টিকে ধরে একেবারে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করত। ক্লাস পরীক্ষায় এবারও ফার্স্ট হয়েছে সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না মেয়ের। বাড়ির চাকর বা বাগানের মালির সঙ্গে জঙ্গলে বেড়াবে, তবু ওর সঙ্গে নয়। তি-চারটে মেয়ে-বন্ধু হয়েছে এখন। চা বাগানের ছোট বা মাঝারি সাহেবদের মেয়ে, সঙ্গে লোক নিয়ে ওর চোখের ওপর দিয়ে হাসতে হাসতে তাদের বাড়ি চলে যায়। ডাকলে ওকে মুখের ওপর বলে দেয়, তুমি বজ্জাতি করো, তোমার সঙ্গে মিশব না। কেবল ভালো কিছু লোভের টোপ ফেলতে পারলে একটু আধটু আসে। আর এলেও বাপীরই বেফাঁস রাগের ফলে ঝগড়া বেঁধে যেতে দশ মিনিটও সময় লাগে না।

এটাই যে জীবনের সব থেকে দুর্বিসহ বাপী জানত না। বছরের মাঝামাঝি সময়ে মন-মেজাজ বরং একটু ভালো হয়েছিল। মাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুতে দীপুদা কলকাতায় পড়তে চলে গেছে। বাপী অনেকখানি নিষ্কণ্টক। আদুরে মেয়ে কথায় কথায় দাদার কাছে নালিশ করত। তাছাড়া দাদা না থাকার ফলে ওই মেয়ে এখন অনেকটা একলা হয়ে যাবে। বাপীর আশা, ভুলিয়ে ভালিয়ে আবার ওকে আগের মতো জঙ্গলে টানা যাবে।

....সকলে ধরে নিয়েছিল এ-বছর বনমায়ার চরিত্র ভালো হয়ে গেছে। দেখা গেল তা নয়, এবারে দিনমানে ছাড়া অবস্থাতেই পালিয়েছে। গাছ পাতা খাওয়ানোর জন্য ভীম বাহাদুর ওকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিল। ছেড়ে দিয়ে ঘন্টা দু' ঘন্টার জন্য নিজেও কোথায় গেছল। ফিরে এসে দেখে বনমায়া উধাও। ডেরাতেও নেই। পরে বাপীকে আবু হেসে হেসে বলেছে, বনমায়া গেলেই দোষ, ওকে জঙ্গলে ছেড়ে ভীম বাহাদুর নিজে কোথা গেছল?

কোথা গেছল শুনে বাপীর রক্তেও দোলা লেগেছে। ভীম বাহাদুর চা বাগানের আড়াই-পাতি তোলা এক কামিন মেয়ের প্রেমে পড়েছে। ওকে বিয়ে করবে বলে টাকা যোগাড়ের চেষ্টায় আছে। ফাঁক পেলে সেই মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে যায়।

বরাত ভালো, কর্তাবাবুরা এবারে আর বনমায়ার পালানো নিয়ে ভীম বাহাদুরের ওপর মারমুখি হয়ে ওঠেনি। তারাও ধরে নিয়েছে, বছরে দেড় বছরে বনমায়া একবার করে পালাবেই আর দিন-কতক গেলে নিজে থেকে ফিরেও আসবে।

কিন্তু উধাও হবার সেই রাতেই বনমায়া তার প্রেমিক হাতিকে নিয়ে বেশ একটা ঝগড়ের কান্ড করে গেছে। আসলে ওরা বানারজুলি জঙ্গলের খুব দূরে কোথাও যায়নি তখন পর্যন্ত। বেশি রাতে দুটোতে মিলে জঙ্গলের সেই গোপন ভাঁটিখানায় এসেছে। সেখানে যে দুটো লোক ভাঁটি আগলায় প্রাণের ভয়ে তারা একটা গাছের মগডালে গিয়ে উঠেছে। বনমায়া আর তার সঙ্গী মস্ত হাঁড়ি ভরতি দারু চোঁ-চোঁ করে মেরে দিয়েছে। তারপর দুটোতে মিলে সে-কি আহ্লাদ আর নাচানাচি। সেই আহ্লাদে আর নাচানাচিতে ভাঁটিখানা ভেঙে গুঁড়িয়েছে, সামনের অনেক ছোট গাছপালা মুড়িয়েছে। আরু আর বাপী ছুটে গিয়ে সেখানকার অবস্থাখানা দেখে এসেছে। বাপের আড়ালে হেসেছে শুধু আরু, নইলে ওর বাবা কালু আর অন্য বীট-ম্যানদের বনমায়ার ওপর সে-কি রাগ!

ভালো মেয়ের মতো এবারে বনমায়া দু' সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে এসেছে। বাপী লক্ষ্য করেছে, এবারে আর ভীম বাহাদুর রাগ করবে কোন মুখে? দৃশ্য দেখে বাপীর বেজায় হাসি পাচ্ছিল। বনমায়া তার খুদে চোখ দুটো বেঁকিয়ে ভীম বাহাদুরকে দেখছিল আর থেকে থেকে মাথা নাড়ছিল আর শুঁড় দোলাচ্ছিল। যেন বলছে, এমন কাজ আর কক্ষনো করব না। ভীম বাহাদুরও যেন আড়ি করে অর্থাৎ মুখখানা হাঁড়ি করে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

এই সময় আরুর একটা কথায় সামনে যারা ছিল সকলেই হেসে উঠেছে। এমন কি ভীম বাহাদুরও। বনমায়ার বুকের কাছে পেল্লায় দুটো আদরের চড় বসিয়ে আরু বলল, তিন বছর ধরে পালিয়ে গিয়ে রঙ্গ করে আসছিস—বাচ্চা কাচ্চা হবার নাম নেই কেন? তোর মরদটাকে ধরে এনে ডাক্তার দেখা—

সকলের সঙ্গে বাপীও হেসেছে বটে, কিন্তু এ-সব কথা শুনলেও ভিতরে ভিতরে কি-রকম একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সকলের অলক্ষ্যে বনমায়ার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। জন্তুর জানোয়ারের প্রেম বা ভালবাসাবাসির কিছুই আর অস্পষ্ট নয় ওর কাছে। বয়েস তো চোদ্দ গড়াতে চলল, তবু মানুষের ব্যাপারটাই যা একটু আবছা এখন পর্যন্ত। আরু অবশ্য বলে, সব এক ব্যাপার। মানুষ ওদের থেকে আরো পাজী জানোয়ার। ভাল-বাসাবাসির ব্যাপারে বেশিরভাগ জন্তুর সময়ের বাছ বিচার আছে, বছরের মধ্যে কোনো একটা সময় ধরে ওরা মেলে। মানুষ সম্বৎসর ভোগের দাস।

এই ভোগটা ভালো করে বোঝার জন্য একটা দুর্বোধ্য তাড়না। ফাঁক পেলে এক-একসময় চা-বাগানের দিকে চলে যায়। সেখানকার পাতা-তোলা সোমত্ত বয়সের মেয়েগুলোকেই চেয়ে চেয়ে দেখে বিশেষ করে। এদের মধ্যে কোনটা ভীম বাহাদুরের ভালবাসার মেয়ে জানতে ইচ্ছে করে। ওরা গায়ে জামা-টামা পড়ে না, খাটো কাপড় এক-দিকের কাঁধ-বুক পেঁচিয়ে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত নেমে আসে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওদের ঢলঢলে শরীরের বাঁধুনিতে আর উঁচু-বুকে কি-রকম মিষ্টি-মিষ্টি ঢেউ খেলে। এই চোদ্দ বছরে বাপী মাথারও ঢ্যাঙা হয়েছে বেশ। ওর সেই হাঁ করে দেখাটাও কম-বয়সী কতগুলো মেয়ে বোধহয় টের পেয়ে গেছে। ওর দিকে চেয়ে খিলখিল

করে হাসে এক-একসময়। কালো মুখে সাদা দাঁতের সারি ঝকঝক করে। একটা দুটো মেয়ে আবার দুষ্টুমি করে হাত তুলে [redacted] ডাকেও ওকে। বাপী তক্ষুনি ছুটে [redacted]য়ি। কিন্তু তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাথাটা ঝিমঝিম করে।

আজ আবার ওই রসিকতার কথা-গুলোই বাপীর মাথায় খুবপাক খাচ্ছিল। আবু অন্য কাজে চলে না গেলে ওর সঙ্গ নিত। বড় সাহেবের বাংলোয় কাজে এসে পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

বাবান্দায় দু হাত শূন্যে ঝাঁকিয়ে মিষ্টি তার বাবার কাছে কিছু একটা আব্দার করছে। ওর পরণে একটা লাল ডুরে শাড়ি। গায়ে চকচকে নতুন জামা।

বাপীর চোখে পলক পড়ে না। এই বেশে মিষ্টিকে আর কখনো দেখেনি। জামা আর শাড়ির একটা লালচে আভা যেন মিষ্টির চোখে মুখে ঠিকরোচ্ছে। মিষ্টিরও বয়েস দশের মাঝামাঝি এখন। আগের থেকে মাথায় বেড়েছে আর আরো হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে বাপী সেটা আগেই লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এখন ওকে দেখেই মনে হল ও যেন হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে মস্ত বড় হয়ে গেছে। আর রূপ-কথার সেই রাজকন্যাদের মতো হয়েছে।

বাবার পিছনে মিষ্টি ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল, বাপী জোরে একটা হাত-তালি দেবার লোভ সামলাতে পারল না। মিষ্টি ঘাড় ফেরালো। অন্য দিন হলে ও হয়তো জিভ ভেংচে ঘরে সেঁধিয়ে যেত। গত পরশুও তাই করেছে। বাপীকে পাল্টা ভেংচি কাটার সুযোগ না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেছল। কিন্তু আজ এই নতুন সাজটা দেখানোর তাগিদে পায়ে পায়ে বারান্দা থেকে নেমে গেটের দিকে এগুলো। বাপীর অমন ভেবাচেকা খাওয়া চাউনি দেখে ওর ঠোঁটে টিপ টিপ হাসি।

সব বেয়ারেখি ভুলে বাপী বলেই ফেলল, কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে—মাইরি বলছি।

মিষ্টিরও এক মুখ হাসি।—কলকাতার দিদিমাকে চিঠি লিখেছিলাম, আমার জন্য সুন্দর দেখে একটা শাড়ি কিনে পাঠাতে—লোকের সঙ্গে কাল শাড়ি জামা দুইই পাঠি-য়েছে। বাবাকে আজ আচ্ছা করে ধরেছি জিপে করে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, আমি এই শাড়ি পরে যাব—বাবা রাজি হয়ে গেছে।

শুনে সত্যি হিংসে হচ্ছে বাপীর। চাইলেই শাড়ি পায়, বাবার সঙ্গে জিপে করে বেড়াতে পায়। মাথা খুড়লেও শাড়ি-পরা মিষ্টির পাশে বসে জিপে করে একটু বেড়ানোর উপায় নেই। সাহেব মেম-সাহেব ছেড়ে মিষ্টিকেও এ কথা বললে ও বেয়াদপী ভেবে মুখ মচকাবে। কি, না ওর বাবা কেরানী, কেরানীর ছলের এত সাহস বর-দাস্ত হবার নয়। কেরানীর বোনের হাতের তৈরি আমসত্ত্ব-আচার বা দুধ-কলা-মুড়ি তো বেশ চেটেপুটে খেতে পারিস।

তবু, এই মিষ্টিকেই আজ দারুণ লাগছে বাপীর। তাই ঠেস-ঠিসারায় ওকে রাগাতে চাইল না। উল্টে খুব মোলায়েম করে বলল, আজ দুপুরে এই শাড়িটা পরে চুপিচুপি জঙ্গলে বেড়াতে আসবি? আয় না, একেবারে জঙ্গলের দেবীর মতো দেখতে লাগবে তোকে—

মিষ্টির মন ভিজল, কিন্তু ভরসা পেল না। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, হুঁ, বাড়িতেই বলে শাড়ি সামলাতে পারি না, এদিক ধরি তো ওদিক খোলে—শাড়ি পরে জঙ্গলে ঢুকে আছাড় খেয়ে মরি আর কি।

—না রে না, আমি তো থাকছি সঙ্গে, আছাড় খাবি কেন?

শোনা মাত্র মিষ্টি চোখ পাকালো—ও, এই ফাঁকে আমার গায়ে হাত দেবার মতলব তোমার—কেমন? ফের তুমি আমাকে তুই-মুই করে কথা বলছ?

মুহূর্তের মধ্যে বাপীও আগের সেই বাপী। দু চোখে রাগ জমাট বাঁধছে। সেই সঙ্গে লোভও চিকিয়ে উঠছে। অনেক দিনের মধ্যে গায়ে দুবে থাক, হাতে হাত ঠেকাবারও সুযোগ হয়নি। রাগের চোটে হাতদুটো এখন ভরল নিশপিশ করছে, আর ওই ফোলা গাল দুটো ছিঁড়ে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু মিষ্টিও সেয়ানা কম নয় এখন। এই চোখ-মুখ দেখেই গেট ছেড়ে এক ঝটকায় তিন পা পিছিয়ে গেল। তারপর বাপীর মতো করেই পলকা বাগে চোখ পাকাতে চেষ্টা করল। এখানে ও-ছেলের কোনো জারিজুরি খাটবে না জানে বলেই ঠোঁটে মজার ছোঁয়া।

—ডাকব মাকে?

গেট ছেড়ে বাপী হনহন করে হাঁটা দিল। রাগের মাথায় বনমায়ার ঘিরে আসার খবরটাই ওকে বলা হল না। কিন্তু রাগটা আজ আর বেশিক্ষণ ধরে বাধা গেল না! ..... আর যদিও বলে ভালোবাসাবাসির ব্যাপারে মানুষে জানোয়ারে তফাৎ নেই, তবু ওর চোখে মেয়েরা এখনো আরব্য রহস্যের মতো। আজ শাড়িপরা মিষ্টিও যেন ওমনি একটু রহস্যের ওধারে চলে গেছে।

এর দিন-কতকের মধ্যে সেই রহস্যের পর্দা ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার। কি কারণে স্কুলের ছুটি চলছে তখন।

কলকাতা থেকে জ্যাঠতুতো ভাই মণিদা এসেছে। সঙ্গে তার নতুন বউ গৌরী। গৌরী বউদি। মাত্র মাসখানেক আগে বিয়ে হয়েছে তাদের। কলকাতা থেকে নেমতন্নর চিঠি এসেছিল। বাবা লিখেছে যাওয়া সম্ভব নয়। সুযোগ সুবিধে হলে মণিদা যেন বউ নিয়ে বেড়াতে আসে।

আসলে নতুন বউ নিয়ে মণিদা গেছল দার্জিলিং বেড়াতে। ফেরার পথে দিন চার-পাঁচের জন্য এখানে আসা। আগে থেকে জানান দিয়েই এসেছে তারা। শুনে বাপী একমাত্র কারণে খুশী হতে পারেনি। দুখানা মাত্র ঘর। অতিথিরা এলে থাকার ব্যবস্থা কি হবে শুনেই বাপীর মাথা গরম হয়েছিল। বাবার ঘরটা বড় একটু। পিসীর সঙ্গে সেই কটা রাত বাপীকে বাবার ঘরে শুতে হবে। এমন বিড়ম্বনার মধ্যে বাপীকে স্মরণীয়কালের মধ্যে পড়তে হয়নি।

কিন্তু মণিদা আর তার নতুন বউ গৌরী বউদিকে দেখে বাপীর সেই চাপা কৌতূহল নতুন খোরাক পেল যেন একটু। গৌরী বউদির বছর কুড়ি হবে বয়েস আর মণিদার আটাশ। বয়সের তুলনায় মণিদাকে একটু ভারিক্কি গোছের দেখায়। ওদিকে নাম গৌরী হলেও গৌরী বউদি ফর্সা নয় আদৌ। কালোই বলা চলে। কিন্তু মুখ-খানা বেশ। আর একটু চকচকে হলেও চোখ দুটো হাসি হাসি।

উঠতে বসতে চলতে ফিরতে পুষ্ট যৌবনের কোনো মেয়েকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল বাপীর। আরো কিছু উফ অথচ মজার খোরাক পেতে লাগল মণিদার উদ্দেশ্যে গৌরী বউদির হাসি-মাখা চোখের ইশারার ব্যাপার-ট্যাপারগুলো লক্ষ্য করে। মণিদা হয়তো পিসীর সঙ্গে কথা কইছে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর, গৌরী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি বই

সোনালী রেখা ৬·০০

প্রণয়পাশা ৮·০০

হিসাব মেলাতে ৭·০০

নতুন তুলির টান ১২·০০

নাথ পাবলিশিং হাউস

পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩

বউদিও সেখানেই। হঠাৎ দেখা গেল, পিসীকে গোপন করে চোখের ইশারা করে আর সামান্য একটু ঘাড় বেঁকিয়ে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করে গৌরী বউদি ঘরে চলে গেল। আর তার একটু বাদেই মণিদাও চলল সেদিকে। বাবার সামনেও দুরাত এই কান্ড দেখেছে। খাওয়া দাওয়ার পর বেশ গল্পসল্প হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। বাপীকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়, ও ঠিক লক্ষ্য করেছে গৌরী বউদি উসখুস করছে একটু, আর মণিদার দিকেই চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতে গৌরী বউদির সেই-রকম ইশারা আর তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে যাওয়া। তার একটু বাদেই মণিদা গোটা দুই হাই তুলে বলল, যাই, শুয়ে পড়িগে।

বাপীর অজানা রহস্যের সব কিছু এখন ওই একটা ঘরের আড়ালে। ভিতরে কি এক অবুঝ অবাধ্য তাড়না। ওই কাঠের ঘরের কোন্ ফাঁকে বাইরে থেকে চোখ লাগালে ভিতরের সব দেখা যায় তাও ওর জানা। ওটা পিসীর আর ওর ঘর। আচার আমসত্ত্ব এমনকি পয়সা চুরি করার জন্যও নিজের উপস্থিতি গোপন করে পিসী ঘরে আছে কিনা বা কি করছে না করছে—কত সময়ে দেখতে হয়। জলে-টলে ভিজে এলে তো দেখতেই হয়—কারণ ওই এক ব্যাপারে পিসীর মাথার ঠিক থাকে না।

....বাবা শুলেই ঘুম। পিসীকে বাইরে যাবার কথা বলে পা টিপে বাইরের সেই ফাটলেও চোখ লাগিয়েছে। কিন্তু ভেতরে ততক্ষণে ঘুটঘুটি অন্ধকার। চোখ নিঃশব্দে দিনের বেলাতেও লাগিয়েছে। কিন্তু খাওয়া দাওয়া সারতেই বেলা হচ্ছে ইদানীং। মণিদাকে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে দেখেছে, আর গৌরী বউদিকে কলকাতা থেকে আনা গল্পের বই পড়তে দেখেছে।

মণিদাকে দেখে বাপীর মনে হয়েছে, মোটাসোটা ভাল মানুষ। খেতে আর ঘুমোতে ভালবাসে। তার মধ্যে রহস্যের ছিটে-ফোঁটাও নেই। যা-কিছু সব ওই গৌরী বউদিকে ঘিরে। চোখের ইশারায় বা ভ্রূকুটি বা ঠোঁটের হাসি দিয়ে মণিদাকে যেন যেমন খুশি চালানোর ক্ষমতা রাখে।

বাপীর একটা সুবিধে, নতুন যে দেখে সে-ই ওকে খুব নিরীহ গো-বেচারা গোছের ছেলে ভাবে। মণিদা আর বিশেষ করে গৌরী বউদি তো ভাবেই। নইলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময় বুকের কাপড় খসে গেলেও পিসীর সামনে যেমন তাড়াতাড়ি তুলে দেয়, ওর সামনে নয়। সকাল সাড়ে নটার মধ্যে সেদিন বাপীর সঙ্গে গৌরী বউদি আর মণিদার জঙ্গল দেখতে বেরুনোর কথা। জঙ্গলের ব্যাপারে ও-যে কেমন ডানপিটে সেটা অবশ্য তারা জেনেছে। পাথর দিয়ে একদিন দুটো বুনো মুরগী মেরে এনে তাদের খাওয়ানো হয়েছে। তাদের অবাক হতে দেখে পিসী ওর জঙ্গলের দস্যি-পনার গল্প করেছে। কিন্তু ওর পড়াশুনোর ব্যাপারে বাবা আবার যা বলেছে তাতে সকলেই ওকে হাবা-গোবাই ধরে নেবে। না হলে জঙ্গলে বেরুনোর আগে গৌরী বউদি এমন কান্ড করে সেদিন।

....গৌরী বউদি বলেছিল, একেবারে স্নান সেরে বেরুবে। দেরি দেখে তার ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে বাপী ঢুকে পড়েই থতমত খেল। কিন্তু ওকে দেখে মণিদা বা গৌরী বউদির ভ্রূক্ষেপ নেই। প্যান্ট আর শার্ট পরে তৈরি হয়ে মণিদা চৌকিতে বসে সিগারেট টানছে। গৌরী বউদির হাতে পাট-ভাঙা শাড়ি, তার উল্টো-সোজা দেখে নিচ্ছে। পরণে শুধু ব্লাউস আর সায়া। ওকে দেখে শাড়ির দিকে চোখ রেখেই বলল, দাঁড়ারে বাবা, যাচ্ছি তো জঙ্গলে, অত তাড়া কিসের—এতো আর সিনেমার টিকিট ফুরিয়ে যাবার মতো কিছু নয়।

স্নানের আগে বাপী গৌরী বউদিকে একবার তাড়া দিয়েছিল বটে। এখন ঘর থেকে সরে না গেলেও কেউ কিছু ভাববে মনে হল না। গৌরী বউদি যত্ন করে শাড়ি পরছে। বাপী আড় চোখে দেখছে দাঁড়িয়ে, আর মণিদা আগে কখনো জঙ্গল টঙ্গল দেখেছে কিনা সে-সম্বন্ধে দুই একটা অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করছে।

ধীরে সুস্থে শাড়ি পরা শেষ হল গৌরী বউদির। ঘাড় বেঁকিয়ে পিছন দিকটা দেখে নিয়ে ওকে বলল, নে, এবার পিছনে পায়ের দিকটা টেনে দে দেখি।

এ-রকম উদ্ভট ফরমাসের জন্য বাপী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। পিছনে গিয়ে উপুড় হয়ে বসে শাড়ির ওপর দিয়ে দু হাতে একটা পা ধরল, কিন্তু কি-ভাবে টানবে বুঝতে পারছে না।

গৌরী বউদি হেসে বাঁচে না। হাসছে মণিদাও। গৌরী বউদি হাসি সামলে বলল, তুই এ-রকম হাঁদা, আঁ্যা! পা ধরে টানছিস! শাড়ির তলার দিকটা টান করে দিতে বললাম তোকে আর তুই উল্টে পা চেপে ধরে শাড়িটা কুঁচকে দিলি?

এবারে বাপীর মাথায় ঢুকেছে। তাই করেছে। আর সন্তর্পণে বড় নিঃশ্বাস নিয়েছে। সেন্না পাউডারের গন্ধ...। মিষ্টির গায়ের মতো নয়।

ওদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। গা ছম-ছম করছে বলে হোক বা পায়ে ঠোক্কর খাবার ভয়ে হোক, গৌরী বউদি বেশির ভাগ সময় বাপীর হাত ধরে থেকেছে। জঙ্গলের গল্প করতে করতে বাপীর মাথায় আরো বেশি হাবা-গোবা সাজার ঝোঁক চেপেছে। ওরই ভিতর থেকে কে-যেন ইন্ধন জুগিয়েছে। খুব বোকার মতো যে-প্রসঙ্গে আসতে চায় তার সুযোগের অভাব জঙ্গলে

প্রকাশিত হ'ল ঃ নটরাজনের

প্রেম অভিসারে ১০,

বড়ু চণ্ডীদাসের বিতর্কিত কাব্যগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' এর ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসের রস সম্বলিত বৃন্দাবন লীলার এই আবেগঘন চির-নূতন প্রেম-কাহিনী বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অপূর্ব সংযোজন।

ওরা সেই পুলিশ ১৫, প্রমীলা মহল ১০,

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

আত্মচরিতে সমাজচিত্র ১২,

গ্রন্থ সিরিজের ভারত খণ্ড (প্রথম পর্ব)

হিন্দুযুগ ও মুসলমান যুগের ভারতীয় সমাজ বিষয়ক আলোচনা।

অবনী সাহার দক্ষিণ ভারতের সরস ভ্রমণ কাহিনী

টালা থেকে তামিলনাড় ৮,

শক্তিপদ রাজগুরুর নতুন উপন্যাস

মায়া দিগন্ত ১০,

বনে বনান্তরে ৮, স্বর্ণ মৃগয়া ৪,

বহুরূপীর হাস্যরস গ্রন্থ ।। লৌকিকতার পরিবর্তে ৮,

ঐ ।। একটি শিশির বিন্দু ৫,

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ : ৩৪-৯৫৯২

নেই। দুটো বন-মোরগ দেখে লোভীর মতো মণিদা বলে উঠল, মার না—পারবি?

বোকা-বোকা গম্ভীর মুখে বাপী মাথা নেড়েছে।—ও দুটোর একটা পুরুষ, একটা মেয়ে—ভালবাসাবাসির সময় মারতে নেই।

এই প্রসঙ্গে আসতে চায় বলেই বলা। নইলে আগে-পিছে মুরগি দুটো এমনিই চরছিল। ওদের দেখে জঙ্গলে ঢুকে গেছে। কিন্তু এ-কথা শুনে মণিদা আর গৌরী বউদি দুজনেই হাঁ প্রথম। তারপর তাদের দুজনের চোখো-চোখি। মণিদা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর গৌরী বউদি হাসি সামলানোর চেষ্টায় হাত ছেড়ে শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজেছে। তাও কি সহজে হাসি থামে।

ডেরছা চোখে চেয়ে গৌরী-বউদি জিজ্ঞাসা করল, তুই জানলি কি করে?

আরো সাদা মুখ করে বাপী জবাব দিল, জঙ্গলে বেশিদিন থাকলেই জানা যায়। আমাদের সাড়া পেয়ে ঝোপে ঢুকে গেল বলে, নইলে দেখতে একটা আর একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আবার ঝলকে ঝলকে হাসি গৌরী বউদির আর মণিদার সঙ্গে চোখোচোখি। এত হাসির কি হল বাপী যেন বুঝেতেই পারছে না।

গৌরী বউদি জিজ্ঞাসা করল, তুই নিজে থেকে জেনেছিস না কেউ তোকে বলে দিয়েছে?

বাপী সতর্ক। আবার প্রসঙ্গ বিস্তারের ঝোঁকও অদম্য।—গোড়ায় গোড়ায় আবু বুঝিয়ে দিয়েছে। ও তো সব জন্তু-জানোয়ারের নাড়ি-নক্ষত্র জানে, আর চোখেও দেখেছে।....ওর সঙ্গে থেকে আমিও কম দেখিনি।

এমন সাদা-সিধে ছেলের মুখ থেকে আরো শোনার লোভ গৌরী বউদির। তক্ষুনি জিজ্ঞাসা করল, তুই আর কি দেখেছিস?

বাপী তখন ভালবাসাবাসির সময় পুরুষ ময়ূর পাখনা মেলে মেয়ে ময়ূরকে কেমন নাচ দেখায় সেকথা বলেছে, সাপের সেই পাকে-পাকে জড়ানোর মারাত্মক ভালবাসাবাসির কথা বলেছে। একই প্রসঙ্গে তিন রকম ধরে বনমায়ার বজ্জাতির কথাও বলেছে।

আদিম ইশারা কাকে বলে বাপী সঠিক না জানলেও নতুন কিছু দেখছে। গৌরী বউদির রুপালী মুখে লালের ছোপ লেগেছে। থেকে থেকে মণিদার সঙ্গে যেন চোখে চোখে কিছু কথা হচ্ছে আর। দুজনেরই, বিশেষ করে গৌরী বউদির মুখে চাপা হাসি ঠিকরে পড়ছে।

কি-হিল কি-হিল আর L-ফেরার পরে এক-দিকে চোখ পড়তে বাপীর পা দুটো আটকে গেল মাটির সঙ্গে। অদূরে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে ভীম বাহাদুর। তার তিন হাত দূরে বসে একটা উঠতি বয়সের কালো-কালো পাহাড়ী মেয়ে। বাপী দেখা মাত্র বুঝে নিয়েছে মেয়েটা কে।

এই দলটিকে দেখে ভীম বাহাদুর বেশ লজ্জা পেয়েছে। কারণ বাপী তো আর ওর অচেনা নয়। ওদের হাব-ভাব দেখে আর বাপীর মুখ দেখে গৌরী বউদি কৌতূহলে টইটম্বর। খানিক এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুই চিনিস নাকি ওদের?

—চিনব না কেন। লোকটা হল ভীম বাহাদুর, বনমায়ার মহন্ত—মেয়েটা ভীম বাহাদুরের ভালবাসার মেয়ে। কাজে ফাঁকি দিয়ে দুটোতে জঙ্গলে এসে ঢুকেছে—

এর পর বাড়ি ফেরা পর্যন্ত মণিদার চাউনি দেখে বাপীর মনে হয়েছে তার যেন বেজায় জল-তেষ্টা পেয়েছে। আর জলের অভাবে ঘন ঘন গৌরী বউদির দিকে তাকাচ্ছে। গৌরী বউদি কেবলই হাসি চাপছে, আর সঙ্গের হাবা ছেলেটাকেই যেন গোপন করে ইশারায় মাথা নাড়ছে বা ভ্রূ-কুটি করে মণিদার বেহাল হাল করে দিচ্ছে।

....নিঝুম দুপুরের রাতজাগাতেও কি যে জানাকানি ছিল বাপী জানে না। বাবা বেরিয়ে গেছে। পিসীও শুয়ে। ও-ঘরের দরজা বন্ধ। কেউ যেন জোর করে বাপীর পা দুটোকে সেই ঘরের পিছনে টেনে নিয়ে গেল। তারপর একটা চোখ সেই বন্ধ ঘরে ঢুকে গেল। তার পেছনে বাইরে একেবারে ফাঁকা ওর ভিতরে প্রবল ঝাঁকুনি। বুকের ধুক-ধুকানি ভিতরের কেউ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু সেই ভিতরে। শরীরের রক্ত শিরশির করে পা বেয়ে নামছে তো নামছেই। আবার একই সঙ্গে মাথার দিকে আগুনে ছুটেছে। মণির ঢেউয়ের মতো পায়ের নিচের মাটি দুলছে।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না। হঠাৎই আবার একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমক ভাঙল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাপী ঘরের বাইরে ছুটল। ছুটে একেবারে জঙ্গলে। সর্বাঙ্গ ঘাম ঘাম করে কাঁপছে। বুকের ভিতরটা আরো বেশি ঢিপ-ঢিপ করছে।

জঙ্গলে ঢুকেও হন হন করে হেঁটেই চলেছে বাপী। অথচ এর থেকে বাড়ির কুয়োটাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ঢের ভালো হত। গা মাথা ডুবিয়ে বসে থাকতে পারলে ভালো হত।

[চলবে]

শ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

বিশ্বের ইতিহাসে শ্রীমা হলেন এক অভিনবশক্তি। একটা নূতন আলো। পৃথিবীর মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করার জন্যই মায়ের আবির্ভাব। তাঁরই জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 'আলোকময়ী শ্রীমা' হল। শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীমায়ের জীবনব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধির উদ্দীপনাময়ী কাহিনী মায়ের জীবন কথার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

প্রখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচী প্রণীত

আলোকময়ী শ্রীমা ৬

• লেখকের আরও কয়েকটি বিশিষ্ট জীবনীগ্রন্থ •

রাজা রামমোহন ৫
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ ৫
পরমাপ্রকৃতি সারদা ৫
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ৫
শরৎচন্দ্র ৫

পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য লিখুন

শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮।২সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

কাশেমের রিক্সা \ বিকাশ জানা

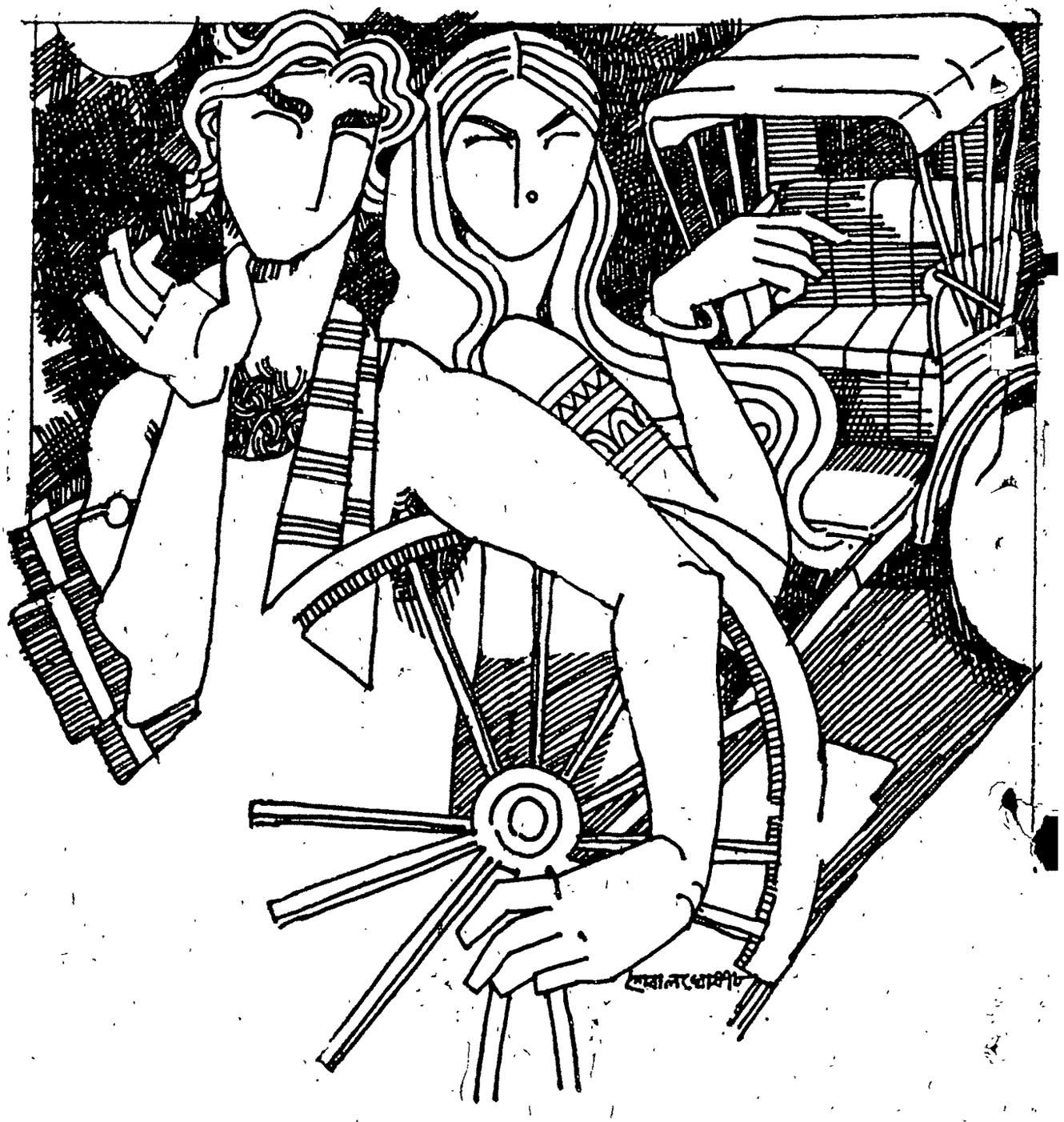

রাস্তায় আলোগুলো তখনো নেভেনি। রাতের কাকের চিৎকার শুরু হয়নি গলির মোড়ে। দোতলায় মিস্তির বুড়ো এক্সদফা কেসে নিয়ে লেপের ভেতর আরেকটা ঘুমের আয়োজনে ব্যস্ত। ল্যাজকাটা ফুকুরেটা আবর্জনার পাশে তখনো নিদ্রিত। কুয়াশা সারা গলি চাদর মুড়ি দিয়ে রেখেছে। ঠিক এই সময়ে ঘুমন্ত এই গলির মধ্যে কাসেমের রিক্সা ঠুং ঠাং শব্দ করতে করতে এগিয়ে যায়। কাসেম পাশের বস্তিতে থাকে। সেখানে কিন্তু অনেক আগেই সকাল এসে গেছে। বস্তির প্রতি ঘুপচীতেই এখন ব্যস্ততা। এই গলিতে সকাল হবে জানলায় রোদ আসার পরে। আবার এর পাশের বড় রাস্তায় সকাল আসে তারও অনেক পরে, যখন ভোঁ বাজে। কাসেম রাত্রে যখন বাড়ি ফেরে, এই গলিটা তখন সকালের মতোই নিদ্রিত থাকে। তার এই আসা যাওয়ার সময় গলিতে কেউ থাকে না। তবু সে ঘন্টা বাজায়। শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে ঘন্টায় ওপ্রান্ত আছড়ে ফেলে।

শরীরের ভেতর আদীম শরীরেরা গভীর সুখ নিতে নিতে তখন বিরক্ত হয়। এখানেই কাসেমের মজা।

আস্তে সে তেমনি শব্দ করতে করতে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। একটা জলাপাকানো কুকুরের পায়ের ওপর দিয়ে রিক্সা চলে যেতে কুকুরটা একটু আওয়াজ তুলেই চুপ করে। প্রথম প্রথম অবশ্য কুকুরটা খুব চেল্লাত। কিন্তু এখন তার কাছে এটা গা সওয়া ব্যাপার। কাসেমের কাছে এ হল আরেক মজা। সে কোনদিকে না তাকিয়ে চুপচাপ রিক্সা নিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু বড় রাস্তায় ওঠার প্রাক-মুহূর্তেই দাঁড়িয়ে পড়ে রিক্সা ও তার চালক। গলির মোড়ের কলে হাসিনা জল নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে। ছেঁড়া শাড়ি ছাড়া তার শরীরে অন্য কিছু নেই। হাত দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে সে গলি ছাড়িয়ে কুয়াশায় ঢাকা বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে। কাসেম চকিতে ঘন্টার শব্দ তোলে। হাসিনা চমকায় না, তাকায়ও না। সে জানে এ সময়ে এ ঘন্টা কার। তার শ্যামমুখে এক লাফে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। কোন কারণে জল তখনো আসেনি। চারদিক দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে কাসেম রিক্সাটা আরো কাছে নিয়ে যায়।

তুই বুঝি আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছিস? কিরে কিছু বলছিস না যে? এগুলো কি দেখছিস।

দূর তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। একটু বানিয়ে বলতে পারিস না? মনটা তাহলে খুশী হতো।

কেন। মিথ্যে বলব কেন।

এঃ কি আমার যুধিষ্ঠির এসেছো।

সাত সকালে গাল দিবি না বলে দিচ্ছি।

এয় শোন, রিক্সায় চাপবি?

না বাবা যদি কেউ দেখে ফেলে।

দেখলেই যা। কদিন পরেই তো তুই আমার ঘরে সব সময়ের জন্য যাচ্ছিস—কি চল না।—যাবি?

হাসিনার চোখ দুটো তখন লজ্জায় নত হয়ে গেছে। কাসেম তাকে রিক্সায় তুলতে যাবে, ঠিক সেই সময় ঝর ঝর করে জলপড়া শুরু হতেই হাসিনা তাড়াতাড়ি কলের নীচে কলশি পেলশ করে। কাসেম বুঝতে পারে আজ আর হাসিনাকে নিয়ে যাওয়া হল না। তার মাথায় ছোট্ট চাঁটি মেরে সে বড় রাস্তায় পা দেয়। একটা ট্রাক হেড লাইট জেলে দম্ভ পেরিয়ে যাওয়ার সময় তার শরীরে কাদা জল ছিটিয়ে দেয়। কাসেমের মুখ থেকে কিছু গালাগালি বেরিয়ে আসে। শালা সকালে বেলাতেই গণ্ডগোল।

কিন্তু হাসিনাকে মনে পড়তেই সমস্ত তিক্ততা ভুলে যায় সে। ভ্যাই-ড্রাইভারের ওপর আর রাগ করতে পারে না। যাদের ওপর তার যত ক্ষোভ থাক না কেন, এই মুহূর্তে সে সবাইকে ক্ষমা করে দেয়। তার চোখ এখন হাসিনাময়। আর কদিন পরেই হাসিনা হবে তার একার। তখন আর এভাবে ভয়ে ভয়ে কথা বলতে হবে না। শীতের সকালে আর্কে জলের জন্য দাঁড়াতে হবে না। সে তখন কাসেমের গলা জড়িয়ে ঘুমোবে, সেই ছেলেবেলায় যেমন ঘুমোতো। সে সময় ছোট্ট হাসিনাকে যখন তার বাবা মেরে রাস্তায় বের করে দিত, তখন সেই কাকপালক রাতে কাসেম তার কান্না থামাতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলত। তারপর সারারাত একই শয্যায় দুটি ছেলেমেয়ে সমাজ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে আগডুম বাগডুম কত কথা বলে যেত।

তারপর দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। তারা যত বড় হয়েছে, ততই কেমন দূরে সরে গেছে। আজ এতদিন পরে তারা আবার একসঙ্গে থাকতে শুরু করবে। কাসেমের কাছে এ এক দুরন্ত ব্যাপার। কিন্তু এর জন্য যে টাকা দরকার, তা তার কাছে নেই। কি করেই বা থাকবে। মালিককে রোজ চার টাকা দিয়ে কাছে তিন-চার টাকা থাকে। মা দু বোন ও তার এতে কোন রকমে চলে যায়। অথচ হাসিনার বাবাকে দুএকদিনের মধ্যে চল্লিশ টাকা না দিলে নয়। এদিকে লাইনের দোস্তরাও জেনে গেছে। সারাজীবনে এই একমাত্র আনন্দের সুযোগ. সে তাদের বাবা দেয় কি করে। আচ্ছা এখন আর যদি দ্বিগুণ হতো। এশ্বালার পাবলিকও দিন দিন চামার হয়ে যাচ্ছে। কেউ রিক্সায় চাপতে চায় না মাইরি। যদিওবা চাপে, সে একঘন্টা দরাদরি করে। তোমাদের পয়সা আছে, দশ পয়সা বেশী দিলে গায়ে লাগবে না, অথচ এই পয়সায় আমার অনেক কিছু হতে পারে।

পেছন থেকে একজন 'রিক্সা' বলে ডাকতেই কাসেম রিক্সার মুখ ঘুরিয়ে নেয়। লোকটি দাম না করেই উঠে পড়ে। তাকে নামিয়ে থলিতে টাকা রাখতে না রাখতেই আরেকজন। কাসেম এখন দারুণ খুশী। পর পর খদ্দের, এরকম যদি সারা-দিন লেগে থাকে তাহলে তো কোন চিন্তাই নেই। প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিয়ে সে এবার স্ট্যান্ডে আসে। দোস্তদের তার সমস্যার কথা জানায়। অন্য রিকসা চালকদের আর্থিক অবস্থা কাসেমের মতোই। তবু সবাই স্থির করে খদ্দের পেলে কাসেমকেই আগে ছেড়ে দেবে। এসময় হীরুর কাছে এক প্যাসেঞ্জার যেতেই সে কাসেমকে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু দামে গরমিল হতে সে যায় না।

বেলা বাড়ে। প্রতিদিনের মতো একটা জায়গায় রিকসা রেখে সে মোড়ের দোকানে চা খেতে যায়। সামনে দিয়ে একটা প্রাইভেট কার ঠিক এ সময় দুরন্ত গতিতে আসতে আসতে কাসেমের রিকসায় ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দোকান থেকে বেরিয়ে আসে সবাই। রিকসাটা তখন মুখ থুবড়ে পড়ে। কাসেম রিক্সাটা তুলতেই কয়েকটা কাঠ এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। একটা চাকা খতম।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-চর্চা

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিশ্বসাহিত্যসমূহের বিশেষ করে ভারতীয় সাহিত্যের বিশদ আলোচনা। (২৫·০০)

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী কর্তৃক সেরা দশটি সংস্কৃত নাটকের গদ্যরূপ। (৮·০০)

বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কীর্তনের তত্ত্ব বিবর্তন ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের জীবন-কথা। (১০·০০)

উপনিষদের কথা

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। সহজ সাবলীল ইতিহাসগত আলোচনা। (৪·০০)

বাঁকুড়ার মন্দির

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দির-গুলির ইতিহাস ও স্থাপত্যশৈলী। ৫৩ আর্টপ্লেট (১৫·০০)

চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। ৪ মানচিত্র (১০·০০)

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ব্যাপার স্যাপার দেখে গাড়িবাবু ততক্ষণে গাড়ি নিয়ে হাওয়া। রিকসা ঘিরে এখন তার দোস্তদের জটলা। কাসেমের কাছে তাদের কোন কথাই কিন্তু পৌঁছোয় না। তার বুকে তখন তীব্র হাতুড়ির শব্দ। শূন্য চোখে সে চাকার দিকে তাকিয়ে। খোঁড়া মা, হাসিনা, ছোট বোন দুটো তার চোখের সামনে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। তার মনে হয় গলির ভেতর ছোট্ট ঘরটাও এই মুহূর্তে রিকসার মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এতদিনের জমানো স্বপ্ন, আশা, সবই এই চাকার ভাঙচোর মতো এখন দূরে দূরে ছড়িয়ে। এ মুহূর্তে কি করবে সে কিছুই ভেবে পায় না। চাকাটা ভাল করে দেখে বুঝতে পারে এ আর গাড়ির সঙ্গে লাগানো যাবে না। এবার তাহলে একটা নতুন চাকা। তার মানে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু এত টাকা সে পাবে কোথায়! তাহলে কি এই রিকসা আর চলবে না! এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ও তার মা, বোনের পরিণতির কথা ভাবতে থাকে। এখন কিছু একটা তাকে করতেই হবে।

এবং তখনই হঠাৎ এক আশার দুরন্ত বেগে মালিকের কাছে দৌড়ে যায়। কিন্তু গালাগাল ছাড়া কিছু পায় না। মালিক জানিয়ে দিয়েছে, আজকের মধ্যে রিকসা না সারালে তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হবে। কি করবে ভেবে না পেয়ে কাসেম সেই ভাঙা রিকসা কাঁধে লাইনে ফিরে আসে। দোস্তেরা মালিক ড্রাইভার সবাইকে ধিক্কার করে, কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারে না। সে যখন কি করবে জিজ্ঞেস করে, তারা এ ওর দিকে তাকায়। লাইনের এক নতুন ছেলে হঠাৎ চাকা কেনার কথা বলতেই সবাই ধমকে ওঠে। ছেলেটা বুঝতে পারে না অন্যায় কি বলল।

এক সময় ভাগ্যের ওপর সব দায় চাপিয়ে তারা একে একে খদ্দের নিয়ে চলে যায়। সে রিকসা কাঁধে বাড়ির পথ ধরে। দু কাঁধে দুটো চাকা, মাথায় রিকসার বডি, হাতলটা সামনের দিকে বেরিয়ে। রকে আড্ডারত কয়েকজন তাকে এই অবস্থায় দেখে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। একজন বলে মেবা দুশমনে মেহমুদ এবকম করেছিল। অন্যজন রিকসাওয়ালার ছবির গান ধরে। এক যুবতী যুবকের হাত ধরে রাস্তা পেরুতে গিয়ে তাকে দেখে বলে, 'সিন দেখেছ?' কাসেম তাদের কোরাস হাসির তোয়াক্কা না করে এগিয়ে যায়। এক ক্যামেরাম্যান পজিশন নেওয়ার জন্য তার পেছন পেছন দৌড়ায়। আর কাসেম রিকসা কাঁধে যেতে যেতে ভাবে, আল্লা এখন তাকে যদি বেশী নয়, চল্লিশটা টাকা দেয়, যা কেমন বাবু তার এ অবস্থায় দয়া করে যদি কিছু দিয়ে বলে, কাসেম রিকসাটা ঠিক করে নে, তাহলে কি ভালই না হয়।

এ ভাবে নানা চিন্তার মধ্যে গলিতে ঢুকতেই হাসিনা তাকে দেখে হেসে বস্তির দিকে দৌড়ে যায়। মা খবর পেয়ে ছুটে আসে। মায়ের চোখে কাসেম দেখতে পায় নিজের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়ে মা। এ যেন সন্তানের মৃত্যু সংবাদ। কাঁধ থেকে রিকসা নামিয়ে কাসেম মায়ের পিঠে হাত রেখে বলে, কাঁদছ কেন? দেখবে রিকসা ঠিক হয়ে যাবে।

যাবে?

মায়ের চোখে আশা।
তুমি কিছু টাকা দাও।

কোথায় পাব?
নেই?

মা কিছু না বলে সজোরে কেঁদে ওঠে। কাসেম কেমন সান্ত্বনা বাক্য শোনাতে পারে না। রিকসাটা কাঁধে নিয়ে সে রাস্তার দিকে যায়। মেকড়ে পৌঁছে দেখে হাসিনা এক আশ্চর্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে। কাসেম চোখ ফিরিয়ে নেয়। ভাবে এসব ছেড়ে সে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে। সেখানে মালিক থাকবে না, মা থাকবে না। কিন্তু তারপর, খোঁড়া মাটা যড় রাস্তায় গিয়ে দূরের দিকে তাকাবে আর কাঁদবে; তারপর একদিন না খেয়ে মারা যাবে। আর বোন দুটো, তারা হয়তো বেপাড়ার হ্যারিকেনের আলোয় নিজেদের দাম যাচাই করবে। না কাসেম পালাতে পারে না। তার মনটা পালানোর মতো চালাক হয়নি। এক সময় তার হারু চাচাকে মনে পড়ে। ষাট বছরের হারু চাচা কিভাবে হাসপাতালের লোকদের ঠকিয়ে টাকা এনেছে তার গল্প করছিল। কাসেমও যদি তার মতো টাকা আনে। কিন্তু সে তো ষাট বছরের হারু চাচা নয়, সে কি করে কটা টাকার জন্য তার শ্রেষ্ঠ সুখ হারিয়ে ফেলবে। হাসিনার মুখ তার চোখে ভাসে, তাকে ঘিরে কাসেমের স্বপ্নেরা তখন ক্রীড়ারত। সে স্থির করে যা হবে হোক সে হারু চাচা হবে না।

কিন্তু যেকোন ভাবে তাকে এখন উঠে দাঁড়াতেই হবে। তার দিকে কয়েক জোড়া চোখ পরম নির্ভরতায় তাকিয়ে। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে সে তার রিকসা দেখিয়ে বাবুদের কাছে পয়সা চায়। অনেকে 'ধ্যাৎ যত্ত সব' বলে সরে যায়, অনেকে সমবেদনা জানায়, অনেকে বা অবহেলায় পাঁচ দশ পয়সা ছুঁড়ে দেয়।

এক অসহায় ক্ষোভে তার সারা শরীর ঘিরে ধরে। কি করবে খুঁজে পায় না। সে ধার চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে এখন! তার চোখে বহুদিন ভুলে যাওয়া এক স্মৃতি হঠাৎই খেলা করে যায়। এক উলস শিশু এক হাতে মায়ের একটা স্তন মুঠো করে আরেকটা স্তন পান করছে। স্মৃতিটা তাকে ভীষণ করে নাড়া দেয়।

এবং তার পর কাসেম যা করে, সেই ভয়ংকর ঘটনাটি উহ্য রেখে লেখক এখানে একটি রূপকথা স্মরণ করল :

নদীর তীরে বসিয়া কাসেম যখন কাঁদিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে জলদেবী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,

বৎস তুমি কাঁদিতেছ কেন?

কাসেম ধীরে ধীরে সব কথা বলিল। জলদেবী নদীতে ডুব দিয়া একটি বিমান আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি তোমার?

কাসেম বলিল, না।

জলদেবী আবার ডুবিয়া একটি ইম্পালা আনিয়া বলিলেন, ইহা?

ইহাও নয়?

জলদেবী আবার ডুবিলেন। এবং এইবার দেখা গেল একটি রিকসা।

ইহা কি তোমার?

ইহা আমার নয়, তবে আমার রিকসা ইহার মতোই।

এখন তুমি কি চাও?

আমি শুধুমাত্র রিকসার একটি চাকা চাই।

জলদেবী সন্তুষ্ট হইয়া কাসেমকে বিমান, ইম্পালা ও রিকসা প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করিলেন যে.....।

হায় সবকিছু যদি এরকম হতো!!

লালবাই-এর দেশে

রেখা বড়ুয়া

বললাম, হ্যাঁ শোভা সিংহ গেলেন, নতুন নেতা হলেন পাঠান সর্দার রহিম খাঁ। তার কথা পরে হবে, এবার বিষ্ণুপুরের কাহিনীতে আসি।

এই যখন অবস্থা, তখন মোগলের মিত্র রঘুনাথ—রঘুনাথ তখন যুবরাজ, তবে দুর্জন সিংহ অসুস্থ থাকায় কার্যতঃ তিনিই রাজা—তিনি লুঠপাট করে নানা ধনরত্ন নিয়ে ফিরে এলেন।

সেটা বিষ্ণুপুরের প্রজাদের পক্ষে ছিল একটা উৎসবের দিন। কুমার যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসছেন, দেশে আনন্দের বান ডেকেছে তখন। বিজয়ী বীরের অভ্যর্থনার জন্যে রাজধানী প্রস্তুত। জরপতাকা উড়ছে তোরণের চূড়ায়, নহবৎ বাজছে দিকে, দিকে নাগরিকেরা সাজসজ্জা করে ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে আসছে কুমারকে স্বাগত জানাতে।

শোভাযাত্রা আসছে। প্রথমে একসার পশুতে টানা গাড়ী তাতে রয়েছে লুণ্ঠিত ধনরত্ন, তারপরেই অশ্বারোহী সেনার দল। তারপর এল রঘুনাথের দেহরক্ষী বাহিনী। তারা পথ করে দিল কুমারের জন্যে। এবার কুমারকে দেখা গেল সাদা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। পরণে গোলাপী বিষ্ণুপুরী রেশমের ধুস্ত আর মখমলের মুসলমানী ধরনের আঙরাখা। গলায় মুক্তোর মালা, কানে মুক্তোর বীরবৌলি, হাতে সোনার অঙ্গদ, মাথায় পান্না বং-এর পাগড়িতে হীরের কল্কা সূর্যের আলোয় জ্বলছে। রঘুনাথের ঘোড়ার পেছনে রয়েছে অনেকগুলি শিবিকা। রাজ-পুরোহিত এগিয়ে আসতে কুমারের ধরস্য অনঙ্গমোহন তাঁকে কিছু বললেন। মাথা নাড়লেন ব্রাহ্মণ তারপর কুমারকে লক্ষ্য করে স্বস্তি বচন উচ্চারণ করলেন। সেটুকু কর্তব্য শেষ হলে তিনি এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সোনার পাত বসান মকরমুখী শিবিকাখানির সামনে। প্রজাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, বিষ্ণুপুরের ভাবী বধূরাণী পরলোকগত ভূস্বামী শোভা সিংহের কন্যা রত্নেছেন এই শিবিকায়। আমরা তাঁকে বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করার জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

শিবিকার দরজা খুলে গেল, দাসীর হাত ধরে মাটিতে পা রাখলেন চেতোয়া ধরদার কুমারী। অঙ্গে তার ঘন নীল ধারা-পসী শাড়ী। অঙ্গে রত্নালংকার, মাথায় চূড়াকৃতি খোঁপায় বেলফুলের মালা। সর্ব অঙ্গে রূপ যেন এক আশ্চর্য মহিমা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। নাগরিকেরা পথ করে দিল সসম্ভ্রমে, পুরাঙ্গনারা লাজ বর্ষণ করল, শঙ্খধ্বনি করল ভাবী বধূরাণীর উদ্দেশ্যে।

চেতোয়ারদার কন্যার সঙ্গে চলেছে তার সখীরা, দাসীরা। তারা সেজেছে বিচিত্র সাজে। কেউ পরেছে গঙ্গাজলী কেউ বা মেঘ-ডম্বরী শাড়ী। সখীদের অঙ্গে সোনার অলংকার, দাসীরা সেজেছে রূপোর হাঁসুলী, বাউটি, মল, বাজুবন্ধ পরে। এরই মধ্যে একটি শিবিকার আরোহিণীকে দেখে গুঞ্জন উঠল চারপাশে।

—মুসলমানী—

—বেগম বুঝি বা কোন নবাবের।

—কি রূপ, চোখে ধাঁধা লাগছে যেন।

সত্যিই ধাঁধা লাগানের মত সে রূপ। লাল নবম রেশমের সালেওয়ার কুর্তার ওপর স্বচ্ছ গোলাপী রং-এর দুপাট্টা। জরির ফিতে জড়ান বেণী সাপের মত পিঠে লুটিয়ে পড়েছে। পায়জোরের আওয়াজ উঠল মাটিতে পা রাখতে।

—লালবাই—

—রহিম খাঁর বেগম।

—বেগম নয়, উপপত্নী, তওয়ায়েফ—

ঘাড় ফিরিয়ে চাইল লালবাই, চোখে বিদ্যুতের ছটা, নাকের নথনীর মুক্তোর ঝুরিগুলো দুলে উঠল, কানের হীরের দুল ঝিলমিল করে আলো ছড়াল। লাল মখমলের পয়জার পরা পা ফেলে গর্বিত ভঙ্গিতে প্রাসাদে ঢুকল লালবাই।

অন্দর মহলেও আলোচনার ঢেউ উঠল, ভাবী পট্টমহাদেবীর প্রসঙ্গ ছাপিয়ে লাল-বাইএর কথাই চলল মুখে মুখে। সখীরা বলল, এমন রূপ, কুমারের না মতিভ্রম হয়ে। প্রতিবাদ করল একজন সেবিকা বলল, আমাদের ভাবী মহারাজ অত তরলমতি নন, এমন কথা মুখে এনো না তোমরা। কারুর কানে গেলে—

—না গো সুরুচী, বলল সখী, ও যবনীর গান শোনেনি তোমরা। শুনে কুমার নাকি সঙ্গীতের জন্যে পাগল, তা না আরও চিন্তা।

কথাটা সত্যি। কুমার রঘুনাথ ছিল বীর, সাহসী, প্রজাবৎসল। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হল, তিনি সঙ্গীতরসিক। সারা বিষ্ণুপুর একথা জানে। উত্তর ভারতে আওরঙ্গজেবের শাসনে সঙ্গীত যখন নিগৃহীত হচ্ছে, তখন এদিকে বিষ্ণুপুরে তার চর্চা চলছে পুরোদমে কোথাও কেউ ভালো গান গায় শুনলে রঘুনাথ স্থির থাকতে পারেন না, তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন প্রাসাদে, অর্থ দিয়ে উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেন নানা ভাবে। আই বিষ্ণুপুর রাজ্য তখন সঙ্গীতময়। আর সে সঙ্গীত ছিল রীতিমত উচ্চস্তরের, রাগ তালের বাঁধনে বাঁধা বাংলার চর্যাগীতি বহু প্রাচীন, তা ছাড়া ছিল কীর্তন। জয়দেবের পদও তার লালিত মধুর আবেদন দিয়ে বাঙালীর মন জয় করেছিল। কিন্তু তবু বহির্বঙ্গে, বিশেষ করে আগ্রা মথুরা গোয়ালিয়র এই সব জায়গায় যে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ সঙ্গীতের চল ছিল, তার ওপর আকর্ষণও রঘুনাথের

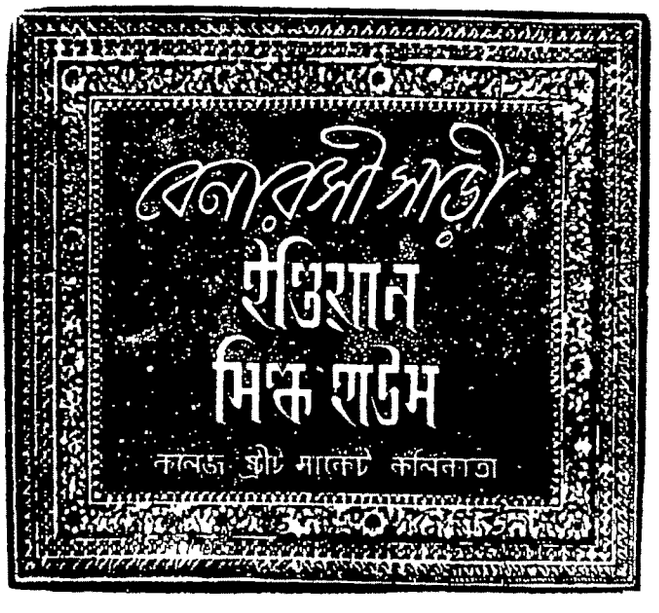

বলল না। তিনি শুনতে চাইতেন, চাইতেন এই নতুন ধরনের কে। সুযোগেরও অভাব ছিল না, আওরঙ্গজেবের কঠোর রীতিতে কিছু গায়ক বাদক যে অন্যত্র ছড়িয়ে চাইবেন এ তো স্বাভাবিক। এমনি গায়ক রঘুনাথের সভায় স্থান ছিলেন। এঁর মুখ থেকে হিন্দু-ঢংএর গান শুনতেন রঘুনাথ অব-পলেই।

—এই কি বাহাদুর খাঁ? তানসেনের ?

প্প বলতে বলতে তন্ময় হয়ে ছলাম। বিষ্ণুপুর রাজ্যের সেই তর গৌরবময় দিনগুলিকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। রর কথায় আমার চিন্তার সুতোয় পড়ল। বললাম, কি বললি?

—বলছি এই কি তানসেনের বংশধর র খাঁ? যাঁর নাম অনেক গানের পেয়েছি? ঝুমুর প্রশ্নটা স্পষ্ট করে ধরল।

—শোন ঝুমুর, আমি বললাম, একটা ধারণা যাঁরা ইতিহাস লিখেছেন ব অনেকের মনেই গেঁথে আছে, তার ব্যাপারটা নিয়ে বেশ একটা গণ্ড-র সৃষ্টি হয়েছে।

—কিসের ভুল? ঝুমুর জানতে

বলাম, বাহাদুর খাঁ বা বাহাদুর বলে কোন গায়ক রঘুনাথের সভায় ছিলেন কিনা সে কথা পরে আসছে, কিন্তু তানসেন বংশীয় বাহাদুর বলতে যাঁদের বোঝায়, তাঁদের পক্ষে রঘুনাথের সভায় থাকা বা শিষ্য তৈরী করা সম্ভব নয়।

—কেন?

উত্তরে বললাম, কারণ, তানসেনের বংশে জীবন খাঁর ছেলে বাহাদুর খাঁকে নির্দেশ করা হয়েছে বিষ্ণুপুরের গায়ক বলে। ইনি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের লোক। অথচ রঘুনাথ মারা গেছেন ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে। তানসেনের বংশে সেতারী মসিদ খাঁর ছেলের নামও বাহাদুর। তিনিও রঘুনাথের সমসাময়িক নন। আর একজন বাহাদুর ছিলেন তানসেনের মেয়ের বংশে। তাঁকেও ধরা যাচ্ছে না, কারণ তিনিও পরবর্তী কালের লোক।

—বাব্বা, ঝুমুর বলল, এত বাহাদুর অথচ কেউই সে সময়ের নন? তাহলে বলা, ও গানটা কে লিখেছে? ওই যে ধ্রুপদখানা—

সবগুণ নিধান মহারাজ রঘুনাথ
ওর শেষে তো ভণিতা রয়েছে—
ইস লিয়ে বাহাদুর নিশদিন
গুণ গাওয়ে।

—এটা কার লেখা? ঝুমুর উত্তেজিত গলায় বলল।

—আচ্ছা ঝুমুর, বললাম, মনে কর তুই ভুপাল অথবা তাঞ্জোরে আছিস। ওখানে দীপেন ঠাকুর বলে কেউ যদি বলে যে সে রবীন্দ্রনাথের বংশের লোক, তাহলে তুই কি অবিশ্বাস করবি? অথবা সুকান্ত বসু নামে কেউ যদি বলে যে সে সুভাষ-চন্দ্রের আত্মীয় তাহলে? একেবারে অবিশ্বাস করবি? হতে পারে এরা সত্যিই কবিগুরু বা নেতাজীর সঙ্গে সম্পর্কের কোন আত্মীয়। তা ছাড়া বড় নামী মানুষের সঙ্গে লতায় পাতায় কোনও সম্পর্ক থাকলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেটিকে বড় করে দেখাতে চায়। বাহাদুর খাঁর বেলায় তো এমন ঘটে থাকতে পারে। অর্থ প্রতিপত্তির লোভে সেই গায়ক ওই-টুকুকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জাহির করে ছিলেন। অথবা এমন হওয়া আশ্চর্য নয় যে পুরোটাই ফাঁকা আওয়াজ। এ কালের চালিয়াৎ মানুষের মত বাহাদুর পুরোটাই বানিয়ে বলেছিলেন, আসলে তানসেনের বংশের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্কই ছিল না। তবে একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই যে রঘুনাথের কাছে একজন উত্তর ভারতীয় গায়ক ছিলেন, এবং তাঁর নাম বাহাদুর খাঁ হওয়ার কোন বাধা নেই। এই গায়কটির পক্ষে কয়েকজন শিষ্য তৈরী করাও সম্ভব তবে তিনি নিজে খুব উঁচু দরের শিল্পী ছিলেন বলে মনে হয় না, কারণ তার কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণের একমাত্র পথ হল তাঁর শিষ্যদের গুণাগুণ বিচার করা। কিন্তু সে দিক দিয়েও সমর্থন মেলে না। কারণ বাহাদুর খাঁর শিষ্য বলে যাঁদের নাম করা হয়ে থাকে সেই গদাধর চক্রবর্তী, নিতাই নাজির, বৃন্দাবন নাজির, কৃষ্ণমোহন গোস্বামী গানের জগতে শুধু নাম মাত্র হয়ে আছেন। রামশংকরের নাম এখানে আসছেই না কারণ রামশংকরের জন্মই হয়েছিল এসময়ের অনেক পরে। যাই হোক, যে শিষ্যদের নাম করলাম তাঁরা গানের ক্ষেত্রে কেন ছাপই রেখে যেতে পারেন নি এটা দেখতেই পাচ্ছি। কোনও বড় গুরুর গুণী শিষ্যের পক্ষে এটা কিন্তু নিতান্ত অস্বাভাবিক।

—কিন্তু ফুলমাসি, যখন তথ্যের মধ্যে এত অমিল তখন তোমার কেন মনে হচ্ছে যে, রঘুনাথের কাছে একজন হিন্দু-স্থানী গায়ক ছিলেনই।

—কারণ হল লালবাই। আমরা অনেক জায়গায় উল্লেখ পেয়েছি যে লাল-বাইএর গানে রঘুনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখন ভেবে দেখা যাক রহিম খাঁর হারেমে যে ছিল, সে কি ধরনের গান গাইত, অর্থাৎ কি ধরনের গান তার পক্ষে গাওয়া স্বাভাবিক। গীত-গোবিন্দের পদ না নরোত্তম ঠাকুরের লীলাকীর্তন? কি মনে হয় তোর? লালবাই এইসব গাইত? আমি প্রশ্ন করলাম।

ঝুমুর হেসে উঠল, বলল, যাঃ তা কি করে হবে। লালবাই নিশ্চয় হিন্দু-স্থানী গানই গেয়ে শোনাত, আর সে বেশ নিয়মমাফিক গান হবে, কারণ লালবাই-এর তো গায়িকা বলেই খ্যাতি, কাজেই তাকে অবশ্যই শিখতে হয়েছিল ভালো করে।

উকুনের জন্য আপনার মনের শান্তি নষ্ট করবেন না।

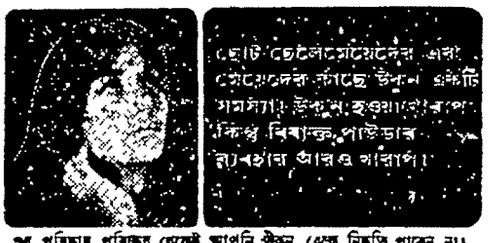

শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকেই আপনি উকুন থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না। আপনার ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে এদের বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। মেয়েদের মধ্যেই সাধারণতঃ এরা সহজে ছড়ায়। স্কুলে যাবেন না বিষাক্ত প্যারাডাই আপনার চুল, মাথার তালু ও চামড়ার সমূহ ক্ষতি করে। নব আবিষ্কৃত এই আধুনিকতম উকুন-নাশক সুবাসিত তেল মাসে মাত্র একবার ব্যবহার করে আপনি উকুন ও নিট থেকে নিশ্চিন্ত থাকুন। ও ধূসরকীও হতে দেয় না।

লাইসিল
সুবাসিত উকুন-নাশক

সুজানিল কেমো ইণ্ডাস্ট্রিজ, পুনা-৩৩

আমি বললাম, তাহলে ভেবে দেখ, এই সব কালোয়াতি গান রঘুনাথের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল না নিশ্চয়, তা নইলে তিনি এ গানে রস পেতেন না।

—যেমন আমরা পাই না কর্ণাটক মিউজিক শুনে, ঝুমুর বলল।

—ঠিক বলেছিস, আসল কথা হল রুচি তৈরি করা, সেটা ভালোমত শোনা না থাকলে হঠাৎ হয় না। আমার ধারণা, সেকালে অহল্যাবাঈ রোড ধরে যে সব গায়করা উত্তর থেকে পুরীধামে যেতেন তীর্থ করতে তাদের মুখে আভাস পেয়ে রঘুনাথের কৌতূহল জেগে উঠেছিল, তারপর বাহাদুর খাঁ নামে কোন গায়কের মাধ্যমে তিনি ভালোভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এই নতুন ধারার সঙ্গীতের সঙ্গে, সেইজন্যেই লালবাই-এর গান উপভোগ করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি। অবশ্য খানিকটা অনুসন্ধান, আর খানিকটা অনুমান দিয়েই আমাদের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে কারণ ইতিহাস তেমন ভাবে কিছু নেই। তবে আমার ধারণা লালবাইএর কাহিনী যদি সত্যি হয় তাহলে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের ইতিহাসে তারও নিশ্চিত কিছু দান রয়ে গেছে।

—কি রকম, খুলে বলো। ঝুমুর সোজা হয়ে বসল।

বললাম, আমার মনে হয় যাহাদুর খাঁ রঘুনাথকে হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে একটা ধারণা করে দিয়েছিলেন আর

আপনার চুল কি খস্‌খসে শুকনো, নির্জীব?
নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু আপনার চুলে করে তুলবে ঝলমলে প্রাণবন্ত!

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার চামড়ার স্বাভাবিক তেলতেলা ভাবটি কমে যেতে থাকে। এর ফলে চুল খস্‌খসে শুকনো, নির্জীব হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু চুলের এই সমস্যার সমাধানে দারুণ কার্যকরী। এর যে বিশেষ উপাদান আছে, অ্যালানটোইন তা' মাথার এই স্বাভাবিক তেলতেলা ভাব বজায় রাখতে টনিকের মত কাজ করে·· ও চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায়।

নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু আপনার চুলের এই নির্জীব শুকনো ভাবটি সম্পূর্ণ দূর করে চুলে আনবে সহজাত সৌন্দর্য· চুলকে করে তুলবে চিকন ঝলমলে, প্রাণবন্ত

নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পুর ঘন ফেনা আপনার চুলের ময়লা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে চুলে আনবে ঝলমলে দীপ্তি। এর তাজা সুগন্ধ আপনার দারুণ ভালো লাগবে। আপনার চুল চিকন ঝলমলে, প্রাণবন্ত করতে আজই কিনুন— নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু!

নতুন হেলো টনিক শ্যাম্পু নির্জীব চুলে আনে প্রাণবন্ত ঝলমলে দীপ্তি

TS.G 1/8.BN

লালবাই সেই গানকে জনপ্রিয় করেছিল। সুকণ্ঠী গায়িকার গলার গান স্বভাবতঃই মানুষকে আকৃষ্ট করে। সেই কারণে ও-গান যাদের কানে গেছে তারা নিশ্চিত কৌতূহলী হয়েছে। তাছাড়া আর একটা কথা হল এই গণিকার মাধ্যমে অন্য কিছু গান—আমীর খসরুর চেষ্টায় যে কাওয়ালী অথবা গজলের একটা আদল ধরা পড়েছিল উত্তর ভারতে, তার কিছু নমুনা বাংলার মানুষের কানে আসা খুব অসম্ভব নয়। যাই হোক, আসল কাহিনী থেকে আমরা দূরে সরে আসছি—কি যেন বলছিলাম?

—রঘুনাথ একজন গায়ককে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, তাঁর কাছে রঘুনাথ, নতুন ভাষা, নতুন সুরের সন্ধান পেলেন। মালব, বসন্ত, রামকিরি বিভাস এসব রাগের সঙ্গে পরিচয় ছিল আগে, এবার পেলেন, ইমন, সরফর্দা, এমনি আরও অনেক অজানা রাগ।

নতুন রাগ, নতুন নতুন তাল, তাছাড়া গমক মিড় যেন ঢেউএর মত উঠছে নামছে, এমন সঙ্গীত রঘুনাথ আগে বড় একটা শোনেন নি। এই নতুন ধাঁচের গান রঘুনাথের সঙ্গীত পিপাসা দিন দিন বাড়িয়ে তুলছিল যখন, সেই সময় এল লালবাই। রহিম খাঁর হাভেলীতে ছিল এই তওয়ায়েফ, তিনি যুদ্ধে যাবার সময় একে রেখে গেলেন চেতোয়া বরদাব প্রাসাদে। সেখানে ওর গানের কথা কানে গিয়েছিল রঘুনাথের, তাই নিয়ে এসেছেন বিষ্ণুপুরে।

লালবাই-এর গান শুনে মুগ্ধ হলেন রঘুনাথ। তাঁর মনে হল, এমন তো শুনিনি কখনও। বাহাদুর খাঁও তো গায় কিন্তু তা শুনে তো শরীর এমন রোমাঞ্চিত হয় না, এমন দোলা লাগে না প্রাণে। এ যেন এক যাদুর মত। কোকিল-কণ্ঠীর অপূর্ব এই গান যেন এক মায়া-জগতের দরজা খুলে দিল তাঁর সামনে। লালবাইএর উচ্ছল যৌবন, চটুল কটাক্ষের মত এ সুরে কি মাদকতা। রঘুনাথ মুগ্ধ হলেন, রঘুনাথ ভেসে গেলেন সুরের স্রোতে, ঘুঙুরের ছন্দে।

শোভা সিংহের কন্যা তখন বিষ্ণুপুরের মহারাণী। দুর্জন সিংহের মৃত্যু হয়েছে, সিংহাসনে বসেছেন রঘুনাথ। কিন্তু মহারাণীর মনের শান্তি অন্তর্হিত হয়েছে। ওই গান যেন শনি হয়ে এসেছে তাঁর জীবনে। মনে পড়ে সেদিনের কথা। শোভা সিংহ তখন যুদ্ধে, মনটা উন্মুখ হয়েছিল যুদ্ধের সংবাদের জন্য। সেদিন সন্ধ্যেয় দেবী বিশালাক্ষীর মন্দিরে গিয়েছিলেন তিনি পিতার কল্যাণ কামনায়, দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, পিতাকে রক্ষা কর মা, দেশকে যবনমুক্ত কর, রক্ষা কর সনাতন হিন্দু ধর্মকে।

দেবীকে প্রণাম করে শান্ত চিত্তে ফিরে আসছিলেন কিন্তু প্রাসাদের সোপানে পা রেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। যবনীর মহল থেকে ভেসে আসছে সুরের রেশ—

কাঁহা সমরী রয়না বিতাই—

সুরে অদ্ভুত একটা মোচড় লাগছে, ভঙ্গির মত ভাষাটাও যেন অচেনা। এমন চটুল ছন্দের গান আগে শোনেন নি শোভা সিংহের কন্যা।

ভালো লাগেনি। মনটা বিরক্তে ভরে উঠেছিল। কেন পিতা এই গায়িকাকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন। ওর অসম্বৃত বেশবাস, মদির চাউনী ভালো লাগেনি, তাই বোধহয় মনের মধ্যে বিতৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছিল শুদ্ধচিত্ত কুমারীর।

অতপর এল শোভা সিংহের মৃত্যু-সংবাদ। দুঃখকে ছাপিয়ে লজ্জাই যেন তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল মনে। এ কি হল? ক্ষেত্রীয় হিন্দুধর্মের রক্ষক শোভা সিংহ সগৌরবে ফিরে আসবেন জয়ী হয়ে, রাজ্যে আনন্দ উৎসব হবে, মন্দিরে মন্দিরে শংখ ঘন্টা বাজবে রাজার কল্যাণে, তা নয় এ কি নিদারুণ সংবাদ এল, লজ্জার বোঝা তুলে দিল সবার মাথায়।

এমনি সময় এলেন রঘুনাথ, বিষ্ণুপুরের যুবরাজ। বিজয়ী হয়েও কোন লাঞ্ছনা কোন অপমান করলেন না অন্তঃপুরিকাদের বরং সসম্মানে নিয়ে এলেন শোভা সিংহের কন্যাকে কুললক্ষ্মীর মর্যাদা দিয়ে।

না, রঘুনাথের ওপর কোন বিদ্বেষ নেই রাণীর। ক্ষত্রিয় কুমারীদের কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় এসব সময়। এইতো কৃষ্ণরায়ের কন্যা—না সেকথা নয়। বিষ্ণুপুরের মহারাজের পটমহিষী, ধন রত্ন মান মর্যাদা সব কিছু পেয়েছেন তিনি, কিন্তু ক্ষোভ তাঁর অন্য ব্যাপারে। ওই যবনী—ও যেন যাদু করেছে মহারাজকে। কি আছে ওই গণিকার? রূপ? গান? কেন বিষ্ণুপুররাজের অন্তঃপুরে কি রূপের এতই অভাব? আর গান? ওসব কিছু নয়, মহারাণী স্থির বুঝেছেন যে রঘুনাথ দিনে দিনে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছেন ওই যবনীর মোহে।

কথাটা হয়তো সত্যিই। নইলে রঘুনাথও তো নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারছেন না নিজের পরিবর্তন। এতদিন বাহাদুর খাঁ আর তার শিষ্যদের গান তো শুনেছেন কত ধৈর্য ধরে। কিন্তু আজ যেন সব স্বাদহীন রসহীন মনে হচ্ছে। জলসা-ঘরে এখন আর সন্ধ্যায় সারে সারে বাতি জ্বলে না, আসর বসে না মহাসমারোহে।

আগে রাজকার্য শেষ করে স্নান শেষে, শুভ্র রেশমের বস্ত্র আর উত্তরীয় অঙ্গে জড়িয়ে আসতেন রাজা, কপালে থাকত শ্বেত চন্দনের তিলক, গলায় মদনমোহনের প্রসাদী মালা। তানপুরার চারটি তারকে সুরে বেঁধে নিতেন বাহাদুর খাঁ, মুদঙ্গে আটার পুলটিশ লাগিয়ে প্রস্তুত হতেন সহযোগী পাঁরবকস। পদ্ধতিমত আলাপের পর গান ধরতেন বাহাদুর।

অচল রাজ করো—

স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী পার হয়ে—আভোগে ভণিতা দিতেন—

শুভনখত সাধ অমৃতযোগ শুভচন্দ্র

'অনসেন মনভয়ো আনন্দ।'

কিন্তু ভালো লাগে না আজ আর ওই গান। মনে হয় বাহাদুর খাঁর কণ্ঠ বড় কর্কশ। সব একঘেয়ে। অথচ লালবাই? কি মধু তার কণ্ঠে, কি মাদকতা তার হাসিতে ভঙ্গিতে। এ গান শুধু শোনার নয় দেখারও। লালবাইকে দু চোখ ভরে দেখতে প্রাণ চায়, তার ওই বিদ্যুৎ কটাক্ষে বুকের রক্তে জোয়ার আসে রঘুনাথের। ওর কাছে এলে দেহের সমস্ত স্নায়ু উন্মুখ হয়ে ওঠে, মনে হয় জীবনটা অফুরন্ত সুখে ভরা, তাকে নিংড়ে উপভোগ করাই পুরুষের কাজ। রাণী? সে তো পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে, বিষ্ণুপুর রাজের পট্টমহিষী হওয়া কি কম ভাগ্য, কম সম্মানের কথা? তাছাড়া তার সংসার আছে, দেবতা আছেন। তবে আর কিসের অভাব রইল তার? তাকে নিয়ে চিন্তারই বা আছে কি?

—তারপর?

অতপর আসে লালবাই-এর কথা। সেতারের তানে ভাসতে ভাসতে কোথা থেকে কোথায় এল সে ভাবলে নিজেই যেন অবাক হয়ে যায়। তকদীর? মিথ্যে কথা। কি দিয়েছিল ওকে ভাগ্য? ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, দুবেলা দুখানা পোড়া রুটি, তাও মিলত না বিনা গঞ্জনায়। দেহে তখন যৌবন আসেনি তাই মানুষের কাছ থেকে নিষ্ঠুরতা আর লাঞ্ছনার বেশী কিছু পাওনা ছিল না তার। কিন্তু দিন বদলাল। একটি একটি করে বসন্ত অফুরন্ত সম্ভারে ভরিয়ে তুলল তার দেহ, মনে জাগাল আকাঙ্ক্ষা আর উচ্চাভিলাষ।

প্রাথমিক অবস্থায়
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা
থেকে
আরাম পেতে
বিশুদ্ধ
হ্যামেনসা
মলম
ব্যবহার করুন-
অস্ত্রোপচার না
করলেও চলে!
3081 BEN.

লালী হল লালীবিবি, তারপর লালবাই। ক্রমে আত্মবিশ্বাস এল, সব রকমের কলা-কৌশল আয়ত্তে এল তার। মোহিনী শক্তি আর রূপের জোরে অবশেষে একদিন পাঠান সর্দার রহিম খাঁর বহমহলে পৌঁছে গেল লালবাই। সেখান থেকে এক বিপরীত সেতারের টানে আজ এসে পৌঁছেছে বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজার প্রাসাদে।

কিন্তু রহিম খাঁর কি হল? সে খবর না জানা পর্যন্ত তো নিশ্চিন্ত হচ্ছে না লালবাই-এর মন। আর যাই হোক রহিম খাঁ লালবাই-এর মন কেমন করে গা ভাসাতে হয় সুখের সাগরে। এখানে উপকরণে কিছু কমতি নেই, তবু কাফেরের রাজ্যে অষ্টপ্রহর এই কীর্তন আর হরিধ্বনি যেন পাগল করে তুলেছে ওকে। তাই ওর উৎকণ্ঠা রহিম খাঁর খবরের জন্য। কোথায় সে? সে কি জয়ী হয়েছে? আর কি কোন আশা আছে অবশিষ্ট?

খবর এল। রহিম খাঁ মুরশিদাবাদ লুঠ করে, মালদহ রাজমহল দখল করে শাহ উপাধি নিয়েছে। শোভা সিংহের সৈন্যরা এখন রহিম খাঁর অধীন।

অস্থির হয়ে উঠল লালবাই। কোথায় রহিম শাহ আর কোথায় জঙ্গল বাজ্যের এক কাফের ভাঁইয়া। কেমন করে তার কাছে পৌঁছবে সেই চিন্তায় আহারে রুচি গেল, গানের রেয়াজ বন্ধ হল লালবাই-এর। রঘুনাথ এসে ফিরে যান, লালবাইএর তবিয়ৎ ঠিক নেই, মহারাজ যেন মাফ্ করেন ওকে। বাঁদী হাসিনা দরজা বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলল না। আবার খবর এল, জবরদস্ত খাঁর হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়েছেন রহিম খাঁ। অবশেষে এল মৃত্যু সংবাদ। সব আশার শেষ হল।

হাসিনা আবার দরজা খুলে দিল। আবার শুরু হল নৃত্যগীত, উচ্ছল উদ্দাম। সেই জোয়ারে সম্পূর্ণ ভেসে গেলেন রাজা রঘুনাথ সিংহ। আর নিজের শেষ কড়িটি পর্যন্ত এবার বাজি রাখল লালবাই। এই কাফেরকে গোলাম বানাতে হবে আর এরই কাঁধে ভর রেখে পৌঁছুতে হবে উচ্চাভিলাষের চূড়ায়। এ ছাড়া আর পথ নেই।

রঘুনাথ তখন পুরোপুরি গোলামই বনে গেছেন। তাঁর রাজ্য গেছে, প্রজা গেছে, দেবতা গেছেন, স্ত্রী গেছে, আছে শুধু লালবাই।

লালবাই পিয়ারী।

লালবাই, কাছে এস—

—মহারাজ যবনী গণিকার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, মহারাজ, আমি মুসলানী, তাই যতই ভালোবাসি না কেন, আমি তো আপনার আপন হতে পারব না, যেমন আপন আপনার মহারাণী—

(চলবে)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

অমৃতলেখনীর অবিস্মরণীয় জীবনী-সাহিত্য

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে

পঞ্চম খণ্ডে :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১ম ও ২য় খণ্ড)

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

ষষ্ঠ খণ্ডে :

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

সপ্তম খণ্ডে :

ভক্ত বিবেকানন্দ

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

এবং রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

এই নয়খানি অবিস্মরণীয় জীবনী-সাহিত্য ও তৎসহ ১২০৪ খৃঃ হতে পূর্বভারতে ধর্মবিপ্লব এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনের বিস্তৃত ইতিহাস, শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী সংকলন, পরিপূরক হিসাবে প্রত্যেক মহাপুরুষ ও শ্রীমায়ের চরিতামৃত ও নানা বিষয়ে অতিরিক্ত প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার তথ্য পঞ্জীসহ উক্ত তিনখণ্ড লাইনো-টাইপে মুদ্রিত। প্রতিখণ্ড ২৫৲। মোট প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা। কবিপক্ষের মধ্যে (৯মে—২৪শে মে) উক্ত রচনাবলী ও পূর্ববর্তী প্রকাশিত চারখণ্ড (প্রতি খণ্ড ২০৲) রচনাবলী ক্রেতাদের ২০% কমিশন দেওয়া হবে। এজেন্ট ও বিক্রেতাগণ অতিরিক্ত কমিশন পাবেন। সীমিত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। এই অমূল্য খণ্ডগুলি এক্ষুণি সংগ্রহ করুন। মফঃস্বলের ক্রেতাগণ, সম্পূর্ণ সাতখণ্ড অথবা যে কোন খণ্ডের জন্য সম্পূর্ণ মূল্য ড্রাফ্ট / মনিঅর্ডারে পাঠালে অতিরিক্ত ডাকব্যয় ব্যতীত ঘরে বসে রেজিস্টার্ড ডাকে বই পাবেন।

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১।এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিঃ-৭৩

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

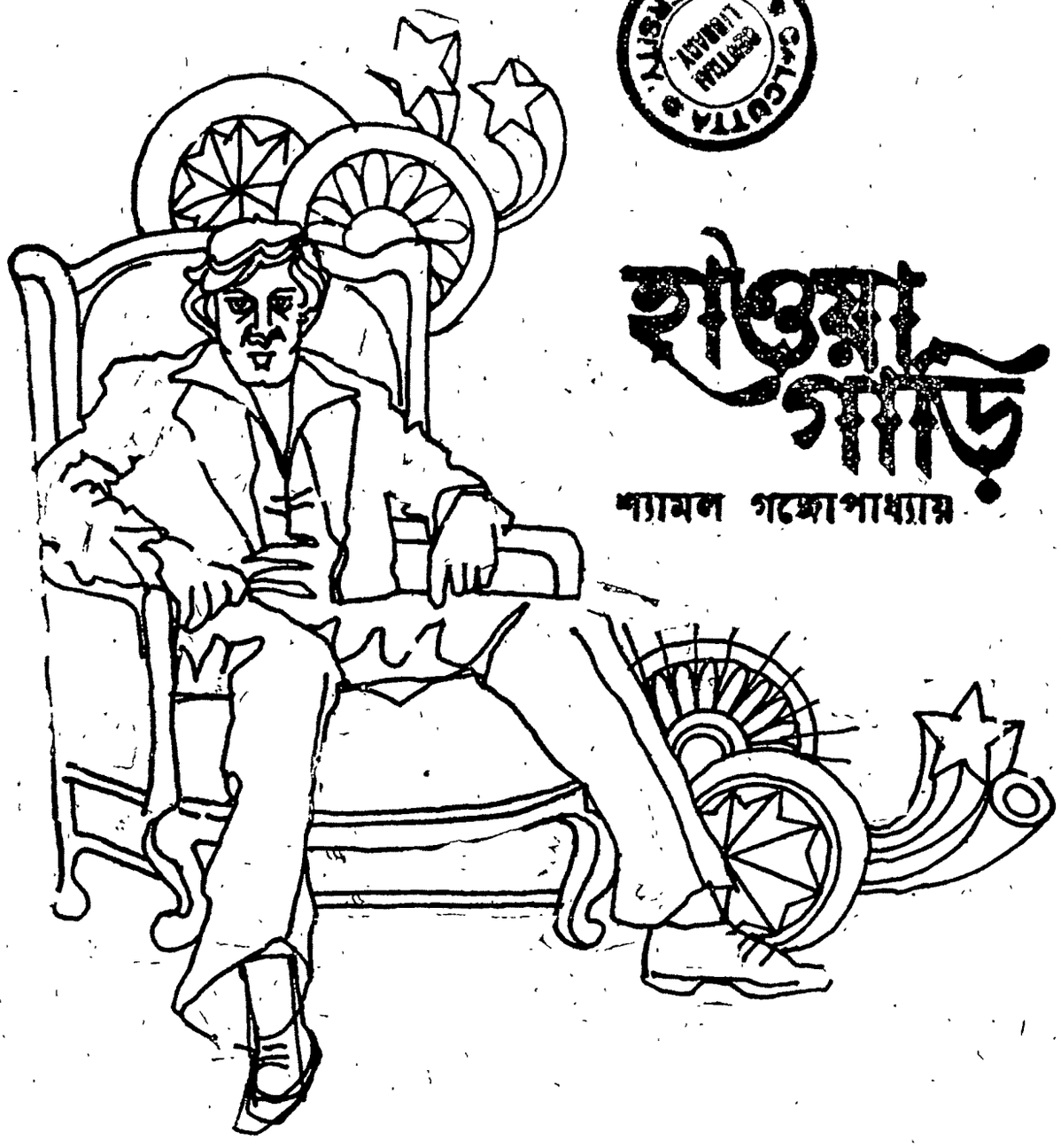

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ পনেরো ॥

কাগজের বিজ্ঞাপনের খসড়াটা লিখে ফেললো কিরীটী। তাতে একটি লাইনই প্রধান হয়ে উঠলো। খালি গলায় ভালো টপ্পা গাহিয়া থাকেন। বিজ্ঞাপনের শুরুটা এরকম।

বাবা ফিরিয়া আসুন।

আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল আপনি নিরুদ্দেশ। এই বয়সে আপনার পলায়নের কোন কারণ নাই। পুর্ণাঙ্গ সংসার করিবার পর আপনি পরমানন্দেই ছিলেন। আপনার এই আকস্মিক উধাওয়ের কারণ শুধু আপনিই ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

এটা যেন বৃন্দাবন পালিতকে লেখা কিরীটী পালিতের চিঠি হয়ে যাচ্ছে। কেটে দিয়ে কিরীটী লিখলো, দেড় বৎসরের উপর উধাও পরিণত বয়সের শ্রীবৃন্দাবন পালিতের কোন খবর দিতে পারিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। খালি গলায় ভাল টপ্পা গাহিয়া থাকেন।

বয়স ঠিক জানে না বলেই কিরীটী পরিণত কথাটি লিখলো। এখনো তার কানে বাবার টপ্পার তান লেগে রয়েছে। সই। ভালো করে বিনোদ বেণু বাঁধিয়া দিস—

কিংবা—

আমার কাঁচা পীরিত পাড়ার লোকে পাকতে দিলো না—

এমন আরো অনেক। বাবা বড় সদানন্দ মানুষ। বেঁচে থাকলে—যেখানেই থাকুন—সেখানটা মাতিয়ে রেখেছেন। কি হতে পারে বাবার ?

কেউ মেরে ফেলতে পারে বাবাকে। কিন্তু কারো সঙ্গে তো তাঁর শত্রুতা ছিল না। হয়ত ভুল করে কেউ খুন করে বসতে পারে।

কিংবা—বাবা হয়তো ট্রেনে কাটা পড়তে পারে। রোজই তো কতই অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে।

আরেকটা জিনিস হতে পারে। মর্নিং ওয়ার্কে বেরিয়ে—বাবার হয়ত স্মৃতি মুছে গিয়েছে। যাকে বলে বিস্মৃতি—স্মৃতি-ভ্রংশ। তাঁর মনে নেই—তিনি কে ? কোত্থেকে এসেছেন ? কোথায় যাবেন ? সংসার, ছেলে, বাড়ি-ঘর, স্ত্রী গৃহ,

নাতি-নাতনী—সবার কথা চিরকালের জন্যে ভুলে গেছেন। তাই ঠিক এখুনি হয়তো তিনি ঘুরতে ঘুরতে নর্মদার তীরে গিয়ে পৌঁছেছেন। কোন শিশুকে আদর করছেন হয়ত। সেই সময় পূর্বস্মৃতি থেকে গলায় টম্পায় উঠে এলো। কি যেন মনে পড়ে। পড়তে পড়তে একটুর জন্যে আর মেন পড়ে না। সবই ধোঁয়াটে। তখন গানের শেষে অকারণে চোখে জল এসে যায়।

কিংবা বৃন্দাবনের একথাও মনে হতে পারে—এ পৃথিবীতে কেউ মরে না। কেউ হারায় না। সাময়িকভাবে আমরা কেউ কারও বাবা—কারও ছেলে—ইত্যাদি। নয়ত আমরা তো চিরকালের মুক্ত আত্মা। এ সব-সংসার দু দিনের বই তো নয়। হয়ত টান ভালবাসা ঢিলে হয়ে যাওয়ায় বৃন্দাবন পালিত বেরিয়ে পড়েছেন। আর কোনদিন ফিরবেন না। কোন অচেনা জায়গায় শেষ আশ্রয় দেহ রাখবেন।

কে?

আমি বড়বাবু।

লোকটি এ এলাকার পুরনো মুচি। কিরীটীর স্টুডেন্ট লাইফ থেকে দেখে আসছে।

কি ব্যাপার মটরু?

এক সাহাব আপনাকে ঢুঁড়ছেন—সাহেব? নিশ্চয় তো ভেতরে।

মটরু যাকে ভেতরে পৌঁছে দিল—তার হাতে ভি আই পি ব্যাগ। পরণে সাধারণ সুট। গলায় টাইটা ঢিলে করে ঝোলান। আমি—দিলীপ বসু।

তাই বলুন! বসুন। বসুন। আমি ভাবছিলাম—কোন্ না সাহেব এলো বসুন। ওখানটায় বসুন। আমার নাম—কিরীটী পালিত। আমিই মালবিকার বাবা—

বেলা দশটা হবে। দিলীপ সবাসরি এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরছিল। ট্যাক্সিতে। কি মনে হতে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে আদি গঙ্গার ধারে এখানটায় নিয়ে এসেছে।

আপনার ছেলেরা—বাচচু টাপু ওরা আমায় চেনে।

জানি। আপনার প্রশংসা শুনেছি ওদের মুখে। ওরা তো আপনারও ছেলে। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি পিতৃত্ব জিনিস-টাকে বেশন কার্ড করে ফেয়ার প্রাইস শপ থেকে ঠিক মত ডিস্ট্রিবিউট করতে পারতাম

খুব অবাক হোল দিলীপ। কি রকম? সেটা কি করে সম্ভব?

খুব সম্ভব। একটুও কঠিন না। কার্ডে টাকা জমা দিতাম। ভালবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ, পারিবারিক বন্ধন—সবই নিয়মমত কন্ট্রোল করা যেত। সাংখ্যদর্শনে আছে মন চল অন্নময় কোষ। সেই এন্ন যদি ফেয়ার প্রাইস শপ বিলি করে—তাহলে জেনুইন পিতৃত্ব—আপত্য স্নেহ—এসব জিনিসের ভাল বিলি-ব্যবস্থা কেন করা যাবে না?

দিলীপ এখানটায় চোষাল শক্ত করে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল।

কিরীটী প্রায় ধর্মকে থামাল তাকে। কোন সন্তান আদরে গোল্লায় যাচ্ছে। কেউ বা অনাদরে অবহেলায়, মেন্টাল কেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোন পিতা ছেলের ঘাড় থেকে নামছে না। নিজের আনপ্ল্যান্ড ফ্যামিলি যে সব পিতা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যযাতি হয়ে বসে আছে। আবার কোন পিতাকে ছেলে টাকা পাঠিয়ে মানি অর্ডার রসিদ লন্ডির বিলের সঙ্গে গেঁথে রাখছে—এ সবই পেতৃত্বের সঠিক বিলি-ব্যবস্থায় ঠিক হয়ে যাবে। সপ্তাহে সপ্তাহে কার্ডে টাকা জমা দিতে হবে। সেই টাকায় অনাদরের শিশুর জন্যে স্নেহ, হস্টেল, দুধের জোগান—আবার সেই টাকাতেই অবহেলিত পিতার জন্যে ওল্ড এজ হোম, পুরীতে যাবার টিকিট—সব হবে।

যযাতিদের জন্যে কি করবেন?

তাদের জন্যেও কার্ড থাকবে। পুরো আইডিয়াটা এখনো ভাবি নি। ভাবা হয়ে গেলেই পেটেন্ট করাবো।

পেটেন্ট? কেন?

নয়ত কেউ মেরে দিয়ে বলবে—সে-ই অরিজিনাল। লক্ষ্য করেছেন—এখন আমরা মানুষরা বেশি ট্যাক্স দিয়েও গাড়ির জন্যে পথ ছেড়ে দিয়েছি। পায়ে হাঁটার ফুটপাথ ফি বছর সরু করে করে প্রায় শেষ করে আনা হয়েছে।

উপায় কি আর বলুন। গাড়ির জন্যে তো জায়গা চাই।

চাই ঠিকই। কিন্তু মানুষের জন্যেও তো চাই।

গাড়ি তো বেড়েই চলেছে কিরীটী বাবু। আরও বাড়বে।

না। আমার পেটেন্ট অনুযায়ী গাড়ি আরও কমাতে হবে। কমিয়ে একই গাড়িতে এখনকার চেয়ে বেশি লোক যাবে।

কোন গাড়ি কোন্‌দিকে যাবে কা রাস্তার লোক জানবেই বা কি করে? তা ছাড়া গাড়ির মেইনটেনান্স?

কোন অসুবিধা নেই। গাড়িগুলো দিকচিহ্ন লাগিয়ে ছুটবে। সবাই মাস-কাবারি টিকিট কাটবে। সেই টাকায় ড্রাইভার, পেট্রোল, রিপেয়ার, ট্যাক্স—সবই চলবে। কারও গায়ে চাপ পড়বে না। আবার কোন গাড়ি ফাঁকাও যাবে না। এই-ভাবে ট্রান্সপোর্ট সোসালাইজেশন হয়ে যাবে। অল্প পয়সায় সবাই গাড়ি চড়তে পাবে।

তাহলে গাড়ির বিক্রি কমে যাবে কিরীটীবাবু। গাড়ি কম বানান হবে। মোটর কারখানায় ছাঁটাই হবে।

সমাজের প্রয়োজনেই তো উৎপাদন। মার্কস তো তাই বলেছিলেন। আমি অবশ্য

জরাসন্ধ-এর
ত্রিলজি উপন্যাস
স্বপ্ন
সত্য
বাস্তব
৭০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস
১২ টাকা

গ্রীকনাটকসংকলন
এসকাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপাইদেস ও এ্যারিস্টো-ফেনস্ এর ১২টি নির্বাচিত নাটকের সংকলন। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।
গ্রাহকমূল্য ১৫ টাকা।

সেকালের শিক্ষাগুরু
বিগত কালের ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত, শুভঙ্কর সহ ২০ জন শিক্ষাব্রতীর জীবন ও সাধনার কাহিনী।
১৫ টাকা।

দেশবন্ধু
চিত্তরঞ্জন দাশের বাংলা ও ইংরেজী সকল রচনা। দুই খণ্ডের গ্রাহকমূল্য ২২ টাকা।

দান্তে
১ খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহক-মূল্য ১৫ টাকা।

সেকস্‌পীয়ার
৫ খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা।

তুলি - কলম
ফোন : ৩৪-৮১৮০
১, কলেজ রো, কলকাতা - ৯

অত-শত বুঝিনে। শোনা কথা। দরকারে মোটর কারখানার প্রোডাকশন অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

দিলীপ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই এয়ারপোর্টে ছুটেছে। সেখান থেকে এয়ার-বাসে কলকাতা। তারপর এই কিরীটী পালিতের মুখোমুখি। এ আইডিয়াটা পেটেন্ট করিয়েছেন?

করাব করাব ভাবছি। কাগজপত্র রেডি হয়ে গেলেই দিল্লি যাব। সেখানে পেটেন্ট করিয়ে নম্বর হাতে নিয়ে তবে কলকাতা ফিরব।

দিলীপের মুখের চেহারা আবার শকত হয়ে এল। কিরীটীবাবু আপনাকে আরও একটা জিনিস ভেবে-চিন্তে পেটেন্ট করাতে হবে।

কোনটা বলুন তো।

সেই সব ছেলেধরা বাপ-মায়ের কথা বলছি।

কিরীটীর মুখখানা একটুও বদলাল না। বরং হাসি এসে ভাসতে লাগল।

দিলীপ বলছিল, যারা মেয়ে লেলিয়ে দেয়—

আমাদের মালবিকার কথা বলছেন তো?

দিলীপ হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারল না।

হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি—সে তো বেয়ান এসে নিয়ে গেছেন তাকে।

বেয়ান?

আপনার স্ত্রী। তা আপনার ছেলের বউকে কি আমি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো। মালবিকা তো আপনাদের বাড়িতে। বলেই হো হো করে হাসতে লাগল কিরীটী।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আপনি দিল্লি থেকে এই ফিরছেন? চা খাবেন না?

কোন জবাব না দিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল দিলীপ। তারপর কয়েক লাফ দিয়ে একদম রাস্তায়। ট্যাক্সিওয়ালা অস্থির হয়ে পড়েছিল।

লিফট দিয়ে ওপরে উঠেই বেল টিপল দিলীপ। একটু পরেই দরজা খুলে দিল মালবিকা। ভেতরে ঢুকতেই নতুন শাড়ির গন্ধ ছড়িয়ে মেয়েটি তাকে প্রণাম করল নিচু হয়ে। প্রায় পথ আটকে। দিলীপ সরে দাঁড়াতে পারল না—কিংবা, পিছলে সরে যেতেও পারল না।

একা একাই নিজের ঘরে গিয়ে দিলীপ একটু বাদে ফ্রেস হয়ে এল। বুঝলো, রাণী আর কুটু কাছাকাছি বেরিয়েছে। মেয়েটি আবার রবির ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে।

এয়ারবাসে বসে যে কাগজ পড়ে পড়ে শেষ—সেখানেই আবার উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো দিলীপ। তার বুকের ভেতরটা মরুলে লাল হয়ে যাচ্ছিল। আমি রবিকে নিয়ে অনেক আশা করেছিলাম। অনেক। অনেক রকমের—আর হয়ে গেল কি। কিছুতেই দিলীপ পেছন ফিরে রবির ঘরে তাকাতে পারছিলেন না।

এবার ডোরবেল বাজতেই দিলীপ উঠে গিয়ে দরজা খুললো। রাণী আর কুটু।

কুটু বললো, কখন এলে বাবা? চা দিয়েছে বৌদি?

বৌদি?

দিলীপের খিচিয়ে ওঠা চোখ মুখ দেখে রাণী শান্ত গলায় বললো, আমার হাতের চুড়িগুলো ভেঙ্গে মালবিকার জন্যে একজোড়া বালার অর্ডার দিয়ে এলাম।

বালা?

হ্যাঁ। টেবিলে গিয়ে বোসো। ওই তো মালবিকা চা করে এনেছে।

মাথার ঘোমটা সামলাতে সামলাতে মালবিকা প্লেটসমেত চায়ের কাপ রাখলো টেবিলে। ঠক করে।

আমাদের বাড়িতে এত ঘোমটা দিতে হবে না মা। শ্বশুরকে প্রমাণ করেছো?

দূর থেকে মালবিকা মাথা নাড়লো। কুটু এগিয়ে গিয়ে ঘোমটাটা নামিয়ে দিল। দিলীপ আগের মতই রাগে রাগে বললো, শ্বশুর?

রাণী হেসে বললো, হ্যাঁ। ঠিক তাই। যাও। টেবিলে বসে চা খেয়ে নাও।

ঠিক মালবিকার সামনে পারলো না দিলীপ। মেয়েটি সম্ভবত আবার চা করতে ঢুকলো কিচেনে। সেই সময় দিলীপ রাগে ফেটে পড়লো। কী ভেবেছো তোমরা? যে মেয়ের বিয়েই হয়নি—তাকে প্রেগনান্ট অবস্থায় বাড়িতে এনে উৎসব লাগিয়েছো। গয়না বানাতে দিয়ে এলে? ওকে রবির বউ বলে মানবে সবাই? তোমাদের লজ্জা করে না? আইনের চোখে এভাবে রবি বাবা হতে পারে?

তোমার লজ্জা করে না? একটা বাঙালী বাড়ির মেয়ে এ-অবস্থায় কোথায় যাবে? আমাদের রবি কি সবচেয়ে বেশি দায়ী নয়? অন্যকে দোষী করে কি লাভ হবে। যাও বাজার করে এনে দুজনকে খেতে বলো। আমি ঘরটর সাজিয়ে দিয়ে কাল পাড়ায় ছেলেদের দিয়ে উৎসব করিয়ে দিয়েছি।

কিসের উৎসব? এ বিয়ে আমি মানি না।

আর ছেলেমানুষী কর না। এখন বয়স হচ্ছে আমাদের। যাতে আমাদের ছেলে-মেয়েরা খুশী হয় — এখন থেকে আমরা শুধু তাই করব। ওদের সুখেই আমাদের সুখ।

রবি বিয়ের কি বুঝে?

আস্তে কথা বল। বউমা শুনতে পাবে।

বউমা?

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। ছেলে-মেয়ের বাপ হতে পারে—আর বিয়ের কিছু বুঝবে না রবি। ঠাণ্ডা হয়ে বসো। ভাল কথা—দিল্লিতে কেমন ছিলে?

ভালোই। আমাদের রবিকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

তোমার ছেলে পুলিশকে ফাঁদে ফেলে চরকি নাচন নাচাচ্ছে—আর তাকে ফাঁদে ফেলবে একটা সরল মেয়ে! যাও। উঠে গিয়ে বউমাকে দুটো ভাল কথা বল। লোক-জনকে খেতে বল।

আমি পারব না রাণী। রবি এভাবে আমার সব নষ্ট করে দিল?

ওভাবে দেখছ কেন? মেয়েটি তো ভাল। বড় সরল। সিধে। তোমার ছেলে যে কোন দিন বেঁচে ফিরে আসবে—তারও তো কোন ঠিক নেই।

এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে এক সময়।

হলো। তাতে কি হবে।

ফিরে আমি রবির বিয়ে দেব।

ছেলেমানুষীর আর শেষ নেই। যাও—বউমা বলে দুটো ভাল কথা বলে এসো। আমাদের কুটুর চেয়ে সামান্য বড় হবে। আমাদেরই মেয়ের মত। মত কেন? মেয়েই তো। হাজার হোক রবির বউ—বলে কান্না এসে যাচ্ছিল রাণীর চোখে। তবু সে কঠিন করে তাকিয়ে থাকল।

আমি পারব না রাণী। এ বিয়ে আমি মানতে পারছি না। আমায় ক্ষমা কর। রবিকে নিয়ে আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম—

তা পারবে কেন! তোমার মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে পথে না ভাসালে না। যাও। চান করে এসে বাজার ঘরে এস। মালবিকার মা-বাবা — ভাইদের নেমন্তন্ন করে এস।

আমি পারব না রাণী। ওর ভাইদের আমি চিনি—তারাও আমায় চেনে। কিন্তু আমি পারছি না।

তা পারবে কেন? খাদান খাদান করে মাতলে কিছুদিন। ছেলেটা কোথায় গেল—

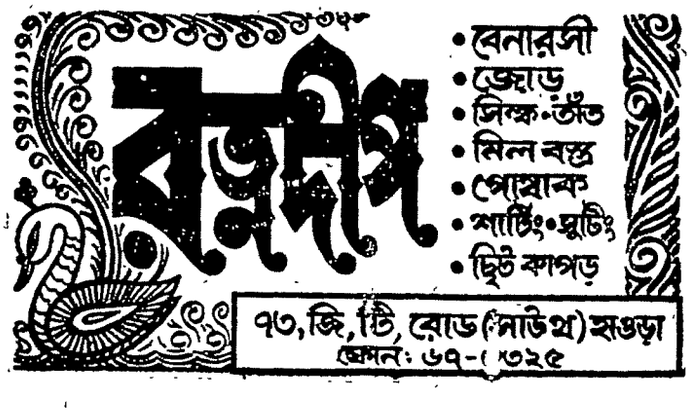

ভারতে এর বিক্রী সবচেয়ে বেশী

অন্য যে কোন ডিটারজেন্ট ট্যাবলেট বা বারের তুলনায়

সুপার৭৭৭

লক্ষ লক্ষ লোকের পছন্দ আর তাঁদের মত:
সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোওয়ার বার

বেশী দিন চলে, অনেক বেশী সাদা করে,
সাবানের তুলনায় খরচও কম।

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

Shilpi-dm-63/77 Ben

কি করল—সে খোঁজ নাও নি। দালালীর পয়সায় নয়-ছয় করে বেড়ালে।

নয়-ছয় করবার রাণী। তার অনেক-কিছুই গেছে—শেয়ারের টোপ গাঁথতে।

সবটাই নয় তো।

না।

তা দিয়ে গাড়ি দেখে বেড়িয়েছ। কিনছ। বেচছ। এই মাসখানেক ধরে গাড়ি পারালে। আর অমনি কি হল—বেচে দিলে—

আজকাল আমার কিছু ভাল লাগে না রাণী। কিছু না। আমার জীবনটাই কি হয়ে গেল।

আর আমাদের? আমাদের দিকে তুমি ফিরে তাকাও কখনও?

কেন? কোন কাজ তো বাকি রাখি নি। যা দরকার—সবই ব্যবস্থা করেছি।

তুমি নিজে কখনও আমাকে নিয়ে সিনেমায় গেছো? নাটক দেখতে গেছো?

সময় হয় নি।

ইচ্ছে থাকলেই সময় করা যায়। তারপর আবার ফ্ল্যাটের কিস্তি দাও নি ছ মাস।

ও দিয়ে দেব ঠিকই।

অনেক জমে গেছে কিন্তু।

আমার খেয়াল আছে রাণী।

ভাল বলে রাণী উঠে গেল। উঠতই সে। মালবিকা চা বানিয়ে আনছিল। রাণী এগিয়ে গিয়ে কাপটা ধরে ফেলল। তুমি সকাল সকাল চান সেরে নাও। আজ তোমায় নিয়ে একটু কালীঘাটে পুজো দিতে যাব।

দিলীপ এসব কথায় কান দিচ্ছিল না। কিন্তু সবই তার কানে আসছিল। রবির ফাকা খাটের স্ট্যান্ডে বাসি বকুল-মালা পাখার হাওয়ায় দুলছিল। দিলীপ গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। সবই আগের মত চলছে। শুধু সে আর আগের মত নেই। বেলা এগারটা সাড়ে এগারটা হবে। শীত চলে যাবে বলে এরই ভেতর বাতাসে রোদের তাত। এইটুকু তাতে এখন কষ্ট হয়। আর গত দু বছরে লোড শেডিংয়ের ভেতর সিঁড়ি বেয়ে নেতাজী সুভাষ রোডের কত বাড়িতে উঠেছে দিলীপ। ওপরে উঠে গিয়ে বিসেপসনে বসে থেকে দম ফিরে পেয়েছে। তারপর সুইং ডোর ঠেলে ফার্স্টলাইজার, অ্যালামের কোম্পানীর বড় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছে সে। তখন তো গরম লাগে নি। অথচ এই সিঁড়ি ভাঙাভাঙি সে করেছিল প্রচণ্ড গরমের ভেতরেই। ভাদ্র মাসের এই গরম—এই বর্ষার ভেতর। সন্ধ্যেবেলা যেই ঋষি বলেছে—দিলীপ তুই একটা মিরাকেল!—অমনি সারা দিনের সেসব হাওয়া সে ভুলে গেছে। গোকুল দত্ত তখন নিজের প্লেট থেকে মাছভাজা এগিয়ে দিয়ে বলেছে—নে। খা—

কুটু এক সময় বলল, চান করে এস বাবা। আমাদের হয়ে গেছে। এক সঙ্গে খাব সবাই।

তোমরা খেয়ে নাও।

মা কালীঘাট ঘুরে আসুক বৌদিকে নিয়ে। তারপর তো সবাই খেতে বসব। তুমি চান করে এস সেই ফাকে—

কোন জবাব দিল না দিলীপ।

অফিস যাবে না আজ?

না।

মালবিকাকে নিয়ে রাণী বেশ বেলায় ফিরল কালীঘাট থেকে। তখন কুটু ঘুমোচ্ছিল এক ঘরে। দিলীপ আরেক ঘরে।

রাণী এসে ঘুমন্ত দিলীপের সামনে দাঁড়াল। নিজের মনে মনে বলল—ভয়ংকর ক্লান্ত। মুখে বলল, মালবিকা—ওর গায়ে একটা চাদর দিয়ে দাও—

বাইরে তখন আকাশ মেঘলা হয়ে এসেছে। মালবিকা বলল, যদি জেগে যান—

যাবে। তাতে কি?

রেগে যেতে পারেন—

না না। বলেও নিজের মনের ভেতর রাণী পরিষ্কার দেখতে পেল—মালবিকাও কষ্ট পাচ্ছে। ভীষণ কষ্ট। সবই ঘটছে নিজেদের ভেতর। অথচ তার কিছু করার নেই।

দিলীপ জাগতে জাগতে পেল—তার গায়ে একখানা পাতলা সুতীর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাদরের ওপাশে একখানা ভীতু মুখ। খুব সুন্দর সরল। মালবিকার মুখ। দিলীপ আবার চোখ বুজল।

তখন বাইরে অকালে বৃষ্টি হচ্ছিল।

সেই বৃষ্টির ভেতর টাপু আর বাচচু—দুই ছেলেকে নিয়ে—তাদের বাজনাপত্তর গুছিয়েগাছিয়ে ট্যাকসিতে উঠল কিরীটী পালিত। আজ পি এম জির সামনে ফাংশন। অফিস বিক্রিয়েশন ক্লাবের। বাচচু বাজাবে ড্রাম। টাপু স্প্যানিশ গিটার। বিশ্বনাথ আগে চলে গেছে। সে গাইবে গান। পি এন টির সেন্ট্যাল হলে।

ট্যাকসিতে বসে কিরীটী বলল, আমরা হলাম গিয়ে মিউজিসিয়ানের ফ্যামিলি। বাবা খালি গলায় গাইতেন। আমি কেরামতুল্লার সঙ্গে তবলার লহরা করেছি বয়সকালে। তোরা বাজাস বাজনা।

টাপু বলল, কিন্তু বাবা—আমরা তো ওয়েস্টার্ণ বাজাই। তোমার পি এম জির ভাল লাগবে?

লাগবেরে। লাগবে। চাই কি তোর একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে। পি এম জি সব পারে।

পারে বাবা। কিন্তু যে জিনিস বোঝেন না—তা তাঁর ভাল লাগবে?

ওয়েস্টার্ণ তো রবীন্দ্রনাথ কথা বসিয়ে গান বেঁধেছেন। তেমন একটা বাজাবি। বিশ্বনাথ গাইবে।

বিশ্বনাথ তো হিন্দি ছবির গান গায়। আমরা বাজাই পিওর ক্ল্যাসিকাল।

দু একটা ফোক টোক —

তা জানি অবশ্য।

তাই বাজিয়ে দিবি। তাতেই চলবে।

তোমাদের হলের অ্যাকস্টিকস্ কেমন?

সেটা কি?

সাউন্ড এফেক্ট কেমন?

ভালই। -অ্যানুয়াল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হয়। পি এম জি লেকচার দেন। একবার সেন্ট্রাল কম্যুনিকেশন মিনিস্টার স্পিচ দিয়েছিল। ভালই তো। পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল। তবে হ্যাঁ। একটু গম গম করে।

বাচ্চু হেসে ফেললো। ওই তো মুস্কিল বাবা! ওই গমগমটাই।

তোরা কি চিরকাল বাজনা বাজিয়ে যাবি? আর বিহার্সাল দিবি একতলায় বসে? আমি তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

টাপু বললো, আমি দেখো তুমি—বড় সুরকার হবো। মিউজিক ডাইরেকটর। পাব পিকচার তিন লাখ। বম্বেতে—

তা দেখতে ততদিন আর আমি বেঁচে থাকবো না। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে কিছু একটা কর। মালবিকা তো শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

বাচচুর চোখদুটো শকত হয়ে গেল। রবিকে পেলে আমি তলপেটটা ফাঁসিয়ে দেব।

ছিঃ। তোমাদের ভদ্রলোকের মত হও।

টাপুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, ভদ্রলোক। আমাদের বোনের মত অ্যাথলেট সারা কলকাতায় কটা আছে? মালবিকা কিছু ফেলনা মেয়ে নয়। হাতে পেলে ভদ্রলোকের খোমা পালটে দিতাম।

খোমা মানে কি রে?

ও তুমি বুঝবে না। মুখের চেহারার নাম খোমা। মোরে উল্টো করে দিতাম। বড় বিপ্লবী আমরা। রবির বাবা তো আমাদের জেনে। সে জানে না—আমরা কি জিনিস?

তোমাদের গুরুজন এখন।

ওরকম অনেক গুরুজন দেখা আছে আমাদের—। তবে লোকটা খারাপ না বাবা। দিলদরিয়া আছে। আমরা বললে টু পাইস গসায়।

ব্যবহার করুন
লিচেল্লা

লোকটা লোকটা করছিস কেন? তোদের বোনের শ্বশুর হন।

হ্যাঁ। আমার একবার বন্যাফ দিয়েছিল। আমাদের জন্যে একটা অ্যামপ্লিফায়ার কিনে দেবে। ঠিক ছিল—আমরা মাসে মাসে ফাংশন করে দাম শোধ করে দেব। তা সে আর কেনার নাম নেই।

হয়তো কোন কারণে পারেননি।

না বাবা। এমনিতে অবস্থা ভালো। প্রায়ই গাড়ি বদলায়। বিলিতি-দিশী—

তা একজন বদলাতেই পারে। পুরনো গাড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া—বদলানো সারানো অনেকেরই নেশা। এতো বেশি পয়সার ব্যাপার নয়।

বাচচু বললো, নাবে দাদা—একটা বেচে আবার একটা কেনে দেখেছি। তিন মাস ধরে সাবাস রং করায়—কিছুকাল চড়ে আবার বেচে দেয়। ওই এক নেশা লোকটার। এদিকে যে ছেলেটা ভেসে বেড়াচ্ছে—সেদিকে খেয়াল নেই—

মনে মনে হাসলো কিরীটী। বাবাদের কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে ছেলেদের সমালোচনা। হয়তো আমাকে নিয়েও ওরা এমন কিটিসাইজ করে থাকে। আমার মেজো ছেলেটা— খোকন যে কেন গান-বাজনায় ভিড়লো না জানি না। ভিড়লে বোধহয় ভালই হোত। বউমারা যেতে আবার বিয়ের বাই উঠেছে। অথচ এদিকে ওর ছেলে সবে হামাগুড়ি ছেড়ে টলেটলে হাঁটতে শিখেছে।

হ্যাঁরে টাপু— সোকনকে তোদের দলে নিস না কেন?

ও এলে তো। অফিস থেকে ফিরেই তো জুযো খেলতে বসে।

কেমন খেলে?

সেদিকে সেয়ানা। যা নিয়ে খেলতে বসে—তার চেয়ে বেশি নিয়ে ওঠে রোজই।

তোদের কিছু বলে টলে?

কি বলবে বাবা?

এই আর কি—ফিরে বিয়ে থা-র কথা।

টাপু গম্ভীর হয়ে গেল। বাবা। ও যখন আবার বিয়ে করতে চায়—তাহলে দিয়ে দাও। বাঁধা দিয়ে কোন লাভ নেই। আপত্তি করলে আবার আগেরবারের মত লুকিয়ে বিয়ে করে আসবে।

তুই তো আমার বড় ছেলে। তুই বিয়ে থা করবি না?

এখন বিয়ের কোন কোশ্চেন ওঠেই না। ওয়েস্টার্ণ ক্লাসিক শিখতে আমাকে এখনো অনেকদিন খাটতে হবে বাবা।

খাটতে গিয়ে যদি বিয়ের বয়স চলে যায়—

যাবে।

ধর যদি আমি মরে যাই আচমকা—সংসার চলবে কি করে?

চালিয়ে নেব কোনরকম করে। বাড়ি ভাড়া তো আর লাগছে না। অনেকের তো ও অবস্থায় বাড়িও থাকে না।

তোর কি টাপু বিয়েরও ইচ্ছে করে না?

না বাবা। ওকথা মাথায় আসেনি। বরং একটা যদি অ্যামপ্লিফায়ার করে দাও আমাদের—

দাঁড়া বেলের কমিশনটা পাই আগে।

সন্ধ্যেবেলা পি এন টির সেন্ট্রাল হল থেকে বাচচু আর টাপু ফিরলো। বাজনা, গান—দুই-ই খুব জমেছিল। অনেকবার হাততালি পড়েছে। ফিরে ফিরে বাজাতে হয়েছে। কিরীটী ফিরতে পারেনি। ওদের হাতে ট্যাকসি ভাড়া ছাড়াও তিরিশটা টাকা দিয়ে বলেছে—তোরা এগো। আমি আজ চাকরির কথাটা পি এম জির কাছে পাড়বো।

কেন শুধু চেষ্টা করছো। আমাদের কোন চাকরি হবে না বাবা। বরং আরও কুড়িটা টাকা দাও।

যা ছিল তাই দিলাম। এখন যা। কথা পাড়ার এমন সুযোগ আর আসবে না। পি এম জি দেখছি ভালো মুডেই আছেন—

বিশ্বনাথকে নিয়ে বাচচু বাজনাপত্তর শুদ্ধু ট্যাকসিতে বাড়ি চলে গেল। টাপু নেমে পড়লো মোমিনপুরের মোড়ে। মরচে-ভঙ্গ বোডের একটা চেনা ঠেক ছিল তার। হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গিয়ে হাজির। সামনের দিকে সাইকেল সারানোর দোকান। পেছনে রীতিমত গুলতানী। আবগারি ডিপার্টমেন্টের এক ঘুঘু ডাইভারের প্রাইভেট বার। সবই পাওয়া যায়। এক নম্বর জিনিস। দাম সস্তা। শৈলেশ দাশ মিউজিক ডাইরেকটর জায়গাটা চিনতো তাকে। শৈলেশবাবু একটা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করিয়ে নিয়েছে টাপু দিয়ে। আজও তিনশো টাকা পায় টাপু শুধু ঘোরাচ্ছে। দেবার নাম নেই।

একটু নীরেস রায়—এক টাকা ৫ কলকাতার শুধু 'আমর্ড কনেস্টবলদের এ দরে পাওয়া যায়। দুটো খাওয়ার টাপুর ভালোই লাগতে লাগলো। রাং সামান্য ছিট ছিট বৃষ্টি ইনসটল থাকলে আজ যে কোন জায়গায় বা পারে টাপু। সে একা নয়—তার দল। কিছু বাজনাপত্তর একটু একটু করে কি টাপু। নীলামে। চেনাশোনার ভে এই খিদিরপুর, মোমিনপুর, হেস্টি ওখানকার ব্রীজ, গার্ডেনরিচের ৫ ব্রীজ—এ জায়গাগুলো তার এক এক আশ্চর্য লাগে। বৃষ্টির দিন এক চেহ সন্ধ্যে রাতে আবেক। মুন্সীগঞ্জে ড হকের চেম্বারে রুগীদের লাইন—শি কাবাবের দোকানের চুলো থেকে আগু শিখার লাফালাফি—রাস্তা জুড়ে অনে রকমের মানুষ, হাতটানা রিকসা—মিলিয়ে টাপুর চোখে রং ধরে যায়। এই চলন্ত মানুষ, চলন্ত জিনিসপত্তরের ভে থেকে তার চোখে একরকমের রং উঠে আ তখনই তার মনে গুণ গুণ করে আসে। এই চলন্ত পৃথিবীর সুখ। কাঁপতে থাকে। তখন জ্বর এসে শরীরে। ঠোঁট ফেটে যায় টাপুর। একটা নির্জন স্টুডিও থাকতো। তাহ টাপু সেখানে ছুটে গিয়ে সুরটাকে রাখতো—বাজনায়— পারলে কথা বসি এ খেলায় টাপুর বড় স্বাদ।

অল্প জল, নীরেস রায়, বরং টুকরো, আদার কুচি, ছোলা ভিজে নুন-ব্যাস। দিব্যি লাগছিলো খেতে। পি এন

সেন্ট্রাল হল একটু আগে টাপুর সুরে জেনা শুনে হাততালি দিয়ে হলের ছাদ শাটিয়ে দিয়েছে।

অল্প আলোয় জেনা দশ-বারো খদ্দের বিবিবিলিতে খাচ্ছিলো। তাদের ভেতর থেকে রোগা মত একজন উঠে দাঁড়াতেই টাপু শুনতে পারলো। তার বউমরা ভাই। তুই এখানে কেন?

টাবুর এ কথায় খোকন ক্ষেপে দাঁড়ালো। কুকের পয়সায় খাই। তোর মত বেকার নাকি আমি। সারাদিন পিড়িং পিড়িং।

টাপু হাসলো। তাতো বলবিই। তারপর ভিন তাসের খেলাতেও তো তোর হাত খোলে ভালো। সে-পয়সাগুলো কিবস কি?

ওড়াই।

বাবাকে দিস কিছু?

সে-খবরে তোর দরকার কি?

না। ব্যাংকে জমাতে হচ্ছে তো তোক।

খোকন বেরিয়ে যাবার মুখে রুখে দাঁড়ালো। সে-খবর তোকে দিলো কে বড়দা?

চেতলায় অনেকেই তো ব্যাংকে কাজ করে। এ আর জানতে অসুবিধা কিসের। তা জানলো। জমিয়ে যা। আবার যখন বিয়ের পিঁড়িতে হয়েছে—তাহলে তো টাকা লাগবেই।

অন্য খদ্দেরদের অসুবিধে হচ্ছে দেখে দু ভাই রাস্তায় বেরিয়ে এলো। এখন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড় আর ভারি। সঙ্গে বাতাস। সে বাতাসে সাইকেল মেরামতীর দোকানের খোলানো ডুম দুলছে।

ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিট্যুট অব্ ইণ্ডিয়া

পুণে — ৪১১০০৪

১৯৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি

নিম্নবর্ণিত কোর্সসমূহে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহূত হইতেছে:—

কোর্সের নাম	মেয়াদ	ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাবলী	বয়ঃসীমা	আসন সংখ্যা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
				ভারতীয়দের জন্য	বিদেশীদের জন্য
কোর্স:					
(ক) মোশান পিকচার ফটোগ্রাফী অথবা ফিল্ম এডিটিং	৩ বছর (২ বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স এবং যে কোন একটি বিষয়ে বিশেষায়নের এক বছর)	একটি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বোর্ড হইতে ইন্টারমিডিয়েট অথবা সমতুল অথবা ১০+২ অথবা ফটোগ্রাফী/ফাইন আর্টসে ডিপ্লোমা।	১৭ ও ২৫ বছরের মধ্যে	১২	৩
(খ) সাউন্ড রেকর্ডিং ও সাউন্ড এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স	১ বছর	ইলেকট্রনিকস অথবা রেডিও এঞ্জিনীয়ারিং অথবা সাউন্ড এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা অথবা সমতুল।	১৭ ও ২৫ বছরের মধ্যে	৯	৩
(গ) ফিল্ম ডিরেকশন ও টেলিভিশন প্রোডাকশনে পোস্ট-ডিপ্লোমা কোর্স	১ বছর	কেবলমাত্র উপরে (ক)-তে বর্ণিত কোর্সসমূহের ডিপ্লোমাধারীদের ভর্তি করা হইবে। কোর্সটি ১৯৮০ সালে শুরু হইবে।			

দ্রষ্টব্য-১: বয়ঃসীমা:

১লা আগস্ট, ১৯৭৮ তারিখানুযায়ী অনধিক ২৫ বছর। তপশীলি জাতি/তপশীলি উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩ বছর এবং বিদেশী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিলযোগ্য।

দ্রষ্টব্য-২: (ক) উপরে (৫) স্তম্ভে বর্ণিত আসনের ২০ শতাংশ তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিভুক্তদের জন্য সংরক্ষিত।

(খ) উপরে (৬) স্তম্ভে বর্ণিতমতে ৩টি আসন এফ্রো-এশিয়ান দেশসমূহের প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।

মনোনয়ন পদ্ধতি:

ডিপ্লোমা কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষা ও প্রবণতা পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার তারিখ ও অন্যান্য বিবরণ যোগ্য প্রার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে জানানো হইবে। ইংরাজী মাধ্যম গ্রহণীয় লিখিত পরীক্ষা এলাহাবাদ, বোম্বাই, কলিকাতা, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, নয়াদিল্লী ও ত্রিবান্দ্রমে গৃহীত হইবে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে বসিবার জন্য কোন রাহা খরচ দেওয়া হইবে না।

আবেদনের পদ্ধতি:

দরখাস্ত ফর্ম, কোর্সের বিবরণ ইত্যাদি সম্বলিত প্রস্পেকটাস ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিট্যুট অব ইণ্ডিয়ার রেজিস্ট্রারের বরাবরে প্রদেয় ২ টাকার রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার এবং ৪০ পয়সা ডাকটিকিট সহ ২৫ সেঃমীঃ×১০ সেঃমীঃ আকারের নিজ নাম-ঠিকানা লিখিত স্ট্যাম্পযুক্ত খাম সহ লিখিত আবেদনক্রমে রেজিস্ট্রার, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিট্যুট অব্ ইণ্ডিয়া, ল কলেজ রোড, পুণে-৪১১০০৪ এর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ১০ টাকার একটি রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার সহ সম্পূর্ণকৃত দরখাস্ত ফর্ম এই ইন্সটিট্যুটে সর্বশেষ ৩১-৫-১৯৭৮ তারিখের মধ্যে পৌঁছানো চাই।

ডিএভিপি-৭৮/২৩

খোকন বললো, আলবৎ জমাবো। তোর মত লম্বা চুল রেখে বাজনা বাজিয়ে বেড়াই না আমি। পার্মানেন্ট বেকার নই। আমি এদেশের একজন রেসপেক্‌টেবল সিটিজেন।

টাপুর মায়া হচ্ছিলো ছোটভাইয়ের জন্যে। একা একা ফিরতে পারবি ?

কেন পারবো না। আমি তো মাতাল হয়ে যাওয়ার জন্যে নেশা করি না।

বেশি বকাসনি। টেনে একটা চড় কষাবো। মাতাল হওয়ার জন্যে নেশা করে না। বলে টানতে টানতে টাপু একটা দাঁড়ানো ট্যাকসিতে তুললো খোকনকে। ড্রাইভারকেকে বললো, চেতলা। নতুন পুল—তারপর ঝুঁকে পড়া খোকনকে বললো, ফিরে বিয়ে করলে তোর বাচ্চাকে কে দেখবে ভেবেছিস একবারও ?

সবাই দেখবে।

না। তখন তোর ওপর কারও সিমপ্যাথি থাকবে না।

না-ই থাকলো বড়দা। ওর মা এসে দেখবে ওকে—

কোত্থেকে আসবে। সে তো আর নেই।

দিব্যি দেখবে ওকে। স্বর্গ থেকে নেমে এসে—। সেসব নিয়ে তোমাদের কোন চিন্তা নেই বড়দা—

তুই তো প্রেম করেই লাভ ম্যারেজ করেছিলি। বাবার ইচ্ছে ছিলো না। মায়ের ছিলো না। তাও তো জেদ করে বিয়ে করলি। আর এখুনি—মাকে যেতে আবার বিয়ে বসার ইচ্ছে হলো ?

আঃ। সেই থেকে বক্‌ বক্‌। প্রেম ভালোবাসার তুমি কি বোঝো বড়দা ? নেশাটাই নষ্ট করে দিলে। কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে মিশেছো ?

টাপু কোন জবাব দিলো না। একা একাই অন্ধকার ট্যাকসিতে হাসলো। ব্রীজের নিচে জজকোর্টের সামনেকার রাস্তার ট্রামলাইন।

খোকন জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, সংসারে টাকা দিতে পারলে আমার বাচ্চাকে সবাই ভালোবাসবে। আদর করবে। না দিতে পারলে—কেউ ফিরেও তাকাবে না—

এই বুঝি তুই জেনেছিস।

তোমার মুখে বড় কথা মানায় না বড়দা। এখনো তুমি সংসারে একটা পয়সা দিতে পারলে না—

তা পারিনি—

মালবিকার মত ট্যালেন্টেড মেয়েকে ঘরের মত একটা লোফার সুযোগ নিয়ে, টর্নমাস্ট করলো। আমাদের সারা ফ্যামিলির অপমান। আমরা রবিকে ছেড়ে দিলাম। কিচ্ছু বলিনি। সেফ চাঁদির জুতো মেরে রবির মা মালুকে নিয়ে গেল। আমরা একটা কথাও বললাম না বড়দা। এর চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে। আমাদের টাকা থাকলে মালুর জীবনটা এরকম হোতো ?

টাকা তো তোর আছে। তুই তো কিছু করলি না।

আমার একার টাকায় হবে কেন ? সবাই মিলে দিয়ে মামলা তোলা যেত কোর্টে।

তাতে আমাদের বোন কষ্ট পেতো।

কেন ?

এটুকুও বুঝিস না। হাজার হোক মালবিকা তো রবিকে ভালোবাসে।

উঃ। চুপ করো বড়দা। আবার সেই ভালোবাসা। ভালোবাসা এত সস্তা নয়। তাতে বুকের ভেতরে একা একা রক্ত পড়ে। সে তুমি বুঝবে না।

ট্যাকসি এসে পালিত-বাড়ির সামনে থামলো। নিজের ছোটভাইকে এর আগে কোনদিন টাপুর ট্যাকসি থেকে টেনে নামতে হয়নি। একতলাতেই ওর বিছানা এ-বিছানায় গড়াগড়ি দুই আগেও ওর পাশে দাদু শুতো। ভোর রাতে গান গাইতো দাদু। টাপুর নেশা একদম হয়নি। সব কেটে গেছে।

খোকনকে শুইয়ে দিয়ে টাপু সারা-বাড়ি ঘুরলো। একজন লোকও বাড়ি নেই। বাচ্চু এসে বাজনাপত্র গুছিয়ে রেখে চলে গেছে। বাবা তো ফেরেনি। মা নিশ্চয় নবগ্রহ মন্দিরের ওখানে কথকতায় আসরে। মালবিকা চলে গিয়ে বাড়িটা একদম খালি।

একা একাই সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে বসে পড়লো টাপু। নীলাম থেকে কেনা ছোট গিটারটা হাতে নিলো। লন্ডন স্কুল অব মিউজিকের পরীক্ষায় বসছে সামনের মাসে। নিকের পরীক্ষায় বসছে সামনের মাসে। এখানে সব কোশ্চেন পেপার আসবে। সেগুলো ফি নিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে পার্ক সার্কাসের একটা মিউজিক স্কুল। সে পরীক্ষায় পাশ দিলেই টাকু একটা চাকরি পাবে। কথাই হয়ে আছে। ব্যারাকপুর পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর কাজ। সম্মানের চাকরি। ইনকিমেন্ট আছে। যত বড় অনুষ্ঠানে পুলিশ ব্যান্ড কম্পাকুট্‌ করতে হবে তাকে।

আনমনেই গিটারে ছায়ানটে তার দোলাতে লাগলো টাপু। সঙ্গে স্টেক। তারের ওপর হাতের লোহাটা ঘষে ঘষে।

অরুপ লইয়া—

ধ্যুৎ। বাকি কথাগুলো মনে নেই। ছায়ানটের ওপর রবীন্দ্রনাথের কথা বসানো।

নজরুল বসিয়েছিলো অন্যভাবে। একই সুরের ওপর—

শূন্য এ বুকে—

ভালো কথা। খোকনের ছেলেটা কোথায় গেল ? গিটার রেখে ফাঁকা বাড়িতে টাপু ডেকে উঠলো। জ্যেঠু। ও জ্যেঠু। নিশ্চয় ঠাকমার সঙ্গে কথকতায় গেছে। নয়তো বাচ্চুর কোলে চড়ে পাড়ার দোকানে। মহা পাড়া-বেড়ানী।

বাপ হয়ে ছেলের খোঁজ নেওয়ার সময় নেই। উল্লুকটা বিছানায় পড়েই ভোস্‌ ভোস্‌ করে নাক ডাকছে। কাল সকালে জেগে উঠে বেকারির চাকরি। ফাঁক পেলে—তিন তাস। ফাইন।

(চলবে)

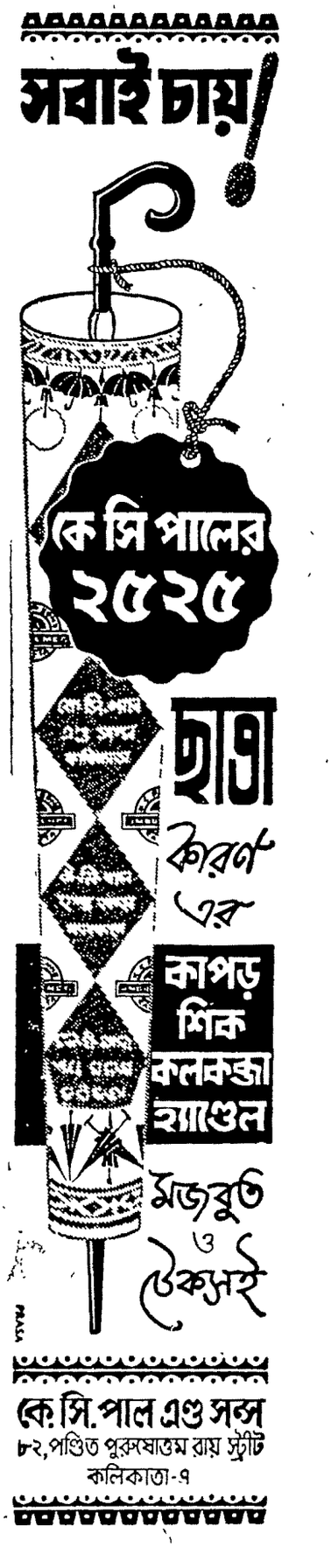

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

(৮)

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা ও আন্ত প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলা—দুইটি ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য— ব্রিটিশ সরকারকে উচ্ছেদ করা, অর্থাৎ 'ট্যু-ওবেজ ওয়ার এগেইনশ্ট কিং এম্পায়ার'। সরকার বিপ্লবীদের অজ্ঞাতে হুইসকির বোতল উপহার দিল; ডিনামাইট ষড়যন্ত্র ও আন্ত প্রাদেশিক বৈপ্লবীক প্রচেষ্টা এই দুইটিই সরকারের দেওয়া নাম। একটু চেষ্টা করলেই জানা যাবে, ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের মামলা বটে, কিন্তু বাস্তবে একটি ডিনামাইটও ছিল না। বৈপ্লবীক অভ্যুত্থানের অভিযোগে আন্ত প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলা বটে কিন্তু তাতে না ছিল রাইফেল, না ছিল স্টেনগান বা ডিনামাইট—কেবল ছিল কাগজপত্রে বিরাট প্ল্যান। মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ইংরেজ— সরকারের একটি সুপরিকল্পিত পাল্টা ষড়যন্ত্র যাতে জ্বালাময়ে সংস্কারবাদী কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর প্রভাবে কমিউনিজমের সমাধীর উপরে বিকল্প কম্যুনিজম জন্ম নেয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চালিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অভিরুচি পূর্ণ হয়নি, তা কেউ বলতে পারবে না। আমার কথাটি বলি— ডিনামাইট মামলা এই মদের বোতলের নেশায় গর্ববোধ করছিলাম। চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা ডিনামাইট যোগাড় করেছিল, তাদের স্বকিয় পরিকল্পনায় ডিনামাইট দিয়ে জেল ভাঙ্গা, আদালত গৃহ ধ্বংস করা, গল্টর্নে টেনিস খেলার মাঠে সাহেবদের বড় বড় সোফা উড়িয়ে দেওয়া ট্রাইব্যুনালের মোটর গাড়ী ডিনামাইট দিয়ে বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা অনেকগুণ বেশী সম্মানের। বন্দুকের বারুদের সাহায্যে তা করা হলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে না। তাই ডিনামাইট প্রচার করতে ভাল লাগত। সরকারই আমাদের সেই সুবিধা করে দিয়েছিল। আমরা মদমত্ত বিপ্লবীর দল অহংকারে মত্ত—আমরা ডিনামাইট যোগাড় করে মাটি খুঁড়ে বড় রাস্তায় রেখেছি লোকচক্ষুর অন্তরালে একশ-দুশ গজ ইলেকট্রিক তার মাটির নিচে দিয়ে নিয়ে গেছি ব্যাটারী ও সুইচের সঙ্গে যোগ দিতে। এই সব করতে অনেক বেশী শক্তি ক্ষয় হয়েছে কিন্তু এই কাজে বাস্তবে ডিনামাইট ব্যবহার করতে হলে পরিশ্রম সহস্রগুণ কম হোত। ল্যান্ডমাইন বানাতে প্রথম ১০ মণ আর তারপর আবার ৫ মণ গান পাউডার তৈরী করতে আমাদের যোগাড় করতে হয়েছিল ৭৫ ভাগ সোরা, ১০ ভাগ গন্ধক, আর বাকি ১৫ ভাগ কয়লা। এই প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ গোপনে যোগাড় করা এবং ওগুলোকে যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে গুড়ো করে তারপর ১৫ মণ গান পাউডার তৈরী করার মধ্যে অনেক বৈপ্লবীক ধৈর্য ও কৌশলের প্রয়োজন ছিল। এইভাবে আমাদের সাফল্য না ভেবে ডিনামাইট

প্রচারের বাহাদুরি নিতে বেশী ইচ্ছুক ছিলাম।

গান-পাউডারের এই হচ্ছে সাধারণ ফরমুলা। কিন্তু এই বারুদকে বেশী জোরদার করার জন্য ৩০ ভাগ পটাশ ক্লোরাস মেশাতে হয়। আমরা পরীক্ষা করে দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত ৩০ ভাগই মেশানো সাব্যস্ত করি। কখন ৩০ ভাগ পটাশ ক্লোরাস এই পাউডারের সাথে মেশালেও ঘর্ষণে আগুন জ্বলে না। বোমা, ডিনামাইট ল্যান্ডমাইন যেন কখনও ঘর্ষণে জ্বলে না যায় সেটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়। বাইরে থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিয়ে ওগুলোকে বার্স্ট করাতে হয়, নইলে বিপদের আশংকা। আমরা খুব চেষ্টা করে বন্দুকের দিশী পাউডার দিয়ে যত উচ্চ ধরণের ল্যান্ডমাইন তৈরী করা সম্ভব তা তৈরী করেছিলাম। তাতে অবশ্য আমাদের গর্ব করার কথা। অনেক বেশী গর্ব করার কথা যে, পুলিশ ও মিলিটারীর সজাগ দৃষ্টির মধ্যেও কী করে তা করতে পেরে ছিলাম।

আশু প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বিদ্রোহীরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন বটে, তবে তারা বাস্তবে কতখানি বৈপ্লবীক অভ্যুত্থানের জন্য কাজ করতে পেরেছিলেন? এই প্রশ্ন কি তাদের মনে কখন এসেছিল? একটা ডিনামাইটও নেই, তবু ডিনামাইট কন্সপিরেসী কেস বলে যে প্রচার হয়েছিল এবং আমরা নিজেরাও তা প্রচার করে যে গর্ব অনুভব করতাম, সে সম্বন্ধেও কি আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল? আমি আজ খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমরা যতখানি বিপ্লব চেয়েছি, তার চাইতে অনেক বেশী বিপ্লবের নামে বাহাদুরী চেয়েছি। তাই দেখেছি পার্টিতে পার্টিতে ঝগড়া আর হিংসা। নিজ নিজ পার্টি সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে, সবচেয়ে বেশীবিক্রম প্রদর্শন করেছে এবং সরকার তাদের অ্যাকশনকে সব-চেয়ে বেশী মূল্য দিচ্ছে এই প্রচার করতে নিজেদের সময় ব্যয় করেছে। আজ মনে হয় যদি আমরা সত্যি বিপ্লব চাইতাম এবং বিপ্লবীরা একত্র হয়ে কোন একটি প্রচেষ্টা দিতে পারতাম তবে আমাদের সফলতা অনেক বেশী হোত। আমরা জাহির করতে ব্যস্ত ছিলাম, কার থেকে কত বেশী করেছি। এই ফাঁকে হিসেব-নিকেশ করতো ভুলে যেতাম আমরা সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য কতখানি করতে পেরেছি। বিপ্লবীদের ভিতরে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলকভাব ছিল। আমরা অনুশীলন পার্টি থেকে বেশী করেছি আবার কেউ ভাবতেন, আমরা যুগান্তর পার্টি থেকে বেশী করেছি। বি বি-র কোন সংগঠন নেই। আর অন্যরা ভাবতেন শ্রীসংঘের সদস্যরা বিপ্লবী কর্ম-পন্থা নিয়ে কোন কাজ করতেই পারবে না। এইরকম হামবড়া ভাব নিয়ে বিপ্লবীরা চলত। সেই বেষাবেষী ভাব তখন ছিল এখন আর নেই—ভাবাটা ভুল। বেষাবেষি যখন শত্রুতার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অন্যকে খর্ব ও ধ্বংস করতে সব উপায়ই গ্রহণ করে এমনকি পুলিশের সাহায্যে অপরপক্ষকে উৎখাত করতে তাদের বাধে না। এই অবস্থা উপলব্ধি করেও প্রত্যেকটি পার্টি নিজের নিজের গণ্ডিতে নিজেদের অটুট রেখে সক্রিয় কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে গেছে। সেইজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল নিজেদের শক্ত ঘাঁটি। যে সংগঠনের বেশী শক্ত ঘাঁটি থাকবে পুলিশকে ও বিপক্ষ দলকে বিপথগামী করতে ততই তারা সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের সময় ওদের শক্ত ঘাঁটি ছিল গণেশ ঘোষের কাপড়ের দোকান, মাস্টারদা যেখানে থাকতেন সেই কংগ্রেস অফিস আর অনন্ত সিংহের গতিশীল ঘাঁটি তার মোটরগাড়ী। এই তিনটি ঘাঁটি সফলতার সঙ্গে কাজ করতে পেরেছিল যেহেতু তাদের সঙ্গে আরও কয়েকটি শক্ত উপ-ঘাঁটি ছিল। সেই ঘাঁটিগুলোর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, যথা আনন্দের বাড়ি, রজত সেনের বাড়ি। বাড়ি বলতে আমি বোঝাতে চাইছি বাড়ির লোকদের সহানুভূতিশীল ব্যবহার ও তাঁদের সমর্থন। কোন ঘাঁটি কার্যকরী হবে না, যদি না বাড়ির সবার বিপ্লবীদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল সমর্থন পাওয়া না যায়। রজতের ও আনন্দের মা, বাবা ভাই, বোন—সবারা পুরো সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম। ১৯২৯-৩০ সালে শহরের এই সব প্রধান ঘাঁটির কথা উল্লেখ করলাম। ১৯৩১ সালে ৩০ আগস্ট আসানুল্লা। (ডি এস পি) হত্যার পর চট্টগ্রামে বৃটিশ বাহিনীর ভীষণ অত্যাচারে প্রতি ঘরে ঘরে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। এই কারণে যুব-বিদ্রোহের গেরিলা বাহিনীর পক্ষে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গেরিলা যুদ্ধ চালানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাই ঠিক হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরের বাইরে গিয়ে চেষ্টা করতে হবে। ১৯৩২ সালে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে নতুন পরিকল্পনা অনুসারে মাস্টারদা এবং নির্মলদা নির্দেশ দিলেন যুব-বিদ্রোহের তৃতীয় নেতা অরবিন্দের দস্তিদার (ফুটু)কে গোপন অবস্থা থেকে বেড়িয়ে এসে কাজ করতে হবে। তারক মাস্টারদা এবং নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ করে কলকাতা যাবে বলে স্থির করলো। ঠিক করলো সঙ্গে নেবে কালীকিংকর দে এবং বত্রজেন দেকে। সে ঠিক করলো বত্রজেন তুলাতলীতে এক রাত্রি থাকবে। পরের দিন সবাইকে নিয়ে সন্ধ্যার পর সে নদীর ওপারে পতেঙ্গা গ্রামে গেল। আগে থেকে ঠিক করা ছিল এই গ্রামে তারা একদিন থাকবে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এমন কোন আশ্রয় পেল না যাতে এক রাত্রিও থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত তারকেশ্বরের কথামত শেষ ভরসা দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামের উদ্দেশ্যে তারা রওনা হোল। তারা তিনজন সমুদ্রের পাশ দিয়ে সারারাত হেঁটে গিয়ে পৌঁছালো দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে। এই গ্রামে কালীর মামা শ্রীজগবন্ধু মজুমদার থাকতেন। তারা একেবারে ভোরবেলায় গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হোল। জগবন্ধু বাবু তাদের সঙ্গে কালীকে দেখে তাদের দু-দিন রাখ-বেন বলে কথা দিলেন। যে বাড়ীতে তাদের রাখার জন্য ঠিক হোল, সেই বাড়ীটি হোল কালীকিংকরের কাকা নিশিচন্দ্রের শ্বশুর-বাড়ী। মাস্টারদার নির্দেশ ছিল, তাদের আশ্রয় ঠিক হলে বত্রজেন যেন গিয়ে তাঁকে সংবাদটি দেয়। সেইজন্য পরের দিন বত্রজেন সে এই নিরাপদ আশ্রয়ের খবরটি পৌঁছে দেবার জন মাস্টারদা ও নির্মলদার কাছে গেল। কালী সে-র জগবন্ধু মামা এবং

প্রকাশিত হল

দ্বৈপায়ন'র
দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষে ৭৲

শেখর সেনগুপ্ত'র
একই বৃত্তে ক'জন ৫৲

জয়ন্ত দত্ত'র
কখন খেলার ছলে ৬৲

সঞ্জয় দাশগুপ্ত'র
সমুদ্র মন্থনে বিষ ৮৲

পরিবেশনায়
মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

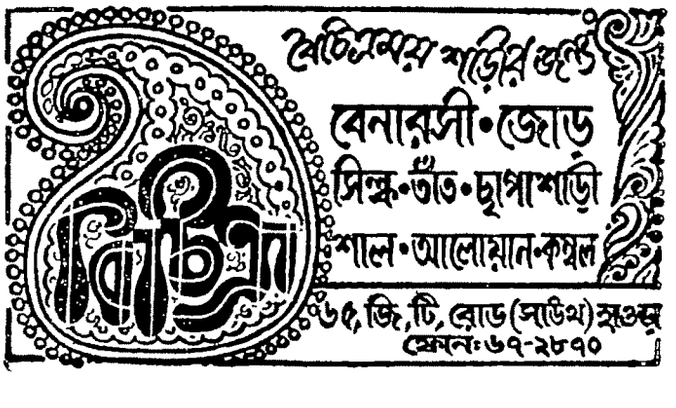

তাব কাকা নিশিচন্দ্র দে দুজনেই আসাম বেঙ্গল বেলওয়ে পাহারতলী ওয়ার্কশপে চাকরি কবতেন।

মামার মুখে খবর পেয়ে কাকা কালি-কিংকরের সাথে দেখা করতে মামার সাথেই এলেন। ভাইপো কালিকিংকরকে তিনি বরাবর বিপ্লবী কাজে সাহায্য করে এসে-ছেন। তিনি ভাইপোকে খুব ভালবাসতেন, খুব বিশ্বাসও কবতেন। সেইজন্য অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন। তিনি তাঁব নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন 'ডিনামাইট' তৈরীর কাবখানা করতে। তিনি তাঁর এই শ্বশুরবাড়ীটিও ব্যবহাব কবেছেন বোমার লোহার খোল ঢালাই করব ব্যাপারে। এই বাড়িটিতে ন্যাডমাইনেব নানা সাজ-সরঞ্জাম, সবঞ্জাম, এ্যাসিড প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থাও তিনি কবেছিলেন। তাঁকে যখন ডবল-মুবিং বাড়ী থেকে পুলিশ অ্যাবেস্ট করল, তখন তাঁর ওপর পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করে। তিনি একেবাবে নির্বাক ও নিস্তব্ধ ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে শত চেষ্টা কবেও পুলিশ একটিও গোপন কথা বার কবতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এই বাড়ীর সন্ধান পায়নি। তিনি এই জেল-যন্ত্রণা ভোগ করে, পুলিশেব হাতে নির্যাতিত হয়ে, ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, তখনও বিপ্লবের আগুন তাঁর অন্তরে নির্বাপিত হয়নি। তাব পবও তিনি বিভিন্ন সময়ে উৎসাহেব সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে বিপ্লবী কাজে সাহায্য কবেছেন। সাহায্য কবেছেন। তাই তাবপর আমাদেব শ্রদ্ধা সব সময় ছিল। তার ওপব কালী-দেব অটুট ভরসা ছিল।

তারকেশ্বর এক সন্ধ্যায় কালীর কাকাকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে-ছিল। সেই দিনই তারকের সঙ্গে তাঁর খুব খোলাখুলি আলোচনা হয়। তিনি তারককে তাঁর পূর্ণ সাহায্য দানের আশ্বাস দিয়ে-ছিলেন। তারকের অনুরোধে পরের দিন তিনি কালীর স্ত্রীকে এই বাড়ীতে এনে দিয়েছিলেন। কাকা না হলে বাড়ী থেকে তাব স্ত্রীকে এখানে আনা সম্ভব হোত না। কালীর এই কাজ প্রতিদিনই ওয়ার্কশপ ছুটি হবার পর এই বাড়ীতে আসতেন। তিনি তারকেশ্বরের সঙ্গে খুব কথা বলতেন এবং ক্রমেই তারকেশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কাকার অনুরোধে কালীর জগবন্ধু মামা কালী ও তারকেশ্ববকে তাদের কলকাতা রওনা হওয়ার দিন পর্যন্ত তাঁদের আশ্রয়ে রাখার ঝুঁকি নিলেন। তাঁদের নিজেদের বাড়ীতে কোন মেয়ের থাকার অসুবিধা ছিল। কালীব বড় মামা জগবন্ধু ছোট মামা দীনবন্ধুর সাথে পরা-মর্শ করে ঠিক করলেন তাঁদের পুবোহিত শ্রীঅপর্ণা ঠাকুবের বাড়ীটিকে বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে যেন ব্যবহার কবা যায়। শ্রীঅপর্ণা ঠাকুর শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

এদিকে কলকাতা থেকে খবর এলো তারকেশ্বর যেন তার কলকাতা যাওয়া স্থগিত রাখে। এই কাবণে কালীব স্ত্রী প্রেমলতাকে তারকের কথামত তার কাকা ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

এখানে একটি কথা বলা দরকার, ঠিক হয়েছিল তারক যখন কলকাতা যাবে তখন যেন স্বস্ত্রীক যাচ্ছে এমন ভান করে যায়। এও ঠিক হয়েছিল কালীর স্ত্রী এই কাজে সহায়তা করবে।

কালীর ছোটমামা দীনবন্ধু বিপ্লবী দলের সভ্য হয়েছিলেন। এই সময়ে তারকের অনুমতি নিয়ে দীনবন্ধু মামার সাহায্যে কালী প্রফুল্ল দাসের (গামা) সাথে দেখা করে। জালালাবাদ যুদ্ধের পরে এই প্রফুল্ল দাস কালীকে অনেকবার অনুরোধ করেছে তাকে বিপ্লবী দলের সভ্য করে নিতে। কালী সেই সুযোগ এবার নিল। প্রফুল্ল দাস দলে যোগ দিল।

কাট্টলী গ্রামের আর একটি ছেলে শান্তি চক্রবর্তী আমাদের দলে যোগ দিল। শান্তি বহু চেষ্টা করে প্রথমে আমাদের দলে যোগ দিতে না পেরে সে অনুশীলন দলে যোগ দেয়। শান্তি, গামা ও দীনবন্ধু তিনজনেই জানতে পেরেছিল জালালাবাদ যুদ্ধের পর বিপ্লবীদের একটি ছোট দল ফেবার পথে একটি পুকুরে তাদের মাস্কেটিন রেখে গিয়েছিল। কয়েক দিনেব মধ্যেই এই তিন বন্ধু পুকুর থেকে সেগুলোকে উদ্ধাব করে নিজেদেব হেপা-জতে নিয়ে যায়। শান্তি তখন অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিল। দীনবন্ধু ও প্রফুল্ল দাসের থেকে আমাদের দলের ছেলেরা জানতে পারলো যে শান্তি ঐ সব বন্দুক অনুশীলন পার্টিকে দিয়েছে। তাবকেশ্বর এই কথা তাদের মুখে শুনে খুবই চিন্তিত হলেন। কালী দে-র সঙ্গে শান্তি চক্র-বর্তীর বিশেষ ভাব হয় এবং সে-ই তাকে আমাদেব দলে আনে। কিন্তু এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অর্থাৎ শান্তির বন্দুক-গুলিকে অনুশীলন পার্টিকে দিয়ে দেওয়াতে আমাদের দলের সদস্যবা তার সাথে সাবধানে মিশত। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান চাই। সেইহেতু তারকেশ্বব কালীকে বলল, সে যেন খুব সতর্কতাব সঙ্গে শান্তির সাথে গিয়ে দেখা করে এবং তার ভাবগতিক দেখে যেন বোঝে তার মতিগতি কী এবং সে যদি সূর্য সেনের দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ পায়, তবে কি সে যোগ দেবে?

শান্তি কালীর বিশেষ বন্ধু। তাই সতর্কতা নিয়ে তাব সঙ্গে কালীর দেখা করা খুব অসুবিধা হয়নি। কালীর কাছ থেকে যে রিপোর্ট পাওয়া গেল, তা খুবই আশা-প্রদ। তারকেশ্বব শান্তি সম্বন্ধে কালীর কাছ থেকে যা জানতে পারলো, তার থেকে সে সিদ্ধান্ত করলো সে নিজে যাবে তার সাথে কথা বলতে। কালীকে নিয়ে দু-একদিনের মধ্যেই তারকেশ্বর হঠাৎ তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। শান্তি তারকেশ্বরেব পবিচয় পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হোল যখন সে জানলো তারকেশ্বরই তখন মাস্টাবদার দক্ষিণ হস্ত হয়ে কাজ করছে। রাইফেলগুলো অনুশীলন পার্টিব হেপা-জতে ছিল না, শান্তিব কাছেই সেগুলো ছিল। কাজেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল কাবণ আমাদের ছেলেদের জন্য মাস্কেটির খুব চাহিদা ছিল। শান্তি চক্রবর্তী আমাদেব দলে যোগ.. দিল এবং ঐ মাস্কেটিগুলো নিয়ে এলো।

এই সময় আরেকজনকে আমাদের দলের সভ্য হিসাবে পেয়েছিলাম, তাঁব নাম যতীন মজুমদার। যতীন মজুমদার শান্তিব বন্ধু। এদের নিয়েই দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে ১৯৩২ সালে জানুয়ারীতে এই সংগঠনটি। গড়ে উঠলো। চট্টগ্রাম শহবে পাশে এইরকম একটি শক্ত ঘাঁটি আমাদের খুব প্রয়োজন ছিল। মাস্টাবদা এই খবব পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। এই ঘাঁটিটির সাহায্যে অন্যান্য জায়গায় সংযোগ রাখা সহজ হয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে বাইরের যোগাযোগে এই সংগঠনেব গুরুত্ব অপরিসীম। কাট্টলীর এই সংগঠনের সাহায্যে ১৯৩২ সালে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে শ্রীশচীন সেন (মানদা) ও শ্রীবিনোদ দত্ত কুমিল্লা ও নোয়াখালি গেল।

আমার সঙ্গে আন্দামানে শান্তি চক্র-বর্তীর দেখা হয়। শান্তির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই আমি শান্তির সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম। সবাই তাকে প্রশংসা কবত। সে ছিল একনিষ্ঠ কর্মী। মাস্টারদার প্রতি তার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। মাস্টাবদার নির্দেশ পেলেই সে কাজ করতে ছুটতো। তাব প্রখব বুদ্ধি ছিল। আন্দামানে সাড়ে চারশো বন্দীর ভিতরে সে-ই ছিল সবচেয়ে বেঁটে। সে যেদিন প্রথম আন্দামানে এলো আমাব সঙ্গে সেদিন আর কথা হচ্ছিল —শান্তি : আমি এখন আব একসার-সাইজ কবতে পাবি না। প্যাবালাল যাবে কোন রকম জিমন্যাসটিক করতে আমি অক্ষম।

(ক্রমশঃ)

আপনার পরিবারের সকলের জন্যে এখন পাবেন সর্বাধুনিক শ্যাম্পু- যা সবকটি গুনে সমৃদ্ধ, অথচ কমদামী-

নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু

আজকের শ্যাম্পু হবে গুণে সমৃদ্ধ-এবং ঘন: যেমন নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু। যা খুব বেশী ঘন বা খুব বেশী পাতলা নয়। জল যাই হোক, নরম বা খর—প্রচুর ফেনা হয় এই শ্যাম্পুতে।

প্রত্যেকের চুলের যত্নের জন্যে: নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু আপনার পরিবারের সবার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। বাচ্চাদের নরম চুলের জন্যেও উপযুক্ত। আপনার চুলকে শুধু পরিষ্কার করা নয়—নরমও ঝকঝকে করে তোলে। কিন্তু রুক্ষভাব এনে দেয় না। বাড়ীর কর্তার জন্যেও ঠিক মনের মতো।

দামে কতো কম: নতুন পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু আপনার সারা পরিবারকে যোগাবে সবকটি গুণে সমৃদ্ধ ভালো শ্যাম্পুর বিলাস—অথচ এই ধরণের যে কোন শ্যাম্পুর চেয়ে এর দাম অনেক কম।

পামলিভ ফ্যামিলি শ্যাম্পু—আপনার পরিবারের জন্যে সবকটি গুণে সমৃদ্ধ একটি ভালো শ্যাম্পু।

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

কর্বেটের কোন লেখায় কি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাই নিয়ে আলোচনা করছিল গোপু আর কানু। হঠাৎ একটা জায়গা দেখিয়ে কানু বলল, এই তো, এই জায়গায় একটা গাছের গায়ে জিম করবেটের ছবি টাঙানো আছে। আমরা দেখেছি। সেই গাছের ওপর থেকে গুলি করে চিতাবাঘটাকে মেরেছিলেন করবেট।

উঁকিঝুঁকি মেরে সেই গাছটাকে আবিষ্কার করল ওরা। তবে অনন্ত ভাল বুঝতে পারল না। তাছাড়া এই ধরণের দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সে অনুভব করে না। তার চেয়ে অলকানন্দার অপর তীরে যে গভীর জঙ্গল পাহাড়ের কোলে কোলে উঠে গেছে অনেক দূরে পর্যন্ত, সেইদিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে ভাল লাগে, যদি এখানে থাকতে হত কিছুকাল, কেমন হত।

একটু পরেই এসে গেল রুদ্রপ্রয়াগ। বাসস্ট্যান্ডে আসতেই একজন পুলিশ এসে কিছু বলল ড্রাইভারকে। ড্রাইভার ডাক দিল কন্ডাকটারকে। সেও কথাবার্তা শুনে নেমে গেল টাইমকিপারের খোপের দিকে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে কনভয় ছেড়ে চলে গেল একটু দূরে, দাঁড় করালো একটা কোনে। শোনা গেল, শ্রীনগর থেকে এস-ডি ও সাহেব টেলিফোনে এখানকার পুলিশের কাছে নির্দেশ দিয়েছেন, কনভয় থেকে কেটে বাসটাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে। পাঞ্জাবী পরিবারটির জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কিনা তাও জানতে চেয়েছেন তিনি। বলেছেন, পরের গেট-এ আসছে ওই পরিবারটি। এসে এ গাড়ি ধরবে। অর্থাৎ এই বাসটি এই গেটে আর যাবে না। যাবে পরের গেট এলে।

দুঃসংবাদ শুনে ভয়ংকর বিরক্ত হল দীপুয়া। আজ সন্ধ্যায় এই বাস যোশীমঠ পৌঁছোবার কথা। সে পর্যন্ত যেতে না পারলেও তার আগে চামোলী বলে জেলা শহরে গিয়ে রাতের মত রেস্ট নেবে। তাহলে পরের দিন বেলা আটটার আগেই যোশীমঠ পৌঁছতে পারবে। চামোলী কিম্বা যোশীমঠ রাতে থাকার জায়গার অসুবিধে নেই। পরের গেট কখন আসবে, কোথায় লাঞ্চ ব্রেক করা হবে, কিছুরই স্থিরতা নেই। একটি পরিবারের অবিমৃশ্য-কারিতায় এতগুলি লোকের দুর্ভোগ! সুতরাং বিরক্ত হবারই কথা।

গোপু বলল, দীপু চল সংগম থেকে স্নান করে আসি। বেশ খানিকটা সময় পাওয়া গেছে। লেট অ্যাস ইউটিলাইজ ইট প্রপারলি।

দীপুর মেজাজ তখনও গরম ছিল, বলল, সংগম এখান থেকে অনেকটা দূরে।

কানু বলল, বিশেষ দূরে নয়। চলুন রায়দা দেখার জায়গা রুদ্রপ্রয়াগ। স্নান করা অসম্ভব। তবে ফেস্‌ওয়াশ নেওয়া যেতে পারে। কি বলিস আশু?

আশু বলল, রুদ্রপ্রয়াগের সংগম মানে সেই সিঁড়ি? আমি ওটিমে নেই।

পানু বলল, তুই না হয় চান করিস না। তা বলে যে যে যেতে দোষ কি?

বাসের ড্রাইভার ও টাইমকিপার ইত্যাদি ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, পরের গেট আসতে দুঘন্টা দেরী হবে। অর্থাৎ বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ এই বাস ছাড়বে। তার মানে এখানে এখনও দেড় ঘন্টার বেশি অপেক্ষা করতে হবে। মালপত্রের জন্যে চিন্তা নেই। এসব অঞ্চলে এখনও চুরি-বাটপাড়ি ছিনতাই চালু হয়নি। তাছাড়া বাসের লোকেদের চোখের সামনে থাকছে বাস।

সংগম খুব একটা দূরে নয়। যেখানে বাস দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে বড় জোর আধ মাইল দূরে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পথ দুভাগ হয়ে গেছে। অলকানন্দার উজান ধরে গেছে বদরীনাথের পথে। আর বাঁয়ে মোড় নিয়ে বাঁধ পেরিয়ে মন্দাকিনীর উৎস মুখে চলেছে কেদারের পথে। সেই বাঁধের ওপর দিয়ে ওপারে গিয়ে আর অল্প একটু হেঁটে গেলেই পাওয়া যায় সংগম। ঘাটের উপর মন্দির। যাত্রীশালা। সেখান থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে সংগমের বুকে। অগুন্তি সিঁড়ি। অনন্তর মনে হয়, একশোটারও বেশি। মন্দির থেকে সংগম কম করেও সত্তর-পঁচাত্তর ফুট নিচে।

না, স্নান করা এখানে সম্ভব নয়। ওপর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। এক-ধাপ একধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে কাছে গিয়ে পৌঁছে মনে হল, শেকল ধরে জল ছুঁয়ে আসাও প্রচণ্ড রিস্কের ব্যাপার। এমন উথাল-পাতাল, কান্ত কখনো কল্পনাও করেনি অনন্ত। তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘুরে যায়। পাহাড়ী নদী কি ভয়ংকর রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরস্পরের বুকে। কি করে মানুষ শেকল বানিয়েছে, ওখানে, কারা সেই শেকল ধরে স্নান করে, যদি কেউ পা ফস্কে যায় তবে নিমেষে তার চূর্ণ শরীরটা কোথায় গিয়ে ভেসে উঠবে এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া শক্ত।

সুঠাম একটি তরুণী ঝাঁখে কলসী নিয়ে নামছিল সিঁড়ি বেঁয়ে। মাঝ বরাবর চওড়া চাতালের একপাশে বসে আছেন একজন পূজারী। সময়ে স্নান করতে গেলে তাঁকে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। স্নান দান ইত্যাদি পুণ্য কর্মের জন্যে আসেনি এরা। শুধু দু চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে এসেছে।

পানু পূজারীর সঙ্গে নিজস্ব হিন্দিতে বাকালাপ করছিল। সিঁড়ির ধাপের ওপরে বসে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সংগম দেখতে দেখতে অনন্তর মনে পড়ে যাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েকটি লাইন—

মোছল শিখের রণে, মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠে পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা।
দুইজনে।

গোপু বলছিল, ঘন্টার পর ঘন্টা এখানে বসে থাকলেও ক্লান্তি আসবে না। বলুন রায়দা।

অনন্ত ভাবছিল, কি আশ্চর্য অখণ্ড শান্তি এই এখানে, চতুর্দিকে পাহাড়ে ঘেরা হিমালয়ের এই সব নিভৃত তীর্থ-গুলিতে। কতযুগ ধরে কত পুণ্যার্থী, কত যাত্রী এসেছে পরমার্থের আশায়, এসেছে শান্তির কামনায়। প্রচণ্ড গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে, ঝাঁঝা ঘুরে যাচ্ছে সোতের ধারায় উৎক্ষিপ্ত জলকণা দেখে। ঠিক এই রকম ঘূর্ণি আর গর্জন দেখা যায় বড় বড় স্টীমারের প্রপেলার যখন জল তোলপাড় করে এগিয়ে যায় নদীতে বা সমুদ্রে। সেই আওয়াজেও কানে তালা ধরে যায়। কিন্তু এখানে তো মনকে বিক্ষিপ্ত করে না। এতো প্রকৃতিরই বিশেষ একটা রূপ। আর স্টীমারের চলা কালে ঘূর্ণি সৃষ্টির মধ্যে থাকে মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপ।

এই দুটি পাহাড়ী নদীর মিলন অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাই ভয় করলেও দেখতে ভাল লাগে। গোপু যে বলছিল ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও ক্লান্তি আসবে না, কথাটা খুব মিথ্যে নয়।

সুঠাম দীঘল মেয়েটি জল নিল ঘড়ায় করে। আশ্চর্য কায়দায় এক হাতে শিকল ধরে অন্য হাতে ঘড়ার কাঁধ নামিয়ে স্রোতের ধারার উপর থেকে ভরে নিল ঘড়া। তারপর সিঁড়ির চাতালে ঘড়া বসিয়ে ধীরে সুস্থে শিকল ধরে হাত-পা ধুলো। মাথায় মুখে জল দিল। শেষে সুন্দর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে মাথায় ঘড়া নিয়ে একটি একটি করে সেই একশ ধাপ উঠে গেল ধীরে ধীরে।

দীপু তাড়া দিল, আর না, বয়েজ, গেট রেডি। তিনটে বাজে।

এরই মধ্যে তিনটে বেজে গেল? সবাই কথাটা শুনে চমকে গেল। ঘন্টাখানেক বসে আছে তারা এখানে? বসে আছে ছাড়া ছাড়া। কথা বলেছে পরস্পরে খুব কম। অথচ একটি মুহূর্ত মনে হয়নি বোর ফিল করেছে কেউ।

বাসস্ট্যান্ডে ফিরে এসে একটা দোকানে চা খেয়ে নিল সকলে। বেলা এগারটায় ভাত খেয়েছিল। তারপর এতক্ষণে কিছু খাওয়ার কথা মনে হল। দেখা গেল, মনে না হলেও খিদে পেয়েছিল প্রত্যেকেরই। বাসি বড়া ভাজা আর লাড্ডু, দুটোরই চেহারা সন্দেহজনক। তবু কিছু চিন্তা না করেই খেল সকলে সেই অখাদ্যবস্তু। অনন্তর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের অনুরোধে একটু মুখে দিতে হল। তারপর দেখা গেল, আর পাঁচজনের থেকে পরিমাণে হয়তো কমই খেয়েছে সে তবু যা খেয়েছে, তা একেবারে সামান্য নয়।

গালে আজ চারদিনের না কামানো দাড়ি। গত চারদিন একটা সার্ট একটা প্যান্টই পরে আছে। সুতরাং ময়লা হয়েছে বইকি। আজ স্নান হয় না। যদিও স্নান করাটা কণাদের প্রয়োজনীয় বিলাস। বছরের বেশির ভাগ সময়ে দুবেলা স্নান করে সে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট খুঁত খুঁতে। এখানে সেখানে যা পাচ্ছে, তাই খাচ্ছে। একটা সপ্তাহ আগে, যদি এই গত কয়েকদিনের জীবনযাপনের ছবি তাকে দেখানো হত, সে পাগলের উদ্ভট কল্পনা বলে উড়িয়ে দিত। কি আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে রুচি, অভ্যাস, সহনশীলতা। লিলি যদি হঠাৎ এখানে এসে উপস্থিত হয়, তাকে দেখে কি ভাববে? শরৎচন্দ্রের নায়িকার মত স্বামী সংশোধনে লেগে যাবে খুশি মনে? অবশ্য রুচি এবং অভ্যাসের দিক দিয়ে লিলি কিছু প্রিমিটিভ। ওর কাজকর্মের মধ্যে যতটা প্রয়োজন ততটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে মেনে চলে। বাড়তি শুচিবাই কিম্বা ঘরদোর সাজানো গোছানো নিয়ে মানসিক স্বচ্ছন্দ কোনদিন নেই তার। বাতে শোবার সময়ে কতদিন কণাদ বলেছে, গাটা ধুয়ে এলে না কেন? কিম্বা কাপড়টা ছেড়ে এলে পারতে? লিলি বোঝে তার গায়ে ঘামের গন্ধ, কাপড়ে বাসি গন্ধ, ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না কণাদ। তবু আলস্য করেই হোক কিম্বা স্বাভাবিক অনীহা থেকেই হোক, অত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে সে চায় না সব সময়ে। বেবুবার সময়ে খুব মাজাঘসা করবে মুখ চোখ। রকমারী টয়লেটে বোঝাই ওর ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ার। কিন্তু বাড়ি ফিরে ভাল কাপড় পরেই হয়তো মেঝের ঘসে পড়ল। কিম্বা ঘরদোর সাফ সুতরো করে ক্লান্ত শরীরে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। বিছানায় বেড কভার থাকে। কিম্বা মেঝেতেও যে খুব ধুলো ময়লা থাকে, তা হয়তো না। তবু এসব ব্যাপারে একটু পারটিকুলার হলে কণাদ খুশি হত। প্রথম অনেক সময়ে কিছু কিছু মন্তব্য করেছে কণাদ। প্রথম প্রথম হাসি মুখে দুটি স্বীকার করেছে লিলি। তারপর উভয়েই পরস্পরের আচরণে বিব্রত হয়ে ওঠার ফলে একে অপরকে সহ্য করে নিয়েছে।

হঠাৎ বাসে বসে মনে হল অনন্তর বোধহয় পরিশীলিত অভ্যাসের অজান্তেই এই রকমভাবে সহদেব কৌশলের আনন্দ কামনায় সহযোগী হয়েছে লিলি। ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না কণাদ ওই লোকটিকে। লম্বা চেহারা। দামী সুট, টাই ব্যবহার করে। ট্যাকসি ছাড়া চলে না। হাজার দুইয়ের ওপরে মাইনে পায়, তবু নাকি বাজারে ওর প্রচুর দেনা। কাজে এলে দামী সেন্টের গন্ধ ছাপিয়ে ওর গায়ের উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগে কণাদের। ওই বেহিসাবী অভব্য, অপরিষ্কার, অমার্জিত লোকটি লিলিকে আকৃষ্ট করেছে। তার কারণ হল লিলির স্বভাবজ রুচি বিকৃতি। মনে মনে খুব বিমর্ষ বোধ করতে থাকে অনন্ত। চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে নিরুপায় ক্ষোভে।

দীপু এসে চারমিনারের প্যাকেট খুলে নিজে মুখে দিয়ে একটা বাড়িয়ে দিল অনন্তর দিকে। বলল, কি ভাবছেন রায়দা? আমাদের সঙ্গে এসে খুব ভুল করেছেন মনে হচ্ছে। আপনি যেরকম টিপটাপ পরিচ্ছন্ন স্বভাবের ভদ্রলোক—

চমকে উঠে সিগারেট নিল অনন্ত। তারপর ঠোঁটে সিগারেট রেখে চেপে ধরল ডান হাত দিয়ে দীপুর হাতখানা এক মুহূর্তের জন্য। মনে মনে বলল, তোমাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ দীপু। তোমরা আমাকে অনেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছ। ক্লেদ আর গ্লানি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছ সুন্দরের অঙ্গনে। বলার উপায় নেই, প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাই কিছু জানাতে পারলাম না।

হাত ছেড়ে দিতে দেশলাই জ্বালালো দীপু। সিগারেট ধরিয়ে বলল, আমাদের যেরকম দেখছেন আপনি, আমরা কেউ স্বাভাবিকভাবে সেরকম নই। আপনি আমার ঝাড়গ্রামের কোয়ার্টার্সে যাবেন, সব কিছু রুচি মাফিক পাবেন। আশু থাকে বহরমপুরে। ওর ওখানে যাবেন। দেখবেন বেটা ভাল্লুক বেরকম দামী দামী পাউডার, কিম, আফটার শেভিং লোসন ব্যবহার করে, আধুনিক মহিলাও তা দেখে লজ্জা পাবে।

আশু সিগারেট ঠোঁট থেকে নামিয়ে বলল, পেল তো বয়ে গেল। আমি কি তোর মত আধুনিক মেয়েদের কাছে ঘুরঘুর করতে গেছি?

গোপু বলল, ঠিক ঠিক, আই এন-ডোর্স।

দীপু চটে উঠে বলল, গোপুদা, তুমিও ভাল্লুকটার সঙ্গে হাত মিলিয়েছ?

গোপু বলল, কি করি বল না। তোমার কিছু কিছু ভাবান্তর চোখে পড়েছে কিনা।

কানু, পানু দুজনেই দীপুকে আরও কিছু ক্ষ্যাপাবার তালে ছিল, এমন সময়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। শোনা গেল গেট এসে গেছে। দীপু বলে উঠল, শোন, তোমরা কেউ গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাবে না। যারা এতখানি ইবেসপনসিবল হয়—

তাকে বাধা দিয়ে পানু বলল, ড-ড-ড-ডক্টর, হুইল দাইসেলফ।

প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল সকলে।

১৬

গেট আসার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা ফিরে এসে যে যার জায়গায় বসেছিল। নতুন যাত্রী উঠেছে জনাতিনেক। তবু জায়গা খালি রয়েছে। দীপু বলছিল, মে মাসে যদি আসতেন, আপনাকে বাসের টিকেটের জন্যে চার-পাঁচদিন ধর্না দিতে হত। প্রচণ্ড রাশ হয় সে সময়ে।

কানু বলল, আর কদিন পরে, মনসুন কেটে গেছে, পুজোর সময়ে বাঙালী যাত্রীদের ভিড় হবে। এখন বড় একটা কেউ যায় না এসব অঞ্চলে। যারা ভ্যালী-অব-ফ্ল্যাওয়ার্স দেখতে যায়, তারাও কমপক্ষে এখন থেকে তিন সপ্তাহ আগে দেখে ফিরে গেছে।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আপনারা দেরী করলেন কেন?

দীপু বলল, আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে শতোপন্থ। ভ্যালী-অব-ফ্ল্যাওয়ার্সটা এমনি বেড়াতে যাওয়া। গোবিন্দঘাটের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, তিনটে দিনের ব্যাপার। আপনি যতবার ওখানে যাবেন, কখনই পুরোনো লাগবে না। লাগতে পারে না। হিমালয়ের মজাটাই এই। পথ আপনি চেনেন, কিন্তু সেই পথ পরের বছর যাবার সময়ে নতুন করে ভাল লাগবে। সব তো পাল্টে যায়। এতো শহরের পথঘাট নয় যে বছরের পর বছর একই রকম থাকবে। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বরফ পড়বে। দশ ফুট বারো ফুট বরফের তলায় ঢেকে যাবে ওইসব অঞ্চল। কত ল্যান্ড-স্লাইড হবে। কত গাছ-পালা, তৈরী করা রাস্তা ভেঙে চলে যাবে নদীর গর্ভে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যাবে বরফ গলা জলের প্রচণ্ড স্রোতে। আবার

নতুন করে রাস্তা বানাতে হবে। নতুন গাছ-পালা গজাবে।

পালটে যায়, অনন্ত ভাবছিল, সব-কিছুই পরিবর্তনশীল। হয়তো এখানে সেই পরিবর্তন খুবই স্পষ্ট। খুব দ্রুত এবং স্বাভাবিক। তবু মনকে তেমনভাবে নাড়া দেয় না। মানুষের চরিত্রগত পরিবর্তন, স্বভাবের পরিবর্তন কত ধীরে ধীরে হয়। তবু সেই পরিবর্তনের রূপ প্রত্যক্ষ হলে বিস্মিত হয়ে যাই আমরা।

শিখ পরিবারটি খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে গাড়িতে এসে উঠল। উঠেই ফেলেরাখা জিনিসপত্রের খবর নিচ্ছিল। কোনটা সিটের ওপরে রেখেছিল, কোনটা তলায়, সব হিসেব মিলিয়ে কন্ডাকটার মারফৎ ছাদের ওপরের মালপত্রের খবর নিতে থাকল। কন্ডাকটার জানালো সব ঠিক আছে। সন্দেহ হলে ওপরে গিয়ে দেখে আসতে পারেন।

আবার সেই ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে সেকেন্ড ক্লাশ প্যাসেঞ্জারের দুরতিক্রম্য ব্যবধান। আশু গলা নামিয়ে বাংলায় বলল, লালারা বাপের গাড়ি পেয়েছে। একটু সংকোচ নেই মাইরী? এতগুলো প্যাসেঞ্জারের অসুবিধে করে—

তরুণী মেয়েটি তাকাল এদিকে। কথা বন্ধ হয়ে গেল আশুর।

স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক-সময়ে রেলিংয়ের গরাদের ফাঁক দিয়ে পেছনে তাকালেন ভদ্রলোক। বললেন, আপ-লোগোঁকো বহোৎ তক্‌লিফ উঠানে পরা।

কেউ কোন উত্তর দিল না। সম্ভবতঃ সিচুয়েশন বুঝে ভদ্রলোক আবার বললেন, ম্যায় মাফি মাংতা হুঁ। লেকিন বাত হ্যায় কি, হামারা উও গরুবদুরারামে এক ভারী ডাক্টর সাব হ্যাঁয়। হি একজামিন্ড মাই ভটাব ওরোলি। হি গেভ হাব সাম মোর মেডিসিনস। দেন হি সেড, অলরাইট, সি ক্যান ট্রাভেল নাউ। নাথিং বট উইথ হার এনিমোর। হাহা করে হাসলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ওঁর উদ্দেশ্যটা মাঠে মারা গেল। কেউ কোন কথা বলল না।

এবার ছেলেগুলির উষ্মা বুঝে ভদ্র-লোক সম্ভবতঃ ঘাড় ফিরিয়ে নিলেন।

আশু রহস্য করে গলা নামিয়ে বলল, দীপু, কথা বললি না, তোর সুযোগ কিন্তু ফস্‌কে গেল। আমাদের কোন দোষ নেই, কি বল খুড়ো?

পানু বলল, আর কি করববে বল ভাইপো। কপাল! এত কষ্ট করে বাসের ছাদে উঠে মেডিসিন বক্স্‌ নামিয়ে নিয়ে এল—

তার কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড আওয়াজ করে স্টার্ট দিল বাসের এঞ্জিন।

বুদ্দপ্রয়াগ ছাড়িয়ে মাইল খানেক পথ থেকেই চড়াই ঠেলে উঠতে থাকল বাস। গোঁ গোঁ আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, অনেক উঁচু দিয়ে বাঁ দিকে অলকানন্দার গর্জ ধরে চলে গেছে বাসের পথ। পথের মাঝে মাঝে ল্যান্ড স্লাইড হয়েছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সেই ক্ষতের দাগ সবুজ পাহাড়ের গায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে। দেখলে শির শির করে ওঠে গায়ের মধ্যে।

সেকেন্ড গেটে গাড়ির সংখ্যা সম্ভবত বেশি। প্রথম গাড়িখানা, একটি মিলিটারী ট্রাক, বাঁ দিকে বেঁকে গর্জ ধরে চলেছে। ওদের বাস থেকে তার দূরত্ব কম হলেও আধ-মাইল হবে। তারপর আরও সাত-আটটা গাড়ি কম-বেশি ব্যবধানে চলেছে। বাকি অনেকগুলি গাড়ি পড়ে গেছে সামনে, চোখের আড়ালে। ওদের বাসের পিছনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে খান-করেক ট্রাক। তবে তারও পেছনে যে আরও অনেক গাড়ি আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। চল্লিশটি গাড়ির দীর্ঘ কৃষ্ণচূড় পিঁপড়ের সারির মত চলেছে হিমালয়ের দেওয়াল বেয়ে।

গত রাতে পর্যাপ্ত ঘুম হয়নি কারো। দীপুরা তিনটের উঠে পড়েছিল। অনন্তর ঘুম ভেঙেছিল রাত চারটের কিছু আগে। গাড়ির দুলুনিতে ঘুম আসছিল অনেকের চোখে। শিখ ভদ্রলোকের স্ত্রী পেছনের রেলিঙে মাথা হেলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কর্তাটি অনেক কসরৎ করে, এঁকে-বেঁকে কাত হয়ে, পাগড়িটা কোন পোঁটলা-জাতীয় বস্তুর ওপরে শেলস করে পা ছড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন ড্রাইভারের ডানপাশের ফাঁকা জায়গাটায়। শুধু তরুণী মেয়েটি গভীর কালো চোখ মাঝে মাঝে পার্টিশনের রেলিঙের ফাঁকে রেখে দেখছিল এদের। দীপুর সঙ্গে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে, সন্তর্পণে লক্ষ্য করেছিল অনন্ত। তবে দীপু হয়তো ঘুমে আছে এখনও, তাই তার দিক থেকে খুব আগ্রহ দেখা যায়নি, মেয়েটার দৃষ্টির প্রসাদে উল্লসিত হতে। কত বয়েস হবে মেয়েটির? অনন্ত অনুমান করল, উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। দীপুর বয়স কত হল, মনে হয়? বছর ছাব্বিশ-সাতাশ। দুএক বছর এদিক ওদিক হতে পারে। এই বয়সটা বড় বেহিসেবী। অভিমান আর ভুল বোঝাবুঝির বয়েস। অবশ্য এই একটুখানি সাক্ষাৎকারের জের মিটে যাবে একটুখানি পরেই। জীবনের ক্ষত যাঁকে কত প্রত্যাশার রামধনু জেগে ওঠে মনের পটে। তার স্থায়িত্ব খুবই কম। তাইতো মন কেড়ে নেয় এত বেশি করে।

কানু কি একখানা বই পড়ছে মনোযোগ দিয়ে। মাঝে মাঝে বই বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠিক জুৎ পাচ্ছে না। একবার অনন্তর সঙ্গে চোখাচোখি হল তার। দুজনেই যে দীপু এবং পাঞ্জাবী মেয়েটির দৃষ্টি বিনিময়ের সাক্ষী, সেই যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল মৃদু হাসির বিনিময়ে।

গোপু মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার নাক ডাকছিল অল্প-স্বল্প। হঠাৎ বোধ-হয় ঘুমটা কিঞ্চিৎ গাঢ় হবে ওঠায় ফলে বেশ জোরে ডেকে উঠল তার নাক। বাসের গর্জন ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল নাসিকা গর্জন। ফার্স্ট ক্লাশে বসা ভাইবোন হেসে উঠল খিল-খিল করে। তারপর দিদি ভাইকে আলতো-ভাবে শাসন করল হেসে অসভ্যতা করার জন্য।

কানু, দীপু আর অনন্ত ব্যাপারটা উপভোগ করছিল হাসতে হাসতে। কানু বলল, গোপু, শিয়ালদা এসে গেছে।

তাড়াতাড়ি ঘুমের চটকা ভেঙে গোপু জেগে উঠে বলল, হ্যাঁ, এই যে, আমি জেগে আছি।

অনন্ত বলল, জেগে জেগেই যদি এই কাণ্ড, তাহলে ঘুমোলে কি ব্যাপার হবে?

কানু হাসতে হাসতে বলল, আপনি তো সে ব্যাপার জানেন না। তাহলে শুনুন। আমরা সেবারে রূপকুণ্ড যাচ্ছি। এই যাদের দেখছেন, এই পাঁচজন, প্লাশ দেবু বলে আমাদের আর এক বন্ধু, সেও বাইরে থাকে, নর্থবেঙ্গলে পোস্টেড। সেবারে আমরা লাস্ট ভিলেজ ওয়ান বলে একটা জায়গার ডাক-বাংলোয় উঠেছি। কিছু পরে আর একটি বাঙালী পার্টি, তাঁরা সংখ্যায় জনা চারেক, এসে উঠলেন বাংলোয়। বাংলোর দুটো ঘর। দুটোই আমরা বুক করে রেখেছি। এদিকে ওরান ডাকবাংলোর অলটিচুড প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট। সুতরাং রাতে কি রকম ঠাণ্ডা বুঝতেই পারছেন। শখ করে কে বারান্দায় পড়ে থাকতে চাইবে? তাই তাঁরা একখানা ঘর আমাদের কাছ থেকে চাইলেন। আমরা বললাম, আমরা ছ'জন লোক। এক-খানা ঘরে জায়গা হবে না। দুটো ঘরই আমাদের দরকার। তাঁরা বললেন, একটা কাজ করা যাক, দুটো ঘরেই পাঁচজন পাঁচজন করে থাকা যাবে। ওঁরা চারজন আর আমাদের একজন এখান থেকে একজন ওঁদের ঘরে শোবে। পাহাড়ে এরকম স্যাক্রিফাইস করতেই হয়। তাই আমরা সবাই পরামর্শ করে ওদের অনু-রোধ মেনে নিলাম।

দীপু বলে উঠল, ওঁদের সেই খাওয়া-দাওয়ার গল্প বল্‌!

কানু বলল, বলছি, বলছি, দাঁড়া না। ওঁদের একজন, সুধাংশুবাবু, মার্চেন্ট অফিসে ভাল চাকরি করেন, বিয়ে-থা করেননি, খুব মেজাজী লোক। পরে আমাদের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেছে। তিনি শুনলাম প্রচুর খরচাপাতি করে থাকেন পাহাড়ে। ওঁরা তো সব ভেড়া কাটিয়ে দিব্যি মাংস-ফাংস রান্না করালেন। আমাদের শুধু ভাত আর আলুর তরকারী আর চাটনি। খুব রাগ হল আমা-দের। এই পাহাড়ে, ঠাণ্ডায়, রাত্তিরের মত একখানা ঘর ছেড়ে দিলাম, আর ওঁরা, এক বাটি মাংস আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দিতে পারলেন না? ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান হয়ে গেল। আশুর তো এসব ব্যাপারে বুদ্ধি বেশি খোলে, ওই বলল, গোপুদাকে ওদের ঘরে পাঠানো হোক। গোপু রাজি হচ্ছিল না। কে নিজের দল ছেড়ে অন্য অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে শুতে চায় বলুন? কিন্তু সকলের মতের বিরুদ্ধে তো আর যেতে পারে না। তাই শুতে গেল রাত্রিবেলা। পরদিন সকালে—হাসতে হাসতে আর কথা শেষ করতে পারল না কানু। আশুও জেগে উঠে শুনছিল। বলল, গোপুদা এপিসোড, আনফরগেটেবল্‌। পরের দিন সুধাংশুবাবুরা শুধু মারেতে বাকি রেখেছিলেন আমাদের।

(চলবে)

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী ১৯৭৮

শৈবাল ঘোষ

অস্ট্রিয়ার শিল্পীদের মধ্যে হসনার এবং লেমডেন 'ফ্যান্ট্যাসটিক রিয়েলিজম'-এর অনুগামী এবং গুস্তাভ হেসিং এবং ফ্র্যাঞ্জ এল্সনার 'ইম্প্রেশনিস্ট' রীতিতে কাজ করে থাকেন।

গুস্তাভ হেসিংএর কাঁপা কাঁপা মোটা রেখায় করা লিথোগ্রাফ এ ভ্যানগগ-এর ডুইং স্পষ্ট। তিনি এঁকেছেন 'ভিলেজ ইন লোয়ার অস্ট্রিয়া'।

এল্সনার এর কাজে পল সেজানের পদ্ধতি লক্ষণীয়। লেমডেনও খুব সুন্দর রেখা ধরে ধরে এক মাঠ ভর্তি হাড়ের ছবি এঁকেছেন তাঁর এচিং 'ফিল্ড অফ বোন্স'এ।

বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে রশীদ চৌধুরী সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ শিল্পী। তিনি তেল রঙে ছবি এঁকেছেন। রশীদ চৌধুরী 'ট্যাপেস্ট্রি' তৈরী করায় বিখ্যাত। বাংলাদেশে তিনিই একমাত্র শিল্পী যিনি নিজেই ট্যাপেস্ট্রির নক্সা তৈরী করেন এবং নিজেই তা তাঁতে বুনে থাকেন।

ওঁর করা জলরঙে ট্যাপেস্ট্রির লে-আউট যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন শিল্পী জলরঙেও কত পারদর্শী।

তাঁর তেলরঙা ছবি দেখে মন ভরলো না। ফরমের সফ্টনেস বা কোমলতার ব্যাপারটা পুরোপুরি অনুপস্থিত। এই ছবিগুলি বড়ই রুক্ষ এবং রঙের তালা ভাব একেবারেই নেই।

রশীদ চৌধুরীর তেলরঙের কাজ তাঁর ট্যাপেস্ট্রির ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

বিটেনের একজনই শিল্পী একটিমাত্র কাজই পাঠিয়েছেন। তিনি হলেন জন ডেভিস। 'ইনি ভাস্কর্য' করে থাকেন এবং 'সুপার রিয়েলিজম্'-এ বিশ্বাসী। এঁর কাজ দেখলেও লোকে চমক খাবে। দুটি সাধারণ মানুষের মাপে মানুষ তৈরী করেছেন তিনি। একজনের হাতে গোল একটা চাকা। সেই চাকা ছুঁড়ে দেবার জন্য তিনি তৈরী হচ্ছেন।

যে কেউ দেখলে মনে করবেন, মূর্তিটা বুঝি জীবন্ত। এতই দক্ষ এর কারিগরী, গায়ের রঙ থেকে সবই একজন সাধারণ মানুষের মত। এমন কি, যে জামাটা উনি পরিয়েছেন সেটাও সাধারণ সুতীর জামা।

বুলগেরিয়ার শিল্পী কানচো আবরামভ-এর রিফিউজিস' নামে ভাস্কর্যটি খুবই মর্মস্পর্শী। গরু বাছুর, মানুষজন, বাচ্চা কোলে মেয়ে-শিশু, সবাই ভয়ার্ত মুখে পালাচ্ছে। প্রচণ্ড বেগ এবং আবেগ দুইই আছে এই ছোট্ট মূর্তিটিতে।

ভেলিচকো মিনেকভের 'হেড' নামক ব্রোঞ্জের মূর্তিটিও খুব সুন্দর একটি ভাস্কর্য। এটি একটি প্রতিকৃতি। আঙুলের আঁচড়ে চুলের গড়ন তৈরী করা হয়েছে। মুখমণ্ডলে নারীর লাবণ্য। খুবই দক্ষ হাতে করা কাজ।

চীন অনেকটা ভিয়েতনামের মত একটাই রীতি মেনে ছবি এঁকেছে। সব শিল্পীই স্কেচ্ল পেণ্টিং করেছেন, ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে। জলরঙের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় এঁদের কাজে। উল্লেখ-যোগ্য কাজ করেছেন কুয়ান-শন-উয়ে। তাঁর ছবির বিষয় লালফুলে ভরা আকাশ। উ-তে-জেন উড়ন্ত ঈগল পাখী এঁকেছেন। স্টাডিধর্মী এই কাজ খুবই দর্শনীয় হয়েছে।

ক্যালিগ্রাফি ছাড়া যেমন কোন 'চাইনীজ পেণ্টিং' পুরো হয় না, সেইমতই সব ছবিতে এইসব শিল্পীরাও রেখার সঙ্গে লেখা ব্যবহার করেছেন এবং লেখাটাও ছবিরই একটি অঙ্গ হিসাবে ধরে নেওয়া যায়।

উ-লিং-শেং ফ্যান-পো-ওয়েন-এর রচনা 'মর্নিং ইন চুং শ্যান মাউণ্টেন' ভিন্নের ওপর ভিজে পদ্ধতিতে জলরঙে চাইনীজ রাইস পেপারের ওপর করা।

সুং-ইন-কে 'ল্যাম্ব অফ আওয়ার কমিউন'এ একটি কিশোরীকে দক্ষ হাতে এঁকেছেন কোলে দুটি ভেড়ার বাচ্চা নিয়ে আদর করছে। যেমনই মিষ্টি ছবি তেমনই মিষ্টি ছবির রঙ। ব্রাশিংএর দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

ওয়াং-শু-তাও এর 'পিওর নিও' একটি উৎকৃষ্ট রচনা।

কিউবার নেলিজা লোপেজ 'আই অ্যাম সেভেন ইয়ার ওল্ড' সেক্স গডেস মেবিলিন মনরোর ছবি আঁকায় শিল্পচিন্তা কতটা উৎরেছে বলতে পারবো না। তবে পোস্টার হিসাবে যে অনবদ্য সেটা কালোয় সাদায় আঁকা চে গুয়েভারার প্রতিকৃতি দেখলেও বোঝা যায়।

জোস লুই পোসাদা 'ডিভা সিবিল' নামক এক সেট লিথোগ্রাফ রচনা করেছেন তাতে সন্ন্যাসীদের হাতে লাঠির মাথায় বিরাট মাথা বসানো ইত্যাদি। কাজের মধ্যে বলিষ্ঠ গঠনভঙ্গিমা আছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার শিল্পীরা অনবদ্য কাজ হাজির করেছেন প্রদর্শনীতে। এঁদের বেশীর ভাগ কাজই ভাস্কর্য। স্যুরিয়ালিস্টিক স্টোরেক-এর কাজ দেখে মনে হয় এই

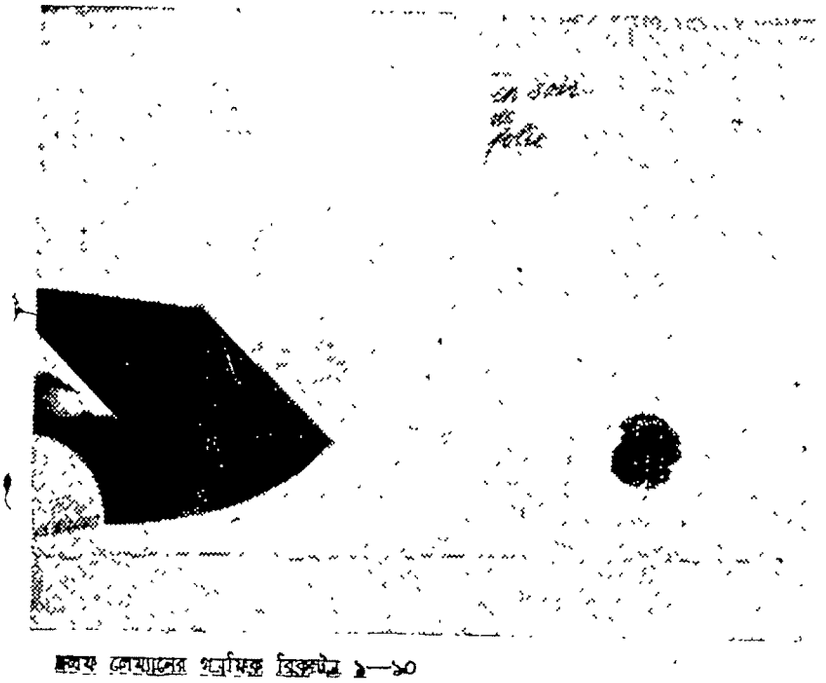

রুফ লেম্যানের গ্রাফিক বিকেন্দ্র ১—১০

শিল্পীর দুর্ভাগ্য যে ইনি কোন পুরস্কার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ইনি অসাধারণ মূর্তি তৈরী করেছেন। এই মূর্তি পুরোপুরি নতুন আঙ্গিকে করা এবং এর অনেক গভীরে যাওয়া যায়। এর এক একটা কাজ এক একটি মাস্টারপিস। তাঁর করা 'টু ওল্ড মেন', 'আরখিলাস', 'চ্যারিওটিয়ার', 'দ্য নাইট', 'আরমার বেয়ারার', 'রেস্টলার' এবং 'এথলেট' অসাধারণ রচনা। ইনি টুকরো টুকরো কাঠের মণ্ডের ওপর জাল এবং প্লাস্টার দিয়ে মূর্তি গঠন করেছেন। ফর্ম এতই বলিষ্ঠ যে, মন কেড়ে নেয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ 'চ্যারিওটিয়ার'। এতে দুটি বিশাল সাদা রিয়েলিস্টিক পায়ের পেছন দিয়ে একটি চ্যাপ্টা ডেকরেটিভ চাকাওয়ালা রথ তার মধ্যে নারীর প্রতিকৃতি। 'দ্য নাইট' নামক রচনাটি ব্রোঞ্জে নির্মিত একটি ভেনাস আকৃতির নারীর একটা হাত বড় করে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি যে ভালবাসার যন্ত্রস্বরূপ তার চিহ্ন পাওয়া যায় তার পায়ের কাছে একটি যান্ত্রিক মূর্তিতে। 'এথলেটে' তিনি অ্যাপোলোকে দেখিয়েছেন এক হাত বুকের ওপর কোণাকৃণি করে দেওয়া।

স্টোরেকের মূর্তি প্রাচীন গ্রেকো-রোমান ভাস্কর্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তাঁর ভাস্কর্যের আঙ্গিক বিশালত্বও অতুলনীয়।

এঁর আরও তিনটি ছোট ছোট মার্কেটের মত কাজ আছে ব্রোঞ্জে করা নাম 'সাভেনির' জাতে ভেনাসকে লতায় পাতায় ফলে ফুলে জড়িয়ে উপহার দেওয়া হচ্ছে এবং 'আইয়াস'এ হাত-পা-মুখ টুকরো টুকরো ভাঙা গঠনে পুরো বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এর কাজ দেখে আমার মত আরও অনেক দর্শকও মুগ্ধ হয়েছেন এবং প্রশ্ন করেছেন এই শিল্প পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলেন কেন?

ফিনল্যান্ডের মাবজাটা নুরোরেভা খুব সুন্দর মেজোটিন্ট তৈরী করেছেন। তাঁর বিষয় দ্বীপ এবং সমুদ্রের তীর। পাথরের চাঁই, জঙ্গল ইত্যাদি। ইনি আধা রিয়েলিজমে কাজ করেছেন এবং এনার কাজে বেশ নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পের দেশ ফ্রান্স থেকে আরও বেশী শিল্প আমরা আশা করেছিলাম। ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র চারজন। তার মধ্যে এব্রাহাম হাডাড এর কাজ সুন্দর।

জারমান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের রুডোলফ অস্টেন-এর মধ্যে পল সেজানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'স্টীল লাইফ উইথ ভিউ অফ সী' ছবিতে। ইনি লিনেনের ওপর মিক্সড্ মিডিয়ায় কাজ করে থাকেন।

ওয়াল্টার আরনল্ডের ভাস্কর্যও দেখতে ভালো লাগে। প্রথাগত রীতি অনুসারে তিনি তাঁর ভাস্কর্য 'আফরো ডাইভ', 'ব্রিটেন', 'গুড থট্স' উপস্থাপনা করেছেন। মার খাওয়া যুবতী, যুবতী চুল বাঁধছে ইত্যাদিই তাঁর মূর্তির বিষয়।

ওয়াইল্যান্ড ফরস্টার-এর 'আকর্ডিয়ান অ্যাকর্ট' এবং 'মোর্নিংম্যান' অনবদ্য রচনা।

উইলী সিট বিপ্লবের ছবি এঁকেছেন বৃদ্ধার প্রতিকৃতির সঙ্গে লাল পতাকা, কষ্ট, যন্ত্রণা এবং বিজয় এই সবই তাঁর বিষয়। অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে ইনি তেলরঙ ব্যবহার করেছেন এবং পরীক্ষায় সফল হয়েছেন।

ফেডারাল রিপাবলিক অফ জার্মানীর হাইডে বুল একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী। তাঁর সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। আর ভালো লাগে জ্যান পিটার টিবুপের কাজ। ইনি তীব্রভাবে অ্যাব্সট্র ওয়াইথ-এর অনুসরণ করেন। অ্যাক্রাইলিকে সুপার রিয়েলিস্টিক কাজ। 'দ্য লর্ড অফ ফিল' এবং 'গুড ক্লোট' তাঁর দুটি অনবদ্য রচনা।

ভিয়েটমার উলরিচ-এর ক্যানভাসে আঁকা 'দ্য সুইমার'ও একটি বলিষ্ঠ ছবি।

ক্লাউস ভোগেলগেস্যাঙ এক বৃদ্ধা নারীকে বকসিং করছেন ইত্যাদি নানা ভঙ্গিমায় মজার ছবি করেছেন।

ইনি চারকোল দিয়ে ড্রয়িং করে থাকেন। তার ড্রয়িং-এ মুন্সিয়ানার ছাপ পওয়া যায়। 'ম্যাডাম বাটাইফ্লাই'ও একটি অসাধারণ রচনা।

আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রদর্শিত উল্লেখযোগ্য শিল্পসামগ্রী সম্বন্ধে পাঠকদের মোটামুটি একটা ধারণা নিশ্চয়ই হয়েছে। এবারের ত্রিবার্ষিক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে শিল্পের নন্দনতত্ত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন চেকোশ্লোভাকিয়া, ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আয়ারল্যান্ড এবং হাঙ্গেরী। এইসব দেশের কাজ আজকের শিল্পের বাঁধাধরা নিয়মকানুনের অনেক বাইরে। এবং নতুন কিছু সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

এবারের প্রদর্শনীতে ট্র্যাডিশনালিস্টিক ছবি খুবই কম দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক শিল্পের ভাষা যদিও এক তবুও তার থেকেই অনেক নতুন কিছু পাওয়া গেলো কিছু ছবি বা ভাস্কর্যের মধ্যে।

একটা উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো যে আজকাল অনেকেই ইমপ্রেশনিস্টদের অথবা পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট মাস্টারদের অনুকরণ করে বিষয়কে অন্য বক্তব্যে নিয়ে যেতে চাইছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছবি উৎরেছে আবার কোনও ক্ষেত্রে সাফল্য আসেনি। ওল্ড মাস্টারদের কোথাও কোথাও অনুকরণ দেখা গেছে তবে উপস্থাপনার গুণেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক অতটা খারাপ লাগে না দেখতে।

আসলে সামনে একটা শিল্পের ধারা রেখে এগুতে গেলে সবচাইতে বড় যে জিনিসটা দরকার তা হলো সেইসব ছবি কি অবস্থায় কি পরিবেশে আঁকা হয়েছে সেটা বোঝা এবং জানা। তখনই সেই ধরন অনুকরণ করা উচিত বা সেই ধরন ধরে আরো এগুনো উচিত যখন সেই অবস্থায় নিজেকে ফেলা যায়।

অর্থাৎ উপলব্ধি ছাড়া ছবি হয় না, শুধুই অনুকরণ হয়। এবারের আন্তর্জাতিক বিভাগে অনেক সৃষ্টিধর্মী ছবির মধ্যে এ ধরনেরও প্রচুর ছবি দেখা গেল। তার ফলেই এতবড় প্রদর্শনীর ভেতর থেকেও সত্যিকারের শিল্প ঠিকই চেনা গিয়েছে। যার ফলে বারবার আন্তর্জাতিক বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখলেও শেষ অবধি দেখা যায় যে সেইসব শিল্পই টেনে রাখছে বা সেইসব শিল্পের সামনেই আমরা বারবার ঘুরে ফিরে আসছি যা কোন অনুকরণ বা অতীতে দেখা ধরনের ধার ধারে না।

তবু একটা জিনিস যেটা প্রদর্শনী দেখে চোখে পড়লো তা হলো আমরা আবার সেই আগের জায়গায় অর্থাৎ রিয়েলিজমে ফিরে যাচ্ছি। এ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট পুরনো হয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পরিত্যক্ত হয়েছে। সব দেশের ছবিই প্রায় একটা না একটা ধারণাকে বোঝাতে চেয়েছে আকার ও রূপ দিয়ে এবং যেটা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণের কাছে সহজবোধ্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

(সামনের সংখ্যায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব এবং অন্যান্য প্রদর্শনী)

চিঠিপত্র

রবীন্দ্র-ভারতীর জরুরী সমস্যা

২৪ চৈত্র ১৩৮৪-র অমৃতে প্রকাশিত 'শিক্ষায় বিশৃঙ্খলা ও রবীন্দ্র ভারতী' শীর্ষক সম্পাদকীয় রচনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ এই প্রথম সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রভারতীর প্রকৃত সমস্যাকে নিরপেক্ষ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা দেখা গেল।

রবীন্দ্রভারতীর একটি জরুরি সমস্যা—এখানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোন প্রশাসন-সংসদ নেই; ফলে প্রশাসনের নানা স্তরে দুরূপনেয় গাফিলতি থেকে যাচ্ছে। তবে অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদে (৫-৪-৭৮) প্রকাশ, সরকার এখানেও প্রশাসন-সংসদ গঠন করতে যাচ্ছেন। সরকারের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, সংসদের সদস্য নির্বাচনে তাঁরা যেন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন, নতুবা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাঁরা দু-তিন বছর আগেও ছাত্রনামধারী একদল সমাজবিরোধী যুবককে প্রশ্রয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নানা বিশৃঙ্খলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সংসদে সেইসব ছদ্মবেশী শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিত্বের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রোধ করা কঠিন হবে।

আপনার আলোচনায় রবীন্দ্রভারতী পরিচালনার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে : যেহেতু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে সামাজিকভাবে জাগিয়ে রাখার জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সেজন্য সমাজের নানা সম্প্রসারণশীল প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এর পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নতুবা কালক্রমে সমাজের কাছে এর অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়বে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথও তাঁর একাধিক রচনায় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সার্বজনীন ও যুগোপযোগী হয়ে ওঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্রভারতীর পরিচালন-নীতির ব্যাপারে বাইরে থেকে কোন নীতি বা চিন্তা আরোপ না করে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনার সূত্র অনুসরণ করাই সমীচীন।

> 'বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলণ্ডের য়ুনিভার্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। .. বর্তমান কালের চিন্তাদ্বন্দ্ব ও কর্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে' (বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ : রবীন্দ্রনাথ)।

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রভারতীর অধীনে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম সংবলিত কতকগুলি কলেজকে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়ে আমরা সরকারের কাছে রবীন্দ্রভারতীর 'এ্যাফিলিয়েটিং' পর্যায়ে রূপান্তরের দাবি জানিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও সক্রিয়ভাবে আমাদের এ দাবি সমর্থন করেছেন। এখন, আপনাদের পত্রিকা মাধ্যমে জনসাধারণের সমর্থন আহ্বান করছি। —রবীন্দ্র গুপ্ত; যুগ্ম-সম্পাদক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস টিচার্স এ্যাসোসিয়েশন।

ছৌ নাচ প্রসঙ্গ

গত ১৭ ফেব্রুয়ারীর অমৃতে পুরুলিয়ার লোকশিল্পাশ্রয়ী নাচের মুখোশ নামক প্রকাশিত রচনাটির পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ মার্চের অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে পুরুলিয়ার তরুণ সাহার লেখা চিঠিটির প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা জানান আবশ্যক মনে করছি।

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমায়, পুরুলিয়া ও বিহারের সেরাইকেল্লা এবং রাঁচি জেলার যে সব জায়গায় ছৌ নাচের প্রচলন আছে, সেই সব অঞ্চলের জনগোষ্ঠী এই লোকনৃত্যকে ছৌ নামেই চিরকাল ডেকে এসেছে। তবে আজকাল দেশে-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ঐ নাচের নাম হিসাবে ছৌ কথাটির যে অপপ্রয়োগ ও বিস্তার হয়েছে তাতে শুধু যে শহরবাসী লোকই আকৃষ্ট তা নয়, আজকের পুরুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কিছু মানুষও বেশ বিভ্রান্ত হয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছেন। একদিকে আছে ঐতিহ্যবাহী ছৌ নামটি, অপরদিকে পণ্ডিতদের বেদবাক্য হিসাবে ছৌ। অবশ্যই স্থানীয় কিছু বুদ্ধিজীবীও এর প্রতিবাদ করেছেন।

ছৌ শব্দটি যে শুধু শহরকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের ভ্রান্তবিকৃতির ফলে সৃষ্ট, তা আমি আমার লেখার মধ্যেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি। লেখার মধ্যেও শুধুমাত্র ছৌ শব্দটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছি। ছৌকে নয়। কিন্তু রচনাটির নামে যে ছৌ শব্দটির অসঙ্গত প্রয়োগে হয়েছে তা আমার লেখার মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই। মুদ্রণ-প্রমাদেই রচনার নামটিতে ছৌ শব্দের জায়গায় ছৌ হয়েছে।—সোমনাথ চক্রবর্তী, ৫।১ সুবি লেন, কলকাতা-১৪।

সত্যিই অরুচিকর

আমি অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠিকা। নিত্যনতুন পরিমার্জিত অঙ্গসজ্জার জন্য এই পত্রিকাটি শুধু আকর্ষণীয় নয়, লোভনীয়ও বটে। কিন্তু বর্তমান চিঠিতে আমি কিছু বিরুদ্ধ বক্তব্য রাখতে বাধ্য হচ্ছি। এর জন্য আমি প্রথমেই সম্পাদক মহাশয়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। বিগত অমৃতের কয়েকটি সংখ্যায় (বিনোদন সহ) পরিতোষ সেনের রচনায় তাঁর অংকিত কয়েকটি ছবিতে অমৃতের শালীনতা নষ্ট করেছে। কোন প্রদর্শনশালার আর্ট গ্যালারীতে যে কোন মানের ছবি প্রদর্শিত হওয়া সুশোভন, কারণ সেখানে ছবি দেখাই মূলত দর্শকের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকায় যেখানে লেখকের রচনাশৈলী প্রধান বিবেচ্য, সেখানে এ ধরনের ছবি ছাপা পাঠককে ক্লান্ত করে, রচনাপাঠে ঘৃণার উদ্রেক হয়। বিশেষ করে তিনি যেভাবে মানব-মানবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিস্ফুট করেছেন তা সত্যিই অরুচিকর। যদিও তাঁর অংকনশৈলী যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু শিল্পের প্রকাশ সুরুচিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই নয় কি? বিশেষ করে সেটা যদি কোন উঁচু-দরের সাহিত্য পত্রিকা হয়। আশা করি, অমৃত ভবিষ্যতে রুচিকর অঙ্গসজ্জায় আরও সচেতন হবে। —ডোরা মিত্র; কাশীপুর, কলি-৭০০০০২।

বিজ্ঞাপন বন্ধ হলে ব্যবসা অচল

নতুন কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকারের যে বিজ্ঞাপন নীতি ঘোষিত হয়েছে তা আমাদের কাছে আতংকের কারণ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সংস্থা ব্যবসাক্ষেত্রে তাদের মোট বিনিয়োগের মাত্র তিন শতাংশ বিজ্ঞাপন খাতে ব্যয় করতে পারবেন। বৃহৎ শিল্প সংগঠনের পক্ষে এই নীতি খুব বেশী ক্ষতিকর হবে না। কিন্তু যাদের ব্যবসা বিজ্ঞাপন নির্ভর তাদের পক্ষে এই নীতি মৃত্যুতুল্য। বিশেষ করে যাত্রা-জগৎ। সারা বছর বিজ্ঞাপন দিয়ে তবেই ব্যবসা পেতে হয়। আর তাতেই ব্যবসা চলে। বিজ্ঞাপন বন্ধ হলে ব্যবসা অচল হয়ে পড়বে। ফলে পশ্চিম বাংলার এই বৃহৎ শিল্প মাধ্যমটি বিপন্ন হবে। —শিব ভট্টাচার্য, কলকাতা।

অসাধারণ ধারাবাহিক রচনা

অসাধারণ ধারাবাহিক রচনা সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। অনন্ত সিংয়ের 'যাঁদের দেখেছি' এবং প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের পল্লীগীতিকার 'হাসন রাজা ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা' — এই মূল্যবান রচনা দুটি অমৃতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন পড়ে মুগ্ধ হচ্ছি। এর জন্য সম্পাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। —নীরদকুমার রায়, বাগালীবাজনা, জলপাইগুড়ি।

বধিরের মানসিকতা

অনুভূতি বসু

বহু পরীক্ষার পর বধিরের শ্রুতির একটা নূন্যতম ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই বর্তমানযুগ পূর্ণ বধিরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ব্যক্তি বিশেষে বধিরতার পরিধি ও প্রকারভেদ থাকে আর তারই তারতম্যে তার বস্তুজ্ঞানে, ভাষার অধিকার লাভে ও সর্বোপরি তার মানসিকতার একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব দেখা দেয়। বধিরতার ফলশ্রুতি এতই সুদূরপ্রসারী যে সাধারণের পক্ষে তার উপলব্ধি সম্ভব নয়।

আমাদের জীবনে শ্রবণের প্রভাব, কার্যকারিতা ও গুরুত্ব যে কতটা তার সম্বন্ধে আমরা বেশ উদাসীন। যে কাজটি আমাদের ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, সচেতন, অর্ধ-সচেতন বা অসচেতনভাবে ঘটে যায়, তার সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতই নির্বিকার হয়ে থাকি কারণ তাকে আমরা অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে অভ্যস্থ নই। কেবল-মাত্র ঘুমন্ত বা উচ্চ ভাবাবস্থা ছাড়া সবসময় আমরা শুনি, এবং শুনতে হয় যেহেতু শোনার হাত থেকে রেহাই পাবার আমাদের কোন উপায় নেই। চোখ বন্ধ করে বা চোখের সামনে কিছু অন্তরায় সৃষ্টি করে দেখা রোধ করা যায় কিন্তু শোনা?—তাকে এড়িয়ে যাবার পথ কোথা? এই বিশ্বে শব্দহীন স্থান একান্তই বিরল, তাকে খুঁজে পাবার জন্যে যেতে হবে উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ বা মেরুপ্রদেশের মত অচিন দেশে। কতদিন দিবা নিদ্রার আয়োজন করেছি ঘর বন্ধ করে কিন্তু ধ্বনি প্রবাহের আনাগোনা রোধ করতে পারিনি বলেই শুনতে হয়েছে কত বিচিত্র শব্দ—কলকোলাহল, যানবাহনের আওয়াজ, পাখীর ডাক, নানা ধরনের স্ফুট অস্ফুট শব্দের সংমিশ্রণ। স্বভাবতই প্রশ্ন মনে জাগে—কেন এই অবিরাম শোনা? আমাদের জীবনে এর অর্থ বা প্রয়োজন কি?' তার উত্তরে বলা যায় যে নিছক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে শোনার প্রয়োজন। আমরা যে বিশ্বে বাস করি তা গতির বেগে সদাই শব্দ মুখর ও প্রাণচঞ্চল। বস্তুর সঙ্গে রয়েছে ধ্বনির অচ্ছেদ্য যোগসূত্র। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ থেকে সুরু করে বিরাট বস্তুপুঞ্জ প্রতিক্ষণই যে ধ্বনি সৃষ্টি করছে, তার তরঙ্গকম্পন নানা দিক থেকে এসে আঘাত করছে আমাদের শ্রবণইন্দ্রিয়ে তাই আমরা অবিশ্রান্ত শুনছি। সর্বজগতের উপযোগী করে প্রকৃতিদেবী আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়টিকে এমনভাবে রচনা করেছেন যে আমরা অহরহ পরিবেশের ধারতীয় সংবাদ শ্রুতির মাধ্যমে পেয়ে আমরা নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছি। শ্রুতির মাধ্যমে আমরা পাই বিপদের সঙ্কেত, আর তারই নির্দেশে যথোপযুক্ত আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করি। এর অভাবে জীবন যে কতটা সমস্যাসঙ্কুল ও শোচনীয় হতে পারে—তার স্নিগ্ধরূপটি অনবদ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে কৌশিশ রইটিতে।

শ্রুতির অভাবে দেখাও হয় আংশিক ও অসম্পূর্ণ। গাছের ডালে বসে যে পাখীটি ডাকছে, অকে একটি বধির সেই মুহূর্তের জন্যে দেখবে একটি স্থির ও নির্বাক চিত্রের ঠোঁট খোলা পাখী হিসাবে কিন্তু যখনই পাখীটি একটু নড়বে, তখনই তার সামনে উপস্থাপিত হবে আর একটি চিত্রের। এমনি করে পরিদৃশ্যমান জগতের পটভূমি অবিশ্রান্তভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে বধিরের চোখে কিন্তু, সে এই নির্বাক চিত্রগুলির যোগসূত্র সব সময় খুঁজে পায় না। শ্রুতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে আমরা পরিবেশের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত এবং পরিচিত। শ্রুতির অভাবে বধিরের জগত তাই অপ্রত্যাশিত, অনিশ্চিত ও দুর্বোধ্য—সেই জন্যে সে বাস্তবের সম্মুখীন হতে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করে।

জীবনের যে ক্ষেত্রে ধ্বনি সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ সেটি হোল ভাষার আয়ত্তীকরণ ও বুৎপত্তিলাভে। বস্তু ও ভাবের প্রতীক হচ্ছে শব্দ এবং তার সাহায্য নিয়ে সম্ভব হয় আমাদের মানসিক কার্যকলাপ। চিন্তা ভাবনা, কল্পনা, বিচার বিশ্লেষণ, স্মরণমনন প্রভৃতি যাবতীয় মনের কাজের জন্যে আমরা কত কথাই না বলি নীরবে মনে মনে। এই সীমাহীন নীরব রাজ্যে আলোচ্য বিষয়ের কোন বাছবিচার নেই—খ্যাতি অখ্যাতি ঝগড়া বিবোধ, গালিগালাজ থেকে সুরু করে মহত্তম ধ্যান-ধারণা অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হয় এখানে। স্মরণ রাখতে হবে যে এই নীরব ভাষাও কিন্তু শব্দাশ্রয়ী এবং তা একান্তভাবে নির্ভর করছে শ্রুতির উপর। আমরা অন্যের কথা শুনে, তার অর্থ বুঝে, তাকে অনুকরণের জন্যে বাকযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকি এবং বহু চেষ্টার পর তাদের আয়ত্ত করি। এই জন্যেই শ্রবণহীনের পক্ষে ভাষার অধিকার-লাভে এই দুস্তর বাধা।

একজন বধির অন্যের কথাবার্তাকে দেখে ওষ্ঠ সঞ্চালনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে। এই আংশিক দেখার সাহায্যে সে বক্তার বক্তব্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যের কথা বুঝতে পারা, অর্থবা নিজেকে বোঝাতে পারা কোনটিই বধিরের পক্ষে সম্ভবপর হয় না সেই কারণে সে ক্রমেই নিজেকে আত্ম-কেন্দ্রিকতার মধ্যে লুপ্ত করতে চায়। একথা অনস্বীকার্য যে কথাভাষাই হচ্ছে সমাজজীবনের ধারক ও বাহক। এর সাহায্যে একদিকে আমরা যেমন আমাদের প্রাত্যহিক দিনের প্রয়োজনগুলি মেটাই, অন্যদিকে আত্মিক বিকাশে সচেষ্ট হই। মানসলোকের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করে ভাষা আমাদের নিয়ে যায় পূর্ণতরের পথে। তাই বলা যেতে পারে যে ভাষার বুৎপত্তি ও সার্থক প্রয়োগের উপর নির্ভর করে মানুষের জীবনের সাফল্য অসাফল্য, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা ও পূর্ণতা অপূর্ণতা।

মানুষ মাত্রেই থাকে আত্মপ্রকাশের আকুতি, তাই বধির কথ্য ভাষার পরিবর্তে ব্যবহার করে ইসারা ইংগিতের সাংকেতিক ভাষা, যে ভাষা অন্যের কাছে একান্তই দুর্বোধ্য। একান্ত পরিচিতজন ছাড়া এই ভাষা অন্যের কাছে যেমন রহস্যময়, তেমনি অবাঞ্ছিত। বধিরের কোন দৈহিক অক্ষমতা নেই সেইজন্যে তার প্রকাশভংগীর স্থলতা অন্যের মনে সৃষ্টি করে একটা অবজ্ঞিকর বিজাতীয় মনোভাব। সমাজের এই মনো-ভাবকে অপসারিত না করলে বধিরের মানসিকতার কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। সেজন্য দরকার বধিরের জীবনে ভাষা-রাজ্যের সিংহদ্বারটি খুলে দেওয়া। শৈশবে বধিরতা আবিষ্কার সুচিকিৎসা, পিতামাতা ও শিশুর বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সমাজের সচেতন সহযোগিতায় এই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব। সুস্থ মানসিকতাবোধ যেমন ব্যক্তির স্বার্থের জন্যে প্রয়োজন, তেমনি সমাজের অগ্রগতির জন্যেও তা অপরিহার্য। জনসাধারণের অজানা এই দিকটিতে আলোকপাতের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী
বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং
সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক
শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম
২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

রবার্ট ছিল আমাদের আপনজন

চার-ছেলের সঙ্গে লেসলি ক্লডিয়াস (বাঁ দিক থেকে) বেল্লো (বড়), ডিকি (মেজ) র‍্যান্ডেল (ছোটো) ও বাবি ক্লডিয়াস। সকলে মিলে দেখছেন লেসলির ওলিম্পিকে পাওয়া স্বর্ণপদক।

বেশ মনে আছে সেই দিনগুলির কথা। হকি মাঠে বাবার হাত ধরে আসতো দুটি বাচ্চা ছেলে। তাদের বাবা নাম করা খেলোয়াড়। জগতজোড়া নাম তাঁর। ভারতীয় ওলিম্পিক হকি দলের অধিনায়ক। বাচ্চা দুটির বাবা খেলতেন মাঠের মধ্যে। আর বাইরে বড়দের দুটি স্টিক হাতে নিয়ে দুই ভাই লড়ে যেতো। তারপর একদিন আবার তাদে বদেখা যেত না। জিজ্ঞেস করলেই ওদের বাবা লেসলি ক্লডিয়াস হাসতেন। বলতেন, রবার্ট আসানসোলে ফিরে গেছে।

আসানসোলের সেন্ট মেরিজ স্কুলে পড়তো রবার্ট ক্লডিয়াস। স্কুলের মধ্যেই প্রকান্ড মাঠ। সেইমাঠ ছিল হকির নাম করা এক আখড়া। স্কুলের বেশীরভাগ ছেলেই—বিশেষ করে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা হকি স্টিক হাতে নিয়েই বেশীরভাগ সময় কাটাতো। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ভারতীয় হিসেবে রবার্টের নাম ছড়িয়ে পড়লো ঐ স্কুলে পড়ার সময়ই।

স্কুলে পড়ার সময়ই সে জুনিয়ার বাংলা দলে খেললো। খেললো জুনিয়ার ভারতীয় দলে। ১৯৭৫ সালে গেলো ইউরোপ সফরে। তার নেতৃত্বে ভারতীয় জুনিয়ার দল প্রথম জুনিয়ার বিশ্ব কাপ হকির প্রাথমিক পর্বে খেলতে গেলো। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত সেই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান প্রথম হয়েছিল আর ভারত দ্বিতীয়। আসছে বছর জুনিয়ার বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা হবে। কিন্তু রবার্টকে সেখানে খেলতে দেখা যাবে না।

অবশ্য মাত্র ১৯ বছর বয়সে রবার্ট ভারতের সিনিয়ার দলে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছে। বাবা লেসলির মতো সে খেলতো বাইট হাফে। তবে সেন্টার হাফেও সামাপ্ত চতুর্থ বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতায় সে ছিল ভারতীয় দলের রক্ষণভাগের অন্যতম স্তম্ভ। ভারত বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি বিশ্বকাপের আসরে। কিন্তু রবার্টের খেলা সকলের নজর কেড়েছিল। আরো দশ-বারো বছর সে স্বচ্ছন্দে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলতে পারতো।

গত শনিবার (৮,৪,৭৮) সে বুয়েনার্স-এয়ার্স থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিল। কলকাতায় ফেরার পর বন্ধু বান্ধবরা তাকে নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। বাবা-মার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলার সময়ও সে পায় নি। রবিবার সন্ধ্যার পর একটি সম্বর্ধনা সভায় গিয়েছিল সে। সম্বর্ধনার পর ছিল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ সে ফাদারকে বলে বইরে এলো। এক্ষুনি আসছি বলে। হয়তো মিস মার্টিনকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছিল সে আর মিঃ চ্যাঙ্গ। সবার শেষে রবার্ট কোন বকমে বসেছিল। একটা স্কুটারে তিনজনকে কি আর আঁটে?

পি. জি হাসপাতালের সামনে একটি দ্রুত ধাবমান লরীর ধাক্কায় ছিটকে পড়লো। মিঃ চ্যাঙ্গ বাঁ দিকে আর রবার্ট ডানদিকে। মুহূর্তের মধ্যে লরীটি রবার্টের ওপর দিয়ে চলে গেলো। লরীর চাকায় পিষে গেল তার মুখ। সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর ডাক্তাররা রবার্টকে মৃত ঘোষণা করলেন। চ্যাঙ্গ আর মার্টিনকে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে ভারতীয় হকি দলের এক উজ্জ্বল ভাবনা খসে পড়লো। ভারতীয় হকির এখনকার দৈন্য দশার মধ্যে রবার্টের মতো তরুণ খেলোয়াড়রাই ছিল ভবিষ্যতের দৃপ্ত প্রতিশ্রুতি। রবার্ট ছিল তার বাবা লেসলি ক্লডিয়াসের যোগ্য উত্তরাধিকারী।

রবার্টের মৃত্যু লেসলি পরিবারের এক নিদারুণ ক্ষতি। সোমবার দুপুরে লেসলি বার বার বলছিলেন, "ভারতীয় দল তার হাফকে হারালো। আর একজনকে খুঁজে পাবে ঠিকই। কিন্তু আমি আর কখনো আমার রবার্টকে ফিরে পাবো না ... !"

এখনো রবার্টের ঘরে দুটো ব্যাগ পড়ে আছে। বুয়েনার্স এয়ার্স থেকে ফেরার পর এখনো সে দুটি খোলা হয়নি। ফুরসুতই পায় নি রবার্ট। শনিবার সকালে সে ঘরে ফিরেছিল বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় খেলে। আর রবিবার হল সাঝ রাতে এক পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তাকে প্রাণ হারাতে হল। জগদীশ বসু রোড আর হরিশ মুখার্জি রোডের সংযোগ স্থলের কাছাকাছি এক জায়গায়।

সেখান থেকে ম্যাকলাউড স্ট্রীটে তাদের বাড়ি আর কতোটা দূরে। সেখানে হয়তো পুত্র গর্বে গর্বিত পিতা লেসলি ক্লডিয়াস তখন ছিলেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

কলকাতার দর্শকদের দুঃখ তাঁরা রবার্টের খেলা দেখার তেমন সুযোগ পেলেন না। শীতকালীন হকি ছাড়া রবার্ট কলকাতায় খেলেন নি। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের চাকরি পেয়ে সে গত বছর দিল্লিতে চলে গিয়েছিল। খেলতো এয়ারলাইন্সের পক্ষেই। চাকরী আর তার করা হল না। তার স্বপ্ন ছিল, ভারতীয় হকির হারানো সম্মান উদ্ধার করা। তাও হলো না। সব কিছু পেছনে ফেলে রেখে রবার্ট আজ পরপারে চলে গেলো। আজ সে শুধু স্মৃতি। সে স্মৃতি বেদনার!

শান্তিপ্রিয়

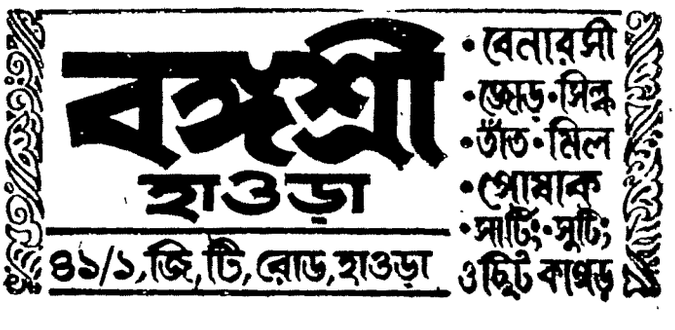

খেলা

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেষ্ট ক্রিকেট

পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৮ রাণে হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭৮ সালের টেস্ট সিরিজে ৩—১ খেলায় 'রাবার' জয়ী হয়েছে এবং এই জয়ের সূত্রে পেয়েছে 'ওরেল ট্রফি'। ফলে এই দুই দেশের শেষ পঞ্চম টেস্ট খেলার গুরুত্ব অনেকটা কমে গেল। অস্ট্রেলিয়া শেষ পঞ্চম টেস্ট খেলায় জিতলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতেই ওরেল ট্রফি থেকে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জয়ের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন বিশেষ করে এই চারজন খেলোয়াড়—অধিনায়ক কালিচরণ, উইলিয়ামস, প্যারী এবং হোল্ডার। স্পিন বোলার ডেরেক প্যারী যেন একাই একশো। দ্বিতীয় ইনিংসে প্যারী ৬৫ রাণ করে দলকে চরম শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। অপর দিকে মাত্র ১৫ রাণে ৫টা উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৯৪ রাণের মাথায় ফেলে দিতে সাহায্য করেছিলেন ভ্যানবার্ণ হোল্ডার ৪৪রাণে ৭টা উইকেট পান— প্রথম ইনিংসে ২৮ রাণে ৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬ রাণে ১ উইকেট। এক বছর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলতে গিয়ে হোল্ডার পায়ে দারুণ চোট খেয়ে টেস্ট খেলার আসর থেকে অকালে বিদায় নিয়েছিলেন। তখন টেস্ট খেলায় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল—৩১টা টেস্টে ২৮২৯ রাণে ৯০ উইকেট। কেরী প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চারজন শীর্ষস্থানীয় পেস বোলার তৃতীয় টেস্ট থেকে বাদ পড়ার ফলেই তো হোল্ডার আবার টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলেন এবং প্রমাণ করলেন তিনি এখনও ফুরিয়ে যান নি।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রব সিম্পসন টসে জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে প্রথমে ব্যাট করতে দেন। এর আগের তিনটে টেস্টেই তিনি টসে হেরেছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট পড়ে ২৮৩ রান উঠেছিল। অধিনায়ক আলভিন কালিচরণ মাত্র ৮ রানের জন্য সেঞ্চুরী থেকে বঞ্চিত হন। ওপনিং ব্যাটসম্যান বেসিল উইলিয়ামস ৮৭ রান করে আউট হন। এটা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা। মাত্র ১৬ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ে যায়। এরপর ৩য় উইকেটের জুটিতে গোমেজ (৩০ রান) এবং উইলিয়ামস দলের ৯৫ রান যোগ করে নড়বড়ে ভিত শক্ত করেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৯২ রাণের মাথায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র এক মিনিট আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ২৯০ রাণের মাথায় শেষ হয়। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২ রাণে এগিয়ে যায়। যেখানে ৫টা উইকেট পড়ে ২৫৪ রাণ ছিল সেখানে ২৯০ রাণের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ রীতিমত এক নাটকীয় ব্যাপার। এই নাটকীয় ঘটনার নায়ক হলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩২ বছরের পেস বোলার ভ্যানবার্ণ হোল্ডার। নতুন বল হাতে পেয়ে ৩৫টা বল খেলে তিনি মাত্র ১০ রাণ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ৫টা উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ইয়ালপ এবং সার্জেন্ট দলের ১০১ যোগ করেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের রাণ দাঁড়ায় ২৮০ (৯ উইকেটে)। লাঞ্চের সময় ছিল ৮৪ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৭২ (৬ উইকেটে)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৫১ রাণের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়লে অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে খেলার মোড় ঘুরে যায়। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই দুঃসময়ে ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন ডেরেক প্যারী। তিনি কেবল ব্যক্তিগত ৬৫ রাণই করেন নি। প্যারী ৭ম উইকেটের জুটিতে শিবনারিনের সহযোগিতায় দলের ৫৩ রাণ এবং ৮ম উইকেটের জুটিতে ফিলিপের সহযোগিতায় দলের ৬৯ রাণ যোগ করেছিলেন। তৃতীয় দিনে ফিলিপ ৩৯ রাণ করে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ২৯০ রাণের মাথায় শেষ হয়। এইদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র ১৫ মিনিট ব্যাট করেছিল। ফিলিপ ৪৬ রাণ করে আউট হন। খেলায় জয়লাভের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে ২৯৩ রাণের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল পর্যাপ্ত সময়—বারো ঘন্টা। কিন্তু তিন ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ৯৪ রাণের মাথায় শেষ হয়। দশের ঘরে রাণ তুলেছিলেন এই চারজন—ইয়ালপ (১৮ রাণ), উড (১৭ রাণ), ট্রেহি (১৭ রাণ) এবং বিক্সন (১৩ নট আউট)। অস্ট্রেলিয়ার এই দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংয়ে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্যারী (১৫ রাণে ৫)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২৯২ রাণ (বেসিল উইলিয়ামস ৮৭ এবং কালিচরণ ৯২ রাণ। টমসন ৬৪ রাণে ৩, ক্ল্যার্ক ৬৫ রাণে ৩ এবং হিগস ৫৩ রাণে ৩ উইকেট)।

ও ২৯০ রাণ (গিলমোর ৬৯ এবং প্যারী ৬৫ রাণ। ইয়াডলি ৪০ রাণে ৪ এবং সিম্পসন ৩৯ রাণে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া ঃ ২৯০ রাণ (ইয়ালপ ৭৫, সার্জেন্ট ৪৯ এবং ট্রেহি ৪০ রাণ। হোল্ডার ২৮ রাণে ৬ উইকেট)

ও ৯৪ রাণ (ইয়ালপ ১৮ রাণ। প্যারী ১৫ রাণে ৫ এবং জুমাদিন ৩৪ রানে ৩ উইকেট।

দর্শক

চিত্রধ্বনি

১৯৭৯
যে সব ছবি দেখব

৭৬, ৭৭ ও ৭৮-এর এই পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রায় শতাধিক ছবি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সুস্থ ছবি হয়েছে ৭।৮টি। বাদবাকী ছবি শুধু যে শিল্প বা বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে দুর্বল তা নয়, ছবি-গুলো তেমন আর্থিক সাফল্যও পায় নি। ৭৮-এর বাকী সময়টাও মনে হয় এভাবেই কেটে যাবে। কিন্তু ১৯৭৯তে দর্শকেরা বেশ কিছু ভাল বাংলা ছবি দেখার সুযোগ পাবেন, যদি ছবিগুলো ঠিকমত মুক্তি পায়। অঞ্জন, বুদ্ধদেব, নীতিশ, বরুণ, অমিতাভ বিপ্লবদের মত তরুণেরা ইতি-মধ্যে ছবি শেষ করে বসে আছেন।

অন্য দিকে সত্যজিৎ রায়, পুণেন্দু পত্রী, নারায়ণ চক্রবর্তী, বিমল ভৌমিক, রাজেন তরফদারদের মত অভিজ্ঞদের সঙ্গে বেশ কিছু সম্ভাবনাময় তরুণও ছবি শুরু করছেন বা করার কথা ভাবছেন। এসব পুরোন সংবাদ। বাংলা ছবির দর্শকদের কাছে এ আজ অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু এর মধ্যে একটি নাম উল্লেখ হয় নি। আমরা দর্শকেরা অনেক দিন ধরে তাঁর ছবি খুঁজছি। ১৯৭৪য়ে তিনি শেষ ছবি করেছিলেন ব্যাংক থেকে ঢাকা ধার করে। ১৯৭৩ থেকে বাংলা ছবি তৈরীর জন্য আমরা তাঁকে কোন প্রযোজক দিতে পারি নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও ৭৩-৭৪এ তিনি দুটো বাংলা ছবি করেছেন, ছবি দুটো প্রশংসা পেয়েছে, স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ কি এক অজানা চক্রান্তে পেশাদার প্রযোজক, পরিবেশক তাঁর কাছ থেকে দূরে। এ সত্ত্বেও তিনি বসে থাকেন নি। ৭৫-৭৬এ করেছেন একটি হিন্দি ছবি ও ৭৬-৭৭এ একটি তেলেগু ছবি। আমরা অনেক বারই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, কেন বাংলা ছবি করছেন না? তিনি বলেছেন, বাংলায় আবার ছবি করব। আজ নয় তো কাল। এবং তা করব প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শকদের নির্দেশে নয়, করব নিজস্ব উপলব্ধির দাপটে, নিজস্ব অনুভূতিকে সম্বল করে। যে ভাষা নিয়ে ছবি করব, তার ভাষা আমার বুকে, আমার সমস্ত অস্তিত্বে ....সে ভাষা দারিদ্র্যের, কঞ্জনার, প্রতি-বাদের।

আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে তিনি আমাদের অনন্তকালের অপেক্ষায় রাখেন নি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, ছবি শুরু হচ্ছে।

বললাম, মালয়ালম ভাষায় নয়।

না, বাংলায়।

এক ভূমিহীন কৃষক পরিবারে সন্ত ছাড়িয়ে শহরে পাড়ি দেয় বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। তার বুকে এক গভীর স্বপ্ন। শহরে এসে সে কাজ খোঁজে,...এখানে তার আশা, ব্যর্থতা, বাঁচার চেষ্টা....সে দেখে তার মত অসংখ্য মানুষ এখানে-ওখানে কিভাবে জীবন কাটাচ্ছে, সে তাদের কাছে যায়, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে একটা ঐক্য— খুঁজে পায় লড়াইয়ের জমি, এবং তারপর..

ছবিটির নাম পরশুরাম। অভিনয় করবেন বাংলার গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীরা। যাঁদের মধ্যে আছেন নীলকণ্ঠ, অরুণ, বিভাসেরা। কাহিনী-চিত্রনাট্য ও সংলাপে মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক স্বয়ং। ছবিটির পরিচালক মৃণাল সেন।

তাঁর ওকা উরি কথার ভাষা তেলেগু। সম্প্রতি এই ছবিটি বাংলা ভাষায় ডাবিং-এর জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ই আই এম পিয়ের একটি আইন। ১৯৭৬এ ইন্টার্ণ মোশান পিকচার্স একটি নিয়ম চালু করে যার মোদ্দা কথা পূর্বাঞ্চলের বাইরের কোন ছবি পূর্বাঞ্চলীয় ভাষায় ডাবিং করা যাবে না। ফলে এই সংস্থা ওকা উরি কথাকেও এই নিয়মের মধ্যে ফেলতে চান। একটি সুফলের কথা চিন্তা করে এবং কলকাতা ও পূর্বাঞ্চলীয় ছবির ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই নিয়মটি করা হয়েছিল। এমনিতে আঞ্চলিক ছবির রিলিজ চেন খুবই কম। আর এর মধ্যেই যদি শোলে জাতীয় হিন্দি ছবি ডাবিংয়ের সুযোগে ঢুকে পড়ে, তাহলে আঞ্চলিক ছবিগুলোর মুক্তিতে অসুবিধে দেখা দেয়। কিন্তু সমস্ত আইনের মত এ আইনেও ফাঁকা জায়গা অনেক। ফলে ডাবিং না করে অনেকে ডবল ভার্সানের সুযোগ নিচ্ছেন। আমার মতে এই নিয়মের সামান্য পরি-বর্তন দরকার। আমরা দর্শকেরা ভাল ছবি দেখতে চাই। আমাদের ভাষায় ভাল ছবি হোক। আর এর পথ প্রস্তুত করতে হলে চাই কিছু ভাল ছবির পরিবেশনা। ভারতের নানা আঞ্চলিক ভাষায় বেশ ভাল ছবি তৈরি হচ্ছে — কানাড়া, গুজরাটি, মালয়ালম প্রভৃতি নানা ভাষার। জাতীয় ও আন্ত-র্জাতিক স্বীকৃতিও অনেক ছবি পেয়েছে। সেগুলো যদি বাংলা ভাষায় তর্জমা করে আমাদের দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা দর্শকেরা প্রান্তমনস্ক হতে পারব,শিল্পসম্মত ছবির এখানে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম পাবে, যা বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির মর্যাদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

মৃণাল সেনের ওকা উরি কথা আমি দেখি নি। কিন্তু তাঁর অন্যান্য সব ছবিই আমি দেখেছি। এবং সেই পরিচিতি থেকে সাধারণ যে ধারণা করতে পারি—তাহল ছবিটি একটি সৎ ও সুস্থ চলচ্চিত্র। আমরা অনেক দিন বাংলা ভাষায় ভাল কোন ছবি দেখতে পাই নি। যদি ওকা উরি কথার মত দু-চারটে ছবি এখানে থাকত, তাহলে এই ছবিটির বাংলা অর্জমা না করলেও কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন আমরা ভাল ছবির সংজ্ঞা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছি, তখন মৃণাল সেনের এই প্রয়াসকে আমরা আন্তরিক স্বাগত জানাই। এই সঙ্গে ই আই এম পিএকেও অনুরোধ করব শুধু ওকা উরি কথা নয়, আঞ্চলিক ভাষার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো যদি বাংলা অর্জমা করে এখানে পরিবেশন করতে চায় তাহলে তার পথে দয়া করে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না, বরং তাকে স্বাগত জানানোর পরিবেশ সৃষ্টি করুন। কেননা এখান থেকে এবং এভাবেই তৈরি হবে রুচি, শিল্প-সাহিত্যবোধ। প্রস্তুত হবেন দর্শক। ফলে বাংলার ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে ভাল ছবি তৈরির পরিবেশ রচিত হবে। যাঁরা হিন্দি ছবিকে ঠেকিয়ে রাখার কথা ভাবছেন— তাঁরাও এটাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন—ভাল আঞ্চলিক ভাষার ছবিকে বাংলা ভাষায় ডাবিং করে। আমাদের প্রস্তাব ওকা উরি কথা সেই পথ প্রস্তুত করুক।

বিকাশ জানা

হিন্দি ছবি ও আফিং

'মানুষের জন্য পোশাক না পোশাকের জন্য মানুষ' এমন কোন প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি বলেন পোশাকের জন্য মানুষ তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় তিনি হিন্দি ছবির পরি-

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনীর পথে।

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬।।টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬।।টায়

নটরাজ-পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেঃ- বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, ঊশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

জনপ্রিয় হবার যোগ্যতা রাখেন। নাচ মার গান লাগ্য যদি তৈরী থাকে তবে কোন একটা কাহিনীর ওপর চাপিয়ে দিলেই হল। পোশাক যদি রং-এ ঢং-এ চটকদার হয় তবে মানুষটার ছাতে ফিট করা কি খুব মুস্কিল।

'বিশ্বনাথ'-এ হয়তো এবিষয়ে কিছু লংঘন থেকে গেছে কেননা পরিচালক সুভাষ ঘাই-এর হাতে অতিরিক্ত উপকরণ হিসেবে ছিলএক আদর্শনিষ্ঠ সরকারী উকিলের চরিত্র। সরকারী উকিল বিশ্বনাথ বাবুর চেয়েও জোরদার মেয়ের এক আমীর পুত্রকে খুন আর ধর্ষণ-এর অপরাধে জেলে পাঠাল। আমীরও কম যায় না, টাকার জোরে ঘুষ দেওয়ার মিথ্যে মামলায় উল্টে বিশ্বনাথকেই সে জেলে ঢোকালো। এইভাবে শুরু হল বদলা নেওয়া। একবার ঐ নেয়, তো একবার ও নেয়। একবার ও নেয় তো একবার এ নেয়। নিতে নিতে নিতে নিতে যেই না আড়াই ঘন্টা পার হল অমনি পুলিশ এসে শয়তানগুলোকে ধরে নিয়ে গেল।

শুধু 'বিশ্বনাথ' কেন 'বেশরম' ইত্যাদি অনেক হিন্দি ছবির হাইওয়ে এই বদলা

১৩৮৫র শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর
উদয়শঙ্করের
ইন্দ্রজাল
শ্রেঃ উদয়শঙ্কর; যাদুনায়িকা পূর্ণিমা, মঞ্জু, লক্ষ্মী, বীণা, তারক, দুলাল, তরুণ ও কাশী
পরিবেশনায়ঃ—
ইন্দ্রজাল থিয়েটার
৪৬।২৭ এস, এন, ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা ৭০০০১৪ ফোন ২৪৬৫৩৩
বিঃ দ্রঃ বুকিং চলিতেছে;
নায়েকরা যোগাযোগ করুন।

ক্রাউন
টেলিভিসান !!
A/C, D/C or Solid State
স্পষ্ট ছবি
আর মিষ্টি আওয়াজ
"ক্রাউনটিভি"
তাই "টিভি-সরতাজ" !
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, স্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

বিশ্বনাথ ছবিতে
বীনা রায় / শত্রুঘ্ন সিনহা

নেওয়া। যে কোন একটা গলি পথধরে হাই-ওয়েতে পৌঁছলেই হল। তারপর চলুন বা ছুটুন কিংবা সেফ বসে থাকুন, আড়াইটা ঘন্টা পার হলেই 'মঞ্জিল'—সত্যমেব জয়তে। এবং এখানে পৌঁছনোর জন্য পরিচালকদের প্রয়োজনে এবং তাঁদের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়াই আর একটি সত্য প্রকট হয়ে ওঠে—সেটা এই 'বুদ্ধির' উৎস মূলেরাডি। কোননা কোনভাবে প্রশাসনিক প্রতারণার শিকার আমরা দর্শকরা যখন দেখি ছবির নায়কও আমাদেরই মত প্রতারিত, বঞ্চিত তখন মনটা সহানুভূতির শিশিরে ভিজে ওঠে। আমরা যা পারিনি ছবির নায়ক কিন্তু তা করে ফেলে। লাঠি সড়কি চালিয়ে সে ন্যায়ের পাল্লায় ওজন চাপায়। ঝাঁকুনি খেয়ে উথলে ওঠা বিয়ারের ফেনার মত আমাদের অভিযোগ-অভিমানগুলো সান্ত্বনা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আবার। এইভাবে আমাদের কাম-ঠোকরা স্ফোভগুলো বুকের 'কোটরে পোষা' পাখরা হয়ে যায়। আমরা খুশী হই। দুই হাতে বাহবা বাজাই।

হাত তালির আওয়াজ কিন্তু ছবিঘরের চার দেওয়ালে আটকে থাকে না। দেয়াল পেরিয়ে পৌঁছায় সৃষ্টার উৎকর্ণ শ্রবণে। সৃষ্টির সার্থকতায় বুঁদ হয়ে তিনি শুরু করেন পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত পঞ্চম বা পঞ্চদশ সংস্করণ। তাঁর রসদ প্রেম-বাৎসল্য, ব্যভিচার-বলাৎকার, নৃত্য-গীত ও বোমা-বন্দুক, সাপ, তার মূলধন আমাদের যুক্তি বুদ্ধিহীন আবেগ সর্বস্ব মগজ। মানলুম আঙ্গিকে অনেক উন্নতি হয়েছে হিন্দি ছবির, কিন্তু তাতে তো শুধু পাত্রই বদল হয়েছে, খাদ্য কি? টক নুন ঝালের মাত্রায় কিছু রদবদল হোক বা না হোক আমাদের বুভুক্ষা যদি তা গোগ্রাসে গিলে উদরপূর্তির উদ্গার তোলে তবে কেউ কি কান পেতে থাকবে শিল্পে টাপরায় পরিতৃপ্তির সেই টকাস ধ্বনি-টির অপেক্ষায়। তবে দুষবোটা কাকে? হিন্দি ছবি ও তার পরিচালকের ষষ্ঠীপুজো করে মুঠোমাপা কটা লোক যদি সিনিক সাজার চেষ্টা করে তাতে কার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে। কারুরই না। কারণ আমরা আছি আমাদের অমোঘ অথচ অলস বুভুক্ষা নিয়ে, অক্ষম প্রতিরোধ প্রবণতা নিয়ে, বিরাট এক নেশা নিয়ে, এক বুক বোকা আবেগ নিয়ে। তাই বিশ্বনাথ বেশরমেরা শুধু নাম-বদল করে শিল্পী বদল করে একই কাহিনী নিয়ে আসবে যাবে, আর আমরা তাকে স্বাগত জানাবো।

ছবি তৈরী হবে আমাদেরই জন্যে, আমরা কখনো ছবির জন্যে তৈরী হবো কি?

প্রসঙ্গ বিশ্বনাথ ও বেশরম।

বিমান দাস

ভেল্কির খেলা

প্রিয়নাথ অব ঝিন্দা থেকে ঝিন্দের বন্দী, না ঝিন্দের বন্দী থেকে প্রিয়নাথ অব ঝিন্দা, এই আলোচনায় না গিয়েও বলব, আমাদের আলোচিত ছবি এ দুয়ের যে কোন একটির ওপর বা দুটোর ওপরেই নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। বোম্বাইতে এই রীতি অনেক দিন ধরে চলে আসছে। সালিম জাভেদ, নাবাযণ প্রমুখ কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকারেরা অনেক ছবি বা বই অনুসরণ বা অনুকরণ করে নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন। বন্দী ছবিতে দেখলাম গল্পকার হিসেবে আলো সরকারের নাম। এবং এ করে তিনি ভালোই করেছেন। কেননা ছবিটি মূল কাহিনী থেকে সরে না গেলেও যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তাতে তাঁর পূর্বসূরীরা নিশ্চয়ই লজ্জা পেতেন, সুখের বিষয় আলো-বাবু তাঁদের এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

'বন্দী' বাংলা হিন্দি উভয় ভাষাতেই নির্মিত। এবং হিন্দি ছবির যাবতীয় যা ফর্মুলা তা এখানে উপস্থিত। পরিচালক প্রযোজকের প্রধান উদ্দেশ্য ছবির মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জন। শিল্পটিল্প তাঁরা করতে যাননি, সেরকম উদ্দেশ্যও ছিল না, তাই এই ছবি কতটা শিল্পপরিচ্যুত, কোন শটের ডিটে-লসে কি গন্ডগোল, এরকম কোন আলোচনা এখানে উপযোগী নয়। কিন্তু তাঁরা যে ব্যবসা করার জন্য ছবিটি করেছেন, আলোচ্য ছবি যদি তাঁদের সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তাহলেও আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। অথচ ছবিটি রঙীন। এবং এ ধরনের ছবিতে সে জাতীয় চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ইত্যাদি হয়ে থাকে, কাহিনী বিস্তারে যেসব দৃশ্য দেখা যায়, 'বন্দী' তার সবকিছুকেই অনুসরণ করেছে। কমার্শিয়াল ছবির যেসব ফর্মুলা আছে, তার কোন একটার ওপর পরিচালক বিশ্বস্ত থাকতে চাননি। এ ধরনের ছবির দর্শকেরা কখন যে কি চেয়ে বসে, তাই তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সবরকম উপাদানের কিছু কিছু এখানে রক্ষিত।

কিন্তু মুশকিল বাধিয়েছে ছবির গল্প। ভারত সরকারের রাজন্য ভাতা বিলোপের

বন্দী ছবিতে
সুলক্ষণা পন্ডিত ও উত্তমকুমার

আগে থেকেই হিন্দি ছবিতে রাজা যুবরাজদের রাজত্ব প্রায় বিদায় নিচ্ছিল। এখন তো নেই বললেই চলে। এখন শোর্ড ফাইটিং এর বদলে ক্যারাটে, কুফুরা রাজত্ব করছে। পরিচালক তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনে এ ব্যাপারে সতর্ক হলে পারতেন। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য এই ছবির এবং এ জাতীয় ছবিতে দর্শকেরা এক বিশেষ ধরনের গান পছন্দ করেন, যে গানে সিটি, বাজবে, কোমর দুলবে, পয়সা ছোঁড়াযাবে। কিন্তু শ্যামল মিত্র এদিক দিয়ে দারুণভাবে ব্যর্থ। অথচ ছবিটিতে আছে দুর্দান্ত গতি ও অভিনয়। উত্তমকুমার যে কত বড় অভিনেতা, তা আরেকবার প্রমাণিত। এক অত্যন্ত সাধারণ ছকে বাঁধা চরিত্রে অভিনয় করেও তিনি দর্শকদের তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করতে বাধ্য করেন। তাছাড়া অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও অসি-চালনা, যদিও তাঁর হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর ভাগ্নি কাজটি সম্পাদনা করেছেন, তবুও এখানকার দর্শকদের কাছে এটা একটা বড় আকর্ষণ। আমজাদ, উৎপল, সুলক্ষণা, বিন্দু প্রভৃতি শিল্পীরা তাঁদের যথাকর্তব্য পালন করেছেন।

টেকনিক্যাল কাজ, বিশেষত ডাবিং, রং ও সম্পাদনা বেশ মনোরম। প্রথম ছবির দীর্ঘ আট বছর পরে আলো সরকার 'বন্দীর' মাধ্যমে হয়তো তাঁর প্রথম ব্যর্থতা মুছে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে 'ছোটী সী মুলাকাত' তার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে হিন্দি ছবির দর্শকদের কাছ থেকে যতটা সামনে এগিয়ে গেছিল, এই ছবি ঠিক ততটা পিছিয়ে গেছে।

পুনের রীলের তামাসা

ইতিপূর্বে বোম্বাই বাজার থেকে ম্যাক্স লড়কী হুঁ, দশ হাজার লড়কিয়াঁ, লড়কী ভোলীভালী ইত্যাদি সুপারহিট হয়েছে। লড়কী সিরিজে এবার হাজির হয়েছে বেশ রংচং মাখান লড়কী জোয়ান হো গ্যারী। দেশে-বিদেশে রাজনীতি, অর্থনীতিতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে কত কিছুর পরিবর্তন ঘটে, কেবল হিন্দী ছবিতে তার কোন বালাই নেই। হিন্দী ছবি তার নিজস্ব যৌবন নিয়ে কলকল খলখল শব্দে একই গতিতে বয়ে চলেছে। কোন বিরাম নেই। রীলের পর রীল জুড়ে প্রেম, নাচ-গানা, বন্দী কমেডী, ক্রাইম, মারামারির বিরাট অভিযান। দর্শকের বিচার ও রুচির গালে থাপ্পড় মেরে পরিচালক আনন্দ সাগানী অনায়াসে এই সব ঘটালেন। আমরা দেখলাম। কোন কেনর উত্তরের জন্য এই ছবি নয়। সার্কাসও এর চেয়ে বড় শিল্প। সরকার অপরায় বুঝতে গরীব বাঁচাতে নেশাভাঙ বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। ঠিক একই কারণে এই সব অনাসৃষ্টির জন্য এখানে তেমনি কোন ব্যবস্থ নেওয়া যায় কি ?

সুভাষ গুহ

সাক্ষাৎকার

আজকের সচেতন দর্শক কেন বাংলা ছবি দেখবেন ?

প্রমোদ লাহিড়ী

কৌতূহলী চোখে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'ছবি সুপার ফ্লপ হওয়া সত্ত্বেও আমি এই কারণে হ্যাপি, ইন্ডাস্ট্রিতে 'অযাস্থিক' ছবির মাধ্যমে আমি ঋত্বিকের মতো একজন পরিচালককে ইনট্রোডিউস করতে পেরেছি।'

শুনে আমি অবাক এবং পরক্ষণেই মুগ্ধ। ক্ষয় এবং ক্ষতি করে যাঁরা শিল্পের জন্য নিজেদের উজাড় করে ঢেলে দেন,—ঐসব বিরল মানুষদেরই একজন প্রযোজক প্রমোদ লাহিড়ী শুধুমাত্র প্রযোজক নন, চলচ্চিত্রের একজন পরিপূর্ণ মানুষ। দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একসময় বাংলা ছবির প্রসঙ্গ আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'দর্শক যে বাংলা ছবি দেখছেন না, এর কারণ কি ?'

শুনে বললেন, 'আমাকে বলো তো আজকের সচেতন দর্শক কেন বাংলা ছবি দেখবেন ?'

দর্শক তৈরি এবং তাঁকে সচেতন করার জন্যে প্রমোদবাবু ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলনের মাধ্যমে একটি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। এখানেই থেমে থাকেননি। তাঁর নিজের ভাষায়, 'কলাকুশলীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে কম বেশ এ মেম্বারশিপ দেওয়ার কথা একসময় ভেবেছিলাম। তাঁদের কাছ থেকে সাড়া পাইনি। আজ যাঁরা একই সঙ্গে চার-পাঁচটি ছবি করছেন, তাঁদেরও ডেকে ছিলাম। সবকিছু জেনে বসে আছে এমন ভাব করে পাশ কাটিয়ে গেছে। এদিকে দর্শক তৈরি। তাঁরা কেন ঐসব বাঁধাধরা ফর্মুলার ট্র্যাশ দেখবেন ? ওঁরা নতুন কিছু চান। যে কারণে ইদানিং ধর্মীয় ছবিগুলি হিট করছে।'

বেশরম ছবিতে অমিতাভ বচ্চন

একটু থেমে বললেন, 'চলচ্চিত্র একটি যৌথ শিল্প। এখানে সাহিত্য, সঙ্গীত, পেইন্টিং—সব আছে। অথচ এরা বোঝে না। চেষ্টাও করে না।'

পেইন্টিং প্রসঙ্গে নানান কথার ফাঁকে বুনুয়েল কিভাবে তাঁর 'ভিরিডিয়ানা' নামক অবিস্মরণীয় ছবিতে 'দ্য লাস্ট সাপার' পেইন্টিংটি ব্যবহার করেছেন তা বললেন। এরপর এলো সঙ্গীত এবং সাহিত্যগুণসম্পন্ন চিত্রনাট্য প্রসঙ্গ। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যাবে আমরা প্রযোজক বলে চিনি, তিনি কিভাবে আমার চোখের সামনে কখনো সঙ্গীতজ্ঞ, পরক্ষণেই দক্ষ চিত্রনাট্যকার, তারপর ছবির সমঝদার হিসেবে এলেন।

একসময় আমি পিটার উস্তিনভের অভিনয় প্রসঙ্গ আনতেই বললেন, 'হ্যাঁ, ঐ

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও
নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র

মেট্রোপলিটন
কলেজ

সঙ্গীত প্রবীণ ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে
শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত ঃ শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী
লঘু-সঙ্গীত ঃ শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ
তবলা ঃ শ্রীসবীর খাঁ
রবীন্দ্র-সঙ্গীত ঃ শ্রীঅমল নাগ
(দক্ষিণীর প্রাক্তন শিক্ষক)

শিশু বিভাগে রবীন্দ্র-সঙ্গীত
বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

২৪১।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা,
কলিঃ-৩৪, ফোন ঃ ৪৫-০৯৩৯

ছলেই কি অভিনয় ক্ষমতা থাকে? আমাদের এখানকার অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারে কী অসাধারণ অভিনয়ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা আছেন। কিন্তু ওদের সুযোগ নেই। আর একটা কথা, এখানে ফিল্মিক এ্যাকটিং নেই বললেই চলে। বলেই তিনি ফিল্মিক এ্যাকটিং কি এবং কেন, তা আমাকে বোঝাতে লাগলেন। এবং কেন, তা আমাকে বোঝাতে লাগলেন। কিভাবে বাংলা চলচ্চিত্র সংকটমুক্ত হবে, প্রশ্ন করতেই বললেন, 'নতুন ব্লাডের দরকার। কিন্তু তাঁদেরও সমস্যা অনেক। স্বপ্ন, আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে চিত্রনাট্য লেখার পর প্রযোজক কি পরিবেশকের কাছে গেলেই তো শুনতে হবে—ঐ সিকোয়েন্সে একটা গান

প্রমোদ লাহিড়ী

হচ্ছে এ্যাকটিং। আর আমাদের এখানে দ্যাখো—। আরে বাবা লালু লালু চেহারা দিন। একটা কোর্ট সীন রাখুন, হিরো করুন অমুককে। এদিকে যা চরিত্র, অমুক খাপ খায় না। তাঁদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা অনেক উপদেশ দিয়েছেন। কাজ হয়নি। একের পর এক ছবি ফ্লপ করেছে। আর উপদেশ দেবেন না। একই সঙ্গে নতুন ছেলেদের বলি, ছবিতে দুর্বোধ্যতাকে বেশী প্রাধান্য দেবেন না। ওতে কাজ হয় না।'

'আপনি আর ছবি করবেন না?'

'—করবো। তবে 'অযান্ত্রিক'-এর মতো কয়েক দশক এগিয়ে যাওয়া ছবি আর করবো না।'

নিয়মিত দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি চলচ্চিত্রের উন্নতিতে কোনো ভূমিকা পালন করছে কিনা প্রশ্ন করায় বললেন, 'নিশ্চয়ই করছে। তবে সমালোচনা যাতে কনস্ট্রাকটিভ হয়, সেদিকে কিন্তু সমালোচকের নজর দেওয়া উচিত। এই প্রশ্নের উত্তরে তোমাদের পত্রিকায় এক পরিচালক তোমাকেই একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ফিল্ম এ্যাপ্রেসিয়েশন গ্রুপের মুখপত্রগুলি গদার হুফো কি করছে, তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, যাঁরা হুফো গদারের ধারে কাছে যান না, তাঁদের কাছে তো ঐ ধরনের আলোচনা অনর্থক ঠেকবেই। ওঁদের বদলে এখানকার টম্-ডিক-হ্যারির ছবির আলোচনা করলে কি বাংলা ছবির উন্নতি হবে? গদার হুফো নিয়ে কি আলোচনার কোনই প্রয়োজন নেই? এখানে যাঁরা সৎ ছবি করেছেন তাঁদের নিয়েও তো আলোচনা হয়েছে। আসলে যাঁরা কমপ্লেক্সে ভোগেন, তাঁরাই এই ধরনের মন্তব্য করেন।

বর্তমান সরকার বাংলা ছবি নির্মাণের জন্যে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বললেন, 'আশার কথা। সুখের কথা। তবে সরকারকে অনুরোধ করবো, অর্থ যাতে যোগ্য পাত্রে যায়, সেদিকে তাঁরা যেন লক্ষ্য রাখেন। কোনো রকম পক্ষপাতিত্বকে প্রশ্রয় দিলে উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে হবে।' বলে প্রমোদবাবু থামলেন।—যিনি ভীষণ আনহ্যাপি। কারণ তাঁর ছবি কমার্শিয়ালি সাকসেস হয়নি বলে তিনি ইন্ডাস্ট্রিকে ক্ষতিকরের মতো আরো দুএকটি পরিচালক দিতে পারেন নি।

নির্মলকুমার দাস

সরগম এর আনন্দ আসর

গত ১৬ এপ্রিল রবীন্দ্র ভারতীর রবীন্দ্র মঞ্চে সরগম সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত 'সরগম আনন্দ আসর' অনুষ্ঠিত হল। সংস্থার শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আসরে অংশ নিয়েছে। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল সমবেত কণ্ঠের রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান, হাসির গান, বুশী রূপকথার নাট্যরূপ, বাগাশ্রয়ী গান, ঝুমুর, ধানকাটা, ধান বোনা এবং মাঝিমাল্লার গান। এছাড়া নাচের বিভাগে ভারত নাট্যম, যতিস্মরম, ভারত নাট্যম, তিল্লানাও ছিল। আর ছিল চিত্রপ্রদর্শনী।

সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্তের গানের আসরটি ভালো লাগল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর পরিচালনায় ধান কাটার নাচ অনুষ্ঠানটিও ভালো। সব চেয়ে ভালো লেগেছে বুশী রূপকথার নাট্যরূপ 'কোঁকর কোঁ'। পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় ছিলেন সীমা দাস। বিভিন্ন ভূমিকায় বিবি দাস, বলাকা চক্রবর্তী, কৌশিক চৌধুরী, মধুবন্তী পাল, মুনিয়া রায়, সুরেখা পাল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এমন একটি অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করার জন্য সীমা দাস অবশ্যই প্রসংশা পাবেন। শুভাপ্রসন্নের তত্ত্বাবধানে চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন, নন্দিনী চক্রবর্তী, শতরূপা চট্টোপাধ্যায়, সায়ন্তনী দাস, দুর্বা বসু ও আরও কয়েকজন। সঙ্গীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গতে সহযোগিতা করেছিলেন বালক নন্দী, শ্যাম মুখোপাধ্যায় এবং রঞ্জন দস্তিদার।

দিগ্বিজয় দিকপতি

'সুস্থ সংস্কৃতির জন্যই রবীন্দ্রচর্চার প্রয়োজন'

২৫শে বৈশাখ সংখ্যা

- বহু নামী কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে বহু তরুণ কবি সাহিত্যিকের প্রবন্ধ কবিতা থাকবে।
- রবীন্দ্রসদনে ২৫শে বৈশাখের ভোরে সংগ্রহ করুন। মূল্য—এক টাকা।
- দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে থাকবে ন্যাস নাটক, অনুবাদ গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, রাশিফল, জ্যোতিষ প্রশ্ন-উত্তর ও কবিতা।
- বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—পনেরো টাকা মাত্র; ষাণ্মাসিক গ্রাহক চাঁদা—আট টাকা মাত্র।

প্রকাশিকা

মন মধুকর। ব্যান্ডেল। হুগলী

দুঃসাধ্য রোগ।

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেতদাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯; শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

1 MAY 1978

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০৫

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol.1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক স্টোর্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 12th May, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুক্‌মীর নাম জুড়ে হুবহু কুক্‌মী (Cookme) নামের ষ্টাইল নকল করে আসল কুক্‌মী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুক্‌মী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুক্‌মী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ যুগন্ধর গ্রন্থ

—নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল—

বিমল মিত্রের

একক দশক শতক

এই উপন্যাসখানি এক বিশেষ কালের সামাজিক-ইতিহাস জীবনের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিমল মিত্রের অসামান্য শক্তির সার্থক নিদর্শন। ত্রিশ টাকা

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কৈলাস ও মানস সরোবর

হিন্দুর সেই দুর্গম ও পৌরাণিক তীর্থ যার স্মরণ মনন মাত্রেই রোমাঞ্চ জাগে পুণ্যার্থীর মনে ভগবান শিবের আবাসস্থান—যে তীর্থপথ আজ আমাদের কাছে রুদ্ধ তারই সত্য ও বাস্তব বিবরণ। সুদৃশ্য কভার ও অসংখ্য ছবি বইটির একটি বাড়তি আকর্ষণ। কুড়ি টাকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপনগর

উপন্যাস ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয়। দীর্ঘ উপন্যাস কিন্তু আশুতোষের শক্তিশালী লেখনী ও কাহিনী বয়ানের আশ্চর্য শক্তিতে বুদ্ধশ্বাসে পাঠ করার মতো কৌতূহল সৃষ্টি করে। এই রূপনগরের স্বপ্ন কি আমরা সবাই দেখি না? চল্লিশ টাকা

বাংলাসাহিত্যের রহস্যময় লেখক

প্রবোধকুমার সান্যালের

বহু বিতর্কিত বহু প্রশংসিত

স্মৃতিচারণ

বনস্পতির বৈঠক

সকল মানুষেরর সমগ্র জীবন বিরাট একখানা গ্রন্থের মতো। সেই বিরাট গ্রন্থ থেকে ছোট ছোট কয়েকটি টুকরো তুলে নিয়ে এই স্মৃতিচারণ। এ স্মৃতিচারণে একটি বিশেষ কালের পটভূমিকে ধরা হয়েছে যার আরম্ভ ১৯০৫এ এবং যেটি শেষ হয়েছিল ১৯৪৪এ। সেই কালটিকে ধরে লেখক নিজে তৎকালীন কয়েকটি ছবি এঁকে গিয়েছেন অনেকটা মুক্ত ত্রালকায়। স্মৃতিচারণ কেবলমাত্র স্তুতিবাদ নয়—আত্মপ্রচার তো নয়ই। স্মৃতিচারণের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সত্য রক্ষার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। আত্মগোপনশীলতা বা অপলাপবৃত্তি স্মৃতি-চারণের প্রধান শত্রু। নির্ভুল তথ্যাদির দোহাই দিয়ে অনেক মূল অসত্যকে মনোহর চেহারায় সাজিয়ে তোলা যায় বটে, কিন্তু সত্যের ইতিহাসে সেই স্মৃতি বিবরণ চাটুপ্রধান হয়ে থাকে। বাঙালী সাহিত্য পাঠকের সৌভাগ্য ক্রমে বনস্পতির বৈঠক সেই শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্য নিরস আত্মজীবনী হয়ে উঠে নি। উপরন্তু সেই বিশেষ কালের এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে। ১ম ও ২য় খণ্ড—৩৮

—কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

সুমথনাথ ঘোষের

সুন্দরের পিয়াসী ৮

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

অর্জুনের অজ্ঞাতবাস ১২

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কথা কল্পনা কাহিনী ১৬

স্বামী রামানন্দ ভারতীর নতুন গ্রন্থ

হিমারণ্য ৮

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নতুন গ্রন্থ

ফিরে ফিরে চাই ১৬

সমরেশ বসুর

আনন্দ ধারা ৬

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

রক্তের বিষ ৭-৫০

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। ৩৪৮৭৯১

৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪৩৪৯২

শিয়ালদহ হয়ে শিলাইদহ

শিয়ালদহ স্টেশন ১৮৮১

শান্তিনিকেতনের বক্ষুর খোয়াই থেকে শিলাইদহের প্রমত্তা পদ্মা অনেক দূর। 'উর্মিল শাল কাঁকরের নিঃস্তব্ধ তোলপাড়' থেকে 'শ্রান্ত রূপসীর মতো প্রসারিত তনু পদ্মার উচ্চ-তটতল'—কবি মনের এই ক্রমঃ পরিবর্তনের বিচিত্র পথ শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত প্রসারিত। বারংবার কবির এই পথ-পরিক্রমার সহস্র স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে শতাব্দী-প্রাচীন শিয়ালদহ।

পূর্ব রেলওয়ে

অমৃত
১৮ বর্ষ
২য় সংখ্যা
৪ জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৫
19 May, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
আমি কেমন আছি ৫
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৭
পর্যবেক্ষক
কবিতা ৮ গৌরাঙ্গ ভৌমিক,
তুষার চৌধুরী, সমীর চট্টোপাধ্যায়
অসিত পালের ড্রয়িং ৯
প্রচ্ছদকাহিনী ৮
বাঙালীবাবু/নারায়ণ দত্ত
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
শ্যামল দত্ত রায়
দুই দিকপালের মুখোমুখি ১৭
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ২৬
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
এই রকম (গল্প) ৩১
আশিস ঘোষ
লালবাই-এর দেশে ৩৫
রেখা বড়ুয়া
যাঁদের দেখেছি ৪০/অনন্ত সিং
হৃদয়নন্দন বনে (উপন্যাস) ৪৪
সোমেন্দ্রনাথ রায়
তৃতীয় আন্তর্জাতিক চারুকলা
প্রদর্শনী ৪৭ শৈবাল ঘোষ
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৫৪
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
খেলা ৫৯
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী : উড়ন্ত পরী
লিখেছেন শ্যামাপ্রসাদ সরকার
রমেন্দ্র রায়ের গল্প
বিলায়েৎ সম্পর্কে লিখেছেন
তথাগত চক্রবর্তী

ঔপন্যাসিকের কন্সটিটুয়েন্সী

ভোটের প্রার্থীর মত লেখকেরও একটা নির্বাচনী এলাকা আছে। সেখান থেকেই তিনি বারবার রস আহরণ করবেন। সেখানেই তাঁর শেকড়। প্রহর, সময়, ঋতু ও রুচি নির্দিষ্ট চৌহদ্দির ভেতরেই তাঁর শিল্পের জগৎ।

যে লেখকের বই পড়ে বোঝা যায় না—চরিত্রগুলো পৃথিবীর কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে, এখন ক'টা বাজে, কিংবা বছরের এটা কোন্ সময়— সে লেখা শেকড়বিহীন।

টলস্টয় কিংবা উপন্যাসের গ্রেট মাস্টাররা তাঁদের লেখায় পদবীসমেত মূল চরিত্রের বয়স, পোষাক ও রুচির কথা বলে দেন। তাঁরা উপন্যাসে বর্ণিত সময়কাল, সাল তারিখ নির্দিষ্ট করে দেন। শীতকালে বরফের ওপর দিয়ে স্লেজগাড়ি ছুটে যায়। গণদেবতায় লাঙলের ফলা ঠিকমত পোড়ানো যাচ্ছে না বলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা বসে।

আমাদের প্রিয় গ্রন্থগুলির কোন কোনটির বয়স চল্লিশ অতিক্রান্ত। তাদের পুরোন করে দেবার মত বই গত চল্লিশ বছরে কেন আসেনি খুঁজতে গিয়ে দেখলাম—আমাদের হাতে ঘোরা চলতি বইগুলোর কোন ঋতু, সাল তারিখ, পদবীসমেত নায়কের নাম নেই।

আরো একটি জিনিস দরকার। তা হ'ল সংঘাত। যে উপন্যাসে দুই বিরুদ্ধ চিন্তার কোন প্রবল সংঘর্ষ নেই তা আসলে নিরস্থি গদ্যের সমাবেশ। এরকম গদ্যে কিছু প্রেম ও কিছু সেক্স ছিঁটিয়ে দিয়ে রবারের মত টেনে বাড়ানো গল্পকে ইদানিং উপন্যাস বলে চালানো হচ্ছে। সুখের কথা লেখাগুলি স্বল্পায়ু।

কালজয়ী রচনার আরেকটি লক্ষণ—সমগ্র গদ্য থেকে রসিকতার ছটা ঠিকরে বেরোবে। এই চাপা হাসির রসিকতা বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতে তীব্র। সাধু গদ্যে তারাশঙ্করও কম প্রবল নন। একই কথা বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের বেলাতেও খাটে। খাটে শরদিন্দুর বেলাতেও।

কিন্তু তারপর থেকে সব ঔপন্যাসিককেই দেখি রসিকতাবিহীন ও ভয়ঙ্কর গম্ভীর। ফলে খানিক পড়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। এমনটি ঘটে কেন?

ঘটে, কারণ, যে-প্রবল জীবন যাপন করলে সর্বাঙ্গীণ রসবোধ গড়ে ওঠে সে জীবনের বড়ই অভাব। রেল কিংবা এজি বেঙ্গল অফিস থেকে লেজারে নিয়ত কোন লোককে ধরে এনে উপন্যাস লিখতে বসিয়ে দিলে যা ঘটতে পারতো, উপন্যাসের নামে এখন তাই ঘটছে।

সাহিত্য ইত্যাদি....

রবীন্দ্রনাথ কি ট্র্যাজিক হিরো ?

হিরণকুমার সান্যাল, অর্থাৎ আমাদের হাবলদা হঠাৎ একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পড়াশোনা কদ্দুর করেছেন ?

কথা হচ্ছিল গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে। হাবলদা আমার প্রতিবেশী ছিলেন। সুযোগ পেলেই রাস্তায় হাঁটা ছিল তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। মাঝে মাঝেই তাই দেখা হয়ে যেত তাঁর সঙ্গে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতে গল্পগুজব চলত। কিন্তু এমন বেমক্কা ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন কোনোদিনই করেন নি তিনি। বেশ একটু হকচকিয়েই গিয়েছিলাম তাই। তবে লোকটি তো হাবলদা। কোনো কিছুই অপ্রত্যাশিত ছিল না তাঁর বেলায়। বরং বলা যায়, সেইটেই ছিল তাঁর ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। অতএব অন্য কেউ যে প্রশ্ন করলে চটে যেতাম, হাবলদার বেলায় তেমন কিছু ঘটল না। চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষার ডিটেলগুলো জানালাম।

হাবলদা বললেন, ঠিক আছে। ইংরেজি সাহিত্যের বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন দেখছি কিছুটা। তাহলেই হবে। বলে তাঁর সেই চিরপরিচিত ঢঙে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো নিঃশব্দে একটু হেসে ব্যাখ্যা-মূলকভাবে জুড়ে দিলেন, অনেককে দেখেছি কিনা, সাহিত্য নিয়ে খুশিমতো মন্তব্য করে যাচ্ছেন, কিন্তু সাহিত্য বিচারের গোড়াপত্তনই ঘটে নি। কলেজে যদি এমনকি পরীক্ষা পাশের জন্যেও খানিকটা ইংরেজি বা অন্য কোনো ভালো সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা থাকে শেত্রতাব, অথথা বকে মবা থেকে বেহাই পাওয়া যায়। এ আমি অনেক দেখেছি। লেখাপড়ার দৌড় জানলে বুঝতে পারি, কার সঙ্গে কথা বলছি ? তিনি আমার কথা-টথা বুঝতে পাববেন বিনা। তা থাক। মণীন্দ্র রায় মহাশয়, বলুন তো, রবীন্দ্রনাথ একজন বড কবি, কিন্তু তার কবিতায় বা কবিদৃষ্টিতে ট্র্যাজিক সেন্সটা কোথায় ? মানে আপনি তো নিশ্চয়ই মানবেন, ট্র্যাজিক হিরো সুলভ একটা চরিত্র না থাকলে বড় কবি হওয়া যায় না। তাহলে বলুন তো, কোনদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজিক হিরো ?

এভাবে কখনো ভাবি নি, স্বীকাব করতেই হল। রবীন্দ্রনাথেব কবিতা আমার বহুকালের চেনা। বহুবার পড়েছি তাঁর কবিতা। বহু সমালোচকের বহু লেখা পড়েছি রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিবে। কিন্তু না, আর কখনো এমন ধরনের কোনো কথা শুনেছি বলে মনে পড়ল না। হাবলদাকে আমি ববাবর জানতাম বেশ একটু মজাদার মানুষ হিসেবে। হঠাৎ-হঠাৎ হকচকানো কথা বলা ছিল বহুকালের অভ্যাস। সেসব মন্তব্যের মধ্যে পবিহাসের সুরই বাজত বেশি করে, সিরিয়াস ভাবটা কমই থাকত। কিন্তু সেদিন যা বলেছিলেন তা এত নতুন, এমন আশ্চর্যবকম চিন্তা-জাগানো মনে হয়েছিল বে কী বলব। হাবলদা কী বলেন শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখে হাবলদা বললেন, পৃথিবী। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যে সম্বন্ধ, সেইটেই হল ববীন্দ্রনাথের আসল ব্যাপাব। সে এক আশ্চর্য বন্ধন, যা তাঁব জীবনেব অণুপবমাণুর সঙ্গে বাঁধা। যাকে ছাড়া তাঁব এক নিমেষও চলে না। অথচ ছেড়ে যেতে হবে তাকে, অনিবার্যভাবেই একদিন শেষ বিদায় নিযে চলে যেতে হবে। এই চেতনার জন্যেই রবীন্দ্রনাথেব মধ্যে এসেছে ট্র্যাজিক নো। আর এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজিক হিবো। বলে হাবলদা হাসলেন, তাঁর সেই কুইক ফেড্ ইন কুইক ফেড্ আউটের পেটেন্ট করা হাসি।

আমি বললাম, কিন্তু আনন্দবাদ ? সেই যে—আনন্দ থেকে সবকিছু জন্মে আর আনন্দেব মধ্যে মিলিয়ে যায়—এইসব উপনিষদ ঘেঁষা কথাবার্তাই তো ববীন্দ্রনাথ বেশি বেশি বলেছেন। তার কি ব্যাখ্যা ? দুটো মনোভাব কি একসঙ্গে মেলানো যায় ?

না যায় না। —হাবলদা সিরিয়াস সুরে চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, রবীন্দ্রনাথও পারেন নি মেলাতে। তাঁর শেষ লেখা কবিতা মনে আছে আপনার ?

কী ? সেই—আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন—এইসব কথা ?

হ্যাঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে রয়েছে প্রায় ষাট বছব ধরে লড়াই। আর এতেই রবীন্দ্রনাথ এত বড় হয়েছেন। প্রথম দিকের কবিতাগুলোর কথা ভেবে দেখুন। প্রভাত-সঙ্গীতের আগে প্রায় কবিতাই তো দীর্ঘশ্বাসে ভরা। তারপর এল সেই উপলব্ধি, 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।' কিন্তু সেখানেও আবার নতুন বিষাদের ছায়া—এই সুন্দর জগৎটাকেও ছেড়ে যেতে হবে। অতএব, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'।....কী ? ঠিক-ঠিক বলছি তো ?

নিশ্চয় ! —সুযোগ পেয়ে যেতেই উতোব গাইতে শুরু করলাম আমি, তারপর এল ক্ষণিক পুলকে ক্ষণিকের গান গাইবার কথা। রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, মৃত্যু আছে দুঃখ আছে তবু আনন্দ, ইত্যাদি। একটা মরীয়া লড়াই যেন। তারপর এল ফিলোমোফাইজ করার পর্ব। যখন পাওয়া গেল বলাকার কবিতা-গুলো। বলা যায় তার আগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বড় কবি, কিন্তু সেই সময়ে তিনি হলেন মহৎ কবি। সেই সর্বব্যাপী গতির চেতনা, যেখানে পর্বতও উড়ে যেতে চায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘের মতো। যেখানে কোনো থাকাই থাকা নয়, চলিষ্ণুতাই হল আসল সত্য। না-থাকার বেদনাকে যেন প্রায় জয়ই করে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ। যন্ত্রণা আব আনন্দ যেন একসঙ্গে মিশে গিয়ে এক অপরূপ দীপ্তিতে ভাস্বব হযে উঠল তাঁর কবিতাব মধ্যে। এইটেই তো বলছেন আপনি ? কিন্তু এটাও যেন শেষ কথা নয়। তাই আবার তাঁকে লিখতে হল পৃথিবীর মতো কবিতা। চির উদাসীন এই পৃথিবীর কাছে কী আর্ত মিনতি তাঁব শেষ বিদায়েব দিনে কপালের ওপর ছোট্টো একটি মাটির তিলকেব জন্যে ? এই জন্যে তো ট্র্যাজিক হিরো বলছেন রবীন্দ্রনাথকে ?

হাবলদা আমাব কথার কোনো জবাব দিলেন না। চেয়ে দেখলাম, আসন্ন সন্ধ্যাব রক্তিম ছটায় সমস্ত মুখ তার বিষণ্ণতায় ম্লান। দূরে আকাশের একটা অনিশ্চিত বিন্দুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি বেত্রাঘ্রের মূর্তির মতো।

মণীন্দ্র রায়

মফস্বলের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা

নয়ন তারা

আজই গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমাদের দপ্তরে লিখুন। সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের রচনাতে সমৃদ্ধশালী। একজন বেকার যুবকের ব্যাপক পরিশ্রমের সাফল্য হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তরুণ সাহিত্যিক, কবি ও প্রবন্ধকারের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। লেখা পাঠান। গ্রাহক হওয়ার জন্য আজই লিখুন।

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা

এক, দুই ও পাঁচ বছরে গ্রাহক চাঁদা সডাক বারো, আঠারো ও তিরিশ টাকা মাত্র কিছুদিনের মধ্যে নতুন প্রেস থেকে অভিনব কায়দায় নয়নতারা বাজারে আসবে।

আজই লিখুন :

সম্পাদক / নয়নতারা

অনিমেষ চক্রবর্তী

পোঃ গাইঘাটা, জিলা ২৪ পরগণা

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

এক একটা সময় আসে যখন পাগলের মত অস্থির লাগে নিজেকে। তখন মনে হয় পৃথিবীতে কোন নিরাপদ জমি নেই, বিশুদ্ধ চাকরি নেই। তখন বাইরের লোক-জন তোমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, ভয়ে ভয়ে দূরে সরে যায়। অবিনাশকাকাকে আমি মাঝে-মাঝেই এরকম হতে দেখতাম। বেহালার বাড়ির ঠিক উল্টো দিকেই এক চিলতে জমির উপর একটা সব পেয়েছির আসর বা মণিমেলা বা ঐ ধরনের অন্য কোন একটা ক্লাব ছিল। তারা বিকেল হতেই আয় মোরা সব রায়বেঁশে, জয় সোনার বাংলা, অকালে পুষিলাম পাখি—এসব নানা ধরনের গানটান করত। ওদের মধ্যে একটা ছেলে, বোধহয় কাস্টেন-ট্যাস্টেন গোছের কিছু একটা হবে, সে সাদা জামা সাদা প্যান্ট পরে বুকে অনেকগুলো মেডেল ব্যাজ ঝুলিয়ে বাঁকা নাকি সুরে ওসব গানে সর্দারী করত। কেমন অকারণে, একে-বেঁকে ছোটাছুটি করে ছেলেটা নিজেকে ব্যস্ত প্রমাণ করত সে কথা এখনও মনে পড়লে রাগে আমার গা জ্বলে যায়। অবিনাশকাকারও জ্বলত বোধহয়। খালি গা, লুঙ্গি পরা অবিনাশকাকা আকাশের দিকে চোখ ভাসিয়ে দিয়ে ও সময় অন্য কোথাও চলে যেতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর বোধহয় ডাকতারের মানা ছিল বেশী হাঁটা-হাঁটি না করতে। তাই রাস্তর এমাথা থেকে ওমাথা আস্তে আস্তে হেঁটে-চলে বেড়াতেন অবিনাশকাকা, ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত না মণিমেলার আসর শেষ হয়। তারপর নিঝুম হয়ে গেলে, সন্ধ্যের শুরুতে যেমন হয়, যেমন হত, শাঁখের আওয়াজ শুনতে পেতাম। এখন আর পাই না, কেন পাই না বুঝি না, কেবল না পেলে বড় কষ্ট হয় পেলেও যেমন হত, যেমন বুকের ভিতর থেকে একটা অনাহত শব্দ শুনতে পেতাম। মনে হত এই সমস্ত অন্ধকার, ঘাসের উপর হাওয়া, ঘাসের গোড়ায় ভিজে ভিজে ভাব, এই সব বাড়ি ফিরে আসা প্রতিদিন—এ এসের কোন মানে আছে। অন্য কোন মানে। তাকে আমি কোন দিনও, যতদিন এভাবে আছি, খুঁজে পাব না। আমাকে আরও আরও বড় হতে হবে। অনেক দূরে যেতে হবে। হয়ত একা-একাই। ছায়ায় অন্ধকারে মহাপ্রস্থানের পথটা আবছা আবছা চোখে ভাসত। সেখানে আমার সঙ্গে কেউ যাবে না. মা তখন বাবার কাছাকাছি থাকবে, ছোড়দি বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে—তবুও। এ সময় অবিনাশকাকাকে কেমন আধো চোখ বোজা অবস্থায় মণিমেলার মাঠের মাঝখানে বসে থাকতে দেখতাম। অনেকক্ষণ। আমার অবিনাশকাকাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করত। কোন গাঢ় বিদ্যুৎ বা কোন তীব্র আকাশ আমার হাতে দুলে ওঠে কিনা ও ছোঁয়ায় তা জানাতে আমার সাহস হয় নি। আবার অবিনাশকাকিমা যখন অনর্গল পাড়াপড়শির সঙ্গে মুখ খারাপ, চেঁচামেচি করতেন অবিনাশকাকাকে দেখতাম নির্বিকার মুখে রোয়াকে বসে পা নাড়াচ্ছেন অন্যমনস্ক। একটা সময়ের পৃথিবীর মধ্যে সব সময় অন্য আর একটা জগৎ অন্য আর একটা সময় খুঁজে নিতেন যেন। অজস্র তারার দল, উল্কা ছায়াপথের শেষে হয়ত হাজার হাজার জীবন অপেক্ষা করে আছে। একটা ফুরিয়ে গেলেই অন্য আর একটার চলে যেতে হবে। অবিনাশকাকার হয়ত তাই কোন তাড়া ছিল না। তিনি অপেক্ষা করতে পারতেন, মগ্ন হতে পারতেন। ইচ্ছে মত মনের সুইচ অন-অফ করা তাঁর কাছে সহজ ছিল।

কিন্তু আমার তাড়া ছিলো। অতনুর ছিল। শ্রীলার ছিল। সেকেণ্ড ইয়ারের মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন আমি কেমন যেন বুঝে গেলাম আমার শৈশব শেষ। সবুজ ঘাসের উপর থির থির করে পলক কাঁপুনিতে বাঁশি বাজানো আর হবে না। জীবনকে গোল্লা গোল্লা নরম তুলতুলে ভেড়ার ছানা বলে আমার আর মনে হয় না। বরং হলুদ রঙের উপর আশ্চর্য নিখুঁত এক বাঘ সামনে এসে দাঁড়ায়। সে বাঘ কেমন রহস্যে ভরা। তারারা আর আলোর বল্লম ছোঁড়ে না, বরং নক্ষত্রের জলে আকাশ ভিজে যায়। অপাপবিদ্ধতার থেকে অভিজ্ঞতায় চলে যাচ্ছি শ্লেকের কবিতার মতো। বিলকের ডুইনো এলিজি পড়া হয়ে গেছে। দুঃখের তিল তিল মুহূর্তগুলোকে মিলিয়ে মিশিয়ে মৃত্যু অবধি এক মসৃণ পথ গড়ে নিতে হবে। এখন ভেবে নিতে পারি এমন কোনো দিনের কথা যখন শ্রীলাকে দেখতে পাবো না। কলেজের নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো নিশ্চল শ্রীলাকে দেখে হঠাৎ একদিন মনে হোলো আমি কত সামান্য। শ্রীলা বোধহয় জানে না কোন্ প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে আমি ওর জন্যে বেসামাল ছিলাম। শ্রীলা বোধহয় জানে না ওর সামনে এলে আমি কতো দুর্বল হয়ে যাই। অথচ ওকে ছুঁয়ে ফেললেই আমার ভিতরের কবেকার কোন অসহ্য ময়াল বা সব শীতঘুম ভাঙে। তার চেয়ে শৈশবের সেই নরম বুকের ওমের কাছেই আরি অনেকটা নিশ্চিত ছিলাম। যে আমায় ভালোবাসার চোখ-মুখ এঁকে দিয়েছিলো, যে আমায় ভালোবাসার পৃথিবী চিনিয়ে-ছিলো। মার শরীরের ভিতরের সমস্ত জলে আমি ভালোবাসা জেনেছিলাম। মা কেবল হেসেছিলেন, বলেন নি তাঁর রহস্য। কেবল তিনি ছিলেন সুন্দরী, আমি ছিলাম নিরাপদ। শ্রীলার কাছে এলে আমার এসব কথা মনে হয়। আমি জানি মৃত্যু অবধি আমি ভালোভাবে চলে যাবো, তবুও কিছুটা সময় শ্রীলার আমাকে এগিয়ে দেওয়া উচিত। অথচ শ্রীলা কোনোদিনও সে দায়িত্ব নেবে না আমি জানি। নতুন কেনা আইসি-কিম-কোন্ কত সহজে ভিখিরীর ছেলেকে খাইয়ে দিতে পারে শ্রীলা আমি তা দেখেছি। আলতো ছোঁয়ায় ঘেন্না কুকুরের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে পারে। শ্রীলা এসব পারে। আমি শ্রীলাকে স্বপ্নে একবার চিৎপুরের নোংরা সরু গলি দিয়ে হাঁটতে দেখেছি। শ্রীলাকে মানিয়ে যায়। আমি সেসব মানতে পারিনি তখনো। বিলকে পড়া আমার সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি। কেন যে সময়ের উপর একটা আক্রোশ আসতো থেকে থেকে তখনো জানি না। অতনুরও এসেছিলো, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে। রত্নার গায়ে অতনুর নখের আঁচড় দেখে আমি তা বুঝেছিলাম। রত্না একদিন আমায় দেখিয়ে-ছিলো সেসব দাগ। সেই রত্না—যার ছবি দেখে জ্যোতি, আমি, অতনু ফ্ল্যাইং ক্লাবের ধারে কোনো এক মনমরা বিকেলে একটানা বহুক্ষণ একজোট হয়ে, বসেছিলাম। যার দু বিনুনীর ফাঁকে ছিল লজ্জা টলমল ভরা কপাল, চোখ আর চুলে বয়েসকালের কাঁপুনি আর অন্যান্য লক্ষণ। অতনুর প্রথম প্রেম, অথবা একমাত্র। অথচ অতনু ভিতরে ভিতরে একটা মৃত্যু সঙ্কেত পেয়ে গিয়ে ছিলো মৃত্যুর বহু আগেই। বড্ড বেশি শরীর দিয়ে রত্নাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলো। কেননা ওর হাতে সময় কমশ কমে আসছে। মৃত্যুর গন্ধ অনেকে কি করে জানি টের পায়।

ঘরটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। ভিতরে অতনু। একা একা বসে বোমা বানাচ্ছিল। একা, তাই সিগারেটে আগুন ধরিয়ে সময় কাটাতে চাইলো। সেই আগুনের একটা ফুলকে এসে বোমার মসলায় ঠিকরে পড়তে অতনু মারা যায়। সেকেণ্ড ইয়ার যখন শেষ হতে চলেছে সত্তর সালের শেষাশেষি হঠাৎ এক সন্ধেবেলায় আমায় সে খবর শুনিয়ে গেলো রত্না। খুব স্বাভাবিক গলায়, খবরটা জানিয়ে, রত্না চলে গেলো অন্য একটি ছেলের সঙ্গে। পরে একদিন, রবিবারের দুপুরে রত্না আমার বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ ছিল। কেন অতনু এমন অসাবধানী হয়ে পড়লো, কেন বোমার মসলার পাশে বসে সিগারেট খাওয়ার মতো অন্যমনস্কতা অতনুকে পেয়ে বসেছিলো, আমি সে সব কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম। কারণ রত্না ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা খুব ভালো করে জানা সম্ভব ছিল না। রত্নার জন্যে এসে অতনু একটা জলজ্যান্ত মানুষের মধ্যে

কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে চাইতো বলে আমার বিশ্বাস। বাকি সময় হলকা আগুনে অথবা ঠাণ্ডা তর্ক বিশ্লেষে। সে অতনুকে আমি বুঝতে পারতাম না। অতনু নিজেই বুঝতো কিনা সন্দেহ। বেহালার বাড়ির ছাদে রাত সাড়ে দশটার পরেও যে আমাকে ভালোবাসা বোঝাতে গিয়ে নিজের উপর সব দায়, সব অপরাধ নিয়ে নিয়েছিলো, সে অতনুকে আমি আর খুঁজে পেতাম না। কলেজে-ওঠার পর বহুদিন কোনো যোগা-যোগ ছিল না। কেবল একই রাজনীতিতে বিশ্বাস করতাম বলেই আমি ওর খবর পেতাম, ও আমার খবর পেতো। সেকেণ্ড ইয়ারের গোড়ায়, আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস যখন আস্তে আস্তে পথ পাল্টাচ্ছে, বিপ্লবী তত্ত্বের মধ্যে সংশয় খুঁজে পাচ্ছি, বন্ধু বান্ধবদের চেহারায় ভালোবাসার বদলে ঘৃণার ছাপ—ঠিক তখন একদিন অমনি এক বেশি রাতে অতনু আমার বাড়িতে খানিকটা উদভ্রান্ত, খানিকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে কড়া নেড়েছিলো। আগের মতোই আমরা আবার বাড়ির ছাদে উঠে, আকাশের তলার কাছাকাছি কথা বলেছিলাম। অতনু মুচকি হেসে আমার চোখে-ভয় খোঁজার চেষ্টা করেছিলো। আমি কথা বলিনি। পাশের পুকুরঘাটে বেশি রাতে কারা যেন স্নান করে ফিরে যাচ্ছিল। বাসন মাজার আওয়াজ, ঘটিবাটির ঠুংঠাং শব্দ পাচ্ছিলাম। বেহালার বাড়ির পাশের ওই পুকুরটার, ওই অন্ধকারের একটা চিরদিনের নিয়ম ছিল। স্নান করা, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়া। হয়তো এখনো সে নিয়মই টিকে আছে। কালো অন্ধকারের মধ্যে একটা গতানুগতিক জীবনের হাওয়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আরো দূরের মেসবাড়িটাতে নিয়মমাফিক হঠাৎ সমস্ত আলো নিভে গেলো। আমার মনে হলো অতনু যা করতে চাইছে তা অসম্ভব। এখনো সময় হয়নি। অতনু তা বোঝেনি। সময়ের সঙ্গে ও পাল্লা লড়তে চাইলো। রত্না তা জানতো।

চিঠিপত্র

ভেজাল শিশু-সাহিত্য

গত ২১ এপ্রিলের অমৃতে প্রকাশিত মণীন্দ্র রায়ের লেখা 'শিশু-সাহিত্যের' কথা শিরোনামায় সাহিত্য ইত্যাদি ..ফিচারটি পড়লাম। এই আলোচনাটি প্রকাশের জন্যে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাংলা শিশু-সাহিত্য চিরকালই অবহেলিত। সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে একে মেনে নিতেও অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত। শ্রীরায় কোন দলের জানি না। তবে তাঁর এই লেখাটি পড়ে বর্তমান শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে খুব বেশি খোঁজ-খবর রাখেন—তা মনে হল না। তা যদি রাখতেন তাহলে বর্তমান শিশু-সাহিত্যের যে নিরাশাজনক চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন—তা থেকে বিরত হতেন এবং বর্তমান শিশু-সাহিত্যকে ঢালোয়াভাবে 'ভেজাল শিশু-সাহিত্য' বলে অপবাদ দিতে দ্বিধা করতেন। সবচেয়ে অবাক লাগে যখন তিনি সার্থক শিশু-সাহিত্য লেখক হিসাবে সত্যজিৎ রায় এবং মতি নন্দী ছাড়া আর কোনো লেখকের নাম মনে করতে পারেন না। মতি নন্দী নিঃসন্দেহে একজন বলিষ্ঠ লেখক। তাঁর লেখা ঝেলাধুলো সম্পর্কিত গল্প উপন্যাস-গুলি সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুজন সার্থক শিশু-সাহিত্যিকের মধ্যে তিনি একজন—একথা কটা মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। কি রে অস্বীকার কবি সদ্য প্রয়াত খগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নাম, তাঁর সৃষ্ট ভোম্বল সর্দারের কথা—যা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে—কজন সার্থক শিশু-সাহিত্যিক নন? আর শ্রীমতী লীলা মজুমদার, তিনিও কি সার্থক শিশু-সাহিত্যিক নন? তা যদি না হবেন—তা হলে অমৃতের ঐ একই সংখ্যায় (৩০ এপ্রিল, ২১) লীলা মজুমদারের 'হাতি' নামে গল্পটির সমালোচনা প্রসঙ্গে কেন একথা হল, লীলা মজুমদারের লেখা তো, অমন অনেক সহজ এমন ঘরোয়া গল্প লিখেছেন মনে হয় যেন গল্প বলছেন—গল্প শুনছে সামনে বসে বাচ্চার মতো কৌতূহলী কিশোর। আর ধীরেন্দ্রলাল ধর, অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য (ছোট-দের উপযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস লেখায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার), স্বপনবুড়ো, হরেন ঘটক—(ছোটদের কবিতার ছন্দ সম্পর্কে যিনি সদা সচেতন), তরুণদের মধ্যে শিশিরকুমার মজুমদার, নির্মলেন্দু গৌতম প্রমুখ—বাংলা শিশু-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে বসলে এঁদের নাম কি সর্বাগ্রে মনে পড়ে না? এঁদের লেখা বইপত্র কি শ্রীরায় পড়েন না?

তবে একথা ঠিক, বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশিত হয় এমন শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকার সংখ্যা নগণ্য। কোন কোন শিশু পত্রিকা প্রকাশিত হলেও চোখে দেখা যায় না। সেগুলি নাকি প্রকাশকের ঘর থেকে সরাসরি চলে যায় স্কুল বোর্ডের গুদাম ঘরে—সেখান থেকে পুরানো কাগজের দোকানে। শিশুদের হাতে সে সমস্ত পত্রিকা কোনদিনই পৌঁছায় না, পৌঁছাবে না। বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার শিশুদের পাতা নামাংকিত পৃষ্ঠাটি বর্তমানে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় রূপান্তরিত। পাদ পূরণের জন্য ছোটদের নামে দু-চারটি লেখা সেখানে প্রকাশ করা হয়। এদিক দিয়ে বর্তমানে শিশু-সাহিত্যের দুর্দিন যাচ্ছে—তাতে সন্দেহ নেই। লেখক এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলে খুশী হতাম।

অজিতকুমার দাস
প্রচার সম্পাদক।
শিশু-সাহিত্য পরিষদ

অর্থগতির জন্য বলছি

মণীন্দ্র রায় নিয়মিত সাহিত্য ইত্যাদি বিভাগে ৩১ মার্চ লিখেছেন বাঙালী লেখকরা এখন আর কেউ ছবি আঁকেন বলে জানি না। ছবি দেখেন কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত নই। তাঁর অবগতির জন্য বলছি পূর্ণেন্দু পত্রী একালের একজন কবি, সাহিত্যিক ও চিত্র পরিচালক। কিন্তু সব-চেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন সুপরিচিত ছবি আঁকিয়ে। অতএব তিনি একজন বাঙালী লেখক ও শিল্পী।

বর্তমানের সাহিত্যসেবীরা ছবি সম্পর্কে আগ্রহী কিনা এ ব্যাপারেও তিনি সন্দিহান। ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অজস্র চিত্র শিল্পের উপর একটা বই লিখেছেন। একটি মাসিক পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় একজন শিল্পীর মুখোমুখি সম্পর্কে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা পড়লে, চিত্র শিল্পের উপর তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না এবং নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে তিনি একজন ছবির দর্শক।

তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমি কয়েক-জন কবি সাহিত্যিককে জানি যাঁরা ছবি সম্পর্কে উৎসাহী এবং সুযোগ পেলে প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন বৈকী। কবি মণীন্দ্র রায় নিজেও কি তার ব্যতিক্রম?

হিরণ্ময় দাশ
বামনপুকুর
২৪ পরগণা

সত্যজিৎ রায়ও ছবি আঁকেন

গত ৩১ মার্চ তারিখের অমৃত সংখ্যায় সাহিত্য বিভাগে লেখক সাহিত্যিক-দের ছবি আঁকার আগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক অনেকের ছবি আঁকা সম্বন্ধে বলেছেন কিন্তু সত্যজিৎ রায়-এর নাম করেননি। ছবি আঁকার বিষয়ে সত্যজিৎ রায়-এর অবদান সর্বজনবিদিত। তাঁর অধিকাংশ গল্পের বই-এর ছবি তিনিই আঁকেন। এমন কি তাঁর বই-এর প্রচ্ছদপটগুলিও তাঁর সৃষ্টি।

কৌস্তভ বসু
কলিকাতা—২০

চরণ সুগার লবিকে সঙ্গে চান

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী হবার পর চরণ সিং গোড়ার দিকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেস-বিরোধী ও ইন্দিরা-বিরোধী জনমতকে রীতিমত পলিটিক্যাল রূপ দিতে। কিন্তু তাঁকে এই কাজে শক্ত হাতে বাধা দেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। চরণ সিং কট্টর কংগ্রেস বিরোধী॥ নেহরুর সঙ্গে পাল্লা লড়ে কংগ্রেস ছেড়েছেন পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে। আজও তাঁর কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব বিন্দুমাত্র কমেনি। চরণ সিংয়ের বিশ্বাস মোরারজী দেশাই মনেপ্রাণে কংগ্রেসী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গৃহমন্ত্রীর মনোমালিন্য ও মত-বিরোধ লেগেই আছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনাও হয় না।

ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রীর গদির জন্য চরণ সিং মনে করেন জগজীবন রাম তাঁর বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। মোরারজী ক্যাবিনেটে দুই নম্বর আর তিন নম্বর মন্ত্রী যথাক্রমে চরণ সিং এবং জগজীবন রামের মধ্যে বাক্যালাপ নেই বললেই চলে।

জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট চন্দ্রশেখরের সঙ্গে চরণ সিংয়ের ঝগড়াটা এখন তুঙ্গে। জগজীবন রামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হলেন চন্দ্রশেখর। এছাড়া জনতা পার্টির অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে চরণ সিং বনাম চন্দ্রশেখর ঝগড়ার কোন নিষ্পত্তির পথ এখনও দেখা যাচ্ছে না। রাগে ও বিরক্তিতে তাই চন্দ্রশেখর কয়েকবার পদত্যাগ করতেও চেয়েছেন। জনতা পার্টির অর্থনৈতিক রূপরেখা তৈরী করেছেন চরণ সিং। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গ্রাম ভারতে গান্ধীবাদী সমাজবাদ আনাই হল চরণ সিং কল্পিত নীতির উদ্দেশ্য। চন্দ্রশেখরের ধারণা চরণ সিংয়ের পথে গ্রাম-ভারতে পা বাড়ালে আখেরে সব সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করবে লোভদাব-মহাজন গোষ্ঠী। দরিদ্র কৃষক যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থাকবে। চরণ সিং এসব কথায় কান দেন না। ওঁর পালটা অভিযোগ জনতা পার্টি এবং জনতা সরকার তাঁর অর্থনৈতিক নীতির রূপায়ণে ঢিলিমিলি করছে। ঢিলিমিলি করছে কেননা এঁরা কেউ কৃষকদের প্রতিনিধি নন। কৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে এঁরা সকলে উদাসীন। গ্রাম-ভারতের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনৈতিক ধসড়ার তাড়াতাড়ি রূপায়ণের জন্য চরণ সিং প্রবল চাপ দিচ্ছেন। বড় ও মাঝারি শিল্প সম্বন্ধে ওঁর বিরাগ এখন প্রকট। চরণ সিংয়ের কথায় শিল্প সংস্থাগুলির যথাযথ সম্প্রসারণ হলেও দেশের মোট বেকার জনসংখ্যার দশ শতাংশের বেশী লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হবে না। অথচ গ্রামাঞ্চলে সেই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করলে অনেক বেশী লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

চরণ সিং একমাত্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যিনি সব সময় নিজেকে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে প্রচার করেন। ওঁর বদ্ধমূল ধারণা যে গত ত্রিশ বছরে কৃষকদের স্বার্থ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবনার অভাবের জন্যই দেশের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। কৃষকদের অবহেলা করা হয়েছে। সুতরাং, তিনি কৃষকদের হয়ে এখন থেকে লড়বেন। দেশের ছোট-বড় নানা পরিকল্পনায় তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে চান কৃষক ও তার স্বার্থকে।

একরোখা জাঠ নেতা হলেন চরণ সিং। এই একরোখা ভাবটা গোড়ার দিকে সেই জনতা হাওয়ার যুগে রাজধানীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রীতিমত 'লাইম লাইটে' এনেছিল তাঁকে। কিন্তু রাজনীতির খোলা ময়দানে একরোখা ভাবটা অনেকের ভালো লাগলেও প্রশাসনিক ছকে এমন ভাবমূর্তি সচরাচর খাপ খায় না। চরণ সিংয়ের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। প্রশাসনের নিয়মকানুনে এবং রীতিনীতিতে পারদর্শী রাজধানীর আমলাশাহী স্বভাবতই তাঁর গুরুত্ব বজায় রাখতে উদগ্রীব। চরণ সিং নিজের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত নেবেন এটা আমলাদের পছন্দ নয়। চরণ সিং সম্বন্ধে তাঁদের পারোক্ষ বিরাগটা ইদানীং বড় বড় দপ্তরের করিডরে বেশ মুখর। চরণ সিং অবশ্য দমবার পাত্র নন। সুযোগ পেলে উনি ঠুকতে ছাড়েন না আমলাদের। বেশ কয়েকজন নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমলা প্রভাবিত ও আমলা পরিচালিত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও চরণ সিং কিন্তু নিজের মতে চলেন। তাই বাজারে চালু কথাটি হল ঃ চরণ সিংয়ের স্টাইল অব ফাংকশনিং আপত্তিজনক।

এরই যাকে বলে 'ফল আউট' প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে চরণ সিংয়ের বি-এল-ডি দলের মধ্যেও। বিশেষ করে সংসদে গোলমালটা ভালোমত দানা বেঁধেছে। সাতাত্তর জন বি-এল-ডি সংসদ সদস্যের মধ্যে এখন ওঁর সঙ্গে আছেন মাত্র উনচল্লিশজন। হিসেবের খাতায় এটা বড় লোকসান নিঃসন্দেহে। তবে এ-নিয়ে হা-হুতাশ না করে এবং সংসদে 'লবি' তৈরীর পুরোন কৌশল ত্যাগ করে উনি এখন অন্য পথ নিয়েছেন নিজের ভাবমূর্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে। বিভিন্ন কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করবার ছক তৈরী করছেন তাঁর অনুগতরা।

চরণ সিং নিজে ধনী জাঠ কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ক্ষেত-খামারের ব্যক্তিগত মালিকানার স্বেচ্ছার প্রবক্তা। উত্তর-প্রদেশ ও হরিয়ানায় ছড়িয়ে আছে জাঠ সম্প্রদায়। জাঠ ছাড়াও আহির ও যাদব সম্প্রদায়গুলিকেও উনি ইদানীং প্রভাবিত করছেন। একফসলে দুধের ব্যবসায় লিপ্ত এই আহির ও যাদবরা এখন ক্ষেত-খামারের মালিক হয়েছে। এরা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কৃষক। এরা ছড়িয়ে আছে উত্তর-পূর্ব রাজস্থান, হরিয়ানা, পশ্চিম ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে। এদের এখন বলা হয় 'নিউ কুলাক'। উত্তর ভারতে সবুজ বিপ্লবের দৌলতে এরা বেশ অবস্থাপন্ন এবং জমিজমা নিয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। জাঠ-আহির-যাদবরা এমনি শক্তিশালী যে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতি ও রাজনীতি তাদের হাতের মধ্যে। এদের নিয়ে আপাততঃ দল পাকাচ্ছেন চরণ সিং। আর্যসমাজ প্রভাবিত এই জাঠ-আহির যাদবদের মধ্যে আবার 'ট্রাইবাল' মনোভাবও অত্যন্ত প্রবল। নিজেদের মধ্যে বেষারেষি থাকলেও বাইরের অন্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে এরা সব সময় অনায়াসে এককাঠ্ঠা হতে পারে। কংগ্রেস আমলে এরা সোচ্চার হতে শুরু করে। কেন্দ্রে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসবার পর এরা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য চাপ দিচ্ছে। সেজন্য উত্তর ভারতের এক শ্রেণীর কৃষকদের নেতা হয়ে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের স্বপ্ন যে দেখা যায় না সে খেয়াল চরণ সিংয়ের আছে। তাই উচ্চ ও মধ্যবিত্তের এই কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে উনি বিত্তশালী চিনি কলের মালিকগোষ্ঠী বা সুগার লবির সমর্থন পেতে ব্যস্ত। বর্তমানে সুগার লবি হল সব চাইতে শক্তিশালী রাজনৈতিক লবি। উত্তরপ্রদেশে বড় বড় আখচাষী এবং চিনির-কলের মালিকদের মধ্যে চরণ সিংয়ের প্রভাব আছে। উনি এখন কর্নাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের সুগার লবির সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় আপাততঃ বাধ সাধছে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের দুই মুখ্যমন্ত্রী কর্নাটকের দেবরাজ আরস এবং অন্ধ্রপ্রদেশের চেন্না রেড্ডি। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে কট্টর চরণ সিং-বিরোধী॥ ভারতের সুগার লবির কিছুটা রাজনৈতিক সমর্থন লাভে সফল হলে চূড়ান্ত ক্ষমতালাভের লম্বা দৌড়ের খেলায় চরণ সিং কোমর বেঁধে নামতে পারেন। তবে মহলা দেবার আর সময় নেই। খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটির জন্য ভবিষ্যতে প্রবীণতম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আমলাদের প্রিয় জগজীবন রামের দাবী যে জোরদার হতে পারে এমন একটা 'থ্রেট' চরণ সিংকে সর্বদা চিন্তিত রাখছে।

পৃষ্ঠা ১৩ কলম ৩

পরিস্থিতি
গৌরাঙ্গ ভৌমিক

হাওয়া মনোরম,
শাজাদপুরের চিঠি এসেছে গতকাল,
টেগোর স্যানাটরিয়ামের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে হরিয়াল পাখির ডাকে।

ঘুমকাতুরে চোখে দেখছি,
রবীন্দ্রনাথের গানে প্লাবিত হচ্ছে মাঠ, নিশুতরাতের গাছগাছালি।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর বসেছে দিকমোহনার চত্বরে।

না, এখন আমি বিশ্বাস করি না, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন।

সাঁইত্রিশ বছর ধরে
আমি উঁকিঝুঁকি মারছি বিশাল এক আলখাল্লার পেছন থেকে,
স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় টেগোর হিলে বেড়াতে যাচ্ছি।
সাঁইত্রিশ বছর ধরে বাইশে শ্রাবণ পালিত হচ্ছে ভুল করে।

এই ভ্রম সংশোধন এখনই দরকার।

পুনর্মুদ্রণের পর পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বই,
পুনর্মুদ্রণের পর পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে গীতাঞ্জলি,
পুনর্মুদ্রণের পর পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে গীতবিতান।

স্বরলিপির চাহিদা বাড়ছে।

তিরিশ বছর আগেও এমনটি ছিল না।
তিরিশ বছর আগেও মুদ্রণ-প্রমাদ ছিল ভয়ংকর,
রবীন্দ্রনাথের গান ছাপা হয়ে যেত অন্যের নামে।

এখন মুদ্রাকর প্রমাদ কমছে ক্রমশ,
নির্ভুলভাবে আমি রবীন্দ্রনাথ নামের বানান লিখতে পারি।

এখন আমি বিশ্বাস করি না, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন।

গতবারও বাইশে, পাঁচিশের সম্মেলনে তিনি ছিলেন সভাপতি।
সাতাত্তরের রাগী কবিসম্মেলনে তিনি বাণী পাঠিয়েছেন
সাফল্য কামনা করে।

এবার বহু জায়গা থেকে আমন্ত্রণপত্র এসেছে তাঁর নামে,
অথচ রবীন্দ্র রচনাবলীর সংস্করণ হচ্ছে না।

এখন তিনি একসটেনসানে আছেন, বয়স ঢালুর দিকে।
খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার :
"স্বপ্নিল চোখ একজন তরুণ রবীন্দ্রনাথ চাই,
ইন্দ্রিয়সচেতন, বাস্তববাদী, গৃহকাতর ও সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ,
তিনি পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির সমকক্ষ।"

আটাত্তরের তরুণ কবিসম্মেলনে
রচনাবলী সংশোধন ও সংস্করণের জোর দাবি জানানো হবে।

হাওয়া অফিসের ব্যারোমিটারে ঝড়ের পূর্বাভাস।

এখন কোথাও যাবার না থাকলে, এখানে আসুন।
স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য টেগোর স্যানাটরিয়ামের দুয়ার খোলা,
এবং পর্যটক ভ্রমণের জন্য টেগোর হিল।

দ্রাক্ষাদ্বীপ
সমীর চট্টোপাধ্যায়

জলপুলিশের মতো তৎপরতায় আমি খুঁজে নেবো পথ দ্রাক্ষাদ্বীপ
ফেরারী আড্ডার ফূর্তি অথবা অবলো
বেবুনের চলাফেরা সরু পথ চিনে জ্যোৎস্নায়
মায়াবী নদীর পাড়ে বসা যাবে

ভালুকের নাচ কিংবা মহুয়া ফুলের ঘ্রাণ ভালুক-কন্যার কামনার
দেখে শহরের পথে শেষ ট্রামে ফিরেছি বাড়িতে
রন্ধনশালায় আমি পেরেছি মৃত্যুর সোঁকোবিষ
সুন্দরবীর বুকে প্রেমে নিরাপদ হুল্লাকের মতো বেড়ে উঠে
প্যারাম্বুলেটরে চড়ে কিনেছি কাঠের আসবাব
শুধু অরণ্যের কাছে আসবাব শৌখিনতা মূল্যহীন জেনে
বিলাসী গমের চাষ করা যাবে দ্রাক্ষাসবোবরে

দ্রাক্ষাকুঞ্জে যতো মুক্ত ফেসকো হরিণ
দেখেছি চিতার সাথে গোপন সংগমে
কাকতাড়ুয়ার স্বপ্ন ভেসে গিয়ে বিডন-স্ট্রীটের ঘাটে ঠেকে
বন্দুক তুলেছি হাতে দেখেছি হরিণ হাই তুলে অবজ্ঞায় চলে গেছে
আমি দ্রাক্ষাফল নেবো বলে গিয়ে দেখি
সব গোক্ষুরের দাঁত ঝুলে আছে গাছে

এখানে সহাবস্থান হিম আলো ফিটন-গাড়ির
প্যান্টুলনের মমতা কিংবা পুষে রাখা কোনো রঙ
তক্ষকের চোখে আমি খুঁজে নেবো পথ দ্রাক্ষাদ্বীপ

তনুশ্রীশঙ্কর
তুষার চৌধুরী

উনিশ শ' আটাত্তরে প্রেম কিংবা কবিতার আর কোনো সম্ভাবনা নেই
স্বভাবত অনুভূতি হৃদয়বেদনা নামে কিছু অবশিষ্ট নেই আর
আমার তরুণ কবিবন্ধুদের প্রশ্ন করি : লেখো নাকি প্রেমের কবিতা ?
তারা সমস্বরে হো হো হাসে :
প্রেম সে কেমন বস্তু চলো যাই চামেলীর কাছে
মধ্যবিত্ত-যৌবনের যকৃত ফুসফুস রক্ত মূত্রাশয়ে মন্থরদূষণ
ঘটে গেছে
চুম্বনের অতিজ্ঞতা এতটাই দুর্ভাগ্যজনক
এর প্রতিকার কোনো টুথপেস্ট জানে না।
তবু প্রেম আছে আজও
গল্প উপন্যাস কিংবা চলচ্চিত্রে কৈশোরের স্বপ্নের উদ্গমে
দু-একটি টাকার বিনিময়ে
ন্যাপথলিন দিয়ে নেড়ে চেড়ে রাখি অনুভব মাথার তোরঙ্গে
এরই নাম প্রেম

শুধুমাত্র ব্যতিক্রম মানবীপ্রতিভা যাকে দেখে মনে হোলো
ভালোবাসা
ফিবিঙ্গিপাড়ার নীল মাছিদের ওড়াউড়ি নয়
ফিড আলজিভ ওষ্ঠ নিম্ননাভি নয়
কিংবা নয় বক্ষ কটি পুচ্ছের প্রমিতি

গভীর গভীর চোখে বিরল কবিতাময় পূরবীরাগের নদীচ্ছবি
কিংবা শুধু ছবি নয় জীবনানন্দের সেই অতুলনা তনুশ্রীশঙ্কর

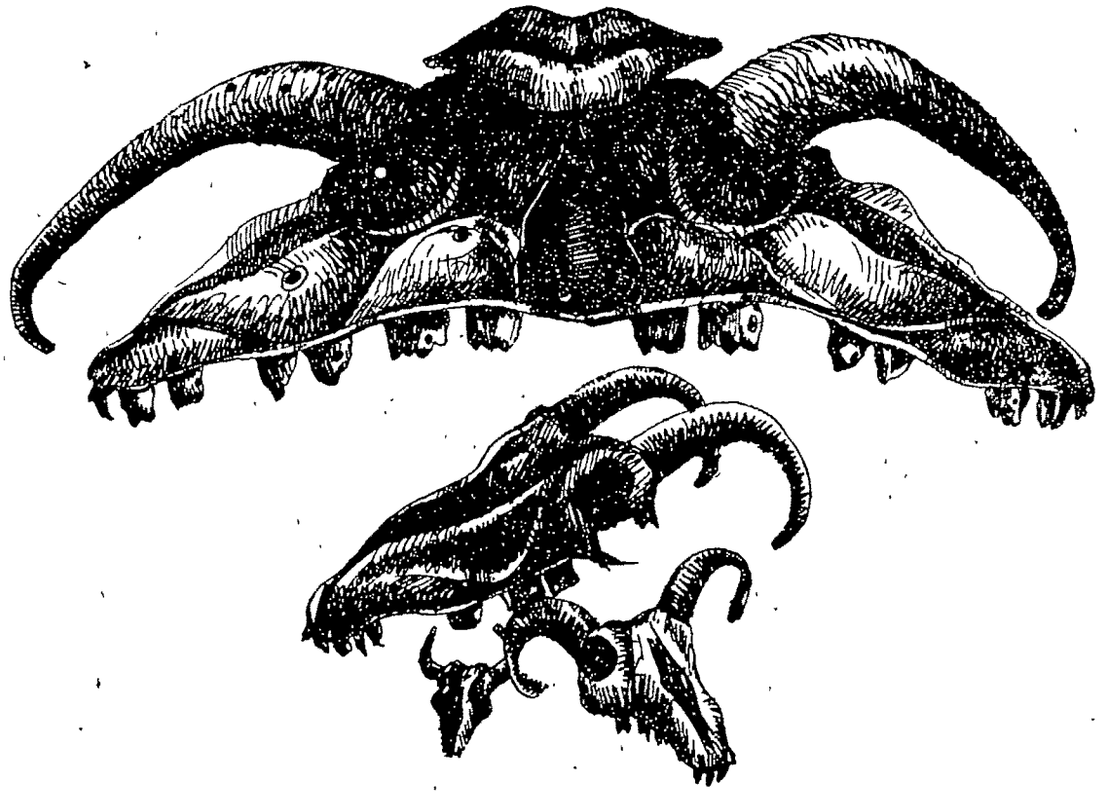

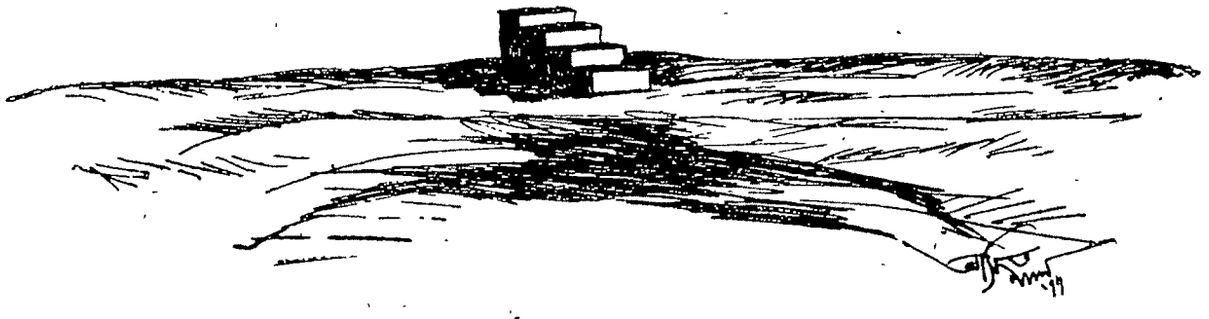

অসিত পালের ড্রয়িং।

বাঙালী জন্ম থেকেই বাবু।

বাঙালী মানেই বাবু। বাঙালীয়ানা মানেই বাবুয়ানা। কয়েকশ বছরের নানা রাষ্ট্র বিপ্লবে ঝড়ঝঞ্ঝা, ওলট-পালটের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালী চরিত্রের এই বাবুয়ানির বিবর্তন ঘটেছে। রং পাল্টেছে। কিন্তু আশ্চর্য তার কাঠামো পাল্টায় নি। এখানেই তার বনেদীয়ানা। আবার এই বহুতাগুণ থাকার জন্যেই বোধ হল বাঙালী বাবুয়ানির কাছে তার দাসখত লিখে দেয়নি। এবং বলতে কি, এর মধ্যে দিয়েই তার চমৎকারিত্ব, তার বৈশিষ্ট্যটা ধরা আছে সঠিক। ব্যাপারটা তাই গোড়া থেকেই একটু বিশদ করে বলার অপেক্ষা রাখে।

বাঙালী বাবু

[illegible] দত্ত

[illegible] পাগড়ি, গায়ে বেনিয়ান, জড়ান চাদর, কোঁচানো ধুতি ও পায়ে নাগরা—উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের [illegible]। এই ছবি আছে ফার্কার পার্কসের বইয়ে।

"সেন রাজাদের সময়ে হিন্দু বাঙালীর সমাজের প্রতিমা এক রকম তার পূর্ব রূপটি পেলে; তার কাঠামো গড়া হয়েছিল পালবংশের পূর্বে, এক-মেটে আর দো-মেটে হয় পালবংশের অধীনে; আর তার রং চং করা, চোখ চমকানো, সাজানো হল সেনবংশের সময়ে। তারপর তুর্কী আক্রমণ আর বিজয়ের ঝড় বয়ে গেল, বাঙালী জাত যেন দশ বছর মূর্ছাগ্রস্ত হয়ে রইল। তারপর এই জাতি আবার চোখ মেললে;.... আর বাঙালী জাতকে পূর্ণতা দিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এসে..."

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য থেকে আর একটি সত্যও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়—শ্রীচৈতন্যের মধ্যেই প্রথম একজন গোটাগুটি বাঙালীকে খুঁজে পাওয়া গেল। এবং সেই বাঙালী কি রকম? তাও জানবার উপায় আছে। সুখের কথা, চৈতন্যের কয়েকজন ভালো 'বায়োগ্রাফার' আছেন। তাঁদের কল্যাণে তাঁর দিনচর্যার টুটাফুটা ছবি উত্তরকালের জন্যে রয়ে গেছে। চৈতন্য জীবনীকারদের মধ্যে চৈতন্য ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাসকে আদর্শ হিসেবে ধরতে পারা যায়। কেননা তখনও চৈতন্যকে পুরো দেবতা করার সময় পাননি তিনি; যদিও তার প্রবণতা এই কালে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বেশ। সে কথা যাক। প্রথম জীবনে কি ছিলেন গৌরসুন্দর? অধ্যাপক। সেকালের সেই অধ্যাপকের ছবিটা দেখা যাক :

'একদিন প্রভু আইসেন রাজপথে।
সাত পাঁচ পড়ুআ প্রভুর চারিভিতে।।
ব্যবহার-যোগ্য বস্ত্র মাত্র পরিধান।
অঙ্গে পাণিতোলা পীত পট্টের সমান।।
অধরে তাম্বুল কোটি চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বলে মূর্তিমন্ত এই কি মদন।।
ললাটে তিলক ঊর্ধ্বে পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্মনেত্রে সর্বতাপ হরে।

নিমাই পণ্ডিতের ছবি আর এক জায়গায় রয়েছে :

'সুবাসিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ।।
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তাই অনন্ত-বিজয়।।
শ্রীললাটে ঊর্ধ্ব সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর।।
[illegible]

সেকালের বাঙালী অধ্যাপকের আদলটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে —পরণে ধুতি, গায়ে চাদর, মুখে পান, কপালে তিলক, হাতে বই। মাথায় একমাথা কোঁকরানো চুল। তাতে ফুলেল তেলের গন্ধ। গলায় পৈতে। আর 'পপুলার' অধ্যাপকের যেমন হয়, মৌমাছির মত ঘিরে চারপাশে পাঁচ-সাতজন ছাত্র। অন্যত্র যতি বিশ্বম্ভর, ধর্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্যের যে ছবি আছে তাও একইরকম। যতদিন না শিখাসূত্র মুণ্ডন করে নেতা হয়েছিলেন, ততদিন কিছুই পাল্টায়নি।

আরও এক চমকপ্রদ তথ্য দিচ্ছেন চৈতন্যভাগবতকার। তাঁর সযত্ন আঁকা নানা ছবির মধ্যে দেখা যাচ্ছে আধুনিক জনের মত নিমাই পণ্ডিত নিজেই লক্ষ্মীকে দেখে পছন্দ করে আসেন নবদ্বীপের গঙ্গার স্নানের ঘাটে। একেবারে 'লভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট'।

দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র সেই সময়ে সেই স্থানে।।
নিজে লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মী ও বন্দিলা মনে প্রভু পাদদ্বন্দ্ব।।
হেন মতে দোঁহে চিনি দোঁহা ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা।।

খেলা এই থেকেই শুরু। বল্লভ আচার্যের কাছ থেকে বনমালী ঘটক গেল নিমায়ের মা শচীদেবীর কাছে। আজকের কোন মায়ের মতই শচীদেবী তাকে হাঁকিয়ে দিলেন, আবে না না। ছেলে এখন পড়ছে। : "আই বলে, "পিতৃহীন বলাক আমার।
স্ত্রীটক পড়ুক আগে তবে কার্য আর।"

বনমালী আচার্য আর কি করে? মনের দুঃখে ফিরে যাচ্ছেন। রাস্তায় দেখা নিমাই-এর সঙ্গে। —কি ব্যাপার বনমালী, কোথায় গিয়েছিলেন? নিমাই-এর বোধকরি কপট জিজ্ঞাসা। যার আর কোথায়? তোমার মায়ের কাছে। তোমার বিয়ের কথা বলতে। কি জানি কেন, তিনি তগা করলেন না। ইনিয়ে বিনিয়ে বলে থাকবে বনমালী।

শুনে গৌরচন্দ্র 'মৌন হৈলা'—গম্ভীর হয়ে গেলেন। বাড়ী ফিরে মাকে বললেন, আচার্য এসেছিলেন। কথা বলনি কেন ভালো করে? শচীদেবী বুঝলেন সব। বনমালীকে ডেকে পাঠালেন। আর কয়েকদিন পরে পাঁচটা হরিতকী দিয়ে অনিন্দ্যসুন্দরী বল্লভকন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে গৌরচাঁদের বিবাহ হয়ে গেল। এবং বাঙালীর লিখিত ইতিহাসে এইটাই বোধ করি প্রথম প্রেমঘটিত বিবাহ।

কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের অবস্থা কেমন ছিল? জগন্নাথ মিশ্রের ত পুজো আচ্ছা করে দিন গুজরান হত। নিমাই অধ্যাপক। অবস্থা মোটেই ভালো নয়। বাজারে কাপড় কিনতে গেছেন তাঁতি বাড়ী। কাপড় পছন্দ করে দামের কথা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁতি বললে, আপনি যা দেবেন। প্রভু বললেন, টাকা নেই। শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পয়ারে সেই বৃত্তান্তটা এই :

"ভাল বস্ত্র আন" প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ।।
প্রভু বোলে "এবস্ত্রের কি মূল্য লইবা?"
তন্তুবায় বোলে 'তুমি আপনে যে দিবা।।"
মূল্য করি বোলে প্রভু "এবে কড়ি নাঞি।"
তাঁতি বোলে "দশে পঞ্চে দিবা বা গোসাঞি।।
বস্ত্র লইয়া পর তুমি পরম সন্তোষে।
পাছে তুমি কড়ি মোর দিও সমাবেশে।।"

দশটা 'ইনস্টলমেন্টে' দাম দেবার কড়ারে কাপড় নিয়ে নিমাই পণ্ডিত তাঁতির ঘর থেকে বার হলেন। শুধু তাঁতি নয়, গোয়ালা, মালাকর, তাম্বুল সরবরাহকারী—কারও কাছেই দাম দিলেন না প্রভু বা দিতে পারলেন না তিনি, এমনি অবস্থা নিমাই-এর মত নবদ্বীপের খ্যাতনামা একজন পণ্ডিতের!

কিন্তু এ ত একজন সাধারণ বাঙালীর জীবনচর্যার একটুকরো ছবি পাওয়া গেল। তার বিলাস, তার বাবুয়ানির ছবিটা কেমন? সেকালে তার বাবুগিরি ছিল বা কেমনতর? চৈতন্য-ভাগবতের কৃপায় সে চিত্রও একটু আধটু রয়ে গেছে বৈকি। শুধু দৈনন্দিন জীবনের চাল-কাপড়, দধি-নবনীরই খোঁজ করেন নি চৈতন্যদেব নবদ্বীপের বাজারে। নিমাই পণ্ডিত গন্ধ-বণিকের কাছে গন্ধ-দ্রব্যের খোঁজ করেছিলেন। এই গন্ধদ্রব্য কিন্তু মশলা নয়। আজকের 'সেন্ট' জাতীয় বিলাসদ্রব্য। কস্তুরী, অগরু বা ঐরকম কিছু। কেন না, তার বেসাতের গুণপনা ব্যাখ্যান করে বণিক বলেছে :

"আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর।।
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে।।"

বঙ্গ জনজীবনে ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্যের এই সৌরভ পাঁচশ বছরের ব্যবধান পেরিয়ে আজও যেন নাকে এসে লাগে। দৈনন্দিন দুঃখের বোঝা পেরিয়ে, দারিদ্র্যের পাশাপাশি বাঙালী মানসের এই অপ্রয়োজনীয় বিলাসই বাঙালী জীবনের ডৌলটিকে স্পষ্ট করে

পাকে নথ, কানে ঝুমকো দল, গলায় চন্দ্রহার, ওপর হাতে বাজু, নীচে হাতে রুলি, কোমরে বিছে, পায়ে মল। ১৮৫০ সালে সাহেব শিল্পীর আঁকা। ছবি আছে ফ্যানি পার্কসের বইয়ে।

তোলে। সেখানে টুলো পণ্ডিত নিমাই মালাকরের কাছে মালা কেনে —

"প্রভু বলে, ভাল মালা দেহ মালাকার।
কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার।।"
মালার পর পান।
"তাম্বুলী বোলয়ে" বড় ভাগ্য সে আমার।
কোন ভাগ্যে তুমি আমা ছারের দুয়ার।।"

দৈনন্দিন জীবনেই শুধু ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল করে থাকত না সেকালের বাঙালীরা, যেকোন উৎসবে পান ছিল অপরিহার্য। বিবাহসভায় থালা ভরে পান দেবার রেওয়াজ চৈতন্যের আমলেই বেশ চালু হয়ে গেছে :

"শিরেমালা, সর্ব্বঅঙ্গে লেপিয়ে চন্দনে।
একো বাটা তাম্বুল সে দেন একোজনে।।"

এটা অবশ্য বরযাত্রীদের তোয়াজ। দেশেঘরে সাধারণ মানুষের আতিথ্যও বড় কম ছিল না। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডে মুকুন্দ দাসের গৃহে একদা আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই ছবি এঁকেছেন চূড়ামণি দাস তাঁর 'ভুবনমঙ্গল' কাব্যে :

সুমার্জ্জিত ঘর পিঁড়া প্রভু ওঠে গিয়া
নফরে ত ভোট পাতে বসিল চাপিয়া।
চরণ পাখালি প্রভু তৈল কাচা পরে
নারায়ণ তৈল দিল মুকুন্দ আদরে।
অঙ্গে তৈল সুমর্দ্দন করে অনুচর
উষ্ণোদক করে আর সুবুদ্ধি নফর।
নানা সুকার্য্য করে নানা ভৃত্যগণে
যজ্ঞান কুমার করে পূজোর আয়োজনে।
উষ্ণোদকে স্নান করে নিত্যানন্দ রায়ে
তসরের কাঁচা ধুতি নফর জোগায়ে।

মুকুন্দ দাস অবশ্যই বেশ সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ। রীতিস লোক। কালটা অবশ্যই শীতকাল। অতিথির স্নানের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা। তাছাড়া কত ভৃত্য। গায়ে তেল মাখাবার চাকর পর্যন্ত।

অবশ্য তোলা জলে স্নান, নারায়ণ তৈল, গুয়াপানের বা পুষ্পমাল্য ব্যবহারের বিলাস বা বাবুগিরি যে চৈতন্য আমলের বাঙালীঘরের রেওয়াজ ছিল, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও তা বলে গেছেন। সদা বিয়ে-করা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী খুল্লনাকে সতীন লহনার হাতে সঁপে দিয়ে ধনপতি দত্ত গৌড়দেশে গেলেন বাণিজ্য করতে। প্রথমটা লহনা সত্যই জননীর মত পালন করেছিল সতীনকে। কবি বর্ণনা দিচ্ছেন :

ঘরে ছয় দণ্ড বেলা কুচকুমে তুলিয়া মলা
নারায়ণ-তৈল দিয়ে গায়।
ছইয়া প্রাণের সখী শিরে দিয়া আমলকী
তোলা জলে সিনান করায়।।

এই সময়ে খুল্লনার জীবনচর্যার মধ্যে সেকালের উচ্চকোটির জীবনের দিন যাপনের ছবিটা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিচারিকারা মাথায় জল ঢেলে স্নান করায়, কেউবা ধরে থাকে শুকনো কাপড়। কেশ মার্জনা করে কেউ চিরুনী দিয়ে, অঙ্গে কেউ পরিয়ে দেয় শীতল চন্দনের প্রলেপ। বেলা দশটা বাজতে বাজতে রুপোর থালায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন 'ওদন, পায়স পিঠা'। 'অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা'। খেতে খেতে গায়ে ফুটে ওঠে ঘাম। তার জন্যে পাখায় বাতান। হাওয়ার পর শোয়া। খাটে পাতা গদি-তোষক। সেকালের ভাষায় 'চুলী'। খাটে টাঙ্গান মশারি। বুকে কর্পূর-সুগন্ধিবাসিত পান। ঘরে ভেসে আসে মালীর জোগান দেওয়া মালতী ফুলের ভুরভুরে বাস। বিকালে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে লেবুর সরবত। বাঙালী মেয়েরাও সেকালে পাশা খেলত। আর জামাই এলে বসতে দিত লোহিত কম্বলে। শুতকালে মেয়েরা পড়ত পাটশাড়ী। নানা রকম অলংকারের মধ্যে চুড়িও ছিল বেশ কয়েক গাছি।

এবং সেকালের উচ্চকোটির বাবুরা পারিষদসহকারে সভা আলো করে বসতেন। সে কবি কৃত্তিবাসের পোস্টাই বলুন আর মুকুন্দরামের বাবু রঘুনাথই বলুন। এবং তাঁরা সার্থক কবিকে শিরোপা দিতেন :

কানে সোনা করে বালা গলে দিল কণ্ঠমালা
করাঙ্গুলি রত্নভূষণ
শিরে পাগ পরিতে জোড়া দিল চরণের ঘোড়া
পায়েনেবে দিলেন ভূষণ।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, জন কোম্পানী যখন তাদের কলকাতা সাম্রাজ্যের জন্যে দালাল বা উকিল নিয়োগ করতেন, তাদেরও এমনি পাগড়ী, শিরোপা, ঘোড়ার সম্মাননা দিতেন।

আধুনিক কাল বা ইংরেজরা আসবার আগে অষ্টাদশ শতকের পূর্বে এই ছিল মোটামুটি সেকালের বাঙালী বাবুগিরির চেহারা। বাবুয়ানি ত হল কিন্তু বাবু এল কবে? বাবু শব্দই বা কবে এল, এবং ইংরেজ আমলে তার আদলই বা কিভাবে পাল্টাল?

বাবু বলতে আজ যা বুঝি—রাজশেখর বসু তাঁর চলন্তিকায় যা ছকে দিয়েছেন যেমন 'হিন্দু ভদ্রলোকের নামের সহিত যোগ্য উপাধি (মিঃ রামবাবু); কেরানী (অপিসের বড়বাবু); ভদ্রপরিবারের কর্তা বা অন্য পুরুষ (বাবু বাড়ি নেই। ছোটবাবু); মধ্যবিত্ত মনিবকে বা ইতর কর্তৃক ভদ্রকে সম্বোধন; শৌখিন, বিলাসী (লোকটি অত্যন্ত বাবু)—সবই এসেছে মনে হয় ইংরেজ আমলের প্রথম একশ বছরের মধ্যে। তার প্রাথমিক অর্থ হয়ত কেরানীই ছিল জন কোম্পানীর দপ্তরে যদিও প্রথম পনর-বিশ বছর জন কোম্পানীর খাতাপত্রে বাবু শব্দের কোন উল্লেখ নজরে পড়েনি। তবে বাবু শব্দের সঙ্গে বাঙালীর একটা বিশেষ যোগ আছে, একথা অনেকে মনে করেন। বাংলাদেশ থেকে যেসব উকিলরা দিল্লীর দরবারে যেতেন তাঁরা নাকি দিল্লীওলাদের টেক্কা দেবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে আতর ব্যবহার করতেন। এই সৌগন্ধ বশ (খুশবু)-র কারণে বাবু। নাবি বয়, ফুলবাবুদের সঙ্গে সাধর্ম্য থেকে বাবু? অনেকে অবশ্য সংস্কৃত বপ্র থেকে বাপু এবং পরে বাবু শব্দের আবির্ভাবের কথা বলেন। সমাজে শৌখিন লোক চিরকালই ছিল, আছে এং থাকবে—কাজেই প্রকার ভেদে তাঁদের বোঝাবার জন্যে একটা অভিধাও ছিল নিঃসন্দেহে। তাঁদের মর্যাদা, মান রাজসী বোঝাবার শব্দের অভাব নিশ্চয়ই হয়নি কখনও তবে ঠিক এই বাবু শব্দের সমধর্মী কি শব্দ তখন প্রয়োগ করা হত, তা বলা শক্ত কেননা ইংরেজ আমলে যাঁদের বাবু বোঝান হত তাঁদের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। চলনবলন, ধরণ-ধারণ-এর কোন জুড়ি ছিল না বোধ হয় আগে।

তবে কবিকে বাবু অভিধায় ভূষিত করার প্রথম উল্লেখ সম্ভবতঃ ছোট জালালির চরণে। বড় বিচিত্র সেই কাব্য। হিন্দি-ফারসী মিশ্রভাষায় তার কবেকটা চরণ এই রকম?

কাঁহা জাতে হো খোনকার আসরায়া লাগায়ে গাব
শিরমে টোপি তেরা
হাত মে ছুরি তেরা
পাউস দেকে পার
হারাম কি উর
কাহা হাল্লাল করেগা
ইত বাবু রামাই গায়।'

এর কিছু পরেই রয়েছে 'রামাই কহে বাবু তোঞি খোনকার চলে যা আপন কি ধাম।' অনেকেই জানেন, ধর্মপূজোর প্রবর্তক ও ধর্মঠাকুরের আদিপুরোহিত হচ্ছেন রামাই পণ্ডিত। ধর্মঠাকুরের

পূজাকে বলে সাজাত। এই পূজার শেষ দিনের অনুষ্ঠান ঘুম ভাঙার গান করা হয় জালালি কলিমা। এরই শেষ অংশ ছোট জালালি।

'গাইল পণ্ডিত রামাই জালালি-পাবনসার
ধর্মের গাজনে পড়ে জয়জয়কার।।'

পণ্ডিতরা মনে করেন ধর্মপুরাণের এই পুঁথিগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে নয়। হয়ত তাই; কিন্তু কবির আগে বাবু পদবী মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এটাই বোধকরি প্রথম ব্যবহার, এবং সেদিক দিয়ে ব্যাপারটা কম ঐতিহাসিক নয়।

আর এই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই মনে হয় বাবুরা বঙ্গধামে অবতীর্ণ হলেন। বঙ্গধামের সাবাৎসার তখনই কলকাতা। তাকে ঘিরেই বাঙালী 'এলিটদের' আবির্ভাব ঘটছে।' কেননা মধ্য-যুগের সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশকে সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র টাকার জোরে এক নতুন শ্রেণীর মানুষ তখন কলকাতা বঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল আলোকে হাজির হয়েছেন। তাঁরা বলা-বাহুল্য, ইংরেজ প্রসাদপুষ্ট। এই ইংরেজরা শুধু সুবে বাংলার নতুন শাসকসম্প্রদায় নয়, এরা বণিক সম্প্রদায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮২৩) তাঁর 'নববাবু বিলাসে' বাবু-সৃষ্টির রহস্যটা উদ্ধার করে লিখেছেন :

> ধন্য ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্ট নিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানী বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আগিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মটকার বেতনোপভুক্ত হইয়া কিম্বা বাজের গাছের কাঠের খাটের পাটের মটের ইটের সরদারি চৌকিদারি জুয়াচুরি পোদ্দারি করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকারি ভাঁড়ামি বাস্তা বন্দ দাসা দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপাত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারী কর্ম্মাধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।

বাবু অংকুরোদ্গমের এইটেই হচ্ছে গুপ্ত কথা। কলকাতা কমলালয়ের দাক্ষিণ্য লাভ করে যাঁদের পক্ষোদ্গম হয়, তাঁরাই উনবিংশ শতকের ফুলবাবু। এদের আদিপুরুষ হচ্ছেন মুখ্যতঃ ৯ জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী—নন্দরাম সেন, জগত দাস, রাম ভদ্র, গোবিন্দরাম মিত্র, প্রভৃতিরা। ভবানীচরণ এঁদের লক্ষণ নির্বাচন করে গেছেন :

> মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান,
> খোষ পোষাকী যশস্বী দান।
> আরিমুড়ি কানন ভোজন,
> এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'

এই নয় রকম বাবুর লক্ষণ মিলিয়েই কিনা জানি না কলকাতার বাগবাজারের বাবু রাজেন্দ্রকুমার মিত্তির মশায় আটবাবুর কথা বলে গেছেন এক তরজা গানে। এঁরা হলেন—রামতনু দত্ত, রাজা নবকৃষ্ণ দেব, হুকুরীমল, বনমালী সরকার, আশুতোষ দেব, গোবিন্দরাম মিত্র, রামলোচন ঘোষ ও গোকুলচন্দ্র মিত্র। বাবু ও বাবু টুনুবাবু। হাটখোলার মদন দত্ত মশায়ের পুত্র।' হেদোর মালিক এঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন।' বিখ্যাত রামদুলাল দে সরকার এঁদেরই অন্যে প্রতিপালিত। টুনুবাবুর কোমরে দাগ পড়ে বলে, নতুন কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পড়তেন। ক্লাইবের মুন্সী রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর রাজত্বকালে, মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁর দীয়তাং ভুজ্যতাং [illegible]

মাথায় বিঁড়ে পাগড়ি, লম্বা জুলফি, ঝোলানো গোঁফ—সেকালের সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র।

গেছে। হুকুরীমল সেকালের কসমপলিট্যান কলকাতার শিখ ধনকুবের। রাজা উমিচাঁদের শালা। আজকের আরমানিয়ান ঘাট নাকি আদিতে তাঁরই প্রতিষ্ঠা করা। বনমালী সরকারের প্রাসাদ, মধ্য কলকাতার লাটুবাবু, ছাতুবাবু, কুমোরটুলির কালা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র এবং হেস্টিংস পত্নীর দেওয়ান পাথুরেঘাটা ও জোড়াবাগানের ধনকুবের ইংরেজিনবীশ রামলোচন খ্যাতকীর্তি। এই রামলোচন ঘোষ সম্বন্ধে তরজা গাওয়া হত :

> 'খাটের ঘরে খানা খেতেন রামলোচন ঘোষ।'
> লাটের বিবির মেজাজে তিনি রাখতেন নিতি হোস।।'

আরও গাওয়া হত বাগবাজারের মদনমোহন খ্যাত গোকুল মিত্র সম্বন্ধে :

> বিশ্বামিত্র গোত্রপ্রধান গোকুল মিত্র।
> আটবাবুর প্রধান হয়ে শোভেন নিত্য।।'

অবশ্য কালের সঙ্গে সঙ্গে বাবুও পাল্টাচ্ছে। কেননা নব-বাবু বিলাসে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা এক পুরনো টুনুবাবু ছাড়া হচ্ছেন রাজা গুরুদাস, রাজা ইন্দুনাথ, রাজা লোকনাথ, রামহরিবাবু, বেণীমাধববাবু—যাঁদের কাছে জগদুর্লভ বাবু(১) মজলিস শিখে-ছিলেন, 'যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও' জেনেছিলেন। তবু 'নববাবি বিলাসে' বুড়ো বাঁড়েরা যে আদ্যিকালের বাবুদের তাঁদের লোচ্চামির জন্যে স্মরণ করতেন তাঁরা হচ্ছেন : রাজা মহানন্দ মিত্র, দেওয়ানজী ও বাবু নন্দরাম সেনজী ও রামহরিবাবু।' 'ইহাদিগের উপাখ্যান সদা সর্ব্বক্ষণ করিয়া কালযাপন' করতেন বৃদ্ধ বেশ্যারা।

এখন বাবুদের চার প' হলে হয় হাপ্‌বাবু। এই চার প' হচ্ছে—পাশা, পায়রা, পরদার, পোষাক। আর এর ওপর চার 'খ' হলে ফুলবাবু হয়। এই চার খ' হচ্ছে—খুসি, খানকি, খানা ও খয়রাত। সেকালের বাবুদের চার প'এর মধ্যে পোষাকের বৈচিত্র্যের

(১) ইনি কি বাস্তবে দয়েহাটার বিখ্যাত ভাগবতচন্দ্র সিংহের পুত্র জগদুর্লভ সিংহ ?

ফিরিস্তি এখন বলে নেওয়া যাক : জামা-বোড়া, চাপকান পায়জামা, পাগোষ পাগড়ী আমামা লাড়ুলার মোড়াসা, চাকা বাক। নিমন্ত্রণ রক্ষার নিম্নতম সাজ ছিল ঢাকাই ধুতি, জরির জুতা। একজোড়া ঝুটো জড়ির জুতার দাম ছিল আঠার আনা। আর ধুতির বাহারও বলে শেষ করা যায় না। ঢাকাই ধুতি কলকাদার কিংবা রঙিন থান-চেরা বসমাদার। আর পাড়ের ত কথই নেই—তাবিজপেড়ে, মরিচপেড়ে, কস্তাপেড়ে, রাস্তাপেড়ে, ডোমবাপেড়ে কোকিল পেড়ে, দাঁতে মিশি পেড়ে, ঠোঁটে হাসি পেড়ে, হাতিপেড়ে, মহারাষ্ট্র পেড়ে, সতরঞ্চীপেড়ে, কুঁচপেড়ে, দেবাখাপেড়ে, সীরপেড়ে, সখীপেড়ে, রুমাল পেড়ে, খড়কে পেড়ে, আহ্লাদে-প্রহ্লাদে-রাজাপেড়ে, চেনপেতে, ঘাটপেড়ে।' প্রমথ শর্মা পাড়ের এখানেই ইতি টানেননি, ইত্যাদি বলেছেন। বকুন পাড়ের বাহারখানা। বাহার তেমনি শাড়ীর : 'কেহ কেহ বিলাতী বক মসলিন ও লেকনেট মসলিন ও মলমল এবং বিবিধ প্রকার নিনুবস্ত্র করিয়া অর্থাৎ গোলে আনার কাসনি ফুসমি সন্দলি, বেঙ্গলি, পেঁয়াজী, ধানি আবি ইত্যাদি নানা রঙ্গে রঙ্গীন সাড়ি-পরিধান করেন।'

এই অবকাশে সেকালের মৌবলা-মাছ, নালতা শাক, ঘৃত-সংযুক্ত অন্নভক্ষণকারী বাঙালীর মিষ্টান্ন-বৈচিত্র্যের বাবুয়ানিরও খবর নেওয়া যেতে পারে। সেগুলি এই : মোণ্ডা মুণ্ডি মনোহরা খাসকরা ক্ষীরপুলি ক্ষীরপোরা বাদামতক্তী বাদাম দেওয়া ছোলাভাজা ছানাবড়া পানতোয়া সরভাজা পোলাও মেঠাই বরফী বুঁদে খইচুর সেউ জিলাপী মতিচুর লুচি কচুরি ছানাবড়া নিমকী ঘেওর সিঙারা গজা খাজা খাস্তাবাদামী কিসমিস-পেস্তা-মোহনভোগ নিখুতি আর খোরা। এছাড়া পানদানে দেওয়া হত—বাংলা পান, সাচি পান, নানা রকম মসলা—ছোট এলাচ, বড় এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, জয়ত্রী, মোয়ান, ধনে, ফিরিঙ্গবালা আর সুপারি ও কর্পূর। পাঁউরুটি তখনই বাবুমহলে এসে গেছে। সঙ্গে পোলাও কালিয়া কোরমা কোফ্তা দোপেয়াজা কাবাব সির বেবঙ্গ।'

মৌতাতের বহরটাও কম নয়। আট পয়সা ছটাক ছিল মোহিনী গাঁজা। কমা জিনিষ ছিল চার পয়সা ছটাক বালচরে পাতিভরা গাঁজা। মাদকদ্রব্যের মধ্যে ছিল—গাঁজা, সিদ্ধি, গুলি, চরস, গ্রাকস, মদিরা, মেদেরা এবং ব্রাণ্ডি। এছাড়া পিতলবান্ধা কেহবা রূপা বান্ধা, কেহ সোনাবান্ধা হুঁকোতে, কেহ গুড়গুড়িতে কেহবা আলবোলাতে তামাক খেত। তামাকের মধ্যে ছিল ভেলসা, অম্বরী।'

কিন্তু বাবুরা বসে নেই। কালে কালে তাঁরা পাল্টাচ্ছেন। মধুবাবু থেকে আমরা 'আলালের ঘরের দুলাল'—মতিলালঅবধি দেখলাম। দেখলাম তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ—মাথায় কাঁকড়াচুল, দাঁতে মিশি, সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা—বুটেদার 'একলাই' ও 'গানের' সেরজাই গায়, মাথায় জরির তাজ, হাতে আতরে ভুরভুরে রেশমের রুমাল ও ছড়ি, পায়ের রূপার বগলসওয়ালা ইংরিজি জুতো। তার স্বভাব, ধরণ-ধারণ সেই কুসুমিত নববাবুরই মত তবে তদ্দিনে সুফল এসে গেছে কলকাতায়। সে মুনশি রেখে না পড়ে শেরবোরন সাহেবের স্কুলে যায় দুএকদিন; ভর্তি হয় কালুস সাহেবের স্কুলে।

এবং দেখতে দেখতে হুতোম বা 'নিশাচর' বাবুদের দেখে ঠাট্টা করতে লেগে গেলেন। গ্রীষ্মকালে বাবুদের ভুরে উড়নি মলমলের পিরান, রবাবের জুতো। চুলের মধ্যেতঃ তখন দুরকমের স্টাইল—'আলবার্ট' ফ্যাসন অর্থাৎ বাঁকা সিঁথি আর 'ওয়েলেসলী' ফ্যাসন অর্থাৎ চেরা সিঁথি। নিশাচর ঠাট্টা করে বলছেন চেরা সিঁথি নয় পাড়াগেঁয়ে বাবুইরা বরোজে যেরূপ আল দেয় ইহাও ঠিক সেরূপ। হুতোমপ্যাঁচার নক্সাতে গন্ধবেনে এক বাবুর গল্প আছে।

ওয়েলসলী ফ্যাশানে চুল ফিরিয়ে তিনি চায়না-কোট গায় ও স্টকিংসে পায়ে তালতলার বড় রাস্তা দিয়ে ধর্মতলার দিকে যখন যাচ্ছিলেন, তখন দোতলা থেকে এক ভদ্রলোক তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক, তামাক দেবে' বলে নারকেলের তেলে আধ বাণ্ডিল চীনের সিঁদুর গুলে তার ওয়েলসলী সিঁথি পরিপূর্ণ করে তেল-সিঁদুরে নেপে দিয়েছিলেন। চাকরেরা জোড়া শাঁক বাজিয়ে হুলুধ্বনি দিয়েছিল! ভদ্রলোক গ্যান্সার সাহেবের আপিসের কর্তাবাবু। চেরা সিঁথির কি বিপদ!

সময়টা বাঙালীর জীবনে সন্ধিক্ষণ। 'নবাবী আমল শীত-কালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো।' হুতোম বলছেন, যারা বনেদী বড়লোক তারাও অস্ত গেলেন। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎ শেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো। আর নবো মুন্সি, ছিরে বেনে আর পুঁটে তেলি রাজা হল। সমাজের মাথা হল। জাত কাছারীর কর্তা হল।

আর এই অবকাশে বীরকৃষ্ণ (দাঁবাবু ধুপছায়া চেলীর জোড় ও কলার কপ ও শ্লেটওয়ালা জোড়ের গোলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্ছেন; রুমালটি কোমরে বাঁধা আছে—সোনার চাবির সিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসিয়েটিং নিয়েছে।' এই বাবুদের দুর্গাপূজার উৎসবের পোষাক। রাত্রে অবশ্য পোষাক পাল্টাবেন। কেননা, তখন 'নাচ' হবে। সাহেবরা আসবে। 'গাল্টার আর হুপার' খানা পরিবেশন করবে। খাবারের সঙ্গে থাকবে বরফ ও ফরাসী মদ। ফ্যানী পার্কস এই বাঙালী বাবুয়ানির সাক্ষ্য দিচ্ছেন। সালটা আঠারশ' তেইশ। বাঈটিতেও অবশ্য সে-ধারা পাল্টায়নি। তবে এই সময়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চে আর এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি রামমোহন। তিনি শিক্ষায়, ধর্মের, আচরণের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে পোষাকের কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। খিড়কিদার পাগড়ির বদলে বাঁধা পাগড়ি এবং কাবা পরবার রীতি প্রচলন করেন তিনিই।

দেখতে দেখতে বাঙলা সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাব হল। বাঙালীবাবুরাও সেখানে হাজির হলেন। বঙ্কিম তাঁর 'বিষবৃক্ষের' নায়ক নগেন্দ্রনাথকে পরালেন সাহেবী পোষাক : পেন্টালুন পরণে, টুপি মাথায়, বুটওয়ালা পা। আর এক প্রতিনায়ক ব্রাহ্মসমাজের লোক দেবেন্দ্র। তিনি তামাকু সেবন করেন। হীরার বাড়ীতেও মিঠাকড়া তামাকু গান করেছিলেন। মটন কাটলেট সহযোগে বোতল বাহিনীর সেবা করেছিলেন দেবীপুরে তাঁর নিজের বাড়ীতে। হীরার বাড়ীতেও ব্রাণ্ডি পান করেছিলেন।

বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথে আসা যেতে পারে। বিশ শতকের একেবারে আবির্ভাব লগ্নে। গোরার পোষাক ছিল কি?

'খুন্তের উপর জলখাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া চাকরের হাতে দিয়া সুচরিতা হাতে আসিয়া বসিল এবং সেই মুহূর্তে বেহারার সঙ্গে গোরাও আসিয়া প্রবেশ করিল। সুদীর্ঘ শুভ্রকায় গোরার আকৃতি আয়তন ও সাজ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। গোরার কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ, পরণে মোটা ধুতির উপর ফিতা বাঁধা জামা ও মোটা চাদর,, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতো।'

শুধু তাঁর উপন্যাসেই নয়, তাঁর প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ চোগাচাপকানকে বর্জন করে ধুতি চাদরেরই প্রশংসা করে গেছেন :

'যে ব্রাহ্মণেরা একদিন ভারতবর্ষকে সভ্যতার উচ্চশিখরে

উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বসনের একান্ত বিরলতা জগদ্বিখ্যাত। ... বিদ্যাসাগর একা বিদ্যাসাগর নহেন আমাদের দেশে বহু মোটা চাদরধারী ব্রহ্মণ পণ্ডিতের সহিত গৌরবে গাম্ভীর্যে কোর্তাগ্রস্ত কোন বিলাত ফেরতই তুলনীয় হইতে পারেন না।'

সেই প্রবন্ধের শেষেই কিন্তু তিনি আবার বলেছেন, যদি সত্য হয়, চাপকান পায়জামা একমাত্র মুসলমানদেরই উদ্ভাবিত সজ্জা, তথাপি এতথা যখন স্মরণ করি, রাজপুতবীরগণ শিখসর্দারবর্গ এই বেশ পরিধান করিয়াছেন, রাণা প্রতাপ রণজিৎ সিংহ এই চাপকান পায়জামা ব্যবহার করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তখন মিস্টার ঘোষ-বোস-মিত্র, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে-মুখুয্যের এ বেশ পরিতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখি না।'

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের ধুতি চাদরের ছবি থাকলেও আঠারশ' নব্বই-এ কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে নেতৃ সম্মিলনের একটা 'গ্রুপ ফটো' আছে। তার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সহ যে পাঁচজন বাঙালীর ছবি আছে, তাঁরা সবাই কোটপ্যান্ট পরা। রবীন্দ্রনাথের মাথায় কেবল পাগড়ি আছে। ফিরোজ শা মেহতার মাথায়ও টুপি।

বিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী বাবুদের ধরণধারণ আঁচ করার মত বেশ কয়েকটি প্রহসন আছে। উনিশ শ' পাঁচে বেরোয় অমৃতলাল বসুর নাটক-প্রহসন, 'সাবাস বাঙালী'। তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। বিলিতী বর্জন চলছে জোর কদমে। তখন বাঙালীবাবুরা বস্টন, ডসন আর ল্যাটিমার—প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানীর জুতো পরত। কিন্তু উল্টো হাওয়ায় :

ছোকরাদের সব ঘুরে গেছে মাথা
তাই চাচ্ছে দিশী ধুতি দিশী জুতি
দিশী ফিতে ছাতা।

কাজেই বাবুয়ানা বা ইংরেজিআনা মার খাচ্ছে খুবই :

'ওরে আমার ঘাড়-ছাঁটা বুলবুল,
তোমার থাকবে কোথায় কামিজ কোট,
ইংরিজি চুলবুল।'

এই প্রহসনের আর একটা নায়িকা বিনোদিনীর আর একটা গানে সেকালের মেয়েদের বিলাসিতার ছবিটাও স্পষ্ট :

আমার এমন চিকণ কেশে
মাখতে মানা ম্যাকেসর।
বিলাতী তেলে চুল ভিজলে
চোটে যান যে প্রাণেশ্বর।
আমার গলা ধরে আদর কোরে
বলেন ভিয়ার বিনো,
কিনোনা পিয়ারস পাউডার
বিমেল গন্ধনেল পিনো।
চুলে দেব কুন্তলীন বুমালে দেলখোস,
হবে প্রাণ পরিতোষ, মেখে দিশী
বোসের এসেন্স মনোহর।

প্রায় এই একই সময়ে, গ্রামবাংলার মেয়েদের বিলাসের নানা প্রকরণের কথা লিখেছেন কবি রজনীকান্ত সেন। 'কল্যাণী' কাব্যে খুড়ো বাঙ্গাল' তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বলছেন :

আবসি দিচি, কাইই (চিরুনী) দিচি,
গাওমাজনের হাপান (সাবান) দিচি,

চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওনা যায়
বেলওয়ারি-চুরি দিচি, পাল্লা-পাইব্যা কাপর দিচি,
পিরান (ব্লাউস) দিচি, মজা কৈব্যা দিবার লাগচে গায়।

'উলের' কুইন ভিকটোরিয়ার সাজে খ্যাতকীর্তি মহীয়সী মহিলা ব্রহ্মময়ী দেবী—সি আর দাশের জ্যাঠাইমা।

কাপড়ও গ্রামবাংলায় অনুপ্রবেশ করেছে—রজনীকান্ত তাও দাগা দিচ্ছেন।'

উনবিংশ শতকের শেষে আর বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালী বাবুর বেশভূষার এক প্রামাণ্য দলিল সিবিলিয়ান চারুচন্দ্র দত্ত মশায়ের মেমসাব 'পুরানো কথা'। দত্তমশায় লিখেছেন, সেকালের শহর কলকাতায় ধুতির বড় দুর্দিন। সাহেবদের না-পসন্দ ত ছিলই, তাছাড়াও ছিল, বললে অনেকেই হয়ত আজ প্রত্যয় করবেন না, বহু জায়গায় ধুতি পরে ঢোকা নিষিদ্ধ। লালকাটা ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাবের কথা ত বাদই দেওয়া গেল. চারু দত্ত মশায় লিখেছেন, 'ইডেন গার্ডেনের গঙ্গার দিকটায় অনেকখানা লম্বা লাল সুরকির দেব জন্য দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকত।' এমনকি ঘোড়দৌড়ের মাঠেও ধুতি পরে যাওয়া ছিল ঝকমারি।'

আপিস সভা-সমিতিতে চোগাচাপকান পরে যেতেই হবে ডাকতার মহেন্দ্রলাল সরকার—যাঁকে সবাই দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর বলত, তিনিও টাউন হলের সভায় যেতেন চোগাচাপকান চাপিয়ে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

নানা ঢপের পিরান, পাঞ্জাবী ও মেরজাই চলনও হল কম নি। গৃহস্থঘরের ছেলেরা ধুতির সঙ্গে কামিজ বা আটা কোর্তা পরত। তবে গায়ে একটা চাদর ছিল আবশ্যিক। ছেলেরা জুতো পরত ফিতেবাঁধা। কালো রং। নাগরা জুতো পরত হিন্দুস্থানীরা। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের হিন্দুস্থানী দারোয়ানরা এই ধরনের জুতো পরে [illegible]

মাদ্রাজীরা পায়ত মাদ্রজী চটি। বিদ্যাসাগর পরতেন ঠনঠনের চটি। মহেন্দ্র সরকার তালতলার।

কলেজের ছেলেরা পরত জিনের ইজের আর গলাবন্ধ কোট। তবে চারুবাবু নিজে কলেজে যেতেন ধুতি পরে। তাঁর এই বিদ্রোহের কারণ হাসাকর। জিনের প্যান্ট আর গলাবন্ধ কোট পরে তিনি একদিন শিয়ালদহ স্টেশনে অপেক্ষা করছেন ট্রেনের, এমন সময় এক সাহেব পাকড়ালেন তাঁকে স্টেশনে টিকেটবাবু মনে করে। একটার পর একটা প্রশ্ন। সাহেবের বদ্ধমূল ধারণা চারুবাবু স্টেশনের চেকারবাবু। তা নইলে এই পোশাকে কেউ স্টেশনে থাকে?

সে যাত্রায় অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, ইজের কোট আর নয়। ধুতি চাদরেই কলেজ যাবেন। কলেজ এই ধুতি চাদরে কাটলেও বি-এ পাশ করার পর তাঁকে কোট প্যান্টেই ফিরে যেতে হল কেননা তখন তাঁকে নানারকম সভাসমিতি জলসায় যেতে হত। এই মিটিং-কা কাপড়া ছিল বিচিত্র। মাথায় গোলটুপি, গায়ে গলাবন্ধ পাশী কলার খাটো কোর্তা ও ফতুই। ভেতরে বিলিতি কামিজ, তার ছাতি তক্‌তার মত শক্ত। ইজারটা পুরোপুরি ইংরাজ ফিশনের।'

কিন্তু এ-সাজও বেশী দিন সয়নি তাঁর। ঘটনাটি একদিক দিয়ে ঐতিহাসিক। স্থান টাউন হল। কলকাতা। সেদিনের প্রধান বক্তা আর কেউ নন, শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত। প্রকাণ্ড সভা। টাউন হলের মধ্যে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। লোকে লোকারণ্য। অ্যানী বেশান্ত তখন জাতীয়তা বোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অজস্র ধারায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন উত্তাল বাংলাদেশে।

জনচিত্তে পথে-প্রান্তরে গঞ্জে গঞ্জে, শহরে শহরে। এখন সেদিনের মিটিং চলেছে ভীমরবে। সদ্য বি-এ পাশ, বিলেত যাত্রা সব ঠিকঠাক—সিবিলিয়ান চাকরির উমেদার দত্ত মশাই বলেছেন সামনের সাবিতে। অ্যানী বেশান্ত বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন অনর্গল। শহর কলকাতা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছে সেই বজ্রনির্ঘোষ। নিস্তব্ধ সভাক্ষেত্র। বুঝিবা পিন পড়লে তার শব্দ শোনা যাবে।

এমন সময় হঠাৎ যেন চারুবাবুকেই লক্ষ্য করে আঙুল দেখিয়ে অ্যানী বেশান্ত বলে উঠলেন : 'অ্যান্ড ইউ দেয়ার ইন ইওর ইংলিশ কস্টিউম লেট মি টেল ইউ, দ্যাট বিহাইন্ড ইয়োর স্টাচর্ড সার্ট ফ্রন্ট দেয়ার বিটস এ হিন্দু হার্ট।' এবং আপনি, বিলেতী পোষাক-পরা আপনি, আপনাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনার ঐ কড়া মাড়দেওয়া জামার ভেতরে যে হৃদয় ধুক ধুক করছে সেটি একটি হিন্দু-হৃদয়।

এর ফলে দত্তমশাই-এর যা অবস্থা হল, তা তাঁর নিজের মুখেই শুনুন : 'আশেপাশে সকলের নজর আমার উপর পড়ল। আমার হিন্দু হার্ট (হিন্দু-হৃদয়) এমন দুড়ু দুড়ু করে উঠল, যে আমি চুপি চুপি হল্‌ থেকে বেরিয়ে একেবারে বাড়ি পালালাম। ইজার-কোর্তা পরা ঘুচল কিছুদিনের মতো।'

অ্যানী বেশান্তের এই কম্বুকণ্ঠে ডাক শুধু চারুদত্ত মশাইকে নয়, সারা বাংলাদেশের হৃদয়কেই নাড়া দিয়েছিল। কোর্তাটুপির কাল বাঙালীবাবুদের জীবনে কমে আসছিল। অনেক দেশীয় রাজাই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। বাঙালী জমিদারবাবুরাও পিছিয়ে ছিলেন না। কুচবিহারের মহারাজা ছিলেন খুবই রসিক। একদা তিনি তাঁর ফুটবল টিমকে কলকাতায় খেলিয়ে ফিরছিলেন। তিনি নিজে একান্ত স্বদিশি—ধুতি-পরা, চটি পায়ে। এখন শিয়ালদহ স্টেশনে দেখা হয়ে গেল ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবের সঙ্গে। তিনি ঐ ট্রেনেরই যাত্রী। রাজাবাবু ব্যারাকপুর স্টেশনে লাটবাহাদুরকে খানার নিমন্ত্রণ করলেন। লাটসাহেব রাজী হলেন। কয়েক স্টেশন বাদে ট্রেনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। রাজাবাহাদুর ধুতি কামিজ পরেই সেদি লাটসাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন এবং খাওয়ালেন সুরুয়া রোস্ট নয়, লুচি তরকারী। লাটসাহেবও পরম পরিতৃপ্তি-ভরে সেই বাঙালীখানাই খেয়েছিলেন সেদিন, বাঙালী পোষাকপরা রাজার আতিথ্যে!!

কিন্তু মোদ্দা কথা কি দাঁড়াল? দাঁড়াল এই—বাঙালী জন্ম থেকেই বাবু। বাঙালীয়ানা মানেই তার বাবুয়ানা। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য, তার নিবিড় পাতাহাওয়া গাছপালা, তার শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্তের আবহাওয়া, তার খোলামেলা নীল আকাশ, সমতল দূর্বাদলশ্যাম দিগন্ত চুম্বিত প্রান্তর, তার অশান্ত বহতা নদীজল, তাকে দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানির মধ্যে আটকে রাখতে পারেনি। এরা তাকে নিত্যপ্রয়োজনের সংকীর্ণ গণ্ডীবাধা জগত থেকে মুক্তি পাবার মন্ত্র দিয়েছে। ঐ একটা পাগলা জাত। খেপে গেলে বিশ্বের দুরূহতম দায়িত্ব তার কাছে হস্তামলকবৎ। এই খেপামিই তার নিজস্ব। তার চরিত্র। তার বাবুয়ানি। এই বাবুগিরি বাদ দিলে বাঙালী হয় না। ভালে কালে এই বাবুগিরির ছিবিছাঁদ পাল্টেছে। কিন্তু বাবুগিরি যায়নি। যাবার নয়। কেননা, বাঙালী থেকে বাবুগিরি বাদ দিলে, ফল দাঁড়ায় শূন্য।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে বুঝি এটাও তার ভাবের ব্যাপার। ভাবের বিভোরতা। প্রাবল্য। ভাবের বন্যা। তাই সুরুতেই জাতটাকে যিনি উথালপাথাল করে দিলেন সেই টুলোপণ্ডিত পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে, প্রেম করে বিয়ে করে, ধার করে গন্ধদ্রব্য কেনে, সুন্দর চাঁচর চিকুরে দিব্যাগনের শোভা বাড়ায়। আবার একসময় সব ছেড়েছুড়ে একবস্ত্রে দূরের পথে পাড়ি জমায় কি এক ঐশী উন্মাদনায়।

আবার শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে, হৃতসর্বস্ব বাঙালী আজও হৃদয়তন্ত্রের সামান্য ঝংকারে জমিদার কৃষ্ণনাথবাবু ফেরিওয়ালা কৃষ্ণ বোষ্টম হয়, তাহার চকচকে বিলাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল' রাস্তার পাশে অতি অবহেলায় ফেলে যায়। একবারও তার কোন খোঁজ রাখে না!

দুই দিকপালের মুখোমুখি

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

—এটা তুমি কি করলে গৌরীশংকর, চুন, বালি, সিমেন্ট, ইঁট কাঠ মালমশলা এনে ফেললে কিন্তু ইমারৎটা বানালে না! সুন্দর নিটোল গল্পের পরিবেশ তৈরি করে যেখানে রাউন্ড স্টোরির আয়োজন কমপ্লিট অমনি তুমি ছেড়ে দিলে। এটা ক্যানো করলে? আর একটু টানলেই ত দিব্যি হত।

খোঁচাখুঁচি খেলে অবশ্য আলাদা কথা নইলে ওঁর সামনে সহসা নিজের মত জাহির করি না। কি বলব, মাথা চুলকোতে-চুলকোতে সংসকোচে বললাম—আমি ঠিক উপন্যাস তৈরি করতে চাই নি। নিটোল গল্প যাতে না হয়ে যায় সেই দিকেই নজর দিয়ে লিখেছি।

—ক্যানো বাপু! গল্প হলে ক্ষতি কি হত?

ক্রমেই আমার সাহস আসছে। বলি—বিশেষ একটা পরিবেশে কতকগুলি চরিত্র এসে জড়ো হচ্ছে, আবার তারা যে যার মত বিদায় হয়ে যাবে—যেখানে কারুর আসা বা যাওয়ার কিংবা সম্পর্ক গড়ে ওঠা না-ওঠার কোনো নিশ্চয়তা নেই সেখানে বিশেষ কাউকে নায়ক-নায়িকা হিসেবে গড়ে তুললে আড্ডার ঢিলেঢালা মুড মার খায়, ওদিকে সিরিয়াসলি ফ্যাসটেশনে ভোগা শিক্ষিত বুদ্ধিমান খুব সমাজের মানসিক বিকৃততার চিত্রও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

আমার যুক্তির সম্মুখে চা এল। চুমুক দিতে দিতে বললেন—প্রেম বুবলিকে আমার ভালো লেগেছে। বাপু ভালো লিখেছ। তোমার বক্তব্য বুঝলাম কিন্তু আমি হলে অন্য রকমভাবে শেষ করতাম।

সকালে সজনীবাবুর বাড়ি আড্ডা দেবার জন্যে বেরিয়ে কিছুটা পথ এসেই মনে হল এখনই গৌরীশংকরকে কথাটা বলে আসা ভালো। অমনি পথ বদল হল।

এরপর রোদ কড়া হবার আগেই দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ি অবধি ওঁকে পৌঁছে দিয়ে গেট পর্যন্ত চলে এসেছি উনি হাঁক দিলেন—কবালেএ, ও কবালী— কবালী আসতেই আদেশ হল—যা-বা গৌরীশংকরকে পৌঁছে দিয়ে আয়—!

এর বছর কয়েক পরে ইস্পাতের স্বাক্ষরকে কেন্দ্র করে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। গ্রীষ্মের এক দুপুরে তারাশংকর হঠাৎ এসে পড়েছেন, ঘরে লেখা কাগজপত্র ছড়ানো। ওঁর সামনে নিজের লেখাপড়ার কথা কোনো দিনই প্রকাশ করি না। ওই অবস্থায় আমাকে উনি দেখে ফেলায় খুব কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম। জিগ্যেস করলেন—কি লিখছো?

—উপন্যাস।

—হ্যাঁ, উপন্যাস আ ত বুঝলাম।

—বিষয়টা কী?

—এই কারখানার শ্রমিক মজুরদের নিয়ে—

—কত বড় হবে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে চার পাঁচ শ' পাতা—

উনি একটু সংশয় প্রকাশ করলেন—বিরাট বই। কি জানি বাপু ওদের নিয়ে এত কি বলবার থাকতে পারে যে অতবড় বই করতে হবে।

এ কথায় মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হলাম। আমার মগজে তখন বার্নপুর আর জামসেদপুরের হাজার হাজার মানুষ আর কলকারখানার পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ইতিহাস গজ-গজ করছে। ছেলেবেলা থেকে দাদার কুলি টাইপ কোয়ার্টারের পরিবেশে দফায়-দফায় বিস্তর সময় কেটেছে। ওদের নিয়ে তেমন করে কেউ বলেনি অথচ বলার কতোই আছে। উনি কিছু না ভেবেই একেবারে উড়িয়ে দিতে চাইলেন কেন?

বই প্রকাশের পর অতুল গুপ্ত-মশাইকে দিয়ে ওঁর কাছে সেই রাত্তেই বই দিতে গিয়েছি। দোতলার বারান্দা থেকে আসুন-আসুন সম্ভাষণের পর বললেন—শুনেছি তুমি একখানা গল্পমাদন লিখে ফেলেছ? বাংলা উপন্যাসের মধ্যে এটিই তখন বৃহত্তম, কটাক্ষ সেই উদ্দেশ্যেই। খুব রাগ হল। হাসতে হাসতেই জবাব দিলাম—আপনার কাছে নিয়ে এলাম, যদি পারেন বিশল্যকরণীটা গুঁজে যাব করবেন এই ভরসায়।

প্রায় হাজার পাতার বইখানা উল্টে-পাল্টে গম্ভীরভাবেই মন্তব্য করলেন—জানো কম কথায় অনেক বেশি বলা যায়। উৎকৃষ্ট আর্টের সেটাই লক্ষণ। যামিনীদা (রায়) প্রায় যাব একথা আমাকে বলতেন।

রাজশেখরবাবুর প্রশংসায় আমি তখন খুব গর্বিত। তার ওপর উনি কেবলই খোঁচা দিচ্ছেন। সহ্য করতে না পেরে বললাম—আপনি যদি পড়েন হাতে একটা লাল পেন্সিল নিয়ে বসবেন। অবান্তর অংশ-গুলো দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন, আমি দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ে সেটা সামনে রেখেই কাজ করব, আপনাকে আর একখানা বই দিয়ে যাবো।

এর পর ইস্পাতের স্বাক্ষর কেমন লাগল কি কিছু কোনো কথাই জিগ্যেস করি নি। লোকমুখে শুনলাম তারাশংকর বলেছেন—গৌরীশংকর এখন আর এস পি করছে। তাতে আরও রাগ হল। কেন কি আমি নিজেকে কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়াতে নারাজ নিজের স্বাধীন মতামত জাহির করতে গেলে খর্ব করতে হয় এই আমার ধারণা।

আমার পিতৃবিয়োগের পর এক সকালে শৈলজানন্দ, রজনীকান্তর সামনে আমায় ধরেই প্রস্তাব করলেন—বইটা রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্যে দিচ্ছ না কেন?

যে নিয়মের প্রতিবাদে স্বাক্ষর করেছি সেই নিয়মকে মেনে নিয়ে আর যিনিই বই দাখিল করুন আমি করব না ইঙ্গিতটা তারাশংকরের প্রতিই ছিল। এমনিতে যদি আসে ত ভালো কথা এই ছিল আমার জবাব। কিছুদিন পরে তারাশংকর নিজে থেকে অভিনন্দন জানালেন এবং অ্যাকাডেমী পুরস্কারের জন্য সুপারিশ হয়েছে একথা প্রভাকর ম্যাচুয়ের মুখে শুনেছেন তাও বললেন। হয়নি। তারও কিছুদিন পরে একদিন বাড়িতে এলেন, আমার ঘরে অন্য লোক থাকায় বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন—শরৎ স্মৃতি পুরস্কারে তোমার আপত্তি আছে? আপত্তি থাকবে কেন? তবে তদবির করা আমার স্বভাব হবে না। উনি অভয় দিলেন, কিছু করতে হবে কেন। আমি শুধু জেনে নিলাম আপত্তি আছে কি না।

পুরস্কার পাই নি। কিন্তু তার বদলে তারাশংকরের মত মানুষের কাছে সাবাস পেয়েছি এটাই কি কম কথা।

তারাশংকরের কাছাকাছি এসে আমি ভুল করেছিলাম একথা মোটেই সত্য নয় সেটা এখন বুঝলেও এক-এক সময়ে মনে হত বুঝি যা এ-পাড়ায় না আসা কিংবা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠা আমার মত মানুষের মানায় না। সেরকম ঘটনা সংখ্যায় খুব বেশি

[illegible] হলেও [illegible] [illegible] [illegible]

এটা বলতে পারো। তবে ও মাইলারও যেমন ছিরি—যাক গে।

বিশু ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে প্রশ্ন করে—কি কি আসন করবেন?

উনি বলে যেতে লাগলেন।

বিশু যেন সেইদিনই যোগাসনে দীক্ষা নেবে এমন ঔৎসুক্য দেখায়—ধনুরাসন যে করেন ওটা কিভাবে করতে হয়?

কর্তা দেখি বীতিমত উৎসাহিত। আমায় হুকুম করলেন—গামছা আছে?

এই সংকট থেকে উদ্ধার করল করালী বাইরে থেকে হর্ণ মারতে লাগল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছি, সে নেমে এল এবং ভেতরে কর্তাকে দেখে স্বগতভাবে বলল—দেখ দিকিন, আমি সজনীবাবুর বাড়ি, শৈলজদা বাবুর বাড়ি ঘুরে—।

কর্তা তাকে দেখে কৈফিয়ৎ তলব করলেন—কি চাই?

—বাড়ি চলুন।

—যা এখন যাবো। চলে যা—

করালী চলে যেতে আবার গামছা-র রিকুইজিশন। কি জন্যে চাইছেন জানি না। আমিও আসন করি কখনো-সখনো। কিন্তু গামছা? অনেক ভেবে বড় টার্কিশ তোয়ালে এগিয়ে দিলাম—যদি পরেন তাহলে যেন কোনো অসুবিধে না হয়।

তখন-এ-তাউস ছেড়ে সটান ভূমি-শয্যায় পেটের ওপর ভর করে হাত-দুটো পিছনে নিয়ে পা-দুটো উল্টে ধরবার চেষ্টা করতে তোয়ালের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। উপস্থিত সকলেই যেন মজা পেয়েছে ইনি কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রের মত প্রতিটি ভঙ্গী নিখুঁত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় অনন্যমনা। আর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই।

একটার সময় করালী গাড়ি নিয়ে পাহারা দিতে লাগল। করালী যত বারই বলে এবার চলুন কিংবা কখন যাবেন বাবু। ততবারই ধমক খায়—তুই চলে যা আমার যখন সময় হবে যাব। অথবা—তোকে কে আসতে বলেছিল। আমি এখন যাব না। তুমুল বর্ষা। আড্ডা ছেড়ে কেউ যায় না। উনি উঠলেন আড়াইটের পর—সেদিন বাড়ি থেকে খুব চটাচটি করেই চলে এসেছিলেন। করালীর ওপর গৃহ-কর্ত্রীর বোধহয় কড়া নির্দেশ ছিল, ওঁকে না নিয়ে বাড়ি ফিরবে না।

আড্ডায় আমাদের বড়দা আবার বড়-বাবু দুজনেই কম যেতেন না। কলকাতায় তারাশংকরের যেমন ছিল মোহনবাগান রো-তে শনিবারের চিঠি, টেড্ডার্স বুথে মিত্র ঘোষ, বড়দার তেমনি বনগাঁয়ে লিচু-তলা ক্লাব কিংবা গোপালনগরের হাট আর মাঝে মাঝে যে কলকাতায় তিনি আসতেন সেও ত এ-আড্ডা সে-আড্ডায় ঢেপ দিতে। তবে তারাশংকরের আরও খাসর ছিল নিজের নাটকের রিহার্সাল দেখতে থিয়েটারে যাওয়া। এ-ছাড়া নিজের প্রিয়-জনদেরও যখন অভিনয় দেখতে আমন্ত্রণ করতেন তখন নিজেও হাজির হতেন। আমার জীবনে এ-রকম বার কয়েক ঘটেছে। হঠাৎ বুকের পাঁজরা সরিয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালেন, বসতে বললেও বসবেন না, দর্শকের মুখের ওপর তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হচ্ছে তা দেখার জন্যই আসা। এটা টের পেতাম, কেন না মাঝে মাঝে এ-পাশ ও-পাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতেন সেটা বুঝতে পারা যেত।

বিখ্যাত অনেক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিল্পীর পারিবারিক জীবন ষোল আনা শান্তিপূর্ণ হয় না। এর দুটি ক্ষেত্র একটি নারী দ্বিতীয়টি সুরা। স্বামীর অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি যতই হোক না কেন ধর্মপত্নীরা যখের পুরুষ অন্যের প্রতি আসক্ত দেখলেই দিশেহারা হয়ে পড়েন। ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু অসাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে সমাজের সকলেরই কৌতূহল থাকে বলেই প্রচারটা বেশি হয়। দোহাই আপনারা যেন ধরে নেবেন না এই দুই গুরুজনের সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিতে বা কালিমা মাখাতে বসেছি। উপরোক্ত মানুষেরা অন্য জগতের জীব। ভাববাচ্যে বিচরণ করেন, জীবনকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দ্যাখেন সেহেতু মানুষগুলোর রীতিনীতি আচার-আচরণ অন্য রকম হবে এটাই প্রচলিত ধারণা। হয়েও থাকে বই কি। সে হিসেবে এঁরা দুজনেই ব্যতিক্রম এবং পারিবারিক জীবনও স্বচ্ছন্দগতিতেই প্রবাহিত। তবে দু-একটা মজাদার ব্যাপার যে একেবারেই হয়নি তা নয়। যেমন কল্যাণী বৌদি বিষের পর প্রথম দিকে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে বড়দার পা দুটো বেঁধে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারতেন, তাঁর কেবলই ভয় ঘুম থেকে উঠে হয়ত দেখবেন বড়দা কোথাও চলে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে বড়দার হয়ত পায়েসের সঙ্গে আম মেখে খেতে ভালো লাগল তখনি আমাদের সামনে বৌদিকে একদলা না খাইয়ে ছাড়বেন না, অথচ বৌদির তাতে আপত্তি। কিন্তু সে-কথা কে শোনে। তারাশংকরের দাম্পত্য জীবনেও এ-রকম কিছু কিছু ইতিহাস আছে। উনি যখন নাটকের অভিনয় মঞ্চস্থ করার কাজে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন উমা দেবীর শরীর খারাপ হতে লাগল।

একদিন সকালে ও বাড়িতে গিয়েছি তারাশংকরের জন্য অপেক্ষা করছি। সনতের মা আমাদের কুশলবার্তা নিচ্ছে। ঘরে আর কেউ নেই। আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন। —আচ্ছা গৌরী, আমাকে কি খুব রোগা দেখচ? না আগের চেয়ে একটু সেরেছি মনে হয়? আমি লক্ষ করার আগে, কথার কথা হিসেবেই জবাব দিলাম আগের চেয়েও ভালোই আছেন মনে হচ্ছে।

তখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই বলে গেলেন —সন্তান বড় হলে তার কাছে বলতে লজ্জা নাই। দ্যাখো বাবা বামুনের মেয়ে, ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ না করে কোনোদিন জল খাই না। আজ বুড়ো বয়সে ডাকতাবের পরামর্শে বাপু এখন রোজ একটা করে মুরগীর ডিম খেতে হচ্ছে। কি করব, নইলে ছিবি ছাদ নষ্ট হয়ে যায়। একটু চুপ করে থেকে বোধহয় সমর্থনের আশায় বললেন—একটু মোটা হইচি। ওজনও বেড়েছে। কি করি এই বয়েসে কী উপসর্গ বলো দিকিন কিন্তু উপায় কী। আবার কখনো বা কোনদিন সুযোগ পেলে জিজ্ঞাসা করেছেন, কর্তা গোপনে টাকা-পয়সা নিচ্ছেন কিনা। এইসব মুহূর্তে তাঁকে বড় অসহায় মনে হত। যথাসম্ভব তাঁকে অযথা সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত করেছি।

সুরা না, তবে সুরের নেশা বড়দা আর বড়বাবু দুজনেরই ছিল। বড়দাকে ট্রেনে, নৌকোয়, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্রসৈকতে মুসৌরীর হাড়ে-হাড়ে বাদ্যি বাজানো শীতে সুর ভাঁজতে দেখেছি। তাঁর ছোট ভাই নুটুদার ত শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে বেশ ভালো দখল

ছিল। বড়দা গাইতেন না তবে গৌরী, কেদারা, বেহাগ, মালকোশে সুর ভাঁজতেন, একটি গান অবিশ্যি হামেশা গাইতেন 'খোদা দেনেবালা হ্যায় মালিক দেনেবালা।' বড়বাবুকে কখনো গাইতে শুনিনি তবে নিজের নাটকে নিজেই গান বাঁধতেন এবং সেগুলির জনপ্রিয়তা থেকেই স্বচ্ছন্দে বলা যায় ভালো উৎরোতো, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর গানের বাণীকে ভাবের দিক থেকে অসাধারণ মনে করি। কবিবর নীরেন চক্রবর্তীর কণ্ঠে তারাশঙ্করের গান যে শুনেছে সে-ই এটা উপলব্ধি করবে। তারাশঙ্করের কীর্তন, বাউল, দেহতত্ত্বের গান খুব প্রিয় ছিল তাঁর।

ধর্ম বিশ্বাসের মত একজন যদি ঈশ্বর আর পরলোকে বিশ্বাস করেন ত অন্যের আস্থার আওতায় দেবদেবী আচার-অনুষ্ঠান কিছুই বাদ যায় না। বিভূতি নিজের দিনলিপিতে লিখেছেন আমি তিল-তুলসীর তর্পণে বিশ্বাসী নই'। মহালয়ার দিনে পরলোকগত পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে অপরাজিত উৎসর্গ করলেন। আর এক সময়ে তারাশঙ্কর শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত কি বিষ্ণুর উপাসক হবেন এই দ্বিধান্বিত মানসিক স্বন্দের গৌরীনাথ শাস্ত্রী মশাইয়ের শরণ নিয়েছিলেন, পরিশেষে উভয় মতে ভেদ কিছু নেই এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট স্মরণ নেই আমার; হয়ত কিছু অসঙ্গতি রইল এই বিবৃতিতে, যদি কারুর ভালোভাবে সেই দিনটির কথা মনে থাকে অনুরোধ রইল আমার এই ভ্রম সংশোধন করেন।

স্মৃতি বড় অবুঝ। কেন না এখনই চোখের সামনে ভেসে উঠল আমাদের দোলের দিনের কথা। বছর কয়েক আগে যুগান্তরে যা লিখেছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করছি :

আজকের দোলে সেই রং আর খুঁজে পাচ্ছি না। উন্মাদনা হয়ত আছে আছে তরুণ দলের হৈ-হুল্লোড়—কিন্তু রঙের বাহার বলতে যা বুঝি তার দেখা মেলে না। কিংবা হয়ত রঙের ছড়াছড়ি ঠিকই আছে নেই আমার সেই মন। মনের বয়স হয়েছে? হবেও বা। যা চলে যায় তার জন্যে আফশোস করলে পিছিয়েই পড়তে হয়। চলার নাম জগৎ।...এসব তত্ত্বকথা জানা নেই তা নয়। তবু সামনে যেখানে আকর্ষণ নেই মানুষ সেখানে পিছন ফিরে স্মৃতির মধ্যে সান্ত্বনা খোঁজে। সেও ত এক ধরনের চলা। কেউ ত মনকে যন্ত্রের নিয়মে সামনে বা পিছনে চলতে হুকুম করতে পারে না—করলেই বা শোনার গরজ মনের না থাকলে সে স্বচ্ছন্দে আপন অভিরুচি অনুযায়ী চলবে!

ওসব থাক। একটা পুরনো দোলের [illegible] থেকে সেই সময়ে টালা থেকে পাইকপাড়া এই মহল্লায় বিচিত্র এক যৌথ পারিবারিক পরিবেশ রচিত হয়েছিল। অনেকেই পয়সা খরচ করে শান্তিনিকেতনে দোল বা বসন্ত উৎসব দেখতে যান।

আমার এক বন্ধু ফিরে এসেছিলেন হতাশার বেদনা নিয়ে। তিনি বললেন, সবই ভালো দাদা! নাচ গান ছন্দ—অপূর্ব। কিন্তু অম্যাদের গায়ে কেউ একটুও ফাগও দিল না। আমরা যেন উৎসবের বাইরের অস্পৃশ্য জীব। যখনই মনে হয় আমাদের উৎসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে তখনই খারাপ লাগে। এই সময়েই মনে পড়ে, একাকী গায়কের নহে ত গান? কই আশ্রমের বাসিন্দারা ত কবির সে-কথা মনে রাখেন নি।

বন্ধুর একথা থেকেই পাইকপাড়ার সেই রঙীন দোলের ছবিটা জেগে উঠল।

সকাল হতে-না হতে গৌর আর শিব দুজনে এসে গেলেন। এলেন মুন্সীদা তাঁর দল নিয়ে। শিল্পী অনন্দা মুন্সীকে যিনি কাছাকাছি থেকে না দেখেছেন তিনি এই মানুষটির অমেয় প্রাণ-প্রাচুর্যের কোনো খবরই পান নি। মুন্সীদার গলায় ঝুলছে ছোট একটি ঢোলক। সঙ্গী আছেন রঘুনাথ গোস্বামী, দিলীপ, নীরু এবং আরও দু-তিন জন—সকলের কাছেই কিছু-না-কিছু বাদ্যযন্ত্র।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ যাত্রা শুরু হল। প্রথমে দক্ষিণাদার বাড়ি। দোতলার বন্ধ দরজা গান দিয়েই খোলানো হল। আজি রঙে-রঙে বাঙিছে আকাশ। বৌদি-দাদাকে আবীর দিয়ে—দাদাকে সঙ্গী করে আমাদের অভিযান। বাজার পড়ল পথে। এক গুচ্ছ সজনে ডাঁটা নিয়ে, সাজানো রান্না গৌরের গামছা-মোড়া মাথায় গুঁজে দিয়ে মুকুট বানানো হল। আর পবনে ত তাব চটের আলখাল্লা ছিলই। এবার নরেন মিত্র। সে-বাড়িতে মিষ্টান্ন জুটলো। নরেন-ধীরেন আমাদের দলভারি করলেন।

এরপর মধ্য পাইকপাড়াব। আছেন নারায়ণ চৌধুরী, নীরেন চক্রবর্তী, বিমল কর, চিত্ত সিংহ, অরবিন্দ মুখার্জি (তিনি তখনও সিনেমা ডিরেক্টর হিসাবে খ্যাত হন নি) সব বাড়ির দরজাই বন্ধ ছিল প্রথমে। 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল' বলে অকপট আবেদনে সাড়া আদায় করে আমরা যখন বড় রাস্তায় ফিরলাম তখন দলটি বাহিনীর আকার ধারণ করেছে।

কেউ অবাক হয়ে দেখছেন যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক দক্ষিণা বসুকে দু'হাত তুলে নৃত্য করতে। কেউ অবাক কষ্টর সমালোচক অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের এই মূর্তি দেখে। তাজ্জব খবর। এর মধ্যে স্থানীয় আভিজাত্য ফেলে দিয়ে ডাক্তার মিছিলে নতুন গানের সংযোজন হয়েছে

মন একবার জয়হিন্দ্ বল

জয়হিন্দ্ বলে তারাশংকর-বাড়ি চল।'

সবাই গাইছে। নাচের তালে হাত-পা তুলে উচ্ছ্বাসেও কেউ কুণ্ঠিত নয়।

তারাশঙ্করের বাড়িই ছল আমাদের শিবির। সেখানে যাবো। পথে তাঁর জামাতা শান্তিশংকরকেও পাওয়া গেল। তারাশঙ্করে জামাতা কবি, সুরসিক শান্তিও গানের সুরে তারাশঙ্কর-বাড়ির ঘুরোতে কণ্ঠ সংযোগ করতে দ্বিধান্বিত নন।

ঝিলের পাশ দিয়ে মিছিল চলল। কে দেখছে, কি মন্তব্য করছে—তা শোনার দরকার নেই। আবীরে অগুরু মিশানো হয়েছে। পথিককে আবীর মাখানো হচ্ছে। হাওয়াতে ফাগ ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে।

এমনি করে আমরা তারাশংকরের বাড়ির সামনে হুসে থামলাম। গান কিন্তু থামল না।

দরজা খুলে গেল।

এস এস। পথে কেন, ভিতরে এস। সবাই এস।

কর্তা স্বয়ং দু হাত প্রসারিত করে আমন্ত্রণ জানালেন। বড় ঘর। সবার সঙ্গে তিনিও মাটিতে একাসনে বসলেন।

প্রথম বছরে কি করে যে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল তা মনের খতিয়ানে লেখা নেই। তবে তারপর থেকে প্রতি বছর এই দিনটিতে তারাশংকর যে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকতেন তা জানা হয়ে গিয়েছিল। এক বছরের খবর : তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন। বোধহয় দিল্লী। সনৎ বললেন, বাবা কালই ফিরে এলেন আজ তোমরা আসবে সেইজন্যে।'

এই দুপুরে ওই ঘরে বসে গান গাইতে হবে। তারপর আসরে রসগোল্লা বিলি হবে, চা আসবে। বেলা একটা বাজবে। রাতে সকলের আহারের নিমন্ত্রণ ও গানের আসর বসতো।

এটা যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতিবছর এ মহল্লার তরুণ এবং বয়স্ক শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক থেকে শুরু করে সমাজের আপাতগম্ভীর সম্প্রদায় এই একটি দিন মুখোশ ফেলে দিয়ে রঙের মিছিলে মিশে যেতেন।

তারপর কালের নিয়ম কে-কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। পরস্পরের সঙ্গে হয়ত ব্যক্তিগত যোগাযোগ রয়েছে—কিন্তু সেই মিলিত কণ্ঠস্বর ত আর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় না। খ্যাতির অরণ্যে হারিয়ে গেছে সেই প্রাণের সুর।

তারাশঙ্করের জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আমরা প্রতি বছর ভোরবেলায় তাঁর বাড়িতে প্রথম প্রণামের নিবেদন নিয়ে উপস্থিত হতাম। ঠিক কোন্ বছরে এটা শুরু হয়েছিল মনে নেই, তবে চাকুরিয়া থেকে গজেনদা, প্রমথদা,

বছরে উনি খুব অবাক হয়েছিলেন, প্রসন্ন আবেগসিক্ত দুই হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এবং রাত্রে আমাদের খাবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। ক্রমে সেটাই এক বিরাট উৎসবে রূপান্তরিত হল। টালার বাড়িতে যখন এলেন তখন ত কথাই নেই। আমরা বসে থাকতে থাকতেই সজনীকান্ত ছোট এক ভাঁড় দই আর একটি চারা পোনা হাতে করে সঙ্গে সুধা বৌদি, আসতেন পাটুদা, বৌদি শৈলজাদা সস্ত্রীক। আমার নেশা ফুলের তাই আগের দিন হয় শোভা নার্শারি আর সেখানে না পেলে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি থেকে একটি জাপানী ফুল 'ইয়ক্কা' বা সেঞ্চুরি ফ্ল্যাওয়ার নিয়ে এসে রেখে দিতাম। সকাল থেকে সেই যে অতিথি অভ্যাগত আসা শুরু হত তার সেরাত রাত নটা দশটা পর্যন্ত চলতো। বাংলার সাহিত্য, সংবাদপত্র, সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত, লোক, পণ্ডিত মহলের আর রাজনীতি ও সরকারী মহলের যে- কোনও গণমান্য ব্যক্তি ওই দিন ওই উৎসবে না দেখলে বুঝতে হত তিনি হয় অসুস্থ, নয় কলকাতার বাইরে রয়েছেন। শুধু কি তাই, সাধারণের জন্যও সে দুয়ার অবারিত। আমার বন্ধুবান্ধবকেও কতবার নিয়ে গিয়েছি এবং তাদেরও আদরযত্ন কিছু কম হয় নি।

একবার জন্মদিনে প্রণাম করতেই উনি আমায় পাশে বসিয়ে বললেন—কি হয়েচে। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে কেন? কি অপরাধ করেছি?

চড়-থাপ্পর মারলে রাগ হয় আমি প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে দ্বিধা করি না। কিন্তু এমন এক জায়গায় ঘা পড়ল যে চোখ দিয়ে জল পড়বার উপক্রম। তখন সব দিক দিয়ে আমার খুব দুর্দিন চলছে। কি বলব? খুব খাটো গলায় স্বীকার করলাম—'আমি হেরে গেছি। তাই ঘরেই বসে কাটাই। বিশ্বাস করুন, দেখাবার মত মুখ আমার নেই।

আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—'দ্যাখো পুরুষ মানুষের মুখে একথা সাজে না। আমি আঠারো বছর ধরে এক নাগাড়ে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছি। হাজার টাকার জন্যে বছরের পর বছর একটা পত্রিকার দু-হাতে কলম ঠেঙিয়েছি কিন্তু হার মানি নি। ভাগ্য তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল বলে তুমি পড়ে পড়ে মার খাবে। না, না না, ওসব ছাড়ো। তোমার ওপর কত দায়িত্ব। আর মানুষের জীবন ত একভাবে চলে না, সুখেদুঃখে মিলেই ত জীবন। বাবা!'

তারাশঙ্করের সেই জন্মদিনের কথা-গুলো আজও মাঝে মাঝে মনে বাজে।

বড়দার জন্মদিনের কথা এর আগেও বলেছি আর অপুর পাঁচালীতে লিখেছি। এখানে শুধু একটি কথা বলি, ঢাকুরি আমাদের বাড়িতে আর গজেনদা-সুমনদা বাড়িতে এই দিনটিকে ঘিরে মেয়েমহ প্রচ্ছন্ন রেষারেষি ছিল। বড়দাকে খাওয়ার জন্য নানা আয়োজন হত। আমি জান বড়দা সুরুপার রান্নাই বেশি পছন্দ ক আর আমার ওই ঘরখানাতে একবার জ বসলে ওঠার ইচ্ছে বড় একটা থাকত আমিই বরং তাগাদা দিয়ে তুলতাম।

শেষ জন্মদিনের সন্ধ্যা সুইন স্ট্রীটের কানুমামার বাড়িতে—অনে এসেছিলেন। তবে সেই সন্ধ্যায় বাবল নিয়েই আসরটা যেন বেশি প্রাণচ হয়েছিল। তার আগের দিন মিরঘো দোকানে বড়দার যে ফটো তুলেছিলাম ফোটোটি এনলার্জ করে বড়দাকে উপ দিই। সেটিই পরে তাঁর সবচেয়ে পবি ছবি হিসেবে রয়ে গেছে। আমার মা শিয়রে আজও রয়েছে।

আজকের দিনের মানুষ যারা এ আসে তাদের অনেকেই প্রশ্ন করে—' কার ছবি?' সগর্বে বলি—'আ বড়দা'র। যদি নাও জিগ্যেস করে তাহ সেধে বলি—ইনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যো পাধ্যায়, আমায় ছোট ভাইয়ের মত ভাল বাসতেন।' যদি চ মনের গভীরে একটা কণ্ঠস্বর আমাকে শোনায়—'না, ছোট ভাইএর চেয়েও ঢের ঢের ভাল

GO BRIGHT WITH SANKYO DYNAMO LIGHT

Sankyo

নির্ভয়ে যাত্রা
চিরস্থায়ী এবং
উজ্জ্বল আলোর জন্য
স্যাংকিও সাইকেল
ডায়নামো লাইট

১২ ভোল্টস্ এবং ৬ ভোল্টস্

স্যাংকিও সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ডায়নামো লাইট

প্রস্তুত কারক :

IJI ইন্দো-জাপানীস ইণ্ডাস্ট্রীস লিমিটেড

১৪ ক্যানাল স্ট্রীট, কলিকাতা—ইণ্ডিয়া

বিক্রয় ব্যবস্থাপনায় :

নিগম ব্রাদার্স

১৫০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০১৩, ফোন : ২৪-৪১৩৫/৩৬

GO BRIGHT WITH SANKYO DYNAMO LIGHT

GO BRIGHT WITH SANKYO DYNAMO LIGHT

তেন।' কিন্তু সেটা মুখে উচ্চারণ তে পারি না।

'বড়দার শেষ জন্মদিনের সঙ্গে কি করে মৃত্যু সংবাদটি জড়িয়ে রয়েছে। ৫০-এর পুজোর পর কলকাতার কেই গিয়েছিলেন ঘাটশিলায় বেড়াতে। মিলনকে কেন্দ্র করে ধলভূমগড়ে টের ম্যানেজার বঙ্কিমবাবু চায়ের ন্ত্রণ করেছিলেন। সেখান থেকে ফেরার ই বড়দা দু একবার বমি করেন। আগেই র খারাপ হয়েছিল কিন্তু এতগুলি র সঙ্গ পাবার আগ্রহে সেটা চাপা দিয়েই ন গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে সেই যে াহণ করলেন তাই শেষ। এর মধ্যে কৈফিয়ৎ কোনো ত্রুটি ঘটে থাকতে পারে ' বড়দা নিজে যেন মৃত্যুর খবর পেয়ে-লেন নইলে প্রতিবেশীকে খবর দিয়ে কৈফিয়ৎ আনিয়ে কেন বলবেন—নটু নইল খবেন।' আবার বৌদি যখন বললেন—মি বারাকপুরে আর যাবে না? র্মতীতে স্নান করবে না?' তার উত্তরে নই বা হাসিমুখে জবাব দেবেন—'ফিরে য়ে তুমি ক'র।'

বড়দা আর বার্ণার্ড শ' একই দিনে ান্তরিত হন। তবে বড়দার মৃত্যু বাদ ৩।১১।৫০ তারিখের খবরের কাগজে াশিত হয়। বার্ণার্ড শ'-এর ২-১১-৫০ রিখে। বয়োজ্যেষ্ঠকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নন্দবাজার পত্রিকায় তারাশঙ্কর লেখেন : জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বৈরাগী তিভোলা বিভূতিভূষণ সংসারাশ্রমে বাস করেছিলেন—সুদূরব্যাপ্ত আসক্তিকে ন্দীভূত করার সে একটি মধুর দৃশ্য। ই প্রসঙ্গে অল্প কিছুদিন আগে প্রকাশিত ভূতিভূষণের একটি গল্প আমাকে দনায় চঞ্চল করে তুলেছে—'বাবা তলাল'—ছেলে বাবাকে এই বলেই কে, বাবা ঘোড়া সাজেন। বাবা সঙ্গী হয়ে লেকে চেনান গাছ-বন আশপাশের থিবী। বাবা ছেলেকে নিয়ে গেলেন ীতে, ছেলেকে স্নান করিয়ে তীরে খলেন, তারপর নিজে নামলেন স্নানে। হসা নীরযতি বন্যা হানলে; কুমীর ধরলে তলালকে, প্রাণরক্ষার জন্যে কুমীরের সঙ্গে র্ধযুদ্ধ করলেন মতিলাল, ছেলে ভাবলে াবা মতিলালের' এ এক মজা, হাসলে, তালি দিলে, —বাবা মতিলাল তলিয়ে লেন জলে, মজা, মজা হল, একা তীরে াড়িয়ে ছেলে ডাকতে লাগল, 'বাবা মতি-াল, এসো উঠে এসো।'

'বিভূতিভূষণের সংসার-বন্ধনের সঙ্গে যাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে াঁদের একজন হিসেবে আমার মনে হচ্ছে বভূতিভূষণ কি তাঁর নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'রহস্যলোকসন্ধানী বিভূতি-ূষণের পক্ষে হয়তো অসম্ভব নয়। র্বশেষে হে বন্ধু প্রণাম।'

বড়দার মৃত্যু সংবাদে সকলেই বসন্নাহত। মিত্রঘোষের দোকানে রোজই ছোটখাট বৈঠক বসে, তারাশঙ্কর স্মৃতিচারণ করেন টেনে কানপুরে সাহিত্যসভা করতে যাবার পথে বড়দার খাওয়া বেশি হয়ে গিয়েছিল তাই তিনি তারাশঙ্করকে বলে-ছিলেন—'দে ভাই হাতটা ধুয়ে দে আমার, বড্ড বেশি খেয়ে ফেলেচি।' একেবারে সরল শিশু ভোলানাথ যেন। ....ঘাটশিলায় সবাই যাওয়া হবে তারাশঙ্কর, সজনীকান্ত, মনোজ বসু, প্রবোধদা প্রমুখ প্রস্তুত হচ্ছেন। ঘাটশিলাতে শোকসভা হবে। নটুদা কলকাতায়ও এসে বাড়ি বাড়ি বলে গেলেন। এরপর হঠাৎ এম সি সরকারের দোকানে প্রমথ বিশী মশাইএর ট্রাঙ্ক কল এল ঘাটশিলা থেকে 'নটু নেই। এর বেশি বলা যাবে না এখন। প্রোগ্রাম বাতিল করো।'

খবরটা সবাইকে দেওয়া হল এবং আমরা কয়েকজন শ্রাদ্ধের বাজার নিয়ে রাতের ট্রেনে হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলাম, শেষ রাতে ঘাটশিলা স্টেশন থেকে দাহিগোড়ায় বড়দার বাড়ির সামনে সাইকেল রিকশা থেকে নামবার সময় দেখলাম নটুদাকে দাহ করে শবযাত্রীরাও ফিরছে। আঘাতের ওপর আরও আঘাত পড়ে দুই বিধবার মুখের দিকে চাওয়া যায় না। প্রমথবাবুর কাছেই শুনলাম —নটুদা সকালবেলায় ঘর থেকে কার্বলিক অ্যাসিডের বোতলটি গোপনে নিয়ে সুবর্ণ-রেখার দিকে চলে গিয়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি। ওই বোতলটি সাপের হাত থেকে বাড়ির চৌহদ্দি রক্ষার জন্য রাখা হয়েছিল—মাঝে মাঝে জল মিশিয়ে চারদিকে ছিটিয়ে দেওয়া হত, তার গন্ধে বিষাক্ত পোকামাকড় ধারেকাছে ঘেঁষতে পারত না। অনুতাপ, অনুশোচনা কিংবা অন্য কোনও অজ্ঞাত কারণে জীবন সম্বন্ধে তিক্ততা দুঃসহ হওয়ার ফলেই নটুদা আত্মহত্যা করেন, রাখাল বালকেরা ডাকতারবাবুর গোঙানীতে ছুটে গিয়েছিল তাঁরাই বাড়িয়ে খবর দেয়, প্রমথবাবু এবং স্থানীয় গণ্যমান্যদের চেষ্টায় ময়নাতদন্তের ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হয়। একই সময়ে দুই ভাই-এর আদ্যশ্রাদ্ধ হল। অতঃপর অনেক চেষ্টা করেও কল্যাণী বৌদি আর যমুনা বৌদিকে একসঙ্গে রাখা গেল না, নিজের বাপের বাড়িতেই তাঁরা চলে গেলেন। ঘাটশিলা বা বারাকপুরের বাড়িতে তাঁদের পক্ষে থাকা সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে নটুদার মৃত্যুর পিছনে কোনো কোনো মহল নানারকম অভিসন্ধি চক্রান্তের গন্ধও ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন—কেন তা আজও বুঝতে পারি না।

ঘাটশিলায় গিয়ে বড়দার শোকসভা করা হল না, অতএব মূলতবী সভা কলকাতায় করা হবে স্থির। সজনীকান্তর ইচ্ছা সাহিত্য পরিষদে, আমাদের কয়েকজনের মত সেনেট অথবা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। একপক্ষ চান ডক্টর সুশীলকুমার দেকে সভাপতি করা হোক, আমরা বলি মোহিত-লাল মজুমদারকে করলেই ভালো হবে। সজনীকান্ত আশংকা করেছিলেন বড় হলে সভা করলে লোকজন বেশি না হলে খারাপ লাগবে আর মোহিতলালকে কিছুতেই সম্মত করা যাবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ওঁদের ধারণা বদলে দিতে পারব। মোহিত-লালকে রাজী করিয়ে ফেলেছিলাম, সেনেট হলের বন্দোবস্তও হল। কিন্তু ইতিমধ্যে লোকমুখে মোহিতলাল খবর পেয়ে গিয়ে-ছেন যে, উদ্যোক্তাদের মধ্যে সজনী তারাশঙ্কর প্রধান। তার কিছুকাল আগে থেকেই মোহিতলাল এঁদের উপর অত্যন্ত বিরূপ, বিশ্বিষ্ট মনোভাব প্রকাশ করে আসছিলেন। সভার দিন দুই আগে তিনি একটি লিখিত ভাষণ পাঠিয়ে দিলেন এবং সভায় উপস্থিত থাকার অক্ষমতা জানিয়ে আমাকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে ওঁদের সম্পর্কে কঠোর ও রুচিবিগর্হিত মন্তব্য ছিল। সেইসঙ্গে একটি অনুরোধ ছিল তাঁর লেখাটা একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে আমাকেই পড়তে হবে অন্য কেউ যেন পাঠ না করেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে যেন লেখাটি পড়া না হয়।

সভার কাজে সজনীবাবু সন্ধ্যার মুখে দোকানে আসেন এবং পড়ে দেখবেন বলে চিঠিখানি আমার অনুপস্থিতিতে গজেনদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একফাঁকে গাড়ি করে চলে যান। ব্যাপারটা শুনে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সজনীকান্তের কাছে লোক পাঠালে চিঠি ফেরৎ দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর আমি ফোনে তাঁকে খুব অপমানসূচক কথা বলেছিলাম, তখন তিনি অপরাধীর মত জবাব দিলেন—আমাকে যা খুশি তাই বলতে পারো কিন্তু চিঠিখানা আমি যেমন নিয়ে এসেছিলাম ঠিক তেমনি আর একজন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে। সেটি আমার কাছে নেই।' তিনি কে? তারাশঙ্করা এরপর আর কি বলব?

তারাশঙ্কর গজেনদাকে জানালেন—গৌরীকে বল, আমার জীবদ্দশায় ও চিঠি কাউকে দেবো না, সে আমাকে খুন করুক।'

মাথার ওপর বড়দার শোকসভা, সেটাই আসল কাজ। অতএব ওসব নোংরামি 'ধামা-চাপা রইল। সভাপতিত্ব করলেন অতুল গুপ্ত মশাই। মোহিতলালের ভাষণের মধ্যে থেকে কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে সজনী-কান্তই সেটি পাঠ করলেন, আমাকে সভার অন্যান্য ব্যাপারে এমন ব্যস্ত রাখা হল যে কে কি বললেন না বললেন সেদিকে নজর দিতেও পারলাম না। আমি শুধু এতেই খুশি যে, আমাদের অন্তরের একান্ত ইচ্ছা বড়দার ইহামৃতকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব সেটি স্বয়ং সভাপতিই সভার তরফ থেকে উত্থাপন করবেন। যেহেতু অতুলবাবুর অভিপ্রায় এক্ষেত্রে রায় দেওয়ার সামিল সেহেতু বড়দার রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়া সুনিশ্চিত। আরও একটা খুশির কারণ সভাতে অস্বাভাবিক ভিড়। সেনেট হলের ভেতরে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

সেদিনই পি ই এন-এর আর একটি অধিবেশন ছিল, সেনেটের পর সবাই সেই সভায় যাত্রা করলেন। সেই সভায় আরও অনেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, কিন্তু

অন্নদাশঙ্কর বললেন: 'কেবল বিভূতি-ভূষণের লেখাই টিঁকবে, আমরা সবাই মুছে যাবো।'

ইছামতীর জন্য বিভূতিভূষণকে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হল। ইছামতী নদী তীরের মানুষের জীবনের যুগপ্রবাহকে একেবারে বর্তমানকালে পৌঁছে দেওয়ার কাজ অসমাপ্ত রেখেই তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন, কিন্তু নিজের যা পাবার এই পৃথিবীর কাছ থেকে তা ষোল-আনা পেয়ে গিয়েছেন মৃত্যুর বছর দুই আগেই তার পাকা রসিদ দিয়ে গিয়েছেন, যাপসী রায়কে বলেছিলেন—আমার মৃত্যুর পর যখন আমার কথা লিখবেন তখন বলবেন আমার সব আশাই পূর্ণ হয়েছে।'

বছর ঘুরলে তারাশঙ্কর সমেত সাহিত্যিকদের একটি দল ঘাটশিলাতে বিভূতিভূষণের স্মৃতিসভা করেছিলেন। স্মৃতিরক্ষার জন্য কমিটিও তৈরি হয়েছিল কিন্তু তা দিয়ে কাজের কাজ ত কিছু হয়নি।

সচরাচর যেমন হয়ে থাকে উচ্ছ্বাসের ফেনা থিতিয়ে এসেছে এবং স্মৃতিরক্ষার ভার কালের হাতে চলে এসেছে।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর তারা-শঙ্কর আরও বিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং এই কুড়ি বছরের আয়ু অবিশ্রাম লেখনীর সৃষ্টিতে অলঙ্কৃত হয়েছে। সার্থক হয়েছে: এদেশীয় সবগুলি পুরস্কারেই তিনি ভূষিত হয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি যে হাওড়াতে সাহিত্যের জন্য দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তা বলিনি, তেমনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের কথাও বলার দরকার নেই। সে ত সর্বজনবিদিত ব্যাপার। সেসব কথা সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা থাকবে। আমার কাল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চৌহদ্দির ভেতর। সেই কথাই বলি।

চীন থেকে ঘুরে এসে উনি ঘরোয়া-ভাবে একদিন বলেছিলেন, হ্যাঁ একটা দেশ দেখলাম বটে। গোটা জাতটা কী আশ্চর্য নিয়মে এগিয়ে চলেছে। আমি হোটেলের বারান্দায় সকালে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতাম, কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে নারাপীপুরুষ সবাই সকালে চলেছে। গম্ভীর মুখ, চেঁচা-মেচি নাই, এত মানুষ আছে অথচ কোনো শব্দ নাই। যেন লড়াই করতে চলেছে।.... তবে একটা কথা মনে হয়েছে 'ওখানে সেক্স নাই।' ও'র ঘরে চীনা সাহিত্যের অনেক বই, সেগুলি উপহার পেয়েছেন। আর যা দামী জিনিস পেয়েছেন তাতে আমার লোভ নেই কিন্তু বইগুলি দেখে লোভ হয়েছিল বই কি।

একবার পনেরই আগস্ট কংগ্রেসের তরফ থেকে গুণীজন সম্বর্ধনায় তেনজিংকে সম্মানিত করা হল। তারাশঙ্করের গাড়িতে একসঙ্গে ফিরছি। সনতের মা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ গো তেনজিং-এর পাশে যে বসেছিল ওই কি ওর বৌ নাকি!

—হ্যাঁ। কেন?

—আমার বাপু দেখে মনে হল, বুঝি মা ওটা তেনজিং-এর মা।

উনি হাসতে হাসতে বললেন—যার ভাগ্যে যেন জোটে! ওতেই যদি ওরা সুখে থাকে তাতে তোমার আপত্তি আছে?

পথে যাচ্ছিল কয়েকটি চীনা মেয়ে। তাদের দেখিয়ে উনি বললেন—আগে দেখতাম চীনে মেয়েদের বুক একেবারে হাতের তেলোর মত স্লেন কিন্তু বাপু যুদ্ধের সময় আমেরিকান, নিগ্রো সোল-জাররা সে কী যে কবল কে জানে, তারপর থেকে এখন ওদের বক্ষসম্পদ নজরে পড়বার মত।

আমরা ও'র সামনে সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে চাইলেও উনি সেই বাধার প্রাচীর নিজে হাতে ভেঙে দিতেন জোর করে। আমার বন্ধুবান্ধব ও'র সামনে সিগারেট খেত না, উনি জোরজুলুম চালাতেন—এ আবার কি!! সিগারেটের টিন নিজে হাতে এগিয়ে বলতেন—নাও বলছি! একটা বয়সের পর ছেলে ত বন্ধুর মত হয়। আর সিগারেট কিছু লুকিয়ে খাবার জিনিস নয়। এতে পাপ নাই, গোপনতাই অস্বস্তিকর। আমি তোমার সামনে দিবি; টানের পর টান দেবো আর তোমার পেট ফুলবে, উসখুস করবে, একথা মনে হলেই বাপু খারাপ লাগে। তা চলবে না।'

অন্তরঙ্গ বন্ধুর ওপর প্রতিশোধ নেবার পদ্ধতিও তাঁর বিচিত্র ছিল। বিকেলের দিকে ও'র ঘরে বসে আছি, ফোন বেজে উঠল। তারাশংকর বললেন—দ্যাখো কে। সজনী-কান্ত। উনি আর উঠলেন না, বললেন—জিগ্যেস করো, কি বলছে সজনী।

আমার সঙ্গেই সজনীবাবুর কথা হচ্ছে —বড়বাবু কি বেড়াতে যাবে?

—বলে দাও, যাবো বেড়াতে।

সজনীবাবু বললেন—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, একসঙ্গেই বেরুনো যাবে।

এরপর উনি হাঁক দিলেন—কবালে গাড়ি বার কর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সজনীবাবুর হিন্দু-স্থানখানা এসে দাঁড়াল। তার পিছনে তারাশংকরের গাড়ি দুজনে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরোবেন। দুখানা গাড়ি কেন? শনি-বারের চিঠির সম্পাদকীয় কোনও মন্তব্যে তারাশংকর বন্ধুর ওপর চটেছেন। এটা তারই অভিব্যক্তি।

আবার এর বিপরীত অভিব্যক্তিও দেখেছি। সজনীকান্তর আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে সাহিত্যিকরা সমবেদনা জানাতে এসেছেন। বাড়ির ভেতরে বাইরে রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লোকারণ্য। অলইণ্ডিয়া রেডিও থেকে টেপ করার জন্য প্রতিবেদক দল এসেছেন। তারাশংকর মাথা হেঁট করে দেখাশোনা করছিলেন; হঠাৎ তিনি প্রবোধকুমার সান্যাল মশাইকে নিয়ে একটু তফাতে চলে গেলেন। বুঝতে একটুও দেরি হল না, 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক রাশিয়ার ডায়েরিতে প্রবোধদা যেসব কথা লিখেছেন সেই ব্যাপারেই জনান্তিকে কিছু প্রাপ্য লাঞ্ছনা চুকিয়ে দিতেই তারাশংকরের এই আহ্বান। খুবই স্বাভাবিক, কেন না, তারাশংকরের নেতৃত্বেই সে প্রতিনিধি দল সফরে গিয়েছিলেন সেই দল থেকে নিজেকে প্রবোধদা বিচ্ছিন্ন করে নেতার অমতে ওখানে কিছু কয়েক থেকে গিয়েছিলেন, শুধু তাই নয় ডেলিগেট হিসেবে যা করা উচিত নয় এমন অসংযমের কাজও তিনি করছেন দেখে তারা-শংকর বন্ধুকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও ফল হয়নি। তারাশংকরের ধারণা প্রবোধ করেছে, তাতে ভারতীয়দের ও-দেশে বদনাম হয়েছে।' এখন দেশে ফিরে যেসব কথা ও রচনায় লেখা হচ্ছে তাতে তারাশংকরের চিত্ত সংকীর্ণতা লেপনের চেষ্টা প্রতি-ফলিত! ও'দের কথা-কাটাকাটি রীতিমত উত্তেজিতভাবে. এবং অনেকক্ষণ ধরেই চলে-ছিল।

দুই ক্ষেত্রে আচরণের এই প্রকার ভেদের কারণ খুঁজতে গিয়ে এই অবাক আমার মনে হয়েছে যে, সজনীকান্তের তীক্ষ্ণ আক্র-মণ সাহিত্যিক সীমানা লংঘন করেনি যা যদি করে থাকে তা তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু অপর ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণের সমর্থনে যথেচ্ছ অসত্যভাষণ তারাশংকরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছিল এবং তিনি যোগ্য জবাব দিতে কৃতসংকল্প হয়েই দুর্বাসা মূর্তি ধারণ করেছিলেন।

শেষ বয়সে তিনি বাইরে বড় একটা কোথাও অকারণে যেতেন না। প্রভাতে উঠে বাড়ির সামনে বেড়াতেন সেই সময় পথ-চলতি মানুষের সঙ্গে কথাবার্তাও হত। আমার পরিচিত একটি যুবক নাম তার নির্মল বিশ্বাস, সে সম্প্রতি কথায় কথায় বলছিল: আমি তখন কলেজে সবে ঢুকেছি, মাসীর বাড়িতে য়াণাঘাট থেকে এসে দস্তবাগানে প্রায় কাটাতাম ভোরবেলায় তারাশংকরকে দেখতে পাবার জন্য। কিন্তু না উনি হাঁটছেন আমি তফাতে চলি আর দেখি। এমনি করে নজরে পড়ে গেলাম। মনে আছে পার্কের গাছ থেকে ঝড়ে-পড়া শিউলিফুল ঘাসের ওপর থেকে কুড়িয়ে ও'র হাতে তুলে দিলাম।' উনি খুশি হয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলেছিলেন —ফুল আমিও ভালোবাসি হে! সব মানুষই বাসে। তাই দ্যাখো না, উৎসব-শোকে সবকিছুর মধ্যেই ফুলের স্থান সবার আগে—এর দেশ-বিদেশ নাই, জাত বিচার নাই।

এ কথায় বড়দাকে আমার মনে পড়ে যায়। তাঁর সঙ্গে পথে বেরুলেই গাছ চেনা-তেন। বাসাডেরা, মুরাকাঞ্জিয়ার অজস্রের মধ্যেও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত নামের ফুলের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিলেন তার মধ্যে একটির নাম ইণ্ডিগোফেরা পালচেরা। আর ধাতুপ গোলগোলি আমাদের কলকাতায় এগিয়াটি ক্যালচাবাল গার্ডেনও দেখে চিনেছি।

বড়দা বনবাদাড় চষে বেড়ালেও নিজে হাতে বাগান কখনও করেন নি। তিনি যেন দ্রষ্টা কিন্তু তারাশংকরের মধ্যে সৃষ্টির নেশা এখানেও। টালাপার্কের বাড়িতে বাগানের পিছনে কত মেহনৎ করতেন নিয়ম বেঁধে।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই যেন কোন-না-কোন সৃষ্টির মধ্যে ফলপ্রসূ হবার জন্য

তাই তাঁর তুলি আঁকা করলেন, নিজের ঘরের দেয়ালে দেয়ালে আপন গল্প-উপন্যাসেরই পাত্রপাত্রীদের যেন রংবিচিত্রিত অভিপ্রকাশ ঘটল। এখানে যা লাভপুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে পথে পড়ে থাকা কাঠকুটো কুড়িয়ে নিতেন তারপর তা থেকে জন্তু-জানোয়ার সেপাই-সান্ত্রী পাখিয়ে উঠত—তারা এখনো তাঁর লেখার ঘর জুড়ে বহালতবিয়তে বিরাজ করছে। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ তারাশংকরের চিত্রপ্রদর্শনী যাঁরা দেখেছেন তাঁদের অনেকেই শিল্পীর স্বতন্ত্র দৃষ্টির তারিফ করেছেন।

বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালীর বকুল-গাছ সবাইকেই দেখাতেন। ওই বকুল গাছটি দেখাবার জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এবং আরও কত বন্ধুজনকেই বারাকপুর গাঁয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। আর তারাশংকর স্বহস্তে যে বকুল গাছটি রোপন করেছেন, তার কথা কজনই বা জানে। সনৎকুমারের কাছেই আমি প্রথম জেনেছি হালে। আবণ্যকের অগলপ্রসাদ যেমন বনকে সাজাবার জন্য আপন খেয়ালে বৃক্ষরোপণ করত এও কি তাই। যখন মর্তকায়ায় আমি থাকব না তখন পথিককে এই গাছ ছায়া দেবে বাতাসে ফুলের সৌরভ ছড়াবে আর সুন্দরের পূজারী কত শিশু, যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ফুলের মাধ্যমে মনের কথা জানাবে। এই ত উদ্দেশ্য! কেউ বলবে, এ একটা খেয়াল, কিন্তু আর কিছু না হয়ে এমন খেয়াল যার হয় সেই ত যথার্থ কবি!'

সত্তরের দশকে এই শতাব্দী সবে পা দিয়েছে কি দেয়নি এমন সময়ে কী একটা কাজে রাতের দিকে গিয়েছি। দেখি বাড়ির চারদিকের দরজা জানালা বন্ধ। দোতলায় আলো জ্বলছে। ডাকাডাকি করতে সনৎ নেমে এল। দরজা খুলল, ঢুকতে যাবো, দেখি গেটেও তালা। এ বাড়ির কি সবই বদলে গেল নাকি? যে-বাড়িতে রাত দশটায় মনে হত সন্ধ্যা লাগছে সেখানে সন্ধ্যায় গভীর রাত! কর্তা নিচেই ছিলেন বোধহয়। আমা-দের গলা পেয়ে ডাকলেন। কথায় কথায় বললেন -আর বল না, এরা আমাকে জেল-খানায় বন্দী করে রেখেছে। মেরে ফেলবার জো করেছে।' সনতের কাছে শুনলাম, পুলিশের ওপর মহলের খবর এই যে, তারাশংকরকে হত্যা করার জন্য নকশালদের ফ্যান আছে। উনি নিজেও স্বীকার করলেন, একদিন উনি বেড়াচ্ছেন কটি ছেলে ছোরা দেখিয়ে শাসিয়ে গিয়েছে। উনি আবিশ্যি ঘাবড়ে যাননি। বাড়ির আশপাশে প্রতি-ক্রিয়াশীল তারাশংকরের রক্ত চাই দেয়াল লিখনও দেখা গিয়েছে। তবে কতটা বিশ্বাস নিরতির নির্দেশের বাইরে কিছু হতে পারে না, প্রাণভয়ে ঘরের মধ্যে বন্দী থাকার কোন অর্থ নেই। যাই বলুন তিনি, রাষ্ট্রের দায়িত্ব সরকার পালন করেছে, তাঁর বাড়ির সামনে সিকিউরিটি গার্ডও দেওয়া হয়েছে।'

সেই সময়ের কলকাতার চেহারা মনে পড়লেও বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এরই মধ্যে বন্ধুবর বজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য তাঁর সাপ্তাহিক প্রতিশ্রুতির পক্ষ থেকে, তরুণ সাহিত্যব্রতী যাদের নাম হয়নি কিন্তু লেখার মধ্যে শক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট তাদের পুরস্কৃত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বজেন, সনৎ, শান্তি আমরা সবাই একই সময়ে সাহিত্যের আসরে নেমেছিলাম তাই বজেনের ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন কেন। নইলে সভাসমিতিতে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন।

শহরের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আর পারিবারিক সংকটের দরুণ আমিও কোথাও নড়ি না। আগের আড্ডার সদস্যদেরও চলা-ফেরা স্ব স্ব কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে আমার মেজছেলে কারারুদ্ধ হওয়ার পর ত বটেই। বজেন সবই জানে, শুধু কি জানা, বজেন আর সহপাঠী ক্ষেমেন্দ্রলাল রায় দুজনে আমাকে সব সময়েই আগলে রাখে। ক্ষেমেনের গাড়ি এল, আমায় তুলে নিল। তারাশংকরের বাড়ি গেলাম।

উনি বোধহয় বজেনের জন্য অপেক্ষা করে বারান্দায় বসে ছিলেন। তার সঙ্গে আমাকে নামতে দেখে উচ্চকণ্ঠে সনতের মাকে ডাকলেন—ওগো, দ্যাখো তো কে এসেছে! চিনতে পার কি না দেখি!

উনি কি ঠাট্টা করলেন আমাকে? সংকুচিত মনে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, পরক্ষণে আমার থুতনী উঁচুতে তুলে চোখের সামনে নিয়ে মমতাসিক্ত সুরে বললেন--কিন্তু, এ কী চেহারা! কি কুবিচিস, এ্যাঁ! আহা রে—

সনতের মা বেরিয়ে এসে বললেন, এ ত আমাদের গৌরী! হাঁ গো, আমি গৌরী-শংকরকেও চিনতে পারব না?

তারাশংকর আমার হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর যা কাণ্ড করলেন তা এখনও ভাবতে বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। উনি চিবুনি নিয়ে আমার মাথার চুল আঁচড়ে দিতে লাগলেন, কোনো বাধাই মানলেন না। আর বলতে লাগলেন—অমন সুন্দর মুখ, এমন বাহারের চুল—কোথায় দিলি বাবা!

বাৎসল্যরসের এমন স্বতোৎসারিত দ্বিধাহীন স্পর্শের স্বাদই বোধহয় অমৃতের সমান মধুর—বড় হয়ে এমনটি কোথায় পাবো! হঠাৎ আমাকে যেন উনি শিশু করে ফেললেন।

চুল আঁচড়ে দেওয়া শেষ আর হয় না, অথচ চুল ত আমি ছোট করে ফেলেছি। এক সময়ে যেন নিজেকে শুনিয়েই বললেন—চলো, গোপাল যাই, ওরা অপেক্ষা করছে।

সেদিন অনুভব করেছিলাম, এই পৃথিবীকে উনি এখন যে দৃষ্টিতে দেখছেন সে দৃষ্টি যেন মর্ত্যলোকের নয়, দিব্য-শক্তির অধিকারী হয়েছেন। হয়ত অনেক ভাবছেই হয়েছিলেন, আমি তা বুঝিনি।

বড়দা বিয়ের কিছুকাল আগে কুমারী রমা চট্টোপাধ্যায়কে মস্ত বড় বড় দুটি ভুল কথা লিখেছিলেন। হ্যালির ধূমকেতু আবার ১৯৮৫ সালে দিগন্তে দেখা দেবে এই কথাটা উল্লেখের পরই তিনি হিসেব দিচ্ছেন তুমি বৃদ্ধা, নাতিপুতি বেষ্টিতা হয়ে গল্প করবে বসে সন্ধ্যাবেলায়। নাতনিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—এই দ্যাখো রেখা, হ্যালির ধূমকেতু উঠেচে—'বিভূতিবাবু বলে একজন লেখক আমার ছেলেবেলায় আমায় বলেছিল, এ ধূমকেতু আমি দেখব। আজ বিভূতিবাবুর কথা তাই মনে পড়চে। রেখা বলবে—কে বিভূতিবাবু ঠাকুরমা? তুমি বলবে—আমাদের সেকেলে একজন লেখক ছিল, বেশ বইটই লিখতো—রেখা ভবিষ্যৎ যুগের মেয়ে ত—তাই ছোট বোন শিখার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলবে—ঠাকুরমার সব সেকেলে ঢং—তারপর দুই বোন খিলখিল করে হেসে উঠবে। আর আমি? কোথায় তখন আমি?... হায়রে। মৃত্যুলোকের পার থেকে হয়তো সস্নেহ দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ যুগের নবীনা বালিকা দুইটির দিকে চেয়ে ভাববো একদিন ওদের ঠাকুরমা ওইরকম বালিকা ছিল ওদের মতই। তার নাম কল্যাণী—কিন্তু নাতনীরা হয়তো সে নাম জানে না।....(৩।৬।১৩৪৭)।

প্রথম ভুলটি অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই শুধরে নিয়েছিলেন এবং রমাকে বিয়ে করে সবাইকে আনন্দ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ভুলটি আর শোধরানোর উপায় নেই—তাতেও আমরা সবাই আনন্দিত। বিভূতি-বাবুর নাম ১৯৮৫ সালে অজ্ঞাত। অপ্রচলিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। অর্থাৎ আজ থেকে আর মাত্র ৭ বছরে বিভূতি-ভূষণের লেখা মানুষ ভুলে যাওয়া ত দূরের কথা উল্টে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে, বাড়বে তারাশংকরের মরনোত্তর খ্যাতি। এর মধ্যে কোনো জল্পনা-কল্পনা নেই সেফ গণিতের হিসাব। এঁদের দুজনেরই রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছে। আরও মজার কথা এই যে বিভূতিভূষণের রচনা-বলীর একটি সুলভ সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে তার চাহিদা খুব বেশি, কিন্তু তাতে দামী সংস্করণের বা স্বতন্ত্র গ্রন্থ-গুলির বিক্রি চোট খায়নি।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পর যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের শীর্ষস্থান দখল করেছেন তাঁদের মধ্যে বিভূতি আর তারা-শংকরের বই-ই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়—না এখন নয়, বরাবরই হয়ে আসছে। আধুনিক কালের বড় বড় পত্র-পত্রিকার মনোপলি মদৎ পেয়েও হালের লেখকরা ওঁদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছেন না। হয়ত বা দু দফা সংস্করণ হু-হু করে বাজার হয়ে গেল কিন্তু তারপর আর নড়ে না বই। সেকেলেরা চিরকেলে হলেন কেমন করে। তাঁরা ত বড় কাগজের বিরাট প্রচার যন্ত্রের বাঁধা-বাঁধি পৃষ্ঠপোষকতা পাননি।

যখন যেখানে সুযোগ হয়েছে সেখানেই লিখেছেন। বাধা দেবার কেউ ছিল না। বাধা দিলে শোনার মত মেজাজই তাঁদের ছিল না। আমার লেখা, আমি লিখব। আমার যা বলবার আছে তাই আমি বলব। এই ছিল শপথ। আর একটা শপথ ছিল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে যাবো না অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে, লোক দেখানোর জন্য নয় নিজের মনের প্রসারকে প্রসন্নতর, সমৃদ্ধতর ও প্রখরতর করে যাওয়ার আন্তরিক তাগিদই ছিল এঁদের সংবর্ধনের ভিত। শুধু এঁদেরই নয় এঁদের যুগের যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের চরিত্রে এই গুণটি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

পাঠকের কাছে কোনো ধোঁকাবাজি টেঁকে না, চটক পালিশে ঢাকের আওয়াজ বেশি দিন বাঁচা যায় না এই সামান্য কথাটা এ যুগের ঠাঁটিয়াল লেখকরা যদি না বোঝেন তবে ক্ষতি তাঁদের যত তার চেয়ে ঢের বেশি অনাগত দিনের সাহিত্য রস পিপাসুদের। জাত সাহিত্যের সঙ্গে চলতি কলমের সাহিত্যের তফাৎ ত এখানেই। বিভূতিভূষণ তারাশংকর কেউই শহরের মানুষ ছিলেন না এবং সেই সময়ে নাগরিক পত্র-পত্রিকায় শহুরের লিখিয়ে হিসেবে নিজেদের হামবড়া ভাবতেন। সেই হাটে এসে কল্কে পাওয়া সোজা কথা ত ছিল না।

ওসব যাক তারাশংকর যেমন ঈর্ষা-পরায়ণ সাহিত্যিকদের উদ্দেশে বেশ জাঁকালো মেজাজে বলতেন—আরে তোমরা বললেই আমি লেখা থামাবো। আমি পত্র-পত্রিকার জায়গা দখল করে আছি, বেশ করছি। ক্ষমতা থাকে, পার তো আমাকে নামাও তবে বুঝি হ্যাঁ।

আজ সেই কণ্ঠস্বর স্তব্ধ কিন্তু মনমানসের রায়ই ত বিচারের শেষ কথা। তাঁদের রায় পরসার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়। বড়লোকের পরসা নয়, পাঠকের পরসা। দুই প্রেমিকের পয়সা থাকে না, তবু তারাই বেশি কেনে।

তারাশংকর অসুস্থ। খবর পেয়ে দেখতে গিয়ে বুঝলাম, রোগীকে নিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে সমাগত উৎকণ্ঠিত মানুষ-গুলির প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য দু-চারজন লোকের দরকার। আগন্তুকদের মধ্যে পড়ে কিছুক্ষণ কাটল। বাইরের ঘরে লোক, বাইরে লোক—সবাই নীরব। একতলার ভেতরের বড় ঘরে আগে যেখানে বসে লিখতেন সেখানেই শায়িত আচ্ছন্ন ঘরে কেউ না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। একবার মনে আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকল—দেখবি। তার পিছু পিছু ভেতর বাড়িতে ঢুকে ঘরের চৌকাঠের মুখে দাঁড়াই। সব শ্বেতশুভ্র নার্স ডাকতার—মনে হল মহা শ্বেতার জনক তাঁর চারপাশে পবিত্রতার পরিবেশ রচনা করেছেন। শুধু একটি নল তার ভেতরটা গাঢ় লাল আর একটা স্বচ্ছ প্রায়। রক্ত দেওয়া হচ্ছে—জীবন এই ত জীবন। আর যেন কিছু দেখার নেই।

বাইরের ঘর। সেখানে দেওয়ালে ছবিরা, কোণে কোণে জীবন্তু আর সেপাইশান্তীরা মোতায়েন। মাঝখানে শূন্য আসনটি যেন অপেক্ষা করছে তারাশংকরের জন্য। এক পাশে বসে থাকি। এই ঘরে দোল, জন্মদিন। এখানে বসেই তিনি এক আসনে বসে পঞ্চ পুত্তলী গোটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি শুনিয়েছেন। বিকেলে শুরু হয়েছিল, শেষ হতে রাত নটা বেজে গিয়ে-ছিল। রাইকমলে যে পতিত অবজ্ঞাত মানুষগুলিকে সাহিত্যের আঙিনায় আসার শুরু তারই পরিণত ব্যাপক রূপ। তারা-শংকর জীবনের সমগ্রতাকে পেতে চেয়ে ছেন সে পাওয়া দেবার জন্যই পাওয়া। এই কথাটাই আসল। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষও মাঝে মাঝে এই বিরাট পুরুষটিকে বুঝে উঠতে পারতেন না। মানসিক এই স্তরভেদই শিল্পীর সাধারণ জীবনকে বিড়ম্বিত করে—করেছিল টল-স্টয়ের জীবনকেও। তবুও আপনজন আপনই থাকে।

সেদিন তাঁকে দেখে আসার পর বার বার মনে হয়েছে করে যেন বলেছিলেন: তাঁর সেই বলার বিশেষ গুরুগম্ভীর ভঙ্গীটুকুও কানে বাজে: তুমি মহাকালের পায়ের শব্দ শুনেছ কখনো? আমি শুনতে পাই। হঠাৎ তার পায়ের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। রাত নিশুতি। গভীর যে জমাট আঁধার নিশীথের সমুদ্রের তলে কালের ভারি ভারি পদধ্বনির আওয়াজ থাকে ভেতরটা থরথর কাঁপতে থাকে তখন তুমি চোখ বুজতে পারবে না ঘুমুতে পারবে না, হাজার চেষ্টা করলেও একটু থেমে যেতেন বলতে বলতে হঠাৎ তারপর খুব মৃদু, মধুর অন্তরঙ্গ সুর বলতেন—বিশ্বাস করো আমি শুনেছি প্রায়ই শুনতে পাই। বাপ রে সে কী গম্ভীর, কী অসহ্য ভারি— বলে বোঝাতে পারছি না।

তারাশংকর কি মহাকালের সেই পদ ধ্বনি শুনেছেন।

দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু তাঁর কথারা অমৃত শব্দই বন্ধু। যুগে যুগান্তরে সেই শব্দকেই মানুষ অর্থবহ করে তুলেছে তার মৃত্যু হয় না। সেই অমৃতের আরাধনা করে আসছে। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া সেই বল সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে বিভূতিভূষণ, তারাশংকর দুই জনে একই অমৃতের ভাণ্ডার দিয়ে গেছে আমাদের আর অনাগত দিনের উত্তর-পুরুষদের জন্য।

১৯৭১ সালের বর্ষা ভেজা যে দিনটিতে তারাশংকর বিদায় নিলেন ১৮৯৫ সালে সেই ২৮শে ভাদ্রেই বিভূতিভূষণ পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলেন।

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

[১]

চোখের সামনে আর রহস্যের পর্দা বলে কিছু নেই। এতদিন সেটা অল্প অল্প দুলছিল, দুলছিল। তার ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু আভাস উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল তার জন্যই সে এমন অদ্ভুত কল্পনা বাপী করতেও পারেনি। কিন্তু তাই যেন ঢের ভালো ছিল আর মিষ্টি ছিল।

এক হ্যাঁচকা টানে পর্দাটা ছিঁড়ে দিয়েছে কেউ। কেউ কেন, বাপী নিজেই দিয়েছে। তার সেই মুহূর্তের [illegible] তলার রূপ-কথার জগতটা ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে গেছে।

গৌরী বউদিকে নিয়ে মণিদা চলে গেছে। বাপী যেন হাঁপ ফেলে বেঁচেছে। গৌরী বউদির পাশে মণিদাকে একটু বেঁটে দেখায়। বাপী গৌরী বউদির মাথার মাথায় হবে। যাবার আগে গৌরী বউদি ওকে দু গাল টিপে আদর করে গেছে। কখনো কলকাতায় গেলে তাদের ওখানেই উঠতে বলেছে। মাঝের দুটো দিন বাপী আগের মতো কাছে যেতে পারেনি, তাকাতে পারেনি। [illegible]

তাকালেই চুরি ধরা পড়ে যাবে। একেবারে জল-ভাত ছেলে না জানলে গৌরী বউদির সন্দেহ হতে পারত।

যেমন আদর হয়েছিল।

আগেও বাপীকে তারিফের সুরে অনেক সময় বলেছে, তুই একটা ডিপ্লো বেড়াল, দেখলে মনে হবে কিছু জানিস না, কিছু বুঝিস না—ভাজা মাছখানাও উল্টে খেতে জানিস না। মজা লুটতে চাস তো এই ভাবেই থাকবি আর দরকার হলে কোপ বুঝে কোপ মারবি।

[illegible]

মনে স্বস্তি নেই একটুও। ও যেন কি একটা সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে। তার থেকে যত বেরিয়ে আসতে চায়, ওটা ততো টানে। আর ভিতরে একটা অজানা যন্ত্রনা ছড়ায়। নিজেকে শাস্তি দেবার জন্যেই বিনা তাগিদে পড়ার বই নিয়ে বসে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু যন্ত্রণাটা তখন মাথায় নড়াচড়া করতে থাকে। বই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ছোট লাঠিটা হাতে বয়ে জঙ্গলে চলে আসে। দমাদম পিটে এক-একটা গাছের ছাল তুলে দেয়। নখ তো পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে যা করে দেয়। একটা ময়ূর দেখে পাথর নিয়ে ক্ষ্যাপার মতো তাড়া করেছিল। এরকম করলে যন্ত্রনার চাপ-ধরা বাতাসটা যেন হালকা হতে থাকে।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ। অবাধ্য পা দুটো তারপর ওই বড় সাহেবের বাংলোর দিকে এগোবেই। কিন্তু রবাত এমন, পর পর দুদিনই মিষ্টির বদলে ওর বাবা-মাকে বারান্দায় দেখেছে। মেয়ে ফার্স্ট হয় ক্লাসে, সকালের দিকে ঘরে বসে তার পড়াশুনা করাই স্বাভাবিক এটা মনে হয়নি। অকারণ রাগে একটা থাবাপ গালাগাল ভিতর থেকে ঠেলে বেরুতে চেয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই সাহেব আর মেমসাহেবকে ঘিরেই একটা কুৎসিত ছবি মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। নিজের ভিতর থেকে সেটা উচ্চেদ করার তাগিদে বাপী হনহন করে সামনে এগিয়েছে।

সেই সামনে এগনোর শেষ চা-বাগানের আড়াই-পাতি তোলা মেয়েদের কাছাকাছি এসে। যে মেয়েগুলো আগে লক্ষ্য করেছে, তারা ওকে দেখলেই মজা পায়। দাঁত বার করে হাসে। ওকে নিয়েই নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা চলে মনে হয়। সেদিনও এক ফুর্তিবাজ মেয়ে হাত তুলে ওকে ডেকে বসল। বাপী সেদিন আর আগের মতো ছুটে পালালো না। কটা দিনের মধ্যে ভিতরটা কত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে নিজেরও জানা ছিল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

মেয়েটা কম করে আট-ন বছরের বড় ওর থেকে। ঠোঁট আর কালো কালো চোখ দুটোও যেন হাসিতে ভেজা। খোঁপার গুঁজি বাঁধা রোমরটা সোজা করে দাঁড়াল। অবাক অবাক সুরে জিগেস করল, তুমি ইখেনে কি দেখতি আস গো খোকাবাবু?

বাপী বলল, তোমাদের পাতা তোলা দেখতে ভালো লাগে।

শুনে মেয়েটা শরত মাটিতে আছাড় খেল যেন। —পাতি তুলা দেখতি ভালো লাগে—মোদের দেখতি লয়। হায় হায় হায় হায়—

আশ পাশের আট-দশটা মেয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বোকামুখ করে বাপীও হেসেছে একটু একটু। তারপর চলে এসেছে। একটা ছোট ছেলেকে বসে পেয়েছে ভেবেই এমন হাসাহাসি ওদের। ব্যবসটা যে বাপীর বাতাবাতি কত বেড়ে গেছে ওরা জানবে কি করে। এত বেড়েছে যে নিজের ভিতরে আর কুলিয়ে উঠছে না। মনে হয় এজন্যেই এমন বন্তনা।

ঘরের সামনের জমিতে বসে হাতদা দিয়ে একটা বাখারি চাঁছছিল আবু রবষাণী। বাপী কাছে আসতে মুখ তুলে একবার দেখে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল।

বাপী সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল ওর মেজাজ-পত্র ভালো নয়। ওর পাশে আরো কটা চাঁছা বাখারির টুকরো পড়ে আছে।

হাত দুই ফারাকে বাপীও মাটির ওপরেই বসল। বলল, দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুরে তোমাকে জঙ্গলে না পেয়ে এখানে এলাম—

বাখারি চাঁছার ফাঁকে আবু একবার টেরিয়ে দেখে নিল ওকে। তারপর ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, ছুটির মধ্যে এ কদিন সকাল দুপুর কোথায় ডিউটি দিলি—বড় সাহেবের বাংলোয়?

বাপী ঢোঁক গিলল। —না, কলকাতা থেকে দাদা-বউদি এসেছিল।

এবারে আবু অবাক একটু। —তোর আবার দাদা-বউদি কে?

—জ্যাঠতুতো দাদা। .....বিয়ের পর নতুন বউ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। এখানেও এসে দু-সাত দিন ছিল—

বাখারি ছেড়ে আবুর ছোট ছোট চোখ দুটো এবারে ওর মুখে এসে আটকালো। এভাবে কি দেখার আছে ভেবে না পেয়ে বাপীর অস্বস্তি।

—দাদার বয়েস কত?

....সাতাশ আটাশ।

—আর বউদির?

....বছর কুড়ি। আবুর চাউনি রকম-সকম দেখে বাপী ঘাবড়েই যাচ্ছে

—দেখতে কেমন?

....কালো। .. তবে ভালোই।

আবু এবার কানে গোঁজা একটা টেনে নিয়ে দাঁতে লাগালো। কো লুঙ্গিতে গোঁজা দেশলাই বার করে ধ সেটা। যন বেড়াল মারার পর চার হয়েই গেছে ধরে নিয়ে বিড়ি খেতে করেছিল। ওকে বলেছিল, কোনো নেশা না থাকলে পুরুষ মানুষকে : না। কিন্তু বাপের ছাল দেখে ছাঁ ওপর হাড়ে চটা। তাই বিড়ি ধরেছে।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এবারে হ ছালে বলল, তাই বল, নতুন বউদির যত্ন করে বেশ বসে বসে ছিলি কটা দি নইলে ছুটির দিনগুলোতেও তোর ছেলে সকাল দুপুর ঘরে কাটায়।

বাপীর ফাঁপরে পড়ার দাখিল। নিজেই বলে জঙ্গলের সব জানোয়ারের মেজাজ বোঝে। এখন মনে হল, ওর দি আর একটু ভালো করে তাকালে তি যা আছে সব গলগল করে বার করে দে

হেসেই পাশ কাটাতে চেষ্টা করল বাবা আপিস নিয়ে এত ব্যস্ত এ ক আমাকে বাজার পর্যন্ত করতে হয়েছে বুঝলে?

তাহা মিথ্যে কিছু বলেনি। এ কদিন ধরে বাবার কাজের ব্যস্ততা বে গেছে। রাতে ছাড়া কলকাতার অতিথি

নববর্ষে প্রকাশিত বাঙ্গনৈতিক ভাষ্যকার **মেঘনাদের** একটি অপূর্ব সৃষ্টিঃ অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত ও উপেক্ষিত **মিজোরাম**, অঙ্গরাজ্যের শোষিত, লাঞ্ছিত 'মিজোদের' জীবনধারা, কৃষ্টি, ভাষা, ধর্ম, সমাজব্যবস্থা ও ঐতিহ্য যে বিক্ষোভ ধূমায়িত করেছে এতকাল তারই বিস্ফোরণ মিজো বিদ্রোহ। জঙ্গী মিজোদের প্রিয় নেতা লালডেংগা। এদের তথ্যপূর্ণ একমাত্র ভারতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থ।

মিজো বিদ্রোহ ও লালডেংগা ৮

লেখকের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ :

রাজতক্ত রাজরক্ত ৯ পাঁচমহল ৮ মাটির ক্ষুধা ৮
বিচিত্র এই কলকাতা ৯ রাজনীতির পটভূমি ৮

সদ্য প্রকাশিত **চিরঞ্জীব সেনের** একটি রহস্যোপন্যাস

লণ্ডন মিস্টি ১০

বিদেশী স্পাই-এর পটভূমিকায় লেখকের বইটি একবার আরম্ভ করলে শেষ না করা পর্যন্ত আকৃষ্ট করে।

পয়েন্ট ব্ল্যাংক ৮ নীল আতঙ্ক ৮

নববর্ষের আর একটি **শক্তিপদ রাজগুরুর** অসাধারণ উপন্যাস

তারা দু'জন ৯

কয়লার রং কালো ৮ কখন অন্যমনে ৮ রং নিয়ে খেলা ৭

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস: ৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

দুদণ্ড বসে গল্প করারও সময় পায়নি। হাত দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ না যাওনি যে?

বিড়িটা দাঁতে চিবিয়ে আবু অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, এ শালা জঙ্গলের নিকুচি আমি।

জঙ্গল-অন্ত প্রাণ আবুর মুখে এ কি! —কেন, চাকরি হবে না তোমার?

—হবে। তোর শ্বশুরের নাতি-নাতনি বড় হলে পরে হবে।

শ্বশুর কাকে বলছে বাপীর সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। আগেও ঠাট্টা করে বড় সাহেবকে ওর শ্বশুর বলেছে। আর নাতি-নাতনি হবার কথাটা শোনামাত্র বুকের দুশ্চিন্তা ভিতর থেকে ঠেলে ওঠার সঙ্গে, সঙ্গে সেই বস্তুটাও। আবু ওর খেয়ালে আছে তাই বাঁচোয়া।

—তোর পিসীর কাছ থেকে কিছু ধার টার করে দিতে পারিস—একটা খাকী প্যান্ট আর মোটামুটি একটা ভালো জামা দরকার। শিলিগুড়ি চলে যেতে পারলে একটা কাজ হয়ে যেত—যুদ্ধের বাজারে সেখানে অনেক লোক নিচ্ছে শুনলাম।

বাপী হতভম্ব। —যুদ্ধের চাকরি!

আবুর গলায় বিরক্তি। —কি লেখাপড়া করিস, পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে জানিস না?

—সে তো ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানির—এখানে কি?

—এখানেও হতে পারে, নইলে কুড়ি-বাইশ লোক নিচ্ছে কেন? আবার পাঠিয়েও দিতে পারে, এই বানারজুলির রাস্তা দিয়েও ফৌজ বোঝাই মিলিটারি যাচ্ছে আসছে দেখিস না?

বাপী ভয়ানক দমে গেল। বানারজুলি যাবে, এই জঙ্গলে ছেড়ে আর ওকে ছেড়ে কোথাও চলে যেতে পারে ভাবলেও বুকের ভেতর টনটন করে। তার ওপর বলে কিনা যুদ্ধের চাকরি নেবে, যুদ্ধে যাবে!

—কি রে, শুনেই ঘাবড়ে গেলি যে খুব। ওর মুখডে পড়া মুখ দেখে আবুর বোধহয় ভালো লেগেছে। —আরে এই শর্মা করে কি, কোনো শালার একটা চান্স পর্যন্ত নাম নেই—এখানে বসে বসে রাস্তা ভাঙব?

গলায় একটু জোর এনে বাপী বলল, নেই ঠিক তোমার কাজ হয়ে যাবে, দেখো।

—আর হয়েছে। আমাদের বড় সাহেবের ছোট বাবা এসে সকলকের পেছনে লাগা দিয়ে গেছে, এখন চাচা যে যার আপনা প্রাণ বাঁচা—কে কাকে দেখে? কান বুজে নতুন বউদির সেবা-যত্নই করে গেলি, এদিকের কোনো খবরই রাখিস না বুঝি?

আমার যে অবস্থা চলেছে সত্যি কোনো খবরই রাখে না বাপী। বাবাকে কখনো এত বেশি ব্যস্ত দেখেছে কদিন এই বা। মা মণিদারা চলে যাবার পর এ দুদিন বাবার সঙ্গে দেখাই হয়নি বলতে গেলে। আগেই বা কতটুকু হত।

আবুর মুখে মোটামুটি খবর শুনে সেও কিছুটা তাজ্জব বটে। বড় সাহেবের ছোট বাবা বলতে উত্তরবঙ্গের সহকারী ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার—দু কথায় অ্যাসিসট্যান্ট ডি এফ ও। তার ওপরে ডি এফ ও—সে লালমুখো খাঁটি সাহেব। আর ওই এ ডি এফ ও এদেশের মানুষ হলেও বাঙালী নয়। কারো লাগান-ভাঙানের জন্যে হোক বা বানারজুলি জঙ্গলের রিপোর্ট দেখে হোক, জানান না দিয়ে সে হুট করে এসে হাজির হয়েছিল। চার-পাঁচ দিন থেকে সব দেখে শুনে রাগে অগ্নি-শর্মা হয়ে ফিরে গেছে।

তবু না বুঝেই বাপী জিগেস করল, অত রেগে গেল কেন?

—রেগে যাবে না, যার চোখ আছে সেই বুঝবে এ জঙ্গলের বারোটা বাজতে আর বেশি বাকি নেই। আধোক নালা শুকনো, জল চলে না, কত চাবা বেড শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেল, তাও ছাগল গরুতে মুড়িয়ে যাচ্ছে, দামী দামী শিশু গাছ গুলোর চার ভাগের এক ভাগ লোপাট, শাল জঙ্গল তো আরো বেশি ফাঁকা হচ্ছে—ওদিকে জঙ্গল কুপ-এর ইজারাদাররা সেই একই টাকা দিচ্ছে। সাহেবদের পিয়ারের বা খদ্দের-শিকারীরা এসে একধার থেকে বাঘ ভালুক শূকর হরিণ মেরে মেরে জঙ্গল কানা করে দিচ্ছে—জঙ্গল বাঁচবে কি মন্ত্রের জোরে? ছোট থেকে বড় সব শালা চোর—বুঝলি?

সত্যিকারের রাগে বেগনে মুখ আবুর। বাপী কিছু জানত, কিন্তু এতটা জানত না। শেষের কথায় আবো মুখ শুকোলো। ভয়ে ভয়ে বলল, আমার বাবাও?

—ধেৎ। এবারে আবু ঠাণ্ডা একটু।—তোর বাবা হল গিয়ে ধার্মিক চুনো পুঁটি মানুষ তেনার কথা কে বলছে। জঙ্গলটা সায়েব-সুবোদের লুটের মাল, তাদের পেট মোটা হচ্ছে। নড়ুক নড়ুক—ধর্মের কল বাতাসে ভালো করে নড়ুক।

ঝটকা মেরে উঠে ঘরে চলে গেল। হাত-দাটা ওর হাতেই। বাপীর মনে হল, হাতের কাছে তেমন কাউকে পেলে একটা কোপ-টোপ বসিয়ে দিতে পারে।

মিনিট সাত-আটের মধ্যে আবার বেরিয়ে এলো। পরনে হাতে কাচা পরিষ্কার পা-জামা গায়ে ফুল-কাটা পাঞ্জাবি। এ-ই ওর বাবু-পোশাক। চাছা বাখারিগুলো জড়ো করে হাতে তুলে নিল। —চল্।

আবু চল্ বললেই চলে অভ্যস্ত বাপী। ওর হাতের বাখারিগুলো বেশ পুরুষ্টু। ভাবল তেমন ভালো কোনো চারাগাছের জন্য হয়তো ওগুলোর দরকার। কিন্তু আবু জঙ্গলের পায়ে-হাঁটা পিছনের রাস্তা ধরে চলল। ও-দিকে শুধু ঝোপ-ঝাড় আর নীচু জাতের খেটে-খাওয়া মানুষদের একটা দুটো করে মাটির ঘর ছাড়া আর কিছু আছে বলে জানে না। এদিকে যারা থাকে তারা বেজায় গরিব।

আরো একটু ভিতরের দিকে প্রায় দেড় মাইল হাঁটার পর আবু ওকে নিয়ে এক-জায়গায় এসে থামল। একই মাটির ছাদের নিচে পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা সামান্য বড় আর একটা ছোট। ছোট ঘরটার সামনেটা হাঁ করা, অর্থাৎ দরজা নেই। বড় ঘরের সামনে হোগলার ওপর বাখারি লাগিয়ে দরজা বসানো। ঘর দুটোর চারদিকে একটু জায়গা নিয়ে গাছের ডালের বেড়া দেওয়া হয়েছে। ডালগুলো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে মোটা তার দিয়ে কষে বাঁধা। সামনেও দুটো বাঁশের খুঁটির সঙ্গে আটকানো গাছের ডালের গেট।

খুব কাছাকাছির মধ্যে আর কোনো মাটির ঘরও নেই।

আবু গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, কই গো, বাদশা-বেগমরা এখনো সব ঘুমিয়ে নাকি?

বাপীর মুখে কথা নেই, ভিতরে বেশ অবাক। আবুর সঙ্গে এতকাল ঘুরছে, কিন্তু এখানে এই প্রথম।

প্রায় একই সঙ্গে পাশা পাশি ঘর দুটো থেকে দুটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। আর দরজা-অলা ঘরটার ভিতর থেকে পুরুষের গলা ভেসে এলো, আবু ভাই এলে? দুলারি, আবু ভাইকে ভিতরে আসতে বল্ না—

দুজনেরই পরনে আধ-ময়লা জোড়া-তাপ্পির শাড়ি। পুরুষের গলা থেকে বোঝা গেল হোগলার দরজার সামনে যে, সে-ই দুলারি। বছর উনিশ-কুড়ি, অর্থাৎ আবুর বয়সী হবে। বেমন ঢ্যাঙ্গা, তেমনি আঁটো-সাঁটো শরীর। গায়ের রং কালো-ঘেঁষা তামাটে। মাথার এলোমেলো লালচে চুলে কখনো বোধহয় তেলের ছোঁয়া পড়েনি। সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। রুক্ষ মুখ, ধার-ধার চাউনি।

বাপীকে দেখে নিল একবার। তারপর আবুর দিকে চোখ। গলার স্বরও পুরুষালি ধাঁচের, ঘরের লোকের উদ্দেশ্যে জবাব দিল, বলতে হবে না, শুনতে পাচ্ছে।

দরজাশূন্য পাশের ছোট ঘরের সামনের মেয়েটা হয়তো দুলারির থেকে বছর দুই ছোট হবে। অত লম্বাও নয়। ঠিক ফর্সা না হলেও কালো বলা যাবে না। ঢলঢলে মুখ, নাক চাপা একটু। তেলের অভাবে এরও মাথার চুল রুক্ষ, তবু অন্যজনের মতো নয়। চাউনি দেখে মনে হবে এই মেয়েটার একটু রস-বোধ আছে।

গেট সরিয়ে আবু ভিতরে ঢুকল। এতক্ষণের বিরক্তি-ভরা মুখটা একটু হাসি হাসি দেখাচ্ছে এখন। ঘাড় ফিরিয়ে বাপীকে বলল, আয়—।

বড় মেয়েটার সামনে এসে হাতের বাখারিগুলো বাড়িয়ে দিল, ধরো, কাল এসে ও-ঘরের দরজা বানিয়ে দেব।

—তোমার দরজার জন্যে আমরা ঘরে বাচ্ছিলাম? ওই রেশমাকে দাও, ঘরে কেউ ঢুকতে চাইলে বাখারি পেটা করবে।

রেশমা কোনো মেয়ের নাম হয় বাপী জানত না। কিন্তু বেশ মিষ্টি লাগল। মেয়েটার চোখে ভ্রূকুটি, ঠোঁটে হাসি।

হাতের বাখারি আবু মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, ওঃ, সব ধার যেন আমার—ওসব

দরজা-টরজা নিজেরাই বানিয়ে নিও। যতো ভালো করতে যাই ততো সব পেয়ে বসে—

দুলারিরও ঠাণ্ডা তেরছা জবাব।—অত ভালো করার জন্য কে সাধছে তোমাকে?

—ফের তুই আবু ভাইয়ের সঙ্গে ক্যাট ক্যাট করে কথা বলিস দুলারি? ভিতর থেকে পুরুষের কর্কশ গলা।

যে-মুখ করে দুলারি ঘরের দিকে মুখ ফেরালো একবার, বাপীর মনে হল ভিতরে যে আছে তাকেও সে একটুও কেয়ার করে না। আবু এগিয়ে যেতে দরজা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল। আবু ভিতরে চলে গেল।

বাপী হাঁ করে দাঁড়িয়ে। এরকম বাতাস থেকে ঝগড়া টানার কারণ কিছু বুঝছে না। এবারে দুটো মেয়েরই ওর দিকে চোখ। তারপর দুলারির আবার তেমনি ঠাণ্ডা চাছা-ছোলা কথা। —কি বুদ্ধি, এখেনে বাবু-ঘরের ছেলে এসে হাজির!

ভিতর থেকে আবু ডাকল, বাপী, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভিতরে আয়।

অগত্যা বাপীও পায় পায় ভিতরে এসে ঢুকল। পিছন থেকে এগিয়ে এসে দুলারি গম্ভীর মুখে একটা তেলচিটে ছেঁড়া-খোঁড়া চাটাই মাটিতে পেতে দিল।

চাটাইয়ের ওপর আবু গ্যাট হয়ে বসল। হাত ধরে ওকেও বসালো। দড়ির খাটিয়ায় বসা কালো কালো দাড়ি বোঝাই লোকটার দিকে আলো করে তাকিয়ে বাপী বিমূঢ় হঠাৎ। এই লোকটাকে তো ও খুব চেনে। কাঁধের পেল্লায় ঝোলায় ছোট-বড় তিন-চারটে ঝুড়ি নিয়ে সাপুড়ের পেট-মোটা বাঁশি বাজিয়ে বামারজুলির রাস্তায় আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে কত রকম সাপের খেলা দেখাতো। বছর খানেক হল একে আর দেখছে না। তার একি হাল! দাড়ির জন্য গাল দেখা যাচ্ছে না, সমস্ত কপাল নাক আর চোখের নিচটা বসন্তের শুকনো গর্তে ছেয়ে আছে। চাউনিও যেন কি-রকম।

আবু জিজ্ঞাসা করল, ছট্টু দাদাকে দেখেছিস কখনো?

বাপীর নাম জানা ছিল না। বলল, সাপের খেলা দেখাতো.....

লোকটার বয়েস কম হলেও চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। দাড়ির জন্য দুলারির ভবল বয়েস মনে হয়। ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, নিজে এখন খোদার খেলা দেখছি।

আবু বলল, গেলবারের বসন্তে ছোট্টু দাদার চোখ দুটোও গেছে। এখন আবার বুকের ব্যামোয় ধরেছে। এই হল ছোট্টুদাদার বিবি দুলারি আর ওই রেশমা—ছোট্টুদাদার বোন।

দুলারি খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, আর রেশমা দরজার কাছে। ওদের দিকে এক-বার করে তাকাতে গিয়ে ঘরের এক-কোণে থাকে থাকে সাজানো কটা সাপের ঝুড়িও চোখে পড়ল। ওগুলোতে এখনো সাপ আছে মনে হল।

বাপীর পরিচয় শুনেই ছোট্টুদাদা বলল, বাপকে ধরে আবুর চাকরিটা জলদি পাইয়ে দাও খোকাভাই—নইলে ও বুদ্ধু চলে যাবে বলছে।

এরপর আবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ সে। আবুর মতো ছেলে আর হয় না। আল্লার শেষ মার থেকে ও-ই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ভাঙা ঘর মেরামত করে দিয়েছে, জঙ্গলে মুরগি খরগোশ যা পায় মেরে এনে ওদের দিয়ে যায়, নইলে কাঠ বেচে দুলারি আর কটা টাকা পায়, গোটা মাসের আটা চালও হয় না তা দিয়ে। ঘরের পিছনে খানিকটা জমি সাফ করে এই আবুই চারদিকে গাছের ডালের বেড়া দিয়েছে। পিছনের জমিতে এখন লাউ কুমড়ো আর শাকটাক বেশ হচ্ছে। সোৎসাহে ছোট্টুদাদা বলল, তোমার লঙ্কা গাছে এখন খুব লঙ্কা ধরেছে আবু ভাই।

আবু নির্লিপ্ত মুখে নিজের প্রশংসা শুনছিল। ওদিকে দুলারির মুখে কৃতজ্ঞতার ছিটে ফোঁটা নেই। শুধু রেশমার হাসি-মাখা দুচোখ আবুর মুখের ওপর। দেখা-মাত্র বাপীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জাগল একপ্রস্থ। আবু যে খুব ভালো তাতে ওরও কোনো সন্দেহ নেই। তবু আবুর এত দয়া এত উদারতা সব ওই রেশমার জন্য। এ একেবারে অকাট্য সত্য। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

আবু উঠে পড়ল। ওকেও ডাকল, চল্, কেমন লঙ্কা হল দেখে আসি।

এদিক থেকে দুলারি হুকুম করল, রেশমা যা—

আবু ওমনি কাঁকিয়ে উঠল, রেশমা যাবে কেন, আমি চিনি না?

পাল্টা ঝাঁঝে দুলারি বলল, গেলে তোমার গায়ে হলকা লাগবে?

সঙ্গে সঙ্গে ছোট্টুমিয়া খেঁকিয়ে উঠল, আবু ভাইয়ের সব কথায় তুই জবাব দিস কেন?

পিছনের ছোট সবজি বাগান দেখতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। রেশমা ওদের দশ হাতের মধ্যেই ছিল। আবু ওর দিকে ফিরেও তাকায়নি। বাপীর তবু মজা লাগছিল। আবুর সঙ্গে এতদিন এত মিশেছে, অথচ এতবড় ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি। ওর পেটে পেটে এত।

কিন্তু ফেরার পথে ওই রেশমার কথা শুনে বাপী অবাক আবার। রেশমার বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরে মরদও আছে। লোকটা আবার মুসলমান নয় খ্রীস্টান। জঙ্গলে কুলির কাজ করে কাঁদনা—রেশমা তার বউ। দিন-রাত মদ খায় লোকটা, ঘরে এক পয়সাও দেয় না। নেশায় ব্যাগড়া দিতে গেলে বউটাকে ধরে দেদার ঠেঙায়। মেরে শুইয়ে ফেলে একেবারে। সেদিন খুব বেশি মারধর হয়, রেশমা তার ভাসুরের কাছে পালিয়ে আসে। দুদিন চারদিন বাদে আবার যায়, আবার মার খায়, আবার আসে। ছ' মাস ধরে এরকমই চলছে।

শুনে বাপীর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তাহলে আবুর কি-যে আশা ভেবে পেল না।

দু-সপ্তাহের মধ্যে বামারজুলির জঙ্গলের শান্তি তছনছ হয়ে গেল। নাড়া-চাড়া কিছু পড়বে সেটা সহকারী ডি. এফ. ও চলে যাবার পরে সকলেরই মনে হয়েছিল। কিন্তু সেই নাড়াচাড়ার ফল যা দাঁড়াল সেটাই নীল আকাশ থেকে আচমকা বাজ পড়ার মতো।

আবু আর বাপীর অন্তত সেই রকমই মনে হল।

মাঝে এখানকার রেঞ্জ অফিসার সন্দীপ নন্দী তিন-চার দিনের জন্য হেডকোয়ার্টারসএ চলে গেছলেন। এর দিন কতক বাদে স্বয়ং ডি এফ. ও—লালমুখো খাঁটি সাহেব এসে হাজির। সকলকে অবাক করে এখানকার বড় সাহেব অর্থাৎ নন্দী সাহেবের বাংলোয় তিন দিন তিন রাতের অতিথি হলেন তিনি। আগের সহকারী এসে ডি. এফ. ও'র জন্য চা-বাগানের বাংলো ঠিক করা হয়েছিল। এবারের পরিদর্শনের ফল কি দাঁড়াবে তখনো কেউ জানে না। আবু চুপি চুপি বাপীকে বলে-ছিল, তোর শ্বশুরের বাংলোর শহর থেকে বাবুর্চি আর খানসামা এসেছে, আধ পেটি বিলিতি বোতলও এসেছে—আর কত রকমের মাংস আসছে ঠিক নেই।

বিলিতি সাহেবকে নিয়ে ঘটা করে দুদিন জঙ্গল দেখানো হল। ফাইলপত্রও পরীক্ষা করা হল। জঙ্গলের গলদের প্রধান আসামী আবুর বাবা কালু ববযানী। লাল-সাহেব জানলেন, জঙ্গলের ভিতরে ভাঁটি-

খানা গজিয়ে ওঠার মূলে সে। আসামীর তালিকায় আরো তিনজন বীটম্যান, একজন ফরেস্ট গার্ড, একজন সেচের বাবু। হরি-বাবুর ফাইল আর গাছপালার হিসেবনিকেশও বিলিতি সাহেবের কাছে সন্তোষজনক নয়। এদের সকলের যথাযোগ্য দণ্ডের নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

এরপর এখানকার বড় সাহেবের সেই ডিভ বিধানের পালা। হেড বীটম্যান কালু ববরানী, তিনজন বীটম্যান, একজন ফরেস্ট গার্ড আর সেচবাবুর চাকরি গেল। আর তদন্তসাপেক্ষে হরিবাবুকে সাসপেণ্ড করা হল।

কপাল শুধু আবু ববরানীর। বড়সাহেব নিজে ডেকে তাকে বীটম্যানের চাকরি দিলেন। চাকরি পেয়ে আবু সাহেবকে সেলাম ঠুকল আর ঘরে এসে নিজের কপাল চাপড়ালো।

বাবার চোখে জল দেখেছে বাপী। পিসীর পায়ে হাত রেখে বাবাকে বলতে শুনেছে, আমি কোনদিন এক পয়সাও কার-চুপি করিনি, তুমি তো জানো।

পিসীর চোখেও জল। বাবাকে হাত ধরে টেনে তুলেছে আর বলেছে, এত ভেঙে পড়িসনে, ঠাকুর এতবড় অবিচার কক্ষনো করতে পারেন না।

ঠাকুরের ওপর বাবার ভরসা এখন কতটুকু বাপী জানে না। দিনের মধ্যে পাঁচ-বার করে তাকে ঘর থেকে ছুটে বেরুতে দেখছে। কোথায় যায় বাপী তাও আঁচ করতে পারে। বিচার যে করবে তার কাছে। ওই বড়-সাহেবের বাংলোর মেজ সাহেবের বাংলোয়। চোখে না দেখলেও বাপী জানে, আবুর মতে আসল চোর যারা, বাবা তাদেরই হাতে পায়ে ধরছে, কান্নাকাটি করছে।

আরো তিন সপ্তাহ বাদে বাবার ছটফটানি কমল। মুখ থমথমে এখন। তার বিচার হয়ে গেছে। বড়সাহেব দয়া করেছে। চাকরি থাকল। তিন বছরের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ। সঙ্গে ওয়ার্নিং।

এবারেও আবু ওকে চুপিচুপি বলেছে, পায়ে ধরিয়া হয়ে বাবা হেড কোয়ার্টারসএ ছোটে আর হাটে হাঁড়ি ভেঙে সব ফাঁস করে দেয় সেই ভয়ে বড় সাহেব আর মেজ সাহেব এই দয়া দেখালো। বলেছে, তোর বাবা তো আর আমার বাপের মতো মুখখু নয়।

ভেতর বার সব জ্বলছে বাপীর। সেই কবে থেকে জ্বলছে। দূর থেকে বাংলোটাকে দেখে। চোখের আগুনে ওটা ভস্ম হয় না। রাত্তির মানুষগুলোও ভস্ম হয় না।

...তারপর সেই দিন। যে দিনটা বাপী এ জীবনে আর কোনদিন ভুলবে না। কোন-দিন না।

মিষ্টি জঙ্গলে। মিষ্টি একা। ওদের বাংলোর খুব কাছেই। একটা রঙ্গিন প্রজা-পতির পিছনে তাড়া করেছে।

সেটা শনিবার। প্রচণ্ড কিছু ঘটবে বলেই বাপীর এই মতি কিনা কে জানে। আকাশ সেদিনও মেঘলা ছিল। বানারজুলির জঙ্গল ওকে বড্ডোই টানছিল। শনিবার দেড়টায় ছুটি ক্লাসের মাস্টারমশাইকে পিসীর শরীর খারাপের কথা বলে বারোটায় বেরিয়ে এসেছে। তারপর বাড়ি। তরপর জঙ্গল। নিজের মনে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর দূর থেকে এই দুটো চোখে একবার মিষ্টিকে ক্ষম করার আশা নিয়েই এদিকে এসেছিল। বেলা এখন আড়াইটের কম নয়।

দূর থেকে মিষ্টিকে দেখেই বাপীর পা দুটো থেমে গেল একবার। ওকে দেখেনি। দেখলেই ছুটে পালাবে। সেই পথ আগলানোর জন্যেই আধ মিনিটের মধ্যে পিছন দিকে চলে এলো। মিষ্টি এখনো প্রজাপতির পিছনে। মাকে কিছুদিন কাছাকাছি না হওয়ার ফলে বেশ ডাগরটি লাগছে এখন। বাপীর দু চোখ লোভে চিকচিক করছে। আগের মতো নয়, এই লোভ বাপীর কাছেও নতুন। চোখের সামনে জোড়া জোড়া মুখ। মণিদা আর গৌরী বউদি.. ভীম বাহাদুর আর তার ভালবাসার মেয়ে... আবু আর রেশমা। পিছন থেকে বাপী নিঃশব্দে এগোচ্ছে। তার চোখে শুধু লোভ নয়, দুর্জয় আক্রোশও।

প্রজাপতির পিছনে আর না গিয়ে মিষ্টি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাপী তখন ওর পাঁচ হাতের মধ্যে। মিষ্টি থমকে তাকিয়ে মতলব বুঝতে চেষ্টা করল। বলল, পিছন থেকে চুপি চুপি আসা হয়েছে—কেমন?

একেবারে কাছে এসে বাপী জবাব দিল, চুপি চুপি আসব কেন। তোকে দেখেই তো এলাম—

একটা হাত ধরল। এক ঝটকায় সেই হাত ছাড়িয়ে মিষ্টি ধমকে উঠল, ফের গায়ে হাত দিবি বলব মা-কে?

প্রাণপণ চেষ্টায় বাপীর বাইরেটা মোলা-য়েম তখনো। —ঠিক আছে, আমাদের বাড়ি চল্, পিসী ক্ষীরের পুলি বানিয়েছে—খেলে আর ভুলতে পারবি না।

মিষ্টি মুখ মচকে জবাব দিল, হ্যাঃ, তোমার বাবা চুরি করে ধরা পড়েছে, আমার বাবা ক্ষমা করে দিল বলে—আর কক্ষনো তোমাদের বাড়ি খেতে যাই—

কথাগুলো মুগুরের ঘায়ের মতো মগজে এসে লেগেছে। তারপর যা ঘটার চোখের পলকে ঘটে গেল। আচমকা দুহাতসুদ্ধু বেড়িয়ে নিজের বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে বাপী ওকে শূন্যে তুলে নিয়ে ভিতরের দিকে ছুটল। মিষ্টি ভালো করে চেঁচাবারও ফুরসৎ পেল না, ওর হাঁ করা মুখের মধ্যে বাপী নিজের মুখ চেপে ধরেছে।

পঁচিশ তিরিশ গজের বেশি এগনো গেল না। ওর ঠোঁটে মুখে মিষ্টি হাত বসিয়ে দিয়েছে। নখতোসুদ্ধু পা ছুঁড়ছে।

দাঁড়িয়ে গেল। তার পরেই মিষ্টি মাটিতে। বাপী ওর ওপরে। ভিতর থেকে যে শয়তানটা বেরিয়ে এসেছে, বাপী নিজেও তাকে ভালো চেনে না। তার স্থান কাল বোধ নেই, ভালো-মন্দ জ্ঞান নেই, পরিণামের হিসেব নেই। তার শুধু লোভ, শুধু আক্রোশ। মুখে দাঁতে ঠোঁটে জিভে নরম মাংসের স্পর্শ। মুখে মুখ চেপে গলা দিয়ে ওকে টুঁ শব্দও বার করতে দিচ্ছে না। আর হাত দুটোরও সর্বাঙ্গের নরম মাংস খুবলে তুলে নেবার উল্লাস।

এই উল্লাসের মুখে আবার একটা ধাক্কা খেয়েই শয়তান থমকালো। তারপর পলকে কোথায় সেঁধিয়ে গেল যেন। এবার বাপী দেখছে। দেখছে মিষ্টির সমস্ত মুখ আবির-গোলা। লাল। চামড়া ফেটে এক্ষুনি রক্ত বেরিয়ে আসবে বুঝি। বড় হাঁ-এর মধ্যে একটা বিকট কান্না চাক ধরে আছে। ওটা মুক্তি না পেলে দম-বন্ধ হয়ে মরেও যেতে পারে।

নিজের অগোচরেই ওকে ছেড়ে বাপী হাত-দুই সরে গেল। খুব শব্দ না করেই কান্নাটা মুক্তি পেল। তারপরেই ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি পনের বিশ হাত ছুটে গেল। পলকের জন্য ঘুরে দাঁড়াল একবার। মাটি থেকে বড়সড় একটা পাথর তুলে নিয়ে প্রাণপণ জোরে ছুঁড়ে মারল ওকে। লাগলে কি হত বাপী জানে না। লাগল না। বাপী নিজের অজান্তে মাথা নইয়ে ফেলে-ছিল। মুখ তুলে দেখি মিষ্টি নেই।

তখনো বিকেল। আবুর ঘরের সামনের উঠোনে বসেছিল বাপী। শরীর অবসন্ন। কিছু একটা ঘটবে জানে। কিন্তু ও কি করতে পারে জানে না। তাই এখানে।

আবু এলো। সঙ্গে আরো দুজন বীট-ম্যান। আবুর থমথমে মুখ। বলল, বাড়িতে না দেখেই বুঝেছি তুই এখানে। চল্, বড় সাহেবের বাংলোয় যেতে হবে, তোকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে—

বাপী ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো।

আবু রেগে গেল। —হাঁ করে দেখ-ছিস কি, আমি বড় সাহেবের গোলাম না এখন? তারপর কুঁকে গলা খাটো করে বলল, তোর বাবাও আছে সেখানে, দুষ্টুমি করেছিস, না হয় মার-ধর খাবি একটু, অত ভয়ের কি আছে, চল্—

কি দুষ্টুমি বা ভয়ের কতটা, আবুও জানত না। বাংলোর বারান্দায় মেমসাহেব, সাহেব আর বাপীর বাবা। দরজার ও-ধারে মিষ্টি।

আর কাউকে কিছু করতে হল না। যা করবার বাবাই করল। চুলের মুঠি ধরে কিল-চড় ঘুঁষি মেরে মেরে ওকে কাঠের মেঝেতে ফেলল প্রথম। তারপর একজন বীটম্যানের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে পাগলের মতো পিটতে লাগল। চাপা আর্তনাদ করে করে বাপী উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু বাবা ওর প্রাণটা বার হওয়ার আগে আর থামবেই না। গা পিঠ হাত পা কপাল নাক মুখের চামড়া ফেটে চৌচির। নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। জিভে ঠোঁটে গরম তাজা রক্তের নোনা স্বাদ।

এধার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে বাপীর। আরো অন্ধকার। গায়ে মুখে মাথায় লাঠির ঘা পড়ছে এখনো। কিন্তু আর যেন অত লাগছে না। ও কি রকম ঘুমপাড়ানি অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

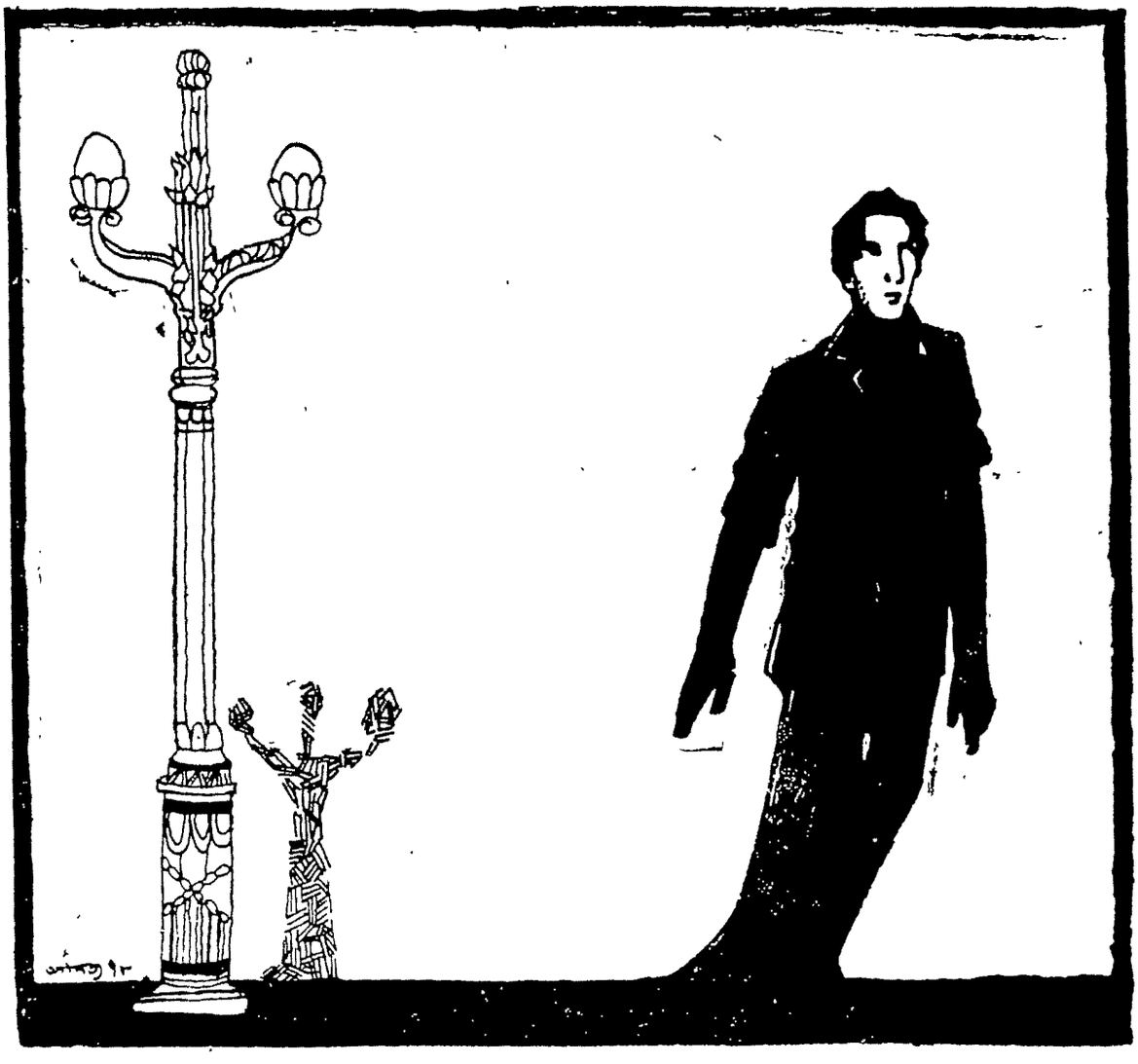

এইরকম \ আশিস ঘোষ

ভাবলাম মৃদুলাকে আজ খুব চমকে দেব।

কোনদিন এ-সময়ে ওদের বাড়ি যাইনি। রাস্তার উল্টো দিকেই লাল বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বাইরের জানালা বন্ধ। গেটের পাশে কামিনী গাছটা হাওয়ায় দুলছে।

রাস্তা পেরিয়ে মৃদুলাদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। ও কি স্কুল থেকে ফিরেছে? না ফিরলে অপেক্ষা করবো। মাসীমা তো আছেই। রিংকুও আছে। সময় কাটানোর অসুবিধে হবে না।

দরজায় শব্দ করলাম। উত্তর এলো না। কে খুলতে পারে? যদি মৃদুলা ফিরে থাকে তো, ওই খুলবে।

আজ ওকে খুব অবাক করে দেব।

সকালে সময় মতো বেরিয়েছিলাম। বাড়ির সামনের [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] টেনেছি। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোড়ালি শক্ত হয়েছে। ধুলো উড়েছে। শুকনো পাতা। মাবিলের গন্ধ। লরী টেম্পো ট্যাকসি কত কি চলে গেছে। তারপর কখন যেন হলুদ ডোরাকাটা একটা বাস এসে দাঁড়াতেই হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়েছি।

বাস, যেমন চলে, তেমনি চলছিল। ঘর ঘর শব্দে মনে হচ্ছিল গাড়িটা কোথাও যাচ্ছে। অর্থাৎ আমি অফিসে যাচ্ছি। অফিসের কথা মনে পড়তেই, ডেস্ক, চেয়ার, ঢাকা দেয়া জলের গ্লাস, পেপার-ওয়েট, ফাইল-পত্তর সব মনে পড়লো।

বাসটা রাসবিহারীর মোড়ে পৌঁছে গেল। খুব ভিড। দু-একজন নামার চেষ্টা করতেই প্রায় এক ডজন লোক [illegible] দিল। আবার চাকার শব্দ হতেই [illegible] অনেকের চীৎকার শুনতে পেলাম। বাসের চাকা গড়াতে গড়াতে প্রচণ্ড ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল। এ্যাক্সিডেন্ট। ঘড়ি উল্টে ঘড়ি দেখলাম। প্রায় এগারোটা। অর্থাৎ আজ আর অফিস যাওয়া হলো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বাসটা ঘিরে ভিড় জমছে। চীৎকার। ছুটোছুটি। আমাকে নামতেই হলো।

নীচের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা লাগতেই মনে হলো,—কি করি এখন? আমি কোথাও যাব? কোথায়? নিজেদের কথা সময় হয়নি। কোন বন্ধুর অফিসে যেতে পারি। কিন্তু সে-ই বা কতক্ষণ আমাকে সময় দিতে পারবে? যদি রাস্তায় ঘুরে [illegible]

বাড়ি যাই ? এ সময়ে আমাকে দেখলে, ও অবাক হবে না, তো ?

আজ ওকে খুব চমকে দেব।

দরজায় আবার শব্দ করলাম।

—কে ? ভেতর থেকে সাড়া এলো। এবার দরজার কাছে।—কে ?

—আমি ! বলেই বুঝতে পারলাম, 'আমি' বললে কিছুই বোঝায় না। দরজা খোলার শব্দ হলো। একটু ফাঁক হয়ে মৃদুলার মুখটা উঁকি দিল।

—এ কী তুমি !

—ভূত দেখছো ?

হাসলো মৃদুলা।—এসো, ভেতরে এসো। দরজা ছেড়ে সড়ে দাঁড়াল।—অফিস যাওনি ?

ভেতরে ঢুকে জুতো খুলতে খুলতে বললাম—মাসীমা, বিল্টু ওরা কোথায় ?

—মা দাদার ওখানে। বিল্টু স্কুলে। বসো, এখানে বসো। সোফার দিকে হাত দেখাল মৃদুলা।—হঠাৎ এখন এলে যে ?

হেসে বললাম—তোমার একটু চমকে দেব বলে !

একটু আগেই মৃদুলা স্নান সেরেছে। ভিজে চুল মাথায় চুড়ো করা। অসময়ে আসায়, খুশী হয়েছে কিনা বোঝা গেল না।

ওদের দুটো ঘর। বাইরের ঘরের নীচু টেবিলে সকালের চায়ের কাপটা এখনো রয়েছে। একটা ডেস্ক ক্যালেন্ডার। খবরের কাগজ। পুরোন ম্যাগাজিন-ছেঁড়া বই একটা।

ফ্যান ঘুরিয়ে দিল মৃদুলা। সোফায় বসলাম। ও পাশের ঘরে গেল। এ ঘরে এখন আমি ছাড়া দুটো চেয়ার। নীচু টেবিল, সোফা। ক্যালেন্ডার। আর বইয়ের আলমারি। তিন থাকে বই সাজান। নীচে মাটির পুতুল কয়েকটা। কাপ ডিস এই-সব।

কিছুক্ষণ বসে রইলাম। আজ তো অফিস নেই। আড্ডা নেই। সারাদিন এখানে বসে থাকবো। বই পড়বো। রেডিও শুনবো। ওর সঙ্গে গল্প করবো। আরও কি কি করবো বা করা যায়, এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না। ইচ্ছে মতো যা খুশি করতে পারি।

উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলাম। ভেতরের বারান্দায় মৃদুলা দাঁড়িয়েছিল।

ডাকলাম—এই শোন।

মৃদুলা এ-ঘরে এলো। ওর চুল বাঁধা হয়ে গেছে। কপালের সবুজ টিপ জ্বলজ্বল করছে।

—কিছু বলবে ?

—কি বলবো !

—ডাকছো কেন ?

—ডেকেছি !

—এই তো ডাকলে।

তাই তো, কেন ডেকেছি ! কী বলতে চাই ? কী করে ওকে চমকে দিতে পারি ? ও কি আমার কথা বুঝতে পারবে ?

—হাত দেখাচ্ছে তোমাকে।

—তাই বুঝি ?

—আমাকে তুমি বিশ্বাস কর না ?

—কেন, একথা বলছো কেন ?

—বলবো না ? আমি ঘরে ঢুকতেই পাশের ঘরে চলে গেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলে।

হাসল মৃদুলা ! হেসে আমার হাত ধরে, আবার সোফায় এনে বসিয়ে দিল।

ওকে বললাম—তাকাও আমার দিকে। ভাল করে দেখ—

মৃদুলা তাকাল না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। ওর হাত ধরে বললাম—তোমাকে —তোমাকে আমি—

—কি ?

—চুমু খেতে চাই

—থাক, এখন না

—কেন, এখন নয় কেন ?

—জানলা খোলা যে—

হাত বাড়াতেই মৃদুলা একপাশে সরে গেল।—ঐ দেখ

দেখলাম। শাদা একটা বেড়াল জানলায় বসে এদিকেই চেয়ে আছে। ওর দিকে চাইতেই হাই তুললো। তারপর টুপ্ করে লাফিয়ে নিচে নেমে গেল।

মৃদুলা জানতে চাইল, সারাদিন আজ কি করবো। কিছুই যে করার নেই, সেটা আর বলা যায় না।

বললাম,—তোমার কাছেই তো এলাম। বল না কি করবো ?

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো মৃদুলা। তারপর হেসে বললো—আমাকে তো স্কুলের খাতা দেখতে হবে।

একটু যেন বিরক্ত হয়েছে। কি করি এখন ? ভেবেছিলাম, অসময়ে এসে খুব চমকে দেব। অন্যদিন যা যা করি বা বলি, আজ তা কিছুই হবে না। এমন কিছু করতে হবে, যা এতদিন হয়নি। কিন্তু ওর দিক থেকে তো কোন সাড়া পাচ্ছি না। তাহলে ? উঠে গিয়ে ফ্যানটা বন্ধ করে বললাম—সারাদিন ঘরে বসে থাকাটা ভাল নয়। চল না, বাইরে একটু ঘুরে আসি।

ফ্যান বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো মৃদুলা। অদ্ভুত একটা শব্দ করে বললো—তোমার কোন বান্ধবী নেই ?

—কেন থাকবে না ?

—তাকে নিয়ে বেড়াতে যাও না ?

—সুযোগ পেলেই যাই।

—সুযোগ বুঝে চুমু খাওনি ?

—তা তো মনে নেই।

—মিথ্যেবাদী !

মৃদুলা আর কিছু বললো না। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলো। তারপর বুকের আঁচল ঠিক করতে করতে বললো,—তোমার সঙ্গে যাওয়া উচিত—বলতে বলতে পাশের ঘরে গেল।

কেন জানি না, হঠাৎ খুব হাসি পেল। একা-একা হাসতে শুরু করলাম। হাসতে হাসতে গায়ের জামা ঠিক করে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছলাম। মাথায় চিরুনি চালালাম। জুতোয় ফিতে বাঁধলাম।

ওকে নিয়ে এখন বাইরে বেরুবো।

বিকেল চারটে।

এখনো বেশ রোদের তাপ আছে। পার্কে একটা রাধাচূড়া গাছের ছায়ায় আমরা বসেছিলাম।

মৃদুলা বললো,—এই রোদে বাইরে না ঘুরে বাড়িতে থাকলেই হোত।

ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, বাড়িতে তো রোজ থাক। একদিন বাইরে বেরুলে মন্দ কি।

মুখ নীচু করে ও ঘাসপাতা ছিঁড়ছিল। শাড়ির আঁচলে পিঠের একদিক ঢাকা। অন্যদিকে নরম ফর্সা গলা আর পিঠের কিছুটা বেরিয়ে আছে। ও কিছু বলছে না। একটুও নড়ছে না। একভাবেই বসে আছে।

লাঠি হাতে কয়েকজন বুড়ো পার্কে ঢুকলো। একজনের সঙ্গে কুকুর। ওরা নিজেদের মধ্যে কি যে বলাবলি করছে, কে জানে ! সামনেই একটা বেঞ্চিতে বসলো। কুকুরটা আমাদের দিকে ছুটে এলো। রাধাচূড়ার সবুজ পাতায় বিকেলের রোদ কাঁপছে। একজনকে কাছেই দেখা গেল। লম্বা শাদা চুল। শাদা দাড়ি। গায়ের জামাটাও শাদা। বুড়ো আমাদের দিকেই চেয়ে আছে। নিঃশব্দে।

মৃদুলা কি যে বললো, শুনতে পেলাম না।

হাত নেড়ে বললাম,—ইয়ে হয়েছে, মানে—

ও বললো—ইসে

আমি বললাম—এইসব, মানে—

ও হেসে বললো—ইয়ে এইসব ইসে

আমি কয়েকরকম শব্দ করলাম

ও আরও নানারকম শব্দ করে গেল

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললো, —এই জানো, একদিন না ঘুমের মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছিল।

—সে কী !

—হ্যাঁ গো, আমার না কী ভয় !

—কী করলে ?

—কাউকে খুঁজে পেলাম না। অনেক চীৎকার করেও কেউ এলো না।

—তারপর ?

—চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের সামনেই এক-একটা বাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ছে। রাস্তা বসে যাচ্ছে।

কথা বলতে বলতে মৃদুলা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মুখটা সামনের দিকে ঝুলে পড়লো। গায়ে হাত দিতেই ভীষণ-ভাবে কেঁপে উঠলো।

শব্দ করতে করতে রাস্তা দিয়ে পরপর দুটো দমকল চলে গেল। গাছের পাতায় শব্দ হতেই দেখি, লাল রোদে পিঠ দিয়ে একটা চিল আমাদের দিকেই চেয়ে আছে।

রাস্তায় এত ভিড় যে ভালভাবে হাঁটার উপায় নেই। পাশাপাশি যতবার হাঁটার চেষ্টা করি, ভিড়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়। গাড়ির ভিড়। ট্রাম, বাস ট্যাক্সি।

ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামার চেষ্টা করতেই একটা স্কুটার ঠিক পাশ দিয়েই চলে গেল। [redacted] লোক যে কেন রাস্তায় বেরোয়। খায় যায় এরা ?

সকালের সেই এ্যাকসিডেন্টের জায়গায় এসে পৌঁছলাম। কোন চিহ্ন নেই। কত লোক রাস্তার এপাশ-ওপাশ করছে। নরম পীচে টায়ারের দাগ। ট্রামের শব্দ। গাড়ির হর্ণ। শব্দের সঙ্গে গাড়ির চেহারারও কেমন যেন মিল আছে। শব্দ শুনেই বোঝা যায় কোন গাড়িটার চেহারা কেমন। কী রঙ। চোখ বুজে মৃদুলাকে বলে দিতে পারি, কোনটা সবুজ, কোনটা কালো বা বাদামী।

হাত ধরলো মৃদুলা।—দাঁড়িয়ে পড়লে কেন ?

—জানো, সকালে এখানেই একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

চমকে উঠলো মৃদুলা।—ওমা সে-কী।..

—তাই তো অফিস যাওয়া হলো না। তোমার বাড়ি গেলাম।

—দেখেছো ? চেনা কেউ ?

—ভিড় ঠেলে তো দেখিনি। চাপ-চাপ রক্ত ছড়িয়েছিল।

—উঃ। কেঁপে উঠলো মৃদুলা।

ওকে কাঁপতে দেখে আমার শীত করলো। মুখ তেতো মনে হলো। জ্বর নেই, তবু জ্বরের মতো।

কয়েক পা এগুতেই একটা রেস্তোঁরা চোখে পড়লো। মৃদুলাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। হাতের ব্যাগ খুলে ও যেন কী খুঁজছিল। রুমাল দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিল।

এখানেও বসার জায়গা নেই। ভিড়। কথা বলছে সবাই। বিশেষ কারুর কথাই বোঝা যাচ্ছে না। একজন বেয়ারা আমাদের দাঁড়াতে বললো। কাউন্টারের কাছেই দাঁড়ালাম। মৃদুলা খুব চটছে বোধহয়। জানি, রাগটা পড়বে আমার ওপরেই। কী করবো ভাবছি, বেয়ারাটা আবার এলো।

—আসুন স্যার

—কোথায় ?

—কেবিন খালি হয়েছে।

মৃদুলাকে নিয়ে ওর পেছন পেছন একটা কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভেলভেটের লাল পর্দা সড়ানো। সবুজ টেবিলের দু-পাশে দুখানা করে চেয়ার। আমি একদিকে বসতেই, মৃদুলা উল্টোদিকে গেল।

—বলুন। বেয়ারা হাতের তোয়ালে দিয়ে টেবিলটা মুছে দিল।

—চা দুটো।

—আর কিছু ?

মৃদুলার দিকে চাইলাম। মুখ নীচু করে বসে আছে।

—না, আর কিছু চাই না। চা-টা একটু তাড়াতাড়ি দেবে।

পর্দা টেনে দিয়ে বেয়ারা চলে গেল। এখন আমি আর মৃদুলা মুখোমুখি। মাথার ঠিক ওপরেই পাখা ঘুরছে। দু পাশে বাদামী কাঠের পার্টিশান। টেবিল সল্টের শিশি হাতে নিয়ে, খানিকটা নুন হাতের চেটোয় ঢেলে নিল মৃদুলা। হাত ওল্টাতেই শাদা নুনের দানা টেবিলে ছড়িয়ে পড়লো। ফুঁ দিয়ে টেবিল পরিস্কার করতে করতে মনে হলো,—ওকে কি বলতে পারি এখন ? কি ইচ্ছে করছে ? কী ? এমন কিছু করবো, যা ও ভাবতেই পারে না। আমাদের সম্পর্কটা একঘেঁয়ে হয়ে গেছে। দেখা হয়, কথা বলি, কিছু সময় এক সঙ্গে থাকি। তারপর যে যার মতো চলে যাই। আজ একটা কিছু করতে হবে। এত দিনের অভ্যাস পাল্টাতে হবে।

বেয়ারা চা দিতেই কাপটা টেনে নিয়ে বললাম,—ভাল করে একবার তাকাও তো আমার দিকে।

ও একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল।

—কী হলো ?

—ভাল লাগছে না

—কেন ? জ্বর হয়েছে ? দেখি তো গায়ে হাত দিয়ে

—ধ্যাৎ

—দেখি না ? ওকে ধরবার জন্যে হাত বাড়াতে যাব, বেয়ারা ঢুকলো বিল নিয়ে।

সবুজ টেবিলে শাদা কাচ। সল্টের শিশি। গুঁড়ো মশলা। দুটো শাদা কাপ। ডিস। টেবিলের কাচে আলো। আলোটা চোখে লাগছে।

বিল আর টাকা নিয়ে লোকটা বেরিয়ে যেতেই মৃদুলাকে বলতে চাইলাম,—দেখ, আমি তো তোমার কাছেই এসেছি। তুমি যা চাও, আমি তো তাই করতে চাই।

কিছু বলতে পারলাম না। গলার ভেতরটা জ্বালা করছে। মৃদুলা আমার দিকেই চেয়ে আছে।

—তোমার শরীর খারাপ ?

—কই না তো !

—ছটফট করছো কেন ? চায়ের কাপটা ও সামনের দিকে ঠেলে দিল। ওর হাতের নখে লাল নেইল পালিশ। লাল রঙে চোখ পড়তেই কালো পীচের রাস্তায় চাপ চাপ রক্ত দেখতে পেলাম। রক্তের ফোঁটা এখানেও ছড়িয়ে পড়লো। মৃদুলার গায়ে। টেবিলে। চায়ের কাপে। গা গুলিয়ে বমি আসছে। কি বলবো ওকে ? ওকি বুঝতে পারবে ?

উঠে দাঁড়াল মৃদুলা। শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে বললো,—চল, যাওয়া যাক। বাইরের হাওয়ায় ভাল লাগবে।

আমি কিছু বলার আগেই ও কেবিনের বাইরে চলে গেল। ভেলভেটের লাল পর্দা দু-একবার দুলতেই আমাকেও উঠতে হলো।

এখন আলো জ্বলতে শুরু করেছে। উল্টো দিকের ফুটপাতে বিজ্ঞাপন জ্বলছে। লাল নীল সবুজ। একটার পাশে আর একটা। ওপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে। আলোয় আলোয় শব্দে শব্দে—

ওর হাত ধরে বললাম,—কি জানো, দিনকে দিন কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি। ও শুধু একবার আমার দিকে চাইল। খুব আস্তে নিঃশ্বাস ফেললো। কিছুই বললো না।

ট্রাম স্টপে এসে পড়েছি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। একটা গাছের নিচে দাঁড়ালাম। এক্ষুনি ট্রাম এসে পড়বে। মৃদুলার চলে যাওয়ার কথা মনে হতেই সামনের ট্রাম লাইন আরও চকচক করে উঠলো। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া গায়ে লাগতেই, ওর হাত ধরলাম। বুকের ভেতর শিরশির করে উঠলো।

—এই।,

ও কিছু বললো না। কেঁপে উঠলো একবার।

—কবে দেখা হচ্ছে ?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল। এবার চলে যাবে মৃদুলা। আমাকেও ফিরতে হবে। বাড়িতে, নয়তো আড্ডায়। কাল থেকে তো আবার এক রকম। বাড়ি অফিস ট্রাম বাস ভিড়। মৃদুলার সঙ্গে দেখা হলে, কেমন যেন মনে হয়। ইচ্ছে হয়, ওর সঙ্গে চীৎকার করে কথা বলি। জড়িয়ে ধরে চুমু খাই। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ একটা ল্যাম্প পোস্টে উঠে, সবাইকে চেঁচিয়ে বলি,—মৃদুলাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তা হয় না। পারি না। কিছুই করতে পারি না। আজকের এই সময়টুকু যদি—

ট্রাম এসে পড়লো। হেসে হাত নাড়লো মৃদুলা।—চলি।

কয়েক পা এগিয়ে পা-দানীতে পা তুলতেই, ট্রাম আবার চলতে শুরু করলো।

হাত নাড়লাম। ট্রামটা ওকে নিয়ে ছুটে গেল।

চারদিকে এখন যারা দাঁড়িয়ে আছে, কাউকেই চিনি না ওদের কিছু বোঝাতে চাইলেও বুঝবে না। এত শব্দ হচ্ছে। কারুরই ভ্রুক্ষেপ নেই। কেন যে এরা

সদ্য প্রকাশিত

বিকল্প নেই ৫·০০

বিমল দত্ত

জীবনের বাস্তব সমস্যা ও অনুচ্চ মনোবেদনা সম্বলিত ছোট গল্প সংগ্রহ

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩

দাঁড়িয়ে থাকো। দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। এই জায়গাটা যদি ফাঁকা হতো। কেউ না থাকতো। কোন ট্রাম বাস মানুষ কেউ না। তাহলে চীৎকার করে বলতাম,—মৃদুলা তোমাকে চাই—তোমাকে চাই!

বুড়ো একটা ভিখারী সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা বোবা। হাত নেড়ে কী যেন বোঝাতে চাইছে। কিছুই বুঝতে না পেরে, পাশের একজনকে দেখিয়ে দিলাম। সেও বিশেষ আমল দিল না। বুড়ো আরও কয়েকজনের কাছে গেল। হাত-মুখ নেড়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলো। বিশেষ আমল পেল না। একজন তো ধমকেই দিল। বুড়ো লোকটা রাস্তায় বসে কাঁদতে লাগলো।

কয়েকজন রঙ-চঙে জামা পরে হেঁটে যাচ্ছে। হাসছে। চীৎকার করে গান করছে। লম্বা চুল দুলছে। ঢিলে জামা হাওয়ায় উড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা বুড়ো লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল। ইঙ্গিতে বোবার ভঙ্গী করে একজন কী বললো। বাকীরা হেসে উঠলো। তারপর হৈ-চৈ করতে করতে উল্টো দিকের ফুটপাতে চলে গেল।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোন মানে হয় না বলেই হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তার মাঝ বরাবর হাঁটার ঝুঁকি আছে জেনেও, ফুটপাতে উঠলাম না। দু'পাশ দিয়েই গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। সামনে পেছনে বাস কিংবা ট্যাকসি। হেড লাইটের আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। হর্নের শব্দে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। পেছনে কোন গাড়ি যদি ধাক্কা দেয় তো, যে কোনদিকে ছিটকে পড়বো মসৃণ পীচের রাস্তায় রক্ত ছড়িয়ে পড়বে। চাকার নীচে শরীরটা যাবে থেতলে। মৃদুলা, আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে না। জানতেও পারবে না, তোমাকে কী বলতে চেয়েছিলাম। আমি তো নিজেই জানি না, কী করতে চাই!

কালো রাস্তায় লম্বা সাদা দাগ। ডিজেলের গন্ধ ছড়িয়ে পাশ দিয়ে একটা হলুদ বাস চলে যেতেই মনে হলো, হয়তো এই শেষ! আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে না।

রাত দশটায় আড্ডায় চা খেতে খেতে সুভাষকে বললাম,—জানিস, আজ সারাদিন শুধু ঘুরে বেরিয়েছি। ওকে আর বললাম না যে, সঙ্গে মৃদুলাও ছিল। কোথায় কোথায় ঘুরেছি। কী করেছি!

রেস্তোরাঁয় বাইরের আলো নিভে যেতেই, ফ্যানটাও থেমে গেল। জানলাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা উঠতেই হলো।

বেরুনোর মুখে অশোকের সঙ্গে দেখা। ওর মুখে গন্ধ পেলাম। কপালে ঘাম কয়েক ফোঁটা। সবাইকে ও তাড়িয়ে নিয়ে চললো। কোথায় জানে!

কথা বলতে বলতে বাস স্টপে দাঁড়ালাম। তিনজনেই সিগারেট টানছিলাম। অশোক বললো—চল না, বসি কোথাও।

সুভাষ সায় দিলো। কিছুই না বলে আমি শুধু সিগারেট টেনে গেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হলো। হাসাহাসি করলাম। তর্ক করলাম।

রাত বাড়তে থাকল।

দোতলা একটা নীল বাস এসে দাঁড়াতেই, সুভাষ লাফিয়ে উঠলো। অশোক আবার সিগারেট ধরালো। আমি আর নিলাম না।

বাসটা সুভাষকে নিয়ে চলে যেতেই, অশোককে সকালের সেই এ্যাকসিডেন্টের কথাটা বললাম। ও খুব গম্ভীর হয়ে বললো,—চল কোথাও বসে বসে শোনা যাবে।

ওকে আর বললাম না যে, লোকটাকে দেখিনি। যদি চেনা কেউ হয়!

ও বললো,—আজকাল এসব প্রায়ই হচ্ছে। দুর্ঘটনা। ট্রাফিক-জ্যাম। কখন যে কী হয়, বলা যায় না। দুপুরে হারীতের সঙ্গে ঐ নিয়েই কথা হচ্ছিল।

—হারীতের কি খবর? অনেক দিন তো আসে না।

অশোক কিছু বলার আগেই আমার বাস এসে গেল। রাত প্রায় এগারোটা।

ফাঁকা বাসের পেছনে বসতে বসতে মনে হলো—অশোককে আরও কী সব বলবো ভেবেছিলাম। মৃদুলাকে ও চেনে। আমার সঙ্গে মৃদুলার সম্পর্কটাও ওর জানা আছে। এব্যাপারে ওর মত কি, জানলে হোত।

মার্চের কলকাতায় এখন কুয়াশা নেই। রাস্তা প্রায় অন্ধকার। সব দোকান বন্ধ। ফুটপাত প্রায় ফাঁকা একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ফাঁকা বাসে যে কজন বসে কেউ কোন কথা বলছে না। হাত-পা নাড়ছে না দু-একজন তো বসে বসেই ঝিমুচ্ছে।

কন্ডাক্টর সামনে দাঁড়াতেই, খুচরো পয়সা দিলাম। লোকটা পয়সা নিয়ে টিকিট দিল। আরেকজনের টাকা নিয়ে, তাকে পয়সা আর টিকিট দিল। বাস থামল। চলতে লাগল। ঘন্টি বাজল। বাজতে থাকল। বাস থামল। আবার চলতে লাগল। কন্ডাক্টর দু'জন ঘুরে ঘুরে টিকিট চাইল। পয়সার শব্দ হতে থাকল।

আমার স্টপ আসতেই নেমে পড়লাম। আরও দু'জন নামল। ঘন্টি বাজল। শব্দ হলো। বাসটা আবার চলতে শুরু করলো।

যে তিনজন বাস থেকে নেমেছি, কেউ কাউকে চিনি না। কারুর মুখের দিকেও চাইলাম না। বাঁ দিকের রাস্তায় একজন ঢুকে গেল। অন্যজন একটু কুঁজো হয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

একটা সাইকেল রিক্শা সামনে দিয়ে যেতেই মৃদুলাকে আবার মনে পড়লো।

ওকে আজ প্রশ্ন করেছিলাম—আমি তোমার কে?

কোন উত্তর পাইনি।

জানতে চেয়েছিলাম,—তোমার কাছে কেন এসেছি?

ও হেসেছিল।

ও স্বপ্নের কথা বলেছিল। —এসবের মানে কী?

আমি কিছুই বলিনি। কী বলা উচিত বুঝতে না পেরে বলেছিলাম,—তুমি কেন? কী চাই তোমার কাছে?

ও কিছুই বলেনি।

যখন বললাম,—কেন আমাদের দেখা হয়? কেন?

ও হাসতে শুরু করলো। হাসতে হাসতে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

মৃদুলার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালাম। ঘর অন্ধকার, মানে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনের ছোট মাঠ আবছা জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট। বাইরের দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ভেজানোই আছে। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জেলে দিলাম। ফ্যান ঘোরাতেই এক টুকরো কাগজ টেবিল থেকে উড়ে নিচে পড়লো। দেওয়ালে ক্যালেন্ডারের শব্দ।

পাশের ঘরের দরজা খোলা। প্রায় অন্ধকার। কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। ফ্যানের শব্দ। আর কোন শব্দ নেই। বাইরের রাস্তায় কারা যেন কথা বলছে। কথা বলতে বলতে ঠিক বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছে। শব্দ করে কে যেন হেসে উঠলো। হাসতেই থাকল। জানলা খুলে দেখার চেষ্টা করলাম। দু'জন। কাউকেই চিনি না। ওরা কী যেন বলতে বলতে একসঙ্গে হেসে উঠলো। তারপর দু'জন দু'দিকে চলে গেল।

জানলার দাঁড়াতেই দেওয়ালে ল্যাম্পপোস্টের ছায়াটা হঠাৎ চোখে পড়লো।

লালবাই-এর দেশে

রেখা বড়ুয়া

—ছি লালী, রঘুনাথ বলেছেন, ওকথা বলো না, তোমার চেয়ে আপন আমার অন্য কেউ নয় এ সংসারে। মহারাণী—

—কিন্তু সে আপনার স্ত্রী মহারাজ।

মুহূর্তের জন্যে কথা হারালেন রঘুনাথ।

লালবাই বলল, আমি যখন সে মর্যাদা পাব না, তখন আমাকে বিদায় দিন মহারাজ, আমি আগ্রার চলে যাই, সেখানে আমার ফুফু রয়েছেন, তিনি আমাকে ফেলবেন না।

—লালী, লালবাই— আকুল হলেন রঘুনাথ।

এবার ধীরে ধীরে রূপ পালটাল লালবাই। শাণিত গলায় বলল, মহারাজ আপনার হিন্দুত্ব কি লালবাই-এর চেয়েও বড়? আপনি ফয়সালা করে নিন—

লালবাই-এর হীরেপান্নার দুলের হিংস্র দীপ্তিতে চোখে ধাঁধা লেগেছিল রঘুনাথের, একটু সময় চেয়েছিলেন তিনি ভাবার জন্যে।

—বেশক—তীক্ষ্ণ হেসেছিলেন লালবাই আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, তিন দিন —এরপর লালবাইএর সঙ্গে আর আপনার দেখা হবে না, খুদা কসম্।

কুমুর, আজকের এই শাঁখারীবাজার এলাকায় মদনমোহনের যে মন্দির দেখলি, সেই মন্দির তখন সর্বদা গমগম করত পুণ্যার্থীদের ভিড়। সারি সারি ঘি-এর প্রদীপ জ্বলত, চন্দন আর ফুলের গন্ধে ভরে থাকত চারদিক। রাজবাড়ি থেকে ভোগ-গৃহে আসত ভারে ভারে গোবিন্দভোগ চাল, কাঁচাদুধ, দই, মাখন, গাওয়া ঘি আর মন্ডা বাতাসা। ফলফুলুরী তো ছিলই। সন্ধ্যায় আরতি দেখতে সমবেত হত ভক্তরা।

ওদিকে মল্লেশ্বর শিবের মন্দিরে গঙ্গাজল বেলপাতার অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে যেত কুমারীরা। রাসমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের রাসযাত্রা উৎসবে আনন্দের বান ডাকত বাজ্যে, লীলা-কীর্তন, নামসংকীর্তনে মুখর হয়ে উঠত চারদিক। এই রাজ্যের রাজা রঘুনাথ। এই ধর্ম তাঁকে ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, প্রজাদের ধর্মান্তরিত করতে হবে রাজার ধর্মে।

কি কঠিন শর্ত। কিন্তু উপায় নেই। অসহায় লালবাইকে হারাতে হবে চির-কালের মত। না সে সইতে পারবেন না রঘুনাথ। রাজ্য যাক প্রজা যাক ধর্ম যাক। সব যাক, তবু লালবাই থাকুক। ওকে ছাড়া যেন না রঘুনাথ। অসম্ভব।

অসম্ভব। মহারাণী বললেন, তার আগে আমি বীরবাঁধের জলে আত্মবিসর্জন করব।

—কিন্তু মা, মহামন্ত্রী বললেন, তাতে তো সমস্যা মিটবে না। তুমি প্রজাদের মা, তুমি বীর শোভা সিংহের কন্যা, দেশ তোমারই মুখ চেয়ে রয়েছে মা। এক গণিকার খেয়াল-খুশিতে পিতৃ পিতামহের ধর্ম হারাবে এতগুলো মানুষ, এই কি তুমি নীরবে দেখবে? তোমার কি কোন কর্তব্যই নেই?

শয়নে স্বপনে শুধু তাই ভেবেছেন রাণী। কি করে রক্ষা করবেন দেশকে, রক্ষা করবেন দেবতাকে। ওই যবনীর হাতে পড়লে, মদনমোহন, মল্লেশ্বর মৃন্ময়ী মন্দি-রের একখানি ইঁট, একখন্ড পাথরও অক্ষত থাকবে না, অপবিত্র হবে সব দেবমূর্তি। মাতামহীর কাছে কাহিনী শুনেছিলেন শিশুকালে। সুলেমান করবানীর সেনাপতি নাকি মহাপ্রভু জগন্নাথকে মূর্তিকেও খন্ড খন্ড করে কেটেছিল। ওরা সব পারে।

শিউরে উঠলেন তিনি। না কোনমতেই এ হতে দেবেন না তিনি, একে রোধ করার জন্য যত মূল্য দিতে হয় তা দেবেন রাণী, এই তাঁর নিয়তি।

চন্দন কাঠের পিঁড়ির সামনে রূপোর থালায় অন্ন ব্যঞ্জন, পরমান্ন মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলেন তিনি নিজের হাতে তারপর রঘুনাথ আহারে বসলে ধীরে ধীরে লালবাই প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, মহারাজ, আমি আপনার ধর্মপত্নী, আপনাকে পরামর্শ দেওয়া আমার কর্তব্য, তাই বলছি, আপনি নিবৃত্ত হোন। কত বড় ঐতিহ্য এই মল্লবংশের, আপনার পিতা মহারাজ দুর্জন সিংহ—

—ও কথা থাক, হিতোপদেশ আমার ভালো লাগে না, অসহিষ্ণু গলায় বললেন রঘুনাথ।

—কিন্তু মহারাজ, আপনাকে ফেরাতে না পারলে আমি ধর্মে পতিত হব—

—ধর্ম ধর্ম ধর্ম—গর্জে উঠলেন রঘু-নাথ, রসাতলে যাক ধর্ম, ধর্মকে ত্যাগ করব আমি। লালবাই—

জ্বলে উঠলেন রাণী একটা দুশ্চরিত্রা ললিকা, তার জন্যে—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার জন্যে। পদাঘাতে অন্নপাত্র লন্ডভন্ড করে দিলেন রঘুনাথ, বললেন, সামনে অমাবস্যায় সপরিবারে ইস-লাম ধর্ম গ্রহণ করব আমি, প্রস্তুত থেক তার জন্যে।

স্তম্ভিত হয়েছেন মহারাণী। অমাবস্যার আর তিন দিন মাত্র বাকী। স্বর্গবুকুলে পিতৃকুলে স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করবেন তাঁকে, ধর্মের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেবেন চেতোয়া বরদার কন্যা, বিষ্ণুপুরের কুলবধূ। এ তাঁর পবিত্র কর্তব্য।

বিষ্ণুপুর শহরে একটি জায়গা ছিল যাকে লোকে ভোজনটিলা বলত। তার পূর্ব-দিকে বহু অর্থব্যয়ে তৈরী হয়েছিল লালবাই এর প্রাসাদ নতুন মহল। এই প্রাসাদে তখন দাসীরা ব্যস্ত ভবিষ্যৎ বেগমের মনোরঞ্জনে সাচ্চা জরির কাজ করা ফিরোজ রঙের চুরিদার কুর্তা এনে সাজিয়ে রেখেছে, মেঘবং-এর ওড়নায় জরির বুটি তুলছে এক চতুরা দাসী দ্রুত হাতে। বুপোর খাঞ্চায় থাকে থাকে সাজানো চ্ছে অলঙ্কার আর একজন, হীরের টায়রা, গজমুক্তার মালা, পদ্মরাগ-মণিপান্না কোমরবন্ধ, নবরত্নের বাজু-বন্ধ, হীরের কঙ্কন সব গুছিয়ে রেখেছে। সব শেষে সোনার থালায় পাতলা রেশমের রুমালের ওপর বসান রয়েছে বেগমের মুকুট। দাসীরা ওটি স্পর্শ করবে না লালবাই নিজে হাতে তুলে নেবে ওটি। নিবেট সোনার ওপর সতেরো খানা বড় এবং আশিখানা ছোট হীরে আর মুক্তো বসান ওতে। বিষ্ণুপুরের ভবিষ্যৎ অধিশ্বরীর জন্য তৈরী হয়েছে ওই মুকুট।

প্রাসাদের বাইরে পশ্চিমদিকে ভোজন-টিলাতেও তখন মহা সমারোহ চলছে। রাজ্যের তাবৎ প্রজার জন্যে রান্না হচ্ছে বসুই খানার। মুরশিদাবাদ থেকে আটজন মুসলমান পাচক এসেছে, তাঁদের যোগানদার এসেছে আরও আটজন নফর। ভারে ভারে চাল, আটা, ঘি, কিসমিস, পেঁয়াজ, গরম মশলা আসছে। সব শেষে তৈরী হবে গোমাংসের কাবাব। তাই দেওয়া হবে কাল প্রজাদের পাতে।

ভীত প্রজারা স্ত্রী পুত্র নিয়ে দলে দলে দেশত্যাগ করছে, আবার কেউ বা এসে আছড়ে পড়ছে রাজবাড়ীর দেউরীতে।

স্থির হয়ে গেছেন মহারাণী। গত রাত্রে এসেছিলেন মহামন্ত্রী আর এসেছিল পুরুষানুক্রমিক সেবক ভুলাই সর্দার। দেবী মৃন্ময়ীর মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি জন। সেখানে দেবীর বেদী ছুঁয়ে কি শপথ করেছিল ভুলাই সর্দার তা কেউ জানল না।

তারপর কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে প্রাসাদে এলেন রঘুনাথ, পরদিনের উৎসবের প্রয়ো-জনীয় কাজ তখনও কিছু বাকী। প্রচুর মদ্য-পান করেছিলেন তিনি। রাজপ্রাসাদের দরজায় এসে দেহরক্ষীদের বিদায় দিয়ে টলোমলো পায়ে উঠে এলেন অন্দরমহলের দিকে।

প্রাসাদে রাতের মহলে সেদিন আলো ছিল না। গমগমে আঁধার পায় হয়ে আস-ছিলেন রাজা, হঠাৎ শোনা গেল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। পোষা কাকাতুয়াটাও যেন ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটে চেঁচিয়ে উঠল, রাণীমা—

স্থির হয়ে বসেছিলেন রাণী, বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন ওই আর্তনাদ টুকুর। কানে আসতে শিথিল হয়ে গেল দেহ, জ্ঞান হারালেন তিনি।

—তারপর?

তারপর সব কিছু ঘটল দ্রুত বেগে। গুপ্ত ঘাতকের হাতে মহারাজ নিহত হবে-

ছেন. উৎকার বেগে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। নতুন মহলের ওপাশে তখন যজ্ঞকুণ্ডের মত আগুন জ্বলছে, বড় বড় হান্ডায় রান্নার আয়োজন চলছে, মিষ্টান্ন পাক হচ্ছে কড়ায়। সেখানে খবর পৌঁছুনোমাত্র হুলুস্থুল পড়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে শুধু যেটুকু সময়, তারপরই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল পালানোর তাগিদে।

পরিচারিকা আর্তনাদ করে উঠেছিল, তার মুখ চেপে ধরল লালবাই। বলল, হাসিনা যা কিছু মূল্যবান শীগগির বেঁধে নে—প্রাণে যদি বাঁচতে চাস—

নিজে ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিল খাজার ওপর রাখা গহনা, সোনার থালায় রাখা মুকুট। একবছরের ছেলে চাঁদ, তাকে রেশমী ওরনা দিয়ে পিঠে বেঁধে নিল শকত করে। দীর্ঘ দিনের অনভ্যাস, তবু পিঠে বোঝা নিতে আজও কষ্ট হল না লালবাঈয়ের।

কিন্তু তবু শেষরক্ষা হল না। বিষ্ণুপুরের পাথুরে মাটি আরবী ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে নিমেষে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেত, পৌঁছে যেত মুরশিদাবাদে, ফৌজদারের দরবারে। শুধু যদি একঘন্ট সময় পেত। এইরূপ আর যৌবন যতদিন আছে ততদিন কোন পুরুষকে ভয় করে না লালবাই। কিন্তু তা হল না, কারণ এখানে প্রতিপক্ষ নাবী। সর্বস্ব পণ করে সে তখন বাঘিনীর মত নির্মম ভয়ঙ্করী রূপ ধরেছে। তাই নতুন মহলের প্রাচীরের সীমানা পার হতে পারল না লালবাই, মুরশিদাবাদে যাওয়া আর হল না তার।

—কি হল তার? ঝুমুরের গলা যেন কতদূর থেকে ভেসে এল।

বললাম, জানি না, তবে বহুবছর পরে লালদিঘির জল থেকে একটা কঙ্কাল উঠেছিল। তার হাতে পায়ে গলায় ছিল লোহার শেকল জড়ান। লোকে বলে ওই নাকি লালবাইয়ের শেষ পরিণতি।

কে জানে, সেই আগুন জ্বালান রূপের কোনও চিহ্নও ছিল কিনা ওই শ্যাওলাধরা বিবর্ণ হাড় কখানাতে। থাকে না। ওই কোকিলকণ্ঠ, তীব্র আকাঙ্ক্ষা; কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই সব কিছু, নইলে তো সব শূন্য। তখন থাকে শুধু ইতিহাস, থাকে কিংবদন্তী। তাই রয়েছে। ইতিহাস দিয়েছে কিছু তার মাঝের ফাঁকগুলো ভরাট করে নিয়েছে মানুষের কল্পনা। মনও সন্তুষ্ট হয় তাতে মনে হয় তো স্বাভাবিক, এছাড়া আর কিই বা ঘটতে পারত।

—রাণীর কি হল? ঝুমুর বলল অনেকক্ষন পরে।

—তিনি সহমৃতা হলেন. সতীকুণ্ডে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে। আজও দেশের প্রধীনারা হাত জোড় করে প্রণাম জানায় পতি ঘাতিনী মহাসতীর উদ্দেশ্যে।

আর লালবাই? তার স্মৃতিতে কোন মহিমা নেই, নেই কোন গৌরব। সে ছিল বিষ্ণুপুরের শত্রু। হাতে ক্ষমতা পেলে সে ধ্বংস করত বিষ্ণুপুরের ধর্ম, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে। কিন্তু তবু আমি বলি, লালবাই বিষ্ণুপুরকে দিয়েছেও কিছু।

ঝুমুর বলল, দেওয়ার মত মন কি ছিল তার? সেতো শুধু নিতেই চেয়েছে।

আমি বললাম, দিয়েছে সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে, আর যারা পেয়েছে তারাও সেদিন মূল্য বোঝেনি সেটুকুর। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যেটুকু লালবাই এনেছিল বিষ্ণুপুর রাজ্যে, না চাইলেও তার রেশ রয়ে গেছিল মানুষের কানে। সাধারণের কথা ছেড়ে দিলেও সঙ্গীতবিলাসিক মানুষের চিন্তা-ভাবনার তলায় তলায় তার ছাপ থেকে গেছিল। জমি প্রস্তুত হয়েছিল অনেকখানি, তাই পঞ্চাশ ষাট বছর পরে উপযুক্ত বীজ থেকে মহীরুহ জন্মাতে পেরেছিল. সৃষ্টি করেছিল বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের ঘরাণা।

—তুমি বলতে চাইছ যে রামশঙ্কর, যিনি এই ঘরাণা সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর কাছে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত একেবারে অপরিচিত ছিল না।

—আমার ধারণা তাই। অন্ততঃ এই গানের আবছা আভাস তিনি পেয়েছিলেন, তারপর অসামান্য বুদ্ধি, প্রতিভা আর উপযুক্ত গুরু এই তিনের যোগ হবে তাঁকে—

বাধা দিল ঝুমুর। বলল, বাহাদুর খাঁ তো বরবাদ, তাহলে রামশঙ্করের গুরু কে?

বললাম. সে আর এক কাহিনী, কিন্তু একটানা বকবক করে গলা শুকিয়ে গেছে রে, এবার চা দিতে বল। বাকীটা না হয় রাত্তিরে শুনিস।

নোনতা বিস্কুট ছিল সঙ্গে, প্যাকেটটা ঝুমুরই বার করল সুটকেস থেকে। ওই দিয়ে দুকাপ চা খেয়ে মনে হল ক্লান্তিটা কমল যেন।

ঝুমুর চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুরন্ত ফ্যানের দিকে তাকিয়ে ছিল, আমি সেই ফাঁকে একখানা চিঠি লিখে শেষ করে দ্বিতীয়টা ধরেছি। কাল সকালেই পোস্ট করতে হবে এ দুখানা।

হঠাৎ ও বলল, সত্যি কতবড় শিল্পী হতে পারত লালবাঈ, দেশজোড়া নাম হত, যদি না—থেমে গেল ও।

আমি কলম তুলে বললাম, শিল্পকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে কটা মানুষ বল, তার জন্যে ত্যাগ করতে পারে কজন? যে পারে তার যশের সীমা থাকে না, কিন্তু কজন পারে।

—পারলে তোমরা মানবে? নিন্দে করবে না তার? বলবে না ওমা, এই ফরল? তীক্ষ্ণ গলায় ঝুমুর বলল।

আমি হেসে বললাম, বলবই তো, সাধারণ মানুষ আর শিল্পীর হিসেবে তফাৎ তো চিরকালই থাকবে। কিন্তু তোর হল কি? হঠাৎ বেগে উঠলি কেন?

আমার কথার জবাব না দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ঝুমুর, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনী টানল দুবার, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছিস?

—বাগানে—যেতে যেতে জবাব দিল ঝুমুর।

রাত্রে খাবার টেবিলে আজ আর বেশী কথা হল না। ওদিকের টেবিলে সেই ভদ্রলোক আজও পান করে এসেছেন দেখলাম। মনে হল মাত্রাটা যেন একটু বেশী ছয়ে গেছে, বেশ চড়া গলায় কথা বলছিলেন শুরু থেকেই। কি একটা রান্না পছন্দ না হওয়ায় চেঁচালেন, বলাও ম্যানেজার কো—বিড় বিড় করলেন অনেকক্ষণ, আল স্যাক রু অল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের খাওয়ার মাঝে ওয়েটারীর আধা হিন্দি ছেলেমেয়েগুলো খুব ফুর্তির মেজাজে এসে ঢুকল ডাইনিং রুমে তারপর খাবার নিয়ে ছড়িয়ে বসল সারাঘর। কেউ কেউ আবার মেঝেয় বসে গেল পা ছড়িয়ে: একজন তার মধ্যে পকেট থেকে কটা স্লাইস পাউরুটি বার করে সঙ্গিনীর ডালের বাটিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে লাগল। একজনের হাতে দেখলাম কাঁচালঙ্কা একটা, চোখ দিয়ে জল করছে, কিন্তু মুখের চেহারা দেখে মনে হল ভারি মজা পেয়েছে। ওদের হৈ হট্টগোল চলতেই থাকল, আমরা উঠে পড়লাম।

ঝুমুরের মনের মধ্যে একটা কিছু চলছে। আমার মনে হচ্ছিল, সুঝুমাদি, মেয়েটার দিকে নজর দেয় না একেবারে। ও যেন বড় একা, তাই নিজের সমস্যা নিয়ে সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বিছানায় শোওয়ার পরও ওর কথাই ভাবছিলাম। সে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দিল ওই। বলল, ফুলুমাসি তোমাকে বলব

বলেছিলাম, তাই বলছি—আমি দিয়ে করছি।

—কাকে? চমকটা লুকিয়ে সবচেয়ে দরকারী প্রশ্নটা করলাম আমি।

—একজন গায়ককে।

সে রাতে অনেক পরে ঘুমোল ঝুমুর।

পরদিন সকালে ঝুমুর একটু দূরে দূরেই রইল। বুঝলাম লজ্জা পাচ্ছে। বললাম, আজ আর বেরোবো না এখন একেবারে দুপুরে খাওয়ার পর বেরোনো যাবে।

ব্রেকফাস্টের পর ধীরে ধীরে ও আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। চুলে চিরুনী টানতে টানতে বলল, তোমার বিষ্ণুপুর কাহিনীর বাকীটা কখন বলবে? কাল তো শেষ হয়ে যাবে ছুটি।

আমি বললাম রাজবংশের যা কিছু বলার মত তা শেষ হয়ে গেল রঘুনাথের সঙ্গেই। এরপর গোপাল সিংহ রাজা হলেন। মুসলমান হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে কিনা জানি না, এঁর আমলে ধর্মের ঘটা খুব হয়েছিল। রাজ্যে পুজোআর্চা কীর্তন হরিনাম, বারোমাস তিরিশ দিন লেগেই থাকত। রাজা নিয়ম করে প্রতিদিন নাম জপ করতেন, প্রজাদের ওপরও হুকুম ছিল, এই সব করতে করতে রাত্তিরটি গেল। সেপাই শান্ত্রীদের বসে বসে হরিনাম করে শরীরে বাত ধরে গেল, অস্ত্র-শস্ত্র মরচে ধরল। এদিকে মাহাতোরা হানা দিতে লাগল পাহাড় বন-জঙ্গল পেরিয়ে এসে।

গোপাল সিংহের পর চৈতন্য সিংহ যখন রাজা হলেন তখন রাজ্যের চরম দুর্দশা। বিষ্ণুপুর রাজ্যের অহিংসা নীতির ফলে দেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, এদিকে লোদ্ধ দস্যু দিন দিন বেড়ে চলছে। ধনবত্তা না পেলে মাঠে ফসল, তো রয়েছে। তাই বা কম কি। হীরাকাটের পাথুরে মাটিতে মাথা কুটলে একদানা শস্য মেলে না, মেলে না একবিন্দু জল। তাই বিষ্ণুপুরের অরক্ষিত ভাণ্ডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা দলে দলে।

এদিকে সবার অলক্ষ্যে এক নতুন শক্তি একটু একটু করে প্রস্তুত হচ্ছিল এক বড় রকমের আঘাত হানার জন্যে। ১৬৩৮ সালে শাহ সুজার মেয়ে কাপড়ে আগুন লেগে দগ্ধ হল। তার চিকিৎসার জন্যে এল ইংরেজ ডাক্তার, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল সে শাহাজাদীকে। সম্রাট শাজাহান আনন্দে অধীর হয়ে তাকে পুরস্কার দিতে চাইলেন। কি চাই বলো, অর্থ? জায়গীর? ধনবত্তা? সুন্দরী নারী সব কিছু দিতে প্রস্তুত সম্রাট বলো তুমি।

আভূমি নত হয়ে কুর্ণিশ করলেন গেব্রিয়েল বাউটন, বললেম, আমি চিকিৎসক আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। তবু মহানুভব সম্রাট যদি পুরস্কার দিতে চান তবে এই আদেশ দিন যে ইংরেজরা যেন বাংলার বাণিজ্যের অধিকার পায় বিনা শুল্কে।

মাত্র এই, সম্রাট হুকুমনামা জারী করলেন, ওদের কাছে কেউ শুল্ক চাইবে না, সম্রাটের নিষেধ রইল।

সেই শুরু। তারপর একশো বছর ধরে চলল শক্তি সঞ্চয়ের ইতিহাস। ইংরেজ বণিক কূটনীতির চালে পাকাপোক্ত, সময় বুঝে তারা লোভের হাত বাড়াল বাংলার দিকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে যুদ্ধ জয় করল ইংরেজ তার কূটবুদ্ধি দিয়ে। ভাগ্য নির্ণয় হয়ে গেল বাংলার।

এমনি অবস্থায় বিষ্ণুপুরের ইতিহাসও চলল সরল অধঃপতনের পথে। চৈতন্য সিংহের রাজত্বের অবশিষ্ট যা ছিল তার দ্বিতীয় দাবীদার এলেন দামোদর সিংহ আর এই গৃহ বিবাদ একেবারে নিঃস্ব করে দিল রাজবংশকে। শেষ পর্যন্ত চৈতন্য সিংহ মদনমোহনকে পর্যন্ত বন্ধক রাখলেন, বাগবাজারের গোকুল মিত্রর কাছে। বিষ্ণুপুর রাজত্বের শেষ এইখানেই ১৮০৬ সালে বৃটিশের তত্ত্বাবধানে বিষ্ণুপুরের অবশিষ্ট জমিদারী নীলাম হয়ে গেল। রাজবংশের জাগো সামান্য পেনসন আর দেবত্ব সম্পত্তির সামান্যটুকু রইল বাকী। এমনি করে শেষ হল বাংলাদেশের এক স্বাধীন রাজবংশের ইতিহাস।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ঝুমুর, বলল, তা সব শেষ।—কিন্তু অমন করে হায় দিস না ঝুমুর, শেষ হয়েও কী ছিল আর সেইটুকু নিয়েই জ্বলে উঠেছিল আবার, আর এক আশ্চর্য ব্যাপার।

—কেন? ঝুমুর জানতে চাইল।

বললাম, জানি না, আর কোথাও এমন হয়েছে কিনা, তবে বিষ্ণুপুরের এককুল ভেঙেছে আর অন্য এককুল গড়ে উঠেছে ঠিক একই সময়ে। তুই বিষ্ণুপুরের গানের কথা ভুলে যাচ্ছিস ঝুমুর, সেই গানের চরম উন্নতিই ঘটেছিল সেই কালে যখন মারাঠা আক্রমণে দেশ বিপর্যস্ত, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর একেবারে শ্মশান করে দিয়ে গেছে সব, রাজার সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়েছে ইংরেজ। এমনি সময় পত্তন হল বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গানের ঘরাণার, আর তার সবটুকুই ঘটেছিল একটি মাত্র বিস্ময়কর প্রতিভাবান মানুষের চেষ্টায়।

ঝুমুর বলল, তুমি রামশংকর ভট্টাচার্যের কথা বলছ, তাই না? এঁকেই তো আমরা রঘুনাথের সমসাময়িক বলে ভেবেছিলাম।

বললাম, হ্যাঁ, সাল তারিখ দিয়ে হিসেব করলে দেখা যায় যে রঘুনাথের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে রামশংকরের জন্ম হয়েছে আন্দাজ ১৭৫১ সালে। আর রামশংকরের সঙ্গীত জীবন আরম্ভ হয় ১৭৮২-৮৩ সালে। এখন লক্ষ্য করে দেখার কথা হল যে বাহাদুর খাঁ, যাকে বিষ্ণুপুরী বলে ঐতিহাসিকরা নির্দেশ করেছেন তিনি এই সময় বর্তমান ছিলেন। কিন্তু একজন গবেষক বলছেন যে রামশংকরের গুরু প্রকৃত পক্ষে ছিলেন আগ্রা মথুরা অঞ্চলের একজন হিন্দু সঙ্গীত সাধক।

আমাদের কথায় মাঝখানে দরজার কে নক করল। খুলে দেখলাম সুইপার ছেলেটি ঝাঁটা বালতি নিয়ে ঘর মুছতে এসেছে। ওর কাজের জন্যে আমাদের আলোচনায় ছেদ পড়ল। ঝুমুরের কৌতূহল খুব, ও ছেলেটিকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা তোমাদের এখানে মানে বিষ্ণুপুরে শহরে গান-বাজনা কেমন হয় আজকাল? তুমি গান জানো?

ছেলেটি খুব হাসিখুসি। দেখলাম কথা বলতে ভালোবাসে ঝুমুরেরই মত। এক গাল হেসে বলল, আমি জানি না দিদিমণি, আমার জামাইবাবু জানে, সে যাত্রা দলে গান গায়—খুব ভালো ভালো গানের পার্ট করে।

—তাই বুঝি, ঝুমুর বিস্ময় প্রকাশ করল, তারপর প্রথম প্রশ্নই আবার জিজ্ঞেস করল, এখানে গানটান কেমন হয়?

ছেলেটি হাতের ঝাড়ু থামিয়ে বলল, দিদিমণি আগে খুব হত, বাবার মুখে শুনেছি, আর এখন? মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, সব গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটা কোথায় জানো? কোন রাস্তায়?

—হুঁ, গোপেশ্বরবাবু, সুরেশবাবু, সত্যকিংকরবাবু, জ্ঞান গোঁসাই অনাদের কে না জানে। গোপেশ্বরবাবুর বাড়ি তো ওস্তাদ পাড়ায়।

—রাজবাড়ীটা কোন দিকে বলতো? আমি একটু রাস্তাঘাটের আন্দাজ পেতে চাইছিলাম।

রাজবাড়ীর রাস্তা বুঝিয়ে দিল ও, তারপর বলল রাজামশাইকে যদি দেখতে চান তাহলে মাড়ুই বাজারে যাবেন পুস্তকালয়ে গেলে এখন দেখা পাবেন।

—রাজামশাই? ঝুমুর অবাক হল, রাজা কোথায় এখন?

—হুঁ দিদিমণি, ছেলেটি, গভীর

প্রকাশিত হ'ল প্রকাশিত হ'ল

বিনায়ক সান্যালের

বিদেশী গল্প ৫·০০

জীবন মানেই কতকগুলো এলো-মেলো টুকরো ঘটনার জোড়াতালি। সে-ঘটনা কত আশ্চর্য, কত সুন্দর, কত ভয়ানক, করুণ ও বেদনাদায়ক। তাই জীবন কখনো সৈকতের সীমা ছাড়ানো রহস্যময় শৈবালদ্বীপ—শুধু জলতরঙ্গের খেলা, আবার কখনো অপসৃয়মান কুয়াশিক্ত কোমল গোধূলি।

জীবনের এই ফেরীঘাটে একে একে ভেসে ওঠে চীনের নিষিদ্ধ শহর পীপিঙ, ফ্রান্স, ফ্লোরেন্স, প্যারি, তামাম ইঙ্গ-মার্কিন মুলুক যেখানে পুত্রশোক উন্মাদিনী স্যাভেজগৃহিণীর উৎকট সাইসিকতা, মাদাম পল হ্যামেটের অসহায় আর্তনাদ ও বৃদ্ধ জেফরের ক্ষয়ক্ষীতভরা জীবনের তলে তলে বেদনার মাধুরী করে, শোনা যায় মিস্ রবিনসনদের আধুনিক জীবনোল্লাস। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প-লিখিয়েদের বাছাইকরা গল্পের এক আকর্ষণীয় সাবলীল অনুবাদ।

অরুন্ধতী পাবলিশার্স

৫৬, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা—৯. পোঃ বক্স নং—১০৮৫৪

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, কালীপদ সিংহ ঠাকুর—তিনিই তো রাজা বিষ্ণুপুরের। তাঁকে দেখতে হলে অখানেই যান, নইলে—

আমি বললাম দেখতে তো চাই, কিন্তু—

ঝুমুর বলল, যাবে ফুলমাসি? চল না রাজাকে দেখে আসি।

শেষ পর্যন্ত প্রোগ্রাম বদল করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আজ তেমন গরম নেই। সকালবেলার নরম রোদে ঝুমুরের কমলা রঙের ডুরে শাড়িটা আলো ছড়াচ্ছে যেন। আজ ওকে অনেক হালকা আর ছেলেমানুষ লাগছে। বোধহয় আমাকে সব কিছু বলতে পেরে ও স্বস্তি বোধ করছে।

বেশ অনেকক্ষণ চলার পর আমরা রাজারের কাছে এলাম। দোকানের সাইনবোর্ড দেখে ঝুমুর চেঁচিয়ে উঠল ওই তো বাদী পুস্তকালয়। সরু রাস্তার দুপাশে সারি সারি দোকান তার মধ্যে একটির কাছে ঘিকসা থামল।

ছোট্ট দোকানের কাউন্টারের পর সামনে প্রায় রাস্তার ওপর এগিয়ে একটু জায়গা। তার দুপাশে ছোট্ট সরু দুখানা বেঞ্চি পাতা। তার একটিতে বসে রয়েছেন দুজন ভদ্রলোক। প্রথমজনের পরণে তাঁতের ধুতি আর ফর্সা লংক্লথের পাঞ্জাবী অন্যজনের গেরুয়া বসন বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি আর গোঁপ। দুজনেরই বয়েস অনেক।

বিকসাওয়ালা আমাদের নামিয়ে দিয়ে বলল, এনারা কলকাতা থেকে এসেছেন রাজমশাইকে দেখতে।

কালীপদ সিংহঠাকুর। সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক হলেন বিষ্ণুপুরের রাজা। চৈতন্য সিংহের পর আর দু-একজন সিংহাসনে বসেছিলেন তার মধ্যে রামকৃষ্ণ সিংহ হলেন শেষ রাজা। তাঁর ভাই এর ছেলে নীলমণি সিংহের দৌহিত্র হলেন কালীপদ। রং পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, দেহ শীর্ণ, তবু অবয়ব দেখে মনে হয় এককালে ইনি সুপুরুষ ছিলেন। আমাদের দেখে দন্তহীন মুখে হাসলেন, বললেন কি আর দেখবেন—

প্রশ্ন করে জানলাম ছেলেরা কেউ ব্যাংকে চাকরী করে, কেউ কলেজে পড়ে। রাজা সকালে এসে বসেন এখানে। এখানেই কেটে যায় সারা বেলা।

ঝুমুর বলল, আপনার বাড়িতে কি এখনও গান-বাজনা হয়? আপনার পূর্ব-পুরুষ তো—

রাজা বললেন, গান আর কোথায়, সেদিন—কৈ হে, বল না, গেরুয়াপরা ভদ্রলোকটিকে কনুই-এর খোঁচা দিলেন তিনি।

দোকানী ভদ্রলোক বললেন, গানের কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করুন, উনি হলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের বংশধর।

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল—বললাম ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন আপনাকে। আমার বিদ্যে বইপড়া। রামশংকর সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে পেলে ভারি খুশী হতাম।

উনি বললেন, এখানে বসার জায়গা কম তাছাড়া বাস রিক্সার আওয়াজে কথা বলা যাচ্ছে না, বরং আমার বাড়িতে চলুন কাছেই—আমাদের বংশের তালিকা দেখতে চান যদি তাও পাবেন বাড়িতে এলে।

পথে যেতে যেতে ভদ্রলোকের পুরো পরিচয় পেলাম। নাম কিরীটিভূষণ ভট্টাচার্য দিল্লিতে দন্ত চিকিৎসক ছিলেন কর্মজীবনে পরে বেশারসে রামকৃষ্ণ মিশনে কিছুদিন কাটান। এখন থাকেন বিষ্ণুপুরে। বিয়ে করেননি, থাকেন ভাই-এর ছেলেদের সঙ্গে। তারা সবাই মানে কর্তাব্যক্তি বলে। অত্যন্ত সদালাপী ভদ্রলোক, সারা পথ নানা গল্প করতে করতে গেলেন।

ওদের বাড়িটি সেই সাবেক আমলের, রামশংকর বাস করেছেন এইখানেই। বাড়ির ছেলেরা এখন নানা কাজ কর্ম করেন আর বাড়িটিকে বেশ খরচ করে সারিয়ে টারিয়ে রেখেছেন। তবে কাঠামো যদি তখনকার হয় তাহলে ভট্টাচার্য পরিবার যে সে আমলেও বেশ সম্পন্ন ছিল এটা আন্দাজ করা যায়।

উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার এঁদের পূর্বপুরুষের বাস ছিল। বংশের প্রথম যাঁর নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন কমলাকান্ত সার্বভৌম। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজা হয়েছিলেন হাম্বিরের ছেলে রঘুনাথ। নবাব সরকারে খাজনা বাকী রাখার জন্য ইনি বন্দী হয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। বন্দী অবস্থায় তিনি নাকি অদ্ভুত বাঁবিত্ব দেখিয়ে মুক্তি পান এবং নবাব তাঁকে সিংহ পদবী দিয়ে সম্মানিত করেন। কিংবদন্তী আছে কমলাকান্ত সার্বভৌমের ইষ্ট দেবীর কৃপায় নাকি রঘুনাথ এই সম্মান পেয়েছিলেন। এরপর রঘুনাথ কমলাকান্তকে নিয়ে এসে তাঁর রাজধানীতে প্রথম বারেন্দ্রব্রাহ্মণের পত্তন করলেন।

কমলাকান্তর মেয়ে জগদীশ্বরীর বিয়ে হয় প্রভুরাম ভট্টাচার্য নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সঙ্গে। এই প্রভুরামের পর চতুর্থ পুরুষ হলেন রামশংকর, আর রামশংকরের পর চতুর্থ পুরুষ কিরীটীভূষণ।

রামশংকরের বাবা গদাধর ভট্টাচার্য ছিলেন বিষ্ণুপুর রাজের সভাপণ্ডিত। বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত পিতার কাছে রামশংকর শাস্ত্রচর্চা করেছেন, গানের সঙ্গে তখন তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল বলে জানা যায়নি। এই সময় উত্তর ভারত থেকে একজন বিশেষ প্রতিভাশালী গায়ক বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। তিনি কে, হিন্দু অথবা মুসলমান এবং কেন এসেছিলেন সে সম্বন্ধে কোন কথা কিরিটীভূষণ বলতে পারলেন না, অর্থাৎ তেমন কোন তথ্য নেই তাঁদের পরিবারে। যাই হোক কথিত আছে সেই গায়কের গান শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন তরুণ রামশংকর।

আট পুরুষের ইতিহাস মুখে মুখে এসেছে, অদল-বদল কিছু হওয়াই সম্ভব, তবু মোটামুটি ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে উত্তর থেকে আসা ওই ওস্তাদের গান শুনে রামশংকর মুগ্ধ হন এবং গোপনে চর্চা করে হঠাৎ একদিন রাজসভায় সবার সামনে গাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে পরিবারের সকলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন কারণ রামশংকরের প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না, সবাই তাঁরা পাগলামী মনে করেছিলেন। এ ব্যাপারে সবার চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হলেন পুরোধা কারণ তিনি ছিলেন রাজার সভাপণ্ডিত, ছেলের কাজের কৈফিয়ৎ তো শেষ পর্যন্ত তাঁকেই দিতে হবে। কিন্তু রামশংকর অটল। শেষ পর্যন্ত তিনি গাইলেন আর সে গান শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন উপস্থিত শ্রোতারা। ওস্তাদ বললেন, এমন প্রতিভা নষ্ট করো না তুমি, আমি শেখাব তোমায় যা শিখতে চাও।

শিখিয়েছিলেন ইনি, তার এই ওস্তাদ হিন্দু কি মুসলমান সেটা জানার কোন পথ নেই, কারণ রামশংকর তাঁর নামধাম কিছুই বলে যাননি। তবু আজকাল কেউ কেউ বলেন যে রামশংকরের গুরু নাকি একজন হিন্দু পণ্ডিত।

এই নতুন মতটিকে প্রতিষ্ঠা করার মত কোনও তথ্য অবশ্য তাঁরা দিতে পারেননি।

ঝুমুর বলল, এতো খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়, অথচ কোনও সূত্রে কোন ইতিহাস নেই এটা সত্যিই আশ্চর্য।

—সেইটাই হয়েছে সবচেয়ে মুশকিল। ইতিহাস থাকলে আর এত মতভেদ হত না। সেই বলেই অনেকটা অনুমান করে নিতে হচ্ছে যুক্তির বুনিয়াদ খাটিয়ে। তবে তানসেন বংশীয় বাহাদুর খাঁর সঙ্গে রামশংকরের সময় মিলে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে এঁরা সমসাময়িক। এমন অবস্থায় এইটাই ধরে নেওয়া উচিত যে ইনিই রামশংকরের গুরু। এই প্রচলিত মতটি খণ্ডন করার মত জোরালো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এটিকে অস্বীকার করার যুক্তি নেই। তবে একথা সম্বন্ধে বোধহয় কারও সন্দেহ নেই যে বিষ্ণুপুরের গানের ঘরাণার আদি পুরুষ হলেন রামশংকর। প্রায় ষাট-সত্তর বছর ধরে এই একটি মানুষ নিয়ে গান গেয়েছেন, সঙ্গীত রচনা করেছেন, আর সেই সঙ্গে শিষ্যও তৈরী করেছেন একের পর এক। ভিন্ন দেশীয় গুরুর কাছে শিক্ষা হলেও বাঙ্গালী মনের মাধুর্য আর কুশলতা দিয়ে তিনি বিষ্ণুপুরে এক নিজস্ব স্টাইলের সৃষ্টি করেছিলেন, যার পরিচয় আমরা একালেও পেয়েছি অনেকখানি।

—কিন্তু ফুলমাসি ঝুমুর প্রশ্ন করল, এই গানের ধারা কি কেবল বিষ্ণুপুরের মধ্যেই আটকে ছিল? বাইরে ছড়ায় পড়েনি?

উত্তরে বললাম, একটা কথা রাখিস ঝুমুর, যে তখন দিনকাল অন্যরকম। আজকাল রেডিও, গ্রামোফোন কল্যাণে কন্যাকুমারিকা থেকে ফিলিপিনস

সব জায়গার গানবাজনাই অবাধে আমাদের কানে এসে পৌঁছচ্ছে। সেকালে তো এ সুবিধে ছিল না। তাছাড়া যাতায়াতও তো কম ছিল এখান থেকে ওখানে। বেশী দূরের কথা ছেড়েই দিলাম, এই এত কাছে কলকাতা শহর সেও তো বিদেশ ছিল তখন, যেতে গেলে সময় লাগত অনেক, তাই একবার বেরোতে হলে অনেক তোড়-জোড় করতে হত। বিষয় সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে, মা বাপ স্ত্রী পুত্রের কাছে বিদায় আশীষ নিয়ে তবেই রওনা হত মানুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেকালে রামশংকরের কাছে গান শেখার জন্যে ছেলেরা আসত হুগলী, মেদিনীপুর নদীয়া থেকে। কয়েক বছর গুরুগৃহে কাটিয়ে শিক্ষা শেষে ঘরে ফিরে যেত তারা, তারপর রামশংকর ভট্টাচার্যের শেখানো বিষ্ণুপুরী ধারার গান শেখাত নিজেদের শিষ্যদের। ছড়িয়ে পড়ার এইটাই ছিল সহজ রাস্তা। তাছাড়া রামশংকরের শিষ্যরা অনেকে যেতেন কলকাতায়। শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার নাম তখন থেকেই। কাজেই গুণীর পক্ষে সেদিকে যাওয়ার টানটা খুবই স্বাভাবিক।

—রামশংকরের নিজের বংশের কেউ গিয়েছিলেন কলকাতায়? মানে গায়ক হিসেবে—ঝুমুর জানতে চাইল।

বললাম, রামশংকরের পাঁচ ছেলে আর এক মেয়ের মধ্যে একমাত্র রামকেশবই গান-বাজনার চর্চা রেখেছিলেন। ইনি প্রথমে ছিলেন কুচবিহারের মহারাজার সভায় এবং শেষের দিকে কলকাতায় সেকালের বিখ্যাত আশুতোষ দেবের (যিনি সাতুবাবু নামে পরিচিত) কাছে ছিলেন কিছুদিন। ধ্রুপদীয়া হিসেবে সেকালে এঁর যশ ছিল, তাছাড়া বাংলার এসরাজ যন্ত্রটি বাজানো ইনিই চালু করেছিলেন বলে শোনা যায়।

ছেলের পরে আসে শিষ্যদের নাম। প্রথম বলি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কথা। মেদিনীপুরের লোক হলেও এঁকে বিষ্ণুপুর ঘরাণাভুক্ত করছি এই জন্যে যে ইনি রামশংকরের কাছ থেকে যে ধারা পেয়েছিলেন সেটিকে সযত্নে রক্ষা করে নিজের চিন্তা বুদ্ধি খাটিয়ে গানের জগতে অনেক বড় কাজ করে গেছেন। অর্কেস্ট্রা বাজনা আর অক্ষর মাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

রামশংকর ভট্টাচার্যের এইসব শিষ্যরা সেকালে ধনী এবং রসিক পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় বাংলার উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের বিকাশ এবং প্রচারের কাজ অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন। সে সময় ধনী বনেদী বংশের বিশিষ্ট লোকেরা প্রায়ই নিজেদের বাড়ীতে গানবাজনার আসর বসাতেন এবং পছন্দ হলে গায়কদের মাইনে বা মাসোহারা দিয়ে নিজেদের কাছে রাখতেন। ফলে এইসব মানুষদের ঘিরে এক একটি সঙ্গীত চক্র গড়ে উঠেছিল। এইভাবে তারকনাথ প্রামাণিকের কাছে ছিলেন রামশংকরের আর এক শিষ্য কেশবলাল চক্রবর্তী। এঁরও ধ্রুপদ সেকালে কলকাতায় বেশ সুনাম অর্জন করেছিল।

রামশংকরের শিষ্যদের মধ্যে দীনবন্ধু গোস্বামী কিন্তু কলকাতায় এসে থাকেন নি। ইনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় বিষ্ণুপুরেই বসবাস করেছেন। এঁর ছেলেদের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ গান বাজনার চর্চা রেখেছিলেন ভালোভাবে।

ঝুমুর বলল, কিন্তু এত বড় বড় গায়ক বাদক এঁদের অনেকের বংশে গান কেন একপুরুষেই শেষ হয়ে গেল। ছেলে-মেয়েরা কেউ কেন ধারাটা রাখতে পারল না? এটা কিন্তু আশ্চর্য লাগছে ভাবতে।

আমি বললাম, এ কথার উত্তর দেওয়াটা খুব সোজা নয়। শুধু গানের জগতে কেন, অন্য সব শিল্পকলা বিজ্ঞানের জগতেও তো হামেশাই ঘটছে এটা। দেশবরেণ্য কবির ছেলে কবি নয়, ঐতিহাসিকের ছেলে গেল বিজ্ঞান পড়তে, আবার বৈজ্ঞানিকের মেয়ে ফিল্মে নামল, এতো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। তবে কেন এমনটা ঘটে তা এক-কথায় বলা সম্ভব নয়, সেটা অন্য তত্ত্বের ব্যাপার। তবে তোর গানের কথাই বলি, অন্যেরা না রাখলেও রামশংকরের একটি শিষ্যের বংশে কিন্তু গান বেশ কয়েক বছর ধরে চলে আসছে।

—কার, কে তিনি?

—অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নাম শুনেছিস?

—হ্যাঁ, ঝুমুর খুশি গলায় বলল, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা। বললাম শুধু গোপেশ্বর নয়, অনন্তলালের আর দুই ছেলেরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, তাঁরা হলেন রামপ্রসন্ন আর সুরেন্দ্রনাথ। রামপ্রসন্ন ছিলেন সবচেয়ে বড় তারপর গোপেশ্বর আর সুরেন্দ্রনাথ।

অনন্তলাল নিজে ছিলেন রামশংকরের মতই বহুক্ষণ পণ্ডিতের ছেলে। তিনিও শাস্ত্রচর্চা ছেড়ে গানের দিকে মন দিয়েছিলেন। সে যুগের হিসেবে মন দেওয়ার অর্থ ছিল নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া। অনন্তলাল সেদিক দিয়ে সাধিকারের সাধকের মত ছিলেন বলে শোনা যায়।

রামপ্রসন্ন এবং গোপেশ্বর দুই ছেলেকেই তিনি নিজের মনমত করে গান শিখিয়েছিলেন, তাই এঁরা খাঁটি বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের ধারাটিকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাছাড়া এঁদের রচনা কিছু বই আছে যা এখন বাজারে পাওয়া শক্ত, কিন্তু পেলে দেখা যেত যে তার মধ্যে বিষ্ণুপুরী ঘরাণার বহু অমূল্য সম্পদ ধরে গেছে, যা শিক্ষার্থী থেকে গবেষক সবারই সমান কাজে লাগে।

যাই হোক এঁরা অনেকটা আধুনিক কালের মানুষ বলে এঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু আমরা সঠিকভাবে জানতে পেরেছি। অন্যদিকে এঁরাও বিষ্ণুপুরের বাইরে বিশেষ করে কলকাতায় নব্যশিক্ষিত সমাজের আওতায় এসে পড়ায় এঁদের প্রতিভার কথা সাধারণের জানার সুযোগ ঘটেছিল। সেদিক দিয়ে এই সময়টা ছিল একটা জাগরণের যুগ। এর আর একটা কারণ হল যে, একালের কোন কোন গায়ক বাদক রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন আর তার ফলে গানের জগতে একটা নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এদিক দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

—আচ্ছা মা—

নিজেদের আলোচনায় এত ব্যস্ত ছিলাম যে, রিকশাওয়ালার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ইঁট কাঠের শহরের মানুষ আমরা, একজন রিকশাওয়ালার যে এসব ব্যাপারে কিছু বক্তব্য থাকে তা ভাবতেই পারিনি।

ও বলল, গোপেশ্বরবাবুর স্ত্রী, সুরেনবাবুর মেয়ে তো বেঁচে আছেন, তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করলে তো পারতেন। ওঁরাও খুব ভাল গান করেন। অনেক কথাও জানেন। চমকটা সামলে বললাম, তুমি চেনো ওঁদের বাড়ী? নিয়ে চল তাহলে।

রিকশাওয়ালা হাসল, বলল, মা পনেরো ষোল বছর বয়েস থেকে রিকশা চালাচ্ছি, ওনাদের কত নিয়ে গেছি এখানে ওখানে। আমি চিনব না তো চিনবে কে?

বললাম, চল তবে।

ঝুমুর বলল, বাব্বা ফুলমাসি বাংলাদেশের গানের কোথায় কি আছে সব তুমি না দেখে ছাড়বে না দেখছি।

বললাম, দেখতে এসেছিলাম নিজে, কিন্তু কাল তোর কথায় বুঝেছি যে এগুলো তোরও দেখা দরকার। কারণ বাংলাদেশে কি ছিল বা কি আছে এখনও, সে সম্বন্ধে তোর ধারণা একেবারেই নেই।

—কিন্তু একথা তো মানো, যে বাংলার চেয়ে বাইরে বড় ওস্তাদ অনেক বেশী? নাকি তাও স্বীকার করবে না? ঝুমুর তর্কের সুরে বলল।

—না, তুই যেভাবে বলছিস, তা মানি না। তার কারণ হল, তোর মত অনেকেই এই ধরনের কথা বলে যার গোড়ায় একটা বড় ভুল আছে।

—কি রকম? ঝুমুর তীক্ষ্ণ সুরে বলল।

—বাংলা আর বাংলার বাইরে—অর্থাৎ বম্বে, দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালিয়র, বরোদা, লক্ষ্ণৌ—কত নাম করব, এক বাংলার সঙ্গে কমপিট করতে সবাইকে সার দিয়ে দাঁড় করাচ্ছিস।

(চলবে)

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন
কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট
Glitter
কনজিউমার প্রোডাক্টস
২৮এ, এস এন দাস লেন, কলি—৫০
পরিবেশক :
পাপু এন্টারপ্রাইজ
৪৭।৩৭, আর কে ঘোষ রোড, কলি-৫০

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

আমি : (অবাক হয়ে) কেন? কি হয়েছে?

রাইফেলের বুলেট তার পিঠের স্ক্যাপুলা বোন ভেঙে দিয়ে সামনের ডান-দিকের পেক্টোরাল মাসল ভেদ করে যে বেরিয়ে যায়, তার চিহ্ন সে দেখায় এবং বলে সেইজন্য সে একেবারে ডানহাতে জোর পায় না। যখন ধরলা গ্রামের একটি বাড়ী থেকে সে ও কল্পনা প্রমুখ পালিয়ে বাচ্ছিল তখন মিলিটারীর রাইফেলের .৩০৩ বুলেট তার পিঠে লেগে বুকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। অজস্র রক্ত ঝরেছে, তবু সে অন্যান্য ক্ষমরেডদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব। সেই বাড়ীতে মাস্টারদা ধরা পড়েছিলেন। সেই গল্প এখানে আব বলছি না। শান্তি গুরুতর আহত অবস্থায় বহু মাইল অতিক্রম করে একটি নিরা-পদ আশ্রয়স্থলে গিয়ে ওঠে। সেখানে তাকে প্রায় দু মাস থাকতে হয়েছিল। এই গুরুতর আহত অবস্থা থেকে সে বেঁচে যায়, কিন্তু তার হাতটি প্রায় অচল হয়ে যায়। সে দুঃখ করে এইসব কথা বলছিল—আন্দামানে সে আমাদের সঙ্গে ব্যায়াম করতে পারবে না; জিমন্যাসটিক করতে পারবে না। মিলিটারী ড্রিলও করতে পারবে না। তার করুণ কণ্ঠে দুঃখের কাহিনী শুনে আমি মেনে নিইনি যে তার হাত একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে এবং সে ডন, কুস্তি, ব্যায়াম আর কিছুই করতে পারবে না। আমি তাকে বললাম, 'তুমি ভুল করছো। তোমার হাত এতে বিকল হতে পারে না। ব্যায়াম করলে তুমি ঐ হাতে জোর ফিরে পাবেই।' তাকে আমি নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমি আমার সামান্য অভিজ্ঞতার কথাও তাকে জানাই। আমি আমার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুল যে ভাঙ্গা তা দেখিয়ে বলি, 'এগুলো ভালভাবে সেট করেনি। আমার ডান হাতের ভাঙ্গা রেডিয়াসও ভাল সেট হয়নি, তাই হাতটি বাঁকা। বন্ধুবান্ধব সবাই বলেছিল আমি নাকি হাতে আর জোর পাব না।' সত্যি প্রথম প্রথম আমার তাই মনে হোত। কিন্তু তাতে আমি নিরুৎসাহ হইনি। আমি আবার ব্যায়াম করতে শুরু করি, জিমন্যাসটিকও করি। ডাক্তারও ছাড়িনি। এখন আমি প্রায় নরমাল। কাজেই তুমি আশা ছেড় না, ব্যায়াম করে যাও। প্যারালাল বারে জিমন্যাসটিক করতেও কসুর করো না।

আমার মনে হয় শান্তি আন্দামানে আমাকেই বেশী মানত। আমার কথাগুলো হয়ত তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিছু-দিনের মধ্যেই সে আমাদের মত ইউনিফর্ম জোগাড় করে ফেললো—সাদা শার্ট, সাদা শর্ট, সাদা মোজা, টানা গার্টার, সাদা রাবার-সোলের জুতো, বেল্ট, সাদাটুপী। তারপর থেকে শান্তিকে রোজই ব্যায়াম ও ড্রিল করতে দেখা যেত।

জেলখানায় ড্রিল ও ব্যায়াম করাটাই খুব বড় বিপ্লবী কাজ নয়। সবচেয়ে বড় কাজ হল কী করে ও কী উপায় ধীরে ধীরে আন্দামান জেলে সি পি এফ (সেলুলার পলিটিক্যাল ফোর্স) রেজিমেন্ট গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। আন্দামানে আমা-

দের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ছিল ডন, কুস্তি ও মিলিটারী শিক্ষায় শিক্ষিত হব। এবং এই সঙ্গে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ শিক্ষা ক্ষমতা অনুযায়ী হৃদয়ঙ্গম করব। কখন ভাবতে পারিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শুধুই পুথিবীর শিক্ষা তার সঙ্গে মিলিটারী শিক্ষার কোন যোগ নেই। আমরা ধাপে ধাপে আন্দামানে আমাদের বুদ্ধি ও শক্তি নিয়ে মার্কসবাদ-লিনিনবাদ ও মিলিটারী শিক্ষা একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবরকম সুব্যবস্থা করি।' এই কর্মসূচীতে শান্তি চক্রবর্তীর অবদান যড় কম নয়। যেমন নাকি রাইফেলের সাইজে কাঠের একটি ব্যাটনে নিজেদের মত করে ডামি রাইফেল তৈরী করার কাজে শান্তির বিশেষ অবদান ছিল। ঐ সব এখানে বলার ইচ্ছা নেই। আমি আবার চলে যাচ্ছি তাদের কাটলী গ্রামের সংগঠনের প্রসঙ্গে। সেখান থেকে শ্রীশচীন সেন ও শ্রীবিনোদ দত্ত তাদের সংগঠন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কুমিল্লা ও নোয়াখালি চলে যাওয়ার পর, কাটলী সংগঠন তাদের প্রধান কর্মসূচী গ্রহণ করল সেই গ্রামে আরও বেশী গোপন আশ্রয়স্থল জোগাড় করার জন্য। এই অভিযানে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী ছিল শ্রীদীনবন্ধু মজুমদার। তার চেষ্টাতেই 'মামার শেলটার' (অপর্ণা চক্রবর্তীর বাড়ী), 'জয়দুর্গের শেলটার' (যোগেশ মজুমদারের বন্ধুর বাড়ী) এবং 'নারকেল বাগান' (একটি নাথ বাড়ী) জোগাড় হয়। চট্টগ্রামে গেরিলা যুদ্ধের সময় এই প্রত্যেকটি শেলটারের দাম অপরিসীম। তার মধ্যে জয়দুর্গের নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত জয়দুর্গ (যোগেশ মজুমদার) বিপ্লবী কাজকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি কাজ করতেন। চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম প্রান্তে পাহারতলী এলাকাতে আসাম বেঙ্গল রেলের হেড কোয়ার্টার এবং রেলের ওয়ার্কশপ ছিল। যোগেশ মজুমদার এই ওয়ার্কশপেরই একজন দক্ষ কর্মী। দক্ষিণ কাটলী থেকে পাহারতলী এলাকা পর্যন্ত যোগেশ মজুমদারকে এক-ডাকে সবাই চিনত। তার মত সাহসী ও দুর্ধর্ষ লোককে সবাই ভয় করত। যোগেশ বাবুর সাহসের পরিচয় লোকে প্রথম পেয়েছিল ১৯২৬ সালে যখন দক্ষিণ কাটলীতে 'প্রজা বিদ্রোহ' হয়েছিল। এই বিদ্রোহে চট্টগ্রামে বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য সুরেন দাসের স্কুলে ছিল এই যোগেশ মজুমদার। সুরেন দাসের পিতা 'প্রাণহরি দাস সেই গ্রামের ডাক-সাইটে জমিদার। ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আরম্ভ করে পুলিশ পর্যন্ত সবাই কোন ঘটনার অনুসন্ধান করতে এলে তাঁরই বাড়িতে এসে উঠতেন এবং তাঁরই সাহায্যে তাঁরা অনুসন্ধান চালাতেন।

বঙ্গোপসাগরের তীরে এই কাটলী গ্রামে বহু সংখ্যক জেলে বাস করত। এই জেলেরা মাছ ধরার জন্য মাঝদরিয়ায় পাড়ি দিত। কুমীর, হাঙর, বিষাক্ত সাপ, ভূত-প্রেত—কোন কিছুকেই তারা ভয় পেত না। কিন্তু একটি জায়গায় তাদের ভীষণ ভয়—সেটি হল প্রাণহরিবাবুর কাছারি বাড়ী—সেখানে তারা মুখফুটে একটাও কথা বলতে পারত না। প্রাণহরিবাবু যতই অন্যায় করুন না কেন কেউই তার প্রতিবাদ করত না। তারা জানতো কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাদের মাছ ধরা জাল, নৌকো প্রভৃতি হারাতে হবে। তাই তারা মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করত। অন্যায় অত্যাচারে যখন তারা জর্জরিত, তখন একদিন তারা প্রাণহরি দাসের বিরুদ্ধে দাবুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করল। প্রাণহরি দাসের ছেলে সুরেন দাস তাদের কাছে এত জনপ্রিয় থাকা সত্ত্বেও জেলেদের বিক্ষোভ থেকে তিনিও রেহাই পেলেন না। এই মারমুখো বিদ্রোহী জেলেরা যখন প্রাণহরিবাবুর বাড়ী আক্রমণ করেছিল, তখন সুরেন দাসের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অসম সাহসী আমাদের যোগেশ মজুমদার। যোগেশ মজুমদারের লাঠির সামনে জেলেরা দাঁড়াতে পারেনি ছত্রভঙ্গ হয়েছিল ও হার হয়েছিল। তাদের পরাজয় হলেও একটি সম্মানসূচক চুক্তি হয়। জেলেদের পক্ষে এই সম্মানসূচক চুক্তির জন্য সুরেন দাসকে প্রশংসা করতে হয়। এই যোগেশ মজুমদারকে একবার প্রাণহরিবাবুর দরবারে মেয়েঘটিত ব্যাপারে হাজির হতে হয়। যোগেশবাবু ঘাড় বেঁকিয়ে প্রাণহরিবাবুর মুখের উপর উত্তর দিয়েছিলেন, 'গর্হিত কাজ যদি হয়েই থাকে, তবে তা বেশ হয়েছে।' কার কত শক্তি থাকে আসুক না এগিয়ে।' প্রাণহরিবাবু অতি বিচক্ষণ ও ধূর্ত মানুষ। তিনি সবদিক ভেবে যোগেশ মজুমদারের বিরুদ্ধে কেস মিটিয়ে ফেললেন। কালীর দীনবন্ধু মামা তারককে যোগেশের সম্বন্ধে এইসব গল্প বলেছিল। সেই গল্পে সত্যতা ছিল। তারকেশ্বর এইসব গল্প খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনে মনে মনে ভেবেছিল, যোগেশ মজুমদারকে অনেক কাজে লাগানো যাবে। তারকেশ্বর যখন যোগেশ সম্বন্ধে এই সব ভাবছিল, তখন কালীর দীনবন্ধু মামা ফটুদাকে (তারকেশ্বর) বলল, ফটুদা সেদিন যে যোগেশের গল্প আপনাকে বলেছিলাম, তার এক মৃত বন্ধুর বাড়ী তার তত্ত্বাবধানে আছে।' বাড়ীটি খুবই নিরাপদ মায়গায়। বন্ধুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণ যোগেশ চালায়। যোগেশকে সবাই গুণ্ডা বলে জানলেও, তার মনটি খারাপ নয়। তার বিশেষ গুণ, সে লোকের সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও আলালাবাদ যুদ্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সে সবসময়ই করে থাকে। আমি যে এখন পলাতক সে তা খুব ভালভাবে জানে।' তার সঙ্গে আমার যথেষ্ট খাতির আছে। আমি যদি তার ভাগ্নে কালীর জীবন রক্ষার জন্য বন্ধুর বাড়িটি আশ্রয় স্থল হিসাবে চাই, তবে সে জোগাড় করে দেবেই। এখন আপনি বলুন, আমি সেরকম চেষ্টা করব কি না। যদি একবার কালীর নাম করে সেই বাড়ীটি আমাদের বিপ্লবের জন্য পাই তবে আমাদের সবার জন্য ঐ ব্যবহার করা যাবে।

তারক এসব শুনে অনুমতি দিলেন। কী কী কথা, কী কায়দায় সতর্কতা নিয়ে বলবে এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হোল তাও দেখে যেন তাকে বিশদভাবে রিপোর্ট দি

উকুনের জন্য আপনার মনের শান্তি নষ্ট করবেন না।

ছোট ছেলেমেয়েদের এবং মেয়েদের কাছে উকুন একটি সমস্যা। উকুন হওয়া খারাপ কিন্তু বিষাক্ত পাউডার ব্যবহার আরও খারাপ।

শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকেই আপনি উকুন থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না। আপনার ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে এদের বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। মেয়েদের মধ্যেই সাধারণতঃ এরা সহজে ছড়ায়। তুলে যাবেন না বিষাক্ত পাউডার আপনার চুল, মাথার তালু ও চামড়ার সমূহ ক্ষতি করে। নব আবিষ্কৃত এই আধুনিকতম উকুন-মাশক সুবাসিত তেল মাসে মাত্র একবার ব্যবহার করে আপনি উকুন ও নিক্কি থেকে নিশ্চিন্ত থাকুন। ঐ পুতকীত হতে দেয় না।

লাইসিলং

সুবাসিত উকুন-মাশক

সুধানিধি কেমো ইণ্ডাষ্ট্রিজ, পুনা-৩৩

দেয়, তাও বলল। তার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সে সিদ্ধান্ত নেবে।

দীনবন্ধু যোগেশের বিশেষ বন্ধু বলে সে খুবই আশান্বিত ছিল যে, যোগেশ তার কথা ফেলতে পারবে না। তার ভাবনার কথা শুনলে সে নিশ্চয় একটা উপায় করবেই। কালীর দীনবন্ধু মামা পরের দিনই তারককে জানালো যে, যোগেশবাবু রাজি হয়েছেন, ওর উপরে নির্ভর করা যায়।

তারপরের দিন দীনবন্ধু কালীকে নতুন আশ্রয়ে নিয়ে গেল। তারকেশ্বর রোজই কালীর কাছ থেকে রিপোর্ট নিতেন এই সব কথা জেনে তারকেশ্বরের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল, যোগেশ বাবু পুলিশের লোক নয় এবং তাকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে। তাই তারকেশ্বর কালীর কাছে প্রস্তাব করল, 'আমি যোগেশ বাবুর সঙ্গে দেখা করব। আমি নিজে কথা বলব।'

দিন ও সময় স্থির করে সে দীনবন্ধু ও কালীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া বুক, বলিষ্ঠ বাহু, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ নিয়ে যখন যোগেশ জ্যোৎস্না রাতে তারকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন জ্যোৎস্নার আলোকে তারক একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল —এইটি হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী কালীর অভিমত। যোগেশ বাবুর কাছে গিয়ে নমস্কার করতেই তারক তাকে কাছে টেনে বসালো। অল্পক্ষণ পরেই কালী ও দীনবন্ধু সেখান থেকে সরে গেল। তারকেশ্বর দু ঘন্টারও বেশী যোগেশবাবুর সাথে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছিল। প্রথম দিনের আলাপেই তারক বুঝতে পেরেছিল, যোগেশবাবু সাহসী ও সৎ লোক। এই মানুষ বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। একে যদি বিপ্লবীরা আপন করে নেয় ও ভাল ট্রেনিং দেয়, তবে তাকে দিয়েও কালীর নিশি কাকার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো যাবে।'

যোগেশবাবুর শেলটারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়ে পরিণত হল। মাস্টারদা ও নির্মলদা যোগেশবাবুর মত সাহসী বেপরোয়া লোকের খবর পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কালীর দীনবন্ধু মামার বাড়ীতে যেমন বোমার লোহার খোল ঢালাই হয়েছিল, ঠিক তেমনি বোমার লোহার খোলে পোরার জন্য পিকরিক অ্যাসিড ও গান-কটন তৈরী করার জন্য নির্ভরযোগ্য এই বাড়ীটিও ব্যবহার করা হয়েছিল। শহরের কাছাকাছি এই রকম একটি নির্ভরযোগ্য বাড়ী পাওয়াতে বিশেষ কর্মীদের শহরের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ করারও বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। এই সময় শহরে অনেক নেতৃস্থানীয় ছেলেমেয়ে বাড়ীতে নজরবন্দী অবস্থায় ছিল। তাদের পক্ষে গ্রামে গিয়ে নেতাদের সঙ্গে দেখা করে সেই রাতেই বাড়ী ফিরে আসা সম্ভব হোত না। তাই সেই বাড়িটি থাকাতে তাদের খুব সুবিধা হয়েছিল এই—সেই বাড়ীতে ফেরার নেতাদের সাথে দেখা করে তারা সেই রাতেই নিজেদের বাড়ী ফিরে আসতে পারত। প্রযোজ চৌধুরী শহর সংগঠনের একজন সংগঠক। নির্মল সেন বর্তমানে চট্টগ্রামের একটি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। তারা দুজনে প্রায় এসে তারকের সাথে দেখা করে সেই রাতেই নিজেদের বাড়ী ফিরে যেত। তখনকার দিনে প্রখ্যাত বিপ্লবী কল্পনা দত্ত বহুবার রাত্রির অন্ধকারে পুরুষের বেশে পাহারারত পুলিশকে দস্তুরমত ফাঁকি দিয়ে তারক ও অন্যান্য নেতাদের সাথে দেখা করত। এই সময় '৩২ সালের শেষের দিকে মাস্টারদা একদিন তারক ও কালীকে পথড়কোড়া গ্রামে 'কপালকুণ্ডলা' শেলটারে ডেকে পাঠালেন। তাদের কাছ থেকে বিস্তারিত খবর জানলেন। এর কিছুদিন পর ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন 'ধলঘাট যুদ্ধ' হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন ক্যামারন নির্মলদার রিভলবারের গুলিতে নিহত হন। এই যুদ্ধে আমরা নির্মলদা ও অপূর্ব সেনকে হারালাম। মাস্টারদা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে মিলিটারী বেষ্টনী ভেদ করে গিয়ে উঠলেন জ্যৈষ্ঠপুরা গ্রামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শেলটার 'কুটীরে'। সেই শেলটারে তখন অজ্ঞাতবাসে ছিল—কালীকিংকর দে, সুশীলচন্দ্র দে এবং মহেন্দ্র চৌধুরী। ধলঘাট গ্রামটি পটিয়া থানার অন্তর্গত। এই ধলঘাট যুদ্ধে অপরাধী সাব্যস্ত হোল এই থানার প্রতিটি গৃহস্থ। প্রত্যেক গৃহস্থের উপর ধার্য হল মাসিক পিউনিটিভ ট্যাক্স। পটিয়া এবং বোয়ালখালি থানার গ্রামকে গ্রাম রাত্রির অন্ধকারে ঘেরাও করা হোত। তারপর অর্চিন্তিতে শত শত মিলিটারী সৈন্য দিয়ে ভোর থেকে শুরু হোত বাড়ীর পর বাড়ী তল্লাসী। তখন কেউ চোখ খুলেছে, কেউ খোলেনি—সেই অবস্থায় প্রতিটি পুরুষ, নারী, ছেলে, মেয়েকে মিলিটারীর অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হোত। গ্রামে দেখা দিল গ্রাসের সম্ভাব। আবার বিপ্লবীরা আশ্রয়ের অভাব অনুভব করতে লাগলো। অনেক দিন থেকে কোন অ্যাকশনের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে, ফেরার বিপ্লবীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগলো। 'গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য অজ্ঞাতবাস, বেঁচে থাকার জন্য নয়'—যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী জালালাবাদ যুদ্ধের এক অপরাজেয় সৈনিক, যে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বিয়ে পাশ করেছিল, সেই বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী মাস্টারদাকে এই কথা বলল। শৈলেশ্বর এই বলে শহরের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকার জন্য মাস্টারদার কাছে অনুমতি চাইল, উদ্দেশ্য ছিল যে কোন বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে 'অ্যাকশানের' একটি পরিকল্পনা নেবে—'ডেথ প্রোগ্রাম' নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই যে সে যাচ্ছে, ফেরারী জীবন কাটাতে, সে আর ফিরে আসবে না। মাস্টারদা শৈলেশ্বরের দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পেয়ে বাধা দিলেন না, তাকে বললেন, 'যাও, তুমি চেষ্টা করে দেখ।'

দু-একদিনের মধ্যেই বজ্রেন দে, কালীকিংকর ও শৈলেশ্বরকে দক্ষিণ কাট্টলীতে কালীর মামার বাড়ীতে ১৯৩২ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পৌঁছে দিল। কালীর মামা দীনবন্ধুর মুখে জানা গেল যোগেশ বাবু কারখানা থেকে ইউরোপীয়ান ক্লাবের চাকরিতে বদলী হয়েছে। ইউরোপীয়ান ক্লাবটি ছিল সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে। এই এলাকার মধ্যে যারা চাকরি করে, তাদের ওপর আই-বি ও পুলিশের কড়া নজর থাকত। এইসব খবর পাওয়ার পরও শৈলেশ্বর ও কালী যোগেশবাবুর শেলটারে গিয়ে উঠলো। সেখান থেকে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হল। ডাবল মুরিংসের দীনেশ চক্রবর্তী, পাথরঘাটার পয়োজ চৌধুরী, চট্টগ্রাম কলেজের নির্মল সেন (বুলবুল—কোড নাম ছিল বার্ড) এবং শান্তিরঞ্জন সেন সবাই মিলে ডাবল মুরিংস থেকে চক বাজার পর্যন্ত শহরের সব এলাকার প্রয়োজনীয় খবরাদি যোগাড় করে দিত। এরাই ছিল শহরের নামকরা প্রথম সারির কর্মী যোগেশবাবুর কাছ থেকে ইউরোপীয়ান ক্লাবের প্রয়োজনীয় সব খবর জানা যেত।

ইউরোপীয়ান ক্লাবটি শহরের একমাত্র স্থান যেটিকে ইংরেজরা ভাবত তাদের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। কারণ এই ক্লাবটি ছিল পাহাড়ে ঘেরা। এর কাছাকাছি কোন রাস্তা দিয়ে সাধারণ লোকের যাতায়ত নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণের কোন প্রাইভেট গাড়ীও যেতে পারত না। এই এলাকার প্রধান প্রবেশ পথটির ওপরে ছিল অকসিলারী আর্মারী। সূর্যাস্তের সাথে সাথে এই আর্মারীর এলাকা থেকে একদল টহলদারী মিলিটারী সেপাই বেড়িয়ে পড়ত। তাদের সঙ্গে থাকত সঙ্গীনযুক্ত রাইফেল। এদের কাজ ছিল হকিন্স ক্লাব পর্যন্ত টহল দেওয়া। এই এলাকা পুরোটা একবার ঘুরে আসতে তাদের সময় লাগত ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট। সাহেবদের ধারণা তাদের এই ব্যূহে অবাঞ্ছিত লোকের প্রবেশ একেবারে অসম্ভব। কিন্তু বিপ্লবীরা তাদের মনোমত লোক সেখানে প্রবেশ করানো খুবই সম্ভব বলে মনে করত। সাহেবরা এই নিরাপদ স্থানে বসে বিপ্লবীদের ধ্বংস করার জন্য কতই না পরিকল্পনা করেছে। তাদের এই ঘাঁটি বিপ্লবীরা উড়িয়ে দেবে ঠিক করেছিল। সাহেবদের আক্রমণ করে তাদের হত্যা করবে—তাও তাদের প্ল্যান ছিল। এইসব সন্ধান পাওয়া ও পরিকল্পনা করা সবই সম্ভব হয়েছিল, যেহেতু যোগেশবাবু সেই ক্লাবে চাকরি করতেন। সরজমিনে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য মাস্টারদা তারককে নিযুক্ত করলেন। সেই ক্লাবে যখন যোগেশবাবুর ডিউটি তখন খবরাদি পাওয়া যে খুব অসম্ভব নয়, তা বুঝতে পারা যায়।

তারক কট্টলী গ্রামে এলো এবং সে পৃথক পৃথকভাবে শান্তি চক্রবর্তী, গামা ও দীনবন্ধু মজুমদারকে খবরাদি নেবার জন্য কাজে নিযুক্ত করলো। তিনজনই পৃথক পৃথকভাবে খবর এনে দিত। তাদের সংক্ষিপ্ত খবরের ওপর তারক প্রশ্ন করে সংক্ষিপ্ত উত্তরই পেত। কিন্তু সব উত্তরই প্রায় একরকম। তাই তারক বুঝলো খোঁজ নেওয়ার

ব্রিটানিয়া
দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্লাক্সো মিল্ক বিস্কিস

সিবটাস-BBC.GLXMB.1-203 BG

ব্যাপারে ভেজাল নেই। উত্তরও শুদ্ধ বিচার-এর এই মাপকাঠি নির্ভুল।

তারক যোগেশবাবুর সাথে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শুরু করল। যোগেশবাবু মুগ্ধ হয়ে তারকের কথা শুনতেন এবং দেখা গেছে যোগেশবাবু তারকের কথায় খুবই অনুপ্রাণিত হতেন। একসময় যোগেশবাবু তারককে বললেন, 'আপনারা যদি সাহেবদের খতম করার জন্য ক্লাবটি আক্রমণ করেন, তবে আমি ভিতর থেকে আপনাদের সবরকম সাহায্য করব।'

তারক এই কথা শোনার পর খুবই খুশী হয়ে বলল, 'যোগেশবাবু হবেন আমাদের বহ্নি রক্ষক। সেই দিন থেকে যোগেশবাবুর কোড নাম হল 'অগ্নিদগ্ধ'। যোগেশবাবুর কাছ থেকে রীতিমত ক্লাবের ছাপানো প্রোগ্রাম পাওয়া যেত। তাই দেখে তাদের একটি বিশেষ সমাবেতের দিনে আক্রমণের জন্য পরিকল্পনা পাকাপোক্ত হল। ঠিক হল সেই আক্রমণের নেতৃত্ব করবে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্লাবের হলঘরের প্রধান গেট পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ শুরু করতে হবে। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী এবং কালিকিঙ্করদের হাতে থাকবে .৪৫৫ বোরের ওয়েবলী রিভলবার। শান্তি চক্রবর্তীর হাতে থাকবে (অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের তৈরী খোলের) বোমা, যার মধ্যে থাকবে উচ্চ ধরনের বিস্ফোরক অ্যামন পিকরেট ও পটাশ ক্লোরেট পাউডার এবং যেটি স্ট্রাইকার ফিট করা অর্থাৎ যেটি ছুঁড়ে মারলে মাটিতে পড়েই ব্লাস্ট করবে। আরেকটি বোমে লোশন দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হবে—সেই রকম একটি বোমাও শান্তির সঙ্গে থাকবে। তার সঙ্গে একটি তরবারিও থাকবে। প্ল্যানটি ছিল এইরকম—শান্তি প্রথমে স্ট্রাইকার বোমা ফাটাবে, তারপরই লোশন দিয়ে একটি বোমা ছুঁড়বে, যেটি চার-পাঁচ সেকেণ্ড পরে ফাটবে। ইতিমধ্যে শান্তি তার রিভলবার থেকে সাহেবদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করতে থাকবে। তারপর তরবারী দিয়ে যাকে সামনে পাবে তার শিরোচ্ছেদ করবে। সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী—উভয়ের হাতে থাকবে ব্যারাল কেটে ছোট করা পুলিশ আর্মারি থেকে লুঠ করা মাকসেটিন। কাস্ট আয়রনে তৈরী স্ট্রাইকার-যুক্ত একটি করে বোমা। আরেকটি লোশন ঢেলে নিক্ষেপ করার উপযুক্ত বোমা। উত্তর দিক থেকে 'বিলিয়ার্ড রুম' আক্রমণ করবে বীরেশ্বর চক্রবর্তী ওয়েবলী পিস্তল নিয়ে। তার পাশে থাকবে পান্নালাল। পান্নালালের হাতে থাকবে একটি মাস্কেটিন। আর গামার (প্রফুল্ল দাস) হাতে থাকবে, দুটি পূর্ব বর্ণিত বোমা, একটি ছোড়া। চতুর্থ দলে দীনেশ চক্রবর্তী ও দীনবন্ধু মজুমদার তিন রকমের ইস্তাহার নিয়ে উপস্থিত থাকবে। ক্লাবের কাছাকাছি একটি জায়গায় তারা থাকবে এবং সেখান থেকে দেখবে ও জানতে চেষ্টা করবে আক্রমণ শুরু হল কি। আক্রমণ শুরু হলেই শোনা যাবে বোমা ও গুলির শব্দ। তখন তারা সেই শব্দ শুনে সাথে সাথেই ছুটে যাবে শহরে যেখানে শান্তিরঞ্জন সেন এবং নির্মল সেন দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের সব ইস্তাহার দিয়ে দেবে যেন তারা সেইগুলি বিভিন্ন নির্দিষ্ট জায়গায় বিলি করে দেয়।

নির্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে আক্রমণকারীরা ক্লাব থেকে জয়দ্রথের সংকেত পাওয়ার অপেক্ষায় গোপনে ক্লাবঘরের নিকটে প্রস্তুত হয়ে রইল। তারা জয়দ্রথের বাড়ি থেকে রওনা হয়েই এসেছিল, কিন্তু পথে বিঘ্ন ঘটল। তাই দেরি হওয়াতে জয়দ্রথের সংকেত ছিল সেদিন আক্রমণ করা উচিত হবে না। তারা এই সংকেত পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ফিরে যাওয়ার সময় পথে শৈলেশ্বর কালীকে বলছিল, মায়ের ডাক আমি ঠিক শুনেছিলাম, সাড়াও দিয়েছিলাম। এখন দেখছি আমি মায়ের বেদিমূলে বলী হওয়ার উপযুক্ত নই।

তারা সবাই নিজ নিজ শেলটারে গিয়ে উঠল। তাদের অস্ত্রের বর্ণনা আগেই দিয়েছি, তাছাড়া তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটি করে পটাসিয়াম সায়ানাইডের পুড়িয়া। জীবন্ত তারা কেউ ধরা দেবে না। সেইজন্য এই বিষের পুড়িয়া সঙ্গে রাখা। নিজেদের শেলটারে এসে যখন বন্ধুরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন একজন জেগে ছিল—সে হল শৈলেশ্বর। কেন সে জেগেছিল? মনে তার কি প্রতিক্রিয়া—তা কেবল সেই বলতে পারে। সে শুয়েছিল খাটের উপরে, আর মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছিল কালীকিঙ্কর। কালীর রিপোর্ট—শৈলেশ্বর তখনও ঘুমায়নি, একবার এপাশ আর একবার ওপাশ করছিল। কালীকে সে দুবার তেকে জিজ্ঞেস করেছিল এখন কটা বাজে? কালী একবার বলল, একটা বাজে। আরেকবার বলল, দুটো বাজে। সে কালীর কাছ থেকে একটুকরো কাগজ ও পেন্সিল চেয়ে নিল।

কালীর সামান্য যা মনে ছিল তাই সে বলল। শিরোনামায় লেখা ছিল ডেজ আর ডাল। লাইফ ইজ গেটিং মোর এণ্ড মোর এনোমেলাস ডে বাই ডে। মাইণ্ড ইজ অ্যাবসলিউটলি ভেগ এণ্ড ভেকেণ্ট। এই লেখা শেষ করে সে কাগজ আর পেন্সিল তার পাশে রাখল। তারপর বালিশের তলা থেকে বিষের পুড়িয়া টেনে নিয়ে মুখে পুড়ে দিল। সব কাজ সমাপ্ত করে তারপর কালীকে বলল, আমি বিষ খেয়েছি। সবাই যা জানে পটাসিয়াম সায়ানাইড জিভে ঠেকলেই মানুষ মরে যায়, তার চরম ব্যতিক্রম দেখা গেল শৈলেশ্বরের বেলায়। তার গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজ শুরু হোল। দারুণ আওয়াজ। কিছুতেই আওয়াজ বন্ধ হচ্ছিল না, অথচ তার জ্ঞানও ছিল না। এই অবস্থায় কালী আর শান্তি খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগল। শান্তি ছুটে গেল ডাকতার আনতে। ভোর বেলায় জয়দ্রথ ডিউটি থেকে ফিরে এসে এই আত্মহত্যার কাহিনী শুনে বলল, এই ব্যাপার যেন প্রচার না হয়। সে সারাদি পাহাড়া দিল যেন বাড়িতে কেউ না এসে ঢোকে। গভীর রাত্রে বঙ্গোপসাগরের তীরে বালুচরে শৈলেশ্বরের শবদেহ সমাধিস্থ করা হল। শিয়রে দেওয়া হয়েছিল একটি তরবারী এবং দেহ নানারকম ফুল দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। তারপর বন্ধুরা শেষ প্রণাম জানায় অনুচ্চস্বরে বন্দে মাতরম ধ্বনি দিয়ে।

আক্রমণের প্ল্যানটি এইরকম শোচনীয়ভাবে বিনষ্ট হওয়ার পর বিপ্লবীরা দমে গেল না। তারা আবার প্রস্তুত হল আক্রমণ করার জন্য। এইবারে নেতৃত্ব দেবে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। আক্রমণের দিন ধার্য হয়েছিল ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোন একটি দিন। প্রীতিলতার সঙ্গে আরও দুটি মেয়ের যাওয়ার কথা ছিল—একজন কল্পনা দত্ত, আরেকজন প্রেমলতা (কালী দেবের স্ত্রী)। এই পরিকল্পনাও কার্যে পরিণত হোল না কারণ ক্লাবের কাছাকাছি জায়গায় আক্রমণের আগের দিন ধরা পড়ে গিয়েছিল পুরুষবেশী কল্পনা দত্ত। তার সঙ্গে নির্মল সেন ও দীনবন্ধু মজুমদারও গ্রেপ্তার হয়েছিল। এই ব্যাপারে সেখানে খুব হৈ-চৈ হয়। প্রেমলতাকে এবারেও ফিরে যেতে হল। অল্পদিনের ব্যবধানে এতসব ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল। পুলিশ কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এসব কিছুই টের পেল না। জয়দ্রথের উপর দলের আস্থা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। আবার দিন ধার্য হল সেই সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখে রাত সাড়ে নটা-দশটায়। এই আক্রমণ অভিযানে নেতৃত্ব দেবে স্বয়ং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। দীনেশ ও দীনবন্ধুর জায়গায় দীনেশ একা থাকবে। অন্যান্য সব আগের-বারের মতই ঠিক ছিল। এবারের পরিকল্পনাকে কেউ ঠেকাতে পারল না। প্রীতিলতার নেতৃত্বে এই আক্রমণ সাফল্য লাভ করল। টহলদারী মিলিটারী পাহারা শ্বেতাঙ্গ উচ্চ কর্মচারীদের রক্ষা করতে পারল না। টহলদারী মিলিটারীরা যখন ক্লাব ছেড়ে পূর্ব দিকে অকসিলিয়ারী আর্মারীর দিকে গেল, তারপর মিনিট পনের পার হবার পর বিপ্লবীরা মনে করল এই তাদের সুবর্ণ সুযোগ। তারা সঙ্গে সঙ্গে সংকেত দিল। জয়দ্রথও তার উত্তর দিল সংকেতে এইটিই ঠিক সময়। চারিদিক থেকে প্ল্যান অনুযায়ী তারা আক্রমণ করল। বোমা বিস্ফোরণের শব্দ, বন্দুক পিস্তলের আওয়াজ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে যারা ইস্তাহার বিলি করার জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা বুঝল আক্রমণ শুরু হয়েছে, যত শীঘ্র সম্ভব ইস্তাহার বিলি করতে হবে। তারা তখন তাদের কাজ করতে ছুটল।

(চলবে)

চতুর্থ আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী ১৯৭৮

শৈবাল ঘোষ

(৩)

আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিকে ভারতের অংশগ্রহণ শেষ পর্যন্ত অনেক জটিলতার মধ্যে হয়েছিল।

প্রথম বাছাইয়ের যে নয়জন শিল্পী ত্রিবার্ষিকে যোগদানে অক্ষম জানিয়েছিলেন সেই নয়জনকে বরোদার শিল্পী গুলাম মহম্মদ শেখ আমন্ত্রণ জানালেন, এই ত্রিবার্ষিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ একটা সমসাময়িক প্রদর্শনী করার জন্য। এই নয়জনের মধ্যে ছিলেন কলকাতার গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সনৎ কর, দিল্লীর পরমজিৎ সিং, ভিভান সুন্দরম ও মৃণালিনী মুখার্জি, বরোদার ভূপেন খাকর এবং গুলাম শেখ নিজে, বোম্বাইয়ের গিরেভ্ পটেল এবং হায়দ্রাবাদের লাক্ষ্মা গৌড়।

কলকাতার তিনজন অর্থাৎ গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য ও সনৎ কর এবং দিল্লীর পরমজিৎ সিং এই প্রস্তাবে সায় না দেওয়াতে বাকী ছয়জন দিল্লীর কুমারস্ গ্যালারীর প্রদর্শনীতে যোগদান করলেন।

প্রাক্তন নির্বাচক রামচন্দ্রণ ও তাঁর রেট্রোস্পেকটিভ প্রদর্শনী শুরু করে দিলেন ওই কুমারস্ গ্যালারীতেই।

অন্যদিকে ধূমিমাল গ্যালারীর স্বামী-নাথন, বিকাশ ভট্টাচার্য, কৃষণ খান্না, জেরাম পটেল, পরমজিৎ সিং, শান্তি দাভে, সতীশ গুজেরাল, বীরেন দে, মনু পারেখ, নন্দ কাত্যাল এবং হিম্মত শাকে নিয়ে প্রদর্শনী শুরু করলেন।

'গ্যালারী চাণক্য' শ্রীধরণী গ্যালারীতে প্রদর্শন করলেন রামেশ্বর বুটা, শান্তি বর্মন, নবীন নাথ, যোগেন চৌধুরী, প্রভাকর বারভে, মমতানি, সুধীরঞ্জন ভূষণ, গোলাম রসুল, সন্তোষ, প্রফুল্ল মোহান্তি, আনন্দ দেব, বিশ্বম্ভর খান্না, বিশ্বনাথন, অমৃত পটেল, কৃষ্ণা রেড্ডি এবং জারিনার ছবি।

'আর্ট হেরীটেজ' গ্যালারী সুব্রহ্মন-নিয়ম, তায়েব মেহতা এবং আকবর পদম-সীর ছবি নিয়ে প্রদর্শনী শুরু করলেন। তার আগেই হুসেনের প্রদর্শনী শেষ হয়েছে।

এতগুলো প্রদর্শনীতে দিল্লী একবারে চারুকলা নগরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একই সঙ্গে ভাওয়ালপুর হাউসে চলছিল রাষ্ট্রীয় কলামেলা। বহুদিন বাদে দিল্লীতে এরকম জমজমাট অবস্থা দেখা গেল।

দিল্লী শহর ঘুরে সব গ্যালারীর প্রদর্শনী দেখার পর, আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিকে ভারতের অবদান হাজার পাওয়ার আলোর পাশে মোমবাতির মত লাগে। ভাবতেই লজ্জা হয় যে, ভারত যেখানে এতবড় ত্রিবার্ষিকের হোতা সেখানে ভারতের অবস্থা ছেঁড়া কাঁথার মত। আমরা খেয়োখেয়িতে কত এগিয়ে গেছি আর শিল্পের নান্দনিক দিকে কত পিছিয়ে আছি সে কথা আন্তর্জাতিক চারুকলাবিদরা এই ত্রিবার্ষিকে ভারতের অংশ গ্রহণ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। তবু সবচাইতে বড় সান্ত্বনা এই যে, আন্তর্জাতিক শিল্প-রসিকরা যাঁরা অনেক দূর দেশ থেকে এই প্রদর্শনী দেখতেই ছুটে এসেছেন, তাঁরা দিল্লীর অন্যান্য প্রদর্শনীর ভারতকে দেখে এটা অন্তত আন্দাজ করতে পেরেছেন যে, ভারতেও ভালো শিল্পের সৃষ্টি হয়।

রবীন্দ্র ভবনের সেমেন্টে ভারত তাঁর প্রদর্শন সামগ্রী উপস্থিত করেছে এই ত্রিবার্ষিকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবার পর ঘরে ঢুকতেই তিন হাত দূরে প্রথম নজর টানে যোগেন চৌধুরীর দুটি ছবি। একটি ছবি এত বড় যে, ভালো করে দেখতে গেলে অন্তত দশ ফুট দূর থেকে দেখা উচিত। যোগেন চৌধুরীর দুর্ভাগ্য যে তাঁর এই ছবি যেখানে রাখা আছে সেখানটাতেই খালি আলোর ব্যবস্থা নেই। তবু অন্ধকারের মধ্যেই এই ছবি দেখার মজা ভেবেই বোধহয় কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উনি এঁকেছেন মুনলিট নাইটে এক বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার শিকার এক দলাপাকানো নারী দেহের উপর। ছবিটির ভাব এবং বক্তব্য খুবই সহজবোধ্য। পেনের স্টিপলিং এবং গাঢ় কালির জমাট ব্যাকগ্রাউন্ডে তার ছবির ফর্ম কেটে বেরিয়ে এসেছে। এ ছবি

বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি

বুঝতেও যেমন সহজ দেখতেও ততই মজা। ওঁর অরেকটি ছবি মুঠোর মধ্যে সিগারেট ধরা এক চাদর গায়ে মানুষের প্রতিকৃতি। যোগেন চৌধুরীর ছবিতে রঙ খুবই কম থাকে। দু তিনটি রঙের পাতলা আস্তরণে তাঁর ছবি আরও মায়াবী রূপ ধারণ করে। সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ বক্তব্য। ট্রিটমেন্টও খুব ভালো।

নন্দগোপাল একজন পুরস্কৃত শিল্পী। তাঁর করা কপার প্লেট বিলিফ ভাস্কর্য 'রিচুয়াল ইমেজেস' তাঁকে এতবড় সম্মান এনে দিয়েছে। কাজটিতে ভারতীয় ট্র্যাডিশন পুরোমাত্রায় বর্তমান। নন্দগোপালের অপর ভাস্কর্যটিও একই ধরনের। কুর্ম অবতারকে নিয়ে করা রিলিফটিতেও উনি ডেকোরেটিভ প্যাটার্ণ ব্যবহার করেছেন এবং দুটি কাজই অনবদ্য হয়েছে। ভালো করে খুটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, শিল্পী এই ভাস্কর্য দুটি তৈরী করতে প্রচুর খেটেছেন।

নন্দগোপালের পাশের কিউবিকালেই জ্ঞানকীরামের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। জ্ঞানকীরাম বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী এবং নন্দগোপাল ও জ্ঞানকীরাম দুজনের কাজ দেখলে একই স্কুলিংএর কাজ এটা বোঝা যায়। জ্ঞানকীরাম হয়তো এই ধারায় ভাস্কর্য করা শুরু করেছিলেন। ওঁর ভাস্কর্য 'গড়ুর' সাধারণ দর্শকদের ভালোই লাগবে। জ্ঞানকীরাম গড়ুরকে একটা মূর্তির মতোই রূপ দিয়েছেন। কিন্তু তাকে প্রাণ দেননি। গড়ুরের তেজ তাঁর ভাস্কর্যে পাওয়া যায় না। অপরদিকে নন্দগোপাল জ্ঞানকীরামের ধারায় কাজ করে ভাস্কর্য শিল্পের সীমাবদ্ধতা অনেকটাই দূর করেছেন। নন্দগোপালের ভাস্কর্য দর্শককে তার ভাবের রেশ গভীরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, কিন্তু জ্ঞানকীরামের গড়ুর একটা মূর্তি হিসাবেই দেখা যায় তার গভীর বক্তব্যের মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। এককথায় বলা যায় জ্ঞানকীরামের ধারাকে নন্দগোপাল আরও বিশালত্ব এনে দিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের শিল্পী জয়কৃষ্ণ আগরওয়াল 'স্যান ডিয়েগো' নামে দুটি গ্রাফিক্স প্রদর্শনীতে দিয়েছেন। খুবই সুক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ রচনা। ছাপার কৌশলও প্রশংসনীয়। তবে যাঁরা এই শিল্পীর অন্যান্য কাজ দেখেছেন তাঁরা এটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে ইনি এই ধরনের ফর্ম ছাড়া অন্য ফর্মে যেতে পারেন না। তাঁর যে কোন নামেরই ছবি দেখলে মনে হবে একই বক্তব্য, পার্থক্য শুধু নামে আর কিছুতে নয়।

প্রভাকর বরভের তেলরঙে করা ছবি 'ডিসাইডেড ইমেজে' জানলা দিয়ে দেখা সাদা আকাশের মধ্যে এক নীল স্তম্ভ। ফর্মগুলি ভেঙে খুবই মনোহর করে তোলা হয়েছে ছবিটিকে। দুঃখ লাগে তার পাশের ছবি 'পেডেস্টাল' দেখলে। দুটো কাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই রচনাটিতে বেশ সস্তা ধরনের চমকদারী আছে। বারভের কাজে একটা জিনিস যেটা স্পষ্ট বোঝা যায় তা হল তিনি এখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন নি। এখনও তিনি ফর্মের মধ্যে নিজের ভাব প্রকাশের ধরন হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। এই ছবিটি দেখার পর বারভে সম্বন্ধে সব ধারণা বদলে যায়।

ধনরাজ ভগত-এর ভাস্কর্য খেলার ছলে দেখলে মনে হয় যেন তিনি ভাস্কর্যকে সৃষ্টি করেন। ভাস্কর্য তৈরী করা যে কত কঠিন এবং কত মনোযোগ দিয়ে তা সম্পাদন করতে হয় (নন্দগোপালের কাজ দেখলে এটা বোঝা যায়) এটা বোধহয় তিনি জানেন না। ওনার মত নামকরা শিল্পীর এ রকম ভাস্কর্য তৈরী করতে হয়-বলে-করাটা ভীষণ দৃষ্টিকটু লাগে। তাঁর করা 'ফিগার উইথ সিম্বলস' দেখার পর মনে হয় এরকম অসংখ্য স্টাডি আর্ট কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা করে থাকেন। 'সিম্বল' যে কি, অনেক খুঁজেও সেটা উদ্ধার করা যায় না। ন্যুড ফিগারের হাতের ওপর হেলান দেওয়া ভঙ্গিতেই যদি উনি কিছু 'সিম্বল' পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্য বলার কিছুই নেই। তবে, এইটুকু বলতে পারি দর্শকরা কোনও 'সিম্বল' পান নি। এই ধরনের ভাস্কর্য ত্রিবার্ষিকের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীতে কি করে স্থান পায় এটাই আশ্চর্যের বিষয়। এই মূর্তি যে কোনও আর্ট কলেজের প্রদর্শনীতেও যে কোন শিল্পী দেখাতে সংকোচ বোধ করতেন। নিঃসন্দেহে ধনরাজ ভগতের সাহস আছে এটা অনস্বীকার্য।

সুধীররঞ্জন ভূষণের কোলাজ যেমনই সুন্দর ঠিক তেমনই খারাপ তাঁর ভাস্কর্য 'উইন্টার মর্ণিং'এ চাদর জড়ান মানুষের সরল ফর্ম আমরা অনেক আগে দেখেছি। তার উপরে খারাপ ট্রিটমেন্ট-এর জন্য ভাস্কর্যটিকে আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে। তাঁর করা 'স্প্রিং' সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

বিদ্যাভূষণ জলরঙের মত করে তেলরঙ ব্যবহার করায় তাঁর ছবি 'ফ্ল্যাওয়ার অফ কাই গার্ডেন নং১, নং ২' খুবই উঁচু ধরনের ইলাস্ট্রেশন বলে মনে হয়। ছবি হিসাবে কত দূর উৎরেছে তাতে সন্দেহ থেকে যায়।

লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ আর এস বিষ্ট-এর কাজ ভাল লাগে। তাঁর করা ছবিতে বিশাল প্রান্তরের ক্ষুদ্র এক রমণী এবং অদূরে কুকুর। নীল আকাশে এক আশ্চর্য গতিময় আলো।

ব্রহ্ম-এর মিকসড মিডিয়া গ্রাফিক 'আইসোলেশন'এ উঁচু ধরনের মুদ্রণ প্রণালী লক্ষ্য করা যায়। একই আকারের চারটে রূপ পরম্পরায় উপস্থাপনা করে উনি গ্রাফিক পদ্ধতিতে যে কতটা দক্ষ সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

রামেশ্বর বুটো একজন নামকরা শিল্পী। 'বি-কনস্ট্রাকশন' ছবিতে সারা ক্যানভাস জুড়ে এক পর্দার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট কয়েক জনের সিলুয়েট ইমেজের মধ্যে একজনের মুখ শিল্পীর মত। তাঁর অন্য ছবি 'কুর্সি'তে গণেশ পাইনের বিখ্যাত ছবি 'এপ্ অ্যান্ড দ্য চেয়ারের' বিষয়ের সঙ্গে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। অসংখ্য কলাকৃতির শিল্পীদের লক্ষ্য একটাই চেয়ারের দিকে। ইঙ্গিতবাহী ছবি। মনে বেশ দাগ কাটে। বুটোর রঙ লাগানোর কায়দায় দক্ষতার পরিচয় মেলে। ক্যানভাসটি যে যত্নে তৈরী করা সেটা তাঁর প্রয়োগ কৌশলে বোঝা যায়।

যতীন দাশের তেলরঙের ছবি দুটি দেখে যে কোনও লোক তাঁর মেহনতের কথা বলে ভুল করতে পারেন। শিল্পী ছবির নীচে তাই বড় করে সই করেছেন, দর্শকদের ভুল ভাঙানোর জন্য। সেই একই ধরনের ফ্ল্যাট কালার-এর কনট্যুরিস্টিক ফর্মে মানুষের রূপ এবং কালার-এর ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি দেখে মনে হয় এই ধরনের ছবির গঠনের আবিষ্কর্তা তাঁরে মেহতাই এই সব ছবি ভাল করে থাকেন। যতীন খুবই সচারুরূপে তাঁরে মেহতাকে অনুকরণ করেছেন। মানু পারেখের ছবির কিছু ফর্মও যতীন দাশের ছবিতে আবিষ্কার করা যায়। এই দুজনের ধরনকে নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। কষ্ট লাগে ভাবতে যে এই ধরনের অনুকরণও ত্রিবার্ষিকে স্থান পায়।

প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য আগে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সবাই জানেন এই প্রবীণ ভাস্কর কি প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। ওনার দুটি কাজ 'ফুটফুল কিস' এবং 'এগ ব্যাইড' দেখে বোঝা যায় অনেক পরীক্ষা করে উনি ধীরে ধীরে তাঁর ভাস্কর্য গঠনের ধরন পালচ্ছেন। ওনার ভাস্কর্যের ফর্ম এখনও নীচের দিকে ম্যাসিভ আকার ধারণ করে আছে। মূর্তির মাথার কাছটা দেহের তুলনায় ছোট। ফর্মের সরলীকরণে প্রদোষবাবু পুরো মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বিমল দাশগুপ্তও এক প্রবীণ শিল্পী। তাঁর করা দুটি ছবি 'ফ্যান্টাসি-১ এবং ২' দুটোই অসাধারণ ছকে বাঁধা। তাঁর ছবি এতই ব্যালান্সড যে, একটা ছোট ফর্ম ছবির থেকে সরিয়ে নিলেই মনে হয় ছবি ডিসব্যালান্সড হয়ে পড়বে। বিমলবাবুর তেলরঙ লাগানোর কায়দাটা দেখবার জিনিস। ওয়াটার কালারের স্বচ্ছতা দিয়ে গাঢ় অসচ্ছ রঙের ডিভিশন সৃষ্টি করায় শিল্পী যে কত দক্ষ সেটা উপলব্ধি করা যায়। ওনার সব ছবিই মিষ্টি মিষ্টি। মাছ, ঝিনুক, পদ্ম, প্রজাপতি এই সবই ওনার ফ্যানটাসির ফর্মের বিষয়। উনি নিজস্ব এক প্রথায় কাজ করে থাকেন এবং ওনার কাজ দেখলেই অনেক ছবির ভিতর থেকেও চিনে নেওয়া যায়। ছবি দুটি এই ত্রিবার্ষিকের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

শান্তি দত্ত ত্রিবার্ষিক কমিটির একজন সদস্য এবং নির্বাচন সার্কাসের একজন হোতা।

'গর্ভা ১ এবং ২' এনকমটিক প্রসেস ক্যানভাসের ওপর করা। গত ত্রিবার্ষিকে শান্তি দত্ত পুরস্কৃত হয়েছিলেন। দুটো কাজ একই এক ধরনের যে মনে হয় দুটো ছবি না এঁকে উনি একটা আঁকলেও কিছু ক্ষতি ছিল না, দর্শকরাও একই ছবি দুবার করে দেখার হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন। কিছু ছবি দেখে হাঁপিয়ে উঠতে

লাক্ষ্মণ গৌড়-এর এচিং

হয়, শান্তি দণ্ডের ছবি সেই ধরনের। বড় বড় রেকট্যাঙ্গুলার ফর্মের ছড়াছড়ি, তার মধ্যে কোথাও কোথাও উঁচু করে সারফেস তৈরী করা হয়েছে এবং তাতে মানুষের আকৃতি ধরা পড়ে কোথাও কোথাও। ডিস্টর্তী ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার ও'র সব ছবিতেই দেখা যায়। এতে তাঁর কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তা শিল্পী নিজেও জানেন না।

বীরেন দে একজন নামী শিল্পী। তাঁর ছবি 'জানুয়ারী ৭৭' এবং 'জুলাই ৭৭' দেখতে বেশ লাগে। বীরেন দের ছবিতে তন্ত্রধর্মী ফর্ম লক্ষ্য করা যায়। চড়া রঙের ব্যবহারে উনি ছবি এঁকে থাকেন। সব মিলিয়ে ছবি দেখতে ভালই লাগে।

আনন্দ দেবের কাজ দেখলে হাসি পায়। শিল্পী 'লাইফ উইথ দ্য একজিস-টেনস'এর দুটো ছবিতেই কোলাজ করেছেন বলে দাবী করে থাকেন। শিল্পের নন্দন-তত্ত্বের মূল্যায়নে উনি কোন মতেই একটা গোল্লার বেশী দাবী করতে পারেন না। কালো ক্যানভাসের ওপর বাসি রুটি আটকে এবং খয়েরী ক্যানভাসের ওপর ঘুঁটে আটকে উনি এই জগতে টিঁকে থাকার কষ্টের নমুনা দেখিয়েছেন। ঘুঁটে আর বাসি রুটি ক্যান-ভাসে আটকে এত সহজেই দরিদ্র শ্রেণী অথবা ভুখা মানুষদের কথা বলা যায় না।

প্রত্যেক দর্শকই ছবি দেখে হাসাহাসি করেছেন। এই-ই যদি ত্রিবার্ষিকে ভারতের নমুনা হয় তো এমন প্রদর্শনীতে ভারত অংশ গ্রহণ না করলেই পারত।

ধর্মরত্নমও এক নামকরা শিল্পী। ওনার দুটি ভাস্কর্য রয়েছে। তার মধ্যে 'মদপতি' নামক ভাস্কর্যটি চলনসই। এতে তিনটে মানুষ জড়ান ভঙ্গিতে দেখা যায়। এটি ব্রোঞ্জে করা। অন্য কাজটির নাম 'সর্পম।' কে'চোর মত নারীর রূপে উনি সর্প কোথা দিয়ে খুঁজে পেলেন কে জানে। এই রকম খারাপ ভাস্কর্য বহু দিন দেখি নি। এনার দুটি কাজের মধ্যে শিল্পবোধের লেশমাত্র আভাসও পাওয়া যায় না।

হেব্বারের 'ওয়াব এন্ড পিস' ছবিটি বেশ সুন্দর। একদিকে সবুজ গাছে ফুল ফুটেছে। অপর দিকে ওই গাছই লাল বিস্ফোরণের আকৃতিতে ছবিটি খুবই ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে।

খোশার করা 'ইন্টু দি অব্রিভিয়ন' বেশ অদ্ভুত আকৃতির রচনা। ছবিতে উল্টো করে মানুষের উপস্থাপনা দর্শককে বেশ ধাক্কা দেয়।

ভিমলকুমার 'প্রেরণাকে প্রতীক' নামক দুটি ছবি এঁকেছেন। তন্ত্রধর্মী গঠনে কাঁচা হাতে করা কাজ। প্রেরণা বলতে ইনি নারীর বক্ষ, যোনি, পুরুষের লিঙ্গ এই সবই বলেছেন। এঁর কাজ দেখলে মনে হয় এই কাজের বদলে যদি এখানে সুনীল দাসের ছবি থাকত তাহলে দর্শকরা এই ছবি দেখার বিরক্তি থেকে মুক্তি পেতেন।

পাম্মিলালের কথা লিখতে ইচ্ছা না হলেও লিখতে হচ্ছে। তাঁর ছবি এই ত্রিবার্ষিকের ভারতীয় বিভাগের মান নামিয়েছে। হঠাৎ এই ত্রিবার্ষিকের বিচারক হয়ে পড়ায় পাম্মিলালের ছবি 'গ্রহণ' আমাদের দেখতে হল। মিষ্টি খাবার পর মুখে নিমপাতা পড়ার মত উপলব্ধি হয় এঁর ছবি দেখলে।

মমতানি 'সেলেব্রেভিগন' নামক দুটি ইউরোপিয়ান আলপনা এঁকেছেন। পোস্টারের লেটারিং-এর মত লেখা আছে এনার ছবির নিম্নাংশে। ওয়াল ডেকরেশন হিসেবে মন্দ লাগে না। মীরা মুখোপাধ্যায়ের কাজ যদি ঠিক সময়ে প্রদর্শনীতে পৌঁছাত তাহলে উনি একটা পুরস্কার হয়ত পেতেও পারতেন। ওনার করা 'স্পিরিট অব ডেলি ওয়ার্ক' নামক ব্রোঞ্জ কাস্টিংয়ে দেখা যায় এক ঘোমটা মাথায় বধূ (লাইফ সাইজ) এলোকেশী এক হাতে কুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঢোকরা পদ্ধতিতে কাস্টিং করা এত বড় মূর্তি আগে কখনও দেখা যায় নি, মুখের গঠন ভারতীয় মিনিয়েচারে পাওয়া নারীর মুখের মত, টানা টানা আয়ত চোখ, মাথা, এক পাশে ঘোমটা তাতে ঘোমটা এবং চুল ডেকরেটিভ ঢোকরা প্যাটার্ণে চালচিত্রের মত কাজ করেছে। ওপরের তুলনায় নিচের দিকটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে মনে হয়। এটাই ভাস্কর্যের একমাত্র দোষ। তবুও অনন্যসাধারণ এই ভাস্কর্য দেখলে জার্মানির মহিলা ভাস্কর হেডে বুহলের শক্তির কথা আবার মনে পড়ে যায়। মীরা মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য ভারতীয় বিভাগের শোভা অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। এমন শক্তিময়ী এক মহিলা ভাস্কর আমাদের দেশেও আছে ভাবতেই গর্বে বুক ফুলে ওঠে।

মুথুকোয়া লাক্ষাদ্বীপ থেকে যে ছবি পাঠিয়েছেন সেই দুটো ছবিই অত্যন্ত সস্তা ধরনের ব্যানার হয়েছে। শিল্প হয় নি।

রেডাপ্পা নাইডুর সম্বন্ধে নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। ও'র আঁকা রামায়ণ বেশ ভাল কাজ। প্রতীকধর্মী ছবিতে পানিকরের প্রভাব লক্ষণীয়।

লাক্ষ্মণ পাই 'থার্ড এন্ড ফ্যাওয়ার' এবং 'লোটাস এন্ড ফেস' নামক দুটি ছবি এঁকেছেন। দুটোতেই অত্যন্ত সস্তা ধরনের চটকদারী পোস্টার-এর মত ট্রিট-মেন্ট করা হয়েছে। একাডেমিক ধরন-ধারণের বালাই নেই। রঙের মধ্যেও মনো-রঞ্জক কিছু পাওয়া যায় না। প্রতিকৃতির মুখের ফর্ম অনেকটা আফ্রিকান ট্রাইবাল মুখোশের মত। গঠনভঙ্গী দেখে মনে হয় সিনেমার পোস্টার। কি করে একজন শিল্পী হয়ে এই ছবি উনি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দিতে পারলেন সেটাই ভাবার বিষয়।

পালিওয়ালও খুব নিম্ন মানের কাজ দিয়ে ভারতীয় বিভাগের দেওয়াল ভরেছেন।

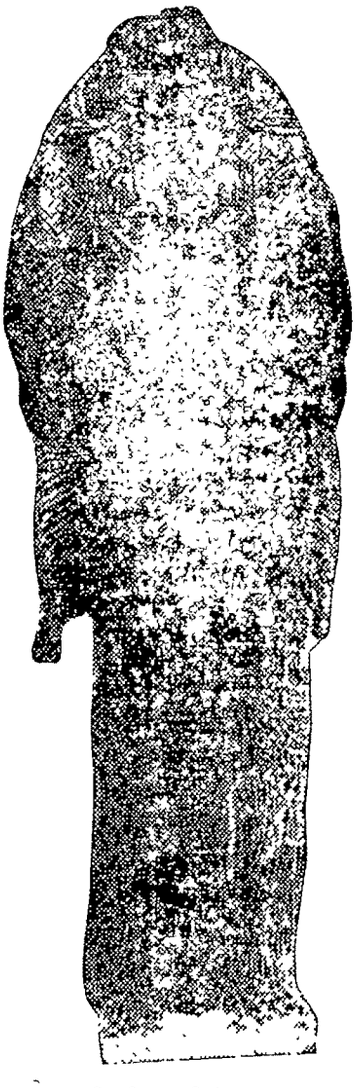

মধালিনী মুখার্জির ম্যাকরাম

পানিকরের কাজ সম্বন্ধে সমালোচনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। যে নিজস্ব ধারায় উনি শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন সেই ধারা অনেক ছবিতেই আজ লক্ষ করা যায়। উনি রঙের যাদুকর ছিলেন। কম রঙ এবং সামান্য রেখার মধ্যে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে সক্ষম ছিলেন। ওনার যে দুটি কাজ এই প্রদর্শনীতে আছে, তার নাম 'ভিলেজ গেম' এবং 'বেড ডগ।' দুটোই ভাল ছবি। এর থেকেও ভাল ছবি ওনার আছে। সেই-গুলো কেন এই প্রদর্শনীতে দেওয়া হল না সেটাই আশ্চর্য লাগে।

জেরাম প্যাটেলের মধ্যে অসামান্য শিল্পশক্তি উপলব্ধি করা যায়। কাঠের উপর ব্লো ল্যাম্প দিয়ে পুড়িয়ে ফর্ম গড়ায় তিনি দক্ষ। এখানে ওনার দুটো বিশাল ড্রইং ছিল নাম 'জেরাম ব্যাক ওথান এবং টু'। এই ধরনের ম্যাসিভ আকৃতির এবস-ট্র্যাক্ট ফর্ম প্রথম দর্শনে দেখতে ভালই লাগে। কিন্তু বার বার দেখলে এই ছবির দর্শককে টেনে রাখার ক্ষমতা চলে যায়। জেরাম প্যাটেলের কাজ বৃহত্তর শিল্পের স্বার্থে করা বলে চিহ্নিত করা যায় কি? ভারতীয় শিল্প নির্বাচনের সময় এবস-ট্র্যাক্ট শিল্পীদের এবারের প্রদর্শনী থেকে যেখানে বাদ দেওয়া হয়েছিল সেখানে জেরাম প্যাটেলের এই এবসট্র্যাক্ট ছবি কীভাবে স্থান পেল সেটাই ভাবার বিষয় (যেখানে অন্য অনেক অ্যাবসট্র্যাক্ট শিল্পীরা এই নির্বাচনের নিয়মাবলীর শিকার হয়েছেন)।

পি টি রেড্ডি এবং জি আর সন্তোষ এই ত্রিবার্ষিকের দুই নবনির্বাচক। বেড্ডির করা ভাস্কর্য 'গেটওয়ে' মোটামুটি সহ্য করা যায়। ফোমারা আকৃতির ডেকরেটিভ ফর্মে কাঠে খোদাই করা কাজ।

সন্তোষের সেই একই ধাঁচ আর কতদিন ভাল লাগবে। উনি রঙ নিয়ে খেলতে ভালবাসেন, ফর্ম সাজাতে ভাল-বাসেন, কিন্তু শিল্পরুচিসম্পন্ন দর্শকদের ভালবাসেন না। যাঁরা অনেক আশা নিয়ে ওনার ছবি দেখতে গিয়ে আগে দেখা কোনও ছবির পুনরাবৃত্তি দেখেন, তাঁদের কি কম সেই একই বিষয় নিয়ে একই রঙ ব্যবহারে করা ছবি বার বার ভাল লাগবে।

চন্দ্রশেখর সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পী। ওনার করা ড্রইং টেমপটেশনে উনি যে নারী পুরুষের মিলনের জান্তব ভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন বিশ্লেষিত ড্রইং-এর মাধ্যমে সেটা দেখতে ভালই লাগে। তবুও লাকশমা গৌড়ের সেই আবেগ তাঁর একই বিষয়ের ওপর করা ছবিতে পাওয়া যায় না।

পাতিয়ালার গুরচরণ সিং ড্রইং করে-ছেন। ওনার ড্রইং-এর বিষয় সেই একই বৃত্ত, যা আমরা জাতীয় প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হতে দেখেছি, উত্তরপ্রদেশ ললিতকলার ড্রইং প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হতে দেখেছি। গুরচরণ বৃত্তের মধ্যেই আটকে গেছেন। ওনার বৃত্ত ছেড়ে অন্য ফর্মে আসতে নিশ্চয়ই ভয় হয়। যদি ছবি প্রদর্শনীতে নির্বাচিত না হয়? হয়ত সেই কারণেই উনি ডেকরেটিভ বৃত্ত ছাড়তে পারেন না। ওঁর ছবি দেখলে বোঝা যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে উনি ছবি এঁকে থাকেন। বৃত্ত ছেড়ে অন্য কিছু ফর্মে ছবিকে নিয়ে যেতে পারলে আরও অনেক বেশী কিছু তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে বলেই মনে হয়।

শ্রীখণ্ডে 'মাইগেলটোরস' নামক ব্রোঞ্জ কাস্টিংয়ে উড়ন্ত ফর্ম দেখিয়েছেন, গোলাকার পৃথিবীর উপর। পৃথিবীর আকৃতি মজবুতো মৌচাকের মত, তার উপরে মানুষের উড়ন্ত ভঙ্গি অসাধারণ লাগে। ইনি একজন সাহসী ভাস্কর এনার কাজই সেটা প্রমাণ করে দেয়।

অনুপম সুন্দর এক রঙে করা এচিং-এর ছাপার কৌশল খুবই উঁচু মানের। অদ্ভুত বিষয় নিয়ে ইনি কাজ করে থাকেন। যন্ত্রমানব তৈরী হচ্ছে পেছনে তাজমহলের ছায়া ইত্যাদিই তাঁর বিষয়বস্তু। এনার করা প্রিন্ট দেখে অনেকেই আনন্দ পাবেন।

ভোরা 'উইংগস' নামক যে ভাস্কর্যটি করেছেন সেটা আধুনিক আঙ্গিকে উপ-স্থাপিত পাখির রূপ। এই কাজ ১০।১৫ ফুট বড় করে এনভাইরোনমেন্টাল ভাস্কর্য করলে দেখতে সুন্দর লাগবে বলেই মনে হয়।

অন্যান্য যে সব ছবি, ভাস্কর্য বা গ্রাফিকস প্রদর্শনীতে আছে তা মোটামুটি মাঝারী আকারের শিল্প। দেখলে খারাপও যেমন লাগে না, খুব একটা ভালও লাগে না।

ভারতীয় বিভাগ দেখতে গিয়ে দর্শক-দের বড়ই বিরক্তি লাগে। শিল্প হচ্ছে মানুষের জন্য, রুচিবোধকে তুলে ধরাই হচ্ছে ভাল শিল্প। শিল্পের নামে যা হোক তা হোক একটা কিছু দেখিয়ে দর্শককে প্রবঞ্চিত করার অধিকার কারুর নেই। যে শিল্পী মানুষকে এভাবে প্রবঞ্চিত করে তিনি শিল্পীই নন।

মাঝে মাঝে মনে হয় এত ছবি দিয়ে ভারতীয় বিভাগের ঘর ভরাবার দরকার কি ছিল। বাছাই কিছু ছবি থাকলেই তো হত। কর্মকর্তারা বোধহয় ভেবেছিলেন যে বেশ অনেকগুলো ছবি না থাকলে বোধহয় ভাল দেখায় না। তার জন্য ভারতীয় বিভাগে যা পেয়েছেন তাই-ই সাজিয়ে দিয়েছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ত্রিবার্ষিকে ভারতীয় বিভাগ তাই অন্যান্য বিভাগের চাইতে নিম্ন মানের হয়ে গেছে। নবনির্বাচকগণ ও ত্রিবার্ষিক কমিটির সভ্যগণ চেকোশ্লোভাকিয়া যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানীর কাজ নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে, অতিবিবৃত ছবি বা ভাস্কর্য থাকলেই প্রদর্শনী সুন্দর হয় না। তুলনা-মূলকভাবে যে কোনও দর্শক বলে দেবে যে, আন্তর্জাতিক বিভাগের তুলনায় ভারতের কি দৈন্যদশা!

তবে এটাও অনস্বীকার্য যে শুধুই ভাল ছবি দিয়েও প্রদর্শনী হয় না। ভালমন্দ মিলিয়েই একটা প্রদর্শনী পুরো হয়। মন্দ ছবি না থাকলে লোকে ভাল শিল্পের মূল্য বুঝবে কি করে? ভারতীয় বিভাগ থাকার জন্য তুলনামূলকভাবে বোঝা যায় যে অনন্য দেশ শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং অনেক দেশেই আজ উন্নতমানের নতুন ধারার শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে। ত্রিবার্ষিকের ভারতীয় বিভাগকে ডাস্টবিনের মতো ব্যবহার করার জন্য দায়ী নয় নির্বাচকগণ। তবে জঞ্জালের মধ্যেও, ধুলোয় দু-একটা রত্ন পাওয়া যায়।

ভারতীয় বিভাগে অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু শিল্পীর একই সময়ে অন্যান্য গ্যালারীতে যে ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই এই ত্রিবার্ষিকে প্রদর্শিত ছবির চাইতে উঁচু মানের। রহস্যটা কি বোঝা যায় না। মনটা সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে। এই ত্রিবার্ষিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

দিল্লির বিখ্যাত আর্ট গ্যালারী ধূমিমাল। প্রদর্শন কক্ষটি সুন্দরভাবে সাজানো। ছবি ভালোভাবে দেখার জন্য প্রচুর আলোর ব্যবস্থা আছে। এই গ্যালারীর কর্ণধার শ্রীরবি জৈন অত্যন্ত আধুনিক মানসিকতায় গ্যালারীটি সাজিয়েছেন। ছবি দেখতে কোনও অসুবিধাই হয় না। প্রয়োজনে ১০।১৫ ফুট দূর থেকেও ছবি দেখা যায়। গ্যালারীর ফ্লোর একটু কম-কম লাগে। তবুও ছোটখাটো প্রদর্শনীর পক্ষে এক আদর্শ গ্যালারী এই ধূমিমাল।

এখানে যাঁদের প্রদর্শনী চলছে তার মধ্যে ভাল লাগে বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি। উনি প্যাস্টেলে করা মহিলার দুটি প্রতিকৃতি দিয়েছেন। বিষয়ের উপস্থাপনা বেশ রহস্যময়। বিকাশ ভট্টাচার্যের সব ছবির মধ্যেই কিরকম একটা মিস্টিক ভয় ভয় ব্যাপার আছে। দক্ষ হাতে শিল্পী ছবি দুটিকে গড়ে তুলেছেন। শিল্পকলা রসিক-দের ছবিগুলি ভীষণ ভাল লাগবে। বিকাশ ভট্টাচার্য ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীতে ছবি না দেওয়াতে ত্রিবার্ষিকের ভারতীয় বিভাগ যে প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এই কাজ দুটি দেখলে সেই কথাই সবার আগে মনে পড়ে। ওনার আরো বেশী ছবি এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাবো আশা করে-ছিলাম।

স্বামীনাথনের ছবির সম্পর্কে নতুন করে বলার মতো কিছুই নেই। ওনার ছবির বিষয়বস্তু সেই একই পাহাড়, একটি পাখী আর গাছ। খুবই সরলীকৃত ছবি। ওঁর যে কটা নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে আছে তার মধ্যে সবগুলোরই এই একই বিষয়বস্তু। যদিও কমপোজিশন অথবা উপস্থাপনা নতুন নতুন ভঙ্গিতে করা তবুও মাঝে মাঝে বড়ই একঘেয়ে লাগে। ওনার ছবির প্রফেশন্যাল দৃষ্টিভঙ্গি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিস্ময় এক হলেও ছবিকে একঘেয়ে হতে দেয় না। চলা বং ব্যবহারে উনি ছবি এঁকে থাকেন এবং জ্যামিতিক ভাবসাম্য তাঁর সব ক্যানভাসেই বর্তমান।

শান্তি দাস একজন নামকরা শিল্পী প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মানে উনি আগে

গোলাম শেখের ছবি রিটার্নিং হোম

ভূষিত হয়েছেন। ত্রিবার্ষিকের ছবির একঘেয়েমি এই প্রদর্শনীতেও লক্ষ করা যায়। একমাত্র ওনার করা উড্‌কাট্‌ একটু অন্য ধরনের। শিল্পী জমির টেকসচার নিয়ে খুবই ভাবেন। ওনার করা পেন্টিং-এর চাইতে উড্‌কাট্‌ অনেক উচ্চমানের বলে মনে হয়।

হিম্মত শা আধুনিক ভাস্কর্য যুগের রাজা রামমোহন। উনি কোনও কুসংস্কারকে মানেন না। হাই বিলিফে করা ওঁর ভাস্কর্য অত্যাধুনিক গঠন-কৌশলে পরিপূর্ণ। জ্যামিতিক আকৃতির থ্রি ডাইমেন্সনাল ফর্মকে উনি এমনভাবে উপস্থাপনা করে থাকেন যে ভাল লাগতে বাধ্য।

ওনার ভাস্কর্যের মানে খুঁজতে গেলে কিছুই পাওয়া যাবে না। দৃষ্টিগত রূপ নির্ণয়ের মানদণ্ডে বিচার করলে ওনার ভাস্কর্য ভীষণ ভাল লাগে।

সতীশ গুজরাল এখন ভারতের সবচাইতে মূল্যবান শিল্পী। উনি ভারতে দেয়ালচিত্রে অর্থাৎ ম্যুরালে নতুন যুগের প্রবর্তন করেছেন। অনেক শিল্পীই আজ ওনার ধরনে ম্যুরাল রচনা করে থাকেন।

ইনি এবারের আন্তর্জাতিক ত্রিবার্ষিকের একজন বিচারক ছিলেন। আজকাল আধুনিক কলাকৌশলে হাই রিলিফ ভাস্কর্য অথবা ম্যুরাল করে থাকেন। ফর্ম খুবই ডেকরেটিভ। কাঠ এনোডাইজড এলুমিনিয়ামে উনি কাজ করেন। শিল্পের নতুনতত্ত্ব উপলব্ধি করার পরও বলতে হয় এই শিল্প দর্শকদের দর্শনসুখের জন্য নির্মিত। বেশীরভাগ কাজই তিনি এনভাইরোনমেন্ট-এর গুণাগুণ বিচার করে করেন। অর্থাৎ যেখানে এই শিল্পদ্রব্যটি থাকবে তার আকৃতিক রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উনি হাই রিলিফ, সেরামিক অথবা অন্য মিডিয়ামে ম্যুরাল অথবা ভাস্কর্য করে থাকেন।

মানু পাবেথেক এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবি অসাধারণ। ত্রিবার্ষিকে ওনার ছবির চাইতে এখানে প্রদর্শিত ছবির উৎকর্ষ অনেক বেশী। স্পেস, ব্যালান্স ফর্ম এবং কমপোজিশন বিচার করে অত্যন্ত কম রং-এ ওনার করা দুটি কাজ দেখলে মন ভরে যায়।

কৃষণ খান্না সময়ে সময়ে ধারা পরিবর্তন করে আঁকতে ভালবাসেন। ধূমিমালে প্রদর্শিত কাজগুলি তাঁর আধুনিক পিরিয়ডের কাজ। বিশাল বিশাল ক্যানভাসে উনি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ছবির রিয়েলিস্টিক ফর্ম ভেঙ্গে স্কেচধর্মী ফর্ম-এ উপস্থাপিত করেছেন। জমিতে করা খয়েরী রং-এর ড্রাইং এর উপর পুরু সাদা রং-এর টুকরো টুকরো আস্তরণ দিয়ে ওঁর ছবি করা। ধরনটা যদিও বেশ নতুন ঠেকে তবুও হুসেনের কিছু ছবির ধরনের সঙ্গে কোথায় একটা মিল আছে এই ছবিগুলির। বলতে বাধা নেই ওনার তিনটে ছবিই দর্শকদের ভালো লাগে।

পরমজিৎ সিং-এর তিনটি ছবি প্রকৃতির পারিপার্শিক রূপকে নিয়ে করা। ওনার ছবিতে দেখা যায় বিশাল প্রান্তর পাহাড়, আকাশ, জল, ক্ষেত ইত্যাদি। কোনও মানুষ এনার ছবিতে স্থান পায় না। এই ছবি দেখলে নিজেকে কি রকম একা একা লাগে। ক্যানভাসকে কয়েকটি এঙ্গেলে ভেঙে উনি বাস্তবকে রূপ দেন। ওনার ছবির শান্তি এবং একাকীত্ব দর্শককে বিহ্বল করে দেয়।

কুমারস গ্যালারীর ছয়জন শিল্পীকে নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনীতে ধূমিমাল গ্যালারীর সেই প্রদর্শনীর মেদোহরী আবহাওয়া অনুপস্থিত। খাঁ-খাঁ করছে গ্যালারী। মনে হয় ভূতুড়ে বাড়িতে ঢুকছি। তবে ছবি দেখার পর মন ভরে যায় তখন আর অন্য কোনও খুঁত চোখে পড়ে না।

এখানে সমসাময়িক ছয় শিল্পীই ত্রিবার্ষিক প্রদর্শনীতে যোগদান না করে এই প্রদর্শনী করেছেন। শিল্প রাজনীতির শিকার এই ছয়জন শিল্পীর ছবি যদি ত্রিবার্ষিকে থাকতো, ভারতের মান হয়ত আরো কিছুটা বৃদ্ধি পেতো।

ভূপেন খাকারের ছবি ক্যালেন্ডারধর্মী হলেও শিল্পগুণে পরিপূর্ণ। নিজস্ব শৈলীর অতি সাধারণ বিষয়কে উনি অনেক উঁচু জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন। সেটাই এই শিল্পীর সবচাইতে বড় গুণ। এনার ছবি দেখলে একঘেয়ে লাগে না। নতুন বাস্তববাদী বিষয় নিয়ে ইনি ছবি করে থাকেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এনার ছবি আধুনিক সমাজব্যবস্থা এবং কাঠামোকে বিদ্রূপও করে থাকে। ওনার ছবি 'মানুষের হাতে প্লাস্টিকের ফুল' দেখে খুবই ভাল লাগে। মানুষের সুপ্ত, লুপ্তপ্রায় অনুভূতিগুলো, যেগুলো দিনে দিনে মৃতপ্রায় হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে তুলে ধরাই ভূপেন খাকারের উদ্দেশ্য।

রাশিয়ান আইকন্‌ এবং জিওত্তোর ম্যুরাল ওনাকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। ওঁর ছবিতে মূল বিষয়ের বক্তব্যকে সামনে বড় করে দেখিয়ে, আনুষঙ্গিক বিষয়-

বাহির হইল ! NOTES' ON বাহির হইল !

ভারতী সহায়িকা (প্রথম)

(Hindi 3rd Language)

IX & X

By K. K. Verma

আধুনিক পুস্তক প্রকাশন ৪০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি —৯

গুলি ক্যানভাসের দুধারে অলংকারের মতো ব্যবহার করেছেন। কোনও কোনও ছবিতে ক্যানভাসের ডিভিশন ওনার ছবিকে মুরালের পর্যায় নিয়ে যায়। ভূপেন থাকারের সব-চাইতে দুর্বল স্থান হচ্ছে ওনার রং লাগানোর কায়দা অ্যাকাডেমিক রীতি-নীতির বাইরে, ব্যানারধর্মী রং লাগানো মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু লাগে।

গুলাম শেখের ছবি ভারতীয় মিনিয়েচারের থেকে অনুপ্রাণিত। ওনার অনেক ছবির মাঝে 'রিটার্নিং হোম' ছবিটি সত্যিই ভাল লাগে। গ্রামে বন্ধ মার কাছে ছেলেরা দূর দেশ থেকে, দেবদূতের মতো সুসংবাদ বয়ে নিয়ে পাখির মতো উড়ে উড়ে ঘরে ফিরছে। ফিগারের গায়ে ভানা লাগিয়ে গুলাম শেখ আবেশ সৃষ্টি করেছেন। শিল্পী ভাবপ্রবণ। এনার সব ছবিই দর্শকদের কোথায় একটা মানসিক তৃপ্তি দেয়।

গিয়েভ প্যাটেল চারটি ছবি প্রদর্শন করেছেন। বিশালাকৃতির এইসব ক্যানভাসে ভারতীয় রং-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বার্নট্ সায়েনা টেরাভার্ট, কিংসমন, ভিরিডিয়ান ইত্যাদি রং-এ করা ছবিগুলি শুদ্ধ রং-এর প্রলেপে তৈরী। ছবির বিষয়ও অত্যন্ত সহজ সরল। একটা লোক মাথায় পাগড়ি পরে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। একধারে আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন ইলেকট্রিক পোল, যন্ত্র ইত্যাদি অন্যদিকে সবুজ মাঠ। আরেকটা ছবিতে একজন লোক আনাজপাতি বিক্রি করছে। গিয়েভ প্যাটেল ক্যানভাসের জায়গায় জায়গায় গাঢ় রং-এর পুরু জমি তৈরী করে কোথাও কোথাও একটা সাদা বা লাল রং-এর ফর্ম দিয়ে ছবির অলংকরণ করে থাকেন। গিয়েভের ছবি ঢ়ীষণ প্রাণবন্ত।

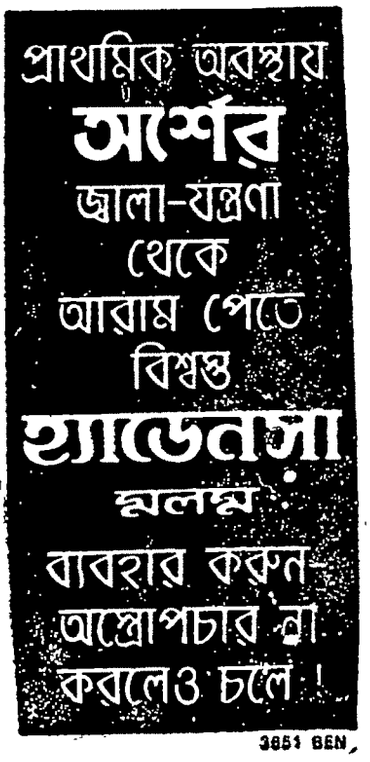

3851 BEN

হায়দরাবাদের লাক্ষ্মা গৌড় এক বলিষ্ঠ শিল্পী। ইনি এচিং-এ পারদর্শী। কিছুদিন আগেই লাক্ষ্মা সাও পাউলো বিয়েনালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। এনার ছবির বিষয় এবং উপ-স্থাপনাও ভীষণভাবে ভারতীয়। গ্রামের নারী পুরুষের ভালবাসার আদানপ্রদান, মিলন এইসবই হচ্ছে লাক্ষ্মার ছবির মূল বিষয়। এই প্রদর্শনীতে পুরোনো কতগুলো এচিং-এর সঙ্গে নতুন কতগুলো ড্রইং প্রদর্শিত হয়েছে। ড্রইংগুলো সিলভার পয়েন্টধর্মী। পেনসিলের সূক্ষ্ম স্ট্রোকের লালিত্যে করা এই ড্রইংগুলোই শিল্পরস-পিপাসু দর্শকদের বুঝিয়ে দেয় লাক্ষ্মা কত দক্ষ শিল্পী। আসামীদের অথবা কয়েদীদের নিয়ে করা এই ড্রইংগুলি বড়ই অদ্ভুত। কোথাও বা কয়েদীর বুকটা একটা বাক্সের মতো খোলা তার থেকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে অসংখ্য দড়ি বেরিয়ে আছে। জামায় পেরেক মারা, পাজামার মধ্যে দিয়ে পায়ের বদলে হাত বেরিয়ে আছে। এইসব ফ্যানটাসি ড্রইং-এর মধ্যে দিয়েই লাক্ষ্মা তার মনের ভাব দর্শকদের বোঝাতে চেয়েছেন। কোথাও বা একটা মানুষের দেহ থেকে চারটে হাত বেরিয়ে তার আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করছে।

ছায়াছবিতে যেমন 'অডিও-ভিসুয়াল' অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। ছবির মাঝে আগে তা কোনকালেই পাওয়া যায়নি। ছবি শুধুমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারাই এতকাল দেখা গিয়েছে। লাক্ষ্মার শিল্পী হিসেবে সার্থকতা এখানেই। তিনি এমন ছবি এঁকেছেন, যেটা শুধু চোখে দেখেই অনুভব করার নয়; ছবির বিষয়ের দুঃখ-দুর্দশা, জ্বালার কথাও সে দর্শকদের কানে কানে বলে যায়। দর্শককে ছবির সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ করে দেয়।

আজকের সমকালীন ভারতীয় চারুকলা জগৎ-এ আর একজনই মাত্র শিল্পী আছেন যিনি ছবিকে অডিও ভিসুয়াল এক্সপিরি-য়েন্সের পর্যায় নিয়ে যেতে পারেন অর্থাৎ ছবিকে কথা বলাতে পারেন। তিনি হলেন কলকাতার শিল্পী গনেশ পাইন। খুবই দুঃখের কথা যে এঁর ছবি আমরা এযাবৎ দিল্লিতে আয়োজিত কোনও প্রদর্শনীতেই দেখতে পাইনি। ইনি ত্রিবার্ষিকের নির্বাচনের খামখেয়ালীপনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে ছবি প্রদর্শন করেননি।

আজ অবধি আন্তর্জাতিক শিল্পের ইতিহাসে যতরকম 'ইজমের' সৃষ্টি হয়েছে তাতে আর একটা 'ইজম' জুড়ে এই দুই ভারতীয় শিল্পীকে (গনেশ পাইন এবং লাক্ষ্মা গৌড) 'অডিওভিজুয়ালিস্ট' এবং এঁদের শিল্পকে 'অডিওভিজুয়ালিজম্' আখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যায়।

মৃণালিনী মুখোপাধ্যায় প্রখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। উনি দড়ির বাঁধনে 'ম্যাক্রাম' এবং ভাস্কর্য তৈরী করে থাকেন। ভারতের অন্য কোনো শিল্পী আজ অবধি বোধহয় এই ধরনের নতুন মিডিয়ামে কাজ করেন নি।

মৃণালিনী মুখোপাধ্যায়ের 'স্কাল্পচার' এক বিশাল গিরগিটির আকৃতিতে গড়া ভাস্কর্য। দড়ি দিয়ে বুনে বুনে উনি এত সুন্দর আকৃতি কি করে তৈরী করলেন সেটাই ভাবতে অবাক লাগে।

'ম্যাক্রাম' করা খুবই কষ্ট, পরিশ্রম এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। মৃণালিনী ওনার শিল্প সৃষ্টিতে অদ্বিতীয় এই কথা কটি বলা ছাড়া ওনার কাজের সমালোচনা করা যায় না।

ভিভান সুন্দরম রং-এ কালার ইলুশন তৈরী করেন। ওনার করা 'কাট আউট' ইত্যাদি বড়ই পপ্ পোস্টারের মতো লাগে। ছবির মধ্যে ছন্দ পুরোমাত্রায় বজায় থাকলেও ফর্ম বেশ দুর্বল। বিপরীত ধর্মী বা কনট্রাস্ট রঙ ব্যবহার করে ইনি র'-এর ছন্দ গড়ে গেলেন। যথা, চড়া লালের ওপর সবুজের গতিময় সর্পিল রেখার আবরণ ওনার ছবিতে আরো জাজ্বল্যমান করে তোলে।

ভিভানের করা সব ছবি দেখলেই মনে হয় একটা জানালার ভাঙা কাঁচের মধ্যে থেকে দেখা। ভাঙা কাঁচের গড়নগুলোই ওনার ছবির মূল বক্তব্য।

কুমারস গ্যালারীর প্রদর্শনী দেখলে আধুনিক সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পের সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা তৈরী হয়।

সমস্ত প্রদর্শনী ঘুরে দেখার পর ত্রিবার্ষিকের ভারতীয় বিভাগের কথা বার বার মনে পড়ে এবং মনে একটাই ক্ষোভ থেকে যায়। একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে লজ্জিত হই এই ভেবে যে, এতবড় একটা প্রদর্শনী গুটি কয়েক মহাবিকল্প শালী, স্বার্থান্বেষী, সুযোগ সন্ধানী কিছু শিল্পীর আপন খেয়াল বা স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ভারতের কিছু রত্নকে (গণেশ পাইন, সনৎ কর, বিকাশ ভট্টাচার্য, পরমজিত সিং লাক্ষ্মা গৌড়, গিয়েভ প্যাটেল, গোলাম শেখ, ভূপেন থাকর, মৃণালিনী মুখোপাধ্যায়) বিশ্বের দরবারে আমরা উপস্থিত করতে পারলাম না।

ললিতকলার অন্তর্কলহের ফলে আরও একবার প্রমাণিত হলো শিল্প ক্ষেত্রে ভারতের মতো শিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধশালী (অজন্তা, ইলোরা, খাজুরাহো, ভারতীয় মিনিয়েচার) দেশও তার নিজস্ব শিল্পকর্ম প্রদর্শনে কতো দীনদরিদ্র হতে পারে। কিছু সুযোগসন্ধানীদের জন্য আমরা আজ সারা বিশ্বের কাছে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর হোতা হিসাবে হাস্যাস্পদ হলাম।

এটাই কি কাম্য ছিল ?

এই লেখার জন্য ছবি, ক্যাটালগ ইত্যাদি দিয়ে লিখতে সাহায্য করেছেন ধূমিমাল গ্যালারির কর্ণধার শ্রীবীরেন্দ্র জৈন, শিল্পী শ্রীবীভান সুন্দরম, কুমারস গ্যালারির জনৈকা মহিলা তত্ত্বাবধায়ক এবং শিল্পী বন্ধু সুস্মিতা মজুমদার। এনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

—লেখক

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

দীপু শব্দ করে হাসতে পারে না। একটানা হাসিও আসে না তার। মাঝে মাঝে হাসে, মাঝে মাঝে কথা বলে। চোখ মুখ অভিনেতাব মত গোল গোল হয়ে যায় উত্তেজিত মুহূর্তে। বলল, সকালে সুধাংশুবাবুই ক্ষেপে গিয়েছিলেন বেশি। মশাই, আপনাদেব সঙ্গে আমবা কি শত্রুতা করেছিলাম ? একখানা ঘর চেয়েছিলাম এই তো অপবাধ ? জেনে-শুনে ওই রকম একজন ভদ্রলোককে আমাদের ঘরে পাঠালেন ?

আমরা তো সব বুঝেছি, মনে মনে হাসছি। কিন্তু যেন কিছুই জানি না, এমনি ভাব করে বললাম, কেন বলুন তো ? গোপুদা তো অত্যন্ত ভাল লোক।

সুধাংশুবাবু বললেন, ভালো লোক কিনা জানি না মশাই। তবে আমরা রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। ওঃ, বাঘের ডাককেও হার মানায়, এমনি নাকের ডাক। খুব লোককে পাঠিয়েছিলেন আমাদের ঘরে।

দেবুটা তো ভীষণ শয়তান। ভালো-মানুষের মত বলল, কই আমাদের তো কখনো সেরকম মনে হয়নি। তাহলে বোধহয় গোপুদার কাল খুব খিদে পেয়েছিল। শুনেছি খিদে পেলে নাক বেশি ডাকে। আমাদের তো শুধু আলুর তরকারী আর ভাত। গোপুদা বেচারা একটু ভালমন্দ খেতে ভালবাসে।

হাসির চোটে সকলের চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কিছুতে আর থামতে চায় না হাসি। চোখ মুছতে থাকল কানু আর আশু।

হাসির আওয়াজে ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সর্দারজী আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসেছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছিলেন এদিকে। গোপু বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। এবারে বাইরের দিকে তাকাও। দেখুন রায়দা, এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত অলকানন্দা গর্জ। পঞ্চাশ মাইল মত একটানা এই গর্জ চলে গেছে অলকানন্দার স্টর্তীয় ধরে।

খাড়া সুউচ্চ গিরিখাত নদীর রেখা ধরে চলে গেছে একটানা। উজ্জ্বল সেই পাথরের চাঁচাছোলা রূপ দেখলে ভয় লাগে। কত যুগ, কত লেপ সেই পাহাড়ের দেওয়ালের। মনে হয় ছেনি দিয়ে কেউ কেটেছে পাহাড়ের গা।

সর্দারজী সকলকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ইংরেজিতে। কি দেখছেন আপনারা ?

সকলের দৃষ্টি ফিরে গেল সেদিকে। তারপর তাকালো সকলে অনন্তর দিকে। চোখ টিপে ইসারা করল আশু, উত্তর দিতে বলল তাদের হয়ে।

ইংরেজিতেই জবাব দিল অনন্ত। যা শুনেছিল গোপুর কাছে, তাই জানালো। গোপু যোগ করল, ইউ হ্যাভ রেড এ্যাবাউট গ্রান্ড ক্যানিয়ন অন দি কলোরেডো বিভার ইন এ্যামেরিকা। দিস্ গর্জ ক্যান ওনলি বি কমপেয়ার্ড উইথ দ্যাট গর্জ।

সর্দারজী ভাল বুঝল কিনা কে জানে। তবে ঘাড় নাড়ল বুদ্ধিমানের মত। ওই পরিবারটির সঙ্গে এই সূত্রে সন্ধি স্থাপিত হয়ে গেল বলে খুশিই হল সবাই।

পিণ্ডার নদ আর অলকানন্দার সঙ্গমের ওপারে আর একটি তীর্থক্ষেত্র, কর্ণপ্রয়াগ। কানু বলল, আপনাকে তখন যে রূপকুণ্ডের কথা বললাম, পরে একসময়ে ডিটেলস বলব, সেই রূপকুণ্ডের পথে পড়ে গোয়ালদাম। ওখান থেকে ত্রিশূল পর্বত খুব কাছে। পিণ্ডার নদী সেইখান থেকে এসে মিশেছে এইখানে অলকানন্দায়।

বেলা পাঁচটা বেজে গেছে। সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। একটু শীত শীত ভাব লাগছিল সকলের। বাস থেকে নেমে, চা খাওয়া যায় কিনা তারই চেষ্টা করছিল কানু। হঠাৎ দীপু ডাক দিয়ে বলল, কানু যাস না, শোন, ওরা আজ আর যাবে না বলছে!

তার মানে ? বিস্মিত হয়ে ছুটে এল কানু। এখনো যথেষ্ট বেলা রয়েছে। অনায়াসে চামৌলী পৌঁছুতে পারে।

কন্ডাকটার আর ড্রাইভারের চারপাশে সব প্যাসেঞ্জার ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভার জানালো, এরপর রাস্তা খারাপ। আলো কমে গেছে। চামৌলী পৌঁছুতে বেশ অন্ধকার হয়ে আসবে। তখন বাস চালানো সম্ভব হবে না। এ্যাকসিডেন্ট হবার ভয় আছে। এর পরে চামৌলীর আগে, আর কোন ভাল থাকার জায়গা নেই। কাজেই এখানে ওরা নাইট হল্ট দিচ্ছে।

সর্দারজী দীপুদের জিজ্ঞাসা করল, কি বলছে ওরা ?

দীপু বেশ রাগ করেই বলল, ওরা আজ আর গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাবে না। এখানেই থাকতে হবে। তার মানে আমাদের যোশীমঠ পৌঁছুতে কাল বেলা এগারটার আগে নয়। তখন পৌঁছে মিলিসপত্র রেখে, এস-ডি-ও অফিসে গিয়ে ধর্না দিতে কম করেও সাড়ে বারোটা একটা। কখন থাওয়া-দাওয়া হবে, কখন পোর্টার ঠিক করা হবে—কি একটা ঝামেলে ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল।

দীপু কথাগুলো বাংলাতেই বলছিল। বলছিল তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে। সর্দারজী না বুঝতে পেরে তাকিয়ে আছে দেখে অনন্ত ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল, শ্রীনগরে গাড়ি কেল করেছিল সর্দারজী। তাই পরের ট্রিপ-এ আসার ফল ভুগতে হচ্ছে সকলকে। এদের একটা পুরো দিন নষ্ট হল। বিদেশে একটা দিন মস্তবড় একটা ফ্যাক্টার।

সর্দারজী বলল, আমি খুব দুঃখিত। কিন্তু কি করব বল। আমার মেয়ে কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তোমরা দেখেছ। তাকে ডাক্তার দেখানোটা নিশ্চয়ই তোমরা অন্যায় বলবে না।

আশু বলল, দীপু, প্যাঁচে পড়ে গেছিল বাবা। আর গণ্ডগোল করিসনে। যা হবার হবে বলে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করা যাক।

সে ব্যবস্থা করতে পাঠিয়ে দিয়েছিল দীপু। পানু আর গোপু একটু পরেই এসে সংবাদ দিল, ফার্স্টক্লাস ঘর পেয়ে গেছি। চল চল, মালপত্র নিয়ে চল তাড়াতাড়ি।

দীপু বলল, কোথায় ? কোন্ মুলুকে ঘর ঠিক করে এলে ?

পানু বলল, দে-দেদ-দেখবি। বিউটি-ফুল ঘর। একেবারে নদীর ওপরে। বেশ বড় ঘর। মাত্র দু-দু-দুটাকা ভাড়া।

গোপু বলল, এক মিনিটের রাস্তা। ওই যে সাদা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওর পাশেই চল না, দেখে আসবে।

চিন্তান্বিত মুখে দীপু বলল, মালপত্র আগে নামানো হোক। তারপরে যাচ্ছি। তোমরা যুক্ত করে এসেছ তো ?

না, তা করিনি। ঝিক আছে। তোমরা মালপত্র নামানোর ব্যবস্থা করো। আমি কানুকে নিয়ে যাচ্ছি। পছন্দ হলে একেবারে টাকা দিয়ে বুক করে আসা যাবে।

ঠিক পিণ্ডার নদীর ওপরে, পাহাড়ের চাতালে একতলা বাড়িটি, খান দুই বড় ঘর, একটা ছোট মত বারান্দা এবং একধারে রান্না করার জায়গা। তাছাড়া একপাশে একটি ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম মত জায়গা, তবে মাথার ওপরটা খোলা। দু টাকা দৈনিক ভাড়ার পক্ষে সুন্দর বাড়ি। জিনিসপত্র বড় ঘরটার এক কোণে সাজিয়ে রাখার পরও অনায়াসে জনা আষ্টেক লোক হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারে দেখা গেল। ঠিক হল, আপাততঃ চা খেয়ে আসা যাক, আর রাতের খাবার জায়গা ঠিক করে আসা যাক। সম্ভব হলে যাতে দোকান থেকে খাবার পৌঁছে দেয়, সেই ব্যবস্থা যেন করে আসা হয়। অনন্ত গোপু আর কানু সেই দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাসটা এরই মধ্যে সরিয়ে নিয়ে গেছে ড্রাইভার। একটু এগিয়ে বিরাট একটা পাকুড় গাছের নিচে রেখেছে ওরা বাসটাকে। গোপু বলল, কানু, কাল ভোর বেলা যাতে বাসটা এসে আমাদের বাসার কাছে দাঁড়ায়, সেই ব্যবস্থাটা করবে চল। তাহলে মালপত্র বেশি দূরে টানাটানি করতে হবে না।

পাকুর গাছের নিচে পাঞ্জাবীদের কিশোর ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরস মুখে নখ খুঁটছিল। গোপু গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমারা পিতাজী মাতাজি কাঁহা গিয়া?

কানু নিচু গলায় বলল, আর একজনের কথা উহ্য রাখলে বুঝি?

গোপু বলল, সে খবর তো আমাদের জীভার নেবে।

ছেলেটি আঙুল দিয়ে দেখাল, একটা খাবারের দোকানের কাছে হোল্ডল, স্যুটকেশ এবং অন্যান্য যাবতীয় জিনিসপত্র রেখে দাঁড়িয়ে আছেন সর্দারজী, তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে। নেহাৎ অকুলীন খাবারের দোকান। ভাল কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হল না।

ওদের দেখে সর্দারজী জিজ্ঞাসা করলেন অনন্তকে, কোথায় ওরা থাকছে রাত্রে।

অনন্ত জানিয়ে দিল তাদের থাকার ব্যবস্থার কথা।

সর্দারজী খুব বিমর্ষভাবে বললেন, এখানে থাকার মত জায়গা বিশেষ নেই। যাত্রী-শালা আছে, সেখানে এরই মধ্যে প্রচুর যাত্রী গিয়ে উঠেছে। তাছাড়া সেখানে মেয়েদের নিয়ে ওঠার অসুবিধে আছে। বাসওয়ালাকে বলেছে রাত্রে বাসে থাকতে দেবার জন্যে। রাজি হয়নি তারা। বুঝতে পারছেন না কি করবেন।

গোপু কানুকে বলল, ওনারা তো আমাদের ও-পাশের ঘরটায় থাকতে পারেন। আমার মনে হয়, ওঁদের ফুলিয়ে যাবে।

কানু বলল, আমরা সে অফার দিতে পারি না। দীপু, আশু এদেরও জিজ্ঞাসা করা উচিত।

গোপু বলল, তাহলে সেকথাই ওঁকে বলুন না রায়দা? যদি দীপুরা আপত্তি না করে আর ওঁদের পছন্দ হয়, থাকতে পারেন। অসুবিধেয় পড়েছেন ভদ্রলোক, সঙ্গে মেয়ে-ছেলে।

অনন্ত কানুর দিকে তাকালো। ভেবে নিয়ে কানু বলল, বলুন আপনি। তবে বলে দেবেন, জায়গা দেবার ব্যাপারে আমাদের কথাই ফাইনাল নয়।

অনন্তর প্রস্তাব শুনে ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর এসে বললেন, দেখে আসা যাক, কেমন ঘর, থাকার ব্যবস্থা কি রকম।

কানু বলল, গোপু, তাহলে তুমি এবার পবিত্র কর্তব্য করোগে যাও। আমি আর রায়দা এখানে বইলাম। ছোট জায়গা, ফিরে এসে আমাদের খুঁজে নিও।

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বোধহয় একেই বলে। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়েছে বড় ঘরের মেঝেয় ম্যাট্রেস ফুলিয়ে। অনন্ত শুধু কম্বল পেতে শুয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে উজ্জ্বল একটা তারার আলো আর মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। গায়ে একটা চাদর দিলে আরাম লাগে। খুব ঝরঝরে লাগছে শরীরটা।

এতক্ষণ খুব হাসাহাসি করছিল ছেলেরা। ও-পাশের ঘরে পাঞ্জাবী পরিবার ঠাঁই নিয়েছে। হাসাহাসির লক্ষ্য ওদের তরুণী মেয়েটি। গোপু বলছিল আমি ঠিক জানি, এমন একটা প্রস্তাব আমাদের জীভার সানন্দে লুফে নেবে। বলা যায় না, আমি ব্যবস্থা করে দিলাম বলে হয়তো আমাকে খাইয়ে দেবে। কানু সন্দেহ প্রকাশ করছিল—

দীপু মস্ত একটা মোটা বাতি জ্বালিয়েছে। কানু তার হিসেবের খাতা আর দীপু তার ডায়েরী নিয়ে লিখছে বাতির আলোয়। গোপুর কথায় রাগ করে দীপু বলল, খাওয়াবে তোমাকে। ভদ্রলোক আমাদের একটা পুরোদিন লোকসান করে দিল—

আশু বলল, তাতে কি হয়েছে, তার মেয়ে তো আর দেয়নি। আর দিতই যদি, সেটা কি লোকসান হত? বলুন রায়দা?

পানু বলল, ভাইপো, তুমি অ-অ-অ-অশাসকৃতি আশ্রম করবে, আর তোমার মুখে এ-এ-এইরকম কথা?

গম্ভীর হয়ে আশু বলল, অশসকৃতি আশ্রমে যেতে হলে এইসব আসকৃতি, প্রলোভন সব পেরিয়ে যেতে হবে, বুঝলে খুড়োমশাই?

কানু বলল, দীপু, তুই এই জানলার ধারে বসে একটা গান ধর। ওদিকে জানলা থেকে তার উত্তর আসবে আর একটা গানে। হিন্দি সিনেমা হয়ে যাক একটা।

দীপু বলল, আর তোরা শালারা কি করবি? নাচবি?

অনন্তর চোখ জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। উজ্জ্বল তারাটা ঠিক চোখের সামনে। এমন পরিষ্কার আকাশ, তারায় এত উজ্জ্বল আলো, কোনদিন দেখার সুযোগ হবনি। পিণ্ডার নদ অলকানন্দার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ঠিক মনস্থির করতে পারছে না যেন। মনের যত স্বপ্ন প্রকাশ করছে একটানা কলতানে। কানুর মাথার ছায়া কাঁপছে দেওয়ালে। বাতাসে প্রদীপ শিখা এক-একবার নিবু নিবু হয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হচ্ছে দীপু। জানলাটা বন্ধ করে দে কানু। কানু আপত্তি জানাচ্ছে, না, সুন্দর বাতাস আসছে।

ঘুম ঘুম মাথায় অনন্তর মনে হল, লিলি যেন বসে আছে তার পাশে। ভরা গঙ্গা গম্ভীর কলতানে বয়ে যাচ্ছে ভাঙা চোরা কেল্লাটার নিচে দিয়ে। সাপ খোপ থাকতে পারে। একটা রাখাল ছেলে একটু আগে সাপের ভয় দেখিয়ে গেছে। কিন্তু আজকের এই শ্রাবণ সংক্রান্তিতে, তাদের বিয়ের বাৎসরিক উদ্‌যাপন করতে ভাষমণ্ডহারবার এসে সাপের ভয়ে যদি পাসের বুকে লম্বা হয়ে শুয়ে মাথাটা বসে থাকা লিলির কোলে রাখা না যায়, তবে তো সব আনন্দটাই মাটি। খুব ইচ্ছে হচ্ছে, লিলি যেন তার চুলে বিলি কেটে দেয়। কিন্তু লিলি শুধু নিজের মনে গান গাইছে একটানা করুণ সুরে। তার কথা বোঝা যাচ্ছে না। সুরটা চেনা বলে মনে হয় না, শুধু অনুভব করতে পারছে। লিলির বুকে দুঃখের বাষ্প ঠেলে পাকিয়ে উঠেছে। এখুনি ঝর ঝর করে জল নামবে ওর দুচোখ দিয়ে। টপ্ টপ্ করে পড়বে কল্যাণের মুখে, বুকে। সেই প্রত্যাশা নিয়েই যেন অপেক্ষা করে আছে কল্যাণ কতক্ষণ ধরে। মনে হল, লিলি যেন বুঝতে পেরেছে তার নির্বোধ প্রত্যাশা। লিলির চোখের জল তার মুখে কবে পড়বে, এই সুমিষ্ট, গোপন আকাঙ্ক্ষা। তাই হাসছে লিলি মনে মনে।

হঠাৎ কল্যাণের মনে হল, লিলি বোধহয় অপেক্ষা করে আছে কারো জন্যে। তাই কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকা কল্যাণের জন্যে ওর মনে কোন গভীর অনুভূতি নেই। ছোট

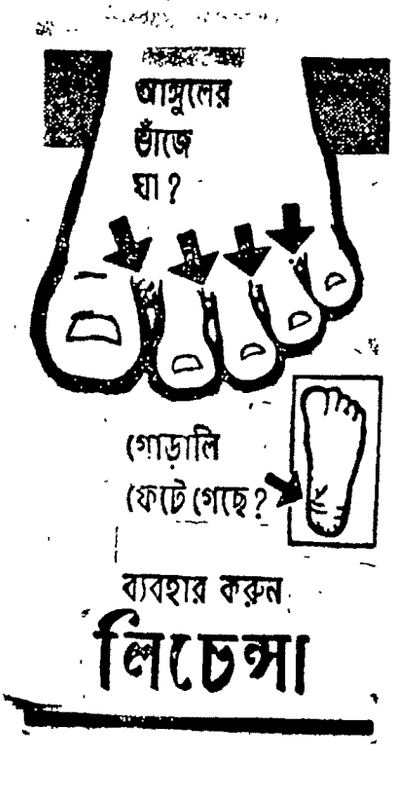

একজন মোটর বোট নিয়ে পাশের ঝোপটার আড়ালে অপেক্ষা করে আছে। সেই বোটের আওয়াজ গঙ্গার ধোলা হাওয়ায় এক-একবার জোর হয়ে উঠছে, এক-একবার মৃদু হয়ে যাচ্ছে। শুধু কণাদ কতক্ষণে ঘুমে অচেতন হয়ে যাবে, তারই অপেক্ষা করে আছে লিলি। তারপর সংকেত জানাবে সেই মোটর বোটের আরোহীকে। কণাদ যেন দেখতে পাচ্ছে, জোপের পাশ থেকে, মোটর বোটের সংকীর্ণ পাটাতনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা চওড়া ব্যক্তি। নাক-মুখ-চোখে কেমন বিজাতীয় উগ্রতা। লোকটি খুব চেনা। অনেকটা প্ল্যানিং একসিকিকটিভ সহদেব কৌশলের মত দেখতে। ইসারা করছে লোকটা লিলিকে। লিলি খুব দোটানায় পড়েছে, বুঝতে পারছে কণাদ। ওর মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দিতে সাহস পাচ্ছে না লিলি। যদি জেগে ওঠে কণাদ? খুব অস্থির হয়ে উঠছে লিলি। তার মনে ভয় হয়েছে, কৌশল হয়তো মোটর বোট নিয়ে চলে যাবে। কি করবে কণাদ? ঘুমের ভাণ করে মাথাটা নামিয়ে নেবে লিলির কোল থেকে? ওকে এই দোটানার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে? খুব জোর হয়ে উঠল মোটর বোটের গর্জন। ভয়ানক দুঃখিত মনে লিলির কোল থেকে মাথাটা গড়িয়ে দিল কণাদ ঘাসের ওপরে। ঘাসগুলো শুকিয়ে গেছে। বড্ড ফুটল সেই শুকনো ঘাস তার কপালে। লিলি চলে যাচ্ছে মোটর বোটে করে। তার কোমরটা আলতো-ভাবে জড়িয়ে ধরেছে সহদেব কৌশল। বিকৃত গলায় চিৎকার করতে চাইল কণাদ, লিলি, যেও না, লিলি ফিরে এস, লিলি—

অনন্তর গা ধরে নাড়া দিল কানু। রায়দা, রায়দা, ঠিক হয়ে শোন।

কানুর হাতে টর্চের আলো। ঘুম ভেঙে কি রকম বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল অনন্ত। কানু বলছিল, ওদিকে গোপু নাক ডাকাচ্ছে, এদিকে আপনি গোসাচ্ছেন, আমরা কোথা যাই বলুন তো?

ফোলানো বালিশ থেকে অনন্তর মাথা কন্ধুয়ের ওপরে পড়ে গিয়েছিল। ভাল করে শুয়ে হাত ঘড়ি দেখল সে। কানু বলল, সবে দেড়টা বাজে। এখনো চার ঘন্টা ঘুমোতে পারেন। সকাল ছটার আগে বাস ছাড়বে না। টর্চ নিভিয়ে দিল সে।

চার ঘন্টা কাটাতে হবে এইভাবে চুপ-চাপ শুয়ে? ঘুম আর আসবে না চোখে। এরকম মনের অবস্থায় ঘুম আসতে পারে না। উত্তপ্ত মাথায় একই চিন্তা ঘুরে ফিরে আসবে। উঃ, মনে মনে কাতরে উঠল অনন্ত। কি কঠিন শাস্তি!

কেন তার এই কষ্টভোগ। মনে মনে বিচার করতে চাইল সে। কি তার অপরাধ যে এমন করে বিনিদ্র রাত কাটাতে হবে তাকে সারাজীবন? এই রকম মানসিক অবস্থার জন্যেই কি নেশার বশীভূত হয়ে যায় মানুষ? সেও কি তবে সর্বস্বান্ত জুয়াড়ী কিম্বা মাতাল হয়ে কাটাবে বাকি জীবনটা? না, তা কখনো হতে পারে না। নিজেকে সে ভালবাসে। আপন ব্যক্তিত্বকে ধুলোয় লুণ্ঠিত করার মত দুর্বল মানসিকতা সে বরদাস্ত করতে পারে না। হতে পারে সে যে পরিবেশে জীবন কাটায়, যারা তার নিত্যসঙ্গী, সেই সব কিছুই চরিত্রগত দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়। তবু সকলের সঙ্গে সমানে তাল মিলিয়ে চললেও নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিতে পারবে না সে কিছুতে। তাকে ঘুমোতে হবে। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে। বেঁচে থাকতে হবে প্রত্যাশা নিয়ে। সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের কোন চিহ্ন কি দেখা যাচ্ছে কোথাও? কোথাও কোন আলোর ইসারা নেই। নিটুট্ অন্ধকার চারদিকে। কিন্তু এ অন্ধকার তো চিরস্থায়ী হতে পারে না। এক সময়ে না একসময়ে ফিকে হয়ে যাবে অন্ধকার। আসবে ঊষা নতুন সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা নিয়ে। তার জন্যে সুস্থ মনে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে জেগে থাকতে হবে। অধীর উত্তেজনায় ছটফট করলে কোন অন্ধ গহ্বরে তলিয়ে যাবে, কে বলতে পারে? সুতরাং যত কষ্ট হয়, সহ্য করে যাও কণাদ। অনন্ত তোমাকে সহনীয় জীবন যাপনে সাহায্য করবে, যতদিন না নিজের অন্তরে সান্ত্বনা আর শান্তি খুঁজে পাও তুমি। চেষ্টা করো ঘুমোতে। চেষ্টা করো ভুলে যেতে অতীতের দুঃসহ স্মৃতি। আগামী কাল নতুন দিনের আলোয় নতুন বিস্ময় তোমার মনের সামনে মেলে ধরবে নিজেকে।

আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অনন্ত। ঘুম ভাঙল কানুর ডাকে। উঠুন রায়দা, পাঁচটা বেজে গেছে।

আর সকলেই ঘুমোচ্ছে। জানলা দিয়ে ভোরের আবছা আলো এসে ঘরের অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। অবশ্য ঘুম জড়ানো গলায় বলল, কেন রায়দার ঘুম ভাঙাচ্ছিস?

কানু বলল, তবে কার ঘুম ভাঙাবো বলো? তোমাদের কারো ঘুম ভাঙালে তো সকলে মার মার করে উঠবে। বাবদা নিরীহ ব্যক্তি। কিছু বলবেন না। তাই ওঁকেই ডেকে তুলতে হল। বাইরে যেতে হবে। দেখতে হবে চা পাওয়া যাবে কিনা। একা একা আমি বাইরে যাব ভেবেছ?

হৃষিকেশ সহরে এই রকম ভোরে বাস ছেড়েছিল। এখানেও ভোরের আলোয় বেরিয়ে এসেছে বাইরে। মনে মনে তুলনা করছিল অনন্ত, এখানের ভোরে বেশ একটা পবিত্র ভাব রয়েছে। আনকোরা পাটভাঙা ধুতি পরে ছোটবেলায় পুজো দেখতে যেতে যেমন শুচি স্নিগ্ধ পবিত্রতার আস্বাদ পাওয়া যেত, এই ভোরের আকাশ, বাতাস, পিস্তার নদীর স্রোতের ধারা, সব মিলিয়ে তেমনি একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে মনে। কণাদ কোনদিন ভোর দেখে না। সপ্তাহে একদিন বাজার করে। বাড়িতে ডাইনিং হলে ফ্রিজ আছে। মাছ-মাংস-ডিমতো বটেই, আলু-পেঁয়াজ-আদা, এমনকি ঝিঙে-পটল-উচ্ছে-লেবু, সবই থাকে ফ্রিজে। সাড়ে সাতটা নাগাদ বিছানা ছাড়ে কণাদ। চা খায় আটটায়। তারপর শেভ করে স্নান করে খেতে বসে পৌনে নটায়। সওয়া নটায় অফিসের গাড়ি আসে দশ নম্বর বাস ডিপোর কাছে। একেবারে ছকে বাঁধা জীবন। রবিবারে একটু বেশি সময় পড়ে থাকে বিছানায়। মাঝে মাঝে আগে আগে ঘুম যে ভাঙে না তা নয়। তখন আবার চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শোয়। কি হবে অত সকালে উঠে? কি কাজ আছে সকালে? খবরের কাগজ যে ছোকরা দেয়, সেও লেট্ কামার। সাড়ে ছটার আগে কাগজ দেয় না। অবশ্য কাগজে মন দিয়ে পড়তে পারে না কখনো। কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে লিলি। যত ফ্যাসানের প্যারেডের খবর, যত সিনেমার খবর, হাবি-জাবি সব খবর পড়তে ভালবাসে লিলি। আর ভালবাসে ডিটেকটিভ বই কিম্বা থ্রিলার পড়তে। অফিস লাইব্রেরীতে আয়ান ফ্লেমিং, হেডলে চেজ, এ্যালস্টেয়ার ম্যাকলীন যা ছিল, সব পড়া হয়ে গেছে।' চৌরঙ্গীর একটা বুক স্টল থেকে ধারে বই নিয়ে আসে ইদানিং। পঞ্চাশ পয়সা করে ভাড়া দেয় বই পিছু। জমা রাখে দশ টাকা।' মাঝে মাঝে দু-একখানা নিষিদ্ধ বইও আনে বলে সন্দেহ হয়েছে। কারণ রাত জেগে বই পড়ার পর পাতা খুলে বেপেই কোন রকমে বেড সুইচ অফ করে ঘুমিয়ে পড়ে লিলি। সকালে সে বই পড়ে থাকে মাথার বালিশের পাশে। যেদিন থাকে না, সেদিন বুঝতে পারে কণাদ, পোর্নোগ্রাফী পড়ছে লিলি। মাথার বালিশের নিচে ওই রকম একখানা বই পেয়েছিল সে একদিন। কি দরকার? প্রশ্ন করেছিল সে লিলিকে। ওই সব বই ভাড়া নেওয়া মানে ওই সব থার্ডক্লাশ বইদের স্টলের ডেস্ডারের কাছে খেলো হওয়া। ওতে কি নতুন কোন স্বাদ পাওয়া যায়? একখানা ওই জাতীয় বই পড়লেই তো সব বই পড়া হয়ে যায়। উত্তর দেয়নি লিলি। মুখ লাল করে চুপ করে থেকেছিল। তারপর থেকে আরও সতর্ক হয়ে গেছে। ওই সব বই রাত্রে আর পড়ে না। দুপুরের অখণ্ড অবসরে হয়তো বসিয়ে বসিয়ে পড়ে।

ক্রমশঃ

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

।। ষোল ।।

সন্ধ্যের দিকে একা একা ঘুরতে ঘুরতে দিলীপ বসু হাজরার মোড়ে চলে এলো। হাঁটতে ভারি সুন্দর লাগে। হাত পায়ে যেন জং ধরে ছিলো এতদিন। চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে স্প্রেগনাল্ট মেয়েরা রাস্তা দেখছিল। ভবানীপুর থানায় গায়ের রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট গাড়িগুলো।

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলেরা আশুতোষ কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে গেটমিটিং করছে। আমি ওখান থেকেই গ্র্যাজুয়েট। এখন আমি মধ্যবয়সী গৃহস্থ। মুন্ডুটার ওজন অন্তত পনেরো কে-জি। বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ। শরীরে যেখানে হাত রাখি—সেখানেই থক থক করছে মাংস।

পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট নিতে গিয়ে দিলীপ দেখলো, তার ভ্রু বলতে আর কিছু নেই। একদম মুছে গেছে। চোয়ালের দু ধারে দুই থাবলা চর্বি। চোখে কোন আলো নেই। এ কোন্ দিলীপের মুখ?

এই মুখখানা একসময় তার বন্ধুদের হাসাতো। বান্ধবীদের চোখে আলো এনে দিতো। শরীরটা এখন তার বোঝা লাগে। আগে এই শরীরটাই ছিল স্প্রিং।

হাঁটতে হাঁটতেই কালিকা সিনেমার সামনে স্কুলজীবনের ক্লাশফ্রেন্ড—এখন মোটা ডিভিজিটের ডাক্তার—বংশীর কাছে গেল।

বংশী সবদেখেশুনে বললো, তোর তো আইয়োডিন দরকার শরীরে। একদম কোন সিকিশন নেই। থাইরয়েড্ গ্ল্যান্ডের গণ্ডগোল। তোর খুব বেশি করে হাঁটা দরকার।

এ রোগের কারণটা কি বলতো?

কারণ? অনেক কিছুই হতে পারে।

যেমন?

টেনশন।

সিমটম্?

জেনে কি করবি দিলীপ! শরীর থাকলেই রোগ থাকবে।

তবু এ-রোগের গোলমালটা কি?

খিদে পাবে খুব। আস্তে আস্তে কিডনি, লিভার—সব জখম করবে।

তাই নাকি?

শেষে হার্টকে টনিক দেবে দিলীপ।

কিভাবে?

তোর ওজন বাড়তেই থাকবে।' অলস লাগবে শরীরটা। যা খাবি—তাই হজম।

তাহলে তো ভালোই।

ওটাই খারাপ দিলীপ। তুই প্রোটিন ওরোডিন টেস্ট করা আগে। ওজন বাড়তেই থাকবে। তোকে রিল্যাকস্‌ড্‌ থাকতে হবে। তাহলে টেনশন তোকে ছুঁতে পারবে না। এক ফাঁকে সমুদ্রের তীরে ঘুরে আয়। প্রচুর আয়োডিন সমুদ্রের মাছে। ম্যাকারেল মাছ ভাজা খাবি। তাহলেই সেরে যাবি।

বংশী ডাক্তারের চেম্বারে কেওড়াতলা কিমোটেরিয়ামের উজ্জ্বল মার্কারি আলো। এ আলোতে পোকা পর্যন্ত চকচকে লাগে। দিলীপ কথা বলছিলো, আর পরিষ্কার বুঝতে পারছিলো, জীবন মানে ডাক্তার। জীবন মানে প্ল্যান্ড—টেনশন, ওষুধ, মাংস ওজন। এবং টাকা। সব কটা জিনিসের শেষে আরেকটা জিনিস—আয়ু।

পরদিন সকালে দিলীপের ঘুম ভাঙলো রাত সওয়া চারটেয়। কাছাকাছি কোন মসজিদে মাইকে আজান দেওয়া হচ্ছিল। দিলীপ বসু কেডস্‌ পায়ে দিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লো। চেতলার দিশী কুকুরেরা তাকে বোধহয় চেনে। কিন্তু সাহানগর রোডের খাঁটি দিশীরা কিছুতেই তার পেছন ছাড়ে না। সকালবেলার পাতলা ঠাণ্ডা বাতাস। জীবনটা যেন এইমাত্র শুরু হোল। এক এক পাল কুকুর দিলীপকে দেখে এগিয়ে আসে—আর, দিলীপ অদৃশ্য ঢিল হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারার নকল পোজ দেয়। অমনি কুকুরগুলো পিছিয়ে যায়। ওরা যে যার এলাকার দখল প্রমাণে ব্যস্ত।

একসময় হাল ছেড়ে দিল দিলীপ। সে রাস্তা পালটে সদানন্দ রোড দিয়ে হেঁটে চলেছে। পেছনে তিনটি দিশী কুকুর ঘাঁয়ে ঘেঁষে এগোচ্ছে। ওরা তিনভাই বা তিনবোন হবে। কারণ, চোখের এক জায়গা দিয়ে কালো ছোপ। ডাইনে মাত্র একটি—কিন্তু বেশ মোটাসোটা। পেছনের একটা পা টেনে চলে। চোখ লোড়া ঘোলাটে। গলায় শুধু একটিই আওয়াজ—ভুগ্‌। ভুগ্‌ ভুগ্‌।

যে-পাড়া দিয়েই দিলীপ হাঁটে—সেখানকার লোকাল স্ট্রীট ডগরা তাকে ফলো করে কি খেয়াল হতে দিলীপ হাঁটতে হাঁটতে একদম অফিস পাড়ায়। হাতঘড়িতে সওয়া পাঁচটা। ডান হাতে একটা ব্যাংক বাড়ি। বাঁ দিকের বাড়িগুলোর একতলা জুড়ে একের পর এক ঘড়ির দোকান। ওপরের ফ্ল্যোরগুলো অফিসে অফিসে ভর্তি।

সামনেই কোল ইণ্ডিয়ার মাল্টিস্টোরিড অফিস। এপাশ থেকে যে এগারো-বারোটা এয়ার কুলারের বাক্স দেওয়ালে ফুঁড়ে বসানো—তারই দুটিকে সে চেনে। একটি অনাথ চক্‌কোত্তির ঘরে বসানো। অন্যটি সাধন গুপ্তর ঘরে। এর ভেতর কোনোটা হয়তো ঋষির ঘরে বসানো হয়েছে। সেটাকে দিলীপ এখনই সনাক্ত করতে পারবে না।

এই অবস্থায় দিলীপকে কোল ইণ্ডিয়ার অফিসের সামনে দেখলে অনেকে অনেক কিছু মনে করতে পারে। তার নিজের এখন ইচ্ছে করছিল—কেডসসুদ্ধ এই বাড়িটাকে পুরোনো দাঁতের কায়দায় উপড়ে তুলে ফেলে। কেননা, এখানেই তো সামান্য সামান্য টেবিল চেয়ার ঘিরে—নানারকম মিটিং, নোট, কনফিডেন-সিয়াল করে তবে রাগ, অপমান, ক্ষোভ এটসেটেরার বীজ বোনা হয়। ঈর্ষার চাষ হয়। আত্মরতি, ইডিওসিনক্রেসির ঢিমে আঁচে বাতাস দিয়ে দিয়ে জ্যানিটির পাচা বড়াগুলো ভাজা হয়।

ভোরবেলার গঙ্গা ফাঁকা অফিসপাড়ায় হাওয়া পাঠাচ্ছিল। সেই ঠাণ্ডা বাতাস দিলীপ বসুর রগ ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছিল। এখানকার কোন কোন বাড়ি আগের সেঞ্চুরির মাঝামাঝি তৈরি। কিংবা তারও আগের। তখন এসব রাস্তা দিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতাপ প্রবাহিত হোত। এখন দিশী সাহেবদের কথা-বার্তায় সেই ট্র্যাডিশনের নামে নাক দিয়ে পোঁটা পড়ে।

রেড রোড দিয়ে হেঁটে ফেরার পথে দিলীপের একবার মনে হোল, আমি কি আর দাগের মত হতে পারি না?

যেমন, সেই হাল্কা চেহারার দিলীপ বসু—যার পা মাটিতে পড়তো স্প্রিং হয়ে। সে হাঁটতো টগবগ করে। তার মুখখানা ছিলো চরিত্রশূন্য। চোখে আলো ছিলো। তখনো রবি এমন হয়নি। সবে সে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ঋষি তখন দিলীপের সঙ্গে দেখা হলে পাগলের মত করতো। কি খাওয়াবে। কেমন করে আদর করবে। একেই কি ভালবাসা বলতো। অনেককাল আগে ঋষিদের বাড়ি গিয়েছিল একবার। ঋষির তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। সন্ধ্যেবাতের চাঁদ দোতলার ঘেরা বারান্দায় ক্যাম্পখাটে এসে পড়েছিলো। সেখানে ওরা দুজনে সারারাত ধরে গল্প করেছিল। ঘরের ভেতর নতুন বউ লাবণ্য। কথাই ফুরোচ্ছিল না সে-রাতে—দু বন্ধুর। একেই কি বলে ঘন ক্ষীরের মত মেশামিশি—কিংবা ভালবাসা।

আমি কি খুব বেশি দাবি করছি?

বয়স হয়ে গেলে তো মানুষ পাল্টায়। তীব্র পছন্দ—তীব্র অপছন্দ গড়ে ওঠে মনের ভেতর। এক একজনের খাদ্যে রুচি এক-এক রকমের। তাই কি মেশামিশি শেষ হয়ে যায়। ভালবাসা উড়ে যায়। জীবনটা বাসি লাগে।

কেডস-এর নিচে ছায়া ছড়ানো বড় বড় গাছের ঝরাফুল—বেগুনী, বাসন্তী রংয়ের—সব পিচরাস্তায় থেতলে যাচ্ছিল। কোন্‌ দিকে যে পা ফেলবে বুঝতে পারছিল না দিলীপ। এইসব ফুলের কোন গন্ধ নেই। ডান হাতে মোর্ট উইলিয়মের ছাদে কোনো-বেলের নিজের পতাকা পত্‌ পত্‌ করে উড়ছিল।

দিলীপের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে ফাইনালি। কোন মায়া দয়া নেই। বাবার সময় হলেই চিরকালের জন্যে চলে যেতে হবে। তখন রাণী বড় একা পড়ে যাবে। নিউ রোডে মাল্টিস্টোরিড বাড়িটার ফ্ল্যাট ফাঁকা লাগবে কুটুর। আমার চলে যাওয়ার পর অয়ারডেভের ভর্তি আমার জামাগুলো নিশ্চয় ন্যাপথলিন রাখতে ভুলে যাবে। চার-

ছোটদের বই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অপুকাহিনী

অপুর ছেলেবেলা ৬.
ছোটদের অপরাজিত

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছোটদের কাজল ৬.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
টেনিদার উপন্যাস

চারমূর্তি ৫.
ঝাউবাংলোর রহস্য ৫.

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ঘনাদা কাহিনী

ঘনাদার জুড়ি নেই ৫.
মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা ৫.

অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুন্দরবনে সাতবৎসর
শিশির ঘোষের ৫.

লাহুল সিংহের সন্ধানে ৬.

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের
ডাকাত দস্যুকাহিনী

বাঙলার ডাকাত
১—৫. ২য়—৬. ৩য়—৬. ৪র্থ—৬.

বিশু মুখোপাধ্যায়ের

বিখ্যাত দস্যু কাহিনী
মনি বাগচীর ৬.
জীবনী সাহিত্য

যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
রাজা রামমোহন
শরৎচন্দ্র
আলোকময়ী শ্রীমা
পরমাপ্রকৃতি সারদা
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকা
• সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

শৈব্যা পুস্তকালয়
৮।২সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

জোড়া জুতো নিয়ে যাবে পুরনো কাগজ-ওয়ালা। আমি শেষমেষ একখানা ফটোতে গিয়ে শেষ হবো। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই ভিজিটররা আমার উল্টোদিকের দেওয়ালে পাবে।

বিবেকানন্দের স্ট্যাচুর পেছনে পি জি হাসপাতাল। দিলীপ ন্যাশনাল লাইব্রেরির রাস্তা ধরলো। চিড়িয়াখানার দরজা খুলতে দেরি। একঘোড়ার এক্কার দুধের বালতি যাচ্ছে হাসপাতালে। চিড়িয়াখানার দেওয়াল ঘেঁষে ভেতরে খানিকটা নকল পাহাড়, খাল তৈরি করা আছে। সেখানে হরিণরা খেলে। সেই নকল পাহাড়ের উঁচু ঢিবিতে একটা কিশোর হরিণ সদ্যগজানো সিং তুলে বাইরের রাস্তা, সিগারেটের হোর্ডিং দেখছিল।

তাকে দেখে দিলীপ দাঁড়িয়ে পড়লো। ভোরবেলার ফাঁকা কলকাতা। আমি তো এই চেয়েছিলাম। পৃথিবীর গায়ের ওপর দিয়ে সবচেয়ে সস্তার একখানা হাওয়াগাড়িতে ঘুরে বেড়াবো। সে-গাড়ি তেল খাবে সবচেয়ে কম। দমকলের ঘণ্টা থাকবে হর্নের বদলে। ঢং ঢং করে রাস্তা পার হবো। আমার পাশে থাকবে এমনই একটি হরিণশিশু। হুড্‌খোলা বাড়িতে রোদ এসে সে-হরিণের পিঠে পিছলে পড়বে।

মর্নিং ওয়াকের দিলীপ বসু সেই হরিণটাকে হাত দিয়ে ডাকলো, আয়—। চলে আয়—

হরিণটা চমকে তাকালো। মাথা নুনো তুলে ধরলো। চোখ স্থির। ভোরবেলার বাতাসে আকাশে তিনখানা ছেঁড়ামেঘ স্লোমোশন উড়ন্তে যাচ্ছিল।

দিলীপ রাস্তার গাছের একটা গাছ থেকে পাতাসুদ্ধ কচিডাল ভাঙলো একটা। তারপর তা ছুঁড়ে দিল হরিণটার দিকে।

হরিণটা অবাক হয়ে দেখলো। চোখ তখনো স্থির। পাতাসুদ্ধ কচিডালটা ওর কাছে পৌঁছায়নি। দিলীপ দেওয়ালের গা থেকে ডালটা তুলে আবার ছুঁড়ে দিল। এবারেও পৌঁছল না। ডালটা কুড়িয়ে নিয়ে দিলীপ ওর ঠাণ্ডা চোখে তাকালো। আমায় চিনতে পেরেছিস?

মানুষের গলার স্বর এতভোরে কোন-দিন শোনেনি বোধহয়। অবাক চোখে দিলীপের দিকে তাকালো।

আমার পাশে বসবি তুই। আমরা সারা পৃথিবীর ওপর দিয়ে চলে যাবো।

হরিণটা কি ভেবে গলা বাড়িয়ে দিল দেওয়ালের দিকে।

তাতে উৎসাহিত হয়ে দিলীপ বসু চিড়িয়াখানার দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গেল। হাত দিয়ে ধরবে এমন কিছু নেই। লাফ দিয়ে দেওয়ালের প্যারাপেট ধরতে গিয়ে পড়ে গেল।

আর ঠিক তখুনি পুলিশের একটা ছোট কালোমত ভ্যান রাস্তায় থামলো। দিলীপ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ভ্যানের সাইড দরজা খুলে একজন অফিসার বেরিয়ে এলো। এইতো দিলীপ-হতভম্ব দিলীপ ধুলোবালি সুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকালো।

শেষরাত থেকে আমরা সারাবাড়ি সার্চ করছি। আপনি ঘরে ছিলেন না। কোথায় গিয়েছিলেন?

মর্নিংওয়াকে—

এত ভোরে! রবিকে কোথায় রেখে এলেন বলুন?

রবিকে আমি বহুদিন দেখিনি।

তার ফুর্তি মাবার মাগীটাকে তো বাড়িতে এনে তুলেছেন।

মাগী নয়। আমার পুত্রবধূ। রবি বসুর স্ত্রী মালবিকা বসু।

তা যা বলেছেন। মাল একখানা। বিয়ে হোল কবে? কার্ড ছেপেছিলেন?

না।

গোপন বিবাহ! ভ্যানে উঠুন।

ইন্সপেকটর দিলীপকে পাশেই বসালো। তারপর চলন্ত গাড়িতে বসেই বললো, গাড়িন হোল কবে?

এসব আমার জানার কথা নয়।

তাহলে জেনে রাখুন। আপনার ছেলে কাল রাতে আপনাদের বিল্ডিংয়ে এসেছিলো। আমরা জানি।

কি করে জানলেন?

আমাদের ইনফরমেশন তাই। এখনো সে ও বাড়িতেই আছে।

ও বাড়িতেই? কোথায়? আমি তো জানি না।

ক্যানো জেনেশুনে ন্যাকা সাজছেন। সব জেনেই তো আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন শেষ রাতে। আমাদের এসে পৌঁছতে একটু দেরি হয়। সেই ফাঁকে।

সেই ফাঁকে?

বসিকতা হচ্ছে বাস্তোৎ! আমরা কিচ্ছু বুঝি না ভেবেছো? কোত্থেকে অত টাকা আসে! প্রায়ই গাড়ি কেনা। বদলানো। সারানো। সব আমরা নজরে রেখেছি।

কোত্থেকে টাকা আসে মানে—

মানে? রবির দল থেকেই টাকা আসে। এ তো জলের মত সোজা। নয়তো চাকরি করে অত টাকা হয় না। বাপকে ট্রেজারার বানিয়ে ছেলে পার্টি চালাচ্ছে।

দিলীপ আর কথা বাড়ালো না।

মাল্টিস্টোরিড বাড়ির সামনে ভ্যান থেকে নামতেই ইন্সপেকটর বললো, চিড়িয়াখানার দেওয়ালে উঠে পালাতে যাচ্ছিলেন কেন?

পালাইনি তো।

তবে?

হরিণের বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে গাছের পাতা খাওয়াবো ভেবেছিলাম।

ইন্সপেকটরের ভ্রু কুঁচকে গেল। স্টুপ্ড! তারপর ঠোঁট ভেঙে বললো, পশু-প্রেম! মিথ্যে ছেনালীর আর জায়গা পাওনি শুয়োর।

ভাল ভাল কথায় কান সয়ে এসেছিলো দিলীপের। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চমকে গেল। বাবোতলা বাড়িতে মোট ছেষট্টিটা ফ্ল্যাট। প্রায় সব কটা বালকনিতেই কোন না কোন ধুধু যেদিকটায় জাপানী কনসুলেট—সেদিকটায় লাগায়ো দেওয়াল ঘেঁষে প্রাচীন রেনট্রি গাছটার গা জুড়ে ক'টালতা। দিলীপের মুখে হাসি এসে যাচ্ছিল। সামলে নিল। মনে মনে বললো, এমন ফাঁদ পাতা জায়গায় কেউ বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে? উজবুক!

শীতনেক সি আর পি মিলে সব কটা ফ্ল্যাটের তোষক, লেপ, ভুয়ার, বাথরুম—সব সব তছনচ করেছে। ছেলের জন্যে এই প্রথম গর্ব হতে লাগলো দিলীপের।

লিফট্ দিয়ে উঠতে গিয়ে দিলীপ দেখলো, সেকেন্ড লিফটের ফাঁকা গর্তটার দুজন সি আর পি দাঁড়িয়ে। মেশিনের অর্ডার গেছে কোঅপারেটিভ থেকে। কিন্তু লিফট্ এসে পৌঁছায়নি। জাপানী কনসুলেটের দেওয়ালের দিকেই এ বাড়ির এমারজেন্সি একজিট। সেদিকটার সিঁড়ি ইনকমপ্লিট। সিমেন্ট মিকসার, বাঁশ, চুনের বালতিতে জায়গাটা গোলমেলে হয়ে আছে।

নিজের ফ্ল্যাটে লিভিং রুমে ঢুকে দিলীপ বুঝলো, পুলিশ কি জিনিস। উত্তর-প্রদেশের গাড়োয়াল জেলার বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা রাইফেল কাঁধে দাঁড়ানো। কাঁধে তিনটি হরফ। সি আর পি।

কেন যে রবি এ ঝামেলার তুই জড়ালি কি দরকার ছিল? আমাদের জীবন কি সুখের ছিল না? আমি না হয় তোর চোখে দালাল। কিন্তু তোর মা? বোন? বউ? এদের কি অপরাধ? কি অপরাধ এই সারা বাড়ির লোকজনের?

বাণী একবার কুটুকে সামলাচ্ছে। একবার মালবিকাকে। দুজন দুই বিছানায়। সেদিনের শুকনো মালা মেঝেতে। তাতে গুচ্ছের পিঁপড়ে। দিলীপ তুলে ফেলে দিতে গেল। সি আর পি যুবা তা করতে দিল না। খানিক বাদে দিলীপ আর মালবিকাকে থানায় গাড়িতে উঠতে হোল।

এসবই ঘটে গেল বেলা নটার ভেতর। থানায় গিয়ে ওদের দুজনকে প্রায় বেলা একটা অব্দি বসে থাকতে হোল। সওয়া একটা নাগাদ একজন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এলো। দুজনকেই খাতির করে ভেতরের একটা বড়ঘরে বসতে দেওয়া হোল। তারপরই শুরু হয়ে গেল প্রশ্ন—প্রশ্নের পর প্রশ্ন। যেমন—

আপনার স্বামী কাল কতক্ষণ ছিলেন?

আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

আতো জানিই। কিন্তু তিনি ছিলেন কতক্ষণ?

মালবিকা চুপ করে থাকলো।

দিলীপ একবার বললো ওকে না হয় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। তারপর আপনার যত ইচ্ছে কোশ্চেন করুন আমায়—

না। মিসেস বসু এখন এখানেই থাকবেন। উনি আগাগোড়া সব জানেন।

মালবিকা চোখ তুলে তাকালো। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের বয়স তিরিশের

বসতে পারছি না—বলে উঠে দাঁড়ালো মালবিকা।

ওর চোখে কি ছিল। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারও উঠে দাঁড়ালো। আপনার দুটো সই রাখবো আমরা—

কাগজপত্তর নিয়ে আসুন। আমি চেতলার মেয়ে। অ্যাথলেটিসে বেঙ্গলকে তিন-বার রিপ্রেজেন্ট করেছি। সবাই জানে—আমি কোনদিন পলিটিকস করিনি।

কাগজপত্র এলে দিলীপকেও দু জায়গায় নমুনা সই করতে হোল। তারপর থানার গাড়িতেই— হস করে—একদম বাড়ি।

লিফটে দুজনে কোন কথা হোল না। একদম দোরগোড়ায় এসে দিলীপ জানতে চাইলো, সকাল থেকে কিছু খেয়েছো ?

না। সে তো আপনিও কিছু মুখে দেননি।

রবি এসেছিলো নাকি ?

মালবিকা চারদিক তাকালো। বাড়ির আশেপাশে একজন সি আর পির টিকিও দেখা যাচ্ছে না। তখন মালবিকা মাথা নামালো।

ঠিক এই সময় কাটু দরজা খুলে দিল। দিলীপকে দেখে মুখ-চোখ উচ্ছ্বসিত। জানো বাবা। দাদা ধরা পড়েনি—

কুটুর পেছনে রাণী। এগিয়ে এসে সে মালবিকাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

কুটু তখন বলছিল—দাদা ওদিককার দরজা দিয়ে থার্ড ফ্লোরে নেমে যায়—এমারজেন্সি একজিট দিয়ে-

ওপথ তো তৈরি হয়নি সবটা—

দমকল উঠবার জন্যে যতটা তৈরি হয়েছে—তাই দিয়েই দাদা গিয়ে বেনিটু গাছটার গায়ের লতা ধরে ঝুলে থেকে একদম কনসুলেট কমপাউন্ডে। আর অমনি জাপানী কুকুরগুলো চেঁচিয়ে উঠেছে একসঙ্গে—

পায়ে চোট খায়নি তো ?

একদম না। একচল্লিশ নম্বরের সুলতাদি নিজের চোখে দেখেছেন। তিনিই তো বললেন—সি আর পি চলে যেতে।

পুলিশ টের পায়নি ?

এখন পেয়েছে—দাদা ততক্ষণে কনসু-লেট পেরিয়ে ওপাশের রাস্তায় বাসে উঠে পড়েছে।

রবি এসেছিলো—তুমি জানতে মালবিকা ?

বিশ্বাস করুন—আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা হলে—এভাবে পালাতে বারণ করতাম।

ঠিক এই সময় কারেন্ট গেল। রাণী বললো, আমপোড়া করেছি। কুটু সবরকটা মনে দেনা তোর বাবাকে। খেয়ে তবে চানে যাও—

তখুনি কারেন্ট গেল বরেন দত্তর বাড়িতেও। বেলা দেড়টা অব্দি মক্কেল এসেছে বরেনের। বেশির ভাগই চায় বারো-তের হাজারের ভেতর অ্যামব্যাসাডার। নয়তো সিকসটি এইট নাইনের ফিয়াট। সকাল থেকে তিনটি ডিল ক্লোজ করতে পেরেছে বরেন দত্ত। সবই কলকাতার বাইরের পার্টি, অ্যামব্যাসাডার বেচে খুব একটা পড়তা থাকে না। তার চেয়ে সিকস কিংবা আরও তেলখোর গাড়ি বেচতে পারলে প্রফিট বেশি আসে। যেমন আট সিলিন্ডারের স্টুডি-বেকার কমান্ডার। গাড়ির মালিক তিন হাজার টাকা পেলেই খুশি, ঘাড় থেকে নামলে সে বাঁচে। বাকি সবটাই বরেনের। চা-বাগান এলাকার পার্টি এসব বড় গাড়ি চায়। তারা কিনে নিয়ে ডিজেল বসায়: বেশি বেলায় খাওয়া-দাওয়া করে বরেন ঘুমোচ্ছিল। পাশেই বড়ছেলের ঘর। সেখান থেকে কি পড়বার শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ালো তড়াক করে। বরেনের এখন ষাটের ওপর বয়স। বেশি বয়সে বিয়ে করে এই প্রথম ছেলে। সিধে তার ঘরে গেল।

বাবা। লোকজন ডেকে আমার তোলো।

বরেন একতলা থেকে তার অফিসের লোকজন, ড্রাইভারদের ডাকলো। তারা এসে ছোটকর্তাকে খাটে তুলে দিয়ে চলে গেল।

হাড় ভাঙেনি তো ?

নাঃ। কিন্তু একা একা দাঁড়াতে পারছিনে বাবা।

এই তো মুশকিল করলি। তুই না পাশে দাঁড়ালে আমাদের ব্যবসা দেখবে কে ? বলতে বলতে বরেন প্রায় কেঁদে ফেললো। কথাটা সত্যি। বিক্রির জন্যে গাড়ি এলে বড়ছেলে চালিয়ে দেখে। ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, ডিফারেনসিয়াল—শব্দ শুনে, নেড়েচেড়ে বলে দেয়—দর ঠিক করে মালিকের সঙ্গে। আবার খদ্দেরকে গাড়ি গছাবার সময় বড় ছেলেই চালিয়ে দেখায়। পরিষ্কার হাত। কলকাতার ভিড়ে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিডে হামেশা চালায়। তাছাড়া গ্যারেজে লোক খাটানো—তাও দেখে বড়ছেলে।

করেছিস কি বাবা। হাড় ভাঙেনি তো ?

তুমি তোমার ব্যবসাই দেখছো বাবা। আমার দিকটা দেখছো না একদম। উঃ।

কোথায় লাগছে ?

পিঠে। ঠিক মেরুদণ্ডের নিচে।

বিপদে ফেললি তো। এখুনি ডাক্তার ডাকতে হয়—

তার আগে মাকে ডাকো তো।

তোর মা তো তেতলায়। আমি উঠতে পারবো না সিঁড়ি ভেঙে।

ফোন করো মাকে।

এত ব্যায়াম করছিস কেন ? মাস্টার-মশাইয়ের সামনেই ব্যায়াম করা ভালো। মস্তিকরা তো তোকে পছন্দ করে গেছেই।

তা করুক। এত মোটা বলে শেষে যদি এ বিয়েটাও কেচে যায় বাবা—তখন তুমি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে ?

কোথায় তুই মোটা ? তাছাড়া ওদের মেয়ে তো রোগা নয়।

আমি মোটা নই ? হাসালে বাবা। একশো দশ কেজি ছিলাম। এই নাগাদ ব্যায়াম করে—ডায়েটিং করে এখন একা নব্বুই কেজি হয়েছি। চাইকি চেষ্টা করলে আশি কেজিও হতে পারি—

তাই বলে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকবি বাবা ?

দরকার হলে থাকতে হবে। আসলে বাবা তুমি আমার বিয়ে দিতে চাও না।

কে বললে ?

আমি বলছি।

আমার স্বার্থ ?

খুব পরিষ্কার। জলের মত পরিষ্কার বাবা।

ক্ষেপে উঠলো বরেন দত্ত। চল্লিশ বছর ধরে দালালী করে এই প্রপার্টি, এই গুডউইল—আমার জন্যে গড়ে তুলিনি। সবই তোমাদের জন্যে।

উহু। তোমার জন্যে বাবা। তোমার নিজের তৃপ্তির জন্যে সব করেছো বাবা।

একথা বলছো কেন ?

বলছি তার কারণ আছে বাবা।

নিজের ছেলেকে কোনদিন এত গম্ভীর দেখেনি বরেন। ভেতরে ভেতরে সে নিজেও ভয় পাচ্ছিল। ছেলের এ চেহারা সে নিজেও কোনদিন দেখেনি।

একটা শাড়ির জন্যে যতটা সময় দিয়েছো—আমি রোজ মোটা হয়ে যাচ্ছি—সেজন্যে অতটা সময় দিয়ে একবেলার জন্যে আমাকে কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওনি।

আমি—

দাঁড়াও। আমাকে বলতে দাও বাবা। আমার বিয়ের সম্বন্ধগুলো যখন ভাঙতে শুরু করলো—তখন তুমি একজন ব্যায়ামের টিচার এনে হাজির করলে—

এ রোগ তো তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছো।

তুমি তো আমার বাবা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র : বর্ণবহ্নি ১২·০০
নবনীতা দেবসেন : আমি, অনুপম ৮·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : স্বর্গনয় ৭·০০
আশাপূর্ণা দেবী :
এক আকাশ অনেক তারা ১০·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : লক্ষ্মীর পা ৭·০০
ঈশান ৭৯।২ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭০০০০৯

বরেন চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

আমি কিন্তু ষোল বছর বয়স থেকে ছায়ার মত তোমার পাশে আছি। একদিনের জন্যেও কামাই করিনি। সেদিন তিনটে গাড়ি বেচে তোমার দশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে— সেদিনও তুমি জানতে চাওনি— হ্যাঁরে, খোকা—তুই এত মুটিয়ে যাচ্ছিস কেন? তখনো যদি আমার চিকিৎসা শুরু করতে তাহলে ন্যায়রত্ন লেনের বিয়েটা আমার ভেঙে যেতো না।

তোর খুব পছন্দ হয়েছিল মেয়েটিকে? আগে বলিসনি কেন? ওখানেই আমি তোর বে দেব। যত টাকা লাগে—

টাকায় সব হয় না বাবা। আর আমাকে অপমান কোরো না। আমি তোমার বিনে মাইনের—পেটে ভাতায় ম্যানেজার—অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী। নিজের বড় ছেলে।!

ওকথা বলিসনি খোকা। তোর জন্যে আমি সব করবো। কালই গাড়ির ব্যবসা তুলে দেব।

হয়েছে। থাক বাবা। সময়মত যদি আমাকে পড়াশুনো করাতে। আমি হয়ে গেলাম—মোটর মেকানিক।

ন্যায়রত্ন লেনের মেয়ের বাবা তো দিনরাত্তির ছিল। চেষ্টা করি। নগদ তিন লাখ টাকা নিয়ে দেখা করবো?

আর আমায় অপমান কোরো না বাবা। আমার ছোট্ট ভাইবাও বড় হচ্ছে। ওদেরও মোটার ধাত। এখন থেকেই ওদের চিকিৎসা করো। এখনো সময় আছে।

ন্যায়রত্ন লেনকে আমি রাত্রি করাবো খোকা। তুই মনে কোন দুঃখ রাখিস নে। এখুনি আমি নগদ টাকা আর গাড়ি নিয়ে বেরোবো। আমার এই চল্লিশ বছরের বেত্রকাবিতে কত পার্টিকে খাত্রি করালাম—

মানুষ আর গাড়ি এক নয় বাবা। যে মেয়ে আমার দেখে খিল খিল করে হেসে উঠেছে—হাসি চাপতে পারেনি—সে কি করে বিয়ে করবে আমাকে। তুমি বরং ডাকতারকে খবর দাও।

খুব ব্যথা করছে? কেন সারাদিন আসন করছিস? সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে কি লাভ হোল?

বোধহয় হাড় সরে গেছে। ডাকতার বাবুকে খবর দাও। আমি যে করেই হোক আরও পনেরো কেজি ওজন কমাবো।

ভুল করিসনি বাবা! শরীর কি তোর ফোরবোরেটর! জেট পিন পালটে তেল কমিয়ে মাইলেজ বাড়াবি! শেষে ইঞ্জিনটাই যাবে খোকা। ভালভ জ্বলে যাবে শেষে।

তুমি ডাকতারকে ডাকবে?

ধমক খেয়ে বরেন বেরিয়ে এলো। ফোন করছি দাঁড়া—

লম্বা ঢাকা বারন্দায় শ্বেত পাথরের টেবিলে আকাশী রঙের টেলিফোন। বার তিনেক ডায়াল করেও লাইন না পেয়ে নিচে নেমে এলো বরেন। তারপর নিজের হাতে সাজানো ইমপোর্টেড মরিসখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

ডাকতারকে পেল না। বেরিয়ে গেছে। অন্য যেসব ডাকতারকে গাড়ি দিয়েছে বরেন—তাদের কেউই হাড়ের ডাক্তার নয়। কেউ হার্টের—কেউ বা গাইনি।

গাড়ি চালাতে চালাতে বরেনের এক সময় খেয়াল হোল—সে এখন সন্ধ্যের মুখে বজবজের কাছাকাছি এসে গেছে। ওই তো গঙ্গা। পেট্রল টুম্প। পাটকলের চিমনি। লঞ্চ আলো জেলে নদী পার হচ্ছে।

একটা রাস্তা বড় চেনা লাগলো। তখনো বড়খোকা হয়নি। বিয়েই হয়নি যে। বরেনের বয়স তখন বাইশ, তেইশ। এই পথটা দিয়েই তো।

তখন এ রাস্তা ছিল ঘেষ ফেলা এক-চিলতে পথ। রাস্তাটা ঠিক চিনতে পেরেছে বরেন। গাড়ির স্পিড কমিয়ে কাঠের গেট-ওয়ালা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো বরেন। স্টিয়ারিংয়ে বসেই দোতলার তাকালো। কাঠের সোতলা। লতানো ফুল-গাছের ঝাড। কাঠের সিলিং থেকে ঝোলানো আলো জ্বলে উঠলো। খচ করে মনে পড়ে গেল বরেনের—তখন ওখানটায় গ্যাসের বাতি জ্বলতো।

গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলে ভেতরে গেল বরেন। ম্যাডাম—

ইয়েস— বলে একজন ধবধবে ফক পরা মেম বেরিয়ে এলো। চোখে চশমা। মাথার চুল শাদা।

আই গেভ ইউ এ ফিফাট একজাকটলি ফর্টি ইয়ার্স এ গো। আই অ্যাম ইওর বরেন—

মহিলা দু হাতে বরেনের হাত দুখানা ধরলো। ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

তুমি তো একটুও পালটাওনি।

নো নো। আমি এখন সিকসটি থ্রি।

বাট আই অ্যাম সেভেনটিফাইভ।

ইউ ডোন্ট লুক সো ম্যাডাম—

থ্যাংকযু। দেয়ার্স দ্য কার—

সত্যি। এখনো সে গাড়ি রেখেছেন ম্যাডাম।

ভেরি মাচ। আমি এখনো নিয়ে বেরোই। এনজিন ইজ ইয়ং।

দুজনে মিলে গাড়িটার কাছে গেল। একদম চকচক করছে। বাম্পারের নিকেল অব্দি নিখুঁত।

ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে দেখবো?

সিওর।

গানের কলির মত ইঞ্জিনটা গুণ গুণ করে গেয়ে উঠলো। বরেনের মনে পড়লো, গাড়িটা বিক্রি করে সে চল্লিশ টাকা মারলিন পেয়েছিলো। সে কি আনন্দ! —

মহিলা বরেনকে হাতে ধরে চেয়ারে এনে বসালো। কি খাবে?

চা দিন।

আর?

আর কিছু নয়।

একটু কেক নাও। সেবারেও তোমায় আমার হাতের তৈরি কেক দিয়েছিলাম। মিস্টার র‍্যামস্ বুথম্ মৃত্যুর আগে এ বাড়িটা কিনে নিয়ে আমার নামে করে দিয়ে যান।

একটি ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে দেখে-ছিলাম?

সে এখন তিন ছেলের বাবা। সাসেকসে কোলিয়ারির ম্যানেজার। ওই দ্যাখো আমার নাতিদের ছবি।

বরেন উঠে গিয়ে কার্ডবোর্ডে সাজানো ছবি দেখলো।

মহিলা এগিয়ে এসে বরেনের গালে স্নেহ চুম্বন দিলেন। দু হাত মাথায় বুলিয়ে দিয়ে নিজের চোখ বুজলেন। সে একটা দিন ছিলো বরেন। তখন আটশো টাকায় একটা ফিয়াট কেনা যেত। এখন এক পাউন্ড মাখনের দাম বারো টাকা। উইডো পেনসন নিয়ে গঙ্গার তীরে বসে আছি আমি।

ছেলে আসে?

একবার এসেছিলো। সাত বছর আগে। ইংল্যান্ড তো শীতের দেশ। ঠাণ্ডায় আমার ছেলের মাথায় অকালে টাক পড়ে গেল। ইণ্ডিয়ায় থাকলে এটা হোত না। বিয়ে করবেনা নিশ্চয়—

হুঁ।

কটি ছেলেমেয়ে?

তিনটি ছেলে।

সেদিনের সেই বরেন। তিন ছেলের বাবা এখন! পৃথিবীটা কত তাড়াতাড়ি পালটে গেল। তাই না।

আমার এখন তেষট্টি।

শরীরটা ভালোই রেখেছো।

ভেবে টেনিস খেলি।

র‍্যামস্‌বথুম্‌ও খেলতো। ভেবে ওই গাড়ি নিয়ে চলে যেতো। তখন পেট্রল কত সস্তা ছিল। কোন কোনদিন আমিও সঙ্গে গেছি।

সুন্দর কেক হয়েছে। আর উঠি ম্যাডাম।

উঠবে। বেশ। এই প্যাকেটটা নিয়ে যাও।

ওসব আবার কেন?

নিয়ে যাও। তোমার ছেলেদের জন্যে—। বলবে আমার হাতের তৈরি কেক।

অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে বরেনের মনে হোল—মহিলা কি অতবড় বাড়িতে একা থাকেন? কে দেখাশুনো করে? অসুখ করলে কে ডাকতার ডেকে দেয়? চিঠি ডাকে দিয়ে আসে কে?

কলকাতার রাস্তায় পড়েই আগেকার মাইল মিটারের কাঁটা ষাটে গিয়ে স্থির হয়ে কাঁপতে লাগলো।

(চলবে)

ভারতীয় হকি ও আমরা

খেলাধুলোর আন্তর্জাতিক আসরে গর্ব করবার মত আমাদের সম্বল একটাই ছিল। বুক ফুলিয়ে আমরা শুধু ঐ হকির কথাই বলতে পারতাম। কিন্তু সেই সামান্য সম্বল-টুকুও আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিশ্ব হকিতে ভারত আজ আর কোন শক্তিই নয়। প্রথম চার-পাঁচ জনের তালিকায় স্থান নেই ভারতের। ভারতের জায়গা আজ বিশ্বের দুর্বল দলগুলোর সঙ্গে এক সারিতে। অথচ তৃতীয় অর্থাৎ কোয়ালালামপুরের বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেবারের ফাইনালে ভারত হারিয়েছিল এবারের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানকে। দারুণ খেলেছিল ভারত। কিন্তু সেই শেষ তারপর থেকে ভারতের ব্যর্থতার ইতিহাস আর শোচনীয় পরাজয় আমাদের মনকে ভারী করে তুলেছিল। মন্ট্রিল অলিম্পিকে ভারত অস্ট্রেলিয়ার মত দলের কাছে ৯ গোল খেয়েছিল। আন্তর্জাতিক হকিতে ভারত আর কখনো অতো গোলে হারেনি।

তবে সে রেকর্ডও এবার ভারত ডিঙ্গিয়ে গেছে। সাত গোলে হেরেছে পশ্চিম জার্মানীর কাছে। হেরেছে কানাডার মত শক্তিহীন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। হার স্বীকার করেছে স্পেনের কাছে। হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ, নিপুণ শিল্পী বাবু, রূপ সিংয়ের ভারতের এই হাল সত্যিই ভাবা যায় না। কারণ, এঁরাই একদিন বিশ্ব হকিতে ভারতকে শীর্ষস্থানে তুলে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন বললে বোধহয় ভুল হবে—বছরের পর বছর, অলিম্পিকের পর অলিম্পিকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা সেই বিজয়-পতাকা তুলে ধরেছিলেন। তারপর একদিন ভারত ভাগ হল। সৃষ্টি হল নতুন দেশ পাকিস্তান। ভারতের কজন সেরা খেলোয়াড় চলে গেলেন পাকিস্তানে। সেই পাকিস্তানই একদিন ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল অলিম্পিকের স্বর্ণপদক। তারপর থেকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানের জন্যে জোর লড়াই চলতো ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে। কিন্তু মিউনিখ অলিম্পিকে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল পশ্চিম জার্মানী। বিশ্ব হকিতে সেই প্রথম এশিয়ানদের প্রাধান্য ঘুচলো।

কিন্তু তারপর কোয়ালালামপুরের বিশ্ব কাপ হকির আসরে দারুণ খেললো ভারত। ভারতের অশোককুমারকে 'হকির পেলে' বলা হতো সেখানে। কিন্তু এবার সেই অশোককুমারের স্থান হচ্ছিল না দলে। খেলোয়াড়দের সঙ্গে কর্মকর্তাদের বিরোধকে কেন্দ্র করে দল থেকে বাদ পড়লেন গোবিন্দ, আসলাম শের খাঁ, বাবন্দার সিংয়ের মত সেরা খেলোয়াড়। [illegible] একটি দুর্বল দল পাঠিয়েছে। এর আগের তিনটি বিশ্বকাপ হকির আসরে ভারত কখনো এতো দুর্বল দল পাঠায় নি। প্রতিটি খেলায় ভারতীয় দলের রক্ষণভাগের দুর্বলতা বড় প্রকট হয়ে উঠেছিল, তাই পঞ্চম স্থান নির্ধারণের খেলাতে পর্যন্ত ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল স্পেনের হাতে।

আমরা ভারতবাসী, আমাদের কাছে এর চেয়ে লজ্জা আর পরিতাপের বিষয় কি হতে পারে? হকির কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল আর খেলোয়াড়দের ওপর সর্দারি করতে গিয়ে আজ তাঁরাই ভারতীয় হকিকে এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছেন। এবারের বিশ্বকাপ হকিতে ১৪টি দেশের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান লাভ করে মাথা নীচু করে ভারতীয় হকি খেলোয়াড়রা দেশে ফিরে এসেছে। পাকিস্তান এবার ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো সম্মান আর আমরা অর্থাৎ ভারত আন্তর্জাতিক হকির আসরে নেমে গেছে আরো এক ধাপ। হারতে হারতে ভারত আজ এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁচেছে যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া চট করে সম্ভব হবে না। জানি না, ভারতীয় দলের এই শোচনীয় ফলাফল হকির কর্তাদের আর সরকারের চোখ খুলে দেবে কিনা। ১৯৮০ সালে মস্কো অলিম্পিক। সেদিকে নজর রেখে ভারত যদি এখন থেকেই তৈরী হতে শুরু করে, তাহলে অশ্রা করা যায়—হারানো সম্মান ভারত কিছুটা ফিরে পেলেও পেতে পারে। দেখা যাক, কি হয়। কারণ শুধু কথায় তো আর চিঁড়ে ভিজবে না ...!

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া

পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট

কিংসটনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার শেষ পঞ্চম টেস্ট খেলা দর্শকদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ, হামলা এবং পুলিশের ফাঁকা গুলির ফলে শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। এই সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের রান ছিল ২৫৮ (৯ উইকেটে) এবং অস্ট্রেলিয়া ১১০ রানে এগিয়েছিল। যেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতে ছিল মাত্র একটি উইকেট, সেখানে অস্ট্রেলিয়ার ৩৮টি বল খেলতে বাকি ছিল। এই ৩৮টি বল খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ১১১ রান তুলে খেলায় [illegible] ইণ্ডিজের শেষ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভ মোটেই অসম্ভব ছিল না। সুতরাং দর্শকদের হামলার ফলে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের একটি সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল। তবে এই পঞ্চম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারলেও তাদের রাবার সম্মান এবং ওরেল ট্রফি হারাতে হত না। কারণ তার মীমাংসা আগেই হয়ে গেছে —ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩—১ খেলায় জেতার সুবাদে।

প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩টে উইকেট পড়ে ১৮৬ রান দাঁড়ায়। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ইয়ালপ (৫৭রান) এবং পিটার টুহি দলের মূল্যবান ১৩৩রান যোগ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন: টুহি ১০৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। টুহির আটটি টেস্ট খেলার জীবনের এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। পিচ ভিজে থাকার ফলে একঘন্টা দেরিতে খেলা আরম্ভ হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৪৩ রানের মাথায় শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস সাড়ে আট ঘন্টা স্থায়ী ছিল। খুবই মন্থর গতিতে রান উঠেছিল। অস্ট্রেলিয়া প্রথম পাঁচ উইকেটে তুলেছিল ৩০৮ রান। কিন্তু শেষ পাঁচ উইকেটে উঠেছিল মাত্র ৩৫ রান। শেষ পাঁচটা উইকেটের মধ্যে জুমাদিন একাই চারটে উইকেট নিয়েছিলেন। এইদিন টুহিকে তাঁর ১২২ রানের মাথায় আউট করার সূত্রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩২ বছরের মিডিয়াম পেস বোলার ভ্যানবার্ণ হোল্ডার ৩৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলে তাঁর একশত টেস্ট উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। দ্বিতীয় দিনে বাকি সময়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩০ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭৬ (৮উইকেটে)। মাত্র ৬৩ রানের মাথায় তাদের ৫ম উইকেট পড়ে যায়। দলের এই দারুণ সঙ্কট কালে গ্যারী গোমেজ ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে শিবনারায়ণের সহযোগিতায় দুঘন্টা পাঁচ মিনিটে দলের অতি মূল্যবান ৯৬ রান তুলে দেন। শিবনারায়ণ ৫৩ রান করে আউট হন। অপর দিকে গোমেজ ১১৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ২৮০ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ৬৩ রানে এগিয়ে যায়। এরপর অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ৩০৫ রান তুলে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ২০ মিনিট আগে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। [illegible]

(৯৭রান) দলের ১৮০ রান যোগ করে খেলার স্থিত খুব পাকাপোক্ত করেছিলেন। দুজনেই নব্বইয়ের ঘরে গিয়ে আউট হন। টুহির দুর্ভাগ্য যে, তিনি মাত্র তিন রানের জন্যে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আজও কোন খেলোয়াড় টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করতে পারে নি। খেলায় জয়লাভের জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৩৬৯ রানের দরকার ছিল। চতুর্থ দিনে তাদের মাত্র একটা বল খেলার পর আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

শেষ পঞ্চম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৫৮ রানের মাথায় ভ্যানবার্ন হোল্ডারকে (১ম উইকেট) আম্পায়ার ওয়েসলি ম্যালকম হাত তুলে আউটের নির্দেশ দেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলার জিম হিগস এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা হোল্ডারের সম্পর্কে কট বিহাইন্ড আউটের আবেদন জানিয়েছিলেন। হোল্ডার দুবার আম্পায়ার ম্যালকমের দিকে তাকিয়ে অখুশী হয়ে ধীর পদে প্যাভিলিয়নের পথে পা বাড়ান আম্পায়ারের নির্দেশ পাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ ক্রিজে হোল্ডারের দাঁড়িয়ে থাকা এবং বার কয়েক আম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে দেখার ফলে তাঁর আউট হওয়া সম্পর্কে দর্শকদের চোখে সন্দেহের উদ্রেক হয়। এবং তারই ফলে প্রচন্ড বিক্ষোভ। গ্যালারী থেকে মাঠের মধ্যে ইটপাটকেল, বোতল এবং চেয়ার পড়তে থাকে। কয়েক শ' লোক মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পীচের একদিকে গর্ত খুঁড়ে খেলা বন্ধ করার চেষ্টা চলে। বিক্ষোভ এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামাতে পুলিশ আকাশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করে। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক কালীচরণ ১২৬ রান করে আউট হন। টেস্ট খেলায় এটা তাঁর দশম সেঞ্চুরী। ৯ম উইকেটের জুটিতে শিবনারায়ণ (২৭ রান) এবং কালীচরণ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে একঘন্টা চল্লিশ মিনিটে ৯১ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪৩ রান (টুহি ১২২, ইয়ালপ ৫৭ এবং সিম্পসন ৪৬ রান। জুমাদিন ৭২ রানে ৪ এবং হোল্ডার ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩০৫ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। উড ১০ এবং টুহি ৯৭ রান। জুমাদিন ৯০ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২৮০ রান (গোমেজ ১১৫ এবং শিবনারায়ণ ৫৩ রান। লাফলিন ১০১ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৫৮ রান (৯ উইকেটে (কালীচরণ ১২৬ রান)

প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ

ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল পরিচালিত ১৯৭৭-৭৮ সালের প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগের প্লে-অফ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ১৩২ রানে গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগানকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এর আগে তারা ১৯৭৪-৭৫ সালে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্মভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। মোহনবাগান এপর্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোট ১৩বার (এর মধ্যে যুগ্মভাবে তিনবার)।

দর্শক

চার্লসওয়ার্থের সঙ্গে কিছুক্ষণ

অস্ট্রেলিয়ার হকি দলের অধিনায়ক চার্লসওয়ার্থ সম্প্রতি কলকাতায় ঘুরে গেলেন। এসেছিলেন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার্স হকি দলের সঙ্গে ভারত সফরে। চার্লসওয়ার্থ হকি আর ক্রিকেট দারুণ খেলেন। হকিতে তিনি ওলিম্পিকে খেলেছেন, ছিলেন বুয়েনাসএয়ার্সের সদ্যসমাপ্ত বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক।

চার্লসওয়ার্থ ভারতীয় হকি সম্বন্ধে প্রশংসার পঞ্চমুখ হলেও বুয়েনাসএয়ার্সে ভারতীয় দলের খেলা তাঁকে বড়ই হতাশ করেছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, আন্তর্জাতিক হকিতে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরে খেলছেন। কিন্তু এবারের মত এমন দুর্বল দলের মুখোমুখি তিনি আর কখনো হননি। বললেন, এবারের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলটির মধ্যে বিশেষ কোন বোঝাপড়া ছিল না। ফরোয়ার্ডরা এগিয়ে অছেন, ডিফেনডাররা পিছিয়ে। দুই অর্ধের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে কেউ নেই। অর্থাৎ লিংকম্যানের দায়িত্ব কাঁধে নেবার মত কেউ ছিলেন না দলে। তা ছাড়া ভারতীয় দলের রক্ষণভাগ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ফলে কানাডার মত অতিসাধারণ দলও বার বার পেনাল্টি কর্নার আদায় করতে পেরেছে। গোল করেছে। ঠিক উল্টো হয়েছে ভারতের বেলায়। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করায় ভারত দেখিয়েছে অচিন্তনীয় দুর্বলতা। সব কটা খেলা মিলিয়ে ভারত পেয়েছিল চল্লিশটির ওপর পেনাল্টি কর্নার। কিন্তু তা থেকে গোল করতে পেরেছে মাত্র দুটি। চার্লসওয়ার্থের মতে, পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করতে না পারাই ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করতে পারলে এবারের বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতার চোদ্দটি দেশের মধ্যে ষষ্ঠ হয়ে ভারতকে দেশে ফিরতে হত না।

চার্লসওয়ার্থ আরো একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, গোবিন্দর মত খেলোয়াড় যে কোন ভারতীয় দলে ছিলেন না, তিনি ভেবে পান না। গোবিন্দর খেলা তিনি ওলিম্পিকে, কোয়ালালামপুরের বিশ্বকাপে দেখেছেন। তাঁর ধারণা, গোবিন্দর মত খেলোয়াড় বর্তমান বিশ্বে খুব কমই অছেন। তবু গোবিন্দ ভারতীয় দলে ছিলেন না। কেন ছিলেন না সে কথা অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক চার্লসওয়ার্থ জানেন না। আমরা জানি।

কর্মকর্তাদের রাজনীতির শিকার হতে হয়েছিল গোবিন্দ এবং আরো কয়েকজন খেলোয়াড়কে। কয়েকজন স্বার্থসর্বস্ব কর্মকর্তার জন্যে ভারত শক্তিশালী দল পাঠাতে পারেনি বুয়েনাসএয়ার্সে। দলের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরাও দিয়েছেন চরম ব্যর্থতার পরিচয়। খেলার সময় কর্মকর্তাদের মাঠের ধারে কাছে দেখা যেতো না। অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়েছিল যে একদিন একজন খেলোয়াড় খেলার সময় আঘাত পেলে তাঁকে সময়মত প্রাথমিক শুশ্রূষা পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। অন্য দলের কাছে হাত পাততে হয়েছিল। খেলোয়াড়দের খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য সুখ-সুবিধের দিকে পর্যন্ত নজর দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি কর্মকর্তারা। সামান্য ডিমের জন্যে পর্যন্ত খেলোয়াড়দের অভিযোগ জানাতে হয়েছিল।

মনট্রিল ওলিম্পিকে ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে ছয় গোল খেয়েছিল। এবার আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। বিশ্বকাপের আসরে পশ্চিম জার্মানী গুনে গুনে সাতটি গোল দিয়েছিল ভারতকে। এর থেকে লজ্জা, দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আমরা ভারতবাসী, আমাদের কাছে আর কি হতে পারে? বুয়েনাসএয়ার্সে ভারতীয় দল শোচনীয়ভাবে হেরে যাবার পর ভারতীয় হকি সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও এখনো পর্যন্ত ভারতীয় দলের এই রকম শোচনীয় ফলাফলের জন্যে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। অথচ এই জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার। দরকার তদন্তের। কারণ ওলিম্পিকে কিংবা বিশ্বকাপে ভারত গাদা গাদা গোলে হারলেও সমস্ত বিশ্ব এখনো বিশ্বাস করে যে হকি খেলায় ভারত ও পাকিস্তানই শ্রেষ্ঠ। এই দুটি দেশের কাছে তাঁদের অনেক কিছুই শেখার আছে। কলকাতায় খেলতে এসে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক চার্লসওয়ার্থ আমাকে সেই কথাই বলে গেছেন। চার্লসওয়ার্থ-এর মতে, ভারত চেষ্টা করলে এখনো আন্তর্জাতিক হকির আসরে সহজেই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান ফিরে পেতে পারে।

শান্তিপ্রিয়

চিত্রধ্বনি

এ বছরের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার

বছরের সেরা ছবি হিসাবে স্বর্ণকমল পেয়েছে কানাড়া ছবি 'ঘাটশ্রাদ্ধ' (পরিচালনা : গিরিশ কাশরাভল্লি)। এছবির শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষতা সম্পর্কে দ্বিমত ছিল না কারও। ছবিটি আমি দেখেছি। এক কথায় দারুণ ছবি! শ্লোগানের মত সোচ্চারে সমাজ বদলের কথা নেই, কিংবা পলায়নী মনোভাবও নয়, ব্রাহ্মণ সমাজের অপশাসন এবং অমানবিক নিয়মকানুনগুলির প্রতি একটি বিষ-তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তরুণ কাশরাভল্লি দৃঢ়হাতে সেই তীরটি কেন্দ্রবিন্দুতে নিক্ষেপ করেছেন। মালায়লাম ভাষায় সেরা ছবির পুরস্কারটি পেয়েছে আদুর গোপালকৃষ্ণণের 'কোডিয়েট্টম্।' (ঘাটশ্রাদ্ধের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়েছিল) ওঁর আগের ছবি 'স্বয়ম্বরম' ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো লাগেনি, বক্তব্যের চাইতে বলার ভঙ্গিটাও বিসদৃশ মনে হয়েছিল। কিন্তু 'কোডিয়াট্টম'য়ে তিনি অনেক বেশী ধীর, সংযত এবং লক্ষ্যভেদী, তাই সেরা ছবির পুরস্কারটি তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে এখন ঝড় উঠেছে। ভালো ছবি তৈরীর ঝড়। এবারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সেই কথাই প্রমাণ করল। সেরা কানাড়ি ছবির পুরস্কার পেল বি-ভি-কারনাথ ও গিরিশ কারনাডের 'তবলিউ নেনাডে মাগানে' (গোধূলি)। ছবিটিতে নাটকিয়তার প্রাচুর্য আছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে বক্তব্যের সিঁড়ি হিসাবে। এই প্রথম নয়, ওঁরা দুজন এর আগেও একাধিকবার পুরস্কৃত। মারাঠি ছবি জব্বর প্যাটেলের 'জয়েত রে জয়েত'ও (জয় থেকে জয়) প্রমাণ করে তাঁরা পিছিয়ে নেই। বম্বের ব্যবসায়ী ছবির সঙ্গে পাল্লা না দিয়ে সোৎসাহে এগিয়ে আসছে মহারাষ্ট্র।

বছরের সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন কেরালার তরুণ সি অরবিন্দন (কাঞ্চনসীতা)। আঞ্চলিক ভাষার সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে উড়িষ্যা ও আসাম। শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র পুরস্কার পেয়েছে তপন সিংহের সফেদ হাতি।

গায়ক-গায়িকার পুরস্কারটি নিয়ে বিতর্ক ওঠে প্রতি বছর। বিচারকরাও দ্বিধান্বিত হন একটি গানের শিল্পীকে পুরস্কৃত করতে। প্রথামাফিক তবুও দিতেই হয়। এ বছর পেলেন মহম্মদ রফি (হাম কিসিসে কম নহি) ও জানকী (সুইট সিক্সটিন)।

গিরিশ কাশরাভল্লির ঘাটশ্রাদ্ধ

শোনা গেল পনেরজনের এই বিচারক কমিটি উৎসব অধিকর্তার কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন শিল্পনির্দেশনা বিভাগে নতুন পুরস্কার প্রবর্তন করার। বোধকরি 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' ছবিতে ডিটেলসের চোখ ধাঁধানো কাজ দেখেই তাঁরা এবিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। বংশী চন্দ্রগুপ্ত পুরস্কৃত হলেন না বটে, ভবিষ্যতের সামনে সুযোগ রইল এটাও কম কথা নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—যে বাংলা ছবিগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল সেগুলির প্রায় কোনোটাই গুণগত মানে কোনো শ্রেণীপদবাচ্য নয়, কিন্তু 'স্বাতী' ছবিটি কি আঞ্চলিক ভাষায় সেরা ছবির পুরস্কার পাবারও অনুপযুক্ত ছিল?

সফেদ হাতি

বাংলায় বছরে-দু বছরে এক-আধটি শিশুচিত্র যদিও বা দেখা যায়, হিন্দীতে মেলে কদাচিৎ, গত বসেক বছর তাই জাতীয় পুরস্কার তালিকায় শিশুচিত্র ছিল অবহেলিত। এবার পেল। চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি নামক একটি সরকারী সংস্থা এই কাজে তেমন আগ্রহী বা অগ্রণী নয় কেন জানি না।

বছরে তিনশো ছবি তৈরী হয় যে ভাষায়, সে ভাষায় শিশুরা উপেক্ষিত, এর চাইতে খুব ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর আর কি প্রমাণ থাকতে পারে। তাজা তরুণেরাও কেউ এগিয়ে আসছেন না, সবাই পরীক্ষা নামক এক স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত। ফলতঃ অসফল।

সুতরাং লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ পরিচালককেই আসতে হল। কাবুলীওয়ালা আর অতিথির পর আবার তিনি ক্যামেরা ধরলেন ছোটদের জন্য। তপন সিংহ তৈরী করলেন 'সফেদ হাতী'।

এ ছবি তৈরির প্রথম-প্রধান-শেষ লক্ষ্য যেহেতু শিশু আর কচি-কাঁচার দল, তাই নির্দেশককে ছবিটির গঠন-প্রণালীতে, নাট্যবিন্যাসে, ঘটনার স্বাভাবিকতায়, সঙ্গীতের ব্যবহারে, অর্থাৎ প্রতিটি পদক্ষেপেই সাবধানী হতে হয়েছে। কিন্তু এই অতিসতর্কতা কখনও যান্ত্রিক নয়, কখনও থমকে দেয়নি ছবিকে, বরং ভাসিয়ে নিয়েছে ঘটনার স্রোতে।

কিশোর দর্শক মা-বাপহারা শিবুর অসহায় অবস্থা দেখে যেমন দুঃখ পাবে, তেমনি বনের রাজা এক সাদা হাতীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বেও শিহরিত হবে। বাঘ আর শাপের কাণ্ডকারখানাটাই বা তাদের রোমাঞ্চিত করবে না বলি কি করে?

এক নিঃসঙ্গ শিকারী রাজা এসে সাদা হাতীকে বন্দী করতে চাইলে শিবুই যখন বন্ধুর উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে—সেসব দৃশ্যে পুলকিত হবে না এমন শিশু আছে নাকি?

বর্ণপরিচয়ের সাধারণ শিক্ষাগুলি ছবিতে গল্পের আকারে সুন্দরভাবে উপস্থিত। 'সৎ-এর নয়, অসতের সর্বনাশ' —এই শিক্ষার প্রমাণ মামা-মামির সাপের কামড়ে মৃত্যু।

আর রয়েছে জঙ্গলের দুরন্তরোমাঞ্চ সৌন্দর্য। ছুটন্ত হরিণ, সাপে-নেউলের ঝগড়া, কথা-বলা ময়না, তিব্বতের নদী, গম্ভীর বনানী, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বাঘের জঙ্গল, নীল আকাশের চাঁদোয়া, সূর্যাস্তের সিঁদুরে রং, অন্ধকারের সৌন্দর্য (ক্যামেরা : বিমল মুখার্জি) আর ফুটফুটে [illegible]

০ নতুন নাটক ০

সাজানো বাগান

মনোজ মিত্র

মজাব পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৫-৫০

গোলাপে রক্ত

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

সামাজিক পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৫-৫০

মধুরেণ

গৌতম রায়

হাসির পূর্ণাঙ্গ। দুটি নাবী। ৫-৫০

পাহাড়ী বিছে

মনোজ মিত্র

জমাট পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৬-০০

গোরুর গাড়ির হেডলাইট

সরোজ রায়

হাসিখুসির পূর্ণাঙ্গ একটি নাবী ৫-৫০

চিচিং ফাঁক

রাধারমণ ঘোষ

স্যাটায়ার পূর্ণাঙ্গ। দুটি নাবী। ৫-৫০

ব্যভিচার

সমর মুখার্জি

জমজমাট পূর্ণাঙ্গ। পাঁচটি নাবী। ৬-০০

রাজকাহিনী

অমল রায়

সিরিয়াস পূর্ণাঙ্গ। একটি নায়ী। ৫.৫০

বারাববাস

অমল রায়

মঞ্চসফল পূর্ণাঙ্গ। দুটি নারী। ৫-০০

পদ্মপাতায় জল

গৌতম রায়

সামাজিক পূর্ণাঙ্গ। একটি নারী। ৫-০০

সঙ্গীত সেনেব

নাট্যতত্ত্ব ও প্রয়োগ স্তানিস্‌লাভস্কি ও ব্রেশ্‌ট

একটি গ্রন্থে বিশ্বেব দুই মহান নাট্য-তাত্ত্বিক ও প্রয়োগকর্তার শিল্পকর্ম।

১২-০০

প্রকাশ মন্দীর

নাটক অভিনয়

মঞ্চাভিনয়েব জন্য একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রচুব ছবি। সহজ ভাষা। ১৫-০০

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটিব
৫৪।৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩

সফেদ হাতির শিল্পী অশ্বিনী

হাতীটি, যে শিবুকে দেখলেই শুঁড় উঁচিয়ে কখনও ডেকে ওঠে, আদর করে, উল্লসিত হয়, কখনও জল ঝরে চোখে।

একটি পশুব সঙ্গে শিশুর সখ্যতাকে কেন্দ্র করে পবিচালক অর্থগুন্ধু মামা-মামির চরিত্রটিকেও প্রাধান্য কম দেননি, নাটকেব অংকবটি তো ওদের মধ্যেই নিহিত।

ছবির শুরুতেই এক ফিল্ম প্রযোজকের (উৎপল দত্ত) নস্যাৎ-কবা কয়েকটি মন্তব্য এদেশে শিশুচিত্র না হবার কাবণটি প্রকাশ করে দেয়। তরুণ পরিচালক বিজয় অরোরা প্রায় কসরৎ করেই প্রযোজকের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুটিংযে। প্রকৃতিব উদাব লোকেশনে দেখা হয় বাথাল বালক শিবুর সঙ্গে। বিজয় অবোরা শিবুকে ধরেই ছবি করতে শুরু করে। শিবুর জীবনকে বাঁধা হয় ফিল্মেব ফিতেয়। আর তপন সিংহেব ইউনিট অনুসবণ কবে বিজয়কে। ফিল্ম উইদিন ফিল্ম। ঘটনাটা ছোটদেব কাছে অবশ্যই মজাদার।

শিশুরা চিরদিনই ভালো শিল্পী হয়। উপরন্তু পরিচালক যদি হন তপন সিংহ, তখন ভালো কাজ না করে উপায় নেই। প্রধান চরিত্র শিবুর ভূমিকায় তাই অশ্বিনীকে দেখে শিশু দর্শকরা নিজেদের এক বন্ধুকেই খুঁজে পাবে। দিদির চরিত্রে পায়রাও ভালো কাজ করেছে। মামা-মামিব শিল্পী সাধু মেহের ও মালা জগ্‌গি মাটিব গন্ধ গায়ে মেখে নিয়েছেন। শত্রুঘ্ন সিনহা শিকারী রাজার ভূমিকাটি বুঝতে পেরেছেন। আব প্রকৃতিব ভূমিকাটিকে যথার্থ মুন্সীয়ানায় উপস্থিত করেছেন চিত্রগ্রাহক বিমল মুখার্জি। সঙ্গীত বচনা (রবীন্দ্র জৈন) ও সংলাপ (হৃদয়েশ পান্ডে) শিশু মানসিকতাব অনুসারী। ভাষায় ও ছন্দে দোলা আছে। প্রতিটি বিভাগেব সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে একটি পরিচ্ছন্ন হৃদয়গ্রাহী নয়নলোভন শিশুচিত্র উপহার দেবাব প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই তপন সিংহেব। তাঁর কুশলী হাত ও শিশু মনেব অভিজ্ঞতা না থাকলে নীলকমল মুখিজ এমন ছবি দিতে পারত না!

নির্মল ধর

বিকাশ জানার সংযোজন

১৯৭৭-এব শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র হিসেবে 'সফেদ হাতী' জাতীয় পুবস্কাব স্বর্ণ-কমল পেয়েছে। ইতিমধ্যে ভাবতেব নানা রাজ্যে ছবিটি প্রমোদকবমুক্ত। হিন্দি ভাষায় নির্মিত এই রঙীন ছবিটির পবি-চালক, প্রযোজক কলাকুশলী, সংখ্যা-গবিষ্ঠ শিল্পী এই বাংলাব। ছবিটি নির্মিত হযেছে এখানে। অথচ এখনো অব্দি ছবিটি এখানে প্রমোদকবমুক্ত তো হযেই নি, অধিকন্তু অতিরিক্ত হিসেবে ঘাড়ে চেপেছে কালাব সাবচার্জ। ভাবতেব নানা প্রদেশে প্রশংসিত এই ছবিটিকে ইতিমধ্যে এখানকাব অনেক শিক্ষক,ছাত্র, অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবী স্বাগত জানিয়েছেন। আমাব মতে এটি একটি সৎ ও সাহসী প্রচেষ্টা, ছোটদের জন্য প্রকৃত ছবি যখন প্রায় হচ্ছিলই না, সেই সময় 'সফেদ হাতী' আমাদেব সামনে একবাশ আলো নিযে আসে। এটি অসামান্য সৃষ্টি না হতে পাবে, কিন্তু এখানে যদি ভাল ছবি তৈবিব পথ প্রস্তুত বাখতে হয, ছোটদেব জন্য ছবি কবাব আন্তবিক উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাহলে 'সফেদ হাতী'ব মতো ছবিকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। দর্শকেরা যাতে এই ছবিব প্রতি আকৃষ্ট হন প্রযোজক, পবিচালক, পবিবেশকেরা যাতে আবে বেশী করে এগিযে ঝোঁকেন, সে জন্য এই ছবিটি প্রমোদকবমুক্ত হওয়া প্রযোজন, তাহলে অনেকেই দেখাব সুযোগ পাবেন। বাজাবি হিন্দি ছবিব ভিড়ে ছবিটি যেন হাবিযে না যায়।

বিষয : বারবধূ

বিজয় চট্টোপাধ্যাযের প্রথম ছবি 'বারবধূ' সমালোচক কর্তৃক দারুণ ভাবে অভিনন্দিত। অথচ এখনো ছবিটি তেমন করে দর্শকমনে সাড়া জাগাতে পারেনি। প্রথম ছবি হিসেবে এটি পথেব পাঁচালী বা অযান্ত্রিক না হলেও বর্তমান বাংলা ছবিব তুলনায় ছবিটি অত্যন্ত উঁচু-মানেব। তাই বাংলা চলচ্চিত্রকে তাব হাবিযে যাওয়া ব্যক্তিত্ব ফিবে পেতে হলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে নকল-নবীশ না কবে ভাল ছবিব কাবখানা খুলতে হলে সর্ব শ্রেণীর দর্শককে আন্ত

এই ছবির পাশে দাঁড়াতেই হবে। চলচ্চিত্রের স্বার্থেই ব্যবধানের সফল হওয়া প্রয়োজন। এই ছবি যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আগামী কয়েক বছরে কেউ আর সৎ ছবি করার সাহস করবেন না, বলিষ্ঠ বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করার কথা ভাববেন না।

অন্য চোখে

চলচ্চিত্রকার বা চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ইতিপূর্বে পৃথিবীতে অনেক তথ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। করেছেন তাঁদের অনুরাগীরা, কিন্তু তাঁরা নন। আজ থেকে বেশ কয়েক বছর পরে সারা পৃথিবীতে এক চলচ্চিত্রকারকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেবে যখন তিনি বয়সের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন বা অন্য লোকে যাত্রা করবেন। কিন্তু এখন যদি একটা আগাম প্রশ্ন রাখি ঐ তথ্যচিত্রটির নির্মাতা কে হবেন, কাছেপিঠে যত নাম দেখছি, তাঁদের কারুর বিশেষ চিত্র নির্মাণের সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে বলে মনে করি না। কেননা তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যাকে প্রচলিত কোন ফিতেয় মাপা যায় না। শিল্পের এমন কোন শাখা নেই, যেখানে নেই তাঁর অবাধ গতি। তিনি অবলীলায় সেইসব পথ অতিক্রম করেন, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুরূহ। আজকের ভারতবর্ষে তিনি এক অনন্য প্রতিভা। শিল্পের সমস্ত শাখাতেই সমানভাবে চলাফেরা করলেও প্রধানতঃ তিনি নিজেকে এক চিত্রস্রষ্টা হিসেবে মনে করেন। এবং এক চিত্রস্রষ্টার জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে কোন বই-এর চেয়ে ফিল্মই হবে ভাল মাধ্যম। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ছবি করার চেষ্টা, চিন্তা, মানসিকতা, সামাজিকতা, রুচি ইত্যাদি নানা বিষয়েই অনেক কথা বলা হয়েছে, পরেও অনেক বলা হবে। এবং তার কোনগুলোই সম্পূর্ণ বা সার্থক নাও হতে পারে। কেননা এমন এক চরিত্রকে ঠিকমতো আয়ত্ত করার ক্ষমতা কজনেরই বা থাকে। আবেগ নয়, অন্ধ ভালবাসা বা শ্রদ্ধা নয়, আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে চাই স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে—যার দ্বারা আমরা ও আমাদের আগামী সময় বুঝতে পারি যে আমাদের মতো এক মানুষ আমাদের মধ্যে থেকেও কিভাবে কোথায় পৌঁছোতে পারেন, তাই এ ব্যাপারে অন্যের চোখ দিয়ে দেখার চেয়ে তাঁর চোখ দিয়েই তাঁকে দেখতে চাই। নিজেকে তিনি কিভাবে বিচার করেন সে জানাও তো এক অভিজ্ঞতা।

আমাদের প্রস্তাব তিনি নিজেকে নিয়ে একটি তথ্য চিত্র নির্মাণ করুন। (এবং এ যদি হয় তাহলে এটিই সম্ভবতঃ হবে পৃথিবীর প্রথম সেলফ ডকুমেন্টারী) আর ঐ চিত্রটির নামকরণে যেন কোন বিশেষণ না থাকে। শুধু তাঁর নামেই চিত্রটির নাম হোক—'সত্যজিৎ রায়'।

আনন্দ আশ্রম ছবিতে উত্তম-শর্মিলা

কবচকুণ্ডলের মরা চাঁদ

'মরা চাঁদ' কেমন নাটক? এককথায় বলা যায়, অসামান্য, কিন্তু ব্যর্থ। নাটকে এরকম বহু মুহূর্ত আছে, যা ঝর্ণার মতো। কিন্তু সমুদ্রে এসে ঝর্ণাগুলি মিলে যেতে পারে নি।

নাটকটির পটভূমি গ্রাম। কৃষি-ব্যবস্থার গণ্ডগোল, দারিদ্র্য, ধর্মব্যবসা, অন্ধ নায়কের কাছ থেকে স্ত্রীর পলায়ন ও ধর্মগুরু কেতক দাসের কাছে আশ্রয়লাভ, এবং অবশেষে নতুন বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি—খুব ছোঁদো কথায় বললে এই হচ্ছে নাটকের মূল ব্যাপার। এসবের ফাঁকে ফাঁকে আছে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা। আছে, সংগঠন। তবে, প্রথমেই অভিনয়ের কথা বলা উচিত। 'কবচ-কুণ্ডলের' প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী চরিত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলেছেন। জানি না, এ-মুহূর্তে আলপনা গুপ্তার মতো অভিনেত্রী মঞ্চে আর কে আছেন। মাসীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ভোলার জন্য চেষ্টা করতে হবে। জন্মলানীর জন্য নারকোলের শুকনো পাতা টেনে আনা থেকে শুরু করে বোন-ঝি রাধার স্বামী পবনকে জল এগিয়ে দেওয়া-ও অতি নিখুঁত। কোথাও কোনো ভুল তিনি করেন নি। অন্ধ গায়ক পবনের ভূমিকায় ছিলেন অসিত মুখোপাধ্যায়। যাকে আমরা বলি, আত্মভোলা, চরিত্রটি সেই ধরনের। স্ত্রী রাধার সঙ্গে ঝগড়ার দৃশ্যে-ও তিনি স্বাভাবিকভাবে সবকিছু করে গেছেন। রাত্রে পাখির ডাক শুনে পবনের যে চোরাটান ও জ্যোৎস্নায় বৌকে অন্ধভাবে পাবার ইচ্ছা, তাতে অভিনয়ে গণ্ডগোল হতেই পারত। অসিতবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি শেষ পর্যন্ত দৃশ্যটির মর্মোদ্ঘাটনে সহায়তা করেছেন। এবং তিনি সফল। ঐ দৃশ্যে রাধার (পুতুল সান্যাল) অভিনয়-ও অপূর্ব। চরিত্রটি ধরারবরই চাপা, অন্তর্দ্বন্দ্বময়। শেষদিকে এসে ভেঙে পড়েছে। অন্ধ স্বামী ও দারিদ্র্যকে সহ্য করতে না-পেরে কপট ধর্মগুরু কেতক দাসের (বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) আশ্রয়ে উঠেছে। সব সময়েই পুতুল সান্যাল রাধার মনোকষ্টে ও দোটানায় ভুগেছেন। দর্শক তাঁকেও ভুলতে পারবে না। আর, সমাজ সংস্কারক শচীনবাবুর চরিত্রে যা করা সম্ভব, সবই করেছেন অলোক চক্রবর্তী। কিন্তু, এই চরিত্রটিই নাটকটিকে বেশ কিছুটা ডুবিয়েছে। সেকথা পরে বলছি। কোথাও অভিনয়ে কোনো ফাঁকি ছিল না। যদি কেতক দাস ও তার অনুচর ভোলাকে একটু অন্যরকম কিছু করা যেত, তাহলে সবদিক রক্ষা পেত। এই দুটি চরিত্র শুধু মাত্র অভিনয়ের দোষেই টাইপ হয়ে গেছে। এছাড়া অভিনয় সংক্রান্ত ত্রুটি সামান্য। যেমন, ভিক্ষা কেউ বারবার হাতে করে দেয় না। পাত্র উপুড় করে ভিক্ষা ঢেলে দেওয়ার রীতিই বাংলাদেশে আছে। আর, মিটিঙের সময় গ্রামবাসীরা কথা বলতে গিয়ে বারবার উঠে দাঁড়িয়েছে। এটা চোখে লাগে।

নাটকে অবাস্তব দৃশ্য মাত্র দুটি। রাধার চড় খেয়ে পবনের গান গেয়ে ওঠা সত্যিই বেশ ড্রামাটিক। এতোটা না করলেই কি নয়? আর শেষ দৃশ্যটি, যার ওপর নাটকটির প্রত্যাশা ছিল অনেক। যে অন্ধ গায়কের স্ত্রী ঘর ছেড়ে পালিয়েছে,

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনীর পথে।
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়
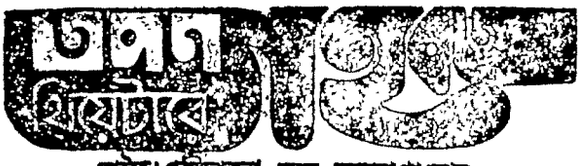
নাটকা-পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেঃ- বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, ঊশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

সেই মুহূর্তে যে বিপর্যস্ত, হতভম্ব ও ভগ্নপ্রায়, যার গলা ভাঙা এবং বুক কাঠ হয়ে আসছে, সে কী করে শচীনবাবু ও গ্রাম-বাসীদের দু মিনিটের অনুরোধে গেয়ে উঠতে পারে 'নতুন বাংলা গড়বো'? এই গেয়ে-ওঠার পূর্ব প্রস্তুতি নেই, সেরকম যুক্তিময় সংলাপ ও আবহাওয়া নেই। তবু পবনকে গাইতে হয়েছে। এটাই নাটকের প্রধান ত্রুটি। বিজনবাবু নাটকটির নাম দিয়েছেন 'মরা চাঁদ।' অথচ বিরাট প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাটকটি শেষ করা হয়েছে। এখানে নাটকের চেয়ে বড় হয়েছে নাট্যকারের বক্তব্য। সে কারণে, আমাদের আর কিছু বলার নেই। তবু, দর্শক কি একটুও ব্যাখ্যা চাইবেন না? শচীনবাবু সংকলিত দৃশ্যগুলি মূল নাটকের সঙ্গে যে মিশে যেতে পারে নি, এটা তো যে-কেউই বলে দিতে পারে। তবু, বিজনবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে এগুলো থেকে গেছে এবং এগুলোর পেছনের যৌক্তিকতা খোঁজার চেষ্টা এ-নাটকে তিনি করেন নি। এতো কথা বলার কারণই হচ্ছে যে, নাটকটির সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। তিনি যা লিখেছেন, তার বেশীর ভাগই তিনি নিজে জানতেন। শুধু শচীনবাবু ও তার বক্তব্যকে নিজের আবহাওয়ায় তিনি আনতে পারেন নি।

নাটকে কটা গান আছে? না-গুনে সহজেই বলা যায়, প্রচুর। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা, প্রত্যেকটি গানই চমৎকার গেয়েছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। দু-একটি গান এতো ভালো যে, দর্শকরা বাড়ি ফিরতে বাসে-ট্রামে গেয়ে ওঠেন। মনে রাখা দরকার যে, সঙ্গীত পরিচালকও বিজন ভট্টাচার্য নিজেই।

আলো, মঞ্চ ও রূপসজ্জায় যথাক্রমে স্বরূপ মুখার্জি, জয় সেন ও শক্তি সেন যথাযথ কাজ করেছেন। শুধু একবার জ্যোৎস্না রাতেও আকাশে চাঁদ ছিল না। হয়তো গণ্ডগোল হয়েছিল কিছু।

নাটকটিতে তিনটি দিক আছে। এক, জমিতে সেচ-ব্যবস্থার অসমতা। দুই, বৈষ্ণব ধর্মগুরুর শঠতা ও শোষণ। তিন, অন্ধ গায়ক পবনের ব্যর্থতা। সব ছাপিয়ে মরা চাঁদটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল পবনের। কিন্তু, তা হয়নি। সমাজ-সংস্কারক শচীনবাবু নাট্যকারের সহায়তায় ঐ কাজটি করেছেন। অথবা, অন্যরকমও হতে পারে। প্রতিটি বাংলা নাটকেই এই চরিত্রটিকে আমরা পাই। বিজন ভট্টাচার্যের হাতে একটি ভালো বাংলা নাটক লেখা হচ্ছে, ইনি আর স্থির থাকতে পারেন নি হয়তো। হুড়মুড় করে নাটকে ঢুকে গেছেন। হতে পারে। তবু, এ-নাটকটি দেখা উচিত। গানের জন্য, অভিনয়ের জন্য এবং এমনকি নাটকের জন্যও। অন্তত, বেশ কিছু ভালো দৃশ্য তো রয়েছে। কবচ-কুণ্ডলের এই নাটকটি দেখতে দেখতে একটা কথা বার বার মনে হয়েছে যে, বিজন ভট্টাচার্য এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। থাকবেন আরো অনেককাল। কিন্তু শুধু 'কবচকুণ্ডল' কেন, অন্যান্য বড় গল্প-গুলোর তাঁর নাটক অভিনয় করতে বাধা কোথায়?

অনন্য শান্তিদেব

শান্তিদেব ঘোষের গান শুনলেই আমার চোখে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় শান্তিনিকেতন-এর লাল মাটি, বর্ষার আকাশ, গ্রীষ্মের তামদগ্ধ ধরিত্রী, বসন্তের ভুবনমোহিনী বাসন্তী রূপের মধ্যে যেমন কবি প্রকৃতি ঈশ্বর এবং সেই সঙ্গে জীবন সত্যটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন শান্তিদেবও তাই-ই পেয়েছেন। শান্তিদেবের প্রকৃতি মানুষ আর ঈশ্বর একাত্ম হয়ে যাবার-বন্দনা করে গাওয়া গান যেন ছুটে যায় শান্তিনিকে-তনেরই মাটি ছুঁয়ে কবিরই বন্দনায়। এ অবশ্য একান্তই আমার নিজস্ব অনুভূতি। এর সঠিক কোন ব্যাখ্যা হয়তো আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

এসব প্রসঙ্গে আসতে হল গত ১ বৈশাখ কলকাতার অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এ শান্তিদেব ঘোষের একক অনু-ষ্ঠানের কথা লিখতে গিয়ে।

বৈশাখের প্রথম দিনটিতে বেদমন্ত্রের ধ্বনি উচ্চারণ এবং নব অরুণোদয়ের জয় ঘোষণায় শুরু হল অনুষ্ঠান। তারপরই বৎসরের ক্লান্ত আবর্জনা সরিয়ে চির-নূতনের ডাক শোনা গেল রুদ্রবৈশাখের আবাহন গীতিতে।

এরপর নাটকের গান। নৃত্যনাট্য আর গীতিনাট্যের গান। একে একে চিরকুমার সভা, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, অরূপ রতন, তপতী, নটীর পূজা, চিত্রাঙ্গদা, বসন্ত, শ্রাবণ গাথা, নবীন, শ্যামা, শাপমোচন এবং শিশুতীর্থের গান গাইলেন শান্তিদেব। বড়ো বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে শুনছিলাম তাঁর গান। সমাহিত অনু-ভূতিতে কখনও আমার রোমাঞ্চ লাগছিল। সুর, তাল, লয়, স্বরলিপির আঁকাবুকি ক্রমেই অস্পষ্ট হচ্ছিল চোখের সামনে। বারবারই মনে হচ্ছিল কালোত্তীর্ণ শিল্পী বুঝি এমনি করেই বারবার ছাড়িয়ে যান নিজেকে। সুর স্বরলিপির ঊর্ধ্বে উঠে পৌঁছে যান অন্য এক রসলোকে। আর সে কারণেই অবলীলায় ছুঁয়ে ফেলতে পারেন সঙ্গীতের প্রাণ-সম্পদটিকে।

শান্তিদেব যখন 'যে আমারে দিয়েছে ডাক' কিংবা 'সব দিবি কে' গাইছিলেন— তখন পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের চেহারা যেন সুস্পষ্ট হচ্ছিল চোখের সামনে। মনে হয় এই নিবেদন রবীন্দ্রনাথেরই চরণে। এ প্রসঙ্গে সদ্য প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিবে-দিত প্রাণ শিল্পী পংকজকুমার মল্লিকের একটি উক্তি মনে পড়ল, —'এতো শুধু গান গাওয়া নয়, গানের ছলে তাঁরই পূজারতি করা।'

এদিনের অনুষ্ঠানে অনন্য শান্তিদেব কয়েকটি অবিস্মরণীয় গান উপহার দিয়ে-ছেন শ্রোতাদের। বিশেষ করে —চলে যায় মরি হায়, কাঁদলে তুমি মোরে, জাগো হে বুদ্ধ জাগো, যে আমারে দিয়েছে ডাক, বইল বলে রাখলে যারে, অমল ধবল পালে লেগেছে গানগুলি। গীতিনাট্যের কথোপকথনের ঢঙএ গাওয়া কয়েকটি গানও শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দেয়। এর মধ্যে কাল মৃগয়ার 'কি বলিলে কী শুনিলাম', বাল্মিকী প্রতিভার 'আহা আস্পর্ধা একি ওদের' এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি, এফ, জে, এ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশান ১৯৭৮ সালের ৪১তম বর্ষে কার্যকরী সমিতির নাম ঘোষণা করেছেন। সভাপতি, —নির্মলকুমার ঘোষ। সহসভাপতি—জনাব বৈসুদ্দিন ফরিদি, শ্রীমতী দত্তর। সম্পাদক—রাগীশ্বর ঝা। সহঃ সম্পাদক—তাপস ব্যানার্জি, অশোক মজুমদার। সদস্য-বৃন্দ, অরিজিৎ সেন, স্বপন মল্লিক, শৈলেশ মুখার্জি, নির্মল ধর, প্রফুল্ল বসু, লখবীর সিং, বীর, ওয়াসিমুল হক, বিভূতি সিং।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা] ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

দারুণ আকর্ষণ !

যুগান্তর এর শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে
প্রচণ্ড লাভ !

কারণগুলো জানলে আপনিও
যুগান্তর এ
বিজ্ঞাপন দেবেন

- যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিলে আপনি অনেক বেশি উত্তর পাবেন। কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে।
- যুগান্তরের বর্তমান কাটতি যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আপনার বক্তব্য সহজেই আরও অনেক বেশি পাঠকপাঠিকার কাছে পৌঁছবে। গত ছ'মাসেই যুগান্তরের দৈনিক প্রচার সংখ্যা বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি।
- বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন। বিজ্ঞাপনগুলি সহজেই নজরে পড়ে। ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

পাত্র-পাত্রী ☐ চাকুরী ☐ জমি-বাড়ী ☐ ব্যবসা-বাণিজ্য ☐ মোটর-গাড়ি
ব্যক্তিগত কিংবা যে কোনও বিষয়ে কম খরচে বেশি জবাব চান তো

যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীপ্সিত ফল পাবেনই

Regd. No. WB/NC-13
ram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 19th May, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুকমী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

17 MAY 1978

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২

পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

উড়ন্ত পরী

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘো
দাম ৭৫ পয়সা
২৬ মে ১৯৭৪

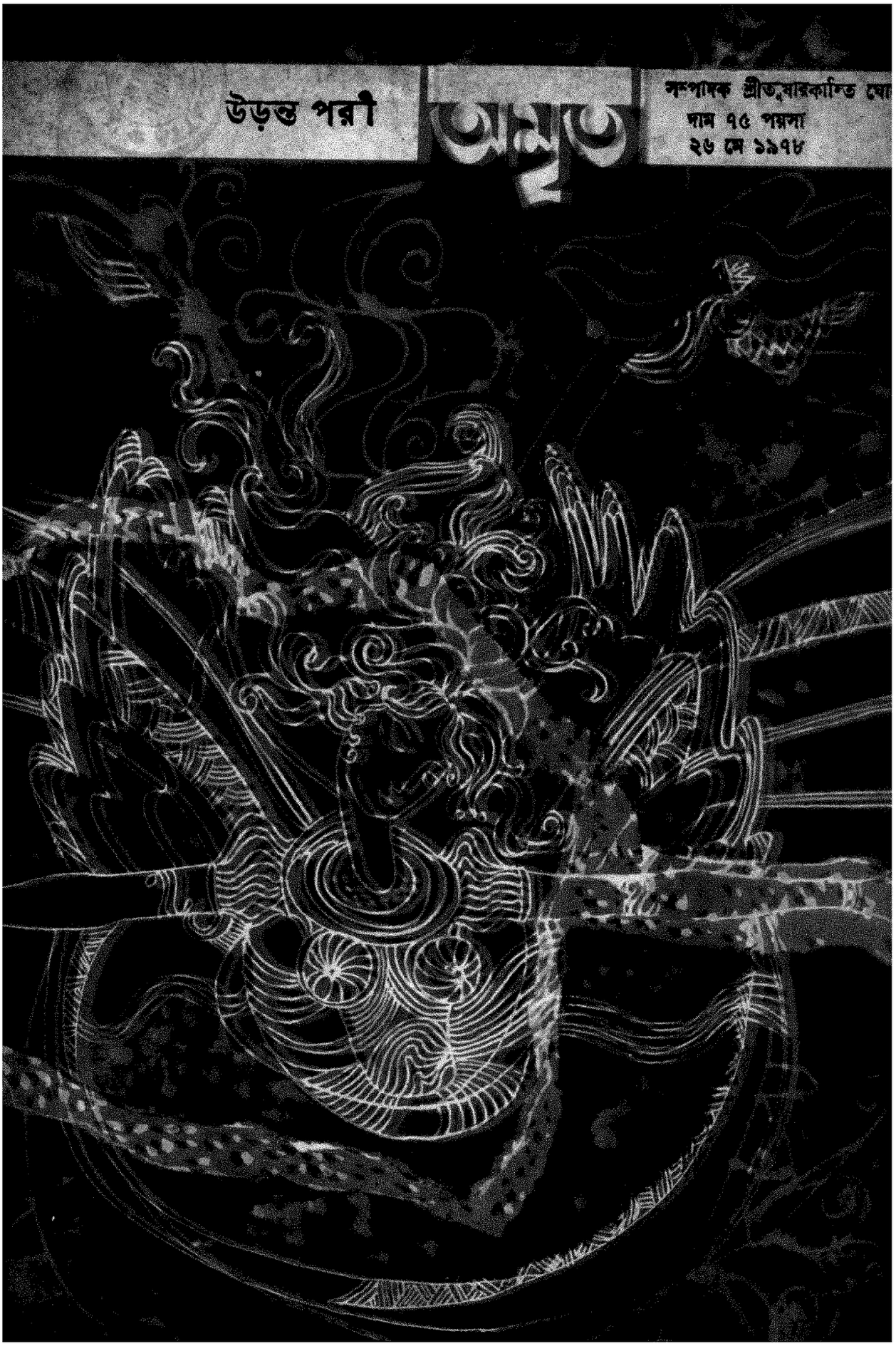

আসল ফরাসী
সৌরভের
মত অনুপম

লাক্মে

ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্ক

একেবারে আসল ফরাসী
ল্যাভেণ্ডারের মত এর
মন-মাতানো সুরভি আপনাকে
সারাক্ষণ আবেশে বিভোর
করে রাখবে—যে সুরভির রেশ
কখনো ফুরোয় না।

ল্যাক্মে -
সৌন্দর্য সাধনায় যাঁরা সবার সেরা

লাক্মে

গোরা রঙ..

তরতাজা ভাব..

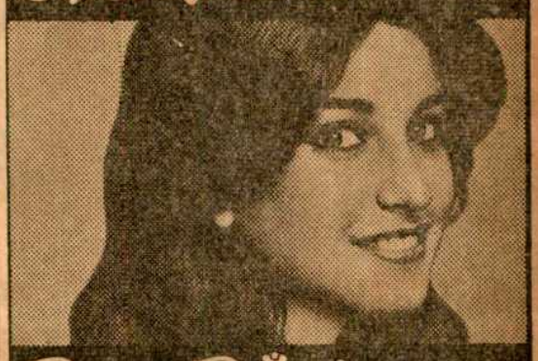

নিদাগ, নিখুঁত !

লাক্মে

ভ্যানিশিং ক্রীম

কত কোমল...
কত স্বাভাবিক—মেক-আপের
মূল বুনিয়াদের এক আদর্শ
উপাদান : ল্যাক্মে
ভ্যানিশিং ক্রীম।

ল্যাক্মে -
ত্বকের পরিচর্যায় যাঁরা সবার সেরা

লাক্মে

daCunha/L-VC/LT/3 h Ben.

কাশীকান্ত মৈত্রের সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ

গণতন্ত্র

মুখোশ ও মুখশ্রী ২৫.

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের নবতম উপন্যাস

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮.

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতিচারণ

বিপ্লবীর জীবনদর্শন ২০.

বাংলাসাহিত্যে বৃহত্তম ও মহত্তম ভ্রমণকাহিনী

শঙ্কু মহারাজ-এর

মধু-বৃন্দাবনে

শ্রীধাম বৃন্দাবনের যাবতীয় মন্দির, স্থল, তীর্থ ও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা; যাবতীয় বন, মথুরা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড; যাবতীয় ঘাট, গোকুল, রাবেল প্রভৃতি পরিক্রমা; শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ষড়-গোস্বামীগণের কথা— আর শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরলীলার কাহিনী। তিন শতাধিক পৃষ্ঠার তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সমাপ্ত। মূল্য প্রতি পর্ব মাত্র বারো টাকা।

শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা ও কৃষ্ণলীলাস্থল অবলম্বনে

এই লেখকের

মন-দ্বারকায় ১২.

শৈলেশ দে'র সার্থকতম রচনা

গান্ধীজী ও নেতাজী ২০.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণকাহিনী

গোমুখীর পথ ১৬.

সুভাষ সমাজদারের নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন :

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ॥ ফোন : ৩৪-৪৩৫৬

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫.

নিরালা পর্বত-সীমার গভীরে এক বিচিত্র পটভূমিকায় দুটি হৃদয়ের ভালবাসা—ঘর বাঁধার স্বপ্ন। এক অকল্যাণের দূত যেন সেই শান্ত জগৎকে ধ্বংস করতে উদ্যত, কিন্তু তমসার বুকে সূর্যোদয়ের মতই অভিজিৎ-এর সত্যানুসন্ধান —তার সাধনা আর স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে। রহস্যঘন অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক এই কাহিনী বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবিতে রূপায়িত হচ্ছে।

এই লেখকের

অভয়ারণ্য ১৫.

গৌড়জন বধূ ১৪.

মুক্তিস্নান ৬.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

শেষবিচার ১৮.

পিতা ও পুত্রকে নিয়ে লেখা এই উপন্যাস পাঠককে সন্ত্রস্ত করে, ভাবায়; এই উপন্যাস আজকের কাহিনী... আমাদের কাহিনী, যার সঙ্গে আজকের প্রতিটি মানুষ অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

এই লেখকের

স্বাতী ও দীপ ১২.

বিশ্বাসের বাইরে ৫.

অমলেন্দু ঘোষের

বিপ্লব ও বিপ্লবী ৮.

নিখিলচন্দ্র সরকারের

সজনে নির্জনে ১২.

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০.

আবদুল জব্বারের

পল্লীর পদাবলী ১২.

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ নঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol.1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক ষ্টোর্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

অমৃত
১৮ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
১১ জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৫
26 MAY, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
প্রচ্ছদ ও দুর্লভ ৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সমালোচনা ৮
কবিতা ১০ রত্নেশ্বর হাজরা
দিলীপ ভড়, কবিবুল ইসলাম
মতি মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব দেব
প্রদর্শনী ১১
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
প্রচ্ছদকাহিনী ১২
উদ্ভব পর্বী
শ্যামাপ্রসাদ সরকার
প্রচ্ছদ এঁকেছেন আদিত্য বসাক
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ১৬
পর্যবেক্ষক
গল্প
পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটার ১৭
অশেষ চট্টোপাধ্যায়
কোথাও নদীর জলে ২৯
রমেন্দ্র রায়
মুখোমুখি বিলায়েৎ ৩৪
তথাগত চক্রবর্তী
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩৮
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
লালবাই-এর দেশে ৪৪
বেথা বড়ুয়া
হৃদয়নন্দন বনে (উপন্যাস) ৪৭
সোমেন্দ্রনাথ রায়
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৫০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
যাঁদের দেখেছি ৫৫ অনন্ত সিং
বাঙলার বাইরে বাঙালী ৫৮
খেলা ৫৯
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়
নতুন উপন্যাস

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

লিখেছেন শৈবাল মিত্র
প্রচ্ছদ কাহিনী
পার্ট টাইম বিনোদিনী
লিখেছেন বোলান গঙ্গোপাধ্যায়
বসন্তগোবিন্দ পোর্দারের গল্প

ভাষাশিক্ষা কি বোঝার মত?

বেশ কয়েক বছর আগে জনৈক পরিহাস-রসিক লেখক বহুপরিচিত সরস্বতী স্তোত্রের খানিকটা অংশ অন্যভাবে লিখে যুগপৎ একই সঙ্গে আনন্দিত ও ব্যথিত করে তুলেছিলেন। মূল অংশটিকে ঘুরিয়ে তিনি লিখেছিলেন, বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ।

বাস্তবিক শিক্ষাসমস্যা এখন যে হারে তালগোল পাকাতে শুরু করেছে, তাতে বিদ্যাস্থানের বিষয়ে কিছু বলতে গেলে তা ভয়ে ভয়েই 'বচ' করতে হচ্ছে। কেননা চলমান এই সংসারে আমাদের লেখাপড়ার সিলেবাস এখন আকাশের বিদ্যুৎ-ঝলকের চেয়েও বেশি চলমান। এমন 'আজ আছে কাল নেই' বিষয় নিয়ে আর যাই হোক স্থায়ী কোনো মতামত তৈরি করা শক্ত।

আমাদের সাম্প্রতিক বিহ্বলতার কারণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একটি মন্তব্য। কয়েকদিন আগে এক আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে তিনি বলেছেন, আজকাল বি-এ ক্লাসগুলোতে ভর্তির হার খুবই কমে গেছে এবং ছাত্রেরা চাইছে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে। কাজেই তাদের সুবিধের জন্যে পরীক্ষার বিষয় হিসেবে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাকে [illegible] করে দেওয়া উচিত। তাতে তারা নির্ভার হবে। ভাষা শিক্ষার চলতি ব্যবস্থাকে ছাত্রদের কাঁধে বোঝার মতো বলে বর্ণনা করেছেন উপাচার্য।

আলোচনার অন্যত্র তিনি নিজেই বলেছেন, ছাত্ররা ইংরেজি কিম্বা বাংলা বেশ কিছুটা আয়ত্ত না করতে পারলে তাদের পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন। এরই জন্যে তিনি ইংরেজি বা বাংলা শেখার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান ছাত্রদের।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আসল সমস্যার কি তাতে সুরাহা হবে? কী উপায়ে ছাত্ররা তাহলে তখন প্রশ্নপত্রের উত্তর দেবে? লিখে উত্তর দেবার দায় থেকে কি তাদের অব্যাহতি দেওয়া হবে?

?

কাগজে যা দেখা গেল তাতে এসব সমস্যার কোনো সমাধানের হদিশ পাওয়া গেল না।

অবিশ্যি উপাচার্য বলেছেন, ভালো করে বিবেচনার জন্যে আরো বেশি আলোচনা করা দরকার। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে নিজে তিনি তাঁর মতামত দিলেন কেন তার আগে? এতে কি বিভ্রান্তির মাত্রাই আরো বেড়ে যাবে না?

একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট, যে-ছাত্রের ভাষার ওপর দখল নেই, তার বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বা অন্য যে-কোনো শিক্ষাই সুসম্পূর্ণ হতে পারে না। ভাষার সাহায্যেই মানুষ চিন্তা করে। ভাষার ওপর দখল যতো কমজোরী থাকে, চিন্তার পরিচ্ছন্নতাও হয় ততো কম। কাজেই কেউ যদি মনে করেন, ভাষা শিক্ষার বাঁধনকে মুক্ত করে দিলেই বিজ্ঞান বা অন্য শিক্ষা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবে, তবে তিনি সঠিক পথে চলছেন বলা শক্ত।

হয়তো এমন হতে পারে, এখন যতো জোর দিয়ে বা যতো ব্যাপকভাবে ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তাকে কমিয়ে আনা দরকার। কিন্তু বাদ দেওয়া নয়। বাদ দিলে ছাত্রদের সামনে উচ্চশিক্ষার রাস্তা হবে চিরতরে রুদ্ধ।

সাহিত্য ইত্যাদি....

লিভিস-এর চিরবিদায়

লোকে বলে ইংরেজদের রাজনৈতিক আধিপত্য গেছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক দাপট সমানই বজায় রয়েছে।

কথাটা এক হিসেবে হয়তো সত্যি। পোশাক-পরিচ্ছদে, জীবনযাত্রার ধরণধারণে, এবং সব থেকে বেশি, ইংরেজি বুলি কপচানোর ঝোঁকে ইংরেজভীতি আমাদের বেড়েছে বই কমেনি।

কিন্তু একটা ব্যাপারে তবু বেশ একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছি। আগে যেমন ইংরেজি ছাড়া অন্য কিছু আমাদের নজরেই পড়তে চাইত না, এখন আর তেমন অবস্থা নেই। চোখের সামনে আজ সারা পৃথিবীর দরজা খুলে গেছে। সব দেশের সাহিত্যের বিষয়েই ওয়াকিবহাল থাকতে চাইছি। তুলনায় বরং ইংরেজি সাহিত্যের দিকের আগ্রহ এখন কম। আমরা ফরাসী জার্মান রুশ স্প্যানিশ সাহিত্যের খবর রাখার জন্যে চৌবঙ্গীর বিদেশী বইয়ের বাজার চষে ফেলি আজকাল। খবর নিই লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার সাহিত্যেরও। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের হালচালের বিষয়ে আশ্চর্যরকম শীতল। খ্যাতনামা সমালোচক ও সাহিত্য জগতের একজন দিকপাল ব্যক্তি লিভিসের মৃত্যু সংবাদও এদেশে তেমন করে প্রচারিত হয়নি। একটিমাত্র ইংরেজি কাগজ ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর বিষয়ে কোনো আলোচনা নিবন্ধও চোখে পড়েনি।

স্বাধীনতার আগে হলে এমন ঘটনা ভাবাই যেত না। তখন ইংরেজি ভাষার তৃতীয় শ্রেণীর কবির রচনাও শুঁটিয়ে শুঁটিয়ে মার্জিনেনোট নিয়ে পড়তে হত। লর্ড টেনিসন তখন আমাদের চোখে বিরাট কবি। শেকস-পীয়ারের চাবিকাঠি তখন এ সি ব্র্যাডলি। আই এ রিচার্ডস নবদিগন্তের দিশারী। উইলিয়াম এম্পসনের নাম আধুনিকদের মুখে মুখে। এবং সর্বোপরি এলিয়ট—তিনি তো তখন সাহিত্য জগতের ঋষিতুল্য পুরুষ—যা বলেন তাই বেদবাক্য।

যাক এসব। আমার আসল আলোচনা ইংরেজি সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে নয়, আর আমি তার যোগ্যও নই, আমি বলতে চাইছি বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্ক রেমন্ড লিভিসের কথাই। তাঁর বিষয়ে বাংলাভাষায় তেমন কোনো উল্লেখ পড়েনি সেটাই আমার পরলা কথা। এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব, এই পণ্ডিত ব্যক্তির বিষয়ে সামান্য কিছু নিবেদন করা।

সত্যি কথাই বলব, আমাদের ছাত্র-জীবনে অর্থাৎ চল্লিশের গোড়ার দিকে, লিভিস ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ভারতের মাটিতে হাজিরহতে পারেন নি। তখন মাত্র একবার, একবারই তাঁর নাম শুনি ধূর্জটিপ্রসাদের কাছে। কিন্তু তাতে কোনো স্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে পারে নি। স্বাধীনতার পরেও অনেক বছর তিনি অবহেলিতই ছিলেন বলা যায়। কিম্বা এটা তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসন। কেননা তখন তিনি এলিয়টকে সমর্থন করাই তাঁর প্রধান কাজ বলে বেছে নিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর অন্য শিক্ষাগুরু ছিলেন রিচার্ডস। ফলে প্রবল দুই সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি চলে নিজে তিনি হয়ে পড়েছিলেন বেশ কিছুটা নিষ্প্রভ।

কিন্তু ক্রমে তিনি আলাদা হতে শুরু করেন। এলিয়টের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রিচার্ডস থেকে তিনি দূরে সরে আসেন। সমালোচনার ব্যাপারে তিনি তাঁর নিজের ভাষায় "কংক্রীট জাজমেন্টস" এবং "পার্টিকুলার অ্যানালিসিস" পদ্ধতির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। বিশ্বাস করতে থাকেন তিনি যে, সমালোচনার কাজ দুটো আসলে পাঠকের সঙ্গে একটি 'ডায়লগ'-এর পথ খুলে দেওয়া। ফলে অচিরেই তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। এবং তাঁর খ্যাতি ঘাঙালি পড়ুয়া মহলেও ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু শুধু পড়ুয়া মহলেই। তার বাইরে নয়। কেননা তা না হলে মৃত্যুর পর বাংলা কাগজে তিনি অনালোচিত থাকতেন না।

লিভিস সম্বন্ধে আমার জানানোর বহর বেশি নয়। দিন কয়েক আগে আমার এক অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় লন্ডন থেকে গার্ডিয়ান কাগজের একটি টুকরো পাঠিয়েছিল। তাতে লিভিসের ওপর তিনটি লেখা বেরিয়েছে। লিভিস যে সত্যিই একজন বড় সমালোচক এবং শিক্ষক ছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে ঐ তিনটি স্মৃতিতর্পণে। ব্যক্তি-মানুষ ও সমালোচক হিসেবে লিভিস ঠিক কী পরিমাণ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় পেয়ে লাভবান হওয়া যায়।

মানুষটি লিভিস ছিলেন বেশ একটু অন্য ধরনের। চট করে তিনি অন্যের সঙ্গে একমত হতে পারতেন না, বরং অন্যের মতকে নস্যাৎ করাই ছিল তাঁর সব থেকে বেশি আনন্দ। তাছাড়া মতামতের ব্যাপারে কোনো আপোসরফাও তাঁর স্বভাবে ছিল না। ফলে সাহিত্য জগতের প্রভাবশালী মানুষদের অনেকেরই তাঁকে পছন্দ করতেন না। এবং লিভিসও বেপরোয়াভাবে তাঁদের সম্বন্ধে শ্লেষ বিদ্রূপ চালাতেন।

যেমন, তাঁর জনৈক সাহিত্যিক প্রতি-পক্ষের কোনো একটি সদ্য প্রকাশিত বইয়ের কথা তুলে কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটা তিনি পড়েছেন কিনা। লিভিস তৎক্ষণাৎ তার জবাবে বলে ওঠেন, ও বই পড়া মানেই তো লেখকের ঐ ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করা!

তাঁর ভেতরে ছিল সিনেমার হিরোর মতো বেশ একটা স্মার্ট ধরনের সপ্রতিভতা, যা তাঁর ছাত্রদের মুগ্ধ করে রাখত। চেহারায় তিনি ছিলেন একহারা ধরনের ছোটোখাটো মানুষ। মাথা জোড়া টাক। বয়স ৮২। কিন্তু পরতেন তিনি চওড়া কলারের বুকখোলা সার্ট। অনেকটা শেলীর ধাঁচে। বয়সকে তিনি আমোল দিতেই চাইতেন না। বছর কুড়ি আগে তাঁর এক সমবয়সী প্রতিপক্ষের বিষয়ে তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, পা মচকে গেলে লোকে যেমন খুঁড়িয়ে চলে, ওঁকে দেখে আমার তাই মনে হয়। বলেই তিনি আবার ভ্রূভঙ্গি করে দেন, আমাদের পরিবারে কিন্তু ষাট বছরে বুড়ো হয়ে যাওয়ার চলন নেই!

ব্যক্তির ব্যাপারে লিভিস ছিলেন চূড়ান্ত রকম নাক তোলা। তাঁর একটা মত বর্তমান লেখকের খুবই পছন্দসই। কয়েক সপ্তাহ আগে 'সমালোচনার' প্রসঙ্গে একই কলমে একবার লিখেছিলাম, ভালোকেই শুধু ভালো বলা নয়, সমালোচকের দায়িত্ব হল খারাপকেও খারাপ বলে চিনিয়ে দেওয়া। দেখছি, লিভিসও ঠিক সেই কথাই বলে গেছেন, তাঁর নিজস্ব স্টাইলে সেটা হল, ইল্ল দি এনিমি অফ বেস্ট।

তাঁর আরো একটা মত হল, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই হলেই অতীতের সমস্ত লেখকের বিষয়েই কিছু না কিছু ভালো কথা বলতে হবে এটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। তিনি এসব লোক দেখানো মিষ্টি কথাকে পাত্তাই দিতেন না। এবং নির্মমভাবে খারাপকে খারাপ বলে চিনিয়ে দিতেন।

যেমন ধরুন, শেকসপীয়ারকে তিনি অসম্ভব রকম শ্রদ্ধা করতেন। অত্যন্ত বিনয় ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি শেকসপীয়ার পড়াতেন। কিন্তু তবু তিনি না বলে ছাড়তেন না যে, ওথেলো আর এন্টনী যা করেছে সেটা ঠিক বয়স্ক ব্যাপার বলে মানা চলে না, সেটা হল বুড়ো খোকাদের কীর্তি।

এলিয়টেরও তিনি ছিলেন অদম্য অনুরাগী। কিন্তু এলিয়টকে অজস্র প্রশংসা করেও একবার তিনি বলেছিলেন, তাঁর সবই ভালো, শুধু এই ব্রায়গার্টার [illegible] গণ্ডগোল আছে। (বলে তিনি আঙুল দি[illegible] নিজের পেট দেখালেন, তারপর [illegible] দিলেন) হয়তো-বা আরো নিচের দিকেও।

এম-এ ক্লাসের ছাত্ররা যে কী মজাই পেত তাঁর এসব মন্তব্যে।

আসলে ছাত্রদের সঙ্গে তিনি সমানে-সমানে মিশতেন। তাদের তিনি সংস্কৃতিবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাইতেন। একটা উন্নত ধরনের রুচি যা কেবল সাহিত্য নয়, সিনেমা, টিভি, খবরের কাগজ এমনকি বিজ্ঞাপনের কপির মধ্যেও কাজ করবে—এইটেই ছিল তাঁর বিশেষ যত্নের বিষয়। তিনি চাইতেন একটা 'গ্রেট কালচার'। এবং এর প্রচারে তাঁর উনিশ শতকী মেজাজ ম্যাথু আর্নল্ডের মতোই তিনি নিরলস।

আশ্চর্য এই যে, এমন একজন জ্যান্ত স্বভাবের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যু আমাদের সাহিত্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই তৈরি করতে পারল না।

অমলেন্দু রায়

প্রচুর ও দুর্লভ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সেদিন প্রাচুর্য সবদিক দিয়েই যেন উছলে পড়েছিল। বড়লোকের বাড়ি, আগেকার আমলের একজন মাঝারী-সেই জমিদার নীলরতনবাবু। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহ, নিমন্ত্রিত হয়ে গেছি।

বাইরে তোরণের ওপর নহবৎখানায় বারাণসী থেকে বায়না দিয়ে আনা কে একজনের নামকরা সানায়ের আসর বসেছে। রেডিওর আগের যুগ, সানাই তখন সকাল-বিকাল-সন্ধ্যার তাঁবেদার হয়ে এত সস্তায় নামোনি, সেখান থেকে নিয়ে মহালের চত্তরটা বিজলী বাতির বং বেবঙের আলোয় ঝলমল, তখন বিজলীও সবে নতুন দেখা দিয়েছে, আজকের মতো গলিঘুঁজি, এমন কি পান-বিড়ির দোকানের পর্যন্ত মান বাড়াতে গিয়ে মর্যাদা হারায়নি।

আর সব কত বকমের সাজ সরঞ্জাম উৎসব বাড়িতে, ধাঁধা লাগে, চোখ ঝলসে যায়।

আরও চোখ ঝলসে গেল, লগ্ন সমযে যখন বিবাহ আসরে গিয়ে বসলাম, ওঁদের সবচেয়ে বড় হলঘরটায় সম্প্রদানের আযোজন। ঘরটা ওপরে বিজলী ঝাড়ে, ব্র্যাকেটে, নীচে বেশম মখমলে সাটিনে একটি যেন রূপকথার বহস্যপুরী। বিজলী পাখা তখন সাযেব বাড়িতে অর্থাৎ বড় বড় সাযেবী দোকানে এসে পৌঁছাযনি। ভালোই হযেছিল ঘরের চারটে দেয়ালে আটজন বডিল উর্দিপরা বেযারা সবুজ সাটিনে মোড়া ব্যাং-ঝালর বসানো অটটা বিরাট বিরাট তালপাতার পাখা আস্তে আস্তে দোলাচ্ছে, তাদের নলতা বাঁশের বাঁটগুলো চেপে।

বিজলী পাখা হলেও মর্যদা এভাবে রক্ষা করতে পারত না, আমি তো বলব বরং ছন্দপতনই ঘটাত।

ঘরের মাঝখানে সম্প্রদানের ব্যবস্থা। একদিকে সোনা-রূপা-কাঁসার বাসনের ছয়লাপ, দানসামগ্রী। কাঁসা নযতো, কাঁসা যেন বলে সোনাকে ছেড়ে আমায় দেখ। অন্যদিকে সাযেব বাড়ি থেকে আমদানি করা নতুন ধরনের ফার্নিচার। দু-একটা নাকি বিলিতি জাহাজ থেকে সদ্য নেমেছে, এও জানের।

এরপরও চোখ ঝলসাবার যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু পূরণ করে দিল নববধূ, আরও ঠিক করে বলতে গেলে যে নববধূ হতে চলেছে। প্রাথমিক অনুষ্ঠান হয়ে গেলে পুরোহিতের নির্দেশে তাকে নিয়ে আসা হল। সেকালের বড়ীমাখা বালিকা বধূ আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে গুটিযে সুটিযে বসেই পড়তে যাচ্ছিল, পিতা নীলরতন বলতে একটু সোজা হযে দাঁড়াল যতটা অমন পরিবেশে সম্ভব; তারপর নীলরতন বললেন—এবার বোস, সবাইকে হাত জোড় করে নমস্কার করে।

এক মিনিট।

কিন্তু সেই একটি মিনিটে যা দেখলাম তার আর জুড়ি পাইনি, হয়তো আর পাবোও না।

পাযের পাঁযজোড় থেকে নিয়ে মাথার মুকুট পর্যন্ত সোনা-রূপা-হীরা জহরৎ মুক্তাষ মুড়ে সালংকারা কন্যাকে সম্প্রদান করছেন নীলরতন—সোজা হয়ে দাঁড়াতে জড়োয়া গযনার দ্যুতিতে ঘরের আলো যেন চার গুন বেড়ে গেল।

জমিদার ঘরের অপূর্ব সুন্দরী মেযে, হীরার দ্যুতির সঙ্গে রূপোর দ্যুতি মিশে সেও কি আশ্চর্য রূপকথা এক!

এরপর আমি যা বলতে বসেছি—অলংকারের বাহুল্যে হীরেরই জযজযকার না? রূপের সঙ্গে মিতালী করে সেদিন আরও তার জযজযকার, কিন্তু সেই একটি মিনিটের এক যুগে আমার যে ত্রিনিসটির ওপর দৃষ্টি আটকে গিযেছিল তা হীরার জড়োয়া নয়, বলতে গেলে হীরার ঠিকরে পড়া প্রভায খানিকটা নিষ্প্রভই একটি মুক্তার কণ্ঠহার।

ক্ষণিকের বিভ্রমে আমার যেন সম্মোহিত করে দিত হারটুকু, ছোটই, যদিও সে ধরনের মুক্তা আর কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। তবে আমার মনে হোল আজকের আসরে আলো অলংকার সব কিছুকে পরাভূত করে আবার সব কিছু সার্থক করল ঐ একটি মুক্তার মালা।

বিস্মিত হযেছি।

পরে ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছি, এমনটা কেন হবে? মণিকুলের রাজা হীরা, তার চটক আছে, দীপ্তি আছে, আসর মাৎ করবার শক্তি তো তারই থাকবে। অপর পক্ষে দীপ্তির কথা বাদ যাক, মুক্তার তো স্বচ্ছতাটুকু পর্যন্ত নেই, মুক্তা অসুন্দর, একথা কেউ বলবে না তবে তার সৌন্দর্য যেন বিষণ্ণ। তারও এক ধরনের একটা দীপ্তি আছে বৈকি, কিন্তু সে দীপ্তি কিসের একটা প্রলেপে যেন আচ্ছন্ন।

এই সূত্র ধরেই আমি সেদিনের ক্ষণিক বিভ্রমের উত্তর পেযেছিলাম শেষ পর্যন্ত। মুক্তার সঙ্গে বিবাহ ত্রিনিসটারই একটা মিল রযেছে। বিবাহের সব উৎসব, সব উল্লাসের ঠিক কেন্দ্রস্থলটিতে কি একটা বিষণ্ণতাই ছেযে নেই? বধূর কথাটাই ধরি আগে—তার নবজীবনের উল্লাসটা কি বেদনাস্পৃষ্ট নয়? একটা সুনিশ্চিত, অভ্যস্ত প্রীতি আদর দিযে ঘেরা জীবন থেকে বিদায় নিযে একটা অপরিচিত, সংশয় সংকুল জীবনের দিকে পা বাড়ানো। যে বিদায় নিচ্ছে, তারপর যাদের বিদায় দিতে হচ্ছে তাদের কথাও।

মুক্তার সঙ্গে বিবাহের এই সাদৃশ্য রযেছে বলেই কি সেদিন আর সব ছেড়ে আমার মন ঐ মুক্তামালাটিকেই জযমালা দিয়েছিল? উত্তরটা যাই হোক, এটা ঠিক সেকালের অবলেপে সে রঙের আর সব অস্পষ্ট হযে এলেও, অনেক কিছু মুছে গেলেও—কিশোরী কণ্ঠের সেই মুক্তার

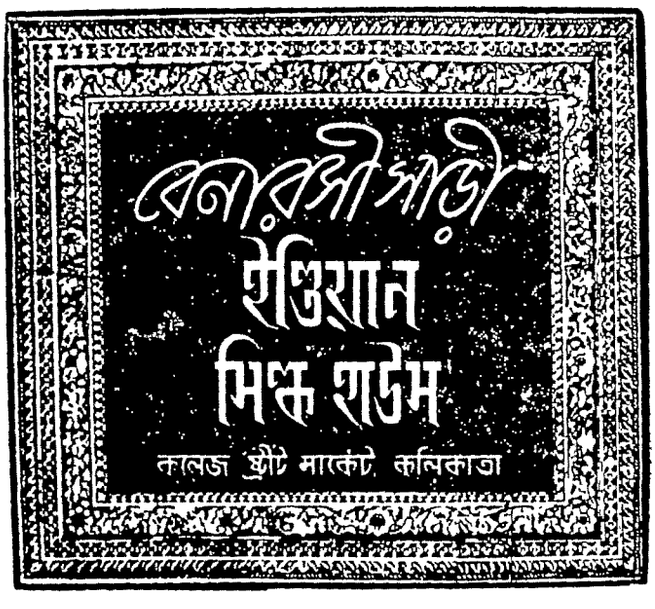

মালাটি বহুদিনই তার অনুজ্জ্বল মহিমায় স্পষ্ট হয়ে থেকে গিয়েছিল আমার স্মৃতিতে।

যতদিন পর্যন্ত না তাকেও আর এক মুকতায় পরাভূত করল তার নিজস্ব সৌন্দর্যে এবার আর মালা নয়, দুটি মুকতা বিন্দু মাত্র, কণ্ঠহারের মুকতার মতো তারা আয়ুষ্মতীও নয়, অতি ক্ষণিক।

তাদের কথা বলি এবার।

কাহিনীটুকুও তাদের মতোই সংক্ষিপ্ত। কাহিনী, না কাব্য বলব? তাহলে একটি সনেট বলাই ভালো, মাত্র আটটি পংক্তির আয়ুতেই নিঃশেষ।

জমিদার বাড়ির বিবাহ মণ্ডপের মতো কিছুই নয়। একটি ছোট, অবহেলিত লাইনের থার্ড ক্লাসের কামরা। গাড়ীটা ধিকতে ধিকতে ছুটে চলেছে। মেঘলা দিনের বিকাল।

গাছপালায় ঢাকা একটি ছোট্ট স্টেশনে গাড়ি এসে থামতে দুজন যাত্রী এসে বসল, একটি আন্দাজ বছর তেরোর মেয়ে, একটি মাঝারী বয়সী স্ত্রীলোক, তার হাতে একটি পুটলি। আমি জানালার ধারে বসেছিলাম, মেয়েটি বসল আমার সামনাসামনি তার পাশে প্রৌঢ়া পুটলিটা পাশে রেখে। এরপর গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলেও পুটলির পাশটায় এসে বসল।

বর্ষা-অপরাহ্নের যাত্রী-বিরল গাড়ি, আমার মনটা কাজের অভাবেই তিনটিকে নিয়ে পড়ল একটু।

নিতান্ত গ্রাম্য গৃহস্থ তিনটি প্রাণী। ওর মধ্যে মেয়েটিরই যা একটু সামান্য সাজগোজ, বাকি দুজন হচ্ছে একটু পরিচ্ছন্ন. তার বেশি নয়, মেয়েটি যেন একটু চপল, মাত্র তেরো বছরের, খেলাঘরের মেয়েই তো। বসায় বাইরের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ায়, প্রৌঢ়ার সঙ্গে উৎফুল্ল দু একটা কথায় বয়েসের চাপলাটুকু বোঝিয়ে আসছে। তারপর গাড়ি চলায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা যেন হঠাৎ থেমে গেল। ক্রমে মেঘলা আকাশের আর পাশের বনের স্নিগ্ধ ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে একটি বিষণ্ণতা নেমে এল মুখখানিতে। একসময় জানলার গায়ে মাথাটা চেপে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইল, সে চপলিকাই নয় আর।

তারপর সেই দুটি মুকতাকণা। হঠাৎ আকাশ লক্ষ্য টানা-টানা চোখ দুটি থেকে নেমে দুটি গালের ওপর জমে উঠল। হঠাৎ চোখ পড়ে আমি সেদিনের চেয়েও মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি এক মিনিটও নয়, কটি সেকেণ্ড মাত্র—তার মধ্যে মুকতা দুটি নিটোল হয়ে উঠেই গাল বেয়ে ঝরে পড়ল, মেয়েটিও আমার দিকে চেয়ে একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠে মুছে নিল চোখ দুটি।

ওকি পুরাতনের কাছে বিদায় নিয়ে নতুনের কাছে যাচ্ছে? কিংবা নতুন যাদের কাছে গিয়ে, যাকে পেয়ে নতুন ধরনের আদর খেয়ে এল, তারই ক্ষণিকের স্মৃতিতে?

কিংবা হয়তো একেবারেই অন্য ধরনের কিছু, হয়তো ছেলেটি ওদের কেউই ছিল না, নতুন করে ঘরে নিয়ে যাওয়ার নতুন মানুষও নয় পুরাতনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোন নিকট আত্মীয়ও নয়।

গল্পটি আমার পূর্ণ করা হয়নি।

তাতে কিছু যায় আসে না। অজানা অপূর্ণ বলেই একটি অকাল সন্ধ্যায় তেরো বছরের একটি মেয়ের অকাল বিদায়ের কাহিনীটিই শাশ্বত হয়ে আছে আমার মনে। আমি জানি তারই জন্য তার চোখের ঝিনুকে হঠাৎ দুটি মুকতা কিছু টলমল করে উঠেছিল।

কালো গালের ওপর দুটি প্রভাহীন মুকতা, কিন্তু সেদিনকার কণ্ঠহারকেও ম্লান করে দিয়ে আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে।

চিঠিপত্র

অনেকেরই নাম বাদ গেছে

গত ২১।৪।৭৮ তারিখে অমৃত পত্রিকায় মণীন্দ্র রায়ের লেখা শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে পড়লাম মনের মত লাগল না শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে উনি আরেকটু লিখলে ভালোই করতেন. শিশু সাহিত্যে উনি এমন সব লেখকদের নাম দিয়েছেন তাঁদের শিশু সাহিত্য থেকে বড়দের সাহিত্যেই নাম বেশী শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে যখন লিখলেন তখন ওনার শিশু সাহিত্যিকদের সম্পর্কেই লেখা উচিত ছিল, অথচ তিনি রবীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, সুনির্মল বসু, আশাপূর্ণা দেবী অন্নদাশংকর রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, যোগেন্দ্র গুপ্ত নরেন্দ্রনাথ দেব ও স্বপনবুড়োর নাম বাদ দিয়ে গেলেন কেন বুঝতে পারলাম না। শিশু সাহিত্যে সুনির্মল বসুর নাম অবশ্যমরণীয় তিনি আজীবন শিশু সাহিত্যেরই সেবা করে গেছেন, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ছড়া নাটক প্রভৃতি লেখার মাধ্যমে অথচ তাঁর নামই বাদ চলে গেল আর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভোম্বল সর্দার বাঙ্গালীর ঘরে প্রতিটি ছেলেমেয়েরা এই বইটি পড়েছেন। তিনি কি করে এই সব দিকপাল সাহিত্যিকদের নাম বাদ দিয়ে গেলেন ভাবতে অবাক লাগে অথচ তিনি একটি নাম করা পত্রিকায় শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে লিখলেন আমার ধারণা এই লেখাটি যদি কোন অভিজ্ঞ শিশু সাহিত্যিক লিখতেন তবে লেখাটি আরও সুন্দর ও বলিষ্ঠ হোত যাক আশাকরি পরবর্তী অমৃততে এদের সম্বন্ধে জানতে পারব।

মানস চক্রবর্তী
যাদবপুর
কলকাতা—৩২

কবিরাই কবিতার পাঠক!

আমি অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত ৩ মার্চ ১৯৭৮-র সংখ্যাটিতে প্রকাশিত সাহিত্য ইত্যাদি বিভাগে কবি মণীন্দ্র রায়-এর কবিতার কথা লেখাটি পড়ে কিছু মন্তব্য না করে আর পারলাম না।

কবি মণীন্দ্র রায় কবিতা কিভাবে হয় এবং কি ধরণের কবিতায় কবি সত্যি করে ঘাঁচেন তার সুন্দর কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রত্যেক সৎ কবিরই তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত। তবে একথা ঠিক কবি এখানে আধুনিক কবিদের সমালোচনার মধ্যে না গিয়েও কবিতার সূত্র হিসেবে গ্রহণীয় কয়েকটি মন্তব্য করেছেন।

আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় তাঁর এই মূল্যবান রচনাটি সম্পর্কে নয়। আমার কয়েকটি প্রশ্ন মাঝে মাঝেই মন থেকে ভীষণভাবে আন্দোলন তোলে—কবিতার সূত্র কি? আধুনিক কবিতা কাকে বলব কিম্বা প্রতিদিন হাজারটা কবির পাঠক কেন তৈরী হচ্ছে না? আসলে কবিরা তাঁদের সৃষ্টি বড্ড বেশি দুর্বোধ্যভাবে প্রকাশ করছেন। পাঠকের মনে কোনো পংক্তি আন্দোলিত হয় না। আবৃত্তির ধ্বনি খুঁজে পান না। সম্ভবত এ কারণেই একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যাঁরাই কবিতা লেখেন তাঁরাই কবিতার পাঠক। কবিতায় তাঁরা কি যে বলতে চান কোন অনুভূতি জাগাতে চান বোধ করি তাঁরা নিজেরাই জানেন না।

আমার হাতের সামনে মণীন্দ্র রায়ের একটি কবিতার বই আমিও তোমারই ঘরে বাংলাদেশ।' প্রত্যেকটি কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে আমার মন বার বার ফিরে যায়। কেন জানেন? বোধকরি অনেক আধুনিক কবিই এর উত্তর দিতে পারবেন না। আসলে এই কবিতাগুলিতে আছে একটি দেশ-কাল এবং তার মানুষের মনের ছবি বাইরের এক বিশ্ব প্রকৃতির অনুভূতি। আর আছে আবৃত্তি করার মতো একটি বিশেষ ছন্দ। যেগুলো পড়তেও ভালো লাগে দুর্বোধ্যও নয়। কবিতা সম্পর্কে আরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলে খুশি হব।

প্রসাদ
আলিপুরদুয়ার কোর্ট
জলপাইগুড়ি

যাত্রার জন্য লেখা হয়নি

কোনো আধুনিক গানে বল্লভ শব্দটি ব্যবহৃত হওয়াতে, ও বিশেষ করে পল্লব শব্দটির সঙ্গে তা মেলানোতে কবি মণীন্দ্র রায় (সাহিত্য ইত্যাদি. ২৮ এপ্রিল) গীতিকার ও যে শিক্ষিত ভদ্রলোক ওই গানটি বেশ দরদ দিয়ে গাইছিলেন তাঁদের উভয়ের উপরই খড়্গহস্ত হয়েছেন। কেননা তাঁর মতে পৌরাণিক যাত্রার ছাড়া বল্লভ শব্দটি এ শতাব্দীতে আর একবারও ব্যবহার করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী গানটি পৌরাণিক নয়। আর বোধহয় যাত্রার জন্যও লেখা হয়নি। অথচ এই গানে বল্লভ শব্দটি শুধু ব্যবহার করাই হয়নি, তাকে পল্লবের সঙ্গে মেলানোও হয়েছে. তব আঁখি পল্লবে দিয়ো আঁকি বল্লভে। গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের না বাঁচারে আমায় যদি মারবে কেন তবে গানটিও শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা বেশ দরদ দিয়ে গেয়ে থাকেন। এ গানেরও শেষ কথাটি মরণদুখে জাগাবে মোর জীবন-বল্লভে।

জয়ন্ত দত্তগুপ্ত
গেস্ট ইন্টার্ণ হোটেল
কলকাতা—৬৯

আমরা উপকৃত হবো

সম্প্রতিই ফেব্রুয়ারীর 'অমৃতে' 'সাহিত্য ইত্যাদি'—পর্যায়ে শ্রীমণীন্দ্র রায়ের মন্তব্যশীর্ণ লেখাটি পড়ে বেশ কিছু ঘরোয়া খবর যেমন জানা গেল, তেমনি ভালো গদ্য লিখিয়েদের ভেতরে যে সর্বদাই এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করে তারও আভাস মেলে। মণীন্দ্রবাবু বাংলা ভাষায় যে কথাশিল্পী-দের নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে বড় গদ্যকার। এবং ধারাবাহিক-ভাবে এঁদের রচনা পড়লে বোঝা যায় ভাষাকে স্থবির বা নির্জিত না রেখে,—সচল গতিশীল ও যথাযথ করতেই ছিল এঁদের সাগ্রহ চেষ্টা। অবশ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিশালী গদ্যকার হওয়া সত্ত্বেও বোধহয় কাহিনী রচনার অসামান্য সক্ষমতার জন্যেই তাঁর গদ্য ভাষা নিয়ে স্বতন্ত্র কোন আলোচনা হয় নি। শৈলী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিও এদিকে পড়ে নি। মণীন্দ্রবাবুও যদি এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের রচনা বিষয়ে তাদের সনে কোন আলোচনা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে লেখেন তবে এই দুই গদ্যকারের পাঠকদের আনন্দ আরও বাড়বে। প্রাথমিকভাবে এঁদের গল্প বা উপন্যাস পড়তে পড়তে কোথাও কোথাও বেশ মিল চোখে পড়ে। যেমন কোন পাঠক 'ডবল ডেকার'-এর পাশাপাশি দিকে সরে এসেছেন। এঁদের বাক্য গঠন রীতি, বিশেষণ-ব্যবহার ইত্যাদিতে ও পরবর্তীকালে আর কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও শুনেছি অচিন্ত্য-কুমারের অন্তিমপর্বের কবিতাকে একটি চিঠিতে প্রশংসা করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু তবুও সেটি আশ্চর্যজনক মনে হয়। কেননা, বুদ্ধদেব বসু যখন 'একদিন : চিরদিন' বা 'স্বাগত বিদায়'-এর তীব্র, চকিত, উদ্ভাস-উজ্জ্বল- ও মিত-গঠিত যে কবিতা-পুঞ্জ রচনা করছেন তার পাশাপাশি অচিন্ত্যকুমার অনেক উচ্ছ্বসিত; তাঁর কবিতার গঠন রীতি খুব নবীন নয়, অতি-কথিতও বলা যায় বোধহয়। একালের সাহিত্য সমালোচকরা যদি এইসব বিষয়ে শৈলী বিজ্ঞান নির্ভর আলোচনা করেন তবে আমরা বড়ই উপকৃত হই।

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়
গোবরডাঙ্গা।

অমৃত সার্বজনীন হয়ে উঠবে

বিগত ৮।১০ বছর আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠক। কিছুকাল থেকে অমৃতের যে নতুনত্ব ও আকর্ষণীয় রচনার সমাবেশ হচ্ছে এজন্য আপনাকে জানাই অকুণ্ঠ অভি-নন্দন।

বিশেষ করে গত কয়েকটি প্রচ্ছদ কাহিনী—১) লোকাল ট্রেনে চলন্ত পৃথিবী ২) দর বাড়ছেই ৩) মদ যদি বন্ধ হয় ৪) ছোট পরিবার সুখী পরিবার ৫) কাজ চাই কলকাতা। ঢাকা ইত্যাদি এই সবগুলি রচনাই সময়োপযোগী।

ধন্যবাদ জানাই অমৃত পত্রিকাকে নতুন-ভাবে ঢেলে সাজাবার জন্য। নতুন ও প্রতি-শ্রুতিপন্ন লেখক লেখিকাকে সুযোগ নিশ্চয় দিতে হবে, তবে যোগ্যতা ও অ যোগ্যতার সঠিক বাছবিচার হওয়া চাই।

গল্পের মধ্যে 'কুয়ো', 'টান', 'নিজে তুমি এসনা', 'রূপকথার দুঃখ', ভাল লাগল।

শ্রদ্ধেয় ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের 'মানুষ বেচাকেনার ইতিহাস পড়লাম খুব ভাল লাগল। এই রচনায় ঐতিহাসিক মূল্য অ-পরিসীম। এমন একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ উপ-হার দেওয়ার জন্য লেখক-কে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

পরিশেষে একটি অনুরোধ যে সমস্ত লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সে সমস্ত লেখার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখবেন। ছাপায় ভুলের দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে আমি সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ জানাই। এইসব ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারলেই অমৃত সার্বজনীন হয়ে উঠবে। কুনাল দে, শিলং, মেঘালয়।

সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়

পরমাণু গবেষণা ব্যাপারে ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি কি তা জানতে স্পষ্টই সাহায্য করবে। প্রবন্ধটির জন্যে তাই ভারত অংশের লেখক সংতর্ষণ রায় ও চীন অংশের লেখক সুধাংশুকুমার ঘোষকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এ রকম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পুরোপুরি তথ্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত মনে করি বলে ভারত-অংশ যে অংকের ভুলটি দৃষ্টিগোচর হল সেইটি তুলে ধরবার প্রয়াসে এই চিঠির অবতারণা।

সংকর্ষণবাবু লিখেছেন যে আকরিক য়ুরেনিয়ামে বিদারণযোগ্য য়ুরেনিয়াম, (য়ুরেনিয়াম-২৩৫)-এর পরিমাণ ০.৭ শতাংশ, আর বাকীটা অর্থাৎ ৯৯.৩ শতাংশ হল সাধারণ য়ুরেনিয়াম (য়ুরেনিয়াম-২৩৮)। তার পরের অনুচ্ছেদে লিখেছেন, একশো কিলোগ্রাম (আকরিক) য়ুরে-নিয়ামের মধ্যে আছে সাতশো গ্রাম য়ুরে-নিয়াম-২৩৫। ১০০ গ্রাম য়ুরেনিয়ামের মধ্যে ৭০০ গ্রাম য়ুরেনিয়াম ২৩৫ আছে। এই অসম্ভব কথা লেখবার সময়ও কি লেখকের মনে খটকা লাগে নি? তিনি ত নিজেই আগের অনুচ্ছেদে লিখে-ছেন ১০০ গ্রাম আকরিক য়ুরেনিয়ামে পাওয়া যাবে মাত্র ০.৭ গ্রাম য়ুরেনিয়াম-২৩৫। এই প্রবন্ধের চীন-অংশ সুধাংশু-কুমার ঘোষ মহাশয় কিন্তু ঠিকই লিখে-ছেন (পৃঃ ১২) প্রতি ১০০০ স্বাভাবিক পারমাণবিক আইসোটোপ (য়ুরেনিয়াম-২৩৮) ভিতর কেবলমাত্র ৭টি বেড়িও-একটিভ আইসোটোপ (য়ুরেনিয়াম-২৩৫) পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকদের তথ্য পরিবেশন একটু দৃষ্টিসজাগ থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়, নয়ত পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি আসতে পারে। সেটা নিশ্চয়ই তারা চান না। —অনিল সোম, রামসেব-পুর।

কিছু ভুল খবর

গত ১০-২-৭৮ তারিখের সাপ্তাহিকে 'বাঘা কিংকেটার পাতৌদি' শীর্ষক ক্রীড়া সংবাদীয় ধারাবাহিক রচনায় একটা ছবি ছাপা হয়েছে। ঐ ছাপানো ছবির বিবরণ যদি লেখক শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় বন্দ্যো-পাধ্যায় দিয়ে থাকেন তবে তাঁরই ভুল হয়েছে। ছবির বিবরণ ভুল ছাপা হয়েছে। আপনারা ছেপেছেন 'পাতৌদি ও তাঁর সতীর্থরা ইংল্যান্ড সফরকালীন নদীতে মাছ শিকারবত'—এ রকম আর কি। ছেলেবেলায় খেলাধূলার ছবি বিশেষত কিংকেট খেলার ছবি সংগ্রহ করতাম। ঐ ভুলটা দেখার পরক্ষণেই বাড়ী এসে পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম আমিই ঠিক। ছবিটা সংগ্রহ করেছিলাম যুগান্তর থেকে। আসলে আপনাদের ছাপা উচিত ছিল

ভাঙা সাঁকোর উপর

রত্নেশ্বর হাজরা

যেমন আছি তেমনি থাকবারও কথা ছিল না আমার। হয়ত কথা ছিল
শ্মশানের পাশে কাঠগোলার মালিক হবো কিংবা কবরখানায়
মৃতদেহ দুষ্ঠনকারীদের একজন—
হয়ত ভার কেটে ট্রেন থামিয়ে রাখব ওয়াগন ব্রেকারদের জন্য
কিংবা কালো জিনিস শাদা করার কায়দা শিখিয়ে দেব
মুখোশ-পরা একদল মানুষকে—।
আমি তেমন কিছু হতে না পেরে হয়েছি এই রকম—এবং এই
যা হয়েছি তার চেয়ে অন্যরকম থাকবারও
কথা ছিল না আমার—

ভাঙা সাঁকোর উপর টলমল করে পা নিচে টলমল করে জল, আর
পাশ দিয়ে কার্পাস মেঘের বাচ্চারা
হৈ-হৈ করে চলেছে ভিন-পাড়ায়—
তাদের গায়ে হাওয়ার জার্সি—আমার গা গতর
সিরসির করে। টলমল করে পা। কেবল কচুরিপানার উপর
শাদা বক সাক্ষী থাকে। আমার
সামনে ইজেলের উপর ক্যানভাস লাগানো বোর্ড
হাতে বড় মাখানো তুলি
মধ্যে এক আলোকবর্ষ প্রমাণ দূরত্বও নয়—তবু কমছে না।

যেমন আছি—তেমনি থাকবারও কথা ছিল না আমার। আমি
কার দিকে তাকাব। কে আর কার দিকে ফিরে তাকায়।
বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড নীলাম হওয়ার শব্দ—তবু,
পরিবেশ বধির। আমার
বকেয়া চুনি করে পালিয়ে যাচ্ছে একদল বকেয়াচোর
জিরাফের পিঠে জিন লাগিয়ে—।
ভালো নেই—তবু এমন থাকবারও কথা ছিল না আমার
হয়ত কথা ছিল
আলপিনের ডগার পদ্মাসনে বসে দেখব ভূমণ্ডলকে—

দেখা হলো

নিশীথ ভড়

হারিয়ে যায় না হারিয়ে যায় না হারিয়ে যায় না মুখ
চিনতে পারে হঠাৎ লোকে, পনেরো বছর পরে।
আবার কবে ঘরে ডাকে, কাঁপতে থাকে বুক
দুই শরীরে বৃষ্টি ভাঙে ঝরঝরঝর স্বরে।

কেমন তাদের বাঁচামরা ? কেমন যাওয়া-আসা ?
সুখ-দুঃখের প্রদীপে তেল, আশা বা নৈরাশ্য—
সব ঝরে যায়, তাও মরে না যে চোখ উৎসুক
ঢেউ তুলে দেয় ঢেউ তুলে দেয় গভীরতম সুখ।

ফুল থেকে ফলে

কবিরুল ইসলাম

তোমার বন্ধুতা পেলে এক হাজার মাইল হেঁটে যেতে পারি।
কেন তুমি মুষ্টি ভিক্ষা আমাকে দেবে না ?

দিলেও, তোমার যা কিছু আছে, যেখানে যেমন, সব থেকে যাবে,
বরং বিদ্যার মতো যাবে বেড়ে, যে রকম বাড়ে
ফুল থেকে অগোচরে ফলের গড়ন

তোমার প্রণয় পেলে এক হাজার মাইল ছুটে যাবো।।

ধারাবাহিক

মতি মুখোপাধ্যায়

টেনে ছিঁড়ে অনো মূল, দ্যাখো
মাটির গভীরে ছিল কোন রস এবং খনিজ
যা' থেকে চিকণ পাতা, দুধলাগা শিশুর মুখের
মতো গোলগাল ডালপালা, সুখ
নামে নীল ফুল সেইখানে ফোটে।

ভিয়েনে নোতুন রস এবং খনিজ
হালুইকর ব্যস্ত থাকে প্রভুর নির্দেশে
অথবা বিজ্ঞানী কোন অন্য মূল জুড়ে
ভাবে, ডালপালা ফুলে আনবে বিপ্লব চেতনা।

আহ্ সেই যন্ত্রণা, ধারাবাহিকতা
সবুজ চিকণ পাতা, নীল ফুল ফোটে।

অঙ্গার

বাসুদেব দেব

এত তাড়াতাড়ি যাবে ? কেন যাবে ?
স্বপ্ন থেকে স্মৃতি থেকে বিষণ্ণতা থেকে
কতদূরে যাবে তুমি ? তোমার ঘুঙুর
অন্ধকারে ক্রমশ গড়ায় শতাব্দীর মাঠে মাঠে

প্রকৃতির মতন তোমাকে
আমিও চেয়েছি চিরকাল
একদিন উঠেছিলে পতাকার মতো
গানের আখর থেকে যুবকের স্বপ্নের চূড়ায়
আজ ঐ রাশি রাশি অক্ষরের স্তূপে
তোমার আলস্যভরা চোখের কাজল
ঢাকা আছে

কথা ছিল ঘাসের ওপর
তুমি পাশে বসে রবে, স্পর্শের বিদ্যুতে
আমার এ অন্ধ চোখে হবে চন্দ্রোদয়
চারদিকে কাগজের কুচি বাদামের খোলা আর
এত তাড়াতাড়ি যাবে ? তবে কেন এলে ?

সমালোচনা

বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্য

যে নদী সাধারণ মানুষের ঘাটের পাশ দিয়ে বয়ে যায় না, যে নদীতে অবগাহনের অধিকার শুধুমাত্র রাজা ও মহারাজাদের, বড়জোর তাদের আশীর্বাদপুষ্ট আরও কিছু মানুষের—সে নদীর জন্ম ও জন্মের মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ লেখা ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্য প্রবাহ আজ লুপ্তপ্রায় হলেও যে ঐশ্বর্য এই নদী প্রবাহ তার দুই কূলে রেখে গেছে, কয়েকটা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার উপকরণ তার ভাণ্ডারে আছে—একথা বললে সম্ভবত অত্যুক্তি করা হবে না। দুর্ভাগ্যবশত সেই খবরটুকু রাখার অবকাশ, ধৈর্য ও জ্ঞানস্পৃহা আমাদের নেই। উপরন্তু আমাদের অধিকাংশ ধারণার সূতিকাগৃহ হল অজ্ঞানতা। তাই সংস্কৃতকে 'মৃতভাষা' আখ্যা দিয়ে আমরা যতখানি পাণ্ডিত্যের বড়াই করেছি—অনন্ত সম্পদের আকর বলে ততখানি মাথা নোয়াবার জ্ঞানও করি নি।

এই দুর্দান্ত গণতন্ত্রের যুগে যখন ভাষা-গোষ্ঠীর সংখ্যার জোরটা খুব বড় জোর এবং যখন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ থেকে এমন দাবী ওঠার সম্ভাবনা নেই যে, যে ভাষা ও সাহিত্যকে অস্বীকার করে নব্য-ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, বিকাশ ও বিস্তার সম্ভব নয়, তার সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের যোগকে আরও ঘনিষ্ঠতর করতে হবে—তখন একজন প্রকাশক ও কয়েকজন সম্পাদকের দুঃসাহসিকতা আমাদের সেই রত্নভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার যে দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাকে সুস্বাগত না-জানালে অন্যায় করা হবে বলে বিশ্বাস করি।

নবপত্র প্রকাশন সংস্কৃত সাহিত্যের সেই রত্নভাণ্ডারে থেকে কিছু কিছু মণি-মাণিক্য অনূদিত গ্রন্থাবলীর আকারে বাঙ্গালী পাঠকদের উপহার দেবার সংকল্প নিয়েছেন। বলা বাহুল্য সংস্কৃত সাহিত্যের সেই রত্নরাজিই প্রকাশকদের লক্ষ্য যা সমালোচক ও কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হিমালয় পর্বত শ্রেণীর সুস্পষ্ট শৃঙ্খলগুলির মত আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে।

কয়েক খণ্ডে প্রকাশিতব্য গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডে আছে অশ্বঘোষ-এর সুবিখ্যাত কাব্য বুদ্ধ চরিত এবং বিখ্যাত নাট্যকার ভাস-এর তিনখানি নাটক স্বপ্ন বাসব দত্তা, প্রতিমা নাটক ও পঞ্চরাত্র-এর অনুবাদ। শুধুই অনুবাদ নয়। সঙ্গে আছে প্রত্যেক কবি ও নাট্যকার সম্পর্কে এবং কাব্য ও নাটক বিষয় বিশদ পরিচয়, আলোচনা ও সমালোচনা। সাধারণ পাঠকের জন্য প্রচুর শব্দ ও সূত্রের বিস্তারিত টীকা দেওয়া আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য মূল সংস্কৃত নাটকটিও বাংলা হরফে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

সব মিলিয়ে কবি ও কাব্য পরিচয়ের এত সুবিস্তৃত আয়োজন আগে কখনও চোখে পড়ে নি। প্রকাশক নিয়েছেন ঝুঁকি, আর সম্পাদকরা করেছেন অনলস পরিশ্রম। দুই মিলে, নবপত্র প্রকাশনের 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার একটি পরম কাঙ্ক্ষিত জাতীয় প্রয়োজন মেটাতে আবির্ভূত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

কাব্য ও নাটকগুলি পড়তে পড়তে আবিষ্কারের আনন্দে অবাক হতে হয়। 'বুধচরিত'-এ কাব্য ও দর্শনের যে সমাহার ঘটেছে, তাকে সংস্কৃত কাব্য বিচারের সূত্রানুসারে কেউ যদি মহাকাব্য না-ও বলেন, মহাকাব্য শব্দটির অর্থগত তাৎপর্য অনুসরণ করে তাকে অবশ্যই মহাকাব্য বলা চলে। ইতিহাস দর্শন কল্পনা অনুমান এবং মহাজীবন উৎসারিত মহিম বাক্যের উৎসারণ—এক যোগে পরিপাক হয়ে যে মহাকাব্যের সৃষ্টি করেছে—তা পণ্ডিত দার্শনিক কবি ও রসিককে আজও অভিভূত করে রাখতে পারে।

এবার ভাসের নাটক প্রসঙ্গে আসি। তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তাই আমরা তাতে যাব না। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জন্মগ্রহণ করে ভাস যে নাট্যপ্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, তা বিশ্বসাহিত্যের যে কোন ভাষার পক্ষে পরম গর্বের বিষয় হতে পারে। আলঙ্কারিকদের বিধান বার বার ভেঙ্গে ভাসই প্রমাণ করে দিয়েছেন, প্রতিভাকে কোন ফ্রেমের মধ্যে আটকে রাখা যায় না। আমরা যারা মধুসূদনের সিন্ধরসের প্রতি অবহেলা দেখে বিস্মিত হয়েছি, তারা হয়ত ভাসের পঞ্চরাত্রির বিষয় শুনলে চমকে উঠবে। সেখানে দুর্যোধন গুরু দক্ষিণার অঙ্গীকার রক্ষা করে পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ দুর্যোধন ভাল হয়ে গেছেন।

স্বপ্ন বাসবদত্তা নাটকে পাঠকের তথা দর্শকের আগ্রহকে প্রতি মুহূর্তে জাগিয়ে রেখে যেভাবে নায়ক-নায়িকার মিলন রচিত হয়েছে—তা আজও অভাবিত অভিনয় সফলতা এনে দিতে পারে। স্বপ্নের ঘোরে উদয়নের সঙ্গে অবন্তিকারূপী বাসবদত্তার ক্ষণিক মিলন ও বিচ্ছেদের দৃশ্যটি অসাধারণ। একটি মিলনান্তক নাটকে সাসপেন্স বজায় রেখে নাটকের পরিসমাপ্তি টানার মধ্যে যে নাট্যক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন ভাস, তা আধুনিক পাঠককে বিহ্বল করবে।

ভাল কাগজ, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে ও সবত্র বাঁধাই দেখে মনে হয় প্রকাশক যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গেই বলেছেন 'আমরা ঘরে ঘরে সংস্কৃতের সাহিত্য সম্পদ পৌঁছে দেব এমনভাবে যাতে সংস্কৃত না-জেনেও সংস্কৃত সম্পর্কে একটা আগ্রহ জেগে ওঠে, আর যাতে বংশানুক্রমে সেই সম্পদ রক্ষিত হতে পারে।'

সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ রঙে ও বিন্যাসে বইয়ের মর্যাদানুসারী।

সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার। সম্পাদক মণ্ডলী : ডঃ সুবীরমোহন সেন, জ্যোতিভূষণ চাকী, তারাপদ ভট্টাচার্য, ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান উপদেষ্টা : ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। নির্বাহী সম্পাদক : প্রসূন বসু। নবপত্র প্রকাশন। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।

গোবিন্দ দাস

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের আবির্ভাব। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে কম-বেশী সমাদরে স্থান পেলেও, তিনি যে আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত কবি তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। অথচ একথা সত্য, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বলতম দিনগুলিতে তাঁদের যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকেই এই কবি বাংলাদেশের এক-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় অশিক্ষিত, পূর্ববাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চলের একজন গ্রাম্য কবির পক্ষে ঐ সম্মানলাভই তাঁর কবিতার জনপ্রিয়তার সূচক।

একদিন সুনাম ও সুফল অর্জন করেছিলেন, অথচ আজ একালের মানুষের কাছে বিস্মৃত প্রায় একজন কবিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ কাজ তো নয়ই—অনেক পরিমাণে দুঃসাহসিকও বলা চলে। কারণ, প্রথমতঃ আধুনিক পাঠককে গোবিন্দ দাসের কবিতার সঙ্গে পরিচয় করানো প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কবির কাব্যের মূল্যায়ন ও কবিতাশক্তির পরিমাপ নির্ণয় করা দরকার। এই দুটি কাজ সুসমাপ্ত হলে, তবেই আধুনিক নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে গোবিন্দ দাসের নবমূল্যায়ন ও নবপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

গ্রন্থকার কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার এই উপেক্ষিত কবিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং সেই কাজটি করার চেষ্টা করেছেন শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে। নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে কুমুদবাবু ভূমিকায় বলেছেন, বর্তমানে যেই

বাংলার শস্যজীবী-কৃষিজীবী সমাজ যখন শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে রত, তখন তাদের সামনে বাংলা সাহিত্যের সংগ্রামী অতীতকে তুলে ধরা প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থকার গোবিন্দ দাসের সামন্ত বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী, সহায় সম্বল-হীন বাস্তুচ্যুত-কৃষকের প্রতি গভীর দরদ ও শোষিত মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি সম্পর্কে অবিচল আস্থা—তাঁর জীবনও কাব্য থেকে আবিষ্কার করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

প্রথম প্রবন্ধে কুমুদবাবু দেখানোর চেষ্টা করেছেন, জমিদারী ক্ষমতা দখলে জাওয়ালের রাজ পরিবারের মূল্য স্বরূপ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তার এই পরিবার প্রতিষ্ঠা পেলে এবং কর আদায়ের ভার পেলে প্রজাদের উপর কি নির্মম হয়ে উঠেন, তার পরিচয় দিয়ে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন ঢাকা অঞ্চলের তৎকালীন ভূমি নিয়ে বিস্তর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জাওয়ালের রাজা ও ম্যানেজারের প্রজা পীড়নের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করেনি, এমনকি প্রতিবাদও না। অথচ ভূমি স্বার্থে তাঁরা যখন নিজেদের বিবেককে সামন্ত প্রভুদের কাছে বন্ধক দিয়েছেন, তখন অল্পশিক্ষিত ও ইংরেজী শিক্ষায় বঞ্চিত স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির প্রলোভনকে অস্বীকার করে কৃষক প্রজাদের সমর্থনে এগিয়ে এসে দুঃসহ লাঞ্ছনাকে বরণ করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং তাঁর 'বান্ধব' চক্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। এই মামলাটি ঢাকা কোর্টের সামান্য কেরানী পদ থেকে, জাওয়াল রাজ্যের সর্বেসর্বা ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। নিযুক্তির অল্পকাল পরেই তিনি যে বিরাট ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছিলেন তাতে কৃষক রমণীর ইজ্জত পর্যন্ত রক্ষা পায় নাই। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকার করতে গিয়েই গোবিন্দ-লাল রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ থেকে ইস্তফা দেন। ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির দিকে না তাকিয়ে এই আপোষহীন অনমনীয় বিদ্রোহী অশক্ত অক্ষম দুর্বল প্রজাদের সমর্থনে এগিয়ে এসে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এক অনন্য মর্যাদার স্থাপন করেছেন। যার ফলে জাওয়াল রাজ্য থেকে তাঁকে চিরনির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আর এই সময়ে বাংলা দেশের আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও বিপ্লবসমাজ যে স্বর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, গ্রন্থকার তার পরিচয় রেখেছেন চতুর্থ অধ্যায়ে। এইখানেই মগের মুলুক কাব্যে গোবিন্দ দাসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়ে ওঠে। এবং ফল কবিকে পেতে হয়। এই কাব্যটির বিরুদ্ধে যেমন মামলা দায়ের না হয়, অন্যদিকে গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্রও চলতে থাকে। পঞ্চম অধ্যায়ে এর বিস্তৃত পরিচয় আছে।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জমিদার ভূস্বামী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক কবি সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে লড়াই যে কত কঠিন কাজ, পদে পদে পর্যুদস্ত হওয়ার যে কি অশেষ সম্ভাবনা—তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে স্বভাব কবির প্রতি বিশ্ববৎসমাজের মনোভাব প্রবন্ধে।

শেষ জীবনে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কবিকে জীবনাতিপাত করতে হয়। বাংলার সারস্বত সমাজ সেদিন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন কবির দিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, ভবিষ্যৎ বংশধররা সেজন্য তাঁদের ক্ষমা করবেন কিনা সন্দেহ কবির জীবনের শেষ দিনগুলির করুণ বর্ণনা আছে সপ্তম অধ্যায়ে।

সব মিলিয়ে চরিত্র শক্তিতে, নিষ্ঠায়, শ্রেণী চেতনায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলায় স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে প্রতি-যোগীহীন দৃষ্টান্ত— মোটামুটিভাবে শ্রীভট্টাচার্য তা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

এতৎ সত্ত্বেও বইটিতে অনেকগুলি ত্রুটি চোখে পড়লো। এই ত্রুটিগুলো বইয়ের সৌন্দর্যকে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। প্রথমত, গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই একটি চাতুরী আছে। সেটি আবার লেখক নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন। উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস এই নামের বইয়ে যদি উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ সম্পর্কে এক লাইনও আলোচনা না থাকে—তাহলে কি বলতে পারি না—নামটা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য রচিত হয়েছে? উনিশ শতকের কি 'মগের মুলুক' ছাড়া অন্য কোনই নিষিদ্ধ গ্রন্থ নেই? লেখকের চাতুরী ধরা পড়েছে যেখানে নিজেই তিনি ইংরেজিতে গ্রন্থের শিরোনাম অনুবাদ করে দিয়েছেন এ প্রহিবিটেড বুক অফ দি নাইনটিন্থ সেন-চুরি অ্যান্ড পোয়েট গোবিন্দ দাস। অনুবাদ কি ঠিক হয়েছে? নাকি ইচ্ছা করেই ইংরেজী এ-র পরিবর্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়নি? দ্বিতীয়ত, লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন 'মগের মুলুক' কাব্যটি প্রকৃতই আদালতের আদেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যের একান্ত অভাব: বিস্ময়কর স্বীকারোক্তি। একটি আনুমানিক ভিত্তির উপর একটি গবেষণা গ্রন্থের নাম-করণ স্থির হয়ে গেল? তৃতীয়ত ১৮৫ পৃষ্ঠার একটি সমালোচনা গ্রন্থে মাত্র ৭৪ পৃষ্ঠা আলোচনা এবং ১১১ পৃষ্ঠা কাব্য সংকলন। আবার ঐ ৭৪ পৃষ্ঠা আলোচনার মধ্যেও অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে কবির কাব্যের উদ্ধৃতি। একমাত্র গবমের আইস-ক্রিমেই টু ইন ওয়ান, থ্রি ইন ওয়ানের নাম শুনেছি। একাধারে গবেষণা ও কাব্য সংকলন পাইনি। তবু বলবো, কুমুদবাবুর আলোচনার মধ্যে মৌলিকতা আছে। দুঃসাহসিক বক্তব্যও আছে অনেক। বইটি সুপ্রচলিত হলে যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়া হবে।

অমলা মুখোপাধ্যায়

উনিশ....শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস। কুমুদকুমার ভট্টাচার্য। পরিবেশক: এ মুখার্জি এণ্ড কোং। ২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা—৭৩ দাম, আঠার টাকা।

অনুবাদ পুরস্কার

বোম্বাইয়ের টেগোর সোসাইটির উদ্যোগেই শরৎ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান কমিটি একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মে-লনের আয়োজন করেছিল (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৪৯তম অধিবেশন)। এই সম্মেলন সংগঠিত হয়েছিল অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের পরিকল্পনায়।

শরৎজন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান পালনের ব্যয় বহনের জন্য কমিটি যখন অর্থ সংগ্রহ করছিলেন তখনই তাঁরা ঘোষণা করেন, অনুষ্ঠান শেষে উদ্বৃত্ত অর্থ কোন বৃহৎ সাহিত্য প্রয়াসেই ব্যয় করা হবে। তাঁরা মনে করেছিলেন এরই ভেতর দিয়ে শরৎ-চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। অনু-ষ্ঠান শেষে কমিটির হাতে ২৪,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে।

কমিটি বোম্বাইয়ের আশী বছরের পুরনো সাহিত্য সংগঠন মুম্বই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহালয়ের সহযোগিতায় একটি জাতীয় পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার গ্রন্থসমূহের জন্য ভাষায় শ্রেষ্ঠ অনুবাদের জন্য এই পুরু-স্কার দেওয়া হবে। উদ্বৃত্ত ঐ টাকা থেকে প্রতি দু বছর অন্তর এই পুরস্কার দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে।

টেগোর সোসাইটি এবং সংগ্রহালয় মনে করেন, ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যপ্রেমী মানুষ অনেকেই তাঁদের প্রতিবেশী ভাষা ও সাহিত্যে কী ঘটছে সহজেই তা জানতে পারেন না। এমন ঘটনার জন্য অনুবাদ, সংস্কৃতির আদান-প্রদানের অভাবই প্রধানত দায়ী। এ অভাব অনুভব করেই মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক এবং চিন্তাবিদ মানে গুরুজী 'অন্তরভারতী' আন্দোলনের সূচনা করেন।

শরৎচন্দ্র ও মানে গুরুজীর স্মৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পুরস্কারের নাম দেওয়া হয়েছে 'মুম্বাই মারাঠী গ্রন্থসংগ্রহালয়— টেগোর সোসাইটি—অন্তরভারতী—শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি ট্রান্সলেসন অ্যাওয়ার্ড'।

বিশদ বিবরণ সংগ্রহের ঠিকানা :— এ আর তারি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, এম এম গ্রন্থ-সংগ্রহালয়, গ্রন্থসংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, বোম্বাই-৪০০০১৪, ফোন— ৪৪-০৩৩১-৩৪

আমি ঘুড়ি ওড়াচ্ছি

প্রদর্শনী

দুটি লিথো ও আঠারোটি ছবি নিয়ে ভবেশ সান্যালের ছবির প্রদর্শনীটি এগারোই মার্চ পর্যন্ত পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি ব্রিটিশ পেইন্টস-এর দোতলায় ছিলো। হলে ঢুকতে, বাঁদিকে প্রথমেই ছিলো এক নম্বর ছবি—আই ফ্লাই কাইট।

ভবেশ সান্যালকে আমি চোখে দেখিনি, আত্মপ্রতিকৃতি কি না বলতে পারবো না। কিন্তু, শেষ মোগল, কাকতাড়ুয়া ও আমি এভাবে, ক্যাটালগের ১ থেকে ৭ পর্যন্ত সমস্ত ছবিতেই একটি চেহারাকে পাওয়া গেল, সে চেহারা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। পাকা-দাড়ি, টাল্ল কপাল, ঘন ভ্রু, ছিপছিপে চেহারার এক তরুণ বৃদ্ধ—ছয় নম্বর ছবিতে বাঁর কাঁধে একটি পাখি বসে থাকে। শুনেছিলাম ভবেশ সান্যালের বয়স আটাত্তর ছুঁয়েছে। ছবি সেকথা বলে না। শেষ মোগল ছবিটিতে ফ্রেম দেবার হিউমার, অ্যামিওর কালার, ইগো নিয়ে তাঁর যুবকোচিত সক্রিয় মাথার ঠাট্টার কথা বলে। পাঁচ নম্বর ছবি, স্রেটিব নাম মউনটেনস অ্যান্ড আই, সেখানেও মাথার পিছনে প্রায়-ওভাল পাহাড়খণ্ড চমৎকার বসেছিল; কিন্তু বুঝতে পারলাম না সে ছবিতে আকাশের দরকার হলো কেন। আকাশ এই ছবিতে একটি অনভিপ্রেত বিলিফ ঘটিয়েছে। চার নম্বর ছবি কসমিক ম্যান। দেখতে দেখতে একটু ভয় আসে—ভয়টা ধরা যায় না। বলা দরকার, কসমিক মানবের হাল্কা বর্ণসম্পাতও ছবিটাকে সাফল্য দেবার গোড়ার কথা ছিলো। কাকতাড়ুয়া আর আমির অপেক্ষাকৃত গাঢ় বর্ণবিন্যাসও প্রথম থেকে ছবিটাকে একটু বেশি স্পষ্ট করে ফেলেছে। এক থেকে সাত পর্যন্ত সব কটি ছবিই এ অর্থে আত্মপ্রতিকৃতিও নয়, আত্ম-বিশ্লেষণের ছবি। আত্মবিস্তারেরও। নিজেকে ঘুড়ি করে উড়িয়ে দেবার ছবি।

আদার আর্থ (৮), রাইস ফিলড (১০) আমার ভালো লাগেনি। তুলনায়, স্কেয়ারক্রো অ্যান্ড দ্য সিজার্স উরোম্যান অনেক বেশি দৃষ্টিরোচক। স্কেয়ারক্রো বা কাকতাড়ুয়া ভবেশ সান্যালের প্রিয় বিষয়—এটা শুধুমাত্র তাঁর ফুডিটি শিল্পকর্মের মধ্যে তিনটি ছবিই এই বিষয় নিয়ে হয়ে উঠেছে বলে বলছি না; প্রত্যেকটি কাক-তাড়ুয়ার উপস্থাপনা তাঁকে বারবার উৎসাহী করেছে। এই ছবিতে কাকতাড়ুয়া বাঙে বাইয়ে-ঘরে এক চাষী রমণী। এর টাল্সপোজেস নিয়ে ছবি।

ছয়নম্বর ছবিতে পাখিটি আমাদের মুগ্ধ করেছিল। মাটিবর্ণের শরীর আর টুকটুকে লাল ঠোঁট আর লাজ নিয়ে একটি ভেতি বৃদ্ধকে সে কোনো ভাষাহীন যুক্তিতে কুপোকাৎ করে ফেলছিল। এবার প্রায়ই দেখতে পাই ভবেশ সান্যালের

ভবেশ সান্যাল

জুগার্ডেন। সোনমার্গের পথে শাদা ঘোড়া সৌন্দর্যে, নিঃসংগতায় পাথরের পাশে থেমে যায়। একটি দার্শনিক বিষণ্ণ বাঘ পাখিদের অত্যাচার মেনে নেয়, রক্তমুখ বানরেরাও হাতীর সঙ্গে একটা সমাঝোতায় আসে। কাকেরা একটি ঘোড়াকে নিয়ে আনন্দ করে। বরং, এই সিরিজে, আঠারো নম্বর দেওয়া কাক ছবিটি খুব নতুন কিছু লাগলো না। ভবেশ সান্যালের ছবির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় ঘটলো—দেখতে পেলাম তাঁর ছবির পৃথিবীতে ঘুড়ি, আকাশ, কাকতাড়ুয়া, জীবজন্তু ও পাখিকে, রঙের আনন্দকে—যা যে কোনো দৃশ্যমান বস্তুকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখে ও দেখায়।

অভিনব

৪ মে, রোববার সকাল দশটায় বিড়লা অ্যাকাডেমির দোতলায় ভীওয়ানি টেকস্টাইল মিলসের ঘরোয়া প্রদর্শনীটি সদ্য গোছগাছ শেষ করলো। শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী কানাইলাল ভট্টাচার্য দশটা দশে পৌঁছলেন। কিছু বলুন—এই অনুরোধে শুভেচ্ছা জানালেন গোয়ালিয়র রেয়নকে—গেভিরার স্যুটিং ও সার্টিংকে। এর মধ্যে, হলে প্রায় একশো পাঁচটি কাপড়ের পিসের ইকেবানা দেখে নিয়েছিলাম। উদ্যোক্তারা সাজিয়েছেন এমনভাবে যাতে কোনো একটিও দর্শকের চোখ, মনোযোগ না এড়িয়ে যায়। বাইশ টাকা ষাট-এর চাঁপা রঙ শার্টিং-এর কাপড় থেকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সার স্যুট-পিস পর্যন্ত দামগুলো নানাভাবে পালটালেও, প্রত্যেকটি জিনিসের বস্ত্র, রঙের রুচি আর সাজাবার দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে একটা হার্মনি প্রত্যেকেই টের পাচ্ছিলেন। সাধারণত কাপড়ের দোকানে গেলে প্রতি উৎসাহী মহিলা ছাড়া প্রত্যেকেরই মাথা ধরে। উদ্যোক্তারা এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। যে কারণে, যাঁরা একেবারেই ফ্যাশানেবল্ নন, তাঁরাও হলটিতে তিন-চারবার করে ঘুরছিলেন। একজন ফটোগ্রাফারকে দেখলাম, বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়াও, আয়োজনের গুণে প্রায় শিল্পবস্তু করে তোলা এই প্রদর্শনীর আলোকচিত্র তুলে নিচ্ছেন ঘুরে ঘুরে। পাশের ঘর থেকে লঘু হিন্দি গান ভেসে আসছিলো, যুবক উদ্যোক্তারা মাঝে মাঝেই সুগন্ধি জল স্প্রে করছিলেন ঘরের বাতাসে। অথচ, সাজাবার জন্যে যে খুব বেশি আড়ম্বর করা হয়েছিলো তা নয়। ডেকরেটর-এর মধ্যে, শোলার স্লেটে শোলায় লেখা করেকটি স্লোগান। টোটালি নিউ রেঞ্জ—দ্যাট স্যুটিং সেটস্ দা টেনর্ড—মেক দা বোর বাই—নমনীয় রঙের কাপড়ের মধ্যে থেকে এগুলিই একমাত্র কথা বলে যাচ্ছিলো। একজন বললেন, আশ্চর্য লাগছে এতোগুলো পিস একসঙ্গে থেকে তো স্টাফড্ লাগছে না? তাহলে ইজ এনিবডি বিহাইন্ড—যিনি পুরো পরিকল্পনাটা করেছেন? উদ্যোক্তারা তাঁকে কেউ কেউ ঘিরে ছিলেন কিন্তু কোনো একজনের নাম তাঁরা করলেন না এই প্রশ্নের জবাবে।

আস্তে আস্তে হলটি ভর্তি হয়ে যাচ্ছিলো। যিনি এসে প্রায় আমার পাশেই দাঁড়ালেন, তিনি একজন যুবক, পরনে জিনস্। ডিপ ব্লু, হিপপকেট ও অন্য কতকগুলো লাইনিং লালে এমব্রয়ডার্ড। হঠাৎ একটা তালভঙ্গের অভিজ্ঞতার মতো লাগতে, খুব খুঁটিয়ে আমি আমার চোখের সামনে মেলে রাখা গেরু-রঙে হাল্কা খয়েরি স্ট্রাইপ দেওয়া স্যুটিংটির দিকে তাকিয়ে তাঁর অ্যাগ্রেসিভ জিনসের দিকে আবার তাকালাম। এই জিনসটির রঙ নীল হলেও একটা অনভিপ্রেত বিদেশী হওয়ার ধাক্কা দেয়—গেভিরা স্যুটিং ও শার্টিং এই ধাক্কা দেওয়াটাকেই বরবাস্ত করেছে। ভীওয়ানি টেকস্টাইল মিলস-এর মূল স্লোগান হলো পরিচ্ছদের বর্ণসুষমা, আর এই সুষমাকে আনবার জন্যে তাঁরা এটাও বুঝে নিয়েছেন যে, গরমের দেশে চড়া রঙ কখনোই শেষ কথা হতে পারে না। তাঁদের প্রদর্শনীতে টাঙিয়ে রাখা ও কাউন্টারে ডাঁই করা কোনো একটিও পিসের রঙ—তা সে একরঙা হোক বা নানা স্ট্রাইপ থাকুক, উদ্ধত আক্রমণাত্মক নয়। মডারেট। এই কারণে, চোখ কোথাও কষ্ট পায়নি। শঙ্কিত বোধ করেনি। চোখের শুশ্রূষা হয়েছে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

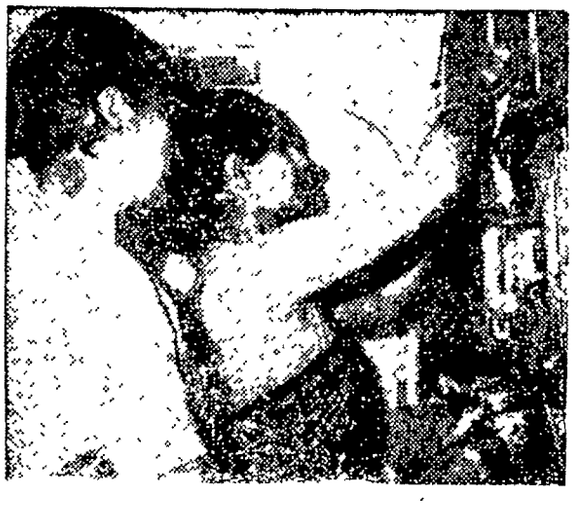

উড়ন্ত পরী

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

যেন বেহস্ত থেকে উড়ে আসা একদল হুরীপরী। যেমন রঙ তেমনি বাহার। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় নীল কাপেটে মোড়া রাতের আকাশের তারাফুলের বাগান থেকে দলছুট হয়ে কয়েকটা ফুল এসে ছোটাছুটি করছে এই আকাশ পাখির বুকে। তোমরা এদের কি বল, বেহস্তের হুরী না আসমানের পরী ?

প্রশ্নটি ছিল সদ্য এদেশে আসা এক আরবযাত্রীর। বোম্বাইয়ের সান্তা ক্রুজ বিমান বন্দরে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রথম পর্বেই তিনি এই প্রশ্ন রেখেছিলেন আমার সামনে। আর দমদম থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের ফকার ফ্রেণ্ডশীপে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া একদল যাত্রীর মধ্যে এক ইতালীয় তরুন জোড়হাট বিমানবন্দরে নেমে বিমানসখী রত্না রায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ও মেয়ে তোমার দুচোখে আমি এসব কি দেখছি। আমার ভারত দর্শন কি এখন হবে শুধু তোমার চোখের সাধনায়।'

রত্নার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছিল। চোখের পাতা ভারী ভারী। দ্রুত চলা পা দুটো ফ্রিজ শটের মত পাথর হয়েছিল মুহূর্তে এবং সেই সুযোগে হাতের কাগজে তরতর করে ছুটলো পেন্সিল। ইতালীয়ান তরুণ এঁকে ফেললেন রত্না রায়কে। ছবির নীচে ইতালীয় ভাষায় বন্দনা- গান রচনা করলেন। তারপর সেটি রত্নার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই বিশাল পৃথিবীতে তোমার সঙ্গে আবার কোনদিন কোথাও আমার দেখা হবে কিনা জানি না তবে এই ছবিটুকুই তোমায় উপহার দিয়ে গেলাম। বিদায় মেয়ে বিদায়।'

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমানে যাঁরা বিমানবান্ধবী হয়ে উড়ন্তপরীর মত সারা ভারত দাপিয়ে বেড়ান তাঁদের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আকছারই হয়। বয়স যাঁদের বেশ অল্প স্বপ্ন আর বাস্তবের সীমান্ত ঘেঁষা তাঁরা পড়েন বিপদে। বিপদ হলো অভিজ্ঞতা জাচাইয়ের কাজটা। সব মানুষই তো সমান ভাল নয়। বা সমান খারাপ কিন্তু ভাল লাগার কথা বোধ হয় সবাই সমান ভাবে বলে। যাতে অন্তত ছোঁয়া যায়। এ কথাগুলি বীতা গাঙ্গুলীর। এক ঝলক স্নিগ্ধতা তাঁর চোখে মুখে। হাল্কা সিনগ্ধ শরীর। গায়ের রঙে গাছের ছায়ার শ্যামলিমা। বীতা বলেছিলেন তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। ছেলেবেলা থেকেই আকাশে ওড়ার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু ডানা ছিল না গায়ে। পিসতুতো দাদা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতেন, রীতা সত্যি তুই কোনদিন আকাশে উড়তে পারবি ? রীতা কোন জবাব দেননি তখন। শুধু মনের কোণে বাসনার আগুনটা জ্বলেছে ধিক ধিক করে। বাবা কালিদাস গাঙ্গুলী চামড়ার ওপর বাটিকের কাজ বসানো জিনিস তৈরীর ব্যবসা করলে কি হবে ছেলেমেয়েদের তিনি স্বাভাবিক গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসাতে দেননি। দু ভাই জ্যোতিপ্রকাশ আর প্রতাপ জাহাজে রেডিও অফিসারের কোর্স করছে, ছোটবোন শিখা পাইলট হবার আশায় ইতিমধ্যে নশ্বই ঘন্টা আকাশে উড়ে এসেছে। সেন্ট টেরেসা থেকে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট কোর্স করে গোখেল থেকে প্রি-ইউ। বি-এ পড়তে পড়তে চোখে পড়ে ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনসের বিজ্ঞাপন। এর মধ্যে আড়াই বছর জাপানী ভাষায় নিজেকে রপ্ত করতে ছাড়েননি রীতা।

খুব সহজে বিমানবান্ধবী হবার সৌভাগ্য তাঁর সামনে সহজেই এসে পড়েনি। ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনসের কন্ট্র-রুমে বসে রীতা বলছিলেন, চোখ ছলো ছলো হয়ে আসছিল, চাকরিটা পেতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে। বার বার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের অফিসের সামনে দিয়ে ঘুরে যেতাম। আমার জীবনে আদর্শের মত ছিলেন তখন এলমিক ফ্রান্সিস। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বিমানবান্ধবী। তিনিই আমার জীবনে প্রথম জীবন্ত এয়ার হোস্টেস। আমার ব্যর্থতার কথা শুনতে চাইতেন না এলমিক। দেখা হলেই বলতেন, বীতা, উঠে পড়ে লাগো, কোন কিছুতেই ভয় পাবে না, দেখবে তুমি সত্যি সত্যি একদিন কৃতী এয়ারহোস্টেস হতে পেরেছ।' সব ঠিক হয়েও এক পাউণ্ড ওজন কম বলে আমি আটকে গেলাম।' এলমিকের ভরসা বুকের মধ্যে। সোজা চলে গেলাম আঞ্চলিক অধিকর্তা জি ডি মাথুরের কাছে। তিনি বললেন, কোন ভয় নেই রীতা, কাল থেকেই তুমি কাজে যোগ দাও।

খুশীর আনন্দে সারা রাত ঘুম হলো না আমার। মোমিন-পুরের যে দিঘীতে সাঁতার কাটি তার কালো জলে স্বপ্নের মধ্যেও যেন চোখ ভাসালাম।

বীতা বললেন, বাড়িতে মা, বাবা ও কাকার ভয় ছিল। কাগজে বিমান দুর্ঘটনার খবর অনেক পড়েছেন। তাই বাড়ির মেয়েকে

সে-কাজে দিতে তাঁদের মন টানছিল না। রীতার বিশ্বাস সাধারণ স্নাতক হয়ে আজকের পৃথিবীতে এমন কি-ই বা করা যায়। তার চেয়ে বিমানবান্ধবীর কাজে অনেক বেশি ভবিষ্যৎ। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি আকাশে উড়লাম আমি। অবজারভেশান ফ্লাইট। ডাকোটা, ফ্রেন্ডশীপ ও ভাইকাউন্টে। প্রথম দিন ডাকোটায় কলকাতা থেকে জামসেদপুর। বিমানের পাইলট ক্যাপটেন আশিস ব্যানার্জি দারুণভাবে গড়ীত করলেন আমাকে। অদ্ভুত ড্যাক ড্যাক শব্দ করতে করতে ডাকোটা আকাশে উড়লো। একসময় তাকিয়ে দেখি আমার পরিচিত শহর কলকাতার মাথার ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি। জামসেদপুরে নামার আগে আকাশ থেকে দেখতে পেলাম টিসকো কারখানা। মনে হচ্ছিল শিল্পী বজ্রগোপালের আঁকা কোন স্কেচ দেখছি যেন। ভীষণ থ্রিলিং।

বিপদের অভিজ্ঞতা যদি জিজ্ঞাসা করেন, রীতার দৃষ্টি সরাসরি আমার মুখের দিকে, প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি এক অ্যাড্রো সার্ভিসে গিয়ে। সেটা ছিল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের কলকাতা-ভুবনেশ্বর-ভাইজাগ-বিজয়বাড়া-হায়দ্রাবাদ ফ্লাইট। কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর পার হয়ে আমরা ভাইজাগের আকাশে উড়লাম। নীল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ঘন কালোর জাফরি। ভাইজাগ বিমানবন্দরের আকাশসীমায় এসে হঠাৎ বিমানটা কেঁপে উঠলো বাঁদিকে। যেন চলন্ত যন্ত্রের কোন পাখা ধাক্কা খেল জোরে। দস্যু হাওয়ার মুখোমুখি। এয়ারপকেটে পড়লে যেমন হয় বিমানটা হঠাৎ ভীষণ নিচে নেমে এলো। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় কম্যাণ্ডার বিমানকে আরও নীচে নামিয়ে আনলেন। আমি জানলা দিয়ে বাঁদিকের ডানায় চোখ রাখলাম। দেখি এঞ্জিনের (ডানার মূল অংশ) প্রায় ভাসা অবস্থায় ঝুলছে বিমানের গায়ে। হিম হয়ে এল শরীরের সব রক্ত। তৎক্ষণে বিমান আমাদের ভাইজাগ বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করেছে।

রীতা একটু থামলেন। আমাদের সামনে বসে দুই পাইলট। ক্যাপটেন নিমডি ও ক্যাপটেন আগরওয়াল। তাঁদের দিকে তাকিয়ে রীতা আবার সরব হন, বিপদ এবং ঝুঁকির পাশে পা রেখেই আমাদের উড়ে চলা। তবু তার মধ্যেই যখন সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে কোন অজানা অরণ্যের পাশ দিয়ে ছুটে যাই তখন যেন প্রকৃতিকন্যা মনে হয় নিজেকে। আন্দামান তাই আমার প্রিয় দ্বীপ। সুযোগ পেলেই ছুটে যাই পোর্ট ব্লেয়ার সার্ভিসে। ভূগোল পড়তে আমার অসম্ভব ভাল লাগতো। আন্দামানের পাড় দিয়ে উড়ে যেতে যেতে গভীর সমুদ্র কেমন করে হাল্কা হতে হতে বেলাভূমির কাছে নেমে তাও দেখেছি বার বার। পোর্ট ব্লেয়ারে সবাই মিলে দল বেঁধে সমুদ্র-স্নান আমার কাছে তীর্থ স্নানের মত মনে হত। হিমালয়ের প্রান্ত-সীমা দিয়ে উড়ে গিয়ে শ্রীনগরে নামতে ভাল লাগে আমার। কাশ্মীর অরণ্য, পর্বত আর ডাল-লেক নিয়ে আজও আমায় ডাকে।

স্মিতা গোপালের উপাখ্যান

আমার নাম স্মিতা গোপাল। বয়স বাইশ বছর ছ' মাস। জন্ম লক্ষ্ণৌতে। প্রথম লেখাপড়া ওক গ্রোভ স্কুলে, দেরাদুনে। দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজ থেকে স্নাতক। বিষয় ছিল মনস্তত্ত্ব। ছেলেবেলা থেকেই মানুষ আমাকে টানে। মুখের অবয়ব জীবনের স্বাদ পাই। বাবার রেলের চাকরি। বদলীর সুযোগ নিয়ে দেশ দেখা আর মানুষকে জানতে অসুবিধে হয়নি আমার। ত্রিবেণী বরকাকানার জংশন স্টেশন দেখেছি আমি। কেমন করে একটা লাইন গেছে ডালটনগঞ্জ ডেরি-অন-শোনের দিকে, আরেক দিকের রেলপথ চোটামুরী-টাটা-হাওড়া। তৃতীয়টি রায়লাপরা মহুয়া মিলনের দিকে। ম্যাকলুস্কিগঞ্জের প্রকৃতি ও মানুষের সখ্যতা মুগ্ধ করেছে আমাকে। বাবা যখন কলকাতার বদলী হয়ে এলেন তখনই আমি নিজেকে মনে মনে তৈরী করে নিই একটা কিছু করবো বলে। খুব বেশি পড়াশুনা করতে মন চাইছিল না। তাই বিমান বান্ধবীর কাজ আমার কাছে রিলিফের মত মনে হল।

বই পড়তে ভালবাসি ছেলেবেলা থেকেই। সেই অভ্যাস আজও আছে আমার। ইংরেজি ছবি সবচেয়ে বেশি টানে আমাকে। নির্বাচিত হিন্দী ছবি দেখি। সাম্প্রতিক হিন্দী ছবির মধ্যে অংকুর, নিশান্ত এবং স্বামী ভাল লেগেছে আমার। সত্যজিৎ রায়ের 'সতরঞ্চ কি খিলাড়ি'র আশায় বসে আছি। কবে রিলিজ করবে বলুন তো এদেশে?

বিমানবান্ধবীর কাজ আমার কেমন লাগছে, বলছি শুনুন, দারুণ, মোস্ট ইন্টারেস্টিং। আকাশে ছত্রিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে যখন অন্য শহরের দিকে উড়ে চলি তখন আমাদের বিমানের প্রতিটি যাত্রীকেই আমার আকর্ষণীয় মনে হয়। মনস্তত্ত্বের ছাত্রী আমি। কারুর মুখের দিকে তাকালে এক লহমায় টের পাই, ভদ্রলোকের ব্যবসায় বোধ হয় জোয়ার ভাঁটার টান চলছে। কোন সফল প্রেমিক জানলা দিয়ে দূরের মেঘের দিকে চেয়ে তাঁর প্রেমিকার মুখচ্ছবি দেখতে মগ্ন, পাশ দিয়ে চলে গেছে যেতে যেতে আমার দৃষ্টি আবার এক অন্য মহিলার দিকে যিনি অপেক্ষা করে আছেন এমন এক বিমান-বন্দরের যেখানে তাঁর দয়িত প্রতিটি বিমানযাত্রীর মধ্যেই তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বোধহয়?

বিপদ?

ঝড়ে পড়লে বিপদ তো আছেই। আর বিমান যদি জেট না হয় তাহলে তো কথাই নেই। ঘন মেঘের আস্তরণে তাকে নাচতে হবে তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ। যাত্রীদের জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনসের বিমানে তাই তৈরী থাকে সিকনেস ব্যাগ, মেডিক্যাল কিট, অতিরিক্ত অক্সিজিনের সিলিণ্ডার। ঝড় এলে ক্যাপ্টেনকে

ভয়ংকর ব্যস্ত থাকতে হয় ককপিটে। যাত্রীদের দেখার দায়িত্ব পড়ে আমাদের ঘাড়ে।

প্রেম-ভালবাসা ?

আরে সুন্দরী মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব করবে না এমন হয় নাকি। আকাশে উড়তে উড়তে এসব প্রস্তাব অনেক আসে আমাদের। কেউ বলেন, চলো বিয়ে করে বিদেশ চলে যাই. কেউ বা বান্ধবী হিসাবেই পেতে চান। যাঁরা সত্যি খুব সিরিয়াস তাঁদের অনেকে শেষ পর্যন্ত বিবাহিত জীবনে নিজেদের যুক্ত করে ফেলেন। কেউ কেউ ব্যাপারটা নিতান্তই 'মধুর অভিজ্ঞতা' বলে ধরে নেন। বেশির ভাগ বিমানবান্ধবীদের জীবনে এসব ঘটনা বড় একটা আঁচড় কাটে না।

আমার বিয়ের কথা মাঝে মাঝে শুধোন আমার মা, বাবাও। অবশ্য তাঁরা বলেছেন, তাঁদের কোন গোঁড়ামি নেই। যাকে খুশি আমি বিয়ে করতে পারি। তবে যাকেই করি, কোন পাইলটকে করবো না নিশ্চয়ই। ট্রাডিশনাল ভারতীয় চিত্রকলা আমাকে টানে। সূচিশিল্পে, লনটেনিসে মন আছে আমার। তবে রান্নার কথা বললে গায়ে জ্বর আসে।'

মেঘালয়ের মেয়ে

দু বছর হলো মীনাবানী আকাশে উড়ছেন। বিমানবান্ধবী হয়ে। শিলংয়ের কাছাকাছি একটি অঞ্চল থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনসের ডাকে কলকাতায় আসেন মীনাবানী। পরীক্ষা দেন এয়ার-লাইনস হাউসে। চ্যালেঞ্জের মত তিনি ছুটে এসেছিলেন পাহাড় থেকে। সে ছুটে আসা তাঁর সার্থক হলো। কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করে মীনাবানী এখন পুরোপুরি বিমানবান্ধবী।

একটি ফকার ফ্রেণ্ডশীপ বিমানের সামনে দাঁড়িয়ে দমদম বিমানবন্দরে মীনাবানী বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প। দেশ দেখা আর মানুষকে জানার নেশাই তাঁকে ঘরছাড়া করে। কত বিচিত্র মানুষই না তাঁর স্মৃতিতে ছড়ানো। দেশি, বিদেশি। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা।'

মীনাবানী পছন্দ করেন কাঠমাণ্ডু সার্ভিস। হিমালয়ের পাদপ্রান্তে প্রকৃতির ছড়ানো সৌন্দর্যের মাঝে কাঠমাণ্ডু পৌঁছলে নিজেকে যেন আরও সুন্দর বলে মনে হয়—বলছিলেন মীনাবানী। মেঘালয়ে যতবারই ফিরে যান ততবারই ডাক দেন পাহাড়ি মেয়েদের বিমানবান্ধবীর কাজে যোগ দিতে। ফলও হয়েছে। সিকিম, মিজোরাম, মণিপুর, নেফা, অরুণাচল থেকে দলে দলে মেয়েরা যোগ দিচ্ছেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসে বিমানবান্ধবী হয়ে।

দক্ষিণী তামিল তনয়া

দক্ষিণের তামিলতনয়া ছন্দা উইলিয়ামসের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় তামিলনাড়ুর মীনামবক্কম বিমানবন্দরে। প্রথম পরিচয়েই আমাকে কিঞ্চিৎ বিস্মিত করে ছন্দা খাঁটি বাংলায় বলেছিলেন, বড় বড় গভীর দুটি চোখ, ঘন কালো একমাথা চুল আর চাপা গোলাপি রঙের শাড়িতে স্নিগ্ধ এক কন্যা যখন আপনার বিমানযাত্রার সঙ্গিনী হবেন জানবেন তখন যাত্রাসিদ্ধি। বিমানে ওঠার সিঁড়ি দিয়ে আপনি যখন শেষধাপে এসে পৌঁছবেন মৃদু হেসে তিনি আপনার সামনে এসে দাঁড়াবেন 'নমস্তে' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে স্বাগত জানাবেন আপনাকে বিমান যাত্রায়। সারা ভারতে হাজার হাজার মাইল আকাশপথ ভ্রমণে এমনি গভীর কালো চোখ, একমাথা চুল আর চাপা গোলাপী রঙের শাড়ির বিমানবান্ধবীরা যাত্রীদের সেবার জন্য নিয়োজিত রয়েছেন। কলকাতা থেকে শ্রীনগর, কোচিন থেকে দিল্লি, গৌহাটি থেকে বোম্বাই —ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে আপনি যেতে চান আকাশপথে, বিমানবান্ধবীরা আপনার কাছেই আছেন সব সময়। পাঠক, আমার মত আপনারও হয়তো মনে হতে পারে এমন একটি বৃত্তিতে কি মিশন আছে যা নিয়তই শিক্ষিত আধুনিকাদের আকর্ষণ করে, বয়ঃসন্ধির সেই ভয়ংকর লগ্নে তাঁরা ছুটে আসেন ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনসে, কখনো ক্যারাভেল, কখনো ফ্রেণ্ডশীপ, কখনো বোয়িং-এ পাড়ি দেন দূর দূরান্তের পথে।

ছন্দা উইলিয়ামসকে আমি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছন্দা শুধু লেখাপড়াতেই আকর্ষণীয় ছিল না, বাংলা এবং ফরাসীতে তার অসীম অনুরাগ। কলেজ পালিয়ে কখনো ছুটির দিনে ছন্দা সমুদ্রের কাছাকাছি ছুটে যেত নির্জন সৈকতে। সমুদ্রের গর্জন গভীর স্বপ্নের মত টানতো তাকে।

মেবিণা আর মহাবলীপুরমের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে যেত ছন্দা। বিড় বিড় করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতো :

'হে আদিজননী, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার, একমাত্র কন্যা তব কোলে।'

সাপের ফনার মত তীক্ষ্ণ গভীর কালো ঢেউগুলি মহাবেলী। পুরুষের দেবমূর্তির পদতলে অঞ্জলি দেয় বিনম্র শ্রদ্ধায়। বহুদূরে চোখে পড়ে ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে মাছ ধরার আশায় ভাসা জেলেদের। দল বেঁধে সমুদ্রের গান গাইতে গাইতে তারা একসঙ্গে ভেসে চলেছে, জীবন মৃত্যুকে পিছনে ফেলে কি বিচিত্র তাদের সহ-অবস্থান।

ছন্দার মনে হত নিশ্চয় কোন যাদু আছে এই সমুদ্রে।

এমনি করেই সে বড় হয়ে উঠেছে। আর শিশুকাল থেকে দূর দূরান্তের প্রতি আকর্ষণ জেগেছে ছন্দার। কলেজের পড়া শেষ করে তাই হাতে এল অফুরন্ত অবসর।

ছেলেবেলা থেকেই ফরাসী ভাষার চর্চা দেখেছে বাড়িতে। ফরাসী সাহিত্যের মহান লেখকেরা ছন্দার প্রতিদিনের সঙ্গী হলেন, সম্মুখে তার নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এমনি করেই দিন কাটছিল। হঠাৎ এক বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে'। তামিলতনয়া ভ্রূকুঞ্চন করলেন। মনে হল এখানেই বোধ হয় সাড়া দেওয়া যায়। তারপর দেশে দেশে উড়ে চলা। বিমানসেবিকা ছন্দা উইলিয়ামস সকাল বিকেলে দিল্লি বোম্বাই করেন, রাত্রি কাটে কখনো কলকাতা, কখনো ভুবনেশ্বর, কখনো কুলুভীগ্রামে। বিচিত্র, বিস্মিত এক জীবন।

পৃথিবীর অন্যান্য বিমান কোম্পানিগুলির মত ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স জানে যে, যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধার জন্য বিমান সেবিকার প্রয়োজন অপরিহার্য। বর্তমানে অন্তর্দেশীয় সার্ভিসে ক্ষমপক্ষে ১৮৯ জন বিমানসেবিকা ও ৫৩ জন বিমান সেবক সব সময় প্রস্তুত আছেন। যাত্রীদের প্রয়োজন মেটাতে তাঁদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স নয়াদিল্লিতে একটি বিশেষ শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। ছ' সপ্তাহ ধরে ২০ জন করে বিমান সেবিকা ও বিমান সেবককে এখানে সেবার কাজে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলা হয়। এই শিক্ষাকাল সমাপ্ত হবার পর ছ' মাস তাঁদের শিক্ষানবিশী থাকতে হয়, তারপর পুরোপুরি আকাশী জীবন। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে বিমানবাহিনীর কাজে যোগ দিতে গেলে বয়স যেন উনিশের কম এবং পঁচিশের বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

নার্সিং, জনসংযোগ ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উচ্চতা ৪ ফুট ১১ ইঞ্চির কম এবং ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির বেশি যেন না হয়। ওজন ১২৫ পাউণ্ডের মধ্যে। চশমা ছাড়া দৃষ্টি যেন স্বাভাবিক থাকে। প্রার্থীদের অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান সেবিকাদের মুখ্য নির্দেশিকা শ্রীমতী সাহানী। ১৯৫৫ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি মুখ্য বিমান সেবিকার পদে উন্নীত হন। শ্রীমতী সাহানীর মতে, শতকরা ২৫ জন বিমান সেবিকা তাঁদের কাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন সংসার বাঁধার আশায়।

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিমান সেবিকাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ক্রুদ্ধ যাত্রীদের প্রশ্নোত্তর থেকে শুরু করে সঙ্গীহীন শিশুর সাময়িকদান পর্যন্ত প্রতিদিন নব নব বিস্ময়। তাই একাজে যাত্রীদের মানসিকতাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়, নতুবা সার্থক বিমান সেবিকা কখনোই হওয়া যায় না। এক কথায় ভারতের সমস্ত সেবিকার আদর্শটি বিমান সেবিকাদের সামনে রাখা দরকার।

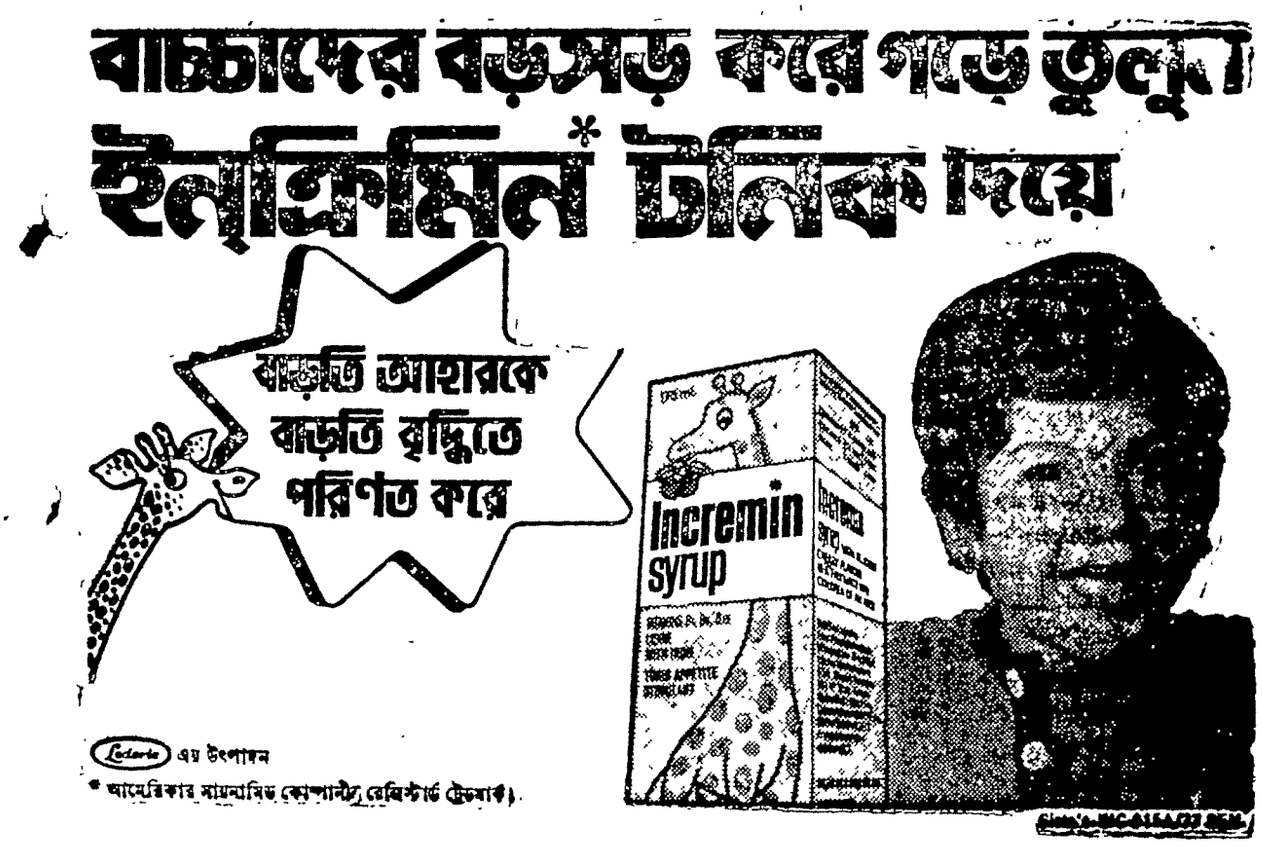

আমি পুতুল নই : সঞ্জীব রেড্ডি

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

আমি পুতুল নই। রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি স্পষ্টভাবে এই মোক্ষম কথাটি বলতে চান। ওঁর ভাষায় : আমি রাবার স্ট্যাম্প প্রেসিডেন্ট নই। অর্থাৎ মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার চুটি-বিচ্যুতি মুখ বুজে সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। গত তিন মাসে নানা ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি যে সব মন্তব্য করেছেন তাতে এটা এখন স্পষ্ট যে প্রাসাদোপম রাষ্ট্রপতি ভবনে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে উনি বসে থাকতে নারাজ।

নীলম সঞ্জীব রেড্ডির এই রকম ভাবগতিক রীতিমত শুইমাকসে উঠল যখন কিলহাল উনি হুড মারফৎ প্রধানমন্ত্রীকে একটি গোপন চিঠি পাঠালেন। এই গোপন চিঠির বক্তব্য এবং বাইরে প্রকাশিত তাঁর নানাবকম মন্তব্য যাকে বলে 'সেন্স বল' হয়ে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোয় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে নিঃসন্দেহে খানিকটা নাড়া দিয়েছে।

প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতির কয়েকটি কথা শেল হয়ে বিঁধছে অনেককে। সেই বাছাইকরা তীক্ষ্ণ মন্তব্যগুলি এইরকম : কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে একই রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন নয়। এর ফলে দেশের প্রশাসন অতীতের মত আর কোন বিশেষ দলের পারিবারিক ব্যাপার নয়। এই অবস্থায় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় মতৈক্য গড়ে তোলা দরকার। রাষ্ট্রপতি মনে করেন সংবিধানের জন্মক্ষণে কেডারেল কাঠামোর যে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তার বেশ খানিকটা ক্ষয় হয়েছে। কেন্দ্র-রাজ্য সমঝোতার জন্য মতামতের আদান প্রদান প্রয়োজন। দেশ দ্বিধা-বিভক্ত হোক এটা যখন কেউ চাইছেন না তখন আলাপ আলোচনায় আপত্তি থাকা উচিত নয়। কেবল হিন্দিতে কথা বলতে হবে এমন উগ্র মনোভাব বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর মতে হিন্দি যাদের মাতৃভাষা নয় তারা এতে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। হিন্দি না জানলে যদি দিল্লিতে চাকরি, না পাওয়া যায় তাহলে অহিন্দিভাষীরা মনে করতে পারে তাদের নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হচ্ছে। কেডারেল কাঠামোর যথাযথ মেরামত করে হিন্দি ভাষার ব্যাপারটায় ফয়সালা হওয়া দরকার সহযোগিতা ও মতামতের লেনদেনের ভিত্তিতে। আর সময় নষ্ট করা উচিত নয় এমন সতর্কবাণী। উচ্চারণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। এখানেই তিনি থামেন নি, দেশের আইন শৃংখলার অবনতি এবং বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুলিশের গুলিতে হতাহতের সংখ্যায় তিনি হতবাক।

রাষ্ট্রপতির এই রকম ভাবমূর্তিতে সব চাইতে বেশী খাপ্পা হয়ে উঠেছে আর এস এস দল। পত্র-পত্রিকা এবং ঘরোয়া বৈঠক মারফৎ এই দল নীলম সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতির মতান্তর অতীতেও হয়েছে। এটা নতুন ঘটনা নয়। আজ থেকে সাতাশ বছর আগে প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর মনো-মালিন্য হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫১ সালের পনেরো সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লিখিতভাবে জানান যে কোন বিলে সম্মতি দিতে, পার্লামেন্টকে কোন প্রস্তাব পাঠাতে এবং পার্লামেন্টের পুনর্বিবেচনার জন্য বিল ফেরৎ দেবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী তিনি কাজ করবেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দু কোড বিল সম্পর্কে এই কথাগুলি বলেছিলেন। নেহেরু তাঁর জবাবে বলেন সরকার ও পার্লামেন্টের সঙ্গে তাহলে রাষ্ট্রপতির বিরোধ দেখা দেবে।

নেহেরুর মতে পার্লামেন্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার নেই রাষ্ট্রপতির। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কিন্তু নেহেরুর বক্তব্য আক্ষরিক থেকে মেনে নিতে পারেন নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর জবাবে বলেছিলেন সংবিধান সুস্পষ্টভাবে বলছে পার্লামেন্টকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য পেশ করবার অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। কোন বিলে সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়ার অধিকারও আছে রাষ্ট্রপতির। এ ব্যাপারে সংবিধানের সুস্পষ্ট বক্তব্য অর্থগতভাবে খানিকটা সংকুচিত হয়েছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'কনভেনশন' বা প্রচলিত প্রথা ও নীতির সংযোজনে। ব্রিটেনের রাজার মত এখানে মন্ত্রিসভার উপদেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কাজ করবেন। এ সত্ত্বেও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে কোন সময়েই যে রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত দিতে পারেন না এমন কথা বলা যায় না।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে রাজেন্দ্র প্রসাদের পর ভি, ভি, গিরি কয়েকটি ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন। তবে তিনি তাঁর মতামতকে তেমন সোচ্চার করে তোলেননি। তারপর গতবারে নয়টি রাজ্যে নির্বাচনের জন্য বাস্তু বিধানসভাগুলিকে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে ভেঙ্গে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তটিকে মঞ্জুর করবার ব্যাপারে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বি-ডি-জাত্তি সময় নিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন আমাকে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর ফলে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল রাজধানীতে। জনতা পার্টির সমর্থকদের একটি মিছিল গিয়েছিল জাত্তির বাড়িতে। চোখা চোখা শ্লোগানও দেওয়া হয়েছিল। এখন নীলম সঞ্জীব রেড্ডি হলেন সেই পুরোন ও জটিল নাটকের নতুন নায়ক।

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং উচ্চবিত্তের পরিবার থেকে যাঁরা রাষ্ট্রপতির পদে বসেছে তাঁদের সঙ্গে অধিকার-ক্ষমতা নিয়ে প্রধান মন্ত্রীদের ঝগড়া-বিবাদ এ পর্যন্ত হয়নি। মতান্তর দেখা দিয়েছে এমন রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন ছাপোষা পরিবার থেকে। যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দেশেই হয়েছে এবং যাঁরা সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে এককালে ছিলেন ওতোপোতভাবে জড়িত। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভি-ভি-গিরি, জাত্তি এবং নীলম সঞ্জীব রেড্ডির মধ্যে এই রকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মত।

নীলম সঞ্জীব রেড্ডি তাঁর গোপন চিঠিতে বলেছেন যে দেশের আইন শৃংখলা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। আর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে গৃহমন্ত্রী আছেন কি নেই বোঝা মুস্কিল। হরিজন এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকজনের ওপর যে সব অত্যাচারের খবর আসছে তার দায়িত্ব গৃহমন্ত্রী এড়িয়ে যেতে পারেন না।

মোরারজী দেশাইকে লেখা চিঠিতে রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে— দলের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন সেই দলের ভাবমূর্তি এইসব ঘটনার ফলে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দেশের নানা স্থানে সফর করে তিনি উপলব্ধি করেছেন গত এক বছরের অনুসৃত নীতির ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বিন্দুমাত্র কমেনি।

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই রাষ্ট্রপতির গোপন চিঠির জবাবে বলেছেন অবস্থা আয়ত্তে আনবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ এটা মনে রাখা দরকার যে গত বিশ বছরের রীতিনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দেশের সমস্যা-সংকটে নিয়মিতভাবে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমর্থনে জনতা পার্টির কিছু সদস্য অভিযোগ করছেন যে রাষ্ট্রপতি দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছেন।

রাষ্ট্রপতি যে পুতুল নয় সেই কথাটি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি বার বার প্রমাণ করতে সচেষ্ট। মোরারজী দেশাইকে তিনি বলেছেন রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে ঘটনাবলির নীরব দর্শক হয়ে তিনি থাকতে পারেন না। প্রয়োজন হলে তিনি সরকারকে 'সেনসর' করবেন। জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

—পূর্বদেশ

পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটার

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

—শো থ্যাঙ্ক ইউ জেন্টলম্যেন, নেকশট বাউন্ড অফ টক্‌স্ উইল বি অন দ্য ফিফটিন্‌থ্, এস-ডি-ও-র গলায় এক রকম থোরজাব কবে পাট চুকিয়ে দেবার মেজাজ। এক ঘব লোকেব চেঁচামেচি, এঁড়ে তর্ক, টেবিল চাপড়ানি—যার অফিশিয়াল নাম দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ কমিটির মিটিং—এতক্ষণে শেষ।

ভীড়টা হাল্কা হবার অপেক্ষায় হেরম্ব। দু ঘন্টার এ্যাবশার্ড নাটকের একটি প্রধান চরিত্র। আবার দর্শকও। ডানদিকের রগটা অনেকক্ষণ ধবে দপদপ। সাতসকালের চা-মুড়ি তখন হজম।

দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ না ফার্স। ফর নাথিং এতখানি সময় বরবাদ। একদিকে ছেয়ারম্যান, গোয়েল আর অ্যাগরওয়ালরা। এক একটি গণ্ডারের চামড়ার ঢাল। হাজার গালাগালেও টোল পড়ে না। ও পক্ষে কিছু আপনি মোড়ল গোছের জনগণের উকিল। কথা বললেই গলার শিরা উঁচু, ঠোঁটের কোনে ফেনা। বাদ বাকী লোকেদের মগজ আর মুখ—দুটোতেই কুলুপ। মাঝখানে পড়ে হেরম্বর পাগলা জগাইয়ের হাল।

মিটিংয়ের সভাপতি এস-ডি-ও-র বয়স বছর পঁচিশেক, কপালে আই এ এসের বাজতিলক। বাংলা প্রায় ভুলে মেরে দেওয়া দিল্লীর ব্যাঙাল। এখানকার বাজারের চাল-ডাল-তেলের সুলুক সন্ধান না জানার মতই। জানার ইচ্ছেও নেই। তার শুধু একটাই; সিনিয়ার স্কেল পাবার আগে আনাদানা করে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া। এই টাইপটা হেরম্বের চেনা।

দেখেশুনে হেরম্বর ডান হাতের তর্জনীটা থেকে থেকে নিশপিশ। থাকতো একটা [illegible]

ভুঁড়িটা কি ফাইন টার্গেট)। এসব চিন্তা হেরম্ব পারলে নিজের কাছেও লুকিয়ে রাখে। সবাই জানে ঠান্ডামাথা লোক। অফিসাবরা বলে মোস্ট রিলায়েবল। / হেরম্বর কিন্তু ধারণা রিলায়েন্সের দিনকাল. ক্রমশই চলে যাচ্ছে।

দু পুরুষ স্কুল মাস্টার হেরম্বর তালিম বাবা ঈশ্বর আম্বিকা ভটচাজের কাছে। মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তর ছাত্র অম্বিকা ভটচাজের মানুষ তৈরীর একসপেরিমেন্টে হাতের কাছের গিনিপিগ—ছেলে হেরম্ব। ছোটবেলা থেকেই সত্য, ন্যায়, নিষ্ঠা—এসবের কড়া কড়া ইঞ্জেকশান পড়েছে। সে ইঞ্জেকশানের ডোজ এখন অনেক ফিকে। বেয়াল্লিশ বছর বয়েসে হরেক রকমের ইতবামির সঙ্গে লড়াইয়ে আর তেমন জুৎ পায় না। সারা দেশে মরলবাজ শয়তানদের পপুলেশান বাড়ছে তো বাড়ছেই। ফ্যামিলি প্লানিং শব্দটাই লোপাট এদের ডিকশনারি থেকে। তাই আজকাল হেরম্বর ডান হাতের তর্জনীটা হঠাৎ হঠাৎ বেঁকে আঁকশী। সবার অজান্তে একটা অদৃশ্য রিভলভারের ট্রিগারে টেপে। কাল্পনিক্রিংয়ের শব্দটা শুনতে পায় শুধু নিজেই।

ভাবী সবুজ পর্দাটা ঠেলে বাইরে আসতেই গরম হাওয়ার হলকা। ওঁত পেতে আছে বেলা দেড়টার বোদ। ছায়ার চৌহদ্দির ঠিক বাইরেই। এস-ডি-ও-র চেম্বারের সামনে বাবাদায় সার দিয়ে লম্বলম্ব টাইপরাইটার। ঘটাঘট ফটাফট মামলার খই। হেরম্ব দু পা না যেতেই পথ জুড়ে মরলা শাড়ীর ফেস্তে বোরা সুখ। সিঁথিতে সিঁদুর। সঙ্গে কটা কাচ্চাবাচ্চা। হাতে কতকগুলো ময়লা কাগজপত্র। দরখাস্ত পেশ করার জন্যে হত্যে দিয়েছে। জানে না ঘরের ভেতরে টাকিস তোষালে ঢাকা রিভলভিং চেয়ারটা এখন ফাঁকা। সাহেব লাঞ্চ সারছেন বাংলোতে।

শাঁখাপরা হাতে একটা শিকি ঠেকিয়ে বারান্দা থেকে কোর্ট কম্পাউন্ডে হেরম্ব। জর্মান মাল্লা ঘেঁষে একটা কালো এ্যামবাসাডর। সরে দাঁড়াতে গিয়ে সেকেন্ড দুই একপায়ে লম্বড়।

—লেখাপড়া করে সেই, গাড়ীচাপা পড়ে সেই, আন্তর্বাক্যটি আর কালো এ্যামবাসাডরের মালিক একই। গাড়ীর জানলায় বোদে পোড়া চওড়া, বাঁক একটা মুখ। মস্ত সানগ্লাসের আড়ালে চোখ। দারোয়ানি গোঁফের তলায় দুসারি ঝকঝকে দাঁত। সব মিলিয়ে ধীরেন প্রামাণিক ওরফে ধীরু। বোদ-বৃষ্টি থেকে হেরম্বর বাঁচার আশ্রয় বাবার বানানো টিনের বাড়িটা। তার পাশেই ধীরুর ভেতরে মোজাইক বাইরে গড়ীল দোতলা বাড়ি।

—চলে আয়, বাড়ি রাখি তো, গাড়ির ড্রাইভার আর ধীরুর গলা একসঙ্গে দরাজ।

ধীরুর কর্মকর্ম যাতায়াত আলোর চেয়ে অন্ধকারেই বেশী। হেরম্ব তা জানে। ডান-দিকের বগ মাথাধরার দখলে। পেটে ক্ষিদের দৌরাত্ম্য। এই ঠা ঠা বোদে দু মাইল পায়ের ধাক্কায় ফেরলে তবে বাড়ির নাগাল। নইলে পঁচাত্তর পয়সা সাইকেল রিকসা ভাড়ার গুনাগার। গাড়িতেই উঠে পড়লো হেরম্ব। বন্ধ করলো দরজাটা।

—লক হয় নি ঠিকমতো, বলে হেরম্বর ঘাড়ের ওপোর দিয়ে হাতটা চালান দিলো ধীরু। এক হ্যাঁচকায় দরজাটা দড়াম।

—সাবু খাস নাকি, হাতে এইটুকু জোরও নেই তোর, গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললো ধীরু।

—রোজ মাংস খেলেও গায়ের জোর কি টাকার জোর কোনটাতেই পারবো না তোর সঙ্গে, বললো হেরম্ব। কথা বলার ইচ্ছে না থাকলেও।

লম্বাচওড়া মানুষ ধীরুর হাসিও বেশ বড়সড় মাপের। কোর্টের চত্বর ধুলোয় ঢেকে গাড়ি বড় রাস্তায় গাড়ির স্পীড গলায় তুলে ধীরু বললো, তা বলে কথার জোরে কোন ঘাটতি পড়ে নি তোর। বিদ্যের জোর তো আছেই। আমার সঙ্গে একটু কোঅপরেট করলে পয়সার জোর হতেও কোন অসুবিধে ছিলো না।

হেরম্ব তৈরী ধীরুর পুরোন রেকর্ড শোনবার জন্যে। গাড়িচড়ার মাশুল দিতেই হবে।

—তোকে তো ওয়ার্কিং পার্টনার করতেই চেয়েছিলাম। তোর এ্যাতো গুড্ উইল, এ্যাতোগুলো আই-এ-এস—আই-পি-এস অফিসার তোর ক্লাশমেট। শুধু এখানে ওখানে একটু বলে দেওয়া। যেখানে টপ টু বটম্ চোর, সেখানে তুই একা সাধু হয়ে কি করবি? তাই এম-এ পাশ করেও হেরম্ব মাস্টারই থেকে গেলি।

হেরম্ব পুরোপুরি রক্তমাংসের স্ট্যাচু। জানে, এই ফেভারিট টপিকটার ওপোর ধীরু একনাগাড়ে অনেকক্ষণ বলতে পারে। ছোট-বেলায় হেরম্ব ধীরুর নাগালের বাইরে। ফারাকটা ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে লাস্ট বয়ের। বোল্ডকারের দৌড়ে এখন পজিশানটা উল্টো। ফাক পেলেই হামবড়াই আর গলাবাজির ঢেবল ঢাক পিটে হেরম্বকে সে কথাটা বোঝাতে চায় ধীরু। হেরম্বর বৌ কল্যাণীরও ওই এক বা। ছুতোয় নাতায় হাজির করে হেরম্বর ফেইলিওরের লম্বা লিস্টটা। বলে, লোকে মানি করে। তাই নিয়ে কি ধুয়ে খাব? তবু ভাল ছেলেপুলে হয় নি। হলে সেগুলোর হাঁড়ির হাল হতো।

ধীরুর মস্ত দুই হাতের মুঠোয় স্টিয়ারিং। চওড়া কব্জাতে ঢাউস ঘড়ি। হেরম্ব জানে ঘড়িটা জাতে কুলীন—রোলেক্স অথেন্টার। ধীরুর সব দামী খুচরো সম্পত্তি চেনে হেরম্ব। ট্র্যানজিস্টার, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, স্টিরিওগ্রাম, গ্যাস লাইটার—আরও হরেক জিনিষ। হেরম্ব যা হেরম্বকে অছিলা করে কল্যাণীকে না দেখানো পর্যন্ত শান্তি নেই ধীরুর। মেলার ম্যাজি-শিয়ান ছেঁড়া রঙওঠা কোটটা ঢেকে রাখে সার সার মেডেল সাজিয়ে। লাথি খাঁটা খেয়ে গায়ের চামড়া মজবুত, কুল্ল মুহুরীর ছেলে শীবুরও এখন এই মেডেল কুড়োনোর বাতিক। আর দেখানরও। উৎসাহ, আগ্রহ, বিস্ময়—কোন কিছুই কাবু করতে পারে না হেরম্বকে। শুধু কল্যাণীরই দু চোখ লোভে ছোকছোক।

—একটা দারুণ জিনিষ পেয়ে যাচ্ছি দাঁওয়ে, একটা গাড়ভায় পড়ে গাড়িটা না লোফালে হেরম্ব হয়তো শুনতে পেতো না ধীরুর কথাটা।

দাঁওয়ের ধান্দায় ধীরু সব সময়। ওর চিন্তায় লাভ-লোকসানের ঠাসবুনোট। একটা মামুলি—কিসের দাঁও—জিজ্ঞাসা করলো হেরম্ব।

—দারুণ জিনিষ। একজন কোম্পানির ক্যাশ ভেঙ্গে বেকায়দায় পড়ে বেচে দিচ্ছে সস্তায়। নইলে সাড়ে তিন হাজার তো জলের দর, ধীরুর গলায় সাসপেনসের জের।

ধীরুর পৃথিবীতে পয়সা ফেললেই সব জিনিষ হাতের মুঠোয়। মোটর গাড়ি থেকে মেয়েছেলে। কম পয়সায় বাগানো মানুষের একমাত্র কৃতিত্ব। সেটা পাবলে পাবলিসিটির নিবন সাইন অমলানোটাই স্বাভাবিক।

—কি সেই সাড়ে তিন হাজারি দারুণ জিনিষটা, ধীরুর সাসপেনসের ঠ্যালায় হেরম্ব বিরক্তিতে চিড়বিড়।

হাত গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে, চোখ দুপুরের ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায়, ধীরু আরও ক' সেকেন্ড চুপচাপ। চোখ না ফিরিয়েই হঠাৎ বললো, একটা রিভলভার।

ঠাস করে কথাটা ফাটলো হেরম্বর কানে। ঠান্ডা মাথা হেরম্বর হৃৎপিন্ড বড় একটা হোঁচট খায় না। এবার খেলো। আড়চোখে ধীরুর দিকে তাকাতেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেঁকা। সাড়ে পাঁচফুটি হেরম্বর চেয়ে ধীরু এমনিতেই প্রায় একমাথা লম্বা। ঘাড় শক্ত রেখে রিভলভারের মালিক ধীরুর মুখের দিকে তাকানোর আর জো থাকলো না।

ধীরুর বাড়ি, গাড়ি, গুচ্ছের দরকারি অদরকারি ইম্পোর্টেড এটা সেটা। হেরম্ব দেখেছে, দেখে। যেমন শোকেশে সাজানো জিনিষ। স্রেফ আলতো চোখ বুলিয়ে যাওয়া। পকেটে রেস্ত, কেনার তাগিদ—কোনটাই নেই আজকাল মাঝেসাঝেই হেরম্বর আঙুল নিশপিশ। তাই রিভলভারের আলাদা ঔজ্জ্বল্য। আগুন, চাকা, বারুদ—এগুলোর আবিষ্কার ইতিহাসে এক একটা ঘটনা। রিভলভারেরও তাই। মানুষের তাবৎ ক্ষমতা আঁটশাঁট প্যাক করা ওই ছোট্ট যন্ত্রটির মধ্যে। মুরোদ না থাকলেও হাতের মুঠোয় একটা পেতে ইচ্ছে করে। এমন কি স্বপ্নে হলেও।

হেরম্ব যতক্ষণে এতসব ভাবলো, ধীরু কিন্তু মুখ বন্ধ করেনি। প্রায় হাতের মুঠোয় যে রিভলভার তার রূপগুন সমানে বর্ণনা করে যাচ্ছিল। গোডার দিকটা প্রায় কানেই যায় নি হেরম্বর। শেষেরটা শোনা।

—লাইসেনসের জন্যে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, ধীরুর কথা বলার স্পীড গাড়ির চেয়ে বেশী। ওই চালকুমড়ো ডি-আই-বি ইন্সপেকটরটা। বলে কিনা, আপনার পুলিশ রেকর্ড আছে, সেই

কচি বয়েসে দন্তক্ষয়ের দরুন দাঁত পড়ে গেলে সেখানে যে শক্ত দাঁত বেরোয় তা টেরা-বাঁকা হয়ে গজিয়ে উঠতে পারে। তাতে মিষ্টি হাসির শ্রী চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে যায়। এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার একটিই উপায়—বিনাকা ফ্লোরাইড* ব্যবহার ক'রে দাঁত সুরক্ষিত রাখা। পৃথিবীময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, টুথপেস্টে ফ্লোরাইডই হল একমাত্র উপাদান যা দাঁতের এনামেলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিশে দাঁত

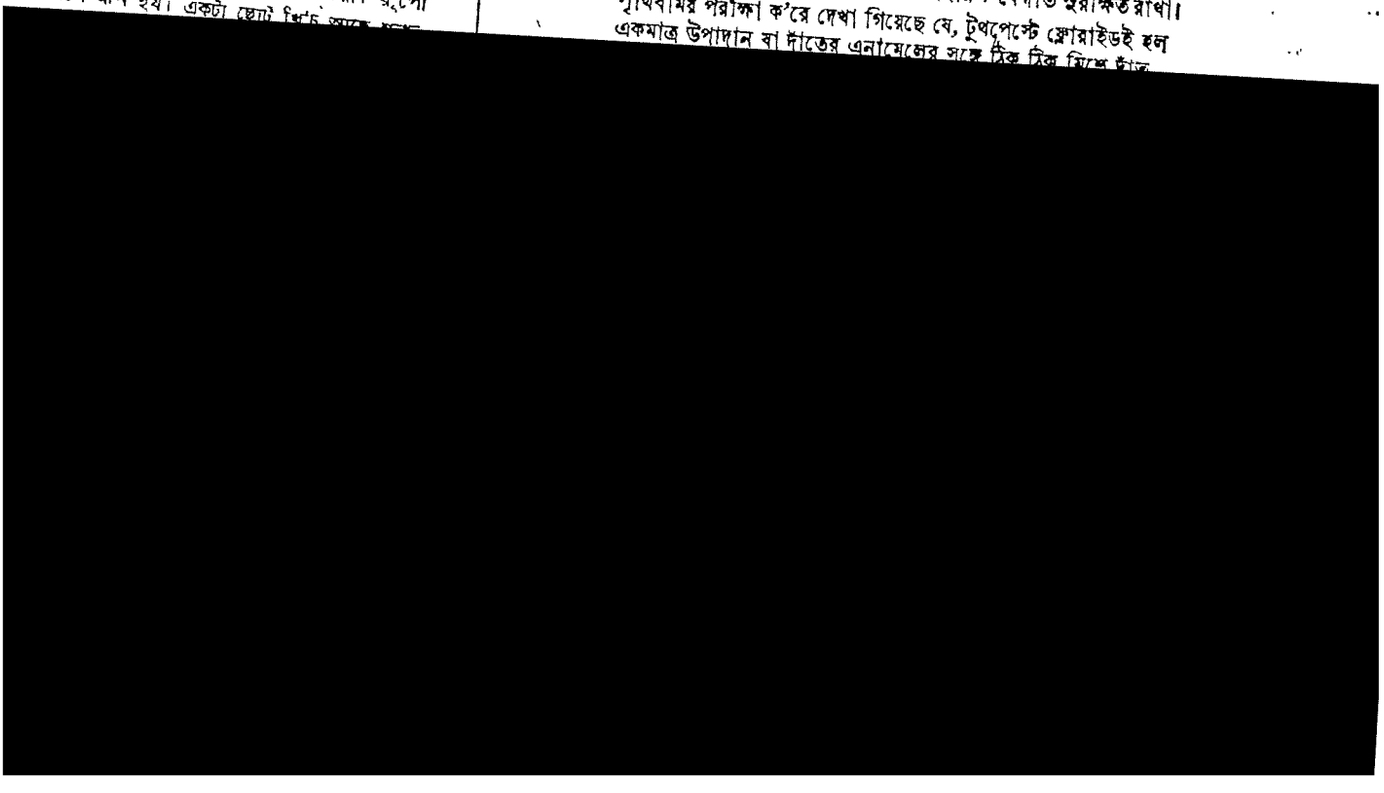

...ার পুরোন কাসুন্দী। আমারও শোর্স ...। ব্যাটাকে ভেজালাম শেষ পর্যন্ত। ...দিকে আবার সতীলক্ষ্মী, নগদা পয়সা ...তে ছোঁয় না। তবে পেটুক লোক, মোর ...খানেওয়ালা পার্টি। শের-ই পাঞ্জাব হোটেলে মালিকের প্রাইভেট ঘরটাতে বসে খুব ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন রোস্ট সাঁটালো। আর জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল। চারশো তুরুপের তাস। যাক এই বড় গাঁটটা টাকার ওপোর গচ্চা। উপায় নেই, ওর হাতেই টপকেছি। ডি-এম-এর অফিস থেকে লাইসেন্সটা বের করতে দেরী হবে না। কম ঝামেলা, সব শালারা খাবার জন্যে হাঁ করে বসে আছে, ধীরুর রানিং কমেন্টারি বন্ধ হলো এতক্ষণে।

হেরম্বর মুখে একটা তিতকুটে হাসি। এই ডি-আই-বি ইন্সপেকটারটির জন্যেই অনেকগুলো ছেলের চাকরি হয় নি। পুলিশ ভেরিফিকেশান, রিপোর্টে সবার পিঠেই দাগীর ছাপ পড়েছে।

—তোর তো দু দুটো বন্দুক আছে, তার ওপোর রিভলভার দিয়ে কি করবি, হেরম্ব জিজ্ঞাসা করলো হঠাৎ।

—তা আছে, পোশমেজাজে বললো ধীরু একটা ডিঃ সেভেন ফাইভ ম্যানলিকার রাইফল আর একটা হল্যান্ড এ্যান্ড হল্যান্ডের টুয়েলভ বোর শটগান। কিন্তু রিভলভার ইজ রিভলভার। হ্যান্ডি, পকেটে রাখা যায়। চট করে বের করে ফর্টাফট দু' রাউন্ড ফায়ার করা যায়। পিস্তলের মতো অ্যাম হবার চান্স নেই।

একটু থেমে বললো, আর জিনিষটা দেখতেও চমৎকার। ছোট্ট, এই এক বিঘতের চেয়েও কম। কোয়াম স্প্লেটিং করা। রুপো বলে মনে হয়। একটা ছোট্ট ফিতে আছে [illegible]

লটারি, মোটর স্পেয়ার পার্টসের দোকান আর টায়ারের এজেন্সী—এগুলো ধীরুর ব্যবসার সাইনবোর্ড। এছাড়াও কিছু বেলাইনের কারবার আছে। রাত্তির বেলায় জাপানী ট্রানজিস্টার, ঘড়ি, ক্যামেরা, চাইনীজ মেড কলম, সিগারেট লাইটার, হংকঙের নাইলন, জর্জেট, সিল্ক, কাজের নেপাল বর্ডার পেরিয়ে এদিক্ ওদিক চালান যায়। লোকে বলে এইসব আমদানী রপ্তানীর মেহনত আর ঝুঁকি নেয় কিছু বেকার ছেলেরা। আর ক্যাপিটাল সাপ্লাই করে ধীরু আর তার মতো আরও কেউ। লোকের ফিসফিসোনি বাতাসেই মিলিয়ে যায়।

শুধু তাই নয়। শহরের যিনি বড় লীডার—তিনি আবার পশ্চিমবাংলার একজন পয়সা সাবির লীডারও বটে—কিছুটা একস্টা খাতির করেন ধীরুকে। যদিও ধীরুর অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত কিছুই তার অজানা নয়। লীডার শহরে থাকলে ধীরুর কালো এমবাসাডর হামেশাই তাঁর সেবায় হাজির। অবশ্য হেরম্বর একটা আলাদা পজিশান আছে লীডারের কাছে। লীডার জানেন, তাঁর আশপাশের ভবিষ্যালদের মধ্যে হেরম্বই এক বিশ-বাইশ ক্যারেট খাঁটি। আরও জানেন, নিজের দলের ইমেজ এখন অনেক কালচে। সেই মরলা তোলার কাজে ব্যাশো ছেলে হেরম্বর মত দুটি একটি লোক। আরও বড় কথা, হেরম্বর লয়ালটি আছে। সুবিধে বুঝে ক্যাম্প চেঞ্জ করবে না।

—শালা, শুয়োরের বাচ্চা, আচমকা ধীরুর বেসা-ফাটানো চীৎকার। কিছু বোঝার আগেই ড্যাশবোর্ডের ঠোক্কর হেরম্বর কপালে। গাড়িটা টালমাটাল। দরজা খুলে ধীরু একলাফে বাইরে। সামলে উঠে—ব্যাপারটা কি? দেখার চেষ্টায় হেরম্ব হাঁচড়পাঁচড়। রাস্তার ধারের চাপলের পশরায় নাক লাগিয়ে গাড়িটা চুপ।

—মারবেন না, মারবেন না স্যার, মরে যাব, কে যেন কেঁদে উঠলো চেঁচিয়ে। সঙ্গে মেয়েলি আর বাচ্চার গলার দোয়ারকি।

একটা ভোঁতা যন্ত্রণা ভেতর থেকে হাতুড়ি ঠুকে হেরম্বর কপালটা একটু একটু করে ঠেলে তুলছে। আমল না দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো।

কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ময়লা, ছেঁড়া ধুতি, বাদবাকী শরীর খালি, একটা নব্বর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বয়েসের লোকের রুক্ষ চুল ধীরুর বাঁ হাতের মুঠোয়। ডান হাতের খোলা পাঞ্জাটা বেশ খানিকটা ওল্লোন-শুদ্ধু এই নাবলো বলে।

—কি করছিস ধীরু, চেঁচিয়ে উঠলো হেরম্ব।

অমনি ধীরুর উচোন ডানহাতটা চড় হয়ে নাবলো লোকটার গালে। পড়ে যাবার কথা লোকটার। কিন্তু চুলের ঝুঁটি আটক ধীরুর হাতের মুঠোয়। তাই হাঁটু দুমড়ে হুলতে লাগলো। গলা দিয়ে ওগরানো আওয়াজটার সঙ্গে মানুষের কান্নার মিল কম। কতকটা হাল ছেড়ে দেওয়া জন্তুর গোঙানি। সঙ্গে লোকটার বউ বোধ হয়। আর দূই থেকে বছর আস্টেকের গোটাতিনেক বাচ্চা। কেঁদে যতটা প্রতিবাদ জানানো যায় তারাই জানালো।

হেরম্বর মাথার মধ্যে পেট্রল ট্যাঙ্কার। তাতে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি। ডান হাতের তর্জনীটা গুটিয়ে আঁকশী।

—কি হচ্ছে কি ধীরু, চেঁচাতে গিয়ে গলাটা চিরে গেল হেরম্বর।

ধীরুর নজর হেরম্বর দিকে। হাতের মুঠোর তেমনি শক্ত করে ধরা লোকটার চুলের ঝুঁটি। সানগ্লাসের ওপার ভবদুপুরের সার্চলাইটের বিচ্ছুরণ। ঢাকাপড়া চোখ দুটোর আগুনও হতে পারে। পাল্টা গলা চড়িয়ে বললো ধীরু, মেরেই ফেলবো শালাকে। রাস্তা চলতে জানে না শুওরের বাচ্চারা। একেবারে গাড়ির সামনে এসে পড়েছিলো।

ধীরুর হাতের কব্জি তো নয় লোহার পিস্টন একেবারে। তাকে নাড়ানো হেরম্বর মাংসহীন সরু আঙুলগুলোর অসাধ্য। উল্টে খানিকটা প্যাচপেচে ঘাম লেগে গেল। ধীরুর মুঠো খোলার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে হেরম্ব বললো, গাড়িচাপা পড়ে মরতে পারেনি বলে কি পিটিয়ে মেরে ওর ভুলটা শুধরে দিতে চাস? ছেড়ে দে। ধীরুর কব্জিটা আবার টানলো হেরম্ব।

দাঁতে দাঁত চাপা ধীরুর। চওড়া, বাঁক মুখ পুরোপুরি হেরম্বর দিকে। চোখ দেখা যায় না। বুঝতে অসুবিধা হয় না দুসারি দাঁতের মধ্যে হেরম্ব নিজেই। —ছেড়ে দে ধীরু, গরীব দুখী লোক, মরে যাবে, ধ মনে একটা নরম জায়গা খোঁজার চেষ্টা কর হেরম্ব।

এতক্ষণে লোকটার আটক থাকা চুলের ঝুঁটির বেহাই। ছাড়া পেতেই লোকটা ধুপ করে রাস্তার ওপোর। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো। হুবহু মানুষের মতো। —আপদ যতো, ধীরুর ওপোর এখনও একটা জানোয়ারের ভর, সমানে গরগরিয়ে চললো, জানোয়ারের মতো কতকগুলোর জন্ম দিয়েছে দেখো। গুলি করে মারা উচিত সবগুলোকে।

ততক্ষণে চারিপাশে একটা মোটামুটি লোকজনের গমায়েৎ। যেমন হয়। ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো, ঠিক ঠিক, কিন্তু অত পুণ্য কি করেছে ব্যাটারা।

নিবু নিবু হেরম্ব আবার জ্বেতে আগুন। অমনি মনে পড়লো এই লোকটাই কিঙ্গলভ্যালের লাইসেন্স পেয়েছে। দেশ থেকে গরীব দের খতম করতে চায়। হিটলারের ফাইন্যাল সলিউসানের কায়দায়। একটা ভয়ানক কিছু করতে বা বলতে যাচ্ছিল হেরম্ব। আটকালেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ছাত্র। খুব জোর বেঁচে গেলো।

মুখে বললো, ইন্দিরা গান্ধী কি বোকা, মিছিমিছি প্ল্যান প্রোগ্রাম করছে গরিবী হটানোর জন্যে। তোর মতো কিছু লোকের ওপোর ছেড়ে দিলে কত কম খরচায় না কাজটা হয়ে যেতো। উল্টে গোলাগুলির কারখানা আর শ্মশানে গোরস্তানে কিছু লোকের চাকরি হতো। গরিবী আর বেকারি কত সহজেই না হঠানো যেতো।

ভীড়ের মধ্যে একটা খাটাসমার্কা হাসি। হেরম্বর তিতকুটে কথাগুলোর মানে আন্দাজ করে ধীরুর মুখ কালো। লোকটা তখনও কাঁদছে। সমানে ফোঁপাচ্ছে ওর বৌ-বাচ্চারা।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করলো, বাড়ি কোথায়?

লোকটা মুখ তুললো। চোখের জলে ধ্যাবড়ানো মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কশ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললো, জয়নন্দি জোতে বাবু।'

—সে তো পাশের জেলায়, এখানে কি করতে এসেছিলে, ধীরুর উপস্থিতিকে ভুলবার জন্যে লোকটাকেই আঁকড়ে ধরলো হেরম্ব।

শহরে এসে ভ্যাবাচ্যাকা গ্রামের লোকটা অনেকক্ষণ পর বোধহয় একটা মানুষের গলা শুনলো। শোনাবার লোক পেয়ে অমনি কথায় জাপাজাপি। আত্মকাহিনী বলে যাচ্ছে মিঃ ইন্ডিয়া, নাইনটিন সেভেনটি ফোর। ঠিকঠাক সাজিয়ে নিলে দাঁড়ায় :

এ বছর জয়নন্দি জোত আর আশপাশের এলাকার বারো আনা ধান নষ্ট হয়েছে পাগলি নদীর বন্যায়। ফসলি জমি কিছু ধারলে খেয়েছে নদী, কিছু চাপা পড়েছে বালির তলায়। লোকটা ভেঙে পড়ে

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪৯/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• পোষাক
• সাড়ি • সুট
ও ছিট কাপড়

বন্যায় সমস্ত কিছু বিলিফ পেয়েছে। এখন ক্ষেতখামারে কাজ নেই। চালের দাম বাড়তির দিকে। ব্লক অফিসে ডি-আর-এর ধর্ণায় মেলাই লোক। তাই লোকটা যা যা বেচবার বেচে ফেলেছে। তারপর বৌ-বাচ্চার হাত ধরে শহরে। স্টেশন ইয়ার্ডে খোলা ওয়াগনে ঘুম পচছে ক'দিন ধরে। গাছ বেবিয়ে গেছে পর্যন্ত। কাছাকাছি আর-পি-এফ না থাকলে অনেকেই দু-চার মুঠো করে সরায়। সেই ঘুম সেদ্ধ করে খেয়েছে কাল দুপুরে। তারপর থেকে পেটে কিছু পড়েনি।

ধীরু এর মধ্যে বাজে ঝামেলা মেটাবার জন্যে তাগাদা দিয়েছিলো বারকতক। হেরম্ব গ্রাহ্য করে নি। মানুষের দুঃখকষ্টে ছোট-বেলায় কান্না পেতো হেরম্বর। পরে বিলোবার মতো চোখের জলে ঘাটতি। তখন ভগবান বলে একজনের কাছে যতো কমপ্লেন। এখনও নেহাত অভ্যেসের বশে ভগবানকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তবে কমপ্লেন আর করে না। করে লাভও নেই। লোকটা ডেফ এ্যান্ড ডাম্ব স্কুলের লাস্ট বেঞ্চেরও বেহদ্দ।

মিস্টার ইণ্ডিয়ার মস্ত হাঁকরা ক্ষিদের গর্ত বুজোতে হেরম্বর নিজের মুরোদ এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা। টাকাটা রেখে পয়সা-গুলো দিয়ে দিলো লোকটাকে। ধীরুর দিকে তাকিয়ে বললো, দেখ তো। কেমন মেরেছিস, ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে!

—সরি, ধীরু আগের চেয়ে অনেক নরম, বললো, একেবারে গাড়ির সামনে এসে পড়লো। কি করে যে সামলেছি সে আমিই জানি। চাপা পড়লে তুই আর দয়া দেখাবার ফুরসুৎ পেতিস না, তার আগেই লোকে পিটিয়ে পরোটা বানিয়ে দিতো।

পার্স থেকে এক তাড়া নানান মাপের নোট বের করে একটা দশ টাকার নোট বাছলো ধীরু। লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, নে।

লোকটা চোখ ফেরাতে পারছে না নোটটা থেকে। হেরম্বও। পারলে হেরম্ব লোকটাকে হিপ্নোটাইজ করতো। যাতে নোটটা না নেয়। হেরম্বর অন্তরাত্মা চীৎকার করে উঠলো, নিও না। নিজে ছাড়া কেউ শুনতে পেল না।

ধীরু মুখ বেঁকিয়ে বললো, আরে নে, নে।

লোকটার হাতটা নোটটার আরও কাছে। হেরম্ব চোখ বুজলো। খুললো যখন নোটটার হাতবদল কমপ্লিট। ধীরুর বিরুদ্ধে লোকটাকে এ্যাসল্ট করার কেসটা প্রমাণ হলে অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা জরিমানা। একটা দশ টাকার নোট ঘুষ দিয়েই রেহাই পেলো ধীরু। অপরাধের আর কোন দাগ রইলো না।

রাস্তার একটা পাশ ধীরুর গাড়ি আর তামাশা দেখনেওয়ালাদের জবরদখলে। পেছন থেকে অধৈর্য কিছু ট্রাক আর সাইকেল বিকসার হর্ন।

—যতো ঝামেলা, চল এবার, ধীরু বললো।

—তুই যা, আমি হেঁটেই ফিরবো।

—কি হলো আবার? একটু চড়ু মেরে দশ টাকা দণ্ড দিলাম তো, এবার ধীরু সত্যি অবাক।

—হয় নি কিছু, তুই যা।

—আরে তোর কপাল ফুলে যে আলু হয়ে উঠেছে। বেশ কষার সময় ধাক্কা খেয়েছিলি নিশ্চয়, ধীরুর কথায় হেরম্বর কপালটা নতুন করে দপদপ।

—ও কিছু না, আমি হেঁটেই ফিরবো, জোর দিয়ে বললো হেরম্ব।

—যা বাবা, বলে ধীরু ঘ। হেরম্ব ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে।

দিন কতক পরে লীডার খবর পাঠালেন হেরম্বর কাছে। দেখা করার জন্যে। এমনিতে যেচে লীডারের বাড়ি হেরম্বর খুব একটা যাতায়াত নেই। কি করতেই বা যাবে। নিজের এ্যামবিশান তো ছোটেকেটে না থাকারই মতো। নখ-খাওয়া ছেলের নখ। বাড়তে আর পায় না। এক কথনো শখনো কারুর চাকরির জন্যে বলা। তা লীডার যতটা পারেন, করেন। অন্যের বেলায় যা করেন, তার চেয়ে বরং বেশীই। লীডারের দলে এখন নানান ফ্যাকড়া। দলের মধ্যে ঝোলটানা বা মুরুব্বিয়ানার দখলদারিতে হেরম্বর উৎসাহ নেই। লীডারেরও মহাজ্বালা। শহরে এলে নালিশ আর সালিসিতেই সময় কেটে যায়।

সন্ধ্যের দিকে লীডারের বাড়ি যাবার কথা। তাই গেলো হেরম্ব। চামচে বাহিনী আর চাকরির উমেদারেরা কি জানি কেন বহাল ছিল। শুধু বাইরের ঘরে জনা তিন-চার। এ্যান্টি-নাশিত মুভমেন্টের জলজ্যান্ত পোস্টার হাতে সিগারেট প্রত্যেকেরই। হেরম্ব বাইরের বোষাকে থমকালো। একজন, একটু মর্সামতন, আগে তার ছাত্র ছিল। ক্লাশ নাইন অবধি ইংরিজি বাংলা গ্রামারের ধাঁধা ভাঙতে ওস্তাদ। তারপরেই বাপ মরতে পিছলে গিয়ে বেলাইনে। সে বেলাইনে থানা, হাজত আর কোর্ট—এই তিনটে স্টেশান ঘুরে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত মিসার মেলগাড়িতে চড়ে বছরখানেক জেলে বহাল—থানেকের জন্যে হাওয়া বদল।

একটু দোনোমোনো করে ঢুকেই পড়লো হেরম্ব। একজনের সিগারেট অমনি জুতো-চাপা। নজর এড়ালো না হেরম্বর। লীডারের ঘরে ঢোকার মুখে প্যান্ট-সার্ট পরা চওড়া কাঁধ, কোচকানো ভুরুতে বাজের সন্দেহ আর প্রশ্ন, দরজার ওপোর হাত রেখে বললেন, কি চাই?

এই ব্যারিকেডটি হেরম্বর হিসেবের বাইরে। তবু লোকটা কে বুঝতে দেরি হলো না। লীডারের নতুন সিকিউরিটি। বোধহয় কলকাতার এস-বি-র লোক। আগের জন এ-জেলারই আই-বি-র, হেরম্বকে ভালো করেই চিনতো।

হেরম্ব কিছু বলার আগেই পর্দার আড়াল থেকে লীডারের ভারি গলা, কে?

GO BRIGHT WITH SANKYO DYNAMO LIGHT

Sankyo

নির্ভয়ে যাত্রা
চিরস্থায়ী এবং
উজ্জ্বল
আলোর জন্য
স্যাংকিও
সাইকেল ডায়নামো লাইট

১২ ভোল্টস্ এবং ৬ ভোল্টস্

স্যাংকিও সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ডায়নামো লাইট

প্রস্তুত কারক :

IJI ইন্দো-জাপানীস ইণ্ডাস্ট্রীস লিমিটেড

১৪ ক্যানাল স্ট্রীট, কলিকাতা—ইণ্ডিয়া।

বিক্রয় ব্যবস্থাপনায় :

নিগম ব্রাদার্স ১৫০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০১৩,

ফোন : ২৪-৪১৩৫/৩৬

GO BRIGHT WITH SANKYO DYNAMO LIGHT

—আমি হেরম্ব।

—ঠিক আছে চৌধুরি, আসতে দাও, বেশ ওয়েট আছে লীডারের গলায়। নীচের-তলার ভীড়ভাট্টা কাটিয়ে ওপোরের ফাঁকা ফর্দায় ওঠা ইস্তক লীডার খুব মন দিয়ে পার্শোনালিটির চায় করেছেন। এখন কথা বলার চেয়ে শোনেন বেশি। কথা কম বলে কাজ হাসিল করার আর্ট এখন রীতিমতো রপ্ত। তাই কথা বললেই এসব কিছুর ছাপ খানিকটা থেকে যায়।

বালিশে কনুই, মাথায় হাত, উঁচু খাটের ওপোর লীডার আধশোয়া। হেরম্বর দিকে চোখ ফিরিয়ে একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বোসো।

লীডারের হাতের সিগারেটটা থেকে অফুরন্ত ধোঁয়ার সুতো। পাশের টেবিলে ছাপাছাপি এ্যাসট্রে। বসতে বলে খানিকক্ষণ চুপ লীডার। হেরম্ব লীডারের এরকম মুডে অভ্যস্ত। অনেক সময় একটা সিরিয়াস কথা পাড়ার আগের প্রস্তুতি। গত বছর এমনি কিছুক্ষণ। চুপচাপ থেকে হেরম্বকে দলের স্তর থেকে জেলা আর-টি-এ-র মেম্বার হতে বলেছিলেন। হেরম্ব অন্য মেম্বারদের নাম শুনে আর রাজি হয় নি। হেরম্বও চুপচাপ। দেওয়ালে অনেকবার দেখা লীডারের নানান ফটো, মানপত্র, কাচের আলমারিতে লীডারের প্রথম যৌবনে থিয়েটার আর আবৃত্তিতে পাওয়া বিবর্ণ কাপ, মেডেল একটা ছবিতে নৌকোয় আরও অনেকের সঙ্গে প্রায় কিশোর লীডার। গায়ে গেঞ্জি, কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধা ধুতি, হাতে নৌকোর দাঁড়। তখনও লীডার, ফ্রান্ড রিলিফের কাজে। অন্য একটা ছবিতে জহরলাল নেহরুর সঙ্গে অনেক কম বয়েসের লীডার। নেহেরুর মুখ নীচু তর্জনী উঁচিয়ে কি বলছেন। লীডার শুনছেন গম্ভীর মুখে। আরেকটায় ইন্দিরা গান্ধীর হাতে একটা বোকে দিচ্ছেন লীডার। দুজনের মুখেই হাসি।

—চৌধুরি, আরেক প্যাকেট সিগারেট দাও তো, সেই ভারি গলা লীডারের। হয়তো অনুরোধ, শুনতে হুকুম।

—এই যে স্যার, চৌধুরির হাতে ইন্ডিয়া কিং-এর প্যাকেট।

—আর দ্যাখো, আমি এখন কোনো ভিজিটারের সঙ্গে কথা বলবো না, সিগারেটের প্যাকেটটা নিতে নিতে বললেন লীডার।

—ঠিক আছে স্যার, চৌধুরি স্টিফ হয়ে বললো। বলেই পর্দার ওপারে।

ঠোঁটে সিগারেট, দুহাত দিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই আগলে ধরানোর কসরৎ, তারই ফাঁক দিয়ে বেরোলো লীডারের কথাগুলো, সামনে মিউনিসিপাল ইলেকশান, তোমাদের ছ নম্বর ওয়ার্ডে কাকে নমিনেশান দেওয়া যায় ভেবেছো।

কথাটা এলো আচমকা। একটু থমকে গেলেও হেরম্বর একেবারে আন্দাজের বাইরে নয়। লীডার এবারে এসেছেন সমাজসেবার উমেদারদের লম্বা লাইনটা ছোঁটেকেটে মাপমাফিক করতে। অনেকের মতো হেরম্বও তা জানে। অমনি হেরম্বর মনের মধ্যে একটা মরকুটে চাবাগাছ ডালপালা ছড়াতে লাগলো। আজ হেরম্ব মাস্টারের কোন তকমা নেই। লোকের দুঃখকষ্ট সাফ করার কাজে সততার সার্টিফিকেটটাই সম্বল। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হলে একটা বাড়তি ওজন। যেটার অভাব অনেক দিন বোধ করেছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের চাপরাশটা আশ-পাশের অভাব-অভিযোগ হটানোর কাজে একটা ভালো কোঁদালের ফাল। না চাইলেও লীডার আর-টি-এ-র মেম্বারশিপ অফার করেছেন। তারও আগে পার্টির ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারির পোস্ট, স্টেট কমিটির মেম্বার-শিপ। হেরম্বর এ্যামবিশান তো নখ-খাওয়া ছেলের নখ। তাই কোনটাই নেয় নি। কিন্তু এবার আর রিফিউস করবে না। এক সেকেন্ডে ডিসিসান নিলো হেরম্ব: লীডার নমিনেশান অফার করলে এ্যাকসেপ্ট করবে।

—কিন্তু না হেরম্ব, তুমি যা ভাবছো তা নয়, সিগারেটের ধোঁওয়ায় চোখ রেখে লীডার বললেন, এবার আর তোমাকে আমি অফার করবো না।

এক ঝাঁকুনিতে হেরম্ব সোজা। দু কানের টেমপারেচার অমনি চড়ার দিকে। গণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, কি করে জানলেন যে আমি আপনার কাছ থেকে নমিনেশান আশা করছিলাম?

কথার মতো লীডারের হাসিটাও গম্ভীর। কোন আনন্দের ছাপ নেই। শুধু মুখের রেখা আর গলার শব্দে ধরে নিতে হয়। বললেন, রাজনীতি করতে গেলে লোকের মনের মধ্যে ঢুকতে হয়। সব সময় অন্য লোককে আউট-গোয়িং করতে হয়। রাজনীতিতে বন্ধু আর শত্রুর মধ্যে লাইনটা খুব অস্পষ্ট। তুমি যখন সোজাসুজি আমার কথার জবাব দিলে না, তখন আমাকে ভাবতে হলো তুমি নিজের কথাই চিন্তা করছো, তাই নয় কি? বলে তাকালেন হেরম্বর দিকে। এক লহমার জন্যে।

আবার চোখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাকে এর চেয়েও অনেক বড় প্রাইজ পোস্ট অফার করেছি। তুমি নাও নি, রেসপনসিবিলিটি এ্যাভয়েড করেছ। তাতেও আপত্তি ছিলো না। কিন্তু সিচুয়েশনটা এখন পুরোপুরি বদলে গেছে। পার্টির সেই আগের ইন্টিগ্রিটি নেই। এখন ঘরের মধ্যেই অনেক শত্রু। তাই নমিনেশনের ব্যাপারে ট্রাস্ট আর কমানই বড় কথা, ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান্ডিডেটের অনেস্টি আর পপুলারিটি নয়।

—আমার মনে হয় আপনি ছ নম্বর ওয়ার্ডে নমিনেশন কাকে দেবেন ঠিক করেই ফেলেছেন, হেরম্বর গলা খুব শান্ত।

—তা করেছি, নমিনেশনটা ধীরু পাবে বিচারকের রায় ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বললেন লীডার।

হেরম্বর মনে হলো হার্ট এ্যাটাক হবার সময় লোকের শরীর এরকম করে। বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটা একটা দানোয় পাওয়া ঢাক। যার শব্দের ওপোর কোন কন্ট্রোল নেই। অফ অল পারসনস্, ধীরু ভাবতে গিয়ে হেরম্বর মনে জাগে, বিস্ময়ে তুলকালাম কান্ড। লীডার চেহারায়, ব্যক্তিত্বের, পজিশনে, অনেক দিন থেকেই হেরম্বর কাছে হিরো। নিজেকে কোন রকমে হোড়াতালি দিয়ে সেই হিরোর দিকে তাকাল হেরম্ব। এক সময়ের ধারালো প্রোফাইল একটা বাড়তি চর্বির লেয়ারে এখন অনেকটা ভোঁতা। ফর্সা রং কতকটা তামাটে। কানের ওপোরের চুলে বয়েসের ছাপ। তবু এখনও রীতিমতো হ্যান্ডসাম। তবু এই লোকই হেরম্বর এতোদিনের অনেক কষ্টে আগলে রাখা ধ্যান-ধারণাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। ভাবতেও যন্ত্রণা। রাজনীতি মানুষকে কি ভীষন নিষ্ঠুর করে, হেরম্ব ভাবলো।

—আমাকে কি আপনার ডিসিসানটা শোনাবার জন্যে ডেকেছেন, হেরম্বর গলা ভয়ংকর স্বাভাবিক।

লীডার শুনতেই পেলেন না হেরম্বর কথা। সিগারেটের ধোঁওয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি হয়তো ভাবছো তোমার মতো ক্যান্ডিডেট থাকতে আমি কি করে ধীরুকে নমিনেশন দেবার কথা ভাবছি। বাজোর রাজনীতিতে আমি আজ পঞ্চলা নারিতে, সারা ভারতবর্ষে আমার পজিশন ব্যাক বেঞ্চারদের অনেক ওপোরে, প্রায় মিড্‌ল অর্ডারে বলতে পারো। সব কিছুর শুরু কিন্তু এই মফঃস্বলের ছোট্ট শহরটা থেকে। এটা আমার আসল বেস এখানে কোন ডিস্টারবেনস্ আমি সহ্য করবো না।

লীডারের নিজের মনে কথা বলাটা ভালো লাগছিল না হেরম্বর। মাঝ রাস্তায় দাঁড়ি

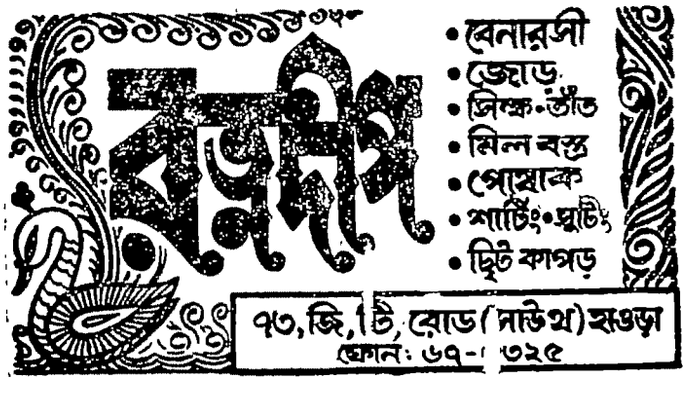

টানাব জন্য বললো, তা আমাকে কি করতে বলেন।

লীডার এখনও নিজের মধ্যে ডুবে। হাত তুলে হেরম্বকে থামিয়ে বললেন, সহজ, তরল নীতিবোধের বড় রাস্তায় রাজনীতি চলে না। কোন ধরাবাঁধা ট্যাকটিক্স্ নেই। একট স্ট্র্যাটেজিক এন্ড আছে মাত্র। ধীরুকে আমায় নমিনেশন দিতে হবে, কারণ সে নমিনেশন না পেলে আমাদেব যে সাপ্লিমেন্টাব গ্রুপটা সব ওয়ার্ডে প্যারালাল ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে, তাদের খপ্পরে চলে যাবে। ওরা সমানে তাতাচ্ছে ওকে, কথা দিয়েছে ত্রিতলে অন্ততপক্ষে ভাইস চেয়ারম্যান করবেই। আমার কথায় ধীরু এখনো ওদের ক্যাম্পে জয়েন করে নি।

তাছাড়া, লীডার বলে চললেন, পার্টি ইলেকশানে খুব একটা টাকা-পয়সা দিতে পাববে না, ক্যান্ডিডেটদেব ইন্ডিভিজুয়াল বিসোর্শই ভরসা। ধীরুর পয়সা তো আছেই, তাছাড়া আছে ইলেকশান মেশিনারী শেট-আপ কবার ক্ষমতা। এত বড় একটা রিশোর্স তোমাকে নমিনেশান দিলে আমাব শত্রু হয়ে যাবে। কুড়িটা ওয়ার্ডেব মধ্যে পাঁচটা তো খরচের খাতায় লিখেই বেখেছি। আবও তিনটে হল মার্জিনাল শিট। আই কান্ট এ্যাফর্ড টু লুজ এনি মোর, গম গম করে উঠল লীডারের গলা।

হঠাৎ শ্বর বদলে হেরম্বর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে কিন্তু ধীরুব হয়ে এ্যাকটিভলি ক্যাম্পেন করতে হবে। তুমি নিউট্রাল থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পাবব না। তোমার কাছে আমার অনেক আশা।

এতক্ষণে ঝুলির বেড়াল বাইরে। এক ধরনের নিশ্চিন্ত বোধ কবল হেরম্ব। মনের মধ্যে দাপান রাগ সত্ত্বেও।

—আমি তোমাব ডিফিকালটি বুঝি হেরম্ব, কিন্তু উপায় নেই। এটা রাজ-নীতি, আদর্শেব সঙ্গে অনেক সময় অনেক কম্প্রোমাইজ করতে হয় বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে।

—কিন্তু আমি তো সে রাজনীতি কবি না, ঠান্ডা গলায় বললো হেরম্ব, আমাব কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। নিজের সীমাবদ্ধ শক্তিতে লোকেব যেটুকু উপকার করতে পাবি, করি।

—সে আমি জানি হেরম্ব, অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন লীডার, সে সুযোগ তোমাকে আমি আবও বেশী দিতে চাই। তুমি আমাকে কথা দাও ধীরুকে সাপোর্ট করবে, আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি আগামী বাজ্যসভার ইলেকশানে তোমাকে নমিনেশন দেব। কাজটা মোটেই সহজ হবে না, কিন্তু আমার যতটা সাধ্য তোমার জন্যে করব, তোমার মত সাইলেন্ট ওয়ার্কারেব জন্যে আমার একটা মরাল অবলিগেশান আছে।

শেষের দিকে লীডাবের গলায় কেমন একটু ইমোশনের ছাপ এসে গেল। এমনিতে আসে না। এত কথাই কারুর সঙ্গে বলেন না।

লীডারের প্রতিটি কথা হেরম্বর করোটির নার্ভের ওপর ঝড়তি চাপ। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। কানের টেমপারেচার কমার নাম নেই। এক ঝটকায় শরীরের যত ব্যথা, বিষ ঝেড়ে ফেলল হেরম্ব। শিরদাঁড়া টানটান করে বলল, ধীরুকে সমর্থন করলে আখেরের কথা না ভেবেই করব।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল হেরম্ব। লীডারও খাট থেকে মাটিতে। হেরম্বর মুখোমুখি। হেরম্বর মাথা লীডারের কাঁধ বরাবর। প্রথম যৌবনে লম্বা, ঝাড়াঝাপ্টা শরীর, শহরে শখের থিয়েটারের একচেটে নায়ক। এখন বেশ ভারিক্কি চেহারা, আরও অনেক বেশী ভারী ব্যক্তিত্ব। হেরম্বর ওপর চাপ দিয়ে বললেন, আমার কথার পরিষ্কার জবাব আমি এখনও পাই নি হেরম্ব।

লীডারকে ছোট করে ভাবতে কষ্ট হয় হেরম্বর। পঞ্চাশের দিকে হেলা চল্লিশের ঘরে বয়েস। বেয়াল্লিশের আন্দোলনে জেলে গেছেন। তাম্রপত্র পেয়েছেন। পেশাদার রাজনীতিক। অনেক রকম ময়লা ঘাঁটতে হয়। অনেক সময় জেনেশুনে, ইচ্ছে করে। তবু ওরই মধ্যে লীডারের দেখার চোখ আর কথার মধ্যে হঠাৎ চমক ধমকে দিয়েছে হেরম্বকে। আজ অতি নগণ্য, বসেসে ছোট হেরম্ব মাস্টারের কাছে হাত পেতেছেন সেই লীডার। মাসে দু-তিনবার দিল্লি যান। তিন-চার মাসে একবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুলাকাৎ। বিদেশে গেছেন কতবাব। এই তো সেদিন রাশিয়া আর ইস্ট ইউরোপে একটা ডেলিগেশান লীড করে এলেন। ভাবতেই ছেলেমানুষী গর্বে হেরম্বর আগেব রাগ-দুঃখ বেশ খানিকটা পেছপা। ভাবল, একবার কল্যাণী কি ধীরু থাকত এই সিনটাতে, অন্তত দর্শকেব ভূমিকায়।

—হেরম্ব, লীডারের চোখ, মুখ রীতিমত শকত।

—আপনি জানেন ধীরুর মত অচল আধুলিকে চালান কত শকত, সমানে সমানে জবাব দিল হেরম্ব।

পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। কে একজন ধরল। লীডার দু চোখে সাপটে বেখেছেন হেরম্বকে। চৌধুরী পর্দা ফাঁক করে বলল, স্যার, কলকাতা থেকে টুনকে-কল।

—ধরতে বল, লীডার চোখ না ফিরিয়ে বললেন।

—খুব জরুরী, একটু ইমমেডিয়েট কথা বলতে চাইছে চৌধুরী।

—আঃ, বলে দাও আমি ঝাড়ি নেই, লীডারের গলা এমনিতে বিশেষ চড়ে না। এখন কিন্তু চাপা গর্জন। চৌধুরী ঢুকে পর্দার আড়ালে লোপাট।

—আমি কাউকে বেশী অনুরোধ করতে অভ্যস্ত নই হেরম্ব, এক লহমার উত্তাপের পর লীডারের গলা আশ্চর্য ঠান্ডা। দু চোখ একবারও ফেরাননি হেরম্বর মুখ থেকে।

—আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, হেরম্বকে এক দুঃসাহসের মজার খেলায় পেয়ে বসেছে।

—না, ভয় দেখিয়ে কাউকে ওয়ার্নিং আমি দিই না। যা করবার সেটা করি এবং কি কবব সেটাও জানাই না, লীডারের কথা-গুলো একদম ফ্ল্যাট, কোন উত্তেজনা নেই। কিন্তু তাতান লোহার আঁচ আছে।

—কাজটা শকত আমি জানি। আর এও জানি পার্টির ওপর তোমার লয়ালটি আছে, তাই তুমি পারবে, তোমাকে পারতেই হবে, চাপ ঢিলে করলেন না লীডার।

—হেরম্বর চোখে জল আসি আসি। সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, যা বলবেন তাই হবে।

—আমি জানি তুমি আমাকে ডোন্ট ডাউন করবে, লীডারের মুখে অনেকক্ষণ পরে হাসি। তাবই জের টেনে খানিকটা হাল্কা চালে বললেন, আমাদের পার্টিটা হল কুম্ভমেলার মত। সাধু, সন্যাসী, পুণ্যার্থী-রাও আছে, আবার হাজার রকমের মতলব-

চেয়ে, দেব-প্রকাশও আজও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মতই ওই। তবে পৃথিবীতেই সৎ লোকের সংখ্যা কম। প্রথমটা হেরে গেলেও শেষ পর্যন্ত তারাই সব কিছুর মোড় ফেরায়। টয়লেট পেপারের মত ধীরুর ঔইপের লোকেরও দরকার হয় নোংরা কাজে। কিন্তু তোমার মত লোকরাই পার্টির বা দেশের পার্মানেন্ট এ্যাসেট।

হেরম্ব খুশীর লীডার তার পিঠ চাপড়াচ্ছেন। মাস্তান ভোকাবুলারিতে এরই নাম বোধ হয় প্যাস দেওয়া। তবু অখুশী হল না হেরম্ব। নার্ভের লড়াইয়ে লীডারের মত ঘাঘু লোককেও রীতিমত বেগ দিতে পেরেছে। তাই বা কজন পারে।

—চলি, হেরম্ব পাশের ঘর পেরিয়ে বাইরের, বারান্দায়। সঙ্গে সঙ্গে লীডারও। আসে কোন দিন এ রকম এগিয়ে দিতে আসেন নি। বললেন, আমার গাড়ি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসুক।

—তার দরকার হবে না, বলে হেরম্ব বারান্দা ছেড়ে রাস্তায়। লীডার তখনও আর দিকে চেয়ে।

লীডার কাউকে খুশী, কাউকে অখুশী করে নমিনেশানের লিস্ট একটা বানিয়ে দিয়েই কলকাতামুখো। আবার আসবেন ইলেকশানের কদিন আগে। ধেওয়ালে পুরোন লেখা চুন দিয়ে মুছে তার ওপর নতুন লেখা। পল্লীর বিশিষ্ট সমাজসেবী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিককে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে নাগরিকদের সেবা করার সুযোগ দেবার জন্যে অনুরোধ।

যদিও পাশের বাড়ির লোক ধীরু। হেরম্বর সঙ্গে দেখা প্রায় নেই। দুজনের মেলামেশা, চলাফেরা আলাদা। লীডারের অনুরোধের জের টেনে ধীরু নিজে থেকে কিছু বলে নি হেরম্বকে। হেরম্বও যেচে যায় নি।

কল্যাণী একদিন বিকেলে স্কুল-ফেরৎ হেরম্বকে বলল, ধীরু ঠাকুরপো বলছিল ভোট আসছে, মেয়েদের সঙ্গে পাড়ায় বেরিয়ে একটু কাজ করতে। সেই আগের বড় ইলেকশানে যেমন করেছিলাম। কল্যাণী কথা বলে চোখ, মুখ দুটো দিয়েই।

কল্যাণীর সঙ্গে হেরম্বর বয়েসের অনেক বছর বারোর। এর পেছনে অবশ্য মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ছাত্রের নিজস্ব থিওরি : স্ত্রীর বয়েস কম হলে বুড়ো বয়েসে স্বামীর যত্নটা ভাল হয়। হেরম্বও বয়সের সাবেক ধারণা পুরোপুরি কাটাতে পারে নি। মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে বড় মেয়েছেলে। হেরম্বর মা কথা বলতেন মুখের ওপর আঁচল চাপা দিয়ে। হেরম্ব অবশ্য কল্যাণীকে ততটা করতে বলে না। তবে চোখ-মুখ নাচানোটা অপছন্দ করে। আগে আগে বলত। এখন আর বলে না। হাল ছেড়ে দিয়েছে।

গতকাল হায়ার সেকেণ্ডারীর খাতা দেখার চেকটা পেয়ে মেজাজটা ভালই ছিল হেরম্বর। হেসে বলল, কি করবে, লাউড-স্পীকারে ভোট ফর ধীরু, ঠাকুরপো বলে চেঁচাবে ?

আহ্ কথার ছিরি, মুখ-চোখ বেঁকিয়ে বলল কল্যাণী, চেঁচান ছাড়া যেন আর কোন কাজ নেই।

—ধীরু দেখছি তোমাকেই বলে, আমাকে তো বলে না।

হেরম্ব কথাটা ভেবে বলে নি। কিন্তু অমনি কল্যাণীর মুখে রঙের রকমফের। কেমন থতমত। দেখে হেরম্বরও মনে খটকা। কিছু হয় নি এমনি মুখ করে বলল, ধীরু করে এসেছিল বাড়িতে।

—বাড়িতে আবার এল কোথায়, খুব তাড়াতাড়ি বলল কল্যাণী, এই তো দিন-দুই আগে। তুমি স্কুলে। বাইরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম, হুস করে গাড়ি থামল ধীরু ঠাকুরপো, তখন বলল।

একেবারে ক্ল্যাশ ফাইভের স্ট্যাণ্ডার্ডের পড়া মুখস্ত। হেরম্বর অভিজ্ঞতায় কল্যাণীর মিথ্যে কথা বলার ফায়দাটা ওই রকমই কাঁচা, আনাড়ি। কোনটা মিথ্যে, কতটা মিথ্যে যাচাই করার উপায় নেই। হেরম্বর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

—যা, হেরম্ব বলল।

—কি মা ? কল্যাণী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—ধীরুর ঢ্যাঁড়া পেটানোতে তোমার বেরোনোয় না, হেরম্ব চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

—তোমার আসলে ধীরু ঠাকুরপোকে হিংসে, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল কল্যাণী।

—তোমার বিদ্যে-বুদ্ধিতে এর চেয়ে বেশী চিন্তা করা সম্ভব নয় তা জানি, হেরম্বর হাসিটা ভীষণ ধারাল। বলল, সত্যি তো ধীরুকে কেন হিংসে করব না আমি, ওর মত বৌকে খুন করে সুইসাইড বলে চালাই নি, মেয়েছেলে সাপ্লাই দিয়ে কন-ট্রাক্ট জোগাড় করি নি, স্মাগলিং করতে পারি না, আরও অনেক কিছু পারি না।

—হেরম্ব যা ভেবেছিল, তাই হল। কথার ছেঁকাপোড়ায় কল্যাণী আরও চিড়বিড়। বলল, কারুর পয়সা হলে লোকে হিংসেয় বানিয়ে বানিয়ে ও রকম অনেক বলে। ধীরু ঠাকুরপোও তাই বলছিল, ছোটবেলায় তোমাকে ও হিংসে করত তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে বলে। এখন তুমি ওকে দেখতে পার না, ও টাকা গঙ্গাজলে ধোওয়া কিনা দেখে না বলে।

—এ ডায়ালগটা তো ধীরু ভাল দিয়েছে, কখন দিল, তাহলে অনেক কথাই তোমাকে বলেছে বল, হেরম্ব খুব মিষ্টি করে বলল।

অমনি কল্যাণী এক ঝটকায় ভেতরের ঘরে। হেরম্ব নিজের মনেই হাসল খানিক। তারপর বেরিয়ে গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় ধীরুর বাড়ির সামনে সার দিয়ে এ্যামবাসাডার, ফিয়াট আর সরকারী, বেসরকারী জিপ। থানাপিনা থাকলে মাঝেসাঝে হয় এ রকম জমায়েৎ। আজও বোধ হয় তাই, বাস্তবে টিউশনি থেকে ফিরে হেরম্ব ভাবল। ধীরুর বাড়ির দিক থেকে চড়া পর্দার হাসি। তারও অনেক পরে দিশীমতে তখনও রাত, বিলিতিমতে দিন শুরু, ধীরু আর অতিথি-দেব বোতল আর হুল্লোড়ের স্টক ফুরোবার কোন লক্ষণ নেই। পাড়া-প্রতিবেশীর তোয়াক্কা রাখে না। সবাই জানে পয়সা আর কব্জির জোর—দুটোতেই ধীরুর হেভী ওয়েট।

হেরম্বর অন্ধকার শোবার ঘরে ধীরুর বাড়িমুখো দুটো জানলাই বন্ধ। তবুও ধীরুকে বাতিল করে ঘুমকে ঠাঁই দেবার জো নেই। পৃথিবীর যা কিছু স্ফূর্তি, আনন্দ সবটাতেই ধীরুর মৌরসীপাট্টা। অথচ এই ধীরুকেই গুড কনডাক্ট সার্টি-ফিকেট দিয়ে সাফশুতরো করে লোকের সামনে হাজির করার দায় হেরম্বর। এক এক সময় মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের ছাত্রটির ওপর রাগ হয় হেরম্বর। সেই যে বিবেক বলে একটা মেশিন চালু করে দিয়েছিলেন। এখনও টিকিয়ে টিকিয়ে চলে। বন্ধ হতে চায় না। উল্টে মাঝেসাঝে একেবারে ভিত কাঁপিয়ে ধকধক করে ওঠে। তখন নজর ফেরাতে হয়। কে হাসপাতালে শিট পাচ্ছে না, কার জি আরের দরকার, কার বেকার ছেলে বসে থেকে থেকে তার বাটতে গিয়ে ধরা পড়েছে, এই সব। ইন্দিরা গান্ধীও সারা দেশের দিকে তাকিয়ে এই সব আপদ-বালাই তাড়াবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তার তো অনেক লেফটেন্যান্ট আছে বোঝা হালকা করার জন্যে। হেরম্ব একেবারে একা। পঞ্চান্ন কোটি তো দূরের কথা। সত্তর হাজার লোকের এই শহরের একটা ওয়ার্ডেই টনটন দুঃখ-কষ্ট। ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

ধীরুর বাড়ি হেঁড়ে গলায় হিন্দি ফিল্মি গান ধরেছে কে। বাদবাকী সকলে জুতো ঠুকে, হাততালি দিয়ে তাল রাখছে। সবাই জানে ঠাণ্ডা মাথা লোক হেরম্ব। কখনও রাগে না। রাগের মুখে ঠিক সময় মত লাগাম কষতে জানে। কিন্তু রাত-দুপুরে ধীরু আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের বেলেল্লাপনার ঠেলায় একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়

শেক্সপীয়র – ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩০.০০
মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য – ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র ২০.০০
শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা – (সংকলন) – ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত ২৫.০০
• এছাড়া মুক্তধারা-র (বাংলাদেশ) প্রধান পরিবেশক
পুস্তিপত্র ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

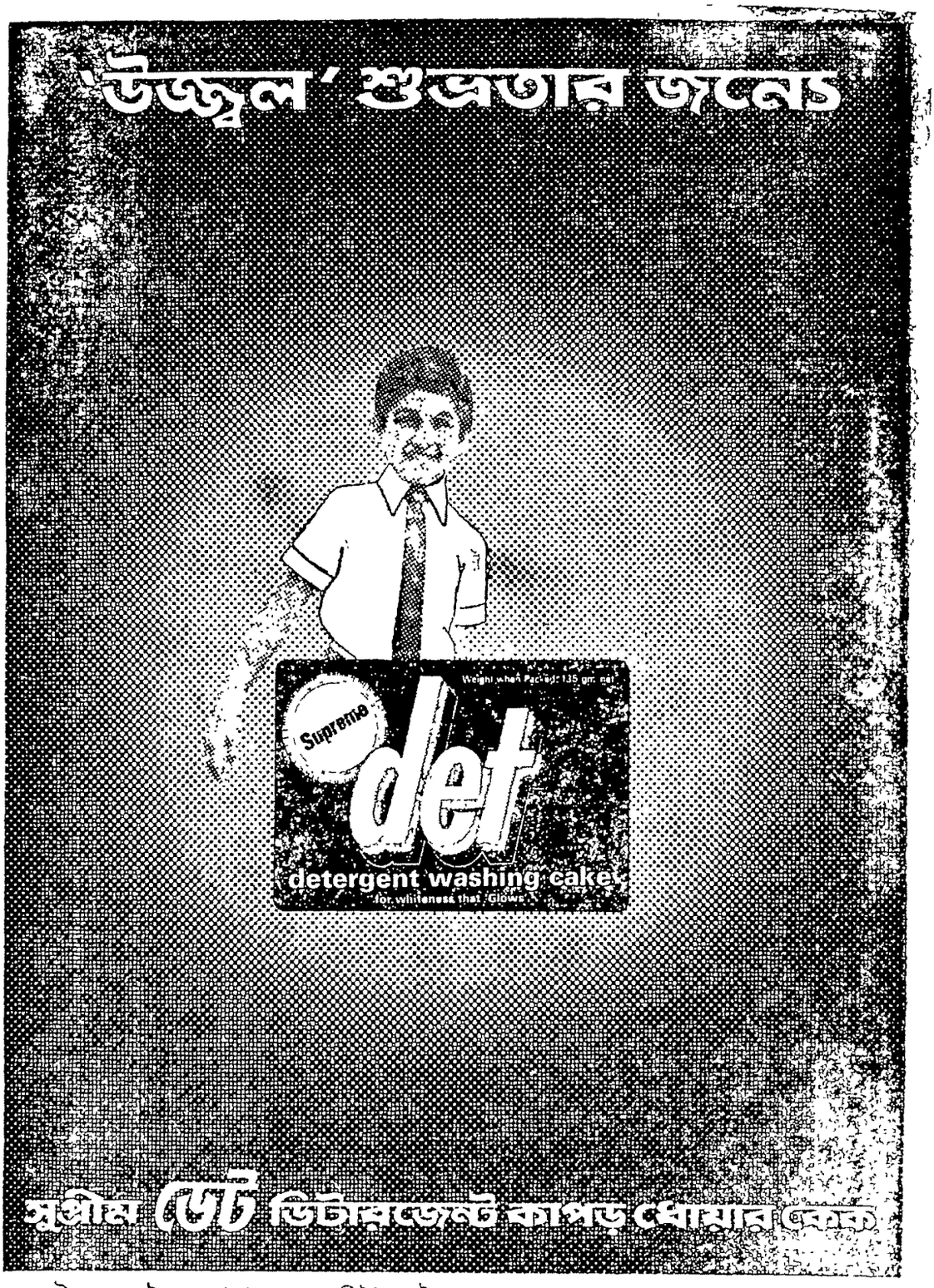

নতুন উন্নততর ডেট কেক বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক।

এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়,কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই।

ব্যবহার করে দেখুন। তফাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম ডেট কেক।

ধবধবে সাদা,
ডেটের সাদা

হেরম্বর মনে অনেক খোলা মাঠ পেয়ে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে কেমিস্ট্রি বাধান মহাত্মা অশ্বিনী-কুমারের ছাত্র পুরান চন্দনের ছোপ দেওয়া ফ্রেমের আড়ালে তাঁর উপদেশ-টুপদেশ শুধু ঝ।

কল্যাণী কিন্তু খড়খড়ি ফাঁক করে জানলার গরাদে একেবারে ডাকটিকিট সাঁটা। হেরম্ব বারণ করেছিল। আমল দেয় নি। খানিকক্ষণ চারি দিক ঝিম মেরে থাকার পর একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দ। তারপর আরেকটা। মাতালদের জমায়েৎ ভাঙ্গল এতক্ষণে, হেরম্বর বুকচেরা রাগ একটা গরম নিঃশ্বাস হয়ে বেরোল। ধীরুর বাড়ির থেকে একটা হাসির গররা। খুব নীচু পর্দায় তার প্রতিধ্বনি জানলার কাছ থেকে। খড়খড়ি চোঁয়ানো আলোয় কল্যাণীর স্ভিটেল বোঝা যায় না। বুঝতে অসুবিধে হয় না চাপা হাসির দমকে দু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। মধ্যে-মধ্যে দু-একটা হাঁপিয়ে ওঠা কথা। টোটাল দিলে দাঁড়ায় : একটা লোক গড়িয়ে দর্দশায় পড়ে গেল।

কল্যাণীর হাসিতে হেরম্বর মাথার মধ্যে অনেকগুলো লাল আলোর সুইচ পটা-পট জ্বল। মনে পড়ে গেল নিজের অজস্র কেইলিওরের মধ্যে একটা। যেটা এখন মধ্যে মাঝেই হয়। রাত্তিরে তিবিশ বছরের কল্যাণীর চাহিদা মেটাতে গিয়ে হেরম্বর বেয়াল্লিশ বছরের শরীরটাতে ফুলে ফেঁপে ওঠা জোয়ার-ভাটার টানে নেতিয়ে পড়ে হঠাৎ। প্রথম প্রথম কল্যাণী গুম। এখন আর তা হয় না। ফুরিয়ে যাওয়া ক্লান্ত হেরম্বর ঝুলে ওজন, দু সাকের ফুটোর স্টিম ইঞ্জিনের হাঁসফাস, সব কিছু মিলে এক অসার সুড়সুড়ি। কল্যাণীর লেপ্টে থাকা শরীরটাতে ঢেউ খেলতে থাকে একই টাইপের চাপা হাসির তোড়ে। পরাজিত হেরম্বর বুকে, তলপেটে, উরুতে হাতুড়ির ঘাড়ি।

কথাটা মনে হতেই সব উপদেশের বেড়া ভেঙে চুরমার। একটা নিষিদ্ধ গালা-গাল হেরম্বর মনে শীলমোহর মারল : মাগি। ইংরিজি পোশাক পরিয়ে সেটাকেই আবার ছুঁড়ে দিল কল্যাণীর দিকে : কুত্তি, স্টুপিড উওম্যান। দুমড়ে দু ভাঁজ হয়েই ছিল কল্যাণী। এবারে মেঝেতে বসে পড়ল। তবুও সেই বেহায়া হাসিটা থেকে নিস্তার নেই।

—চুপ কর, হেরম্বর কথাগুলো বাতাসের পিঠে চাবুক।

কল্যাণীর হাসি থামার লক্ষণ নেই। হেরম্বর মধ্যে একটা ডিনামাইটের ফিউজ পুড়ছে। যা কিছু একটা হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। দু হাতের আঙুল-গুলো কখন গুটিয়ে মুঠো। ডান হাতের তর্জনীটা লাফিয়ে উঠল। অন্ধকারে একটা অদৃশ্য রিভলভারের ট্রিগার বার বার দাবাতে লাগলেন। একটা হেরম্ব খাটের ওপর পাথর। আরেক হেরম্ব দেওয়াল ফুটো করে রাস্তায়। গাড়িগুলোর সিলিন্ডার খাওয়া তেল লাইটের দিকে এলোপাথাড়ি ফায়ার।

[শেষ অধ্যায়]

পরের দিন সকালে সেই ধীরুই আচমকা হাঁক ছাড়ল বাইরে থেকে, হেরম্ব বাড়ি আছিস ?

ঘন্টা তিনেক ঘুমের পর অনেক ফ্রেশ হেরম্ব। সকাল বেলার টাটকা রোদে কাল রাত্তিরের হ্যালিউসিনেশানটা ফেরার। শোবার ঘরে খাটের ওপর হাফ ইয়ার্লি'র খাতার ডাঁই নিয়ে বসেছিল। একটা খাতার কুচি কুচি নম্বর টোটাল দেবার মাঝ রাস্তায়। ধীরু আবার ডাক দিতেই যোগের স্পীডটা বাড়িয়ে দিল।

রান্নাঘরের দিক থেকে ছুটে এল এক পিঠ খোলা চুল আর আধ ময়লা রঙিন ছাপা শাড়ি দিয়ে মোড়া একটা ঝড়। বাতাসের আগে। সদর দরজা খোলার শব্দ। হেরম্ব তার যোগের ট্রেনটাকে ঝুলে। চোখ যোগের ফিগারে, কান বাইরে। কল্যাণীর ওমা ধীরু ঠাকুরপো, সক্কালবেলা কি সৌভাগ্য, আসুন, আসুন-মার্কা অভ্যর্থনা। কিন্তু তারপরেই একই গলায় চিল চিৎ-কারের এ্যান্টি ক্লাইমাকস।

যোগ রইল পড়ে। হপ-স্টেপ এ্যান্ড জাম্পে হেরম্ব বাইরের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিন্ডটা এক হাঁচকা টানে গলায় ঢিপি।

ধীরুর উঁচিয়ে ধরা ডান হাতে সেই ভয়ংকর সুন্দর ছোট্ট যন্ত্রণা। পোর্টেবল হাউইটজার কামান ঠিক। তাগ মাফিক বাগিয়ে ধরলে ক্যাসিয়াস ক্লেবও হাঁটু দুমড়ে দ। যার জন্যে হেরম্ব ডান হাতের তর্জনী আজকাল প্রায়ই নিশপিশ। কি প্রচন্ড শকতি ওই ঝকঝকে সাদা এক বিঘত মাপের স্টীলের জিনিসটার মধ্যে। এত কাছ থেকে মোহন রূপ দেখে হেরম্ব স্ট্যাচু।

ধীরুর চওড়া, রাফ মুখে ভিলেনের হাসি। চাপা গলায় বলল, হ্যান্স আপ।

হেরম্ব দু হাত তুলল। যন্ত্রটাকে সম্মান দেখাতে হলে তুলতেই হয়। কল্যাণীর ডান হাতটা মুখের ওপর চাপা। চোখ এমনিতেই বড়। এখন আরও বড়।

দাঁতে দাঁত ঘষে হেরম্ব কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, দু হাত মাথার ওপর।

আস্তে আস্তে হাত দুটো তুলল কল্যাণী। অমনি আলগা আঁচলটা খসে পায়ের কাছে। শাড়ি আর ব্লাউজের দুই লাইনের মধ্যে অল্প চর্বিশুদ্ধ এক ফালি পেট। লাল ব্লাউজ জানলার পর্দার ফাঁক ডিজাইন রোদের ফোকাস। হেরম্বর বুক আর মাথার মধ্যে জোড়া ভূমিকম্প।

তারপরেই এক নাগাড়ে অনেকগুলো হাসির বোমা ফাটালো ধীরু। রিভলভারটা হাতের তালুতে নাচালে বার-কতক। তত-ক্ষণে লুটোনো আঁচল কুড়িয়ে কল্যাণী দৌড়ে ভেতরে।

—খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলি, তাই না হেরম্ব, সেই ভিলেনের হাসিটা ধীরু খুব জোড়িয়াল। হাতের তালুতে রিভলভারটা শুষে। পজিশানটা বদলে গিয়ে একেবারে বাচ্চার হাতের নিষ্প্রাণ খেলনা।

হেরম্বর মাথায় আর বুকে জোড়া ভূমিকম্পের দোলানী কমে আসতে রিভলভারটার ভূমিকা বদলে যেতেই রাত্তিরের বুনো রাগটা আবার এক ছুটে এসে হাজির। হেরম্ব তার যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে বলল, এটা কি ধরনের ঢাষাড়ে রসিকতা ?

—সত্যি বলছি, তোকে শুধু রিভলভারটা দেখাতে এসেছিলাম, ধীরু হেরম্বর মেজাজ বুঝে একদম নরম, বলল, গত-কালই হাতে পেয়েছি। তাই দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কাল রাত্তিরে একটু সেলিব্রেট করলাম। সকালে ইচ্ছে করলো তোকে দেখাই। বৌদি এসে দরজা খুলতে ভাবলাম একটু মজা করি। তা তোরা দুজনে এত ভয় পাবি ভাবতে পারি নি।

একটু থেমে আবার বলল, তুই আমার শিশুকালের বন্ধু। আমার বাবা তোর মাপকাঠিতে আমাকে মেপে ছোট-বেলায় উঠোনে ফেলে কণ্ঠি দিয়ে পেটাতো। সেই তোকে মেরে তোর সুন্দরী বৌকে বিধবা করব আমি—কি করে ভাবলি তুই, একটা গা ঘিন ঘিন-করা হাসি দিয়ে কথা-গুলো শেষ করল ধীরু।

হেরম্বর রাগ তখনও পড়ে নি। বলল, তুই যেটা অভিনয় করলি, ওই রোলেই তোকে মানায় ভাল।

—তুই সত্যি সত্যি বেগে গেছিস দেখছি, আই এ্যাম সরি, ধীরু আরও ক ধাপ নীচে হেরম্বর নাগাল পেতে।

—তুই একটা বুদ্ধু, তোর হাতে রিভলভার থাকা মানে সমাজের মস্ত বিপদ, ঝেঁঝে বলল হেরম্ব।

—আরে বুদ্ধুদেরই তো রিভলভার লাগে, কথাটা আলগোছে লুফে নিয়ে বলল ধীরু, নইলে তোর মত নিরামিষ লোকের রিভলভারের দরকার কি ? আমার চেয়ে অনেক বড় বুদ্ধু ঢের বেশি খাতির কুড়িয়ে ঘুরছে, কারণ তারা আমার মত কুজ্ঞ মুহুরির ছেলে নয়। রিভলভারটা দরকার তাদের জন্যে। আমার পকেটে একটা আছে আর দরকার পড়লে আমি দমাদ্দম চালিয়ে দেব জানলে সবাই সমঝে চলবে।

ধীরু তার বড়সড় মাপের শরীরটা ভরে দিল একটা নড়বড়ে বেতের চেয়ারে। হেরম্বকে তার নিজের বাড়িতে আপ্যায়ন করে বলল, বোস না, ঝগড়াটা বসে বসেই কর।

হেরম্বর মনে হল সামনে একটা ল্যান্ড ডাস্টবিন। আরেকটা চেয়ার খানিকটা পিছিয়ে নিয়ে বসল। মুখের মধ্যে নিমপাতা বাটা। মাথা আর বুকে একটু আগের যমজ ভূমিকম্পের হাঁ-করা ফাটল। তার থেকে গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এ সবই ভেতরের ব্যাপার। বাইরে থেকে দেখলে হেরম্বের মুখে কোন ভাবলেশ নেই। শুধু কপালটা অল্প কুঁচকান।

ধীরু রিভলভারটা সামনের টেবিলে রাখল। নলটা হেরম্বর দিকে ফেরান। চোখের মণির চেয়ে ছোট্ট ফুটো। সেখান থেকেই ঠিকরে বেরোয় মৃত্যুর খোকাবা। ধীরুর মত ভাগ্যটাই অনেকের মোক্ষম

জায়গায় একটা ছেঁদা করে দেবার ওয়াস্তা। অমনি ধীরু চোপসান বেলুন। হেরম্বর খুব ইচ্ছে হল একটু হাত বোলায় রিঙ্গল-ভাবটার গায়ে।

কাত হয়ে এক পাশের পাছাটা তুলল ধীরু। প্যাকেট বের করে ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল গ্যাস লাইটার দিয়ে। একটা জমাট নিঃশ্বাস ফেলল। শব্দটা হেরম্বর কান এড়াল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানল ধীরু। ছাইটা ইঞ্চিখানেক গজানোর পর খানিক প্যান্টে, খানিক মেঝের ওপর।

—আমার ব্যাড লাক হেরম্ব, তুই আমাকে ঘেন্না করবিস, রাফ, রুট ধীরুর বেনামে আরেক ক্রান্ত, অবসন্ন ধীরু।

—তোর মাপকাঠিতে আমি নিশ্চয় অসৎ, কিন্তু আমিও তো এই সমাজ থেকেই এসেছি। কুঞ্জ মুহুরির ছেলে, ক্লাস এইট পর্যন্ত বিদ্যে। আমাকেও কম স্ট্রাগল করতে হয় নি, লাথি-ঝাঁটাও কম খাই নি। মাত খেতে খেতে যা কিছু ভাল তার বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ জন্মে গেছে। অনেক তথাকথিত সৎ লোককে ভাগাড়ে নাবিয়েছি, কিন্তু হার মানলাম তোর কাছে। আজ তোর কোঅপরেশান ছাড়া ইলেকশান লড়া আমার পক্ষে শক্ত। আমি তুই কথা দিয়েছিস আমাকে সাপোর্ট করবি, বলে, কিন্তু তোকে দেবার মত আমার কিছু নেই, জুতো দিয়ে সিগারেটটা মেঝেতে ক্রাশ করে ছিল ধীরু।

হেরম্ব জবাব দিল না। ধীরুর চেহারা বা মন বলে যদি কিছু থাকে সেটা হেরম্বর ধারণায়, নিবেট কংক্রিটের চাঙ্গড়। তার ফাঁকে-ফোকরে এত ইমোশানের স্টিম কোথায় লুকিয়েছিল ভেবে পেল না হেরম্ব। কোন ধীরুটা আসল ভেবে হেরম্ব মহাধাঁধায় পড়ে। অনেকটা মানুষের মত গলা। অথচ ধীরুর। আবার এই লোকটারই বৌ মরেছিল গলায় দড়ি দিয়ে। ছেলেমেয়ে দুটো সেই করে থেকে পড়ে আছে মামার বাড়ি। খোঁজও নেয় না।

শাড়ি পল্টে ভোল ফিরিয়ে এল কল্যাণী ভেতর থেকে। সিনেমা যাবার আগে যেমন সাজে তেমনি। পাটভাঙ্গা শাড়ি, চোখে কাজল, মুখে পাউডার। হেরম্বর মনটা দেখেই তেতো। ধীরু আবার পুরো-পুরি স্কাউন্ড্রেল।

ধীরুর চওড়া, বাফ মুখে এক ধ্যাবড়া হাসি। হৈ-হৈ করে উঠল, আরে কি সেজে-ছেন বৌদি, সাক্ষাৎ হেমা মালিনী। বম্বের ডাইরেক্টাররা পেলে লুফে নেবে।

অরিজিনাল ধীরুকে ফিরতে দেখে হেরম্ব নিশ্চিন্ত। আর একটু হলে মিস্ড গিয়েছিল আর কি। কল্যাণীর মুখে নিয়ম মাফিক লালচে ছোপ। চোখ দুটো হাসছে। মুখে বলল, যাঃ যত সব বাজে কথা।

—কিসের বাজে কথা, ধীরু হেঁকে উঠল, বম্বের সব স্টার আমার দেখা আছে। এই তো গত মাসে গিয়েছিলাম বম্বেতে। ডাইরেক্টার চোপরা আছে না। গত বছর স্যুটিং করতে এসেছিলেন এখানে। হেলপ করেছিলাম তাঁবু দিয়ে, গাড়ি দিয়ে। পয়সা নিই নি। চোপরা ইনভাইট করে গেল বম্বেতে যেতে। ওরই মেখিন ড্রাইভের বাড়িতে ছিলাম দিন তিনেক। নিয়ে গেল সেকেন্ড দিন ওদের এক ফিল্মি পার্টিতে, সান এ্যান্ড স্যান্ড হোটেলে।

একটু থেমে নতুন করে সিগারেট ধরিয়ে ধীরু বলল, সেখানেই দেখলাম সব অপ্সরীদের। হেমা মালিনী, হেলেন, জীনাত আমন মায় সেদিনের সেক্স বম্ব নীতু সিং পর্যন্ত।

—আর হিরোদের মধ্যে কে কে ছিল, কল্যাণী কৌতূহলে ছাপাছাপি একেবারে। হেরম্বর ভদ্রতাবোধের ওপর অসম্ভব চাপ। ধীরু আর কল্যাণীর টগবগে উৎসাহের কাছে ভোটে হেরে চুপ।

ততক্ষণে ধীরুর আরেক কিস্তি চালু। বলল, রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, শত্রুঘ্ন সিংহ—কে নয় সত্যি বলছি বৌদি সব মেয়েগুলোর রং-করা মুখ দেখে এক রকম মনে হল। কিন্তু দাঁড়ান তো ওদের পাশে, কে বলে আপনি হেরম্ব মাস্টারের বৌ।

দরজায় পিঠ কল্যাণীর জ্বলজ্বলে দু চোখে হিরো ওয়ারশিপ। ধীরুর কথকতার মধ্যে মাঝে—ওমা তাই নাকি, সত্যি, বাঃ—এই রকম দু-চারটে উসকান ঠেকা ছাড়া কথা নেই।

ধীরুর দখলদারী শুধু বাইরেই নয়, হেরম্ব ভাবল, একেবারে ভেতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে হেরম্ব আবার কাল রাত্তিরের হ্যালিউশিনাশানটার পাল্লায়। ভেতরটা পুরোপুরি ফারনেস। চড়চড় করে পুড়ছে। বাইরে ঠোঁটের একটা কোণ শুধু দাঁতের কোণায় চাপা। ধীরুর নতুন করে ধরতাইয়ের আগে টপিকটা বদলান দরকার, হেরম্বর চটপট ডিসিশান।

সমজদার শ্রোতা পেয়ে ধীরু একে-বারে মশগুল। হেরম্ব, রিঙ্গলভার, কিছুই খেয়াল নেই। কল্যাণীরও। কেউ দেখছে না হেরম্বকে।

—ওঃ, সে কি টেরিফিক পার্টি, আবার শুরু করল ধীরু, স্কচের ফোয়ারা। তারপরেই এক কান্ড, ধীরু থামল কল্যাণীর সাসপেন্সকে খুঁচিয়ে দিয়ে।

—কি হল তারপর, কল্যাণী ঝুঁকে পড়ল সামনে। কি যেন বলতে যাচ্ছিল ধীরু কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ বেকে কথল। মুখটা হঠাৎ ফাঁকা। এক সেকেন্ড আগের উৎসাহ একেবারে বরবাদ। হেরম্বর সরু মাংসহীন হাতে রিঙ্গলভারটা। ফুট তিন-চার দূরে ধীরুর চওড়া বুক। তার নীচে মানানসই একটু শক্ত গোছের ভুঁড়ি। অনেকখানি লম্বা-চওড়া টার্গেট। গুলি ভরা থাকলে আর মিস হবার কোন চান্স নেই। হেরম্বর ভেতরের ফারনেসে হাপরের পাড়। বাইরেটা হাসি হাসি। ঠোঁটের একটা কোণে তেমনি চাপা দাঁতের তলায়।

কল্যাণী অতশত লক্ষ্য করে নি। তারপর? বলে তাকাতেই ধীরুর ভয়তারাশে মুখ। হেরম্বর হাতে ঝকঝকে সাদা রিঙ্গল-ভারটা। অমনি কল্যাণীর গলায় হেঁচকি।

তিনজনই চুপচাপ। মাথার ওপর

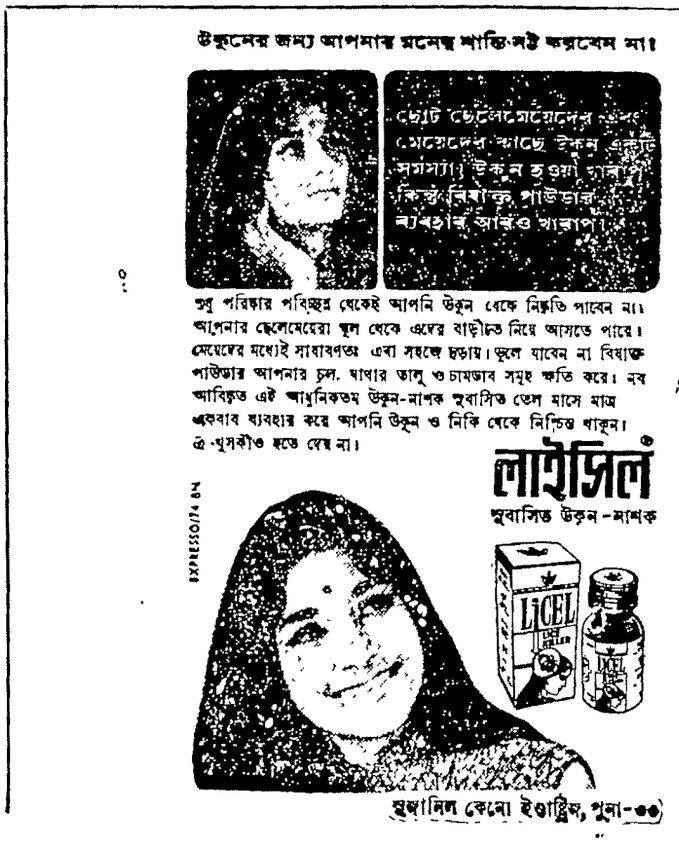

টিনের চালে কটা কাক স্লিপ খাচ্ছে। ধারাল নখের ঘষায় চিরুনি-চেরা শব্দ। তিনটে বিভিন্ন কোণ থেকে ছ জোড়া চোখ দেখছে বিভলভাবের নলটা। একজোড়া চোখ নলের ওপর দিয়ে বাডতি দেখছে বাটিক প্রিন্টের হাওয়াই সার্টে ঢাকা মস্ত চওড়া একটা বুক। সময় হাঁটছে, পায়ে ভাঙাবেডি।

—ও আবার কি খেলা, রেখে দাও ওটা, কল্যাণীই প্রথমে মুখ খুলল। গলায় ভয়ের সঙ্গে ঝাঁঝ।

ধীরুর নীচের চোয়ালটা নড়ল। কোন আওয়াজ বেরুল না। চওড়া, রাফ মুখটা এক জল পুরোন রবার। তেলতেলে ঘামের কোটিং। চাপা গলায় অনেক চেষ্টা করে কথাগুলো ঠেলে বের করল ধীরু, ওটা নিয়ে খেলা করিস না হেরম্ব, ওটা লোড করা আছে।

আছে, আছে, আছে, আছে। ধীরুর শেষ কথাটা হেরম্বর মাথার মধ্যে সমানে ঝাপটাতে লাগল।

—গুলিগোলা নিয়ে খেলা নয়, রেখে দাও ওটা, এবার কল্যাণীর গলা অনেক নরম।

—কেন, মুখে হাসি, গলায় বরফের ছোঁওয়া, হেরম্বর প্রশ্নটাই একটা বুলেট।

—কেন আবার কি, কল্যাণীর গলাটা ফের ছুঁচলো, ওসব কি সবাই নাড়াচাড়া করতে পারে, রেখে দাও বলছি।

কেন, আবার একটা বুলেট বেরিয়ে এল হেরম্বর মুখ থেকে।

ধীরুর ঠোঁট দুটো আবার নড়ল। ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলল, ওটা আমাকে ফেরত দে হেরম্ব।

হেরম্বর মুখ তেমনি চাপা হাসিতে ঢাকা। এত দিন নিঃশব্দ আঙুল খেলা করেছে অদৃশ্য বিভলভাবের সঙ্গে। এবার মুঠোর মধ্যে আস্ত, জ্যান্ত বিভলভার। আই সি বি এস, পোলাবিস—সব কিছুর ক্যাপসুল সাইজ এই ক্ষুদে যন্ত্রটা। হেরম্ব চিৎকার করে উঠতে চাইল, বাহাবা, বাহাবা, কোল্ড সাহেব। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম। কি কলই না বানিয়েছিলে। এত বড় দুর্ধর্ষ ধীরু ভয়ে একদম কেঁচো

ইন্দুভূষণ মণ্ডল-এর প্রকাশনায়

একালের স্বপ্ন

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা—বৈশাখ লিখেছেন : বাজীরাও সেন, রতন বিশ্বাস, অশোক সাহা, হিমাদ্রি, শ্রীপূজারী, নরেশচন্দ্র, সমীরকুমার সরকার, কমল সেন, জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং আরও অনেকে। উপযুক্ত ডাক টিকিটসহ লেখা পাঠান। বার্ষিক চাঁদা সডাক—পাঁচ টাকা।

সম্পাদক—**বীরেন হালদার**

ইন্দা, খড়গপুর, জেলা—মেদিনীপুর

হেরম্ব মাস্টারের কাছে। একটা ছোট্ট যন্ত্রের হাত বদলে ফিরে গেছে পাশার দান। ধীরু, তার টাকা, বাড়ি, এ্যামবাসাডর গাড়ি, ঘর ভর্তি দিশি-বিলিতি হরেক জিনিস—এ সবের দাম কানাকড়িও না। শুধু একটু আঙুলের চাপ। ব্যস, খেল খতম। ধীরুকে দিয়ে এখন কান ধরে ওঠ-বোস করাতে পারে হেরম্ব।

—ওটা দিয়ে দে হেরম্ব, অনেক দূরে ধীরুর ভাঙা রেকর্ডের আওয়াজ। প্লিজ হেরম্ব, ধীরু প্রায় কেঁকিয়ে উঠল।

—তুই মরতে ভয় পাস ধীরু, অনেকক্ষণ পর হেরম্ব কথা বলল। তুই মরতে চাস না, হেরম্বর গলা তো নয় গ্রানাইট পাথর।

ধীরুর গলা প্রায় বন্ধ, ঘাড়টা নাড়ল।

—তোর কেন এত বাঁচতে সাধ ধীরু। বউটা মরে বেঁচেছে, লোকে বলে তুই-ই খুন করেছিলি, ছেলেমেয়ে দুটোকেও দেখিস না। তোর কে আছে? কে কাঁদবে তুই মরলে, হেরম্বর গলায় কোন উঁচু-নীচু নেই, কথাগুলো চাঁচা-ছোলা।

—তুই মরলেও কেউ কাঁদবে না, আমি মরলেও না, আমারও বাঁচতে ইচ্ছে করে না, বাঁচার কোন মানে হয় না জীবনে ধরবার মত কিছু না থাকলে। আমি আসলে তোর চেয়েও একলা ধীরু, হেরম্বর গলায় সেই এক টোন।

ধীরুর পুরো শরীরটা ঢিলে। কেতরে পড়ে আছে বেতের চেয়ারের খোপে। কোন সাড় নেই। হেরম্ব আরও কিছুক্ষণ বিভলভাব টিপ করে। শকত জিনিসটা আঁকড়ে ধরে হাতের আঙুল, কব্জি ব্যথায় টনটন। বিভলভাবের নলটা কাঁপছে। নড়াচড়ার সঙ্গে টার্গেট বদল। কখনও ধীরুর হৃৎপিণ্ড, কখনও ডান দিকের ফুসফুস, পেট, গলা। ধীরুর নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। এত টেনশানের মধ্যেও হেঁচে ফেলল ফ্যাচ করে।

চমকে উঠল কল্যাণী। হেরম্বরও চমকাবার কথা। কিন্তু সে রকম কিছু হল না। উল্টে হেরম্বর মনে মনে পুষে রাখা সব দুঃখ, কষ্ট, বঞ্চনা, অভিমান হাঁচির শুড়শুড়িতে একটা দশ গুণ বড় মাপের হাসি হয়ে বেরিয়ে এল। এমন শব্দ করে হেরম্ব জীবনে হাসে নি। একটা মস্ত কাসার বাটি থালা ওপর থেকে মেঝেতে পড়ে চর্বকি, ঝনঝন শব্দটা বন্ধ হবার নাম নেই।

কল্যাণী, ধীরু দুজনেই এই হঠাৎ হাসির ধাক্কায় সিঁটিয়ে। বিভলভাব শুদ্ধ ডান হাত দিয়েই চোখে জমে-ওঠা জল মুছে ফেলল হেরম্ব। টেবিলের ওপর ঠক করে নামাল বিভলভারটা। সঙ্গে সঙ্গে ধীরু হামলে, টেবিলের ওপর। ছোঁ মেরে তুলে নিল বিভলভারটা। খট্ করে যন্ত্রটা দু ভাঁজ। উপুড় করতেই টুপ টুপ বুলেট-গুলো বাঁ হাতের তেলোয়। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, হেরম্ব গুনলো। মৃত্যুর ছটি লিলিপুটিয়ান খোকা। তামার মধ্যায় গায়ে চকচকে পেতলের জামা। মাজা-ভাঙা বিভলভারটা সোজা হয়ে আবার ফিট-ফাট। মৃত্যুর খোকাদের উগরে দিয়ে এখন সেফ খেলনা।

—ওঃ শোধ নিলি বটে ভয় দেখানোর, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ধীরু বলল, দারুণ নাটক করলি তো। আর কি ডায়ালগ, কোথায় লাগে দিলীপকুমার। স্মার্ট হবার চেষ্টা করছে ধীরু। কথাগুলো তবু ফাঁপা।

—আমাকে খালি বিভলভারটা একবার দিবি ধীরু, হেরম্ব বলল।

—কি করবি ওটা নিয়ে, ধীরুর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

—খালি রিভলভারে তোর ভয় কি ধীরু, তোর তো গায়ের জোর আমার চেয়ে অনেক বেশি। কেড়ে নিতে পারবি না আমার কাছ থেকে?

—ভয় আমি কোন শালার করি না, থমথমে মুখে বলল ধীরু। বিভলভারটা বাড়িয়ে ধরল হেরম্বর দিকে। বলল, নে, যত খুশি দেখ, ইচ্ছে হলে ট্রিগার টেপ।

হাত বাড়িয়ে নিল হেরম্ব। চাপ্ ট্রিগারটা চাপ্ না, উৎসাহ দিল ধীরু। এবার সত্যি সত্যি চাপ দিল হেরম্ব। তার-পর আরও চাপ্। ট্রিগারটা একটু সরেই নিজের জায়গায় গ্যাট। হেরম্বর সরু কব্জির হাড়গুলো ঠেলে উঠেছে। দু কানে দাউ দাউ আগুন, কপালে ফোটা ফোটা ঘাম। ট্রিগারটা কেটে বসে যাচ্ছে অঙ্গুলে। তবু সেই ছোট্ট মিষ্টি শব্দটা হেরম্বর নাগালের বাইরে। ভাবতেই পারে নি ট্রিগার টিপতে এত জোর লাগে।

খিলখিল করে হেসে উঠল কল্যাণী। বলল, রেখে দাও এবার, তোমার মুরোদ বোঝা গেছে। কথায় বলে যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। সারাটা জীবন তো ব্ল্যাকবোর্ডে চক ঘষে কাটালে, এখন বুড়ো বয়েসে ঘোড়া রোগ। নাও হয়েছে, ফেরৎ দাও এবার।

ক্লান্ত, পরাজিত হেরম্ব টেবিলে রাখল বিভলভারটা। ডান হাতের আঙুল-গুলো ঝনঝন করছে। কল্যাণীর ছোবলমারা কথাগুলো কানে ঢুকল না।

—কলের কাজ বলে হয় না বে, জোর ছাড়াও ওর কায়দা আছে, বলে বিভল-ভারটা টেবিল থেকে তুলে নিল ধীরু।

বেয়াল্লিশ বছর বয়েসে এই প্রথম হেরম্ব লেসন্ নিল ধীরুর কাছে : বিভলভার থাকলেই হয় না, দরকার কায়দার। কায়দা-টাই আসল।

—এই দ্যাখ, বলে বার বার ট্রিগার টিপতে লাগল ধীরু। নলটা আবার হেরম্বর দিকে। প্রত্যেকবার নির্ভুল খট্ শব্দটার সঙ্গে একটা অদৃশ্য বুলেট বিঁধতে লাগল হেরম্বকে। কল্যাণী হাততালি দিয়ে উঠল। প্রথম দু-তিনবার চোখ বুজে ফেলল হেরম্ব। তার পরের প্রতিটা শব্দে মজার শুড়শুড়ি।

—মার যত পারিস মার, আমাদেরও দিন আসবে, হাসতে হাসতে বলল হেরম্ব।

থমকে গেল ধীরু। বিভলভারের নলটা অমনি ঝুঁকে মাটির দিকে।

কোথাও নদীর জলে

রমেন্দ্র রায়

দরজায় ঠক ঠক শব্দ। কেউ বাইরে থেকে ঠুকছে। কে হতে পারে? মাথাটা বেশ ভারী, চোখ দুটো জুড়ে আসছে ঘুমে। প্রভাস ক্ষীণ ঘুম জড়ান স্বরে বলল, কে? দরজার ওপার থেকে হোটেলের বয় বীরসার গলা ভেসে এল—সাব্ আপনার চায়ে।

— ও চা। কোন রকমে টলমল পায়ে প্রভাস দরজাটা খুলে দিল।

হোটেলের উর্দিপরা বয় দাঁড়িয়ে। গ্লামার বোতাম ঠিক করতে করতে বলল—চায়ে আনব সাব? আউর ব্রেকফাস্ট?

—চা না। কফি। ব্রেকফাস্ট পরে। বয় চলে গেল।

শরীরটার ওজন বেড়ে যায় বেশি ঘুমোলে। প্রভাস এখন ঘুমকাতর শরীরটা নিয়ে জানলার কাছে এল। ইস, রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ কাল রাত্রে ভেবে রেখেছিল, ভোর ভোর উঠে বেড়াতে যাবে। হল না। অনেক রাত জেগে জেগে শেষ রাতে ঘুম এসেছিল। জীবনে কত প্ল্যান এমনি ভেস্তে যায়। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা তাল রাখে না প্রায়ই। অথচ সে নেশা করেনি। এক বিন্দু অ্যালকোহল পেটে পড়েনি। তবু ঘুমের নেশা শরীর জড়িয়ে রয়েছে। আর একটুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে হয়। বিছানাটার দিকে করুণ চোখে তাকাল প্রভাস। ভারী পা দুটো টেনে টেনে বিছানার কাছে এলও। বালিশের দিকে ঝুঁকে শরীরটা ঝপাস করে ফেলে দেবার ইচ্ছা। যাকে থেকে কবা যাকে বলে সেই কায়দায় পড়তে গিয়েও পারল না। ঠিক জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে কালো মেঘের মত একগুচ্ছ পাতার কোলে চড়ে ফুটফুটে একটি ফুল হাসছে। মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে দুষ্টু কিশোরীর মত ডাকছে। কী মিষ্টি সুগন্ধ। আঃ। প্রভাস ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল—হ্যালো মিস সুরভি। হ্যালো মাই ডিয়ার সুগন্ধী। আমার ঘরে কতক্ষণ থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছ? ডাকতে পারনি। আই অ্যাম সরি। পৃথিবীতে ঠিক সময়ে সব কাজ ঠিকভাবে হয় না। যাই হোক, আমি তোমাকে আজ দারুণ ভাল বাসব। এই বেলা একটু ছুঁয়ে দেখব তোমাকে? কি মাথা নাড়ছ? মানে ছোঁব না। কেন তুমি তো এতক্ষণ হেসে হেসে আমার ঘরে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিলে। এখন ছুঁলে কি হয়? না, আমি তোমার কোন কথা শুনব না। আমি তোমার শরীরে হাত রাখবই। আবার মাথা নাড়ছ? পৃথিবীতে নারীদের সব এক রকম ব্যাপার। মলিও এই রকম করেছে। শেলী টোকস বুলা জয়ন্তী মণিমালা এই রকমভাবে আমাকে দুঃখ দিয়েছে। থাকগে, শোন....

দরজায় খুব কেজো গলা শোনা গেল—সাব্ কফি।

বীরসা এক পট কফি নিয়ে এসেছে। সঙ্গে খান চারেক বিস্কুট। প্রভাস দ্রুত বাথরুমে ঢুকে গেল। এক মুখ জল নিয়ে

কুলকুচো করল। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে আবার ফুলটার দিকে চোখ গেল। কী যেন নাম ঐ ফুলটার? অ, গন্ধরাজ। ভ্যালো মিস গন্ধী....গন্ধী....ও হ্যাঁ, মিস সুগন্ধী, তোমাকে যা বলছিলাম—

আবার বাধা পড়ল। দরজায় কেবল খস খস শব্দ। কে-যেন এসে দাঁড়াল। প্রভাস খুব অবাক হল। একটি পাঁচ-ছ বছরের মেয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ের রংটা টকটকে ফর্সা। সোজা প্রভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অবাক চোখে। প্রভাস একটা বিস্কুট হাতে নিয়ে ইশারায় ডাকল মেয়েটাকে। কিন্তু মেয়েটা কপাটের আড়ালে চলে গেল। আবার উঁকি দিল। প্রভাস আবার বিস্কুট বাড়িয়ে ধরল। মেয়েটি মাথা নাড়ল। শেষ পর্যন্ত প্রভাস হাল ছেড়ে দিবে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগল। মেয়েটি এবারে ঘরের মধ্যে চলে এল। প্রভাসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল—তুমি 'ক' লিখতে পাব? আমি পারি। মা পারে। দিদিও পারে।

প্রভাস বড় বড় চোখ করে বলল—তাই নাকি? কই আমাকে দেখাও তো কেমন পারো।

মেয়ে তখন প্রসন্ন পাল্টাল — তুমি নাম লিখতে পাবো? আমি পারি।

দরজার বাইরে এবারে মিষ্টি ডাক শোনা গেল—টুনটুন। টু..ন..টু..ন... সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে সাড়া দিয়ে উঠল—এই যে দিদি আমি এখানে। প্রভাস দরজায় এক ঝলক রাঙা আলো আছড়ে পড়তে দেখল। পলাশ রাঙা শাড়িতে জড়ান এক রাশ বিদ্যুৎ এসে দাঁড়িয়েছে। মেকল-সত্যেবার বেশি হবে না কিছুতেই। প্রভাস মনে মনে হিসাব করল।

—টুনটুন তুমি এখানে কি করছ? চলে এসো।

'চলে এসো' ডাকটা খুব কড়াই মনে হল প্রভাসের। প্রভাস খুব ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু টুনটুন নড়ছে না। আবার কঠিন ডাক শুনল প্রভাস—টুনটুন।

প্রভাস মাথা নিচু করে কফির কাপে চুমুক দিল। তার সব আশা কেমন নষ্ট হয়ে যায়। এই মেয়েটির দিদির কাছে কী যেন প্রত্যাশা ছিল প্রভাসের। এই মুহূর্তে ঐ কোমল স্নিগ্ধ সুন্দর শরীরটা থেকে কঠিন চাবুকের মত স্বর বেরিয়ে এসে সব কিছু ভেঙে-চুরে দিল। কাজেই প্রভাস দরজার দিকে না তাকিয়ে জানলার দিকে ফুলটার উপর চোখ রাখল। ফুলটা এখন স্থির। কেমন দুঃখী-দুঃখী ভাব। প্রভাসের জন্য ওর দুঃখ হচ্ছে কি?

—আপনাকে এতক্ষণ ধরে খুব বিরক্ত করছিল বুঝি টুনটুন।

টুনটুনের দিদি কথা বলছে। আশ্চর্য আওয়াজটা তো এখন কঠিন নয়। রেশ চিনচিনে মিষ্টি।

প্রভাস চোখ তুলতেই হাসল টুন-টুনের দিদি।

—আপনি বুঝি একা এসেছেন?

প্রভাস দরকারের সময় প্রায়ই হাসতে পারে না। বিষণ্ণ শোকার্ত মুখ করেই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—এখানকার সব দেখা হয়ে গেছে আপনার?

—বেশী কিছু দেখবার নেই এখানে। কাছাকাছি ছোট পাহাড় আর নদী আছে। আমি সে সব দেখেছি এর আগেরবারে যখন এসেছিলাম তখন।

—ওমা সে কী। আসল দেখবার যা তা-ই....ইস, আপনার পায়ের কাছে কাঁচ-ভাঙ্গা। একুনি পা পড়লে কেটে যেত।

টুনটুনের দিদি ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে এল। তারপর কী যেন হল। মুখ গম্ভীর করে টুনটুনের হাত ধরে টানতে টানতে চলে গেল।

প্রভাস আর একবার মনে মনে বলল, সব আশা এইভাবেই নষ্ট হয়ে যায়।

প্রভাস আবার জানলার দিকে তাকাল। ফুলটার উপর দিয়ে দুটো প্রজাপতি টানা উড়ে যাচ্ছে। ফিবে আসছে।

টুনটুনের দিদির অমন মুখ গম্ভীর করে চলে যাবার কারণটা প্রভাস বুঝতে পারছে না। ভাঙা কাঁচের গেলাসটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি প্রভাসের। মাথা নিচু করে চৌকির তলায় একবার চোখটা ঘুরিয়ে আনতেই চমকে উঠল প্রভাস। সত্যি মুখ গোমড়া করার কারণটা ওখানেই লুকিয়ে আছে। একটা খালি মদের বোতল আর এঁটো ডিশে কিছু মাংসের ভুক্তাবশেষ রয়েছে। প্রভাস এসব খাননি। সে তো কাল সন্ধ্যায় এসেছে। বেশ ক্লান্ত ছিল। সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। এ নিশ্চয়, এর আগে যে লোক এই ঘরে ছিল, তার কান্ড।

তক্ষুনি প্রভাস বেশ জোরে চেঁচিয়ে উঠল—বীরসা। বীরসা....বীরসা....

প্রায় ছুটতে ছুটতেই বীরসা এসে দরজায় দাঁড়াল। চোখ-মুখ ভয়ংকর করে প্রভাস চৌকির তলাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—এ সব কী?

বীরসা চৌকির তলায় উঁকি দিয়েই দাঁতে জিব কাটল—কসুর হোয়েছে সাব। পরতাপ সিংজী কাল ছিলেন এই কামরায়। এ তিনিই খেয়ে লিয়ে চলি গেছেন।

কুদ্ধ কণ্ঠে প্রভাস হুকুম করল—এখুনি সাফ করো।

বীরসা সব পরিষ্কার করে নিয়ে যাবার পরে নিজের মনেই প্রভাস হুমকে উঠল, কে কী মনে করল না করল, আমার কিছু যায়-আসে না। আমি এখানে নিজের মত থাকতে এসেছি। যা খুশি তা-ই করতে পারি।

প্রভাসের ভাবনাটা এখন এই রকম হলেও সারাটা সকাল দুপুর সে যেন কিছুর অপেক্ষা করল। টুনটুন আসবে এবং তার দিদি আসবে তাকে খুঁজতে—এই রকম এক ছক নিয়ে মনে মনে খেলা করল। আচ্ছা টুনটুনের দিদিকে দেখে সে এত দুর্বল বোধ করছে কেন? কোথাও দেখা কোন ছবির সঙ্গে মিল কি? কিংবা আগেকার পরিচিত কোন মেয়ের সঙ্গে?

প্রভাস জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করল টুনটুন নামের ছোট্ট মেয়েটা কোন ঘরের বাসিন্দা। কিন্তু এখন কেউ তেমন বাইরে নেই। হোটেল পুষ্পকের বাসিন্দারা এখন ঘরের ছায়ায় দরকারী কাজকর্ম সেরে নিচ্ছে কিংবা বিশ্রাম করছে। বাইরে এখন কড়া রোদে কয়েকটা কাক শুধু হোটেলের রান্নাঘরের চালায় বসে আছে। সকালের কাগজটা একবার উল্টে-পাল্টে দেখেই সরিয়ে রাখল প্রভাস। তেমন পড়ার কিছু নেই। এখন স্নান করে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে। তার আগে দাড়িটা কামিয়ে নেওয়া ভাল। ব্রাশে সাবান ঘষে গালে লাগানের পরে মনে হল নখগুলো বেশ বড় হয়েছে। নখ ছাঁটার জন্য এই সময় দু মিনিট ব্যয় করা যায়। কারণ ততক্ষণে গালে সাবানটা দাড়ি নরম করবে। প্রভাস মাঝেমাঝে এই ধরনের অর্থনৈতিক চিন্তায় বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দেয়। নখ ছাঁটার সময়ে টুনটুন সোজা ঘরের মধ্যে চলে এল। সাবান মাখা ব্রাশটা হাতে নিয়ে বলল, আমি তোমার মাখিয়ে দেব?

প্রভাস ব্যস্ত হয়ে বলল, না না। তুমি ওটা রাখো। হাতে সাবান-টাবান গেলে যাবে।

—তাহলে আমার গালে একটু মাখাই?

—উহুঁ। তুমি এটা ধরবেই না। দেখছ না সাবানের ফেনা রয়েছে।

টুনটুন তবুও ধরার জন্য প্রভাসের সঙ্গে একটা ছোটখাট লড়াই চালাচ্ছিল। ঐটুকু বাচ্ছাকে সামলানো সোজা নয়। একটু ধমক ধামক গোলমাল হচ্ছিলই।

বাইরে ডাক শোনা গেল—টুন-টুন। সেই কণ্ঠ। প্রভাসের বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল। মনে মনে বলল, সে আসছে।

দরজায় এক ঝলক সুগন্ধ হাওয়া আছড়ে পড়ল। কড়া বোদ নরম হয়ে গেল। দরজা জুড়ে আশ্চর্য রং দুলে উঠল। প্রভাস মুখ তুলে তাকাতেই এক মনোরম চোখের মণি দেখতে পেল। আঃ এ কী এই পৃথিবীর মানুষ? ফুলের প্যাপড়ির মত এমন নিষ্কলঙ্ক মুখ হয় কি করে। আঃ ওকে দেখলেই শরীর জুড়ে উৎসব শুরু হয়ে যায় যেন।

—আবার আপনাকে বিরক্ত করছে টুনটুন? দরজায় আলতো হাত, কেমন এক মধুর ভঙ্গিতে দাঁড়ানো টুনটুনের দিদি। এই মেয়ের কি নাম হতে পারে? মনে মনে প্রভাস ঠিক করতে লাগল।

—আচ্ছা! আপনি কি কলকাতার লোক?

প্রভাস চমকে উঠে বলল, কেন বলুন তো?

—দরকার আছে। বলুন না। টুন-টুনের দিদি এক পা ঘরের মধ্যে এগিয়ে এল।

প্রভাসের বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকল। যেন ইন্টারভিয়ো দিচ্ছে তেমনি গলায় বলল, হ্যাঁ, কেন বলুন তো। বস্তুত প্রভাস কোন দিনই মেয়েদের সামনে

তুখোড় চটপটে হতে পারে না। মেয়েদের থেকে দূরে সরে গেলে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা মনের খাঁচায় ছটফট করে। যার এক একটা যে কোন মেয়েকে আত্মহারা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু দরকারের সময় সে সব কথারা কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

এক গালে সাবান মাখিয়ে প্রভাস টুনটুনের দিদির নাভির দিকে চোখ রাখল। আঃ কি সুন্দর। এক তাল মাখন দিয়ে বানান পেট আর কোমর।

—তা লে ঠিকই ধরেছি। আপনি কুমোরটুলিতে যেতেন?

—কুমোরটুলি? ও হ্যাঁ, কলকাতার অনেক জায়গাতেই তো যেতাম। মানে এখনও যাই-টাই দরকার পড়লেই।

—আপনি কুমোরটুলির গোঁসাই গলির মণিমালা বলে কাউকে চিনতেন?

—কে, কে তুমি? প্রয়োজনের চাইতেই রুক্ষ গলায় প্রভাস প্রায় তেড়ে উঠল।

খিল খিল করে হেসে উঠল টুনটুনের দিদি। মুখে আঁচল চাপল—কী হল, অমন করছেন কেন?

প্রভাস খুব লজ্জা পেল। কিছুক্ষণ আগের রুক্ষতা একান্তই আকস্মিক। শুধু একটা ছোট্ট ঘটনার সামান্য খোঁচাতেই সে অমন করে উঠেছিল।

টুনটুনের দিদি তেমনই হাসির ছোট ছোট বুগবুগি চাপতে চাপতে বলল—মণিমালা আমার দিদি। জ্যেঠতুত। আমার নাম....

এইটুকু বলেই আবার হাসি চাপল। —না বলব না। আপনি বলুন না দেখি কেমন মনে করতে পারেন।

প্রভাসের চোখের সামনে কুমোরটুলির প্রতিমা। পায়ের ঝকঝকে গোছা থেকে চোখ ধীরে ধীরে উপরে তুলতে তুলতে প্রভাসের শরীর টান টান হয়ে উঠতে লাগল। নাভির নীচে মধ্য সমুদ্রের উল্লোল আবর্তে শাড়ির দুটি ফুল বাতাসে কাঁপছে। সরু কোমর থেকে এক আশ্চর্য দেহের আদল, তাজা গাছে দুটি নিটোল ফল। লাল টকটকে চোখে প্রভাস জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, ঠিক মনে পড়ছে না। মনে মনে বলল, তোমার ঐ শাড়ীটা আমাকে খুলে ফেলতে দাও। আমি তোমাকে কুমোরটুলির মাটির মূর্তির মত দেখব। তোমার উরু সন্ধিতে মুখ ডুবিয়ে তোমার নাম উদ্ধার করব। ঠিক বলে দেব কে তুমি!

টুনটুনের দিদি প্রভাসের লাল চোখ দেখে ভয় পেল। আস্তে করে টেনে-টুনে শরীরের অনাবৃত অংশগুলো ঢেকে দিতে লাগল। অবশ্য যতদূর সম্ভব ধীরে—যাতে প্রভাস কিছু মনে না করে।

—পারলেন না তো বলতে। একদম ভুলে গেছেন, আমি মঞ্জুলা।

প্রভাস আবার খুঁজতে থাকল এই তরুণীর শরীরের কোনখানে মঞ্জুলা নামের চিহ্ন আছে কিনা। যা সে বছর বারো আগে দেখেছিল। না নেই।

—এখনও পারলেন না। যাঃ, আপনার মাথাটা না একেবারে গেছে। বলেই দাঁতে জিভ কাটল মঞ্জুলা—আপনি মণিদির মাস্টারমশাই। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার কানটা একবার মুলে দিন তো যেমন মণিদিকে দিতেন।

আবার খিলখিল হাসি।—কী মানুষ আপনি!

কথিত্য প্রভাস খুব আতান্তরে পড়েছে। মণিমালাদের বাড়িতে যখন ও যেত তখন দরজার কাছে কয়েকটি ছেলেমেয়ে দেখতে পেত। চার পাঁচ ছয় সাত—এই রকম তাদের বয়স। সেই মুখগুলি এতদিন পরে মনে রাখা সম্ভব নয়। সেই ছোট শরীর এখন বেড়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য রহস্যে শরীর নদীর মত গভীর গোপন। এখন কণ্ঠস্বরে মধু, মুখপদ্মে মধু, গতিভঙ্গি মধুর। যেন চলার সময় নিংড়ে নিংড়ে মধু ঝরিয়ে যায়।

প্রভাস এবারে বুকের মধ্যে টাটকা সুগন্ধের আভাস পেল। মুখের জড়তাও দূর হয়ে গেল। অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে আবৃত্তি করল—না, এই তোমাকে তখন আমি দেখিনি। এখনকার তুমি তখনকার কেউ নও। তুমি মঞ্জুলা একটু বসো না আমার ঘরে। আমি দাড়িটা একটু কামিয়ে নি।

মঞ্জুলা ঘরের মধ্যে একবার চোখ ঘুরিয়ে আনল। ঘরের মধ্যে একটাই মাত্র চেয়ার। আর সেইটেতে প্রভাস বসে আছে। প্রভাসের বিছানার দিকে মঞ্জুলা তাকাল। কিন্তু বসার কোন লক্ষণ দেখাল না। প্রভাস দেখেছে, মেয়েরা সহজে অচেনা পুরুষের বিছানায় বসতে চায় না। প্রভাস তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারটাই এগিয়ে দিয়ে বলল—বোস না মঞ্জুলা। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

কিন্তু মঞ্জুলা পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকাল। বাইরেটা একবার দেখল। তারপর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া এক রাশ চুল আলতো হাতে পেছনে সরিয়ে বলল—না, এক্ষুনি মা খুঁজবে আমাকে। টুনটুনকে চান করিয়ে খাওয়াতে হবে। আমারও চান বাকি। বিকেলে বেড়াতে বেরুবেন? আমরা নদীর পাড়ে সেই পাহাড়টা দেখতে যাব। আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।

—আমি তো দেখে এসেছি একবার।

—তাতে কি হয়েছে। আর একবার না হয় আমাদের সঙ্গে চলুন।

প্রভাস মনে মনে উল্লসিত। কুমোরটুলির প্রতিমা আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। প্রভাস পাকা খেলুড়ের মত বলল— আচ্ছা দেখি।

—দেখিটেখি না। চলুন। বাবার প্রেশারটা একটু বেড়েছে বলে বেশি দৌড়-ঝাঁপ করতে ডাক্তার নিষেধ করেছেন। বাবা যাবেন না। মা আমি আর টুনটুন। আপনি সঙ্গে থাকলে খুব ভাল হয়। মাকে আপনার কথা বলেছি। মা বলেছেন, আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে।

প্রভাস খুব অবাক হল, মেয়েরা এত চটপট এতখানি ভূমি তৈরি করে কি করে? এই মেয়েটা যেন জাদুকর। কোথাকার কি। ঠিক পরিচয় বের করে বাড়িতে এর ভূমিকা তৈরি করে রেখে দিয়েছে।

প্রভাস হাসতে হাসতে বলল—তুমি সত্যি জাদুকরী মঞ্জুলা। আমার সঙ্গে তোমার কথাটথা তখনও কিছু হয়নি। আর এর মধ্যেই বাড়িতে আমার কথা বলা হয়ে গেল? আমি তো তোমার মণিদির মাস্টার মশাই না-ও হতে পারতাম। পৃথিবীতে প্রায় এক রকম দেখতে দুটি-তিনটি মানুষ প্রায় তো দেখা যায়। সে রকম যদি হয়ে যেত? তোমার দেখার ভুলও হতে পারত? তখন কি করতে?

মঞ্জুলা হেসে বলল, সে আপনাকে বলতে পারব না। আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনার পায়ে একটা কাটা দাগ আছে। একবার বর্ষায় পথ ভাসছিল। আপনি হাঁটু জল ভেঙে এলেন। দিদি চিৎকার করে উঠল, আপনার পা থেকে কি রকতই না পড়ছিল! ডেটল দিয়ে আপনার পা বেঁধে দিল দিদি। তারপর পাটা একটা চেয়ারে তুলে দিয়ে আপনি সারাক্ষণ বসে রইলেন। দিদি পড়াতে বারণ করলেও আপনি শুনলেন না। আমার সব মনে আছে। পায়ের ঘাটা শুকিয়ে গেলে একটা দাগ রয়ে গেল। সেটার কথা বলে দিদিকে বলতাম, মাস্টারমশাইর সিনসিয়ারিটির জন্য পদ্মশ্রী দেওয়া উচিত। আপনি অবশ্য তখন বাইরে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। দিদি আমাকে চোখ পাকিয়ে ধমক দিত। বলত, মাস্টারমশাইকে নিয়ে ঠাট্টা করবি না।

প্রভাস এবার হো হো করে হেসে উঠল। ওর হাততালি দিতে ইচ্ছে হল। বলল, মঞ্জুলা, পদ্মশ্রীটা তোমারই প্রাপ্য। সত্যি তোমরা এত ছোটখাটো ঘটনাও মনে রাখতে পারো।

মঞ্জুলা শুধু কুচকে বলল, পারি বলেই তো আপনাকে চিনলাম।

প্রভাসের এই সময়ে মায়ের কথা মনে পড়ল। মা ছিলেন জীবন্ত একটি দিন-পাঞ্জিকা। বার তিথি নক্ষত্র সব করগুণে নির্ভুল হিসেব করে দিতেন। বাড়ির সকলের কোন মাসে কি বারে জন্ম ঠিক ঠিক বলে দিতেন। শুধু তাই নয়। পাড়ার অনেক পরিবারে কারও জন্ম-মৃত্যুর দিন-ক্ষণ নিয়ে সন্দেহ জাগলে অনেকে মাকে জিজ্ঞেস করতে আসত। মা ঠিক বলে দিতেন। পরিবারে কার কোন বয়সে কী ধরনের ফাঁড়া, অসুখ-বিসুখ গেছে, সব যার মনে থাকত।

মঞ্জুলা ঘরের মধ্যে আর একটু এগিয়ে এসে প্রভাসের পিছনে দাঁড়াল। আয়নায় প্রভাসের এক গালে দাড়ি কামানো কিন্তু অন্য মুখের পাশে একটি আশ্চর্য ফুলের মত মুখ ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। মঞ্জুলা সরে গেছে। দরজার বাইরে ওর গলা শোনা গেল—বিকেলে কোথাও যাবেন না। আমি চারটের সময় এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব। মা বলে দিয়েছেন।

আর কোন কথা নেই। মঞ্জুলা চলে গেছে। একটু সুগন্ধ হাওয়ায় উড়ছে। আয়নায় এক আশ্চর্য মুখ যা এই পৃথিবীর নয়। তাড়াতাড়ি পাশে সাবান ঘষে প্রভাস নিজের মুখটার শ্রী ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল। মনে মনে বলল—আমি কি বুড়িয়ে যাচ্ছি? নইলে এ ফোটা পদ্মের পাশে আমাকে এমন বিশ্রী দেখাচ্ছিল কেন?

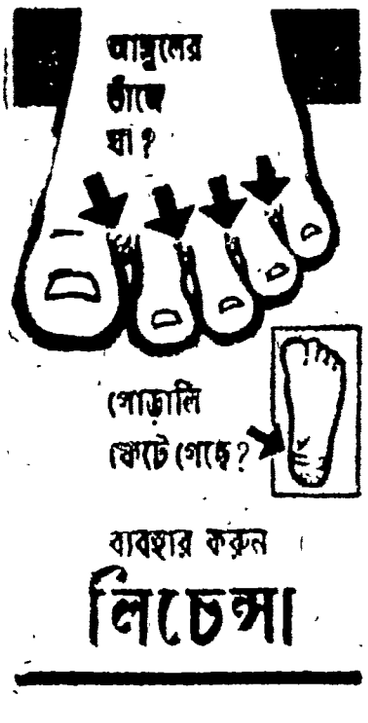

এখানে ছোট পাহাড়ে অরণ্য। পাশে নদী এবং একটি ভগ্ন দুর্গ। টুনটুন একটা প্রজাপতির পেছনে খুব ছুটছিল। মঞ্জুলার মা এতটা পথ হেঁটে আসতেই ক্লান্ত। হাপাচ্ছিলেন। প্রভাসের একটা হাত ধরে বললেন—বাবা আমাকে এই খাড়াইটুকু পার করে দাও। তারপর ঐ পাথরটায় বসব। ছোট্ট একটা ঢিবিমতন জায়গা। মসৃণ পাথর। মঞ্জুলার মা সেখানে বসতে চাইলেন। প্রভাস তাঁকে বসিয়ে দিতেই তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৌটো খুলে এক খিলি পান মুখে পুরলেন। তারপর চারদিকটা দেখে বললেন—জায়গাটা সত্যি বেশ। কী চমৎকার হাওয়া পাচ্ছি বাবা। কলকাতায় এমনটা কোন জন্মে পাইনি।

মঞ্জুলা যেন ছটফট করছিল। এক সময় মার কাছে এসে বলল, মা তুমি একটু বসবে? আমরা সামনের পাহাড়ী নদীটা একটু দেখে আসি।

মঞ্জুলার মা একটু উদ্বিগ্ন হলেন—দেখছিস না সন্ধে হয়ে আসছে। কোথায় যাবি এখন অচেনা জায়গায়। তার চেয়ে এখানে বোস না আমার পাশে।

—দূর! মা তুমি যেন কী? এতদূরে এসে কিছুক্ষণটি দেখব না? খালি বসে বসে থাকব? মঞ্জুলার কণ্ঠে দুঃখ ঝরে পড়ল।

মঞ্জুলার মা বললেন—অহলে যা। বেশ দূরে যাবি না কিন্তু। দেখছিস না সন্ধে হচ্ছে।

—তুমি কিচ্ছু ভেব না মা। প্রভাসদা এখানে দু-তিনবার ঘুরে গেছেন। আমি চট করে ঘুরে আসব। টুনটুনকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

—এস। মঞ্জুলার মা বাতাসের দিকে মুখ করে একমুখ টাটকা বাতাস যেন নিলেন।

মঞ্জুলা পায়ের দিকে শাড়ি একটু গুটিয়ে পাথরে পাথরে পা দিয়ে চলছিল। যেন নাচছিল। একটু যেতেই পাথরে পাথরে গড়িয়ে চলছিল স্বচ্ছ ফটিকজল। কোথাও নিশ্চয় ঝরনা আছে। মঞ্জুলা বলল, প্রভাসদা ঝরনাটা কতদূরে জানেন?

—জানি। প্রায় মাইলটাক। এখন যাওয়া যাবে না। ঝপ করে অন্ধকার নামবে।

—তা লে কাল যাব। এ রকম নদী আমি কখনও দেখিনি। জল যেন পাথরগুলোকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। কেমন মিষ্টি কুল-কুল হাসির শব্দ হচ্ছে না?

প্রভাস খুব অবাক হয়ে মঞ্জুলাকে দেখছিল।

মঞ্জুলা বলল—কী দেখছেন?

প্রভাসের শুধু বাঁকানো চোখের ভাষা দেখব। মঞ্জুলা আবার বলল—অমন করে তাকিয়ে আছেন যে।

প্রভাস এবারে হেসে বলল—দেখছি, তোমরা আজকাল অনেক পাল্টে গেছো।

—মানে? মঞ্জুলা আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। প্রভাস দু হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল। প্রভাসের নিজেরও পা হড়কাল। কিছুক্ষণ মঞ্জুলাকে বুকে নিয়ে টাল-মাটাল সময়। তারপর সহসাই ঝপাং করে প্রভাস পাথর থেকে জলে পড়ল। প্রাণপণে মঞ্জুলাকে উঁচু করে তুলে প্রভাস পায়ের নিচে গুঁড়ো গুঁড়ো পাথর পেল। নদীর বুকে নুড়ি পাথর। প্রায় কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে গেল প্রভাসের। তবুও পায়ের নিচে শকত জমি। এক ঝোকা সুগন্ধি ফুলের মত মঞ্জুলাকে নিয়ে প্রভাস এদিক সেদিক তাকাল। মঞ্জুলা ভয়ে সিঁটিয়ে প্রভাসের গলা সাঁড়াশীর মত আঁকড়ে ধরেছিল। প্রভাস একটা শুকনো খড়খড়ে বড় পাথর খুঁজছিল। যেখানে পা দিলে হড়কাবার সম্ভাবনা নেই। প্রভাসের দু হাতের মধ্যে মঞ্জুলা বসে আছে। শরীর এলিয়ে দিয়েছে। প্রাসের ডান হাত মঞ্জুলার বুকের তলায় আর বাঁ হাত হাঁটুর নিচে। এইভাবে এক যুবতী নারীকে বহন করে নেবার সময় হঠাৎ প্রভাসের মনে পড়ল জ্যোৎস্নার কথা। জ্যোৎস্নার বাবা বাঙালী। মা ছিল বিহারী। একরাশ মাখনের মত নরম উজ্জ্বল শরীর ছিল জ্যোৎস্নার। এক রকম জোর করেই ওকে বিয়ে করেছিল দিল্লির প্রেমপ্রকাশ। বিয়ের পরে কলকাতায় এসে বাসা নিয়েছিল। প্রভাসরা যে বাড়িতে থাকত, তার নিচের তলায়। ফ্যারেক রস কোম্পানীতে কাজ করত প্রেমপ্রকাশ। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বেরত। এক একদিন দুজনেই বাইরে খেয়ে-টেয়ে আসত। প্রভাসের তখন পনেরো-ষোলো বছর বয়স। একদিন রাত প্রায় এগারোটায় প্রভাস পরীক্ষার পড়া করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সদরে দাঁড়িয়েছিল সামান্য একটু হাওয়া পাওয়ার আশায়। ঘরে পাখা ছিল না তো। ঠিক সেই সময় সদরে একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে নামল প্রেমপ্রকাশ। আর ভেতরে চোখ বুজে পা ছড়িয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। প্রেমপ্রকাশ প্রভাসকে বলল, ভাইয়া, একটু হেল্প করুন।

প্রভাস ঠিক বুঝতে পারছিল না ওর কথা। প্রেমপ্রকাশ তখন দুহাতে ট্যাকসির ভেতরে ছড়ানো শরীরটা বার করার চেষ্টা করছিল। বলল, প্লিজ একটু ধরুন ভাই। খুব ভয় পেল প্রভাস। জ্যোৎস্নার কি হয়েছে? ওই রকম ভাবে পড়ে আছে গাড়িতে। মরে গেল নাকি? প্রভাসের শরীরটা কেমন করে উঠল। প্রেমপ্রকাশ জ্যোৎস্নাকে ধরে টানছে। প্রভাস শেষ পর্যন্ত ধরল। না মরে নি। জ্যোৎস্নার বুকটা ওঠা-নামা করছে। প্রভাসের হাতের উপর নরম মাংসের স্তূপ। হাত থেকে

জড়িয়ে পড়ল প্রভাসের বুক জুড়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেন ঘুমের ঘোরেই জ্যোৎস্না দু হাত দিয়ে প্রভাসের গলা জড়িয়ে ধরল। ঐভাবে বয়ে নিতে প্রভাস জীবনে এই প্রথম অনুভব করল—মেয়েদের শরীরে কোন হাড় নেই। নরম রবারের মত। এক তাল ময়ান দেওয়া ময়দার মত। তারই মধ্যে কেমন ঘামের টকো গন্ধের সঙ্গে আর একটা কি উগ্র গন্ধ জ্যোৎস্নার শরীরে মুখে। প্রভাসের বমি আসছিল। পরে বয়স বাড়তে প্রভাস জেনেছিল ওটা মদের গন্ধ। সে রাত্তিরে জ্যোৎস্না মদ খেয়েছিল এবং তাকে নিয়ে প্রেমপ্রকাশ হোটেলে লাপটা-লাপটি করেছিল। জীবনে ঐ প্রথম মেয়েদের শরীর নিজের শরীরের উপর রাখার অভিজ্ঞতা হল প্রভাসের।

মঞ্জুলাকে তর-তর নেমে যাওয়া পাহাড়ী নদীর উপর বয়ে আনতে আনতে প্রভাস নাকে গন্ধ টানল। না টকো ঘামের গন্ধ নেই। বমি আসছে না। বরং কেমন এক আশ্চর্য সুগন্ধ। কোমল শরীরটা প্রভাসের শরীরের খাঁজ ভাঁজগুলো ভরে দিচ্ছিল। শূন্য স্থান পূরণ করার মতো ব্যাপার। বিদ্যুৎ চমকের মত প্রভাসের মনে হল নারী কি পুরুষের শরীরের পরিপূরক?

সাবধানে নদী পার হয়ে প্রভাস ওপরে উঠল। তারপরে কেমন এক ধন্দের মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জুলাকে নামিয়ে দিতে যেন ইচ্ছে হচ্ছে না। কোথাও নরম বিছানায় রেখে পরীক্ষা করার ইচ্ছে। মঞ্জুলা এতক্ষণ চুপচাপ এক শিশুর মত প্রভাসের গলা জড়িয়ে ছিল। হঠাৎ যেন ও জেগে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে বলে উঠল—ইস কি যাচ্ছে তাই ব্যাপার। আমাকে নামিয়ে দিন শিগগীর। নামিয়ে দিন।

মঞ্জুলার কথাগুলো চাবুকের মতো লাগল প্রভাসের বুকে। খুব দুঃখ হল। আহত হল প্রভাস। তাড়াতাড়ি মঞ্জুলাকে নামিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মঞ্জুলা লাফিয়ে নামল। প্রভাসের গলায় ওর নখের আঁচর লাগল। কেমন জ্বালা জ্বালা করছিল। মঞ্জুলার কনিষ্ঠ আঙুলে এক ইঞ্চি লম্বা রং করা তীক্ষ্ণ নখ।

গলায় হাত দিয়ে দেখল প্রভাস, চিনচিন জ্বালা করছে জায়গাটা আর একটু ভিজে ভিজে। রক্ত বেরিয়েছে। হাতে চেপে রক্তটা নিয়ে চোখের সামনে ধরল প্রভাস। মুখ গম্ভীর করে বলল—চলো, ফিরে যাই, সন্ধে নামছে।

টুনটুন এই সামান্য সময়টা একটা ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে এক থোকা লাল ফল কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছিল। ও টেরই পায়নি যে দিদি পড়ে যাচ্ছিল নদীর জলে।

কেমন এক জ্বালা ধরা মন নিয়ে প্রভাস নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছিল সামনে। টুনটুনকে টানতে টানতে পেছনে মঞ্জুলা প্রায় ছুটছিল। প্রভাস আরও জোরে হাঁটতে থাকল। পেছনে মঞ্জুলার ডাক শোনা গেল—ও প্রভাসদা, দাঁড়ান। অত জোরে হাঁটবেন না।

প্রভাস অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জুলা এসে পাশে দাঁড়াতেই আবার হাঁটতে লাগল প্রভাস লম্বা লম্বা পায়ে।

মঞ্জুলা বারে বারে প্রভাসের দিকে তাকাচ্ছে। প্রভাস টের পাচ্ছে। তবুও প্রভাস বেশ শক্ত হয়ে হাঁটছিল। মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে প্রভাসের জামার কোণা টেনে ধরল—রাগ করলেন প্রভাসদা। মঞ্জুলা প্রায় ছুটে আসার জন্য হাঁপাচ্ছিল।

প্রভাস গম্ভীর গলায় বলল—তুমি জলে পড়ে যাচ্ছিলে। আমি তোমাকে পড়ে যেতে দিইনি।

—টুনটুন দেখে ফেলবে বলে আমি তাড়াতাড়ি নেমে যেতে চাইছিলাম। টুনটুন যা দেখে মাকে তাই বলে দেয় তো। মঞ্জুলার কণ্ঠে এক ধরনের বিষণ্ণতা বেজে উঠল।

প্রভাস আবার বাতাসে সুগন্ধ পেল। বিকেলের আলো বড় মায়াময় মনোরম মনে হল। এখন আর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলার কোন প্রয়োজন বোধ করল না প্রভাস। দুপাশে হাওয়ায় দুলছে পাকা গাছালি। মাঝখান দিয়ে প্রভাস ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। মঞ্জুলা টুনটুনকে প্রভাসের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, ওকে আপনি সামলান। বড্ড ছটফটে।

প্রভাস হেসে বলল, ওর জলে পড়ার ভয় নেই। তবুও ওকে কোলে নেব। তোমার মতো ও নিশ্চয় নখে আঁচড়াবে না।

—মানে? চোখ কুঁচকে তাকাল মঞ্জুলা।

—মানে, কণ্ঠে একটা পরিচয় চিহ্ন এঁকে দিয়েছ।

—ওমা সে কী? দেখি দেখি। মঞ্জুলা প্রভাসের গলার কাছে চাঁপা হাতটা টেনে সরিয়ে ঝুঁকে দেখে বলল—ইস। আমি খেয়ালই করিনি। দাঁড়ান দাঁড়ান। একটু ঘাসপাতা থেঁতো করে লাগিয়ে দিচ্ছি। নখে বিষ থাকে জানেন তো।

—মুখেও। বিশেষ করে মেয়েদের। প্রভাস নিরাবেগ গলায় ঘোষণা করল।

মঞ্জুলা কোনো জবাব দিল না। ঝুঁকে পড়ে কিছু ঘাস পাতা ছিঁড়ে নিল। হাতের মধ্যে পাতাগুলোকে চটকে রস করে গলায় চেপে চেপে লাগাতে আরম্ভ করল। নিঃশ্বাসের সীমানায় মঞ্জুলা। চাঁপার কলির মতো ওর আঙুলগুলো গলার কাছে খেলা করছে। প্রভাস একটু ঝুঁকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। প্রভাস নিজের ছায়া দেখতে পেল মঞ্জুলার স্বচ্ছ জলাশয়ের মত চোখের মণিতে।

আমাকে বাঁচান

প্রিয় পাঠক মাফ করবেন আপনি কি নিরাশ হয়ে পড়েছেন গৃহের ফেরে পড়ে অনেকে অনেক সময় দুঃখ দুর্দশায় নাড়িয়ে পড়ে, আপনি নিরাশ হবেন না—আপনার দুঃখ দুর্দশা চিন্তা ভাবনা দূর করার জন্য আমি আপনার কাছে শুধু একটা পাথর (লাকি স্টোন) নিয়ে এসেছি যেটা ধারন করলে আপনার চিন্তা ভাবনা দুঃখ দুর্দশা দূর হয়ে যাবে জীবনে সফলতা আসবে—এই পাথর দিতে গেলে রাশি অথবা জন্ম তারিখ এবং নাম জানান আমি আপনাকে একটা পাথর (লাকি স্টোন) ভি পি দ্বারা পাঠিয়ে দেবো—মনে রাখবেন—প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ ভাষকরাচার্য্যর নিয়ম অনুসারে আমাদের পটবর্ধন এ্যাস্ট্রলজিকাল ইনস্টিটিউট আপনার কোন পাথর অনুকূল হবে ঠিক করে নেবে। যদি ৩০ দিনের মধ্যে কোনো সফলতা এনে দিতে না পারে তাহলে ৪৫ দিনের মধ্যে ভি পি দ্বারা ফেরৎ পাঠাইলে মূল্য ফেরৎ বাধ্য থাকিব।

ধারণ করার নিয়ম

এই পাথর (লাকি স্টোন) পাঁচবার পর সোমবার কিংবা বৃহস্পতিবার স্নান করে দুধ মিশ্রিত জলে পূজা করে দেহে ধারণ করবেন এবং দেখতে পাবেন—সফলতা আসতে শুরু করেছে—আপনার আর্থিক চিন্তা, উদাসীনতা, কাজে অক্ষমতা গিয়ে, সম্পত্তি মামলা মোকদ্দমা মানসিক অশান্তি সমস্ত দূর হয়ে যাচ্ছে আপনার জীবনে সুখ শান্তি দেখা দিচ্ছে। পাথরের মূল্য মাত্র ১১৲ টাকা ভি পি সাথে আজই নীচের ঠিকানায় লিখুন—হিন্দি অথবা ইংরাজীতে—

পটবর্ধন এাস্ট্রলজিকাল ইনস্টিটিউট

শাস্ত্রী বাড়া, শাস্ত্রী পোল

কোঠি, বরোদা-৩৯০০০১

মুখোমুখি বিলায়েৎ

তথাগত চক্রবর্তী

হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার!

ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল সেতারের বিশাল কালো বাকসটার ওপর লেখা এই তিনটি শব্দ। ইতস্ততঃ ট্রানজিস্টর-সুটকেশ। পেরেক বেয়ে দেয়ালের গায়ে গোলাপী ডোরাকাটা পাঞ্জাবী। মেঝেয় পাতা দুধ-সাদা বিছানা। অতীতের জল বসন্তের কিছু দাগ সাদা মুখে। আমাকে অবাক করে অল্প হেসে বললেন, বসুন আপনার জন্যেই বসে আছি। আমার মতো সামান্য যুবককেও বিলায়েৎ খানের মতো অসামান্য শিল্পী যে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানাবেন, তা পুরো-পুরি বুঝে উঠবার আগেই ছেলে সুজাত ঘরের জানলাগুলো খুলে দিল। ঘরে শীতের সকালের রোদ্দুর সারা ঘরে একটা আড়মোড়া ভাঙবার আমেজ এনে দিল।

টুকিটাকি কথায় আস্তে আস্তে ঘুমের আবেশটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় নিলেন খাঁ-সাহেব। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলেন, কী জানতে চান?

আপনার নিজের কথা।

'সে তো অনেক। কোথা থেকে শুরু করব? আমার পঞ্চাশ বছর বয়েসের চল্লিশটা বছরই তো স্টেজের সঙ্গে। বাবা যতোদিন বেঁচেছিলেন, বাবার সঙ্গে নারায়ণ-গঞ্জ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মীর্জাপুর এ-সব নানান জায়গায় ছোট-খাটো কনফারেন্স করতে করতে ১৯৩৬ সালে কোলকাতা শহরে যখন এলাম, ম্যাডান থিয়েটারে (এখনকার এলিট সিনেমা) ভূপেন ঘোষের অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স-এ আমার প্রথম বাজনা হোল। সঙ্গে ছিলেন থেবকথা সাহেব। সেই শুরু। সেদিক থেকে একালে আমিই সবচেয়ে পুরোন আর্টিস্ট—যখন বড়ে আলি খান, আহ্‌লাদিয়া খান, কেশরবাঈ, হাফেজ আলি খান, ফৈয়জ খানের মতো আর্টিস্টরা গাইছেন, বাজাচ্ছেন। আমার পরে অনেক গাইয়ে বাজিয়েরা স্টেজে এলেন।'

একটু দম নিতে থামলেন। তারপর বলে চললেন, 'আর আজ আপনারা আমার কাছে যে এসেছেন, জানতে চাইছেন আমি কি দিয়েছি, কি পেয়েছি, আমার কি অভিজ্ঞতা—সে সব কিছু চাইবার একটা মানে আছে। আপনারা একজন সবচেয়ে সিনসিয়ার পুরোন আর্টিস্টের কাছে জানতে চান এ-সব কথা। কিন্তু নতুন-পুরোন এ-সব কি আজকাল আর মানা হচ্ছে? আমরা তো এখন মোস্ট জুনিয়র আর্টিস্টের-এর সঙ্গে মোস্ট সিনিয়র আর্টিস্টের-এর তুলনা করছি। দুম করে বলে দিচ্ছি—আহ্, এই নতুন একটা সেতারী এমন বাজাচ্ছেন যেটা আজ আটশ' বছরের মধ্যে হয় নি। এটা বলা উচিত নয়—নতুন পুরোন কারোর পক্ষেই ভালো নয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে এসব খুব হচ্ছে। আমি অন্য রাজ্যে কি হচ্ছে তা কেমন করি না। কিন্তু এখানে এটা খুব হচ্ছে। আমি বাঙালী। আমার জন্ম গৌরীপুরে। অনেক দিন বাইরে থেকে আমার ভাষা খারাপ হয়ে গেছে। তবু বাঙালীদের মধ্যে এটা দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে—কষ্ট হয়। এখানে এইসব পলিটিক্স হচ্ছে খুব বেশী। যেটা আমাদের সময় ছিল না। যাই হোক, আমার বাবা যখন মারা গেলেন, তখন আমার বয়েস বছর দশ। সেতার হাতে করেছি পাঁচ-ছয় বছর বয়েস থেকে। আর ঐ সময়েই বাবা আমার হাত এমনভাবে সেতারের ওপর বসিয়ে দিলেন যে তার ওপর আমি আজও বসে করে বাজাচ্ছি।

প্রশ্ন রাখলাম, আপনার বাবা তো যখন আপনার মাত্র দশ বছর বয়েস তখনই মারা গেলেন। তাহলে আপনার শেখার তো—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা মারা গেলেও আমার শিক্ষা তো শেষ হয়ে যায় নি। আমার দাদু ওস্তাদ বন্দে হুসেন খান আমায় কুড়ি বছর তালিম দিয়েছেন। আমার কাকা ওস্তাদ ওয়াহীদ খান আমাকে সতেরো বছর তালিম করলেন।'

তারপর উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন—'লোকে বললে কী হবে আমি কিছু শিক্ষা পাই নি। আরে আমার ঘরে তো গান-বাজনা জন্মেছে। আমি মায়ের পক্ষে গাইয়ে বাবার পক্ষে বাজিয়ে। আর সেই জন্যেই তো ভগবানের আশীর্বাদে একটা জিনিস পেয়েছেন—মেটা ছোল গায়কী অঙ্গ—ভোকাল্ স্টাইল ছোট্ট মুখে তো বড়ো কথা মানায় না, ইতিহাস বলছে, আটশ বছরের আগে আমার খসরুর সময় থেকে বিলায়েৎ খান হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যে এই স্টাইল আবিষ্কার করেছে। আমার থেকে তো তারা শেখে। আমার খেয়াল, স্টাইল চুরি করে টেপ-রেকর্ড করে বাড়িতে বসে বাজাচ্ছে—শিখছে। কিন্তু ইমান দিচ্ছে না। আমাকে নজরানা দিচ্ছে না। গাইয়েরা খালি বসে যাচ্ছে চুরি-চামারি করে গান করতে। জানে না গান কাকে বলে। সেতার বাজাতে জানে না। আমি তো, এই তো টেপ করে বলে দিচ্ছি—আমার সামনে আসুন। বলুন।

কতো গান করতে জানে, বাজাতে জানে। হাত ধরে, গলা ধরে বলে দেব এইখানে তোমার ভুল। আ—করতে জান না। ভোকাল কর্ডে তোমার রিসার্চ নেই। হাত তোমার ঠিক-মতো সেতারের ওপর বসানো নেই। সরোদের জাওয়া ধরতে জান না। কাঁধে সুর শুংগার রাখতে জান না। স্টো কী পেটে বিদ্যে না থাকলে ঝুটমুটই বলে দেব? আমি কী এমনি এমনি কিছু না জেনে মাথার ওপরে বসে বাজাচ্ছি? লোকেরা বলে ওঁর বাবা তো ওঁর ছোট-বেলায়ই মারা গেছেন—উনি শিক্ষা পান নি। উনি ঠুংরী বাজান। হ্যাঁ। আমি ঠুংরী বাজাই। কিন্তু আমি ঠুংরী শোনার আজ থেকে দেড়শ' বছরের পুরোন করেক হাজার ঠুংরী। দাদরা শোনার—শোনার কাজরী, চৈতী, হোরি। আজ থেকে এক হাজার বছর আগেকার পুরোন ধ্রুপদ, ধামার হোরি সাদরা—আজ থেকে তিনশ' বছর আগেকার টপ্পা, তারানা। সে কি শিক্ষা না পেয়েই শেখার? সতেরো বছর ধরে দাদু আর কাকার কাছ থেকে আমি শিখেছি সুরবাহার, বীণা, সুরশৃংগার সরোদ। গান শিখলাম। তিন চার ঘন্টা রেওয়াজ করতাম। যার জন্যে এখনও গান করি। আর একালে, এখনকার জেনারেশনের মধ্যে চ্যালেঞ্জ গেছে কমে। পলিটিক্স বেড়ে গেছে। পার্টিবন্দী হয়ে যাচ্ছে এরা। এর মধ্যে একজনকে তুলবে—অন্যকে ফেলবে। বেশী কাজ করবে না। খালি রাস্তা বের করে বেরিয়ে যাওয়ার ফিকির। রেওয়াজ নেই, শেখা নেই, রিসার্চ নেই, ইমানদারী নেই।'

খাঁসাহেব থামলেন। তারপরে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'আমি যদি উদাহরণ দিই? মুখ খুলে বলতে পারি হাজারো সেতারীর মধ্যে শতকরা পাঁচানব্বইজন সেতারী তো আমার নকল করছে। খুব যদি জোর করে বলা যায় শতকরা পাঁচজন সেতারী নিজেদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাজাচ্ছে শুধু সেতারী নয়—আমি সব রকমের বেহ্যায়িং আর বোয়িং যন্ত্রই বোজাচ্ছি। আমি জানি না তারা কাদের ছাত্র। তবে আপনি পরিষ্কার ধরতে পারবেন যে তারা আমার নকল করে আমার স্টাইলে বাজাচ্ছে। নিজেদের ঘরানা ভাঙছে। বলছে আমি এর ছাত্র, ওর ছেলে। তবে আমি আমার চেহারা তো দেখতে পাচ্ছি। সবাই বুঝতে পারছে। যারা ইমানদার তারা মুখের ওপর বলে দিচ্ছে। যারা বেইমান তারা চুপ করে থাকছে। বাবা-কে বাবা বলে ডাকছে না। আমি নাম করে বলতে পারি। এরা আমাকে কপি না করে বাজাতে, গান করতে পারছে না।'

প্রশ্ন করলাম, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আপনি সেতারী হিসাবে সফল বা সাকসেসফুল?

খাঁসাহেব জোর করে মাথা নাড়লেন—সে তো নিশ্চয়ই। ইংরাজীতে তো কথাই আছে—ইমিটেশন ইজ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ্ কমপ্লিমেন্ট।

এর থেকে বেশী কমপ্লিমেন্ট তো

আমি পেতে পারি না। তবে কী দুঃখ হয় আজকাল জানেন, এই ইয়ং জেনারেশনে ইমান চলে গেল—বেইমানী এসে গেল। আমি তো এই পঞ্চাশ বছর বয়সে আজও স্টেজে বাজাতে বসলে যেই ঘরানা থেকে যা ক্লিনিক শিখেছি, তার নাম করি। আমাকে আজ যারা নকল করছে, তাদের আমাকে নজর দেওয়া উচিত—স্বীকার করা উচিত।

বিলায়েৎ খানের মতো বিশ্ববন্দিত শিল্পী এই কথা বলতে গিয়ে যে কী গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন, তা' সামনে না থাকলে বোধহয় বোঝানো যায় না। শ্বাস ফেলে বললেন— নোংরা রাজনীতি খুব হচ্ছে। আর্টিস্টদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়ে নিজেরা সব দল পাকাচ্ছে। আমাকে এসে আর একজনের নামে বলছে। আমার নামে আর একজনের কাছে বলছে। এরা ভুলে যাচ্ছে যে আমি একটা সেতারী যা সেবা করতে পারবে, পাঁচটা সেতারী তার চেয়ে অনেক বেশী সেবা করতে পারবে। আল্লা করুক—একশটা সেতারী হোক। আর এর মধ্যে থেকে যদি আমি বেরোতে পারি, তাহলে সেটা আরও বড়ো একটা কথা হয়। কিন্তু এখানকার আর্টিস্টদের মধ্যে কোন প্রতি যোগিতা নেই। ভাবটা সবাই মরে যাক্। আমি একা বেঁচে থাকি। সবাই বেঁচে থাক। তার মধ্যে থেকে আমি বেরিয়ে আসি সেটা একেবারেই নেই। ট্যালেন্ট কমে গেছে। বিশেষ করে এখানে খুব বেশী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

খাঁসাহেব নিজের কথা বলতে গিয়ে বারবার চলে আসছিলেন একালের শিল্পী-দের প্রসঙ্গে। আপনা থেকে আবার ফিরে গেলেন শৈশবে। বলতে শুরু করলেন।

বাবা মারা গেলে সামান্য কয়েক হাজার টাকা আর পাঁচ সার্কাসের বাড়ীটা ছেড়ে গিয়েছিলেন। আমার মা আমার পিছনে অনেক খরচ করলেন বেওয়ারিশের জন্যে। তারপর আমরা সবাই দিল্লী চলে গেলাম। আমি তখন রেডিওতে সেতার বাজাতাম। রেডিওতে দেড়শ টাকা মাইনে পেতাম। আর প্রোগ্রামে প্রতি একশ টাকা। সামান্য দুশতিনশ টাকা রোজগার হত। দেড়শ' টাকা মতো বাড়ী পাঠিয়ে দিতাম। পঞ্চাশ টাকার মতো হাতে থাকত। এক্সজন আমার বন্ধু ছিলেন। পাকিস্তানের এক বড়ো জমিদারের ছেলে মুসতাক আহমেদ। দিল্লীর তালকোটারা বাগের কাছে বিরাট হাবিলির কাছে তাঁর বাড়ীর পিছনের গ্যারেজের পাশে একটা ঘরে আমার থাকতে

দিয়েছিলেন। সেখান থেকে রোজ সকালে সেতার হাতে সিঙ্গল সাইকেলে করে পুরোন দিল্লীর আলিপুর রোডে রেডিও অফিসে যেতাম। দিল্লীর গরম, দিল্লীর শীত, দিল্লীর বর্ষায় ঐ টিনের ঘরে থেকে রেওয়াজ করতাম। খুব কষ্ট হত। পেটে ভাত নেই। গায়ের ওপরে কাপড় নেই। বড়ো খারাপ অবস্থায় তখন ছিলাম। ঐ পঞ্চাশ ষাট টাকা যা হাতে থাকত। দুধ খাওয়ার পয়সা ছিল না। তার ওপরে রোজ পনেরো মাইল যাতায়াত আর তারপরে রেওয়াজ।

'কিন্তু এই আর্থিক কষ্টের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো সূক্ষ্ম জিনিষ কিভাবে একসঙ্গে চালিয়ে নিয়ে গেছেন?' আমার এই প্রশ্নে খাঁসাহেব একটু দম নিলেন।

'দেখুন, সে কষ্টটাকে আমি কষ্ট বলে মনে করিনি কারণ আর্টিস্টের জন্মই হয়েছে কষ্ট সহ্য করবার জন্য। পেইন বিয়ার করবার জন্য।

রাতভর টিনের ছাদের নীচে-দরজা বন্ধ করে রেওয়াজ করেছি বারো-চৌদ্দ ঘন্টা, কোনদিন খেয়ে কোনদিন বা না খেয়ে—কোন দিন বা বেশী খেয়ে নিয়েছি পরের দিন পাব কিনা জানি না তো—তখন তো এইরকমই অবস্থা ছিল। সেই সময় এমন একটা দিন গেছে যখন আমি পরপর তিনদিন না খেয়ে-ছিলাম। খুব ক্লান্ত লেগেছে, মনে হয়েছে ঘুমিয়ে নিই—তবু না ঘুমিয়েই রেওয়াজ করেছি, তখন কিন্তু আমার কোনদিন একবারও মনে হয়নি আমি কী পাব—সেটা বিবেচনা করবার বুদ্ধিও তখন হয়নি। আমি শুধু এই জানতাম যে আমার কি দিতে হবে। আর আজকাল সবাই ভাবছে কী পাব—এখন উল্টো হয়েছে। সর্টকাট করে নিউজপেপার-ওয়ালাদের সঙ্গে চেনাপরিচয় করছে। স্যাম্পেন খাওয়াচ্ছে। চিন্ এ হাত বোলাচ্ছে। প্রেস-কনফারেন্স করছে। আরে, এই সময়টা যদি রেওয়াজে দিত তাহলে কতো ভালো হত। প্রেসের লোকেরা আপনিই আসত। যেমন আজ আপনি এসেছেন আমার কাছে। শুধু তাই নয়, এরা টাকা নেয় এক, আর বলে বেড়ায় আর এক। এরা কুড়ি হাজার টাকা থেকে শুরু করে আর শেষ পর্যন্ত রফা করে পাঁচ হাজার টাকায়। এই তো সব চলছে।

সরাসরি প্রশ্ন করলাম, আপনি কতো নেন?

এই প্রশ্নটা হয়তো আশা করেন নি। তাই উত্তরটা দিতে একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর বলে উঠলেন, দেখুন এটা বোধহয় আমার পক্ষে বলা ঠিক হবে না। কারণ অর্গানাইজাররা সব খবরই রাখে। তবে একটা কথা আপনার এই প্রসঙ্গে লেখা উচিত যে আমার জন্যে ভারতের আর্টিস্টদের ফিজ্ বেড়ে গেল। আপনি ভেতরে ভেতরে খোঁজ নিয়ে দেখুন গিয়ে। আমি বরাবর একটা টাকা বলেছি তখন চারহাজার নয়শো নিয়ানব্বই টাকা নিইনি। আর এখনকার....'

প্রতিটি প্রসঙ্গে এখনকার শিল্পীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধা, বিরক্তি, ক্ষোভ বারবার গানের স্থায়ী সুরের মতো ফিরে ফিরে আসছিল। বললাম, যদিও আমি প্রেসের পক্ষ থেকে এসেছি, তবু একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না যে আপনি রেডিও, টিভি, প্রেসকে এড়িয়ে চলেন। তাহলে কি বুঝতে হবে আপনি পাবলিসিটি চান না অথবা প্রেসকে ঘৃণা করেন?

জবাব দিলেন, 'দেখুন, প্রেসকে আমি এড়িয়ে চলেছি সত্যি কথা, তবে প্রেসকে আমি ঘৃণা করিনি। প্রেস খুব প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রেস আজকাল বড়ো পলিটিকস করছে। প্রেস একটা পলিটিক্যাল ব্যাপার। কিন্তু সে যদি আর্ট, স্পোর্টস, পেইন্টিং নিয়ে পলিটিকস্ করে সেটা খুব খারাপ: একটা ইন্দুরকে হাতী বলে দেয়—হাতীকে বেড়াল।

'—তাহলে কি বলতে চান প্রেস আপনার প্রতি সুবিচার করে না এই আশংকাতেই এড়িয়ে চলেন?'

'—না, ঠিক তা নয়, তবে', বিলায়েৎ খান যেন একটু ভাবলেন, 'প্রেসের মধ্যে ভালো লোকও আছে, তবে তাদের একপেশে হওয়া উচিত নয়। পাবলিসিটি আমি নিশ্চয়ই চাই। তবে যতোটা না নিজের জন্যে, গানবাজনার উন্নতির জন্যে তার চেয়েও বেশী। প্রেস যদি আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে, তবে গানবাজনার আরো উন্নতি হয়। তবে রেডিও বা টিভিতে বাজাইনি বিকজ অফ্ দেয়ার রং এ্যাটিচুড। এখানে গাধা, ঘোড়া, বিশিল, চুহা সব একরকম। কিন্তু আমরা ঐতিহ্যকে ইম্পর্ট দিই। যদিও আমি বুড়ো হয়েছি, আমার ছেলে বাজাচ্ছে—আল্লা করুক, ও আমার চেয়েও ভালো বাজাক। ও ভালো বাজালে আমার নাক উঁচু, খারাপ বাজালে আমার নাক কেটে যাবে। তবে যতোই ভালো বাজাক, বড়ো-ছোট তো মানবে! কিন্তু রেডিও স্টেশনে সবাই এক। ছাত্র, গুরু, ভালো, মন্দ সব একই গ্রুপ, এক ফিজ, একই এ-বি-সি গ্রুপ—এক ব্যবহার। তারও ওপরে পার্সোনালিটি তো খুবই আছে। আমি যদি বড়ো অফিসার হই; আমার ছেলেকে 'এ' গ্রুপে বসাব। আমার ছেলের থেকে যদি ভালো কেউ সেতার বাজায়, তাকে সি-গ্রুপে বসাব। এইসব বেইমানী হচ্ছে—কোন মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না।

'চারিদিকে পার্টিবাজী হচ্ছে। সুলোতও এটা খুব 'ফেস' করছে। আজ যদি ও গ্রুপ করে, আমেরিকায় চলে যায়, তবে ও আজকে অনেক কিছু করবে। তবে আমি আমার জীবনের মধ্যে গ্রুপ তৈরী করতে দেব না। অমিতকে মেজরিটি তৈরী করতে বলব। আমি ওর মুখে রোজ ফ্যাশগান মালতে ক্ষমতায় থেকেও উত্তরসূরীর ভিক্ষা যে তাকে নিজে হাতে তৈরী করতে দিতে চাইছেন, অন্ততঃ যা আমাকে বললেন—তাতে মনে হয় আজকের বালক সুজাতও হয়তো একদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারবে। তবে সে তো দূর অস্ত।

আপনার বাজনার পরীক্ষানিরীক্ষার কথা কিছু বলবেন?

বিলায়েৎ খান বললেন, 'দেখুন, আমি সেতারের ওপর নিজের বুদ্ধিতে যা কিছু পেরেছি, সব কিছু নিয়ে পরীক্ষা করেছি। যেমন, সেতারের জোয়ারী, তার মীড, সেতারে গায়কী অঙ্গ, গতের কম্পোজিশন এই সবকিছু নিয়েই করেছি। যেমন আগে সব বিলম্বিত বারোমাত্রা থেকেই উঠত। কিন্তু আমি বিভিন্ন গৎ বিভিন্ন মাত্রা থেকেই বাজাতে শুরু করলাম।' গানের একটা সুর গেয়ে উঠে হাত তাল দিয়ে বলতে শুরু করলেন '—সব সময় বারো মাত্রায় উঠে ষোলো মাত্রাতেই বা আসবে কেন? দশ মাত্রা থেকে নয় কেন? এই চলনটা আমি দিয়েছি। আর একটা, যেটা এখন দ্রুত লয়ে খুব চলছে, তা হোল তান নিয়ে ফেরা, অন্তরার পরে। এইটা আমি খেয়াল থেকে নিয়েছি। তবে একটা আমার নিজের বাজনা সম্পর্কে বলে দেওয়া ভালো যে আমি আসরে সাধারণতঃ শুধু তিনতালই বাজাই।'

কারণ?

'—তার কারণ আমি চাই যে ইতিহাসে থাকুক যে বিলায়েৎ তিনতাল ছাড়া কিছু বাজাতেন না। আমি আমার ছেলেকে অনেক তাল, এমনকি সাড়ে তালও শিখিয়েছি। তবে আমি নিজে বাজাই না। আমি মনে করি যে সারা তাল ঐ তিনতালের মধ্যেই আছে। এমন হয় যে একটা গৎ তিনতালে বাজাতে বাজাতে তারই মধ্যে অন্য আর একটা গৎ অন্য তালে বাজিয়ে দিই। তাও করি।'

প্রসঙ্গান্তরে গেলাম। কথার কথায় এল বিদেশ আর বিদেশী গানবাজনার কথা। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি তো অনেকবার বিদেশে গেছেন—

'—অনেকবার। সত্যি কথা বলতে কি স্বাধীনতার পরে আমিই প্রথম বিদেশে বাজনা নিয়ে যেতে শুরু করি। আর তখন থেকে আজ অবধি এতোবার গেছি যে গুনতে পারব না। তবে এটা ঠিকই যে আমি মোটেই ভালো-বাসিনা বিদেশে গিয়ে বসবাস করতে।

খাঁসাহেব একটা সুন্দর উপমা দিলেন।

'আমি ভালোবাসিনা ঐসব বড়লোকের বৌদের, যাদের স্বামী বড়ো কাজ করেন, আর তিনি বেবিসিট্ পড়েন ইস্কুলে পড়াতে। নিজের ছেলেমেয়েরা আছে। তারা ইস্কুলে যাচ্ছে। বাড়িতে আসছে। অবহেলা পাচ্ছে। সেইসব মিসেস ঘোষ, মিসেস খান, মিসেস

ছেলেমেয়েদের মানুষ করছ? তেমনি এটা আপনি দেখবেন যে কিছু শিল্পী বাইরে থাকেন। অন্য দেশের লোকেদের শিক্ষিত করছেন। এখানকার ছেলেমেয়েরা কিছু শিখতে পারছে না। ঠিক কিনা? আমি বাইরে গিয়েছি অনেকবার। কিন্তু নিজের দেশ ছেড়ে যেতে ভালোবাসি না। নিজের দেশের ছাত্রদের, শ্রোতাদের ছেড়ে বিদেশে থাকব? সেটা মোটেই ভালো নয়। ওখানে প্রোগ্রাম করি। ওদের ছেলেমেয়েরা যদি শিখতে চায় কিছু শিখিয়ে ফিরে আসি। নিজের দেশে বেশী থাকতে চাই। আপনারা বলবেন, বিলায়েৎ খান শেখান না। ইস্কুল খোলেন না। হ্যাঁ—আমি ইস্কুল খুলি না। কারণ আমি বিশ্বাস করি না গানবাজনা ইস্কুল করে শেখান যায়। সারা জীবন সব কিছু ছেড়ে এর পেছনে পুরো সময় দিতে হয়। আমি এইরকম ছাত্রই তৈরী করি—এদেরকে শেখাই। আমি তাদের কাছ থেকে কোন টিউশান ফি নিই না। কোনদিন নিইনি, ভবিষ্যতেও নেবো না। কোটিপতি থেকে গরীব ছাত্র কেউ আমার কাছে টাকা দিয়ে শেখে না। এইরকম আমি করি না কি—এসো টাকা দাও—ভর্তির ফি দাও। কুড়িটা গৎ, পঞ্চাশটা তাল, একশটা রাগ—আর এই কোর্স—আর হয়ে গেল সঙ্গীত সুধাকর, সঙ্গীত বিশারদ!' রেগে উঠলেন আবার!

—আর শেষকালে তিন বছর পরে দেখলাম তানপুরা সেতার টিউন করতেই জানে না—বাজাবে কি। এই করে ছাত্রদের জীবন নষ্ট করা হচ্ছে। এইসব স্যুডো ঢংবাজীর জন্যে আমি ইস্কুল খুলি না।

'বিদেশে কেমন বুঝছেন আমাদের গানবাজনার ভবিষ্যৎ?' আমার প্রশ্ন।

'খুব ভালো। তারা এগিয়ে আসছে। তবে ইউরোপে তো সব সময়ই একটা করে যুক্তরা আসে। একবার হরেরাম হরেকৃষ্ণ, একবার মহেশ যোগী। এই দেখলেন হাওয়াইয়ান গীটার, এই স্প্যানীশ গীটার। একটা করে কেন্দ্র এল আর চলে গেল। এখন সেতারের কেন্দ্র এসেছে। দেখবেন কাঁধে একটা রামনামী দোপাট্টা আর কাঁধে একটা সেতার। তার মধ্যে চরস, গাঁজা, আফিং ভরে বিদেশে পাচার হচ্ছে। কোন কিছু নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে এই হয়।' একটু থেমে বলে উঠলেন—আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কোনদিন কমন মার্কেটে আসেনি—আসবেও না।'

প্রশ্ন : আপনি বড়ো জায়গায় খুব কমার্সিয়াল গান-বাজনা করেন?

খাঁসাহেব থমকে গেলেন। তারপর একটু থেমে বলে উঠলেন—না, কমার্সিয়াল গানবাজনা করি না। তবে একটা জিনিস করি যে কোন কঠিন জিনিস যেমন লচ্ছাশাক-এর মতো রাগ বা সাড়ে সতেরো মাত্রা বা ষট্‌রাগ, ত্রিবেণী, সংগম, রাগসাগর এইসব আমি বাজাই না। কী করি—দেশ, ইমন, মেহাগ, তিনতাল এইসব বাজাই, যা সবাই বুঝবে। তবে গাইয়ে-বাজিয়েদের সামনে ঐসব বাজাই।

কেরামতুল্লা খানের সঙ্গে

প্রশ্ন : তাহলে বাজাতে গিয়ে আপনি আগে হিসেব করে নেন কারা কেমন দর্শক?

উত্তর : হ্যাঁ। ইন্টালেকচুয়ালদের বাজনা আমি তো গ্যালারিতে ছুঁড়ে দেব না। তবে আমি গ্যালারির বাজনাও বাজাব না। সব লোকের কি আর রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কবিতা ভালো লাগে? তাই না?

আপনি কি ওয়েস্টার্ণ ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শোনেন?

—নিশ্চয়ই, গাঢ় স্বরে উত্তর দিলেন বিলায়েৎ, আমি তাদের স্বরবা খুবই প্রভাবিত। বাখ্, বেটোফেন, মোৎজার্ট এদের বাজনা আমি খুব শুনি, খুব ভালবাসি—

প্রশ্ন করলাম, আপনি আপনার বাজনায় ওদের ম্যুভমেন্টস্ বা ইমেজারী আনবার চেষ্টা করেন না?

খাঁসাহেব একটু সময় নিলেন। তারপরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমার এ বিষয়ে কিছু কথা বলবার আছে। যতো লোকে গানবাজনায় পূর্ব আর পশ্চিম মেলাবার চেষ্টা করেছে, শেষ অবধি তারা, আমার মনে হয়, তারা পুরোপুরি ফেইলিওর। যদিও আমার এ সম্পর্কে শেষ কথা বলবার অধিকার নেই—আমি বলতে পারি না—তবু আমার মনে হয় এটা হয় না। তার কারণ হোল ধর্ম, দর্শন, সঙ্গীত এইসব কিছু নির্ভর করে দেশের আবহাওয়া বা এনভায়রনমেন্টের ওপর। আমাদের দেশের লোকেরা কিভাবে থাকে, কি খায়, কি জামা-কাপড় পরে, এখানকার জলবায়ু, সূর্যের কোণ গরমকালে কেমন থাকে, শীতকালেই বা কি হয়, এইসব কিছুর ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে তাদের পরম্পরা যার ওপরে গড়ে ওঠে সঙ্গীত। পাশ্চাত্য সঙ্গীতও ঠিক এইভাবেই তাদের থাকবার ঢংগী, ভঙ্গীর ওপর গড়ে উঠেছে। তারও একটা বিশাল সমুদ্র। আমরাও। আমি যখন তাদের বাজনা শুনতে গেছি তখন আমি একটা শিশু হয়ে গেছি—ভুলে গেছি যে আমি ভারতের একজন বড়ো ওস্তাদ। আমি তিন চারবার এই দুটো দিক মেলাবার চেষ্টা করেছিলাম। খুব গভীরে গিয়ে দেখলাম যে এই দুটোরই চরিত্র আমি মেরে ফেলেছি। একটা থার্ড ক্যারাকটার তৈরী হয়েছে। দেখুন—দুটো রঙ মেশালে তো আলাদা একটা রঙ বেরোবেই। দেখেছি দুটোকে মেলাতে দুটোকেই নষ্ট করেছি। আবার ওদের বাজনা তৈরীই হয়েছে ওদের জন্যে। পিয়ানোতে যেমন সব থার্ড নোট। ওতে কী আর মীড় আসবে?

—কেউ কেউ তো চেষ্টা করছেন।

'হ্যাঁ করছে। তবে যতোই করুক মীড় তো আসবে না—তেমনি সারেঙ্গীতে তো আর ওদের বাজনা আসবে না। মনে হবে যেন নরওয়ের খুব ফর্সা মেয়েকে শাড়ী পরানো হয়েছে। সবাই বলে যে কেমন একটা নতুন জিনিস হয়েছে। কিন্তু তাতে আর কি। ওটাকে ঐ রকমই রাখতে হবে। যেমন আছে তেমনিই থাকুক—তাকে সেই রকমই রেখে দাও। এদের মধ্যে এতো ভাইটালিটি আছে যে ওরা আপনিই বেঁচে থাকবে।' কথার শেষ এইখানেই নয়।

রাতে ঢাকুরিয়ার হীরেন রায়-এর বাড়ীতেও অনেক কথা হয়েছিল। তবে তা মুখে নয়—সেতারের মীড়ে-মোচড়ে। সেখানে আমার মুখে কোন প্রশ্ন ছিল না। বস্তুই রাত একটা পর্যন্ত অনেক কথা বলেছিল।

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। এগারো ।।

সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন কিনা বাপী ঠাওর করে উঠতে পারল না। নিজের ঘরের চৌকিতে শুয়ে আছে। কোণে ডিম করা হারিকেন। আলোর থেকে অন্ধকার বেশি। ঘরে কেউ নেই।

পিসী রাত থাকতে ওঠে। তাই উঠে গেছে বোধহয়। কিন্তু তা হবে কেমন করে। রাতে শোবার পর ঘরে হারিকেন জ্বলে না। তাহলে ও শুয়ে কেন?

মাথা উঁচিয়ে খোলা দরজার দিকে দেখতে গিয়ে ঘোর পেল কেন। ঘাড়ে মাথায় কপালে মুখে আর সমস্ত গায়ে ভীষণ যন্ত্রণা। শুধু ব্যথা নয়, জ্বলেও যাচ্ছে। নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে।

স্বপ্ন নয়। মনে পড়ছে। সাহেব বাংলোর বারান্দা থেকে কে-যেন এক সময় ওকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তারপর একবার দুবার চোখ তাকিয়ে খুব সম্ভব আবুর মুখখানাই দেখেছিল। জিভটা মুখের ভিতর নড়াচড়া করল, তারপর নিজের ঠোঁট দুটোও চেটে দেখল। না, রক্ত লাগছে না। কেবল জ্বালাই করছে। ঠোঁটে আর তার ওপরে নিচে কোন ওষুধ-টষুধ লাগান হয়েছে বোধ হয়। জিভটা বিচ্ছিরি হয়ে গেল। কিন্তু তার থেকে ঢের বিচ্ছিরি নোনতা রক্ত। সেটা মনে পড়তে গা-টা কেমন করে উঠল। নিজের শরীরের রক্তের এমন গা-ঘুলনো গরম নোনতা স্বাদ, জানত না।

—ক'বার তোকে ঘরে যেতে বললাম, বসে বসে রাত করছিস কেন?

বাইরে বাবার বিরক্তি-ঝরা ভাবি গলা। বাপীর দু কান খাড়া। কিন্তু যাকে বলল তার কোন জবাব শোনা গেল না.... কয়েক মুহূর্ত। নিশ্চয় আবুকে। ও হয়ত

চলে গেল। কারণ একটু বাদেই পিসীর কথা কানে এলো।

—এটুকু আর বাকি রেখে জ্যান্ত ফিরিয়ে আনলি কেন—একেবারে শেষ করে দিলেই তো হত।

আর এক প্রস্থ চাবুকের মতই বাবার ঝাঁঝাল জবাব।—শেষ করতেই চেয়েছিলাম, আর শেষ করাই উচিত ছিল—বুঝলে? কিন্তু ও শেষ হবার ছেলে নয়, তার আগে আমাকে শেষ করবে।

মুখের মধ্যে বাপীর জিভ নড়ে-চড়ে উঠল আর একবার। ঠোঁট দুটো চেটে নিল। বক্ত নয়। বক্তের থেকেও বিস্বাদ কিছু যেন ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে। যত রাগ তত ঘৃণা। বাবার গলা শুনেই এই, মুখ দেখলে হয়ত ফিনকি দিয়ে রক্তই ছুটবে।

কিন্তু মুখ রাতে দেখা গেল না। সকালেও না। সকালে যখন চা-বাগানের ডাক্তার এল, তখনও না। রাতে বা সকালে পিসীর সঙ্গেও কোন কথা হয়নি বাপীর। রাতটা কি-রকম ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে। পিসী ডাক্তারকে বলল, সমস্ত রাত জ্বরে ভাজা-ভাজা হয়েছে।

ডাক্তার পরীক্ষা করল। নাক মুখ আর সমস্ত গা হাত পা উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর গম্ভীর মুখে বাইরে চলে গেল। একটু বাদেই বাপীর কানে মধু। পিসীকে ডাক্তার বলছে, চিকিৎসা যা করার করছি, কিন্তু আপনার উচিত পুলিশে খবর দেওয়া—ছেলেকে এ-রকম শাসন করা চলে কিনা সেটা তারা বুঝিয়ে দেবে।

ঘাড় উঁচিয়ে বাপী পিছনের দরজার দিকে তাকাল। বাবা কোথায়? বাবা কি শুনল?

দুপুরে আবু এল। বাবা তখন আপিসে। পিসী তার পুজোর জায়গায়। আবু ঘরে ঢুকলে পিসীকে গোবর জলের ছড়া দিতে হয় বলে ভিতরে কমই ঢোকে। আজ ঘরে পা দিতেই একটা উদ্গত অভিমানে বাপী অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

পিসী শোয় বলে আবু চৌকি ছোঁবে না। হাত দুই তফাতে দাঁড়িয়ে ওকে দেখল একটু। বলল, রাগ তো হবেই তোর. আমি শালা কেমন গোলাম ভাল করে দেখে রাখ্—

বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বাপীও বুঝল। আস্তে আস্তে ওর দিকে ফিরল আবার। আর মনে মনে ভাবল, চোখে যদি জল আসে তো নিজের চোখ দুটো উপড়ে ফেলবে।

আবু বলল, কাল রাতেও খবর নিতে এসেছিলাম। পিসী বলল খুব জ্বর তোর। তোর বাবার মুখের দিকে চেয়ে আর ঘরে ঢোকার সাহস হল না। এখন আপিসে কাজ করছে দেখে ঝট করে চলে এলাম।

বাপী বলল, একটা কিছু টেনে নিয়ে বস না—

—আর বসে না, এক্ষুনি তো জঙ্গল ট্যাঙাতে বেরুতে হবে। তারপর গলা খাটো করে বলল, এত বড় কাণ্ড হবে জানলে আমি তোকে বানারজুলি থেকেই পাচার করে দিতাম। সামনে ঝুঁকল একটু, কি করে-ছিলি রে তুই — মেয়েটার একেবারে সর্বোনাশ-টর্বোনাশ করে বসে আছিস নাকি? কুকুর বেড়ালেও তো কেউ এভাবে মারে না—

সর্বনাশ কাকে বলে বাপী তাও এখন বেশ বুঝতে পারে। একটা মেয়ের নরম মাংসের ওপর পাগলের মতো সেই হামলার পর ভিতরের শয়তানটা আরো বেপরোয়া কিছুর দিকে ঝুঁকতে চাইছিল। কিন্তু মিষ্টির হাঁ-করা মুখের দম-আটকানো কান্না দেখে সেই শয়তান উধাও হয়েছিল। এখন খেদ। আবু যা বলছে তাই হলে কি হত? না-হয় একেবারে মেরে ফেলা হত ওকে। তার বেশি কি হবে?

আবু চেয়ে আছে। কিন্তু বাপী কি করেছে না করেছে মুখে কি বলবে? মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, অত্যাচার না।

দাঁতে দাঁত ঘষে আবু বলল, যদি মরদ হোস তো একদিন শোধ নিবি। তারপর একটা চোখ ছোট করে অন্য চোখে সটান তাকিয়ে শুধলো, কি-রকম শোধ বুঝলি?

কেন যেন বাপীর জ্বালা-যন্ত্রণা মুড়চ্ছে একটু। মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

কিন্তু দু মাস না যেতে বাগে আর পরিতাপে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করেছে বাপীর। আর জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারের মতো একটা চলন্ত জিপে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। বেঙ্গ অফিসার সন্দীপ নন্দী দিনাজপুর না কোথাকার জঙ্গলে বদলী হয়ে গেল এ-খবর প্রথম আবুই দিয়েছিল ওকে। বলেছিল, অনেক দুর্নাম রটেছে বড় সাহেবের নামে কত আর চাপা দেবে? তাই মানে মানে নিজেই তদবির করে সরে পড়ছে।

আগে কামনায় কিছু চাইলে বাপী সেই প্রার্থনা ভগবান নামে অদৃশ্য কারো কাছে পেশ করত। সেই মানের পর ভগবানের নাম আর মুখেও উচ্চারণ করেনি। তবু নিজের বুক চিরে কাউকে রক্ত দিলে যদি এই বদলী বন্ধ হত, তাও দিত। কিন্তু কিচ্ছু করা গেল না। ওরা চললই।

এত দিনের মধ্যে বাপী আর বাংলোর কাছে আসেনি। আজও দূরেই দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে ব্যস্তসমস্ত বাবাকে দেখেছে। মেজ-সাহেব ছোট সাহেব, ফরেস্ট গার্ড, বীট-ম্যানদের দেখেছে। মেমের হাত ধরে মেমসাহেব জিপে উঠল। সাহেব সামনে। জিপটা আসছে। বাপী রাস্তা আগলে দাঁড়িয়েছিল, ধারে সরে গেল। মিষ্টি দূর থেকে দেখেছে ওকে। মা-কেও দেখিয়েছে। জিপটা বেরিয়ে গেল। বাপী মিষ্টির দিকেই চেয়ে আছে। মিষ্টিও। সামনে বাবা, পাশে মা, তবু ওর ভয়-ভয় মুখ।

জিপ দূরে বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে গেল। শিরায় শিরায় রক্ত ফুটছে বাপীর। মুখে বলছে না কিছু। মনে বলছে। বলছে কসম্ রইল পালাবি, তোকে আর পার না ভেবেছিস।

বিপ্লবী নিকেতনের উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম এক অভাবনীয় বিপ্লবী সংকলন, শৈলেশ দে সম্পাদিত

অগ্নিযুগ

২৫

(একত্রে বাঁধাই দুই খণ্ডে সমাপ্ত)

লেখক তালিকায় রয়েছেন : শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু, নেতাজী, বিপ্লবী মহানায়ক বাসবিহারী বসু, শহীদ সূর্য সেন, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি, কমরেড মজঃফর আমেদ, কমরেড শিবদাস ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), মতিলাল রায়, হেমচন্দ্র ঘোষ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, মেজর সত্য গুপ্ত, সত্যরঞ্জন বকসী, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, নলিনীকিশোর গুহ, ভূপতি মজুমদার, জগদীশ চ্যাটার্জি, নিকুঞ্জ সেন, রসময় শূর, হরিদাস দত্ত, যতীশ ভৌমিক, বীনা ভৌমিক, কমলা দাশগুপ্ত, উজ্জ্বলা বক্ষিতরায়, শান্তি রায়, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, অখিল নন্দী, মণীন্দ্র নায়েক, অরুণ দত্ত, অমলেন্দু ঘোষ, বণেন গাঙ্গুলী, ডাঃ ভূপাল বসু, শান্তিময় গাঙ্গুলী, লোকেন্দ্র সেনগুপ্ত, বসিক দাস, কল্যাণী ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ঘোষ, বিমল দাশগুপ্ত, নিরঞ্জীব রায়, দেবনাথ দাস, জ্যোতিষ জোয়ারদার, কাজী নজরুল, কবি সুকান্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রমেশ মজুমদার, অন্নদাশংকর রায়, সরোজিনী নাইডু, ডঃ রমা চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, সুকমল ঘোষ, রামসিংহাসন মাহাতো, চিত্তপ্রিয় মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাশীকান্ত মৈত্র, ত্রিপুরা-শংকর সেনশাস্ত্রী, জাহানারা বেগম, রেখা আহমেদ, হরিশ দেবনাথ, পার্থ চট্টো-পাধ্যায়, পার্থসারথি বসু, ব্রততী ঘোষ রায়, শ্রীকান্ত, তপনকিরণ রায়, চোমং লামা, নীরদ রায়, সলিল লাহিড়ী, তমাল রায়, সুশান্ত আচার্য, হরি ঘোষ, স্বপন মজুমদার, মানিক মুখার্জি, সত্যেন ভদ্র চৌধুরী, ঝনঝা দাস, রেখা বকসী, শ্রীমতী দেবযানী, রূপম মজুমদার, বজ্রবাণী বসু, সন্তোষ বসু, অর্ধেন্দু গুহ, মণিলাল অধিকারী, দিলীপ ঘোষ রায়, এলা রায়, রঞ্জনা অধিকারী, বাণী দেবী ও শৈলেশ দে।

৫ টাকা দিয়ে গ্রাহক হলে বইটি ২০ টাকায় পাওয়া যাবে। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র। নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাহক হওয়ার শেষ তারিখ ৩০শে জুন, ১৯৭৮।

* বইটির বয়েলটি বাবদ প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিকিৎসার জন্য কিডনিকে শয্যা সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করা হবে।

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ, টেমার লেন। কলি-৯। ৩৪-৯৫৯২

পরের দু বছরে বাপীর ভেতর-বাহির বদলেছে। পড়াশুনোয় মোটামুটিভাবে রপ্ত হয়েছে। পড়াশুনোয় মোটামুটিভাবে রপ্ত হয়েছে। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পৃথিবীর মুখ তখন ঘরের কোণে এসে গেছে। চা-বাগানের ক্লাবে খবরের কাগজ আসে। রোজ সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে বাইরের বেঞ্চিতে বসে বাপী কাগজ পড়ে। কিন্তু যুদ্ধের এত খবর মনে খুব একটা দাগ কাটে না। ওরও ভিতরে অবিরাম যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে সেটা কম কিছু নয়। মিষ্টি নামে একটা মেয়ে কোথাও না কোথাও আছেই। বাপী হিসেব তোলেনি। ওই মেয়ে বারো পেরিয়েছে এখন। কল্পনার আর একটু বড় দেখেছে ওকে, আরো সুন্দর দেখেছে। আরো বড় হোক। আরো সুন্দর হোক। দেখা হবে। হবেই হবে।

বানারজুলির জঙ্গল তেমনিই টানে ওকে। আরু ভীষণ ব্যস্ত। তার দেখা কম মেলে। কাজে গাফিলতি নেই। তার ওপর রোজ চা-বাগানের বাস্ত এলাকায় গিয়ে বাপের জন্য ছাড়িয়া যোগাড় করে নিয়ে আসতে হয়। চাকরি খোয়ানোর ফলে কোনো সন্ধ্যতেই একটা জিনিস থেকে ও বাপকে বঞ্চিত করেনি। জঙ্গলে বেশির ভাগ সময় একলাই ঘুরে বেড়ায় বাপী। কিন্তু এ ঘোরাটা অন্য রকম। জীবজন্তুর জল-বাসাবাসির দিকে আর চোখে নেই। এ দুবছরেও বনমায়া তার হিসেব মতো নিখাঁজ হয়েছে আর সকলের প্রত্যাশিত সময় মতোই ফিরেছে। কিন্তু এ নিয়েও বাপী আর আগের মতো অত উত্তেজনা বোধ করে না। এমন কি চা-বাগানের আড়াই-পাতি তোলা হাসি উছলানো মেয়েদের দিকেও আর বেশি ঘেঁষে না। নিজের মনে জঙ্গলে ঘোরে। এখানকার নিস্তব্ধতা ভালো লাগে। গাছ-পালার সড়সড় শব্দও ভালো লাগে।

বা একটু কৌতূহল কেবল বসন্তের কোপে অন্ধ সাপুড়ে ছট্টুদাদার বউ দুলারি আর তার ননদ মাতাল ফাঁদনার বউ রেশমাকে নিয়ে। দুলারি এক রকমই আছে। পুরুষালি ছাঁদ, মুখে কম কথা, আর আগের মতোই আবুকেও চোখ রাঙানোর সাহস। কিন্তু মাতাল স্বামীর হাতে মার-খাওয়া রেশমার মুখশ্রীর আভা চলচলে হয়েছে। বছর উনিশ এখন ওর বয়েস। আরু বলেছে মাসের মধ্যে কম করে বিশ বাইশ দিন রেশমা এখন তার ভাসুরের কাছেই থাকে। ফাঁদনা এসে হাতে পায়ে ধরে খুব কাকুতি-মিনতি করলে তবে যায়। কিন্তু দুদিন বাদে আবার দাগড়া-দাগড়া মারের দাগ নিয়ে পালিয়ে আসে। মদ খেলেই ইদানিং ওর নাকি বউয়ের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে মাথায় সন্দেহ গজাতে থাকে। তারপর মেয়ে শুইবে না ফেলা পর্যন্ত সন্দেহের পোকাগুলো মাথা থেকে সরে না। রেশমা আর নাকি তার মরদের ঘরে যাবেই না পণ করেছে।

এত কথা বাপী আরুর মুখ থেকেই শুনেছে। আর ফাঁদনার সন্দেহ কতটা সত্যি আরুর মুখের দিকে চেয়ে তাই আঁচ করতে চেষ্টা করেছে। ওদের নিয়ে কৌতূহলের আরো কারণ, দুলারি আর রেশমা দুজনেই এখন রোজগারের রাস্তায় নেমে গেছে।

সাপের ঝুড়ি আর বাঁশি নিয়ে দুজনে এক-সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সাপ-খেলা দেখাতে বেরোয়। দু বছরে অন্ধ ছট্টু মিয়ার কাছে বিদ্যেটা রপ্ত করে নিয়েছে। সকালে ঘরের কাজ থাকে, রান্নাবান্না থাকে, খুব বেশি ঘুরতে পারে না। কিন্তু দুপুরে পেরুনোর আগে অনেক দূরে দূরে চলে যায় ওরা। ভয়-ডর নেই। দুলারির তো একেবারে নেই।

ওরা কোথাও সাপ খেলা দেখাচ্ছে শুনলে বাপী গুটিগুটি না এগিয়ে পারে না। শুধু বাপী কেন জোয়ান বয়সের অনেকেই এগোয়। দুলারি আর রেশমা দুজনেই তখন ঘাগরা পরে বেরোয়। সেই ঘাগরা ওদের হাঁটু ছাড়িয়ে এক বিঘতও নামে না। গায়ে রং-বেরংয়ের আঁট কোর্তা। ছট্টুমিয়ার খেলা অনেক দেখেছে বাপী। সেই একই খেলা এদের হাতে যেন অন্যরকম। গাল ফুলিয়ে সাপুড়ের বাঁশি বাজিয়ে পালা করে খেলা দেখায়। সাপ ডাইনে বাঁয়ে দোলে। হাঁটু মুড়ে বসে ওরাও তেমনি দোলে। ছোবল মারার মতলবে সাপ সামনে পিছনে দোলে। ওদের তখন উত্তেজনা বাড়ে। ওরাও সামনে পিছনে দোলে। ছোবল খাবার জন্য মাটিতে উল্টো করে হাত পাতে, আবার ছোবল পড়ার আগে পলকে হাত সরায়। এই করে সাপে। উত্তেজনা বাড়ায়। নিজেদের আর বাবা গোল হয়ে দাঁড়ায়—তাদেরও। সাপের ছোবল এক-বার না একবার লেগেই যাবে। ঝরঝরে করে বকুনি পড়ে। তখন ঠান্ডা হয়ে পাতা আর শেকড়-বাকড় চিবিয়ে চটপট লাগিয়ে দেয়।

বাপী লক্ষ্য করেছে ছোবল খাবার লোভ বেশমার থেকেও দুলারির বেশি। অন্ধ ছোট্টুদাদাকে যত বুড়োই দেখাক, দুলারির বয়েস এখন বড় জোর বাইশ। কিন্তু সাপ খেলা দেখানোর সময়েও মুখ-খানা করে রাখে বত্রিশের মতো। বেশমার মতো হাসে না। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে দোলে ওর থেকেও বেশি। খপ করে একসময় দু-হাতে সাপের গলা চেপে ধরে বুকের কাছে নিয়ে আসে। সাপের মুখ নিজের মুখের কাছে। সাপের চেরা-জিভ চিভচিভ করে। দুলারিও তখন ঘন ঘন জিভ বার করে আর টেনে নেয়। যেন জিভেই ছোবল নেবার বাসনা। বাপীর কেন যেন তখন সাপের চেয়েও ওই দুলারিকেই বেশি ভয় করে।

পরীক্ষা এসেই গেল। পড়াশুনায় আপনা থেকেই একটু মন বসেছে। তারই মধ্যে আচমকা দুর্যোগ। যে 'মালোরি' জ্বরের ভয় পিসীর, তাই তাকে খেয়ে বসল। পাঁচ দিনের মাথার ধুপ করে নেবে যেতে বোঝা গেল ওটা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ডাক্তারের মুখে ওই নাম বাপী পরে শুনেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাত্র আট দিন বাকি তখন।

বাবা কাঁদল না। পাথর হয়ে থাকল। বাপীও কাঁদল না। বুকের একখানা হাড় খসে গেল ওর। তবু না। আছড়ে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। তবু না। কেবল আরুর চোখে জল দেখেছিল।

পরীক্ষার ছেদ পড়ল না। পরীক্ষা শুরু হল, শেষও হল। গত দু বছরের মধ্যে বাবার সঙ্গে বাপীর কদিন মুখ দেখাদেখি হয়েছে হাতে গোনা যায়। পিসী চোখ বোজার পর মুখ দেখাদেখি বলতে গেলে দু বেলাই হচ্ছে এখন। বাবা মোটামুটি রাঁধতে জানে। বাপীর হাতে ছেড়ে দিলে রান্না এক-রকম সে-ও করতে পারে। কিন্তু বাবা মুখ বুজে নিজেই রান্না করে। বাপী দেখে। মুখে কিছু বলে না। পরীক্ষা হয়ে যাবার পর বাবা সকালের বাজারটা ওকে মাঝে মাঝে করতে দেয়।

একই বাড়িতে দুটি প্রায় অচেনা বাসিন্দা যেন দুজন। সকালে বাবার আপিস থাকে। আগে খেয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রাতেও বা ছুটির দিনেও খাবার সময় বাপী দূরে সরে থাকে। বাবা বুঝে নিয়েছে ও তার সঙ্গে বসে খাবে না। তাকে সামনে দেখলে আজও বুকের একেবারে তলা থেকে একটা বিতৃষ্ণ ঠেলে ওঠে বাপীর। বাবা তাও বুঝতে পারে কিনা বাপী জানে না। বাবা ভাকে না। ওরটা সরিয়ে রেখে নিজে খেয়ে চলে যায়।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুল। বাবা এতটা আশা করে নি নিশ্চয়। আর বাপী ফল নিয়ে মাথাই ঘামায় নি। পাশ করবে জানত।

....ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। খবর আসার পর দিনই বাবার মুখ দেখল। এ-ঘরে এসে বলল, বড় সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, কাল বিকেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। আমি নিয়ে যাব।

কে এখন বড় সাহেব বাপী সে-খোঁজও রাখে না। কি কথা হয়েছে বা কেন দেখা করতে যেতে হবে না বুঝে মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল।

বাবা বলল, এ জঙ্গলে আর একজন ক্লার্ক নেওয়া হবে সেটা আগেই ঠিক হয়ে ছিল। বড় সাহেবকে তোর কথা বলে আমি আটকে রেখেছিলাম। ম্যাট্রিক পাশ চাই। আজ বেজাল্টের কথা বলতে সাহেব ফোনেই দেখা করতে বললেন।

কথা শেষ করে বাবা চলে যাচ্ছিল। বাপী বলল, আমি কলেজে পড়ব।

হরিবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। ছেলের মুখ এবারে ভাল করে দেখে নিলেন। সেই পুরনো বিতৃষ্ণ আর ঘৃণা নিজের মুখে আরও কত এঁটে বসেছিল বাপী জানে না। গলার স্বরেও কিছু প্রকাশ পেয়েছে কিনা বলতে পারে না।

হরিবাবুর মুখে কঠিন আঁচড় পড়তে লাগল। গলাও অসহিষ্ণু, ভারী।—কলেজ মানে তো সেই জলপাইগুড়ি, সেখানে হস্টেলে থেকে পড়ার ইচ্ছে?

বাপী চুপ।

—আমার সে ক্ষমতা নেই।

বাপীর জবাবও এবারে স্পষ্ট।—আমি একবার সেখানে গিয়ে দেখব কোন ব্যবস্থা হয় কিনা।

হরিবাবু থমকালেন। মুখের ওপর এতখানি স্পষ্ট কথা শুনতে অভ্যস্ত নন।

তাঁর চোখে এটা অবাধ্যতা। কিন্তু সামনে যে দাঁড়িয়ে সে এখন তাঁর চেয়েও তিন আঙুল ঢ্যাঙা। দু বছর আগের সেই মারের পর থেকে ছেলে বদলেছে এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। শাসন নিষ্ফল হয় নি ভেবেছেন। দিদি মাঝে না থাকতে বাপ-ছেলের ফারাকটা এখন আরও বেশি স্পষ্ট। আগে কখনও কাছাকাছি হতে না পারাটাই কারণ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু ছেলের এই মুখে আর এই স্পষ্ট জবাবে যেন আরও কিছু লেখা আছে।

অসহিষ্ণুতা চাপতে পারলেন না।—সেখানে গিয়ে ব্যবস্থা হয় কিনা দেখার জন্য এখানকার চাকরি বসে থাকবে?

বাপী নিরুত্তর।

এই নীরবতার মধ্যেও ধৃষ্টতা দেখলেন হরিবাবু। — ম্যাট্রিক পাশ করে খুব লায়েক ভাবছিস নিজেকে, কেমন? স্টুপিড! এখানে আমার ব্যবস্থাই ব্যবস্থা এ যেন মনে থাকে।

থমথমে মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

পর দিন খেয়ে-দেয়ে সকাল দশটা নাগাদ আপিসে বেরুনোর জন্য তৈরি হয়ে ছেলেকে কাছে ডাকলেন। বললেন, চারটে বাজার মিনিট পনের আগে আপিসে আসতে হবে, সেখান থেকে আমি সঙ্গে করে বড় সাহেবের বাংলোয় নিয়ে যাব।

বাপী চুপচাপ অন্য দিকে চেয়ে রইল।

আপিসে বেরুনোর সময় মেজাজ ঠান্ডা রাখতে চান হরিবাবু। আজ রাখা গেল না। চাপা গর্জন করে উঠলেন, আমার কথা কানে যাচ্ছে?

বাপী এবারে সোজা বাবার মুখের দিকে তাকাল। ঠান্ডা মুখ। ঠান্ডা গলা।—তুমি আর না পড়াতে পাব, পড়াবে না। এভাবে জুলুম করছ কেন?

হরিবাবু ঠিক দেখছেন? ঠিক শুনছেন? পায়ে এখন চটি নেই, ফিতে বাঁধা জুতো। তাই খুলে হাতে নেবেন? কিন্তু ছেলের এই মুখের দিকে চেয়ে কটা মুহূর্তের মধ্যেই আবার তাঁর মনে হল, আগের সেই দিন আর নেই। কত্তা নেই ঠাওর করে উঠতে পারলেন না। ছেলের এই ঠান্ডা চাউনির ভিতর থেকে কিছু যেন ঠিকরে পড়ছে মনে হল তাঁর। উদ্গত রাগ ঠেলে তল করলেন আপাতত।

—আচ্ছা, বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা-শুনা কথাবার্তা হোক। তারপর আর কিছু ভাবার থাকে তো বিকেলে ঘরে এসে ভাবা যাবে।

হরিবাবু হন হন করে চলে গেলেন।

বাপী তার এক ঘন্টার মধ্যে স্নান সারল। খাওয়া সারল। অন্য দিন দেরি হয়। আজ তাড়া।

এরই মধ্যে আবু এসে হাজির। খুশি উপচানো মুখ।—তোর পেটে পেটে এত যে আমাকে খবর পর্যন্ত দিলি না—অ্যাঁ?

—কি খবর?

—আজ বড় সাহেবের সঙ্গে তোর মোলাকাত হবে, কাল পরশু থেকে তুই আমাদের ছোট কেরাণিবাবু। শুনেই ছুটে চলে এলাম আমি—

বাপীও হাসছে অল্প অল্প।—কার কাছে শুনলে?

—একবার আপিসে গেছলাম, তোর বাবাই ডেকে খবরটা দিলেন। আমি ভেবেছি এর পর কি বলে ডাকব রে—হ্যাঁ? লোকের সামনে না হয় আপনি-টাপনি করে বলব—কি বলিস?

—আগে কাজ হোক, তারপর ভেবো। চাকিতে ভেবে নিল কি।—বাবা নিজে ডেকে তোমাকে শুধু এই খবরটা দিল না আর কিছু বলল?

—খবরটা জানিয়ে আমাকে বললেন, সাড়ে তিনটের সময় ঘরে গিয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিস। চারটেয় বাংলোয় বড় সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা।

বাপী হাসছে মনে মনে। বাবার তাহলে নিজের হুকুমের ওপর ভরসা একটু কমেছে। মনে মনে নয়, বাইরেও হাসলে বাপী। বলল, ওই বাংলোর বারান্দাতেই বাবা আমাকে মেরে মেরে একেবারে শুইয়ে ফেলেছিল—নিজের রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম আমি।

আবু থতমত খেল একটু।—দূর, দু বছর আগের সেই মার তোর গায়ে লেগে আছে, না সেই বড়সাহেব আছে। এই লোকের কাছে কাজের কদর আছে বলেই তো তোর বাবার সুবিধে হয়েছে।

বাপীর মজাই লাগছে। আবার বলল, আর পর দিন দুপুরে এসে তুমি বলেছিলে, যদি মরদ হোস্ একদিন শোধ নিবি—আর আজ ছোট কেরানি হয়ে বসছি দেখেই ভাবি খুশি তুমি।

এবারে আবুকে ঢোঁক গিলতে হল একপ্রস্থ।—আচ্ছা ছেলে তো তুই, সে-সব কথা এখনও মনে করে বসে আছিস! তারা এখন পৃথিবীর কোন্ রাজ্যে আছে তার কিছু ঠিক আছে? তাছাড়া খোদার মর্জি হলে ছোট কেরানি হলেও শোধ নেবার দিন আসতে পারে। খুশির দিনে ও-সব মাথায় রাখিস না, অনেক কাম এখন, যাই—ঠিক সাড়ে তিনটেয় এসে যাব, রেডি থাকিস—

চলে গেল।....না ওকেও কিছু বলা গেল না। বলা নিরাপদ ভাবছে না। সমূহ সমস্যার সমাধান পিসীই করে রেখে গেছে। নইলে আবুকেই বলতে হত। তার কাছ থেকেই সাহায্য চাইতে হত। তার দরকার হল না, বাঁচোয়া। আবু যে ওকে ভালবাসে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাপীর মতলব জানলে ওকে আগলাবার জন্য কি কান্ড করে বসত, কে জানে। হয়ত বাবার কাছেই ছুটত আবার। চাকরি ওর কাছে মস্ত জিনিস এখন।

....কি করবে না করবে বাপী গত রাতেই ঠিক করে ফেলেছিল। দরকার শুধু নগদ কিছু টাকার। বানারহাট পৌঁছুতে

মননশীল বই

* **চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ**

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। তথ্যাদি নষ্ঠ সাবলীল বিবরণ। চার বিরল মানচিত্র। [১০-০০]

* **প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য**

ডঃ নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যসমূহ সহ সংস্কৃত সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫-০০]

* **স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সামাজতান্ত্রিক আন্দোলন**

ডঃ শঙ্করপ্রসাদ ঘোষ। তত্ত্ব ও তথ্যাদি নষ্ঠ আলোচিত। [২০-০০]

* **বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা**

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। ৮ মানচিত্র। [১৫-০০]

* **সংস্কৃত নাটকের গল্প**

অনিতা চক্রবর্তী। দশটি সংস্কৃত নাটকের কাহিনী। [৮-০০]

* **সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান**

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সম্পাদক : অঞ্জলি বসু। প্রায় সাড়ে তিন হাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবনচরিত। [৪০-০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

পারলে সেখান থেকে জলপাইগুড়ি পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের বেশি নয়। ভাড়া সেই দিনে বড়জোর এক টাকা। খুব কম হলেও আরও তিন-চার টাকা বাপীর হাতে থাকা দরকার। সপ্তাহের বাজার আর টুকিটাকি কেনার জন্য বাবা ওর হাতে পাঁচ টাকা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বাপী বরং ওই পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ মাইল হেঁটে যাবে, তবু ও-টাকার এক পয়সাও ছোঁবে না। আবুকে বলে দেখবে পাঁচটা টাকা ধার পায় কিনা। পাক না পাক, ও এবার যাবেই এখন থেকে।

কিন্তু গত রাতের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। চৌকির নিচে পিসীর ছোট বাকসটার কথা মনে পড়ল। চাবি বাপীর কাছেই। পিসী মারা যাবার পরে এ-পর্যন্ত আর খুলে দেখা হয় নি ওতে কি আছে না আছে। যদি কিছু থাকে তা বাপীর ছাড়া আর কার ?

জামা কাপড়ের তলা থেকে হাতে তৈরি ছোট্ট থলে বেরুলো একটা। বেশ শব্দ না করে বিছানায় উপুড় করে ফেলল। সবই কাঁচা টাকা, আর একটা আধুলি। মোট সাড়ে সতের টাকা। বাপীর কাছে ঐশ্বর্য। টাকা থলেয় পুরে ওটা কপালে ঠেকাল। ভগবান-টগবান নয়, পিসীকে প্রণাম করল। তারপর সমস্ত রাত আর সকাল কাটল এই দুপুরের প্রতীক্ষায়।

সঙ্গে যা নেবার চটপট গুছিয়ে নিল। টিনের ছোট সুটকেসে ধুতি, শার্ট, গেঞ্জি একটা গরম সোয়েটার। শতরঞ্জী মোড়ানো পুঁটলিতে শুধু নিজের পুরনো কম্বল, রঙিন চাদর একটা, আর গায়ের আলোয়ান। বিছানা-বালিশের বিলাসিতা মন থেকে ছেঁটে দিয়েছে। ওই টিনের সুটকেসই দিব্যি মাথায় দিয়ে শোয়া যাবে।

বারোটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। বাবার বাজারের টাকা তার বিছানায় বালিশ চাপা দিয়ে রেখে এসেছে।....আবু আসবে সাড়ে তিনটেয়। ঘরে শেকল-তোলা দেখে ভাববে ও আগেই বাবার আপিসের দিকে চলে গেছে। আপিসে না পেয়ে আবার ঘরের দিকে ছুটবেই। মোট কথা, ও নেই জানাজানি হতে বিকেল চারটে গড়াবে। ততক্ষণে ও অনেক দূরে।

জঙ্গল দিয়ে নয়, সোজা রাস্তা দিয়েই চলল। জঙ্গলে আবুর সঙ্গে ফের দেখা হয়ে গেলে মুশকিল। ভয় শুধু ওকে। রাস্তায় আর কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই বা। কে কি বুঝবে ? বেরিয়ে যখন পড়েছে, আর ওকে ফেরাবার সাধ্য কারও নেই।

বরাত ভাল। আধ মাইল না যেতে এক ঠেলা-অলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুটো লোক ঠেলায় লোহালক্কড় চাপিয়ে বানারহাট যাচ্ছে। বাপীর কাছে প্রত্যেকটা পয়সা দামী এখন। তবু দু আনায় রফা করে টিনের সুটকেস আর শতরঞ্জীর পুটলি ঠেলায় তুলে দিল। ঝাড়া হাত-পায়ে ওকে দেখলেও এখন আর কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

আরও মাইলখানেক না যেতে বাপী মনে মনে নিজের বিবেচনার তারিফ করল। সামনে দিক থেকে আসছে সাপুড়ে ননদ-ভাজ। দুলারি আর রেশমা। পরনে খাটো ঘাগরা, ছোট-বড় সাপের ঝুড়ি। ও-দিক থেকে খেলা দেখিয়ে ফিরছে। রোদের তাতে দুজনারই লালচে মুখ।

ওকে দেখে রেশমা দাঁড়িয়ে গেল। তাই দুলারিও। মরদের হাতে ঠেঙানি খেয়ে রেশমা কাঁদে কেমন বাপী জানে না। কিন্তু হাসে বেশ।

—ডর দুপুরে কোথায় গো বাপী ভাই ?

আবুর সঙ্গে এত খাতির, বয়সেও বছর দুই বড় হবে, রেশমা ওকে তাই বাপী-ভাই বলে ডাকে। দুলারির মুখে এ-যাবৎ কোন ডাক শোনে নি।

—এই সামনে। তোমাদের আজ এত বেলা, দূরে গেছলে বুঝি ?

—হাঁ গো, আজ ভাল রোজগার হল। কদিনের মধ্যে তোমার বাঁটম্যান সাহেবের দেখা নেই কেন — বলো, দাদা খোঁজ করছিল।

দুলারির কপালে ভ্রূকুটি।—বলো রেশমা খোঁজ করছিল।

নিরীহ মুখে বাপীও একটু মজাই করল। বলল, খানিক আগে আমার ওখানেই ছিল, এতক্ষণে বোধহয় তোমাদের ঘরেই বসে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে রেশমা বলল, চল ভাবী, পা চালিয়ে চল—বেলা বাড়ছে।

গম্ভীর চোখে রেশমার মুখে রূপ করে একটা ছোরা বসাবার মত চাউনি দুলারির।

ওরা এগুলো। বাপী দাঁড়িয়ে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও পেল। এক সঙ্গে দুজনেই ওরা পিছন ফিরে তাকাল। বাপী ঘুরে তাড়াতাড়ি পা চালাল।

....মাতাল ঠেঙাড়ে সোয়ামীর সঙ্গে রেশমার ছাড়াছাড়ি এক-রকম হয়েই গেছে যখন, আবুটা ওকে নিকে করে ফেলছে না কেন বাপী ভেবে পায় না। ওদের সমাজে এটা কঠিন ব্যাপার মনে হয় না। তবে যত সেয়ানাই হোক, আবুর ভেতরটা নরম। হয়ত ওই মাতাল কাঁদনার জন্যও ওর একটু দরদ আছে। কিংবা, দুজনাই এখন ওরা অঙ্গলের চাকুরে বলে হয়ত চক্ষু লজ্জায় পেরে উঠছে না।

বানারহাটে পৌঁছে প্রথমেই নিশীথের মামা বাড়িতে এল বাপী। নিশীথ সেন। ক্লাসে ওর সঙ্গেই সব থেকে বেশি খাতির। নিশীথ সেন জন্ম থেকেই বলতে গেলে দিদিমার কাছে মানুষ। বাবা-মা কলকাতায়। বাবা সেখানে কবিরাজ। অন্য ভাই-বোনেরা তাদের কাছেই থাকে।

এ-বাড়িতে বাপীর আগেও যাতায়াত ছিল। শুনল, নিশীথ আগের দিনই জলপাইগুড়ি চলে গেছে। সেখানে ওর আর এক মামা থাকে। কাঠের কারবারী। ভাল অবস্থা। এখন সেখানেই উঠেছে। তারপর হস্টেলে থেকে কলেজে পড়বে। জলপাইগুড়ির মামার অনেকগুলি ছেলে-পুলে। সেখানে থাকলে নাকি ওর পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে।

ঠিকানা নিয়ে বাপী আবার বেরিয়ে পড়ল।

সমস্যার সমাধান এত সহজে হয়ে যাবে বাপী কল্পনাও করে নি। কলেজে পড়ার জন্য ও কিভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে শুনে নিশীথও প্রথমে বেশ ঘাবড়ে-ছিল। বাপীও আই এস সিই পড়বে। সায়েন্সের মাইনে সাত টাকা। ভর্তির ফী ছাড়াও অ্যাপারেটাসের জন্য কশান মানি পনের টাকা জমা রাখতে হয়। হস্টেলে থাকা-খাওয়া বাবদ এ-সবের ওপর মাসে আরও চল্লিশ টাকার ধাক্কা।

মুশকিল আসান এক দিনের মধ্যে ওই নিশীথই করে ফেলল। এখানকার মামাও নিশীথকে বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করার জন্য বকাঝকি করেছিল। ও রাজি হয় নি। মামা-মামীর সঙ্গে কথা বলে তাদের এক চৌকি ছেলেমেয়ে অর্থাৎ দুটি ছেলে আর দুটি মেয়েকে প্রদ্যুম্নের ভার বুঝিয়ে

ওপর চাপিয়ে দিল। মামা-মামীকে বোঝালে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা বন্ধু অল্পের জন্য স্কলারশিপ মিস করেছে। এমন মাস্টার পাওয়া ভাগ্যের কথা। বিনিময়ে বাপী এখানেই থাকবে খাবে আর দশ টাকা মাইনে পাবে।

মামার কাছ থেকে ছ মাসের মাইনে আগাম পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। পনেব টাকা বাপীর কাছে আছে, বাকি যা লাগে নিশীথ ধার দিল। কলেজে ভর্তি হওয়ার সমস্যা মিটল।

কিন্তু কদিনের মধ্যেই বাপীর ক্লান্তি এসে গেল।ওর কল্পনা যে সাম্রাজ্যের সিংহাসনের দিকে ছোটে, বাস্তবটা সে তুলনায় একটা কুৎসিত ঘায়ের মত। নিশীথের মামার ছেলে-মেয়েদের প্রতিও ভিতবটা বিরূপ ওর। যুদ্ধের চাকরিতে লোক নেওয়া হচ্ছে। ভাবে সব ছেড়েছুড়ে ওতেই ঢুকে পড়ে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে কেমন হয়। আবাব নিজেই জানে, সব সম্ভাবনার তাহলে ভরা-ডুবি হয়।

দিন কুড়ির মধ্যে কলেজের আপিসে ডাক পড়ল। কেন, বাপী কল্পনা করতে পারে নি। বানারজুলি থেকে বাবা আপিসে চিঠি দিয়েছে তার ছেলে ওখানে ভর্তি হয়েছে কিনা। হযে থাকলে কোন ঠিকানায় আছে। জবাবে আপিসের কেবানিবাবু ওর ঠিকানা জানিযে দিয়েছে, আর ওকে জিজ্ঞেস করেছে, বাবা ছেলের ঠিকানা জানে না, এ কেমন কথা।

বাপী যা-হোক জবাবদিহি করে চলে এসেছে।

মাসের শেষে ওর নামে বাবার কাছ থেকে তিবিশ টাকা মণি অর্ডার। কুপনে শুধু লেখা মাসে-মাসে তিরিশ টাকার বেশি পাঠান সম্ভব নয়।

মাসে তিরিশ টাকা পাঠানোই বাবার পক্ষে কতখানি বাপী তা জানে টাকাব জন্য নয—সেই ঘৃণা, সেই বিদ্বেষ। টাকা নিয়ে তক্ষুনি পোস্ট অফিসে ছুটল। গাঁটের পয়সা খরচ করে তিরিশ টাকাই ফেরৎ পাঠাল। কুপনে লিখল, টাকাব দরকাব নেই। কাবও কাছ থেকে কোন আশা নিয়ে সে ঘর ছেড়ে আসে নি।

পরেব মাসের মাঝামাঝি টেলিগ্রাম। কাউকে দিযে আবু তাব পাঠিযেছে। হবি-বাবুব অবস্থা সংকটাপন্ন। চলে এস।

এবাবে বুকেব ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে বাপীব। কিন্তু তবু অভিমান। তবু বিদ্বেষ। যাবে ? যাবে না। ...যাবে ?

... সেই দিনই বানারজুলি পৌঁছেছে। তার পব দিন বেশি রাতে বাবা চোখ বুজল। হঠাৎ বুকের বাঁ দিকে প্রচণ্ড ব্যথার শয্যা নিয়েছিল। তার পরেই এমন অবস্থা যে স্থানীয় ডাকতার হাসপাতালে সরাতেও সাহস করে নি। আগের সমস্ত রাত এমন কি পব দিন বিকেল পর্যন্ত বাবার পুরো জ্ঞান ছিল। বাপী এসে দাঁড়াতেই বাবা বড় বড় চোখে ওকে দেখেছে। সেই বড় বড় চোখের জল দুই গালে গড়িয়েছে। বাবা যেন অব্যক্ত আকুতিতে ওকে সব ভুলে যেতে বলছে।

বাপীর ভিতরটা দুমড়ে ভেঙেছে। সমস্ত রাত বসে তার বুকে হাত বুলিয়েছে। বাবা তারপর পরম তৃপ্তিভরে থেকে থেকে ওকে দেখেছে।

পর দিন ভোর রাতে সব শেষ। পিসী যেতেও বাপী কাঁদতে পারে নি। এখনও পারল না। পিসীর বুকে আছড়ে পড়ে যেমন কাঁদতে ইচছে করেছিল, বাবার দিকে চেয়েও তেমনিই একটা ইচছে ভিতর থেকে ডুকবে উঠছে। এত দিনের সব ঘৃণা আব বিদ্বেষ ফিরে ওকেই চাবুক হেনেছে।

বাবার কাজ মেটার পরেও কিছু দিন থেকে যেতে হল। এবারের বড সাহেব সত্যি ভাল লোক। বাবাব প্রভিডেন্ড ফান্ডের বারোশো কত টাকা ওব হাতে তুলে দিলেন। মালপত্রসহ ওকে বানারহাট পৌঁছে দেবাব জন্য জীপও দিলেন।

সঙ্গে আবু। বানারহাট পর্যন্ত ওর সঙ্গে যাবে। কিন্তু মুখে কথা নেই।

যেতে যেতে বাপী এবারে লোভীর মতই বানারজুলির জঙ্গল দেখছে। আবাব সামনে তাকিয়েই জীপটা দাঁড়াতে বলল। পথেব ধারে গাছের গুঁড়িতে বন্যমায়া বাঁধা ও সামনে যেতেই গলা দিয়ে শব্দ বার করে শুঁড় উঁচিযে সেলাম জানাল। বাপী ওর কপালে আর শুঁড়ে বার কয়েক হাত বুলিযে আবার ফিরে এল। চোখের কোণ দুটো বড বেশি শিবশির করছে। গেল বাবে বানারজুলি ছাড়ার সময় এমন হয় নি।

একটু সহজ হবার জন্যেই আবুকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বিয়েটা হচ্ছে কবে ?

বিরক্ত মুখে কবে আবু জবাব দিল, বিযের নিকুচি করেছে। শালাব মরদ ঘরে থাকতে তাব বিবিকে বিয়ে করা এত সোজা।

বাপী হেসে ফেলল। কিন্তু ভেতর হাল্কা হল না। আবুর সঙ্গে, এই বানার-জুলিব সঙ্গে, বানারজুলির জঙ্গলেব সঙ্গে বানারজুলির আকাশ-বাতাসের সঙ্গে কি-যে নাড়ির যোগ এ যেন আগে জানত না।

সেই যোগ ছিঁড়ে আজ ও ভেসে চলল।

একেবারে একা।

(চলবে)

বাংলার নবাবী আমল যখন শেষ ইংরেজ কোম্পানীর আমল তখন শুরু। শাসনের মুঠি সবে কড়া হচছে। বন-বাদাড় প্রচণ্ডই আছে। ভাল রাস্তা ঘাটও হয় নি। পথিক পথ চলতে ভয় পায়। গেরস্থের চোখে ঘুম নেই। কখন বুঝি হানা দেয়—হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তাদেব গোঁজা জবা ফুল। মুখে হা-রে-রে পিলে চমকানো ডাক। তারাই বাংলার ডাকাত। বিলেতে বাবিন হুডের আদল তাদের সবার মধ্যে। বীবত্ব, মহত্ব, দান, ধ্যান ভকতিতেও তারা কম যায় না। আবার তাদের সঙ্গে লড়বার মতো পুরুষ ও মেয়েব অভাবও ছিল না। সেইসব কাহিনী জানা মানেই প্রাচীন বাংলাকে জানা। এই বই লিখে যোগেন্দ্রনাথ হৈ চৈ ফেলেছিলেন। দলিলপত্র, কিংবদন্তী ও সরকারী গেজেটিয়ার ঘেঁটে বের করেছিলেন এই সব দুর্ধর্ষ মানুষদের কথা। সংবাদ প্রভাকব, সমাচার, দর্পণ, **Calcutta Review 1845, History, Literature and Religion of Hinddoos** প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে খুঁজে বের করেছিলেন প্রামাণিক তথ্য। আবাব সেই বই বেরুল। এমন চমকপ্রদ গা শিবশিব কাহিনী, অথচ এতটুকুও বানানো নয়। এমন নির্ভেজাল সত্য ঘটনা আব কেউ তাঁব আগে এমন কবে বলতে পাবে নি।
১মা।৫, ২য়া।৬, ৩য়া।৬, ৪র্থা।৬

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩,
ফোন : ৩৪৮৫৪৩

লালবাই-এর দেশে

রেখা বড়ুয়া

নিজের ভুল বুঝে লজ্জা পেল ঝুমুর। সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, অন্যভাবে বলি, বাংলায় অল ইন্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ডের গায়ক তৈরী হয়েছে? বল?

বললাম, অল ইন্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ডটা কিভাবে বিচার হবে ঝুমুর? বাংলার বাইরে থেকে যখন আমরা ফৈয়াজ খাঁ, গোলাম আলি খান, ওঙ্কারনাথ, পালুসকরকে এনে গান শুনেছি, সেকালে শুধু একটা নামই করি—তারাপদ চক্রবর্তী বেঁচে ছিলেন। তাঁর গান বোধহয় শুনিস নি কারণ দীর্ঘদিন শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্যে তিনি প্রায় সব কিছু পাকার আধারকে বর্জন করেছিলেন। এই বাংলা-দেশের কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা কি মর্যাদা দিয়েছে তাকে? ওইসব দিকপালদের কথা ছেড়ে দিলেও অতি সাধারণ স্তরের গায়ক বাদক নামের পাশে বম্বে, দিল্লী, আগ্রা ছাপ নিয়ে এসে কলকাতা কনফারেন্সে গেয়ে বাজিয়ে গেছেন, তাঁর আমলা পয়সা খরচ করে তা শুনেছি এত রেজে। কোনদিন প্রতিবাদ করি নি, বলিনি যে আমাদের নিজস্ব শিল্পীদের উপযুক্ত মূল্য যোগ্য মর্যাদায় গাইতে দাও, শোনাতে দাও তাঁদের গান।

—কিন্তু কেন, এঁদের গান কি হয় না কনফারেন্সে? ঝুমুর দ্বিধান্বিত গলায় বলল।

—হয়, এখন চারদিকেই শিল্পীর আকাল পড়েছে তাই এঁরাও পাচ্ছেন, তবে ওই যে বললাম, যোগ্য সম্মান আগে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হত, সন্ধের দিকে যখন লোক জমে নি হল ফাঁকা তখন বসিয়ে দেওয়া হত তাঁদের, বেশী রাতে যখন গায়ক আর শ্রোতা দুয়ের মেজাজ জমে ওঠে সেই সময়গুলো থাকত বাইরে থেকে আনাদের জন্যে। স্ট্যান্ডার্ড তো এই করেই তৈরী হয়। আর এই আত্মঘাতী নীতির ফল হচ্ছিস তোরা। জন্মে থেকেই জেনেছিস, এখানে ভালো গুরু নেই, ভালো গায়ক নেই সবকিছুই ওখানে।

ঝুমুর বলল, ফুলমাসি সবটাই আমাদের দোষ দিচ্ছ কেন? আমাদের শিল্পীদের কি কোন ত্রুটি নেই? কোন একজন নামকরা গায়ক এলে আমাদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা পর্যন্ত হুড়োহুড়ি করেন সেখানে নাড়া বাঁধতে, তাতে অসম্মান হয় না?

বললাম, দুঃখ সেইখানে আরও বেশী। উন্নতি করতে হলে একজন শিল্পীকে চোখ কান খোলা রাখতে হয়, সপ্তম বাড়াতে হয়। কিন্তু তার জন্যে নিজেকে এত নীচে নামানোর কোন প্রয়োজন হয় না। এসব দেখে শুনে মনে হয় গানের জগতে আমরা এ যুগে যেন এক অদ্ভুত ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগছি। ফল যা হওয়ার তা হয়েছে। প্রাপ্য সম্মানের বদলে আমাদের কপালে জুটেছে পিঠ চাপড়ানি।

—ফুলমাসি, ঝুমুর বলল, তুমি খুব বেগে গেছ মনে হচ্ছে। কিন্তু কি করব বল, আমরা যা দেখছি তাই বলছি।

—এটা রাগের কথা নয় রে, ক্ষমতা দুঃখের। তবে এর মধ্যে সান্ত্বনা এইটুকু যে বাংলার সঙ্গীত সমালোচকরা আজকাল মুখ খুলেছেন। অন্ততঃ আনন্দলোকের ঢেউ-এ তাঁরা ভেসে যাচ্ছেন না এইটুকুই আশার কথা।

তর্ক থামিয়ে পথের দিকে নজর দিলাম। ভাবি অদ্ভুত এই শহরটা। ওদিকে অনবরত বাস আসছে যাচ্ছে, কলকাতা বাঁকড়া, দুর্গাপুর কত জায়গায়। ব্যাঙ্ক আছে কোর্ট কাছারী আছে, আবার এদিকে কাঁচা পথের ধারে খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর, আঙিনায় সবজীর লেবু, আতা গাছ, পুকুরে শালুক ফুটেছে, হাঁস চরছে—কোনটার সঙ্গে কোনটা মেলে না। একে গ্রাম বলব না শহর, বোঝা শক্ত। এরই মধ্যে দিয়ে অনেক ঘুরে আমাদের বিকাস্য মন্থর গতিতে কাঁচকোঁচ শব্দ তুলে এসে দাঁড়াল একটি পুরোনো বাড়ীর সামনে। বাড়ীটা স্বর্গতঃ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাইরে একটা বড় শিক দেওয়া গেট মত, তার পরই ছোট বারান্দা। সামনে বড় ঘরখানা বেশ পরিষ্কার। তক্তপোষে টান টান করে বিছানা পাতা। তার ওপর যত্নে রাখা কটি তানপুরো। দেওয়ালে সঙ্গীত নায়কের ছবি, ঠাকুর দেবতার পট। কোণে একটি দুটি পুরোনো চেয়ার, ট্রাংক, কাঠের বাক্স-টাক্স গুছিয়ে রাখা। আমাদের শব্দে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন।

একটি মেয়ে আছে দেখলাম ছেলে-মানুষ।

এখনও নিত্য পূজা অর্চনার মত গৌরী গান গাইতে বসেন। ধ্রুপদ শিখছেন দীর্ঘ-দিন ধরে। এখনও এখান ওখান থেকে ডাক আসে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিচারক হওয়ার জন্যে।

বিকসায় উঠে ঝুমুর বলল, সত্যি কি একা টানি। ভাবলে ভয় করে। অথচ গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় বেঁচে থাকতে হয়তো এই বাড়ীই গমগম করত লোকজনে। আর এখন?

চুপ করে রইলাম। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ঝুমুরের চিন্তা কোন খাতে বইছে।

বিকসাওয়ালা বলল, সুরেনবাবুর মেয়ের বাড়ী এই সামনেই, যাবেন তো?

পাড়াটার নাম ওস্তাদ পাড়া। নাম থেকেই বোঝা যায় যে অতীতে এখানে একটা বিরাট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল নেই বিষ্ণুপুরে। আজ সে শিল্পীরা ইহজগতে নেই কিন্তু এলাকাটার নাম সেই স্মৃতিটুকু সযত্নে ধরে রেখেছে।

বিন্ধ্যবাসিনী দেবী একা থাকেন, তাই দরজা খোলার আগে ডেকে সাড়া নিলেন। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি শুনে ব্যস্ত হয়ে ভেতরে আসতে বললেন।

বাড়ীতে পা দিয়ে সবার আগে মনে হল যেন এক দেবালয়ে ঢুকেছি। ঝকঝকে উঠোনে গাঁদা বেল জবা, টগর কত ফুলের গাছ সযত্ন পরিচর্যায় বেড়ে উঠেছে। ধারান্দার ওঠার সিঁড়ির পাশে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি বেদী তাতে পাথরের ওপর জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখ লেখা। বারান্দায় তকতে পোষের ওপর একটি তানপুরো নামানো, মনে হয় কেউ গাইতে গাইতে হঠাৎ উঠে গেছেন।

ঘর ভেতরটিও তেমনি পরিচ্ছন্ন। মেঝেয় মাদুরের ওপর ঢাকা দেওয়া তানপুরো আর দুটি বাদ্যযন্ত্র। এপাশে ফুলচন্দন চর্চিত একজোড়া খড়ম। নিশ্চয় সুরেন্দ্র-নাথেরই, ঘরের দেওয়ালে ছবি, তাকে রই একটি পুরোনো রেডিও এমনি সব ঝিনিমি পত্র ঝকঝকে করে গুছিয়ে রাখা। কোন চাকচিক্য নেই, আড়ম্বর নেই অথচ সব পরিপাটি।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ উঠে পড়লেন বিন্ধ্যবাসিনী। হেসে বললেন, ভুলেই পড়ে গেল বোধ হয়, একবেলা খাই—একটু দেখে আসি। দৌড়ে চলে গেলেন উঠোন-পেরিয়ে রান্নাঘরে আবার চলে এলেন, আবার চলে গেলেন। এমনি টানা পোড়েন চলল অতিথি আর সংসারের মাঝে। চুপ করে বসে থাকার সময় নেই। ঘরোয়ার সান্ধ্য লানো ঠাকুর আছেন তাঁর সেবা, তারপর খেয়েই বেরোতে হবে, কলেজ আছে। রামশঙ্কর কলেজ অফ মিউজিক, সেখানে শেখাতে হয়। এর মধ্যে দুকলি গেয়েও শোনালেন হিন্দি ধ্রুপদ আর রামশঙ্করের লেখা বাংলা গান।

ওই নিয়েই বেঁচে আছেন। নইলে বাবা মারা যাবার পর সংসার তো শূন্য হয়ে গিয়েছিল। হাঁ, বিয়ে হয়েছিল নিতান্ত বালিকা বয়সে, তারপর এল বৈধব্য, বাপের বাড়ী এলেন তখন। একদিন মা হঠাৎ বললেন বাবাকে, হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী, বললেন পরে মেয়েকে গান শেখাও, এদিকে নিজের মেয়েটা যে—

সেই থেকে শুরু। প্রথমে শিখলেন যন্ত্র, সুরবাহার, সেতার এসরাজ আর

ব্যাণ্ডের মত একটা বাজনা, তারপর গান। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা। এখন ওই নিয়েই আছেন। প্রৌঢ় বয়সেও জীবনের রসটুকু শুকিয়ে যায়নি, গান এসেছে ওঁর জীবনে ঈশ্বরের করুণাধারার মত।

সুরেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে ইনি কলকাতায় গান গেয়েছেন। তারপর আর যাননি। আর ভালো লাগে না। দেখলে মনে হয় যৌবনে রীতিমত সুন্দরী ছিলেন বিন্দ্যবাসিনী, এখন শুধু মোটা থান আর নিরাভরণ চেহারা, দেহে বয়সের ভার নেমেছে, তবু একটা আভাস মেলে। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়ীতে কবিগুরুর সংস্পর্শে কি করে এলেন সে কাহিনী বললেন স্মৃতি থেকে।

দিনেন্দ্রনাথ স্বরলিপি করতেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরেন্দ্রনাথের তখন তরুণ বয়েস। তাঁকে দেখে বোধহয় রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল, তাই ওকে কাছে বসালেন তারপর শুধু গলায় গেয়ে শোনালেন—বাজে বাজে বন্য বাঁশি, বললেন স্বরলিপি করো তো দেখি। অর্গানটা। দেখিয়ে দিলেন আঙুল দিয়ে।

মাথা নাড়লেন সুরেন্দ্রনাথ, বললেন, থাক্।

—দরকার নেই?

—না।

মাথা নীচু করে কাগজ নিয়ে বসলেন। অনন্তলালের যোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি। তাই সাতটি সুরে ওপর ছিল অবাধ অধিকার, স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর আর জ্ঞানও তৈরী, কাজেই অসুবিধা হল না কিছু। ওই টুকু ছেলের ক্ষমতা দেখে উপস্থিত সকলে ভারি খুসী হলেন, প্রসন্ন হলেন কবিগুরু। সুরেন্দ্রনাথের ওপর তখন দায়িত্ব পড়ল অনেক।

পুরোনো কথা বলতে গিয়ে যেন সেই অতীতের দিন গুলোতে ফিরে গেলেন বিন্দ্যবাসিনী। কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা ছিল তখন প্রাণে। জমজমাট ছিল বিষ্ণুপুর। গান আর গান ওই নিয়ে কেটে যেত কে একটা মানুষের জীবন। অথচ আজ কি দশা হয়েছে সেই দেশের। হিংসা বিদ্বেষ দলাদলি প্রবল হয়ে মহৎ সম্পদের পথকে চিরকালের মত বন্ধ করে দিয়েছে। তা ছাড়া, বিন্দ্যবাসিনী বললেন আজকের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই বা সে নিষ্ঠা কোথায়? তাদের লেখাপড়া রয়েছে। তাছাড়া আরও আছে সিনেমা আড্ডা ফ্যাশন, চায়ের দোকান। একটা পাঠা দিলে একমাসে তৈরী হয় না, খাস্তা না দেখলে গান মনে পড়ে না। অথচ সেকালে কি না করেছি আমরা এই গানের জন্যে?

ফেরার পথে ভাবছিলাম বিন্দ্যবাসিনী একালের বিষ্ণুপুর দেখেছেন, কিন্তু কলকাতা দেখেন নি। সেখানে সিনেমা, নাটক, চায়ের দোকান, ডিসকথিক, সাহিত্য-চক্র আড্ডা, কি নেই? ভলে, বল কি না করছে ছেলেমেয়েরা? পাহাড়ের ঢালায় উঠছে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, রাইফেল শুটিং, গাড়ীর রেস, সবেতেই সমান উৎসাহ তাদের। আর এই [illegible] গানের [illegible] দিন দিন।

তবে কলকাতায় গান নেই একথা বললে ভুল হবে। আছে প্রচুর। বিবিধ ভারতীর কল্যাণে উপচে পড়া ভাণ্ডার সিনেমা সঙ্গীতের। পথেঘাটে দোকানে বাজারে অষ্টপ্রহর চলছে ওই গান। এক মুহূর্ত বন্ধ থাকলেই বরং ফাঁকা লাগবে মানুষের। বিষ্ণুপুরে এসে প্রথমটা তাই যেন একটা কি নেই ভাব মনে হচ্ছিল। পরে বুঝলাম সিনেমা সঙ্গীত নেই। না, তিনটে দিনে অন্ততঃ পথে ঘাটে তো ঘুরছি গুচ্ছের, কিন্তু কানে আসেনি বড় একটা। জানিনা এটা আমাদের ভাগ্যেই হঠাৎ ঘটল কিনা।

কিন্তু বিষ্ণুপুর তো পশ্চিমবঙ্গেরই শহর তাই এখানেও লোড শেডিং হয়। তবে পাঁচ দশ মিনিট, বেশী হলে ঘন্টা খানেক একটানা। তখন টুরিস্ট লজের বেয়ারারা ওই লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে যায় ঘরে ঘরে।

নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ খেয়াল হল গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী থেকে বেরোবার পর থেকে যেন ঝুমুর গম্ভীর হয়ে গেছে, কেমন। কিসের কথাও তো বলেনি একবার। আশ্চর্য।

খাওয়ার পর নীরবতা ভাঙ্গল। হঠাৎ বোধহয় ওর খেয়াল হয়েছে যে এই চুপচাপ থাকাটা যেন ওকে মানাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করল, বিকেলে আবার বেরোবে নাকি ফুলমাসি।

—গোস্বামী পাড়াটা দেখা হল না যে—

—কে আছেন সেখানে?

—আছেন নয়, ছিলেন, রাধিকা গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী।

—শূন্য এ বুকে পাখি মোর?—

হেসে ফেললাম। ওইটুকুই সব পরিচয় নয় তাঁর—

যাবার দিনচ্ছিল যে লোকটি, সেই এল বিকেলের চায়ের অর্ডার নিয়ে যাবতে। কথার মাঝে বললাম, সদি যান মা, তবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন, বেলা থাকতে ফিরে আসবেন। রাস্তায় বাতিটাতি তেমন নেই, দিনকালও ভালো নয়।

আমি বললাম, তাহলে তো এক্ষুনি বেরোতে হয়।

ও বলল, এত তাড়া নেই, এখন তো মোটে পৌনে দুটো, ঘন্টাখানেক জিরিয়ে নিয়ে বেরোন, পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসবেন। ফিরে এসেই না হয় চা'টা খাবেন।

ঝুমুর বলল, সেই ভালো ফুলমাসি, চা এসেই খাওয়া যাবে।

তিনটে নাগাদ ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কাল চলে যাব দুপুরের বাসে। এর মধ্যে আর যা যা দেখার আছে দেখে নিতে হবে। বেরোনোর মুখে দেখলাম বিদেশী ছেলেমেয়েগুলি ফিরে আসছে। গোটা আস্টেক বিকসার একটা কনভয় মত করে বেড়াতে, বেরিয়েছিল ওরা। কোনটাতে দুজন কোনটাতে একজন এইভাবে বসেছে। ওরই একটি খালি পেয়ে নিলাম আমরা। বিকসাওয়ালা বলল, গোঁসাইপাড়ায় কার বাড়ি যাবেন আপনারা?

—জ্ঞান গোঁসাই।

বিকসাওয়ালা বলল, তিনি তো অনেকদিন গত হয়েছেন, তাঁর ছাইপো আছেন দুগী গোঁসাই। তা তিনি তো— এখন তো স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে নিজের ভুল নিজেই শুধরে নিলও।

ঝুমুরকে বললাম, রাধিকা গোস্বামীর নাম জানিস তো?

—জানি ঝুমুর বলল, তবে বেশী কিছু জানি না তাঁর সম্বন্ধে। শুনেছি গিরিশংকর চক্রবর্তী তাঁর কাছে শিখেছিলেন।

—তবে তো অনেক জানিস দেখছি। আমি হাসলাম।

ঝুমুর কিন্তু রাগ করল। বলল, ঠাট্টা করছ ফুলমাসি, কিন্তু আমরা বড় হওয়ার পর এঁদের কোন স্মৃতিসভা বা এঁদের নামে কোন সম্মেলন কিছু দেখেছ যে জানব? তোমরাই বা কতটুকু মনে রেখেছ এঁদের শুনি?

স্বীকার করলাম। আমরাও এঁর গান শুনিনি তবে নামটুকু জানতাম। তারপর যার কৌতূহল আছে সে বইটই পড়ে জেনেছে, তাছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল

উত্তরসূরি

২৫ শ বর্ষ ১ম সংখ্যা
সব স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

গুস্তভ ফ্লবেয়ারের উপর একটি দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ লেখা এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। প্রতিষ্ঠিত কবিদের কিছু উজ্জ্বল রচনা, 'কবিতা কবিতা' পর্যায়ে গুচ্ছ বাংলার তরুণ কবিদের কবিতা, বিশিষ্ট সঙ্গীতশাস্ত্রী অমিয়নাথ সান্যালের একটি অসাধারণ চিঠি ।। মূল্য ২.০০

অরুণ ভট্টাচার্যের অসাধারণ দুটি কাব্যগ্রন্থ

ঈশ্বর প্রতিমা ঃ সময় অসময়ের কবিতা

উত্তরসূরি ।। ।। ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০

না। বললাম, যাকগে—বাসে আসার সময় শ্রীনিবাস আচার্যের কথা বলেছিলাম মনে আছে?

—হ্যাঁ, সেই যাঁর পুঁথি চুরি গেছিল।

—সেই শ্রীনিবাস গোস্বামীর ছেলে গতিগোবিন্দ। গতিগোবিন্দর ছেলে হলেন রাধামোহন ঠাকুর, নামকরা পণ্ডিত। এঁর বংশে জগৎচাঁদ ছিলেন বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক। মৃদঙ্গ অর্থে কিন্তু এখানে খোল নয়, পাখোয়াজ। এই জগৎচাঁদের ছেলে হলেন রাধিকা গোস্বামী। ইনি প্রথমে অনন্তলালের কাছে ধ্রুপদ শেখেন, তার পর কলকাতায় এসে শিবপ্রসাদ আর গুরুপ্রসাদ মিশ্রর কাছে খেয়াল শেখেন।

—কেন? ঝুমুর প্রশ্ন করল, অনন্তলাল কি খেয়াল জানতেন না। খেয়াল কি তখনও আসেনি বিষ্ণুপুরে?

বললাম, তা এসেছিল, আর অনন্তলাল কেন, রামশংকরও খেয়াল জানতেন, তবে তার ধাঁচটা ছিল অন্য রকমের। সোজা কথায় বলতে গেলে, ঠিক হিন্দুস্থানী ঢং-এর খেয়াল যা উত্তর ভারতে তখন চলছিল তার প্রচলন বিষ্ণুপুরের চেয়ে কলকাতায় স্বভাবতঃই বেশী ছিল তখন। বিষ্ণুপুর যা সংগ্রহ করেছিল তার চেয়ে নতুনতর জিনিস তখন কলকাতায় এসে পৌঁছে গেছে। কলকাতায় লক্ষ্ণৌ এর গদীচ্যুত ওয়াজেদ আলি শাহকে ঘিরে উত্তর থেকে আসা গায়ক বাদকদের—এক বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। কাজেই খাঁটি হিন্দুস্থানী ঢং-এর খেয়াল ঠুমরী শিখতে চলে কলকাতায় যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, আর রাধিকাপ্রসাদও তাই গিয়েছিলেন।

কলকাতায় অনেকদিন ছিলেন তিনি। বিশ শতকের প্রথমদিকেও কলকাতার মানুষ গান শুনেছে তার, শিখে তৈরী হয়েছেও অনেক শিষ্য। কাশিমবাজারের মহারাজার কাছেও তিনি ছিলেন কিছুদিন, কিন্তু এযুগের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বড় সূত্র হল আদি ব্রাহ্ম সমাজ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে সেখানে সঙ্গীতাচার্যের পদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা ধ্রুপদাঙ্গের গানগুলির সুর দেওয়ার সময় এঁর কাছ থেকে অনেক বিষ্ণুপুরী ঘরাণার গানের ছায়া নিয়েছিলেন, যেমন নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। এমনিভাবে সেকালের বাংলার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গে রাধিকাপ্রসাদ খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গেছিলেন। গানের জগতে তিনি পরিচিত ছিলেন গোঁসাইজী বলে, প্রাচীন যাঁরা এখনও বর্তমান আছেন তাঁরাও ওঁর উল্লেখ করেন ওই নামে।

—এতক্ষণে বুঝলাম। আমার গুরুজীও প্রায়ই বলেন গোঁসাইজী এটা গাইতেন, গোঁসাইজী এই বলতেন, তখন বুঝিনি জ্ঞান গোঁসাই এঁর কে?

ছেলে? ঝুমুর প্রশ্ন করল।

বললাম ছেলে নয়, ভাই-এর ছেলে। তবে উনি ছেলের অধিক করে শিখিয়েছিলেন।

ঝুমুর বলল, এঁর গান আমরা রেকর্ডে শুনেছি, আমার এক বন্ধুর কাকার পুরনো রেকর্ডের স্টক আছে।

আমি বললাম এমন একটা সময় ছিল যখন জ্ঞান গোঁসাই বললে আর পরিচয় দেওয়ার দরকার হত না। ছোটবেলায় অনেক গল্প শুনেছি ওঁর। ওঁর আসরে আসাটা নাকি ছিল আবির্ভাবের মত। সুদর্শন চেহারা তার ওপর সিল্কের পাঞ্জাবি কাঁচি ধুতি পরে আসর আলো করে বসতেন। রসিকতা করে বলতেন, পহেলে দর্শনধারী, তব গুণ বিচারি—আগে দেখুক তারপর শুনবে।

তা দেখতও আর শুনতও লোকে। জমিয়ে বসে গলা খুললে আসর জমে যেত। এমনি গলাকেই বোধহয় গোল্ডেন ভয়েস বলে। তারপর ছিল দাপটি মেজাজ, তানের কলক। হিন্দুস্থানী ছাড়াও খেয়ালের আঙ্গিকে যেসব বাংলা গান উনি গেয়েছেন তা এক সম্পদ হয়ে রয়েছে আজও।

কথা বলতে বলতে গোস্বামীপাড়ায় পৌঁছে গেলাম। একটু খোলা মাঠ মত জায়গা, তার সামনে বাড়ি। বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা যে খুব সচ্ছল নয় তা অনুমান করা যায় দেখে। দরজা খুলে দিলেন এক মহিলা। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর বাড়ি কিনা জিজ্ঞেস করায় বললেন, উনি তো নেই।

আমাদের হতাশ ভাব দেখে বিকেসওয়ালা বলল দুর্গা গোঁসাই-এর বাড়ি তো পাশেই উনি তো গান বাজনা করেন। ওখানে চলুন। তারপর নিজেই এগিয়ে চললমত জায়গার পাশ দিয়ে নিয়ে চলল আমাদের।

দুর্গা গোস্বামীও জ্ঞান গোস্বামীর ভাইপো, রাধিকা গোস্বামীর নাতি। ষাটটা না বয়েস তাঁর তার চেয়ে বেশী দেখায় মনে হল। সংসারের চাপে যেন ব্রিষ্ট। বাড়ির মেটে উঠোনে এলোমেলো গাছপালা, গরু বাঁধা। দুর্গা গোস্বামীর ব্যবহার ভালো, বিনয়ী মানুষ বলে মনে হল। বংশের গৌরবের কথা জানেন, তবে সেকথা মনে রেখে আর লাভ কি।

বললেন, যারা আছে তার মধ্যে আমি গান গাই, আর গায় তারু—জ্ঞাতি তারাপ্রসাদ।

রাধিকাপ্রসাদ আর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের ফটো খুলে আনলেন দেয়াল থেকে, ঝেড়ে-মুছে সামনে রাখলেন। বললেন, ঠাকুরদা সরল মানুষ ছিলেন বিষয় আশয় কিছু করে যেতে পারেন নি। রেকর্ডে গান দিয়েছিলেন, সোহাগে মৃণাল ভুজে, গানখানার খুব নাম হয়েছিল শুনেছি। না, আমার কাছে নেই এক কাঁপও।

একখানা মোটা বাঁধানো খাতা এনে দেখালেন, রাধিকাপ্রসাদের নিজের হাতে লেখা গানের স্বরলিপি আছে অর্ধেকটা, আর বাকী অর্ধেক কাঁচা হাতের অংক কষা। লজ্জিত হয়ে বললেন, ছেলেটা অংক কষেছে।

কি বলব ভেবে পেলাম না।

দুর্গা গোস্বামী বললেন রাধিকা প্রসাদের গলার আওয়াজ নাকি অপূর্ব ছিল। সে তুলনায় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গলা নিরেস, একথা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ নিজেই বলতেন।

কথা শেষ করে আবার সেই বন-এলাম গাছপালার পাশ দিয়ে বোধহয় এলাম। এবার লক্ষ্য পড়ল দেওয়ালের গায়ে ফলকে লেখা, রাধিকা গোস্বামী লেন।

স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা ওইটুকুই। আর কি চাই?

বিকসাঃ উঠে ঝুমুর বলল, ফুলমাসি রাজাদের কথা বললে গানের সম্রাটের কথা বললে অথচ যদু ভট্টের নাম তো করলে না।

স্বীকার করলাম। বললাম ভুলটা বেন হয়েছে জানিস? যদু ভট্ট অসম্ভব প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন, মানুষও বিষ্ণুপুরের। কিন্তু এ দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। সেই জন্যই বোধহয় ভুলটা হয়েছে। শোন তাহলে বলি।

বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি অঞ্চলে মধুসূদন ভট্টাচার্য বলে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি সুরবাহার, সেতার ভালো বাজাতেন আর বোধহয় গানও গাইতেন। এঁর ছেলে হলেন যদু—যদুনাথ ভট্টাচার্য। যদু প্রথমে বাবার কাছে শিখলেন সেতার, সুর বাহার, পাখোয়াজ। এরপর গান। অসম্ভব ভালো গলা ছিল যদুর।

বাধা দিয়ে ঝুমুর বলল আচ্ছা ফুলমাসি, আমরা তো জানি হিন্দু বাজারে নাকি গলা খারাপ হয়ে যায়, অথচ বিষ্ণুপুরে তো দেখছি গায়ক হয়েও যদু ভট্ট যন্ত্র বাজাতেন, বন্দ্যোপাধ্যায়রাও বাজাতেন বললে।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

কমিশন ৫০%
করুণাসিন্ধু পালিত
প্রেম অমৃত
যৌবন-যজ্ঞ
ভাব, ভাষা, প্রেমের
মাধুর্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি।
মাথ বন্ধুদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

কি সব ভাবছে অনন্ত। নিজের ওপরে রাগ ধরে গেল তার। এই সুন্দর ভোরে, সবে যখন অন্ধকারের অতল থেকে জেগে উঠছে জগৎ, তখন কেন নোংরা স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে। এই চিন্তা তো অফিসে বসেও হয়েছে একদিন। তখন অস্বাভাবিক মনে হয়নি লিলির আচরণ। সর্বত্র যেখানে নির্বিঘ্ন চিন্তা ভাবনা, যেখানে স্বাভাবিকতার স্পর্শও নেই কোথাও, সেখানে পার্ভার্সান মনকে হ্রাস করবে, এ আর বিচিত্র কি! এইবিকৃতিই জীবনের অঙ্গ। এমন ধারণা নিয়েই ছিল এতকাল। আজ মনে হচ্ছে, শহুরে জীবনের কৃত্রিমতাকে এখন করে পরমার্থের মত আঁকড়ে ধরতে যদি না চাইত, যদি লিলিকে নিয়ে সিনেমায়, বারে, ক্লাবে, বেসকোর্সে না যেত, বন্ধুবান্ধব অথবা বস্-এদের কাছে সুন্দরী স্ত্রীকে জাহির করে আত্মপ্রসাদ পাবার চেষ্টা না করত কণাদ, তবে তো এই জটিলতা আসত না তাদের জীবনে। একদা লিলির সঙ্গে বিবাহিত জীবনও তো সুন্দর এবং পবিত্র ছিল। একটা কাপড়ের স্যাণ্ডাল কণাদ কিনে দিয়েছিল লিলিকে। লাল চওড়া ফিতে দেওয়া স্যাণ্ডাল। মাঝে মাঝে ধপধপে সাদা খোলের তাঁতের সাড়ি পরতে লিলি। লাল পাড় সাড়ি। কপালে সিঁদুরের টিপ দিত। চওড়া করে সিঁদুর দিত সিঁথেয়। খুব ভাল লাগত কণাদের। অফিস থেকে এলে ওই রকম পরিচ্ছন্ন সাজগোজ করে এটি ঘাস ফট্ ফট্ করতে করতে এসে দরজা খুলে দিত লিলি। হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিত। সেই সুন্দর দিনের স্মৃতি কেন মুছে গেল মন থেকে? এখনকার ঈষৎ পৃথুলা, জাপানী টেবিলিন পরিহিতা, স্লিভলেস্ ব্লাউজে দেহের স্বল্পতম অঙ্গ ঢেকে রাখা লিলি যখন আধুনিকতা দেখাবার জন্যে সকলের সামনে সিগারেট ধরে ঠোঁটে, তখন পাঁচজন কলিগের চোখে ঈর্ষার জ্বালা হয়তো ফুটে ওঠে। কিন্তু সত্যি কি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করে কণাদ?

ব্রুটি কোথায়? কাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে সদ্ভব। এইসব পুণ্য তীর্থে একদা মুনি ঋষিরা বিচরণ করতেন। তপস্যা করতেন এমনি সুন্দর পবিত্র মুহূর্তে। আরও নিষ্পাপ ছিল এখানকার জগৎ, সেই পৌরাণিক যুগে। বাস-ট্রাক, ইলেকট্রিক নোংরা হাত বাড়ায়নি এখানে, ছাড়ি করেনি লোভী ব্যবসায়ী। উন্নাসিক ভ্রমণবিলাসীর শ্রদ্ধাহীন দৃষ্টি পড়েনি এই এখানকার জল-মাটি-পাহাড়ে। সেই পবিত্র উষায় সমাধিমগ্ন কোন ঋষিকে যদি দেখতে পাওয়া যেত, প্রশ্ন করে জেনে নিত, জীবনাযবে এই অসঙ্গতিকে কেমন করে সারিয়ে তোলা যায়।

পিন্তার নদের তীরে দাঁড়িয়েছিল অনন্ত। সামনে, সম্ভবতঃ মাইল দুই দূরে কালো মেঘের মত আড়াল করে আছে রোমেশ পাহাড়। আকাশ যত ফর্সা হচ্ছে, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠছে পাহাড়ের গায়ের গভীর অরণ্য। কিছুটা দূরে পিন্তার নদ মিলেছে অলকানন্দার সঙ্গে। সেখানে নদী অনেক চওড়া। এখানে পাথরের টুকরোর সরাকীর্ণ নদীর খাত অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। তবু তার বিক্রম কম নয়। হিমালয়ের বুক থেকে বেয়ে আসা পাহাড়ী নদী প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

পাকুড় গাছটার নিচে যে দোকানটা থেকে গতকাল রাতে খাবার নিয়েছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিল কানু, ভোরবেলা চা খাওয়াতে হবে। সেই চুক্তি অনুযায়ী দুটো বড় বড় ফ্লাক্স নিয়ে এসেছিল সঙ্গে। কিন্তু এখানকার ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যে কি অসাধ্যসাধন, হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেল সে। তবু বন্ধুরা তাকে কেন বাঙাল বলে, অনন্ত তা অনুধাবন করতে পারল তার কাণ্ড দেখে। সত্যি সত্যি সেই প্রায় মরা মানুষ দুটিকে জাগিয়ে কাঠের আগুনে চা বসিয়ে আধ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে বড় দু ফ্লাক্স চা নিয়ে এসে ডাক দিল সে অনন্তকে। চলুন রায়দা, হয়ে গেছে।

হেসে অনন্ত একটা ফ্লাক্স ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল।

ঘরে গিয়ে দেখা গেল, সকলেই উঠে পড়েছে। জিনিষপত্র বেঁধে ছেঁদে কমপ্লিট। কানু চা নিয়ে আসতেই হৈ হৈ করে উঠল সবাই। গোপু ম্যানজারকে ধন্যবাদ দিচ্ছিল। আশু বলল, দাঁড়াও গোপুদা। আগে ব্যাটা বাঙাল কৈফিয়ৎ দিক, এত দেরি হল কেন চা নিয়ে আসতে।

কানু বলল, তোর শ্বশুরের দোকান থেকে চা নিয়ে এলাম কিনা। জামাইয়ের খবর নিচ্ছিল, তাই দেরি হয়ে গেল।

দাঁপু বলল, ভাল্লুকের শ্বশুর ভল্লুকবান ন্যাকি রে?

পাশের ঘরেও কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। কানু সকলকে চা পরিবেশন করে নিজে চায়ের গ্লাস মুখে তুলল। বলল, তোর রোশনকুমারীকে চা খাওয়াবি নাকি?

দাঁপুর ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়।

গতকাল ভদ্রলোকের পরিচয় জানা হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের নাম সুরজিৎ সিং। থাকেন বেরিলিতে। মিলিটারি এ্যাকাউন্টসএ চাকরি করেন। বদলীর চাকরি। মেয়েটির নাম রোশনকুমারী। ইউ-পি বোর্ডের স্কুল ফাইনাল পাশ করে বসে আছে। বিয়ে থা দেবার চেষ্টা চলছে। সম্ভবতঃ কিছু একটা ঠিক হয়েছে, তাই সর্ত পূরণের জন্য হেমকুণ্ডএ প্রার্থনা জানাতে যাচ্ছেন। ছেলেটি পড়ে ক্লাশ এইট-এ।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুললেন ভদ্রলোক। লুঙ্গির ওপরে সার্ট পরা। মাথায় পাগড়ি ঈষৎ অবিন্যস্ত। কানু ইংরেজিতে বলল, আমাদের কাছে চা আছে বেশি। খাবেন না কি?

শুনে ভদ্রলোক ঘরের ভেতরে গেলেন। আশু বলল, বৌয়ের কথা ছাড়া একপা চলে না। বাঙালীকে হার মানিয়ে দিলে।

পানু বলল, দাঁপু, এই রোশন-কুমারীর মাকে ধর। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রাগ করে দাঁপু বলল, বাঁদর সব। একটা বিদেশী মেয়ে, তার বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে রসিকতা লজ্জা করে না বাঁদরামো করতে?

পানু বলল, আমাদের তো লজ্জা নেই। তোর যে খুব আছে, তাতে কাল দেখলাম।

গতকাল দাঁপু রোশনকুমারীর সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলেছিল পথে দাঁড়িয়ে। কি কথা, তা কিন্তু কিছুতেই কে প্রকাশ করেনি। নিতান্ত সাদামাটা কথা হয়তো। তবে তাই নিয়ে রাতে শোবার সময়ে অনেক হাসা-হাসি করেছিল সকলে।

সর্দারজী এসে বললেন, চা কি দু-কাপ হবে?

আশু বকম্যাকের স্ট্র্যাপ বাঁধছিল। ইঙ্গিতপূর্ণ গলা খাঁকারি দিল দুবার।

কানু বলল, দু-কাপ কেন, তিন চার কাপ হতে পারে। আমরা বড় ফ্লাক্স ফুল চা এনেছি। প্রায় ষোল কাপ চা হবে। একটু বেশি বেশি করে খেয়েছি আমরা, তবু যা

আছে, আপনার ফ্যামিলির পক্ষে সাফিসিয়েন্ট। ফ্লাক্সটা এগিয়ে দিল সে।

আবার সেই বিখ্যাত অলকানন্দা গর্জ ধরে বাস চলল। সকালের আলোয় সেই গর্জের চেহারা তত ভীষণ মনে হচ্ছে না। গতকাল বিকেলের বোদে যাকে সোনাব তুল্য মনে হচ্ছিল, এখন দেখা যাচ্ছিল তা নিতান্তই পাথরের দেওয়াল।

দীপু খুব বক বক করছিল সুরজিৎ সিংয়েব সঙ্গে। নিজেদের মাউন্টেনিয়ারিং একসপিডিশনের কৃতিত্বের কথা, হিমালয়ের নানা অঞ্চলের সৌন্দর্যের কথা, বন্ধুদের কথা, এমনকি স্বল্প পরিচিত অনন্তর কথাও বলছিল সে বং চড়িয়ে। তাব কথাবার্তা শুনে বন্ধুরা নিজেদেব মধ্যে হাসি-তামাসা করছিল নিচু গলায়।

অনন্ত আশুকে বলল, আপনাদেব লীডাব সায়েব উপন্যাস লেখেন নাকি?

অনন্ত ঠিক ধবতে না পেবে বলছিল অল্প স্বল্প লেখে, তবে সেসব ভ্রমণ কাহিনী। মুগান্তবে ওর লেখা—

কানু হো হো করে হেসে উঠল। গোপুও যোগ দিল সে হাসিতে। পানু অন্যদিকে তাকিয়েছিল বলে শোনেনি কথাটা। সে হাসিব বিষয়বস্তু থেকে বঞ্চিত হয়ে জিজ্ঞাসা কবছিল কানুকে, কি হয়েছে বে?

এতক্ষণে আশু ব্যাপাবটা অনুধাবন করে হাসতে হাসতে দীপুকে বলল, এই দীপু, বাযদা জিজ্ঞাসা কবছেন, তুই উপন্যাস লিখিস কিনা। জবাব দে।

দীপুব মনোযোগ সুরজিৎ সিং এবং পবোক্ষভাবে রোশনকুমারীব দিকে নিবদ্ধ থাকলেও হাসিব কাবণ অনুমান কবতে ভুল হয়নি। অনুযোগেব সুবে অনন্তকে বলল শেষকালে আপনিও ওই বাঁদবগুলোব সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন?

আশু বলল, এখন আমবা তো বাঁদব ছবই। উপন্যাসেব নায়িকার কাছে তুমিই একমাত্র মানুষ।

পানু তোতলাতে তোতলাতে বলল, ম-ন-ন-নবসুন্দর।

আবাব হো হো কবে হেসে উঠল সবাই।

রোশনকুমারী বুঝেছিল, তাকে নিয়েই হাসাহাসি কবছে ছেলেগুলি। সে গালেব ওড়নাটা মাথায় একটু তুলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে ছিল বাইবেব দিকে। তার ভাই কি-একটা জিজ্ঞাসা করছিল দিদিকে। চাপা ধমক দিল তাকে রোশন।

একটু পরেই দেখা গেল জেলা সহর চামোলী। বিস্তীর্ণ উপত্যকা। মাঝে অল্প দু-একটি নিচু পাহাড় থাকায় বাড়ি ঘরের অবস্থান ছবির মত। ভাল ভাল দোকানপসার অনেকগুলি পথেব ধারে ধারে। পুলিশ চৌকীটি বুগেনভিলিয়ার লতা ঘেরা। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো একটু উঁচুতে। তাব বাগানে আলো করা ফুলের সমারোহ। ছোটখাটো কাঠের বাড়িগুলির সামনে যে সামান্যটুকু জমি, সেখানেও ফুল গাছ। কত রকমের সিজন্ ফ্লাওয়ার। কত গাঁদা, কিসেন্থিমাম, ডালিয়া। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। বাস যেখানে দাঁড়ালো, তার কাছেই একটা চায়ের দোকানের পাশে বুনো গোলাপএর ঝাড়। জানা গেল বাস এখানে দাঁড়াবে মিনিট দশেক। তাই সকলেই নেমে গিয়েছিল বাস থেকে। কানু একটা খাবারের দোকানে গিয়ে কি অর্ডার দেবে তাই নিয়ে দোনামোনা করছিল। পানু যা কিছু সাজেস্‌সান দিচ্ছে, কিছুই তার মনোমত হচ্ছে না। গোপু আর আশু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে নিবিষ্ট মনে। সুরজিৎ সিং কিছু লাড্ডু আর একটা লোটা ভর্তি চা স্ত্রীকে দিয়ে এসে গল্প করছিল অনন্তর সঙ্গে। বেরিলীর জলহাওয়া, জিনিসপত্রের প্রতুলতা ও দাম, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর সুবিধা অসুবিধা এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিল। রোশন আর তার ভাই খানিকটা উঁচুতে উঠে একটা তারের জাল ঘেরা বাগানের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। ধীরে ধীরে নেমে এল সে ওপর থেকে। তার হাতে হলদে রংয়ের গোলাপ ফুলের একটা বড় কুঁড়ি। একটু আগে অনন্ত দেখেছে, চায়ের দোকানের বাচ্ছাটাকে দিয়ে পাতাশুদ্ধ ওই হলদে বুনো গোলাপের কুঁড়িটি তুলিয়ে নিয়েছিল দীপু। ফুলটা কখন কিভাবে হস্তান্তরিত হল, বলা শক্ত।

ঝুড়ি ভর্তি পেঁয়াজের বড়া আর ঠোঙায় করে লাড্ডু। সঙ্গে এক ফ্লাস্ক চা নিয়ে গাড়িতে এসে উঠল কানু। ডাক দিল সকলকে। এই চলে এস সবাই, পেঁয়াজী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আশু বাসে উঠতে উঠতে বলল, শালা ম্যানেজার পেঁয়াজী মারছে।

কানু বলল, সঙ্গে দিল্লীকা লাড্ডু। যো খায়গা ও পস্তায় গা।

দীপু অনেকক্ষণ ধাবে-কাছে ছিল না। সে এসে বলল, কি বে কি খাওয়াচ্ছিস?

কানু বলল, কি আর খাওয়াবো বল। সেই একই লাড্ডু। এখানেও যা, ওখানেও তাই।

দীপু ভ্রু কুঁচকে বলল, মানে?

পেঁয়াজী চিবুচ্ছিল সবাই খুব বেলিশ করে। আশু বলল, মানে জানতে হলে ডিকসেনারি দেখগে যা।

দীপুব ভাগ আলাদা করা ছিল। তাকে দিয়ে কানু জিজ্ঞাসা করল, তুই গিয়েছিলি কোথায়?

মুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে দীপু বলল, একটা টেলিফোন করা যায় কিনা খোঁজ করছিলাম। এস-ডি-ও যোশীমঠের বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা জোগাড় করা গেল না। বেলা নটার আগে কেউ আসে না পুলিশ কোতোয়ালীতে।

পানুটা অতিবিকৃত ফাজিল। কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বলল, গোলাপকুঁড়ি যেটা ছেলেটাকে দিয়ে তোলালি, সেটা দেখছিলাম আর একজনের হাতে। ব্যাপারটা কি রে দীপু?

কানু চোখ, ভ্রু, মাথা ঝাঁকিয়ে এঁহে, এঁহে কবল বাব দুই।

আশু বলল, খুড়ো, তুমি সব ব্যাপারে বড় বেশি নাক গলাচ্ছো। গুরুজনদের সব দেখতে নেই, এটা শেখোনি?

দীপু পেঁয়াজী চিবুতে চিবুতে বলল, ছোট ছেলে, ফুলটা চাইস—

গোপু বলল, সাপ্রেসান অব ফ্যাকটস্। পেনাল কোডের ধাবায় পড়ে।

কানু বলল, ছেলে না ছেলের দিদি? চাইল না যেচে দেওয়া হল?

দীপু বলল, শালারা সব ঈর্ষায় ছটফট্ করছে। দে চা দে।

কানু বলল, কার জন্যে? এখন কিন্তু এক কাপ করে চা এনেছি দু জনের জন্যে। অপরকে যদি খাওয়াতে চাও, নিজেরটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে।

চা খেতে খেতেই গাড়ি ছাড়ল। চমৎকার আবহাওয়ায়। ঝলমল করছে রোদ। আকাশের দু-এক জায়গায় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। তাদের পাড়গুলো সূর্যের আলোয় জ্বলছে। থাক থাক হয়ে উঠে গেছে ধানের ক্ষেত যেন সবুজ প্রদীপ দিয়ে সাজিয়েছে পাহাড়গুলি। রামদানার ক্ষেতে সবুজের মধ্যে দু-একটা লালডগা। মোড় নিয়ে আবার ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকল বাস। ঝম ঝম করছে বাসের গর্জন, বিরাট বিবাট গাছের গুঁড়িতে প্রতিহত হয়ে। কিভাবে এস-ডি-ওকে ধরা হবে, কেমনভাবে পোর্টার সংগ্রহ হবে, যোশীমঠে কোথায় ওঠা হবে, তাই নিয়ে সদস্যরা আলোচনা করছিল। আবাব অলকানন্দার গতিপথে ফিবে এসেছে বাস। বিস্তীর্ণ গিরিখাত। চওড়া বালিব পাড়ের ভেতব দিয়ে ছুটে চলেছে সগর্জিত অলকানন্দা। অনেকটা নিচে চলে এসেছিল পথ। এবার উঠতে থাকল গোঁ গোঁ করে। খানিক পরেই পৌঁছুল গিয়ালকোঠী। ছোট্ট জনপদ।

এখানে বাস দাঁড়াল না বেশিক্ষণ। সম্ভবত আগের দিন দেরি হয়ে গেছে বলেই একটানা ছুটে যোশীমঠ পৌঁছুতে চাইছিল। কি বিশ্রী চড়াইয়ের পথ। ভাবছিল অনন্ত। ঘুরে ঘুরে বাস উঠছে তো উঠছেই। ইঞ্জিন তার যথাশক্তি প্রয়োগ করে উঠে চলেছে অনেক উঁচুতে। পথের পাশে ভাঙাচোরা পাথরের গা; কুশ্রী রুক্ষ। পি-ডবলু-ডির লোকজন রাস্তা মেরামত করে চলেছে নিরলসভাবে। অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে বাস, বুঝতে পারা যাচ্ছিল শীত শীত ভাব লাগায়। কানে তালা ধরে গেল একবার, কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না। চলতে

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দুষ্ট ক্ষত, রক্তদোষ, ব্যাতরক্ত, ফুলো, শ্বেতদাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯; শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

পারে না বাস। অবশেষে একটা মোড় ঘুরে খোলা আকাশের বুক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগে আবার মোড় নিয়ে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, সামনেই অনেক ঘরবাড়ি, মিলিটারী ব্যারাক, লোকজন, সহরের আভাস। গোপু বলে উঠল, যোশীমঠ। আমাদের যাত্রা আপাতত শেষ হল। তাহলে রায়দা? সত্যি সত্যি এলেন হিমালয়ে?

যোশীমঠ নাম শুনেই যে প্রাচীন তীর্থ-স্থানের কথা হয়, বাস থেকে নেমে সে ভাবটা আর থাকে না। গোপু বলছিল, শংকরাচার্য আজ থেকে প্রায় বারোশো বছর আগে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন জ্যোতির্মঠ। আপনি পড়েছেন নিশ্চয়ই, বৌদ্ধধর্মের অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্যে নর্থ ইণ্ডিয়ার কোন পণ্ডিত এগিয়ে আসেন নি। এসে-ছিলেন সেই কেরল থেকে শাম্ভুদিবিপাদ বংশের শংকরাচার্য। বদরীনাথের মন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ওই যে দেখছেন, ওই উঁচুতে, ওই যে গাছপালা ঘেরা একটা মন্দির মত, ওইটেই জ্যোতির্মঠ।

অনন্ত দেখতে চেষ্টা করল। সহরের দক্ষিণে ক্রমশ উঠে গেছে পাহাড়। আধখানা আকাশ ঢেকে দিয়েছে। তারই গায়ে অনেকটা উঁচুতে মন্দির। তার মাথার নিশান উড়ছে।' বলল, অনেকটা উঁচুতে না?'

হ্যাঁ, তা হবে বইকি! প্রায় তিনশ ফুট উঁচুতে হবে।

দীপু বলল, গোপুদা, কি করছ? ধর, মালপত্রগুলো নামাতে সাহায্য কর।

বাকি চারজনের দুজন উঠেছে বাসের ছাদে, দুজন নিচে। ট্রাংক দুটো দুজনে নামাচ্ছে ওপর থেকে। নিচে দীপু আর আশুকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল দুজনে।

জিনিসপত্র নামিয়ে গুনে গেঁথে হাত-পা ঝেড়ে সিগারেট ধরালো দীপু। কানু আর শানুকে ধর্মশালায় জায়গা ঠিক করে আসতে পাঠিয়ে দিল। বলল, কিছু মনে কোরো না গোপুদা, সময় হাতে খুব কম। আজ আমাদের এস-ডি-ও অফিস থেকে পারমিট সংগ্রহ করে, পোর্টার কনট্রাকট্ করে বাকি কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে বিকেলে। তারপর যদি সময় পাওয়া যায়, তোমার ইতি-হাস, ভূগোল সব গল্পই করা যাবে।

সরি লীডার, বলে একপাশে সরে গেল গোপু।

অনন্ত চারদিক দেখছিল উৎসুক হয়ে। পাহাড়ের গায়ে বেশ খানিকটা মালভূমি মত জায়গা, সেইখানে গড়ে উঠেছে সহর। সেখান থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পথ নেমে গেছে অলকানন্দার তীরে। অনেক নিচে নদী। বোধহয় মাইল খানেক নিচে হবে।' অবশ্য তার পক্ষে দূরত্ব কিংবা উচ্চতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা শক্ত।

সুরজিৎ সিংয়ের সঙ্গে গল্প করছিল দীপু। রোশনকুমারী ভাইকে নিয়ে পথের প্রান্তে উঁকি দিয়ে অলকানন্দা নদীর ওপরে যে ব্রীজটা দেখা যাচ্ছে, সেটাকে দেখছে।' আশু আর গোপু কথা বলছে। পায়ে পায়ে রোশনের দিকে এগিয়ে গেল অনন্ত।

পাঞ্জাবী মেয়েদের তুলনায় রোশনের চেহারায় শ্রী আছে বলতে হবে। চোখ দুটো ছোট এবং তার ওপরে সুর্মাটানা। তার ফলে আরও ছোট দেখায়। তবে ছোট কপাল বলে মানিয়ে গেছে। অসুন্দর শুধু ওর ঝটপটা লালচে চুলের ছোট্ট বেণী। ওর মায়েরও অবশ্য চুল বেশি নেই। বড় সুন্দর চুল ছিল লিলির। একঢাল রেশমের মত কুচকুচে কালো চুল। প্রথম দিকে কখনো সখনো খোঁপা বাঁধত, মাথার ঘোমটা দিত। তখন বাবা বেঁচে ছিলেন। তারপর বাবা মারা গেলেন। ভাই পড়াশুনো শেষ করে চলে গেল বিদেশে চাকরি নিয়ে। ছোট্ট সংসারে গুটিয়ে বসল কণাদ। বাড়ি ভাড়া নিল সাউথ ক্যালকাটায় পশু এরিয়ায়। তারপর ক্রমে ক্রমে গত সাত-আট বছরে ধীরে ধীরে পালটে গেল জীবনের ধারা। বছর পাঁচেক আগে চুল বব্ করবে বলে ধরে বসল লিলি। তার আগে প্রায়ই কাঁচি দিয়ে চুলের আগা কেটে একটু একটু করে ছোট করে আনছিল চুলের গোছা। দিনের পর দিন লিলির গানঘ্যানানি শুনতে শুনতে অবশেষে তার বব্ সম্মতি দিয়েছিল কণাদ। ইদানিং প্রতি মাসে একবার করে চুল কাটাতে যায় লিলি পার্ক স্ট্রীটের সেলুনে।'

রোশনের নাক, চিবুক, ঠোঁট, সবই বেশ ধারালো। অনন্তকে কাছে আসতে দেখে হাসল মিষ্টি করে। হিন্দি বলায় ভাল রপ্ত নয় অনন্ত। ভাইবোনের সঙ্গে কথা বলতে হলে হিন্দির আশ্রয় নিতে হবে ভেবেই সংকুচিত হয়ে উঠল সে মনে মনে। ওরাও সংকোচবশতঃ কথা বলল না দেখে বেঁচে গেল সে।

দীপু ডাক দিয়ে বলল, রায়দা, মিস্টার সিং বলছেন, গুরুদুয়ারায় গিয়ে উঠবেন। কোথায় সেই গুরুদুয়ারা, তা কিন্তু উনি জানেন না। ফ্যামিলি নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন। আমি বলছিলাম, ধর্মশালায় ওরা কি রকম জায়গা পায় দেখা যাক। সুবিধে হলে আমা-দের সঙ্গে থাকুন একটা দিন। ওঁকেও এস-ডি-ও অফিসে গিয়ে পারমিট নিতে হবে। অবশ্য ওঁদের ক্ষেত্রে সুবিধে আছে। শিখ পিলগ্রিমদের জন্যে ঢালাও অর্ডার দের অথরিটি।

অনন্ত ঠিক বুঝতে পারল না কি বলা উচিত।' তাই সে সর্দারজীকে ইংরেজিতে বলল, আপনি তো আমাদের লীডারের প্রোপোজাল শুনলেন।' এখন কি ঠিক করবেন?

সুরজিৎ সিং বলল, আমার ধারণা ছিল এখান থেকে গোবিন্দঘাট খুব কাছে। সেই-খানে গিয়ে গুরুদুয়ারায় উঠব ভেবেছিলাম। এখন শুনছি গোবিন্দঘাট সাত মাইল দূরে। এস-ডি-ওর কাছ থেকে পারমিট সংগ্রহ করে কখন বেরুব, কখন পৌঁছব, বুঝতে পারছি না।

দীপু ইংরেজিতেই বলল, দুটো দিন বাস মিস করেছেন। আজকের দিনটা রেস্ট নেওয়াই উচিত।

সুরজিৎ তার উত্তরে বলল, সে ক্ষেত্রে আমার স্ত্রী বলছেন এখানকার গুরুদুয়ারায় গিয়ে উঠতে।'

দীপু বলল, কিন্তু আপনি তো গুরু-দুয়ারা কোথায় তা জানেন না।' তা সত্ত্বেও যদি সেখানে গিয়ে উঠতে চান, সেই ব্যবস্থা করুন। পোর্টার রয়েছে। ওদের সঙ্গে কথা বলে নিন। অনন্ত দেখল, অনেকগুলি পোর্টার এগিয়ে এসেছে মালপত্র দেখে।

সর্দারজী বলল, হ্যাঁ, একবার অন্তত চেষ্টা করা উচিত।' না হলে আমার স্ত্রী খুশি হবে না।

সর্দারনী বেশ জাঁদরেল গোছের মহিলা। চেহারা স্বামীর মতই ভারি সারি। বড় মেয়ের তুলনায় মরলা বলতে হবে। মুখের ভাবও বেশ কর্কশ। বসেছিলেন পথের পাশে একটা পাথরের ওপরে। পরনে কুঁচি-দেওয়া শালোয়ার আর ফুলকাটা কামিজ, তার ওপরে ওড়না। সর্দার গিয়ে উবু হয়ে বসলেন স্ত্রীর পাশে।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে সহর একটু উঁচুতে। চওড়া পাথরের সিঁড়ির মত ধাপ কাটা পথ দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়। কানুর গলার স্বর শুনে গোপু আর আশু এগিয়ে গিয়ে-ছিল। মালপত্র পথের পাশে পড়ে আছে বলে দীপু নড়েনি জায়গা থেকে।

শোনা গেল চমৎকার ঘর পেয়েছে ওরা ধর্মশালায়। কানু বলছিল, রায়দার খুব পছন্দ হবে। মেঝের কার্পেট, ইলেকট্রিক লাইট, ফার্স্টক্লাশ বাথরুম, ট্যাপ ওয়াটার। এই অঞ্চলের ফাইভস্টার হোটেলের স্যুট বলতে পারেন।'

দীপু জিজ্ঞাসা করল, কটা ঘর নিয়েছিস।

কানু বলল, কটা ঘর আবার! মস্তবড় ঘর একটা পেয়েছি।

পাঞ্জাবী দম্পতির দিকে ইসারা করে দীপু বলল, ওদের জন্যেও তো একটা ঘর চাই।

কানু রেগে গিয়ে বলল, ওদের চাই তো ওরা ব্যবস্থা করুক গিয়ে। আমরা তো বাধা দিতে যাচ্ছি না।

(চলবে)

চাকুরীর পরীক্ষায় এ কে ব্যানার্জীর

1.	W.B.C.S. SPECIAL EXAM. —	Rs. 10
2.	W.B. CLERKSHIP EXAM. —	Rs. 8
3.	FIFTH & APPROACH TO SIXTH PLAN	Rs. 3
4.	INDIAN CONSTITUTION (Q & A) —	Rs. 2

বেনসনস্ : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

[১ সত্তেরো]

দশ বছর আগেও পাটনা সিটি জংশনে এতগুলো হোটেল ছিল না। আই টি ডি সি-র হোটেল পাটালিপুত্রের বার বেশ সাজানো। বাঁশের চাঁচারি দিয়ে দেওয়াল মোড়া। কিন্তু গান নেই। বাজনা নেই। তাই সিটি জংশনের গায়ে এই দশতলা হোটেলবাড়ির বারে সবচেয়ে ভিড়। এখানে এখন এয়ারকন্ডিশনড্ বারে হাসিগানের রীতিমত ফোয়ারা ফলকাচ্ছে। কাঁচের দেওয়ালের ওপিঠে পাটনা তখন লু-এর কবলে। রাস্তাগুলো ফাঁকা। এখন বেইলি রোডে হয়তো দু'একটা গাড়ি দেখা যাবে। দুপুরে কলেজের ছেলে, অফিস পালানো **একমিকিউটিভ, সেকায়োর** [redacted] দালালের ভিড়। সন্ধ্যে হলে শহর ঠান্ডা হবে। তখন আরেক দল লোক এখানে গলা ভেজাতে আসবে। তখন এই দশতলা হোটেলবাড়ির গায়ে নিওনের লাল হরফে একটি লেখা ফুটে উঠবে। রাজগৃহ। লোকাল লোকজন শর্টে বলে হোটেল রাজ।

সেভেন্থ ফ্লোরের জানালায় দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ বাচ্চুকে বলল, দরবারীলালের পছন্দ আছে। কিন্তু বুঝতে পারলো না বাচ্চু। টাপু তখনো তার বিছানায় ঘুমিয়ে।

বিশ্বনাথ বললো, ডাকাতির পয়সায় হোটেল। কিন্তু দরবারীলাল ইতিহাস বই দেখে নাম রেখেছে হোটেলের। রাজগৃহ।

ইতিহাসে আছে বুঝি?

[redacted]

ধর্মপ্রচার শুরু হয়েছিল—এই পাটনার কাছাকাছি—রাজগৃহ নামে এক জায়গা থেকে—। হিস্টিতে পড়িস নি? তখন অবিশ্যি পাটনার নাম ছিল পাটলিপুত্র।

ইতিহাস আবার কবে পড়লাম! সব জেনেশুনেই জানিস। জেনেশুনে ইয়ার্কি হচ্ছে!

আমিও স্কুলে থাকতে কিছু পড়িনি। পড়লে তো আমরা পাশই করে যেতাম।

বিশ্বনাথ জানলা দিয়ে দূরের মাঠটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে বললো, পাশ করা থাকলে যে কোন চাকরি পেয়ে যেতাম! রোজ সন্ধ্যে হলে এই বারে বাজে গেয়ে বেরোতে পারবো?

[redacted]

দাওয়া—চাকরিতে পাওয়া যেতো ? জব খরচ বাদ দিয়ে এত টাকা কে দিত বিশ্বনাথ ?

গভমেন্ট চাকরি হলে এই দুশ্চিন্তা থাকতো না বাচ্চু। আজ দরবারী লালের সঙ্গে কন্ট্রাকটে আছি। কাল তো কোন কাজ নাও জুটতে পারে। তখন কোথায় যাবো ? আর—

কি ?

এ গলা তো চিরদিন থাকবে না। তখন কে ডাকবে আমাকে !

এত তাড়াতাড়ি একথা বলছিস কেন বিশ্বনাথ। এখনই—

কোন দিন কি আমরা এ হোটেল থেকে বেরোতে পারবো ?

চুক্তির মেয়াদ ফুরোলেই আমরা চলে যাবো। অসুবিধে কিসের ?

আবার যদি চুক্তিতে ধাঁধে দরবারী-লাল—। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

চুক্তি হলে থেকে যাবো। খারাপ কি ! এত টাকা। আদর যত্ন। খাওয়া থাকা ফ্রি। কে দেবে আমাদের বিশ্বনাথ ?

তাহলেই তো মরেছি বাচ্চু। কোনদিন আমরা বেরোতে পাববো না এখান থেকে। রোজ সন্ধ্যেবেলা তোদের বাজনার সঙ্গে গলা মেলানো। খদ্দেরদের হাততালি।

এইতো চেয়েছিলি বিশ্বনাথ। এর ভেতর অরুচি এসে গেল ! হয়তো আরও বড় জায়গায় আমাদের ডাক পড়তে পারে।

বিশ্বনাথ আটতলার জানলা দিয়ে দেখলো—একপাল লোমহর্ষক ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে একটা বড় মত ল্যাংটো ছেলে। রোদের দিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বাচ্চুর কথায় একদম অন্য রকম জবাব উঠে এলো বিশ্বনাথের গলায়। কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে—কুটুর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

কুটু তোকে খুব ভালবাসে—তাই না ?

কুটুর জন্যে আমার খুব চিন্তা হয়।

কেন ? বেশ তো ভালো আছে।

বাইরে থেকে সব বোঝা যায় না বাচ্চু।

হবে। বলে বাচ্চু ইলেকট্রিক গিটারের তারে লম্বা মখসুদ্ধ নিজের ডানহাতের আঙুলগুলো বোলাতে লাগল। তাতে সরাইখানার আড্ডার তারের বাজনার সুর ফুটে উঠছিল। একদম সরাইখানার সুর। আঁকা ছবির সরাইখানা। যেখানে নীল রঙের মদ্যাংশের আঙুল আর তার মিলে গান গায়। পাগড়ি মাথায় লোক গাধা থেকে নেমে শুনতে বসে যায় এরকমই একটা ছবি বিশ্বনাথের মনে কাজ করছিল।

বাজাতে বাজাতে বাচ্চু বললো, চল বিশ্বনাথ—অরোরার ওখান থেকে ঘুরে আসি।

না। এখন যাবো না।

এইতো একটা ফ্লোর নিচে। যাবো আর আসবো।

না। টাপু শেষ রাত থেকে অরোরার ওখানে ছিলো। এখন বেচারা ঘুমচ্চুক্কে হয়তো।

ও ঘুমোয় না বিশ্বনাথ। ঘুমোলেই নাকি—লাডাকের বরফঢাকা পাহাড়ের চাই ভেঙে পড়তে দেখে—

ওসব নেশার কথা বাচ্চু। আমিতে ছিলো। ফ্রন্ট লাইনে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে খোঁড়া হয়ে চাকরি গেছে।

নেশার কথা নয়। ও নিজে বেশি খায় না। পেনশনের টাকায় হোটেলে থাকে। আর বাজনা শেখে একা একা।

বাড়ি গেলে পারে।

কোন বাড়ি নেই। একদম একা। গিটারে সুর তোলে। চলনা বিশ্বনাথ।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে না নেমে লিফটে নামতে গেল। লিফট ওপরে যাচ্ছিল। ওদের দেখে থামলো। কিন্তু ওদের নিলো না। লিফটের দরজা খুলে খোদ দরবারীলাল বেরিয়ে এলো।

এ কেয়া বাত ? তুম লোক নিচে যাও। আজি বাহারমে লুঁ—

দরবারীলালকে দেখলেই বাচ্চু স্ট্যাচু হয়ে যায়। এবারো তাই হোলো। তার মুখে কোন কথা নেই। দরবারীলাল পাকা ছ' ফুটের ওপর লম্বা। তার সর্বাঙ্গকে মুখখানার প্রায় ছবি আঁকা একটি গোঁফ। শাহী আস্তিন পাঞ্জাবীর সঙ্গে সবুজ পাজামা। চোখগুলো খুব বড়। মাথায় ছোট কিন্তু কোঁকড়া কালো চুল। হাসলে কিংবা রাগলে—মুখে একই ভাব। শুধু কাল জুলফি কুঁচকে যায়। অল্প ফরসা চেহারার কোথাও এক ছটাক বাড়তি চর্বি নেই। বিশ্বনাথের মনে হোল, বয়স চল্লিশ হবে।

যাও। আজি শোনে যাও বাচ্চে লোগ্। রাত মে গানা হ্যায়—।

ওদের ঘরে পাঠিয়ে দরবারী লাল আবার লিফটে ঢুকে গেল।

বিশ্বনাথের বিচ্ছিরি লাগছিলো। কিন্তু এই হল গিয়ে রাজগৃহের নিয়ম। এখানে দরবারীলালের কথাই শেষ কথা। ঘরে ফিরে বিশ্বনাথ এয়ারকুলারের নবটা ঘুরিয়ে দিলো—জায়গাটা যাতে আরো ঠাণ্ডা হয়—তাই।

তিন মাসের চুক্তিতে এখানে আসা। এপ্রিল মে জুন। থাকা খাওয়া নেশা—সবই ফ্রি। তার ওপর মাথাপিছু মাসে সাতশো টাকা। কন্ট্রাকট হবার পর টাপু হু-য়-রে বলে লাফিয়ে উঠেছিল। তার প্ল্যান—টাকা জমিয়ে এবারে অ্যামপ্লিফায়ারটা কিনে ফেলবে। টাপুর দিকে তাকালো বিশ্বনাথ। অঘোরে ঘুমোচ্ছে টাপুদা। শেষ রাত থেকে মেজর জিতেন অরোরাকে গিটারের তালিম দিয়েছে। সেই সঙ্গে ফ্রি রাম। তাই এখন ঘুম।

বাচ্চু বললো, দেখলি বিশ্বনাথ—দরবারী লালের চেহারাটা।

বিশ্বনাথ চুপ করেই থাকলো। সে জানে হিন্দি ছবিতে বড় সাইজের মস্তানের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে বাচ্চু সিনেমা হলেই হাততালি দিয়ে ওঠে। একটা ছবিতে অমিতাভ বচ্চন ডিনামাইট থেকে বিড়ি ধরিয়েছিল। সেই ধরাবার স্টাইল দেখে বাচ্চু এনকোর দিয়ে উঠেছিল।

বাচ্চু আবার বললো, ডাকু হো তো অ্যায়সা হো।

তোর খুব ভালো লাগে দরবারী লালকে ?

ভীষণ। কেমন ঠাণ্ডা গলা। টান টান চেহারা। চোখের ইশারায় সবাই কাজ করে। লোকটা নাকি প্রথম জীবনে কিলার ছিল।

কিলার ?

হ্যাঁরে বিশ্বনাথ। আমি রাজগৃহের পুরনো লোকদের মুখে শুনেছি—

কি শুনেছিস ?

Institute of Railway Services

announces one-year correspondence course for preparing candidates for

RAILWAY SERVICE EXAMINATION

for the fo owing posts :-

Post	Qualification	Age	Pay
Clerk	Matric/Equiv.	18-25	260-400
Asst. Station Master	Matric/Equiv.	18-25	330-560
Ticket Collector	Matric/Equiv.	18-25	260-400
Trainee Guard	Matric/Equiv.	18-25	290-480
Signaller	Matric/Equiv.	18-25	260-430
Typist	H. S. with 40 w p m.	18-28	260-400
Stenographer	Matric with 80/40 w.p.m.	18-30	330-560
Telephone Operator	Matric/Equiv.	18-25	260-400

The upper age limit is relaxable by 5 years for SC/ST. Next session commences from June, 1978 For pros-pectus and admission form send a self-addressed 25 paise stamped envelope (12 x 24 cm) to the Programme Director

INSTITUTE OF RAILWAY SERVICES,
10, Old Post Office Street, Calcutta-700 001.

Standard

দরবারীলাল টাকা নিয়ে খুন করতো।

কি রকম ?

ধর তোর টাপুদাকে খুন করতে হবে। দরবারী লালকে টাকা দিলি। অ্যাডভান্স। খুন করার পর বাকিটা দিয়ে দিলি দরবারী লালকে। তোর কাজ কমপ্লিট। পিকচারে থাকতে হোল না। অমন সুন্দর চেহারার মানুষ খুন করতে পারে বলে কেউ ভাবতেও পারতো না। সেই করেই তো দরবারীলালের ক্যাপিটাল হোল। এক-একটা মার্ডারে দশ হাজার—পাঁচ হাজার। আবার অনেক সময় সস্তায় কাজও করতে হয়েছে। ধর মাত্র আটশো টাকার জন্যে—

বিশ্বনাথ বাচচুর মুখ দেখছিল। দরবারীলালের কথা উঠলে বাচচু একদম কথক হয়ে ওঠে। যেন কোন রূপকথা বলছে। চোখের সামনেই ও তখন রূপকথা দেখতে পায়। হোটেলের এই ঘরের বাইরেই পাটনা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বলছে যাচ্ছে। ভেতরে এখন ঠান্ডা। আরামের শীত।

বাচচু বললো, দরবারীলাল একদম হিরো প্যাটার্নের লোক। এখন কোথায় গেল বলতো ?

আমি জানবো কি করে। যার সারা ইন্ডিয়ার সব হাইকোর্টে একটা দুটো মামলা ঝুলছে—তার সবকিছু কি জানা যায় ? এই দশতলা হোটেলের মালিক—অমন হিরো হিরো চলাফেরা—তার তো একটা লাস্ট্ থাকবেই বাচচু—

তোর কথাগুলো বিশ্বনাথ খুব বেঁকা-বেঁকা। কি হয়েছে বলতো তোর ?

কিছু না। যা বলছিলি বল—

এখন দরবারীলাল তার কেপ্টের কাছে গ্যালো—কী সুন্দরী—দশ তলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটে থাকে। সেখানে সব আলাদা ব্যবস্থা। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। স্টিরিও। সফ্ট মিউজিক বেজেই চলে—

অবাক হয়ে তাকালো বিশ্বনাথ। এত সব জানলি কি করে ?

জানতে হয়। গত রবিবার তোরা ঘুমোচ্ছিলি। অপারেটর ফোনে বললো,

দশ তলায় যেতে হবে। মাগীমা একটু শুনবেন। ডাকছেন—

মাগীমা ?

ওই নামেই এখানকার ওয়ার্কাররা ওঁকে ডাকে—। ভারি সুন্দরী। পায়ের আঙুলেও আর্টি। ঢলঢলো মুখখানায় নাকছাবি।

খুব আড্ডা দিয়ে এসেছিস মনে হচ্ছে।

তা তো দিয়েছি। ছত্তিশগড়ী মানুষ: জম দিয়ে সিটার শুনলো।

কি বাঙালি ?

ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন—। একদম রবীন্দ্রসঙ্গীত। বুঝলো ?

একটা দোলা আছে তো বাজনায়। মাগীমা শুনছিলো আর অল্প অল্প দুলছিল। ফিরে বাজাতে বললো। বাজালাম। আবার। আবার। বারবার তিনবার—

খুব মুগ্ধ করেছিস বল্।

বাঙালী দেখেনি তো। মাগীমায়ের খুব বাঙালী দেখার ইচ্ছে ছিল। তাইতো আমায় ডাকা। সেই সঙ্গে বাজনা।

দেখে সার্থক।

বাচচু হেসে ফেললো। তা বলতে পারিস। শেষে খেতে দিলো। ফ্রিজ থেকে মন্টুর দোকানের রসগোল্লা। পেড়া। তরমুজ। তুইও তো বিশ্বনাথ দুদিন পাঁচ তলায় গোছস। গান শোনাতে—

কে বললো ?

জানি। সব জানি। দরবারীলালের নিজের ফ্যামিলি থাকে। মেয়েটা কলেজে। তোর গান শুনতেই তো ডাকা।

হো হো করে হেসে উঠলো বিশ্বনাথ। থামতেই চায় না।

বাচচু চেঁচিয়ে বললো, অত হাসির কি হোল ? হাসছিস কেন ?

শোন্। এ বাড়িটাই আস্ত একটা সিঁড়ি ভাঙার অঙ্ক।

বাচচু অবাক হয়ে তাকালো। একথা বলছিস কেন বিশ্বনাথ ?

তাই না তো কি। একতলায় আমরা গাই বাজাই। পাঁচতলায় দরবারীলালের ফ্যামিলি। সিক্সথ ফ্লোরে মেজর অরোরা। সেভেন্থ-এ আমরা। দশ তলায় মাগীমা। একই সিঁড়িতে গোলকধাম। শুধু ঘুরে ঘুরে ওঠা। নয়তো নামা—

টাপু আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। তোরা খেয়েছিস ?

না।

দেড়টা বেজে গেল। চল্। খেয়ে নিই আমরা—। তারপর আরেকটু ঘুমিয়েই তো গান আছে—আজ বিশ্বনাথ তুই অমর ভূপালীর সেই গানটা গাইবি তো।

ক্লাসিকের ওপর তো। মদ খেতে এসে কেউ ও গান শুনবে না—

তুই গেয়েই দ্যাখ না। ঠিক শুনবে—

ক'দিন ধরেই দিলীপের কাছে কলকাতা বড় ছোট লাগছে। সেই কোল ইন্ডিয়ার অফিস। কয়েকটা ঠেক। যেখানে খানিক গান। কিছু ডিংকেস্। মাছভাজা নয়তো বোনলেস চিকেন। সভা ভঙ্গের সময় টিপ্স।

কলকাতা অ্যাতো ছোট কেন ? কলকাতার গায়ে এত গন্ধ কেন ? করেকটা বাস্তার গায়ে কিছু ছালবাকল তোলা বাড়ি দাঁড় করানো মাত্র। ব্যাপারটা বোঝা যায় শেষ রাতে হাঁটতে বেরোলে। তখন সারা কলকাতা ঘুমোয়। বাস্তায় লোক নেই। আছে শুধু বাড়ি আর ফাঁকা রাস্তা। লোক বেরিয়ে পড়লে এটা বোঝা যাবে না।

কলকাতা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে এলো। চেনাজানা লোকজনের নিবিঘ্ন বাসি লাগছে বলেই কি এমন হোল ?

অনেকদিন পরে অফিসে এসে নিজের টেবিলটাকেই অচেনা লাগছিল দিলীপের। এই টেবিলে সে কতই রাখছে আজ প্রায় পনেরো-ষোল বছর। এই টেবিলের ডান-দিকের তিনটে ড্রয়ারের ভেতর মাঝেরটা একটু ন্যাম। টানলে খোলে না। চাপলে বন্ধ হয় না। বেলা দশটাও বাজেনি। কোল ইন্ডিয়ার কিউবিকলগুলো বেয়ারারা এসে এয়ারকুলার চালিয়ে ঠান্ডা করে রাখছে। খানিকক্ষণের ভেতর কোল ইন্ডিয়ার বাজার গরম হয়ে উঠবে। তারপর লাঞ্চ-আওয়ারের পর দিলীপের নাকে ভাঙা বাজারের পচা মাছের গন্ধ উঠে আসবে। আসবেই। সেই সাতপুরনো রসিকতার গন্ধ। সেই একই ওয়াগন মুভমেন্ট। কয়লার চলান। পিট-সাইড স্টক। উঃ! শেষ নেই। শেষ নেই।

তার চেয়ে পান্ডবেশ্বরের এরিয়ার তরতাজা ভৌমিক খাদান ছিল। ছিল কি। এখনো তো আছে। কয়লাও উঠছে। সে-করলা বাজারেও আছে। ভৌমিক খাদান তো প্রাইভেট মাইনিং-এ একটা নাম এখন। সবাই জানে চেনে—

এই তো বেশ সুবোধ বালকের মত টেবিলে বসে আছিস। কবে জয়েন করলি ?

একদম সামনাসামনি ঋষি এসে দিলীপের উল্টোদিকের চেয়ারে বসলো। দিলীপ জানতো না—তারও বুকের ভেতর এক বালতি রক্ত একসঙ্গে এমন চলকে ওঠে। দিলীপের মনের ভেতর এখন একই সঙ্গে পর পর তিনটে সেন্টেন্স একদম ডায়ালগের স্টাইলে পর পর লাইন দিয়ে দাঁড়ালো।

তুই ঋষি এ-র‍্যাকেটের ভেতর কি করে আছিস ?

আমাকে বাদ দিয়ে তোর অন্য লোকের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে ?

আমাকে দেখে কোল ইন্ডিয়ার জন্যে তোর ভেতর কোন ধিক্কার ওঠে না ?

কিন্তু এর কোনটাই বলা যায় না। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কথাগুলো বলতেই মানুষের গলা বুজে আসে। কথা চোক করে। দিলীপ একদম হাল্কা টোনে বললো, দিল্লি তো ভালোই কাটলো।

তা কাটলো। আমি আর অনাথদা একটা রাতের জন্যে নাগাল রেস্ট হাউসে চলে গিয়েছিলাম। তাকালেই চোখের সামনে শিবালিক পাহাড়। রেস্ট হাউসের চত্বরেই টিলার গাছের ছায়ায় বসে চিল্ড বিয়ারের সঙ্গে রেশমি কাবাব। তুইও যেতে পারতিস। কথা তো শুনলি না। একটা না একটা গন্ডগোল পাকিয়ে বসবি—

আমি কি এসব শুধু শুধু করি ঋষি ? একদম অকারণে ?

তা বলতে পারি না। তবে না করলেও তো চলতো। অনাথদা তো তোকে কম ভালবাসে না। শিবালিকের সামনে ডেক-চেয়ারে বসে আমরা—বিকেলবেলা—সর্বক্ষণ শুধু তোর কথা।

আমি তো কারও বিরুদ্ধে নই ঋষি।

তবে ?

আমারও তো তাই প্রশ্ন। পরিষ্কার

বুঝতে পারছি, কোল ইণ্ডিয়া আমার জায়গা নয়। ভৌমিক খাদানের বাজার দখল দেখে চেয়ারম্যান চার্ষ—ক্লিপ হিজ উইংস! পল্ হিম টু হিজ চেয়ার!! সাধন গুপ্ত আমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছে! অনাথ চক্কোত্তি নাকি আমাকে ভালবাসে! আমি কি করি বলতো?

যা এখন করছিস তাই করে যাবি। তবে আমি বলবো—তুই যেমন ছিলি তাই থাকলেই তো ভালো ছিলো।

কেমন?

হাসবি। নাচবি। ভৌমিক খাদানের কাজ ভালো লাগলে করবি।

সে-খাদান তো আমার ইচ্ছেয় নয়। তুই আর অনন্ত যেমন চাইবি তেমন হবে। অনন্ত আর মীরা তো ভৌমিক ট্রাস্টের তরফে স্বত্ত্বাধিকারী। সেখানে আমার কথা টিকবে না। আর এখানে। সে তো আরও ভালো।

আমি এখানে যুক্তির খাতিরে যে-কথাই বলবো—সেটা গিয়ে দাঁড়াবে—আমি তোর বিরুদ্ধে কথা বলছি। অথচ আমি তা বলতে চাই না।

লোকে কিন্তু তাই বলছে।

মজা তো ওইখানে। ঋষি। আমি যা বলবো—তারই অর্থ ওই একটাই দাঁড়াচ্ছে।

আমি বলি কি দিলীপ—তুই মন থেকে ওসব ঝেড়ে ফেলে দে। রাগ রাখিসনে কারও ওপরে। ওতে শরীর খারাপ হয়।

আমি কারও বিরুদ্ধে নই।

মানি আমি। আসলে দিলীপ—আমি আর তুই দুই রকমের লোক। তুই চাইছিস—আমরা যেন একরকমের হয়ে যাই। তা তো হয় না।

তবু এরই ভেতর ঋষি—মানুষ ন্যায়ের কোর্টে গেলে একরকমের হয়। অন্তত সেই কোর্টে থাকবার সময়টায়। বন্ধুত্বের কোর্টে গেলেও তাই হয়। মেশামিশির সময় তাই হয়। অল্পক্ষণের জন্যে হলেও—খানিক-ক্ষণ তো দু'রকমের লোক এক হয়। প্রতি-বাদ দু'জনকে এক করে। বন্ধু করে। প্রোটেস্টের ধর্মই তাই। ধিক্কারের ধর্মই তাই।

আমি কি বলতে পারি সাধনদাকে—দিলীপের অনেক বছর হয়ে গেল এক টেবিলে?

কক্ষনো নয়, ঋষি। সেটা তো বেগিং।

তাছাড়া সেটা তোর পক্ষে সম্মানেরও নয়—দিলীপ।

বটেই তো। যাদের যা তা নিজে থেকে না করলে বলার তো কিছু নেই। যারা এরকম করে—তারাই তো র‍্যাকেট। সেই র‍্যাকেটের পার্টনার আমি কোনদিন হইনি। হবো না। আমার যন্ত্রণা তো ডবল। কোল ইণ্ডিয়ার কিছু বললে তা যায় তোর বিরুদ্ধে। আর—

থামলি কেন? বল—

পাণ্ডবেশ্বরে আমাদের—সরি, তোদের খাদানের জন্যে যত শেয়ার ক্যাপিটালই জোগাড় হোক না—এস-খাদানে মাইনিং বাড়ানো হবে না।

সেভাবে তো কোনদিন ভাবিনি। সে তো দিলীপ আগে অনেকবারই বলেছি—বিশাল কোম্পানী হোক—এ তো কোনদিন চাইনি আমরা—

চাওয়া না চাওয়া অধিকারের ওপর নির্ভর করে।

শুধু অধিকার কেন?

তা নয়তো কি ঋষি! আমি চাইলেই কি ভৌমিক খাদান বড় হবে। আমার ইচ্ছেটা প্রমাণের মত—ট্রান্সফেক্ট করার মত কোন কাগজপত্রই তো নেই। আমি তো কোন ট্রাস্টের বংশধর নই। তাছাড়া—

তাছাড়া কি?

নাঃ! অন্য কথা বলি আয়—

দু'জনেই এক সঙ্গে চুপ করে গেল। দিলীপ ঋষির মনের ভেতরটা জানে না। কিন্তু তার নিজের মনের ভেতর আর একটা সেণ্টেন্স—বেশ পুরনো সেণ্টেন্স—একদম ডায়লগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। যেমন—

এমন তো নয় ঋষি—ভৌমিক খাদানটা তোর খেলা? আর কোল ইণ্ডিয়া তোর কাজ! এক জায়গায় তুই কমপিটিটর। আর এই কমপিটিটরের পশ্চারেই কোল ইণ্ডিয়ায় তুই নয়নের দুলাল? শুধু খেলা খেলা সারাবেলা—

দিলীপ জানে ও-কথাটার ভেতর তার যে চেহারাটা ফুটে ওঠে, তাতে তাকে খুব ছোট দেখাবে। এমন দেখাবে বলেই কি সে ও-কথা বলতে পারে না। কেন তুই সদ্য বিয়ের পর আমার সঙ্গে সারারাত গল্প করেছিলি? কেন প্রথম প্রথম আমার নেশা হলে তুই কপালে হাত বুলিয়ে দিতিস? বমি হয়ে যেতে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। কেন তুই তখন বলতে গেলি—'ও কিচ্ছু না দিলীপ। লিভার ভালো আছে বলেই অ্যালকোহল বিফিউজ করছে। এটা গুড সাইন। যখন আর হজম পাবে না, তখন বুঝবি, লিভার অ্যালকোহল অ্যাবজর্ব করতে করতে শকৃত হয়ে গেছে—'। কেন তুই এসব করতে গেলি। এসব বলতে গেলি। নয়তো আমার তো কোন মায়া থাকতো না তোর জন্যে। আমি যা প্রাণ চায় বলতে পারতাম। এইভাবে কি লোক লোককে ভালবাসে।

এর কোন কথাই উচ্চারণ করা যায় না। উঠবার সময় ঋষি বললো, আমি চাই তোর মন থেকে সব রাগ মুছে যাক। তুই শান্ত হ। ভাল করে ঘুম দিয়ে মনটা মেজাজটা ঠাণ্ডা কর।

আমার মন খুব ঠাণ্ডা ঋষি। নয়তো অত অল্পদিনে অত শেয়ার ক্যাপিটাল আনা যেতো না।

সেখানে তুই ঠিক ছিলি। এখানে দিলীপ তুই অস্থির। ধৈর্য ধর না—

এই কথাটাই তো সাধন গুপ্ত বলে।

কিছু অন্যায় বলেনি।

তা তো ঠিকই।

দরবারীলালের রাজগৃহ সন্ধ্যেবেলা জমজমাট। পুরুষদের ফেয়ারস্, প্যারালাল, উঁচু গোড়ালির জুতো—প্রায় সব ক'জন-কেই কাপড়ের বিজ্ঞাপনের পুরুষলোক করে দেয়। দূর থেকে দেখতে সাহসী, লম্বা-চওড়া, দরাজদিল। তাদের কানে সিলিং থেকে লুকোনো স্টিরিও মারফৎ সুর আসে। গান আসে। বিশ্বনাথের গলা। টাপু আর বাচ্চুর বাজনা।

সব কোই হৃদয় তোড় দিয়া—

মুকেশের বিখ্যাত গানের পয়লা কলি জুড়ে দিয়ে বিশ্বনাথ দম নিতে একটু হাসলো। তার সামনের টেবিলে তারই বয়সী একটি ছেলে—সঙ্গে উঁচু খোপার বান্ধবী—হাতে ঢিলে ব্যাণ্ডে বড় হাত-ঘড়িটা ঝুলে পড়েছে—প্যারালাল ছাড়িয়ে জুতোর দু' ইঞ্চি হিল। সামনে পাথরের প্লেটে বেয়ারা যত্নেষ্ট সম্মান দেখিয়ে খুব সাবধানে ধোঁয়া-ওড়া সিজলিং চিকেন দিচ্ছিল।

'হৃদয় তোড় দিয়া' কথাটা শুনে ছেলেটি সিধে হয়ে বসে বিশ্ব-নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। সে হাসি ফিরিয়ে

ডঃ দীপক দের

বঙ্কিম মূল্যায়ন ১০-০০

(পি এইচ ডি. থিসিস)

সাম্যবাদ (উপন্যাস) ৬-০০

(১৯৬৭ থেকে বিপ্লব, ৭৭ অবধি শাসন)

মাষ্টার মশায় ৫-৫০

(শিক্ষক জীবন নিয়ে উপন্যাস)

অবাঞ্ছিত (উপন্যাস) ৪-০০

(পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমন)

কলকাতা দেখেছি ৪-০০

উদারপন্থী (উপন্যাস) ৫-০০

প্রেমিক প্রেমিকাদের বৈঠক ৪

দে বুক স্টোর, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

দিয়ে বিশ্বনাথ খুব দুঃখু দুঃখুভাবে গানের বাক্সটুক্স ধরলো। সারা যার তখন উ-উ-আঃ। ধরনের একটা চাপা শব্দ করে উঠলো। টাপু বাজাতে বাজাতে দেখলো—দরবারীলাল তার লোকজন নিয়ে পেছনে কোণের বড় টেবিলে বসে। টাপু পর পর তিনটে স্টেনাক দিল ভরে। মাথা নিচু করে। সে জানে দরবারীলালের টেবিলে কারা কারা বসে আছে। পাটনা সেক্রেটারিয়েটের রুলিং পার্টির লেজারার—ভাই চিরঞ্জীলাল। আর শহরের সেরা ফৌজদারী উকিল। দরবারীলাল বলে—ভকিলসাব। বোকারোয় বড় ঠিকেদার—ঠিকাদারসাব। এরকম চার-পাঁচজন।

রাত এগারোটার মধ্যে ভাঙলে—ওই টেবিলে কাগজপত্তর নিয়ে বসবে দরবারী-লাল। ফাইল আসবে বিভিন্ন মামলার। পাঁচতলা থেকে। আর আসবে দশতলা থেকে মাগীমাষের টেলিফুন—ঘন ঘন।

তারই ভেতর দরবারীলাল আর তার লোকজন ফাইল দেখবে। হাসবে। কথা-বার্তা বলবে। আস্ত আস্ত রোস্ট খাবে। বড়সড় সাইজের একজন আবার মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজা খোলা রেখে পৈতে কানে পেচ্ছাপে বসবে।

এরই মাঝে দরবারীলাল তার প্রিয় এক-একটা গানের অর্ডার দেবে। যব পিয়া গয়ে শ্বশুরাল—। ফাঁকা বারে বিশ্বনাথকে এক-একটা গান শেষ হবে—আর দরবারী-লাল বাঁ হাতের তিনটে আঙুল তুলে ধরবে। অমনি একজন বেয়ারা এসে তিনটে ঠাণ্ডা বিয়ারের বোতল ব্যান্ড-স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাবে। ওরা তিনজন তখন একসঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে সেলামের শোড করে আবার নতুন গান ধরবে।

এই হয়ে আসছে আজ দু' হপ্তা। জলো নিভলে ওরা তিনজনে পনেরো থেকে আঠারোটা বিয়ারের বোতল নিয়ে নিজেদের ঘরে যায়। পরদিন সকালে এই বারেই সেগুলো বেচে দেয়।

এই হয়ে আসছে আজ ক'দিন। আজও রাত একটা নাগাদ ওরা যখন আলো নিভলে লিফটে উঠছিল—তখন ঘুমন্ত মাল্টিস্টোরিড হোটেলবাড়িটার এক জানলা দিয়ে আকাশে গিটারের এক কলি ঝুলে পড়লো।

ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন

বিশ্বনাথ নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, বেশ শিখেছে তো অরোরা—

টাপু লজ্জা লজ্জা গলায় বললো, ফাঁহাতক আর বিনি পয়সায় রাম খাবো। ভাই কাল শেষ রাতে না ঘুমিয়ে শিখিয়ে দিলাম লোকটাকে—

হাত খারাপ নয়।

উঁহু। সেন্টারে একটু ভুল হচ্ছে।

ওরা তিনজনে তখন অন্ধকার ঘরের জানলার গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে এখন ঠাণ্ডা পাটনা। রাজগৃহের সামনে দুপুরের সেই মাঠটায়—অনেকদূরে—একটা চৌকো আলো লম্বা হয়ে পড়ে আছে। বাচ্চু বুঝলো, মাগীমাষের জানলার আলো। এক-দম দুর্গাপ্রতিমার মত মুখ। এখনো দরবারীলাল যেয়ে উঠতে পারেনি।

ওরা তিনজনই না খেয়ে শুয়ে পড়লো।

অন্ধকারে প্রথম কথা বললো বিশ্ব-নাথ। আমরা আর কোনদিন এখান থেকে বেরোতে পারবো না।

টাপু তড়াক করে উঠে বসলো। আমায় যেতে হবেই। উরে বাবাঃ! ওয়েস্টার্ন ক্যালিফর্নিয়ার ক্যালিফোর্নিয়া স্কুলের লেসন নেব আমি। ওটি হচ্ছে না। চির-রঞ্জন কি কেউ এ-কাজ পাবে। তোকে না বিশ্বনাথ আজ অমরভূপালীর সেই গানটা গাইতে বলেছিলাম—

লোকে নিতো না টাপুদা—

খুব নিতো।

বাচ্চু বলে বসলো, খারাপ কি আছি। বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছি। বাংলা খেতে হচ্ছে না। দোবেলা ছিকেন। তার ওপর বিলিতি। স্প্রিংয়ের খাটে ডানলপের গদি। এয়ারকুলার বসানো ঘরে চব্বিশ ঘন্টার জন্যে রুম সার্ভিস। আর কি চাই বড়দা! কোন চাকরিতে থাকলে আমরা এই খাতির যত্ন পেতাম? আমি তো স্কুল ফাইনাল ফেল।

অন্ধকারের ভেতরেই বাচ্চুর বড়দা বললো, তোর কোন উচ্চাশা নেই? এই খাওয়া-দাওয়া আর সাতশো টাকাই কি কারও জীবনের অ্যাম্বিশান হতে পারে?

তাহলে তুমি কি করতে চাও?

আমি মিউজিক ডিরেক্টর হবো। আমার সুরে বসানো গান হোল ইন্ডিয়ায় হিট করবে। ইন্ডিয়ার বাইরেও—যেখানে যত ইন্ডিয়ান আছে—তারা কান পেতে শুনবে। হিন্দি ছবির টাইটেলে থাকবে—মিউজিক ডিরেকশন—টি পালিত। তাহলে তো টাপুদা আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয়। নয়তো চিরকালের মত আমরা এখানে বন্দী হয়ে যাবো।

বিশ্বনাথকে উঠে বসতে দেখে বাচ্চু বললো, ওকথা বলছিস কেন বিশু? দরবারীলাল তো কোন খারাপ বিহেভিয়ার করেনি আমাদের সঙ্গে।

টাপু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তবে তুই থেকে যা বাচ্চু। একাই গাইবি। একাই বাজাবি।

তা হয় নাকি বড়দা। ওকি? তোমরা সত্যিই চললে নাকি?

তা নাতো কি। গিটারের খাপ দুটো বের কর। খাটের নিচে আছে।

বিষাবগুলো কি হবে বড়দা?

খা বসে বসে।

তা হয় নাকি? না গেলেই না বড়দা—

তবে তুই থাক না। কাল দিনের বেলা বোতলগুলো বেচে দিয়ে দুপুরের ট্রেন ধরবি।

তখন আমায় একা পেলে দরবারীলাল ঠিক চামড়া তুলে নেবে।

বিশ্বনাথ বললো, কতকাল বাংলা খাইনি টাপুদা। মুখ নষ্ট হয়ে গেল বিলিতিতে। তারপর রোজ রোজ চিকেন খাওয়া যায়? কেমন গন্ধ গন্ধ লাগে।

খানিকক্ষণের ভেতর তিনজনে অন্ধ-কার সিঁড়িতে। গেট লক করে দারোয়ান দাঁড়ানো। ওরা আন্দাজে সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে এমারজেন্সিতে বেরোবার সিঁড়ি পেয়ে গেল। এ সিঁড়ি অনেক সরু। বাতিল জিনিসপত্রের গো ডাউন প্রায়। আগুন-টাগুন লাগলে দমকলের জন্যে এ রাস্তা। টেলিফোন অপারেটরই একদিন বলেছিল এ রাস্তার কথা।

ওরা তিনজন ঠোকর খেতে খেতে সরু সিঁড়ির এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছালো—যেখানটায় ল্যান্ডিং অনেক চওড়া—জায়গাটা পরিষ্কার।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে টাপু অবাক হয়ে গেল। দেশলাইয়ের আলোতে প্রথমেই একটা রিভলভিং চেয়ার—গদি মোড়া—তার সামনে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে টেবিল ল্যাম্প। বাচ্চু গিয়ে খট করে আলো জেলে দিল। কিচ্ছুরের অপারেশন রুম বিশ্বনাথ।

টাপু কাউকে কিছু না বলে টেবিলের ওপর থেকে দু' দু'টো মোটা ফাইল—কাগজপত্র উপছে পড়ছিল তার ভেতর থেকে—সবশুদ্ধ গিটারের বড় বাক্সের ভেতর ভরে নিল। বড় জ্বালাতো রোজ লোকটা। রাত এগারোটারপর গানের অর্ডার। কাগজ হারিয়ে বাছাধন একটু হয়রান হোক। চল বাচ্চু—

এটা কি করলে বড়দা? দরবারীলাল বিপদে পড়বে—

দরবারীলাল তোমার শ্বশুর! এক মাসের টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে এসেছিলাম আমরা। আর দিয়েছিল টেন ভাড়া। যাবার ভাড়াও তো আমরা ছেড়ে দিয়ে গেলাম—

ভাই বলে কাগজপত্র হাপিস করে নিয়ে যাবে?

তবে তুই এখানে দরবারীলালের জামাই হয়ে থাক বাচ্চু। মাগীমা তোর শাশুড়ি হবে খন। বাজনা শোনাবি।

তোমার শেখানো বাজনা তো অরোরা এখানে বাজাচ্ছে।

টাপু একটু থমকে দাঁড়ালো। তার-পর বললো, জোরে কথা বোলো না কেউ। এমারজেন্সি এগজিটের রাস্তাটা হোটেলের পেছন দিকটায় এসে শেষ।

খানিক বাদে ওরা তিনজনে পাচিল টপকে একদম শেষ রাতের পাটনায়। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ওদের যেন আরাম দিল। ঠাসা লরি ফুল স্পীডে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওদের সামনেই একটা অন্ধকার দশতলার গায়ে নিওনে লেখা—রাজগৃহ।

বিশ্বনাথ খুব কৃতজ্ঞ গলায় বললো, তুমি না থাকলে টাপুদা আমরা কোনদিন এখান থেকে বেরোতে পারতাম না।

আগে স্টেশনে চল। টিকিট কাটতে হবে। ভোরের যেকোন ট্রেনের। এখুনি পাটনা ছাড়া দরকার—

(চলবে)

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

এই সংঘর্ষের সময় এক মিলিটারী অফিসারের গুলিতে প্রীতিলতা আহত হয়। আক্রমণ করতে যাওয়ার আগে প্রীতির সঙ্গে কালীর একটি চুক্তি হয় যে, প্রীতিলতা এই সংঘর্ষ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবে না। এই কথাটি আক্রমণকারীরা সবাই জানতো, এমনকি তারকেশ্বর ও মাস্টারদাও জানতেন। কালী প্রীতিকে অনেক বুঝিয়েছিল এবং তার এই ধরনের মনোভাব থেকে তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রীতিলতা একেবারে অন্য। প্রীতিলতা কালীকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনি আমাকে কথা দিন, আমার পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার পরও আমি মরতি না দেখলে আপনার পটাসিয়াম সায়ানাইডের টুকরোটাও আমার মুখে গুঁজে দেবেন, যেন আমি নিশ্চিত মরতে পারি।

ভীষণ গুলিগোলা চলার পরে যখন ইংরেজরা পালালো আর বিপ্লবী ছেলেরা ফিরে আসছিল তখন প্রীতিলতাও তাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে চলেছিল। তার প্রাণে ছিল কালী। সবাই তখন দূরে গেছে। প্রীতিলতা তার চলন শক্তি হারাচ্ছিল। সে তখন তার পটাসিয়াম সায়ানাইডের পুরিয়া খুলে মুখে দিয়ে সেখানেই ঢলে পড়লো। কালী দেখে বুঝেছিল তার মৃত্যু অনিবার্য। তার চুক্তির কথা মনে পড়ল। সে তখন তার নিজের পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রীতির মুখে দিয়ে দিল।

এই পর্ব এখানেই শেষ হল। কিন্তু জয়দত্তের কথা কিছুটা আমাকে বলতে হয়। জয়দত্ত ক্লাব থেকে বার হয়নি। তিনি সেখানকার কর্মচারী। সেরূপ দায়িত্বজ্ঞানে সেখানেই থাকাটা তিনি সমীচীন মনে করেছিলেন। পুলিশ ও মিলিটারী এসে দেখে জয়দত্ত একটি ঘরে খিল দিয়ে সেখানেই বসে আছেন। জয়দত্ত সেই ঘর থেকে লাইট দিয়ে সংকেত দেন এবং সেই ঘরেই তিনি বসে ছিলেন। মিলিটারী এসে সেই ঘর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তার ওপর খুব পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল। জয়দত্ত ইচ্ছা করলে প্রত্যেকের নাম ঠিকানা বলে দিতে পারতেন, কিন্তু তার মুখ থেকে পুলিশ একটা কথাও বার করতে পারেনি। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর জয়দত্ত ছাড়া পেয়েছিলেন। তার পরেও বিপ্লবীদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি আশ্রয় দিয়ে গেছেন এবং নানা উপায়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। জয়দত্তের সঙ্গে আমার কোনদিন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তবে আমাদের দলের প্রতি তার যে সমর্থন ছিল, সেইজন্য আমি তার প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলাম। জয়দত্ত এখন যেখানেই থাক না কেন তিনি আমার বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

(৪)

১০ই জানুয়ারী ১৯৭০ সালে আমাকে গ্রেপ্তার করল। যাঁর বাড়ী থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করল, তিনি আমার কাকাবাবু সুবোধচন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত জেলার স্কুল-ইনসপেক্টার। তাঁরই

গড়িয়ার বাড়ী 'শিবালয়' থেকে আমি গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। আমার কাকাবাবু একজন শিবতুল্য লোক। তাঁর সান্নিধ্যে যারা এসেছেন, তারা তাঁকে কখনই ভুলতে পারেননি। ইমাম সাহেব তাঁর এককালের ছাত্র, এখন বেশ অবস্থাবান এবং কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ নাগরিক। তিনি ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর এক প্রাইভেট লিমিটেড প্রেসের সর্বময় কর্তা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। তিনি বারাসাতে (যেখানে তাঁর বাড়ী) একটি হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই নতুন স্কুলটি ভালভাবে অর্গানাইজ করে দেওয়ার জন্য তিনি কাকাবাবুকে অর্থাৎ সুবোধচন্দ্র সেনকে হেড-মাস্টারের পদে নিযুক্ত করবেন বলে মনস্থ করে কাকাবাবুর কাছে 'শিবালয়ে' এসে অনুরোধ জানালেন যেন তিনি সেই হেড-মাস্টারের পদটি গ্রহণ করেন। কাকাবাবু তখন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেকটার। চাকরি করলে মন্দ হয় না, কিন্তু অতদূরে স্কুল যাওয়া-আসা করাটা তাঁর মনঃপূত হচ্ছিল না। কিন্তু ইমাম সাহেবের এত মিষ্টি স্বভাব যে, তাঁর অনুরোধ কাকাবাবুর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এই ইমাম সাহেব হিন্দু-মুসলমান রায়টের সময় হিন্দু এলাকায় থাকাটা একেবারেই নিরাপদ বলে মনে করছিলেন না। কাকাবাবু তাকে একেবারে নিজের ছেলের মত ভাবতেন। একদিন তিনি ইমামকে বললেন, 'ইমাম, তোমার সেখানে থাকা হবে না। রায়টের সময় কখন কি হবে বলা যায় না। কাজেই তুমি আমার বাড়ী এসে যতদিন ইচ্ছে থাক। অবস্থা শান্ত হলে আবার তুমি ফিরে যেও।' ইমাম সাহেব কাকাবাবুর বাড়ীতে প্রায় এক মাস ছিলেন।

কাকাবাবু হেডমাস্টারের পদটি গ্রহণ করেছিলেন এবং এতদূরে থেকে তিনি সেখানে যাতায়াত করতেন। স্কুল খুব ভালভাবেই চলেছিল। খুব শীঘ্র সরকারী গ্রান্ট ও স্কুল বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছিল। কাকাবাবু সেখানে বোধহয় দু-তিন বছর চাকরি করেছিলেন। তারপর তাঁর শারীরিক অবস্থার কারণে ইমাম সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে তিনি সেই প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিলেন। আমি আজ খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি, আমার

সুবোতার বই :

মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায় একমাত্র

বাছাইকরা ছোট গল্পের সংকলন

তীর্থের কাক ৫

পরিবেশক :

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮।১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩

গ্রেপ্তারের সময় তিনি যদি বেঁচে থাকতেন, তবে জোর গলায় এর প্রতিবাদ করতেন। তিনি কখনই বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, আমি কখন কোন অসামাজিক ও অন্যায় কাজ করতে পারি। কাকাবাবুর আমার প্রতি বিশ্বাসটি আমার জীবনের একটি মহামূল্য সঞ্চয়।

পুলিশের বড়কর্তারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন পাঁচটি বড় বড় ডাকাতির ব্যাপারে। দুর্গাপুর 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়াতে' ডাকাতি অবশ্য হয়নি, তবে ডাকাতির সমস্ত রকম ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছিল এই তথ্যাদির উপর নির্ভর করে গল্প করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। যখন তাঁরা বুঝলেন আমি তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে কোন কথা বলবই না, তখন তাঁরা চলে গেলেন তের চোদ্দ বছরের আগের কলকাতার বড় বড় ডাকাতি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে। এই সম্বন্ধে আমি আমার কথা আগের কয়েকটি সংখ্যায় লিখেছি। এখন পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য নিবারণ করার জন্য আমি যা জানতে পেরেছি সে কথা বলব।

সকাল নটা নাগাদ পার্ক স্ট্রীট পোস্ট-অফিসে একটি ভয়ংকর সশস্ত্র ডাকাতি হয়ে গেল। লুঠ করে নিয়ে গেল প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। এই ডাকাতি স্মরণ করিয়ে দেয় বুশ দেশের টিট্রফ্লিস্ ডাকাতি। টিট্রফ্লিস্ পোস্ট-অফিসেও টেজারি থেকে টাকা আসছিল। টাকার গাড়ীর আগে পিছে ককেশীয় সৈন্য রক্ষী হিসাবে ছিল। জি, পি, ও থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা একটি ট্রাঙ্ক ও একটি ব্যাগে করে পার্ক স্ট্রীট পোস্ট-অফিসে আসছিল। টাকা ছিল পোস্ট-অফিসের ভ্যানে। পোস্ট-অফিসে বিভিন্ন ধরনের ভ্যান ব্যবহৃত হোত। প্রতিদিনই জি, পি, ও থেকে টাকা নিয়ে প্রায় ৬১টি পোস্ট-অফিসে টাকা দিয়ে আসা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আবার সন্ধ্যার সময় এই প্রত্যেকটি পোস্ট-অফিস থেকে টাকা কালেক্ট করে জি, পি, ও-তে নিয়ে যাওয়া হোত। এইজন্য প্রায় দশ-এগারোটি ভ্যান প্রতিদিন ব্যবহৃত হোত। লাল রঙের পোস্টাল ভ্যানগুলোর সাইজ ও হাইট বিভিন্ন ধরনের। পেছনের দরজা দু' পাল্লা নয়ত এক পাল্লা হোত। বেশীর ভাগই দু' পাল্লা হোত। পেছনের দরজার ওপরের দিকে দুটি জানালা থাকত বাইরে দেখার জন্য। ভিতরে টাকা নিয়ে ক্যাশিয়ার ও ক্লার্ক বসত আর থাকত একজন, কিংবা দুজন রাইফেল নিয়ে সি, আর, পি। এই ভ্যানে ড্রাইভারের সামনের সীট পিছনের অংশ থেকে পার্টিশন করা। টাকা নিয়ে যাওয়া-আসার সময় আরেকটি সি, আর, পি বন্দুক নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসত।

সেইদিন এই গাড়ীটি জি, পি, ও থেকে প্রথম টাকা নিয়ে পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে আসছিল। সেদিন এই গ্রুপের সাতটা পোস্ট অফিসে টাকা ডেলিভারী দেওয়ার কথা ছিল। কাজেই যাদের টাকা লুঠ করার কথা ছিল, তারা ঠিক করেছিল কোন টাকা কোন পোস্ট অফিসে ডেলিভারী দেওয়ার আগেই সব টাকা তারা লুঠ করে নেবে। তাই স্থানটি নির্দিষ্ট হল পার্ক স্ট্রীট থানার কাছে পোস্ট অফিসে। সকাল নটার সময় পার্ক স্ট্রীট লোকে লোকারণ্য। ঘন ঘন গাড়ী ও পুলিশের ভ্যান সেই পথে চলে। তাদের পরের ডেলিভারীর জায়গা ছিল এলগিন রোড পোস্ট অফিসে। এলগিন রোড পোস্ট অফিসে অপেক্ষাকৃত অনেক নিরাপদ স্থানে ডাকাতি হতে পারত কিন্তু তার আগেই টাকার একটি বিরাট অংশ পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে ডেলিভারী হয়ে যেত। পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে বিপদের আশংকা থাকা সত্ত্বেও ডাকাতির প্ল্যানটি চূড়ান্তভাবে ঠিক করা হয়েছিল যে, পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে পূর্বদিকের দরজা দিয়ে যখন টাকা ডেলিভারী দেবে, তখন ডাকাতিটি করা হবে। ভ্যানটি পোস্ট অফিসের পূর্বদিকে গা ঘেঁষে গলিটি দিয়ে প্রায় ৩০ গজ ভেতরে যাওয়ার পর একটি উঠোনের মত জায়গা আছে যেখানে গাড়ী ঘোরানো যায়, সেখানেই পোস্ট অফিসের পূর্বদিকের দরজা। টাকার থলি এই গেট দিয়ে নামিয়ে পোস্ট অফিসের ভেতরে সেফিংস ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শীল করা থলিতে ক্যাশ জমা নেয়। গলির মুখ থেকে উঠোন পর্যন্ত রাস্তার মাঝখানে ডাকাতি করতে হবে, তাই ঠিক হয়েছিল। অনেক গবেষণা করে ঠিক হয়েছিল, উঠোনে যখন গাড়ী এসে থেমে যাবে এবং বড় বড় টাকার ব্যাগ নামাবে, সেইটি আক্রমণের ঠিক সময়।

নির্দিষ্ট দিনে টাকা নিয়ে ছোট ভ্যানটি এলো। তাতে 'ডাকাতদের' সমস্যা অনেক কমে গেল। যদি বড় ভ্যান আসতো, তবে তার ভিতরে যে বন্দুকধারী প্রহরী ও ক্যাশিয়ার প্রমুখ থাকত, তাদের বাইরে থেকে দেখা যায় না; সেইহেতু একটি দেড়-ফুট উঁচু লম্বা বেঞ্চ এবং একটি ছোট দেড় ফুট উঁচু টুলও তাদের নিতে হয়েছিল। উঁচু ভ্যানের মধ্যে বন্দুকধারী প্রহরী ও ক্যাশিয়ার প্রমুখ লোকদের পিস্তল, স্টেনগান প্রভৃতি দেখিয়ে কমান্ড করতে হলে এই জাতীয় টুল ও বেঞ্চ ছাড়া কাজ হোত না। ঐ ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য তারা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। পোস্ট অফিসের গলির মুখে ফুট-পাথের উপরে ছোট পান-বিড়ির দোকানের সামনে তারা সকাল নটা থেকে বেঞ্চ নিয়ে বসেছিল। যদি সেদিন দৈবাৎক্রমে বড় ভ্যান এসে পড়ত, তবে এই বেঞ্চগুলো টেনে নিয়ে উঠোন পর্যন্ত যাওয়া হোত এবং ভ্যানটি থামলেই ভ্যানের পাশের ও পেছনের জানলার দিকে বেঞ্চ ও টুল রাখা হোত। যে দুজন যুবকের ভ্যানের ভিতরের লোক-দের পিস্তল দেখিয়ে কমান্ড করার কথা ছিল, তারা চট্ করে এই বেঞ্চ ও টুলে দাঁড়িয়ে কমান্ড করত। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হোল না। ছোট ভ্যানটি এসে দাঁড়াল। নীচে দাঁড়িয়েই ভ্যানের ভিতরটা সব দেখা যায়। ভ্যান দাঁড়ানো মাত্রই তাদের

কাজ শুরু হয়ে গেল। দুটি রোড ব্লক দিয়ে চাকা জাম করে দিল, আর দুটি চাকাও পাংচার করে দিল। সামনের সীটে ড্রাইভার ও তার পাশে একজন বন্দুকধারী সেপাই ছিল। আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন সেপাইকে গুলি করল, যদিও তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল—'বিনা প্রয়োজনে কাউকে গুলি করবে না।' তাদের স্পষ্টই বলা হয়েছিল যেন একজন কমান্ড করে এবং সেই কমান্ড যেন সরকারীপক্ষের পুলিশ ও পোস্ট অফিসের কর্মচারীরা বুঝতে পারে। কিন্তু সেখানে এমনই একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা সবাই মিলে বলছিল, 'বন্দুক ফেলে দাও, চুপ করে থাক, ভয় পেও না, পালাতে চেষ্টা কর না' ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে ড্রাইভারের সীটের বাঁ পাশ থেকে ফায়ার হল। সেপাইটি বন্দুক ফেলে সেখানেই ভয়ে পড়ে রইল। ক্যাশিয়ারবাবু তার বন্দুকটি তুলে নিয়ে ভ্যানের পেছনের দিকে ডাকাতদের লক্ষ্য করে বন্দুকের ট্রিগার টিপলেন। বেপরোয়া একটা গুলি ছুটলো। আশ্চর্য! নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল একজন ডাকাত। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি গুলি এসে আঘাত করল ক্যাশিয়ার বাবুকে। ক্যাশিয়ার বাবুর হাতের বন্দুক খসে পড়ল। তারা একটি ভারী ট্রাঙ্ক ভ্যান থেকে বার করে আনল। বিভিন্ন পোস্ট অফিসে টাকা ডেলিভারী দেওয়ার জন্য এই ট্রাঙ্কে টাকা ভর্তি ছটি ব্যাগ ছিল। পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে দেওয়ার জন্য একটি বড় ব্যাগ আলাদা করে রাখা ছিল। গার্ডরক্ষী টাকাগুলি নামাল কিন্তু বড় ব্যাগটা নামাল না। গুলি করা, সবই একসঙ্গে হোচামোচি করা, ব্যাগ ফেলে আসা—এ সবই স্নায়বিক দুর্বলতার কারণে ঘটল। তাদের যদি মাথা ঠাণ্ডা থাকত ও সুশৃঙ্খলভাবে গার্ডটিকে ঘেরাও করে সুনির্দিষ্টভাবে কমান্ড করত তবে দেখতে পেত সবই কাজ হয়েছে এবং ভ্যানের ভিতরের ক্যাশিয়ারবাবু সেপাই-এর পরিত্যক্ত বন্দুক নিয়ে গুলি ছুঁড়তেও পারতেন না। আর ড্রাইভারের পাশে যে সেপাই বন্দুক নিয়ে বসেছিল সে-ও বন্দুক ফেলে পালাতে পারত না ড্রাইভারও পালিয়ে যেতে পারত না। পুলিশ এইসব কথাই আমার কাছে ব্যক্ত করে, তবু সামান্য একটি বেসুরো ছড়ি নিয়ে অনেক গবেষণা করেও সেইটির তাৎপর্য উদ্ধার করতে পারেনি কেন ছড়িটি বানানো হয়েছিল? বন্দুক নয় পিস্তলও নয় সামান্য একটি ছড়ি। এইটির বিশেষ তাৎপর্য আমি তাদের মুখে শুনেছিলাম। তারা একটি আচমকা সমস্যার কথা ভেবে খুব গবেষণা করে এই ছড়িটির ব্যবস্থান ডাকাতদের পক্ষে ভয় হয়ে দাঁড়াত ভীষণ এক সমস্যা। দরজা ভাঙতে হোত। সেইজন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। হ্যামার দিয়ে আঘাত করে কো-বার (বেল লাইন তোলার যন্ত্র) দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া পাঁচ ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি বিস্ফোরক দ্রব্য ভর্তি লোহার পাইপটি দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক সুইচের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটালে দরজা ভেঙ্গে চুরমার হোত। এই বিরাট আয়োজনের বদলে কেবল একটি ছড়ি দিয়ে যদি সময়মত কাজ করা হয়, তবে এই সমস্ত গুরুদায়িত্ব এড়ানো যায়। আক্রমণ করার পূর্ব মুহূর্তে এবং কমান্ড করার সঙ্গে সঙ্গে একজন ঐ খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ঐ ছড়িটি গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়ে দেবে, তাহলে যতই দরজা টানুক না কেন দরজা বন্ধ করা আর সম্ভব নয়। কাজেই এই একটি সামান্য ছড়ির সময়মত ব্যবহার একেবারে অপরিহার্য ছিল। সেইজন্য তারা আগে প্র্যাকটিশও করে। পুলিশ হতভম্ব হয়েছিল। এই ছড়িটির অর্থ তারা খুঁজে পায়নি; কারণ ব্রিটিশ আর্মি ম্যানুয়েলে এইসবের উল্লেখ নেই। গেরিলা যুদ্ধে এই জাতীয় তুচ্ছ জিনিসকেও কাজে লাগানো হয়।

বিপ্লবী ডাকাতরা যখন ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন রক্তাক্ত দেহে পড়ে থাকা ক্যাশিয়ারবাবুকে দেখে মনে করেছিল তিনি হয়ত আর বাঁচবেন না। বড় রাস্তার ধারে তাদের গাড়ী রেডি ছিল। টাকা ভর্তি বড় ভারী ট্রাঙ্ক গাড়ীর পেছনে ক্যারিয়ার বকসে তুলল। গার্ডদের দুটো টেন শট ম্যাগাজীন রাইফেল নিয়ে আসতে তারা ভুল করেনি। ড্রাইভার আগে থেকেই গাড়ীতে বসে ছিল। আরও পাঁচজন গাড়ীতে উঠল। তারা ছয়জনই খুব কায়দা করে বসেছিল। পিছনের সীটের মাঝের ছেলেটি পিস্তল হাতে হাঁটু গেড়ে পিছনের দিকে মুখ করে বসে। তার পাশের দুজন একজন ডানদিকে আর একজন বাঁদিকে মুখ করে রিভলবার হাতে বসেছিল। ড্রাইভারের পাশে যে দুজন ছিল, তার একজন বাঁদিকে এবং অপরজন সামনের দিকে ও ডানদিকে লক্ষ্য রাখছিল। তাদের রুট ছিল ডানদিক ঘুরে ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে যাওয়া অফিস টাইম। দুদিক দিয়েই ক্রমাগত গাড়ী চলছে। কিন্তু গাড়ী সব থামিয়ে দিয়ে ডানদিক দিয়ে তাদের ঘুরতেই হবে।

পেছনের সীটে ডানদিকে যে ছিল, সে রিভলবার বার করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'গাড়ী থামাও।' সামনের সীটে যে বাঁদিকে [illegible] রিভলবার বার করে গেল। তবু তারা প্রস্তুত ছিল যদি আচম্বিতে সামনের ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে কোন পুলিশ ভ্যান আসে। সেইরূপ ক্ষেত্রে তারা ট্রাফিক আইন ভেঙ্গে ত্রিকোণ পার্কের ফুটপাথের উপর দিয়ে পূর্ব দিকে গিয়ে আবার দক্ষিণ দিকে বেঁকে বেরিয়ে যাবে। এই যুদ্ধনীতি আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। রামায়ণ-মহাভারতেও হয়েছে, আর হিটলারও বেলজিয়ামের নিউট্রালিটি মানেননি। 'আতুরে নিয়ম নাস্তি'। যাই হোক সেইদিনের সব লক্ষণই বিপ্লবীদের অনুকূলে ছিল।

তাদের প্রায় দশ-পনের বছর পরে প্রথম এই অভিযান বেশ সাফল্যমণ্ডিত হল। গাড়ীটি ছিল ল্যান্ডমাস্টার। তাতে বেশ কিছু ডিফেকটও ছিল। গাড়ীটি সাধানো হয়নি। ভাল গাড়ী যেটি ছিল, এই ডাকাতির একদিন আগে সেটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কাজেই সেটি অকেজো হয়ে ছিল। ঐদিন যদি ডাকাতি করতে হয় তবে সেই গাড়ীটি ব্যবহার করা অসম্ভব। কিন্তু তবু তারা নির্দিষ্ট দিনটি পরিবর্তন করল না। অনেক ডিফেকট থাকা সত্ত্বেও তারা ল্যান্ডমাস্টারটি নিয়ে গেল। যদি এই গাড়ীটি হঠাৎ অচল হয়ে পড়ত, তবে তার পরিবর্ত হিসাবে একটি প্রাইভেট ট্যাক্সির তাদের উদ্ধার করত। সেইজন্য একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি তারা আগে আগে থেকে ভাড়া করে রেখেছিল। যে গাড়ীটি ভাড়া করেছিল, সে একজন সুদক্ষ ড্রাইভার। যে পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তার হাতে ট্যাক্সি চালাবার জন্য নতুন গাড়ীটি ছেড়ে দিল, তার পূর্বে পরিচয় তিনি জানতেন। যদি এই গাড়ীটি ঘটনাস্থলে কোন কারণবশতঃ ধরা পড়ত বা যে ট্যাক্সি চালাবার জন্য এই গাড়ীটিকে নিয়ে এসেছিল সে ধরা পড়ত তবে তার সূত্রে পুলিশ দলের অন্যদের ধরে ফেলত। তবুও মনের ভাল, স্পটে ধরা না পড়ার জন্য শেষপর্যন্ত এই নতুন গাড়ী ব্যবহার করার রিস্ক তারা নিয়েছিল।

(চলবে)

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন
কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট

বাংলার বাইরে বাঙালী

সাহিত্যিকার প্রয়াস

বোম্বাইয়ে বাংলাভাষা প্রচারের ক্ষেত্রে যেসব সংস্থা রয়েছে, তার মধ্যে 'সাহিত্যিকা' অন্যতম। এটি শান্তিনিকেতনের লোক-শিক্ষা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত। এখানে দু' বছরের পাঠ্যক্রম চালু আছে। এরপর সর্বভারতীয়ভাবে সরাসরি শান্তিনিকেতন থেকে বাংলা পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সংস্থাটি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ 'সাহিত্যিকা'র প্রতি কিছু বেশি বলে মনে হয়।

১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাই শহরে এই সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার মূলে উদ্দেশ্য বোম্বাই শহরে নানা প্রাদেশিক ভাষার প্রসার করা। প্রথম এটি ডাঃ বিপিন কে গান্ধীর সৌজন্যে মাতুঙ্গার বালোদ্যান কেন্দ্রে শুরু হয়। সাহিত্যিকার কার্যকারিতা দেখে ক্রমশঃ বোম্বাইয়ের অন্যান্য অংশেও এর শাখা খোলা হয়। স্থানীয় অনেক স্কুলেরই কর্তৃপক্ষ বিনা ভাড়ায় তাঁদের বিদ্যালয়ের ঘর ব্যবহার করতে দিয়ে সাহায্য করেছেন। বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটিও এ-ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখিয়েছে।

শুধু পড়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখাবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সঙ্গীত শিক্ষকতায় যাঁরা ব্রতী, তাঁদের মধ্যে আছেন—সর্বশ্রী শ্যামল গুহ, গায়ত্রী গুহ, কুমারী ঋতু গুহ, ডাঃ সুবীর কর, বি পি মাদগাওকার, নলিনী মাদগাওকার প্রভৃতি। সাহিত্যিকা নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে বোম্বাইবাসীদের আনন্দ দিয়ে থাকেন। এছাড়া খ্যাতনামা সাহিত্যিক অথবা গায়ক-গায়িকাদের দিয়েও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

সাহিত্যিকাকে সাফল্যমণ্ডিত করার পিছনে বহু ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং সহযোগিতা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন সলিল ঘোষ। ইনি সংস্থার জন্ম-মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ডাঃ ভি এন আইয়ার, সাহিত্যিকার সেক্রেটারি, বলতে গেলে তিনি এই সংস্থার স্তম্ভস্বরূপ। যাঁদের সহৃদয় সহযোগিতা ভিন্ন এই সংগঠনের কাজ কখনই বাস্তবে রূপায়িত হতো না, তার মধ্যে রয়েছেন—লীলাধর শাহ, জে এন পারিখ, কে সি ব্যাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কোন বেতন গ্রহণ করা হয় না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই এখানকার শিক্ষকরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আনন্দের বিষয় এই যে, এই সংস্থারই অনেক প্রাক্তন ছাত্র এখানে শিক্ষকতা করছেন। অতি যত্নসহকারে নবাগতদের বাংলা শেখায় সাহায্য করে থাকেন। এঁদের মধ্যে রাজা মালাপকার, কে ডি ভাট, ওজিয়ের নাম অগ্রগণ্য।

তবে দুঃখের বিষয়ও কিছু আছে, সেটি এই যে, লক্ষাধিক বাঙালী অধ্যুষিত বোম্বাই শহরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে খুব কম সংখ্যক বাঙালীই এখানে শিক্ষাদানের জন্য এগিয়ে আসেন। যদি বাঙালীরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতেন, তবে বাংলাভাষার প্রসার আরও অনেক বেশি হতো। আশা করব ভবিষ্যতে তেমন দিন আসবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সাহিত্যিকার নৃত্যানুষ্ঠান

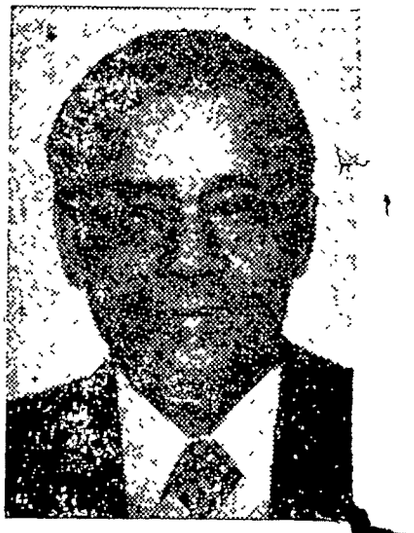

শিশিরকুমার মিত্র

সায়নামাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীশিশিরকুমার মিত্র অরগানাইজেসন অফ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডিউসার্স অফ ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। এই নিয়ে পর পর তিন বছর শ্রীমিত্র এই পদের জন্য নির্বাচিত হলেন। সংশ্লিষ্ট শিল্পে গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ এবং নিয়োজিতপ্রাণ এই মানুষটি একজন খাঁটি জাতীয়তাবাদী। তিনি দৃঢ়-ভাবে বিশ্বাস করেন, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অথবা সরকার যে-কোন নীতি, লক্ষ্য অথবা কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করুন না কেন তা অনিবার্যভাবেই প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের অভিমুখী হওয়া উচিত।

শিল্প সংগঠনের একজন মনোযোগী ছাত্র এবং গ্রন্থপ্রেমী শ্রীশিশিরকুমার মিত্র খেলাধূলা, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং অভিনয় বিষয়েও যথেষ্ট আগ্রহী।

খেলা

বেটন কাপ

১৯৭৮ সালের বেটন কাপ হকি ফাইনালে মোহনবাগান ০—০ ও ১—০ গোলে দিল্লীর সেন্ট্রাল বিজার্ভ পুলিশ ফোর্সকে হারিয়ে একই বছরে প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেতাব এবং বেটন কাপ জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, গত বছরও মোহনবাগান লীগ ও বেটন কাপ—এই দ্বিমুকুট সম্মান লাভ করেছিল। এই নিয়ে মোহনবাগান ১৫ বার বেটন কাপের ফাইনালে খেলে বেটন কাপ জয়ী হল ১৩ বার—এর মধ্যে পাঁচ বার টস যুগ্মভাবে। অপর দিকে সি আর পি এস এই নিয়ে দুবার ফাইনালে খেলে দুবারই রানার্স আপ হল।

ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে প্রথমার্ধের খেলার ১৫ মিনিটের মাথায় মোহনবাগানের ইনসাইড লেফট ইজাজ হোসেন দলের জয়সূচক গোলটি করেন।

মোহনবাগান ১৩ বার বেটন কাপ জয়ী হয়ে সর্বাধিকবার কাপ জয়ের রেকর্ড করেছে। পূর্ব রেকর্ড ছিল ১২ বার—ক্যালকাটা কাস্টমসের। এবার নিয়ে মোহনবাগান ৮ বার একই বছরে লীগ ও বেটন কাপ জয়ী হল। এটাও রেকর্ড।

প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি মোটেই উচ্চ মানের হয় নি। খেলার প্রথমার্ধে মোহনবাগান এবং দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লীর সি আর পি এফ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এইদিনের খেলায় নায়ক ছিলেন মোহনবাগানের গুরুবক্স সিং। প্রথমার্ধের [illegible] ২৬ মিনিটে মোহনবাগান পেনাল্টি স্ট্রোক পেয়েও গোল করতে পারে নি। এই পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল হলে মোহনবাগান এক গোলে এগিয়ে যেত. পেনাল্টি স্ট্রোক মারতে সিদ্ধহস্ত মোহনবাগানের ডেস পেজ বলটি বাইরে পাঠান. উভয় দলই কয়েকটি করে পেনাল্টি কর্ণার পেয়েও গোল করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত ফাইনালের প্রথম পর্বের খেলা গোলশূন্য ড্র যায়।

সেমি-ফাইনাল

দ্বিপাক্ষিক সেমি-ফাইনাল খেলায় গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ০—০ ও ৩—১ গোলে ত্রিতীয় হকির যুগ্ম-বিজয়ী দিল্লীর ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সকে এবং সেন্ট্রাল বিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (দিল্লী) ০—০ ও ১—০ গোলে জলন্ধরের আর্মি সার্ভিস কোরকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

মোহনবাগান বনাম ইন্ডিয়ান এয়ার-লাইন্স দলের প্রথম পর্বের সেমি-ফাইনাল

কাপ হাতে জেনিংস

খেলাটি গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয় পর্বে মোহনবাগান ৩—১ গোলে জয়ী হয়। খেলা শুরু হওয়ার প্রথম মিনিটেই ইজাজ হোসেন গোল দিয়ে মোহনবাগানকে ১—০ গোলে এগিয়ে দেন। খেলার দশ মিনিটের মাথায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সুরজিৎ সিং গোলটি শোধ দিলে খেলার ফলাফল সমান ১—১ দাঁড়ায়। খেলার ২৫ মিনিটের মাথায় বুলবীর সিং গোল দিলে মোহনবাগান ২—১ এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে মোহন-বাগান একটির বেশী গোল দিতে পারে নি।

মোহনবাগানের পক্ষে বীরেন্দ্র বাহাদুর পেনাল্টি কর্ণার থেকে তৃতীয় গোলটি দেন। অপর দিকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এক সময় একটানা আক্রমণ চালিয়ে যে একাধিক পেনাল্টি কর্ণার পেয়েছিল তা থেকে একটাও গোল দিতে পারে নি।

দিল্লীর সেন্ট্রাল বিজার্ভ পুলিশ ফোর্স বনাম জলন্ধরের আর্মি সার্ভিস দলের প্রথম পর্বের সেমি-ফাইনাল খেলা গোলশূন্য ছিল। এই দুই দলের সাদামাটা খেলার জলন্ধর দলের যা সামান্য কিছু প্রাধান্য ছিল। জলন্ধর দল কাগজে-কলমে বেশ শক্তিশালীই ছিল—তিনজন বিশ্ব কাপ হকির খেলোয়াড় এবং দুজন প্রাক্তন অলিম্পিক খেলোয়াড় দলে ছিলেন। এই দুই দলের দ্বিতীয় পর্বের সেমি-ফাইনাল খেলা প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভের তিন মিনিটের পর বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় আর্মি দল ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। এই গোলটা দিয়ে-ছিলেন প্রাক্তন অলিম্পিক খেলোয়াড় হরচরণ সিং প্রথমার্ধের খেলার পঞ্চম মিনিটে। এইদিন আর্মি দল খেলেছিলেনও খুব ভাল। কিন্তু তাদের কপাল মোটেই ভাল ছিল না। দ্বিতীয় পর্বের পুনরায়োজিত খেলার আর্মি দল ০—১ গোলে হেরে যায়। প্রথমার্ধের ১৯ মিনিটে সেন্ট্রাল বিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের জয়সূচক গোলটি করেন এস এস ম্যান।

কোয়ার্টার ফাইনালের আটটি দলের মধ্যে স্থানীয় দল ছিল এই তিনটি—মোহনবাগান, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং ক্যালকাটা রেঞ্জার্স। অপর দিকে বহিরাগত দল ছিল এই পাঁচটি—দিল্লীর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও সেন্ট্রাল বিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, জলন্ধরের আর্মি সার্ভিস কোর ও কোর অব সিগন্যালস এবং বোম্বাইয়ের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান ইন্ডিয়ান নেভী। কোয়ার্টার ফাইনালে জলন্ধরের কোর অব সিগনালসকে ৪—০ গোলে মোহন-বাগান হারিয়েছিল। মোহনবাগানের এই চারটি গোলের মধ্যে ২০ বছরের বাইট ব্যাক বীরেন্দ্র বাহাদুর পেনাল্টি কর্ণার থেকে পর পর তিনটে গোল দিয়ে হ্যাট-ট্রিক করার গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের বেটন কাপ হকি প্রতি-যোগিতায় এই একটাই হ্যাট-ট্রিক।

১৯৭৮ সালের বেটন কাপ হকি প্রতি-যোগিতায় গত বছরের রানার্স-আপ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে এবং এ বছরের কলকাতার প্রথম বিভাগের হকি লীগের রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল অংশগ্রহণ করেনি।

পংকজ গুপ্ত কাপ

১৯৭৮ সালের স্কুল হকি প্রতি-যোগিতার ফাইনালে খালসা স্কুল ১-০ ও ২-০ গোলে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলকে হারিয়ে পংকজ গুপ্ত কাপ জয়ী হয়েছে।

সেমি-ফাইনালে খালসা স্কুল ৩—১ ও ৭-০ গোলে খালসা ইংলিস স্কুলকে এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল ১২ ও ৩-০ গোলে গত বারের বিজয়ী কিশোর ভারতীকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

দর্শক

পুরোভাগে বাংলার গৃহবধূ

ভারতে রাইফেল সুটিংয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিচ্ছেন মেয়েরা। এই তো কিছু দিন আগে, আমেদাবাদে বসেছিল সর্বভারতীয় রাইফেল সুটিংয়ের আসর। সেখানে .২২ ফ্রি রাইফেল থ্রি পজিশনে প্রায় ৫০ জন পুরুষ-মহিলা প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ান হলেন বাংলার গৃহবধূ শ্রীমতী রীতা সিংহ। নজিরটি নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের, কারণ এর আগে আর কোন মহিলা এই ইভেন্টে বিজয়ী হতে পারেননি। মোট ১২০০ পয়েন্টের মধ্যে রীতা পেয়েছেন ১০৭০ পয়েন্ট। এই বিভাগে রেকর্ড আছে ইণ্ডিয়ান নেভীর সুশীল রায়চৌধুরীর, ১১০১ পয়েন্টের। আমেদাবাদের এই আসর থেকে রীতা কলকাতায় নিয়ে এসেছেন ১১টি স্বর্ণপদক, ১১টি রৌপ্যপদক এবং ব্রোঞ্জ ৩টি। এতগুলো পদকপ্রাপ্তি ছাড়াও রীতা এশীয় ক্রীড়া এবং এডমন্টনের কমনওয়েলথ গেমসের জন্য কোয়ালিফাই করেছেন। এপ্রিলে হিমাচল প্রদেশের নাহালে যাচ্ছেন রীতা সতীর্থ স্যুটারদের সঙ্গে উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য।

আমেদাবাদে রীতা ছাড়াও আর এক বাঙালী মহিলা বাংলার বিজয়কেতন উড়িয়েছেন। তাঁর নাম শ্রীমতী গীতা রায়। গীতা রায়ের নামটি অবশ্য সর্বভারতীয় সুটিংয়ে নতুন নয়। বিগত সাতাশ বছর ধরেই উনি নিত্য-নতুন নজির গড়ে চলেছেন।

১৯৫২ সাল থেকেই গীতা রায় জাতীয় সুটিংয়ে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করছেন। কায়রোতে বিশ্ব সুটিং এবং কোরিয়াতে এশীয় সুটিং বেঙ্গে বন্দুক হাতে এই বাঙালী মহিলা বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন এর আগে। আমেদাবাদের সাম্প্রতিক আসরটি থেকে গীতা এনেছেন ৭টি সোনা, ৭টি রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক। অবশ্য সোনা, রুপো অথবা ব্রোঞ্জ পাওয়া নতুন নয় গীতার কাছে। বাড়ীতে অন্ততপক্ষে ৪টি কিটব্যাগ ভর্তি পদক আছে, ওঁর ২৭ বছরের সুটিং জীবনের স্বীকৃতিগুলিকে সযত্নে রেখে দিয়েছেন। আলমারীতে আছে অসংখ্য ট্রফি। স্বর্ণপদকগুলির কয়েকটি দিয়ে শ্রীমতী রায় একটি হারই বানিয়ে ফেলেছেন।

শ্রীমতী গীতা রায় এবং ওঁর স্বামী দিব্যনাথ রায় শুধুমাত্র গান লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ১৯৫১ সালে দক্ষিণ কলকাতার পুলিশ বেঙ্গের সভ্য হন, মধ্যেই সুটিং মস কেড়ে নেয় শ্রীমতী রায়ের সেই সময় ফোর্ট উইলিয়ামে একটি সুটিং প্রতিযোগিতা হত। সেখানে ট্রান্সপোর্ট স্পোর্টস দলের কিছু ইংরেজ মহিলা সভ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, এঁদের হারাতে হবে —এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে গীতা রেঞ্জে নেমে-

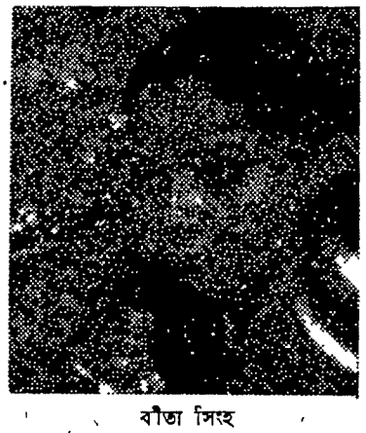

রীতা সিংহ

ছিলেন। হারিয়েও ছিলেন। স্পোর্টিং ইংরেজ মহিলারা গীতাকে কাঁধে নিয়ে রেঞ্জে ঘুরেছিলেন। সেদিনের সেই ছবিটি আজও শ্রীমতী রায়ের অ্যালবামে সযত্নে রক্ষিত। সেই শুরু, তারপর শুধু সাফল্য, সাফল্য আর সাফল্য। এখন ৫১ বছর বয়সেও শ্রীমতী রায় সুটিংয়ে সমান উৎসাহী। বললেন,—যতদিন পারব চালিয়ে যাব, সুটিং যে আমার প্রাণ।

যে রীতা সিংহ আমেদাবাদে রাইফেল সুটিংয়ে পুরুষদের আধিপত্য খর্ব করেছেন, তিনি কিন্তু কিছুদিন আগেও বন্দুকের শব্দ শুনলে কানে আঙুল দিতেন, ভয়ে চোখ বুজে ফেলতেন। সুটিংয়ে হাতেখড়ি বিবাহোত্তর জীবনে, মাত্র ৬ বছর আগে ১৯৭২ সালে। বাড়ীতেই রাইফেল রেঞ্জ। স্বামী দেবাশিস সিংহ নামী স্যুটার। স্বামীকে দেখেই রীতা রাইফেল স্যুটিংয়ের অনুপ্রেরণা পান। বেলগাছিয়া ভিলায় বাড়ীর রেঞ্জে মাত্র ১৩ দিন অনুশীলন করে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর রীতা গেলেন গোমিয়ায় ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া সুটিং প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে নন-স্যুটার হিসেবে। প্রথম প্রতিযোগিতাতেই ভিনি-ভিডি-ভিসি। এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। গোমিয়ার ওই আসরে মহিলাদের ফ্রি রাইফেল ইংলিশ ম্যাচ প্রোন পজিশনে মহিলাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হলেন নবীন রীতা। গোমিয়াতেই নিজের রাস্তা খুঁজে পেলেন। কলকাতায় ফিরে রীতা স্যুটিংয়ে মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। পাশে থাকলেন স্বামী দেবাশিস সিংহ, ধরিয়ে দিলেন ভুল-ত্রুটিগুলো। রীতা সিংহ ১৯৭৪ সাল থেকেই মহিলাদের কোন না কোন বিভাগে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। ৭৫য়ে স্ট্যাণ্ডিংয়ে মহিলাদের স্টাণ্ডার্ড রাইফেল জাতীয় রেকর্ডের অধিকারী। ১৯৭৬য়ে ২২ ফ্রি রাইফেল থ্রি পজিশনে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে তৃতীয় স্থান পেলেন রীতা, তারপর এবার, ১৯৭৮য়ে এই অনন্য নজির।

স্কুল-কলেজে থাকার সময় কুস্তি ছাড়া সব খেলাধুলো ভাল লাগলেও কোন স্পোর্টসকেই সিরিয়াসলী নেবার কথা ভাবেননি রীতা। ছবি আঁকতেন, গান শিখতেন দিবেন মুখার্জির কাছে। তুলি-ধরা হাতে এখন শোভা পায় রাইফেল। অবশ্য ছবি আঁকাও চলছে। স্বামী দেবাশিস পারিবারিক বন্ধু দীপংকর ধাড়া আর রেঞ্জের আলী অকুণ্ঠচরণ বাউথের সজাগ দৃষ্টি রীতার ওপর। দিন ৬ ঘন্টা অনুশীলন। অনুশীলনে অবশ্য মাঝে মাঝেই অসুবিধা হয়, কারণ মেয়ে দেবারতি বড় হচ্ছে। ওর দিকে নজর দিতে হয়, তবু, রীতা বললেন, বেঞ্জে গিয়ে যখন রাইফেল ধরি, তখন আমি অন্য মানুষ—অন্য রীতা।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

সর্বভারতীয় গ্রামীণ সাঁতার

দিল্লীতে পঞ্চম সর্বভারতীয় গ্রামীণ প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলার সাঁতারুরা বালক ও বালিকাদের দলগত ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় এগারোটি রাজ্যের ৯৫ জন সাঁতারু অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু মাত্র পাঁচজন সাঁতারু ১০টি নতুন রেকর্ড করে বালিকা বিভাগে ৭টি এবং বালক বিভাগে ৩টি। বালিকারা নতুন রেকর্ড গড়ার ব্যাপারে বালকদের থেকে এগিয়ে থাকে।

বালক বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পশ্চিম বাংলার ১৩ বছরের বালক হেমন্ত কুমার দেবনাথ। তার পয়েন্ট সংখ্যা ৪২। সে ৬টি বিভাগে প্রথম স্থান পেয়ে মাত্র একটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করে। অন্য দিকে বালিকা বিভাগে পশ্চিম বাংলারই ১৩ বছরের কিশোরী ছন্দা দেচৌধুরী ৫২ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে ব্যক্তিগত চাম্পিয়ান হয়। সে সাতটি বিভাগে প্রথম হয়ে চারটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করে।

দলগত বিভাগ

চাম্পিয়ান ও রাণার্স

বালক বিভাগ : ১ম পশ্চিম বাংলা (১৩০ পয়েন্ট) ২য় ত্রিপুরা (৬২ পয়েন্ট)

বালিকা বিভাগ : ১ম পশ্চিম বাংলা (১২০ পয়েন্ট) ২য় কেরালা (৩৭ পয়েন্ট)

জাতীয় সাব-জুনিয়ার ফুটবল

কোয়েম্বাটুরে আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় সাব- জুনিয়ার ফুটবল প্রোতিযোগিতার ফাইনালে কর্ণাটক ৬—০ গোলে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে। কর্ণাটক প্রথমার্ধের খেলায় ৪—০ গোলে এগিয়েছিল

চিত্রধ্বনি

বহুরূপী : ৩০

পয়লা মে, ১৯৭৮। 'বহুরূপী' তিরিশ পেরিয়ে একতিরিশে পা দিল। এই তিরিশ বছরে বহুরূপী চুয়াল্লিশটি প্রযোজনা করেছে।

নাট্যজগতের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রথম চেষ্টা করে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ—যার নেতৃত্বে ছিলেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পি-বৃন্দ। পরে নানা কারণে গণনাট্য সংঘে সংকট দেখা দেয়। অনেক শিল্পী সংঘ থেকে বেরিয়ে আসেন। শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র প্রভৃতি মিলে 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠা করেন। এর মূল সংগঠক অবশ্যই ছিলেন শম্ভু মিত্র। এর পরে অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম হয়। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ক্রমে প্রসারিত হয়। এই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পথিকৃৎ 'বহুরূপী'। তাই গৌরবের সঙ্গে তিরিশ বছর পার হওয়া, এ শুধু একা 'বহুরূপী'র গর্বের কথা নয়, সব নাট্যগোষ্ঠীরই আনন্দের কথা। এবং আশারও কথা। নাট্যদলগুলির সামনে হতাশার কারণ তো কম ছিল না কোনো দিনই, কম নয় আজও। হতাশার প্রবল কারণগুলিকে ভেদ করে একটা দল যে এতা দূর এগোতে পারল, এই ঘটনাই অন্য দলকে সাহস দেবে, লড়বার ক্ষমতা দেবে।

তিরিশ বছর পূর্তির উৎসব-অনুষ্ঠানে ছিল : (১) রাজা ও দশচক্রের অভিনয়; (২) একটি প্রদর্শনী; (৩) পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ।

এখন শম্ভু মিত্র অভিনীত নাটকের টিকিট কেনার জন্য অবিশ্বাস্য রকমের ভিড় হয়। এবারেও তা হয়েছে। রবিবার সকালে কাউন্টার খোলার কথা, কিন্তু শনিবার দুপুর থেকেই লাইন দেওয়া শুরু হয়। রবিবার লোকের চাপ এতই বাড়ে যে ঐখানেই আর একটি দশচক্রের শো (৭ মে) ঘোষণা করতে হয়।

২৯ এপ্রিল, শনিবার সন্ধ্যে ছটার সময় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় অ্যাকাডেমিতে। সত্যজিৎ রায়, অন্নদাশংকর রায় এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রথম দিন প্রদর্শনী দেখতে আসেন। এখানে 'বহুরূপী'র তিরিশ বছরের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় খুবই শিল্প সম্মতভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চুয়াল্লিশটি প্রযোজনার ছবি—তিনটি দশকে ভাগ করে—এখানে রাখা ছিল। প্রতিটি প্রযোজনার সঙ্গে প্রকাশিত ফোল্ডার এবং নানা উপলক্ষে প্রকাশিত অনেকগুলি সুভেনির প্রদর্শিত হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পত্র-পত্রিকার সমালোচনা একটি জায়গায় সংরক্ষিত ছিল। আর ছিল এগারোটি সেট-এর মডেল। এখনকার দর্শকরা অনেকেই 'উলুখাগড়া' বা 'ছেঁড়া তার' দেখেন নি। তাঁরা অন্তত সেট-এর একটা ধারণা এখানে পেলেন। একটি পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে যে চুয়াল্লিশটি প্রযোজনারই মডেল থাকলে ভাল হোতো। তা হোতো। কিন্তু সেটা বিরাট খরচের ব্যাপারও হয়ে পড়ত। আর প্রদর্শনী শেষে সেগুলি রাখারই বা কি ব্যবস্থা হোতো? এই এগারোটা মডেল নিয়েই সমস্যা আছে। এগুলি রাখার জায়গা কোথায়? কোনো স্থায়ী মঞ্চ-মিউজিয়মে বা কোনো শিক্ষালয়ে এগুলি রাখলে মডেলগুলি থাকবে, নয়তো ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে। এই বিশেষ আকর্ষণীয় ও মূল্যবান মডেলগুলি প্রদর্শনীর পরেও রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। প্রদর্শনীতে বড় বড় করে লেখা ছিল 'বহুরূপী'র আদর্শ—তাঁরা ভালো নাটক ভালো করে করতে চান। সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বসম্পন্ন নাটক করতে চান।

'বহুরূপী' পত্রিকার এ যাবৎ ৪৯টি সংখ্যা বেরিয়েছে। সেগুলিও এখানে রাখা ছিল। পয়লা মে-তে এবার যে বিশেষ সংখ্যাটি (৪৯তম সংখ্যা) বেরোলো, সেটি কিন্তু 'বহুরূপী'বিষয়ক নয়, বিজন ভট্টাচার্য ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র স্মরণে বিশেষ সংখ্যা।

৩০ এপ্রিল ও পয়লা মে অভিনীত হোলো 'রাজা' ও 'দশচক্র'। 'রাজা'য় এবার বহুদিন পরে বাঞ্ছারামের ভূমিকায় অভিনয় করলেন অমর গাঙ্গুলি। 'দশচক্রে'ও অমলেন্দু গুহের ভূমিকা তিনি করেছেন। দীর্ঘকাল তিনি চাকরি উপলক্ষে কলকাতার বাইরে ছিলেন। এখন কলকাতায়। অনেক দিন পরে দর্শকরা তাঁকে মঞ্চে দেখে খুশী হয়েছেন। 'দশচক্রে' হৈমর ভূমিকাতে ছিলেন নতুন শিল্পী গীতা চক্রবর্তী।

দু দিনই অভিনয়ের আগে বহুরূপীর পক্ষ থেকে দেবতোষ ঘোষ দর্শকদের স্বাগত জানান এবং তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

দু দিনই অভিনয়ের শেষে কয়েকটি কথা বলেন শম্ভু মিত্র। তিনি বলেছিলেন, 'বহুরূপীর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে আমাকে দু একটা কথা বলতে বলা হয়েছে। তিরিশ বছর হবে গেল বহুরূপীর। একটা প্রতিষ্ঠানের তিরিশ বছর টিঁকে থাকা কম নয়। আর শুধু টিঁকে থাকা নয়, হয়তো কিছু কাজও করেছে। বাঙালী তো শোনা যায়, বেশী লোক নিয়ে কাজ করতে পারে না। তবু যে করা গেল—তা আপনাদের সাহায্য ও ভালবাসা পাওয়া গেছে বলে। এখন এরা, নতুন ছেলেমেয়েরা, কাজ করবে। এরাও আপনাদের ভালবাসা পাবে আশা করব।—অবিশ্যি যদি ভালবাসার মতো কাজ করে। এক টুকরো জমি পেলে, একটা নিজেদের থিয়েটার হাতে পেলে, হয়তো আরো ভাল কাজ কিছু করা যেত, আরো নতুন কিছু করা যেত। তবে তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। ভাগ্যে যা দেয়, তার মধ্যে দাঁড়িয়েই যতটা সম্ভব কাজ করতে হয়। আমরাও এই যতটা পারলুম। আমরা যখন এই কাজ করতে আসি—অভিনয়ের ফাল্গুন, তখন তো এটা জেনেই আসি যে এ কাজের কিছু থাকে না। যখন অভিনয় করা হোলো, তখনই যা। এখন ভালো লাগল তো হোলো। নয়তো আর কোনো দিনই ভালো লাগানো যাবে না। অভিনয় তো ধরে রাখা যায় না, পরের প্রত্যাশাও কিছু থাকে না। এটা জেনেই আসা। তাই ভেতরে ভেতরে একটা দর্শনও গড়ে ওঠে। আমরা আর কি দিতে পারি আপনাদের। এই মুহূর্তের কিছু—এরা আপনাদের একটু ফুল দেবে।'

প্রথম দিন শম্ভু মিত্রের বক্তৃতার শেষে দর্শকদের অনুরোধে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হয়। দ্বিতীয় দিন আবৃত্তির দাবী ওঠেনি।

প্রত্যেক দর্শককে ঢোকবার সময় চাঁপা ফুল এবং বেরোবার সময় জুঁই ফুল দেওয়া হয়। ফুলের সৌরভ চিরকাল থাকে না। অভিনয়ও তাৎক্ষণিক।

'বহুরূপী'র সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনীর পথে।

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়

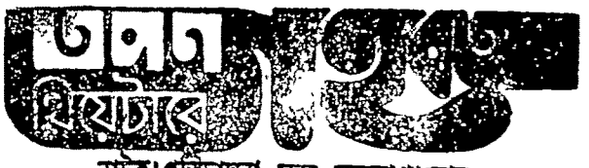

নাট্য-পরিচালনা : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেঃ- বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

কোথায়- নানা উত্তর হতে পারে। মঞ্চ-জগতের রুচি পাল্টেছেন তাঁরা। রবীন্দ্র নাটককে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা। সত্যিকার গভীর নাটক হয়তো একমাত্র তাঁরাই অভিনয় করেন। নাট্য প্রযোজনার মানকে প্রভূত উন্নত করেছেন তাঁরা। বাংলার তথা ভারতের নাট্যজগতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। সারা দেশের মঞ্চকর্মীরা তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।

এ সবই হয়তো সত্য। কিন্তু আজ পয়লা মে, আরো এক বছর আয়ু পেয়েছে, বেঁচে আছে 'বহুরূপী'। এই দিনে 'দশচক্র' দেখে বেরিয়ে এসে, মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা কথাই বেশি করে মনে হচ্ছে। 'বহুরূপী' বেঁচে আছে। 'বহুরূপী'র বেঁচে থাকাটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার। সব চেয়ে বড় আশ্চর্য, বেঁচে না থাকলে অনেক কথা লোকে ভালো করে জানতেই পারতো না। অনেক কাজ, যা করা হয়েছে তাও অজ্ঞাত থেকে যেত। যেমন, শম্ভু মিত্র বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'চার অধ্যায়' শুরুতে প্রচুর দর্শককে টানতে পারে নি, পেরেছিল কুড়ি বছর পরে। যদি 'বহুরূপী' বেঁচে না থাকতো ঐ কুড়ি বছর, তাহলে ঐ অত আগে করা 'চার অধ্যায়' কার্যত মূল্যহীন হয়ে যেত। সুতরাং বেঁচে থাকাটা ভীষন দরকার। কিন্তু 'বহুরূপী'র বেঁচে থাকাটা সহজ ছিল না।

অনেক রকমের বাস্তব বাধা এ কালে থাকে—সব নাট্যদলেরই আছে। 'বহুরূপী' একদম আদি দল বলে হয়তো এই অসুবিধা আরো বেশী ছিল। কিন্তু এ বাধার কথা আমি এই মুহূর্তে ভাবছি না। এর থেকেও বড় বাধা ছিল। 'বহুরূপী' কোনো ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে আপোষ করে নি। সে তার নিজস্ব স্বাধীন মত নিয়ে, যাকে সে সত্য বলে মনে করেছে তা নিয়ে, দাঁড়াতে চেয়েছে। এর চেয়ে শক্ত কাজ আর কিছু নেই আজকের জগতে। একাজ 'দশচক্রের' ডঃ পূর্ণেন্দু গুহও করতে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর ওপর পাওর ছোঁড়া হয়েছিল, চাকরি গিয়েছিল তাঁর নিজের ও কন্যা মঞ্জুর এবং শুভাকাঙ্ক্ষী সমরেশের, বাড়ী ছাড়তে হয়েছিল। ডঃ গুহ সেইসব কঠিন পাথুরে 'কালচারাল হেরিটেজ' জমিয়ে রেখেছিলেন। এই আক্রমণশীল 'হেরিটেজ' বহুরূপীর উদ্দেশেও কম বর্ষিত হয়নি। এই তিরিশ বছর ধরেই বর্ষিত হয়েছে: সেইসব বিস-দংশনে মৃত্যুই স্বাভাবিক, 'বহুরূপী'কে স্তব্ধ করে দেওয়াই ছিল দংশনগুলির লক্ষ্য। কিন্তু 'বহুরূপী' স্তব্ধ হয়নি। 'বহুরূপী' তিরিশ বছর ধরে মঞ্চে রয়েছে। কী করে হইল? ঐ যে ডঃ পূর্ণেন্দু গুহ বলেছেন— একা নিজের ওপর ভরসা রাখা—সাহস রাখা—। 'বহুরূপী' নিজের ওপর ভরসা রেখেছিল, সাহস রেখেছিল।

তাছাড়া আমাদের কালচারাল হেরি-টেজের অন্য একটা দিক আছে। 'দশচক্রের' ঐ সমরেশের মতো— যে নিজের চাকরি খুইয়েও নিজের বাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল 'দেশবৈরী' ডঃ গুহকে। 'বহুরূপী'ও এইরকম অনেক সমরেশকে তার চলার পথে পেয়ে গিয়েছে— যাঁরা অযাচিতভাবে সাহায্যের হাত ভাল-বাসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, ডঃ গুহ, প্রথম রাউন্ডের জিত আপনার হয়ে গিয়েছে।

এই মুহূর্তে পাথুরে 'কালচারাল হেরিটেজ'কে ভোলবার চেষ্টা করি। সমরেশের মতো 'কালচারাল হেরিটেজের' হাতটা চেপে ধরি—কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রোফাইলের নাটক : একটি প্রতিশ্রুতি

ক্যাবারে অধ্যুষিত কমার্শিয়াল নাটক আর অফিসপাড়ার বাৎসরিক বিনোদনকে বাদ দিলে বাংলাদেশের যে থিয়েটারটি অবশিষ্ট থাকে, সেই গ্রুপ থিয়েটারই এই ভূখণ্ডে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে নিজের শরীরে ধারণ করে আসছে এতকাল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান খরচের চাপে অস্তিত্ব বাঁচাতে তাদের নিজেদের মধ্যেও একটা অলিখিত প্রতিযোগিতা ঘোষণা হয়ে গেছে যেন। ফলে বিজ্ঞাপনের চটকে এ-বছরের সেরা, সর্ব-কালের শ্রেষ্ঠ, যুগান্তকারী এই জাতীয় বিশেষণ দেখতে দেখতে আমরা সবাই ক্লান্ত। অথচ বড় দলগুলিরও কারুরই প্রায় প্রযোজনার মান বিজ্ঞাপিত লক্ষ্যের মাইলের মধ্যেও পৌঁছতে পারে না। এই ডামাডোলের বাজারে মাঝে মাঝে দু-একটি ছোটখাট সংস্থার অবিজ্ঞাপিত ভাল নাটক দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করি, এটাই আশার কথা। প্রোফাইলের সাম্প্রতিক প্রযোজনা দুটি একাংক **আমি আমার বন্ধুরা** এবং **রাজা নিরুদ্দেশ** এরকম ছিমছাম প্রত্যাশা পূরণে সার্থক।

আমি আমার বন্ধুরা নাটকটির বিষয়-বস্তু সুন্দর। আমরা এবং আমাদের বন্ধুরা অনেকেই মানবদরদী সাজি, যা হয়তো সম্পূর্ণ ভালও নয়, তবে অনভিজ্ঞ ও পলকা। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে সামাজিক দায়িত্বের যে অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসে, তার নিষ্ফল পরিণতি এ-নাটকে সুকৌশলে বিন্যস্ত। তবে শুভ ইচ্ছারও তো দাম আছে, আমরা এবং আমাদের বন্ধুরা যেটুকু সমবেদনার সামিল হতে পারি তা হয়তো পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু সামান্য হলেও মূল্যবান। নাট্যকার দীপেন্দু চক্রবর্তীর শেষ মুহূর্তের ইঙ্গিতে এই কথাটাই ফুটে উঠে প্রেক্ষাগৃহে আমাদের কিছুটা সান্ত্বনা ও স্বস্তি দেয়। আর পরবর্তী নাটক **রাজা নিরুদ্দেশ**-এর আঙ্গিক এবং বিষয় যদিও অধুনা বাংলা নাটকে পরিচিত, তবু সৎ ও সাহসী প্রয়াস। সৎ কারণ স্ববিরোধ নেই, সাহসী কারণ একই ধরনের আরও দু-একটি বিখ্যাত প্রযোজনার পুনরাবৃত্তি এড়ানোর চ্যালেঞ্জ-এর সামনে, অন্তত থিয়েটার ওয়ার্কশপের **রাজরক্ত**-এর কাছ থেকে তো বটেই। দ্বিতীয় নাটকের নাট্যকার এবং দুটি একাংকেরই প্রয়োগকর্তা শ্রীবিদ্যুৎ নাগের পরিকল্পনা সুন্দর, তবে তাঁর সম্বন্ধে বরাবরই আমার ভয় যে, তিনি বর্তমান নাটকে প্রায়শ ব্যবহৃত প্যাচগুলোর আওতায় না চট করে পড়ে যান।

প্রথম নাটকের ঈশ্বরের ভূমিকায় **রাজা নিরুদ্দেশ**-এর রাজা অর্থাৎ বিদ্যুৎ নাগকে বাদ দিলে এঁরা দুজনেই দলের অভিনয়ের শক্ত খুঁটি। সামান্য ম্যানারিজমের আশ্রয়ে পৃথ্বীশ মিত্র অসম্ভব নিপুণ। এঁদের সঙ্গে সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ও (অর্থ-নীতিবিদ ও মন্ত্রী) যথেষ্ট ভাল অভি-নেতা। দ্বিতীয় নাটকটিতে ওঝা এবং ওঝার দোসরের চরিত্রে বিকাশ মিত্র ও শক্তি চক্রবর্তী বিশ্বাসযোগ্যভাবে স্টাই-লাইজড্। এঁদের বাদ দিলে বাকি অভি-নেতারা কিন্তু অনেকেই অনভিজ্ঞ ও দুর্বল। প্রথম নাটকটির পরিচালনাতেও

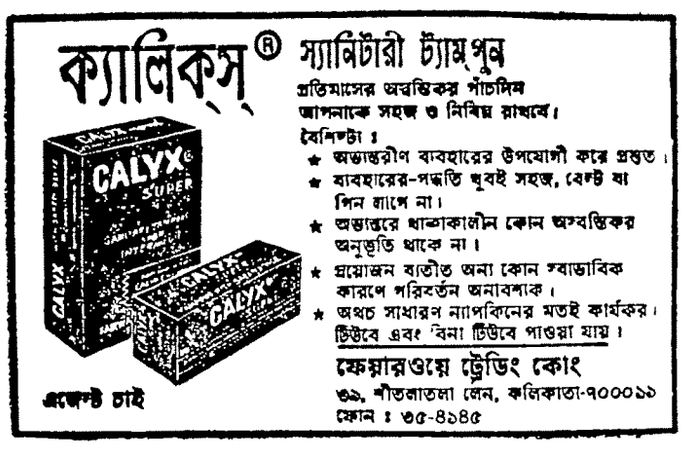

উপযুক্ত মঞ্চকল্পের অনুপস্থিতি পীড়া দেয়। যদিও বাজার-চলতি বিচ্ছিন্ন নাটকের নামে সাজিয়ে অভি-র খেদোক্তি প্রশংসার দাবি রাখে অন্তত কল্পনরা অভিনবত্বের সূত্রে এবং ঐ দৃশ্যটির উপস্থাপনা নাটক এবং পরিচালনা উভয়ের যোগ্য মিলনের ফল।

যোগেশ মাইম নিরাভরণ মঞ্চ, তবে তার যান্ত্রিক ব্যবস্থা যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। এই নাটক দুটির পরিচালক এবং আলোক-সম্পাতকারী (রবীন পাঠক) তাঁর যথা-সাধ্য ব্যবহার করেছেন। শ্রীপতি দাসকৃত ধ্বনি সুন্দর কিন্তু এ-নাটকে ওগুলোর খুব প্রয়োজনে আসে না। অভিনয়ে যেটুকু খামতি আছে, এঁরা তা এঁদের বিশ্বস্ত পরিশ্রমে কিছুদিনের মধ্যেই অতিক্রম করতে পারবেন, যদি অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক সংকটের কম্পিত মুহূর্তগুলোকে অতিক্রম করে সেই কিছুদিন তাঁরা বেঁচে থাকতে পারেন।

সুরজিৎ ঘোষ

শুধু সত্যজিৎ কেন!

এই আলোচনাটি লেখার সময় জানতে পারলাম আমেরিকায় 'সতরঞ্জ কি খিলাড়ী' দারুন সাড়া ফেলেছে। আমেরিকা অনেকদিন ধরে এই ছবিটির অপেক্ষায় ছিল দুটি কারণে। এক ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়, দুই 'সতরঞ্জ কি খিলাড়ী'র প্রচার।

পশ্চিমবাংলায় 'সতরঞ্জ কি খিলাড়ী' কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত কিছু দর্শক ছবিটি দেখার সুযোগ পেলেও সর্বসাধারণের জন্য এখনো ছবিটি মুক্তি পায়নি। কেন মুক্তি পায়নি বা পাচ্ছে না, তার জন্য আজকের এই আলোচনা নয়। এ নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। চলচ্চিত্রপ্রেমী কোন দর্শকের এসব আজ জানতে বাকী নেই। কাগজে কাগজে এই নিয়ে বহু আলোচনা বিতর্ক দিনের পর দিন দেখেছি। ছবিটি সেই শুরু থেকেই এ পর্যন্ত কাগজের হেড লাইন অধিকার করে আছে। কেননা এর পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায় এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর ছবি করাও যেমন ঘটনা, ছবিটির মুক্তি না পাওয়াও তেমনি ঘটনা। এ নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিক

কিন্তু এ বিষয়ে শুধু সত্যজিৎ কেন, আরো যাঁরা ছবি করছেন, তাঁদের কথা কেন অজ্ঞাত থেকে যায়? সত্যজিতেই তো চলচ্চিত্রের শেষ নয়। তাঁর পরেও ছবি হবে ভাল ছবি করার চেষ্টা চলবে, আর সেই পথ যদি এখন থেকে না প্রশস্ত হয় তাহলে?

সত্যজিৎ রায় যে পথ ধরে এসেছেন, যে পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন সেই পথের পাশাপাশি, তাঁকে অনুসরণ করে আরো অনেকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এই মুহূর্তে তাঁদের প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। একটা টিমে যখন কয়েকজন নিয়মিত খেলতে

এক বাপ ছ বেটি ছবিতে
মেহমুদ ও যোগিতাবলী

থাকেন তখন তার পাশাপাশি আরো কয়েক-জনের প্রস্তুতি চলতে থাকে, কেউ আহত হলে বা অবসর নিলে যাতে তার স্থানটা নিতে পারে।

অবশ্য আমরা এটা ভাল করেই জানি যে চলচ্চিত্র থেকে সত্যজিৎ রায়ের অবসরের ঠিক পরমুহূর্তেই তাঁর স্থান পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু একদিন যে তাঁকে অন্য কেউ ছাড়িয়ে যাবে না, এ তো কেউ বলতে পারে না। কেননা এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে সবকিছু সেই এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। আগামী দিনে বা দূর ভবিষ্যতে যাতে চলচ্চিত্রকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি, তার প্রস্তুতি তো এখন থেকেই নেওয়া উচিত।

কলকাতায় এখন বেশ কিছু তরুণ চলতি হাওয়ার বাইরে থেকে ছবি করার চেষ্টা করছেন। কোন কিছুর কাছে মাথা না নামিয়ে তাঁরা তাঁদের রুচিমতো ছবি করছেন এবং এ ব্যাপারে কোনো বাণিজ্যিক শর্ত তাঁরা মেনে নেননি। চলচ্চিত্রকে করতে চেয়েছেন সুস্থ শিল্প। ফলে পেশাদার প্রযোজক-পরিবেশক-প্রদর্শকদের সাহায্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁরা কি করেছেন বা তাঁদের নিরীক্ষায় কতটা সফল হয়েছেন এ বিচারের দায়িত্ব দর্শকের। কিন্তু দর্শকেরা এখনো তাঁদের ঐসব ছবি দেখার সুযোগ পাননি যেহেতু পরিবেশক প্রদর্শক তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে, যেহেতু পরিবেশক-প্রদর্শকদের ছক অনুযায়ী তাঁরা ছবি করতে রাজী হননি।

তাঁদের অনেকে দীর্ঘদিন ছবি শেষ করে সেন্সার সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছেন, অনেকে টাকার অভাবে মাঝ পথে থেমে গেছেন।

আমার প্রশ্ন ওঁরা কেন আলোচিত হল না? কেন ওঁদের ছবি প্রদর্শনের জন্য জোর দাবী ওঠে না? কেন সরকার বা কাগজগুলো এ বিষয়ে নীরব? সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজের গুণে কাগজে হেড লাইন দখল করুন, সরকার তাঁর ছবি মুক্তির জন্য আলোচনার পর আলোচনা চালান এও যেমন চাই, তেমনি ওঁদের কথা কাগজের প্রথম পাতায় না হোক, অন্তত শেষ পাতায় লেখা হোক, সরকার এইবার বেপরোয়া চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য কিছু সময় ব্যয় করুন। কারণ ওঁরাই সেই চিত্রসম্ভার উত্তরাধিকারী যিনি পথের পাঁচালী করার জন্য স্ত্রীর গয়না ও প্রিয় রেকর্ড বিক্রী করেছিলেন।

বিকাশ জানা

সগৌরবে চলছে!

"পরিচালক রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া..নাটক জমিয়ে দিয়েছেন"
—আনন্দবাজার।

"এ ছবির প্রশংসনীয় দিকটা হল..অভিনয়" —যুগান্তর।

"অনুপকুমার মহেন্দ্র পিওনরূপে খুবই বিশ্বস্ত। মিঠুর চরিত্রে আশ্চর্য অভিনয় করেছে বাচ্চা মেয়ে সঞ্চিতা ভট্টাচার্য।"
—দৈনিক বসুমতী।

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্সের নিবেদন

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

ডাক দিয়ে যাই

পরিচালনা: রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া

রূপায়ণে: অনুপকুমার · সুমিত্রা · সুব্রতা · ঝুমা · দিপীকা
কালী চক্রবর্তী · হরিধন ও বেবি সঞ্চিতা

পরিবেশনা: শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা ও শহরতলীর অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

সম্প্রতি কলামন্দির ভূমিতল মঞ্চে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কালচারাল সার্কেলের উদ্যোগে এক উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ গোলাম মুস্তাফী (কণ্ঠসংগীত) এবং মাহমুদ মির্জা (সেতার)। এঁদের সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন সাবির খাঁ।

পুরিয়া কল্যাণ দিয়ে মাহমুদ তাঁর বাজনা শুরু করেছিলেন। তাঁর নৈষ্ঠিক বাজনায় নিজস্ব রীতিটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটেছিল। সচেতন শ্রোতার তা চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি। রাগের রূপ তিনি অনাহত রেখেছিলেন। কিরানা ঘরাণার যে রাগের বিস্তার এবং তানে পরিলক্ষিত হয়েছিল। মাহমুদ মির্জা রাগকে শুধু সরগমে পরিণত করেননি। তার সুচিন্তিত বিস্তার এবং সুশৃংখল স্বরবিন্যাস রাগরূপকে সুশ্রাব্য করে তুলেছিল। সেতারের আওয়াজের শুদ্ধতার দিকে ছিল তাঁর সাবধানী দৃষ্টি। মাহমুদের বাজনায় রাগের রূপ প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছিল নিম্নগ্রামের 'নি ধা সা নি মা গ মা ধা পা'—এই কটি স্বর বিস্তারে।

গোলাম মুস্তাফী শুরু করেছিলেন শ্যামকল্যাণ দিয়ে। তাঁর কণ্ঠমাধুর্য এক সময় ওস্তাদ আমীর খানের কথা মনে পড়াচ্ছিল। পরে শ্যামকল্যাণের পরে ধরেছিলেন প্রায় অপ্রচলিত একটি রাগ—অনেকটাই শোনীকল্যাণ ঘেঁষা। অদ্ভুত জাল গেয়েছেন শিল্পী। যদিও কখনও কখনও টপ্পার কাছাকাছি হচ্ছিলেন। অবশ্য গোলামের গলা ফারসীর পক্ষেই ভীষণভাবে উপযোগী, সেটা প্রমাণিত হয়েছে। সাবীর খাঁর সঙ্গত তাঁর দক্ষতাকেই স্পষ্ট করেছে।

হৃদয়স্পর্শী সেতার

হাজরা রোডে সাঙ্গীতিকের অনুষ্ঠানে বিমল মুখোপাধ্যায়ের সেতার শুনে মুগ্ধ হলাম। বার বার মনে হচ্ছিল আমরা কলকাতার সঙ্গীত শ্রোতারা কি একচোখে সেনী ঘরের একটি শাখার (উজির খাঁ সাহেবের ঘর) সঙ্গীত সুধা পান করে মত্ত হই, কোনদিন ভেবে দেখি না যে এই ঘরে সুধার অমৃতধারা শুধু পূর্বদিকেই আসে নি, পশ্চিমেও গিয়েছিল, জয়পুর, ইন্দর ও বরোদাতে। বরকতুল্লা খাঁ সাহেব বলে যে কেউ সেতার বাজাতেন আমরা অনেকেই জানি না। অমৃত সেনজী, যিনি সেতারে বাদশা ছিলেন তাঁকেও আমরা জানবার চেষ্টা করি না অথচ নিজেদের সেনী ঘরাণার বলে পরিচয় দিই। বীণার থেকে সেতারের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও আমরা সরোদিয়া বা তাদের শিষ্যদের মাধ্যমে বীণার বাজকে খুঁজে বেড়াই, যেখানে পাবার কথা বরারের বাজ। বিমল মুখোপাধ্যায়ের মত যেসব সেতার বাদক বীণকারের কাছে শিখেছেন এবং যাঁদের বাজনা বীণার ঙ্গাস একটি মিড়ের মোচড় শুনলেই পাওয়া যায়, তাদের বাজনাকে উপযুক্ত মর্যাদা না দিয়ে, যাঁদের প্রচার মাধ্যম জোরদার তাদের মধ্যে আমরা বীণার বাজকে খোঁজবার চেষ্টা করি। প্রচারের এমনই শক্তি যে বীণার অঙ্গ এক আনা না পেলেও মাথা নেড়ে সায় দিই, বলি ঠিক ঠিক অনেকটা কালে খাঁ সাহেবের তানপোষের মত।

আমাদের দেশে ভাল গানবাজনাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে খোলা মন নিয়ে ও যুক্তি দিয়ে চুলচেরা বিচার করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের (শ্রোতাদের) যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। উদ্যোক্তাদের তো আছেই। বাইরের খাঁ সাহেব বা পণ্ডিত অমুক মিশ্র হলেই পাঁচবার সেলাম ঠুকে যন্ত্র মেলানোর সময় থেকেই মাথা নেড়ে বাহবা দিতে আরম্ভ করব আর বাঙালী ছেলে বাজালেই 'চল চা খেয়ে আসি বাইরে, ও তো পাশের বাড়ীর ছেলে ওর বাজনায় আবার পয়সা দেব কি?' এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। রাধিকামোহন মৈত্র, চিন্ময় লাহিড়ীকে ও মুস্তাক আলীকে আবার জোয়ান করা যায় না। তাবাপদ চক্রবর্তী ও জ্ঞান গোঁসাইকেও বাঁচিয়ে তোলা যায় না, অতএব বিচারবুদ্ধিতে শীঘ্র শান দিয়ে নেওয়া দরকার না হলে বাঙালীবাবুদের ভাল গান বাজনা শোনার বা শোনার দিন শেষ হয়ে যাবে।

আজকে বিমলবাবুর বাজনা সম্বন্ধে বলতে বসে যে এতো অপ্রিয় সত্য কথা বলার জোর পেলাম, এতেই প্রমাণ হয় যে, সেদিনের বাজনায় কত সৌন্দর্য ও শক্তি ছিল। জয়পুর বাজের ক্যানভাসের ওপর বিমলবাবু আফতাবে মুসিকির রঙ্গিলা ঘরের সুন্দর সুন্দর রং তুলে নিয়ে মেজরাফের সাহায্যে রাগের ছবি আঁকেন। জয়পুর সেনীয়দের রাগ বিস্তার পদ্ধতির সঙ্গে আগ্রা ঘরের বিস্তারের পদ্ধতির কোন বিরোধের কারণ ছিল না। দুই ঘর সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়েছিল বিমলবাবুর সেতারের মসৃণ গতিতে। এর কারণ বোধহয় এই যে আগ্রা ঘর সেনী ঘর থেকেই বেরিয়েছে এবং মালকাজান আগ্রাওয়ালী ফৈয়াজ খাঁ প্রভৃতি সকলেই সেনীয়াদের মত তুম নুম এর আলাপের সঙ্গে ধ্রুপদ ধামারও গাইতেন।

বিমলবাবু প্রথমে বাজান দুর্গা। গতি একটু চঞ্চল হলেও তান, জমজমা লোডী লড়গুথাও, ও লড়লপেট বাজিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটি সুন্দর সঙ্গীতের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। দুর্গা ছোট রাগ। সেতারেও বাজানো খুব কঠিন। বিমলবাবুর বিভিন্ন অলংকারের বৈচিত্র্যে দুর্গাকে ছোট রাগ বলে মনে হচ্ছিল ও'র সেতারের ওপর দখল এ রাগকে শ্রোতাদের কাছে সরল করে ছিল। স্বপন চৌধুরীর তবলা সঙ্গে বৈচিত্র্যে যে পরিপূর্ণতা ছিল, তা বয়সের খুব কম তবলা বাদকের এর পর বিমলবাবু বাজালেন সেনী পটবেহাগ। পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা মিশ্রণে বাজনা আরও উপভোগ্য হয় হাম্বিরের মসিদখানি ওরে জাগ তোতায় আমরা তৈয়ারী ও লয়দার জয়পুর মসিদখানি বাজের একটি পাই, যাতে খেয়াল অঙ্গে সাপুট তা ধ্রুপদ অঙ্গের বোল বিস্তার ও মেজরাগের কাজ পাই যা আজ প্র পেতে বসেছে। শেষে ঠুংরী অঙ্গে বেজাখানি গৎ বাজিয়ে উনি নিজের বোধের পরিচয় দেন। স্বপন তবলার শুধু রেওয়াজ করার বোল পাই তার থেকে অনেক বেশী সুপরি জবাব সৌন্দর্যবোধ, পরিচ্ছন্নতা, ও তবলা বাদকদের মধ্যে শ্রোতাদ জায়গায় হাততালির জন্য যা প্র পেতে বসেছে পরিমিতিবোধ ও সংয়

সুব্রত ক

ভানুতীর্থের কবিপ্রণাম

গত ৭ মে বিড়লা একাডেমী ভানুতীর্থের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষিকার মিলিত উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদনের এই পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানটি আগাগোড়া আন্তরিকতায় ছিল।

কবির হে নূতন দেখা দিক গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শিল্পীদের সম্মেলক কণ্ঠের প্রশংসা পাওয়ার মত। খোলা গলা দাপটের সঙ্গেই গেয়েছে তারা। বিশে হারে বের বেরে, এক হাতে ওর আছে, বাঁধ ভেঙ্গে দাও, তোমায় বি বলে গানগুলি মনে ছাপ রেখেছে। সম্মেলক গানগুলির মধ্যে এক মনে একতারাতে এবং তোমারি রাগিণী কুঞ্জে গান দুটি ভালো লেগেছে। গানের দু-একজন ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হয়নি। তাই নাম করতে পারলাম না। তবে তাদের যিনি তোমার কথা হেথা কেহ তো গানটির নির্বাচন এবং গাওয়া সুন্দর। শিশুশিল্পী ইন্দ্রজিৎ বসু রবীন্দ্রনাথের ১৪০০ সাল অ ভালো লেগেছে। অবিচল বিশ্বাসের যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

পাত্রপাত্রী না চাকুরী ?
জমিজমা না মোটর লরি ?
ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বাণিজ্য ?

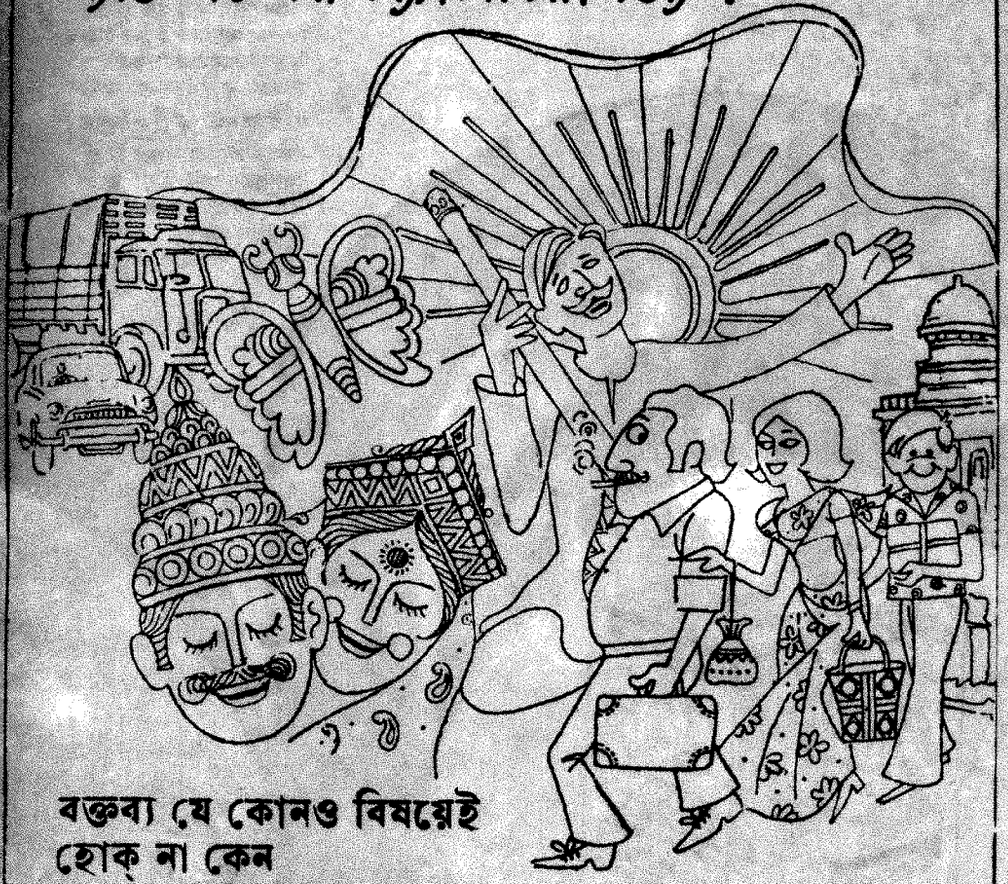

বক্তব্য যে কোনও বিষয়েই
হোক্ না কেন

যুগান্তর এ

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপালে
অনেক বেশি উত্তর পাবেন
কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে

কারণ অনেকগুলো :

* যুগান্তরের জনপ্রিয়তার দ্রুত ঊর্ধ্বগতি। গত ছ'মাসে দৈনিক প্রচার বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি। তাছাড়া প্রতি রবিবারের কাটতি এখন ৩,৯০,০০০ এরও ওপর।
* পাঠক সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। লোকে অন্যের হাত থেকে টেনে নিয়ে যুগান্তর পড়ে থাকেন। আপনার বক্তব্য এই অগণিত পাঠক পাঠিকাদের নজর এড়াবে না।
* প্রতিটি শ্রেণীর বিজ্ঞাপন সুন্দরভাবে সাজানো হয়, ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

যুগান্তর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীষ্ট ফল পাবেনই

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 26th May,
Phone 55-5231 (14 lines)

29 MAY 1978

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র কুকমী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

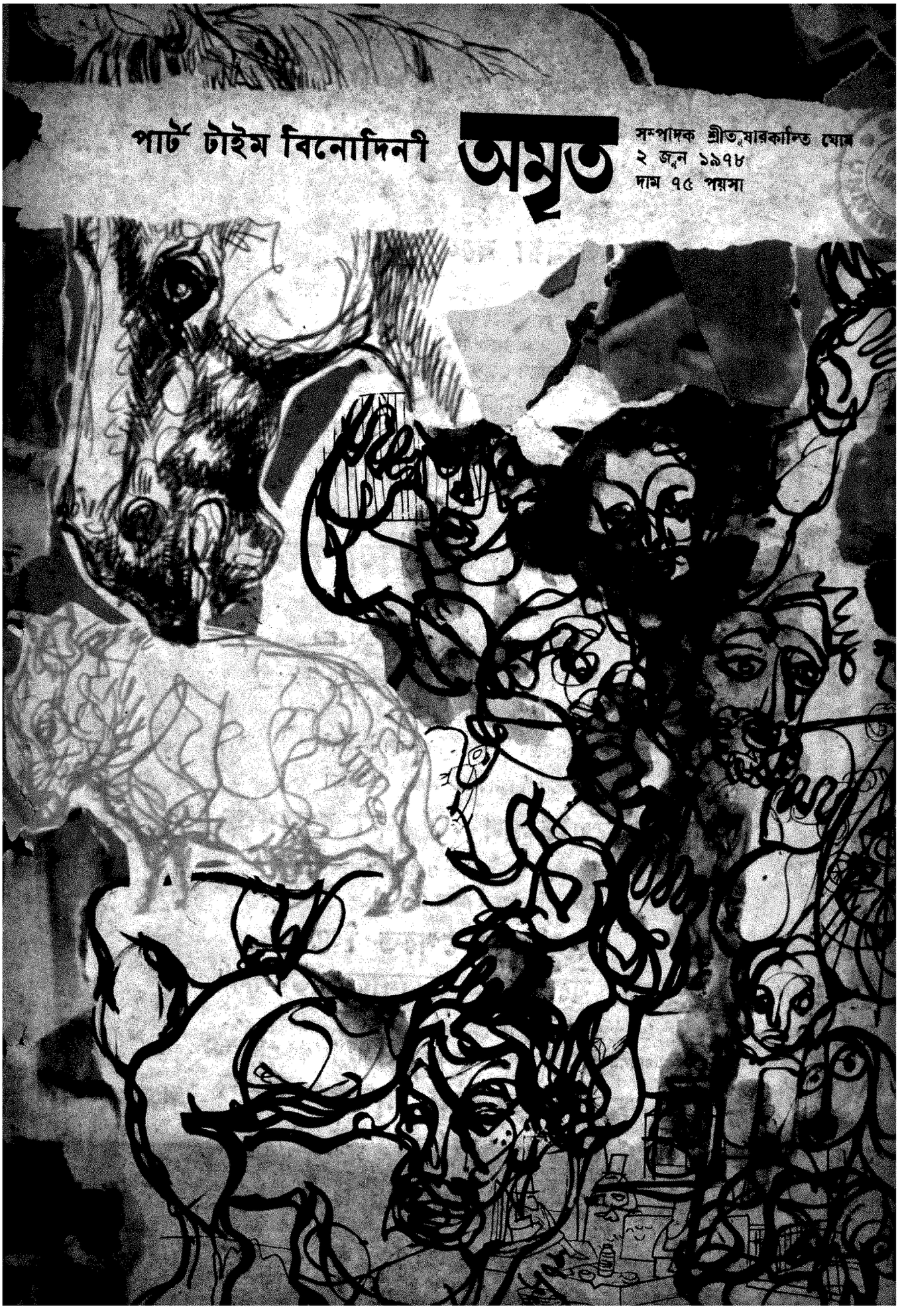
পার্ট টাইম বিনোদিনী
অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
২ জুন ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে নববর্ষের অমৃতে থাকবে সবচেয়ে সেরা লেখা
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমল শাসমলের সুদীর্ঘ প্রামাণিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধী ঃ লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার

পিছু হটার পালা ঃ লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীমাণিক্য

অনেক কিছু হয়েছে ঃ লিখেছেন অতুল সুর

সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী

প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছেন

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ ঃ ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে
শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন ঃ অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা
দাম তিন টাকা !! রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন।
অথবা লিখুন
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-৩

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
অজ্ঞাতবাস ৯

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
রক্তের বিষ ৭·৫০

সমরেশ বসু
আনন্দধারা ৬

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
সরাইখানা ৮

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের
রোটারিয়ান ৭

প্রশান্ত চৌধুরীর
টুকরো কাঁচেরছবি ৯

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের
অর্জুনের অজ্ঞাতবাস ১৫

নিমাই ভট্টাচার্যের
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ৬

নারায়ণ সান্যালের
হংসেশ্বরী ১০

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

সুমথনাথ ঘোষের
সুদূরের পিয়াসী ৮

বিমল মিত্রের
চলতে চলতে ১৬

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
পাঞ্চজন্য ১৬

শঙ্কর মহারাজের
পঞ্চবটী ৮

প্রমথনাথ বিশীর
বঙ্গভঙ্গ ১৪

নলিনীকান্ত সরকারের
দাদাঠাকুর ১২

শংকর-এর
স্থানীয় সংবাদ ১০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবযান ১৫

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কীর্তিহাটের কড়চা ৬০
(১ম ও ২য় খণ্ড)

কালিকারঞ্জন কানুনগোর
রাজস্থান কাহিনী ১৬

ভিন্ন স্বাদের তিনখানি গ্রন্থ

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
কৈলাস ও মানস সরোবর ২০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
ফিরে ফিরে চাই ১২

স্বামী রামানন্দ ভারতীর
হিমারণ্য ৮

পেপার ব্যাক সংস্করণ :—

বিমল মিত্রের
সাহেব বিবি গোলাম ১২·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
আমি কান পেতে রই ১২·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গণদেবতা ৭·৫০

প্রমথনাথ বিশীর
লালকেল্লা ১২·৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ইছামতী ৯ আরণ্যক ৭

মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩/ ৩৪৮৭৯১
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯/৩৪৩৪১২

যদি আপনার বাচ্চা কেবলই উল্টে-পাল্টে অসুখে ভোগে, তাহলে আপনার উচিৎ এই বিজ্ঞাপনটি খুঁটিয়ে পড়া, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জল-বাহিত দূষিত রোগের হাত থেকে কিভাবে আপনার বাচ্চাকে রক্ষা করবেন!

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েব বাপ-মা হিসেবে আপনাদেব মনে সবচেয়ে আগে এই প্রশ্নই জাগবে, "পানীয় জলে এই দূষিত বোগ সংক্রমণ কি করে সম্ভব?" পানীয় জল ভাল কবে ফুটিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও সেই জল খেয়ে বাচ্চার কি কবে অসুখ হতে পাবে? হ্যাঁ, তা কিন্তু হতে পাবে। কথাটা অসম্ভব মনে হলেও, এটাই কিন্তু খাঁটি সত্যকথা! একটা ছোট্ট উদাহবণ দিচ্ছি, ১৯৭৭ সালেব ৪ ঠা মে তাবিখে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র দৈনিক সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদেব সংক্ষিপ্ত খববটি জানাচ্ছি,

"জল-বাহিত রোগ সংক্রমণের ফলে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ঠিক যে কত যদিও তা জানানো সম্ভব নয় তবে, প্রকৃত ঘটনা এই যে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা যদিও মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ, কিন্তু প্রতি বছরে শিশু মৃত্যুর হার মোট মৃত্যুহারের শতকরা ৪০ ভাগ।"

আপনি জানেন কি? আপনার বাচ্চারা সবসময়ে জল-বাহিত রোগের শিকার!

এটা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রমাণিত যে পানীয় জল ফোটানো সম্পূর্ণ নিরাপদ পদ্ধতি নয়

আজ এটাই প্রমাণিত যে পানীয় জল ফুটিয়ে নেওয়াই সম্পূর্ণ নিরাপদ পদ্ধতি নয়। জল ফোটালে জীবাণুগুলি মবে যায় বটে, কিন্তু জল **সম্পূর্ণ নির্বীজ** হয় না। আপনার এমন একটা কিছু দরকার যা এই দু'টা জিনিসই সম্পূর্ণ দূর করে। ফোটানো জলের তলানিতে যে বীজাণু থিতিয়ে থাকে তার সঙ্গে রোগ জীবাণুগুলি মিশে থাকে। আর এমনকি, ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে (যে তিগ্রীতে জল ফুটতে থাকে) জল ফোটালেও লচিাজারের কোনও কার্যকরী জল পাওয়া যায় না। জল ফোটানোর কয়েক ঘন্টা পরে যখন জল ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন এই রোগ জীবাণুগুলি কার্যকরী হয়ে ঐ ফোটানো জল আবার দূষিত করতে থাকে।

এই সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই আছে!

চিন্তা করবেন না! সমস্যাটা বড়ই কঠিন, সমাধানটা ঠিক তত্তই সরল। সারাদেশে অতিত্র বাপ-বাছেরা কিন্তু পিউরিটাস ওয়াটার ফিল্টার ব্যবহার করেন। সঙ্গে দেওয়া ফিল্টারের চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছেন যে, ফিল্টারের উপরের অংশে ২টি ভাগে বিভক্ত ও ছাংসহে একটি চীনামাটির নল (ক্যাণ্ডেল) ও একটি জল আছে। ফিল্টারের ওপরে অংশে জল ভর্তি করলে নলের মধ্যে দিয়ে জল পরিষ্কারভাবে ফোঁটা ফোঁটা পরিষ্কার জলটি ফিল্টারের নীচের অংশে জমা হতে থাকে।

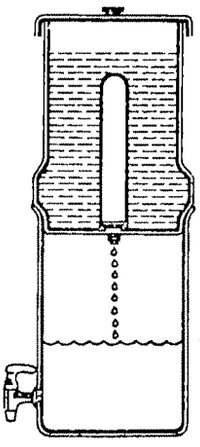

এই ক্যাণ্ডেলের গোপন ইতিহাস

পিউরিটাস ক্যাণ্ডেলের অন্তর্নিহীত গোপন ইতিহাসটি এই যে,এই ধরণের ক্যাণ্ডেল ভারতে এই সর্বপ্রথম। প্রত্যেকটি পিউরিটাস ক্যাণ্ডেল ল্যাবরেটরিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা আর এগুলি প্রধান প্রধান পৌরপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত। এই ক্যাণ্ডেলগুলি এক বিশেষ ধরণের মাটি দিয়ে তৈরী যার নাম 'কিসেলগুর'। এতে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে যার ফলে জল পরিষ্কার করে ফোঁকার জন্যে এটি একটি আদর্শ উপাদান। সহজ বলতে কি, এই নলের সাহায্যে সবরকম রোগজীবাণু ও বীজাণু পরিষ্কার করে ছেঁকে বার করে দেয়া যায় যার ফলে,ফিল্টারের নীচের অংশে আপনি পাচ্ছেন ১০০% ভাগ বিশুদ্ধ, নির্মল পানীয় জল।

পিউরিটাসের সাহায্যে ১০০% ভাগ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছেন তার প্রমাণ কি?

প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। সারাদেশে আমাদের যেকোনও অফিসে আসবাব জন্যে আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, কারণ সেখানে আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারবেন ল্যাবরেটরির আসল টেস্ট রিপোর্টের ফটোস্ট্যাট কপি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের যেকোন হেড অফিসে এসে আসল রিপোর্টটিও পরীক্ষা করতে পারেন—যে রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে যে পিউরিটাস ওয়াটার ফিল্টারে সবরকম রোগজীবাণু ও বীজাণু সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়। যার ফলে আপনি পাচ্ছেন ১০০% ভাগ রোগজীবাণু ও বীজাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল যা আপনার ও আপনার পরিবারের বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের জন্যে ১০০% ভাগ নিরাপদ।

মাটির কলসী থেকে সাবধান!

আপনার যেকোনও বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করুন, তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন। মাটির হাঁড়ি বা কলসীতে ক'রা ফোটানো জল পরীক্ষের পক্ষে বিপজ্জনক। মাটির হাঁড়ি বা কলসীর অসংখ্য রন্ধ্র থেকে লক্ষ লক্ষ রোগজীবাণুর সৃষ্টি হয়। এমনকি, স্টার্লিকের মত পরীক্ষায় নির্মল জল মাটির পাত্রে রেখে পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জলেতে অসংখ্য রোগজীবাণু আছে যার ফলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা, অক্ষিস, হুকওয়ের নানান রোগ ও অন্যান্য আরও ব্যাপকহারে সাংঘাতিক রোগ হয়।

আপনার প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের যত্ন করুন।

বালসারা

পিউরিটাস

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
এক বুনিয়াদ সহায়ক

BALSARA বালসারা অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রা.) লি.
৮৫, বাউনফাস রাস্তার রোড, ফোর্ট, বোম্বাই ৪০০ ০২৩

সাবধান!

আপনার পরিবারের নিরাপত্তার জন্যে আসল পিউরিটাস ওয়াটার ফিল্টার কিনুন।
ফিল্টারের ওপরের অংশে পিউরিটাস লেবেলটি ভাল করে পরীক্ষা করুন।
ক্যাণ্ডেলের মেটাল বেস-এ পিউরিটাস নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৯৬৫০১ আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখে নিন।

CHATRA-BLS-158 BEN

অমৃত

১৮ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
১৮ জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৫
2nd June, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
সমালোচনা ৬
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৮
পর্যবেক্ষক
ভবিষ্যৎবাণী ৯ শ্রীমাণিক্য
বিজ্ঞান ১০ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ কাহিনী ১১
পার্ট টাইম বিনোদিনী
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়
প্রেম প্রেম খেলা
শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত
প্রচ্ছদ এঁকেছেন গোপাল সান্যাল
কয়েকটি প্রদর্শনী ১৪
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
কবিতা ১৬ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সুবিজিৎ ঘোষ
চন্ডাল সিং (গল্প) ১৭
বসন্ত গোবিন্দ পোদ্দার
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ২২
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
লালবাই-এর দেশে ২৯
বেথা বড়ুয়া
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ৩২
শৈবাল মিত্র
হৃদয় নন্দন বনে (উপন্যাস) ৩৮
সোমেন্দ্রনাথ রায়
যাঁদের দেখেছি ৪২ অনন্ত সিং
কাছের মানুষ সুনীতিকুমার ৪৫
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওয়াগাড়ি (উপন্যাস) ৪৯
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
চিঠি ৫৩
খেলা ৫৫
রেকর্ড সমালোচনা ৫৭
সান্ধ্য আসরে আমজাদ আলী খাঁ ৫৯
সুব্রত রায়চৌধুরী
চিত্রধ্বনি ৬০

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
হাতফেরতা হাওয়াগাড়ি
লিখেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
গল্প লিখেছেন প্রলয় সেন

বিদ্যুৎ ছাঁটাই এবং তারপর

বছরের এই সময়টিতে গরম এমনিই বেশি পড়ে। তার ওপর ঘন ঘন এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে লোডশেডিং চলার জন্যে এবার তা আরো দুর্বহ হয়ে উঠেছে। অন্তত এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত তো বটেই।

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পর্যায়ক্রমিকভাবে অচলাবস্থা দেখা দিচ্ছে। তাতে সন্দেহ জাগে, মেরামতির কাজ ত্রুটিমুক্ত কিনা। একই ইউনিট যদি প্রতি মাসে বিকল হয়, এবং মেরামত করেও তা যদি না সারানো যায়, তবে অল্পদিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গোটা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাই বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অথচ গ্যাস টার্বাইনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে প্রস্তাবের কথা আগে শোনা গিয়েছিল তাও এখন নানা টালবাহানায় ধামাচাপা পড়ার মতো।

মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্ভাগ্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আরো অনেক রাজ্য এর ভাগিদার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু শিল্পোৎপাদনের দিক দিয়ে অগ্রসর, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজির সঙ্গে শিল্পোৎপাদনের হার অব্যাহত থাকার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেইহেতু বিদ্যুতের অনটন এখানে কেবল দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যেরই অভাব ঘটাচ্ছে না, বেকারত্বের আশঙ্কাও বাড়িয়ে তুলছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির পক্ষ থেকে প্রতিদিন যেভাবে আমলাতান্ত্রিক নিষ্প্রাণতার সঙ্গে ছাঁটাই বিদ্যুতের তালিকা পেশ করে কর্তব্য শেষ করা হচ্ছে, তাতে বিপদের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটার বিষয়ে সচেতনতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

তবে আশ্বাসের বিষয় এই যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের ঘনায়মান বিদ্যুৎ-সঙ্কট নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা করেছেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকারও বিষয়টির গুরুত্বের বিষয়ে অবহিত হয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল, সচেতন হবার পরও কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে কেন? কেনই বা গ্যাস টার্বাইন স্থাপনের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এত দেরি?

উত্তর একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই জানেন।

সাহিত্য ইত্যাদি....

ইণ্ডিয়ান বি বি সি ও বেতার নাটক

চল্লিশের মাঝামাঝি সময়ের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হতে চলেছে। কিন্তু ইংরেজ তখনও দেশ ছেড়ে চলে যায় নি। সেই সময় কলকাতার বেতার কেন্দ্রে মিস্টার বোখারী নামে একজন স্টেশন ডিরেকটার ছিলেন। তাঁর দাদা বোধহয় তখন দিল্লি রেডিওর একজন বড়কর্তা। সে জন্যে ওয়াকিবহাল লোকেরা সে সময়কার রেডিও প্রতিষ্ঠানকে (ইণ্ডিয়ান) বি বি সি বলতেন। তার নিহিতার্থ বলা বাহুল্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশান নয়, বোখারী ব্রাদার্স কর্পোরেশান।

তা সে যাক। কলকাতার বোখারী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার দিন তিনেক দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল।

একদিন বোখারী সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কাকে আমার বড় লেখক বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন মাত্রই তিন-চার বছর হল মারা গেছেন। রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্তির প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলেও, তাঁকে আমরা এক নিমেষের জন্যেও মনের আড়াল করতে পারি নি তখনো। অনিবার্যভাবেই তাই রবীন্দ্রনাথের নাম বললাম। বোখারী ভদ্রলোক তা শুনে প্রায় ছিটকে উঠলেন।

আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি রায়, আর কারো নাম মনে পড়ল না?—বোখারী সাহেব টেবিলের ওপাশ থেকে উঠে এসে ঘরের মধ্যে একটু পায়চারী করে বললেন, তুমি একজন যুবা পুরুষ, (তখন ছিলাম। —লেখক।) অথচ পঁচাশী বছরের এক বৃদ্ধ যিনি মারাও গেছেন দিব্যি কয়েক বছর হল, তাঁকে ছাড়া নতুন কিছু ভাবতে পারলে না?

কিন্তু, তিনি যে সত্যিই বড়। খুবই বড়। —অসহায়ভাবে আত্মসমর্থনের চেষ্টা করলাম আমি।

অস্বীকার করছে কে? বোখারী সমান তেজের সঙ্গে বললেন, কিন্তু, তাই বলে তাঁর মধ্যে আটকা পড়ে যাবে কেন?

না আমরা অবিশ্যি তা পড়ি নি। আধুনিক কবিরা যে রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকটা আলাদা তা তো তুমি নিজেও জানো। (কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে।—লেখক।) আমরা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এখন ইউরোপীয়, বিশেষ করে আধুনিক ইংরেজি কবিতাই বেশি পড়ি।

তারই বা কী দরকার? —বোখারী পায়চারী বন্ধ করে ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে দেয়ালের শেলফ থেকে একখানা বই বার করে বললেন, এটাই বা নয় কেন? বলে বইখানা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

হাতে নিয়ে দেখলাম, ময়মনসিংহ গীতিকা।

বোখারী বলে চলেছেন, তুমি যদি এই ধরনের কোনো লেখাকে বড় বলতে, খুশি হতাম আমি। কিম্বা অন্য কিছু। আমি চাই ওরিজিন্যাল চিন্তা। বাঁধা সড়কের বাইরে চলার সাহস। দুর্ভাগ্যের কথা, তোমার মধ্যে তা নেই। তোমাদের কারো মধ্যেই নেই। না, কারো মধ্যে নেই।

এমন এলোপাতাড়ি মার খেলে মরা মানুষও লাফিয়ে ওঠে। বিদ্রূপের হাসি টেনে আমি বললাম, ওরিজিন্যাল হবার চেষ্টায় তুমি দেখছি হাস্যকর হয়ে উঠছ মিস্টার বোখারী।

বোখারীও হাসলেন। প্রাণখোলা উচ্চ হাসি। বললেন, এতক্ষণে যা হোক যুবকের মতো একটা প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম তবু। তারপর নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে সিরিয়াস গলায় বললেন, আমি কিন্তু তোমাকে হার্ট করার জন্যে কিছু বলি নি রায়। ভাষা ব্যবহারে কিছুটা বাড়াবাড়ি থাকলেও যা বলেছি তা আমার সত্যিকারের মত বলে জেনো। এবং কেন তা বলেছি তাও তোমাকে জানাচ্ছি।

একটু কী চিন্তা করে বোখারী সাহেব বললেন, তুমি যেখানে বসে আছ ঠিক ঐখানেই কাল একজন বড় সাহিত্যিক বসেছিলেন। আমিই ডেকেছিলাম। তাঁকে আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম রেডিওর জন্যে কয়েকটা নাটক লিখে দিতে। উনি বললেন, তাঁর কয়েকটা গল্পের নাকি নাট্যরূপ দিয়ে অনেক আগেই অভিনয় করানো হয়েছে রেডিও থেকে। পছন্দ মতো অন্য গল্প বেছে নিতে পারি। নাট্যরূপ দেওয়া হলে তিনি কন্ট্রাক্টে সই করে দেবেন। আমি তখন তাঁকে বলি, আমি অন্য জিনিস চাইছি। গল্পকে নাটক করা নয়। কিম্বা নাটককে ব্রডকাস্ট করা নয়। আমি চাইছি রেডিও নাটক। সেটা প্রথম থেকেই লেখা হবে ঐভাবে। মানে রেডিও নাটক হিসেবে। উনি অস্বীকার করলেন। বললেন, ও জিনিস তো বই হিসেবে ছাপা যাবে না। ও লিখে লাভ কী? আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, এ তো একটা নতুন জিনিস। ভালো করে লিখলে এতেই বা সাহিত্য হবে না কেন? উনি হেসে উঠলেন। জানো রায়, সেফ হেসে উড়িয়ে দিলেন আমার কথা। বললেন, আমি নাকি খুব একজন পাকা ক্যানভাসার। কিন্তু, তিনিও তো কথা বেচে খান, তাঁকে বাগে আনা যাবে না। সত্যি বলছি রায়, ভয়ানক হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু— বোখারী আমার দিকে চেয়ে বললেন, আজ আমি দশ গুণ বেশি হতাশ হয়েছি তোমার কথা শুনে।

কিছু মনে করো না মিস্টার বোখারী, আমি ক্ষীণভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, তোমার কথাবার্তা প্রায় গোয়েন্দা কাহিনীর মতো রহস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। আমি তার কোনো মাথামুণ্ডু পাচ্ছি না।

বোখারী লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি দুঃখিত যে তোমাকে পুরো ব্যাপারটা বলা হয় নি। আমি বেশ কিছুকাল ধরে কলকাতা স্টেশান থেকে সত্যিকারের সাহিত্যিকদের লেখা বেতার নাটক চালু করার চেষ্টা করছিলাম। দু' চারজনের সঙ্গে কথাও বলেছি এই নিয়ে। কালও আমি সেই মতলবেই ডেকেছিলাম মিস্টার এক্স-কে। কিন্তু কাউকেই আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে পারিনি। নতুনত্বও নয়। কাউকেই আমি তাতিয়ে তুলতে পারলাম না। বাঁধা সড়কের বাইরে এক পাও কেউ নড়বেন না।

নতুনত্ব কী, শুনি?

নতুনত্ব নয়? বোখারী বিস্ময় ও বেদনা মেশানো গলায় বললেন, জগত সংসারের সমস্ত রকমের ঘটনা ও দৃশ্যাবলীকে চোখের রাজ্য থেকে সরিয়ে শব্দের রাজ্যে আনছ। সেটা নতুন নয়? নির্বাক সিনেমা যেমন শুধুই দেখার রাজ্যে, বেতার নাটকও তেমনি শুধুই শোনার রাজ্যে।

কিন্তু এখনও তো সেইভাবেই করা হয় বেতার নাটক। —আমি বললাম।

হয়। কিন্তু ভয়ংকর আর্টিফিসিয়াল-ভাবে। কথার ওপর এত বেশি ঝোঁক দেওয়া হয় যে, গোটা ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়ায় সংলাপ নাটক। কথা ছাড়াও পৃথিবীর হাজার হাজার কতো শব্দ, এবং নীরবতা, নিস্তব্ধতা, হাঁ, একেবারে শব্দহীনতা, এইসব দিয়ে একেবারে একটা নতুন জাতের নতুন স্বাদের জিনিস— মানে, আমি বলছি, যিনি লিখছেন, তিনি সেইভাবেই সমস্ত অনুভূতিকে কানের মধ্যে নিয়ে গিয়ে লিখছেন—এটা নতুন নয়?

কী জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই। কথাটার মধ্যে সত্যিকারের সার কতোটুকু তাও আমার পরখ করা হয় নি কোনোদিন। কিন্তু, এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, বোখারী সাহেব যে সাহিত্যিকদের রেডিও নাটকের বা রেডিও স্ক্রিপ্ট-এর দিকে টানতে চেয়েছিলেন, তাতে সাড়া দিলে ভালোই হত।

সাহিত্যের দিক দিয়ে না হলেও সাহিত্যিকদের দিক দিয়ে তো বটেই। অন্য কোনো রাস্তা না পেয়ে সব লেখকই যে এখন উপন্যাসের রাজ্যে ভিড় করছেন (এবং রাজ্যে বইয়ের বাজারকে স্ফীততর করে তুলছেন) তার প্রকোপটা কমত।

এবং হয়তো বেতার নাটকেরও কিঞ্চিৎ স্বাদ বদল ঘটত।

মণীন্দ্র রায়

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

রত্না বলেছিলো অতনু নাকি আত্মহত্যা করেছে। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই বাক্স হাতে নিয়ে অমন বিপজ্জনক জায়গায় অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ছেলে আর যে হোক, অতনু নয়। নতুন করে জীবন শুরু করাতে অতনুর আগ্রহ ছিল না। কেননা পিছনে ফিরে আসা আর হার স্বীকার করা—এ দুটো ব্যাপার ওর কাছে প্রায় একই রকম ছিল। ছোটবেলায় যে যে কারণে অতনুকে ভালোবাসতাম, সেই সেই কারণগুলোর মধ্যেই অতনুর পরিণতি লুকিয়ে ছিলো। আমি জানি, অতনুর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল নিজের উপর। অতনুর অস্তিত্বকে দাম দিতে পারে, জায়গা দিতে পারে এমন জমি পৃথিবীতে খুব কম জায়গায় আছে। হয়তো বিপ্লবে নতুবা মৃত্যুর বিস্ফোরণ ছাড়া অতনু বলে উঠতে পারতো না, 'এই দ্যাখো, এই আমি, এত বড়, এত বিরাট।' আমি কোনো অন্ধ ত্রিকালদর্শী টাইরেসিয়াস নই। তবু অতনুর মৃত্যু আমাকে একটা আত্মপ্রসাদ দেয়। বিচার-বিবেচনায় অভ্যস্ত ছিলাম বলে, বিপ্লবের হিসেবে পাক্কা ছিলাম বলে নয়। নিজেকে বুঝতে পারার জন্য। জীবনের কোনো নিভুল মীমাংসা নেই এটুকু জানতাম বলে। সময়কে এগিয়ে নিয়ে আসার এনা তাকে নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করিনি বলে। অথচ সময় যে যন্ত্রণা দেয়, দিয়ে থাকে, তা অতনুর থেকে আমিও কোন অংশে কম পাইনি। সেদিন রাত্রে অতনু যা যা কথা আমায় বলেছিলো, বিপ্লবের স্বপক্ষে—সে কথাগুলো হয়তো আমিই অতনুকে বলতে পারতাম। হয়তো অতনুর বদলে রত্না আমাকেই ভালোবাসতে পারতো। হয়তো সাইকেল কেলেংকারিতে অতনুর বদলে সাজা আমিই পেতাম, অতনু পেতো রত্নার ভালোবাসা।'

শ্রীলাকে বলেছিলাম, শৈশবে ছাড়া আর অন্য কোথাও আমি নিরাপদ নই। পাশে বসেছিলো সুমন্ত্র। একমনে লিওনটিয়েভের পোলিটিকাল ইকনমির পাতা উল্টে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুখটা আমার মুখোমুখি রেখে ঠোঁটের বাঁদিক থেকে ডানদিকে একটা শ্লেষের হাসি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেছিলো 'কারণটা জানতে তোর ইচ্ছে হয় না ?' আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই শ্রীলা অনর্থক, ছোটবেলার সেই হলুদরঙের পাখীটার মতো, অকারণে যে ঠোঁটে রোদ্দুর নিয়ে টাল-মাটাল চেঁচামেচি করতো, ঠিক সেরকম হাল্কাপল্কা গলায় এলোমেলো বলে উঠল, 'আ ফিলোজোফিকাল প্রবলেম হ্যাজ দ্য ফর্ম : আই ডোন্ট নো মাই ওয়ে আবাউট।' লুডভিস ভিটগেনস্টাইন সুমন্ত্রকে তখনকার মতো চুপ করিয়ে দেয়। লিওনটিয়েভ বন্ধ করে সুমন্ত্র উঠে চলে গেল। শ্রীলা তখন আমাকে বলেছিলো-ও নাকি আমার দাড়ি দেওয়া, ইলাস্টিক খুলে যাওয়া ছেলেবেলার কালো রঙের পেন্টুলুনটাকে পর্যন্ত ভালোভাবে চেনে। ঐ পেন্টুলুন আমাকে ছোটবেলায় বড্ড হয়রানি করতো সবার সামনে। কারণে অকারণে খুলে গিয়ে। শ্রীলা যেন পারলে আমায় কোলে নেয়, এমনভাবে আমার কপালের উপরে পড়েথাকা চুল সরিয়ে দিতে দিতে বলে ওঠে, 'আমি চলে যাচ্ছি, পার্ট টু দিয়ে দিদির কাছে।' আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেলো, যেন চিরদিনের ভোর বেলাকার পাখীটা মাথা ঠুকরে আমার সামনে পড়ে গেলো ডানায় রক্ত ঝরে। আমি শুনতে চাই না, শুনতে চাই না এভাবে সবাই আমার থেকে একে একে দূরে চলে যাবে। কেবল সুমন্ত্র থাকবে। আমি শুনি নি শ্রীলা কোথায় যাবে। শ্রীলা তখন আমার পিঠে হাত রেখে বলেছিলো, সুমন্ত্রর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে। বলেছিলো যেতে এখনো অনেক দেরি। বলেছিলো সবাই মিলে শিমুলতলায় বেড়াতে যাবে পার্ট টু পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে। আমরা অনেকে মিলে যাবো। রথীনকাকুর শিমুলতলায় নিজের বাড়ি আছে। সুমন্ত্র হয়তো যাবে, হয়তো যাবে না। আমি ও কদিন সুমন্ত্রর সঙ্গে কোনো ঝগড়া কোরবো না, ও কদিন প্রতিদিন সাউথ পাহাড়ের কাছে বেড়াতে যাবো শ্রীলার সঙ্গে। ফিরে আসার পর শ্রীলা চলে যাবে। ওয়াশিংটনে দিদির কাছে। আর কোনো দিনও শ্রীলা ফিরে আসবে না, আমি জানি।

একরকম ভাবেই চলে যেতে হয় জানি। চলে যেতে গেলে হঠাৎ যেতে হয়, সময় নিয়ে, তর্ক করে, যাওয়া আর হয় না। বিসুভিয়স যখন জেগে উঠল, পম্পেই-এর লোকজন কাকেকে বিদায় জানানোর সময় আর পায়নি। ফারাও রামেসেসের অত্যাচারে মানুষ যখন মিশর ছেড়ে চলে গেলো প্যালেস্টাইনে, সেই এক্সোডাসের সময়েও কোনো ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি ছিল না। পূর্ববাংলার রিফিউজিরাও হয়তো জানতো দণ্ডকারণ্য থেকে পদ্মা, রূপসার কাছে তারা আর কোনো দিনও ফিরে আসতে পারবে না। বেহালার বাড়ি ছেড়ে আমরা যখন চলে আসি, বাবাও জানতেন সেকথা। বাবা দ্বিতীয়বার ঘরছাড়া হলেন। কোন যৌবনে প্রথম শিয়ালদা স্টেশন পার হবে সুটকেস ট্যাংক বোঝাই করে পূর্ববাংলার যতটুকু নিয়ে আসা যায়, এনেছিলেন। রিফিউজি, লোনের টাকায় বেহালার বাড়ি একতলা সম্পূর্ণ হলো। দোতলা ঠাকুর্দার টাকায়। বড়দির বিয়ে হোলো, দাদা বিদেশে গেল, আমি কলেজে উঠলাম—সব কিছু হোলো ওই বেহালার বাড়ির বিশ্বাসে খুঁটিতে ভর দিয়ে। একান্নবর্তী পরিবারে ঘরের মধ্যে ঘর, পালঙ্কের তলায় আচার শিশি, পুরোনো ছবি— এসব বাবা, কাকা পিসি এদের সবাইকে শক্ত আঠার মতো করে রেখেছিলো। শ্রীলা চলে যাবার কদিন পরে, একাত্তর সালের প্রথমদিকে এক দুপুরবেলায়, একটা ট্যাক্সিতে আমি ছোমা, সে বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম দক্ষিণ কলকাতায়। বাবা লরিতে মালপত্র নিয়ে এলে চলে যাবার দিন আমি বাড়ির ছাদে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। যেখানে আমার অত সঙ্গে ভালোবাসার রহস্য নিয়ে অনেক হয়। যেখানে অতনুর সঙ্গে আমার শেষ হয়। যেখানে দাঁড়ালে অনেক বাড়ির রান্নার ধোঁয়া, শহরতলীর একজোট জীবন দুঃখ-সুখ হট্টগোল বুঝে নেওয়া যেত চিলেকোঠার ঘরের দেয়ালে পেনসিলে লেখা 'দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সপ্তম শ্রেণী, রোল নং, ক্রমিক সংখ্যা তেরো।' পেনসিলে, আর ব্যাঁকা বড় বড় অক্ষরে। 'রোল নাম্বার টিন, এদিকে এসো'—অঙ্কের মাস্টার গোবর্ধনবাবু বেত উঁচিয়ে ডাকতেন। তেরো সংখ্যাটা আমার ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসেছিলো ক্লাস সেভেনে। মনে হোতো ঐ অশুভ সংখ্যাটার জন্যই গোবর্ধনবাবুর ক্লাসে আমি কখনো ভালোভাবে অঙ্ক করে পরবো না। হাফইয়ার্লির পরীক্ষায় এই ভূত আমার খারাপ ফল হোলো। চিলেকোঠার দেয়ালে আরো অনেক কথা পেনসিলে লেখা আমারই। মন খারাপ হলেই ছাদের ঘরে গিয়ে আমি এসব দেয়ালালিপির জন্ম দিতে আর এক জায়গায় দেখি লেখা আছে 'ভগবান শকতি দাও !' ছোটবেলায় ভগবান কবে যেন মরে গেছে। আশ্চর্য ! কবে গেলো। সিঁড়িতে অন্ধকার থাকলে, নেমে আসার সময়ে আমাকে সাহস দিতে ভগবানটাই তো। যাকে কখনো এক পয়সা বাতাসা খাওয়াইনি। বরং তার জন্যে (কার জন্যে ?) তুলে রাখা বাতাসার প্যাকেট হরদম চুরি করেছি। পরীক্ষার কোয়েশ্চেন পেপার হাতে পাবার আগে সন্ধ্যেবেলায় দোতলার বারান্দা থেকে গলা গলায় বাবা হঠাৎ আমায় ডেকে উঠলে, লোকটার কথাই মনে পড়তো। খুব ভালো ধারণা ছিল না যার সম্বন্ধে। কখনো বাবার মতো মনে হোতো, কখনো মতো। কখনো আবার ছোড়দিভাই অবিনাশকাকুর মতো। সেই ভগবানের গলার কান্নাটা শক্ত হয়ে উঠতেই বুঝতে পারলাম আমার কান্না পাচ্ছে। ভগবানটা এখানেই থেকে যাবে। এই চিলেকোঠায়। আমরা চলে যাবো। শ্রীলাও যাবে। আরো অনেক দূরে। ও আমার কান্নাকে দেখতেই পেলো না কখনো।

সমালোচনা

ভূমি রাজস্ব ও জরীপ

ভারতবর্ষে ভূমি সংস্কার নিয়ে বেশ কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে, কিন্তু ভূমি রাজস্ব ও জরীপ নিয়ে লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম, এবং বাংলা ভাষায় বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থ আছে বলে মোর জানা নেই। এদিক দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি পথিকৃৎ।

ভূমি-রাজস্ব ও জরীপ নিয়ে আলোচনা একটি নীরস বিষয়, অন্যদিকে ভূমি-সংস্কারের ওপর আলোচনা এখন আধুনিকতার একটি চিহ্ন বলে মনে করা হয়। ভূমি-সংস্কারের সঙ্গে রাজস্ব ও জরীপের প্রত্যক্ষ বিশেষ সম্বন্ধ না থাকলেও একেবারে সম্পর্কহীন—একথা বলা যায় না। যারা ভূমি-সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামান না তারাও জরীপ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানেন। গ্রাম বা শহরের অনেক জমির মালিককেই তাঁর নিজের সম্পত্তিটি কোন না কোন সময়ে জরীপ করিয়ে নিতে হয়েছে। ভূমি-সংস্কারের মধ্যে মিশে আছে অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি; জরীপের মধ্যে আছে শুধু কতকগুলো প্রকরণ। জরীপের কাজ তাই একেবারেই সাদামাটা। ভূমি-রাজস্বের সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা যায়। এককালে যখন আয়কর বা বিক্রয়-কর খুব একটা প্রচলন ছিল না তখন ভূমি-রাজস্ব ছিল সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। সেই ভূমি-রাজস্ব বর্তমানে সরকারের মোট উৎস হিসেবে অপ্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভূমি-রাজস্বের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসও খুব একটা জনপ্রিয় বা আকর্ষণীয় বিষয়-বস্তু নয়। গ্রন্থকারকে অভিনন্দন—তিনি এই নীরস বিষয়-বস্তুকেও যথেষ্ট সরসতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ভূমি-রাজস্ব ও জরীপের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জরীপের ক্রমবিবর্তনের পরিচ্ছেদটি বিশদ টেকনিক্যাল বিবরণ দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কারের জন্য প্রণীত প্রধান আইন দুটি—অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইন ও পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার অনেকগুলি কেস্-স্টাডি বা দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মধ্যে গরীব চাষীর অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। ইন্দ্র লোহার, মতিলাল প্রভৃতি বর্গাদারদের অসহায়তার তিনি তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। আমাদের দেশে জোতদারেরা আইনের প্যাঁচে ভাগচাষীদের উপর যে অত্যাচার করে আসছেন যুগ যুগ ধরে, তার সাম্প্রতিকতম কয়েকটি ঘটনা গ্রন্থকার মরদী মন দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে তিনি শাসনযন্ত্রকেও বলিষ্ঠভাবে সমালোচনা করতে পিছপা হননি। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন ভূমি-সংস্কার আইনের রূপায়ণে বাঞ্ছিত পথ কী। এই অংশে তিনি সার্ভে বা জরীপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের আলোচনা করেছেন দীর্ঘ একশ পৃষ্ঠা জুড়ে। আমাদের মতে এই অংশটি একটি পৃথক অধ্যায়ে রাখলে গ্রন্থটির পর্যায়ক্রমে সুসংহত হত, কারণ সার্ভে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'ভূমি সংস্কার আইনের রূপায়ণে বাঞ্ছিত পথ'—এই আলোচনার মধ্যে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। অবশ্য, জরীপ সম্বন্ধে যাঁদের জানবার আগ্রহ আছে বা জরীপ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাছে এই অংশটি মূল্যবান বলে মনে হবে। ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি পথনির্দেশ করেছেন উপসংহার অংশে। গ্রন্থকার জরীপ বিভাগের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বলেই মনে হয়, কারণ ভূমি-রাজস্ব ও জরীপ নিয়ে এমন তথ্যবহুল আলোচনা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। আরও মনে হয়—তিনি ভূমিসংস্কার আইনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্বন্ধেও যথেষ্ট অবহিত আছেন, কারণ যে-সব খুঁটিনাটি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন তা ভেতর থেকে দেখা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। এজন্যই আমাদের আশা ছিল—পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কারের বাঞ্ছিত পথ কী হবে সে সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা আরো বিশদ হবে। আমাদের অবশ্য মনে রাখা দরকার যে এই গ্রন্থটি মূলতঃ ভূমি-রাজস্ব ও জরীপ নিয়ে, ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে সেটুকু আমাদের উপরি পাওনা। গ্রন্থটির শেষে কয়েকটি মূল্যবান পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে।

ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ

ভূমি রাজস্ব ও জরীপ। টোডরমল। জ্যোতি প্রকাশন। দ্বিতীয় সংস্করণ। দাম পনের টাকা।

নাটক নিয়ে

ভারতীয়দের অভারতীয় ভাষায় বিশেষত ইংরেজীতে সাহিত্য চর্চার প্রয়াস উনিশ শতক থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়াসের উৎস-ভূমি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ। আর এর নেপথ্যলোকে আছে স্থানীয় ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর জগতের নিকট-সান্নিধ্য লাভের একটি নিভৃত প্রেরণা। পরবর্তীকালে এই একই প্রেরণা থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজীতে সাহিত্য চর্চার বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে এবং সেই সব আলোচনায় এদের গুণাগুণ নির্ণয়েরও চেষ্টা করা হয়েছে। এই ধরনের আলোচনার একটি সংকলন গ্রন্থ হল পার্সপেকটিভস অন ইণ্ডিয়ান ড্রামা ইন ইংলিশ। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন কর্ণাটক ইউনিভার্সিটির ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক এম কে নায়েক এবং ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই ইংরেজী বিভাগের বীডার অধ্যাপক এস মোকাসি পুনেকার। ভারতীয় প্রচ্ছদে যে সব ইংরেজী নাটক এদেশে লিখিত হয়েছে, গ্রন্থটিতে তার বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। স্বভাবতঃ আয়তনের সীমাবদ্ধতার জন্যে অনেক নাটকই বাদ পড়েছে। তা হলেও বিষয়বস্তুর নতুনত্ব পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কেননা, ভারতীয় ভাব-ভাবনা অবলম্বনে লিখিত ইংরেজী নাটকের আলোচনা এদেশে খুব কমই হয়েছে। তাই এঁদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

গ্রন্থটিতে খুব অল্প কয়েকজন নাট্যকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং টি পি কৈলাসম। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে দেশে-বিদেশে অজস্র আলোচনা হয়েছে। তাই তাঁর নাটকের আলোচনা করতে হলে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, নির্মল মুখার্জির কোটেশন-কণ্টকিত এ্যাকাডেমিক আলোচনাটির ধার বা ভার কিছুই নেই। এত অগভীর আলোচনাটির সংযোজনের কোন্ প্রয়োজন ছিল বলে

মনে হয় না। তুলনায় এস কে দেশাই-এর দি পোস্ট অফিসের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি মন্দ নয়, যদিও নাটকটির গভীরে তিনি প্রবেশ করবার চেষ্টা করেন নি।

শ্রীঅরবিন্দের নাটকের ওপর আলোচনা আছে দুটি। এই দুটির মধ্যে এম এস কুলকার্ণির আলোচনাটি গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ মোট পাঁচখানা পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য লিখেছেন। অধ্যাপক কুলকার্ণি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এই নাটকগুলোর ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন এবং নাটকের মৌল ভাবনা কৃতিত্বের সঙ্গে উদ্ঘাটন করেছেন। প্রেমা নন্দকুমারের আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি-ভাবনার দিকটি বিশেষভাবে আলোকিত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে কিভাবে আধ্যাত্মিক পিপাসা এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনটি শ্রীঅরবিন্দের নাটকে একত্রবদ্ধ হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত-সুন্দর আলোচনা করেছে প্রেমা নন্দকুমার।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগতে হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। হারীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ এবং অভিনেতা। তাঁর বিশিষ্ট চিন্তা-চেতনার দিকটি তাঁর নাটকের মধ্যেও স্পষ্টরেখ হয়ে আছে। বলা যায়, তাঁর ইতিবাচক ভাবনা এবং তীক্ষ্ণ মননশীলতা নাটকের মত বস্তুধর্মী শিল্পে যেন আরও সংহতরূপে সংসিদ্ধ। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তাঁর নাটকের ওপর যথাযথ আলোচনার এখনও অভাব রয়ে গেছে। স্বভাবতই গ্রন্থটিতে হারীন্দ্রনাথের ওপর আলোচনা দেখে খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম। কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যেন পাঠকের মন ভরতে চায় না। হারীন্দ্রনাথের ওপর জি এস বলরাম গুপ্তের আলোচনাটি মোটামুটি ইনফরমেটিভ। কিন্তু সংবাদ সরবরাহের পরেও পাঠক আরও কিছু প্রত্যাশা করে। আমাদের মনে হয়, আর একটু উষ্ণ হৃদয় দিয়ে আলোচনা করলে বোধহয় সেই প্রত্যাশা মিটত। যেমন, দি সেন্টিস্ল ল্যাবার্টার্ণ, দি প্যারট এবং দি কফিনের ওপর সুবিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। কেননা, তাঁর মূল জীবন-ভাবনা এই নাটকগুলোর মধ্যে প্রকাশিত।

গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সে সব ভারতীয় ইংরেজী নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে টি পি কেলাসম্ অন্যতম। তাঁর রচনার প্রেরণাকেন্দ্র হল আমাদের দেশের আর্ষ মহাকাব্য দুটি। তবে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের ঘটনা-সংক্ষুব্ধ জীবনভূমি তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই মহাভারতীয় বিভিন্ন কথাকে তিনি অঙ্কিত করেছেন আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার আলোকে। কিন্তু কেলাসমের নাটক সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন। তাই তাঁর নাটককে পরিচায়িত করে আলোচনার অগ্রসৃতি ঘটলে সর্বস্তরের পাঠকের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হত।

এই গ্রন্থের বিশেষ মূল্যবান অংশ হল বিবলিওগ্রাফিটি। এস কৃষ্ণভট্ট বিশেষ যত্ন-সহকারে ভারতীয়দের যাবতীয় ইংরেজী নাটক রচনার তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্যে গ্রন্থটি বিশেষ মর্যাদা দাবী করতে পারে।

কার্তিক ভদ্র

পার্সপেকটিভস অন ইণ্ডিয়ান ড্রামা ইন ইংলিশ সম্পাদক : এম কে নায়েক এবং এস মোকাসি পুনেকার। অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। চল্লিশ টাকা।

আশাপূর্ণা

যুগান্তের যবনিকা পারে' সদ্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিতা আশাপূর্ণা দেবীর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস। এই উপন্যাসে আমরা সেই সময়ের এক জমিদার পরিবারের কাহিনী পাই, যে সময়ে দেশের অধিকাংশ পন্ডিত এই মত পোষণ করতেন, লেখাপড়া শিখলেই স্ত্রীলোকের চিত্ত বহির্মুখী হয়ে যাবে, গৃহ-সংসারের প্রতি আর মন থাকবে না, শিশু-পালনে অবহেলা আসবে' ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে সময়ের দিক থেকে পুরোনো মনে হলেও, এই উপন্যাসের কিছু কিছু সমস্যা কিন্তু চিরকালীন। বিবাহের পর সন্তানাদি না হওয়ার কারণ হিসেবে এখনো, এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, প্রথম চোটেই আঙুল তুলে চিহ্নিত করা হয় স্ত্রীকে। —উল্টোটাও তো হতে পারে। হতে পারে এবং হয়ও,—কিন্তু আমরা এখনো সংস্কার মুক্ত নই। এই উপন্যাসে অল্পকথায় হলেও নারীমুক্তির কথা আছে এবং আমরা সকলেই অবহিত কত আন্তরিক ও সচেতনভাবে আশাপূর্ণাদেবী তাঁর কলম মারফৎ যথার্থ নারীমুক্তির জন্যে কাজ করে চলেছেন।

উপন্যাসের নায়ক সোমনাথ রায়-চৌধুরী। অতি অল্প বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং বহু বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোনো সন্তান আসে না। পৃথিবীর সর্বত্র দত্তক নেওয়ার প্রথা ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু সোমনাথের স্ত্রী শুভংকরী রাজী নয়। অগত্যা বংশ রক্ষার তাগিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহ করলেন সোমনাথ,—যে সোমনাথ বহু বিবাহ নিবারণী কমিটির সদস্য তালিকায় স্বাক্ষর করেছেন। এই সত্য গোপনের যন্ত্রণা সোমনাথকে কুড়ে কুড়ে খায়।

ওদিকে দরিদ্র পরিবারের মেয়ে—এক-গ্রাস সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যেই যায় এই বিশাল জমিদার পরিবারে বিবাহ হয়েছে,—সেই নবদুর্গার কোলেও কোনো সন্তান আসে না।

দ্বিতীয় বিবাহের পর সন্তান না আসার কারণ বুঝি সোমনাথ,—উপন্যাসটি পড়তে পড়তে তাই মনে হয়, কিন্তু এক তীব্র যন্ত্রণা এবং চরম অতৃপ্ততা নিয়ে নবদুর্গার আত্মহত্যার পর আসল কারণ উদ্ঘাটিত হয় যখন, তখন মুহূর্তে উপন্যাসটির গভীরতা স্পর্শ করে।

আশাপূর্ণা দেবীর ঈর্ষণীয় কলমে আঁচড়ে বড় চরিত্র ছাড়াও,—হরিমতি, মানদা বুড়ী, পরাণের ঠাকুমা প্রমুখ ছোট ছোট চরিত্রগুলি বড় জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে যেন ঘোরাফেরা করে।

ছাপা ভালো। তবে বাঁধাই এবং গেটআপের প্রচ্ছদ আরো উন্নতমানের হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অল্প যে কটি ছাপার ভুল আছে, তার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দে মধ্যে ফেলে দেয়। সোমনাথের মায়ের নাম ছাপা হয়েছে প্রথম দিকে ফুল্লকমল এবং পরে ফুল্লকুসুম।—কোনটা ঠিক?

নির্মলকুমার দ

যুগান্তের যবনিকা পরে : আশাপূর্ণা দেবী বিমলারঞ্জন প্রকাশন, ৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩। দাম এগারো টাকা।

অমিতাভ

অমিতাভ গুপ্ত একজন পরিণত তরুণ কবি। বেশ কিছুকাল ধরেই তিনি পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছেন, কয়েক বছর আগে আলো নামে একটি কবিতাগ্রন্থ বেরিয়েছিল। সেই বইটিতে পরিচয় সুরুচিবান একটি তরুণ কবিমনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল, যিনি লেখেন অভ্যাসে লেখেন না, একটি তাড়না থেকে লেখেন, একটি স্বচ্ছ কেন্দ্র থাকে তাঁর কবিতায়। ছন্দ জানেন অমিতাভ, তাই গদ্য ভঙ্গিতে যখন লেখেন তখনও মাত্রাবোধ হারান না।

অমিতাভর কবিতায় সঙ্গীতধর্ম আর ভাষার দিক থেকে তিনি স্বেচ্ছাচারী নন বরং ব্যবহৃত শব্দ থেকে যতখানি ক্ষমতা বের করে নিতে পারা যায় তারই চেষ্টা করবেন। ছন্দ, তা-ও ভাঙ্গেন না, অনিলের মতন একটি শৈলীতে তাকে ব্যবহার করেন। অমিতাভর কবিতা পড়ে মনে হয় তিনি আঘাতকে ফিরিয়ে দিতে চান, নিজের মধ্যে তাকে আত্মস্থ করে কবিতায় মুক্ত করে দিতে চান এই তরুণ কবি। প্রথম দিকে কবিতার বিষয়ের সীমাবদ্ধতা বর্তমান গ্রন্থে বড় পরিসরে চলে আসতে দেখি, তাঁর অশান্ত রোমান্টিকতা ও আস্তিক্যে ক্রমশই চিড় ধরছে। অমিতাভ পারিপার্শ্বের অস্থিরতার টেনসানে কবিতা অন্য মাত্রায় বেঁধে দিতে চাইছেন। যেহেতু কবিতা করে তোলার শিক্ষা তাঁর আছে তাই কতদূর গিয়ে থামতে হবে তাও তাঁর জানা। এ গ্রন্থে মুক্তকগুলি পরিচয় অনেক, স্টাইলের দিক থেকে নিজস্বতা আছে, বোধ ও বেদনা আছে শিক্ষা ও সংযম আছে, যা একালের তরুণ কবিদের তেমন সহজলভ্য নয়। অমিতাভ কবি, এ প্রমাণ রয়েছে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এসো আমার ঘরে। অমিতাভ গুপ্ত। প্রাসেয়পত্র। তিন টাকা।

সোসালিস্টরা আত্মহত্যা করছে?

জনতা পার্টির মঞ্চে ভারী পর্দার আড়ালে এক নতুন ধরনের কুচকাওয়াজ শুরু হয়েছে। নানা কৌশল ও কায়দায় মুখোমুখি মুখে দাঁড়াতে কোমর বাঁধছে জনসংঘ-আর এস এস এবং সোসালিস্ট দল। পাঁচ শরিকের জনতা পার্টিতে আর তিনটি গোষ্ঠীর ভাবগতিক এখন আর তেমন গোপন থাকছে না। ভারতীয় লোকদলের মধ্যে লোহিয়া সোসালিস্ট এবং বিজু পট্টনায়ক ও পিলু মোদির সমর্থকরা বাদে রাজনারায়ণ সমেত অন্যরা এই কুচকাওয়াজে তাল মিলিয়ে জনসংঘের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সংগঠন কংগ্রেস এবং কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি দলের লোকজনেরা নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি নিলেও বর্তমান দৃশ্যপটে এখন তারা সোসালিস্টদের কাছাকাছি।

ব্যক্তিগত বেবারেষি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত জনতা পার্টিতে বছরখানেক পরে এই প্রথম সম্পূর্ণ অন্য ধরণের কনফ্রন্টেশনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই নয়া নাটকের কয়েকজন নায়কের গতিবিধি ও হাবভাব থেকে এটা যেন পরিষ্কার যে অদূর ভবিষ্যতের কোন এক ঝড়ের মোকাবিলার জন্য এঁরা তৈরী হচ্ছেন। নিজেদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকজনের কাছে এঁরা চলছেন আগামী জুলাই-আগস্ট মাস দিয়ে নাকি জনতা পার্টিতে কিছু ঘটতে পারে। ব্যক্তিগত কলহ-বিবাদের ব্যাপার যে এটা নয় সে কথাও এঁরা স্বীকার করছেন। আর ব্যক্তিগত কলহ-বিবাদ নয় বলেই নয়াদিল্লিতে জনতাকে ভেঙে বাস্তাধন বলে পিঠ চাপড়ানো ইত্যাদি নতুন কনফ্রন্টেশনের মীমাংসা হবে না। এই সম্ভাব্য মোকাবিলার প্রস্তুতিপর্বের প্রধান উদ্যোক্তারা হলেন জনসংঘ-আর এস এস দলের নানাজী দেশমুখ এবং সোসালিস্ট গোষ্ঠীর মধু লিমায়ে। এঁরা দুজনেই সংসদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় জনতা পার্টির দুই অন্যতম সাধারণ সম্পাদক।

জনতা পার্টির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতির গতিপথ কোনদিকে মোড় নেবে সেই নিয়ে আসলে তাত্ত্বিক। এ ব্যাপারে স্পষ্টাস্পষ্টি বক্তব্য রাখছেন জনসংঘ, আর এস এস এবং সোসালিস্ট দল। তুলনামূলক বিচারে অন্য তিনটি চুপচাপ। পার্টির স্টিয়ারিং ধরতে কে অন্দর মহলে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ধাক্কা ঠেলাঠেলি চলছে। ঠেলাঠেলির এই দ্বন্দ্বিতার লক্ষণীয় ব্যাপার হল কোন পক্ষই কিন্তু দলকে ভাঙতে চান না। কারণ তা ভাঙলে ক্ষতি সকলের। সুতরাং রাজনৈতিক লোকসানের পথ এড়িয়ে একই

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

পর্যবেক্ষক

সময়ে একদিকে যেমন জনসংঘ-আর এস এস অন্যদিকে তেমনি সোসালিস্ট গোষ্ঠী পার্টির ভিতরে ও বাইরে নিজেদের প্রভাবিত এলাকার পরিধি বাড়াচ্ছেন। জনতা পার্টির সাংগঠনিক নির্বাচনের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে এই প্রচেষ্টা ইদানীং জোরদার হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে শুরু করে রাজ্যে-রাজ্যে জনতা পার্টির শাখা-উপশাখাগুলো হল পুরোদস্তুর এক হক ব্যাপার। দলের নির্বাচন সম্বন্ধে জনসংঘ-আর এস এস এবং ভারতীয় লোকদল বাদে অন্য শরিকরা লক্ষণীয়ভাবে উদাসীন, সাংগঠনিক নির্বাচনের ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব এঁরা পিছিয়ে দিতে চান। এমন কি নির্বাচন কবে নাগাদ হওয়া দরকার সে কথাও বলতে চান না সোসালিস্টরা। কিন্তু না বললেও এড হক ব্যবস্থায় একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে। সোসালিস্ট এবং অন্য শরিকরা চাইলেও কি আর বেশীদিন নির্বাচন স্থগিত রাখা যাবে। এত হকিজম দিয়ে কাজ চালানো ক্রমশ মুস্কিল হয়ে পড়বে কেননা নিছক কংগ্রেস বিরোধীতার ভাবমূর্তি ছেড়ে সত্যেজমিনে কাজ করবার উপযুক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের এবং রীতি পদ্ধতি বেরোবার সময় এসেছে। জনসংঘ-আর এস এস গোষ্ঠীর বক্তব্য হল জনতা পার্টিকে ডিসিপ্লিনে বাঁধা পাকাপাকি সংগঠনের রূপ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাদের মতে এ কাজে আর টিলেমিলি করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আগামী অক্টোবর মাসের আগেই অর্থাৎ আগস্ট মাস দিয়ে সাংগঠনিক নির্বাচন হোক। এমন প্রস্তাবে আপত্তি থাকলেও অন্য শরিকরা জোর গলায় না-না বলতে পারছে না। তারা ভেবে পাচ্ছে না কিসের ভিত্তিতে এবং কোন যুক্তিতে তারা আপত্তি করবে। জনসংঘ-আর এস এস বলছে এই বিরাট এলোমেলো সংগঠন নিয়ে পঁচিশটি কোটি লোকের এই বিশাল দেশ চালানো যায় না। সাংগঠনিক নির্বাচন করো: তাদের এই জোরের পিছনে রয়েছে তাদের নিজস্ব দলীয় সংগঠন। সাংগঠনিক নির্বাচনের ভূমিকাতে যেন ভূত দেখছে সোসালিস্ট ও অন্য শরিকরা। তাড়াতাড়ি নির্বাচন হলে সোসালিস্টরা মনে করছে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

এই সব কথাবার্তার দমবাব পাত্র নয় সোসালিস্টরা তারা বলছে আমরা সঙ্গে আছি বলেই জনসংঘ-বি এল ডি অসুবিধে

জনতা পার্টিকে তবু যা একটু প্রগতিশীল বলে মনে হয়। সোসালিস্টদের সহায়তা বিনা নাকি জনতা পার্টির পক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হরিজন এবং তপশিলিদের সামাজিক আস্থা ও রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়া সম্ভব হবে না।

নানা কারণে সোসালিস্টরা অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে গত ত্রিশ বছরে। এই টুকরো টুকরো দলের অনেকেই ইদানীংকালে দেশের মুখ্য রাজনৈতিক সেতুধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এঁদের কয়েকজনের দেখা পাওয়া যেতো সংসদে কিংবা রাজ্য বিধানসভায় হঠাৎ হঠাৎ কোন জনলোভনী ভাষণের মাধ্যমে। সোসালিস্টদের তাই লক্ষ্য করবার মত বিরাট জনপ্রিয় বেস নেই। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন বলে সোসালিস্ট নেতাদের একটা ইমেজ আছে। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বহু সোসালিস্ট নেতার নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। গত সংসদীয় ও রাজ্য নির্বাচনের পর অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সোসালিস্টরাও ক্ষমতায় ভাগ-বাঁটোয়ারায় একটা স্থান করে নিয়েছে। রাজনারায়ণ এবং মোহন ধারিয়াকে আপাতত হিসেবের মধ্যে না এনেও পুরুষোত্তম কৌশিক মধু দন্ডবতে এবং মর্ম ফার্ণান্ডেজকে নিয়ে কেন্দ্রে এখন তিনজন সোসালিস্ট মন্ত্রী। বহুকাল পরে সোসালিস্টরা মনে করছে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটা নির্দিষ্ট ভাবমূর্তি নিয়ে সক্রিয় হওয়া দরকার। নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ বিসর্জন দিয়ে সোসালিস্টরা এখন ঘর গোছাতে ব্যস্ত। এদের ধারণা চুপচাপ থাকলে মুখ্যতঃ জনসংঘ-আর এস এস গোষ্ঠীর চাপে নাকি জনতা পার্টির মধ্যে বসে বসেই তাদের নাভিশ্বাস উঠবে। সুতরাং আস্তিন গুটিয়ে কাজে নামা দরকার। দুই কংগ্রেসে সমভাবাপন্ন লোকজনের সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টাও করছে সোসালিস্টরা। ভবিষ্যতে জনতা পার্টির বাইরের বিভিন্ন সমাজবাদী দল এবং এমনকি কম্যুনিস্টদেরও সমর্থন পাওয়া যাবে বলে সোসালিস্টরা আশা করে। জনতা পার্টির নীতিকে জনমুখী করতে হলে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাডিক্যালিজম বিনা নাকি অন্য কোন পথ নেই এমন মন্তব্য করছেন কিছু সোসালিস্ট। জনসংঘ-আর এস এস দলের সঙ্গে চলছে সোসালিস্টদের অবিরাম কথা কাটাকাটি। সোসালিস্টরা বলছে: নিজেদের সংগঠিত করে আমাদের বক্তব্যকে সোচ্চার করে তুলব। জনসংঘ-আর এস এস জবাব দিচ্ছে: সোসালিস্টদের গতিবিধি তাদের রাজনৈতিক আত্মহত্যার পথে নিয়ে যাচ্ছে।

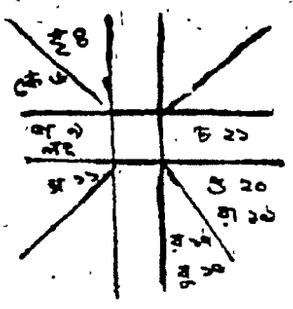

আগষ্টে বৃহস্পতি সহায়

৩, ৪, ৫ জুন ইন্দিরার পক্ষে অশুভ

কোন মহান ভারতীয়ের মৃত্যু

রবির দশা ভোগ্য এক বৎসর ১১ মাস ২৭ দিন

বর্তমানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বে একজন বিতর্কিতা মহিলা। যাঁর ভবিতব্য সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত বিশ্ববাসীই কৌতূহলী এই সংখ্যাতে আমরা তাঁর সম্ভাব্য ভবিতব্যের আভাষ দিতে চেষ্টা করছি। শ্রীমতী গান্ধীর রাশিচক্রে উল্লেখযোগ্য লগ্নপতি এবং রাশ্যাধিপতির স্থান বিনিময়। স্থান বিনিময় করেছে রবি এবং মঙ্গল, আর স্থান বিনিময় হয়েছে বৃহস্পতি এবং শুক্রের মধ্যে। জাতিকার মকর রাশি অধিপতি শনি, লগ্ন কর্কট তার ভাগ্যপতি বৃহস্পতি এবং কর্কট লগ্নের পক্ষে যোগকারক গ্রহ মঙ্গলের গতি এবং কারকতায় উপর দৃষ্টি রাখলেই জাতিকার জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাষ নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে শনির দশা চলিতেছে। এর আগে বৃহস্পতি দশা চলাকালীনই জাতিকার জীবন ঘটনা বহুল হয়ে ওঠে এবং তিনি বিশ্বে একজন প্রথম সারির বলে গণ্য হন। এই বৃহস্পতির দশা ভোগ করেছেন '৫৪ সালের অকটোবর থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত। ঘটনাবহুল এই বৃহস্পতির দশাতে যেমন উনি হারিয়েছেন স্বামী এবং পিতাকে তেমন ভাগ্যকারক দশাতেই তিনি হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি। '৭০ সাল থেকে শনির দশা আরম্ভ হয়। শনির প্রথম ৫ বৎসর ভাল গেলেও স্বাদশস্থ কেতুর অন্তর্দশায় অশুভ ফলের সূচনা করে। গোচরে শনি দ্বিতীয়স্থ মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্ক করতেই জাতিকার পতন হলো। চন্দ্র থেকে অষ্টমস্থ মঙ্গলের সঙ্গে গোচরে শনির সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও গত জুলাই মাস থেকে জাতিকা শনির দশাতে শুক্রের অন্তর্দশা প্রাপ্ত হওয়ায় পুনরায় কিছুটা শুভ ফল প্রাপ্ত হলেন যা চলবে '৮০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই শনি শুক্রের দশা চলাকালীন জাতিকা আগষ্ট মাস থেকে গোচরে বৃহস্পতির সহায়তা পাবেন। এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ভাগ্যকারক বৃহস্পতি লগ্নে তুঙ্গী হয়ে ভাগ্যস্থানকে পূর্ণ দৃষ্টি করবে আর তুলাস্থ গোচর মঙ্গলের কেন্দ্র সম্পর্ক জাতিকার পক্ষে

হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে। যা তিনি পূর্বে ১৯৬৭ সলে দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হবার সময় পেয়েছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেই জুন মাসটা জাতিকার পক্ষে অত্যন্ত অশুভত্বের বহন করে, চন্দ্র থেকে নিধন এবং বন্ধন স্থানে জুন মাসে শনি মঙ্গলের সাথে গোচর মঙ্গলের মিলন মোটেই শুভজনক নয়। জুন থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই শনি মঙ্গলের মিলন অতীব অশুভ বিশেষ করে স্বাস্থ্য এবং আইন বিষয়ক। জাতিকার পক্ষে ৩, ৪, ৫ই জুন অশুভ। উপরোক্ত সময় মকর রাশির অন্তর্গত ভারতের কোন মহান সন্তানের ও জীবনাশঙ্কা।

*

এবার ২৮শে মে থেকে ৩রা জুন পর্যন্ত

সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি।

মেষ :—ভ্রমণের যোগ আছে, দূরের কোন সংবাদ কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে। অর্থসঙ্কুলান হবে যাবে। স্বাস্থ্য সুবিধের নয়, বুধ বৃহঃ অশুভ।

বৃষ :—ব্যয়ের মাত্রা সংযত করুন। কাউকে কোন কথা দিয়ে পরে অপদস্থ হতে পারেন, শুক্র, শনি শুভ।

মিথুন :—সন্তান স্থানীয় কারোর জন্য চিন্তা, অর্থপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন। মঙ্গল-বারটা অশুভ।

কর্কট :—কর্মে অশান্তি এবং নৈরাশ্য, ভ্রমণে ও ক্ষতির সম্ভাবনা, সপ্তাহটি গোলমেলে।

সিংহ :—নিজের ভুলে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। প্রেম-প্রীতিতে আনন্দ পাবেন। শুক্র, শনি অশুভ।

কন্যা :—গুপ্ত শত্রু এবং স্বাস্থ্য উৎপাত করলেও সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে দিনগুলি লক্ষ্যণীয়।

তুলা :—আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে। ব্যবসাতে ঝুঁকি নেওয়া এবং পথ চলতে সাবধানে। সোম, মঙ্গল অশুভ।

বৃশ্চিক :—কর্মস্থানে ক্ষমতা বৃদ্ধি। শত্রু জয়, কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে চিন্তা।

ধনু :—বুদ্ধি দোষে সুযোগ নষ্ট। সন্তানে চিন্তা, নতুন ঝুঁকি নিতে বিঘ্ন, শুক্র, শনিবার অশুভ।

মকর :—সহযোগীদের মনোভাব চিন্তার কারণ হতে পারে। হাতে অর্থ আসবে। এ সপ্তাহে মনের দৃঢ়তা রাখতে পারলে শুভফল বেশী পাবেন।

কুম্ভ :—একটি ব্যস্তবহুল সপ্তাহ। বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহটি সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক।

মীন :—বুধ, বৃহস্পতিবার কার্য্য পারলে সুখবর এবং সম্মান লাভ। কর্মস্থানে মর্যাদা বৃদ্ধি। দাঁতের রোগে কষ্ট হতে পারে, সোম, মঙ্গলবার অশুভ।

শ্রীমানিক্য

আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী

বিজ্ঞান

বাঁচো এবং বাঁচাও—৮

আঠারো বছরের ফ্রাঙ্ক হজেস্ একজন জল-দূষণ বিশেষজ্ঞ। সে সম্বন্ধে আইন-কানুনের তিনি জগদ্বিখ্যাত প্রবক্তা। বিশ্ব সংস্থা তাঁকে গত বছরের শেষের দিকে ভারতে পাঠিয়েছে ভারতে জল দূষণের ব্যাপারটা দেখতে। প্রত্যেকটি প্রদেশ ঘুরে তিনি প্রাদেশিক সরকারকে পরামর্শ দেবেন, কিভাবে জল-দূষণ রোধ করা যায়।

তাঁর মতে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূষীকরণের জন্য যেসব সংস্থা আছে তাদের অস্তিত্ব শুধু 'নামে মাত্র'।

উত্তর প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা—বলেছেন ফ্রাঙ্ক হজেস—'চূড়ান্ত লজ্জার ব্যাপার।'

উত্তরপ্রদেশ আয়তনে বৃটেনের চেয়ে বড়। তার জল-দূষণ সংস্থায় রয়েছে একটিমাত্র মেম্বার সেক্রেটারী। একজন সহকারী জনস্বাস্থ্য এঞ্জিনিয়ার। আর একটি পিওন। সংস্থার না আছে একজন কেমিস্ট, না আছে ল্যাবরেটরী। প্রাত্যহিক আইনগত কাজ চালাবার জন্যে একটি বাক্তিও নেই।

সেই সংস্থার নাকের ডগায় গোমতীর জল বিষিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। লক্ষ্ণৌ সহর থেকে এসে পড়ছে প্রচুর আবর্জনা। গোমতীকে বিষিয়ে তুলতে সবচেয়ে বড় দোষী লক্ষ্ণৌ কর্পোরেশন। কর্পোরেশন এলাকার যাবতীয় মলমূত্র বইয়ে এনে সরাসরি ফেলা হচ্ছে গোমতীর জলে।

উপযুক্ত লোকের অভাব। উপযুক্ত জলের অভাব। গোমতীকে ঠিকমতো অবস্থায় রাখার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে ফ্রাঙ্ক হজেস্ সমানভাবেই হতাশ। এখানকার জল-দূষণ সংস্থারও হাল অনুরূপ। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের নদী-নালা-খাড়ীর জল "সবচেয়ে বিষাক্ত"। ফ্রাঙ্ক হজেস্ বলছেন—"আমি নিজের চোখে দেখেছি বিভিন্ন সাংঘাতিক বিষাক্ত পদার্থ কলকারখানা নিত্য ঢালছে দামোদরে। দুর্গাপুরের প্রকল্প নিত্য বয়ে আনছে—আমোনাইড, এ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন সালফাইড ও ফেনোলের মতো তীব্র বিষ।" দুর্গাপুর প্রকল্প ছাড়াও এ দোষের দোষী অনেকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের ছুলের টিকিটিও ছুঁতে পারে না।'

জল-দূষণ নিবারণের কাজে ওয়াকিবহাল লোক নিযুক্ত করবার জন্যে সরকারের মাথা নেই। পয়সা নেই যন্ত্রপাতি কেনবার।

ফ্রাঙ্ক হজেস্ সমস্ত দেশ ঘুরে এসে বলছেন—কেরল আর আসামে অবস্থা কিছুটা ভালো। কিন্তু তাই বলে উল্লাস করবার কিছু নেই। গোটা দেশের সর্বেসর্বা-হর্তা-কর্তা-বিধাতা রাজনীতিবিদ্‌রা কেউই জল-দূষণ সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে রাজী নন। কারণ একাজে চটপট লোকের চোখ ধাঁধিয়ে ভোট আদায় করা যায় না। তারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সহরে পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করবে। কিন্তু জলকে বিষমুক্ত রাখবার জন্যে একটি পয়সাও খরচ করতে নারাজ।

মিস্টার হজেস্ বলছেন—তিন বছর হল ভারতে জলের আইন (ওয়াটার অ্যাক্ট) চালু হয়েছে। কিন্তু তা একজনও রাজনীতিকের সামান্যতম সহযোগিতা পায়নি।

হজেসের মতে, ভারতে জল-দূষণের সবচেয়ে বড় কারণ একটাই। কলকারখানা। ভারতবর্ষে জল-দূষণ খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেখানে সেখানে এলোপাথারি শিল্পায়নের ফলে।

নাগরিকরাও জল বিষিয়ে দিতে কম দোষী নয়। কলকাতার নাগরিক সংস্থা কর্পোরেশনের কাজ দেখলেই তা বোঝা যায়।

এইভাবে চলতে থাকলে—ফ্রাঙ্ক হজেস্ হুঁসিয়ারী দিয়ে বলেছেন, ভারতের গ্রাম-নগর বড়-ছোট সহর—রোগের আক্রমণে উজার হয়ে যেতে খুব বেশী দেরি নেই।

হজেসের পরামর্শ, যেকোন জনপদ, প্রতি হাজারের ওপর লোক যেখানে বাস করে, তার জন্যে ভূগর্ভস্থ জলনিকাশ পদ্ধতি চাই-ই-চাই।

ভাগীরথীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে গঙ্গাসাগর থেকে দুশো ছিয়ানব্বই কিলো-মিটার ওপর পর্যন্ত। এই এলাকাটুকু মৎস্য শিল্পের দিক থেকে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই এলাকাতে। কলকারখানার ভিড়ও সাংঘাতিক বেশি। তাদের থেকে যে ধোয়াট এসে জলে পড়ে তার বেশ খানিকটা অম্লাত্মক, বাকিটা ক্ষারাত্মক।

এই ধোয়াটের বেশির ভাগটাই আসে কাগজের কারখানা থেকে। এই ধোয়াটের ভিতরে থাকে অতিমাত্রায় পচনশীল জৈব পদার্থ। প্রচুর লিগনিন আর খুব বেশি মাত্রায় পলি। ভাগিরথীর ধারে ছটা কাগজের কারখানা থেকে প্রতিদিন ৩৯-২৯ মিলিয়ন গ্যালন ধোয়াট এসে পড়ে নদীর জলে। সর্বসাকুল্যে এ অঞ্চলের কলকারখানার ধোয়াট দিনে ৭৭ মিলিয়ন গ্যালন।

কাগজের কলের ধোয়াট থেকে মৎস্য শিল্পের ক্ষতি আসাধারণ। এইসব কলে কাগজ তৈরি হয় সালফাইট প্রক্রিয়ায়। এক একটা কলে কাঁচামাল লাগে—বাঁশ, চল্লিশ থেকে ষাট টন। দশ টন পর্যন্ত ছাঁটা কাটা কাগজ। ছেঁড়া ন্যাকড়া দু টন।

প্রক্রিয়া চালাতে রাসায়নিক লাগে, ফটকিরি দু'তিন টন। ট্যালক দশ টন। রোজিন ১-২৫ টন। ক্লোরিন ৩-৫ টন পর্যন্ত। কস্টিক সোডা দেড়শ থেকে দুশো কেজি। সোডা এ্যাশ ১৮০ কেজি। নানারকম রং পঞ্চাশ কেজি। এছাড়াও লাগে ম্যাগনেশিয়াম বাই স্যালফাইট আর সালফিউ-রাস এসিড। আর লাগে পনেরো টন মাটি।

একটা কল থেকে যে আবর্জনার ধোয়াট বার হয় তাতে জৈব রাসায়নিক পদার্থের ভাগ খুব চড়া। তার জন্যে দরকার হয় প্রচুর অকসিজেনের। নদীর জলে সেই ধোয়াট এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের অকসিজেনের বেশির ভাগটাই গিয়ে মেশে তার সঙ্গে। তখন জলের অকসিজেনের ভাঁড়ারে পড়ে প্রচণ্ড টান।

ফলে সেই অঞ্চলের নদীর জলের জীব-গুলির প্রাণ সংশয়।

জলে জীব ততক্ষণই বাঁচতে পারে যতক্ষণ তাতে অকসিজেনের পরিমাণ খুব কম করে থাকে প্রতি লিটারে পাঁচ মিলিগ্রাম। অন্তত ১৯৬৭তে ডুয়োডবফ আর সামওয়ে দুজনে মিলে একমত হয়েছেন আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের জলভাগ সম্বন্ধে। নেমেরর অবশ্য ১৯৬৩তে বলেছিলেন মাছেদের জলে টিঁকে থাকার জন্যে তিন থেকে চার মিলিগ্রাম অকসিজেন প্রতি লিটার জলে যথেষ্ট।

কিন্তু এই ধোয়াট ছাড়ার পরে, সেই জায়গা থেকে ৭৫০ মিটার অবধি জলভাগের ওপরে, নীচে, মাঝখানে অকসিজেনের পরিমাণ কমে যায় তিন মিলিগ্রামেরও নীচে। জায়গাটা জীব শূন্য হয়ে যায়। ঐ এলাকায় কোন শ্যাওলা ম্যাথা পোকা বা ঘুন ঘুনে চিংড়ি—যেগুলো মাছের খাবার—আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না।'

একবার ওই অবস্থায় জলের নীচেকার বাসিন্দা বাঁশপাতি মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে কাতরে উঠেছিল জলের ওপরে ১৯৭২-এর জুলাইএ। বাতাস নেবার জন্যে তারা ছটফট করছিল। এই অঞ্চলটাতেই বিশেষভাবে ইলিশরা আসে বাচ্চা পাড়ার জন্যে। ইলিশের বাচ্চারা মাবাও পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।

শুধু তাই নয়, লিগনিন হল সেলুলোজ জাতের পদার্থ। তাতে থাকে আঁশের মতো ফিনিস। সেগুলো ইলিশের বাচ্চাদের কানকোয় আটকে যায়। তারা দম আটকে মারা পড়ে।'

ইলিশ বড় মেজাজী মাছ।' তার পরিষ্কার বার বার বাধা পড়তে থাকলে তারা আর সে অঞ্চলে আসবে না।

কাজেই ইলিশের বাচ্চারা যদি কাড়ে বংশে মারা পড়ে, আর ইলিশরা যদি ও পথে তাদের পরিষ্কার বন্ধ করে, বাঙালীর মৎসবুভুক্ষার মৃত্যু। সংস্কৃতির মৃত্যু।' বাঙালী জাতেরও অপমৃত্যু।'

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

পার্ট টাইম বিনোদিনী

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

প্লাক করা ভুরু দুটি তুলে মিসেস চৌধুরী বললেন—আমি তো ওদের ডাকি না। ওরা আমাকে ভালোবাসে আর আমি ইয়ুথ ভালোবাসি। তাই ওরা আসে।" মিসেস চৌধুরীর বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। দুই মেয়ে আর স্বামী নিয়ে ছোট্ট সংসার। সম্প্রতি এম-এ পাঠরতা বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ভালো চাকরি করা শিক্ষিত একটি ছেলের সঙ্গে। মিসেস চৌধুরীর চেহারায় এই চল্লিশ পার হয়েও বেশ একটা জৌলুস আছে। ফর্সা রঙ, টিকোলো নাক, ছোট করে কাটা ঝাকড়া চুলগুলি মুখখানির সৌন্দর্যে একটা ঔদ্ধত্য ভাব এনেছে। উত্তর কলকাতার একটা বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা তিনি। দশ বছরের ওপর তিনি এই জীবনযাপন করেন।

"কেন?" আমার প্রশ্নে মিসেস চৌধুরী বেশ বিরক্ত। "আমার ভালো লাগে।" টাকা? না টাকা আমি নিই না। আর ঐ বাচ্চা ছেলেগুলোর সামর্থই বা কতটুকু? ওরা যদি ভালোবেসে কিছু দেয়, ফিরিয়ে দেব। তবে হ্যাঁ যে সমস্ত রাঘব বোয়ালের জন্য আমার সময় নষ্ট করতে হয় তাদের কাছ থেকে টাকা নিই। কেন নেব না? অন্য কোথাও গেলেও ওরা টাকা ঢালত। ওদের টাকা আছে। কেন দেবে না? আমি তো বিনা শ্রমে টাকা নিই না।"

মিসেস চৌধুরীর সময়ের দাম অনেক। ঘণ্টা প্রতি পঞ্চাশ টাকা। এবং রাঘব বোয়ালের আকার বুঝে তা কখনও কখনও বাড়ে। চল্লিশ উর্ধ্বের এই ভদ্রমহিলা যৌবন ভালোবাসেন আর তাই অগণিত কিশোর তরুণ নিয়ে ওঁর ব্যবসা। এইসব কিশোরেরা ওঁর ফ্ল্যাটে আসে, রাত কাটায়। লাল জলের স্রোত বইয়ে দেন মিসেস চৌধুরী। রেকর্ড বাজিয়ে মাঝে মাঝে নাচগানের আসর বসে। মিসেস চৌধুরীর ফ্ল্যাটে এমনি এক নেশাগ্রস্ত সন্ধ্যায় আমি হাজির হয়েছিলাম। রেকর্ডে বিদেশী সঙ্গীতের ঝাঁঝালো সুর—মিসেস চৌধুরীর পরনে হাল্কা নীল জর্জেটের শাড়ি—আর গাঢ় নীল হাত কাটা স্লাউজ। উন্মুক্ত বাহুতে একটা দামী বিদেশী ঘড়ি। চোখে, মুখে নেশার চিহ্ন। বোধহয় পানের মাত্রাটা একটু বেশীই হয়েছিল। খাটের ওপর বসেছিলেন তিনি—কিছুটা এলোমেলো। কোলের ওপর একজন তরুণ শুয়ে ফিল্ম ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। হাতে লাল গেলাস নিয়ে ঘরের একপাশে চারজন যুবক তাস নিয়ে বসেছে। আর তীব্র সেই সুরের সঙ্গে নেচে চলেছে মিসেস চৌধুরীর মেয়ে জামাই আরও তিন-চারজন তরুণ। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় সেই উন্মত্ত বিকৃতিকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এটা কি সত্তরের দশক? কোলকাতা শহর? যেখানে যৌবন সাক্ষী রেখে যুবকেরা দিয়েছিল প্রাণ?

আমরা কোথায় পৌঁছেছি? আত্ম মর্যাদা হারাতে হারাতে এ কোন অন্ধ গলি? যেখান থেকে বেরোবার আর পথ নেই? দুশো বছরের পরাধীনতার ইতিহাস আমাদের জন্য একি রেখে গেল?

অবশ্য এই আসর রোজ বসে না। মাঝে মাঝে মিসেস চৌধুরীকে বড় বড় হোটেলে যেতে হয়। কখনও কখনও কলকাতার বাইরে আউটিং-এ। মিসেস চৌধুরীর ঠিকানা আছে দু'একজন দালালের কাছে। তারাই সব ব্যবস্থা করে দেয়। সব ঠিক করা থাকে। মিসেস চৌধুরী তখন টাকা রোজগার করেন—অঢেল টাকা। রাতে এক একদিন যখন বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে থামে তখন আর তার নামার ক্ষমতা থাকে না। মিঃ চৌধুরী অথবা সেই কিশোরদেরই মধ্যে কেউ তাকে নামিয়ে নিয়ে যায়। শোনা যায় কোন কোন বেকার তরুণকে তিনি চাকরিও দিয়েছেন।

মিঃ চৌধুরী অবশ্য ভালো চাকরিই করেন। মিসেস চৌধুরী ছোট সংসারটা নির্বিঘ্নেই চলতে পারে। তবু চলে না।

এরা কারা?

"সোনাগাছি" অথবা কালীঘাট অঞ্চলে যে সমস্ত বারবধূদের আস্তানা এরা তারা নয়। আইনের "ছাড়পত্র" বা "লাইসেন্স" এদের নেই। আমার আপনার মধ্যেই এরা বাস করে। আপনার পাশের বাড়ির কলেজে পড়া মেয়েটি অথবা সামনের বাড়ির গৃহবধূটি যে কখন আপনার অজান্তে বিনোদিনী হয়ে গেছে আপনি জানতেই পারেননি। কোন একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে চমকে উঠবেন। এই ধরনের অন্ধকারের জীবন আর সাধারণ জীবনকে এরা বেশ মিলিয়ে নিতে পারে। শহর কোলকাতায় ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে পতিতার সংখ্যা ৫০০০, ১৯৬১তেও যা ছিল ৬০৪৯, অর্থাৎ পতিতার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। খুবই সুখের কথা কিন্তু এদের সংখ্যা যে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এরা আইনের মধ্যে পড়ে না। আর তাই এদের সম্বন্ধে কোন হিসাব পাওয়া যায় না। তাহলে প্রশ্ন এরা কি পতিতা? নিঃসন্দেহে "সোনাগাছি" বা "নন্দনবাগানে" যে সমস্ত মেয়েরা দেহকে মূলধন করে জীবিকানির্বাহ করে এরা তারা নয়। কিন্তু এরা সুস্থ গৃহস্থও নয়। স্বামী-পুত্র, পরিজন সব পেয়েও এরা সুস্থ জীবন পেল না। শুধু কোলকাতা নয়, শহরতলীতেও এই ধরনের মেয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শুধু বিবাহিতা মেয়েরা নয়। কুমারী শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়। পনেরজন এইরকম বিনোদিনীর মধ্যে পাঁচজন কুমারী, কলেজে পড়া মেয়ে। এবং পনেরজনের মধ্যে সাতজন মধ্যবিত্ত বাড়ির, পাঁচজন উচ্চমধ্যবিত্ত ও তিনজন নিম্নবিত্ত বাড়ির মেয়ে।

সুপ্রিয়া মিত্র দক্ষিণ কোলকাতার একটি মেয়েদের কলেজে পড়ে। বয়েস আঠারো। বাবা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের পদস্থ অফিসার। মাও চাকরি করেন। ওরা দুই বোন এক ভাই। সুপ্রিয়া মেয়েটি কৃষ্ণাঙ্গী তবে সুশ্রী। আর খুব হাসি-খুশী, চৌখশ। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তুমি এ কাজ কর কেন?" ঘন কালো ভুরু কুঁচকে সুপ্রিয়া বলল—"আমি জীবন ভালোবাসি। পুরনো মূল্যবোধগুলো আঁকড়ে থাকায় দুর্বলতা আমার নেই। তোমাদের বস্তাপচা সতীত্বের ধারনায় আমার ঘেন্না ধরে গেছে। কি হয়েছে দেহটাকে দামী গয়নার মত লকারে বন্ধ করে রাখার কি দরকার?"

'তুমি কি এভাবে টাকা রোজগার কর?'

সুপ্রিয়া বলল—"টাকা পাই। তবে টাকার জন্য করি না। আমার ভালো লাগে।"

ভালো লাগে? কেন? আঠারো বছরের সুপ্রিয়ার কেন ভালো লাগবে ঐ বিকৃত কামনার পথে যেতে? আমি জানি, সুপ্রিয়াদের বিয়ে হয়ে যায়। তখনও তারা অসুস্থ কামনার বিষবিক্রিয়া থেকে মুক্তি পায় না। যে সংসার তারা গড়ে তোলে তাও সুখের হয় না।

ধারবধূদের সঙ্গে এদের পার্থক্য কি ?

লাইসেন্সপ্রাপ্ত পতিতাদের সঙ্গে এদের একটা মূল পার্থক্য আছে। পতিতাদের সংসার বা ভদ্রজীবনের কোন লাইসেন্স নেই। কিন্তু এরা গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়। সাধারণ ভদ্র জীবন-যাপন করে আবার সেই সঙ্গে দেহকে লক্ষ্য করে অর্থ রোজগারও করে। তবে পতিতাদের যেমন অর্থ রোজগারটাই মূলকথা এদের তা নয়। আরও নানান কারণ এদের এই জীবনে বাধ্য করে। তার আলোচনায় পরে আসছি। এখন চলুন শহরতলীর নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে শিপ্রা রায়ের সঙ্গে আমরা কথা বলে আসি। শিপ্রার বাবা নেই। দাদা সামান্য চাকরি করে। সংসারে ওরা পাঁচজন, তার মধ্যে ভাই দুটি একেবারেই ছোট।"

"তুমি এ কাজ কর কেন ?"

শিপ্রা একটু চিন্তা করে বলল—"ঠিক এ কাজ করব বলে আসিনি। চাকরির প্রয়োজন ছিল। ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু আমি তো স্কুল ফাইন্যাল পাশ তাই চাকরি পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে এই পথে চলে এলাম।"

শিপ্রা ম্লান হাসল, "এখন আর ফেরার পথ নেই। এখানে এত অল্প সময়ে এত টাকা পাওয়া যায়।"

শিপ্রার মত কিছু অল্পবয়সী মেয়ে দক্ষিণ কলকাতার একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে এসে জড়ো হয় বেলা দশটা নাগাদ। ওখানে থাকেন মিসেস দাশগুপ্ত—শিপ্রারা "বড়দি" বলে। বিধবা, মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। নানা হোটেলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ। "বড়দিই কাজ দেন।" কখনও হোটেলে যেতে হয় কখনও মিসেস দাশগুপ্তর ফ্ল্যাটের বিশেষ ঘরে। রাত্রে বাড়ি ফিরে যায়। শিপ্রার সময়ের দামও কম নয়। ঘণ্টা প্রতি পনের টাকা। রোজই যে কাজ পায়, তা নয়। কখনও কখনও ফিরেও যেতে হয়। সাধারণতঃ সপ্তাহে তিনদিন কাজ থাকে। রাত্রে শিপ্রা বাড়ির বাইরে থাকে না। অনেকে থাকে। শিপ্রাকে বললাম—"পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হয় না ?"

"ওসব বড়দির ব্যাপার।"

শিপ্রা বলল—"আমি যে এই পথে এসেছি তা এখনও প্রতিবেশীরা জানে না। ওরা জানে কলকাতায় অফিসে চাকরি করি আমি। পুরোপুরি এই জীবনে না এসে, এইত ভালো।" শিপ্রা মন্তব্য করল।

শিপ্রার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, "কারা আসে তোমাদের কাছে ?"

কারা নয় ? আপনারা যাদের ভদ্র জীবনে সভ্য, সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে জানেন, তারাই আসে। প্রধানতঃ ব্যবসায়ীরা তাছাড়া কলেজের ছেলেরা আর বড় বড় চাকুরিয়ারা।

প্রেম প্রেম খেলা

সুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

প্রেমিক প্রেমিকাদের দেখলেই চেনা যায় এ ধরনের একটা অহংকার আমার বেশ ছিল। বিশেষতঃ প্রেম কথাটা বললেই আমার মনে অনেক কিছু ভালো অনুভূতি এসে জড়ো হতো। তখন আমার কথা প্রেম-এর একটা সুন্দর সিগনি ফিকেন্স দিতো : এ যেন সেই পাথর-সেটিং করা দামী নেকলেস কিংবা হাতের বাউটি জোড়া। আসলে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস পড়ে প্রেম সম্বন্ধে এমন সব মহৎ মহীয়ান ধারণা হতো। কেউ প্রেমে পড়লেই আমি তখন বুঝতে পারতাম। একালের একজন কবি ছন্দে এক জায়গায় যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ এই যে আঁচলের কোন জড়ালেই বুঝতে হবে তার কোন ভালবাসার জন আছে। আমি অবশ্য তেমন কোন ভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারতাম না। লজ্জা লজ্জা মুখ, অপ্রস্তুত হাসি ইত্যাকার কতগুলো মৌলিক লক্ষণ ছাড়াও আরো কিছু গভীর গোপন ব্যাপার জলের মতো ঘুরে ঘুরে মুখে চোখে কেমন অস্বাভাবিক দ্যুতি এনে দিত। এইসব প্রাণদ চিহ্ন দেখে আমি সহজেই ক্লাসিফাই করতে পারতাম কার প্রেম কতদিন আগে শুরু হয়েছে, কার প্রেম এমন কনভেনসুড মিল্ক, আর কার প্রেমই বা বিয়ের চৌকাঠ পার হবার ঠিক আগমার্কা মুহূর্তে। মোট কথা এসব দেখতে শুনতে আমার বেশ ভাল লাগতো কেমন যেন একটা স্বর্গীয় টর্গীয় ব্যাপার মনে হত। প্লেটনিক প্রেম, শরীরী প্রেম ইত্যাদির ডিফারেন্স যেহেতু নিজস্ব অভিজ্ঞতা ব্যতীত জানা সম্ভব নয়, তাই ঐ ধরনের কোন ক্লাসিফিকেসন করার ক্ষমতা আমার তখনও ছিল না। তবে এই প্রেমের জন্যে বন্ধুবান্ধব এবং ঘরের ফাগুনের দৌলতে জানা আত্ম-হত্যার নজীর আমাকে বেশ কষ্ট দিত এবং বসুধৈব কুটুম্বকম্ এই বোধে উদ্দীপ্ত আমি খাতা খুলে বেশ মহান মহান ভাবের কবিতা লিখে ফেলতাম। এইভাবে বেশ কাটছিল। তারপর একদিন বুঝলাম কোথায় যেন কি করে সুরে ছানা কেটে যাচ্ছে। মধু জমতে জমতে মৌচাক-গুলো আর ঠিক ভরে উঠছেনা—চাকের বেশ কিছুটা জায়গা থেকে ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের সাহায্যে পূর্ব সঞ্চিত মধু-গুলো নিম তেতো হয়ে টেনে নিচ্ছে। গাছতলাগুলো অবশ্য ভরে উঠছে ঠিকই ভিক্টোরিয়ার দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ জোড়াবদ্ধ নরনারীর ভীড়ে ঠিকই প্যাকড্আপ লক্ষ্য করলে এও দেখা যায়।

আমি জানি আপনারা ভাবছেন তা-হলে অতো হতাশ হওয়ার কি আছে। আগেও প্রেম ছিল এখনও আছে। সে কথার উত্তর আমি একটু পরে দিচ্ছি। আমরা জানি আরশোলার মতো প্রেমটাও নাকি বহুৎ পুরোন জিনিষ। বহু বিবর্তনে ডাইনোসেরাস আজ হয়তো গিরগিটি কি টিকটিকি অথবা কুমীর হয়েছে (ডার-উইন ক্ষমা করবেন অজ্ঞানতা)—আর ঠিক তেমনি প্রেমের কোলবালিশটা আজ তুলতুলে হাল্কা ছোট্ট একটা পশমঘেরা সাদা ম্যানিব্যাগ কিংবা ভ্যানিটি ব্যাগ হয়েছে। কিন্তু এটা কি জানেন ভ্যানিটি ব্যাগ ও মানিব্যাগ থেকে আজ ভ্যানিটি ও মানি চলে গেছে, পড়ে আছে শুধু ফুটো ফাটা ব্যাগটাই। আর সেই ব্যাগ নির্ভর করে টালমাটাল পায়ে এগিয়ে চলে আজ প্রেম নামক বহু পুরাতন ব্যাধি। কি তার চলা ! একবার তাকিয়ে দেখুন তো খঞ্জ পায়ে, নুলো হাতে, কানা চোখে কি সুন্দর তার চলা—শুধু শরীরটা ইয়া বড়ো হৃদযন্ত্রের মাপ ছোট হতে হতে কলিংবেলের চাবি সাইজের যাতে হাত পড়লে প্রাথমিক টুংটাং জল-তরঙ্গের বদলে জ্যাক করে ভাঙা গলার আওয়াজ বেরোয়।

শরীর একটা দেয়ালের মতো। ঐ দেয়ালে প্রেম নামক বস্তুটা আগে খুবই ঠোক্কর খেত। কিন্তু মজাটা এই একবার হোঁচট খেয়ে আবার ওঠবার চেষ্টা করত। তারপর দেয়ালের লৌকিকতা ভেঙে তেড়েফুঁড়ে প্রেম বুলেট লক্ষ্যভেদী বানের মতো কিছুটা উর্ধ্বায়তনে চলত বলেই চন্দ্রমুখী দেবদাস পার্বতী জাতীয় ক্যারেকটারের সন্ধান পেতাম—অন্ততঃ খুব একটি অবাস্তব বলেও মনে হতো না।

কিন্তু এখনকার শান বাঁধানো রাস্তায় প্রেম রোলারের মতো ঘর্ঘর শব্দে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ঐ যে বললাম শরীরের কথা সেটা কিন্তু আজ আর কোন ফ্যাকটারনয়—বরং শরীর পর্যন্তই প্রেমের পরিণতি ও এর বাইরে প্রেম নামক বস্তুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্তি

চমকে উঠে বললাম—"কলেজের ছেলে ?"

"কেন নয় ? শিপ্রা একটু হেসে বলল—কলেজে পড়লে কি সেকস থাকে না ?"

সেকস থাকে। সেকস আছে। কিন্তু তা নিয়ে এই যে মাত্রাধিক মাতামাতি—এর কারণ কি ? একটা সময় ছিল যখন বাড়ির মেয়েদের সতীত্ব রক্ষার জন্য বেশ্যালয় থাকাটা নীতি বিগর্হিত মনে করা হোত না। এখন নীতি পাল্টেছে। কিন্তু যৌন তৃষ্ণা কমে নি। আর তাই চোরাপথে সমাজের একেবারে মাঝে এসে বসেছে এই দেহ ব্যবসা।

অন্য পথের চেয়ে, এ পথ কিছুটা সুগম বলেও হয়ত একে টাকা রোজগারের অন্যতম পথ হিসেবে অনেকে মেনে নিয়েছে।

স্কুল ফাইন্যাল পাশ শ্যামলী চক্রবর্তী নামের সেই গৌরী বধূটির কপালে উজ্জ্বল সিঁদুর, সিঁথিতে চওড়া প্রলেপ। মুখে লাজুক—মিষ্টি হাসি।

বললাম, "কেন ? এ পথ কেন নিলেন ?"

শ্যামলী বলল—"না। স্বামীর অমতে নয়। তাঁকে জানিয়েই আমার এ রোজগার। সংসারের অনটন থেকে একদিন শুরু করেছিলাম এখন নেশা।" মদের চেয়েও তীব্র, ঝাঁঝালো নেশা। যা স্বামী, সংসার ছেলেমেয়ে কোন বাঁধাই মানে না। শ্যামলীর বয়েস তিরিশ পার হয়েছে। এক ছেলে, এক মেয়ে। দুজনেই স্কুলে পড়ে। স্বামী নাইটার্স বিল্ডিংসের কর্মচারী। এ পথে পয়সা আসুক এটা প্রথমে স্বামীর। ইচ্ছা ছিল। এখন শ্যামলীর নেশা। সুখ, শান্তির গৃহজীবন তার একঘেঁয়ে মনে হয়। কাজের দিনগুলো ছাড়া অন্যদিনগুলো তার বড় বিশ্রী লাগে। সে বড়লোক হতে চায়। টাকার কিনতে চায় মান সম্মান, ইজ্জত। বিকৃত কামনার পথ শ্যামলীর রক্তে, অস্থিতে, মজ্জায় বাসা বেঁধেছে। এর হাত থেকে ওর মুক্তি নেই।

এ পথ কেন ?

সাধারণভাবে পতিতাদের জীবনে অর্থাভাব আর জীবিকার একটা বিরাট আর অন্যতম প্রশ্ন শিপ্রার কাছেও এ প্রশ্ন সামান্য নয়। কিন্তু মিসেস চৌধুরী বা সুপ্রিয়ার কাছে টাকার চেয়েও অন্য কোন প্রয়োজন বড়। সে প্রয়োজন কি এবং কেন এই দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা মোটামুটিভাবে কতকগুলি কারণ পাই।

প্রথমতঃ বিকৃত যৌনতৃষ্ণা। আমাদের সমাজে মেয়েরা চিরকাল ধরেই সেকসকে রুদ্ধ করতে শিখেছেন। সেটাকেই আমরা সভ্যতা বলে জানি। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই সেকস আছে আর তা ঠিকমতন পথ না পেলে বিকৃত হবেই। মিসেস চৌধুরী যখন বলেন যে তিনি যৌবন ভালোবাসেন তখন যে যৌনতৃষ্ণার তিনি শিকার তা বড় স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। আঠারো বছরের সুপ্রিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই, তবে

সন্দেহবাদীও ঠিক স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রেমে না পরং যখন ছুঁয়েছি শরীর তখনি দেখেছি প্রেম।

আমি জানি আপনারা আমার একমত হয়ে গিয়েও লজ্জায় হতে পারছেন না। কিন্তু এর চেয়ে বড়ো সত্যিটা আজ কোথায় ? আসল কথাটা অন্য জায়গায় মনে হয়। আজ হচ্ছে গতির যুগ। যে যতোটা তাড়াতাড়ি রণস্থলে প্রবেশ করবে তারই জয়। এর জন্যে খুব একটা সাহস কিংবা ধৈর্যের দরকার হয় না। দরকার কতগুলো ট্যাকটিসের। এবিষয়ে যে যতো ক্লেভারলি এগোবে তারই ভাগে ফার্স্ট-প্রাইজ আসবে। এইতো স্বল্প সময়। তাতে প্রেমের জন্যে অতো ধৈর্যের দরকার কি বলুন বিশেষতঃ হাত বাড়ালেই ছেলে কিংবা মেয়ে। ইয়াকিং স্টাইলে 'হাই' 'টাই' সম্বোধন শুধু নয় অনেক সর্বনাশা বীজ ঢুকে গেছে আমাদের শরীরে। আমরা এটা বুঝে গেছি প্রেম মানেই ভালোবাসা নয়। জাস্ট লাইক ফ্রেন্ড। উহুঃ ফ্রেন্ড বলে ভাববেন না তা নির্মল ধোবা তুলসী-পাতা। বরং এখানেই ফাঁকিবাজির চোর কাঁটা। না হলে প্রেমিকও বন্ধুর একটা গন্ডীভেদে বিশ্বাসী নই কেন। বন্ধু বলতে আমি বুঝি স্নেহ ভালোবাসা সবই থাকবে কিন্তু 'কামগন্ধ নাহি তায়'। পৃথিবীতে বন্ধুর মতো সুন্দর রিলেশন আর নেই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এমন বন্ধু বলতে কি বুঝি অবশ্যই অপোজিট সেকসের বন্ধুত্বের কথা বলছি। এমন বন্ধু মানেই ডেটিং বন্ধু মানেই স্ফূর্তির জোয়ারে ভেসে যাওয়া। এই জন্যই বয় ফ্রেন্ডের সংজ্ঞা আজও বাড়ির বড়োদের কাছে পরিষ্কার হলো না। বয়ফ্রেন্ড বললেই একটু ভুরুকুঞ্চনের "মিসার" আপনাকে ধরা হবে-ই। আসলে আমরা যদি একটু পরিষ্কার থাকতাম তাহলে এধরনের গেস্তারী পরোয়ানা হয়তো ঝুলত না। অবশ্য এর জন্য অন্যায়ভাবেও আমরা গেস্তার হই। তার জন্যে দোষটা শুধু তাদের নয়—আমাদের এটা তো পরিষ্কার।

আমি বুঝতে পারছি আমার এই কথায় তথাকথিত আলট্রা মর্ডানদের নাক কুঁচকে উঠছে তারা হয়তো বলে উঠবেন, তা বলে কি অপোজিট সেকসে বন্ধুত্ব হবে না ? ফ্রি মিকসিং বলে কিছু থাকবে না ? আমি তার উত্তরে সবিনয়ে বলতে চাই : নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু ফ্যাক্টনেসের মানেটি নিছক দেহচর্চা ? শরীরে শরীর না মেশালে কি কিছুতেই ফ্র্যাঙ্ক হওয়া যায় না। তাই এরই মধ্যে যারা একটু রয়ে সয়ে থাকতে চান তাদের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। গৃহে অন্তরীন আমরা কেউ নই। যথাসম্ভব ওয়াইড্‌লি মিশতে চাই। পরপর যতদূর সম্ভব কাছে এসে হৃদয় নামক বস্তুটাকে ছুঁতে চাই। কিন্তু এমন চাহিদা যাদের তারা কিন্তু নিপাত্তা হয়ে যাবেন এখনকার এই হুজুগে প্রিয় সমাজ থেকে। আণবিক বোমার বিস্ফোরণে আমার যতোই কেঁপে উঠি, না কেন ভালবাসার কথা শুনে হৃদয় দোলায়িত হয় এখন কজনের। কারণও জিনিষটা উইদাউট টিকিটে বহুদিন আগেই পালিয়ে গেছে।

অলিম্পিক থেকে সোনাটোনা দুর্বের কথা দু-একটা বোমাও এখন আর কপালে জুটছে না। তার মানে এই নয় যে আমরা আজ খেলার সমজদার নই। আমরা খুব ভালো খেলোয়াড়। তাই আর প্রেম নয়, প্রেম প্রেম খেলাটাই এখন মুখ্য। 'খেলতে খেলতে যখন' প্রেম নয় বরং খেলতে খেলতে খেলার নেশাটাই তার সিংহভাগ মর্যাদা পেয়ে যাচ্ছে। তাই ফুটবলে হ্যাটট্রিক করে যাঁরা ট্রফি আনে তাদের গর্বের কাছে আমাদের সেঞ্চুরি করা প্রেমিক খেলোয়াড়ের দাম খুব কম নয়।

ওরেস্টানাইজড হয়ে আমরা দুধ থেকে জলটাই বেছে নিয়েছি। দুধের মর্যাদা বোঝবার জন্যে চুমুক দেবারও অবসর হয়নি। তাই আমার কোন কোন বন্ধুর মুখে শুনি : বয়েস থাকতে থাকতে যতপারি মেয়েদের সঙ্গে মিশে নেবো মা-বাবা যাকে পছন্দ করে রেখেছে তাকেই তো বিয়ে করবো।' বোকা আমি প্রশ্ন করি হয়তো তা কেন, বান্ধবীদের মধ্যে কাউকে পছন্দ করে নে না। 'সে মুচকি হেসে বললো : যাঃ তা কখনো হয়, মা তাহলে হার্টফেল করবে।' আহা; কি এমন মাতৃভক্ত ছেলে ভাবুনতো!

তাই বলছি এখনকার শান বাঁধানো রাস্তায় প্রেমের কুরুচড়া কখনো যদি ফোটে তবে জানবেন তা একটি নিছক নিপাতনে সিদ্ধঃ সন্ধি। একটি নিটোল ব্যতিক্রম! অতএব প্রেম নেই, আছে প্রেম প্রেম খেলা, আর তা ময়ফিয়ার নেশার মতো আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে। এভাবে চোর হৃদয়ের ভান্ডার থেকে কৌস্তুভমণি কেমন মজায় চুরি করে নিচ্ছে তা আমাদের প্রেমিক সন্তানেরা বুঝতেও পারেন না।

অন্য ধরণের। তারও সেকসের কোন পথ নেই। আর তাই এই তাজা বয়েসে বিকৃত কামনার পথ ধরেছে সে। তার ভালো লাগে। কেন ভালো লাগবে? সুস্থ সামাজিক অবস্থায় আর মানসিকতায় কারোর ভালো লাগা সম্ভব? তার বিকৃত যৌনতৃষ্ণার সঙ্গে এসে মিলেছে পশ্চিমী আর মার্কিনী অবাধ যৌনবাদের ধারণা। ফলে তার বিকৃতিকে সে ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিকতা মনে করে। ভেঙে যাচ্ছে মানবিক বন্ধন আর সামাজিক সম্বন্ধ। সতীত্বের পুরনো ধারণায় বিশ্বাস করে না সুপ্রিয়া। নতুন ধারণাটা যে কি তাও সে জানে না। আর তাই উশৃংখলতার জোয়ারে ভাসাকে সে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া মনে করে। শৃংখলহীনতাকে মনে করে স্বাধীনতা।

আজকাল সর্বত্র ছেলেমেয়েতে সমানভাবে মেশার একটা প্রবণতা আছে। নিঃসন্দেহে তা প্রগতির চিহ্ন। কিন্তু তার মধ্যে যে অসুস্থতা দানা বেঁধে তার দিকেও নজর রাখতে হয়।

চিরকালই প্রাথমিক স্তরে, বুদ্ধির আবেদনের চেয়ে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কাছে আবেদনটা বড় হয়। সেই আবেদনকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে নিয়ে তাকে কার্যকরী করাটাই মানুষের রীতি। কিন্তু সামাজিক পারিপার্শ্বে যদি বুদ্ধির কার্যকরী দিকে নজর না দেবার একটা প্রতিযোগিতা চলে তাহলে সহজেই মানুষ প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সাংস্কৃতিক দিকে একটা বিরাট পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রাণশক্তির বিরাট এবং ব্যাপক অপব্যবহার। এর কারণ অনেক। তা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু সে কথা বলবার আছে তা হোল, সাংস্কৃতিক এই প্রভাব, যাকে কু-প্রভাবই বলব, মানুষের মূল্যবোধে এক বিরাট ভাঙন ধরিয়েছে। বিশ্বাস হারানোর দিনে বিশ্বাস হারাতে হারাতে যে সে কোথায় এবং কেন পৌঁছেছে, তাই সে জানে না। নতুন বিশ্বাস পাবার আগে এ এক শূন্যাবস্থা। সেকসভিত্তিক হিন্দী-বাংলা সিনেমা, নাটক, গল্প আর উপন্যাসের প্রভাব সমাজে বড় কম নয়। মূল্যবোধে "অশালীনতা" শব্দটি আর নেই। যা কিছু চালানো যায় তাই চলে তাই মিসেস চৌধুরীদের কোন সামাজিক শাস্তি নেই। উপরন্তু এই সাংস্কৃতিক কু-প্রভাব মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করে, তার যৌনতৃষ্ণা বাড়িয়ে তোলে। তাকে বিকৃত হতে বাধ্য করে।

এসব ছাড়াও, আরও একটি কারণ পরোক্ষে নীরবে কাজ করে চলে। অসম ধনব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে এক প্রতিযোগিতামূলক সমাজের। পাশের বাড়িতে টি-ভি এলে নিজের বাড়িতে টি-ভি কেনাটা কেউ কেউ অপরিহার্য মনে করেন। এই দুর্বার প্রতিযোগিতার চাই টাকা আরও অনেক-অনেক টাকা। যখন সুস্থ এবং সৎ উপায়ের টাকা সব সময়ে পর্যাপ্ত হয় না। তখন অসৎ পথ অপরিহার্য। আর বিনোদনের পথে অল্প সময়ে বড় বেশী টাকা পাওয়া যায়।

সমাধান কোন পথে

সরকারী ও বেসরকারী কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পতিতাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর। নাকতলায় আছে এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল হেলথ ইন ইণ্ডিয়া—১৯৭৪ সালের বার্ষিক রিপোর্টে আছে যে ১০২ জনের পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছে নানা কাজের মধ্যে। কিন্তু এই বেআইনী ব্যবসা থামবে কি করে? কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান নয়। সমস্ত সামাজিক মানুষেরই এই দায়িত্ব। মিসেস চৌধুরীদের ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দারা আইনের সাহায্য নিতে পারেন। তারচেয়েও বড় কথা সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। প্রয়োজন হলে "ধোপা নাপিত বন্ধ" করার মত ব্যবস্থা নিতেও দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ আমরা জানি রিপথগামী হলে প্রতিবেশীর দায়িত্ব কম নয়। মানুষের প্রতি মানুষের একটা দায়িত্ব, কর্তব্য ভালোবাসার দাবীতে অগ্রাহ্য করা যায় না।

কয়েকটি প্রদর্শনী

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

শিখা; শূন্যতা/রঙের ঝরনা

আঠাশে মার্চ থেকে নয়ই এপ্রিল অবধি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে একটি যুগল-প্রদর্শী অনুষ্ঠান ছিলো। অবশ্য এই অনুষ্ঠানের শিল্পীরা চিত্রী। দুজনেই অতি তরুণ। মাঝে মাঝে, সাপ্তাহিকের পাতায় এঁদের সম্পর্কে দু এক লাইন প্রশংসা দেখা ছাড়া, এতাবৎকাল এঁদের ছবির সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না।

তিনতলায়, একদম বাঁদিকের ঘরে ছিলো অশোক ভৌমিকের ছবি। নাম, ওয়াচিং। আনইভেন একটি মাঠ বা ক্ষেত্র—রহস্যময় সবুজ— মাঝে মাঝে কালো গর্ত। একটির থেকে একটি সাপ মুখ বার করে রয়েছে। কেন, তার শীতের ঘুম ভেঙেছে, কিংবা কাছে আছে কোনো শত্রু। সাপটি বা সামগ্রিক ছবিটির কথা বাদ দিচ্ছি। এই ছবি দেখেই মনে পড়লো একটি কবিতার কিছু লাইন : 'জলে ভীষণ শব্দ হলো। মরলো কেউ। জ্যোৎস্না নিরিবিলি। চাঁদের মুখে ভয়াল চুল চাঁদের মতো কেউ কি একা ছিলি। ঘরে থেকেও ঘরের বাইরে।' সাপটির ঘাড় পর্যন্ত আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, বাকিটা তার বিবরেই ছিলো। এই ছবিটিও ছিলো আমাদের বামদিকেই।

এরপর, ভূতগ্রস্ত বা ভবিষ্যৎবাদীর মতো ছুটোছুটি করে আমরা পনেরোটি ছবি দেখতে লাগলাম। প্রায় দর্শনার্থীহীন ঘর বলে আমাদের সুবিধে হয়েছিলো। সবকটি ছবি ৭৮এ আঁকা, সবকটি ছবির প্রধানত সবুজ ও কালো—বলাবাহুল্য বহু সবুজ ও বহুরকম কালোই এই ছবিগুলোর বাদী-সংবাদী স্বর। সমস্ত ছবিতেই এসেছে হলো। স্বল্প পরিসরে পনেরোটি ছবির আলোচনা, যা উচিত ছিলো, করা সম্ভব নয়। ১৫ নম্বর ছবি ফেজ অ্যান্ড হলোর কাছে গিয়ে দেখলাম একটি শাদা ময়া চাঁদ, হাল্কা ভঙ্গীর গাছ, তার সামনের জমির এক জায়গায় শূন্যবেদী বা কুয়ো, বস্ত্রমানুষ তার সামনে বিবর্ণরক্তনৈবেদ্য নিয়ে। অশোকবাবুর ছবিতে যখনি বক্তব্য লেগেছে, তা অশোকফুলের মতোই রক্তিম। ঠিক তার মুখোমুখি হ্যাঙ্গিং লিজার্ড। শারিতা রমণীর মুখ মৃতের মতো রহস্যময়, তার সামনে দণ্ডায়মান পুরুষ, কোমর শূন্য বা হলো; পুরুষটির মুখ আতঙ্কিত। তার কাছ থেকে নেমে এসেছে নিম্নমুখ শ্যামলা রঙ একটি টিকটিকি। পুরুষটির পায়ে নাগরাই। নাগরাই অশোকবাবুর খুব প্রিয়। এর সাহায্যে তিনি বিলিফ আনেন, আর এই রিলিফটি এসে লাগসই হয় যে পুরো ছবিটি এরই সাহায্যে গেঁথে যায়। ছবিটি যে যৌন অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করছে—এটা বলাই ঠিক হবে না যদি না বলি যে ছবিটি অলৌকিক লোকায়তকে ধরে ফেলেছে। এবং অশোকবাবুর এই পনেরোটি ছবি একটি সিরিজ হয়ে উঠেছে বহুসংখ্যক গুণের সমাবেশে। একদল খাঁটি ছবি আঁকিয়ের ইন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিকতা দুইই অশোকবাবুর আছে, যার জন্যে তাঁর বিষয় মানুষের মেধা, মন ও রহস্য। সমস্ত ছবির দিকে তাকিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্দশপদী কবিতাবলী বা হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্যের কবিতার কথা মনে আসে। সেখানে যা চিত্রকল্প ছিলো এই পনেরোটি ছবিতে তা চিত্রবস্তুতায় গিয়ে পৌঁছেছে।

সিলের আঁকা অর্ধনগ্ন নারী

তিলক মন্ডলের ছবির ঘরে যেতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। প্রত্যাশার বহু উর্ধ্বের জিনিস পেয়ে গেলে মানুষের যেমন হয়। কিন্তু সে ঘরেও আমাদের জন্যে একেবারে ভিন্ন ধরনের আর একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিলো। অশোকের ঘরে ঢুকে গুহানিহিত রহস্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা; ডানদিকের ঘরে এসে দেখলাম, রঙের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। দক্ষতায় অশোকবাবুর থেকে তিলক বিন্দুমাত্র ন্যূন নন। বাইশ নম্বর ছবি 'বিহেড ন্যুড' দেখে আমরা এই প্রথম জানতে পারলাম, কবন্ধ মানুষদেহকে দেখায় বনাথী গাভীকের মাথার মুকুটের চূড়া বা কেশাট-এর মতো। স্যাতাশ নম্বর ছবি, উইদাউট ব্যাকগ্রাউন্ডে শায়িতা প্রমদা ও পার্শ্ববর্তী সন্ন্যাসীর অবস্থানটিতে নির্ভুলভাবে বহে গিয়েছে বেগুনি নীল, অশোকলাল, রক্তচন্দন, হলুদ, বেগুনি ও সবজে নীল—কোনো একটি পৃথক বর্ণইঙ্গিতকেও ত্যাগ না করে। তিলকবাবুর বাইশটি ছবির মধ্যে দু-একটি ছবি আমার ততো ভালো লাগেনি। রঙের একজুবারেন্স ছাড়াও অশোকবাবুর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ তাঁর এক জায়গায়। অশোক ভৌমিক ভিরাইল, বোটসেন্ট এবং ব্যবচ্ছেদ ৭ দৃষ্টিসম্পন্ন; জীবনানন্দের কবিতা ও শক্তির কবিতার প্রতি তুলনা তাঁর ছবি। তিলকের ছবিতে আছে নিপুণ দৃষ্টি কৌতুক, একেবারেই শিল্পের অরনেট দিকটা। অলোকরঞ্জনের কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা তিলক মন্ডলের ছবিতে নতুনভাবে পাওয়া যায়।

আস্টট্রমার ছবি

ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীটি ছিলো গুস্তাভ ক্লিমট ও ইগন শিল-এর। ২৯শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে বিড়লা আকাডেমিতে তাঁদের মোট আশিটি ছবি দেখানোর ব্যবস্থা ছিলো। এই দুজন শিল্পী অস্ট্রিয়ার। একজন, গুস্তাভ ক্লিমট, রবীন্দ্রনাথের থেকে এক বছরের ছোটো, শিল্প প্রায় ত্রিশ বছরের। দুজনে একই বছরে, ১৯১৮ সালে প্রয়াত। তাঁদের এই আশিটি ছবি জলরঙে আর ফ্যাকাসিমাইল প্রিন্টে।

আলবার্টিনা, যে সংস্থাটি এই প্রদর্শনীর নেপথ্যে, তার পরিচালক ওয়ালটার কোশাম্বিক স্মারকপত্রে জানিয়েছেন, ক্লিমট ও সিলএর ছবি প্রধানত অস্ট্রিয়ান শিল্প ধারণাকে ব্যাহত করতে পেরেছে। মানুষের শরীর-সৌন্দর্যের মহিমাকে এই ধারণা গুরুত্ব দিয়েছে সব থেকে বেশি। ফ্যাকাসিমাইল প্রিন্টের মিডিয়ামটিও এই উদ্দেশ্যেই নেওয়া। ফ্যাকসিমাইল মানেই ফ্যাক্ট সিমিলার। একটি বাস্তবিকতাকে যথার্থভাবে তুলে আনবার জন্যেই ফ্যাকসিমাইল প্রিন্ট। এঁদের জলরঙের যে ব্যবহার তার সঙ্গে এখনকার পরিচিত ব্যবহারের কোনো মিল নেই। ক্ল্যাসিকাল ইংরাজি পদ্ধতিতেই এঁদের জলরঙের ব্যবহার হয়েছে। ফেইনট এলাবঙের ব্যবহার হয়েছে কাটা কাগজের পরে, যাতে রঙে প্রায় তেলরঙের ঘনতা চলে এসেছে অনেকটাই।

ক্লিমট ও শিল—দুজনের ছবিই স্নায়ুকে আঘাত করার বদলে, রেখাভঙ্গে ও রঙে, আলো ওছায়া বাদ করে আনার ধরনে, সেবা করে। অনবস্ত্র রমনীশরীর বহু ছবির অবলম্বন হয়েও খুব নাটকীয় হয়ে ওঠেনি। ক্লিমটের দুই ও চার নম্বর ছবি দুটিকে ধরা যেতে পারে। একটিতে রমনী বাঁ হাত তুলে, অন্যটিতে বাঁদিকে সে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত ছবিটিই তীব্রবকমে উত্তেজক হতে পারতো; কিন্তু, ক্লিমট ব্যবহার করলেন কালো চক। তাতে, দুটি ছবি যে এফিক্ট তৈরি করলো তা উডকাটের —কাঠের স্কালপট-এর কাজের বিশুদ্ধ ধাতুতা, বস্তুর নিজস্বতা এসে ভেঙে দিলো প্রাথমিক ইন্দ্রিয়চেতনাকে। অবসিনিটির বিরুদ্ধে দুজনেরই শিল্পের আক্রোশ। ইগন শিলএর ৪৬ নম্বর ছবিটি দেখে প্রত্যেকেরই সেই বিখ্যাত গল্পটি মনে পড়বে। নগ্ন নারীমূর্তিকে অশ্লীল বলায়, এক শিল্পী জানিয়েছিলেন, এটা অশ্লীল নয়, কিন্তু এর পায়ে যদি মোজা পরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অশ্লীল হবে। ইগন শিল এই ছবিতে নগ্নিকাকে মোজা পরিয়েছেন; পেনসিল ও জলরঙের ব্যবহার পাশাপাশি করে, রমণীমাথাকে চুলের গাঢ়তা দিয়ে এবং উরুদ্বয়কে দুধের মতো শক্তিমান করে তুলে, অশ্লীলতাকে কোথাও দাঁত বসাতে দেননি।

ক্লিমটের চল্লিশটি ছবি ও ইগন শিলএর ছাপ্পান্নটি ছবি শৈলীতে আলাদা, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রায় সহোদর। দৃশ্যবস্তুর একটি বিশেষ অবস্থার গোলককে ধরে ফেলার উদ্দেশ্য ছিলো দুজনের দিক থেকেই প্রধান। তাঁদের মৃত্যু-উত্তর শিল্পবস্তুগুলি এ-কারণে আমাদের কাছে আর নতুন অভিজ্ঞতা না হলেও, প্রসাদজনক। নৈপুণ্যেরও একটা নিজস্ব প্রাণশক্তি আছে, যার গুণে ইগন শিলএর স্টিল লাইফ বা দৃশ্যছবি কোনো একটা সাংকেতিক সত্তা অর্জন করে নিতে পারে আমাদেরও চোখের কাছ থেকে।

সে যাবে ভেতরে

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত

সে যাবে ভেতরে
সে-ই দেখতে পাবে
আলো পড়ে আছে স্থির জলের ওপরে,
গাছগাছালির ফাঁকে দু-একটা পাখি উড়ে আসে।
কী যেন খুঁজতে এসে, একটি কিশোর একা
জারুলগাছের দিকে চলে যায়।

সে যাবে ভেতরে
সে-ই শুনতে পাবে
মানুষের ভালোবাসাবাসি বাঁশির শব্দের মতো
ঝিমঝিম জাউয়ের পাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।
'তোমরা দাঁড়াও, আমি ঘুরে আসছি'—বলে একটি তরুণী
তার তিন প্রেমিকের ভাঙ্গ থেকে চুটি নিয়ে
খোঁপায় তিনটি ফুল গোঁথে, দৌড়ে চলে আসে।

সে যাবে ভেতরে
সে-ই বুঝতে পাবে
খোলা দরজা দিয়ে আরো খোলা দরজার দিকে
যাওয়া যায়।
বেঁচে থাকা মানে, শুধু একটু একটু করে এগিয়ে যাবার জন্যে
তৈরি হয়ে থাকা।
কিন্নর-কিন্নরী শুধু মন্দির-দেয়ালে গাঁথা আছে।
মানুষ মানুষী আছে দেয়ালের আড়ালে, জীবনে।

সে যাবে ভেতরে
সে-ই বুঝতে পাবে।

সে যাবে ভেতরে।।

জলেরও ঠাঁই মেলে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

জলেরও একরকম ঠাঁই মেলে—ঝোপঝাড়—আপাতত মাথা গুঁজবার
মতন গর্তও থাকে, উঁচু ডাল থাকে
স্বস্তি সেখানেও নেই; দুর্বল পশুর ওপর সবলের অহেতুক ষড়যন্ত্র
হিংস্রতার

অসতর্কে মৃত্যু ঘাঁপে পাকে
খাদ্যাখাদকের এই অলিখিত সংবিধান,—গণভোট এখানে অচল
তবু সিংহ শশকের করুণা বিলায়
ভালো ও মগডালে, গর্তে ঝোপেঝাড়ে কখনো আশ্রয়ে পায় পশুর দলল
মানুষের ওইটুকু আশ্রয়েও মেলে না কেন হায়!

বাঁচার তাগিদে নদী সাঁতরে যায় মাঝে মাঝে গরু বা শশক
জলেও কুমীর, ডাঙা জুড়ে চলাচল করে বাঘ ও হায়েনা; তাই ফেরা
যায় না। ওপারে ঠ্যাং তুলে স্থির বসে আছে ধবধবে সাদা ধর্মবক
'কেন এলে? ঠাঁই নেই।' কেন নেই? কোরো না হে হেরা।
অতএব মগগাঙে ডুবে থাকো অসহায়। কেন মাটি তার নয়—জানা
যায় না। পারের দিকে চেয়ে চোখ ঝাপসা হয়। দূরে—
কতো দূরে আমলাম জারুলের হিজলের জলরেখা ভেসে ওঠে। না না
সে শুধু স্বপ্নেই ছিল, বাদলা পোকার মতো আজ কেন ওঠে বুক ফুঁড়ে?

তাড়িত পশুর মতো মাটিতে ঘাসের গায়ে পা রাখা যাবে না, শুধু ছোটা—
কোথায়? ধুলোও পথে জলে বসে, মাটি হয়; মানুষের নেই
সেরকম স্থির কিছু নিশ্চয়তা। শুধু ওড়া, উড়ে চলা। খোঁজা
উপরনো নৌকোর মতো। খেই
পায় না, জলের শেষ কোনখানে! বুকের ভীষণ ভয়—মাছ যদি
ছেঁকে নেয় ওই

অধমানুষেরা! তাই ফেরাও দণ্ডকে,—এক বন্যা পাথরের খাঁচা
খোলা আছে। আয়—

স্বস্তি ও সুখের জন্য সদাশয় ঈশ্বরের মই
উঠেছে স্বর্গের দিকে—উঠে যাও, হাতে আসছে অলৌকিক
টিউবুল উপায়

নিসর্গ

সুরজিৎ ঘোষ

গাছের মাথায় ঘন জ্বাল দেয়া দুধের ওপরে সরের মতন রোদ।
মেয়েটি নবম পাবে।
কানের বাঁপাশে সাজানো চুলের গায়ে
পথের দিকের বাগানের থেকে চুরি করা চাঁপা
শোভা পাচ্ছিল ঠিকঠাক।

বাড়ি হয়েছে, সাধ্যদিন এক দুপুরের ছোঁয়ে সময়
মেয়েটি ক্লান্ত পরাণে দৌড়ে ফিরছে
গালের ওপর কয়েক ফুটছে দাঁতের দাগ
মিশকালো এই অন্ধকারের গায়ে গা মিশিয়ে পুরুষ খাড়া
দীর্ঘ সবল অর্জুন গাছ।

চন্ডাল সিং

বসন্ত গোবিন্দ পোৎদার

"বাবু, এ অঞ্চলে অনেক বছর আগে মেহেব সিং নামে একজন ছেলে থাকত। আপনাব মতনই ছ' ফুটের ওপর দু-এক আঙুল উঁচু, তাগড়া এবং দাড়িওয়ালা। দেখতে অবিকল আপনার মতন।"

"এখন সে কোথাব ?"

"নরকে। হাবামজাদা শালা।"

গালির ওপব থু থু ফেলে বুড়ো আমার দিকে তাকালো, নখশিখান্ত দেখে নিল আমাকে। চোখে তিরস্কারের ভাব। যেন, আমি কেন বেঁচে আছি। মরে নরকে যাই নি কেন ? হাসতে হাসতে বললুম।

"কোনো মেহের সিং-এর সঙ্গে আমার চেহারায় মিল আছে এটা কি আমার দোষ ?"

বুড়ো নিজের গালে চাপড় মেরে বলল, "না, না। ভুল বুঝবেন না বাবু। আপনি তো শিক্ষিত, পণ্ডিত লোক। চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

"মেহেবও পণ্ডিত ছিল বুঝি ?"

বুড়ো আমার ঠাট্টা বোঝে নি। তার মুখ আবার রাগে থমথমে হয়ে যায়। বলল,

"মেহের ছিল এক নম্বর গুন্ডা, জোচ্চোর × × × "

'কিসে মারা গেল সে?'

"নিজের দোষই তাকে ডুবালো। খুন হয়েছিল সে।"

"খুন ? কে করল খুন ?"

"চন্ডাল সিং।"

"চন্ডাল সিং ? কি অদ্ভুত নাম! লোকটা কে?'

বুড়ো আমাকে পান দিতে ভুলে যায়। শুধু পানই কেন, চন্ডাল সিংএর প্রশংসায় মসগুল বর্ণনায় দীনদুনিয়াকেও ভুলে যায়।

চন্ডালকে দেখার ইচ্ছে হল আমার। সে এখনও বেঁচে আছে এবং শুধু তিরিশ মাইল দূরে ভগবতী গ্রামে থাকে শুনে আগামীকালই সেখানে যাওয়ার সংকল্প করলুম।

* * *

পীলিভিতে এসেছিলাম সপ্তাহখানেক আগে। অনুষ্ঠানের জন্য। মনের মত খাদ্যের তল্লাশে একদিন শহর থেকে দু মাইল দূরে সরদারজীর আস্তানায় উপস্থিত হয়েছি।

সেটা মূলতঃ লরিওয়ালাদের থাকা খাওয়ার আস্তানা। তবু সরদারজী এমন চমৎকার রান্না করেন যে সুস্বাদু খাদ্যের লোভে অনেকেই সেখানে খেতে আসে। আবার শহর থেকে দূরে বলে এখানে মদমাংস খাওয়া এবং হৈ চৈ করাও চলতে পারে।

আমি প্রথম যে দিন খেয়েছি, সরদারজীকে বলেছি, "কিয়া বাত হৈ সরদারা। আপ তো পানিকোভি ফোড়ন দেকে তো চিকন সুপ হো জায়েগা।" সরদারজী বললেন, "বোজ আতে জাইয়ে। আপকা হি হোটেল হৈ জী।' বললুম, "প্রতিদিন তো আসতে পারব না। কিন্তু এখানকার কাজ শেষ হবার পর একদিন আপনার ডেরায় এসে থাকব। পদি, বালিশের ইন্তেজাম হবে তো? আমার কাঁধে শুধু একটি ঝুলি থাকে—হোল্ড অল নেই।'

সরদারজী সমস্ত ব্যবস্থার আশ্বাস দিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি এসে হাজির হলুম। হোটেলের কাছে একটি পানের স্টল। তার মালিক যে বুড়ো সেই আমাকে মেহের সিং-এর তারল বোল মনে করে চন্ডাল সিং-এর খবর দিয়েছে। আর সেই

শুনে সরদারজীকে বললাম, "আগামীকাল ভগবতী গ্রামে যেতে হবে। কি করে যাওয়া যায়?" তিনি জানালেন, "অনেক লরি যায় ঐ পথে। যে কোনোটাতে উঠে যাবেন। কোনো অসুবিধে নেই।'

পরদিন সকালে একটি লরিতে চেপে চলে গেলাম আমার অদেখা নায়কের গ্রামে। একটি জায়গায় ট্রাক দাঁড় করে ড্রাইভার বলল, "এখানেই নামতে হবে বাবু। আমরা সোজা যাবো। বাঁদিকে সামনেই ভগবতী।"

নেমে পড়লাম। বাঁদিকে দেখি উঁচু পাহাড়। তার তলপেটেই ভগবতী গ্রামের ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ে গাছগুলি খুব ঘন। যেন এ শীতকালে গায়ে সবুজ রং-এর সোয়েটার পরে দাঁড়িয়ে আছে সে পাহাড়। পরিস্কার পরিবেশ, সূর্যের আলোয় আরও চকচক করছে। কাঁধের ঝুলি আর মাথায় নেপালী টুপি একবার ঠিকঠাক করে ভগবতীর দিকে এগোলাম। কত বয়েস হয়েছে চন্ডাল সিং-এর? বিবানব্বই? তবুও সে তন্দুরস্ত? যা, যাকে কথা বলেছে সে পানওয়ালা। চন্ডাল সিং এর কথা ভাবতে ভাবতে গ্রামে এসে পৌঁছলাম। চোখ তুলে দেখি, গ্রামবাসীরা আমার দিকে অপলক তাকাচ্ছে। যেন সার্কাসের কোনো হিংস্র প্রাণী পিঞ্জর ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। ঐ চাহনিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি। বেফিকির দীর্ঘ পদক্ষেপ দিয়ে চলে গেলাম একটি ছোট হোটেলের দিকে। সেখানে বিবিধ ভাবতী বডিওর নাড়ি থেকে চাঁচাচ্ছে। এমনিতেই আমার গলা চড়া। রেডিওর সোরগোলের চেয়েও তার স্বরে জিগ্যেস করলাম, "চন্ডাল সিং কোথায় থাকে?"

আমার মেঘ-ডাকা গলার আওয়াজে গ্রামবাসীরা চমকে উঠে। তাদের চোখে সন্দেহ ভাব। পিছন ফিরে দেখি অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে আশপাশে। কেউ উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার আরও জোরে জিগ্যেস করি। অনেকেই একসঙ্গে বলে, চলুন। আমি যেন একজন পুলিশ অফিসার, সেই বৃদ্ধকে গ্রেফতার করতে এসেছি এমন ধারণা হয়ে গেছে কি তাদের? হাসি চেপে আমি আরও ভীক্ষ্ণ রূপ ধারণ করি। আমার মনে নূতন একটি নাটক করার পরিকল্পনা দেখা দেয়।

লক্ষ্য করলুম আমার সঙ্গে অনেকেই চলছে। বাড়ি জানলা থেকেও মেয়েরা কৌতূহলে দেখছে। দোতলা একটি বাগান-বাড়ির সামনে এসে জনতা থামল। ভগবতী গ্রামের হিসেবে সেটা ছিল রাজপ্রাসাদ। কয়েকজন 'দাদু, দাদু' বলে ডাকতে শুরু করে।

চন্ডাল সিং দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। নাটকের সেই চরম দৃশ্য। পুরনো যাত্রাগানের নায়কের মতন গগনভেদী গলায় আমি জমার সংলাপ শুরু করি :

চন্ডাল সিং, ১৯০৬ সালে তুমি মেহের সিং-এর মাথায় লাঠি মেরে তার ভান্ডার লুণ্ঠন করে ছিলে। কেন?, মেহের সিংএর মড়া চট করে পুড়িয়ে ছাই করে ফেললে। তারপর সমস্ত গ্রামাঞ্চলে ঘোষণা করে দিলে যে পুলিশের কাছে যে কেউ সাক্ষী দেবে তার মুন্ডুপাত করবে। কাঁধে বন্দুক, কোমরে তলোয়ার এবং পকেটে সামিন মুক্তির এক হাজার টাকার নোট রেখে তুমি রাতের পর রাত ঘোড়া দৌড়িয়ে সমস্ত গ্রামাঞ্চলকে ভয়ার্ত করেছিলে। নির্দোষ গ্রামবাসীদের সঙ্গে এরকম দাদাগিরি? কিন্তু বুড়ো, মৃত লোকও কখনও কখনও মুখ খোলে। এই তো এসেছি আমি। বলো। তোমার জবাব চাই।"

এক নিশ্বাসে এত বড় সংলাপ তো বলে গেলাম কিন্তু সেটা হতেই আমার কবীন্দ্রী গলে গেলো। জনতা স্তব্ধ হয়ে গেলো। শহুরে বাবুকে তারা এবার নিন্দা ছাড়বে না। চন্ডাল সিং খুব আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করে। গত জন্মে বিশ্বাস হতে লাগল আমার। মেহের সিংই ছিলাম তখন। নিয়তি আবার আমাকে আমার গতজন্মের বধকর্তার কাছে টেনে এনেছে। হায় হায়! কেন যে এলুম! কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে চাইলে শিগগির সুর পালটাতে হবে। চন্ডাল সিং মেই দরজা ঠেলে বাইরে এল আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং ফিস ফিস করে বললাম "দাদু, আমি নট্ট কোম্পানির লোক। পিলিভিতে আপনার কীর্তি শুনে শুধু দর্শন করার অভিলাষে এতদূর এসেছি। আমার কথায় রাগ করবেন না। দেখুন ভয়ে আমার ছাতি ধড়ফড় করছে।"

দাদুর হাত তুলে নিজের বুকের ওপর রেখে দিলাম। চন্ডাল সিং হঠাৎ হাসতে শুরু করে। পাঞ্চজন্য ফোঁকার মতন চওড়া হাসি। বলল,

'আপনি তো একজন স্বাস্থ্যবান জওয়ান। চেহারায় শিক্ষা দীক্ষিতও আছে। তবু শব্দ প্রয়োগ ঠিকঠাক জানেন না দেখছি। নিজের বুকটাকে 'ছাতি' বলছেনই বা কি করে। ছাতি শব্দটা ঔরতদের জন্য। পুরুষদের থাকে 'সীনা'। যুবাবস্থায় আমার সীনা থালের মতন চওড়া ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে ফৌজে ভর্তি হয়েছিলাম। গণবেশ পরে প্রথম দিন প্যারেডে হাজির হলুম। অ্যাটেনশনের অর্ডার পালন করি আর আর আমার ডান চোখটা একটুতে বাঁচে। না হলে যেতই।

'ও বাবা। কেন? কি হয়েছিল?'

'দু পা জোড় করে আমি এমন শকত ভাবে সীনা টানলাম যে শার্টের ওপরের বোতাম ভেঙে আমার চোখে ঢুকল।

আমরা দুজনেই হোহো করে হেসে উঠলাম। আমাদের হাস্যপ্রপাতের মধ্যে গ্রামস্থদের হাসিও হারিয়ে গেল। এক মুহূর্তেই চন্ডাল সিং আর আমি জিগর দোস্ত হয়ে গেলুম।

পরের পনের দিন যেন ঝড়ের মতন উড়ে গেল।

দাদুর আসল নাম ছিল রামদুলারে না শ্যামস্বরূপ? ঠিক মতন সেও জানে না। মেহের সিং-এর হত্যাকারী হিসেবে তখন তার 'চন্ডাল' ডাকনাম পড়ে। হত্যার রহস্য উদঘাটিত হবার পরও 'চন্ডাল' গালি যায় নি। শুদ্ধায় সেটা 'চন্ডাল সিং' হয়ে যায়।

জাতি হিসাবে তাকে রাজপুত ধরা যায় বটে কিন্তু সে একজন কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। পোশাক রেখে অচেনা লোক তাকে মুসলমানও বলতে পারে।

আলিগড়ি লেহঙ্গা আর জামা লক্ষ্ণৌকাজ-করা জালিদার সাদা গোল টুপি—ইহুদীরা পরে তার চেয়ে একটু বড়। জৌনপুরী কোট। হাইট মাঝারি। বিরানব্বই বছর বয়সেও শরীরটা তন্দুরস্ত, চর্বি ঝোলার লক্ষণ নেই। সবল নাক, সাদা বিশাল গোঁফ আর বড় বড় কান। বড় কান রূপওয়ান চেহারার সুলক্ষণ। এমনিতে তার মুখ ছোট, কিন্তু ঐ কানের জন্য তাকে রোয়াবদার দেখায়।

এ বয়সেও প্রকৃতি তার ইন্দ্রিয়শক্তি কেড়ে নেয় নি। স্মরণশক্তি সতেজ, চান্দমারি করতে পারে এমন নজর, অস্পষ্ট ধ্বনিতেও কুকুরের মতন কান খাড়া হয় এমন শ্রবণশক্তি, মুর্গীর ঠ্যাং চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারে এরকম দাঁত। স্বাস্থ্যের বিশ্বাস্য বরদান পেয়েছে চন্ডাল সিং। বার্ধক্য বোঝা যায় চামড়ার কুঞ্চন দেখে। সমস্তের অগণিত দাগ কাটা আছে সমস্ত চেহারায়—মাকড়সার জালের মতন।

সে এখনও চাকরিতে আছে। আগে সেই অঞ্চলের এক জমিদার, আটশ বাইশ গ্রামের স্বত্বাধিকারী। স্বাধীনতার পর তিনি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খাটিয়ে অনেকানেক কলকারখানা শুরু করেন। সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ, চিনি কারখানা, চাষ ও ক্ষেত বাগান এবং গুদামঘরগুলোর সিকিউরিটি চিফ চন্ডাল সিং। তার অধিনায়কত্বে কয়েকজন সেন্ট্রী কাজ করে। চন্ডাল সিং-এর দরকারই নেই কাজ করার। কিন্তু মালিক মাইনে দিচ্ছে আর গায়ে এখনও জোর আছে এখনা চন্ডাল সিং সামান্য দেখা-শোনা করে। প্রতিদিন ঘোড়া চড়ে চার-পাঁচ মাইল ঘুরে আসে। পিঠে বন্দুক, কোমরে তলোয়ার এবং বুকে অন্তহীন নির্ভয়তা এ সমস্ত মিলিয়ে চন্ডাল সিং-এর ব্যক্তিত্ব কোনো মধ্যযুগীয় রাজপুত যোদ্ধার মতন দেখায়।

একটি সচ্ছল কিসান পরিবারের ছেলে। দোহারা চেহারা জন্মজাত পেয়েছিল। তারপর ভালো খাওয়া-দাওয়া প্রচন্ড ব্যায়াম আর খোলা বাতাসের খোরাক এই তার বালা-মৃত। সেই দু সপ্তাহে আমাদের মেহেফিল আহোরাত্র জমত। পেড়াপিড়ি না করলে সে মুখ খুলত না। একবার মুখর হলে [illegible]

ফুটত। আসে তার তর্ক, বিচিত্র তার চিন্তা-প্রবাহ। কনৌজী, ব্রজবুলি হিন্দি আর উর্দুতে তার দখল। প্রত্যেকটি ভাষার উচ্চারণও খাঁটি। আমি ওকে 'দাদু' অথবা 'বুড়ো' বলতুম 'তুমি' সম্বোধনে। কিন্তু সে আমাকে সব সময় 'আপনি'ই বলত। হিন্দী ভাষার মর্যাদা সে কখনও ছাড়ে নি।

"তোমার বাবা একটি বাঘিনী পুষেছিলেন

'শুনলাম।'

"না তো। কে বলেছে?"

'বাঘিনীর দুধ না খেলে এমন সুদৃঢ় স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কেউ পায় না।"

দাদু ঠাট্টা করে হাসল। বলল,

"জীবনের প্রথম ষাট বছর নিরামিষ কিছুই খাইনি। খেয়েছি শুধু মাছ-মাংস আর দুধ-ঘি।"

"দুধ আর ঘি নিরামিষ না বুঝি?"

"আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন?"

বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়, উজ্জৈন। কেন?

"ফেরত করে দিন ডিগ্রিটা। আমিষ-নিরামিষের তফাৎ পর্যন্ত তো জানেন না। জানোয়ারের মাংস খেলে আমিষ আর তার দুধ খেলে নিরামিষ? এটা কি করে হবে? "

"দাদু তা হলে গরুর গোবর আর ছাগোলের নাদির সার দিয়ে যে চাষ হয় সেটাও নিরামিষই হবে। কেমন?"

'আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন না আমার নাম চন্ডাল সিং কি করে হল? শুনুন (বিষয়টা বদলে দিল বুড়ো) আমার একটা ভাই ছিল। আমার মতনই পালোয়ান। তবু তবু তার মনটা খুব নরম। সে একটি মেয়েকে ভালবাসত। আমি ওদের বিয়ে ঠিক করে দিলুম। কিন্তু মেহের সিং এর কুদৃষ্টি পড়ল সেই মেয়ের দিকে। একদিন সে বে-ইজ্জত করল ভাইয়ের বউকে। লজ্জায় মেয়েটি আত্মহত্যা করে। ভাই দিওয়ানা হয়ে গ্রাম ছেড়ে দেয়। বেচারা। তারপর কখনও ফিরে আসে নি। বেঁচে আছে কি না জানি না। আমি তখন সমস্ত এলাকার মস্তান ছিলাম। আমার গুসসা সবাই জানত। আমার নামে কেঁপে উঠত। আমার ভয়ে মেহের লুকিয়ে পড়ল। কদ্দিন লুকিয়ে থাকবে? আমি ওর সন্ধানে ছিলামই। সে ভাবল, আমাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলে আর কারুর ভয় নেই। তারপর সে এক নম্বর মস্তান হয়ে যাবে। একদিন রাত দুপুরে ছোরা নিয়ে সে আমার ঘরে ঢুকল। জানত না যে আমার কুকুর খাটের তলায় বসে থাকে। কুকুর খুই ডাকল আমি উঠে পড়লাম। মেহেরব্যাটা বিশ্বভাঁড়ু। পালাবার চেষ্টা করলো খাটের কাছেই ছিল একটা মস্ত বড় ডান্ডা। তাই নিয়ে তার মাথায় প্রচন্ড প্রহার করি। ডিমের কুসুমের মত তার মিলু বেরিয়ে পড়ে। লাঠির শুধু একটি ঘা, আর কাম শেষ। বলাই আছে—পৈসা গাঠকা, ভাই সাথকা আউর হাথিয়ার হাথকা। অর্থাৎ পকেটে যা টাকা সেই কাজে লাগে, সঙ্গে যে থাকে সেই ভাই আর হাতের কাছে যে জিনিষ সেই হাতিয়ার।"

চন্ডাল সিং এর সংগ্রহে এরকম অগণিত প্রবাদ। প্রত্যেকটি বাগের যেমন একটি নিজস্ব চলন থাকে তেমনি ভাষারও থাকে শত শত বছরের সংস্কার ও সংস্কৃতি সেই চলনকে সহজভাবে গড়ে দেয়। সেট অনুবাদ করা অসম্ভব। চন্ডাল এমন অনেক প্রবাদ ব্যবহার করত যাতে পূর্ব উত্তর প্রদেশের মাটির গন্ধ। সেই গন্ধটা অন্য ভাষাতে তুলে আনা শক্ত।

যেমন একটি সন্ধ্যের কিসসা। চাকা দুটি খাটিয়া পেতে ছিল অঙ্গনে। ওপরে গদি, বালিশ, লেপ সবকিছু। একটি থালি বাক্সের ওপর দুটি গেলাস ও দিশি মদের বোতল। আমরা ঘোড়া থেকে নেমে খাটিয়ায় এসে বসি। আকাশের দিকে দেখি সূর্য এখনও পাহাড়ের আড়ালে যায় নি। চন্ডাল সূর্যের উপস্থিতিতে মদ খায় না। বাজে নিয়ম। তবু সে আমার চেয়ে সওয়া দু গুণ বড় আবার যজমান। ভেন্টা চেপে রাখতুম। চন্ডাল বিশ্রাম নেবার ইচ্ছায় বালিসে

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন

প্রতিবার খাওয়ার পর কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত করার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগ শুরু হয়।

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমানিত হয়ে গেছে।

জীবাণুমুক্ত নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঝক্ ঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশি কেনে কোলগেট টুথপেস্ট।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা কিভাবে কাজ করে:

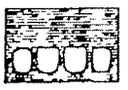
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়ের জীবাণু ফরমায় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ভেতরে গিয়ে অবস্থিত খাবারের টুকরো ও রোগজীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধের ভয় থাকে না, দন্তক্ষয় রোগের প্রতিরোধ।

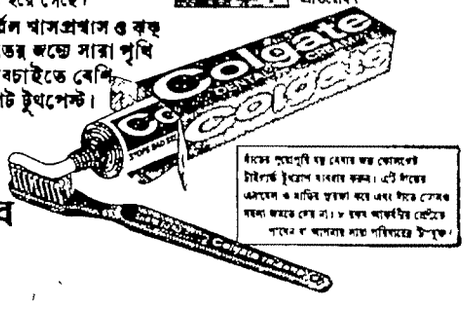

দাঁতের সুস্থ্যপুরি যত্ন নেবার জন্য কোলগেট টাইপার্ক টুথব্রাশ ব্যবহার করুন। এটি দাঁতের এনামেল ও মাড়ির সুরক্ষা করে এবং দাঁতে কোনও যন্ত্রণা করতে দেয় না। ৮ রকম আকর্ষণীয় রেঙ্গে পাবেন যা আপনার সাথে পরিচয়ের উপযুক্ত।

কেবল দাঁতের ডাক্তারই এরচেয়েও ভালোভাবে আপনার দাঁতের পরিচর্যা করতে পারেন

80.04 BN

মাথা রাখল না রাখল আর উঠে বসল। চাকর কে ডাকল। তাকে খাটিয়াগুলো সুদ্ধু সমস্ত সাজগোজ ভেতরে নিয়ে যাবার আদেশ দিল।

"কি হলো? দাদু, মেহেফিল খতম করছ কেন?

"উঠুন। ভেতরে আড্ডা দেবো আজ: বৃষ্টি হবে।"

"বৃষ্টি? এ মরশুমে? কি করে জানলে তুমি? দূর মজাটা বরবাদ করে দিচ্ছো।'

"আকাশের দিকে দেখুন। তিতির পাখির ডানার মতন মেঘ ভিড় করেছে আকাশে। বৃষ্টি অবশ্য আসবে।"

কন্নৌজী ভাষায় যে এমন একটি পদ্য বলল যেটা তিন তিন বার শুনেও আর মনে নেই। তার মানে ছিল :

"যেমন জলের মধ্যে বিচরণ করা মাছের মাথায় পেছেক ঠোকা অসম্ভব, যেমন কাজলনয়না বিধবাকে দুশ্চরিত্রতা থেকে দূরে রাখা মুস্কিল, তেমনি তিতির ডানার মতন মেঘকে বর্ষা বিহীন রাখা না মুসকিল, না মুসকিল। না মুসকিল না সুসকিল।

'বা কিষা বাত হৈ' দাদুর কথাকে বাদ দিয়ে উঠে পড়লাম খাট থেকে। ভেতরে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। চোখ টিপে বললাম, 'বুড়ো, তোমার জীবনে কোনো কাজলপরা বিধবা এসেছে কিনা।'

সেও থেমে গেল। লক্ষ্য করলুম, মুহূর্তের জন্য তার মুখ লাল হয়ে গেল। আলতোভাবে আমার বাহু টিপে বলল, জোয়ানি বড় জাতি হৈ, কিসে ভেজু মনানে কো?' (যৌবন তো আমার ওপর রুষ্ট হয়ে চলে গেছে। কাকে পাঠিয়ে ওকে ফিরিয়ে আনাব?)

আমরা ছাদভাঙা হাসি শুনলাম। তখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। চট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। বুড়ো বলল, মানতো হো?

'তোমাকে তো প্রথম সাক্ষাতেই মেনে নিয়েছি। সামনে দেখো, কি দারুণ দৃশ্যটা।

অপূর্ব! প্রকৃতির কোনো তুলনা নেই। চাবুক ঘায়ের মতন সপাসপ জলধারা পড়ছে। সূর্য এখনও আকাশে। পাহাড়ের শিখরের মাথায় গিয়ে পৌঁছেছে। সেই অস্ত সূর্যের আলো বৃষ্টির পর্দা ভেদে আমাদের কাছে আসতে চায়। মেঘ ও বৃষ্টির নাদ, পাহাড়ের কালো, গাছের সবুজ ও সূর্যের লাল রং এবং সেই নাদ ও রংয়ের যুগল বন্দীতে সদ্যোস্নাতা সৃষ্টির নৃত্য-ভঙ্গি। শুধু প্রকৃতিই মানুষকে চোখ খোলা রেখে সমাধির আনন্দ দিতে পারে।

হঠাৎ কলেজ-দিনের কাঁচা ভালোবাসা মনে পড়ে। ভাং খেয়েছি শুনে প্রেমিকা বকুনি দিয়েছিল : বিরাট প্রকৃতি তোমাকে আনন্দ দেয় না যে একগুলি ভাং খেতে উঁচুছে করে?

চন্ডাল সিং খুব চতুর। কনুই মেরে বলল, 'আমাকে কাজলপরা বিধবার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। এবার আপনি কোন্ রূপসী বালাকে বাদ করছেন শুনি?"

'আনে দো দাদু। চলো, পিয়েঙ্গে।'

গেলাস ভরতে ভরতে জানলা থেকে বাইরে দেখে বললাম, 'কালকে আর পাহাড়ে উঠতে পারব না। কাদা আর কাদা।

চন্ডাল সিং ভোর চারটায় খাটিয়াটা ছেড়ে দিত। আমার ঘুম ভাঙত ৬টার কাছা-কাছি। সোজা পাহাড়ের শিখরে উঠে যেতুম। ৮-৮টায় ফিরতুম তখন প্রাঙ্গণে গ্রামবাসী-দের ভিড়ে দাদুকে দেখতুম। কুড়ি পঁচিশ মাইলের এরিয়া থেকে নানা কাজ নিয়ে লোকেরা দাদুর কাছে আসে। বিয়ের নেমন্তন্ন থেকে মোকদ্দমা জেতার খুশখবরি অথবা টাকার অভাব থেকে মৃত্যুর দুঃখবার্তা ওরা শোনায়। নাস্তা খেতে খেতে আমি দাদুর মুখাবলোকন করি। প্রত্যেকটি খবরের সঙ্গে সে একাত্ম। যতদূর সম্ভব, সমস্যা গুলি মিটিয়ে দেয়। এমন চলত দুপুর বারোটা পর্যন্ত। তারপর ঘন্টাখানেক দাদুর স্নান ও পুজো। আমি তখন মা ভগবতী প্রাইমারী স্কুলে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে আড্ডা দিতুম। দুজন যুবা মাস্টার-মশাই আর তিরিশ পঁয়ত্রিশ শিশু। গ্রাম থেকে বিদায় নেবার সময় ঐ শিশুরাও আমাকে বাসে তুলে দিতে এসেছিল। এমন দোস্তি জমে উঠেছিল আমাদের। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম। তারপর ঘোড়সওয়ারি।

পনের বছর বয়সে দাদুর বিয়ে হয়। সাত বছর পর মেয়ের-হত্যা। ভাই হারিয়ে গেল। বছর দুয়েকের মধ্যে বাবা মার মৃত্যু। উনিশ শো চোদ্দ মানে তিরিশ বছর বয়েস হতে হতে দাদুর দশটি মেয়ে আর একটা ছেলে হয়। দাদুর ভাষায় তারা বাড়িতে 'মেহমান' মানে অতিথি হিসেবে এসেছিল। কেন না, তারা সব দু-চার মাসের চেয়ে বেশি বেঁচে থাকল না। শেষ প্রসূতিতে ছেলে হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারের কুলদীপক। কিন্তু সে তার সঙ্গে তার ধনিকেও নিয়ে গেল। মা, বাবা, স্ত্রী ও এগার বাচ্চার মৃত্যু, ভাই বেপাত্তা, মাথায় খুনের হুলিয়া—চন্ডাল কি করবে এখন? সাক্ষ্য দিতে কেউ এগোয় নি তবু পুলিশরা ওর ওপর চোখ রেখেছিলই। গ্রাম সে ছাড়বে না। জন্মস্থানের মাটির টান তাকে আটক রাখে। ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। জমিদার এসে বলে, 'চন্ডাল, সরকার আমাকে পল্টন থেকে চল্লিশ জওয়ান ফৌজে ভর্তি করার হুকুম করেছে। তুমি যাবে? তোমার যা শক্তিশালী দেহ। কিছু শৌর্য দেখালে হত্যার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে।'

চন্ডাল সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়। বীরত্ব দেখাবার অথবা খুনের পরওয়ানা থেকে ছাড়া পাবার জন্য নয়। একাকী জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য। আত্মীয়রা তো সব গেলই এবার সে নিজেকে আহুতি দেবে কুরু নিরতির কাছে। কিন্তু তা হল না। চন্ডাল শহীদ হবার সুযোগ পায় বটে সফল হয়নি। মেসোপটেমিয়াতে একটি প্রচন্ড বোমা বর্ষণে সে আর দুজন ছাড়া তার প্লেটুনের সব সিপাহী নিহত হয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর মাইনে, পুরস্কার, লুটপাট সব মিলিয়ে চন্ডাল ছ' হাজার রাণীছাপ রুপিয়া পায়। খুনও মাপ হয়।

গ্রামে ফিরে এসে সে দেখল জমিদার তার বেওয়ারিস জমিও দখল করে নিয়েছে। দাদুকে দেখে সে ভয়ে ব্যাকুল কিন্তু ঝগড়াঝাটির ঝামেলায় আর পড়েনি চন্ডাল সিং। আত্মহননের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়েছে দেখে সে শান্তি ও সেবায় জীবন-যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জমিদার তাকে চিফ সিকিউরিটি অফিসার করে দেয়। ভালো মাইনে, বাংলো ইত্যাদিও দেয়। সে নাকি রিটায়ার্ড হবে না। মৃত্যু পর্যন্ত চাকরি।

'দাদু, তোমার গায়ের ভিমসেনি জোর। জমিদার ভয় পেয়ে তোমাকে এসব রাজার মতন সুবিধা দিল। বেচায়া কি জানত যে তুমি মরবেই না। চৌত্রিশ থেকে বিরানব্বই, মানে গত আটান্ন বছর তুমি চাকরীতে আছো। আটান্ন বছর বয়সে বড় বড় সরকারী অফিসাররা রিটায়ার্ড হয়ে যায়। আবার তারা তোমার মতন সুখ-সুবিধাও পায় না। ভলো?'

বসন্তবাবুরা আমার মতন খাটে না। কাজে আমার যেমন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সেটার অর্ধেকও তাদের কাছে নেই। চাকরি করতে গেলে নুটা গুণ থাকা নিতান্ত দরকার

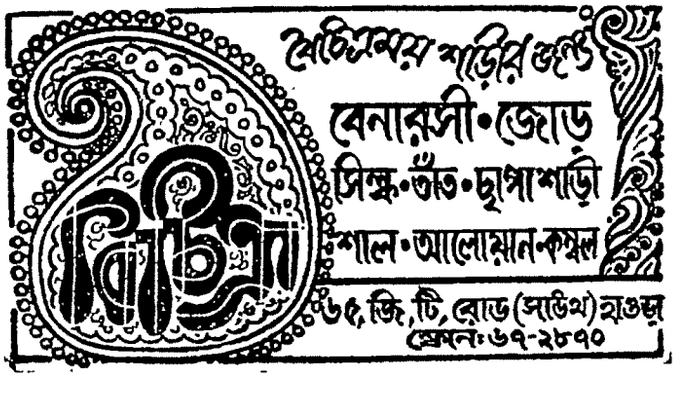

থাক। ওগুলো না থাকলে চাকরিতে কেউ পরিপূর্ণ হবে না।'

'কি, কি গুণ?'

'স্ফূর্ত মানে সাহস. ফূর্ত—ফূর্তি, সূর্ত মানে নির্ভুল স্মরণশক্তি, হাতকা সচ্চা মানে বিশ্বস্ত, বাতকা পক্কা অর্থাৎ যে কথা রাখে, লঙ্গোটীকা সচ্চা এবং নীদ, নাব, ভোজনকে মানে ঘুম, স্ত্রী ও ভোজনকে যে কোনো সময় ত্যাগ করার যার ক্ষমতা থাকে সেই সে সেই চাকরি করতে পারে।'

এগুলো শর্ত থাকলে আজকের দুনিয়াতে কেউ চাকরির যোগ্য নেই। যারা ইন্টারভিউ নেয় তারাও নেই। তার ব্যাখ্যা শুনে আমি নিরুত্তর হয়ে গেলুম। বুড়ো বললো, 'আপনি তো কোনো দিন চাকরি করেন নি। কাজেই এতসব অনিয়মের জিন্দগী। ভবিষ্যৎকালের শক্তি ব্যবহার করছেন বর্তমানে। কদিন বাঁচতে পারবেন এভাবে?'

'তোমাকে বেঁচে থাকার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার অবসর দিতে গেলে আমাকে তাড়াতাড়ি যেতেই হবে। বর্তমানে আমার কাছে থাক, ভবিষ্যৎটা তোমাকে বহাল করে দিচ্ছি।'

সেই পনের দিনে সবচেয়ে বেশি মজা ছিল ঘোড় সওয়ারিতে। হাম্বিয়ারবন্দ দাদু মাথায় বিরাট পাগড়ি বেঁধে ঘোড়ায় উঠত। আর একটি ঘোড়ায় আমি। সংত্রী ও চাষী-দের সেলাম স্বীকার করতে করতে খুব আস্তে আস্তে আমরা এগোতুম। ভগবতী গ্রাম ছাড়ার আগের দিনের কথা।

'আজ কোনদিকে যাব আমরা?' ঘোড়ায় ওঠার পর আমি জিগ্যেস করি।

'একটা মস্ত বড় তালাও আছে। আজ সেখানেই যাব। চমৎকার স্থান।'

দূর থেকে প্রথম দর্শনেই বুঝে গেছি তালাওটা খুব বড়। হঠাৎ গীটার ও ড্রামের ধ্বনি কানে পড়ল। সে কি! এই গ্রামেগঞ্জে বিদেশী বাদ্যগুলি কে বাজাচ্ছে?

দাদুও বাদ্যের ধ্বনি শুনল। বলল, 'মালিকের ছেলে বন্ধুদের নিয়ে পিকনিক করতে এসেছে দিল্লি থেকে।'

কাছে গিয়ে দেখি কজন মিনি স্কার্ট ও স্ল্যাকস পরা মেয়েও আছে। তারা নাচ-গানের হাঙ্গামার মস্ত। ঘোড়ার ওপর দুজন অচেনা লোক দেখে তারা থেমে গেল। ইস্, শুধু শুধু ওদের বংকে বেবং করে দিলাম।

মালিকের ছেলে সেই দাদুকে দেখল, চেঁচিয়ে উঠল, 'কেমন আছেন দাদু? তারপর বন্ধুদের বলল. ইনি আমার দাদু বিরানব্বই বছর বয়স হয়েছে জানো! বলো থ্রি চিয়ার্স টু দাদু--হিপ হিপ সবাই দাদুর জয়জয়কার করে। আমার চশমা ও বাবুপোশাক দেখে মালিকের ছেলে জিগ্যেস করল, 'ইনি কে?'

'আমার বন্ধু। তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

'না না, মজায় আছি।'

ফেরার পথে দাদু বলল, 'আজকের বুড়ো জেনারেশনের মতন চেতনা আগেকার যুবক-দের মধ্যে ছিল না। কত কি করার উচ্চা-কাঙ্ক্ষা এদের। দশ বছর বয়সের ছেলে ডাক্তার হবো না ইঞ্জিনিয়ার হব ঠিক করে রাখে। একটু ব্যায়াম-টায়াম যদি নিয়মিত করে এদের মতন যৌবন পৃথিবীতে দেখা যাবে না। আর ওদের লম্বা চুল! খুবই বাজে গো। আমি ফ্যাশানের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু চুল, জানেন, জোঁকের মতন গায়ের রক্ত শুষে নেয়। ওদের চুল ওপরে করে দেখবে তা এক-একের গর্দান কত পাতলা হয়ে গেছে। চুলগুলো ওদের গর্দানের রক্ত খেয়ে ফেলেছে। মেয়েদের ঘাড় চুলের জন্যই পাতলা থাকে। ওদের মানায়ও।'

একটু পরে দাদু বলল, 'আপনার যতই দোষ হোক না কেন, একটা গুণ খুব ভালো। আপনি প্রতিদিন সকালে ব্যায়াম করেন।'

আগে দোষের উল্লেখ করে দাদু আমাকে চাবি লাগিয়েছিলই। জবাব দিয়েই ওকে চিৎ করার উদ্দেশ্যে বলি, 'ব্যায়াম কেন করি জানো না তুমি দাদু! সকালবেলায় শরীরকে একটু অনুশাসনে রাখার পর সারা দিন তার কাছ থেকে যতসব অনিয়ম করিয়ে নাও। বিবেক-বুদ্ধি পরিষ্কার থাকে। কেমন?'

আমরা দুজনেই জোর হেসে ঘোড়া দুটোকে চমকিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে দাদুর প্রাঙ্গণে প্রায় শ'খানেক লোক। কেন? আমাকে বিদায় জানাবার জন্য। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে গ্রাম বাসীদের রাম রাম করে যখন গ্রামসীমা পেরিয়েছি তখন দাদুর কাঁধে হাত রেখে বলি, 'বুড়ো তুমি যদি এ অঞ্চল থেকে লোকসভায় দাঁড়াও, বাজি রেখে বলছি, মাইরি, সব্বাই হেরে যাবে।'

'এ বুড়োবয়সে রাজনীতি করব না কি। যারা করেছে তাদের সঙ্গে দেখা হলে আমার মনের একটি কথা জানাবেন।'

'ভেবেছিলাম, তোমার তো জীবন থেকে কোনো প্রত্যাশা নেই।'

'পুরো কথাটা শুনে নিন আগে।'

'বল, কি বলতে চাও।'

'পুরাতন কাল থেকে এই ভারতবর্ষে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিখারীদের প্রত্যেকটি শহরে কমসেকম একটা অন্নসত্র থাকত। বেচারারা দু মুঠো অন্তত খেতে পাবত। মুসলমান ও ই: বাদশারাও সেই প্রথা বন্ধ করেনি। কি স্বাধীনতার পর বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা আ যেন শুরু হয়।'

থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে অপ দেখতে লাগলাম। আমার ভাবুক মনা সে ভালো করে চিনে গিয়েছিল। বি বদল করে বলল, 'এতসব লোক আপন শ্রদ্ধা করেন বলে সঙ্গে যাচ্ছেন। এ সঙ্গে একটু কথা বলে নিন। এই সামনেই বড় রাস্তা।'

দাদু এই প্রথম উপদেশের মত বলল। তাও ঘুরিয়ে। না হলে বুঝে নীতি-টীতি মিখিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেয়।

নিজেকে সামলিয়ে আমি স্কু বাচ্চাদের মধ্যে চলে গেলাম। এক্টু হেঁ করে বড়দের ভিড়ে ঢুকলাম। গ্রাম প. যেতের সেক্রেটারী বললেন, 'আপনিই : লোক যার সঙ্গে দাদু এত মিশেছেন।'

যাক গে, নিজের প্রশংসা শুনতে নে। হিমালয়ের ছায়ায় বাস করছেন ম খুব—খুব ভাগ্যবান আপনারা।

বড় রাস্তা এসে গেছে। দাদু একজ আগেই বাস দাঁড় করানোর জন্য পাঠিয়েছি বাসের যাত্রীরা বিবরক্ত ও অবাক আমাদের দলের দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছি তাদের চোখের ভাব ছিল : এরা কি গাড়িতে উঠবে?

ড্রাইভার বাসের এঞ্জিন স্টার্ট ক আর সময় নেই। চট করে দাদুর কাছে য পাটা ছুঁই নি। হ্যাণ্ডশেক করি। জিজ্ঞেস করল, 'আবার কবে আস বসন্তবাবু?'

'যদি বেঁচে থাকি উনিশ শ চু সালে।'

'এত দেরি কবে? চুরাশি সা কেন?'

'তোমাকে অভিনন্দন জানাবার ভ

'অভিনন্দন? কেন?'

'উনিশ চুরাশি সালে তোমার হবে একশ বছর সেই জন্য।

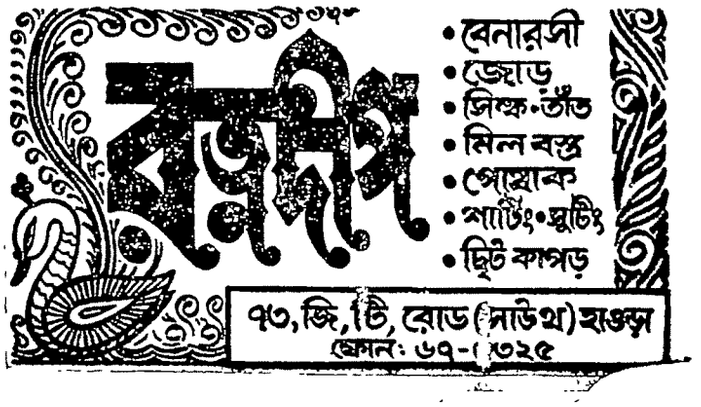

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। বারো ।।

জলপাইগুড়ি ফিরে বাপীর প্রথম কাজ হ'ল বদল। নিশীথের মামা বাড়িতে ওই মাসের মধ্যেই হাঁপ ধরে গেছল। পড়ার য় ছাড়াও ছোট চারটে ছেলেমেয়ে ছে'কে থাকে ওকে। ওদের সঙ্গে খেলতে হবে, প শোনাতে হবে। তাছাড়া নিশীথের া-সামীরও বাড়তি ফাইফরমাসের কামাই

ভিতরে ভিতরে নিশীথের সরে টলে থাকার বাসনা ছিল বাপীর; নিশীথও সানন্দে সেই ব্যবস্থাই করে ফেলল। ওর মতে হাতে সাড়ে বারোশর ওপরে টাকা তখন অনেক টাকা। কিন্তু মাসে সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ টাকা খরচ ধরলে দু' বছরের মধ্যে ও-টাকা ফুরোবে বাপীর সে-হিসেব আছে। তাই নিশীথকে বলল, খাব-দাব না, তোর মামাতো ভাই বোনদের পড়ানোর টাকা কতটা বাড়াতে পারিস দেখ, নইলে আই, এস-সি পাশ করতেই জমা টাকা শেষ হবে।

নিশীথের কানে কিছু ঢোকালে ভালই ঢোকে। কোমর বেঁধে মামা-মামীর সঙ্গে ফয়সলা করে এলো। বন্ধুর জন্য মাসে পঁচিশ টাকাই দাবী ছিল তার—একটা জোয়ান ছেলের দুবেলার ভাত আর জল-খাবার দিতে মাসে পনের টাকাও খরচ হত না নাকি মামার? যুদ্ধের বাজারে খাওয়া-পরার খরচ বাড়ছে না?

মামা-মামী মাসে কুড়ি টাকায় ফয়সলা করল, সেই সঙ্গে বিকেলের জল-খাবার যোগান দিতেও রাজি হল। ছেলেমেয়ের রেজাল্ট ভালো হলে পরের বছরে আরো

মাইনে বাড়ানোর কড়ার করে নিশীথ হস্টেলে ফিরল। এবারে আর এক প্ল্যান মাথায় ঘুরছে তার। এখন পুঁজি থেকে মাসে তিরিশ টাকা খরচ হলেও দু' বছরে আই, এস-সি শেষ করার পর বি, এস-সি পড়ার পুরো টাকা হাতে থাকে না। তাই বাপীকে পরামর্শ দিল, তোর ওই কামানো মাথা নিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা কর. কলেজের মাইনে সাত টাকা আর হস্টেলের সীট রেন্ট ছ' টাকা যদি মাপ হয়ে যায়, তাহলে বি, এস-সি পড়া শেষ করা পর্যন্ত আর ভাবনা থাকবে না।

কিন্তু বাপী রাজি হল না। এক পিসীর কাছে ভিন্ন এ-যাবত আর কারো কাছে মুখ ফুটে কিছু চায়নি। এ-প্রস্তাব সরাসরি ভিক্ষে চাওয়ার মতো। কিন্তু নিশীথ নাছোড়বান্দা। হস্টেলের সুপারিন টেনডেন্টকে ধরে ওর সীট রেন্টের ছটা টাকা রাঁচিয়ে ছাড়ল।

বাপীর এতেও খারাপ লাগল খুব। তবে এবারে অনেকটা নিশ্চিন্ত বটে। আর্থ ববরানী বানারজুলির বাড়িটা কি করবে কে জানে। বাপী ওটা ওকে বিক্রী করে দিতে বলেছিল। শুনে রাগ-রাগ মুখ করে আর্থ বলেছে, তুই কি একেবারে বিরাগী হতে যাচ্ছিস নাকি—ছোট-বড় দেড়খানা কাঠের ঘর আর ওই এক-ফালি জমি—বিক্রী করে কি ঐশ্বর্য পাবি শুনি? তার থেকে বাপ আর পিসীর স্মৃতিটুকু থাক না—

বলেছে ঠিকই। জঙ্গলের পাশের ও-রকম জমির কোনো দামই নেই বলতে গেলে। পিসীর মুখে গল্প শুনেছিল, যারা যখন ওখানে ঘর তুলেছে, সর্ব-সাকুল্যে খরচ পড়েছিল নব্বুই টাকা। জমির দাম ধরে। কাঠ জঙ্গল থেকে ওমনি পেয়েছিল বাবা। শুধু মজুরি আর মিস্ত্রীর খরচ। তারাও আবার জঙ্গলের খাতিরের কন্ট্রাক্টারের লোক।

আবুর মন বুঝে বাপী ওকে ভাড়াটে পাওয়া যায় কিনা দেখতে বলে এসেছে। মাসে পাঁচ সাত টাকা যা মেলে। ও-সব জায়গায় তাও পাওয়া সহজ নয় জানে। যতদিন না ভাড়াটে জোটে আবুকে বাড়িটা দেখাশুনা করতে বলেছে, আর সম্ভব হলে রাতে ওখানে ওকে থাকতে বলেছে।

খুব একটা বড় ভাবনা বাপীর মাথার ওপর কিছু নেই এখন। তবু ভালো লাগে না। বাপীর কিছুই ভালো লাগে না। না নিজে পড়তে, না নিশীথের মামাতো ভাই-বোনগুলোকে পড়াতে। বয়েস সবে সতের এখন। কলেজে ওর বয়সী বা ওর থেকে বড় ছেলেরা কত রকমের হৈ-চৈ ফুর্তিতে মেতে আছে। কিন্তু বাপীর ভিতরের বয়েসটা ওদের সকলকে ছাড়িয়ে যেন ঢের এগিয়ে গেছে। ও-সব খেলা-ধুলো হৈ-চৈ যেন ওর জন্য নয়। তার থেকে নিরিবিলি ভালো লাগে। একলা ভালো লাগে। ভাবনার মধ্যে অনেক দূর হতে ভালো লাগে। বয়সে নয়, ক্ষমতায়। এমন ক্ষমতা, যার কোনো শেষ নেই' তল-কূল নেই। কেরানির ছেলে বলে যারা নাক সিঁটকেছে, যারা চোখ তাকিয়ে দেখেনি, তাদের চোখ ঠিকরে যায় এমন বড়।

ছুটির দিনে বা অন্য দিনেও ফাঁক পেলে বিকেলের দিকে একলা দু'-আড়াই মাইল পথ হেঁটে কবলা নদী বা তিস্তার ধারে এসে বসে থাকে। করলার থেকে তিস্তার দিকটা বেশি নিরিবিলি। সামনে সবুজ খালের মতো তিরতিরে জল। হাঁটুরও আধখানা ডোবে না। তার ওধারে ধূ-ধূ বালুর চড়া। তার শেষে ডুয়ার্স-এর জঙ্গলের রেখা। সতৃষ্ণ চোখে বাপী সেই সবুজ রেখার দিকে চেয়ে থাকে। তখন বানারজুলি ওকে ভয়ানক টানে। খাকি পেরিয়ে কতদিন সেই চড়ার ওপর দিয়ে ওই জঙ্গলের রেখা লক্ষ্য করে কতদূর হেঁটে চলে গেছে ঠিক নেই। কিন্তু ওই সবুজ রেখা ঠিক তেমনি দূরে।

মাথার ওপর দিয়ে আজকাল ঘন ঘন এরোপ্লেন উড়ে চলে যায়। বাপী কাগজ পড়ে রোজ। পৃথিবীর যুদ্ধ এখন কোন্ কোণে এগিয়ে এসেছে জানে। কিন্তু মাথার ওপর এরোপ্লেন দেখলে ওর যুদ্ধটুদ্ধ মনে

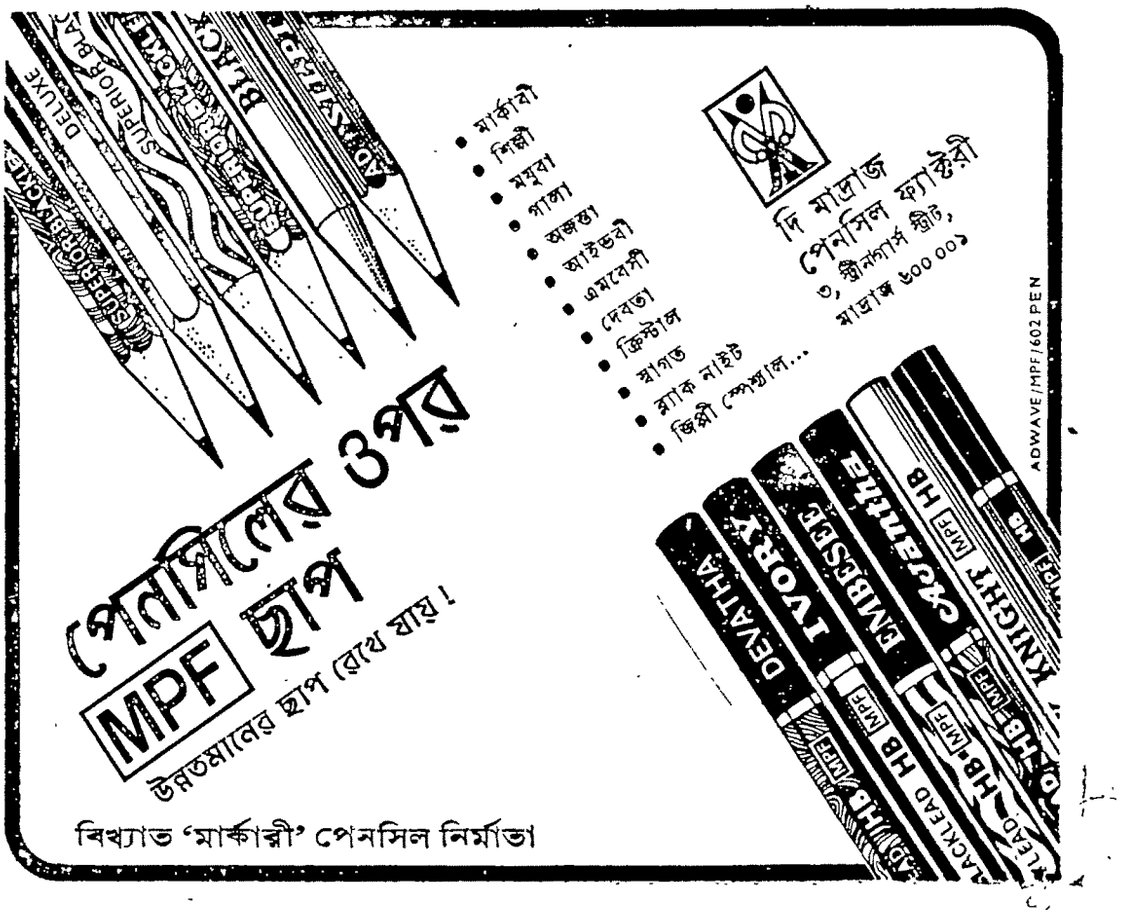

থাকে না। মনটা চেরা ওপর দিয়ে উড়ে চলতে থাকে।

....বিষম চমকের দিনের সেই শীতের বিকেলেও বাপী তিস্তার পারে একলা বসে। যুদ্ধের বোমা কলকাতায় পড়েছে। খড়িও মারফৎ সর্বত্র সেই গায়ে কাঁটা দেওয়া খবর এসে গেছে। অনেকে বলাবলি করছে, জাপানীদের দলে ভিড়ে সুভাষ বোসের এই কীর্তি। তার আজাদ হিন্দ ফৌজ নাকি ভারতের কোন কোন জায়গা দখল করেছে। এবার বার্মা থেকে কলকাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এটা তারই সূচনা।

দিকে দিকে আতঙ্ক। এমন কি এই জলপাইগুড়িতেও। কিন্তু বাপীর ভিতরে আতঙ্কের বদলে অন্য রকম উত্তেজনা। আর মাথার ওপরের ওই এরোপ্লেনের মতো তার ইন্ডট কল্পনা পাখা মেলে দিয়েছে। সুভাষ বোস আর যা-ই করুক দেশের ক্ষতি কক্ষনো করতে পারে না। বোমা ফেললেও। গত বছরের জানুয়ারিতে ওই লোকের উদ্দেশ্যে তাঁবেদার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি থেকে উধাও হবার খবর কানোর সঙ্গে সঙ্গে বাপীর বুকের তলায় যে আনন্দের বান ডেকেছিল, আজও মনে আছে। তখন ও বানারজুলি চা-বাগানের গরিবের বাবান্দায় বসে রোজ সন্ধ্যায় খবরের কাগজ পড়ত। এ খবর পড়ে আবুর সঙ্গে পরামর্শ করেছিল, সুভাষ বোস যদি পালিয়ে এই বানারজুলির জঙ্গলেই এসে উপস্থিত হয়, তাহলে কেমন করে ও আর আবু তাকে এই জঙ্গলের মধ্যেই সকলের চোখের আড়ালে রাখবে। বাপীর তখনো ধারণা, পালানোর সব থেকে ভালো জায়গা একমাত্র জঙ্গল।

এই সুভাষ বোস নাকি ভারতের কোনো কোনো মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা তুলেছে—ফিসফিস করে এ-কথাও কেউ কেউ বলে। পাড়িতে বেড়িও আছে এমন বড় লোকের ছেলেও কলেজে আছে। তাছাড়া অন্য বিভাগের দুই একজন হোমরা-চোমরার সঙ্গেও দু-পাঁচ জন আছে। এবাই বলা-বলি করে।

বাপীর বন্ধ বিশ্বাস, কলকাতায় বোমা পড়েছে এবং আরো পড়তে পারে—সে-শুধু শত্রু নিপাতের জন্য। যারা দেশের শত্রু তাদের ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষতি হবে না বা হতে পারে না। কলকাতা কেমন, কলকাতা কি রকম বাপী জানে না। কিন্তু কলকাতা বলতেই কতগুলো মুখ সামনে ভেসে ওঠে। কলকাতায় থাকুক বা থাকুক, ওটা যেন তাদেরই খাস বাসের জায়গা। তা ছাড়াও বাপীর বিশ্বাস তারা কলকাতাতেই আছে। অতএব যারা সে শত্রুরা নিপাত যাবে বা গেছে তাদের মধ্যে ওই চেনা মুখ ক'টা আছে। নন্দীপ নন্দী, তার মেমসাহেব মনোরমা নন্দী আর তাদের ছেলে সুদীপ নন্দী। বাপীর এই কল্পনায় ওরা দেশেরও শত্রু। কলকাতার এই বোমায় বা পরের বোমায় যারা সব শেষ হয়ে গেলে থাকল শুধু একজন। মিষ্টি।

কুসুমপুরের সেই অবস্থায় মিষ্টিকে মুখোমুখি দেখছে বাপী আর হাসছে অল্প অল্প। মিষ্টিও দেখছে ওকে। এখন এক বাপী ছাড়া ওর কোনদিকের কেউ নেই। এবারে বাপী ওকে কি দন্ড দেবে ভেবে না পেয়ে ওর চোখে মুখে এত ভয়।

বাপীর তাই আরো বেশি হাসি পাচ্ছে। ও-যে কত উদার হয়ে একলার জগৎ থেকে মিষ্টিকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছে তা জানেই বা কেমন করে, বিশ্বাসই বা করবে কি করে।

মাথার ওপর গোঁ-গোঁ শব্দে আবার একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। বাপীর চমক ভাঙল। সামনে তিস্তার খাল। তারপর ধু-ধু বালু চর। তার ওধারে ডুয়ার্সের-এর বনের রেখা।

বাপী হাসছে আবারও। একটা বয়েস ওর অন্য ছেলেদের থেকে ঢের এগিয়ে গেছে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা বয়েস রূপকথার কল্পনার জগতের মধ্যেই আটকে আছে। নইলে কোথায় বোমা আর কোথায় মিষ্টি।

জলপাইগুড়ি এসে বানারহাটের একজন অসম বয়সী সঙ্গী পেয়েছে বাপী। এখন সঙ্গী, আগে ছিলেন সেখানকার স্কুলের ড্রইং মাস্টার। নাম ললিত ভড়। বছর চল্লিশ বয়েস। ম্যাট্রিক পাশ। আর্ট স্কুল বা কলেজের ডিপ্লোমা ডিগ্রি কিছু নেই। নিজ গুণে আর্টিস্ট। তাই কোনো সরকারি স্কুলে চাকরি জোটেনি। বেশ বড় সড় মোটা মানুষ। পান-খাওয়া কালো ছোপ ধরা লাল দাঁত। এক মাথা চুল আর এক গাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তিন মাসে একবার চুলে কাঁচি পড়ে, আর মাসে দু বার গালে ক্ষুর। আঁকার থেকেও ললিত ভড়ের শাস্ত্রজ্ঞান বেশি। চুল-দাড়ি কাটা না কাটা নিয়েও দু-পাঁচটা সংস্কৃত শ্লোক ঝেড়ে দিতে পারেন। বানারহাটের স্কুলের সব ক্লাসেই একটা বেত নিয়ে ঢুকতেন। কিন্তু সেই বেতের ঘা এক-মাত্র টেবিলের ওপর ছাড়া কখনো হয়তো কারো গায়ে পড়েনি। বেত হাতে ক্লাসে ঢোকেন কেন জিজ্ঞাসা করলে নিজেই বলতেন, ওটা পাবসোনালিটি কমপ্লেক্স। বুঝলি কিছু?

বুঝুক না বুঝুক, ছেলেরা মাথা নাড়ত, বোঝেনি। ললিত ভড় তখন কালো ছোপ-ধরা লাল দাঁত বার করে ধমকের সুরে বলতেন, সব তো বুঝে ফেলেছিস, এখন এটা বাকি—বড় হ', বুঝবি।

জলপাইগুড়িতে তাঁর পৈতৃক ভিটে। বাড়ি বলতে দুখানা খুপরি কাঠের ঘর। এককালে এই জলপাইগুড়ির কোথায় নাকি তাঁদের ঘর-বাড়ি আর অনেকটা জমি-জমা ছিল। বন্যায় সব খেয়ে দিয়েছে। বানারহাটে থাকতেই ভদ্রলোক এখানকার কোনো বে-সরকারী স্কুলে চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই চাকরি এতদিনে হয়েছে।

বানারহাটের স্কুলের ছেলেরা ললিত ভড়কে বলত পেটুক ভড়। না,কেউ তাঁকে পেটুকের মতো খেতে দেখেনি কোনদিন। তবু তাঁকে পেটুক বলার পিছনে একটা মজার ব্যাপার আছে। আঁকার হাত পরিষ্কার। বোর্ডে যা এঁকে দেন ছেলেদের তাই আঁকতে হয়। কিন্তু কোনদিন কেউ তাঁকে ফুল লতা পাতা গাছ-গাছড়া নদী পাহাড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ে কিছু আঁকতে দেখে নি। তাঁর আঁকার মধ্যে খাবার বিষয় থাকবেই। আম আতা কলা পেঁপে আঙুর বেদানা, পেয়ারা, জাম-জামরুলের থোকা—লাউ, কুমড়ো, ফুল-কপি, বাঁধা-কপি, আলুর ঝুড়ি, বড় বড় টেমাটো, ফলন্ত সিম গাছ, বেগুন গাছ—হাঁড়ি ভরতি রসগোল্লা বা দই, ডিশ ভর্তি সিঙ্গাড়া বা তালশাঁস সন্দেশ—দশ বিশ সের ওজনের বুই কাতলা, পোলাউ কালিয়া পঞ্চব্যঞ্জনের সামনে বসা তৃপ্ত মুখ ভোজন-বিলাসী—কথামালার সেই হোলুপ নেকড়ের সামনে নধর মেষ শাবক, নাগালের বাইরে থোকা-থোকা আঙুর ডালের নিচে শেয়াল, বাকের মুখে মাংসের টুকরো দেখে ধূর্ত শেয়ালের চাটু কথা—এইসব তাঁর আঁকার বিষয়। সর্ব ব্যাপারে কিছু না কিছু খাওয়ার যোগ থাকবেই।

মাস দেড়েক আগে রাস্তায় একদিন হঠাৎ দেখা তাঁর সঙ্গে। বাপীকে দেখে আনন্দে আটখানা। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই কাঁধ জড়িয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। বানার-জুলিতে গরিবদের কুড়ে ঘর তো কতই দেখেছে বাপী। নিজেদের অবস্থাও সেই রকমই ছিল। কিন্তু ঘুপ-ধরা এই কাঠের খুপরি ঘর দুটোয় এসেই বাপীর মনে হয়েছিল, দারিদ্র্য যেন এখানে একেবারে হাঁ করে আছে।

হাঁক দিয়ে স্ত্রীকে ডাকলেন। দুটো ছেলে ঘরে এলো। পরনে হাফ প্যান্ট, আদুড় গা। আট আর বারোর মধ্যে বয়েস। দরজার কাছে ময়লা শাড়ি জড়ানো বছর চৌদ্দর একটা মেয়ে। এই ছেলে দুটো আর মেয়েটা বেশ লম্বা আর ফর্সাও—কিন্তু গায়ে কারো মাংস নেই। শুধু হাড়গুলো চামড়ায় মোড়া। এত রোগা ছেলেমেয়ে বাপী আর দেখেইনি বোধহয়।

মাস্টারমশাইর বউ এলেন। উনিও হাড় চামড়া মোড়া লম্বা ফর্সা কাঠি একখানা। ললিত ভড় বললেন, আমার বানারহাট স্কুলের ছাত্র বিপুল, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে কলেজে পড়তে এসেছে—দেখ তো ওকে দেবার মতো ঘরে কিছু আছে কিনা।

মুখে হাসিও না রাগও না, একবার ওর দিকে তাকিয়ে ভড়-গিন্নি কলের পুতুলের মতো চলে গেলেন। বাপীর মুখের দিকে চেয়েই ললিত ভড় বললেন, থাক, তোকে আর লজ্জা পেতে হবে না, স্কুলে তোরা আমাকে পেটুক-ভড় বলতিস আমি জানি না নাকি। কিন্তু খেতে না দিলে মনে মনে ঠিক নিন্দে করবি—

লাল-কালো দাঁত শুধু না, খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁক দিয়েও হাসি ঠিকরে

পড়ছিল। এর পরেই সোৎসাহে ওকে শোনাতে লাগলেন, হাতে কিছু টাকা এলেই পিছনের জমিটুকুতে কি-কি অনাজ লাগাবেন—ভালো মাটি, খাসা তরি-তরকারি হবে।

চকিতে বেশমা আর দুলারির কথা মনে পড়ে গেছল বাপীর। অন্ধ ছুটু মিয়ার ঘরের পিছনে তারাও তরকারির বাগান করেছিল। কিন্তু তাতে অভাব মেটেনি। তারা এখন সাপের খেলা দেখায়।

একটা মাঝারি সাইজের ডালায় নুন আর গোলমরিচ ছড়ানো তেলে ভাজা চিঁড়ে এনে সামনে রাখল সেই রোগা মেয়েটা। কিছু সেদ্ধ মটর শুঁটিও আছে ওতে।

—খা খা—খাসা জিনিস, ললিত ভড় নিজেও ডালা থেকে এক মুঠো তুলে নিলেন।

সত্যি মুখরোচক। রোগা ছেলে দুটো হাঁ করে দেখছে। বাপী ওদের কাছে ডাকতে ওরাও এসে খেতে বসে গেল। মেয়েটা আবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বাপী বলল, তুমিও চাখটে নাও না, আছে তো—

ললিত ভড় ডাকলেন, লজ্জা কি রে, খায় আয়। বাপীকে বললেন, আমার মেয়ে কুমকুম, ও-ই বড়, ক্লাস এইট-এ পড়ে—খুব ভালো মেয়ে।

কিন্তু ভালো মেয়ে এলো না। অন্য ঘরে চলে গেল। বাপী বিমনা একটু। .. মিষ্টির থেকে বস্তুখানেকের বড় হতে পারে মেয়েটা। কিন্তু কৌতূহল হওয়া দূরে থাক, মেয়ে বলেই মনে হয় না।

চিঁড়ের ডালার অবস্থা দেখে হাসি পাচ্ছিল, আবার বুকের ভিতরে কেমন যেন করছিলও। কথা বলতে বলতে ললিত ভড় চিঁড়ে ভাজা তুলে নিচ্ছেন। ছেলে দুটো চটপট খাওয়া সারছে। ওই চিঁড়ের ডালার বাপী আর একটিবার মাত্র হাত দিয়েছে। তার মধ্যে ডালা খালি।

ললিত ভড়ের শিল্প-কলার সর্বদা ভালো ভালো খাবার জিনিস থাকে কেন বাপী তা যেন এতদিনে বুঝতে পারছে।

মনের মতো শ্রোতা পেলে ড্রইং মাস্টার ললিত ভড় সব থেকে খুশি। ভালো খাবার পাওয়ার থেকে কিনা তা অবশ্য বাপীর যাচাই করার সুযোগ হয়নি। এই তিস্তার পারেই মাঝে মাঝে দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। লম্বা হাঁটার ঝোঁকে অনেক দিনই এ-দিকে চলে আসেন। ছেলেমেয়ে বউ সত্ত হাড়-চামড়া সার হোক তাঁর দেহখানা লম্বার ওপর নাদুসনদুস।

দেখা হলে এ-সময় যুদ্ধের কথা ছাড়া আর কি কথা হবে। তখন যুদ্ধ নিয়েই অনর্গল বলে যান ললিত ভড়। মেজাজ তিরিক্ষি হতেও সময় লাগে না।— ও-সব যুদ্ধ-টুদ্ধ হল বাজে-বাজেডাব ব্যাপার, বুঝলি? ও আমাদের কিছু নয়। আমাদের শুধু পেটের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ লেগেই আছে। আমাদের গোলাম বানিয়ে রেখে ইংরেজ এই যুদ্ধটাই বেশ করে শিখিয়েছে। ইচ্ছে করলেই ওরা বেশি দিতে পারে, কিন্তু দেবে কেন? ভরা পেটে আর গোলাম হতে চাইবে কেউ? ইস্কুল-কলেজের বড় বড় ছেলেগুলোকেও এটা বোঝাতে গেলে ওরা আবার বোকার মতো হাসে। ওদের কাছে আমি সেকেলে মানে যেমন আমার চেহারা, তেমন বুদ্ধি।

এই প্রসঙ্গে লাল-কালো দাঁত-আর দাড়ি বোকাই মুখ খিঁচিয়ে একদিন বলেছিলেন, শ্লোক আছে, স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশের কুকুর—মানে জানিস? স্বদেশে যার সম্মান, বিদেশে তার অনাদর। আমাদের ঠিক উল্টো। ইংরেজ বিদেশে এসে ঠাকুর আর আমরা স্বদেশে থেকে কুকুর! আমাদের মরণ আগাড়ে, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—যুদ্ধ লাগুক থামুক, আমাদের আবার ভবিষ্যৎ কি?

পরের বছরেও ড্রইং মাস্টার পেটুক-ভড়ের মুখে হা-হা হাসি দেখেছে বাপী কিন্তু তাঁর কথা-বার্তা আর শ্লোকে ধার আরো বাঁঝালো। কলকাতার আশপাশ গুলোতে তখন শুধু সমস্ত চক্ষিশ পরগনা আর বাংলার বহু জায়গা জুড়ে দুর্ভিক্ষ মূর্তি। চালের বস্তা সব নাকি পাখা মেলে উবে গেছে। ডাল তেল নুন মশলা উধাও। ভাত ছেড়ে ভাতের একটু ফ্যানে জন্য দিকে দিকে আর্তনাদের ঘরর। দুর্ভিক্ষ শব্দটাই শুধু শোনা ছিল, ব্যাপারখানা বাপীর জানা ছিল না। এখনো খুব স্পষ্ট নয়। কারণ উত্তর বাংলা মোটামুটি ধান চালের দেশ। কিন্তু অন্য প্রান্তে দুর্ভিক্ষের বাতাসে এখানেও অনেক কিছু দর চড়া। গ্রামে যে যতটা পাবছে ঘরে এ মজুত করছে। পড়াতে গিয়ে নিশীথে মামাবাড়িতেই তো কত চালের বস্তা ঠিক দেখেছে বাপী।

এই প্রসঙ্গেই পেটুক ভড়ের ম.

সদ্য প্রকাশিত হ'ল : তোডরমল-এর রচিত

ভূমিরাজস্ব ও জরীপ ১৫.

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ-এর বিজ্ঞান ভিত্তিক বই

বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী ১৪

নিশাচর-এর শিহরণ জাগানো বই

রহস্য অমনিবাস ২০.

চিরঞ্জীব ও শ্রীপার্থ-এর নতুন খেলার বই

ফুটবলের অ্যালবাম ৮.

রমেশ মজুমদার-এর বিপ্লবী বই

সূর্য সেন ও সশস্ত্র বিপ্লব ৮.

বৈতালিক-এর (পঞ্চকেদার) ভ্রমণ উপন্যাস

হিমগিরি তীর্থপথে ৭.

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাড়াজাগানো উপন্যাস

জ্যোৎস্নায় অরণ্যে একা ৮.

বাসুদেব বসু-র চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী উপন্যাস

ভয়াল অরণ্যটাহতবাক ১২.

জ্যোতি প্রকাশন • ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ০ কলিকাতা-৯

মূর্তি এক এক সময়। —রাশি রাশি লোক মরছে বুঝলি? খিদের জ্বালায় মানুষগুলো পিঁপড়ের মতো পটাপট মরে যাচ্ছে। সরকারি হিসেব দিচ্ছে পনের লক্ষ, কিন্তু কম করে পঁয়ত্রিশ লক্ষ হবে, শুনে রাখ আমার কাছে। সরকারি ফিগার চ্যালেঞ্জ করে কাগজে এই খবর বেরিয়েছে। দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল—সেই সাতাত্তরের আমল থেকে এ পর্যন্ত কত কোটি লোক দুর্ভিক্ষে মরেছে এই দেশে তাও আমি হিসেব করে বলে দিতে পারি। কিন্তু আগের কালে পথ ঘাট ছিল না, গাড়ি ঘোড়া ছিল না—যেখানে দুর্ভিক্ষ সেখানে পটাপট লোক মরত। কিন্তু এখন হয় কেন? এখন মরে কেন? আগের কালে দুর্ভিক্ষ তাড়ানো ছিল রাজধর্ম—রাজভাণ্ডার সুফসার ধান আকালের জন্য মজুত রাখত আর বিলোতো। এখন কে মজুত করছে? কারা বিলোচ্ছে? আমি বিয়ের মধ্যেও খাবার স্লোগান দিই, কিন্তু এই রাজ-রাজড়ারা কি করে?

আর একদিন শুকনো মুখ দেখেই পরীর মনে হচ্ছিল ভদ্রলোকের কিছু খাওয়া হয়নি। সকাল থেকেই খাওয়া হয়নি না কে জানে। কথার ফাঁকে দু'বার উঠে ভেতরে গেছে তিনবারে জলেই কুলকুচি করে এসেছেন।

—শাস্ত্র মতে দুর্ভিক্ষ কেন হয় জানিস? অতীতের দোষে। 'ঈতি' কি জানিস? ঈতি হল, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি পঙ্গপাল মূষিক আর যুদ্ধ। এই দুর্ভিক্ষে ঈতির কম চারটেই বাদ। কেবল যুদ্ধ। যুদ্ধ মানে কি? মানুষের উপদ্রব আর মানুষের তৈরি। বুঝলি? কিন্তু আমার কথা কে মানে—আমার হল গিয়ে 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী'—অভাবের আগুনে সব গুণ পুড়ে ছাই। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেদের দিন এই দুর্ভিক্ষটা কি আর কেন তাই পড়াচ্ছিলাম—পাশ দিয়ে যেতে যেতে পণ্ডিতমশায় ওই টিপ্পনী কেটে গেল!

ফেনা ওঠা শুকনো মুখ আবার ঠাণ্ডা জলে ধুতে গেলেন। বাপী পকেটে হাত দিল। একটা আধুলি আছে জানে। আজ খরচ করে না।

মুখ ধুয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়াল। —চলুন।

খেয়াল না করেই ললিত ভড় ওর সঙ্গে নেমে। মুখেরও জামাই নেই। —আসল হল টাকা, বুঝলি? টাকা থাকলেই সব বুদ্ধি মান সম্মান প্রতিপত্তি সব হল তোর। আর টাকা না থাকলে নিজের বাবাও চিবুনো ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তোর এখনো কেউ নেই বলেই বলছি, এটা মনে রাখিস—নইলে ঠকতে হবে।

লোকালয়ে এসে বাপী একটা জিলিপি আর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। সার বস্তা উঁচিয়ে আছে ফুরফুরে টাটকা মুড়ি। —গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে ইচ্ছে করছে মাস্টারমশাই।

এবারে বাস্তবে ফিরলেন ললিত ভড়। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন খুব সঙ্গে। জিলিপি-ভাজা বড় কড়ার দিকে চেয়ে চোখ দুটো একটু চকচক করে উঠল কিনা বাপী জানে না।

—আজ থাক, তোকে আর একদিন খাওয়াবখন।

বাপী জোর দিয়ে বলল, আজ আমি। একদিন আমি আপনাকে খাওয়াতে পারি না? পকেট থেকে আধুলিটা বার করে দেখালো, এই দেখুন পয়সাও এনেছি—

দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। ললিত ভড় পিছনে। আমতা আমতা করে বললেন, তোর যখন এত ইচ্ছে, একটা কাজ কর তাহলে... কিছু বেশিই নে, বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাওয়া যাবে... ওরাও মুড়ি আর গরম জিলিপি খুব ভালবাসে। আর, আমার জন্যে এক পয়সার পান কেন, মুখটা কেমন হয়ে আছে।

চার আনার মস্ত এক ঠোঙা মুড়ি, পনের পয়সার তিরিশটা গরম জিলিপি আর দু' হাত দূরের দোকান থেকে এক পয়সার দুটো পান কেনা হল। একটা পান ললিত ভড় তক্ষুনি মুখে পুরে দিলেন।

কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি এসে কি যে আবার দরকারি কাজ পড়ে গেল তাঁর বাপী বুঝল না। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা তুই যা, আমি একটা কাজ সেরে এখনই আসছি—আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, তোরা শুরু করে দে—

বাপী কিছু বলার অবকাশ পেল না, তার আগেই হন হন করে উনি আর একদিকে চলে গেলেন।

ওঁর বাড়িতে পা দেবার পর ব্যাপার-খানা বোঝা গেল। প্রথম দিনের পর বাপী এ-যাবত আরো চার-পাঁচ দিন এখানে এসেছে। ভড়-গিন্নি কাছে আসেন না, মেয়ে আর ছেলে দুটোর সঙ্গে কথাবার্তা হয়।

ওকে দেখে বোগা পাংশু মূর্তি কুমকুম এগিয়ে এলো। পিছনে ভাই দুটো। হাতে মুড়ির ঠোঙা আর জিলিপির ঠোঙা দেখে ছেলে দুটোর চোখে মুখে চাপা উল্লাস। পারলে ছিনিয়ে নেয়।

কুমকুম জিজ্ঞাসা করল, এ-সব কেন?

আমতা আমতা করে বাপী বলল, মাস্টারমশাই পাঠালেন, কোথায় একটু কাজে গেলেন, এখুনি আসবেন—

হাত বাড়িয়ে কুমকুম জিলিপি আর মুড়ির ঠোঙা নিল আর সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে বলে উঠল, সমস্ত দিন বাড়িসুদ্ধ সকলকে উপোস করিয়ে এখন জিলিপি পাঠালেন—

থতমতো খেয়ে বাপী জিজ্ঞাসা করল, বাড়িসুদ্ধ সকলে উপোস কেন?

—মাসের শেষে মায়ের বাক্স থেকে বাবা দশ টাকা চুরি করে ধরা পড়েছে তা তোমাকে বলেনি বুঝি? মায়ের জেরার চোটে ধরা পড়েছে। দশ-দশটা টাকা কলকাতার কোন্ দুর্ভিক্ষের ফান্ডে-এ মানি-অর্ডার করে পাঠানো হয়েছে। রাগ করে মা আজ সমস্ত দিন নিজেও রাঁধেনি, আমাকেও রাঁধতে দেয়নি—দুপুর থেকে সবাই উপোস চলছে।

বাপী পালিয়ে এসেছে।

আবার একটা অদমা ইচ্ছা মাথায় নতুন করে চেপে বসছে। অনেক অনেক বড় না হলেই নয়। অনেক—অনেক টাকা রোজগার না করলেই নয়... অপমানের শোধ নেবার জন্য অনেক বড় হওয়া দরকার আর অনেক টাকা দরকার। আবার ললিত ভড়ের মতো মানুষের জন্যেও দরকার।

পড়াশুনা ভালো লাগুক না লাগুক, পরীক্ষায় পাশ না করলে চলবে না এটা ভালোই জানে। নিশীথের সঙ্গে এক ঘরে থাকে তাই বই-এর সমস্যা নেই। ফাইনাল পরীক্ষার চার-পাঁচ মাস মাত্র বাকি আর। নিশীথের ঘুম ভাঙার আগেই ও পড়াশুনা কিছুটা সেরে রাখে।

বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে ললিত ভড়ের বারো বছরের বড় ছেলেটা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলো। সমস্ত রাস্তা ছুটেই এসেছে বোধহয়। দু' চোখ কপালে।—বাপীদা শিগ্‌গীর দিদি তোমাকে যেতে বলল, এক-গাদা পুলিশ এসে আমাদের ঘর তছনছ করছে, বাবাকে তারা ধরে নিয়ে যেতে এসেছে!

বাপী হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। তারপর বুকের মধ্যে কাঁপুনি। প্রথমেই কমাস আগে গিন্নির বাক্স থেকে মাস্টার-মশাইর দশ টাকা চুরি করে দুর্ভিক্ষের ফান্ডে পাঠানোর ব্যাপারটা মনে পড়ল। এবারে কি বাড়ির বাইরে কোথাও কিছু করে বসল নাকি ভদ্রলোক!!

কিন্তু এই বাচ্চা ছেলে কি আর বলতে পারবে। জামা গায়ে চড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। নিশীথ তখনো ঘুমুচ্ছে।

....বাড়িতে অনেক পুলিশই বটে। পাড়ার মানুষেরা সব দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ এগিয়ে আসতে ভরসা পাচ্ছে না। ছেলেটার হাত ধরে বাপী পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। ললিত ভড়কে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। এবারে পুলিশ ভ্যানে তোলা হবে।

বাপীকে দেখে লাল-কালো দাঁত বার করে অদ্ভুত বোকার মতো হাসলেন ললিত ভড়। সমস্ত ব্যাপারখানা যেন তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য। বিড়বিড় করে বললেন, কি ব্যাপার কিছু বুঝছি না, তুই এদের একটু দেখিস—

একজন পুলিশের ভদ্রলোক বাপীর

দিকে এগিয়ে এলো হঠাৎ। গম্ভীর কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, হু আর ইউ?

... বিপুল তরফদার।

—ইনি কে হন? আঙুল তুলে ললিত ভড়কে দেখালেন।

....আমাদের মাস্টারমশায় ছিলেন।

—কি করা হয়?

....আমি? কলেজে পড়ি ...।

—কোথায় থাকা হয়?

... কলেজের হস্টেলে।

লোকটা ফিরে গেল। তার পর মিনিটের মধ্যে ললিত ভড়কে ভ্যানে তুলে নিয়ে ওরা চলে গেল। আশপাশের সকলে ছুটে এলো। সকলের মুখে এক কথা, হাটে বাজারে লেকচার দিয়ে বেড়ানোর ফল। চে'চামিচি - করে ছেলেগুলোর কোন বিপদের খবর কি ওরা রাখে না—আগে ধরে নি সেটাই আশ্চর্য।

ললিত ভড়ের ঘরে এলো বাপী। দুটো ঘরই লন্ডভন্ড করে রেখে গেছে ওরা। কাগজ-পত্র ছড়ানো। বিছানা-টিছানাগুলো মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাক্স প্যাটরা হাঁ-করা খোলা। বোগা মেয়ে কুমকুম মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। হাড় বার করা ছেলে দুটোর চোখে ভয় আর বিস্ময়। ভড় গিন্নীরই শুধু তেমনি কলের পুতুলের মতো মুখ।

পুলিশের এক অফিসারের ছেলে কলেজে পড়ে। নিশীথের সঙ্গে তার বেশি ভাব। নিশীথকে বলে সেই ছেলের মারফৎ খোঁজ নেবার পর জানা গেল, পুলিশের চোখে 'বিপজ্জনক' মানুষের লিস্ট-এ নাকি ললিত ভড়ের নাম উঠেছে। পোলিটিকাল প্রিজনারদের এখন আর শিগগীর ছাড়া পাবার কোনো আশা নেই।

পরের দশ-পনের দিনের মধ্যে বাপী অনেক বার ললিত ভড়ের বাড়ি এসেছে। কিন্তু ভড়-গিন্নীর কলের মুখখানা মনে পড়লে আসতে ইচ্ছে করে না। ললিত ভড়ের খবর নেবার চেষ্টাও তলায় তলায় করেছে। একদিন শুনল, তাঁকে জল-পাইগুড়ি থেকে বাইরে কোথাও চালান করে দেওয়া হয়েছে।

সেদিনই তাঁর বাড়ি এসে দেখে বাইরে থেকে ঘর তালা বন্ধ। পাশের বাড়িতে খবর নিয়ে জানল, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভড়-গিন্নী বাড়ি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ করে দীনাজপুর চলে গেছেন। সেখানে তাঁর ভাইয়ের বাড়ি।

এ-খবর জানার পর বাপী হালকা বোধ করেছে একটু। ছেলে দুটো, মেয়ে আর কলের মুখ ভড়-গিন্নীর ভাবনায় ওর গলার কাছে কি একটা অনুভূতি ঘুমের মধ্যেও যেন দলা পাকিয়ে থাকত।

সেই থেকে বাপীর উপরে ওঠা গলগলে ঘৃণা আর বিদ্বেষের পাকে আর একটা নাম জড়িয়েছে।

সে-নাম পুলিশ।

আই এস সি পাশ করল। তারপর আরো নিঃসঙ্গতার মধ্যে পরের দুটো বছরও কেটে গেল। আই, এস-সি পাশ করে নিশীথ কলকাতায় পড়তে চলে গেছল। মেডিকেল কলেজে জায়গা না পেয়ে সে কলকাতায় বি, এ পড়া শেষ করেছে। মাঝে সাজে চিঠি লেখে। বি-এ পাশ করার খবর দিয়েছে। এদিকে বাপী বি, এস-সি পাশ করেছে।

নিশীথের মামা-বাড়িতে চার ছেলে মেয়ে পড়ানোয় ছেদ পড়েনি। মাইনে পঁয়তিরিশ টাকায় উঠেছে। তবে এক মাস দেড় মাসের ছুটি-ছাটায় হস্টেল বন্ধ থাকলে নিশীথের এই মামা-বাড়িতেই এসে থাকতে হয়, খেতে হয়। তখন মাইনে আবার কুড়ি টাকায় নেমে আসে। ফোর্থ ইয়ারের শুরু থেকে বাপী স্কুলের উঁচু ক্লাসের তিনটে ছেলেকে এক সঙ্গে পড়ানোর কাজ জোটাতে পেরেছিল। বিকেলে হস্টেলে এসে ঘড়ি ধরে দেড় ঘন্টা পড়ে যেত। অঙ্ক, অ্যাডভান্সড অঙ্ক আর মেকানিকস—এই তিন বিষয়। এখনো পড়ে। দশ টাকা করে দেয়। তিনজনে তিরিশ টাকা। ফোর্থ ইয়ারে উঠে বাপীর ব্যাংকের বাকি পঁচাত্তর টাকা আর খরচ হয় নি। মুশকিল দাঁড়িয়েছে বি, এস-সি পরীক্ষার পর। সেই তিন ছেলের একজনের বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে আসতে হয়—বাকি দুজনও সেখানেই আসে। আবার বাপীকে নিশীথের সেই মামা-বাড়িতে ঠাঁই নিতে হয়েছে। তবে মাইনে এবার কুড়ির বদলে পঁচিশে নেমেছে। মোট রোজগার তিরিশ আর পঁচিশ পঞ্চান্ন। খরচ নেই বললে হয়।

বি, এস-সি'র ফল বেরিয়েছে জুলে শেষে। বাপী পোস্ট অফিসে এসেছিল একটা খাম কিনে সেখানে দাঁড়িয়েই কল কাতায় নিশীথকে একটা চিঠি লিখেছে। বি-এ পাশের রেজাল্ট কিছুদিন আগে জেনেছিল। নিশীথ বাপের কাছে কবিরা শিখবে আর চাকরির চেষ্টাও করে লিখেছিল। বাপী তাকে লিখল, সুবে সুবিধে হলে ওর জন্যেও একটু চাকরি চেষ্টা যেন অবশ্য করে। চাকরির সুবি হতে পারে কলকাতায় নিশীথের বাবার এমন অনেকের চেনা-জানা থাকা সম্ভব।

খাম পোস্ট করে ফেরার স অবিশ্বাস্য চমক। উল্টো দিক থেকে মানুষটি আসছেন তাঁকে দেখে বাপী হ

ডইং মাস্টার ললিত ভড়।

চুলে দাড়ি বোঝাই সেই মুখ। চুলে আর দাড়ি দুই-ই এখন কাঁচা-পা সেই রকম কুলো ছোপ-ধরা লাল দাঁ আড়াই বছরে ভদ্রলোক শীর্ণ হয়ে একটু, এই যা। বাপীকে দেখে খুশি উপচে উঠলেন। —কদিন ধরে তোর কথা ভাবছি, কলেজ বন্ধ হস্টেল বন্ধ—কে কে দেখে? আমি ভাবলাম কোথাও চ গেছিস।

খুশি বাপীও কম নয়। —আ

অমিতাভ চৌধুরী

২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছে

কবি ও সন্ন্যাসী

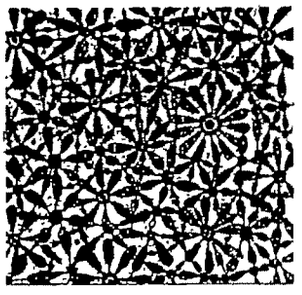

কবি ও সন্ন্যাসী

কবি রবীন্দ্রনাথ ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ উভয়ের বয়সের ব্যবধান দেড় বছরের। উভয়েরই আদি নিবাস বর্ধমান। এমন কি কলকাতায় জোড়াসাঁকো ও সিমুলিয়ার দূরত্বও মাত্র এক মাইল।

শোনা যায় গানের মহড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ অর্গান বাজাতেন আর নরেন্দ্রনাথ বসতেন পাখোয়াজ নিয়ে।

কিন্তু উত্তরজীবনে এই দুই মনীষীর মধ্যে কি সম্পর্কের ফাটল ধরেছিল?

কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রতিটি ভারতবাসীর পরম প্রিয় এই দুই মনীষী পরস্পর পরস্পরের প্রতি নীরব রইলেন কেন? এই প্রহেলিকার উত্তর আজো কেউ দিতে পারেন নি। রবীন্দ্রচর্চায় অভিনবত্বের পথিকৃত অমিতাভ চৌধুরী এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রশ্নে অনেক অজানা তথ্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন কবি ও সন্ন্যাসী গ্রন্থে। দাম—৮.০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮।১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, ফোন ৩৪৮৫৪৩

ছাড়া পেলেন ? কবে এলেন ?

—বারো-চোদ্দ দিন হবে। এখান ক রাজসাহীতে চালান করে দিয়েছিল, খানেই ছিলাম।

—কেমন ছিলেন ?

—খারাপ আর কি। গোড়ার কিছু গুঁতোর চোটে চোখে অন্ধকার দেখতে কিন্তু আমি কার নাম আর কি বস্তুর কথা বলি বল ? ওরা বিশ্বাসই ত চায় না। তারপর অবশ্য ভালই াম, ওরা আমাকে নিয়ে মজা করত, া-ভালো খাবারের ছবি এঁকে দিলে াকে একটু ভালো খেতে দিত। হা হা া।

কিন্তু বাপীর দু' চোখ জ্বলছে। শ মার-ধর করেছে, অকারণে ইটে বছর আটকে রেখেছে, সামান্য ন চাকরিটাও গেছে। জিগেস করল, ীন ফিরেছেন আপনার ছেলেমেয়ে জানে ?

তো সব দীনাজপুর চলে গেছল....

হ্যাঁ, বউয়ের ভাই সেখানে কোর্টের বি। নিজের জায়গা-জমি আছে, গোরু আছে দুটো, পুকুরে মাছ আছে—ভালই আছে নিশ্চয়।

—আপনি ফিরে এসে সেখানে যান নি।

—যাব রে সবে তো এলাম। হাসছেন। —চাকরিটা আবার হয় কিনা বোঝার জন্য স্কুলের হেড-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। দেখেই আঁতকে উঠল ভদ্রলোক, চাকরির কথা বলব কি! আরো হাসছেন। —তার আর দোষ কি বল, ছাপোষা মানুষ, জেল-খাটা লোককে টানবে কোন্ ভরসায়।

এই জেল-খাটা লোককেই বাপী একটা মিষ্টির দোকানের দিকে টেনে নিয়ে গেল। খুশি খুশি বিব্রত মুখে ললিত ভড় বললেন, আবার এখানে কেন রে ?

বাপী বলল, আপনার খাওয়া পাওনা আছে মাস্টারমশাই—আমি বি, এস-সি পাশ করেছি, ডিসটিংশনও পেয়েছি।

শুনেই সানন্দে খেতে বসে গেলেন ললিত ভড়। কাউকে খাইয়ে এত তৃপ্তি আর কি পেয়েছে বাপী ? প্রচুর খাওয়ার পর খুশির ঢেকুর তুলে ললিত ভড় মন্তব্য করলেন, তুই বড় ভালো ছেলে, আর বড় নরম মন—তোর কি-সসু হবে না।

অর্থাৎ ভালো ছেলে আর নরম মন হলে ভবিষ্যত অন্ধকার। বাপী হেসেই ফেলেছিল।

আবার ঠাঁই বদল। নিশীথের মামার বাড়ি ছেড়ে বাপী ললিত ভড়ের দু ঘরের একটাতে উঠে এসেছে। কেন তাঁকে বুঝতে দেয় নি। উল্টে বলেছে ও-ই একটু মাথা গোঁজার জায়গা পেল। ললিত ভড় কেন স্ত্রী বা ছেলেমেয়েকে দেখতে একবার দীনাজপুর যাননি, কেন জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার খবরটা পর্যন্ত তাদের দেননি সেটা বাপীর থেকে ভালো আর কে আঁচ করতে পারে ? বাপী এখানে চলে না এলে মানুষটার উপোস করাদ্দ। হাতে অঢেল সময় এখন, আর একটা টিউশন জোগাড় করে নেওয়া বাপীর পক্ষে খুব অসুবিধে হবে না। যাদের পড়ায় তাদের বললেই হতে পারে। তাদের কাছে ওর অঙ্ক শেখানোর সুনাম খুব।

ললিত ভড়ের কাছে উঠে আসার ফলে বাপীর লাভও কিছু হয়েছে। এক তো মানুষটার সঙ্গ ভালো লাগে। ভদ্রলোক নিজে রান্না-বান্নায়ও পটু বেশ। দেড় মাস তাঁর কাছে থেকে বাপীর মোটামুটি রান্নাও শেখা হয়ে গেল। আর তাঁর কাছ থেকে কিছু যোগব্যায়ামও শেখা হয়েছে। বেশি খিদে হয় বলে নাকি ও-পাট ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু জানেন অনেক কিছু।

মাত্র দেড় মাস। ছেচল্লিশ সালের ষোলই আগস্ট থেকে তামাম ভারতেই বুঝি এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠল। গোটা দেশ রক্তে ভেসে যেতে লাগল। সে এক বীভৎস সময় এখানেও। মানুষের বিশ্বাস গেছে, বুকের ভিতরটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। দুদিন আগের গলা-গলি ভাব গলা কাটাকাটির দিকে গড়ালো। কেবল ভয় আর কেবল সন্দেহ সম্বল। বাপীর থেকে থেকে তখন বানারজুলির আবু রববাণীর কথা মনে হয়েছে। দুলারি আর রেশমার কথা মনে হয়েছে। বাপীকে কাছে পেলে তারা এখন কি করবে ?

গোলযোগের প্রথম ঝাপ্টার পরেই ললিত ভড় বাপীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিনাজপুরে ছুটে গেছেন। তারপর একটা বছরের মধ্যে একটা চিঠি না, একটা খবর না। কেউ বেঁচে আছে কি নেই তাও বাপী জানে না।

এক বছর বাদে, সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট জলপাইগুড়ির মানুষ অন্তত হেসেছে আর হাঁপ ফেলে বেঁচেছে। এক-দিন আগেও বুক ধুকপুক সকলের। দেশ স্বাধীন হবে, দুশ' বছরের দাসত্বের শেকল ভাঙবে—কিন্তু এ-জায়গার মানুষ-দের ভাগ্যে কি আছে ?

পরদিনই বিপরীত উল্লাস। জলপাই-গুড়ির বলতে গেলে সবটাই ভারতের এলাকায় পড়েছে। কিন্তু দিনাজপুরের অনেকটা পাকিস্তানের দিকে চলে গেছে। দিনাজপুরের মানুষ কি করেছে বাপী জানে না। বিপুল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে জল-পাইগুড়ির মানুষ টেন্সারিতে স্বাধীন ভারতের তিন-রঙা পতাকা তুলেছে।

কলকাতায় নিশীথের সঙ্গে বাপীর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। পরের মাসেই নিশীথের টেলিগ্রাম। চাকরির একটা ব্যবস্থা হয়েছে। পত্রপাঠ চলে এসো।

টেলিগ্রাম হাতে বাপী বিহ্বল খানিকক্ষণ।

....কলকাত্তা !

....চাকরি করতে বাপী সত্যি কলকাতা যাবে ?

....এই বাইশ বছরের জীবনে বুকের তলার সব থেকে বড় সাধ সফল হবে এবার ?

....দশ বছর আগে বানারজুলির বড় সাহেবের আট বছরের এক মেয়ে প্রথম দিনের আলাপে ওকে বলেছিল, কলকাতা দেখনি আবার ছটফট করছ—তুমি জংলি ভূত একটা। সেই কলকাত্তা।

[চলবে]

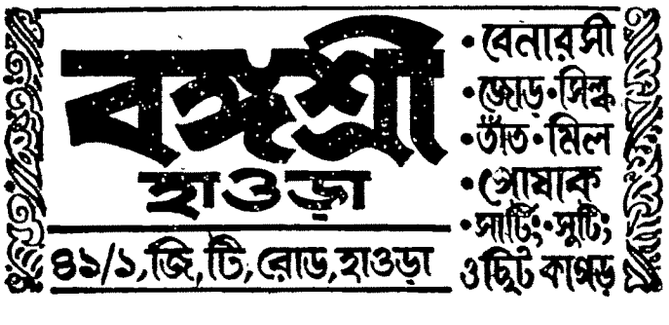

লালবাই-এর দেশে

রেখা বড়ুয়া

—বাজাতেন নব কুমুর, এখনও বাজান। খাস বিষ্ণুপুরী ধাঁচের নামী গায়কদের মধ্যে রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেতার জানতেন শুনেছি, আর যিনি গায়ক এবং বাদক হিসেবে খ্যাতি নিয়ে এখনও বর্তমান তিনি হলেন সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর গানের কথা তোরা শুনেছিস। কিন্তু সেতারের কথা বোধহয় জানিস না, কারণ উনি সেতার বাজাতে চান না সহজে। তবু আজও কলকাতা শহরের বিখ্যাত সেতারীরা ওঁর বাজনা শোনার জন্যে আসর বসান। যাক, যা বলছিলাম, যদুর গলা ছিল অপূর্ব। তাই শুনে বৃদ্ধ রামশংকর মৃত্যুর ক'বছর আগে ওকে ডেকে শেখাতে শুরু করেন। তবে সে নিতান্ত ছেলেবেলায়। রামশংকরের মৃত্যুর পর পনেরো বছর বয়েসে যদু কলকাতা চলে যান। কিন্তু গেলে কি হবে, খাওয়া পরার কোন ব্যবস্থা তো নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে, স্বপাক আহারটা অভ্যেস ছিল, সেইটুকুই কাজে লাগল শেষ পর্যন্ত। এক বাড়িতে রান্নার কাজ নিলেন যদু, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলল সঙ্গীতচর্চা। এরপর নদীয়া জেলার গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ শিখলেন।

এদেশের শিক্ষা এই পর্যন্ত, তারপর তিনি চলে যান পশ্চিমে। সেখানে নানা ঘরাণা থেকে নানা ঢং-এর গান শিখে কলকাতায় ফিরে এলেন। তখন যদু ভট্টের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

—শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রনাথ এঁর কাছে গান শিখেছিলেন? সত্যি ফুলমাসি? কুমুর প্রশ্ন করল।

বললাম, সত্যি। আর একটা খবর হল যে বঙ্কিমচন্দ্রও এঁর কাছে গান শিখেছিলেন আর যদুভট্টই বন্দে মাতরম-এর আদি সুরকার।

—একটা কথা কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে ফুলমাসি, কুমুর বলল, এত প্রতিভাবান শিল্পী থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুপুরে ঘরাণা এমন করে নষ্ট হয়ে গেল কেন।

বললাম, অন্য বংশগুলো প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও বন্দ্যোপাধ্যায়দের মধ্যে কিন্তু এখনও কিছু প্রকৃত গুণী শিল্পী আছেন। তবে এটা ঠিক যে তাঁরা বর্তমানের সর্ব-ভারতীয় ধারার সঙ্গে একটা মোটামুটি কমপ্রোমাইজ করে নিয়েছেন। অবশ্য না করে উপায়ও তো নেই, কারণ কোন একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে শিল্প এবং শিল্পী দুই-এরই মৃত্যু অবধারিত। সেটুকু বুঝে এঁরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বর্তমান জগতের সঙ্গে

এছাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের প্রবীণ গুণীদের মধ্যে অনেকে গত হয়েছেন আবার কেউ বা বয়সের জন্যে শ্রোতাদের সামনে থেকে সরে গেছেন। কাজেই একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে একথা বলা ঠিক হবে না। এখনও এ ঘরাণার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা যা আছে সেটুকু তুলে ধরলে বাংলার গৌরব বাড়বে বই কমবে না।

—আমরা এসে গেছি, কুমুর বলল, ওই তো টুরিস্ট লজ।

আমার মনের মধ্যে আর একটু ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কুমুরকে কি করে বলব ভাবছিলাম। সেই সকাল থেকে ঘোরাঘুরি চলছে। ও বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু ইচ্ছেটাকে দমন করতে পারলাম না। ওকে একটু আদরের সুরে বললাম, কুমুর, আর একটু আছে—লক্ষ্মীসোনা মেয়ে, আর একটু কষ্ট কর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদটা একবার দেখে যাই। শুনেছি ওখানে নাকি অনেক পুরোনো পুঁথি, মুদ্রা আর প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিদর্শন আছে। তাছাড়া এখানকার রক্ষক যিনি তিনি নাকি অনেক কিছু জানেন শোনেন। হয়তো বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা শোনা যাবে এঁর কাছে।

এটা সেটা করতে করতে কখন বেলা পড়ে এসেছে। মাঝে রিকসার চাকা থেকে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে বাস্তায় দেরি হয়ে গেল খানিকটা। সাহিত্য পরিষদে এসে রিকসা ছেড়ে দিলাম, টুরিস্ট লজ তো কাছেই। কুমুর বোধ হয় ক্লান্ত, বুঝেও একবার দেখে যাবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

বাইরে আঙিনায় মানিকলাল সিংহের সঙ্গে দেখা হল। ওঁর হাতেই দায়িত্ব এখানকার। জানি না কি কারণে উনি আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন না, বাইরের রোয়াকের ওপর বসালেন। বিষ্ণুপুর রাজ-বংশের কথায় নিরাসক্তভাবে বললেন, কোথায় ইতিহাস, কিচ্ছু নেই, বেশীর ভাগই আন্দাজ। আমার প্রশ্নের উত্তরে শেষের দিকের দু-চারটি সাল আর নাম বললেন। ওটুকু অনেক বই-এও আছে জানি, তবু মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে লিখে নিতে চাইলাম। এদিকে বাইরে তখন অন্ধকার নেমেছে। ভেতরটা দেখার সময় আলোয় লিখে নেব ভেবে বললাম, ভেতরটা একটু দেখা যায় না?

সিংহমশাই-এর মন অথবা শরীর নিশ্চিত ভালো ছিল না সেদিন, নইলে এভাবে উনি দরজা থেকে অতিথিকে ফেরাতেন না নিশ্চয়। কিন্তু আর কিছু না হোক আলো একটু দরকার আমার তখন।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। সঙ্গে টর্চ ছিল,

সেইটা মেলে নাম আর সাল কটা লিখে নিলাম।

সাহিত্য পরিষদ দেখা আমাদের হল না। অন্ধকারে পথে নেমে এলাম আমরা।

টুরিস্ট লজে তখন আলো জ্বলছে। গেটের ভেতর টানা পথটুকুর দুপাশে ফুল ফুটেছে অনেক। বাতির আলোয় তাদের রংগুলো অন্য রকম দেখাচ্ছিল। আকাশে চাঁদ উঠেছে তার আলোও অল্প অল্প ছড়িয়ে পড়ছে। ফুলের গন্ধের সঙ্গে সবুজ পাতার একটা কেমন গন্ধ নাকে আসছিল। বেশ ভালো লাগছিল এই সন্ধ্যা আর রাতের মাঝের সময়টুকু।

পরদিন সকালে আজ চলে যাব। ঘুম থেকে জেগেই প্রথম মনে পড়ল। বাথরুম থেকে জলের শব্দ আসছে। শব্দটা বন্ধ হতে কানে এল যোগিয়ার সুর। কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, তবে সুরের বাঁকগুলো, ছন্দের দোলাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। সত্যি ভারি সুন্দর গলা ঝুমুরের।

স্নান সেরে ও বেরোলো ঘন কালো পাড় আকাশীরং এর তাঁতের শাড়ি পরে। ভিজে চুল পিঠে এগিয়ে দিয়েছে, মুখখানা বৃষ্টির জলে ধোওয়া কচিপাতার মত উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত।

সব মেঘ কেটে গেছে, ঝুমুর আবার স্বাভাবিক ওর খিদে পেয়েছে, আবার। ব্রেকফাস্টের পর বললাম, ঝুমুর, তোরা গুছিয়ে-টুছিয়ে নে, আমি এই ফাঁকে একটু ঘুরে আসি একবার।

—উঃ তোমার এততেও সাধ মিটল না ফুলুমাসি, দেরি করো না যেন আবার, ঝুমুর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঝংকার দিল, শেষে বাসে জায়গা পাবে না।

এদিকে রাজবাড়িটা দেখা হয়নি ওটুকু বাকী থাকলে মনটা খুঁত খুঁত করবে।

বিষ্ণুপুর দেখার ইচ্ছে আমার অনেক-দিনের। এখানকার আলোছায়ায় মেশা ইতিহাস, সঙ্গীতের শতমুখী ধারা অনেকদিন থেকে টানছিল আমাকে। তবে সংসারী মানুষের যখন যা ইচ্ছে তা করার সময় কোথায়। ধীরে ধীরে শত ক্ষয় সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার মাঝে ইচ্ছেটুকুর কথা যেন নিজেই ভুলে গেছিলাম। এবার একটু নাড়া পেয়ে সেটা যেন নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এসেছিলাম তিন দিনের মেয়াদে। বিষ্ণুপুরের কাঁচা, পাকা, শহুরে, মেঠো পথ দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম অবিশ্রান্ত। কোথাও উঁচু-নীচু পাথুরে জমি, কোথাও বা সবুজের সমারোহ। কলকাতার ইট কাঠ, কংক্রিট, পাতাল রেল, লোড শেডিং মিছিল থেকে দূরে পালিয়ে এসে বুক ভরে টাটকা বাতাস নিয়ে গেলাম, চোখ ভরে দেখে নিলাম অন্য এক জগৎকে।

সাহিত্য পরিষদের পাশের রাস্তাটা ধরে কিছু দূর গিয়ে রিকসা থামল সোনা ধরা ইঁটের ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা বাড়ির সামনে। বাড়ি না বলে একে বাড়ির অংশ বলাই ভালো। আসল রাজবাড়ি নাকি পেছন দিকটায় ভেঙেচুরে জঙ্গলে ঢেকে গেছে। দরজার ওপর অনধিকার প্রবেশকারীদের সাবধান করে দেওয়া ফলক লাগান। খোলা আঙিনায় একটা পথের কুকুর শুয়ে রয়েছে। সামনের বারান্দায় একটা পুরোনো ইজি চেয়ার, জলের বালতি ঘটি এমনি দু চারটি জিনিস ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে। আমার সাড়া পেয়ে একটি ছেলে বেরিয়ে এল। খোলা গায়ে একটা খাকি রং-এর প্যান্ট পরা, মনে হল বোধহয় বেরোনোর জন্যে তৈরী হচ্ছে। খাঁস খাঁকড়ার টানে বলল, কাকে চান ?

—এমনি দেখতে এসেছিলাম রাজ—থেমে গেলাম। ছেলেটির দৃষ্টিতে বিরাগ। ভদ্রতার দায়ে চেপে রাখতে চাইছে সেটুকু। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হল। আর কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম ধীরে ধীরে।

কি ছিল আর কি হয়েছে। যেতে যেতে শেষ ১৮৮৫ সালে বিষ্ণুপুর জমিদারীর অবশিষ্ট যা ছিল তা নীলামে চড়ল, দু লক্ষ পনেরো হাজার টাকায় তা কিনে নিলেন বর্ধমানের রাজা। রাজবংশের প্রধান শাখা বেঁচে রইল শুধু দেবোত্তরের সামান্য আর আর পেনসনের টাকায়। থাকার ব্যবস্থা রাজবাড়ির এই অংশটুকুতে। তাই আছেন কালীপদ সিংহ ঠাকুর। রাজবংশের অন্যান্য শাখার লোকেরা কুচিয়াকোল, জামকুড়ি আর ইন্দাস নামে জায়গাগুলিতে বাস করছেন বলে শুনেছি। তবে একজন নাকি আছেন এই শহরেই, তিনিও চৈতন্য সিংহের এক বংশধর। নাম সত্যেন সিংহ দেব। সাহিত্য পরিষদের কাছেই একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন। দরজায় ডাকতে ছোটখাটো চেহারার হাস্যমুখী একটি মিষ্টি মেয়ে বেরিয়ে এল। স্কুলে পড়া মেয়ের মত একটি রঙীন শাড়ি ঘুরিয়ে পরা, কোঁকড়া চুলের বাসি বিনুনী দুটি পিঠে ঝুলছে। নাম রীতা। রীতা বলল, বাবা গেছেন জমিজমা নিয়ে কি কাজে যেন—

আমার নাম ঠিকানা দিয়ে ফিরে এলাম। পরে আমরা বেরোনোর আগে ভদ্রলোক এসেছিলেন টুরিস্ট লজে। মোটা ধুতি পাঞ্জাবি পরা পরিচ্ছন্ন ভদ্র চেহারা, কোর্টে কাজ করেন, ক্লার্কের। অফিসে যাওয়ার মুখে দেখা করে গেলেন।

ফেরার সময় পাথর দরজা আর গুপ্ত-ঘরটা দেখে এসেছিলাম ভালো করে। দরজা জানলা নেই গুমঘরের, অপরাধীদের নাকি ওপর থেকে ভেতরে ফেলে দেওয়া হত।

এবার আমার বিষ্ণুপুর দেখা শেষ হল।

ফিরে এসে খেতে বসেছি। খাওয়ার মধ্যেই টুরিস্ট লজের ম্যানেজার এলেন বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। মিশিশে ভদ্র চেহারা, ব্যবহারও সুন্দর। ওপাশেই বোধহয় ওঁর কোয়ার্টার। কাল সন্ধ্যায় ওদিক থেকে টানজিস্টারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর শুনে ছিলাম যেন। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এখানকারই মানুষ? বললেন, না, কলকাতার। মুখের ওপর হালকা মেঘের মত একটা বিষণ্ণতার ছায়া যেন চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। নাকি ওটুকু আমার কল্পনা ? জীবন্ত শহরের একটা প্রাণবন্ত মানুষ এই অতীতের ধ্বংসস্তূপ পাহারা দিয়ে বসে রয়েছে এমনি একটা চিন্তা যেন আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল, হয়তো সেই এ দৃষ্টিবিভ্রম।

রসিকগঞ্জের বটতলায় বাসের আনা-গোনা অবিরাম। জায়গায় জায়গায় মানুষ ছোটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মালপত্র নিয়ে। কেউ যাবেন দুর্গাপুর, ছেলে কোয়ার্টার পেয়েছে সেখানে, তাই বউমাকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন। খাঁকড়া কোর্টে কেস আছে একজনের। আরামবাগে কাপড়ের দোকান আছে কারও। বিষ্ণুপুরী শাড়ি আর সোনামুখীর তসর নিতে এসেছিলেন। দুটো গাঁঠকে সাবধানে মুড়ে নিয়ে চলেছেন। দাগটাগ লাগলে আবার মুশকিল হবে।

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী

বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং

সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক

শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম

২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

আমরা জায়গা পেলাম সামনের দিকে। দরজার পরেরটা আমি নিলাম।

আমার সিটের আধখানায় বসেছে একটি সাঁওতাল মেয়ে। চোখে অবোধ দৃষ্টি। কোথায় নামতে হবে ও জানে না। সেকথা বলে দেবে ওর চলনদার। চারপাশে সভ্য মানুষের বিচিত্র চালচলন, যন্ত্রযানের দুর্দম গতি সবের মাঝে পড়ে দিশেহারা ওর মন। এসেছিল শহরে, আবার ফিরে যাচ্ছে। মাঝপথে হয়তো চলতি বাস থামিয়ে নেমে যাবে কোথাও। ধানক্ষেত, পোড়ো জমি, বন জঙ্গল সব পেরিয়ে চলে যাবে সভ্য মানুষের বাসভূমি ছেড়ে অনেক দূরে। মল্লভূমির অখ্যাত কোন জনপদে ওর বাস। ওদের গ্রামে শালগাছে ঘেরা পবিত্র জাহির, সেখানে মোরগ বলি দিয়ে ওরা গ্রাম দেবতাকে তুষ্ট করে। শিকার উৎসবের সময় শিকারে যায়, ওর স্বজন তারা ফিরে এলে আবার মাদল বাঁশী বাজিয়ে গান গায়, হাঁড়িয়া খায় নাচে ওরা।

ও কলকাতা দেখেনি, পাতাল রেলের নাম শোনেনি ২০০০ সালে সভ্যতা কত উন্নত হবে সে খবর জানে না, জানে না কেমন করে কথার পর কথার মালা গেঁথে সাজিয়ে উপহার দিতে হয় সভ্য মানুষকে।

বাস ছুটে চলেছে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আমি চাইলাম ওর দিকে ও যেন স্থির। কত শত বছরের ইতিহাসের সেতু বয়ে গেল সামনে দিয়ে, কিন্তু ও যেন সব কিছুর স্পর্শের অতীত। জয়মল্ল, শূরমল্ল, হাম্বির, রঘুনাথ—না, কারুর নাম শোনেনি, ও জানে না কোকিলকণ্ঠী লালবাই-এর উত্থান-পতনের কাহিনী।

অঙ্গের খাটো ময়লা শাড়িখানা আঁটো করে বেঁধে কতশত বছর আগে ও মাটি খুঁড়েছে লালবাঁধ, বীরবাঁধের, তারপর সন্ধ্যায় চালের অভাবে মহুয়া ফুল সিদ্ধ অথবা আমানি খেয়েছে। আজও খায়। পাথর ভেঙে, পরের জমিতে কাজ করে এসে তারপর পচাই-এর বসে ডুবে যায়। আবার মাদলের তালে জেগে ওঠে, দেহের ফুটন্ত স্নায়ুগুলো সজাগ হয়ে ওঠে, জোয়ার আসে রক্তে। মল্লভূমির আদিবাসী এক প্রাণও।

বাস ছুটে চলেছে বন-জঙ্গল নদী-নালা পেরিয়ে। আর কয়ণ্টার মধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে যাব আমরা, ভ্রমণের ক্লান্তিটা ঘুচলে মুখর হয়ে উঠব, বর্ণনা করব পুরানো মন্দির, ইমারতগুলোর সৌন্দর্যের, গল্প বলব রাজবাড়ীর, রাজ বংশের, আলোচনা করব মল্লভূমির ইতিহাস আর সামাজিক অবস্থা নিয়ে। গানের ঘরাণা কথাও বলব নিশ্চিত। কিন্তু সে সব কথা যখন শেষ হয়ে যাবে তখনও আমাদের মনে ভাবে না ওর কথা। ওর কোন জায়গাই যে না আমাদের কাহিনীতে আর সে থাকার জন্যে একটু কুণ্ঠাও কথাও না আমাদের মনে।।

(শেষ)

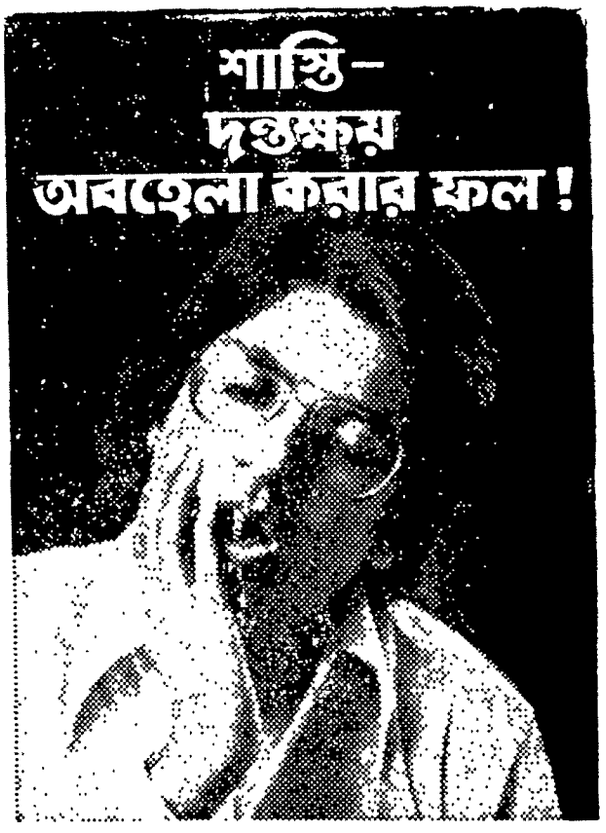

ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দাঁতে গর্ত! দাঁতের রোগ! এর হাত থেকে বাঁচতে হলে আপনার দাঁতকে দন্তক্ষয়ের কবল থেকে বাঁচান। বিনাকা ফ্লোরাইড* ব্যবহার ক'রে দাঁত পরিষ্কার আর সুরক্ষিত রাখুন।

পৃথিবীময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, টুথপেস্টে ফ্লোরাইডই হল একমাত্র উপাদান যা দাঁতের এনামেলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিশে দাঁত মজবুত বানায় আর ক্ষয় হতে দেয় না। বিনাকা ফ্লোরাইডের দীর্ঘস্থায়ী গুণ দন্তক্ষয়ের জীবাণু জন্মাতে দেয় না আর দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত হতে দেয় না।

* এতে আছে সবচেয়ে কার্যকর ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড সোডিয়াম-মোনোফ্লোরোফস্‌ফেট।

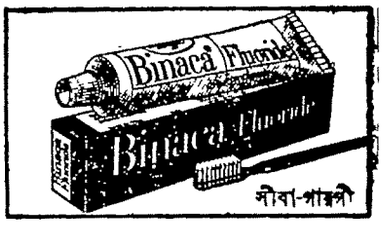

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—

বিনাকা ফ্লোরাইড

ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম ফ্লোরাইড টুথপেস্ট।

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

শৈবাল মিত্র

জেলখানার গরু মোষ। কয়েদীরা ভাবনা দেয়। দুধ দোয়। ডিউটির জমাদার সিপাইরা খায়।

ওরা দুজন শান বাঁধানো রকে বসলো। জমাদারকে দেখে অজিতের চোখের মণি ঘোরে। বলে—এখানে বসবো না। ও বি-এ্যাবেস্টের ভয় পাচ্ছিলো। কিশোর ভাবছিল অন্য কথা। সাত মাস তেরো দিন বেমালুম গাঁয়ের হয়ে গেলো। অনেক কাজ পড়ে আছে। শুরু করার মুখেই বাগড়া। ধরা পড়ে গেলো। ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। হাওয়ায় লাল মাটির ঘূর্ণি ওড়ে। কিশোরের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। কতোদিন একটানা হাঁটে নি। পায়ের তলায় মাটি হারিয়ে যাওয়ার দাখিল। মনে হয় হাওয়া মাড়িয়ে চলেছে। কিশোর আবার পেছনে তাকায়। জেলের বিবর্ণ, উঁচু পাঁচিল, ঝাঁকড়া পিপুল গাছ। সাত মাস তেরো-দিন—ও বিড়বিড় করে। রাস্তার দু' পাশে ছোট ছোট দোকান, পুরোনো ঘর-বাড়ী। পা ফেলার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ সব কিছু দুলে উঠছিল। দুজনের হাতে দুটো পুঁটলি। ভেতরে লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি। খালি হাতে জেলে ঢুকেছিল। সাত মাস তেরো দিনে পুঁজি বেড়েছে।

সামনে একটা চায়ের দোকান। শুকনো মুখ দোকানী। রাস্তার ধারে পুরোনো দুটো বেঞ্চ। ওরা বসে। দোকানী চা দেয়। ওদের দেখে। চারপাশ চুপচাপ। বাজার এখান থেকে কিছুটা দূরে। লোকজন কম। একটা গরুরগাড়ী যায়। চাকার শব্দ ওঠে। ধুলো ওড়ে।

কিশোর আজ কোলকাতায় যাবে। সিউড়ি থেকে রাতের দিকে ট্রেন আছে। কোলকাতায় গিয়ে কথা বলবে পার্টির সঙ্গে। তারপর ফিরবে নিজের এলাকায়। অজিত সিউড়ি হয়ে বাহেঁসায় ঢুকবে।

সবে কাজ শুরু হয়েছিল। অচেনা গাঁয়ের গরীব মানুষের মধ্যে পা রাখার মাটি মিলছিল, তখনই ধরা পড়ে গেল হঠাৎ। আফসোস হয়। কিন্তু কিছু করার ছিল না। সাত মাস তেরো দিন গচ্চা দিতে হলো।

সেই রাতটার কথা কিশোরের মনে পড়ে। তাতলাই থেকে ওরা বেরিয়েছিল সন্ধ্যের পর। মশানজোড় যাবে। প্রায় আট মাইল রাস্তা। এমন কিছু নয়। সামনে তরণী পাহাড়। পাহাড় ডিঙোতে হবে। পাকদন্ডী রাস্তা। ঘাম ছুটে যায়। দিনমানে ওরা হাঁটে না। গাঁ ছেড়ে বেরোয় না। গরীব মানুষের মধ্যে কাজ করতে এসেছে। সুখে দুঃখে দিন রাত মাটি কাটতে তাদের পাশে থাকতে হবে। তাছাড়া চারপাশে অনেক শত্রু। সতর্ক না থাকলে জান নিয়ে টানাটানি। পার্টির নির্দেশ আছে, একটা নির্দিষ্ট এলাকা, নির্দিষ্ট ইউনিট আর স্কোয়াড্ বেছে নিতে হবে। ছড়িয়ে কাজ নয়। গরীব কৃষকের গাঁয়ের বাইরে যাওয়া চলবে না। তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।

প্রায় মাস তিনেক আগে কিশোর এখানে এসেছে। তারপর অজিত। সেই থেকে আর বেরোয় নি। পাশাপাশি গাঁগুলোতে গেছে। মাঝ রাতে সভা বৈঠক করেছে। দিনের বেলা ঘুমিয়েছে। সেও দু' চার ঘন্টা ঘুম। গরীব মানুষের বিশ্বাস অর্জন কাজ শক্ত ব্যাপার। কিন্তু কাজ হচ্ছে।

তরণী পাহাড়ের কোলে যে রাস্তাটা পশ্চিমে গেছে, সেখানেই দেখা হলো অজিত আর কানুপার সঙ্গে। একটা শালগাছের নীচে ওরা বসেছিল। তখন সূর্য ডুবছে। পাতলা অন্ধকার নেমেছে। মাঝিপাড়ায় মাদল বাজছে। গরমকাল। সারাদিন রোদে পোড়া লাল পাথুরে মাটি উষ্ণ হাওয়া ছাড়ছে। হুটহাট শব্দ তুলে বাগালেরা ঘরে ফিরছে। সামনে পেছনে গরুর পাল।

অজিত আছে বাহেঁসা গ্রামে। তাতলাই থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। সময় ঠিক করা ছিল। অজিত একটু আগেই এসে গেছে। অজিতের মুখে হাঁড়িয়ার গন্ধ। কোমরে চেক লুঙ্গি, মাথায় গামছা জড়ানো। লম্বা, চওড়া, শক্ত চেহারা। গায়ের রঙ কালো। দু'পাশে পাকানো ঘন গোঁফ। মাস তিনেক আগে পর্যন্ত ও কোলকাতায় ছিল। প্যান্ট-শার্ট পরে অফিস গেছে। বোঝা মুস্কিল। খুব চটপট ও মিশে যেতে পারে। যে কোনো বিপদে ও রেখে ঢেকে কাঁপ দেয়। এই লুঙ্গি, গামছা আর একটা গেঞ্জি নিয়ে ও কোলকাতা ছেড়েছিল। আর ছিল কয়েকটা বই এবং হোমিওপ্যাথির বাক্স।

খাড়াই রাস্তা ধরে ওরা হাঁটছিল। দু' পাশে ঘন বন। শাল, সেগুন, মহুয়ার গাছ। অচেনা মানুষ পথ হারায়। মাথার ওপর শুক্লপক্ষের চাঁদ। আলো ছিল। হাওয়ায় মহুয়া ফুলের গন্ধ।

অজিত বললো—কানুপাকে নিয়ে এলুম। রাস্তা হারানোর আর ভয় নেই। কিশোর কানুপাকে চেনে। ও ভালুক নাচাতো। মাসখানেক হলো ভালুকটা মরেছে। সেই থেকে ও বড়ো মুষড়ে আছে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে কানুপা হাসলো। ওর চোখে নেশার ঘোর।

অন্ধকার পাথুরে রাস্তা। দু' হাত অন্তর ঢিবি, গর্ত। শুকনো পাতার সরসর শব্দ। এই সময়ে ভালুক বেরোয়। সারারাত মহুয়া ফুল চুষে খায়। সাঁওতালরা এই পাহাড়কে বলে বানাফুলি, ভালুকের পাহাড়।

হাঁফ ধরছিল কিশোরের। কপালে ঘাম।

অজিত বললো—রাস্তাটা আমি চিনে গেছি। তবু ওকে নিলুম। সাবধানের মার নেই। তাছাড়া ও থাকলে ভালুক ঘেঁসবে না।

কানুপা হাসে। অন্ধকারে ওর শাদা দাঁত ঝিকমিক করে।

কিশোরের পেটের মধ্যে মাড়ভাড়ি পাক দিচ্ছিল। সেই সকালের দিকে চাট্টি মুড়ি খেয়েছে। তারপর আর দানাপানি জোটে নি। খালি পেটে গা গুলোয়। অজিতের হাতে একটা বেশন ব্যাগ। ভেতরে একটা ধারালো ছোরা আর খানকতক বই।

কিশোর একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—ছুরিটা নিবে ঘুরিস কেন?

অনেক জন্তু জানোয়ার আছে। যে কোনো সময়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। অন্ধকার রাস্তায় অজিত হঠাৎ ব্যাগ থেকে ছোরাটা বার করে। ঝকমকে ইস্পাতের ধারালো ফলা।

কি হলো—কিশোর জানতে চায়।

সামনে কি যেন একটা দেখলুম—অজিত নীচু গলায় বলে।

অন্ধকারে শুকনো পাতায় মসমস শব্দ ওঠে। কানুপা হাওয়ায় গন্ধ শোঁকে। ওর দুটো চোখে ঝিলিক দেয়।

চারপাশে ঝিম-ধরা অন্ধকার। গাছে গাছে জড়াজড়ি। চাঁদের আলোয় ধুলোর আবছা পর্দা কাঁপছে। অনেক নীচে তাতলাই, টোংরা আর বৃন্দাবনী গ্রাম। অন্ধকারে লেপে মুছে একাকার।

কানুপার সঙ্গে মাসখানেক আগে ওদের পরিচয়। কানুপার ছেলেকে অজিত ওষুধ দিয়েছিলো। মেলায় উল্টোপাল্টা খেয়ে কলেরা ধরেছিলো ছেলেটার। বছর দশেক বয়েস। অজিতের ওষুধের গুণ আছে। বোগ সেরেছিলো। কিশোর হোমিওপ্যাথির মাথা-মুন্ডু বোঝে না। অথচ কি মন দিয়ে অজিত ডাক্তারি করে। কোলকাতাতে ছাত্তার থাকলার মধ্যেও সে দু-একটা নতুন হোমিওপ্যাথির বই কিনতো। সাত জেগে হোমিওপ্যাথির বই পড়তো। তখন ওরা কলেজে পড়ে।

অজিত ব্যাগ থেকে এক ঠোঙা ছোলা ভাজা বার করে। এক মুঠো কানুপাকে দেয়। নিজেও নেয় এক মুঠো। ঠোঙাটা এগিয়ে দেয় কিশোরকে। খাড়াই শেষ করে ওরা নামছিল। এখানটায় গাছপালা কম। রাত অনেক। চাঁদ উত্তর পশ্চিমে হেলেছে। বিশাখের পরিষ্কার আকাশ। তারায় তারায় আলোর সংকেত ছুটছে। ছোলাভাজা চিবোতে চিবোতে কিশোরের মনে হয় এতো চমৎকার সুখাদ্য সে বহুকাল খায়নি। অজিত এতোক্ষণ এটা কোলায় পুরে রেখে-ছিলো কেন।

একটা বড়ো তেঁতুল গাছের তলায় ওরা বসেছিল। গোটা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে। কোথাও সাড়া শব্দ নেই। ঝলমলে আকাশ মাথার কাছে নেমে এসেছে। হঠাৎ মনে হয় এই পাহাড়টা আকাশের সঙ্গে লাগানো।

কানুপা নিজের গল্প বলছিলো। সাঁওতালের গল্প। সাঁওতালরা এমনিতে কম কথা বলে। ভাব ভালোবাসা হলে কথা আর থামে না। অজিতের সামনে ওরা আজকাল কুল-কুল করে কথা বলে যায়।

কানুপা খুব মুষড়ে পড়েছিলো। ওর পোষা ভালুকটা দিন আগে মারা পড়েছে। ভালুকটার

ছেলে নানকু। অনেক দিন ছিলো ওর ঘরে। প্রায় ওর ছেলের বয়েসী। ক্ষেত-খামারের কাজ বছরে খুব জোর তিন চার মাস। বাকী সময়টা ওই নানকুই সম্বল। হাটবাজারে, মেলায় নানকুকে নিয়ে ঘুরলে দু' চার পয়সা রোজগার হতো। অনেক রকম খেলা শিখেছিলো জন্তুটা। বাঁশকুলি গাঁয়ে গিয়েছিলো সেদিন। হরনাথ মণ্ডলের নাতির মুখে ভাত। ভালুকের খেলা দেখিয়েছিলো। এক পাল কুচো-কাচা। তারা ছাড়তে চায় না। তখন শেষ বিকেল। মেজোকর্তার খুব পশু-পাখীর শখ। আলকাপ করে। মাথায় বাবরি চুল। বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা দেখেছিলো। কানুপাকে বললো—তু রাতে খেয়ে যাস্। আজ আর ঘরে ফিরতে হবেক নাই।

খুব খুশী হয়েছিলো কানুপা। গাঁয়ের মুরুব্বীদের বাড়ী ওরা সহজে পাত পায় না। ছোঁয়াছুঁয়ি হলে গোবর জল ছড়ায়। রাস্তার বসে খেতে হবে। তা হোক। পেট পুরে খাওয়া যাবে। কতো রকমের অনব্যঞ্জন। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের দাওয়ায় ও শুয়েছিলো নানকুকে নিয়ে। নানকুও খেয়েছিলো খুব। নানকুর গলার দড়িটা দাওয়ার বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে ও ঘুমোলো। মাঝরাতে কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। কানুপা কান খাড়া করে শোনে। নানকুর দুটো চোখ অন্ধকারে দপদপ করে। কানুপা দেখে বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। একজন পশ্চিল উপচে ভেতরে ঢুকে সদর দরজা খুলেছে। বাকী লোকেরা ঢুকছে। কানুপা ভয় পায়। মুরুব্বীর বাড়ীতে ডাকাতি। বাইরে দাওয়ায় সে শুয়ে আছে। সবাই বলবে, তার ঘড় ছিলো। কাজ হ্যাঙ্গামার একশেষ হবে। দারোগা আসবে। কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে। অন্ধকারে ডুবে আছে চারপাশ। জনমনিষ্যির সাড়া নেই। ভেতরে মানুষ-গুলোর নড়াচড়ার শব্দ। কয়েক সেকেণ্ডে কানুপার বুদ্ধি খুলে যায়। নানকুর দড়িটা খুঁটি থেকে খোলে। সদর দরজার কাছে একজন দাঁড়িয়ে আছে। দরজাটা আধ-খোলা। দড়ির খুঁটটা ধরে ও নানকুকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। দরজা বন্ধ করে। ভেতরে হুটোপুটি লেগে যায়। মরণ চীৎকার, গোঙানি। নানকু একজনকে চিরে ফেলেছে। বন্ধ দরজা খুলে পালাবার জন্যে ভেতর থেকে টানাটানি শুরু হয়। এক হাতে নানকুর দড়ি অন্য হাতে দু' দরজার লোহার কড়া। দাঁতে দাঁত টিপে কানুপা ঝুলতে থাকে। ভেতরে হৈ-চৈ, গলার আওয়াজ। বন্দুকের জোরালো শব্দ ওঠে। মুরুব্বি বন্দুক দাগছে।

কানুপার গলা ভিজে যায়—আমার নানকুও বন্দুকের গুলিতে মরি গেলো। অন্ধকার থমথম করে। অজিত বলে—ওঠা যাক। ওরা হাঁটতে শুরু করে।

অনেক দূরে মশানজোড়ের আলো। পথ এখন পরিষ্কার। আর ভুল করার ভয় নেই। কানুপা চলে গেলো। ও এখন তরুণী পাহাড়ের অন্ধকার জঙ্গল সাবাবাত একটা ভালুকের বাচ্চা খুঁজবে।

মশানজোড় পৌঁছোতে রাত একটা বাজলো। তারপর সন্দীপের বাড়ী খুঁজতে গেলো আরো আধ ঘন্টা সময়। কথাবার্তা শুরু হলো। পার্টির রাজনীতি আর কর্ম-পদ্ধতি কিশোর বুঝিয়ে বললো। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার পার্টি নির্দেশ পড়া হলো। শ্রীকাকুলামে প্রাথমিক স্তরে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়েছে। হত্যা করার একচেটিয়া অধি-কার শ্রীকাকুলামের বীর কৃষকরা কেড়ে নিয়েছেন শাসক শ্রেণীর কাছ থেকে। প্রতিটা আক্রমণের বদলা নেওয়ার জন্যে তারা তৈরী। যেখানে অত্যাচার, সেখানেই প্রতিরোধ। নতুন যুগের নতুন মানুষ তৈরী হয়েছে সেখানে। নিজেদের ইজ্জত সম্পর্কে তারা সচেতন। সন্দীপ গাঁয়ে এসে কাজ করতে চায়। আর পারছি না কমরেড—সে বলে—এই পাতিবুর্জোয়া জীবনে অরুচি ধরে গেছে। ও সিউড়ি কলেজে পড়ে। টগবগে তরুণ।

কিশোর ওর পিঠে হাত দেয়—আর কিছুদিন থাক। শহরেও কিছু কাজ আছে। পার্টি আর সংগঠন গড়তে হবে। তোমরা এখানে রেডগার্ড সংগঠন বানাও। জঙ্গী, রাজনৈতিক সংগঠন। শ্রমিক কৃষক গরীব মানুষের লড়াই-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াও।

আলোচনা শেষ হতে রাত কাবার হলো। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। মুখে চোখে জল দিয়ে ওরা তৈরী হয়। রাণীশ্বর যেতে হবে। সন্দীপ যাবে ফরাক্কায়। কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ভোরের প্রথম বাস ছুটে যায়। দু' পাশে ফাঁকা মাঠ। ঠান্ডা হাওয়া লাগে ওদের মাথায়। ঘুমে জড়িয়ে আসছিলো কিশোরের চোখ। অজিত বিড়ি টানছিলো। সন্দীপ এক বান্ডিল বিড়ি দিয়েছে ওকে।

রাণীশ্বর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটে। তপন সাহার বাড়ীর ঠিকানা ওরা জানে। সন্দীপ দিয়েছে। ছেলেটাকে ওরা আগে দেখেনি। বোলপুর কলেজে পড়ে। ছাত্রদের মধ্যে কাজ করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে নতুন ছেলে আসছে। রাজনীতি দিয়ে তাদের সংগঠিত করা দরকার। তা না হলে ভেসে যাবে।

রাস্তার ধারে চায়ের দোকান। সকালের মিহি হাওয়ায় মিষ্টি চায়ের গন্ধ। দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। কতোকাল চা খায় নি। কিশোর মাসখানেক আগে লাউবেড়েতে চা খেয়েছিলো। ছেলিগুড়ের চা। দুধ ছিলো না।

অজিত দাঁড়ায়। একটু চা হোক—সে বলে।

দুজনে দোকানে ঢোকে। গরম চা আসে। সঙ্গে মুচমুচে বিস্কুট। অজিত বেঞ্চে পা তুলে বাবু হয়ে বসে। মৌজ করে চুমুক দেয়। কিশোরের ঘুম কেটে আসছে। মাথার কোষগুলো জাগছে। অজিতের কাছ থেকে ও একটা বিড়ি নেয়।

দোকানের সামনে দু' চারজন মানুষের জটলা। সকলেই ওদের দেখছে। চোখাচোখি হতে সরে যায়। লোকগুলোর দৃষ্টি সুবিধের নয়। কিশোর গা টেপে অজিতের। অজিত বলে—গুলি মারো। ওর খয়েরি লাল ভোরাকাটা লুঙ্গি থেকে ধুলো ওড়ে। নিজের সবুজ লুঙ্গিটা কিশোরের হঠাৎ ভীষণ ময়লা মনে হয়। দু' একজন নিবীহ চোখে ওদের দেখে যাচ্ছে। আবার ঘুরে আসছে। তিন মাসে অজিতের মোচটা ভয়ংকর ফুলেছে। গুণ্ডা গুণ্ডা দেখায়। অজিত বেপরোয়া। গোঁফ পাকায়। কিশোরের মুখেও দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। কিশোর নিজের গালে হাত বোলায়। গতকালও টকুরু মাঝি ধারালো কাস্তে দিয়ে ওর দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিশোর রাজী হয়নি।

বাইরে ফ্যাকাশে রোদ। আকাশে সামান্য মেঘ আছে। তার ওপর ধুলো উড়ছে। দোকানী ওদের দেখে। উশখুশ করে।

কিশোরের বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে। বিপদের গন্ধ পায়। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। দোকানদারকে পয়সা দেওয়ার সময় কিশোর জিজ্ঞেস করে—কি ব্যাপার?

দোকানী চমকে ওঠে। কপালে ভাঁজ পড়ে। একটু কেশে নেয়। বলে—কাল রাতে ওখানে দুটো বড়ো ডাকাতি হয়েছে। মোচরমান ডাকাত। এই রকম ডুরাটানা লুঙ্গি আর গেঞ্জি ছিলো তাদের গায়ে। ওদের পোশাকের দিকে সে আঙুল তুলে দেখায়।

একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া কিশোরের বুক থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে

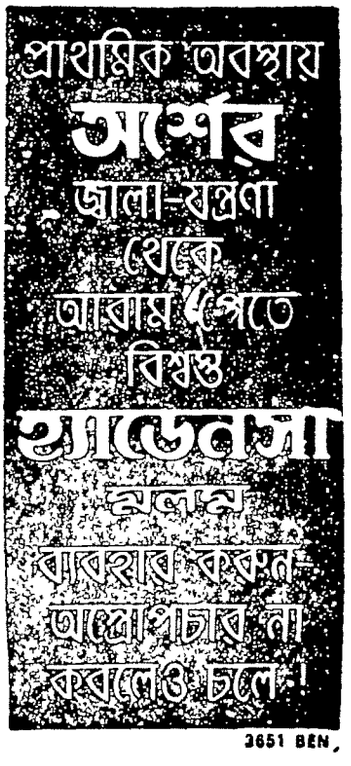

পড়ে। কথা হারিয়ে যায়। অজিত দমে না। চওড়া বুক, মেটা কব্জি। ছাঁচে তোলা স্বাস্থ্য। এই তিন মাসে কিশোর আধখানা হয়ে গেছে। গেঞ্জি ঢলঢল করে। অজিত কিন্তু একটুও টসকায় নি। ওর মাথাও বেশ গরম। দোকানীর কথায় ও তেতে যায়। জিজ্ঞেস করে—আমরা ডাকাত নাকি?

দোকানীর গলাও ঠাণ্ডা, বরফ। সে বলে—তুমরাই জানেন।

আরো দু'চারজন তখন ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কথা না বাড়িয়ে ওরা রাস্তায় নামে।

আকাশের রঙ ফ্যাকাশে। কালচে মেঘটা ছড়িয়ে পড়ছে। ভ্যাপসা গরম।

একজন ছুটতে ছুটতে আসে। জানায় —দারোগাবাবু এসে গেছে।

ভীড়টা লাফিয়ে ওঠে—কুথা, কুথা?

ওরা হাঁটতে থাকে। কিশোর বুদ্ধি করে একজনকে জিজ্ঞেস করে—তপন সাহার বাড়ীটা কোথায়?

কেউ জবাব দেয় না। দু একজন অবাক চোখে তাকায়। নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় কথা বলে।

একজন জিজ্ঞেস করে—কুথাকার কুটুম?

কুটুম নয়। বন্ধু। কিশোর বলে। লোকটাকে দেখে ও। লোকটার হাতে খেঁটো লাঠি খাঁকির হ্যাফ প্যান্ট শার্ট। ওখানকার সরপঞ্চ চৌকিদার।

ওরা চুপ করে। সরপঞ্চ খুশী হয় না। ঘাড় দোলায়। আঙুল তুলে রাস্তা বাতলায়। কিশোর ভাবে তপনকে কেমন দেখতে। রাস্তায় হঠাৎ মুখোমুখি হলেও চিনতে পারবে না। সন্দীপকে সঙ্গে আনা উচিত ছিলো। মাথার মধ্যে ঘুমাট কুয়াশা।

চিন্তা কাজ করে না।

ধুলো উড়িয়ে একটা সাইকেল আসে। সাইকেলে মাঝবয়েসী একজন ভদ্রলোক। ময়লা খাটো ধুতি, ফতুয়া পরা। চোখে তারের চশমা। রোগা, পাকানো শরীর। দোকানের খুঁটিতে ভদ্রলোক সাইকেল রাখে।

তপনা ঘরে আছে নাকি—সরপঞ্চ জিজ্ঞেস করে।

কেনে—ভদ্রলোক চোখ ঘোরায়। ভিড় দেখে। ওদের দেখে।

ইনারা তপনের কুধু—আঙুল দেখিয়ে সে বলে।

চিনেন নাকি—একজন জিজ্ঞেস করে।

সাইকেলবাবু একচমক ওদের দেখে। দোকানীকে চা দিতে বলে। কথার জবাব না দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়।

ভিড়ের মানুষগুলোর চোখে সন্দেহ ঘন হয়। ওরা হাঁটতে থাকে। দুচারজন ওদের পেছনে লেগে থাকে। অচেনা মানুষ দেখে রাস্তার একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। বাজার ছাড়িয়ে ওরা নীচের পাড়ার মেঠো রাস্তায় নেমেছে। নীচের পাড়াতেই তপনদের বাড়ী।

অজিতের চোখ দুটো দপদপ করে। কিশোর ভয় পায়। হয়তো এখনি ছোরা নিয়ে ও ভিড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে। কোলকাতায় এমন ঘটনা কয়েকবার হয়েছে।

শিবু আসছে—কে যেন বলে।

রাস্তার ওপাশ থেকে একজন বছর পঁচিশের ছেলে আসছে। ওরা দেখে। লুঙ্গির মতো ধুতি পরেছে ছেলেটা। হাফ হাতা শার্ট।

সে ওদের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

তুমার ভেয়ের বন্ধু—পেছনে আসা মানুষদের কে একজন বললো।

এই ছেলেটা তপনের দাদা। কিশোর লক্ষ্য করে তাকে। শিবু দেখে অবাক চোখে। ওদের পোশাক আশাক, দাড়ি গোঁফ সবকিছুই তার কাছে দুর্বোধ্য।

মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে সে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

ভিড়টা নিথর চুপ। শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার আগে বাঘও এরকম গুম মেরে যায়।

তপন আছে বাড়ীতে—অজিত প্রায় চেঁচিয়েই জিজ্ঞেস করে।

শিবু মুখ ফেরায় না। তবু ওর বলা 'না' শব্দটা বেশ জোরে শোনা যায়।

অজিত দমে না। এক দৌড়ে শিবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আপনাদের বাড়ীতে যাবো। একটু দেখিয়ে দিন। সে বলে।

শিবু আমল দেয় না। জানায় আমার কাজ আছে।

অনেক দূরে আবছা তরণী পাহাড়। লাল, রুক্ষ মাঠ। হাওয়ায় বাদামী ধুলোর ঘূর্ণি নাচে। ওরা দ্রুত পা চালায়।

ভীড়টা থমকে গেছে। কথা বলছে। লোক দুটো পুলাচুছে। হঠাৎ পেছনে রেরে আওরাজ। ওরা পেছন তাকায়। বাঁশ নিয়ে ছুটে আসছে দুজন। লাঠি হাতে সরপঞ্চ। পেছনে জনতা। ওদের মাথার মধ্যে রক্ত চলাচল। ওরা ছুটতে থাকে।

বিপদটা ওরা বুঝেছে। কিন্তু বুঝিয়ে বলার মতো অবস্থা নেই। কেউ এখন ওদের কথা শুনবে না। তবু বাঁচতে হবে। এতো তাড়াতাড়ি ধরা পড়া চলবে না। পরিস্থিতি জট পাকিয়ে গেছে। অজিতের ব্যাগটা নিয়ে মুস্কিল। তা না হলে একবার ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিশোর বলতে পারতো—আমরা ডাকাত নয়। আমরা তোমাদের ক্ষতি করতে আসিনি। বরং তোমাদের জন্যেই আমরা ঘরবাড়ী ছেড়েছি। তোমাদের মুক্তির জন্যেই আমাদের এই লড়াই, বিদেহ। ছুটতে ছুটতেই এসব কথা কিশোর ভাবে। সামনে একটা মজা পুকুর। জল আছে। কালো রঙ। ঝাঁঝ আর পানায় ভর্তি। ওরা পুকুরে নেমে যায়। পাঁক আর পাঁক। হাঁটু পর্যন্ত পাঁকে ঢুকে যায়। বুদবুদগুড়ি ওঠে। দুর্গন্ধ বেরোয়। ঝাঁঝ আর পানা ওদের জড়িয়ে ধরে। একগলা জলে ওরা দাঁড়ায়। কিশোর বলে—ব্যাগটা ফেলে দে।

পুকুর পড়ে অনেক লোক। তারা চেঁচাচ্ছে। গালিগালাজ করছে। হঠাৎ একটা শক্ত পাথর কিশোরের কপালে লাগে। চোখের সামনে আলো, পৃথিবী ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। আকাশটা ঝুপ করে মাথার ওপর নেমে আসে। ইঁট, পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়।

অজিত শক্ত মুঠোয় কিশোরের হাত ধরে আছে। ডুব দে ডুব দে। ইঁট, পাথরের সঙ্গে তাল রেখে ও টুপটাপ ডুব দেয়। তবু ওর চোয়াল ফেটে যায়।

কিশোরের শরীরে হঠাৎ কি যেন জ্বালা ফিরে আসে।

ওঠ—ও বলে অজিতকে। দুজনে পাড়ে আসে। অজিতের মাথায় একজন বাঁশ মারে। ওর গলায় একটা ফিকে আর্ত শব্দ। কপাল বেয়ে রক্ত গড়ায়। কিশোরের শরীরে চড়চড়পড় পড়ে।

সরপঞ্চ হঠাৎ যেন অন্যরকম হয়ে যায়। মেরো না—সে বলে—বড়োবাবু আসছে। অজিতের ভিজে চুল হাওয়ায় ওড়ে। কিশোরের রোগা শরীরে পেশী টানটান।

থলিটা কুথা—কে যেন জিজ্ঞেস করে।

আবার হল্লা ওঠে—থলি কুথা? থলি কুথা?

পাঁচ-ছজন পুকুরে নামে। জল কাঁদা হাতড়ে থলিটা তোলে।

আনন্দে ফেটে পড়ে সকলে। ব্যাগ থেকে ছোরাটা বেরোয়। ধারালো, ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা। কিশোর এক লাফে একটা ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়ায়। দুজন লোক শক্ত করে ওর দুহাত চেপে ধরে।

ছোরাটা দেখে সকলে চমকে গেছে। গত রাতে ডাকাতদের সঙ্গেও ছোরা ছিলো। মোটা ভিড় পাথর। রক্তমাখা ভিজে

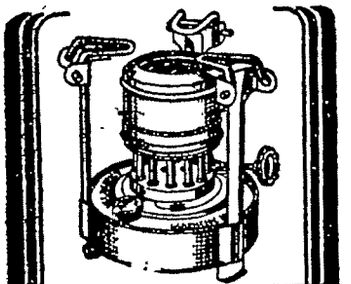
নির্ঝঞ্ঝাটে রান্না সারতে
লাইটক্স
নীল শিখার কেরোসিন কুকার
১) স্টোভ ফাটবার কোনো সম্ভাবনা নেই।
২) তৈয়ারীর গুণাগুণ সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
৩) প্রতিটি অংশই আলাদা পাওয়া যায়।
পরিবেশক:
ভেনাস এজেন্সীজ
৬, আমড়াতলা স্ট্রীট • (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০১ • ফোন: ৩৪-৬৫৭৩

কসা। ফুলে উঠেছে। দুচারজন নেড়ে-চেড়ে দেখে। একটা লাল বই। প্ল্যাস্টিকের জ্যাকেট। কয়েকটা পাতলা পুস্তিকা। মাও সে তুং-এর তিনটি লেখা। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন। দেশব্রতী পত্রিকা।

কিশোরের বুকে তখন ঢেউ উঠেছে। কিছু খুলে বলা দরকার। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। জনগণই আসল বীর। ইতিহাসের স্রষ্টা। ও বক্তৃতা শুরু করে—আমরা কম্যুনিস্ট। আপনাদের শত্রু নয়। গরীব মানুষের সেবা করতে চাই আমরা। আমরা নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চাই। যেখানে শোষণ নেই, অত্যাচার নেই। সেই নতুন দেশ গড়ে তোলার জন্যেই আমরা লড়াই করছি। ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে গরীব মানুষ জেগেছেন। তাঁরা লড়াই শুরু করেছেন। সেই যুদ্ধে নাম লিখিয়ে আমরা ঘরবাড়ী ছেড়েছি। আপনাদের কাছে এসেছি।

কিশোর বুঝতে পারে তার দুহাত ধরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের মুঠো আলগা হয়ে গেছে। সামনের ভিড়টা এখন ঘুটঘুটে। একজন তাকে আরো ঘেঁসে দাঁড়ালো। বাকীরা একটু পিছিয়ে গেল। অজিত দাঁতে দাঁত টিপে তাকে দেখছে। অজিতের কান, মুখে চাপ চাপ রক্ত। গেঞ্জির বুকটা ভিজে লাল।

কিশোরের চোখের সামনে আলো জ্বলছে, নিভছে। হলুদ রঙের চিকুর উঠছে।একজনের হাত থেকে লাল বইটা ও টেনে নেয়। আবার শুরু করে—এই বই গরীব মানুষের মুক্তির পথ দেখাবে। ওর গলা শুকনো। জিভ জড়িয়ে যায়। কপাল বেয়ে সরু রক্তস্রোত ওর চোখে নামে। দৃষ্টি ঝাপসা। একজন ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। ফলতু ঝামেলা। আগে ডক্তারের কাছে চলুন। সে কিশোরকে ডাকে।

থোড়া দাবাই লে আও—সরপঞ্চ কাকে যেন হুকুম করে। নাদান আদমি। অজিতকে সে ধমক দেয়। হামার লেড়কা ভি এ্যায়সা করতা হ্যায়। সে হাসে।

ভীষণ তেষ্টায় কিশোরের গলা বুজে আসে। কিন্তু সে থামতে পারে না। একটানা সে চেঁচিয়ে যায়। কি বলছে সে নিজেই বুঝতে পারে না। মাথার ওপর লাল বইটা শুধু দুলতে থাকে। বইটা হঠাৎ ভীষণ ভারী হয়ে যায়।

দারোগাবাবু আসছে। দারোগাবাবু আসছে। ভিড়টা গমগম করে।

জনাদশেক কনস্টেবল ভিড়টা ঘিরে ধরে। দারোগা এগিয়ে আসে। তাগড়াই চেহারা। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত কামানো।

কিশোর তখনও বলছে—দুনিয়া বদলাতে হবে। সেই সঙ্গে নিজেদেরও বদলাতে হবে। আমরা নিজেদের বদলাতে চাই। তাই এখানে এসেছি। গরীব মানুষ যা পরে, যা খায়, আমরাও তাই করি। গরীব মানুষের সঙ্গে আমরা একাত্ম হতে চাই।

ওর বুক, পেট সমস্ত চেতনা ভেদ করে কথাগুলো বেরিয়ে আসে। প্রতিটা শব্দের সঙ্গে অনেক দুঃখ, কান্না আর হিম্মত মিশে যায়। দারোগা অজিতের গেঞ্জি চেপে ধরে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হুকুম করে এ উল্লু কা পট্ঠা, চোপ রও।

সরপঞ্চ এগিয়ে আসে। অদ্ভুত কায়দায় দারোগাকে সেলাম ঠোকে। একজন কনস্টেবল কিশোরের হাত ধরে হেঁচকা টান মারে। ওর পায়ের তলার মাটি দুলে ওঠে। সটান মাটিতে পড়ে যায়। তারপর বেহুঁশ। দারোগা লাল বইটা তুলে নেয়। মলাট উল্টে মাও সে তুং এর ছবিটা দেখে। এ কে আছে—সে জিজ্ঞেস করে।

অজিত নাম বলে।

বেঙ্গলী রাইটার? দারোগা জানতে চায়। অজিত ঘাড় নাড়ে।

ওদের একটা কালো ভ্যানে তোলা হয়। ভিড়টা থমথম করে। হোরাটার হদিশ পাওয়া যায় না।

গাড়ী ছাড়ার সময়ে সরপঞ্চ অজিতের কানের কাছে বিড় বিড় করে—নাদান। বিলকুল নাদান। গাড়ী ছুটে চলে রানীশ্বর থানার দিকে। লাল ধুলোয় পেছনটা ঝাপসা। সূর্য প্রায় মাঝ আকাশে। অদৃশ্য আগুনে পৃথিবীর রস শুষে নেয়। কিশোরের তখন জ্ঞান ফিরেছে।

তারপর একশো ন ধারা। ভবঘুরেদের জন্যে এই আইন। দুমকা জেলে ওরা চালান গেলো। হাজতি বন্ধী। সাত মাস তেরো দিন বাদে রায় দিল ম্যাজিস্ট্রেট। গতকাল কোর্টের দিন ছিল। ছ' মাস সাজা হলো।

রায় শুনে অজিত রেগে টং। তেতাল্লিশ দিন ফেরৎ চাই। কোর্টের মধ্যেই সে চেঁচিয়ে ওঠে। ম্যাজিস্ট্রেট তখন উঠে গেছে।

কিশোর ভাবছিল অন্য কথা। জেলগুলো যেন কবরখানা। মানুষের হাজার হাজার বছর এখানে কবর দেওয়া আছে। সময়ের শরীর নেই, রক্ত মাংস নেই। তবু মানুষের জীবন থেকে সময়কে ছিঁড়ে নেওয়া যায়। এক একটা বড়ো জেলে কতো হাজার লক্ষ বছর মাটি চাপা দেওয়া আছে। কিশোর হিসেব করেছিল এই দুমকা জেলেই গত পাঁচ বছরে প্রায় চার হাজার বছর কবর দেওয়া হয়েছে। চার হাজার বছর রামায়ণ, মহাভারত লেখা হয়েছিল। ব্যাসদেব, বাল্মীকি বেঁচে ছিলেন। এই আয়ুর ব্যাংক থেকে যদি কিছুটা ধার পাওয়া যেত। গত রাতে এই সব চিন্তা ওর মাথায় চিনচিন করছিল। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। আকাশে মুঠো মুঠো তারা। দু একটা খসে যায়। অন্ধকার দ্যুলোক ছুটে বেড়ায়। হাজার হাজার নষ্ট বছরকে ও যেন সেই মুহূর্তে ছুঁয়ে ফেলে। নিজেকে ওর বিরাট লাগে। ঘুপচি সেলের ছাদ ফুঁড়ে ওর মাথা আকাশ স্পর্শ করে। পা ঢুকে যায় পৃথিবীর গভীরে। সেখানে কালো জল ছলছল করে। মহাকালের পরমায়ু। নক্ষত্র লোকের সোনালী রাজপথে ওর সাত মাস তেরো দিন মিশে যায়।

অজিত বলে, ওঠ্ বাস ধরতে হবে। কেমন যেন বুঁদ হয়েছিল কিশোর। চমকে ওঠে। দোকানে আর খদ্দের নেই। দোকানী ঢুলছে। দাম মিটিয়ে ওরা রাস্তায় নামে। কিশোর প্রথমে যাবে সিউড়ি, তারপর কোলকাতা। পার্টির সঙ্গে কথা বলবে। অজিত ফিরবে বাহেস্সায়।

(চলবে)

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

দীপু ও উষ্মা জানিয়ে বলল, সেইটেই তো জিগ্যেস করছি, আর ঘর এ্যাভেলেবল হবে ওখানে ?

পানু বলল, তা হবে। পাশের ঘরটাই তো খা-খা খালি রয়েছে।

চিন্তান্বিত মুখে চারজন পোর্টার ঠিক করে মালপত্র তাদের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে রাবার ব্যবস্থা করল দীপু। প্রত্যেকটি পোর্টারের সঙ্গে একগাছা করে দড়ি। একজন পোর্টার বড় বড দুটো টুরিস্ক উপরি উপরি বেঁধে দড়ি দিয়ে ফাঁস দিয়ে কপালে বেঁধে ঝুলিয়ে নিল পিঠে। চারজনেই মোট মাল-পত্রের বারো আনা ভাগ পিঠে নিল। বাকি রুকস্যাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিজেরা কাঁধে নিয়ে ধর্মশালার দিকে যাত্রা করল সকলে।

দীপু সর্দারজীকে বলল, আমরা ধর্ম-শালায় যাচ্ছি। একটুখানি দূরে। ওপরে উঠে লোককে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে বিড়লা ধর্মশালা। ওখানে আরও একটা ঘর খালি আছে। যদি মনে করেন, ওখানে গিয়ে থাকতে পারেন আজকের রাতটা। যাই হোক, আমরা আধ ঘন্টার মধ্যেই এস-ডি-ও অফিসে যাচ্ছি। আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

একটা রুকস্যাক পিঠে আর বালতিভরা টুকিটাকি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল কানু। তার পেছনে কুঁজো হয়ে চলেছে ভারবাহী পোর্টারেরা একজন একজন করে। গোপু, আশু, পানু, ওরাও প্রচুর মালপত্র পিঠে এবং হাতে নিয়ে পেছনে পেছনে যাচ্ছিল কথা বলতে বলতে। গোটা দুই সুটকেশ, তেলের ল্যাম্বিকেন, স্টোভের কিট পড়েছিল তখনও। অনন্ত সুটকেশ দুটো হাতে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। দীপু বলল, বড় সুটকেশটা আপনি নামিয়ে রাখুন। বাঁ-হাতে তেলের ল্যাম্বিকেনটা নিন।

রোশন আর তার ভাই এগিয়ে এসেছিল এতক্ষণে। কিন্তু তাদের মা-বাবার দৃষ্টির সামনে দীপু তাকাতে পারছিল না তাদের দিকে। বুদ্ধি করে অনন্ত নিজের দিকে সর্দারজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দুটো দিন পথে কাটল একসঙ্গে। আশা করি সেই স্মৃতি মনে থাকবে ইত্যাদি ছোঁদো কথায় বিদায় নিতে চাইল ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে। সুযোগ বুঝে শুধু চোখের ভাষায় বিদায় জানালো দীপু মেয়েটির কাছে, অনুরূপ মান করতে ভুলল অনন্ত।

বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় দোতলা সমান উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওঠে এল ওরা। তারপরে বাঁধানো রাস্তা ঘুরে ঘুরে চলে গেছে আরও ওপরে।

এপাশে ওপাশে ফাঁকা জমি কাঁটা-গুল্মে ভরা। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাড়ি, ছোটখাটো, পাথরের টালির ছাউনি দেওয়া। বাড়িগুলির লাগোয়া বাগানে ডালিয়া আর গাঁদা আর গোলাপ ফুটে আছে। এগিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল, অনেকখানি কম্পাউন্ড নিয়ে একটি ক্যাম্পাস, সাইনবোর্ড টাঙানো পথের ওপরে, ভেটারনারি হসপিটাল। তার বাগানে সিজন ফুলের কেয়ারীর মাঝ-খানে চমৎকার গোলাপের ঝাড়। বহু জাতের গোলাপে আলো হয়ে আছে বাগান।

চড়াই ঠেলে উঠতে হাঁফ ধরে যায় বুকে। ঘাম গড়িয়ে পড়তে থাকে মাথা বেয়ে। দীপু চলেছে ভাবী বোঝা নিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে। কথা বলছে যোশীমঠ সম্পর্কে। এদিকটায় ফাঁকা, অফিসগুলো বাস স্ট্যান্ডের দক্ষিণে। যেদিকে ওরা এখন চলেছে, সেই দিকে কিছুটা এগিয়ে মিলিটারী এলাকা। বাজার ইত্যাদি অনেক নিচে। পাশের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিল সে। ওই পথ ধরে সোজা নেমে গেলে ডানদিকে ঘুরেই বাজার দোকান, ধর্মশালা ইত্যাদি।

অনন্ত বলল, আমাদেরও তো ধর্ম-শালায় যেতে হচ্ছে।

দীপু বলল, আমরা যাচ্ছি বিড়লা ধর্মশালায়। কানু বলল শুনলেন না? ফাইভ-স্টার হোটেলের সাট। কানু হচ্ছে আমাদের সত্যিকারের সাথের। নিচে মন্দির কমিটির ধর্মশালা, কালিকমলীর ধর্মশালা, এসব আছে।

আর একটা বাঁক ঘুরেই চোখে পড়ল, চমৎকার রেলিং দিয়ে ঘেরা সবুজ ঘাস আর ফুলবাগান। তারই পেছনে ঝকঝকে সাদা একটা বিল্ডিং। দোতলা বাড়িটি রিইনফোর্সড কংক্রিটের তৈরী। তার বারান্দায় মালপত্র নামাচ্ছে পোর্টাররা। হাঁফ ছাড়ল অনন্ত। এইটুকু উঠে আসতেই দম বেরিয়ে গেছে।

প্রায় মেসিনের মত কাজকর্ম করছিল সকলে। দীপু নির্দেশ দিচ্ছিল। অবশ্য সেই নির্দেশ কানু অথবা পানুর কথায় পালটাতে হচ্ছিল না তা নয়। তবে সব মিলিয়ে খুব সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কাজকর্ম সারা হল।

দীপু বলছিল, এই দুজন পোর্টার দেখো গোপুদা, এই হচ্ছে শের সিং। আর এ হচ্ছে মাহিন্দর সিং। এরা বলছে, আমাদের সঙ্গে যাবে লোকপাল হয়ে বদরীনাথ পর্যন্ত। কি বল, চলবে ?

অনন্ত দেখল দুজনকে। বেঁটেখাটো, শক্ত-সমর্থ চেহারার দুটি যুবক। শুনেছে, ওরা গাড়োয়ালী। খুব গরীব এবং পরিশ্রমী আর অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ হয় এরা। শের সিং একটু ফর্সা। লম্বাটে মুখ, মুখে-চোখে সরল হাসির আভাস। মাহিন্দর সিং অপেক্ষাকৃত ময়লা রংয়ের, একটু রোগা, মুখে, চোখে কিছুটা বিমর্ষ ভাব।

গোপু ওদের জিজ্ঞাসা করল, কেয়া, তুমলোগ্ সেকেগা। ইতনা ওজন লেকে যানে সেকেগা ?

উত্তরে ঘাড় নেড়ে হাসল ওরা। কথা বলল না।

অনন্ত সেখান থেকে সরে গেল ভেতরে। ঘরের বাইরে ভেতরের দিকে প্রশস্ত বারান্দা। টানা লম্বা বারান্দা প্রায় পঞ্চাশ ফুট গিয়ে আবার ডাইনে পঁচিশ ফুট চলে গেছে। বোঝা গেল এদিকের সারিতে তিনখানা আর ওদিকের সারিতে বাকি একখানা ঘর এই একতলায়। তার পরে সিঁড়ি। উঠে গেছে দোতলায়। বারান্দার পরে উঠোন। সেখানেও নানা জাতের ফুলের গাছ, সবুজ ঘাস, ময়লা ফেলার লিটার বিন্, একটা জালে ঘেরা পাখীর বড় খাঁচা। তাতে গোটা তিন-চার ছোট ছোট পাখী উড়ে উড়ে খেলে বেড়াচ্ছে। এ-ধারে বারান্দার সঙ্গে টানা কয়েকটি সেপটি পায়খানা আর গোটা তিনেক স্নানের ঘর। বাথরুমে গিয়ে দেখল অনন্ত, টয়লেট রাখার তাক, বুক সমান উঁচু মোজ্যাক করা দেওয়াল এবং মেঝে, শাওয়ার, ট্যাপ, সবই ছিমছাম। ধনী-শ্রেষ্ঠ বিড়লারা পুণ্যার্থীদের আরামের বন্দোবস্ত করেছেন অকৃপণভাবে।

দীপু এসে বলল, যান, রায়দা, স্নান-টান করে নেবেন তো নিন এইবেলা। শের সিংকে খাবার আনতে পাঠিয়েছি। স্নান করে কিছু খেয়ে ছুটতে হবে এস-ডি-ও অফিসে। সেখান থেকে চলে যাব হোটেলে। একেবারে খেয়েদেয়ে ফিরব।

বলতে বলতেই একটা গামছা পরে

হেলতে দুলতে বেরিয়ে এল পানু। সভয়ে লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হল অনন্ত, গামছার নিচে আন্ডার ওয়্যার আছে। পানুর এক হাতে গেঞ্জি, রুমাল, মোজা, অন্য হাতে সাবান। বলল, কি-কি-ক্কি দাদা, এই বেলা স্নান-টান সেরে নেবেন তো নিন। সাড়ে এগারটার পর জল থাকে না। অলরেডি সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

দক্ষিণের পাহাড়টার গায়ে, একটু উঁচুতে, একতলা লম্বা এস-ডি-ও অফিসটি দূর থেকে দেখতে মন্দ নয়। পুব থেকে পশ্চিমে টানা বারান্দা চলে গেছে গোটা দশ-বারো অফিস ঘরের সামনা সামনি। বাইরের লোকজন ভিড় করেছে সেখানে। বাইরে ফুলের বাগান। খুব সহজে হয়তো ফুল ফোটানো যায় এখানকার মাটিতে, কিংবা এদেশের মানুষদের পুষ্পপ্রীতি হয়তো একটু বেশি। সাধারণ ব্যক্তিদের বাড়ির উঠোনেই হোক অথবা অফিস, আদালত ইত্যাদি সরকারী বাড়িতেই হোক, ফুলের গাছ থাকবেই। ভারি ভাল লেগে গেল অনন্তর। বাগানের একধারে বড় বড় পাথরের স্ল্যাব পড়ে আছে। হয়তো নতুন গাঁথনি হবে। একটা বড় স্ল্যাবের ওপরে দাঁড়িয়ে রোদ্দুরে গা সেঁকছিল অনন্ত। সার্টের ওপরে স্লিপ ওভার পরে আছে। তবু রোদটা আরামদায়ক লাগছে। কলকাতায় ডিসেম্বর মাসে এরকম হবার কথা।

দীপুরা বলছিল উত্তরে বদরীনাথ। মলভূমির পরিসর ঠিক কতটা, এখনো আন্দাজ করে উঠতে পারেনি অনন্ত। তবে সোজা উত্তরে গেলে বড়জোর শ'খানেক গজ পর থেকেই নেমেছে খাদ। মাইলখানেক নেমে অলকানন্দা। তারপর নদী পেরিয়ে আবার উঠেছে পাহাড়। দুটি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে সেন্নাতস্বিনী অলকানন্দা।

অল্প অল্প মেঘ করেছে আকাশে। ওধারের পাহাড়ের মাথায় মেঘের স্তূপ, চূড়াকে অনেকটা ঢেকে ফেলেছে। সেখান থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। দ্রুত ভেসে আসছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ নদীর ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে। কিছু কিছু টুকরো মেঘ নদী পেরিয়ে এদিকে চলে এল বলে।

হঠাৎ চোখে পড়ল, রাস্তা দিয়ে আসছে সুরজিৎ সিং সপরিবারে। বোশনের গায়ে লাল সোয়েটার। ছেলেটার গায়েও গরম কিছু একটা, ছাই রঙের। ওরা এসে উঠেছে ধর্ম-শালার পাশের ঘরটায়। স্নান করতে গিয়েছিল তখন অনন্ত। স্নান সেরে খেয়ে-দেয়ে বাইরে বেরিয়ে ওদের ছেলেটাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল সে। শুনেছিল পানুর কাছে, যোশী-মঠে কোন গুরুদুয়ারা নেই বলে এখানেই আশ্রয় নিয়েছে ওরা। আগামীকাল সকালে একসঙ্গে যাবে গোবিন্দঘাট।

প্রায় কাছাকাছি এসে তাকে দেখতে পেয়েছিল বোশন। বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেদিকে। সর্দারজী দেখে হাত নাড়ছিলেন। ওদের সঙ্গে তখন ব্যবধান বড়-জোর পঞ্চাশ গজের মত হবে। ঠিক এমন সময়ে মস্ত একটা প্রাশুটে মেঘের দলা নিচে থেকে উঠে এল। বাতাসের বেগে দ্রুত ভেসে গেল এস-ডি-ও অফিসের ওপর দিয়ে। অল্প সময়ের জন্য ধোঁওয়া ধোঁওয়া অন্ধকার হয়ে উঠল চারদিক। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল পাঞ্জাবী পরিবারটি।

কেমন আঁশটে গন্ধ সেই মেঘে। হাঁড়িতে জল ফুটলে, সেই বাষ্পে যেমন গন্ধ থাকে, তেমনি। তারপর আবার সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক। অনন্তর সমস্ত মন-প্রাণ অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতায় আনচান করে উঠল। লিলি থাকলে কি করত, মনে মনে কল্পনা করতে পারে সে অনায়াসে। অদ্ভুত একটা ছেলে-মানুষী কৌতূহল আছে লিলির। এই রকম সামান্য ব্যাপারে এত খুশী হয়ে ওঠে, শিশু-সুলভ আনন্দে এত উচ্ছল হয়ে ওঠে, যে বলার নয়। দার্জিলিং-এ সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। লিলির প্রাণোচ্ছলতা, সহজে অবাক হবার প্রবণতা, ভীষণ খুশীতে মেতে ওঠার স্বভাব, প্রত্যক্ষ করেছে পুরীতে গিয়ে। সমুদ্রে স্নান করার সময়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল লিলি ঢেউয়ের ধাক্কায়। অল্প কিছুদিন বিয়ে হয়েছে মাত্র। উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে তুলে ধরেছিল কণাদ। জানতে চেয়েছিল লেগেছে কিনা। তার দুশ্চিন্তাকে কোন আমল না দিয়ে খিলখিল করে হেসে আবার ঢেউয়ের আঘাতে লুটোপুটি খেতে মেতে উঠেছিল লিলি। এখানে এই মুহূর্তে থাকলে আজকের বয়স্কা, অভিজ্ঞা, গোপন-চারিণী লিলি কি হাততালি দিয়ে নেচে উঠত পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভুলে? সত্যি সত্যি নেচে না উঠলেও মনে মনে নেচে উঠত, তাতে কোন ভুল নেই। এমন মুহূর্ত গত দশ বছরে কদাচিৎ এসেছে। তবু নিঃসংশয়ে জানে কণাদ, লিলির ভেতরের শিশুসুলভ ভাললাগার অনুভূতি কখনই নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

সুরজিৎ সিং কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার বন্ধুরা কোথায়?

অনন্ত জানিয়ে দিল, এখনো ওরা অফিসেই রয়েছে। দেখিয়ে দিল কোন্ ঘরে পারমিটের ব্যবস্থা হয়। ফর্ম ফিল-আপ করে সই অথবা টিপ ছাপ দিয়ে সশরীরে গিয়ে দাঁড়াতে হয় কালেক্টার সাহেবের সামনে। তিনি উদ্দেশ্য শুনে এবং ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পরিচয়পত্র দেখে নিশ্চিত হলে পারমিট দেওয়ার নির্দেশ দেন। এদের ক্ষেত্রে সেসব ঝামেলা চুকে গেছে। এখন অর্ডার টাইপ হয়ে সই হবার অপেক্ষা। সর্দারজীর বিশেষ ঝামেলা হবে না। শিখদের ধর্মস্থানে যাওয়ার অনুমতি দেবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

আশ্বস্ত হয়ে সর্দারজী চলে গেলেন। পেছনে পেছনে বোশন আর তার মা এবং ভাই গিয়ে ঢুকল নির্দিষ্ট ঘরে।

কিছুক্ষণ পরেই হৈ হৈ করতে করতে এল দীপুরা। পেয়ে গেছে পারমিট। এখন খেয়ে আসতে হবে হোটেল থেকে।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, দেখা হয়েছে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে?

আশু বলল, শুধু ভদ্রলোক! গুষ্টি-শুদ্ধ সকলের সঙ্গেই দেখা হয়েছে। দীপুকে তো সর্দারজী ছাড়ছিল না। বললাম, থেকে যা। ভদ্রলোকের তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। খাওয়াটাই কি বড় হল?

কানু বলল, তোকে কি ভদ্রলোক খাওয়াতো না? না হয় খেতে গিয়ে আর একটা দিন দেরি হত!

গোপু বলল, পরের উপকার করতে গেলে সব সময়েই একটু আধটু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাতে পেছিয়ে গেলে চলবে কেন?

কুকু-কুকু-কুকুকুতে চোখে কি রকম তাকাচ্ছিল? পানুও যোগ দিল রসিকতায়।

দীপু রেগে গিয়ে বলল, শালারা ঈর্ষায় একেবারে ফেটে যাচ্ছে।

কানু বলল, তা অমন এক জোড়া জাঁদরেল শ্বশুর-শাশুড়ি যদি জোটে তোর কপালে, আর সকলের ঈর্ষা হবার কথাই তো!

পানু বলল, গ্যা-গ্যা-গ্যায়ের গন্ধে ভূত পালায়।

হ্যাঁরে শালা, তুই শুঁকে দেখেছিস?

ও শুঁকতে হয় না। এমনিতেই বো-ঝা যায়।

এস-ডি-ও অফিস থেকে বেরিয়ে পুব দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই মিলিটারী এলাকা। পানু বলল, এখানে মাংসাংস-রুটি পাওয়া যায়। মিলিটারীদের জন্যে রেস্টুরেন্ট-সান নেই। রাতে মাংস খাবেন না কি রায়দা?

গোপু বলল, না বাবা। মিলিটারী ব্যাপার, কি সব মাংস চালিয়ে দেবে। দেব-স্থানে এসেছি, ও সাত্ত্বিক ভোগই ভাল। কি বলেন রায়দা?

আশু বলল, খুড়োর ধালি খাই খাই, খালি খাই খাই। কেন, আমাদের দেখে শিখতে পার না?

দীপু বলল, কি শিখবে তোর কাছে? ভাল্লুকে খুব মহুয়া খেতে ভালবাসে, জানেন তো রায়দা? ঝাড়গ্রামে একবার এই রকম টাম্বলার গ্লাসের এক গ্লাস মহুয়া, হাত দিয়ে গ্লাসের যে আবতন দেখাল সে, তাতে অনায়াসে বালতি বলে মনে হতে পারে।

কানু বলল, তুই ছাড় তো। তোর ঝাড়গ্রাম আর মহুয়ার গপ্পো শুনে শুনে কান পচে গেল।

প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে অনন্ত দীপুকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে এত মিলিটারী কনসেনট্রেশন কেন বলুন তো?

দীপু নিজের সাবজেক্ট পেয়ে বিস্তৃত-ভাবে বোঝাতে শুরু করল। ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্ত যদিও হিমালয় পর্বতের দুর্ভেদ্য আড়ালে ঢাকা বলে মনে হয়, তবু কত গুপ্ত পথ আছে তিব্বত থেকে ভারতে আসার। সেই পথ দিয়ে বিদেশী আক্রমণ হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। অল্প কিছুদিন আগে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। বদরীনাথ ছাড়িয়ে আর অল্প কিছু উত্তরে গেলেই এইরকম ভাল্লুকের বেশ কয়েকটা, তাই

এই অঞ্চলে বর্ডার এরিয়া জুড়ে মিলিটারী বেস রাখতে হয়েছে। তারই এই অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার যোশীমঠ।

গল্প করতে করতে মিলিটারী এলাকা ছাড়িয়ে একটা সরু খাঁড়িপথ ধরে গড়গড়িয়ে নিচে নেমে থাকল ওরা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা মিলিটারী এলাকা, মালভূমির তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে। নিচের পথটার দু-পাশে ছোট দুটি বস্তি। নিচু নিচু ঘর, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। জলনিকাশের ব্যবস্থা নেই। থকথকে কাদা কিছু কিছু জায়গায়। মাছি ভন্ ভন্ করছে। কম্বলের কাপড়ের জামা পরা বাচ্চাগুলো পথের ধরে খেলা করছে। তারই মধ্যে হঠাৎ একটি পনের-ষোল বছরের মেয়ে একটা নিচুমত অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। কালো কম্বলের জোব্বার মত সাজ পরণে। নাকে নোলক। গায়ের রং ঈষৎ হলুদের আভাযুক্ত ফর্সা। নাক-মুখ-চোখ যেন ছেনি দিয়ে বহু যত্নে কেটে কেটে তৈরী। রুক্ষ চুলেও সে মুখ বেমানান নয়। যেটা বেমানান লাগল অনন্তর চোখে, তা হল, ওই সবল দরিদ্র কিশোরীর টয়লেট চর্চা। বস্তিতে থেকেও গালে রুজ মাখতে ভোলেনি। সে কথাই ক্ষোভের সঙ্গে বলল সে গোপুকে। শুনে সকলে দিলে হেসে উঠল হো হো করে।

হাসতে হাসতে দীপু বলল, রায়দা বলেনে ভালো। গালে রুজ মেখেছে।

গোপু বলল, ও সব রুজ সব মেয়েই মাখে এখানে। পয়সা লাগে না: প্রকৃতি আপনা থেকেই তার জেগান দিয়ে রেখেছে।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ অবাক হয়ে গেল অনন্ত। বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। এই অষত্নলালিত কিশোরী, যার সর্বাঙ্গে ময়লার প্রলেপ পুরু হয়ে বসে গেছে, যার পোশাক যতদূর সম্ভব আন-ইস্প্রেসিভ, তার ওই প্রতিমার মত চোখ, নাক, চিবুক, তার গালের বক্রতিমাভা, এ যে কি দারুণ কনট্রাস্ট, এটা যে উপলব্ধি করতে পারে, সেই শুধু কষ্ট পাবে তার মত।

গোপু বলল, মা দুর্গা এই গাড়োয়ালের মেয়ে ছিলেন, তা জানেন তো?

ঠিক। বিদ্যুচ্চমকের মত পুরোনো স্মৃতি ভিড় করে এল মনে। খুব ছোটবেলায় মামার বাড়িতে মায়ের আঁচল ধরে জমিদার বাড়িতে দুর্গা ঠাকুর দেখতে যাওয়ার সেই দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা কোন দিন মুছবে না মন থেকে। কত বয়েস তখন। বছর পাঁচ-ছয় হবে। ঢাকাই শাড়ি পরে ঠাকুর দেখতে যেত মা। মা-দুর্গার মুখ আর মায়ের মুখ পর্যায়ক্রমে দেখতে সে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে। তাকে ভাল মনে পড়ে না। যখনই মনে পড়ে, তখনই তার সঙ্গে দুর্গা ঠাকুরের মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এই মেয়েটির টিকোলো নাক, টানা চোখ, সরু চিবুক আর ওর গালের লালিমা সত্যিই সেই শৈশবে দেখা দুর্গাপ্রতিমার স্মৃতি মনে পড়িয়ে দেয়। মানুষের মুখ যে প্রতিমার মত হয়, এখানে না এলে সে অভিজ্ঞতা হত না কখনো।

এদের দেখেই বোধহয় পৌরাণিক ঋষিরা গিরিরাজের কন্যা গৌরীর রূপ কল্পনা করেছিলেন। বার বার দেখেও তৃপ্ত হচ্ছিল না অনন্ত। বৈষ্ণব কবি লিখে গেছেন, নয়ন না তিরপিত ভেল। তিনিও নিশ্চয়ই এমনি কাউকে প্রত্যক্ষ করেই কাব্য রচনা করেছিলেন।

গড় গড় করে নেমে যাচ্ছিল সকলে। একটুখানি পেছিয়ে পড়েছিল অনন্ত। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের ধরবার জন্যে দ্রুত পা চালাল সে।

[৫ ২২]

দীপুকে পাঁচজনের রুকস্যাক্ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা ছিল বারান্দায়। তার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা ছুরাশাব দাঁইতি, আইস-এ্যাকস্। অনন্তর জন্যে কিনে নিয়েছে ওরা একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, তবে খুবই পরিষ্কার—নতুন বললেই হয়, হ্যাভারস্যাক্। আর কিনে দিয়েছে একজোড়া হাল্টার জুতো। গতকাল বিকেলে এসব কেনা হয়েছে যোশীমঠ বাজার থেকে। আজ সকাল সাড়ে সাতটায় পদযাত্রা শুরু হবে।

গতকাল সারা দিনটা ঘোরাঘুরি করে কেটেছে। উঁচু নিচু পথে হাঁটা চলায় কিছুটা রপ্ত হওয়া গেছে। এত হাঁটা এবং বিশেষ করে এইরকম চড়াই উৎরাইয়ের পথ হাঁটার অভ্যাস কোনদিনই ছিল না। তাই পায়ে এবং উরুতে ব্যথা হয়েছে। তবে হাল্টার জুতো বড় ভাল হয়েছে দেখা যাচ্ছে। একটু ভারী বটে, তবে এই রকম পাথুরে পথে এই জুতো পরে বেশ আরাম।

রোশনরা একটু দেরি করে বেরুবে। ওরা আজ থাকবে গোবিন্দঘাট গুরুদুয়ারায়। দীপুরা আই গোবিন্দঘাট থেকে উঠে যাবে ঘাংরিয়ায়। হিসেব মত ওরা নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে পৌঁছবে গোবিন্দঘাট চেক্‌পোস্টে। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে এবং কিছু খাওয়া-দাওয়া করে এগারটা থেকে সাড়ে এগারটায় ঘাংরিয়ার পথে উঠতে থাকবে। সাত মাইল পথ, প্রায় ছ হাজার ফুট চড়াই। পাড়ি দিতে সময় লাগবে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা। সুতরাং সন্ধ্যার অনেক আগেই ডাক বাংলোয় আশ্রয় নিতে পারবে ওরা।

পথে একটা দিন দেরি হওয়ার ফলেই একটা দিন সর্ট করতে চেয়েছে দীপু। অবশ্য আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল তার। সেটা ফাঁস হয়ে গেছে। তাই নিয়ে হাসাহাসিও করেছে তার বন্ধুরা। তা হল, আজ ঘাংরিয়া পৌঁছে আগামীকাল ওরা ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স দেখতে যাবে। এবং পরশু যাবে লোকপাল হেমকুণ্ড। রোশনরা আর থাকবে গোবিন্দঘাটে। কাল পৌঁছুবে ঘাংরিয়ায়: এবং পরশু দিন একসঙ্গে যাওয়া হবে লোকপাল।

ধর্মশালার কেয়ারটেকার লোকটি চমৎকার। দীপুর নির্দেশমত অনন্ত তার বাড়তি জিনিসপত্র হোল্ডল এবং দুটো সুটকেশে ভরে রেখে দিয়ে যাচ্ছে ওর জিম্মায়। ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স থেকে ফিরে দীপুরা চলে যাবে বদরীনাথের পথে। অনন্তকেও সে পথে সঙ্গী হতে ডেকেছিল ওরা। যাওয়া হতে পারেনি অনন্তর। সে কোনদিন পাহাড়ীপথে হাঁটা-চলা করেনি। এখান থেকে গোবিন্দঘাট তারপর গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংরিয়ায় এবং শেষে ঘাংরিয়া থেকে ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স এবং লোকপাল ইত্যাদি ঘুরে আবার সেই চড়াই ঠেলে বদরীনাথ হেঁটে যেতে পারবে, এত ভরসা নেই তার। গতকাল সারাদিন হেঁটে নিজের সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয়েছে তার।

কেয়ারটেকার অমৃতলালজী একটা রসিদ লিখে দিলেন অনন্তকে। বললেন, অবশ্য হিন্দিতেই, যদি ওটা হারিয়ে যায়ও, বিশেষ ক্ষতি নেই। বেজিস্টারী বইতে সব লেখা রইল। সেটাতে সই করে মালপত্র ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

এ রায়ের অ্যাটাচিটা শুধু নিজের সঙ্গে রেখেছে অনন্ত: তাতেই সে ভরে নিয়েছে তার টাকা-পয়সা। এপর্যন্ত এত সামান্য খরচ হয়েছে যে, প্রায় অটুট রয়েছে তার দেড় হাজার টাকার ফান্ড। একশ টাকা দিয়েছে কানুকে: ট্রেনে এবং বাসে খাবার-দাবার কিনেছে টাকা পঁচিশ আর এখানে জুতো, পিঠঝোলা ইত্যাদি কিনতে লেগেছে টাকা পঁচিশের মত। যথেষ্ট টাকা আছে সঙ্গে। সেই টাকা তো পকেটে রাখা যায় না। তাই নিয়েছে এ্যাটাচিটা। অবশ্য এ্যাটাচিতে যা-যা ছিল এবং যেমনভাবে রাখা ছিল, সে-সব কিছুকে কিছুমাত্র ডিস্টার্ব করেনি এযাবৎ। প্রয়োজন হয়নি এবং সব থেকে বড় কথা একটা মুহূর্তও একা থাকার সুযোগ হয়নি যে ঘেঁটে-ঘুঁটে দেখবে।

অমৃতলালজীকে নমস্কার করে বেরিয়ে আসতেই কানু এল সন্তর্পণে। বলল, রায়দা, একটা জিনিস দেখে যান। শব্দ করবেন না, কথা বলবেন না। শুধু দেখবেন আর চলে আসবেন।

উৎসুক হয়ে তার সঙ্গে পথে নামল অনন্ত। বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে ধীরে ধীরে নামতে থাকল কানু। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ডাইনে মোড় নিতেই চোখে পড়ল, গোপু, আশু আর পানু পথের ধারে, ভেটারিনারী হাসপাতালের পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝে মাঝে একটু এগিয়ে গিয়ে গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিচ্ছে। অনন্ত ভাবল, পশু চিকিৎসা সম্পর্কিত কোন ব্যাপার হবে হয়তো, যেটা এই ছ' হাজার ফুট উঁচু হিমালয়ের মালভূমিতেই দেখা যায়। এগিয়ে যাচ্ছিল সে স্বাভাবিকভাবে। তাকে বাধা দিল আশু। সাবধানে দেখে চলে আসুন।

সে আবার কি? কেমন অস্বস্তি বোধ হল অনন্তর। তবু এতদূর ওরা ডেকে নিয়ে এসেছে যখন, একবার উঁকি মারা প্রয়োজন। সেইভাবেই সন্তর্পণে উঁকি দিল সে গেটের ফাঁক দিয়ে। দেখেই চোখেমুখে হাসি ফুটে উঠল তার। হাসপাতালের নির্জন ফুলবাগানে একটা বেঞ্চে পাশাপাশি

বসে আছে দীপু আর রোশন। ওদের দিকে পেছন ফিরে আছে।

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এল অনন্ত। গোপুকে বলল, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্পাইং করাটা বিশ্রী দেখাচ্ছে।

গোপু বলল, আমাদের দোষ নয় দাদা। পানুর কাণ্ড। সাতটা পনের হয়ে গেছে। দীপুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই আমরা চিন্তিত। পানু গিয়ে উঁকি দিয়ে এল পাশের ঘরে। সেখানে নেই। গেল কোথা রে ছেলেটা। তারপর পানুই এসে খবর দিল, লীডার আমাদের একটু বিশেষ ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন।

হাঁটতে হাঁটতে ধর্মশালায় এসে পৌঁছে গিয়েছিল সকলে। অনন্ত বলল, কিন্তু এই অল্প সময়ে এতটা ঘনিষ্ঠতা হল কি করে, সেটা খুব আশ্চর্য লাগছে না?

আশু বলল, দীপু হয়তো আগ্রহ দেখিয়েছে। তবে মেয়েটিও কম যায় না।

গোপু বলল, বর্ণচোরা ল্যাংড়া আম। ওপরটা দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

তার মন্তব্যে হেসে উঠল সবাই।

সাড়ে সাতটা বাজতে যায়। দীপুর জন্যে অপেক্ষা করে আছে সবাই। এমন সময় হুড়মুড় করে এল দীপু। ভীষণ ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বলল, কি ব্যাপার? সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন? সাড়ে সাতটা বাজে। উই শুড স্টার্ট নাউ।

পানু যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে সবে যেতে যেতে বলল, কানু, সায়েব নাউ বলেছে।

হো-হো করে হেসে উঠল সকলে। অনন্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো কানুর দিকে। সে বলল, আমাদের অফিসে বুড়ো পাঠকমশাই ছিলেন। রিটায়ার করেছেন অনেকদিন আগে। অফিসার যদি তাঁকে কোন সময়ে 'বিং দি ফাইল নাউ' বলেছে, তো হয়ে গেল। সক্কলকে উদ্বাস্তু করে মারতেন ভদ্রলোক। ও ভাই, সায়েব নাউ বলেছে। ও ভাই সায়েব নাউ বলেছে। সেই থেকে আমাদের অফিসে কথাটা ভীষণ চালু। হাসছিল তখনো সকলে।

দীপু সম্ভবতঃ আন্দাজ করেছিল কিছু একটা। তাই বিশেষ রাগ করতে পারল না। বলল, হাসি-তামাশা পরে হবে। নাউ বি রেডি। শের সিং—

আশু বলল, লীডার সায়েব এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমরা তো অনেকক্ষণ থেকেই রেডি হয়ে আছি।

ঠিক জুৎসই প্রত্যুত্তর দিতে একটু দেরি হচ্ছিল দীপুর। পানু নিজের রুকস্যাক পিঠে তুলে স্ট্র্যাপ ঠিক করতে করতে বলল, লীডার সায়েব এতক্ষণ ল্যা-ল্যা-ল্যা-ল্যাংড়া আম চাখছিলেন।

এবারে সকলে ফেটে পড়ল হাসিতে। অনন্তও হেসে ফেলল ওদের সঙ্গে। তার হাসি দেখে দীপুর সিরিয়স হবার ভঙ্গিটা আর রইল না। বলল, আপনিও ওই বাঁদর-গুলোর সঙ্গে হাসছেন রায়দা?

অনন্ত তার হ্যাভারস্যাকের ভেতরে রায়ের এ্যাটাচিটা পুরে নিয়েছিল। এবারে কাঁধে তুলে হাসি থামিয়ে বলল, স্ট্র্যাপটা একটু লাগছে। দেখুন তো লীডার, ঠিক হচ্ছে না কেন?

ছজন পোর্টার চলেছে ওদের সঙ্গে। চারজন একস্পিডিশনের মালপত্র গোবিন্দ-ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। দুজন ওদের সঙ্গে যাবে ঘাংরিয়া। একটা স্বল্প-ব্যবহৃত সরু পথ ধরে ওরা চলে এল মালভূমির কিনারায়। এখান থেকে সোজা নেমে যেতে হবে পাকদণ্ডী পথে।

যোশীমঠের এই জায়গাটা থেকে সোজা নিচে তাকালে দেখা যায় বিষ্ণুপ্রয়াগের মন্দির। অলকানন্দায় এসে মিশেছে বিষ্ণু-গঙ্গা। ছোট্ট একটা মার্বেলের মত দেখাচ্ছে মন্দিরের গোলানো ডোম। জিগ্‌জ্যাগ পথে বারোজন ব্যক্তি গড়গড়িয়ে নেমে চলেছে। চারজন পোর্টার প্রথমে নামছে। তারপর দুজন সদস্য, গোপু আর কানু, তারপর একজন পোর্টার মাহিন্দর সিং, তার পেছনে আশু আর পানু, তারপর শের সিং, শেষে অনন্ত এবং সবশেষে চলেছে দীপু। সদস্য-দের মাথায় টুপি, পিঠে রুকস্যাক, হাতে আইস এ্যাক্স। এদের মধ্যে অনন্তকে একটু বেমানান লাগে। তার চেহারা এবং চলাফেরার মধ্যে একটু সম্ভ্রান্ত ব্যবধান। পিঠে হ্যাভারস্যাক, তার আয়তন ছোট। হাতে যোশীমঠ থেকে কেনা একটি সুদৃশ্য লাঠি। মাথা ঢাকায় সুচালো লোহার টুপি পরানো। বাঁদিক থেকে ডাইনে, তারপর আবার বাঁদিক, এইভাবে চলেছে সবাই, নামছে পিঁপড়ের সারির মত পাহাড়ের গা বেয়ে।

বিষ্ণুগঙ্গার ওপরে লোহার মস্ত ব্রিজটার ওপরে এসে দাঁড়াল অনন্ত, হাঁটা শুরু করার চল্লিশ মিনিট পরে। পোর্টাররা তার মিনিট দশেক আগে পৌঁছেছে। দীপু ছাড়া বাকি কজন সদস্যও কম করে পাঁচ মিনিট আগেই এসেছে সেখানে। দীপু দেরি করতে বাধ্য হয়েছে অনন্তর জন্যে। গড়গড়িয়ে শুধু নেমে যেতে গেলেও যে হাঁটুতে ব্যথা লাগে, কোমরে ও পিঠে টান ধরে তা অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারল অনন্ত।

মিনিট দুই দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিল দুজনে। প্রায় দোতলা সমান উঁচু বিষ্ণু প্রয়াগের মন্দির। মাথার ওপরে গোল ডোমটার পরিধি নেহাৎ ছোট নয়। এটাকে ছোট্ট একটা মার্বেলের মত দেখাচ্ছিল ওপর থেকে।

নদী পেরিয়ে বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে সোজা উত্তরে। দু দিকের উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। তার ধরস্রোত দু দিকের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে গম গম করছে। রাস্তায় পাশাপাশি পাঁচ-সাতজন যাত্রী হেঁটে যেতে পারে অনায়াসে। পি-ডবলিউ-ডি ট্রাক অথবা মিলিটারী ট্রাক মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করছে। বাস চলবে হয়ত এই বছরেই। তখন হৃষিকেশ থেকে বদরীনাথ দর্শন করতে যাওয়ার সময়ে এতটুকুও হাঁটতে হবে না।

অনেক ছাড়া ছাড়া চলেছে ওরা। পোর্টাররা কোন্ বাঁকে হারিয়ে গেছে, তাদের দেখা যায় না। গোপু আর কানুও অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রায় শ-খানেক গজ দূরে চলেছে আশু আর পানু। দীপু বলছিল, হাঁটতে অসুবিধে বোধ করছেন না তো?

অসুবিধে হবার কথা নয়। দীপুরা যে রুকস্যাক বইছে, তুলে দেখেছে অনন্ত, তার এক একটার ওজন পনের-ষোল কেজির কম নয়। তুলনায় অনন্তর হ্যাভারস্যাকের ওজন বড় জোর পাঁচ কেজি। একটা প্যান্ট, একটা সার্ট, একজোড়া মোজা, একটা পুলওভার, একটা স্লিপওভার আর গরম শাল, এই কটি জিনিসকে পলিথিন সিটে জড়িয়ে ভাল করে প্যাক করে দিয়েছে ওরা হ্যাভারস্যাকে। ওদের চেয়ে অনন্তর বয়সটা কিছু বেশি। সেটা এমন কিছু অন্তরায় নয়। হাঁটার তফাৎ হচ্ছে যে কারণে, তা হল অনভ্যাস। পথ হাঁটার অভ্যাস কোন-দিনই ছিল না অনন্তর।

একটা পাহাড় পেরিয়ে আর একটি পাহাড়ের গায়ে যেখানে উঠেছে পথ, সেখানে আলো বাতাস বেশি। হঠাৎ সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলে যেমন ভাল লাগে, তেমনি অনুভূতি হয়। পাহাড়ের দেওয়ালের গা বেয়ে কোথাও সরু ধারায় জল নামছে। সেই জল বয়ে যাচ্ছে পথের ওপর দিয়ে খাদের দিকে। বাঁদিকে পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। তাই এই পাথরের দেওয়াল, এবড়ো-খেবড়ো, অসুন্দর। কয়েকটা পাহাড়ের শ্রেণী পার হয়ে একটু-খানি উপত্যকা মত জায়গা চোখে পড়ল। সবুজ ধানের ক্ষেতে কাজ করছে নারী পুরুষ। ফুলগাছের কাঁটা ঝোপের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট বাড়ি। কাদা দিয়ে পাথরের স্ল্যাব গাঁথা। মাথায় স্লেট পাথরের টালির ছাউনী। উঠোনের মাচায় লাউ ঝুলছে। প্রথমে বুঝতে পারি নি অনন্ত। দীপু বলল মাচা থেকে কি ঝুলছে বলুন তো রায়দা?

বৃহৎ চাল কুমড়ো সাইজের অনেক-গুলি বস্তু ঝুলছিল। সেগুলোকে লাউ বা চাল কুমড়ো ছাড়া কিছু মনে হয় না। সে কথাই বললে অনন্ত।

হেসে দীপু একটা যাচ্ছাকে ডেকে কিছু পয়সা দিয়ে কিনল একটা কাঁকড়ি। আইস এ্যাক্স দিয়ে ফেড়ে ফেলল সেটাকে। একটুকরো অনন্তকে দিয়ে বলল, খান।

(চলবে)

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

যখন বিপ্লবী ডাকাতরা হানা দেয়, তখন পোস্ট-অফিস থেকে পার্ক-স্ট্রীট থানায় টেলিফোন করে। পার্ক-স্ট্রীট থানা মুহূর্তে লালবাজারে খবর দেয় এবং পার্ক-স্ট্রীট থানা থেকে দুটি ভ্যান বোঝাই পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পার্ক-স্ট্রীট থানার দরজায় ডাকাতি, তবু তোড়জোড় করে আসতে পুলিশের দশ-পনের মিনিট লেগে গেল। যখন তারা এল, ডাকাত তখন হাওয়া। তখন পুলিশ এসে কি করবে? সব পুলিশ ভ্যানকে ওয়্যারলেসে খবর দেওয়া হল—'কালো ল্যান্ডমাস্টার গাড়ীতে ছয়জন ডাকাত ডাকাতি করে পালিয়েছে। তাদের সঙ্গে বোমা পিস্তল আছে।' পথে পথে সন্দেহজনক কালো ল্যান্ডমাস্টার গাড়ী মনে করলে পুলিশ চেক করতে লাগল।

এদিকে বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে এই বিপ্লবী ডাকাতদের গাড়ীটি তাদের নিজেদের নির্দিষ্ট আস্তানায় গিয়ে পৌঁছাল। পথে এই গাড়ীটিকে নিয়ে তাদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। রেডিয়েটারে এক ফোঁটাও জল ছিল না। লেকের সামনে গাড়ীটি দাঁড় করিয়ে তারা রেডিয়েটারে জল ঢালে। যে পাড়ায় গাড়ীটিকে নিয়ে গিয়েছিল সে পাড়ায় বিটায়ার্ড বড় বড় পুলিশ অফিসারদের বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতেই রিভলভার নিয়ে তাদের বডি-গার্ড থাকে।

টাকার ট্রাঙ্কটি মস্ত বড়। ভারীও খুব। সেটি নামাতে দেখলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল। সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ছিল দুটি ম্যাগাজীন রাইফেল নামান। পাছে তাদের চোখে পড়ে। ডাকাতির স্পট থেকে গাড়ী ছুটে এসেছে। গাড়ীটিকে খুব কাছ থেকে কেউ অনুসরণ করে নি। কিন্তু খুব দূর থেকে কেউ যদি লক্ষ্য করে থাকে, তাহলে পুলিশ খুবই শীঘ্র এসে হানা দেবে।

লক্ষের টাকা ও দুটো ম্যাগাজীন রাইফেল সেই বাড়ীতে রেখে তালা দিয়ে তক্ষুণি সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিৎ মনে করে তারা সরে গিয়েছিল। এইরকম নির্দেশই তাদের উপর ছিল। কিন্তু কোন পুলিশ এসে হানা দেয়নি।

বাড়ীটির উপর পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য তারা সারাক্ষণ নজর রেখেছিল। প্রথম থেকে বোঝা গিয়েছিল কেউ বাড়ীটিতে নজর রাখেনি। তবু একঘণ্টা পরে সতর্কতা নিয়ে তারা তিনজন সেই বাড়ীটিতে ঢুকে নোটগুলো বার করল। তাদের সেন্ট্রাল কমিটির একজন সদস্য একলক্ষ টাকার একটি বান্ডিল দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে, বলে নিল। আরেকটি পঞ্চাশ হাজার টাকার নোটের বান্ডিল দেওয়া হল আর একজন সেন্ট্রাল কমিটির সদস্যকে যার সঙ্গে তাদের মতের খুব মিল ছিল না, বনিবনাও ছিল না। বাকী টাকা কলকাতা শহরে তিনটি বাড়ীতে রাখা হল। এই কাজ একঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত করে ঘরে তালা দিয়ে তারা সবাই আবার চলে গেল। দূর থেকে পাহারার ব্যবস্থা রাখল কারণ তখন সেই বাড়ীতে পোস্ট-অফিসের বড় একটি খালি

ট্রাঙ্ক ও দুটি ম্যাগাজীন রাইফেল ছিল। দিনের বেলা এগুলোকে সরানো যুক্তি-সঙ্গত হবে না বলে মনে করেছিল।

রাত আটটার সময় গাড়ী নিয়ে এসে সেই বড় ট্রাঙ্ক ও দুটি রাইফেল তারা সেই বাড়ী থেকে নিয়ে কুইন্স পার্কের রাস্তার ধারে স্যুটকেসটি নামিয়ে রাখল, আর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে রাস্তার ধারে রাইফেল দুটো নামিয়ে তারা গাড়ী নিয়ে চলে গেল।

রাত প্রায় বারোটার সময় টহলদারী পুলিশ ট্রাঙ্ক ও রাইফেল দেখতে পেয়ে বালিগঞ্জ থানায় রিপোর্ট করে। থানা থেকে পুলিশ এসে সেগুলো নিয়ে থানায় জমা দিল এবং যথারীতি লালবাজারে খবর দিল। লালবাজার থেকে বিজ্ঞ অফিসাররা এসে যখন বুঝল পোস্ট-অফিসের ডাকাতির ট্রাঙ্ক ও লুঠ করা দুটি রাইফেল, তখন তাদের আক্কেল গুড়ুম। তারা ভেবেই পাচ্ছিল না ডাকাতরা রাইফেল দুটি নিলই বা কেন, ফেরৎই বা দিল কেন? এই নিয়ে পুলিশদের মধ্যে বহু গবেষণা হয়েছে। কেবল তা-ই নয় পাবলিকের মধ্যেও এই নিয়ে কম গবেষণা হয়নি—কেন বিপ্লবী ডাকাতরা রাইফেলগুলো নিয়ে গিয়েছিল, আবার তখনই বা আবার ফেলে গেল? পুলিশের বিশেষজ্ঞরা আমাকে এই প্রশ্নটি করে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন জবাবের আশায়। আমি তাদের উত্তর দিয়েছিলাম, 'আপনাদের এতজন বিশেষজ্ঞ পুলিশের মাথায় এই প্রশ্নের জবাব যখন খুঁজে পেলেন না, তখন কি করে আশা করতে পারেন আমার কাছে জবাব পাবেন?

দেবী চৌধুরাণী তাঁর বয়ান থেকে শুনতে পেলেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন আদেশ দিচ্ছেন—প্রত্যেকের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নাও'—ক্যাপ্টেন সাহেবের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আদেশের বিরুদ্ধে দেবী চৌধুরাণী সবাইকে জানালেন—তোমাদের যার যা অস্ত্র আছে সবাই এক্ষুণি বিনা দ্বিধায় জলে নিক্ষেপ কর। সবাই অস্ত্র জলে নিক্ষেপ করল। স্তম্ভিত ইংরেজ ক্যাপ্টেন হতভম্ব হল।

এখন আমি বলি কেন দুটো রাইফেল সেখানে আবার বিপ্লবী ডাকাতরা ফেলে গিয়েছিল। দুটো রাইফেল কোন বাড়ীতে লুকিয়ে রাখা খুব সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। হাউস কর্তা বা কর্তীর অনুমোদন না থাকলে এবং স্বেচ্ছায় যদি তারা রাইফেল গোপন করে রাখার জন্য জায়গা না দেন, তবে রাইফেল রাখা সহজ নয়। সংগঠনে প্রতিষ্ঠাবান লোকের সংখ্যা মোটেই ছিল না বলা চলে। সংগঠনের সদস্যরা প্রায় সবাই নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তাদের কোন আলাদা ঘর নেই। একটি ঘরেই হয়ত বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই একসঙ্গে থাকে। সেইরকম বাড়ীতে কি ভাবে রাখা যায় রাইফেল রাখার কথা? তাছাড়া সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য যার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখতে দেওয়া হয়েছিল, সে সন্ধ্যার সময় তা ফেরৎ দিল এবং বলল টাকা রাখার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আরেকজন সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য যে একলক্ষ টাকা নিজের হেপাজতে রাখবে বলে নিয়ে গিয়েছিল, সে দুদিন পরে ফেরৎ নিয়ে এলো এবং দুঃখের সাথে জানাল টাকা রাখার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই ছিল সংগঠনের বাস্তব অবস্থা। এই অবস্থা দলের সাধারণ সদস্যরা বুঝতে না পারলেও দলের যে শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন তিনি খুব ভাল করেই তা বুঝেছিলেন। এই অবস্থায় দলের কারো বাড়ীতে রাইফেল রাখা উচিত হবে না বলে মনে হয়েছিল রাইফেল রেখে যে ঝুঁকি সবসময় নিতে হত সেই ধরনের প্রস্তুতি তাদের ছিল না বললেই চলে। তাই নির্দ্বিধায় যে চারলক্ষ টাকা পাওয়া গেল, তা দিয়ে বিভিন্ন খরচ মিটিয়ে সংগঠনের বুনিয়াদটি তৈরী করার অধিক প্রয়োজন ছিল।

'আওয়ার স্ট্যান্ড'-এর সময় থেকে আমাদের একটা চিন্তাধারা ছিল যে চার লক্ষ টাকা আমাদের নির্দ্বিধায় পেতে হবে। পোস্ট অফিসে এই ডাকাতির পরে আমাদের এতদিনের স্বপ্ন ও সাধনা সফল হয়েছে বলে মনে হল। পুলিশ আমাদের কাউকে ধরতে পারল না। লুটের মাল ধরা পড়ল না। পুলিশ আমাদের সন্দেহও করতে পারল না। এই ডাকাতির পর পুলিশ প্রায় এক হাজার লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেষ্টা করেছে তাদের সঙ্গে বার চোদ্দ বছরের আগে সোনার দোকানে রাত্রি ডাকাতি করেছিল তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে কিনা। পুলিশ কাউকে কাউকে কতো প্রশ্ন করেছে অনন্ত সিংহকে তারা সন্দেহ করে কিনা। কেউ কেউ নাকি উত্তর দিয়েছিল, 'অনন্ত সিংহের হাতে কি একটি পিস্তল বা স্টেনগান ছিল না? তাদের ডাকাতি করতে হল পাইপগান দিয়ে?' সত্যি ডাকাতিটি হয়েছিল ক্যাকার ও পাইপগান নিয়ে।

১৯২৩ সালে পড়াইকোড়া গ্রামে ডাকাতির সময় আমরা রিভলভার, ক্যাকার ও লটগান ব্যবহার করেছিলাম, তবু পিস্তল ফায়ার করা হয়নি। কারণ পিস্তল ফায়ার করলে প্রমাণ থেকে যায় কার্তুজের খোল যাইবে ছিটকে পড়ে এবং তা দেখে পুলিশ বুঝতে পারে যে পিস্তল ব্যবহৃত হয়েছে। রিভলভারের কার্টিজ ফায়ার করার পরে বাইরে পড়ে না, চেম্বারেই থেকে যায়। সাধারণ লোক কেবলমাত্র আওয়াজ শুনে বলতে পারে না। পিস্তল ব্যবহার করলে পুলিশ বুঝে নিতে স্বদেশীরা আবার তৎপর হয়েছে।

পোস্ট অফিসের চার লক্ষ টাকা ডাকাতি হওয়াতে পুলিশ বিলাত হয়েছিল—সঠিক বুঝতে পারছিল না যে, এই ডাকাতি অনন্ত সিংহের দলের লোক করেছে কিনা। কারণ এই ডাকাতিতে স্টেনগান বা পিস্তল ব্যবহৃত হয়নি, তারা পাইপগান ব্যবহার করেছিল এবং নিজেদের তৈরী পাইপগান ইচ্ছে করে সেখানে ফেলে এসেছিল।

পুলিশ অনুসন্ধান বন্ধ করেনি। দিনের বেলায় এতবড় একটি ডাকাতি হয়ে গেল ডাকাতরা চার লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও হল, ক্যাশিয়ার বাবু ও সি আর পিয়ন লোকে আহত হল—এতসব কাণ্ডের পরেও ডাকাত দলের হদিস করতে না পারা কলকাতার ডি ডি ডিপার্টমেন্টের পক্ষে খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। তাই এই কলঙ্ক মোচন করতে তারা বেছে বেছে কয়েকজনকে ডাকাত সন্দেহ করে ধরল এবং তাদের পুলিশ কাস্টাডিতে রেখে কারো কারো কাছ থেকে 'স্বীকারোক্তি' আদায় করল, আবার তাদের মধ্যে কারোকে দিয়ে হাকিমের কাছে স্ট্রাডিসিয়াল কনফেসন রেকর্ড করাল। এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদের বহু মাস ধরে জেল হাজতে আটক থাকতে হয়েছিল। তারপর যখন পুলিশ অনন্ত সিংহের দলকে বহুবছর-খানেক বাদে ধরে মামলা রুজু করতে যাচ্ছে তখন তারা বুঝল তাদের মারাত্মক ভুল হয়েছে— ভুল ব্যক্তিদের নামে মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছে। তাদের সবাইকে তখন জামিনে মুক্তি দেওয়া হল।

আজ মনে হচ্ছে যদি পুলিশ আমাদের দোষী মনে করে না ধরত তবে হয়ত এই হতভাগ্যদের সাজা হত ও তাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড ভোগ করে মরা ছাড়া উপায় ছিল না। যখন আমাদের চার্জশীট দেখ, তখন এই ভদ্রলোকদের কেস পুলিশ তুলে নিল।

এই ডাকাতি সুসম্পন্ন হওয়ার পরে যখন আমরা একেবারে পুলিশের দৃষ্টির বাইরে ছিলাম তখন ভেবেছিলাম আমাদের পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কাজ নির্দ্বিধায় শেষ করতে পারব। আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল চার লক্ষ টাকা খরচ করে সংগঠনের একটি অপরিহার্য প্রাথমিক স্তর তৈরী করব। যেখান থেকে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে কাজ করে যাওয়া যাবে। প্রাথমিক স্তরের কাজ হিসাবে ধরে নিয়েছিলাম যে, কাজ চালাবার জন্য কয়েকটি বাড়ি থাকবে, কয়েকটি গাড়ীও থাকবে। প্রথম অধ্যায় সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা কেন্দ্রে বাছাই করা ক্যাডারকে নিয়ে স্কুল চালাব। সেই স্কুলে শিক্ষা দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব আমারই থাকবে। স্কুলে সদস্যরা আসবে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে যেন তাদের আসা-যাওয়াটা অহেতুক কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। আর আমি যার গোপনে এবং প্রয়োজনে মেক-আপও নেব। যে শিক্ষা আমি তাদের দেব বলে ভেবেছিলাম, সেই শিক্ষা আমাদের সংগঠনে আর কেউ দিতে পারত বলে আমার জানা ছিল না। বিভিন্ন গ্রুপে মাঠে বসে যেসব সদস্যদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তারা এই পরিকল্পনার কথা অনেক মুখেই শুনেছিল। তিন মাস ধরে চারটি ক্লাশ করব চারটি নিরাপদ বাড়িতে। বাড়ি নিশ্চয় বড় হবে। যারা ঢুকবে বের হবে,

তাদের পরিচয় পুলিশ জানবে না। এই বাড়িতে ক্লাশ হচ্ছে তাও বুঝবে না। আর আমাকে নিয়ে একটি গাড়ী প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে ঢুকে যাবে।

আমাদের যেসব সদস্য ছিল, তাদের অধিকাংশেরই বয়স কম এবং প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সেই রকম বড় বাড়ি ওদের কারো পক্ষে ভাড়া করা সম্ভব ছিল না। তার জন্য চাই স্টাটাস। স্টাটাস তৈরী করে তখন বাড়ী ভাড়ার চেষ্টা করা হত। সেইরকম পরিকল্পনার কাঠামোটা আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল। কিন্তু কোন কিছুই করা যাচ্ছিল না আমাদের টাকার অভাবে। নির্বিবাদে চার লক্ষ টাকা আসার পর আর দেরী করার কোন প্রয়োজন ছিল না। চারটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী তৈরী করা প্রত্যেকটি কোম্পানীতে তিন চারজন করে ডাইরেক্টরের এবং একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের নাম দেওয়া, কোন নামী উকীল বা এটর্ণীর সাহায্যে 'আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন' ও 'আর্টিকেলস অফ মেমোরাণ্ডাম' ছাপিয়ে নিয়ে রেজিষ্ট্রি করা। কোন কোম্পানী এভাবে চালু করতে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় না। খুব সামান্য টাকায় তা করা যায়।

তার পরের কাজ অর্থ সাপেক্ষ। যেমন নামি গাড়ী কেনা ও বড় বাড়ি ভাড়া করা। সেই সব বাড়িতে কেবল থিওরিটিক্যাল ক্লাশ হবার কথা ছিল তা নয়, সেখানে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়া ও প্রাথমিক আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করারও ইচ্ছা ছিল।

মোটর গাড়ি চালাবার ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা ও টার্গেট প্র্যাকটিশ করার পরিকল্পনাও ছিল।

আমাদের সংগঠনের গোপন পুস্তিকা ছাপার জন্য একটি ছোট প্রেস কেনার পরিকল্পনা ছিল। ভাবা হয়েছিল পুলিশই সেরকম পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করবে, আর প্রেস সীজ করবে তা নয়, অন্যান্য বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধ মতবাদের প্রচার থাকলে তারা যে কোন সময় প্রেসটি ভেঙ্গে দিতে পারে ও যারা এই গোপন পুস্তিকা বহন করবে, তাদেরও মারধোর করে পুস্তিকা সব পুড়িয়ে দিতে পারে। এইসব আশংকা করে তার বিকল্প ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য যে ধরণের কাজ করা প্রয়োজন, সেই ট্রেনিং দেওয়ারও কথা ছিল। এই ভেবেই আমরা সংগঠনে প্রথম স্তরে একটি স্প্রিং বোর্ড তৈরী করার পরিকল্পনা অনিবার্য বলে মনে করেছিলাম। আমাদের সংগঠনের প্রথম সারির ছেলেরা এবং নেতারাও নিশ্চয় এই বিষয় খুব ভাল করে জানত। কিন্তু ডাকাতি হয়ে যাবার পর এই সাংগঠনিক প্রোগ্রাম নিয়েই আমাদের আলোচনার কথা আমি ভেবে-ছিলাম। কিন্তু আমাদের ভিতরে আমার পরেই যে ফিল্ড কমান্ডে ছিল, সে হঠাৎ নতুন করে এইভাবে কথার অবতারণা করল, 'আপনি আগে এই ধরণের কথা যা বলেছিলেন, সেগুলো তখন আমি খুব ভাল করে শুনিনি। আমার মনে হয় এখন আমাদের আবার ভাল করে আলোচনা করে কর্মসূচী স্থির করা উচিত। এই সব টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম আলোচনার বিষয়-বস্তু হওয়া উচিত নয়। তার পূর্বে আমাদের স্থির করতে হবে বিপ্লবের নীতি ও কৌশল।'

মার্কসবাদী ও লেনিনবাদীদের বৈপ্লবীক নীতি ও কৌশল প্রথম থেকেই জানতে হয়। অর্থাৎ কোন শ্রেণী বর্তমান যুগে বিপ্লবী শ্রেণী বলে গণ্য হবে এবং এই বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে কারা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবে আর কারা সহানুভূতিশীল থাকবে—এইসব তত্ত্ব আমাদের মধ্যে আগে বহুবার আলোচনা হয়েছে। আজ যখন চার লক্ষ টাকা খরচ করে প্রাথমিক স্তরে একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করা প্রয়োজন, যথা কতকগুলো মোটর গাড়ী কেনা দরকার কয়েকটি বড় বাড়ি ও কয়েকটি ছোট নিরাপদ বাড়ি ভাড়া করা প্রয়োজন যখন এইসব বড় বাড়িতে অন্তত চল্লিশজনকে গোপনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, তখন তা না করে ওই ধরণের প্রসঙ্গ তুলে মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টির নীতি ও কৌশল নিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল।

দিনেরবেলা পার্ক স্ট্রীট পোস্ট অফিসে চার লক্ষ টাকা ডাকাতি হওয়ার পর আমাদের প্রথম সারির চল্লিশটি ছেলে বুঝতে পারে যে, এই ডাকাতি আমাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল এবং তার ফলে তাদের সবারই মনোবল অনেক বেড়ে গেল। তারা উৎসাহিত হল এবং দিন গুণতে লাগল কবে সক্রিয়ভাবে তাদের ট্রেনিং ক্লাশ শুরু হবে, যে ট্রেনিং ক্লাশ স্বয়ং আমি পরিচালনা করব। ওদের মধ্যে যারা ফিল্ড কমান্ডারের কথায় বিভ্রান্ত হল, তারা বলতে লাগল কি ক্লাশ হবে? আমরাতো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো কয়েকবার পড়ে মুখস্ত করে ফেলেছি। লেনিনের হোয়াট ইজ টু বি ডান' বহুবারই পড়েছি। নতুন তিনি আর কি বলবেন? ....এদের মধ্যে পায় সবাই বলে আর বছর খানেক পরে বলতে লাগল—'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' প্রভৃতি কিছুই বুঝিনি, না বুঝেছি চাইনীজ কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক নীতি ও কৌশল। আমরা কেবল শ্লোগানের ভিত্তিতে চাইনীজ কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কৌশল বুঝেছি বলে মাত্র দাবি করেছি, যথা 'গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও করা' কিন্তু বুঝিনি যে কৃষি বিপ্লব করতে হবে কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে প্রলেটারীয়ান পার্টির নেতৃত্বে। এই মূল জিনিসটির অর্থ বিশ্লেষণ করে না বুঝে চেঁচালে বিপ্লব কখন হয় না। মূল তাত্ত্বিক বিষয়ে আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি যে এক ছিল না, তা নিয়ে এখানে আর বিশেষ বলব না।

আমাদের প্রথম সফল ডাকাতির চার লক্ষ টাকা পার্টি ফাণ্ডে আসার পর যে কাজের প্রোগ্রাম সাধারণভাবে আমার কাছে নির্ধারিত ছিল তা ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের গোপন দলের সর্বোচ্চ স্তরের সবাই কেবল আলোচনা করেই সময় কাটালাম তিন মাস। আর সব কমরেড অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারা কি জানতে পারছিল না। তাদের মনে প্রশ্ন ছিল কেন ক্লাশ না করে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তাদের তা বিশ্লেষণ করে বলা হয়নি। এই দায়িত্বজ্ঞানহীনের পরিচয় আমাদের দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না কেন আমরা এই রাজনৈতিক ডাকাতির আগে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বে সচেতন ছিলাম না? ফিল্ড কমান্ডের নেতা কে প্রশ্নটি নতুন করে তুললেন—কেন কিভাবে আমরা প্রোগ্রাম ঠিক করব, তা বিবেচনা করা উচিত। আমি সেই সভায় এই কথা তুলেছিলাম—না বুঝে ও প্রশ্নের সঠিক উত্তর না পেয়ে ফিল্ড কমান্ডার কি করে ডাকাতি করতে পারলেন? আজ কেন তিনি এইরকম বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন তুলে আলোচনা করতে চাইছেন? যাই হোক আলোচনা যখন শুরু হয়েছে তখন তা শেষ না করে কোন উপায় ছিল না।

আমি এক মাসের জন্য চোখের ছানি কাটাতে বম্বে যাই। বম্বে থেকে ফিরে এসে দেখি সংগঠনে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থা। তারপরে হল আমাদের গোপন সভা এবং সেই সভায় নিশ্চলতার কারণ আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিল যখন বুঝলাম সমস্ত বিভ্রান্তির মূলে আছে ফিল্ড কমান্ডার। ইতিমধ্যে ফিল্ড কমান্ডার প্রত্যেকের সাথে কথা বলেছে এবং প্রত্যেককে তার স্বপক্ষে পেয়েছে, কেবল একজনই তার মতবাদ মেনে নিতে পারেনি। তাকে ধরে নেওয়া যায় সেই ছিল সংগঠনের মধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সে আমার মত ও পথ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করল। সত্যি বলতে কি আমি সেদিন নিজেকে খুব অসহায় মনে করেছিলাম, আর ভেবেছিলাম তখনই সংগঠন ছেড়ে চলে যাই। সে এক অসম্ভব অবস্থা। এক এক করে সবাই বক্তব্য রাখল এবং ফিল্ড কমান্ডারকে সমর্থন করে গেল। তখন আমার মনে হয়েছিল আমার আর কিছু করার নেই, আমি বিদায় হই। কিন্তু কর্তব্যের ডাক শুনতে পেলাম—"অনন্ত সিং, ধৈর্য ধর। তোমার সাহস করে এগোতে হবে।' আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম এবং নিজেকে সংযত করে নিয়ে আলোচনায় যোগ দিলাম।

(চলবে)

কাছের মানুষ সুনীতিকুমার

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪ই জৈষ্ঠ, ১৩৮৫ সাল (ইংরেজী ২৯শে মে, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী। গত বছর, ওই দিনে, বিকেল ৪টে ২০ মিনিটে, প্রবল হৃদরোগের আক্রমণে কলকাতা উডল্যান্ডস নার্সিং হোমে তাঁর দেহান্ত হয়।

আমার বিবেচনায়, তিনি চিরকালের মহান্ বাঙালীদের শুধু অন্যতমই নন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও জ্ঞানবত্তার গুণে সেই পরিমন্ডলে এক বিশিষ্ট স্থানেরও অধিকারী। খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বড় মাপের যেসব বাঙালী আমাদের জগৎ সভায় প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এবং যাদের তুলনা বর্তমান শতকে বিরল, তিনি সেই পরম-গোষ্ঠীরই প্রতিনিধি—হয়ত বা অন্যতম শেষ প্রতিনিধি। নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বী তাঁর অসামান্য ধী-শক্তির পরিমাপ করবে যথা সময়ে, যথা নিয়মে। আমার সে-যোগ্যতাও নেই, ধৃষ্টতাও করি না। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতায়, জীবনের শেষ চোদ্দটা বছর তিনি আমাকে তাঁর পায়ের কাছটিতে বসতে দিয়েছেন যে কোনো সময়ে, যে কোনো প্রয়োজনে। সে-উদারতায় অভিভূত আমি, তাঁর-লেখা ভূমিকা সংবলিত আমার একটি বই-এর মুখবন্ধে সেজন্য বলেছিলাম—আমার মত অভাজনের প্রতি এই মহানুভব, নিরভিমান, বিদ্যোৎসাহী, জ্ঞান তপস্বীর সহৃদয়তার কথা যখন ভাবি তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাকুলতায় রবীন্দ্রনাথের ভাষার আশ্রয় নিতে হয়—'তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁর দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে—আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁর গ্রহণের যোগ্য হ'ক।'

আজ 'কাছের মানুষ সুনীতিকুমার' সম্পর্কে লিখতে বসে কত উজ্জ্বল উক্তি, কত মর্মে-গাঁথা স্মৃতি, সরলতায় তরলিত সেই অগাধ পান্ডিত্যের কত মনোহারী রূপের কথাই না মনে পড়ছে। এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে তার সামান্যই হয়ত বলা যাবে। তবু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কথাটাই প্রথমে বলি। সেটা যে আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা তাতে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

সময়টা ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ বা ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক। কলকাতার এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির' নামের সচিত্র লেখাটা তখন ধারা-বাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। চাকুরিসূত্রে সে-সময়ে বাস করি চুঁচুড়ায় আর সপ্তাহান্তে এক-এক কিস্তি লেখা পাঠাই সেই পত্রিকার দপ্তরে। পরিবার রেখে এসেছি কলকাতায়, এক চাকর-কাম-রাঁধুনী নিয়ে আমার চুঁচুড়ার সংসার। জেলা-সদরে যখন থাকতে পাই, তখন দিনের কাজ চুকিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ এসে বসি লেখার টেবিলে। সেদিনও পরবর্তী কিস্তির লেখায় ডুবে ছিলাম যখন সেই পরমাশ্চর্য ও একান্ত অপ্রত্যাশিত টেলিফোন-কলটা এল।

বিসিভার তুলে আত্মপরিচয় দিতেই ওধার থেকে দৃপ্ত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল—'আমি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কথা বলছি। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। সরকারী চাকুরির বেশ্যাবৃত্তিতে যার অন্ন সংস্থান হয় সেই অতি অভাজনের সঙ্গে জগৎ জোড়া খ্যাতির অধিকারী এক মহা পন্ডিত নিজে অগ্রণী হয়ে কথা বলছেন এমন অবিশ্বাস্যরকম চমকপ্রদ ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ঠাহর করতেই একটু সময় লাগল। আমতা আমতা করে বললাম—আপনার কথা কত শুনেছি, সভা সমিতিতে দূর থেকে আপনাকে দেখেওছি, আপনার বক্তৃতাও শুনেছি কত কিন্তু কখনো সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সৌভাগ্য হবে স্বপ্নেও ভাবিনি।

এক কথায় আমার যাবতীয় সংকোচ, শঙ্কা তিনি দূর করে দিলেন পরম ঔদার্যে। বললেন—পরিচয়টা এবার হবে মশায়, বেশ ভাল ভাবেই হবে। সে-জন্যেই তো ফোন করছি। আপনার 'বাঁকুড়ার মন্দির' লেখাটা চমৎকার হচ্ছে। নতুন বিষয়ে লেখা, খেটে-খুটে লেখা, আর সবচেয়ে বড় কথা—ঝরঝরে লেখা। আমি পড়ে যাচ্ছি, বেশ ভাল লাগছে। তবে এ-নিয়ে এক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে মশায়।

অসঙ্গতি? কোনো ভুলভ্রান্তি হচ্ছে নাকি লেখাটায়? ঘাবড়ে গেলাম। কেননা, অনেকের মতো আমিও জানতাম, শুধুমাত্র ভাষা চর্চাতেই তাঁর সমগ্র অভিনিবেশ নিবদ্ধ নয়, জ্ঞানমার্গের বিভিন্ন শাখাপথে তাঁর অবাধ বিচরণ এবং সে-পথ পরিক্রমা অল্পবিদ্যের সংশয়ী পদক্ষেপে নয়, সম্রাটের মতো দৃপ্ত পদক্ষেপে।

আমার বিচলিত ভাবটা তিনি লক্ষ্য করলেন। বললেন—অসঙ্গতি কথাটা শুনে ঘাবড়ে যাবেন না মশায়। ভুলচুকের কথা মোটেও বলছি না। তবে অসঙ্গতি একটা আছেই। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব বলে ঠিকানাপত্র যোগাড় করতে গিয়ে শুনলুম, আপনি নাকি হুগলিতে 'মেজেস্তাবী' করেন। এরকম বিসদৃশ ঘটনা তো আজকাল বড় একটা ঘটে না মশায়। ঘটত অনেককাল আগে, যখন শাসককুলের দেশী-বিদেশী অনেকেই আমাদের ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে দামী দামী সব কাজ করে গিয়েছেন। তা, আপনি, এতদিন পরে, এক ভূঁইফোড়ের মতো, হঠাৎ সেরাস্তায় গেলেন কী করে? অসঙ্গতিটা এইখানে — বুঝলেন তো! আপনার লেখার কোনো ভুলত্রুটি নিয়ে নয়।

সেই নির্বান্ধব প্রবাসে, ওলন্দাজ আমলে তৈরি এক জীর্ণ বাড়ির নির্জন ঘরে, এক বিরাট মানবের দক্ষিণ করস্পর্শে এসে স্পর্শ করল আমার অনন্ত মনটা।

আমার সমগ্র হৃদয় সেই মুহূর্তেই তাঁকে নিবেদন করেছিলাম।

কয়েকদিন পরে, সুনীতিবাবুর কলকাতার বাড়ির তেতলায় বইয়ে-ঠাসা দুটি ঘর পার হয়ে তৃতীয় ঘরটিতে প্রবেশ করতেই চারিদিকে স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্য থেকে উঠে এসে তিনি আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। বলিষ্ঠ বাহুর বেষ্টনে বড় উষ্ণ, বড় একান্ত সেই আলিঙ্গন। চোখে আমার জল এসে গেল। আনন্দাশ্রু। যেন মনে হল—অনেক অনেকক্ষণ তিনি আমাকে জড়িয়ে রাখলেন তাঁর বুকে। আমার এই নগণ্য জীবনে সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত যে সেটাই তাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

অবশেষে আলিঙ্গন শিথিল করে আমাকে বসতে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। পাশেই তাঁর শোবার খাটের ওপর সর্বত্র বই। রাত্রে ঘুম চোখে বোধহয় এক চিলতে জায়গা করে নেন কোনক্রমে এক পাশে। খাটের সামনের টেবিলে বই, চেয়ারে বই, বই চতুর্দিকে। বাংলাভাষায় যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো স্তরের লেখক বা পত্র-পত্রিকার সম্পাদক তাঁদের মগজের ফসল নিয়মিত পাঠাতেন তাঁর কাছে একটু মন্তব্য, একটু আশীর্বাণীর আশায়। তাঁর সেই জ্ঞান-তপস্যার ঘরে তাদের সবাইকে ঠাঁই দিতে তিনি অবশেষে মেঝেতে-পাতা মাদুর আশ্রয় করতেন মাঝে মাঝে। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় মাদুর থেকেই উঠে এসে আমায় আলিঙ্গনবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর ব্যস্ততা নিবারণ করবার জন্য সেই মাদুরেরই এক প্রান্তে বসে পড়লাম আমি। প্রথমটা হাঁই-হাঁই করে উঠেছিলেন। কিন্তু যখন বললাম—প্রখর গ্রীষ্মে বা বর্ষায় অথবা হাড় কাঁপানো শীতে পশ্চিমবাংলার গ্রামগ্রামান্তরে অনাহারে, অনিদ্রায় ঘুরে বেড়িয়েছি দীর্ঘকাল, যেন বেশ আশ্বস্ত বোধ করলেন তিনি। তারপর, আসনপিঁড়ি হয়ে মুখোমুখি বসলেন মাদুরের আর এক মুড়োয়।

পরনে অতি-সাধারণ এক সুতীর লুঙ্গি, গায়ে ততোধিক সাধারণ গেঞ্জি, চুল এলোমেলো। বেশবাসে কোনো বৈশিষ্ট্যই নেই, বৈশিষ্ট্য চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা দুই চোখের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে, স্বাতন্ত্র্য মেরুদণ্ড সিধে রেখে বসবার ভঙ্গিতে। বয়স তাঁর তখন চুয়াত্তর। এ-বয়সে দেহেমনে এত সজীব বাঙালী কমই দেখেছি।

কথাবার্তার শুরুতে আমি যে 'বরিশালিয়া, বাঙাল' সে-কথা শুনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অশ্বিনী দত্তের প্রসঙ্গ তুললেন, কথা পাড়লেন বরিশালের সেইসব হীরের টুকরো ছেলেদের সম্বন্ধে যারা জীবনমৃত্যু তুচ্ছ করে সন্ত্রাসবাদের ক্ষুরধার পথে হাসিমুখে এগিয়ে গিয়েছিল। পরে সখেদে বললেন—আমি মশায় বাঙালও নই ঘটিও নই, আমি বাটি। আমার পিতৃ-মাতৃকুলের এক অংশ বাঙাল, আর এক অংশ ঘটি। বাঙালের বা আর ঘটির টি নিয়ে আমি তাই বাটি। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী, তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ বিদ্যার এহেন এক পরিহাস-তরলিত চুটকি শুনতে পাব ভাবিনি। তখন অবাক হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু পরে, দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে, নিঃসংশয়ে জেনেছিলাম—দুনিয়ার বিস্তর সমাজ সঙ্গত কারণেই তাঁকে যে-সিংহাসনে বসিয়েছে, যেখানে তাঁর অধিকার অবিসংবাদিত, সেই মনিময় নিগড় থেকে কত সহজেই না তিনি নেমে আসতে জানতেন পথের ধুলোয় আমাদের মতো সাধারণের মাঝে। যাঁরা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে শুধু শুকনো এক মহা পণ্ডিত বলেই জানেন, তাঁরা তাঁর বহু দ্যুতিমান ব্যক্তিত্বের সামান্যই যে আঁচ করতে পেরেছেন সে বিষয়ে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ।

আলোচনার মোড় 'বাঁকুড়ার মন্দির' লেখাটার দিকে ফিরতেই বুঝলাম, এই স্বল্প-অধীত বিদ্যায় তাঁর দখল কিছু মাত্র কম নয়। সখেদে বললেন—আরে মশায়! গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়ানো আমাদের এই অমূল্য সম্পত্তির কত অংশ যে ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে অনাদরে অবহেলায়, কত যে ক্ষয়ে খসে পড়ছে প্রতিদিন, কে তার খবর রাখে। সরকার নিষ্ক্রিয়, জন সমাজ উদাসীন আর যে-পরিবারের মন্দির তার বংশধরেরাও হয় নির্লিপ্ত নয় অক্ষম। এক্ষেত্রে অন্তত উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তিগুলোর একটা ফোটোগ্রাফিক ডকুমেন্টেশন করে রাখাটা খুবই জরুরী। তা মশায়, আমার ছাত্রদের মধ্যে ছবি তুলতে পারে এমন দু'জনকে তো জপিয়ে বাজী করালুম, তারা বর্ধমান জেলা থেকে শুরু করবে। কিন্তু জানেন, চার বছর আগে তারা বর্ধমান রওনা হয়ে গিয়েছে, এখনও ফিরে আসেনি।

বাংলার ক্ষয়িষ্ণু মন্দিরবাদির তথ্য সংগ্রহ করা এবং লোপ পাবার আগে তাদের এক আলোকচিত্র-ভান্ডার গড়ে তোলার কাজে সুনীতিবাবু যে একদা অগ্রণী হয়েছিলেন সে কথা কম লোকই জানে। আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির' লেখাটা সেই জন্যই তাঁর নজর কেড়েছিল যা কখনই ঘটত না যদি তিনি শুধু ভাষাতাত্ত্বিকই হতেন।

লেখাটা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তার একটি ভূমিকা লিখে দেবার ব্যাপারে সানন্দে রাজী হলেন। বললেন—আমি তো মশায় এক পেশাদার ভূমিকা-লেখকে পরিণত হয়েছি। কিন্তু করি কি বলুন? বাংলা ভাষায় এখন এত ভাল ভাল কাজ হচ্ছে নানা দিকে যে, সেসব লেখক-গবেষকরা যখন এসে ধরেন একটু আশীর্বাণীর জন্যে তখন তাঁদের অনুরোধ ঠেলতে পারি না। আবার, এমন কাউকে যদি পাই যিনি আমারই এককালের পরিকল্পিত কোনো কাজ সুসম্পন্ন করেছেন যা আমি নিজে করতে পারিনি নানা কাজের ভিড়ে বা যোগ্যতার অভাবে, তাহলে তাঁকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরি। এই যেমন আপনাকে ধরেছিলুম একটু আগে।... কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নত হয়ে এল।

হঠাৎ যেন কি ভেবে প্রশ্ন করলেন—আপনার ধারাবাহিক লেখাটা তো প্রায় শেষ হয়ে এল। বইটা কোন প্রকাশককে দেবেন? কোনো সদুত্তর দিতে পারিনি। কলকাতার প্রকাশক মহলে তখন আমি একান্তই অপাঙ্‌ক্তেয়। গল্প-উপন্যাস লিখি না বলে এখনও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে মনে হয় না। অবশ্য এক প্রখ্যাত প্রকাশন-সংস্থার দুই অংশীদারের আহ্বানে তাঁদের সঙ্গে এক স্বল্পপরিচয়স্থায়ী আলোচনায় বসেছিলাম একদিন। যখন বুঝলাম সেই সাপ্তাহিকে ব্যবহৃত ব্লকগুলো তাঁদের ন্যোগাড় করে দিলে তবেই তাঁরা প্রকাশনার ঝুঁকি নিয়ে আমাকে বাধিত করবেন, তখন তাদের সঙ্গে আর বেশি সময় নষ্ট করিনি। শুধু বলেছিলাম—আমার ছবিগুলোর কিছু ইজ্জৎ আছে, সেগুলো তোলবার সময় মাঠঘাটের অমানুষিক পরিশ্রম ছাড়াও ডার্করুমে তাদের পরিস্ফুটিত করবার বেলায় এক-একটার পেছনে লেগে থাকি ঘন্টার পর ঘন্টা। বহুল প্রচলিত পত্র-পত্রিকার অবশ্য নিউজ-প্রিন্ট ছাড়া গতি নেই, ব্লক তৈরীর সময়ে পঞ্চাশ-ষাটের বেশি স্ক্রীনেও তাঁরা উঠতে পারেন না প্রযুক্তিগত কারণে। বাঙ্ময় ছবি তাঁদের হাতে মার খেলেও তার একটা সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বইয়ের কথা স্বতন্ত্র। তার আয়ু সাময়িক পত্রের মতো দুদিনেই ফুরোয় না। সেজন্য যেসব প্রকাশকের দৃষ্টি শুধু লাভের অঙ্কের দিকেই নিবদ্ধ তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বিশেষত এমন একটি বইয়ের ক্ষেত্রে যার উচ্চাশা ভাবীকালের কাছে একালের এক ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের আলেখ্য তুলে ধরা।

এসব কথাই সখেদে বললাম সুনীতিবাবুকে। তিনি কি যেন একটু ভাবলেন মনে মনে। তারপর বললেন—আচ্ছা, এ-দায়িত্বটা ছেড়ে দিন আমাকে, আমি ভার নিলুম।

কয়েকদিনের মধ্যেই যখন শিশু সাহিত্য সংসদ ও সরস্বতী প্রেসের কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, তখনই বুঝলাম, লেখকের পক্ষে উপযুক্ত (আবার বলি— উপযুক্তর) প্রকাশক যোগাড় করার বৃহত্তম বাধাটা কার হাতের জাদুস্পর্শে অন্তর্হিত হল। অথচ, আপনার জন্য এতো করলাম তত্তো-করলাম জাতীয় একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে শুনিনি কখনো। যখন প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগের কথাটা তাঁকে বললাম, আনন্দে বিগলিত হল তাঁর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল

চাইনি। শুধু বললেন—যাক্ মশায়, ছবি-গুলো আপনার মাটি হবে না। 'বাকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁরা সে-বইয়ের ছবিগুলির গুণগ্রাহী, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই—নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখে এই বিরাট পুরুষ যদি আমাকে সাহায্য না করতেন তাহলে এত পুনর্মুদ্রিত ফোটোগ্রাফ আমি তাঁদের কখনই উপহার দিতে পারতাম না।

ধারাবাহিক লেখাটা শেষ হবার দু সপ্তাহের মধ্যেই এক মাঝারি গুরুতর হৃদ্‌রোগের শিকার হলাম আমি। চুঁচুড়া থেকে অ্যামবুলেন্সবাহিত হয়ে পি জি হাসপাতালে এসে ভর্তি হলাম। খবর পেয়ে সুনীতিবাবু একদিন এসে বসলেন আমার রোগশয্যার পাশে। আমার অবস্থা উন্নতির দিকে শুনে আহ্লাদে আট-খানা বললেন—ভাল হয়ে উঠে, বয়েসযে বইটা বার করে ফেলুন। আমি এবার যাচ্ছি ইউরোপে আর স্যাটজিভা-লিথুয়ানিয়ায়। ফিরে এসেই ভূমিকাটা লিখে ফেলব।

তারপর, একথা-সেকথার মধ্যে হঠাৎ যেন এক অসংলগ্ন কথা মনে পড়ল তাঁর। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন—আরে মশায়! কলকাতায় কোনো পোস্টিং-এর অর্ডার পেয়েছেন নাকি? কিছু জানি না সে-বিষয়ে। তিনিও কোথায় কোন কলকাঠি নেড়ে এসেছেন তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন—পাবেন বোধহয় কয়েকদিনের মধ্যে। মনোমত একটা চাকরির পোস্টিং। তা মশায়। আমি তো তখন বিদেশে। ফিরে এসে নিশ্চয়ই দেখব আপনি নতুন কাজে জয়েন করেছেন আর গ্রন্থাকারে 'বাঁকুড়ার মন্দির'এর কাজ এগিয়েছে অনেকদূর।

হাসপাতালে শুয়েই সরকারী হুকুম-নামা পেলাম—আমাকে পশ্চিমবঙ্গের জেলা গেজেটীয়ারের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। পশ্চাৎপটের বৃত্তান্ত পরে শুনেছি এক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে। সুনীতিবাবু তখন বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আর প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় মুখ্যমন্ত্রী। দু-দিন তিনি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ গিয়ে হানা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। নানাভাবে তাঁকে বুঝিয়েছেন, কেন আমাকে কলকাতায় একটা লেখাপড়ার কাজ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কথা আদায় করে তবে তাঁকে ছেড়েছেন। অথচ, রোগশয্যায় আমার আনন্দ বিধানের জন্যও একটা কথাও বলেন নি আমাকে। জীবনে উপকার অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছি। কিন্তু দুঃখে অনুদ্‌বিগ্ন মন সুখে বিগতস্পৃহ, স্বেচ্ছায় অন্তরালবাসী এমন উপকারীর দেখা আর একটিও পাইনি।

আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, আমার দীর্ঘ চাকুরি-জীবনের শ্রেষ্ঠকাল গেজেটীয়ার গ্রন্থের সেই পাঁচটা বছর। সরকারী কর্ম-

সূত্রেই তখন পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল চষে বেড়িয়েছি, লক্ষাধিক মাইল পরিক্রমা করে প্রায় আড়াই হাজার গ্রামে উপস্থিত হতে পেরেছি, গ্রামীণ জীবনের যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি, ছবি তুলেছি। সেসব তথ্যে তিরিশটি মোটা ফিল্ড নোটবুক ঠাসা আর নেগেটিভের সংখ্যা কম-বেশি দশ হাজার। এই অমূল্য সঞ্চয় এক মহাপুরুষের নিছক দয়ার দান। আমি কিছু পরিশ্রম করেছি সত্য। কিন্তু সেই মহতোমহীয়ানের শুভ করস্পর্শ আমার ললাটে না লাগলে সে-পরিশ্রমটুকু করবার অবকাশই পেতাম না।

এই গভীর কৃতজ্ঞতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁর পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসেছি বারংবার। সঞ্চয়ের থলিতে কি কি সম্পদ জমা পড়ল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি তা শুনেছেন। একটা সংশয় নিয়ে একদিন গিয়ে হাজির হলাম। তখন হুগলি জেলা গেজেটীয়ার রচনার কাজ চলছে। জানাই সে-জেলার এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রাম। সেখানকার জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় মন্দিরাদিও বিশেষত্ববর্জিত নয়। গেজেটীয়ারে তাদের স্থান-লাভ সম্পর্কে কোনো স্থিরমত নেই। সন্দেহ জাগল সেখানকার প্রখ্যাত মিষ্টান্ন 'মনোহরা' নিয়ে। তারও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। আছে জনচিত্তচঞ্চলী প্রভাবের কথা। কিন্তু গেজেটীয়ারের মতো গুরুগম্ভীর (হয়ত বা উন্নাসিক) সরকারী প্রকাশনায় তাকে স্থান দেওয়া কি সমীচীন হবে?

সুনীতিবাবু যে ভোজনবিলাসী ছিলেন ভাষাতত্ত্বের মহাপণ্ডিতের পক্ষে তা কি

চতুর্থ মুদ্রণ
প্রকাশিত হয়েছে
শঙ্করপ্রসাদ রায়ের
তুষার তীর্থ
অমরনাথ ১০৲
ইলোরা প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স
২৮ ডোভার রোড, কলিকাতা-১৯

রসজ্ঞহীন ?) সেকথা অনেকেই জানেন। তাঁর মুখ থেকে পৃথিবীর তাবৎ দেশের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের সরস বিবরণ শোনা ছিল এক চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা। জনাই-এর 'মনোহরার'র কথা পাড়তেই যেন লাফিয়ে উঠলেন। তারস্বরে বললেন—আলবত্ লিখবেন মশায়, হবুগঞ্জ লিখবেন! গেজেটীয়ার, তাতে ভরটা কিসের ? যেসব পুরাকীর্তি, যেসব আচার-আচরণ আজ আছে, কাল থাকবে না তাদের কথাই তো মশায় বেশি করে লেখা দরকার গেজেটীয়ারে। জনাই-এর মন্দিরের কথা যখন লিখতে পারছেন, 'মনোহরা'র কথা পারবেন না কেন ? মন্দিরগুলো তবু হয়ত টিকবে কিছুদিন। কিন্তু আপনাদের এই ছানা কন্ট্রোল অর্ডার না অম্বডিম্ব কন্ট্রোল অর্ডারের কল্যাণে ছানার তৈরী যাবতীয় মিষ্টি তো মশায় কলকাতা থেকে নির্বাসিত। (কলকাতা এলাকার সে-আইনটা তখন চালু ছিল)। শুধু 'মনোহরা' কেন, ময়রা-আর্টের যাবতীয় সুকুমার সৃষ্টির নাভিশ্বাস উঠেছে বহুদিন আগেই। একেবারে লোপ পেতে আর দেরি নেই। সেই জন্যেই তাদের কথা লিখবেন, বিশদভাবে লিখবেন।....

যখন তাঁকে বললাম—পশ্চিমবাংলার স্থানে স্থানে একদা যেসব সুপরিচিত মিঠাই প্রস্তুত হত, গেজেটীয়ারে ব্যবহারের জন্য আমি তাদের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছি—একটা ভিন্ন চিন্তা যেন তাঁর মাথায় খেলছে মনে হল। জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মোট সংখ্যা কত ? বললাম—পঁচিশ তিরিশ। মাথায় সেই চিন্তা নিয়ে তিনি নীরবে উঠে গেলেন তাঁর লাইব্রেরী ঘর বুটির দিকে। ফিরে এলেন, কয়েকখানা বই হাতে নিয়ে। বাঙালীর ভোজ্য পানীয় সংক্রান্ত সেসব বই—বৈদিক যুগ থেকে হাল আমল পর্যন্ত। এখন বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে, বাঙালীর জীবন থেকে মিষ্টান্ন বিলোপের চক্রান্তে এখন তিনি আর উত্তেজিত নন। বইগুলো আমার হাতে দিয়ে বললেন—একটা কাজের ভার আপনাকে দিচ্ছি অমিয়বাবু ! (হায়। শত চেষ্টাতেও তাঁর কাছ থেকে 'বাবু' শব্দাংশবিহীন 'তুমি' সম্বোধন আদায় করতে পারিনি যদিও আমি তাঁর ছাত্রস্থানীয় তো বটেই পুত্রস্থানীয়ও বটে। কিন্তু সে অন্য কথা।) বইগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে বসতে বলে যেন ধরাধরা গলায় বললেন—কাজটা আমারই করা উচিত ছিল, পেরে উঠিনি নানা কারণে। এ-কাজটার ভার আপনিই নিন। তাঁর সেই সতেজ গলা একটু কি ম্রিয়মাণ শোনাল ? বললেন—শুধু মিষ্টান্ন নয়, একটা বড় বই আপনাকে লিখতে হবে অমিয়বাবু! —'বাঙালীর আহার'। বেদের কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি। এ বইগুলো থেকে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাবেন আপনার কাজের। পরে আরো বই, আরও হদিস দেব আপনাকে।....

আমি যে বাংলায় নাম-লেখানো ছাত্র ছিলাম না কোনোকালে তা তিনি জানতেন। হঠাৎ সেকথা বুঝি মনে পড়ল তাঁর। বললেন —মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে, বিশেষত মঙ্গল-কাব্যগুলোয়, বাঙালীর আমিষ-নিরামিষ আহারের যেসব দীর্ঘ বিবরণ আছে, সেগুলো তো আপনাকে সংগ্রহ করে দিতে হয়! দেখি কি করতে পারি।

উঠে গিয়ে টেলিফোনে ধাঁকে ধরলেন, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে কথা পাকা করলেন, মাসখানেক পরে আমি তাঁর কাছ থেকে তাঁর-আহরিত প্রয়োজনীয় নোট্স নিয়ে আসব। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুকৃত্য যথাযথভাবেই পালন করেছিলেন। তাঁর নিজের হাতে লেখা সেই বিশদ অনুলিখন এখনো আমার ফাইলে বন্দী। কিছু কাজ করেছিলাম, পাঁচ বছর পূর্বের এক সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনার আগে অবধি। তারপর বাঁচার লড়াইটা জেতবার প্রয়াস এতই সর্বাত্মক হয়ে দাঁড়ায় যে, আর অগ্রসর হতে পারিনি। গত বছর এরকম সময়ে সুনীতিবাবুর মরদেহের পায়ের কাছে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা রেখে যখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলাম, তখন বড় বেদনার মতো এই কথাটাই বারবার মনে পড়েছিল—তাঁর দেওয়া এ-কাজটা তাঁর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ করতে পারিনি। এই ব্যর্থতা, এই গ্লানি হাহাকার তুলে আমাকে অভিভূত করে মাঝে মাঝে। ব্যাধির বিরুদ্ধে চোয়াল-শক্ত-করা লড়াইটা চালাতে চালাতে প্রতিজ্ঞা করি—সেই গুরুকৃত্য সমাধা করবার আগে আমার যেন মৃত্যু না হয়।....

এবার একটু পিছু হটে ধাঁকুড়ার মন্দির'-এর ভূমিকা লেখার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ল্যাটভিয়া-লিথুয়েনিয়া থেকে ফিরে আসতেই ডাক পড়ল আমার। বই-এর কাজ বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে শুনে তিনি তো মহাখুশি। কিন্তু অনতিবিলম্বে আবার বেরোলেন বিশ্ব-পরিক্রমায়। এবারকার ভ্রমণসূচীতে ওয়েস্ট-ইন্ডিজ, ইস্ট আফ্রিকা, স্যাভাগাস্কর। প্রকাশনার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে ভূমিকা লিখে দেবার একটা দিন স্থির করে গেলেন—পয়লা ডিসেম্বর, ১৯৬৪।

সুনীতিবাবুর সেবারকার যাত্রাটা বোধ হয় শুভ ছিল না। সফরের প্রায় শুরুতে, জ্যামাইকায়, কলকাতা থেকে কেবল্ পেলেন—তাঁর স্ত্রী গুরুতর পীড়িত। বাকি সফর বাতিল করে বাড়ি ফিরে এলেন সরাসরি। খবর পেয়ে দেখা করতে গেলাম। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তখন যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। পাঠক-পাঠিকা বিশ্বাস করুন—সেই সংকটমুহূর্তেও একবার বললেন—আপনার বই-এর ভূমিকাটা লিখে দেবার তারিখ স্থির করেছিলুম পয়লা ডিসেম্বর, তার তো আর দেরি নেই। তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম বারংবার—এসব তুচ্ছ কথা যেন একবারও মনে না আনেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় ভাল হয়ে উঠুন, তারপরে ধীরে সুস্থে সব হবে।

কয়েক দিন পরে ফোনে ডাকলেন আমাকে। উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর। বললেন—আজ আমার স্ত্রী বিছানায় উঠে বসেছেন, কথা কয়েছেন, ডাক্তাররা বলেছেন তাঁর অবস্থা উন্নতির দিকে। এই সুযোগে মশায় আপনার বই-এর ভূমিকা লিখে ফেলেছি দু পৃষ্ঠা। তা আপনি একবার এসে ধরতাইটা ঠিক করে দিয়ে যাবেন তো। সেই দিনই গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, ভূমিকার দু পৃষ্ঠা সর্বজনস্তবের উর্ধ্বে চমৎকার লেখা। বাকি অংশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলেন। সহজেই বুঝলাম, বক্তব্য বিষয়ে তাঁর দখল প্রগাঢ়। খুশি মনেই বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন।

কিন্তু নির্মমতার কথা কে বলতে পারে। নিরন্ত্র দীপশিখার শেষ উৎক্ষেপের সঙ্গে মুমূর্ষুর দেহত্যাগের কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় মারা গেলেন ঠিক তার পরদিন। সে সময়ে সুনীতিবাবুকে মনে হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। এত বিচলিত, এত শোকাকুল তাঁকে আর কখনো দেখিনি। কিন্তু সামলে নিলেন দু-চার দিনের মধ্যেই। আমার ডেকে পাঠাতেই গেলাম তাঁর কাছে। দেখলাম, তিনি এগারো দিন-ব্যাপী অশৌচ পালন করছেন। প্রথাগত বেশ-বাস, প্রথাগত আহারবিহার। কিন্তু খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-ওঠা মুখে সেই একই প্রশান্তি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই একই দ্যুতি। গম্ভীর মুখে বললেন—ভূমিকা লেখাটা আবার হাতে নিয়েছি, পয়লা ডিসেম্বরই দিয়ে দেব। তাঁকে নিবৃত্ত করতে কত কাতর অনুনয়ই যে সেদিন করেছিলাম। কিন্তু তাঁর সংকল্প থেকে তাঁকে টলাতে পারিনি।

১৯৬৪ সালের পয়লা ডিসেম্বরই ভূমিকার চূড়ান্ত কপিটা পেয়েছিলাম। এই মহামানবের কেনা গোলাম হয়ে গিয়েছিলাম সেদিনই। আজও তা-ই আছি। আমরণ তা-ই থাকব।

যষ্টি-মধু

ব্যঙ্গ-পত্রিকা — পরিচিতি সংখ্যা প্রকাশিত হলো। অমূল্য সম্পদ ৩.০০..

সম্পাদক—কুমারেশ ঘোষ

।। কবিপাধারা ।। কলকাতা-৫৪

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

১। আঠারো টি।

সকালের ডাকে হরি ভাক্তারের চিঠি এসেছে। আবুধাবি থেকে। দূর থেকে অনেক দিন পরে কারও চিঠি পেলে দিলীপের খুব ভালো লাগে।

প্রিয় দিলীপ,

এদেশে এলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোত। এখানে পেট্রলের লিটার আমাদের টাকায় মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। সুপারমার্কেটে যাওয়ার সময় লোকে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে না। পেট্রল ওদের কাছে জলের চেয়ে অনেক কম দামী। বরং খাবার জলের কদর আছে। এক গ্লাস এক টাকা। আমি আছি তেলের ব্যবসার এক হালপাতালে। এখানে চুক্তিতে কাজে বিয়ে বসা যায়। ছ' মাস, আট মাস, এক বছর, দু' বছরের জন্যে। তারপর ছাড়াছাড়িতে কোন আপত্তি নেই। আমি আট মাসের জন্যে একটি চুক্তি করেছি।

আমার ইচ্ছে তুমি এখানে চলে এসো। তোমার মনমত সবচেয়ে সস্তায় এখানে গাড়ি মেইনটেন করতে পারবে। অনেক ঘুরেও সারা মাসে তেল খরচ দেড়শো টাকার ওপর নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা গাড়ি—সবচেয়ে সস্তায় তুমিই চালাতে পারবে। তোমার ডিজম অনুযায়ী। এখানে রিপেয়ারিং চার্জ বেশি বলে অনেক ইমপোর্টেড গাড়ি—বলতে গেলে—বাট ফর এ সঙ্-এ হাফ বদল চয়। এই ধরো আমাদের টাকায় ন'শো মাত্র। তুমি ভালো করে বাচ দেখলে চাইকি বিনি পয়সায় অমন চকচকে একটা গাড়ি পেয়ে যেতে পারো। আমি থাকতে থাকতে চলে এসো।

ঋষির খবর কি? খাদান কদ্দুর? গোকুলদা এখানে এলে ডবল বে করতে পারতো। এখানে গোকুলদার মত ভিরাইল লোকের ডিমান্ড খুব বেশি। বলে দিও গোকুলদাকে।

তোমরা কি আমার চেম্বারে আর বসছো না? জায়গাটা একটু দেখাশোনা কোরো—

আর পড়তে পারলো না দিলীপ। ভাদ্র মাসের সকালে বৃষ্টি ধোয়া রোদ্দুর। চারদিক ঝকঝক করছিল। দিলীপ গোড়ায় বুঝতে পারছিল না—কেন তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। চোখ তার ঝুরে এলো। খোলা চোখ

দিয়ে আপনা-আপনি দু ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো। ব্যালকনিতে বসে, দূরের ময়দান—হাওড়া ব্রিজের কংকাল—সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ঘরের ভেতর মালবিকা ভারি পায়ে হাঁটাহাঁটি করছিল। ওর তো এখন যেকোন দিন ডেলিভারি হতে পারে।

আমি কাঁদছি কেন? চার পেগের পর আমি সত্যি সত্যি এক একদিন বেকোন রেকর্ডের সঙ্গে নাচতে পারতাম। শরীরটা সুর ধরে নিয়ে লাফাতো। একদম স্প্রিং। তখন বন্ধুতের হালকা বাতাসে ভেসে বেড়াই। দিনগুলো বড় সুন্দর ছিলো। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। আমি তো আর ঋষির খবর জানি না। আর আগে? কতো জানতাম! এখন আমি ঋষির মনের খবর জানি না। এ কি আমার পাগলামি? ঋষির কি একবারও মনে হয় না—দিলীপ ছাড়া আমি আসলে কেমন আছি? কেমন কাটছে আমার?

চোখ মুছে ফেললো দিলীপ। কেউ দেখতে পায়নি। এই বিশাল আকাশে ব্যালকনিটা ঝুলে আছে। দিলীপ উঠে গিয়ে নিজেই ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করলো। এমন সময় ডোর বেল বেজে উঠলো।

দরজা খুলে দিলীপ অবাক। কি মনে করে গোপাল?

চলে এলাম খুঁজে খুঁজে। যদি কোন গাড়ির দরকার থাকে—

বোসো। কি গাড়ি আছে?

গাড়ি তো অনেক আছে। কি দরকার আপনার?

সে তো আমিই জানি না। ধরো যে-গাড়ির দাম সবচেয়ে কম। তেল খাবে সবচেয়ে কম।

গ্যালনে একশো দশ কিলোমিটার ছুটবে—আনকোরা ইমপোর্টেড ফিয়াট আছে একখানা। নেবেন? ফোরসিটার। শাদা রংয়ের ছোট্ট গাড়ি—

দাম কত?

তা পয়ষট্টি পড়বে।

ফোর সিটার পয়ষট্টি হাজার—?

তা তো পড়বেই। তেল খরচটা কত কমে যাচ্ছে বলুন। বাঁশগাছে! আমি অন্য কাজে এসেছি আপনার কাছে।

কি ব্যাপার গোপাল?

গাড়ি নয়। শুনে আপনি হাসবেন। ভালো করে গান শিখতে চাই আমি। লোকে বলে আমার গানের গলা মুকেশের মত। চাই কি শিখে-টিখে আমি মুকেশের জায়গাটা নিতে পারি। মানুষ ইচ্ছে করলে তো সব পারে।

তা পারে গোপাল।

অনেক আগে আমি যাকে গাইতাম। বলেছি বোধহয় আপনাকে।

বলে থাকতে পারো। কত কথাই তো বলেছো।

বান্দির লরি চালাবার আগে কলকাতার তিন-চারজন বাবু গেয়েছি।

কি গান?

ফিলমি সং। হিন্দি ছবির গান। মুকেশ, কিশোর, রফি—সবার গানই আমি দরদ দিয়ে গাইতে পারি। এখন যে ছেলেটা গাইছে—ওর চেয়ে খারাপ গাইবো না। যদি ভালো তালিম পাই—

গাড়ি কোনবেচা করবে না?

অনেক দিন তো করলাম। এবার একটু মুখ বদলাই। আপনি আমার গান শেখার ব্যবস্থা করে দিন।

অবাক হয়ে তাকালো দিলীপ। এরই ভেতর গোপাল দাবি করতে শুরু করেছে। কতটুকুই বা আলাপ।

গোপাল ফিরে বললো, আমার কোথাও নাড়া বাঁধতে হবে। সেসব আপনাকে করে দিতে হবে। আমি বছরখানেক তালিম পেলে সব পারবো। কেউ আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

বেসমেন্ট থেকে গাড়ি বের করে দিল গোপাল। বললো, কোনদিকে যাবো বলুন?

আস্তে আস্তে ময়দানের দিকে চলো।

গোপাল আদৌ আস্তে চালাতে পারে না। অনেকগুলো গাড়ি ওভারটেক করে গোপাল যখন রেসকোর্সের গায়ে গাড়ি দাঁড় করালো—তখন মাথার ওপর তিনখানা মেঘ ওই এরিয়ায় গুড়ো গুড়ো বৃষ্টি ফেলতে লাগলো। এখানে এলেন যে?

নির্জন আছে। তোমার গান শুনবো একটু। কোন গান—

মুকেশ ভালো লাগে আপনার?

কোন গান—

গোপাল গলা খুলে গাইতে লাগলো। হিন্দি ছবির দুঃখের সিনের গান। একটু চন্দ্রবিন্দু ঘেঁষা গলা। বলা যায়—এটাই গোপালের গায়কী।

দিলীপ ওকে থামিয়ে বললো, চলো তাহলে। আজই আলাপ-পরিচয় হোক। আমার ক্লাশ ফ্রেন্ড। সাগর রায়ের ক্লাসিকাল রাগপ্রধান এখন সব ফাংশনেই থাকে। ওর কাছে একটি বছর তালিম পেলে তোমার আর ভাবনা নেই—

দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি বড় ফ্ল্যাট-বাড়িটার তেতলায় ওরা দুজন যখন সাগর রায়ের বসবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো—তখন সাগর নিজের ঘরের কার্পেটে বসে একা একা তানপুরা নাড়ছিল।

দিলীপকে নিজের পরিচয়ও ঝালিয়ে নিতে হোল। অনেকদিন দেখা নেই। কলেজ ছাড়ার পর সবারই চেহারা পালটে গেছে। তারপর আসল কথাটা পাড়লো দিলীপ। গলা ভালো। তুমি শুনে দ্যাখো সাগর।

তা তো শুনবো। কিন্তু ওর জন্যে আমার যে আর সময় বের করবার উপায় নেই দিলীপ। সারা হপ্তা জুড়ে আমি সাতদিনের জন্যেই বুকড্।

তাহলে ও তোমার সামনে এসে বসে থাকবে। শুনে শুনে যা তালিম পায়—

তালিম না নিলে কোন শিষ্য কিছু শেখে না। আর শুধু সামনে বসে তালিম হয় না। বরং এক কাজ করুক। রবিবার রবিবার দুপুরবেলা চলে আসতে পারে।

তখন তো তোমার স্টুডেন্ট আসবে।

না। ছাত্ররা আসে তিনটে নাগাদ। খেয়ে উঠে যে-সময়টা শুয়ে থাকি—তার খানিকটা বের করে নেব। সেই সময়টা যদি ওর কাজে লাগে।

স্যার। আপনার তখন শেখাতে কষ্ট হবে।

কিচ্ছু না। তুমি পারলেই হোল। একটা গান শোনা যাক তৎক্ষণ। কেমন গলা শুনে দেখি।

গাইতে গিয়ে গোপাল নার্ভাস হয়ে পড়লো। সে কোনদিন কারও কাছে কিছু শেখেনি। রেডিও রেকর্ড সিনেমা থেকে শুনে শুনে গান তুলেছে।

গাও না। ভয় কিসের।

তবু গোপাল গলা খুলতে পারছিল না।

সাগর রায় আবার সাহস দিলো। দিলীপ বললো, আমি একটু আসছি।

কোথায়?

সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।

বোসো। আনিয়ে দিচ্ছি।

ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এখুনি আসছি সাগর।

বেশ বড ফ্ল্যাটবাড়ি। দুদিকে ঘোরানো সিঁড়ি। দিলীপ বাঁদিকের সিঁড়িটা ধরবে বলে এগোচ্ছিল। তার আগেই আরেকজন তাকে ধরে ফেললো।

আধো-ভেজানো দরজার ভেতর থেকে একখানা হাত এসে দিলীপের কাঁধ ধরে ফেললো। তারপর তার হাত ধরে একটা ঘরে টেনে নিলো তাকে।

দিলীপের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠলো। একদম হকচকিয়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো প্রায়।

আস্তে। নন্দন ঘুমোচ্ছে।

ঘরের ভেতরকার অন্ধকার সয়ে আসতেই দিলীপ চমকে উঠলো। তুমি স্বাতী। একদম ডিটেকটিভ বইয়ের মত আচমকা আমায় টেনে আনলে—

নাহলে তোমায় চমকে দিতাম কি করে! সাগরবাবুর ওখানে এসেছিলে? কে গান শিখবে?

কোন জবাব না দিয়ে. দিলীপ বললো, তুমি এখানে? কতদিন?

এখানেই তো চলে এসেছি। সুধীর অসহ্য জানে না। নন্দনকে একদিন চুরি করেছিলো। তুমি তো জানো।

চুরি কেন বলছো? সুধীরেরই তো ছেলে নন্দন। বাপ হয়ে ছেলেকে দেখতে চাইবে না?

ওইটেই তো মুশকিল হয়েছে। আমি আছি এ-বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে। আমাদের জনাশুনো সুলতাদির বাড়ি এটা। মিড-ওয়াইফারি করেন হসপিটালে। এই তো এখন ফেরার সময় হয়ে এলো।

নাইট ডিউটি?

হ্যাঁ। মাসের ভেতর অন্তত বিশদিন। তোমার কথা ওকে বলেছি।

শুনেটুনে কি বললেন?

বোসো না।

না। আমি সিগারেট কিনতে বেরিয়েছি। ওরা ওয়েট করবে।

করুক গিয়ে। তুমি বোসো তো।

সারাটা শরীর দিয়ে দিলীপকে ঠেলে নিয়ে স্বাতী বড় একটা সোফায় বসিয়ে দিল। এখান থেকে ফ্ল্যাটটা পরিষ্কার দেখা যায়। পুরনো কাঘদার ভেতর বেশ নতুন করে গোছানো। জানলাগুলোর ওপর কাঠের পেলমেট। কলের মুখ লাগানো কুজো।

ছেলে এতবেলা অব্দি ঘুমোচ্ছে? তুলে দাও।

না। ঘুমোক। কাল স্কুলে ডিল্লে এক-জামিন ছিলো। সন্ধ্যে অব্দি। অন্য কথা তুলো না। আমি একটা কথা বলতে চাই তোমায়—

সিগারেটটা কিনে আনি আগে। ওরা বসে আছে—

থাকুগগে। আর সময় হবে না হয়তো। তোমার সঙ্গে সুধীরের সেপারেশন হয়ে গেছে। ও এখন নন্দনের দখল চাইছে। সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। তুমি একটা ব্যাপারে আমায় সাহায্য করতে পারো। ওর একজন বাবা দরকার।

বাঃ! নিজের বাবা থাকতে আমার বাবা ডাকবে কেন!

তোমাকে ও রেসপেকট্ করবে। তুমি লোভী নয়। এসো। আমরা একসঙ্গে থাকি। আমি ভীষণ আনপ্রোটেক্টেড। এক এক সময় ভয় করে দিলীপ—

তোমার তো ভয় করার কথা নয় স্বাতী। দিব্যি অজানা স্যার লেজলি উডের সঙ্গে মিশে গেলে সেবারে—

সেটা তোমার প্রয়োজনেই দরকার ছিল দিলীপ।

তাই বলে অতটা?

তুমি কেন পালিয়ে এসেছিলে দিলীপ। সহ্য হয়নি? তাই না?

এই সকালবেলা ঝগড়া করে কি লাভ। তোমার কমিশন তো চেকে পাঠানো হয়েছিল।

হ্যাঁ। মোটা টাকার চেক। দুজনে একসঙ্গে থাকলে আরও বড় অঙ্কের চেক পেতাম। এসো। আমার সঙ্গে এখানে থাকবে। বৌদিকে জানাবার দরকার নেই। আমাদের বিয়েরও দরকার নেই। নন্দন বড় হয়ে বুঝবে। তখনো তোমাকে সমান রেসপেক্ট করবে। আজকাল একা আমার ভীষণ ভয় করে। বয়স হচ্ছে। পুরুষলোক তবু আমার দিকে না তাকিয়ে পারে না—

তাদের দোষ কি। তোমার স্কিন যে ভালো!!

এভাবে বোলো না দিলীপ। এসো। আমরা একসঙ্গে থাকি।

আমি যে কোন দিন দাদু হবো। এখন কি আর নতুন করে পারবো?

দাদু?

হ্যাঁ। রবির বউয়ের বাচ্চা হবে।

বিয়ে দিলে কবে?

দিলীপ শর্টে সেরে দিল। এইতো। বছরখানেক। তোমার সঙ্গে চারাগানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরেই তো সব হয়ে গেল। কাউকে খবর দিতে পারিনি।

তুমি এখনো টাইট আছো দিলীপ। দিব্যি আরেকটা বিয়ে করতে পারো। পুরুষলোকের আবার বয়স কিসের! আমাদের কোন অভিভাবক নেই দিলীপ। বেশ মাথার ওপর থাকবে।

ভালো চাকরি।

ঠাট্টা কোরো না। নয়তো আমি যে কোনদিন সুলতাদি হয়ে পড়তে পারি। বলতে বলতে অন্ধকার কার্পেটে হাঁটু মুড়ে স্বাতী দিলীপের কোলে মাথাটা রাখলো। নিরুপায় অবস্থায় দিলীপ স্বাতীর পিঠে ডান হাত রাখলো। জানলার আলোয় স্বাতীর পিঠটা পরিষ্কার বলে দেয়—শরীর চর্চায় কোথাও মেদ জমতে দেওয়া হয়নি—অসম্ভব ভালো স্কিন—যা ভালো রাখবার সব নিয়মকানুন স্বাতীর নখদর্পণে। তাই বয়স এখানে পিছু হটে গিয়েছে।

দিলীপের পাঞ্জাবির ওপর মুখখানা রেখে স্বাতী যা বললো—তার মানে দাঁড়ায়—সে সুলতা হয়ে যেতে পারে। কোন কোনদিন বাড়ি ফেরে সুলতাদি। আবার ফেরেও না। তিন-চারদিন পরে ফিরে এসে টানা দুদিন ঘুমোয়। তখন খদ্দের এলেও ফোন ধরে না, নামিয়ে রাখে—।সেও সুলতা হয়ে যাক—দিলীপ কি তাই চায়?

দিলীপ আস্তে বললো, উঠে বোসো। সিগারেট কিনে আমায় এখুনি ফিরতে হবে। সুলতা হওয়ার দরকার কি? তুমি রিউটিসিয়ানের কাজ করো। ওটাই তো তোমার প্রফেশন।

মাথা তুলে তাকালো স্বাতী। সে উপায় নেই দিলীপ। চেম্বার করবো বলে যে কটা টাকা জমিয়েছিলাম—তার বারো আনা চলে গেলো সুধীরের সঙ্গে মামলায়। তারপর সুলতাদি প্রায়ই ছুতোনাতায় টাকা চেয়ে নেয়। ফেরৎ দেওয়ার নাম নেই। নন্দনের স্কুল আছে আমাদের খাওয়া-দাওয়া আছে। কি থাকতে পারে হাতে! দুটো ফিকসড ডিপোজিট ভাঙা হয়ে গেছে।

কাউকে বিয়ে করো তুমি। তাহলে সব চিন্তা তার ঘাড়ে পড়বে। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সবাই ভালোবাসতে চায় দিলীপ। বিয়ে তো কেউ করতে চায় না।

ছ্যা কেন? একটু বেশি বয়সের পুরুষ দ্যাখো। যার সঙ্গতি আছে এমন লোক। সে তোমায় মাথায় করে রাখবে।

সেরকম পুরুষ আর কোথায়। তাদের তো বিশ বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে। আমি কি খুব খারাপ দেখতে হয়ে গেছি?

তা কেন? তুমি তো রীতিমত সুন্দরী।

তাহলে তোমার আপত্তি কিসের দিলীপ?

আমার কথা বাদ দাও। আমি এমনিতেই ভালো নেই।

কি হোল আবার?

আমি স্বাতী মোটা হয়ে যাবার রোগে ভুগছি। তাছাড়া আমি তো আর সে আমি নেই। তোমার কাজ চালানো গোছের ঠেকা দিয়ে যাবার মতও যোগ্যতা আমার আর নেই।

একথা বলছো কেন দিলীপ?

আমি আজকাল আর অবাক হতে পারি না। বিস্মিত কথাটা আমার কাছে এখন মিনিংলেস। সকালে ঘুম থেকে উঠে তো সেই একই জীবন। ভীষণ বাসি লাগে স্বাতী।

বৌদি তো এতটা অসাবধানী নয়। বৌদি কি কোন খোঁজই রাখে না তোমার?

আমরা তো অনেকদিন একসঙ্গে আছি। বাণী মনে করে—আমি আছি মানে থাকবোই। আমি বাণীর কাছে—একদম—ফর গ্র্যান্টেড। শালগ্রাম শীলা! কোন অদল-বদল নেই। অজয় অমর অক্ষয়!

আমার সঙ্গে থাকো। আমি তোমার নতুন করে দেবো দিলীপ। পুরুষকে যা লাগায় তার খোঁজ আমি রাখি।

বাঃ। বেশ সুন্দর বাংলা বলছো তো। আমি উঠি। এবার ওরা নিশ্চয় খুঁজতে বেরিয়েছে।

স্বাতী কিছু বলবার আগেই খোলা দরজা দিয়ে দিলীপ টুক করে বেরিয়ে পড়লো। পেছনে তাকাতে তার সাহস হোল না। দৃশ্যটা সে জানে। আধো খোলা দরজায় মুগা সুতোর ফুলতোলা পাড়ের তাঁতের শাড়ি পরে সকালবেলাকার স্বাতী দাঁড়ানো। চমৎকার স্কিন। মুখের ব্যায়াম আর ওষুধ-বিষুধের দরুন গালে কোথাও চর্বি জমেনি। টান টান চোখ। বড়। নাকের নিচের রিংকলস প্রসঙ্গে অনেকদিন আগে স্বাতী একবার বলেছিলো শশার রস ঘসলে কোন দাগ থাকে না। স্বাতীর এ কথাটা যে আমি কেন ভুলতে পারি না।

বেশি বেলায় সাগর বাবার বাড়ি থেকে গোপালকে নিয়ে বেরুলো দিলীপ। সাগর বললো, তোমার কোন পয়সা দিতে হবে না ভাই। একখানা বাঁধানো খাতা এনো। যা বলবো লিখে রেখো।

দিলীপকে সাগর বললো, ছেলেটার গলার বেস ভালো। তবে সংস্কার দরকার।

গোপাল গাড়ি চালিয়ে দিলীপদের ফ্ল্যাট বাড়ির বেসমেন্টে এসে পৌঁছালো। আজ সে উৎসাহে আনন্দে ফেটে পড়ছিল: গাড়ি লক করতে করতে দিলীপকে বললো, জানেন স্যার— যখন বালি বোঝাই লরি ড্রাইভ করে শেষরাতে গোহাটি ঢুকতাম—তখনো আমার গলায় গান থাকতো। সারা রাত হাইওয়ে দিয়ে চালাতাম। এন এইচ

থার্টি কোর। এন এইচ থার্টি সিকস। এক এক হাতে একই গান তিরিশবার গেয়েছি স্যার—

এখন গোপাল তুমি নিয়ম করে গান শিখবে। এখন আমাকে যা কাউকে স্যার বোলো না।

কেন স্যার ?

এ তো আর গাড়ি কেনাবেচা নয়। তাই না ?

আপনি যা বলবেন স্যার। সবি—

গোপাল চলে যাচ্ছিল। দিলীপ তাকে থামালো। পেছন দিকটা খুলে দাও। বউমার জন্যে কটা ডাব কিনেছি—

গোপাল চলে যেতে দিলীপ তিনটে ডাব নিয়ে বেসমেন্ট থেকে বেরোচ্ছিল। ফেরার পথে গাড়ি থামিয়ে কিনেছে। মালবিকার এখন ডাবের জল ভালো লাগবে। এক একদিন ডাবের গরমে সারা ফ্ল্যাট-বাড়ি ভেতে থাকে।

মাটির নিচে বেসমেন্টে প্রায় তিরিশ-খানা গাড়ি থাকে। তাছাড়া থাকে ওপরে। এখন বেসমেন্ট প্রায় ফাঁকা। সেই ফাঁকা বেসমেন্টে গুলির মতই একটা কথা ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। একদম অর্ডারের ভঙ্গীতে।

দাঁড়াও।

প্রথমবার বুঝতে পারলো না দিলীপ। বেসমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিলো প্রায়। আবার দাঁড়াও কথাটা রিবাউন্ড করে তার কানে আছড়ে পড়লো। দিলীপ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, কে?

দুটো অ্যামবাসাডরের পেছন থেকে রোগা মত টাপু বেরিয়ে এলো। মাল্টি-স্টোরিডের চওড়া কলমের গায়ে বিল্ট-ইন সুইচ। সেটা টিপে দিতেই টাপুর পুরো চেহারাটা দেখতে পেল দিলীপ। রক্তচক্ষু। ডান হাতে খালি সোডার বোতল একটা।

কিরে টাপু। এটাই তোদের আখড়া হয়ে গেল !

আজ দিলীপদা তুমি আমার ফ্রেন্ড হবার চেষ্টা কোরো না। আজ আমি একটা ফয়সালা চাই—

কতটা খেয়েছিস ?

তাতে তোমার কি দরকার ?

কোথাও বাজিয়ে টাকা পেয়েছিস নিশ্চয়। এভাবে ওড়াসনে। তুই তো আমাকে অ্যামপ্লিফায়ার কিনে দিতে বলেছিলি। এভাবে না উড়িয়ে নিজেই তো কিনতে পারিস—জমিয়ে জমিয়ে।

ও রিকোয়েস্ট উইথড্র করে নিচ্ছি। আই ওয়ান্ট এ শো ডাউন। তোমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে—

কি হয়েছে বল না। অত ইংরিজি বলছিস কেন ? বলতে বলতে দিলীপ দেখলো সোডার বোতলশুদ্ধ টাপুর হাত উঠছে।

দিলীপ খুব সাবধানে বাঁহাতে ঝোলানো ডাবগুলো ঢালু বেসমেন্টে গড়িয়ে দিল। তার চোখ তখন টাপুর হাতের দিকে। কি হয়েছে তোর টাপু—? বলতে বলতে দিলীপ এগিয়ে গিয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো। কি ব্যাপার বলতো ?

ছাড়ো। ছাড়ো বলছি।

না। ছাড়বো না। বলে দিলীপ গোড়াতেই সোডার বোতলটা কেড়ে নিল: কে কে খাচ্ছিলি ? এটা বাথোয়ারি বার হয়ে গেল শেষে। কে কে ছিল সঙ্গে ? অনেকটা খেয়ে ফেলেছিস দেখছি।

কেউ না। আমি একা।

একা একটা বড় বোতল খেলি ? এই ড্যাপসা গরমে ?

সে খবরে তোমার দরকার কি ? তোমার ছেলে আমার বোনের সর্বনাশ করেছে। রবি কোথায় ? বল আমাকে। খুলিটা উড়িয়ে দেব।

দিলীপ হেসে ফেললো। চেষ্টা করলেও তা বোধহয় পারবি না।

নিজের ছেলের জন্যে খুব গর্ব ? তাই না ? অমন চোরের মত পালিয়ে থাকে কেন ? আমার বোনটার ক্যারিয়ার ফিনিস। অ্যাথলেটের লাইফ ছেড়ে দিতে বাধ্য হোল।

তোদের বৌদি তাকে তো ছেলের বউয়ের মত বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

তাতে সব অপমানের ফয়সালা হয়ে গেল !

আমাকে বলে কয়ে তো মালবিকা রবির সঙ্গে মেশোনি। আর আমরাও তোর বোনকে মাথায় করে রেখেছি।

জুতো মেরে গরুদান ?

কি বাজে বকছিস ? যা বুঝিসনে টাপু—

অমন ভড়কি দিও না। তোমার ছেলেটা একটা কাওয়ার্ড। পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

তার সামনে এসব কথা বললে পারিস। দেখা হলে তো !

আচ্ছা। দেখা হলে রবিকে তোর সঙ্গে কথা বলতে বলবো। তখন এসব চাটপাট কোথায় থাকে দেখবো।

টাকার গরম দেখিয়ো না। তোমাদের মত বড়লোকের ছানাপোনা যে কোন ক্রাইম করে ছাড়া পেয়ে যায়। কেউ তাদের ছুঁতে পারে না।

টাপু। এবার কিন্তু আমি তোকে তুলে আছাড় দেব। রবি নিজের প্রফিটের জন্যে কিছু করতে যায়নি। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালিয়ে থেকে সে সল্ট লেকে দু কাঠা জায়গা পাবে না। নে সরে দাঁড়া. ডাবগুলো গেল কোথায় ?

নিজের মাল খুঁজে নাও। আমি পারবো না।

তা পারবি কি করে। তোর বোনের জন্যই এনেছিলাম—। একবার তো দেখতে গেলেও পারিস।

বাইরে নিশ্চয় এখন অনেক মেঘ এসে পড়েছে। নয়তো বেসমেন্টের ভেতরটা এত অন্ধকার হয়ে এলো কেন। একটা ঠাণ্ডা পাওয়া গেল চওড়া কলামের পাশেই বাকিগুলো গড়িয়ে কাছাকাছিই ছিল। টাপু গুছিয়ে গাছিয়ে দিলীপের হাতে তুলে দিচ্ছিল। দিতে দিতে বললো, মৃত্যুর পর কাগজে আমাদের ছবি উঠবে। নিচে লেখা থাকবে ইনি সারাজীবন বেকার ছিলেন—

অন্যদিন হলে দিলীপ হো হো করে হেসে উঠতো। আজ বললো, এরই ভেতর নেশা কেটে গেল !

কতটুকু খেয়েছি দিলীপদা ?

দাদা ডাকবি না আর—

ও হ্যাঁ। মালবিকার শ্বশুর তো ! তা মেশোমশাই তোমাদের মত পয়সা পাবো কোথায় ! তোমরা তো বড়লোক।

এই ছিঁচকাঁদুনে কথাগুলো রাখ।

তাহলে কি বলবো ? জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে যে পাঁচ পয়সা কামাই করেনি—এমন একটা উদাহরণ দাও তো।

ইচ্ছে করলেই কামাই করা যায়। ওসব কথা বলে কথা ঘোরাসনি। রবির সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা হয় তো বলিস—তার ওপর আমার আর কোন রাগ নেই। আমি দালালি ছেড়ে দিয়েছি—

দিলীপ ডাব হাতে লিফটের দিকে এগোচ্ছিল।

পেছন পেছন টাপু। তুমি দালালি করতে নাকি ?

হ্যাঁ টাপু। একটা খাদানের শেয়ার ক্যাপিটাল—ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সবই আমি জোগাড় করে দিয়েছি। সেজন্যে আমি কমিশনও পেয়েছি। এই কমিশন অবিশ্যি খরচ-খরচায় অনেকটা বেরিয়ে গিয়েছে। তবু দালালি তো—

ঠিক এই সময়—কলকাতা থেকে অনেক দূরে—সামনে একটা পাহাড় সাক্ষী রেখে ঋষি কোল ইণ্ডিয়ার গেস্ট হাউসের বারান্দায় এসে বসলো। আগেকার দিনে মালিকের বাংলো এখন সরকারী বিশ্রামালয়। চারদিকে ঘোরানো বারান্দা।

ভাদ্র মাসের পড়ন্ত বেলায় মেঘলা আকাশের নীচে পাহাড়টা আগাগোড়া ভিজে যাচ্ছিল। ঋষি যেদিকেই তাকাচ্ছিল—সেদিকেই হয় কালো—না হয় সবুজ। গাছ-পালাগুলো কতযুগের বৃষ্টির জল পেয়ে পেয়ে সবুজ। ধুলোমাখানো পাহাড়গুলো জলে ধুয়ে গিয়ে নিজের নিজের স্বরূপ ফিরে পেয়েছে।

এটা কোল ইণ্ডিয়ার জায়মাদের পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া। গদিওয়ালা চেয়ারে বসে ঋষি গুন গুন করে গাইছিল। টেবিলে পেপারওয়েটের নিচে কাল বিকেলের একটা টেলিগ্রাম পড়ে আছে। কবার পড়া হয়ে গেছে। আরেকবার দেখার ইচ্ছে হোল। কিন্তু দেখলো না।

এখন এখান থেকে বসে সে এই পাণ্ডবেশ্বরেরই আরেকটা খনির কথা ভাবছিল। এই চেয়ারে বসে তৌফিক খাদান

যা যায় না। দেখতে হলে ক্রিপে করে ততদূর কয়েক মাইল যেতে হবে। তবে যা যাবে।

বৃষ্টির গুঁড়োগুলোকে দলা পাকিয়ে গত মাসের ক্ষ্যাপা বাতাস উঁচু-নীচু ঠর ওপর দিয়ে রোল করে ছুটে ছিল। টেবিলে চাপা দেওয়া টেলিগ্রামটা ফড়-ফড়ের উড়ছে।

আমি লেটারপ্যাড নিয়ে চিঠি লিখতে বলো।

প্রিয় অনন্ত,

গতকাল সন্ধ্যেবেলা এক টেলিগ্রামে ড অফিস থেকে আমার আরেকটি মোশানের খবর পেলাম। আমাকে যত গগিরি সম্ভব চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে হেড ফসে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ বার সেই কোল ইণ্ডিয়ার অফিসে গিয়ে মাকে বসতে হবে। কলকাতার ফিরতে র না ভালো লাগে।

আমি এখন কোল ইণ্ডিয়ার গেস্ট উসের বারন্দায় বসে তোমায় চিঠি খছি। বেলা পড়ে এলেও বৃষ্টির ছাঁট শাল ঠান্ডা বাতাস খুব ভালো লাগে খানে। আমি চেয়ারে বসে ভৌমিক খাদানের স্টিং কেন্দ্র বা অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না। না দেখতে পাওয়াই ভালো। ওই খাদানে আমি আমার এক বন্ধুকে হারিয়েছি। আমি পুরো ব্যাপারটাকেই এখন ক্যাটাসট্রফি বলে মনে করি। দিলীপকে আমরা আর কোনদিন ফিরে পাবো না। সে দিলীপ আর নেই। কেউ কেউ বলে আমার ওপর ওর একটা বিশ্বেষ চিবকালই চাপা ছিল। নানা ঘটনায় তা বেরিয়ে পড়েছে। এসব কথা আমি এখনো বিশ্বাস করি না। কিন্তু সারা ব্যাপারটাই কেমন আগলি হয়ে পড়েছে। তাকানো যায় না। ভেতরে ভেতরে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। দিলীপ যদি তিন বছর ধরে একটানা ঘুমিয়ে তারপর জেগে উঠতো। তাহলে হয়তো সব ভুলে গিয়ে সুস্থির হোত। বাঙ্গালীর শিল্প-প্রয়াসে ভৌমিক খাদান একটি ল্যাণ্ডমার্ক। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলের এ খাদান অলরেডি ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। পরবর্তী কালে এ খাদান গবেষণার বিষয় হবে। অনেক মালমশলায় বোঝাই। এ খাদানের স্বাভাবিক মৃত্যু বন্ধ করে আমরা আবার জাগিয়ে তুলেছি। জাগাতে গিয়ে বন্ধু হারালাম। বাণিজ্যের সাফল্যের পেছনে সর্বদাই নীল বঙের খানিকটা পাপ থাকে। এভরি ফরচুন হ্যাজ এ সিন বিহাইণ্ড। এ কথাটা আমি খুব বিশ্বাস করি অনন্ত। তার দাম আমাদের—আমাকে দিতে হচ্ছে। ভৌমিক খাদান শুরু হয়েছিল আনন্দের ভেতর দিয়ে—হাসি গান— আড্ডায়। সে খাদান এখন আমার কাছে একটা ক্যাটাসট্রফি ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বারকানাথের আমলের খাদানকে ইতিহাস থেকে টেনে তোলা ঠিক হয়নি। তার স্বাভাবিক মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ছিল। ইতিহাসকে ইতিহাস থাকতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

এই অব্দি লিখে ঋষি আবার চোখের সামনের পাহাড়টার দিকে তাকালো। এরিয়া ম্যানেজার থেকে এবার অমি. পুরো একটা রিক্লিওনের তার নেব। কলকাতার হেড কোয়ার্টারে বসে সবটা দেখতে হবে আমাকে।

আচ্ছা এই পাহাড়টা এখান থেকে কতদূরে? এটা টপকালেই কি ভৌমিক খাদান? অনন্তদের পূর্বপুরুষরা সাবফেস মাইনিং করে এ খনিব পত্তন করেছিলেন। তখন রাস্তা ছিল না। চারদিকে জঙ্গল। বোদে রোদ। শীতে শীত।

(চলবে)

চিঠিপত্র

প্রশংসার দাবী রাখে

আমি 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও বিশেষ অনুরাগী। অমৃত পত্রিকা যেভাবে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন রুচির পাঠকের মনোরঞ্জন করে চলেছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। গত কয়েকটি সংখ্যা পড়ে দারুণ আনন্দ ও উৎসাহ পেয়েছি। তার আগে তো বৈকুণ্ঠ পাঠক আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। তাঁমদনে সরাসরি অবতীর্ণ হয়েছেন হাওয়া গাড়ির মাধ্যমে।

কুকুরের বিষয়-আশয় ও ঈশ্বরতলীর পকথার লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে মার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাবেন। ওয়া গাড়ির দশম পর্বে এসে অধীর াগ্রহে অপেক্ষা করছি পরবর্তী সংখ্যার ন্য। হ্যাঁ, ৩১ মার্চ সংখ্যাটির কথাই সছি। একই সঙ্গে তিনটে উপন্যাস ড়লাম। তবে কোনটাই এখনও শেষ য়নি। পাঠকেরা নিশ্চয়ই হাওয়াগাড়িতে পে নন্দন কাননে সোনার হরিণ খুঁজ-ছেন। আমার ভালো লাগার কথা আগে-াগেই জানিয়ে রাখছি। **অনলই অনলপূর্ণা** ও **রূপরূপের লেপথ্যে** রচনা দুটি আরো য়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত করুন। নঃসন্দেহে উপভোগ্য হয়েছে। অবশ্য ুধুমাত্র ঐ রচনাগুলিই নয়, গত ১০, ১৭ ও ২৪ মার্চে প্রকাশিত **কেলকাতা ছবি তরির কারখানা, পরমাণু শক্তি ভারত ও নীল ও কলের মানিকের দেশে** এই তিনটি লেখাই পাঠককে অনেক কিছু জানতে ও ভাবতে সাহায্য করেছে। এ-ধরনের রচনা পরের সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করতে ভুলবেন না যেন। প্রচ্ছদপট ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে। গত ১০ মার্চের বিজ্ঞান বিভাগে বাঁচো এবং বাঁচাও নিবন্ধটি সত্যই সময়োপযোগী ও চিন্তনীয়। দুঃখের বিষয়, নিয়মিত কবিতা পাচ্ছি না। ব্যাপারটা দেখবেন। এখন বৈকুণ্ঠ পাঠকের জায়গায় এসেছেন মণীন্দ্র রায়। নিত্যনতুন বিভিন্ন সূত্র ধরে সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে আকর্ষণীয় লেখা লিখছেন। তার ওপর তো পবিত্র মুখোপাধ্যায় আছেনই। দুজনকেই অজস্র ধন্যবাদ। গত ১৫ জুলাই, ১৯৭৭-এর অমৃতে প্রকাশিত দীপাবলী সেনের **সত্যজিৎ রায়ের লেখা** রচনাটির মত মাণিক **বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সম্বন্ধে** কিছু ছাপালে হয় না। অমৃতে প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই নিয়মিত নিখুঁতভাবে পড়ছি এবং মুগ্ধ হচ্ছি। সত্যিই এত বিচিত্র তথ্য-গল্প-ফিচার উপন্যাস প্রবন্ধ খেলাধুলা ও সিনেমা-থিয়েটার ছাড়াও বিবিধ বিষয়ে রচনাসম্ভার একযোগে পরিবেশন করা সম্ভব তা কেবলমাত্র অমৃতের গুণমুগ্ধ পাঠক-পাঠিকারাই উপলব্ধি করতে পারছেন।

বুদ্ধদেব দাস, ১১।৪, বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া-৭১১১০১।

গ্রাম হারিয়ে যাচ্ছে

হালফিল বাংলা সাহিত্যে একটা জিনিসের অনুপস্থিতির বেদনা মাঝে মাঝে অনুভব করি। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে গ্রাম বাংলা আশ্চর্য ঔদাসীন্যে অনুপস্থিত। যেন তারা বিস্মৃতির দিকে। ধূসরতায় ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের উন্মোচনের শতাব্দীতে গ্রামবাংলা ঠিক এইভাবে উপেক্ষিত হয়নি। এদেশের প্রথম বিস্ফোরক নাটক নীলদর্পণ-এর পটভূমি সংগ্রামশীল বাংলা। গ্রামীন মধ্যবিত্ত আর সাধারণ চাষী স্থির পদক্ষেপে চরিত্রের আসরে সেখানে স্থান করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস অনেকাংশে শহর-কেন্দ্রিক হলেও তাঁর কবিতা ও নিটোল ছোটগল্পে অজস্র উচ্ছলতায় পল্লীবাংলা উপস্থিত। শাশ্বত প্রেম, দুঃখ বেদনা বাৎসল্য প্রভৃতি অনুভূতিকে বিশাল ও বিচিত্র নিসর্গের পটভূমিতে

স্থাপন করে পাঠকসমাজের কাছে এক ধরনের শৈল্পিক রিলিফ এনেছেন। শরৎ-চন্দ্রে পল্লীবাংলা অনিবার্যভাবে উপস্থিত। নিশ্চল, বিদীর্ণ, অসহায় ও যন্ত্রণাবিদ্ধ গ্রামের কান্না তাঁর উপন্যাস ও গল্প উভয় ক্ষেত্রকেই সরস করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় অবধি বাংলা সাহিত্যে পল্লীর প্রসার এইভাবেই। এই প্রসারতা তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসুর মধ্যে ঘটেছে। আর সম্ভবত তারা-শংকরই পল্লী ও আঞ্চলিক সাহিত্যের শেষ কথাকার। কিন্তু তার পরেই এক নিষ্করুণ শূন্যতা। আর এখন কঠিন ফুটপাত এবং উদাসীন ও রুদ্ধ মনুষ্য-কবলিত বিবর্ণ অথচ লাস্যময় শহর সাহিত্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে ফেলেছে। গ্রাম বুঝি এখন ধূসরতায় বিলীন। গ্রাম সম্বন্ধে উৎসাহী অনেকেই হয়েছেন আবার অনেকেই থমকে থেমে থেমে গেছেন। পরখ করেছেন কাথার এলাম। কখনো কখনো কবিতায় শুধু নিসর্গ চিত্রণ। স্বাধীনতার পূর্বকালে গ্রামকে যতটুকু চেনা গিয়েছে, আজ তাও সম্ভব নয়। যে বিপদ আগে দেখা গিয়ে-ছিল আজ তা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের কাছে আরো দুর্জ্ঞেয় এবং জটিল হয়ে গিয়েছে। অতীতের মত সরলীকরণ করলে তার ক্ষীণ স্বরূপও ধরা পড়বে না। সাহিত্যের ক্রম-মুক্তির পথে এ এক বাধা। অনস্বীকার্য-ভাবে গ্রাম আজ গতিশীল এবং পরি-বর্তনের মুখোমুখি। দেশের বৃহত্তর অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনধারার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে সাহিত্য যতই শহর-কেন্দ্রিক হতে থাকবে, ততই সংকীর্ণতার পেষণে তার পচনশীলতা আত্মপ্রকাশ করবে। পচনশীল এই শহুরে সাহিত্যকে আজ মুখ ফেরাতে হবে নিজের মুক্তির জন্য। ব্যাপ্ত জীবনের সঙ্গে যোগ মানেই সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের সঙ্গে অন্বয়। এ-কাজ দুরূহ। কিন্তু দুরূহের সাধনাই তো সৎ সাহিত্যের সাধনা।

সুধেন্দুবিকাশ চক্রবর্তী, কোলকাতা-৪।

বেছে নিতে জানা চাই

১৪ এপ্রিল অমৃতে প্রকাশিত শুচিস্মিতা দাশগুপ্তের হিন্দি সিনেমা সম্পর্কিত চিঠিতে কিছু অসঙ্গতি নজরে পড়ল। প্রথমতঃ, লেখিকা নিজে হিন্দি সিনেমার দোষগুণ জেনেও বাজার-চলতি গরম ছবি দেখতে পিছপা হন না। যদিও তিনি জানেন না, একটা হিন্দি ছবি দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন পরবর্তী ছবিগুলো কি টাইপের, তিনি অমর, আকবর, এ্যান্টনী দেখার পরও ছৈলাবাবু, রাইমজুরী ইত্যাদি ছবি দেখেছেন, যেগুলো আর্ট ফিল্ম যা নিউওয়েভ বলে কারুরই ভ্রান্তি ছিল না।

সিনেমা যেখানে মূলতঃ এখনও গল্প থেকে তৈরি, সেখানে একটু রূপকথার আমেজ থাকবেই। পুরোপুরি রিয়ালিস্টিক

বা বাস্তবধর্মী ছবি বোধহয় একমাত্র ডকু-মেন্টারী ফিল্মকেই বলা সম্ভব।

আরেকটা কথা, সিনেমা কারো এক-চেটিয়া শিল্প নয়, যে কারণে কার্শিয়াল ছবির ভক্তকুলা গ্রাস থেকে শিল্পের উদ্ধার করার কথা আসে না (প্রথমতঃ, ভক্তকুলা গ্রাস করে না, রক্ত চোষে)। বাংলা ছবি তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামাল যেমন ভালো গল্প, ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী থাকা সত্ত্বেও কেন আজ এই পরিণতি? যেখানে আমরা অংকুর, নিশান্ত, ভুবনসোম, মৃগয়া, চিত-চোর, স্বামী, আবিষ্কার, কিনারা প্রভৃতি ভালো ছবি পেয়েছি, সেখানে আরো আশা করা যেতে পারে। শিল্পের দুই সমান্তরাল ধারা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। এক ধারক শুরুচিপূর্ণ শিল্প, আরেক ধারা শিল্পের নামে ভাঁড়ামো। বেছে নিতে জানা চাই। কারণ, সিনেমা বা যে-কোন মাস্ মিডিয়ার সাফল্য তার দর্শকদের উপর নির্ভর করে। দর্শক মানে আমি ছাড়া আর সবাই, যারা বুঝতে পাবে না, দেখতে জানে না, এই নয়, তাদের মধ্যে আমিও একজন, এই চেতনা থাকলেই সুস্থ শিল্প তৈরি করা যায়। একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি আমা-দের মধ্যে বড় বেশি। এটাকে আগে দূর করা যাক তারপর না হয় অন্যের ভাল-মন্দ বিচার।

নন্দিতা চৌধুরী, ১৯, রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা-৩২।

মতামত বদলে যেত

৩ মার্চের অমৃতে প্রকাশিত 'হিন্দী ছবির ফেলে-আসা বছরটা' সম্পর্কে নির্মল ধরের লেখা পড়ে মর্মাহত হলাম। পত্র-লেখককে আমার কিছু বলার আছে। তা নীচে পেশ করছি।

পত্রলেখকের নিজের উদ্ধৃতি তুলে ধরছি :

১। পঁচাশীটি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে একটি ছবির নামও মনে আসছে না —যেটি দেখার স্মৃতি সারাটা বছর বয়ে যেতে পেরেছি।

এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা যে, পঁচাশীটি ছবির মধ্যে একটিও তাঁর মন ধরেনি। আমার মনে হয় তিনি যদি জিন্দেগী, করম, ছোটাবাপ, মুক্তি লায়লামজনু দেখতেন, তাহলে কখনই এ-কথা বলতে পারতেন না, কিংবা তাঁর মতামত বদলে যেত। আমার মনে হয় এগুলি সত্যই রুচিবোধসম্পন্ন ছবি এ কোনরকম সেক্স, ভায়োলেন্সের ছোঁড় নেই। তাঁর ভালো লাগা ?আমারও- চার-খানি ছবি কিনারা প্রিয়তমা স্বামী দুসরা আদমী—এইগুলিও কি তাঁর সারা বছর বয়ে যেতে পারার মতো স্মৃতি এনে দিতে পারেনি।

তাই নির্মল ধর মহাশয়ের কাছে এইটুকুই অনুরোধ রাখছি যে, তিনি যদি জিন্দেগী, করম, ছোটাবাপ, মুক্তি লায়লামজনু—এই ছবিগুলি না দেখে থাকেন, তাহলে ভবিষ্যতে দেখে নেবেন অন্ততঃ জিন্দেগী দেখবেন। হয়তো আপনার রুচিবোধটাই বদলে যেতে পারে

২। আবার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, গানের ব্যাপারে হিন্দী ছবি আমাদের কানকে আনন্দ দিতে পারে -নি। ইলিক-ট্রনিক সঙ্গীতের বিকট চিৎকারে কান ঝালা-পালা হয়েছে। নে-শাদ, ও পি নায়্যার প্রমুখের অনুপস্থিতি বুকে বাজে।

এ বিষয়ে আমি এই টুকুই বলবো যে নৌশাদ, ও পি নায়্যারের অনুপস্থিতি আমরা নিশ্চয় অনুভব করি, কিন্তু তাই বলে যে, ৭৭ সালে কোন গানই ('আলাপ' ছাড়া) আনন্দ দেয় নি তা বলা যুক্তি যুক্ত নয়।

৩। পুনরায় এক জায়গায় উল্লেখ করে-ছেন যে, 'ছবির সংখ্যা যদি জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হয় তাহলে অমিতাভ, সঞ্জীব-কুমারের বাজার দর এখন তুঙ্গে।'

এই বিষয়ে আমি একটা কথাই বলবো যে, নির্মলবাবুর মনে রাখা উচিৎ ছিল যে, এই সঞ্জীবকুমারই 'খিলোনা', 'মৌসম', 'অর্জুনপন্ডিত' প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর ছবির জন্য বহু পুরস্কার পেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও সেরা অভিনেতার পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন এবং ছবি-গুলিতে তাঁর অভিনয় অনবদ্য হয়েছিল। পত্র লেখককে তাই অনুরোধ জানাই যে, একজন উঁচু দরের অভিনেতা সম্বন্ধে এত এক সস্তা মন্তব্য করবেন না।

এছাড়াও ঐ লেখাটিতে তিনি ছবির তালিকা দিতে গিয়ে 'চিত চোর' ছবিটির নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি, যদিও 'চিত চোর' একটি সুরুচি সম্পন্ন ছবি।

তা ছাড়াও তিনি লিখেছেন যে, অপর্ণা সেন 'ইমান ধরম' ও 'পরবরিশ' এ মিসকাস্টেড হয়েছেন। কিন্তু অপর্ণা সেন 'পরবরিশ'-এ ছিলেন না। ছিলেন 'কোতো-য়াল সাব' ছবিতে। রাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বলপুর; উড়িষ্যা।

খেলা

ফেডারেশন কাপ ফুটবল

কোয়েম্বাটুরে অল্-ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দ্বিতীয় ফেডারেশন কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতার দুই প্রধান—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের দু দিনের ফাইনাল খেলা গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিত থাকে। ফলে উভয় দলকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। গতবছর কোচিনে প্রথম ফেডারেশন কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ ১-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল। গতবছর ইস্টবেঙ্গল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি।

এবছর দ্বিতীয় ফেডারেশন কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল ভারতের নামকরা কুড়িটি দলের কোয়ার্টার-ফাইনাল লীগের খেলায় লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সূত্রে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল 'এ' গ্রুপ থেকে ইস্টবেঙ্গল (৬ পয়েন্ট) ও ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ (৪ পয়েন্ট) এবং 'বি' গ্রুপ থেকে মোহনবাগান (৪ পয়েন্ট) ও লগজিৎ কটন টেক্সটাইল মিলস্ (৪ পয়েন্ট)। কোয়ার্টার-ফাইনাল লীগের খেলায় আটটি দলের মধ্যে একমাত্র ইস্টবেঙ্গল তিনটে খেলাতেই জিতেছিল—রাজস্থান পুলিশকে ৫-০, মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাবকে ২-১ ও গত বছরের ফেডারেশন কাপ বিজয়ী ইন্ডিয়ান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজকে ২-০ গোলে। অপরদিকে কোয়ার্টার-ফাইনাল লীগের খেলায় মোহনবাগানের জয় ১ (এইচ এ এলের বিপক্ষে ৮-১ গোলে) এবং ড্র ২ (প্রিমিয়ার টায়ার্সের বিপক্ষে ০-০ ও ব্রে সি টি দলের বিপক্ষে ১-১ গোলে)। ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের তিনটে খেলায় ৯টা গোল দিয়ে মাত্র একটা গোল খেয়েছিল। অপরদিকে মোহনবাগান ৯টা গোল দিয়ে গোল খেয়েছিল দুটো। লীগের খেলায় এইচ এ দলের বিপক্ষে মোহনবাগানের ৮-১ গোলে জয় প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একটি খেলায় সর্বাধিক গোল করার নজির সৃষ্টি করেছে।

সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দুই পর্বেই প্রখ্যাত ব্রে সি টি দলকে ১-০ ও ২-০ গোলে পরাজিত করেছিল। কিন্তু মোহনবাগান সেমি-ফাইনালের প্রথম পর্বে আই টি আই-কে ২-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় পর্বে ০-২ গোলে হেরেছিল। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান ভাগ্যের জোরে টাই-ব্রেকারে জিতে ফাইনালে উঠেছিল। ফেডারেশন কাপের ফাইনাল খেলা বাদে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের অন্য খেলাগুলির ফলাফল বিচার করলে দেখা যায় ইস্টবেঙ্গল কোয়ার্টার-ফাইনাল লীগ এবং সেমি-ফাইনালের সমস্ত খেলাতেই জিতেছে নামকরা দলের বিপক্ষে। মোহনবাগান কিন্তু এ সম্মান অর্জন করতে পারেনি। পাঁচটা খেলার মধ্যে মোহনবাগানের জয় ২, ড্র ২ এবং হার ১।

নেশানস কাপ টেনিস

পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত প্রথম নেশনস কাপ টেনিস টুর্ণামেন্টের ফাইনালে স্পেন ২-০ খেলায় ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে নগদ ৬০,০০০ স্টার্লিং পুরস্কার লাভ করেছে। আমেরিকা এবং ইতালী তৃতীয় স্থানের জন্য পেয়েছে প্রত্যেকে ২৫,০০০ স্টার্লিং। সেমি-ফাইনালে স্পেন হারিয়েছিল আমেরিকাকে এবং অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল ইতালীর বিপক্ষে। স্পেনের জোশ হাইগুয়েরাস প্রতিযোগিতায় অপরাজিত ছিলেন। ফাইনালে ৬-২ ও ৬-৩ গেমে তিনবারের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান জন নিউকম্বকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সিনিয়ার নক্ আউট কিকেট

সি এ বি পরিচালিত ১৯৭৮ সালের সিনিয়ার নকআউট কিকেট প্রতিযোগিতা বর্তমানে ফাইনাল পর্যায়ে এসে গেছে। ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইস্টবেঙ্গল এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন।

সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ২৬ রানে কালীঘাটকে এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৩ উইকেটে মোহনবাগানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন-মোহনবাগান

মোনবাগান : ১৪০ রান (প্রলয় চেল ৫৯ নট আউট। প্রদীপ নিয়োগী ৪৯ রানে ৫ উইকেট)

স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ১৪৩ রান (৭ উইকেটে। গোপাল বসু ৫৯ নট আউট)

ইস্টবেঙ্গল-কালীঘাট

ইস্টবেঙ্গল : ২৫৭ রান (রাজা মুখার্জি ৮৪ রান। মদন ঘোষ ৬৭ রানে ৩ উইকেট)

কালীঘাট : ২৩১ রান (মাইকেল দালভি ৭৯ রান। বরুণ বর্মণ ৫৩ রানে ৩, অমিতাভ রায় ৬১ রানে ২ এবং অলক ভট্টাচার্য ১৮ রানে ২ উইকেট)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত মে ১৫ তারিখে কলকাতার মযদানে ১৯৭৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার উদ্বোধন হয়েছে। কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলার তিন প্রধান মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং একটু দেরি করে আসরে নামবে। কথা আছে, ইস্টবেঙ্গল মে ২৫, মহামেডান স্পোর্টিং মে ২৬ এবং মোহনবাগান মে ৩০ তারিখে লীগে তাদের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে। এবারও লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াই শেষ পর্যন্ত গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল এবং গত বছরের ত্রিমুকুট জয়ী (আই এফ এ শীল্ড, বোডার্স ও ডুরান্ড কাপ) মোহনবাগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

দর্শক

নজরুল-সুকান্ত সংখ্যা ০ নজরুল-সুকান্ত যাত্রা সংখ্যা ০ যাত্রা সংখ্যা ০ যাত্রা

'মনমধুকর' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা— **নজরুল সুকান্ত সংখ্যা**

'মনমধুকর' আষাঢ় সংখ্যা— **যাত্রা সংখ্যা**

প্রবন্ধ : ডঃ প্রদ্যুতকুমার সেনগুপ্ত, নির্মল সেনগুপ্ত, গৌতম ভট্টাচার্য, মানু ভট্টাচার্য ও বিশ্বজিৎ ঘোষ
অনুবাদ গল্প : ফণীশ্বরনাথ রেনুর একটি সাড়া জাগানো হিন্দী গল্পের অনুবাদ (একটি আদিম রাত্রির সৌরভ) করেছেন ক্ষৌণীশ বাগচী।
কবিতা : গোপাল ভৌমিক, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অমিতাভ দাসগুপ্ত, অপূর্বকুমার সাহা, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, নভোনীল মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর ঘোষ।
নাটক—প্রবীর বিশ্বাস।
গল্প—সৈয়দমুস্তাফা সিরাজ

- যাত্রা শিল্পের সুখ-দুঃখ, সমস্যা, সমাধান, খবর, সাক্ষাৎকার, ছবি, বিজ্ঞাপন থাকবে।
- যাত্রা সম্পর্কে যাঁরা লিখবেন তাঁরা প্রত্যেকেই সুখ্যাত শক্তিমান সাহিত্যিক-সাংবাদিক।
- ঐ সংখ্যায় একটি বড় গল্প লিখছেন 'সোনালী মন, রুপোলী প্রেম' খ্যাত বিশ্বজিৎ ঘোষ।
- ঐ সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে শুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নতুন ধরনের জীবনকাহিনী — 'মনের মানুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'।
- ধারাবাহিক উপন্যাসও শুরু হবে।
- নিয়মিত বিভাগ—আশেপাশে, মাসিক রাশিফল, ভাগ্য সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর, খেলাধুলো, চিঠিপত্র
- বিজ্ঞাপনদাতাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- বার্ষিক গ্রাহক গ্রাহক চাঁদা—পনেরো টাকা মাত্র, ষাণ্মাসিক গ্রাহক চাঁদা—আট টাকা মাত্র

—প্রকাশিকা। মন মধুকর। ব্যাণ্ডেল। হুগলী

কলকাতার হকির অন্তিম দশা

কলকাতা ময়দানে আর একটি ক্যাম্প এবং বিরক্তিকর হকি মরশুম শেষ হল। এই মরশুমের হিসেব-নিকেশ করলে দেখা যাবে—কিছুই পাওয়া যায়নি—সবই গেছে খরচের খাতায়। ১৬ বছর পরে তবে এবার একটি বিদেশী দল কলকাতায় খেলে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার কিংকেটার্স হকি ক্লাব। কিন্তু তাদের আসার পেছনে বি এইচ এর কোন কৃতিত্ব নেই। গুরবক্স সিং-ই ছিলেন আসল মানুষ। আর অস্ট্রেলিয়ার ঐ দলটি নিজেদের থেকেই খরচ-পত্তর করে ভারত সফরে এসে কলকাতায় খেলে গেল। এবং সেই খেলায় ভিড়—বিশেষ করে প্রথম দিন মোহনবাগানের সঙ্গে খেলাটি—দেখে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল কলকাতার মানুষ ভালো হকি খেলা দেখতে চান।

কিন্তু বি এইচ এ অর্থাৎ বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের দৌলতে তা আর আমাদের বরাতে জোটে না। এই বছরই বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার আগে পাকিস্তান হকি দল ভারতে খেলতে এসেছিল। বি এইচ এ চাইলে, পাক দলের একটি খেলা কি কলকাতায় হতো না? নিশ্চয়ই হতো। এবং তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তা তো হবার নয়। কারণ বি এইচ এ বলতে আজকাল একটি মানুষকেই বোঝায়। বছরের পর বছর তিনি সম্পাদকের পদটি অলংকৃত করে আছেন এবং তাঁর সুষ্ঠু পরিচালনায় হকি খেলা বাংলাদেশ থেকে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। এবং তিনি বহাল-তবিয়তে হকির রাজত্ব চালাচ্ছেন।

কলকাতার হকি মরশুম এখন বিরক্তিকর। মানুষকে এতোটুকুও আকর্ষণ করে না। ভুলেও বিশেষ কেউ মাঠে যেতে চান না। অথচ চিরকাল তো এমন ছিল না। একদিন কলকাতার হকির আসর ছিল রমরমা। ভারতের নামকরা সব খেলোয়াড়রা খেলতেন কলকাতায়। ভারতীয় দলে তাই বাংলার বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় স্থান পেতেন। হকির প্রয়াত কে ডি সিং বাবু পর্যন্ত কয়েকবার কলকাতার মাঠে খেলে গেছেন। ফুটবলের মত হকিতেও কলকাতা ময়দান তখন অনেক এগিয়ে।

কিন্তু তারপর বি এইচ এর পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার হকির অন্তিম দশা দেখা দিল। এবারের বেটন কাপের খেলা তখন শুরু হয়েছে। বাইরের দলগুলো আসবে আসবে করেও আসছে না, তখনই একদিন বি এইচ এর সম্পাদক শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী মহাশয়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—বেটনের এমন অবস্থা কেন? উত্তরে তিনি বললেন, চারপাঁচ বছরের ব্যাপার তো, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে

বি এইচ এর সম্পাদক কি মনে করে ঐ কথা বললেন জানি নে। তবে তাঁর কথার অর্থ একটাই হয়—বেটনের বয়স অনেক হল। এবার উঠে যাবার সময় এসেছে। সত্যি এঁদের হাতে পড়ে ভারতের সবচেয়ে ঐতিহ্যশালী হকি প্রতিযোগিতা বেটন কাপের কি অবস্থা যে হয়েছে তা ভাবা যায় না। এবং বলতে বাধা নেই তা হয়েছে ঐ একটি মানুষের জন্যে। বাংলা দেশের হকির চাবিকাঠি পকেটে পুরে গাঁট হয়ে বসে আছেন। তাঁকে ঐ স্থান থেকে সরানোর ক্ষমতা যেন কারো নেই। অথচ ওঁর বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ সকলের মনে মনে।

তবে গাঙ্গুলী মশাইকে একটা ব্যাপারে কৃতিত্ব দিতেই হবে। বছরের পর বছর তিনি কলকাতার হকি লীগ কিংবা বেটন কাপের খেলা ঠিক শেষ করে দেন। তা সে যাই হোক না কেন। দরকার হলে যুদ্ধ বিজয়ী ঘোষণা করেও মরশুমের নিষ্পত্তি তিনি ঠিক করে ফেলেন। এবং তাতেই বোধহয় তিনি খুব খুশী। হকি নিয়ে ভারতের নানা জায়গায় কতো কি হচ্ছে—বিদেশী দল খেলতে আসছে, বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন পাকিস্থান খেলে যাচ্ছে—কিন্তু আমরা তার আঁচটুকুও পাচ্ছিনে। অথচ বি এইচ এ একটু চেষ্টা করলে পাকিস্তান যে কলকাতায় খেলতে আসতো সে বিষয়ে কারো এতটুকুও সন্দেহ নেই। পাকিস্তান দল কলকাতায় খেলতে এলে কি ভিড় হতো তা ভাবাই যায় না। অস্ট্রেলিয়ার কিংকেটার্স হকি ক্লাবের খেলা দেখতে যদি অতো মানুষ আসতে পারেন—তাহলে পাকিস্তান এলে যে ইডেন উদ্যানও কুলোতো না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সন্দেহ বি এইচ এর কর্তাদের ছিল। তাই তাঁরা গা করেন নি।

কিন্তু পাকিস্তান কলকাতায় খেলতে এলে বাংলা দেশের হকির মরা গাঙ্গে যে বান ডাকতো—সে কথাটা বোধহয় ওঁদের মাথায় ঢুকলো না। ঢুকলেও বোধহয় ওঁদের মধ্যে ছিল তৎপরতার অভাব। এই ব্যাপারে বি এইচ এর সম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলী মহাশয় কি বলেন জানতে ইচ্ছে করে.....।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমারে তুমি অশেষ করেছ

এবারের বসন্ত বন্দনা সিরিজের (গ্রামোফোন কোম্পানী) মুকুটমণি হল এল ; ডিস্কে পংকজ মল্লিকের কণ্ঠের বাছাই রবীন্দ্রসংগীতের সংকলন। একদিন যাঁর কণ্ঠে তুর্যরবে আজকের এই রবীন্দ্রসংগীত গের আবাহন ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠের সেই পরিচিত গানগুলি অতীতের ন্ধ স্মৃতিকাকে যেন কয়েকমুহূর্তের জন্য ধরে। 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে' রণ ধরিতে দিওগো আমারে', 'তাই তোমার নন্দ', 'আমারে তুমি অশেষ করেছ', মোর দুর্ভাগা দেশ'—আরও অনেক গান তাঁর ধীরোদাত্ত কণ্ঠ ও অনন্য প্রকাশ-ঙ্গির সংগে মিলেমিশে একাকার হয়ে য়েছে আমাদের স্মৃতিতে। 'আমারে তুমি শেষ করেছ'—স্মরণ করিয়ে দেয় পংকজ ল্লিক শুধু গায়ক ছিলেন না। ছিলেন ছক শিল্পী কল্পনার দিব্যদৃষ্টির প্রসাদে খানে তিনি হয়ে উঠেছেন দার্শনিক।

উপরি পাওনা হিসেবে গানগুলির াগে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর স্ব-কণ্ঠের রটি থা তাঁর অগণিত অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে। তজ্ঞতার অশ্রুজলে ভেজা প্রতিটি শব্দ ন তাঁর জীবন বেদ। এ ডিস্ক প্রকাশ রে গ্রামোফোন কোম্পানী একটি বিরাট তীয় কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন।

ইস্টার ন্যাশনাল সিরিজে প্রকাশিত য়েস্ট মিটস ইস্ট অ্যালবাম ৩ নম্বর শীর্ষক রটি এল পি ও বসন্ত বন্দনার রেকর্ড-চ্ছের অন্তর্ভুক্ত।

এ ডিসক ভারতীয় রাগসংগীত ভিত্তিক ন এক সংগীত সংলাপ যার মধ্যে রয়েছে থিবীর দুই প্রান্তের শিল্পীদের রস্পরিক ভাববিনিময়ের আর্তি। আমাদের দুই অতি জানা রাগসংগীতের বহুধা-স্তারিত রূপের একটি নতুন দিক দেখতে াল লাগে তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যে, দেশীয় সম্ভ্রমবনত অভিষেকে আর নাট্য-সের বৈভবেও। রবিশংকরের পরিকল্পনা ও বিচালনায় তাঁর সেতারের সুরের সংগে মেশে ইহুদী মেনুহিনের বেহালা, গ্রীন াইয়ার ব্যামপ্যালের বাঁশী, মার্টিন গিলিয়নের হার্প। রেকর্ডের একদিকে াছে শংকর টেম্ভারনেস ও শংকর টুইলাইট ড,—অপরদিকে দি এনচ্যানটেড ডনা ও রের মর্দিং লাভ।

প্রথমটির (শংকর টেম্ভারনেস সুর-র্তি) শুরু হয়েছে নর্টটেভর রাগকে আশ্রয় রে। এখানে একটি কোমল করুণ মধুরতা ন্ধের বিস্তারকে হৃদয়ের কাছাকাছি করে তালে। গা মা রে সা (২) গামা ধা ধা ব বারংবার আবৃত্তি ঘুরে ফিরে এসেছে, ানের মুখবাঁধ মত। কখনও দুটি স্বরের ীড় কখনও দুই বা ততোধিক স্বরসমন্বয়ে ন্দের নক্সায় আনাগোনা, বিভিন্ন মাত্রায়

পঙ্কজ মল্লিক

যতি ঝনিয়ে দেয় সংগীতে ক্ষণবিরতির একট. নিজস্ব ভাষা আছে এবং সে ভাষাকে ত আবেদনশীল করে তোলা যায় প্রয়োগ নৈপুণ্যের শক্তিতে।

মেনুইনের বেহালা দিয়েই বাজনা রু। তাঁর তেহাই, তান, সুরবিহার সবই বেজেছে ভারতীয় রাগসংগীতের কাঠামোয় যে সংগীতে শিল্পী পদে পদে স্বতন্ত্র। কিন্তু পরিবেশনায় মেজাজটিকে ঠিক প্রাচ্য-সংগীতের মেজাজ বলা যায় না। তবু শ্রোতাদের মন একটুও হোঁচট খায় না। কারণ শিল্পী তাঁর সহজাত অন্তর্দৃষ্টিতেই একাত্ম হয়ে উঠেছেন বিষয় বস্তুর (টেম্ভারনেস) সংগে। তাঁর শক্তিশালী ছড়ের প্রতি মূর্ছনায় আছে অন্বিষ্য হৃদয়ের আর্তি। এই আর্তিই তাঁকে রাগ-

রবিশংকর

সংগীতের আত্মার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে রবিশংকরের সেই ওঁংকার ধ্বনির মত ষ্ট্রোক, ক্ষুরন্ত ঝমঝমায় ঝলকে উঠেছে তাঁর স্বপ্নলোক। আর এই উভয় শিল্পীর মিলন সুষমার ফলশ্রুতিই হল শংকর টেম্ভারনেস যাকে অন্য ভাষায় বলা যায় স্পর্শকাতর চিত্তের মর্মদ্রাবী বিকাশ। টুইলাইট মুড্—সৃষ্টি হয়েছে পুরিয়া ধ্যানেশ্রী রাগকে নিয়ে। এ রাগের প্রধান সম্পদ তার কাব্যসৌন্দর্য। দিনের শেষে পাখীদের ঘরে ফেরার পালা। সারাদিন কাজের পর ছুটির আয়োজন ছড়িয়ে পড়েছে সারা প্রকৃতিতে। অস্তরাগের গৈরিক আলো এসে পড়েছে গৃহমুখী গাভীদের পায়ের ধুলো-ওড়ানো পথে-প্রান্তরে। কিন্তু এ আলো যেন খেলাভাঙার বিষণ্ণতা মাখানো। পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিতে এই ক্লান্ত, করুণ ঔদাস্য যেন ছবি হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে দি এনচ্যান্টেড ডনা ও শংকর মর্ণিং লাভকে রূপময় করে তুলেছেন যথাক্রমে গ্রীন র‍্যামপ্যাল (বাঁশীতে) মার্টিন গিলিয়ট (হার্প) এবং র‍্যামপ্যাল ও রবি-শংকর।

প্রথমটি উচ্ছলিত হয়েছে ঝিকমিকী জোড়কে আশ্রয় করে। বাঁশীকেই এখানে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছে হয়ত উঁচু সুরের উত্থেল আবেগ সৃষ্টি করবার জন্য। এবং এ কাজ দক্ষতার সংগে পালন করেছেন র‍্যামপ্যাল। সুরের এই উচ্ছল প্রবাহের ফাকে মাঝে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মতই অনুরণিত হয়েছে গিলিয়টের বীণা ধ্বনির মত সুর। উত্তাল নৃত্য মুখরতায় বেজেছে আল্লা রাখার তবলার উত্থান পরন তাল-ফেরতার ছন্দবৈচিত্র্য। সব মিলিয়ে মেলোডিকে ছাপিয়ে এসেছে অর্কেস্ট্রার আমেজ। কিন্তু উপভোগ্যতা তাতে কমেনি।

এই এল পি ডিসকের তালিকাভুক্তই আছে ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের নজরুল গীতি। তাঁর খোলা মেঘাবী গলা উচ্চাংগ-সংগীতের অনুশীলনে মার্জিত। আব্দুরবালা ইন্দুবালার কাছে তালিম পাওয়া গায়কীর সংগে মিশেছে নিজের গাইবার আবেগ। তাই প্রতিটি গানই এত প্রাণবন্ত হয়েছে। তাঁর গাওয়া ভক্তিগীতি (বল বে জবা), ভাব-গীতি (গভীর রাতে জাগি), পল্লীগীতি তেপান্তরের মাঠে আর সবরকম গানগুলি মনে করিয়ে দেয় সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফিরোজা বেগমের মন্তব্য: অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের গানে কাজী সাহেবের গায়কী অবিকৃত থাকে।

দেশবন্ধুর গানের এল পি ডিসকও মূল্যবান সংকলন। কারণ এই সব গানে দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্বের একটি নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে।

অন্য একটি এল পি রেকর্ডের আলোচনা

দের সারা বছরের গান। ছয় ঋতুর বিভিন্ন মেজাজ নিয়ে রচিত হয়েছে এক একটি গান। ঐ গানগুলির গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিচালক প্রভাস দে।

বিমান ঘোষ প্রযোজিত ছোটদের গীতিনাট্য 'কেশবতী রাজকন্যা' প্রশংসনীয় প্রয়াস। গানের সুরে এই রূপকথা কাহিনীকে মূর্ত করে তুলেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ডলি মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, শৈবাল মজুমদার, সুব্রতা মুখোপাধ্যায়, প্রণব ঘোষ, অতসী চট্টোপাধ্যায় রবীন মুখোপাধ্যায়, নীলা মজুমদার, অসীমকুমার দে, পারমিতা সেনগুপ্ত, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরমিতা মুখোপাধ্যায়, দেবাঁকা চক্রবর্তী ও প্রদীপ্তা দাস।

কাহিনী রচনা সুর, সঙ্গীত পরিচালনা ও গ্রন্থনায় আছেন যথাক্রমে ইন্দিরা দেবী, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ইনরেকো কোম্পানীর লেবেলে নবনালন্দা প্রযোজিত 'মেঘনাদবধ কাব্য'—উল্লেখযোগ্য দুটি কারণে। প্রথমত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ ধরনের দুঃসাহসিক উদ্যম এই প্রথম। দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় সংহতি ও পরিমিতিবোধ। নাট্যরূপ, রচয়িত্রী ও পরিচালিকা ভারতী মিত্রর অভিনিবেশ ও বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর রয়েছে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মাইকেলের চিঠির সুনির্বাচিত সংকলনে। প্রমীলার ভূমিকায় সুচিত্রা মিত্রর আবৃত্তি ও সংলাপ তাঁর গানের মতই সংবেদনশীল। মেঘনাদ, রাবণ ও বিভীষণের চরিত্রকে যথাযোগ্য রূপ দিয়েছেন বিপ্লব দাশগুপ্ত, কল্যাণ রায় ও আর্য মিত্র। টিমওয়ার্ক প্রশংসনীয়। গ্রামোফোন কোম্পানীর বসন্তবন্দনা সিরিজের ই পি ডিস্কগুলির মধ্যে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, রজনীকান্তর গান, আধুনিক গান এবং যন্ত্রসংগীতও। বনানী ঘোষের কণ্ঠে 'তুমি ছেড়েছিলে' গানটি জমে উঠেছে শুধুমাত্র কণ্ঠসৌন্দর্যের কারণেই নয়। কোন্ লয়ে এ গান গাইতে হয় সে বোধ তাঁর আছে আর আছে প্রতিটি কথার উচ্চারণস্পষ্টতা ঐ একই কারণে শোনবার মত হয়েছে অন্য তিনখানি গান।

অর্ঘ সেনের গায়কীতে আসে অনেকটা সুনীল রায়, শুভ গুহঠাকুরতা ও সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিবেশনার ঢং। এর সঙ্গে মিশেছে তাঁর আবেগভরা প্রাণময়তা। এই সবকটি বস্তু মিলিয়ে রসোত্তীর্ণ তাঁর চারখানি গান। এর মধ্যে আছে 'জানি নাই ত সাধন বলে' ও 'আমার যে আগে কাছে' গানদুটিও।

সর্বানী সেন তাঁর নিজস্ব মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন চারখানি অতুলপ্রসাদের গানে। রজনীকান্ত সেনের চারখানি গানের মধ্যে দুখানি গেয়েছেন নিশীথ সাধু ও দুখানি গীতা মাইতির।

এসব ডিস্ক ছাড়াও স্বাদবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্না দাসগুপ্তের কণ্ঠের চারখানি আধুনিক গানে। অলোকনাথ দেব বাঁশীতে রয়েছে জনপ্রিয় গানের সুর। শিল্পীর মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করবার মত। জনপ্রিয় গানের সুরে সৈকত মুখার্জির মাউথ অর্গ্যানও ভালো লাগে।

অন্যান্য রেকর্ড

ভারতী রেকর্ড কোম্পানীতে যত মুখোপাধ্যায়ের সুরে শুক্লা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ডিস্ক 'আকাশে সূর্য মাটিতে সূর্যমুখী' ও 'জীবননদী বয়ে যায়' প্রতিশ্রুতি জাগিয়েছে। অপরদিকে অসিত বর্মনের 'ঢেউ ঢেউ, ঢেউ শুধু ঢেউ'—সুগীত।

আর এক অভিনব প্রয়াস 'সংবিধ পাখিকুলং কলকাতা বিষয়ক' ও 'মহানগর ঘোড়াগুলি'। ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে নিবেদিত চারখানি গদ্যকাব্যের সুস্মিতরূপ। কলরাতার প্রতিদিনের জীবনের সংগ্রাম রুক্ষতা ও নির্দয় কাঠিন্যের মধ্যেও কবি স্বপ্নব্যাকুল সৃজনপ্রয়াসী তরুণ প্রাণ অনুভব করেছে নিস্পন্দ।

এইসব স্বপনচারীদের মধ্যে আছেন বলা ঘোষাল, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়। আবহ সংগীতের রচনায় আব্রাহাম মজুমদার, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাপস দাস, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, তপেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা সেন

কেন চেয়ে আছো গো মা

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমিদের মধ্যে পরিষ্কার দুটো ভাগ আছে। একদল শ্রদ্ধা করেন শান্তিদেব-সুবিনয়-জ্যোতিরিন্দ্রের মত সাধক শিল্পীদের। অন্যদের প্রিয় হেমন্ত-দ্বিজেন-চিন্ময় প্রমুখ প্রেমিক শিল্পীরা। কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো ভাগাভাগি নেই। সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ শ্রোতা। তবু আজ তিনি বহু বিতর্কিত। তাঁর রেকর্ডিং প্রায় নিষিদ্ধ। (কারণ খুলে না বললেও চলে)। তাই বহুদিন পর তাঁর অগণিত শ্রোতাদের কাছে একটি নতুন ই-পি রেকর্ড তুলে দেওয়ার জন্য ইনরেকোকে ধন্যবাদ।

রেকর্ডটিতে দেবব্রতবাবু গেয়েছেন 'কেন চেয়ে আছো গো মা (জাতীয় সংগীত পর্যায়), 'ওই যে ঝড়ের মেঘের' (প্রকৃতি-বর্ষা) 'একটুকু ছোঁওয়া লাগে' (প্রকৃতি-বসন্ত) এবং 'এই আসা যাওয়ার' (পূজা)। গানগুলি ভাবের দিক এত ভাল যে সেগুলো কোন বিশ্লেষণের ধার ধারে না। এর মধ্যে 'কেন চেয়ে আছো' সম্পর্কে দুচার কথা বলতেই হয়। যাঁরা স্বর্গত ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ঋত্বিকের মুখে গাওয়া ওই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি ভুলতে পারেন নি। ছবির ওই গান গেয়েছিলেন দুজনে মিলে। স্থায়ী-সঞ্চারীতে দেবব্রত বিশ্বাস এবং অন্তরা-আভোগে সুশীল মল্লিক। একই গান, একই শিল্পীর মুখে দুজন ভাগ করে গেয়েছেন, এমন নজির এই প্রথম। ইনরেকোর এই রেকর্ডে কিন্তু সুশীলবাবু নেই। স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ সর্বত্রই অনন্য দেবব্রতকণ্ঠ। আর তা কী আবেগময়! অন্য একটি এল-পি ডিস্কে শিল্পীর আগেকার গাওয়া বারোখানি জনপ্রিয় গানের সংকলন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইনরেকোকে অনুরোধ, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর বছর পনেরো কুড়ি আগের গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে টেপ আছে, তা যেন তাঁরা রেকর্ডের আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

রবি প্রণামের অপর শিল্পী সুবিনয় রায়। যিনি শুধু অভিজ্ঞ এবং গুণীই নন, তিনি শিল্পীদেরও শিল্পী। আজকের অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরই সংগীতগুরু। ই-পি রেকর্ডে তাঁর গাওয়া চারখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রোতারা তো বটেই, সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও আদর্শ বলে ধরে নিতে পারবেন। পূজা এবং ব্রহ্মসঙ্গীত পর্যায়ের এই গানগুলিতে শিল্পীর মার্জিত, সুরেলা কণ্ঠ তিন সপ্তকেই অনায়াস যাতায়াত করেছে। কোথাও কোনো ধাক্কা নেই, সুবিনয়বাবুর গায়কীর আর বড় গুণ। দাদরায় 'ভেঙেছ দুয়ার'-এর লয় নির্বাচন (কনট্রাকট্ হিসেবে রয়েছে একতালের 'জীবন যখন শুকায়ে যায়'), পরজ তিনতালে 'তব প্রেমসুধাবসে' গানে নর্সঙ্গ, গুঞ্জগুঞ্জাপ রা দ প্রভৃতি—এ-সবের সুনিপুণ

দেবব্রত বিশ্বাস

প্রয়োগ, বাহারে বাঁধা 'এ কী করুণা করুণাময়' ছাড়া গানে টপ্পার কাজ—এসব অবাক হয়ে শোনবার মত। কোম্পানীর কাছে আর একটি অনুরোধ—তা হল সুবিনয়বাবুকে দিয়ে উচ্চাঙ্গ পর্যায়ের বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করিয়ে নেওয়া। কেননা এমন কিছু গান আছে যার ডিমনস্ট্রেশনে তাঁর পরে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অন্য একটি এল-পি রেকর্ডে রয়েছে শান্তিদেব ঘোষের গাওয়া প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশী গান

ত্র, স্বদেশ· এবং নাট্যগীতি পর্যায়ের
খানি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অমূল্য সংকলন।
কটি গান তো কিংবদন্তী। যেমন, কৃষ্ণ-
। যে গানের রেকর্ডে পিন ছোঁওয়ানো
চোখের সামনে একে একে ভেসে ওঠে
র ক্ষেতে ঢেউ, ঈশান কোণের কালো
ল মেঘ বা শ্যামায়েরের মুক্ততবেণী।
। আসন্ন মেঘের গুরু গুরু। মুহূর্তে
ছুটে যায় যমনাপাড়ার মাঠে। সত্যি! অমন
আর কেই বা ও-গান গাইতে পারেন!
ষশিল্পীদের মধ্যে এখনও একমাত্র তিনিই
করেন 'সি' শার্পে এবং অনায়াস, প্রাণ-
ও খোলা গলায়। কৃষ্ণকলি ছাড়া তাঁর
ন্য গানগুলি হল—'নহ মাতা নহ কন্যা',
তে কি শুধু', 'আবার মোরে পাগল করে',
'নিশীথ রাতের প্রাণ' ইত্যাদি। আর শেষ
গানের অনুরোধ'—আমায় বোলো না গাহিতে
বোলো না'।

এঁরা ছাড়া অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়
এবং সুবীর সেন একটি করে ই-পি রেকর্ড
করেছেন। এস-পি রেকর্ড করেছেন রাজেশ্বর
ভট্টাচার্য। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে আছেন
চিত্রলেখা চৌধুরী, ইন্দ্রাণী সেন এবং কুম-
কুম চট্টোপাধ্যায়। সকলের একটি করে ই-পি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত কথা ও সুরের সমন্বয়।
একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই
কথা বাদ দিলে তা কি রবীন্দ্রসঙ্গীত থাকে?
না থাকলেও, শতকরা পঁচানব্বই জন কি
তারও বেশী ওই সুরেই মাতেন। তাই
ভি বালসারা পরিচালিত অর্কেস্ট্রার
এল-পিতে বারোখানি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর
জনপ্রিয় হবে। এতে গানের সুর অনুসারে
বিভিন্ন বাদ্যের প্রয়োগ অভিনব হয়েছে।
পিয়ানোর সুন্দর বটে তব' চমৎকার। তবে
'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'-এর ক্ষেত্রে স্বর্গত
পংকজ মল্লিকের সেই বিখ্যাত রেকর্ডের কথা
বারবার মনে পড়েছে। ওই রেকর্ডে পংকজ-
বাবুকে সহযোগিতা করেছিলেন 'ক্যাসানোভা'
অর্কেস্ট্রা। বালসারা ছাড়া অন্য দুটি ই-পি
রেকর্ডের যন্ত্রীরা হলেন সলিল মিত্র
(বেহালা) এবং অভিজিৎনাথ (গীটার)।
আচ্ছা? এমনটা যদি হত? সুর বাদ দিয়ে
রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার রেকর্ড? তাহলে
কজন রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রেমী থাকতো সেসব
কথা।

অসিতবরণ মিত্র

সান্ধ্য আসরে আমজাদ আলী খাঁ

গত শনিবার সন্ধ্যায় সাবদা মঠের
ব্যার্থে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
ছিল রবীন্দ্র সদনে। সরোদ বাজিয়ে
ন আমজাদ আলী খাঁ এবং এবং তবলায়
সাগিতা করেছিলেন সাবীর খাঁ।

আমজাদ আলী প্রথমে বাজান 'ললিতা-
র'। ললিতাধ্বনি' প্রাচীন রাগ নয়—
পীর নিজেরই তৈরী। বছর চোদ্দ আগে
বুন্ধান রেকর্ড কো-পানীতে শিল্পী এই
একটি রেকর্ডও করেছিলেন, তখন তাঁর
ধ খুবই অল্প ছিল। ললিতাধ্বনিকে
ভন্নভাবে বর্ণনা করা যায়। যারা নতুন
-বাজনা শুনছে তারা বলবে ইমনের সমস্ত
ব্যবহার করে তাতে ললিতাঙ্গের শুদ্ধ
ম প্রয়োগ করা হয়েছে। যাদের হেমন্তের
বেশী পরিচয় তারা হেমললিতের সঙ্গে
সাদৃশ্য খুঁজে পাবে। আমরা সেনী ঘরের
চনিধিরা বলবো শুদ্ধ বসন্তের চিন্তা
নে রেখে কৌশিকি-ধ্বনির সঙ্গে শুদ্ধ
ধার মিশ্রণে ললিত মেশানো হয়েছে। যাই
ক এর এফেক্ট্ পঞ্চম গ্রুপের রাগগুলির
ন—শুদ্ধ পঞ্চম ললিত পঞ্চম, বসন্ত
ম, হেমন্ত, হেমললিত ও শুদ্ধ বসন্তের
নই সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়।

রাগের কাঠামো শাস্ত্রীয় ছিল কারণ
ভন স্বরের সম্পর্কের মধ্যে সমতা বজায়
য়। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে উত্তর
তীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকার
র এর বৈশিষ্ট্য হল আমাদের প্রাচীন রাগে
সমতা সবসময় বজায় রাখা হয় যেটা দক্ষিণ
তীয় রাগে না রাখলেও চলে। যেরকম
নের নি রে'র সঙ্গে মা ধা, নি সা'র সঙ্গে
পা, নি রে গা'র সঙ্গে মা ধা নি ইত্যাদি।
বীতেও সা কোমল রে'র সঙ্গে পা ও কোমল
বে গা'র সঙ্গে দা নি ইত্যাদি। ললিতা-
নতেও আরোহণে গামার সঙ্গে নি সা ও
ধার সঙ্গে সা গা'র ব্যালেন্স ছিল অব-
হলেও ধাতীবঁ মার সঙ্গে বে নি'র একই
ঙ্গস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

আমজাদ আলীর বাজনার ক্যানভাস
কম বৃহৎ হয়েছে তার সঙ্গে তার কল্পনা-
তিও হয়েছে প্রখর। বাজনার চমক
লাগানো অতি দ্রুতগতি থাকলেও কখনো
এক সুরের সঙ্গে অরেক সুর জড়িয়ে যায়নি।
আমজাদ আলী যে অঙ্গে সরোদের মতো যন্ত্রে
একহাতা তান করে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এটা
কম কথা নয়। নতুন দুটো জিনিস এবার
লক্ষ্য করলাম সুরবোধের তীক্ষ্ণতা ও
ললিতাধ্বনিতে বাজনা আজানো। অনেক
ওয়াজ ও দিনের পর দিন সম্পাদনার ফলে
বাজনাকে এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে
যে, যারা গান-বাজনা বোঝে না, তাদের
মনকেও নাড়া দেবে। এর কারণ বোধহয়
আমজাদ আলীর বাজনায় কিছুটা রহস্য ও
উত্তেজনাও আছে। বিশেষ করে যখন বিদ্যুৎ-
গতিতে কিছু দিরি দিরি অঙ্গের তান ও
পর থেকে নীচে ঝটকা দিয়ে গমক বাজায়।
লয়ের ওপর দখল ভালো বলে এই সমস্তের
সমাশ্রিতেও বৈচিত্র্য থাকে।

ললিতাধ্বনির পরে আমজাদ আলী
বাজান মালকোষ রাগে আলাপ ও তিনটি গৎ
যথাক্রমে ঝাপতাল তিনতাল ও একতালে
নিবদ্ধ ছিল। আলাপের গতি ছিল অতি
বিলম্বিত বলা যেতে পারে ধ্রুপদের
তুমুনুম্ আলাপের গতিকে খেয়াল অঙ্গের
অলংকারে সজ্জিত করা। ডান হাতের জবাব
টোকা পড়ছিল কম কিন্তু বাঁ হাত খেলছিল
বেশী। প্রাধান্য পেয়েছিল শৃংগার ও বীরবস,
অনেকের মতে মালকোষ পুরোনিজের রাগ বলে
তাতে করুণ রস কম থাকা উচিত। এই
ধরনের অতি বিলম্বিত আলাপে মানসিক
পরিশ্রম খুব বেশী হয়। আর একবার শিল্পী
যদি পরিশ্রান্ত হয়ে যায় তাহলে মন ও
যন্ত্রের ঐক্যে বাধা পড়ে। এই কারণেই বোধ-
হয় হাফেজ আলি খাঁ সাহেব সব সময়ে এই
লয়ে আলাপ করতেন, কিন্তু বেশীক্ষণ
করতেন না। আলাপের পর যখন 'জোড়'
বাজাতেন তখন লয় দ্বিগুণ করে শ্রোতাদেরও
এই গম্ভীর রস শ্রবণের একাগ্রতা ধোর
ক্তি দিতেন। আমজাদ আলী খাঁও প্রায়
তিবিশ মিনিট অন্তরায় না গিয়ে এই ধরনের
আলাপ করবার পর বুঝলেন যে এইবার
নিজের মনকে মুক্তি দেওয়া দরকার। অন্তরা
না বাজিয়ে কিছু লোড়ার কাজ করে ঝাপতালে

চলে গেলেন। ঝাপতালের গৎ সাদরা অঙ্গের
ছিল। একতালের একটি সুন্দর দ্রুত গৎ
বিশেষ সুখশ্রাব্য হয়েছিল। তিনতালের গৎটি
সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। এর পর উনি
বাজালেন খাম্বাজের ঠুমরী অঙ্গের একটি গৎ,
তার সঙ্গে ঠুমরী অঙ্গের কিছু বিস্তার ও
দুর্গার কয়েকটি পংক্তি। সব মিলিয়ে
আমজাদ আলীর বাজনা সেদিন খুব ভালো
হয়েছিল।

সাবীর খাঁ তবলা সঙ্গতে ছিল তৈরী,
পরিমিত বোধ, সংযম ও সহযোগিতার প্রয়াস
তার বাজনার ওজন ও বাঁয়ার দখল তাকে
ইতিমধ্যেই সঙ্গীত জগতের একটি স্থানে
পৌঁছে দিয়েছে। যত বয়স বাড়বে যত বিভিন্ন
লোকের সঙ্গে বাজাবে অভিজ্ঞতা ততই তাকে
নতুন রাস্তা দেখাবে। তবলা পিটিয়ে হাত-
তালি নেওয়ার ইচ্ছে যদি তার বর্তমান
সংযত সঙ্গতধারাকে না প্রভাবিত করে তাহলে
কেরামতুল্লা খাঁর আসন শূন্য থাকবে না।
আমরা সাবীরের মধ্যে তার পিতাকে আবার
খুঁজে পাব।

সুব্রত রায়চৌধুরী

CALCUTTA

চিত্রধ্বনি

সংবাদ ও সততা

'ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের যথার্থ কোন সমালোচনা হয় না. হয় কেচ্ছা এবং ঐ জাতীয় কিছু' আমাদের দেশের এক অগ্রগণ্য চিত্রস্রষ্টা কয়েক বছর আগে একটি সভায় এই মন্তব্য করায় সাংবাদিক-দের সে কি অভিমান। একজন তো লিখেই ফেললেন, ঐ চিত্র-পরিচালককে তাঁরাই প্রথম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের এক-জন বলেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি একথা বলেন কি করে। কিন্তু সবিনয়ে একটি প্রশ্ন করি, যুক্তিহীন নিছক প্রশংসা বা নিন্দার নামই কি সৎ সমালোচনা। আমি নিজেকে চিত্র-সাংবাদিক বলে দাবি করি না। সত্যি বলতে কি সে-যোগ্যতা আমার নেই। আমি চলচ্চিত্রের এক পেছনের সারির ছাত্র। এই শিল্পের কাছে আমার এখনো অনেক জানার আছে, বোঝার আছে এবং এদিক দিয়ে আমি অত্যন্ত মূর্খ। তাই কিছু জ্ঞানলাভের আশায় বাংলা ও ইংরেজি পত্র-পত্রিকাগুলো পড়ি ও অবাক হই। বিদেশী চিত্র-সাংবাদিক ও আলোচকেরা যখন কোন ছবির খুঁটিনাটি সমালোচনা করেন, পরিচালক ও অভিনেতা-নেত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁদের সাক্ষাৎকার নেন, তখন এ-দেশের বেশির ভাগ সাংবাদিকতা ও সমালোচনা চলে নায়ক-নায়িকা-পরিচালক ইত্যাদিদের ব্যক্তিগত ঘটনা নিয়ে, এবং এমন ঘটনা যা পড়ে পাঠকদের এক বিশেষ ইন্দ্রিয়ে জাগরিত হয়। অবশ্য বিদেশে যে এ-জিনিস নেই তা নয়, তবে সিরিয়াস কাজের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। বিদেশী এক সমালোচক তাঁর সমালোচনার গুণে এ-দেশের এক পরিচালকের ছবির আলোচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হন, আমরা নানা আলোচনায় তাঁকে কোট করি, কিন্তু এদেশে তেমন কাউকে পেলাম না। অথচ এখানে অনেক যোগ্য ব্যক্তি ও লেখা হারিয়ে গেছে। অনেকেই চিত্র-সমা-লোচনাকে বিশ্বস্ত করতে চেয়েছেন। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতাকে এক বিশেষ মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি। তার কারণ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, স্ববিরোধিতা, গোঁজামিল ও বন্ধুদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা।

পাঠকেরাও বিপর্যস্ত হন, যখন একই ছবির ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা পড়েন। কোন ছবিকে কেউ বলছেন ভাল, কেউ বলছেন খারাপ। এ হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ এক না হতে পারে। কিন্তু একটি খারাপ ছবিকে অনেকে যদি ভালো বলেন, তাহলে পাঠকের মনে সমালোচনা ব্যাপারটার ওপরেই [illegible] দেখা দেয়। এ-জিনিস আজ চলে আসছে বেশ কয়েক বছর। ফলে পাঠকেরা এখন সমালোচনার ওপরেই বিশ্বাস হারিয়েছেন। যার জন্য 'বারবধূ' যথেষ্ট প্রশংসা পাওয়া সত্ত্বেও হলে ভিড় বাড়ে না। সাংবাদিক-সমালোচকদের কাছে এই ঘটনা খুব সুখকর কি?

চিত্র-সাংবাদিকতা এমন এক পেশা যেখানে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখা যায় না। কোন সমালোচক বা সাংবাদিক যদি সত্য-নিষ্ঠ থাকতে চান, তাহলে তাঁর শত্রু বাড়বেই। এক নিরপেক্ষ আলোচকের এটাকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার না করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যদি তিনি সবদিকই ঠিক রাখতে চান, তাহলে সবচেয়ে বেশি অবিচার করেন তাঁর নিজের ওপর। পাঠকেরা তাঁকে ত্যাগ করেন। মনে হয় দুজন প্রযোজক-পরিচালক বা অভিনেতার চেয়ে দু' হাজার কি দু' লক্ষ পাঠকের কাছে বিশ্বস্ত থাকাই অত্যন্ত জরুরী। ওঁরা সঙ্গে থাকলে চিত্র-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যতই শত্রু ভাবুন না কেন, তাঁদের স্বীকার না করা ছাড়া উপায় নেই।

সুখের বিষয়, এখানকার বেশ কিছু পেশাদার ও অপেশাদার সাংবাদিক-সমালোচকেরা নিজেদের কাছে ও পাঠকের কাছে সৎ ও বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। এই অপেশাদার সাংবাদিকদের পাঠকের সামনে এনেছে ফিল্ম, চিত্রপট, আন্ত-র্জাতিক আঙ্গিক, চিত্রবীক্ষণ প্রভৃতি পত্রিকা। এবং এই জাতের পেশাদার সাংবাদিকেরা যেসব কাগজ থেকে এসেছেন, সেই সব কাগজ আবার বেশ কিছু অসৎ ও মেরুদণ্ডহীন সমালোচককে উপহার দিয়েছে কিন্তু দোষ এখানে কাগজের নয়, ঐ আলোচকের যেহেতু কাগজ কখনো কাউকে অন্যরকম কিছু লিখতে বাধ্য করে না। ঐসব সাংবাদিক সমালোচকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন স্বমনোনীত কিছু চিত্রসাংবাদিক। তুলনায় ওঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্টুডিও ফ্লোরের চেয়ে ওঁরা নজর দেন নায়ক-নায়িকার মেকআপরুমের দিকে। এ-ব্যাপারে বহুদিনের নানা সিনেমা-সংশ্লিষ্ট কাগজের সঙ্গে আজকাল এখানে-ওখানে সিনেমা ইত্যাদির বেশ কিছু রুচিহীন পত্র-পত্রিকা মাথা ফুঁড়ে উঠে পড়ছে। দু'দিন স্টুডিওয় গিয়ে, একদিন কোন শিল্পীর সঙ্গে কথা বলে তাঁরা নিজেদের সাংবাদিক-সমালোচক আখ্যায় ভূষিত করেন। এবং নিজেরা যাতে গুরুত্ব পান, সেজন্য যে সহজ পথটি বেছে নিয়েছেন, তা হলো: ১। প্রত্যেকের সম্বন্ধে (অবশ্য যাঁরা বিজ্ঞাপন দেন তাঁদের বাদ দিয়ে) অশ্লীল বিরূপ মন্তব্য করা, ২। শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের কত যে নিকট সম্পর্ক তা নানাভাবে বোঝানো, ৩। বন্ধু-দের একে অন্যকে শর্তসাপেক্ষে প্রশংসা। ফলে চিত্রসাংবাদিকতা আজ ভয়ংকরভাবে নিম্নগামী। ওঁরা এমন এক স্রোতে গা ভাসিয়েছেন, যেখানে বন্দী হাউসফুল হয় অথচ বারবধূর হাউসফুল বোর্ডটির পরে ধুলো জমে। যদিও এর সবকিছুই সময়ের স্রোতে ভেসে যেতে বাধ্য। আজ তাঁদের কে কতটুকু ফিল্ম বোঝেন। কে সে-পরীক্ষায় তাঁরা এখনো যোগ্য দে এখনো তাঁরা গদীনরম নিয়েই বা তাঁদের পৃথিবী এত ভয়ংকরভাবে ছো এক সৎ পাঠকের এক সেকেণ্ডেই সে হাঁফ ধরে। তাঁরা কি সত্যিই চলা ইত্যাদির উন্নতি চান? দর্শক তৈ আগ্রহী? তাহলে তাঁরা ব্যক্তিবিশে নিয়ে যুক্তিহীন প্রশংসা বা বিদ্বে প্রসূত আলোচনা (যা অশ্লীল নামান্তর) করলেই হয়ে যাবে? যদি চান, ভারতবর্ষে অসংখ্য সংখ্যায় অপরা শ্রেণীর ছবি হোক ও সে-ছবি মাসের মাস হাউসফুল যাক, তাহলে তাঁদের পথ নিতে হবে। কিন্তু তাঁরা সাময়িক উত্তেজনা চান, যে-কোনও যে-কোন ধরনের নাম কিনতে চান, অন্য উপরোধ করে বিজ্ঞাপন জোগাড় করে মা আয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহলে ত আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু ও এই কার্যকলাপ আজ এমন এক পরি সৃষ্টি করেছে, যেখানে কোন সংবাদ সমালোচনার প্রতি আজ পাঠকেরা বি নন।

পুরানো ছবির পরিবেশনা

১৯৫৬ সালের একটি ছবি নতুন এই '৭৮-এর মধ্যভাগে মুক্তি পে ছবিটি সেসময় মাঝি ভাল পয়সা দেয় এবারে যাতে ঐ একই ফল না হয় সেই পরিবেশক ঢালাও প্রচারের ব্যবস্থা করেছে ছবিটির বর্তমান পরিবেশক কল্পনা চিত্র অনেক পুরানো ছবি নতুন প্রিন্ট ও এডিট করে ওঁরা দর্শকদের কাছে আনে শুনলাম দর্শকরাও ওঁদের বিমুখ করে না। ওঁদের পরিবেশিত বেশ কিছু ছবি নাম পর পর বলে গেলেন এক প্রতিটি যার অধিকাংশই আমি দেখিনি। ঐসব ছ ওঁরা খুব কম টাকাতে কিনে নতুন ক পরিবেশন করেন। বর্তমানে ওঁরা দেখাচ্ছে কীর্তিগড়। ছবিটি দেখে প্রথম মনে এল ১৯৫৬-র সঙ্গে ১৯৭৮-এর তেমন কে তফাৎ নেই শুধু ৪০।৪৫টা ছবি আলাদা করে রাখা যায়।

পুরোনো ছবি দেখার মধ্যে অনে আমরা বর্তমানে যাঁদের প্রৌঢ় বা ব দেখছি বা যাঁরা এখন মৃত, তাঁরা তাঁ যৌবনে কি করেছেন বা ঐসময় কেমন ছ হয়েছে এসব অনেক কিছুই এর মাধ্য জানা যায়। কিন্তু কীর্তিগড় সম্ভ এসবের প্রতিনিধিত্ব করেনি। পরিবে একটি ব্যবসা বিশেষ। প্রত্যেকেই চান, ল না হোক, ক্ষতি যেন না হয়। কি কীর্তিগড় ওঁদের সে ভরসা দেয় কি? ত মুক্তি যখন থেকেই যাচ্ছে তখন কীর্তি [illegible] প্রমথেশ সরকার, হরিদাস [illegible]

দেবকী বসুদের ছবিও তো পরিবেশন করতে পারেন।

এবং শুধু পুরোনো ছবি যা কেন! কেন ওঁরা নতুন ছবি প্রযোজনা বা পরিবেশনার দায়িত্ব নিচ্ছেন না? এই ছবির জন্য প্রচার ও সম্মেলন ইত্যাদিতে ওঁদের যে খরচ হয়েছে, তার থেকে একটু বেশী খরচ করলো বা ঐ টাকাতেও নতুন ছবির কথা ভাবা যায়।

ছবিটি আলোচনার জন্য কর্তৃপক্ষ একটি প্রেস শোয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই ১৯৭৮ এ থেকে কি ভাবে, কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে ১৯৫৬ সালের একটি ছবির আলোচনা করব। এই সময়ে থেকে যেমন এ ছবির আলোচনা করা যায় না, তেমনি চলচ্চিত্রের সার্বিক উন্নতির জন্য ঐ সময়েও ফিরে যেতে চাই না। এই ছবিটির বর্তমান আয়ু চার সপ্তাহ। আজকের দর্শক ২২ বছর আগের একটি ছবি কি ভাবে নেন, তা দেখতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী। তাই এই ছবির ক্ষেত্রে আমার কোন ধারণা দর্শকের ওপর চাপাতে চাই না। কেননা তাঁদের এই গ্রহণ ও বর্জনের ওপরেই আগামী দিনের চলচ্চিত্রের গতি নির্দ্ধারিত হবে।

টালিগঞ্জের টেনিদা

পটলডাঙ্গার চারমূর্তির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত এই ছবিটি তাঁদের বার কয়েক হোঁচট খেতে সাহায্য করে। টেনিদা ও তার তিন চ্যালা, প্যালা ক্যাবলা ও হাবুলকে আমরা সে ভাবে দেখেছি, ছবির সঙ্গে তার মিল খুঁজতে গেলেই বিপদ যে কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে আলোচ্য চিত্রটি গড়ে উঠেছে, ছবিতে তা কোথাও অক্ষত থাকে নি। পরিচালকের এটি একটি সফল সিজারিয়ান অপারেশন, যেভাবে তিনি এর খোল নলচে বদলেছেন, তাতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাবলিল কৌতুক আন্তরিক ভাবে লজ্জা পায়।

কোন কাহিনীকে চিত্রায়িত করার সময়ে পরিচালক হুবহু ঐ গল্পকে অনুসরণ না করলেও কোন ক্ষতি নেই। গল্পের পরিবর্তনে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু এই ছবিতে তিনি যা করেছেন তা কতটা শিল্পবোধের পরিচয় দেয়? এই প্রশ্নটি উহ্য রেখেও যদি এই মুহূর্তে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চারমূর্তিকে বিস্মৃত হয়ে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক উমানাথ ভট্টাচার্যের চারমূর্তিকে প্রাধান্য দিই, এবং তা ছবির শর্তে, তাহলেও কি ছবিটি আমাদের কোন সুরম্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে?

চারমূর্তি যে কাহিনী পরিবেশন করেছে সে রস যোগান দিতে চেয়েছে, তা তার শ্লথ ও বিক্ষিপ্ত ভঙ্গীর জন্য বার বার বাধা পেয়েছে। চিত্রনাট্য অত্যন্ত মামুলি ও অবিন্যস্ত, সংলাপে নেই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা, যা এই শ্রেণীর ছবির পক্ষে কার্যকারী। আলোক নিয়ন্ত্রণ এতই দুর্বল যে অতি সামান্য আলোতেও ঘর আলোময় হয়ে ওঠে, বনে গাছের ছায়া থাকে না, অন্ধকার রাত্রি দিবালোকের মতো স্বচ্ছ মনে হয়। পিন্টু দাশগুপ্তের ক্যামেরায় কোন আলোছায়ার বালাই নেই, আলোর দিকে পেছন ফিরে কোন শিল্পী কথা বলছে, মুখে স্বাভাবিক ছায়া থাকতে বাধ্য, অথচ এই সামান্য কাজটিও সেখানে পালিত হয়নি। আবহসঙ্গীত ছবির গতির সঙ্গে তাল রেখে এগোয় না, গানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে বাণিজ্যিক শর্ত হিসেবে, ছবির একটাও গান প্রয়োজনের তাগিদে আসেনি। কয়েকটি দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি বড়ই কষ্ট দেয়। টেনিদা'র খাওয়া, মেসোর শিকারের গল্প ইত্যাদি শুধুমাত্র বিপিটেশানই নয়, ছবিটির স্বাভাবিক গতিকেও ব্যাহত করে দেয়। টাইটেল পেপ্লে যেসব কার্টুন আছে তা আলাদা করে দেখলে ভাল লাগে কিন্তু ছবির সঙ্গে তার তেমন একটা যোগাযোগ নেই। টাইটেল মিউজিক সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। অভিনয় বড্ড বেশী মঞ্চাশ্রিত। চিন্ময় রায় তাঁর পরিচিত দীর্ঘ চুল নিয়ে অন্য আর পাঁচটা ছবির মতোই অভিনয় গেছেন, কিন্তু টেনিদা'কে ধরতে পারেন নি। রবি ঘোষ এক মাড়োয়ারীর ভূমিকায়।

টেনিদা চিন্ময় রায়

তাঁর প্রথম দৃশ্যে তিনি যতটা উচ্ছল, স্বপ্নদৃশ্যে তার চেয়েও বেশী যন্ত্রণাকর। অবশ্য ঐ স্বপ্ন-দৃশ্যের উপস্থাপনা ও পরিবেশ পরিচালকের এক স্থূল কল্পনা ও নিম্ন রুচির উদাহরণ। ছবির তিনজন বদমায়েশের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী। এবং যেহেতু তিনি ব্যবসায়ী, তাই বাংলা ছবির প্রথা অনুযায়ী তাঁর মাথায় টুপি, সংলাপে বাংলা ও হিন্দির জগাখিচুড়ী। পরিচালক ছবিতে এই ট্র্যাডিশান ভাঙ্গলে কোন ক্ষতি ছিল না। কিশোরদেব দিয়ে দন্তাল্ত অভিনয় করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এখানে প্যালা ক্যাবলারা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেই অভিনয়ের ধারে কাছে পৌঁছোতে পারেনি। ওদের একজন পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলে, কিন্তু গানের সময় সে গায় এই বাংলার মার্জিত উচ্চারণে। পরিচালক এদিকে একটু সতর্ক হলে পারতেন। অবশ্য সতর্কতা আরো অনেক বিষয়েই প্রয়োজন ছিল। পরীক্ষার হল, টেন, গুহা ইত্যাদিতে যেখানে পরিবেশ অনুযায়ী আস্তে কথা বলা উচিৎ সেখানে মোরে সংলাপ, পুলিশদের দীর্ঘক্ষণ প্যারেড (যা ক্লান্তিকর

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও
নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র

মেট্রোপলিটন
কলেজ

সঙ্গীত প্রবীণ ক্লাসে ভর্তি চলিতেছে
শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত : শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী
লঘু-সঙ্গীত : শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ
তবলা : শ্রীসবীর খাঁ
রবীন্দ্র-সঙ্গীত : শ্রীঅমল নাগ
(দক্ষিণীর প্রাক্তন শিক্ষক)

শিশু বিভাগে রবীন্দ্র-সঙ্গীত
বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

২৪১।১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা,
কলিঃ-৩৪, ফোন : ৪৫-০৯৩৯

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনীর পথে।
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়

তরুণ থিয়েটারে

নাটক ও পরিচালনা—মন্মথ মুখোপাধ্যায়

শ্রেঃ- বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং
রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

নামান্তর), তিন বদমায়েশের হাস্যকরভাবে ধরা পড়া (যেন ওরা ধরা দেওয়ার জন্য ছটফট করছিল), অগোছালো সম্পাদনা, দুর্বল সেট-সেটিং, অস্পষ্ট সংলাপ ইত্যাদি অতি সাধারণ ভুলগুলো যে ১৯৭৮-এর কোনো চলচ্চিত্রে দেখব তা আশা করিনি।

বিকাশ জানা

আগুনের ফুলকী

কিছু ছবি আছে, যেগুলোকে একেবারে বাজে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার যে ভাল বলা যাবে সেরকমও নয়। মোটামুটি? না, তাও নয়। আসলে ধরণটা আগুনের ফুলকি না দেখলে বোঝানো শক্ত। এমন কিছু ছবি বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। রিলিজ হবার দু' সপ্তাহের মধ্যেই যেগুলো বেপাত্তা হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই বরাবরের মত। ছবিগুলো কখন আসে, কখন যায়, খুব কম দর্শকই তার খবর রাখে।

গল্প অত্যন্ত মামুলী। রেল কর্তৃপক্ষের ডকুমেন্টারী মনে হতে পারে। এক গেটম্যান-এর পারিবারিক ঘটনা। গেটম্যান হয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, স্ত্রী সাবিত্রী এবং পুত্র অংশুমান। এই পুত্রকে নিয়ে বাবা-মার সুখ-দুঃখ স্নেহ-ভালবাসার এক বিবরণ আছে এই ছবিতে। হঠাৎ একে ছোটদের ছবিও মনে হতে পারে। তবে গল্প কাঁচা। কিছু ক্ষেত্রে মনে হয়েছে শুটিং করতে করতেই যেন তা লেখা। চিত্রনাট্য, সম্পাদনা এবং ডিটেলের কাজও সেইরকম। সাবিত্রীকে বারবার এক মহিলার সান্ত্বনা দেওয়া, সুব্রতার ঘন ঘন কান্না, অনিল-সাবিত্রীর ভুল বকা, থিয়েটারের গান, রতনের ঘর মোছার মত কিছু একঘেঁয়ে দৃশ্য ছবির বোঝা বাড়িয়েছে। এছাড়া গানের মাধ্যমে রতন (অংশুমান)কে রাম এবং সাবিত্রীকে শচীমাতা হিসেবে দেখানোর ব্যাপারগুলো তো রয়েছেই। অপর এক জায়গায় রতনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার দৃশ্যটি নির্মম। এরই মধ্যে আবার কিছু ভাল দৃশ্যও রয়েছে। রতন যেভাবে দুর্ঘটনার হাত থেকে ট্রেনকে বাঁচায়, যেভাবে মাকে ফিরে পায়, তা দেখতে বেশ ভালো লাগে। এইসঙ্গে সাবিত্রীর ফ্ল্যাগ নাড়ার দৃশ্যটিও সুন্দর। লোকেশান চমৎকার। যদিও মাঝে মাঝে সেট-এর ব্যবহার করা হয়েছে। একটি দৃশ্যে টেপ-এ চালানো এলেম নতুন দেশে রবীন্দ্রসংগীতের সুরের সাথে নাচের প্রয়োগ প্রশংসনীয়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া তাঁর নিজের এবং মান্না দে-র গান দুটোও শুনতে বেশ লাগে। অর্কেস্ট্রায় জয়জয়ন্তী ছবির একটি গানের সুরকেও কাজে লাগানো হয়েছে।

তবে ছবির সবচেয়ে ভাল অংশ এর অভিনয়। প্রথমেই বলতে হয় অনিল চট্টোপাধ্যায়ের কথা। অনেক দুর্বল মুহূর্তে তিনি একাই ছবিকে টেনে নিয়ে গেছেন। তাঁর হিন্দী-ঘেঁষা বাংলা কথাও চমৎকার। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় যথাযথ ভালো। তেমনি দিলীপ রায়। আর যাদের কথা না বললে কিছুই বলা হবে না, তারা হল রুমকী রায় এবং বিশেষ করে রতনের ভূমিকায় অংশুমান।

অসিতবরণ মিত্র

সাক্ষাৎকার

পি লংকেশের নাম কানাড়া সাহিত্যে সুবিদিত। এই প্রথম বিয়াল্লিশ বছরের সুসাহিত্যিক মানুষটি প্রবেশ করলেন চিত্রজগতে। এবং প্রায় প্রবেশ মাত্রই, গত বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকের পুরস্কারটিও তিনি পেলেন। পল্লবী সংস্কারা এই দুটি ছবিতেই অবশ্য তিনি ব্যর্থ হয়েছেন অভিনেতা হিসেবে—তবু সৃষ্টিশীল পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে অনন্য।

লেখক হিসেবে তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমের যোগ্য কিনা জানতে চাওয়া হলে, তিনি কিছুটা উষ্মাভরেই বলেছিলেন যে, তিনি যখন লিখতে শুরু করেন, তখন

পি লংকেশ

এসব প্রশ্ন ওঠেনি। লোকে যখন অভিজ্ঞতার চেয়ে ব্যাকরণগত দিকটার দিকে বা ফর্মাল দিকে বেশি নজর দেয়, তখনই এসব প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু কোন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব যদি সত্যিকারের আগ্রহী থাকে কোন শিল্প মাধ্যমে, তাহলে ব্যাকরণটা কখনই কোন সমস্যা থাকে না।

লংকেশকেও ছবি তৈরি করতে অনেক পর্যায়ের অনেক রকম বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রাথমিক ক্ষেত্রে, তারা ছিলেন মোটামুটিভাবে কপর্দকহীন। এক বন্ধু দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা, যেটা সংগ্রহ করতে লংকেশকে তিনশো মাইল পথ যেতে হয়েছিল। এছাড়া সিন্ডিকেট ব্যাংক অগ্রিম হিসেবে দিয়েছিলেন ১৫,০০০ টাকা এবং আরও কিছু কিছু বন্ধু সাহায্য করেছিলেন।

টাকার সমস্যা মেটাবার পর নতুন সমস্যা হল 'প্রদর্শন'। কর্ণাটকের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ঘোড়পাদে এ-বিষয়ে কোনরকম সাহায্য করেননি। উপরন্তু অন্যান্য স্থূল রসের আর বোকা-বোকা ছবি যেখানে আট সপ্তাহের করমুক্তি পেল, পল্লবী সেখানে পেল মাত্র চার সপ্তাহের।

তাঁর প্রথম ছবিটি তৈরি হল একটি ছেলে এবং মেয়ের মানসিক আপাতঃ বিরোধিতা নিয়ে। অনেক ছবিই এই বিষয় নিয়ে তৈরি হয়েছে, যেমন চারুলতা অথবা মহানগর। তবু লংকেশের মতে তাঁর পল্লবী অনন্য। কেননা, ভারতীয় মেয়েদের আর কখনও এত বিস্তৃতভাবে এপর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়নি।

ভীমসেনের ঘরোয়ান্দা-র সঙ্গে পল্লবীর প্রচুর মিল কিন্তু লংকেশের মতে ঘরোয়ান্দা ছবিই নয়। তার অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন, প্রত্যেকটি শটে প্রত্যেকটি ঘটনায় দর্শককে খুশি করার জন্যই ভীমসেন ছবিটি করেছেন।

কিন্তু এই সাহিত্যিককে চলচ্চিত্র-মাধ্যম কেন আকর্ষণ করল? তার অন্যতম কারণ তিনি অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত অধিকাংশ জনগণের কাছে তাঁর ভাষা নিয়ে, বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হতে চান। সিনেমার মতন এমন সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম আর নেই। তাছাড়া, এমন দিন আসতে পারে যখন বিশ্ব-সংস্কৃতিতে চলচ্চিত্র-মাধ্যম একটা বিরাট ঐক্য আনতে পারে। লংকেশ মনে করেন, সাধারণ সিনেমা দর্শকেরা তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ, যাঁদের পুঁথিগত বিদ্যাই মূলধন, তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি সিনেমা বোঝেন।

কমার্শিয়াল সিনেমা বলতে যা বোঝায়, আসলে তাইতো এখন যুগের হাওয়া। তাঁর মতে গিরিশ কর্নাড, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকের ছবি তো ঠিক জনরুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না। লংকেশ এ-বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি মনে করেন যে, রাজকাপুর, মনেমোহন দেশাই এঁরা জনগণের রুচির বিরাট ক্ষতি করেছেন, নিঃসন্দেহে কিন্তু একটা উপকারও করেছেন। চলচ্চিত্র-মাধ্যমের সঙ্গে জনতার পরিচিতি ঘটিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা সৎ ছবি করতে চান, তাঁরা জনগণের এই পরিচিত মাধ্যমকে সততার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন।

লংকেশের পরবর্তী ছবি অনুরূপা। পল্লবী যদি একটি মেয়ের গল্প হয়, তাহলে অনুরূপা একটি ছেলের গল্প। পল্লবীর নায়কের চাকরি ছিল না, কিন্তু অনুরূপার নায়ক প্রতিষ্ঠিত — আপন শক্তিতে বলীয়ান। কিন্তু সে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কম্প্রোমাইজ করল। এই ছবিটির নায়ক আদর্শবাদী। নিজের কলেজকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য নিয়ে সে ছাত্রদের ক্ষেপিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী ছাত্রদের সন্তুষ্ট করতে পারল না। আসলে ভারতবর্ষে বিদ্রোহী কাউকে সন্তুষ্ট করার মত কিছু নেই।

কানাড়া ছবির শেষ সাত বছর লংকেশের মতে অসাধারণ। কৃষ্ণস্বামী, লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতিদের দ্বারা যে নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল, সম্ভাবনা—তারই পরিনতি। আরও কতকগুলি ছবিও বড় ভালো হয়েছে। বংশ বৃক্ষ আর কাদু ও

ভালো ছবি, তবে অসাধারণ কিছু নয়। চেমানা ডুডি ও এমন কিছু না। কিন্তু ওগুলো বিশেষ ছবির কথা নয়।ছবির জগতের সমস্ত আবহাওয়াই বড় কথা।

কিন্তু বাংলা আর মালয়ালাম ছবির মতন কানাড়া ছবির এই আবহাওয়াটা নষ্ট না হয়ে যায়, এ'টাই লঙ্কেশের ভয়।

কানাড়া-ভাষী নয় এমন মানুষেরাও কানাড়া ছবির অনেক উন্নতি করেছেন। পট্টভীরাম্মা রেড্ডী এঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি এখনও কানাড়া ভাষা বলতে পারেন না। এছাড়া বহু শিল্পীও আছেন। লঙ্কেশের মতে এটা খুব স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। এছাড়া আছেন হৃষিকেশ মুখার্জী। চেন্দমারুত আর অনুরূপার সম্পাদনার কাজটি তিনি করেছেন।

হট্টমালার ওপারে মণিকাঞ্চন যোগ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সব তুচ্ছতা ছড়িয়ে থাকে পায়ে পায়ে, আমাদের শিল্পে তাকে অতিক্রম করে অন্যতর কোন মহৎ দায়িত্বে সামিল হতে হবে—এই রকম একটা চেষ্টার ভিতর দিয়েই নাট্যকার বাদল সরকারের শুরু। তাঁর প্রথম পর্বের নাটকে সেই প্রয়াসের প্রমাণ আছে। এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে ত্রিংশ শতাব্দী সবখানেই তা স্পষ্ট। বস্তুত জীবনে এবং নাটকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র চরিত্র নির্মাণের চেষ্টায় বাদল সরকার তখন এক রকম করে বুঝেছিলেন নির্মোক ছেঁড়ার প্রয়োজন। বাকি ইতিহাস-এ শরদিন্দু ত্রিংশ শতাব্দীতে শবং যেমন করে বুঝেছিল সামাজিকতার মুখোশের আড়ালের টান, তার যন্ত্রণা।

এই বাদল সরকারকে আমাদের দর্শক প্রবল অভিনন্দনে গ্রহণ করেছিল, গ্রহণ করেছিলেন আমাদের সরকারও। ফলে একদিকে যেমন বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হতে শুরু করল তার নাটক, অন্য দিকে তেমনি জুটলো তাঁর সরকারী খেতাব, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা। এই সবগুলোই কিন্তু নাট্যকার বাদল সরকার-এর জন্য, শতাব্দী নাট্য গোষ্ঠীর পরিচালকের জন্য নয়। এর ফলে একটা ব্যাপার সহজেই ঘটতে পারতো—বাদল সরকার প্রধানত নাট্যকারই থেকে যেতে পারতেন, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের নাটকের তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই ছিল বেশী। কারণ আমাদের তাও কিছু সক্ষম প্রযোজক আছেন, কিন্তু ভালো নাট্যকার গুণতে হলে এক হাতের পাঁচটি আঙুলই যথেষ্ট।

বাদল সরকার নিজে কিন্তু এই ভূমিকা যথেষ্ট মনে করলেন না। ফলে পরিণত বয়সে, লব্ধ সাফল্যের পরিচিত জগৎ ছেড়ে এগিয়ে গেলেন প্রযোজনার ক্ষেত্রে। শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীকে নিয়ে নাটক করে যাওয়াটাই তার কাছে প্রধান হয়ে উঠলো। আর সেখানেও তার বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়ে গেল অল্প দিনেই। সারা

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা পুরস্কার লাভ করুন

প্রবেশ মূল্য নেই আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

উদাহরণ

মোট ২৪

৫	১০	৯
১২	৮	৪
৭	৬	১১

	১২	
	১০	
	৮	

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন। দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়াল্ড সাউন্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারান্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ৩০.....খাড়াভাবে, সমানভাবে, কোণাকুণিভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ২৫-৬-৭৮

আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

Gemini Traders(116)
Gandhinagar
Delhi 110031

জেমিনি ট্রেডার্স (১১৬)
গান্ধীনগর
দিল্লী ১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান

পৃথিবীর থিয়েটার যখন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে স্বাভাবিকবাদ থেকে ক্রমে প্রতীক ও স্পেকটেক্‌লের জগতে বিচরণ করে হাঁপিয়ে উঠেছে, তখন সে তার আধুনিকতার শরীরে চেয়েছে নতুন আন্দোলন, চেয়েছে বাহুল্যের আয়োজন থেকে মুক্ত হতে। যান্ত্রিক কলাকৌশল আর বিভিন্ন মঞ্চ স্থাপত্যের মায়ার সুযোগ বাদ দিয়ে একেবারে দর্শকের মাঝখানে সহজ শারীরিক ও মানসিক নৈকট্যে সেই আন্দোলন শুরু করেছেন এখানে বাদল সরকার আর তাঁর শতাব্দী। নতুন নাটক নয় শুধু, নতুন থিয়েটার করতে চাইছেন তাঁরা। যে থিয়েটার বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করে না, নির্ভর করে না প্রাতিষ্ঠানিক পিঠ চাপড়ানির উপর। ফলে আমাদের এই হট্টমালার দেশ-এর হৈচৈ পেরিয়ে বাদলবাবু এমন একটি জগৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যেখানে নাট্যকার তিনি ও প্রযোজক তাঁর পরিবর্তনশীল পরীক্ষানিরত মানসের মণিকাঞ্চন সংযোগ সম্ভব হয়েছে। থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল-এ এক শুক্রবার মণিকাঞ্চন ও হট্টমালার ওপারে নাটক দুটো দেখতে দেখতে এ কথাই নতুন করে মনে হল আবার।

মণিকাঞ্চন-এর মণি এবং কাঞ্চন থ্রট্‌ রিডিং-এর খেলা দেখাত কৌশলে ভর করে। অবশ্য বাইরের লোকের কাছে মানতে চাইত না তা। বলত এ তাদের অলৌকিক ক্ষমতা। একদিন এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে প্রচুর টাকার বিনিময়ে খেলা দেখানোর ডাক পাবার আশায় তারা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনে, যে এটা কৌশল নয়। আর সেহাৎই কাকতালীয়ভাবে সে কথা যখন সত্যি মনে হল তাঁর তখন মণিকাঞ্চনকে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে হল অন্যের মনের কথা জানতে পারার ক্ষমতা থাকার অপরাধে; শাসক শ্রেণীর কুটিল পরিকল্পনায় তাতে বাঁধা আসতে পারে তো। আপাতদৃষ্টিতে এই বক্তব্য স্থূল। কিন্তু এই নাটকের বৈশিষ্ট্য তার বক্তব্যে নয়, উপস্থাপনার। ফলে অতিচালাকের গলায় দড়ি-র মতো মণিকাঞ্চনের পরিণতি, অথবা শাসক শ্রেণীর বন্ধুতে সর্পভ্রম হওয়ার মত বক্তব্যে জোর দিচ্ছি না, জোর দিচ্ছি তা কীভাবে দেখানো হল তার উপর। এত বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এবং এত স্বাভাবিক ট্র্যাজেডি আমাদের ভিতর দিয়ে আমাদের মাঝখানে ঘটে গেল যে তাতে জড়িয়ে পড়া ছাড়া দর্শকের কোন উপায় ছিল না। অভিনেতৃদের সঙ্গে দর্শকের এই স্বাভাবিক

বলিষ্ঠমনা কারিগরির অঙ্ক দিয়ে মাই ফুটিতে সুমিতা ও সঞ্জিতা

যোগ বা নাটকের সঙ্গে দর্শকের এই ইনভলমেন্ট ঘটানোই এই জাতীয় প্রযোজনার উদ্দেশ্য, আর তা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল এই নাটকের সামান্য পরিসরে।

হট্টমালার ওপারে-র ক্যানভাস্‌ অবশ্য অনেক বড়ো। বর্তমানে যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিতরে আমরা বাস করি, যে ইঁদুরে দৌড়ের জীবনকে, প্রাণান্ত প্রতিযোগিতার জীবনকে একমাত্র সম্ভব অবস্থা বলে মনে করি তার সবকিছুই হট্টমালার ওপারে হাস্যকর। আসলে যে জগৎ তিনি এ নাটকে রচনা করেছেন সেটাই হট্টমালার এপারে, আমাদের প্রাত্যহিক জগতকে যারা জানে হট্টমালার ওপারের দেশ বলে। তাদের সরল যুক্তির পাশে এই নেই-নেই এর পৃথিবী. দাম দিয়ে জিনিস কেনার পৃথিবীর যুক্তি অচল। তারা বলে এই দুনিয়ায় যা কিছু দরকারী, আমরা সবাই মিলেই বানিয়ে নিতে পারি— অন্য তাই যখন পারি তখন কেন অযথা

বাজার যাবো? বেচাকেনার জগৎটাই, তার সমস্ত হিসেব-নিকেষটাই অযথা হয়ে যায় এই যুক্তির চাপে। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতার জগৎ নির্মাণের ডাক দিয়েছেন বাদলবাবু আমাদের থিয়েটারে। তাঁর এই নাটক সে ডাকেরই প্রতিধ্বনি।

দু-একটা কথা তাও বলার থাকে। এই নাটক মঞ্চের প্রচলিত স্পেস-বিন্যাসকে, যান্ত্রিক সুবিধাকে বর্জন করেছে, বর্জন করেছে উপকরণের সুযোগ। ফলে বহুলাংশে তাকে নির্ভর করতে হয়েছে মাইম্‌-এর উপর। এই মাইম সব সময় স্বচ্ছন্দ হয় নি, চেষ্টাটা প্রকট হয়ে উঠেছে বার বার। আর প্রতিটি মার কাজের মাঝ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে যে সুন্দর দ্যোতনাটি বেরিয়ে আসে 'চিকিৎসক' ও 'দাদাচোর'-এর কথোপকথনে তা ভেঙে যায় যখন দাদাচোরকে চিকিৎসক বলেন, এতদিন তো গর্ত করে এসেছ অনেক, এবারে গর্ত বন্ধ করার কাজ কর। এই গোছের মোটা দাগের সংলাপ এ জাতীয় নাটকে ক্ষতিকর যথেষ্ট। অবশ্য নাটকের সঙ্গে দর্শকের একাত্মীকরণের বাধা বহুলাংশে দূর করেছে এই নাটকের অভিনয় সঙ্গীত। কথা ও সুর দুয়েই এর গান বাংলা থিয়েটারে এক অনাস্বাদিত পূর্ব সুন্দর অভিজ্ঞতা। আর একটা কথা, এই ধরনের নাটকে অভিনয়াংশ নিছক স্বাভাবিকত্বে পর্যবসিত হবার একটা প্রবণতা আছে। 'হট্টমালার ওপারে'র চোরেরা বা 'মণিকাঞ্চন'-এর নায়ক ও বাদলবাবু, সৃষ্ট চরিত্রটি তা কখনও অতিক্রম করতে পারলেও সকলেরই অভিনয়ে আরো আত্মগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

শতাব্দী 'ফ্রী থিয়েটারে' বিশ্বাস করে। মানুষের মাঝখানে, বাস্তবের নৈকট্যে ও খোলা আবহাওয়ায়, প্রতিযোগিতা শূন্য সহযোগিতার সুস্থ বাতাসে নির্ভর করে। তারা তাই বিজ্ঞাপন দেয় না। তবু লোকের মুখে মুখে ক্রমে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে, যাবে তার নাম। যে কোন শুক্রবার। কলেজ স্কোয়ার : মহাবোধি সোসাইটির পাশে থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল-এ সন্ধ্যে সাতটায় দেখা যাবে তাদের কোন না কোন অভিনয়। প্রবেশমূল্য ঠিক নয়, চাঁদা হিসেবে এক টাকা এখনও লাগে। না হলে এই সামান্য খরচও (যেমন হল ভাড়া ও অভিনেতৃদের সামান্য চা খাবার বাবদ) জোটানো মুস্কিল। বিদেশের পুরো থিয়েটার-এর কল্পনা যতদূর নামতে পারে, আমাদের থিয়েটার যে এমনিতেই তার চেয়ে দরিদ্রতর।

সুরজিৎ ঘোষ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে প্রিয়প্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। বিশেষ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৮৫ পয়সা। অন্যান্য অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

দাবদাবী না চাকুরী ?
জমিজমা না মোটর গাড়ি ?
ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বাণিজ্য ?

বক্তব্য যে কোনও বিষয়েই
হোক্ না কেন
যুগান্তরএ
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপালে
অনেক বেশি উত্তর পাবেন
কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে

কারণ অনেকগুলো :

- যুগান্তরের জনপ্রিয়তার দ্রুত ঊর্ধ্বগতি। গত ছ'মাসে দৈনিক গ্রাহক সংখ্যা ৮০০০০ এরও বেশি। তাছাড়া প্রতি রবিবারের কাটতি এখন ৩,৯০,০০০ এরও ওপর।
- পাঠক সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। লোকে অন্যের হাত থেকে টেনে নিয়ে যুগান্তর পড়ে থাকেন। আপনার বক্তব্য এই আগ্রহী পাঠক পাঠিকাদের নজর এড়াবে না।
- প্রতিটি শ্রেণীর বিজ্ঞাপন যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সাজানো হয়, ছিটে হারিয়ে যায় না।

যুগান্তর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীপ্সিত ফল পাবেনই

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 2nd June, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

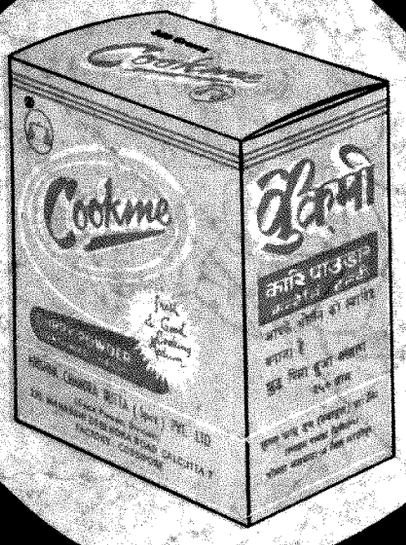

কেনার সময় দেখে নেবেন— কুকমীর প্যাকেটে কেবলমাত্র কুকমী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

অমৃত

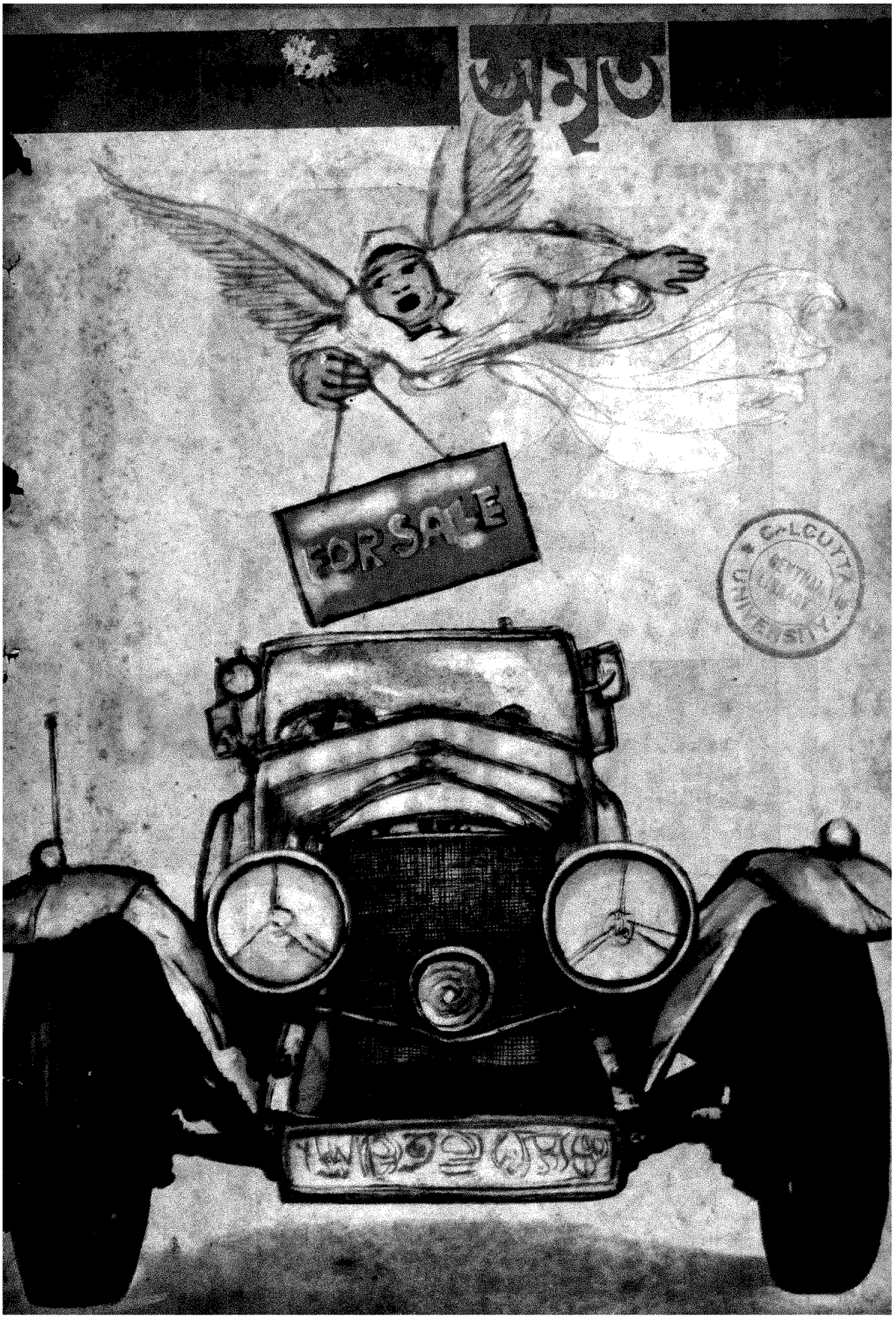

CALCUTTA UNIVERSITY

আসুন
নাম্বার টেন
ফিল্টার
ধরা যাক

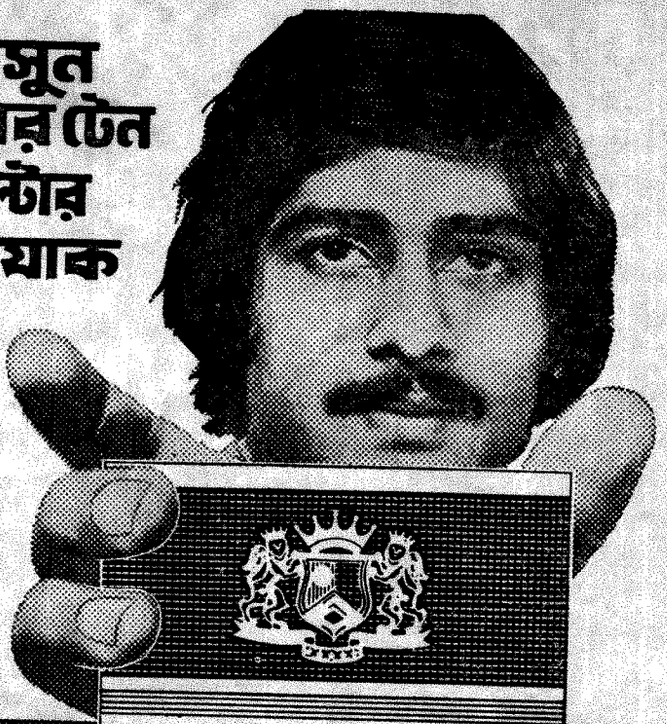

স্বাদ পাবেন।
মোলায়েম
মেজাজ পাবেন।
পাবেন ভরপুর
তৃপ্তি—
পছন্দমত দামে।
সত্যি, নাম্বার টেন
ফিল্টার অনেক
বেশী কিছু দেয়।

No10
FILTER

STATUTORY-WARNING
CIGARETTE SMOKING
IS INJURIOUS TO HEALTH

সর্বাধিক মূল্য
১টা ১০টি
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

নাম্বার টেন
ফিল্টার

যে স্বাদ দিন রাত মন ভরায়

SAA/FD/11DA/B

বিধিবদ্ধভাবে প্রচারণীয়: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

আমাদের প্রকাশিত এক সেটে অভিনয়োপযোগী মঞ্চ-সফল পূর্ণাঙ্গ নাটক

রতনকুমার ঘোষের

সকালের জন্য (১ নারী ॥৭ম সংস্করণ) ৫.

সীতাহরণ (২ নারী) ৫. জম্বুদ্বীপের ইতিকথা (নারী বর্জিত) ৫.
সময়ের রূপকথা (৩ নারী) ৫. এই দশকের মঞ্চে (২ নারী) ৫.
দোহাই হাসবেন না (২ নারী) ৫. অমৃতস্য পুত্রাঃ (৩ নারী) ৫.
ভোরের মিছিল (২ নারী) ৫. ফেরা (১ নারী) ৩.৫০ সিঁড়ি (১ নারী) ৫.
ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩. ভূমিকম্পের পরে (১ নারী) ৫.

মনোজ মিত্রের

নরক গুলজার (১ নারী) ৫. পরবাস (১ নারী) ৫.
শিবের অসাধ্য (২ নারী) ৫ নেকড়ে (৩ নারী) ৪.

অগ্নিমিত্রের

নিকটে ফাঁদ (২ নারী) ৫. নেপোনটবর কথা (১ নারী) ৫.
পটভূমি দৃশ্যমান (১ নারী) ৫. নিজস্ব সংবাদদাতা (৩ নারী) ৪.

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

এই মন সেই মন (২ নারী) ৩.৫০ পাঞ্চজন্য (২ নারী) ৩.
কেষ্টধনের কেরামতি (২ নারী) ৫. আমার জননী (২ নারী) ৫.

রাধারমণ ঘোষের

শতাব্দীর পদাবলী (১ নারী) ৫. রণ-দুন্দুভি (১ নারী) ৫.

অগ্নিদূতের

অন্ধকারের নীচে সূর্য (২ নারী ৫. **বৃত্ত বিশ্ব ভালবাসা** (১ নারী) ৫.

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ইস্তাহার (১ নারী) ৩.৫০
চিতাভস্ম (৩ নারী) ৩.৫০
নিহত নিয়তি (২ নারী) ৩.

তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের

ব্রেকজার্ণি (১ নারী) ৫

কিরণ মৈত্রের

রাতের কান্না (২ নারী) ৫.
শেষ কোথায় (২ নারী) ৫.

সুশীলকুমার গুপ্তের

সমান্তরাল (২ নারী) ৫.

সুশীল সেনের

ভলপোন (২ নারী) ৩.৫০

দিলীপ মজুমদারের

গোলাপ কাঁটার মৃত্যু ৩.০০

দেবনারায়ণ গুপ্তের

নাট্যকার (২ নারী) ৫.

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর

মল্লাটের রং মুহূর্ত (২ নারী) ৩.
খাঁচা (২ নারী) ৩.
সম্রাট কণিষ্ক (১ নারী) ২.৫০

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের

ক্যাপ্টেন হুর্রয়া (১ নারী) ৫.

মণীন্দ্র রায়ের

লাখিন্দর (২ নারী) ৫.

মনমথ রায়ের

শরৎ-বিপ্লব (৪ নারী) ৫.

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন :—

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে নববর্ষের অমৃতে থাকবে সবচেয়ে সেরা লেখা
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমল শাসমলের সুদীর্ঘ প্রামাণিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধীঃ লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার

পিছু হটার পালা ঃ লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীমাণিক্য

অনেক কিছু হয়েছে ঃ লিখেছেন অতুল সুর
সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী
প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছে

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ ঃ ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে
শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন ঃ অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা
দাম তিন টাকা ।। রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন।
অথবা লিখুন
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা -৩

অমৃত

১৮ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
২৫ জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৫
9th June, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
আমি কেমন আছি ৫
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
প্রচুর ও দুর্লভ ৬
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রদর্শনী ৭
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
ভবিষ্যৎবাণী ৮ শ্রীমাণিক্য
সমালোচনা ৯
কবিতা ১১ শকতিপদ ব্রহ্মচারী,
গৌতম গুহ, সলিল চক্রবর্তী,
নির্মলেন্দু ঘোষাল
প্রচ্ছদ কাহিনী ১২
হাত ফেরতা হাওয়া গাড়ি
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ এঁকেছেন বিকাশ ভট্টাচার্য
পৌরাণিক (গল্প) ১৭
প্রলয় সেন
ভরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২১
শৈবাল মিত্র
আশ্চর্য লেখক—আশ্চর্য মানুষ ২৫
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
হৃদয় নন্দন বনে (উপন্যাস) ২৯
সোমেন্দ্রনাথ রায়
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩৪
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
যাঁদের দেখেছি ৪১ অনন্ত সিং
প্রাচীন ভারতে কমলা ৪৫
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪৯
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
আমরা গাঁয়ের মেয়েরা ৫৪
মায়া সিদ্ধান্ত
চিঠিপত্র ৫৫
খেলা ৫৬
সঙ্গীত সমালোচনা ৬০
সুব্রত রায়চৌধুরী
চিত্রবাণী ৬১

আগামী সংখ্যায়
প্রচ্ছদ কাহিনী
যা এখনও নিজের হাতে দেশ চালান
লিখেছেন দাউদ হায়দার
সুবোধেন্দু ঘোষের গল্প
[illegible]

বিজ্ঞানের নতুন রক্তবীজ

একদিন ছিল যখন বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা নিয়ে থাকতেন, সাধারণ মানুষ থাকতেন তাঁদের নিজের কাজ নিয়ে। এখন সময় বদলেছে। সাধারণ মানুষও এখন বিজ্ঞানের বিষয়ে খবর রাখেন। অন্তত তাঁদের মধ্যে যাঁরা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখেছেন তাঁরা তো বটেই।

তাছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিণাম মাঝে মাঝে এত সুদূরপ্রসারী হচ্ছে যে সধারণ মানুষেরা সেজন্যেও সচেতন থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

যেমন, উদাহরণ দিয়ে বলা যায় সাধারণ মানুষ এখন অ্যান্টি বায়োটিক জাতর ওষুধের মাত্রাহীন ব্যবহারেব বিপদ সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। কিম্বা যেমন অনেকেই আজ জানেন যে, নির্বিচারে ডি ডি টি ব্যবহারও ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এমন কি উদরঘটিত কোন কোন ব্যাধির প্রতিষেধক হিসেবে সে সব ওষুধ প্রায় ঘরে ঘরেই ব্যবহৃত হত এককালে, তারও কোন একটি ওষুধ বেশি ব্যবহার করলে অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে, এ তথ্যও আজ আর অজানা নেই সাধারণ মানুষের। এই সব কারণে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োগ এবং তার সম্ভাব্য প্রতিকিয়ার বিষয়ে আগের চেয়ে এখন মানুষ অনেক বেশি হুঁশিয়ার। বিজ্ঞানীরাও এখন গবেষণার ভাল-মন্দের বিষয়টি শুধু নিজেদের মধ্যে আটকা না রেখে সাধারণ মানুষকেও ওয়াকিবহাল রাখা দরকার মনে করেন।

কিছুকাল আগে এই রকমই এক সতর্কবাণী প্রচার করে কয়েকজন বিজ্ঞানী এক নতুন বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। জীবদেহের মধ্যে যেসব জেনেটিক কোড থাকে, যেসব জেনেটিক কোডই আসলে প্রতিটি জীবসত্তার বিকাশ ও পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা নিয়ে গবেষণা করার বিষয়ে কতকগুলো বিধি নিষেধ রয়েছে বিজ্ঞানী মহলে। ইদানীং নাকি বিশ্বের কোন কোন বিজ্ঞানী সে নিষেধ অমান্য করে গোপনে গোপনে বিপজ্জনক এক পরীক্ষা চালাচ্ছেন তাঁদের গবেষণাগারে। তাঁরা নাকি জীবদেহ থেকে জেনেটিক কোডকে বিচ্ছিন্ন করে তার মধ্যে অন্য কোড ঢুকিয়ে দিয়ে জীবসত্তার মধ্যে নতুন ধরনের বিকাশ ও পরিণতি ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি তাঁরা সফল হন, তবে অজস্র নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটা সম্ভব হবে পৃথিবীতে। এবং জীবজগতের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিধ্বস্ত হয়ে ভয়াবহ এক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

শুনতে সম্ভাবনাটিকে প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি মনে হলেও এর বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয়ই খুব সামান্য নয়। ঘটনাটি যদি সত্যি হয়, জীবজগতে নতুন প্রাণীর উদ্ভব ঘটুক বা নাই ঘটুক, মহাযুদ্ধের মারণশাস্ত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই।

সাহিত্য ইত্যাদি....

কথাসাহিত্য ও আত্মজৈবনিক নিম্ন

পৃথিবীতে বহু আত্মজীবনী আছে যা লোকপ্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। লেখক তালিকায় রুশো টলস্টয় গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ থেকে চ্যাপলিন টয়েনবি প্রমুখ অনেকেই আছেন। অনেক সময় আবার আত্মজীবনীর আসল উদ্দেশ্য নিজের বিষয়ে বলা নয়, অন্য কারো সম্বন্ধে আলোকপাত করা। যেমন নির্মলকুমার বসুর 'গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালিতে'। কিম্বা 'মাই ডেজ উইথ পিকাসো' ধরনের রচনা।

কেউ কেউ দেখা যায়, আত্মজীবনী লেখেন ডায়রি বা চিঠির আকারে। তাতে জীবনের সব দিকের তথ্য নয়, বিশেষ একটি প্রবণতাকে অনুসরণ করাই থাকে প্রধান উদ্দেশ্য। কুলদা ব্রহ্মচারীর শ্রীশ্রীসদগুরুসঙ্গ প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' এবং রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র কিম্বা বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ইত্যাদি হল এই জাতীয় রচনা।

বিচিত্র ধরনের এইসব রচনার মধ্যে বেশি হোক কম হোক লেখকের নিজের কথা থেকেই যায় কিছুটা। ফলে যিনি লিখছেন সে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হয় না একেবারে।

কিন্তু মুশকিল হয়, লেখক যখন গা-ঢাকা দিয়ে আত্মজীবনী লেখেন। কিম্বা আত্মজীবনীর কিছু কিছু মশলা দিয়ে নতুন ধরনের এক ব্যঞ্জন উপহার দেন। পাঠক তখন মস্ত একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে যান। কতোটুকু সত্যি আর কতোখানিই বা কল্পনা তার মাত্রা ঠিক করতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এবং কোনো না কোনোভাবে সমস্যাটির সমাধান খোঁজেন।

যেমন ধরুন, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পটি কি নিছকই গল্প? এর মধ্যে কোনো আত্মজীবনীর উপাদান নেই? শ্রীকান্ত কি বেশ কিছুটা শরৎচন্দ্রের নিজের জীবন থেকেই গড়ে ওঠেনি? মহাশ্বেতার জাতক কি সবটাই নিজের কথা?

এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন।

সমস্যাটা আরো জট পাকিয়ে ওঠে সাহিত্যিকদের নিজেদেরই নানা মন্তব্যে। প্লেটো সেই আদিকালে একবার বলেছিলেন, সাহিত্য (প্লেটো যদিও কবিতার কথাই বলেছিলেন তাঁর লেখায়।) হল থ্রাইস রিমুভড্ ফ্রম ট্রুথ। অর্থাৎ সে হল ছায়ার ছায়া। সেই থেকে সাহিত্যিকদের একটা বেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে, সুযোগ পেলেই জানিয়ে দেওয়া যে, যা তিনি লিখছেন সবই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। অর্থাৎ ফালতু ব্যাপার নয়।

অবশ্যই তাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা যা আত্মজীবনীর উপাদান থাকলেই কি সেটা সাহিত্য হয়ে ওঠে?

হয় না। সাহিত্য তৈরি হয় বাস্তবের সঙ্গে লেখকের নিজস্ব চেতনার রসায়নকে মিশিয়ে দেবার কায়দায়। কায়দা বা কল্পনা যাই বলুন, ব্যাপারটা সত্য থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

প্লেটোর কথা যখন বলা গেছে, অ্যারিস্টটলের কথাও বলা যাক। সত্য থেকে দূরে মানে, অ্যারিস্টটলের ভাষায়—সাহিত্যিকের কাজ এ নয় যে যা আছে তার কথাই শুধু তিনি বলবেন, সাহিত্যিকের আসল কাজ হল যা হতে পারে তারই কথা বলা। এটাই হল তাঁর 'ল' অফ প্রব্যাবিলিটি।

কিম্বা অতো দূরে যাবারই বা দরকার কী? গত শতকের জার্মান কবি হাইনের উপমাটিই মনে করুন না! পিঁপড়ে চিনির দানা টেনে নিয়ে যায় গর্তে। তার গর্ত খুঁড়লে সে যা সংগ্রহ করেছে সেই জিনিস, অর্থাৎ চিনির দানা ঠিক সেই অবস্থাতেই পাওয়া যেতে পারে, তার বেশি নয়। কিন্তু মৌমাছি যখন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে চাকে জমা করে, তখন সে চাক ভেঙে যা পাওয়া যায় তা ফুলের মধু নয়, অন্য যৌমাছির নিজস্ব উপাদান মেশানো মধু, যা স্বাদে ও গুণে ফুলের মধু থেকে অনেক বেশি উঁচু জাতের।

যে লেখক পিঁপড়ে শ্রেণীর সত্যের সঙ্গে তিনি অন্য কিছু মেশাতে পারেন না। যিনি পারেন, মৌমাছির মতো তিনি উঁচু জাতের জিনিস উপহার দেন।

পাঠক বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছুকাল ধরে বড্ড বেশি সত্যি কথা বলার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে না কি? অর্থাৎ অনেকেই কি চেষ্টা করছেন না, নতুন কোনো সামাজিক তথ্য জোগাড় করে আকাড়াভাবে সেটা উগড়ে দিতে? অনেকটা ঐ পিঁপড়ের মতোই?

না হলে আজকের এইসব হাড়েমজ্জায় শহুরে লেখকরা আন্দামান থেকে নেফা পর্যন্ত এমন করে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? কেনই বা তাঁরা ধীবর-কৈবর্তের জীবন থেকে যাত্রাশিল্পী বা খিদিরপুর ডকের শ্রমিকদের জীবন নিয়ে উপন্যাস ফাঁদার চেষ্টায় হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন? তাঁরা কি মনে করেন, শুধু সেটিং বদলে দিলেই চরিত্রগুলো আলাদা হয়ে যায়?

হয় না। কিছুতেই তাঁরা মধ্যবিত্ত ধরনের মন-দেওয়া-নেওয়া প্যাটার্নের বাইরে যেতে পারে না। কিম্বা পারে না তাঁরা তাঁদের শংকরীয় আদিমতার ছকটাকে এড়িয়ে যেতে। শুধু দিন কতকের জন্যে বেড়াতে গিয়ে, অথবা কোনো একটা অন্য ধরনের জীবনযাত্রাকে ওপর থেকে দেখে সব থেকে ভালো যা হতে পারে তা হল রিপোর্টাজ, সাহিত্য নয়। আমি দেখেছি, আমি ওদের মধ্যে থেকেছি, এমন কি দরকার পড়লে গড় গড় করে অনেক কিছু তথ্যও আমি উগড়ে দিতে পারি—এ দিয়েই সাহিত্য তৈরি করা যায় না।

এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিও তা পারেননি। এবং নিজেই তা স্বীকার করে গেছেন। মাঝে মাঝে 'ওপাড়ার' আঙিনার ধারে গেলেই কর্মে ও কথায় 'ওদের' সত্য আত্মীয়তা অর্জন করা যায় না, তা তিনি জানতেন। আর সেই জন্যেই তিনি টুরিস্টের টহলদারী দিয়ে গল্প-উপন্যাসের আঙিনা ভরেন নি। বঞ্চিত করেছেন তাকে জীবনের কোনো-না-কোনো গভীরতর উদ্ভাসের আলোতেই। তাঁর সাহিত্য তাই ফুলের মধু নয় শুধু, মৌচাকের মধু।

একালের বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাস কিন্তু সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। পাঠকরা সেখানে মধুর খোঁজে গিয়ে পান শুধু আত্মজৈবনিক নিম।

বেচারা পাঠক।

মণীন্দ্র রায়

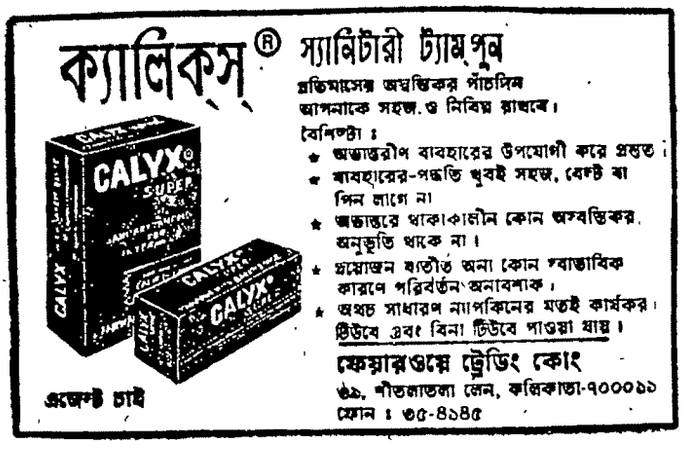

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

ভগবান আছেন কি নেই, তা নিয়ে— আমার খুব একটা মাথা ব্যথা ছিল না। ভগবানের সঙ্গে আমার দেখা হবে না ভেবে কোনোদিনও মনে মনে খুব একটা কষ্ট পাইনি। আফ্সোস পাই না। আমি যে ছায়া-পথের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে যাবার কথা ভাবতাম, বা, যে ঘাস যে জল যে অন্ধকারকে নিয়ে মাঝে মাঝে অবাক হতাম মাঝে মাঝে মুগ্ধ, তার সঙ্গে ধর্মের ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশ্বর চেতনা, আত্মদর্শন, এসব আমাকে খুব একটা কোনোদিন ভাবায়নি। বয়েসকালে কি হবে জানি না। আমার ছোটবেলার ভগবান সব সময়েই কোনো না কোনো ভাবে আমার কোনো গোপন ভয়, অসুখ বা দুঃখের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতেন। আমার ভিতরে যখন কোনো গোলমাল হোতো, পাপের সঙ্গে হাত, হাতের সঙ্গে বুক পিঠ, মাথা মেরু-দণ্ড তাল রাখতে পারতো না তখনি আমার ভগবানের দাওয়াই দরকার হোতো। ভগবান যে কোনো রকম একাকীত্ব বা বিচ্ছিন্নতাব মধ্যস্থ করেন। এবং যার যার ভগবান তার তার মতো। দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টের দিন-মজুরের ভগবান আর আমার ভগবান একরকম নয়। তার শরীর থেকে যে শব্দ বার হয় সেই তার ভগবান। ভগবান তাকে দিয়ে খাটান, ঘামান, ক্লান্ত করেন। কিন্তু ক্রমশ সেই ভগবান তার শরীর থেকে, তার নাম ঠিকানা, আত্মপরিচয়, আমিত্ব, স্বজন সংসার থেকে বহু দূরে চলে যান। ভগবান তখন ভূত। শ্রমিকের নিজের পরিশ্রম শ্রমিককে শাসন করে, আহত করে, নষ্ট করে। তারপর তাকে ছিবড়ে করে ফেলে দেওয়া হয়। ভগবান তখন মালিককে স্বপ্নে দেখা দেন মন্দির বানাতে বলেন। মালিক যদি রাজি না হতেন তবে ভগবান ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট বা সি বি আই বা দুর্নীতি কমিশনের কাছে চলে যেতেন। সেই ভয়ে মালিক রাজি হয়ে যান। অর্থাৎ শ্রমিকের ভগবান, মালিকেরও নন। কেবল শ্রমিক আর মালিকের মাঝখানে। উনি মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যৎসামান্য বিষাদ আসে মনে। তখন পৃথিবীতে খানিকটা রদ-বদল হয়। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র বা ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যে রদবদল দেখা গেছে।

আমি অবাক হতাম ভীষণ। কী করে মানুষের নিজের শক্তি, নিজের ভাবনা, নিজের স্বপ্ন, নিজেকেই গ্রাস করে চলে প্রতিনিয়ত তা ভেবে ভেবে। আমাদের পাড়ার দুর্গা ঠাকুর তৈরী করতেন বিশু-কাকা। বিশ্বনাথ পাল—প্রায় তিন পুরুষ ধরে বিশুকাকার পরিবারের সবাই কুমোর। শেষটানে মা দুর্গার চোখ আঁকা হয়ে গেলে খানিকটা বোবা মেরে যেতেন। মূর্তির কারুকাজ এত নিখুঁত হোতো যে প্রতিমার সাজসজ্জা সম্পূর্ণ না হলে, শাড়ি গহনা পরানো না হওয়া অবধি বড় লজ্জা হোতো। খুব জীবন্ত। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবার আগেই এতটা প্রাণ এসে যেতো যে ঠাকুর আর বিশুদার আপন থাকতো না। বিশুদাকে এতো সামান্য লাগতো তখন প্রতিমার তুলনায় যেন বিশুদা কেউ নয়; এ প্রতিমার সঙ্গে তাঁর কখনো কোনোদিনও কোনো আত্মীয়তা কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিশুদাও হয়তো মেনে নিতেন সেকথা। একমাস ধরে সারাদিন সারারাত্রির কেবল ধান্যেশ্বরী আর ভিজে ভাতের উপর দিয়ে শরীর চালা রেখে একটানা যে মানুষটা কাজ করে যেতে পারতেন, মূর্তি তৈরী শেষ হয়ে গেলে কী যে তাঁর হোতো চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। যে প্রতিমার প্রত্যেকটা খাঁজ— পায়ের নোখ থেকে ঊরুস্তম্ভ, জঙ্ঘা, কোমর, স্তনের তীব্রতা বিশুদার ধেনো-মাখা চোখের বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসার ফলা-ফল তার পায়ের কাছে পোষা বিড়ালের মতো চুপটি করে বসে থাকতেন তিনি। আমার রাগ হোতো। বিশুদার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে ইচ্ছে হোতো ওঠ বেটা, এ তোর নিজেরই তৈরী। একে ভেঙে গুঁড়োগুড়ো করে দিলেও তোকে কারো কিছু বলার অধিকার নেই।' পারতাম না। পাড়ার মস্তান বা সে প্রতিমা কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে তুলে নিয়ে রেখে দিতো পাঠকদের চণ্ডীমণ্ডপে। আমাদের পাড়ার সমস্ত জমি-জিরেতের এক সময়ে মালিক ছিলেন এই পাঠকরা। হয়তো বিশুদার কোনো আদি প্রপিতামহকে এরাই কিনে নিয়েছিলেন কোনোদিন। সেই সূত্রে বিশুদার এই জন্ম গোলামী। বিশুদা প্রতিমা তৈরি করতে করতে সেকথা হয়তো ভুলে যেতেন। তা না হলে তাঁর অতটা ঘন সম্বন্ধ সৃষ্টি হোতো না প্রতিমার সঙ্গে। প্রতিমা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে হয়তো খেয়াল হোতো, হয়তো ধান্যেশ্বরী তাঁকে আর মাতাল রাখতে পারতো না। এমনি হয়। আমি, মা, ছোড়দিভাই, দাদা, বাবা, মাস্টারমশাই— আমাদের সবারই হয়তো এমন হয়, এমন হোতো। নিজেকে কেবলই অন্যের হাতে তুলে দিয়ে, বেঁচে থাকতে শিখে যাই আমরা সবাই।

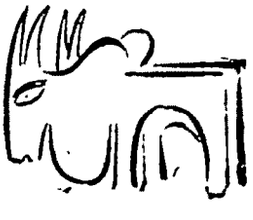

দুর্গাপুর স্টীল কারখানাতে একবার এমন দেখেছিলাম। রাতির নটা নাগাদ যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি অন্ধকার আকাশের দিকে কারখানার চুল্লীর আগুন চোখ ধাঁধানো সাদা রং প্রতি মুহূর্তে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। আমি সেই সময়ে সুখী। কতকটা উষ্ণতা, কতকটা আত্মার সত্তের রঙের চেহারা তখন ছিল আকাশে। এ যেন প্যালেটের সেই দুষ্প্রাপ্য রং দুর্লভ সময়ের মুগ্ধ আবিষ্কার, যুসোর স্লিপিং জিপসি ছবির সিংহের কেশরের মতো। আমি এমন এক বিশুদ্ধ রঙের আকাঙ্খায় মনে মনে বহুদিন ছিলাম। বহু সময় ও আগুনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম সেদিন। এক হাতে সিগারেটের প্যাকেট অন্য হাতে দেশলাই— তবুও সিগারেট আর শেষ পর্যন্ত ধরানো হয়নি। ফিরে আসার পথে একটা সস্তা খোপরায় বসে চা খাচ্ছি, সিগারেটের ধোঁয়ার ফুসফুসে অনেকটা আরাম। এক সময়ে নজর পড়লো পাশের বেঞ্চে বসে থাকা একটি প্রায় আমার সম-বয়সী ছেলের দিকে। হয়তো দুর্গাপুর স্টীল প্লান্টেরই মজুর। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। বিশ্রী নীল শার্টটা ঘামে ভিজে চুপসে গেছে। চোখের মধ্যে কেবল দুটি চোখ। তারা কেবল দেখে, যতটা দেখতে হয়, যতটা না দেখলে বাঁচা যায় না ততটুকু।

মুখে বিড়ি গুঁজে একেবারে খালি হয়ে বসে আছে লোকটা। ও কারোরই নয়, ওর বিড়ির আগুনটুকু অবধি অন্য কেউ নিয়ে চলে গেছে। অথচ পাশের বেঞ্চে আমার সিগারেটের ধোঁয়া, আমার দেশলাই, লোকটার নজরে পড়েনি। অথবা পড়লেও, ও আগুন চাইবার মতো শ্রম বা স্পর্ধা লোকটার ক্ষমতার বাইরে। এতটা শূন্যতা এতটা নিরুত্তাপ আমি আগে কখনো দেখিনি। লোকটার দিকে দেশলাই এগিয়ে দিলাম। ও বিড়ি ধরিয়ে দেশলাই ফেরৎ দিলো। সামান্য একটা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন পর্যন্ত ফুটে উঠলো না চোখে মুখে, ধন্যবাদ তো দূরের কথা। দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে আবার ওই চুল্লীর আগুন দেখতে পেলাম। আগের মতোই সুন্দর, ধবধবে টিনোপালে কাচা জামা যেন। রাত গভীর হয়ে ওঠার সঙ্গে আগুনটা যেন আরো আরো সুন্দর হয়ে উঠছিল। ঈশ্বরের গায়ের রং বোধহয় এরকমই।

প্রচুর ও দুর্লভ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

'জয় রাম' শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল বিকম্পিত করে হনুমান সাগর লংঘন করে রাম সমীপে উপস্থিত হলেন, সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানিয়ে বললেন—'দেব, মা জানকীর সন্ধান নিয়ে এলাম, তিনি দুর্বৃত্ত রাবণের প্রমোদ-উদ্যান অশোকবনে চেড়ীপরিবৃতা হয়ে কালাতিপাত করছেন, দাসানুদাসকে দেখে যুগপৎ হর্ষে ও শোকে অভিভূতা হয়ে বললেন—'বৎস হনুমান, সত্বর আর্যপুত্রকে আমার উদ্ধার করতে বল, আমার জীবন সহ্যাতীত হয়ে উঠেছে।....এই তাঁর অভিজ্ঞান, প্রভু।' এই বলে, জানকী প্রদত্ত রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় শ্রীরামের হস্তে অর্পণ করে বললেন—'এখন আমাদের যা করণীয় আদেশ করুন দেব।'

সংবাদটা রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বানরশিবিরে তুমুল হর্ষকলরব পড়ে গেল। —'জয় রামা!—মা জানকীর জয়!' তার সঙ্গে উৎকট প্রতিহিংসার নিনাদ—'পাপাত্মা রাবণ বিনাশ যাক!। স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হোক!!'

অনুজ লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব-নল-নীল-গয়-গবাক্ষ আদি অনুচরগণ রামের চারিপাশে যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করে উপবিষ্ট ছিলেন, উদ্বিগ্নভাবে হনুমৎ-বাহিত সমাচারের প্রতীক্ষাই করছিলেন। শুভ সংবাদে সবারই অন্তর প্রচণ্ড উল্লাসে পূর্ণ, আপাতকর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু সমাচারটা শুনেই রামকে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করতে দেখে সকলেই মৌনাবলম্বন করে রইলেন। রামের এই প্রকৃতি। তিনিই অন্তরে অন্তরে সবচেয়ে উল্লসিত, কিন্তু তিনি স্থিতধী, জয়ে, উল্লাসে অপ্রমত্ত। আত্মস্থ হয়েই তিনি যথাকর্তব্য নির্ণয়ে নিরত রয়েছেন। সবাই নতমস্তকে তাঁর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে রামই মৌনভঙ্গ করলেন—'বৎস হনুমান, তোমরা সকলেই শোন, জানকীর সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন তাঁর উদ্ধার নিয়ে আর সংশয় থাকতে পারে না। এখন প্রশ্ন শুধু সময়ের। তোমাদের মনোভাব বুঝছি। বাইরে ঐ বানর অনীকিনীর জয়োল্লাসে যে প্রতিহিংসা বিঘোষিত হচ্ছে, জানি তোমাদের অন্তরেও তারই প্রতিধ্বনি উঠছে। আমি যেন তা শুনতেই পাচ্ছি। জানি, দুরাচার রাবণের প্রাপ্যও তাই। তবু, নিতান্তই উপায়ান্তর না থাকলে, একের অপরাধে—হোক সে রাজাই—নিরীহ সহস্র সহস্র প্রজাদের সর্বনাশ কি বাঞ্ছনীয়? স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে দেখ এ ছাড়া ঐ যে আমাদেরই সেবকেরা সংহারের তৃষ্ণায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—আমাদের কত আপন, কত স্নেহাস্পদ—যুদ্ধবিগ্রহ হলে ওদেরও কতকে যে আমাদের হারাতে হবে তার কি ইয়ত্তা আছে? অতএব আমার ইচ্ছা তুমি আর একবার সাগর লংঘন করে রাবণের কাছে যাও এবং সীতাকে সসম্মানে প্রত্যার্পণ করবার কথা বল। অন্যথা পরিণামটা কি হবে তারও আভাস দেবে। এর পরও পাপাত্মা অসম্মত থাকলে তার ধ্বংসসাধন ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর থাকবে না। অতএব তুমি ঋতিই আর একবার গিয়ে তার অভিমত নিয়ে ফিরে এসো।'

হনুমান অধোবদনে শুনে যাচ্ছিলেন এতক্ষণ, এবার মুখ তুলে বললেন—'প্রভু, এত দিন দাসত্ব করেও আমি কি এটুকুও জানব না যে, আপনি শত অপরাধেও কত ক্ষমাশীল, ক্রোধেও কত করুণাময়। মা-জানকীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সর্বপ্রথম দুরাচার রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মাকে বিহিত মর্যাদার সঙ্গে ফিরিয়ে দিতেই বলি। পাষণ্ড সম্মত না হয়ে আমায় এক দুরপনেয় অপরাধে লিপ্ত করেছে, আমি কি করে তা থেকে মুক্তত হব, তা-ই এখন আমার প্রধান চিন্তা...'

—বলে হনুমান আবার অধোবদন হলেন।

সভাস্থ সকলেই দ্বিধা-সংশয়ে পড়ে খানিকটা ভীতভাবেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন, রামও খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন—'কী অপরাধের কথা বলছ বৎস? তোমার এমন কি অপরাধ হতে পারে যা আমার কাছেও অমার্জনীয়?'

হনুমান পুনরায় মাথা নত করে নিয়ে বললেন—'সেবক ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে, আপনার অনুমতি না নিয়েই এক মা-জানকীর অশোক বন ছাড়া সমস্ত স্বর্ণলংকাই দগ্ধ করে এসেছে।'

যেন অপরাধের গুরুত্বের নমিত হয়েই শ্রীরামচন্দ্রের চরণে স্বীয় মস্তক রক্ষা করলেন। রাম ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে শিরস্পর্শ করে বললেন—'ওঠো। তোমার ক্রোধে আমি অতটা ইন্ধন নিশ্চয় জোগাতাম না, তবু এও ঠিক যে ঐ অগ্নিতেই তুমি নিজের অপরাধও দগ্ধ করে আরও শুদ্ধ হয়েই ফিরে এসেছ।'

সভাস্থ সকলের দিকে চেয়ে বললেন—'এবার তাহলে তোমরা পাপাচারীর যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান করে জানকী উদ্ধারে তৎপর হও।'

আদেশটা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তুমুল উদ্দীপনার সঞ্চার হোল। এ যাবৎ রামসেবকরা তাদের আশা, উৎসাহ এবং কর্মশক্তির অনুপাতে উদ্দীপনার কিছুই পায় নি, শুধুই মা-জানকীর নিষ্ফল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকা আর ভগ্নমনোরথ হয়ে শিবিরে ফিরে আসা। এত দিনে তাদের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে, পর্বত নিসৃত প্রবল জলপ্রপাতের মত তাদের দুর্বার শক্তি সহস্র ধারায় ছুটে চলল। প্রথম কাজ সাগরবন্ধন। সাগর উল্লংঘন করে লংকায় উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা একমাত্র হনুমানেরই আছে। আর সবাইকে স্থলপথে যেতে হবে এবং সে স্থলপথ স্বল্পপরিসর হলেও চলবে না তাকে সুপরিসর এবং সুগম করে গড়তে হবে যাতে ভারতভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এই বিয়াট-বিপুল বানববাহিনী যুদ্ধসম্ভার নিয়ে লংকায় রণশিবির রচনা করতে সমর্থ হয়। নদী নয়, তড়াগ নয়, উত্তাল-তরঙ্গ সাগরের ওপর দিয়ে সেতু অসম্ভব চিন্তাও করা যায় না।

সেই অচিন্তনীয় অসম্ভবকে সম্ভব করা হচ্ছে।

ত্রিভুবনে কোনকালে এ রকম বিরাট পূর্তকর্ম কেউ কখনও দেখে নি। লক্ষ লক্ষ বানর নল-নীল-গয়-গবাক্ষাদির পরিচালনায় বনভূমি নিশ্চিহ্ন করে বিরাট বিরাট বনস্পতি আর পর্বত উৎসাত করে বিপুলাকার প্রস্তর এনে সমুদ্র গর্ভে ফেলছে, লক্ষ লক্ষ বানর সেগুলিকে সমুদ্র গর্ভে সুবিন্যস্ত করার কাজে ব্যস্ত। সবার মুখেই 'জয় রামা!—জয় মা জানকী!!' ধ্বনি। সমুদ্রগর্ভ ভরাট করে সেতু রচনা হচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে, ক্লান্তির বদলে উৎসাহ, উদ্দীপনা যাচ্ছে বেড়ে, সেতু চলছে এগিয়ে। সামনে লংকা ধ্বংস, জানকী উদ্ধার—এই লক্ষ্যই যেন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে।

অন্ত নাই উৎসাহ-উদ্দীপনার, এমনভাবে মন-দেহ দিয়ে প্রভুর সেবা করতে পারবে কেউ কল্পনাও তো করতে পারে নি কখনও।

অদূরে লক্ষ্মণ—সুগ্রীবাদি পরিবৃত হয়ে রামচন্দ্র শিলাসনে আছেন বসে। আর সবার দৃষ্টি পরমাশ্চর্যে পূর্তকর্মে নিবদ্ধ, কিন্তু তিনি একটি অতিক্ষুদ্র প্রাণীর কার্যকলাপে যেন সম্মোহিত হয়ে তার দিকেই আছেন চেয়ে। ধূসর বর্ণ, শরীরের অনুপাতে লাঙ্গুলটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, প্রাণীটি সেটা পিঠে তুলে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সেতুর দিক থেকে একবার ছুটে এসে সমুদ্রতটে বালুর ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, তখনই আবার ছুটে গিয়ে দেহলগ্ন সেই স্বল্প বালুকণা সেতুর এক স্থানে ঝেড়ে দিয়ে আবার আগেকার মত তটভূমিতে আসছে ছুটে। অত্যন্ত ব্যস্ত, একটি মুহূর্ত যেন যেন নষ্ট হলে চলবে না তার।

কাজটা মোটেই সহজ নয়, সহস্র সহস্র বানরের চঞ্চল পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে

এঁকে-বেঁকে পথ করে যেতে হচ্ছে তাকে, একটু এদিক-ওদিক হলেই পদতলে নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে হবে তাকে।

এক সময় যা আশংকা করেছিলেন তা হয়েও বসল।

ওর এই অদ্ভুত আচরণের উদ্দেশ্য যাই হোক, এই কর্মচঞ্চলতার মধ্যে একটু বাধাও তো সৃষ্টি করে যাচ্ছে নিজের চপল গতিবিধি দিয়ে। দু-একটি বানর ওকে ধরবার চেষ্টা করল, নিশ্চয় ধরে সাগরে নিক্ষেপ করে দেওয়ার জন্যই, অতি ক্ষুদ্র আর অতি ক্ষিপ্র বলেই বোধহয় পারল না। তারপর অন্যতম এক বানরের পায়ের অঙ্গুলীতে বোধহয় বন্ধ হয়ে যেতেই সে হেঁট হয়ে তুলে এবং হাতে একটু চাপ দিয়ে নিক্ষেপই করতে যাচ্ছিল সাগর জলে, রামচন্দ্র—'নিবৃত্ত হও। নিবৃত্ত হও!' বলে গভীর উদ্বেগভরে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

আদেশ করলেন—'নিয়ে এসো আমার কাছে।'

সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

একটু যেন মূর্চ্ছাগত প্রাণীটি। ভয়ে, তাছাড়া রূঢ় হস্তের অবলেপও তো গেছে।

রামচন্দ্র চেয়ে নিলেন—'দাও আমায়'।

করুণাঘন পদ্মপলাশ লোচন দুটি কিঞ্চিৎ সজল। বললেন — 'তোমরা সবল, বিরাট বৃক্ষ-শৈল-খণ্ডাদি বহন করে এনে সেতু রচনা করছ, ওর সাধ্য কয়েকটি বালু-কণা বহন করা পর্যন্ত, তবু ওর সেবা আর যার কাছেই তুচ্ছ হোক, আমার কাছে তো দুর্লভই।'

বক্ষে ধারণ করে নীল কমলের মত দক্ষিণ হস্তটি অসীম স্নেহভরে বুলিয়ে দিতে লাগলেন তার হ্রাসবিদ্ধ, কোমল দেহে।

—একটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর কাঠবিড়ালী।

সেদিনের সেই স্নেহস্পর্শই তিনটি অঙ্গুলীর শ্যাম রেখায় আজ পর্যন্ত বংশ-নুক্রমে বহন করে যাচ্ছে।

১৫ মের তথ্যকেন্দ্রে প্রদর্শনী

ছটা নাগাদ সাহিত্যসভা ঘরে—বাসে দশ মিনিট দেরি হতে, তথ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দেখলাম হলের দরজা বন্ধ। চতুর্দিকে লোক। মাইক্রোফোনে বক্তৃতা শুনতে পাচ্ছি। বাইরে, পিছনে কিছু চেয়ার দেওয়া হয়েছে। স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আসরাফ সিদ্দিকি ও জনাব আসাফুদ্দৌলাকে। প্রথম জন বাংলা আকাদেমির ডিরেকটর জেনারেল। দ্বিতীয়জন বাংলাদেশ শিল্পকলায় ডিরেকটর জেনারেল। সিদ্দিকি তখন বক্তৃতা দিচ্ছেন। 'মশাই, আমরা বাংলাদেশের লোকেরা ঠাকুরবাড়ির স্ত্রী সাপ্লাই করে গেছি। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী'—

শিলাইদহের কথা বললেন সিদ্দিকি। বিশেষ গুরুত্ব দিলেন রবীন্দ্রকবিতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকটির ওপর। এরিক ফ্রোম ও অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদদের কথা টেনে নিয়ে এসে বললেন, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ না থাকলে অন্যরকম হতো। যেমন আরো অনেক বেশি গান হয়তো পেতাম আমরা—রবীন্দ্রনাথ যদি পুরুলিয়া বা ধানবাদের মতো ধূসর দেশে থাকতেন। পার্টিকুলারি কবিরা কিছু কিছু পার্টিকুলার শব্দ ব্যবহার করেন। যার পিছনে একটা নির্দিষ্ট ইতিহাস-ভূগোল থাকে। সেই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করা হোক।

আসাফুদ্দৌলা বললেন, রবীন্দ্রনাথকে চরম স্বীকৃতি আমরা দিয়েছি—তাঁর ভালোবাসার বাংলাভাষাকে বক্তব্যের প্রতিদান দিয়ে। 'আমি একজন বাঙালি মুসলমান—আমার চোখে তাঁর কোনো ধর্মান্ধতা ধরা পড়েনি।' 'রবীন্দ্রনাথের গান আমরা যেভাবে গাইতে চাই ঠিক সেইভাবে গাই।' 'পশ্চিমে বৈশাখের দিনেই এখানে আসতে পারলে ভালো লাগতো—কিন্তু পরে এসেছি বলে কোনো দুঃখ হয়নি।' শিক্ষামন্ত্রীর সহযোগি-তার কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, 'আমার সহকারকে আমি সমস্তই জানাবো।'

ঘোষক ও বক্তাদের কথায় বোঝা যাচ্ছিলো সমাগত অতিথিদের মধ্যে আছেন অমিতাভ চৌধুরী। আসাফুদ্দৌলা বক্তৃতা শেষ করার পর সভাপতি নেপাল মজুমদার খুব অল্প সময়ে দুটি মূল্যবান প্রস্তাব রাখলেন। 'অনেকেই জানেন শিলাইদহেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম কো-অপারেটিভের উদ্যোগ করেন। এ সংক্রান্ত কাগজপত্র ও বিস্তারিত বিবরণের খোঁজ খবর নেওয়া হোক। এমনিতেই বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে।'

'পতিসর ব্যাংকে নোবেল প্রাইজের টাকা জমা ছিলো। তারপর, বিটার টুথ—কি হয়েছে সকলেই জানেন—নানা কারণে সেই ব্যাংক উঠে যায়। বিশ্বভারতী কিছু টাকা তুলেছিলেন। কিন্তু ব্যাংক যে উঠে গিয়েছে, এ সংক্রান্ত কাগজপত্র কিছু নেই—বা অন্য ধরনের প্রমাণ নেই। বেশ দেরি হয়ে গেলেও, এই জিনিসটা একটু বাংলা আকাদেমিকে দেখতে বলছি।'

এরপর ছিলো গান শোনানোর পালা। এর আগে জেনে নিয়েছিলাম, সঙ্গীতশিল্পী-দের ভারতীয় ও বাংলাদেশী দল দুই দেশ সফর করবেন।

১৯ মে থেকে শুরু হয়েছিল দুজনের ছবির প্রদর্শনী। আকাদমি অব ফাইন আর্টসের নিউ সাউথ গ্যালারিতে সুনীল বৈদ্যের এবং নর্থ গ্যালারিতে সত্যেন্দ্রনাথ পোদ্দারের।

সুনীল বৈদ্য তাঁর এই প্রদর্শনীটির নাম রেখেছেন 'আমার দেশ।' কিছু ভারতীয় নিসর্গদৃশ্য, কিছু গ্রামীণ পশ্চাৎপট' ছবিতে আজন্ম হবার কারণে—হয়তো এই সিদ্ধান্ত। মুড়ো করে নিলে, সত্যিই ভারতবর্ষ আসে কি? জানি না। গ্রামীণ জীবনের কয়েকটি এক মুহূর্তের দৃশ্য তো গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা নয়। অন্তত, চিত্রীর অনাসক্তির শর্ত সুনীলবাবু মানেননি। এই কারণে, তাঁকে শিল্পী বলার থেকে ক্র্যাফটস্‌ম্যান বলাটাই আমি পছন্দ করবো। কেননা, গ্রামের এই সেন্টিমেন্টাল সরলীকরণ বাদ দিলে, ঘন ইন্দ্রিয়সংবেদে সঞ্চারিত হবার সবকটি উদ্দেশ্য ও কর্মপথ তাঁর জানা আছে। রংয়ের ব্রকতোচ্ছ্বাস ও প্রায় মাংসলতা, প্রচুর ও বিচিত্র টোন্ খেলানোর মধ্যে ছবিকে একটা ভাস্কর্যসুলভ মাসিভিটি দেবার কৌশল ও চেষ্টা আমাদের নজর এড়ায় না। আর এই-গুলোই 'দ্য কিং', (২০) 'অন হান্টিং' (২৯)' 'গুড মর্নিং' (৬), 'অ্যালার্ট' (২), 'সুইট হোম' (২১),' প্রভৃতি ছবিতে—ছবিগুলির অবলম্বন যথাক্রমে ঈগল, মোরগ, বৃক্ষ-কোটরে ফেরা পাখি ও পেঁচা হবার জন্যে—অর্থাৎ এদের নিয়ে শিল্পীদের সেন্টিমেন্ট—অব্যাহতি ঘটার জন্যে এক একটি শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। পাঁচ নম্বর ছবি, ক্যাপটিভেও একটি মাছকে দেখা যায়—যার উৎকণ্ঠ দৃষ্টি-হীন চোখ এবং সমস্ত শরীরের অ্যাগনি—জলে থেকেও তার তৃষ্ণাকে বুঝিয়ে দিয়ে মানুষেরই প্রতীক হয়ে ওঠে। কিন্তু, ভারত-বর্ষ বললেই সুনীলবাবুর যে কি হয়, তিনি 'ওম্' শিরোনাম দিয়ে ষাঁড় ও ত্রিশূল এঁকে ফেলেন। আর একটা মুশকিল, তাঁর ছবি দেখার সময় অনতিউচ্চভাবে নজরুলের 'ভোরের হাওয়া এসে' গানটি বাজানো হতে থাকে। ছবি দেখার সময় দর্শকের ঠিক মিউ-জিক্যাল প্রিপারেশন-এর দরকার থাকে কি না!

নর্থ গ্যালারিতে এসে আরো বিপদ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ পোদ্দার ধর্মমূলক সাহিত্যের খুব ভক্ত এটা বোঝা যায়—ইভ আর শয়তান, দুর্গা, সমস্ত দেবতাই এক, কাম দেখতে হয়। লাভার্স বললে কুঞ্জবনে প্যাস্টো-শাডিপরা প্রেমিকযুগলদের দেখতে হয়। কোনোটিতেই একজন চিত্রী বা কারুবিদকে আবিষ্কার করা যায় না। বর্ণসমাহারের রুচির থেকে রুচিহীনতা অনেক বেশি, আবয়বিক সংস্থানের মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই। আঠাশটি ছবির মধ্যে চারটি ছবি অয়েল প্যাস্টেল। একটির নাম শীত। নেভি ব্লু জমিনের পর সোনালি রঙে ফেলা বিশীর্ণ গাছের স্কেচ। কল্পনা করুন! তার পরের ঈশ্বর-প্রেম স্বপ্ন গোলাপ—শিল্পের সামঞ্জস্য রুচি আর পরিকল্পনার অভাবে রঙের উদ্গারময় ভেগোলজি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

শনির সাড়ে সাতিতে প্রধানমন্ত্রী

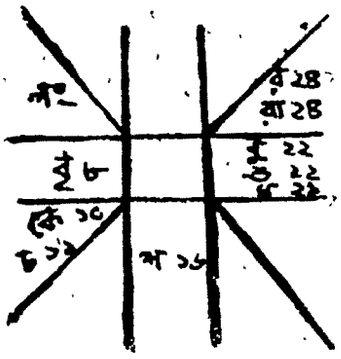

শুক্রের মহাদশা ভোগ্য ২-৩-২৭ দিন

বিশেষত্ব :—ভাগ্যপতি শনি বৃশ্চিক-স্থানে, কর্মেশ ধনস্থানে এবং আয়পতি মঙ্গল এই তিনটি তুঙ্গ।

ভাগ্যপতি কর্মপতির সাথে, কর্মপতি আবার লগ্নপতি এবং বৃশ্চিকপতির সাথে সম্পর্ক করাতে আর চন্দ্র থেকে ভাগ্যপতি মঙ্গল তুঙ্গস্থানে এবং চন্দ্রকে দৃষ্ট করাতে রাশিচক্রকে বলবান করেছে। অতএব, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল এবং লগ্নেশকে অনুধাবন করলেই জাতকের অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মোরারজী ভাই দেশাইয়ের জীবনের শুভাশুভের মোটা-মুটি একটা আভাষ পাওয়া যেতে পারে। যেমন জাতক শনি এবং বৃহস্পতির গোচর প্রভাবেই তার সাথে তুঙ্গ গুরুর মহাদশাতে তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হন এবং উক্ত গুরুর মহাদশাতেই আর গোচরে রাশি থেকে গুরুর এবং শনির শুভ সংক্রমণে জাতক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যোগ দেন। কিন্তু লক্ষ্য করার মত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় থাকাকালীন জাতক বিভিন্ন সময় জাতির কাছে সমালোচনার এবং বিতর্কের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন কারণ জন্ম-কালীন শনি এবং গুরু বক্রী ছিলেন আর জন্মকালীন শনি এবং মঙ্গলের মধ্যে কেন্দ্র সম্পর্ক জাতককে প্রায়ই বিব্রত করতো এবং করছে। যেমন বিদেশী মুদ্রাসংকট, দেশে মুদ্রাস্ফীতি, স্বর্ণ আইন ইত্যাদি। ১৯৬৪ সালে নেহরুর মৃত্যুকালে শনির গোচরে কুম্ভরাশিতে রবির সাথে মিলন এবং শনির মহাদশায় শুক্রের অন্তর্দশা ছিল ফলে তখন প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভে বঞ্চিত হলেন। শাস্ত্রীজির স্বভাবে পরও শনির দশাতে রবির অন্তর্দশা এবং গোচরে সেই শনি কুম্ভ রাশিতে অবস্থান। শুধু তাই নয় তারপরও শনির বাকী দশা জাতকের পক্ষে মোটেই শুভপ্রদ ছিল না। শনি/মঙ্গল শনি/রাহুর দশা জাতকের পক্ষে নেহাৎই অশুভ ছিল। তারপর এল লগ্নপতি বুধের দশা আরম্ভ হলো ৭৪ এর জুন মাস থেকে চললো ৭৬-এর অক্টোবর পর্যন্ত বুধের দশা বুধের অন্তর্দশা। গোচরে তখন শনি—বন্ধন ও নিধন পতি বিধায় লগ্নাদির উপর দিয়ে সংক্রমণ করায় খারাপ অশুভ ফল দিয়েছে, কিন্তু '৭৬এর নভেম্বর থেকে জাতকের বুধ/কেতু দশা আরম্ভ

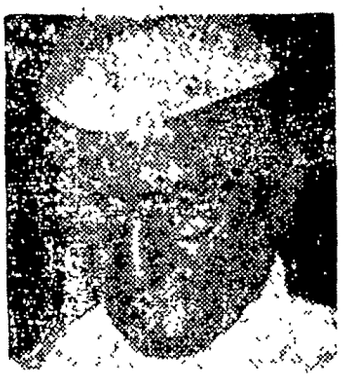

হওয়ায় এবং গোচরে বৃহস্পতি চন্দ্রের থেকে শুভ স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় জাতক জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ পেতে আরম্ভ করলেন। এই বুধ/কেতু দশাতেই জাতক '৭৭ সালের মার্চ মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ৭৭-এর অক্টোবর থেকে জাতকের বুধ/শুক্র দশা আরম্ভ হয়েছে। গোচরে ও শনি পূর্ণ সাড়ে সাতী প্রাপ্ত। দেখা যায় সে সময় থেকেই জাতককে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন জুন মাসে জাতকের রাশিতে শনি মঙ্গলের সহাবস্থান এবং রাশির অধিপতি রবি এবং জন্মকালীন রাহুর সাথে সম সপ্তম সম্পর্ক জাতকের স্বাস্থ্য এবং পদমর্যাদার হানিসূচক এমনকি এ সময় সহকর্মীদের নিয়ে বিব্রত হতে পারেন। বুধের দশায় শুক্রের অন্তরে রবির প্রত্যান্তর দশাতে যা চলবে ৭ই জুন পর্যন্ত অশুভের ইঙ্গিত দেয়। তারপর চন্দ্রের চলবে আগষ্ট পর্যন্ত তারপর মঙ্গলের প্রত্যান্তর চলবে অক্টোবর পর্যন্ত এবং রাহুর প্রত্যান্তর চলবে আগামী বছর ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত। এর মধ্যে সিংহ রাশিতে শনি মঙ্গলের মিলন ঘটে জুলাই মাসে। আগষ্টে মঙ্গল রাহুর মিলন কন্যা রাশিতে এবং ডিসেম্বরের শেষ রাহু শনির মিলন সাড়ে সাতীবুকৃত সিংহ রাশিতে। উপরোক্ত সময়গুলি আমাদের ঊর্দ্ধগতির সহিত লক্ষ্য রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ঐ সময়টা কর্ণধারের পক্ষে অশুভের ইঙ্গিত দেয় তেমন ইঙ্গিত দেয় আমাদের দেশ মকর রাশির অন্তর্গত ভারতের পক্ষেও।

এবারে সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলা হচ্ছে :—

সপ্তাহটি আরম্ভ হচ্ছে ইংরেজী ৪ঠা জুন রবিবার থেকে। সপ্তাহে শনি মঙ্গলের সিংহ রাশিতে সহ ং এবং শুক্রবার শুক্রের কর্কটে গম দলের কোন সংবাদ চাঞ্চল্য আনতে পা

মেষ :—আয় ব্যয় সমতা রাখা মুস্কিল হবে। স্বীয় বুদ্ধিতে শত্রু জয় করতে পারবেন। বুধ, বৃহঃ শুভ কিন্তু মঙ্গলবার অস্বস্তি।

বৃষ :—কর্মস্থানে প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও কোন বিশেষ দ্রব্যের ক্ষতি এবং সন্তানের জন্য চিন্তা হতে পারে। মঙ্গলবার শুভ, বৃহঃ মনস্তাপ।

মিথুন :—ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা। সাংসারিক অশান্তি, কর্মস্থানেও দুশ্চিন্তা। কিন্তু ব্যবসায়ীদের পক্ষে শুভ যোগাযোগ। মঙ্গল-বার ব্যয়।

কর্কট :— কাজে কর্মে ঝঞ্ঝাট, মানসিক ক্লেশ, তবু হাতে অর্থ আসবে। শুক্র শনি-বার লক্ষ্য রাখুন।

সিংহ :—দাম্পত্য সুখ, ব্যবসার প্রসার। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে হতাশা দেখা দিতে পারে। শুক্র, শনিবার কোন ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।

কন্যা : শত্রু বৃদ্ধি, কিছু ঋণও অসম্ভব নয়। তার উপর আইন বিষয় থেকে সাবধান থাকা ভাল। সোম, মঙ্গল অশুভ।

তুলা :—নিম্ন গুণে সম্মান বৃদ্ধি। কার্যকারণে মনের উৎসাহ বাড়বে। কিন্তু বৃহস্পতিবারটা অশুভ যাবে বলে মনে হয়।

বৃশ্চিক :—কর্ম এবং গৃহ সুখ হলেও সপ্তাহের শেষে কোন কারণে মনে আঘাত পেতে পারেন। স্বাস্থ্যটাও উৎপাত করবে।

ধনু : ভ্রমণের যোগ, ভ্রাতৃ সুখ। দূরের কোন সংবাদে উৎসাহ পেতে পারেন। কিন্তু শনিবার কারোর সাথে মন কষাকষি হতে পারে।

মকর : বন্ধু বিরোধ, স্থান পরিবর্তন। কিন্তু আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকবে। কোন ব্যাপারে বিশ্বাস হারাতে পারেন, স্বাস্থ্য দেখুন।

কুম্ভ :—আর্থিক টান থাকলেও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ভ্রাতৃবিরোধ এবং স্বাস্থ্য ক্লান্তি আনবে। বৃহঃ বার অশুভ।

মীন : ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মস্থানে শুভ ইঙ্গিত কিন্তু কোন চুক্তিতে বাধা এবং স্যাউকে বেফাঁস কথা বলে শুক্র শনিবার মনস্তাপ পেতে পারেন।

শ্রীমাণিক্য

আগামী সংখ্যায় জে পি

সমালোচনা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একটি সুপরিচিত নাম। বাংলা গদ্যের আদি রূপকার উইলিয়ম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু ও বিদ্যাসাগর এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই কলেজ কেবলমাত্র বাংলা গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টিতেই প্রেরণা জোগায়নি। আধুনিক উর্দু ও হিন্দী গদ্যসাহিত্যের সূতিকাগার হিসেবে এই কলেজের এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে। অন্যদিকে এই কলেজ সিভিল সার্ভিসের প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসে এই স্বল্পায়ু প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এমন একটি মূল্যবান প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ইতিহাস আমাদের হাতে ছিল না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কৃতি গবেষক শিশিরকুমার দাশ এই অভাব পূরণ করলেন। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'সাহিবস অ্যান্ড মুনসিস —অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ দি কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম' উনবিংশ শতাব্দী চর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সিভিল সার্ভিসের উন্নতির প্রয়াস প্রথম আরম্ভ করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর পরে কর্নওয়ালিশও এই প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। বস্তুত এঁদের আমলেই একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ক্রমশ হোগ্য শাসকগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কিন্তু এঁদের দুজনের কেউই কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য একটি সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার কথা ভাবেননি। ওয়েলেসলী কিন্তু বুঝেছিলেন যে নতুন ধরনের শাসনকর্মের যোগ্য করে তুলবার জন্য কর্মচারীদের সুসংবদ্ধ এবং পরিশ্রমসাধ্য প্রশিক্ষণ অতিশয় জরুরী। এই বোধ এবং বিশ্বাসের প্রেরণাতেই তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরিকল্পনা করেছিলেন।

১৮০০ সালে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। ওয়েলেসলী ভেবেছিলেন যে এই কলেজে তিনি এমন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করবেন যাতে কর্মচারীরা একদিকে ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করতে পারে, এবং অন্যদিকে ভারতীয় ভাষা, আচার, আচরণ, ইতিহাস ও এ দেশীয় আইন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে ওয়েলেসলী এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে কোম্পানীর ডিরেকটরদের অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি কলেজটি চালু করে দিয়েছিলেন। ডিরেকটররা তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করেন নি। ফলে, প্রতিষ্ঠানটি কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও প্রকাশনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। পাঁচ দশক ধরে প্রতিষ্ঠানটি এই ভূমিকা পালন করে, আর এই ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই জন্ম দেয় হিন্দী, উর্দু ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের।

ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে কলেজটির এই অবদান ভাষার ঐতিহাসিকরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত অবশ্য মনে করেন (যেমন ডেভিড কফ্) কলেজটি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল। শ্রীযুক্ত দাশ তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে এই মতবাদ খণ্ডন করেছেন। তাঁর সংগৃহীত সমস্ত সাক্ষ্যই প্রমাণ করে যে কলেজটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলা, যাতে তাঁরা শাসনকর্মে যোগ্য হতে পারেন। যোগ্যতায় ও পাণ্ডিত্যে ইওরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের তুলনায় কলেজের শিক্ষকরা ছিলেন বেশ ছোট মাপের। কলেজটির কর্মপদ্ধতি যাঁরা পরিচালনা করতেন, তাঁরা কেউ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। কোম্পানীর ডিরেকটরদের মধ্যে অনেকেরই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার চাইতে অবজ্ঞাই ছিল বেশী। কলেজ থেকে যেসব গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল, সেসব কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ নয়। সেসব গ্রন্থ মূলত ছিল পাঠ্যপুস্তক। সর্বোপরি। প্রাচ্য বিশারদদের আগ্রহ ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে। আর ফোর্ট উলিয়ম কলেজের আগ্রহ ছিল সমসাময়িক ভারতীয় ভাষায়। মৃত ও অর্ধমৃত ভাষা ও সংস্কৃতিতে তাঁদের আগ্রহ ছিল কম।

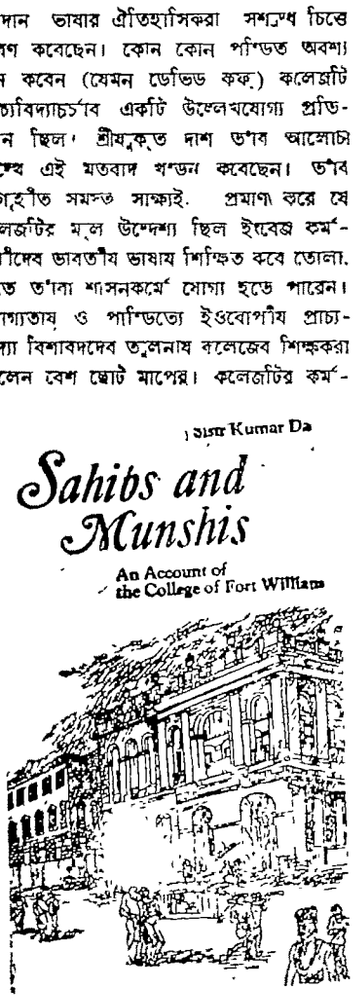

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইওরোপীয় পণ্ডিত ও ভারতীয় পণ্ডিতরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে ছিল আসমান-জমিন ফারাক। সাহেবরা ছিলেন প্রফেসর অথবা টিচার। মাইনে মাসিক ১৫০০ টাকা অথবা ১০০০ টাকা। আর ভারতীয়রা ছিলেন মুন্সী। মুন্সীদের সর্বাধিক মাইনে ছিল ২০০ টাকা, বেশীর ভাগ মুন্সী নিয়োজিত হতেন মাসিক ৪০ টাকা বেতনে। এই মুন্সীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, মীর আম্মান এবং লাল্লুজিলাল যথাক্রমে বাংলা, উর্দু ও হিন্দী গদ্যসাহিত্যে জনক-রূপে পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাইনে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাহেবরা একপ্রান্তে, মুন্সীরা আরেক প্রান্তে। এখানেও শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রভেদ। ছাত্ররা ছিলেন রাজকর্মচারী। মুন্সীরা যে তাঁদের শিক্ষক—এ বোধ তাঁদের ছিল না। ছাত্ররা মুন্সীদের অপমান করেছেন, এমন কি মারধোও করেছেন। কোন একজন ছাত্রের কানছ যখন কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর মুন্সীর প্রতি অশিষ্টাচারের জন্য কৈফিয়ৎ চান, তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি জানতেনই না যে এসব ব্যক্তিদের প্রতি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করতে হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর এই কলোনিয়াল রূপটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

তবু এই কলেজ ছিল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে ভারতের সর্বত্র থেকে পণ্ডিতদের সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। তাঁদের বিচিত্র ভাষা, বিভিন্ন পোশাক, বিচিত্র ধর্ম, আরবী ফারসী, হিন্দী, উর্দু, বাংলা, এমন কি মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলেগু—বলতে গেলে ভারতের সমুদয় ভাষার পণ্ডিতরা একসঙ্গে এই কলেজে কাজ করেছেন। ভারতের ইতিহাসে ভাষাচর্চার এমন মিলনকেন্দ্র আগে কখনো গড়ে ওঠেনি। কলেজের প্রকাশনা কেন্দ্র বহু বই প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দী, উর্দু ও বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এইসব প্রকাশনার মূল্য অপরিসীম। ভারতের ভারৎ ভাষাতে অথবা সেসব ভাষার ওপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। অভিধান ও ব্যাকরণগ্রন্থ তো ছিলই, তাছাড়া ছিল অনুবাদ গ্রন্থ, হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্পর্কে বই। কিছু ছিল পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করার মত গল্পের বই।

এই কলেজের লাইব্রেরীটিও ছিল মূল্যবান। আরবী ও ফারসী ভাষার বহু হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করা হয়েছিল। স্রোতের সংগৃহীত হিসেব থেকে দেখা যায় পুঁথি আর মুদ্রিত বই মিলিয়ে, মোট বই ছিল এগারো হাজারেরও বেশী।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু শিক্ষকদের বিদ্যাচর্চায় আগ্রহ কোম্পানীর পরিচালকদের কাছে কোন উৎসাহই পায়নি। তাঁদের কাছে এ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ছিল সাময়িক। সুতরাং

গড় কিছু ইংরেজ কর্মচারীকে একটি (বা দুটি) ভারতীয় ভাষায় কিছু জ্ঞান দিয়ে দিলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। এর চাইতে বেশী কিছু এই কলেজের কাছে আশা করতেন না। ছাত্ররাও কখনো এই কলেজকে গুরুত্ব দেয়নি। খুব অল্প ছাত্রই ভারতীয় ভাষা ভাল করে শিখবার আগ্রহ ছিল। এসব কারণে কলেজটিকে দুশ্চরিত্র একটা দোটানার মধ্যে চলতে হয়েছে।

নানা তথ্যে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লেখকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা অনুকরণীয়। পূর্ববর্তী গবেষকদের জন্য তিনি তথ্যের আলোকে বিচার করে দেখেছেন। তবু তথ্যের ভারে বইটির কোন অঙ্গহানি হয়নি। কারণ লেখকের ভাষা স্বচ্ছ এবং অর্থবহ। বইটির শেষে যে ছয়টি অ্যাপেনডিকস্ আছে তার সবকটি মূল্যবান। ১৮০১ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত যেসব সিভিল সার্ভেন্ট এ কলেজে পড়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের নাম (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত কর্মপরিচয়) একটি অ্যাপেনডিকস্ আছে। রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাছে এই তালিকাটির মূল্য অপরিসীম।

এমন একটি গ্রন্থ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত দাস আমাদের সবার ধন্যবাদের পাত্র হয়ে রইলেন। এই গ্রন্থ কেবলমাত্র আধুনিক ভারতীয় ভাষার গবেষকদের কাছেই আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে না। উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে যাঁরাই চর্চা করেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন—এঁদের প্রত্যেকের কাছেই এ গ্রন্থ একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্যতা রাখে।

গৌতম ঘোষ

Sahibs and Munshis — An account of the college of Fort William / Sisir Kumar Das / Orion Publications, New Delhi / Feb. 1978 / Rs. 45.00.

বুদ্ধদেব বসু

কল্লোল যুগের এক অতি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথের ধারাকে প্রায় অস্বীকার করে বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর আবির্ভাব। বুদ্ধদেবেরও উদয় এই সময়। উদয় এবং ক্রমাগত উদয়। সাহিত্য বোধের সঙ্গে শিল্প ও রুচির এই রকম সুষ্ঠু মিশ্রণ খুব বেশী লেখকের মধ্যে দেখা যায়নি।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রণেতা অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—কবি ও অধ্যাপক এই গ্রন্থে তিনি বুদ্ধদেবকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর উত্তাপে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণ করেছেন।

কবিতা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম [illegible]

বুদ্ধদেব বসু

থাকবে।' এই রাজ্যের বহু প্রতিষ্ঠিত কবির প্রথম জীবনের প্রেরণা ছিলেন তিনি।

সম্পাদক বুদ্ধদেব যতখানি গম্ভীর স্নেহশীল পিতৃসদৃশ—কবি বুদ্ধদেব ঠিক ততখানিই মায়াময় বিমুগ্ধ প্রেমিক। একথা ঠিক, কবিতা রচনার সময় রবীন্দ্রনাথকে তিনি কখনো অস্বীকার করেন নি।' বরং ক্রমশঃ দেখা গেছে, তাঁর কবিতা পৃথিবী রবীন্দ্রনাথের চাইতে বিশেষ আলাদা নয়।' সম্ভবত কবিতায় তিনি অনেক বেশী রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি। তা হোক, তবু তাঁর শব্দ নির্বাচন, চিত্রচয়ন, স্নিগ্ধ দৃষ্টি-কোণ এই সবই আমাদের বারবার বলে দিয়েছে—ইনি স্বতন্ত্র।' একক কণ্ঠস্বরের অধিকারী ইনি।

কবিতা রচনা ও বিদেশী কবিতার অনুবাদ—এই দুই ভিন্নমুখী ব্যাপারকে তিনি চমৎকার মিলিয়েছিলেন। অনুবাদ যে কতখানি রুচিশীল হতে পারে, তার চূড়ান্ত উদাহরণ, বুদ্ধদেব অনূদিত শার্ল বোদলেয়ার—তার কবিতা এবং রাইনের মারিয়ার রিলকের কবিতা'। কবিতা যে শুধু সৃষ্টি নয়—কবিতা এক অন্বেষণ—এই দুটি গ্রন্থ-পাঠে সেটা পরিষ্কার অনুভব করা যায়। বিদেশী কবিতা প্রচুর অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব, তবে উল্লেখযোগ্য, সব ক্ষেত্রেই এই অন্বেষণ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি বুদ্ধদেব বা অনুবাদক বুদ্ধদেব, আসলে একই ব্যক্তিত্ব—স্বধর্মে তিনি চিরদিন প্রোথিত।

অলোকরঞ্জনবাবু এরপর বুদ্ধদেবের প্রতিভার অন্যান্য দিকে সন্ধানী আলো ফেলেছেন। যেমন ধরা যাক, সমালোচক বুদ্ধদেবের কথা। সত্যি কথা বলতে কি, তুলনামূলক সাহিত্যের প্রসঙ্গেই সমালোচক বুদ্ধদেব বেশী আলোচিত হবার যোগ্য। এই ব্যাপারে তাঁর অগ্রণী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।' উনিশশ' আটাশ সালে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই তুলনামূলক সাহিত্যের বোধকে ব্যাখ্যা করেন। যাই হোক, সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব এই রাজ্যে নতুন ঢেউ এনেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সমালোচনার স্টাইল ভাষা স্বতন্ত্রভাবে বিশিষ্ট সাহিত্যরস বহন করে আসছে। এটা কম কথা নয়। উপরন্তু তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর প্রণীত একটি গ্রন্থ—মহাভারতের কথা। এখানে তিনি সাহিত্য সমালোচনার চলতি সমস্ত রীতিনীতি অগ্রাহ্য করেছেন। এই তাঁর সমালোচনার গোড়ার কথা। যে কারণে বুদ্ধদেবের সমালোচনা পাঠ করার সময় কোথাও আমাদের হোঁচট খেতে হয় না। সহজ সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিটি বিষয়-বস্তু আমাদের মনে নিবিড় সুগন্ধ সঞ্চার করে। অবশ্যই এর মূলে তাঁর মায়াবী গদ্য-রীতি। এই গদ্যরীতিই তাঁর সবচাইতে বড় অস্ত্র ছিল।' এই অস্ত্রের জোরে তাঁর হাতে খুব সাধারণ বিষয়ও অসাধারণ হয়ে উঠত। কোনো-কোনো সময় মনে হয়, কবি হিসেবে তিনি যত না গুরুত্বপূর্ণ, তার চাইতে ঢের বেশী গুরুত্বপূর্ণ গদ্যকার হিসেবে। অনুভূতির শেষতম সূক্ষ্ম পর্দার ঝংকার তোলে তাঁর গদ্য।' কবিতার মতো এক্ষেত্রেও তিনি শব্দচয়ন সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন। হয়তো গদ্যের দিকে বেশী নজর দিয়েছিলেন বলেই মৌলিক রচনার (অর্থাৎ গল্প উপন্যাস) ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সার্থকতা পাননি।' তবুও আজও 'তিথিডোর' পড়তে আমাদের ভালো লাগে। আসলে 'তিথিডোর' একটা আধুনিক শহরের গল্প। শহরটার নাম কলকাতা।

এছাড়া আছে বুদ্ধদেব রচিত কিশোর সাহিত্য।' এই ধরনের লেখায় তিনি ছোলস্ত ছিলেন।

এরপর নাটক ও কাব্যনাটক। অসামান্য সংলাপ রচনার ক্ষমতা ছিল বুদ্ধদেবের। কবিতার বোধ থেকেই তাঁর নাট্যবোধের উৎপত্তি। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র মতো কাব্য-নাটক আমাদের গর্ব'। যদিও এই কাব্যনাটকে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র প্রভাব আছে। তা সত্ত্বেও বিন্যাসে ও শিল্পভাস্কর্যের প্রসঙ্গে এটি এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।' তারপর ধরা যাক 'কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ'। এই নাটকে বুদ্ধদেব গদ্য ও কবিতাকে কাছা-কাছি আনার চেষ্টা করেছেন।' সেসময় গদ্য ও কবিতার মাঝখানে যোগাযোগের দরজাটা খুলে দেবার জন্য বাংলা সাহিত্যে বেশ একটা চিন্তার জোয়ার এসেছিল। এই জোয়ারে যে এখন ভাঁটা পড়ে গেছে, তা বলছি না। তবু বুদ্ধদেবই প্রথম এই পথে সফল পথিক হয়তো।

বুদ্ধদেবের এই বিস্তৃত মূল্যায়নের প্রয়াস অলোকরঞ্জনবাবু নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।' তাঁর প্রচেষ্টা পাঠকদের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গোটা গ্রন্থে অলোকরঞ্জন-বাবু বুদ্ধদেবকে সমালোচনা করার চাইতে আলোচনা করেছেন বেশী।' জীবিতকালে সমালোচনার মুখোমুখি বুদ্ধদেব বহুবার হয়েছেন। মোকাবিলাও করেছেন স্থির যোদ্ধার মতো।' কিন্তু আলোকিত খুব বেশী হয়েছেন কি? সুতরাং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এখানে বুদ্ধদেবকে শুধু আলো-চনা নয়—আলোকসঞ্চার করেছেন তাঁর লেখকসত্তার প্রতিটি অঙ্গনে।

অভীক রায়

BUDDHADEVA BOSE :— Alokeranjan Dasgupta Published by :— Sahitya Academi. New Delhi Price 2.50

যাত্রায় সহজ ছিল

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

যাত্রায় সহজ ছিল কণ্টিকারি এসে পর পর
ঢেকেছে সকল রাস্তা, রাস্তা নাকি পথ
সবাক্ষ ও জানালার মুখোমুখি যোদ্ধবেশ, দেখি
অদম্য ভৈরব

এ খেলা আমার ও খেলা দরজা ভেঙে ভুল
ভেঙেছে যখন
খাদ্য ও আহার্য জুড়ে বসে থাকে পাহাড়-প্রতিম
পাখির গেরুয়া ঠোঁটে দীর্ঘ অনটন

এসব পুরোনো কথা ঠাকুমার বয়সিনী হবে
তারি জন্য এতো
সুখ-দুঃখ কথাকল্প ক'মিনিট জল-না-লাগার
স্বপ্ন অনিকেত

যাত্রায় সহজ ছিল পর পর এসে কণ্টিকারি
কেড়েছে রাতের ঘুম শতচ্ছিন্ন হা-অতে মশারি ॥

তুমি হও লাল

গৌতম গুহ

মাটির তলার অন্ধকার বুকে নিয়ে উচ্চ গৃহে আছি
যাতায়াত অলৌকিক হলুদ টিকিটে
হন্যে হয়ে যাকে খুঁজি
বলাকার মতো এখনো সে পাক দিয়ে ঘোরে
সতর্ক শব্দ সব ওঠে সিঁড়ি বেয়ে
তালগাছ বাড়িটার বেলা বয় গভীর বিষাদে
দোতালার যুবকের ভীষণ অসুখ
আসুরিক স্বপ্ন তাকে নষ্ট করে গ্যাছে
বুকে নেচে গ্যাছে কেরাধান্ধ ওরাংওটাং।

মাটির তলার অন্ধকার বুকে নিয়ে নামি
ফুটপাতে মাঁহাবাজ লালগাড়ি ছুটে গেল দেখি
ঘণ্টা নেড়ে ঢং ঢং সবাকার কান মলে গেল
বলে গেল : নেশাভাঙ ভাল নয়
ঘুম ছাড়ো, একবার লোকে যেন জানে
বেঁচে আছো—
চাকুরে মতো তোমাত নিজের কথা বিঁধে দাও বুকে
মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকে বৃক্ষও সবুজ হয়
তুমি হও লাল—
লালুজন দেখামাত্র বলে যেন : সামাল, সামাল।

রূপ

সলিল চক্রবর্তী

ঘুমিয়ে রয়েছো তুমি মাঠভাঙা জ্যোৎস্নার রোদ্দুরে
ফলমূল, ন্যাসপাতি পড়ে আছে দূরে, ঝলসানো
এখন এখানে কেউ নেই—

কড়ি, বরগার ছাদ ফুটো হ'য়ে আঁধার নামছে
খুব জোরে ডেকে উঠলে দেবে কি উত্তর পুড়ন্ত পাখি ?
পা রাখি আস্তে আস্তে, এগোই—

এখনো তেমনি ঘুমিয়ে রয়েছে বিদেশী পাষাণ।

ঘুম ভাঙো, দেখি ঘুমের প্রতিমা।
আমি জলে পুড়ে যেতে চাই, পুড়ে পুড়ে হিম হ'তে চাই
পোড়াবে ? পোড়াবে আমার মিথ্যে শরীর ? ভালোবাসা।

ঠিক একমাস আগে
এখানে, আগুনে ভিজে ছিলো—
তিনটি শরীর—স্বামী, স্ত্রী এবং সন্দেহ।

দেবী আসছেন

নির্মলেন্দু ঘোষাল

আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি; কাল ঠিক দেবী আসছেন।
বৃষ্টি হবে পাহাড়তলায়, ব্রাহ্মণভোজন সন্ধ্যায়,
ফুল দিয়ে ঢাকা হবে পথের গালিচা,
মৃত মানুষ পুনর্জন্মের জন্যে প্রার্থনা করবে,
চন্দনগন্ধে মিনার হবে শুদ্ধ, বিধানসভায় কোন মন্ত্রী আসবে না,
এক হাজার কবিতা উৎসর্গ হবে দেবীর নামে। ঐ দেবী আসছেন।

আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি; কাল ঠিক দেবী আসছেন।
সব গাড়ী বন্ধ হবে ভোরের বেলায়,
ভিখারী-শিশুরা পাবে আপেল-প্রসাদ,
জীবন্ত মানুষ সমৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনা করবে,
নাবিক দল ভুলে যাবে বিপদ-সংকেত,
বিষণ্ণ-কিশোরী বই হাতে মন্দিরে যাবে। ঐ দেবী আসছেন।

আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি; কাল ঠিক দেবী আসছেন।
ঈশ্বরীর কাছে আমি ভিক্ষা চাইব প্রেম,
বলবো বিতৃষ্ণার কথা, বৈশাখী উৎসবের ছড়া শোনাব।
ঈশ্বরী, রাতে ভালো ঘুম দাও, অনেক অনেক,
মৃত্যুর রাজহাঁস সুরে, ঐ ডাকে দূরের পথিক আর অবুঝ দোয়েল,
তোমার পায়ে দেবো অলিন্দ নূপুর, শিশির-দূর্বা আর প্রিয় কবিতা।
রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি; আজ আমার দেবী আসছেন।

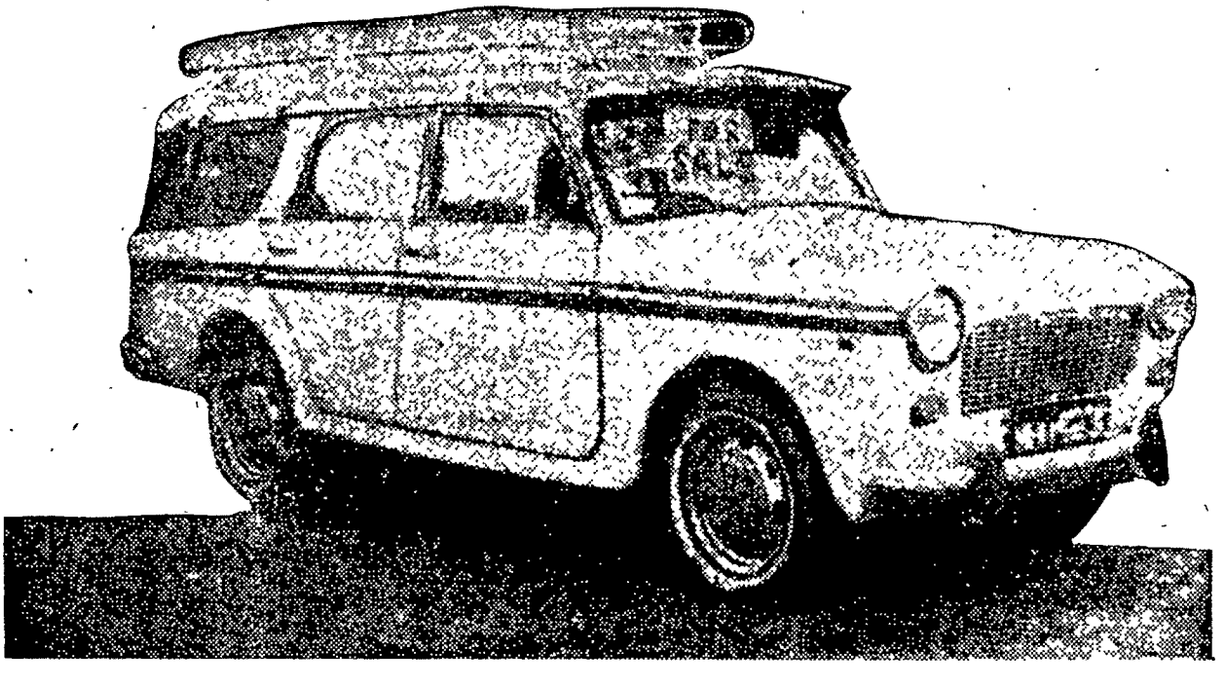

হাত ফেরতা হাওয়া গাড়ি

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

'অ্যাম্বাসাডর ১৯৭৪, এ-ওয়ান কণ্ডিশন, সিঙ্গল্ ওনার, ফর সেল, ফোন. .....'

*

'ফর সেল, প্রিমিয়ার পদ্মিনী, ইম্যাকুলেট কণ্ডিশন, ওনার শিফ্টেড, বিং. ..'

একটা পুরোনো মোটর গাড়ি কেনার ইচ্ছে হওয়ার পর থেকে রামবাবু ইংরিজি খবরের কাগজে এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে যাচ্ছেন। রামবাবু বাংলা কাগজই পড়েন, কিন্তু গাড়ি কেনার ইচ্ছে হওয়ার পর থেকে ইংরিজি কাগজ কিনছেন। কিছুদিন অন্যের কাগজ চেয়ে নিয়ে দেখতেন। কিন্তু সে আর কতোদিন পারা যায়? তা ছাড়া গাড়ি চড়ার আগে ইংরিজি কাগজ কেনা সুরু করা ভালো।

বিজ্ঞাপনে যে টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে তা দেখে ফোন করলেন রামবাবু। যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁর গাড়ির মালিক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রামবাবু প্রথমে জানতে চাইলেন, অ্যাম্বাসাডরটার দাম কতো? প্রিমিয়ার পদ্মিনীর (আগেকার ফিয়াট) বেলায় দাম ছাড়া জানতে চাইলেন কোন্ সালের মডেল? এই রকম করে বেশ কয়েকটা গাড়ির দাম জানা হলো। তারপর একদিন একটা গাড়ি দেখতে গেলেন। সঙ্গে ভাই শ্যামবাবু অথবা বন্ধু যদুবাবু। কেউই মোটর গাড়ি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। তাই সঙ্গে গেছে মধু, যে কিনা ড্রাইভারের কাজ করে অথবা মোটর গাড়ির মেকানিক।

মধু গাড়িটা চালিয়ে দেখে। রামবাবু আর শ্যাম-(অথবা যদু-)বাবু পিছনের সীটে বসে থাকেন। সঙ্গে থাকে গাড়ির মালিকের লোক। মধু চালাতে-চালাতে বলে, না, রামবাবু, বড্ডো আওয়াজ হচ্ছে; কিংবা গিয়ারটা সুবিধে বুঝছি না। কিংবা ব্রাকে কিছু গণ্ডগোল আছে। রামবাবুর কাছে প্রায় সবই শ্লোক। মধু সেই গাড়ি রাতিল করে।

এইরকম চার-পাঁচটা গাড়ি দেখার পর মধু একটা গাড়ি পছন্দ করে। রামবাবুও পছন্দ করেন। যদুবাবু বলেন, মধু যখন ভালো বলছে....। দাম নিয়ে একটা ফয়সালা হয়। রামবাবু টাকা দেন। তারপর সরকারি নিয়মকানুন অনুযায়ী সইসাবুদ হয়ে গেলে রামবাবু মোটর গাড়ির মালিক হন।

হাওয়াগাড়ির হাতবদল যে সব সময় এইভাবেই হয়, তা নয়। যদিও এইটাই সবচেয়ে সহজ পথ। কিন্তু সব যদি এত সহজেই হবে তা হলে আয়ো বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে কী করে? তাই এই হাতবদলের মধ্যে থাকে তৃতীয় একটা হাত। অনেকটা ঘটকের মতো দুটি হাত মিলিয়ে দেওয়াই সেই তৃতীয় হাতের কাজ। সেই তৃতীয় হাতের মালিক হলো ফড়ে, দালাল বা মিডল্ম্যান—যাই বলুন না কেন।

রামবাবু যাঁকে যেমন করলেন তিনি হয়ত এই রকম একজন, দালালও হতে পারেন। তিনিই রামবাবুকে গাড়ি দেখাবেন, সন্তুষ্ট করবেন, দরদস্তুর করবেন, টাকাপয়সা নেবেন, সরকারি নিয়মকানুন পালনের ব্যবস্থা করবেন, এত ঝক্কি তিনি পোয়াবেন কেন? পোয়াবেন, কেন না তিনি এর বদলে পাবেন কমিশন।

এই যে দালাল বা মিডল্ম্যান, ইনি যে একজন লোক হবেন, এমন কোনো কথা নেই। একটি প্রতিষ্ঠানও এই কাজ করতে পারে। নতুন গাড়ির যেমন ডীলার থাকে পুরোনো গাড়িরও তেমনই ডীলার আছে। রীতিমতো সংগঠিত ব্যবসা। অফিস, গ্যারেজ, শোরুম, সেল্স্ম্যান, মেকানিক। কিন্তু কলকাতার মতো শহরেও এই ধরনের ডীলারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বড় জোর গোটা ছয়েক। অর্থাৎ দালালদের মধ্যে বেশির ভাগই একলাই কেনাবেচা করেন। যাঁরা সংগঠিত ব্যবসায়ী তাঁদের মতে, এই যে-সব লোক একাই লেনদেনের মধ্যে থাকে তাদের কোনো অফিস নেই, কাগজপত্র নেই, নেই ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার ঝামেলা। সব সময় নগদে কারবার।

সংগঠিত ডীলারই হোক আর সাধারণ ফড়েই হোক, পুরোনো হাওয়াগাড়ির হাতবদলে তার পাওনা সাধারণত কমিশন। ঠিক কী হারে কমিশন মেলে তা ভাঙতে ঐ লাইনের কেউই রাজি নন, কিন্তু সাধারণত তা স্থির হয় গাড়ির দামের অনুপাতে। কমিশন ছাড়া ডীলাররা অনেক সময় পুরোনো গাড়ি নিজেরাও প্রথমে কিনে নেন, তারপর মেরামত করে বেচে দেন। প্রায় সব গাড়িই হাতবদলের আগে মেরামতের দরকার হয়। অনেক সময় ডীলার বা ফড়েই মেরামত করিয়ে দেন। কখনও-কখনও ক্রেতা নিজেও করিয়ে নেন কেনার পর। ডীলারদের সকলেরই নিজস্ব ওয়ার্কশপ আছে গাড়ি মেরামত করার জন্যে।

প্রতিষ্ঠিত ডীলারদের কাছে অনেক বিক্রেতাই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে যান। ডীলার তারপর ক্রেতাকে সেই গাড়ি দেখান। দেখিয়ে বিক্রি করেন। প্রতিষ্ঠিত ডীলার দু-একজন আছেন যাঁদের ওপর বিক্রেতাদের খুব আস্থা। তা না হলে এত দামী একটা সম্পত্তি কেউ ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে? ডীলারেরা বলেন, এই আস্থা অর্জন করতে হয়েছে দীর্ঘদিনের চেষ্টায়। তবে এ-সব ক্ষেত্রে ডীলারের সুবিধে, গাড়িটি হাতবদল হলো, তাঁর হাতেও কিছু এসে গেল এবং প্রায় বিনা লগ্নীতেই।

এদেশে গাড়ির 'মডেল' বছর-বছর বদলায় না। মান্ধাতার আমলের 'মডেল' এখনও রোজ অ্যাসেম্‌বিল লাইন বেয়ে বেরিয়ে আসে। আশ্চর্য নয়, এবারের লোকসভার নির্বাচনের পর একটি ইংরিজি দৈনিকে জনৈক পত্রলেখকের প্রার্থনা ছিল, প্রেস সেন্সরশিপ উঠে যাক এবং একটি বিশেষ মোটর গাড়ির আকার বদল হোক! 'মডেল' বদলের বালাই যেহেতু নেই তাই পুরোনো দিশি মোটর গাড়ির দাম ঠিক হয় তৈরির বছর হিসেব করে। অর্থাৎ যতো পুরোনো গাড়ি ততো কম দাম। এইটেই সাধারণ নিয়ম, তবে সব সময় যে ঘটে তা নয়।

এক প্রতিষ্ঠিত ডীলারের কাছে জানা গেল, সাধারণত বছর পাঁচেকের পুরোনো গাড়ি নিয়েই কেনাবেচা করতে চান তাঁরা। এখন ১৯৭৮, তাই ১৯৭৩ সালের আগে তৈরি দিশি গাড়ির দিকে বিশেষ নজর নেই। তার আগের গাড়ি যে তাঁদের হাত দিয়ে হাতবদল হয় না তা নয়, তবে সংখ্যায় কম। গাড়ি তৈরির বছর ধরেই তাঁরা দাম ফেলেন। ক্রেতারাও এই হিসেবেই পছন্দ করেন। ক্রেতা যদি পছন্দ করেন তা হলে তাঁদের আর কী? তবু তাঁরা সাবধান করে দেন সবাইকে। শুধু 'মডেল-ইয়ার' দেখে ভুলবেন না। গাড়ির চেহারা দেখেও ভুলবেন না। ভেতরটা ভালোভাবে যাচাই করে নিন। পরখ করে নিন বডিটা। এক ঝানু সেলস্‌ম্যান বললেন, তাঁর কাছে আসল দায় বডির। বডি যদি খারাপ হয় তবে আর কোনো কিছুরই নাকি দাম নেই।

কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন বরং গাড়ি একটু পুরোনো হলেই দাম হতো বেশি, ক্রেতাদের পছন্দ হতো বেশি। না, না, ভিন্টেজ কারের কথা বলছি না। সে অন্য কাহিনী। বলছি অ্যাম্বাসাডর, ফিয়াট, স্ট্যান্ডার্ডের কথাই। এদেশে গাড়ি তৈরির সুরু চল্লিশের দশকের শেষের দিকে। তৈরি মানে কিন্তু ঠিক তৈরি নয়। অ্যাসেম্বল করা। অর্থাৎ বিদেশ থেকে অংশগুলো এনে এখানে জোড় লাগানো। তারপর একদিন সুরু হলো সত্যি-সত্যি তৈরি করা। কিন্তু তখনও বিদেশী সাজসরঞ্জাম থাকতো বেশি। তারপর সরকারি প্ররোচনায় 'ইণ্ডিজেনাস কন্‌টেন্টের' অনুপাত লাগলো বাড়তে। বিদেশী সরঞ্জামের অনুপাত এলো কমে। আর আমাদের 'কেজ্রে ফর ফোরেনেষ' কথা কে না জানে? তাই যে-গাড়িতে যতো বেশি 'ফোরেন' সরঞ্জাম তার কদর ততো বেশি। তাই নতুনতর গাড়িতে দিশি সরঞ্জামের অনুপাত যখন বাড়ছিল তখন একটু বেশি পুরোনো গাড়ির দিকেই বেশি ঝুঁকতেন রায়বাবুরা। তখন এমনও দেখা গেছে, অনেকে আনকোরা নতুন গাড়ি কিনছেন, কিন্তু পুরোনো গাড়ি থেকে কিছু সরঞ্জাম খুলে নিয়ে লাগিয়ে নিচ্ছেন সেই গাড়িতে!

আনকোরা মোটর গাড়ির চলতি দাম কী, তার ওপরেও পুরোনো গাড়ির দাম অবশ্য অনেকটা নির্ভর করে। নতুন গাড়ির দাম বাড়লে পুরোনো গাড়ির বাজারও গরম হয়ে ওঠে। পুরোনো গাড়ির দাম পড়ে আসে নতুন গাড়ির দাম পড়লে। গত বছর ছয়েকের মধ্যে নতুন গাড়ির দাম চড়েছে হুহু করে। ১৯৭১ সালে সবশুদ্ধ (অর্থাৎ যাকে কিনা পরিভাষায় বলে 'অন দি রোড প্রাইস') একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ির দাম কলকাতায় ছিল ২২,৬৮৯ টাকা। বছর তিনেকের মধ্যে ঐ দাম দাঁড়ায় ২৫,৩০৮ টাকা। তারপরে একেবারে পৌঁছে যায় ৩৪ হাজার টাকায়। কিন্তু একে পেট্রলের চড়া দাম, তার ওপর গাড়ির এই দাম। ফলে বাজারে দেখা দেয় মন্দা। তখন সব প্রস্তুতকারকই দাম কমাতে বাধ্য হন। এই বছরের এপ্রিল থেকে কলকাতায় অ্যাম্বাসাডরের দাম ৩৭,৯৫০ টাকা। নতুন গাড়ির

দামের এই ওঠানামার ধাক্কা পুরোনো গাড়ির দামে এসেও লেগেছে অনিবার্যভাবে।

দিশি পুরোনো গাড়ির চলতি দর কেমন? নমুনা হিসেবে এই রকম বলা যেতে পারে :

অ্যাম্বাসডর ১৯৭৩ মডেল—১৩ থেকে ১৪ হাজার টাকা; ১৯৬৯ মডেল—১০ হাজার টাকা;

ফিয়াট ১৯৭১ মডেল—১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকা; ১৯৬০ মডেল—১০ হাজার টাকা;

স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড ১৯৭০ মডেল—১০ হাজার টাকা; ১৯৬৫—সাড়ে ছ'হাজার টাকা।

আবার বোধ হয় বলা দরকার, এগুলো নেহাৎই নমুনা, কারণ প্রতিটি গাড়ির দামই নির্ভর করছে তার অবস্থার ওপর। ১৯৬০ মডেলের অ্যাম্বাসাডর বিশ হাজার টাকা পেলেও হাতছাড়া করতে রাজি নন, এমন মালিক আছেন। কারণ তিনি তাঁর গাড়িটাকে সেইভাবেই লালনপালন করেছেন।

এদেশে অবশ্য শুধু দিশি গাড়িরই হাতবদল হয় না, বিদেশী গাড়িরও হাতবদল হয়। এই বিদেশী গাড়ি আবার দু গোত্রের। ভিন্‌টেজ গাড়ি আর রোজকার চড়বার গাড়ি। সাধারণত যে-সব গাড়ি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের তৈরি, এদেশে তারাই পায় ভিন্‌টেজ গাড়ির তিলক। সে-গাড়ির বাজার আলাদা, কেতা আলাদা। যেহেতু এটা একটা সখের বাজার তাই এখানে দামও ফেলা হয় সেই অনুযায়ী। সেই দামটা বেশ চড়া।

কিন্তু রোজকার চড়বার বিদেশী গাড়িরও হাতবদল হয় হামেশাই। অবশ্য বিদেশী গাড়ির বাজার তুলনায় অনেক সীমিত। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মোটর আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে বহুকাল আগে। এখন বিদেশী গাড়ি আনার হাজার ঝামেলা। আমদানি বন্ধ হওয়ার পর বিদেশী গাড়ি আসার একটা বড় রাস্তা ছিল কূটনীতিকদের মারফৎ। বিদেশী দূতাবাসের কর্মীরা সঙ্গে করে গাড়ি আনতেন কিছুদিন ব্যবহার করার পর বেচে দিতেন প্রায়-নতুন গাড়ি। সে-গাড়ির খদ্দেরের অভাব হতো না কোনোদিন। চড়া দামও মিলতো। বিদেশী গাড়ির গোত্র এদেশের খুব কম লোকই চেনেন। তাই বিদেশী হলেই জিভে জল আসে। একে বিদেশী, তায় প্রায় নতুন। যদিও শেভ্রলে ইম্‌পালা মার্কিন মুলুকে জাতিবিচারে সবচেয়ে নিচের তলার গাড়ি, তবু ঐ ইম্‌পালা চড়াকেই এদেশের হোমরাচোমরা ব্যবসায়ী বা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মনে করেন। বিদেশীরা এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাবে, এটা আর আশ্চর্য কী? এক ডীলারের কাছে জানা গেল, তখনকার দিনে অনেক দূতাবাসের কর্মী দেশে যাওয়ার আগে খবর নিয়ে যেতেন যে কোন্ ধরনের গাড়ি আনলে লাভ বেশি? বিদেশীরা এদেশের গাড়ির বাজারটা ঠিক আঁচ করতে পারে না। ওরা ভাবে ওদের দেশে যেমন কমদামেই আরো বড় গাড়ি চড়ার রেওয়াজ হয়েছে, এদেশেও বুঝি তাই। কিন্তু এখানে বিদেশী হলেও ছোট গাড়িরই কদর বেশি, কারণ বড় গাড়ি পুষতে ট্যাঁকের জোর লাগে অনেক বেশি।

কিন্তু দূতাবাসের কর্মীদের সরাসরি গাড়ি বেঁচা বন্ধ হয়ে গেল একদিন। সরকার সন্দেহ করলেন, এই বিদেশী গাড়ি নিয়ে একটা চোরাবাজার চলছে। তাই বন্ধ করে দিলেন সরাসরি বিক্রি। নিয়ম হলো, গাড়ি বেচতে হলে বেচতে হবে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনকে। তারপর এস টি সি সেই গাড়ি নীলাম করে বেচবে।

গ্যারেজ থেকে

দেবাশিস রায়চৌধুরী

এই তো সেদিন পাড়ার এক ভদ্রলোককে অ্যামবাসেডার কিনতে দেখে কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করে বসলাম, কত দিয়ে কিনলেন? ভদ্রলোক বললেন, দশ হাজার টাকায়। দশ হাজার টাকায় অ্যামবাসেডার! আমার চোখেমুখে কৌতূহলী ছাপ দেখে ভদ্রলোক বললেন, সেকেন হ্যান্ড। বললেন এক মোটর গ্যারেজ থেকে কিনেছেন। এ সম্পর্কে আর একটু খোঁজখবর করতে ছুটে গিয়েছিলাম বেহালা ম্যাপ্টনের বিশ্বস্ত মোটর গ্যারেজ জয়নারায়ণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে। গ্যারেজের মালিক অশোক রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক আমাকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, সাধারণত আমরা পুরনো অ্যামবাসেডার ও জীপ বিক্রি করে থাকি। মাঝে মাঝে কিছু কিছু মাঝকেনটাইল ফার্ম পুরনো গাড়ির টেন্ডার ডাকে। গাড়িগুলির বেশিরভাগই হবে ৬৭ বা ৬২ মডেলের। দীর্ঘ কয়েক বছর ব্যবহার করার পর গাড়ি গুলির স্ক্র্যাপ ভ্যালু দাঁড়ায় ছয় থেকে সাত হাজার টাকা। আমরা গাড়ির ডকুমেন্ট বা সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন দেখে বুঝে নি কি ধরনের রিপেয়ার করতে হবে। তারপর গাড়ির রিপেয়ারিং-এর প্রয়োজনীয় পার্টস আমরা বিশ্বস্ত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে আসি। ভদ্রলোককে একটু থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন কি, আপনারা কি সবই নতুন পার্টস কেনেন, না পুরনোও আছে। অশোকবাবু বললেন স্টিয়ারিং, ব্রেক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আমরা নতুনই কিনে থাকি, এতে গাড়ীকে অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে বাঁচান যাবে। আর অন্যান্য সব পার্টস যেমন ওয়াটার পাম্প বা ফুয়েল ট্যাঙ্ক—এগুলি সেকেন্ড হ্যান্ড হলেই চলে। এরপর টায়ারের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। অশোকবাবু বললেন, আমরা 'মল্লিক বাজার' থেকে রিসলিং টায়ার কিনে নিয়ে আসি। এতে খরচা অনেক কম পড়ে। অবশ্য এই টায়ার দিয়ে গাড়ীকে দূরপাল্লার কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই টায়ারে গাড়ী শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে চলাফেরা করতে পারে। এরপর গাড়ীর বডি পেন্ট করা হয় স্প্রে পেন্ট-এর সাহায্যে। ভদ্রলোককে বললাম, 'এই সমস্ত গাড়ীতে তেল খরচ কিরকম হয়? উনি বললেন, 'নতুন গাড়ীর সঙ্গে এর খুব একটা পার্থক্য হয় না। এইসব গাড়ী এক লিটার তেলে দশ কিলোমিটার যেতে পারে।' অশোকবাবুকে বললাম, 'এই গাড়িগুলো কতদিন নাগাদ চলে? উনি উত্তর দিলেন, সবটাই নির্ভর করে চালাবার উপর। তবে প্রথম দুবছর বিনা মেরামতেই চলে যায়। তারপর টুকটাক রিপেয়ার করতে হয়—তা প্রায় বছর দশেক তো চলেই। আমি বললাম অনেক সময় নতুন গাড়ীও তো কেনার সঙ্গে সঙ্গে রিপেয়ার করতে হয়—তা এরকম হয় কেন? ইঞ্জিনে অনেকরকম সূক্ষ্ম পার্টস থাকে। অনেক সময় দক্ষ মিস্ত্রীর অসাবধানতার জন্য এরকম হয়ে থাকে। কথায় কথায় বললেন পুরনো গাড়ী কেনার প্রবণতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে তবে এই সমস্ত গাড়ী কিনে অনেকেই আজকাল ভাড়া খাটান। এতে বেকার যুবকদের রুজিরোজগারের পথ কিছুটা খুলেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খুচরো আপনার গ্যারেজ থেকে কটা গাড়ী বিক্রি হয়। উনি বললেন, অ্যামবাসেডার ও জীপ মিলে থানপাঁচেকের মতন। অশোকবাবু তাঁর কাজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যথেষ্ট আশাবাদী।

প্রথমবার বেচা নিয়েই অবশ্য বাড়াবাড়ি। তারপর কেনাবেচার নিয়ম সি গাড়িরই মতো।

কোনো প্রবাসী ভারতীয় দেশে ফেরার সময় বিদেশী গাড়ি সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেন 'পার্সোনাল বিলংগিং' হিসেবে। যদি অবশ্য চীফ কন্ট্রোলার অভ ইম্পোর্টস্ এণ্ড একসপোর্টসের অনুমতি মেলে। সি সি আই ই এই অনুমতি দেওয়ার আগে সাধারণত হাতবদল সম্পর্কে শর্ত আরোপ করেন। যেমন, সাত বছরের মধ্যে এই গাড়ি বেচা চলবে না। সাত বছর পরেও যখন সেই ভদ্রলোক গাড়ি বিক্রি করবেন তখনও সি সি আই ই'র কাছে আবেদন করতে হবে যে, মহাশয়, আপনার শর্ত অনুযায়ী সাত বছর উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব যদি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে গাড়িটি বিক্রয়ের অনুমতি দেন তবে বাধিত হইব। এই অনুমতি মেলার পর বিক্রেতা যখন গাড়ি হস্তান্তর করবেন তখন সরকারি পাবলিক ভিহিকিলস্ ডিপার্টমেন্ট আগে দেখবে প্রয়োজনীয় অনুমতি মিলেছে কিনা, বিল অভ এন্ট্রি ঠিক আছে কিনা।' তারপর ' হাতবদলের স্বাভাবিক নিয়মকানুন অনুযায়ী ব্যবস্থা।'

বিদেশী গাড়ির কথা বলতেই এক সম্পন্ন উকীলের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আরে মশাই, সে-সব দিন কি আর আছে! যুদ্ধের আগে মার্সিডিজ-বেনজ (১৭০ ভি) বেচেছি হাজার চারেক টাকায়। ইতালিয়ান ফিয়াট (৫০০ সিসি) বেচেছি ১৯০০ টাকায়। যুদ্ধের পরেও মাঝারি অস্টিন বেচেছি আট হাজার টাকায়। আজ একটা ঐ মডেলের মার্সিডিজ-বেনজের দাম কতো জানেন ? লাখ পাঁচেক টাকা— অবশ্য ডিউটি নিয়ে। লাখ টাকার কমে অস্টিন মিলবে না। তবে বিদেশী বড় গাড়ি এখন আর কেউ চায় না। বড় ভল্ল পড়ে আছে, স্টুডিবেকার পড়ে আছে। খদ্দের নেই। এখন চাই ছোট গাড়ি। ফোকস্ওয়াগেন (জার্মান), অথবা ছোট অস্টিন। গাড়ি মশাই ফোকস্ওয়াগেন। সবাই চায়। পাই কোথায় ? ফোকস্ওয়াগেন বীটলের জন্যে আঠারো-বিশ হাজার টাকা পাওয়া কোনো ব্যাপারই নয়, যদি বেশি পুরোনো না-হয়। বছর কুড়ি আগে তৈরি অস্টিন ওয়েস্ট মিনিস্টার এখনও দশ হাজার টাকায় বিকোয়। বিদেশী গাড়ির দামও ঠিক হয় তৈরির বছর ধরে—তবে গাড়ির কন্ডিশানটাই বড় কথা আমাদের দেশে।

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ির বাজার এখন কেমন ? প্রতিষ্ঠিত উকীলদের মতে, বাজার খারাপ নয়। তাঁরা তো অনেক সময় গাড়ি বদলিয়ে উঠতে পারেন না। গাড়ি মানে পছন্দসই গাড়ি। কিন্তু সাধারণ দালালদের সকলের মতের সঙ্গে এই মত মেলে না। তাঁদের কেউ-কেউ বলেন, বাজার তেমন ভালো নয়। ভালো হবেই বা কী করে ? গাড়ির বাজারে মন্দার বড় কারণ পেট্রলের দাম। '৭৩ সালের আগস্টে পেট্রল ছিল এক টাকা ৬৭ পয়সা লিটার। তারপর লেগে গেল আরব-ইস্রায়েল লড়াই। নবেম্বরে দর হয়ে গেল দু টাকা ৮৪ পয়সা। আর এখন ? তিন টাকা ৫০। অর্থাৎ দশ লিটার তেল ভরতে গেলে নগদ প্রায় ৩৫টি টাকা হাতছাড়া করতে হয়। এ অবস্থায় কতো-জন গাড়ি কিনতে উৎসাহী হবেন ? তায় আবার পুরোনো গাড়ি, যার হাজার বারনাক্কা। অনেক গাড়িই তেল বেশি খেতে চায়, পাঁচ লিটারে পঁচিশ মাইল বেতে আনিচ্ছে। মেরামতির খরচ বেশি। আজ বেক্ক গেল তো কাল ইঞ্জিনের গণ্ডগোল। এদেশে নতুন গাড়ি পোষার ঝক্কিও কিছু কম নয়। নতুন কিনেও কতো লোককে নাকের জলে চোখের জলে হতে দেখেছি। তবে নতুন গাড়ির অন্তত এক বছরের ওয়ারেন্টি থাকে। ঐ সময় মেরামতি বা সার্ভিসিংয়ের জন্যে গাঁটের কড়ি খরচ করতে হয় না। পুরোনো গাড়িতে তো আর সে-সুযোগ নেই।

প্রতিষ্ঠিত উকীলরাও অবশ্য অস্বীকার করেন না যে, আজ-

কাল গাড়ি চড়া খুব সহজ কর্ম নয়। আগে ধরুন, দু হাজার-আড়াই হাজার টাকা রোজগার হলেই অনেকে গাড়ি চাপার কথা ভাবতে পারতেন। এখন আর পারেন না। শুধু চাকরির বাবের নির্ভর তাদের পক্ষে গাড়ি চড়া একটা বিরাট বিলাসিতার ব্যাপার। অবশ্য একেবারে ওপরতলার চাকরি হলে অথবা চাকরির সঙ্গে উপরি থাকলে আলাদা কথা। নিজে গাড়ি চালালেও এখন মাসে পাঁচ-ছ' শ' টাকার কমে গাড়ি পোষা মুস্কিল। ড্রাইভার রাখলে কম করে আরো দু শ'। তাও খুব টানাটানিতে চালাতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, মাসে হাজার টাকা খরচ করতে পারলে তবে গাড়ি রেখে কিছুটা সুখ। কিন্তু সে-সামর্থ্য ক'জনের আছে ? আসলে মুস্কিলটা কী জানেন ? আমাদের দেশে কিছু লোকের হাতে অঢেল টাকা। আর অধিকাংশ লোকের হাতেই টাকা নেই। এ-অবস্থায় কি আর বাজার বাড়ে ?

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ির খদ্দের কারা ? রামবাবুর পক্ষে মাঝারি রকমের ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী —এ-সবই হওয়া বেশি সম্ভব। চাকুরিজীবী হওয়া যে একেবারে অসম্ভব তা মোটেই নয়। নিজের বাড়ি আছে, সংসারের দায় বেশি নেই, এই রকম লোক হলে দু হাজার টাকা আয়েতেও গাড়ি কোনো রকমে মেইনটেইন করা যায়। ব্যাচেলাররা অনেকে এই আয়েতেই গাড়ি চালান। তবে পেশা যাই হোক না কেন, একটা ব্যাপারে এরা প্রায় সকলেই আডিল। গাড়ির ব্যাপারে এরা প্রায় সকলেই 'গোল্লা'। মোটরগাড়ি সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। তাই গাড়ি কেনেন অন্ধের মতো, অনেকেই ঠকেন। মেরামত করাতে প্রাণ যায়। আজ এ-পার্টস বদলাও তো কাল ও-পার্টস। অনেকেই তখন ছোটেন মল্লিক বাজার। সেখানে পুরোনো পার্টস মেলে।

বিচিত্র এক জায়গা এই মল্লিকবাজার। পার্ক স্ট্রীট আর লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ের কাছাকাছি এই বাজারটার একটা ডাকনামও অবশ্য আছে। চোরবাজার। নামটা এই কারণেই যে, এখানে মিলবে মোটরগাড়ির চোরাই পার্টস। সব রাস্তা রোমে গিয়ে পৌঁছায় আর না-পৌঁছায়, মোটরগাড়ির সব চোরাই পার্টস নাকি মল্লিকবাজারে পৌঁছবেই। অন্তত সেই রকমই শোনা যায়। গাড়ি পার্ক করে রেখে ফিরে এসে 'ওয়াইপার' আর দেখতে পাননি, এমন ঘটনা প্রায় প্রত্যেক গাড়ির মালিকের কপালেই ঘটেছে। এমন কি 'স্টেপনি' বেপাত্তা হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। তাই বলে মল্লিক-বাজারে সব মালই চোরাই মাল, এমন কথা কেউই বলেন না। প্রধান-

কার দোকানীরা অনেক পুরোনো বা বাতিল গাড়ির পার্টস কেনেন। তারপর সেগুলো ঠিকঠাক করে বেচেন। কিছুটা সস্তা দরেই বেচেন।

মল্লিকবাজারের দোকানী বা মেক্যানিকদের একটা বিশেষ পারদর্শিতার কথা জানা গেল এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে। ধরুন, কোনো বিদেশী গাড়ির পার্টস মিলছে না। এই সব দোকানীকে গিয়ে সমস্যার কথা জানালে ওঁরা তখন গড়ে-পিটে ঠিকই এমন পার্টস বানিয়ে দেবেন যাতে আপনার কাজ চলে যাবে। তাতে কি কম উপকার? বিদেশী গাড়ির পার্টস যোগাড় করার ঝামেলার কথা তো সকলেই জানেন।

রামবাবু তো গাড়ি কিনবেন সেকেন্ড হ্যান্ড অথবা এমন কি থার্ড হ্যান্ড। কিন্তু ফার্স্ট হ্যান্ড গাড়ি সেকেন্ড হ্যান্ড হবে কি করে? প্রথম যিনি গাড়ি কিনেছিলেন তিনি সেটি বেচলে তবেই তো? তা তিনি কখন বেচবেন? আজকাল আর তার ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। নতুন গাড়ি কিনে কিছু দিন চড়ে, তারপর কেউ যখন সেটি বিক্রি করেন তখন তা সাধারণত করেন আর একটি নতুন গাড়ি কেনার জন্যে। অবশ্য কেউ-কেউ যে দায়ে পড়ে বেচে দেন না তা নয়। তবে সচরাচর নতুন গাড়ি কেনার জন্যেই বেচা হয়। বিদেশে একটা ব্যাপার চালু আছে, পরিভাষায় তার নাম 'ট্রেড ইন'। অর্থাৎ পুরোনো গাড়িটা আপনি নতুন গাড়ির ডীলারকে দিলেন, সেই ডীলার পুরোনো গাড়িটার একটা দাম ধরলেন, তারপর নতুন গাড়ির দাম থেকে ঐ দামটা বাদ দিয়ে বাকি টাকাটা নগ নিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে নতুন গাড়ি অন্যত্র বেচে টা যোগাড় করতে হয়, তারপর তার সঙ্গে আরো বেশ কিছুটা যোগ করে নতুন গাড়ি ঘরে আনতে হয়।

যখন এ-দেশে গাড়ি বেশি তৈরি হতো না অথচ চাহিদা ছিল বেশি, তখন নতুন গাড়ি কেনার পর কতো দিন পরে তা বেচা যাবে সে-বিষয়ে কড়াকড়ি ছিল। একটা নতুন গাড়ি কেনার পর তা দু' বছরের মধ্যে বেচা যেত না। গাড়ির কালোবাজার ঠেকানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। এখন নতুন গাড়ির অতো চাহিদা নেই। তাই কালো-বাজারের আশংকাও নেই। এখন নতুন গাড়ি কেনার পর যে-কোনো দিনই তা বেচে দেওয়া চলে।'

কেউ যখন গাড়ি বেচবেন তখন সেই বিক্রির খবর বিক্রির ১৪ দিনের মধ্যে সরকারি দপ্তরকে (পাবলিক ভিহিকিলস্ ডিপার্ট-মেন্ট) জানাতে হবে। আর ৩০ দিনের মধ্যে ক্রেতাকে দরখাস্ত করতে হবে মালিকানার বদলের জন্যে। এর জন্যে নির্দিষ্ট ফরম আছে। ফরম ভর্তি করে 'সেল লেটারের' কপি, ব্লু বুক (অর্থাৎ যাতে গাড়ির মালিকানার কথা লেখা থাকে) ইত্যাদি সহ জমা দিতে হবে। দরখাস্ত পাওয়ার পর পি ভি ডি দেখবে গাড়িটি কিস্তিতে কেনা হয়েছিল কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তবে খোঁজ নেওয়া হবে, কিস্তির টাকা পুরোপুরি শোধ হয়েছে কিনা। তারপর আছে বিক্রেতার সই মেলানো। সই যদি মিলে যায় তবে ঝামেলা নেই। গাড়ি হাতবদলে সময় লাগবে না। যদি সই না মেলে তবে পি ভি ডিকে খোঁজখবর করতে হয়। পুলিশই সেই খোঁজ করে। বিক্রেতা সত্যিই গাড়িটা বিক্রি করেছেন কিনা সেই খোঁজখবর করা হয়।

একেবারে জাল সইয়ের ঘটনা বিশেষ ঘটে না। তবে মজার ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটে। যেমন ধরুন, বিক্রেতার সই মিললো না। পুলিশ গিয়ে বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি সত্যিই গাড়ি বেচেছেন তো অমুক লোককে?

বিক্রেতা বললেন, হ্যাঁ, বেচেছি তো।'

পুলিশ তখন জানতে চাইলে, তা হলে আপনার সই মিলছে না কেন?

বিক্রেতা তখন হেসে উত্তর দিলেন, সইটা ইচ্ছে করেই একটু অন্যরকম করে করেছি।

—সে কি মশাই?

—হ্যাঁ, মানে, উনি পুরো টাকাটা এখনও দেননি তো, পনের হাজার দেওয়ার কথা, পাঁচ এখনও বাকি.... সেই জন্যেই সইটা একটু অন্যরকম....!

হাওয়াগাড়ির হাতবদলের নিয়মকানুন ঠিক-ঠিক না-মানলে সাজাও পেতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পি ভি ডি যদি লেন-দেনের খবর না-পায় তবে প্রথম সাজা, গাড়ি নতুন করে রেজিস্ট্রি করতে হয়। শুধু হাতবদলের ফী ২৫ টাকা, কিন্তু নতুন করে রেজিস্ট্রি করতে গেলে খরচ পড়ে ৪০ টাকা। তাছাড়া পি ভি ডির তরফ থেকে নালিশ করা হয় আদালতে। সেখানেও জরিমানা হয় কিছু। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে পুলিশ খোঁজ নিতে গিয়ে যদি বিক্রেতার হদিশ না পায় তখন পি ভি ডি কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়.... 'যেহেতু অমুক-অমুক নম্বরের গাড়ির মালিকানা হস্তান্তরের জন্য আবেদন জমা পড়িয়াছে তাই যদি উক্ত হস্তান্তর সম্পর্কে কারো কোনো আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের সাত দিনের মধ্যে....' ইত্যাদি। যদি কোনো আপত্তি না-ওঠে তবে গাড়ির মালিকানা বদলে অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তার আগে ক্রেতার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় ইনডেমনিটি বন্ড। অর্থাৎ যদি ভবিষ্যতে এ-নিয়ে কোনো গোলমাল হয় তার জন্যে সব দায়িত্ব ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

হাওয়াগাড়ির হাতবদলের জগৎটা খুব ছোট নয়। বহু লোক এর সঙ্গে জড়িত। ক্রেতাবিক্রেতারা তো আছেনই, সেই সঙ্গে আছেন ডীলার, ফড়ে, মেকানিক, গ্যারেজ, পার্টসের দোকানী ইত্যাদি। বেশ কয়েক হাজার গাড়ির হাতবদল হচ্ছে প্রতি বছর এই পশ্চিম বাংলাতেই। কয়েক হাজার লোকের ভাগ্যও জড়িত এই সব লেনদেনের সঙ্গে। কিন্তু এদেশের অনেক ব্যবসার মতো এই পুরোনো গাড়ির জগৎ নিয়েও খোঁজখবর হয়েছে কম। ডীলার, সেলসম্যান, ক্রেতা-বিক্রেতা, মেকানিক—সকলের মধ্যেই চরিত্র মিলবে। সে-সব চরিত্র নিয়ে মহাকাব্য না-হোক, অন্তত আরো দু'-একটা 'অয়াল্লিক' লেখা চলে অনায়াসে। কারণ হাওয়াগাড়িকে এঁরা সত্যিই ভালোবাসেন।

ছবি তুলেছেন দিলীপ ঘোষ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

পৌরাণিক

প্রলয় সেন

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আশ্বিনের এক ভোরে পিসিমার মুখে এক নতুন বুলি ফুটে উঠল।

দক্ষিণের বারান্দায় আমরা ক'জন হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছি। ছোটকা দাদা আমি আর তনু। শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপলে আমাদের বাড়ি পৌঁছুতে ঘন্টা-খানেকের মত সময় লাগে। খোলামেলা জায়গা। তাই পুজো শেষ হতে না হতেই সকালের দিকে অল্প অল্প শীত পড়তে শুরু করেছে।

আমাদের সামনে সধূম চায়ের কাপ। পিঠে পাতলা ফ্লানেলের মত মোলায়েম রোদ জড়িয়ে। হাল্কাচালে গল্পগুজব করছিলাম। এমন সময় পিসিমা এসে রসভঙ্গ ঘটাল। পরনে খুরপি। কষাশায় ভেজা মুখ। পায়ের গোড়ালিতে খুবো মাটির দানা লেগে। সামনে ফুলের মরশুম। এখন পিসিমা খুবই ব্যস্ত। বারান্দায় উঠে বলল, 'ও রতন, আরো দিনকতক আছিস তো?'

'না', মাথা নাড়ল ছোটকা, 'টিকিট কাটা হয়ে গেছে। বুধবার রাতের ট্রেন ধরব।'

'ওই বুধবার?' মুটি মুটি এগিয়ে এল পিসিমা। যেন ছোটকার কথাটা ভাল করে শুনতে পায় নি এইভাবে বলল।

'হ্যাঁ', প্রভাতী মৌতাতটুকু টুকে যাচ্ছে দেখে পিসিমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিতে চাইলাম, 'আর কদিন থাকবে। এসেছে তো সেই মহালয়ার আগে।'

ছোটকা বিপত্নীক। বছর কয়েক হল বিহারে আছে। কি-একটা পুজোর সময় কয়েক দিনের জন্য এখানে আসে। ছেলে শিবু নীলরতনে হাউসসার্জেন। নিজেও ঢাকার মিডফোর্ড স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তার। ডালটনগঞ্জে বসলেও প্র্যাক্টিশ।

আমার কথা কানে তুলল না পিসিমা। আস্তে সুস্থে হাতটা মুছে বসল। তারপর ছোটকার দিকে ঝুঁকে মাড়িতে মাড়ি ঘষে বলল, 'আমি বলিকি, আরো কটা দিন থেকে যা।'

'অসম্ভব!' হাতের ডিসপোজেবল কাপটা চুমুকে শেষ করে উঠল। চেয়ারে ঘষে চলল ছোটকা, 'এখানে এতদিন থাকলে অফিস সামলাবে কে।'

ধমক খেয়ে পিসিমার মসৃণ ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি দিয়ে থাকা হাসিটুকু আস্তে আস্তে নিভে গেল। পিটপিট করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল ছোটকার দিকে। তারপর খুব করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে ঝিড়বিড় করে উঠল, ঠিক আছে, যা ভাল বুঝিস কর্—

'ছোটকাকে থাকতে বলছ কেন বলে যাবে তো।'—পিসিমা দুই হাতে ভর রেখে উঠছিল। দাদার কথায় থেমে গেল। এ বাড়িতে দাদার ওপর পিসিমার টান সবচেয়ে বেশি। ভুরু কুঁচকে বলল, 'বলে কি লাভ। তোরা কখনো আমার কথা শুনেছিস!'

কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। এর আগে পিসিমাকে এভাবে নিজের ক্ষোভের কথা এত জোর দিয়ে বলতে শুনিনি। বললাম, 'কেন শুনব না। বলেই দ্যাখো না।'

পিসিমা যেন মাড়িতে মাড়ি ঘষে আত্মস্থ হতে চাইল। তারপর দৃষ্টি স্থাণু-স্থির করে দাদার দিকে ঘুরে বলল, 'গতিক

ভাল বুঝছি না বড়খোকা। মনে হচ্ছে কার্তিকের মধ্যেই চলে যেতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'—ছড়ানো ডান পাটা গুটিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল তনু।

'কোথায় আবার', বুঝি বা পিসিমার কণ্ঠস্বর সইতে ছেঁপে উঠল, 'সকলেই একদিন যেখানে যায়—'

'ইয়ারকি পেয়েছ', তনুর চোখেমুখে কপট উত্তেজনা চলকে উঠল। ও পিসিমার পেছনে লাগতে ওস্তাদ। মওকা পেয়ে কথার তুবড়ি ছোটাল, 'আমরা কোথায় ভাবছি মেডিসিন করে তোমার সেন্টিনারি করব। মারাপ খাটাব, সানাই বসাব। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নেমন্তন্ন করব। তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে।'

সেকথা শুনে পিসিমার হাসিতে উদাসীনতার আভাস ফুটে উঠল। শান্ত গলায় টেনে টেনে বলল, 'দুর বোকা ছেলে। যাবার সময় এলে আটকে রাখবি কি করে?'

পিসিমার হেঁয়ালিতে দাদাও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বলল চড়া গলায়, 'কি হয়েছে, শরীরটরির খারাপ?'

'না, ওসব কিছু নয়।' পিসিমার মুখের রেখাগুলো ধূসর হয়ে উঠল, 'আসলে কি জানিস বড়খোকা, লক্ষণ ভাল বুঝছি না।'

'মানে?'—আমার প্রশ্ন।

'সন্ধ্যের পর কেবলই লালু (আমাদের বাড়ির পোষা কুকুর) আমার ঘরে ঢুকে পড়ে। সারারাত পেয়ারা গাছের ডালে বসে একটা নিশাপাখি কু ডাকে', থেমে থেমে বলে পিসিমা, 'কদিন হল ঘুমের মধ্যে তোদের পিসেমশাইকে দেখি—'

'পিসেমশাইকে।'—তিন ভাই সমস্বরে বলে উঠলাম।

'হ্যাঁ', বুকের খাঁচা থেকে বেশ খানিকটা বাতাস ছাড়ল পিসিমা, 'কতকাল হয়ে গেল মানুষটা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

এই প্রথম পিসিমার মুখে পিসেমশাইর কথা শুনলাম।

'অপেক্ষা করছে', তনুর শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠল, 'কোথায়?'

'কোথায় আবার', কথাটা অসমাপ্ত রেখে ঘুরপিসুখ হাতটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরল পিসিমা।

একটা নীরব হাসির ঢেউ খেলে গেল আমাদের চোখেমুখে। তনু সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, 'কিন্তু এতদিন বাদে তুমি পিসেমশাইকে চিনলে কি করে?'

তনুর প্রশ্নটা অযথার্থ নয়। সে 'প্রায় সতর বছর আগেকার কথা। পিসিমার দাম্পত্য জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। দিন-সাতেকের মত। পিসেমশাই কোন এক জমিদারির সেরেস্তায় কাজ করতেন। বিয়ে-গমনে যেদিন পিসিমাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন সেদিনই বিকেলের দিকে এক গোমস্তা এসে হাজির। সময়টা অঘ্রাণের শেষ। চাষীদের ঘরে সবে ধান উঠতে শুরু করেছে। জমিদারের তলব মহালে যেতে হবে। অমান্য করার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন পিসেমশাই। ঠিক তার দুদিন পরের কথা। মাঝরাত্তিরে বরকন্দাজ এল দুঃসংবাদ নিয়ে। খাজনা আদায় করে ফিরবার পথে নৌকা ডুবাও করে টাকাপয়সা সব লুঠ করে পিসে-মশাইয়ের মুণ্ডুটা ধড় থেকে খসিয়ে ডাকাতরা চম্পট দেয়। তেরো বছরের পিসিমা তখন লেপের তলায় ঘুমে অচেতন। তাকে টেনে তোলা হল। তারপর পাঁজাকোলা করে পেছনের এঁদো পুকুরের হিমঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে নিয়ে এসে উঠোনের মাঝখানে পিঁড়িতে বসানো হল। সামনে কয়েকটা লণ্ঠন আর কিছু মানুষের ভিড়। একজন এসে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দিল। হাতের নোওয়া খুলল। নোড়া দিয়ে শাখা ভাঙল। ডুরে শাড়ি পাল্টে খানকাপড় পরানো হল। তারপর মশারির ভেতর তিন মাস বন্দী। কচি বিধবার মুখ দেখা অমঙ্গলের—তাই এই বিধি।

'এটাই ভাল বললি', একগাল হেসে পিসিমা তনুকে ফুৎকারে নিভিয়ে দেয়, 'নিজের জনকে চিনতে পারব না!'

সেই বুধবারই ছোটকা ডালটনগঞ্জে চলে গেল। যাবারই কথা। একে পিসিমার ভিমরতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। ছোট হাল্কাপল্কা শরীর। অসুখ বিসুখ কিছু নেই। বয়সের তুলনায় বেশ খাটাখাটুনি করতে পারে। রোজ অন্ধকার থাকতে উঠছে। উঠোনে গোবরছড়া দিচ্ছে। বাগানের তদ্বির-তাবিরত একাই করে। তাছাড়া গোয়াল পরিষ্কার, ছেলেপুলেদের সামলানো, ঠাকুরের সিংহাসনের ফুলজল পাল্টানো। কাঁথা সেলাই, রক্ষমারি আচার তৈরি করা—বলতে গেলে সারাটা দিনই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত। তাই, আসছে মাসেই যে একটা কিছু অঘটন ঘটে যাবে এটা আমাদের সকলেরই কল্পনার বাইরে।

কিন্তু সেদিন থেকে পিসিমার যে যাওনার শুরু হল তার আর বিরাম নেই। ঘুরে ফিরে মুখে শুধু এক বুলি : ডাক এসে গেছে। এবার আমার যাবার পালা। ভাইদের মধ্যে একমাত্র দাদাই ওর নীরব শ্রোতা। দাদাকে পেলে মুখ খই ফোটে পিসিমার। বলে : মন দিয়ে শোন বড়খোকা। বলা তো যায় না কখন কি হয়ে যায়। শ্বাস উঠলেই কিন্তু আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাবি। মুখে গঙ্গাজল দিবি। বুকে একখানা রাধাকৃষ্ণের ফটো রাখবি। অন্তিমকালে যেন হরিনাম শুনতে পাই। বেশি লোকজন ডাকবি না। ঘটা করে শ্রাদ্ধশান্তি করার দরকার নেই। পারলে জনকয়েক গরিব-দুঃখীকে ডেকে একবেলা ভরপেট খাইয়ে দিস।—এমনি আরো কত সাতকাহন প্রাচারণী কুরোতেই চায় না। দাদার অসীম ধৈর্য। উচ্চবাচ্য করে না। শুধু মাঝেমাঝে মাথা নেড়ে সায় জানায়।

উইকএণ্ডে শিবু বাড়িতে এসে বুড়িকে নিয়ে পড়ে। হাত নেড়ে গলা চড়িয়ে বলে : তোমার কোন কথা শুনব না পিসি। বুড়ি এই কার্তিকেই সত্যি সত্যি টেসে যাও তাহলে যা মজা করব। কলকাতা থেকে তাসা নিয়ে আসব। পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের ডাকব। তারপর তোমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে টুইস্ট নাচতে নাচতে শ্মশানে যাব।—অনেক চেষ্টা করেও শিবু নাটক জমাতে পারে না। কেননা, ওর কথায় রাগ করে না পিসিমা। বরং হাসে মিটিমিটি।

ভেতর বাড়িতেও পিসিমার ঘোরাফেরা বেড়ে যায়। ভাঙ্গা রেকর্ডের মত একই কথা বলে বলে বাতাস ভারি করে তোলে। ছবি বলে : আপনি চলে গেলে বাচ্চাকাচ্চাদের কে দেখবে পিসিমা।—সেকথা শুনে পিসিমা কপট বেগে ওঠে : বেশ বললে মেজবৌমা। তোমাদের শ্বশুর-শাশুড়ী মারা গেছে সেই কবে। তখন থেকে সংসার আগলেছি। এখন তোমরা এসে গেছ। এবারও আমাকে ছুটি দেবে না!—বৌদি আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। হাসতে হাসতে বলে : বেশ তো, আছেন পিসিমা। দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছেন। এখনই আপনার ছুটি নেবার কি দরকার পড়ল?—পিসিমা তখন হাঁক পাড়ে। আমাদের সাক্ষী মানতে চায়। বলে : ও বড় খোকা, পল্টু, তনু—শুনে যা তোরা, বউমারা কি বলছে। বয়সটা কি আমার কম হল। ওরা এখনও আমাকে থাকতে বলছে। —বিরক্ত হই। রেগেমেগে পিসিমাকে দুটো রূঢ় কথা বলি। ছবি আমাকে ধমকায়। বলে : মিছেমিছি মাথা গরম করছ কেন। বুড়ি মানুষ। দুটো কথা বলে যদি শান্তি পায়, তাতে তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে না। —ছবির কথায় বুকের ভেতর একটা চোরা ভয় ঘাই মেরে ওঠে। পিসিমা ঠাকুরদার প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান। বাবার চেয়েও বারো-তেরো বছরের বড়। সত্যি যদি এই কার্তিকেই মারা যায়। আমাদের বিয়ের পর পিসিমার গুরুত্ব অনেকটা ধূসর হয়ে গেলেও ওর সুদীর্ঘ-কালের নীরব উপস্থিতি এমন একটা আশ্বাসের অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে সংসারটাকে ঘিরে রেখেছে যেটা আচমকা ধসে পড়লে সত্যি সত্যি আমরা কিছুটা অসহায় হয়ে পড়ব। মুখে আর কথা সরে না। বুকের ভেতর একটা হিমেল স্রোত বয়ে যায়। ছবির কথার কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে চলে আসি।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। কার্তিকের সাত-আট তারিখ হবে। অফিসের তাড়া। কোনমতে নাকেমুখে দুটো গুঁজে ছুটছি। হঠাৎ সদরের কাছাকাছি এসে হোঁচট খেলাম।

ডাইনে লম্বাটে একখানা একটেরে ঘর। পিসিমার। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে একপাশে একটা কাঠের চৌকি।

আরেক ধারে কাপড়ের পুঁটলি, পান ছ্যাঁচার হামানদিস্তা, পাশ্ববের কিছু থালা-বাটি, কাসুন্দির শিশি ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। পিসিমা মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় উবু হয়ে বসে। সামনে ডালাখোলা মাঝারিসাইজ টিনের ট্রাংকখানা। ঝকঝকে লোহার পটিগুলো ধুলো গিয়ে লালচে হয়ে আছে। পিসিমার মাথার অর্ধেকটা ট্রাংকের গহ্বরের ভেতর নেমে গেছে। পিঠের কাপড় একপাশে ঝুলে পড়ায় শিরদাঁড়ার গিঁঠগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শুধু গলকম্বলের কম্পনটুকু না থাকলে পিসিমাকে একটা বড় সাইজের কৃষ্ণনগরের পুতুল বলে মনে হত।

দৃশ্যটা অপরিচিত নয়। ছেলেবেলায় প্রায় প্রতিদিন দেখতাম। তবু দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বহুকাল বাদে দেখছি, হয়ত তাই। বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক্‌ করে উঠল। লোভ সামলাতে পারলাম না। বলে উঠলাম, 'ও পিসি'। অবিকল ছেলেবেলার মত করে।

কয়েকটা আরশোলার বাচ্চা ট্রাংকের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ভেতরে-বাইরে ছোটা-ছুটি করছিল। মূর্তিটা ভেঙে গেল। ডালার ভেতর থেকে পিসিমার মুখ বেরিয়ে এল। কুয়াশায় দূরের জিনিসকে মানুষ যেভাবে ঠাহর করতে চায়, সেই দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। শ্লেষ্মাজড়ানো গলায় শুধোল, 'কে, পল্টু নাকি?'

'হ্যাঁ', আমি ওকে ঘাবড়ে দেবার জন্য ধারালো গলায় বললাম, 'কি করছ পিসি?'

'আর বলিস না', পিসিমা কিন্তু কেঁপে উঠল না। বরং আমাকে চমকে দিয়ে হেসে বলল, 'পুজোর পর একদম সময় পাইনি। আজ সবে বাক্সটায় হাত দিলাম। তা বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। ভেতরে আয়—

নটা পঁচিশের বারুইপুর লোকাল গাছগাছালির ঝাপ্সি কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর টেন দশটা পাঁচে। অর্থাৎ আজ অফিসে পৌঁছুতে ঘণ্টা-খানেকের মত লেট হয়ে যাবে। সেই উদ্বেগ কিন্তু ছায়া ফেলল না আমার ভাবনায়। বরং পিসিমাকে বিপর্যস্ত করে তুলবার জন্য মরীয়া হয়ে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লাম, 'এ ট্রাংকটার দশা। এবার এটাকে ফেলে দাও পিসি—

জন্ম থেকে ট্রাংকটা দেখছি। ওটা যেন পিসিমার যক্ষের ধন। স্বর্ণসিন্দুরের কৌটো লুকিয়ে রাখা, ত্রিফলা ভেজানো জলের বাটি উপুড় করে ফেলা, আলিমের নিচে খোলাম কুচি ছড়িয়ে দেওয়া, আচারের বয়েমে জল ঢেলে দেওয়া—ছেলেবেলায় কতই না উৎপাত করেছি। এর জন্য মা লক্ষ্মীর কাছে কম ধমক খাইনি। পিসিমা কিন্তু সব সময় আমাদের দোষ আড়াল করে রাখতে চাইত। বলত হেসে: ছেলে মানুষ। এই তো দুষ্টুমির বয়স। এর জন্য এত বকাঝকা করছ কেন। তোমাদের সব তাতেই বেশি বেশি।—অথচ সেই মানুষ আশ্চর্য, একটা ব্যাপারে ছিল ভীষণ অসহিষ্ণু। একাচোরা যখন এই ট্রাঙ্ক খুলে বসত তখন আমরা কেউ ওর ত্রিসীমানায় এগুতে পারতাম না। এমন কি দূরে থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারলেও চোঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলত। বলত: ও যতীন, ও বতন—দেখে যা তোদের ছেলেদের কাণ্ড-কি অসভ্য রে বাবা। আমাকে একটু শান্তিতে বসতে দিচ্ছে না, অ্যাঁ।'—বাবা কাকারা চিৎকার শুনে ছুটে আসত। মুখো-মুখি পড়ে গেলে পিঠে দু' চার ঘা পড়ত। তখন কিন্তু পিসিমা রা-টি পর্যন্ত কাড়ত না। তাতে আমাদের কৌতূহল বেড়ে যেত। তকে তকে থাকতাম। কখন পিসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দেখতে হবে কি রহস্যের ভাণ্ডার আছে ওই ট্রাঙ্কের ভেতরে। কিন্তু কখনো সে সুযোগ পাই নি। ট্রাঙ্কের ব্যাপারে পিসিমা ছিল ভীষণ সজাগ।

'যা বলেছিস', আমাকে শূন্য থেকে মাটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পিসিমা বলল, 'এইবার ভাবছি এটাকে বিদেয় করে দেব।'

সন্ধ্যায় ঘরে এসে জামাকাপড় ছাড়ছি। ভেতরের বারান্দা থেকে নূপুর ছুটে এল। ওর হাতে একটা গ্রাস গোলমত চিবুনী। সেটা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'দ্যাখো বাবা—

ছবি চা নিয়ে এল। চিরুনিটা উল্টে-পাল্টে দেখছি। হাড়ের দাঁতগুলোর বেশির-ভাগ ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বাটের পুরু অংশ সোনার পাতে মোড়া। চোখ বড় করলাম, 'এ যে দেখছি খাঁটি সোনা—

'হ্যাঁ', মাথা নাড়ল ছবি, 'পিসিমার কাণ্ড। নূপুরকে দিয়েছে।'

'সেকি', চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলাম, 'তুমি মানা করলে না!'

'শুনছে কে!' ছবি হাসল।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন:

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন, স্বেচ্ছায় জানাচ্ছেন

"...আমার দাঁতে কোনো গোলযোগ নেই..."

"...ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে শুরু করে অবধি আমার দাঁতে কোনো গোলযোগ বা দাঁতের ক্ষয় হয়নি...

আপনাদের ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আর ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশের জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো..."

(স্বা:) পি. মাহেশ কামাথ, আহেরী, থানে

(এগুলির এবং এই ধরণের আরো চিঠির ফোটোস্ট্যাট কপি ফ্রেঞ্চ ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিঃ-র যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

"প্রায় দশ বছর আগে আমার মাড়িতে গোলযোগ ছিল..."

"প্রায় দশ বছর আগে আমার মাড়িতে গোলযোগ ছিল, আর তখনই আমি টুথপেষ্ট বদলে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করি...এখন আমি সম্পূর্ণ আর সুস্থ দাঁতের এক গর্বিত অধিকারী।

এই অপূর্ব ফোরমিউলার টুথপেষ্ট তৈরীর জন্যে আপনাদের অভিনন্দন জানাই।"

(স্বা:) বি. এস. জয়ন্তী, মৌলালী, হায়দ্রাবাদ

দাঁতের সঠিক যত্নের জন্যে রোজ রাত্রে আর সকালে সঠিকভাবে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন ফরহ্যান্স দিয়ে। আর, মাড়ি মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করুন।

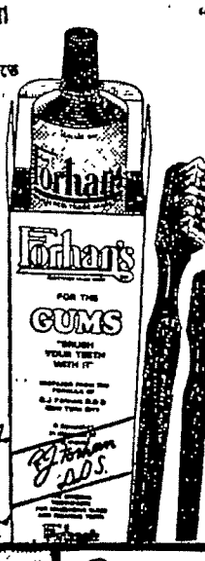

বিনামূল্যে! "দাঁত আর মাড়ির যত্ন" সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ২০ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন: ফরহ্যান্স ডেন্টাল এডভাইসারী ব্যুরো, পোস্ট ব্যাগ নং ১১৪৬৩, ডিপাঃ নং T 75-179 বম্বে ৪০০ ০২০। যে ভাষায় চান জানাবেন।

ফরহ্যান্স দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

1795-163 BEN

চায়ের কাপ নিয়ে খাটে বসলাম। ছবি খাওয়াতে দুপুরে কলকল করে উঠল, 'ঠাকুমা মাকেও একটা সিঁদুর-কৌটো দিয়েছে।'

'তাই নাকি', এক ঢোক গরম চা গলায় চালান করে দিয়ে বললাম, 'কই, নিয়ে এসো দেখি।'

নুপুর ছুটে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে কৌটোটা নিয়ে এল। দেখতে অবিকল একটা ক্ষুদে ডাবের মত। মাঝ খান দিয়ে খোলা যায়। রুপোর, তবে বহু কালের পুরোন বলে কালচে হয়ে গেছে।

'ব্যাপার কি?'—আমি ছবির দিকে অর্থপূর্ণ তাকালাম।

ছবি ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে বলল, 'কে জানে।'

নুপুরের কাছ থেকে সব শুনলাম। আজ দুপুরেই নাকি পিসিমা ট্রাঙ্ক খুলে ওর ভেতর যা ছিল সব জনে জনে ভেকে বিলিয়ে দিয়েছে। একজোড়া কানপাশা দিয়েছে দাদার মেয়ে সোমাকে। বৌদিকে দিয়েছে কয়েকটা দুপোর কাঁটা। তনু আর শিবুর ভাবী বউদের জন্য রেখেছে একছড়া সোনার মটরদানা হার। বৌদিকে বলেছে—সময়মত ওটা ভেঙে দুজনের জন্য দুটো গয়না গড়িয়ে দিতে। সব শুনে খুশি হতে পারলাম না। তবে শৈশব কৈশোরের রহস্যের ঘোরটা কাটল। বিরাগমনের সময় ট্রাঙ্কটা সঙ্গে করে নিয়ে বসেছিল পিসিমা। পিসেমশাইর মৃত্যুর পর ঠাকুরদা আর ওকে শ্বশুরবাড়িতে যেতে দেননি। ট্রাঙ্কের ভেতর পিসিমার দাম্পত্য-জীবনের যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন সব জমা ছিল। এতদিনে বুঝলাম—কেন এই সত্তর বছর ধরে পিসিমা ওই ট্রাঙ্কটাকে লক্ষের ধনের মত আগলে ছিল।

তবু সংশয় ঘুচল না। হাতপা ধুয়ে হাল্কা জলখাবার খাবার পর পিসিমাকে সকলের সামনে পাকড়াও করলাম। বললাম, 'এসব কি শুরু করেছ পিসি?'

পিসিমা দেঁতো হাসল, 'কি হয়েছে?'

'হবে আবার কি', আমি ইষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, 'তোমার যা কিছু ছিল সব দিয়ে দিলে কেন?'—দাদাও আমার কথায় সায় দিল।

'অনেকদিন ধরেই মনে করে রেখেছিলাম', মাড়িতে মাড়িতে ঘষল পিসিমা, 'কখন কি ঘটে যায়, বলা তো যায় না। তাই আগেভাগেই দিয়ে রাখলাম।'

তনু আর নিজেকে চাপতে পারল না। চাবাড়ে গলায় বলল, 'এসব তোমার বুড়ো বয়সের পাগলামি, বুঝলে পিসি।'

তনুর কথা কানে গেল না পিসিমার। ভেতর থেকে এখন আবেগটা অস্তিত্ব ফুটে বেরুচ্ছে। স্বস্তিতে পূর্ণতায় টলটলে হয়ে ওঠা একটা মানুষ। যাকে আমরা আগে কখনো দেখিনি। উঠে যাবার আগে চোখমুটো কুসব করে আপনমনে বিড়বিড় করে উঠল পিসিমা, 'আসল মানুষটার কাছেই যখন যাচ্ছি তখন আর এসবের মায়া করে কি হবে।'

একটা ঘুনঘুনে ঝাপসা গলার আওয়াজে জেগে গেলাম। চোখ মেলতে দেখি—মশারির ভেতর রাতশেষের পাতলা আবছায়া। আমার পাশে বাপি। তারপর নুপুর। একেবারে ওধারে ছবি। সকলেই ঘুমে কাদা। শীত শীত করছিল। ক্লান্তিতে সারা শরীর অবশ। অফিসের কাজে দিন পাঁচেকের জন্য নর্থবেঙ্গল টুরে যাই। ফিরেছি কাল অনেক রাতে। উঠে বসলাম। আওয়াজটা কোনদিক থেকে আসছে বুঝতে পারলাম না। পায়ের কাছে পাট করা কাঁথাটা টেনে নিয়ে ফের শুয়ে পড়ে গলা অব্দি ঢেকে দিলাম।

শান্ত নৈঃশব্দ্যের আওয়াজটা যতই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে ততই একটা অস্বস্তি আমাকে অসহিষ্ণু করে তুলছিল। বিরক্ত হয়ে কান পাতলাম। আওয়াজ নয়, একটা কাঁপা কাঁপা সুরেলা কণ্ঠস্বর। খুবই পরিচিত। বুকের ভেতরটা নড়ে উঠল। চাপা গলায় ডাকলাম, 'এই ছবি। শুনছ—

'উমু—।' ঘুমের মধ্যে ছবি মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠল।

'পাশের ঘরে কে?'—প্রশ্ন করলাম।

'পিসিমা।'—বুকের ওপর কাপড় টেনে দিতে দিতে উত্তর করল ছবি।

'পিসি। তনুর ঘরে কেন?'—অবাক হলাম।

ছবি জবাব না দিয়ে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল।

আবছায়া ফিকে হয়ে আসছে। পিসিমার তৈরি নক্সিকাঁথার ভেতর আমার শরীর। চোখের পাতা পাথরের মত ভারি। তবু ঘুম আসছে না। অক্সি যেন খুব হাল্কা হয়ে দূরে শৈশবের দিকে ভেসে যাচ্ছিলাম। মিহি আতপচালের গন্ধ আমার চারপাশে। একটা ঠান্ডা খসখসে বুকের মধ্যে মিশে যাচ্ছিলাম আমি। আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে একটা গানের কম্পন ফুটে বেরুতে চাইছে। মনে হল, বহুকাল বাদে পিসিমা যেন কাঁপাকাঁপা গলায় রামপ্রসাদের মালসী গেয়ে একটা সকালকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে।

ঘুম ভাঙতে দেখি পাশে কেউ নেই। শিয়রের দিকের জানালা দিয়ে একখন্ড ধারালো রোদ এসে পড়েছে আমার বুকে। প্রথম শীতের রোদ। বড় ভাল লাগছিল।

কুয়োতলায় যাবার মুখে শিবুর সঙ্গে দেখা। আজ ওর বাড়ি থাকার কথা নয়। ওর কাছ থেকে সব কথা শুনলাম। আমি যেদিন টুরে বেরিয়ে যাই সেদিনই নাকি গোয়ালঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে কালো গরুটার পায়ের লাথি খেয়ে পিসিমার বুকের বাঁদিকটা জখম হয়ে যায়। সেই থেকে শ্বাসকষ্ট, তার ওপর আবার নতুন উপসর্গ জুটেছে। কিডনির গন্ডগোল শুরু হয়েছে কাল থেকে। পেচ্ছাব হচ্ছে না ঠিকমত। জিজ্ঞেস করলাম, এখন কেমন আছে? —ফূর্তিবাজ শিবু মাথা নাড়ল, ভাল নয়। যে কোন সময় টক্সিমিয়া স্টার্ট করে যেতে পারে।'

চা বিস্কুট খেয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গেলাম। ততক্ষণে দাদা আর তনু পিসিমাকে পাঁজাকোলা করে বাগানের মাঝখানে ফাঁকায় বেতের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে গেছে। পিসিমার চারপাশে বাড়ির বাচ্চাদের জটলা। ডাইনে পিসিমার পবিত্যক্ত স্টিলের ট্রাঙ্কটা বনকলমি ঝোপের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

আমি বারান্দা থেকে নেমে বাগানের দিকে এগিয়ে গেলাম। পিসিমা মাথা নিচু করে কি যেন করছিল। কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'পিসি—

পিসিমা মুখ তুলতে কেঁপে উঠলাম। হাত মুখ অস্বাভাবিক ফুলে যাওয়ায় ওকে চেনাই যাচ্ছে না। পিসিমা ঘরঘরে গলায় শুধোল, 'কে পল্টু?'

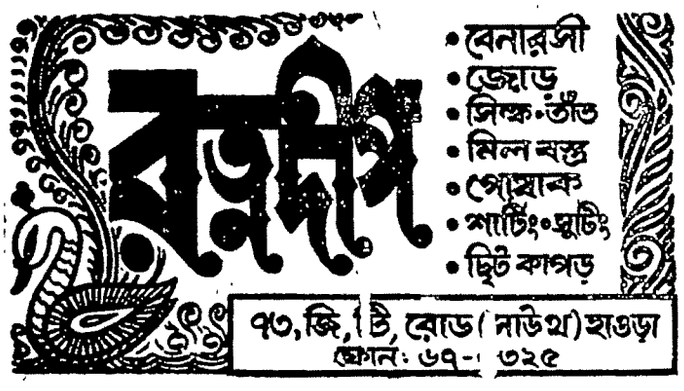

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

শৈবাল মিত্র

(দুই)

ডুগ, ডুগ, কুড কুড কুড়ুম। তালে তালে বাজছে মাদল আর নাকড়া।

আকাশে রুপোর থালার মতো চাঁদ। গাঁয়ের বাড়ী ঘর, গাছ পাতা, হলুদ মাঠ আলোয় ডুবে আছে। হিম পড়ছে। হিম আর আলোয় মিশে চারপাশ বড়ো অদ্ভুত দেখায়। লখাই বাঁশী বাজাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল ঝুমরীর দিকে। ঝুমরি এখন ব্যস্ত। নাচের লাইন ছেড়ে সে রান্না সামলাচ্ছে। দাউ দাউ চুলোর আগুন। ওপরে মাটির হাঁড়ি। তিনটে খরগোস আর দুটো পায়রা রান্না হচ্ছে। ঝুমরি টিপে টিপে দেখছে। বুলু, বাকিন আর শশক দেওয়া হয়েছে। এরপর হবে খুদের জাউ

মরদেরা আজ শিকারে গিয়েছিলো সারাদিন ঘুরে এই শিকার। তেরোজন মরদ আর দুটো কুকুর ছিলো। মোট পনেরোট ভাগ হবে মাংস। এসব ব্যাপারে ছেলে-ছোকরাদের ঝুমরির ওপর খুব বিশ্বাস

মাথাতে তার মুড়ি নেই। কাজকর্মেও পরিষ্কার মাথা।

বাজনার শব্দে অন্ধকার কাঁপছে। ছেলেমেয়েরা দু লাইনে নাচছে। মাঝে দুলছে উথাল পাথাল। ঝুমরী আড়চোখে দেখে লখাইকে। চোখাচোখি হয়। লখাই চোখের ইশারা করে। ঝুমরী হেসে মুখ ঘোরায়।

গোটা কুলি এখন কোবকুরিদের মহলে। বুড়োরা আসে নি। গাঁয়ে মড়ক চলেছে। গাঙভীন গরু মরেছে পাঁচটা। কাল যাবে জানগুরুর দরবারে। ঝাড়ফুঁক হবে। তেল, পান, সুপুরি জোগাড় হয়েছে।

দ্রিম দ্রিম—ধামসা বাজে। দ্রুত পায়ে নাচ জমে ওঠে। হাঁড়িয়া, মহুয়ার বান ডাকে। হাসির তুফান ওঠে। এ ওর গায়ে খুশীতে ঢলে পড়ে।

গান শুরু হয়। নয়ং মোনেএ বড়েই কেন্দা ঘনে মনে বদল কান। মেয়েরা কোমর দুলিয়ে গায়—তোমার মনে কি আছে বুঝেছি। ঘন ঘন বদলাচ্ছে। উদ্দাম মাদল বাজে। মেয়েদের চকচকে খোঁপা থেকে সাকনবাহা পরে যায়। ঝুমরীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে। দীঘল আখের মতো শরীর লখাইকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। হিম আর জ্যোৎস্নার সোনালী চিকে ঢাকা বাহেঙ্গা গ্রাম ফুর্তিতে টলমল করে।

লখাই আজ বেজায় খুশী। ঝুমরীর সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে। সামনের মাসে ওদের তিলকচুরি, পাকা দেখা। লখাই-এর আজ কিছুতে নেশা ধরছিলো না। বুকের মধ্যে কি একটা চুলবুল করছিলো। ঝুমরী ঝুমরী বাঁশীর মধ্যে ও হাওয়া খেলায়।

গান শেষ হলো। দুইপাশ মাদল এখন দ্রিম দ্রিম করছে। কোইয়ে খাপ খোলা হিম হাওয়া। সামনে শুকনো কাঠ-পাতার আগুন। ছেলেমেয়েরা হাত-পা সেঁকছে। ঝুমরী কাঠকুটো জোগাচ্ছে। এবার খাবার ভাগ করবে। লখাই-এর রাগ হয়। ঝুমরী একবারও তার কাছে আসছে না। তাদের মধ্যে কি এত সিরসিরানি। অভিমানে গলা বুজে আসে। অনেকক্ষণ ধরে ও চোখের ইশারা করছে। বাঁশী হেলিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছে একটু তফাতে যাবার। অথচ ঝুমরী ওকে পাত্তা দিচ্ছে না। তবু লখাই উঠতে পারে না। ঝুমরীর চোখের ভ্রূ. তিটা আগুনের ডগা ওকে হুল ফোটাচ্ছে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর হিম হয়ে যায়। তবু ও আগুনের কাছে যায় না। শরীরের কাপুনি নিয়ে ও বসে থাকে। ঝুমরীই এখন এক মাতব্বর অনুরোধ লখাই ভেবে পায় না কবে কেন দোরুগ-ডাকা সকালে একটা কচি মেয়ে হঠাৎ ডাগর ভোগর ঝুমরী হয়ে গেল।

খাওয়ার পাট শেষ হলো। চাঁদ হেলেছে তরণী পাহাড়ের পূর্ব দিকে। কুলি থেকে চুপচাপ উঠে যাচ্ছে দুজন করে। ঝুমরির হাত ধরে লখাই একটা খড়ের গাদায় ঢুকে গেলো। ঝুমরীর বুকের আগুনে লখাই এখন তার হাত-পা মুখ সেঁকছে। ঝুমরি ঘন হয়। উলের লাছির মতো শরীরের তাপে ঢেকে দেয় লখাইকে।

ভগতরাম এবারেও এসেছে। সে যে আসবে জানান দিয়ে গিয়েছিলো সেই শাওন ভাদর মাসে। রানীশ্বর না আসনবুনি কোথায় যেন বাড়ি। একটা মুনিষের পিঠে কাপড়ের বিরাট বোঁচকা চাপিয়ে ফি বছর ও আসে। ওঠে চিমনলালের ঘরে। জানগুরু চিমনলাল। আশ-পাশের দশ-বিশটা মাঝি পাড়ার সে ডাক্তার, বদ্যি, পুরুত সব কিছু। এ তল্লাটে এক ডাকে সকলে তাকে চেনে। ভব করে। খাতির করে। মস্তো বড়ো গুণীন সে। ঝাড় ফুঁক করে। তন্ত্র মন্ত্র ভাবিচ, কবজ দেয়। জল পড়া, তেল পড়া, ফুল পড়া, পান দর্পন, নখদর্পন, তেলপাত, সিঁদুরপাত, তামাম জিনিস সে জানে। অসুখ বিসুখ কলেরা বসন্ত দেখেল গরুর বাঁটে ঘা, এ-রকম কতো উৎপাতে জান-গুরুই ভরসা। দশ বিশটা গাঁয়ের লোক এসে ধর্ণা দেয় জাহির থানে। ওখানে আছে চাণ্ডী বোঙ্গা। আর ভাব সেবক চিমন জান। নিশুতে রাতে দেওতাবা তার কানে ফুসমন্তর দিয়ে যায়। ভূত প্রেত, দানদত্যি তার পাশের শব্দ শুনলে পালায়।

রোগ, মড়ক লাগলে দেওতারা তাকে বলে যায়, কার জন্যে গাঁয়ের এই দুর্ভোগ। গাঁয়ে কার ঘরের মেয়ে বৌ ডান হয়েছে, তার হদিশ চিমন জান দিতে পারে। শুরু হয় ঝাড়ফুঁক। কুলিতে মজলিস বসে। ডানটাকে দাবেস দিতে হয়। দাবেসের টাকার মদের ফোয়ারা ছোটে। শুয়োর কাটা হয়। জরিমানা দিতে না পারলে গাঁয়ের লোক ডানটাকে পিটিয়ে মারে। জরিমানার আধলা পাথ নফর জান।

লখাইএর হাতে মাথা রেখে ঝুমরী অঘোরে ঘুমোচ্ছে। খড়ের গাদায় সব সব শব্দ। চাঁদের আলো এসে পড়ছে ঝুমরীর মুখে। ওর খোঁপার লাল আবীর ফুল খসে পড়েছে। খড়ের গাদা হিমে ভিজে গেছে।

ভক সাইজের এই চিমন জানের কথা ভগতরাম। গত হপ্তায় এক মিকেলে সেই মহাজনের সঙ্গে লখাই-এর ঝগড়া হয়েছে। কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে তাকে।

এবারেও শাওন মাসে ভগতরাম কাপড়ের বস্তা নিয়ে এসেছিলো। চিমন জানের আখড়ার সামনে দুটো গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ও ঝুলিয়ে রাখে রাজ্যের কাপড়। নানা বাহার। হাসাবো রঙ। কাপড় ছাড়াও থাকে লুঙ্গি, গামছা, জামা। ছোট বড়ো, হরেক জিনিস।

ভগতরাম এলেই গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। দড়িতে টাঙানো রঙ-বেরঙের শাড়ী, লুঙ্গি, গামছাগুলো দেখে তাদের চোখ জ্বল জ্বল করে। নতুন শাড়ীর সামনে সব এসে জোরে জোরে শ্বাস টানে। ইস্ রে, কি মিঠি বাস।

ভগতরাম পসরা সাজিয়ে বসে থাকে। পান খাওয়া লালচে দাঁত। হাতে খড়কে। দাঁত খোঁটে। খাটো কাপড় ঢাকা মেয়েদের আঁটসাট শরীরে ওর দুটো খুদে চোখ ঘুরে বেড়ায়। মেয়েদের আদুলে গলা, কণ্ঠা, কোমর বেয়ে দৃষ্টি আরো নামতে থাকে। হেসে হেসে সুর করে বলে—যার যা ইচ্ছে নিয়ে যা। লুঙ্গি শাড়ি গামছা। বাপের নাম, টিপ সই। এই আমার খাতা বই। লাগবে নাকো টাকা কড়ি। সস্তা দামে গামছা শাড়ি।

মেয়েরা চোখে চোখে তাকায়। খিল-খিলিয়ে হাসে। নিজেদের কনুই দিয়ে খোঁচায়।

ভগতরাম রসিয়ে রসিয়ে মজা করে। বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকায়। বলে বিকি করে ভগতরাম। বর্ষাকালে দাম কম।....

আর পাঁচটা মেয়ের মতো গত বর্ষায় ঝুমরীও টিপসই দিয়ে একটা শাড়ি নিয়েছিলো। লখাই-এর ওপর অভিমান করেই সে এটা করলো। লখাই তাকে নথা দিয়েছিলো চইতের তেলপোড়ার মেলা থেকে একটা শাড়ি এনে দেবে। আর সাল চিবুনি। এখনো দুজনে এতে কাছাকাছি আসে নি। আস্তে আস্তে চেনা-জানা হচ্ছে।

একটা দিন ঝুমরীকে না দেখলে লখাই-এর বুক চিনচিন করতো। আবছা ভোরে ঝুমরীদের ঘরের সামনে হাঁটাহাঁটি করতো। গলায় শুকনো কাশির শব্দ। কাশতে কাশতে গলা জ্বলতো। পোষা কুকুরটার নাম ধরে জোরে জোরে ডাকতো—কুসা, কুসা। দৌড়ে আসতো কুকুরটা। পায়ের কাছে মাটির ওপর লুটোপুটি খেতো। সামনের পা দুটো তুলে কোমর জড়িয়ে ধরতো। ঝুমরীর দেখা মিলতো না। রাগে, দুঃখে চোখ ফেটে জল আসতো তার। গুনে গুনে দশটা গাল দিতো ঝুমরীকে। কুকুরটা ভয়ে পিছিয়ে যেতো। তারপর সন্ধ্যের দিকে আলোয় বাঁশ-বাগানে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতো। কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরতো বুকের মধ্যে। সোহাগে ছটফট করতো মেয়েটা। লখাই তখন যোদ্ধার

কাছে প্রার্থনা করতো সকালে দেওয়া গালগুলো ঝুমরীর যেন না লাগে।

তারপর তারা অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ঝুমরীর শরীর হয়েছে আরো গনগনে। গায়ের চেকনাই বেড়েছে। এখন সে পলাশ ফুলের গভীর গন্ধ টের পায়। কালো, মস্তো খোঁপায় লাল শিমুল গুঁজে ধরথর কাঁপে। লখাইকে একদিন না দেখলে তার বুকের মধ্যে অন্ধোর বৃষ্টি পড়ে। অনেক উদ্ভট, সৃষ্টি ছাড়া কল্পনা সোঁ সোঁ ঝড়ে তোলপাড় করে দেয় তার মন। তখন গুন গুন গান গায়—মাদেওরা লগর রে, কামেদা লগর রে।

এই রকম এক মিষ্টি মান-অভিমান মাখা দুপুরে লখাই বলেছিল—আসছে চইতে রানীশ্বরের মিলাতে তুকে একটা লালপাড়া শাড়ি দিনে দিব। কথা রাখতে পারে নি। গাঁটে কড়ি কম। মেলা থেকে ফেরার পথে একগোছা শাদা কাশফুল গুঁজে দিয়েছিল ঝুমরীর খোঁপায়। কিন্তু ঝুমরী ভোলে নি শাড়ির কথা। লখাইকে শাস্তি দেওয়ার জন্যেই সে টিপসই দিয়ে ভগতরামের শাড়ি নিয়েছিল।

ভগতরাম এখন এসেছে টাকা উসুল করতে। ঘর ঘর তাগাদা দিচ্ছে। ঝুমরীর ঘরেও গেল একদিন। তার শুকনো, চুপসে যাওয়া মুখ দেখে নকল স্নেহে বললো—মুখটা অমন ছোট করছিস ক্যানে রে? তুর মতন আমার একটা ভাইঝি আছে। ঠিক এই রকম টিকোলো নাক খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে সে ঝুমরীর নাকটা আদর করে টিপে দেয়। হাতে ট্যাকা নাই? দু-এক ট্যাকা কম পড়েছে? তাতে খোঁত কি? যা পারবি তাই দিবি। না পারিস, যখন পারবি, তখন দিবি। তা বলে আমার দুকানে যাবি না ক্যানে? ঝুমরী অসহায় চোখে তাকায়। চোখে জল আসে। ভগতরাম বলে যায়—আমি যাচ না ভালুক রে? তুরা পাঁচজনা না গেলে দুকান জমে, না মন ভালো থাকে? আজ বিকেল করে একটু যাস তো। উনুনটা ধরিসে ডেকচিটা মেজে দিবি। আর ঐ পথে তোর লেগে একটা লাল গামছা নিয়ে আসবি। চিমন জান তুর কতো নাম করে। যাস বুঝলি। ভগতরাম বেরিয়ে যায়।

লখাই-এর গলাটা ঝুমরী নরম হাতে মড়িয়ে ধরে। মুখের মধ্যে কি যেন বলে, তার পাশে অসাড় জ্যোৎস্না। হিমে ভরে গেছে। ঝুমরীর আদুল শরীরটা ও বুকের মধ্যে টেনে নেয়। একটা চটের নীচে দুটো শরীর। তলায় শুকনো খড়। গোটা পাড়া ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুর ডাকে।

ঝুমরীর মুখে সব কথা শুনে আগুন ধরে গিয়েছিল লখাই-এর মাথায়। পেতলের বড়ো কাঁসিটা মাত্র চল্লিশ টাকায় বেচে ও ছুটলো চিমন জানের ঘরে।

হাঁফাতে হাঁফাতে ভগতরামকে বললো—এই সুদাগর ঝুমরীর নামে কতো ট্যাকা বাকী আছে শিগগীর বল তো।

রোদে রোদে মেঠো ইঁদুরের পেছনে ছুটেছে। লালচে চোখ। হাতে তীর ধনুক। ঘোলাটে চাউনি। কাঠ কাঠ কথা।

এ রকম লোককে ভগতরাম দু চোখে দেখতে পারে না। খেঁকিয়ে উঠলো—তাতে তোর কি রে, তুই কি ওর বাপ?

যা শুধোইছি, তু বলবি কি না—হাতের তীরটা লখাই কাঁধ থেকে নামায়ে—উ আমার কে বটেক, তা তুকে জানতে হবেক নাই।

ট্যাঁক থেকে নোটগুলো বার করে হাতের মুঠোয় রাখলো ও। নোট দেখে আর লখাই-এর কথা শুনে ভগতরাম আর বাড়াবাড়ি করলো না। টাকা মিটিয়ে কাঁধে ধনুকটা রেখে লখাই বললো—ই গাঁয়ের মেয়েছেলে দিও জাতের এঁটো থালা মাজতে না। সেমনি হলে ঘর থেকে কাউকে লিয়ে আসবি উ কাজ করতে।

এ-সব এক হপ্তা আগের ঘটনা। তারপর শুরু হলো গাঁয়ে গয়ের মড়ক। দুমদাম দু ঢাবটে গাই মরে গেলো। কোনোটা মাঠে, কোনোটা গোয়ালের মধ্যে। গোটা গাঁয়ের লোক হকচকিয়ে গেলো। আবার গাঁয়ে ডান এসেছে। সকলে ছুটলো জান গুরুর কাছে। লখাই ভাবে যদি ডাক্তার থাকতো। ডাক্তারের ওষুধের বাক্স এখনও তার ঘরে রয়েছে। রানীশ্বরে গিয়ে আর ফিরলো না। সেও প্রায় সাত-আট মাস হয়ে গেল। ও শুনেছে লোকটাকে পুলিশে ধরেছে। তাঁতিপাড়ার মোতি এসেছিল একদিন। সেই খবরটা দিয়েছে। লোকটা থাকলে বুকে বড়ো বল পাওয়া যায়। লখাই-এর এখন বার বার অজিতের কথা মনে পড়ে। বুধনের সঙ্গেও দেখা নেই। কালই একবার বুধনের পাত্তা করতে হবে।

কাল জান গুরুর দরবার বসবে। গাঁয়ের বুড়ো বুড়িরা দু পাঁচ টাকা যে যা পারে দিয়ে এসেছে জানের পায়ের তলায়। জান কৃপা করেছেন। কাল ডান ধরার দিন। ডাক্তার এ-সব ঝাড়ফুঁক বিশ্বাস করতো না। বুধন লখাই তার গাঁয়ের ছেলেদের বলতো—যতো ভুয়ো ব্যাপার। রোগ হলে গরু মরে। ঘাঁটে যা হয়। ক্ষেতে পোকা লাগলে গাছপালা ছেয়ে যায়। চিকিচ্ছে করো। ঠিক হয়ে যাবে। আরো কতো কথা যে লখাই বলতো, লখাই সব মনে করতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে ডাক্তারের কথা শুনে আগুন চাপতো মাথায়। কখনো কান্না পেত। লোকটা দেখতে পারতো না নকর জানকে। একদিনও জানের থানে যায় নি। ভগতরামের সঙ্গেও মুখোমুখি হয় নি। পলাশ গাছের মাথায় ওপর চাঁদটা এখন নেমে এসেছে। চাঁদের বুকে কালো কালো জমাট কুয়াশা। লখাই-এর চোখে ঘুম নামে।

দুপুরের আগেই জান গুরুর দরবার বসলো। আকাশে অসময়ের মেঘ। শাল-ধনের মাথাটা কালো হয়ে আছে। এলোকেশী শালবন। ফাঁকা খালি মাঠে উত্তুরে হাওয়া হুসহাস শব্দ করে। দুচোখ বুজে জানগুরু ধ্যানে বসেছে। চারপাশ চুপচাপ। গাঁয়ের মানুষের অবোধ চোখে ভয়। খড়কে দিয়ে দাঁত খোচাচ্ছে ভগতরাম। ওপর পাটির দুটো দাঁত সোনাবাঁধানো। চোখে কটাসের দৃষ্টি। জানগুরুর সে দোস্তু। গুরুর পাশে বসেছে। শ্বাসরুদ্ধ করে অপেক্ষা করছে সবাই। শুকনো পাতায় খসখস শব্দ। কারা যেন আসছে। বোধহয় সেই দেওতারা। গুরুর কানে তারা বলছে জানের নাম। ধীরে ধীরে চোখ খোলে চিমন জান। ঘোরলাগা লালচে চোখ। সকলের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে একবার তাকালো। তারপর নীচু গলায় হওয়ার সঙ্গে কথা বললো। ফিক করে হাসলো একবার।

সকলে জোড়হাতে বসে আছে। মুখিয়া নানকু মাঝি বললো, দোহাই জানগুরু, আমাদের বাঁচাও।

চিমন জানের মুখে নরম হাসি। ইবারের ডানটি খুব শয়তান বটেক—সে জানায়।

লখাই গিয়েছিল শালবনে কাঠ কাটতে। সে এসে দাঁড়ায় হাতে ধারালো দা বুপোলী ঝকঝকে ফলা। কাঁধে একবোঝা কাঠ। ঝুমরীকে খোঁজে। মেয়েদের ভিড়ে ঝুমরী বসেছে। তাকায় না। চিমন জান হাওয়ায় মন্ত্র পড়ে। নানকুর দিকে তাকিয়ে বলে—বড়া শক্ত পুকুত। এক ঘড়িতে যাবে না লাগছে। দিখা থাক না কবে তেঁইতিশ দেওয়া, আমার আর কি ক্ষেমতা আছে। কপালে দুহাত ঠেকায় সে। তার দেখাদেখি বাকী সকলে কপালে হাত লাগায়। সকলে একমুখ প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছে। ফ্যাকাসে মুখ। কেউ কারো দিকে তাকাতে সাহস পায় না।

কে যেন বলে উঠলো-ডানটি যে বটেক গুরুবাবা।

উইটিতে তো জানা গেছে নাই। খুব শয়তান ডান বটেক।

শুরু হলো তেলপাত। মসৃণ সবুজ শালপাতায় তেল লাগিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগালো গুরু। দেবতা সদয় হলে এই পাতার ওপর ভেসে উঠবে ডাইনীর মুখ। তখন চেনা যাবে। বুড়োদের হাতে একটা করে তেলমাখানো পাতা দেওয়া হলো।

লখাই-এর বুকটা দুরদুর করে। মাথার মধ্যে কেমন গুলিয়ে যায়। চিরকাল ডাইনীগুলান শুধু গাঁয়ের সোন্দর সোন্দর মেয়েগুলোর ওপর ভর করে। কোনো জন্তু-জানোয়ারের ঘাড়ে তারানামে না। ইটা কি করে হয়? মাস্টার থাকলে বলে দিত। তুমি কুথায় যে চলে গেলে হে। মেয়েগুলো কি সত্যি সত্যি ডান হয়? সোন্দর তাজা মেয়েরা কি এতো শয়তানী করে? অনেক মেয়ের মুখ তার স্মৃতিতে ভাসে। ফুলমণি, মেঘনা, রুবি। হঠাৎ তার বুকটা কি এক ভয়ে দুলে ওঠে। গলা শুকিয়ে আসে। মেয়েদের দিকে তাকায়। এদের মধ্যে কি কেউ ডান আছে? কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। টোংরার মেঘনার ওপর ডান চেপেছিল। গাঁয়ের কুলিতে মেঘনার দুটুকরো দেহটা পড়ে ছিল। হঠাৎ তার পায়ের কাছে কে যেন থলে ভড়ং। লখাই চমকে ওঠে। দেখে বুধন। তার সঙ্গে ডাক্তারের সঙ্গে খুব খাতির ছিল ওর। ওদের বাড়ীতেই ডাকতার থাকতো। বুধন বলে—কতো ডাইন মারা পড়লো, তবু গাঁয়ে জানোয়ার আর মানুষ মরে কেন? ওর কথাগুলো লখাইয়ের কানে আবছা হয়ে যায়। হাতে তেল চুকচুকে শালপাতার ওপর নজর পড়তে হঠাৎ বুকটা কেঁপে ওঠে। কার মুখ? একটা ছাপানো ছবি পাতার ওপর ফুটে ওঠে। একটু ভালো করে দেখে চিনতে পারে। নিশ্চিন্তে ছায়া। ঝাঁকড়া চুল। শক্ত চোয়াল।

ভীড়ের মধ্যে কে যেন হঠাৎ গুরুবাবা গো, আমার তেলপাতে ডান এসে গেইছে। জানগুরু ডাকে কাছে ডাকে। তার পাতাটা দেখে দুহাতে কপালে ঠেকিয়ে চাপা গলায় কি যেন বলে। তারপর ধ্যানস্থ হয়। কারো মুখে কথা নেই। ছুঁচ পড়ার শব্দ শোনা যায়। মেয়েগুলো মুখ ফ্যাকাশে। বস নেই। কয়েক সেকেণ্ড পরে জানগুরু চোক্ষ মেলে। ভীড়ের দিকে তাকায়। বলে দেওতা বলছে মাঝি পাড়ার কুঞ্জ মাঝি বিটিটা ডান বটেক। ইয় দেখ সবাই। অবিকল ঝুমরির ছবিটি ফুটে উঠেছে। ই ডানটি আস্ত বঢ়ি ডান বটেক। ইটি পিরথমে আমাদের জানোয়ারকে খাবেক। তার সঙ্গে খাবে গাঁয়ের লুককে। আরো কি সব যেন বলছিল চিমনজান। সব কথা তার কানে যায় নি। চোখের সামনে রাশি রাশি কাশ ফুল ওড়ে। বুকের মধ্যে তোলপাড়। ঝুমরী শব্দটা হাজার হাজার তীর থাওয়া পাখী হয়ে কলেজের মধ্যে ডেকে বেড়ায়। বুকের মধ্যে রক্ত বন্ধ। পায়ের নীচে ভূমিকম্প। দুনিয়াটা বেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। মাথাটা কেমন বোম হয়ে যায়। দুটো শক্ত হাত তাকে ধরে থাকে। বুধন বলে—শালা জান। পদমশি, পাজি। চিমনজান আর ভগতরামের সামনে তখন মজলিস বসেছে। কুঞ্জ মাঝি গলায় গামছা জড়িয়ে কাঁদছে। জানগুরুর পা জড়িয়ে বলছে—গুরুবাবা, অ গুরুবাবা, আর খানিক ভালো করে দ্যাখ। আমার ঝুমরী বিটি ডান শুতে পারে না। উ ডান লখকো আর কেউ বটেক, তুমার পায়ে ধরি গুরুবাবা অতো টাকা আমি দিতে লারবো। ই গাঁয়ে থাকবো না, আজকেই চলে যাবো সবাই মিলে। উ ডান লইগো গুরুবাবা।

ঝুমরীর যাবার সব কথা লখাই-এর কানে ঢোকে না। ঝুমরী মাটিতে লুটিয়ে খোঁপাচ্ছে। নফর জানের কানে ভগতরাম ফিসফিস করে কি যেন বললো। জানগুরু দু-হাতে কুঞ্জকে তোলে। বলে—তুর বিটিকে সদাগরের সঙ্গে শহরে পাঠিয়ে দে। দারোগের টাকা উ দিবে। তুর বিটিও জানে বাঁচবে।

চারদিক একবার ভালো করে দেখে লখাই। বুধন ওর হাত চেপে ধরেছে। সামাল। সামাল—বলছে ওর কানে। চপোমাম—ধমকায় লখাই। তুলসা ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। ঘন মেঘ এখন শালগাছের ঝুঁটি ধরে টানছে। ঝড় উঠবে। আকাশে বিদ্যুৎ চিকিরি দেয়। ভিড়ের মধ্যে গুনগুন কথা। দু-চার গাঁয়ের লোক হাজির হয়েছে।

মাঝের পাড়ার সিধু মাঝি পাকা কলা ছাড়াচ্ছে। এই কলা মন্ত্র পড়ে ঝুমরিকে খাওয়ানো হবে। ভগৎরাম মুচকি হাসছে। লখাই-এর মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়। হাতপায়ের পেশী ফুলে ওঠে। মাথার ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় কেশর নাড়ে। থামদা নিয়ে ও চিমনজানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শরীরের সবকটা রোমকূপ দিয়ে ওর রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। ও চেঁচায়—ধাল-মিয়ালাং, গজ মিয়ালাং ই শালাই ডান পয়দা করে। সব ডান আজ আমি ঘুচিন দিবেক। ই শালাই গাঁয়ের সবকিছু লস্ট করেছে। পাগলের মতো ও ঝপাঝপ কোপ চালায়। গাঁয়ের লোক হৈ হৈ করে। মেয়েরা ভয়ে গোঙায়। ভগতরাম বোঁচকা ফেলে দৌড় লাগিয়েছে। পেছনে ছুটছে তার মুনিষ। মনিবের কাছে তার সাত টাকা পাওনা আছে।

লখাই খেপেছে। কেউ সাহস করে এগোয় না। চিমন জানের বুকের হাঁ-মুখ দিয়ে তোড় রক্ত বেরোচ্ছে। ক্ষতটা দুহাতে চেপে ও রক্ত থামাবার চেষ্টা করছে। রক্ত থামে না। হামাগুড়ি দিয়ে জানগুরু পালাতে চাইছে। গুরুর চুলের মুঠি ধরে লখাই দাঁড় করায়। পেটে লাথি কষায়, কোঁক করে শব্দ হয়। জানগুরু ধরাশায়ী।

আজ শালা ডানের ঝাড়বংশ নির্মূল করবো। তুমি শালা চিনো না আমাকে। একনাগাড়ে কথা বলছে অর না। চালাচ্ছে লখাই। চিমন জানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুটিকুটি কাটা। নাক, ঠোঁট, কপাল থেঁতলে ভয়াবহ। ছোট ছোট টুকরো হাড় ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। দেহটা এখন একতাল কিমা।

লখাই-এর হাতে মুখে রক্ত। কোমরের ছোট টাঙ্গি রক্তে লাল। ও চেঁচাচ্ছে—শালা এখনো মরে নাই। দেওতাগুলোন বলছে—ডানটি ইখনো শেষ হয় নাই। আভি বঢ়ি ডান। গাঁজ সে গাঁজো সে শালা ডানের গুষ্টিফুষ্টি গাঁয়ো সে, উড়কে যাও।

গোটা ভিড় ভয়ে স্তব্ধ। আকাশ ফাটিয়ে একটা বাজ পড়লো। তারপর উঠলো ঝড়। বনবাদাড় ফুঁড়ে হাওয়া ছুটে আসে। গলায় গাঁক গাঁক শব্দ। লাল মাটির ধুলোয় ঢেকে যায় চারপাশ। শুকনো কুটো পাতা ঝড়া হাতে ঝাপটা মারে। মড়মড় গাছ ভাঙার শব্দ। জঙ্গলে পাখীরা কিচিমিচি উঠছে। মেঘের গুড়গুড়। একপাল গরু দিশেহারা হয়ে ছুটে যায়। তুলকালাম বৃষ্টি নামে। পাথর হয়ে যাওয়া মানুষগুলো হঠাৎ সম্বিত পায়। বৃষ্টির ফোঁটা বক্ষতালু ভেদ করে আত্মায় ঘা মারে।

লখাই তখনো বকছে—ডান দুষমনের খেল খতম। আর ভর লাইবে। ঝুমরী তু খাড়া থাক।

বুধন হাত ধরে টানছে। লখাইকে গাঁয়ের বাইরে সরিয়ে দেওয়া দরকার। দারোগাকে নিয়ে এখনি ভগতরাম হাজির হবে।

(চলবে)

অবধূত-এর
সুখ শান্তি ভালবাসা
৬০০ পৃষ্ঠার টিলজিট উপন্যাস
১০ টাকা
১০ টাকা অগ্রিম পাঠালে ভাকমাশুল লাগবে না।
তুলি-কলম ॥ ফোন : ৩৪-৮১৮০
১, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

আশ্চর্য লেখক—আশ্চর্য মানুষ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আগাগোড়া বিস্ময়কর। মানুষটি, তাঁর লেখা, তাঁর সাধনা, তাঁর জীবন, তাঁর মেজাজ, তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর কথাবার্তা—সবই। 'গৃহদাহে'র সুরেশ অচলাকে বলেছিল, 'অচলা, মাস দিন বৎসর দিয়ে মহিমকে মাপা যায়, আমাকে যায় না।' কথাটা তখন ভাল বুঝি নি, এই লোকটিকে দেখে বুঝলুম।

এক এক শ্রেণীর মানুষ সত্যিই এমনি অসাধারণত্বের সনদ নিয়ে আসেন বিধাতার কাছ থেকে—যাকে সাধারণ কোন নিয়মের বা ফরমুলায় ফেলা যায় না—সাধারণ রীতি-নীতি দিয়ে বিচার করা যায় না, যাঁর বেলা কোন সাধারণ নিয়মই খাটে না। ভাল দিকে হোক, মন্দ দিকে হোক—এ দুইয়ের বাইরে বা দুই মিশিয়ে হোক—এরা অনন্য, একক।

অথচ সাধারণ খাতেই তো জীবনটা বইবার কথা ছিল। ভবানীপুরের এক নিতান্ত মামুলি পাড়ার এক মামুলি গলিতে—আদি নিবাস সম্ভবত পূর্ববঙ্গ—অনাথ মুখুজ্জে মশাইয়ের ছেলে দুলাল, চাকরি-বাকরি করবে, বিয়ে-থা করে ঘর-কন্না করবে আর পাঁচটা তরুণ ছেলের মতো—এই তো সবাই ভেবেছিল সেদিন। আর তাই তো করছিল—পোর্ট কমিশনারে চাকরি করে অল্প বয়সে বিয়ে করে আর পাঁচটা ছেলের মতোই সংসার পেতেছিল। শখ-শৌখিনতাও কিছু ছিল বৈকি। অ্যামেচার ক্লাবে থিয়েটার করা, ফিল্ম-স্টুডিওতে উঁকিঝুঁকি মারা—একটু কোন রকমে কাজে আসতে পারলে সেখানে খুশী হওয়া—এ পর্যন্ত সবই ছকে ফেলা ভাবে চলছিল।

হঠাৎ গোলমাল হয়ে গেল—ছেলে হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্ত্রীর মৃত্যু হতে। উনি বলতেন, আমার জন্মলগ্নে এমন জায়গায় বাহু আছে—যাতে কোথাও স্থির হতে দেবে না। বাহু যার এভাবে থাকে তাকে এক সময় খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্ষমতা ঐশ্বর্যের তুঙ্গে তোলে, তারপর কিন্তু একেবারে আছড়ে মারে। আমার অদৃষ্টেও তাই আছে।'

এর সত্য মিথ্যা কিছু জানি না। জানাও মুশকিল ছিল, অন্য দু-একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের মতোই—ওঁর একটা মিথ্যা কথা বলার বিলাস ছিল, নাটকীয় প্রভাব সৃষ্টি করে কৌতুক অনুভব করতেই মধ্যে মধ্যে একেবারে তখন তখনই বানিয়ে নিয়ে মিথ্যা বলতেন—দু একবার তা ধরাও পড়ে গেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই অন্য গল্প

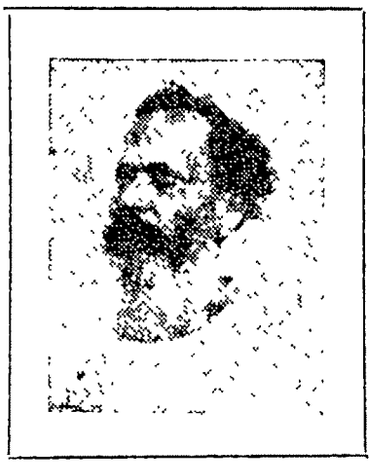

বলে—সম্পূর্ণ উল্টোও হয়ে যেত এক এক সময়—তবে সে সবই নির্দোষ, 'মজা' দেখার জন্যই, তাতে কারও কোন ক্ষতি হত না। এমনি ছিল তো বিভূতিবাবুরও। আমি তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'মিথ্যা-রসিক'। আর যদি অভয় দেন তো বলি—এ কৌতুকেচ্ছা শরৎচন্দ্রেরও ছিল।

সেদিন তীব্র বৈরাগ্যে, ক্ষণপরিক্ষণে হয়ে এক বস্ত্রে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় কিভাবে সন্ন্যাস নেন—তার পূর্ণ বিবরণ তিনি কোথাও লেখেন নি বা বলেন নি। টুকরো টুকরোভাবে এক একদিন এক একটা কাহিনী বলেছেন। শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন সম্ভবত ওঁর এক কাকার কাছে—তিনি এক সময় পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী ছিলেন, শেষ জীবনে কাশী বাস করতেন। তাঁর নাম সম্ভবত নগেনবাবু। তবে উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দিরেই পুরোপুরি অবধূত হয়েছিলেন, একথা বহুবারই বলেছেন। পূর্ণাভিষিক্ত তিনি, সে কাহিনী উনি 'কথাসাহিত্য' পত্রিকাতে নিজেই লিখে গেছেন। শ্মশানের জ্বলন্ত চিতা থেকে অর্ধদগ্ধ নরমাংসের টুকরো তুলে গুরু খেতে দিয়েছিলেন, 'অসংস্পর্শ পবমানন্দে' তা গ্রহণ করার আদেশ দিয়ে।

এছাড়া প্রায় তিন বছর হিমালয়ে কাটিয়েছেন মৌনব্রত ও অঙ্গুলির ব্রত নিয়ে। আভাসে ইঙ্গিতে যা জানা যায় এ আত্মগোপনের মূলে সাধনা ছাড়াও অন্য প্রেরণা ছিল—বিপ্লবীরূপে চিহ্নিত হওয়ার পর আত্মগোপন করার চেষ্টা। মৌনব্রত মানে কারও সঙ্গে কথা না বলা, অঙ্গুলির ব্রতের হচ্ছে কেউ কোন খাদ্য সামনে দিলে খাবেন—নচেৎ উপবাসী থাকবেন। ভিক্ষা করবেন না। আকারে ইঙ্গিতেও না।

শুনেছি এই অবস্থাতেই উত্তর কাশীতে একবার মা আনন্দময়ীর সঙ্গে দেখা করতে যান। মা ওঁর অবস্থা বুঝে নিয়ে আশপাশের সকলকে সরিয়ে ওঁর অনুচ্চারিত প্রশ্নের (অবশ্যই সাধনার গূঢ় রহস্য সংক্রান্ত) উত্তর দেন। সেই কারণেই বহুবার আমাকে বলেছেন, 'মা-ই সাক্ষাৎ মহামায়া, স্বয়ং কালী'।

এই হিমালয় বাসেরই ফল এঁর পরবর্তীকালের 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'। তবে দুঃখের বিষয় তিনি হিমালয়ের নীলকণ্ঠ রূপই দেখেছেন, প্রসন্ন গম্ভীর অমৃতময় রূপ তাঁর চোখে পড়ে নি। কে জানে পাঠক-পাঠিকা বিষ্ণুরই আস্বাদ চায়—এই ধারণা ওঁর মনে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল কিনা!

এরপর উনি হিমালয় থেকে নেমে লোকালয়ে এসে পুরোপুরি আশ্রম কর্তার জীবন শুরু করেছিলেন। কামাখ্যায় ছিলেন বহুদিন, শ্রীহট্টে আশ্রম করেছিলেন, পূর্ব-বঙ্গের অন্য অন্য দু-এক স্থানেও বাস করেছেন, পরে পশ্চিমবঙ্গে এসেও গঙ্গাতীরে একাধিক জায়গায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন—বোধহয় নবদ্বীপেও কিছুদিন ছিলেন—কোথাও ভক্তের বা অর্থের অভাব হয় নি—কিন্তু ঐ জন্ম লগ্নস্থ রাহুই বোধহয় কোথাও স্থির থাকতে দেয় নি। তবে এই যে চূড়ান্তের জোড়াঘাটের আশ্রমটি (বুদ্ধচণ্ডী মঠ, ইষ্ট মূর্তি বিপরীত রতি - বজ্রা দেবীর) দীর্ঘকাল, আমৃত্যু কাটালেন তার কারণ সন্ন্যাসী অবধূতকে আচ্ছন্নম আবৃত করে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন লেখক—সার্থক লেখক অবধূত।

তবে শেষ জীবনে আর একক ছিলেন না। বহিশাল উজীরপুরের এক মেয়ে (উজীরপুর তীক্ষ্ণধার বঁটি কাটারির জন্য বিখ্যাত—প্রায়ই তামাশা করে বলতেন)—ওঁর স্ত্রী বলুন, উত্তরসাধিকা বলুন বা ভৈরবী বলুন—ওঁর জীবন ও সাধনার অংশ ভাগিনী সঙ্গিনী হয়েছিলেন। শুনেছি উনি সাধিকা হিসাবে অবধূতের থেকেও অগ্রসর ছিলেন, ওঁরই শিষ্য বা ভক্তের সংখ্যা অধিক। ভৈরবীকে যে উনি কত ভালবাসতেন তার সম্যক পরিমাণ করা গেল ভৈরবীর মৃত্যুর পর। তখন থেকেই অবধূত যেন প্রস্তুত হয়ে পরপারের খেয়া-ঘাটে এসে বসে ছিলেন, নৌকো আসার অপেক্ষায়।

অবধূতের প্রথম বই 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। বিভূতিভূষণের মতো উনিও প্রথম বইতেই বাজী মাৎ করলেন—বাংলা সাহিত্য কেন, বিশ্বসাহিত্যেই এ দৃষ্টান্ত

কিরল—তবে বিভূতিভূষণের মতো সে-অশান্তি শেষ পর্যন্ত ভোগে যাচ্ছে পারেন নি।

'মধুতীর্থ' হিংলাজের সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র আরও একটি মিল আছে, পথের পাঁচালীতেও অনেক মাল-মশলা করেছিলেন লেখক, বিশেষ তো একবার লেখার পর দুর্গার চরিত্রটি যখন অন্তর্হিত হয় তখন পুরোই ফেলে দিতে হয়েছিল নিশ্চয়—মধুতীর্থ হিংলাজও নাকি অনেকবার আদ্যো-অন্ত পরিবর্তন ও পরিবর্জন করে পুনর্লিখন করেছিলেন। লেখক বলতেন 'তেইশ বার', তবে সে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতিশয়োক্তি বা নাটকীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা হতে পারে। অবশ্য হলফনামার মতো যে পরিবর্জন হয়েছিল তা বই পড়েই বোঝা যায়।

এই 'মধুতীর্থ হিংলাজ' প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

চুঁচড়োতে এসে স্বর্গত সুবোধ রায় অপরাইজের সঙ্গে অবধূতের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। সুবোধ রায় কবি বা লেখক হিসেবে যত না প্রসিদ্ধ ছিলেন তত প্রসিদ্ধ ছিলেন লেখকদের আড্ডাধারক হিসেবে। অবধূতও বইটি প্রথমে সুবোধ রায়কে শোনান। এর পরে একদিন জগদীশভট্টাচার্য সম্ভবত কোন সভা উপলক্ষে চুঁচড়ো যান, সঙ্গে গৌরীশংকর ভট্টাচার্যও ছিল। সভার শেষে বা প্রথমে সুবোধ রায়ের বাড়ি বসে জগদীশভট্টাচার্য। সেখানেই মধুতীর্থ হিংলাজের কিছু অংশ শোনেন। খাঁটি ব্রাহ্মণ চিনতে ভবভূতির নিমেষমাত্র বিলম্ব হয় নি, তিনি কৃষ্ণ 'ভবভূতির স্বপ্ন' মাসিকের অভিজ্ঞাধক স্থানীয়, তার জামাই লেখাটি দিতে বলেন।

শ্রীমান গৌরীশংকর ফিরে এসে অবশ্য এই লেখাটির কথা বলেছিল। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, আমি তত গুরুত্ব দিই নি। কে এক সন্ন্যাসী সে ভ্রমণ কাহিনী লিখেছে—তাতে আর এত আহামরি কি আছে! নজর পড়ল অনেক দিন বাদে। আমার মা খুব ভাল পাঠিকা ছিলেন, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রাত ১১টা অবধি জেগে বই পড়ে গেছেন—তিনিই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'ভবভূতির স্বপ্নের' কান্ডারী বন্ধুবর অজিতবাবুর শরণ নিলাম। তাঁর উদ্ভব দিলেন, আরও দু'জন প্রকাশক এর আগে বলেছেন—তাকে দেখ একটু ভেবে দেখি।' অতঃপর নিজে সক্রিয় হওয়া ছাড়া উপায় কি? চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অবধূতের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি বললেন, সুবোধবাবুর মত নিয়ে বলব। সুবোধবাবু মিত্র-ঘোষের হয়ে জোর সুপারিশ করতে তিনি চিঠি নয়—সশরীরেই এসে হাজির হলেন, সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হয়ে গেল। গৌরীশংকর তখন নিরালার মালিক—তাঁরও ঐতিহ্য ওপর ঝোঁক ছিল, তখন জানতাম না। কিন্তু অবধূতের ভাগ্য তারকা তখন ঊর্ধ্বগামী এবং মিত্র-ঘোষেরও তাই এ যোগাযোগ হয়েছিল।

মিত্র ঘোষ অবশ্য কুটিল নিরোহিত ব্যবসায়ী, প্রথমেই যা বিজ্ঞাপন করেছিল তাতে তিনটি সংস্করণের আগে খরচা ওঠবার কথা নয়। তবে অবধূত সে বিজ্ঞাপন সুদসুদ্ধ পুষিয়ে দিয়েছিলেন। এক 'দৃষ্টিপাত' এবং পরবর্তী যুগে 'চৌরঙ্গী' ও এপার বাংলা ওপার বাংলা ছাড়া এমন অভূতপূর্ব বিক্রীর নজীর নেই। 'পরমপুরুষ'ও আশ্চর্য রকম বিক্রী হয়েছিল কিন্তু সে তো শুধু একখানি গল্পগ্রন্থ নয়—সে যে ঠাকুরের জীবনী। যতদূর মনে আছে অবধূত প্রথম এক বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা রয়ালটি পেয়েছিলেন। মধুতীর্থ হিংলাজের বিক্রী দীর্ঘকাল সমান ছিল—ফিল্ম না হওয়া পর্যন্ত।

সেই ওঁর জয়যাত্রার শুরু।

বশীকরণ, বহুব্রীহি, উদ্ধারণপুরের ঘাট—একটার পর একটা জয়মাল্য অর্জন করে চললেন। বিশেষ উদ্ধারণপুরের ঘাট। এই বইটি সঞ্জয়বাবুর 'পূর্বাশা' মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তিন যা চায় কিস্তি—ঠিক মনে নেই—বেরোবার পর কাগজ কিছুদিন বন্ধ থাকে। তার আগেও বেশ খুঁড়িয়ে চলছিল—বোধহয় সঞ্জয়বাবুর স্বাস্থ্যের জন্যই—তাতেই অসহিষ্ণু অবধূত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, এবার সুযোগ পেয়ে নিয়ে এলেন কথাসাহিত্যে। আগে নাম ছিল 'উপাধান'—আমারই প্রস্তাবে নতুন নামকরণ হল 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'। উদ্ধারণপুরের ঘাট বাঢ় অঞ্চলে বিখ্যাত। বহু দূর-দূরান্তর থেকে 'গঙ্গা' পেতে ওখানের শ্মশানে শব বয়ে নিয়ে আসতেন—হয়ত এখনও আসেন। তবে এখন দ্রুততর যানের ব্যবস্থা হয়েছে নিশ্চয়। তখন তিন-চার দিনের পথও হেঁটে আসতেন শব বাহকের দল। লেখকের কাল্পনিক (?) এক তান্ত্রিক সাধক সেই শ্মশানে পরিত্যক্ত শব-শয্যা স্তূপাকার করে তার ওপর বসে থাকেন—আর বহু বিচিত্র মানুষের বিচিত্রতর কাহিনী শোনেন, জীবিত ও মৃত সকলকারই বিবরণ, লোভ ও আবর্ত হের মনোবৃত্তির কল্পনাতীত পরিচয় মেলে, মেলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের বিবরণ—কোন কোন মানুষকে নিয়ে। এই মহা-শ্মশানে—সর্ব প্রবৃত্তি ও বিপ্লব পরম সমাপ্তির মহা বিনষ্টির পুণ্য ক্ষেত্রেও কত মানুষ বয়ে এনেছে কত বাসনা কামনা—কত বিপ্লব খাদ্য যোগাতে এসেছে এখানেও, কত ঘৃণ্য চিত্র, কত গভীর ট্র্যাজেডী তার পাশে, কত সর্বনাশ কত সর্বনাশের সূচনা—এ সবেরই নীরব দর্শক ঐ সাধক। শবের উপাধানে কান পেতে শোনেন সেই সব মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থার করুণ বা মধুর বিবরণ। কিন্তু দিনে রাতে চোখে তাঁর নিদ্রা নেই—দু' চোখ মেলে দেখছেন এইসব আশ্চর্য মানুষের মেলা, শুনছেন তাদের সুখ দুঃখের, লালসা ও সম্ভোগের অবিশ্বাস্য বিবরণ। হয়ত শেষ পর্যন্ত নিরাসক্তি বা ঔদাসীন্য বজায় রাখতে পারেন নি—কিন্তু তা বুঝি সম্ভবও নয়।

বাংলা সাহিত্যে বহু বিস্ময়কর গ্রন্থ লিখিত হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে উদ্ধারণপুরের ঘাটের জুড়ি বোধহয় একখানিও নেই। শ্রীকুমার একে অভিহিত করেছেন 'শ্মশানের মহাকাব্য' বলে, সুনীতিকুমার বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির অন্যতম অবধূতের শ্রেষ্ঠতম।....

'বশীকরণ' বহুকৃত তিনটি (বা চারটি, আজ আর ঠিক মনে নেই) বড় গল্পের মালাবন্ধন, তবু একেও উপন্যাসের দলে টেনে-বুনে টানা যায়। 'বহুব্রীহি' সোজা-সুজি ছোট গল্পের সংগ্রহ। সেদিক দিয়েও এটি এক পরমাশ্চর্য সংকলন, সমৃদ্ধ বাংলা ছোট গল্পের আসরেও এর আবির্ভাব অনধিকার প্রবেশ নয় কোন মতেই।

এর পর—?

এরপর সেই ফরাসী প্রবাদবাক্যের মতো বন্যা নয়—এল এক ঝঞ্ঝা। সমস্ত জীবনটাই হয়ে দাঁড়াল এক ঝড়—দিবারাত্রির জীবন-যাত্রা লেখা, পড়া, বলা সবটাই যেন চলতে লাগল ঝড়ের বেগে। বই লিখেও চললেন বৈকি, এই খ্যাতির পর চারিদিক থেকে চাহিদা আসবে সে তো স্বাভাবিকই, উনিও সে অনুনয়-বিনয়ে সাড়া দেবেন সেও স্বাভাবিক। জীবনেও অনেক পরিবর্তন এল। মধুতীর্থ হিংলাজের প্রচ্ছদে সন্ন্যাসীর ছবি ছাপা হয়েছিল। সেই ছবি দেখে আত্মীয়রা চিনতে পারলেন, বহুকাল পরে আবার যোগাযোগ হল, ভাই, মা এবং প্রায় না-দেখা পুত্রের সঙ্গে। ছেলে অমল তখন তরুণ যুবক, কাকার আশ্রয় থেকে চলে গিয়ে সুদূর বোম্বেতে এক সাধারণ চাকরি করছে। অবধূত নিজে গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে এলেন। মাকে নিয়ে গিয়ে কাশীতে একটি ঘর ভাড়া করে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করলেন রাজরাণীর মতোই। ভাই বোন সকলের সঙ্গেই যোগ-স্থাপন হল।

সন্ন্যাস জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের পর থেকে কখনই হিসাব করে খরচ করেন নি, এখনও তার প্রয়োজন রইল না। দু-হাতে টাকা খরচ করতে লাগলেন, ফেলে ছড়িয়ে বিলিয়ে। বাস্তার কুকুর পুষি দৈনিক ছটা করে রাজভোগ খেতে লাগল। ভৈরবী বেড়াল ভালবাসতেন, জুটেও ছিল অনেকগুলি, তাদের জন্য একসের পাঁচপো চুনো মাছ আসত, ভাতের সঙ্গে মেখে ফেলে রাখা হত একটা বৃহৎ পাত্রে—সারা দিন ধরে খেত তারা। ভৈরবী একবার মুসৌরীতে গিয়ে কিছুদিন ছিলেন, সঙ্গে কতকগুলি বেড়াল গিয়েছিল, বহু অর্থ ব্যয় করে স্পেশাল-এ নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের।

বেড়ালরাও অবশ্য তাঁকে ভালবাসত। তার এক আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। একবার এক রাত্রির জন্য আমাদের বাড়িতে ছিলেন। বিছানা সহ্য হত না, মেঝেতেই শুয়েছিলেন। তখন আমাদের বাড়ি বেড়াল ছিল না। দু-একবার সে কথা বলে এমনিই শুয়ে পড়লেন। পরের দিন ভোরে দেখি তাঁর আঁচলের মধ্যে একটি বেড়াল! সেটি নাকি প্রাণের মমতায় রাত্রে মধ্যে পরিচয়

নতুন উন্নততর ডেট কেক-বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক।

এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়,কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই।

ব্যবহার করে দেখুন। তফাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম ডেট কেক।

ধবধবে সাদা,
ডেটের সাদা

SMRH:DM YA/Ta Ben

ব্যবধান লাফিয়ে পার হয়ে জানলা গলে ওঁর কোলের কাছে এসে শুয়ে ছিল।

কিন্তু শুধু যদি উপার্জিত অর্থই দু হাতে বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতেন তো বোধকরি অত ক্ষতি হত না। সেই সঙ্গে দু হাতে বিলিয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগলেন নিজের জীবন। পূর্ণাভিষিক্ত শাক্ত সাধক, কারণ-করার অভ্যাস তো থাকবেই, সেই কারণ-করা মদ্যপানে দাঁড়াল। দেসিকেও আশ্চর্য শকতি দেখেছি। নির্জলা স্কচ হুইস্কি বোতল থেকে গলায় ঢেলে এক নিশ্বাসে পান করা—এ শক্তি নাকি পৃথিবীতেই কম লোকের আছে। আরও আশ্চর্য, নির্বিচারে বিলিতী দিশী—ঘরে চোলাই করা গোড়ী, অরিষ্টম পান করে গেছেন—কিন্তু কখনও তাঁকে মাতাল হতে দেখি নি।

তবে মাতাল না হলেও সেই বিষের প্রভাব দেহের অনিষ্ট করবে বৈকি। সে বিষক্রিয়া তার প্রভাব সঞ্চারিত করল লেখনীতেও। তাঁর শেষ বহুল-প্রচারিত বই বোধকরি কলিতীর্থ কালিঘাট। তারপর অনেক বই লিখলেন, দুরী বৌদি, শুভার ভবতু, মীড গমক মূর্চ্ছনা প্রভৃতি মধ্য-পর্বের বই—'পিয়ারী' 'দুই তারা' 'ভোরের গোধূলি' প্রভৃতিও—পরবর্তী যুগে 'অবিমুক্ত ক্ষেত্রে', হিংলাজের পরে, নীল-কণ্ঠ হিমালয় ফক্কড় তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি তীর্থক্ষেত্র-ভ্রমণ ও সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতা লিখে পূর্ব খ্যাতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই আর তা হল না।

গেল না তাঁর কারণ ওঁর একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিছল যে বাঙালী পাঠক জীবনের বিষাক্ত দিকের গল্পই শুনতে চায় শুধু। 'দুরী বৌদি' থেকে শুরু করে শেষের দিকে যত বই—সার পকেট বই 'সান্ধ্য দরবার'ও সেই ধারণার সাক্ষ্য বহন করছে। সম্ভবত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত—'বিবি-বলির বিলে'ও তাই। নবকল্লোলে কতক-গুলি ছোট উপন্যাস বা নভেলেট বেরিয়েছিল তা গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ঐ একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই আর লেখকের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে পারে নি।

এই মনোভাবের সর্বনাশা পরিণতির কতকগুলি প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্যের নজীর দিচ্ছি এই কারণে—এদেশের বহু পাঠকের এখনও এসব লেখকের কথা মনে আছে। ডিকেন্স ও থ্যাকারে সমসাময়িক লেখক। মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি উভয়েরই প্রচুর। লেখার শক্তি সমান, বরং কেউ কেউ বলেন, থ্যাকারে বেশী শক্তিমান, তাঁর 'ভ্যানিটি ফেয়ার' ইংরেজী সাহিত্যের স্মরণীয় বই তাতে সন্দেহ নেই। তবু আজও ডিকেন্স অমর হয়ে আছেন, থ্যাকারের নামই লোকে ভুলতে বসেছে। বর্তমানকালের কোন কোন প্রকাশক নতুন করে তাঁর খ্যাতি জাগাতে চেষ্টা করে ছিলেন, পারেন নি। এর কারণ ওই—থ্যাকারে মানবচরিত্রের অন্ধকার দিকগুলোই দেখেছিলেন শুধু, ডিকেন্স দেখেছিলেন দোষে গুণে জড়ানো মানুষকে, তিনি দেখিয়েছেন কেউই একেবারে খারাপ নয়। সে জন্যে বিল সাইকস ও কুইলিপের মতো পাষণ্ডদের মৃত্যুতেও পাঠকরা ঈষৎ বেদনা বোধ না করে পারেন না। অথচ ভ্যানিটি ফেয়ারের মতো অত আশ্চর্য বই লিখতে বসেও কোন আলোর দিক লেখকের নজরে পড়ে নি।

এঁদের সঙ্গে নাম করা উচিত নয়—তবু রেনল্ডস-এর কথাও ভাবুন। যাঁর 'লন্ডন রহস্য' যোগেশ উইনমট, মেরী প্রাইস, রবার্ট ম্যাকেয়ার প্রভৃতি বই একদা লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয়েছে, পৃথিবীর অন্য সব প্রধান ভাষাতে তো বটেই—আমাদের বাংলাতেও, আজ সারা পৃথিবীর বাজার খুঁজে কোথাও তাঁর একটা বই দেখা যাবে না। একমাত্র মাদ্রাজের এক ঘড়ির দোকান বোধহয় শেষ ছেপেছিল তাঁর ইংরেজী সংস্করণগুলি। অথচ তাঁর ভাষা জ্ঞান ছিল অসাধারণ, মানবচরিত্রের জ্ঞানও কম নয়। তবে এ অপমৃত্যুর কারণ কি? অশ্লীলতা? তাঁর আগে ও পরে অনেকেই অশ্লীল বই লিখেছেন। এখন আমেরিকায় যা লিখিত হচ্ছে রেনল্ডস কল্পনাও করতে পারবেন না। তবে? কারণ ঐ এক-প্রকারের কালো চশমা পরা দৃষ্টি। শুনেছি তিনি (প্রমাণ নেই হাতে) গর্ব করে বলে-ছিলেন, 'ইংল্যান্ডের রানীর কথা বলব না, কারণ তাহলে রাজদ্রোহ হবে, নিজের মার কথা বলব না, কারণ আমি তাঁর গর্ভে জন্মেছি—এছাড়া ইংল্যান্ডের সমস্ত মেয়ে অসতী।' এই দৃষ্টির ফলেই তাঁর আজ এ শোচনীয় পরিণাম।

লেখার জনপ্রিয়তা কমলেও অবশ্য তাঁর দমেন নি। কোন কারণেই হাল ছাড়া তাঁর ধাতে ছিল না। তিনি আবার ফিরে গিয়ে-ছিলেন 'সন্ন্যাসীজীবনের চিত্রাঙ্কণে'। পূর্বোদ্যমে যাগযজ্ঞ ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন। টাকা দু হাতে খরচ করার অভ্যাসও যেমন ত্যাগ করেন নি, উপা-র্জনের শক্তিও তাঁকে ত্যাগ করেনি কখনও। তিনি জানতেন ব্যয়-কুণ্ঠিত যে ইঁদুরের মতো জীবনযাপন করা পুরুষের কাছে অধর্ম—উপার্জনের নূতন পন্থা আবিষ্কারই তার পৌরুষ, তার জীবনধর্ম।

আর একটি কথা না বললে তাঁর চরিত্রের এক মহৎ ও বিরাট দিকের ইতিহাস অকথিত থেকে যাবে। মানুষটিকে অনেকেই ভুল বুঝত। দাম্ভিক, ক্রোধী, খামখেয়ালী, অব্যবস্থিতচিত্ত, দুর্মুখ—অনেককে অনেক বিশেষণ প্রয়োগ করতে শুনেছি। কিন্তু আমরা দেখেছি তাঁর ভিতরে একটি আশ্চর্য স্নেহ-কোমল মন, দেখেছি ভালবাসা, দেখেছি কেউ বিপন্ন হয়ে এসে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে সব শক্তি প্রয়োগ করে তার উপকার করার চেষ্টা। আমার স্ত্রীকে তিনি 'বোনটি' বলতেন, বোনের মতোই ভালোবাসতেন। তিনি হাসপাতালে গেছেন, অস্ত্রোপচার হবে—এই খবর পেয়ে অসুস্থ অবস্থাতেও সারা রাত জেগে কী সব ক্রিয়া করে মাদুলি প্রস্তুত করে নিয়ে হাসপাতালে এসে পরিয়ে দিয়ে গিছলেন। ভৈরবীর একবার চর্মদল বসন্ত হয়। বাঁচবার আশা ছিল না, ঘায়ের দুর্গন্ধে কেউ কাছে যেত না—উনি একা একমাস মশারীর মধ্যে সেই রোগিনীকে কোলে করে বসেছিলেন, নিজের বিপদ-সম্ভাবনার কথা চিন্তাও করেন নি। আর, বস্তুত, ভৈরবীর মৃত্যুর পর বলতে গেলে তিনি তো নিজের মৃত্যুকে ডেকেই আনলেন।

তিনি চলে গেলেন, রেখে গেলেন এক বিরাট শূন্যতা। মহান মানুষ ছিলেন কিন্তু সে বিচারের সময় এখন নয়—মৃত্যুর এত অল্প দিনের মধ্যে সে হিসাব করা যায় না—তবে বিরাট মানুষ যে ছিলেন, অ-সাধারণ মানুষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রবল ব্যক্তিত্ব, সীমাহীন অভিজ্ঞতা, সংস্কার-শূন্য মন—শ্রেষ্ঠ লেখকের সমস্ত গুণই তাঁর ছিল। শেষের দিকের বই বাদ দিলেও, বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন একটি থাকবেই—মরুতীর্থ হিংলাজ ও উদ্ধারণ-পুরের ঘাট সে আসন তৈরী করে দিয়েছে কিন্তু আমাদের, তাঁর বন্ধুদের মনে যে বিপুল শূন্যতা তিনি রেখে গেলেন, তা কি আর কাউকে দিয়ে পূর্ণ হবে! মানুষটাও যে শিল্পীর চেয়ে কম বড় ছিল না, এটা হয়ত ঠিক বোঝাতে পারলুম না, তার কারণও ঐ—চিত্তের আকস্মিক বিপুল শূন্যতা। এত তাড়াতাড়ি হয়ত লিখতে বসাও উচিত হয়নি, কিন্তু তাঁর কথা বলার জন্যেও যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, সে অকুলতা শান্ত করব কী করে?

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন। **হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর**, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন: ৬৭-২৩৫৯; শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

বাচ্চাটার কাছ থেকে জল নিয়ে ধোওয়া হল ধুলো মাখা কাঁকড়ি। নুন আর কাঁচা লংকা বাটা মাখানো হল। কামড় দিয়ে অবাক হল অনন্ত। এমন মিষ্টি শসা কল্পনাও করা যায় না। অথচ ছোটখাটো ডাল বালিশের সাইজের কাঁকড়িটার ওজন হবে কম করেও চার থেকে পাঁচ কেজি। ওরা পয়সা দিয়ে কাঁকড়ি কিনছে দেখে বাচ্চাটার মা দু-আড়াই বছরের আর একটা বাচ্চাকে পাঠিয়ে দিল। থ্যাবড়া মুখো মায়ের নাকে হলুদ রঙের কাঁচা সোনার নথ, কানে টানা দেওয়া। গায়ে কালো জোব্বা। মাথায় অল্প একটু ঘোমটা। ছোট বাচ্চাটার কপালে ফেটি দিয়ে পিঠে ঝুলিয়েছে একটা শসা। সেটার আকার এবং ওজন আগেরটার চেয়েও বেশি। টালমাটাল পায়ে ফর্সা গোলগাল বাচ্চাটা সাত-আট কেজি ওজনের শসাটা নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। নাক থেকে সর্দি ঝরছে। দীপু বলল, হামলোক লে যায়গা কেইসে? পোর্টার লোক চলা গিয়া। জিনিস নেওয়া হল না। পরিবর্তে বাচ্চাদের খুশি করার জন্যে পকেট থেকে লজেন্স বার করে দু-ভাইয়ের হাতে দুটো দিল দীপু। দেখে তাদের মাও এগিয়ে এল মাটির দাওয়া ছেড়ে। এ শেঠজি, হামকো মিঠাই দে।

দীপু বাংলায় বলল, ভাগ, বাচ্চাকে দিয়েছি বলে তোমাকেও দিচ্ছি আর কি।

বেরুবার আগে গোটা-আষ্টেক করে লজেন্স দিয়ে দিয়েছিল কানু প্রত্যেককে। হাঁটা পথে যেতে গলা শুকিয়ে যায়। লজেন্স মুখে রাখলে ভাল লাগে। এ পর্যন্ত একটা লজেন্স খেয়েছিল অনন্ত। সুতরাং একটা দান করতে পারল স্বচ্ছন্দে।

দীপুর সিডিউল অনুযায়ী গোবিন্দ-ঘাট পৌঁছোবার কথা সকাল সাড়ে নটার মধ্যে। অনন্তর জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেল। ঘাট চটি বলে জায়গাটায় পৌঁছুতেই বেজে গেল দশটা। দীপু বলল, এসে গেছি। এখান থেকে নেমে যেতে হবে নদীর ধারে। আসুন, এই দোকানটায় বসে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।

অনন্ত বলল, ওরা চা খেল না—

তাকে থামিয়ে দিয়ে দীপু বলল ওদের জন্যে ভাববেন না। অনেক আগে ওরা এসেছে। চা খাননি, ভাবছেন? রুকস্যাক দোকানের পাটায় নামিয়ে সিগারেট বার করল সে পকেট থেকে।

বার কয়েক ব্রিজের ওপর দিয়ে নদী পারাপার করতে হয়েছে। এখন ওরা নদীর পশ্চিম কূলে। অনেকটা নিচে নদী। ধারের কোপ জঙ্গলের জন্যে দেখা যায় না। তবে গর্জন কানে আসে। দোকানী চা তৈরী করছিল। তার বউ জামা সেলাই করছিল পথের ধারে বসে। বছর দেড়েক কিংবা দু বছরের একটা বাচ্চা খেলছিল মার পেছনে। সে টলমলে পায়ে সরু পথ ধরে নিচে নেমে যাচ্ছিল। শিউরে উঠে চিৎকার করে উঠল অনন্ত, আরে আরে, পড়ে যাবে বাচ্চাটা।

তার মা সেলাই থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখল শিশুকে। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল ছেলেকে। সে হাসতে হাসতে উঠে এল মায়ের কাছে।

দীপু বলল, ঘাবড়াবেন না রায়দা। এরা এইভাবেই মানুষ হয়। জন্ম থেকেই এইভাবে হাঁটা চলা করতে শেখে।

চা খেয়ে পথে নামল দুজনে। অল্প কিছুটা নেমেই চোখে পড়ল, প্রবল গর্জনে ছুটে চলেছে অলকানন্দা উত্তর থেকে দক্ষিণে। তার পশ্চিম তীরে হিমঙ্গাম সুন্দর ঘাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কানু। জিনিসপত্র নামানো চারদিকে। অনন্তকে দেখে বলল, হিমালয়ে প্রথম দিনের ট্রেনিং। কেমন লাগল বাবদা?

হেসে অনন্ত বলল, বহুকাল মনে থাকবে।

অনন্তর জন্য প্রায় ঘন্টাখানেক দেরী হয়েছিল ঠিকই তবু যে কারণে ওদের সেদিনের মত যাত্রা আটকালো তাহল সরকারী চৌকিদারের কর্তব্য গাফিলতি আর তার সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা।

পাঁচ মাসখানেক আগে চিঠি দিয়েছিল দীপুরা। কর্তৃপক্ষ সে চিঠির জবাবে জানিয়েছিলেন গোবিন্দঘাট এবং ঘাংবিয়ার ডাক বাংলো দুটি তাদের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলিতে সংরক্ষিত রইল। কিন্তু চৌকিদার না থাকলে সে রিজার্ভেসনের মূল্য কি?

পানু, আলু এবং গোপু গিয়েছিল অনেক দূরে, চৌকিদার যেখানে থাকে সেই গ্রামে। তাকে খুঁজে বার করতে সময় লেগেছিল। ফিরল ওরা বারোটার পর।

অলকানন্দার ওপরে ব্রীজ পেরিয়ে যেতে হয় ওপারে। তার আগে ডাইনে মিলিটারী চেকপোস্ট। তার পাশে একটা খাবারের দোকানে রুটি তরকারী পাওয়া যায় অর্ডার দিলে। এসেই কানু অর্ডার দিয়ে রেখেছিল। কথা ছিল, বেরুবার মুখে খেয়ে দেয়ে হাঁটা সুরু করবে। কিন্তু তার আগেই নামল প্রচন্ড বৃষ্টি।

চৌকিদারকে দিয়ে ঘর খোলানো হয়েছিল। একসপিডিসনের মালপত্র সব চৌকিদারের জিম্মায় সাজিয়ে রাখল ছেলেরা। ফেরার সময়ে নিয়ে যাবে শতো-পান্ধর পথে। চারজন কুলি ফিরে গেছে। এখান থেকে যাবার দিনে চারজন পোর্টার সংগ্রহ করে নেবে। সেই ভার দিল চৌকিদারকে।

আকাশে মেঘ জমছিল অনেকক্ষণ থেকে। ব্যস্ত ছিল সকলে, তাই খেয়াল করেনি কেউ। হঠাৎ হুড়মুড় করে মুষল ধারে বৃষ্টি নামল।

পাহাড়ে এরকম সময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছে ওরা কিন্তু এরকম বৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত থাকা সম্ভব নয় কারো পক্ষেই। বারান্দার নিচে ঘাসের জমি, পনের বিশ গজের মত। তারপর খাড়া পাড় নেমে গেছে নদীতে। অনেকগুলো বড় বড় পাথর পড়ে আছে নদীর গর্ভে, সেগুলোতে বাধা পেয়ে উচ্ছল নদী ফুলে ফেঁপে, আছাড় খেয়ে, চতুর্দিকে ফোয়ারার মত জল ছিটিয়ে দেয়। তারপর নদীর গতি হঠাৎ বেঁকে গেছে পুবে, তারপর আবার দক্ষিণে। শেষের বাঁকটার ওপরেই নদী পারাপারের জন্যে মস্ত লোহার ব্রীজটা বানানো হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল অনন্ত। তাতেও তৃপ্তি হয়নি বলে নদীর কূলে কূলে যতদূর সম্ভব এগিয়ে গিয়ে দেখে এসেছিল। এখন বারান্দায় এসে নদীটাও চোখে পড়ছিল না, এমনই নিশ্ছিদ্র বৃষ্টির ধারা অঝোরে ঝরছিল। আকাশ যেন নেমে এসেছে

মাটিতে; চতুর্দিক ঢেকে গেছে অন্ধকার ঘেরাটোপে। নদীর পশ্চিম কূলের পাহাড় থেকে বন্যার মত নামছিল জল। নেহাৎ অসম্ভব ঢালু জমি তাই জল দাঁড়াচ্ছিল না সে রকম। তবে বাংলোয় ঢোকবার সরু পথটা ঘাট চটি থেকে নেমে এসেছে, সেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল ছোটখাটো একটা পাহাড়ী ঝরণা। তার স্রোত ঠেলে যাতায়াত করা প্রায় দুঃসাধ্য।

নিজেদের মধ্যে হঠাৎ আসা বৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করছিল সকলে। এখুনি বৃষ্টি থেমে যাবে, এই রকম স্থির বিশ্বাস নিয়েই কথা বলছিল সবাই। কানু বলছিল, একেই বলে ভাগ্য। চৌকিদার যদি থাকত এখানে, তাহলে কোনকালে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়তাম আমরা। তাহলে অবস্থাটা কি হত বুঝেছ গোপু?

গোপু বলল, বুঝিনি আবার? পুনে গাঁওয়ের আগে তো কোন আশ্রয় নেই। ওখানেই গোটা কয়েক চায়ের দোকান আছে। তা সেই তোমার পুনগাঁও তো কম করেও দু মাইল চড়াই ঠেলে উঠলে তবে পৌঁছতে পারবে। খেয়েদেয়ে এই সময়ের মধ্যে পৌঁছুনো যেত বলে মনে হয় না।

আশু বলল, তাহলে বলছ, ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন?

পানু বলল, আমি বলব, না দ্যা। দীপুর মুখখানা দেখেছিস?

আশু বলল ও, হ্যাঁ তাও তো বটে। রোশনকুমারী তো এখন পথে রয়েছে। এতক্ষণ বিষ্ণুপ্রয়াগ নেমে এসেছে নিশ্চয়ই। কি বলিস কানু?

কানু বলল, ওরা তো পাকদণ্ডি দিয়ে নামতে পারবে না, নামবে গাড়ির রাস্তা দিয়ে। আর কুলি যদি পাকদণ্ডি দিয়ে নামাতে থাকে, আর এই বৃষ্টি পায় রাস্তায় মাঝখানে তাহলে নির্ঘাৎ এ্যাকসিডেন্ট।

গোপু বলল, আমরা কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই, বে ছুটে গিয়ে রেস্কু করব।

পানু বলল, আমি ও টিমে নেই দাদা। রোশনকে রেস্কু করত দীপু।

আর কাকেও হাত দিতে দিত না। ছেলেটাকে গোপুদা। কানু আর আশু সর্দারজী আর অব গিন্নীকে রেস্কু করতে গেলে,—ওরে বাবারে, আমি ভা-ভা ভাবতেও পারছি না।

দীপু এতক্ষণে ছদ্ম রাগ দেখিয়ে বলল, মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবো জ্যাঠা ছাগল। ওরা এই বৃষ্টিতে ভিজছে আর তোরা তাই নিয়ে মজা করছিস। লজ্জা করে না?

গোপু বলল, লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে নয়।

কিন্তু নিজেদের মধ্যে রসিকতা খুনসুটি, হালকা কুথাবার্তা সব ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। থমথমে হয়ে উঠল প্রতিটি মুখ। এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে থামার কোন লক্ষণ নেই। কানু বলল, দীপু বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে বারোটা পঁয়ত্রিশে। এখন পৌনে দুটো। ভয়ঙ্কর গম্ভীর চেহারা কি হয়েছে এখন কল্পনা করে দেখ।

দীপু বলল, সেটা তো বটেই, তবু তার ওপার কাঠের ব্রিজ আছে। অবশ্য এ বছরে সে ব্রিজ সারানো হয়েছে কিনা কে জানে। আমার চোখে ভাসছে শুধু শুধু সেই ন্যালাটার চেহারা। পাথরের ওপরে পা দিয়ে পেরুতে হয়, জানেন রায়দা। দুটো মোটা মোটা লগ্ ফেলা আছে। এখন সেই কাঠের গুঁড়ির অন্তত তিন হাত ওপর দিয়ে স্রোত ছুটছে। মানুষ দূরের কথা, হাতির পক্ষেও সেই স্রোত ঠেলে পার হওয়া সম্ভব নয়।

অনন্ত মৃদু হেসে বলল, তাহলে না বেরিয়ে ভালই হয়েছে বলছেন।

দীপু চিন্তান্বিত মুখে বলল, কিন্তু বৃষ্টি যদি শিগ্‌গির না থামে তো খুব মুস্কিল। মিনিমাম চারঘন্টা লাগবে চড়াই ঠেলে উঠতে। সাড়ে চার হাজার ফুট থেকে উঠতে হবে দশ হাজার তিনশ ফুট। তার মানে ছ' হাজার ফুটের কাছাকাছি। ধরে নিন নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং। শেষের চড়াইটার পরে আবার গভীর জঙ্গল প্রায় এক মাইল পথ ধরে। দিনের বেলা আকাশে রোদ থাকলেও সেই জঙ্গলের মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হয়ে যায়। আকাশে মেঘ করে থাকলে কিম্বা সন্ধ্যে হয়ে গেলে ওই বনের ভেতর দিয়ে চলা ভীষণ মুসকিল।

কিন্তু শিগ্‌গির দূরের কথা, পরের ঘন্টাতেও বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আশু বলল, বেজায় খিদে পাচ্ছে খুড়ো। কি কবা যায় বলোতো?

পানু বললে, আমি মুখ ফুটে বব-বব বলতে পারছিলাম না ভাইপো। এমনিতে আমাকে যে রকম আওয়াজ দাও তোমরা—

দীপু বলল, খাবার তো দোকানে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেড়ি হয়ে গেছে। যাওনা, গিয়ে খেয়ে এসনা তোমরা।

আশু বলল, অমনি আমার খাবারটাও এনে দিবি।

কানু বলল, ওঃ, সখ কতো! আমি তো ভাবছিলাম তোকেই পাঠাবো খাবারটা নিয়ে আসার জন্যে।

অশু বলল, তা কি করে হবে ম্যানেজার? তোমরা আমাকে ভালুকে বলবে, আবার বৃষ্টির মধ্যে খাবার আনতে পাঠাবে, তা কি করে হয়? আমার শ্যাম্পু করা লোম ভিজে যাবে না?

পানু বলল, তারপর কোঁ কোঁ করে কাঁপবে। ভালুকের জ্বর হয় জানেন তো রায়দা?

কানু একটা বর্ষাতি আর টুপি মাথায় দিয়ে এল। বলল, কেউ তো আর যাবে না, আমাকেই যেতে হবে সবার জন্যে।

দীপু বলল, তুই একা যাবি কেন? দাঁড়া, আমিও যাচ্ছি তোর সঙ্গে।

কানু বলল, কিচ্ছু দরকার নেই। একাই আনতে পারব। বালতিটার ওপরে পলিথিন শিট ঢাকা দিয়ে সঙ্গে নিল কানু। অন হাতে আইস্ এ্যাকস্। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল কানু সকলের জন্যে দোকান থেকে খাবার আনতে। আশু চেঁচিয়ে বলল, ম্যানেজার জিন্দাবাদ!

হেসে একবার মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে গেল কানু জলকাদার মধ্যে। ফিরে এল প্রায় আধঘন্টা পরে। তখনো সমানে বৃষ্টি পড়ছে।

বর্ষাতির আবরণ এই বৃষ্টির কাছে কিছুই নয়। সম্পূর্ণ স্নান করে গিয়েছিল কানু। জুতোর ভেতর থেকেই বেরুল আধ লিটার জল। জামা প্যান্ট ছেড়ে শুকনো পোশাক পরল সে, গায়ে দিল সোয়েটার। সকলেই তাকে দেখে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছিল। কানু বলল, আমাকে আর কি দেখছ, দীপুর রোশনকুমারী আর তার মা বাবার অবস্থা যদি দেখতে—

চশমা খুলে কাঁচ মুছছিল কানু। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মুখে এসে পড়েছে। চোখ দুটো হাই পাওয়ার চশমার সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে ঈষৎ টেরিয়ে গেছে। ওর মজা পাওয়া মুখের চেহারা দেখে উৎসুক হয়ে উঠল সকলে।

দেখা হয়েছিল মানে আমি দোকানটায় বসে সিগারেটে টান দিচ্ছি আর বর্ষা দেখছি। হঠাৎ চোখে পড়ল, একজন পোর্টার ওদের সেই বিখ্যাত মেরুন রঙের হোলডল আর স্যুটকেশ নিয়ে প্র্যাকটিকালি সাঁতরাতে সাঁতরাতে আসছে। যে পরিমাণ ভিজেছে, তাতে সাঁতরে এলে তার থেকে বেশি ভিজত না।

দীপু অধৈর্য হয়ে বলল, ওদের কি হয়েছে বলনা?

পানু মুখের কাছে হাত এনে আওয়াজ করল।

কানু বলল, ধৈর্য ধরতে হবে। আমি অনেক কষ্ট করে দেখে এসেছি।

আশু বলল, অত দরদ থাকে, যাওনা, গিয়ে খোঁজ নিয়ে এস না। কেউ তোমার নিষেধ করেছে?

গোপু বলল, ঠিক। বিল্বমঙ্গল ঠিক এইরকম অবস্থায়—

কানু বলল, কাদার তাল জলে গলে গিয়ে কি অবস্থা হয়, তোমরা জানো? থপ্‌থপ্ করে দীপুর শাশুড়ি যখন আসছিল—

গোপু বলল, দীপু, তোমার কিন্তু ইমিডিয়েটলি গিয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত।

দীপু বলল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। না খেয়েই চলে যাব বলছ?

কানু বলল, তুচ্ছ খাওয়ার চিন্তা মনে আসে এখন ?

দীপু রাগ করে বলল, আমাদের খেতে দিবি, না বাজে বকবক করাব ?

চশমা চোখে দিতে দিতে কানু বললে, দোকানে বসে আমি দুখানা রুটি খেয়ে এসেছি। খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল। তোমরা যে-যে খাবে খাও, আমার জন্যে অল্প রাখলেই হবে।

গোপু বললে, তুমি এই প্রচণ্ড বর্ষার মধ্যে কষ্ট করে খাবার নিয়ে এলে, দিস্ ইজ মোর দ্যান উই ডিসার্ভ ফ্রম এ ভেবী এফিসিয়েণ্ট ম্যানেজার। কি বলেন রায়দা ? এখন আমরা ভাগ করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। মৎ ঘাবড়াও।

খাওয়া শেষ হতে হতেই বৃষ্টির বেগ কমে এল। বেলা তিনটে বাজে প্রায়। ধোঁওয়ার মত কুয়াশা উঠছে ফুলে ফেঁপে ওঠা নদী থেকে। আজকের মত পদযাত্রার ইতি। কপালে একটা দিনের লোকসান আছেই। কার সাধ্য তাকে খণ্ডায়।

ঘরের ভেতরে আলো আঁধারীতে কম্বল পেতে আধো শোওয়া হয়ে গল্প করছিল সবাই। বাইরে বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে বসেছিল অনন্ত। দীপু বলল, রায়দা, ভেতরে চলে আসুন। বসে গল্প করা যাক।

কুণ্ঠিত গলায় অনন্ত বলল, বাইরে বেশ ভাল লাগছে।

আশু বলল, ভাল লাগলে অবশ্যই বাইরে থাকবেন।

গোপু সংস্কৃত আবৃত্তি করে বলল, মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তি-চেতঃ। মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। না দাদা, আপনি বাইরে বসে বসে ভাবুন বৌদির কথা। আমরা আপত্তি করব না।

হেসে উঠল সবাই। দীপু বলল, ফাজিলের একশেষ।

(২৪)

তামাশা করে বললেও গোপুর কথাটা মর্মে গিয়ে বিঁধল। অবাক হয়ে গেল অনন্ত এই কথা ভেবে, কাল সন্ধ্যে থেকে আজ এই বিকেল পর্যন্ত লিলির কথা একবারও মনে পড়েনি তার। সেই বুক মোচড়ানো অনুভূতি বিগত কুড়ি-বাইশ ঘণ্টায় একটিবারের জন্য অস্থির করেনি তাকে। অথচ কয়েকটা দিন আগে চেষ্টা করেও অন্তরের জ্বালা ভুলে থাকতে পারছিল না বলে কষ্ট পাচ্ছিল সে।

ক'দিন হল আজ ? মনে মনে হিসেব করল সে। চোদ্দই আগস্ট রাতে বেরিয়েছে। ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে আজ উনিশ তারিখ। মোটে পাঁচটা দিন কেটেছে। সময়ের যাদু এরই মধ্যে বিস্মৃতির প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে মনের সেই ক্ষতস্থানে ?

তাই হয়। সেটাই তো স্বাভাবিক। অন্তত রুটিন হিসেবে বিচার করলে পাঁচটা দিন কমই মনে হবে। কিন্তু বিগত পাঁচটা দিনের অভিজ্ঞতা, মনে হচ্ছে তার চরিত্রের মূলে ধরে নাড়া দিয়েছে।

বিদেশী মার্কেণ্টাইল ফার্ম, এখনো যা মারোয়াড়ী কবলিত হয়নি সম্পূর্ণভাবে, সেই অফিসের সিনিয়র একসিকিউটিভ কর্ণাদ মিত্র সুবেশ, মার্জিত রুচির ভদ্রলোক। পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা সব কিছুই সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের তুলনায় তো বটেই, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের তুলনায় যথেষ্ট ডিস্টিংগুইস্ট। তার কলিগ্‌রা কর্ণাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো কটু সমালোচনা করে। কারণ এই ধরনের মানুষেরা অপরের সম্পর্কে নেংরা আলোচনা করে এক ধরনের সুখ পায়। সফিস্টিকেশনের এটা অবশ্য পরিণতি। ছেলেবেলায় স্কুলে হরকালী পণ্ডিতমশাই বলতেন, সায়েবরা পিঠের দাদ লুকিয়ে রাখে জামার নিচে। বিশ্বাস সাম্যালের, এমনকি কর্ণাদ নিজেও নিজেদের চরিত্রের অসঙ্গতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই আত্মসমালোচনার পরিবর্তে কৃষ্ণস্থানীয় ব্যক্তিদের চরিত্রহনন করেই সুখ পায়। তবে এটাও জানে কর্ণাদ, কলিগ্‌রা তাকে ঈর্ষা করে। ঈর্ষার কারণ কর্ণাদের শিক্ষার গভীরতা। পড়াশুনো করেছে কর্ণাদ খুব মন দিয়ে। অনায়াসে টিচিং প্রফেসানে যেতে পারত। অল্পের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি।

জীবন-জীবিকার প্রতিটি স্তরে এই

কলেজ পাঠ্য পুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—(১ম) ৯ম সং ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—(২য়) ৩য় সং ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—৩য় খণ্ড
(বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—১০ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—(আধুনিক যুগ) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-কাপ্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন— (Phi. of Religion) ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান—২য় সংস্করণ ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা— (For B.U.) ৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—(পরিমার্জিত) ৪র্থ সংস্করণ ১৫-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ ২২-০০

বাংলা সাহিত্য

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা—দ্বিতীয় সংস্করণ ১০-০০

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত

কুলীন কুলসর্বস্ব ১০-০০

শিক্ষক-শিক্ষণ (B. Ed and Basic).

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও গৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস—(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস— ১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৪-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান ৩য় সং ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—সংশোধিত ৩য় সংস্করণ ১৫-০০
Higher Secondary Philosophy (English edition) 15.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান— ২৫-০০

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ঘোষ ও হালদার প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা— ২২-০০

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা— ১৪-০০

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো, পিন-৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৭২৩৪

ন্যক্কারজনক ভণ্ডামী। তাই না সওয়া হয়ে গেছে কৃত্রিম জীবনবোধ। যে পরিমণ্ডলে সহজ বিশ্বাস নিতে অভ্যস্ত কণাদ, সেখানে মর্যাল ভ্যালুজ বিচার হয় ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। যদি কেউ 'সদা সত্য কথা' বলে, তাকে কণাদ এবং তার বন্ধুজনেরা ভাববে ইডিয়ট, অথবা মিথ্যেবাদী, অথবা হাফ-উইট কিম্বা ধড়িবাজ। কারণ ওদের ধারণায় কেউ সদা সত্য কথা বলে না, বলতে পারে না। শুধু ভাণ করে সাধুতার। অবশ্য সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষগুলিও কি সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বিচার করে না পরস্পরকে? তাহলে তাদের সঙ্গে সাধারণের তফাৎ কোথায়?

তফাৎটা, ভেবে দেখেছে কণাদ, তার স্তরের মানুষদের বিবেকহীনতায়। নীতি-বোধের অভাব এবং বিবেকহীনতা তাদের চরিত্রকে জটিল করে তুলেছে। ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহলে স্ত্রী ভাগ্যের জন্যে ঈর্ষান্বিত হয় সে। লিলির এ্যাডাপটেবিলিটি অসাধারণ। অন্য সকলের স্ত্রীদের তুলনায় লিলি অনেক বেশি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ। তার অর্থ এই, লিলি অধিকতর ভণ্ডামীতে দক্ষ, অনেক বেশি নিষ্ঠুর এবং বিবেক-বর্জিত, এবং সাধারণ নীতিবোধ ও মূল্য-বোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সান্যাল অথবা বিশ্বাসদের স্ত্রীরা কখনই অসংবৃত পোশাকে পুরুষদের আড্ডায়, নেশাখোরদের ভীড়ে, সহজ নিশ্বাস নিতে পারে না। ওরা তাই কণাদকে ঈর্ষা করে.

অথচ এমন একদিন ছিল, যেদিন লিলিকে মনে হত সত্যিই দুর্মূল্য। সেদিন লিলির কথা ভেবে এই অসামান্য সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিত কণাদ। লিলির কথা, হাসি, গান, লিলির চিন্তা, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, লিলির রুচি, শিক্ষা, সহবৎ, সবই কণাদের কাছে পরম স্পৃহনীয় ছিল। কি গভীরভাবেই না ভালবেসে ফেলেছিল সে স্ত্রীকে। 'লাখে না মিলল এক', বৈষ্ণব কবির কথাই মনে হত লিলির সম্পর্কে।

ধীরে ধীরে পালটে গেছে লিলি। সে কি শুধু লিলিরই ইচ্ছায়? ঈশ্বর পরম কারুণিক। উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি। কেড়েও নিয়েছেন নিঃশেষে। একটি সন্তান যদি আসত লিলির কোলে—, কখনোই এমন অবশ্য পরিবর্তন দেখা দিত না তার চরিত্রে। লিলির ছেলে, ফুটফুটে, তুলতুলে, ফুলের মত নিষ্পাপ, কোমল, সুন্দর শিশু, আলো করে থাকত লিলির বেডরুম। তাহলে স্বামীর বন্ধুদের চোখে কামাতুর লোভী দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলার অনুষঙ্গ ব্যসনে লিপ্ত হতে পারত না লিলি। দোষ কার? যে ঈশ্বর সব দিয়েও অপূর্ণতায় খুঁত লুকিয়ে রেখে দেন শরীরে, তিনি কি দোষী নন? ঈর্ষাকাতর বন্ধুরা আজ তার পলায়নের কাহিনী শুনে কণাদকে বধূশা করবে। হেসে উঠল সে অম্লান করে।

সিগারেটের টুকরো বাইরে ফেলে দিতে এসেছিল দিপু। বিস্মিত হয়ে সে বলল, কি হল রায়দা, হাসছেন কেন?

অনন্তর ছদ্ম পরিচয়ের আবরণে নিজেকে ঢেকে ফেলতে একটু সময় লাগল। বুদ্ধিমান কণাদ প্রতিটি সিচ্যুয়েশনের জন্যেই তৈরী বলতে পারে বলে অহংকার ছিল তার নিজের মনে। এখনো সে অহংকার অনায়াসে করতে পারে। অনন্ত হেসে বলল, ভগবানের রসিকতা দেখে হাসছি।

দীপু রাগ করে বলল, হাসবেন বইকি! আমাদের যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। একটা দিন লোকসান হল।

আশু ভেতর থেকে বলল, রোশন-কুমারী ভিজে গোবর হয়ে গেল।

প্রায়ান্ধকার ঘরের ভেতরে ওদের সম্মিলিত হাসির উচ্ছ্বাস বাইরের সেতারের গর্জনকে ছাপিয়ে গেল। দীপু বলল, ডান্ডাবাটা সঙ্গে থাকলে ভাল হত। বেটা ভেটেরিনারী সার্জন। ছাগল, বাঁদর, ভাল্লুক, এদের ম্যানেজ করতে পারত।

আশু বলল, বিলিতি শুয়োরটা পচা গোবরে মুখ ডুবিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে চাইছে, তাকে শায়েস্তা করতে পারত।

আবার হেসে উঠল সকলে।

দীপু ঘরে চলে গেল। অনন্ত ভাবতে থাকল, এই ছেলেগুলির সাহচর্য তার মানসিক পরিবর্তনে কতটা সহায়তা করেছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত অনন্তকে কিরকম আপন করে নিয়েছে, কোন সংকোচের বালাই রাখেনি। চলেছে সহজভাবে, অথচ স্টাইল্ড ডিসিপ্লিন মেনে চলেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে রিলীফ কি নেই? দীপু-রোশন ঘটিত ব্যাপারটাকে ওরা এমন উপভোগ্য করে তুলেছে যে তার মধ্যে কোথাও কিছু অন্যায় বা অবৈধ ভাব ঠাঁই পাচ্ছে না। কানু এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সকলের জন্যে খাবার নিয়ে এল। অন্যত্র হলে যে এই কষ্টটা করত এবং যাদের জন্য করত, উভয় তরফই নানা ধরনের কৃত্রিম উচ্ছ্বাসে উদ্ব্যস্ত হত। অথচ এরা সেটাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূল্য দিচ্ছে না একবারও। প্রোগ্রাম সিডিউল বিপর্যস্ত হয়ে গেল অকাল বর্ষণে। কতখানি বিরক্ত হতে পারত সকলে। শুধু এই ঘটনায় পরস্পরের সঙ্গে মনান্তর হয়ে যেতে পারত। কিন্তু কিছুই হল না। সব ক্যালামিটিকে এরা সুন্দরভাবে মেনে নিচ্ছে। হ্যাটস্ অফ টু দীজ বয়েজ। মনে মনে উচ্চারণ করল অনন্ত।

(৬৪)

রাতে রেডি করে রাখা ছিল সব কিছু, সকালে উঠেই পদযাত্রার জন্যে তৈরী হয়েছিল সকলে। পিঠে হ্যাভারস্যাক ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অনন্ত।

আকাশ গাঢ় নীল। এমন উজ্জ্বল নীল আকাশ দেখতে ভুলতে হয়। আমার বাড়ির গ্রামে, ইছামতির ধারে, শরতের নীল আকাশ দেখেছে সে। এ আকাশের তুলনায় সে আকাশের রঙ অনেক ফিকে। গাছের পাতা ঘন সবুজ। নীল আকাশের পটভূমিকায় সবুজ গাছের কনট্রাস্ট মন কেড়ে নেয়। দু-এক টুকরো সাদা মেঘ ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে সেই কালার-কনট্রাস্টকেই খোলতাই করার জন্যে। মুগ্ধ হয়ে গেল অনন্ত।

রোশনের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসতে গেল দীপুরা। কেউ যেতে চাইছিল না দীপুর সঙ্গে। অনন্ত বুঝিয়ে পাঠাল সকলকে। দীপুর ইচ্ছে রোশনকে দেখার। একা যেতে সংকোচ পাচ্ছে।

তার ফল পাওয়া গেল হাতে হাতে। নতুন তৈরী হচ্ছে গুরুদুয়ারা। মস্ত কাঠের খাঁচা বানাচ্ছে শিখ ছুতোর মিস্ত্রীরা। পুরুষদের থাকবার বিরাট জায়গা। ওধারে মেয়েদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। এ বাড়ি থেকে পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরে। দিনের বেলা যাতায়াত বা মেলা-মেশার অসুবিধে নেই। দীপুদের দেখে খুশি হলেন সুরজিৎ সিং। খেয়ে যেতে বললেন।

সকালে চা বিস্কিট খেয়ে বের হয়েছিল সকলে। কথা ছিল পুণগাঁওয়ে যে চাষের দোকান আছে, সেখানে দ্বিতীয়বার চা খাবার সময়ে যোশী মঠ থেকে আনা লাড্ডু খাওয়া হবে। এখানে গুরুদুয়ারায় জুটে গেল খোসা শুদ্ধ বিউলির ডাল আর পরটা। ডালের স্বাদ-পদ বোঝা যায় না। পরটা কিঞ্চিৎ কাঁচা, আকারে বৃহৎ এবং কাঠের উনোনে তৈরী বলে কেরোসিন তেলের গন্ধ লাগছে একটু একটু। মাটিতে সতরঞ্চির আসন পেতে অ্যালুমিনিয়মের বহু জায়গা তোবড়ানো ডিসে করে দিয়েছিল খাবার। মনে মনে হাসছিল অনন্ত। এরকম ভাবে কোনদিন খেতে হতে পারে, এবং খাওয়ার সময়ে সম্পূর্ণ সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে খেতে হবে, একথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারত না কণাদ। লিলি রান্নাবান্না নিজেই করে। বাড়িতে গ্যাস আছে, হট্-প্লেট আছে, খাবার তৈরীর আধুনিক পদ্ধতিতেও রপ্ত। সুতরাং রান্না করাটা সাধারণ বাঙালী বউদের কাছে যেমন একটা কামব্রস প্রসেস, লিলির ক্ষেত্রে মোটেই তা নয়। ভেজিটেবল্ কোর্স তারা সপ্তাহে দু-তিন দিনের বেশি খায় না। ফ্রিজে মাছ-মাংস-ডিম সর্বদাই মজুত রাখে লিলি। দিনে কিম্বা রাতে একঘণ্টা থেকে সওয়া ঘণ্টা লাগে রান্না করতে। পরিচ্ছন্ন রুচিকর রান্না। স্টেনলেস স্টীলের ঝকঝকে বাসনপত্র। ডাইনিং টেবল, মিটসেফ, র‍্যাকে শোভিত মূল্যবান ক্রকারি, সব মিলিয়ে রান্না-খাওয়ার যে পরিবেশ গড়ে তুলেছে লিলি দীর্ঘদিনের অভ্যাসে, তার থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি দেখলে অস্বস্তি লাগে। এমনভাবে ভিখিরির মত খেতে হবে হাসিমুখে, এই আছে তার লালট লিখন, খুরি জোনাকির ঠাট্টা ফুরে

বলত যে লিলিকে, কি রি-এ্যাকশন হত তার? বিস্মিত হত? মজা পেত? বিরক্ত হত অমার্জিত ইঙ্গিত করা হচ্ছে বলে? যদি কোনদিন শোনে সত্যি সত্যি দিন কেটেছে এমনি ভাবে, তাহলে কি খুশি হবে লিলি? আত্মপ্রসাদ অনুভব করবে তাকে শাস্তি দেবার জন্যে পালাতে গিয়ে এরকম কষ্ট পেয়েছে বলে? কোন সময়ে কি অনুশোচনা হবে না নিজের কৃতকর্মের জন্যে? দুঃখ হবে না, সমবেদনা জানাবে না কণাদ কষ্ট পাচ্ছে বলে?

কিন্তু সত্যি সত্যি তো কষ্ট পাচ্ছে না কণাদ। বরং অনেক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে অন্তরে অন্তরে। যেন মনে হচ্ছে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখা কৃত্রিম খোলসটা হঠাৎ উড়ে গেছে ঝোড়ো হাওয়ায়। উদ্ধমুক্ত নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে পারছে মুক্ত পক্ষ পাখী। এই সত্যিকারের অনুভূতিটা যদি লিলির গোচরে আসে, তখন তার মনোভাব কেমন হবে। হিংসে করবে কণাদকে? তারই স্থলনের সুযোগ নিয়ে যে অনাস্বাদিত পূর্ব মুক্তির সুগন্ধ বুক ভরে নিতে পারছে আজ কণাদ, তাতে কি লিলির কোন ভূমিকা নেই? কেন তবে তাকে বঞ্চিত করছে কণাদ? একথা একটি মুহূর্তের জন্যেও কি ভাববে লিলি? এক মুহূর্তের জন্যে ভাবলেও তো সার্থকতায় মণ্ডিত হবে কণাদের এই জীবনযাপন।

পাশে বসেছিল পানু। বলল, কি কি বায়দা? গ-গ্-গলা দিয়ে নামছে না, না? এইসব খেতে পারে বলেই দুনিয়ার সব জায়গায় ওরা ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। আমাদের বাব্বাব্ বাঙালীরা খেখেয়েই ফতুর।

তারপাশে বসে খাচ্ছিল দীপু। বলল, ওরে, পানু কি বলছে শোন! বাঙালী নাকি খেয়েই ফতুর!

কানু বলল, আমি সাক্ষী দোব। শুধু খাওয়ার জন্যে আমাদের খরচ হয়েছে—

আশু বলল, ম্যানেজারকে বাতিল করো। সন্ধ্যেবেলা খাওয়া নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে।

গোপু যোগ দিল, তবু নিজের পয়সায় খাওয়াতে হচ্ছে না। শেষকালে সদাব্রতে পাত পাড়তে হল আমাদের।

আশু বলল, দীপুর কিন্তু খুব ভাল লাগছে, দেখেছ গোপুদা!

গোপু বলল, লাগবেই। চালাক ছেলে। আগে থেকে অভ্যেস করে নিচ্ছে।

দীপু শক্ত পরটা চিবুতে চিবুতে বলল, মাইরী প্রাণের দায়ে কোন রকমে গিলছি, তারপর তোমরা যদি এরকম করো—

গোপু বলল, উপায় নেই লীডার। তোমাকে নান্দিমুখে টিকে থাকতে হবে।

প্রসঙ্গটা বুঝতে না পেরে অনন্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো আশুর দিকে। আশু বলল, ও, নান্দীমুখের গল্প শোনেন নি বুঝি?

দীপু বলল, এই, না, এখন গল্প নয়। দেরী হয়ে যাবে। কোন রকমে সকলে শেষ করে নাও। পথে যেখানে বসা হবে, সেখানে গল্প হবে।

প্রাণের দায়ে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে। তবু তার একটা সীমা আছে। কেরোসিনের গন্ধওলা কাঁচা আটার ডেলা গিলতে চেষ্টা করাটা সেই সীমার অতিরিক্ত। অসুবিধেয় পড়েছিল সকলেই। চোখের ইশারায় সাব্যস্ত হল, আশুর রুকস্যাকটা কাছেই আছে, সকলের পাতের অবশিষ্ট পরটা পাঞ্জাবীদের অলক্ষ্যে তার ভেতরে চালান করে দেওয়া হোক। পাতে ফেলে রাখাটা খারাপ দেখাবে। কোন রকমে ইঞ্চি দুই পরটা খেতে পেরেছিল অনন্ত। বাকি পৌনে দুখানারও বেশি সেই বস্তু, পানু চট্ করে সাফায় নিজের পাতে নিয়েছিল। সেখান থেকে পানুর অবশিষ্টাংশের সঙ্গে যোগ হয়ে চলে গেল দীপুর পাতে। ওদিক থেকে গোপুর বাড়তি পরটা আর আশুর ভুক্তাবশেষ জমা হয়েছে আশুর পাতে। তারপর খুব সাবধানে রুমাল বার করার ভাণ করে, একটা পলিথিন প্যাকেট বার করে সেগুলো ভরে ফেলা হল রুকস্যাকে। ভাগ্যে বাঙালীদের অতিথিবৎসলতা খাওয়া দাওয়া উদারতা করতে অভ্যস্ত নয় শিখ ধর্মনিষ্ঠ সেবাইতরা!

বোশন আর তার মা এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। ছেলেটা ধারে কাছে নেই কোথাও। সুরজিত সিং কি কাজে গিয়েছিলেন ভেতরে। এদের দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে ডেকে নিয়ে এল একটি পাঞ্জাবী যুবক। বিদায় নিয়ে পথে এসে দাঁড়াল ছয়জনে।

পোর্টার দুজনকে আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বলে দেওয়া হয়েছিল, ভুইন্দর গাঁয়ে চৌকিদারের খোঁজ করে যেন তারা। জানিয়ে দেয়, ওরা যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে যেন ঘাংরিয়া যাবার জন্যে তৈরী থাকে।

গতকালকের প্রচণ্ড বৃষ্টির জের এখনো চলেছে। জল বেড়ে গেছে অনেকখানি। উথাল পাথাল স্রোত অলকানন্দায়। ব্রিজ পেরিয়ে গুটি গুটি চলতে থাকল সকলে পুব মুখে। অল্প কয়েক গজ এগিয়ে একটা কাঁটা ঝোপ এড়িয়ে ডাইনে উঠে গেছে পথ। দেখেই চক্ষু স্থির হয়ে যায়। দূর থেকে যে বিসর্পিল পথরেখা দেখে অনায়াসে ওঠা যাবে মনে হচ্ছিল, সেই জিগ্‌জ্যাগ্ পথের প্রথম সিঁড়িটিই উঠেছে ষাট ডিগ্রি এ্যাঙ্গেলে প্রায় ত্রিশ গজ। বুক দমে যায়।

গোপু বলল, রায়দা ভয় পাচ্ছেন নাকি?

দীপু বলল, ভয় পাবার কি আছে? প্রথম দিকেই এই যা একটু চড়াই। ঘাবড়াবার কিছু নেই। জয়ধ্বনি দিয়ে দাও গোপুদা।

সঙ্গে সঙ্গে গোপু বলে উঠল, বোলো ভাই, লোকপালজী কি—

বাকি সকলে উঠতে উঠতে বলল, জয়!

ডানদিকে মুখ ফেরাল অনন্ত। নিচে ব্রিজটার গোড়ার দিকে মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রোশন। দীপু হাত নাড়ছে। অনন্তর মনে হল, রোশনও যেন হাত নাড়ল একবার।

(চলবে)

সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান

[প্রায় সাড়ে-তিন হাজার জীবনী সম্বলিত আকরগ্রন্থ]

প্রথম সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।
সম্পাদক শ্রীঅঞ্জলি বসু।

সেকালে কি একালে
বাংলায় কি বহির্বাংলায়
প্রবাসীই হোন
আর পরদেশী-ই হোন
বাংলার জনমানসে
যাঁরা স্বাক্ষর রেখে গেছেন
এমন প্রায় সাড়ে-তিন হাজার ব্যক্তির
জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : "প্রকাশিত চরিতাভিধানের মত একখানি পুস্তকের অভাব বাঙালী পাঠকসমাজে অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। এই চরিতাভিধানখানি 'সাহিত্য সংসদ'-এর মর্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছে।"

ছাত্র শিক্ষক বা বইয়ের মত বই।
সংবাদিক বা পাঠ্যানুরাগ ব্যক্তি
সকলের কাছেলখক গবেষক

[মূল্য : চল্লিশ টাকা]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

[illegible] তেরো।।

কলকাতা।

হাওয়ায় ভেসে কলকাতা এসেছে বাপী। ওকে নেবার জন্য নিশীথ স্টেশানে হাজির ছিল। নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। বাপী ওকে চিঠিতে লিখেছিল দু'দিন ওর বাড়িতে থেকে জ্যাঠাতুতো দাদার অর্থাৎ মণিদার বাড়িটা খুঁজে নেবে। আপাতত সেখানে থেকেই চাকরি করবে।

মণিদার বাড়ির ঠিকানা জানা থাকলে তাকেও চিঠি লিখত। জানে না। ঠিকানা বানারজুলির বাড়িতে কোথাও পড়ে থাকতেও পারে। বাপীর স্মরণশক্তি প্রখর। মণিদা কাস্টমস-এ চাকরি করে এটুকু আজও মনে আছে। কারণ বাবা এক রাতে ঠাট্টা করে তাকে বলেছিল, কাস্টমসের চাকরির তো মাইনে থেকে উপরি বেশি শুনেছি।

বাবার কথায় মণিদা খুব হেসেছিল।

কিন্তু মণিদার আপিসের ঠিকানাই বা পাবে কোথায় যে একটা চিঠি লিখে জানাবে, ও এসেছে।

শনিবার সকালে এসে পৌঁছেছিল। নিশীথ সেদিন ছুটি নিয়েছে। ও প্রায় বছর-খানেক আগেই চাকরিতে ঢুকে গেছে। ওর আপিস ডালহৌসিতে। কেরানি হলেও আপিসের ডিভিশন।

শনি-রবি দুটো দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে নিশীথ কলকাতা দেখালো ওকে। এমন কি চিড়িয়াখানা মিউজিয়াম বোটানিকাল গার্ডেনও বাকি থাকল না। ঠাট্টা ছেড়ে [illegible]

রাখ, এই প্রথম কলকাতায় এসেছিস বুঝতে পারলে লোকে বাঙাল বলবে।

দেখে শুনে গোড়ায় বাপী হাঁ হয়ে গেছল সত্যি কথাই। বই-এ পড়েছিল, আজব শহর কলকাতা। এমন তাজ্জব রকমের আজব কে জানত! ট্রাম বাস লরি ট্যাকসি মোটর ঠেলা রিকশার মিছিল দেখে দুদিনেই মাথা ঝিমঝিম করেছে। গোটা কলকাতা শহরটা যেন সদা ব্যস্ত, কেবল ছুটছে আর ছুটছে। আসার সময় ট্রেনে বসে ঘুরে ফিরে মিষ্টির কথাই বেশি মনে এসেছিল। মায়ের টানা আটটা বছর যেন কিছুই না। কোথায় আছে ওরা এখন জানে না। কিন্তু বাপীর বদ্ধ ধারণা, কলকাতায় আছে। মিষ্টি কথায় কথায় একদিন বলেছিল, একটু উঁচু ক্লাসে উঠলেই ও কলকাতায় দাদুর কাছে থেকে পড়াশুনা করবে। ওর মা-তে বাবা-তে সেই রকমই নাকি কথা হয়ে আছে।

ট্রেনে আরো কিছু..... মনে পড়াতে বাপীর হাসি পেয়ে গেছল। নাওয়া খাওয়া ভুলে দু-দুবারের সেই বিশাল ছাপা সরকারি গেজেট এনে পড়া। কেন, সে শুধু ও-ই জানে।

সেই থেকে বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল, আর কেউ থাকুক না থাকুক, মিষ্টি অন্তত কলকাতাতেই আছে। একদিন না একদিন দেখা হয়ে যেতে পারে কেন—যাবেই। একটা কুৎসিত অভিলাষ ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে। কলকাতায় চাকরি হওয়াটা সেই অনেক অনেক বড় হওয়া আর শোধ নেওয়ার প্রথম ধাপ। কিন্তু এই কলকাতা দেখে বাপী হকচকিয়ে গেছে। ওদের হদিস মেলা দূরে থাক, এই ব্যস্তসমস্ত শহর থেকে মণিদাকে খুঁজে বার করবে কি করে ভেবে পেল না।

মণিদাকে না পেলেও অবশ্য ঘাবড়াবার খুব কিছু নেই। হাতে চারশ টাকার মতো মজুত আছে। চাকরির মাইনের কোনো মেসে থাকার খরচা চলেই যাবে। তবু নতুন জায়গায় একটু অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত মণিদাকে পেলে ভালো হয়। এখন নিশীথ সঙ্গে আছে তাই। নইলে ট্রাম-বাস-মোটর-লরির এই ছোটাছুটি, লোকজনের এই ভিড় আর এত ব্যস্ততার মধ্যে পড়লে ও যেন ভয়ানক একলা হয়ে যাবে।

যে জন্যে কলকাতায় আসা সেটা আর যা-ই হোক, লোয়ার ডিভিশন কেরানি চাকরি নয়। এ রকম চাকরি বাপী চার বছর আগে ঘরে বসেই করতে পারত। করবে না বলেই ঘর ছেড়েছিল, বাবাকে ছেড়েছিল। চারবছর বাদে বি এসসি পাশ করার পর সেই লোয়ার ডিভিশন চাকরি জনে ধরার কথা নয়, আকর্ষণ একটাই। কলকাতা। বড় হতে চাও তো বড় গণ্ডিতে এসে ঘোসো। কলকাতা সেই বড় গণ্ডি। ভাগ্যের জোর থাকলে এখান থেকেই ফাঁকির উঁজির হয়, ছোঁড়া কাঁথার মানুষ হাত বাড়িয়ে স্বপ্নের লাখ টাকা মুঠোয় ধরে। বাপী তাই কলকাতার এই বড় গণ্ডিতে এসে একটু বসার জায়গা পেয়েই খুশিতে আত্মহারা হয়েছিল।

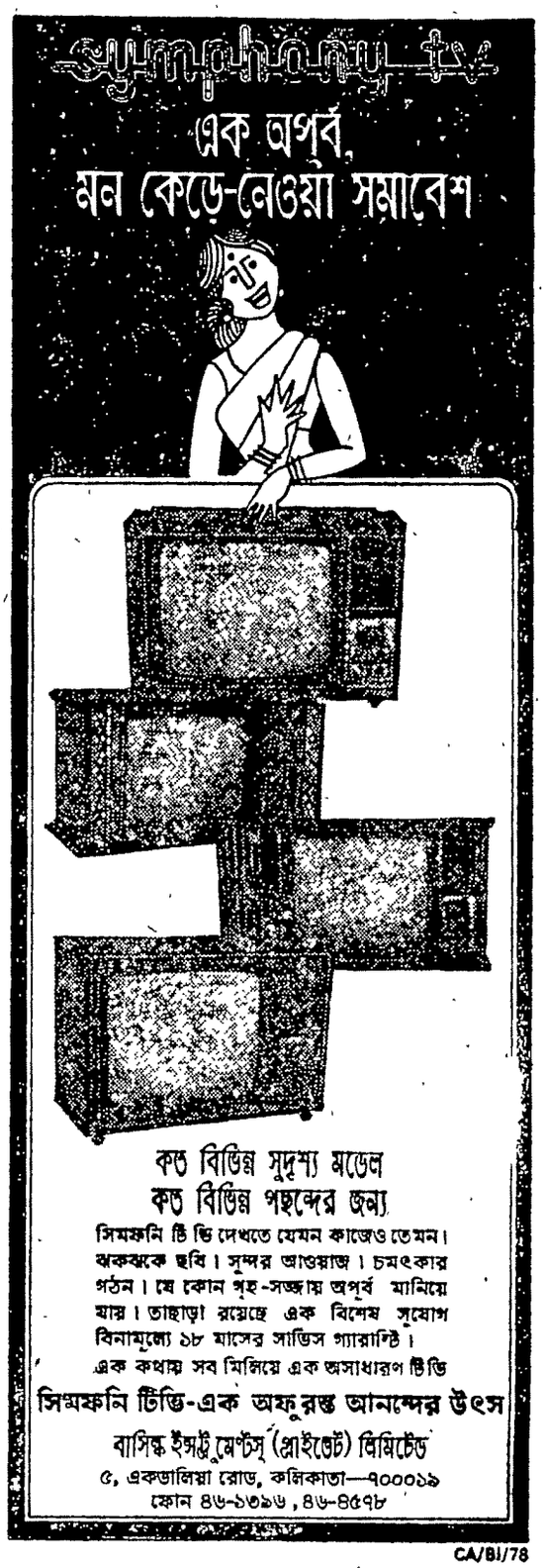

CA/BI/78

আপার ডিভিশন লোয়ার ডিভিশন নিয়ে মাথা ঘামায়নি। নইলে ওর থেকে অনেক খারাপ ছাত্র নিশীথ সেন আপার ডিভিশন। যত ছোটই হোক, বাপীর কাছে কলকাতায় এসে স্থিতি হতে পারাটাই ভাগ্যের পাশার একটা অনুকূল দান।

কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হতে না হতে ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেল একটু। কবিরাজ বাবার একজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে নিশীথ রামকাকা বলে ডাকে। নাম রাম-চরণ গাঙ্গুলি। বড়কলিনের কোনো বিভাগের তিনি মেজবাবু। বড়বাবু মন্মথ সোমের সঙ্গে তাঁর বেজায় খাতির। রেসের মাঠে হবিহর আত্মা দুজনে। এই খাতিরের সুতো ধরে বাপীর চাকরি। বড়বাবু মন্মথ সোমকে অজীর্ণ রোগে ধরেছিল। রামকাকার অনুরোধে নিশীথের বাবা দু মাস বিনে পয়সায় চিকিৎসা করে তাঁকে সারিয়ে তুলেছেন। সেই মওকায় নিশীথ রামকাকাকে বন্ধুর চাকরির জন্যে ধরে পড়েছিল।

কিন্তু প্রথম দিন খিদিরপুর বড়কলিন ডিপোয় হাজিরা দিয়ে বাপী ভিতরে ভিতরে হতাশ। যদিও সেই দিনই কাজে জয়েন করার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধে হয়নি। রাম-কাকা বাপীকে বড়বাবু মন্মথ সোমের কাছে নিয়ে এসেছেন। বিশাল হলের এক কোণে তিন-দিক ঘেরা একটু ছোট জায়গায় তিনি বসেন। সামনে তাকালে সমস্ত দপ্তরটি তাঁর চোখের সামনে।

বাপীর পরনে ধুতি পাঞ্জাবী। ঘুলঘুলি-তর হাওয়ায় কলকাতার কেরানিবাবুরাও বেশির ভাগ তখন ধুতি ছেড়ে ট্রাউজার আর শার্ট ধরেছে। ধুতি পাঞ্জাবী পরে প্রথম দিন আপিসে উপস্থিত হওয়াটা নিশীথের পছন্দ ছিল না। কিন্তু উপায় কি। বিরক্তি মুখ করে বলেছিল, একটু কম ঢ্যাঙা হলেও তো আমারটা দিয়ে দিনকতক চালিয়ে দিতে পারতিস।

বড়বাবুকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে বলে দিয়েছিলেন রাম গাঙ্গুলি। কিন্তু তার সুযোগ কম দেখে বাপী স্বস্তি বোধ করল। চার দিকের চেয়ার ঠেলে টেবিলের তলায় পায়ের নাগাল পাওয়া সহজ নয়। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালো।

বাপী জানে আগে থাকতে বলা কওয়া আছে। তবু, রাম গাঙ্গুলি পরিচয় দিতে মুখ তুলে চুপচাপ খানিক দেখলেন ওকে। ছোট-খাট রোগা মানুষ, ফ্যাকাশে মুখ। গম্ভীর। যাচাই করে দেখার মতো হিসেবী চাউনি। বসতে বললেন না।

—এ-বছর বি এসসি পাশ করেছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দ্বিতীয় প্রশ্নের আগে বাপী এবারে বুদ্ধিমানের মতো বলল, আমার নাম বিপুল, আপনি তুমি করে বলুন।

—ডিসটিংশনে পাশ করেছ ?

—হ্যাঁ সার।

—অনার্স পড়লে না কেন ?

বাপী এর কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। চুপ করে রইল।

—কোন্ কলেজ থেকে পাশ করেছ ?

বলল।

—বাড়ি কোথায় ?

বলল।

—দেশ ?

এবারে একটু মাথা খাটাল বাপী। দেশ ভাগ হয়েছে যখন কাজে লাগতেও পারে। বলল, দেশ কখনো দেখিনি সার, শুনেছি, পূর্ববঙ্গে।

বাপী কেন, বাপীর বাবাও দেশ দেখে নি। বড় সাহেবের দু চোখ আবার ওর মুখের ওপর আটকে রইল খানিক। তারপর যে মন্তব্যটা করলেন সেটাই অপ্রত্যাশিত এবং হতাশার কারণ।—একেবারে ভাঙা হাটে এসেছ, চাকরি আজ আছে কাল নেই, কি লাভ।

নিশীথ অবশ্য কলকাতায় আসার পর বলেছিল, টেম্পোরারি চাকরি। বাপী জানে গোড়ায় সব চাকরিই টেম্পোরারি। তাছাড়া কেরানির পাকা চাকরি করছেই বা কে। কিন্তু ভাঙা হাটের চাকরি, আর, আজ আছে কাল নেই শুনে ঘাবড়ালো একটু।

বড়বাবু চেয়ার ঠেলে উঠলেন। ওকে আসতে ইশারা করে সামনে এগোলেন। হল্ পেরিয়ে বারান্দার ওদিকে আর একটা ঘর। দরজার বাইরে চাপরাশি টুলে বসে। বড়-বাবুকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

বাপীকে অপেক্ষা করতে বলে বড়বাবু সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। এবং দু মিনিটের মধ্যে ওরও ডাক পড়ল।

মস্ত টেবিলের ওধারে যিনি বসে তিনি বড়বাবুরও ওপরওয়ালা বোঝা গেল। বাঙালী। বড়বাবু অবশ্য তাঁর সামনের চেয়ারে বসেন। সাহেব তাঁর সমবয়সী হবেন।

বাপী এবারেও দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার সারল। বাঙালী সাহেব মাথা নাড়লেন কি নাড়লেন না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার শুধু দেখলেন ওকে। তারপর বড়বাবুকে বললেন, ঠিক আছে।

বড়বাবুর ঠোঁটের ফাঁকে এবারে সামান্য হাসির রেখা লক্ষ্য করল বাপী।

ওকে সঙ্গে করে নিজের জায়গায় ফিরলেন আবার। নিজে বসে এবারে ওকেও বসতে বললেন। সেই ফাঁকে আবার একটু দেখেও নিলেন।

—বয়েস কত ?

—বাইশ।

বয়েস পছন্দ হল নাকি আর কিছু, বাপী সঠিক বুঝে উঠল না। বয়েসই হবে বোধ হয়, কারণ, আর একবার মুখ থেকে বুক পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বললেন, ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের বয়েস যাই থাক, ঠিক ঠিক বয়েস কত ? বলতে বলতে একটা ছাপা ফর্ম বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে. বয়েসের জন্য তোমার চাকরি আটকাবে না—আমার তো তেইশ-চব্বিশ মনে হচ্ছে।

চাকরি পাওয়ার আগ্রহটাই বাপীর সব আপাতত। প্রতিবাদ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল। জবাব দিল, হতে পারে সার.....সার্টিফিকেটে কমানো আছে কিনা বাবা জানতেন।

হতে পারে শুনে আখুশি নন। ভদ্রলোকের ঠোঁটের হাসিটুকু চেষ্টা করে হাসার মতো। তেমনি একটু হেসে মন্তব্য করলেন, নানা আশায় ছেলের দুই-এক বছর বয়েস সব বাবারাই কমিয়ে লেখান। ওই ফর্মটা ফিল আপ করো, সার্টিফিকেটের বয়েসই লিখবে।

অর্থাৎ উনি ধরেই নিলেন বাপীর বয়েস তেইশ চব্বিশের কম নয়।

পুথক দরখাস্ত করারও দরকার হল না। ফর্ম ফিল-আপ করা হতে ওতেই তিনি খসখস করে লিখলেন কি, নিজের নাম সই করলেন, তারপর সেটা নিয়ে আবার চলে গেলেন।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে খালি হাতে ফিরলেন। চেয়ারে বসে আবার একটু চেয়ে রইলেন। ভদ্রলোকের এই দেখাটাই কেন যেন অস্বস্তিকর বাপীর কাছে।

শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে

কিরীটি রচিত

দুর্গম গিরি তীর্থে

যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ ও কেদার-বদ্রী ভ্রমণের চমকপ্রদ উপন্যাস।

সাহিত্যলোক ৩২।৭, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

—রামবাবুর মুখে তোমার কথা সব শুনেছি, বাবা-মা তো নেই, ভাই-বোন বা অন্য কোনো আত্মীয় পরিজনও নেই ?

রামবাবুর মুখে শোনা মানে নিশীথের মুখে শোনা। সে কি বলেছে না বলেছে কে জানে। তাই জ্যাঠতুতো দাদার কথাও বলা গেল না। জবাব দিল, না সার....

খুব সদয় মুখ করে বললেন, ভেরি আনফরচুনেট। যাক, এ কাজটা কিছুই নয়, তার ওপর পিওরলি টেম্পোরারি, স্টপ্‌গ্যাপ— ক্যারি অন।

সেইদিনই কাজে বহাল হয়ে গেল। তিন-চার দিনের মধ্যেই চাকরির ব্যাপারটা বুঝে নিল। বড়কলিন ডিপো যুদ্ধের বহু রকমের মাল স্টকের অফিস। এই আপিস এখন অনেকটাই গুটনো হয়ে গেছে। তবু সময় সময় কাজ জমে গেলে ছাঁটাই কর্মচারীদেরই কিছু কিছু আবার অস্থায়ীভাবে ডেকে নেওয়া হয়। বাপী ছাঁটাই মার্কা না হলেও বড়বাবুর কল্যাণে ঢুকে গেছে।

নিশীথের ওপর গোড়ায় একটু অভিমানই হয়েছিল বাপীর। এরকম চাকরির জন্য এভাবে ছুটে আসত কিনা সন্দেহ। মাইনে আট টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স আঠোর—সর্বসাকুল্যে মাস গেলে আটাত্তর টাকা।

মেজাজ খারাপ করে নিশীথকে বলেই ফেলেছিল কথাটা। নিশীথ কানেই তোলেনি, বলেছে, ওই বড়বাবুটির ক্ষমতা কত জানিস না, লেগে থাক আর ভদ্রলোকের মন রেখে চল—

উনিশ বিশ একই কথা রাম গাঙ্গুলি বলেছেন।— বড়বাবু কাউকে রাখবেন বলে ধরে থাকলে তাকে হটানো সহজ নয়, বুঝলে ? বাজে ভাবনা না ভেবে তাঁর মন রেখে চলো।

মন রেখে কি করে চলতে হয় বাপীর সেটাই জানা নেই। চাকরির মাস-খানেকের মধ্যে কপাল দেখা রতন বণিক ওর বশংবদ হয়ে ওঠার পর সেও বলেছে, আপনি হলেন গিয়ে বড়বাবুর লোক, আপনার 'বিটেল্ফ'-এর ভাবনা কি। বড়-বাবুর ইয়েস তো বড় সাহেবের 'ইয়েস', এনার 'নো' তো ওনারও 'নো'।

বড়বাবুর লোক ভেবেই রতন বণিক ওরও অনুগত হয়ে উঠছে কিনা, বাপীর সে সংশয়। বড়বাবুর মন পাওয়ার আশায় বাপী শুরু থেকেই যতটা সম্ভব মন দিয়ে কাজ করছে। ছুটির পরেও এক ঘণ্টা তিনি আপিসে থাকেন, বেশির ভাগ চাকুরেরা ছুটির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু বাপী তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকে। বাপীর ধারণা মুখে কিছু না বললেও ভদ্রলোক ভিতরে ভিতরে খুশিই হন একটু।

মণিদার বাড়ির হদিস মিলেছে চন্দ্রবিন্দুতে ঢোকার চার দিন বাদে। আপিস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র

অমৃতলেখনীর অবিস্মরণীয় জীবনী-সাহিত্য

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে

পঞ্চম খণ্ড : পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১ম ও ২য় খণ্ড) ও পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

ষষ্ঠ খণ্ডে : পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) ও কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

সপ্তম খণ্ডে : ভক্ত বিবেকানন্দ, বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম) এবং রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

এই নয়খানি অবিস্মরণীয় জীবনী-সাহিত্য ও তৎসহ ১২০৪ খৃঃ হতে পূর্বভারতে ধর্মবিপ্লব এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ-গমনের বিস্তৃত ইতিহাস, শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতবাণী সংকলন, পরিপূরক হিসেবে প্রত্যেক মহাপুরুষ ও শ্রীমায়ের চরিতামৃত ও নানা বিষয়ে অতিরিক্ত প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার তথ্য পঞ্জীসহ উক্ত তিন খণ্ড লাইনো টাইপে মুদ্রিত। প্রতিখণ্ড ২৫৲। মোট প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠা। সীমিত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। এই অমূল্য খণ্ডগুলি এক্ষুনি সংগ্রহ করুন।

বনফুল রচনাবলী

(দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইল)

জগদীশ গুপ্তের রচনাবলী

(প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল)

মানিক গ্রন্থাবলী

(তের খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে)

বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ

(পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে)

প্রেমেন্দ্র মিত্র রচনাবলী

(দুই খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী

(প্রথম খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে)

(প্রতিটি রচনাবলীর প্রতি খণ্ড ২০৲ টাকা এবং লাইনো টাইপে ছাপা অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ ৫ম খণ্ড ২৫৲ টাকা। জগদীশ গুপ্তের রচনা-বলী ১ম খণ্ড ২৫৲ টাকা।)

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ।। ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল-৭৩

দালিয়ে নিশীথ ভাড়া স্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে অফিসে ঠিকানায় খোঁজে গেছিল। রাতকয়েক সে ঘরে ঢুকে নিশীথ মণিলাল তরফদারের খোঁজ করছিল, ভদ্রলোক সে ঘরেই দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলছিল। নিজের নাম কানে যেতে এগিয়ে এসেছে। মণিদা নিজেই বাড়ির ঠিকানা দিয়েছে আর বাপীকে চলে আসার কথা বলেছে। পার্ক সার্কাসের দিকে ঠিকানা। নিশীথ তাকে বলে এসেছে বাপী সোমবার যাবে। খবরটা দিয়ে নিশীথ মন্তব্য করেছে তোর মণিদাকে দেখে সেরকম বড় চাকরে-টাকরে মনে হল না রে। বলেছিলি স্কাস্টমস-এ ভালো চাকরি করে....পরনে দেখলাম চলচলে ট্রাউজার্স আর গায়ে টুইলের শার্ট—তাও সে রকম পাট-ভাঙা পরিচ্ছন্ন নয়।

বাপীর ধারণা ছিল মণিদা ভালো চাকরিই করে। তাই বলেছিল। একথা শোনার পর সেখানে থেকে চাকরি করার কতটা সুবিধে হবে সেই ভাবনা। মণিদার বাড়ির হদিস মিলতে এ ব্যাপারে একটু অস্বস্তি। আট বছর আগে বালিগঞ্জের একটা সরু আর দুপুর যেন ভিতরের কোনো গোপন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজের ছেলেবেলাটাকে এক-এক সময় একেবারে শেকড়শুদ্ধু চেঁছে ছিঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে বাপীর।

রবিবার সকালে নিশীথ ওকে বাড়ির সেকেলে গাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে গেল। নিয়ে ঢুকল না, কারণ বাবা তাড়া দিয়ে রেখেছে। রবিবার সকালে বাবার কাছে হাতে-কলমে কাজ শিখতে হয়, কবিরাজি ওষুধপত্র বানাতে হয়। কিন্তু বাইরে থেকে মণিদার ফ্ল্যাট দেখেই ও রকমটা অপ্রস্তুত একটু। বেশ ভালো চাকরি না করলে এ জায়গায় এরকম ফ্ল্যাটে থাকা সম্ভব নয়।

রাস্তার ওপর থেকে বাড়িটা মণিদার। সামনে ছোট একটু পার্কের মতো। বেশ খোলা মেলা জায়গা। নিচের দরজার সামনে দো-ভাঙা লুঙ্গি কষে কাপড় পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে। নিশীথ তাকে জিগেস করতে সে দোতলাটা দেখিয়ে দিল।

ওকে ছেড়ে নিশীথ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

এক তলায় মাদ্রাজী পরিবারের বাস মনে হল। বাপী পায়ে পায়ে দোতলায় উঠে এলো। হাতে রঙচটা টিনের সুটকেস আর মশলা শতরঞ্জী মোড়া দড়িবাঁধা শীর্ণ শয্যা। সিঁড়ির মুখের দরজা পেরিয়ে ভিতরে পা দিতেই হাতের জিনিস দুটো বেমানান লাগল। এও বেশ বড়সড় একখানা ঘরের মতোই। বিস্কুট রঙের তকতকে মেঝে মাঝামাঝি ডাইনিং টেবিলের চারদিকে ডাইনিং চেয়ার। বাপী কখনো টেবিল চেয়ারে ভাত খায়নি, তবু এন্তার জিনিস যে নয় ওগুলো আঁচ করতে পারে। টেবিলে শৌখিন পেয়ালা আর ছোট বড় ডিশ পড়ে আছে। একটু আগেই বাড়ির লোকেরা প্রাতরাশ সেরে উঠে গেছে বোঝা যায়। ওদিকের দেয়াল আলমারির কাঁচের পাল্লা দিয়ে ঝকঝকে কক্ষকরি সেট দেখা যাচ্ছে।

সামনে পর পর তিনটে ঘর। পুরু পর্দা ঝুলছে। শেষের ঘর থেকে রেডিওর গান কানে আসছে।

হাতের টিনের সুটকেস আর বিছানার পুঁটলি চট করে চোখে পড়বে না এমন এক কোণে বাখল বাপী। তারপর প্রথম ঘরের পর্দাটা সরিয়ে দেখল।

এটা বসার ঘর। গদির সোফা সেট ডিভান সাজানো। ব্যাপারে দেখে বাপীর চক্ষুস্থির হয়ে যাওয়ার দাখিল। পর্দা সরানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি যার সঙ্গে সে বছর ছ-সাতের একটি ছেলে। আর শোয়া হয়ে একটা পাতলা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল, আর একখানা পা হাতলের ওপর। পাশের সোফায় মণিদার চোখের সামনে খবরের কাগজ। মুখে আধখানা চুরুট। পরনে চকচকে লুঙ্গি গায়ে জালি গেঞ্জি।

—বাবা!

দরজায় অপরিচিত লোক দেখে ছেলেটা মণিদাকে ডাকল।

মণিদার মুখের কাছ থেকে কাগজ সরল। চুরুটটা হাতে নিয়ে এক গাল হাসি। কাগজ ফেলে সোফা ছেড়ে উঠল কত বড় হয়ে গেছিস রে বাপী আজ আর—বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?

বাপী হাসি মুখে মাথা নাড়ল। অসুবিধে হয়নি। তারপর এগিয়ে এসে মণিদাকে একটা প্রণাম ঠুকল।

তিনটে ঘরেরই মাঝখানে একটা করে ভিতরের দরজা। বাইরের বারান্দার দিকেও একটা করে দরজা। ভিতরের দরজার পর্দা-গুলো তোলা এখন।

মণিদা হাঁক দিলেন, বউ গো দেখে এসেছে, দেখে যাও—

হাঁক শোনার আগেই ওই শেষের ঘর থেকে গৌরী বউদি ওকে দেখে এগিয়ে আসছিল। ও-ঘর থেকেই রেডিওর গান শোনা যাচ্ছিল। সেটা এখনো চলছে। কে এলো বা কে আসবে জানাই ছিল নিশ্চয়। কিন্তু এগিয়ে আসতে আসতে গৌরী বউদি যেন খুব পরিচিত মানুষ দেখছে না। এঘরে পা ফেলার আগেই বাপী বেটুকু দেখার দেখে নিয়েছে। সামান্য মোটার দিকে ঘেঁসেছে গৌরী বউদি নইলে আট বছর আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। তখন কুড়ি ছিল বয়েস, এখন আঠাশ হবে...! এই আট বছরে মণিদা ফুলে আরো গোলগাল হয়েছে, ফলে তাকে আরো বেঁটে দেখায়। কিন্তু সামান্য মোটা হওয়ায় ফলে গৌরী বউদিকে আগের থেকে একটু লম্বা মনে হয়।

মণিদা জিজ্ঞাসা করলেন ওকে চিনতে পারলো?

গৌরী বউদির সেই হাসিমাখা চকচকে চোখ দুটো পরিষ্কার মনে আছে বাপীর। তখন মনে হত, ওই দুটো চোখ দিয়েই গৌরী বউদি অনেক কথা বলতে পারে। এখন কতটা পারে জানে না এখন সাদাসিধে একটু হাসি শুধু ফুটে আছে।

বাপীর দিকে তাকিয়েই বলল, চেনা ছিল বলে পারছি, না থাকলে পারতুম না। খাসা মানিক-মানিক চেহারাখানা হয়েছে তো এখন।

বাপী ভাবেও একটা প্রণাম সারতে গেল। তার আগেই গৌরী বউদি দুপা সরে গিয়ে বলল, প্রণাম-টনাম দরকার নেই, বোস—জোয়ান-মর্দ ছেলে পায়ে হাত দিতে এলে বিচ্ছিরি লাগে।

বাচ্চা ছেলেটা বই হাতে সেইভাবেই লেখার আধ-শোয়া হয়ে নতুন লোকটাকে দেখছিল আর মা-বাবার কথা শুনছিল। তার দিকে চোখ যেতেই গৌরী বউদির সামান্য মেজাজ চড়ল যেন। —এই ছেলে! সকালের মতো শুয়ে কি পড়া হচ্ছে তোর?

ছেলে সোজা হয়ে বসল। —কি করব বলো তো শুধু কাগজই পড়তে দিল, স্কুলের গল্প দেখিয়ে দিচ্ছিল না—

এমন সামান্য কারণেও গৌরী বউদির চকচকে চোখে বিতৃষ্ণাই দেখল যেন বাপী। কথাগুলোও রুঢ় একটু। —সমস্ত দিন তো বাইরেই কাটাও সকালের একটা ঘণ্টাও যদি না দেখতে পারো তো কাল থেকেই ওর জন্যে একজন মাস্টার ঠিক করো।

কৈফিয়ত দাখিলের সুরে মণিদা বলল, [illegible]

পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এর
বারুদের বিস্ফোরণে জন্মের এক
চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক দলিল
প্রকাশিত হলো

জবাব দাও—জয়প্রকাশ
মূল্য : টা: ১৫.

—তোমার কাছে ওর বাবো মাসই রোববার। ছেলের দিকে ফিরল, ওঘরে গিয়ে নিজে যা পারিস পড়গে যা, আমি আসছি—বেডিওটা বন্ধ করে নিস।

বাপী লক্ষ্য করছে মায়ের মতোই মুখ ছেলের। মণিদার আদলের ছিটে-ফোঁটাও নেই। মনঃপূত হোক না হোক মায়ের হুকুমে উঠে চলে গেল। এদিকের পর্দা ঠেলে দরজার কাছ থেকেই গলা একটু চড়িয়ে গৌরী বউদি বলল, ভিখু, চালের জল চড়াও, আর মিষ্টসেফ-এ খাবার কি আছে দেখো—

....বানারজুলিতে নতুন বউ গৌরী বউদির সঙ্গে এই গৌরী বউদির কিন্তু একটা বড় তফাৎ এরই মধ্যে চোখে পড়ছে বাপীর। বানারজুলি থেকে ফেরার আগে বাপীকে গাল টিপে আদর করে এসেছিল মনে আছে। এই গৌরী বউদির আর কিছু না হোক, মেজাজ বেশ বদলেছে বোঝা যায়।

সোফায় বসে মণিদা নেভানো চুরুটটা আবার ধরিয়েছে। দরজা ছেড়ে এদিকে আসতে একটু সহজ হবার তাগিদে বাপী বলল, সকালের চা জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছিলাম—

ওর মুখোমুখি সোফাটায় বসল গৌরী বউদি। —কেন, এখানে জুটবে কিছু জুটবে না ভেবে?

বাপী তাড়াতাড়ি বলল, তা কেন, কতক্ষণ দেবে ততোক্ষণ খেতে পারি। চট করে অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে গেল, ছেলেটাকে এমন তাড়া দিয়ে পড়তে পাঠালে যে আমি কে জানলও না—কি পড়ে, রোববারেও ওর কি এত পড়া?

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে মণিদা বলল ক্লাস ওয়ান।

ভাগ্যে বাপী হেসে ফেলেনি। কারণ সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ চোখের একটা ঝাপটা খেল মণিদা। সঙ্গে ঝাঁঝালো কথারও। ক্লাস ওয়ান হোক আর যাই হোক, সঙ্গে নিয়ে না বসলে ওইটুকু ছেলে নিজে থেকে দিগগজ হয়ে যাবে? উইকলির বেজালটগুলো চোখ আঁকিয়ে দেখেছ একবারও? লজ্জা করে না মুখ নেড়ে কথা বলতে?

মণিদার মুখখানা একটু চুপসেই যেতে দেখল বাপী। তাড়াতাড়ি ওই আবার সামাল দিতে চেষ্টা করল। —তুমি কিছু ভেব না বউদি, এবার থেকে আমিই ওকে নিয়ে বসব—কি নাম ওর?

গৌরী বউদি জবাব দিল না। এবারে মণিদার একটু আগ্রহ দেখা গেল। —তাই তো রে। তোর সেই বন্ধুটি বলছিল ডিস্টিংশনে বি-এস-সি পাশ করে তুই এখানে এসে কি একটা চাকরিতে ঢুকেছিস। আমার সকাল দুপুর বিকেল বাড়ির চাকরির জোয়াল কাঁধে—তুই একটু নিয়ম করে ছেলেটাকে দেখলে তো ভালোই হয়—কি বলো?

শেষের বিনীত জিজ্ঞাসা বউয়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু জবাব না দিয়ে গৌরী বউদি এবারে দুটো চোখে বাপীকে একটু মেপেই নিচ্ছে। তারপর ছেলেকে ডেকে

হল, ডিসটিংশনে বি-এস-সি পাশ করাটা কিছু নয়—ছেলে পড়িয়ে অভ্যেস আছে। এই করেই তো নিজের পড়াটা চালিয়েছি।

গৌরী বউদির দু চোখ ওর মুখের ওপর থেকে পাশের খোলা দরজার দিকে ঘুরল। —বাচ্চু!

মায়ের এক ডাকে ওদিক থেকে ছেলেটা ছুটে এলো। বাপীকে দেখিয়ে গৌরী বউদি বলল, এ তোর একজন কাকু হয়, এখানে থাকবে—কাল থেকে রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় এই কাকু তোকে পড়াবে—বুঝলি?

বাপী দেখল, গৌরী বউদির মুখখানা একটু যেন প্রসন্ন এখন। ছেলের জন্য দুশ্চিন্তা দেখে প্রথম সুযোগে পড়ানোর প্রস্তাব ওই দিয়েছে। এখানে থাকা খাওয়ার বিনিময়ে যেটুকু করা যায়। তবু আধঘণ্টা হয়নি এসেছে, মুখের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বউদির ছেলেকে ডেকে এই ফয়সলা করে ফেলার মধ্যে ওই বিনিময়ের হিসেব-টুকুই যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল। মণিদা বা গৌরী বউদি এ পর্যন্ত পিসী বা বাবার সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি।

ছেলেটা সোজা তাকিয়ে কাকুর মুখখানা একবার দেখে নিল। জরীপটি বিপজ্জনক কিনা বোঝার চেষ্টা। সে রকম মনে হল না। মায়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, মাস্টার কাকু?

মাস্টার ঠিক করার কথা প্রায়ই শোনে, তাই এ প্রশ্ন।

—না, বাপী কাকু। জঙ্গলের কতরকম গপ্‌প বলবে তোকে শুনিসখন। কিন্তু মনে পড়তে গম্ভীর মুখে সামান্য হাসির আভা ঝলালো। কি মনে পড়তে পারে বাপী সেটা সেই মুহূর্তে আঁচ করেছে।

ছেলের গলায় অভিমান ঝরল। —হ্যাঁ জঙ্গলের গপ্প শুনবে, আজ পর্যন্ত আমাকে চিড়িয়াখানাই দেখালে না তোমরা।

—এবারে কাকু দেখাবেখন। এখনো এক ঘণ্টা পড়তে হবে, বই নিয়ে বোসগে যা।

দ্বিতীয়বার বলতে হল না, বাচ্চু চলে গেল। ভিখু বাড়ির আধবুড়ো চাকর। তার সামনে ডিশে কিছু খাবার আর এক পেয়ালা চা রাখল। দাদা বউদির সামনে এক পেয়ালা চা রেখে প্রস্থান করল।

পেয়ালা তুলে নিয়ে গৌরী বউদি আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের আর কি নতুন ভালবাসাবাসি দেখেছিস?

ডিশের খাবার সবে একটু মুখে তুলেছিল। বাপীর বিষম খাবার দাখিল। মাথাটাও ঝিমঝিম করে উঠল। ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে এক দুপুরের দৃশ্যটা বেরিয়ে আসার জন্য যেন ডানা ঝটপট করছে। বানারজুলির জঙ্গলের সেই একটা দিন মণিদাও ভোলেনি হয়তো। বউয়ের রসিকতার কথা শুনে চুরুট মুখে তার ভারি গালের খাঁজে খাঁজে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে।

পলকা ধমকের সুরে গৌরী বউদি আবার বলল, বল না! ইস লজ্জা দেখো ছেলের—

বাপীর মনে হল, গৌরী বউদি ওকে সেই আট বছর আগের মতোই বোকা ভাবছে। এখনো সেই বোকাবোকা ভাবটাই ধরে রাখার চেষ্টা বাপীর। লোকের চোখে ধুলো দেবার মতো এর থেকে ভালো কৌশল জানা নেই। হাসতে চেষ্টা করে বোকার মতোই বলল, তখন কি কিছু বুঝতাম নাকি!

....বানারজুলিতে এই গৌরী বউদির মুখে অনেক রকমের খুশির ছটা দেখেছিল বাপী, মুখে খিলখিল হাসি দেখেছিল।... জঙ্গলে যাবার আগে পাটভাঙা শাড়ি পরার পর ওকে পিছনে পায়ের দিকটা টেনে দিতে বলেছিল, আর উল্লাস ফয়সালটা না বুঝে বাপী উপুড় হয়ে বসে শাড়ির ওপর দিয়ে দু হাতে তার একটা পা চেপে ধরে কি করে টানবে ভেবে পাচ্ছিল না। গৌরী বউদি তখন ওকে হাঁদা বলেছিল আর হেসে সারা হয়েছিল। ....তারপর জঙ্গলে ওর সেই সব কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে হেসেছিল আর ঘন ঘন সেই হাসি মণিদার দিকে ঠিকরে পড়ছিল। এ পরিস্থিতি অতটা হাসির না হলেও বাপীর মনে হয়েছে গৌরী বউদি এখন আর সেরকম হাসে না বা হাসতে পারে না। ধার ধার মুখের এই হাসির মধ্যে যেন কিছু হিসেব লুকনো আছে। অপচয় নেই।

স্নাটের ফাঁকে এমনি একটু হাসি খেলে গেল। ভুরুর মাঝে হালকা ভাঁজ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি বই

সোনালী রেখা ৬·০০
প্রণয়পাশা ৮·০০
হিসাব মেলাতে ৭·০০
নতুন তুলির টান ১২·০০

নাথ পাবলিশিং হাউস

পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

পড়ল একটু। —এখন সব বুঝে ফেলেছিস? তার পরেই আত্মস্থ। —যাক, সেসবের গল্প করতে গিয়ে ছেলের মাথার আবার এসব ঢোকাতে যেও না।

বাপী তখুনি বোকার মতো মাথা নাড়ছিল। অমন কাজ সে করবে না। এর ফলেও গৌরী বউদি কয়েক পলক চেয়ে রইল। এই বয়সের ছেলের সরলতা দেখে ভিতরে ভিতরে একটু মজাও পাচ্ছে হয়তো।

মণিদা প্রসঙ্গ ঘোরালো। ওর চাকরির খোঁজ নিল। শোনার পর বীতশ্রদ্ধ।—বি এস সি ডিসটিংশনে পাশ করার পর এই চাকরি করতে ছুটে এলি। মাইনে কত?

গৌরী বউদির সামনে এ প্রশ্নটাই যেন জামা ছিল। অকপটে বলে দিল সব মিলিয়ে মোট আটাত্তর টাকা—

—দেখ কাণ্ড! হালছাড়া চোখে মণিদা একবার তার বউয়ের দিকে তাকালো। তারপর ওকেই বলল, এরকম কেরানির চাকরি করবি তো আমাকে জানালি না কেন, আমার ওখানে চেষ্টা করে দেখতাম। কাকাও তো লিখলে পারত—

—বাবা চার বছর আগে মারা গেছেন, তোমাকে বললাম না টিউশনি করে নিজের পড়া চালিয়েছি।

গৌরী বউদি নির্লিপ্ত কিন্তু মণিদা অপ্রস্তুত একটু। —জানব কি করে বল, তুইও তো কিছু লিখিসনি। পিসীর মৃত্যুর খবর অবশ্য কাকাই জানিয়েছিল।

বাপী তাড়াতাড়ি কাজের কথায় ফিরে এলো। —এ চাকরিও একেবারে টেম্পোরারি, কবে আছে কবে নেই—তোমার ওখানে এখনো একটু চেষ্টা করে দেখো না মণিদা।

মণিদার গলায় এবারে অতটা উৎসাহ নেই। বলল, দেখি—

কিন্তু এটুকু আশার মুখেও গৌরী বউদি ছাই ঢেলে বসল যেন। —যাক, তোমাকে আর দেখতে হবে না, যা করবে করুক পরে দেখা যাবেখন—তোমার ওখানে ঢুকে পরের ছেলে হাত-কড়া পরুক শেষে।

বাপী অবাক। সত্যি মাথায় কিছু ঢুকল না। মণিদা সামাল দিতে চেষ্টা করল যেন, বললেই কি চাকরি হওয়া অত সহজ নাকি —

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাইরে চটির শব্দে ঘাড় ফেরালো।— এসো সন্তু এসো—

মণিদার ওখানে ঢুকলে হাত-কড়া কেন পরতে হবে তখনকার মতো বাপীর সেটা দুর্বোধ্যই থেকে গেল।

দামী চটির আওয়াজ তুলে পর্দা ঠেলে যে ঘরে ঢুকল বেশ লম্বা একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বয়েস বত্রিশ তেত্রিশের মধ্যে। গায়ের রং ফর্সা, মুখশ্রী সুন্দর নয়। পরনে দামী কাপড়ের সাদা পাজামা গায়ে মুগোর পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির দুটো হাতই পাঁচ ভাঁজ আস্তিন করে গোটানো। এক হাতের আস্তিনে ঝকঝকে সাদা পাথরের আংটি, অন্য হাতে নীল পাথরের। ডান হাতের পুরু কব্জিতে মস্ত একটা সোনার ঘড়ি। পাঞ্জাবির বুক খোলা, তার একদিকে সোনার চেনে সোনার বোতাম আটকানো। সব কটা বোতামের মাঝখানে একটা করে পাথর ঝিকমিক করছে—ওগুলোর নামই হীরে কিনা বাপী জানে না।

ভদ্রলোক নতুন মুখখানা দেখে নিয়ে বলল, বোববারের আড্ডা জমে গেছে দেখছি—

সোফার মণিদার পাশে বসল। মণিদা নেড়া চুবট অ্যাশপটে গুঁজতে গুঁজতে পরিচয় দিল, আমার খুড়তুতো ভাই বাপী এসেছে উত্তরবঙ্গের সেই বানারজুলির জঙ্গল থেকে এখানে চাকরি করতে—ওর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

জলপাইগুড়ির পাঁচটা বছর মণিদার মাথার নেই। ব্যাকব্রাশ চুলের নবীন ভদ্রলোকের কপালখানা বেশি চওড়া দেখায়। সে তুলনায় চোখদুটো সামান্য ছোট। হাসিমাখা চাউনিটা বাপীর মুখের ওপর। হালকা মন্তব্য করল, জঙ্গল থেকে এসেছে বলছ, ভাষার সুন্দর মুখখানা দেখে মনে হয় বৃন্দাবন থেকে আসছে।

মণিদা জোরেই হেসে উঠল। কিন্তু বাপীর চোখ তখন গৌরীবউদির দিকে। মুখের ধারধার ভাব মিলিয়ে গেছে। রসিকতা উপভোগ করল, হাসির সঙ্গে আবার একটু ঠেসও ছুঁড়ে দিল যেন।—তোমার কি আর অত ভুল হয়, জঙ্গল থেকে এলেও ওর ভেতরখানা বৃন্দাবন থেকে আসার মতোই।

সাদা কথায় আবার বোকাই বলা হল ওকে, কিন্তু শুধু ওর ভেতর বোঝানোর জন্যে গৌরী বউদি যেন কথাগুলো বলল না। মণিদার এতেও হাসি। তারপর বাপীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, এ হল সনৎ চৌধুরী, মস্ত কন্ট্রাকটর, পাশের বাড়িটা ওর—

বাপীর খুব ইচ্ছে করছিল, উঠে এসে সনৎ চৌধুরীকেও একটা প্রণাম ঠুকে গৌরী বউদিকে বুঝিয়ে দেয়, সত্যি কত জলভাত ছেলে ও। পেরে উঠল না। কোনরকমে দু-হাত জুড়ে নমস্কার সারল।

পকেট থেকে শৌখিন সিগারেট কেস বার করে ভদ্রলোক নিজের ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে কেসটা মণিদার দিকে বাড়িয়ে দিল।

মণিদা বলল, সিগারেট তো খাই-ই না, তবে তোমার দামী সিগারেট দেখলে লোভ হয় দাও—

সিগারেট ধরিয়ে সনৎ চৌধুরী হৃষ্টমুখে বাপীর দিকে তাকালো।—ভাষার এখানেই থাকা হবে নাকি?

হাঁ বা না কিছুই না বলে বাপী হাসতে চেষ্টা করল একটু। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মণিদা বলল, হ্যাঁ, কলকাতায় আমি ছাড়া ওর আর কেউ কোথাও নেই—

এই প্রশ্ন আর জবাবের মধ্যে গৌরী বউদি মজার কি পেল বাপী জানে না। কিন্তু মজাটুকু শুধু চোখেই ঠিকরালো যেন। মুখে বলল, আমাদের তো মোটে তিনখানা ঘর, সন্তুর ওখানেও পাঠিয়ে দিতে পারো—অতবড় বাড়িতে একলা থাকে—দুজনেরই উপকার হবে।

নাম ধরে ডাকাটা বাপীর কানে খারাপ লেগেছে। সনৎ বা সন্তু চৌধুরীর হাসিমাখা ভ্রূকুটি গৌরী বউদির দিকে।—উপকার হবে কিরকম?

—ও একটু চালাক চতুর হবে আর তুমি সৎসঙ্গ পাবে।

এক বাপী ছাড়া সকলেই হাসছে। কিন্তু শুধু মণিদার হাসিটাই বোকা-বোকা লাগছে বাপীর।

মণিদা বলল, যাই বাজারটা সেরে আসি—

সন্তু চৌধুরী তক্ষুণি বলল, চলো আমিও যাই—

গৌরী বউদি সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো। —এই! একরাশ বাজার করে এনে আমাকে হেঁসেলে পাঠানোর মতলব?

সন্তু চৌধুরীর সাদামাটা জবাব, ছুটির দিনে আমার শুধু একটু ভালো খাওয়ার মতলব—সেটা তোমার ভিখুর বাবা সম্ভব হলে হেঁসেলে যাবে না।

এ কথার ফাঁকে বাচ্চু লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে সোজা সন্তু চৌধুরীর কোলে এসে জাঁকিয়ে বসল।—সন্তুকাকু, মা বলেছে আমি ওই বাপী কাকুর সঙ্গে এবারে চিড়িয়াখানা দেখতে যাব!

—খুব ভালো কথা। কবে?

জবাবের আশায় বাচ্চু তার মায়ের দিকে তাকালো। মুহূর্তের মধ্যেই কিছু একটু ভেবে নিল গৌরী বউদি। সন্তু চৌধুরীকেই জিজ্ঞাসা করল, দুপুরের দিকে তোমার গাড়িটা ফ্রি থাকবে?

—হুকুম হলেই থাকবে।

মণিদা জামা-কাপড় বদলাতে যাচ্ছিল। বাধা পড়ল।—দুপুরে তোমার কি কাজ?

মণিদার বিব্রত মুখ।—খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রামের পর আমার তো একবার বেরুতেই হবে।...গাড়ি থাকলে আর কি, বাপীই নিয়ে যেতে পারবে'খন।

ঘর ছেড়ে চলে গেল। গৌরীবউদি ছেলেকে বলল, ঠিক আছে, আজই যাবি।

বাচ্চু আনন্দে হাত-তালি দিয়ে উঠল। কিন্তু সেই মুহূর্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে বিষম একটা সাড়া পড়ে গেল বাপীর।...গৌরী বউদির ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি, পলকের তেরছা চাউনি সন্তু চৌধুরীর মুখের ওপর। আর তক্ষুনি বাপীর মনে হল, গৌরী বউদি ছেলেকেই শুধু খুশি করল না। পলকের ওই কটাক্ষে সন্তু চৌধুরীর প্রতিও কিছু যেন অযাচিত করুণার আশ্বাস।

ভদ্রলোকের ছোট ছোট দুটো চোখে হাসি চিকচিক করছে।

স্নায়ুতে সাড়া পড়ার মতো সত্যি কিছু দেখল, না এটা নিজেরই বিতর্কচিন্তার ঝোঁক একটা বাপী ভেবে পেল না।

[চলবে]

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা ও তারও বেশী সময় আমার বক্তব্য যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাতে লাগলাম। এভাবে পাঁচ ছয় দিন বোঝাবার পর প্রত্যেকেই আমার যুক্তি মেনে নিল, এমনকি ফিল্ড কমান্ডারও আমার যুক্তি স্বীকার করে নিল। তারপর আমরা সবাই একমত হয়ে কয়েকটা কর্মসূচী গ্রহণ করলাম।

যখন সবাইকে নিয়ে এই পর্ব শেষ হচ্ছিল, তখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উগ্রপন্থী যে সে টাইফয়েডে ভুগছিল। সে অন্যের মুখে সব রিপোর্ট পাচ্ছিল। সবার মূল ভাবনা যে কি, মাত্রএকজনের রিপোর্টে তা বোঝা যায় না। সেও বুঝতে পারেনি বা বুঝতে হয়তে চায়নি, আর নয়ত তখন তার বোঝার মত ক্ষমতাও হয়ত ছিল না। এই ছিল সংগঠনের ভিতরের অবস্থা।

আমি যে এগুলো প্রকাশ করছি, তাতে অনেকের মনে প্রশ্ন—এই দুর্বলতা প্রকাশ করার কি কোন অর্থ আছে? আমার কাছে দুর্বলতা গোপন করে রাখা অনুচিৎ বলে মনে হয়। মতভেদ ও সাংগঠনিক দুর্বলতার বর্ণনা দিয়ে সবাইকে সচেতন করে দেওয়া উচিৎ। ভবিষ্যতে তারা গবেষণা করে বুঝবে ঐরূপ মতভেদের সত্যি কি কোন তত্ত্বগত কারণ ছিল? না কি তাদের অহংভাব বিভেদের মূলে ছিল? নিজস্ব প্রাধান্যের জন্যই কি ঐরূপ প্রচেষ্টা তারা করত? যে কমরেড টাইফয়েডে ভুগছিল সে কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল এবং সেন্ট্রাল মিটিংয়ে অংশগ্রহণও করেছিল। প্রথম থেকেই সে আমাদের সেন্ট্রাল ডিসিশন গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সেন্ট্রাল ডিসিশনের বিরুদ্ধে মত সে প্রচার করতে ব্যস্ত হল। সেন্ট্রাল কমিটির পক্ষে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউ সমর্থ হয়নি। তাকে আমাদের সেন্ট্রাল এগজিকিউটিভের সঙ্গে কথা বলতে ডেকে আনা হয়েছিল। সেখানে আমাকেও উপস্থিত থাকতে হয়। সে ত প্রথম থেকেই খুব চটেছিল এবং আমাদের কোন কথাই তার ভাল লাগছিল না। সে তার বিরুদ্ধে মত খুব জোরের সঙ্গেই ব্যক্ত করছিল। আমি ছাড়া বাকী চারজন যারা ছিল, তারা প্রত্যেকেই তার সম্বন্ধে বলল—তার সঙ্গে আর চলা যাবে না, তাকে বাদ দিয়েই চলতে হবে। তবু আমি শেষ চেষ্টা করে দেখব বলে মত প্রকাশ করলাম। দিন সাতেক খুব সহানুভূতির সঙ্গে তার কথা শুনলাম এবং আমার কথাগুলোও খুব সহানুভূতিসহকারে তার কাছে রাখলাম। যেসব কথা সে আগে শুনতে চায়নি, ফুঁকারে উড়িয়ে দিয়েছে, সে কথাই সে আমার কাছ থেকে সব শুনে একমতও হল। তারপর তার সঙ্গে সেন্ট্রাল কমিটি আবার আলোচনায় বসল এবং খুব আনন্দের সঙ্গে সেন্ট্রাল কমিটি একটি কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করল। ট্রেনিং ক্লাশটিই খোলার জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কর্মসূচীর অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ট্রেনিং ক্লাশের বিশদ একটি খসড়া অনুমোদিত হয়। দুদিন পরে এই কর্মসূচীর খসড়াটি আমাদের কাছে লিখিতভাবে উপস্থিত করার জন্য ফিল্ড কমান্ডারকে ভার দেওয়া হয়েছিল। স্থির,

সময় ও দিন ঠিক করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ দিনটিতে কেন্দ্রীয় কমিটির সবাই ঠিক সময়ে উপস্থিত হন। কিন্তু যার উপরে ভার ছিল খসড়া কর্মসূচী লিখিতভাবে উপস্থিত করার সেই ফিল্ড কমান্ডার সময়মত এসে পৌঁছলেন না। আমরা তখন আকুল হয়ে ভাবছিলাম—কেন দেরী হচ্ছে? কেন সময়মত আসছে না? অসুখ করেছে কি?

প্রায় দু ঘন্টা পরে ফিল্ড কমান্ডার এসে উপস্থিত হল। খুব গম্ভীর। তাকে দেখে খুব চিন্তিত মনে হল। কিন্তু এ কি হল? ছ' মাস পরে এত ঝগড়াঝাটি ও মন কষাকষির পর যদিও আমরা একমত হয়েছিলাম, তার পরেও ফিল্ড কমান্ডার এসে অগ্নি উদ্গীরণ করতে লাগল, 'আমরা এ কি করতে যাচ্ছি? আমি যতই ভেবেছি ততই আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়েছে, আমি সারারাত কেঁদেছি। একি, আমাদের ক্লাশ করতে হবে? কি ক্লাশ করব? তিনি ক্লাশ নেবেন, আর আমরা সব হাঁ করে বসে থাকব? কি নতুন কথা তিনি বলবেন যে, আমাদের সেখানে বসে বসে শুনতে হবে? এ আমার একেবারে অসহ্য মনে হয়েছে।'

তাছাড়া যে কমরেড টাইফয়েডে ভুগে উঠেছে, তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সে কতগুলো কথা বলেছিল। তক্ষুনি সেই কমরেড রেগে উঠে বলল, 'আমি জানতাম আপনার সঙ্গে আমার এইরকমটি একদিন হবে। তা দেখছি আজই হল। আমরা এখনই নিজ নিজ পথে চলে যেতে পারি। প্যাচ-ওয়ার্ক করে দল রেখে কোন লাভ নেই।'

এতদিনের পরিশ্রমের পর যদিও সংগঠনটি এক কর্মসূচী নিল, কিন্তু পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে, মনে হল এই ক্ষণিক আশাটি বোধহয় বিলীন হয়ে যাবে। তবুও তাদের বোঝাবার জন্য সবাই কিছু কিছু চেষ্টা করল। আমিও যতদূর পারি চেষ্টা করেছিলাম। যার উপরে কোন ভরসাই করতে পারিনি সেই অসুস্থ কমরেডেরই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখলাম। যে আমার সব কথাই মেনে নিল। তখন আমাদের চোখে ফিল্ড কমান্ডার ছোট হয়ে গেল। আমার মনে হয় ফিল্ড কমান্ডার এর জন্য নিজে দায়ী। কোন এক অবসর সময় ফিল্ড কমান্ডার নিজে বিশ্লেষণ করে বুঝবে এই কথা ঠিক কি না।

আমাদের অর্গানাইজেশনে বাইরের কাঠামো দেখে আপাতদৃষ্টিতে সবারই হয়ত মনে হবে সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর আমাদের অর্গানাইজেশনটি খাড়া হয়েছিল। কেবল বহিঃপ্রকাশ দেখে মনে হবে অর্গানাইজেশন খুবই শক্তিশালী ছিল, কিন্তু সেন্ট্রাল কমান্ডে মনের দিক থেকে সবাই একমত ছিল না। তাই তারা ছিল খুবই দুর্বল।

কোন অর্গানাইজেশনই সবল হতে পারে না, যদি তার ভিতরের বনিয়াদ শক্ত না হয়। আমাদের অর্গানাইজেশনে সংগঠকরা দুর্বলতা মুক্ত ছিল না এবং তাদের বিবাদ ও কলহ দিন দিন বেড়েই গিয়েছিল, কখন কমেনি। তার অবশ্যম্ভাবি ফল হিসাবে তাদের গুপ্ত দল বিবাদে বিসম্বাদে ভেঙ্গে গিয়েছিল। প্রধানত তিন অংশে তারা বিভক্ত হয়। তারপর প্রত্যেক অংশের মধ্যেও মতভেদ দেখা দেয়।

(৯)

আমরা সংগঠন বিশৃঙ্খলার পুরো-দস্তুর আভাস ও ইঙ্গিত পেলাম। নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য অতি ক্ষুদ্র বিপ্লবী সংগঠনেও যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে ছিল। প্রত্যেকেই যেন নভোমণ্ডলের নীচে একাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের নিখুঁত সমঝদার। নিজেদের ভেতরে তিক্ততা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। তিক্ততা রোধ করার ক্ষমতা কারও ছিল না। স্বার্থের প্রশ্ন যখন দেখা দিল, তখন বিপ্লবের আদর্শ কাকে ধরে রাখতে পারল না। বিপ্লব ভেসে যাক, তবু তারা নিজ স্বার্থই তার কাছে প্রধান।

মন কিভাবে বিষিয়ে যায় এবং সেই-রকম ব্যাধিগ্রস্ত মনের উপর পুলিশের প্রভাব কিভাবে পড়ে তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজসাক্ষীর কথা একটু বলি। ৫৬ নং রাজ-সাক্ষী তার দরখাস্তে লিখেছিল: আমি ১৯৬৭ সালে যখন ভাড়া বাড়িতে থাকতাম তখন আমি মোটর পার্টসের ব্যবসা করতাম। আমি হারুকে ওরফে হারাধন দাসকে চিনতাম। সে আমাদের পাড়ায় থাকত। সে আমাদের বলত ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব হতে হবে। এই নিয়ে সে আমাকে কদিন ধরেই সশস্ত্র বিপ্লব কেমন করে ঘটাতে হবে বুঝিয়েছিল। সে আরও বলেছিল ইণ্ডিয়ার রেভলিউশনারী কমিউনিস্ট কাউন্সিলের সে দপ্তরের একটি কর্মসূচী আছে। এই বলে সে আমার কাছে জানতে চায় যদি সেরকম কোন দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ তার আসে তবে সে যোগ দেবে কিনা এবং আরও বলেছিল, যদি আমি সেরকম ইচ্ছা প্রকাশ করি, তবে সে দলের বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। আমি হারুকে তক্ষুনি বললাম, আমি এইরকম বিপ্লবী দলে নিশ্চয় যোগ দিতে চাই।

আমার কথা শোনার পর হারু একটু ভেবে নিয়ে বলল, তাহলে আর দেরী করব না তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কিন্তু তোমার একটা কাজ করতে হবে—যে দিনটির কথা বলছি, সেদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় তোমার চৌরঙ্গি হোটেলে যেতে হবে। যিনি ঐ দলের নেতা তিনি সেদিন ওখানে তোমার সাথে দেখা করতে আসবেন। হারু আমাকে অ্যাট্র্যাকটিভ শার্ট পরে যেতে বলল আর বলল যে লিডার আসবে তার শার্টের বুক পকেটে থাকবে গোল্ড ক্যাপের পেন। এটাই হবে তাঁকে চিনে নেওয়ার চিহ্ন। আমি যেন তার কাছে গিয়ে একটি দেশলাই চাই।

এই কথা মত ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কোন একদিন সেই হোটেলে যাই। সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট একজন এলেন। তার বুক পকেটে দেখলাম গোল্ড ক্যাপের পেন রয়েছে। বুঝলাম তিনিই হবেন দলের নেতা। আমি তার কাছে গিয়ে দেশলাই চাইলাম। তিনি আমাকে বুঝে নিয়ে দেশলাই দিলেন এবং বললেন চলুন আমরা ভিতরে গিয়ে বসি।

ভিতরে একটি কেবিনে আমরা দুজনে মুখোমুখি বসলাম। বসার পর আমি আমার নাম তাঁকে বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমাদের প্রত্যেকেরই একটি করে ছদ্মনাম আছে, তোমাকেও একটা ছদ্মনাম নিতে হবে। অর্গানাইজেশনে তুমি সেই নামেই সবার কাছে পরিচিত হবে। সবাই জানে আমার নাম সুব্রত রায়। তোমার নাম হবে ইন্দ্রজিৎ কাপুর। তারপর তিনি আমার সঙ্গে সাধারণ রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলেন এবং বিশদভাবে বললেন রুশ ও চীন দেশের বিপ্লব সম্বন্ধে। তারপর টেনে নিয়ে বললেন, ভারতবর্ষ আমাদের সেইরূপ বিপ্লবই করতে হবে এবং তা করতে গেলে চাই মানুষ অর্থ এবং অস্ত্র। তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছিলেন পার্টিতে তোমার বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে হলে প্রথমেই তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে অর্থ ও অলংকারাদি এনে দিতে হবে, তা তুমি কি পারবে?

আমি শুনে জবাব দিয়েছিলাম আমার কলকাতার বাসা থেকে তা আনা সম্ভব নয়। যদি পারাবারে নিজেদের বাড়িতে যেতে পারি তবে সেখান থেকে হয়ত কিছু টাকা আমি আনতে পারব।

সেই নেতাকে আমি বুঝিয়ে বললাম, বে-আইনীভাবে আপনার কথামত আমার কলকাতার বাড়ি থেকে বৎসামান্য টাকা ও গহনা হয়ত আমি আনতে পারতাম, কিন্তু তা যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমার মনে হয় না। তার থেকে অনেক সহজ উপায়ে দেশের বাড়ি পারাবার থেকে আমি তা আনতে পারি। এবং তা নিয়ে গোলমালও তেমন হবে না। কাজেই আমি বলি কি আমাকে দেশের বাড়িতে যাবার অনুমতি দেওয়া হোক যাতে আমি বেশ কিছু টাকা ও গহনা আনতে পারি। দেখলাম সেই নেতার মুখ হাসিতে ভরে গেল। তিনি তাতে মত দিলেন। আমরা এবার সেখান থেকে উঠে পড়লাম।

১৯৬৭ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে কিছু টাকা যোগাড় করে পারাবারে গেলাম। বাড়ি থেকে বেশী কিছু নিতে পারলাম না, নগদ মাত্র ৮০০ টাকা নিলাম। আমি হারু মারফৎ সুব্রতবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম সুব্রত বাবুর সঙ্গে সিমলা হোটেলে দেখা করবার। সিমলা হোটেল আমাদেরই লোকালিটিতে ছিল। আমার কথা অনুযায়ী সেই টাকা সুব্রতবাবুকে আমি দিলাম। তিনি আমাকে বললেন আমি যেন সেই সম্পূর্ণ সময় ক্লাসিস্ট পার্টির ভ-

সঙ্গে দেখা করি। আমি সেই সন্ধ্যায় আলী-ঘাট পার্কে সুব্রতবাবু ও অন্য আর এক-জনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সেখানে আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল—দিলীপ পরেশ, সুকান্ত, অরবিন্দ ও হারু। সুব্রত রায় বললেন, তোমাদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি হল আর এই গ্রুপের চার্জে থাকবে দিলীপ। এই গ্রুপ আর সি সি আই-এর নির্দেশ মেনে চলবে। এই কথা বলে সুব্রতবাবু চলে গেলেন। আমরা পরে কোন একটি মিটিংয়ের দিন ঠিক করে বাড়ি গেলাম।

আমার যতদূর জানা আছে অন্যান্য সদস্যরাও নিজেদের বাড়ি থেকে টাকা ও গহনা এনে দিয়েছিল। আমি এই গ্রুপের কারো কারো সঙ্গে তাদের বাড়ি যাই এবং তারা যা টাকা ও গহনা এনে দিয়েছিল তা আমি গ্রুপ কমান্ডারকে পৌঁছে দিই। সেই সব টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হয়েছিল। কিছু অলংকারাদি বিক্রয় করা হয়েছিল এবং বাদ বাকী গহনা মজুত রাখা হয়েছিল পরবর্তীকালে সুবিধামত বিক্রয় করার জন্য। আমি নিজের কাছে কোন গহনা বা টাকা কড়ি কিছু রাখিনি। আমাদের গ্রুপ-ইন-চার্জ দিলীপের কাছে শুনেছিলাম—১৯৬৭ সালে আমাদের পার্টির ন্যূনতম খরচ সভ্যদের দেওয়া গহনা ও টাকায় কোনমতে মিটেছিল।

১৯৬৮ সালের শুরুতে সুব্রত রায় আমাদের ডেকে বলেছিলেন পার্টির ফান্ড বাড়াবার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম নিতে হবে। যারা প্ল্যানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে তারা ছাড়া আর কেউ সেই প্ল্যানের কথা জানতে না। সেন্ট্রাল কমিটি ঠিক করবে নতুন প্ল্যান কার্যকরি করার জন্য অংশ গ্রহণ করবে। সেই সময় যে সেন্ট্রাল কমিটি ছিল তার মেম্বার হলেন অনন্ত সিং ওরফে ওল্ড গার্ড ওরফে অবিনাশ। অন্যান্য মেম্বার যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সুব্রত রায়, দীপু, মনু, সরকারদা, শ্যামলদা, পরেশ।

১৯৬৮ সালে লেক প্লেসের আমি পরিচিত রূপবান নাম নিয়ে একটি ঘর মাসিক ১০০ টাকায় লীজ নিলাম। বাড়িওয়ালার কাছে নিজেকে একজন ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। তাকে বলেছিলাম ব্যবসার জন্য আমাকে মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হতে পারে। এখন আমি সেই বাড়ির কথা মনে করতে পারছি না। প্রথমে ঠিক হয়েছিল পরেশ ওখানে থাকবে। পরে ঠিক হয়েছিল সেই বাড়িতে বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা হবে। তারপর আমরা নিজেরা ঠিক করেছিলাম পরেশের সাথে হারু ওরফে গান্ডও সেখানে থাকবে।

এই বাড়িটি পার্টির কাজে ব্যবহার করতে দিয়ে আমি নিজে আমার ভবানীপুরের বাড়িতে থাকতাম। পার্টির কাজে সক্রিয় ও যুক্ত থাকায় আমি নিজের মোটর সেল্স ব্যবসা করতে পারতাম না। ঠিক হয়েছিল সদস্যদের ১০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হবে। আমি পেতাম ১০০ টাকা পেতাম। তারপর সময়ে ধরে আমি পার্টি থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। তারপর আমার সঙ্গে পার্টির খুব সামান্যই যোগাযোগ ছিল বললেই চলে। ১৯৬৮ সালে আমাদের পাড়ায় সকাল সময় সন্তে নটার সময় হারু আর মণিকুন্তলা দেখলাম ট্যাক্সি করে এসে হারু বাড়ির সামনে থামল। হারু ট্যাক্সি থেকে নেমে তার বাড়িতে ঢুকলো। প্রায় দশ-পনের মিনিট পরে হারু একটি সুটকেশ হাতে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠলো। সেই সময় আমাকে দেখতে পেয়ে হারু বলল, হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে তা আমি জিজ্ঞেস করিনি। বুঝে নিয়েছিলাম ডাকাতি একটা করেছে। কারণ বহুদিন ধরেই শুনছিলাম হাতে টাকা নেই, ডাকাতি হবে। কিন্তু ডাকাতি না হওয়ার জন্য আমি একটু ভগ্নোৎসাহী হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। তাই হয়ত হারু আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সেই কথাটি আগে-ভাগেই বলে গেল—হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের একটি গ্রুপ মিটিং ছিল। বহুদিনই আমি গ্রুপ মিটিংয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু একটা হবে কিছু একটা করব—এইসব কথা রোজ বোজ আর কত শোনা যায়—কিছুই হবার নয় সেই, কুড়ি কুড়ি কেবল কথা। তাই আমি আর মিটিংয়ে যেতাম না। হয়ে গেছে শুনে উৎসাহিত হয়ে ছিলাম। দু-এক মুহূর্তের ভিতরে সারা কোলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে লোমহর্ষক এক দুঃসাহসিক ডাকাতির কথা। সন্ধ্যায় গ্রুপ মিটিংয়ে গেলাম। সেখানে দিলীপ পার্ক স্ট্রীট পোস্টাফিস অ্যাক্টের ডাকাতির বিস্তারিত বর্ণনা দিল আর বলল এই ডাকাতি আমাদের পার্টির ছেলেরাই করেছে। আমরা সবাই উৎসাহিত হলাম এবং মিটিং শেষে বাড়ি ফিরে এলাম।

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে আমাদের গ্রুপ-ইন-চার্জ আমাকে বললেন, তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিশ হারুর বাড়ি সার্চ করতে পারে, আর যেহেতু তুমি হারুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাই তোমাকেও অ্যারেস্ট করতে পারে। আমি বাড়ি থেকে চলে গেলাম। সেই সময় আমার বিশেষ কাজ ছিল দলের জন্য বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভাড়া করা। বাড়ি পাওয়া কিন্তু সহজ ব্যাপার ছিল না বাড়িওয়ালারা সহজে যাকে তাকে বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। তারা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ চায় প্রতি মাসে ভাড়া দেওয়ার সংস্থান আছে কিনা। যদি কোন অফিসে চাকরি হয় তবে সেই প্রশ্নের জবাব সহজে তারা পেতে পারে। কিন্তু সেইরূপ বয়স আমাদের কমরেডদের কারো ছিল না। চাকরি না হয়ে আমাদের ব্যবসাদার সেজেই যেতে হত। বাড়িওয়ালা কেউ ব্যবসাদার তা জানবার জন্য চেষ্টা করতেন। কাজেই বাড়ি চাইলাম—বাড়ি ভিজে দিয়ে—জল নয়। প্রত্যেকটি বাড়ির জন্য ৪ রকম কাগজপত্রে সই করতে হয়েছে। এইসব জমা করতে প্রচুর সময় লেগে কিন্তু না করে উপায়ও ছিল না। আমরা অনেকগুলো ছোট ও মাঝারি ধরণের বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। আমাদের গ্রুপে আমরা কেবলমাত্র কষ্ট করে বাড়ি যোগার করেছি তেমনি অন্য গ্রুপের ছেলেরাও দলের জন্য বাড়ি যোগাড় করেছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় কাজের জন্য বড় বাড়ি নিশ্চয় যোগাড় করা হয়েছিল তবে তা দলের নেতারাই জানতেন।

ভেবে দেখুন, যদি দলের জন্য পঞ্চাশটি বাড়ি ভাড়া করা হয় এবং যদি বাড়ি ভাড়া গড়ে মাসিক ২০০ টাকা হয়, তবে প্রতি মাসে নটি ১০,০০০ টাকা বাড়ি ভাড়ায় চলে যায়। আর এইসব বাড়িতে আড্ডা করা কার্যকরিতার জন্য প্রতি মাসের খরচ অন্তত ৫০০০ টাকা। যদি ১০টি মোটর গাড়ী দলে থেকে থাকে, তবে প্রতিটি গাড়ীর জন্য খরচ অন্তত কমপক্ষে মাসে হাজার টাকা। তাহলে ১০টি গাড়ীর জন্য মাসে কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা খরচ হয়েছে।

আমরা কয়েকটি সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ী দলের জন্য কিনেছিলাম। তার জন্য খরচ হয়েছিল অন্তত বার-সত্তর হাজার টাকা। একটি মোটর কেনা, হয়েছিল তার জন্য প্রায় এককালীন হাজার দেড়-দুই টাকা খরচ করতে হয়। মাঝি রাখতে হয়েছিল। নতুন মোটর গাড়ী বসিয়ে রাখা হোত না। সেই মোটর গাড়ী দিয়ে গাড়ী চালানো শেখানো হত। সঙ্গেই তিনজন ড্রাইভারকে রাখা হত। এই তিনজন ড্রাইভার ও মাঝির বেতনের জন্য মাসে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা লাগত।

আমাদের প্রধান খরচ ছিল সক্রিয়দের জন্য বেতন দেওয়া। কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতিতে বেতন দেওয়ার প্রচলন আছে। সব সময়ের কর্মী ও পার্ট-টাইম কর্মীকে আমাদের বেতন দিতে হত। এই বেতনের হার নির্ধারণ করেছিলাম তাদের কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী। আমাদের কর্মীরা ছাড়াই গৃহস্থালী এবং তারা মতামত গ্রুপে কাজ করছিল। কাজেই তাদের নৈতিক অধিকার ছিল পরিমাণমত নিয়মিত বেতন নেওয়া। কেউ টাকার অভাবে চাকরি কিংবা টিউশানি করুক, সেটি আমি চাইনি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যদি প্রতি মাসে ৪০০ টাকা ৫০০ টাকা বেতন নিতে পারে, তবে আমাদের কমরেডদের তার চেয়ে কম দেওয়া উচিত নয়। তারা ফ্রন্ট লাইনে থাকে—যুদ্ধ করবে প্রাণ দেবে, তাই তাদের নৈতিক অধিকার অনেক বেশী। টাকার অভাব থাকলে বিপ্লবাত্মক সংগঠনে কেউ না কেউ পুলিশ হয়েও যেতে পারে। সেইজন্য এই সব প্রশ্ন মনে রেখে প্রত্যেকের বেতন ঠিক করেছিলাম যা গড়ে অন্তত তিনশ টাকা করে পড়ত। যদি সত্তরজন কমরেডকে মাসে গড়ে তিনশ টাকা করে দিয়ে থাকি তবে

মাসে খরচ দাঁড়ায় ২১০০০ টাকা এখন মোট খরচ—	
বাড়ি ভাড়া	১০,০০০ টাকা
ফার্নিচার ভাড়া	৫,০০০ "
গাড়ীর খরচ	১০,০০০ "
ড্রাইভার ও মাঝির বেতন	১,৫০০ "
কমরেডদের বেতন	২১.০০০০ "
প্রতি মাসে মোট খরচ	৪৭.৫০০ টাকা

এর সাথে এককালীন খরচ—মোটর গাড়ীর জন্য ৭০,০০০ টাকা আর নৌকোর জন্য ২,০০০ টাকা।

এখন স্বীকার করতেই হবে আমরা পোস্টাল ভ্যানে ডাকাতির পর ছয়-সাত মাস কেবল তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করলাম, সেই নৈতিক অধিকার আমাদের ছিল না। কোন কাজের কাজ না করেই কিন্তু প্রতি মাসে আমাদের ৪৭,৫০০ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছিল।

যে টাকার হিসাব আমি দিলাম, সেটি আমি কোন খাতা দেখে দিইনি, মনে মনে হিসাব করেই দিয়েছি। কোন খাতে হয়ত বেশী ধরেছি আবার কোন বিষয় হয়ত উল্লেখই করিনি। যেমন নাকি মোটর গাড়ী ছাড়ার পাবচেজে কেনার প্রতি মাসে কিস্তির সেটার উল্লেখই করিনি। আমি স্থূলভাবে হিসাব করে দেখিয়েছি মাসে কত টাকা খরচ হত।

পোস্টাল ভ্যান ডাকাতির সাত মাস পরে স্বভাবই অর্গানাইজেশনের উপর চাপ এলো টাকার জন্য। ফান্ড শর্ট—টাকা পেতেই হবে। কারণ কোন বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া বাকি রাখবে না। হায়ার পারচেজের কিস্তির টাকা বাকী রাখা চলে না। আমাদের ওয়েজ কিংবা বেতন দিতেই হবে, কম বাকী রাখা যায় না—তবে সেখানে আমরা টাকা কম দিতে পারি কিন্তু সেভাবে জোড়াতালি দিয়েই বা কদিন চলবে। এই ভাবে এইরকম অর্গানাইজেশন চলতে পারে না। আমরা ক্রমশই একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছালাম। আবার তোড়জোড় করতে হল—ডাকাতি করতে হবে। ভাবা হয়েছিল যদি রেলের ৪০-৪৫ লক্ষ টাকা একবারের ডাকাতিতেই পেয়ে যাই, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাকাতিতে ঝুঁকি নিতে হয় না। সেইজন্য চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার যে সন্ধানটি আমাদের কাছে ছিল সেটিকে বেছে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য সক্রিয় পরিকল্পনা মত আমরা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। চলার পথে আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে লাগলাম। আমারই এই সক্রিয় গ্রুপের বাছাই করা কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ার ভার ছিল।

এইটি একটি অতি দুঃসাহসিক ডাকাতির প্ল্যান। টাকার ভ্যানের আগে ও পিছে দুটি মোটর ভ্যানে মিলিটারী রাইফেল নিয়ে সি আর পি সৈন্য থাকত। এই কনভয়টি অপেক্ষাকৃত খুব নির্জন পথ দিয়েই যেত। আমরা এমন স্থান বেছে নিয়েছিলাম যেখানে সামনের ও পিছনের মিলিটারী ভ্যান দুটিকে খুব চতুরতার সঙ্গে আলাদা করে ফেলতে পারি। দুটো ভ্যান আলাদা করার পর আমাদের সুরক্ষিত আর্মাড কার টাকার ভ্যানটিকে সামনে থেকে আটক করত এবং আমাদের এই আর্মাড কার থেকে লাউডস্পীকারে আদেশ করা হত: গাড়ী থামাও। যারা আছ তারা বন্দুক গাড়ীর ভিতর ফেলে রেখে হাত মাথার উপরে তুলে গাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও। যদি একটু বিলম্ব কর তবে আমরা স্প্রে করে সালফিউরিক অ্যাসিড ছড়াব।

ঐদিকে যে ভ্যানকে আলাদা করার কথা তাদেরও নিরস্ত করার জন্য লাউড-স্পীকারে আদেশ দেওয়া হোত: অস্ত্র ফেলে সবাই এক্ষুনি বেরিয়ে যাও, নইলে বিপদ আছে। ভ্যান আমরা উড়িয়ে দেব। দুটি ল্যান্ড টর্পেডোর ব্যবস্থা আমরা রাখতাম। বেগতিক বুঝলে সেগুলো ভ্যানের নীচে গিয়ে ফেটে সি আর পির ভ্যান ধ্বংস করত। এইসব কিছুরই প্রয়োজন হোত না, যদি আমরা লাউডস্পীকারের মাধ্যমে আমাদের আদেশ যন্ত্রনির্ঘোষ কণ্ঠে তাদের শোনাতে পারতাম।

কাজেই এই ডাকাতি করার জন্য আমাদের এক বিরাট প্রস্তুতি, আয়োজন ও ট্রেনিং চলছিল। এক-একটি সমস্যা চোখের সামনে পড়েছে এবং তা সমাধান করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যেমন, লাউড স্পীকার দিয়ে হুকুম দিতে হবে—সেই জন্য লাউড স্পীকার কেনা হবে, বসানো হবে এবং ট্রায়াল দিয়ে দেখতে হবে। আবার ধরুন ঠিক হল অ্যাসিড স্প্রে করে গাড়ী থেকে সশস্ত্র পুলিশ বা সেপাইদের বার করে দিতে হবে। তার জন্য কোথায় উপযুক্ত স্প্রে পাওয়া যায় খোঁজ নিতে হবে এবং অ্যাসিডের বদলে জল স্প্রে করে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে হবে বাস্তবে তা কতখানি কার্যকরী হচ্ছে। যেসব কমরেডরা এই গ্রুপে ছিল, তাদের ট্রেনিংয়ের মধ্যে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধেও বলা হত। এইসব ক্লিনিসপত্র যোগাড় ও ব্যবহার করার নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার প্রয়োজন হত।

এই প্রস্তুতি পর্ব চলাকালে প্রত্যেক

কমরেডের মানসিক প্রতিক্রিয়া বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হত, যখন একটি বাস্তব চিত্র সামনে রেখে বলা হত একটি মোটর গাড়ীতে বিস্ফোরক দ্রব্য ভর্তি ব্যারাল নিয়ে গাড়ী চালিয়ে সামনা সামনি কোন এক মিলিটারী ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে, গাড়ীর চালক নিজে গাড়ীর সাথে উড়ে যাবে এবং মিলিটারী ভ্যান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। এ আর তেমন কিছু নয়। ২য় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা তাদের বেতনভোগী অল্পবয়সী সৈন্যদের এমনভাবে প্রস্তুত করেছিল, যেন তারা এরোপ্লেনে টর্পেডো নিয়ে যুদ্ধ-জাহাজের উপরে গিয়ে পড়ে। গর্বিত বৃটিশ নৌ-বাহিনী যখন সিঙ্গাপুরে এলো, তখন সেই নৌবহরের সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-জাহাজ 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্'-কে লক্ষ্য করে অল্পবয়সী জাপানী সৈন্যরা এরোপ্লেনের সঙ্গে টর্পেডো বেঁধে নিয়ে যুদ্ধ জাহাজটিকে আক্রমণ করল। একটি টর্পেডো বাঁধা প্লেন নিয়ে একজন জাপানী পাইলট সুনিশ্চিত মৃত্যু জেনে প্রিন্স অফ ওয়েলসের চোঙার ভেতরে ঢুকে গেল। পরক্ষণেই বিরাট বিস্ফোরণের সঙ্গে প্রিন্স অব ওয়েলস ভেঙে টুকরো হয়ে গেল এবং তার সলিল সমাধি হল।

ইংরেজের সঙ্গে জার্মানীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানী যখন নরওয়ে আক্রমণ করল, তখন নার্ভিক বন্দরে বৃটিশের সর্ববৃহৎ রণতরী 'ডানকার্ক' উপস্থিত হল। জার্মানীর বোমারু বিমান থেকে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণে 'ডানকার্ক' রণতরীটি নরওয়ের উত্তর উপকূলে কয়েক মিনিটের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেল। গর্বে ধরা করে নৌ-যুদ্ধ বিশারদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, উপকূলের সংকীর্ণ সাগরের জলে বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ ম্যানুভ্, করতে পারে না এবং সেই জন্য বোমার বিমানের প্রাধান্য থাকবেই। কিন্তু এই শিক্ষা বৃটিশ নাবিকরা গ্রহণ না করে তাদের অ আধুনিক যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' জাপানের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে পাঠালো। অ দর্পে হত লংকা। বৃটিশের গর্ব 'প্রিন্স অ ওয়েলস্' জাপানী বিমান বাহিনীর প্রচ আক্রমণে জলে ডুবে গেল। অনেকগুলো বিমান একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল, তা না বারুসেনার স্যুইসাইড স্কোয়াডের এক সৈনিক 'নির্ভিকচিত্তে জাহাজের লক্ষ্য করে তার ভিতরে নিজে ঢুকে যায়। জাপা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের স্বার্থে সে নিজে উৎসর্গ করল, কিন্তু তার সাহস ও বিক শিক্ষণীয় বটে। যা সাম্রাজ্যবাদী বেতনভো সৈন্য পারে, তা আমরা বিপ্লবীরা পারব হতেই পারে না। এইভাবে আমি আ বক্তব্য টেনিংয়ের সমস্ত অন্যান্য কমরেড কাছে রাখলাম।

চলো

প্রাচীন ভারতে কয়লা

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক সভ্যতায় বায়ু, মাটি ও জল ব্যতীত কয়লার মত এত প্রয়োজনীয় উপাদান প্রকৃতিতে আর কিছু আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই কৃষ্ণকায় মৃত্তিকাসার বস্তুটি যথার্থই একটি সুপ্ত ডাইনামো—বিরাট এক শক্তির উৎস। এই কয়লা—যা সাধুভাষায় মৃদঙ্গার বলে অভিহিত, বর্তমানে খনিজরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও বাস্তবে এর জন্ম হয়েছে কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সুশ্যামল ঘন বনসম্পদ থেকে, যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সূর্যের শক্তিরই কিছু অংশ এই কয়লা।

তাই মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, প্রকৃতির বহুমূল্য দান এই কয়লা—যা নিজে এত সুপ্রাচীন, মানব জাতির ব্যবহারে সর্বপ্রথম কখন আসে?

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী শবদাহের জন্য কয়লার ব্যবহার হোতো তিন চার হাজার বছর আগে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত ওয়েলসের গ্ল্যামোরগান সায়ারে। কয়লার আগুনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে ১২১ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন রোমার দুর্গে ও হেড্রিয়ান প্রাচীন সংলগ্ন ঘরবাড়ীর ধ্বংস স্তূপে। প্রাচীনকালে রোম ও গ্রীসেও কয়লার প্রচলন ছিল। খৃষ্ট যুগের পূর্ব হতেই চীন দেশে কয়লা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হোতো। মার্কোপোলোর অভিযান সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, লিউ আন্ নামে এক ব্যক্তি (খৃষ্টপূর্ব ১২২ সালে যাঁর মৃত্যু হয়েছিল) চীনা সাহিত্যে কয়লার উল্লেখ করেন। তিনি কয়লার নাম দিয়েছিলেন আইস-চারকোল বা তুষার-অঙ্গার। চীনের কাথে প্রদেশে খনি হতে আহরিত ও জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত কালো পাথরের কথা মার্কো পোলো (১২৭৫ খৃঃ) এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

'এই প্রদেশের সর্বত্রই এক প্রকার কালো পাথর পাওয়া যায় যাহা তাহারা পর্বতগাত্র হইতে খনন করে। অগ্নি সংযোগ করিলে ইহা কাঠকয়লার মত জ্বলিয়া উঠে, কাষ্ঠের চাহিতেও ইহার দাহিকা শক্তি বেশী, সারারাত্রি জ্বলিয়াও নির্বাপিত হয় না, পরদিন সকালেও জ্বলিতে দেখা যায়। জ্বালাইবার প্রথম অবস্থা ছাড়া এইসব পাথরে শিখা হয় না, কিন্তু ইহারা অতি অধিক মাত্রায় তাপ প্রদান করিয়া থাকে।'

'ইহা সত্য যে এই দেশে কাষ্ঠের অভাব নাই, কিন্তু জনসংখ্যা এত বহুল এবং তাহাদের চুল্লী ও স্নানাগারের সংখ্যা এতই অধিক যে শুধু কাষ্ঠ হইতেই তাপ উৎপন্ন করিবার পূর্ণ চাহিদা তাহাতে মিটে না। এমন কোনো ব্যক্তি নাই যিনি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন উষ্ণ জলাধারে স্নান না করেন। প্রতি ধনী ব্যক্তির গৃহেই উষ্ণ স্নানাগার আছে। তাই সঞ্চিত কাষ্ঠের পরিমাণে ঘাটতি অবশ্যই হইবে। অপরপক্ষে এই কালো পাথর কম মূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে।'

প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ১০৬৮ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে নরম্যান আক্রমণের পর মঙ্ক সম্প্রদায় একাদশ শতাব্দীতে লৌহ উৎপাদনের জন্য কয়লা ব্যবহার করতেন এবং এই কাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

তাই মনে প্রশ্ন জাগে, সভ্যতায় এত সুপ্রাচীন হয়েও আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ কি কয়লার আবিষ্কারে এতই পিছিয়ে ছিল? ইংরেজই কি ভারতের মাটিতে কয়লার আলো প্রথম জ্বালিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতেই?

ভূতত্ত্ববিদ মি এইচ হাটম্যান সাহেবের অন্ততঃ সেই রকমই ধারণা ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন :

'এমন কোনো প্রমাণ নাই যে, গ্রীক ও রোমানেরা কয়লার ব্যবহার জানিতেন, এমন কি কোনো আধুনিক জাতিও এখনও পর্যন্ত ইহা ভালভাবে কাজে লাগাইতে পারে নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৃতীয় হেনরির রাজত্বকালে ইংলন্ডে সর্বপ্রথম কয়লার ব্যবহার হইয়াছিল।

ইংলন্ডে বা ইউরোপেই যখন কয়লার ব্যবহার এত পরে হইয়াছিল ভারতবর্ষে যে ইহার আবিষ্কার আর পরে হইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।'

এইচ, ডি, মি, হামফ্রে সাহেব তাঁর 'বাংলাদেশে কয়লাখনির ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধে একথা অবশ্য মানতে রাজী হন নি। তিনি লিখেছেন।

যদি বাণীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কয়লা আহরণ কার্যের গোড়াপত্তন হইয়াছিল ১১ই আগষ্ট, ১৭৭৪ খৃঃ যখন জন সামনার ও এস জি হিটলী বঙ্গভূমিতে কয়লা খনন ও বিক্রয়ের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিয়াছিলেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে বঙ্গদেশ ও বীরভূমের লোকেরা কয়লার অবস্থিতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক পূর্ব হইতেই অবহিত ছিলেন। স্যার সিরিল ফক্স অবশ্য তাঁর 'ঝরিয়া কয়লা-ভূমির অভ্যুত্থান' শীর্ষক নিবন্ধে দাবী করেন যে জ্বালানিরূপে কয়লার ব্যবহারে ভারত পাশ্চাত্য দেশগুলিরই অনুসরণ করে। ইহা ঠিক নহে, কারণ, কয়লা খনি অঞ্চলে এমন কয়েকটি স্থানের নাম বহু যুগ হইতেই প্রচলিত আছে যাহা কয়লা বা খনি ইত্যাদির সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে জড়িত। যেমন 'রবাকর'—এটি সংস্কৃত নাম, অর্থ বর বা শ্রেষ্ঠ আকর, আকরের অর্থ খনি বা খনিজ। আর একটি স্থানের নাম কালি পাহাড়ী যাহার মানে কালো পাহাড় বা কয়লার পাহাড়। আসার-পাথরা (বা অঙ্গার প্রস্তর) এইরূপ আর এক একটি স্থানের নাম। স্বভাবতই স্থানের এই প্রকার নাম প্রমাণ করে যে, সামনার ও হিটলী সাহেবের বহু পূর্বেই এই সব অঞ্চলে স্থানীয় লোকেরা কয়লা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। আর একটি নাম 'দামোদর' যাহা নিঃসন্দেহে সংস্কৃত ভাষার অন্তর্ভুক্ত। এই দামোদর নদীর উপকূলেই প্রথম ব্যবসায়-ভিত্তিক কয়লা খনি নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং রেল লাইন পাতিবার পূর্বে শুধু এই দামোদর নদীর মাধ্যমেই কলিকাতা পর্যন্ত কয়লা সরবরাহ করা হইত। এই সংস্কৃত

শব্দ দামোদরের প্রকৃত অর্থ 'উদরে যার আগুন'.....।

বর্ধমানের প্রাদেশিক অর্থদপ্তরের ১৫ আগস্ট ১৭৭৪ খৃঃ-এর একটি পত্র হইতে জানা যায় যে সামনার ও হিটলী সাহেব তাঁহাদের আবেদনপত্রে যে কয়লা অঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছিলেন সেই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন হইত এবং সম্ভবতঃ এই ব্যাপারে আঞ্চলিক কয়লাই ব্যবহৃত হইত।

বঙ্গদেশের প্রাচীন রাঢ়ভূমিতে এই লোহা এমন কি তামার নিষ্কাশনও ব্যবহার ব্যাপকভাবে ছিল। ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়দেশের জঙ্গল-বিবরণে আছে :

দ্বিজাগ-জাঙ্গলং তত্র গন্ধমশ্চৈবক ভাগকঃ
স্থলগা ভূমিরুর্বরা চ বহুলা চোষরা মতাঃ।।
রারী ...ী) খণ্ড জাঙ্গলে চ
লৌহধাতোঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ
আকরো ভাবিতা তত্র কলিকালে বিশেষতঃ।।

এই বিষয়ে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বিখ্যাত 'বাঙালীর ইতিহাস' পুস্তকে লিখেছেন :

'এখানে রাঢ়দেশের জাঙ্গলখণ্ডে লৌহ খনির উল্লেখ আমরা পাইতেছি। বাঁকুড়া, বীরভূম ও সাঁওতালভূমে তো এখনও জায়গায় জায়গায় লোহা আহরণ এবং লোহার তৈজসপত্র, গৃহোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তৈরি করা স্থানীয় দরিদ্রতর জনসাধারণের জীবন ধারণের অন্যতম উপায়। এসব জায়গায় লোহা গলানোর পদ্ধতিও প্রাগৈতিহাসিক।.....তাম্র বা তামা সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা।... আমার তো মনে হয় তাম্রলিপ্ত নামটির মধ্যেই এই তাম্র-জন্মভূমির স্মৃতি জড়িত। এই স্মৃতিও প্রাগৈতিহাসিক।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের খনিজ জগত প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—রস, উপরস ও রত্ন। রস বলতে সাধারণতঃ পারদকেই বোঝাতো। পারদ ছাড়া আরও আট রকম রসের উল্লেখ 'রসরত্ন সমুচ্চয়' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই আট রস হোলো : অভ্র, বৈক্রান্ত, মাক্ষিক, বিমল, শাদ্রক (শিলাজতু): সম্যক, চপল ও রসক।

বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী- যে চৌষট্টি কলার উল্লেখ আছে তার মধ্যে অন্যতম খনি ও আকর' বিষয়ে জ্ঞান।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র সোনা, রুপা সীসা, টিন এবং লৌহজাত খনিজ পদার্থগুলির বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। এই কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেই খনিকার্যের অধ্যক্ষের (বা মাইনস্ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কর্তব্যের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পন্ডিত রাধা-গোবিন্দ বসাক....ডাঃ মূল সংস্কৃত থেকে তা এই ভাবে অনুবাদ করেছেন :

অধ্যক্ষ প্রচার
দ্বাদশ অধ্যায়

৩০ শ প্রবরণ-আকর কর্মান্তের প্রবর্তন
'আকরাধ্যক্ষকে (খনি কার্যের অধ্যক্ষকে)

শুল্বশাস্ত্র (শাকলাদি ভূসিরা-বিজ্ঞান, অথবা যে শাস্ত্রে তাম্রাদি ধাতুকে সুবর্ণাদিতে পরিণত করিবার উপদেশ প্রদত্ত আছে সেই শাস্ত্র), ধাতুশাস্ত্র (অর্থাৎ যে শাস্ত্রে ধাতুর শক্তি বাড়াইবার উপদেশ বিহিত আছে); রস (রসোপনিষদাখ্য বিজ্ঞান, পাক (রসনাদি ধাতুর অগ্নিপচন কর্ম দ্বারা উৎকর্ষ সাধন জ্ঞান) ও মণিরাগ (মণি-সমূহের বর্ণ ভেদোৎপাদন কর্ম) এই সবের জ্ঞান-বিজ্ঞান জানিতে হইবে; এবং তাঁহাকে তত্ তৎ শুল্বশাস্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ লোকদিগকে কার্যার্থ সহায়রূপে লইতে হইবে, অথবা তাঁহাতে সেই সব দ্রব্যের কার্যে নিত্য উপযোগী কর্মকরগণ দ্বারা ও তৎ তৎ কর্ম-করণের উপযোগী (খনিত্রাদি) উপকরণ-সমূহ দ্বারা যুক্ত হইতে হইবে। (এই-রূপ সম্পদে সম্পন্ন) আকরাধ্যক্ষ ভূতপূর্ব আকরের ফিল্ট্ (লৌহমল); মূষা (সুবর্ণাদি গলাইবার ভাণ্ডাদি); অঙ্গার ও ভস্মরূপ চিহ্ন দেখিয়া এগুলিকে পরীক্ষা করিবেন, অথবা তিনি অভূতপূর্ব (নূতন) আকর, ইহার ভূমি (মৃত্তিকা); প্রস্তর ও বসের (জলপাষাণাদির) ধাতু বা সার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ইহার বর্ণ ও গৌরব (গুরুত্ব বা ভার) অত্যর্থ মাত্রায় বর্তমান থাকা দেখিয়া এবং ইহার গন্ধ ও রস তীব্র-ভাবে থাকা লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের এই বর্ণনায় কয়লা খনির কার্য বা কয়লার ব্যবহারের কথা স্পষ্টভাবে না থাকলেও 'অঙ্গার' শব্দটির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ অঙ্গার অর্থে আমরা কাঠকয়লা বুঝি, কিন্তু এই অঙ্গার যে পাথুরিয়া কয়লা ছিল না তা প্রমাণ সাপেক্ষ।

অঙ্গার শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। কয়লা সম্বন্ধে বিশ্বকোষের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা হোলো :

কয়লা। (হিন্দী) বৃক্ষাদির দগ্ধাবশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থকে এদেশে সাধারণতঃ কয়লা বলে। আপাততঃ কয়লা দুই প্রকার দেখা যায়, অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠাদির কয়লা আর ভূগর্ভোত্তলিত খনিজ কয়লা। খনিজ কয়লাকে সংস্কৃত ভাষায় 'মৃদঙ্গার' বলে, এবং কাষ্ঠের কয়লা অঙ্গার নামেই প্রচলিত। খনিজ কয়লাও ভূগর্ভস্থ অভ্যন্তর তাপে দগ্ধবিশিষ্ট বসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন বৃক্ষা-দিরই অবশিষ্টাংশ বটে। জীব শরীর হইতেও কয়লা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প। 'কয়লা' এই পদার্থের বাঙ্গলা নাম নহে, কয়লা হিন্দী নাম। যথা 'কয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ করে পরবেশ। ইহার সংস্কৃত নাম অঙ্গার 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।' এই অঙ্গার শব্দের অপভ্রংশ আঙার ইহার বাঙ্গালা নাম। এখন কয়লা নামই চলিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—

হিন্দী—কোয়লা, কয়লা
বাঙ্গালা—আঙার, আঙরা, কয়লা
দাক্ষিণাত্য—কোল্সা
গুজরাটী—কোয়লো বা কোলসো
সিংহলী—অঙ্গুরু
...."

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে এই কয়লার বিষয়ে আরও কিছু জানা যায় যেমন :

'কয়লা'—(প্রাকৃ-কোইলা । কোহেলা) চট্ : প্রাদে : 'কইলা। বি; অঙ্গার · অঙ্গার; দগ্ধ কাষ্ঠ

২। ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য বি;
কয়লা মাছ
৩। (প্রাদে:) কাষ্ঠাঙ্গার

'মৃদঙ্গার : (মৃৎ-অঙ্গার (ভূমধ্যস্থ অঙ্গার) বি, পার্থিবিয়া কয়লা

'আলত' : ১। মূলগত অঙ্গার ২। অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ ৩। পোড়া কয়লা

'আলত শিলা' : পার্থিবিয়া কয়লা'

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক্ আমাদের ভারতবর্ষ আরও পূর্বে অতি প্রাচীনকালে খনি ও ধাতুবিদ্যায় কতটা অগ্রসর ছিল।

ইংরেজীতে সম্পাদিত 'বৈদিকযুগ' পুস্তকে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সিন্ধু উপত্যকায় ব্যবহৃত স্বর্ণ আসতো কোলার স্বর্ণখনি ও অনন্তপুর জেলা থেকে। আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া এবং পারস্য দেশ রৌপ্য সরবরাহ করতো। মহেনজোদারোর সর্বনিম্নস্তরেও তাম্র ও ব্রোঞ্জের নিদর্শন পাশাপাশি পাওয়া গেছে। তাম্র আমদানি হতো সম্ভবতঃ রাজপুতানা বেলুচিস্তান ও মাদ্রাজ থেকে। ব্রোঞ্জের ব্যবহার হতে বোঝা যায় যে তৎকালে ধাতুবিদ্যা কতটা অগ্রসর ছিল।

প্রাচীন ভারতে ব্যাপকভাবে সীসার খননকার্য ও ব্যবহার হোতো এবং সিন্ধু উপত্যকা এই সীসা আমদানী করতো আফ-গানীস্থান থেকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা লোহের ব্যবহার জানতেন না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ইংরেজী ভাষায় লেখা 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে রসায়ন

মেঘদূতীয়ম্ – ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩০.০০
মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য – ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র ২০.০০
শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা – (সংকলন) – ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত ২৫.০০
• এছাড়া মুক্তধারা-র (বাংলাদেশ) প্রধান পরিবেশক
পুস্তিপত্র ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

শাস্ত্রের ইতিহাস' শীর্ষক পুস্তকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্বন্ধে আরও কিছু মূল্যবান তথ্য জানা জানা যায়, যেমন :

'খনিজ বা আকর হইতে তাম্র ধাতুর নিষ্কাশণ খনিগুলির সন্নিকটেই করা হইত। তৎপর ধাতুর শোধন হইত মাটির পাত্রে। মহেনজোদারোর ভগ্নস্তূপে ধাতুমলসহ এই সব মাটির পাত্রের ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই ধাতু নিষ্কাশনের কার্যে যে চুল্লী ব্যবহৃত হইত তাহা মাটির অভ্যন্তরে মাটির আকরে সাধারণ গর্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্য জাতীয় চুল্লী বা কিলনের সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, জ্বালানিরূপে অঙ্গার অবশ্যই ব্যবহৃত হইত। গর্তের তলদেশে অঙ্গারের স্তরটি সম্ভবত প্রথমে রাখা হইত ও তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত। তাহার উপর খনিজ আকর ও অঙ্গার পর পর সাজানো হইত এবং বায়ু সঞ্চালনের যথার্থ ব্যবস্থা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা হইত,

'বিজ্ঞানের ইতিহাসে' শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথা লিখেছেন :

'ভারতবর্ষেও তামের ব্যবহার সুপ্রাচীন। ঋগ্বেদে 'অয়স' নামে যে ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ তাহার দ্বারা তাম্র অথবা লৌহকে বুঝাইত। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার কথা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগে তাম্র নির্মিত কিছু কিছু দ্রব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ, নাগপুর, মাদুরা ও মহীশূর হইতে তাম্র ও পিতল নির্মিত অনেক অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিগট মনে করেন, রাজপুতানা, ছোটনাগপুর ও সিংভূম জেলা হইতে আগত তাম্র হইতে এই যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত। আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ভারতীয় সভ্যতা উদ্ভবের আদি পর্বে তাম্র ও পিতলের যে ব্যাপক ব্যবহার ছিল, অর্থাৎ নব্য প্রস্তর-যুগ হইতে লৌহযুগে পৌঁছিবার অন্তবর্তী সময়ে ভারতবর্ষকেও যে তাম্র ও পিতল-যুগের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। এমনকি পশ্চিম এশিয়ার পিতলকারদের তুলনায় ভারতীয় পিতলকারদের অনেক বেশী দক্ষতার নমুনা দেখিয়া অনেকে মনে করেন সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই পিতলের প্রথম আবিষ্কার ঘটে। .. .... তাম্র ও পিতল সংক্রান্ত ধাতুবিদ্যা আবিষ্কারের বহু পরে তথাকথিত তাম্র ও পিতলযুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।'

প্রাচীন তাম্রনিষ্কাশন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রীসেন লিখেছেন :

'... মারুত চুল্লীতে দিবার আগে তাম্র-খনিজকে প্রথমে পাথরের নুড়ি দ্বারা গুঁড়াইয়া গোবরের সহিত মাখিয়া তাল পাকাইতে এবং অপর একটি চুল্লীতে গালিত করিতে হইবে। তারপর উপযুক্ত পরিমাণ কাঠকয়লা, গালিত তাম্রখণ্ডিকা ও ধাতুমল হিসাবে কিছু লৌহ মারুত-চুল্লীতে সংস্থাপন করিয়া ইহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হয়..... ..।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' শীর্ষ ইংরেজী পুস্তকেও আভাস দেওয়া হয়েছে যে বিহারের সিংভূম জেলায় বহু যুগ থেকে খনি থেকে তাম্র আকরের আহরণ ও তাম্র নিষ্কাশন চলে আসছে। সম্ভবতঃ দু হাজার বছর আগেও তাম্রখনির অস্তিত্ব ছিল। রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্যেও তাম্র আকরের খনন ও তাম্র ধাতুর নিষ্কাশন প্রাচীনকাল হতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বসু সাহেব রচিত 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভূবিদ্যা' নামক পুস্তকে শেষের দিকে প্রচলিত এই তাম্র নিষ্কাশন পদ্ধতির কিছু বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

'.. কাদামাটির প্রলেপকে শুষ্ক করিবার নিমিত্ত প্রাথমিক অগ্নিসংযোগের পর, চুল্লীর ভিতর অঙ্গার, গালিত আকর এবং লৌহমল সংস্থাপন করা হইত। ৯ কি ১০ ঘণ্টার মধ্যে ৩ মণ অঙ্গার, ২½ মণ গালিত আকর এবং ২ মণ লৌহমল তাম্র নিষ্কাশনে খরচা হইত ..... শতকরা ২½ হইতে ৭½ ভাগ তাম্র পাওয়া যাইত।'

বিহার ও রাজপুতানা ছাড়াও পূর্বকালে নেপাল, সিকিম, মধ্যপ্রদেশ, কুমায়ুন গাড়োয়াল ও মাদ্রাজ অঞ্চলেও তাম্র খনি ছিল ও ঐ ধাতুর নিষ্কাশন চলিত।

লৌহ ও লৌহখনির সম্বন্ধেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া গেছে। ১৯৬৪ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ২২তম আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান সম্মেলনে 'ভারতবর্ষের লৌহজ-আকর' নিবন্ধে এম্ এস্ কৃষ্ণণ এই কথাই বলেছিলেন :

অন্ততঃপক্ষে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রক হইতেই—যখন ভারতীয় আর্য সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিল, পারস্য ও মেসোপটেমিয়াতে সম্প্রসারিত হইয়াছিল—ভারতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পত্তন হইয়াছিল। চার হাজার বৎসরের পুরাতন ঋগ্বেদেও লৌহের উল্লেখ পাওয়া যায়।'

মে এম হীথ সাহেব ছিলেন ভারতে আধুনিক লৌহ নির্মাণ পদ্ধতির একজন অগ্রসূরী। তিনি এক সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন ও পরে ইংলণ্ডে এই বিষয়ে শিক্ষালাভের পর একজন সুদক্ষ লৌহ নির্মাতা ও বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন কাল হতেই ভারতে লৌহ ও ইস্পাত ব্যাপকভাবে নির্মিত হয়ে আসছে এবং মনে হয় প্রাচীন মিশরে পিরামিড, বিভিন্ন মূর্তি ও মনুমেণ্ট ইত্যাদি নির্মাণের ব্যাপারে মিশরীয়গণ ভারতীয় শিল্পী ও কলাকুশলীদের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত আমদানী করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন

এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের সঙ্গে **EXHAUSTIVE QUESTIONS**-এ দেওয়া প্রশ্নগুলি মিলিয়ে নিলে বোঝা যাবে এ বইয়ের সার্থকতা কোথায়।

১৯৭৯ সালের পরীক্ষার্থীদের বই এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। দাম ১৫৲ টাকা। পুরো টাকা **M. O.** করলে রেজিষ্টার্ড ডাকে বই পাঠানো হয়। অবশ্য বই ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই টাকা আসা চাই।

B. B. KUNDU & SONS
18L. TAMER LANE, CALCUTTA-700 009

গ্রীসদেশে লোহার প্রচলন ছিল না, মহা সম্রাট আলেকজান্ডার ভারতীয় রাজা পুরু প্রদত্ত ছোট্ট একটি উৎকৃষ্ট ধরনের লৌহ-পিণ্ডকে মহামূল্য দান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ ধাতুবিদ স্যার রবার্ট হ্যাড্‌ফিল্ডও এই সব তথ্য সমর্থন করেছেন।

'বিজ্ঞানের ইতিহাসে' শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন এই বিষয়ে আরও মূল্যবান তথ্য জানিয়েছেন। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ইউরোপ ভারতবর্ষের মত উৎকৃষ্ট লৌহ ও ইস্পাত তৈরি করতে পারতো না। ওই শতাব্দীর মধ্যভাগেও ছুরি, কাঁচি, চামচ ইত্যাদি দ্রব্য নির্মাণের উপযোগী ইস্পাত ইংলণ্ডে প্রস্তুত হোতো না; অথচ এই জাতীয় ইস্পাত ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী আগে হতেই উৎপন্ন হয়ে এসেছে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ইংলণ্ডে বিটানিয়া টিউবুলার পুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারগণ ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহারের সুপারিশ করেছিলেন। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, এই লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ভারত আজ পৃথিবীর অনেক দেশেরই পিছনে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন লৌহ ও ইস্পাত-প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'বিজ্ঞানের ইতিহাসে' লিখেছেন :

'..... তারপর লৌহখনিজ ও কাঠকয়লা পর পর কয়েকটি স্তরে চুল্লীর মধ্যে সাজাইয়া অগ্নি সংযোগ করিলে ৪ হইতে ৫ ঘণ্টার মধ্যে ধাতু-নিষ্কাশন সম্পূর্ণ হইত।'

কৃষ্ণণ, স্যার টমাস হল্যাণ্ড প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণও লিখেছেন যে, প্রাচীন ভারতে লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণে 'চারকোল' বা কাঠ-কয়লা এমন কি কাঠেরও ব্যবহার হোতো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই অভিমত লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, প্রাচীন ভারতে বেশীর ভাগই 'রট-আইরণ' জাতীয় লোহা তৈরি হোতো। কারণ, সাধারণতঃ 'চারকোল' বা কাঠকয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য চুল্লীর ভিতর ধাতু গলানোর উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ উৎপন্ন করা সম্ভব হোতো না যার ফলে কার্বন মিশ্রিত লোহা বা 'কাস্ট-আইরণ' তৈরি হোতো না। ইস্পাত তৈরি করা হোতো এই 'রট-আইরণ' জাতীয় লোহা থেকে—তাও কাঠকয়লা বা 'চারকোল' ব্যবহার করে; পদ্ধতিটি অবশ্য ছিল আধুনিক সিমেন্টেসন বা ক্রুসিবিল প্রোসেসের' অনুরূপ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে নরম্যান আক্রমণের পর মাত্র সম্প্রদায় একাদশ শতাব্দীতেই লৌহ উৎপাদনের জন্য খনিজ কয়লারই ব্যবহার করতেন। আর ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আব্রাহাম ডার্বি আবিষ্কৃত 'ব্লাস্ট ফারনেসের' প্রবর্তন হওয়ার পর লোহা ও ইস্পাত নির্মাণে এই খনিজ কয়লারই ব্যাপক ব্যবহার হতে থাকে। অথচ ভারতবর্ষে তখনও পর্যন্ত খনিজ কয়লার ব্যবহার হয়নি একথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা কঠিন। বিশ্বাস করা কঠিন—যে দেশে এত উৎকৃষ্ট ধরনের লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হোতো প্রচুর পরিমাণে—সে দেশ শুধু কাঠকয়লা বা কাঠই জ্বালানিরূপে ব্যবহার করতো। সংস্কৃত বা তৎকালীন ভাষায় এই সব জ্বালানিকে অঙ্গার বলা হোতো। হয়ত এই অঙ্গার শব্দের যথার্থ অর্থ বা মানে নিয়েই যত সমস্যা। প্রাচীন ভারতে যে অঙ্গারের ব্যাপক ব্যবহার ছিল সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

বৈদিক যুগে পাশা খেলার মত অঙ্গারেরও ব্যবহার নিয়তই হোতো। ঋগ্বেদে এর কিছু আভাষ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত, ১ মন্ত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হোলো :

নীচা বর্তন্ত উপরি স্ফুরন্ত্য
হস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে।
দিব্যা অঙ্গারা ইরিণে ন্যুপ্তাঃ
শীতাঃ সন্তো হৃদয়ং নির্দহন্তি।।

এর বাংলা অর্থ এই দাঁড়ায়—

ইহারা কখন নীচে নামিতেছে, কখন উপরে উঠিতেছে। ইহাদিগের হাত নেই, কিন্তু যাহার হাত আছে, সে ইহাদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ইহারা দেখিতে শ্রীযুক্ত, জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় (পাশার) ছকের উপর বসিয়া আছে। স্পর্শ করিতে শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে।

এই অঙ্গার বলতে কি শুধু দগ্ধকাষ্ঠই বোঝাতো? যজুর্বেদে কিন্তু অন্য কিছুর সামান্য আভাষ পাওয়া গেছে।

শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা একাদশ অধ্যায়।

১৮।। কাণ্ড

আগাত্যা বাজ্যধ্বানং সর্বা মৃধো বি ধুনুতে।
অগ্নি সধস্থে মহতি চক্ষুষা নি
চিকীষতে।।

বেগবান এ অশ্ব পথ চেয়ে শত্রু দূর করছে। তার পর উৎকৃষ্ট পৃথিবীতে বর্তমান অগ্নির কারণ মৃত্তিকা চোখ দিয়ে দেখেছে।

১৯ কাণ্ড

আক্রম্য বাজিন্ পৃথিবীমগ্নিমিচ্ছা
ব রুচা ত্বমঙ্গিরঃ।
ভূম্যা বৃতত্বায় নো বহ্নি যতঃ খনেম
তং বয়ম্।।

হে অশ্ব, তুমি পা দিয়ে পৃথিবী পরীক্ষা করে দীপ্তির দ্বারা অগ্নি অন্বেষণ কর ভূমি স্পর্শ করে আমাদের বল যে স্থান আমরা খনন করবো।

২২ কাণ্ড

উদক্রমীদ্ দ্রবিণোদা বাজ্যর্বাকঃ
সলোকং সুকৃত্যং পৃথিব্যাম্।
ততঃ খনেম সুপ্রতীকমগ্নিং
স্বো রুহাণা নাক মুত্তমম্।।

চঞ্চল নিদাতা অশ্ব যে প্রদেশ থেকে উৎক্রমণ করেছে, পৃথিবীর সে শোভন প্রদেশ পুণ্য করেছে। তারপর দুঃখরহিত উত্তম স্বর্গলোকে গমনেচ্ছু আমরা সে স্থান থেকে শোভনমুখ অগ্নির হেতু মৃত্তিকা খনন করবো।

বৈদিক ঋষিগণ কি অগ্নির কারক সেই অঙ্গারে সন্ধানে মৃত্তিকা খনন করেছিলেন?

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ উনিশ ॥

ঋষির মনে পড়লো, কয়েক বছর আগে—সে, দিলীপ আর অনাথদা সারা দিন ধরে গাড়িতে বাইরোডে শিলিগুড়ি ফিরছিল। ভুটানের একটা পাহাড় ডান দিকের আকাশে সারা দিন দাঁড়িয়ে ছিল। মাইলের পর মাইল। নর্থ বেঙ্গলের এক-একটা পাগলা নদী শীতের বিকেলে নির্বাহভাবে শুয়েছিল। ব্রিজে পার হয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। পরেপর। তিনজনেরই চোখে ঘুম।

দূরে ধারে পাকা ধানের মাঠে যতদূরে চোখ যায় — খানিক দূরে অন্তর অন্তর প্রদীপ জ্বলছে।

দিলীপ সোজা হয়ে বসেছিল, মাঠে কি রূপসা রে ঋষি?

তখন সন্ধ্যের হিম অন্ধকারে পাহাড়টা মুছে গেছে। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে চালাতেই বলেছিল, হাতি পাকা ধান খাবার জন্যে আসে। হাতি তাড়াবার জন্যে আলো—

আমরা তিনজনই সারাটা পথ উঠে বসে মাঠের আলো দেখেছিলাম। চোখের ঘুম কোথায় চলে গেল। সারাটা আকাশ তখন অন্ধকার। একটা ব্রিজের নিচে সংকোচ নামে একটা নদী পড়েছিল তখন। এই নদীটা নাকি বর্ষাকালে ভুটান পাহাড় থেকে পাথর আর বালি নিয়ে চা-বাগানে ঢুকে পড়ে।

ক'দিন আগে দিলীপকে নিয়ে অনাথদার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। অনাথদা বা আমি—কেউই আমাদের দিলীপকে খারাপ লোক বলতে পারি না। ও সত্যি সত্যি খারাপ লোক হলে আমার কোন অসুবিধা ছিল না। তাহলে আমার ভেতরে ভেতরে কোন যন্ত্রণাই হত না। একটা খারাপ লোকের জন্যে কে চিন্তা করে। তাকে স্বচ্ছন্দে হিসেবের বাইরে ফেলে দেওয়া যায়।

চিঠিখানা আবার শুরু করল ঋষি।

অনন্ত। আমার এক এক সময় মনে হয়—দিলীপ পাগল হয়ে গেছে। কমপ্লিট প্যারানোইবাক। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই—ও একটা পাহাড়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে ডিনামাইট চার্জ করছে। পুরো পাহাড়টাই ও উড়িয়ে দিতে চায়। সেজন্যে নিজের যদি ক্ষতিও হয়—তাও ও মেনে নেবে। হাসি

মুখে। কিন্তু পাহাড়টা ও ওভাবেই। যেভাবেই হোক। দরকার হলে নিজের গায়ে আগুন মেখে ও বাবুদে শুয়ে পড়বে। এই জিনিসটাই আমাকে কষ্ট দেয় অনন্ত। এই পয়েন্ট অব নো রিটার্ণ হোল কেন? এ জন্যে কি আমি দায়ী? সাধনদা? অন্যথ চক্রোত্তি? আমরা? ভৌমিক খাদান? ঠিক কোন্ জায়গাটা দিলীপকে খোঁচা দিচ্ছে—তা আমি এখনও ঠিক মত ধরতে পারি নি। অবিশ্যি ধরেও আর লাভ নেই। দিলীপকে কিছুতেই ফেরান যাবে না।

এখন আমার মনে হয় — ইতিহাস থেকে কোন জিনিসকে জাগাতে নেই। প্রত্যেক জিনিসের একটা স্বাভাবিক মৃত্যুর মাত্রা আছে। সেই মাত্রাকে ডিসটার্ব করতে নেই।

বাকী কথা কলকাতায় গিয়ে হবে।

কলম বন্ধ করে নির্জন রেস্টহাউসের বারান্দায় ঋষি চুপচাপ বসে থাকল। তার চোখের সামনে বৃষ্টিতে পাহাড়টা ভিজছে। জায়গার নাম পাণ্ডবেশ্বর। পাহাড়ের নাম পাণ্ডবেশ্বর। এখানে ক বছর আগে আমরা একদিন সন্ধ্যেবেলা হাসতে হাসতে ট্রেন থেকে নেমেছিলাম। তখন কত আনন্দ ছিল। আরেকটা খাদান দিয়ে কি দরকার ছিল আমাদের।

ঠিক এই সময় গোকুল দত্তর ম্যারাপ বাঁধা ছাদে গোকুল দত্ত তার পরলা নাতির অন্নপ্রাসন দিচ্ছিল। রেকর্ডে সানাই। গোকুলের স্কুলজীবনের বন্ধুরা পরিবেশন করছিল। ক্যাটারারের লোকের হাতে পোলাউয়ের বালতি। তার ভেতর থেকে মাংসের সুগন্ধী টুকরো তুলে তুলে গোকুলের এক বাল্যবন্ধু সবাইকে পরিবেশন করছিল। লাবণ্যর থালায় দু টুকরো সুগন্ধি মাংস এক সঙ্গে দিতেই লাবণ্য বলে উঠল, আর দেবেন না। পারব না। বরং রেখাকে দিন—

বলে লাবণ্য রেখার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। তারপর ভয়ে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। আর যারা খেতে বসেছিল—তাদেরও অনেকেই খাওয়া থামিয়ে তাকিয়ে আছে। বছর আটেকের একটি মেয়ে খেতে খেতে কেঁদে উঠল।

গোকুল দত্ত—তার ছেলেরা ছাদের দক্ষিণ কোণের লোকজনের খাওয়া দেখছিল। মাছ পড়ল কিনা। আরেক হাতা দই। এটুকু খেতেই হবে। এই সব কথা হচ্ছিল। চিৎকার শুনে তারা এদিকে ছুটে এল।

এসেই গোকুল রেখার এঁটো হাতখানা চেপে ধরল। কী হল রেখা?

রেখার এঁটো হাত পিছলে যেতেই সে ক্যাটারারের টেবিলে সাজান আরেকটা আধুলি টুপ করে মুখে পুরে দিল।

এবার গোকুল বেশ জোর করেই চেপে ধরল রেখাকে। নিচে চল।

লাবণ্য যা দেখেছে, তা হল, কলাপাতার নুনের পাশে এক মুঠো সিকি-আধুলি রেখে রেখা এক এক গ্রাস পোলাউয়ের সঙ্গে দিব্যি দু-চারখানা তুলে তুলে মুখে পুরে দিচ্ছে।

রেখাকে নিচে নিয়ে যাওয়ার পর গোকুল দত্তর বড় ছেলে লাবণ্যর কাছে এগিয়ে এল। ভয় পাবেন না কাকীমা। ছোট মায়ের মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়। খেয়ে নিন।

খেতে বসে লাবণ্যর ভাল লাগছিল না। কোথায় নিয়ে গেল রেখাকে—

নার্সিং হোমে কাকীমা। আপনি চিন্তা করবেন না। গরম কালে সিট বুক করা থাকে আমাদের। পোলোরা দেবে আরেকটু—

না। লেবু আছে?

নিশ্চয়ই — বলে গোকুল দত্তর বড় ছেলে ছুটে গেল।

এবার আশ্বিনের শেষেও প্রবল বৃষ্টি হল। নাগাড়ে সাত দিন। কলকাতা ভেসে যায় যায়। কাগজে কাগজে ভাসন্ত ঘরগেরস্থালীর ছবি। বিহারে, ওড়িশায় আবামবাগে এরোপ্লেন থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলতে হল।

মালবিকার একটি খোকা হয়েছে। কার্তিকের তিন তারিখে। নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরে সে বিছানায় কান পেতে এখনও বৃষ্টির শব্দ শুনতে পায়। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে ফিরে আসা রবির পায়ের শব্দ শুনতে পায় সে। নার্সিং হোমে বহাল হবার পর তার একটাই ভয় ছিল। যদি রবি তার ছেলেকে দেখতে আসে। এলেই তো ধরা পড়বে। পুলিশ কি আর ফাঁদ পেতে রাখে নি। তার ছেলে হওয়ার দিনক্ষণ রবির একদম করগুণে-গুণে জানা ছিল। এই ভয়েই সে নার্সিং হোমে সিঁটিয়ে ছিল। এই বুঝি ছেলে দেখতে এসে রবি পুলিশের গুলি খায়। কী ভয়ে ভয়েই না কেটেছে কটা দিন।

রাণী এখন নতুন দিদিমা। সে নিউ রোডের মাল্টিস্টোরিডের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূরে মাঝের হাট বাজারের নিচের আদিগঙ্গাকে দেখতে পেল। জলে একদম ফুলে ফেঁপে উঠেছে। জল দেখলে যে কী ভাল লাগে। কুটুর পার্ট টু পরীক্ষা হয়ে গেলে ওরা সবাই মিলে ট্রেনে করে কদিনের জন্যে কোথাও যাবে—যেখানে যাওয়ার পথে ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা যাবে—ধান কাটা হচ্ছে একদিকে—আর অন্যদিকে দুই ল্যাংটো ছেলে মাঠের জল ছেঁচে ল্যাঠা মাছ ধরছে—আর দেখা গেল না—ট্রেন এগিয়ে গেল।

শীতের প্রথম দিকে বিকেলের মরা আলো দিলীপকে চেপে ধরে। চেতলা, রাসবিহারীর মোড়, সন্ধ্যে রাতে চিড়িয়াখানার ফাঁকা গেট—সবই কেমন ফুরিয়ে আসা চেহারা পেয়ে যায়। তার যেন কী করার কথা ছিল। কিন্তু করা হয়নি। কিছুতেই মনে করতে পারছে না দিলীপ। এই যে বাতাস বয়ে যায়—এই বাতাসের ভেতরেও আরেকটা বাতাস আছে। পেঁয়াজের খোসার মত ওপরের বাতাসটা তুলে ফেলে ভেতরের বাতাস সে চিরে ফেলে দেখতে চায়।

কলকাতার বাইরে পৃথিবীর মানুষ খসে ছিল না। দেখতে দেখতে ধানকাটা সারা। এবার বানভাসি বৃষ্টির জলও সরে যেতে লাগল। বাতাসে শীতের ধার। বেলা বাড়লে আগুন।

চৈত্রের গোড়ায় একদিন মালবিকা গেছে বাপের বাড়ি। রাণী পাশের ফ্ল্যাটে। কুটুর পরীক্ষার ফি দিতে সকালে গিয়ে লাইন দিয়েছে। দিলীপ ফাঁকা বাড়িতে দেখল রবির ছেলেটা একা একা অয়েলক্লথে উপুড় হওয়ার চেষ্টা করছে। সে এগিয়ে গিয়ে এই নবাগত পুরুষ লোকটিকে খানিকটা সাহায্য করল।

ছেলেটা উপুড় হয়ে কি খুশি। হাঁ করে হাসছে।

দিলীপ পরিষ্কার বলল, তোর বাবা তো গুলি খেয়ে মরে গিয়েও থাকতে পারে।

জবাবে রবির ছেলে মুখখানা ভরে হাসল।

দিলীপ আবার বলল, তোর বাবা তো খুনের মামলার আসামী।

এবারে কিন্তু ছেলেটি হাসল না।

ওঃ! তুমি বুঝতে পেরেছো। দাঁড়াও। দেখাচ্ছি। বলে দিলীপ তাকে জোর করে ফিং করে দিল। আর অমনি ঠা ঠা করে কেঁদে উঠলো রবির ছেলে।

কান্না থামানোর জন্যে নিরুপায় মানুষটাকে কোলে নিল দিলীপ। তোর জন্যেই তো আমার ছেলের জীবনটা আরও ঘোলাটে হয়ে গেল।

দিলীপের এসব কথায় তার মাতৃত্ব আরও ক্ষেপে গেল। বাচ্চাটাকে নিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল দূরে একখানা হাতঠানা রিকসায় ব মালবিকা ফিরছে। দূর থেকেই মালবিকা

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জেড • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• প্রোডাক
• সাটিং • সুটিং
ও ছিট কাপড়

একই সঙ্গে তার ছেলে আর শ্বশুরকে দেখতে পেল। তারপরেই দিলীপ দেখলো, হাত-রিকসা বেশ জোরে ছুটে আসছে।

অনেকদিন পরে দিলীপ বুঝলো, ছেলে জিনিসটা মানুষের বড়ই দরকারী। কত কাজে লাগে। ভালবাসতে। স্নেহ করতে। ভালবাসা পেতে। পাশে থাকলে সাহায্য হয়। রবি কতদিন আসে না। কোথায় যে আছে? মরে যায়নি তো এর ভেতর। তাহলেই তো চিন্তির।

মালবিকা ওপরে উঠে এসে বললো, দিন। আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে।

না। ভীষণ বুদ্ধিমান। আমাকে দেখে একটু আগে হাসছিল।

এ বাড়িরই ধারা পাবে তো।

ও কথা বললে কেন বউমা?

হেসে কেঁদে মায়া বাড়িয়ে দিতে ওস্তাদ। এরই ভেতর দেখুন না কেন—আপনাকে কেমন বশ করেছে এ ক'মাসে।

তোমাদের বাড়ির খবর কি?

বাবা বোধহয় মামলায় জিততে পারে—

রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সেই মামলা? এখনো চলছে?

বাবা তো বললেন, শেষ হয়ে এসেছে। জিতবেন—

তাহলে তো অনেক টাকা পাবেন।

আগে জিতুন। তবে তো। ওদিকে বড়দা—মানে টাপুদা কদিন হোল মিসিং। আজ চিঠি এসেছে বম্বে থেকে। মিউজিক ডিরেক্টর হবে।

তা টাপু হয়ে যেতে পারে। ভালো বাজার—

কম্পিটিশন আছে। ভাগ্য আছে। সবার কি সব হয় বলুন? একথা বলে মালবিকা সরাসরি দিলীপের মুখে তাকালো।

চেষ্টা থাকলে হয়।

সব সময় যে হবেই—এমন কোন মানে নেই। বড়দা অর্কেস্ট্রার ভেতর এখন একজন মিউজিক হ্যান্ড মাত্র।

ওখান থেকেই টাপু উঠে দাঁড়াবে। দেখো—

সব সময় হয় না বাবা। আমি তো দশ হাজার মিটার দৌড়ে বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করতাম। এখন আমি কোথায়!

ও পথ তো তোমরা নিজেরা বেছে নিয়েছো। বলে খানিক চুপ করে থাকলো দিলীপ। উল্টোদিকের আয়নায় নিজের মাথায় সিঁথি দেখতে পেল। সিঁথির পাশ দিয়ে খানিক জায়গায় পাক ধরেছে। দু'তিন বছরের ভেতর নিশ্চয় পেকে যাবে অনেকটা।

রবির ছেলে এই বয়স্ক পুরুষ লোকটির দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ তাকে কোলে নিয়ে নিল।

মালবিকা মাথা নিচু করে পড়া মুখস্তর গলায় বললো, আপনার কোলে থাকা অভ্যেস করুক।

একথা বলছো কেন বউমা?

আপনাকে বেশ পছন্দ করে—

আমি ঠাকুর্দা। তাতো করবেই। ও তো এ সংসারে ফেলনা নয়। রবির ছেলে। কতদিন বাইরে থেকে এসে প্রথমেই তো ওকে কোলে তুলে নেয়—

আপনারা ভালো বাসবেন। আপনাদের জিনিস।

ওভাবে কথা বলছ কেন?

আমি তো বাবা এখনি গিন্নি বান্নি হয়ে যেতে চাইনি—

সে-কথা আগেই ভাবা উচিৎ ছিল। বলতে বলতে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দিলীপ আবার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। আজকাল এই কুলবারান্দাকে তার মনে হয়—পৃথিবীর থিয়েটার দেখার বক্স। তাকালেই থিয়েটার।

ছেলেটা দিব্যি দিলীপের কাঁধ চেটে দেয়। কখনো গায়ে পেচচাপ করে। পুতুল-পানা হাত দিয়ে দিলীপকে ধরে রাখতে চায়। এখনো তাই করছিল। দিলীপ বকলে—রবির ছেলে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে। সে এক দেখার জিনিস। তখন অনেক আদর করে তবে ওর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে পারে। বাইরের পৃথিবীটা এত বিজনেস লাইক। এত কঠিন আর এবড়োখেবড়ো—তার ভেতর দিয়ে এই শিশু চলবে কি করে? রবি কোথায় কেউ জানে না। মালবিকা এখনি গিন্নিবান্নি হতে চায়নি। ওর মা-বাবা বলতে এখন—রাণী আর আমি। ও আমাদের কচি নাতি। আমরা ওর কচি দাদু-দিদি। দিলীপ রবির ছেলের গায়ের গন্ধ শুকলো। একদম দুধের গন্ধ। সেই সঙ্গে শুকনো শিশু ঘামের গন্ধ।

বাবা। ও কি করছেন?

মালবিকাকে দেখে দিলীপ চমকে উঠলো। কিছু না।

ও দিব্যি আপনার কোলে উঠে আদর খাচ্ছে।

না। না। গন্ধ শুকে দেখছিলাম।

গায়ে বোটকা গন্ধ হয়েছে। দিন পাউডার মাখিয়ে আনি। বলে মালবিকা তার

ভারত কী করে ভাগ হোলো

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানরা যোগ দেন নি কেন?

মৌলানা মহম্মদ আলি কেন বলেছিলেন: "মহাত্মা গান্ধী ও মতিলাল নেহরু হিন্দু মহাসভার পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।"

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে বাঙালি কংগ্রেস নেতারা সহ্য করতে পারতেন না কেন?

কোন আইন পাশ করাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাংলা গভর্ণমেন্টের পক্ষে ৪২ বার ভোট দিয়েছিলেন?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি সিঙ্গাপুর গুপ্তচরবিভাগের ভারতীয় সৈন্য দলের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন?

মৌলানা আজাদ লর্ড লিনলিথগোকে কেন লিখেছিলেন: "ভারত ছাড়" আন্দোলনের নামে যা হয়েছিল তার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই।"

লর্ড ওয়েভেল চার্চিলকে কবে লিখেছিলেন: "পশুশক্তি দিয়ে ভারতকে আমরা আর পদানত রাখতে পারবো না। আমরা যেমন লগলুল ও ডি ভ্যালেরার সঙ্গে মীমাংসায় এসেছিলাম তেমনি গান্ধী ও জিন্নার সঙ্গেও আমাদের মীমাংসায় আসতে হবে।"

ওয়েভেল গান্ধীজীকে কি বিষয়ে বলেছিলেন: "দিস্ ইজ ননসেন্স।"

গান্ধীজী ওয়েভেলকে কখন বলেছিলেন: "ইফ ইণ্ডিয়া নিডস্ এ ব্লাড-বাথ শী শ্যাল হ্যাভ ইট।" (ভারতের যদি রক্তস্নানের প্রয়োজন থাকে তাহ'লে তাই হবে।)

জিন্না বলেছিলেন: "দুটি কাঁটার মাঝে একটি গোলাপ ফুল।" গোলাপ ফুল কে? কাঁটা দুটি কারা?

জিন্না মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ঘণ্টায় ভালো করে কথা বললেন না কেন?

মাউন্টব্যাটেন কেন বলেছিলেন: "ভারতে আমার কাজ যে কত অসম্ভব হবে জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আমি তা বুঝতেই পারিনি।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় কার অবদান বেশি—ইন্দিরা গান্ধীর? না, মহম্মদ আলি জিন্নার?

অমৃত

স্বাধীনতা সংখ্যায় লিখেছেন বিমলানন্দ শাসমল

ছেলে হেবৎ নিল। আপনার ফোন বাবা—
বলে দাও বাড়ি নেই।
না। খুব জরুরী নাকি, আপনাকে চাই।
দিলীপ গিয়ে ফোন ধরলো।
কে? মিস্টার বোস? আপনার মনের মত গাড়ি পেয়েছি। যাকে বলে হাওয়া গাড়ি— একদম তাই। হুড খোলা। আমি ধরেন বলছি স্যার—আপনাদের বরেন দত্ত।
কাল দেখলে হয় না?

বিকেলে তো ভিড় থাকবে না। ফাঁকায় এসে দেখে যান। টোয়েন্টি এইটের অস্টিন ট্যুয়ার। বডিতে আপনার এক পয়সা খরচা নেই। ব্যাটারিটা পালটাতে পারেন ছ মাস পরে।
মাইলেজ?
তেল ভরুন। আর চড়ে বেড়ান।
তবু? গ্যালনে কম্পাউল যাবে?
পঞ্চাশ বাহান্ন—
কি বলছেন?

তবে কি স্যার! বলেছিলাম না আপনার জন্যে একটা গাড়ি খুঁজে বের করবো।
দেখতে কেমন গাড়িটা?
যেমন দেখতে তেমন।

আচ্ছা বুঝতে পারছেন না মিস্টার দত্ত। একটা বদখদ চেহারার গাড়ি কিন্তু আমি নেব না।

পাগল নাকি! সে গাড়ি আপনাকে দেব না আমি। এ একবার ডিপ রেড কিংবা শেল হোয়াইট বং করে বেরিয়ে পড়ুন—এর চেয়ে রাইস ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এগাড়ি আপনি দেখেছেন।
কি রকম বলুন তো?

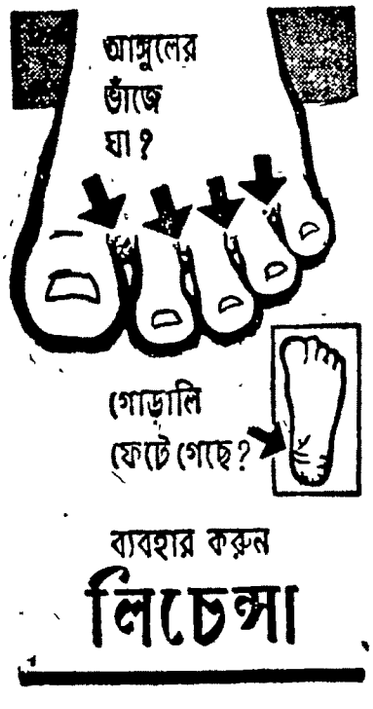

পাহাড়ী সান্যাল শেষদিকে একটা গাড়ি চড়তেন।
সেই ফুটবোর্ডওয়ালা—

হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। কিংবা ভবানীপুরে একজন বুড়োমত সাদা দাড়ির সর্দারজী হেমোপ্যাথ আছেন—একা একা চড়ে বেড়ান— ডিপ বন্ধু রঙের—অনেকটা সেই ধাচের।
সেই ধাচের কেন বলছেন মিস্টার দত্ত?
ও গাড়ি দুটো নাইন্টিন থার্টি সেভেনের। আর এটা হোল গিয়ে টোয়েন্টি এইটের।
তাহলে তো ডিস্টেজকার।
না। তা নয় এ-গাড়িটা যিনি চড়তেন—তিনি কদর জানতেন। তিনি সেকেণ্ড ওনার ছিলেন। আপনি হবেন থার্ড। আমিই কালু ঘোষকে কিনিয়ে দিয়েছিলাম সেই থার্টি'ফোরে। এক ইহুদি সাহেবের কাছ থেকে। গাড়ি একদম ঝকঝক করছে। পায়ের কাছে আসল ব্রাস এখনো চকমক করে—
কোন কালু ঘোষ?
কালু ঘোষ আবার কজন। একজনই তো হয়।
তিনি তো মারা গেছেন।
হ্যাঁ। এই তো মাস চারেক হোল খুন হয়েছেন।
সেই যে বাবুইপুর লেভেল ক্রসিংয়ে মার্ডার কেস—স্টিয়ারিংয়ে খুন হলেন।
হ্যাঁ মিস্টার বোস। ওঁর সঙ্গের লোকটিও বাধা দিতে গিয়ে খুন হয়েছিল।
মিস্টার দত্ত দামটা বলুন তো।

দামে আটকাবে না। আপনি এসে দেখুন তো। আমার ড্রাইভার নেই আজ।
আমি ড্রাইভার দেব। পাঁচ লিটার তেল ভরে সারা কলকাতা তো আগে ঘুরে বেড়ান। তারপর কথাবার্তা হবে।
বিকেল পাঁচটা নাগাদ বরেনের ড্রাইভার নিয়ে দিলীপ কালু ঘোষের গাড়িতে বেরিয়ে পড়লো। আগেকার স্পোর্ক লাগানো চাকা। হুডখোলা বলে সন্ধ্যেবেলার বাতাস ভালো লাগছিল। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে পড়ে ড্রাইভার বললো, স্টিয়ারিং ঠিক নেই স্যার। যেতে চাইছি ডাইনে। গাড়ি চলে এলো বাঁয়ে। কি ব্যাপার বলুনতো?
বাঁয়ে বোধহয় টাল আছে।

ড্রাইভার নেমে বাঁয়ের চাকা দেখে বললো, নাতো স্যার—
তাহলে চালাও তো।

ড্রাইভার গাড়ি চালালো। গাড়ি সন্ধ্যে রাতের হালকা বাতাসে দিব্যি ফুর-ফুর করে প্রায় উড়ে এসে ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে থেমে গেল। তখনো পুরো থামেনি। সেই অবস্থাতেই ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে পড়লো। এ গাড়ি স্যার আমি চালাতে পারবো না—
কি হোল?

যাচ্ছিলাম বেকবাগান। গাড়ি চলে এলো ক্যালকাটা ক্লাবে—
কি বলছো?
হ্যাঁ স্যার। আমার আগে আগে কে যেন এগাড়ি চালাচ্ছিল।
কি যা তা বলছো!
হ্যাঁ স্যার। আমি স্টিয়ারিংয়ে বসে টুটো জগন্নাথ। আমার সামনে বসে কে যেন স্টিয়ারিংয়ে ভর করে ছিল। এ স্যার নিশ্চয় অ্যাকসিডেন্ট গাড়ি। এ আমি চালাতে পারবো না।
বাজে বোকো না। আমি চালাতে জানি না। গাড়ি তো গ্যারেজে তুলে দেবে—
আমি গ্যারেজে তুলতে গেলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে স্যার। ওগাড়ি আমি ছোঁবো না। এ পথটা যে আমি কি করে চালিয়ে এসেছি—সে আমিই জানি।
তাহলে গাড়িটা রাস্তায় পড়ে থাকবে?

এ গাড়ি একবার চালালে কেউ ছোঁবে না স্যার।
তাই বলে পড়ে থাকবে রাস্তায়?
বেশ তো সাইড করে আছে রাস্তায়। বলেই ড্রাইভার ছোকরা মোড় ঘোরা একটা স্লো মোশন বাসের পেছনের দরজায় উঠে পড়লো।
দিলীপ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললো, মিস্টার দত্তকে আমি রিপোর্ট করবো।
জবাবে বড় বাসটা শুধু সাইলেন্সার দিয়ে খানিক ধোঁয়া ছাড়লো।

হাতঘড়িতে সন্ধ্যে ছটা দশ। নতুন মাবকারি ল্যাম্পের আলোয় ক্যালকাটা ক্লাবের মোরাম ঢাকা প্রাঙ্গন মাড়িয়ে এক-একখানা গাড়ি ঢুকছে। আবার বেরিয়েও যাচ্ছে। গোবিন্দ স্টিলের সঙ্গে দিলীপ এখানেই ডিল কমপ্লিট করেছিল। এখানেই স্যার লেজলিনউড ওর আর স্বাতীর জন্যে আলাদা করে পার্টি দিয়েছিল।

ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এক যুবককে দিলীপ চেনে। তাকে খুঁজে পেলে হয়তো একজন ড্রাইভার পাওয়া যেতে পারে। এতবড় ক্লাবের কি আর ড্রাইভার নেই আলাদা।

কিন্তু খুঁজতে গিয়ে দিলীপ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিকে পেল না। তার ডিউটি ছিল সকালে। তখন বরেন দত্তকে টেলিফোন করলো। ফোন বেজেই যাচ্ছে। কেউ ধরার নেই। হয় ফোন খারাপ। নয়তো বাড়ি নেই কেউ।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ইনফরমেশন সেন্টারের সামনে এসে দিলীপ দাঁড়ালো। কি আশ্চর্য। গাড়িটা ছিল ক্যালকাটা ক্লাবের পয়লা গেটে। পাছে অন্য গাড়ি ঢুকতে গিয়ে গুঁতো মারে—তাই কে যেন দয়া করে গাড়িটাকে ইনফরমেশন সেন্টারের উল্টোদিকে সেফ জায়গায় পার্ক করে রেখে গেছে।

তাহলে শহরে এখনো কনসিডারেট ভদ্রলোক আছে। কে বলে কলকাতা মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বলিহারি ড্রাইভার। গাঁজা খায় বোধহয়।

নইলে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এভাবে সটকে যায় কেউ? আবার বলে কিনা অ্যাকসিডেন্টের গাড়ি। রইলো আপনার চাবি—আমি চললাম। কলকাতার মত শহরে—চারদিকে লোকজন—ইলেকট্রিকের আলো— ভূতের গল্প বানাতে এসেছে।

অ্যাকসিডেন্টের গাড়ি কেউ কেনে না। সারিয়ে নিয়ে কেউ চড়ে না। তাহলে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নীলাম থেকে এত অ্যাকসিডেন্ট গাড়ি বিকি হয় কি করে?

এই যে বোস। এখানে? অন্ধকারে? কি মনে করে? একখানা থেমে দাঁড়ানো বোভার নাইনটিন স্টিয়ারিং থেকে ভারিমত একটা লোক দিলীপের দিকে তাকালো। উঠে এসো। ভেতরে বসে কথা হবে।

আপনি?

চলো। ভেতরে চলো। তোমাকেই খুঁজছি কদিন ধরে। উঠে এসো।

গাড়িতে উঠতেই এক চকচকে ক্লাবের ভেতরে এসে ঢুকলো রোভারটা। গাড়ি থেকে নামতে নামতে লোকটিকে চিনলো দিলীপ। স্যার লেজলি উডের কোম্পানীর বাঙালী ডিরেকটর। মেজর জেনারেল রায়। আগে ফোর্ট উইলিয়ামে ব্রি ও সি ইস্টার্ন কমান্ড ছিল। রিটায়ারের পর স্যার লেজলি রায়কে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল ডিরেকটরের চেয়ারে। ডিরেকটর ফর পার্সোনেল। আসলে কোম্পানীর শোভা। তখনই রায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় দিলীপের। দিব্যি মিশুকে লোক। সন্ধ্যের পর বাড়ির হাতায় বসে পাঞ্জাবী বউ নিয়ে গল্প করে। একটি ছেলে। আর্মিতে ক্যাপটেন। একটি মেয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে হোস্টেস। এক ঝলকে সব মনে পড়ে গেল দিলীপের।

ক্লাবে ঢুকতে ঢুকতে মেজর জেনারেল রায় বললো, জানো বোধহয়—স্যার লেজলি হোমে ফিরে গেছেন। পার্লামেন্টে ওঁর একসপেন্স অ্যাকাউন্ট নিয়ে কোশ্চেন আনস্যার হবার পরেই—বিলেতে ডিরেকটর বোর্ড থেকে ডেকে পাঠালো। নাউ আই অ্যাম টিপড্ ফর চেয়ারম্যানশিপ—

কনগ্রাচুলেশনস।

পরেও জানাতে পারবে। এসো আগে বসা যাক। তোমাকে প্রথম দেখেই আমি টেকে রেখেছিলাম—

কি ব্যাপার জেনারেল?

আমি লেফটেনান্ট জেনারেলও হতে পারিনি দিলীপ—

নামটাও মনে আছে দেখছি।

আমরা কিছু ভুলি না বোস। তোমাকে আমাদের ফার্টিলাইজার ডিভিশনের সেলসে এনে বসাতে চাই। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ায় আমাদের সেলস ফিগার পড়েই বাচ্ছে। আমি জানি। তুমি পারবে। আমি তোমার তখন দেখেছি। সেই কয়লার ডিল এখনো চালু আছে।

ভৌমিক খাদানের কয়লা নিচ্ছেন এখনো। বাঃ! বেশ।

তুমি কিছু খাচ্ছো না দিলীপ।

এই তো নিলাম।

আমার এই কার্ডখানা রাখো। কাল সকালে ফোন করবে। ঠিক সাড়ে নটায়। ফেলে যেও না।

ও ভুল আমার হয় না জেনারেল—

উহু। শুধু মেজর জেনারেল। ভালো কথা দিলীপ। কালু ঘোষের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?

কালু ঘোষকে চিনতেন?

কালুকে চিনবো না! এবার কিন্তু হারালে তুমি। ক্যালকাটা অ্যান্ড কালু—বোধ অবার সিনোনিম ফর ইচ আদার। কালু আমার সঙ্গেই রোটারিয়ান ছিল। পনেরো বছর আগে—আমি তখন লাইট মাবাঠা ইনফ্যান্টির লেফটেন্যান্ট কর্নেল। কিছু দিনের জন্যে ফোর্ট উইলিয়মে এসেছি। দেন হি ওয়াজ এ ইয়ং লায়ন। এ ফাইন সুটাব। বাফ অ্যাট দ্য অটোমোবিল। তখনই তো কালু ছ-ছটা কোম্পানীর ডিরেকটর। ছ মাস আগেও আমরা দুজনে এই টেবিলেই বসেছি।

শেষদিকে তো অটোমোবিল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেকটর ছিলেন।

দিলীপের মুখের কথা রায় কেড়ে নিল গাড়িটা কিন্তু পাল্টাবনি। ওটা চড়েই সব জায়গায় যেতো।

চিন্নের প্লেটটা পড়েই আছে। দিলীপের মনে নেই—কটা খেয়েছে। তিন পেগ? না চার পেগ? একদম স্মুদ হুইস্কি। গাড়িটা আমি কিনলাম—

ইটস্ এ বারগেইন! ও তো গাড়ি নয়—লিওপার্ড রাস্তা পেরোবে লম্বা লাফে। উড্‌সের স্প্রিং শক অ্যাবজরবার আছে সামনের দিকে। ও গাড়ি আমি জানি দিলীপ। কালুর প্রাণ অন্ত ছিল গাড়িটা। পেছনের দুটো হাইড্রোলিক ব্রেক। সামনের দুটো মেকানিকাল। ফার্স্ট গিয়ার স্লিপ আছে। তাতে অবিশ্যি কিছু আসে যায় না—।

আপনার দেখছি মুখস্ত মেজর জেনারেল—

আমি যে চড়েছি কালুর সঙ্গে। হি ওয়াজ এ গ্রেট স্পোর্টস্ ম্যান। তাছাড়া ক্লাব লাইফের ও ছিল প্রাণ। কিন্তু গাড়িটা কিনলে কার কাছ থেকে? ওর বউ তো সেপারেশনের পর অনেককাল হোল কানাডা চলে গেছে। ওনলি চাইলড্—মেয়েটাও তো সুবিধানার থাকে। ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনিং করে।

অটোমোবিল ইণ্ডিয়াই বোধহয় ডিলার মারফৎ বেচে দিলো।

তা হবে দিলীপ। আমি উঠছি। খুকীর মায়ের জন্যে একটা সফ্‌ট কিছু নিয়ে যেতে হবে—আমিও উঠবো।

তুমি থাকো না। তোমার তো এখনো শেষ হয়নি। আমি জানি—এখনো তুমি আরও তিনটে নিতে পারো—

আমি কমিয়ে এনেছি জেনারেল—

উহু। হোল না! শুধু মেজর জেনারেল। তুমি যেতে পারবে তো?

খুব পারবো।

তাহলে বোসো। কাল সকাল সাড়ে নটায়—মনে আছে তো?

খুব! বলতে বলতে দিলীপ দেখলো আর্মির টাটকা স্টেপ ফেলে ফেলে রায় বেরিয়ে গেল। তখনো তার শেষ গ্লাসের ধারো আনা বাকি। অনেকদিন পরে হুইস্কি তার বেশ ভালোই লাগছে। যে জন্যে খাওয়া—সেকাজ ততক্ষণে দিলীপের শরীরে শুরু হয়ে গেছে। গালের বাঁ দিকটা আপনা আপনি কাঁপছিল। এরই নাম নেশা। ডাকতার বলেছে—ওভাবে খাওয়া দাওয়া চালালে—কোনদিন আপনি রাস্তায় কালী-ঘাটের পাঁঠা হয়ে পড়ে থাকবেন। তার মানে জিভ বের করা মানতের মুণ্ডু। ঝড় তখন হাঁড়িকাঠে।

ক্লাবের ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠে এদিককার টেবিলগুলো প্রায় ফাঁকা। আলো কিছু কম। একটা ঝাকড়া গাছের ডালের ছায়ায় দূরের ফ্লাড্ লাইট ঠিক এখানটাতেই কিছু ঘোলাটে। খানিক বাদে দিলীপ দেখলো, তার উল্টোদিকের চেয়ারে হাসি হাসি মুখে বেশ সুবেশ একজন বসে। ব্যাকব্রাশ চুল। নিখুঁত করে কামানো গাল। ওখানেই তো একটু আগে মেজর জেনারেল বসে ছিলো।

দিলীপের যেমন সন্দেহ হোল। সে কি আজ সন্ধ্যেবেলা মেজর জেনারেলের সঙ্গে এখানে এসেছিলো? না, গতকাল সন্ধ্যে-বেলা? আজই যদি সে এখানে এসে থাকে—তাহলে এতক্ষণ এ লোকটা কোথায় ছিলো?

সব গুলিয়ে গেল দিলীপের।

লোকটি নিজে থেকেই হেসে ফেললো। কি? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তো? তারপর বেশ আশ্বাস দিয়ে বললো, আজ নয়। কাল সন্ধ্যেবেলা রায়ের সঙ্গে আপনি এখানে এসেছিলেন—

তাহলে?

তাহলে কি দিলীপ?

তাহলে আজ আমি কার সঙ্গে এসেছি এখানে?

কেন? আমার সঙ্গে। আমরা সন্ধ্যে থেকে একসঙ্গে খাচ্ছি। একসঙ্গে ঘুরছি।

আমি তো বিশেষ ঘুরিনি মেজর জেনারেল—

উহু। মেজর জেনারেল নয়।

তবে কে আপনি?

আমি ঘোষ। কালু ঘোষ—

দিলীপের শরীর শরীরের ভেতর কে যেন এক বেলচা বরফকুচি ছুড়ে দিল। ঠাণ্ডা। গায়ে বিঁধছে। আপনি তো নেই।

নেই মানে! খুব আছি। ওইতো এক-সঙ্গে বসে আছি। খাচ্ছি। গল্প করছি। এর পরেও বলবেন আমি নেই?

না। মানে—শুনেছিলাম—আপনি নাকি স্টিয়ারিংয়ে বসা অবস্থাতেই—

ওসব বাজে কথা। যত সব গাঁজাখুড়ি। শত্রু পক্ষের রটনার কান দেবেন না একদম।

(চলবে)

আমরা গ্রামের মেয়েরা

মায়া সিদ্ধান্ত

"আজ বিশ্ব সভ্যতার সমান শরীক নারী। মানুষের যে জগৎ আজকের নারী সেই জগতের উপযুক্ত হোক এই আমাদের প্রার্থনা, আমাদের লক্ষ্য, আমাদের আদর্শ।"

নারীজগৎ পত্রিকার মলাটে আশাপূর্ণা দেবী যে কথা বলেছেন, গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরের প্রতিটি নারীর সেই একই প্রার্থনা। বিশ্বে পুরুষ ও নারীর মান সমান হোক পদমর্যাদা ও অধিকারের দাবিতে। প্রতিটি কাজে তারা পুরুষের মত মাথা উঁচু করে চলুক। নারীবর্ষ পালিত হয়েছে। পুরুষের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলার চেষ্টার অন্ত নেই।

তথাপি আমরা গ্রামের মেয়েরা আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আমার মত গ্রামের মেয়েদের লেখাপড়া শিখেও সমাজের কাছে কিছু চাওয়া অপরাধ। গ্রামের শিক্ষিত মেয়েদের সমস্যার কোনদিন বোধহয় সমাধান হবে না।

আমার মত কলকাতা থেকে ২০ মাইল দূরে যে সমস্ত শিক্ষিতা মেয়েরা বাস করে, তারা কিছু করতে চেয়ে তো প্রতিটি পদে পদেই হোঁচট খেয়ে মরছে। আমার গ্রামে প্রতিটি ঘরেই স্কুল ফাইনাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, পার্টওয়ান অবধি পড়া মেয়ে আছে। বিদ্যাসাগর মশাই নারীশিক্ষার প্রচলন করার ফলে আজ ঘরে ঘরে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটেছে। কিন্তু সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানোর মত কোন ক্ষেত্রই আমাদের গ্রামের মেয়েদের নেই।

আমাদের আদর্শ গ্রামে প্রয়োজনীয় সবরকম অফিস, হাসপাতাল, থানা থাকলেও অনেক সম্প্রদায়ের লোক বেশি। চাষের ফসল বিক্রি করেও অনেকরা তাদের মেয়েদের শিক্ষিতা করছে। চন্দনীর মেয়ে তরু, অপর্ণা, মিনতি, শ্যামলী, মমতাকে দেখেছি ভোর চারটেয় সময় ঘুম থেকে উঠে লম্ফ জেলে স্কুলের পড়া মুখস্থ করতে। সকাল হলেই বাবার সাথে মাঠে গিয়েছে ঝিঙে, পটল, অথবা আলু তুলে আনতে। ১০টায় বাড়ি ফিরে স্কুলে গিয়েছে, বিকেলে আবার মাঠে গিয়েছে ক্ষেতে জল দিতে। এইভাবে পড়াশোনা করেও এরা প্রত্যেকে স্কুলের বেড়া ডিঙিয়েছে ভালভাবেই, অনেকেই কলেজও। এত কষ্টের লেখাপড়া শিখে এরা কি করতে পেরেছে? পড়াশোনা শেষ করে পাঁচ-সাত বছর ধরে চুপচাপ বাড়ি বসে শুধু মা, বাবা, ভাইবোনদের সেবা করে চলেছে। দিনের পর দিন কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে এ্যাপ্লিকেশন আর ইন্টারভিউ দিয়েও একটা কেরানীর চাকরিও জোটাতে পারেনি।

ওদের অভিভাবকেরা বিয়ের চেষ্টার ত্রুটি করেননি। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ মেয়ের জন্য হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ ছেলে খুঁজতে গিয়ে দেখেছেন তার দাম বাজারে ১০ হাজার টাকা। শিক্ষিত ছেলের দাম অত তো হবেই। চাষের জমিগুলো বেচে অপর্ণার বাবা হয়ত ১০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। তাহলে যে সারা বছর না খেয়েই থাকতে হবে। কাজেই তখন খোঁজ হয় মূর্খ ছেলের। নাম সই করতে পারে, এমন ছেলের বাজার দর পাঁচ হাজার। কিন্তু পাশ করা মেয়েদের সেন্টিমেন্টে যারা অকাট মূর্খের গলায় মালা পরাতে। তারা রাজি হয় না। তাই তাদের বিয়েও হয় না। কত আর বয়স হয়েছে তাদের ২৬।২৭। এ আর এমন কি? কি সুন্দরভাবে তাদের দিনগুলো কাটে এ আর কে ভেবে দেখবে?

হয়, বিয়ে হয় এর মধ্যেও। পি-ইউ পাশ মেয়ের সঙ্গে এইট পাশ সাধনের বিয়ে হয়। তিনি যে অন্নপূর্ণা মিলে কাজ করেন। দেনা পাওনাও ওই পাঁচ হাজারেই মিটে যায়।

যাদের বাজার দর ১০ অথবা ৫ হাজার টাকা তাদের বিয়ে হয়ে যায় ওই দামেই, হয় না তাদের বোনেদের বিয়ে। দাদার বিয়ে হলেই তো বোনের সুখ। বোনের বিয়ে নাই বা হল!

ধার দেনা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েও বাবা মার শান্তি আছে কি? আমার পাশের বাড়ির বিমলার বিয়ের সময় ওর বাবা সাইকেল আর মেয়ের হাতের ঘড়ি দিতে না পারায় বিয়ের দুবছর পরে ওর স্বামী ওকে বাবার বাড়ি রেখে গেল, আর নিতে গেল না। আরো বেশি পাওনা নিয়ে একটা বিয়ে করল। বিমলার গরীব বাবা মামলা করেও মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি আর পাঠাতে পারল না। বাবার অক্ষমতার জন্য, বাবার দারিদ্রের জন্য বিমলা স্বামী হারাল। বাবা-মার বোঝা হয়ে না থেকে কলকাতার এক বাবুদের বাড়ি থাকা খাওয়ার কাজ জুটিয়ে নিল। এইট পাশ বিমলাকে ওর বাবুরা নাকি ভালবাসেন। "ঝি"-এর মত দেখেন না। ২৫ টাকা মাইনার টাকা জমিয়ে পুজোর সময় বিমলা ওর বাবা-মাকে, ভাইপো ভাইঝিকে জামা কাপড় দেয়।

আর অদ্ভুত গ্রামের সমাজ ব্যবস্থা! বিমলার বাবা ভিক্ষে করেও যদি বিমলার বিয়ে দেন, তবে তো তিনি হবেন সমাজে পতিত। আর এমন হৃদয়বান পুরুষ কি বাংলাদেশে আছে যে সব জেনে শুনেও বিমলাকে বিয়ে করবে তার নারীত্বের মর্যাদা দেবে?

আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সাধারণ স্কুল শিক্ষকের মেয়ে বলে কখনো স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখিনি। ডিগ্রীটুকু অর্জন করবার জন্য বাড়ি বাড়ি ছেলে পড়িয়ে ১৮ মাইল দূরে কলেজ করতে কি অমানুষিক পরিশ্রমই না আমাকে করতে হয়েছে। কত আশাই না তখন ছিলো, পাশ করে নিশ্চয়ই একটা চাকরি পাব, একমাত্র ছোট ভাইটাকে অনেক লেখাপড়া শেখাব, বাবার কষ্টের কিছুটা লাঘব হবে, সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। আমি যে বেকার, সরকারের গোচরে আনার জন্য এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে ৭ বছর ধরে কার্ড রিনিউ করে চলেছি। "টাইপটা জানা থাকলে এখুনি আমার অফিসে তোমার একটা চাকরি করে দিতে পারতাম।" পরিচিত বড় অফিসরের মুখে একথা শুনে টাইপ শিখেছি। আর কি কি কোয়ালিফিকেশন থাকলে আমি একটা সাধারণ চাকরি পেতে পারি জানলে তা আমি এখুনি সংগ্রহ করতে রাজি আছি।

মাত্র দুমাস আগে আমি এক দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযান সেরে ফিরেছি। কোন কিছু পাওয়ার বিনিময়ে আমি যে কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে বিন্দুমাত্র পিছপা হই না। তাই সমুদ্রকে জানতে সমুদ্রকে জয় করতে ছোট্ট পালতোলা ডিঙ্গি "অনিমেখলাকে" সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দাঁড় টেনে, হাল ধরে, পাল তুলে আমি গভীর সমুদ্র দিয়ে গঙ্গা থেকে পণ্ডীচেরী পর্যন্ত গিয়েছি ও এসেছি। আমার সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত ও স্কুল শিক্ষক আজিজুর রহমান। এঁদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। সমুদ্রকে জানার সুযোগ এঁরাই আমাকে দিয়েছেন।

আমার নিজের সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস জন্মেছে, আমি যে কোন ধরনের কাজ করতে প্রস্তুত। আমাকে দিয়ে যে অনেক কাজ হতে পারে, আমাকে দিয়ে যে কিছু করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, একথা কে ভেবে দেখছে। অথচ আমি যদি পাশ্চাত্য দেশের মেয়ে হতাম তাহলে যেকোন কাজে আমার ডাক পড়তো। আমার উৎসাহ ও উদ্দীপনার দাম আমি পেতাম।

কলকাতার অফিসগুলোতে অনেক মেয়েরাই কাজ করে। কিন্তু সেগুলোতে আমাদের মত গ্রামের মেয়েদের ঠাঁই নেই। আমাদের যে "ব্যাকিং" নেই।

তাহলে, আমরা গ্রামের মেয়েরা পুথি-পড়া শিখে বাড়ি বসে থাকব? সমাজে কি আমাদের কিছু করবার নেই? আমাদের প্রতি কি সমাজের কোন দায়িত্বই নেই?

সহৃদয় পাঠক - পাঠিকা! আমি সুলেখিকা নই। আমার গ্রামের প্রতিটি শিক্ষিতা মেয়েদের ও আমার যে সমস্যা আমি আমার লেখায় বলতে চেয়েছি, আমি জানি এই সমস্যা আজ প্রতিটি শিক্ষিতা মেয়ের। আমরা সমাজ ও সরকারের কাছে থেকে কি আমাদের মেয়েদের সমস্যা কিছুটা অন্ততঃ লাঘব হওয়ার মত সাহায্য পেতে পারি না? লেখাপড়া শিখেও কেন আমরা পিছিয়ে থাকব। কেন আমরা আমাদের দাবীর জন্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করব না? কেন গ্রামের মেয়েরা শিক্ষিতা হয়েও চাকরি পাবে না, বিবাহযোগ্যা হয়েও সমাজের লোভী পুরুষের পাওনা মেটানোর সাধ্য না থাকায় সে সুখী সংসারী হতে পারবে না? আজ আমাদের মত গ্রামের শিক্ষিতা মেয়েদের কি এই বিষয়ে চিন্তা করবার সময় আসেনি?

চিঠিপত্র

তারাশংকর

বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার ১২ মে ১৯৭৮ তারিখের সংখ্যার প্রচ্ছদে সাহিত্যিক স্বর্গত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছবি ছাপা হয়েছে। সূচীপত্রে দেখলাম ছবিটি শ্রীশুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের আঁকা। সূচীর নিচে ছবিসহ শিল্পীর জীবনচরিতও প্রকাশিত হয়েছে।

আপনাদের সাতার্থে জানাই, শিল্পীর ঐ ছবিটি আমার তোলা ১৯৬৮ সালে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আলোকচিত্রের একেবারে সোজাসুজি কপি করা। চলতি ভাষায় যাকে বলে লাইন ধরে 'কার্বন কপি'। প্রমাণস্বরূপ শ্রাবণ ১৩৭৯, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'তারাশংকর রচনাবলীর' ২য় খণ্ডের উল্লেখ করতে পারি—যেখানে এই ছবিটি ছাপা হয়েছে এবং সূচীপত্রে আমার নাম আছে। এর নেগেটিভ আজও আমার কাছে খুব যত্নেই আছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে শিল্পী নিশ্চয়ই ছবি আঁকবেন কোন ছবি দেখে, কিন্তু কোন আলোকচিত্রের লাইন ধরে কপি করলে সেই আলোকচিত্রীর নামটা কি স্বীকার করা উচিত নয়?

বিদেশের বিভিন্ন দেশে যখন উনি গেছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি বহু শিল্পী, তাই 'প্রচ্ছদের নেপথ্যে' বলে বিশেষভাবে স্থান পেয়ে যা প্রকাশিত হয়েছে তা যথার্থ। আমি আশা করব আমার এই চিঠি আমার তোলা তারাশংকরবাবুর সেই মূল ছবিসহ (একখানা ছবি এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি) বিশেষ জায়গায় না হলেও সামান্য স্থান পাবে আপনার আগামী সংখ্যায়। আমার নিজের ছবি পাঠাবার দরকার আছে কি? মোনা চৌধুরী, জালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০।

উত্তর

গত ১২ মে '৭৮-র অমৃতে প্রকাশিত আমার আঁকা প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে আপনাকে জানাই—ছবিটি তারাশংকর রচনাবলীতে মুদ্রিত একটি হাফটোন ছবি থেকে আমি কাঠকয়লায় আঁকি। তাতে আপন মনের মাধুরী মিলিয়ে অন্য কিছু করা মনে করিনি। পৃথিবীতে নানান চিত্রকর নানা ব্যক্তিত্বের অবয়ব আপন ব্যক্তিত্বে প্রকাশ করেছেন। এসব প্রস্তুতির একটু ইতিহাস আছে, অপ্রাসঙ্গিক হলেও কিছুক্ষণ প্রতিবাদ পত্রের আইনানুগ মন্তব্যের একটু বেশী কিছু বলতে চাই।

দীর্ঘদিন সখ্যতার ফলে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে তার নিজস্ব পরিচিতের একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত ধরা পড়ে—যা তার একান্তই নিজস্ব। ঠিক তেমনি কোন বড় [illegible], যিনি তার দীর্ঘ জীবনে অগুন্তি লোকের কাছে তাঁর নানান ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতে পেরেছেন, হয়ত সহজ চোখে অচেনা লোকে তাঁর সে ছবি স্বীকার করবে না কিন্তু

মেনো চৌধুরীর ফটো

পরিচিতের কেউ না কেউ তাকে চিনে নেবে। আবার কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রভাব যুগ যুগ ধরে নানাভাবে তাঁকে স্মরণে আনায়। এইসব সুযোগকে অবলম্বন করে চিত্রকরেরা তাঁদের রচনায় আপন দৃষ্টিকোণের প্রকাশ করেন। তাই কোন অদ্বিতীয়কারী ব্যক্তিত্বের যথেচ্ছ ময়না তদন্তেও শিল্পীর অবয়ব সার্থক হয়ে ওঠে, যেমনটি ফ্রান্সিস বেকনের চার্চিলের প্রতিকৃতিটি আবার সমরসেট মমের ছবিটি গ্যাহাম সাদারল্যান্ড তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সাহিত্যিককে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এসব উদাহরণের কোনটিই আমার সুযোগে সহায়তা করেনি।

আমাদের প্রচ্ছদ

তাঁকে দেখেছি, কিন্তু সখ্যতার সুযোগ হয়নি তাই স্মৃতির দুর্বল পুঁজি নিয়ে যুদ্ধে নামিনি। কাঠকয়লায় প্রতিকৃতি আঁকা বহুদিনের অভ্যাস—তাই প্রচ্ছদ আঁকার দাবিত্ব পেয়ে একটি ছাপাই ছবিকে অবলম্বন করে তারাশংকরকে এঁকেছি। পত্রলেখক কার্বন কপির হয় অর্থ জানেন না নতুবা রেগে গিয়ে ভুল শব্দ লিখেছেন। পরে জেনেছি ছবিটি পত্রলেখকের ক্যামেরায় তোলা। হয়ত, ঐ আঁকার প্রসঙ্গে লেখা উচিত ছিল 'একটি আলোকচিত্র অবলম্বনে', কিন্তু তা সকলেই জানেন কারণ, আমার তারাশংকর প্রকাশিত হবার অনেক আগেই ঐ আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। তবে, পত্রলেখক আলোকচিত্রীকে শ্রদ্ধা জানাই কারণ তিনি যন্ত্রটি যাহাবে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তিনি যদি স্বহস্তে আমার ভুলটির কার্বন কপি (তাঁর ভাষায়) করতে সক্ষম হন, তবে আমি আত্মহত্যায় প্রস্তুত হব। শুভাপ্রসন্ন, কলিকাতা-৯।

*

১২ মের 'অমৃত' সাপ্তাহিকে তারাশংকরের একটি সুন্দর প্রতিকৃতিকে প্রচ্ছদে স্থান দিয়ে এবং তাঁকে নিয়ে অমল আচার্যের প্রচ্ছদ কাহিনীটি প্রকাশ করে, অমৃত নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে।

শ্রীআচার্যের লেখাটি সুলিখিত এবং অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিবাদী মনের পরিচায়ক। সমগ্র লেখাটি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শিরোনামে আলোচনা করে লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

তারাশংকরের সাহিত্য সত্তা শাঙপুর তথা গ্রাম বাংলার প্রাণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট মানুষেরা অধিকাংশই আমাদের কাছের মানুষ। কাজেই শ্রীআচার্য যেখানে তারাশংকরের রচনায় প্রবাদ প্রবচনের উল্লেখ করেছেন সেটা আরো বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল।

তিনি মোট তিনটি গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু গণদেবতা থেকে একটার বেশী প্রবাদ প্রবচনের উল্লেখ করেন নি। অথচ আরো উদ্ধৃতি অনায়াস-লভ্য।

এছাড়া তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কালিন্দীতেও এমনি অনেক প্রবাদ প্রবচন আছে।

লৌকিক উপাদানের উল্লেখে, শ্রীআচার্য অন্যতম ষষ্ঠী নীলষষ্ঠীর উল্লেখ করেন নি।

তারাশংকর যে সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, সেকথা বলা হলেও তাঁর সাহিত্যে যে তিনি এই ভাষার যথেষ্ট প্রয়োগ করেছেন সেকথা উল্লেখ করা হয়নি। শ্যামলকুমার বিশ্বাস, পল্লীশ্রী, শ্যামনগর। নদীয়া।

বিশ্বকাপ ফুটবল আসর

আজ সারা পৃথিবীর ফুটবল অনুরাগীদের দৃষ্টি আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ারসের দিকে নিবদ্ধ। সেখানের পাঁচটি স্টেডিয়ামে একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এই খেলাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর ফুটবল অনুরাগীদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। সকলেরই মুখে এক কথা এবার কোন দেশ ফুটবলের বিশ্বকাপ জয়ী হবে?

আর্জেন্টিনার এই একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল আসরে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে ১৬টি দেশ—এই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুবাদে ১৪টি দেশ এবং গতবারের (১৯৭৪ সালের) বিশ্বকাপ ফুটবল বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী ও একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ আর্জেন্টিনা।

১৯৭৮ সালের একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানের আবেদনপত্র দিয়েছিল ১০৩টি দেশ। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নি। প্রতিযোগিতার প্রথা অনুসারে গতবারের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী এবং উদ্যোক্তা দেশ আর্জেন্টিনাকে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে খেলতে হয় নি। তারা সরাসরি আর্জেন্টিনার মূল আসরে খেলবার অধিকার লাভ করে। কিন্তু বাকী ১৪টি দেশ বাছাই করার জন্যে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের আসর বসেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। সে এক এলাহি কান্ড। প্রাথমিক লীগের খেলায় ১৪টি দেশ বাছাই করতে প্রায় দু বছর সময় লেগে যায়। প্রাথমিক লীগের খেলায় ঝাড়াই-বাছাই হয়ে আর্জেন্টিনার মূল আসরে শেষ পর্যন্ত খেলবার যোগ্যতা লাভ করে এই ১৪টি দেশ : ইউরোপের ৯টি—পোল্যান্ড, ইতালী, অস্ট্রিয়া, হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, স্কটল্যান্ড, স্পেন ও হাঙ্গেরী, লাতিন আমেরিকার ৩টি — মেকসিকো, ব্রেজিল ও পেরু, আফ্রিকার ১টি—তিউনিশিয়া এবং এশিয়ার ১টি—ইরাণ। একটা লক্ষ্য করার বিষয়, এ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল আসরে যে-সব দেশ খেলেছে তাদের মধ্যে একমাত্র ব্রেজিল প্রতিটি মূল আসরে (অর্থাৎ এগারটি মূল আসরে) খেলবার গৌরব লাভ করেছে। ব্রেজিলের পর ইতালী ও পশ্চিম জার্মানীর ৯টি করে এবং মেকসিকোর ৮টি মূল আসরে খেলা উল্লেখযোগ্য।

আর্জেন্টিনার ১৬টি বাছাই করা দেশকে নিয়ে একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার যে মূল আসর বসেছে তাতে আগের বিশ্বকাপ ফুটবল বিজয়ী দেশ

আছে তিনটি—ইতালী, ব্রেজিল এবং পশ্চিম জার্মানী। ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল কাপ বিজয়ী উরুগুয়ে এবং ১৯৬৬ সালের বিজয়ী ইংল্যান্ড এবার মূল প্রতিযোগিতায় উঠতেই পারে নি। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকান জোনের ২নং গ্রুপের লীগ খেলায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল বলিভিয়া এবং রানার্স-আপ উরুগুয়ে। চারটে খেলায় বলিভিয়ার পয়েন্ট ৭ এবং উরুগুয়ের পয়েন্ট ৪। উরুগুয়ে রানার্স-আপ হওয়ার ফলে তারা দক্ষিণ আমেরিকান জোনের ইন্টার জোনাল খেলায় উঠতে পারে নি। ফলে এ বছরের মত প্রতিযোগিতা থেকে তাদের বিদায় নিতে হয়। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল বিজয়ী ইংল্যান্ড এবার নিয়ে পর পর দুবার (১৯৭৪ ও ১৯৭৮) মূল আসরে খেলতে পেল না। ১৯৭৪ সালে, ইংল্যান্ডের মূল আসরে যাওয়ার পথে প্রধান বাধা হয়ে যেমন দাঁড়িয়েছিল পোল্যান্ড এবার তেমনি ইতালী। এবার ইউরোপীয় জোনের ২নং গ্রুপে ইতালী এবং ইংল্যান্ড সমান ১০টা করে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু কিন্তু গোলের গড় হিসাবে ইতালীর কাছে ইংল্যান্ড হেরে গিয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়।

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল আসরে উরুগুয়ে এবং ইংল্যান্ড ছাড়াও এই তিনটি নামকরা দেশ খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি—রাশিয়া, পূর্ব জার্মানী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া। রাশিয়া ১৯৫৬ সালে এবং পূর্ব জার্মানী ১৯৭৬ সালে অলিম্পিক ফুটবল আসরে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল। অপর দিকে চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯৬৪ অলিম্পিকে রৌপ্যপদক, বিজয়ী এবং ১৯৭৬ সালের ইউরোপীয়ান নেশনস কাপ চ্যাম্পিয়ান। তাছাড়া বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চেকোশ্লোভাকিয়া রানার্স-আপ হয়েছে দুবার (১৯৩৪ ও ১৯৬২ সালে।) এবার ইউরোপীয় জোনের ৯নং গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল হাঙ্গেরী এবং এক পয়েন্ট কম পেয়ে রাশিয়া রানার্স-আপ হয়েছিল। ফলে রাশিয়া মূল প্রতিযোগিতায় উঠতে পারে নি। লীগের খেলে রাশিয়া ২-০ গোলে হাঙ্গেরী এবং ২-০ গোলে গ্রীসকে হারিয়েছিল। আবার তারা ১-২ গোলে হাঙ্গেরী এবং ০-১ গোলে গ্রীসের কাছেও হেরেছিল। এখানে উল্লেখ্য ১৯৭৪ সালে ইউরোপীয় জোনের ৯নং গ্রুপে রাশিয়া চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে চিলির বিপক্ষে না-খেলাতে রাশিয়ার মূল আসরে যাওয়া হয় নি।

চিলি ওয়াক-ওভার পেয়ে মূল আসরে উঠেছিল। এবার ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক ফুটবল চ্যাম্পিয়ান পূর্ব জার্মানী ইউরোপীয় জোনের ৩নং গ্রুপে অস্ট্রিয়ার থেকে এক পয়েন্ট কম পেয়ে রানার্স-আপ হয়েছিল। ফলে তাদের প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়। লীগের খেলায় পূর্ব জার্মানীর জয় ৩ এবং ড্র ৩। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দুটো খেলাই ১-১ গোলে এবং লীগ তালিকায় তৃতীয় স্থানাধিকারী তুরস্কের সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা ড্র করে। তুরস্কের বিপক্ষে অপর খেলায় পূর্ব জার্মানী ২-১ গোলে জিতেছিল। এবার ইউরোপীয় জোনের ৭নং গ্রুপে ১৯৭৪ সালের অলিম্পিক ফুটবলের রৌপ্যপদক বিজয়ী চেকোশ্লোভাকিয়া সর্বনিম্ন স্থান পেয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। চারটে খেলায় তাদের তিনটে হার এবং একটা জয়। ৭নং গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়—তাদের যা একমাত্র সান্ত্বনা।

আর্জেন্টিনায় একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল আসরে যে ১৬টি দেশ খেলছে তাদের মধ্যে নতুন মুখ আফ্রিকার তিউনিসিয়া এবং এশিয়ার ইরাণ। মূল আসরে তিউনিসিয়া এবং ইরাণের এই প্রথম আবির্ভাব। এশিয়া-দেশ থেকে এ পর্যন্ত ৫টি দেশ প্রতিযোগিতার মূল আসরে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছে এবং কোন একটি দেশের পক্ষে

মূল আসরে দুবার খেলার সৌভাগ্য হয় নি।

প্রতিযোগিতার মূল আসরে এশিয়া অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত এই ৫টি দেশ খেলেছে—

১৯৫৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়া, ১৯৬৬ সালে উত্তর কোরিয়া, ১৯৭০ সালে ইসরাইল, ১৯৭৪ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ১৯৭৮ সালে ইরাণ। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে মূল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে একমাত্র উত্তর কোরিয়া। ১৯৬৬ সালের মূল আসরে উত্তর কোরিয়া লীগের খেলায় ১-০ গোলে ইতালীকে হারিয়েছিল এবং চিলির সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা ড্র করেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী পর্তুগালের বিপক্ষে উত্তর কোরিয়া বিশ্রাম সময়ে ৩-২ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ৩-৫ গোলে হেরে যায়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা ফুটবল পণ্ডিতদের দৃঢ় ধারণা ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলবে ব্রেজিল এবং আর্জেন্টিনা। এবং তাঁদের কাছে ব্রেজিলের জয়ের সম্ভাবনা নাকি ষোল আনা। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি আর্জেন্টিনার জয়ের সম্ভাবনাকে বেশী জোর দিয়েছেন। তাদের মতে আর্জেন্টিনা স্বদেশের মাটি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে খেলবে। খেলায় জয়ের পক্ষে তা এক মস্ত অনুকূল পরিবেশ। বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দেখা গেছে স্বদেশের মাটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জয়ী হয়েছে চারটি দেশ—১৯৩০ সালে উরুগুয়ে, ১৯৩৪ সালে ইতালী, ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড এবং ১৯৭৪ সালে পশ্চিম জার্মানী।

একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার আসরে দেশ পর্যন্ত কোন দেশ কাপ জয়ী হবে তা নিয়ে দেশে দেশে বাজি ধরার হিড়িক পড়ে গেছে। লণ্ডনের জুয়াড়ীদের দাঁড়িপাল্লায় ব্রেজিল হট ফেভারিট অর্থাৎ তারাই জিতবে। সেই মত জুয়াড়ীরা বাজির দরও দিয়েছে।

১৯৭৮ সালের একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল আসরে অংশ গ্রহণকারী ১৬টি দেশ চারটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল নিয়ে সেমিফাইনাল লীগ খেলার তালিকা তৈরী হবে। সেমিফাইনাল লীগের খেলায় ৮টি দেশ দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে লীগ প্রথায় খেলবে এবং দুই গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান দল নিয়ে ফাইনাল খেলার আসর বসবে। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ধারণের জন্যে সেমি-ফাইনাল লীগের দুই রানার্স-আপ দলের মধ্যে খেলা হবে। মূল প্রতিযোগিতায় মোট খেলার সংখ্যা ৩৮।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় ১৬টি দেশকে এইভাবে চারটি গ্রুপে সমান ভাগ করা হয়েছে :

গ্রুপ ১ : পঃ জর্মানী, পোল্যান্ড, তিউনিসিয়া, মেক্সিকো।

গ্রুপ ২ : আর্জেন্টিনা, ইতালী, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী।

গ্রুপ ৩ : ব্রেজিল, অস্ট্রিয়া, সুইডেন স্পেন।

গ্রুপ ৪ : হল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, পেরু, ইরাণ।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৩০ সালে। প্রতি চতুর্থ বছরে এই প্রতিযোগিতার আসর বসার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে আসর বসে নি দুবার (১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে), বিগত দশটি আসরে কাপ জয়ী হয়েছে ইউরোপের তিনটি দেশ—ইতালি (২ বার) পশ্চিম জার্মানী (২ বার) ও ইংল্যান্ড (একবার) এবং দক্ষিণ আমেরিকার দুটি দেশ—ব্রেজিল (৩ বার) ও উরুগুয়ে (২ বার)। ব্রেজিল ১৯৭০ সালে মোট তিন-বার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুবাদে চিরতরে মূল বিশে কাপটি নিজেদের দখলে পেয়ে যায়। ফলে ১৯৭০ সালে জুল রিমে কাপের অধ্যায় শেষ। ১৯৭৪ সাল থেকে জুল রিমে কাপের বদলে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ চালু হয়েছে। এই কাপটা কোন দিনই কোন দেশের দখলে চিরদিনের মত যাবে না।

দর্শক

একদিন শ্রীকৃষ্ণ আসবেন ...

৭৬-'৭৭-এর ক্রিকেট সিজন শেষ। অমনি সি-এ-বি কর্তৃপক্ষ একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। বিষয়—বাজে ক্রিকেটের মনোনয়ন এবং বেছাই। সদা সমাপ্ত সিজনে বাংলার শোচনীয় ব্যর্থতার কথা আমাদের জানা। মানের দিক থেকেও যার যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। অতএব কি কি উপায়ে বাজে ক্রিকেটের মানকে আবার উন্নত করা যেতে পারে তারই হাউসে আয়োজিত ওই সভায় মূলতঃ তাই আলোচিত হয়। আলোচনা করেন বাংলার অতীত দিনের বেশ কয়েকজন দিকপাল ক্রিকেটার এবং আজকের কয়েকজন কোচ। এঁরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে বাংলা ক্রিকেটের মান এখন সর্ব ভারতীয় মানের থেকে অনেক নীচে নেবে এসেছে। পংকজ রায় এবং শ্যামসুন্দরের মিতব্যয়ী স্থান এখনও পূর্ণ হয়নি। অবশ্য-পোষণীয় তাঁদের শ্রেষ্ঠ দিন যেন ফিরিয়ে এনেছে। দলে ট্যালেন্টের অভাব। ফিজিক্যাল ফিটনেসের অভাব। ইত্যাদি। তাহলেও সকলে আশা রাখেন। আর সবচেয়ে বেশী আশা রাখেন কার্তিক বোস। তাঁর ভরা বলার নাই তিনি বলেন—'একদিন শ্রীকৃষ্ণ আসবেন। আমাদের বাংলার ক্রিকেটের পতাকাকে তুলে ধরতে। যেমন ধরেছিল পংকজ।'

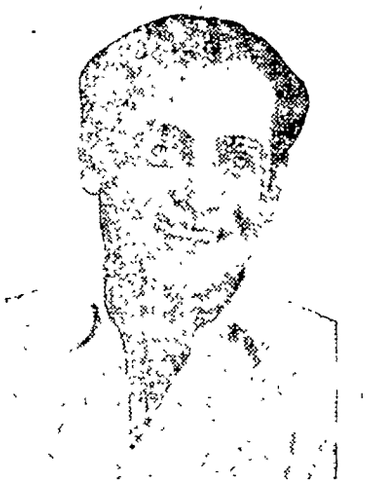

পংকজ রায়

কেন এই নিম্নমান? শুরুতে পংকজ রায় তাঁর অগ্রজদের কাছে সেই প্রশ্নই রাখেন। সেই সঙ্গে সি-এ-বি সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত 'কিরকম কোচিং হওয়া উচিত' সে বিষয়েও সকলের উপদেশ চান। একে একে অতীত দিকপালেরা বলতে শুরু করেন। প্রথম বক্তা বয়োজ্যেষ্ঠ জিতেন ব্যানার্জী। জিতেনদা তিনটে ব্যাপারে খুব জোর দেন। লীগ ক্রিকেটে দল সংখ্যা কমানো, ভাল পিচের ব্যবস্থা এবং নেগেটিভ বোলিং-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। কোচিং প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন যে আজকের কোচেরা অনেক ডাইনামিক তবে তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস বাড়াতে হবে। ডিমনসট্রেশনের ক্ষমতা রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিল হিচ-এর কথা উল্লেখ করেন। কিভাবে বিল হিচ শর্টে স্যালার্স্টিক বোলার, মিড অফ মিড অন-এর ওপর দিয়ে মেরে দেখিয়ে তবে শিক্ষা দিতেন। (এখন পলি উমরিগর নাকি তাঁর ছাত্রদের কিভাবে প্যাড-গার্ড পরতে হবে তাও প্রথমে দেখিয়ে থাকেন) তাঁর অন্যান্য বক্তব্য কোচ-দের অবসর গ্রহণ, বাংলা দলে বাইশ জনের বদলে ষোল জনকে নিয়ে 'টেনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট' গড়ে তোলা ইত্যাদি।

শিক্ষার প্রারম্ভ হল দেখা। ছাত্রদের খেলা দেখতে হবে। কিন্তু কজন আছেন তা দেখাবেন ?' —বলেন কার্তিক বোস। এই প্রসঙ্গে দু-একটা ঘটনার কথাও কার্তিকদা উল্লেখ করেন। কেমন করে প্রকাশ পোদ্দারকে প্রথম তিন বছর তিনি **আউট হতে দেন নি। ওই সময়**

শুটে ব্যানার্জী

পোদ্দার শুধু দেখেছে। ওতে ওর একাগ্রতাও বেড়েছে। (পোদ্দার আজও তা স্বীকার করেন) আবার উল্টোটাও বটে। কোচকেও তেমনভাবে দেখতে হবে। যেমন কার্তিকদা দেখেছিলেন শ্যামসুন্দরকে। যার ফলে বোলার শ্যামসুন্দর একজন প্রথম সারির ব্যাটসম্যান হতে পেরেছিল।

রণজি ট্রফির আগে বাংলা দলের ছেলেরা আলাদা আলাদাভাবে ক্লাব ক্রিকেটে মেতে থাকে। ফলে নিজেদের মধ্যে বোঝা-পড়া গড়ে উঠতে পারে না। তাই রণজির আগে দলকে কিছু ম্যাচ খেলতে হবে। এই আলোকপাত শুটে ব্যানার্জীর। কোচিং-এর ক্ষেত্রে শুটেদার মত একটু আলাদা। তিনি দু ধরনের কোচের কথা বলেন। একদল ব্যাটিং শেখাবে। অপর দল বোলিং। তবে ফিজিক্যাল ট্রেনিং সকলকেই ভালভাবে জানতে হবে। কোচদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি সুন্দর কথাও বলেন। তা হল—'আপনারা যদি ভাল ক্রিকেটার গড়তে না পারেন; অন্তত শক্ত সামর্থ নাগরিক গড়ে তুলুন।'

আমাদের ক্রিকেটের কবর খুঁড়ছে তিন ঘন্টার লীগ ম্যাচ। কারণ স্পীনারবা এখানে অবহেলিত। ফাস্ট বোলারদের বলা হয় নেগেটিভ বোলিং করতে। দলের সকলে ব্যাট করার সুযোগ পায় না। এ বিষয়ে কমল ভট্টাচার্য, নির্মল (পুটু) চৌধুরী, শ্যামসুন্দর মিত্র এবং সুহৃদ মিত্র একমত। কমলদা বলেন, খেলোয়াড়দের শক্তি, স্ট্যামিনা ও ধৈর্য্যের কথা। যা তিন ঘন্টার খেলায় আনা অসম্ভব। তাই খেলাকে কম করে দু দিনের করতে হবে। শেষ দশটি টীম নিয়ে একটি আলাদা গ্রুপ করতে হবে। প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করতে হবে। শ্যামসুন্দর মিত্র এই সংখ্যাকে কমিয়ে সাত-এ আনেন। তাঁর মতে ডজ বলে কিছু থাকা ঠিক নয়। হয় হার নয় জিৎ। সুহৃদ মিত্রর সাজেশন হল—প্রথম ডিভিশনে সাঁইত্রিশটি দলের জায়গায় ষোলোটি, দ্বিতীয় ডিভিশনে ছত্রিশটি এবং বাদবাকী সব তৃতীয় ডিভিশনে। এই প্রসঙ্গে দেবু মুখার্জী বলেন যে, প্রথম ডিভিশনে দল-গুলির মধ্যে একটা ভাগাভাগি থাকলে সেরা চারটি দলকে এই মে মাসের প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে খেলতে হত না।

প্রেমাংশু চ্যাটার্জীর দীর্ঘ ভাষণ ছিল কোচ এবং সিলেকটরদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা, ইডেনে পিচ ভাড়ার ব্যবস্থা, তিন মাসের বদলে ন' মাসের ক্রিকেট, বর্ষাকালেও নিয়মিত প্র্যাকটিস, বয়স্ক খেলোয়াড়দের অপসরণ, ডিসিপ্লিন—এসব নিয়ে। বাংলা সিনিয়র দলের জন্য ষোলো, জুনিয়ারের জন্য বাইশ এবং স্কুলের জন্য ষোলো—এই আটচল্লিশজনকে নিয়ে যাতে নিয়মিত প্র্যাকটিস হতে পারে সে এ বিষয়ে তিনি সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। কোচ সুব্রত বোসের অভিমতও অনেকটা এই রকম।

ছেলেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকটার প্রতি বিশেষ নজর দেবার কথা তুলে ধরেন মন্টু ব্যানার্জি এবং সলিল ভদ্র। কোচদের প্রতি মন্টুদার বাণী হল 'ক্যাচ দেম ইয়ং'। পুটুদাও যে ব্যাপারে একমত। অর্থাৎ ট্যালেন্ট খুঁজতে হবে অল্প বয়সীদের মধ্যে থেকে।

এমনি করে সকলেই যখন বাংলার নিম্নমানের প্রতিকারের কথা বলতে থাকেন, তখন আলোচনায় ঝড় তোলেন প্রকাশ পোদ্দার। তিনি বলেন—'খেলার মান বলতে কি শুধু ট্রফি? বাংলার মান এমন কী খারাপ হয়েছে? আগেও কি তা ভাল ছিল?' সকলে চুপ। পোদ্দার বলে চলেন—'সারা পৃথিবীতেই খেলার মান খারাপ হয়ে গেছে। খেলার আর্ট, উন্নতি এবং কালচার আজ পয়সার কাছে হেরে গেছে। আমাদের বাংলার মাটি নরম। ফাস্ট পিচ নেই। (কমলদার মতে আমাদের পাঁচে কেবলমাত্র হাল্কা অফ স্পিনার তৈরী হতে পারে। ফাস্ট বোলার বা লেগ স্পীনার কখনই নয়।) তা সত্ত্বেও আটচল্লিশ সালের পর থেকে ভারতের সেরা ফাস্ট বোলাররা এখান থেকেই উঠেছিল। তবু কেন আমাদের এখানে ফাস্ট পীচের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি? আমাদের স্কুল দল দারুণ। সি কে নাইডুর আমরা চ্যাম্পিয়ন। ব্যাস! তারপর কী গোলমাল হচ্ছে? কেন বাংলার ছেলেরা

কমল ভট্টাচার্য

তিন দিনের খেলাতে আনফিট হয়ে পড়ছে? কেন ছেলেরা ডিসিপ্লিন মানছে না?' খেলোয়াড়দের বয়স প্রসঙ্গে বলেন—'বয়স কখনই নির্বাচনের ফ্যাকটর নয়। নঈম বত্রিশ বছর বয়সে সব থেকে ফিট ফুটবলার বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার বব সিম্পসনকে ওরা আবার ডেকেছে। ক্যাসিয়াস ক্লে এখনও শ্রেষ্ঠ। তাছাড়া ভারতীয় হকি দলে নবীনরা কি করল? পোদ্দারের সঙ্গে বাংলার ক্রিকেট মানের ব্যাপারে কোচ সোমেন বসুও একমত।

সুখের কথা, সকলের আলোচনা পর সি-এ-বি সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত উপস্থিত সকলকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে—'যে রকম ভাবেই হোক, তিন মাসের বদলে আমরা ন' মাস ধরে খেলব'।

শেষ বক্তা ছিলেন সি-এ বি সভাপতি অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। আলোচনাচক্রটি পরি-চালনার দায়িত্বও ছিল তাঁর। অমরবাবুর মতে বাংলার নিম্নমানের একমাত্র কারণ ভাল খেলোয়াড়দের ডিসিপ্লিনের অভাব। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে কোচ, সিলেকটর এবং টীম ম্যানেজার-সকলকেই আন্তরিক ভাবে তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সি-এ-বির নতুন কর্তৃপক্ষ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এই আলোচনাচক্র (যা সম্ভবত এই প্রথম) নিঃসন্দেহে সে কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু শুধু আলোচনাতেই যেন সব কিছুর শেষ না হয়। মাঠে যেন তার ফসল ফলে।

অসিতবরণ মিত্র

কলকাতার ফুটবল

কলকাতার ফুটবল লীগের খেলা শুরু হয়ে গেছে। তিন প্রধান — মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিংও মাঠে নেমে পড়েছে। অর্থাৎ কলকাতা ময়দান এখন জমজমাট। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই পিঁপড়ের মত সার বেঁধে হাজার হাজার মানুষ এখন ময়দানের পথে হাঁটেন —এস্‌প্লানেডে ট্রাম কিংবা বাস থেকে নেমে। এক একদিন সব পথ গিয়ে মেশে এক এক মাঠে; সেই মাঠে সেদিন হয় মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল না হয় তো মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা। খেলা শুরু হবার অনেক আগেই মাঠ কানায় কানায় ভরে যায়।

কলকাতা ময়দানে একটি স্থায়ী ফুটবল সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৮৯২ সালে একটি সভা হয়। শোভাবাজার তাঁবুতে অনুষ্ঠিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডালহৌসী ক্লাবের এ আর ব্রাউন, আর বি লিণ্ডসে, ক্যালকাটার ওয়াটসন সাহেব আর শোভাবাজার ক্লাবের নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী।

সেই সভায় একটি নতুন ফুটবল সংগঠন গড়া হল। নাম দেওয়া হল— ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা আই এফ এ। ঠিক হল পরের বছর থেকেই আই এফ এ একটি নক আউট প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করবেন। প্রতিযোগিতার নাম আই এফ এ শীল্ড। আই এফ এ শীল্ড তৈরী করার দায়িত্ব নেবার জন্যে এগিয়ে এলেন কুচবিহারের মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা আর ডালহৌসী ক্লাবের জে আদারল্যাণ্ড। শীল্ডটি তৈরী করার ভার দেওয়া হল লণ্ডনের এলকিংটন অ্যাণ্ড কোম্পানীকে

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সাল থেকে শুরু হল আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা। ভারতের প্রথম ফুটবল সংস্থা হিসেবে আই এফ এ স্বীকৃতি লাভ করল। আই এফ এর প্রথম সভাপতি হলেন ক্যালকাটা ক্লাবের ম্যাকফারসন সাহেব। সম্পাদক এ আর ব্রাউন। নগেন্দ্রপ্রসাদের পরামর্শ মত আই এফ এ কমিটিতে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে সম্মানীত হলেন শোভাবাজার ক্লাবের হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

প্রথম দিকে আই এফ এ শীল্ডের খেলা দু জায়গায় হত। পশ্চিমাঞ্চলের খেলা হত এলাহাবাদে আর পূর্বাঞ্চলের কলকাতায়। এলাহাবাদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল চারটি ফৌজী দল। আর কলকাতায় ডালহৌসী, ক্যালকাটা, হাওড়া ইউনাইটেড, নেভাল ভলেন্টিয়ার্স আর শোভাবাজার। এ ছাড়া ছিল চারটি ফৌজী দল। দ্বিতীয় দল বলতে ছিল একমাত্র ঐ শোভাবাজারই। ডালহৌসী মাঠে ফাইনাল ১৮৯৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর। এলাহাবাদ অঞ্চলের বিজয়ী রয়েল আইরিশ দলের সঙ্গে খেলল কলকাতা অঞ্চল চ্যাম্পিয়ান পঞ্চম রয়েল আর্টিলারী। প্রথম দিন খেলাটি শেষ হল ১-১ গোলে। পুনরনুষ্ঠিত খেলায় রয়েল আইরিশ এক গোলে আর্টিলারীকে হারিয়ে আই এফ এ শীল্ডের প্রথমবার বিজয়ী হল।

কলকাতায় ফুটবল খেলা আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ক'বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে লীগের খেলা শুরু হল। আই এফ এ শীল্ডে ভারতীয় দলগুলোকে যোগদান করতে দেওয়া হলেও কিন্তু লীগের খেলায় সে অধিকার পেল না ভারতীয় দলগুলো। ফৌজী আর গোরা দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল লীগের খেলা। ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগের খেলা শুরু হল। এবারও ভারতীয় দলগুলোকে খেলতে দেওয়া হল না। অথচ তখন কয়েকটি ভারতীয় দল রীতিমত শকতিশালী ছিল। তারা গোরা ও ফৌজী দলগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলত।

ওদিকে কালী মিত্রর জায়গায় মন্মথ গাঙ্গুলী আই এফ এ কমিটিতে গেছেন। শুধু তাই নয় তাঁকে জয়েন্ট সেক্রেটারী পর্যন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু লীগের খেলায় ভারতীয় দলগুলোর অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি কিছুই করতে পারলেন না। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। তারপর ১৯১১ সালে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জেতায় সেই অসন্তোষ ভয়ংকর হয়ে উঠল। দর্শকদের মধ্যে থেকেও দাবী উঠল—ভারতীয় দলগুলোকে লীগে খেলতে দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ সালে এক রকম বাধ্য হয়েই লীগ ফুটবলের দ্বিতীয় বিভাগে স্থান দেওয়া হল দুটি দলকে। মোহনবাগান আর এরিয়ান্স প্রথম দুটি বাঙালী দল হিসেবে লীগে খেলার সুযোগ পেল। পরের বছরই মোহনবাগান উঠে গেল প্রথম বিভাগে। আর তার শূন্য স্থানটি পেল শোভাবাজার ক্লাব। ১৯১৬ সালে এরিয়ান্স প্রথম বিভাগে উঠল। আর পরের বছর দ্বিতীয় বিভাগে খেলার সুযোগ পেল আরও চারটি দল—টাউন, গ্রীয়ার, কুমারটুলি ও মুশলিম দল ওরিয়েন্টাল।

ওদিকে কুমারটুলি পার্কে ক্যালকাটা ইউনিয়ন নামে ছোটদের একটা ক্লাব ছিল। ১৯২০ সালে অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়কে সভাপতি করে জোড়াবাগানের সুরেশ চৌধুরী, কুমারটুলির তড়িৎ রায়, উয়াড়ীর নসা সেন প্রভৃতিরা ক্যালকাটা ইউনিয়নের নাম বদলে নতুন একটি ক্লাব গড়লেন। তার নাম দেওয়া হল ইস্টবেঙ্গল। পরের বছর তাজহাট ক্লাব উঠে গেল। তারা লীগে দ্বিতীয় বিভাগে খেলত। তাজহাটের শূন্য স্থানটি পেল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম বছরই ইস্টবেঙ্গল দারুণ খেলল। ২৪টি খেলার মধ্যে হারল মাত্র একটিতে। পেল ৩২ পয়েন্ট। লীগ তালিকায় প্রথম বছরই ইস্টবেঙ্গল পেল তৃতীয় স্থান।

কলকাতার লীগের খেলা এখন পুরো দমে চলছে। খেলছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং। ময়দান জমজম করছে। লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ লাভের লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে দর্শক ও সমর্থকদের প্রত্যাশা মিটিয়ে ক্লাবগুলো একটির পর একটি খেলায় জিতে চলেছে। ২৯ জুলাই দুই প্রধান মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা। সেই দিনই বোঝা যাবে এবারের লীগের মালা কার গলায় উঠবে। আজকাল ঐ একটা খেলাই সব। আগে এই রকম ছিল না। তখন প্রত্যেকটি খেলায় লড়তে হত। জিততে মেহনৎ করতে হত। আধকাল তো বড় দলগুলো হেলায় হারায় ছোট ক্লাবগুলোকে। আর তারপর দু প্রধান মুখোমুখি হয়ে ফয়সালা করে নেয় লীগের ভাগ্যের। এবারও বোধহয় ঠিক তাই হবে। তাই ফুটবল উৎসাহীরা এখন থেকেই তাকিয়ে আছেন ২৯ জুলাইয়ের দিকে। সেই দিন যা হবার হয়ে যাবে। ১৯৭৮ সালের লীগ ফুটবলের ভাগ্য নির্ধারিত হবে সেই দিনই.....।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপালি নাগ

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বাইশ তারিখে শ্রীমতী দীপালি নাগের জন্ম। লেখাপড়া ও সঙ্গীত শিক্ষার হাতে খড়ি প্রধানতঃ ওঁর আগ্রা শহরে। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইংরেজীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন আর বিখ্যাত আগ্রা ঘরানায় তালিম লাভ করেন পরলোকগত বসির খান, তাসদ্দুক হোসেন খান ও ফৈয়াজ খানের কাছে। এই প্রথিত-যশা শিক্ষাগুরুদের কাছে তাঁর পাঠ চলে সেই ১৯৪৩ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত।

সঙ্গীত প্রেমীরা ওনার অনেক রেকর্ডের সাথে পরিচিত এবং তারা হয়ত এও জানেন যে তাঁর প্রথম রেকর্ড বেরিয়ে ছিল ১৯৩৯ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে। কিন্তু ওই প্রথম রেকর্ডের ভিতরের ইতিহাস টুকু কজন জানেন। শ্রীমতী নাগ এসেছেন কবি নজরুলের কাছে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন তাঁর স্বকণ্ঠের একটি গানে: যা ছিল 'জয়জয়ন্তী' রাগাশ্রিত একটি হিন্দী বন্দিশ। গান শুনে খুশী হয়ে কবি সঙ্গে সঙ্গে একটি বাংলা গান রচনা করে ওই সুরেই শ্রীমতি নাগকে গাইতে বললেন। আর আমরা সঙ্গীতপ্রেমীরা পেলাম সেই কালজয়ী গান মেঘ মেদুর বর্ষায়। এই গানে তিনি সারা বাংলায় ও জৌনপুরী রাগের একটি খেয়াল গানে সারা ভারতের সঙ্গীত জগতে নিজের স্থান করে নিলেন অতি সহজেই।

শ্রীমতী নাগ রেডিওতে গাইছেন সেই ১৯৩৯ সাল থেকেই। ১৯৭০ এ গোয়ালিয়র তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনে, ১৯৭২ এ রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনে তাঁর গান সাড়া জাগায়। শুধু দেশীয় বেতার কেন্দ্রগুলিই নয় বিদেশেও (লন্ডন,প্যারিস) সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দেশে বিদেশের টেলিভিশনেও একাধিকবার ওঁর অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

তিনি ১৯৫০ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত 'গীতবিতানের' সহ অধ্যক্ষা এবং ১৯৬৬-৬৭ পর্যন্ত ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিকের শিক্ষিকা ছিলেন। আকাশ বাণী কলকাতার এসিসটেন্ট প্রডিউসার অব মিউজিক হিসাবেও (১৯৫৬-৬৫) তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বিদেশেও ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের জন্যে তিনি যথেষ্ট সচেষ্ট। লন্ডনে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে শুরু করে ইন্দো আমেরিকান সোসাইটি, ইণ্ডিয়া ইন্টার ন্যাশানাল সেন্টার, ম্যাক্স মুলার ভবন (দিল্লী ও কলকাতা) ত্রিবেনী কলা সঙ্গম এবং অসংখ্য সেমিনারে তাঁর অগণিত বক্তৃতার যে কি অসীম মূল্য তার সঠিক মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত বোঝা যাবে না। এই জ্ঞান পিপাসু শিল্পীর সাধনার ফসল তাঁর লেখা বই এবং উচ্চমানের বাংলা ও হিন্দীতে লেখা প্রচুর প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি কোলকাতা

দীপালি নাগ

আগ্রা বেনারস, দেরাদুন, পাতিয়ালা এবং এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের পরীক্ষক ও প্রশ্ন কর্তা ছিলেন। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমীর স্কলারশিপ কমিটির সদস্য হিসাবেও (১৯৭০) প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। শিল্পীর মানসিক প্রসারতার ও উদারতার পরিচয় আমরা তখনই পাই যখন দেখি যে তিনি কি অমানুষিক সাধনায় প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্য সংগীতেরও পাঠ নিয়েছেন লন্ডনে। সঙ্গীত সমালোচক হিসাবেও তাঁকে আমরা পেয়েছি 'স্টেটসম্যান' ও 'লিঙ্ক' পত্রিকায়।

বিখ্যাত শিল্পি রামগোপালের সাথে বিদেশে প্রচুর অনুষ্ঠান করেন. ১৯৭৪ এ একটি সাংস্কৃতিক সফর করেন চেকোস্লো-ভাকিয়ায় ও রাশিয়ায়। সম্প্রতি আরেকটি সাফল্য সফর সমাপ্ত করেন ইরানে ১৯৭৭এ।

অজানাকে জানবার এবং জানাকে আরও ভাল করে চিনবার নেশায় শিল্পী আজও মত্ত। তাঁর বয়স, প্রতিষ্ঠা, সুনাম তাঁকে থামতে দেয়নি, তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। এখনও পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। গড়ে তুলেছেন 'সপ্তসুর' দিল্লীও কলকাতায়। এই সংগঠনের মাধ্যমে অকৃপণে দু হাত ভরে দিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীদের। অস্বাভাবিক ধৈর্য্যের সঙ্গে হাতে ধরে সঙ্গীতের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন প্রতিটি ছাত্রীকে। প্রতি নিয়ত খুঁজে চলেছেন নূতন প্রতিভা। প্রতিষ্ঠিত পুরাতনের মাঝে অপ্রতিষ্ঠিত নবীনপ্রতিভাকে জায়গা করে দেবার চেষ্টায় সদাই ব্যস্ত। এজন্য তিনি প্রতি বছর বেশ কিছু ঘরোয়া জলসা ও সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। আবার কখনও গীত গাইতে ছাত্রীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন। এদিক ওদিক। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিচ্ছেন সমানে। 'সপ্তসুর' ছাড়াও দিল্লী স্কুল অব মিউজিকের সাথেও তিনি ব্যস্ত রেখেছেন নিজেকে। গানের সাথে সাথে পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখাও তাঁর থেমে নেই। নিজেও গান করছেন যায়গায় যায়গায়।

তাঁর মধ্যে এমন এক সঙ্গীত সাধককে দেখতে পাই যাঁর কাছে সঙ্গীত অর্থোপার্জনের বা যশ লাভের সোপান মাত্র নয়। তাঁর কাছে সঙ্গীতই ধর্ম, সঙ্গীতই জীবন।

রবীন্দ্রায়ণের শ্যামা

রবীন্দ্রায়ণ প্রযোজিত 'শ্যামা' দেখবার সৌভাগ্য হলো। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন অমলশংকর ভাদুড়ী। এঁর গান আমি খুব ছোটোবেলায় (১৯৫৬ সাল) শুনেছিলাম। দীর্ঘদিন উনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্বাস্থ্য বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন। তা সত্ত্বেও যে গান-বাজনার চর্চা রেখেছেন এটা বিশেষ প্রশংসনীয়।

'শ্যামা'তে তাঁর গাওয়া কয়েকটি গানে ভাব ও সুরের কোথাও বিচ্যুতি ঘটে নি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মত একজন প্রবীণ শিল্পীর পাশেও ওঁর গানে উৎকর্ষ, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য বোধ কম মনে হয় নি।

অমলশংকর ভাদুড়ি

কখনও কখনও এমনও মনে হচ্ছিল সেদিনকার প্রোফেশনালদের অপেক্ষায় এঁর গলাই ভালো বলছে—এঁর গানই ভালো লাগছে।

এই ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অনেক উঠতি সমালোচক নিন্দেদের অল্প বিদ্যা দেখানোর জন্যে খুঁজে বেড়ায় কোথায় 'সা'র বদলে 'সা রে' লাগলো। সঙ্গীতে ভাবই আসল, স্বরলিপি গৌণ। আর তাছাড়া পোস্ট-মর্টেম করলে কোনো শরীরই সুন্দর থাকে না—একটি সুন্দর দেহ কাটাকুটি করলে বিশ্রী দেখায়। এই ধরনের সমালোচনার আমি পক্ষপাতী নই, আমি তো বলবো যে কুড়ি বছরের ওপর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যান্ত্রিক জীবন কাটিয়েও যে এই ধরনের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পেরেছেন, এত উৎসাহের সঙ্গে সকলকে একত্র করে এবং নিজে ভালো গেয়েছেন এইটাই কম কৃতিত্বের কথা নয়—এবং যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

সুব্রত রায়চৌধুরী

চিত্রধ্বনি

অসমিয়া ছবি বনজুই

তখন জোনা ও প্রেমাধব পাশাপাশি শুয়ে। ঠিক সেসময় হলে ঢুকলাম। ছবি তখন বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। আসলে কলকাতায় সেদিন প্রচন্ড বৃষ্টি ফলে রাস্তা জ্যাম তাই ঠিক সময়ে বেরিয়েও ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারিনি। তবে বিশ্বাস ছিল আসামের বন্ধুরা তাঁদের স্বাভাবিক সারল্য ও বন্ধুতার তাগিদে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবেন। আমার সেই বিশ্বাস আহত হয়নি।

এই ছবির আলোচনায় আসার আগে দুটো ব্যাপারে আমার দীনতা স্বীকার করি, ১। প্রায় ৮০০ ফিট দেখানোর পরে হলে আসা, ২। অসমীয়া ভাষাতে সম্পূর্ণ অধিকার না থাকা।

এ সত্ত্বেও ছবিটির কাছাকাছি আসতে পেরেছি, তার প্রথম কারণ ছবির গল্প এবং দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ এর আবহ সঙ্গীত, এ ছবি আরেকবার প্রমাণ করে যে ভূপেন হাজারিকার কাছে আমাদের তথাকথিত সঙ্গীত পরিচালকের অনেক কিছু শেখার আছে। বস্তুতঃ তাঁর এই ছবির আবহ ও গানের জন্যে আমি দশমাইল রাস্তায় হাঁটতেও প্রস্তুত।

আসামের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার প্রকৃতি, এ ছবিতে পরিচালক তা চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করেছেন। সৈয়দ আব্দুল মালিকের একটি বিখ্যাত গল্প এর বিষয়বস্তু। স্বাধীনতার আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আসামের একটি গ্রামের ছোট্ট পরিবারে ভাঙাগড়ার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এসেছে পুলিশের অত্যাচার, গ্রাম-বাসীদের সংস্কার এবং সেই সঙ্গে একটি চিরন্তন সত্য, সন্তানের জন্য নারীর তীব্র আকাঙ্খা।

আমাকে সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে পরিচালক আব্দুল মজিদের সাহস। যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি ছবি করেছেন এই সবকিছুকেও তা চলচ্চিত্রায়িত করতে অনেকের হাত কাঁপবে। এছবি আমাদের নিয়ে গেছে এক নির্মম সত্য ও মানবিকতার সামনে।

কিন্তু এর বিষয়বস্তু যত গোবালো বাচনভঙ্গী ততটা নয়। ছবির গায়ে প্রচন্ড ঢিলেঢালা ভাব। সম্পাদনা ছবিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেনি। অনেক জায়গা বেশ একঘেয়ে লাগে, তার ধীরগতির জন্য। অনেক ফেডিং ও আগোছালো কিছু কিছু অংশের ডিটেলসেও গোলমাল আছে। তবু এর মধ্যে কয়েকটি দৃশ্য দুর্দান্ত, আমি তার দুটো উদাহরণ রাখছি ১। ঘরছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নায়িকার নৌকায় একটা পা রেখে চিন্তা, কয়েকটি ফ্রিজ শটে যা

গঙ্গা কি সৌগন্ধ ছবিতে বিন্দু

এসটাবলিশড হয়েছে, ২। নায়িকার ফিরে আসার পরে নায়কের মুখোমুখি হওয়ার সময় নায়িকাকে নেগেটিভে দেখানো, অভিনয়ে নায়িকা জোনার চেয়ে ময়নাবুপগ মুদুলা বড়ুয়া অনেক বেশী স্বাভাবিক। কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তে তাঁর তাকানো, কান্না সত্যিই অসাধারণ। মাধবের চরিত্রে রমেন শর্মাকে আমার অনেকদিন মনে থাকবে। নায়িকা (জৈবা মুমতাজ) নায়ক (বিশ্বজিৎ সেন) ও গোলাপেরা তাঁদের চরিত্রে বিশ্বস্ত হতে পেরেছেন।

ছবিটি দেখে বোঝা যায় যে নানা অসুবিধের মধ্যেই ছবিটি নির্মিত হয়েছে। আসামের চলচ্চিত্রের গর্ব যে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তাঁরা ভেঙে পড়ছেন না, বরং নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচ্ছেন। আসামে এখনো ল্যাবোরেটরী নেই, ভাল ক্যামেরা নেই। ফলে তাঁদের কলকাতার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। আর কলকাতায় আসা যাওয়া থাকা ইত্যাদিতে যা খরচ হয়, সে টাকায় আরেকটা ছবির প্রায়শঃভাগ শেষ করা যায়।

অসমীয়া চলচ্চিত্রের অনুরাগী হিসেবে আসাম সরকারের কাছে আবেদন করি, দয়া করে কলকাতার ওপর নির্ভর না করে নিজেরাই ল্যাবোরেটরী ইত্যাদি নির্মান করান, তাতে সময় শ্রম অর্থ ইত্যাদি অনেক কিছুরই সাশ্রয় হবে। তাছাড়া অসমীয়া চলচ্চিত্র তো এখন প্রাপ্ত বয়স্ক, চামেলী মেমসাব, ফাল্গুনী, বনজুই ইত্যাদি ছবিই তার প্রমাণ। তাই আপনারা কেন এখনো কলকাতার ওপর নির্ভরশীল হবেন?

-বিকাশ জানা

কয়েকটি তথ্যচিত্র

গিয়ার্সন আমাদের দেশে জন্মাননি, জন্মাবেন কিনা ভবিষ্যতও বলতে পারে না। সুতরাং ডকুমেন্টারী ছবি এখনও সত্যনিষ্ঠ ডকুমেন্ট ছাড়া শিল্পের মর্যাদা আমাদের দেশে পায়নি।

ব্যতিক্রম কি নেই? সে আর কজন। গর্গ, সুখদেব, চিদানন্দ দাসগুপ্ত, আশিষ মুখার্জি তেই তালিকার সমাপ্তি টানা যেতে পারে। অধুনা অরুণের দল ফিল্মের গ্ল্যামার রোগে ভুগছেন, ডকুমেন্টারী ছবিকে প্রায় অচ্ছুৎ করেছেন অনেকে। কেউ কেউ এটাকে ফিচার ফিল্ম করার মই হিসাবে ব্যবহার করছেন। ভাবুন তো কি অসহনীয় ট্র্যাজেডি!

কলকাতার চিদানন্দবাবু এখন দিল্লীবাসী এবং ফিল্ম করা থেকে বিরত, আশিষবাবু এখন শৈল্পিক ডকুমেন্টারী ছবি করায় অনিয়মিত, নিয়মিত শুধু কাজ করছেন শান্তি চৌধুরী, ইমেজ ইন্ডিয়ার একক ব্যক্তিত্ব।

ও'র 'ডিরসা এন্ড দি ম্যাজিক ডল' ও হীরের প্রজাপতি 'পুরস্কৃত' প্রশংসিত দুটি তথ্যচিত্র। সম্প্রতি তিনি চারখানি ছবির এক বিশেষ প্রদর্শনী করলেন গোর্কি সদনে। ছবিগুলি হল—ফোক সঙ্গস অফ পাঞ্জাব, ম্যাজিক হ্যান্ডস, পার্বতী ও পেইন্টার অফ আওয়ার টাইম।

প্রতিটি ছবিতেই পরিচালকের নিখুঁত নৈপুণ্যের ছাপ স্পষ্ট, কাব্যিক মেজাজও উপলব্ধি করা যায় অনেকক্ষেত্রে শট কম্পোজিশনে। ফোক সঙ্গস অফ পাঞ্জাব যে গল্পের কাঠামো থাকায়—ডকুমেন্টেশনটি

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনীর পথে।

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়

নাটক। পরিচালনা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঃ- বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, শান্তনু, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, ঊশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও ভরুপকুমার

হয়ে উঠেছে মনোগ্রাহী। পার্বতী ছবিটিতে পেশাদারী দক্ষতাটাই যেন বড়, পরিবার পরিকল্পনা প্রচারের উদ্দেশে তৈরী এই ছবি যত না শিল্পধর্মী তার চাইতে বেশী প্রচারধর্মী। বলা যায় ডকুমেন্টারী চরিত্র থেকে কিঞ্চিৎ পথভ্রষ্ট।

ম্যাজিক হ্যাণ্ডস ও পেইন্টার ছবি দুটিতেই শান্তিবাবুর শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামা কারিগরের হাতে বাঁশের তৈরী ক্লিনিসগুলো যে কি সুন্দর রূপ নেয় তা নিয়েই এই তথাচিত্র ম্যাজিক হ্যাণ্ডস। মণিপুরের নয়নলোভন লোকেশনে তোলা এ ছবির রংটাও সুন্দর। পেইন্টার ছবিটিতে শান্তিবাবু প্রখ্যাত চিত্রকর এস এফ হোসেনের জীবন ও শিল্প চিন্তাকে একজন শিল্পীর চোখ দিয়েই তুলে ধরেছেন। যদিও হোসেন সাহেবের বহু ছবি পেইন্টিং স্থান পেয়েছে ছবিটিতে, কিন্তু ঐ দৃশ্যটিতে ভোলা যায়নি এখনও। যেখানে হোসেন সাহেব আমাদের মত ভেসে ভেসে বিরাট একটি ক্যানভাস নিয়ে এগিয়ে আসছেন দর্শকের দিকে কিংবা শেষ দৃশ্যে সাদা রং দিয়ে একটি ছবিকে রুদ্ধ করে দেওয়া। এগুলোতো পরিচালকের চিন্তার গভীরতা ছাড়া সম্ভব নয়।

ডাক দিয়ে যাই

ছবিতে ক্যামেরার মাধ্যমে পরিচালক কল্পিতমল কাংকারিয়া যা তুলে ধরেছেন তা আগাগোড়াই নাটক। তাও যদি আধুনিক হত। কিন্তু 'ডাক দিয়ে যাই' একেবারে পুরোনো ধাঁচের। মনে হবে ষ্টাবে বসে কোনো প্লে দেখছি। সেলিটমেন্টের যেখানে ঢালাও কারবার। আসলে চিত্রনাট্যটাই নাটকের। ক্যামেরাতে তাই চরিত্র ছাড়া অন্য কিছু ধরা পড়েনি। শব্দগ্রহণে ও সংলাপ এবং মিউজিক ছাড়া কোনো প্রাকৃতিক শব্দ গ্রহণ করা হয়নি। ঘটনা, চরিত্র সবই কেমন মন্থরগতি। প্রধান ভূমিকায় শিল্পী অনুপ কুমারের কথা ধরা যাক। পেশায় পিওন। কর্তব্য ছাড়াও যার হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। লোককে যে শুধু সুখের খবরটাই দিতে চায়। দুঃখের খবরগুলো চেষ্টা করেও দিতে পারে না। জনৈক সৈনিকের যুদ্ধে প্রাণ হারানোর খবরটা তাই সে বেমালুম চেপে গেছে। শুধু তাই নয়, মাসে মাসে নিজের মাইনে দিয়ে ওই মৃত সৈনিকের সংসার চালিয়েছে। যদিও এর জন্যে তাকে হাতে খেতে হয়েছে, বাড়ীতে পরিবার অনাহারে থেকেছে ইত্যাদি। ভালোমানুষ বলে তাকে দেখানো হয়েছে ঠিক কথা। কিন্তু ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি নয় কি? যাই হোক ওই ঘটনা নিয়েই ছবির যত কিছু। শেষে জেলঘর আদালত মুক্তি এবং শূন্যের মত ডাক দিয়ে যাই গান গেয়ে অনুপকুমারের চিঠি বিলি।

পিওনকে নিয়ে ছবি। তাই খাম পোস্টকার্ড ইনল্যান্ড লেটারের ওপর নাম লিখে টাইটেল পর্বের শুরু। চিঠিগুলো সব একালের। অন্য একটি দৃশ্যে স্টকশটে প্রথম মহাযুদ্ধের বোমারু বিমানগুলো দেখা গেছে। আবার আদালত দৃশ্যে ৭৬ সালের ক্যালেন্ডারও চোখে পড়ছে। এই রকম আরো কিছু গলদ আছে। এক জায়গায় ফ্ল্যাশব্যাকে পানের দৃশ্যটির কোনো দরকার ছিল না। অভিনয়ের ক্ষেত্রে বেবি সন্থিতাকে দিয়ে যেরকম পাকা পাকা কথা বলানো হয়েছে তা হাস্যকর। ফলে সন্থিতা ভাল অভিনয় করেও বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেনি।

তবে ছবির কিছু ভাল দিকও আছে। যেমন অনুপকুমারের অভিনয়। ইদানিং তার এমন সংযত অভিনয় খুব কমই চোখে পড়ে। যে দৃশ্যে মণিঅর্ডার ফর্ম দিয়ে তিনি সুমিত্রার কাছ থেকে মুখের ভাব আড়াল করেছেন বা যেখানে সুমিত্রাকে তিনি টেলিগ্রামের খবর পড়ে শোনাচ্ছেন, সে দৃশ্যগুলোতে তার অভিনয়ের তুলনা নেই। নিঃসন্দেহে তার অভিনয়ই ছবির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পলাতক-এর পর তার এত ভাল অভিনয় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অনুপকুমার ছাড়া আরও একজন অভিনয়ের জোরে ছবিকে মাতিয়ে রেখেছেন, তিনি হরিধন মুখোপাধ্যায়। এই গুণী শিল্পীকে বহুদিন পর একটা ম্যাচুরিটি বড় চরিত্রে দেখা নিশ্চয়ই আনন্দের। পর্দায় যতক্ষণ দেখা গেছে ততক্ষণই তিনি দর্শকের সকলের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন। এঁরা ছাড়া মোটামুটি ভাল অভিনয় করেছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

তিমিরবরণ এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক। তার আবহ এবং গানের সুর দুই-ই সুন্দর। দীনেন গুপ্তর ক্যামেরা ভাল। আর ভাল এ ছবির সংলাপ। অসিতবরণ কিন্তু

সাক্ষাৎকার

'সেন্সার বোর্ডের কর্তারা বিশ্বাস করতে চান না যে স্বাধীন ভারতের গ্রামে এখনো শোষন চলে।'

পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্নাতক ছাব্বিশ বছরের কানাড়া তরুণ গিরিশ কাশরাবল্লী বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতে এক উল্লেখযোগ্য নাম। সম্ভবতঃ সুবর্ণকমল সমী ছবির এতারংকালের সর্বকনিষ্ঠ পরিচালক তিনিই। রেকর্ড নিশ্চয়ই। তার আবার ঘাটশ্রাদ্ধ গিরিশের প্রথম ছবি। বি ভি কারনাথের চোমলা ডুডিতে তিনি ছিলেন সহকারী। এক বছর পরে গিরিশ স্বাধীন ভাবে নামলেন ছবি করতে এবং প্রথম ছবিতেই হাতে এল ভারতের সেরা ছবির পুরস্কার। ঘাটশ্রাদ্ধ কানাড়া ছবির কলোম্বাল পর্বের একটি বড় লাম্প পোস্ট। কিন্তু ছবিটির ভাগ্যে আর্থিক সাফল্যের রসটিকা পড়েনি। ব্যবসায়ী মহলের শিকার হয়েছে ঘাটশ্রাদ্ধ। এই ছবি ছবির সাফল্য অসাফল্য নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন সম্প্রতি তারই সংক্ষিপ্ত রূপ এই প্রতিবেদনে:—এই ঘাটশ্রাদ্ধ ছবির কাহিনী আপনি পেলেন কি ভাবে?

—ছবির প্রোডিউসার মিঃ সুবর্ণর সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ হয় ১৯৭৬ সালে বম্বেতে। তখন সেখানে ফিল্ম ফেস্টিভালে দেখানো হয়েছিল।

মিঃ সুবর্ণকে আমি তখন ঘাটশ্রাদ্ধের স্ক্রিপ্টটা শোনালাম। ভালো লাগল ওঁর।

তখনই ঠিক হল সম্পূর্ণ আউটডোরেই ছবিটার কাজ করব আমি। কাশরাবল্লী গ্রামের আমার বাড়িটাকে নানাভাবে ব্যবহার করেছি ছবিতে, সব জায়গায় শুটিং করেছি। কোন জায়গা বাদ দিইনি। এমনকি ঐ গর্ভপাতের দৃশ্যটা তোলার জন্য আমাদের গোয়াল ঘরটিকে ভাঙতে হয়েছে।

: শিল্পীদের তো আপনি মনোমতই পেয়েছিলেন, তাই না?

—তা প্রায় পেয়েছিলাম. অসুবিধে হয়েছিল শুধু নায়িকা যমুনাকক্কাল শিল্পী নির্বাচন করতে। আমি আর আমার ক্যামেরাম্যান এস রামচন্দ্র কম করে পঁচাত্তর আশিটা মেয়েকে দেখেছি, প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-দেরও দেখেছি, কিন্তু কিছুতেই পছন্দ হয় না। একদিন গল্পের লেখক প্রফেসর অনন্ত মূর্তিকে বললাম মেয়ের সমস্যার কথাটা

দক্ষিণী

১ দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা—২৬

নূতন-শিক্ষাবর্ষ

নূতন শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণীতে নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ট্রেনিংড গুরুঠাকুরতা পরিকল্পিত বয়স্কদের পাঁচ ও শিশুদের তিন বছরের পাঠক্রম যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হবে। শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় বয়স্কদের চার ও শিশুদের তিন বছরের শিক্ষাক্রম। শিক্ষা গ্রহণ ও ভর্তির সময় : শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৪—৮।, বুধবার বিকাল ৪—৭, রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ৪—৭।

তিনি বলেন আমার ছাত্রীদের দিয়ে চলবে, যদি চলেন্তো দেখতে পারো। ওঁর ছাত্রীদের মধ্যে থেকেই আমি মীনাকে বেছে নিই।

: গর্ভপাতের দৃশ্যটিতে সেন্সর বোর্ড কোন আপত্তি করেনি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, করেছিল বৈকি। যেখানটায় দেখানো হয়েছিল অ্যাপেরশনের পর ক্লান্তিতে কষ্টে মেয়েটার চোখ বুজে আসছে, হাঁ করা মুখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সে দৃশ্যটিকে ওঁরা কেটে কম করতে বললেন। ওঁরা বললেন দৃশ্যটা বড় পীড়াদায়ক, নৃশংস। তাই কিছিৎ কমাতেই হল। কিন্তু দৃশ্যটার অর্থ গেল বদলে। এখন আপনারা যা দেখলেন তাতে হাঁ করা মুখটা দেখে যদি কেউ মনে করেন মেয়েটা বোধহয় মরেই গেল। আশ্চর্য হবো না।

বিচ্ছিন্ন একটি দৃশ্যের প্রতি সেন্সরের এই নজরকে না হয় বরদাস্ত করা গেল কিন্তু সব চাইতে হতাশার কথা কি জানেন—সেন্সর বোর্ডের অ্যাটিচ্যুড, কাহিনীর প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটাই অন্য-রকম।। সেন্সর বোর্ডের কর্তারা বিশ্বাস করতে চান না যে স্বাধীন ভারতের গ্রামে এখনও শোষণ চলে।

সেজন্যই চোমল ডাডি বা আমার এই ছবির সময়কালকে আমরা নিয়ে গেছি চল্লিশের দশকে। অথচ সত্তর সালেও ঘাটশ্রাদ্ধ হয়েছে অনেক গ্রামে আমি জানি, কিন্তু করার কিছু নেই।

: ঘাটশ্রাদ্ধের ডকুমেন্টের যে ঐতিহাকে উপস্থিত করেছেন সে সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ছবিতে কতখানি প্রতিফলিত ?

—আমি তো নিজে ব্রাহ্মণ, এখনও পর্যন্ত ধর্মীয় সকল আচার-আচরণকে নস্যাৎ করতে আমি পারিনি। কিন্তু আমার সবচাইতে দুঃখ হয় এই ঘাটশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে। খুবই খারাপ লাগে আমার। কারণ অমানবিক নৃশংস নিয়ম এটা। কিছু ব্রাহ্মণের মধ্যে এক ধরণের হিপোক্র্যাসি আছে আমি তার জন্য ব্রাহ্মণ হিসাবে সত্যিই দুঃখিত।

ছবির বৃদ্ধ টোল শিক্ষক উদ্‌পা এক জন বৈদিক, যিনি তন্ত্রদর্শনে বিশ্বাস করেন যে দর্শন বিধিকে সমর্থন করে। সেই উদ্‌পাই তার গর্ভবতী মেয়ের গর্ভপাত ঘটায়।

: ছবি দেখে দর্শকের প্রতিক্রিয়া কি রকম ?

—কোন কোন মহল থেকে প্রচুর বাধা এসেছিল। যখন ছবির শুটিং করছি তখনই অনেক লোক কাহিনীকার অনন্তমূর্তিকে ওয়ার্ণিং দিয়েছে।—মশাই আপনার ঐ ছোট গল্প নিয়ে ছবি করা বন্ধ করুন। খবরের কাগজে উল্টো-পাল্টা বহু চিঠিপত্র বেরিয়েছে তখন।

বাদ প্রতিবাদের ঝড়টা তুঙ্গে উঠেছিল যখন ডেকান হেরাল্ড পত্রিকায় সমালোচক টি জি বৈদ্যনাথন ধারাবাহিক একটি মন্তব্যকারী প্রবন্ধ লিখলেন ছবিটিকে

গিরিশ কাশরবল্লী

আক্রমণ করে। রচনাটি বহু জায়গায় স্ববিরোধী এবং ধোঁয়াটে। মিঃ বৈদ্যনাথন ছবিটির নাম দিয়েছিলেন সিনেমাশ্রাদ্ধ।

এছাড়া কর্ণাটকের ছটি সেন্টারে ছবিটি ভালোই চলেছে। সুতরাং দর্শকদের নিশ্চয়ই ভালো লাগছে বলতে পারি। আমাদের ওখানে ফিল্ম সচেতনতা বেড়েছেও অনেক।

: তাহলে ছবিটা এতো তাড়াতাড়ি উঠে গেল কেন ?

—সে আর কি বলবো। সবচাইতে বড় ভুল করেছিলাম আমার পরিবেশককে বিশ্বাস করে। ট্যাক্স এক্সেম্পশন হওয়ার কিছুদিন পর ছবিটা রিলিজ করলেন, আর আট সপ্তাহ যেতে না যেতেই ট্যাক্স একসমপশন পিরিয়ড শেষ হতেই ছবিটা তুলে নিলেন ডিস্ট্রিবিউটর। আর হিসেবের কারচুপি করে আমাদের দেখালেন সেল কমে গেছে। একেতো ছবির ডিস্ট্রিবিউটর পাওয়াই এক বড় সমস্যা। আমি নিজে পাকা চার মাস এক ডজন পরিবেশকের দরজায় দরজায় ঘুরেছি। সবাই-ই এককথা বলেছেন—ছবিটা খুব ভালো পানটান নেই, তায় আবার অমন মর্মান্তিক গল্প।

আর্জেন্টিনার ছবি

আর্জেন্টিনার ফিল্ম বলতে প্রথমেই যে নামটি মনে পড়ে সেটি হচ্ছে লিওপোল্ড, টেবি নেলনসন। দু বছর আগে কলকাতার আন্তর্জাতিক উৎসব আমাদের সেই পরি-চয়কে বিস্তৃত করেছিল সোলানাসের 'আওয়ার অফ ফার্নেস' ছবিটি উপহার দিয়ে।

লাতিন অমেরিকার রাজনৈতিক উথাল-পাথালিতে বিধ্বস্ত এই দেশটি আমাদের বুদ্ধি এবং চেতনাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ঐ একখানি ছবি দিয়েই। দিল্লী উৎসবে দেখা দুখানি ছবি ('বিবেলিয়ন ইন প্যাটাগোনিয়া' ও 'কুয়েরাকো') চেতনায় এনে দিল এক বিপ্লবী ইমেজ। ক্যামেরাও যে সংগ্রামের হাতিয়ার হতে পারে এবং আর্জেন্টিনার টগবগে তরুণেরা সেই সংগ্রামেই যে আত্মনিবেদন করেছেন, সে খবর আর অজানা নেই।

আর্জেন্টিনায় কম্যুনিস্ট - বিরোধী আঁতাত নামক একটি বেসরকারী সংস্থা জুলিও টরসলাবকে (আওয়ার অফ দি ফারনেস ছবির শিল্পী) হত্যা করেছে, এখবরও আমাদের জানা। চিত্রগ্রাহক হানস্ হাবম্যান মৃত, রেমুন্ডো গ্লেইজার এখনও বেপাত্তা সে খবরও পৌঁছেছে আমাদের কাছে।

দুর্ভাগ্য, দিল্লীর উৎসবে হেকটর অলিভেরা নামধারী একজন আর্জেন্টিনিয় ফিল্ম পরিচালকের সঙ্গে সোলানাসের হতে তাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করায় জবাব পেয়ে-ছিলাম 'সেক্স কমেডি' ছবিই এখন আমাদের ছবির বাজার গরম করে রেখেছে। সেন্সরবিধির কড়াকড়ি লোহার প্রাচীরের মত। ছবি তৈরী শুরু থেকে রিলিজ অব্দি বিভিন্ন পর্যায়ে সেন্সরের মাস্তানিপনা সহ্য করতে হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়েছিলেন।

সংগ্রামের হাতিয়ার ক্যামেরাকে কাঁধে করে যারা পথে বেরিয়েছেন তাঁদের কোন হদিশ নেই, এখনও তারা দেশত্যাগী। আশার আলো একটাই—বিপ্লবী লিপিকার অক্টাভিও গোটলে এখন সেন্সর বোর্ডের অধিকর্তা। পূর্বে অভিশপ্ত কয়েকটি ছবি

যেমনি মুক্তি পেয়েছে, তেমনি সোলো-নাসের নতুন ছবি 'দি চিল্ড্রেন অফ দি ফিয়েরো' নতুন করে সুটিং হবার পরও এখনও ক্যানবন্দী। কারণ অবশ্যই সেন্সরের ফাঁস।

সেই সঙ্গে রয়েছে অর্থনৈতিক সংকট। উৎপাদন মূল্য বেড়েছে অথচ টিকিটের দাম আনুপাতিক হারে বাড়েনি। এমতাবস্থায় চলছে বাঁচার লড়াই। আর্জেন্টিনার চালু ছবিগুলিতে তাই নাটক আর উত্তেজক দৃশ্যের রোশনাই।

সম্প্রতি ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া শহরে যে তিনটি ছবির ব্যাপক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন তার কোনটিকেই যথার্থ আর্জেন্টিনার ছবি হিসাবে চিহ্নিত করা গেল না। অন্ততঃপক্ষে যে ইমেজ ছিল, সে মাপকাঠিতে নয়।

হেকটর অলিভেরার 'দি ডেড ম্যান' দর্শনীয় শুধু নয়নলোভন দৃশ্যাবলীর জন্য। গল্পে কোন বিশেষত্ব নেই. কিংবা বক্তব্যের কোন ঋজুভঙ্গিও নজরে আসে না।

এনরিক কাহেনের 'অন এ বীচ বাই দি সী' তিরিশের দশকে মিউজিকাল হলিউডি ছবির ব্যর্থ অনুকরণ বলা যায়। ব্যবসায়িক মূল্য ছাড়া এ-ছবির বাড়তি কোন চাহিদা দর্শকের কাছে নেই।

প্রোগ্রামের তৃতীয় ছবি হুগো সোফোভিচের 'এ ডিফারেন্ট টাচ' মজার সেক্সি কমেডি চরিত্রের ছবি। ভ্রান্তি-বিলাস ধরনের কতগুলি সিচুয়েশন অবশ্যই ভালো লাগে।

উৎসবের উদ্বোধনী সন্ধ্যায় মৃণাল সেন বলেছিলেন এই তিনটি ছবি আজকের আর্জেন্টিনার প্রকৃত ছবি প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু এই অনুষ্ঠান দিয়েই শুরু হল ছবির প্রদর্শনী। আশা করা যায় বিপ্লবী আর্জেন্টিনার বিতর্কিত ছবিগুলি হবে পরবর্তী আকর্ষণ। আমরাও তাই আশা করি। অক্টাভিও গেটিনো যখন দেশে রয়েছেন, তখন সোলানাসের ছবি সাগর পেরিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরোবে, নিশ্চয়ই প্লেইজারের পাত্তা মিলবে, হোসে মার্তিনেজ সুয়ারেজ, বিকাশদা লুনার মত তরুণ এবং সেইসঙ্গে হুগো ফার্গো নিচ, টোবি লেলসন-এর মত প্রবীণদের ছবিও সহজে মেমো-রিয়ালে পর্দায় দেখতে পাবো। কারণ আমরা বিশ্বাস করি 'আওয়ার অফ দি ফার্নেস' এখনও ঠাণ্ডা হয়নি।

নির্মল ধর

রূপ-কল্পের 'বৈরী'

কিছু কিছু নাটকের ভিতরকার গল্পের বুনোট এত ঘন হয় যে শিথিল প্রযোজনাও দর্শককে বসিয়ে রাখতে বাধ্য করে। ম্যাকসিম গোর্কির 'দি এনিমিস' অবলম্বনে রচিত নাটক 'বৈরী' দেখতে দেখতে গত ২২ মে এই কথাই মনে হচ্ছিল বারবার. নাটকটি প্রযোজনা করেছিলেন রূপকল্প নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের দ্বিতীয়তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এটি দল, বলা উচিত এটি সংগ্রামী গ্রুপ থিয়েটার উনিশ বছরে বহু বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে উনিশটি নাটক মঞ্চস্থ করার পরে তাঁদের উদ্দেশ্যের সততায় অবিশ্বাস করা উচিত নয়, বিশেষ সেই উনিশটি নাটকের প্রায় সবগুলোই যখন এটি মহৎ আদর্শের প্রেক্ষাপটে রচিত এবং প্রযোজিত। তাহলে প্রযোজনার শৈথিল্যের কথা উঠেছে কেন? উঠছে, কারণ সাধ আর সাধ্যের মিল সবসময়ে হয় না তাই।

এই নাটকের নাট্যকার নির্দেশক সমৃদ্ধ ঘোষ বুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছেন গোর্কির জোরালো বচনাটির প্রতি শ্রদ্ধাসিদ্ধ নিষ্ঠাবান থেকে। দু-এক জায়গায় অনু-বাদের গন্ধ বা তারেকটি সংলাপ ইচ্ছাকৃতে বাদ দিলে নাটকটির রচনা বেশ ভালো। আরো ভালো এর মাঝে মাঝে কোথাও বিরতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত। কিন্তু নাটকের তীব্র বিরতি না দিয়ে যা মেজেছিল, সংলাপের অনুরূপ গন্ধ ও আবেগ বহন করেও যা এগিয়েছিল তা বারবার কেটে গেছে অভিনেতাদের পার্ট ভুলে যাওয়ায়, কখনো জড়ানোয়, অনাবশ্যক কাল্পনিকে আর প্রম্পটারের অসহায় আত্মপ্রচারে। তবু সীমার ভূমিকায় সীতা নাগকে ক্ষমা করা যায় তাঁর চরিত্রটিকে আগাগোড়া ধারার ক্ষমতার জন্য, জয়ন্তর ভূমিকায় নিখিল দাস-এর উপরও ততটা রাগ করা যায় না, কিন্তু শান্তনুর ভূমিকায় বাবলু ঘোষ অমার্জনীয়। তাঁর চীৎকারসর্বস্ব অভিনয়ে যে চীৎকার করতে গেলেই তাঁর কথা বোঝা যায় না। এমন কী উত্তেজনা থাকতে পারে যে নিজে তিনি মিঃ দত্ত হয়েও সীমা দেবীকে মিঃ রায় প্রসঙ্গে বটুকোক্তি করতে গিয়ে বারবে দত্ত বলে চেঁচাবেন? প্রশান্তর ভূমিকায় অজিত মুখোপাধ্যায় কেন বারবার হিস্টেরী অভিনয়ের কায়দায় ঘাড়টে খেয়ে খেয়ে কথা বলবেন? কেনইবা নতুন ভূমিকায় প্রতিমা দাস বারবার আমাদের ভুল উচ্চারণ শোনাবেন?

অথচ এ প্রযোজনায় তা হওয়ার কথা ছিল না। কুশলীরা অনেকেই একটা সুর ধরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন; মনুর ভূমিকায় সন্তোষ ঘোষ-এর কণ্ঠ যৎপরোনাস্তি ক্ষীণ হলেও তাঁর অভিনয় দক্ষতার ছাপ ছিল। টিমু দত্ত (সিতেন) কে অনাবশ্যক অতিরিক্ত ভাড় সাজানো হয়েছে নাহলে তিনিও খারাপ অভিনেতা নন। আর অপূর্ব প্রাণবন্ত অভিনয় করেছিল এলে-বুলির ভূমিকায় কিশোরী শ্যামবর্তী ঘোষ। বেড়ো হয়ে এই মেয়েটি সত্যিকারের ভালো অভিনেত্রী হবে যদি ঠিক ঠিক সুযোগ পায়। এদের নিষ্ঠার সঙ্গে সমতা রক্ষা করেছিল সুন্দর মঞ্চবিন্যাস এবং ভাল বিশ্বাসের নিপুণ বিশ্বাসী আলোর সম্পাত। সুন্দর পরিকল্পনার ছাপ ছিল আগাগোড়া আলোচনা চার আমলে কুশলীর আলোচনা কুশিলব, কুশিলব আলোচনা দৃশ্যটির উপ-স্থাপনা পরিচিতি না ফ্যাকাশে হয়ে পড়লেও আমি ভালো বুঝি সংলাপটির পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়ে শোষক শ্রেণীর ভিতরের মিলটা ধরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত। এসব সামগ্রিক প্রযোজনায় শেষ পর্যন্ত এরা সেখানি নাটকে দলের ছাপ রেখে গেল। সে ছাপ থাকার পিছনে যেমন এক লেখার গোড়ার দিকে বলা কটিগুলো দায়ী তেমনি দায়ী এর আবহসংগীতের ব্যবহার বা পুনরাবৃত্তিতে ক্লান্তি। কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও একথা মনে রাখতে হবে যে পর্দার অন্তরালের অসুবিধা কণ্ঠের বলে আমাদের জানা হয়তো অনেকেরই, তবু তাঁরা যে আদর্শ নিয়ে সমাজের স্বপ্ন দেখেন সে সমাজ গঠনের প্রধান কিন্তু শ্রমিকদের ভূমিকা, অথচ মানুষ-বাড়িতে সমস্ত ছবিতে প্রযোজিত নাটক অভিনয় এই সে কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে হয় ছোট একটি কথা বলে নয়।

সমরজিৎ সেন

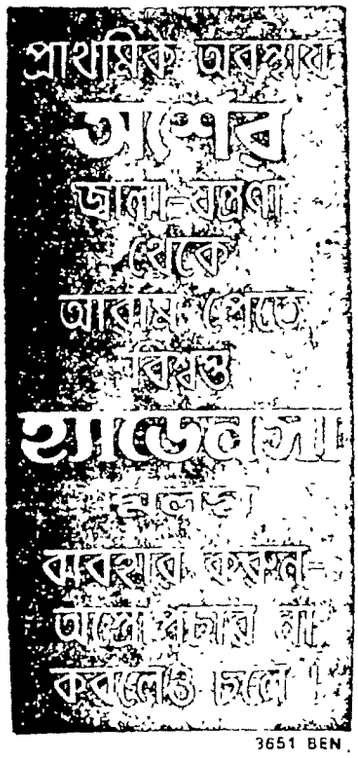

3651 BEN.

মেসার্স পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে ইন্দুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও ৩৩ চৌরঙ্গী ১২।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

দারুণ আকর্ষণ !

যুগান্তর এর শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে
প্রচণ্ড লাভ !

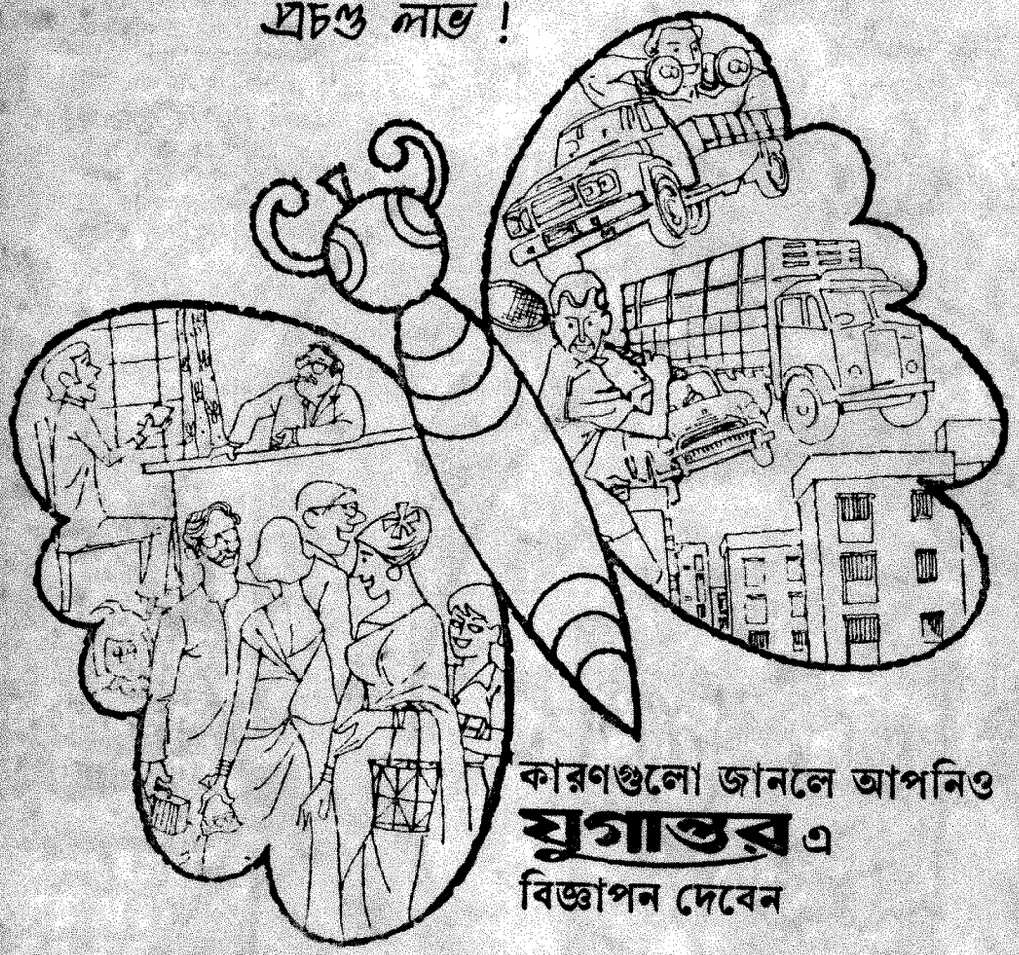

কারণগুলো জানলে আপনিও
যুগান্তর এ
বিজ্ঞাপন দেবেন

- যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিলে আপনি অনেক বেশি উত্তর পাবেন। কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে।
- যুগান্তরের বর্তমান কাটতি যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আপনার বক্তব্য সহজেই আরও অনেক বেশি পাঠকপাঠিকার কাছে পৌঁছবে। গত ছ'মাসেই যুগান্তরের দৈনিক প্রচার সংখ্যা বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি।
- বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন। বিজ্ঞাপনগুলি সহজেই নজরে পড়ে। ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

পাত্র-পাত্রী ☐ চাকুরী ☐ জমি-বাড়ী ☐ ব্যবসা-বাণিজ্য ☐ মোটর-লরি
যাতিপত্র কিংবা যে কোনও বিষয়ে কম খরচে বেশি জবাব চান তো

যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীষ্ট ফল পাবেনই

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 9th June, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুক্‌মী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুক্‌মীর নাম জুড়ে হুবহু কুক্‌মী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুক্‌মী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুক্‌মী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুক্‌মী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

7 JUN 1978

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘো
১৬ জুন ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

া এখনও নিজের হাতে দেশ চালান

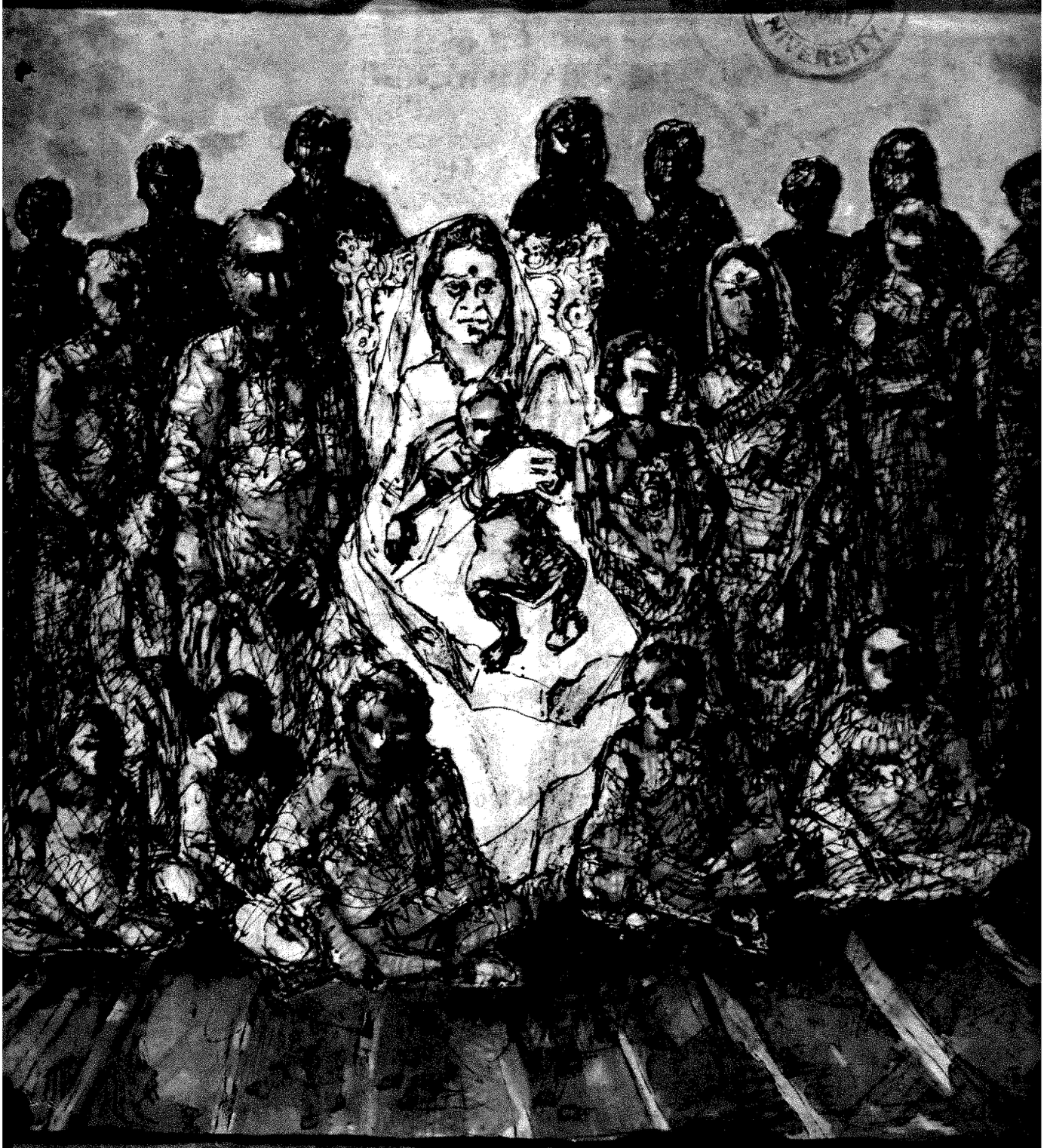

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে নববর্ষের অমৃতে থাকবে সবচেয়ে সেরা লেখা
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃতে স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমল শাসমলের সুদীর্ঘ প্রামাণিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধী ঃ লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার

পিছু হটার পালা ঃ লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীমাণিক্য

অনেক কিছু হয়েছে ঃ লিখেছেন অতুল সুর
ভবতোষ দত্ত

সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী

প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছেন

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ ঃ ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে
শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন ঃ অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা

দাম তিন টাকা ।। রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেণ্টকে এখুনি বলে রাখুন।

অথবা লিখুন

সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-৩

বিখ্যাত রবীন্দ্র-জীবনীকার
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

ফিরে ফিরে চাই

বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথের বিরাট জীবনী লিখে যিনি বিশ্বের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনও যেমন বিচিত্র, তেমনি কর্মবহুল! সেই ঋষি-কল্প লেখক এই গ্রন্থে নিজের বিগত বিপুল জীবনের দিকে তাকিয়েছেন। এ দৃষ্টিও সাধারণ দৃষ্টি নয়। ফলে এই অভিজ্ঞতাও সাধারণ আত্মজীবনী হয়ে ওঠেনি, উপন্যাসের থেকে উপ-ভোগ্য হয়েছে।

—দাম ষোল টাকা—

স্বামী রামানন্দ ভারতীর
বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী

হিমারণ্য

লেখকের এই অসামান্য ভ্রমণ-কাহিনী দীর্ঘ কয়েক যুগ অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ ছিল! যা'রা ভ্রমণ কাহিনী লেখেন এবং যা'রা ভালবাসেন সকলেরই এ জন্য আক্ষেপের অবধি ছিল না। এতকাল পরে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় উদ্ধার করে পাঠক সমাজে উপস্থাপিত করা হল।

—দাম আট টাকা—

নতুন ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে :—

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নগরপারে রূপনগর ৪০.

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম (১ম খণ্ড ৪০. ২য় খণ্ড ৩২.)

জরাসন্ধের
নিঃসঙ্গ পথিক ১ম খণ্ড ১৮. ২য় খণ্ড ১৮.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই ১৮. উপকণ্ঠে ২৫.

জ্যোতির্ময়ী দেবীর
সোনা রূপা নয় ২০.

সুমথনাথ ঘোষের
বাঁকাসোঁতা ৬॥ সুদূরের পিয়াসী ৮.

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
মধুমতী থেকে ভাগীরথী —ষোল টাকা—
অজ্ঞাতবাস —নয় টাকা—

নারায়ণ সান্যালের
নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা —চোদ্দ টাকা—
অবাক পৃথিবী —দশ টাকা—

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
মনে মনে খেলা ৬·৫০ **সরাইখানা ৮.**

নিমাই ভট্টাচার্যের
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ৬. **নাচনী ৭.**

সমরেশ বসুর
আনন্দধারা ৬. **সূর্যতৃষ্ণা ৯.**

আশাপূর্ণা দেবীর. জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

প্রথম প্রতিশ্রুতি ২৮.

শীঘ্রই চতুর্দশ মুদ্রণ প্রকাশিত হচ্ছে।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩/৩৪৮৭৯১
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯/৩৪৩৪৯২

একটি-ই আস্থা

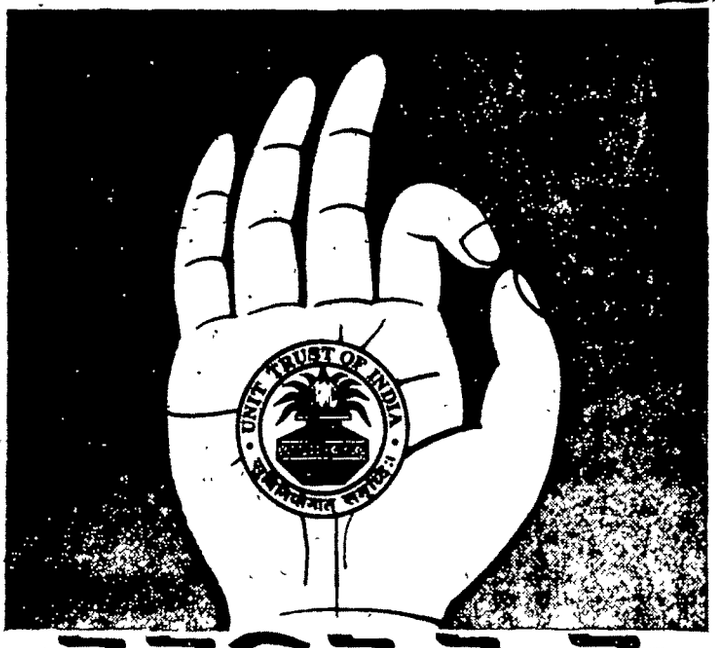

ইউনিট ট্রাস্ট

ইউনিট ট্রাস্ট সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত একটি বিনিয়োগ সংস্থা। ইউনিট ট্রাস্ট কাজ শুরু করে ১৯৬৪ সালের জুলাই মাস থেকে।

এই সংস্থা নানা রকম প্রকল্প অনুসারে ইউনিট বিক্রি করে আর এইভাবেই জনসাধারণকে সঞ্চয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

তারপর ওই সঞ্চয়কে কী করে? ইউনিট ক্রেতাদের উপকারের জন্য প্রধানত দেশের সেরা ও উন্নতিশীল কোম্পানী-গুলোর শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে লগ্নী করে।

লগ্নী ইত্যাদি থেকে ট্রাস্টের বার্ষিক যা আয় হয় সেটা খরচা ইত্যাদি বাদ দিয়ে অন্যাংশ হিসেবে ইউনিট ক্রেতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

সত্যি বলতে, প্রত্যেকটি ইউনিট কেনার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ক্রেতা মোট যে-পরিমাণ ইউনিট কিনেছেন তিনি সেই পরিমাণে ট্রাস্টের সম্পত্তিতে অংশীদার হয়ে যান।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা দারুণ সুবিধা ভোগ করতে থাকেন: তাঁর টাকা পয়সার ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞদের বুদ্ধি পরামর্শ পেয়ে যান নিজের থেকেই, কারণ শিল্প-বাণিজ্য, মূলধন-বিনিয়োগ, অর্থের আদান-প্রদান প্রভৃতি কাজে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানেই এই ট্রাস্ট চলে।

আরও অনেক সুবিধা আছে: যেমন বিনিয়োগের ঝুঁকি ভাগ হয়ে যায়, কর ছাড়, মূলধনের নিরাপত্তা, আকর্ষণীয় লভ্যাংশ, চট করে ইউনিট ভাঙানোর সুবিধা ইত্যাদি। সমস্ত রকম লগ্নীর মধ্যে এই লগ্নী একেবারে অতুলনীয়।

এগুলো এবং আরও অনেক বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা ইউনিট ট্রাস্টে করা হয়েছে—এসমস্তই করা হয়েছে সবরকম লোকের প্রয়োজনের কথা ভেবে।

আর ওর সবচেয়ে বড়ো সুবিধাটার কথা তো বলা-ই হয়নি। একবার এর নানারকম প্রকল্প ও যোজনার কথা জানবার পর আপনি আমাদের ট্রাস্টের একজন অংশীদার হতে চাইবেন।

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া

৪ ফেয়ারলি প্লেস কলিকাতা ৭০০০০১

টেলিফোন: ২৩-৯৩৯১,২৩-১৬৩৮,২৩-৮৮১৮

মুখ্য প্রতিনিধিদের নাম ও ঠিকানা

জে. এম. বিশ্বাস
১০৩ আর. বি. ঘোষ রোড,খোশবাসান
বর্ধমান,

জে. জি. অধিকারী
ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বিল্ডিং,বিস্টুপুর,
জামশেদপুর

এইচ. পি. চৌধুরী সি/১৫ নেতাজীনগর
কাস্টাটোলী,রাঁচী-৮৩৪০০১

সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলুন একটি একটি ইউনিটে

8888-e—UTI. C/4/78 Bn

অমৃত

১৮ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
১ আষাঢ়
১৩৮৫
16 June, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
আমি কেমন আছি ? ৫
দীপংকর চক্রবর্তী
চিঠিপত্র ৬
সমালোচনা ৭
কবিতা ৯ অনন্ত দাশ, দেবী রায়, শংকর চক্রবর্তী, তুষার চৌধুরী
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ১০
পর্যবেক্ষক
ভাগ্য গণনা ১১ শ্রীমাণিক্য

প্রচ্ছদ কাহিনী ১২

মা এখনও নিজের হাতে দেশ চালান
লাউদ হায়দার
প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্যামল দত্ত রায়
গত সংখ্যার প্রচ্ছদশিল্পী
ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত
পাতিহাঁস (গল্প) ১৭
সুধাংশু ঘোষ
পারিবারিক খাতা ২২
পশুপতি শাশমল
তরুণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৭
শৈবাল মিত্র
প্রদর্শনী ৩৩
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
সখীচরণের বউ (গল্প) ৩৫
অরুণা সেন
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩৯
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
হৃদয় নন্দন বনে (উপন্যাস) ৪৫
সোমেন্দ্রনাথ বাব
যাদের দেখেছি ৪৯ অনন্ত সিং
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৫৩
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
খেলা ৫৮
সংগীত সমালোচনা ৬০
সুব্রত রুদ্র চৌধুরী
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়

আত্মহত্যার অধিকার
লিখেছেন বজ্রেশ্বর রায়
অসীম চক্রবর্তীর গল্প
নৈঋত মুস্তাফের
অন্ধ্র মুসলমানরা কেমন আছে

আবার ম্যালেরিয়া ?

দেশে আবার ম্যালেরিয়া হচ্ছে এ খবরে নতুনত্ব নেই কিছু। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে সম্প্রতি যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে বোঝা গেল বিষয়টি কতো বেশি জরুরি।

সমস্যার গভীরতা বোঝার জন্যে কয়েকটি পুরনো তথ্য জেনে নিলে ভালো হবে।

সারা দেশে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ১৯৫৩ সালে ছিল প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। সেই সময়ই টনক নড়ে সরকারের। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে ৬৬ সালে রোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হয় ৪০ হাজারে। এটাই এখন পর্যন্ত সব থেকে কম সংখ্যা। এর পরই বোধহয় ঢিলেমি দেখা দেয় কাজে। এবং ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যাও আবার বাড়তে থাকে। দশ বছর পর ৭৬ সালে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, রোগীর সংখ্যা ৬ কোটি।

আর কেবল তাই নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা ঘটনা যেমনভাবে এগোচ্ছে তাতে ৮০ সাল নাগাদ ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বছরে ৪ কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে।

এ অনুমানের একটা কারণ হল, ম্যালেরিয়ার বিপদ সম্বন্ধে সরকারি মহলে উপযুক্ত পরিমাণে সচেতনতার অভাব। আর দ্বিতীয় কারণ, ডিডিটি দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে না। একালের মশাদের মধ্যে ডিডিটির বিপদকে কাটিয়ে ওঠার মতো নতুন প্রজাতি দেখা দিয়েছে। কাজেই ডিডিটি ছড়িয়ে মশা মারা সম্ভব হচ্ছে না; এবং ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশারা অবাধে বংশ বৃদ্ধি করে ম্যালেরিয়া-মহামারীর আশঙ্কাকে সত্যি করে তুলছে।

ডিডিটির বিকল্প হিসাবে অন্য যে কটি রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হয়েছে ইতিমধ্যে, তাতে খুব কিছু কাজ হচ্ছে বলে শোনা যায় না। তাছাড়া মশারা এসব কীটনাশকও হজম করে ফেলে আজকাল, আগের মতো কাজ হয় না।

অন্যদিকে, ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মধ্যেও ওষুধ প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা দেখা দিচ্ছে জানা গেল। সেটা আরো বেশি দুঃসংবাদ। আগেকার দিনে ম্যালেরিয়ার ওষুধ ছিল কুইনাইন। পরে তার জায়গায় আসে ক্লোরোকুইন, যা ছিল মোক্ষম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নতুন এক ধরনের ম্যালেরিয়া জীবাণুকে সেই ওষুধ দিয়েও নিশ্চিহ্ন করা যাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর এসব সমস্যার বিষয়ে নতুন কি পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন তা জানতে পারলে আশ্বস্ত হওয়া যায়। আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ম্যালেরিয়া যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে কী হাহাকার এনেছিল সে স্মৃতি এখনো দেশ থেকে মুছে যায় নি।

সাহিত্য ইত্যাদি...

অনুবাদ ও নতুন সাহিত্য

একালে সব দেশেই অনুবাদের দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। যাতায়াতের সুবিধে এবং রাজনৈতিক ভাবসাম্যের ক্রমাগত অদল বদলের ফলে পৃথিবীর প্রায় সব জাতের মানুষই পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। ফলে অনুবাদের দরকারও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত।

তার কারণ শুধু রাষ্ট্রিক যোগাযোগের ব্যবস্থাকে সুগম করা নয়। কিংবা নয় বাণিজ্যিক লেনদেনের পথকেই প্রশস্ত করা। অন্য দেশের সাহিত্যসম্পদকে নিজের ভাষায় নিয়ে আসার তাগিদও একটা বড় কারণ।

সাহিত্য যে জাতির দর্পণ তা সকলেই জানেন। একটা দেশের মানুষজনের বিষয়ে ভালো করে খবর নিতে গেলে তাই সেই দর্পণে উঁকি দেওয়া আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

কিন্তু এসব গভীরতর কারণ বাদ দিলেও; নিছক সাংস্কৃতিক কারণও কম জরুরি নয়। অনুবাদ হল সাহিত্যকে জোরালো করে তোলার সবথেকে ভালো উপায়। প্রায় সব দেশের সাহিত্যেরই আদি পর্বে তাই অনুবাদের দিকে ঝোঁক পড়ে।

এবং কোনো কোনো বিশেষ কালে পরিপুষ্ট সাহিত্যেও যখন অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দেয়, তখনো আবার অনুবাদের প্লাবন এনে তাকে নতুন করে উর্বর করার চেষ্টা দেখা দেয়।

বাংলা সাহিত্যেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছে।

প্রথম যুগে দেখা দিয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ। অথবা সত্যের খাতিরে বলা উচিত, ভাবানুবাদ। কেননা, অনুবাদ যাঁরা করেছেন, তাঁরা প্রায়ই নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতো গ্রহণ-বর্জন করেছেন। পাঠকের পছন্দ-অপছন্দের কথা মনে রেখে নতুন জিনিসও ঢুকিয়ে-ছেন। তবু উদ্দেশ্যটা ছিল মহৎ সাহিত্যের অনুবাদ উপহার দিয়ে বাঙালি পাঠককে আনন্দ দেওয়া। এবং সেই উপায়ে বেশ কিছুটা উন্নত করে তোলাও বটে।

এই প্রতিক্রিয়ারই ফলশ্রুতি হল ভাষার পুষ্টি এবং সাহিত্যের উন্নতি। না বললেও চলে, এ-উন্নতির ধরনটা চক্রবৃদ্ধি সুদের মতো। অর্থাৎ ক্ল্যাসিকস্-এর আদল সামনে পেয়ে কেউ একজন তার মতো নতুন একটা কিছু লিখল। এবং সেই লেখা দেখে অন্য লেখকরাও উৎসাহী হয়ে অন্য-অন্য লেখা উপহার দিতে লাগল।

সাহিত্যের বেলায় এ-ব্যাপারটা হামেশাই ঘটে। একটা পিরিয়ড থেকেই অনেক পিরিয়ড জন্মেছে।

বাংলা সাহিত্যে আরো একবার অনুবাদের দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল—উনিশ শতকে। তারাশংকরের 'কাদম্বরী' বা বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' কি 'শকুন্তলা' যে একালের বাংলা সাহিত্যে কোন্‌ চিহ্নের হয়ে রয়েছে তা সকলেই জানেন।

সব বইয়ের নাম করার দরকার নেই। অন্যের কথা বাদ দিলেও, বিদ্যাসাগরেরও সব অনুবাদের তালিকা তৈরি করব না এখানে। কেননা, তা অনেকেই জানেন, আর সহজলভ্যও বটে। কিন্তু এ-কথাটা আমাকে বলতেই হবে, বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধু সংস্কৃত নিয়ে থাকলেই হবে না। চোখ ফেরাতে হবে বিদেশী সাহিত্যের দিকেও। সেজন্যে তিনি ঈশপ বা শেকস্‌পীয়ার, কারো দ্বারস্থ হতেই পিছপা হননি।

এদিক দিয়েও বিদ্যাসাগর আমাদের পথপ্রদর্শক। তিনি শুধু বাংলাভাষারই জনক নন, বাংলা সাহিত্যেরও ভগীরথ। আমাদের এই আঞ্চলিক সাহিত্যকে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে সচলতা বজায় রাখার রাস্তা তৈরি করে গেছেন।

সেই পথ ধরেই জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর অনুবাদ করলেন সংস্কৃত এবং বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্য। গিরিশচন্দ্র অনুবাদ করলেন শেকস্‌পীয়ারের নাটক। আর ছায়ানুবাদ কিংবা প্রেরণা নিয়ে লিখেছেন তো অনেক রথী-মহারথী। তার মধ্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউই বাদ যান না। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের অর্ধেক জীবন কেটেছে উনিশ শতকে।)

না বললেও চলে, তাঁরা মহৎ কাজই করেছেন। যদি তাঁরা তা না করতেন, আমাদের এই রূপগুণক প্রাদেশিক সাহিত্য যে আরো কতোকাল তর্জা-খেউড়ে ঘুরপাক খেতো ভাবতেও হৃদকম্প হয়। তাঁদের দূরদৃষ্টি আর প্রবল সাহিত্যিক ক্ষমতার জন্যে বাংলা সাহিত্য আজ পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয়ে উঠতে পেরেছে। বাংলা সাহিত্য তাঁদের কাছে চিরদিনের জন্যে ঋণী।

সে যাক। কথা হচ্ছিল অনুবাদ নিয়ে। বিশ শতকের তৃতীয় পর্বে, মানে তিরিশের দশক থেকে আবো একবার অনু-বাদের ঝোঁক দেখা দিয়েছিল বাংলা সাহিত্যে। এবারের উৎসাহ ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে। এবং প্রধনত লক্ষ পড়ে-ছিল গল্প-উপন্যাসের রাজ্যে। রোম্যাঁ রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ, কনরাড, হামসুনের হাঙ্গার, গোর্কীর মাদার তখন হাতে হাতে ঘুরত। সেই সঙ্গে ছিলেন টলস্টয়, ওস্ট-য়েভস্কি, টুর্গেনিভ, চেকভ প্রমুখ দিক-পাল লেখক। কন্টিনেন্টাল সাহিত্য আর স্লাভোনিক রিয়্যালিজম কথা দুটো তখনি মুখে মুখে শোনা যেত। সেকালের বাঙালি সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র-শরৎ অধ্যুষিত সাহিত্যিক আবহাওয়ায় ঋতুবদলের নিশানা পেলেন। কল্লোলী আমলের আধুনিক সাহিত্যের গোড়াপত্তন ঘটেছিল সেইভাবেই।

বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ও স্থানীয় সাহিত্যের প্রাণস্পন্দনের এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে পর্বে পর্বে ভাগ করে আধুনিক কাল অবধি টেনে আনা কঠিন কাজ নয়। একেবারে হাল আমলেও তো অনুবাদের দিকে নতুন করে ঝোঁক পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

এবং তা যে সঙ্গত কারণেই ঘটেছে, তাও হয়তো প্রমাণ করে দেওয়া শক্ত নয়। কেননা, গল্প-উপন্যাসের রাজ্যে পুস্তক-বিস্ফোরণ জাতীয় ফুলঝুরি কলকারখানা লক্ষ্য করা গেলেও, গুণগত দিক দিয়ে লেখার মধ্যে কমই একতাল্পতার লক্ষণ এত প্রকট হয়ে উঠছে যে, অনু-বাদের মাধ্যমে রক্ত দেওয়া ছাড়া তাকে নতুন করে চাঙা করে তোলা কঠিনই ছিল।

সেদিক থেকে অনুবাদের জোয়ার যে সময় মতোই শুরু হয়েছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না। সাধারণ পাঠকেরা যেভাবে এইসব অনুবাদের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, বাংলা গল্প ও উপন্যাস পড়ে তাঁরা তৃপ্ত হতে পারছিলেন না—মনের মধ্যে অন্য কিছুর জন্যে চাহিদা জমা হচ্ছিল।

এরপর যদি নতুন ভাষের বাঙালি লেখকরা নতুন কিছু না দিতে পারেন সেটা তাঁদের ত্রুটি। পাঠক ভৈরব নেই বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না।

পাঠক বলতে অবিশ্যি আমি তাঁদেরই বোঝাচ্ছি যাঁরা মোটামুটি শিক্ষিত। যাঁরা শেকস্‌পীয়ার পড়েন, স্টেটসেভস্কি পড়েন (পড়েন নিশ্চয়ই) নিশ্চয়ই সবাই-ই অনুবাদকরা বই কিনে তাকে তুলে রাখেন না।) আমি তাঁদের কথাই বলছি।

নতুন লেখকরা ভালো কিছু লিখুন। নিশ্চয়ই পাঠক পাবেন।

মণীন্দ্র রায়

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

মৃত্যু কোনো মহৎ শব্দ নয়। তা একটা মুহূর্ত মাত্র। বাকি সমস্তটাই জীবন। জীবন মানে যাত্রা। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সুদীর্ঘ পথ। মানুষ অনেক-দিন বাঁচে, প্রায় একশো বছর। একশো বছর বা সত্তর বছর বা ষাট বছর। পঞ্চাশের আগে কেউ মারা গেলে আমরা বলি আহা। আমরা বলি অপমৃত্যু। অর্থাৎ সে সঠিক মৃত্যু নয়। সুতরাং, এই পঞ্চাশটা বছর অবধি যে মানুষটাকে বেঁচে থাকতে হয়, জীবনের প্রতি দায়িত্বপালন করার জন্য, সে-মানুষটা কিছু কম বীর, কম সাহসী নয়। বেঁচে আছে যখন, দু-বেলা সময়ের থাপ্পোড় খেয়ে, তাকে জীবন বলি। জীবনের মধ্যেই প্রেম, প্রেমের মধ্যে জীবন, এবং দুঃখে এবং ব্যথায়। এ-সবের মধ্য দিয়ে পা ফেলে, পা ফেলে সাবধানে হেঁটে চলে যাচ্ছে যারা, আবহমান কাল ও অতীতের তীর থেকে তাদের নিয়েই মহা-ভারত। যুধিষ্ঠির তার নায়ক, কেননা সে যুদ্ধে স্থির থাকে। আমি সুমন্ত্র, শীলা, অতনু, বত্যাকে নিয়ে কোনো গল্প লিখতে চাই না। কেবল, যে সময় আমাদের ব্যথায় নীল করে দিয়েও আমাদের মধ্যে কারোকে বাঁচিয়ে রেখে কারোকে মৃত্যু অথবা আত্মহত্যায় ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো দাপটে, তাকেই তুলে ধরতে চাই। তাহলেই হয়তো বোঝানো যেতো আমি কেমন আছি। আমি বা আমার মতো অন্য কেউ। যাদের খুব জোরে হাঁটার ইচ্ছে ছিল, যাদের খুব জোরে বাঁচার ইচ্ছে ছিল। যারা আস্তে হাঁটে। হয়তো অত জোরে নয়, আস্তে আস্তে। বন-উপবনে, পথ পথিকের সঙ্গে, নদী-নালায় জীবনে অভিমানে বিষাদে ছায়ায় রুকতে যামে। পতুলনাচের ইতিকথায় মানিকবাবু শশীকে যেমন এঁকেছিলেন। যে শশীর প্রিয় ইচ্ছে ছিল গাঁওদিয়ার সূর্যাস্ত দেখা। শেষে যা তার আর দেখা হোলো না। অথচ শশীকে পুরোপুরি নিঃস্ব করে দিতেও মানিকবাবুর আপত্তি ছিল। দুঃসময় ও একা মানুষের এই লড়াই-এর ছবিটা আমার খুব প্রিয়। আমি জানি বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা আজো টিকে আছে সময়পৃষ্ট হয়ে, তারাও আমারই মতো। ওইখানেই একটা আনন্দ জেগে থাকে। কোনো একটা যোগাযোগ আছেই মানুষের সঙ্গে মানুষের। এবং কোনো না কোনোদিন সেটা আবিষ্কৃত হবেই। সে-জন্যেই বেঁচে থাকা। আর যা-কিছু, যেমন প্রেম, যেমন শরীর, যেমন সুখ, যেমন তৃপ্তি—সেসব তো যেমন তেমন। এটা কোনো বাইবেলের বাণী নয়, ইতিহাসের প্রমাণ। বারবার ব্যর্থ হয়েও যে কারণে আবার বিপ্লবকে সম্ভাবনায় টের পাই, বারবার ব্যর্থ হয়ও যেমন মানুষ মানুষীর কাছে ফিরে আসে।

আমরা কখনোই কোনোদিনও হয়তো বোঝাতে পারবো না আসল গণ্ডগোলটা আমাদের কোথায়। কেন উৎসাহ নেই, কেন আগ্রহ নেই, জীবনের প্রতি তেমন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ কেন নেই। হয়তো যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখলে আমাদের সমস্ত অনাগ্রহ, অনাসক্তির ভিতরে ভিতরে এক ধরনের হেরে যাওয়া মনের ভাব খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যুক্তিই তো সব নয়। উনিশশো আটাত্তরের প্রখর গ্রীষ্মে দাঁড়িয়ে যুক্তির ঢাক পেটানো বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা বাংলাদেশের যুদ্ধ, নকশালবাড়ির রাজ-নীতিকে হারিয়ে দিতে পারলো যখন, একটা মাও সে-তুং-এর মৃত্যু চীনের রাজ-নীতির চেহারা পালটে দিতে পারলো যখন। সময়ের আড়ালে যে সময়টা বয়ে যায় অস্পষ্টভাবে, তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। যে নিঃসহায়তাকে আমরা সবাই বুঝে গেছি, যাকে 'আট বছর আগে' কবিতাতে জীবনানন্দ খুঁজেছিলেন, সেটা সহজে ফেলে দেবার মতো নয়। আমাদের নপুংসক বা ভীতু বলে গালাগালি দেয় যেসব উদ্বুদ্ধ যুবারা তাদের জীবনের চ্যালেঞ্জ, আগ্রহ, অনুভূতিগুলো এত মোটা, এত স্থূল, এত রংওঠা সস্তা খেলনার মতো লাগে যে বিনীতভাবে বলতে ইচ্ছে হয়, 'আপনাদের সার্থকতা আপনা-দেরই থাক। ওই মাটিতে দাঁড়ানোর সামান্য ইচ্ছেটুকুও আমাদের নেই।' যা ফিকে, যা পানসে, জল মেশানো চোলাই-এর মতো—জীবনের সেই সস্তা মদ খেয়ে হৈ হৈ হুল্লা হারে রে-রে কবার থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি একটানা ঘুমোনো এবং রাত্রি দশটা অবধি ছিলিম ধরে বসে থাকা অনেক স্বাদু, অনেক সতেজ। হয়তো ব্যাপারটা একটু অপ্রাসঙ্গিক শোনাবে, তবুও এটা সত্যি। সুমন্ত্রকে আমার একটা ঘেন্না করার কারণও বোধহয় এটাই। সুমন্ত্রর নিয়মঘেঁষা জীবনবোধ যতখানি মার্কসবাদী ছিল, তা নিয়ে আমার খুব একটা মাথাব্যথা নেই। কিন্তু একটুকু আমি নিশ্চিত জানি যে, জীবনকে নতুন করে জানতে চাওয়া বা বুঝতে চাওয়া বা গ্রহণ করতে চাওয়ার যে গভীর ইচ্ছে থেকে একজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতে শুরু করে, নানান ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, হতাশ হয়, নতুন পথ খোঁজে বা আপোস করে—তার কোনোটাই সুমন্ত্র ঘোষালের জীবনে ঘটেনি। মার্কসবাদ সুমন্ত্রর কাছে একটা খুব ভালো আই কিউ টেস্টের বই-এর মতো। বুদ্ধির গোড়ায় আলো-হাওয়া খেলাতে যার জুড়ি নেই। যেমনভাবে সুমন্ত্রর বাপ-ঠাকুর্দা আইন পড়তেন, যে নিষ্ঠা নিয়ে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের পাতায় নিদ্রাহীন চোখ মেলে রাখতেন, ঠিক সেরকমভাবেই। তাতে আপত্তি করার মতো কিছু নেই। যেভাবে আমার কবিতায় বা উক্তিতায়, শ্রীলার গানে বা স্বপ্নে বেঁচে থাকা ঠিক সে অর্থেই। কিন্তু তার বেশি দাবির প্রশ্ন যখন ওঠে, যখন অন্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন নেশা ইত্যাদির উপর (যেমন আমার বা শ্রীলার উমনো-ঝুমনো আবোল-তাবোল পাগলামি বা খেয়ালখুশির উপর) সুমন্ত্র দারোগা-গিরি করতে যেতো, তখন আমার অসহ্য লাগতো। সুমন্ত্রর বাপদাদারা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে সমাজের নানান গুরুত্বপূর্ণ চেয়ার দখল করেছিলেন। সুমন্ত্রর বোধহয় ধারণা ছিল যে, ও নিজের জন্য বিপ্লবীর চেয়ারটা দখল করে নেবে। না পারলে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে নিজেকে বিপ্লবী প্রমাণ করবে। যে প্রশ্ন ওর মনে কোনোদিন হয়নি বলে আমার বিশ্বাস তা হোলো, আমরা তৈরির কুর-খানায় বিপ্লবী তৈরি করা যায় কিনা। হয়তো যায় অন্তত ভারতবর্ষে। কিন্তু আমার সে-বিপ্লবে রুচি নেই। যে ধরনের রেসপেক্টেবিলিটির প্রতি আমার জাত ঘৃণা, সুমন্ত্রর আচার-আচরণে চিরটা কাল তাই দেখে এসেছি। ট্রামে-বাসে টিকিট ফাঁকি দেওয়া, টিকিট না কেটে দুরপাল্লার ট্রেনে চেপে বসা, পঁয়ষট্টিটাকিটে তৃতীয়বার আয়ে দিন বাহাদুরকে ধরনের হিন্দি সিনেমা দেখা বা রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ার আনন্দে সুমন্ত্রর আগ্রহ ছিল না। বেলেল্লাপনা করতে ও রীতিমতো লজ্জা পেতো। গেঞ্জি ছাড়া শার্ট পরার কথা ও কোনোদিন ভাবতে পারেনি। শ্রীলার কাছে এ নিয়ে ও কম নাস্তানাবুদ হয়নি। শ্রীলা আসলে আমারই মতো। অস্থানে কুস্থানে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াতে ও কখনো অরুচি দেখায়নি। কলেজের বারান্দার আর্চের তলায় কোনো এক বর্ষা-ভেজা দুপুরে, পোর্টিকার অর্ডিড গুলো যখন নৈঃশব্দ্যের পরিষ্কার, লনের ঘাসে-ঘাসে পা ফেলে ঠিক যেন বনের পথ দিয়ে হেঁটে, যেন ফুলের গন্ধে চমক লেগে বিভোর হয়ে, গাঢ় নীল জিনসের প্যান্ট হাঁটু অবধি গোটানো, সাদা [illegible] পাঞ্জাবির বুকের বোতাম দু-একটা [illegible], এমন শ্রীলা বড্ড ভালো বড্ড সুন্দর [illegible] হঠাৎ দুম্ করে আমাদের মাঝখানে এসে পড়লো। আমাদের মানে আমি আর সুমন্ত্র। সুমন্ত্র বুটিনমাফিক অর্ডার পিরিয়ডে বসে কী একটা পিকিং পাবলিশিং হাউসের বই পড়ছে। [illegible]

পড়তে আমার ভীষণ হাসি পেলো। সুমন্ত্র হাতে লেনিনের 'হোয়্যাট ইজ টু বি ডান', সুমন্ত্রর পাশে শ্রীলা। 'ডগমাটিজম অ্যান্ড ফ্রীডম অফ ক্রিটিসিজম' (খুব সম্ভবত ওটা বই-এর ফার্স্ট চ্যাপ্টার) এতটাই ব্যস্ত যে, ঘাসফুলের মতো ছোট আর পলকা শ্রীলা ওর মনোযোগ ভঙ্গতে পারেনি। ঘণ্টা পড়াতে তাড়াহুড়ো করে সুমন্ত্র উঠে পড়লো, ও যেমন উঠে পড়তো (বিপ্লবের ঘণ্টাতেও উঠে পড়েছিলো নিশ্চয়ই, তারপর ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পরীক্ষার ঘণ্টা পড়াতে, কী করে আর বেচারা সুমন্ত্র! দিয়েই দিলো পরীক্ষাটা)। প্যান্টের পা গোটানো, ধুক খেলা পাপ্পুরির মতো শ্রীলাকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠে সুমন্ত্র জিজ্ঞেস করেছিলো 'এছাড়া কি তোমার বাড়িতে। আর কোনো পরার জামা-কাপড় নেই, শ্রীলা?' খুব স্বাভাবিক গলায় শ্রীলার উত্তর, 'অফ পিরিয়ডে গম্ভীরভাবে বসে মার্কস সাধনা করা ছাড়া তোমারও কি আর করার কিছু করার নেই সুমন্ত্র?' সুমন্ত্র কখনোই শ্রীলার সঙ্গে তর্কে-তর্কি কোরতো না (সুমন্ত্র সেই পরিবারের ছেলে যারা ভিক্টোরিয়ান নম্রতায় মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে), অন্যমনস্ক হয়ে যেতো এসব সময়ে, কোনো কথা না বলে দ্রুতগতিতে সুমন্ত্র তখন ক্লাসে চলে যাচ্ছিল। শ্রীলা পিছু ডাকল। ফিরে আসতে সুমন্ত্রর হাতে আর ভুল করে ফেলে-যাওয়া টিফিন-বক্সটা তুলে দিয়ে (সুমন্ত্র রোজ বাড়ি থেকে টিফিন আনত। পলকা নীল ন্যাপকিনে বাঁধা) বলল— 'সুমন্ত্র, প্লিজ, ভর পেয়ো না। আই ওল্ট রেপ ইয়ু।' আমার মনে হয়েছিলো সুমন্ত্রকে আরেকবার ডাকি। ডেকে বলি, 'সুমন্ত্র, হোয়াট ইজ টু বি ডান।'

সেদিন খুব মেঘলা আকাশ ছিল। সেদিন বড় বৃষ্টি হয়েছিলো। সেদিন ঠাঁই ঠকঠক্ শিল পড়ছিলো। সাদা সাদা, শিউলি ফুলের মতো। শ্রীলাকে কলেজের মাঠে ভিজতে দেখেছিলাম সেদিন। সেদিন বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছিলো। তিস্তার মতো শ্রীলার শরীর সেদিন উথালপাথাল। সেদিন সুমন্ত্রকে আমার কাছে ডাকতে ইচ্ছে হয়েছিলো। জানতাম, সুমন্ত্র আসবে না এই বৃষ্টিতে পথ হাঁটতে, ভরসাও। কেননা, সেদিন বড় বৃষ্টি হয়েছিলো। এক ছায়াপ্রাণ শিরীষ গাছের নিচে আমি আর শ্রীলা যেন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে চাই, এমনভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। বৃষ্টির ছোট ফোঁটা দানা বাধলো, বড় হোলো, রাস্তার উপর ভেঙ্গে পড়লো। জলধোয়া অ্যাসফাল্টের গায়ে আমার হাজার ছবি, শ্রীলারও। বৃষ্টি আমায় ভাসাচ্ছিলো, বৃষ্টি আমায় গড়ছিলো। সে যেন অনেক অনেক-কাল আগের কথা। তখনও এসব হোতো।

চিঠিপত্র

চারমূর্তির সমালোচনা

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত (২রা জুন, ৬৭) 'চারমূর্তি' ছবির সমালোচক, শ্রদ্ধেয় শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার কোন গল্পটির কথা বলেছেন ঠিক বুঝলাম না। কারণ আমি যে গল্পটি পড়েছি তাতে রবি ঘোষ অভিনীত চরিত্রটি একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর। সুতরাং মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর মাথায় টুপি ও হিন্দি মেশা সংলাপ যদি বিকাশবাবুর কাছে গতানুগতিক মনে হয়ে থাকে, তবে হয়তো একদিন তিনি একথাও লিখবেন যে 'যেহেতু অমুক চরিত্রটি বাঙালীবাবুর সেহেতু তাঁর পরনে ধুতি। শেঠ চুনিলাল' সম্পর্কে এ জাতীয় মন্তব্যই তিনি করেছেন। আর নিম্নরুচি বা স্থূল 'কল্পনা' এ জাতীয় শব্দের মানে কি সমালোচক মশাইয়ের জানা আছে? তাঁর অভিধানে কথাগুলির হয়তো অন্য মানে। তবে একটি মজার স্বপ্নদৃশ্য, যা মূল কাহিনীতে ছিল, একবিন্দুও পরিচালকের কল্পনা নয়, (শুধু গানটি ছাড়া) তাকে কি ভদ্র ঐ আখ্যা দিলেন? এ মন্তব্যের জন্য তাঁর সঁতাই লজ্জিত হওয়া উচিত। আর সে ছবি দেখতে গিয়ে তিনি এত হোঁচট খেয়েছেন, ট্র্যাজিশন ভাঙলে তো এমন আছাড় খেতেন যে বেচারা পরিচালককে কাল মাশুল দিতে চলচ্চিত্র জগতই ছাড়তে হত। আর হঠাৎ রবি ঘোষের চরিত্রটিকে ট্র্যাডিশান ভাঙার কথাই বা আপনার মনে এল কেন? 'গানের বাণিজ্যিক প্রয়োজন' কথাটি ঠিক বুঝলাম না। যে গানগুলি মানুষকে আনন্দ দেয়, লোকের মুখে মুখে ফেরে সে গান বোধহয় আপনার মতে থাকতে থাকা উচিত নয়? তা শৈল্পিক প্রয়োজনের গানগুলি কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? আপনি কি দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বসে ছবিটি দেখেছেন? সেখানেই গান সম্বন্ধে দর্শকের মতামত তাঁদের উচ্চহাসির হাসির মধ্যে পাওয়া যায়। প্রচেষ্টা যদি দুর্বলও হয়, আমি মনে করি সৎ প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রেই কিছুটা প্রশংসার দাবী রাখে। বিকাশবাবুর সমালোচনায় বার বার ফিল্মের টেকনিকাল ত্রুটির কথা এসেছে। কিন্তু শিশুরা কি টেকনিক্যাল দিক সম্বন্ধে খুব সচেতন বা জ্ঞানী? মূলতঃ ছবিটা যখন ছোটদের তখন, সমালোচনার ধারার 'ট্র্যাডিশন' আপনি একটু ভাঙলে আমরা হোঁচট খেতাম না। তবে বয়স্করা যে এ ছবি দেখবেন না তা নয়, কিন্তু বাংলা ছবির সব পরিচালককে যদি সত্যজিৎবাবু, মৃণালবাবুর মাপকাঠিতে বিচার করে তাঁদের প্রচেষ্টাকে অন্যায়ভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনার জালে জড়ানো হয়, তাতে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খুব একটা উপকার করা হয় বলে আমার মনে হয় না। যে দেশে শিশু ও কিশোর চিত্তের অত্যন্ত অভাব সে দেশে তেতো যদি সে অভাব মেটানোর জন্য সবজ হোক দুর্বল হোক সামান্য চিন্তাও করে থাকেন, তাঁদের সামান্য উৎসাহ দেওয়াও কি জনগণের কর্তব্য নয়। অবশ্য, দর্শকের রুচির সঙ্গে সমালোচকের রুচির পার্থক্য এখনো রয়েছে। আমার তো মনে হয়, বয়স্ক হলেও মনের বয়স কিছুটা কমালে মোটামুটিভাবে এ ছবি উপভোগ্য।

আমার মনে হয় সমালোচক মহাশয় আর একবার 'চারমূর্তি'র মূল কাহিনীটি ভালভাবে পড়ে নেবেন, শুধু ছিদ্রান্বেষী সমালোচনার খাতিরে চোখ বুলিয়ে যাবেন না।

যাই হোক, ইদানীংকালের লালকুঠি, বন্দী, ডাক দিয়ে যাই এ ধরনের গতানুগতিক অনুকরণপ্রবণ ছবির ভিড়ে 'চারমূর্তি' যথেষ্ট উপভোগ্য (অন্ততঃ আমার মত সাধারণ দর্শকের কাছে)। তবে জানেন তো, সবজান্তার মুখোস আঁটা বামগরুড়ের ছানার সংখ্যা দেশে প্রচুর? তাই তাদের দেখে দেখে আমরা ছোটরা ঠিক করেছি এখন থেকে তিন ঘন্টার মন ভরানো আনন্দ ভোগে (যা সমালোচকের কাছে নিম্নরুচির পরিচায়ক) শুধু শিল্পমন্ডিত দুর্বোধ্য 'ইনটেলেকচুয়ল' ছবিই দেখব। (না পেলে হিন্দি বইও বাদ দেব না) বুঝি আর না বুঝি 'আর্ট ফিল্মের' যত্নস অফিসের উন্নতি তো হবে। হাসি সত্যিই এ যুগে দুর্লভ। একটু হাসির কথা উঠলেই তা 'হাসব-না - না - না - নাদের' তোড়ে কোথায় যে ভেসে যায়। ভবিষ্যতের হাসিগুলো শুধু 'ক্রান্তকুতুর নামান্তর' হয়ে ফিরে আসে। বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাপার মত সাহস আপনারা রাখেন বলেই এ লেখা পাঠালাম। আশা করি, কাপ্যুরুষতার পরিচয় দেবেন না?

শর্মিলা ঘোষাল
(একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী)
কলিকাতা-২৬।

বিষ্ণু দে

সুধীন্দ্রনাথ

সুধীন্দ্র নাথ

বিষ্ণু দে

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুই দিকপাল কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে। আধুনিক বাংলা কবিতার বিকাশে এঁদের দান অপরিসীম। শুধু কবি হিসেবে নয়, পাণ্ডিত্যে, বিশ্ববাবস্তায় অনুভব ও অনুশীলনে, পারঙ্গম সমালোচকরূপেও সুখ্যাত।

এই দুই অসমবয়সী কবির প্রীতি-স্নিগ্ধ বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আধুনিক কবিতার মনোযোগী পাঠকের কাছে সুবিদিত। প্রচলিত কথা আর প্রতিষ্ঠিত সত্যের মধ্যে একটা পার্থক্য থাকেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র সম্পর্ক বিষয়ে প্রচলিত যা কথা আছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উপাদান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে অরুণ সেনের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ, এই মৈত্রী, এই মনান্তর।

গ্রন্থটির মূল বিষয় হল, ১৯২৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথের ৫১ খানা চিঠি। বলা বাহুল্য এই ৫১ খানা চিঠি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অবিশ্বাস, আকাশের মত ব্যাপ্ত সহৃদয়তা, উন্মুক্ত বন্ধুত্ব, চন্দন চর্চিত রুচি অথচ অকপট ও দৃঢ় ভাষণের চারিত্রিক দৃঢ়তা এই চিঠিগুলির মধ্যে কর্ণার জলের মত স্বচ্ছ। এই চিঠি-গুলি অরুণ সেন অতি দক্ষতার সঙ্গে সম্পা-দনা করেছেন। অকৃপণ পরিশ্রম দিয়েছেন এর জন্য। সম্পাদনাকে নিখুঁত করবার পরণতায় অতি সূক্ষ্ম খবরাখবর দিতে অনলস চেষ্টা করেছেন। সম্পাদনার এত উচ্চশ্রেণীর মান আর কোনো বাংলা পত্র-সংকলন গ্রন্থে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। চিঠির সাইজ চিঠির কাগজের রকম কাগজের ও ব্যবহৃত কালির বৈচিত্র্য লেটার হেডের প্রকৃতি, হাতের লেখার গুণাগুণ, চিঠিতে ব্যবহৃত সমস্ত রকম সূত্রের পুংখানুপুংখ আলোচনা, বিচার ও তথ্য সন্নিবেশ—প্রত্যেকটি চিঠি ঘরে ঘরে তার পাদটীকাতে করা হয়েছে। এই করাটা এত বেশী ডিটেলে করা হয়েছে যে কারু কারু কাছে হয়তো একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। আমাদের মনে হয়, চিঠি-পত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ মান স্থাপনের প্রয়াস থেকেই এতটা জোর এসেছে।

চিঠিগুলির ভূমিকা হিসেবে, 'দুই বন্ধু, দুই কবি' নাম দিয়ে সম্পাদক যে ভূমিকা রচনা করেছেন, সেটিও একটি মূল্যবান ভূমিকা। কী সূত্রে সুধীন্দ্রনাথের বিষ্ণু দে-র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে—সেখান থেকে আরম্ভ করে পরিচয়কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের যে চাঁদের হাট বসেছিল তার একটি প্রাণবন্ত চিত্র-পরিচয় অরুণবাবু সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সেই জন্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধা নেই, এই মৈত্রী! এই মনান্তর! বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন। আধুনিক কবিতার রচনা, সমালোচনা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের পক্ষে এটি একটি অপরিহার্য গ্রন্থ।

এতগুণ থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের আরোপ এবং এক দেশদর্শিতা গ্রন্থটির মর্যাদাকে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে। যদিও সম্পাদক উদ্দেশ্যটি অপ্রকট রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, তবু গ্রন্থ পরিকল্পনায় এবং সম্পাদকীয় অতিভাষণে ব্যাপারটা স্বপ্রকাশ হয়ে পড়েছে।

সাধারণতঃ প্রবন্ধ, সমালোচনা ও সংপাদিত গ্রন্থাদির নামকরণ সরল ও জটিলতাবর্জিত হয়। কিন্তু এই গ্রন্থের নামকরণ করতে সম্পাদক প্রায় হিমসিম খেয়ে গেছেন। প্রচ্ছদে নাম দিয়েছেন এই রকম : সুধীন্দ্রনাথ।বিষ্ণু দে, পরের লাইনে আছে এই মৈত্রী। এই মনান্তর।

প্রচ্ছদের এই নাম থেকে গ্রন্থের বিষয় কিছু বোঝা গেল কি? সম্ভবত সম্পাদকের নিজেরও কিছু সন্দেহ ছিল। তাই বোঝানোর চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। প্রচ্ছদে বিষ্ণু দের একটি গোটা কবিতা তুলে দেওয়া আছে। ওটা যতটা-না স্টাইল তার চেয়ে অনেক বেশী উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। অর্থাৎ প্রয়াত কবি সুধীন্দ্রনাথের বাড়ির দরজায় জীবিত কবি বিষ্ণু দের প্রমাণ মাপের তৈল-চিত্র।

তাতেও গ্রন্থ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বইয়ের যে নাম ছাপা হচ্ছে তাতে কিন্তু 'সুধীন্দ্রনাথ।বিষ্ণু দে' বাদ পড়েছে। তৃতীয় পৃষ্ঠায় এসে নামের সঙ্গে গ্রন্থ বিষয়ে একটা ব্যাখ্যা পেয়ে বিষয়টা কিঞ্চিত পরিষ্কার হল। অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথের ঐ ৫১ খানা চিঠি অবলম্বন করে সম্পাদক দুই কবির বন্ধুত্বের ইতিহাস রচনা করেছেন।

আসল সত্য কথাটি হল, সম্পাদক যা করতে চেয়েছেন এবং যা করেছেন, তার মধ্যে কোন মিল নেই। দুই বন্ধু, দুই কবি নাম দিয়ে তিনি গ্রন্থারম্ভে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখেছেন, তার সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ঐ ৫১-খানা চিঠির কোন যোগ নেই বললেই চলে। এবং এটিকে আর যাই বলা চলুক, দুই কবির বন্ধুত্বের ইতিহাস কোনক্রমেই বলা চলে না। এই অংশে তিনি যে মতামত তৈরী করেছেন তার অনেকটাই বিষ্ণু দের ভাষ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—যা হয়তো কবি ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা বা চিঠিপত্রে ব্যক্ত করেছেন সম্পাদকের কাছে। একজন কবি যতই নমস্য হোন না কেন, তাঁর ব্যক্তিগত সংলাপ কোন ইতিহাস রচনার আকর হতে পারে না। অথচ সুধীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি,—যাতে তাঁর সাহিত্যবোধ ও অকপট ভাষণের নানা দিক উদ্ভাসিত—যা সূর্যের আলোর মত স্বপ্রকাশ—সেই প্রসঙ্গগুলি সম্পাদক সন্তর্পণে আলোচনার বাদ দিয়ে গেছেন। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ অনেক দিন ধরে চলে আসছে, বিশেষত কয়েকজন কবির কবিতা সম্পর্কে—আধুনিক কবিতার একজন বড় কবি ও সমঝদার সুধীন্দ্রনাথের চিঠিতে সে অভিযোগ যে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সম্পাদক সে সম্পর্কে এত নিরব কেন?

কি সুধীন্দ্রনাথের মত নয়? নাকি বন্ধুতের ইতিহাসের মধ্যেও পড়ে না?

সুধীন্দ্রনাথের তিরোধানের এত বছর বাদে তাঁর এতগুলি মহামূল্য চিঠি নিয়ে আলোচনা করতে বসে সম্পাদক 'ফোকাসে' রেখেছেন জীবিত কবি বিষ্ণু দে-কে। বিচারে, বিশ্লেষণে, পক্ষ অবলম্বনে, ভক্তের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব এতই দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট যে সম্পাদক তার একতিয়ার ছাড়িয়ে গেছেন কিনা সে প্রশ্নও সম্ভবত তোলা চলে।

উদ্দেশ্যমূলকতাটা ধরা পড়েছে 'চিঠি প্রসঙ্গে' লেখাটিতে। প্রতি চিঠি ধরে ধরে টীকাও ব্যাখ্যা দেওয়ার পরও সম্পাদকের মনে হয়েছে যথেষ্ট হয়নি। ঐ নাম দিয়ে ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী চিঠিগুলির আবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই অংশটি রচনার দরকার হল কেন? সুধীন্দ্রনাথের বুদ্ধি প্রধান সমালোচনা এবং কোথাও কোথাও আক্রমণ থেকে, স্বীয় মহিমায় মহৎ কবি বিষ্ণু দে-কে রক্ষার প্রয়াসেই এই 'ঢাল' অংশটি রচনা করেছেন। শুধু ঢাল দিয়েই ক্ষান্ত হননি, প্রয়াত কবি সুধীন্দ্রনাথের দিকে মাঝে মাঝে তরোয়ালের অগ্রভাগও দেখিয়েছেন। যে বইটি আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় একটি আকরগ্রন্থ হয়ে উঠতে পারতো, তাকে একদেশদর্শী সমালোচনা গ্রন্থে পর্যবসিত করে ফেলেছেন। যাঁর চিঠি তিনি ফোকাসে নেই ফোকাসে এসে পড়েছেন যিনি এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ।

সম্পাদকের দায়িত্ব এবং সমালোচকের কর্তব্য এক নয়। দুটোই করার অধিকার এক-জনের থাকতে পারে— তবে সেটা একই গ্রন্থে নয়। হলে অরুণ সেনের মত মুস্কিলে পড়ে যেতে হবে—নিজেই ভেবে ঠিক করতে পারবেন না—তিনি লেখক না সম্পাদক।

এতসব বলেও অস্বীকার করা যাবে না যে বইটিতে রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ৫১ খানা চিঠি। ফিরে ফিরে পড়ার মত। এত অন্তরঙ্গ সুধীন্দ্রনাথকে আর কোথায় পাওয়া যাবে? সম্ভবত তাঁর কবিতায়ও নয়।

অমল মুখোপাধ্যায়

এই দৈরথ। এই মনান্তর। অরুণ সেন।
আশা প্রকাশনী। দশ টাকা।

বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

সুলিখিত ও সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বাংলার ইতিহাস নেই। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' মূল্যবান, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য। অন্য দু-একখানি বই লেখা হয়েছে পরবর্তীকালে। কিন্তু ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে তা লেখা হয়নি। প্রাপ্ত বাকতির অভাব না থাকলেও এজাতীয় বই লিখতে এগিয়ে আসেননি তাঁরা। আধুনিককালে ইতিহাস লেখার ধরনও বদলে গেছে। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই একটি জাতির ইতিহাসকেই বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। শ্রীঅতুল সুরের এই সংক্ষিপ্ত বইটি সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস' নাম হলেও আলোচনার পরিধি অনেক বিস্তৃত। বাংলার ভূতাত্ত্বিক গঠন, বাঙালীর প্রাচীনতম আবাসভূমি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, আর্য ও প্রাক আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণ, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, আদি সমাজ ও জাতিভেদ, অর্থ-নৈতিক জীবন, ধর্মসাধনা, জীবনযাত্রা প্রণালী, মধ্যযুগের ধর্ম-সাহিত্য-সমাজ-জীবন, চৈতন্যোত্তর যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, কৌলীন্যপ্রথা ও সহমরণ, বাঙালী ধনী, বিদেশী বণিকদের আগমন ও বাঙালী সমাজে তার প্রভাব থেকে শুরু করে বাংলার নবজাগরণ পর্যন্ত শ্রীসুর বিশ্লেষণ করে-ছেন। রামায়ণ মহাভারতের যুগে বা আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এই বঙ্গভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ কেমন ছিল বা নদনদী কিভাবে যুগে যুগে বাঙালীর অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে অথবা বাঙালী জাতির সুপ্রাচীন যুগের নিদর্শন কিভাবে পাওয়া পাওয়া গেছে বইটির মধ্যে সুন্দরভাবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি থেকে শুরু করে প্রাচীন শিবি ও চেত রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রীসুর যে বিবরণ দিয়েছেন, বাঙালীর গৌরবময় দিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রয়োদশ শতকে বাঙালার গৌরবময় প্রাচীন সংস্কৃতির অবসান ঘটেছিল মুসলমানগণ কর্তৃক বাঙলা বিজিত হবার পর' বলেছেন শ্রীসুর এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তের পক্ষে মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্য কর্ম থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। মধ্যযুগের সামা-জিক চিত্র পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই আঁকা হয়েছে। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বাংলায় মন্দির স্থাপত্যের বিকাশ ঘটেছিল কিভাবে তারও বিবরণ তুলে ধরেছেন লেখক। কৌলীন্যপ্রথা মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ভিতকে কি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে অব-নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার সুনিপুণ আলেখ্য লেখকের যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনায় ফুটে উঠেছে। ইংরেজদের আগমনে বাংলার শিল্পের ধ্বংস-সাধন ও বাঙালী কৃষিনির্ভর জাতিতে কিভাবে পরিণত হয়েছিল আর ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার বাংলার নবজাগরণকে কিভাবে ত্বরান্বিত করেছিল বইটিতে তার সুস্পষ্ট আলেখ্য আছে। আলোচনার শেষে গ্রন্থকারের মন্তব্য: 'যদিও বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক অগ্রগতি ও স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন কর্ম যোজনা বাংলার জীবনচর্যাতে এক নূতন চিন্তা ও প্রভাব আনতে সমর্থ হয়েছে, তবুও সমকালীন সামাজিক বিশৃংখলা ও নৈতিক শৈথিল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে স্বভা-বতই মনে প্রশ্ন জাগে যে, বাঙালীর জীবন-চর্যা ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে?' সত্যিই আজ প্রতিটি বাঙালীকেই এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। লেখকের ভাষা সাবলীল। সহজেই বইটি পড়া যায়।

কমল চৌধুরী

বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস: অতুল সুর।
জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো। কলকাতা ৯। দাম: ৮ টাকা।

কলকাতায় হুইটম্যান

হুইটম্যান এমন একজন কবি, যাকে আমেরিকার কবি বলে চিহ্নিত করা চলে না। তিনি আন্তর্জাতিক। তাঁর প্রতিভার মধ্যেই এই আন্তর্জাতিকতার বীজ রয়েছে। উনিশ শতকের সাহিত্যে তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব; প্রভাবিত করেছেন আধুনিকতার আন্দোলনকে। এমন আন্ত-রিক—মানুষকে, প্রকৃতি, ঈশ্বর, তাবৎ প্রাণীকুলকে শ্রদ্ধা ও নিবিড় মমতার কাছে টেনে নেওয়ার এরকম আন্তরিক আর্তি তাকে প্রিয়জন করে তুলেছে মানুষের, সহজ গদ্যভঙ্গীতে কথা বলবার রীতি বিশ্বব্যাপ্ত খ্যাতির অন্যতম কারণও বটে।

মে ৩১, ১৮১৯ জন্ম কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের। আমেরিকান সেণ্টার লাইব্রেরীতে ৩১ মে ১৯৭৮-এ হুইটম্যান সন্ধ্যা উদ্‌যাপন করা হলো। একজন প্রিয় কবির প্রতি তাঁর প্রাতভামুখ কয়েকশ মানুষ দেড়শ বছর পরে প্রীতি ও শ্রদ্ধা অনাড়ম্বরভাবে জানালেন। কবিতা পাঠ ইংরেজী আর বাংলা অনুবাদ, তার মধ্য দিয়ে অনুভূতির নিবিড় উন্মোচন উপলব্ধি করেছি আমরা। 'অপরেম' নামক একটি আবৃত্তি সংস্থা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, কাজল চৌধুরী, দীপংকর মজুমদার হুইটম্যানের অনুবাদ পাঠ করলেন তাঁদের স্বভাবসুলভ ভাবগম্ভীর গলায়। সবচেয়ে উপভোগ্য লেগেছে শর্মিষ্ঠা পাঁজা, প্রিয়দর্শিনী ঘোষের ইংরেজী উচ্চারণ। এঁদের রীতি আর কবিতা অনুভব এমন সমন্বিত হয়েছিলো যা বিরল অভিজ্ঞতা বলা চলে। অন্যান্য আবৃত্তিকারদের কৃতিত্ব যথেষ্ট। 'সঙ্ অব মাইসেলফ্' কবিতার নানা অংশ পাঠ হলো, বিচিত্র পন্থায় সাজিয়ে।

ফুলব্রাইট স্কলার ডঃ জন, এস, লরি হুইটম্যানের প্রতিভা বিষয়ে একটি বিস্তৃত ভাষণ দিলেন। বক্তৃতাটিতে কবির ব্যক্তিগত এবং কবিচরিত্র সম্পর্কে নানারকম তথ্য ছিলো, যা উপস্থিত শ্রোতাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিলো। বক্তৃতা শেষে অনেক উৎসাহী শ্রোতা প্রশ্ন করেছেন, জন লরি উত্তর দিয়েছেন যথেষ্ট জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে।

কলকাতায় হুইটম্যান সন্ধ্যাটি কবিতা প্রেমিক উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে একটি বিশেষ স্মৃতি হয়ে থাকবে দীর্ঘদিন।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এই শহরে

অনন্ত দাস

এই শহরে
দিন যায় কত্রাচে ভর দিয়ে
রাত্রিগুলি বাঘের চোখের মত জ্বলে
আমি তার কিছুই দেখি না
শিথিল মুঠোর থেকে শুধু অবিরাম ঝরে যায় জল।

আমি পাদানিতে সামান্য পা রাখতে গিয়ে
বারবার পড়ে যাচ্ছি
দ্রুতগতি সময়ের বাস
মুখের উপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে যায়
পথের দুপাশে শুধু পড়ে থাকে প্রতিশ্রুতি, আজন্ম আশ্বাস।

এখন আমার কোন অভিযোগ নেই
বহুদিন ভুলে গেছি ঔদ্ধত্যের বুলি
যেন জ্বাতসারে জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত রেখে
আমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্ছি
ছিঁড়ে ফেলছি সাজানো পোশাক
আর এই শীর্ণ হাতে
সূর্য নয়
তোমার চোখের নীচে জ্বেলে দিতে ক্ষুদ্র এক নক্ষত্রের আলো
উচ্ছিষ্ট সময় চলে যায়।

ওগো মেঘ

দেবী রায়

ছোটো ছোটো আঘাত
তাকে কি পরোক্ষে
সম্ভাব্য কোনো
অতি-বড়ো, আঘাতের
মুখোমুখি দাঁড়াতে বলে ?

তখন, মনে মনে দাও শান
আর ভিতরে-ভিতরে
স্তম্ভিত-কালো মেঘ
স্যাতসেঁতে, চাপা দুঃখের
ঘেরাটোপে গরজায়

আর, না জানে কে
যে যতো বেশি গরজায়
ঠিক ততোটা কি বরষায়

আধেকলীন বহসো ঢাকা
ওগো, গোধূলি গগনের মেঘ
ওগো মৃত্যু, তুমি কি শোকের বেশে—
দেবে মুখ ঢেকে।

ফুলের মতন

শঙ্কর চক্রবর্তী

এইমাত্র ছিঁড়ে পড়লো ওই ফুল, তার চক্ষু থেকে শাদা
পাথরের মতো পাপড়ি—সঙ্ঘ-সমিতির জ্বলে-ওঠা
সমস্ত বাগান; আমি শুয়ে আছি একা, বাগানের গাছও
সাক্ষী থাকে, শুধু ওই ফুল ঝরে-পড়া শব্দে শোনা যায়—বন,
বন হয়েছিলো এই পল্লবিত মানুষ; মৃতির
মতো আমি ঘ্রাণ নিই, নিঃশ্বাসে রঙের পলেস্তরা
জমে, শরীরের নিচে ঘাস, কোলাহল-শূন্য কিছু
উড়ন্ত পাপড়িও। আমি স্তব্ধ হয়ে যাই, মাঠ ও গাছের
লতাপাতা, গন্ধরাজ আঠায় জুড়েছিলাম একদিন, তবুও সে ধ্বনি
এসে কড়া নাড়ে বোজা, হিম-জ্যোৎস্না তছনছ করে
আসে, আত্মসমর্পণে ডাকে—কে আছো অন্দরে ? এতোটুকু
ছুঁয়ে দ্যাখো স্তব্ধ ফুল, আমি পাথরের শয্যা জুড়ে
শুয়ে আছি একা।

প্রারম্ভিক ভাঁড়বিদ্রোহ

তুষার চৌধুরী

আমরা কবি ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ তেজী খুবই দুঃসাহসী মিশিমার মত
দৈনিক চৌমাথা কাফে শুঁড়িখানা সরগরম করে
মাইকেল রবির মৃত্যুপাত কবি লোক জমিয়ে শূন্যে লাট খাই
ফেরারী আদম নয়তো মারাকভস্কির মত আপাদমস্তক লালে লাল
যে কোনো মুহূর্তে নলি কেটে ফেলতে পারি গোড়ালির
যে কোনো সময় নিজ কান কেটে পার্সেল
পাঠাবার হুমকি দিই মক্কি সম্রাজ্ঞীকে।
নৃশংস তৈমুর আমরা স্পেচুলা চালিয়ে
নরম শব্দাদি চেঁছে ক্ষুরধার ঝলমলে বানাই
হাতুড়ি বাটালি দিয়ে যা কিছু পেলব
এবড়ো খেবড়ো কবি আর সামান্য মৌআতশ কবি ইতিহাসখ্যাত
পীর গোরাচাঁদের আস্তানায়

প্রেম ভালোবাসা নিয়ে আমাদের হাসি ও মস্করা
বোমিওকে বেঁধে রেখে ঠোঁট কামড়ে জুলিয়েটকে বলি,
ঘুরে ঘুরে নাচো
বুদ্ধকে সাবধান করি বারবার : মহাশয় আপনার অঢেল
অনুকম্পা মাখা হাসি দেখলেই গা পিত্তি জ্বলে যায়
বর্ষাতি গামবুট পরা ভাবভাবিলকে ক্ষণিকাকে দেখে
সান্ত্বনার মত বলি : হে রাজন, কেঁদো নাকো, খুঁজে দেবো মাথা

চিন্তাভাবনা করে কারা ? যাবতীয় চিন্তার তলপেট
শুঁকিয়ে দেবার রুনা ছবি
পকেটে দুচার পয়সা
অথচ ভোজন—তা সে তরকী মাংস বা মদিরা যা কিছুরই হোক—
সামান্য অপর্যাপ্ত আছে
চোখে আছে মাষাঞ্জন ন্যূনপক্ষে কাপালিটোলার সুর্মাটানা
হিজড়ের হাতাতে চুমু লেগে আছে গালে

আমরা নাস্তিক সংসারী ও উর্ধ্বমার্গী কিন্তু ফেরেববাজ কপটচারী কবি
আমরা নাস্তিক মিশমার কড়ে আঙুলের যোগ্য নই লোকে বলে

দুই কংগ্রেসই মিলন চাইছে

মিলনের বাঁশি বাজছে। সে বাঁশির ডাকে আজ নয় কাল সব কংগ্রেসীরা সাড়া দেবেন। দুই কংগ্রেসের কিছু লোকজন লেগে পড়েছেন। কেউ নেপথ্যে কেউ প্রকাশ্যে। লোকচক্ষে কারও মাথা যাতে হেঁট না হয় তারই ব্যবস্থা করতে দুই পক্ষ ব্যস্ত আশ্চর্যত। পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বেশীদিন বজায় রাখা সমীচীন নয়। দুই কংগ্রেসের লোকজনরাই এমন এই কথা বলছেন। এমন বক্তব্যের সমর্থনে দুই গোষ্ঠীর যুক্তি পুরোপুরি যে মিলছে তা নয়। আর সেইসব কথাবার্তার বিচার-বিশ্লেষণে স্পষ্ট হবে ওঠে কেন্দ্রে ক্ষমতা-চ্যুত কংগ্রেসীদের 'অ্যাটলেমা' এবং সেই-জন্যে হতাশা।

কেন্দ্রে জনতা সরকারের এক বছর প্রশাসন চলবার পর দুই কংগ্রেস দলের নেতাদের মধ্যে হতাশা ধীরে ধীরে বাড়ছে। প্রথমদিকে 'ঘোষাকের দুনিয়ার' ওঁরা বিচরণ করতেন। ভাবতেন কেন্দ্রের মসনদে বসে দেশ চালাবার 'ডিভাইন রাইট' আছে কেবল কংগ্রেসীদের। একাজ আর কেউ পারবে না। মসনদে অন্য কোন দল দৈবাৎ বসে পড়লেও সেটা হবে নিতান্তই সাময়িক পরিবর্তন। সাজানো সালের চরম পরাজয়ের গ্লানি খানিকটা হালকা করা সম্ভব হয়েছিল কল্পনার এইরকম রঙিন ফানুস উড়িয়ে। এখন দুই কংগ্রেসই বুঝতে পারছে কুরসি একবার গেলে চট করে আবার ফিরে আসে না। আসলে মৌলিক রাজনৈতিক মানসিক-তার দিক থেকে দুই কংগ্রেসের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

ক্ষমতায় আসা যায় কি করে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেই কংগ্রেসীদের কাছে। ওঁদের ধারণা জনতা পার্টি ভুলের পর ভুল করবে। এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হবে দেশ জুড়ে। তখন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দৌলতে ওঁরা ক্ষমতায় সিংহাসনে বসবেন। অর্থাৎ অপরপক্ষের ভুলের মাশুলে হবে কেন্দ্রে কংগ্রেস রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ক্ষমতায় আসবার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেস আর জাতীয় কংগ্রেস যাকে বলে হাত কামড়াচ্ছে। থেকে থেকে দিল্লির সিংহাসন মরীচিকার মত মনে হচ্ছে। বাসনামিশ্রিত এই হতাশা দুই দলকে ক্রমশঃ কাছে টানছে। বাসনা এক। লক্ষ্য এক। তখন হাত ধরাধরি করে সুপ্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করতে আপত্তি আর কেন।

আপত্তি থাকছে না। কারণ দুই কংগ্রেস সম্বন্ধে পরস্পরের বিরাগ ও বিতৃষ্ণা কমছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি উপ-নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের নাজেহাল অবস্থা জাতীয় কংগ্রেসকে মুছে ফেলছে দেশের রাজনীতি থেকে এমন কথা মনে করা

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন লোকসভা এবং নানা বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার গাণিতিক হিসাব দিলেও এই দলের পুনরুত্থান বিচার করা যায় না। প্রাচীনতম রাজ-নৈতিক দল হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের একটি রাজনৈতিক কালচার আছে। আর সেই কালচারের দ্বারা অনেকে আজও প্রভাবিত। তাছাড়া, যত দুর্বলই হোক না কেন দেশজুড়ে রয়েছে তার সাংগঠনিক কাঠামো। সুতরাং কংগ্রেস একেবারে লাটে উঠেছে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। রাজ-ধানীতে সম্প্রতি রাজনৈতিক সম্মেলনের পর জাতীয় কংগ্রেসের এই উপলব্ধি অনেকটা ভিটামিনের মত কাজ করছে। আর তার ফলে জাতীয় কংগ্রেস এখন ইন্দিরা গান্ধীর ভরটা কাটিয়ে উঠছে। এঁদের মতে ইন্দিরা গান্ধীর পারসোনালিটি ভালো, যতটা রাজনৈতিক ওজন ততটা নয়। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণমান ফুটো জাহাজ মনে করে রাত-নৈতিক অস্তিত্ব বাঁচাতে ইন্দিরা কংগ্রেসের আস্তানার দিকে দৌড় দেবার প্রয়োজন নেই। এছাড়া এই মহলের ধারণা ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বলেই দাপটের সঙ্গে দলকে নিজের ইচ্ছেমত চালাতে পেরে-ছিলেন। এখন তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী নিয়ে দলের মাথার ওপর দাপাদাপি করা সম্ভব হবে না। পুরোন স্টাইলে চলবে দলের আর দশজন এখন অনায়াসে বেঁকে বসবে। ইতিমধ্যেই যেমন শুরু হয়েছে। দেবকান্ত আদস, চেল্লা রেড্ডি, শরীফুদ্দিন, পি ডি নরসিংহা রাও কমলাপতি ত্রিপাঠি চটেছেন ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক কয়েকটি মন্তব্যে। রাজনীতির বাজারে পুরনো নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর মাতামাতি তাঁরা বরদাস্ত করবেন না বলেছেন।

দুই কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা মনে করেন পাশ টেনে ধরা ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মিলন এখন প্রয়োজন। এমন মিলনের ফলে কংগ্রেস সরাসরি ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে জনতাফ্রন্টের জনতা পার্টির একমাত্র শক্তিশালী বিকল্প সংস্থার পুনরুত্থান লাভ করবে। ধারেকাছে আর কেউ থাকবে না।

এইরকম বিকল্প শক্তি হিসাবে কংগ্রেসীরা নাকি পথে নামবেন। আন্দোলন করবেন। যতদিন না মিল হচ্ছে ততদিন জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে ইন্দিরা কংগ্রেস যোগ দিলে যেমন আপত্তি থাকবে না তেমনি আবার ইন্দিরা কংগ্রেস খুশী হবে তাদের সভা-মিছিলে জাতীয় কংগ্রেস উপস্থিত হলে। কিন্তু প্রশ্ন হল দল

পর্যবেক্ষক

হিসাবে কংগ্রেসীরা কোন পর্যায়ে পড়বে? এরা দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী বা বামপন্থী? স্পষ্ট করে নেতারা এর উত্তর দিতে পারছেন না। এই না পারাটাই ছিল অতীতে কংগ্রেসী-দের মূলধন। কংগ্রেসের বিরাট সামিয়ানার তলায় তাই সবাই এসে জড়ো হতেন। কিন্তু অবস্থা পাল্টাচ্ছে। অতীতে যেটা মূলধন বলে মনে হত এখন সেটা ক্রমশঃ হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক দায়। কংগ্রেসীদের পক্ষে বামপন্থী বা বামঘেঁষা ভাবমূর্তি নেওয়া সম্ভব নয়। দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী মনোভাব মিশ্রিত একট চেহারা অবশ্য কংগ্রেস নিতে পারে। আর তাহলে বড়জোর জনতা-পার্টি-বিরোধী ভাবমূর্তি দানা বাঁধবে কি করে? জনতা পার্টিও তো দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী চিন্তাভাবনা মিশ্রিত গোষ্ঠী। প্রশাসনিক আদব কায়দায় কংগ্রেসের সঙ্গে তার উল্লেখ-যোগ্য তেমন ফারাকও নেই। পৃথক ভাবমূর্তি তৈরী করাই হবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমস্যা। যত দিন যাবে এ সমস্যা তত বড় করে দেখা দেবে। দায়িত্বশীল বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করে জনসাধারণের সেবা করে এমন কথা কংগ্রেসীরা যতই আওড়াক না কেন আসল উদ্দেশ্য হল ক্ষমতায় ওঠবার পথঘাট আবিষ্কার করা। সরকার-বিরোধী আন্দোলনের জন্য পথের তুলনায় সংসদকক্ষে বিভিন্ন দল নিয়ে যে ভালসাম্য আছে তাতে ভাঙন ধরানো অল্প পরিশ্রমে এবং মোটামুটি বিনা রক্তপাতে ক্ষমতায় আসা সম্ভব এমন ধারণা হয়েছে কংগ্রেসীদের। ঐক্যসূত্রে এখন আলো দেখাচ্ছেন জগজীবনবাবু। জনতা পার্টিতে নিজেকে মিলিয়ে দেবার সিদ্ধান্তটি আমার রাজনৈতিক জীবনের মস্তবড় ভুল এমন কথা উনি সম্প্রতি কোন কোন মহলে বলেছেন, আর সংসদের সম্প্রতি বাজেট অধিবেশন শেষ হবার পর জগজীবন নাম দল তৈরীর কাজে অগ্রসর হচ্ছেন। পুরোন সি এফ ডি এবং হরিজন ও তফসিলদের নিয়ে উনি এখন নমস্কারেন সংসদ সদস্য জোগাড় করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন নেতাকে জগ-জীবনবাবু কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছেন। জাতীয় কংগ্রেস বিনা দ্বিধায় জগজীবনবাবুর সঙ্গে যোগ দেবে। জগজীবনবাবুর নেতৃত্বের পিছনে ইন্দিরা কংগ্রেসেরও পূর্ণ সমর্থন আছে। জগজীবনবাবুকে নিয়ে কংগ্রেসীরা একত্র হলে এদের বিশ্বাস জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাবে সংসদে ডি এম কে, আন্না ডি এম কে, চরণ সি গোষ্ঠী বাদ বি এল ডি দলগুলির সমর্থন পাওয়া যাবে। এই দল পাকানোর খেলার পিছনে, কিন্তু প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার কোন প্রেরণা নেই। এখন প্রশ্ন হল জনতা পার্টির অন্য শরিকরা এবং বাম-পন্থী দলগুলি দেশের লোকের মাথার ওপর দিয়ে এইরকম রাজনৈতিক যোগসাজসের মোকাবিলা কিভাবে করবেন।

অশুভ তিথি অপেক্ষা করছে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে

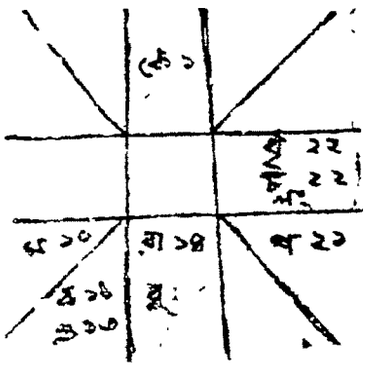

চন্দ্রের দশা ভোগ্য ৭-১১-১৬ দিন।

আমাদের এবারের আলোচ্য লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ। জাতকের মকর লগ্ন, মকর রাশি, শ্রবণা নক্ষত্র। বর্তমানে বুধের দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশা চলবে '৭৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অথবা সন্তানদের রাশিচক্র লক্ষ্য করলে প্রথমেই দেখা যাবে এমন কতকগুলি শুভযোগ অথবা রাজযোগের সমন্বয় থাকে যার ফলে জাতক লাভ করে প্রতিষ্ঠা, মান, যশ, অর্থ, সম্মান ইত্যাদি। কেউবা এই লাভটা অনায়াসে পান, আবার কেউ বা কষ্টসাধ্যে। যাঁদের শুভযোগগুলি নিষ্কণ্টক, তাঁরাই অনায়াসে লাভ করেন, আর যাঁদের শুভযোগের সঙ্গে কিছু-না-কিছুর অশুভত্বের যোগ থাকে, তাঁদের লাভ হয় কষ্টার্জিত। আলোচ্য রাশিচক্রে যেমন চন্দ্র বৃহস্পতির সহাবস্থানে জীবযোগ, ভাগ্যপতি ও কর্মপতির স্থান বিনিময়ে রাজযোগ এবং কেতু ও চন্দ্র স্বীয় নক্ষত্র পাওয়ায় উত্তমযোগের সৃষ্টি করেছে, তেমন ভাগ্যস্থানে নিধনপতির অবস্থান, কর্মস্থানে বাহু এবং লগ্নপতি দ্বাদশপতির স্থান বিনিময় শুভ এবং রাজযোগগুলিকে বহুলাংশে দুর্বল হীন করে রেখেছে, তাই আমরা দেখতে দেখতে পাই—জাতক জীবনে বহুবার বহুপ্রকার দেশসেবাতে অযাচিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, বহু সমস্যার সমাধানে একাকী প্রয়াসী হয়েছিলেন, আবার বহুবার জাতককে হতাশার অন্ধকারে উপেক্ষিতের মত দুঃসহ জীবনের শিকার হতে হয়েছে। মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সর্বোচ্চ সহায়ক কর্মস্থান। যদিও জাতক রাজযোগের নিমিত্তে এবং বাহুর অবস্থানবশতঃ জাতির সেবায়, পীড়িতদের রক্ষায় নিবলসভাবে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটেছেন, কিন্তু জাতকের ভাগ্যস্থানে শনির দৃষ্টি এবং রবি-শুক্রের সমন্বয়ে ভাগ্যস্থান, হয়েছে একটি খল-ক্ষেত্র। যার ফলে জাতক কর্ম করেও পাননি ভাগ্যের সহায়তা, পেয়েছেন বিড়ম্বনা পেয়েছেন হতাশা। তার সঙ্গে জাতক, উদ্যম বয়সে কর্মের প্রারম্ভ কাল থেকেই পেয়েছেন অশুভ গ্রহের মহাদশা। জ্যোতিষ

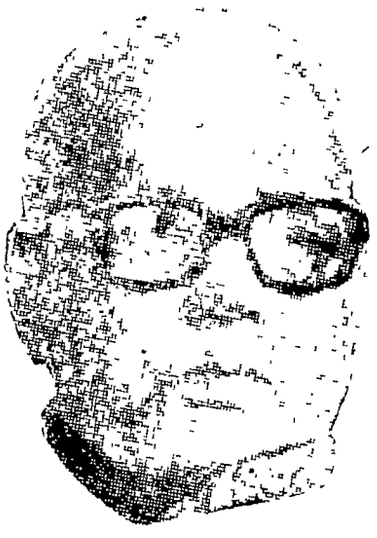

শাস্ত্রে জীবন প্রতিষ্ঠাতে কর্মে-সাফল্যে যে-দশার সহায়তা একান্ত প্রয়োজন।

জাতক ১৫ বছর অতিক্রান্ত করে পেয়েছেন ৩৩ বছরের অধিক বয়স পর্যন্ত রাহুর দশা। তারপর ১৬ বছর অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বৃহস্পতির দশা। এই বৃহস্পতির দশাতে জাতক হয়তো অনেক কিছুই পেতে পারতেন, হয়তো দেশসেবার যোগ্য পাত্র হতে পারতেন কিন্তু বৃহস্পতি যেমন জাতকের পক্ষে অশুভ, তেমন প্রাচুর্যতার বিদ্বেষী শনি দ্বাদশস্থ—জাতককে রেখেছে শুধু ত্যাগী, সেবক, গভীর পরিণামদর্শী করে। এলো অতঃপর ১৯ বছরের জন্য ব্যাধিকারক, পরিশ্রমী, ত্যাগী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বার্থহীন, পরার্থে জাতক গ্রহ শনির দশা। যিনি পাহাড় পর্বতে ভ্রমণশীল, যিনি অসামাজিকদের প্রতীক, যিনি সন্ন্যাসী, যিনি মহাযোগী, মহাসাধক, আশ্রমবাসী। সেই শনি ৭০ সাল পর্যন্ত নানার নিষ্ফলতার মধ্যেও জাতককে করেছে সংগ্রামী, উদ্যমী, দিয়েছে ইঙ্গিত নিকটেই সাফল্যের, করেছে স্বভাব সেবাধর্মের পরিবর্তন, করেছে আশ্রমবাসী, রবিয়েছে ত্যাগের নিশান এগিয়েছে সাহস, এগিয়ে নিয়েছে সার্থকতার দিকে। '৭০ সালের পর এলো ভাগ্যপতি রাজযোগকারক বুধের দশা। কিন্তু সাফল্য, দিল জাতির সেবার পুরস্কার, করল তাঁকে লোকনায়ক। কিন্তু আজ বিচার্য, সাফল্যের মূলে তিনি কি দেখতে পান তাঁর সেই স্বপ্নের প্রতীক। কতদিন অপেক্ষা করবেন তিনি তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট সৈনিকদের সাফল্যের জন্য? তিনি ষষ্ঠ দশা ভোগ করছেন। ভোগ করছেন পীড়াদায়ক দশা। তাঁর অষ্টম অর্থাৎ মৃত্যুস্থানে শনি, মঙ্গলের যোগ, অশুভ ত্রিপাপ বর্ষ, অশুভ তিথি অপেক্ষা করছে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। আগের সংখ্যাতেই বলেছি জুন-জুলাই ভারতের পক্ষে শুভ নয়। ভরসা শুধু তুঙ্গমুখী বৃহস্পতি আর লোকনায়কের সুস্বাস্থ্যের জন্য লোকবাসীর প্রার্থনা।

এবার সম্ভাব্য এ-সপ্তাহের ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি

মেষ : সৎকর্মে ব্যয়, ফলে অর্থটান। কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তা পাবেন। বুধ, বৃহঃ অশুভ।

বৃষ : রবিও স্বাস্থ্য উৎপাত করবে, কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবেন। ব্যবসাতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। শনিবার অশুভ।

মিথুন : কার্যকারণে আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে, হঠাৎ ক্রোধও ক্ষতিকর। চাকুরেদের উন্নতির যোগ।

কর্কট : ভাগ্যোন্নতির যোগ পাবেন সপ্তাহের মাঝামাঝি। কিন্তু ঘরে অশান্তির ইঙ্গিত আছে।

সিংহ : ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা। কর্মক্ষেত্রেও নৈরাশ্য। কোন বন্ধুর সহায়তা পাবেন। শুক্র, শনিবার শুভ।

কন্যা : আয় বৃদ্ধি, সম্মান যোগ, কিন্তু শিরঃপীড়ার কষ্ট। সোম, মঙ্গলবার লাভ।

তুলা : শত্রু বৃদ্ধি, ঋণযোগ, বন্ধুর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। এরই মধ্যে বুধ, বৃহস্পতিবার শুভ।

বৃশ্চিক : ব্যবসাতে বিঘ্ন, সন্তান সুখ, ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

ধনু : কর্মে প্রতিষ্ঠা, বেকারদের কর্মযোগ, কিন্তু স্বাস্থ্য উৎপাত করবে।

মকর : সন্তানের জন্য চিন্তা, শ্রমযোগ, অর্থপ্রাপ্তি যোগ। শুক্র, শনি লক্ষ্য রাখুন।

কুম্ভ : অর্থসুখ, কিন্তু সন্তানের জন্য ব্যতিব্যস্ত। বুধ, বৃহঃ শুভ।

মীন : মান, যশ বৃদ্ধি কিন্তু সামান্য কারণে উত্তেজনায় ক্ষতি। বুধ থেকে শনিবার লক্ষ্যণীয়।

শ্রীমানিক

আগামী সপ্তাহে
নীলম
সঞ্জীব রেড্ডি

মা এখনও নিজের হাতে দেশ চালান

দাউদ হায়দার

আমার পিতা ছিলেন তাঁর স্ত্রীর স্বারা শাসিত, মা ছিলেন তীক্ষ্ণ মেজাজের মহিলা। আমি জন্মের প্রথম চার বছর মানুষ হয়েছি মাতুলালয়ে। মামা ছিলেন নিঃসন্তান। মামীকে মা বলে ডাকতুম। অভ্যেসটা ছিল নয় বছর পর্যন্ত। পাঁচ বছরে বাবা-মায়ের কাছে চলে এসেছি। হামাগুড়ি দেয়ার বয়স পেরিয়ে যখন মন্দ হাঁটতে পারি, মা বললেন, 'খোকনকে এবার স্কুলে দাও।' বাবা আপত্তি তুললেন, 'ও-তো এখনো কথাই বলতে পারে না। স্কুলে যাবে কি করে?'—পাতাকে ভাবতে হবে না—মায়ের প্রতিবাদে বাবা চুপ করে গেলেন। বাবাকে আমি বেশী ভালোবাসতে শুরু করেছি। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে বুঝতে পারলুম সত্য আমার সত্যিকারের বন্ধু। কিন্তু বন্ধুর কোন কথাই বাড়ির কর্ত্রী শোনেন না। হাঁপাই হাঁপাই পাসে স্কুলে যাই। হোঁচট খেয়ে হাতের মেলেট ভাঙে। স্কুল বাড়ি থেকে খুব বেশি হলে পাঁচশো গজ দূরে। বাবার তৈরী স্কুল। মাস্টার মশাইরা ধমক দিতে পারেন না। বরং আদর করে, টেনিয়ে বিনিয়ে, প্রায় কোলের উপর তুলে নিয়ে বর্ণ-পরিচয় শেখান। নামতা মুখস্থ করতে দিলে, ভুলে গিয়ে খেলার সাথীদের সঙ্গে মেতে উঠি। মাস্টার মশাইরা পড়া ধরেন না। কখনো সখনো পড়া ধরলেও পারি না—তবু 'ভালো ছাত্র'। ওঁদের চাকরি হারানোর ভয়, কিংবা স্কুল-মালিকের কাছে খারাপ হতে চান না। বাবার কাছে, তাঁর ছেলেদের কোন প্রকার নালিশ চলবে না—খারাপ তো নয়-ই; বরং যতটা ভালো বলা যায়। ভালো বললে বাবা দারুণ খুশি হন। শুধু তাই নয়; সন্তানদের প্রশংসা করলে, শুনেছি, 'মাস্টারদের বেতন বেড়ে যেত।' বাবা ছিলেন, যথারীতি একজন জমিদার। জমিদার বলতে আমরা যা বুঝি, বাবা ছিলেন তার চাইতে একটু অন্য ধরনের। সেকালে মুসলিমদের মধ্যে জমিদারী প্রথা ছিল ভীষণ কম। মুসলিম জমিদারদের হাতে গোনা যায়। প্রায় পুরো জমিদারী ব্যবস্থাটা ছিল হিন্দুদের হাতে। তার মধ্যে দুই একজন মুসলিম জমিদার থাকলে, অন্তত দশ-বারো জেলার লোকজন তাঁকে চিনতেন। অত্যাচারী জমিদার হলে তো কোন কথাই নেই, খোদ ইংল্যাণ্ডের মহারাণী থেকে শুরু করে দেশের পিঁপড়ে পর্যন্ত তাঁর নাম মনে রাখবেন। ভালো হলে, ইংল্যাণ্ডের রাণী না চিনলেও, গ্রামের প্রজারা তাঁকে শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে। বাবা যে কি করে জমিদারী চালাতেন, আমি কিশোর বয়স পেরিয়ে যাবার পরও ঠিক বুঝতে পারিনি। পাবনায় আমাদের বাড়ি। শীতলাইয়ের জমিদার যোগী মৈত্রের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে। বাবা জমিদারী পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। বাবা অন্যান্য জমিদারদের মতো ঠাঁট ঠিকই বজায় রাখতেন। বাড়ির পুবে বিঘাট পুকুর চার বিঘে জমি নিয়ে। পুকুরটার চারপাশে যাবতীয় গাছ-গাছালি। চারদিকে চারটে স্নান-ঘাট। শান-বাঁধানো। দক্ষিণ দিকে, ওই গাছ-পালার ভেতরে সারি সারি তিনটি নাচঘর। তার পাশে জমিদারীর কার্যালয়। নাচঘরগুলো এখন ভাঙতে বসেছে। নাচঘরে কি হতো, আমি জানি না! তবে শুনেছি, গোমস্তা, খাজাঞ্চি, দেওয়ান, প্রমুখ জমিদারীর কর্তারা রাতে সময় কাটাতেন। বাবা কখনো গেছেন বলে শুনিনি। কথাগুলো কতটা সত্যি আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। তবে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য।

বাবার জমিদারী, বাবা যতটা চালাতেন, তার চাইতে বেশি খবরদারী করতেন মা। হিসেব থেকে শুরু করে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা নেয়া পর্যন্ত। দরকার পড়লে, গ্রামে গ্রামে চলে যেতেন, প্রজাদের কাছে। প্রজারা ভয়ে তটস্থ। মায়ের ভেতরে মাতৃত্ব কতখানি ছিল, প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে পিতার ভেতর পিতৃত্ব ছিল পুরোমাত্রায়। পিতা ছিলেন আমাদের কাছে আদর্শ। কিন্তু মা এতশত পছন্দ করতেন না। মায়ের মেজাজের কাছে আমরা শুধু নতজানু নই, ভয়ে ভয়ে থাকি। অথচ মায়ের ভালোবাসা ছিল অন্যরকম। প্রতিদিন সকালে উঠে প্রথম কাজ ছিল তাঁর ফজরের নামাজ আদায় করা। নামাজ শেষ করে কোরাণ পাঠ করবেন। এগুলো, তিনি কাক-পক্ষী ডাকার আগেই সেরে ফেলতেন। আমরা বেলা কাড়লে ঘুম থেকে উঠি। সকাল সাতটা মায়ের কাছে অনেক বেলা। সাতটার মধ্যেই তিনি সবাইকে ডেকে তুলবেন। সাতটার পরে এক মিনিট বেশি ঘুম চলবে না।

মায়ের শাসন ছিল কড়া। হাতমুখ ধুয়ে পড়তে বসা। খাওয়া পাওয়া যাবে সাড়ে আটটায়। তার আগে নয়। বাবা প্রায়ই বলতেন, 'ছেলেদের জন্যে মাস্টার রেখে দিই—কি বলো।'—এই পর্যন্তই বাবার কণ্ঠ। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে পর্যন্ত আমরা ভাইবোন কোন প্রাইভেট টিউটর দেখিনি। কেন, এত মাস্টার কিসের? টাকা কি গাছে ধরে?—তুমি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে পারো না? সকাল দশটা পর্যন্ত কি তোমার এমন কাজ যে, এটুকু সময় ব্যয় করতে পারবে না?'—মায়ের জবাবে বাবা হলেন আমাদের গৃহ-শিক্ষক। বাবার শিক্ষকতায় কিছুটা এলোমেলো ভাব ছিল। সকালে লোকজনের ভিড়, সমস্যার কথা তাঁকে শুনতে হয়।

মা কয়েকদিন ধরে ব্যাপারটি খেয়াল করেছেন। মনে আছে মা একদিন আগতদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'দশটার পরে আসবেন। এবং যা বলার থাকে, বলবেন।' সাক্ষাৎপ্রার্থীরা তারপর

থেকে দশটার পরে তো বটেই, আর কখনো দশটার দুই মিনিট আগে এসে কেউ দরজায় কড়া নাড়েনি। বাবা গৃহ-শিক্ষক হলেও মা ছিলেন হেডমিসট্রেস। প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি খবর নিতেন কতদূর পড়া হলো। না হলো। টেবিল থেকে আচমকা বই টেনে নিয়ে পড়া জিজ্ঞেস করতেন। না পারলে খুব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন 'মনোযোগ দাও।' এই দুটো শব্দে আমাদের হৃৎপিণ্ড কেঁপে যেতো। কিংবা তাঁর তাকানোর প্রতি। সে চোখে যে আগুন ফুটে বেরুতো, একমাত্র নরকের জ্বালানীর সঙ্গে তুলনা হতে পারে। পড়া শেষ করে, স্নান সেরে স্কুলে যাবার সময় মা নিজের হাতে চুল আঁচড়িয়ে দেবেন। জামায় বোতাম লাগাবেন। কখনো কখনো জুতোর ফিতেয় ফুল-প্রজাপতি তুলতে ভুলতেন না। খাবার সময় নিজের হাতে খাওয়াবেন। মাদুরের সামনে বসে নিজ হাতে পরিবেশন যখন করেন, মনেই হতো না, তাঁর চোখ থেকে নরকের আগুনের হলকা বেরিয়েছিল। আর ওই স্কুলে যাবার সময়, প্রত্যেকটি ভাইবোনের কপালে একটি ছোট্ট চুম্বন দিতেন। বলতেন, 'ঠিকমতো পথ চলবে।' মায়ের এই চুম্বনের জন্যে দুই-একদিন আমাদের দেরি করতে হয়েছে। বান্নাঘর থেকে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে দরজার সামনে এসে নির্বিকার দাঁড়াবেন। মায়ের চুম্বন ছিল আমাদের প্রতিদিনের আশীর্বাদ। বাবা এসব দূর থেকে দেখতেন। কিন্তু কখনো স্কুল পথে ছেড়ে দিয়ে, পথের দিকে খানিকটাও তাকাতেন না। তবে বাবাকে বলতে শুনেছি 'ওদের হাতে কিছু পয়সা দিয়ে দাও না'—।বাস, এইটুকুই। মায়ের কাঁপালো কণ্ঠে পয়সার কথা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হতে শুনিনি।

এখন ভাবতে অবাক লাগে, উপরোক্ত ব্যবহারগুলো বাবার করবার কথা নয়। এগুলো মায়েদের জন্যে। মা তাঁর সন্তানদের জন্যে স্বামীর পকেট থেকে চুপি চুপি পয়সা চুরি করে দেবেন; বাড়িতে মাস্টার রাখবার জন্যে চাপ দেবেন। অথচ সব উল্টো: মা বারণ করবেন, এই অভ্যাসগুলো যেন এই বয়সে না গড়ে ওঠে। বাবা, মায়েদের আহ্লাদ স্নেহ পেয়ে ছেলেমেয়ে বখে যাবে; এইগুলো বলবেন—যেমন অনেক বাবাই বলেন। বলবেন, স্কুলে যাবার সময় পয়সা দেবে না ছেলেমেয়েদের হাতে, আজেবাজে জিনিস খেয়ে শরীর খারাপ করবে।

আমার বাবা মায়ের এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার পর, প্রিয় পাঠক মহাশয়, আপনারা কি ধরে নিয়েছেন, আমার বাবা স্ত্রৈণ ছিলেন ?—যিনি সর্বদাই স্ত্রীর কথা শুনতে প্রস্তুত।—মোটেই তা নয়। মাকে দেখেছি, বাবার কথা শুনতে। বিকেলে বাবা কাজ থেকে ফিরবেন। তার জন্যে মায়ের উৎকণ্ঠা। মা বাবার জন্যে খাবার তৈরী করে রেখেছেন। বাবা আসবার আগেই নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। ওদিকে আমরা খেলাধূলো করে ফিরলাম। মা, তাঁর স্বামীর পরিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের হাত-মুখ ধোয়ালেন খাওয়ালেন।

মাঝে মাঝে বাবার নির্দেশে মা আমাদের বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যেতেন। কখনো কখনো মা বাবা দুজনেই সঙ্গী হয়েছেন আবার কোন কোন রবিবারে দুপুরে বাড়ির সবাই মিলে মজা করে পিকনিক করা হলো। বাবা মা দুজনেই উপস্থিত। শুধু উপস্থিত নয়, তাঁরাই প্রথম উদ্যোক্তা এবং যাবতীয় কাজকর্ম করছেন। বাবা কাজের মানুষ ছিলেন বলে হয়তো সংসারের অনেক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে পারতেন না। সংসারে কখন কি প্রয়োজন, বাজার দোকানের কথা নয়। তেল নুন ডাল, মরিচ, চাল কখন কি দরকার তার খবরদারি না-ই দেখেন, সেজন্যে বাবাকে কখনো না কিছু, বলেন নি তা নয়। প্রয়োজন তাৎক্ষণিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মায়ের সাধ্যের ভেতরে। ভিন্ন বিষয়সংসার। তাদের খাওয়া কখন সাব দিতে হবে বাব পাওনা টাকা শোধ করতে হবে সাব ওখানে কি কাজের জন্যে যেতে হবে অথবা কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে; সবই মা সময় মতো বলে দিতেন। আর আমাদের সাজ-পোশাকের জন্যে আমাদের বিন্দুমাত্র কখনো ভাবতে হয়নি। না চাইতেই পাওয়া, তা নয়; তবে প্রয়োজন মতো চলে আসে। যেন লোকে বলতে না পারে অমুকের ছেলে এই পোশাকে থাকে।

মা রাত্রে ঘুমানোর আগে, প্রত্যেকের ঘরে এসে আলো জেবলে, মশারি ঠিক আছে কিনা, মশা ঢুকছে কিনা দেখতেন। মাথাটা গরম হয়েছে কিনা। আর নিজের ঘরে চলে যাবার আগে মাথায় যে একবার সারা রাত্রির মতো হাত ছুঁয়ে যাবেন; তাতে কোন রাত্রে খোয়াব কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ছেলেমেয়ে রাত্রে খোয়াব দেখে বলে অনেক মা বাবা তাদের সন্তানদের রাত্রে, মঙ্গল মাঙ্গলী পঠান—যেন শরীরটা ভালো থাকে। দুশ্চিন্তা, কুচিন্তা থেকে মুক্তি পায়—না, আমাদের এমনটি কোনদিন হয়নি।

আমাদের ভাইবোনের সংখ্যা বেশি। সাত ভাই, সাত বোন। সেকালে পরিবার পরিকল্পনা ছিল না। থাকলেও বাবা মা না, কেউ-ই পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাস করতেন না। বাবা ছিলেন পরিবার পরিকল্পনার বিরোধী—অর্থাৎ পরবর্তীকালে যখন এসবের উদ্ভব হয়, বাবা বলতেন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং শরিয়তের বিরোধী। ধর্মের নিয়মের বাইরে যাবেন না। আর মানুষের সাম্প্রতিক মানে, এইসব বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের ধার তিনি ধারতেন না। শুধু তাই নয়, বাবার কাছে যারা আসতেন, তাদেরও তিনি বোঝাতেন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং; আমাদের ধর্মের বাইরে। একাজ করলে পাপ হবে। ঈমানের অস্তিত্ব নষ্ট হবে। তবে মায়ের মুখ থেকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনরকম কথা শুনিনি কোনদিন। হয়তো পরবর্তী সময়ে লজ্জা পেতেন; মনে মনে। কিন্তু একথা সত্যি তিনি তাঁর চোদ্দটি সন্তান নিয়ে গর্ব করতেন লোকসমাজে। চোদ্দ সন্তানের মাঝে যখন মা বসতেন মুখটি তাঁর ভীষণ উজ্জ্বল দেখাতো। তাঁর সন্তানদের জন্যে তিনি জীবনের সর্বস্ব খুইয়েছেন আর সেই জন্যেই ছেলেমেয়ে নাতীনাতনীর মাঝখানে বসে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করতেন। তাঁর চারপাশ জুড়ে পাখিদের কণ্ঠের মতো কোলাহল, গুঞ্জন, গান। সব মিলে তিনি ছিলেন সবার মধ্যমণি। কিন্তু, কতক্ষণ ?—তাঁর বড় মেয়ের বয়স যখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বড় মেয়ের বড় মেয়ে যখন এক সন্তানের জননী মা তাঁর বড় মেয়েকে হুকুম হুকুম করছেন। আর তিনিও শিশুর মতো শুনছেন পালন করছেন। মায়ের কাছে সব আবদার চলবে। কিন্তু সে আবদারের যুক্তি থাকতে হবে। অসম্ভব কিছু চাহিদা চলবে না। সাধ্যের মধ্যে পূরণ করতে চেষ্টা করবেন।

মনে আছে তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে। ঠাঁই করে একদিন আমার এক বান্ধবী বাসায় গিয়ে হাজির। বান্ধবী কি কারণে বাসায় গিয়েছিল, এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

বাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে মায়ের সঙ্গে দেখা। মা খুব আদর করে আমার বান্ধবীকে কাছে টেনে নিয়েছেন। যেন কতদিনের বন্ধু। দুপুরে তাকে খেয়ে ভাইয়েছেন। খবরাখবর নিয়েছেন। এবং জেনে নিয়েছেন, আমি তার কতদিনের বন্ধু। কি রকম বন্ধু। কি আশ্চর্য মোসাদ্দেক নামটি সব হড় হড় করে বলে দিয়েছে। মোসাদ্দেক কথা শুনে মা আরো পুলকিত হয়েছেন। তারো বেশি খুশি আদর-যত্ন হয়েছে—কিন্তু বিস্তৃতিতে বলবার দিনটি পরবর্তী অধ্যায়ের কথা। মোসাদ্দেক নে এসে আদর-যত্ন খেয়ে গেছে। সব শুনেছি। সেদিন বাড়ি ফিরতে আমার একটা সন্ধ্যা হয়েছে। ইতিমধ্যে মোসাদ্দেক তার বাসায় ফিরে গেছে। আমি ফিরে এসেছি আমার বাসায়। খাবার টেবিলে সবার সামনে খুব মজা করার অর্থাৎ গম্ভীর কণ্ঠে মা বললেন কিরকম মেয়েছিস। সন্ধ্যার একটি আগে গেছে। মায়ের মুখ দেখে কিরকম মনে হলো কিছুই বলতে পারবো না। বোধহয় একটি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে সমস্ত বঙ্গদেশ। কিন্তু না, কোন মেয়ের

আওয়াজ নেই, আকাশ বাতাস ভীষণ শান্ত। ব্যাপারটার আমিই শুধু নয়, অন্যান্য ভাইবোন যারা খাবার টেবিলে ছিলো, সবাই অবাক হলো। মা বললেন, কথায় মনে হলো, শিবলীনের সঙ্গে তোমার পরিচয় অনেক দিনের। কথাগুলো আমাকে তুমি বলতে পারতে।— না, তখন এরচেয়ে বেশি কিছু বলেন নি। রাত্রে ঘুমানোর আগে আমার ঘরে এলেন, ঘরে ঢুকবার সময়, হয়তো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি বলেই তিনবার নক্ করলেন। গত কয়েক বছর আগেও এমন দেখিনি, তখন তিনি শেববারের মতো বিছানা, মশারির অবস্থা দেখে যেতেন। এখন আসেন না। হয়তো এলে তিনি নিজেই লজ্জা পাবেন।

মা ঘরে ঢুকলেন। দরজায় মায়ের নক করার শব্দ শুনেই আমি সিগারেট নিভিয়ে দিয়েছিলাম। ঘরে তখনো ধোঁয়া খেলা করছিল। মা বললেন, 'একটু পরে আসবো।' আমি বললাম, 'না, না তুমি বসো।" মা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন "শিবলীন সম্পর্কে আমার জানবার উৎসাহ তেমন নেই, তবে তুমি আমাকে না জানিয়ে প্রেম করছো ভালো নয়। মনে রেখো, তোমার বড় বন্ধু আমি, তোমার বাবা। আর কি সিগারেট খাচ্ছিলে ? —বাজে সিগারেট খেয়ো না। না। দরকার পড়লে আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে কিনো। সিগারেট কম খেয়ো; তবে যা খাবে, ভালো খাবে।" মায়ের দ্বিতীয় কথায় আমি লজ্জার মাত্রির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম; কিন্তু প্রথমটিতে নয়। বরং প্রথমটিতেই হবার কথা। আমি ইনিয়ে বিনিয়ে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, না মা, প্রেম নয় ... ও আমার বন্ধু।'

মা উঠে যাবার সময় শুধু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রমথেটিকে আরেকদিন নিয়ে এসো'। এইটুকু বলেই তিনি দরজার দিকে এগিয়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু, পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে খুব শান্ত কণ্ঠে বললেন 'যদি তোমাদের আড্ডা মারার উচ্চতা পালে প্রতিদিন বাসায় আড্ডা দেবো—কিন্তু একদম বাইরে নয়। মোদ্দা মা যারা যদি আড্ডাটাড্ডা অপছন্দ করে, তার আমার ছবিটা স্থান উন্মুক্ত"। মায়ের এই কথার কোন উত্তর আমি দিতে পারিনি। বরং মনের খুশি করে মার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আর তখন থেকেই মা আমার কাছে একজন সত্যিকার বন্ধু হয়ে উঠলেন। কিন্তু এ বন্ধুকে সব কথা খুলে বলা যায় না—তার অনেকটাই বলতে হয়।

গত তিন-চার বছর আমি বাংলাদেশের বাইরে ঘুরে বেড়াই। কালে ভদ্রে ঢাকায় যাই। মা গত বছর মারা গেছেন। ছিয়াত্তর বছর বয়সে মা কিরকম মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, আমি দেখিনি, তবে নিঃশব্দে তাঁর আত্মনিমজ্জন বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যখন আমি একটি সভা থেকে আরেকটি দেশে, পাসপোর্ট সাথে করে ঢাকায় এয়ারপোর্টে পা রাখলাম মনে পড়ল, এর আগে যখন আমি দেশে ফিরেছি তিনি না আসতে পারলেও কাউকে না কাউকে বাড়ি থেকে বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে দায়ায় কেউ ছিল না।

মায়ের কাছে, আমার বন্ধুবান্ধবীরা ছিল সন্তান স্নেহের মতো। এই কলকাতায় এসে কখনো আমি পারোপারি রোমেন্টিসিজম, চারদিন সবই আমার কাছে সমান অন্ধিসন্ধি সাদাপথ কালির আলো-অন্ধকারে শাসন করছি, তখন একজন বিদেশী মহিলা, নাম অরুণা আমাকে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলেন। আমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। মেয়েটি আমাকে ভালোবাসতো। হয়তো এখনো ভালোবাসে। ওর সঙ্গে অনেকদিন আমার দেখা হয় না। শুনেছি ইদানিং খুব সুখে আছে। থাকুক। যা বলছিলাম আমাদের পরম পরিচয়ের কথা, আমি মা-কেই জানিয়েছিলাম। মা খুশি হয়েছিলেন। এক অসাধারণ বিস্ময়, মা আমাকে চিঠি না লিখে, অন্যান্যদের চিঠি লিখছিল। সে চিঠিতে আমার সম্পর্কে কোন কথা নেই। কিন্তু আমাদের চোখে চোখে দেখে রাখার কথা লেখেন নি। মা লিখেছেন "সুখে থেকো।" আমি এই দুটি শব্দের উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, হয়তো ওই দুটি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত দেয়া ছিল, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার। মা, তার ভাবী পুত্রবধূ সম্পর্কে কতখানি উৎসাহী ছিলেন জানি না এবং আশ্চর্যের বিষয়, আমাকেও জানাননি। বরং মাঝে মধ্যে চিঠিতে জানতে চেয়েছেন, 'তোমরা কেমন আছো'। এই প্রশ্নের আড়ালে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। মা যখন বড় চিঠি লিখতেন তখন বয়স হয়েছিল, আঁকাবাঁকা হাতে লেখা, কতক বোঝা যেত, কতক বোঝা যেত না—লিখতেন সংসারের ঝামেলার কথা। জমি-জমার বর্তমান অবস্থার কথা। কোথায় ধান ঠিকমতো পাওয়া গেল, কোথায় এবার ধান হয়নি। কোন বর্গাদার ধানের বদলে পাট লাগিয়েছিল কিংবা পুকুরের মাছ বিক্রী করে কতটাকা লাভ হলো— সব হিসেব। এগুলো প্রথম প্রথম আমার কাছে হাসির খোরাক যোগাত। এগুলো আমি তেমন পড়তাম না। কিন্তু অনেক চিঠিতে খেয়াল করেছি, তিনি জমির দাগ, খতিয়ান নাম্বার দিয়ে, অমুক জমিগাটা নিয়ে অমুকের সঙ্গে বিবাদ চলছে। মায়ের চিঠিতে আমি জমি-জমার ব্যাপারগুলো এখন আয়ত্ত করে ফেলেছি। জমি-জমার হিসেব-নিকেশ বোঝার কথা তাঁর নয়। সেগুলোর জন্যে বাবাই ছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু বাবা মারা গেছেন, মায়ের মৃত্যুর আট বছর আগে। অতএব বাবার ইচ্ছা থাকলেও জমিজমা সংক্রান্ত শিক্ষা দিতে তিনি পারেন নি। সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন মা। কেমন নিয়েছিলেন, আমাদের বালাকালে কোরান, নামাজ পড়া শেখানো' নামাজ, কোরান পড়া শেখানো নাকি তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব। ধর্ম থেকে যেন কখনোই বিচ্যুত না হই, তার জন্যে মাদ্রাসায় পাঠিয়েছেন। মায়ের মুখ থেকেই আমি আমরা অনেক কোরানের বাণী শুনেছি, কিছু সুরাও মুখস্থ করিয়েছেন। এবং বিপদে পড়লে কি সূরা পাঠ করতে হয়, বলতে তিনি ভোলেন নি। আর তার মৃত্যুর দিন কয়েক আগের সেই মারাত্মক চিঠিটা এখনো আমার কাছে রয়ে গেছে। চিঠিতে তিনি একটি সূরা লিখে দিয়েছেন কোরান থেকে। বলেছেন, সব সময় মনে রাখবে। তাহলে বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। মা বলতেন, তাই করো, নামাজটা ঠিকমতো পড়ো, আল্লাহকে স্মরণ রেখো।' এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগা-যোগ ছিল। কেননা, আমি বারবার লক্ষ্য করেছি, তিনি যে বিষয়গুলো সম্পর্কে মন্তব্য করছেন ঠিকঠাক মিলে গেছে।

।।২।।

খুব অল্প বয়সে, তখন ফোরে কিংবা ফাইভে পড়ি। পাড়ার একদল ছেলের সঙ্গে খেলতে খেলতে মারপিট শুরু হয়। কি কারণে মনে নেই। মাঝামাঝিতে সর্বদাই আমি অকৃতকার্য। মার খেয়ে গালে চোখ ফুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলাম। বাবা ঘরেই ছিলেন। আমার এই অবস্থা দেখে তিনি পাস লাফ দিয়ে ঘর থেকে নেমে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কে মেরেছে ' বাবার রাগ দেখে, নিশ্চিত বুঝতে পারলাম আমাকে একলা মারার স্বাদটা এবার ওরা বুঝতে পারবে।' তারা ছুটছিলেন মাঠের দিকে, মা এসে বাধা দিলেন। বললেন আগে জিজ্ঞেস করো খোকনের দোষ কি ? দোষ না করলে নিশ্চয়ই কেউ মারে না। আর পরের ছেলেকে শাসন করবার আগে নিজের ছেলেকে শাসন করো—।' সেদিন থেমে গেল বাবা মায়ের ঝগড়া। তাই বলে ওকে অমন করে মারবে ?'—বাবা বললেন। দোষ করেছে, মেরেছে, বেশ করেছে—মায়ের উপরে বাবা ভীষণ দুঃখ পাচ্ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বুঝলাম মা আমাকেই শাসন করছেন। এবং সেই শাসনের পর থেকে আমি আর মারামারি করবার জন্যে খেলতে যাইনি। তার জন্যবাধ জন্যে বাবার চাইতে মা-কেই বেশি কষ্ট করতে হয়েছিল।

বাবার মৃত্যুর বছর চারেক আগে আমরা ঢাকায় চলে আসি। সবাই নয়; বড়রা থাকতেন পাবনায়। মা বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঢাকায় এলেন। বড় ভাই ঢাকায় থাকেন। সেই ভাইয়ের দেখাশোনার জন্যে মায়ের পরিচর্যা নিয়মিত দরকার। পাবনায় আমরা ছোট ভাইবোনেরা। মায়ের এই অনুপস্থিতি দারুন পীড়া দিতে শুরু করল আমাকে।

বাবা ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। তিনি সময়ে অসময়ে সঙ্গ দিতে থাকলেন। কিন্তু মুশকিল হলো, মায়ের কণ্ঠ না শুনতে পেয়ে আমরা, বিশেষতঃ আমি কেমন যেন একটু বিহ্বল হয়ে পড়লাম।

মায়ের চিঠি না পেলে অস্থির হয়ে যাই। মাকে দিনে ছয়টা থেকে দশটা চিঠি লিখি। কিন্তু পোস্ট করা হয় না। চিঠিগুলো খাতা-বন্দী থাকে। বাবা যখন চিঠি দেন, সপ্তাহে একটির বেশি নয়; তার মধ্যে আমার চিঠি। কিন্তু চিঠির খামের অত্যন্ত ছোট। ওটা বাবার দোষ নয়। ওই খামের ভেতরে অন্যান্য ভাইবোনের চিঠি থাকতো।

চিঠি প্রসঙ্গে মনে পড়ল, মায়ের কাছেই একমাত্র আমি লক্ষাধিক চিঠি লিখেছি। উত্তর পেয়েছি শতাধিক। কেন যে মায়ের কাছে এত চিঠি লিখেছি, জানি না। হয়তো যখন যা মনে হয়েছে, লিখে পোস্ট করে দিয়েছি। ইদানিং, মা মারা যাবার পর, আমি আর কাউকে চিঠি লিখি না। কালেভদ্রে খুব দরকার না পড়লে।

এখন মনে হয় চিঠি লেখা বিড়ম্বনা এবং বিরক্তিকর। যে কারণে আমি প্রেমিকাদের চিঠির উত্তর দিতে পারি না—মূলে কথা, গদ্য লেখায় আমার আলস্য। গদ্য লেখার ভয়েই চিঠি লিখতে পারি না। শুধু কি তাই? পরীক্ষার খাতায় অত্যন্ত কম লিখি বলে, এবং সবই তা গদ্য; যার জন্যে সর্বদাই আমি কম নম্বর পাই। হতে পারে, খারাপ ছাত্র বলেই। তবে ওই যে বললুম, মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই লেখাটা পৃথিবীর জঘন্যতম কাজ বলে আমার কাছে মনে হয়। তবে প্রশ্ন তুলবেন, আপনি যা লিখেছেন, এটা কি? —ক্ষমা করবেন, এটা আমার একদিনের ফসল নয়। দিনে দিনে, কতদিন ধরে, একটা করে লাইন লিখে, এ পর্যন্ত দাঁড় করিয়েছি। আর, এই আত্মজীবনীকে কি গদ্য বলবেন?—যাক সে সব।

মা গদ্য পড়তেন, পদ্য পড়তেন না। আমি তার উল্টো স্বভাব পেয়েছি। কিন্তু এমন হবার কথা নয়। একটি প্রবাদ আছে, বাবার স্বভাব মেয়েরা পায়, আর মায়ের স্বভাব পায় ছেলেরা। কথাটি ঠিক। আমরা, ভাইয়েরা মায়ের স্বভাব পেয়েছি। আর বলাই বাহুল্য মায়ের পুরো স্বভাব, একটি বাদে, সবগুলোই আমার ভেতরে বিদ্যমান। সেই তীক্ষ্ণ মেজাজ, উদ্ধত কথাবার্তা, যা একবার ভেবেছি, তাই--কোনটাই বাদ যায়নি। আমার বোনেদের ভেতরে বাবার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখবার মতো। একেবারে ঠাণ্ডা চরিত্র। সাত চড়ে রা কাড়ে না। এই কারণেই বোধহয়, আমার বিবাহিত বোনেরা স্বামীগৃহে আজ ভীষণ সুখী। কোনদিন স্বামীস্ত্রীতে ঝগড়া লেগেছে বলে শুনিনি। একালের পুরুষদের কাছে, মায়ের মতো স্বভাব-মেজাজ দেখালে সংসার কতখানি সুখের হতো বলা মুশকিল। শুনেছি সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। আমার বোনেরা তার প্রমাণ দিচ্ছেন। মা-ও দিয়েছেন। মায়ের স্বভাবের মধ্যে ছিল মেজাজটা একটু বেশি পরিমাণে কড়া; এই যা। কিন্তু সংসার যাত্রায় কখনো তিনি বিমুখ হননি।

বলছিলাম, মায়ের ঢাকার জীবন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। আমরা আর থাকতে পারলাম না। বাবার কাছে কান্নাকাটি করে ঢাকার রওনা দিলাম। বাবা কিছুতেই ছাড়তে চাননি। তাঁর কাছে থাকবার জন্যে কত প্রকার যে লোভ দেখিয়েছেন—সে ফিরিস্তি এখানে হাস্যকর। বাবা জানতেন তাঁর বড় সন্তানদের জন্যে মায়ের আদর যত প্রয়োজন। অতএব তাঁর স্ত্রীর ওখানে থাকা দরকার। আর না থাকলে কখন কি খাবে, না খাবে তিনি সেটা ভালোই আঁচ করতে পেরেছিলেন। মায়ের অভাবে আমরা হয়ে উঠছিলাম দুরন্ত। আমার কথা?—আমি একটু বেশি মাত্রায় পা বাড়িয়েছিলাম। বাবা দেখলেন, ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। বাবা সব সময় চোখে চোখে রাখতে পারতেন না। তাঁকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হত। শেষের দিকে বাবার সঙ্গে আমার শুধু দেখা হতো রাতে খাবার সময়। এ-নিয়ে বাবা একদিন নয়, কতদিন রসিকতা করেছেন। বলতেন, 'দাঁড়াও, তোমার মা আসুক, তারপর মজা দেখানো হবে।' বাবা মায়ের উপরে শাসনের ভার দিয়ে দিতেন। তাঁর শাসন ছিল এত মৃদু যে, লোকে বলতো, 'হাকিমউদ্দীনই তাঁর ছেলেদের মাথা খেলো।' বাবা কোনদিন গায়ে হাত তোলেন নি। মা একদিন আমাকে প্রহার করেছিলেন। বাবা জানতে পেরে মায়ের সঙ্গে চারদিন কথা বলেন নি নিশ্চিত, অপরাধটা আমার গুরুতর ছিল। তখন স্কুলে পড়ি। বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে সিগেরেট খেয়েছিলুম। বাড়ি ফিরে মায়ের সামনে যেতেই মা খেয়াল করলেন আমার চোখ দুটো লাল। সিগেরেট খেলে কি চোখ লাল হয়?—এখন তো হয় না। তাহলে তখন হয়েছিল কেন?—প্রথম সিগেরেট খেয়েছিলুম বলে?—কি জানি! মা ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর চোখ লাল হয়েছে কেন?' মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বললাম, 'আমি কি করে জানবো!' মা বললেন, 'আয় দেখি তো।' আর ওই দেখাতে গিয়েই যত গোল। মা আমার মুখ থেকে সিগেরেটের গন্ধ পেলেন। আর কোথায় যাই। তারপর থেকে আমি মার খাওয়ার পরেও নিয়মিত সিগেরেট ধরেছি। আর সিগেরেট খেয়ে, যত ভালো করে মুখ ধোয়া যায়, ধুয়েছি। কিংবা সুপুরি চিবোতে চিবোতে মুখের গন্ধ দূর করেছি।

মা, এই সিগেরেট খাওয়া নিয়েই, মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে আমায় সাবধান করেছিলেন। বলেছিলেন : 'সিগেরেট খেলে ভালো সিগেরেট খাবে।' আগের মতো আর শাসন করতে পারেননি। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ঢাকায় মায়ের কাছে ফিরে গেলাম। বড়ভাই চাকরি করেন। তিনি বিবাহিত। মা ছেলের সংসারেও কর্ত্রী। দেখেছি, বড়ভাই, মাসের প্রথমে বেতন নিয়ে এসে মায়ের হাতে তুলে দেন। সুবোধ ছেলে বলে? —নাকি, নিজের কাছে থাকলে খরচ হবার ভয়? মা সেই টাকা থেকে সংসার চালাচ্ছেন। বড়ভাইয়ের পোশাকের প্রতি শুধু নয়, আমাদের জামা কাপড়ের দিকেও তিনি নজর দিচ্ছেন।

মার একটি কথা বড়ভাই কখনো শোনেননি। মা, প্রায়ই বড় ভাইকে বিয়ে করার জন্যে চাপ দিতেন। বলতেন, আমি আর পারিনে বাপু। ঘরে বউ না এলে ভালো দেখায়? ঘরের লক্ষ্মী হচ্ছে বউ।' এই কথাগুলো নিয়ে আমরা কতদিন মায়ের সামনেই কত হাসাহাসি করেছি। মা আমাদের কথায় যোগ দিয়েছেন। ক্ষিপ্ত হয়েছেন। 'বাবা যাবার পর বুঝবি, কেন বিয়ে করার কথা বলেছি'—মা বলতেন। মায়ের প্রচণ্ড চাপে বড়ভাইকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে হয়েছে। ভাইয়ের বিয়ের পর, মা সত্যি সত্যি কি রিলিফ পেয়েছিলেন?—তাঁকে দেখেছি সংসারের সমস্ত খোঁজ-খবর নিতে কার কখন খাওয়া হোল না হোল সে হিসেব নিতে তিনি ভোলেননি। আর সন্ধ্যার পরে, তাঁর বিবাহিত ছেলে ফিরছে না বলে, তাঁর উৎকণ্ঠা পুত্রবধূর চেয়ে অনেক বেশি।

।। ৩ ।।

মা বাংলাসাহিত্যের দুটি বহুল আলোচিত ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত এবং বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পড়েছেন। কিন্তু একদম ভালো লাগেনি। না লাগার কারণ আছে। মা বলতেন, শ্রীকান্তের প্রথমপর্বে যে কাহিনী আছে, সবই তাঁর চেনা, জানা, পরিচিত। পথের পাঁচালী সম্পর্কেও একই কথা। মা ছিলেন একদম গ্রামের মেয়ে। অজ-গ্রাম বলতে যা বোঝায় তার চেয়েও বেশি। 'মায়ের গ্রামে যেতে পাল্কীতে দুদিন লাগে।' নদী, মাঠ, গ্রাম আবার নদী, মাঠ, গ্রামের আল ধরে, তবেই তাঁর বাড়ি যেতে হয়। সে গ্রামের উপর দিয়ে কোনদিন, না, আজকের দিনেও রেল লাইন উঠে যায়নি। মায়ের বিয়ে হয়েছিল চৌদ্দ বছর বয়সে। সেকালে চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হওয়া সাংঘাতিক ব্যাপার। তবে আমার মাতামহ বয়স নিয়ে কখনো ভাবেননি। লোকের দুর্নাম শোনেননি। তার বদলে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাটা ভালোভাবে দিয়েছেন। আমার মা, তাঁর বোনদের চেয়ে একটু বেশি শিক্ষিতা। স্বামীর সংসারে এসে শিক্ষা আরো বাড়াই

করেছেন। আমার মাতামহ ছিলেন, গ্রামের স্কুল-শিক্ষক। মা, বিয়ের পরেও অনেক বছর গ্রামেই কাটিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে সে সময় এত পঁচার কড়াকড়ি ছিল যে, তার মধ্যে লেখাপড়া শিখলেন কি করে। আর কি করেই বা স্কুলে যেতেন। তাও আবার গ্রামে। যেখানে চারপাশে গাছগাছালি, বাঁকানো সিঁথির মতো ছোটখাটো রাস্তা, এলোমেলো নদী, সারাদিন পাখির ডাক। শুনেছি, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মায়ের গ্রামে বাঘ ঘুরে বেড়াতো, সন্ধ্যায়, রাত্রে। মা নাকি অনেকদিন বাঘ দেখেছেন। তবে, তাঁরা কখনোই রাত্রে ঘরের বাইরে যাননি। গ্রাম সম্পর্কে মায়ের ধারণা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস শরৎচন্দ্র কিংবা বিভূতিভূষণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। আর বোধ হয় সেই জন্যেই, তাঁর কাছে এই দুই মহৎ উপন্যাসের পরিবেশ এবং দৃশ্য কখনোই মনে ধরেনি। না ধরবারই কথা। কেননা, এই চিরচেনা দৃশ্যগুলোর কথা ফোনিয়ে বললে কি শুনতে খুব ভালো লাগবে? তবে কাহিনী, দুটি গ্রন্থেরই, নিশ্চিন্ত স্মরণীয়। তবু যে পরিবেশ, দৃশ্য এই দুটি গ্রন্থে দেখতে পাই, একজন অজগাঁয়ের পুরুষ বা মহিলার কাছে এর তেমন আবেদন নেই। একেবারে কোন গ্রামীণ লোকের কাছে তা থাকবার কথা নয়। ওই বাঁশঝাড়, নদী, মাঠ, বইচিনু বন, মাছ-ধরা, গ্রামের একজন লোকের কাছে প্রত্যেক দিনের ঘটনা বা দৃশ্য। আর তিনি কেনই বা তার জন্যে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত কিংবা বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি পড়বেন? সব গ্রামেই একজন ইন্দির-ঠাকরুণ থাকেন। সব গ্রামেই ঘাটু, ভাটা চচ্চড়ি খাওয়া হয়।

মায়ের কাছে শরৎচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণের অন্যান্য বইগুলো তেমন খারাপ লাগেনি। তার কাছে শহর-ভিত্তিক লেখাগুলো ছিল প্রিয়। তিনি জানতে চাইতেন, তিনি যা জানতেন না, তার পরিবেশ, দৃশ্য দেখতে।

যা-কেই বা যা মৌকা দোষ দিচ্ছি কেন? —আমি, এই আমি নিজেই একজন গ্রামের ছেলে। কতদিন আমরা নৌকো করে রাত্রে মাছ ধরতে গেছি—অবশ্য একা নয়। কতদিন, পেয়ের গাছ থেকে ডাব চুরি করেছি। একদিন শীতের রাতে, ঘর থেকে চুপ চুপ বেরিয়ে, আমি আর আমার চাচাত ভাই, খেজুরের রস পেড়ে এনেছি। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করা, ওটা তো প্রতিদিনের রুটিন ছিল। কতদিন আমরা নিজেরাই বহুরূপী সেজে, অন্ধকারে গ্রামের পথিক-দের ভয় দেখিয়েছি। ফলে, এইসব কারণের জন্যে শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব আমার কাছে কোনদিনই তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। পল্লী-সমাজ সম্পর্কেও একই কথা।

মা কিন্তু কখনোই এইসব বইগুলো পড়তে না করেন নি আমাদের। তাঁর নাতি-নাতনীরা, যারা এখন শহরের প্রচণ্ড আহ্লাদে গর্বিত, চূড়ান্ত আধুনিক, তিনি তাদের বলেছেন, "পড়ে দেখ শরৎচন্দ্র, বিভূতিকে। তাহলে দেখবি, তোদের এই ফাজিল শহরের চেয়ে গ্রামের জীবন কত ভালো—তোরা তো আমার কথা বিশ্বাস করিস না"। বলতে বলতে মায়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। চোখ দুটো ছল ছল করতো জলে। গ্রাম সম্পর্কে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি গর্বিতা।

শেষ-বয়সে গ্রামে ফিরে যেতে বড় সাধ জাগতো তাঁর। কিন্তু, বিশাল সংসারের ঝামেলায় পাবেন নি। মাকে দেখেছি, শহরের সঙ্গে কিছুতেই তিনি আত্মীয়তা গড়তে পারছেন না। শহর সম্পর্কে তাঁর ঘৃণা নয়, অবহেলা ছিল দেখবার মতো।

"শহরের লোকগুলো ভীষণ যান্ত্রিক। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন হৃদ্যতা নেই। কেউ কাউকে আপন করে নেয় না। অথচ গ্রামের লোকদের দিকে একবার ফিরে দ্যাখো—যেন তোমার কতদিনের আত্মীয়। একবেলা কেন, চারদিন খাওয়াতে ওরা আপত্তি করবে না। ঘরকে চাইলে থাকো, কিছুই ভাববে না। আর শহরের লোকজন?—বাড়িতে গেলে এক চায়ে বিদায় করে দিয়ে বলবে, দোকানটা যে এমন, বিস্কুটও থাকে না। কিন্তু গ্রামে গিয়ে দ্যাখো, মুড়ি, নারকেল দুধ দিয়ে তোমায় আপ্যায়ন করবে"—মা বলতেন। আমরা তার কথায় বাধা দিয়ে বলেছি তবু শহর ভালো। মা ক্ষিপ্ত হতেন। ভালো?—আমি এখানে কি একদিনও চাঁদের আলো দেখছি? চাঁদ কবে, কখন ওঠে, তাই তো ভুলে গেছি। মায়ের এই অখণ্ডনীয় যুক্তির প্রতিবাদের ভাষা আমাদের ছিল না।

মা আজীবন তাঁর সন্তানদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন, উচ্চবাচ্যে নয়, নিঃশব্দে। কোন কথা না বলে তিনি বকতে বকতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবন-গাথা।

ভাবতে ভালো লাগে, তিনিই সর্বপ্রথম পড়িয়েছিলেন, "সদা সত্য কথা বলিবে। গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিবে"। শিখিয়েছিলেন, "বাড়ির বাইরে যাবার সময় বিসমিল্লাহ বলে বেরুবে—তাহলে পথে কোন বিপদ হবে না"। শব্দটি এমনভাবে আমার ভেতরে প্রবেশ করেছে যে, ঘর থেকে বেরিয়ে সিগ্রেট কিনতে গেলেও মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "বিসমিল্লাহ"।

শুধু আমার মা নয়, প্রত্যেক জননী, তাঁর সংসারকে একটি রাষ্ট্র বলে ভাবেন। আর সন্তানদের পার্লামেন্টের মেম্বার হিসেবে ধরে নেন—অন্ততঃ আমার মা তাই নিয়োজিলেন। সেই জন্যেই তাঁর শাসন ছিল প্রায় সংবিধানের বুলের মতো। তিনি হাতে ধরে শিক্ষা দিয়েছেন, কি করে পরবর্তী সময়ে আমাদের চলতে হবে। মায়ের কাছ থেকে একাধিক নিয়মকানুন, ভদ্রতা এবং বাল্যবয়সে শিক্ষা পেয়েছি বলেই, আজ চারপাশ দেখেশুনে চলতে হয়।

ধরে নিচ্ছি, আমি এখন একটি অফিসের বিগ্ বস। আমার আণ্ডারে কয়েক শত লোক কাজ করেন।

আমি যখন কর্মচারীদের শাসন করি, ভুলে যাই, ওরাও মানুষ। কিন্তু, পরক্ষণেই যখন একসঙ্গে আড্ডা দিই, মনে হয় না, ওরা আমার কর্মচারী। যেন কতদিনের বন্ধু। সবার সমস্যার কথা শুনছি। হাসছি, খেলছি। বলছি "আরে এর জন্যে আবার এত চিন্তা কিসের—সব ঠিক হয়ে যাবে"। —আমার পি-এ-কে হাসতে হাসতে বললাম। আসলে আমার ভেতরে কে যেন সব সময় কাজ করে—যার আদর, স্নেহ, শাসন, ভালোবাসা শৈশব থেকে পেয়ে এসেছি। তিনি সঙ্গে না থাকলেও, প্রচ্ছন্নভাবে হৃদয়ের ভেতরে একেবারে ঠাঁই পেতে বসে থাকেন।

না, আমি এখনো বিগ্ বস নই। সাধারণ কেরানী মাত্র। আমার টেবিলের পাশে আরেকজন কেরানী সকাল দশটায় ঢুকে, কলমটি করে, বড় সাহেবের অর্ডার পালন করে, পাঁচটায় বাস ধরে।

আমার সেই কেরানী বন্ধুটি, যার বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, মুখে আগাছার মতো খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, চুলে পাক ধরেছে, চশমা কপসা হয়ে আসছে, সে এখনো ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ পালন করবার জন্যে কান খাড়া করে রাখেন। কোন প্রতিবাদ নেই। যেমন, মাকে মাঝে আমার বাবা, মাকে নির্দেশ দিতেন, অমুক কাজটা করে রেখো। মা নিঃশব্দে, কোন কথা না বলে, ভালোমন্দ বিচার না করে করে ফেলতেন। আর সেই কাজের নয় ছয় হলে বাবা বকবেন। কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। শুধু ইনিয়ে বিনিয়ে বলতেন, "আপনিই তো বলেছিলেন।"

উপসংহার :

আমার এই পরিবার-ইতিহাসের কি নামকরণ দেওয়া যেতে পারে, ভাবছিলাম। এখানে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা আমি বলতে চেয়েছি, তাতে নিশ্চয় প্রমাণিত হয়েছে, মায়েরা এখনো আমাদের সঙ্গে থাকেন, আড়ালে শাসন করেন, কি সংসারে, কি রাষ্ট্রে। অতএব মায়েরা যে এখনো দেশ চালান, কোন সন্দেহই নেই। লেখাটার নাম হোক উপরোক্ত হেড লাইন।

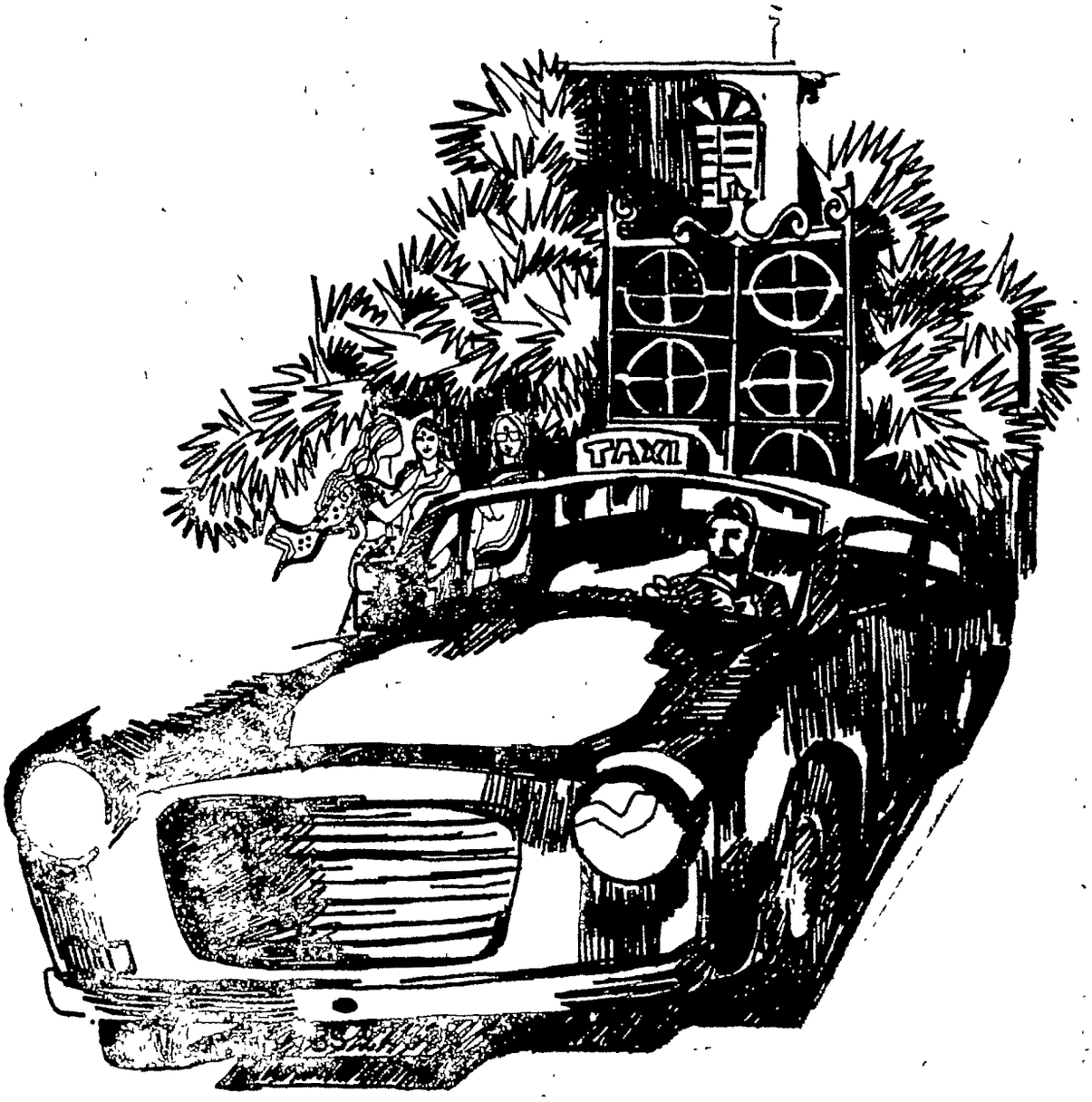

পাতিহাঁস \ সুধাংশু ঘোষ

লাল-নীল- হলুদ- বেগুনি ফুলে ঢাকা পাহাড়ের চুড়ো থেকে নৃত্যপরা নায়িকা দ্রুত নেমে এল। মুখে দারুণ চড়া সুরের গানের একটি কলি, যার প্রথম কলিটি আগেই গেয়েছে নায়ক। পাহাড়টাকে ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু স্রোতস্বতী নদী। টুকটুকে লাল রং-করা ছোট্ট নৌকোয় নায়ক এগিয়ে আসছিল। ঘাঘরা-পরা নায়িকা গিলিগিলি নেচে নেচে পাহাড়ের চুড়ো থেকে নেমে এল জলের কিনারায়। নৌকোখানা কাছে এলে একটা বিপজ্জনক লাফ দিল। নায়ক লুফে নিল নায়িকাকে। নায়কের বুকের ওপর শরীরের ভার রেখে নায়িকা চার সেকেন্ড পা নাচাল শূন্যে। সেই চার সেকেন্ড নৌকো টলমল। তারপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দিগন্ত-বেখার দিকে তাকাল পরস্পরের কোমর জড়িয়ে। তখন গানের প্রথম দুটো কলি দুজন একসঙ্গে গাইছিল। গানের প্রথম দুটো কলির মধ্যে দিয়ে নায়ক-নায়িকা বলছিল, আগুনের হলকায় পুড়ে যাচ্ছিল যে-দিল তা এখন গোলাপ হয়ে ফুটছে। ওদের নিয়ে নৌকোখানা দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছিল। ক্যামেরায় অনিবার্য লংশট।

ছবি শেষ হল। আলো জ্বলে উঠল সিনেমা হলে। রায়পাড়া বন্ধুর মালা আর কুসুম ঘড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। সিনেমা হলের ভেতরটা মাছেভেজাই নোনা। দেয়ালের হালকা সবুজ পলেস্তারা খসে গেছে অনেক জায়গায়। মাথার ওপরে কংকরা পিচবোর্ডের সিলিংয়ে টিনের ছাদ থেকে চুঁইয়ে আসা বৃষ্টির জলের ছোপ। কয়েকটা পিচবোর্ড মোড় থেকে ঝুলে পড়েছে। চেয়ারের হাতলে ঘেন্না, পা দিতে খাবলা-খাবলা গর্ত। মেঝেয় ঘুগনি খাদ্যের খোসা। যতক্ষণ অন্ধকার ছিল, ধেড়ে ইঁদুর দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। ছবি দেখার সময় এসব কিছুই টের পাওয়া যায় না। কুসুম আর বন্ধু

যতক্ষণ ছবি চলছিল, দর্শকদের প্রায় সবাই ভেবেছে, পর্দায় যেরকম, জীবন সেই-রকমই। অন্ধকারে প্রায় সবার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত ছিল। আলো জ্বলে ওঠায় তাদের চোখ-মুখ সহজ স্বাভাবিক, কিছুটা বা ম্লান হয়ে আসছে। মালা আর কুসুম ভিড়ের সঙ্গে একটু একটু করে এগোতে এগোতো সামান্য টলছিল। পর্দার রং এবং শব্দ যে ঘোর লাগিয়েছে তা পুরোপুরি কাটছিল না চট করে।

ভেতর থেকে বেরিয়ে সিনেমা হলের বারান্দায় এলেও ভিড় পাতলা হল না। সমান চাপাচাপি। তার কারণ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। অবশ্য খুব হালকা বৃষ্টি। ভেতরে বসে অনেক ওপরে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতে পায়নি।

দু-চারজন, বিশেষত ছেলেরা, দৌড়ে বাস স্টপে শেডের তলায় চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মাত্র দু-চারজন। তারা রাস্তায় নেমে যাওয়ায় ভিড় তেমন কমল না। মালা-কুসুমের অল্পসল্প ভিজতেও আপত্তি। প্রচুর স্নো-পাউডার মেখে দুজনেই মুখের আসল রং ঢাকতে চেয়েছে। মালার শাড়ি গোলাপী, কুসুমের সবুজ। দুখানা শাড়িই নকল সিলকের। দুজনেরই কানে দুল, হাতে চুড়ি, গলায় হার। সোনার নয়, নকল সোনার। দুজনেরই ঠোঁটে গাঢ় লাল, চোখে কাজল। এসব ধুয়ে যাক; ভিজে যাক, ওরা চায় না। একটু অপেক্ষা করাই ভাল, যদি বৃষ্টি থেমে যায়।

বারান্দার অন্য কোণ থেকে তিনটি যুবক মালা আর কুসুমকে দেখতে পেয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে এদিকে চলে এল। ওরাও তাহলে এই ছবিটা দেখতে এসেছিল। ছবিটা দারুণ। মালা আর কুসুম মেয়ে হয়েও যদি ছবিটা দেখতে এতদূর আসতে পারে, তবে ওরা যুবকরা আসবে না কেন। ওরা তো নিশ্চয়ই সারা শহর আর শহরতলী হামলে বেড়ায়। যুবক তিনটি হাসিহাসি মুখ করে কুসুম-মালাকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনজনেরই মুখ চেনা। একজনের নামও জানা। দুজন রায়পাড়া বস্তিতেই থাকে, একজন কাছাকাছি কোথাও।

বারান্দাটা সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তিনটি যুবকই সিগারেট ধরাল। দুজনের গায়ে কটকট রঙের হাওয়াই শার্ট। একজনের গায়ে হলুদ রঙের গেঞ্জি। চুলে কান ঢাকা, জুলপি চোয়ালের হাড় ছাড়িয়ে নেমেছে। তিনজনেরই পোশাকে ছবির নায়কদের অক্ষম করুণ অনুকরণ। ওদের সঙ্গে কুসুম মালার কখনো সরাসরি আলাপটালাপ কথাটথা হয়নি। তবু ভিড়ের মধ্যে এমন করে গায়ের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়েছে, যেন জড়ভরতের ঘনিষ্ঠতা। বেশতো—মালা আর কুসুম ভাবল—বেশতো, তোমরাও রায়পাড়া থেকে এত দূরে এই ছবিটা দেখতে এসেছো, তা ওপাশ থেকে এদিকে এগিয়ে এসে আমাদের গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাবার দরকার কী?

ইচ্ছে করে গায়ের মধ্যে প্রায় সেঁধিয়ে গিয়ে একজন ফিসফিস করে বলল, চলো না তেলকলের মাঠে একটু বেড়িয়ে তারপর পাড়ায় ফিরব।

আর একজন বলল, তার আগে চলো সামনের পাঞ্জাবীর দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিই। এর মধ্যে বৃষ্টি ধরে যাবে।

কুসুম-মালা রাজী নয়। দুজনেই মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। কথা বলল না, ভুরু কুঁচকে বিরক্তি, এমনকি ওদের প্রস্তাবের প্রতি ঘেন্না প্রকাশ করে ফেলল। এই যুবকদের সঙ্গে কুসুম-মালার তো আলাপই নেই। এদের থেকে অনেক বেশী চেনা যুবকদের সঙ্গে পাঞ্জাবীর দোকানে খেতে যাবার অভিজ্ঞতা তাদের আছে। তেলকলের মাঠে বেড়াতে যাবার অভিজ্ঞতাও আছে।

সামনের পাঞ্জাবীর দোকানে কিমাকাবাব পাওয়া যায়। কষা মাংস, কলিজাকাবাব পাওয়া যায়। একটু কম দামে ডেকা-মুরগি। কিন্তু এসব যুবকদের পকেট বড় হালকা। শেষ পর্যন্ত একটি করে আলু-চপ আর বাড়ির থেকেও খারাপ এক কাপ করে চা।

তেলকলের পাশ দিয়ে এক সময়ে ছোট ট্রেন চলত। এখন ঘাস-মাটির মধ্যে রেলের পাত পড়ে আছে। ফাঁকা মাঠ, ঝোপঝাড়। ওখানে সন্ধের মুখে বেড়াতে গেলে সমীহ এক-আধটু আঙুল ছুঁয়ে শুধু গল্পটল্প করে থামতে চায় না। উথালপাতাল হাত চালায়।

খিদে পেয়েছে ঠিকই। নিজেদের হাতে বাসভাড়া ছাড়া বাড়তি পয়সা নেই সিনেমার টিকিটের টাকাই অনেক কষ্টে যোগাড় করেছিল। কুসুম-মালা পাঞ্জাবীর দোকানে অথবা তেলকলের মাঠে যাবে না। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার।

যুবক তিনটি তাদের ঘিরে প্রায় চেপে রেখেছে। ওদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে, সিগারেটের ধোঁয়ায় ভারী ঝিম-ধরা বাদলা বাতাস ঘোলাটে ধরিয়ে দিচ্ছে চোখে। যুবক তিনটি ধারালো চোখ দিয়ে অবিরাম চাটছে মালা-কুসুমের শরীর। সন্ধের শো দেখতে লোক আসছে দলে দলে। বারান্দায় ভিড় বাড়ছে। চাপাচাপি আরো বেশী। মেঘলা করে থাকায় শেষ বিকেলেই আসছে অন্ধকার অল্পসল্প ভিজতেও রাজী ছিল না মালা-কুসুম। কিন্তু উপায় নেই। বেরিয়ে পড়তেই হবে তাদের। এখানে আর অপেক্ষা করা যায় না। বৃষ্টি কি একটু কমল?

সামনের বাসস্টপটার ওপরে টিনের শেড আছে। তার ওখান থেকে রায়পাড়ার বাস পাওয়া যাবে না। রায়পাড়ার বাসের জন্য এই রাস্তা ধরে কিছুটা গিয়ে বাঁয়ে বেঁকে আর এক বড় রাস্তায় পড়তে হবে। হাঁটতে হবে খানিকটা।

কুসুম-মালা ভিড় ঠেলে ঠেলে বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে এল। বেশ ঝিরঝির বৃষ্টি। কমবার লক্ষণ নেই। ভিজে যাচ্ছে বলে দুজনেরই মন খারাপ তবু, বৃষ্টি থেকে কিছুটা বাঁচবার জন্য মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে দুজনেই হাসল একটুখানি।

খুব কাছে পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাতেই—সেই তিনটি যুবক। হাসছে। মালা-কুসুমের মুখেও তখনো ঘোমটা পরার খুশী ঈষৎ ছড়িয়ে ছিল। যুবকরা উৎসাহিত হল। এগিয়ে এল আরো কাছে। একজন বললো, চলো না কোথাও গিয়ে একটু বসি। চা খাই।

বাঁয়ে ঘুরল মালা-কুসুম। ছুটবার মতন করে হাঁটছিল। কপাল মন্দ, বৃষ্টি জোরে নামল। এই রাস্তাটা নির্জন। একটি যুবক কুসুমের হাত ধরে টানল। বলছিল, ভিজতে ভিজতে কোথায় যাবে?

সামনেই মস্ত একটা বাড়ি। গেট খোলা। দরোয়ান নেই। হাত এড়িয়ে নিয়ে কুসুম-মালা সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকে গেল। গেট পেরিয়ে মোরম ছড়ানো চওড়া পথে কয়েক পা যেতেই বিরাট ঢাকা বারান্দা। সেখানে রাণীর মতন এক মহিলা। সেখানে কোমরে কুরুরি ঝোলানো দরোয়ান। সেখানে মেঝেয় বিশাল এক কুকুর নিয়ে বসে আছে কুচকুচে কালো একটা লোক।

কুসুম-মালা বারান্দায় আসতেই কুকুরটা গরগর করে উঠে ডাক ছাড়ল দুবার। যেন গভীর কোথা গুহায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। কুসুম-মালা আতঙ্কে ছিটকে গেল মহিলার পেছনে। আড়াল খুঁজছিল। মহিলা অবিশ্বাস্য সুরেলা গলায় বললেন, ভয় নেই। তারপর গেটের যুবকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরা?

হেঁচকি তুলে মালা বলল, ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে।

মহিলা সোজা টানটান হয়ে দাঁড়ালেন, তাকালেন দরোয়ানের দিকে। যুবকরা থেকে দুপা ভেতরে এগিয়েছিল। এখন দরোয়ান বারান্দা থেকে নামবার আগেই পেছন ফিরে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কিছু বলতে গেল, কথা স্পষ্ট হল না।

যুবকরা চলে গেল, কিন্তু কুকুরটির আচমকা লাফিয়ে উঠে এল দিকে। দুপাটি ধারালো দাঁতের মাঝখানে লকলকে লালাসিক্ত জিভ। দুটো থাবা তুলে দিল মালার হাঁটুর ওপর। আতঙ্কে চিৎকার করে মালা টলে পড়ল কুসুমের গায়। ততক্ষণে কুচকুচে কালো লোকটা আর দরোয়ান কুকুরটাকে সামলেছে।

মালা এবং কুসুমও ভয়ে খুব কাঁপছিল। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যেতে পারে বেহুঁশ হয়ে যেতে পারে মনে হল।

মহিলা এই প্রথম ওদের দুজনের কাঁধের ভিজে-ভিজে শাড়ির ওপর হাত রাখলেন। বললেন, অত ভয় পেও না। কামড়াবে না। এ কুকুর কামড়ায় না। এসো, ভেতরে এসে একটু বসে যাও।

ওদের চোখ তখনো কুকুরটার দিকে। লক্ষ করল, কুকুরটার দুটো কান একরকম নয়। একটা কান ঠিক আছে, অন্যটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে ঝুলছে।

বারান্দা থেকে মহিলার সঙ্গে ঘরে গিয়ে ওরা চামড়ার সোফায় বসল প্রশস্ত

পাশি। মহিলা অন্য একটি সোফায়। দরজার পেলমেটের ওপরে দেয়ালে বসানো হরিণের শিং: এক ঘরে দুটো পাখা। মহিলা নিজে সুইচ টিপে একটা পাখা চালিয়ে দিলেন। বেগুলেটর ঘুরিয়ে পাখা আস্তে করে দিলেন। ওরা বেশ ভিজেছে। পাখার হাওয়ায় শাড়ি-চুল শুকিয়ে যাক। তবে পাখা বেশী জোরে ঘুরলে শীত-শীত করতে পারে।

মহিলা আবার অবিশ্বাস্য সুরেলা গলায় বললেন, তোমরা কোথায় থাক? কোথায় গিয়েছিলে?

এমনিতে মালা-কুসুমের ধারণা, সিনেমা দেখতে যাওয়া গৌরবের ব্যাপার। গর্ব করে বলার জিনিস। কিন্তু এই মহিলার সামনে হিন্দি সিনেমার প্রসঙ্গ কেমন জলো লাগল। তবু গোপন করতে পারল না। কুসুম বলে ফেলল, আমরা এদিকে সিনেমা দেখতে এসেছিলাম। বায়-পাড়ায় থাকি। আমাদের বায়পাড়ায় ফিরতে হবে।

—বায়পাড়া তো বেশ দূর। মহিলা একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন। —ওদিকে সিনেমা হাউস নেই?

—আছে। দুটো।

—তবে?

—সেখানে তো এই ছবিটা হচ্ছে না।

—এই ছবিটা বুঝি ভাল?

মালা বলতে যাচ্ছিল—দারুণ! কুসুমের চোখের দিকে তাকিয়ে চেপে গেল।

মালা তার হাঁটুতে হাত বুলোচ্ছিল বারবার। মহিলা বললেন, দাঁত ব্যথা করছে নাকি? না না, [illegible]

কুসুম বলল, মালা করছে শাড়িটা তুলে দ্যাখ না।

মালা ভীষণ লজ্জা পেল। মাথা

টিকিট যখন আছে, দেখাবো না কেন?

ঠিকই বলেছেন। এতে সুবিধা কত দেখুন!

আপনার মতো ন্যায়বোধ আর আত্মসম্মান জ্ঞান তো সকলের নেই। বেশ কিছু লোক বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে আর আপনাদের প্রাপ্য সুবিধাগুলিতে ভাগ বসায়। তাছাড়া এদের অন্যান্য দৌরাত্ম তো আছেই। টিকিট কালেক্টর মুখ দেখে এদের কি করে চিনবেন বলুন? সব যাত্রীকে গেটের মুখে আটকে রেখে এক এক করে সকলের টিকিট অবশ্যই চেক করা যায়। তাতে আপনাদের মতো সাচ্চা যাত্রীদের হয়রানি বাড়ে।

আপনাদের সহযোগিতা পেলে অবশ্য কাজটা চটপট ও সহজ হয়ে যায়। আর সহযোগিতার সেই কাজটুকু মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। শুধু অনুগ্রহ করে গেট পার হওয়ার সময় টিকিট দেখিয়ে যান। টিকিট কালেক্টর তখন বুঝে নেবেন কার কাছে টিকিট আদায় করতে হবে। ফলে শুধু তার কাজটাই সহজ এবং চটপট হবে না, আপনাদেরও যাতায়াতের সুবিধা হবে।

আর একটা নিবেদন, টিকিট কালেক্টর টিকিট দেখতে চাইলে রাগ করবেন না। আপনাকে অসম্মান করার জন্যে তো তিনি টিকিট দেখতে চাইছেন না, টিকিট চাইছেন যাতে অনধিকারীরা আপনার প্রাপ্য সুবিধায় ভাগ বসাতে না পারে। কাজেই তিনি আপনার সহযোগিতার আশা করেন।

ER 488/78

পূর্ব রেলওয়ে

কুঁকিয়ে আড়াল করে কাপড় সরিয়ে দেখল, না, কামড়ায়নি। তবে কুকুরের নখের টানে হাঁটুর তলায় শাড়িটা ছিঁড়েছে প্রায় ছ ইঞ্চি।

মহিলা উঠে একবার ভেতরে গিয়ে তখনই আবার ফিরে এলেন। এমন রানীর মতন সুন্দর কোনো মহিলার এতো কাছে মালা-কুসুম এর আগে কখনো বসেনি। এতো লম্বা, যতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল ওপর দিকে তাকিয়ে মুখ দেখতে হচ্ছিল। মাথায় প্রচুর চুল, বেশীর ভাগ কাঁচা, মাঝে মাঝে রুপোলি। গায়ের রং ঠিক চাঁপা ফুলের মতন। ঠোঁট খুব পাতলা, অথচ লেখা কোথার মতন টসটসে। চওড়া জমিপাড়ের সাদা তাঁতের শাড়ি, ভেতরে হালকা গোলাপী বুটি। মানুষের এমন চেহারা হয়, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

মহিলা ভেতর থেকে ফিরে এসে বসেই বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই পড়াশোনা কর।

দুজনেই লজ্জা পেল। কুসুম বলল, আমরা কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ছি।

মহিলা ভুরু কোঁচকালেন। —সে তো ছোটবেলায়। তারপর ?

কুসুমের মুখ থেকে আর কথা খসল না। মালা বলল, আর পড়াশোনা হয়নি।

—তা হলে তোমরা কী কর সময় কাটাও ? মহিলার গলায় বিস্ময় স্পষ্ট।

দুজনেরই মনে পড়ল, বাড়িতে রোজ ভোর থেকে রাত্তিরে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কত অজস্র কাজ করতে হয়। সেই সব কাজের ফিরিস্তি এই মহিলাকে কেমন করে দেওয়া যায় ওরা বুঝতে পারল না। অন্য সব কাজের কথা চেপে গিয়ে মালা বলতে যাচ্ছিল, আপনার যেমন কুকুর আছে, আমার তেমন অনেকগুলো মুনিয়া আছে। তাদের খাঁচা পরিষ্কার করতে হয়, খেতে দিতে হয়। কিন্তু অবশ্য বলল না মালা। বিশাল কুকুরটার সঙ্গে ছোট ছোট মুনিয়া পাখির তুলনাটা ঠিক পছন্দ হল না।

ধান কাপড় পরা তাদের বয়সী একটি মেয়ে একখানা বড় ট্রে হাতে করে এল দেখেই বোঝা যায়, এবাড়িতে কাজ করে। মেয়েটি গোলগাল। কুসুম ভাবল, মেয়েটা আমাদের থেকে ভাল খাবদায়।

নিচু টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল। ধবধবে সাদা পাতলা চায়ের কাপ, প্লেট, চিনির পাত্র, দুধের পাত্র, একখানা প্লেটে তিন চার রকম বিস্কুট। মেয়েটি চলে গেলে মহিলা নিজের হাতে কাপে লিকার ঢাললেন, দুধ চিনি মেশালেন। মিষ্টি করে বললেন, একটু চা খাও। কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে ?

মালা বলল, দেড়টার পরে।

বাইরে আবার বৃষ্টি। ঘর থেকেই দেখা যায়, লনের ঘাস ঝিরঝির বৃষ্টিতে ভিজে ঘন সবুজ।

কিছুক্ষণ থেকে ভেতরটা সেচ্চাচ্ছিল। ওরা লাজুক লাজুক হেসে বিস্কুটে মুখে দিল, ঠোঁট ছোঁয়াল চায়ে।

মহিলা বলছিলেন, স্কুল-কলেজে পড়াশোনা না করলেও তোমরা অন্য কিছু তো করতে পার। সিনেমা দেখে দেখে দিন কাটিয়ে দিলে জীবনে বড় হবে কী করে ?

জীবনে বড় হওয়ার কথাটা বলে মেলে মহিলা নিজেই যেন একটু অস্বস্তি চাপলেন। তবে না থেমে ভাষণ দেওয়ার মতন করে বলে যাচ্ছিলেন, তোমরা ছবি আঁকা শিখতে পার, গান শিখতে পার। প্রায়ই তো পেন্টিংয়ের একজিবিশন হয় আকাদমিতে, তথ্য কেন্দ্রে, আর্ট কলেজে। তোমাদের দেখতে যেতে ইচ্ছে করে না ? গান শিখবার কত ভাল জায়গা আছে। সেখানে গিয়ে তোমাদের গান শিখতে ইচ্ছে হয় না ?

মালা লুকিয়ে কুসুমের কোমরে একটা খোঁচা দিল। চা-বিস্কুট খেয়ে বেশ চনমনে গলায় কুসুম বলল, মালা খুব ভাল গান করে। ওদের বাড়িতে তো গ্রামোফোন আছে, তার গান শোনে। তাছাড়া কালী পুজোটুজোর সময় মাইক ভাড়ে। সেই সব গান মালা দারুণ নকল করে।

মহিলা খানিক চুপচাপ কেবল তাকিয়ে রইলেন। মালার গানের বিষয়ে কোনো উৎসাহ দেখালেন না। তারপর জানতে চাইলেন, কুসুমের বাবা এবং মালার বাবা কী কাজ করেন।

কুসুমের বাবা সরকারী অফিসের দপ্তরী। মালার বাবা নেই। বড় ভাই ডাক বিভাগের পিয়ন, ছোট ভাই চাকরি খুঁজছে। এসব ওরা খুলে বলল না। কেবল জানাল, তাঁরা চাকরীবাকরি করেন।

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় মালা বলল, কুসুমের ছোট বোন কুমকুম ভাল ছবি আঁকে। রামকৃষ্ণদেবের ছবি দেখে দেখে একবার স্বামী বিবেকানন্দ এঁকেছিল কুমকুম। সেই পাগলি, বড় বড় চোখ, বুকের ওপর হাত, পাড়ার অনেকেই প্রশংসা করেছিলেন।

মালার গানের বিষয়ে উৎসাহ দেখাননি মহিলা। কুমকুমের ছবি আঁকার বিষয়েও আগ্রহ দেখালেন না। আসলে মহিলা ওদের তেমন কথা বলছেন না। বাইরে অন্ধকারে হালকা বৃষ্টি ঝরছে। কখন সন্ধে পেরিয়ে রাত নেমেছে। মহিলা দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকালেন।

ওর ইঙ্গিত বুঝতে পারল না মালা বলল, আপনার ছেলেমেয়েরা কোথায় ?

মহিলা জানালেন, তাঁর মেয়ে নেই। একটি মাত্র ছেলে। সে বউ নিয়ে আমেরিকায় আছে। ফিরে আসতে এখনো দু মাস বাকী।

মালার থেকে কুসুমের কৌতূহল কম নয়, সাহসটাই কম। এখন সাহস করে বলে ফেলল, এবাড়ির কর্তা ?

মহিলা জানালেন, তাঁর স্বামী অফিসের কাজে দিল্লি গেছেন। এক সপ্তাহ পরে ফিরবার কথা।

এই সময়ে কুকুরটা আবার কয়েকটা ডাক ছাড়ল। বিস্ফোরণ হল গম্ভীর কোনো গুহায়। কুকুরের ডাক শুনে মালা কেঁপে উঠেছিল। কাঁপুনি থামলে মানতে চাইল, এতক্ষণ ধরে যাযাবরায় বসে কুচকুচে কালো লোকটা কুকুরের কান নিয়ে টানাটানি করছে কেন ?

মহিলা বললেন, কুকুরের একটা কানে ঘা হয়েছিল। সেই কানটাই দেওয়ালে ঘষতাম লেগে ছিঁড়ে যায়। ওই লোকটা কুকুরের কান সেলাই করে দিচ্ছে।

কুসুম বলল, ব্যথা লাগছে বলেই বোধ হয় কুকুরটা মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ছে ?

—বেশী ব্যথা লাগছে না। ওষুধ দিয়ে কান অবশ করে নিয়েছে।

বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি। মহিলা দরোয়ানকে ডেকে ওদের জন্যে ট্যাকসি আনতে বললেন।

ওরা একসঙ্গে প্রতিবাদ করল, ট্যাকসি দরকার নেই। আমরা বাসেই যাব।

মালা গুছিয়ে বলল, বৃষ্টি তো প্রায় নেই। একটু হাঁটলেই আমরা বাস পেয়ে যাব। ওই ছেলেরা নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে কোথাও ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে নেই। ওরা বুঝেছে, আমরা সেরকম মেয়ে নই।

সেরকম মেয়ে মানে কীরকম মেয়ে, মালা বলেনি। তবু তার না বলা কথাটা হয়ত অশোভন। মহিলার মুখে লালচে আভা জেগেই মিলিয়ে গেল। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চাপলেন। মহিলার সঙ্গে দুজনেই এতক্ষণ খুব সাবধানে কথা বলেছে, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে শব্দ ব্যবহার করেছে। এখন মালার একটি না বলা কথাই কি সব কিছু নষ্ট করে দিল ?

মহিলা ওদের প্রতিবাদ শুনলেন না। দরোয়ানকে ট্যাকসি ডাকতে বললেন।

এদিকটায় প্রচুর ট্যাকসি। দু মিনিটের মধ্যে একটি এসে দাঁড়াল গেটের সামনে।

বারান্দা থেকে গেটের দিকে নেমে যাবার সময় মহিলা মালার হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। দেওয়ার সময় মালার শাড়ির ছেঁড়া অংশটা দেখলেন এক ঝলক। টাকা নিতে ভীষণ লজ্জা করছিল। নিতে চায়নি। না না করল। কিন্তু না নিয়ে উপায় কী ? ট্যাকসি ভাড়া কোথায় পাবে ?

ওরা ভেবেছিল, মহিলা বলবেন— এদিকে এলে আবার এসো। আর কোনো দিন এই বাড়িতে ওরা ঢুকবে না। তবু আশা করেছিল, ওই কথাটা শুনতে পাবে। মহিলা তেমন কিছু বললেন না।

কতক্ষণ পরে ট্যাকসিতে উঠেছে মনে করতে পারছিল না কুসুম-মালা। রাস্তার জল জমেছে এক-এক জায়গায়। গর্তের মধ্যে চাকা পড়লে জল ছিটকে যাচ্ছিল পাশে। বাদামতল থেকে বাঁচবার জন্যে লোকজন দ্রুত

সবে যাচ্ছিল। রাস্তা এবং দোকানের আলোগুলো কেমন ভিজে ভিজে। বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে মালা দৃষ্টি রাখল ট্যাকসির মিটারে। এমন ঝামেলা, মিটারে যা ওঠে তার থেকে অনেক বেশী টাকা দিতে হয়।

বেশ কিছুক্ষণ মিটার লক্ষ করে মালা আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। ট্যাকসি-অলাকে বলে বসল, এখন কতটাকা উঠেছে? মিটার দেখে তো ছাই বুঝবার উপায় নেই।

ট্যাকসির ড্রাইভার সাড়া দিল না।

কুসুমও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। গলা চড়িয়ে বলল, কত টাকা উঠেছে?

ড্রাইভার ওদের মাথার ওপরের আলো জ্বেলে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে ওদের দেখল। হাসল গোঁফের ফাঁকে। আবার সামনের দিকে মুখ করে বলল, যাবে তো বললে অনেক দূর।

মালা চট করে মন্তব্য করল, আমাদের তুমি বলছেন কেন? আপনি বলতে গলায় আটকায়?

কুসুম ফিসফিস করল, চেপে যা।

ট্যাকসিঅলা নিঃশব্দে হাসছে কিনা বোঝা গেল না।

সামনের দরজার কাঁচ আধাআধি খোলা। সেখান দিয়ে হাওয়া আসছে, এক-আধটু বৃষ্টির ছাট। শীত শীত করছিল।

বেশ কয়েকটা মোড় ঘুরে, পাশে কাদাজল ছিটিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ট্যাকসিটা অনেকক্ষণ চলল। মিটারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মালা আর সহ্য করতে না পেরে বলল, গাড়ি থামান। আমরা নামব।

ট্যাকসিঅলার গলা শোনা গেল, কেন, থামব কেন? রায়পাড়া তো এখনো এক মাইল।

মালা প্রায় চিৎকার করে উঠল, আমাদের কাছে পাঁচ টাকার বেশী নেই। বাড়ি গেলেও টাকা পাব না।

এবারে কি শব্দ করে হাসল ট্যাকসিঅলা?

আর একটা মোড় ঘুরে সত্যি রায়-পাড়ায় এসে গেলে দুজনেই ছটফটিয়ে উঠল। একসঙ্গে এলোমেলো চেঁচাতে লাগল—থামান, থামান, এখানেই নামব। আমাদের গলিতে ট্যাকসি ঢোকে না।

একটা কাঁকড়া গাছের তলায় অন্ধকার মতন জায়গায় ট্যাকসি থামল। সেখানে লোকজন নেই, ঝিরঝির বৃষ্টি নেই, গাছের পাতা বেয়ে মাঝে মাঝে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে।

মালা ভয়ে ভয়ে বলল, কত টাকা উঠেছে?

—প্রায় ছ টাকা।

[illegible] চিৎকার করে উঠল,

আপনাকে তো বললাম আমাদের কাছে পাঁচ টাকার বেশী নেই।

মালা দরজা খুলবার চেষ্টা করছিল। হাতলটা ধরে চাপ দিয়ে বলল, ট্যাকসি থামিয়ে আমাদের আগেই নামিয়ে দিতে বলেছিলাম।

দরজা খুলতে পারছে না দেখে ট্যাকসিঅলা ঘুরে এদিকে ঝুঁকে এল। হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিয়ে মালার মুখের কাছে মুখ এনে মসকরার গলায় বলল, পাঁচ টাকাই দাও না।

নোটখানা ব্যাগে রাখেনি মালা। সেই থেকে হাতের মধ্যেই রয়েছে। মুঠো করে ধরে থাকায় মুচড়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। দোমড়ানো নোট ট্যাকসিঅলার হাতে দিয়ে ওরা নামল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও নেমে এল। নেমেই দুহাতে দুজনের থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে, নাটুকে কায়দায় বলল কোথায় গিয়েছিল।

ওরা ছিটকে সরে যাবার আগে খুব অল্পক্ষণ লোকটা তার ক্ষিপ্র নিপুণ থাবা আর আঙুল চালালো উথালপাতাল। প্রায় দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ওরা গলিতে ঢুকে গেল।

কুসুম-মালা এগোচ্ছে যথেষ্ট জোরে। কিন্তু এখন হকচকিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করল না। তাছাড়া ওরা যে ট্যাকসিতে এসেছে, জানাতে চায় না কাউকে।

গলি দিয়ে বেশ খানিকটা হাঁটলে প্রথমে কুসুমের বাড়ি, তারপর মালার। গলিতে নোংরা প্যাচপেচে কাদা। এক-একটা জায়গা অত্যন্ত পেছল, আলো কম। বাদলা বাতাস শীত শীত করছিল আগে। এখন মোটেই শীত নেই। সিনেমা হলের পর্দায় শেষ দৃশ্যে মনে হয়েছিল, নায়ক-নায়িকার হৃদয় গোলাপ হয়ে ফুটছে। এখন বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে কুসুম-মালার মনে হল, সারা শরীরে অপমানের হলকা।

নিয়োগকারীদের জ্ঞাতার্থে

পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে আপনাদের কর্মচারীদের বেতন বাবদ যা দিয়েছেন এবং আয়কর বাবদ তা থেকে যা কেটেছেন তার রিটার্ণ পাঠাবার শেষ তারিখ বাড়িয়ে এ বছরে ৩০শে জুন ১৯৭৮ করা হয়েছে।

ফর্ম নং ২৪—আয়ের বিবরণ দেবার নির্ধারিত ফর্মটি, সংশোধন করা হয়েছে; সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাকসেস-এর ৩১শে মার্চের বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে তা সূচীত করা হয়েছে।

খেলাপ—আয়করের রিটার্ন পাঠাতে ভুলে গেলে, তার জন্য প্রতিদিন ১০ টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে।

মনে রাখুন—আপনার রিটার্ন সঠিকভাবে ও পুরো-পুরি, সংশোধিত ২৪নং ফর্মে ভরে, তিরিশে জুনের মধ্যে পাঠাতে হবে।

ফর্ম কিংবা কোনও সাহায্য দরকার হলে আপনার হিসাব নিরূপক আই টি ও অথবা পি আর ও-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান
(রিসার্চ স্ট্যাটিসটিকস অ্যান্ড পাবলিকেশান)
ইনকামট্যাকস ডিপার্টমেণ্ট
নিউ দিল্লী

ডি এ ডি পি ৭৮৬৮১

খাতার কয়েকজন লেখক

পারিবারিক খাতা

পশুপতি শাশমল

বাড়ির সকলেই আছেন। ও বাড়িরও কেউ কেউ এসেছেন যেমন রোজ আসেন। দিনটা ভালো। ভাইফোঁটা। আজ আবার ছেলেদের একজনের জন্মতিথি. উনিশে পড়লা আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। গল্প-গুজবে আলোচনায় সবাই মশগুল। হঠাৎ একজন বলে বসলেন ভাসা মেঘের মতো টুকরো টুকরো ভাবনা চিন্তাকে একটা খাতায় ধরে রাখতে পারলে খুব ভালো হত, তাছাড়া পরিবারের সকলে এমন কি কুটুম্ব বন্ধুরাও ওতে যার যা খুশি অবসর মতো লিখতে পারতেন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। নীলচে রুল টানা সাদা কাগজের একটা মোটা গোছের বাঁধানো খাতা নিয়ে আসা হল। চালচিত্রের ডিজাইনে অর্ধবৃত্তাকারে বড়ো বড়ো হরফে এর শিরোনামটি লিখে দিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ একজন। আনুভূমিক রেখা ধরে জুড়ে দিলেন তিনি ভূমিকার মতো দু চারটি কথা। যৎসামান্য অলংকরণও বাদ গেল না। আর উজ্জ্বলতম মানুষটি গোল গোল মুক্তো বসিয়ে লিখলেন এর নিয়মাবলি বা কয়েকটি 'নিষেধ'।

শুরু হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, সংক্ষেপে পারিবারিক খাতা। বনস্পতির মতো বিশাল মহর্ষি পরিবারেরই উপযুক্ত সারস্বত আধার, যেন বাণীর প্রতিমা। পরিবারের প্রবণতা ছিল বঙ্গসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা, একটি সর্ববয়ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া। স্মৃতিলিপি পুস্তকের মধ্যেও সেই বাসনাটি প্রতিফলিত। সেদিক থেকে একটি একটি প্রামাণিক দলিল একই অর্থে ব্যক্তিগত মানসতা ও মূল্যবন্ধ মননের অভিলেখাগার।

(১)

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লিখিত খাতার নামপত্রটি এইরকম : 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক ইহাতে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকলেই (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন) আপন আপন মনের ভাব চিন্তা স্মর্তব্য বিষয় ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন ইতি'। লেখকদের পক্ষে পালনীয় নিয়ম হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে তিনটি নিষেধ নির্দেশ করে দেন সেগুলি হল : ১। পেন্সিলে লেখা। ২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া। ৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কাগজে অথবা পুস্তকে ছাপানা।

প্রথম রচনা এবং গোড়ার দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত উপকরণ থেকে জানা যায় খাতার শুভ সূচনা হয় সত্যেন্দ্রনাথের বিলিতিলার বাড়িতে ১২৯৫ সালের ২১ কার্তিক বা ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ৫ নভেম্বর সোমবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে। অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে আরও জানা যায় অন্তত ১৩০২ সালের ৯ অগ্রহায়ণ বা ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের শেষ অবধি খাতায় লেখা চলতে থাকে। ১৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখার পর কোনো অজ্ঞাত কারণে উদ্যোক্তাগণ লেখা স্থগিত রাখেন অথবা তা বন্ধ করে দেন। তারপর আরো যে কয়েকটি লিখিত পৃষ্ঠা পাওয়া যায় সেগুলি মূল খাতার অনুক্রম নহে। বহু পরে সংযোজিত। এই অংশটিও পারিবারিক প্রসঙ্গ এবং স্মৃতিকথায় পরিপূর্ণ। যাহোক দীর্ঘকাল সযত্নে রক্ষা করার পর ইন্দিরা দেবী ২৭ নবেম্বর ১৯৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথের শুভ পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাঁর হাতে অর্পণ করেন এই খাতা। বর্তমানে এটি রয়েছে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে, পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৭২।

পাণ্ডুলিপির মূল অংশের বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা হারিয়ে গিয়েছে, এর পৃষ্ঠাঙ্ক ও রচনার ক্রমিক সংখ্যা থেকে সেটা বোঝা যাবে। প্রথম দিকে ক্রমিক সংখ্যা প্রয়োগ করা হলেও ১০৫ সংখ্যক

রচনার পর তা আর অনুসৃত হয়নি। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে রচনার সংখ্যা সহ শিরোনাম ব্যবহৃত। ১. ফিলোলজি, ২৩ হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা, ২৪ উল্লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য, ৬৩ ডায়ালগ : লিটারেচার, ৮৫ চুম্বন, ১০৫ সহজজ্ঞান ও সজ্ঞহনীতি—কতকটা এভাবে লেখা। অধিকাংশ রচনাই সাক্ষরিত, যেখানে তা নেই সেখানে হস্তলিপি দেখে রচয়িতার পরিচয় অনুমান করা সম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে বিজ্ঞাপিত হয়েছে স্থান ও তারিখ। এই দুটি সূত্র থেকে যেমন খাতার কালসীমা নির্ণয় করা যায় তেমনি জানা যায় বিভিন্ন সময়ে বিজিতলা পার্কস্ট্রিট উডস্ট্রিট জোড়াসাঁকো শিলাইদহ সাজাদপুর পতিসরের বাড়িতে খাতাটি স্থানান্তরিত হয়েছিল। এমনও হয়েছে, কোনো লেখা লেখকের অন্যত্র অবস্থানের কালে স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতে রচিত, পরে স্মৃতিলিপি পুস্তকে কপি করা। খাতার সংযোজিত অংশের যাবতীয় কিছু তো বটেই, মূলের বেশ কয়েকটি রচনাও এই ধরনের।

লিখেছেন অনেকেই। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল, আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথনাথ চৌধুরী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। মহিলাদের মধ্যে ছিলেন 'লাহোরিনী' শরৎকুমারী, 'কাচিৎ তত্ত্বজ্ঞানুসন্ধিৎসুনী', এবং সম্ভবত আরও কেউ কেউ। এঁরা সকলেই বৃহত্তর মহর্ষি পরিবারের অন্তর্গত, এঁরাই আবার সেকালের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। সুতরাং খাতাটির ভূমি পারিবারিক হলেও তার উল্লম্ব বিন্দুকে স্পর্শ করেছিল সারস্বত সমাজ নির্মাণের আকৃতি। অধিকন্তু এর পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে পারিবারিক নানা ঘটনা, লেখকদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, স্মৃতিকথা, আপন আপন মনের খেয়ালি চিন্তা ও কৌতূহলবহ অভিজ্ঞতা, পাশাপাশি স্থান লাভ করেছে ভাষা সাহিত্য সংগীত চিত্রদর্শন রাজনীতি সমাজ ধর্ম তথা মানবজীবন ও মানবিকী বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সীমাহীন কৌতূহল ও প্রগাঢ় প্রত্যয়। এক প্রান্তে যেমন রয়েছে লঘু হাস্য-পরিহাস, তেমনি অন্য সীমায় বিদ্যমান সমুন্নত গাম্ভীর্য, কখনো আবার উভয়েই সমন্বিত। ফলকথা জীবনের সমগ্র বিষয় না হোক, পরিবেশিত ভাবনার সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যটুকু রক্ষিত হয়েছিল।

রচনার ভাষা কখনো বাংলা, কখনো ইংরেজি, কখনো বা বাংলা ইংরেজির মিশ্রণ। দু-এক জায়গায় সাংকেতিক ভাষা ও চিহ্ন বা গাণিতিক বীজ প্রযুক্ত। কয়েকটি রচনা কখনো কখনোর রীতিতে লেখা, কোনোটি নোটের মতো সূত্রাকার।

পারিবারিক খাতার নামপত্র

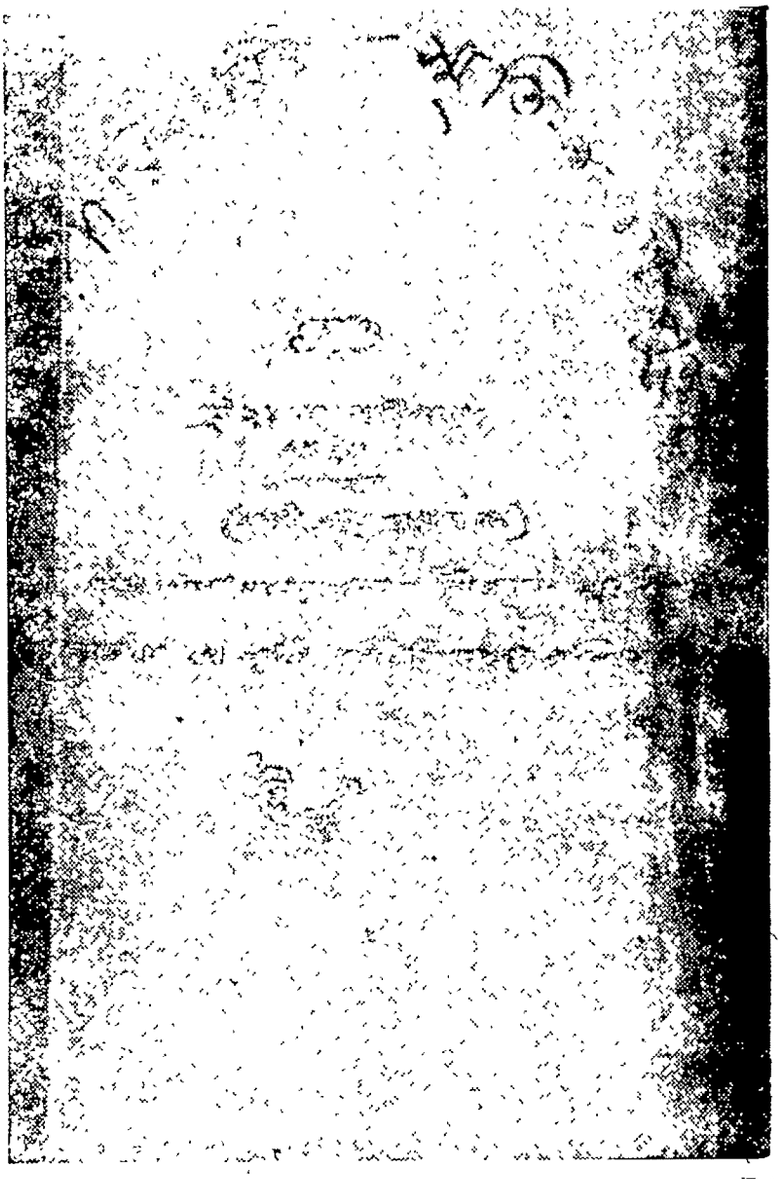

তবে বেশীর ভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধধর্মী। এক একটি আরার ধারাবাহিকভাবে লিখিত, স্থলবিশেষে সে রকম ঘোষণা থাকলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি। কোথাও মূলে রচনার উপর, বিশেষত রবীন্দ্র রচনা সম্পর্কে, মন্তব্য করেছেন অপরে, সকৌতুকে যোগ করেছেন বিচিত্র টীকা-টিপ্পনী, কোথাও আবার একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির জিজ্ঞাসা ও মতামত সৃষ্টি করেছে বিতর্কের বাতাবরণ। ফলে মূল রচনার প্রসঙ্গগুলি নানা দিক থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে, সুতরাং তার বিস্তারিত ঘটেছে, এবং সমাধানের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে জটিল বিষয়ের কুটিল পুরুষ। এযেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত ও পরিণত চিন্তার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়া, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূতের ডায়ারির মতো। পারিবারিক খাতার কয়েকটি রচনা তো পঞ্চভূত গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে ঈষৎ সংশোধিত আকারে। সেদিক থেকে এটি একটি খসড়া খাতা।

সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভারতীর সম্পাদকের বৈঠক (১২৮৪) নামক বিভাগটির আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছিল পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক (১২৮৮); এবং তার অনুসরণে সরলা দেবী সম্পাদিত পরবর্তী পর্যায়ের ভারতীতে প্রবর্তিত হয় খেয়াল খাতা (১৩১২)। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন পাণ্ডুলিপির নিষেধ অমান্য করে তার বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশ করা হয় এই খেয়াল খাতা বিভাগে। বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ তাই বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'আমাদের বাড়িতে একটা খাতা প্রচলিত ছিল তাহাতে আত্মীয়-বন্ধুরা যখন যাহা খুশি লিখিতেন। বেশ বুঝিতেই পারিতেছেন তেমন লেখায় সত্যও থাকে না রচনার সৌন্দর্যও থাকিতে পারে না' ইত্যাদি। কিন্তু খাতার আরও

কয়েকটি রবীন্দ্ররচনা ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল ভারতী ও বালক সাধনা মানসীর পাতায়। আবার পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো রচনার মার্জিত রূপ, কোনো কোনোটির উপাদান ও আইডিয়া অবলম্বনে নবনির্মিত রচনা য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি পঞ্চভূত প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ইতিমধ্যে। তাই এ সমস্ত লেখায় যে সত্য বা সৌন্দর্য ছিল না তা বলা চলে না। তবে প্রয়োজন ছিল সংশোধনের পরিমার্জনার। খেয়াল খাতায় মুদ্রণের পূর্বে তা করা হয়নি বলে রবীন্দ্রনাথের এই অসন্তোষ ও অভিযোগ। এর আভাস দিয়ে রবীন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থে ইন্দিরাদেবী বলেছেন, স্বর্ণকুমারীর স্বহস্তে লিখিত নিয়মাবলির মধ্যে ছাপার নিষেধটি পরে হয়তো রক্ষিত হয়নি। আর প্রকাশ করে ভালোই হয়েছে কারণ হাতের অক্ষরের চেয়ে ছাপার অক্ষর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। তাছাড়া এ লেখার সবগুলির না হোক অনেকগুলির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে।'

(২)

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকের চিন্তামূলক রচনাগুলি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। নিজস্ব পদ্ধতিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছেন প্রধানত দার্শনিক প্রবন্ধ। বিষয়ের সরলীকরণের উদ্দেশে ও তাকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার অভিপ্রায়ে তিনি প্রয়োগ করেছেন অঙ্কচিহ্ন ও গাণিতিক সমীকরণ, এবং কৌতুকরস উদাহরণের সাহায্যে বাংলা ইংরেজি মেশানো ভাষায় বিন্যাস করেছেন গুরুগম্ভীর সিদ্ধান্তসমূহ। দর্শন নামক প্রবন্ধটি বিষয়গৌরবে ও উপস্থাপনের কৌশলে বস্তুত তুলনাহীন। এর মধ্যে বিষয়ের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর নিজের আঁক্ষ মোমের নিষ্প্রাণ কিন্তু নিখুঁত শিখা ও ধাবমান পতঙ্গ, বন্ধ হরিণ ও অপেক্ষারত বাঘের ছবি, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ সময়াধীন ঘটনা বা পদার্থের অবস্থা ও রূপান্তর বোঝাতে পরিমেশিত হয়েছে একটি ছক। আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা সৌন্দর্য। এর উৎসে ছিল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও বল, লোকেন্দ্রনাথের বিউটি ইত্যাদি। সৌন্দর্য ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য, আর প্রতি মানুষের চিরন্তন আগ্রহ ও অনীহার দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ সাধারণভাবে সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে বিতর্কিত পুষ্পগুলির মতো গভীরে তিনি অনায়াসে প্রবেশ করেছেন এ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই শাখার অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট রচনা হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাজ ও খেলা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, সহজ জ্ঞান ও সহজনীতি, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও ধর্মনীতি অভিব্যক্তি সৌন্দর্য সম্বন্ধে নোটস্ বৈষ্ণবধর্ম লোকেন্দ্রনাথের এ্যাগনোসাটিসিজম্ ইত্যাদি।

সঙ্গীত সম্পর্কে লেখকদের সুগভীর ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীত, রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত, সুরেন্দ্রনাথের সংগীত, হারমনি ইত্যাদি রচনায়। কথা ও সুর লঘু হলেও অন্তত দুটি গানের কিছু অংশের স্বরলিপি পাওয়া যায় পারিবারিক খাতায়। শিক্ষার স্বরূপ, আবশ্যকতা ও তার প্রয়োগবিধি নিরূপণে প্রাগ্রসর মনের সন্ধান পাওয়া যায় লোকেন্দ্রনাথের এডুকেশন প্রবন্ধে। তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরীক্ষিত হয়েছে নৃতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব সমাজ বিজ্ঞানের প্রচলিত চিন্তা ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র নামক ধারাবাহিক রচনাটি এক্ষেত্রে এক অসামান্য সংযোজন। বিভিন্ন জাতির ও ব্যক্তির হস্তলিপি স্থাপত্য দেহাবয়ব দেখে তাদের চরিত্র ও মানসিকতা সন্ধান করেছেন বলেন্দ্রনাথ তাঁর অঙ্গুষ্ঠতত্ত্ব আর্কিটেকচার, ফ্রেনোলজি প্রবন্ধে। নৃত্যের প্রতি জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের আসক্তি ও বিরূপতার কারণ নির্দেশিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের নৃত্যপ্রিয়তা রচনাটিতে। চুম্বন প্রথা সম্পর্কেও একই উদ্যম লক্ষিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের দুটি লেখায়। সত্যেন্দ্রনাথের সামাজিক ও রবীন্দ্রনাথের চন্দননাথ বসুর পত্রোত্তরের মধ্যে সামাজিক প্রতিবেশ ও লোক জীবনের প্রেক্ষিত থেকে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে বিবাহবিধি ও বালবিবাহ। প্রসঙ্গত বলা যায়, হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সমতল ভূমির অধিবাসী বলে হিন্দুরা নিয়মতন্ত্রে শান্তে অত্যধিক বিশ্বাসী, তাদের ব্যক্তিতত্ত্ব তাই সংকুচিত, জলবায়ু ভৌগোলিক অবস্থা সামাজিক ব্যবস্থা ধর্ম নীতি প্রভৃতিও এই মানসিক পরাধীনতার মূলে। পর পক্ষ দুটি লেখায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর অবলম্বন ছিল বিভিন্ন প্রকার মানবগোষ্ঠীর উদাহরণ ও প্রখ্যাত মানববিজ্ঞানী সমাজ বিদের অভিমত। রবীন্দ্রনাথ যে শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমাদের সভ্যতার বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য নামক রচনাটিতে।

পাণ্ডুলিপির একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে ভাষা, বিশেষত বাংলা ভাষা বিষয়ক বহুমুখী আলোচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে লেখাটি দিয়ে এই খাতার সূচনা সেটা হল বাংলার ধ্বনি পরিবর্তন সংক্রান্ত সূত্র সংকেত। রবীন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথের প্রথম রচনা দুটিও ব্যাপক অর্থে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত। প্রমথ চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছেন, বানানে লেখকের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকবে না কেন? ইচ্ছাকৃত ভাবে আগাগোড়া ভুল বানানে লিখে গেছেন তিনি বানান ও অন্যান্য প্রশ্ন রচনাটি। নানা গোত্রের একাধিক শব্দ তালিকা প্রস্তুত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লিপি, ধ্বনি, বর্ণ অক্ষর, শব্দ ও তার অভিধা ব্যঞ্জনা, শব্দের সংগীতময়তা এবং চিত্রগুণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে বাংলার ঐশ্বর্য ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারিত হয়েছে বাংলা ভাষা ও বাঙালি চরিত্র, স্টেট্স্ এ্যাবাউট ফিলোলজি অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত নামক রবীন্দ্র রচনাবলিতে। বস্তুত তিনিই এ শাখারও সর্ব প্রধান লেখক। লেখক হিসেবে প্রতিনিয়ত যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সেগুলিই এখানে বিশ্লেষিত, ক্ষেত্র বিশেষে তার সমাধানও সন্ধান করা হয়েছে। পরিভাষা সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রোখো ও খেলো শব্দ, সিটিজেন ও নাগর শব্দ, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা এবং বলেন্দ্রনাথের ভাবনা ও চিন্তা, তর্জমা প্রবন্ধে। সংশ্লিষ্ট নোটস থেকে প্রমাণিত হয় এর প্রায় প্রতিটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গী ছিলেন লোকেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী।

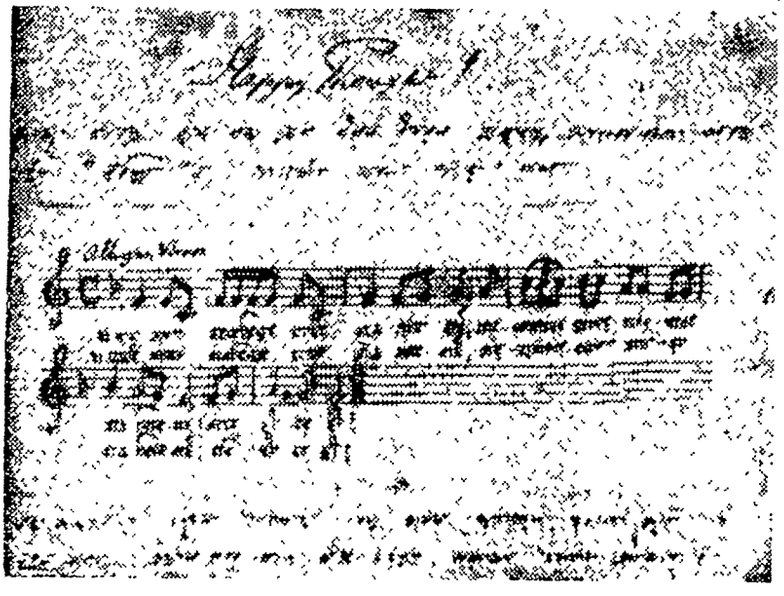

একটি কৌতুকগীতির স্বরলিপি

প্রকৃত পক্ষে ভাষা ও পরিভাষা বিচারের ব্যাপারে তাদের সতর্ক আগ্রহ ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। পরবর্তী কালে এক্ষেত্রে তারা যে নেতৃত্ব দান করবেন সেটা টের পাওয়া যায় রচনাগুলির সান্নিধ্যে এলে। স্মরণ করা যেতে পারে তখনও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠিত হয়নি, তার কথাবার্তা চলছে মাত্র।

পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব, পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব, ধর্মে ভয় কৃতজ্ঞতা ও প্রেম, কবিতার উপাদান রহস্য (মিসটি) আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব, সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের প্রভাব, আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব, সিভ্যালরি, সাহিত্য, বাংলা লেখা, বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি রচনার তত্ত্বগত ও শিল্পগত উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। নামহীন কয়েকটি রচনাও একই বিষয়ের অন্তর্গত। কোনো কোনো রচনা পঞ্চভূত সাহিত্য সমাজ প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, তবে বেশীর ভাগ এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। যা হোক ক্ষেত্র বিশেষে এদের বিষয়পুঞ্জ নিয়ে খাতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর চলেছিল দীর্ঘকাল। নন্দনতত্ত্বের পটভূমিকায় সাহিত্য শিল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথ প্রমথনাথ প্রভৃতি, খাতায় সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে কপি করে রাখা হয় ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরের আকারে। বক্তৃতার আচরণ মুদ্রণ দোষের বিবরণও বাদ যায় নি ফলে জীবন্ত হয়ে উঠেছে রচনাগুলি। এ ধরনের ঘরোয়া ভঙ্গির কথোপকথন শৈলীতে রচিত হয়েছে এ ডিসকাশন, ডায়ালগ, লিটারেচার ইত্যাদি। সদ্য প্রকাশিত রাজা ও রাণী সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি, বলেন্দ্রনাথের লেখা রবি কাকার কবিতা বিশিষ্ট রবীন্দ্রচর্চার নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। শেষোক্ত ব্যক্তির সুনাউল্লার গান শিলাইদহ অঞ্চলে পল্লীগীতির একটি মূল্যবান সংকলন।

কোনো কোনো লেখা লাভ করেছে সৃজনের বৈদ্যুত স্পর্শ। শরতের নির্মল নিরতিশয় আনন্দ ও উজ্জ্বলতায় আলোড়িত স্মৃতি, শৈশবের বিস্ময়মন্থিত প্রেক্ষায় বর্তমানের অতিনিয়মিত অকিঞ্চিৎকরত্বের বেদনা বাঙময় হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের শবৎকাল এবং ছেলেবেলাকার শবৎকালে। ইন্দুর রহস্যের বিশেষ পারিবারিক ঘটনা রূপান্তরিত হয়েছে নির্বিশেষ দার্শনিক প্রত্যয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কৌতুকের প্রস্রবণ। ঈষৎ সংশোধনে এটি পাওয়া যাবে পঞ্চভূতের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের শরিকে।

(৩)

নানান ধরনের ঘরোয়া প্রসঙ্গেরও আকর এই পাণ্ডুলিপি। একদিকে সুদীর্ঘ রচনায় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁদের জোসাঁকো বাড়ির ঐতিহ্য ও কীর্তির স্মৃতিচারণা করেছেন। কর্তাদাদা দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সংকলনের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন হিতেন্দ্রনাথ। অধ্যক্ষ সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা করার অনুরোধটুকু পালিত হয় নি বলে অনুযোগ করেছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ। বধি কাকার কবিতা এবং রাজা ও রাণী নাটক নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন যথাক্রমে বলেন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বে বাড়ির লোকজনদের মধ্যে যে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলেছিল, এমন কি সে সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী পর্যন্ত করা হয়েছিল তার সন্ধান পাওয়া যাবে খাতার গোড়ার দিকের রবিকাকার সন্তান নামক রচনায়। বলেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথের দুটি লেখা পড়ে বোঝা যায় তাঁদের একটি ভাইবোন সমিতি ছিল। খাতার বিবরণটুকু ছাড়া এ ব্যাপারে আর কোনো কথা আজ পর্যন্ত জানা যায় নি।

প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁদের একটি যৌথ রচনার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। একটি প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চুম্বনের রহস্য এবং এই প্রথা সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির মানুষের মনোভাব ও

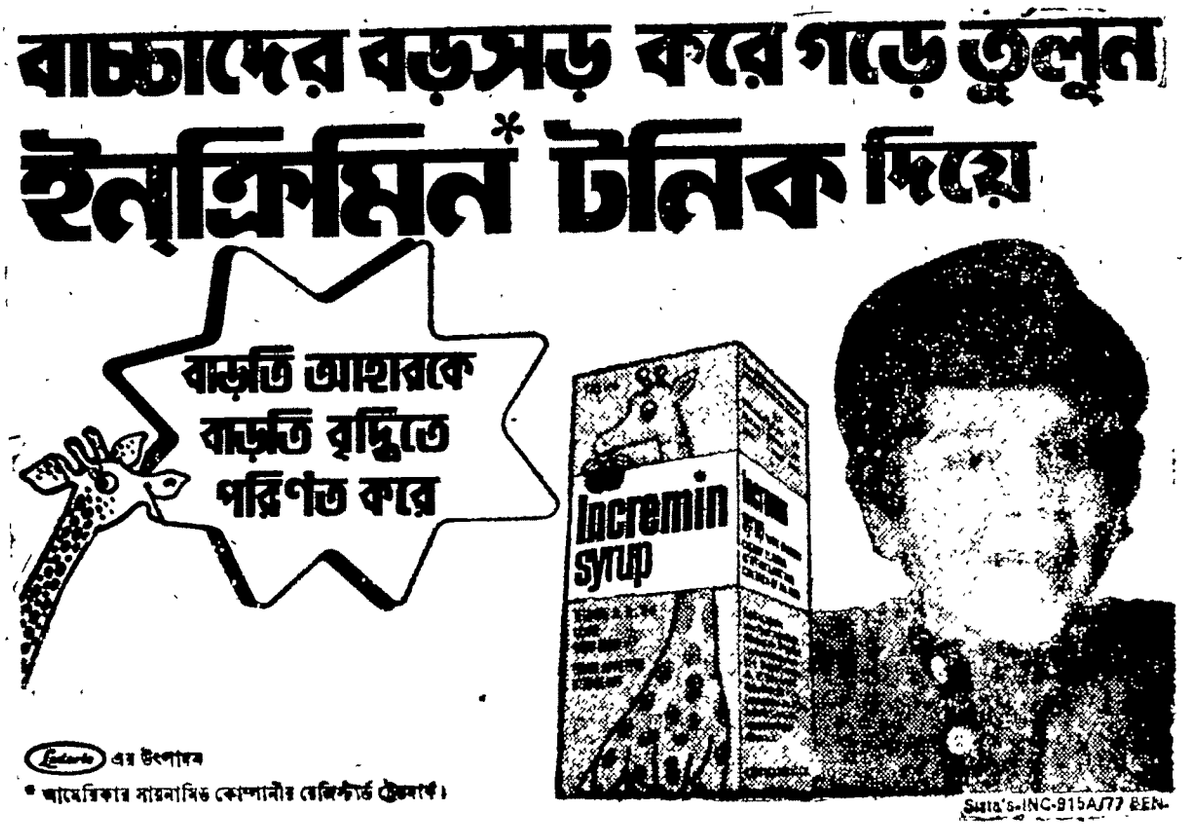

স্বাক্ষরিত রবীন্দ্র রচনা

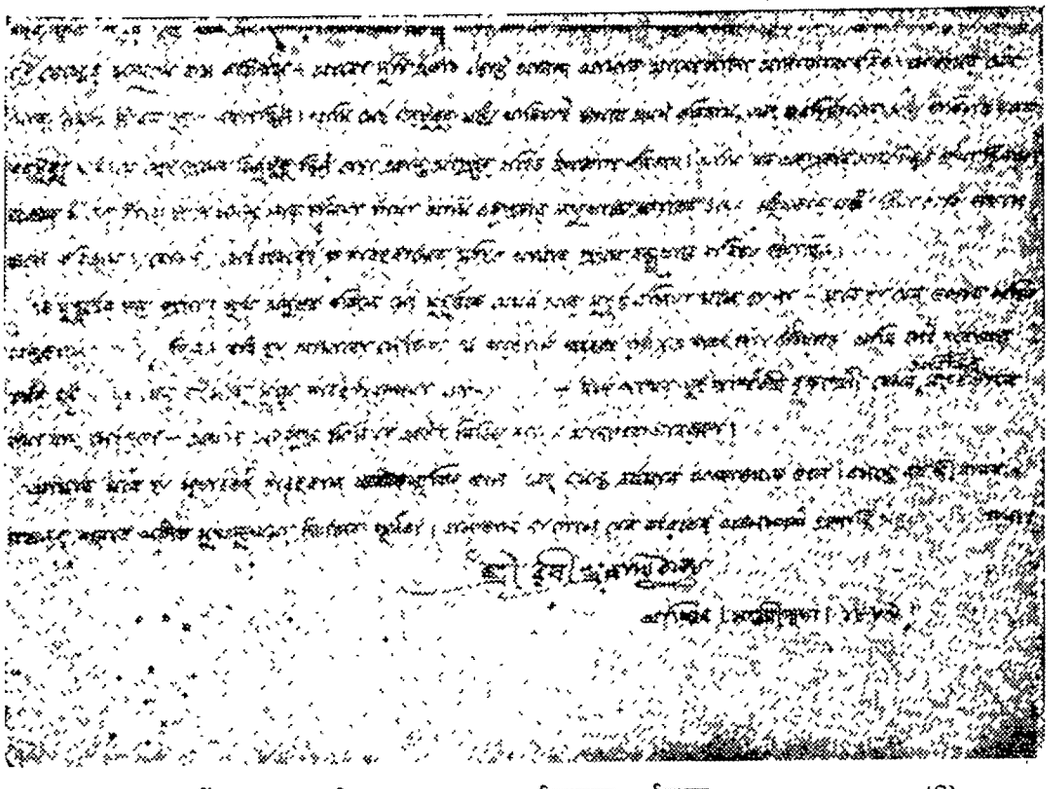

প্রবণতা ব্যাখ্যা করেন। তার ঠিক পরে মন্তব্যের আকারে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশন করলেন নিজের মতামত ও কিছু জিজ্ঞাসা। রচনাটি ক্ষুদ্র, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল :

> চুম্বন প্রথা কি কেবল আর্য জাতীয়দের মধ্যেই বদ্ধ নহে? সেমেটিক মোঙ্গলীয় প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে কি চুম্বন প্রচলিত আছে? আমরা মনেই করিতে পারি না হৃদয়ের মধ্যে স্নেহ প্রেমের উদ্রেক হইলে অধরের প্রতি অধরের আকর্ষণ না হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু উহা কি কতকটা স্বাভাবিক এবং কতকটা প্রথাগত নহে? মন্তদের মধ্যে, চুম্বন নাই—আঘ্রাণ, লেহন, গাত্রঘর্ষণ আছে। বানরী কি করিয়া আপন শাবকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে কেহ বলিতে পারেন?

আর এর পাশেই যেন উত্তর হিসেবে ছোটো হরফে সত্যেন্দ্রনাথ যোগ করেছেন, 'ওঠ্ উকুন বাছিবার স্থান কহিয়া'। লঘু গুরু বিষয়ের কি অপূর্ব শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান! বলা বাহুল্য এ প্রসঙ্গে এখানেই ইতি। মোটামুটি একই প্রকরণে লেখা হয় সাংখ্যদর্শন নামক প্রহেলিকা। গণিতের বীজ সংখ্যা সমীকরণের সূত্র ধরে পৌঁছতে হয় উৎসে। নিন্দার উপকার কি, হাতির সর্দি হয় না কেন, জ্যাঠা ছেলে ও আহ্লাদে ছেলের মধ্যে কে বেশী সহনীয়—এ রকম বিচিত্র প্রশ্ন এবং তার উদ্ভট উত্তর পাওয়া যাচ্ছে পারিবারিক খাতার মধ্যে। প্রমথ চৌধুরীর ধারণা, আহ্লাদে ছেলে বেশী অসহ্য।

গদ্য প্রবন্ধের মতো পদ্য কবিতায়ও দ্বিজেন্দ্রনাথ যে কতো সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের প্রতি প্রেরিত দ্বিজের আশীর্বাদে। কবিতাটি অন্য কেউ খাতায় কপি করে রেখেছেন। বহু পরে পুরবী কাব্যে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত শিলঙের চিঠি পাওয়া যাবে বর্তমান পাণ্ডুলিপিতেই। কবিতাটি অন্য কোথাও প্রথমে লেখা হয়েছিল, তার সংশ্লিষ্ট অংশ কেটে নিয়ে আঠা দিয়ে বসানো হয়েছে এই খাতার পাতার উপর। কৌতুক কবিতার মতো রয়েছে কিছু কৌতুক গীতি, কোথাও কোথাও তার স্বরলিপিও আছে 'প্রোফেসর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নূতন সেটমিক্সান পাম্প শু পরণোলক্ষ্যে' রচিত হয়েছিল একটি কবিতা, এটি সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীত 'তুমি কোন কাননের ফুল'-এর প্যারডি। 'মেঘ বলেছে, যাব যাব'-এরও প্যারডি লেখা হয়েছে। বস্তুত এগুলি নিতান্ত ঘরোয়া ও পারিবারিক প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্ররচনাকে ভিত্তি করে লেখা এ ধরনের কৌতুক কবিতা বা গানের আর একটির আরম্ভ এই রকম :

> 'কবিতার এই বর্ষাধারায় ধুইয়ে দাও।
> আপনাকে এই সরিয়ে রাখা
> বিদেশ থাকা ঘুচিয়ে দাও।
> যে জন আমার মাঝে লুকিয়ে
> আছে দুখের হালে
> আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
> তোমার কচি হাতের সোনার
> কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
> বিদেশ হতে কেবল চাওয়া
> তোমাদেরি চিঠি পাওয়া
> সেই পাওয়াটা ছন্দ দিয়ে ভরিয়ে দাও।

(৪)

পিতৃস্মৃতি এবং অন দি এজেস অব টাইম গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে রক্ষিত পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক বা ফ্যামিলি নোট বুকে 'যখন যার খেয়াল যেত যেমন খুশি তাতে লিখে রাখতেন'। এবং এভাবে লেখা হত কোনানডামস্, উইটি রিমার্কস্, ননসেন্স রাইমস্ অ্যান্ড অলসো ওয়ার্ডস অফ উইজডম দ্যাট অকার্ড টু দি মাইন্ডস্ অফ দোজ হু হেপনড টু বি প্রেজেন্ট। খাতাটি সম্বন্ধে প্রায় একই মন্তব্য করেছেন সকলেই। তবে ইন্দিরা দেবীর দেওয়া বিবরণে কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়। রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থে তিনি বলেছেন, -'আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল যেটি পূর্বোক্ত ভবানীপুরের বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি উঁচু ডেস্কের উপর শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত। তার মধ্যে রবিকাকার নিজের হাতে কতগুলি নিয়ম লেখা ছিল, যেমন তার কোনো রচনা বাইরে প্রকাশিত হবে না ইত্যাদি। এ রকম দুখানি খাতা পর পর ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রথমটি রথীর পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাকে উপহার দিই, এখন সেটি সযত্নে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে'।

[বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভবনের অনুমতিক্রমে যাবতীয় উপকরণ ব্যবহৃত]

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

শৈবাল মিত্র

মোতি এসেছিল বাবাকে দেখতে। বাবার শরীরের বাঁদিক পঙ্গু। হঠাৎ স্ট্রোক হল। দু মাস আগের ঘটনা।

গোটা তাঁতিপাড়া এখন নিঝুম। কেমন যেন আধমরা ভঙ্গী। সব সময়ে ঝিমোচ্ছে। মাঝে মাঝে ঠকর চ্যাং ঠকর চ্যাং শব্দ। কোন ঘরে তাঁত চলছে। এক সময় সারা দিন এই শব্দ চলে তাঁতিপাড়ায়। এই শব্দের সঙ্গে জেগে থাকবে তাঁতিপাড়ার জীবন। মা এসে দাঁড়ায়। রোগা ক্লান্ত চেহারা। মোতি কয়েকটা ওষুধ দেয়। বলে— ডাক্তারদা দিয়েছে। ওষুধগুলো হাতে নেয়। মাটির দেওয়ালে লাগান তাকে রাখে। কত দিনের পুরনো বাড়ী। দেওয়ালের মাটি ঝরছে। চালের খড় পাতলা। আর একটা বৃষ্টি সইবে না। মোতি ছোট ভাই-বোনগুলোকে খোঁজে। কেউ বাড়ী নেই। সারা দুপুর চরে বেড়াবে। যদি কোথাও ফাঁকতালে একটু খাবার মেলে। ইন্দু ফিরল পুকুরঘাট থেকে। ইন্দু আর সে পিঠোপিঠি ভাই-বোন। হাতে কয়েকটা মাজা বাসন। ভিজে কাপড়। মোতিকে দেখে আবছা হাসল। ইন্দুর বিয়ের বয়েস হয়েছে। কথাটা মোতির কয়েকবার মনে পড়ল। বাড়ীর বড় ছেলে সে। অনেক দায়দায়িত্ব তার। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। রান্নাঘরে মা

ভাত বাড়ছে। মোতি আজ বাড়ীতে খাবে। ভিড়ে কাপড় ছেড়ে ইন্দু আসে। বাবার পায়ের কাছে দাঁড়ায়। ইন্দুটা রোগা হয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর দেখতে ছিল। টানা-টানা চোখ। লম্বা ঘন চুল। মাজা শ্যামলা রঙ। অভাবে রূপ জ্বলে যায়।

ঘরের মধ্যে মাটিতে জলছড়া দিয়ে মা ভাত দেয়। মোতি খেতে বসে। হপ্তা-খানেক আগে শেষ বাড়ী এসেছিল। এখন ওর অনেক কাজ। ডাকতারের কাম্পাউন্ডারী করে। সেই সঙ্গে প্রচার চালায়। মাথার মধ্যে আগুন গনগন করে। দুনিয়াটাকে বদলাতে হবে। এদেশের মানুষ কুকুর-বেড়ালের মত বাঁচতে রাজি নয়। কাজ হচ্ছে। দু-দশ মাইল জুড়ে সাঁওতাল গাঁ। এখন সন্ধ্যের পর মাদলের তালে তালে সেখানে আরও এক উত্তেজনা ধিকি-ধিকি নাচে।

বিছানার সঙ্গে বাবা মিশে গেছে। রোগা, ফ্যাকাসে চেহারা। ওষুধ, পথ্যের অভাব। লড়াই-এ বাবা হেরে যাচ্ছে।

এই মানুষটার একদিন তাগড়াই চেহারা ছিল। মোষের মত খাটত। চোখে-মুখে ছড়িয়ে থাকত হাসি। বেশ সুখেই ছিল তখন। বাড়ীতে ভাই-বোন তখন ওরা চারজন। সারা দিন বাবা তাঁত বুনত। তাঁতের ওঠা-পড়ায় তৈরী হত কত রকমের জিনিস—গরদ, মটকা, তসর, মাসলাইট, বাফতা রেশম। তখনও সুতির গামছা, সুতির শাড়ি, বিছানার চাদর। কত নকসা, কত কারুকার্য। গাঁয়ের হাটগুলোতে কেনা-বেচা হত। বৃহস্পতিবার রাজনগর তো রবি-বার রাণীশ্বর। তার পর দিনেই আবার আসনবুগির হাট। হাটে দরাদরি বেশী। মালও খুব বিকোয় না। বেচা-কেনা জমত মেলায়। সোমবছরে মেলাও অনেক। বকেশ্বরে শিবরাত্রির মেলা শেষ হল। ওই রাস্তাতেই শুরু হল দাতাসাহেবের পাথর-চাপড়ি। জ্বরুর মেলা। ঠিক তারপরেই সিউড়ির বড়বাগানের মেলা। বছরে ওরকম আট-দশটা মেলা। বাবার সঙ্গে অনেকবার মোতি গেছে। কখনও বাসে। কখনও পায়ে হেঁটে। শীতের দুপুরে নির্জন পথঘাট। লাল মাটির উঁচুনীচু মাঠ। ফাকা, ধু-ধু করছে। বাবা পাশে থাকলেও তার গা ছমছম করত। ঠিক ভয় নয়। মনে হত, বাবা যদি মরে যায়। তাহলে কি করে তারা বাঁচবে। কে দেখবে তাদের। বাবা জোয়ান। তবু যে কেন এ রকম মনে হত কে জানে!

মোটগাঁঠ নিয়ে বাবা তৈরী। মা এসে দাঁড়াত। ইন্দু তখন বছর দশেক। পরের দুজন শিশু। চলতে-হাঁটতে শিখেছে। কলবল কথা বলে। মার হাত ধরে দাঁড়ায়। অবাক চোখে দেখে। মা বলত—কদ্দিন থেকে বলছি বাপু মুড়ি ভাজার হাতাটা ক্ষয়ে গেছে, ইটো দিয়ে আর চাল ওলান যায় না। রুটির তাওয়া একটা, আর বেশ লকতপারা ছোট একটা কাঁজরা। যদি সস্তায় মেলে তো একটা নারকেল কেরা আর একটা পায়ালাগা তালঘসা। একবার কিনলে অমর অক্ষয়, জীবনভোর চলবে। কাজের জিনিস পরের দোরে চাইতে আমার ভাল লাগে না। আর ভাঙ্গা মেলায় দেখো যদি একটা পঞ্চপ্রদীপ পাও, আর একটা পাথরের খোরা। সত্যনারানের পুজোঅর্চা। ও পাড়ার বামুনমাসী বলছিল....

বাবা বাধা দেয়—ও মোতির মা, তুমি দেখি রেলগাড়ী চালালে।

মা একটু থমকে যায়। বাবা হাসে। বলে—আনাব তো ইচছে। কিন্তু মনে থাকে না। তাবওপর বেচাকেনা আছে।

মোতি কিন্তু মার ফর্দ মনে রাখে। আমি লে আসব—সে এগিয়ে আসে।

মা বলে—ভুলিস না বাপ।

বাবা কোলে নেয় ইন্দুকে। জিজ্ঞেস করে—তোর কি চাই মা?

ইন্দু তৈরী ছিল। গড়গড় করে বলে—কাঁচের চুড়ি, চুলের কিলপ। তরল আলতা।

বাবা মেয়েকে বুকে চেপে ধরে। তার-পর মাকে বলে—গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে চতুর্দশীর পর একদিন মেলায় যেও। তখন ভিড় পাতলা হবে। আমার হাতেও পয়সা আসবে। পছন্দমত তোমরা কিনতে পাববে।

মা নকল রাগে বলে—ভাঙ্গা মেলায় যাব কেনে? তখন তো যত ঝড়তি-পড়তি মাল। ওই যে সিবার বড়বাগান থিকে নিয়ে এলে তেরো সিকের হেঁড়িকেল, তেরো দিনও জ্বললে না।

বাবা অসহায় চোখে তাকায়। চড়লা লাল পাড় শাড়ির আড়ালে মা মুচকি হাসে। মোতি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে। ঘরেব বাইরে ইন্দুর পায়েব শব্দ। মোতি ডাকে। পাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এগুলো খেয়ে নে—ইন্দুকে বলে। তখনও পাতে কিছু ভাত, তরকারি রয়েছে। মা ঘরে ঢোকে। ইন্দু কিছুতেই যাবে না। মা কথা বলে না। মোতি জবরদস্তি ইন্দুকে বসিয়ে দেয়।

পুরনো দিনগুলো কত ভাল ছিল। সেই মেলা, উৎসব, সুমধুর স্মৃতি ওকে খোঁচায়।

খাওয়া শেষ হলে মোতি বাপের পাশে গিয়ে বসে। অনেক দূরে তরণী পাহাড়। দুপুর রোদে থমথম করছে লাল মাটি, ফাঁকা মাঠ। ছেলেবেলায় ওই পাহাড়টা ছিল রূপকথার দেশ, গল্প আর রোমান্সের কারখানা। এখন হপ্তায় দু-তিনবার যেতে হয়। কিশোরদা ধরা পড়ার পর থেকে কাজ বেড়েছে।

বাবা পাশ ফিরে শোয়। মোতি সাহায্য করে। উঠোনে ছায়া নামছে। ফাঁকা তাঁত ঘরটা দেখা যায়। পা রাখাব হাঁ মুখটা জেগে আছে। তাঁতটা সবে যেন বিকৃী হয়ে গেছে। সে তখন কলকাতায়।

বাবার সঙ্গে লেগে থাকলে হয়ত এসব হত না। তাঁত চালাত, সংসার থাকত। কিন্তু সব ঘরেই তো এই হাল। বাড়ীর ছেলেরা হাত লাগিয়েও বাপ-পিতামোর ব্যবসা বাঁচাতে পারে নি।

সে নিজেও বাপের সঙ্গে ছিল কয়েক বছর।

ভাদ্র মাস পড়লেই তখন তাঁতি-পাড়ায় সাজ-সাজ রব। কাঁচা মাল তুলতে হবে। চার-পাঁচ গাঁয়ের তাঁতিরা আসত চণ্ডীমণ্ডপে। মরসুমের কাজ শুরু হত। ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে বিশ-পঁচিশজন বেরিয়ে পড়ত মহল্লা ছেড়ে। সাঁওতাল-পাড়ায় ঘুরত গুটিপোকা আর তসরের খোঁজে। হাজারিবাগের পাহাড় আর জঙ্গলে জামবুনির জঙ্গলে, যদুগোড়ার পাথুরে এলাকায়। চার-পাঁচ জনের ছোট ছোট দল। সব দলেই একজন পুরনো, অভিজ্ঞ মানুষ দলপতি।

হাজারিবাগের ছোট ছোট পাহাড় জঙ্গলের মাঝে মাঝে আদিবাসী পাহাড়িয়া-দের গ্রাম। দু মাইল-আড়াই মাইল অন্তর বসতি। ওরাই তসর ..পোকার চাষ করে। তসরের গুটিকে বলে পোকলু। তসর-চাষীদের নাম পোকলেখাপী। তাঁতিদের পথ চেয়ে থাকে পোকলেখাপীরা। আদর করে বাড়ীতে, গাঁয়ে জায়গা দেয়। তসর চাষ নিয়ে গল্প-গুজব, আলোচনা চলে। একটা ভালবাসার সম্পর্কও ছিল। মোতির মনে আছে, কদিন কি সুখেই না কাটত। সব পোকলু বস্তাবন্দী না হওয়া পর্যন্ত তাঁতিদের থাকা খাওয়ার সব দায়িত্ব ওদের। যেন ভিনদেশী কুটুম এসেছে। যদুগোড়াতেও সেই খাতির। ওখানকার সাঁওতাল আদিবাসীরা তসরকে বলে লুমাঁগ। পণ হিসেবে দরদাম হয়। আঠার পণে এক খাড়ি। এ রকম শ-শ খাড়ি বস্তা ভর্তি হয়। সারা বছরের সম্বল। হাজার মানুষের প্রাণভোমরা আছে এই লুমাঁগ আসুলির মধ্যে।

গাঁয়ে ফিরে হত হিসেব-নিকাশ। তাঁতিরা দরকার মত গুটি ভাগ করে নিত। দামের সঙ্গে জুড়ত গুটি কেনার খরচ।

বিছানায় শুয়ে থাকা ফ্যাকাসে লোকটা ওর বাবা। জাত শিল্পী। তাঁতি মহলে অবিনাশ কুণ্ডুর এক দিন সুনাম ছিল। খাটতেও পারত খুব।

আরও কিছু পুঁজি থাকলে বেশ হত, আরও কাহন দশেক তসর কিনতুম। মা অাঁতকে উঠত—সকাল থেকে সাঁঝ তক্কো তো তাঁতশালেই তাঁত ঠুকছো, দশ কাহন তসর আবার বুনবে কখন শুনি। এই ভাল বাপু।

তোমার কি আক্কেল মোতির মা। সংসার বড় হচ্ছে না। জিনিসপত্তের দর-দাম মারডা হচছে। মোতি বড় হচছে। ও কি আর পারবে না। দুটো মানুষ থাকলে সাত দিনেই একটা থান বুনা যাবেক। মা তাকাত মোতির দিকে। মুখে স্নেহ, হাসি। বলত—কথাটা মন্দ বলো নাই। আমার শাঙ্কাবান্দা জোড়া বন্দক রাখ, না হয় বেচে দাও। ঐ রেখেই বা কি লাভ।

অবিনাশ হাঁ হাঁ করত। ও দুটো বিকৃী করার দরকার নেই। দেখা যাক অন্য কি ব্যবস্থা হয়।

মা চলে যেত। বলত—উনুনের কয়লাগুলান পুড়ছে। বাই হাঁড়িটা বসিয়ে দিগা। অবিনাশ ঢুকত তাঁতশালায়। তাঁত-

পাড়ার দু পা হাঁটু আঁদ্দি ঢুকিয়ে ঢুকিকে কাজ শুরু হত। ঘটাক চঙ, ঘটাক চঙ। মোতি থাকত বাপের পেছনে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গোটা পাড়া কয়েক শো তাঁতের শব্দের ছন্দে দুলত। বোঝা যেত, এরা বেঁচে আছে।

তখনও বাজারে এত টেরিকটন, টেরিলিন, স্টেচ, ক্রেপ ইজিপসিয়ান কটন, টেরিলাইজড, নাইলন আসে নি। বিয়ে, পৈতে এবং আরও অনেক অনুষ্ঠানে তসর, গরদ না হলে চলে না। দিন বদলাল। টাকার দাম কমে ছ আনা হল। সেই সঙ্গে বাড়ল জিনিসপত্তের দাম। তসব পোকার দাম বাড়ল। তসরের কাপড় সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। মিলের কাপড়, সার্টিং, সার্টিং-এ বাজার ভেসে গেল। লোক ছুটল নতুনের পেছনে। সস্তায়, টেঁকসই জিনিস চাই। তার ওপর কত নকসা, কত রঙ। পরে আরাম। তসর চাদরের জায়গা নিল কাশ্মীরী শাল, জামিয়ার।

মা ঘরে ঢোকে। তু এবার যা-বলে। মায়ের দুটো হাত সবু হয়ে গেছে। দু হাত খালি।

মোতি দাঁড়ায়। পাঁচটা টাকা দেয় মাকে। দূরে ছোট ভাই-বোনদের গলা।

মায়ের হাতের সোনা বাঁধন শাঁখা-জোড়া কবে যে চলে গেল, মোতির খেয়াল নেই। গরু-বাছুর বিক্রীর কথা তার মনে আছে। উঠানের লাউ মাচা শুকিয়ে যাচ্ছে। সিম, বরবটির গাছ ওঠে নি তখন।

বাবা হাল ছাড়ে নি। ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে দাতসাহেবের মেলায়। তসরের থান, শাড়ি সাজিয়ে বসছে। তখনও কত নকসা, কত রঙ। এই রঙ আর কারু-কাজের নেশায় বাবা তখনও মশগুল। সাজান জিনিসে ধুলোর সর পড়ে। বাবা ফুঁ দেয়। ঝাড়ন লাগায়। হাতে বোনা থান, শাড়ি ছেলে-মেয়ের চেয়ে কম কি।

লোকে হাত দিয়ে দেখে। দাম শুনে হাসে। ঠাট্টা-মস্করা করে। বাবা অপমানে লাল। মোতির রাগ হয়। লোকগুলো কি বোকা। তসব চেনে না। ডাবা তসর, মুগা তসর, বাফতা, শাড়িয়ান। মিলের কাপড়, সিনথেটিক হু-হু করে বিক্রী হয়। ওদের দোকানে কেউ ঘেঁসে না। মোতির মাঝে মাঝে অসহ্য রাগ হয়। ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। তার ওপর, কোথায় যে সে আক্রোশ মেটাবে ভেবে পায় না।

বাবাকে আগাদা দেয় — চল, বাড়ি ফিরি। অবিনাশও ভাঙ্গা মেলা পর্যন্ত থাকে না। সেও যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ওরা বাড়ি ফেরে। ঝড়ো কাকের মত চেহারা। মুখ শুকনো। চোখ ঢুকে গেছে। হলদে ধুলোয় শরীর ঢাকা। মা কাপড়ের গাঁটখানা দেখেই সব বোঝে। কথা বলে না। বাবা দুম করে দাওয়ার ওপর বস্তাটা রাখে। চেঁচায়, ইন্দু, ইন্দু কোথা গেলি। মা মদত দেয় ও মুখপুড়ি, ভুরু ঘাবাকে জল দে যা।

ইন্দু মুখচোরা, ভীতু। জল আনে। ভয় পায়। সব কিছু বদলে যাচ্ছে। সকলের মন-মেজাজ কড়া? মারমুখী। তার কি অপরাধ সে বোঝে না। অবাক হয়। ভাবে মেয়ে হলে এসব ভোগ আছে।

মোতি দাঁড়ায় না। পুকুর ঘাটে হাত-মুখ ধোয়। মুখে হাতে ঠাণ্ডা জল লাগাতে আরাম হয়। আজকাল তার বাবা ওপর রাগ হয়। কি দরকার বৃথা মেনতের। এই সব শিল্পকর্ম ধুয়ে কি জল খাবে। জলের তলায় ও পা ছোঁড়ে। জল কাঁপে। শেষ বিকেলের মরা আলো। মোতি ঠিক করে, আর এখানে নয়। পনেরো বছর বয়েস হয়েছে তার। সংসারের জন্যে কিছু করা দরকার।

সাধু আসছে জল নিতে। দিবাকর ফাকার মেয়ে, কোমরে পেতলের ঘড়া। মোতি যেন ওর জন্যেই দাঁড়িয়েছিল। সাধুকে দেখে ওর বুক কলসীর জলের মত ছলাৎ ছলাৎ করে। সাধুকে রেখে সে কোথায় যাবে। ভাবতে কান্না পায়। বয়েসটা তার আর দু-চার বছর বেশী হলে সে ভাবত না। ঝাঁপিয়ে পড়ত। অবিনাশেরও বিয়ে হয়েছিল আঠার বছর বয়েসে।

সাধু ঘাটে নামে। মোতির দিকে তাকায় না। ঘড়া দিয়ে ঘাটের জল দূরে সরিয়ে দেয়। খালি ঘড়া দুলতে থাকে। সাধুকে আনমনা দেখায়। আজ সে ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়ায় না। হাসিঠাট্টা করে না। এক রাশ ঘন কাল চুলে খোঁপা ভাঙ্গা-গড়ার খেলা দেখায় না। বড় অচেনা লাগে।

মোতি জল ছিটোয়। সাধুর গায়ে লাগে। সাধু ঝগড়া করে না। ঘড়ায় জল ঢুকছে। গুর গুর শব্দ। ভর্তি ঘড়া কোমরে নিয়ে সাধু জল ছেড়ে ওঠে। দুটো সিঁড়ি ভেঙ্গে থমকে দাঁড়ায়। বলে— আমার বিয়ে। তারপর তাড়াতাড়ি উঠতে থাকে। জল চলকে পড়ে। ওর কোমর, শাড়ি ভেজে। শুকনো সিঁড়ি জলে থৈ-থৈ। মোতির মাথার মধ্যে পুকুরটা দুলতে থাকে। কে যেন তার মাথায় পা ঢুকিয়ে ঘিলুর মধ্যে ঢেউ তুলছে। ভিজে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বুকটা সনসন করে। অন্য দিন সাধুর এক ফোঁটা জলও পড়ে না।

রাতে ঘুম হয় না। মোতির বুক আনচান করে। দুদিন বাদে বড়বাগানের মেলা। বাবার-খাওয়ার ইচ্ছে নেই। মোতি খোঁচাচ্ছিল। এখন তার কোনো উৎসাহ নেই। চুলোয় যাক মেলা, তাঁত, তসর। ঝুপ করে দেওয়ালের মাটি ভেঙ্গে পড়ে। নিকষ অন্ধকার। মোতি চোখ বোজে। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখে। ঠাকুর্দা তাঁতে বসেছে। রাশি রাশি সোনালী তসরের থান। মা, ঠাকুমা নাচায় সুতো গুটোচ্ছে। খটাক্ চং ঘটাক্ চং শব্দ। একটা শব্দের স্রোত কতোকাল ধরে যেন ভেসে চলেছে।

সকালে মা সত্যনারায়ণ পুজোর কথা তোলে। বাবা খেঁকিয়ে ওঠে—সাধ্যে তোমার সত্যনারায়ণ। ও নাড়ুগোপালের ভোগ আমি আর জোটাবো না। একদিন টান মেরে ফুলতুসি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

দেওয়ালে অনেকগুলো ঠাকুর দেবতার ছবি। কালী, চন্ডী, শিব, রামকৃষ্ণ, যীশু-খৃষ্ট। মেলা থেকে কেনা। পাশাপাশি ঝুলছে। হাওয়ায় দোলে।

মা সাড়া করে না। ভয়ে কাঁপে। ভারী পেট। মুখে গভীর আতঙ্কের ছাপ। মায়ের পৃথিবীটা যেন ভেঙ্গে যাবে।

মোতির গলায় একটা কান্না দলা পাকায়। কিন্তু চোখ ভেজে না। জ্বলতে থাকে। সে রাতেই ও ঠিক করে শহরে পালাবে। বড়োবাগানের মেলা সেরে ও আর বাড়ী ফিরবে না। বাবার চোখে ধুলো দিয়ে সরে যাবে। এতো কষ্ট চোখে দেখা যায় না। এক উষ্ণ কষ্ট ওর বুকে পাক খায়। অন্ধকারে মুখ গুঁজে গোটা রাত তখন ঝিমোচ্ছে।

বাইরে ছায়া নামে। মা ধাক্কা দেয়— মোতি ওঠ্। মোতির ঝিমুনি এসেছিল। ও সজাগ হয়। উঠে দাঁড়ায়। বাইরের দাওয়ায় ভাই-বোনদের গলার শব্দ। বাবা ঘুমোচ্ছে। ঠোঁট উপচে লাল পড়ছে। ময়লা বিছানা। তেল চটচটে বালিশ। দ্বিতীয় দফার স্ট্রোক হলো মাস ছয়েক আগে। এখন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে

আকাশে আলো মরে আসছে। বাইরে ঝুপসাপ পায়ের শব্দ। বাঁশবাগানের ভেতর দিয়ে, কারা যেন আসছে। মোতি কান খাড়া করে। বাড়ীতে আজ কারো আসার কথা নয়। আত্মীয় কুটুমরা সন্ধ্যে দিয়ে আসে। মোতি একটু ঘাবড়ায়। খিড়কির দিক থেকে কে যেন ওর নাম ধরে ডাকে। মোতি ছুটে যায়। দেখে লখাই আর বুধন। ওদের পেছনে একটা কুকুর।

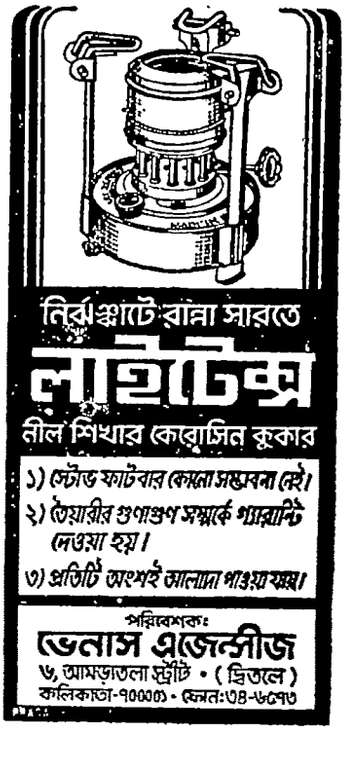

আফিসে শেষ দিনটা কিশোরের মনে পড়ে।

চিঠিটা পড়ে হরিপদবাবু ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে আছে। বেশ ঘাবড়েছে। মাথার ওপর ফ্যানের চক্কোর। হরিপদবাবুর দু আঙুলের ফাঁকে কাগজটা তিরতির কাঁপে। ঘরটা ফাঁকা, চশমার মোটা কাঁচের আড়ালে হরিপদবাবুর দুটো ফ্যাকাসে চোখ। কিশোরকে দেখছে।

ওর অস্বস্তি হচ্ছিল।

যাই—কিশোর বলে।

ভদ্রলোকের চমক ভাঙ্গল। নড়েচড়ে বসল। চিঠিটা ভাঁজ করে পেপার ওয়েটের তলায় রাখল।

হরিপদবাবু ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পি-এ। ছোট্ট ঘরে একা বসে। সামনের টেবিলে একটা রেমিংটন টাইপরাইটার। রোলারের মধ্যে আধখানা টাইপ-করা একটা কাগজ। হরিপদবাবু কেসে গলা সাফ করল।

স্ট্রোর চান্স—জানতে চাইল।

তেমন কিছু নয়। কিশোর আবছা হাসে।

তবে? কিশোরকে খুঁটিয়ে দেখে সে। কিশোর চুপ।

হরিপদর মুখে একটা অসহায় ভঙ্গী। ভাল করে ভেবেছো, জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ।

আরও দিন সাতেক সময় নাও। চাকরিতে রিজাইন তুমি যখন খুশি করতে পার।

আর কিছু ভাবার নেই—কিশোর জানায়—প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি চাই।

হরিপদ কথা বাড়ায় না। দু হাত ছড়িয়ে দেয় টেবিলের ওপর। বলে—সাহেবকে জানাব। চোখ বুজে ও যেন কি ভুলতে চায়।

কিশোরের মায়া হয়। ভদ্রলোক তার বাবার বয়েসী। ভাল মানুষ। কিশোরকে পছন্দ করত। কানা-ঘুষোয় শুনেছে, হরিপদর তাকে জামাই করার ইচ্ছে।

কিশোরের পাকা চাকরি। এই বয়েসে এ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার হয়েছে। ভদ্রলোক প্রস্তাব এখনও পাড়ে নি। দুঃখ পেয়েছে।

বাইরে পুরোদমে কাজ চলছে। খদ্দের-দের ভিড়। নানা কথার টুকরো বন্ধ দরজা ফুঁড়ে ঘরে ঢোকে। আবছা শোনায়। আর দেরি করার সময় নেই। দরজা ঠেলে বাইরে আসে। হরিপদবাবু তখনও চোখ খোলে নি।

ঘরের বাইরে এসে ও হাঁফ ছাড়ে। বেজায় ভিড়। জোর কদমে টাকা লেনদেন হচ্ছে। অজিত দাঁড়িয়েছিল। তাকে নিয়ে কিশোর দোতলার ক্যান্টিনে যায়। চা আসে। অনেক দিন পর কিশোর ক্যান্টিনে ঢুকলো। মোতি যাওয়ার পর থেকে ক্যান্টিনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

মোতি ছিল ওখানকার বয়। এক মাস আগে চাকরি ছেড়েছে। মোতি এই অফিসের প্রথম বিপ্লবী, যে চাকরি ছেড়ে গ্রামে গেছে। ও পথ দেখিয়েছে। ওর ডেরাতেই কিশোর আর অজিত উঠবে।

নীচে মানুষজন হায়-আসে। ব্যাঙ্ক চলেছে। গত সাত দিন কিশোর ছুটিতে ছিল। বিদ্যুৎ বসছে ওর চেয়ারে। সব কিছু সহজ, স্বাভাবিক। জীবন চলছে। ব্যাঙ্ক চলছে। পৃথিবীতে কারও জন্যে কিছু আটকায় না। হারুদার গলার শব্দে তপু সজাগ হয়। লোকটার কাশি হয়েছে। চটের আড়াল দেওয়া রান্নাঘর। ওপাশে হরুদা আটা মাখছে। খক-খুক কাশছে।

পুরোন দিনগুলো কেন এখনও মনে পড়ে, কিশোর ভেবে পায় না। সময়ের স্রোতে বেবাক ভেসে যাওয়া খড়কুটো যেন। আবছা তন্দ্রার আকাশে এক ঝাঁক ধূসর পাখির মত উড়ে বেড়ায়।

ভোরবেলায় কিশোর কলকাতায় পৌঁছেছে। রাস্তায় তখনও ভিড় কম। ছেঁড়া কুয়াশা ঝুলছিল। গঙ্গার ঘোলা জল স্থির। স্টেশন থেকে সোজা এসেছে হারুদার ঘরে। হারুদার দরজা সব সময়ে খোলা। হারুদা ঘরে ছিল না। ভেজান টিনের দরজা। পুরোন, ময়লা ধুতি ঝুলছে দরজার ওপর।

ধুতিটা সরাতেই নজরে পড়লো হারুদার নোটিশ। গোটা গোটা চকখড়ির হরফ—রেশন দোকানে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবো।

কিশোর খুশী হয়। কাপড়টা ঝুলিয়ে দেয়। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে।

ঘরটা দোতলার ওপর। মেঝেতে খরখরে সিমেন্ট। তক্তাপোষে ময়লা, চিটচিটে বিছানা। ধুলো নোংরা ভর্তি। কয়েকটা কাঁচের বড়ো জার, কাঁচের বিকার। ঝুলঝুলে চটে ঘরটা দু ভাগ করা।

জানলায় পাল্লা নেই। শুধু লোহার শিক। বাড়ীটা নতুন। কিন্তু সবটা তৈরী হয় নি। গত দশ বছর এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ওপর জানলা। জানলায় দু পাশের ফ্রেমে দুটো ছোটো আয়না লাগানো। দু মুখো গলির যাবতীয় মানুষকে বিছানায় শুয়েই দেখা যায়। হারুদা সতর্ক লোক। রাস্তার নজর রাখার জন্যে এই কল বানিয়েছে। দু ভাই-এর বাড়ী। ওর ভাগে এই ঘরটা পড়েছে। কয়েক ঘর ভাড়াটেও আছে। বাড়ীর মধ্যে লোকজনের কথা, জলের শব্দ শোনা যায়।

হারুদার বিছানায় কিশোর সটান শুয়ে পড়ে। নোনা, ঘামের গন্ধ। একটু তন্দ্রা এসেছিল। হারুদার পায়ের শব্দে ছুটে যায়।

ওকে দেখে হারুদা অবাক। ফর্সা, গোলগাল চেহারা। মাথা ভর্তি টাক। শরীরে লুঙ্গি আর হাফশার্ট। এক লহমা তাকিয়ে হারুদা হাসে—কি ব্যাপার? কোথা থেকে—নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে। উত্তরের জন্যে দাঁড়ায় না। চটের আড়ালে যায়। জামা খুলে দড়িতে রাখে। হারুদা গায়ে জামা রাখতে পারে না। জামা পরলে ওর সুড়সুড়ি লাগে। চা খাবে—জানতে চায়।

কিশোর বলে, হ্যাঁ।

হারুদা বিকার ভর্তি চা দিল। দুধ নেই। কালো চা। খুব জম্পেশ করে ও চা খেলো। এই বিকারগুলো অনেক দিন এ ঘরে আছে। কিশোর প্রথম দিন থেকেই দেখছে। হারুদার বাবার কেমিক্যালের ছোটো কারখানা ছিল। ভদ্রলোক মারা যাওয়ার পর কারখানা উঠে গেছে। তাঁর ছয় ছেলের কেউ ব্যবসাতে বসে নি। বাড়ীটাও ভদ্রলোক শুরু করেছিলেন। শেষ করার সময় পান নি।

হারুদা বলে—ভালো হয়েছে। ইনকমপ্লিট বাড়ীর ট্যাক্স কম।

হারুদা বিয়ে করে নি। ভাই দাদারা সকলেই একটু খ্যাপাটে। যে যার নিজের ধান্দায় আছে। বড়ো ভাই থাকে হারুদার ঠিক সামনের ঘরে। সপ্তা দিন অন্তর করে। তার ঘরেও টিনের দরজা। দরজার ওপর থার্মোডায়ানামিক্সের তৃতীয় সূত্র নীল খড়িতে লেখা—প্রকৃতির টানাপোড়েন কখনও কমে না। অবস্থা স্বাভাবিক রাখলে সেটা স্থিতাবস্থায় থাকে। তলায় একটা কঠিন অঙ্ক।

কিশোরের মাথায় এ-সব তত্ত্ব ঢোকে না। ধোঁয়াটে লাগে।

হারুদার সঙ্গে সময় কাটাতে ওর অসুবিধে হয় না। হারুদাই একনাগাড়ে কথা বলে। ও কিছু শোনে, কিছু শোনে না। হারুদা খেয়াল করে না। মেজদা আজ দু মাস বাড়ী নেই। ভুবো জাহাজের খোঁজে বেরিয়েছে। উনিশশো সাতান্নয় ত্রিবেণীর কাছে একটা জাহাজডুবি হয়েছিলো। জাহাজ কোম্পানী সেটা তুলতে পারে নি। সামনের মাসে নীলাম। মেজদা দর দেবে।

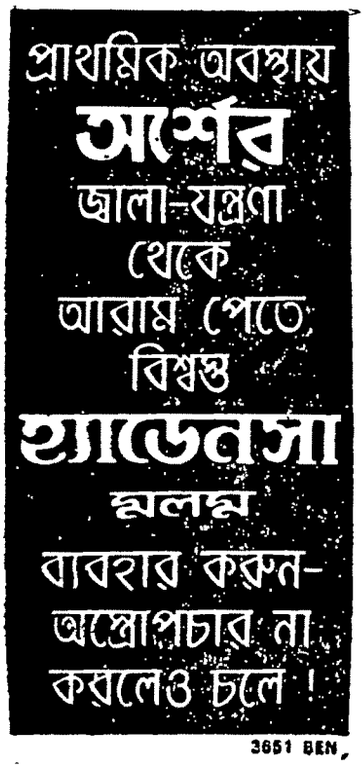

ভালো দাঁও। জাহাজ ভর্তি তামার বার আছে। হাবুদার মেজদাকে ও চেনে। পাড়ার লোক। গত বিশ বছর ধরে একটা তাগড়াই সুযোগ খুঁজছে।

বছর তিনেক আগে বোটানিকাল গার্ডেনের কাছে ঠিক দুপুরে একবার দেখা হয়েছিল। বি-ই কলেজ থেকে কিশোর ফিরছিল। গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে যাবে। জায়গাটা নির্জন, চুপচাপ। ডাঙার সমান। ধার ঘেঁসে লম্বা, ঝাঁকড়া গাছ। অল্প হাওয়া ছিল।

হঠাৎ ও দেখলো মেজদাকে। কাদার কাছে একা দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কয়েক টুকরো খোলামকুচি। টুপ করে একটা টুকরো জলে পড়লো। ঘোলা স্থির জল সামান্য কাঁপে। ছিটকে ওঠে। দু-একটা বুদবুদ জাগে।

কিশোর গলায় শব্দ করে। মেজদা চমকে ওঠে। কিশোরকে দেখে। চোখমুখ সহজ হয়। এগিয়ে আসে। চাপা গলায় বলে—উনিশশো. তেষট্টিতে সেন্ট্রাল ইন্‌ল্যান্ড কোম্পানীর একটা লঞ্চ এখানে ডুবেছিল। নাম মধুকর। চাটগাঁ থেকে আসছিল। লঞ্চে ছিল একশো বস্তা স্টেনলেস স্টীলের বাসন। কোম্পানী নামকা ওয়াস্তে ডুবো লঞ্চটা তোলার চেষ্টা করেছিল। পারে নি। প্রায় দেড়শো টন ওজন। পনেরো দিন পরে ওটার নীলাম হবে। উত্তেজনায় মেজদার চোখে ঝিলিক দেয়। পেছনে একটা ঝাঁকড়া হিজল গাছ। এক ঝাঁক টিয়া উড়ে যায়।

দারুণ মওকা—মেজদা বলে। আবার একটা খোলামকুচি জলে ফেলে। হাত ঘড়ি দেখে। বিড়বিড় করে সাত সেকেন্ড।

কিশোরকে বলে—বুদবুদ দেখে জল মাপছি। কিশোরের সময় ছিল না। ও বলে—চলি। মেজদা ওর সঙ্গে কিছুটা আসে। তারপর বলে—খবরটা পাঁচকান না হয়। দারুণ মওকা এসেছে।

সেই ডুবো লঞ্চটাও কি কারণে যেন মেজদার কেনা হয় নি।

কলকাতায় কাজের ছকটা কিশোর ভাবছিল। কাছেই বাড়ী। শহর ছাড়ার আগে চট্ করে একবার ঢুঁ লাগাবে।

হাবুদা বলে, তিনটায় এ গরে মিটিং।

কিশোর কান খাড়া করে। হাবুদা বলে যার রতন এসেছিল ওদের গ্রুপের বৈঠক।

কিশোর দমে যায়। রতনরা পার্টির বাইরের লোক। দক্ষিণদেশ গ্রুপ। কিশোর একসময় নিজেও দক্ষিণদেশ করতো। পরে বেরিয়ে এসেছে। ওর সূত্রেই এ বাড়ীর সঙ্গে রতনদের যোগাযোগ।

অসুবিধে কি? রতন তো তোমার বন্ধু—হারুদা যোগ করে।

কিশোর চটে যায়। লোকটা বোকা না ভাঁড় কে জানে। সমস্ত দল আর গ্রুপের সঙ্গে মাখামাখি। এ বাড়ী এখনি ছাড়তে হবে। কিশোর ফন্দী আঁটে। কোথায় যাবে, ভেবে পায় না।

পার্টির সঙ্গে এখনি যোগাযোগ করা দরকার। কাজের রিপোর্ট দেবে। সারা দেশ জুড়ে লড়াই চলছে। ওর অভিজ্ঞতা, শিক্ষা শুনবে। কিন্তু শহরগুলো হঠাৎ এতো মেতে উঠলো কেন? এ-রকম কথা ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও হবে। ভারতবর্ষে পাঁচ লক্ষ গ্রাম। শহর দু হাজারের কিছু বেশী। শহরগুলো শত্রুর ঘাঁটি। এখানে অনেক দিন চুপচাপ মাটি কামড়ে থাকতে হবে। গণ-সংগঠন, গণ-আন্দোলন গড়তে হবে। সুবুজ সুরুং শব্দ করে চা খাচ্ছে হাবুদা। হঠাৎ চমকে ওঠে—পল্লব আসছে?

কোথায়—কিশোর সোজা হয়ে বসে।

হারুদা কাপ হাতে জানলার আয়না দেখায়। ওই তো। কিশোর দেখে।

মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। বলে, নীচে যান। ওকে আটকান।

হারুদা দ্বিধায় পড়ে। তারপর চটপট নীচে নেমে যায়।

কিশোরের কপালে ঘাম। গরম চায়ে জিভ জ্বলে গেছে।

এখানে থাকা যাবে না, ও ভাবে। লোকটার সকলের সঙ্গে খাতির। পল্লব লাল ঝান্ডা গ্রুপের লোক। পার্টির সঙ্গে ওদের বনিবনা নেই। ওরা এখনও আলাদা গ্রুপ রেখেছে। আজকের অবস্থায় এটা এক ধরনের দুষমনী। কেন এখনও ওরা আলাদা রয়েছে। মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে ওদের বাধা কোথায়?

অথচ এই রতন, পল্লব একদিন কতো কাছের লোক ছিল। এক ঘরে ওরা পাশা-পাশি থেকেছে। এক বিছানায় শুয়েছে। মুখের ভাত ভাগাভাগি করেছে। ভাসা এবং গভা মিলিয়েই অগ্রগতি, এটা ও জানে। তবু মনের মধ্যে একটা খিঁচ থেকে যায়। রতন আর পল্লবকে শত্রু ভাবতে কষ্ট হয়। ওরা বেইমানী করবে, এটা ও ভাবতে পারে না। অনেক দুঃখ কষ্টে ওরা পুড়েছে। ওদের ভেতরে তার চেয়ে কিছু কম জ্বলুনি নেই। তবু ওরা আলাদা। রতন, পল্লবের পাশাপাশি আরো অনেক মুখ মনে পড়ে। কামাখ্যাদা আজ সংশোধনবাদী। অথচ সেই লোকটাই একদিন বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছিল ওর কানে। দিন নেই, রাত নেই শান্ত থাকতো বাজারবাজার বস্তিতে। বিড়ি শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতো। তারপর একদিন দাঙ্গা বাধলো। উনিশশো চৌষট্টি সাল। সেই বাস্তব কথা আজো মনে আছে। মুসলমান বস্তিতে দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে। বাঁশ ফাটার ফট্যাফট্ শব্দ। অন্ধকার আকাশ ফুটো হয়ে যেন রক্তের ঢল নেমেছে। কান্না, চীৎকার, হৈ-চৈ।

কামাখ্যাদা ছিল শান্তিবাহিনী। পার্টির নির্দেশ ছিল, দাঙ্গা রুখতে হবে। স্কোয়াডে কিশোর ছিল। কামাখ্যাদার প্রাণে। হঠাৎ অন্ধকার থেকে [illegible]

কামাখ্যাদার ঘাড়ের ওপর ফাটলো। অদূরে পুলিশ। তারা মজা দেখছে। দাঙ্গাবাজ, লুঠেরারা পালালো। কেউ আটকালো না।

কামাখ্যাদা বেহুঁশ। ... পড়ছিল কান দিয়ে। ঘাড়ের মাংস ঝোলে গেছে। হাসপাতালে যেতে হলো। প্রায় দু মাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী। কামাক্ষাদা রুগ্ন হয়ে গেলো। সেই কামাখ্যাদা আজ সংশোধনবাদী, শাসক শ্রেণীর উমেদার। কিশোরের বুকটা ভারী লাগে। কামাখ্যাদার সঙ্গে অনেককাল কথা বন্ধ। রাস্তায় দেখলে লুকোতে হয়।

একজন মানুষ সারা জীবন বিপ্লবী থাকে না। আজীবন বিপ্লবী থাকা বড়ো শক্ত কাজ। জীবনের কয়েকটা বছর সততা, তেজ বাঁচানো যায়। তারপর কমে আসে, মরে যায়। তাকে ইতিহাস ছুঁতে ফেলে। ভুলে যায়। চিতার আগুনেও যার বুকের আগুন পোড়ে না, সময় তাকে সেলাম করে, মনে রাখে। তবু যে মানুষ কিছুকাল লড়েছে, হাতে মৃত্যু নিয়ে নোফাজুদ্দি করেছে, তার কথাও কখনো-সখনো মনে পড়ে। তার অধঃপতনের জন্যে দুঃখ হয়। তাকে অস্বীকার করা যায় না। কেন পল্লবরা কি অধঃপতিত, দলছুট? কামাখ্যাদা কি চেনা বাঁধা স্কুলার, এরকমও ওর মনে জাগে। হাসুদা বললো, ওরা তোমার বন্ধু। কিশোরের হাসি পায়। বুর্জোয়ার লিখবাজ। দুনিয়ার সকলকে বন্ধু দেখছে। পুরোনো আমলের জমিদারদের এই এক ভাঁওতা আছে, আড়ালে শয়তানের বাচ্চা বলবে আর মুখের সামনে হেসে গলে যাবে। এটা এক ধরনের আত্মপ্রতারণা। এই বন্ধুতা নীতিহীন নাকামি। ভালো মন্দকে সোজাসুজি চেনা উচিত। পরিষ্কার সীমানা না থাকলে দুটো মিশে যায়। তখন ক্ষতি হয়। লড়াই বিমিয়ে পড়ে।

শত্রু মিত্র, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে এই বন্ধুতা কোলাকুলির পেছনে খারাপ মতলব থাকে। আসলে পুরোনো লোকগুলো সুবিধের নয়। বেশীর ভাগ ভেজাল, ভেতরে বহু গলদ। ডালমে কালা। পরিষ্কার নয় দু হাত দূরেও থাক তামাকেও বাস। আদর্শগত লড়ায়ে তাই ওদের ভয়, বিধা। সকলেই বিপ্লবী, বন্ধু এই ধরনের একটা ভাওয়া বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সকলের কাছ থেকে ওরা সুবিধে চায়। সহা ধুরন্ধর।

এইসব মুহূর্তে কিশোরের বুকে একটা ঝনঝনানি জাগে। কোন্ এক অদৃশ্য ধাতুনি ফুটন্ত কড়াতে যেন তার হৃৎপিন্ডটা ভাজছে। জ্বলে যায়। কতোকাল আগে দেশ ছেড়ে এসেছিল, এখন সে ছবি ঝাপসা। শুধু আকাশ থেকে নেমে আসা একটা ঘন সবুজ বস্তু ওর চারপাশে ভেসে বেড়ায়। বাড়ী-ঘর ছেড়ে চলে এলো। তখন ও শিশু। কিন্তু ভয়ে বুক শুকিয়ে ছিলো। কোলকাতায় এলো, তারপর যেন হু হু করে বড়ো হয়েছে, দুঃখ কষ্ট শিশুকেও ছটপট ছুড়ো করে। গরীবের ঘরে বেশী দিন শিশু থাকা যায় না।

অচেনা শহর। নতুন মানুষ। পায়ের তলায় মাটি পেতে অনেক সময় লাগলো। তবু কোথায় যেন একটা ফুটো থেকে গেছে। কি একটা নেই। মাঝে মাঝে সেটা খোঁচায়। একটা তেতিয়া রাগ ধিকধিক করে। দেশটাকে দু টুকরো করার অধিকার কে দিয়েছে? আমার মাতৃভূমি রাতারাতি কি করে বিদেশ হয়? যারা আমার মাতৃভূমিকে বেচে দিতে পারে তারা হয়তো একদিন আমার মাকেও বিকিয়ে দেবে। এ-সব কথা মনে হলেই কিশোরের বুকটা হুহু করে। অসহায় লাগে। ছেলেবেলায় অনেক রাতে আবছা ঘুমের মধ্যে মাকে জড়িয়ে ধরতো। কাগজে গান্ধী, নেহেরুর ছবি দেখেছে। মনে হতো, ওরা তার মাকে ছিনিয়ে নিতে আসছে। ঘুমের মধ্যে ডুকরে উঠতো। বড়ো হয়ে কিশোর ভেবেছে দ্রৌপদীকে জুয়োড় আসরে যখন যুধিষ্ঠির বিকিয়ে করলো, তখন দ্রৌপদীর ছেলেরা কি করছিলো। রাজারাজড়াদের গোটা ইতিহাসটাই মা বোনদের বেশ্যা বানাবার ইতিহাস।

বুকের মধ্যে এই রাগ ঘেন্না নিয়ে কিশোর বড়ো হয়েছে। কথা কম বলতো। কিন্তু চোখে মুখে উদ্ধত, ঝাঁপিয়ে পড়া ভাব। পুরোনো যুগের মানুষ আর নেতাদের কথায় কাজে কোনো মিল পায় না। যারা মাঝারি বয়েসী লোকেরা অহঙ্কারে ফুটছে। দেশটাকে তারা স্বাধীন করেছে। নয়া ভারত তারাই জন্ম দিয়েছে। তারা নতুন ইতিহাসের কুশিগর। কিন্তু এই ইতিহাসের সঙ্গে ও নিজেকে মেলাতে পারে না। কোথায় যেন একটা ফাঁকি আছে। কারচুপি আছে। উনিশশো চুয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের খবর লোক মুখে শুনেছে। শহরে গাঁয়ে হাজার হাজার মৃত মানুষের পচা গলা দেহ। রাস্তায় রাস্তায় একটু ফ্যানের জন্য বুক-ফাটা কান্না। ওর শরীর সিঁটিয়ে যায়। পালার কাছে কি যেন দলা পাকায়। ছেচল্লিশ সালের দাঙ্গার বর্ণনাও ও শুনেছে। হিন্দু, মুসলমান মার মার কাট কাট ঝাঁপিয়ে পড়েছে পরস্পরের ওপর। কে যেন গঙ্গার ধারে, হাওড়া ব্রিজের তলায় কয়েক শো লাশ দেখেছিলো। তাদের শরীর থেকে মাংস খসে যাচ্ছে। বমি পড়ছে। তারপর আটচল্লিশ সাল। বাকরখীপ, তেলেঙ্গানার লড়াই। গর্ভবতী অহল্যার পেটে পুলিশ বেয়োনেট ফুটে বিষেছিলো। অহল্যা মা তোর সন্তানের জন্ম হলো না। মাঠে মাঠে হাজার সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা। কামাক্ষাদার গলায় এ গান শুনেছে। অদ্ভুত সুর। নদী পাহাড় বন-জঙ্গল পেরিয়ে একটা দমকা হাওয়া ছুটে আসে।

সন্ধ্যাসরি চোখে দেখলো উনষাট সাল। সন্তানবেলায় বাগানে শহীদের ছবি, কালো বর্ডার। কাকুরা তখন স্বাধীনতা বিক্রী করতো। পাড়ায় এক বাড়ীর দেওয়ালে স্বাধীনতা। একটা ছবি আজো মনে আছে। পুলিশ মন্ত্রী, ঝোলা গোঁফ, ফোকলা দাঁত, গোবিলার মতো মুখ—রস-গোল্লা খাচ্ছে। ছবির তলায় মন্ত্রীর বাণী—দেশে খাদ্যের অভাব নেই। পুলিশের গুলিতে একশিজন শহীদ হয়েছিলো। অপরাধ, তারা খেতে চেয়েছিলো। রোজ সকালে কাগজে মৃত মানুষের মিছিল। কিশোর ভাবতো, এটা কি নিয়ম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা অহিংসার কথা বললো, গোলা বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রকে ঘেন্না করতে শেখালো, তারা নিজের দেশের নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারছে কেন? ইংরেজ অহিংসার বিশ্বাসী ছিলো না। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অহিংসার বুলি কপচানো হলো। বিদেশী-দের জন্যে হিংসা বর্জনীয়। দেশের মানুষের জন্যে হিংসাই একমাত্র পথ। কিছুই মেলাতে পারে নি। গুমরেছে।

এলো উনিশশো বাষট্টি সাল। সীমানা নিয়ে চীন-ভারত যুদ্ধ লাগলো। দেশ জুড়ে সাজসাজ রব। অনেকদিনের বন্ধু দেশ রাতা রাতি হলো বিশ্বাসঘাতক, আবশোলাখেকো, পীত দস্যুদানবের ঘাঁটি। প্রচার হলো চীন আক্রমণ করেছে। ভারতবর্ষ আক্রান্ত। চীনের মানুষের অনেক খবর বড়োদের মুখে কিশোর শুনেছে। আমেরিকান সাংবাদিকদের লেখা দু-একটা বই পড়েছে। বুক ভরে গেছে তার। লং মার্চের ইতিহাস পড়ে, চারপাশের পৃথিবী দুলতো। একটা দেশ এগোচ্ছে। সুস্থ, সবল আত্মসম্মানওলা একটা জাতির জন্ম হয়েছে। মনোজ বসুর চীন দেখে এলাম আগে পড়েছে। শৈল মুখার্জি, বিশ্ব-নাথ মুখার্জির বই এবার পড়লো। কিন্তু তাদের ব্যাপার। এরা সকলেই রাতারাতি ভোল বদলালো। বললো—যা দেখেছি, সব ভুল। চীনেরা অতি খারাপ। তাই যুদ্ধং দেহি। স্বাধীনতা আর শান্তির পান্ডাদের পাত্তা পাওয়া গেল না। জরুরী অবস্থা জারি হলো। কিছু মানুষ এসবের প্রতিবাদ করলেন। তাদের জেলখানায় ঢোকানো হলো। হাত-পা কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হল, কিশোর শুনলো ওরা কম্যুনিস্ট বেইমান, দেশের শত্রু।

বুকের মধ্যে কি এক কষ্ট নিয়ে ও বেঁচে থাকে। ইতিহাসের পাতা থেকে যা-হিসেন, হিউয়েন সাঙকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। একটা বুকচাপা, দমবন্ধ ভাব। এই-সময়ে অনেকগুলো বই পড়লো। বার্টান্ড রাসেলের আনআর্মড ভিক্টরি। পৃথ্বী-রাজের দলিল। আবেগের দিক থেকে কম্যু-নিষ্টদের সঙ্গে কোথায় যেন এতোকাল তার একটা মিল ছিল। এবার সেটা বুকতির ভিত পেলো।

পল্লবকে কাটাতে হারুদার কিছু সময় গেলো। ঘরে ফিরলো প্রায় আধঘন্টা পরে। চটের ওপাশে গিয়ে বসলো। কোথা থেকে একটা জল তোলার মোটর পাম্প এনেছে। সেটা সারাবে। ডি-সি পাম্প। আর্মেচার বাঁধতে হবে। একগাদা তামার তার নিয়ে ও কাজে মন দেয়। বলে, তাড়াতাড়ি সারতে হবে। পঁচিশ টাকা আমদানী।

(চলবে)

এক

প্রদর্শনী

এক যুগ পরে এক যুগ
আগের ছবি

[illegible] ছেষট্টি সালের নভেম্বরে, মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসে নিখিল বিশ্বাস প্রয়াত হয়েছিলেন। আটাত্তরের ষোলো থেকে একাশির এপ্রিল পর্যন্ত, তাঁর তেতাল্লিশটি ছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন হলো আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে। শিল্পী প্রয়াত হবার পর, এটি চার নম্বর প্রদর্শনী।

ছেষট্টিতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো; একটি আমন্ত্রণকার্ড পেয়েছিলাম সেই মেয়েলি দিনগ্ধ মনুষ্যটির কাছ থেকে। যাওয়া হয়নি তখন। তখনি আমরা জানতাম, নিখিল বিশ্বাস মানেই ঘোড়ার ছবি।

একযুগ পরে তাঁর ছবির মুখোমুখি [illegible] পোস্টারিটি শব্দটি মনে পড়ে যায়। ডানদিকের ঘরে ঢুকে, ডানদিকে বেনারসঘাট ছবিটি দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। ঐ দেয়ালে ক্রুসিফিকেশন (২৫ নং ছবি) ও হর্স (৪১নং ছবি) দেখে আবার ধাতস্থ হই। অধিকাংশ ছবিই পেন অ্যান্ড ইঙ্কের। মিকসড্ মিডিয়াস দুটি আছে। একটি ওয়াটার কালার। অফেলে ১টি। ঘোড়া, গতিশীলতা, সংগ্রাম—নিখিলবাবুকে যথেষ্ট উদ্দীপিত করেছিলো। স্কুলটির কথা মনে পড়ছিলো আমার—যখন বেডাসি মই সংগ্রামপ্রিয়, যখন রাজকীয়তার চরিত্রকেও গ্রাম প্রতোক চরিত্রে নিগূঢ়ভাবে চালে। ঐ সময়কার একটি নাটকে, যাববার [illegible] করেছিলো 'মাই কিংডম ফর এ হর্স' কবিতাটি। কিন্তু এই স্টিমুলাস্ট একটু বেশি ধরেছে নিখিলবাবুর ছবিতে। পরিবেশনার মধ্যে যখনি রহস্য ছিলো, তখনি এই ঘোড়া ও মানুষ প্যাশন টেনশনে বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে, যেমন চার নম্বর ছবি হর্সম্যান বা আবার পেন অ্যান্ড ইঙ্কেই হতুমের স্ট্যাগারা, (১১ নং ছবি) ও ব্যাটল অব আমাগাডেন (২১ নং ছবি)। চোদ্দ নম্বর ছবি, পেল হর্স তো আমাদের দিকে দৃষ্টিতরবর্ষিতার উদ্দেশ্য নিয়ে তাকিয়ে থেকে [illegible] সময় স্টাল সময় হয়ে ওঠে, এর অবস্থান বৈশেষিত যাথার্থ্য। এই শিল্পকর্মটিকে সমস্যাভেদি একটি আর্টেস্ট করে তোলে। [illegible] পুনঃসাক্ষাৎ সালভোর বাজনা [illegible] টকরো পরিকল্পিতে ১৯ ও ২১ হয় পরে দর্শকদের ব্যাপারিসিস হয়। কিন্তু তবুও ছবিতেই, হয়তো আরো একটু বেশি মনোযোগের দাবি ছিলো যেটা আদৌ [illegible]। দুটি ঘোড়ের ছবি আছে [illegible] সে দুটিতে ছবিগুলি একরঙা ও ছবি দুটি একটু বেশি ডেকোরেটিভ হয়ে হলো। ছয় নম্বর ছবি বাউল বিশেষ [illegible] করেছে মতো। বাউলের মাথার [illegible] ছবির আলোর দিকটি বেছে নিয়েছে [illegible]—একটি অপরূপ ভাঙ মালা সেখানে পরানো; বাউলের মুখে অসমঞ্জস কালো আর ঈষৎ অন্তঃসলিল হালকা নীল বাউলের আগুনকে ধরে ফেলেছে। বাউলদের গলার চড়া টেনশনকে এঁকেছেন নিখিলবাবু—একরঙা বলা যেতে পারে। পেন অ্যান্ড ইঙ্কে তাঁর যে ধরনের কাজ দেখলাম, তার মধ্যে আরো দুটি স্বাদে-নতুন ছবি আছে। ২০নং ছবি চ্যারিয়ট, যাতে একটি ত্রিতল প্রাসাদ আছে, শাদা-কালোয় অস্পষ্ট ইতিহাসের সুদূর মোহ ছাড়াও এই ছবিতে রহস্য এসেছে হঠাৎ কালির ঘন হয়ে ওঠার জন্যে, যা আঙুলে মাখিয়ে কালি লেপে দেওয়া বলে ভাবতে লোভ হয়। সমসাময়িক টেনসন নয় এটি মানবিক অর্জিত অভিজ্ঞতার একটি বিচ্ছেদ। তেরো নম্বর ছবি, এপোমাক্স একটি [illegible] ছবিতে শাদা অংশটি একেবারে বিশুদ্ধবর্ণ ও বিন্যাসে। এই তিনিসটা ছবি অবশ্য সবকটি প্রভ্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত মাত্রা দিয়েছে। এই দুটি ছবি দেখে বোঝা যায় নিখিল বিশ্বাস কিভাবে পাকস্থলীয়তার প্রকাশ ও বিশ্লেষণ—মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এক্সপ্রেস ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মেজাজটা আরো বেশি ধরা পড়েছে তিন নম্বর ছবি দ্য কিং আবাইডস নামনী আলেখ্যে। ঘোড়াটির পদক্ষেপ অত্যন্ত ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে, লম্বাটে আনত মুখ, প্যাটার্নসাইপ হ্যাটায়ার, রঙের বাওময়তা ও এম্পটিনেস—সমস্ত দিক থেকে ছবিটির এমূল্য বহুমাত্রিকতা পৌঁছে দিয়েছে দর্শকদের কাছে।

চিত্রাংশু

চিত্রাংশু, একটি ছবি-আঁকানো ও হাতের কাজের শিক্ষণসংস্থা তাঁদের বার্ষিক পদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ৩১, রাজা বসন্ত রায় রোডে। ছাত্রদের কাজ দেখানোর ব্যবস্থা ছিলো গত আঠারোই মার্চ থেকে চব্বিশ তারিখ অবধি, শিক্ষকসংস্থার কর্মীদের কাজ দেখবার সুযোগ ছিলো সতেরো মার্চ থেকে দোসরা এপ্রিল।

বাচ্চাদের ছবির মজা সবিশেষ ছবিতে নেই। বেশির ভাগ ছবি প্রাকৃতিক পরিবেশ বা দৃশ্যকে যথাসাধ্য অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছে—সেখান থেকে বোঝা যায়, ছবিগুলির প্রস্তুতিতে বড়োদের অনভিপ্রেত ভালো হাত আছে। তবু এরই মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, যাঁর বয়েস মাত্র নয়, চরিত্রে তাঁর বালকোলের ফ্যানটাসিকে ওপরে আনতে পেরেছেন। এঁর ছবির বাস-গাড়ি-পড়া ও বড়ীতে সহিষ্ণায় [illegible] সুমিকা চৌধুরী একজন স্বাভাবিক শিল্পী, তাঁর সার্কাসের ছবিটিতে সার্কাস [illegible] ন [illegible] প্যারেস্টেড হয়েছে নিখুঁতভাবে। এই ছটি দুটির নম্বর ছিলো যথাক্রমে ১৫ ও ১৬। ওর বছরের তনুজা দত্ত বিশেষ কৌতুকে দেখিয়েছে প্যাঁচার উপরে। প্যাঁচাকে আমরা যে ভাবে চিনি—এমন কি [illegible] প্যাঁচাকেও যেভাবে চিনি—সেই চেনাগুলোকে ঘুরে ফেলেও সে আর একরকম চেনাকে ফিরে গেছে। তার আঁকা প্যাঁচাটি একটি [illegible]। এই ছবিটির নম্বর ১২৯। কিংবা যাবা বড়ো কবিবি নিয়ে চারাতে পারে এক পার্বতী, যার বয়েস এগারো। একটি বড়ো [illegible] সে এঁকেছে। টিচি দর্শকের আধুনিক যুগল সেখানে বসে। টিভির পাশাপাশি একটি যুগলবন্দি বিশাল ঘুড়ি [illegible] ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে ঘরে বসে টিভিসপর; টিভির পর্দা কালো, মনের [illegible] অনায়াসেই আসবার মনে হয় [illegible] এই থীম যেনো বয়স্ক [illegible] [illegible] হতো। যেকোনো শিল্পীর ছবি দেখার [illegible] ও শ্রদ্ধা তার এই ছবি [illegible] [illegible] পারে। সঞ্চিতা রায়চৌধুরী [illegible] [illegible] পুতুলের প্যাস্টেলটিও [illegible] [illegible]। প্রত্যাশিত [illegible] ছায়াদি [illegible] [illegible] ভাগ ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] মনে হোলো। [illegible] [illegible] [illegible]—শিল্পশালা। সোসিওলজিস্টের [illegible] থেকে এখনকার কিশোরমনের কোনো নতুন [illegible] পেতে পারেন। [illegible] [illegible] স্কেচ, ছোটিতে তিনি মধ্যবিত্তের উপস্থিত [illegible], তর্জন গর্জন ও নিষ্ঠুর আনন্দ মানুষের একটি যথার্থ চিত্র পরিবেশন করেন। ছবিটি [illegible] ১১ [illegible] ছাড়া বাকি কোনো [illegible] [illegible] আমার [illegible] মনে হয়নি।

অন্যদিনে, এই সংস্থার [illegible] [illegible] [illegible] গুণীজনদের [illegible] ছবি [illegible] সাধারণভাবে ওরিয়েন্টাল নমনরম। [illegible] [illegible] [illegible]

অ্যান্ড ইভের কাজটিকে সদর্থে আকেইক বলা যায় না। মধ্যযুগীয়—ঊনবিংশ শতাব্দীর অজান্তকে নিয়ে হাল্কা ব্যঙ্গ একরকম মেনে নিলেও, কাজটি একটু বেশি জড়োয়া, আর্টি। কিন্তু তাঁর নগ্ন চিত্রগুলি অসাধারণ। গায় হলুদ, রাজকীয় নীল, মসৃণ কালো ও ছাই-রঙের ব্যবহার, ছবিটিকে একটি ইঞ্চিও বন্ধ্যা রাখে নি—এবং চিত্রগুলির গোত্রানি, তাঁদের বর্ণ ও রেখাপাথের উদ্ধত বেদনা ছবি সম্পর্কে অনভিজ্ঞদেরও ছুঁয়ে যায়। মিলি দাসের কাজগুলি রহস্যহীন। লালুপ্রসাদ সাউএর লিনোকাট ভালো লাগলেও, আগে যা দেখেছি তারই মতো। শৈলেন মিত্র ও সুশীল গুপ্তের তিনটি ছবি ধন্যবাদই রেখেছে তাঁদের। সমরেশ চৌধুরীর স্কাল্পচার-অবজেক্ট দুটি তাঁর নামকরণের ব্যঞ্জনার পক্ষে (জ্যাকসটাপোজিশন নাম) বড্ডো বেশি ধাতব। শুকতিশুভ্র প্রধানের টেম্পারা, ড্রিম (৩৪ নং) আর একটি চমৎকার ছবি। বি আর পানেসর-এর ছবির নাম বিলো দি পোভার্টি লাইন। (৩৩ নং) প্রায় অন্ধকার রঙের সামান্য তারতম্য ঘটিয়ে অত্যন্ত অল্প উপকরণে তিনি আমাদের মেধার অভিভাবকতা করেছেন। শুধু এই ছবিটির মডারেশন ও কমিটমেন্টের কারণেই যে এটি একটি স্মর্তব্য অভিজ্ঞতা তা নয়; শিল্প যেভাবে আমাদের জীবনকে স্বচ্ছ করে সেই ক্লারিটিও এই শিল্পকর্মে রয়েছে। 'পতনশীল সময়'কে বা সময় সন্নিপাতকে এঁকেছেন অনিলবরণ সাহা। ঘড়ির নিচে একটু মবিচ্যারি জায়গায় একটি স্ক্রু আড় হয়ে, অল্প একটু লালচে শৈত্য নিয়ে পড়ে আছে। এই ছবিটি আর একটি অভিজ্ঞতা।

শ্যামল মজুমদার ও কোণারক উদয়গিরি

দোসরা এপ্রিল পর্যন্ত আকাদমি অব ফাইন আর্টসে শ্যামল মজুমদারের ছবি দেখানো হচ্ছিলো। এই সব ছবি একটি বিশেষ গ্রন্থনাসূত্র অবলম্বন করেছে। কাজেই, শ্যামল মজুমদারের পুরোপুরি শিল্পীব্যক্তিত্ব এতে ধরা যাবে না। কোণারক নাচানা উদয়গিরি খাজুরাহোতে পাথরে যাদের দেখা পাওয়া যায়, রঙতুলিতে তাদের আবার দেখাকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন শ্যামল মজুমদার। ভারতীয় ঐতিহাসিকতার যেদিকটা স্বাস্থ্য, কমেডি ও শারীরিক সচ্ছলতা এবং বিলাসকে পছন্দ করে, শ্যামলবাবু সেইদিকটিই পছন্দ করেছেন। তাঁর ছবির আলোছায়া এইসব মূর্তির গেস্তেকে আরো একটু অন্য ধরণের মুড দিয়েছে—যে মেজাজটি হলো ইতিহাস-চারী অন্যমনস্কতা। এতে শ্যামলবাবুর রুচির একটি দিক ধরতে পারলেও, তাঁর অন্য ছবির জন্যে অপেক্ষা করাই ভালো।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

দা ভিন্‌চি

তাঁকে স্মরণ করতে হলে দৃষ্টিকে ছুঁড়ে দিতে হয় ফ্রান্সের লুভার মিউজিয়ামে, যেখানে রয়েছে রহস্যের আলো-আঁধারিতে আচ্ছন্ন, অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনায় শিল্প-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি মোনালিসার প্রতিকৃতি। কিন্তু ছবি যাঁদের চোখে শুধু ছবি নয়, সেই গোঁড়া শিল্পজগৎ ইতালীয় রেনেসাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিধর চিত্র-শিল্পী দা ভিনচির ৫২৫-তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্মৃতিচারণ করলেন। যে-সৃষ্টির মাঝে আজও তিনি অবিস্মরণীয় তা এক অসমাপ্ত এবং চিরন্তন প্রহেলিকার জালে প্রচ্ছন্ন। তাকে আরো অর্থপূর্ণ করে তুলতে দা ভিন্‌চির নীলাভ সবুজ রঙে রাঙানো তুলি পটভূমি রচনা করেছে ধোঁয়ার মতো হাল্কা টানে; স্বপ্নের মতো মাথা তুলেছে টিলা পাহাড়, যার অবয়ব জুড়ে মাখনের মতো হাল্কা প্রপাতের ধারা। রহস্যময় হাসিটি পটভূমির সঙ্গে একেবারেই বেমানান, অথচ গড়ে উঠলো কতো কাল্পনিক কথামালা। স্মরণাতীত কাল ধরে নিত্য নতুন অর্থে বিশ্লেষিত হয়ে আসছে লিসার রহস্য। মোনালিসা শুধু পটে আঁকা ছবিমাত্র নয়, দীর্ঘ ছ'বছরব্যাপী মনের মাধুরীতে আঁকা এই অনুপম শিল্প-কর্মকে কেন্দ্র করে দেশে-দেশে কতো বিচিত্র ও অলীক কাহিনীর জন্ম হয়েছে সেও এক ইতিহাস! হয়তো আগামী আর এক দা ভিনচি প্রমাণ করবে রহস্যের মোড়কে মোড়া ম্যাডোনা লিসার কিছুই অলীক নয়, মোনা-লিসার রহস্য আসলে ছবির সুবাদে দীর্ঘ দিন দুজনে অনুসঙ্গে আমার ফলশ্রুতি—প্রতিমুহূর্তের গড়ে ওঠা একটি প্রস্ফুটিত প্রেমোপখ্যান! অথচ অজানা অসম্পূর্ণ এবং বিচ্ছেদই তার পরিণতি!

দা ভিনচির জন্ম ১৪৫২ সালে ফ্লোরেন্সের এক গ্রামে। পিতা ছিলেন নগর আদালতের কর্মচারী। পিতার সঙ্গে শহর দেখতে এসে বিখ্যাত শিল্পী ভেরো-চ্চিয়োর সংস্পর্শে এলেন এবং সাত বছর নবিশী করে অল্প বয়সেই শিল্পীর স্বীকৃতি পেলেন। ফ্লোরেন্সের বাজ-দরবারে ঐতিহাসিক চিত্র এবং গীর্জার, বেদির জন্যে আঁকা যথাক্রমে অ্যাডোরেশন অব্ দা ম্যাজাই ও অ্যাডোরেশন অব্ দা কিংস্ উল্লেখযোগ্য গণ্যালারি করে আছে। ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্টাডির কাজ যা পরবর্তী কালেবাফায়েল প্রমুখ শিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু স্টাডির দীর্ঘ-সূত্রতার দোষে তাঁর অধিকাংশ শিল্প-কর্ম অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। অথচ শেষোক্ত চিত্রটি ইতালীয় রেনেসাঁর এক চূড়ান্ত নিদর্শন।

শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে দা ভিনচির নিজেকে একদিন পরবর্গাহী মনে হয়। তাঁর এই হতাশার কারণ অসমাপ্ত ছবিগুলো। তাই নতুন আঙ্গিকের পরি-কল্পনায় তিনি হঠাৎ মিলানে উপস্থিত হলেন। মিলানের 'সেন্ট ম্যারিয়া দেল্লে গ্যাজিক'-এর ভোজন কক্ষে তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'শেষখৃষ্টের 'লাস্ট সাপার' রচনা শুরু করলেন। কিন্তু স্যাত-সেতে দেয়ালের গায়ে নতুন আঙ্গিকে প্রাণ স্পন্দন করার আগ্রহে এবারও দীর্ঘ-সূত্রতার দোষেই দা ভিনচির জীবতকালেই ছবিটি নষ্ট হতে শুরু করে। এটাই তাঁর প্রধান সৃষ্টির শেষ টানের স্বাদ রসিকদের কাছে পৌঁছতো না। তাই প্রখ্যাত জীবনী ভাস্যকার ভাসারী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, '.....

দা ভিনচির একবার মিলানের ডিউকের চাকরি-প্রার্থী হয়েছিলেন। আবেদন-পত্রে যোগ্যতাবলীর যে বিবরণী তিনি দিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে, একাধারে তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্য স্থাপতি, এঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। এই বহুমুখী সাধনাই সম্ভবত তাঁর অনেক বিস্ময়কর সৃষ্টির অসম্পূর্ণতার কারণ।

দা ভিনচির আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল বাঁ হাতে কাজ করা। অঙ্কনের মাধ্যম সুখ্যাত কালি-কলম হলেও রঙিন বা গাঢ় রঙের চিত্রনাট্যের ওপর তিনি ব্যবহার করতেন মেটাল পয়েন্টে। অঙ্কন শিল্পে মেডিয়াম হিসেবে তিনিই প্রথম বিভিন্ন রঙের চকখড় চালু করেন। প্যাস্টেলের প্রয়োগ তিনিই প্রথম অনুপম শিল্প-কর্ম উপহার দিয়েছিলেন। এমন কি গানের মথন যে মেডিয়ামে বাজকেবেছেন, অমনি চিত্র-শিল্পে নতুন এক শৈলীর উদ্ভব হয়েছে।

১৪৯৯ সাল। ফরাসী সৈন্যরা মিলান দখল করে নিয়েছে। চতুর্দশ লুইয়ের পরাক্রমে মিলানরাজ বহিষ্কৃত হলেন। রাজনৈতিক অটিঘরতায় দা ভিনচি ভেনিসে পালিয়ে যান এবং কিছুদিন পর স্বগ্রাম ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, রাফেয়েল প্রমুখ শিল্পীদের খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। রুচি ও নতুন আঙ্গিকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি হল সমাছন্ন। কিন্তু ষোড়শ শতকের মূর্ত প্রতীক মোনালিসার বিচিত্র রহস্যময় হাসি বিশ শতকের শেষার্ধেও একথাই যেন স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যে-হাসির রহস্য উদঘাটন ও নির্ভুল ব্যাখ্যা এখনো বাকি এবং ম্যাডোনা লিসার মধ্যে দা ভিনচিও থাকবেন চির অম্লান, অক্ষয় ও অব্যয় হয়ে।

—নির্মল দত্ত

অরণ্য সেন

সখীচরণের ঘুড়ি

সখীচরণ বসেছিল উবু হয়ে। দুই হাঁটুর মধ্যিখানে তার মাথা। চোখ মুখ দেখা যায় না কিছু। একমাথা ধুলোটে চুল, রুক্ষ। তেঁতুলচিটে চটের থলের মত ভাঁজ খাওয়া, বিবর্ণ। তার এই বসে থাকার ভঙ্গি অবাধ্য ছেলের নামতা পড়ার মত। মুখস্থ বলে তবে ছুটি। বেলা মরে আসে, ওর মুখস্থ হতে চায় না কিছুতেই। পড়া-শোনোর পাট অবশ্য তার নেই। ছিলও না কোনকালে। মুখে মুখে হিসেব-টিসেবটা করতে পারে। কিন্তু লিখতে গেলেই ক-অক্ষর গো-মাংস।

সখীচরণ নখের ডগা দিয়ে মাটিতে একটা মুখ আঁকার চেষ্টা করছিল। মাটি নামেই মাটি। আসলে ধুলো। ভুসি মেশানো লাল আটার মত। আঁচড় কেটে না ছোঁয়াতেই গুঁড়ি গুঁড়ি গুঁড়ো হয়ে যায়। মুখটা স্পষ্ট হয় না কিছুতেই। তবে এই কথা চোখ বুজলে সে দেখতে পায়। শেষ অবধি। আঙুলের ডগায় তুলেও আনে হয়ত। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মাটি [illegible] থেকে নামতে চায় না। ধুলো [illegible] বড় আপত্তি।

তাকে [illegible] [illegible] মাথায় [illegible] পড়ছে। [illegible] [illegible] [illegible]

সখীচরণ মুখে রা-ই কাড়ে না। বন্ধ গরে বসে থাকে। সেই কারণে তার চারদিকে কৌতূহলী মানুষের প্রায় নিশ্ছিদ্র প্রাচীরে, এখন অনেক ফাঁক-ফোকর। গাঁ-গঞ্জের পরিত্যক্ত বাড়ির মত। জায়গায় জায়গায় ইঁট-খসা। বে-আবরু।

সখীচরণ একবার চোখ তুলে দেখল। এবং এখন তার চাউনিতে আগের মত সেই বিনম্র ভাবটা ছিল না। তাই বলে ঔদ্ধত্যও না। এই দুয়ের মাঝামাঝি। অর্থাৎ মোটামুটি সরল স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সে নিজের চার পাশটা একবার দেখল। এবং দেখে সে তার মাথা, নিজের দু হাঁটুর মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখল আবার।

হাটে মানুষজন যারা আসে, সবাই সওদাপাতি করে এমন নয়। এক দল আসে স্পষ্টত বদ উদ্দেশ্যে। আর এক দল আসে মানুষের ভিড়ে মজা দেখতে। রঙ্গ-তামাসা, চুরি-ছ্যাঁচড়ামো সবেতেই তারা মজা পায়। মোড়লি করে, লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ায়। এই সব মানুষ বেশির ভাগই নিষ্কাম, হা-ঘরে।

এখনও সখীচরণের চার পাশে যারা আছে, খুঁটিয়ে দেখছে—তারা এই দলের। অন্য দিন আদাড়ে-ব্যাদড়ে ঘুরে বেড়ায়, আজ এসেছে মানুষের ভিড়ে মজা মারতে। তবে থাকবে না বেশিক্ষণ। সখীচরণ জানে। মানুষের স্বভাবই হল ঐ। রহস্যের কিনারা না হলে শেষ অবদি তাতে আর উৎসাহ বোধ করে না। 'মরুক গে যাক' গোছের মন্তব্য করে পাশ কাটায়—নির্লিপ্ত হতে চায়। ব্যাপারটা একটু সময়সাপেক্ষ। কিন্তু অবধারিতভাবে — সখীচরণ জানে, এ রকমই হবে।

কাজেই সে আবার ছবিটায় মন দেয়।

অথবা ছবি আঁকার অছিলায় কালক্ষেপ করে। তবু এটা ঠিক ছবিটা আঁকতে গিয়ে মনের ভিতর সেই মুখ বড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার সান্নিধ্য টের পায়।

কিন্তু বসে থাকার দরুণ তার পা রসস্থ হয়। হাঁটুর কাছটায় চিন-চিন করে ব্যথা। এই সব অবশ্য একটু হাঁটাহাটি করলেই ঠিক হয়ে যাবে। তার আসল ভয়টা অন্য। সে শুনেছে এইভাবে একটানা বসে থাকলে অনেক সময় নাকি অর্শ হয়। তার তেমন কিছু হবে না তো? সেই জায়গাটায় এখনই কেমন দপ-দপ করছে।

কথাটা ভাবতে-ভাবতে সখীচরণ মাটিতে পাছা ঠেকিয়ে বসে। তারপর বুক খালি করে লম্বা শ্বাস ফেলে একটা। এখন অবশ্য আর না বসলেও চলে। সে উঠে হাঁটা দিতে পারে। মানুষজন দু-একজন এখনও যা আছে তাতে তার যাওয়া আটকায় না। তবু সে ওঠে না, বসে থাকে। বসে দু হাঁটুর ভাঁজ খোলে, দুই পা সামনের দিকে টান-টান করে মেলে ধরে। মট-মট করে শব্দ হয় তখন। আঙুলের মত হাঁটুও ফোটে বোধহয়। শব্দটা আগে শোনে নি সে। আজ শুনল।

পকেটে হাত দিয়ে ঢ্যাপ্টা এলু মিনিয়ামের কৌটো বের করল সখীচরণ। তাতে একটা বিড়ি পড়েছিল তখনও। গত রাত্তিরের কেনা। অন্য দিন এর আগেই ফুরোয়, কিন্তু আজ ছিল। এই গণ্ডগোলে বিড়ি-টিরির কথা তার মনে পড়ে নি। নেশার দ্রব্য তাও সে ভুলে গিয়েছিল—ব্যাপারটা ভেবে বড় আশ্চর্য হয় সে।

এইবার সখীচরণ ঘটনাটা আদ্যোপান্ত মনে করতে চেষ্টা করল। প্রথম থেকে শেষ ইস্তক কী কী ঘটেছিল। এটা ঠিক যে সে হাটে অন্য দিনের চেয়ে সকাল-সকাল এসে-ছিল। এবং একা নয় সঙ্গে সুবল ছিল। বুদ্ধিটা সেই তাকে দিয়েছে। না হলে নিয়ম-কানুন সখীচরণ তখনও জানত না, এখনও জানে না। তবে ব্যাপারটার কথা সে এর আগেও শুনেছে। বেডিও তো আছেই, অষ্টপ্রহর সেখানে মানুষ ফুসলানোর চেষ্টা। তার উপর গাঁ-গঞ্জের বেবাক মানুষের সলাপরামর্শ। সবই অবশ্য ভাসা-ভাসা। ভাল করে জানে না কেউই। এই সব আলোচনায় টাকার ব্যাপারটাই প্রধান। ঐ গন্ধেই মানুষ গুরুত্ব দেয় ব্যাপারটাতে।

টাকার গন্ধে সখীচরণও লোভী হয়ে উঠেছিল। তার উপর সুবল, সে ইদানীং পাখি পড়ার মত বুঝিয়েছে তাকে। প্রথম প্রথম প্রস্তাবটা শুনে সখীচরণ অবাক হত খুব। বলত—তুমি আর লোক পেলে না সুবল, আমি একটা বউমরা মানুষ—তা আমার ও সবে কাজ কী।

কথাটা শুনে সুবল ধূর্ত চোখে হাসে নিঃশব্দে। তারপর গঞ্জের পাটোয়ারী ব্যবসাদার মানুষের মত বলে—লাভ তো তোমারই।

সুবলের কথায় মারপ্যাঁচ বা জটিলতা নেই। তবে রহস্য আছে। সখীচরণ গোলা মানুষ বিচি ভেঙে না বললে রহস্যটার কিনারা করতে পারে না কেন। বলে—

—কী রকম?

রকমটা খোলসা করে বলার আগে সুবল চারদিক একবার দেখে নেয়। এটা তার মুদ্রাদোষ। তারপর গলা খাটো করে বলে—বউ বা মেয়েমানুষের সংসর্গ যখন কর না, তখন শরীরে রস থাকলেই বা কী আর গেলেই বা কী। আর তাছাড়া বয়স কালে ও রস আপনি মরবে একদিন, কেমন কি না—এই অব্দি বলে সুবল সম্মতির অপেক্ষার সামান্য বিরতি টানে কথায়। সখীচরণ কিছু বলে না, বুজরুদারের মত মাথা নাড়ে। কাজেই—সুবল বলে, এই বেলা ওটা যদি বেচে দাও তো গুচ্ছের টাকা আসবে হাতে।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। সে নিজেও জানে। আর সেই জানায় পর থেকে তার টাকাটার জন্য লোভও হয় খুব। তবু সে সুবলের কথার গা করে নি অত। সুবল তাকে সময় দিয়েছিল। বলেছিল — ভেবে দেখো।

—তা গত কদিন খুব ভাল করে ভেবেছে সখীচরণ। সুবলের কথাটা একে-বারে ফেলনা নয় যে পত্রপাট খারিজ করে দেবে। বস্তুত পাবুল মরে যাওয়ার পর মেয়েমানুষের গতর শোঁকে নি সখীচরণ। সেটা অরুচি বা বৈরাগ্যের দরুণ এমন নয়। আসলে হয়ে ওঠে নি। যদিও এই বয়সে মেয়েমানুষের রহস্য-টহস্য জানার আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না। শরীরের ফিক্স-ফাঁজলাও সব জানা হয়ে গেছে। তবু প্রবৃত্তির জ্বালানিটুকু থাকে, থেকেই যায়। ঘরে বউ থাকলে সেটুকুর নিবৃত্তি হয় অতে। রাত-বিরেতে হামলে পড়া যায়। বাজারের মেয়েমানুষেও হয় অবশ্য। কিন্তু অমন মাগনার নয়। সেখানে ফেল কড়ি মাখ তেল।

সখীচরণের এখন কোনটাই নেই। না বউ, না পয়সা। সে হিসেবে সুবল ঠিকই বলেছে। ও রেখে লাভ নেই। থাকলেই বরং বিপত্তি। শরীর মন উচাটান হয় খামোকা। অ-স্থানে কু-স্থানে ঠেলে।

তবু একটা ভয় রাগী বেড়ালের মত তার শরীরে ফুঁসে উঠত। সখীচরণকে ভয় দেখাত। শাসাত। সেই সময় বলরামের কথা মনে পড়ত খুব।

বলরামের চেহারা ছিল রোগা সিরিঙে। বিড়ির দোকানের পাকান দড়ির মত শুকনো। বাইরে থেকে এ রকম। অথচ ভিতরে ভিতরে রসে টই-টম্বুর। একদিন, সখীচরণ দেখে বলরামের চেহারা বদলে গেছে ভারী। দূর থেকে দেখে পয়লা নজরে চিনতেই পারে নি আদপে। কাছে আসতে দেখে নবপল্লবীর বলরাম। তার গায়ের রঙ এমনিতেই কটা। তার উপর গা-গতরে অফুরান চর্বি জমে চেহারাটা হয়েছে হরি-য়ানার গরুর মত পুরুষ্ট। দেখে সখীচরণ অবাক হয়েছিল খুব। খুশীও। লোকটা এ অঞ্চলে ঝালাইয়ের কাজ করে। বাজারে 'অর ফুটো বালতি ঘটি মেরামত করার দোকান।

কিন্তু বলরামের এখনকার চেহারা দেখলে সে আর প্রত্যয় হয় না। মনে হয় মিষ্টির দোকানের মালিক।

অথচ অমন খোলতাই চেহারা বাগি[redacted]লরাম বড় মনমরা। শিষ ওঠা লণ্ঠ[redacted]ন্ত বিষণ্ণ, হাসে না। মুখ খিঁচিয়ে বলে—ঐ দড়ির মত চেহারাই ভাল ছিল বুঝলে। তাতে আগুন ছিল, সেটা নেভাতে গিয়েই যত বিপত্তি। ঐ যে কথায় আছে না বাঁশ কেন ঝাড়ে....আমার হয়েছে তাই। এই অশিদ বলে যে হাঁপায়। তার মুখের দু কষে সাদা ঘা। ঠোঁট দুটো সামান্য জিরেন পেতেই একটা মাছি এসে বসে সেখানে। বলরামের যেন সাড় নেই কোন। ভ্রূক্ষেপই করে না, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আমার অবস্থা এখন পোয়াতি মেয়েমানুষের মত। ভারী কাজ করতে পারি না মোটে।

কথাটা সত্যি হলে বড় চিন্তার ব্যাপার। মনে মনে উদ্বিগ্ন বোধ করে সখীচরণ।— ডাকতারের কাছে গিয়েছিলে? কী বলে তারা। ডাকতারের কথা শুনে চোলাই গেলার মত বিকৃত মুখ করে বলরাম। ঝাঁঝাল গলায় বলে — ওনাদের কথা বাদ দাও, নানান ফিরিস্তি। বলে, এ নাকি অন্য অসুখ। শরীরের রক্ত সব জল হয়ে গেলে নাকি হয় এরকম।

বলরাম মানুক বা না মানুক সেটাই সত্যি। অন্য কোন রোগ শরীরের দখল নিয়েছিল তার। বিশেষত সে যখন ঐ রকম ফুলতে ফুলতেই মারা গেল শেষ তক। তবু সেই থেকে সখীচরণের মনের মধ্যে একটা খটকা।

সখীচরণ ভাবে। কিন্তু ভেবে কূল-কিনারা হয় না কোন। তবু চিন্তাটা দাঁতের বেয়াড়া ফাঁকে আটকে থাকা কাল-বোস মাছের কাঁটার মত থেকে থেকে জানান দেয়। অগত্যা সে নিজেই গিয়েছিল সুবলের কাছে। এ সব কেস সে করিয়েছে বিস্তর। কী হয় না হয় জানে সব।

[redacted] প্রশ্নটা শুনে সুবল হাসে হো হো [redacted] যেন ভারী মজার কথা বলছে। হাসির গমকে সুবলের শরীর স্টার্ট দেওয়া মোটর গাড়ির মত কাঁপে। কাঁপতেই থাকে। তারপর একটু থিতু হয়ে বলে—তোমায় কে বলেছে। সখীচরণ একবার ভাবল বলরামের কথা বলবে। কিন্তু শেষ অব্দি বলল না, চেপে গেল। শুনে হয়ত আবার হাসবে সুবল। মানুষটা নেই, মরে-ঝরে গেছে। অজ্ঞতার দরুন তাকে এখন হাসির খোরাক করাটা বড় খারাপ। সখীচরণ চুপ্ করে থাকে। তাইতে সুবল আরও ঘো পেয়ে যায়। এককাঠি সরেস গলায় বলে—ও সব বাজে কথা, তুমি নির্ভয়ে কাটাতে পার।

সুবলের কথার ধরন শুনলে মনে হয় ব্যাপারটা যেন কিছুই না। শহরের দোকান থেকে বাহারের চুল ছাঁটার মত সহজ-সরল। এতটা হয়ত নয়। তবু সখীচরণ আশ্বস্ত হয়, বলে—আমি রাজি।

কথাটা শুনে সুবলের খুশি হওয়া উচিত। এতে আড়কাটি হিসেবে তারও কিছু আয়দানী হবে। এত দিন ধরে সেই চেষ্টাই করে আসছে সে। ফাঁক পেলেই অবরে-সবরে নানানভাবে বুঝিয়েছে সখীচরণকে। আজ মক্কেল বাড়ি বয়ে এসে খবরটা দিয়ে গেল, অথচ সুবল তেমন উৎসাহ দেখায় না। বড় নিরুত্তাপ গলায় বলে — তোমার আসল গণ্ডগোলটা অন্য হে। তোমাকে তো একটা বউ যোগাড় করতে হবে।

কথাটা সখীচরণের মাথায় ঢোকে না। ভীক্ষ্ণ চোখে তাকায়—তার মানে।

—মানে একজনকে বউ সাজাতে হবে। টিপ-ছাপ দেবে। জিজ্ঞাসাবাদ করলে বলবে হ্যাঁ এ আমার সোয়ামী।

এরকম হতেও পারে। বউ ভারী দর-কারি জিনিস। আবার বিপজ্জনকও। আর তাই যদি না থাকলে তবে বিচেকটমি করবে কোন দুঃখে। সেই হিসেবে সুবলের পরামর্শটায় যুক্তি আছে। এখন তাকে একটা বউ যোগাড় করতে হবে। সখীচরণ এদিকটা আগে ভাবে নি। কিন্তু এখন বউ পায় কোথায়।

—সে ব্যবস্থাও আছে। সবুল অভয় দেয়, বলে—নিজে না পারো আমাকে গোটা বিশেক টাকা দাও তো চেষ্টা করে দেখি।

[redacted] তো ভারী। পয়সা ফেললে কোনটাই আকাশ নয়। সখীচরণ নিজেই ভাল মন্দ যুটিয়ে আনতে পারে একটা। তাতে গোটা বিশেক কেন তার কমেও হতে পারে। হয়ত নয়, তাই-ই। সুবল ওখান থেকেও কমিশন মারবে। লোকটার দস্তুরই এরকম। ভাদ্রমাসের কুকুরের মত। দিন রাত খালি হা টাকা, যো টাকা করে এখানে ওখানে শুঁকে বেড়ায়। সখীচরণ জানে সবই, কিন্তু এসব কথা এখন সুবলকে বলা যাবে না। হাজার হোক কাজটা বে আইনী। অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে নিতে না পারলে, সুবল বেঁকে বসতে পারে।

সখীচরণ বিনীতভাবে বলে—আর একটু কমে হয় না?

—হবে না কেন হয়। এক টাকা দিলে আট আনা ফেরত দেয় এমনও আছে।

এটা বাগের কথা। সখীচরণ ঢোঁক গেলে। অপ্রতিভ গলায় বলে—যাক্ গে, ছাড়ান দাও। তোমার কথাই থাকল। তবে দেখো যেন গেরস্থ ঘরের বউ-ঝি বলে মনে হয়। এতক্ষণে সুবল হাসে। হাসিটা বড় তৃপ্তির। বলে—বউ বলে বউ, দেখবে একেবারে সতীলক্ষ্মী।

কথাটা রসিকতা করে বলা। আশ্চর্য দেখে সে রকমই মনে হয়। গতকাল সন্ধ্যের সময় সুবল নিয়ে এসেছিল তাকে। তখন ঘুপ্‌চি অন্ধকার। স্পষ্ট করে দেখা যায় না কিছু। সেই কারণেই হয়ত ভাবী রহস্যময় মনে হচ্ছিল তাকে।

সুবল সম্ভবত আগে থাকতেই সব বলা কওয়া করে রেখেছিল। কি কড়ারে সে

ন্যাশনাল ভ্যারাইটিজ

রেজিঃ নং এল-২১০৭

১০০এ, মাণিকতলা মেন রোড,..ব্লক-বি ২, রুম ৮৭, কলিকাতা-৫৪

১৩৮৫ সালের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

হিন্দী, বাংলা, ভোজপুরী, মাড়োয়ারী ভাষায় যাদ্যাভিনয়। মন-মাতানো নাটকাবলী—হিন্দী—সমাজ কো বদল ডালো, কফন, অমর সিং রাঠোর, ঝান্সী কি রাণী, চন্দ্রবল কি জ্বালা ও শহীদ ভগৎ সিং। বাংলা—দেবেন নাথ রচিত "ময়লা সমাজ" এবং রঞ্জন দেবনাথ রচিত "বাঈজির ছেলে"। মাড়োয়ারী—রামচন্দ্রা ও জগদেও কাঙ্গালী। ভোজপুরী-ভাবী

আপনাদের সুপরিচিত শিল্পীবৃন্দ।

পুঃ—সুন্দরলাল, অমল মিত্র, এস এইচ আনসারী, ডি কে সাহা, জগমোহন, চুন্নিলাল সিং, অনিল কুমার ও অসীম কুমার। ভারত বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা—ভগবান দাস।

সঙ্গীত পরিচালনায়—মাষ্টার মোহন সিং।

স্ত্রী—রাণী উর্বশী, মীরা শীল, কেয়া রায়, শকুন্তলা, মিস মীনা, কুমারী অরুণা ও কুমারী নির্মলা।

প্রত্যেক শোর আগে এক ঘণ্টা করে হিন্দী, বাংলা, নাচ, গান ও ভ্যারাইটিজ প্রোগ্রাম হবে।

যন্ত্রস্থ

কোলিয়ারী বুকিং — তৃপ্তি বোর্ডিং

অনিল ভাণ্ডারী — আসানসোল

জেনারেল ম্যানেজার : মাস্তানা জয়পুরী

অফিস ম্যানেজার : সুধীর বসু

স্বত্বাধিকারী—শ্রীমুকুল বসু।

এসেছে, কি বলতে হবে না হবে সব বিস্তারিত। এসব ব্যাপারে ভারী বিচক্ষণ সে। তবু সে ভাবটা করে যেন নিমিত্ত মাত্র। বলে —এর নাম চাঁপা। চাঁপারাণী দাস। ভাল করে দেখে রাখ, কাল যেন অসুবিধে না হয়।

আজ সকালে হাটে এসে এক নজরেই চিনতে পেরেছিল সখীচরণ। সঙ্গে সুবল ছিল অবশ্য—তা সে দেখার আগেই দূর থেকে সখীচরণ দেখে, নিতাই শাব আড়তের সামনে চাঁপা দাঁড়িয়ে। একরাশ কথা হয়ে-ছিল অবশ্য। তবু সে আগে ভাগে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে সখীচরণ এতটা ভাবে নি। চাঁপা দাঁড়িয়েছিল বড় আড়ষ্ট হয়ে। এরা বোধহয় এরকমই। নিশাচর প্রাণী। দিনের আলো সয় না—জ্বালা-ধরা লাগে। যদিও এই জ্বালা-ধরাভাবটা সখীচরণের খারাপ লাগছিল এমন নয়। তবু এটা শেষ অবধি না থাকলেই ভাল। ঘাবড়ে গিয়ে যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে বসে তবেই চিন্তির।

কাছে যেতেই সুবল বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত তর সয় না তার। বলে —তোমরা নিভাট শাব আড়তের পিছনে যাও, ফাঁকায় গিয়ে বোসো, আমি আসছি। কথাগুলো শেষ করে সুবল আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে হাসপাতালের দিকে হাঁটা দেয়।

সখীচরণ দাঁড়িয়ে থাকে একা। আর মেয়েছেলের সামনে একা মানেই বোকা। বিশেষতঃ এরকম অবস্থায়। তেরছা চোখে সখীচরণ চাঁপাকে দেখল একবার। তার বউ

এই পর্যন্ত সখীচরণের বড় পরিষ্কার মনে আছে। তারপরের ব্যাপারটাই গোলমেলে। আর এমনটা হল ঐ বউ কথাটার জন্য। কথাটা মুখের ভিতরে সখীচরণ লোফালুফি করে। তার দুই ঠোঁটের ফাঁকে বউ বউ একটা শব্দ, একটা ঝিড়বিড়ানী আওয়াজ হয় না কোনো, তবু শব্দটা কানের জন্য বাজে। ভারী একটা মজার খেলা যেন। ছেলেবেলার চু-কিত-কিত খেলার মতন। এই বউ বউ শব্দ করতে করতে তার শেষ সীমা অবধি যাওয়ার কথা ছিল, এক এক করে সব কিছু ফুঁকে আসার। পারলে জিত হত। কিন্তু হয় নি। মাঠের বাইরে সে একা পুরি ভাকাত একলা মানুষ। নিঃসঙ্গ।

ফাঁকায় এসে সখীচরণ বলেছিল, তুমি আমার সত্যি বউ হয়ে যাও না কেন। প্রস্তাবটা শুনে প্রথমটায় চাঁপা ভেবেছিল তামাসা। এরকম কথা হামেহাল শোনে সে। তবে এ মনুষ্যটার কথা আলাদা। এরকম অদেখলাপনা কথা শুনলে রাগ হয় চাঁপার। মুখ ঝামড়ে বলে—বউ হলে তোমার সুরোহাটা কীসের।

সখীচরণ প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারে নি। বাস্তবিক সুরাহা যে কী সেটা তার মাথায় ঢোকে না। বউ তো তার একসময় ছিল। তখন সে কী খুব সুখে ছিল? সুখে বা শান্তিতে? কই তেমন তো তার মনে পড়ে না। সখীচরণ বড় নিবিড় হয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। পাবুলকে মুখ চাল ধোয়া জলের মত দেখায়। সামনের একটা দাঁত উঁচু ছিল খুব। মাছি বসলেও টের পেত না পাবুল। এইটেই মনে পড়ে খুব। আর মনে পড়ে একটা গন্ধ। পান্তা ভুকুরে ডুব দিয়ে এসে যেমন একটা গন্ধ হয় শরীরে, আঁশটে, সে রকম একটা গন্ধ।

পাবুলকে এর চেয়ে বেশী মনে করতে পারে না সখীচরণ। তার মাথার ভিতরটা ধানকাটা জমির মত ফাঁকা। সেটুকু মনে পড়ে তার বড় এবড়ো খেবড়ো, অসমান। তবু পাবুল তার বউ। বউ বলেই ডাকত সখী-চরণ। পাবুল নেই, শব্দটাও খসে গেছে বহুকাল।

—সুবাহা, সখীচরণ খুব গভীরভাবে উচ্চারণ করে শব্দটা তারপর দুঃখিতের মত মাথা নেড়ে বলে—জানি নে।

চাঁপা কী বলছে ভেবে পায় না। মানুষটার মাথায় গোলমাল আছে কিছু। চাউনিটা কেমন ভ্যাবড়া গোছের। আপন মনে বিড় বিড় করে। বউ বউ মানুষ অনেক সময় হয় এরকম। আটালিশ মত লেগে থাকে সব কিছুতে। অথচ ভিতরে ভিতরে নিবন্ধ একা।

কিন্তু এরকম মানুষের টাকার থাকতে হওয়ার কথা নয়। হলেও তার একটা মাত্রা আছে। সুবলের উপর হঠাৎ বড় রাগ হয় চাঁপার। আসলে ঐ লোকটাই ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে মানুষটাকে। আর এসে অবধি লোকটা বউ বউ করছে। তবু যদি সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারে একটা। এদের নিয়ে কাজ কারবারে হাঁপা অনেক।

—আমায় দিয়ে হবে নি, বলে তার অবসর দেয় না চাঁপা এক মোদক্কা পানের পিক ফেকে উল্টোবাগে হাঁটা দেয়।

ব্যাপারটা ঘটে বড় আচম্বিতে। সখীচরণ দিশে করতে পারে না কিছু। মাটিতে শ্যাংলো টিউকলের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হুঁশ হতে চীৎকার করে, কিন্তু আওয়াজ হয় না কোনো। নামটা [redacted] পড়ে না। পারুল না কী যেন একটা মনে পড়ে না। তবু সে ছোটে। তার মুখ বউ বউ একটা শব্দ।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হয় নি সখী-চরণকে। সম্ভবও ছিল না। হাটুরে ভিড় বলে, কথা। তবু সে দাঁতাল শুয়োরের মত ভিড়ের মধ্যে একরোখা হয়ে ছুটবার চেষ্টা করেছিল। শেষ অবধি মানুষজন তাকে ধরে বেঁধে থামিয়েছে। তারপর তাকে নিয়ে পড়ল সবাই। কে বউ, কার বউ, তুমিই বা অমন চটছিলে কেন—হাজারো প্রশ্ন।

সখীচরণ মাটিতে বসে পড়েছিল উবু হয়ে। উত্তেজনাটা থিতু হয়েছে কিছুটা। তার বদলে একটা লজ্জা তাকে পেয়ে বসে-ছিল। তখন থেকেই মাটিতে মাথা হেঁট করে সে একটা মুখ আঁকবার চেষ্টা করছিল। তার বউ-এর মুখ।

বিড়ির আগুন সুতো বরাবর এসে একসময় থেমে গেছে। তবু সেটা শূন্য আঙুলের ফাঁকে ধরা ছিল এতক্ষণ। খেয়াল হতেই সখীচরণের অলস আঙুল সামান্য নড়ল কি নড়ল না, বড় আলগোছে খসে গেল সেটা। খসে থেকে আর লাভ নেই। ক্ষ্যাপা-মোটা হাটময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সুবল ফিরবে না।

জল খেয়ে হাতের উল্টোপিঠে মুখ মুছল সখীচরণ। ভেবেছিল অনেকটা খাবে, কিন্তু হলো না। খালি পেটে জল গলা দিয়ে নামতে চায় না মোটে। কেমন একটা থিচুনি হয়। পেটটা পাক দিয়ে ওঠে। বমি আসে মাত্র দু তিন ঢোঁক খেতে পেরেছে। এও অবশ্য থাকবে না—সে জানে। পেটে শক্ত পদার্থ না থাকলে মানুষের শরীর এরকমই। দু মুখ কাটা নলের মত। একদিক দিয়ে ভরলে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। থাকে না।

তবু বেবোতে যতটুকু সময় [redacted] সেইটুকু লাভ। পেটটা সামান্য ভার হালকা হয়েছে। একটু উঁচু মত। ভাবতে ভাবতে পেটে আলতো করে হাত ছোঁয়ায় সে। চিমসে পেট। চত্তির মাসের শুকনো খালের মত। তবু যেন একটু উঁচু হওয়ার কথা। এইমাত্তর দু তিন ঢোঁক জল খেল সখীচরণ। কিন্তু কই উঁচু ভাবটা তো ঠাহর হয় না। পেট অবধি নামে নি নাকি। সখীচরণের ধন্দ লাগে। যদিও এরকম হওয়াটা অসম্ভব। প্রত্যয় হয় না তার। পেটের চামড়া টেনে দেখে সে। আদবখাকি বেড়ালের মত গুর গুর করে শব্দ হয় একটা। পেটের ভিতর জলটা নড়া চড়া করে সেই শব্দ। শুনে সখীচরণ আশ্বস্ত হয় খুব। নিশ্চিন্ত।

তার কাছে বউ-ও এরকম একটা শব্দ। বা একটা নাম। যার চেহারা মনে পড়ে না, অথচ যার শরীরে পানাপুকুরের গন্ধ। আঁশটে।

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। চৌদ্দ ।।

সুখ কাকে বলে?

চেয়ারে বসে টেবিলের ভালো ভালো সাজানো খাবার আয়েস করে গলা দিয়ে নামানো? ভালো ঘরে খাটের ওপর গদির বিছানায় শুয়ে আরামে রাত কাটানো?

তা যদি হয় তো দেড়টা মাস বেশ সুখেই কেটে গেল বাপীর। বাইশ বছরের মধ্যে এমন সুখ আর আরামের নাগাল আর কখনো পায়নি। তবু ভোর হতে না হতে ঘুম ভাঙে। এটা বরাববকার। কিন্তু এই সুখ যখন ছিল না, ঘুম ভাঙার পরেও তখন ইচ্ছে করবে বিশ তিরিশ মিনিট আমেজের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারত। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এখন এই গদির শয্যা পিঠে খোঁচা মেরে তুলে দেয়।

খাট-পাত্য মাকের ধরটা সম্ভবত অতিথি অভ্যাগতর জন্য। কিন্তু দেড় মাসের মধ্যে বাপী একমাত্র পাশের বাড়ির সন্তু চৌধুরী ভিন্ন এই ফ্ল্যাটে অন্য কোনো নতুন মুখ দেখেনি। শুধু খাট নয়, দেয়াল ঘেঁষে চকচকে ড্রেসিং টেবিলও আছে একটা। জিনিসপত্র রাখার দেয়াল আলমারি আছে। ড্রেসিং টেবিলের পাশে আলনাও। গৌরী বউদি এই ঘরটাই বরাদ্দ করেছে ওর জন্য। খাটে নিজের ছেঁড়া-খোঁড়া বিছানা বালিশেরও ঠাঁই হয়নি। গৌরী বউদি বলেছে, তোর ওই রাজ-শয্যা এখানে চলবে না—সরিয়ে রাখ।

নিজেই চাদর বালিশ আর একটা সুদৃশ্য বেড-কভার বার করে দিয়েছে। বলেছে, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে—আমি নোংরা দেখতে পারি না।

গোড়ার তিন-চার দিনের মধ্যে নিশীথ ওর খবর নিতে এসেছিল। থাকার ব্যবস্থা দেখে ওরও চমক লেগেছিল।—লোয়ার

ডিভিশন হলে কি হবে, রাজার হালে আছিস দেখছি। ....তোর মণিদা তাহলে বড় চাকরিই করেন।

এত ঝামেলা সত্ত্বেও ভোর না হতে বাপীর ঘুম ভাঙে। বাথরুম, মুখ-হাত ধোয়া সেরে বসার ঘরের দরজা খুলে পা-টিপে তিন-তলার ছাদে উঠে যায়। আধ ঘন্টার ওপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মজবুত আর তরতাজা রাখার মহড়া চলে। নিঃশব্দে খানিক হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি কাঁপাঝাঁপির পর লম্বা ছিপছিপে শরীরটাকে নানাভাবে দুমড়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে হাড়গোড়সুদ্ধু যথেচ্ছ বশে আনার চেষ্টায় দরদর করে ঘাম ছুটতে থাকলে এ-পর্বের শেষ। বানারজুলির দৌড়-ঝাঁপ আর জঙ্গল টহল দিয়ে বেড়ানো বন্ধ হবার পর থেকে বাপী এই অভ্যেসের দাস। কোন দিন বাদ পড়লে বিচ্ছিরি লাগে, গা ম্যাজ-ম্যাজ করে। ঘরের বদলে এখানে খোলা ছাদ পেয়ে আরো সুবিধে হয়েছে। দেড় মাস লালিত ভুঁড়ের বাড়িতে একসঙ্গে কাটানোর সময় সেই পেটুক-ভর ওর এই কসরত করা দেখে খুশি হয়ে দু-তিনটে যোগ-ব্যায়ামও শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জানতাম তো অনেক কিছু, এসব কবলে রাক্ষুসে খিদে হয় —তাই ছেড়ে দিয়েছি।

ঘাম ঝরতে সময় লাগে। ততক্ষণে পুবের কোণে লাল সূর্যটা খুব একটু একটু করে আকাশের ডাঙায় উঠে বসে। বাপীর ভিতরে তখন শুচি ভাব-টাব কিছু জাগে না। দেখতে শুধু ভালো লাগে। রোজ দেখে, তবু রোজই নতুন মনে হয়।

নিচে নেমে প্রথম কাজ শেভিংয়ের পর নিঃশব্দে স্নান সেরে আসা। আগে তিন দিনে একদিন শেভ করত। কিন্তু গৌরী বউদির চাও চোখে লেগেছিল। একবার চারদিন পরের শেভ করা মুখের দিকে চেয়ে চা খেতে খেতে বলেছিল, কালো মুখখানা তো ভালই দেখায়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি রেখে ভূতের মতো থাকিস কেন—রোজ কামাতে পারিস না?

গৌরী বউদি মিষ্টি কথার ধার ধারে না, এই বলাটুকুর মধ্যেও বকুনির সুর। শুধু শেভ করা নিয়ে নয়, বাড়িতে আধ-ময়লা ধুতি পরে থাকাটাও তার চক্ষু-শূল। সেই গোড়ার তিন-চার দিনের মধ্যেই বলেছিল, বাড়িতে পরিষ্কার পা-জামা পরবি, টাকা না থাকে তো আমার থেকে ধার নিয়ে কয়েকটা করিয়ে নে—মাস কাবারে দিয়ে দিবি।

পুঁজির টাকায় হাত পড়েনি। সেই দিনই আপিস ফেরত একসঙ্গে তিনটে পাজামা আর তিনটে সাদা পাঞ্জাবির অর্ডার দিয়ে এসেছিল। আপিসের জন্য পাঞ্জাবি বানানোর কথা আগেই ভেবে রেখেছিল।

...গৌরী বউদির ধারালো মুখে হাসি-ঠোঁয়া রসিকতাও যাবে। প্রথম যেদিন শেভিংয়ের পর স্নান সেরে মাথা আঁচড়ে সেই পাজামা পাঞ্জাবি পরে ঢায়ের টেবিলে এসে বসেছিল, গৌরী বউদি একটু বড় বড় চোখ করে ওর দিকে চেয়ে ছিল। ঠোঁটে হাসির ফাটলও দেখা গেছল একটু। তারপর বাচ্চুর আর মণিদার সামনেই বলেছিল, বাঃ, তোকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে যে রে!

মণিদা ভারী মুখ টিপে হাসছিল। মায়ের কথা শুনে আরো বেশি হেসেছিল সাত বছরের ছেলেটা। আর যতটা সম্ভব বোকার মতো লজ্জা পেতে চেষ্টা করছিল বাপী। কিন্তু ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে কারা যেন কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

স্নান সারা হবার পর বাপীর একটা বড় কাজ কাতুকুতু দিয়ে আর খুনসুটি করে বাচ্চুর ঘুম ভাঙানো। এখানে আসার চার-পাঁচ দিনের মধ্যে মায়ের কাছে বায়না তুলে বাচ্চু তার শয্যা বদল করেছে। এতদিন ছেলেটা বাড়িতে প্রায় নিঃসঙ্গ ছিল। কার সঙ্গে কথা বলবে, কার সঙ্গে খেলা করবে? মন্তু কাকা অবশ্য খুব ভালো, ওকে কত রকমের খেলনা কিনে দেয়, ছবির বই কিনে দেয়, ওর জন্য বড় বড় লজেন্স চকোলেটের বাকস নিয়ে আসে। কিন্তু এক রবিবার সকালে ছাড়া তাকে আর পাচ্ছে কতটুকু। সন্ধ্যার পরে যখন আসে তখন তো কেবল মায়ের সঙ্গেই আড্ডা দেয়। বাচ্চুকে তখন পড়ার বই নিয়ে বসতে হয়। বাবা বেশির ভাগ দিন সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। যেদিন আগে এসে পড়ে সেদিন অবশ্য বাচ্চুর খুব মজা। বাবা ওর সঙ্গে গল্প করে, খেলা করে, নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। না, মায়ের সঙ্গেই ওর সব থেকে কম ভাব। মা মারে টারে না, কিন্তু একটু কিছু হলেই এমন করে তাকায় যে তাতেই ওর কান্না পায়। মা কখনো ওর সঙ্গে খেলেটেলে কিনা বা ওকে আদর করে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ছেলেটা পরিষ্কার জবাব দিয়েছিল, মা খেলতেও জানে না, আদর-টাদরও জানে না।

দুদিনের মধ্যেই বাপী কাকুকে খুব ভালো লেগে গেছে বাচ্চুর। ওর ভিতরেও তো কত কথা জমা হয়, কিন্তু সেসব শোনার বাড়িতে আর দ্বিতীয় লোক নেই। বাপীকাকু শোনে, হাসে, ওর বুদ্ধির তারিফ করে। বিকেলে আপিস থেকে ফিরে ওকে নিয়ে বেড়াতে যায় নয়তো দুজনে ছাদে গিয়ে হুটোপুটি করে। কিন্তু খেলাধুলো বা ছুটোছুটিতে এতবড় মানুষটা কেন যে সব সময় ওর সঙ্গে হেরে যায় বাচ্চু ঠিক বুঝতে পারে না। আর কত রকমের মজার গল্প করে করে পড়ায়। পড়তে একটুও খারাপ লাগে না।

রাতে বাপীকাকুর সঙ্গে শোয়ার হুকুম মিলেছে এই পড়াশুনার ছুতো ধরে। বাবা-মা ঘুম থেকে ওঠে সাড়ে সাতটায়, বাচ্চু তারও পরে। মুখ হাত ধোয়া আর সকালের খাওয়া সেরে পড়তে বসতেই সাড়ে আটটা। ওদিকে নটা বাজতে না বাজতে বাপীকাকুর আপিসের তাড়া। সকালে পড়বে কখন। অথচ বাপীকাকু ওকে বলেছে, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারলে বাবা-মা ওঠার আগে ওর পড়াই শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সকালে ও উঠে কি করে?

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে ছেলে পড়াশুনার উৎসাহ তার মা ঠিকই লক্ষ্য করেছে। আর ফাঁকে ফাঁকে সকাল সন্ধ্যায় বাপীর পড়ানোর ব্যাপারটাও ঠিকই দেখেছে। যত হাঁদাই ভাবুক, গরিবের ছেলের এদিকে যে কিছু পটুতা আছে, সেটা তার মনে হয়েছে। এই জন্যেই শেষে ছেলের বাপী-কাকুর সঙ্গে শোয়ার অনুমতি মিলেছে।

বাপী ঠিক ছটায় ওকে ঠেলে তোলে। মুখ-হাত ধুইয়ে পড়াতে বসতে বসতে সাড়ে ছটা। আটটার মধ্যে পড়া শেষ। অত ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতে সহজে চায় না। কিন্তু ওঠার পরে ওইটুকু সকালের মধ্যে স্কুলের সব পড়া সেরে ফেলার মজাটাও জানা ছিল না। আর প্রথম দিনেই ওর পড়া নিয়ে বাপী-কাকুর সাহস দেখে তো বাচ্চু অবাক। চায়ের পাট শেষ হতে মা বলেছিল, যা আবার বই নিয়ে বোস্‌গে—

মায়ের হুকুম হলে বাচ্চু প্রতিবাদ জানে না। বাচ্চু কেন, কেউ জানে না। কিন্তু বাপীকাকু টক করে বলে দিল, সকালে দেড় ঘন্টা টানা পড়া হয়ে গেছে, আবার বই নিয়ে বসবে কি! ওকে বলেছে, না রে, এখন আর পড়তে হবে না, তোর খেলার জিনিস কি আছে বার কর, আমি দেখব। তারপর আবার হেসে মাকে বলেছে, আমার হাতে ছেড়েছ, কটা দিন সবুর করে দেখো—

বাচ্চু ভেবেছিল, মা রেগেই গেল। বাপীকাকুর দিকে ভুরু কুঁচকে একটু তাকিয়েও ছিল। তারপর বাবার দিকে ফিরে কি রকম মজার সুরে বলেছিল, আবার দেমাকও একটু আছে দেখি!

বাপীর আপিস সেই খিদিরপুরে। নটার মধ্যে সে একলাই ভাত খেতে বসে যায়। মণিদা সাড়ে নটায় খেতে বসে। তার আগে বাপী খাওয়া শেষ করে বেরিয়েই পড়ে। সকালের খাওয়ার সময় কেউ তদারক করতে আসে না। তবু ভিখুর কল্যাণে সকালের সেই তাড়ার মধ্যেও খাওয়াটা ভালই জোটে। দশটা-পাঁচটা আপিস। জোয়ার ডিভিশন হলেও সেখানকার আপার ডিভিশনরাও ইদানীং ওর প্রতি তলায় তলায় ঈর্ষান্বিত একটু। তার কারণ বড়বাবু মন্মথ সোমের অহেতুক স্নেহ। সেই স্নেহ যে এখন বাড়তির দিকে সেটা বাপীই সব থেকে ভালো অনুভব করতে পারে।

বড়বাবুকে হাসতে বড় দেখে না কেউ। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার সময় মন্মথ সোম একটু-আধটু হাসেনও। প্রায়ই ওকে নিজের খুপরিতে ডেকে নিয়ে সামনে বসিয়ে কাজ করান। সফলের চোখে, বাপীর চোখে তো বটেই, এ-ও এক ভাগ্যের লক্ষণ। কাজের ফাঁকে অন্য কথাও দু-চারটে বলেন। বাপী এখন কোথায় আছে তাও জেনে নিয়েছেন। অত দূরে থেকে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে

ঠিক দশটায় হাজিরা দেওয়া ধকলের ব্যাপার কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপীর কখনো লেট হয় না —এজন্যেও ভদ্রলোক খুশি। নিজের মুখেই সে-কথা বলেছেন। চাকরি-বাকরির মন্দা বাজার আর অনিশ্চয়তার কথাও মাঝে মাঝে বলেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহও দেন একটু। বলেন, লেগে থাকো, আমি তো আছি—দেখা যাক।

দুটোয় সময় নিজের একটা খুপরি ঘরে টিফিন করতে যান তিনি। ইদানীং মাঝে মাঝে বেয়ারা মারফৎ সেখানেও ডাক পড়ছে ওর। নিজের টিফিন বাক্স থেকে টিফিন বার করে ওকে খেতে দেন। বাপী তখন সত্যি খুব লজ্জায় পড়ে যায়। কিন্তু ভদ্রলোক বলেন, আমি তো তোমার বাবার মতো, লজ্জা কি, খাও।

কেরানি মহলে মন্মথ সোমের সুনাম খুব নেই। কিন্তু বাপী মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারে না। নিশীথের বাবা তাঁর রোগ সারিয়েছেন, সেই কৃতজ্ঞতায় অজানা অচেনা একটা ছেলের প্রতি এত স্নেহ যাঁর, বাপী তাঁকে খারাপ ভাববে কেমন করে। নিশীথের রাম-কাকাও মাঝে মাঝে ওকে বলেন, বড়বাবু তোমার ওপর খুব খুশি—তোমার ভাবনা নেই।

অতএব, মাইনে যা-ই হোক, আপিসেও কর্তার সুখের দিনই চলেছে। বিকেলে বাড়ি ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে খাবার টেবিলে ভিখু জলখাবার সাজিয়ে দেয়। এরকম জল-খাবার খেতেও বাপী খুব অভ্যস্ত নয়। পরি-পাটি ব্যবস্থা। ভিখুর ওঠা-বসা চলা-ফেরা সবই বাড়ির কর্তার নির্দেশে। এখানে কর্তা কেউ নেই, একজন শুধু কর্ত্রী। ভালো খাওয়া-দাওয়া বা আরামে থাকার ব্যাপারে গৌরী বউদির এতটুকু কার্পণ্য নেই সেটা স্বীকার করতেই হবে। রাতের খাওয়া সকালের থেকেও ভালো। খাবার টেবিলে সে-সময় বাপীর দোসর শুধু বাচ্চু। মণিদা তো থাকেই না গৌরী বউদিও সে সময় কমই বাড়ি থাকে। থাকলেও রেডিওর গান বা নাটক শোনে, নয়তো গল্পের বই পড়ে। সন্তু চৌধুরী এলে তার সঙ্গে গল্প করে।

রাতের খাওয়ার পর বাচ্চুর সঙ্গে গল্প করতে করতে আরামের শয্যায় শুয়ে ঘুম।

যা-ই হোক, সুখের এই যদি হিসেব হয় বাপী সুখে নেই এ সে নিজেও জোর করে বলতে পারবে না। কিন্তু থেকে থেকেই বাপীর কেমন মনে হয়, এরকম সুখের সঙ্গে কোনো শিকড়ের যোগ নেই। একটা আলগা সুখের হাওয়ায় ও ভাসছে। হঠাৎ কোনো কারণে হাওয়াটা বন্ধ হতে পারে। হুলে খুপ করে মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে।

ফলে এই দেড়টা মাস চোখকান সর্বদাই সজাগ তার। সুবিধে এই, মুখ দেখে সেটা কেউ বুঝতে পারে না। এই দেড়টা মাসে বাপী অনেক জেনেছে, অনেক বুঝেছে।

মণিদা তেমন বড় চাকরি কিছু করে না। কাস্টমস-এর ইন্সপেক্টর। আগে ছিল প্রিভেনটিভ অফিসার, তার থেকে ইন্সপেকটর হয়েছে। মণিদা কথায় কথায় নিজেই গল্প করেছে, এর মধ্যে বার দুই আর একটা প্রমোশনের কথা উঠেছিল তার। কিন্তু আর প্রমোশন-টমোশন সে চায় না। এই বেশ আছে।

কেন বেশ আছে বাপী ভালই আঁচ করতে পারে। সেই আটচল্লিশ সালে ইন্স-পেকটরের মাইনে সর্ব-সাকুল্যে সাড়ে চারশ পাঁচশর মধ্যে। বাপীর ধারণা, ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে এই হালে মাস চালাতে কম করে বারোশ টাকা লাগে মণিদার। সেটা কি করে আসে আর কোত্থেকে আসে বোঝা কিছু শক্ত নয়। বাবার সেই ঠাট্টা ভোলেনি। বলেছিল, ওখানে তো মাইনের থেকে উপরি বেশি শুনেছি। প্রমোশন নিলে এই উপরিতে ঘাটতি পড়ে নিশ্চয়। মণিদা কেন সকাল দশটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে ঘরে ফেরে না তাও আঁচ করা সহজ। কাস্টমস-এর ব্যাপারে হানাদারির কাজ লেগেই আছে। এটা যত বেশি হয়, পকেটে কাঁচা টাকার আমদানিও তত্তো বাড়ে। শুধু টাকা কেন, ভালো ভালো জিনিসও কম আনতে দেখছে না বাপী।

ফাঁক ভালে মণিদাকে নিজের ওখানে চাকরির তাগিদ দিতে গিয়ে বাপী আরো কিছু বুঝে নিচ্ছে। মণিদা খোলাখুলি বলেছে, কেরানির চাকরির ভবিষ্যত ওখানেও কিছুই নেই। আর প্রিভেনটিভ অফিসারের চাকরি সে-রকম ধরা-করার জোর না থাকলে তো হয়ই না। তার ওপর ঘুষ লাগে এন্তার। এই প্রসঙ্গেও নিজের সম্পর্কে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছিল। প্রিভেনটিভ অফিসার থেকে প্রমোশন পেতে আমারই কালঘাম ছুটে গেছল বুঝলি? বছরের পর বছর ওই এক জায়গায় ঘন্টে মরছিলাম। শেষে সন্তু চৌধুরীর এক খাতিরের মুরুব্বির জোরে হয়েছে—তাও কি এমনি, করকরে পাঁচটি হাজার টাকা তার পকেটে গুঁজে দিতে হয়েছে।

দুয়ে দুয়ে চারের হিসেবটা বাপী বড় সহজে করে ফেলতে পারে। ওর ধারণা, মুরুব্বির পকেটে গোঁজা ওই করকরে পাঁচ হাজার টাকাও সন্তু চৌধুরীর পকেট থেকেই খসেছে। কিন্তু মণিদার উন্নতির জন্য তার এত উদার হবার কারণ কি?

সন্তু চৌধুরীর গল্প শুনতেও বাকি নেই। মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। শিবপুর এনজিনিয়ারিং পড়তে পড়তে মাঝ-পথে ছেড়ে দিয়েছিল। মামার কনট্রাকটরি ব্যবসায় ঢুকে পড়েছিল। সেই মামাটির আবার অনেক রকম বদ দোষ আর নেশা-টেশা ছিল। হুট্ করে মরেই গেল একদিন। ব্যবসার হাল সেই থেকে সন্তু চৌধুরীর হাতে। রোজগার-পাতি আগেও ভালই হচ্ছিল। একেবারে লাল হয়ে গেল এই যুদ্ধের বাজারে। ধুলো-মুঠি ধরলে সোনা।

বাপী বোকা-মুখ করে জিজ্ঞাসা করে-ছিল, ভদ্রলোকের এত টাকা-কড়ি, তবু এত বয়েস পর্যন্ত বিয়ে করলেন না যে?

কত আর বয়েস, বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি নয়। করবে হয়তো একদিন। হেসে হেসে মণিদা জবাব দিয়েছিল, মেয়ে জাতটার ওপরেই ওর বিতৃষ্ণা—এখন যারা এগিয়ে আসে তারা কেবল নাকি ওর বাড়ি গাড়ি আর টাকা দেখে এগিয়ে আসে—ওকে দেখে নয়। মামার সঙ্গে যখন ছিল, তখন এক মেয়েকে ওর মনে ধরেছিল, আর স্মার্ট ছেলে দেখে সেই মেয়েও বেশ ঝুঁকেছিল। কিন্তু মামার ফার্ম শুনে বাড়ির লোক ছেড়ে সেই মেয়েও বেঁকে গেল। সেই মামার ফার্মে তখন সে ও চার আনার মালিক হয়ে বসেছে রাগের চোটে সেটা আর বললই না। আর একবার এক জায়গায় বিয়ে প্রায় ঠিক, কিন্তু সেই বাড়ির লোকেরা চুপি চুপি ওর ব্যাঙ্কে ব্যালেন্সের খবর নিচ্ছে দেখে রেগে-মেগে বিয়ে ভণ্ডুল করে দিল।

আসলে ও একটু স্নেহের কাঙাল, বুঝলি। তোর বউদির কাছে ওটুকু পায় বলেই কেনা হয়ে আছে।

মণিদার এভাবে বলার আগ্রহটা যেন ওর শোনার আগ্রহ থেকে কম নয়। বউদির স্নেহ আর অন্যজনের কেনা হয়ে থাকার নমুনা বাপী এই দেড় মাস ধরেই দেখছে। অবাকও লাগে। এর মধ্যে রাঁধা-ঢাকার কোনো ব্যাপার নেই। রোববারের সকালে ভদ্রলোকের বেশি বাজার করা এবং এখানে খাওয়া প্রায় বরাদ্দ। তাছাড়া সপ্তাহের মধ্যে সাত দিনই গৌরী-বউদি সন্ধ্যার পর হয় নিজের শোবার ঘরে বসেই তার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, নয় তার গাড়িতে হাওয়া খেতে বেরুচ্ছে, নয়তো ছুটা-নটার শোতে সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। মণিদা সাধারণত রাত দশটার আগে ফেরে না, কিন্তু গৌরী বউদি মাঝেসাঝে বাইরে থেকে রাতের খাওয়া সেরে তারও পরে ফেরে। এ-নিয়ে মণিদার মুখে কখনো কোনো অভিযোগের লেশমাত্র দেখেনি বাপী। এমন কি ফেরার পর কোথায় গেছল, সে-খবরও নেয় না। গৌরী বউদি নিজের থেকে বলল তো শুনল।

বানারজুলির সেই হাসি-খুশি গৌরী বউদির এত উন্নতি দেখে বাপীর তাক লেগে যায়। দুনিয়ায় কাউকে যেন কেয়ার করার কিছু নেই তার। ....স্নেহ পাওয়া আর কেনা হয়ে থাকার নমুনা দেখে এখানকার প্রথম সকালেই বাপীর স্নায়ু-গুলো এক-প্রস্থ নাড়াচাড়া খেয়েছিল... মণিদা কাজে যাবে, সন্তু চৌধুরীর গাড়িতে বাপীর সঙ্গে ছেলেকে চিড়িয়াখানা দেখতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল গৌরী বউদি। তার পলকের কটাক্ষে সন্তু চৌধুরীও যেন কিছু অযাচিত করুণার আশ্বাস পেয়েছিল। .. ও-রকম দেখাটা বা ভাবাটা নিজের একটা বিতিকিচ্ছিরি রোগ ভাবতে চেষ্টা করেছিল বাপী।

কিন্তু না। নিজের দুটো চোখ ওকে বড় ঠকায় না।

বাপীর এখন হাসি পায়। মণিদার কথা ভেবে অবাক হয় আবার একটু দুঃখও হয়। মণিদা সত্যি কি কিছু বোঝে না? আর রাগ হয় এই ছোট্ট ছেলেটার দিকে তাকালে। ওকে পেয়ে বাচ্চু যেন বর্তে গেছে।

তবে গৌরী বউদিও বাপীর ওপর সদয় এখন। কারণ ছেলে। দেড় মাসের মধ্যে শেষের পর পর চারটে উইকলি রিপোর্টে বাচ্চু ক্লাসে ফার্স্ট। মাথা খাটিয়ে পড়াটা আনন্দের জিনিস করে তুলতে পারলে আর নিয়ম করে দু বেলা নিয়ে বসলে ওটুকু ছেলের ফার্স্ট না হওয়াটাই আশ্চর্য।

বৈঠকখানায় বসে রবিবারের সেই সকালে বাচ্চুকে পালোয়ানের গল্প শোনাচ্ছিল বাপী। সামনে সেই পালোয়ানের ছবির বই খোলা। গৌরী বউদি এসে দাঁড়াল আর বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞাসা করল, আপিসের চাকরি কেমন চলছে?

তাৎপর্য না বুঝে বাপী বলল, খাঁড়া তো ঝুলছেই, যে-কোনদিন গলায় নেমে এলেই হল।

গৌরী বউদি বলল, তোকে ভাবতে হবে না, সন্তুকে বলে রেখেছি, ও নিয়ে নেবে। আজ এলে কথা বলে নিস—

ছেলের ফার্স্ট হওয়ার পুরস্কার সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। বাপীর ফাপরে পড়া মুখ। আমতা আমতা করে জবাব দিল, এ-রকম চাকরিতে একজনের মর্জির ওপর ভালো-মন্দ, তার থেকে ওই ক্রিসমসেই কিছু হয় কিনা দেখ না বউদি।... সেই গোড়ার দিনে তুমি মণিদাকে বলেছিলে হাত-কড়া পরতে হবে, .. লোডশেডিংয়ের মধ্যে গিয়ে না পড়লে তা কেন হবে।

ভুরু কুঁচকে তাকালো গৌরী বউদি। অখুশি আবার একটু অবাকও। এ ছেলে এমন কথা বলতে পারে ভাবে নি। বলল, মাথা তো বেশ খেলে দেখছি ক্রিসমস-এর চাকরি কি আমার হাতের মুঠোয় যে চাইলি আর দিয়ে দিলাম।

বাইরে চটির শব্দ। বাপী আর কিছু বলার ফুরসৎ পেল না। সন্তু চৌধুরী ঘরে ঢুকল আর হেসে প্রথমে ছেলেটাকে তোয়াজের সুরে জিজ্ঞাসা করল, বাচ্চুবাবুর কি করা হচ্ছে?

গল্প আর খেলার মাঝে মাঝের এসে দাঁড়ানোটা বাচ্চুর তেমন পছন্দ হয় নি। সোৎসাহে নিজের জগতে ফেরার ইচ্ছে। বলল, বাপী কাকুর কাছে পালোয়ানের গল্প শুনছিলাম—আমিও পালোয়ান হয়ে গেছি, বাপী কাকুকে একবার পাল্লায় হারিয়ে দিয়েছি। আর একবার হারাবো দেখবে?

গল্পের ফাঁকে এই কসরত একবার হয়ে গেছল। সোফায় বসে হাসি মুখে সন্তু চৌধুরী তাল দিল, বেশ, কেমন পালোয়ান দেখা যাক।

—বাপী কাকু চলে এসো!

সামনের ছোট টেবিলে কনুই রেখে আর এক-প্রস্থ পাঞ্জা লড়ার মহড়া হল। বাপী কাকুর হাত নড়ছে না দেখে আগের বারের মতো বাচ্চু তার ছোট্ট শরীরটা ওই হাতের ওপর চাপিয়ে দিতে বাপী যেন আবারও হাল ছেড়ে হার মানল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সন্তু চৌধুরী হাসি মুখেই মন্তব্য করল, ওকে অতটা ঠকানো উচিত নয় যাদব, তোমার ভুল করা উচিত ছিল।

ছোট্ট ছেলেটা কি বুঝল সে-ই জানে। চ্যালেঞ্জের সুরে বলে উঠল, তুমি বাপী কাকুর সঙ্গে জিততে পারবে? লড়ে দেখো দেখি?

সন্তু চৌধুরীর খুশির মেজাজ। তাকেও ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল। সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজে সিল্কের পাঞ্জাবির হাত গোটাতে গোটাতে এগিয়ে এলো। পরিপুষ্ট বাহু। হালকা ব্যঙ্গের সুরে বলল, ওকে জোয়ান বানাচ্ছ, তোমার নিজের কেরামতিটা দেখা যাক।

এই ছেলেমানুষি দেখেই হয়তো গৌরী বউদির ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস একটু। বাচ্চু আনন্দে হাত-তালি দিয়ে উঠল। আর বাপী যেন একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল। বলল, লেগে-টেগে যাবে না তো...।

শুনে জোরেই হেসে উঠল সন্তু চৌধুরী। বলল, তোমার পক্ষে ওই বাচ্চুই নিরাপদ তাহলে—

আমতা আমতা করে বাপী বলল, না, আমি আপনার কথা বলছিলাম ..

সন্তু চৌধুরী থমকালো এবার। ছোট চোখ গোল হল। নিরীহ গোছের এই শেষের কথা শুনে গৌরী বউদিও কম অবাক নয়।

—আমার লেগে যাবে। হাউ ব্রেভ্ অ্যান্ড হাউ কাইন্ড ইউ আর এসো তো, দেখাই যাক্ একবার—

টেবিলের সামনের সোফায় জাঁকিয়ে বসল। এমন কথার পর সমুচিত শিক্ষা দিলেই নয় যেন।

মাথায় সমান সমানই, লম্বা হবে দুজনে। কিন্তু গায়ে গতরে, সন্তু চৌধুরী হৃষ্টপুষ্ট অনেক বেশি। লোকটার গায়ে জোর কেমন বাপীর ধারণা নেই। তবে মনে হয়েছে, এই লোককে জব্দ না করতে পারলে সত্যের জোর বলে কিছু নেই। মনে হয়েছে, শাশীরের জোরটাই সব নয়। তাই অমন কথা অতি সহজে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

টেবিলে কনুই রাখল। হাতে হাত মেলালো। ও-ঘর থেকে মণিদাও এসে হাজির তখন। মজা দেখছে। বাচ্চুর উত্তেজনা চরমে। আর গৌরী বউদি যেন অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে চাপ দিয়ে বাপীর হাত নোয়াতে চেষ্টা করছে সন্তু চৌধুরী। কিন্তু হাতটা যেন মাটিতে পোঁতা লোহা একখানা। ফর্সা মুখ টকটকে লাল রঙ হয়ে উঠেছে সন্তু চৌধুরীর। নভেম্বরের গোড়ার হালকা ঠান্ডা সত্ত্বেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে। বাপীর মুখে ছেলে-মানুষি কৌতুক। এক-একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে। ও যেন তাকে সুযোগ দিচ্ছে, সময় দিচ্ছে।

হাত সোজা রেখেই সোজা হয়ে বসল একটু। তারপর জোর বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসিটুকু ধরে রাখার চেষ্টা বাপীর। ও জিতবে সেটা অবধারিত এখন। সেই চাপ ঠেকানোর চেষ্টায় সন্তু চৌধুরী দরদর করে ঘামছে। তবু ঠেকানো গেল না। কাত হয়ে হাতের পিছনটা টেবিলে শুয়েই পড়ল শেষে।

আনন্দে হাত-তালি দিয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগল বাচ্চু। পকেট

থেকে রুমাল বার করে সন্তু চৌধুরী ঘাম মুছছে। রীতিমতো হাঁপাচ্ছেও। মণিদা অবাক বেশ। গৌরী বউদি বাপীকেই দেখছে। তার চোখে নতুন বিস্ময়।

পকেটে রুমাল রেখে সন্তু চৌধুরী হাসতে চেষ্টা করল। হাসিটা খুব অকৃত্রিম নয়। বাপীর অন্তত মনে হলো তার পুরুষকার ঘা খেয়েছে একটু। সন্তু চৌধুরী হেসেই বলল, কংগ্রাচুলেশনস। ...তোমার চেহারাখানা স্রেফ ডিসেপটিভ ভায়া, না বুঝে ঠকেছি।

বাপী লজ্জা-লজ্জা মুখ করে সোফা ছেড়ে উঠল। বাচ্চুকে নিয়ে ও-ঘরে যাবে। আর তখনি কেন যেন একটু উদার হতে চাইল সন্তু চৌধুরী। বলল, তোমার বউদি আমার ফার্মে নিয়ে নেবার কথা বলছিলেন তোমাকে। একদিন বাড়ি এসো, আলোচনা করা যাবে।

বাপী নিরুত্তর। একটু বিব্রতও যেন। জবাব গৌরী বউদিই দিল, একটু তির্যক সুরে বলল, কোনো একজনের মর্জির চাকরি করার ইচ্ছে নেই ওর, ফ্রিডম-এ ঢুকতে চায়—

সন্তু ঘোষ আবারও যেন তেতো গিলল একটু। —তুমি বলেছিলে বলেই বলা, ইন দ্যাট কেস আই কান্ট হেল্প।

বাচ্চুর হাত ধরে বাপী তেমনি বিব্রত মুখ করেই বেরিয়ে গেল। পরে সমস্ত দিনের মধ্যে গৌরী বউদি যে অনেক বার লক্ষ্য করেছে ওকে, সোজা না তাকিয়েও বাপী সেটা অনুভব করেছে। ...সন্তু চৌধুরী বলেছিল, অ্যাপিয়ারেন্স ডিসেপটিভ। অর্থাৎ বাইরে যেমন দেখায় ভিতরে তেমন নয়। চাকরির কথায় আর পাঞ্জা লড়ার ব্যাপার দেখে গৌরী বউদিরও যেন সেই সংশয়।

কদিন পরের বাদে বাপীরই ভুলে সেই সংশয়ের ওপর আবার যেন নতুন আঁচড় পড়ল একটা। বোধবার না হলেও কি একটা ছুটির দিন সেটা। মণিদাও বাড়িতে। ফুরসৎ মিললে তার কাগজ পড়ার বাতিক। বসার ঘরে কাগজ পড়ছিল। এ-ঘরে বাপী আর বাচ্চু। ছেলেটায় এক্ষুনি বেড়াতে যাবার বায়না। সদ্য কেনা একটা সান গ্লাস পরে গৌরী বউদি ঘরে ঢুকল। হাল-ফ্যাশানের মোটা লালচে ফ্রেমের চশমা। মস্ত মস্ত দুটো কালচে লাল কাঁচ। চোখ ছেড়ে ওপর নিচের অনেকটা ঢাকা পড়েছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল একটু। তারপর বাপীর দিকে।

—কেমন হল?

বাপীর মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এলো, বেশ মিস্টিরিয়াস লাগছে। পরক্ষণে আবার সামাল দিল, মানে বেশ ভালো লাগছে....

গৌরী বউদির নতুন চশমা হাতে নেমে এলো। ভুরু দুটো প্রায় স্বভাবে কুঁচকোয় এখন। —মিস্টিরিয়াস লাগছে। মানে বেশ ভালো লাগছে?

বাপী আর তার দিকে তাকালও না, কথাও বোধহয় কানে গেল না। বাচ্চুকে তাড়া দিল, যাবি তো চল—

গৌরী বউদি বসার ঘরে চলে গেল। সেখানে সামনে মণিদা। গৌরী বউদির ধার-ধার কথা কানে এলো, তোমার ওই ভাইকে যত হাঁদা ভাবি আমরা ততো নয়—বুঝলে? সন্তুও সেদিন ওই কথাই বলছিল।

—কি হল আবার....। মণিদার গলা।

গৌরী বউদির কথা আর শোনা গেল না। সিঁড়ি দিয়ে ততক্ষণে সে হয়তো নিচে নামছে। কারণ, নিচে থেকে প্রায় তাগিদ দেবার মতো করেই গাড়ির হর্ন বেজে উঠেছে।

সরলতার মুখোশ খুলে গেলে সুবিধে হবে না বাপী জানত। কিন্তু পরের মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ওটা ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার হয়ে গেল। বাপী তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোমের ছোট কেরানি বিপুল তরফদারের প্রতি অমন অঢেল স্নেহের কারণটা আকাশ থেকে হঠাৎ একটা গোলার মতো নেমে সোজা বক্ষতালুতে আঘাত করেছে। শনিবার হাফ-ডে। আপিসের কিছু কাজের অছিলায় সেদিন মন্মথ সোম তাকে সঙ্গে করে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। থাকেন হাওড়ায়।

ফাইল মেলানো কম মিনিটে হয়ে গেল। তারপর ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা প্রচুর আপ্যায়ন করলেন। ঘরের তৈরি অনেক কিছু খাওয়ালেন। কিন্তু সেই ভালো ভালো খাবার বাপীর গলা দিয়ে নামে না। কারণ, সেই আপ্যায়নে যোগ দিয়েছে বছর একুশ-বাইশের একটি মেয়ে। সোম কর্তা-গিন্নীর একমাত্র মেয়ে। নাম ঊষা। বেশ ফর্সা আর মোটাসোটা, কিন্তু মুখে কোন রকম শ্রীর লেশমাত্র নেই। সেই মুহূর্তে বাপী ব্যাপার বুঝে নিয়েছে। আর সেই প্রথমে ওর বাইশ বছর বয়েস শুনে মন্মথ সোম কেন খুশি হন নি তাও বুঝেছে। এমন কি ছাঁটাইয়ের বাজারে চাকরি কেন পেয়েছিল তাও আর অস্পষ্ট নয়। কর্তা-গিন্নী মেয়ের সামনেই মেয়ের অনেক প্রশংসা করলেন।

পরের সপ্তাহেও এক রকম জোর পোকার মতোই মন্মথ সোম বাড়ি টেনে নিয়ে গেলেন ওকে। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই। এবারে মেয়েকে রেখে কর্তা-গিন্নী মাঝে মাঝে উঠেও গেলেন। মেয়ের মুখ দেখেই বাপীর মনে হল সে স্থির জেনে বসে আছে দুজনের সম্পর্কটা কি দাঁড়াবে। বাপীর পছন্দ অপছন্দের কোনো প্রশ্ন নেই, ওই মেয়েকে ওকে পছন্দ হয়েছে সেটা স্পষ্ট।

সরাসরি প্রস্তাব এলো মেজবাবু রামনারায়ণ গাঙ্গুলি—নিশীথের বাম কাকার মারফৎ। সঙ্গে লোভের টোপও। —আর কি, বরাত জোরে ফিরে গেল তোমার, ওই একটিই মেয়ে, বড়বাবুর বাড়ি ঘরদোর যা-কিছু সব তোমারই—আর, মেয়েটারও খুব পছন্দ দেখলাম তোমাকে।

না, তাঁর গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় নি বাপী। বলেছে, মাপ করবেন, বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রামবাবু আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, ফ্যাকাশে মুখে বাপী চেয়ার ঠেলে উঠে চলে গেছে।

চাকরি থাকবে না বুঝেছে। আর সেই দুর্ভাবনার কথাটা মণিদাকে না বলেও পারে নি। আর মণিদা যে সেটা গৌরী বউদিকে বলে দিয়েছে সেটা পরদিনই বোঝা গেছে। কারণ গৌরী বউদির চোখে কৌতুক ঝরতে দেখা গেছে। বিয়ে করতে রাজি নয় বলে চাকরি যাচ্ছে মণিদা তাও বলে দিয়েছে নিশ্চয়।

বড়বাবু মন্মথ সোমের টেবিলে ফাইল পড়েছে। থমথমে মুখ কিন্তু গলার স্বর নরম। —তুমি ভেবে দেখো একটু, লোয়ার ডিভিশন থেকে তোমাকে আপার ডিভিশন করে দিতেও আমার বেশি দিন লাগবে না।

—মাপ করবেন।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসেছে।

মাসের সতের তারিখে রামবাবু ছাঁটাইয়ের নোটিস ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন কাল দুটোর মধ্যে এসে এ কদিনের মাইনে নিয়ে যেও।

...হাঁ, বাপী জ্বলতে জ্বলতেই বাড়ি ফিরছিল। মোসাহেবই এর জীবনের প্রধান শত্রু। সমস্ত রাগ তার ওপরেই ঝাড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু ভিতরের আক্রোশ আর জ্বলেনি।

দুপুর আড়াইটে তখন। মাথার ওপর শীতের সূর্যটাও যেন বেশি জ্বলছে। বাপী শর্টকাট করে সামনের ছোট পার্কের ভিতর দিয়ে আসছিল। পা দুটো থেমে গেল। সামনের বাবাদাস গৌরী বউদি দাঁড়িয়ে। আর লাগোয়া পলাশ বউদির বাবাদাস সন্তু চৌধুরী দাঁড়িয়ে। সে-যেন চোখের ইশারায় মাথা নেড়ে নেড়ে নিঃশব্দে

প্রকাশিত হ'ল

অনুরূপা বিশ্বাসের

নতুন কবিতার বই

কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে

৫৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

কিছু আর্জি পেশ করছে। বাপীর মনে হল, গৌরী বউদিকে ডাকছে বা নিজে আসতে চাইছে। গৌরী বউদির ঠোঁটে হাসি, চোখে হাসি। অল্প অল্প মাথা নেড়ে সে আর্জি নাকচ করছে।

রাস্তাটা পার হবার পর দুজনেই দেখল বাপীকে। বাপীর স্নায়ু আর নিজের বশে নেই তখন। সঙ্গে সঙ্গে সন্তু চৌধুরীর বিমর্ষ বিরক্ত মুখ। গৌরী বউদি সচকিত একটু। তারপর সন্তু চৌধুরীর দিকে চেয়ে একটু বেশি হাসছে।

বাপীর ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বসার ঘর দিয়ে ঢুকতে হবে। এটাও দুপুরে বন্ধই থাকে। খানিকটা শব্দে চোরেই কড়া নাড়ল।

গৌরী বউদি দরজা খুলে দিল। মুখখানা দেখল একটু ভালো করে। একেবারে অন্য রকম লাগছে। বিশেষ করল, এই মূর্তি কেন, কে তাড়া করল? সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই হয়তো মনে পড়ল কিছু। —এ-সময়ে যে? চাকরিটা গেল বুঝি?

ভিতরের গোপন সুড়ঙ্গের দরজা খোলা পেয়ে এক মুহূর্তে সেই আদিম হিংস্র পশুটা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। বাপীর আর অস্তিত্ব বলে কিছু নেই, কাণ্ডজ্ঞান নেই। সামনে খোলা চুল পিঠে ছড়ানো, ঢিলে-ঢালা বেশ-বাসে যে দাঁড়িয়ে—তার মুখ দেখছে, বুক দেখছে—এক উপোসী জানোয়ার বড় লোভনীয় গ্রাসের কিছু দেখছে।

—হ্যাঁ, চাকরিটা গেল।.... এ সময়ে এসে গেলাম বলে তোমার খুব অসুবিধে হল?

জবাবটা দেবার আগে হঠাৎ ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে গৌরী বউদি তিন-পা পিছনে সরে গেছে। আর, তারপরে যেন বিস্ময়ের অন্ত নেই তার। সে-ও চেয়ে আছে।

....তারপর। গৌরী বউদি পিছন ফিরে ঢিমে তালে এ ঘরের দরজা দিয়ে মাঝের ঘরে। সে-ঘরের খোলা দরজা দিয়ে নিজের ঘরে।

বাপীর বুকের তলার দনদনানি তখনো দাপাদাপি থামে নি।

বসার ঘরের দরজা বন্ধ করে মাঝের ঘরে অর্থাৎ নিজের ঘরে এলো। সামনের ঘরের খোলা দরজার দিকে চেয়ে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক। স্নায়ুগুলো কাঁপছে। কটা মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল খুব স্পষ্ট নয় যেন। কিন্তু জানোয়ারটা আবার ভিতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সামনে এগলো। খোলা দরজা দুটো শব্দ না করে বন্ধ করতে গেল। আধখানা বন্ধ করার আগেই নিশ্চল আবার।

ও-ঘর থেকে গৌরী বউদি ডাকল, বাপী শোন্ তো—

গলার স্বর যেমন সহজ, তেমনি নির্লিপ্ত।

আধা-ভেজানো দরজা খুলে বাপী ভিতরে এসে দাঁড়াল। গৌরী বউদি শয্যায় শয়ান। কাঁধের শাড়ি আধখানা খসে বুকের ওপর উঁচিয়ে আছে। ঘাড় ফিরে তাকালো। চোখে হাসি। ঠোঁটে হাসি।

—এদিকে আয়।

ভিতরের জানোয়ারটাকে, আর চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছে না বাপী। কয়েক পা এগিয়ে এলো।

অল্প অল্প হাসছে গৌরী বউদি। সেই হাসিটা যেন ওকে শয্যার আরো কাছে টেনে নিয়ে যাবার মতো।

—তুই এত পাকা হলি কবে থেকে?

—তোমরা বাঙ্গারজুলি যাবারও অনেক আগে থেকে।

—হুঁ? চোখে বিস্ময় ঝলসে। সেই সঙ্গে আরো কিছু যেন। —তাহলে আর খোকার মতো থাকিস নেকো?

—তাতে সুবিধে।

—কি সুবিধে?

—লোকে বোকা ভাবে সেই সুবিধে।

তেমনি অল্প অল্প হাসছে গৌরী বউদি। হঠাৎ বানারজুলির সেই ননদ-ভাজ সাপুড়ে মেয়ে দুটোকে মনে পড়ল বাপীর। বিশেষ করে ছটুমিয়ার বউ দুলোবিকে। সাপের ছোবল খাবার লোভ, ছোবল খাওয়ার নেশা। সাপ যত ফোঁসে, সামনে পিছনে সেই মেয়ে ততো দোলে আর হাত বাড়ায়।

....গৌরী বউদির চোখেও সেই লোভ। না তার থেকেও বেশি কিছু। তাজা কাঁচা একটা পুরুষ দেখছে গৌরী বউদি। ব্যভিচার বয়েস জানে না। কিন্তু মানে না।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ল যেন। বলল বসার ঘরের দরজা বন্ধ আছে তো? কেউ ঢুকে পড়লে চেয়ার টেবিলসুদ্ধ যাবে—

শয্যার মাথার দিকের দরজার দিকে তাকালো বাপী। ছিটকিনি তোলা। বসার ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে তিন ঘরের কোনটাতে কারো ঢোকার উপায় নেই বটে।

—দেখছি। বাপী ভিতরের দরজার দিকে পা বাড়ালো।

পিছন থেকে গৌরী বউদি বলল, দেখে আয়—তোর মনে রাখা আছে?

ভিতরের জানোয়ারটার অস্তিত্বসুদ্ধ উবে গেছে। ওর সত্তা বিষাদে ডুবছে, তলিয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে বাপীর আর বাচ্চুর নতুন তোলা ফোটো। ছেলেটা দুষ্টু দুষ্টু হাসছে বাপীর দিকে চেয়ে। বাপীর চোখ দুটো শিরশির করছে, বুকের হাড়ে হাড়ে একটা কান্না গুমরে উঠতে চাইছে।

বসার ঘরে এলো। নিঃশব্দে বন্ধ দরজা দুটো খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। দরজা দুটো বাইরে থেকে আবার আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে নিচে চলে এলো।

ফিরল রাত দশটার পরে। মণিদা তখনো বসার ঘরে। মাঝের ঘরের বিছানায় বাচ্চু নেই। অর্থাৎ আজ মায়ের কাছে ঘুমুচ্ছে। গৌরী বউদির মুখ দেখা গেল না। কিন্তু বাপী ঠিক জানে সে তার ঘরেই আছে।

....না, পরদিন সকালে মণিদার [illegible] শাসন চাবুক হয়ে নেমে আসে নি। [illegible] তারই ভীরু মুখ। আমতা-আমতা করে বলল, হঠাৎ কি যে হল তোর বউদির, তোকে আজই চলে যাবার কথা বলছে।

যেতে হবে বাপী জানত। মাথা নাড়ল শুধু। আজই যাবে।

বাচ্চুর চোখে ধুলো দিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল। মাসের ষোল দিনের মাইনে নেবার জন্য দুপুরে বন্ধুকলিনে এলো। বেরিয়ে আসার সময় দুঃখ আর সহানুভূতি জানাতে জানাতে রতন বণিক গেট পর্যন্ত এলো। ভালো মানুষ বিপুলকাকুর এত চট করে চাকরিটা চলে যাবে, এ ও ভাবতেই পারে নি।

কি মনে হতে বাপী বলল, যা হবার তো হল। আমাকে দিন কতকের জন্য একটু মাথা গোঁজার মতো জায়গা বলে দিতে পারো? তুমি থাকো কোন্ দিকে?

—ভবানীপুরের দিকে। রতন বণিক অবাক একটু।

বাপী হেসেই বলল, আজ থেকে থাকার জায়গাও নেই... যেখানে হোক একটু জায়গা পেলে হত, টাকাও কিছু দিতাম।

রতন বণিকের মুখখানা দরদে ছেয়ে গেল। বলল, বাড়তি একটা খুপরি ঘর তো আমারই আছে... কিন্তু সেখানে তো আপনি থাকতে পারবেন না, একেবারে বস্তির মতো।

বাপী যেন আশার মুখ দেখল। লোকটা সত্যি ভালো। আর ভদ্রলোকের থেকে অনেক ভালো। সাগ্রহে বলল, আমি খুব পারব, তোমার অসুবিধে হবে না?

রতন বণিক একপায় ছুটে গিয়ে ব্যক্তি সমবর্টকুর জন্য ছুটি নিয়ে এসেছে। তারপর বাপীর সেই সামান্য মাল-পত্র বয়ে তাকে সঙ্গে করে টালি এলাকার খুপরি ঘরে এনে তুলেছে।

....গৌরী বউদি ঘর ছেড়ে বেরোয় নি। বাচ্চু তখন স্কুলে। মণিদা আপিসে।

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন
কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট
Glitter
কনজিউমার প্রোডাক্টস
২৮এ, এস এন দাস লেন, কলি—৫০
পরিবেশক :
পাপু এন্টারপ্রাইজ
৪৭।৩৭, আর কে ঘোষ রোড, কলি-৫০

হৃদয় নদী বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হচ্ছিল। হাপারের মত ওঠা পড়া করছিল বুকখানা। কোমরটা টনটন্ করছিল। লাঠির ওপরে ভর দিয়া বুক টান করে দাঁড়াতে চাইল অনন্ত। মনে একটাই জিজ্ঞাসা, ওদের বুকের ভিতরেও কি এই রকম প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে? বুক ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে?

কানু বলল, বাবদা, ওই হচ্ছে ভুইন্দর নালা, কিম্বা ভুন্দর গঙ্গা, যাই বলুন। ওটা আসছে সপ্তশৃঙ্গ থেকে। সপ্ত-শৃঙ্গ হচ্ছে লোকপাল হেমকুণ্ড লেনের চার-পাশের সাতটা পিক। অর্থাৎ এই নদীর উৎস সন্ধানে আমরা চলেছি।

অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে সকলে। এখান থেকে বিজটা দেখা যায় না, পাথরের আড়াল হয়ে যায়। দেখা যায় গাছপালার মধ্যে দিয়ে গুরুদুয়ারার বাড়িটা।

অলকানন্দায় মেশবার আগে চওড়া হয়ে গেছে ভুন্দর গঙ্গার মোহানা। কত সরু লাগছে অলকানন্দা এত উঁচু থেকে। কতটা উঠে এসেছে বলে মনে হয়? কাকেও জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হচ্ছিল অনন্তর। এখন থেকেই খুঁত খুঁত শুরু করলে ওরা মনে মনে বিরক্ত হতে পারে।

জিগ্‌জ্যাগ্ পথের সাত-আটটা বাঁক পেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার সুরু হল চড়াই ভাঙ্গা। আগের মত অত খাড়াই নয়। আগের মত বৃক্ষ পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলা নয়। এতক্ষণ ভুইন্দর গঙ্গাকে ডাইনে রেখে চলছিল। এবারে পথ বাঁয়ে বেঁকে গেছে অনেকখানি। দ্বিতীয় পাহাড়টিকে বেষ্টন করে উঠতে হচ্ছে বলে নেমে আসতে হয়েছে অল্প একটু। ঘন জঙ্গল সুরু হয়েছে দুপাশে। কোন গাছের নাম জানেনা অনন্ত। কথা বলতে কষ্ট হয়। মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হচ্ছে। কোন প্রশ্ন করতে মন চায় না। জঙ্গলের মধ্যে মাঝে মাঝে চুঁইয়ে আসছে বোল্ডার। বাতাসে ভিজে মেজের গন্ধ। পাথরের খাঁজে খাঁজে ঘাসের চাপড়া, তাতে ছোট ছোট ফুল ফুটে আছে। ছোট ছোট প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। ভাল লাগবার চেষ্টা করছে অনন্ত। পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতাটুকু মন দিয়ে উপভোগ করতে চাইছে। কিন্তু শরীর বাধ সাধছে। যত কষ্ট এইভাবে শরীরটাকে টেনে ওপর থেকে ওপরে তুলে নিয়ে চলা। পাঁচ কেজি ওজন হ্যাভারস্যাকটাকে পঞ্চাশ কেজি বলে মনে হচ্ছে। পা ঠিকমত পড়ছে না। মাঝে মাঝে টলে যাচ্ছে মাথা। দুরন্ত চড়াই ভাঙবার অমানুষিক পরিশ্রম সহ্য করতে চায় মানুষ কোন পরমার্থের লোভে? এখন মনে হচ্ছে, এই ছেলেগুলির কথায় নেচে ভ্যালী-অব-ফ্লাওয়ার্স দেখতে যাবার লোভ তার সম্বরণ করাই উচিত ছিল। ওদের বয়েস আছে। ওরা ভবঘুরে, ওদের যা খুশি করা মানায়। সে সুখী মানুষ শরীরকে অযথা কষ্ট দেওয়াটাকে ক্রাইম বলে মনে হয় তার। অফিসের গাড়ি যেদিন আসে না সেদিন ট্যাকসি করে যায় অফিসে। বাসে ট্রামে যেতে চায় না, যেতে পারে না, শুধু ভীড় আর কষ্টের কথা মনে করে। সেই আত্মপীড়ণ কণাদ কি নির্বোধের মত কাজ করেছে এদের সঙ্গে এসে!

কানুর হাঁটার ভঙ্গীটা বড় সুন্দর। ঋজু একহারা চেহারা পিঠে বোঝা নিয়ে ঈষৎ কুঁজো হয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে পা ফেলছে। একটা স্টেপ, তারপর একটা, তার-পর আবার একটা, তারপর আবার একটা। যেন নির্দিষ্ট লয় মেপে ফেলছে পদক্ষেপ। পানু কাঁধের ওপরে তুলে নিয়েছে আইস-এ্যাক্স। দুহাত সেই এ্যাক্সের দুপ্রান্তে রেখে হাঁটছে হেলে দুলে। গোপুর হাঁটার ভঙ্গীও ভাল, তবে কানুর মত অত সুন্দর নয়। থপ্ থপ্ করে হাঁটছে আশু। ওর যন্ত্রণা ওকে ভালুক বলে ক্ষ্যাপায়। আশুর হাঁটা দেখে সত্যি সেই রকম কিছু মনে হয়। ভারী চেহারা ছেলেটির। বেশ লম্বা, চওড়াতেও মানানসই, কিম্বা একটু মোটার দিকে বলতে পারা যায়। হাঁটছে পুরো পায়ের পাতা মাটিতে ফেলে। দীপুর হাঁটা কেমন, ভাল চোখে পড়ে না। সে আছে পেছনে। অনন্ত দাঁড়ালে সেও দাঁড়াচ্ছে। সুযোগ বুঝে তাড়া দিচ্ছে: চলুন বাবদা, এই তো ঠিক চলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে দেখবেন, দম পেয়ে যাবেন। ভাল লাগছে না? এই ভ্যালীটা পেরিয়ে গেলেই গুলগাঁও। প্রায় দেড় মাইল পথ মেরে দিয়েছেন। জীবনে এই প্রথম পাহাড়ে এলেন। কিন্তু আপনার হাঁটা দেখে সেকথা মনে হচ্ছে না। বিদেশী আপনি অদ্ভুতভাবে এ্যাডজাষ্ট করে নিয়ে-ছেন। আপনাকে প্রথমে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, অনায়াসে আপনি পারবেন।

ওর কথা শুনতে শুনতে বিরক্তি লাগছিল অনন্তর। রাগ হচ্ছিল প্রচণ্ড। এ্যাডজাষ্ট করে নিয়েছে না হাই। তার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর বিদ্রোহ করে উঠছে। দাঁড়াতে ইচ্ছে। নিশ্বেস নিতে চাইছে সে বুক ভরে। বড় ছোট বুকটা। দম ন্যাবার জায়গা নেই। শ্বাস হয়ে আসে গতি। ধীরে ধীরে হ্যাভারস্যাক ধরে ঠেলা দেয় দীপু। চলুন, চলুন, বারদা। পা ফেলুন ঠিকমত। ওরকমভাবে নিশ্বেস নেবেন না। দুটো করে স্টেপ নিশ্বেস নিতে নিতে চলুন। পরের দুটো স্টেপ ফেলার সময় নিশ্বেস ছাড়ুন।

তাই করবার চেষ্টা করল কণাদ। হাঁ, এবার যেন একটু সহজ মনে হচ্ছে। অনেকটা সহজভাবে বিশ-পঁচিশটা স্টেপ ফেলল অনন্ত। তারপর আবার শুরু হল অস্বস্তি। কোমর টন্ টন্ করছে। ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। বুকের ভেতরে যন্ত্রণা হচ্ছে। কোন রকমে বলল, একটু দাঁড়ান। একটু দম নিয়ে নি।

দীপু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, এত দম নেওয়ার কি আছে? এমনতো কিছু পরিশ্রম হয়নি। হাজার ফুটের ওপর চড়াই ভেঙে এসেছেন। চমৎকার হাঁটছেন আপনি। কিন্তু নেভার লুজ কনট্রোল অব ইওরসেল্ফ।

একবার হাঁটা, একবার থামা, এখনি করতে করতে ঠিক সওয়া ঘন্টার মাথায় পৌঁছল ওরা গুলগাঁও। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি দোকান ঘর। সেখানে কাঁচা কাঠ জ্বালিয়ে ভুষোপরা ডেগচিতে জল চাপিয়েছে দোকানী। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ঝিঁঝির ডাক চড়া সুরে বাজছে। পাথরের ওপরে বসে পড়েছিল অনন্ত। ওধারে পাহাড়ের গা বেয়ে জল নামছে। সেইখানে একটা টিনের চোঙা আটকানো। তার মুখ দিয়ে পড়ছে জলের ধারা। পানু জল খাচ্ছিল আঁচলা করে।

অসম্ভব তেষ্টা পেয়েছিল খুব। তাকে তখনি জল খেতে দিল না দীপু। বলল, একটু বিশ্রাম নিন। দু-মিনিট পরে খাবেন।

যেদিকে ঢালু হয়ে গেছে পাহাড়ের গা, সেখানে জঙ্গলের ভেতরে কোথায় মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। অনন্তর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল দীপু। এদিক ওদিক মেরে অনন্তকে ডাকল,

দেখে যান রায়দা। সকলের দেখাদেখি হ্যাভারস্যাক খুলে রেখেছিল অনন্ত। এখন হাঁটতে গিয়ে টলে যাচ্ছিল পা। বেশ মজাতো! ভাবল সে। এরই মধ্যে নিজের শরীরটা আর নিজের বশে নেই? দীপুর কাছে গিয়ে দেখল, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, বেশ কিছুটা নিচে বিস্তৃত হয়েছে ভ্যালীটা। সেখানে ধানের ক্ষেত দেখা যায়। দুটি মেয়ে কাজ করছে ক্ষেতে। দূরে আভাস পাওয়া যায় একটি কুঁড়ে ঘরের। ছোট্ট গ্রাম পুণগাঁও। এই নিরালা জঙ্গলের মধ্যে, লোকালয় থেকে সহস্র যোজন দূরে, নির্বান্ধব পরিবেশে কি করে বাস করে ওরা? কোথা থেকে পায় বেঁচে থাকার রসদ? শুধু পেট পুরে খাওয়া আর কোনরকম একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই, এতেই মিটে যায় চাহিদা? প্রকৃতির কোলে লালিত, পশুর মত জীবনধারণে অভ্যস্ত, সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত বন্যমানুষ। ভয় করে এদের কথা ভাবলে। ওরাও হয়তো তাদেরই মত ভয় করবে কলকাতার বহু বিচিত্র গতি-চঞ্চল জীবনযাত্রার ছবি ওদের চোখের সামনে তুলে ধরলে! আচ্ছা, হঠাৎ মাথায় দুষ্ট কল্পনা ভর করল, যদি লিলিকে এখানে থাকতে বাধ্য করা হয়? কি করবে তবে লিলি? ইতিহাসে পড়েছে, পরের দিন গিলোটিনে প্রাণ যাবে - শুনে এক রাতে সুন্দরী মেরী আঁতোয়ানেতের চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। লিলিকে এখানে নির্বাসন দেওয়া হবে জানালে সেও নিশ্চয়ই এক রাত্রে পাগল হয়ে যাবে!

যান রায়দা জল খেয়ে আসুন চা হয়ে যাবে এখুনি।

অশান্তভাবে নির্দেশ দিয়ে চলেছে দীপু। ওই বয়সের একটি ছেলে তাকে প্রতি মুহূর্তে চালিত করছে, ভাবতে অবাক লাগে। কলকাতায় ওদের আপিসে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে দীপুকে। দেখাতে ইচ্ছে করে নিজস্ব পরিমণ্ডলে কণাদের চেহারাটা কেমন। দেখতে ইচ্ছে করে সেখানে এমনিভাবে সহজে নির্দেশ দেওয়ার এবং সেই নির্দেশ মানবার ক্ষমতা পায় কিনা দীপু।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বিশ্রাম নিয়ে সুরু হল আবার পথ চলা। পা দুটো বিশেষ করে উরু দুটো খুব ভারী হয়ে গেছে। তবে আগের চেয়ে দম নিতে কষ্ট কম হচ্ছে বলে মনে হয়। চড়াই একসময়ে পাতলা হয়ে এল। দেখা গেল, আর একটা পাহাড়, কাশ করে ফেলেছে ওরা। নতুন পাহাড়ের গায়ে গিয়ে উঠছে এবার। একশ দেড়শ গজ প্রায় সমতল পথ পার হয়ে এল। পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে পার হয়ে এল ছোট্ট একটা ঝরণা। আশু পেছন ফিরে বলল, আপনার লাঠিকে একটু জল খাইয়ে নিন রায়দা, খুব তেষ্টা পেয়েছে ওর।

তারপর আবার চড়াই। পথ ঘুরে এসেছে ভুন্দর গঙ্গার তীরে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে রাস্তা ডিগবোয়ের দিকে। তবে প্রতিটি বাহু বড় জোর দশ-বার গজ মাত্র। গোটা দুই চুলের কাঁটার মত বাঁক পেরিয়ে দম নিল অনন্ত। আবার দুটো বাঁক উঠল দাঁতে দাঁত চেপে। পথের ওপরে খবরের কাগজ পাকানো শালপাতার দোনা মোচডানো, সিগারেটের খালি প্যাকেট। আগেকার যাত্রীরা বিশ্রাম নিয়েছিল এখানে। উৎসুক চোখে পিছন ফিরল অনন্ত। একটু দাঁড়াবেন নাকি?

আর একটু চলুন নির্দেশ দিল দীপু। ওই কিষাণীবস্তীর গিয়ে দাঁড়াবেন। ওই যে ঝরণাটা দেখা যাচ্ছে ওপরে, ওখান থেকে ওটাকে আরও স্পষ্ট দেখতে পাবেন। চলুন, এই তো আর একটু।

অনিচ্ছুক শরীরটাকে প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তির জোরে কোন রকমে টেনে টেনে আরও দুটো চড়াইয়ের বাঁক ঠেলে তুলল অনন্ত। উঃ, বাবা, আর পারা যায় না। আর কতদূরে সেই পরিষ্কার জায়গা? ঘাড় তুলে দেখতেও যেন পরিশ্রম লাগে। অন্ধের মত, পঙ্গুর মত, জড়পদার্থের মত হাঁটছে অনন্ত।

এবার দাঁড়ান। বসুন এই পাথরটায়। হ্যাভারস্যাক খুলে রাখবেন? দাঁড়ান, খুলে, নিচ্ছি। দেখুন এপাশে ওধারে তাকিয়ে।

ভুন্দর গঙ্গার গর্জ নেমে গেছে পায়ের পাশ থেকে। নদী পেরিয়ে - জঙ্গলে ভরা খাড়া চড়াই উঠেছে মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে। মাঝখানে দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে প্রবল বেগে নামছে মস্ত একটা ঝরণা। মোটা জলের ধারা পড়ছে অনেক নিচে, বড় বড় শিলা খণ্ডের ওপরে। শব্দ হচ্ছে চটাস চটাস। - সবুজ জঙ্গলের পটভূমিকায় রূপালী জলের ধারা অনবদ্য একটি দৃশ্য। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল অনন্তর, আপনারা ক্যামেরা আনেননি সঙ্গে করে?

সিগারেট বার করে মুখে দিল দীপু। বলল, ক্যামেরা আনার কথা ছিল কানুর। আমাদের মধ্যে ওই সব থেকে ভাল ছবি তোলে। ভাল ক্যামেরা ছিল ওর। ওকে নিয়ে দার্জিলিং গিয়ে হারিয়ে এসেছে ক্যামেরা। কেনার ক্ষমতা নেই আমাদের কারো। বুঝতেই পারছেন, সামান্য চাকরি করি। এই পাহাড়ে আসার জন্যে আড়াই শো তিন শো করে টাকা লাগছে প্রত্যেকের। কতদিন ধরে সেই টাকা জোগাড় করতে হয়েছে তা আমরাই জানি। প্রত্যেকবার বেরুবার সময়ে ধার করি আমাদের আর একজন বন্ধুর কাছ থেকে। বর্ধমানে থাকে। পাহাড়-টাহাড় ভালবাসে না। ভালবাসে যন্ধুদের। তাই এক কথায় হাজার টাকা ধার দিয়ে দেয়। সারা বছর ধরে শোধ করি আমরা। এই পাহাড়ে আসার জন্যে সারা বছর ধরে কত যে কষ্ট করতে হয়, তা বোঝাতে পারব না।

ওধারের পাহাড়ের গায়ের জঙ্গল আর কলমুখর ঝরণাকে দেখতে দেখতে শুনছিল অনন্ত। এখানে বেশ ঠাণ্ডা আবহাওয়া। এদিকে পাহাড়ের গায়ে ছাড়া ছাড়া গাছ আর ঝোপ-ঝাড়। অনেক দূরে-দূরে নিচের ফ্র্যাণ্ডয়াবের মত বুনো ফুল চোখে পড়ে। ওধারে নিবিড় নিশ্ছিদ্র সবুজ অরণ্য। কে জানে কি কি বন্য পশু থাকে ওখানে। কাউকে তো দেখা যায় না। বোধহয় এই ঢাল পাহাড়ের গায়ে চলা ফেরা করতে অসুবিধে হয় পশুদের।

নিম্নে থেকে উঠে পড়ল অনন্ত। ভালই লাগছে এতক্ষণে। জিজ্ঞাসা করল কতটা হাইট উঠে এসেছি বলে মনে হয়?

এই তো ভুন্দর গাঁ প্রায় এসে গেলো এবার ওই যে সামনের পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে নদীর গায়ে। ওখানে মাঝারি আমরা। পথ এখন আর বিশেষ চড়াই নয়। এবারে ভুন্দর নালা। তারপর লক্ষণ গঙ্গা। তারপর আবার চড়াই। এখন আমরা অন্ততপক্ষে প্রায় আট হাজার ফুট উঠে এসেছি।

আট হাজার ফুট। জীবনে [redacted] উঁচুতে ওঠেনি কখনো অনন্ত। সেবার জীপ গাড়িতে করে টাইগার হিল বোধহয় গিয়েছিল দার্জিলিং থেকে। তার হাইট এর থেকে কমই হবে। এখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কিছু। ওধারের পাহাড় তাহলে কম করেও দশ হাজার ফুট উঁচু হবে নিশ্চয়ই। ভালই লাগছে এখন। বেশ লাগছে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে আসতে।

গোটা দুই বাঁক পেরিয়েই দেখা গেল কানুরা বসে আছে বেশ ছায়া সুত একটা জায়গায়। বুকস্যাক নামিয়ে রেখেছে পিঠ থেকে। ওদের দেখে কর্মধ্বনি করে উঠল সকলে। চারজনেরই এক প্রশ্ন। রায়দা কেমন হাঁটছেন দীপু?

একসেলেন্ট একসেলেন্ট দীপু বলল। কানু তোর মনে আছে সান্দকফু টেরেকোংয়ের কথা? কি রকম কষ্ট হয়েছিল সানেভঞ্জংয়ে থেকে উঠতে? তার থেকে কম স্টিফ নয় এই ক্লাইম্ব। দারুন পারফরমেন্স দেখিয়েছেন রায়দা। কিন্তু তোরা এখনই বসলি কেন।

কানু বলল, আমাদের খিদে পেয়েছে। পানু বড় বাইবে গিয়ে ছিল ওই ঝোপটার পাশে। একটা গাছে অনেক স্টু বেরি ফলে আছে। পেড়ে এনেছে। এখনো কাঁচা।

আশু বলল, তবে এপিটাইজার। একটা খেতেই খিদে পেয়ে গেছে। খুড়ো, ওকে একটা স্টু বেরি দে।

পাশ্চুটে রঙের একটা ফল ছুঁড়ে দিল পানু সুফে নিয়ে দীপু বলল, এই একটা মেরেছে দিলি পানু?

এ্যা-এ্যা-এ্যাকটাই খা আগে।

বলার আগেই ফলটা কামড়ে বাপরে বলে চিৎকার করে উঠল দীপু।

কানু গোপু আশু হেসে উঠল প্রাণ খুলে। মুখ থেকে টুকরোটা সাবধানে ফেলে দিয়ে আধ খাওয়া ফলটা ছুঁড়ে মারল দীপু পানুর দিকে। মাথা সরিয়ে নিল পানু। মুখ বিকৃত করে দীপু বলল, দাঁত টকে গেল।

আশু বলল, একটা বাঘ বেরিয়েছিল, মানেন রায়দা। গুটি গুটি আসছিল [redacted] করে রেখে। আমি একটা স্টুবেরি

ছুঁড়ে দিয়েছি। খপ করে লুফে নিয়ে কামড় দিয়েছে বাঘটা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মে, লাফ দিয়ে পালিয়েছে, আর তার দেখা নেই।

লাড়ুর প্যাকেট বার করেছিল কানু। আশু বলল, দীপু পরটা খাবি নাকি? রেখে দিয়েছি তোর জন্যে।

সেই গোবিন্দঘাটের পরটা? মনে পড়তেই শিউরে উঠে হেসে ফেলল অনন্ত।

গোপু বলল, শুনেই রায়দা হাসছেন! উনি একটুও খাননি, আমি দেখেছি ওর গ্লানোও একটু রেখো আশু।

২৭

ঘাংরিয়া ডাক বাংলোর বারান্দায় বেতের ইজিচেয়ারে চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল অনন্ত। শরীরের কোন অঙ্গে এতটুকু ক্ষমতা নেই। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শেষ মাইলখানেক কি করে যে এসেছে, ঠিক মনে করতে পারছে না।

ভুইন্দার গাঁও পর্যন্ত ভালই লাগছিল চমৎকার লাগছিল ছোট গ্রামটি। এই অঞ্চলের শেষ গ্রাম। প্রায় তিন-চারশ লোকের বাস ওই গ্রামে। আট হাজার ফুট উচ্চতায় ফসলে ঢাকা উপত্যকা। গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। তার ধার দিয়ে পথ। স্যাটালাইট মত পঞ্চায়েত ঘর। সাধারণ মানুষদের কম্যুনিটি সেন্টার। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশেও সমাজসচেতনতার এমন সুন্দর স্বাভাবিক বিকাশ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনন্ত। ছোট একটি স্কুল বাড়ি। পঞ্চাশ-ষাটটি ছোট ছোট মেলেমেয়ে পড়াশুনো করে। দোকানও আছে কয়েকটা। আগে থেকে জানিয়ে রাখলে পাঁচ-সাত-দশজনের মত খাবার তৈরী করে দিতে পারে ওরা। চা খাওয়া হল একটা দোকানে। দুধে সেদ্ধ করা চা। মন্দ লাগল না। গ্রাম থেকে একটু ওপরে নদীর অপর পাড়ে টুরিস্ট হাট। বাঁধানো সিমেন্টের [illegible]। মাটি আর পাথর দিয়ে গাঁথা ওয়াল, মাথার ওপরে পাথরের টালির ছাদ। এখানে আশ্রয় নিলে ভ্রমণ বিলাসীর পক্ষে একদিনে ভালো অব-ফ্যাওয়ার্স দেখে আসা সম্ভব। তবে তুলনায় ঘাংরিয়া অনেক সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থিত। এখানকার বাংলোর ব্যবস্থাও প্রথম শ্রেণীর।

ভুইন্দর গাঁও ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা ফাঁকা উপল বিকীর্ণ উপত্যকা পেরিয়ে এসে পার হতে হয় ভুইন্দর গঙ্গা। শকত কাঠের বড়ীজ তার ওপরে। সেটা পেরিয়ে সেই যে চড়াই ঠেলে উঠতে হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সেটাই আজকের পদযাত্রার সব থেকে কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি। বোধহয় মাইল [illegible] পথ চড়াই ঠেলে উঠতে হয়েছে জিগ-[illegible]থে। সে আর শেষ হতে চায় না। [illegible]য় তার অক্ষমতায় বিবর্তিত হচ্ছে, বুঝেও কিছু করতে পারছিল না অনন্ত। কোমর এত টনটন করছিল যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না অনন্ত, বসতে পারছিল না, চলা তো অসম্ভব ব্যাপার। ইচ্ছে হচ্ছিল শুয়ে পড়ে পথের ওপরে। এতটুকু সমতল জায়গা পেয়ে হয়তো তাই করত সে। কিন্তু সেই পাঁচ ফুট সমতল জমিও কি ছাই পাবার উপায় ছিল?

চড়াইয়ের থেকে আবার কিছুটা ফাঁকা জমি। অর্থাৎ আরও একটা পাহাড় পেরিয়ে আসতে হয়েছে। তারপর সুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল।

শুধু শরীরে নয়, মনেও যেন অসীম ক্লান্তি অনুভব করছিল অনন্ত। চিন্তা করার স্বাভাবিক ক্ষমতাটাও কেমন যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। না হলে ওই জঙ্গলের ভয়াল সৌন্দর্যতো উপভোগ করারই মত। বিরাট বিরাট বনস্পতি, তার মধ্যে ফার গাছের সংখ্যাই বেশি। নিশ্ছিদ্রভাবে ঢেকে রেখেছে মাথার ওপরের আকাশ। এক-একটা গাছের বেড কম হলেও ত্রিশ চল্লিশ হাত হবে। অর্থাৎ গাছের গুঁড়ি কিম্বা কাণ্ডের ভেতরটা করে নিতে পারলে ছোট ফ্যামিলির চমৎকার আস্তানা হতে পারে। উঁচুতে উঠেছে গাছগুলো অন্তত একশ থেকে দেড়শ ফুট। এত উঁচু এমন ঘন, জালপালায় সমাচ্ছন্ন, এমন বিপুল পরিধি যুক্ত গাছ যে থাকতে পারে, তা কল্পনাতেও আসত না। আপনা থেকেই জন্মায় গাছ, আপনা থেকেই মরে। তবে ঝড়ে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে না মরলে দুশো পাঁচশো বছর অনায়াসে নিশ্চয়ই বাঁচে। এই নাকি হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অরণ্য।

সেই বনের নিচের পথ যে কি ভয়াবহ তা অভিজ্ঞতায় জেনেছে অনন্ত। হাঁটু ডুবে যায়, এত কাদা হয়েছে গত বৃষ্টিতে। দৃষ্টি চলে না অন্ধকারে। অনুমানে নির্ভর করে ছোট ছোট কাঁটা গুল্ম এড়িয়ে যেতে হয়। ভাগ্যের ভুইন্দার গাঁ থেকে চৌকিদার সঙ্গে এসেছিল এবং দীপুর নির্দেশমত অনন্তর হ্যাভারস্যাক পিঠে নিয়ে প্রায় হাত ধরে টেনে এনেছিল সেই মাইল খানেক পথ, নইলে কখনো কি এখানে পৌঁছোনো সম্ভব হত? হয়তো হতই! তাহলেও অনেক দেরী হত আসতে। দীপুদের কষ্ট হত খুব।

এখানে পৌঁছে বাংলোর বারান্দায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছিল অনন্ত। দীপু কি কাজে ভেতরে গিয়েছিল। তাকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে খুব রাগ করেছিল। চৌকিদারকে দিয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ার আনিয়ে বলেছিল এবারে শুয়ে পড়ুন। দেখছেন না কি রকম ঠাণ্ডা? সাড়ে দশ হাজার ফুট উঠে এসেছেন খেয়াল রাখবেন। এই রকম পরিশ্রম করে এসেছেন বলে শরীর গরম রয়েছে, বুঝতে পারছেন না। ঠাণ্ডা লেগে গেলে শুধু নিজেই ভুগবেন না, আমাদেরও ভীষণ ভোগাবেন।

একটু পরে কানু ডাক দিল সকলকে চা খাওয়ার জন্যে। প্রত্যেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিল। ওদের বিশ্রাম করার উপায় নেই। সারাদিন প্রায় অভুক্ত আছে। রান্না

মননশীল বই

* **চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ**
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। তথ্যনিষ্ঠ সাবলীল বিবরণ। চার বিরল মানচিত্র। [১০-০০]

* **প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য**
ডঃ নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যসমূহ সহ সংস্কৃত সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫-০০]

* **স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সামাজতান্ত্রিক আন্দোলন**
ডঃ শঙ্কর ঘোষ। তত্ত্ব ও তথ্যনিষ্ঠ অন্বেষণ। [২০-০০]

* **বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা**
সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। হাজার-বছরের সামাজিক ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। ৮ মানচিত্র। [১৫-০০]

* **সংস্কৃত নাটকের গল্প**
অনিতা চক্রবর্তী। দশটি সংস্কৃত নাটকের কাহিনী। [৮-০০]

* **সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান**
প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সম্পাদক : অঞ্জলি বসু। প্রায় সাড়ে তিন হাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবনচরিত। [৪০-০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY

যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বড় একটা কেরোসিন স্টোভ এসেছে সঙ্গে। গর্জন হবে মনে হচ্ছে সেটা। বারান্দা থেকে তাব আওয়াজ পাচ্ছে অনন্ত। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। তাই স্টোভের আওয়াজ বাংলো ছাড়িয়ে সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে অনেক উঁচু পাহাড়টার গায়ে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বলে মনে হয়।

চা নিয়ে আসার জন্যে উঠতে যাচ্ছিল অনন্ত। একটা প্লেটে বিস্কুট আর চানাচুর আর কাপে করে চা নিয়ে এল কানু। বলল, আপনি উঠছেন কেন? বিশ্রাম করুন। এতখানি চড়াই ঠেলে উঠে এসেছেন, চাট্টিখানি কথা? আমি তো দীপুকে বলছিলাম, রায়দা বিমার্কেবল কান্ড করেছেন।

ম্লান হেসে অনন্ত বলল, আর আপনারা?

কানু বলল, আমাদের কথা ছেড়ে দিন। কত বছর ধরে এই করছি আমরা। প্রথম প্রথম কম কষ্ট হয়েছে ভেবেছেন? প্রত্যেকবার পাহাড়ে এসে বলতে হয়েছে, কোন শালা আর পাহাড়ে আসে। তারপর যখন ফিরে যাই, তখন কষ্ট হয়। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিন-চারটে মাস কোন রকমে কাটাতে না কাটাতে হাঁফিয়ে উঠি। পরের বার কোথায় যাওয়া হবে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনাই তখন একমাত্র সুখকর চিন্তা। আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, এই হিমালয় আমাদের জীবনের কতখানি অধিকার করে আছে। দীপু মাসে যা মাইনে পায় তার অধিকাংশ চলে যায় এই একসপিডিশনের নানা ঝামেলায়। আমাদেরও কম যায় না। তবে ওর মত পাহাড় পাগল আমরা হতে পারিনি। হাসছিল সে।

আশু ভেতর থেকে ডাকল, ম্যানেজার, খুড়ো আর একটা চানাচুরের প্যাকেট খুলছে। আমার কথা শুনছে না।

খুলছে খুলুক, কাল খাবে না, বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল কানু।

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র

মেট্রোপলিটন কলেজ

পরিচালনা ও শিক্ষাদানে

শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

সুযোগ্য পুত্র

গোলাম সবীর খাঁ

ও

শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য

বিশিষ্ট বেতারশিল্পী

২৪১/১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা

ফোন : ৪৫-০৯০৯

মস্ত একটা এনামেলের মগে করে গরম চা দিয়েছে কানু অন্তত তিন কাপ হবে। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটু একটু করে প্রাণ ফিরে পাচ্ছিল অনন্ত। দীপু ভেতর থেকে গায়ম চাদর এনে গায়ে চাপা দিয়ে দিল। বলল আরাম করুন। একটু সুস্থ বোধ করলে ঘুরে ফিরে দেখবেন। সবে তিনটে বাজে। এখনো অনেক বেলা আছে।

চা চানাচুর, বিস্কুট নিঃশেষ করল অনন্ত। শরীরটা হালকা লাগছে। একটু একটু করে যেন সাড় লাগছে সর্বাঙ্গে। উঠে দাঁড়াল সে। পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর চায়ের কাপ ইত্যাদি নিয়ে ভেতরে গেল সে।

ঘরের ভেতরটা অপেক্ষাকৃত গরম। ভালই লাগে সেই উষ্ণতার আমেজটুকু। চা খাওয়া হয়ে গেছে সকলের। ছুরি দিয়ে আলু পেঁয়াজ কাটছে কানু। চাল ডালের থলি নিয়ে মাপামাপি করছে কানু। গেগপু বিছানাপত্র এবং আরও কি সব ঠিক করছে দীপুর সঙ্গে। ঘর পেরিয়ে ওধারের বারান্দায় চলে এল অনন্ত পায়ে পায়ে। মস্ত একটা ডেগচিতে জল ধরা আছে। তার নিচে ট্যাপ ফিট করা। আশু সেখানে ঘুটো ডেকচি আর কিছু বাসনপত্র ধোওয়ার কাজে ব্যস্ত।

কাজকর্মের ব্যাপারে অনন্তর পটুতা নেই, সবাই জেনে গিয়েছে সেকথা। থাকলেও হয়তো তাকে কাজ করতে দিত না কেউ। কিন্তু কিছু কাজে ব্যস্ত থাকলে ভাল হত। মনের খুঁতখুঁতানি কমত।

আশু বলল; বারদা এখন কেমন বোধ করছেন?

ভালই, হাসল অনন্ত। তবে পা দুটো ব্যথা করছে।

কাল ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আশু আবার।

বাইরে চলে এল অনন্ত। আকাশে মেঘ করেছে। সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে অনেক দূরের একটা পাহাড়ে। বাংলোটা তৈরী করার জন্যে অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। আরও একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছে। পিলার হয়ে গেছে। ওপাশে কাঠের ফ্রেম তৈরী হচ্ছে। কাঠের একটা প্ল্যাকার্ডের ওপরে লেখা আছে, লগ হাউস ম্যানিয়া।

বাংলো থেকে একটা পথ চলে গেছে উত্তর দিকে। কিছুটা দূরে গাছপালার মধ্যে একটা গম্বুজ দেখা যায়। ওটাই সম্ভবত এখানকার গবেষণাগার। যাই হোক, সব সবই জানা যাবে।

ধীরে ধীরে পাশে চলা পথ ধরে হাঁটছিল অনন্ত। বাঁদিকে সেই গবেষণাগারে যাবার রাস্তা। দুধারে ঘাস আর কাঁটা গুল্ম, মাঝখানে সরু পথ। জায়গায় জায়গায় কাঠের কুচো, কখনও চেরা কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি ফেলা। ছোট ছোট পাথরের টুকরোও ফেলে রাখা হয়েছে পথে। চলে কাদায় খুব অসুবিধা হয় পথ চলতে সম্ভবত তাই এই ব্যবস্থা।

আর একটু এগিয়েই চোখে পড়ল, ছোট একটা ধূপদানি মত ঘর থেকে ধোঁওয়া উঠছে। তারা কয়জন দুজন পোর্টার আর চৌকিদার এছাড়া আর মানুষজনের অস্তিত্ব এ পর্যন্ত নজরে আসেনি। ঘর থেকে ধোঁওয়া উঠছে দেখেই উৎসাহভরে এগিয়ে গেল অনন্ত। মনি, মরি এ যে চায়ের দোকান। ছোট টেবিলে কাচের গ্লাস। কাঠের র‍্যাকে কাচের বয়াম। তাতে বিস্কুট। আবার একটা বেঞ্চি পাতা আছে ভেতরে। কুতকুতে চোখে গাড়োয়ালী দোকানী ডাক ছিল, আইয়ে বাবু চা পিজিয়ে।

ভারি ভাল লেগে গেল লোকটিকে। এই জনমানবহীন জায়গায় কার জন্যে চায়ের দোকান করেছে জানতে ইচ্ছে হল। দোকানে গিয়ে বসল অনন্ত।

কলকাতায় পথের ধারে এই ছোট ছোট চায়ের দোকান অনেক চোখে পড়ে। সেখানে সারাক্ষণ থাকে খদ্দেরের ভীড়। বেঞ্চগুলোয় বসার জায়গা হয় না। বাইরের দিকে উনোনে দিন রাত আগুন জ্বলে। তার পাশেই হয়তো ছাইখাদা সেখানে গুঁড়ো চায়ের দলা দলা সিটে জমা হয়। পথে বেরিয়ে প্রচণ্ড চায়ের পিপাসা লাগলেও কখনই সেখানে বেঞ্চিতে বসে চা খাওয়ার কথা ভাবতে পারে না কখনও। ওই সব খদ্দেরদের সঙ্গে কোন আত্মিক যোগ অনুভব করে না সে। যদিও তারা তারই মত বাঙালী, এক ভাষায় কথা বলে, একই ধর্ম ও সংস্কৃতির আওতায় লালিত। এখানে কেন যেন এই গাড়োয়ালীকে দেখে অত্যন্ত আপন বলে মনে হল অনন্তর। বলল, আচ্ছা সে চা বানাইয়ে ভাই। উঁও কেয়া, বিস্কুট? নিকালিয়ে তো, দেখে গা।

বিস্কুটে ছাতা ধরা। দোকানীর সঙ্গে হাজার আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করলেও ওই বিস্কুট মুখে তোলা সাধ্য হবে না তার। কিন্তু ফেরত দেওয়া যায় কি করে? তাকে সেই বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে যেন ঘরের কোনে শুয়ে থাকা প্রাণী এগিয়ে গেল। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল অনন্ত। বিরাট একটি কুকুর। আকারে দু-তিন মাসের বাছুরের সমান হবে। কুচ-কুচে কালো রং। মস্ত মস্ত লোমে ঢাকা সর্বাঙ্গ। এমন কি চোখ দুটো পর্যন্ত ঢেকে গেলে আঁকড়া লোমে।

নিতান্ত নিরীহ পোষা প্রাণীটি এসে লেজ নেড়ে উৎসুক মুখে তাকাল তার দিকে। হাতের বিস্কুটটি বাড়িয়ে ধরল অনন্ত। নিরাসক্তভাবে অনন্তর চোখ-মুখ লক্ষ্য করে বিরাট মুখ-ব্যাদন করে এক গ্রাসে মুখের ভেতর ছাতা-পরা সস্তার বিস্কুট নিয়ে আবার গুটি গুটি চলে গেল শোবার জায়গায়।

আপশোষ জানাল দোকানী। কুকুরটা তার খদ্দেরের মুখের গ্রাস [illegible] নিয়েছে। দূর করে দেবে সে এবার। [illegible] খেতে পাবে না তাই—

(চলবে)

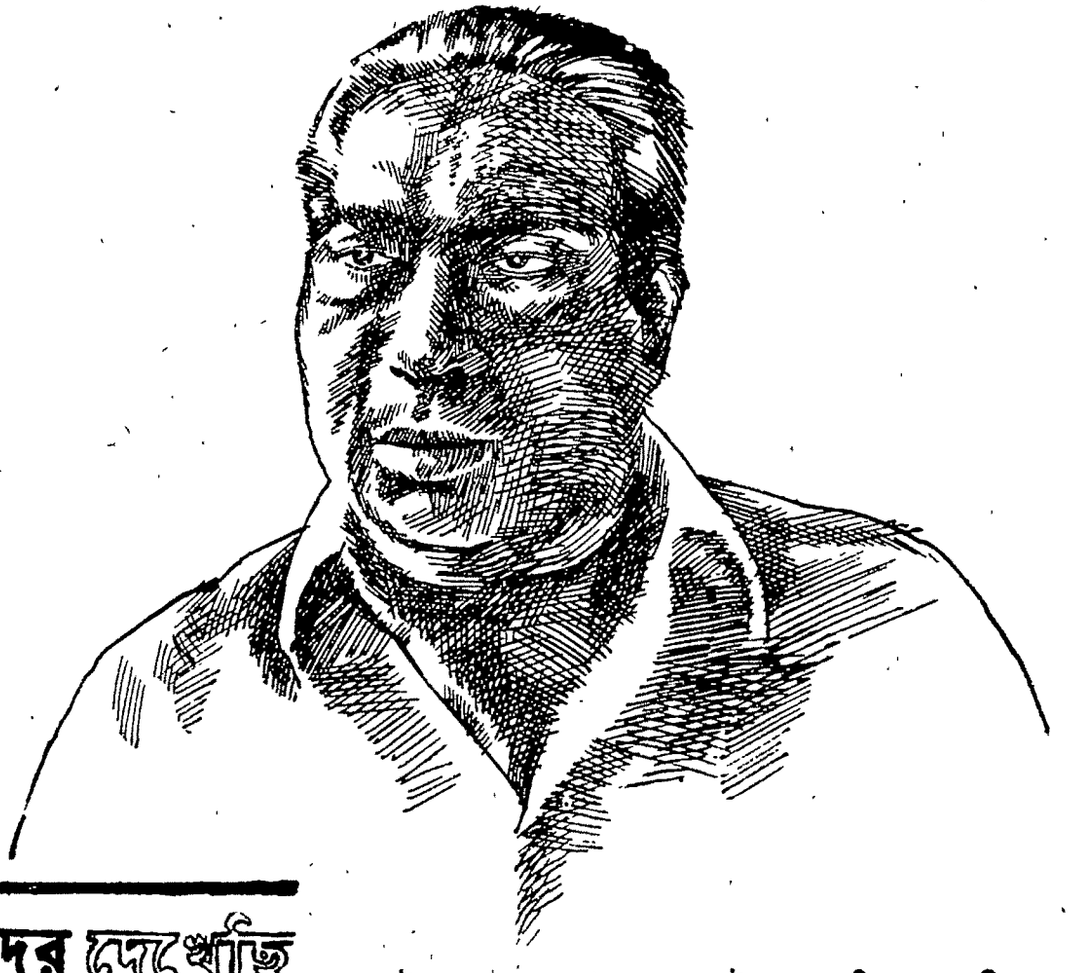

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

এ কেবল আমার ফাঁকা বক্তব্যই নয়, মনপ্রাণে অনুভূতি দিয়ে বুঝতাম। অনুভূতি দিয়েই আমি তা প্রত্যেকের কাছে প্রকাশ করে বলতাম। আমার ধারণা, আমার প্রকাশভঙ্গী দেখে তারা নিশ্চয়ই বুঝত যে আমাদের প্রাণ হাতে নিয়ে ঐরকম দুঃসাহসিক ডাকাতি দুটি মিলিটারী ভ্যানের মাঝে করতে হবে এবং এই ডাকাতি এমনভাবে করতে হবে যেন কোন লোক মারা না যায়। আমাদের প্রত্যেকটি ডাকাতিতে প্ল্যান করতে এইটি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল, যেন কাউকে মার্ডার করতে না হয়। তার জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যান করতে অনেক দেরী হয় এবং খরচও লাগে। যদি সোজা হিসাব করতাম অতর্কিতে আক্রমণ করব এবং ল্যাণ্ডমাইন, ডিনামাইট ও [illegible]মা ব্যবহার করে সব নিশ্চিহ্ন করে দেব, তাহলে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও মেহনত অনেক কম হত।

যখন রেলের পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ডাকাতি করার প্ল্যান হচ্ছিল, তখন সবাই ভাবল এ এক সাংঘাতিক প্ল্যান এটি কার্যকরী করতে হলে দু দিকে সৈন্যদের রাইফেলের সম্মুখীন হতেই হবে। যদিও অতর্কিতেই আক্রমণ করার কথা বলা হচ্ছিল, তবু ফিল্ডে যারা অংশ গ্রহণ করবে তাদের অতগুলো রাইফেলের বেষ্টনীর ভিতরে থাকতেই হচ্ছে। কাজেই সেই সময় কেউ গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে কিনা, কেউ তা বলতে পারে না। সবারই গভীর মনে আতংক ছিল তার বোধ হয় রাইফেলের গুলিতে প্রাণ যাবে। কাজেই ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

অবস্থা দেখে বুঝেছিলাম এই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ডাকাতি করার জন্য আমরা অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হতে পারব না। তাই এই প্ল্যান আমরা পরিহার করলাম। বিকল্প ব্যবস্থার জন্য ছোট-খাট ডাকাতি করার উদ্দেশ্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে সব ছেলেই ভীতু ছিল তা নয়, অসীম সাহসী ও দুর্ধর্ষ ছেলে কম ছিল না। তাদের বলে আমরা বলীয়ান ছিলাম। তাদের শক্তিকে সংগঠন শক্তিশালী ছিল। তাদের সাহস, বিক্রম শক্তি সংগঠনের মেরুদণ্ড ছিল। সেই শক্তির উপরে নির্ভর করেই সংগঠন ছোট ব্যাংকে ডাকাতি করতে প্রস্তুত হচ্ছিল।

ন্যাশনাল গ্রীণলেজ ব্যাঙ্ক, নিউ-মালিপুর ব্রাঞ্চ, অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে অবস্থিত। আমাদের হাতে তখন এমন সময় ছিল না, যাতে অনেক ব্যাংক সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করে তারপর ঠিক করতে পারি কোন-টাতে ডাকাতি করে সবচেয়ে বেশী টাকা পাব। এইসব ব্যাংকেও অন্তত দেড় লাখ-দুই লাখ টাকা পাওয়া যেতে পারে। বেশী তথ্য সংগ্রহ করিনি। তেমন সময়ও ছিল না, আর ব্যাংকের ভিতরে আমাদের কোন লোকও ছিল না।

ব্যাংকের বাইরে থেকে লক্ষ্য করে বুঝেছিলাম লাখ-দেড় লাখ টাকা থাকবেই। কোন বাড়ীর সংবাদ এতখানি নির্ভুল নয়। ব্যাংকের পেছিয়ে [illegible] ব্যাংকের পশ্চিম তিরিশ গজ দূরে নলকূপ-সজ্জন এভিন্যুয়ের উপর একটি পেট্রোল-পাম্প ছিল। পেট্রোল-পাম্প থেকে বেরুবার

রাস্তায় ট্রামলাইন অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে। এই রাস্তা ও পেট্রোল-পাম্পে পুলিশের গাড়ী ও ভ্যান প্রায়ই দেখা যেত। নিউ-আলিপুর থানা থেকে এই ব্যাংক খুব দূরে নয়।

ব্যাংকের সদর দরজা সাটার দিয়ে বন্ধ থাকত। ঠিক দশটার সময় ব্যাংকের দারোয়ান চাবি দিয়ে সাটারটি খুলে ঠেলে উপরে তুলে দিত। তারপর কাঠের দরজা খুলে দিত। ব্যাংকের কাস্টমাররা আগে থেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ব্যাংক খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভেতরে ঢুকতেন। ব্যাংকের সব কাউন্টারগুলো এক সাইডে ছিল। অর্থাৎ ব্যাংকে ঢুকে সংকীর্ণ প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে গেলে সব কাউন্টারগুলো ডানদিকে পড়ত। ম্যানেজারবাবুর ঘর আলাদা, দূরে।

ব্যাংক খোলার সাথে সাথে ব্যাংকের একজন পুরনো কর্মচারী একটি টাকার বাক্স নিয়ে এসে কারেন্ট অ্যাকাউন্টের কাউন্টারে দিয়ে যেত। কাউন্টারের সামনে মানুষের গলা পর্যন্ত কাঠ দিয়ে ঘেরা ছিল। সব কাউন্টারেই টেবিলের মত তক্তা দেওয়া ছিল, যাতে লেন-দেন হতে পারে। তার উপরে নীচু রেলিং দিয়ে ঘেরা দেওয়া ছিল।

আমাদের এমন ব্যবস্থা ছিল যেন টাকার বাক্সটি নিয়ে আসার পরে টাকার বাক্স থেকে টাকা বার করে বিভিন্ন কাউন্টারে দেওয়ার আগেই সেখান থেকে টাকা-ভর্তি বাক্সটি তুলে নিতে পারি। সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে এই বিপ্লবী ডাকাত দল তাদের শক্তি সমাবেশ করে।

গেটে একজন থাকবে স্টেনগান নিয়ে সামনের ভীড় রুখবার জন্য এবং সে সেখান থেকে ব্যাংকের ভিতরটা লক্ষ্য রাখবে যেন কেউ হঠাৎ কোন কিছু দিয়ে আক্রমণ করতে না পারে। কাউন্টারে যাবে তিনজন। একজন ক্যাশিয়ারকে এবং অন্যান্যদের পিস্তল দেখিয়ে সাবধান করবে যেন কেউ কোন বাধা না দেয়। আর একজন লাফিয়ে কাউন্টারের ভিতরে ঢুকে টাকার বাক্সটি তুলে নেবে। সে সেই বাক্সটি কাউন্টারের রেলিংয়ের উপর দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির হাতে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়বে। এবার তিনজন একত্র হয়ে সংকীর্ণ প্যাসেজ দিয়ে বাইরে আসবে। সেই প্যাসেজে সোফায় কাস্টমাররা বসে থাকে। খুব সম্ভাবনা ছিল তাদের বেরিয়ে যাওয়ার সময় কাস্টমারদের মধ্যে কেউ তাদের ঝাপটে ধরলেও ধরতে পারে। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে তারা সেখানে যায়।

স্টেনগান নিয়ে যে গেটে ছিল সে প্রথমেই বজ্রকণ্ঠে আদেশ দিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারও করে। সে চেঁচিয়ে বলেছিল ভয় নেই, চেঁচাবেন না। চুপ করে বসে থাকুন। নড়লেই গুলি করবো।'

তার কমান্ড শুনে ব্যাংকে কর্মচারীরা ব্যাংকের ভিতরে খুব ঠাণ্ডা হয়ে বসেছিল, কিন্তু বাইরের কাস্টমাররা যারা ঐ সংকীর্ণ প্যাসেজে সোফায় বসেছিলেন তারা কিন্তু খুবই বিচলিত হয়ে প্রাণভয়ে পালাতে চেষ্টা করলো। আমাদের ফ্রন্ট গার্ডের ওদের ছেড়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু ভুল করে সে তাদেরও আটক করতে চেষ্টা করে। তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার সেই কমান্ড কেউ শোনে নি। প্রাণভয়ে যারা পালাচ্ছিল তারা পালালোই। ইতিমধ্যে মিনিট দু-তিনেকের মধ্যে আমাদের ডাকাতি শেষ হল এবং ঐ তিনজন একত্রিত হয়ে টাকার বাক্স নিয়ে বেড়িয়ে এলো। গেটে যে ছিল সেও তাদের সাথে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। এই গাড়ী চার-পাঁচ মিনিট আগে ব্যাংকের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ব্যাংকের ভিতরে ব্যাংক ফায়ার ও চেঁচামেচির শব্দ শুনে বাইরের লোক আন্দাজ করতে পেরেছিল যে, ব্যাংকে ডাকাত পড়েছে। আর কোন কোন কাস্টমার পেট্রোল-পাম্পে এসে ফলাও করে বলছিল, 'ব্যাংকে ডাকাতি হচ্চে'।

পেট্রোল-পাম্পে কয়েকজন লোক হাতে ইঁট-পাথর নিয়ে ব্যাংকের দিকে ছুটে গেল। গাড়ীটিকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা ধরে নিয়েছিল ঐ গাড়ীটি ডাকাত দলের। তাদের ভিতরে কেউ ড্রাইভার ও গাড়ীকে লক্ষ্য করে ইঁট ছোঁড়ে। পেট্রোল-পাম্পেও কিছু কিছু লোক জমা হোতে লাগলো।

এদিকে সবাই এসে গাড়ীতে ওঠার পরে গাড়ী ছেড়ে দিল। একজন মোটর সাইকেল নিয়ে তাদের গাড়ী অনুসরণ করতে লাগলো। তাকে নিশ্চেষ্ট করার জন্য একটি কন্ট্রাকার নিক্ষেপ করা হল।

কোর্টে সেই মোটর সাইকেল চালক সাক্ষী দেন এবং এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন : তাকে যখন নিশ্চেষ্ট করার জন্য কন্ট্রাকার ছোঁড়া হল, তখন তিনি দূর থেকে ফলো করছিলেন। কিন্তু দূর থেকে ফলো করে যে তাদের ধরা যাবে না, তা তিনি জানতেন না। বিশেষ স্থানে আমাদের অন্য গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। তারা সবাই সেই গাড়ীতে উঠে অন্যদিকে গেল। আর মাত্র একজন লোক এই গাড়ীটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে পথে ফলস্ নাম্বার প্লেট খুলে আবার আসল নাম্বার প্লেটটি লাগিয়ে নিয়ে সেই গাড়ীটি যেখানে থাকত, সেই বাড়ীর গ্যারেজে নিয়ে গেল।

একটি স্পটে আর্মস নিয়ে আমাদের একজন নেমে পড়লো এবং বিশেষ স্থানে তা নিয়ে গেল। তারপর টাকার বাক্সটি যে বাড়ীতে নিয়ে যাবার কথা সেখানে নিয়ে যাওয়া হোল এবং টাকা গুনে বিভিন্ন প্যাকেটে করে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোল। ডাকাতি হওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত কাজটি সম্পন্ন হয়।

সেই বাড়ীতে টাকা পৌঁছানোর পর যে দুজনের সেখানে গিয়ে টাকা আলাদা আলাদা করে প্যাকেট করার কথা, তারা নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে গিয়েছিল। তারা টাকা গুনে দেখলো প্রায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা। যতদূর আজ মনে পড়ছে রেডিওতে ঘোষণা করেছিল এক লক্ষ বিয়াল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছিল। ঘোষণার সংখ্যা ও আমরা গুণে যে সংখ্যা পেয়েছিলাম তাতে বারো থেকে পনের হাজার টাকা কম ছিল। যে ফিগার রেডিও মারফৎ প্রচার করেছিল, সে ফিগারকে সন্দেহ করার মত কারণ ছিল না। তবে এ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো কি করে?

যার বাড়ীতে টাকা তোলা হয়েছিল সেখানে সেই দশ মিনিটে সে এবং তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তারপর দুজন এলো টাকা গুনতে এবং ভাগ ভাগ করে প্যাকেট করতে। রেডিওর সংবাদ থেকে জানা গেল যে টাকা গোনা হয়েছিল। তার থেকে প্রায় পনেরো হাজার টাকা বেশী ডাকাতি হয়েছিল। তবে কে এই টাকা সরালো?

আমাদের এমনিতে ফান্ডে টাকা ছিলই না বললে হয়। এই ব্যাংকের ডাকাতিতে দেড় লক্ষ টাকাও আসেনি। কাজেই আমরা খুবই চিন্তিত ও বিব্রত বোধ করছিলাম। আর যখন দেখি সত্যি এমত অবস্থায় আমাদের টাকা উধাও হয়েছে, তখন কে এই কাজ করতে পারে তা আমি অন্তত নির্ণয় করেছিলাম। অন্যরাও মনে মনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেও সাহস করে বলতে পারছিল না। আমি যেহেতু অতীতের তার কতকগুলো চুরির ঘটনা জানতাম, তাই তাকে সন্দেহ করতে আমার একটুও বাধে নি। আমি তখন খুব জোরের সঙ্গে অন্যান্য কমরেডদের বলেছিলাম, 'আমাদের দ্বিধা করার কোন কারণ নেই। ওকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হোক। তার স্ত্রী ও তিনটি সন্তানের কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে শাণিত ছুরি তার বুকে বসিয়ে দেওয়া হোক।'

তখন আমাদের ফিল্ড কমান্ডার আমাকে প্রটেস্ট করে বলেছিল, 'এই লঘু কাজে তাকে এত গুরু দন্ড দেওয়া উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে তাকে বিতাড়িত করা হোক।'

ফিল্ড কমান্ডারের মতটাই আরও দুতিন জন সমর্থন করলো। আমি তখন বললাম, বেশ তো, আপনারা যখন মৃত্যুদন্ড দিতে চান না, তখন দেবেন না। কিন্তু আমার মতে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে শেষ চেষ্টা করতে হবে। তার স্ত্রীর কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হোক। এ[redacted]র স্ত্রীকে তার টাকা অপসারণ করার [redacted]র নর্জীবগুলো পরিষ্কার করে জানিয়ে[redacted] হবে, যদি সে এই টাকা ফেরত না [redacted]বে আমরা তাকে মেরে ফেলব এবং এই ছুরি দিয়ে তার বুক ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো। কাজেই আপনাকে আমরা পাঁচ মিনিট সময়

ফিরছি তাকে বুঝিয়ে বলুন এবং টাকা যেন সে একুনি ফেরত দেয়।'

আমি সত্যিই কী নিষ্ঠুর! আমি কী অতখানি নির্দয় ছিলাম? আমার হৃদয়ে কী বিন্দুমাত্র দয়ামায়া ছিল না? কেন এই প্রশ্ন? অনেকে মনে হয় কি করে আমি ভাবতে পেরেছিলাম টাকা অপহরণের জন্য কমরেড-দিকে চরম দণ্ড-মৃত্যুদণ্ড দেব। ওকি আমার মুহূর্তের মতিভ্রম? সে নিয়ে আর আলোচনা হয়ত না আমার অনেক। কমরেডরা বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নিল, লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড অর্থাৎ আমাদের কষ্টের ডাকাতির টাকা অপহরণ করার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না, মৃত্যুদণ্ড কি লঘু অপরাধে চরম গুরুদণ্ড হবে না? তারা তাই সাব্যস্ত করেছিল, তাকে মেরে না ফেলে দল থেকে বহিষ্কার করা। তারপর এই লেখার সময় কত বছর পরে যখন আমি এটা বলছিলাম যে তার স্ত্রী ও তার ছেলেমেয়েদের সামনে তাকে নিয়ে গিয়ে পাঁচটি গুলি তার বুকে ঠেকিয়ে রেখে বলতাম, যদি তুমি বাঁচতে চাও তবে একুনি তোমাকে দলটিতে টাকার মধ্যে থেকে যে কটি হাজার টাকা অপহরণ করেছ তা ফেরত দাও। আর তা যদি না দাও, এই পাঁচটি গুলি তোমার বুকে বসিয়ে দেব। এই বলে ওকে ওর সামনে যে টাকা অপহরণ করেছে সব টাকা ফেরত চাইব। যে আমার এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল আপনি এত নিষ্ঠুর, এত নির্দয় যে ছেলেমেয়েদের সামনে ওকে এমনি করে মেরে ফেলতেন? আমার এটুকু শুনলে তাই মনে হবে। কিন্তু এটুকুই শেষ নয়।

ডাকাতির প্রত্যেকটি প্ল্যানে ও ট্রেনিং-এর সময় আমাকে সব সময় প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে যে, যেন একজনও না মরে বা আহত হয়। আমার মনে হত ডাকাতি করতে গিয়ে অন্যকে মেরে ফেলার বা আহত করার অধিকার নেই। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে পারি। ওই নীতি অনুসরণ করেছিলাম আমার জীবনের সূচনা থেকেই। তাই রেল কোম্পানীর টাকা যখন লুট করি একটি ফায়ার না করেও আমরা টাকা নিয়ে-ছিলাম। আবার যখন টেলিগ্রাফ অফিস অক্রমণ করে বিধ্বংস করি তখনো একটি ফায়ার না করে করেছিলাম। কাজেই মানুষের পায়ে গুলি চালিয়ে দেওয়া খুব সহজ হলেও তা করতে আমি কখনো শিক্ষা দিতাম না।

পুরাকালে কাজীর বিচারে যেমন সামান্য অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড হত, সেইরূপ [redacted] অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই নি। সময়, পাত্র বিবেচনা করে ভেবেছিলাম আমা-বিপ্লবী ফান্ডের টাকা অপহরণ করার [redacted] মৃত্যুই হওয়া উচিৎ। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে টাকা ফেরত পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে ভয় দেখাবার জন্য, তার ছেলেমেয়েদের কাছে উপস্থিত করে টাকা ফেরৎ চাওয়া সঠিক হবে বলে মনে করেছিলাম। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে টাকা ফেরৎ দিতে পারে এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না। ভালই হল, শেষ পর্যন্ত তা আমাদের করতে হয়নি অন্যান্যরা সাব্যস্ত করল ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক এ দল থেকে বিতাড়িত করা হোক।

এই সামান্য টাকা যা ডাকাতি করে পাওয়া গেল, তা আমাদের বিপ্লবী সংগঠনের খরচ—এতো আর কর্মাসের? যদি প্রতি মাসে কাউকে ভাতা, যদি নিয়মিত ভাতা, কমরেডদের বেতন দেওয়া না হত তবে হয়তো সেই টাকায় কয়েক মাস চলা সম্ভব ছিল। কেবল কমরেডদের বেতনের খাতে টাকা কমানো যায়, টাকা কমানোই হয়েছিল, তার চেয়ে আর কিছু করা হয়নি। কিন্তু, সংগঠনের বিপুলে ভাবে টাকার চাপ অনুভব করতে লাগলাম। যে ধরনের টেরর-কাল সংগঠন তাতে বেতন কমানো সমীচিন হয়নি। কিন্তু, আমাদের যে প্রোগ্রামে ট্রেনিং ক্যাম্প ও টেরর কাল সংগঠন বাড়ানো কল্পনা ছিল তার জন্য টাকা কই? সেই টাকা এক লক্ষ, দেড় লক্ষ টাকায় মেটাবার কথা নয়। অন্যান্য পার্টিকে বাধা হয়ে তাকে তার প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠনের অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা, প্রিন্টিং প্রেসের বন্দোবস্ত করা, আমাদের তৈরী কয়েকটি লোহার নল লাগান গাড়ি ও সংগঠনের প্রত্যেকটি সদস্যকে মোটর চালানোর শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। কাজেই টাকার প্রয়োজন, সেই জন্য অন্য আরেকটি বড় ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। সেইজন্য চাই প্রাথমিক টাকা, সেইরূপ বলিষ্ঠ বিচক্ষণ ও সাহসী কর্মী ও আনুষঙ্গিক ব্যবহারের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র মোটরগাড়ি ও বর্ম লাগানো মোটর গাড়ি। এক-একটি দিন দেরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের অনেক হাজার টাকা বিনা হিসাবে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ধারণাটি সকলের কাছে সহজ প্রত্যেকটি কমরেডের কাছ করা প্রয়োজন ছিল।

যাদের উপর পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল কী করে সকলের মধ্যে বেশ কিছু টাকা আনা যায়। তেমন একটি পরিকল্পনা তারা স্থির করে এবং কাজে তা সেরূপ ডাকাতি করতে উপযুক্ত।

কিছু বহু আগে স্থির করে রেখেছিল দুর্গাপুরের স্টীল ও কার-খানার অনেক টাকা প্রতিমাসে পোস্টাপিসে জমা হয়ে থাকে—সেই সময় প্রায় দশ বারো লাখ টাকা জমা থাকে। আমাদের পরিকল্পনা সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে সংগ্রহ করা আর সেই পরিচিত [redacted] ভিত্তিতে আমাদের যা কিছু আছে ও প্রয়োজন সবির সম্ভাবনা আছে, তাদের নিয়ে ঐ দুর্গাপুরের ব্যাংকটি লুঠ করতে হবে। আমাদের হাতে যে টাকা আমরা ডাকাতির পর পেলাম, টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার আগে যদি দুর্গাপুরে ব্যাংকের ডাকাতি করার প্ল্যানটি সম্পন্ন করতে হয় তবে দু মাসের ভিতরেই তা শেষ করতে হবে। অন্যান্য ব্যাংক লুটের সময় আমাদের সময় ছিল না। দুর্গাপুরের ব্যাংকটির সম্বন্ধে যতটুকু খবর পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে আমরা সুনিশ্চিত ভাবে বুঝে ছিলাম এক কোটি টাকা হেফাজত থাকবে। ব্যাংকের ভল্টে কত টাকা থাকে প্রাথমিক এই সংবাদটা বিশ্বস্ত সূত্রের আয়োজন শুরু হল। দুর্গাপুর সংস্থানের একটি কনফারেন্স আহ্বান হল। আমাদের পশ্চিম-ভিত্তিক ছেলে সেখানে বিভিন্ন ভাষে ও বিভিন্ন কমরেড গিয়েছিল। এবং প্রায় বিকেল বিভিন্ন বাড়ীতে থাকত। সেখানে কনফারেন্স ছিল সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একজনের বাওয়ার ট্যাংকলরী পড়ে। এই ব্যাঙ্কের পেছন থেকে পশ্চিম গজের ভেতর টেরোরিস্ট টেরোরিস্টে সব সময় প্রায় থাকতো সেখানে বাইফেল নিয়ে থাকে। আরেকটু দূরে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য মোতায়েন থাকত। সি আর পি সৈন্যও তাদের পাশাপাশি থাকত। দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক-টিতে ব্যাংকের দারোয়ান পাহারা দিত। ব্যাংকের দারোয়ান ও ব্যাংকটি কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু সমস্যা ছিল সি আর পি, বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স এবং টেরোরিস্ট বাইফেল গার্ড।

দুর্গাপুর অপরিচিত জায়গা নয়। কিন্তু এক কোটি টাকা ব্যাংক লুট করে নিয়ে আসা সোজা কথা নয়। কাজেই সাধারণভাবে যদি এই অবস্থান সম্বন্ধে মাত্র সাধারণ জ্ঞান থাকে, তবে সেই জ্ঞান নিয়ে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটান সম্ভব নয়। ব্যাংক ও ব্যাংকের লোকালিটি ও দুর্গাপুরের ঠিক থেকে আমাদের কয়েকজন পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যস্ততার উপযোগীর আমাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তার এলা ট্রাংক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবরাদি আমাদের প্রয়োজন ছিল। একবার বেরুতে গোলাম আর ট্যাংক রোডের বৈশিষ্ট্য। বুঝে ফেললাম তা কিন্তু নয়। ব্যাংকের কি বৈশিষ্ট্য আছে নিশ্চয় করে পুলিশ কোথায় আছে তা আমাদের জানা দরকার ছিল। ডাকাতির পরে এক কোটি টাকা কোন পথে এবং কিভাবে আমাদের [redacted] কোথায় কোন সময় সেই [redacted] নিশ্চয়ভাবে জানা দরকার ছিল। [redacted] এক কোটি টাকা কিভাবে [redacted] তারপর [redacted]

ঘটনাটা ভেঙে রেলপথে মোটর রাস্তায় নিয়ে আসা চাই। কাজেই আক্রমণ করাটাই সব নয়, আক্রমণ করে টাকা নিরাপদে নিয়ে আসাটাও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই সবটাকে বাস্তব রূপ দেওয়া সময়সাপেক্ষ ও অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। সেই জন্য বেছে বেছে ছেলেদের সেখানে পাঠান হল। এবং তাদের পরিচালনা করার জন্য রুট কম্যান্ডার ও ফিল্ড কমান্ডারকে পাঠান হয়েছিল।

ব্যাংকটিকে কখন, কোন্ সময় আক্রমণ করলে অল্প পরিশ্রমে কাজ সাফাই হতে পারে সেই সময়টুকু নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। ব্যাংকের কোন্ সময় এক কোটি টাকা উঠতে থাকবে সেটি জানা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল। আর সেই সময় বা কোন একটি বিশেষ দিনে হানা দিলে সহজে এই এক কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে। এইটি অনুসন্ধান করা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য ছিল। এই একটি ব্যাপারই করতে গিয়ে ব্যাংকে আমাদের কয়েকটি ছোট ছোট সেভিংস্ অ্যাকাউন্টস খুলতে হয়। এই অ্যাকাউন্টস্ অপারেট করার উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকে যাই কেবল দেখতে কোন্ কাউন্টার থেকে টাকা দিচ্ছে। ও কোন্ কাউন্টারে টাকা জমা হচ্ছে। টাকার ভল্টটি কোথায় এবং সেই ভল্টের চাবি কার কাছে থাকে এবং কে তা খোলেন, কিভাবে তা খোলেন। মাত্র এইটুকু কাজই ভেবে দেখুন সমাপ্ত করা কত কষ্ট-সাধ্য। ভল্টটি ফার্স্ট আওয়ারে ভেঙে যায়, ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজার তাদের সঙ্গে চাবি থাকত কারণ তারা দুজনে একত্রে হয়ে চাবি ঘোরালে তবেই ভল্টটি খোলা যেত। ভল্টের মস্ত বড় দরজা ছিল, দরজায় একটা চাকার মত ছিল। কিন্তু সেই চাকা কেউ ঘোরাতে পারত না যদি না কেউ চাবি দিয়ে আগে খোলে। ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার একসঙ্গে এসে ভিন্ন ভিন্ন চাবি দিয়ে আগে চাবির কল খুলতেন। তারপর ঐ বার ইঞ্চি চাকা যা দরজার বাইরে থাকে, সেটি ঘুরিয়ে দরজা খোলা হত। ক্যাশিয়ারবাবু, ব্যাংকের ভল্টের ভেতর যেতেন। তিনি যে সব টাকার বাক্স বার করে দিতেন, ব্যাংকের বিশ্বাসী কর্মচারীরা তা বার করে নিয়ে আসত। তার-পর প্রয়োজন অনুসারে যে কাউন্টারে যত টাকা ফেলা দরকার তা দিত। এই একটি ব্যাপার বোঝাবার জন্য লিখলাম যে কতখানি শক্ত কাজ ছিল তা করা। একদিনে এ সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন দিনে আমাদের বিভিন্ন কমরেডদের যেতে হয়েছিল এবং এই সমস্ত ব্যাপারটি দেখে আসতে হয়। বিভিন্ন কম-রেডদের রিপোর্টের উপরে নির্ভর করে ব্যাংকের ভল্ট খোলা সম্বন্ধে ধারণাটি পাকা করি। সেই ধারণা তাদের উপর নির্ভর করে আমরা আরো বিস্তারিত পরিকল্পনা করি।

আমাদের মাথায় সব সময় ছিল কী করে এই এক কোটি টাকার ব্যাংক ডাকাতটি বিনা রক্তপাতে হতে পারে। তাই ভেবেছিলাম ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজারের চাবি আগে আমরা তাদের বাড়ী যাওয়ার পথে বা বাড়ী থেকে নিয়ে নেব। এবং এই ডাকাতিটিতে রাত্রিবেলা ভল্ট খুলে টাকা বার করে আনব। ভাবা খুবই সহজ, তবে কার্যত তা হচ্ছে কী করে?

যেরূপে বিস্তারিত প্রসেসে আমাদের কাজ চলেছিল তাতে প্ল্যান শেষ করা কয়েকটা দিন বা সপ্তাহের কাজ নয়। কয়েকটি মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু গিণ্ডলেজ ব্যাংকে যে টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে কী আমরা কয়েক মাস ধরে প্ল্যান করতে পারতাম? তাছাড়া এক কোটি টাকা সরিয়ে দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করব কোন্ পথে এবং কিভাবে সে নিয়েও বিস্তারিত পরিকল্পনা আমাদের করতে হয়। যেমন নাকি অয়েল ট্যাংকার বা কোল ট্যাংকারে পুরে ট্রাংক রোডের ওপর দিয়ে দূরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছিলাম। কেবল ট্যাংকারগুলি হলেই হত না, আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার জন্যে অন্যান্য মোটরগাড়ী রাখতে হত। এই সবের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। তারপর দুর্গাপুরে বাড়ীভাড়া, কমরেডদের থাকার ব্যবস্থা, তারও প্রচুর খরচ। এইসব মোটানো গিণ্ডলেজ ব্যাংকের টাকায় কুলোনো যাচ্ছিল না। এর উপরে সমগ্র সংগঠনের খরচ প্রতিমাসে যা দেওয়া হয় তার চাপ অনু-ভব করতে লাগলাম। দুর্গাপুর ব্যাংক লুঠের পরিকল্পনা আমরা যদি দু মাসের মধ্যে শেষ করতে পারতাম তবে হয়তো কোন মতে পারা যেত। কিন্তু তা হওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই সংগঠনের মধ্যে আবার গোলমাল শুরু হল। অনেকেই এই রূপে ডাকাতির প্ল্যানে মত দিতে পারছিল না। আমাদের কোন বিশেষ কমরেড দুর্গাপুরে ব্যাংকের কাছে ক্যান্টিন খোলে। তাকে সেই ক্যান্টিন থেকে দুপুরের ও বিকেলের জল খাবার সাপ্লাই করা হত। এইসে ক্যান্টিন খোলা এবং সেখানে পরিচিতি লাভ করা তাও একটি সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তাও পেতে হয়েছিল। কী করে চপ, কাটলেট প্রভৃতি তৈরি করে ব্যাংকের বাবুদের সাপ্লাই করার ব্যবস্থা করা হল তাও খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনে তাও আমরা করেছিলাম। কলকাতা থেকে অতদূরে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ছোটেট একটা ক্যান্টিন খুলে বসে থাকা সেই কম রেডের বিশেষ মানুষিক প্রস্তুতির উপর নির্ভর করছিল। এবং তারপর সেই ক্যান্টিনের খাবার ডিনিস কোর্ট ও ব্যাংকে সাপ্লাই হত। এইরূপভাবে ধাপে ধাপে আমরা প্রস্তুত হচ্ছিলাম কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল দু মাস কেন আরো দু মাসের মধ্যে প্ল্যানটি সম্পূর্ণভাবে শেষ করা অসম্ভব ছিল। যেমন নেতৃস্থানীয় নেতারা এই বিরাট আয়োজনে বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারছিল তখন সাধারণ সদস্যরাও বেশ উপ-লব্ধি করেছিল যে এই পরিকল্পনা শেষ করতে আরো বহু দিন লাগবে। কাজেই তাদের মনে তখন অনেক প্রশ্ন জাগতে লাগল এবং অনেক কাজেই শিথিলতা দেখা দিল। যখন পুরো উদ্যমে ও সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করা প্রয়োজন ছিল তখন এই বাস্তব দুর্বলতা আমাদের সবাইকে কম-বেশী বিচলিত করেছিল। এদিকে দেরী হওয়া অন্যদিকে—কাজে অস্বাভাবিক চাপ ও সমস্যা যখন দেখা দিল তখন সংগঠনে বিশৃংখলা দেখা দেবে তাতে আশ্চর্য কি? স্লোগান-ভিত্তিক গ্রাম থেকে শহর সব ঘেরাও করা সংস্কৃতি নিয়ে সংগঠনের মধ্যে একদল সোচ্চার হয়ে উঠল। তাদের কাছে লেনিনের "হোয়াট ইস্ টু বী ডান" পুস্তকের সমালোচনা হতে লাগল। সেইসব কর্মীরা হোয়াট ইস টুবী ডানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানকালে আর নেই বলে ঘোষণা করল। কাজেই সংগঠনের মধ্যে দুটি মত দেখা দিল। একদল ঠিকই করল যে তারা ডাকাতি আর করবে না, কৃষকদের মধ্যে গিয়ে তাদের নিয়ে সংগঠন করবে, দুর্গাপুর থেকে এই ট্রেউটি কলকাতার শহরে সব কমরেডকে কিছু না কিছু বিভ্রান্ত করল। এই প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে আমরা সব কমরেডকে ডেকে নিয়ে জায়মণ্ডহারবারে মিটিং করি ও বাক্‌বিতণ্ডা হয়, কিন্তু সমাধান কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। একদল অপর দলকে বলতে লাগল কলকাতা আপ সার্চ করার জন্য ডাকাতি প্রস্তুতি করার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। অপরপক্ষকে বলা হচ্ছিল যে তারা কৃষি বিপ্লবের ধোঁয়া ধরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করবে। এই ডায়মণ্ড-হারবারের গুপ্ত মিটিং-এর পর তারা আবার গুপ্ত মিটিং-এর প্রয়োজন অনুভব করছিল। সেই মিটিংটি নৌকার ওপর হয়। দুই পক্ষই বিশেষ বিশেষ মতে অচল, কাজেই তাদের মধ্যে দল ভেঙে যাওয়াটা অনিবার্য হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দলের যা আর্মস্ ছিল তা ভাগ হয়ে গেল, গাড়িও ভাগ হল। যা টাকা ছিল তাও ভাগ হয়ে গেল।

যারা কৃষক বিপ্লব করবে মনস্থির করেছিল তারা গ্রামে চলে যেতে লাগল আর যারা কলকাতায় সাংহাই অভ্যুত্থানের মত একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য পরি-কল্পনা করছিল তারা তাদের মতে অবিচল থেকে শহরে সশস্ত্র সংগঠন কাজে যাবে স্থির করল।

ভেবেছিলাম ভাঙন হলেও তিক্ততা আসবে না, কিন্তু কোন মহান আদর্শই এই তিক্ততা থেকে সংগঠনকে মুক্ত রাখতে পারে নি।

(চলবে)

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ কুড়ি ॥

বলতে বলতে কালু ঘোষ দিলীপের খালি গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বেয়ারাকে চোখের ইশারায় ডাকলো।

আর নেব না। আমার অনেকটা হয়ে গেছে। আপনি নিন বরং মিস্টার ঘোষ।

আমি তো নিচ্ছিই। কিছু হবে না। থ্রি ফর দি রোড্।

এবারের গ্লাসে কালু ঘোষ নিজেই ফুঁ তুলে দিল। ক্লাবের এদিকটায় আলো সব গাছের ছায়ায় জড়িয়ে গেছে। ঘাসের নিখুঁত কামানো ঘাস অতিথি-প্রাঙ্গণে ভেসে আছে। অনেকটা জুড়ে মাঠে শাদা ডিমের খোলা—উপুড় করে বসানো। চোখ এড়ানো যায় না দিলীপ বললে, আমি তো লাঞ্চটাও নিলাম।

তাতে কি। আপনি ফুললেই গাড়ি চলবে—

আমি তো চালাতে জানি না।

স্টিয়ারিংয়ে বসে দুটো পা ক্লাচ আর অ্যাকসেলারেটরে নাড়াচাড়া করবেন। দিব্যি গড় গড় করে গাড়ি চলবে তখন। দেখবেন—। মাঝে মাঝে ব্রেকে পা ছোঁয়াবেন—মাঝখানটায়।

আপনি থাকুন না আমার সঙ্গে মিস্টার ঘোষ। আমায় বাড়ি অব্দি পৌঁছে দেবেন।

সে দেখা যাবে। কোন অসুবিধে তো নেই—

বাইরে কলকাতা নিশ্চয় এখন ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোতে দিন। আজ তিরিশ বছর আমি দেখছি—যখনই বাড়ি ফিরি, তখন কলকাতার রাস্তা ফাঁকা।

তা তো হবেই। আপনি বাড়ি ফেরেন রাত বারোটার পরে। তখন তো রাস্তা ফাঁকা হবেই। এই অব্দি বলে দিলীপ আরেকবার শেষ চেষ্টা করলো। আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো—

কি বলবো?

আমি আর আপনিই কি বসেছিলাম এতক্ষণ?

হ্যাঁ।

ঠিক জানেন মিস্টার ঘোষ?

তা নয়তো কি! ও-কথা কেন দিলীপ—?

আমার যেন মনে পড়ছে—আমি আর অন্য কে আরেকজন—রমজান জেনারেল রায়—তার সঙ্গেই তো এতক্ষণ বসেছিলাম—

না। আমার সঙ্গে। আমি আর আপনি সেই সন্ধ্যে থেকেই—

তাহলে কে আমাকে গেট থেকে ধরে নিয়ে এলো ?

আমি।

আপনি কি আমায় ফার্টিলাইজার সেলস্-এর কথা বলছিলেন ?

না তো। সেসব নিশ্চয় বাজে বলেছে। আজ সন্ধ্যেবেলা নয়। কাল সন্ধ্যেবেলা বলেছে।

দিলীপের মাথার ভেতরটা ঘুরে যাচ্ছিল। আজকের সন্ধ্যেবেলাই প্রায় গুলিয়ে গেছে এতক্ষণে। তার ভেতরে গত-কালের হারানো সন্ধ্যেবেলা খানিকটা মিশে গেল। দেখতে দেখতে সাত-আট পেগ বাধহয় হয়েছে। স্মৃদ জিনিস বলে এখনো খারাপ কিছু হয়নি। তবে মাথাটা আস্তে আস্তে ডানদিকে ভারি হয়ে উঠছিল।

এবারে দিলীপ আচমকা কালু ঘোষকে সবটা দেখতে পেল। এতক্ষণ টেবিলের ওপর থেকে কালু ঘোষকে একরকম লাগ-ছিল। অনেকটা কোন আবক্ষ স্ট্যাচু। বুক থেকে যে মূর্তির ওপর দিকটা দেখা যায় শুধু। এখন শাদা পোশাকের একটা ধারালো বয়স্ক লোক উঠে দাঁড়িয়েছে।

প্রায় সব টেবিল ফাঁকা। কালু ঘোষ বললো, চলুন, এগোনো যাক।

ক্লাবের বাইরে রাস্তার ওপর গাছ-তলার ছায়ায় গাড়িটা খুব অনুগত পোজে বসেছিল। দিলীপ এগিয়ে গিয়ে বললো, স্টিয়ারিংয়ে আপনি বসুন।

আপনি বসুন না মিস্টার বোস।

আমি কোনদিন গাড়ি চালাইনি।

তাতে কি হয়েছে। স্টিয়ারিংয়ে বসলেই এ-গাড়ি যে-কেউ চালাতে পারে।

দিলীপের মন্দ লাগছিল না। ঠাণ্ডা বাতাস এসে কানের দু পাশের রগ টাচ করে বয়ে যাচ্ছিল। একখানা-দুখানা গাড়ি ফাঁকা রাস্তা পেয়ে দিব্যি উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িটা এখন একটা খোলা প্রায় ছাদ নেই। ক্যাম্বিশের হুড্ পেছন দিকটায় ছুটিয়ে বাধা। লেজে চকচকে বাম্পার। গাড়ির নাকের কাছেও তাই। সেখানে দু-দিকে দুটো ডাব। আসলে হেডলাইট। টু-ডোর গাড়ি। সামনের সিট ভাঁজ করে পেছনে বসতে হয়।

স্টিয়ারিংয়ে বসেই দিলীপ বেশ চালের মাথায় স্টার্ট নিল। ফাঁকা রাস্তা। ক্লাচ এ্যাকসেলারেটর দু-পায়ের বশ হয়ে গেল দিলীপের। সে নিজেই নিজের কেরা-মতিতে আশ্চর্য। ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে রেসকোর্সের দিকে যেতে যেতে দিলীপ ফাঁকা রাস্তে চেঁচিয়ে উঠলো, মিস্টার ঘোষ—আপনি উঠেছেন ?

ঠিক কানের পাশে পেছন থেকে কথা বললো কালু ঘোষ, এই তো আমি। বেশ চালাচ্ছেন। বাঁয়ে একটু টাল আছে।

সারানানি কেন গাড়িটা ?

হয়নি। সময় পাইনি ভাই। ডাইনে চেপে চালান—

এ-অবস্থায় বেচে দিচ্ছেন ?

তাই তো বলেছিলাম ববেনকে। বরেন দত্তই গাড়িটা আমায় কিনে দিয়েছিলো।

ঠিক রেসকোর্সের গেটে আচমকা ব্রেক কষলো দিলীপ। ঝাকুনি খেয়ে গাড়িটা থামলো। দিলীপ পরিষ্কার বললো, পাশে এসে বসুন।

পেছন থেকে কালু ঘোষ বললো, না। এই তো বেশ আছি। পেছন থেকে তোমায় বেশ গাইড করতে পারবো। পাশে বসে সবটা বলা যায় না।

গঙ্গায় একটা জাহাজ গলা খুলে ভোঁ দিলো। কালু ঘোষ তাকে 'তুমি' বলায় দিলীপ কোনরকম অফেন্স নিলো না। সে স্পষ্ট গলায় বললো সত্যি করে বলুন তো —আপনি মরেননি ?

ওসব মিথ্যে কথা তুমি বিশ্বাস করো।

দিলীপ তখনো তার বেডিরুম ডায়ালের হাতঘড়ির কাঁটা চিনতে পার ছিলো। রাত পৌনে একটা। আজ সবই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে। আমি কোনদিন গাড়ি চালাইনি—অথচ এখন দিব্যি চালাচ্ছি।

চেষ্টা করোনি—তাই চালাওনি।

আপনি বলছেন—আমি নাকি গত-কাল সন্ধ্যেবেলা মেজর জেনারেল রায়ের সঙ্গে ক্লাবে ছিলাম।

তাই তো ছিলে।

আজ সন্ধ্যে থেকেই নাকি আপনার সঙ্গে আছি।

কেন ? সন্দেহ আছে তাতে ?

কালু ঘোষের গলা এত পরিষ্কার—দিলীপ তার নিজের কানের পাশে পেছন থেকে কালু ঘোষের গলা—গালের সেভিং কিসমের গন্ধ পাচ্ছিল—সে কিছুই আর সন্দেহ করতে পারলো না।

নাও। এবার স্টার্ট দিয়ে চিড়িয়াখানার দিকে চলো তো। একটা নতুন জিনিস দেখাবো তোমায়।

এখন তো গেটে তালা ঝুলছে।

চলো না বলছি। গৃহ যখন ডিরেক্টর ছিল, সে আমায় তখন এই দরজাটা চিনিয়েছিল। খিদিরপুরের পোল পেরিয়ে চলো।

দিলীপ ধরতে পারছিল না—কে গাড়ি চালাচ্ছে ? সে নিজে ? না, গড়ি নিজেই চলছিলো ? অস্টিন টুয়ারটা সেণ্ট টমাস স্কুলের গা দিয়ে দিব্যি একটা খোলা দরজা পেয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকে পড়লো। সরু পিচ-রাস্তায় নিবু নিবু ইলেকট্রিক আলো। গাছপালার ছায়া। একজনও লোক নেই।

পেছন থেকে কালু ঘোষ বললো, হাতির মাহুত এখন ওয়াটগঞ্জে সুমিত্রার বাড়িতে মজা লুটছে। এ ফিরে তবে দরজা বন্ধ করবে।

সুমিত্রা নিশ্চয় বেশি রাত অব্দি জেগে থাকা কোন মহিলা—যার মাহুতের সঙ্গে বন্ধুত্বেও কোন আপত্তি নেই। মনের এই কথাটা কালু ঘোষকে বলতেই সে তো হেসে অস্থির। এক-একটা কথা বলে আ হো করে হাসে। শেষে বললো, মহি বাড়িউলি। বালিয়া জেলার মানুষ। সারা গায়ে উল্কি। তুমি গেলেও ভাই ঠাণ্ডা সফ্‌ট্ ড্রিংক এগিয়ে দেবে আগে।

কালুর হাসিতে চিড়িয়াখানার দু-একজন বাসিন্দা জেগে গেল। যেমন, হনু-মানদের ঘরের কয়েকজন বাসিন্দা লাফিয়ে লাফিয়ে এসে দিনের বেলার দাঁড়ে বসলো। বাঘের খাঁচা থেকে একটা গম্ভীর মনোকষ্টের যন্ত্রণা উ-উ-ম্ করে ঠেলে উঠলো নির্জন বাতাসে। বাঘের সে-ডাকের ভেতর সবসময় বনের স্বপ্ন মিশে থাকে। চিরকাল এই কথাটাই মনে হয়েছে দিলীপের। খেলা খেলা ভাবে যে-গাড়ি চালানো যায়, তা জানা ছিলো না তার। চিড়িয়াখানাকেও কালু বশ করে রেখেছে।

সামনে এসে বসুন না।

না। এই বেশ আছি। দ্যাখো তোতা কে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে—

কোথায় ?

ডান হাতে তাকাও।

দিলীপ বুক কষলো। গাড়ি থামতেই সে চমকে উঠলো। সেই হরিণটা। ও প্রায়ই সাজানো পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দেও-য়ালের বাইরের কলকাতা দেখে। ডাব দুটোয় একবার আলো জ্বলে উঠতেই কালু বললো, হেডলাইট নেভাও।

নেভাতে নেভাতে দিলীপ দেখলো হরিণটা সেই একই ভঙ্গিতে অস্টিন ট্যুরার, তার পাইলট, পাইলটের বন্ধুকে খুব মন দিয়ে দেখছে। মাথাটা একদিকে হেলানো। একদিকের কান খাড়া। অন্যটা ন্যাতানো। আর সেই হরিণের পেছনে হরিণের পর হরিণ। সারা চিড়িয়াখানার হরিণ। একের পর এক। ছুঁচলো মুখ। [redacted] আচ্ছন্ন-চোখ। মুখ ওপরে তো [redacted] সারি সারি গলা। মাথায় সিং। নয়তো [redacted] য়ের আভাস। সব চোখ দিলীপদের [redacted] কে। দেখলেই মনে হবে পার্কিং-সেটে দাঁড় করানো একপাল হরিণ। যেভাবে অফিস-পাড়ায় অ্যামবাসাডর, ফিয়াট সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হরিণরা বুঝতে পেরেছে—আমরা তারের এপারের বন্দী। ওরা ওপারের—

কালু কোন কথা না বলে চুপ করে থাকলো। দিলীপের ইচ্ছে হচ্ছিল—এবারে ফেরা দরকার। চোখ একদম বুঁজে আসছে। সে কোনদিন গিয়ার দেয়নি দিব্যি লাটু গিয়ারে গিয়ে তার হাত পড়লো। ক্লাচ ছাড়া, অ্যাকসেলারেটর সময়মত চাপ দেওয়া—সবই হয়ে গেল আপনাআপনি।

সেই খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়েই কালু ঘোষ বললো, চলো দিলীপ মাহুত বেটাকে ধরে নিয়ে আসি।

দিলীপ অনেক কষ্টে বললো, কি হবে ছেড়ে দিন।

চলো না ভাই। সুমিত্রার বাড়ি থেকে বন্দমত বেছে নেবে।

হেস্টিংসের দিককার একটা রাস্তার ঠিক কসিংয়ে ট্রাফিকের লাল, সবুজ, হলদে সিগন্যাল আপনাআপনি হয়ে যাচ্ছিল। অথচ এই গভীর রাতে তো কোন ট্রাফিক নেই। দিলীপ লাল পেয়ে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কালু ঘোষ ধমকে উঠলো। থামলে কেন? চলো। গঙ্গার ধারটা ঘুরে যাই।

বলতে না বলতেই গাড়ি প্রায় আপনা-আপনি স্টার্ট নিল। দিলীপ নামকোয়াস্তে শুধু জায়গামত হাতের আঙুল পায়ের গোড়ালি ইউজ করলো। কোন বাম্প নেই। ইঞ্জিনে একটুও ব্যাক ফায়ার নেই। নেই নয়েজ। যেন জলে চলছে।

গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়া পেয়ে দিলীপ বসু স্টিয়ারিংয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। সে তখনে বুঝতে পারছিলো, আজকের সন্ধ্যেটাই গোলমেলে। কোত্থেকে কি হয়ে গেল। কোনদিন গাড়ি চালাইনি। তবু চালাচ্ছি। গাড়ির ওনার আমারই পেছনে বসে। অথচ তার অলরেডি মরে যাবার কথা। কিন্তু সে নার্ভাস সারা সন্ধ্যে আমারই সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছে। একই টেবিলে—মুখোমুখি বসে। স্মুদ হুইস্কি। বরফের টুকরো।

আরও বেশি রাতে একবার জেগে গেল দিলীপ। তাকে কারা যেন জাগালো। একটা কালো রঙের ভ্যান। বাঁ হাতে ভবানীপুরের কাঁসারিপাড়া অনেকটা। ডান হাতে আদিগঙ্গা ঘেঁষে বাতিল মিলিটারি কবরখানা। সিমেন্টের পোলের মাথায় চাঁদ। পোলের নিচেই তিনটে শুয়োর গঙ্গায় নেমে গেল তখুনি।

তারপর আলোয় ভর্তি একটা লিফটের ভেতর সে ঢুকে গেল। এই অব্দি মনে থাকলো। তারপর সব অন্ধকার।

সকালে তাকে ঘুম থেকে তুললো রানী। কাল কোথায় গিয়েছিলে?

বেলা আটটায় পারমিকার রোদে তাকাতে পারছিলেন না দিলীপ। বালকের ট্যাউজার, সার্ট কিছুই খোলা হয়নি। মাথাটা পাথর। চোখের দুই পাতা ভারি। দিলীপ কোন কথা না বলে বাথরুমে চলে গেল।

ফিরে এসে খাবার টেবিলে বসলো দিলীপ। একসঙ্গে দুজনে সকালের চা খায়। ও অনেকদিনের অভ্যেস। চায়ের কাপ রেখে রানী বললো, কাল প্রায় শেষ রাতে লিফটের ভেতর থেকে দরোয়ান তোমায় দিয়ে গেছে। এই তো ছেড়ে দিয়েছিলে, আবার?

দিলীপ মনে করার চেষ্টা করছিলো—কখন সে অন্তর্ধান হয়। না, কখন থেকে তার আর কিছু মনে নেই।

রানী বললো, ঋষি ওদের সঙ্গে গিয়েছিলে?

নাঃ। ঋষির সঙ্গে দেখাই হয়নি। পাণ্ডবেশ্বর থেকে কলকাতায় আসছে—

বদলি হলেন?

হ্যাঁ। প্রোমোশন নিয়ে আসছে।

এক বছরে দু-বার?

যোগ্যতা আছে।

চায়ের কাপ হাতে দুজনে মুখোমুখি। দিলীপ সোজাসুজি তাকাতে পারলো না, রানীর মুখে। বউ কেন অফিসের কথা বলবে? এরকম একটা খটকা মনে আসতেই রানীর জন্যে দিলীপের মনে একই সঙ্গে মায়া আর লজ্জা কাজ করে বসলো। তাই সে আর রানীর চোখে তাকাতে পারলো না খানিকক্ষণ।

কাল কার একটা বিদঘুটে গাড়ি নিয়ে এসেছো?

এনেছি? সেই গাড়িটায় চড়ে এসেছি?

কোন্ গাড়ি?

দিলীপ উঠে দাঁড়ালো। এ-গাড়ির কথা কে বললো তোমায়?

লিফট্‌ম্যান বলছিলো।

কি বলছিলো রানী?

অমন পাগলের মত করছো কেন? বোসো। তোমার জন্য একখানা চিঠি আছে।

কার চিঠি? বলেই দিলীপ আবার উঠে দাঁড়ালো। গাড়িটা একবার দেখে আসি।

তোমার তো একখানা গাড়ি রয়েছে। আবার গাড়ি দিয়ে কি হবে?

সব কি তুমি শুনতে পারবে। ড্রাইভার এলে নিচে বেসমেন্টে যেতে বোলো। আমি এখুনি একবার ঘুরে আসছি।

দাঁড়াও। এই চিঠিখানা পড়ো আগে।

কার চিঠি?

পড়ো আগে।

দিলীপ পড়তে গিয়ে চমকে উঠলো। এসব কি লিখেছে মালবিকা?

আগে সবটা পড়ে দ্যাখো।

শ্রীচরণেষু বাবা,

আপনি ও মা আমায় ক্ষমা করবেন। অনেক ভেবে দেখলাম—এ-জীবন আমি মানিয়ে নিতে পারছি না। আমার ছিলো অ্যাথেলেটের জীবন। ভেবেছিলাম—একদিন এশিয়ান গেমস্—ভালো দৌড়তে পারলে ইণ্ডিয়ার হয়ে অলিম্পিকে যাবো। আপনি বা মা কিংবা কুটু সবাই আপনারা আমায় আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু আমি তো আপনার ছেলের খুনের রাজনীতিতে একদম বিশ্বাস করি না।

আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাদের নাতি ইতিমধ্যেই তার ঠাকুমার অনুগত। ওই-টুকু শিশুর মতো নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। যদি কখনো মনে হয়—ও আপনাদের কাছে একটি বোঝা, তবে আমায় ডাকবেন। আমি এসে নিয়ে যাবো।

আপনাদের ওখানে আমি আরামেই ছিলাম। তবু আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। রবি বলেছিলো—সে মানুষের ভালোর জন্যে এসব করছে। কিন্তু দেখছি সেই মানুষ তার সঙ্গে নেই। বরং মানুষই ওদের ভয় করে।

আমি আমার পুরনো জীবনে ফিরে গেলাম। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন।

প্রণতা
মালবিকা

দিলীপ প্রথম কথাই বললো, বাচ্চাটাকে দিয়ে আসুক কেউ—

না। রবির ছেলে আমাদের কাছে থাকবে।

মা ছাড়া বাচ্চা থাকতে পারে না। কেন শুধু শুধু সেন্টিমেন্টাল হোচ্ছো রানী—

রবি এলে তাকে আমরা কি দেব?

রবি আর এসেছে। এমনিই আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। রবি নিজের হাতে তা আরও শেষ করে দিলো।

কুটুকে পাঠিয়েছি।

কোথায় পাঠালে?

কাল সন্ধ্যাবেলা এ চিঠি পেলাম। তুমি বাড়ি নেই। কুটু নেই। কুটু থাকলেও আমি নিজেই কাল রাতে যেতাম। গিয়ে বলতাম—তুমি এ্যাতোটা নেমকহারাম কেন মা? আমরা তোমায় ছেলের বউ করে বাড়ি নিয়ে এলাম। আর খালাশ হয়েই তুমি স্বরূপ ধরলে!

না গিয়ে ভালো করেছো।

তুমি ফিরলে শেষ রাতে। আমি জেগেই ছিলাম। এই আসো। এই আসো ভেবে অন্ধকার ব্যালকনিতে বসে ছিলাম। একটু ঘুমিয়ে পড়েছি—দরজায় বেল—উঠে গিয়ে দেখি দরোয়ান তোমায় ধরে নিয়ে আসছে। এখানে একটু থেমে রানী বললো, তাই আজ সকালে কুটুকে পাঠালাম—

পাঠাতে গেলে কেন? আমাদের জীবন তো এমনিই নষ্ট হয়ে গেছে।

তবু সে তো আমার ছেলের বউ—বলতে বলতে কুটু ঘরে ঢুকলো।

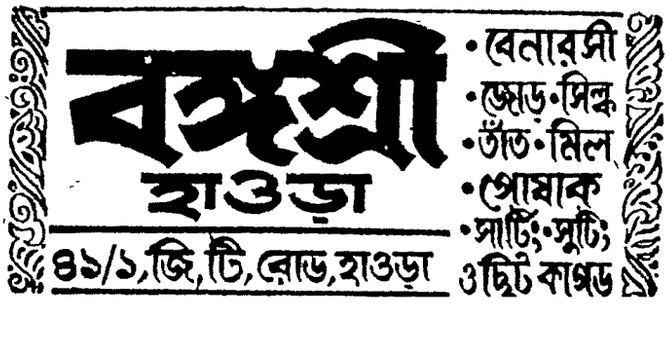

ঢুকেই কুটু বললো, নাঃ! বউদি আসবে না মা—

কাকে বউদি বলছিস কুটু। বলে দিলীপ নিজে নিজেই আধপটা খাবারের টেবিলে রাখলো। নুনদানীর নিচে ফ্ল্যাটের কিস্তি বাকি পড়ার রিমাইন্ডার। ইলেকট্রিক বিল। প্রাইভেট শাড়ির দোকানের নেমন্তন্নর চিঠি। আরো হ্যানোত্যানো—অনেক চিঠি—যার অনেকগুলোই খুলে দেখার সময় হয়নি দিলীপের।

সেই অবস্থাতেই দিলীপ শুনতে পেল —রানী কুটুকে অস্ফুটে বলছে—খোকার অয়েলক্লথটা পাল্টে দে মা। আমি নিচের দোকানে বড় কৌটোর প্ল্যাকসো এনে রাখতে বলেছিলাম। এসে থাকলে আনিয়ে নিতে হবে।

শুনতে শুনতে দিলীপ পরিষ্কার দেখতে পেল—তার এই জীবনে আর কোন দিকে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সব পথ বন্ধ হয়ে আসছে। অনেকগুলো গেট একসঙ্গে পাকিয়ে যাওয়ায় সে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। এর চেয়ে—এর চেয়ে—

ভাবতে গিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলো —পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড়াবার লাইনে পরপর হরিণ দাঁড়ানো। শুধু সামনের হরিণটাকে চেনা যাচ্ছে। তার সরু মুখে কাজলটানা দুই চোখ।

অফিসে বেরোবার নাম করে বেরিয়েই বেরোলো দিলীপ। রবির ছেলেটার চোখে বেশি করে কাজল দিয়েছে রানী। চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে রবির খোকা। চিৎপাত হয়ে। বুকে, গলায় পাউডার। বেরোবার সময় ঘুমন্ত শিশুকে দেখে তার মুখে চাপা হাসি এসে গেল। শালা জমিদার যেন!

বেসমেন্টে নেমে দেখলো সনাতন গাড়ি মুছে-টুছে রেডি করে রেখেছে। গাড়ি বের করতে করতে দিলীপের মুখে না তাকিয়েই বললো, ওটা কি এনেছেন দাদাবাবু?

কেন?

ও গাড়ি কে চালাবে?

তুমি চালাবে।

ও গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরুতে পারবেন!

কেন পারবো না। কালু ঘোষ যদি পারে—

সনাতন সবটা শুনতে পেল না। দিলীপ আবার বললো, গাড়িটা দেখলে তুমি।

দেখার কি আছে দাদাবাবু। ওইতো কোণে গড়িয়ে রাখা আছে।

হ্যাঁ। কাল আমি চালিয়ে এসেছি।

দরোয়ান তাই বলছিলো বটে। কিন্তু আপনি শিখলেন কবে? আমি তো আপনাকে কোন দিন চালাতে দেখিনি।

শিখে নিলাম। শেখার কি আছে? ক্লাচ, ব্রেক, অ্যাকসেলারেটর। হাত পা সেট হয়ে গেলেই চিন্তা থাকে না সনাতন।

এক সন্ধ্যেতেই সেট হয়ে যায় দাদাবাবু?

হবার হলে হয়ে যায়।

আজ অ্যামবাসাডর আপনি চালান।

নাঃ! ও গাড়ি আমি পারবো না। এই দিনের বেলা—ভিড়ের ভেতর আমি পারবো না। শেষে ঘেমে গিয়ে দিলীপ বললো, অস্টিন টুবারটা আমি চালিয়েছি—ফাঁকা রাস্তায়—মাঝরাতে।

খুব বেঁচে গেছেন। লরি এসে মেরে দিতে পারতো। বলতে বলতে গাড়িতে স্টার্ট নিলো সনাতন।

দিলীপ বললো, চেতলা বেকারির ওদিকটায় চল তো।

বাড়ির ভেতরে ঢুকলো না দিলীপ। গাড়ি থেকে নেমে দেখলো, দোতলার ঘরে বসে কিরীটী পালিত—তার বেয়াই এক মন দিয়ে লিখছে। রাস্তা থেকে ঘরখানার অনেকটাই দেখা যায়। দিলীপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। যদি মালবিকা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বাচ্চু তো নেই এখানে। খোকন নিশ্চয় তার কাজের জায়গায়। টাপু বোম্বেতে। কিরীটীবাবু এখনো অফিসে বেরোয় নি। আশ্চর্য! নিশ্চয় আজ বাৎসল্যের আইডিয়াটা লিখে রাখছে। পরে সময় মতো পেটেন্ট করাবে। বুঝতো মজা—বাৎসল্য কাকে বলে—যদি রবির মত ছেলের বাপ হোত।

মালবিকাকে দেখলে ইশারায় ডাকতো দিলীপ। কাছে এলে বলতো, এ তুমি কি করলে বউমা! নিজের ছেলে—নিজের শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে কেউ এভাবে একবস্ত্রে চলে আসে। মন খারাপ হয়ে থাকলে কদিন না হয় বাপের বাড়ি থাকতেই। তাই বলে এভাবে কেউ চলে আসে? না আসতে আছে? সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে। কাটানছাটান করে? একি মাবরেল খলাব খাটানো নট কিচ্ছু! আমরা কি তোমার কেউ নই? ওই শিশুটি তো তোমারই ছেলে—

মালবিকা দোতলার বারান্দায় এসে

ভারত কী করে ভাগ হোলো

বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানরা যোগ দেন নি কেন?

মৌলানা মহম্মদ আলি কেন বলেছিলেন: "মহাত্মা গান্ধী ও মতিলাল নেহরু হিন্দু মহাসভার পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।"

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে বাঙালি কংগ্রেস নেতারা সহ্য করতে পারতেন না কেন?

কোন আইন পাশ করাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাংলা গভর্ণমেন্টের পক্ষে ৪২ বার ভোট দিয়েছিলেন?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি সিঙ্গাপুর পুনর্দখলকারী ভারতীয় সৈন্য দলের স্বাধীনতা নিহত হয়েছিলেন?

মৌলানা আজাদ লর্ড লিনলিথগোকে কেন লিখেছিলেন: "ভারত ছাড় আন্দোলনের নামে যা হয়েছিল তার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক নেই।"

লর্ড ওয়েভেল চার্চিলকে কবে লিখেছিলেন: "পশুশক্তি দিয়ে ভারতকে আমরা আর পদানত রাখতে পারবো না। আমরা যেমন জগজীবন ও ডি ভ্যালেরার সঙ্গে মীমাংসায় এসেছিলাম তেমনি গান্ধী ও জিন্নার সঙ্গেও আমাদের মীমাংসায় আসতে হবে।"

ওয়েভেল গান্ধীজীকে কি বিষয়ে বলেছিলেন: "দিস ইজ ননসেন্স।"

গান্ধীজী ওয়েভেলকে কখন বলেছিলেন: "ইফ ইন্ডিয়া নিডস এ ব্লাডবাথ শী শ্যাল হ্যাভ ইট।" (ভারতের যদি রক্তস্নানের প্রয়োজন থাকে তাহলে তাই হবে।)

জিন্না বলেছিলেন: "দুটি কাঁটার মাঝে একটি গোলাপ ফুল।" গোলাপ ফুল কে? কাঁটা দুটি কারা?

জিন্না মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দুপায় ভালো করে কথা বললেন না কেন?

মাউন্টব্যাটেন কেন বলেছিলেন: "ভারতে আমার কাজ যে কত অসম্ভব হবে জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আমি তা বুঝতেই পারিনি।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় কার অবদান বেশি—ইন্দিরা গান্ধীর? না, মহম্মদ আলি জিন্নার?

স্বাধীনতা সংখ্যায় লিখেছেন বিমলানন্দ শাসমল

দাঁড়ালো না বলে কিছুই বলা হোল না দিলীপের। গাড়িতে বসে বললো, বরেন দত্তর ওখানে চলো।

টেনিস কোর্ট থেকে সোজা এসে টেবিলে বসেছে বরেন। রোজকার মতই। তিন রঙের তিনটে টেলিফোন। পাশের ঘরে সেল ডিভের খসড়া টাইপ হচ্ছিল খটখট করে। দিলীপকে দেখেই বরেন উঠে দাঁড়ালো। এই দেখুন— আপনাকে সকাল থেকে ধরার চেষ্টা করছি। লাইন পাচ্ছি না। ড্রাইভার এসে কি সব আবোল-তাবোল বলছে। ভাতঘুমে গাড়ি। দিনের বেলা ব্যাটা গাঁজা খায়।

দিলীপ খুব শান্ত গলায় বললো, দাম কত?

সেদিক দিয়ে গেলোই না বরেন। আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। লোক দিয়ে ডেকে নিয়ে গেছেন গাড়ি? আমি সরি। আপনার খুব কষ্ট হয়েছে।

ডেকে নিয়ে যাবো কেন? চালিয়ে নিয়ে গেলাম। দাম কত?

গাড়িটা আপনার কাছেই রয়েছে তো। চড়ুন না কদিন। বলেই থেমে গেল বরেন দত্ত। কি বললেন? আপনি চালিয়ে নিয়ে গেছেন? আপনি তো চালাতে জানেন না।

কি আছে চালাবার। হাত পা সেট হয়ে গেলেই তো—

এসব কি বলছেন স্যার? একলা দিন গাড়িতে চড়েই হাত পা সেট হয়ে গেল?

ওসব কথা থাক। দাম কত বলুন?

আপনি কিনবেন ঠিক করেছেন?

আমি কি ইয়ার্কি করতে এসেছি। দামটা বলুন না—

কেমন গাড়ি বলুন তো!

কথা বাড়াচ্ছেন কেন? দাম কত?

কালুর তো কেউ নেই। একা মানুষ ছিল। বউয়ের সঙ্গে তো সেই কবে ডিভোর্স হয়ে গেল। একমাত্র মেয়েটাও বিদেশে।

ছিলো কি মশাই! রীতিমত আছে।

অবাক হয়ে তাকালো বরেন দত্ত। আছে মানে?

মানে আছে।

আছে বলছেন আপনি। কিন্তু সে তো মরে ভূত হয়ে গেছে।

বাজে বকবেন না। আমরা কাল একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম। গাড়ি চড়লাম এক-সঙ্গে—

খাওয়া-দাওয়া করলেন? খাও দেওয়ালেন?

হ্যাঁ মিস্টার দত্ত। সন্ধ্যে থেকে একসঙ্গে একই টেবিলে ছিলাম।

কেমন দেখতে বলুন তো।

কেন? বেশ লম্বা। ভালো করে শেভ করা মুখ। শাদা পোশাক—

হ্যাঁ। শাদা পোশাক পরতে ভালবাসতো।

বাসতো কি! তাইতো পরেছিলেন—। ঠিক আমার পেছনে বসলেন গাড়িতে।

কোথায় নামলেন আপনারা?

এ জায়গাটার জবাব দিতে অসুবিধে লাগলো দিলীপের। কেননা—কাল শেষ রাতের শেষ দিকটা তো তার নেশায় ব্ল্যাক-আউট হয়ে গিয়েছিল। এসব কথা তো গাড়ির ড্রিলারকে বলা যায় না। বেশ রেগে-মেগেই বললো, সে-খবরে আপনার দরকার কি? আপনি বেচবেন কিনা বলুন? নয়তো আমি খোদ মিস্টার ঘোষকেই বলবো।

কালু ঘোষকেই বলবেন! থাক থাক! কি দরকার? তার চেয়ে আমার কাছ থেকেই নিন। নেট বত্রিশ শো টাকা দেবেন।

এক পয়সাও কম নয়?

না। কমাবার হলে সে আপনি কালু ঘোষকে বলুনগে।

বরেন দত্তর মুখে চাপা হাসি দেখে আরও রেগে গেল দিলীপ। হেঁটে গিয়ে গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে চেকবই এনে খসখস করে চেক লিখে দিলো।

কয়েক মিনিটের ভেতর রসিদ করে দিয়ে বরেন দত্ত বললো, গাড়ির সব খবরাখবর, দরকারী নিউজ আমি কাগজ থেকে কেটে ওই মোটা খাতাটায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখি। খাতাটা দেবেন কাইন্ডলি—

দিলীপ এগিয়ে দিলো।

এই দেখুন। গত নভেম্বরে স্টেটসম্যানে কি বেরিয়েছিলো। কলকাতার সব কাগজেই খবরটা ছিলো।

দিলীপ পড়তে গিয়ে দেখলো—বড় বড় হেডিংয়ে লেখা—কালু ঘোষ শট ডেড।

পুরো খবরটা প্রায় চোখে এক কলমের। খানিক পড়তে পড়তে দিলীপের চোখ অন্ধকার হয়ে এলো। খবরের কাগজের খুদে টাইপগুলো ফুলে মোটা হয়ে গায়ে গায়ে লেগে গেল। আর পড়া যাচ্ছে না—

কি হয়েছিলো বলুন তো?

বরেন অন্য জায়গা থেকে খবর করলো। আমার ড্রাইভার তো তাহলে মিথ্যে বলেনি। সত্যিই হয়তো গাড়িটার মায়া ছাড়তে পারেনি কালু।

চিনতেন কালু ঘোষকে।

একসঙ্গে আমরা টেনিস খেলতাম যৌবনে। তারপর ও বড় হয়ে গেল। কে আর পুরনো বন্ধুদের মনে রাখে বলুন? তবে আমি কিন্তু কাল ওর ট্র্যাক রেখে এসেছি। শেষে অপঘাতে মৃত্যু—

কি হয়েছিলো?

আবার কি হবে! একা লোক। হি ওয়াজ অলওয়েজ এ গ্রেট স্পোর্টস। বারুইপুরের দিকে একটা বাগান ছিলো ওর। সেখানে ফুর্তি করতে যেতো। নিজের দিঘিতে ন্যাংটো হয়ে চান করতো ঝাঁপিয়ে। শুনেছি—জল-কেলিও হোত।

তাই নাকি?

পয়সার তো অভাব ছিলো না। শেষে তো দু-সাতটা কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিল। অটোমোবিল ইণ্ডিয়ার এম ডি হয়েছিলো। তা পাড়ার ছেলেরাই হোক—কিংবা নকশালরা—ঠিক জানি না অমরা—ওকে একদম স্টিয়ারিংয়েই পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে মারলো। স্পট ডেথ্। সঙ্গে সব সময় একটা টাউট থাকতো। কলকাতা থেকে মেয়ে নিয়ে যেত। সে ব্যাটাও ওই সঙ্গে আরেক গুলিতে ঘায়েল। দুজনে গেট বন্ধ থাকায় লেভেল ক্রসিংয়ে গাড়ি থামিয়ে ওয়েট করছিলো। গাড়ি বেরিয়ে গেলেই ওরা বাগান-বাড়িতে ঢুকবে—তাই ঠিক ছিলো হয়তো। পড়ে দেখুন না খবরটা আবার—

দিলীপ পেপারকাটিংটা পড়তে গিয়ে দেখলো খুদে খুদে টাইপগুলো আবার ফুলে ফুলে যাচ্ছে। তবে কাল বেশি রাতে আমি কার সঙ্গে বসে শেষ গ্লাসটা উপুড় করে গলায় দিলাম? কে আমায় মাহুতের চোবা দরজা দিয়ে মাঝরাতের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেল? আমি কি তাহলে সন্ধ্যেরাতে মেজর জেনারেল রায়ের সঙ্গেই ছিলাম? রায়ের কার্ড-খানা তাহলে কোথায় গেল? আজই বাড়ি ফিরে খুঁজে দেখতে হবে তো। সেই যে মিলিটারির করখানার গায়ে সিমেন্ট পোলের মাথায় চাঁদ—নিচে তিনটে শূয়োর আদিগঙ্গায় নেমে গেল। আমার চেনা হরিণটার পেছনে সারি সারি হরিণ—একদম পার্কিং লটের সারি সারি গাড়ি যেন! সবই ভুল দেখলাম তাহলে?

ও গাড়ি কিন্তু আমি ফেরৎ নেব না স্যার।

আপনাকে ফেরৎ নিতে হবে না মিস্টার দত্ত।

শেষে ব্যাংকে বলে পেমেন্ট যেন বন্ধ করবেন না।

না না। ছিঃ! তা করবো কেন? আপনি বরং আমায় একটু সাহায্য করুন। আমি যে কিছু বুঝে উঠতে পারছিনে।

বোঝার কি আছে? একবার ক্লাবে গোঁত্তা নিন। কাল রাতে কার সঙ্গে ছিলেন শেষ অবধি। আর—

আর কি?

ভালো যজমান ডেকে গাড়িটার একটু শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে নিন। ইণ্ডিয়ান একেবারে এ ওয়ান। আমি জানি। কালুকে তো আমি আজ চিনিনে—

(চলবে)

খেলা

বিশ্বকাপ ফুটবল আসর

১লা জুন বুয়েনস এয়ার্সের রিভার প্লেট স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে ১৯৭৮ সালের একাদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ফিফার সভাপতি মিঃ জোরাও হ্যভেল্যাঞ্জ।

এর পর গতবারের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী, বনাম তৃতীয় স্থানাধিকারী পোলাণ্ডের উদ্বোধনী খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। এই নিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে পর পর চারটি উদ্বোধনী খেলা গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিত থেকে গেল।

চলতি একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল আসরে শেষ পর্যন্ত কোন দেশ বিশ্বকাপ জয়ী হবে তা জোর গলায় বলা খুবই শক্ত। ফেভারিট হিসাবে ব্রাজিল এবং তারপর আর্জেন্টিনার নাম শোনা যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকার মাটিতে এর আগে চার বার বিশ্বকাপ ফুটবলের যে আসর বসেছিল তাতে বিশ্বকাপ জয়ী হয়েছিল ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালের উরুগুয়ে এবং ১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে ব্রাজিল। অনেকের ধারনা আগের চার বারের মত এবারও দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশ বিশ্ব ফুটবল কাপ জয়ী হবে। দেখা যাক কি হয়।

সর্বভারতীয় যুক্ত অ্যাথলেটিক্স

জলন্ধর ১৬শ সর্বভারতীয় যুক্ত অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে যুগ্ম-ভাবে সার্ভিসেস এবং পুলিশ। উভয়ই ৬৯ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করে। গত বছর সার্ভিসেস একক ভাবে পুরুষ বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। এবার মেয়েদের বিভাগে দলগত খেতাব লাভ করেছে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে (পয়েন্ট ২৮)। মাত্র ১৯-৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে পশ্চিম বাংলা।

বিশেষ ব্যক্তিগত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন পুরুষ বিভাগে রেলওয়ের আর জ্ঞান শেখরন ও সার্ভিসেস দলের শিবনাথ সিং এবং মেয়েদের বিভাগে রেলওয়ের অ্যাঞ্জেল মেরী জোসেফ। জ্ঞান শেখরন ২৮০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে নতুন মিট রেকর্ড সময়ে প্রথম স্থান লাভ করেন। অপর দিকে শিবনাথ সিং নতুন এশীয় রেকর্ড সময়ে ম্যারাথন রেস এবং নতুন মিট রেকর্ড সময়ে ১০,০০০ মিটার দৌড় শেষ করে প্রথম হন। শিবনাথ ম্যারাথন রেস ২ ঘন্টা ১১ মিনিট ৫৯-৪ সেকেন্ডে শেষ করে নতুন এশিয়ান রেকর্ড করেন। ম্যারাথনে পূর্বের এশীয় রেকর্ড ছিল জাপানের কেপ্পি কিমিহারা প্রতিষ্ঠিত ২ ঘন্টা ২১ মিনিট ০৩-০ সেকেন্ড। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালের মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসে পূর্ব জার্মানীর ওয়ালডেমার দ্যুহ ঘন্টা ৯ মিনিট ৫৫-০ সেকেন্ডে ম্যারাথন রেস শেষ করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিলেন এবং শিবনাথ সেই আসরেই পেয়েছিলেন একাদশ স্থান। এখন দেখা যাচ্ছে, শিবনাথের সদ্য প্রতিষ্ঠিত এশিয়ান রেকর্ড ওয়ালডেমারের অলিম্পিক সময়ের থেকে মাত্র ২ মিনিট ০৪-৬ সেকেন্ড বেশী। সুতরাং ম্যারাথন রেসে শিবনাথ, আশের থেকে অনেক উন্নতি করেছেন।

মেয়েদের বিভাগে অ্যাঞ্জেল মেরী জোসেফ (রেলওয়ে) পেন্টাথলনে এবং লং জাম্পে মিট রেকর্ডে প্রথম স্থান লাভ করেন। তাছাড়া ২০০ মিটার হার্ডলসেও শীর্ষস্থান পান।

জাতীয় বয়স ভিত্তিক সাঁতার

মাদ্রাজে ৫ম জাতীয় বয়স ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় সম্প্রতি ৪টি গ্রুপে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—বালক বিভাগের ২নং গ্রুপে এবং বালিকা বিভাগের ২নং ৩নং এবং ৪নং গ্রুপে। বাংলা দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বালকদের ৩নং ও ৪নং গ্রুপে। বালকদের ১নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মহারাষ্ট্র। অপর দিকে বালিকাদের ১নং গ্রুপে দলগত খেতাব পেয়েছে কেরল।

সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত ফলাফল

বালক বিভাগ

গ্রুপ ১ : ১ম রাজস্থান ৮৪, ২য় কেরল ৫৬ ও ৩য় মধ্যপ্রদেশ ৩০।

গ্রুপ ২ : ১ম মহারাষ্ট্র ৭৫, ২য় বাংলা ৭০ ও ৩য় তামিলনাড়ু ৩১।

গ্রুপ ৩ : ১ম বাংলা ৬৭, ২য় মহারাষ্ট্র ৪৭ ও ৩য় কেরল ৪৬।

গ্রুপ ৪ : ১ম বাংলা ১২, ২য় এন এস এ ক্যালকাটা ৩৬ ও ৩য় কেরল ৩২।

বালিকা বিভাগ

গ্রুপ ১ : ১ম কেরল ৮০, ২য় মহারাষ্ট্র ৬২ ও ৩য় গুজরাট ৩২।

গ্রুপ ২ : ১ম মহারাষ্ট্র ৯৬, ২য় বাংলা ৬২ ও ৩য় কেরল ৫২।

গ্রুপ ৩ : ১ম মহারাষ্ট্র ৯৬, ২য় বাংলা ৫৬ ও ৩য় কেরল ৩১।

গ্রুপ ৪ : ১ম মহারাষ্ট্র ৭৯, ২য় বাংলা ৭১ ও ৩য় এন এস এ ২৩।

নতুন রেকর্ড

জলন্ধরের সদ্য সমাপ্ত ষাড়শ সর্ব-ভারতীয় মুক্ত অ্যাথলেটিকস প্রতি-যোগিতায় মোট ১১টি রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়—পুরুষ বিভাগে ৬টি এবং মহিলা বিভাগে ৫টি। এই এগারটি রেকর্ডের মধ্যে আছে ম্যারাথন রেসে সার্ভিসেস দলের শিবনাথের নতুন এশীয় রেকর্ড এবং মেয়েদের পেন্টাথলনের লং জাম্পে রেল ওয়ের অ্যাঞ্জেল মেরীর জাতীয় রেকর্ড।

পুরুষ বিভাগের রেকর্ড

ম্যারাথন : শিবনাথ সিং (সার্ভিসেস)।
সময় : ২ ঘঃ ১১ মিঃ ৫৯·৪ সেঃ (এশীয় রেকর্ড)

১০,০০০ মিটার : শিবনাথ সিং, সময় : ২৮ মিঃ ৫৮-১ সেঃ।

১০০ মিটার : আর জ্ঞানশেখরন (রেল)
সময় : ১০-৪ সেঃ।

২০০ মিটার : আর জ্ঞানশেখরন সময় : ২১-৩ সেঃ।

সটপুট : বাহাদুর সিং (সার্ভিসেস)।
দূরত্ব : ১৮-৩৫ মিটার।

ডেকাথলন : মহেশবাবু (কেরল)।
পয়েন্ট : ৭,০৭০।

মেয়েদের রেকর্ড

সট পুট : সুব্রতা দেবনাথ (বাংলা)
দূরত্ব : ১২-৪৮ মিটার।

লং জাম্প : অ্যাঞ্জেল মেরী (রেল)
দূরত্ব : ৫-৯৪ মিটার।

পেন্টাথলন : অ্যাঞ্জেল মেরী
পয়েন্ট : ৩,৩৭৪

১,৫০০ মিটার : গুলজা নরেশ
সময় : ৪ মিঃ ৪২-৩ সেকেন্ড

হাইজাম্প : উষাবানী মিশ্র
উচ্চতা : ১-৬১ সেঃ

আর সমাপ্ত সর্বভারতীয় মুক্ত অ্যাথলেটিকস আসরে মাত্র দুটি রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষ অ্যাথলিট আসন জনসংখ্যের দিক থেকে বেশী অংশ গ্রহণের যোগাড়া লাভ করেছেন :

সটপুট : বাহাদুর সিং, গুরদীপ সিং ও জগরাজ সিং (সার্ভিসেস)

১০০ ও ২০০ মিটার : আর জ্ঞানশেখরন (রেল)

১১০ হার্ডলস : সতবীর সিং (সার্ভিসেস)

ম্যারাথন : শিবনাথ সিং (সার্ভিসেস)

ডেকাথলন : মহেশ বাবু (কেরল)

ডিসকাস : পালভিন কুমার (পুলিশ)

দর্শক

[illegible] ভাবছেন দুই ক্যাপ্টেন

প্রসূন ব্যানার্জি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—'আমাদের টিম তো সম্পূর্ণ অ্যালাস্সড, গতবারের স্কোয়াডটাই থেকে গেছে কিন্তু ইনজুরি লিস্টটা একবার দেখুন। গৌতম হ্যাপেড্রড পারসেন্ট ফিট নয়। সুধীরও তাই। ফেডারেশন কাপ খেলতে গিয়ে আমিও চোট পেয়েছি। এবার গরমকাল মরশুম শুরু করছি বেশ কিছুটা হ্যান্ডিক্যাপ নিয়ে।'

প্রসূন ব্যানার্জি। বয়স ছাব্বিশ। কুজ মেবুনের দল মোহনবাগানের অধিনায়ক। লীগ শুরু হওয়ার ক-দিন আগে মোহনবাগান তাঁবুর সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে বসে কথা হচ্ছিল প্রসূনের সঙ্গে। ওর মতে, একটানা খেলতে খেলতে খেলোয়াররা বেশ ক্লান্ত। তাছাড়া দলের অ্যাভারেজ বয়সও বেশি। হাবিবের বয়স বেড়েছে। শ্যামের বয়স হয়েছে। বয়স বেড়েছে সুধীর কর্মকারেরও। ওদের যা বয়স, তাতে বেশি খেলার ধকল না নেওয়াই উচিত। তাই নয় কি? প্রশ্নটা প্রসূন ছুঁড়ে দিল শ্যামারই দিকে। উত্তরটা জিভের ডগাতেই ছিল। বললাম, শুধু ওরা কেন, ফুটবল-বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন যে, খুব বেশি ম্যাচ খেললে দক্ষতায় ঘাটতি আসতে পারে। সুতরাং নাম্বার অফ গেমস্ যত কম হয়, ততই ভাল।

নিজের দল সম্পর্কে প্রসূন যথেষ্ট আশাবাদী। তবে আমাদের সাফ সাফ নির্দেশ দিল যে, জিতবই একথা আগে থেকে যারা জোর দিয়ে বলে, ও তাদের দলে নয়।—'আমার দলের শক্তি আছে, ফুটবল-নিলিটি আছে, কিন্তু বিপক্ষ গোলে গিয়া চুপচাপ বসে নেই। ওরাও কি হচ্ছে। সুতরাং জিতবই একথা না বলে বরং বলি জেতার জন্য লড়ব।'

লড়বার জন্যই প্রসূনের দল তৈরি হচ্ছে। এই লেখাটা যেদিন লিখছি (১৯ সেদিন পর্যন্ত মোহনবাগান একটি ও খেলেনি। তবে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে প্রস্তুতি পর্ব চলেছে প্রতিদিন দুবেলা। সম্ভাব্য লেফ্‌টিমেক বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলেছেন শরীর থেকে। ফেভারিট না হলেও সুলভার ফুল খেলোয়াড়। বিদেশি খেলোয়াড়ের ছোট নিরাময়ের পথে। বিদেশি মানস ভট্টাচার্য মোহনবাগানের আক্রমণেই ডানা। পরিণত শ্যাম, হাবিব [illegible] অধিগত বিদ্যার সবটুকু উজাড় করে দেবার জন্য প্রস্তুত। ডিফেন্স [illegible] সুব্রত, পাপীপ আর নবাগত [illegible] ব্যানার্জিরা সব চ্যালেঞ্জ গুঁড়িয়ে দেবার কতসংকল্প। প্রসূন-গৌতম ঠিক করে মোহনবাগান ডার্বাবে না ব্যাকে। [illegible] লক্ষ্মণ আর কখনো-সখনো সন্তোষ বসু, এই নিয়ে গড়া লাস্ট ডিফেন্সও তৈরি হচ্ছে প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকারদের মোকাবেলায়। গোয়ার ফ্রান্সিস ডি-সুজা ছাড়পত্র পেলে তো সোনায় সোহাগা। আটাত্তরের মোহনবাগান এই মুহূর্তে স্কিল আর অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে তৈরি কমপ্লিট একটি ফুটবল দল।

মোহনবাগান দলটি যে যথেষ্ট সুষম আর শক্তিশালী, সে-কথা স্বীকার করতে কয়েক সেকেণ্ডও সময় নিলেন না ইস্টবেঙ্গলের এবারের অধিনায়ক সুব্রতিং সেনগুপ্ত। স্টেট ব্যাংকের স্ট্যাণ্ড বোড হেড অফিসের সিকিউরিটি ডিপার্টমেণ্টের অফিসার সুব্রতিংয়ের সঙ্গে দেখা করলাম ওর অফিসে। লাঞ্চ আওয়ার্সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসে টেপ-রেকর্ডারে ভূপেন হাজারিকার গান শুনছিল সুব্রতিং, যাকে

সুব্রতিং সেনগুপ্ত

প্রসূন ব্যানার্জী

নিঃসন্দেহে বর্তমান ভারতের সেরা রাইট উইংগার বলে অভিহিত করতে পারি (সুব্রতিংয়ের সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎকারটি ফেডারেশন কাপের আগে। ফেডারেশন কাপে, শ্যাম থাপার মতে, সুব্রতিং ছিল বেস্ট প্লেয়ার। আগাগোড়াই ভাল খেলেছিল সুব্রতিং)।

সুব্রতিং বললো, 'ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে দুর্বলতা মিড-ফিল্ডে। পিন্টুদা যদিও যখন তখন অঘটন ঘটাতে পারে, তবু এটা তো সত্যি, ওর বয়স হচ্ছে। আগের মত পরিশ্রম করে সারা মাঠ চষে খেলা ওর অসুবিধাজনক। বাকি থাকল প্রশান্ত আর সুবিমল। সুবিমল একেবারে আনকোরা। মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে। প্রশান্ত পিন্টুদার পাশে 'যদি মানানসই হতে পারে....।'

ইস্টবেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইন তো বেশ ভাল। তুমি আর উলগা দু-পাশে, মধ্যে রণজিত, মিহির। দরকারমত অশোক চন্দ খেলতে পারে। আর সাবির যদি খেলার অনুমতি পায়, তাহলে তো তোমাদের কোন চিন্তাই নেই, তাই নয়কি? সুব্রতিং স্বীকার করল ফরওয়ার্ড লাইন নিয়ে খুব বেশি চিন্তা ও করছে না। অশোক সম্পর্কেও সুব্রতিং আশাবাদী। সাবিরকে পাশে পেলে যে-কোন দলের সঙ্গেই লড়াই জমবে। না পেলেও সাতাশ বছর বয়স্ক লাল-হলুদের নেতা লড়তে বদ্ধপরিকর। ডিফেন্স লাইনে আছে সুধীর কর্মকারের উত্তরসূরী চিন্ময়, আছে শ্যামল, মনোরঞ্জন, সত্যজিৎ। তরুণ খেলোয়াড় সমীর মুখার্জি ও তরুণ মুখিয়াও প্রয়োজনে লড়বে। গোলে ভাস্কর এখন এক নম্বরে, বর্ষীয়ান তরুণ বসুর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। বিশ্বজিতও আছে। কোচ অরুণ ঘোষ প্রতিনিয়তই উদ্দীপ্ত করে চলেছেন দলকে। ওদের সকলের আশা, ইস্টবেঙ্গল অন্তত ভাল খেলবে।

তেইশটি দল নিয়ে প্রথম বিভাগীয় লীগের কাঠামো। কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রশ্নটির মীমাংসা হয় একটি ম্যাচে—মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল। দুটি দলই তাকিয়ে থাকে ওই ম্যাচটির দিকে, তাকিয়ে থাকি আমরা যারা দর্শক, তারাও। লীগের আগে কোয়েম্বাটুরে ফেডারেশন কাপে দুই প্রধান দুবার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু যে প্রশ্নটিকে ঘিরে কলকাতা উদ্বেল হবে, মাতবে, তার উত্তর পাওয়া যায়নি। সেই উত্তরের ঠিকানা জানতে ২৯ জুলাই আবার মুখোমুখি হবে ফুটবলের বাঘ-সিংহ। আমরা তাকিয়ে থাকলাম সেই দিকেই।

নয়ন্ত চক্রবর্তী

গোকুলচন্দ্র নাগ

প্রবীণ সেতারিয়া শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগের নাম আজকের যুগে অনেকেরই জানা নেই—যাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীমণিলাল নাগ ভারতের প্রথম শ্রেণীর সেতারী হিসেবে সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ঘরানার উল্লেখযোগ্য শিল্পী হিসেবে শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগের বিশেষ সুনাম ও খ্যাতি আছে। ইং ১৯০৭ সালে বাঁকুড়াতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা গোবিন্দচন্দ্র নাগও সেতারী হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এর পিতা বাউরীচন্দ্র নাগ (গোকুলবাবুর পিতামহ) সেনী ঘরানার তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ বীণকার ও ধ্রুপদী কাশিম আলি খাঁ এবং তানসেনের বংশধর বাহাদুর হোসেন খাঁর সুযোগ্য শিষ্য রামশংকর ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ অতি শৈশব হইতেই তাঁর পিতার নিকট সেতার শিক্ষা শুরু করেন, পরে বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত যন্ত্রবিদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ) গোকুলবাবুর বাজনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিজে থেকেই তাঁকে শিক্ষা দিতে সুরু করেন এবং গোকুলবাবুকে বিষ্ণুপুরে নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখেন। কেবল সেতারই নয়, রাম প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বীণ, সুরবাহার, এসরাজ, নিলরবা প্রভৃতি যন্ত্রেরও কলা কৌশল কিশোর গোকুলচন্দ্রকে আয়ত্ত করালেন। তার সঙ্গে ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল প্রভৃতি শেখালেন। মোট কথা তাঁর এবং তাঁর উভয় সহোদরকে সংগীতজ্ঞ রামপ্রসন্নবাবু অল্প বয়সের মধ্যেই পারদর্শী করে তুলিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে রামপ্রসন্নবাবু শিক্ষা করিছিলেন সে যুগের বিখ্যাত বীণকার ওস্তাদ সাদেক আলীর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ মহম্মদের কাছে। পরে তিনি প্রসিদ্ধ নত্থো গোপালের কাছে গানও শিখেছিলেন। ওস্তাদ আলা উদ্দিন খাঁ সাহেবও নত্থো গোপালের শিষ্য ছিলেন।

যাইহোক, রামপ্রসন্নবাবুর কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর গোকুলবাবু পরে তৎকালীন আগ্রা ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ সাদিদ হোসেন খাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ খেয়াল ও ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া গোকুলবাবুর এক জ্যাঠামশাই (বয়সে বড় হলেও) শ্রীকেদার নাথ সে সময় বিখ্যাত তবলা ও পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। গোকুলবাবু তাঁর নিকট তবলা ও পাখোয়াজেও বিশেষভাবে আয়ত্ত করে ফেলেন। আমরা খুব কম শিল্পীদেরই এমনি সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি। গোকুলবাবুর বেলায়ও একথাটা আমাদের একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হয়।

শ্রীরামপ্রসন্নবাবু (গোকুলবাবুর গুরু) গোকুল নাগকে কলকাতা যাবার জন্য পরামর্শ দেন এবং নিজে কলকাতায় বহু বড় বড় ব্যক্তিদের সঙ্গে গোকুলবাবুর পরিচয় করিয়ে দেন। কলকাতায় এসেই গোকুলবাবু আকাশবাণীতে কণ্ঠ এবং যন্ত্র দুই সঙ্গীতেই পরিবেশন করতে শুরু করেন। এক রকম আকাশবাণীর গোড়া থেকেই তিনি অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছেন। বিখ্যাত ইমপ্রেসেরিও শ্রীহরেন ঘোষের মাধ্যমে বিখ্যাত নৃত্যবিদ উদয়শংকরের সঙ্গে গোকুলবাবুর পরিচয় হয় ১৯৩৩ সালে। গোকুলবাবুর বিভিন্ন যন্ত্রে পারদর্শিতা দেখে উদয়শংকর মুগ্ধ হন এবং সেই বৎসরই উদয়শংকর গোকুলবাবুকে তাঁর নৃত্য গোষ্ঠীতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং সঙ্গীত পরিচালনার ভার দিলেন। উদয়শংকরের অনুরোধেই আজকের বিশ্ববিখ্যাত সেতার শিল্পী পণ্ডিত রবিশংকরের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় গোকুলবাবুর কাছেই। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সঙ্গীত পরিবেশন এবং নৃত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে অল ইণ্ডিয়া ট্যুর করার পর উদয়শংকর গোকুলবাবুকে তাঁর দলের সঙ্গে বিদেশে যাবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু পিতার সম্মতি না থাকায় গোকুলবাবুকে বাধ্য হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করতে হোলো এবং চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তিনি উত্তরপাড়ার জমিদার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি বহু জমিদার পরিবারবর্গকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। উদয়শংকর ছাড়া বর্ধমানের মহারাজা, সেরাইকেলার রাজা, নিনা দেশাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণও গোকুলবাবুকে বিলেতে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু ওই একই বাধা, পিতার অসম্মতির জন্য তাঁর আর বিদেশ যাত্রা হয়ে উঠলো না। শিক্ষক হিসেবে বা গুরু হিসেবে গোকুলবাবুর বিশেষ সুখ্যাতি আছে। তাঁর নিকট বহু ব্যক্তি সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। গোবীপুরে শ্রীবজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরে (বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র) গোকুলবাবুর নিকটই শিক্ষা করতে। ১৯৫৪-৫৫ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে সঙ্গীত বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ঐ [illegible] তি উত্তরপাড়া থেকে পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন। তৎকালীন ভারতের বহু বড় বড় সঙ্গীত সম্মিলনী এবং বড় বড় মহারাজ দরবারে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গত পরিবেশন করেছেন। শতাধিক জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী এনার বিশেষ বন্ধু ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব গোকুল বাবুকে বড় ভালবাসতেন। উত্তরপাড়ার সঙ্গীত আসরে আলাউদ্দিন খাঁর অনুরো গোকুলবাবু তাঁর সঙ্গে ঘন্টা তিনেক তর্বলায় সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁ বিখ্যাত ধ্রুপদ গাইয়ে অমর ভট্টাচার্য সঙ্গে পাখোয়াজেও কৃতিত্বের স্বা যোগিতা করেছেন।

বহু অগণিত ছাত্রছাত্রীদে [illegible] এখনও নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে শি দিয়ে চলেছেন। আমেরিকায় পিটার এ'নার তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত প্রবীণ

ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করিয়া আমেরিকাতে বড় একটা মিউজিক স্কুল স্থাপন করেছেন। শ্রীগোকুলবাবুর আদর্শ, সরলতা পান্ডিত্য প্রভৃতি তাঁর সান্নিধ্যে না এলে উপলব্ধি করা যাবে না। বহু বড় বড় মহান ব্যক্তি যথা মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতির সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন, কিন্তু নিজের জন্য তাঁদের নিকট কখনও কিছু অনুরোধ করেন নি।

১৯৭২ সালে তাঁর এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রীসৌমেন ঠাকুর বলেছেন, 'গোকুল নাগ এমন এক শিল্পী যিনি সঙ্গীতকে বাঁধন থেকে মুক্ত দিয়েছেন।' শ্রীকানাইবাবু বলেছেন, 'শ্রীগোকুল নাগ বিষ্ণুপুর ঘরানার এক উজ্জ্বল শিখা, তিনি আজীবন নিরলস পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা সঙ্গীতের মূল ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।' শ্রীউদয়শংকর বলেছেন 'পরম শ্রদ্ধেয় গোকুলবাবুর ভারতীয় সঙ্গীত জগতের শ্রেষ্ঠ গুণীদের। আমার অনেক স্মৃতির সাথে তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।'

ত্রিমূর্তির সঙ্গীত সন্ধ্যা

ত্রিমূর্তির প্রয়োজনায় রবীন্দ্রসদনে শনিবার সন্ধ্যায় একটি মার্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়েছিল। অংশ গ্রহণ করেছিলেন কণ্ঠসঙ্গীতে ঐ, কানন ও মালবিকা কানন যন্ত্রসঙ্গীতে সেতার ও সরোদে যথাক্রমে শ্রীমান বুধাদিত্য মুখার্জী ও বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত। অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় শ্রীমতি মালবিকা কাননের রাগ 'শ্রী' দিয়ে। 'শ্রী' কঠীন রাগ, কোমল রেখাব ও পঞ্চমের ওপর সুরের সেতু বোনা করতে হয়। অন্যান্য স্বরে সাবধানে চলা ফেরা না করলে পূর্বাঙ্গে পূরিয়া ধানেশ্রীতে হোঁচট খাবার সম্ভবনা থাকে, উত্তরাঙ্গে মূলতান কে বাঁচাতে হয়। রবীন্দ্রকাল ব্যয়ের মত গুণী ব্যক্তির কন্যা ও শিষ্যা হিসাবে রাগের বিশুদ্ধ রূপ মালবিকা কাননের বরাবরই অক্ষুন্ন থাকত। সে দিন রবীন্দ্রসদনেও এর বিচ্যুতি ঘটেনি। মালবিকা কাননের গুণ হল তাঁর পরিমিত বোধ, তাঁর সীমা সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন। কখন এমন অলঙ্কার করার চেষ্টা করেন না যা তিনি বলতে পারবেন না। গানের মধ্যে অহেতুক দৌড় ঝাঁপ তিনি করেন না। তাঁর সংযত সঙ্গীতচিন্তা যেমন তাঁকে ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে তাঁকে গানের স্ট্যান্ডার্ড এক জায়গায় রাখতে সাহায্য করে, সেই রকম কখন কখন কল্পনা শক্তিকেও সীমাবদ্ধ করে রাখে। এক কথায় উনি শ্রোতাদের হোঁচট খাওয়াতে খাওয়াতে মাউন্ট এভারেস্টে নিয়ে যাবার চেষ্টা না করে মসৃণ পথে সুন্দর ভাবে দার্জিলিং নিয়ে যেতে পারলেই খুশি। 'শ্রী' গেয়ে তিনি শ্রোতাদের এই ভাবেই আনন্দ দেন। তাঁর স্বভাবের মিষ্টত্ব তাঁর কণ্ঠে প্রকাশ পায়। সে দিনও পেয়েছিল।

সে দিন সন্ধ্যায় শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান ছিল বুদ্ধদেব দাসগুপ্তর সরোদ। তাঁর পরিবেশিত রাগ 'ছায়া' সৌন্দর্য্যবোধ, সংযত কল্পনা ও ভাল রাগ শিক্ষার একটি সুন্দর মিশ্রন হয়েছিল। সরোদের পুরাতন কাজ অটুট রেখেই সৌন্দর্যের প্রয়োজনে গায়কী অঙ্গের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। বোল বিস্তারে ওঁর জুড়ি পাওয়া মুস্কিল বিশেষ করে মধ্য লয়ে যেখানে আঁশের সঙ্গে বোল মেশান হয়। একটি নূতন বোলও ওঁর বাজানোর লক্ষ্য করলাম 'দিদ্দার'। এই বোলটি পাখওয়াজ থেকে নেওয়া। আগেকার দিনে রবার, ও বাঁয়ায় দুটো আঙ্গুলের মিজরাফের সাহায্যে, এই বোল বাজানো হয়। 'ভাষা' আজকাল খুব কম শোনা যায়, তার কারণ বোধ হয় এইসব রাগ বাজাতে হলে ভাল তালিমের দরকার। শুনে এই রাগ তুলতে গেলে 'ছায়ানট' থেকে বাঁচান যাবেনা। বুদ্ধদেব দাসগুপ্তর আলাপ যেমন সুরেলা মিষ্টি ও পরিচ্ছন্ন হয়েছিল, গৎ ও হয়েছিল পরিষ্কার ও বৈচিত্রময়। সময় কম পেলেও অনুষ্ঠানটিতে সম্পূর্ণতার অভাব ছিল না। স্বপন চৌধুরীর তবলা সঙ্গত সজিবতায় পূর্ণ থাকলেও তার মধ্যে পেটা ভাব একেবারেই ছিল না। ছিল সুচিন্তা ও সহযোগিতা। বুদ্ধদেব দাসগুপ্তর অনুষ্ঠানকে জমজমাট করতে স্বপন যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, বিশেষ করে ঝরোয়া ও সাতসঙ্গতের সময়ে।

তৃতীয় অনুষ্ঠান ছিল এ কাননের যোগকোষ'এ যেসাল। শারিরিক অসুস্থতার জন্যেই বোধহয় প্রতিটি স্বরে ওঁর গলা না দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ওঁকে সাহায্য করে এই সতেরও আসর জমিয়ে তুলতে

শ্রীমান বুধাদিত্যের সেতারে রাগ 'ইমন' দিয়ে এই সন্ধ্যাসঙ্গিত আসর শেষ হল। বুধাদিত্যের প্রতিভা আছে সুন্দর তানের চিন্তা। বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের কাছে না শিখলেও, তাঁর তানের কিছু রাস্তা বুধাদিত্য গুলে খেয়েছে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয় কারণ বিলায়েৎ খাঁর কোন ছাত্রকে এই তানের রাস্তায় এর থেকে কম দ্রুত লয়ের চলাফেরা করতে দেখি না। বুধাদিত্যের আলাপ শুনতে সুন্দর হলেও মার্গ বিচারে একে আওচার বলাই উচিত আওচারে ধ্রুপদ বা ভাল খেয়ালের বোনাদ না থাকলেও কিছু সুন্দর পংক্তি ও মিড়ের কটকা শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দদেয়। আওচারের পর ঠোক ঝালায় কিছু সুন্দর সাপট তান অতিদ্রুত লয় ও অনেকগুলি স্বর নিয়ে বাজিয়ে সময় সময় চমক লাগিয়ে শ্রোতাদের খুশি করে। বুধাদিত্য কৃতিমান, সেতারের ওপর দখল ও খুব ভাল, কোন গুণী শিল্পীর কাছে রাগদারীর ভাল তালিম পেলে বাঙ্গালীদের মুখউজ্জল করবে।

কলকাতার আশেপাশে

এই বছরে দেখে খুব ভাল লাগল কলকাতার আশেপাশে অনেক ছোট ছোট জায়গায় গান বাজনার আসর বসেছিল মার্চ এপ্রিল মাসে। এই আসরগুলি কলকাতার রবীন্দ্রসদন ও কলামন্দিরের অপেক্ষায় ছোট হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খুব সুষ্ঠুভাবে আয়োজিত। কখনও জেলা লাইব্রেরী হল, কখনও বা সিনেমা হলে। শ্রোতাগৃহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণ দেখে মনে হল গান-বাজনার প্রতি ভালবাসা কলকাতার থেকে কলকাতার আশেপাশের জায়গাই বেশী। গান বাজনা সাধ্য বস্তুর এসব জায়গায় কম হয় বলেই কি এঁদের উৎসাহ বেশী, না বড় শহরের জটিলতা এদের স্পর্শ করেনি বলে? যাইহোক একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এই রকম সঙ্গীত প্রেম দেখা যায় ভারতবর্ষের আর কোন জায়গায় এই রকম সঙ্গীত প্রেম দেখা যায় কিনা সন্দেহ। হাফেজ আলী খাঁ থেকে বিলায়েৎ পর্যন্ত সকলেই যখন এই কথা এক বাক্যে স্বীকার করতেন, তখন ভারতীয় যে বাঙ্গালীবাবুদের বোধহয় মন রেখে কথা বলছেন। এখন দেখছি অনেক শক্তিক্ষয়ের পরেই ওঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

আগরপাড়া, চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর, কোন্নগর, ব্যান্ডেল, চন্দননগর জয়নগর প্রভৃতি জায়গায় পাড়া ব্যাপী অনুষ্ঠান গুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খরচ হয়েছিল তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা। তার মধ্যে হল ভাড়া ও বিজ্ঞাপনের খরচা বাদ দিয়ে হাজার দুই-তিন টাকা শিল্পীদের দক্ষিণা হিসাবে দেওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কলকাতার নামী স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন এবং শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। যাঁরা এইসব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মানস চক্রবর্তী, শংকর ঘোষ, শ্যামল বোস, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গোবিন্দ বোস, অমিয়-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই বছরে আমারও এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যতটুকু করেছেন, ততটুকুই পরিচ্ছন্ন ও সুষ্ঠুভাবে করেছেন। এই পরিচ্ছন্নতা কলিকাতার আসরে আজকাল পাওয়া যায় না। কলিকাতার আসরে হয় পয়সার, অভাব না হলে আন্তরিকতার অভাব। কলকাতার বাইরে কোনটারই ঘাটতি দেখি না। বিশেষ করে আগরপাড়া সঙ্গীত সম্মিলনী ও ব্যান্ডেল সিনেমা হলে বংশীবাদক প্রণব মুখোপাধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিচালনা দেখে ভীষণ খুশি হলাম। এইসব জায়গায় ঝড় বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও শ্রোতাদের উৎসাহ দেখে মুগ্ধ হলাম। কলকাতার শহরে যে সব বড় বড় সঙ্গীত প্রচার কেন্দ্র বড় ব্যবসাদার দের মোটা অংকের অর্থ দিয়ে শুরু হয়েছে তাদের উচিত গ্রামেও সঙ্গীত প্রচার ও প্রসার করা।

সুব্রত রায়চৌধুরী

চিত্রধ্বনি

রাজনৈতিক চলচ্চিত্র

ভারতবর্ষ মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘটনাবহুল দেশ। চেঙ্গিস খাঁর ভারত আক্রমণ থেকে শুরু করে আজ অব্দি অনেক ঘটনার সাক্ষী এর মাটি। এত দূরে না গিয়ে, যদি পলাশীর যুদ্ধ থেকেই শুরু করি তাহলেও নানা দৃশ্য দেখতে পাব। দুশ বছরের পরাধীনতার মধ্যে অনেক নবাবের আগমন নিষ্ক্রমণ ঘটেছে, হয়েছে মন্বন্তর, বিদ্রোহ, মরেছে অনেক মানুষ। তারপর ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, বিধবা বিবাহ জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতি নানা ঘটনায় আলোড়িত এই দেশ। স্বাধীনতার পরেও অনেক ঘটনা ঘটে যায়, হয় দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নেতৃত্বের লড়াই, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন বেকার সমস্যা, নকশালবাড়ি, জরুরী অবস্থা সরকারের পরিবর্তন ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

কিন্তু এসব কোন ঘটনাকে আজো অব্দি ভারতবর্ষের কোন চলচ্চিত্রে দেখা গেল না। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে প্রকৃত কোন ছবি এখানে আজো হয় নি। যা হয়েছে তা বড় বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আবেগ প্রবণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে অনুপস্থিত। এর পাশাপাশি অন্য দেশগুলোর দিকে তাকান, কিউবা, আর্জেন্টিনা চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রীস, জাপান, বাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক নানা ঘটনা সাফল্যের সঙ্গে ওখানে চিত্রায়িত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের দেশেও কিন্তু চেষ্টা চলেছিল। ৭২, বাঘা যতীন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লাইন প্রভৃতি বেশ কিছু ছবি ঐ সময়ে নির্মিত

বাঁশরী ছবিতে সুমিত্রা

হয়েছে। কিন্তু এর কোন ছবিকেই রাজনৈতিক ছবি বলা যাবে না। অবশ্য রাজনৈতিক ছবি যে শুধুমাত্র বাস্তবের ঘটনা নিয়েই হতে হবে এই মতবাদে আমি বিশ্বাসী নই। রাজনীতি কথাটাকে আরো ব্যাপক অর্থে ধরলে আমাদের সামাজিক জীবনেও তার আভাস পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ছবির প্রথম শর্ত তার বিশ্লেষণ। এবং এখানেই আমাদের তথাকথিত সব রাজনৈতিক ছবি ব্যর্থ। এ জাতীয় ছবিতে যে প্রখর দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিকতা ইত্যাদি থাকা দরকার, তার অনেক কিছুই ঐসব ছবিতে নেই। কিন্তু ঐ সময় তবু তো কিছু হয়েছিল, কিন্তু তারপর, ১৯৬৮'র পরে এই পশ্চিম বাংলায় তো অনেক ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু তখন কোন কিছুই চলচ্চিত্রে দেখতে পেলাম না কেন? ১৯৭৮-এ বোম্বাইতে নির্মিত কটা ছবিকে অনেকে রাজনৈতিক ছবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার একটি কিস্সা কুর্সিকা, অন্যটি নাসবন্দী। আমার মতে শোলে, বন্দী বা হাবানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ ইত্যাদি ছবিকে যদি রাজনৈতিক ছবি বলা যায়, তা হলেই ঐ দুটো ছবিকেও রাজনৈতিক বলা যেতে পারে, না হলে নয়। সামাজিক ছবির নামে সমাজ বহির্ভূত নানা ঘটনা পরিবেশনই আমাদের আজকের সংখ্যাগরিষ্ঠ চলচ্চিত্রের মূল কথা। সবাই উদ্দেশ্যহীন পথের যাত্রী। অথচ উদ্দেশ্যই রাজনৈতিক ছবির প্রাণ। রাজনৈতিক ছবির সংজ্ঞা বা উদাহরণ কি, এর উত্তরে খুব সংক্ষেপে বলা যায় জনরঞ্জন একটি রাজনৈতিক ছবি হতে পারত, অথচ হয় নি, অন্য দিকে সুবর্ণ রেখা একটি রাজনৈতিক ছবি হতে পারত অথচ হতে পারে নি, স্ত্রী বা সন্ন্যাসী রাজা ইত্যাদি ছবিও রাজনৈতিক হতে পারত, যদি যদি....

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ছবি না হওয়ার মূলে অনেকে সেন্সারকে দায়ী করেন। কিন্তু সেন্সারের থাবা এড়িয়ে যেভাবে ভৌন দুশোরা আসে, রাজনৈতিক ছবিও ঐভাবেই আসতে পারত।

এ দেশের মানুষকে অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন বলা হয়। কিন্তু সেই রাজনীতি বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক। ফলে পুরো রাজনীতি থেকে তা অনেক দূরে। প্রকৃত রাজনীতি মানুষকে যে বিজ্ঞান, যে বিচার, যে ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়াতে সাহায্য করে, তার মুখোমুখি তাঁরা হতে চান বলেও মনে হয় না। আজকাল এক অদ্ভুত স্ববিরোধীতায় সবাই ভুগছেন, যেমন ধরুন ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ পরিচালকরা আমাদের ছবির সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ নেই এই জন্য যে যাঁরা ছবি করেন তাঁদের কারুরই সঠিক কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই। এর কারণ কিন্তু তাঁরা নন, কারণ দেশ, এই সমাজ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর একদল বললেন দেশ স্বাধীন হয়েছে অহিংসার মন্ত্রে আমরা দেশ এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন, একদল গণতন্ত্রের বিশ্বাসী, আরেক দলের বিশ্বাস সমাজতন্ত্রে, গ্রামাঞ্চলে ধোঁয়াটে এক শব্দ চালু হল : সমাজ তান্ত্রিক গণতন্ত্র। এ তো গেল রাজনীতির ওপর দিকের কথা। কিন্তু তলার দিকের সেই একই, ন্যাপাল। সেখানে সততার প্রতীক গান্ধীজীর নাম করে অনেক কালো বাজারী মুনাফা বাজার এক মার্কস ব্যাখ্যায়িত হয় বহুভাবে নিষ্কামের নামে চলে অনিয়ম, নিষ্ঠো সমাজের নেতৃত্বে এমন লাগাতে করে বেড়ায় যে মিথোকেই সত্যি মনে হয়, রক্ষক নেয় ভক্ষকের আসন, শাসককে চালান হয় উপহাস করে। এই পরিবেশে পুরোনো বিশ্বাস, ভাঙচুর হতে বাধ্য। আর সমাজের একজন হয়ে স্বচ্ছ কোন ব্যক্তি নৈতিক বোধও বিচলিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা একত্রিশ বছরের স্বাধীনতা আমাদের দেশে

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনীর পথে।

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়

নাটক ও পরিচালনা : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেঃ- বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার।

কোন এক স্থির রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে নি, আর এ যতদিন না সম্ভব হবে, ততদিন রাজনৈতিক ছবির নামে কিসসা কুরসিক্লারা শুধু কিস্‌সাই ছড়িয়ে যাবে।

অন্য চোখে

বিজন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পরে অনেক স্মৃতিসভা হয়েছে, অনেক স্মারক-পত্র বেরিয়েছে। তাঁর সৃষ্টকর্ম, জীবন ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন এবং প্রত্যেকের মধ্য থেকে একটা যে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে তা, হল ঃ বিজনদার জন্য অনেক কিছু করা উচিৎ ছিল, অথচ করা হয়নি। একথা আমরা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মৃত্যুর পরে যেমন শুনেছি, তেমনি শুনেছি উদয়শংকর, ঋত্বিক ঘটকের প্রস্থানের পরেও। এবং পরবর্তীকালে আরো অনেকের মৃত্যুর পরে এই একই কথা শোনা যাবে—তিনি সামান্য প্রতিভাশালী ছিলেন নাটক। চলচ্চিত্র। সাহিত্যকে তিনি অনেক কিছু দিয়েছেন, দিতে চেয়েছেন, এজন্য সারা জীবন নানা অভাবের মধ্যে থেকেও সমস্যার মধ্যে থেকেও তিনি সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, অথচ আমরা তাঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি। তাঁকে একটা আশ্বাসনা দিতে পারি নি। মঞ্চ দিতে পারিনি। ...দিতে পারিনি.... .....

আমাদের প্রশ্ন এ জাতীয় কথা আর কতদিন শুনতে হবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর সময় থেকেই তো এসব শুনে আসছি। কই প্রতীকারের জন্য তো কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। এক-একজন মারা গেলেই আমরা সোরগোল তুলি, অথচ যখন তিনি বেঁচেছিলেন, যখন তিনি আমাদের প্রত্যেকের কাছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা রেখেছিলেন, তখন কিন্তু আমরা বেশ পাশ কাটিয়ে গেছি।

মনে হয় মৃত্যুর পরে এসব বলা আজ-কাল একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। ঋত্বিক ঘটক, উদয়শংকর, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি মনিষীরা যাঁরা এই দু-এক বছরের মধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁরা যেসব শিল্পকর্মে রত ছিলেন, এই দু বছরে সেখানে নতুন কি সংযোজিত হয়েছে? এমন কি কোন ব্যবস্থা হয়েছে, যার ফলে আগামীদিনে আরো কোন প্রতিভাকে এমনি করে জীবন শেষ করতে হবে না? কোন স্রষ্টা বা শিল্পপ্রেমিক যাতে তাঁর শিল্পে গতিশীল থাকতে পারেন, যাতে হতাশা, অভাব ইত্যাদির শিকার না হন, তার কি কোন ব্যবস্থা এখনে হচ্ছে? এখনো তো সেই একই ট্র্যাডিশান। গ্রুপ থিয়েটারগুলো রিহার্সেল রুম পায় না, স্টেজ পায় না, চিত্র-স্রষ্টারা ছবি করতে পারছেন না, গায়ক, অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রত্যেকেই সুযোগ না পেয়ে আজ ফ্রাস্টেশানের শিকার। এর প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা আজো হলো না। অথচ এটাই ছিল শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম

দস্যু সর্দার রত্নাকর ছবিতে
রবি ঘোষ

উপায়। আমি জানি না, কবে সেদিন আসবে, যেদিন কোন স্মৃতিসভায় বা স্মারকপত্রে দিতে পারিনি জাতীয় কোন সংলাপ থাকবে না।

মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে যদি বিশ্বাস করি, তাহলে অনুমান করতে পারি, ঐসব মনীষিদের আত্মারা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি ঐ জাতীয় শ্রদ্ধা নিবেদনকে এক আন্তরিক উপহাস বলে মনে করেন।

কেন এই চলচ্চিত্রোৎসব

বুলগেরিয়া ও আর্জেন্টিনায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পরে ফেডারেশান অফ ফিল্ম সোসাইটিজ যুগোশ্লাভ চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করলেন। এবারের উৎসবে ছিল ৬টি ছবি আর সব ছবিগুলোই দেখেছি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে। কোন ছবি সামান্য মুহূর্তের জন্যেও আমাকে নতুন কিছু ভাবতে সাহায্য করেনি। বুলগেরিয়া ও আর্জেন্টিনার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। তাহলে কেন এই প্রদর্শনী? কেন এই অর্থ সময় ও শ্রমের অপচয়? আমরা তো ছবি দেখেই খালাস, কিন্তু এইসব ফিল্ম আনতে, দেখানোর ব্যবস্থা করতে, ফেডারেশনকে যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়, সে তুলনায় প্রদর্শিত ছবিগুলো থেকে তাঁরাই বা কতটুকু পান? আমাদের ফিল্ম সোসাইটিগুলো বেশীর ভাগ ছবি আনেন ফিল্ম আর্কাইভ থেকে আর ফিল্ম আর্কাইভ ছবি পাঠান তাঁদের ইচ্ছে মতো। সম্ভবতঃ সেখানে ফেডারেশনের চাহিদার তেমন কোন মূল্য দেওয়া হয় না। অন্যদিকে ফেডারেশান সরাসরি এমবাসীগুলোর মাধ্যমে বিদেশ থেকে যে হারে ও যেভাবে ছবি আনতেন, সম্ভবতঃ তার পথও ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে। নানা নিয়মের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে একথাও আজকাল শোনা যাচ্ছে যে ভারতের নানা ফিল্ম ক্লাব বাইরের ছবির কিছু কিছু নেগেটিভ কেটে রেখে দেন। যাইহোক, এসব বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলব ষাটের দশকে ফেডারেশান যেসব ছবি দেখিয়েছেন, বর্তমানের ছবিগুলো সে-তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর। আমরা এখন অনেক দিন বেয়ারিম্যান, এ্যান্তোনিওনি, ফেলিনি, করোসাওয়াজের একই ছবি ঘুরে-ফিরে দেখছি। ওঁদের নতুন কোনো ছবি প্রায় আসছেই না। গাদার-এর নতুন কোন ছবি তো ৭০ দশকে দেখিনি বললেই চলে। এর মধ্যে ফ্রান্সের কটা ছবিই বা দেখেছি। ফিল্ম ফেডারেশান যেসব ছবি বর্তমানে দেখান সত্যি করে বলতে গেলে তার ৭৫ ভাগ ছবিই নয়। তাহলে কেন এই চলচ্চিত্রোৎসব? ফেডারেশনের সৃষ্টি হয়েছিল, বিদেশের ভাল ছবির সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করানোর জন্য, শিল্পসম্মত ছবির দর্শকবৃদ্ধির জন্য, এদেশে ভাল ছবি নির্মাণের জন্য। এদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠুক, সৎ ও সাহসী চলচ্চিত্র নির্মিত হোক, এসবই ছিল ফেডারেশনের উদ্দেশ্য প্রথম দিকে তাই নিয়মিত সেমিনার হয়েছে, ভাল ছবি দেখানো হয়েছে, ক্লাবে ক্লাবে বিতর্ক চলেছে, পত্রিকা বেরিয়েছে। কিন্তু এখন এসব কোন কিছুই ঠিকমতো হচ্ছে না। এখন ফেডারেশনের একমাত্র কাজ কিছু ছবি দেখানো। ফেডারেশনের মূল উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে, তা ১৯৭৭-এর বাংলা ছবির ব্যর্থতা ছিন্দি ছবির দর্শক বৃদ্ধি দেখলেই বোঝা যাবে। এই যে এখানে বাংলা ছবি মার খাচ্ছে, ভাল ছবি তৈরি হচ্ছে না, বাংলা ছবির চেনগুলো দখল করেছে হিন্দি ছবি, সেন্সার তারিখ অনুযায়ী ছবির মুক্তি ঘটছে না, পুঁজির স্লাতক ও আরো অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন ভদ্রলোকেরা টাকার জন্য

২৫শে জুন ৬৯ অরূপ নিবেদিত
রবীন্দ্র সদন — দুশো বছরের বাংলা টপ্পা
হিমঘ্না রায়চৌধুরী
সঙ্গতে প্রবীণ শিল্পী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভাব ব্যাখ্যায় রাধামোহন ভট্টাচার্য
টিকিট ১০, ৭, ৫, ৩ স্টাইলো ও হলে

ছবি করতে পারছেন না বা ছবি করে হলের অভাবে বসে আছেন ও ক্রমশঃ হতাশ হচ্ছেন, তার জন্য ফেডারেশান কি করেছেন, কোথায় কি আন্দোলন হয়েছে বা কোন গঠনমূলক প্রয়াস? না কিছুই হয়নি। এর জন্য প্রথম দরকার জনমত সৃষ্টি, সে ব্যাপারেও ফেডারেশানের উল্লেখযোগ্য কোন কাজ চোখে পড়েনি। আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ যে দর্শকশ্রেণী, তাঁদের কাছ থেকে ফেডারেশান বিচ্ছিন্ন। কোন, আন্তরিক যোগাযোগ করার প্রয়াসও তাঁদের মধ্যে দেখা যায় নি। অথচ চলচ্চিত্র শিল্প বাঁচিয়ে রাখেন তাঁরাই, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় নয়, যেহেতু চলচ্চিত্র একটি ব্যয়-বহুল শিল্প। তাই ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের ছবি দেখার চোখ তৈরির যে দায়িত্ব ফেডারেশানের ছিল, সেখানে তাঁরা অবহেলা করেছেন। ফেডারেশান এখন বিশেষ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি ও কিছু সৌখীন মানুষের সংস্থা। অনেকে মোহানবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা সি.এ বি-র মেম্বার হওয়ার মতো সিনে ক্লাবগুলোর মেম্বার হন, যেহেতু তাঁদের কাছে এটি একটি প্রগতিশীল আভিজাত্যের প্রতীক।

কিন্তু ফেডারেশান যদি সাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার না করেন, তাহলে সংখ্যালঘু কিছু দর্শক যখন কোন বিদেশী ছবি দেখে লাফালাফি করবেন, সে সময় তাঁদেরই সামনে অমর আকবর এ্যান্টনীরা দুর্দান্তভাবে রাজত্ব চালিয়ে যাবে। এই সঙ্গে আরো একটি কথা বলার আছে, বিদেশের ব্যর্থ ও তাঁদের ভাষায় 'একসপেরিমেন্টাল ছবি' না এনে এ-দেশের পরিচালকদের কিছু ছবি ফেডারেশান দেখান, আমরা অন্ততঃ কিছুদিন বিদেশী একসপেরিমেন্ট না দেখে, এদেশী এক্সপেরিমেন্ট দেখি। আমি সেইসব ছবির কথা বলছি, যেগুলো বছরের পর বছর পরিবেশকের অভাবে মুক্তি পাচ্ছে না। – আমাদের তরুণেরা কতটা কি করেছেন, করছেন, তাও আমাদের জানা দরকার। ফেডারেশান অবশ্য এ জাতীয় ছবি কিছু কিছু দেখিয়েছেন, কিন্তু তা আরো ব্যাপক হারে হলে ক্ষতি কি?

একটু আগে সাধারণ দর্শক প্রসঙ্গে যে কথা বলেছি, সেই আলোচনায় ফেডারেশান হয়তো বলতে পারেন যে তাঁদের দরজা সবার জন্য খোলা, কেউ না এলে তাঁরা কি করবেন। কিন্তু একথা তো ঠিক, আমরা এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় আমাদের ব্যবহার ইত্যাদি দিয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছি, যেখানে ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের আসতে সুবিধা হয়, সংকোচ হয়, তাই

মানতু ছবিতে সংহিতা ব্যানার্জি এবং দুর্গা ভট্টাচার্য

আমাদেরই তাঁদের কাছে যাওয়া প্রয়োজন অবশ্য যদি আমরা সংচলচ্চিত্রের জন্য গঠনমূলক কিছু করতে চাই।

বিকাশ জানা

'রসকলি'র অনুষ্ঠান

আবৃত্তির ব্যাপক প্রসার এবং বিভিন্ন চিন্তার প্রয়োগে এ। শিল্পকে নতুন করে উপস্থাপিত করায় ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী যে একলব্য নিষ্ঠায় কাজ করে চলেছেঃ— তাদের একজন। সম্প্রতি এই গোষ্ঠী পরিকল্পিত একটি আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়ে গেল রবীন্দ্র সদনে, যা অতীব মূল্যবান। কারণ মঞ্চে সেদিন ছিলেন শম্ভু মিত্র। আবৃত্তিকার হিসাবেই যিনি কিংবদন্তী বিশেষ এবং যাঁকে আবৃত্তিকার ও অভিনেতা হিসাবে সাম্প্রতিককালে মঞ্চে পাওয়া,—বাহুল্য না হলে বলি সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে পরিবেশিত একক দ্বৈত কখনোবা সমবেত কণ্ঠে ভাঁষনভাবে দাগ কাটেন অমিয় চট্টোপাধ্যায়, তাঁর গলায় যখন আসে ঝড়ের পূর্বাভাষ—আমাদের বুক কেঁপে ওঠে। এবং সৌমিত্র মিত্র, এবং গৌরী ঘোষ ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বৈতকণ্ঠে বাংলা ভাষা, মা আমার। কবি—ফজল শামসুদ্দিন। দ্বিতীয় পর্যায়ঃ শম্ভু মিত্র—রবীন্দ্রনাথের লীলাসঙ্গিনী দিয়ে শুরু। পরে নজরুলের ফাল্গুনে সখী পাতিসনে শীলাতলে পদ্মপাতা। সখী দিসনে গোলাপ ছিটে খাসলো মাথা—

পক্ষণেই রবীন্দ্রনাথ।

এরপর শুরু হলো আবৃত্তি বিষয়ক আলোচনা। যোগ দিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র মিত্র এবং প্রেক্ষাগৃহে যাঁরা ছিলেন।

বৃষ্টির মতো অজস্র প্রশ্ন মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহ থেকে আসতে লাগল। কে আবৃত্তির স্বরলিপি করা যায়. কি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গীতের ব্যবহার কু যুক্তিযুক্ত, অভিনয়ের সঙ্গে আবৃ মিল এবং অমিল কতটা—ইত্যাদি।

একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দি দিয়ে গেলেন এবং তাঁর কথা বলার ম নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা না থা দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানটি একটি ঘরে আসরে পরিণত হবে যায় এবং শুধু আবৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় মূল হয়ে ওঠে ক্লাস. ক্লাস নিলেন—শম্ভু মি

কিছুক্ষন আলোচনার পর, আবৃ রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবনান একটি কবিতার শুরু থেকে কিছু —পারমিশন নেই বলে।

আবার আলোচনা। প্রশ্নোত্তর। ক প্রসঙ্গে জানালেন, গলায় সচলতা আনার জ অনেক। মানে খোঁচাবার চেষ্টা করেছি ষোলো সতের বছর ধরে। কবিতা পড়েছে অজস্র। যাতে খোঁচাবার চেষ্টা করেছেন —এই পর্যন্তেই তুমি কাল সকালে আমা কাছে এসো— দুটি শব্দ মন্থলিত বাক্যটির অর্থ কেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে ওঠে তা দুটি শব্দের ওপর আলাদা আলাদা ভাবে জোর দিয়ে যখন তিনি দেখালেন— তখন তিনি শিক্ষক এরপর আবার আবৃত্তি কবিতার নাম ধরে আসে নানান অনুরোধ নানান দিক থেকে। কে একজন যখন কবিতার নাম করতে উনি বললেন, ওটা করবো না। ওটা তৃপ্তি করে'। ধরলেন দুঃসময়।

সবশেষে সদাপ্রয়াত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি, আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই।

তাঁর গলায় কখনো কোনো নদীর উদ্দাম ঢেউ এর নাচ—আমরা মুগ্ধ হই ঘূর্ণি দিয়ে ওঠে যখন প্রবল ঝড়— দিগ্‌ভ্রান্ত।

তিনি পারেন,—এসব একমাত্র তিনিই পারেন। তাঁকে নিয়ে আমাদের গর্ব। আমাদের অহংকার।

নির্মলকুমার দাস

পঙ্কজকুমার মল্লিক স্মরণে বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা : যোগাযোগের ঠিকানা ক বিভাগ—'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' (স্বর—৫৭), খ বিভাগ—'আমি কান পেতে রই' (স্বর—১৫), গ বিভাগ— 'আমারে তুমি অশেষ করেছ' (স্বর—৩৯) চিত্রমুর্তি সঙ্গীত চক্র, হাওড়া-২।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

* ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরার অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

পাত্রপাত্রী না চাকুরী ?
জমিজমা না মোটর গাড়ি ?
ব্যক্তিগত বা ব্যবসা বাণিজ্য ?

বক্তব্য যে কোনও বিষয়েই
হোক্ না কেন
যুগান্তরএ
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ছাপালে
অনেক বেশি উত্তর পাবেন
কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে

কারণ অনেকগুলো ঃ

- যুগান্তরের জনপ্রিয়তার দ্রুত ঊর্ধগতি। গত ছ'মাসে দৈনিক প্রচার বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি। তাছাড়া প্রতি রবিবারের কাটতি এখন ৩,১০,০০০ এরও ওপর।
- পাঠক সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। লোকে অন্যের হাত থেকে টেনে নিয়ে যুগান্তর পড়ে থাকেন। আপনার বক্তব্য এই অগণিত পাঠক পাঠিকাদের নজর এড়াবে না।
- প্রতিটি শ্রেণীর বিজ্ঞাপন সুন্দরভাবে সাজানো হয়, ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

যুগান্তর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন
অভীষ্ট ফল পাবেনই

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 16th June, 19
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুকমী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘো
৩০ জুন ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃত

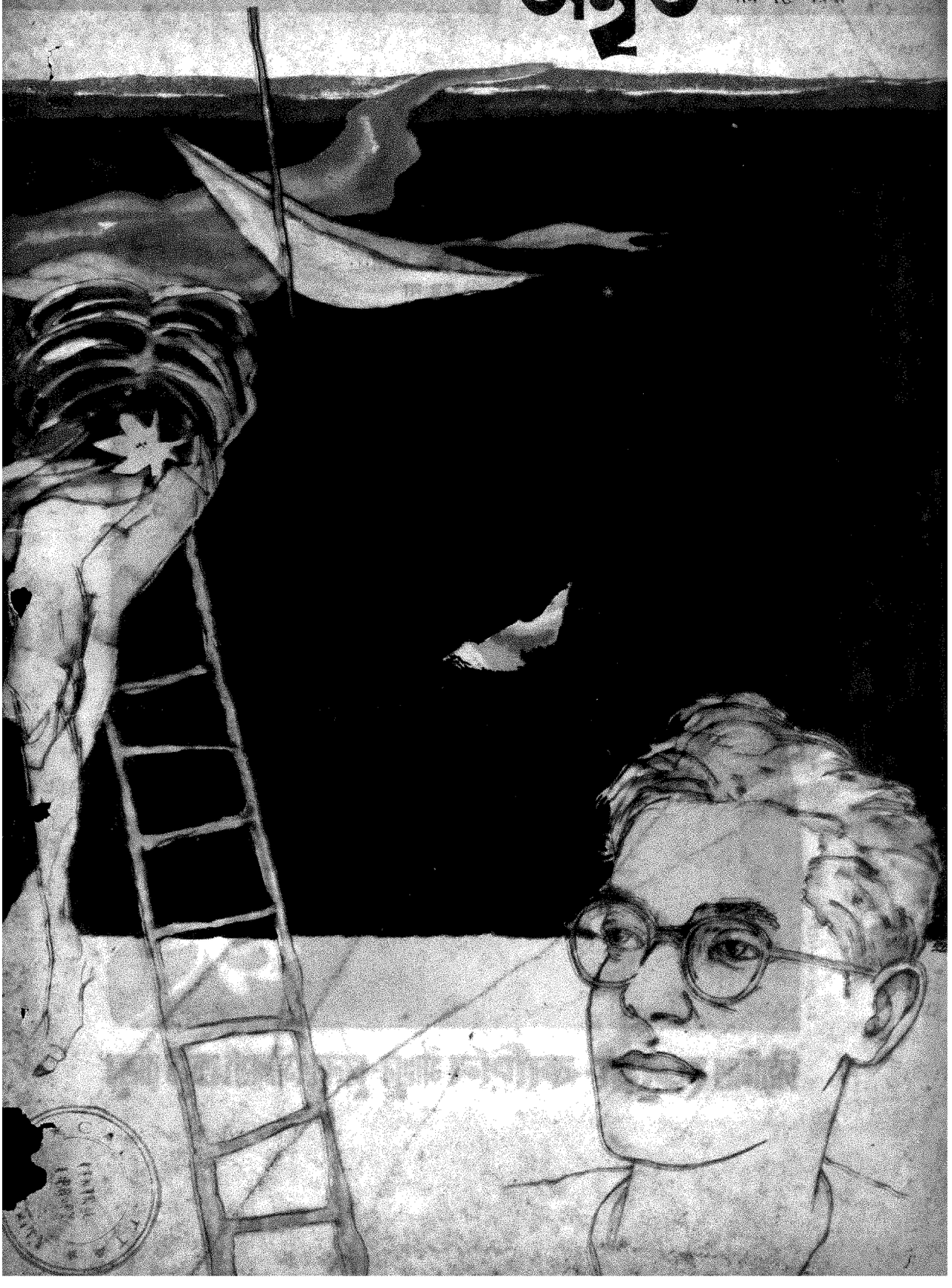

রূপের প্রকাশ চুলে...

আর সেখানেই কেয়ো-কার্পিনের
কথা ওঠে।
এক অতুলনীয় কেশ তৈল...
চুল চটচটে হয় না
জামা কাপড়ে দাগ লাগে না
মনোরম গন্ধ

Dey's
ডে'জ
মেডিকেলের
তৈরী

PX/DM/KB-1/78

নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখুন-চুলের সৌন্দর্য্য অটুট রাখুন

আশাপূর্ণা দেবীর

জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত
বিখ্যাত উপন্যাস

প্রথম প্রতিশ্রুতি

চতুর্দশ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

দাম আটাশ টাকা

এই গ্রন্থের পরিপূরক
অপর দুটি উপন্যাস

সুবর্ণলতা ২৬.

বকুলকথা ২৬.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

বিভ্রান্ত

দাম সাত টাকা

দ্বিতীয় পর্ব
তৃতীয় ও শেষ খণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কীর্তিহাটের কড়চা ৩৫.

লেখকের পরিণত বয়সের বৃহত্তম ও মহত্তম রচনা। উপন্যাসটিকে দুশো বছরের বাঙালীদের জীবনযাত্রার একটি ঐতিহাসিক দলিল বলা চলে।

প্রথম পর্ব পুনঃ যন্ত্রস্থ

পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থরাজি :-

বিমল মিত্রের

একক দশক শতক ৩০. বাংলার চালচিত্র ২০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগর পারে রূপনগর ৪০. রাধা ১৫.

ভৃগুজাতকের

নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন ৩. দাদাঠাকুর ১২

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কৈলাস ও মানস সরোবর ২০.

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :-

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বহ্নিবন্যা ১৩.

সমরেশ বসুর

সূর্যতৃষ্ণা ৯.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

মনেমনেখেলা ৬·৫০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

রঙিনসাঁকো ১০.

নিমাই ভট্টাচার্যের

নাচনী ৭.

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

ঈশ্বরীতলার রূপকথা ১৪.

নারায়ণ সান্যালের

হংসেশ্বরী ১০.

সুমথনাথ ঘোষের

বনরাজিনীলা ১০.

কালপুরুষ-এর

কালপুরুষের ডায়রী ১৫.

জরাসন্ধের

তৃতীয় নয়ন ৬.

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

মধুমতী থেকে ভাগীরথী ১৬.

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের

মহৎস্মৃতি ৫.

শঙ্কু মহারাজের

পঞ্চবটী ৮.

কালিকানন্দ কানুনগোর

রাজস্থান কাহিনী ১৬.

শংকর-এর

স্থানীয় সংবাদ ১০.

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

রেসকোর্স ৯.

দুটি ভিন্নস্বাদের অসাধারণ গ্রন্থ :-

স্বামী রামানন্দ ভারতীর

হিমারণ্য ৮.

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ফিরে ফিরে চাই ২০.

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩। ৩৪৮৭৯১
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ৩৪৩৪৯২

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে নববর্ষের অমৃতে থাকবে সবচেয়ে সেরা লেখা।
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃতে স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমলানন্দ শাসমলের সুদীর্ঘ প্রামাণিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধী : লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার

পিছু হটার পালা : লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীমাণিক্য

বাড়তির পথে ভারত : লিখেছেন অতুল সুর

পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ভবতোষ দত্ত

সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী

প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছেন

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ : ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে
শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন : অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা
দাম তিন টাকা ।। রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন।
অথবা লিখুন
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ । কলকাতা-৩

অমৃত

১৮ বর্ষ
৮ সংখ্যা
১৫ আষাঢ়
১৩৮৫
30th June, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
কবিতা ৫ শংকর চট্টোপাধ্যায়
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অমিতাভ
দাশগুপ্ত, হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদেশীর ইনসাইড স্টোরি ৬
পর্যবেক্ষক
ভাগ্য গণনা ৭ শ্রীমাণিক্য

প্রচ্ছদকাহিনী ৮
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রভাতকুমার দাশ
প্রচ্ছদ এঁকেছেন শুভাপ্রসন্ন
চিঠিপত্র ২১
সেতু পার হতে দেরি হয়ে যায়
(গল্প) ২২ অমল আচার্য
কবিগুরু আয়োজিত সেকালের গানের
আসর ৩১ প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ
তবলা পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ৩৭
শৈবাল মিত্র
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৪২
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
হৃদয় নন্দন বনে (উপন্যাস) ৪৬
সোমেন্দ্রনাথ রায়
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪৯
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
যাদের দেখেছি ৫৪
অনন্ত সিং
সমালোচনা ৫৭
খেলা ৫৯
চিত্রধ্বনি ৬১
সংগীত সমালোচনা ৬৩

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
একটি সংবাদপত্রের ইতিকথা
লিখেছেন সুশান্ত মিত্র
গল্প লিখেছেন
শৈবাল চক্রবর্তী

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির ওষুধ

একখানি শিশুপাঠ্য বইয়ে এমন একটি পংক্তি রয়েছে যা একালের পাঠকদের কাছে অন্য অর্থ বহন করতে পারে।

'ঔষধ খেতে মিছে বলা' এ বাক্যটির মূল তাৎপর্য যাই হোক, এমন শুনলে অনিবার্যভাবেই মনে পড়বে ওষুধপত্রের দামের কথা। গত কয়েক বছরের মধ্যে কতোবার যে দাম বেড়েছে ওষুধের তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ ক্রয়-ক্ষমতা বাড়েনি, বরং কমেছে। ফলে অসুখবিসুখের সংখ্যাও এখন ক্রমবর্ধিষ্ণু। বিশেষ করে সেইসব অসুখ যা অল্প সময়ে সারে না, দীর্ঘকাল ধরে যার জন্যে ওষুধ ব্যবহার করা দরকার।

তাছাড়া অন্য অসুবিধেও আছে, সেটা আরো মারাত্মক। প্রয়োজনীয় ওষুধটি সংগ্রহ করা গেলেও তা যে নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করা যাবে তা নয়। অনেক জনপ্রিয় ওষুধেই ব্যাপক হারে জাল করা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে বাগড়ি বাজার অনাহা হানা দিয়ে এরকম জাল ওষুধ তৈরির গোপন কারখানাও আবিষ্কার করেছে পুলিশ। কিন্তু তাতে যে জাল ওষুধের সরবরাহ কমেছে বাজারে তা নয়। চতুর ব্যবসায়ীরা শুধু তাদের জায়গা বদলেছে, পদ্ধতি বদলেছে। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

অন্যদিকে প্রাণদায়ী এবং সুপরিচিত নামের ওষুধগুলো যারা তৈরি করে সেসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই এখন গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। বাঙালি পরিচালিত প্রধান দুটি ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠান সুপরিচালনার অভাবে প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, সরকার তার পরিচালনার ভার হাতে নিয়ে নতুন করে প্রাণস্পন্দন জাগাবার চেষ্টা করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের এই জটিল এবং বহুবিচিত্র ওষুধ-সমস্যার বিষয়ে সরকার যে খুবই সচেতনতা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর এক সাম্প্রতিক মন্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট। ওষুধপত্রের চড়া দাম এবং ভেজালের প্রাদুর্ভাবের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দুঃখপ্রকাশ করেছেন সেদিন। সরকার নিশ্চয়ই তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করবেন আশা করা যায়। ন্যায্য দামে যদি নির্ভেজাল ওষুধ, বিশেষত যেসব ওষুধ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় সেইগুলো, সরকারী উদ্যোগে সরবরাহ করা সম্ভব হয়, তবে হয়তো সাধারণ বিক্রেতারাও দাম বাড়াতে উৎসাহী হবে না। অন্য কথায়, সেইটেই হতে পারে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির মোক্ষমতম ওষুধ।

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্যিকের স্মৃতি

সাহিত্য ভালোবেসে আমরা সাহিত্যিককে ভালোবাসি। আর তাঁকে একবার ভালোবাসি তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলের আর সীমা থাকে না। পঁচিশে বৈশাখ দলে দলে গিয়ে যে মহর্ষিভবনে ভিড় করি, তার মুখ্য কারণ অবশ্যই কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। কিন্তু গিয়ে তাঁর জীবনকে হৃদয়মনে ফিরে পাবার একটা বড় রকমের গৌণ কারণ নিশ্চয়ই সেই রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত বাড়িকে দেখা, যে ঘরে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন সেই ঘরে ঢোকা করা।

শান্তিনিকেতনে গিয়েও একই অনুভূতি জাগে। বিশেষ করে যখন উত্তরায়ণের আশেপাশে ঘুরি, কিম্বা দেহলী বা শ্যামলীর দিকে তাকাই। অনেক ছোটো ছোটো ঘরোয়া বর্ণনা, যা আমরা কার বইয়ে পড়েছি মনে করতে পারিনে, হঠাৎ যেন তার টুকরোটাকরা ছবি ভেসে উঠতে থাকে চোখের ওপর।

যেমন এক্ষুনি মনে পড়ল একটা দৃশ্য। কবি বিকেল বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি অনেকটা দূরে থেকে তাড়াতাড়ি মাঠ পার হয়ে দ্রুত পায়ে উত্তরায়ণের দিকে ফিরছেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় শোনা গেল গুনগুন করে সুর ভাঁজছেন, চেনা মানুষকেও চিনতে পারলেন না। সেইদিনই সন্ধ্যার পর শোনালেন নতুন একটি গান। (নাম মনে নেই।) বোঝা গেল, এই গানটিই তাঁকে অসময়ে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিল।

এরকম কতো ছবিই যে কতো লোকের মনে পড়ে শান্তিনিকেতনে গেলে।

আর শুধু শান্তিনিকেতনেই বা কেন, শিলাইদহে গেলেও একই অনুভূতি জাগার কথা। সম্প্রতি কাগজে বেরিয়েছে, শিলাইদহের ঐ কুঠিবাড়ির তেতলার ঘরখানি নাকি সংস্কারের অভাবে ভেঙে পড়ার মতো হয়েছে।

বছর চল্লিশ আগে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আর রথীন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে আমি একবার শিলাইদহে গিয়েছিলাম। পাবনা থেকে গরুর গাড়ি চড়ে হেঁটে পার হয়ে (প্রায় ৭।৮ মাইল) নদীর কিনারে হাজির হয়েছিলাম আমরা। তারপর খেয়া নৌকোয় শীতকালের ঈষৎ ক্ষীণকায়া নদীটি পার হয়ে বিকেল নাগাদ হাজির হয়েছিলাম গিয়ে কুঠিবাড়িতে। সেটা '৩৮ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত, যদিও সেখানে আর থাকতেন না। তবে জমিদারী অটুট ছিল তখন। সেজন্যে নায়েব মশাইয়ের আনুকূল্যে অতি সহজেই দেখা গিয়েছিল কুঠিবাড়ির আনাগোনা। অভিভূত হবার মতো বিশেষ কিছু নয়। সাধারণ একটি সেকেলে দালান-কুঠি। অসাধারণও বলা যায় না। কিন্তু কী ভালোই যে লেগেছিল। যেখানেই দাঁড়াই সেখানেই রবীন্দ্রনাথ। যে ঘরেই ঢুকি হঠাৎ যেন মনে হয় এক্ষুনি রবীন্দ্রনাথ ওপাশের ঐ দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকবেন। অথচ তিনি যে শান্তিনিকেতনে তাও জানি। ভালোবাসা যে কতো অযুত সেদিনই যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছিলাম। না থাকার অভাবকে স্মৃতি দিয়ে ভরাট করে রাখা। সান্ত্বনা একটা নিদর্শন পেলেই অনেক কিছু ভেবে নিতে পারে।

সাহিত্যিকদের চিঠিপত্র, ডায়েরি পাণ্ডুলিপি, ব্যবহার করা কলম, সবকিছু দেখেই খুশি হই আমরা সেজন্যে।

কাঁয়া ট্রাটফোর্ড-অন-এভন এ গিয়ে শেকসপীয়ারের পৈতৃক বাড়ি দেখেছেন, কিম্বা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ইয়েসানো পালিয়েনা-তে টলস্টয়ের সুবিস্তৃত আবাসভূমির চত্বরে, তাঁদেরও নিশ্চয় একই অনুভূতি জেগেছে মনে।

শেকসপীয়ারের বাবার ছিল দস্তানা তৈরির ব্যবসা। দোতলায় একটি ঘরে অনেক রকম সাজসরঞ্জাম এবং হাতে কাজ করার যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে যা দিয়ে কাজ করতেন তিনি। অবিশ্যি এই বাড়িটাতে শেকসপীয়ার কতোদিন ছিলেন বলা শক্ত। কেননা একটু দূরেই আরেকটা বাড়ির ভাঙা ভিটে পড়ে রয়েছে, সেখানে নাকি শেকসপীয়ার-পরিবার গোড়ার দিকে থাকতেন। যদ্দূর মনে পড়ছে, ভাঙা ভিটেটাতে একটা-দুটো দেয়ালই শুধু খাড়া রয়েছে এখন আর কিছু নেই। কিন্তু সঙ্গের গাইড ভদ্রলোক যখন বললেন, এই বাড়িতেই জন্মেছেন শেকসপীয়ার, এখানেই বড় হয়েছেন, খেলাধুলো করেছেন, ইস্কুলে গেছেন, হয়তো বয়সে বড়ো একটি মেয়ের সঙ্গে যিনি পরে স্ত্রী হয়েছিলেন শেকসপীয়ারের) প্রেমও করেছেন এখানেই, তখন ঐ ভাঙা দেয়ালটি যেন প্রতীকের মতো হয়ে ওঠে।

শেকসপীয়ার পরিবারের দস্তানার ব্যবসার কথায় মনে পড়ে গেল লিও টলস্টয়ের জুতো তৈরির ছোট্ট ঘরখানা। টলস্টয় তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন কাউন্ট, অর্থাৎ বেশ বড় মাপের একজন জমিদার। পরে তিনি বদলাতে থাকেন, এবং তাঁর ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়ে ঋষির জীবন কাটাতে শুরু করেন। নিজের প্রায় সব কাজই তিনি নিজে করতেন। উপরন্তু গরীবদের জন্যে বটে জুতো তৈরি করতেন। রাশিয়ার ঐ দারুণ শীতে জুতো পরতে হয় এমনকি হাবুরে মানুষকেও। কিন্তু কেনার মতো পয়সা কই তাঁদের। টলস্টয় তাই সময় পেলেই জুতো তৈরি করতেন নিজের হাতে। জুতো লোভা তৈরি হয়ে গেলেই বিলিয়ে দিতেন গরীবদের মধ্যে।

ইয়েসানো পালিয়েনার সেই জুতো তৈরির ঘরে এখনো রয়ে গেছে নেহাই হাতুড়ি, বাটালি, আর সেলাই করার ছুঁচ। দেখলে মনে হয় কাজ করতে করতে একটু হয়তো বাইরে গেছেন টলস্টয়, এক্ষুনি এসে আবার নেহাইয়ের সামনে বসবেন।

ছোটো ঘরের কথায় মনে পড়ল বর্ণার্ড শ'র গ্রামের বাড়িতে বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে সেই (কাঠের তৈরি?) এক-কামরার বাড়িটা। বাড়ি না বলে ঘর বলাই ভালো। কিন্তু তাতে ছোটো একখানা বাড়িতে যা থাকার সবই আছে। লেখার টেবিল চেয়ারকোচ, পছন্দসই দুএকখানা ছবি, এমন কি ছোটো একটি শোবার খাট। বাগানটি ফুলের নয়, বড় বড় গাছের। ফলে এ বাড়ি থেকে বেশ একটু আড়াল তৈরি হয়েছে সেখানে। এর মধ্যেই মাঝে মাঝে লেখার কাজ করতেন শ', অন্তরঙ্গ যাঁরা দেখা করতে আসতেন, কথা বলতেন। গাইড ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন যদি, সামনের ঐ বড় বাড়িতেও তো দিব্যি একখানা বসবার ঘর রয়েছে। তা, এখানে কথা বলার দরকার কী ছিল? উনি হয়তো অল্প একটু হেসে জবাব দেবেন, দেয়ালেরও কান আছে তো। সেইজন্যেই এ ঘরে কথা বলা। আমাকে অন্তত সেই উত্তরই শুনতে হয়েছিল। শুনে ভাবলাম, হবেও বা!

হ্যাঁ আরেকটা কথা। বড় বাড়িতেও শ'র একটি লেখার ঘর আছে। সেখানে টেবিলের কাছে রয়েছে গৌতম বুদ্ধের একটি আবক্ষ মূর্তি। শ' তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে চোখের সামনে রাখতেন। আর ছিল সিঁড়ির নিচে একটি পিয়ানো। (না অর্গান? সঠিক মনে করতে পারছি নে।) স্ত্রী যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এবং দোতলা থেকে নামতে পারতেন না, শ' তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্যে নিচে থেকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন।

পৃথিবীর আরো অনেক দেশে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকেরই বাড়ি নিশ্চয় সযত্নে সংরক্ষিত করা হয়েছে, যা আমার দেখা হয়নি, হবেও না। তাতে ক্ষতি নেই। যাঁরা দেখছেন তাঁরা অনেক কিছু পাচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের কাছের যাঁরা বড় সাহিত্যিক যেমন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ—তাঁদের স্মৃতি কি সংরক্ষণ করার চেষ্টা হচ্ছে? হচ্ছে না। কিন্তু এঁদের স্মৃতি বিজড়িত আবাস এবং জিনিষপত্র, পাণ্ডুলিপি—এগুলোও তো দেখতে চাইবেন ভবিষ্যতের মানুষ? তখন কী হবে? তাঁরা কি আমাদের দায়িত্বহীন মনে করবেন না?

অশীন্দ্র রায়

চলাচল

শংকর চট্টোপাধ্যায়

ক্রমাগত চলাচল হতে থাকে
এখনো মর্তের পথে ভেঙে পড়ে সন্ন্যাসী পাহাড়।
কারা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলে যায়
'তুলে রাখো বাস্তুভিটা ধূলি।'
খেলা থেমে যায় মাঠে
কে জানে নিয়ম ?
লক্ষ্য তার কোন দিকে ?
তুমি কি পথিক ?
পা তুলে পথকে বলো 'হয়ে গেল দেরি—
বহু মানুষের কাছে ছিল বড় ঋণ।'
অথবা ধূলোর পরে নত হয়ে বলেছ 'সরুন
দুয়ার খুলেছে. যাবো—
নিমন্ত্রণ আছে।'

ক্রমাগত চলাচল হতে থাকে
কারা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলে যায়
'তুলে রাখো বাস্তুভিটাগুলি।'

বালক

হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘ ভ্রমণের পর ছাঁটুর ধুলো ঝেড়ে
হাত পেতেছে অবোধ বালক।
বালক জানে না চতুর্দিগন্তের হাওয়ায়
হাজার পাখীর পালক।

বালকের কাঁধ ছুঁয়েছে অরণ্যের হাওয়া,
অরণ্যে ডাকে বুলবুলি।
বালক জানে না মধ্যরাতে কেন কাঁদে
হৃদয়হীন ঘুলঘুলি।

বলক সে তো অবোধ বালক,
চতুর্দিগন্তের হাওয়ায় হাজার পাখীর পালক।

সমানুকম্পন

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যে-মানুষ দুঃখ পেয়ে জেগে আছে,
তাকে ডাকো।
তার সঙ্গে এইবার কথা সেরে নিই।

দুটো কাক আকাশ দ্বিভাগ করে উড়ে গেলো।
হাত-করাতের শব্দে ছিঁড়ে গেলো সমস্ত নীরব।
কিছু পরে, রাত্রি নেমে এসে
সব কিছু পালটিয়ে দেবে।

যে-মানুষ যন্ত্রণায় নীল হয়ে
ঘরের ভেতরে বসে আছে,
তার যা বলবার, তাকে বলতে দাও।
আমাদের প্রত্যেকের স্নায়ু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
টেলিগ্রাফের তার অনন্ত আকাশে মিশে গেছে—

একটি মানুষও যদি দুঃখে কেঁপে ওঠে
তার ঝংকার আর
সমস্ত জীবন ধরে আলোড়িত হবে।

একদিন

অমিতাভ দাশগুপ্ত

একদিন ডেকে-ডুকে বসাবো তোমাকে
গায়ে. বিছিয়ে দেবো পুরোনো আফগানি শাল
বলবো—বাবা গো,
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি—
এবার নিশ্চিন্তে জিরোও।

নিশ্চিন্তে জিরোতে জিরোতে
গাঁজা পার্কে স্ট্যাচু হয়ে যাবে তুমি
তোমার কান চুলকে দেবে শালিখের ছুঁচোলো লেজ
নাক দিয়ে নামবে শেকড়-বাকড়
রাত্তির ছেলেরা ডান্ডা-ছুরি হাতে
তোমার মুন্ডু কাটার জন্য ঘুরে বেড়াবে
রাত্তিরে
বন্দুক হাতে পুলিশ পাহারা না দিলে
তুমি পাথরে গলায় কাঁদতেও পারবে না—
প্রাণধন ওহে প্রাণধন....

তোমার এমনতরো কষ্ট দেখে
মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে তোমার কাঁধে হাত রাখবেন
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আর জগতবন্ধু বেথুন,
বলবেন — চলো হে.
তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

দেওরস রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

পর্যবেক্ষক

"সরকারী সংস্থায়, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা 'ইনফিলট্রেট' করছি। এমন কথা ইদানীং প্রায়ই বলা হয়ে থাকে নানা মহলে। কিন্তু আমরা 'ইনফিলট্রেট' করব কেন? আমরা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'ডমিনেট' করব। বাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস দলের প্রধান বালাসাহেব দেওরস সম্প্রতি এই কথাগুলি বলেছেন। মোর রাজধানীর বুকে বেশ কয়েক হাজার সাদা সার্ট, খাকি প্যান্ট ও কালো টুপী পরা স্বেচ্ছাসেবক এক সমাবেশে আর এস এস প্রধান আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আরও অনেক মন্তব্য করেন। এই সমাবেশে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য নির্দিষ্ট বেশ বিনা কারও স্বেচ্ছা প্রবেশাধিকার ছিল না। শিশু, বালক, যুবক ও বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকদের ভিড়ে সরগরম উদ্যোগে এই সভা।

বালাসাহেব দেওরসের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে ও ছোট-বড় সভায় যাঁরকয়েক সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় তাঁর ধীর-স্থির বাক্তিত্বের মধ্যে রয়েছে নিয়মনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার ছাপ। আর এই দুটি গুণ উনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ক্রমবর্ধমান আর এস এস দলের মধ্যে। আজ থেকে তিপ্পান্ন বছর আগে ১৯২৫ সালে এই সংগঠনটির জন্ম। আর মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তারপর থেকে আর এস এস ধীরে ধীরে অন্য রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দলটির প্রথম লক্ষণীয় বিবর্তন ঘটে ১৯৫৯ সালে। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক আকাশে জনসংঘের উদয় হয়। এর কিছু পূর্বে আর এস এস দলের কয়েকজন প্রভাবশালী অনুগামীকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য দলের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করেন। অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লির এক বৈঠকে জনসংঘ নামে নতুন দল গঠনের প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু হয়। জনসংঘ নতুন দল হিসাবে দেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হুড়মুড় করে আর এস এস সদস্যরা এখানে প্রবেশ করেনি। তারা অপেক্ষা করেছে এবং জনসংঘের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন আর এস এস সদস্যরা জনসংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনীত হতে থাকে। জনসংঘের দুইজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং এল কে আদবানী হলেন আর এস এস 'হার্ড কোরের' লোক।

এই দলের স্বেচ্ছাসেবক হতে গেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। কঠোর শৃঙ্খলানুবর্তিতার মধ্যে সনাতনী ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে প্রত্যহ প্রত্যূষে ভিত্তি ও পাবেত্ত করে স্বেচ্ছাসেবকদের স্বাস্থ্য ও চরিত্রিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেয়। এছাড়া এক ফাইটার মাধ্যমে স্বেচ্ছা-সেবকদের [illegible] ব্যবস্থা করা হয়। ৯ম থেকে দশ বছরের স্বেচ্ছাসেবকদের বলা হয় শিশু পথিক। দশ থেকে ষোল হল বালক পথিক। ষোল থেকে কুড়ি কিশোর এবং কুড়ির উর্ধ্বে তাদের বলা হয় পুরুষ পথিক। এদের নিয়ে নিয়মিত সভা বসে। চর্চা বা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা থাকে।

গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন রাজ্যে আর এস এস সদস্যদের নিয়ে ক্যাম্প করা হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যের সাংগঠনিক নেতা বা প্রচারক এইসব ক্যাম্প থেকে সব রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 'এ্যাকটিভিস্ট' সদস্যদের বাছাই করছেন। আর এস এস সমর্থকদের প্রকৃত সংখ্যার কোন হিসাব পাওয়া যায়নি। দলের কাজকর্মে সক্রিয় অংশ না নিয়েও বহু লোক এদের সমর্থক। এরা ছড়িয়ে আছে শিক্ষায়তনে, সরকারী দপ্তরে ও নানা সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগঠনে।

আর এস এস সর্বপ্রথম তাদের সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দেয় জরুরী অবস্থার সময়। সে আমলে আর এস এস এবং জর্জ ফার্ণান্ডেজের সোসালিস্ট গোষ্ঠী যাকে বলে রীতিমত 'এ্যাকটিভ' ছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে এরা বহু পত্র-পত্রিকা ও ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। জরুরী অবস্থার ভীতিপ্রদ তাণ্ডব সবচাইতে বেশী অনুভব করা গিয়েছিল রাজধানীতে। আর তাই মধ্যে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে আর এস এস দলের নিয়মিত পোস্টার পড়েছে শহরের দেয়ালে দেয়ালে। ফার্ণান্ডেজ গোষ্ঠীর সাংগঠনিক জোর ছিল না। মুষ্টিমেয় ভালো কর্মীদের সাহায্যে তাই তাদের কাজ করতে হয়েছে এলোমেলো-ভাবে। কিন্তু আর এস এস কাজ করেছে সুপরিকল্পিত ছক অনুযায়ী তার অসংখ্য কর্মীর সাহায্যে। জরুরী অবস্থার সময়েই আর এস এস তার কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করে। জানু গোয়েন্দারা তন তন করে খুঁজেও বহু আর এস এস কর্মীর কোন হদিস পায়নি। আত্মগোপনে এরা সফল হয়েছিল এই কারণে যে আর এস এস সদস্যদের নাম ঠিকানা কোথাও লেখা থাকে না। এই দলের কোন মেম্বারশিপ বেজিস্টার নেই। এদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল দলীয় নির্দেশের মৌখিক প্রচার। পার্টি সারকুলার বা চিঠিপত্র ঘটা-সম্ভব কম লেখা। এছাড়া সদস্যদের চাঁদার পরিমাণও থাকে গোপন। চাঁদা বা গুরু দক্ষিণা দেবার সুযোগ দেওয়া হয় বছরে দুবার। কোন কারণে একবার অনুপস্থিত থাকলে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হয়ে সদস্যরা চাঁদা দেয়। 'ভগবা ধ্বজা' নামে পরিচিত আর এস এস দলের গৈরিক পতাকাকে নমস্কার করে সদস্যরা বছরে তাঁদের চাঁদা দেয়। বহু লোক তাদের এক মাসের উপার্জন চাঁদা হিসাবে দিয়ে থাকে। মোট কত টাকা এইভাবে সংগ্রহ হয় তার কোন হিসাব দেওয়ার রীতি নেই সদস্যদের কাছে। বিভিন্ন শাখা থেকে এইভাবে সংগৃহীত অর্থ পাঠানো হয় আর এস এস কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। আর কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শাখার খরচা বাবদ অর্থ খার্য করা হয়। সারা দেশে বেতনভুক্ সর্বক্ষণের জন্যে অসংখ্য কর্মী আছে।

ইদানীং আর এস এস নেতারা জোরের সঙ্গে অনেক কথা বলছেন। আগে ওঁরা কথাবার্তা- ভক্তকাতকি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতেন। মার্কসবাদ-সমাজবাদ বিরোধী আর এস এস দলের একজন প্রতিনিধি এবং সংসদ সদস্য মুরলি মনোহর জোশী সম্প্রতি নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের এক বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মোবাবরী জোশীয়ের কাছে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে এখানে দেশ-বিদেশের ভাষা শিক্ষার বিভাগে মার্কসবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট মিটিংয়ে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। সর্বত্র আর এস এস এখন নিজেদের উপস্থিতিকে কাজে লাগাতে তৎপর। স্টেসসে সাংগঠনিক শক্তিও তারা বাড়াচ্ছে। আর এস এস সূত্রে অনুযায়ী সারা দেশে এখন তাদের বারো হাজার শাখা আছে। আর এই শাখাগুলির অধীনে আছে দশ লক্ষ লোক। এরা নিয়মিতভাবে দলের কাজকর্মে অংশ নেয়। এই দশ লক্ষ 'এ্যাকটিভিস্ট' নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তারা। দলের এখন লক্ষ্য এ্যাকটিভিস্টদের সংখ্যা বাড়িয়ে বাহান্ন লক্ষ করা।

আশা ও উৎসাহে এগিয়ে চলার সুর আর এস এস সদস্যদের কণ্ঠে। এরা মনে করে অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব নাকি তাদের হাতে আসবে। এটা এখন তাদের বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের জোরেই বোধ-হয় উত্তর ভারতে এই দলের মুখ্য প্রচারক অবশেষে বলে বসেছেন যে ইন্দিরা গান্ধীর নীলম সঞ্জীব রেড্ডির বদলে বালাসাহেব দেওরস এবার ভারতের রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন। উত্তর প্রদেশ ও তার আশপাশের কয়েকটি অঞ্চলের দিকে চোখ মেলেই বোধ হয় এই আর এস এস নেতা এমন কথা বলেছেন। কিন্তু উত্তর ভারত তো আর সমগ্র দেশ নয়। উত্তর ভারতের যাত্রা হলেই দিল্লির মসনদে বসা যায় এমন একটা থিওরি গত ত্রিশ বছর চলে আসছে এই অঞ্চলে। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সেই পরিবর্তনশীল রাজনীতিতে আর এস এস দলের চিন্তা-ভাবনায় নেতৃস্থানীয়তা প্রমাণ করবে আগামী দিনের রাজনৈতিক ঘটনাবলী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পারেন

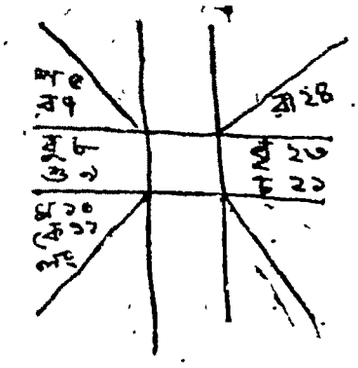

মকর রাশি, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, সিংহ লগ্ন।

ভালোর অল্প ভাল। এই প্রবাদ বাক্যটি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর রাশিচক্রে অন্তর্ভুক্তভাবে মিলে যায়। কারো রাশিচক্রের গ্রহদের যদি জীবনযুদ্ধের সেনা হিসাবে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর রাশি-চক্রে গ্রহ নক্ষত্রগুলি অধিক কড়কগুলি সৈন্যসামন্তের জটিল সমন্বয় না ঘটিয়ে অল্প অথচ সুসংবদ্ধ কোয়ালিটিতে ভরা পরাক্রমশীল একটি ছোট সেনাদল দুর্গম ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়েও কি সুন্দরভাবে জাতককে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়েছে। প্রত্যেক সেনাদলে যেমন একজন সেনানায়ক থাকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর রাশিচক্রে মঙ্গল-গ্রহ প্রধান সেনাপতিত্বের গুরুদায়িত্বটি এমন সুন্দরভাবে পালন করেছে যে জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলগ্রহকে যে সবল, উদ্যম, পরাক্রমশীল, যোদ্ধা, রক্তপূত, যুব, লাল রঙের প্রতীক বলা হয়েছে তার সেই নামের সার্থকতা সে রেখেছে। গুরু চন্দ্রের সম-সময়কে জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয় জীবযোগ। ফলস্বরূপ জীবগণ পায় উচ্চ-ক্ষমতা, উচ্চ-যোগাযোগ, উচ্চ-প্রশাসনিক, উচ্চ-শিব, উচ্চ-জীবনীশক্তি। সেনাপতি মঙ্গল লগ্নস্থ হয়ে ভাবলেন যে কোন জাতককে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে হলে চাই তার সুস্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব, স্থির বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, এবং গতি। তাই সেনাপতি জাতকের লগ্ন-পতি সূর্যকে লাভস্থানে বৃহস্পতির নক্ষত্রে বসালেন। সেনাপতি জানেন যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময় জাতককে রণক্ষেত্রে আত্মগোপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে তাই গোপনীয়তার এবং অলৌকিকতার কারকগ্রহ কেতুকে নিজের সাথে রাখলেন। আর এক প্রধান বীর যোদ্ধা ডিপ্লোম্যাটের কারকগ্রহ রাহুকে রাখলেন মুখোমুখি দৃষ্টিতে যেন প্রয়োজনবোধে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই এই সেনাপতি মঙ্গলগ্রহের দশা আরম্ভ হল জাতকের ১৪ বৎসর বয়স থেকে। চলে আরও ৭ বৎসর। ঐ সময় সেনাপতির পটুতায় বিদ্যাক্ষেত্রে সংগ্রামে জাতক অত্যন্ত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং যোগ্য সহায়ক যোদ্ধাদের সহায়তায় জাতককে বিদ্যা অর্জনে বিদেশ যাত্রা করিয়েছেন। তারপর সেনাপতি মঙ্গল

তার সহায়ক যোদ্ধা রাহুর হাতে ১৮ বৎসরের জন্য জাতকের সংগ্রামী দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিজে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিলেন। ঐ ১৮ বৎসর অর্থাৎ (১৯৩৫-৫৩) রাহুর দশা জীবন সমুদ্রে ভেউয়ের পর ঢেউ ঘাত-প্রতিঘাত সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে জাতককে এগিয়ে নিয়ে গেছে সাফল্যের দিকে। এই রাহুর দশা ফলদানকালের শুরুতেই জাতক বিদেশে রাজনীতিতে দীক্ষিত হলেন। রাহু যখন সহকারী হিসাবে বৃহস্পতিকে পেল জাতক ওখল বাব-এ্যাট-ল' প্রাপ্ত করলেন। এই রাহুর দশাতেই তিনি যেমন সংসারেও মানসিক আঘাত পেয়েছেন রাজনীতিতেও তেমন প্রতিযোগিদের এবং বিরোধীভাবাপন্নদের কখনও সংগ্রাম করে কখনও স্বীয় বৈশিষ্ট্যবলে রাজ্য-রাজনীতিতে নিজের প্রতিষ্ঠা করেন রাহু যেমনি তার দশা ফলদানকালে মঙ্গলের সাহায্য পেল ১৯৫২ সালে, জাতককে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দিল অভূতপূর্ব সাফল্য। এল তারপর বৃহস্পতির পালা। বৃহস্পতিও সুবিধা অসুবিধায় প্রতিপক্ষের কুটিলতায় জালের ফাঁকে স্বীয় প্রভাব ও পাণ্ডিত্যে এগিয়ে নিয়েছে জাতককে সাফল্যের পথে। এই বৃহস্পতির দশাদানকালে রাহুর অন্তর্দশায় জাতককে ১৯৬৭ সালে ঘিরেছে মন্ত্রিত্ব। কিন্তু শনির দশা আরম্ভ হতেই দুর্দান্ত প্রতাপ মঙ্গল এবং বৃহস্পতির ফাঁসে শনি বশার্তা স্বীকার করে দৈত্যগুরু শুক্রের যিনি জাতকের কর্মপতি তার সহায়তায় জাতককে দিল দীর্ঘ ২৪ বৎসরের রাজনীতি সংগ্রামের বিশ্রান্ত পরস্কার বাঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব। কিন্তু শনির এই আনুগত্যে রাহু নিয়ে অভিমান এবং বৈরীভাবাপন্ন হয়ে এগিয়ে আসছেন জাতকের লগ্নের দিকে। তাই সংবাদ শনি/রবির দশান্তে ১৯৭৯ সালের শেষ-ভাগে জাতকের কোন স্থানে নিরপেক্ষ-ভাবে মস্তিষ্কের অপারেশন, অথবা সরকা-রের কোন শীর্ষক হতে পারে। ঐ সময় জাতকের স্ত্রীর স্বাস্থ্য এবং রাশিচক্রও লক্ষণীয়। ঐ সময় অতিবাহিত হলে জাতক আবার চন্দ্র মঙ্গলের আনুকূল্য পাবেন। ফলে কেন্দ্রে মন্ত্রী হতে পারেন।

এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি।

মেষ :—শারীরিক কষ্ট থাকলেও ভাগ্যোন্নতি এবং আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মঙ্গল, বৃহস্পতিবার বিশেষ কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে।

বৃষ :—উৎসবাদিতে ব্যয়, গৃহে অশান্তি, কর্মস্থলে চিন্তার কারণ দেখা যায়। রবি, সোম প্রতিকূল।

মিথুন :—আর্থিক টানাটানি, কর্মস্থানে অপরের ঝামেলায় জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। মঙ্গল বুধবার লাভ।

কর্কট :—কর্মে প্রতিষ্ঠা, সফল, জটিল সমস্যার সমাধান হলেও যুব, বৃহস্পতিবার কোন কারণে মানসিক আঘাত পেতে পারেন।

সিংহ :—স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখুন, মর্যাদা হবজে বৃদ্ধি পাবে কিন্তু আর্থিক সংকুলান হওয়া মুস্কিল। কারোর সাথে বিবাদে না যাওয়া ভাল

কন্যা :—পুরানো বিবাদ মিটে যাবে। ব্যবসাতে আয় বৃদ্ধি। কফ জাতীয় রোগে কষ্ট পেতে পারেন। রবি, সোম অশুভ।

তুলা :—ব্যবসাতে আয়, বেকারদেরও সুযোগ আসবে। কিন্তু ঋণ করে পরে বিড়ম্বনা। যুব, বৃহঃ অশুভ।

বৃশ্চিক :—শত্রুদের সাথে সমঝোতা, ভ্রমণ, চারুবেদের কর্মস্থানে অহেতুক ঝামেলার সম্মুখীন মঙ্গলবার অশুভ।

ধনু :—বন্ধুবিরোধ, অথবা কর্মস্থানে নিন্দা হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা এবং পুরনো পাওনা আদায় হতে পারে।

মকর :—কর্মে সুসংবাদ, উদ্যম বৃদ্ধি, সন্তানের জন্য চিন্তা হলেও আর্থিক ব্যাপারে কিছুটা সুরাহা।

কুম্ভ :—ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ, আর্থিক চাপও থাকবে। গুপ্ত শত্রুতাও দেখা যায়। সপ্তাহটি গোলমেলে।

মীন :—আর্থিক স্বচ্ছলতা, কোন ব্যাপারে বিচক্ষণতার পরিচয় এবং শত্রুদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। বৃহস্পতিবার অশুভ।

শ্রীনাশিক

আগামী সপ্তাহে
সত্যজিৎ রায়

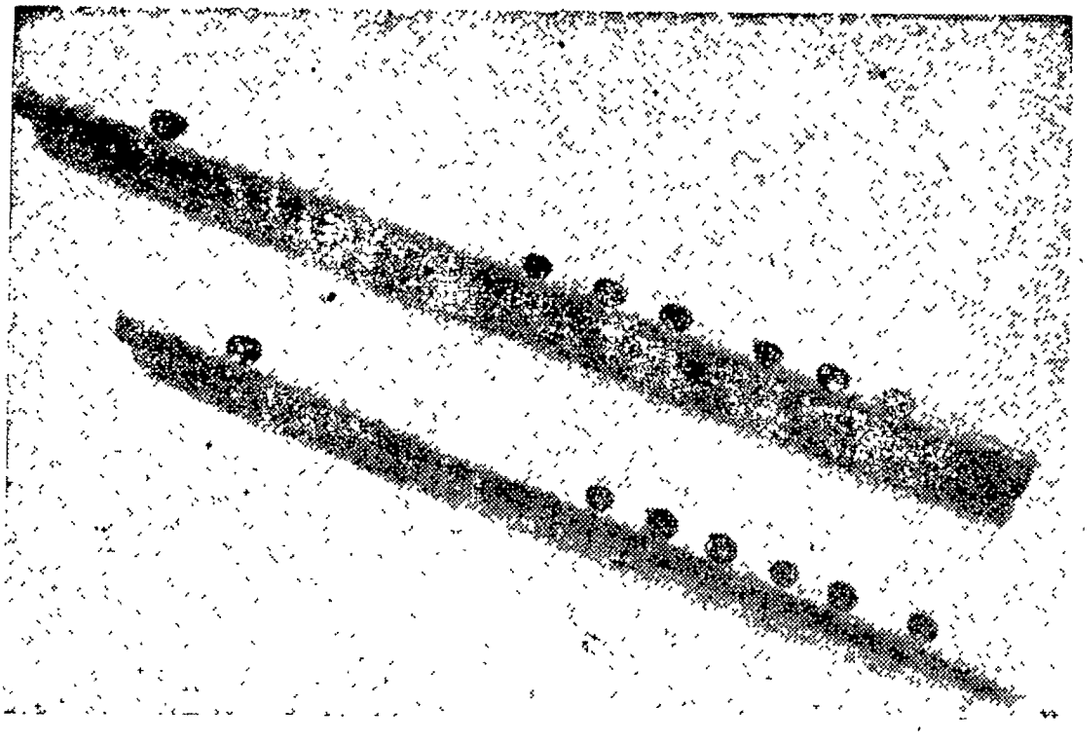

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাতকুমার দাস

ঢাকা বিক্রমপুরের মালপাদিয়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের তরুণ ছাত্র করুণাচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হরিহর বাজনিক বৃত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি-কোর্সে' বা বিজ্ঞান বিভাগে বি-এ পাশ করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। করুণাচন্দ্রের প্রথম সন্তানও নিজের চেষ্টায় মেডিক্যাল স্কুলের ত্রিবার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করে আসাম প্রদেশে সরকারী চাকুরি পান। তখনকার দিনে দু-দশটা গ্রাম খুঁজে এক-আধ ডজন শিক্ষিত পাওয়া যেত। সুতরাং হীরের টুকরো হরিহরকে দেখতে আশেপাশের গ্রাম থেকে নানা বয়সের লোকেরা আসতেন।

পাশ করে হরিহর কিছুকাল কলকাতায় শিক্ষকতা করেন। পরে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনের পি ডাবলিউ-ডির অ্যাকাউন্টস ক্লার্কের কাজ পেয়ে উড়িষ্যা প্রদেশে বালেশ্বরে চলে যান। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি চাকুরি পরিবর্তনের পর, মাসিক একশ টাকা মাইনের সেটেলমেন্ট বিভাগে কানুনগোর পদ পেয়ে সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে একাদিক্রমে এগারো বছর কাটান। কর্মস্থানের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার এবং সাব-ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে চাকুরিজীবন শেষ করেন।

হরিহর বিবাহ করেন স্বগ্রামের নিকটবর্তী গাওদিয়ায়, পত্নীর নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁরই কতগর্ভে, দুমকায় ১৯০৮ সালের ১৯ মে মঙ্গলবার (বাংলা ১৩১৫ সাল, ৬ জ্যৈষ্ঠ) শুক্লাষষ্ঠীতে পঞ্চম পুত্রের জন্ম। গায়ের উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, সুশ্রী মুখমণ্ডল দেখেই আতুড় ঘরে নামকরণ করা হল কালো মানিক।

শকাব্দ ১৮৩০।১।৫।১৭।৪৮।৫৪

জাতাহ				পরাহ		
৩	১৯	২২		৪	২০	১৩
১৮	১১	৩০		২০	৮	১৩
২।১০	৩২	২৫		২১	১০	১৯
৫৪	০	৬		১৫	৩	৭
৪৮						

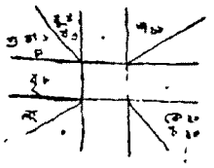

ধনু রাশি, সিংহ লগ্ন, নরগণ পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রের জাতকের জন্ম পত্রিকা বিচার করে জ্যোতিষ নাম নির্বাচন করলেন ভূধরচন্দ্র। [ডঃ সরোজমোহন মিত্রের গবেষণা গ্রন্থ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যে' এই নামটি অধরচন্দ্র বলা হয়েছে।] একটু বড় বয়সে স্কুলের খাতায় বাবা পোশাকী নাম ঠিক করলেন—প্রবোধচন্দ্র।

নীরদা দেবীর গর্ভে চৌদ্দটি সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করলেও পরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ছটি পুত্র এবং চারটি কন্যা। 'হাসিখুশি চঞ্চল নির্ভীক প্রাণবন্ত' মানিক ছেলে-বেলা থেকেই দুরন্তপনায় অস্থির করে তুলেছিলেন সকলকে। নিত্য নূতন ফন্দিফিকির, দুষ্টুমী আর খেয়ালে প্রায়ই কষ্ট পেয়েছেন নিজে, ভুগিয়েছেন বাড়ির লোকজনদের।

কখনো নিতান্তই খেলাচ্ছলে কাৎ-করা বাঁটির বাঁটের উপর দাঁড়িয়ে খলখলিয়ে নাচতে গিয়ে অঘটন ঘটে। হঠাৎ সোজা হয়ে যাওয়া বাঁটিতে আছাড় খেয়ে, পেটটা কেটে প্রায় দু-ফাঁক। শেষ পর্যন্ত বড়দা, দুমকায় ছোট্ট হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পঁচিশটা স্টিচ করে আনেন। মানিক কিন্তু নিঃশব্দ, এক

কোঁচাও জল নেই চোখে। ডাক্তারবাবু অবাক। বললেন—এ অদ্ভুত ছেলে। অন্য কেউ হলে চিৎকার করে পাড়া মাৎ করে দিত।

প্রত্যেকদিন কোন না কোন দুর্ঘটনার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হত। কখন কি হয়। কখনো গরম কড়াই থেকে রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরে, না পারছেন ফেলতে—না পারছেন কাঁদতে; সকলের কৌতুকের হাসির মাঝখানে সহ্যগুণের পরীক্ষা দিচ্ছেন। কখনো কাঠের উনুনে, চিমটে দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে খেলতে খেলতে—পুড়িয়ে ফেলেছেন নিজের পা। যন্ত্রণায় একেবারে বোবা হয়ে গিয়ে, কাউকে ডাকতে পারেন নি, এমন কি সরিয়েও ফেলতে পারেন নি টুকরোটি।

সেই বয়সে ছোট্ট ভাষেরা ছিল রোজকার নতুন বদমায়েসির সাকরেদ। তখন ক্লাস সেভেনে পড়েন। ক'দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে স্কুলে যাওয়া বন্ধ। ঘুরে বেড়ানোও বারণ। কাজেই ঘরে বসে আসছে কালীপুজোর জন্যে বাজি বানানো ভালো। নালু আর সুবোধ—পরের দু-ভাইসহ বারান্দায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এমন সময় নালু ফস্ করে একটু বারুদে দেশলাই জ্বালিয়ে, দেখতে গেছে জ্বলে কিনা। কাছেই রাখা ছিল বারুদ ভর্তি শিশি, প্রচণ্ড আওয়াজে বিস্ফোরিত হল। কাঁচের টুকরোয় তিন ভাই ক্ষতবিক্ষত হলেন। মুহূর্তে অসম্ভব রক্তক্ষরণ হতে লাগল।

ডাক্তারবাবু এসে শাসনের সুরে বললেন—তোমার জন্য ছোটভাই দুটির এত কষ্ট। কাঁচ বার করার সময় যদি তুমি বেশি চেঁচামেচি কাঁদাকাটা কর, ওরা দুজন ভয় পেয়ে ভড়কে যাবে। তুমি বড়, বেশি ব্যথা লাগলে চেঁচানো চলবে না। বুঝতে পেরেছ ?

মানিক চুপ। একটুও কাঁদেন নি।

আহত রক্ত মাখা যন্ত্রণাকাতর ভাই দুটির চেহারা মনের ভিতর রেখে নিজের সব যন্ত্রণাকে নীরবে সহ্য করে নিলেন।

শিক্ষা

বাবার ভ্রাম্যমাণ চাকুরি জীবনে মাণিককেও ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এই জন্যেই ছেলেবেলা থেকে মনটা তাঁর এক তারে বাঁধা নয়। প্রাথমিক শিক্ষাও বাঁধাবাঁধি নিয়মে হয়নি। কখনো মহিষাদলে, কখনো টাঙ্গাইলে, কখনো বাক্ষণ-বাড়িয়ায়। ছন্নছাড়া স্কুল জীবনে ক্লাসের পড়া ভাল লাগত না। ঝোঁক ছিল খেলায়। মন মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠত। কখনো বা একা একা বসে ভাবতেন।

কিশোর বয়সে মানিক ক্রমশ অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ ও দরদী হয়ে ওঠেন। বন্ধনহীন শাসন-বিমুখ বিশিষ্ট জীবন-ধারাটি তখন থেকেই আলাদা পথে চলতে শুরু করে। ভাল বাঁশি বাজাতে পারতেন, দরাজ গলায় গাইতেন গান। টাঙ্গাইলের মাঠে-ঘাটে, ধানক্ষেতের আলে আলে ঘুরে বেড়াতেন উদভ্রান্তের মতন। কখনো নদীর তীরে বাঁধা নৌকোগুলোর মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে দু-চারদিন কাটিয়ে আসেন তাদের সঙ্গে। এই সাধারণ অপরিচিত জীবনযাত্রার সঙ্গে আন্তরিকতায় নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কখনো বাড়ি ফেরার কথা ভুলে গিয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের সঙ্গে, গাড়ির ভেতরে। বাপ মায়ের শাসন, ভয়ডর কোনটাই তাকে বিচলিত করতে পারে নি।

ক্লাসে সুযোগ পেলেই আশ্চর্য সব প্রশ্ন করতেন মানিক। একবার স্কুলে বর্ষা সম্পর্কে রচনা লিখতে দিয়েছিলেন সতীশ-বাবু, বাংলার মাস্টার। তিনি স্নেহ করতেন। মাণিকের রচনাটি স্বতন্ত্র হওয়ায়, ক্লাসে পড়ে শুনিয়েছিলেন সকলকে।

এই টাঙ্গাইলে থাকার সময়, ভবল নিমোনিয়ায় ভুগে ১৯২৯ সালে ২৮ মে তাঁর মা মারা যান।

কাঁথিতে থাকতেন সদ্য পাশকরা ডাক্তার মেজদা সন্তোষকুমার। সকলে চলে আসেন কাঁথিতে। মডেল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল মাণিককে। হঠাৎ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মেদিনীপুরে বড়দি শিশিরকুমারীর কাছে স্থানান্তরিত হলেন। সুস্থ হলে মেদিনীপুর জেলা স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। ১৯২৬ সালে ঐ স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন প্রথম বিভাগে, আবশ্যিক আর ঐচ্ছিক গণিতে লেটার নিয়ে। মাস্টারমশাইরা সকলে স্নেহ করতেন মেধাবী মাণিককে। যদিও স্বভাবে মেধাবী ছাত্রের মত ছিলেন না। মেজাজে ডানপিটে, কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল হতো সকলের সেরা। স্কুল কামাই করতেন, কিন্তু হাজিরা দিয়ে কোটে পড়তেন না। স্কুল পালিয়ে কখনো একা, কখনো সবান্ধবে ঘুরে বেড়াতেন শহর থেকে দূরে, কাছে ঘরে গড়া ছোট ছোট গ্রামে। বর্ষায় ভরা কিংবা শীতে শুকনো খালই এর পাড়ে, বেললাইনের পাশে ফাঁকা মাঠে বুনো ফুলের বনের ধারে, জাম আর শালের জঙ্গলে।

ইস্কুলের পাঠ চুকিয়ে নতুন পর্ব শুরু হল মানিকের জীবনে। নতুন মোড়। কাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজে, আই, এস-সিতে ভর্তি হলেন। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, লম্বায় ছ ফুটের বেশি, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, কৃষ্ণবর্ণ মানিক স্বাতন্ত্র্যে ও মেধায় ভিন্ন প্রকৃতির। স্মার্ট।

থাকতেন রোনাল্ডসে হস্টেলে। মিশন কলেজে ছাত্রাবাসের নিয়মকানুন ধরাবাঁধা। কিন্তু খেয়ালি মানিককে বাগানো কোন নিয়মে ? কার সাধ্য। নিয়মভঙ্গ করাই তখন নিয়মিত ব্যাপার। বিশাল প্রান্তরের মধ্যে রেল লাইনের পাশে কোনদিন একলাটি বাঁশি বাজাতে বাজাতে দৌড় হয়ে যেত, কোনদিন বেরুতে ইচ্ছে করত না কুস্তির আখড়া থেকে। কৈফিয়ত দিতে হতো ইস্কের অধ্যক্ষের কাছে। কলেজের অধ্যাপক জ্যাকসন সাহেব বাইরে

পড়াতেন, মাণিকও বক্তা করে পড়তেন। হয়ত এই সময়ই মন থেকে ধর্মের সকল রকম গোঁড়ামি মুছে যায়।

অসম্ভব কাঁচি সিগারেট খেতেন। লুকিয়ে চুরিয়ে মদ্যপানও শুরু হয় এই সময়। গোপনে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে পড়াশুনোর জন্য রাত্রি জাগরণের অজুহাত দিতেন। আর একটা ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন মানিক, তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে বালোদেশে 'অনুশীলন সমিতি' নামে স্থায়ীভাবে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দল প্রধানত যুব শক্তির উদ্বোধনের জন্য ব্যায়াম লাঠি খেলা মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করত। মানিকের পছন্দ এই রাজনৈতিক দলকে। স্বাস্থ্যচর্চার মনোযোগী কুস্তিগীরের আখড়ায় যাতায়াত ছিল তাঁর।

ঘাঁকুড়া কলেজ থেকে আই-এস-সি পাশ করলেন (১৯২৮) প্রথম বিভাগে। এলেন কলকাতায়, প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে বি-এস-সিতে ভর্তি হলেন।

মেধাবী ছাত্র। পরিবারের সকলের আশা বড় ভাইদের মত তিনিও কৃতী হবেন। বড়দা সুধাংশুকুমার এম-এস-সি, পি আর এস, ডি-এস-সি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন প্রথমে, পরে ভারত সরকারের আবহ বিভাগের সর্বময় কর্তা। মাণিক প্রেসিডেন্সীতে পড়বার সময় বড়দা থাকতেন বোম্বাই, কোলাবা অবজারভেটরীর ডিরেক্টর পদে। তিনি মানিকের পড়াশুনোর খরচ পাঠাতেন।

বাবা অত্যন্ত স্নেহ করতেন, মানিকের প্রতি তিনিই ছিলেন দুর্বল। কিন্তু তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। দাদা বৌদিরাই সহায়। স্নেহাদর মাতৃবিয়োগের পর জোটেনি। কৈশোরে সেই ব্যর্থতা তাঁকে আরও উড়নচণ্ডী করে তুলল। মাণিকের অবাস্তব ঔদাসীন্য দাদাদের পছন্দ ছিল না। ছোটভাই-এর এইসব ছাড়াছাড়া মেজাজ বরদাস্ত করতেন না। নানাভাবে আঘাত পেতেন মানিক।

গল্প লেখার গল্প

পড়ার বই-এ মন ছিল না মানিকের। বারো তেরো বছর বয়সেই—শ্রীকান্ত, বিষবৃক্ষ, গোরা, চরিত্রহীন সব পড়া হয়ে গিয়েছে। আর সেকি পড়া। এক একটা বই পড়লে তার ধাক্কা সামলাতে—তিন-চার দিন মাঠঘাটে, গাছে গাছে, নৌকায়, হাট-বাজারে, মেলায় ঘুরে, মারামারি হৈ-চৈ করে কাটাতে হত। যারা এত সুন্দর সুন্দর গল্প লেখেন তাঁদের প্রতি ঈর্ষা জাগত মনে। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় নিত্য সঙ্গী ছিল, 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী'। আর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি হচ্ছে প্রসারিত, দেশ থেকে বিদেশের দিকে ঝোঁক হচ্ছে তীব্র, হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে আরম্ভ করে শরৎ নাটক। ফয়েডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছেন সদ্য।

সেই লুকিয়ে বই পড়ার মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে লেখক হওয়ার স্বপ্ন। একটু আধটু কবিতাও লিখতেন, যা সব বাঙালী ছেলেরা একটা বয়সে করে। কিন্তু কবিতায় ভরসা ছিল না। সেই বয়সের কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায়—কথা আর সুরে ভরানো সেইসব রচনায় হয়তো কবিতার চেয়ে গান লেখার দিকেই ঝোঁক ছিল তাঁর।

মনে করতেন লেখার তাঁর অধিকার নেই। বয়সের সীমা ছক কষে ঠিক করেছিলেন, 'তিরিশ বছর আগে কারো লেখা উচিত নয়—আমি সেই বয়সেই লিখব। এর মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে সব দিক দিয়ে। কেবল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় নয়, নিশ্চিন্ত মনে যাতে সাহিত্যচর্চা করতে পারি তার বাস্তব ব্যবস্থাগুলিও ঠিক করে ফেলব।'

কিন্তু হঠাৎ সব ওলোট পালোট হয়ে গেল। যে বিজ্ঞান পড়ার মন মুখবিচ্ছে ক্লাসে বসে বক্তৃতা শুনতো, ল্যাবরেটরীতে মশগুল থাকত এক্সপেরিমেন্টে—হাজার কঠোর প্রশ্নের ভারে সেই কবি মনটাই টলমল করে উঠল। মন তখন কিছু একটা ধরতে চাইছে। বিজ্ঞান প্রেমের সঙ্গে দৃঢ়তর হয়ে উঠত লেখার সংকল্প। কলেজ থেকে তখনকার 'বালিকা-বালিগঞ্জে'র বাড়িতে ফিরতেন একা। কখনো আলোহীন অসংস্কৃত জলার মত লেকের ধারে গিয়ে বসতেন। চেনা অচেনা প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যের রস উপলব্ধির উদ্দেশ্যে। তখন, ভেসে আসত নিজের বাড়ির আত্মীয়স্বজন আর পাড়াপড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতম মুখের চামড়া যাদের কুচকে গিয়েছে। ভেসে আসত স্টেশনে ও ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মুখ—তাদের আলাপ আলোচনা, ভেসে আসত কলেজের সহপাঠীদের মুখ—শিক্ষার খাঁচায় পোষা তারুণ্য সিংহের সব শিশু, প্রাণশক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম—চাষী, মাঝি, জেলে, তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হত ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধ করে দিত, আঁধার চোখ, ঠাবত আকাশের হাজার তারা চোখের মত, কোনদিন উঠত চাঁদ। আর এই মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষাভুষো, মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাত তোলপাড় জাগাত—'ভাষা দাও—ভাষা দাও।'

ভাষাহীন এই ব্যাকুল বেদনা অহোরাত্র মাণিকের অন্তর্লোকে আন্দোলন শুরু করল। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ল্যাবরেটরীর বাইরে, মানুষের মন বিশ্লেষণ করতে চাইল।

শৈলজানন্দ, প্রেমেন, অচিন্ত্য, নজরুল এদের নিয়ে সম্প্রতি হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। কলকাতা তখন কল্লোলের জোয়ার—বন্ধুবান্ধবদের মুখে মুখে তখন উঠতি গল্পকার কবি আর তাদের রচনা নিয়ে আলোচনা। তর্ক-বিতর্ক। একদিন মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের বুদ্ধিহীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি প্রবণতা ও ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ করে এক বন্ধু কুৎসিত একটা গাল দিলো। তার তিনটি রচনা ফেরৎ এসেছিল মাসিকের দপ্তর থেকে। সে প্রমাণ করতে চাইল সম্পাদকের হীনমন্যতা—নিজেদের দলের লেখক ছাড়া অন্য লেখা তাঁরা ছাপাতে চান না।

তর্কে মাণিকের বিতৃষ্ণা। বুদ্ধ মন্তব্য তাঁর মনঃপূত হল না, রেগে গেলেন। অনেক কথা কাটাকাটি হল, বাজি ধরলেন মাণিক। তিন মাসের মধ্যে 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' বা 'বিচিত্রা'য় ছাপানো নাম ও গল্প বন্ধুদের উপহার দেবেন।

মাণিকের মনে ভয় নেই, ভরসা অনেক, 'কোনদিন এক লাইন লিখিনি, কিন্তু গল্প তো পড়েছি অজস্র। সাহিত্য হবে না, সৃষ্টি হবে না, কিন্তু সম্পাদক ভুলানো গল্প নিশ্চয় হবে। আমি কেন যে কেউ চেষ্টা করলেই একরকম গল্প লিখতে পারে।'

বাংলা মাসিকের সব গল্পই তখন প্রেম বিষয়ক, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই প্রেম। কিন্তু সেই তথাকথিত প্রেমের গল্পে মাণিকের মন সায় দিল না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের চোখে দেখা দুটো চরিত্র ঝিলিক দিয়ে গেল। সত্যিইতো, তাদের নিয়ে গল্প লেখা যায়। পূর্ববঙ্গের স্বামী-স্ত্রী। স্বামী বাঁশি বাজাতেন, বাঁশের বাঁশি না, ক্লারিওনেট। নিজে খুশি না হলে, শত অনুরোধেও বাঁশি বাজাতেন না। বাড়িতে স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে বাজাতেন। মাণিক সে বাঁশি শুনেছেন অনেকদিন। বেশিক্ষণ বাজালে তার গলা দিয়ে রক্ত পড়ত। ব্যাস এদের নিয়েই এক ঘোরালো ট্র্যাজিক প্লট বানিয়ে লিখলেন 'প্রতসী মামী'। সোজাসুজি ওই কাহিনী না লিখে, আগাগোড়া মানস চোখের সামনে রাখলেন সেই স্বামী-স্ত্রীকে, আর নিজে কাব্যদা করে অল্পবয়সী ছেলে হয়ে গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার মুখ দিয়েই গল্পটা বানিয়ে নিলেন। গল্পের তো নাম ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু গল্পকারের নাম? প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়? না-না তা সম্ভব নয়। এই উচ্ছ্বাসময় নিষ্ঠুরই, পাঠকের মন

ভোলানো গল্প এতে নিজের নাম দেওয়া সম্ভব নয়। পরে নিজের নামে ভালো লেখা লিখলে লোকে নিন্দা করবে। সুতরাং বন্ধুদের জানিয়ে, ব্যবহার করলেন ডাক নাম, মাণিক।

সাহস করে নিজেই জমা দিয়ে এলেন বিচিত্রা দপ্তরে। কুণ্ঠা বা ন্যাকামি নেই, নেই কোন বাড়তি উৎসাহ—ছাপা হবে কি না। যেন এলেন, লিখলেন, জমা করলেন—এমন একটা ভাব।

বিচিত্রার দপ্তরে লেখাটা হাত বাড়িয়ে নিলেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। সম্পাদক উপেনবাবু পরে পড়লেন গল্পটি, ভীষণ ভাল লাগল।

বিচিত্রার দ্বিতীয় বর্ষ চলছে (১৯৩৫)। পৌষ সংখ্যার প্রথম রচনা দুটি রবীন্দ্রনাথের 'রবীন্দ্রধর্ম' নামে ছোটো দুপাতার নিবন্ধ এবং দ্বিতীয়টি তারই ধারাবাহিক উপন্যাস 'যোগাযোগে'র '৫১।৫২ পরিচ্ছেদ'। দ্বিতীয় লেখক চন্দ্রশেখর রায়, রচনা 'পথে প্রবাসে' তৃতীয়জনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবন্ধ, 'বর্ষাকাঙ্ক্ষম' এবং তার পরেই গল্প, 'অতসী মামী'—লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ পৌষ সংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ : বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালির' ১৮।১৯ পরিচ্ছেদ। তথ্য হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে মাণিকবাবুর নামের বানানে 'ণ' ব্যবহার করা হয় পৌষ সংখ্যা থেকেই।

উপেনবাবু এই সদ্যতন তরুণের প্রথম গল্পটি ছেপে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, নিজে গিয়ে দেখা করে এলেন মাণিকের ঠিকানা খুঁজে হাতে দিয়ে এলেন পারিশ্রমিক। অনুরোধ করে এলেন আরও একটা গল্প চাই।

'তারপর সব ওলোটপালোট হয়ে গেল।'

সব ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলেন লেখা।

কিন্তু পরীক্ষার পড়া চুলোয় যাক। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে চমকে দিয়ে ফেল করলেন পরীক্ষায়। বি-এস-সিতে বার বার দু-বার।

বড়দা বোম্বে থেকে বৈষ্ণবীয় তলব করে চিঠি লিখলেন।

উত্তরে মাণিক অকুতোভয়ে জানালেন—পাঠ্য পুস্তক পড়ার সময় নেই। চিঠিতে পাঠালেন বিদেশী লেখকদের নাম এবং তাঁদের গল্প, উপন্যাসের একটি বড় রকম তালিকা। দাদা চেয়েছিলেন পাশ, পরিবর্তে মাণিক সাফ জানিয়ে দিলেন—গল্প, উপন্যাস লেখা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়, কাজেই কলেজের পড়া ছাড়তে হল। আরও লিখলেন, 'আপনি দেখে নেবেন কালে লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান করে নেব। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সমপর্যায়ে আমার নাম ঘোষিত হবে।'

শুরু হল ভাগ্যের সঙ্গে প্রকৃত লড়াই। পরীক্ষা আর দেওয়া হল না। বড়দা খরচ বহন বন্ধ করলেন। মুন্সেফে চেষ্টা ভাই সুরোধবাবু ব্যবসা ক্ষেত্রে বাবাকে নিয়ে গেলেন। তিনিই বাবার অনুরোধে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করতেন। মাণিকের সামনে তখন সাহিত্যচর্চা ছাড়া অন্য কোন জীবিকা নেই। সুয়োরাণী বিজ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করে তিনি জীবনের চোটল পথে স্বেচ্ছায় পা বাড়ালেন।

'বিচিত্রায় প্রথম গল্প প্রকাশের পরের বছর আরও দুটি ছোট গল্প 'নেকী' ও 'ব্যথার পূজা' প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকায়। বছর পাঁচেক পরে বঙ্গশ্রী (১৩৪১—বৈশাখ) পত্রিকায় 'একটি দিন' নামে একটি বড় গল্প ছাপা হয়। এবং সম্পাদকের অনুপ্রেরণায় ঐ গল্পটিই 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি' এবং শেষ পর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে ধারাবাহিক রচনার সম্পূর্ণ হয়। এই একই বছরে আরও একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন 'পূর্বাশায়'। 'পূর্বাশা' কিছুদিনের জন্য অনিয়মিত হওয়ায় 'পদ্মানদীর মাঝি' নামে সেই রচনাটি সম্পূর্ণ হয়নি ঐ পত্রিকায়। পরে হিমাংশুবাবুর

চুলের সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল্যের জন্য

স্বস্তিক

পারফিউমড্ ক্যাস্টর হেয়ার অয়েল

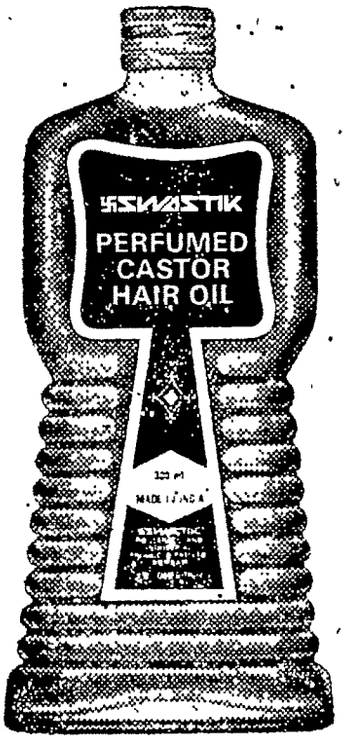

সুন্দর চুলকে সারাদিন সুবিন্যস্ত রাখার জন্য স্বস্তিক পারফিউমড্ ক্যাস্টর হেয়ার অয়েল— যা আপনার পরিবারের সবাকেই পছন্দ করবেন।

স্বস্তিক হাউসহোল্ড এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস্, বোম্বাই।

পাত্রী দেখবার জন্য ১৯৩৬ সালে মাণিক পূর্ববঙ্গের নানা জায়গায় মাসখানেক কাটান। বিবাহের পর সকলে চলে এলেন, রয়ে গেলেন মাণিক। ফিরলেন দিন পনের পরে। পদ্মার মাঝিদের সঙ্গে কাটালেন কিছুদিন। সমাজের নীচুতলার সেই সব অবহেলিত জীবন যাপন প্রত্যক্ষ করে, তাদের আপন করে নিয়ে তাদেরই মুখের ভাষায় লিখলেন 'পদ্মানদীর মাঝি'।

পরের বছর (১৯৩৫) 'জননী', 'অতসী মামী' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য', পর পর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় সাহিত্যজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুর্বার প্রেরণায় দৃঢ়চিত্ত হয়ে উঠলেন। এক জগৎবিখ্যাত পুতুলনাচের দলের নাচ দেখে তিনি একদা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জীবনের কাঠার নিয়মকেই যেন পুতুলনাচের ছন্দে প্রকাশ করতে চাইলেন। বর্তমান বছরেষ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথায়'।

এই সময় কৃত্রিমগত সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সর্বাত্মক আগ্রহ শরীরের প্রতি অমনোযোগী করে তুলেছিল। অনিয়মিত জীবন-যাপনের দৌরাত্ম্যে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃগী রোগের লক্ষণ দেখা দেয় তাঁর শরীরে। প্রধানত শরীরের প্রতি অবহেলা, পারিবারিক অসন্তোষ—এই রোগকে আরও মারাত্মক করে তুলল। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। তিনি বললেন একমাত্র মানসিক শান্তিতেই ও রোগের নিরাময় সম্ভব।

ব্যক্তিগত হাতখরচা এবং এই ভয়াবহ চিকিৎসার অর্থের জন্য তিনি মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বসুশ্রী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কাজে যোগ দেন। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেডের পরিচালনাধীন ঐ পত্রিকাটির কর্ণধার ছিলেন সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য সম্পাদক কিরণকুমার রায়।

বেতন ধার্য হল ৬৫ টাকা। শর্ত, তাঁর 'অমৃতস্য পুত্রা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে হবে 'বসুশ্রী'তে। তার জন্য মাসিক দশ টাকা বাড়তি পাবেন।

ইতিমধ্যে বাবা অবসর গ্রহণের পর, সঞ্চিত অর্থে টালিগঞ্জ—দিগম্বরীতলায় স্থায়ী বাসস্থানের জন্য জমি কিনেছেন। প্রথম দুই প্রতিষ্ঠিত পুত্র তখন কর্মোপলক্ষে বাইরে, অন্যান্য ছেলেদের এক সঙ্গে নিয়ে তিনি যৌথ পরিবারের সূচনা করেন।

বিবাহ/চাকুরি

বাবা অত্যন্ত স্নেহ করতেন মাণিককে। উত্তরোত্তর অসুস্থতা এবং বেপরোয়া সাহিত্যিক জীবনযাপন—হয়তো এই জন্যে তিনি পুত্রের বিবাহের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। উচ্চশিক্ষিত চাকুরীজীবী পাত্রীর চেয়ে তিনি মোটামুটি লেখাপড়া জানা সুশ্রী এবং সর্বোপরি সংসারের প্রতি আগ্রহী মেয়েদের সন্ধানে ছিলেন।

এরকম এক ভদ্রলোক নলিনীকিশোর মুখোপাধ্যায় একটি সম্বন্ধ আনলেন। মেয়েটির বাবা মন্মথনাথসিংহ গভর্নমেন্ট গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আদি নিবাস বিক্রমপুর, পশুসাব। পালং-এ মেয়েটির জন্ম হলেও, মন্মথনাথসিংহ টাউনেই সে বড় হয়েছে। লেখাপড়া ? সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েই কলকাতায় এসেছে। তিন ভাই, চার বোন তারা—সব বোনেদের মধ্যে তৃতীয়া। ডাক নাম ডলি। ভালো নাম কমলা। সোনার বরণ মেয়েটি শান্ত, সুশ্রী। সংসারের শান্তি হয়ত লেখা আছে মেয়েটির স্থির চোখে। উপহার কালো মাণিকের পাশে এই কাঞ্চনকুমারীকেই মানায়।

মেয়েটি এসে উঠেছে তার মেজ কাকা খগেন্দ্রনাথ চাটার্জীর [illegible] টালার। পরিবার ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন গোপনে। তার

২৮ বৈশাখ দিন স্থির হল (১৩৪৫। ইং ১৯৩৮ ১১ মে)। বরানগরে পরামাণিক ঘাট রোডে বাড়ী ভাড়া করে বিয়ে হল। যৌতাতে কয়েকজন সাহিত্যিকও উপস্থিত ছিলেন।

কয়েক মাস যেতে না যেতেই মাণিক 'বসুশ্রী'র চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার বেকার হয়ে গেলেন। দু-বছর কাজ হল বেতন বাড়েনি, তাছাড়া ভবিষ্যতে কোনও রকম উন্নতির আশাও নেই। রোজ দশ বারো ঘণ্টা খাটতে হয়। সব দিক ভেবে, কাজ ছেড়ে দেওয়াই স্থির করলেন। হয়ত সব সময়ের সাহিত্যসেবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার বাধা দেখেছিলেন এই পরাধীন কর্মে। প্রস্তুতঃ এই দুবছরে খুব অল্পই লিখেছিলেন তিনি। আর পাঁচজনের মত সাংবাদিক ছিলেন না, ছিলেন জাত সাহিত্যিক। সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দশটা পাঁচটার নিয়মিত কাজ তাঁর পছন্দ হয়নি।

স্বত্বাধিকারী শিল্পপতি সচ্চিদানন্দবাবু ছিলেন অদ্ভুত মনের লোক। তাঁর কাছে লেখা ছিল একটা শখ বাতিক। দেখা যেত 'বসুশ্রী'র পাতায় এক সময় তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ধারাবিহকভাবে প্রকাশিত হত। তাঁর সঙ্গে মানিকের সম্পর্কটা মধুর ছিল না। মাঝে মাঝে সচ্চিদানন্দবাবুর বাগান বাড়িতে সাহিত্যের আড্ডা হত। তিনি নিজের প্রবন্ধ পড়ে শোনাতেন, ভালো না লাগলে মাণিক সেই প্রবন্ধের প্রশংসার পরিবর্তে সমালোচনা করতেন। দুজনের সম্পর্ক এতে আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। বসুশ্রীর চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে এ সম্পর্কও কার্যকরী হয়েছিল। 'বসুশ্রী'র কাজ ছেড়ে দিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন 'শহরতলী'—যার ভিতরে নিকটগত দুটি বছরের অনেক চরিত্র ও ঘটনার হুবহু মিল দেখা যায়। উপন্যাসটি প্রচারিত হয় সেই বছরের শারদীয় আনন্দবাজারে—সাময়িক পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতির সূচনা।

বেকার হয়ে গিয়ে, কিছু একটা রোজগারের সংস্থান চিন্তা করে পরের ভাই সুবোধবাবুর সঙ্গে ছাপাখানা ও প্রকাশন সংস্থা করা স্থির করেন। ভবিষ্যতের উন্নতির ভরসায় এই ব্যবসার পত্তন। 'পুরাতন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কিছু নগদ, কিছু ধারধোর করে কিনে—'উদয়াচল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস' নামে প্রতিষ্ঠানটি চালু করেন। ঠিকানা ১৩-বি জনক রোড, কালীঘাট। বছর দুয়েক চলেছিল এই ব্যবসা। সম্ভবত দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, একটি রমাপতি বসু সম্পাদিত ১৩৪৫ এর শ্রেষ্ঠ কবিতা—অন্যটি নিজের গল্প সংকলন 'বৌ'। মাণিক এই সময় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনাও মাথায় আনেন। শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়িক ব্যর্থতা তাঁকে কঠিন অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করালো।

যৌথ সংসার। খরচের শেষ নেই। তাছাড়া নিজের ছেলেমেয়েও দুটি। প্রথমটি মেয়ে, টুটু। দ্বিতীয়টি পুত্র, খোকন, কিন্তু জন্ম থেকেই রোগাক্রান্ত, জড়বুদ্ধি। তার উপরে নিজের অসুস্থতা বিপন্ন করে তোলে প্রায়ই।

নিরুপায় হয়ে আবার চাকরির সন্ধান করতে হয়। অল্প কিছুদিনের জন্য একটা চাকরি পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল দপ্তরের প্রচারক সহকারী পদে যোগ দেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ বিষয়ক বক্তৃতা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময়ে মাণিক শারীরিক কারণে ক্রমশ বিপন্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে, সামরিক বিভাগের কয়েকজন অসাহিত্যিক বন্ধুর সংস্পর্শে পড়ে নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

রাজনীতি

[illegible]

সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হওয়ার ফলে মাণিক ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের চাকরি নেন। ১৯৪৪ সালে তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল প্রকাশ্যে।

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তরুণ লেখক [redacted] সেন নিহত হন ৮ মার্চ, ১৯৪২। সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ ওঠে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।' পরের বছর শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিতর্কিত উপন্যাস 'প্রতিবিম্বের' সূত্রে উদ্ভূত সংঘের সঙ্গে মাণিকের যোগাযোগ হয়। ১৯৪৪ সালে ১৫—১৭ জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। এবং বর্তমান বছরেই তিনি যোগ দেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনেও তিনি ঐ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন এবং এই সম্মেলনে সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘের বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ।' এই সম্মেলন থেকে মাণিক পরবর্তী বছরের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সংঘের নিয়মিত কাজে মাণিক তখন ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ দপ্তরে এক প্রাণবান নায়ক। সংঘের বুধবারের বৈঠকে, সমকালীন লেখক-কবি গায়ক-নাট্যকার-শিল্পীর সঙ্গে মাণিক স্বরচিত রচনাপাঠ ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। নামী-অনামী সকলে প্রাণ খুলে যোগ দিতেন সেই সভায়। মাণিক একমুখ হাসি নিয়ে নিবিষ্ট মনে শুনে যেতেন আলোচনা। কখনো জোরালো সমর্থন বা প্রতিবাদ করতেন, কোনো মন্তব্যে মাথা ঝাঁকি দিয়ে মেতে উঠতেন প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনায়। কখনো রাজপথে জনপথে মানুষের দুর্বার মিছিলের একজন হয়ে মিশে গিয়েছেন খেটে খাওয়া মজুরের দলে। মিছিল দেখলেই ভিড়ে যেতেন, কেউ জিজ্ঞাসা করলে নির্দ্বিধায় বলতেন, 'পথে হাঁটতে হাঁটতে একটা মিছিল চলছে দেখলাম, তাই আমিও যোগ দিলাম ওদের সঙ্গে।'

মাণিকের সঙ্গে কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অনেকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। বিশেষ করে কয়েকজন প্রকাশক তাঁর পূর্ব সম্পর্কের অবহেলা ও অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেন। অর্থকষ্ট ও ব্যয়বাহুল্যের চাপে তিনি অসম্ভব দৈন্যে পড়লেন। কারো-কারো দুর্ব্যবহারে পীড়িত মাণিক বসুমতীর সম্পাদকের কাছে তীব্র অভিমানে লেখেন, 'বাংলাদেশে সাহিত্য সাধনার পথে যে অভাবনীয় বাধা-বিঘ্ন, তার কিছু, কিছু, আপনি তো জানেন। কেবল দারিদ্র্য নয়,—সে তো হিসাবের মধ্যে ধরে নিয়েই মেনে নেওয়াই হয়েছে। সহযোগিতারও অভাব বটে। পয়সাওয়ালা কাগজওয়ালারা আমাকে আবার একরকম বয়কট করেছেন। আপনাদের মত কিছু মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাই রক্ষে এ যাত্রায়।'

জটিল গার্হস্থ্য

এদিকে একান্নবর্তী পরিবারে উত্তরোত্তর গোলযোগ, পরস্পর মনোমালিন্য বাড়তে লাগল। বাবা, স্থির করলেন তাঁর নিজের তৈরি বাড়ী বিক্রি করে, অর্জিত অর্থ সব ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। প্রথম দুই ছেলে আলাদাই ছিলেন, পরের ছেলেরাই পড়লেন বিপদে। বিশেষ করে মাণিককে বাড়ি খোঁজার জন্য বেশ কিছুদিন হন্যে হয়ে ঘুরতে হল। একাদিক্রমে এগারো বছর একান্নবর্তী পরিবারে পৈতৃক বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত। নতুন সংসার রচনায় ঝামেলা দেখা দিল। অনেক খুঁজে পেতে

কেন লিখি

লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই যে কথাগুলি জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যেই আমি লিখি। অন্য লেখকেরা যাই বলুন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা কেন লেখেন প্রশ্নের জবাবও এই।

চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশী। প্রতিভা নিছক জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মসচেতনের অভাব আর অন্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন। জ্ঞানিসক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও উৎসাহ অথবা নেশা এবং প্রতিক্রিয়াটির চাপ ও তীব্রতার সহ্য করার শক্তি কতকগুলি বিশ্লেষণযোগ্য বোধগম্য কারণে সৃষ্টি হয়। বাড়ে অথবা কমে। আড়াই বছর বয়েস থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।

লেখার ঝোঁকও অন্য দশটা ঝোঁকের মতই। অঙ্ক শেখা, বন্দুক বানানো শেখা মানে খোঁজা, খেলতে শেখা, গান গাওয়া, টাকা করা ইত্যাদির দলেই লিখতে চাওয়া। লিখতে পারা এই লিখতে চাওয়ার উগ্রতা আর লিখতে শেখার একাগ্রতায় ওপর নির্ভর করে। বক্তব্যের সঞ্চয় থাকা যে দরকার সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য—দাতব্য উপলব্ধির চাপ ছাড়া লিখতে চাওয়ার উগ্রতা কিসে আসবে।

জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেবার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি, এ-জগতে কেউ তা জানে না। (জন্ম পড়ে পাওয়া নতে জানা নয়। কিন্তু, সকলের সঙ্গে আমার জানার এক অর্থপূর্ণ ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি। দান করি বলা ঠিক নয়,—পাইয়ে দিই। তাতে উপলব্ধি করাই আমার চোখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমি লিখে পাইয়ে না দিলে যেচারী যা কোনদিন পেত না।

কিন্তু, এই কারণে লেখকের অভিমান করা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। পাওয়ার জন্যে আনো-বহু না ব্যাকুল পাঠকের চেয়ে কোন লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেক বেশী। লেখকের নিষ্ফল কলম পেষা মজুর। কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তার বাস্তবিক ধারে বসে সে মজুরি খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।

কলম পেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসার আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই এখনো মাঝে মাঝে অনামনস্কভাবে দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোষ জাগে সব খাঁটি লেখক কবে হব।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

*

একটা বাড়ী পাওয়া গেল বরাহনগরে, গোপাললাল ঠাকুর রোডে, বাড়ীর নম্বর ১৮৬-এ। ১৯৪৯ সালে ৫ ফেব্রুয়ারী, শনিবার সকালে দুটি পুত্র, দুটি কন্যা, স্ত্রী এবং নিজে, সঙ্গে সংসারের সামান্য সামগ্রী নিয়ে লরিতে করে এই ভাড়াটে বাড়ীতে উঠে এলেন। পিতা হরিহর ঘর বিক্রির টাকা একমাত্র বড় ছাড়া আর সব ছেলেদের ডেকে ভাগ করে দেন। কয়েক মাস তিনি অন্যান্য পুত্রদের কাছে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে কিছুতেই নিজেকে না মানিয়ে নিতে পেরে, তাঁর দরিদ্রতম লেখক পুত্রের ভাড়াটে বাড়ীতে স্থায়ীভাবে আশ্রয় নেন। তখন তাঁর অন্য পুত্রদের বাড়ীর সংখ্যা পাঁচ, চারখানা কলকাতায়। বৃদ্ধ পিতা টালিগঞ্জে সেজপুত্রের কাছে ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজশাহী যাবেন ঠিক, ফিরে এসে বাড়ী বিক্রি করে ফ্ল্যাটে থাকবেন, সুতরাং বাবার যাবার জায়গা নেই। অধিক না আলজে হয়ত স্ত্রীকে বস্তিতে অন্ধকার ঘর খুঁজে নিতে হবে।

মুক্ত আপাতত, বাইবেল দিকের ঘরটি কাঠের ফ্রেমে সস্তা

বরাহনগরের বাড়ীতে দুটো মাত্র ঘর। ভাড়া ৬৫ টাকার ক্যানভাসের পার্টিসন দিয়ে পৃথক করে ৮০ বছরের বৃদ্ধ বাবাকে আনলেন মাসিক। ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটি টেবিল, দরজার দিকে পিছন করা হাতল ভাঙা চেয়ার। শোবার জন্য একদিকে ছিল নেবারের খাট। একটি সস্তা কাঠের আলমারি—বই ভর্তি। টেবিলের পাশে ছোট্ট বুকসেলফে প্রাচীন জীর্ণ মাসিক পত্র। নিব কলমে জিওল নীল, সুতো দিয়ে শক্ত করে বাঁধা কমদামী একটিমাত্র ভাঙা কলমেই তিনি লিখতেন। টেবিলটির উপর স্তূপীকৃত বইপত্র, মলাট নিজেই নিজের তিসিপত্র রাখতেন বাউক গোছাতে দিতেন না। ব্লেড গোছানোর চেষ্টা করলে ঝগড়া করতেন। ঘাটের তলায় প্রস্তুত মশলা—বেরক্ত—পাশের ঘরে বাবা, বৌ ছোট ছেলেমেয়ে—কোন সংকোচ নেই তাঁর জন্য। কোনদিন বাড়িতে অতিথি বন্ধুদের নিয়ে মদ্যপানের আসর বসান নি, এমন কি তাঁর অল্পদিনই বেসামাল অবস্থায় বাড়ী ফিরতে দেখা গেছে তাঁকে। যেন মদ্যপানমুখ জীবনকে সঞ্জীবিত করার একমাত্র ওষুধ। নেশার কিংবা লেখার জন্য নয়, বাঁচার জন্য।

একমাত্র জীবিকা সাহিত্য রচনা। বিনা পারিশ্রমিকে লেখা দিতে চাইতেন না মাসিক। যদিও তাঁর বিশ্বাস, 'সম্মান মূল্যের' জন্য তিনি গল্প লিখতেন না, লিখে কিছু সম্মান মূল্য প্রত্যাশা করতেন। অবশ্য প্রকৃতে সাহিত্য পত্রিকার আর্থিক অবস্থা খারাপ বিবেচনা করে তিনি বিনামূল্যেও লিখতেন। নিজেকে সব সময় কলমে পেশা মজুর হিসেবেই চিন্তিত করতেন।

ঘনহুগলীতে আসার পরের বছর শ্রীমতী কমলা একটি মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করেন। তখন সংসারের অবস্থা এমন, খরচ বাঁচবে এই ভরসায় তাঁর স্ত্রী যেন হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পেলেন। মানিক এই কঠিন বাস্তবে নিজেকে অসহায় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাতে বাধ্য হন : 'মানুষ সন্তানকে ভয় করছে ? দশ মাস গর্ভধারণ করে মৃত সন্তান প্রসব করে মা ভাবছে বাঁচা গেল ? অভিশপ্ত সমাজ এমনি অস্বাভাবিক করেছে জীবন ? মানুষের বাঁচাই দায়, সন্তানের হাঙ্গামা কে চায় ?'

চারটি ছেলেমেয়ের মধ্যে, টুটু-শিপ্রা পড়ছে স্কুলে। বড় ছেলে প্রশান্ত অসুস্থ, কোনও রকমে বাঁচিয়েছেন তাকে। ছোট ছেলে টুবলু, কিশোর কবি সুকান্তকে স্মরণ করে নিজের ছেলের ভাল নাম সুশান্ত বদলে রাখেন সুকান্ত। সে তখন নেহাত ছোট্ট।

রোজগারের তুলনায় ছোট নয় সংসারটি। তার উপরে অত্যন্ত হাত খোলসা ছিলেন। সংসার দেখতেন স্ত্রী। মানিক প্রায়ই বাজার করতেন নিজে। থলে ভর্তি আনাজ তরিতরকারি কিনতেন। যদিও সংসার খরচের হিসাব লিখে নিজেকে সতর্ক করতে চাইতেন। হিসেবী ছিলেন না, টাকা পেলেই হল। দুর্ভোগ ভুগতে হত কমলাকে।

নিজের খাওয়া শোওয়া অনিয়মিত হলেও, ছেলেমেয়েদের প্রতি নজর রাখতেন। মাঝে মাঝে নিজে পড়া ধরতেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত-নজরুলগীতি-শ্যামাসঙ্গীত ভালবাসতেন। নিজে গাইতেন, শুনতেও চাইতেন। মেয়েরা গান শুনিয়ে খুশি করতে পারলে পুরস্কার দিতেন। তাদের গান শেখার জন্য দুজন গানের মাস্টার রেখেছিলেন যদিও অমনি পড়ানোর মাস্টার ছিল না।

ভালো লাগলে বাঁশি বাজাতেন, জ্যোৎস্না রাতে দাওয়ায় বসে। নিজেই নিজের বাঁশি শুনে মুগ্ধ হতেন। কিংবা মেয়েদের নিয়ে বসাতেন গানের আসর। লেখার সময় কিন্তু মানুষটি একেবারে আলাদা—গম্ভীর-তন্ময়-একাগ্র। কেউ ডাকলে সাড়া পাওয়া ভার, বিরক্ত হতেন। সেই লোকই, অন্য সময় আর পাঁচজনের মতই উৎসাহী, খেয়ালী, হৈ-চৈ-প্রবণ। পাড়ার ছেলেদের খেলার যাতে চর্চা থাকে, তার জন্য সকলের আগে তিনিই ব্যবস্থা করতে ছুটতেন। সরস্বতী কিংবা বিশ্বকর্মা পুজোয় ছাদে দুরন্ত ছেলেদের হাতের লাটাই চেরে নিয়ে ঘুড়ি ওড়াতেন। বিকেলবেলা জানালায় বসে দেখতেন সামনের মাঠে ছেলেদের খেলা, নিজে গিয়ে বেফাঁরি হয়ে যেতেন। অলস মধ্যাহ্নে ছেলেমেয়েদের পাকা চুল বেছে দিতে বলতেন পয়সার বিনিময়ে।

বিলাসিতা ছিল না নিজের। সাধারণ লংক্লথের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী, ধুতি পরতেন। খদ্দর পরতেন না। বাড়ীতে পরতেন খড়ম। ছেঁড়া জামা লুঙ্গি—পোশাকের কোন সতর্কতা ছিল না। স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় কাপড় জামা তাদেরই পছন্দে কিনতেন। পুজোর আগে প্রত্যেককে নিয়ে বাজার করতে বেরোতেন। বাড়িতে থাকলে ঘন ঘন চা খেতে চাইতেন। সারাক্ষণ কেটলিতে গরম জল ফুটত। মাঝে মাঝে নিজেই রান্না করতে লেগে যেতেন। গাছ-গাছালির শখ ছিল, কিন্তু সাবধানে অভাবে তা হয়নি। সারাজীবন জীবিকার্জন, সাহিত্য, সংসার নিয়ে ব্যস্ত মানিক সপরিবারে বেড়াতে যাওয়ার মত একটা অবকাশ পাননি। বড় মেয়ে টুটু হওয়ার পর কয়েকদিনের জন্য স্ত্রীকে নিয়ে বাঁচি গিয়েছিলেন। গয়া আর ঝাড়গ্রামেও পারিবারিক কারণে সপরিবারে যেতে হয়েছিল একবার।

সাহিত্যিকের বৌ

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, উদ্যনচণ্ডী উদাসীনতা, সর্বোপরী আত্মবিনাশী মদ্যপান—সংসারে একটা চিরস্থায়ী অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। বাস্তব লাভ লোকসান বোধ ছিল না তাঁর। দারিদ্র্যকে হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েও স্ত্রী, ডলি-মদ্যপান সম্পর্কে স্বামীর কোন যুক্তিই মেনে নিতে পারেন নি, 'তুমি মদ খাবে আর আমরা সকলে না খেয়ে মরব ?' নিরুপায় হয়ে কান্নাকাটিও করতেন। শ্বশুর হরিহর তাঁর এই বৌমার প্রতিই নির্ভর করতেন বেশি। আমৃত্যু তিনি তাঁর আদরের মাণিকের সংসারেই কাটিয়েছেন। তিনি জানতেন বৌমা কমলা কতখানি ফাঁকের মোষ। একান্নবর্তী পরিবারে শ্বশুরমশাই ছিলেন সর্বেসর্বা। খুব দাপট ছিল। সবাই ভয় করতেন। কমলার বিয়ের পর যখন তাঁর ম্যাট্রিকের বেজাল্ট বেরোল, ভালভাবে পাশ করেছেন এই অজুহাতে চাইলেন, কলেজে ভর্তি হোক। কিন্তু শ্বশুর ও স্বামী তাতে রাজী হননি। বড় এবং মেজ ভাসুর বাইরে। তাঁরাও একান্নবর্তী পরিবারটি বেশ বড়ই। ছোট দুই দেওর নাবালক, আর গুপ্ত—বাড়ির পোষাকী নাম সুবোধ এবং অমর। বৌদির সঙ্গে তাদের ভাল সম্পর্ক ছিল।

সাদামাটা সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত কমলা খুব শক্ত

হাতেই সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি স্বামীর সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না, কিন্তু কোন দিন খুব একটা উৎসাহও প্রকাশ করেন নি। হয়ত ভেবে থাকবেন এই সাহিত্যই তাঁদের সংসারে একটা অনাবশ্যক ঝামেলা গড়ে তুলছে। গহনা পছন্দ করতেন না মাণিক। এক-এক করে কমলার গহনাতে টান পড়তে লাগল। কপট রাগ দেখিয়ে কতদিন তিনি স্বামীকে বলেছেন : ঠিক হবে অত লিখে, এদিকে সংসার অচল হয়ে উঠছে আবার চাকরি খোঁজ।' মাণিক ভরসা দিতেন খুব সংক্ষেপে, দেখো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামান নি কমলা। তবে তাঁর জনপ্রিয়তা সম্পর্কেও একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না তিনি। যখন 'বৌ' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হল—তখন পাড়ার মেয়েরা পরস্পর পরিহাস করতেন কমলাকে দেখে, জানিস, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৌ' বাজারে বেরিয়ে গেছে।' কমলা হাসতেন।

ঋণের বোঝা সামাল দেবার জন্য মাণিক প্রাণপণ চেষ্টা করলেন প্রকাশকদের চাহিদা মেটাতে। শরীরের শক্তিতে যেন কুলোচ্ছিল না। নিজের অসুস্থতাকে ভুলে থাকবার জন্যই তিনি মদ্যপানকে একমাত্র আশ্রয় করে তুললেন। এই নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গেও একটা বিরোধ গড়ে উঠতে লাগল। কমলার রাঙাদি শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় এই মদ্যপান নিয়ে কতদিন মাণিককে তিরস্কার পর্যন্ত করেছেন, 'তোমার এই অবস্থা, তোমার জন্যই ডলিকে একদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে।' মাণিক মৃদুভাষ সঙ্গেই জবাব দিতেন, 'তোমাদের ভাবতে হবে না, ডলির জন্য জমিজমা রেখে যাবো আমি।'

ব্যাধি বন্ধন।

তাঁর বর্তমান অসুস্থতার কথা ভেবে, অনেকেই শুভানুধ্যায়ী নিজেদের মধ্যে কিছু সংগ্রহ করে মাণিককে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। এমন অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন যাঁদের সঙ্গে সাহিত্যগত বা আদর্শের দিক থেকে মাণিকের কোন মিল ছিল না। প্রখ্যাত আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রখ্যাত চিকিৎসক—ডাঃ নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে মাণিকের চিকিৎসা করান। তখন তাঁর শরীরের সবচেয়ে বড় শত্রু সুরা। সুরার থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হতে না পারলে এই রোগের হাত থেকে তাঁকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। স্থির হল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। মাণিকের তাতে আপত্তি। নিজেকে রোগী মনে করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে তাঁর সর্বনাশ হবে,—পরপর নিজের অসুখ ও মদ্যপানের কারণ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য সাজিয়ে অতুলবাবুকে জানাতে চাইলেন, 'একটা কথা ভুল বুঝবেন না—আমি কোন দিন চিকিৎসা বিজ্ঞান বা ডাক্তারকে উড়িয়ে দেবার কথা বলিনি। আমি নিজে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমি বিশ্বাসী। আমি বরাবর ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছি, দরকার মত ওষুধপত্র খেয়েছি।....তবে আমার মনে হল এই, ডাক্তার[-এর] সব উপদেশ মেনে চলা বা সব ওষুধ নিয়ম মত খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কারণ অর্থাভাব এবং অতিরিক্ত খাটুনি। আর একটা ওষুধ খেয়ে ঘুমোলে কাল হাঁড়ি চড়বে না—খানিকটা অ্যালকোহল গিললে কিছুক্ষণের জন্য তাজা হয়ে হাতের কাজটা শেষ করতে পারব। এ অবস্থায় অ্যালকোহলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় কি?.. অ্যালকোহলের কবল থেকে মুক্তির লাভ করা দরকার সে বিষয়ে আমি যে অনেক দিন আগে থেকেই সচেতন হয়েছি তার প্রমাণ আছে।

অর্থাভাব ও অতিরিক্ত খাটুনির জন্য এটা একেবারে বন্ধ করতে পারিনি কিন্তু সামলে চলার চেষ্টা যে করেছি সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন, আমার পুরনো ক্যাশবিল হিসিবপত্র।

আমি মাতাল নই—সাহিত্যিক। খাটুনি এবং চিন্তা অত্যধিক হাত থেকে রেহাই পেলে বাড়িতে থেকেই অ্যালকোহলকে দূরে আনতে পারব।'

মাণিককে তবু ইসলামিয়া হাসপাতালে পাঠানো হল। হাসপাতালে থাকবার সময় তাঁর শারীরিক কিছু উন্নতি হয়েছিল। তবু হাসপাতালের বন্ধন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। নিজেকে নির্বান্ধব-নিঃসঙ্গ ভেবে হতাশ হয়ে উঠলেন। মাণিক চিরদিনই একা। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্নই থেকেছেন চিরদিন। যদিও সভাসমিতি, সাহিত্যিক আড্ডাতেও তাঁকে যে একেবারে নিষ্প্রভ দেখা গিয়েছে তা নয়। হাসপাতালে মদ্যপান সম্পর্কে সতর্ক নিষেধ তাঁকে মনের দিক থেকে আরও দুর্বল করে ফেলেছিল হয়ত।

মাণিক হাসপাতালে থাকলেও, বাইরে তখন অনেকেই একত্রিত হয়ে তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করছেন। তবু নিরুপায়, নিজেকে নিঃক্ষিপ্ত মনে করে আত্মগত অভিমান ও বেদনা অনুভব করেছেন সঙ্গতার আশায়, '..না' দিন কেটে গেছে। দায়িত্বশীল কোন ডাক্তারের উঁকিও মারলেন না—কেবল সুভাষ গীঙারা করেকজন। ভর্তি করে দিয়ে সেই যে 'চলু গেল, আর তার সাড়াশব্দ নেই। দেবীও আসে না। এক তারাশংকর ছাড়া সাহিত্যিকেরা কেউ দেখা করতে আসেন না কেন? এমনকি পার্টির কবি লেখকরা পর্যন্ত? ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে।'

একমাস করেকদিন থাকার পর, তিনি ডাক্তারদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে বাড়ি চলে এলেন একা।

সন্ধ্যায় বাড়ি পৌঁছেছেন বন্ধুস্থানেক। ছেলেমেয়েরা স্থানীয় স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গেছে। হঠাৎ কয়েক-জন এসে খবর দিলেন, বড় মেয়ে টুটু—দুর্ঘটনায় পা ভেঙে কাশী-পুর হাসপাতালে। সুতরাং আর এক ঝঞ্ঝাট।

এদিকে হাসপাতাল থেকে এই চলে আসায় অনেকেই ক্ষুব্ধ এবং চিন্তিত: আর নিজের অসুস্থতা এবং পারিবারিক প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তৎকালীন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের সাহায্য ও সহযোগে তিনি মাসিক একশ টাকা এবং চিকিৎসার জন্য একসঙ্গে বারশ' টাকা সরকারী সাহায্য পান। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

শেষ পর্ব

ছেলেবেলা থেকেই মানিক ছিলেন সংস্কারমুক্ত। সম্ভবত এই সংস্কারহীন উদার মনোভাবের প্রেরণা পেয়েছেন পিতা হরিহরের জীবনচর্যা থেকে: হরিহর সিটি কলেজে পড়বার সময় ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। এই ছাত্রাবস্থায় তিনি সমাজমন্দিরে কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপদেশ-ভাষণ শুনে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। যদিও পরে ব্রাহ্মসমাজে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন নি সাম্প্র-দায়িকতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করে। পুত্র মাণিক, তাঁর ব্যক্তি জীবনে কোন দিন সামাজিক সংস্কারকে প্রশ্রয় দেন নি: নিজে এবং তাঁর পুত্রদের উপবীত ধারণ করান নি। পত্নী কমলা দেবী কুমারী অবস্থায় পূজা অর্চনার প্রতি মনোযোগী হলেও উত্তর জীবনে প্রধানত স্বামীর বিরোধিতায় ধর্মীয় আচরণ উপেক্ষা করেন। যে জন্য কোন পারিবারিক বিগ্রহ তো দূরের কথা লক্ষ্মীর ঘটও পর্যন্ত বাড়িতে স্থান পায় নি। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানে মাণিক সাধারণ ধর্মবোধ ও লোকাচার থেকে-আরও দৃঢ়ভাবে সরে আসেন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মৈত্রী স্থাপনে প্রয়াসী হন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর স্বাধীনতার স্বাদ উপন্যাসটির উৎসর্গ পত্রটি স্মরণ করা যেতে পারে : 'সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে এই বইখানা উৎসর্গ করলাম—জনসাধারণই মানবতার প্রতীক।' মাণিকের সব গ্রন্থেই উৎসর্গপত্র অনুপস্থিত।

তবু মাণিকের জীবনে একটি আশ্চর্য ও লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়. যিনি আজীবন দুর্বার সংগ্রামকেই আত্মশক্তির অনু-প্রেরণা হিসেবে দেখেছেন; জীবনের উপান্তে তিনিই প্রায় অকস্মাৎ এক অলৌকিক বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করেন। এক দুর্নিবার শান্ত-চিত্ত যা তিনি 'মায়ের দয়া' বলে ভেবে নতুন এক শক্তি সঞ্চয় করতে চান। কঠোর দারিদ্র, অচিকিৎসা, অসুস্থতা এবং জন্মগত মদ্যপানের বিভীষিকাময় বন্যতার বন্দীত্ব, অন্যদিকে বিশেষ রাজ-নৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য কোন-কোন প্রকাশক মহলের ভীতিজনক উপেক্ষা, স্থায়ী রোজগারের অভাবে দিন যাপনের অনিশ্চিত অবসাদ তাঁকে এই বিপরীত বোধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য মৃত্যুপূর্ববর্তী মানসিক রূপান্তরের সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাঁর জন্মপত্রিকার দিকে তাকালে। জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে শুক্র, মঙ্গল ও বাহুর সহাবস্থান শুভ ফলদায়ক না হওয়ায় তাঁকে মদ্যাসক্তি গ্রাস করে। ব্যয় স্থানে, অষ্টমপতির অবস্থান ব্যয়বাহুল্যসূচক—এবং এই জন্যে আর্থিক অস্বচ্ছলতা প্রকটতর। মঙ্গল ও বাহুস্থিত শুক্র এবং ব্যয়স্থ বৃহস্পতি প্রথমা-বস্থায় প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কারের বিরোধী করে তুললেও পরিণত বয়সে জাতকের শান্ত মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যায়।

অথচ বাইরের থেকে লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-যাপন দেখে এই ভাবান্তরকে কোন নির্দিষ্ট অধ্যাত্মচেতনা বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা হয়। 'বসুশ্রী' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের পদে আবেদন পত্রে ছাব্বিশ বছরের তরুণ মাণিকের, 'ঈশ্বরেচ্ছায়' ইতিমধ্যে আমি লেখক হিসাবে কিছু সুনাম অর্জন করিয়াছি' এই বাক্যটিতে, 'ঈশ্বরেচ্ছা' শব্দটি নিছকই আবেগবশে ব্যবহৃত। তার সমগ্র সাহিত্য জীবনে ঈশ্বরানুগ্রহের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির কোন প্রত্যক্ষ উদাহরণও বোধ হয় নেই। শেষ জীবনে শক্তিবিষয়ক চর্চার কিছু লিখিত নিদর্শন আছে তাঁর প্রক্ষিপ্ত দিনলিপির পাতায়। শোনা যায় শ্যামাসঙ্গীতও তিনি পছন্দ করতেন। 'শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা', 'লক্ষ্মীপূজা', 'দক্ষিণেশ্বর' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত শব্দগুলি থেকে ধারণা হতে পারে তিনি সচেতনভাবে এক পরিবর্তনের সম্মুখীন, যা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেও তিনি স্পষ্টতঃ দ্বিধান্বিত। হয়তো মদের তৃষ্ণাকে দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর, তিনি এই অলৌকিক 'মায়ের দয়ায়' আশ্রয় চেয়েছিলেন।

মদ্যপান যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেও নিরুপায়। কোন দিন কোন প্রকাশক, হিসেব করে পাওনা টাকার সঙ্গে, সামান্য কিছু নগদ আর একটি ডাব দিয়ে ব্যাপ্যায়িত করলে, তিনি পান করে তৃপ্তিবোধ করেন। আরাম পান। বুঝতে পারেন ডিভ-র চেয়ে অনেক ভাল। একটি ডাবে এক গ্লাস জল হয়। দাম তিন-চার আনা। এক গ্লাস ডি-র জন্য ২॥-৩ টাকা দিতে হয়।' কোন দিন প্রচণ্ড মানসিক অবসাদে শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে, সামান্য অবশিষ্টটুকু পান করে নিজের ওপর কর্তৃত্ব হয় ওঠেন—'দেখা গেল এভাবে হয় না; মদে কোন মীমাংসা নেই।'

ইঁসলামিয়া থেকে পালিয়ে আসার কয়েক মাস পর অনেক চেষ্টায় তাঁকে লুম্বিনীপার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা হয়। সকলে ভেবেছিলেন হয়ত ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকলে মদ্যপান ছাড়বেন। কিন্তু স্পষ্টত, শরীর ও মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত মাণিক আরও অসহায়, অবলম্বনহীন হয়ে পড়েন। 'দেবী—লুম্বিনী পার্কে দিয়ে গেল'—এই একটি মাত্র অসম্পূর্ণ বাক্যে ঐ দিনের বেদনার্ত হাহাকার স্পষ্ট। মাত্র দু মাস থেকে পুনরায় বাড়ি ফিরে আসেন।

এদিকে বিপদের পর বিপদ। বাড়িওলা, সংলগ্ন আগুন্তি শিশু উদ্যান নামক স্কুলটিকে সম্প্রসারণের জন্য, ভাড়া বাকীর অজুহাতে মাণিককে উঠে যেতে বলেন। অভিসন্ধি নিয়ে আদালতের আশ্রয়ও নেন। অবশেষে মোটা টাকার বিনিময়ে মামলার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু জীবনের আদালতে আর দিন নেওয়ার সময় নেই। বস্তু আমাশয় ভুগে আরও কাহিল হয়ে পড়েন, যদিও সে সময় প্রাণপণ চেষ্টা করে, নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে থেকে নিজেকে সবল এবং সুস্থ করে তোলার আগ্রহী হয়েছিলেন নিজেই।

পার্টি সদস্যের ওধারে বৃদ্ধ পিতা, মৃত্যুর কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে থমকে আছেন। দিনকে দিন স্তব্ধ ও কঠোর হয়ে উঠছেন। থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট, আরও নানা রকমের কষ্টের অংশীদারী হয়ে তিনি আত্মদ্রোহী পুত্রের নিত্যসঙ্গী হয়ে কিসের লোভে থেকে যেতে চান, যেন এক করুণ বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দেখবেন বলে।

৩০ নভেম্বর (১৯৫৬) বরানগরের বাড়িতে সেই নাটকের শেষ যবনিকা উঠলো। অকস্মাৎ মৃগী রোগে আক্রান্ত হলেন। কেউ বলেন সন্ন্যাস রোগে।

সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ২ ডিসেম্বর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল নীলরতন সরকার হাসপাতালে।

বৃদ্ধ বাবা, চারটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রী কমলা—সকলের উৎকণ্ঠা, অপেক্ষা আর আশার অবসান করে পরের দিন সোমবার ভোরে (৩ ডিসেম্বর। ১৩৬৩, ১৭ই অগ্রহায়ণ) নিমর্ম পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন একজন একাকী মানুষ, বাংলা কথা-সাহিত্যের একজন শক্তিমান অথচ তখনো পর্যন্ত সবচেয়ে অবহেলিত লেখক, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে

একদা দুঃখেন, আজ বাংলা সাহিত্যের পক্ষে যা লজ্জার—মাণিক তাঁর জীবিতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরে কোনও রকম সরকারী-বেসরকারী পুরস্কার পান নি। অন্তত মৃত্যুর পূর্ববর্তী কয়েক বছর, দারিদ্র অসুস্থ ও অসহায় মাণিককে যাঁরা সাহায্য করতে এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, কেউ কেউ সরকারী পুরস্কার মণ্ডলীর সদস্যও। তাঁর মৃত্যুর পরে একাধিক জনসভায় তাঁকে পুরস্কার দানের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। পরিচয়, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় সজনীকান্ত দাস লিখেছিলেন : 'মাণিক স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার পরিবারকেও এই দারিদ্র লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে কিনা মানিকের জীবিত দাদারা তাহা নির্ধারণ করিবেন। না করিলে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকার এবং তাহার বন্ধুবান্ধব দেশবাসীর দায়িত্ব গুরুতর। আমরা প্রস্তাব করি আপাততঃ এই বৎসরে তাঁহাকে রবীন্দ্রপুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করুন। এখনো পর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন মানিক তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা যোগ্যতায় ন্যূন নহেন। আমরা শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃ পক্ষে পাঁচখানি উপন্যাস ও গল্প পুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে সাদরে স্বীকৃত হইবে এবং বাংলাদেশের সাহিত্যকে অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।'

কয়েক মাস পরে শনিবারের চিঠিতেও (চৈত্র ১৩৬৩) সজনীকান্ত এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন : 'মানিক মৃত বলিয়া তাঁহাকে বাতিল করিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কারণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাশের নজির রহিয়াছে। নির্দিষ্ট সময়-কাল মধ্যে রচিত গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত অপকর্ষও যে পুরস্কারের বাধা হয় না তাহার প্রমাণ রাজশেখর বসু মহাশয়। 'গড্ডলিকা' 'কজ্জলীর সদৃশ্য ও সুস্বাদু নৈবেদ্যের চূড়ায় কৃষ্ণকলির বাতাসা যখন মর্যাদা পাইয়াছে তখন 'দিবারাত্রির কাব্য' 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝির সম্ভার শীর্ষে 'মাশুলের মর্যাদা তেমন নিন্দনীয় হইত না।'

বহুদিও মৃত্যুর পরে প্রায় প্রতিটি সাহিত্য ও সংবাদপত্রে তাঁর সাহিত্যকীর্তি অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত হয়েছিল, তবু সজনীকান্তের এই সমস্ত প্রস্তাব যথানিয়মে নিতান্তই লোকওর লেখকের উদ্দেশে শুদ্ধমাত্র স্তোকবাক্যে পরিণত হয়। আত্মীয়-স্বজন ও সরকারী পুরস্কার উপেক্ষার ভিতর দিয়ে শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর পরে শোকাতুর বধির বৃদ্ধ শ্বশুর সহ চারটি নাবালক ছেলেমেয়েকে নিয়ে, অকালমৃত লেখক স্বামীর নামমাত্র গ্রন্থস্বত্বের আর্থিক ভরসায় নির্ভর করে প্রায় রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়। ৮ বছরের ব্যবহৃত গোপাললাল ঠাকুর রোডের বাড়িটির অধিকার ছেড়ে দিয়ে।

কোন আপস, কোন অন্যায়ের পক্ষে তাঁর মন সাড়া দেয় নি, তাই আজ গৃহছাড়া তাঁর পরিবার। অনলে তাঁর প্রিয় গল্প,

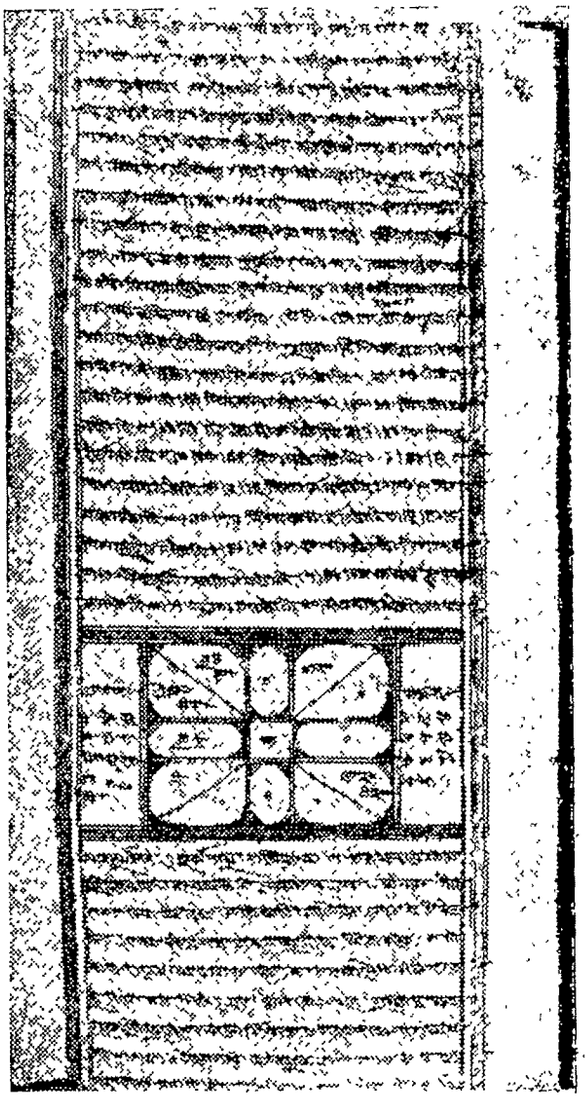

'পরবাসী চলে এসো ঘরের শেষ পংক্তিটির সঙ্গে তাঁর জীবনছন্দ একাকার হয়ে যায়, তিনি ছিলেন 'নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে।'

জীবিতাবস্থায় মাণিক তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের চিরদিনের আফসোস শুনে এসেছেন, 'তোর দাদা লেখা-পড়া শিখে দু-ছত্তর টাকার চাকরি করছে, তুই কি করলি বলতো মাণিক ? না একটা বাড়ি, না একটা গাড়ি—'

নিজে থেকে তার উত্তর দেননি। শেষ লেখার গল্পে তাঁর প্রিয় পাঠকদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন—'আপনারা কি বলেন ?'

জনপ্রিয়তা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনে গ্রন্থাকারে ৩৫টি উপন্যাস, ১৬টি গল্পগ্রন্থ (ছোট গল্প এবং স্বনির্বাচিত গল্প বাদে) রেখে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর অতিক্রান্ত বিশ বছরের মধ্যে (১৯৭১ পর্যন্ত—৮টি) উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে যার একটি 'কিশোরদের জন্য লেখা। 'কিশোর বিচিত্রা' নামেও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মানিক পড়ুকে এবং মশাটি গল্পসহ। 'আমার কাকা এবং বড় হওয়ার' কয়েকটি স্মৃতিকথাও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। শেষ সংকলনের নাম 'ছোট বড় মাঝারি' সেটির একটি নতুন করে সম্পাদিত। লেখক কোন পত্রিকা-গত অথবা বিনু

নি। এক্ষেত্রে তাঁর মত লেখকের ব্যক্তি জীবন জানিবার আগ্রহ আংশত পূরণ হয়, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ লেখকের স্বল্পের কিছু স্মৃতিচারণমূলক রচনায়। তাছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত মণ্ডলের চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়' নামক বহু বিতর্কিত গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা এই গ্রন্থটিতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি ও লেখক-জীবনের নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতময় একটি পরিচয় পাওয়া যায়, যা তাঁর বহু মূল্যবান লেখক ব্যক্তিত্বকে জানবার সহায়ক। গ্রন্থটিতে প্রকাশিত লেখকের চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত পত্রাবলী, অপ্রকাশিত অসম্পূর্ণ রচনা-সহ অনেক রহস্যময় তথ্য জানবার সুযোগ হয়।

'আগে ভো কবিতা লেখা কর্-অভ্যাস কিছু ছিল মোর'—এরকম পংক্তি তাঁর নিজের একটি কবিতায়। জীবিতাবস্থায় তাঁর যেসব কিছু কবিতা ইতস্ততঃ প্রকাশিত হলেও মৃত্যুর পরে যত্নবান চক্রবর্তী তাঁর কীটদষ্ট 'ভাঙায় খাতা' (১ আষাঢ় ১৩৫৩ থেকে সপ্তম সংখ্যা) থেকে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাগুলিকে একত্র করে তার সঙ্গে তার একটি খাতার খোল থেকে একুশ বছর বয়সে রচিত কিছু কবিতা একত্র করে—'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা' প্রকাশ করেন।

১৯৫০ এবং ৫২ সালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির মাণিক গ্রন্থাবলীর প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। সেই পরিকল্পনা অকস্মাৎ বিঘ্নিত হওয়ায়, পরবর্তী ভাগগুলি অপ্রকাশিত থেকে যায়। ১৯৬৩ সালে গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হয় মাণিক গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড—এবং পরবর্তী ১৩ বছরে ১৩ খণ্ডে তা সম্পূর্ণ। অনেকের ধারণা এই গ্রন্থাবলী উদ্যোগের জন্য মাণিকের অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির পাঠক পুনর্মুদ্রণ অবহেলিত। বিশেষত তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে মাণিক জীবিতাবস্থায় দেখে যেতে পান একমাত্র আজ কাল পরশুর গল্পগুচ্ছ। এবং তাঁর মৃত্যুর পর আজ পর্যন্ত 'প্রাগৈতিহাসিক', 'অতসী মামী' এবং 'বৌ' ছাড়া আর কোন গল্পগ্রন্থ দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়নি। যার প্রায় সবকটি আজ বাজারে অনুপস্থিত। একদা মাণিকের 'ডিটেমাটি' নামে একটি সচিত্র বইও প্রকাশিত হয়েছিল, যা আজ অধিকাংশ পাঠকের বিস্মৃতিগর্ভে।

শুরু থেকেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্কিত, কিন্তু জনপ্রিয়তার বিচারে যা বোঝায় তা ছিলেন না। তাঁর জনপ্রিয়তার দুটি জনিককাল, প্রথমটি নিঃসন্দেহে 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৪৬ মুদ্রণ) এবং দ্বিতীয়টি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। গড়ে অন্তত ১৪।১৫ হাজার করে বিক্রি হয়েছে আজ পর্যন্ত। 'দিবারাত্রির কাব্য'ও উপন্যাস হিসাবে জনপ্রিয়। এই তিনটি উপন্যাসের জনপ্রিয়তা অন্য দিক থেকেও বিবেচ্য, গ্রন্থাবলীর পৃথক পৃথক খণ্ডের বিক্রির হিসাবে দেখা যায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এ পর্যন্ত বিক্রি যা গ্রাহকদের মোট সংখ্যা জানতে গিয়ে বর্তমান আলোচক ব্যর্থ হয়েছে, তবু কর্মরত কর্মচারীরা এই তথ্যটুকু জানিয়েছেন) ১ম (পদ্মানদীর মাঝি, দিবারাত্রির কাব্য) ও ৩য় (পুতুল নাচের ইতিকথা) খণ্ডের সবচেয়ে বিক্রির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 'পদ্মানদীর মাঝি' এ পর্যন্ত বিদেশী ভাষায় অনূদিত বাংলা উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৮ সালে বোম্বাই কুতুব প্রকাশক, ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃত বোট ম্যান অফ পদ্মা' প্রকাশিত করে আলোড়ন আনে। গ্রন্থটির রুশ, চীনা, সুইডিশ, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, লিথুনিয়ান, নরওয়েজিয়ান, বুলগেরিয়ান সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। চেক সুইডিশ সংস্করণ ছাড়াও পুতুল নাচের ইতিকথা, গুজরাতি, তেলেগু, হিন্দী, কানাড়া প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত। চেক ভাষায় তাঁর ১৭টি গল্পের একটি অনুবাদ সঙ্কলনও প্রকাশিত হয়েছিল। মাণিকের মৃত্যুর পর ন্যাশনাল বুক এজেন্সী 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ' প্রকাশ করে লভ্যাংশ লেখকের পরিবারের সাহায্যার্থে দেন। ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক থেকে, সর্বোচ্চ মূল্য হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ' উল্লেখযোগ্য।

একমাত্র জীবিকা সাহিত্য, সুতরাং মাণিককে সব সময় প্রকাশকদের উপর ভরসা করতে হয়েছে, যদিও সব প্রকাশকদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল বলা যায় না। তাঁর আত্মবিচ্ছিন্নতার জন্য সব সময় কথা নিয়ে কথা রাখা সম্ভব হত না। 'প্রকাশ ভবনের' কর্ণধার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মানিকবাবু ছিলেন একটু উদাসীন মনের। তাঁর কাছে নিয়মিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া সম্ভব হতো না; অনেক সময় প্রুফ কারেক্ট সংশোধন করতেন, মাত্রা ঠিক থাকত না। এতে কম্পোজারদের কষ্ট হয়, খরচ বাড়ে, শুনে অবাক হতেন।' বলতেন, 'কম্পোজ হচ্ছে দেখলে আমার আইডিয়া আসে।' চলন্ত বাস থেকে নেমে গেছেন, পাণ্ডুলিপি ফেলা, খেয়াল হয়েছে অনেক পরে, তখন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সাহিত্যিক মনোজ বসু তাঁদের বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর পক্ষে করেন মাণিকের 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থ দিয়ে।

মাণিক নিজের রচনা সম্পর্কে চিরদিনই আত্মমান ছিলেন। চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও, তিনি তাঁর রচনায় কপি রাইট বিক্রি করে যান নি। শুধু তাই নয়, আট আনা সিরিজের সস্তা দরের বই লিখতেও তিনি এগিয়ে আসেননি তাঁর দুঃখের দিনে।

চলচ্চিত্রের আঙিনা মূল্যও তাঁর ভাগ্যে জুটেছে অত্যন্ত সামান্য। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ছায়াচিত্রের চুক্তিপত্রে সই করার পর দিলিপিপত্রে লিখেছেন, 'আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করিনি। এতদিন পরে যেচে এসে আমার নির্দেশ সস্তা দরে চলবে না' মেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তিপত্র করল, আশা করছি ছবিটি ভাল হবে।' দুঃখের বিষয়, ১৯৪৯-এর ২৮ জুলাই কলকাতার শ্রী-ইণ্ডিয়া-প্রাচী, চিত্রগৃহে মুক্তি পেয়ে ছবিটি মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে উঠে যায়। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে 'দিবারাত্রির কাব্যের চিত্রপ্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। 'কলকাতা ৭১'এর অন্তর্গত 'আত্মহত্যার অধিকার' এবং সম্প্রতি 'নেকী' অবলম্বনে 'স্বামী' ছোটগল্প দুটির চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক সাফল্যও লক্ষ্য করা যায়। 'পদ্মা নদীর মাঝি' সম্ভবত 'জাগো হুসে সাবেরা'—এই নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল পাকিস্তানে, লেখকের নাম এবং গ্রন্থের নামকে উপেক্ষা করে।

তাঁর কাহিনীর নাট্যরূপ এবং মঞ্চাভিনয়ের তালিকাটিও অত্যন্ত ক্ষীণ। লেখকের পরিবারের একটি সুস্পষ্ট অভিযোগ, আজকাল প্রগতিশীল বামপন্থী নাট্যকর্মী বলে পরিচিত এমন নাট্যগোষ্ঠী, তাঁদের মতো দরদের কথা, একটি নিমন্ত্রণ পত্রও পাঠানোর প্রয়োজন মনে করেন না। 'পদ্মা নদীর মাঝি' এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস দুটি ছাড়া 'ঘাসীপাড়া দিয়ে,' 'ফাঁকিটে' 'অমানুষিক' প্রভৃতি ছোটগল্প এপর্যন্ত অভিনীত। 'হারানের নাতজামাই' এবং 'ছোট-বকুলপুরের যাত্রী' গল্প দুটিকে একত্র করেও নাকি নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকগুলি কাহিনীর বেতার অভিনয় ছাড়াও 'পদ্মা নদীর মাঝি' নৃত্যনাট্যে ও রেকর্ডে গীতিনাট্যে রূপায়িত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা থেকেই লেখকের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে কোনদিনই তিনি ধরা দেন নি। অথচ 'পুতুল নাচের ইতিকথা' 'পদ্মা নদীর মাঝি' এবং 'দিবারাত্রির কাব্য' লেখকের পক্ষে যাদের গল্প কথা জনপ্রিয় উপন্যাস লেখা সহজ হতে পারত। এই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে তিনি তাঁর

প্রবাসী পত্রিকার নিজের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জানান : তিন চার বছরের মধ্যে প্রথম উপন্যাস প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচক স্বীকার করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তী যুগে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, অবশ্য 'মাস'-এর নিকট পপুলার হইতে আমার কিছুদিন সময় লাগিবে, কারণ 'মাস'-মাইন্ড নূতন চিন্তাধারাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করে। এই নিয়মে শিক্ষিত শ্রেণী ছাড়া 'মাস'-এর মধ্যেও আমার পপুলারিটি যে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে তাহার পরিচয়ও আমি পাইতেছি, বাংলাদেশে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আমাকে আর কিছু করিতে হইবে না।'

বস্তুত এই পত্রাংশের শেষ পংক্তিটি নিছকই একজন তরুণ সাহিত্যিকের অতিশয় বিশ্বাস নয়। কেননা আমরা জানি তাঁকে তাঁর সমকালীন লেখকদের তুলনায় অনেক 'বিরোধিতা' সহ্যক্ষিতেও প্রতীক্ষা করতে হয়েছে সময়ের মূল্য শোধবার জন্য।

রবীন্দ্রের কাছে বাঁরা ধরে গল্প লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অকস্মাৎ প্রবেশ ঘটলেও, তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে চাইছিলেন জীবন ও পরিবেশ থেকে সাহিত্য রচনার অভিজ্ঞতা ও উপাদান সঞ্চয় করে নিতে।

একদিকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা অন্যদিকে 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে'র নতুন বস্তুবাদী সাহিত্য আন্দোলন—একারণেই স্বতন্ত্রস্বভাবী মাণিক নিজেকে শুধু লেখক মাত্র নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখবার স্বপ্নে উদ্দীপ্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজস্ব কৌতূহল-বশত যৌনবিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব আর বিশ্বসাহিত্য পড়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে চেয়েছেন। নিছকই রোমান্টিক ভাবালুতার পথ থেকে সাহিত্যের বাস্তববাদের পথে বাংলা কথাসাহিত্যকে মুক্তি দিতে হবে, এই ছিল মাণিকের লেখক জীবনের প্রথম প্রতিশ্রুতি। বলিষ্ঠ শিল্পীই পাঠকের মন ভুলানো গল্প নিয়েই তাঁর আবির্ভাব—তবু নিজেকে নিয়ে বিধায় পড়েছিলেন, বিবরম হবে তাঁর বাস্তববাদী সাহিত্যের চেহারা, শরৎচন্দ্রের পথে, না শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে। 'কল্লোল' এবং 'কালিকলমে'র আধুনিক আন্দোলন এবং ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ অনুভব করছিলেন তিনি। আসলে কল্লোল এবং কালিকলম প্রধানত বস্তুবাদী আন্দোলনের ধুয়া তুলে মাণিকের দুঃসাহসকে আরও বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল। একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে সাহিত্যের আধুনিক আন্দোলন—এই দুটি বিপরীত ধারা আসলে যেন গোপন নিয়মে এক জায়গায় এসে যেন মিলে যাচ্ছিল—মাণিক একটা-অনুভব করেছিলেন। অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক অভ্যর্থনা করেছিলেন এই বইকে বলার ঝোঁকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনাবিল করেছিলেন এবং সাহিত্যে আধুনিকতার কচি কাঁচা নেতাকে বিশ্লেষণ করে আলাপও তাঁর করেছিলেন—পাশে এরা বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছু, ঐতিহ্যের সঙ্গে তাকেও ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেয়।' সুতরাং সচেতন মাণিক রবীন্দ্রনাথের লোভনীয় অভ্যর্থনার প্রেমন আকর্ষণ অনুভব করেন নি তেমন আধুনিকতার কচি কাঁচা নেতাদের দলেও ভেড়াতে পারেন নি। এটা আশ্চর্যের, বিচিত্রা' ও 'পরিচয়' তরুণতম গল্পকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের রক্ষের অগোচরে রয়ে গেলেন চিরদিন।

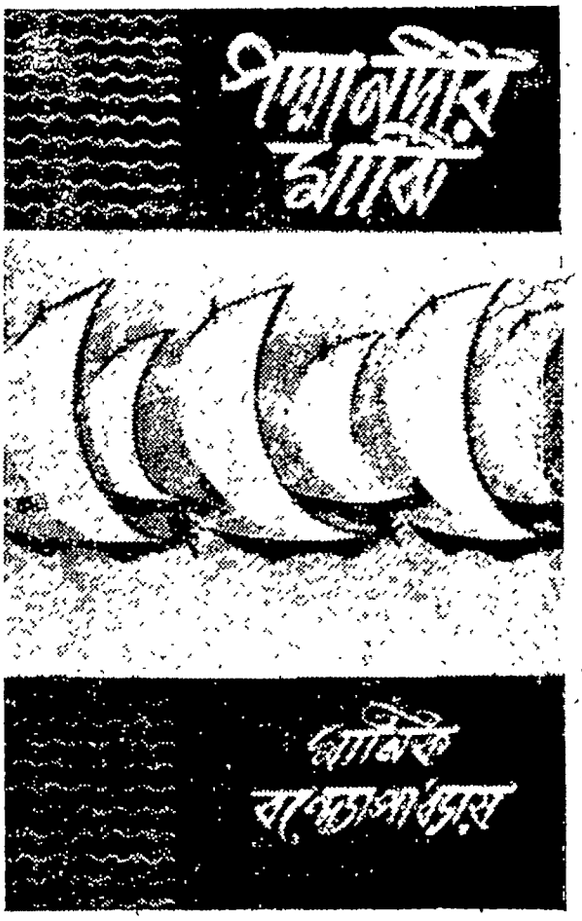

ভদ্র জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, বাহ্যিকতা প্রকাশ ও মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতার সঙ্গে আকস্মিক পরিচয় তাঁকে নিমেষে এক অনির্দেশ্য ক্ষুব্ধবিক্ষুব্ধ করেছে। পরে যৌবনের অকালেই অল্পবয়সে 'পাকা' মাণিক নানা মানসিক জটিল প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছেন। এই প্রেমের ভিতর থেকেই ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে ভিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন উত্তর রবীন্দ্র-পর্বে বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন পথ। একটা অসম্পূর্ণ অধ্যায়কে সম্পূর্ণ করতে তিনি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই সাহিত্য করতে চেয়েছিলেন, নেহাত লেখার খাতিরে, নাম করা লেখক হবার লোভে নয়।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের জীবনযাপন ও পরিবেশের ভেতর দাঁড়িয়ে তিনি জানান অবিচার ও অসাম্যের ভয়াবহ চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। যেন পূর্বপুরুষ জমিদারী পত্তনের পথেই তাঁর সাহিত্য দীক্ষা, গভীর ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের জটিল ধোঁয়াশায়ে উত্তর জীবনে মাণিক মার্কসীয় জীবনদর্শনে বিশ্বাসী হয়ে 'দেশের পশ্চাৎপদ মানুষের জন্য সাহিত্যিক কর্তব্য পালনে ব্রতী হয়েছিলেন। দুই মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রভৃতি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতি-ভঙ্গির পরিবর্তন অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়।

অনেকের ধারণা মার্কসবাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর মাণিক রচনার সাহিত্যিক মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নিছকই প্রচারধর্মিতার প্রলোভনের চাপে। বিপরীত পক্ষীয়ের সুবিধাবাদ, তাঁর কোনো রচনা নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠতর ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন। যেহেতু এখনও পর্যন্ত মাণিকের জনপ্রিয় রচনার মধ্যে 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'অহিংসা', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থগুলি

মানিকের দুই পুরুষ

তাঁর মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব-পর্বের রচনা, সেহেতু পরবর্তী পর্বের রচনাগুলির ব্যাপক অ-প্রচার তাঁর ব্যর্থতার পক্ষে যায়, তাঁরা দোষ দেন মার্কসবাদকে। মতান্তরে, 'সহরতলী' উপন্যাসে মেহনতী শ্রমিক জীবনের যে সূচনা, 'দর্পণ', 'হলুদ পোড়া', 'আজ-কাল পরশুর গল্প', 'সোনার চেয়ে দামী' 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি গ্রন্থে মানিক অতি প্রচারিত না হলেও তাঁর লেখক জীবনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি রচিত।' তৃতীয় পক্ষ, তাঁর প্রথম পর্বের উজ্জ্বল সার্থকতার পাশে পরবর্তী ম্লান অধ্যায়টির তুলনা করে, 'মার্কসবাদ বা মানিককে দোষ না দিয়ে, দোষ দেন 'ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিকে।' বস্তুত একদিকে কম্যুনিস্ট আন্দোলন অন্যদিকে তাঁর নিরন্তর সাহিত্য ধারণাকে এক আরণ্যের মেলাতে গিয়ে হয়ত বিভ্রান্ত হতে হয়েছে। প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানিক, প্রধান দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখেই নানা বিরোধ বিতর্কের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন পরবর্তী সময়ে।

কল্লোলের কলস্বনের নামধারী মধ্যবিত্ত সাহিত্যের বিপক্ষে নিজেকে প্রতিবাদী করে তুলতে চেয়ে তিনিও প্রথমের দিকে মধ্যবিত্তের মধ্যবিত্তির ফাঁদে ধরা দিয়েছেন।। পরের দিকে সচেতনভাবে তাঁর ভাষা ও আঙ্গিককে বদলে নিতে চেয়েছেন। জটিল জীবনগ্রন্থির উন্মোচন, চিরন্তন প্রশ্নগুলোর নিষ্ঠুর সত্যের আলোকিত ক্ষয়, অবাস্তব কল্পনাময়ী প্রণয়বোধের বিরুদ্ধতা, সমাজের নীচুতলায় জীবনযাপনের হুবহু তথ্যচিত্র নির্মাণ প্রভৃতির প্রয়োজনে তাঁর ভাষা ঋজু, স্পষ্ট ও কারুকার্যহীন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কোন ভান করতে চান নি: আলো-অন্ধকার, প্রেম-অপ্রেম, শরীর-মন, সুন্দর-অসুন্দর, নেতিবাচক সূত্র তাঁর পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর গল্পের বিষয়, আঙ্গিক এবং ভাষা, কঠোর জটিল এবং বিরূপ হয়ে উঠেছে।

আমরা জানি, মানিকের শেষ পর্বের বাকিত জীবন ছিল দারিদ্র্য ও অসুস্থতায় বিপন্ন। সাহিত্যকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়ে, সাময়িক পত্রের সামান্য দক্ষিণা আর প্রকাশকদের কাছে প্রাপ্য ব্যালান্সটির আশের উপর নির্ভর করতে গিয়ে আরও অনেক প্রত্যক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্পষ্টতই একটা সময়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন লেখকের স্বাধীন সৃষ্টির স্বাধীনতা নিয়ে এদেশে লেখকের পক্ষে আর্থিক স্বচ্ছলতা আশা করা মুশকিল। সাহিত্য রচনার অনুকূল স্বাধীন ও স্বনির্ভর সুযোগ তিনি পাননি। অথচ জনসাধারণের কাছাকাছি আসবার দুরন্ত প্রেরণা তাঁকে আজীবন লিখিয়েছে। তিনি জীবিতাবস্থায় অপরাপর সাহিত্যিকদের তুলনায় নিজের যথার্থ মূল্যায়ন দেখার সুযোগ পাননি। এটা তাঁর পক্ষে অভিমান ও হতাশার হওয়াই স্বাভাবিক—যদিও প্রকাশ্যভাবে তা ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা করেছেন। সম্ভবত ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মবিভাগ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ণকে নানাভাবে বিলম্বিত ও বিঘ্নিত করে থাকবে। মানিক তাঁর জীবিতাবস্থার শেষের দিকে অনুভব করেছিলেন, 'সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে নিজেদের জোট বাঁধছে।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যকৃতির সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং যোগ্য মূল্যায়ণের ভেতর দিয়েই, তাঁর উত্তর জীবনের বিবর্তনের ইতিহাস সন্ধান করা সম্ভব। যেকোন লেখক, তাঁর জীবিত সময়ে যোগ্য প্রশংসার পরিবর্তে সমালোচনার নামে নিন্দাই পেয়ে থাকেন বেশি। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং ব্যর্থ রচনা-গুলিই তুলে ধরার রেওয়াজ। মৃত্যুর পর সেই একই লেখক নন্দিত হন জনসভায়, সংবাদপত্রে, সাহিত্যসভাদের অশ্রুসজল শোকসভায়, ভবিষ্যের শব-সমারোহে, সমাধি ফলকে, পুষ্পিত শ্রদ্ধার্ঘ্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, এক কঠিন বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যাশা করেছিলেন, আরও সত্য, আরও স্পষ্ট, আরও নির্মম সমালোচনা। যে সমালোচনা তাঁকেও বুঝিয়ে দেবে যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য হয়েও কেন তিনি নিজের রোগের জন্য ওষুধ কেনার টাকা গুনে নিতে।

চিঠিপত্র

সমাজ ব্যবস্থার বিষফল

অমৃতে 'পার্ট টাইম বিনোদিনী' পড়লাম। লেখিকা বর্তমান সমাজজীবনের একটি সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর রচনা প্রসঙ্গে দু-একটি মন্তব্যমত জানাতে চাই।

আমার মনে হয়, আমাদের দেশে 'সেকস' সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার মূলে হলো, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে মানুষের সেকস সম্বন্ধে একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা পোষণ। অনেকে বলবেন, ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার টানাপোড়েনেই এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমি এটাও ঠিক যুক্তি বলে মানিনা। পৌরাণিক যুগের দিকে তাকালে দেখা যাবে অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো সেকালে এই ক্ষেত্রটিতেও আমরা অনেক এগিয়ে (এগিয়ে।) ছিলাম। সেই সময়ে যে হাজার হাজারে মারামারি, শাপ, পাল্টা অভিসম্পাত সংঘটিত হয়েছে তার অধিকাংশেরই কেন্দ্রে আছে নারী নিয়ে অনধিকার-চর্চা। যদিও তখন মানুষ অনেক বেশী নামনিষ্ঠ ছিল, সামাজিক অনুশাসন অনেক বেশী তীব্র ছিল, তবু এটাকে থামানো যায়নি। আবার দেখুন, কোন রাজা অন্য রাজ্য জয় করে জমি দখলের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলেও পতাকা স্থাপন করতেন। তাতে কথা উঠতো না। অথচ কোন মুনিষ স্ত্রী নিয়ে টানাটানি হলেই দক্ষযজ্ঞ। সামাজিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। মুনিঋষিদের জয় রাজারাজড়ার চেয়ে কম ছিল না। অর্থাৎ, একটি অসম নীতিবোধ গোড়া থেকেই চালু ছিল।

আজও আছে। যদি আমরা নীচুতলা, মাঝারিতলা এবং উঁচুতলা এইভাবে সীমারেখা টানি তাহলে দেখবো অন্তত এই একটি ব্যাপারে প্রথম ও তৃতীয় স্তরে প্রায় আগাগোড়া সাদৃশ্য, অথচ মাঝারিতলা দলছুট। এই যে সমুদ্রপ্রমাণ আদিগন্ত বিস্তৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণী; অস্থির, অসম্পূর্ণ যৌন মানসিকতার এরাই সবচেয়ে বড় শিকার। হতাশাতাড়িত এই গোষ্ঠী ক্রমশ হয়ে পড়েছে সমাজবিরোধী, নেশাখোর, মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী, অতিরিক্ত যৌনতাগ্রস্ত—এক কথায় সর্বক্ষেত্রে সমাজবিমুখ হতাশার একটি বড় কারণ অর্থনৈতিক, সুতরাং, সমস্যাটি যে ত্রুটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা উৎপাদিত একটি বিষফল তাতে সন্দেহ নেই। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিকৃত যৌন কর্মকাণ্ডের উৎপত্তিস্থলে রয়েছে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক সমস্যা ও আমাদের মনের আবহমানকাল ধরে বয়ে আনা কুসংস্কার। আমি আর একটি হেতু যোগ করতে চাই—অনগ্রসর নারী সমাজ। সবীসৃপের মতো বুক হেঁটে চলা এই জাতিটির মস্তিষ্কে পুরুষেরা কিছুই করেনি, সে নিজে দুবে থাক। 'আজ পরিপার্শ্বের তাড়নায় তার চোখ ফুটেছে। নরম মেরুদণ্ডে ভর করে সে উঠে দাঁড়াতে চাইছে, ফলে বারবার ঘটছে পদস্খলন।

লেখিকা সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন তাতে আসা যাক। সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোক যদি বিপথগামী হয় তবে লেখিকার বাতলানো ব্যবস্থা অনুযায়ী তাদের ফেরানো যেতে পারে। কিন্তু যেখানে সমস্যা ব্যাপক, বিপথগামীদের মনে বিবেকের দংশন নেই, সে ক্ষেত্রে উপায় কি? পুরোনো প্রবাদ অনুযায়ী—সবসে দিয়ে ভূত তাড়াবেন বলছেন, কটি সরষের ভিতর ভূত বাসা গেড়ে নেই না গাড়বে না? বিশেষত, মূল কারণগুলি উৎখাত না করে এই ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন শুধু 'সেকস' অবদমনেরই নামান্তর। রোগ তৈরী হওয়ার উপযুক্ত প্রলেপ দেওয়া থাকলে আবার রোগ সেরে গেল তা কখনই সম্ভব নয়। ফলে বুদ্ধ কামপ্রবণতা আবার মাথাচাড়া দেবেই এবং ভবিষ্যতে হয়তো আরও ভয়াবহ পথ নেবে।

চিঠি লম্বা করে লাভ নেই। পরিশেষে বলি, আশ্চর্যের কথা এই, এই রকম একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যার ব্যাপারে সবাই সমান নিস্পৃহ। মাঝেমাঝে সামান্য আলোচনা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তা মৌচাকে খোঁচা মারার মতোই। 'অমৃত' আবার বিষয়টির অবতারণা করেছে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন। আশা করবো, এই অনুসন্ধান নিয়মিত হবে। পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের মতামত দেবেন।

চন্দন ভট্টাচার্য
দত্তপুকুর।
২৪ পরগণা।

প্রাথমিক শিক্ষককে কি দিয়েছি

গত ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৮ তারিখে অমৃতে প্রকাশিত 'প্রাথমিক শিক্ষককে কী দিয়েছি?' শিরোনামায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যে কিছু ভুল রয়েছে বলে মনে করি। আমি একজন প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে উক্ত পরিবেশিত সংবাদের প্রতিবাদে এই চিঠি লিখছি।

তথ্যে প্রকাশ, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি মাসিক অনুদান হিসাবে ক্রিটিক্যাল ও অন্যান্য খরচ বাবদ নিম্নলিখিতভাবে টাকা পান, (৫নং তথ্য)—

ঘর মেরামত— ৫৫.০০ টাঃ
বইপত্র কেনা— ৫৫.০০ টাঃ
ভ্রমণ ও আনন্দোৎসব— ১৪.০০ টাঃ
চাষাবাদ, বাগান, ঘর পরিষ্কার— ১৫.০০ টাঃ
কনটিজেন্সী —১৭.০০ টাঃ

দ্রষ্টব্য। ডাইড ডি ও নং ৩৭১১ ইডেন ডেটেড ১৩।৬।৫২ অ্যাপেনডিকস ১০।

উপরোক্ত তথ্যটি আমার যতদূর জানা আছে কোন্ বোর্ড স্কুল পায় না। আর আমাদের বিদ্যালয়ও ঐরূপ কোন অনুদান আজ অবধি পায় নি। এমনকি এস আই মহাশয় ঐরূপ অনুদানের কথা জানেন না।

দ্বিতীয়তঃ— ছুটি সংক্রান্ত নিয়মে (৭ক) অসুস্থতার জন্য ১৪ দিন ছুটি পাওয়া যাবে বলে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা আমি তা দূরের কথা—এস আই মহাশয়ও সে বিষয়ে অজ্ঞ।

আমরা প্রাথমিক শিক্ষকরা সকল প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যদি বা আপনার পত্রিকায় অসহায় প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুকূলে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, তারও অধিকাংশই সমর্থনযোগ্য নয়। যেমন, বছরে রবিবার বাদে ৮৮ দিন ছুটির উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃত ছুটি রবিবার বাদে ৮০ দিন।

পরিশেষে বক্তব্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কোন সরকারী যোগাযোগ পত্র পাব না। বিদ্যালয়গুলির জ্ঞাতব্য স্থান এস আই অফিস এবং সেখানকার নোটিশ বোর্ড। সুতরাং কাগজে উল্লিখিত তথ্যের যদি সমর্থনযোগ্য বক্তব্য থাকে তবে পুনরায় কাগজে উল্লেখ করুন। আমরা প্রাথমিক শিক্ষকরা সে বিষয়ে সরকারের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা পেশ করব।

মনে রাখবেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের ও বিদ্যালয়গুলির সমস্যাই বহু, সমস্যার সমাধানে আজ পর্যন্ত কেউই এগিয়ে আসেন নি। ঐ লেখায় অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে কিন্তু তাঁদের দুরবস্থার প্রতিকারের কোনও ইঙ্গিত নেই। অবশ্যই আশা রাখি, পরবর্তীকালে সমবেদনশীল লেখা প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জিজ্ঞাসু মনকে পরিতৃপ্ত করবেন।

—সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, সহঃ শিক্ষক, ক্ষুদিরামনগর অবৈতনিক প্রাঃ বিদ্যালয়, ক্ষুদিরামনগর, ২৪ পরগণা।

সেতু পার হতে দেরি হয়ে যায়

অমল আচার্য

বিষণ্ণ চোখে তিতাস দেখল দীপা হন হন করে চলে যাচ্ছে। হাতে ধরা বই। দীপা আর নেই।

দীপা প্রেসিডেন্সিতে থার্ডইয়ার অনার্স নিয়ে পড়ত। দাদুর কাছে তিতাসের গল্প শুনত আগে, কখনও কখনও সে নিজেও দেখে। দীপা তখন ফ্রক পরত। চুল বাঁধত বিনুনি করে। চোখে নিচে কাজল টানত। চোখ থেকে পায়ের পাতা অবধি দেখা যেত। এমন কি খেলার সময় টস্—হাওয়া লেগে ফ্রক ফুলে উঠলে ইজের দেখা যেত বুকের আর্মহোল, আর্ট ফ্রকের হল। থেকে থেকে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে কমবয়সী কিশোরের মত দীপা তখন ছটফটানি হাসত, হাসলে ডিমের মত সাদা দাঁত সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে যেত। হাসিটা হাসি থামিয়ে দেওয়ার মত ঢলঢলে চোখে কি যেন দেখত, আর ভাবত।

আলাপ হয়েছিল বিষম বাসরে। লম্বা শালটা চিরকালই বড়দি ব্যবহার টানতে হয়ে যায়। উল্টোটাও ঘটে থাকে প্রায়শ্চিত্তিক নিয়মে। তিতাসের কোন্ উল্টে মনপ্যাচে খেলা শুরু হয়েছিল। তিতাস কি গানের বিষয়ের বাসরে সে ভীষণভাবে একা হয়ে যাচ্ছে? দীপা তিতাসকে চাখাচ্ছিল চোখ দিয়ে, হাত দোলের তালে তিতাস হাঁটে। বাঁটার মত ঠাকুর দিয়ে সাফাচ্ছিল।

—আপনি তো হাসপাতালে ভর্তি ভালোবাসায় পাড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে দীপা।

সামান্য চমকে উঠেছিল তিতাস। বেলা ভর মনোযোগ তখন বিষের ব্যাপার-স্যাপারে লাগা ছিল। দীপাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে সুখ পেয়েছিল সে। ফ্রকের মধ্য, যেখানে হৃদপিণ্ড আর ফুস-ফুসের সবচেয়ে একটা নরম। ঢুকিয়ে চালাতে চেয়েছিল। তরুণ বয়সের এই উত্তাপ কামনা মথিয়ে দীপার চোখ টিপে লম্বা মুদে হেসেছিল। হয়ত সে-হাসির অন্য কোনো মানে ছিল যা হেসেদের ভয়ে উঠে বুকের ওঠা-নামা বাড়িয়ে দেয়, ঢেলিয়া আক্রমণের মত হঠাৎ।

পায়ের বুড়ো আঙুলে ধপাধপ ঢোখ টেনে নিয়েছিল খানিকক্ষণ।

ঠিক তক্ষুণি তিতাস : তুমি তো বউদির বোন, না

দীপা মুখ টিপে হাসে উত্তর দেয় না।

তুমি কবি, তোমার চোখে ও আমি—, গলা নামিয়ে তিতাস : শকুন্তলা পড়নে।

দীপা চমকাচ্ছে। কি করে বিশ্বেছিল ওকে।

ছাদে মাদুর পেতে যাওয়া-দাওয়ার আয়োজন বিকেল। ভাবি বউ বউয়ের খাওয়ানো চলছে, ঝাপসা সন্ধ্যা দেখাশোনা ইলেকট্রিসিটি দাদুর ফোন সতর্কতায়। মাদুরে হাত মুখ ধুয়ে তিতাস বসেছে, চাঁদ বেড়ে, ফোন মতো শুনছে। চোখে চোখে কথা বউদির তিতাস দীপা বসেছে। চাঁদের আলো ঢুকছিল সে। চাঁদের আলো ঢুকছিল। দীপার বাঁকিয়ে উঠে তিতাস দেখল, এলোকেশে দাঁড়িয়ে দীপা ভাবে চোখে চলেছে।

চোখে চোখি হল দুজনের। দীপার চুলে ও চোখে বেঁধে ওঠার বিকেল তিতাস চমকে ফোন ঝাড়ু যোগীর নিষ্পলক ভাবা। দীপা সরে পড়ল মিথ্যে ভাবে তিতাস নিচে। নিচে চলে দীপা। বসুদের দেখল। বীথিকে বুকে জড়িয়ে কানে মুখ রেখে ফিস ফিস করছে কিছুক্ষণ। বীথি চোখ গোল গোল করে বলল মাইরি?

—মাইরি। টুবে, টুবুরা হয়ে গিয়েছিল দীপা, হাসি অনর্গল হাসির ঝর্ণাধারা।

চল আমার সময় দীপার জিজ্ঞাসা : কোথায় যাচ্ছেন যে বউ? থাকবেন না?

—আমি কি করে যে থাকব? রহস্য তিতাস।

মেঘদেব ভাবে 'বর' শব্দটা ব্যবহার করেনি তিতাস, আর কেন মত দীপা ভাবেকরবার চমকে বেরল। নাকি সে দীপার গালে সর্ষেফুলের রঙ যা ফোন? চোখের তারা। ভাবনার মত ঢলঢলে চোখে ঠিক ঠোঁটে কিসের চমকে ফোন চড়াং করে?

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল দীপা : বরের সঙ্গে একজন তো থেকে থাকে, থাকে না আমি জানতাম আপনি বউ থেকে যাবেন।

না তিতাস বলেনি, যদিও বউদি ঠিক বিশ্বাস করে বার বার মনে হয়েছিল থাকলে ভাল হত না।

গল্পের পাড়ে তিতাসদের বাড়ি। বিকেল গড়ায় ঘাটে বসে সে সন্ধ্যার ঝড় দেখত। সূর্যাস্ত আগে চোখ দিয়ে রক্ত উগরাতে সূর্য। থকথকে রক্তে আকাশে মেঘে, ঘন মেঘের ফাটল। আকাশের বুকে সন্ধ্যা ঘনাতে থাকে বিকেল ফোটার ঝড় পড়ত গঙ্গার জল লাল হয়ে যেত। গাছে, মাথায়, ডালে, পাতায় ঝড়ঝড়ানি ঝাপসা ও কাঁপন ভাসে, কাঁপন ফোটে। চাপা চাপা বকুল ঘন হতে থাকে। ঝড় এসময়। গঙ্গার ঘাটে থাকে না। তখন সন্ধি হয়ে। একা তিতাস। ঘাটে পাশেই ছিল বেলপাতা, আমরুল ঝোপ। মৌটুসি পাখি ডাকত। তখন তারা আকাশের দিকে চোখে বেটি বেটি কিচমিচ মত চেয়ে থাকত। দল গড়ে ঘোরাফেরা ভেসে উধাও হয়ে যেত তার মন বউদির কথা মনে হত।

চুনা বলা টিপে টিপে তার সামনে এসে দাঁড়াত। হাঁটতেন ঘরে বেরো। মোকাবেলে চুকতেন, তিনি মরেছেন। কিন্তু দাদুই তিনি ঘরে। ঘরে ঢোকে ঘরে ঘরে শাড়ি ওলো। ঘরে ঘরে ঢোকে সন্ধ্যা হয় হাওয়ায় ভেসে ঘরে। ঢোকে ঘরে তখন নিত্য তাকে, উঠতে, নিজে, ঘরে ঘরে দেখাশুনা, বসিয়ে নিত নিজেকে সন্ধ্যা ঘরে ঘরে। এখনো ঘরে ঘরে ঘরে

পাতা মধের পাখার মত নিশ্চল হয়ে থাকত। ঠোঁটের কিনারে হাসির রেখা স্থির তির কেঁপে যেত।

ক্লান্ত হয়ে তিতাস বলত : বুঝেছ ?

ঈষৎ মাথা দুলিয়ে রত্না বলত : না।

আবার বোঝাত। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করত : বুঝেছ ?

তিতাসের চোখে চোখ জুড়ে ঠোঁটের কোনে হাসি অক্ষত রেখে একইভাবে মাথা দুলিয়ে রত্না বলত : না।

আবার বোঝাত। বোঝানো হয়ে গেলে রেগে গিয়ে বলত : এবার বুঝেছ ?

চোখ একচুল না সরিয়ে, হাসি একচুল না কমিয়ে মাথা সামান্য কাত করে অবশেষে রত্না : খু-উ-ব বুঝেছি—, বলত।

দীপা রোববার এল। দাদা বউদির সিনেমার টিকিট কাটা ছিল। সময় হতেই তাদের চলে যেতে হল। যাওয়ার আগে বউদি : তিতাস, দীপার সঙ্গে গল্প করো। অডডা মারতে যেও না আজ, বলে গেল।

বিকেলে অজিতের বাড়ি সাহিত্যের আড্ডা ছিল। গল্প পাঠ হবে। সঙ্গে হবি গিবির তেলেভাজা, মুড়ি। সুতরাং আড্ডাতে তিতাসকে যেতেই হবে। তাই দীপাকে : আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, বেরুচ্ছি, —বলতেই দীপা : কখন ফিরবেন ?—বলল।

—ঠিক নেই।

দীপা বিমর্ষ হল।

—মা আছেন, সুন্দর গল্প বলেন মা।

দীপা হাসল। ঘোলাটে হাসি।

অজিতের বাড়ি পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেল। তবে জমা অপেক্ষা করছিল সব। যেতেই মারি সুরে

সঞ্জীব : শালা—

অজিত : সাহিত্যিক—

বুজেন : পেছনে—

শওকত : লাথি—

সলাপীপ, সুবতান, মুকুল, সতুর গলা দিয়ে থেমে থেমে হাহা হিহি বেরিয়ে এল। হাহা হিহির উচ্চতা ছাপিয়ে তিতাস : তোদের,—বলতেই সঞ্জীব ফিট হয়ে গেল গল্প হাতে। যথেষ্ট রাতে বাড়ি ফিরলে দাদা তিতাসের দিকে বিরক্ত চোখে, তাকাল। বউদির মুখ গম্ভীর। দীপা চলে গেছে!

কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশান নিয়ে তিতাস খাটাখাটি করল খুব। ইলেকশানে ফ্রক দল জিতে গেল। বিজয় উৎসব সেদিন বাদে কাল্পকে পড়াতে গেল। তিতাস যেতেই রত্না মিষ্টি করে হাসত। সেদিন হাসল না। গম্ভীরমুখে পর পর বই এগিয়ে দিয়ে পড়া বুঝে নিতে লাগল। বরমসরুম দেখে তিতাসের হাসি পাচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করল : গাল ফোলা, দেখছি, মাড়ি ফোলে নি তো ?

রত্না বই খাতা সরিয়ে, কিন্তু কৌতুকে নেভায় লেগে গেল।

—মাড়ি ফুললে কথা বলতে খুব কষ্ট হয়।

রত্না উঠে গিয়ে বইয়ের র‍্যাক ডেলে-পাড় করতে লাগল।

—আমার একবার ফুলেছিল।

একটা পেনসিল খুঁজে পেতে আনল রত্না।

—তোমার কষ্ট কতখানি বেশ বুঝতে পারছি।

—মোডার ডিম। রত্না থেমে গেল।

তিতাসের মুখ ফসকে হাসি ফাটে, হাসি সংক্রামক ব্যাধি, হায়নাকেও হাসায়। রত্না হেসে ফেলল। তক্ষুনি মনে হল রত্না মারাত্মক সুন্দরী।

দুদিনের প্রোগ্রামে বকখালি যাচ্ছে তিতাস বন্ধুদের সঙ্গে। বাস ছেড়েছে খুব ভোরে আগেভাগেই জানলার ধারটা, মানেনা করে নিয়েছে সে। তাতে বন্ধু এক্সের ভীষণ রাগ। বন্ধু দুই কাগজ পড়ছিল। বন্ধু তিন সিগারেট খাচ্ছিল। আর তিতাসের চোখ ছিল বাইরে।

ডায়মন্ডহারবারে বাস দাঁড়াবে পাঁচ মিনিট। ঝটপট চা খেয়ে নিল তিতাসরা। বেশ কিছু প্যাকেট সিগারেট কিনল। বন্ধু তিন আর দুই ঝোলা ব্যাগে ভরে দু বোতল নাম ফিনে আনল, সঙ্গে একটা বন্ধুবন্ধু। বন্ধু এক নিয়ে এল চানাচুর। বাস ছেড়ে দিল। তিতাস জানলার ধার থেকে বন্ধু এককে সিটে চলে এল। বন্ধু এক গেল তার সিটে। সন্ধ্যে ক্যান্সারের মত লাফাতে লাফাতে আকাশের দখল নিয়ে চলল।

কি একটা জায়গা মনে নেই, বাস থেমে গেল। খালাসি কয়া মাল তরাও। কয়েকজন যাত্রী হৈ-চৈ করে উঠল। নিয়মমত চলে কেউই রাজি। এসময়ে মাঝেই একজন উঠে এল বাসে, এক রমণী। সবার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কোঁচকানো চোখ গোলগোল গোল্লা আসল নিল।

রমণীটি কম্পবতী। বয়েস সাতাশ-আটাশ হবে। বিবাহিতা। শরীরের মাঝ-পাঁচগুলো এতই ডিস্টার্ব যে চোখে পাথর কুচি ঢুকে যায়। ভীষণ বাসের চায়ে উঠতে তার চোখের তাকিয়ে।

কিছু যাত্রী মহিলাকে চেনে। নিয়মিত যাতায়াত করে তারা এ লাইনের কোনো কোনো অঞ্চলে কাজকর্ম, ব্যবসার পার্টির ধান্দায়। তাদের সঙ্গে মহিলাটির কিছু কথাবার্তা হল হাঁসা, নাম শব্দ বিনিময়ে, আভাস ইঙ্গিতে। হল ড্রাইভার কনডাকটরের সঙ্গে।

বাসে একটাও খালি সিট নেই। দু একজন দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকার নিয়ম নেই। বোঝাই বাস তারা ড্রাইভার কনডাকটরের খাতিরের লোক, তাই, অনিয়মও নিয়ম হয়ে যায়। রমণীরত্ন আরো খাতিরের পাই পঞ্চাশ ষাট মাইল স্পীডের বাসও এক সময় নিয়ম বহির্ভূত জায়গায় ডেড স্টপ হয়ে দাঁড়ায়।

রমণী তিতাসের পাশে দাঁড়িয়েছিল, কনডাক্টার সরতে বলে এবং চাপাচাপি করে বসে তিতাস তার পাশে ইঞ্চি কয়েক জায়গা ফাঁকা করে নিল। বসতে বলল রমণীটিকে। রমণীটি স্বচ্ছন্দে বসে গেল পাশে। তার দেহ তিতাসের উরুর কিছু অংশ খাবলে বসল। ডান দিকের নগ্ন বুক তার বাঁ পিঠে চাপ খেয়ে চাকা হয়ে গেল। শ্যাম্পু করা গুচ্ছের অগোছাল চুল তিতাসের গালে বুকে দোলনা খেতে লাগল। মেয়েলী শরীরের মিষ্টি অথচ লোভী ঘ্রাণ বাষ্প হয়ে তিতাসের নাকে, তার চৈতন্যে বার বার ঘা মেরে যাচ্ছিল। তিতাস তিল তিল অনুভব করছিল নারী বড় আদরের, বড় সুখের বস্তু নারী। ক্রমশ তিতাসের জড়তার ফাঁস খুলে যেতে লাগল। একটা হাত রমণীর পিঠে তুলে দিয়ে যেন আশ্রয় দিতে চাইল কিছুক্ষণ।

কাকদ্বীপের আগের স্টপে কিছু লোক নেমে গেল। কেউ একজন পেছন থেকে : ফটোবউদি জায়গা হয়েছে—বলতেই ফটোবউদি : না ঠিক আছে—বলা মাত্র একটা চাপা হাসি যাত্রীদের মাথা টপকে তিতাসের কানে ঢু মারল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিতাস বুঝে দাঁড়াতেই বাস ভীষণ ব্রেকিং-এ দুলে উঠল এবং ওঠা মাত্র অপ্রস্তুত তিতাস টাল সামলাতে না পেরে ফটোবউদি অর্থাৎ রমণীর কোল ঘেঁষে নিজের জায়গা খেবড়ে বসল।

ফটোবউদি ফাজিলের মত হেসে বলল : লাগল না তো ?

তিতাস এক মুখ ধোঁয়া ফটোবউদির মুখে ফু করে ছড়িয়ে দিয়ে : আমার ওজন আটানব্বই কেজি আপনার হাঁটুটা ভেঙে দেব ?—বলা মাত্র বন্ধু এক দাবি করে বসল : আমার জায়গাটা ছেড়ে দে। অমনি বন্ধু দুই বন্ধু তিন হা-হা করে হেসে উঠল। বন্ধু এক ফটোবউদির পাশে এসে বসল। ফটোবউদি বন্ধু একের দিকে তাকাতেই তিতাস বাইরে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বন্ধু দুই বন্ধু একের ঘাড় ডিঙিয়ে মুখ তুলে নিয়ে গেল ফটোবউদির কানের কাছে।

—এরকম নাম কেন আপনার।

—কাকদ্বীপে আমার স্টুডিও। ফটো তুলি বলে আমার নাম হয়ে গেছে ফটোবউদি।

কাকদ্বীপে বাস থামলে ফটোবউদি নেমে গেল। তিতাস বন্ধু তিনকে ধাক্কা মেরে বলল : মেয়েছেলে না দেখে ওই দেখ ফিতে, কি সুন্দর শিশ দিচ্ছে।

বকখালির সমুদ্র মনভূমির মত স্থির। বাড়ি-এ আধশোয়া তিতাস সমুদ্র দেখছিল। ঝাউবনের বিস্তার তীর ঘেঁষে। কাল্পনিকের অন্ধকার ঝাউয়ের মাথায় বর্ষার মত ঝরছে। সমুদ্রের নিশ্বাসে ভেসে আসছে অন্ধকার, অন্ধকার দুলছে ঝাউয়ের মাথায় তরতর। ভৌতিক শব্দ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে, তিতাসকে একা দেখতে ফিরে যায়। দমকা হাওয়া তার গালে আচমকা চড় কষিয়ে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় হঠাৎ হঠাৎ। সমুদ্রের ঢাস দিয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে নেমে আসে আবার। সমুদ্রের বুকে ফসফরাস জ্বলছে, কোটি কোটি মশাল ছুটে

আসছে তারা। তিতাস একা বিস্তীর্ণ সমুদ্রতীরে একা। বন্ধুরা ছোটেলে মালের ঝোঁকে হুল্লোড়ে মাতোয়ারা। হুল্লোড় করতেই এসেছে তারা। খেয়াল নেই, তিতাস আছে কি নেই। পেগ দুয়েক মাল টেনে তিতাস বুঝে নিয়েছে, মুড অফ। বড় একা সে।

বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তিতাস। গোলমাল করছিল দীপা রতা। তাকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছিল দুজন। দীপা বসে আছে সামনে। ভ্যাবভ্যাব করে দেখছে তাকে। বড় বিষণ্ণ চোখ। একেবারে চুপ। রতা হাসছে গান গাইছে, দৌড়ঝাঁপ করছে তীরময়। হঠাৎ তিতাসকে ধাক্কা মেরে পালাচ্ছে।

ঝাউবনে লুকিয়ে ডাকছে তিতাসদা, তিতাস, তিতাই আমি এখেনে, এখেনে, এখেনে আমি।

রতা হারিয়ে গেলে দীপা, দীপা হারিয়ে গেলে রতা, রতা দীপা হারিয়ে গেলে কেউ না, আবার রতা, দীপা, দীপা রতা, দী—য়—।

তিতাসকে বালির বুকে কাটাকুটি খেলতেই হয়। মেলে না। যোগ-বিয়োগ করে যেতেই হয়। মেলে না। উল্টে মেলাতেই হয়। মেলে না।

বন্ধুদের অবাক করে তিতাস পর দিন কলকাতা ফিরে এল।

॥ ২ ॥

দীপার সঙ্গে দেখা করে বলল: তুমি রাগ করেছ?

দীপা হাসল। অর্থাৎ রাগ করেছিল, এখন নেই।

তিতাসের আর কিছু জানার নেই। তিতাস বেরিয়ে আসছিল, দীপা আটকাল।

—বসবেন না?

—না।

—এক কাপ চা অন্তত।

—না।

দীপার চোখ ঘামছিল নুন কাটা জল চোখের নৌকো ভাসিয়ে যাচ্ছিল।

তিতাস অসহিষ্ণু হয়ে বলল: আর কিছু বলবে? বলতে চাও না?

—না। এক ফোঁটা জল দীপার চোখ উপচে গাল ভেজাল।

তিতাস বেরিয়ে এল। কফি হাউসের এক কোণে ফাঁকা টেবিলে বসে আবদুলকে বলল: একটা কফি।

সিগারেট ধরাল। কাউন্টারের সামনা সামনি টেবিলে কলেজের বন্ধুরা। মালা, বেলা, গার্গীও সঙ্গে আছে। তিতাসের ইচ্ছে করছিল না ওদের টেবিলে ভিড়তে। মুরারি হাত-পা নাড়িয়ে কিছু বলে যাচ্ছে, অন্যরা মনোযোগী শ্রোতা। কেবল মালা তাকাচ্ছে, ওর লোভী শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে হাসছে। মালা তিতাসকে অপমান করেছিল একদিন।

মুরারি আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটা মেস বাড়িতে থাকত। অন্যরা কলেজে পড়তে যেত। কলেজ-ফলেজ প্রায়ই হত না। হলেও দু একটা ক্লাস করার পরই টাঁযাড় হয়ে পড়ত। তখন সাত-আটজন মিলে মুরারির ঘরে চলত আড্ডা। মালা, বেলা, গার্গী সঙ্গে থাকত। সিগারেটে গাঁজা ভরে টানা হত। মালা দু-তিন বাউন্ডের পরই আউট হয়ে যায়। বিছানায় শুয়ে পড়ে। আর ভূমাগত চিৎকার করে যায়: ওরে বাবা আমি মরে যাচ্ছি রে, আমার মুণ্ডু খসে যাচ্ছে, ধর ধর থেকে হাত-পা ছিটকে পড়ছে, তোরা আমার চারপাশে গোল হয়ে ঘুরছিস কেন? আমার মাথার মধ্যে চাকা ঘুরছে—মালা বকে যেত।

তিতাস মালার মাথা কোলে তুলে নিয়ে বলত: ওটাই মেজাজ, মেদিনী না টললে কি নেশা জমে?

মালা একদিন বাড়াবাড়ি শুরু করে দিলে সকলে ভয় পেয়ে গেল। তিতাস কাছে যেতেই মালা তাকে জড়িয়ে ধরল।

—আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। আমি মরে যাচ্ছি তিতাস। মালা অক্টোপাসের মত তিতাসকে বুকের মধ্যে সাপটে নিল।

ঘোরতর নেশার মধ্যেও তিতাস বুঝতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে তার শরীর বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করে ফেলতে পারে। মালাকে প্রবলভাবে সরিয়ে দেয় তিতাস। মালা ঠোঁট কঠোর বিদ্রূপ ফুটিয়ে বলে: ভীতু। পারে না।

তিতাসের মধ্যে দপ করে আগুন ধরে যায়। কিন্তু সংযম হারায় না। মালার পাছায় চাঁটা মেরে বলে: সুন্দরী গাঁজা খেও না। তোমার ধাতে একেবারেই সয়না।

সেই অপমানের প্রতিশোধ এখন নেবে নাকি তিতাস? তিতাস এ-টেবিল ও-টেবিল পাক খেয়ে মালাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সটান। নায়কী ঢঙে মুরারিকে নির্দেশ দিল মালার পাশের চেয়ার খালি করে দিতে সময় কয়েক সেকেণ্ড।

তিতাসকে দেখে বন্ধুরা জিন্দাবাদ দিল। তিতাস মালার গালে টোকা মেরে বলল: বড় পরনি?

চমকে উঠে মালা শাড়িতে বুক ঢাকল: বেলা গার্গীও।

মালা হাসল শুধু।

—চল মুরারির ঘরে যাই। তোমাকে টপ দেখাচ্ছে। মালা দেখল তিতাসের মুখে নিষ্ঠুরতা খেলছে। চোখে অস্বস্তির হাসি। ভয় পেল মালা।

মুরারি কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল তিতাসের চোখ দেখে। বেলা গার্গী ত্রাস চোখে তিতাসকে লক্ষ করছিল। মালা পেয়ে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছিল বাকি বন্ধুরা।

—তোমাকে খুব রাফ মনে হচ্ছে। মালা গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

—বল কি প্রেমিকের মত দেখাচ্ছে না আমাকে? তিতাসের হাসিতে কফি হাউস ফেটে পড়ল।

—প্রেমটেম বোঝ নাকি তুমি? মালার বাহু ধরে ফেলে তিতাস।

—ন্যাকামি বুঝি না। সেক্সুয়ালিটি কনফেশান বুঝি। একটু থেমে: শরীর টরীর নিয়ে হ্যাংলামি না করলে প্রেমও বাচ্চা পয়দা হয় না বুঝি?

তিতাস মালার হাত ধরে বলল: চল।

—এটা কি প্রেম? মালা তিতাসের শক্ত মুঠি আলগা করার চেষ্টা করে।

হেঁচকা টানে মালাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে তিতাস বলে: লেপ।

॥ ৩ ॥

—আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। শরীরটরীর খারাপ হয়নি তো? রতা উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

তিতাস উন্মনা হাতে কিছুক্ষণ: বলে: কাল থেকে তোমাকে পাতাতে আসা না।

রতা সামলে নিল নিজেকে। মাথা নিচু করে বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল। তার আঙুল কাঁপছে।

—ভাল লাগছে না পড়াতে তাহলে।

রতা চোখ তুলল। দেখে, তিতাসকে। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল।

—আড্ডা ফাড্ডা মারতে না পেরে বোর হয়ে যাচ্ছি।

রতা মধ্যরাতের মত স্তব্ধ থাকে।

—তোমার বাবার কথা দেখা হলে কথাটা তাকেই বলে যেতাম।

বাদুড়ের মত ঝিম মেরে বসে থাকে রতা।

তিতাস উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকাল। ফিরে এল রতার কাছে।

রতার মাথায় হাত রেখে: যাচ্ছি—বলল।

রতার কাপা হাত তিতাসের হাত মুহূর্তে ছুঁড়ে দিল।

॥ ৪ ॥

বোম্বাইয়ের চাপা বেড়ে চলেছে। এতক্ষণ পুরু মেঘের সরে সরে চাপা ছিল। সব সরে যেতেই ঝাঁঝালো রড আইটের মত সূর্য প্রকাশ পেল। বজবজের কেমিক্যাল গুটে এসে বসছে দীপার গলা। জ্বালা ধরে গেল গালে। ঘামে পাউডার ধুয়ে যাচ্ছে গলা বেয়ে ঘাম পড়ে শরীরে এক গোপন শিহরণ। পাউডারের ভেজা পরশ শরীরের অনেক অনেক গন্ধকে সুরভিত করিয়ে দিচ্ছিল দীপাকে। সিগারেট লোকালের ভাষায় সরে গেল দীপা। দলিত কেঁচো মাথল কলেজ গেট পাতালাপাতির মত। তিতাস দেখলেই মাথা ধরে যেতে পারে।

দীপা আরো দুদিন এমনিভাবে অপেক্ষা করে চলে গেছে। তিতাসের দেখা পায়নি। তিতাসের ক্লাস-টাসের সময় জানা নেই তার। আন্দাজে অপেক্ষা করে ফিরে যেতে হয়েছে। অবিশ্যি বজবজে ঢুকে হোস্টেল-খবর নিয়ে ব্যাপারটা জানা হত, দীপার ইচ্ছে হয়নি।

কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অস্বস্তিকর ব্যাপার। বিশেষ করে একজন তরুণীর। মুহুর্মুহু কৌতূহলী চোখে বিদ্ধ হয়ে যেতে হয় তাকে। হরদম শুনতে হয় সাংকেতিক মন্তব্য। দোতলার দাঁড়িয়ে ছেলেরা নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে, সিটি মারে, দোতলায় উঠে যেতে ইসারা করে। দীপা দাঁড়িয়েই থাকে। তিতাসের সঙ্গে তার দেখা হওয়া বিশেষ দরকার।

অনেকদিন দেখেনি তিতাসকে। মনে হয় কত যুগ। না দেখা হওয়ার কি যে কষ্ট। কেন এমন হয়। তিতাস কে হয় তার, দীপা ভাবে। দীপা আরো ভাবে তিতাস নির্বিচলভাবেই তার কেউ হয়।

হন হন করে হেঁটে যেতে লাগল দময়ন্তী। দীপাকে ছাড়িয়ে চলে গেল বহু দূরে। দীপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবং ঠিক করে নিল এবার ফিরবে। ফিরছিলও। কিন্তু হঠাৎ করে কলেজে ঢুকে পড়ল। ক্ষণকালের উঁকি দিল, তিতাস নেই। ক্যান্টিন খুঁজল, তিতাস নেই। দোতলা তিনতলা করিডর দিয়ে ঘুরল, দেখল না তিতাসকে। লাইব্রেরি, না ওখানেও তিতাস নেই।

বারোয়ান দণ্ডশ্রী কেউ একজন হবে হরত বলল: ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস দুটো সকালবেলায় শেষ হয়ে গেছে।

—ও।

দীপা বেরিয়ে এল। মুখের ঘাম মুছল। হাঁটতে লাগল রাস্তা ধরে। পা দুটো আসছিল তার অবসাদ আর ক্লান্তিতে।

॥ ৫ ॥

উরোনো সন্ধ্যে। তিতাস একরোখা। অযোগ নিয়ে পড়তে বসেছিল। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষা যাতে ভাল হয় চেষ্টা করে যেতে হবে। অনার্সটা পেতেই হবে। এ ক্লাস সিরীয়সলি পড়াশুনা করে যাবে। বন্ধুদের নোটিশ জারি করে দিয়েছে সেইমত, নো আড্ডা।

উড়নচণ্ডী মন সহজে বাগ মানতে চায় না। সব কিছু ধানচাল করে দেওয়ার খড়যন্ত্র সর্বক্ষণ লেগেই থাকে। কফি হাউস সাহিত্যের আড্ডা, গাঁজার আসর, দীপা রত্না এরা বারবার মনকে খুঁচিয়ে অবাধ্য করে তোলে। গোলমাল করে দেয় সব।

সেদিন রত্না এল।

রত্নার পরনে ছিল ফিকে সবুজ শাড়ি, ওয়াচিং ব্লাউজ। সবুজে টিপ রুপালে। স্যাম্পু করা চুল বুকে পিঠে ছড়ানো মেখে কাজলের সরু রাগ: চোখে মুখে অটেবর্ণ। শরীর ঘিরে হাল্কা উত্তেজনা ছটফট করতে প্রবল।

বলল: আপনি পড়ানো ছাড়লেন কেন? কেন কৈফিয়ৎ চাইল।

—আমার খুশি।

—আপনার খুশিতেই হবে?

—তবে কার খুশিতে হবে শুনি? তিতাস সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল।

রত্না ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। টেবিল থেকে একটা বই হাতে নিয়ে পাতা করেক উল্টে ছুড়ে দিলে টেবিলে। দেওয়ালে টাঙানো বারমাসের ক্যালেন্ডার। একটা তারিখের পর আঙুল রেখে সময় কাটাল কিছুক্ষণ। বইয়ের র‍্যাকে পুরনো বেতের ছিল। ওটা তুলে নিয়ে ক্যালেন্ডারের মাঝখান চিরে দিল। সিগারেটের প্যাকেট ফেলে দিল জানলার বাইরে। মেঝেতে বসল। তিতাসের সামনে এসে বসল। তিতাসের বিপন্ন মুখের দিকে চেয়ে বলল: বুঝতে পারছেন না?

তিতাস বলল: না।

ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল রত্না। তিতাস নীরবে সিগারেট টেনে চলল। লক্ষ রাখছিল রত্নাকে।

রত্না বলছে: বেন, আমার?

—তুমি আমার কে? তিতাস হাসতে লাগল।

—কেন ছাত্রী? রত্না খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। কেঁপে কেঁপে উঠছিল তার শরীর। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল। জল গড়াল গালে। গাল থেকে তিতাসের হাতে। কেননা তিতাসের হাত তখন রত্নাকে সংযত করার উদ্দেশ্যে উদ্যত ছিল। তিতাসের হাত ছ্যাঁক করে উঠল। চোখের জল এত উষ্ণ হয়?

রত্না টেবিলে মাথা হেলিয়ে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল তার মুখের আদল। দাঁতে দাঁত চেপে ভেতর থেকে উঠে আসা কোনো একটা কষ্ট ঠেকিয়ে চলছিল প্রাণপণ, মনে হল তিতাসের।

—কি হল রত্না? তিতাস ঘাবড়ে গেল।

—মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে খুব। শিরা-ফিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কষ্টটা রত্নার মুখের পর চেপে বসল।

আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে রত্নার মাথায় হাত রাখল তিতাস।

রত্নার মাথা যন্ত্রণার রোগ নতুন নয় তিতাসের। দু-একবার দেখেছে। একবার তো সাতদিন শয্যাগত ছিল রত্না। খুব ডাক্তার আসতে দেখেছে, একসরে হতে শুনেছে—রোগ সারেনি। রত্নার বাবা মাকে ইদানীং খুবই বিমর্ষ দেখত তিতাস। কেন কে জানে!

বেশ কিছুক্ষণ বাদে রত্নার মুখ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে কিছুটা। বসা বাঁধা ধাঁধা হয়ে যায়।

হাঁপ ছাড়ে তিতাস

তিতাস রত্নাকে এগিয়ে দিচ্ছিল। পাশে পাশে হাঁটছিল রত্না। রত্না থুনে থেকেই যায় সামনা।

তিতাস বলল: বাসে থেকে পড়াতে যাব।

তিতাসকে দেখাল রত্না। হাসল। বড় সুখের হাসি।

—[illegible]

রত্না আনমনা থেকে যায়।

—আমার কাছে এসেছ রত্নার কথা জানেন।

রেগে উঠল রত্না। কেন জানবেন না? বাবা সব জানেন।

—সব মানে?

—সব মানে সব। রত্নার ভারে গেল রত্নার মুখ।

তিতাস থেমে পড়েছিল। ভাবছিল রত্নার এত লজ্জা হল কেন, ভাবতে লাগল।

॥ ৬ ॥

মেটালিক রাস্তা দাবড়ে ডি-লাক্স বাস বাঁক নিয়ে, সোজা নিশানায় কখনো, রুক্ষ লালমাটি মাটির ঢিবি দুপাশে ঠেলে ওড়ের মত ছুটছিল। বাবুর হাত স্টিয়ারিং এ থরথর কাঁপছে। ধু-ধু মাঠ, মাঠের পর মাঠ, তিতাস এত মাঠ দেখেনি কোনোদিন। এত ক্ষমতা বাবুর আঙুলে? বিস্ময় বোধ করছিল তিতাস।

স্কুলের বন্ধু বাবু। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর কলেজ ছাড়ে। তার বাবার ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। জীপ, বাস, মিনিবাস আছে। ডি-লাক্স বাস ভাড়া খাটে দূর দূর অঞ্চলে। বাবু ড্রাইভ করে। এবার যাচ্ছে তারাপীঠ বক্রেশ্বর, মাসানজোর, শান্তিনিকেতন। অফিসের পার্টি। বাবু তিতাসকে সঙ্গে নিয়েছিল।

মাসানজোর সেরে রাতে তারাপীঠ হল্ট। পার্টি নেমে গেছে। আস্তানা নিয়েছে স্কুল বাড়িতে। বাসে বাবু আর তিতাস। বাবু বোতল খুলল।

দু-এক চুমুক মদ গেলার পরই তিতাসের মনে হল সে এক ভীষণ জায়গায় এসে পড়েছে। এখানে আকাশ আছে, কিন্তু নক্ষত্র বড় ম্লান। এখানে সূর্য ওঠে, তবু রাতের অন্ধকার বড় গভীর। এখানে মানুষ আছে, অথচ রাত বড় নির্জন। এখানে রাশি রাশি বেদনা রাতের অন্ধকারে প্রেতের মত ঘোরে। এখানে মানুষ বড় একা। এখানে মানুষ নিজের সঙ্গে হাতাহাতি করে রাতদিন। তিতাস তিন ভাঁড় মদ্যপান আক্রোশে ফাবার করে দিল। তার মনে হল সে প্রেমিক, এই মুহূর্তে সে একশটা প্রেমিকার জন্যে একশবার মরতে পারে। রাত আসে না কিছু। বাবুর চোখ লাল। চোখের পাতা ভারী। বাবু অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করে: তুই প্রেম করেছিস?

—জানি না। তিতাস বলে।

—তুই কোনো মেয়েকে ভোগ করেছিস?

—না।

বাবু থুক থুক হাসে। বলে: আমি করেছি। একাধিক মেয়েকে যথেচ্ছ—। বাবু নীট এক ভাঁড় মাল গলায় ঢেলে দেয়: কিন্তু সুখ পাইনি। বাবু খিস্তি করে উঠল: বড় সেয়ানা। দেহ দেবে, কিন্তু এক রত্তি প্রেম দেবে না, এত পয়সাবা—

বাবু [illegible] মাথা [illegible] ঢুলে পড়ে।

॥ ৭ ॥

[illegible] পুলিশী [illegible]

নিশ্বাসে তিতাসের ঘুম ভেঙে গেছে। তার মুখের কাছে আরেকটা মুখ। বুকে নরম মাংসের বিপুল ভার। রীডের মত কাঁপছে আরেকটা শরীর তিতাসের শরীর ছুঁয়ে। তিতাস টুইয়ে টুইয়ে সেই শরীরের পরিচয় নেয়। শরীরটা যতই চিনে নিতে পারে অবাক হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু তার শরীর খেপে যায় পশুর মত। অনিবার্য প্রাকৃতিক নিয়মে নারীদেহে গ্রাস করার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়ে।

তিতাস দীপাকে বুকে টেনে নেয়।

দূরের পেটা ঘড়িতে দুটো। পঞ্চায় বাণ ডেকেছে। তোলপাড় করে ভেসে যাচ্ছে দু-কূল। বোয়ায় মূলে প্রচণ্ড ঘূর্ণি উথাল-পাতাল। স্রোটির পাটাতনে রই পই জোছনা। এসব ভেবে নিতে কষ্ট হয় না তিতাসের।

দীপা অস্ফুটভাবে বলে: তিতাস—

—উঁ।

—তিতাস।

—বল।

—তিতাস।

—দীপু।

দীপা তিতাসের বুকে মুখ ঘষে ধরে। তিতাসের বুকের জমি দীপার চোখের জলে ভেসে যেতে থাকে। তিতাস বাধা দেয় না। সময় পাই পাই ছুটে চলে। এক সময় তিতাসের কাছ থেকে চরম পাওনা আদায় করে দীপা চলে যায় পাশের ঘরে।

।। ৮ ।।

ফিফথ ইয়ারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্টীমার পার্টির আয়োজন হয়েছে। বাংলা ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগের ভার ছিল তিতাসের পর। অনেকেই রাজি হয়ে গেল যেতে। তিতাসের সেকশনের কয়েকটি মেয়ে বাদ হল না। তার মধ্যে উসিও একজন। উসিওকে স্মার্ট ভাববার যথেষ্ট কারণ থাকলেও সে ছিল দারুণ দেমাকি। ক্লাসের কোনো ছেলেকে পাত্তা দিত না। ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসি এমনভাবে ঝুলে থাকত যেন বিদ্রূপ করে যাচ্ছে সারাক্ষণ। যদিও তার সঙ্গে তিতাসের কোনো এলোমেলো সম্পর্ক ছিল না, তবু হেরে যাওয়ার গ্লানিতে অহরহ উত্তেজিত হত তিতাস। ভেতরে ভেতরে একটা কঠোর জেদ তিতাসকে কঠিন করে তুলছিল দিনকে দিন।

অফ ক্লাস। উসিও দীপালি ঘষি গল্প করছে। তিতাস তাদের সামনের বেঞ্চিতে বসে: আপনারা স্টীমার পার্টিতে যাবেন না? —বলতেই দীপালিকে ধাক্কা মেরে উসিও মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠল, যাথা নিচু করে সেই হাসিতে যোগ দিতে গিয়ে দীপালি একটু থেমে নেয় এবং উসিও তিতাসকে লক্ষ করে: যাব না বলেইছি তো—এরকম উক্তি করা মাত্র তিতাস অনমনীয় গাম্ভীর্যে: প্লেজান্ট ট্রিপ হত—বলেছে কি বলেনি অমনি উসিও: আরো অনেকে তো যাচ্ছে—বললে তিতাস অবলীলায়: আপনারা, বিশেষ করে আপনি গেলে জমত ভাল—যেই বলেছে উসিওর মুখ লাল হতে গিয়ে রাগী হয়ে গেল এবং সেই মুখের দিকে তাকিয়ে তিতাস ধস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল নির্লিপ্তভাবে।

—কিভাবে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয় জানেন না—উসিও বলে গেলে, আমি সোজা কথা সোজা বলতে ভালবাসি—তিতাস নিস্পৃহ গলায় বলতে বলতে তার দৃষ্টি উসিওর শরীরে উপচে দিল, অমনি উসিও: অথচ সোজা কথা সোজাভাবে বোঝেন না—বলে বুক থেকে খসে পড়া শাড়ি বুকের মাপে গুছিয়ে বেঞ্চিতে হেলান দিতে যাবে যেই— চল না উসিও, মজা করে আসি? স্টীমার পার্টি কিন্তু, তোমার ব্যাপার—বলে উঠল প্রীতি এবং দীপালি উসিও হাঁ না কিছু না বলে দু-হু করে হেসে উঠল তৎক্ষণাৎ।

প্রায় দেড়শ ছেলেমেয়ে বুকে নিয়ে স্টীমার ছুটছে জল কেটে। দেড়শ যৌবন দেড় কোটি হর্স পাওয়ার প্রচণ্ডতা নিয়ে গঙ্গার নাভি চটকে ছুটছে স্টীমারের ছাদে উচ্চণ্ড তোলপাড়। জীবন জীবনের রস নিঙড়ে আকণ্ঠ পান করছিল দেড়শ তরুণ তরুণী রহস্যের তৃষ্ণায়। উসিও ভিড় কেটে বেরিয়ে দুহাতে খুঁজছিল কোথায় তিতাস, তিতাস চাকার ওপর গলা পাটাতনে চিত হয়ে শুয়ে দেখছিল আকাশ, মেঘের সঙ্গে যাওয়া। তার অমনোযোগী চোখে পিছলে যাচ্ছিল একশ উনপঞ্চাশজনের ছায়া সিগারেট পুড়তে পুড়তে তার আঙুলের চামড়া ছুঁই ছুঁই। উসিও অন্যমনস্ক হয়ে দেখছিল তিতাসকে। হয়ত, হয়ত কেন—অনিবার্যভাবে পরিবেশ মানুষের মনে রং ধরিয়ে দেয়, একটা বিশেষ ভাবে বাঁধা মন। মনের স্বাভাবিকতা ছিড় খেয়ে যায়। নাহলে উসিও তিতাসের পাশে বসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে এত আকুলতা বোধ করছে কেন?

দীপালি হেঁ মেরে ধরে নিয়ে গেল উসিওকে, যেখানে ছবি আর দীপক ট্যুইস্ট দিচ্ছে। দঙ্গল ছেলেমেয়ে তাদের ঘিরে রেখেছে অস্থির, ভীষণ অস্থির উত্তেজনায়। হাতে হাতে তাল পায়ের গোড়ালিতে তাল ঠুকে যায় শতাধিক যৌবন।

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ স্টীমার ম্যান অব ওয়র জেটিতে ফিরে এল। নামল দেড়শ যুবক-যুবতী হই হই করে। বন্ধু-বান্ধবদের সংক্ষিপ্ত বিদায় জানিয়ে ভিড় থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিল তিতাস, হাঁটছিল একা।

—শুনুন।

তিতাস দেখল উসিও আসছে তার দিকে। হাসিতে মুখ ভরিয়ে উসিও বলল: আজকের ট্রিপটা খুব এনজয় করলাম। ধন্যবাদ আপনাকে।

তিতাস নিঃশব্দ হাসল।

হাঁটছিল দুজন।

—আপনাকে খুব অন্যমনস্ক লাগছে উসিও একথা বলতেই চমকে উঠে তিতাস: কই না তো—বললে উসিও: হ্যাঁ লাগছে বলায় তিতাস স্বীকার করে নিল হয়ত বা সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে, কিন্তু কেন সেটাই ভেবে চলেছে তখন পর্যন্ত।

পাতলা হাসি বিনিময়ে উসিও বিদায় নিয়ে চলে গেল।

।। নয় ।।

পড়ানো হয়ে গেলে তিতাস উঠে দাঁড়াল। তক্ষুনি রতা তিতাসের হাতে চিঠি গুঁজে দিল। তিতাস রতার দিকে তাকাল: মুখ ঘুরিয়ে নিল রতা। তিতাস দাঁড়াল না।

দোকান থেকে সিগারেট কিনে ধরাল একটা। গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল। বুক পকেটে, ঠিক হৃদয়ের কাছাকাছি রতার চিঠি, নিঃসন্দেহে প্রেমপত্র। তিতাসের জীবনে প্রথম প্রেমপত্র। তিতাস অস্থিরতা অনুভব করছিল। লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ে নেয়া যেতে পারে এক্ষুনি। তিতাস চিঠিটা হাতড়ে নিল একবার। এই সময় এক কাপ চা গলা সমস্ত ব্যাপারটা পানসে করে যায় ভেবে সে নন্দর চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। চায়ের অর্ডার দিল।

তিতাস চিঠিটা দু আঙুলে টেনে ভাঁজ খুলে নিল। রতা লিখেছে:

কিসি ফিসি লেখা আমার ধাতে নেই। তবু লিখতে হচ্ছে। এমন কিছু কথা থাকে যা, যা সামনাসামনি বলা মুস্কিল। বিশেষ

ডঃ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

অবতার বরিষ্ঠায়

লেখকের সাড়াজাগানো "কলিতীর্থ কামারপুকুর"-এর শেষ অংশ। সম্পূর্ণ নতুন স্টাইলে সমসাময়িক পটভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী।

।। আঠারো টাকা ।।

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ৭০০ ০০৭

কবে আপনি যখন আমাকে পড়ান, অর্থাৎ স্বাভাবিক পরিচয়ে মাস্টারমশাই যখন। এ মা! ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন লাগে। আপনাকে মাস্টারমশাই ভাবা যায়? আপনিই বলুন?

ওসব কথা থাক। আসলে আপনার সঙ্গে বেড়াব। সে যে কোনো জায়গা হতে পারে। কোথায় যাবেন, না যাবেন—আপনার ব্যাপার। আমি শুধু সঙ্গে থাকব। কালই। আমি অপেক্ষা করব শ্যামবাজার, ট্রাম চারটেয়। না হলে কি হবে জানেন তো? আমার কিন্তু লজ্জা ফজ্জা নেই।

আর একটা কথা।

আপনি প্রায়ই আমার কাছে উসির ফুসির গল্প করে থাকেন। ব্যাপারটা কিন্তু ভ্রম হয় না। একদিন তুলকালাম বাধিয়ে দেব। মনে রাখবেন, আমি প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করি না।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। এক চুমুকে পুরোটা গিলে নিতে গিয়ে বেধে গেল গলায়, বিষম লেগে মরার জো হল তিতাস। নন্দ ছুটে এসে কিছু করতে যাবে সঞ্জীব আঁকি সুরে তাকে বাধা দিল : শালাকে মরতে দে। চুরি করে প্রেমপত্র পড়লে জরিমানা দিতে হয়।

তিতাস লক্ষ্য করল এক কোণে সঞ্জীব বেড়ের মত থিতু মেরে বসে আছে, চশমার নিচে তার ফজিল চোখ বোদ লাগা বালির মত চিকচিক করে চলেছে।

তিতাস তার দিকে সিগারেটের প্যাকেট ছুঁড়ে দিয়ে বলল : প্রেমের মর্ম বুঝবি রে খচ্চর? দামড়া বয়েস পর্যন্তও তো একটা জুটল না।

সঞ্জীব খকখক করে হেসে তিতাসের কাছে উঠে এল। বলল : ক' নম্বর চেকের চিঠি পড়ছিলি?

তিতাস হাসল। নম্বর বসাতে পারছি কই? কাকে কিভাবে যে সাজার সেটাই সমস্যা।

হাতে মাত্র আধ ঘন্টা। ইউনিভার্সিটি থেকে শ্যামবাজার পৌঁছতে সময়টা খেয়ে যাবে। সুতরাং তিতাস বিস্কু না নিয়ে বাস স্টপের দিকে এগোতে লাগল। অপরাহ্নের আলো কলেজ স্কোয়ারে কদমবতী ফুলের পাপড়িতে টলটল করছে। ফুলের রেণুতে প্রজাপতি ডানা চড়িয়ে নিঃসাড়। গোলদীঘির জলতরঙ্গে বাতাসের টান। যাত্রীবোঝাই বাস ট্রাম হুসহাস ছুটে যাচ্ছে। পুরনো বইয়ের দোকানে ভিড়। একজন মাঝবয়েসী স্লান্ত ভাব খায়, হাপসা নিশ্চিন্তভাবে উইন্ডের রুগী—কারণ বহু উইন্ডের রুগীকে ওরকম ভাব খেতে দেখেছে তিতাস। গাছতলার পাঁড়িয়ে তরুণতরুণী কথা কাটাকাটি করে অনর্গল। ঠিক তাদের মাথার ওপর ডালে বসে কতকগুলো কাক কর্কশ ডেকে চলে বিরামহীন। স্টপেজে দাঁড়ানো যাত্রীদের জিবাফের মত ঘন ঘন গলা তোলা বাস ট্রাম আসছে কিনা অনুসন্ধানী চোখে। ট্রামের খড়খড়ি নামা জানলার শোভা, তার-স্বর, চেঁচামেচির হল্লা হঠাৎ হঠাৎ ছুটে আসে। এসব আবিষ্কৃত হয়ে যায় তিতাসের চোখে, যেন আজই ব্যাপারগুলোর খোঁজ পেয়ে যাচ্ছে সে।

—কোথায় যাচ্ছ?

তিতাস পিছু তাকাল। দীপা প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটে। দীপা হাসছে। দীপাকে চমৎকার লাগছিল দেখতে। তিতাস চোখের ইশারা করল। দীপা রঙে ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল তিতাসের মুখোমুখি।

—কোথায় যাচ্ছ? আবার জিজ্ঞেস করে দীপা।

তিতাসের কানে ফটকা ধরে। দীপা 'আপনি' বাতিল করে 'তুমি' শুরু করেছে। তা করুক।

—শ্যামবাজার। চারটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, নতার সঙ্গে। তিতাস দোনোমোনো করে না।

—রতা কে? দীপার চোখে কৌতূহল ঝাঁঝা করে।

—আমার ছাত্রী, কলেজে পড়ে। ঘড়ি দেখে তিতাস।

—ও। দীপা থেমে যায়। ওর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, হয় না। হওয়া, না-হওয়ার ভাবে দীপার মুখ ক্লান্ত। কোমর থেকে রুমাল বার করে ঠোঁট মোছে। সেন্টের গন্ধ রুমাল থেকে নাকে উঠে আসে। ঝিমঝিম করে তিতাসের মাথা। সেন্টের গন্ধ ওকে ধরাবার অপসেট করে থাকে।

দীপা বলল : আমি যাচ্ছি—

দীপা চলে যাচ্ছিল ধীর পায়ে। মেয়েদের ব্যাক ফুলেও অসাধারণ সৌন্দর্য গমগমায়, যদি শরীরের গড়ন ঠিকঠাক হয়, ভুলভাল না থাকে। দীপার ব্যাকফুলে তাকিয়ে তিতাসের সে-কথাই মনে হল। হওয়া মাত্র তিতাসের মনে পড়ল সেই রাত, যে রাতে দীপার শরীর সে গভীরভাবে আবিষ্কার করেছে। নারীদেহের সমস্ত রহস্য সেদিন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। পোশাক পরে থাকলে সেগুলোই যেন কেমন হয়ে যায়, কত অচেনা কত গোলোক-ধাঁধা।

তিতাস জোর পায়ে হেঁটে গিয়ে দীপাকে ধরে নিল। বলল : তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েই গেল, আর না ভাবছি।

দীপা কথা বলল না। হেঁটে চলল। তিতাস তার সামনে দাঁড়িয়ে : চল ঘুরি—বলতেই দীপার চোখ ভিজে গেল।

তিতাস বলল : কফি হাউসে চল। একটু থেমে : না ওখেনে নয়, পাবলিক বেঞ্চে বসে—নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে।

দীপা ইতস্তত করছিল। তিতাস দীপার হাত চেপে ধরল।

পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে তিতাসের বারবার মনে হতে লাগল, সে এখন দীপার দেহ যেমন খুশি ব্যবহার করতে নিতে পারে। মনে হলেও তাগিদ পাচ্ছিল না। দীপা এত কাছে, তবু তার বেপরোয়া হাত দীপার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলতে উৎসাহ পাচ্ছে না। দীপার নাভি, তলপেট, উরু ছুঁয়ে তার আঙুল খেলতে পারে, অথচ খেলছে না। তার ঠোঁট দীপার ঠোঁট পিছলে বুকের খাঁজে আটকে যেতে পারে, আটকাচ্ছে না। বরঞ্চ যে নেশার ঘোরে সে দীপাকে তুলে এনেছিল ভাদী পর্দার আড়ালে, সে নেশা হালকা হয়ে যেতে বসেছে যতই দীপার বাহুমূলের ঘাম তার রোমকূপে ঢুকে যেতে শুরু করে।

দাগকাটা সময় পিছলে গেছে তিরিশ মিনিট, হয়ত বত্রা এখনো তার জন্যে অপেক্ষা করে চলেছে শ্যামবাজার। এখনো যাওয়া যেতে পারে, দীপা হয়ত দুঃখ পাবে, দুঃখ পেলে সে কিই বা করতে পারে?

খালি চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে দীপা জিজ্ঞেস করল : এখেনে এলে কেন?

—তাই ভাবছি। তিতাস সহজভাবে বলে যায়।

দীপা মৌন থেকে জিজ্ঞেস করে : একটা কথার উত্তর দেবে?

—কেন দেব না? হাসে তিতাস।

—তুমি আজকাল আমাকে এড়িয়ে চল, বল সত্যি না?

—তোমাকে একটা কথা বলব দীপু?

তিতাস সিরিয়াস হয়।

—বল।

—আঘাত পাবে না? তিতাসের স্বর নরম হয়ে আসে।

—না।

—তুমি আমার কাছে ফুরিয়ে গেছ দীপু, খুব দ্রুত নিজেকে খরচ করে ফেলেছ।

দীপা বজ্রাহতের মত স্থাণুর হয়ে যায়। মুখের রক্ত ফিজ হয়ে জমাট হয়ে ওঠে।

দীপা চলে যায়। তিতাসের বুক চুরমার হতে থাকে। সে যেন খুনী, দীপাকে খুন করে ফেলল ঠাণ্ডা মাথায়।

।।১০।।

শীতের দুপুর। ঘাসের শরীরের রঙ-পোশাকের মত ঝলমল করছে রোদ। নুড়ি-বিছানো পথে বিরবির করছে বোদ্দুরের পোকা। ফুলে ফুলে ছত্রাকার পুকুরধার, রোদ্দুরে পিঠ ভাসিয়ে বেঞ্চিতে বসে ছিল তিতাস, পাশে উসি। ভিক্টোরিয়ার চূড়োয় উড়ন্ত পরীর পাখার বিশ্বরূপ সব। পুকুরের জলে মুখ ভার করা স্তব্ধতা। গাছের ডালে চুপচাপ কাকের দল। গাছের ছায়ায়, বোগেনবিলার ঝাড়ের পাশে, ছড়ানো ছিটানো কোণে কোণে অজস্র প্রেমের সমারোহ। দূরে বিদ্যুতের মাঠে মানুষের কিলবিল চলাফেরা। তিতাস নিজের মনেই সিগারেট টানছে, দেখল উসি। তিতাসের কাছাকাছি থেকেও তার নাগাল পাচ্ছে না উসি, এরকম মনে হয়েছে তার। শুধু একটা দিন তিতাসকে অন্যরকম মনে হয়েছিল সে।

পর্দা আড়াল কেবিনে চা খাচ্ছিল

দুজন। বেস্টুরেন্টে ঢোকার আগেই আকাশে মেঘ ছিল। বৃষ্টি এল কিছুক্ষণ পর। তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টির তোড়ে পথঘাট ভেসে যাচ্ছিল।

বাইরের দুর্যোগ ভালুকের মত উঠে আসে তাদের মধ্যে। উসিস দুহাতে তিতাসের মুখ তুলে ধরল ঠোঁটের কাছাকাছি। তখন উসিসের শরীরে বিদ্যুৎ। উসিস আলতো করে তিতাসের ঠোঁটে ঠোঁট বেখেছিল। তিতাস কিছুক্ষণ সাড়া দেয়নি। উসিস তার বুকে মাথা রেখে কেঁদেছিল। তিতাস উসিসের দেহ প্রবলভাবে ভাওচুর করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল একসময়। সিগারেট ধরিয়েছিল একটা। সিগারেট টানতে টানতে খাতার কাগজে কাটাকুটি করছিল। বাইরে তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে। পথে বাসট্রাম চলাচল শুরু হয়ে যায়। চলতি মানুষের কথাবার্তা ভেসে আসে কানে। মেঘের ডাক ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে ক্রমশ।

—ধুর, সব যেন কেমন হয়ে যায়: স্বগতোক্তি করল তিতাস, মনে হল।

উসিসের আবেশ তখনো কাটেনি। আবেগ জড়িয়ে বলল: কি কেমন হয়ে যায় তিতাস?

—এই তুমি আমি আরো অনেকে। কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় সব। কি যে ভাল লাগে, কি যে চাই বুঝে উঠতে পারি না। এত অতৃপ্তি নিয়ে মানুষ বাঁচে কি করে?

—কিসের অতৃপ্তি তোমার? উসিস জানতে চায়।

—আমিও জানি না। এখন যাকে আপন মনে হয় সে-ই কিছুক্ষণ বাদে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। কাল যাকে খারাপ লাগত, আজ তা বড় প্রিয় হয়ে যায়। ভাবি কোনো কিছুতেই জড়াব না, অথচ জড়িয়ে পড়ি। যা করতে চাই না, করে ফেলি।

তিতাস থামে। উসিসের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে আঁক কাটতে কাটতে বলে: আমি বড় অশান্তিতে আছি উসিস, তুমি জান না আমি কত কষ্টে আছি।

তিতাসের হাতে খুন্তি রেখে উসিস জলভরা চোখ তুলে ধরে তিতাসের সামনে: তোমার কিসে কষ্ট তিতাস?

তিতাস উসিসের চুলে আঙুল ডুবিয়ে বলে: এখন থাক। আজ তোমাকে আদর করতে দাও, আমাকে ডুবিয়ে যেতে দাও তোমার কাছে।

পুকুরের দিকে তাকিয়ে ছিল উসিস। শুকনো পাতা খসে পড়ছে জলে। ভাসছে। হাওয়া নেই। হাওয়া না থাকায় সরে যায় না পাতা, যেখানে পড়ে সেখানেই থেকে যায়। তিতাস অসম্ভব গম্ভীর। কোনো গোলমাল চলেছে মনে, অন্তত উসিস বুঝে নিতে পারে।

তিতাস ডাকে: উসিস—

—উঁ। উসিস মনোযোগী হয়।

—আমাকে দীপা কত্তা ভালবাসে তুমিও বাস। বিশ্বাস কর আমিও তোমাদের ভালবাসি। যখন দীপার কাছে থাকি, মনে

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা পুরস্কার লাভ করুন

প্রবেশ মূল্য নেই আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

উদাহরণ

মোট ২৪

৫	১০	৯
১২	৮	৪
৭	৬	১১

	১১	
	৯	
	৭	

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন। দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউন্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারান্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ২৭ খাড়াভাবে, সমানভাবে, কোণাকুণিভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ২০ জুলাই, ১৯৭৮

আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

Gemini Traders (G-7)
Gandhinagar
Delhi 110031

জেমিনি ট্রেডার্স (জি-৭)
গান্ধীনগর
দিল্লী ১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান

হয় দীপাই সব। রত্না কাছে থাকলে আর কেউ মনে আসে না। যখন তাঁম থাক, তোমাকেই মনে। যখন কেউ থাকো না আমার কাছে, তোমাদের জন্যে কষ্ট হয়। ভেঙে পড়ি তখন।

আকাশে মেঘের টুকরো ভেসে চলে। একটার পর একটা। চিল ওড়ে উঁচুতে। কাকের ফ্যাসফেসে ডাক বুঝিয়ে দেয় ভারাও বড় কষ্টে আছে। কৃষ্ণচূড়ার গুঁড়ি বেয়ে পিঁপড়ের সারি ওঠানামা করে। বড়বড়ি কাটে কোনো মাছ জলের গভীরে। উসিস ছিঁপিপিঁড়ে বক্তৃতাকরণের রহস্য শুরু হয়।

বাসকন্ট বোধ করে উসিস।

—এসব কথা বলার জন্যেই কি তুমি আমাকে ডেকে এনেছ তিতাস? উসিসকে করুণ দেখায়।

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই।

—ব্যাপারটা খুব নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপরের মত মনে হচ্ছে না কি? উসিসের বাসকন্টের ভবিষ্যতা যত বাড়ে, ততই কঠোর হয়ে ওঠে স্বভাবে।

—ভাবতে পার। কিন্তু কিন্তু জবাব নেই আমার। তিতাস শান্তভাবে বলে।

—তাহলে এসবের দরকার কি ছিল? বলে তিতাস, চুপ করে থেকো না।

তিতাস চুপ করে থাকে না। বলে: উসিস নামে একটা মেয়েকে উইন করতে চেয়েছিলাম। উইন করেছি।

ব্যাস? উসিসের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়।

তিতাস উসিসকে খুঁটিয়ে দেখে। বলে: আমি চূড়ান্তভাবে হেরেও গেছি সেই সঙ্গে। তাহলে এত কষ্ট পাই কেন?

তিতাস সিগারেট ধরায়। খালি প্যাকেট ছুঁড়ে দেয় নিস্তরঙ্গ জলে। জলে ঢেউ ওঠে।

উসিস একভাবে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। ঢেউ থেমে যায়। থেমে গেলে উসিস পাথর ছোড়ে। ঢেউ ওঠে আবার। ঢেউ থামা অবধি তিতাস অপেক্ষা করে। ঢেউ থেমে গেলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে না। উসিসকে সঙ্গে করে বেরিয়ে আসে। বাসস্টপে এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে: তোমার কত নম্বর বাস যেন? অথচ উসিসের বাড়ি বহুবার বাসে করে গিয়েছে তিতাস।

—থাক্। একটু থেমে: তোমার ছ' নম্বর এসে গেছে। মিস করো না।

উসিস ভুলেই যায় ছ' নম্বর তিতাসের কোন বাড়ির দিকে যেতে হয়।

।। ১১ ।।

তিতাস দোরগোড়ায় থেমে গেল। রত্না জানালার পাশে বসে বাইরে মুখ বেখেছে। খোলা চুল তার পিঠে ঝর্ণার মত ছড়ানো ছিটানো। গোলাপী শাড়ি, গোলাপী ব্লাউজে আবৃত হয়ে গোলাপের মত ফুটে আছে রত্না। ধীরে ধীরে নিচু সুরে।

তিতাস মোটামুটি তৈরি ছিল, আসা মাত্র সে একটা ঝড়ের মুখোমুখি হবে। রত্নার অ্যাপরেন্টমেন্ট ফেল করেছে সে। এর জন্যে রত্না বেগে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘরের পরিবেশ অন্যরকম বেন একটু অন্য সুরে বাঁধা, টের পেল তিতাস।

রত্না নিজের মধ্যে গুটিয়ে ছিল। তিতাসের উপস্থিতি জানতেই পারল না সে।

তিতাস ডাকল: রত্না—

চমকাল রত্না। তুমি?

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে রত্নার দিকে তাকায় তিতাস। রত্নার এত রূপ আছে? কিন্তু রত্নার চোখের কোণ ভেজা কেন?

—রত্না গান শোনাবে?

রাত হাসল। গান গাইল তিনখানা, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান। গান শেষ হলে রত্না মুখ নামাল। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল তার শরীর।

—কি হয়েছে, রত্না? তিতাস চিন্তিত হয়।

কিছুক্ষণ কেটে গেলে মুখ তুলল রত্না। তার ভেজা চোখ লাল। ঠোঁটের ফাঁকে স্বাভাবিক হাসি ফিরে নেবে। বলে: কি আবার হবে? মাঝে মাঝে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কাঁদলে কষ্ট থাকে না।

রত্না দাঁড়াল। তুমি বস। তোমার জন্যে চা করে আনি। রত্না বেরিয়ে গেল।

রত্না বেরিয়ে গেলে তিতাস ভাবে, রত্নাকে বুঝে উঠতে পারছে না সে। রত্না আবছায়াময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অপরাহ্নের আলোয়...।

তিতাসের চোখে ভেসে ওঠে বাসুদেবপুর। সরস্বতী নদী। সরস্বতী নদীর পর সেতু। উধাও হয়ে যাওয়া হাইওয়ে। বহু দূরে থেকে দুর্ধর্ষ গতিতে ছুটে আসা হলুদ ট্রাক। সেতুর একধারে শ্মশান, অন্যদিকে বিশাল বটগাছের নিচে সাধুর আশ্রম, অজস্র ফুল, লাল নীল হলুদ ফুলের সম্ভারেহ। সেতুতে দাঁড়িয়ে এক কিশোরী সূর্যাস্ত দেখছে। ভীষণ একা সে। আর অপরাহ্নের আলো তার মুখে প্রজাপতি হয়ে বসে আছে।

রত্না চা দিয়ে এলো। চায়ে চুমুক দিয়ে তিতাস জিজ্ঞেস করল: তুমি খুব বেগে আছ আমার পর।

না?

—কেন? রত্না সরে আসে।

—অ্যাপরেন্টমেন্ট র‍্যাখিনি বলে?

রত্না ম্লান হাসল। নিশ্চয়ই আটকে গিয়েছিলে, এতে রাগার কি আছে?

তিতাস অস্পষ্ট আঘাত পেল। সে ভেবেছিল এ নিয়ে রত্নার একটা দুঃখ থাকবে।

—এই শুনছ? তিতাসকে ডাকে রত্না।

—বল। তিতাস মুখ তোলে।

—আমি বাঁচব না। মরে যাব শীগগির—। রত্নার গলা ধরে আসে।

—এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুর শখ? তিতাস কৌতুক করে।

—সত্যি বলছি তিতাস। রত্নার ঠোঁট কাঁপে। আমার বোন ক্যানসার আছে। জানতে পেরেছি। রত্না তিতাসের দুহাত চেপে ধরে। বিশ্বাস কর, এতদিন ব্যাপারটা মা-বাবা গোপন রেখেছিলেন। পিসী একদিন মুখ ফসকে—

তিতাস চেঁচিয়ে ওঠে: কি বলছ তুমি?

রত্না খিল খিল করে হাসে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। চোখের কোণে মৃত্যু, মৃত্যুর ছায়া নাচে। সেই ছায়া রত্নার সামনে প্রেতের মত হাঁটা চলা করে। দুহাত বাড়িয়ে দেয়, হাতের আওতা থেকে হটে যায় রত্না, হাত দীর্ঘতর হতে থাকে, রত্না প্রাণপণ ছুটোছুটি করে এধার ওধার, লিকলিকে আঙুল সাপের জিভের মত হিসহিসায় হিসহিসিয়ে চলেছে তার চোখের সামনে।

—দূর যত সব বাজে কথা। তিতাস বেতালের মাতালের মত রত্নার দিকে এগিয়ে যায়। রত্নাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। চুমুতে চুমুতে রত্নার গাল ঠোঁট কাটা কাটা করে দিতে থাকে আর বলতে থাকে:

বাজে কথা
বিশ্বাস করি না
হতে পারে না।
বাজে কথা।
বিশ্বাস করি না।
হতে পারে না

।। ১২ ।।

তিতাস সেতুর মুখে দাঁড়াল। অন্য মুখে সেই কিশোরী। তার মুখে অপরাহ্নের আলো।

মাঝখানে সেতু। সেতুর নিচে শীর্ণ সরস্বতী, বুকে চরা। একদিকে শ্মশান, অন্যদিকে বিশাল বট, বটের নিচে সাধুর আশ্রম, আর অজস্র বংবেরং ফুল।

তিতাস ডাকে: এই, এদিকে শোনো—

কেউ শোনে না।

তিতাস এক পা এক পা এগিয়ে যায় রেলিঙে ভর রেখে। সেতুর মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়ায়। সরস্বতীর জল দেখে। চোখ ঘুরিয়ে শ্মশান দেখে। দেখে সাধুর আশ্রম, ফুল, অপরাহ্নের আলোয় কিশোরী মুখ।

তিতাস ডাকে: শুনছ?

সূর্য ডুবে যায়। বাসুদেবপুরে অন্ধকার নামে। অন্ধকারে ঝাপসা কিশোরীকে উদ্দেশ্য করে বলে তিতাস: রত্নাকে বিয়ে করেছি সাতদিন আগে, রেজেস্টারী করে। এই মাত্র ওকে হাসপাতালে রেখে এলাম। ও বাঁচবে না।

তিতাস জোরে জোরে শ্বাস নেয়।

তবু রত্নাকে বাঁচাতে চাই, যে কোনো শর্তে। ওকে আরো বেশি ভালবাসা বাকি। কারণ উসিস দীপার মধ্যে আমার অনেকখানি দুঃখই রয়ে গেছে। কিন্তু তারও আগে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই। সাত বছর আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এখেনে, মনে আছে?

তিতাস দৌড়ায়, দৌড়ায় কিশোরীর দিকে।

কিশোরী নেই।

সেতু পার হতে অসম্ভব দেরি হয়ে যায় তিতাসের।

কবিগুরু আয়োজিত সেকালের গানের আসর

প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ

আমার মত সামান্য লোককে যিনি সান্নিধ্য ও স্নেহদানে প্রায় ত্রিবিশ বছর ধরে ধন্য করেছিলেন, তাঁর (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ) সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই নিজের কথা এসে যাবে অযাচিতভাবে। যার ফলে হয়তো আত্মস্তুতি না হলেও নিজের বিজ্ঞাপন জাহির করার দোষে দোষী হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তবুও ঝাপছাড়া হলেও কিংবা ব্যক্তিগত আত্মপ্রচারের সম্ভাবনা থাকলেও আমি কেবল সেসব কাহিনী বলতে চেষ্টা করব সেকালের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর সম্বন্ধে যার মূল্য—শাস্ত্রসম্মত না হলেও অন্তত ঐতিহাসিক মূল্য কিছুটা আছে। অর্থাৎ আজ থেকে ৪০।৪৫ বছর আগে কলকাতা শহরে রবীন্দ্রনাথ যেবার তাঁর রচিত গীতিনাটক অভিনয় করলেন তারপর প্রায় ২০।২৫ বছরের ধরে কত গানের আসর তিনি করেছেন এবং গানবাজনা সম্পর্কিত, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচলন সে যুগে কিভাবে এসেছিল, সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলিই ব্যক্ত করছি।

১৯১১ সালে বছর ১২।১৩ বয়সে আমি ছাত্র হিসাবে শান্তিনিকেতনে কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য আমার শিশুমন শান্তিনিকেতনের সাঙ্গীতিক পরিবেশ ও আশ্রম জীবনে আকৃষ্ট হয়েছিল গভীরভাবেই। অসুস্থতার জন্য কিছুদিন পরেই আমাকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রজীবন ত্যাগ করতে হলেও পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতন ও কবিগুরুর সঙ্গে যেন একটা অচ্ছেদ্য পারিবারিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম নিজের অজ্ঞাতসারে। তাই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় নিজের বাড়ী জোড়াসাঁকোতে এলেই আমার ডাক পড়তো—আর আমিও সে ডাকের অপেক্ষায় যেন দিন গুনতাম।

মনে পড়ে ১৯১৬ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কবি তাঁর বসন্তোৎসবকে 'ফাল্গুনী' নাম দিয়ে একটি গীতিনাট্যের অভিনয় করলেন। কবি নিজে সাজলেন 'অন্ধ বাউল' আর অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্ট গুণীমানুষ। ডাহাড়া স্বয়ং দীনবন্ধু এণ্ড্রুজও এই দলে ছিলেন। তখনকার দিনে 'মঞ্চ-শিল্পী', 'আলোক-সম্পাত শিল্পী' বলে বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা নাম কাগজে বেরুবার চলন ছিল না, নামবাজগোহহীনরূপেই বাঁশী বা করবার করে দিতেন এবং তা হোতোও অনবদ্য। 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে মঞ্চ বা স্টেজ সাজিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং—শুধু গাছ-গাছড়া লতাপাতা দিয়ে। কিন্তু ত্রুটিহীন ব্যাপার। লতাপাতার দুটি সুন্দর দোলনা করেছিলেন স্টেজের দু-পাশে আর সেই দোলনায় বসে

রবীন্দ্রনাথ

সিংহের ভাই) ও 'প্রসূন সেন (ধুনি) অপূর্ব মিষ্টি গলায় গান গেয়েছিলেন—'দখিন হাওয়া ও পথিক হাওয়া'—যার সুর যেন আজও আমার কানে ভেসে আসছে। ওঁদের দুজনের সেদিনের সে গান আজও ভুলতে পারিনি, দীর্ঘ ৫৮ বছরের জীবনে আর এঁদের কণ্ঠের জুড়ি আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এই 'ফাল্গুনী'র অভিনয়ের গানের সঙ্গে কবির হুকুমে আমাকে বাঁশী বাজাতে হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই বাঁশের বাঁশী বাজানোর সখ আমার। কিন্তু তা আমি নিজের সখেই বাজাতাম। কি করে যে সে খবর কবির কানে পৌঁছে গিয়েছিল জানি না—হঠাৎ একদিন আমাকে বাঁশী শোনাবার জন্য হুকুম হোলো—লজ্জা, ভয়, বুক ধড়ফড়ানি সত্ত্বেও বাজাতে হোলো—আর বাব কোথা। তারপর থেকে তাঁর দলে গানবাজনার সঙ্গে বরাবরই বাজিয়েছি। অথচ আমার চেয়ে অনেক ভালো বাঁশী বাজিয়ে কবির পরিবারেই এসময়ে ছিলেন; তিনি হলেন কবির ভাতুষ্পৌত্র, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু বাঁশী নয় —রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাজে তখনকার দিনে সৌম্যের জুড়ি খুব কম ছিল। যেমন সুরেলা গলা আর তেমনি জোরদার। বিনা আয়াসে সৌম্য যে কোনও গান নিজের গলায় তুলে নিতেন আর কোরাসে লিড দিয়ে গাইতেন। মহড়ার সব সময় তাঁকে উঁচুপর্দার গান গাইতে শুনতাম কিন্তু আসল দিনে তিনি কোথায় সরে পড়তেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের ভাণ্ডারের চাবিকাঠি দিয়েছিলেন বড় নাতি দিনেন্দ্রনাথকে আর চেয়েছিলেন সৌম্য দিনুবাবুর অনুপস্থিতি সে —কিন্তু বিধিলিপি অন্য, সৌম্য মেঘের ডাকে সাড়া দিয়ে গানের রাজ্য ছেড়ে অন্যের কাজে বেরিয়ে গেলেন। বহুদিন পর অবশ্য আবার সৌম্যেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে দেখা গিয়েছিল, গায়কে বা মাস্টার হিসাবে না হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তো নিশ্চয়ই।

১৯২১ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর 'বিচিত্রা' ভবনের উত্তরের খোলা ছাদের মেরাপ বেঁধে প্যাণ্ডেল করে গুরুদেব সর্বপ্রথম 'বর্ষামঙ্গল' নামে বর্ষার গানের একটা জলসা করলেন। তখনকার রবীন্দ্রসঙ্গীত,—এখনকার মতো জনপ্রিয় না হলেও নিশ্চিত □ মার্জিতরুচিসম্পন্ন পরিবারে, বিশেষ করে ব্রাহ্ম পরিবারে, বেশ চলন হয়ে গিয়েছিল। ভালো ভালো তখনকার দিনের ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা গানের দলে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিনেত্রী সাহানা গুপ্ত (পরে বসু), চিত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে সিংহান্ত), অরুন্ধতী সরকার (পরে চট্টোপাধ্যায়,) সুপ্রভা রায় এবং ঠাকুর পরিবারের রমা দেবী প্রভৃতি মিলিত গায়িকার দলে এসে গেলেন। আর তাঁদের গান শুনতে শহর প্রায় ভেঙে পড়তে—এরকম অবস্থা।

সাহানা দেবী ও চিত্রলেখা দেবী—এঁদের দুজনেরই ডাকনাম ছিল—এঁদের গানের প্রশংসা আর নাম তখনকার দিনে লোকের মুখে মুখে ফিরতো। এঁরা 'বর্ষামঙ্গলের' গানের দলে তো ছিলেনই—তাছাড়া আরও ছিলেন ধীরেন্দ্র গুপ্ত (সাহানা দেবীর ভাই), হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, জন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্রলেখা দেবীর ভাই) প্রমুখ সুকণ্ঠের অধিকারী তরুণ গাইয়েরা দল। তখনকার দিনে মাইক বলে কিছু ছিল না। কিন্তু কি ছেলে, কি মেয়ে কণ্ঠে এত জোর ছিল গাইয়েদের যে শেষের সারি পর্যন্ত বিনা আয়াসে শোনতাম এঁদের গান শুনতে পেতেন। 'বর্ষামঙ্গলে' ছেলেমেয়েরা কোরাস গাইলেন সারি করে ঘুরে ঘুরে আর পাখোয়াজে সঙ্গত করলেন নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। তখনকার দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তালের বাজনা হিসাবে পাখোয়াজ আর খোলই বাজতো—তবলা কখনই বাজতো না। অনেক গানে আমার তালের বাজনা ছাড়াই গাইবার রেওয়াজ ছিল। 'বর্ষামঙ্গলে' এসরাজ বাজালেন অবনীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। 'বর্ষামঙ্গল' দিয়ে সুরু করে কবি প্রতি বছর এখানে একটা না একটা উৎসব অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। তখনো

কখনও 'শেষবর্ষণ' শারদোৎসব, অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকুমার' প্রভৃতি। এছাড়া 'গীতোৎসব' প্রচলিত হোল। তাঁর রচিত গান—একক, দ্বৈত বা সমবেত কণ্ঠে—মাঝে মাঝে আবার নাচের ব্যবস্থা। এই সব নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরে কলকাতার বাইরে-বাজিয়ে-নাচিয়ে ছাড়াও শান্তিনিকেতনের শিল্পী ছেলেমেয়েরা এসেও যোগ দিতেন। পরে একটা বেশ গানের দল গড়ে উঠলো—সেই দলের গানবাজনা শুনিয়ে, অভিনয় ও নাচ দেখিয়ে কলকাতা থেকে সুরু করে বোম্বাই পর্যন্ত দেশদেশান্তর পাড়ি দিয়ে কবি 'বিশ্বভারতী'র জন্য টাকা সংগ্রহ করে আসতেন।

বেশীর ভাগ এসব অনুষ্ঠান আগে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই হোতো। ক্রমশ পাবলিক স্টেজে হতে আরম্ভ হোলো—এম্পায়ার থিয়েটারে (এখনকার বসুশ্রী), নিউ এম্পায়ারে, স্টারে, অপেরা অফ ভ্যারাইটিসে (এখনকার এলিট), ন্যাশনেল থিয়েটারে (এখনকার মেট্রো সিনেমা), ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, ছায়া সিনেমা হল প্রভৃতি জায়গায় কবি বহুবার গান-বাজনা, নাচ বা অভিনয়ের আসর করেছিলেন। ১৯২৩ সালে এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয়। দুদিন ধরে অভিনয় হোল এবং সাতে একদিন কবি 'রঘুপতি'র ভূমিকায় নেমেছিলেন।

কবির নাটক অভিনয় করার অভ্যাস ও উৎসাহ বহুদিনের—১৮৮১ সালের 'বাল্মীকি প্রতিভায়' বাল্মীকির ভূমিকায় তিনি প্রথম নেমেছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর অভিনয়ের আসরে। সে যুগেও শুনেছি - এরকার 'বিসর্জন' অভিনয় হয়েছিল তাঁর বাড়ীতে, তিনি রঘুপতি সেজেছিলেন। ১৯২৩ সালের 'বিসর্জনে' অপর্ণার ভূমিকায় নেমেছিলেন রাণু অধিকারী (অধুনা লেডী রাণু মুখার্জি) আর 'রাজা' সেজেছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ। এই অভিনয়ে সাহানা দেবীর কণ্ঠে গীতশ্রীর দুয়ার খোলা গানটি অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল। সেবারে অন্য গানগুলিও সাহানা দেবীই গেয়েছিলেন। আগেই বলেছি 'গীতোৎসবে' গানের সঙ্গে নাচের পরিবেশন কবি সুরু করেছিলেন। কিন্তু পুরোপুরি নৃত্যনাট্য তখনও কলকাতার আসরে দেখা যায়নি। একথায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বলেন—এই স্বরচিত কবিতাটি কবি নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন উচ্চৈঃস্বরে আর তার সঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী শ্রীমতী দেবী নৃত্য পরিবেশন করলেন,সে এক অপূর্ব সমন্বয়। গান নেই বাজনা নেই—কিন্তু কবির কণ্ঠস্বরের আর নৃত্যের ভঙ্গিমা যে অনুভূতি সকলের মনে সেদিন জাগিয়েছিল, তার তুলনা মেলে না।

এরপর এলো নৃত্যনাট্যের পালা, মনে পড়ে ১৯২৭ সালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই 'নটীর পূজা'র অভিনয় হোলো। মহারাণী লোকেশ্বরীর ভূমিকায় মালতী দেবী (উত্তরকালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকুমার চৌধুরীর গৃহিণী) অপূর্ব অভিনয় করেন আর নন্দলাল

প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ

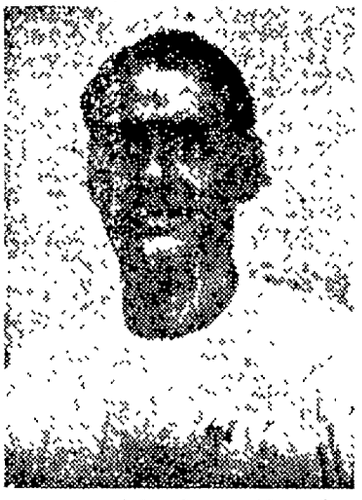

বসুর কন্যা পৌরীদেবীও নটীর ভূমিকায় অপূর্ব নৃত্য প্রদর্শন করেন। তদানীন্তন পরিবারের বয়স্থা মেয়েদের সর্বসাধারণের সমক্ষে নৃত্য পরিবেশন করার রেওয়াজ সে সময়ে এদেশে একেবারেই ছিল না। প্রথম নৃত্য পরিবেশনে প্রচণ্ড হুলুস্থুল বাধলো। সেটা বোধহয় 'নটীর পূজার' অনেক আগের ঘটনা। মিসেস বি এল চৌধুরী (প্রমদা দেবী) প্রতিষ্ঠিত কলকাতার সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রয়োজনায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি চ্যারিটি পারফর্মেন্সের নাচগানের আসরে শ্রীমতী বেলা রায় (বিশিষ্ট ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা ও পুত্রবধূ) নৃত্য পরিবেশন করাতে ব্রাহ্মসমাজের ও রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁর 'সঞ্জীবনী' কাগজে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ঠিক এই পট-ভূমিকায় সুরু হোল রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যের অভিনয়। দেখতে দেখতে এই অহেতুক আন্দোলন বালির বাঁধের মত ভেঙ্গে গেল। জনসাধারণ ও সমাজ সহজভাবে শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য ও রস গ্রহণ করতে সুরু করলেন।

এই সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

ভানু ব্যানার্জী (সুধীন্দ্রকুমার)

সেদিন ট্রামে করে 'নটীর পূজা' দেখতে জোড়াসাঁকো চলেছি। মাঝ রাস্তা থেকে একদল যুবক, বোধহয় কলেজের ছাত্র, ট্রামে উঠলো। শুনলাম তারা পরস্পর বলাবলি করছে—'পূজোর নামে নটীর নাচ সে আবার কি রে ভাই, চল্ না দেখেই আসা যাক'—আমি স্বভাবতই তাদের এই ধরনের উক্তি খুব ভালভাবে নিতে পারিনি। যা হোক, তাদের সঙ্গে পাশাপাশি গিয়ে যথাস্থানে জায়গা নিলাম। অভিনয় শেষে ওদের পেছনে পেছনে আমিও বাইরে এলাম। এবারে শুনি ওরা বলছে—কি অপূর্ব জিনিসই না দেখলাম—এ না দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে রবিঠাকুরের গান-নাচের মধ্যে এত শালীনতা, মার্জিতরুচিবোধ ও পবিত্রভাবের পরিচয় থাকতে পারে।' বলা বাহুল্য ঐ ব্যাপার থেকেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যে ধরনের নাচের প্রচলন করেছিলেন—কথাকলি ও মণিপুরীর সংমিশ্রণে তা কতোখানি উঁচু ও মার্জিত স্তরের।

পঙ্কজ মল্লিক

'নটীর পূজার' অভিনয়ের পর থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আমার যাওয়া-আসা প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল। গানের আসর আর বেওয়াজ, বলতে গেলে প্রায় রোজই হোতো। এমনি এক সময়ে এক মজার ঘটনা ঘটলো। একদিন সন্ধ্যেবেলায় 'বিচিত্রা' ভবনে কোনও একটা অনুষ্ঠানের জন্য সবাই মহড়া দিতে গেছি—মস্ত হলঘর, মাঝখানে কবি স্বয়ং বসে আছেন—তাঁর কিছু দূরে প্রায় ৩০।৩৫ জন ছেলের দল, অন্য পাশে প্রায় সেই সংখ্যক মেয়ের দল। কবি হঠাৎ গলাটা যেন একটু ঝেড়ে নিয়ে বললেন—'আজ আমি ঠিক করেছি প্রত্যেকের আলাদা আলাদাভাবে গান শুনবো, কে কেমন গান গলায় তুলেছে তার আমি পরীক্ষা নেব'—বলেই যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন—তাঁর পাশে-রাখা ফুলদানি থেকে একটা রজনীগন্ধা ফুল তুলে নিয়ে যেন গভীর মনোযোগ সহকারে কি পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। আমি কবির

চেয়ে বসে আছি কিন্তু আমার কানে [illegible] শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ চেয়ে দেখি, ছেলে গাইয়েদের দল ৩০-৩৫ জনের জায়গায় ১০-১২ জনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর বাদবাকী সব চম্পট। কবি একবার আড়চোখে ছেলেদের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—যাক খুব অল্পেতেই পরিত্রাণ পাওয়া গেল তাহলে।' তাঁর কথা শুনে আমরা তো হেসেই অস্থির। গানের মহড়া দিতে সেসব দিনে ছেলেদের দল খুব ভারী হোত আর তাদের মধ্যে অ-গাইয়েদের সংখ্যা এত বেশী থাকতো যে সুরের উপর বেসুরের আধিপত্য অতি সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়তো। সেই অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্যই কবির এই ব্যবস্থা।

১৯৩৬ সালের মার্চ কিম্বা এপ্রিল মাসে নিউ এম্পায়ারে সর্বপ্রথম প্রকাশ্য অভিনয় হয় কবির রচিত নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদার'। অপূর্ব সঙ্গীতপূর্ণ এই নাটক সেদিন সুধীজনের প্রশংসা লাভ করে। আমার চোখে আজও ভাসছে কবি স্টেজের উপর ডানদিকে একটা আসনে বসে আছেন, অল্প দূরে এক পাশে গাইয়েদের দল গাইছেন, স্টেজের মাঝখানে অভিনয় আর নাচ হচ্ছে।

এ সময় অর্থাৎ ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ভারতী' আমার উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব দেন। সে সময় গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং ফিল্মে রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব ব্যবহার হতে আরম্ভ হয়। বিশুদ্ধ সুরে যাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয় তার তত্ত্বাবধান করা এবং কবিকে গান শুনিয়ে তাঁর সম্মতি আনিয়ে দেওয়াই আমার প্রধান কাজ ছিল। এর জন্যে আমাকে প্রতি মাসে ২।৩বার করে শান্তিনিকেতনে কবির কাছে যেতে হোত, ঐ সময়ের দু-একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

প্রমথেশ বড়ুয়া প্রযোজিত ও নিউ থিয়েটার্স নির্মিত 'মুক্তি' ছায়াচিত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কয়েকটি গান ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কবির রচিত একটি কবিতায়—'দিনের শেষে ঘুমের দেশেতে বিখ্যাত শিল্পী ও সঙ্গীত-পরিচালক পংকজ মল্লিক সুর বসান। পরি-

জয়া দাস

চিত্রলেখা সিন্ধান্ত

চালক বড়ুয়া সাহেব, নিউ থিয়েটার্সের তদানীন্তন কর্মাধ্যক্ষ প্রমোদনাথ রায় সঙ্গীত পরিচালক পংকজ মল্লিক ও জনৈক সারেঙ্গী বাদককে সঙ্গে নিয়ে সেই সুর কবিকে শুনিয়ে তাঁর সম্মতি আনার জন্য আমি জোড়াসাঁকোতে কবির কাছে যাই। পংকজবাবু সেদিন কবির সামনে বসে গান ধরতে গিয়ে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েন এবং ফলে সারেঙ্গীর সুরের সঙ্গে কিছুতেই তাঁর কণ্ঠ সেদিন মিললো না। তাতে ক্ষতি যবনিকার কিছুই হোল না, কারণ কবি সে সুর শুনে সহজেই সম্মতি দিলেন। ফেরার পথে গাড়ীতে ওঠার পর সারেঙ্গী-বাদক বললেন, 'পংকজবাবু, এ আপনে কেয়া কিয়া হ্যায়!' পংকজবাবু অপূর্ব হিন্দীতে উত্তর দিলেন, 'আরে ভাপু, তুমি কেয়া বুঝেগা, কিস্‌কা গানামে সুর বসানা—আর গাইতে যে পারা এই যথেষ্ট হ্যায়।' গান যথারীতি রেকর্ড হয়ে যাওয়ার পর এক-কপি রেকর্ড নিয়ে কবিকে উপহার দিতে শান্তিনিকেতন গেলাম। কবি বললেন, বলো, তুই পংকজকে বলিস এ সুর আমার ভাল লেগেছে—কিন্তু লোকে তো বাসাসুদ

বিজয়া (দাস) রায়—সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী

—বলবে এখন—এ রবীন্দ্রনাথের সুরে যখন নয় তখন ভাল নয়—কিন্তু আমার সত্যিই ভাল লেগেছে।' ফিরে এসে পংকজ-বাবুকে এই কথা বলতে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এই সময়ে একবার রাজেশ্বরী বাসুদেবের (অধুনা দত্ত) 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' ও 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' এই দুখানি গান ও একজন প্রখ্যাতনামা ফিল্মাভিনেত্রীর দুখানি গান নিয়ে যাই—কবিকে শোনাতে। ফিল্মের জন্য যে গান দুখানি নেওয়া হয় তাতে অনেকগুলি যন্ত্রের সমাবেশ ছিল। গান শুনে একটু হেসে বললেন, 'এ গান দুটি সুরে, তালে সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমার গান হয়েছে রাজেশ্বরীর গান দুটি। অবিশ্যি ফিল্মে নেওয়া গান দুটিও পাশ করলেন এবং বিরক্তও যথেষ্ট হয়েছিল।

এই সময়ে শান্তিনিকেতনে যখন আমি সাম্পল রেকর্ড নিয়ে প্রায়ই যেতাম, তখন কবিকে বার বার অনুরোধ করেছি কলকাতায় তাঁর গান শেখাবার একটা ব্যবস্থা করবার জন্য। ওখান থেকে প্রতি বুধবার (শান্তি-নিকেতনের ছুটি যেদিন) যদি কেউ এসে কলকাতায় গান শেখান। সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারপর ১৯৪০ সালের মে মাসে একবার কালিংপঙ বেড়াতে যাই। সেখানে আবার ঐ বিষয়ে আলোচনা হয়। আমি তাঁকে জানাই আমরা কলকাতায় তাঁর গান শেখাবার ব্যবস্থা করছি। উনি খুব খুশী হবে বললেন, তার নাম কি হবে? বললেন, নাম যে 'গীতালি', তাহলে মিতালিও খুব হবে। আগস্ট মাসে তিনি যখন কলকাতায় ফিরলেন, শান্তিনিকেতনে যাবার পথে, তখন নিজেই তাগিদ করলেন—কি হোলো? সেই বারেই 'বিচিত্রা' হলে তিনি নিজে 'গীতালি'র উদ্বোধন করে গেলেন। 'গীতালি'ই সর্বপ্রথম কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন। 'গীতালি'র উদ্বোধনে গান করলেন ছেলেদের মধ্যে সোমেন গুপ্ত, সমরেশ চৌধুরী, দেব-ব্রত বিশ্বাস প্রভৃতি আর মেয়েদের মধ্যে ছিলেন কনক দাস, সতী দেবী, বিজয়া দাস, জয়া দাস, অরুন্ধতী ও রমা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে। 'গীতালি'র উদ্বোধনে কনক দাসের একক কণ্ঠে গান—'আমার নাইবা হোল পাবে যাওয়া' এবং সোমেন গুপ্ত ও সতীদেবীর যুগ্ম কণ্ঠে 'জানি জানি হোবে যাবার আয়োজন' গানটি সেদিন সকলের কাছে অনবদ্য বলে মনে হয়েছিল। কবি স্বয়ং এই তিনজনকে কাছে ডেকে এনে আশীর্বাদ করে-ছিলেন। প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে 'গীতালি'তে ছিলেন সমরেশ চৌধুরী পরে রবীন্দ্রদেব ঘোষ এবং শেষের দিকে প্রফুল্ল দাস। প্রথমে ৯০নং পার্ক স্ট্রীটে পরে লাউডন স্ট্রীটে অধিবেশন হোত।

'গীতালি' পর 'গীতবিতান' ও তারও কিছু দিন পরে 'দক্ষিণী' শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরে আরও অনেকগুলি হয়েছে বলে শুনেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত গ্রামোফোন রেকর্ডে

দেবব্রত বিশ্বাস

স্থান পাবার প্রসঙ্গে আরও কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সর্বপ্রথম মহিলা শিল্পী যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেছিলেন, তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কনিষ্ঠা ভগিনী অমলা দাস। এঁর গান শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা জানেন, কী উঁচু দরের শিল্পী ছিলেন ইনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এঁর রেকর্ড বাজারে আর পাওয়া যায় না। এঁর মৃত্যুর বহু পরে সেই পরিবারেরই আরেকটি বিখ্যাত শিল্পী এবং কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী সাহানা দেবী (বসু) কবির রচিত 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' এবং 'বাঁধ ভেঙে নাই চিনি গো' এই গান দুটি বোধ হয় ১৯২২ সালে রেকর্ড করে রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে একটা আলোড়ন আনেন। তাঁর গানের সঙ্গে সে সময়কার তরুণ গায়ক ও জনপ্রিয় অর্গান বাদক সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও নিউ থিয়েটার্সের পাকুতন শিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সুপরিচিত) অর্গান বাজান ও আমাকে বাঁশী

সোমেন গুপ্ত

বাজাতে বলা হয়। ইতিমধ্যেই বিবাহিতা হয়ে দূর প্রদেশে চলে যাওয়ার দরুণ চিত্রলেখা দেবীর কণ্ঠে রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি, যদিও বহু বছর পর—তখন তাঁর প্রৌঢ়াবস্থা—তখন একবার কলকাতায় এসেছিলেন ছুটিতে, সে সময় তিনি, 'তুমি কি কেবলি ছবি' ও নিবিড় আমা তিমির' গান দুখানি রেকর্ড করেন, সঙ্গে তাঁর ষড় কন্যা পিয়ানো বাজান। অমলা দাস ও সাহানা দেবীর গান রেকর্ড হবার মাঝখানে স্নেহ ভট্টাচার্য নামে আরেকজন ভদ্র পরিবারের মহিলা শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করেছিলেন; পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে সত্যকুমার গুপ্ত ও হরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, আর একজন রেকর্ড করেছিলেন, তাঁর নাম বোধহয় বলাই শীল। ঐ সময় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও কয়েক মজুমদারের কয়েকখানি গান রেকর্ড হয়। এঁদের পর বহুদিন আর রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ডে বিশেষ পাওয়া যায় না। তারপরে এলেন আবার ভদ্র পরিবারের মহিলা শিল্পীদের কয়েকজন, যাঁদের মধ্যে সতী দেবী, কনক দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বলতে গেলে এঁরা দুজনেই আজকালকার ভদ্র পরিবারের মেয়েদের রেকর্ডে গান দেবার পথপ্রদর্শক। রবীন্দ্রসঙ্গীত যেমন বাংলা গানের মান বাড়িয়েছে, গ্রামোফোন মেসিন ও রেকর্ড বিক্রীর ব্যাপারেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড ও সেই সঙ্গে গ্রামোফোন মেসিনের চাহিদা অভূতপূর্বভাবে বেড়ে যায়। কারণ, মার্জিত রুচিসম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারে সকলের শোনার মত গান রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ছিল না। অবিশ্যি কবি অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা রজনীকান্ত সেন বাদ দিয়ে। কবির কণ্ঠস্বর গ্রামোফোনে রেকর্ড করার চেষ্টা বহুদিন থেকেই চলছিল। অবশেষে ১৯২৪ সালে আমার অগ্রজ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন ঃ

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন, তাঁরা জানাচ্ছেন

"... আমার দাঁতে কোনো গোলযোগ নেই..."

"...ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে শুরু করে অবধি আমার দাঁতে কোনো গোলযোগ বা দাঁতের ক্ষয় হয়নি...

আপনাদের ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আর ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশের জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো..."

(মিঃ) পি. নাগেশ কামাথ, আন্ধেরী, বম্বে

(এগুলির এবং এই ধরণের আরো চিঠির ফোটোস্ট্যাট কপি জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-র যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

"...প্রায় দশ বছর আগে আমার মাড়িতে গোলযোগ ছিল..."

"প্রায় দশ বছর আগে আমার মাড়িতে গোলযোগ ছিল, আর তখনই আমি টুথপেষ্ট বদলে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করি...এখন আমি অত্যন্ত আর সুস্থ দাঁতের এক গর্বিত অধিকারী।

এই অপূর্ব কোরালিটির টুথপেষ্ট তৈরীর জন্যে আপনাদের অভিনন্দন জানাই!"

(মিঃ) বি. এল. জয়ন্তী, মৌবাণী, হায়দ্রাবাদ

দাঁতের সঠিক যত্নের জন্যে রোজ রাত্রে আর সকালে সঠিকভাবে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন ফরহ্যান্স দিয়ে। আর, মাড়ি মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ফরহ্যান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করুন।

চিবানো অবস্থায় চিবের প্যাকে

মাড়ি খারাপ তো স্বাস্থ্যও খারাপ

বিনামূল্যে! "দাঁত আর মাড়ির যত্ন" সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রঙিন পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ২০ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন ঃ ফরহ্যান্স ডেন্টাল এডুকেটিসারী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১১১৬৩, ডিপার্ঃ নং T 76-179 বম্বে ৪০০ ০২০।
যে ভাষায় চান জানাবেন।

ফরহ্যান্স দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

সুপ্রভাত ৭৭

ময়লার বিরোধী, মুক্তচিন্তার শক্তি

ঝালীন) এবং চন্ডীচরণ সাহা ও আমার পিতার ঐকান্তিক চেষ্টায় সেটা সফল হোলো। কবিকে যখন বলা হোলো 'আপনার গান রেকর্ড করতে চাই,' কবি একটু হেসে বললেন, আমার রেকর্ড আর কি নিবি তোরা—যখন গলা ছিল তখন এল না কেউ—এখন আর কি নেবার আছে—বেশ কোথায় যেতে হবে নিয়ে যাস। সে সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল ও রেকর্ডিং রুম ছিল বিডন স্কোয়ারের আর একটু উত্তরে আপার চিৎপুর রোডের উপরেই 'বিষ্ণুভবন' বলে সরু আলমারীর মত একটা তিনতলা বাড়িতে। কবি এলেন রেকর্ড করাতে সেই বাড়িতে। এদিকে কলকাতা শহরের গ্রামোফোন কোং-র যত বড় বড় সাহেব অফিসার সবাই সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে। সব শুদ্ধ গান ও আবৃত্তি মিলিয়ে ২৮ খানা রেকর্ড সেদিন করা হোলো। ওঁর গানের সঙ্গে দিনুবাবু এসরাজ বাজালেন। তখনকার দিনে মাইক্রোফোন ছিল না—গাইয়ের জন্য একটা আর বাজিয়ের জন্যে আর একটা—এই দুটো চোঙ বা 'হর্ণ'-এর মত বস্তু ছিল, তার মধ্যে দিয়ে শব্দ ধরা পড়ে মোমের চাকতির উপর দাগ কেটে রেকর্ডের ছাঁচ তৈরি হোত। গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করবার বহু আগে বোধহয় ১৯০৪ কিম্বা ১৯০৫ সালে কবির প্রায় ৪০ খানি রেকর্ড করা হয়েছিল। এ খবর আজকালকার অনেকেই জানেন না। কবির বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর গবেষণাগারে নানা সরঞ্জাম নিয়ে গবেষণা করতেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রসিদ্ধ 'ফুলতলিন' তেলের আবিষ্কারক 'হেমেন্দ্র-মোহন বসু (এইচ বোস নামে পরিচিত—নীতিন বসু, মুকুল বসু প্রভৃতির পিতা) শব্দ রেকর্ড করা নিয়ে চেষ্টা করতেন সেই গবেষণাগারে। এঁদের বিশেষ চেষ্টায় কবির আবৃত্তি ও গান রেকর্ড করা হয় মোমের সিলিন্ডারের উপর। সেগুলি আবার প্যারিস-এর পথে ছোং ডিস্ক করে এখানে পাঠিয়ে দেন। অনেকেই সে রেকর্ড তখনকার দিনে হেমচন্দ্রবাবুর বাড়িতে শুনে থাকবেন। কিন্তু তার বহুল প্রচার সম্ভব হয়নি এই কারণে যে, পাথে মেসিন ছাড়া সে সব রেকর্ড বাজানো সম্ভব ছিল না।

একবার ১৯১৮ সালে কবি হঠাৎ চৌরঙ্গীর 'কারনবাঁশি' দোকানে এসে হাজির—তাঁর বড় মেয়ে মাধুরীলতা খুবই অসুস্থ, গান শুনতে চান—তাই কবি এসেছেন যদি কোনো গায়কের গাওয়া তাঁর গানের রেকর্ড পাওয়া যায়। সে সময় তারেন দত্ত, সত্যভূষণ গুপ্ত আর বলাই শীলের গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত কয়েকটা বেরিয়েছিল। যা দোকানে মজুত ছিল তা কবিকে দেওয়া হোলো। কিছুদিন বাদে সেগুলি ফেরত দেবার সময় বললেন, 'এই বলাই শীল আমার সব গান নষ্ট করেছে'। এই উক্তিই বোধহয় তাঁর গানে 'ফিটমরোলার না চালানো' নির্দেশের ভূমিকা। ১৯২৪ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে আবৃত্তি ও গান রেকর্ড করার বহুদিন পরে, বোধহয় ১৯৩৪ সালে 'হিন্দুস্থান' রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ আবার অনেকগুলি আবৃত্তি ও গান রেকর্ড করেন। এই সময় তিনি খড়দহতে গঙ্গার ধারে একটি বাড়িতে থাকতেন। একদিন আমায় ফোন করলেন, 'এখনই বাঁশী সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থান কোম্পানীতে হাজির হও, আমি সাবিত্রীকে নিয়ে সেখানে যাওনা হলাম'। সেইদিন রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে সাবিত্রী দেবীর (কৃষ্ণন) গান রেকর্ড করা হলো—তুমি কিছু দিয়ে যাও, আমার সঙ্গে বাঁশী বাজাতে হোলো। ১৯২৬ সালে আমার দাদা প্রশান্ত-চন্দ্রের চেষ্টায় গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে এই চুক্তি হোল যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের যত রেকর্ড আছে সব কবিকে শোনাতে হবে, যেগুলির সুর তিনি পাশ করবেন কেবল সেগুলিই ছাপা আর বিক্রী হবে বাজারে, বাদবাকী গান সব নষ্ট করে দিতে হবে। যে রেকর্ডগুলি থাকবে তার দরুণ গ্রামোফোন কোম্পানী বোধহয় ৬০০০ বিশ্বভারতীকে এককালীন দেবেন এবং এরপর যে রেকর্ড হবে তার দরুণ ৫ শতাংশ রয়েলটী দেবেন। বলা বাহুল্য সে সময় রেকর্ডে গান দিতে অনুমতির বালাই ছিল না, আর কোম্পানীও কোন শিল্পীকে পয়সাকড়ি রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য দিতে রাজী ছিলেন না। আমার উপর ভার পড়লো একটার পর একটা রেকর্ড কবিকে শোনানো। ১৯২৬ সালের কলকাতার দাঙ্গার মাঝে রেকর্ডের বাণ্ডিল নিয়ে শান্তি-নিকেতনে গেলাম কবিকে শুনিয়ে সব ব্যবস্থা করতে। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এই প্রথম বিধি ব্যবস্থার নিয়ম হোল। বহু সংখ্যক বিকৃত সুরে গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভেঙে ফেলা হোল এবং নতুন কন্ট্রাক্ট হওয়ার পর ভালো শিল্পীদের দিয়ে অনেক গান নেওয়া হতে লাগলো।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। বোধ-হয় ১৯২৫ সালে, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'শেষবর্ষণ' হলো। সেই সময়ে বেলজিয়ামের রাজা ও রাণী কলকাতায় আসেন। তাঁরা উৎসবে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। সেই উপলক্ষে শুধু তাঁদের জন্য শেষবর্ষণ অনু-ষ্ঠানের বিশেষ আয়োজন করা হয়। সে রাতে বাইরের কাউকে বলা হয় নি, এমনকি ঠাকুর পরিবারেরও মাত্র কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমা দেবী (কবির পুত্রবধূ) মেয়েদের সাজাবার জন্যে স্টেজের ভেতর ব্যস্ত ছিলেন। আমার অগ্রজ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মান-নীয় অতিথিদের অভ্যর্থনা করেন এবং কবির আদেশে আমার বৌদিদি নির্মলকুমারী মহ-লানবীশ বেলজিয়ামের রাণীকে অভ্যর্থনা করেন। সেই রাত্রে পাটনা প্রবাসী একটি আট বছরের মেয়ে দু'খানি গান করলো—'বন্ধু রহ রহ সাথে' এবং 'অশ্রু ভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে'—যেমনি মিষ্টি স্বর তেমনি সুন্দর গেয়েছিল সে। মেয়েটি সতীদেবীর সর্ব-কনিষ্ঠা ভাগনী বিজয়া দাশ এবং এখন বিশ্ব-বিখ্যাত চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী।

সাহানা দেবীর সঙ্গে মঞ্জু গুপ্ত

১৯৩১ সালে কবির ৭০ বছর পূর্ণ হওয়ায় কলকাতা শহরে ইউনিভার্সিটি ইন-স্টিটিউটে বিরাট রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়। সে উপলক্ষে ৩।৪ দিন ধরে গানের জলসা বসে এবং তখন শহরের নতুন পুরানো সব রবীন্দ্র সঙ্গীতের গাইয়েরা এসে জড়ো হলেন। এই জলসায় একটি অধি-বেশনে অমিয়া ঠাকুরের গাওয়া মনে। মনে আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে, এ গানের কথা বোধ হয় অনেকেই আজও ভোলেনি। মাইকবিহীন ব্যবস্থায় কি অপূর্ব সঙ্গীত-রস তখনকার দিনের গাইয়েরা পরিবেশন করতে পারতেন— তা' আজকালকার পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী কবিয়ে উদ্যোক্তারা এবং মাইক-সম্বল গাইয়েরা বোধ হয় ধারণাতেই আনতে পারবেন না।

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

শৈবাল মিত্র

(ছয়)

অন্ধকার দাওয়ায় দিবাকর গুম হয়ে বসেছিল। বড়ো ধাঁধায় পড়েছে। বুদ্ধি খেলছে না। এখনি গাঁয়ের ফুলিতে রন দেবে। সজাগ করবে গ্রামবাসীদের।

একবার ভাবলো, কি দরকার মাথা ঘামানোর। যা হচ্ছে হোক, যা করছে ওরা করুক। পরে মনে হলো—সেটা ঠিক নয়, আমার নাম খাটো হবে। আঠাশ বছর ও এখানকার চৌকিদার। আঠাশ বছর সরকারী চাকরি করছে। কাজে কোনদিন কামাই নেই, গাফিলতি নেই। কতো ঝড়বৃষ্টি শীত গেল এই চাকরি জীবনে। দিবাকর থামে নি।

গায়ে সরকারী উর্দি, কোমরে পেতলের চাকতি লাগানো চামড়ার বেল্ট, হাতে একগাছা বেতের লাঠি, দিবাকর ছুটছে। মাঠ, বনবাঁদাড় মাড়িয়ে দূর দূর গাঁয়ে গতায়াত। দিনেরবেলা পেতলের চাকতি রোদে ঝিলিক দেয়। রাতারাতি পেতল জ্বলে। রাতেই কাজ। চোর, ডেঁচোরের দৌত্যদানোরা রাতেই জেগে ওঠে।

বিকেলের দিকে দুজন ভিন্ গাঁয়ের লোককে ও ছুটে আসতে দেখেছে। চেনা চেনা চেহারা। সঙ্গে একটা কুকুর। মুখ দেখে মনে হয় মাঝিপাড়ার লোক। সাঁওকাল। মাঠ পেরিয়ে তারা গাঁয়ের পথ ধরলো। দিবাকরের ভিটের সামনে দিয়ে তারা গেছে।

দিবাকর তখন দাওয়ায় দাঁড়িয়ে একটা ব্যাঁধারি ছুলছিলো। দূর থেকেই মূর্তি দুটোকে দেখেছে। কাছে আসতে পরিষ্কার হলো। চেহারা সুবিধের নয়। মোতির বাড়ীর খোঁজ করলো তারা।

দিবাকরের বুকটা ধক করে ওঠে। সে রাস্তা বাতলায়। কিন্তু মাথার মধ্যে নানা চিন্তা জাগে। একজনের কাপড়ে রক্তের ছিটে ওর নজর এড়ায়নি। ব্যাপার কি? ও ভেবেছে। সন্ধ্যের মুখোমুখি আরো একজন অচেনা মানুষকে দেখলো। ভাগড়াই চেহারা, জবর গোঁফ। বয়েস বেশী নয়। তাঁতিপাড়ার দুজন ছোকরা তার সঙ্গে ছিলো। মনে হলো, মোতির বাড়ীতে তারা যাচ্ছে। ছেলেটার মুখ যেন কোথায় দেখেছে। অনেক ভেবেও দিবাকর পাত্তা করতে পারে না।

বড়ো মুস্কিলে পড়েছে সে। গাঁয়ে কি যেন হচ্ছে! ও বোঝে, কিন্তু ধরতে পারে না। মাথায় নানা বিদঘুটে চিন্তা। আর দেরী করা যায় না। একটু জোরেই বৌকে ডাকলে—মাধুর মা। ও মাধুর মা। নিরুম অন্ধকারে নিজের গলার স্বর অচেনা লাগে। বাতা বাঁধা আগড়টা ঠেলে দিবাকর ঘরে ঢোকে।

মাধুর মা কি যেন বিড়বিড় করে। পাশ ফিরে শোয়। ঘুমের মধ্যে সাড়া দেয়—উঁ। কিন্তু চোখ খোলে না।

দিবাকর বিরক্ত হয়। মেয়েছেলের এতো ঘুম ভালো নয়। কাছে গিয়ে ঠেলা দেয়—এ্যাই শুনছিস, এ্যাই মাধুর মা। বৌ বাগে। কি বলছো, বলো। একটু সুস্থিরে ঘুমোতেও দিবে না?'

'আখুনো নিঃসাড় ঘুমোবে নাকি? দিবাকর মুখ বেঁকায়। বলে—আমি চললুম। ফিরতে দুপহর হয়ে যাবেক।

মাধুর মা এবার ধড়ফড়িয়ে ওঠে। ক্যানে? যাবে কুথা?

দিবাকর কথা বলে না। লণ্ঠনটা উসকে বাড়ালো। মাধুর মাথার শিতান তুলে চাবি নিলো। একটা পুরোনো বাক্স ঘরে আছে। তালা লাগানো। পঁচিশ বছরের পুরোনো একটা নোটবুক আর পেন্সিল আছে সেখানে। খাঁকি পোশাকের বুক পকেটে ওটা থাকে। পকেটটা বেশ ফোলা দেখায়। দিবাকর ভালা খোলে। মেজাজটা আজ কেমন যেন বেচাল। হাতের টানে বাক্সের ডালা খুলে যায়। দিবাকর জানে আগেই সাবধানো উচিত ছিল। পেরেকে টাঙ্গানো খাকি জামাটা কাঁধে বখলো। বেল্ট বাঁধলো। মাধুর মা তখনো শুয়ে আছে।

দিবাকর উঁচু গলায় বলে—আমি চললুম। কপাট খোলা থাকলো।

মাধুর মা উঠে বসলো—কুথা যাবে বলবে তো।

চললুম থানাতে।

তুমি বেশ মানুষ তো, আমি কালকেও তুমাকে বলেছি যে বামুন মাগী জ্বদিন থিকে জ্বালিন গেছে, উদের ঘরটা জ্বালিয়ে দিতে হবেক। সিই বোশেখ মাসে ঘর ছওনোর কথা দিয়ে দু সের চাল এনে খিনছি. ইয়াদ নাই তুমার? আর আজ তো রবিবার নয়, কিসের লেগে?

যদি আজ ফের ডাকতে আসে, বলিস কালকে লাগবো। দিবাকর রাস্তায় নামে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাধুর মা গজগজ করে।

বকুক—দিবাকর ভাবে—তা বলে কর্তব্য থেকে সে পিছোবে না।

কতো দায়িত্ব তার! কে বুঝবে? শুধু মাধুর মা কেন, এই যে লাউজোর, পাঁসপুর, গুড়ুলগাছি, তুলসমাশুল, কোন্ গাঁয়ের চৌকিদাররাই বা বোঝে। বরং ওরা ঠাট্টা তামাসা করে তাকে। পেছনে যা তা বলে। যে যা বলুক দিবাকর পরোয়া করে না। সে যা বোঝে সেটাই ঠিক। যদ্দিন সরকারী কুর্তা গায়ে দেবে, সরকারী বেল্ট কোমরে আঁটবে, সরকারের দেওয়া মাইনে খাবে, তদ্দিন সে একাজ করবে। নেমক-হারামী তার শরীরে নেই। সেবার যখন সিউড়ি থেকে বড়োসাহেব এলো, সব চৌকিদার, দফাদার জমা হয়েছিলো থানাতে। কই, আর কারো নাম তো করলো না বড়ো সাহেব। কিন্তু তাকে কাছে ডাকলো। সকলকে শুনিয়ে বললো—এই দিবাকর মাল—এও একজন সামান্য চৌকিদার। কিন্তু সে জানে সরকারী কাজ মানে দেশের সেবা। সে কাজে নিজের জীবন দিতেও সে প্রস্তুত। সে কারণেই একদল ডাকাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে ভয় পায়নি। কেমন কায়দা করে একজনকে জাপটে ধরেছে। এই রকম সাহস নিয়ে সকলে কাজ করলে, সরকারের সুনাম হবে। গাঁয়ের লোকেরা পেছনে তাড়া করেছিল বটে কিন্তু সকলের সামনে ছিল দিবাকর। ডাকাতের ছোরা খেয়েছে, রক্তে ভেসেছে ওর শরীর, তবু বদমাসটাকে ছাড়েনি। একেই বলে সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা।

বড়ো সাহেব আরো দুচার কথা বলেছিলো। দিবাকরের বুক গর্বে ফুলে উঠেছিলো। একটা নতুন লড়ঝড়ে, দশ টাকার নোট বড়ো সাহেব নিজের হাতে সেফটিপিন দিয়ে ভাব জমায় গেঁথে দিয়েছিলো। সে কি হাততালি। হেড কনেস্টবল এমনকি থানার বড়োবাবুও তাকিয়েছিল তার দিকে। বড়ো সাহেব আবার বলেছিলো—দিবাকরের সাহসের তুলনায় এ টাকা কিছু নয়। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমি ওকে শ্রদ্ধা আর প্রীতি জানাচ্ছি। দিবাকর শুধু রাজনগর থানার গর্ব নয়, সারা দেশের চৌকিদারদের গর্ব। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। দিবাকরের হাজিরা খাতায় তারপর বড়ো সাহেব একপাতা জুড়ে অনেক কিছু লিখলো ইংরিজি লেখা। দিবাকর পড়তে পারে না। বোঝে—প্রশংসা।

সেই থেকে তার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়লো

এতোবড়ো ব্যাপার নিয়েও শুকলাল, রামদরাজ, প্রাণকৃষ্ণ হাসি ঠাট্টা করে। প্রাণকৃষ্ণ বলেছিলো, ভাগ্য ভালো, বেঁচে গেছো। ছোরাটা আর খানিক নামলে, বুঝতে ঠেলা। তখন তোমার বড়ো সাহেব বলো আর গাঁয়ের কেনারাম চাটুজ্জেই বলো, কেউ আসবে না চাঁদ তোমার সৎকার বাঁচাতে। সবাই বলতো, দিবাকর [illegible] নম্বর বুদ্ধুকি, বোকা. ভাই লাঠি [illegible] ডাকাত ধরতে গেছলো। আর তাতেই বেঘোরে মরলো। এরকম কতো দেখেছি দাদা। তখন তোমার বৌকে ভিখ মেগেই খেতে হতো। কেউ একটা কানাকড়ি দিত না।

দিবাকর তর্ক করে নি। কি হবে। এতোই যদি প্রাণের ভয়, চৌকিদারী করা কেন? খেটে খাবার অনেক রাস্তা খোলা আছে, কে তোমায় ধরে রাখছে। যে যা বলুক, বড়ো ধরে গেল দিবাকরের। সে যদ্দিন থাকবে, হাজার কষ্ট সয়েও সরকারের মান রাখবে।

সে জানে বড়োবাবু কেন এতো খাতির করে তাকে। এই কাজের জন্যে। তোকে তো নতুন করে কিচ্ছু বলার নেই, বড়োবাবু সেদিন বলেছিলো—তুই তো আর কাঁ ফাঁকি দিস না, অথচ তোর গাঁয়ে দু দুটো ঘটনা ঘটলো ইস্কুল পুড়ে ছাই, অফিস অফিসে আগুন। আগে দেয়াল লিখন পড়েছে। সে খবর বলেছিস। আমরা দেখে এসেছি। কিন্তু কেউ ধরা পড়ে নি। এখন উপায় কি। একটা কিছু করতে হয়। না হলে ওপর থেকে কৈফিয়ৎ চাইবে।

অন্ধকার রাস্তায় দিবাকর নামে। নুনের দাম সে আজ দেবে। সেই দুটো ধুমসো সাঁওতাল, একজন অচেনা ছোকরা মোতির বাড়ী গেছে। মিটিং হচ্ছে। হয়তো আরো অনেকে এসেছে, আসবে। সারারাত চলবে সলাপরামর্শ, গুনগুন, ফুসফুস।

বড়োবাবু বলেছিল, শুধু শহর থেকে এসে আগুন লাগায় নি। গাঁয়ের লোকেরাও আছে। কোলকাতাটাকে পুড়িয়ে ছাই করছে, দেশের ছোটো বড়ো শহরেও আগুন জ্বলছে, এখন এসেছে দেশ গাঁয়ে।

দিবাকর জানে, বড়োবাবু ভুল পেয়েছে। বড়োবাবু বলে—এটা কি হচ্ছে? দেশটাকে পুড়িয়ে ছাই করবে নাকি? দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করছে. মহাপুরুষদের মুখে কালি লাগাচ্ছে। পরের দেশের মন্ত্রীকে এদেশের নেতা বানাচ্ছে। ওরা সব দেশের শত্তুর। দিবাকর শোনে। তারও রাগ হয়।

অন্ধকার মাঠ। মাথার ওপর বিরাট আকাশ। অনেক তারা জ্বলছে। পায়ের নীচে শক্ত মাটি। রাস্তা নেই। একটা আবছা পায়েচলা দাগ। বড়োবাবু ঠিকই বলেছে।

গত বাতের কথা মনে পড়ে। আবছা অন্ধকারে পাড়ার তিনচারজন ছেলে জটলা করছিল। তাদের চিনতে কষ্ট হয় নি। তারপর এলো একটা মই আর আলকাতরা। নবেন মাইতির ছোট ছেলে রঞ্জন একটা বুরুশ এগিয়ে দিলো। মইয়ের ওপর ছিলো ডাক্তারবাবুর ছেলে বাবলু। দেওয়ালে কি সব যেন লিখছিলো। ওপর পাড়ার

শিবেন দাঁড়িয়েছিল আলকাতরার টিন ধরে। পাশপাড়ার জগাই তিলির বড়ো ছেলেটা নজর রাখছিলো চারপাশে। দিবাকর ছিলো ঝোপের মধ্যে। কেউ দেখে নি তাকে। অথচ তাদের চিনতে ওর ভুল হয় নি। গতকালই রাত আটটা নাগাদ শিবেন আর রঞ্জন এসেছিল এই পাড়ায়। জিজ্ঞেস করায় বলেছিলো—মুরগীর ডিম কিনতে এসেছে। ওই লুঙ্গি আর গেঞ্জি পড়েছিলো শিবেন। গলার স্বর চেনা। ছেলে হিসেবে এরা কেউ খারাপ নয়। রঞ্জন কলেজে পড়ছে। বাবলু আর শিবেন গাঁয়ের ইস্কুলে পড়ে। জগাই তিলির বড়ো ছেলেটা কি যেন নাম, বছর দুয়েক পাশ করেছে। এখন বেকার। ঘরে বিয়ের যুগ্যি দুটো বোন। বাপটা রাতদিন হা হুতাশ করে। ছেলেকে দোষে। কিন্তু লেখাপড়া লিখে, ইস্কুল, আপিস পড়িয়ে কি লাভ। চাকরি মিলবে, দেশ এগোবে। এসব নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, এসব বিচারের ভার তার নয়। অনেক বাঘা বাঘা অফিসার, মাথাওলা লোক আছে। মোটা মাইনে, প্রচুর বুদ্ধি। তারা বুঝবে।

কিন্তু কি এক পাতলা মায়া তাকে জড়িয়ে থাকে। ছেলেগুলোকে সে চেনে। সোনার টুকরো সব। নেশা ভাঙ করবে না। নোংরামি নেই। অথচ এরাই ইস্কুল পোড়াচ্ছে।

রাত ভারী হলো। দূরে ভরণী পাহাড়। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। কুয়াশার সামনের গুড়ুলগাছি গ্রাম ঢেকে আছে। মাটিতে নেমে এসেছে ঝাঁক ঝাঁক কুয়াশা। দূর থেকে নদীর মতো দেখায়। দুপাশে শালবন। মনে হয় মোমের তৈরী গাছপালা। দিবাকর মাথা ঝাঁকায়—না না, এভাবে কিছু হয় না। কোনো মহৎ কাজ এভাবে হতে পারে না। বড়োবাবু ঠিক, এরা দেশের শত্রু।

দিবাকর আরো জোরে পা চালায়। নিজের চোখে সে সব দেখেছে। এখন আর চেপে যাওয়া যায় না। সে চৌকিদার। সরকারের নুন খায়। বেইমানী করবে না। মিথ্যে চুকলি সে কোনোদিন করে নি।

আমার কোনো দোষ নেই। নিজেকে সে কথাগুলো শোনায়।

হঠাৎ তার মনে হয় স্বাধীন কি করছে? স্বাধীন তার সবেধন ছেলে। সিউড়ি কলেজে পড়ে। সেখানেও গণ্ডগোল। এ পাড়ার ছেলেরা সকলেই স্বাধীনের বন্ধু। গলাগলি ভাব। তার ছেলেও কি ওদের সঙ্গে ভিড়েছে!

অন্ধকার ফাঁকা মাঠে দিবাকর এবার প্রায় দৌড়োতে থাকে। এই মোতি ছোকরাটাই যতো নষ্টের গোড়া। গাঁয়ের ছেলেদের মাথা খেয়েছে। শহর থেকে কি বিষ নিয়ে যে ও ফিরলো কে জানে! মোতির বিরুদ্ধে রাগটা ফুঁসতে থাকে। ওই মোতি তার মেয়েটাকেও বশ করেছে। মেয়ের মাও মোতি বলতে অজ্ঞান।

দিবাকরের মাথাটা হঠাৎ ঝিম মেরে যায়।

এই তো সেদিনের কথা। ঘরে ফিরে দেখে তুলকালাম অবস্থা। দরজার কাছে মাধু বসে আছে। কোলে বছর খানেকের ছেলে। এখনও একমাস হয়নি, মাধু শ্বশুর ঘর গেছে। মেয়েকে দেখে দিবাকর অবাক হয়। তার ওপর বৌয়ের তুখোড় মূর্তি। বেশ খোশমেজাজেই দিবাকর বাড়ী ফিরছিল। সিয়াই সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। লম্বা সেলাম দিয়েছে। সাহেব গাঁয়ের হালচাল জিজ্ঞেস করেছে। চারধারে নজর রাখতে বলেছে। আরো নাম চাই। আরো নাম। সিয়াই সাহেব খুশী।

হয়তো এর পর সে ভালো টাকা পুরস্কার পাবে। হেড চৌকিদার হবে। অনেক কথা বুকে নিয়ে ও বাড়ী ফেরে। কিন্তু তাকে দেখেই মাধুর মা চিড়বিড়িয়ে ওঠে—তুমার এখনুনে ঘর আসার সময় হলো? কি দরকার ছিল। থানাতেই থাকতে। ধেক বেক লোক দেখেছি, তুমার মতন... আমার হ'য়েছে জ্বালা। মরণট হলে খালাস পাই।

দিবাকর থামাতে চায়—আরে. কি হয়েছে বলবি তো'। না খালি খালি চিল্লালে কিছু ফয়দা হবেক। কিন্তু বমুনা শোনে না। তার গলা চড়ে যায়—আমি তখুনি বলেছিলুম, অতো দূরে বিটির ঘর কোরো না। কিন্তুক আমার কথা কি কানে যায়? বেয়ানের পাকা দালান দেখে ছুটেছিলে। আখুন ঠ্যালা সামালুক। তারপর শুরু হলো মাধুর বরের কেচ্ছা, জামাই-এর নামে গালাগালি। সবশেষে কান্না। মেয়েটা লজ্জা পেয়ে ঘরে ঢুকলো।

একটু কেঁদে যমুনা ঠাণ্ডা হলো। তবু খুঁটিয়ে কিছু জানতে দিবাকর সাহস পায় নি। বৌকে সে বরাবর ভয় পায়। তবু বুঝলো সংসারে আর একটা বোঝা বাড়লো। জামাই তার দাদার শালীকে নিয়ে মেতেছে। এমনুখো হবে না। অভাবের সংসার। মেয়েকে মনে হলো উটকো ঝামেলা। অথচ বিয়ের পর যখন যমুনার পেটে বাচ্চা থাকে না, তখন সে কম ছটফট করে নি। একটা করে আসে আর করে যায়। বৌকে অপয়া মনে হয়েছিল। আরেকটা বিয়ের কথা ভাবছিলো। তখন মাধু এলো।

সে কি আদর। মেয়ে কোলে সব সময় বসে থাকতো। মাধু কাঁদলে বৌকে গাল দিতো। বছর দুই পরে এলো ছেলে স্বাধীন।

নামটা দিয়েছিলো তখনকার বড়োবাবু যোগেশ ব্যানার্জী। খুব ভালোবাসতো তাকে। এক রোববারে হাজিরা দিতে পারে নি। পরদিন সোমবার। কাঁচুমাচু মুখে থানায় ঢুকলো। সব শুনে জোর ধমক লাগালো বড়োবাবু—ব্যাটা এমন সুখবরটা শুধু হাতে দিতে এসেছিস? খুব অপ্রস্তুত হয়েছিল দিবাকর। পরের দিন একটা বিরাট খাড়া মোরগ হাতে থানায় এলো। বড়োবাবু বেজায় খুশী। বললো—তোর ছেলের নাম দিলুম স্বাধীন। স্বাধীন দেশের মানুষ নাগরিক। দিবাকর ভাবে ছেলেটা কদ্দিনে স্বাধীন হবে? ছেলের পেছনে এখনো টাকা গোঁজা শেষ হলো না।

হাবুদার ঘর থেকে দুপুরে দুটো নাগাদ কিশোর বেরোয়। শীতের দুপুর। রাস্তায় ঘন রোদ। চড়াই পাখির কিচির মিচির। একটা হাইড্রেন্ট থেকে ভকভক জল বেরোচ্ছে। এখন গঙ্গায় জোয়ার। গোটা পাড়া ঝিমোচ্ছে। নাবাণ মুদীর দোকান খোলা। পিঁড়িতে বসে সে ঢুলছে। সামনে দাঁড়িপাল্লা টাঙানো। কিশোর চটপট বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢোকে। কলকাতার চেহারা বদলেছে। দেওয়ালে টেনসিলে আঁকা মাওয়ের মুখ। চারু মজুমদারের লেখার উদ্ধৃতি। একটা দেওয়ালও খালি নেই। কিশোরের বুক ভরে যায়। শহর জাগছে। তাদের দিকে আসছে। এখন ও মাসীর বাড়ী যাবে। মায়ের একমাত্র বোন। হরতুকি বাগানের একটা বস্তিতে মাসী থাকে। মাসীর ওখানে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটাবে। রাত একটু গাঢ় হলে একবার ঢুঁ মারবে নিজেদের বাড়ীতে। অনেককাল বাড়ী ছাড়া। বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছে করে। আবার কবে কলকাতায় আসবে, কে জানে।

গলির মোড় ঘুরতে হাবুদার জানলাটা চোখে পড়ে। জানলায় লাগানো আয়নাতে সূর্যের আলো ঝকঝক করছে। হাবুদা লোকটা ধাঁধা। বিপ্লবী রাজনীতির সকলের সঙ্গে খাতির। পার্টিরও ঘনিষ্ঠ। কিশোরের ব্যাপারটা ভালো লাগে না। পার্টির ভেতরে বিপ্লবীরা আছেন। বাইরেও আছেন—হাবুদা একসময় বলেছিল সকলকে জড়ো করতে হবে। তাছাড়া উপায় নেই। সাধু-সন্তের মতো মুখের ভাব। এইসব কথা শুনলে আজকাল কিশোরের মাথা ধরে। গণ্ড পঞ্চাশ বছর কিছু লোক একরকম বকে যাচ্ছে। মিলন চাই। ঐক্য চাই। ঠিক আছে। পথ বাৎলাও। সেটা কেউ জানে না। অজিতের কথা মনে পড়ে। হাবুদা ওকে দেখলে পালায়। ঘরে অজিত এসেছে জানলে ও নীচে দাঁড়িয়ে থাকতো। দেখা হলেই অজিত কাতুকুতু দেয় ওকে। হাবুদা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

হরতুকি বাগানের মুখে সেই ছোট পানের দোকান। কলেজে যাবার পথে এখান থেকে রোজ একটা সিগারেট কিনতো। ঠিক কলেজ গেটের সামনে শেষ টান লাগাতো। সিগারেট ফুরোতো। তিনতলা লাল বাড়ীটার ছাতে পাঁচিলে বুক লাগিয়ে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। কলেজ থেকে ফেরার পথে কিশোর সোজা দেখতো। এক বিকেলে ছাত থেকে একটা কাগজের গোলা কিশোরের পায়ের কাছে পড়েছিল। কিশোর সেটা ছোঁয় নি।

আর একটু এগোলেই মাসীর বাড়ী। বস্তিটা পুরোনো। সামনে খোলা নর্দমা। সিনেমার কল। সিংহের মুখে চুনকাম। সেখান থেকে জল পড়ে। শীতের সময় ঠিনঠান বেলা। গরমে শুকনো খটখটে। কলের পাশ দিয়ে দুফুট সরু রাস্তা। বস্তিতে ঢোকার মুখে পথ। পাশে টিনের খোলা নর্দমা। তাতখানেক চওড়া। দুপাশের পাকা পাড়।

মাছি ভনভন করে। বস্তির চল্লিশটা পরিবারের অনেক ভাব এই নর্দমা বয়ে। বলে মানুষের কাঁটা, তেল, পিত্তি, আঁশ কতো কি যে ভেসে যায়! রাস্তা বন্ধ করে সেই নর্দমার ওপর অনেকে বসে যায়।

দেশ ছাড়ার পর থেকে মাসীরা এখানে আছে। যাওয়ার দ্বিতীয় জায়গা নেই। বস্তির সামনে একটা ছোটো ঘর। সেটা মেসোমশাই নিয়েছে। একটা টেবিল, গোটা দুই চেয়ার আছে। মেসোমশাই হোমিও-প্যাথি চিকিৎসা করে। বস্তির লোক, গরীব মানুষেরা দুচারজন আসে। কি করে যে সংসার চলে কিশোর ভেবে পায় না। গোরাটাও হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। গোরা ওর মাসতুতো ভাই। মাসীর একমাত্র ছেলে। একই স্কুলে ওরা পড়তো। লেখাপড়ায় ভালো ছেলো। ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে ওঠার সময় স্ট্যান্ড করেছিলো। টাইফয়েড হলো। মাস দেড়েক শয্যাশায়ী। তারপর থেকেই গোরা ক্ষেপে গেলো। অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা শুরু করলো। স্কুলে যেতো না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় না কোথায় ঘুরতো। ক্লাসে জ্বলাতো। স্যারেদের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন ঘাড় নাড়তো। একটা বর্ণ বুঝতো না। চোখে ভ্যাবলা দৃষ্টি। বিশ্বজী হওয়ার জন্যে কোথা থেকে যেন কয়েকটা মুগুর, ঘাবরেল আনলো। ডোর চারটে থেকে কসরৎ শুরু হতো। প্রতি মুহূর্তে ফিতে দিয়ে বুক আর হাতের গুলি মাপতো। কালো রং। চার ফুট দশ ইঞ্চি হাইট। গোরা আর বাড়লো না। ছোলা আর ডিমের খরচ জোগাতে টুইশনি ধরলো। পাঁচ ছটা টিউশনি করতো। কোথাও বলতো স্কুল ফাইন্যাল পাশ। অঙ্ক, সংস্কৃতে লেটার। আই-এস-সি পড়ছে। কোনো বাড়ীতে জানতো বি-এস-সি-র ছাত্র। দশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত মাইনে পেতো। মিথ্যে ধরা পড়ায় মারও খেয়েছে কয়েকবার। পাড়ায় ওকে দেখে হাসাহাসি করতো সবাই। গোরা বেপরোয়া।

রেবাদের ঘরের কাছে এসে কিশোর একটু থমকে দাঁড়ায়। দুটো ঘরে রেবারা থাকে। ওরা সাত বোন এক ভাই। রেবার বাবার নাম মৃণীন্দ্র ঘোষাল। বছর পঞ্চান্ন বয়েস। পোর্টে চাকরি। একটা ছেলের জন্যে কি হা-হুতাশ! সাত মেয়ের পর ছেলে হলো। ছেলেটা পঙ্গু। এই সাত বছরেও সে জড়বুদ্ধি, ছাগলছানা।

দেশ ভাগ হওয়ার আগে ওরা একই জেলার থাকতো। পাশাপাশি গাঁয়ের লোক। প্রায় আত্মীয় সম্পর্ক। মাসীর কাছে এলেই কিশোর ওদের সংসারে উঁকি দেয়। রোগা, ফ্যাকাসে ঘোষাল কাকিমা। হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো এক কাকতাড়ুয়া। সারাদিন ধুঁকছে।

ছেলে হওয়ার পর ঘোষালকাকা বছর-খানেক খুব খুশী। ছেলের রোগ ধরা পড়লো। ঘোষালকাকা বেসামাল। সৎ লোক ছিল একসময়। চাকরিতে দুপয়সা উপরির সুযোগ ছিল। কাকা টলে নি। ডাল-ভাত খেয়ে ফুটো চালের নীচে মাটি কামড়ে পড়েছিলো। ঘোষাল কাকার বড়োদাদা অগ্নিযুগের বিপ্লবী। চাটগাঁর লড়াই-এ শহীদ হয়েছিলো। ইতিহাসে নাম আছে। বড়ো ছেলেকে সারাতে কাকা জাত খোয়ালো। বদনাম হলো। ছেলে সারলো না। সকাল সন্ধ্যে সংসারে অশান্তি চীৎকার কান্না। বড়ো দুই মেয়েকে বাদ দিয়ে বাকিদের কাকা যখন তখন বেধড়ক ঠেঙ্গায়। ভোর থেকে হাউমাউ কান্না, গালাগালি। মারের ধাক্কায় মেয়েরা কখনো সখনো বেহুঁস হয়ে যায়। কখনও অনেক সময় জ্ঞান হারায়। কাকা এখন এপিলেপসিতে ভুগছে।

রেবা ঘরে নেই। কাকিমা জানালো—কাজে গেছে। বাড়ী বাড়ী টেলিফোন মোছার কাজ। একশো টাকা মাইনে। সকাল ন'টা থেকে তিনটে পর্যন্ত ডিউটি। কিশোর কি যেন ভাবে। কাকি বলে—আসার সময় হলো।

বড়ো মেয়ে তপতী ঘরে ঢোকে। ভেতরে ভীষণ হৈচৈ হচ্ছে। ও সেখানে ছিলো। কিশোরকে দেখে সে অবাক।

ছাড়া পেলে কবে—সে জিজ্ঞেস করে। কিশোর জবাব দেয়। তপতীকে দেখে শুকনো রোগা দেখাচ্ছে। পরে শেবতী। বিয়ে হয় নি। হয়তো হবে না। এখন কি মিষ্টি চেহারা। গভীর চোখ। একমাথা চুল। বিনুনি বাঁধা।

তপতী ফিসফিস করে—রেবা তোমায় মজা দেখাবে।

কিশোর বুঝতে পারে না। অবাক চোখে তাকায়।

তুমি কোনো খবর রাখো না। পাড়ায় মধ্যে হৈ-চৈ। তুমি নাকি পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়েছো। তপতী হাসে। বলে, তোমাদের কি যে ব্যাপার, কেউ কাউকে বিশ্বাস করো না। এদিকে গণপতি আবার রেবাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল।

কিশোর কথা খুঁজে পায় না। কোথায় যেন কি একটা ভাঙলো।

তপতীর কান খাড়া। শব্দটা শুনলো। আবার মারামারি লাগিয়েছে—সে বলে।

কিশোর খানিকটা অন্যমনা। মাসীর মুখে যায়। মাসীদের দুটো ঘর পাশে থাকতো জিতেন সাঁতরা। কোন এক কোম্পানীর ক্যান্টিনে রাঁধতো। গতকাল মারা গেছে। সাতকুলে কেউ নেই তার। জিতেন সাঁতরার ঘরের সামনে জটলা। ঘরের দরজা খোলা। একটা ছোট জানলা। আলো আসে না। ঘরটা অন্ধকার। ভেতরে একটা টাউস তক্তাপোষ। পা বাধার জায়গা নেই। তক্তাপোষের চারটে পায়া ইঁট দিয়ে উঁচু করা। তলায় জিতেনের সংসার। পুরানো বাসনপত্র। ধুলোজমা টিনের বাক্স। দেওয়ালে ক্যালেন্ডার, ময়লা ছবি। পেরেকে মাঝারি আমলের কয়েকটা জামাকাপড়। তক্তাপোষের ওপর গোটানো বিছানা।

কিশোর ঘরের মধ্যে উঁকি দেয়। একটা ভ্যাপসা কষা গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে। জিতেনের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মামলা। পাশের ঘরে পুঁটি গাছকোমর বেঁধে লড়ছে। গলার রগ ফোলায় ধার। কাকা আমাকে মানুষ করেছে। কাকার জিনিসে আমার হক। কাকাকে আমি বাবার মতো ভক্তি করতুম। তার বুক চুল কপালে ঝুলেছে। নাকের পাটা লাল। মিনমিনে ঘাম জমেছে।

বিশু খেঁকিয়ে ওঠে—মাইরি আর কি। আমি মুখে আগুন দিয়েছি। আমিই আসল দাবীদার।

পুঁটি এবার আরো উঁচুতে গলা তোলে। কিশোরের কানে ভালো লাগে। বিশু বলে—আমাদের বস্তি কমিটি জিতেনদার সম্পত্তির জিম্মাদার। পুঁটির দুই দিদি এবার এগিয়ে আসে।

নর্দমায় থকথকে ময়লা। কেউ চলে ঢালে না।

আকাশে একটা চিল ককিয়ে ওঠে। এখন কোনো কথাই বোঝা যাচ্ছে না। দুপক্ষই মারমুখী। কিশোরের ধাঁধা লেগে যায়। ও সরে আসে। নষ্ট করার মতো সময় নেই। মাসীর ঘরে ঢোকে। মাসী প্রথমটা ওকে চিনতে পারে না। এক সেকেন্ড মাত্র। তারপর জড়িয়ে ধরে। মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে মেসোমশাই ঘুমোচ্ছে। মুখটা হাঁ করা। অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। গোরা বাড়ীতে নেই। পড়াতে গেছে।

মার সঙ্গে দেখা হয়েছে—মাসী জিজ্ঞেস করে।

রাতে যাবো—কিশোর বলে।

মাসীর চোখ ভিজে। কিশোরকে দেখলেই গোরার কথা মনে পড়ে। ছেলেটা বেঁচেও মরে আছে। একি চেহারা হয়েছে তোর—মাসী বলে।

কিশোর জবাব দেয় না। মাসী নীচু গলায় কথা বলে—তোদের বাড়ীতে দুবার পুলিশ গিয়েছিলো। তোকে খুঁজছে। বাইরের হল্লায় মাসীর গলা ভেসে যায়। নরকের মধ্যে আছি—মাসী বিড়বিড় করে—আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু গোরার কি হবে? পাগল ছেলেকে রেখে মরেও শান্তি হবে না। এতোক্ষণে মাসী ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কয়েকটা মাছি ঘুমন্ত ছেলের মুখে

শুধুমাত্র মহিলাদের লেখা নিয়ে
মাসিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা

শুরুলাইতে বেরোচ্ছে। লেখিকা/গ্রাহক/এজেন্ট এখুনি লিখুন : সম্পাদিকা ৩৩।৩ই চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলি-২৭

খাবার খুঁজছিলো। ঘুমের মধ্যেই মেসো হাত নেড়ে তাড়াচ্ছিলো তাদের। গুন [illegible] এবার জেগে ওঠে।

ফাঁকা চোখে তাকায়। বালিশের পাশে [illegible] চশমা নিয়ে চোখে দেয়। কিশোরকে দেখে ধড়ফড় করে উঠে বসে।

বাইরের গালমন্দ মেসোর কানে ঢোকে। এখানে আর থাকা যাবে না—মেসো গজগজ করে—যতো ছোটোলোকের আড্ডা।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকে—কিশোরদা।

কিশোর দেখে দ্যুতি দাঁড়িয়ে আছে। মাসী ডাকে—ভেতরে এসো। দ্যুতি ঢোকে। মেঝেতে কিশোরের পাশে বসে। বোগা, ছিপছিপে চেহারা। শক্ত ধারালো চোয়াল। আয়তা বাটি দাড়ি, গোঁফ। মাথায় এলো মেলো ঘন চুল। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। দ্যুতি হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় দশজনের মধ্যে ছিলো। দ্যুতি আর দীপিত দুভাই। পার্টি করে। ওর মা প্রভাদিও পার্টির দরদী। পার্টির জন্যে পুরো সংসার উজাড় করে দিয়েছে। আমি কবে যাচ্ছি—দ্যুতি কথা শুরু করে—এখানে থাকা মুস্কিল। মিলিটারি দিয়ে পাড়া ঘিরছে। কোম্বিং হচ্ছে। তোমাদের ওখানে একটা শেলটার দাও।

দ্যুতির লম্বাটে চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মাসী দু কাপ চা দেয়। কিশোর অবাক চোখে দ্যুতিকে দেখে। কিশোরদের স্কুলেই দ্যুতি পড়তো। চার-পাঁচ ক্লাস নীচে। একই পাড়ায় বাড়ী। খুব সৌখিন, বাবু ছেলে। সিল্কের পাঞ্জাবি, পাজামা পড়তো। সেন্ট মাখতো। কেউ হাসতো না। হাসার সাহস ছিল না। বিলিয়ান্ট ছাত্র। সব সাবজেক্টে ভালো রিজাল্ট থেকে। তোর হাতে ব্যাট হাতে পাড়ার মাঠে নামতো। আরো কয়েকজন ছিলো।

দ্যুতিকে নিয়ে স্কুলে অনেক গল্প ছিলো। ক্লাস টেনে এ স্কুলে ভর্তি হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হলো। মাসী খিরে কান্না, চোখে জল। শ্যামল গত বছর ফার্স্ট হয়েছিলো। এবার সেকেন্ড। শ্যামলের বই নেই। পড়া দেখানোর লোক নেই। রেজাল্টের পর শ্যামল ওকে বলছিলো সব। শ্যামলের চোখ ভিজে গিয়েছিলো। সেই থেকে দ্যুতির বুক হু হু করছে। মার সামনে এসেই কান্না। এ স্মৃতিনী মাসীমার মধ্যে শোনা। দ্যুতির দাদা দীপিতদা কিশোরের সহপাঠী। ভালো ছাত্র। গোপীবল্লভপুরের গ্রামে সে কাজ করছে। গোপীবল্লভপুরের অন্তর আভাস দেখা যাচ্ছে।

পার্টিকে বলো সেলটার হবে খবর—কিশোর জানায়।

দ্যুতি একটু চুপ করে থাকে। বলে—পার্টি চায় কাজ করুক। বেডফলো ইলেকশন করি।

মহুরেও বাজ আছে—কিশোর বোঝে লড়ে। গণ-সংগঠন বাড়াতে হবে। বাস্তবনৈতিক পথায় চলবে।

দ্যুতি হাসে—প্রস্থানোদ্যত উঠে দেহে। পুরোনো ঢংএ প্রচার বন্ধ। এ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে প্রচার হবে।

সে কি—কিশোরের মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যায়।

দ্যুতি উঠে যায়। কয়েকটা ছোট সাইজের পুস্তিকা আনে। মাসীর ঘরের পেছনের লাইনে থাকে নাবাগ মুদি, যাতে দ্যুতি তার কাছে শোয়। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে।

কিশোর বইগুলো উল্টে দেখে। নতুন লেখা। পার্টির লাইন এই কয়েকমাসে অনেক বদলেছে। একমাত্র গেরিলাযুদ্ধই জনগণকে জাগাতে পারে। গ্রাম, শহর দুজায়গাতেই মুক্তাঞ্চল গড়া সম্ভব। দীর্ঘস্থায়ী জন যুদ্ধ নয় সত্তরের দশকেই বিপ্লব হবে। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।

দ্যুতি গতকাল সন্ধেয় একটা এ্যাকশানের ঘটনা বলছিল। তখনও বাস্তার আলো জ্বলেনি। ধোঁয়া ধোঁয়ায় অন্ধকার। কলেজ স্ট্রীটে পাড়া শমধম করছে। কিন্তু আগেই একটা ছোটোখাটো যুদ্ধ হয়েছে। রাস্তা ফাঁকা। দোকানপাট বন্ধ। প্রেসিডেন্সি কলেজের বেলিং খালি। আগেরদিন ভবানী দত্ত লেনের মুখে বিধু পাকড়াশী শহীদ হয়েছে। মাঝরাতের ঘটনা। ভ্যান থেকে নামিয়ে তাদের চলে যেতে বলা হয়। আর পর পুলিশ পেট্রল থেকে গুলি করে। তিন জন নিহত। পাড়ার অনেকে জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখেছে। অন্ধকারে ডুবে ছিল গোটা চত্বর। কেউ সাহস করে নি।

পাড়ায় পুলিশ পিকেট বসেছে। সাদা পোশাকের পুলিশ ঘুরছে। খবর এলো, সে এসেছে। সেই লোকটা। লালবাজারের কাপালিক। অনেক ছেলেমেয়েকে বলতে, তার দুহাত লাল। দ্যুতি, কিশোর আর মন্ত্রী তৈরী হয়ে ছুটলো। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে সে দাঁড়িয়েছিলো। ওরা হেদোর ইস্কুলের পাঁচিল টপকে কলেজে ঢুকলো। লোকটা কথা বলছিলো একজনের সাদে সাদা পোশাকের পুলিশ চলবল করছিলো। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। পকেটে হিতলবার থেকে হাত সরায়নি। কলেজের মাঠ ঘুরে বুকে হেঁটে ওরা এগোলো। তারপর সুযোগ পেয়ে ধাঁ করে পেটো ছুঁড়লো একটা। লোকটার মাথায় লাগলো। কিন্তু ফাটলো না। ফুটপাত থেকে রাস্তায় গড়িয়ে পড়লো। লোকটা ভয়ে লাফিয়ে উঠেছিলো। তারপর পাগলের মতো এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগলো। পাশের লোকটা নর্দমায় পড়ে গিয়েছিলো। কথা বলতে বলতেই ওরা বেরাদের ঘরে আসে।

বেরা ফেরে। মসলা তাঁতের মালিক। গোদে পোড়া চেহারা। ওকে খুব ক্লান্ত দেখায়। হাতের ব্যাগটা মাটিতে রেখে ও বসে। কিশোরের মনে হয় ওর এখন ঘুমোনো উচিত। কতোকাল বেরার ঘুম হচ্ছে না।

বেরা দ্যুতিকে বলে—তুমি এখানে কেন? জানাজানি হবে। বিশুরা ওপাশে আছে। আমি অনেকবার বারণ করেছি—ফপটী যোগ করে।

দ্যুতি সরে যায়। হুরেন্দ্রনাথ ভুরুর বিশুরা ফিরছে। কাঁধাঝোলা মস্তবা ছুঁড়ছে। বিশুর পাশে আলো। খোলা চুল, টলটলে চেহারা। বিশুর কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে হাঁটছে। ও ঘোষাল কাকার সব নম্বর মেয়ে। বছর ষোলো বয়েস। স্কুলে যায়। একটু বেপরোয়া। বাড়ীতে কিশোরকে সকলে চেনে। অনেকদিনের যাওয়া আসা। কিন্তু ওর সামনীতির খবর কেউ জানে না। আসলে দক্ষিণদেশ গ্রুপে থাকার সময় পুরোপুরি গোপন কাজ করেছে। কাজেই ভাবে এই গোপনবীতা মানতে হতো। তাতে লাভ হয়েছে। বিশু ওকে দেখে। চোখ মারে। তারপর ছড়া কাটে—কামাই ওরা জামাই। কোরো না তুমি কামাই। আলো হেসে লুটিয়ে পড়ে।

(চলবে)

সোনার হরিণ নেই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। ষোল ।।

মিষ্টি এলো। বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ফিল্পটা স্পায় বেশ আগ্রহ নিয়েই নেমে এসেছিল মনে হয়। কারণ, বাপীর পরো পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি। কিন্তু চোখাচোখি হওয়া মাত্র দু চোখে খাই-খাই খেল একপ্রস্থ। বানারজুলির বাপী বসফদার এই লোক সেটা কল্পনার মধ্যেও ছিল না। শুধু অবাক নয়, প্রস্তুতও। বরং, এখন হয়তো দেখামাত্র মনে হবে এই স্মার্ট বা এমন লোক বাপী তরফদার হতে পারে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলায় টানছে থাকলে বাপী এদিকে সরে আসত না। চেয়ারটা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ে রইল। দু চোখে হাসি ছুঁয়ে আছে কি নেই। বাকিটুকু প্রতীক্ষা। দেখার পর আর চেনার পর ওই মেয়ে এখন যদি মুখ ঘুরিয়ে আবার ভিতরে চলে যায় জীবনের পুরনো অধ্যায় পুরোপুরি শেষ করে নিয়ে বাপীও নিজের পা দুটোকে গেটের বাইরে টেনে নিয়ে যাবে।

শেষ নয়। বারান্দা থেকে বাসল।

...পরনে গাঢ় বাদামি রঙের ঝলমলে চকচকে সাদা কুর্তির সাদা চুড়িদার। গায়ে বাদামি সাদা কামিজ। পায়ে হালকা খয়েরি শৌখিন স্যান্ডাল। বাপী ভালো না কিন্তু। বানারজুলির সাহেব বাংলোয় লাল মুখে শাড়ি পরা দশ বছরের মিষ্টিকে দেখে রূপকথার রাজকন্যার মতো মনে হয়েছিল।

কিন্তু চোখে যতই ঘোর লাগুক, ওর সেই অকুমার শাড়ি সামলানোর বিড়ম্বনাটুকুও আছে। এখন এই পাতলা দামী দেহের ভাঁজে ভাঁজে অনায়াস লেপটে আছে। একটুও বাড়তি নয়।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। আসার এই নিস্পৃহ ধরনটা বানারজুলির বাংলো থেকে সেই মিষ্টির নেমে আসার সঙ্গে মেলে কিছুটা। আসার আগ্রহ যদি থাকেও, বুঝতে দিতে আপত্তি। দেড় গজ তফাতে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এক টুকরো হাসি ঠোঁটের ফাঁকে যেন এসেই গেল।

—এত দিনে চিনতে পেরেছ তাহলে?

বাপীর গলায় বাড়তি উচ্ছ্বাস নেই। অভিমানও না।

সোজা মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি দেখছে ওকে। বানারজুলির সেই দুরন্ত সিঁড়ি ছেলেটাই যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাসল। মাথা নাড়ল। চিনতে পেরেছে। হাসিমাখা কালো দুচোখ ওর মুখের ওপর বড়াচ্ছল কবল একটু। জিজ্ঞাসা করল, তুমি চিনলে কি করে?

চোখে এর মধ্যে ওকে অনেক বার দেখেছে। আর মনে মনে তো অহরহ দেখে চলেছে। আট বছর বাদে গলা এই প্রথম শুনল। কচি ছেলের মতো হাসকা মিষ্টি।

বাপী কি জবাব দেবে? বলবে পাঁচ আট বছরের মধ্যে আটটা দিনের জন্যেও তুমি আমার চোখের আড়ালে ছিলে না—আমি চিনব না কেন? পলাশবনের সত্যি কথাই বেরুলো মুখ দিয়ে। বলল, তোমাদের বাড়ির বাস্তুর এমাথায় এক জ্যোতিষীর চেম্বারে বসে তুমি হাত দেখাচ্ছিলে আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছিলাম।

মাত্র দিন কতক আগে মা জ্যোতিষীর কাছে টেনে নিয়ে গেছল সেটা মনে না থাকার কথা নয়। মিষ্টি হাসছে অল্প অল্প আর দেখছে। একসঙ্গে অনেক দেখায় আছে যেন। বলল, মা সঙ্গে ছিল বলে ছিনেছ, নইলে কথা বললে না কেন?

—এভাবে হঠাৎ তোমার দেখা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছলাম। তোমাদের বেরিয়ে আসার অপেক্ষায় ছিলাম।

—তারপর? মিষ্টি উৎসুক।

—তোমরা বেরিয়ে এলে। তখনো আমাকে দেখে স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে তোমার মা কী বলতে গলার ভিড় বলে গাড়িতে উঠলেন। তুমিও খুব বিরক্ত হয়েছিলে—

মিষ্টির মুখে মিষ্টি বিড়ম্বনার ছায়া—কক্ষনো না, আমার কিছু মনে নেই।

মনে পড়ছে কি পড়ছে না তা নিয়ে বাপীর কোনো মাথা ব্যথা নেই। মন বলছে আট বছর বাদে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ওকে দেখে আর চিনে এই মেয়ে অখুশি নয়। আট বছর আগের সেই বানারজুলির দিন-গুলি এই দুটো কালো চোখে যেন একসঙ্গে ভিড় করে এসেছে। আসছে।

—তোমার ক্লাস আছে?

—ছিল। হাত উল্টে ঘড়ি দেখে নিল। —ক্লাস বসে গেছে, আর ঢোকা যাবে না।

—খুব ক্ষতি হল?

মিষ্টি হেসেই মাথা নাড়ল। —খুব না।

—এ ঘণ্টার পরে ছুটি?

—না, আর একটা ক্লাস আছে।

—একদিন এ ক্লাসও কামাই করো? হাসি ছাওয়া দুচোখ মুখের ওপর থমকালো একটু। নাকচ করার কথা কেন যেন ভাবাও গেল না। তবাব দিতে হবে কে কি করছে। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও আসছি—

কবেকু পা এগিয়েই ঘুরে তাকালো।

—এই একদিনই তো?

বাপী চেয়ে রইল। ফেরার দেরার মতো প্রশ্ন কিছু নয়। কান-মন ভরে দেবার মতো কিছু। পলকা পা ফেলে মিষ্টি চলে গেল।

চারদিকে চেয়ে বাপী দেখছে এটা পতঞ্জলের সেই পার্ক নয়। মিষ্টির এই আসা যাওয়া পতঞ্জলের মতো দিবা স্বপ্ন নয়। কিন্তু গরবালের সেই ও মেয়েটাকে ঘিরে এই বাস্তবের বড় অস্তিত্ব ছিল। এক আশ্চর্য মাদকতায় সেই রকমই ডুবে যাবার মতো। পার্ক স্ট্রিটের লাভির খোঁচায় ঘোর আটাক পলাশ ভবনের দিকে পা বাড়িয়ে বাপী অপেক্ষা করছিল, আটটা বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে কোনো নিভৃতে এই মেয়ের মুখোমুখি হতে পারলে পার্কের সেই কল্পনার ছবিটা একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে না। হতে পারে না।

মিথ্যে হয়নি। বিস্ময়ের সেই ঘোর-ঘোর ব্যাপারটা দেখেছে খুশির চাপা ঝলক দেখেছে। হাসিমুখেও সেই রকমই।

মানুষের ভিতরের কোন দিকটা আসল সত্য, অনুভূতির এই জোয়ারে তারও হদিস মেলা ভার। জ্যোতিষীর ঘরে সন্ধের পাশে এই মিষ্টিকে দেখামাত্র অনেক—অনেক দিনের ক্ষুধার্ত সত্তাগুলো একসঙ্গে টান-টান হয়ে উঠেছিল। তারা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডক্টরশূন্যের মতো ঐ বাপী ভরদ্বাজের দু হাতের মধ্যে এসে মাকে ছেড়ে ওই মেয়েকে বাড়িয়ে দুটো চোখের বাঁধনে আগলে রাখতে চেয়েছিল। পিছনে লাল আলো জ্বেলে গাড়ি চলছিল যখন, তখনো চাঁদ বছর বয়সের সেই প্রস্তুতির অগুন কাঁশর বছরের দেহের শিরায় শিরায় সাড়া জাগিয়ে তুলছিল। পরেও সাততলা নক্ষত্রখচিত বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে বতবার দেখেছে ওকে বাসনার আগুনে হিম ধাতু গলেছে। আর, গতকাল বাড়ির দোতলার বারান্দার বেলিং-এ চোখ রেখে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ মুখে ওর ওপর স্বপ্নালো হাসনার হামলা দেখছিল আর মজা পাচ্ছিল যে মেয়ে—তাকে কোন পাতালে টেনে নিয়ে যেতে পারলে সঠিক জবাব হয়, বুকের তলার সেই নরক খুঁড়ে বেড়াচ্ছিল। প্রবৃত্তির সেই নিষ্ঠুর আদিম অভিলাষে সমস্ত যেন আততায়ীকেই দণ্ডে নিঃশেষ করতে চেয়েছে। ভিতরের পশুটা থাবা চেটেছে। তারপর একজনকে না পাওয়ার আক্রোশে আর একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। কমলা বণিক কতটা দেখেছে কতটা বুঝেছে বাপী জানে না।

আজ?

পার্কের গত কালের অনুভূতিটুকুই ঠাণ্ডা প্রলেপের মতো ভিতরের আনচান-কানাচে ছড়িয়ে আছে। বুকের তলার ঘুমন্ত গুমরানো সেই ভীষণ যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। সেই ভয়ঙ্করের আবেশ নেই। সুতীক্ষ্ণ পথের সেই স্নায়ুচাপটাও উধাও। আর পরিত্যক্ত শূন্য গুহা-গহ্বর খুঁড়ে বাপীর শান্ত দৃষ্টি আবার ওই হুল ঘরের বাথান্দার দিকে।

আর ঘড়ি দেখেনি ওরু আট-দশ মিনিটের বেশি হবে না বোধ হয়। মিষ্টি আসছে। হাতে দুটো মোটা বই আর একটা বাঁধানো খাতা। লালচে মুখ। চোখে এখনো হাসি চিকচিক করছে। বানারজুলির বাপী ভরদ্বাজ মিষ্টি করে বড় হবে। বড় হয়েছে। বড় হবার পর বানারজুলির সেই সব কাণ্ড যদি মনে পড়ে তাহলে কোন মেয়ের মুখে না লালের আভা ছড়াবে?

বাপী হুলপ করে বলতে পারে মনে পড়েছে। নইলে আসত না। পাত্তা দিত না।

কাছে এসে হাসি মুখে মিষ্টি বলল দাদুকে অফিস চেম্বারে একটা ফোন করলাম। গাড়ি নিয়ে আসার দরকার নেই বলে দিলাম।

এই পত্রস্পর্শটুকুও বাপী দুচোখ দিয়েই গ্রহণ করল। এখানে আর দাঁড়ানোর ইচ্ছে নেই। বানারজুলির মতো এই মিষ্টি মায়ের খুব পরোয়া করে মনে হয় না। তবু গেটের দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার মা ভাববেন না?

মিষ্টির কথাবার্তায় আগেও ঘোর-প্যাঁচ ছিল না খুব এখনো অনেকটা তাই। পাশে চলতে চলতে হালকা সুরে বলল মাকে মিছেই মুশকিল, সব-সময় বেশি ভাবে—

—কি রকম?

—তাঁর ধারণা, দুনিয়ার সব ছেলে তাঁর মেয়েকে গিলে খাবার জন্য হাঁ করে আছে। হেসে ফেলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো একবার। —বকাবার করছি, এখানে তো বানারজুলির মতো জঙ্গল নেই।

কথাগুলো তরল হলেও একেবারে সরল ভাবা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে সহজ জবাব দায় বাপীরই। সেও তাকালো একবার। স্বীকৃতি বুঝে নিয়েই যেন মন্তব্য

দিল। —না, এখনকার জঙ্গল বানাবজুলির মতো নয়...।

—এখানকার জঙ্গল মানে? মিষ্টির মুখে পলকা বিস্ময়।

বাপী হাসছে অল্প অল্প। গেটের বাইরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। হালকা করে একটু ভাবি জবাবই দিয়ে বসল।— বানাবজুলির জঙ্গলে আর যাই বলো কোন-রকম কৃত্রিমতা বা ছলনা নেই। পাঁচ মাস হল এসে দেখছি এখানে সবটাই তাই। শব্দ করে হেসে উঠল একটু। সঙ্গে সঙ্গে সামাল দেবার চেষ্টা। বলল, কেবল এই খানিকক্ষণ হল অন্য রকম লাগছে—

অর্থাৎ খানিক আগের এই যোগাযোগের পর থেকে কৃত্রিমতা যা ছলনা দূরে সরেছে। মিষ্টির আয়ত দু চোখ ওর মুখের ওপর।

কি দেখছে বাপী অনায়াসে বলে দিতে পারে। নিজের গায়ের রং কোনদিনই ফর্সা নয়। কিন্তু ছাঁদ-ছিরির কিছু প্রশংসা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে। ড্রইং মাস্টার ললিত ওর বলতেন, ললিত-খাড়ু-দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হলে ওরে পুরুষ। লক্ষ্য করলে ওর মধ্যেও পুরুষের এই দাক্ষিণ্যটুকু এখন মেয়েদের চোখে পড়ে। খতন বনিকের বউ কমলা বনিকের চোখে পড়েছে। মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখে পড়েছে। বুকলিনের বড়বাবু মন্মথ সোমের মেয়ে ঈষার চোখে পড়েছে। মিষ্টির চোখেও পড়ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেতর দেখে নেওয়ার চেষ্টা। বানাবজুলি জঙ্গলের চৌদ্দ বছরের বেপরোয়া ছেলের সেই হিংস্র জোড়া তাড়না কতটা আড়াল নিয়ে আছে, বোঝার চেষ্টা।

বাপীর মজা লাগছে। মুখে কিছু না বলে ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

মিষ্টি সচকিত। বাংলো থেকে ওকে বার করে জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হাতের ওপর দখল নিতে ওর মনে না পড়ার কথা নয়।— কি?

—বই খাতা আমাকে দাও।

মিষ্টি হেসে ফেলল। দিয়েও দিল।

বাপী বলল, শহরের রীতি অনুযায়ী এখন কোথাও গিয়ে তোমাকে একটু চা খাওয়ানোর প্রস্তাব করা উচিত বোধহয়...

তেমনই হেসেই মিষ্টি জবাব দিল, শহরের রীতি অনুযায়ী আমারও সায় দেওয়া উচিত।

সামনের দিকে এগলো দুজনে। বই খাতায় নরম হাতের স্পর্শ লেগে আছে যেন। সংগোপনে সেটুকু অনুভব করার লোভ বাপীর।

মিষ্টি এদিকে ফিরল। দু চোখে কৌতূহল ছেয়ে আছে।— জ্যোতিষীর ওখানে দেখে তুমি আমাদের বাড়ি চিনলে কি করে?

বাপী ঘটা করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।— সেজন্যে অনেক মেহনত করতে হয়েছে। প্রথম সেই জ্যোতিষীর কাছ থেকে মিথ্যে অজুহাতে ঠিকানা আদায় করতে গিয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়ার দাখিল হয়েছিল।

চলতে চলতে সকৌতুকে আমার ঘাড় ফেরালো মিষ্টি।— তারপর?

—তার পরের দিন দুপুর থেকে তোমাদের ওই রাস্তা চষেও কোনো হদিস পাওয়া গেল না। শেষে কলেজ স্ট্রীটে এক বন্ধুর বাড়ি এসে টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে তোমার বাবার নাম খোঁজা হল—

—বাবা তো অল ইণ্ডিয়া সার্ভিসে চলে গেছেন, এখন মধ্যপ্রদেশে পোস্টেড। আমি আর মা দাদুর কাছে থাকি, টেলিফোন দাদুর নামে—পাবে কি করে।

—পাইনি। এরপর তোমাদের গাড়ির নম্বর সম্বল। সেটা মনে ছিল। বন্ধুর সাহায্যে মোটর ভেহিকিলস-এ এসে এক-জন দালালকে এক টাকা ঘুষ দিয়ে তবে ঠিকানা হাত করা গেল।

দাদা মাটা সত্যি কথায় সহজ প্রতি ফিস্রাটুকু লক্ষ্য করছে বাপী। মিষ্টি হাসছে আগের কথা ভোলেনি বলেই অবিশ্বাস করছে না। বলল, ঠিকানা পাতে পেয়েও বাড়িতে না ঢুকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে যেন?

—তোমার মায়ের ভয়ে।

বিব্রত মুখে মিষ্টি বলল, ভিতরে এলে মা কি তোমাকে সেই বানাবজুলির মতো তাড়া করে আসত নাকি?

গম্ভীর মুখে বাপী জবাব দিল, না চিনেই স্টুপিড বলেছিলেন চিনলে তাড়া করার কথা নয়?

মিষ্টি আর যেন তেমন জোর দিয়ে অস্বীকার করতে পারল না। বাপী বলল, তবু গতকাল রুপালি ঠাকে ঢুকেই পাল্টা চোখরাঙিয়েছিলাম। অদৃষ্টে দুর্ভোগ লেখা ছিল। তোমার পাড়ার ভক্তদের ভাইতে আমাকে গায়েপড়া কলার উৎসাহ আরো বেড়ে গেছল।

এও সত্যি। মিষ্টির সহজ হবার চেষ্টা।— আজ তাই অন্য রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলে? আমার এই কলেজ জানলে কি করে?

—গাড়ি থেকে আমাকে দেখে তুমি বিত্তক্ষণ মুখ ফিরিয়ে নিলে। তখন ট্যাকসিতে ফলো করে তোমাকে এই কলেজে ঢুকতে দেখলাম।

একটুও বাড়িয়ে বলেনি, বং ফলায়নি। আট বছর আগের ছেলেবেলার সেই দুরন্ত দিসাকে এর সঙ্গে মেলানো সহজ নয়। কিন্তু মিলছেও আবার। জিগ্যেস করল, তারপর এই বেলা দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছিলপ পাঠালে?

বাপী হাসল। বলল, ছিলপ পেলেও তুমি আসবে কি আসবে না সন্দেহ ছিল। এতবার দেখেও যখন চিনতে পারলে না, ভাবলাম ভুলেই গেছ।

সামনা ফিরে মিষ্টি ফেলে আসা চোখে আর একবার দেখে নিল ওকে। পাতলা ঠোঁটও কৌতুকে উসখুস করছে। তা সংকোচের কথাটা বেশ সহজেই ফেলল।— তোমাকে চিনতে না পারলেও বানাবজুলির বাপীকে ভোলা শক্ত।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে হল, আট বছরের জাবরকের অধোকাঠামোই ভুলে গেছে। তবুল সুরে মিষ্টি আবার বলল, তবু কদিন দেখে তোমাকে চেনা আমার উচিত ছিল।

—কেন?

—তুমি ছাড়া এত বাঙালি আর কে করবে। কাল তো আরো চেনা উচিত ছিল।

—কেন? দুকান ভরে কেবল শুনতেই ইচ্ছে করছে বাপীর।

—পাভার ওই পাতীগুলো বলে তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি দোতলার দিকে একবার ফিরে তাকিয়েছিলে। এমন তাকানো যেন মতটা দূর থেকেই একেবারে ভস্ম করে ফেলবে আমাকে। আট বছর আগে বাবা বানাবজুলি থেকে দিনাজপুরে বদলি হতে মামার বাড়ি ছেড়ে চিপে সার যাচ্ছিলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তখন ওই রকম করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে তুমি। আমার মনে হয়েছিল এই বুঝি চলন্ত জিপ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলবে।

বাপী সন্তর্পণে নিঃশ্বাস ফেলল একটু। গতকালের বা আট বছর আগের হিংস্র তপ্ত চাউনিতে ভস্ম করার তাগিদ ছিল কি আর কিছুর সেটা ভাবে থেকে ভালো আর কেউ জানে না। কিন্তু এতখানি পর এত-দিনের ব্যবধান বুঝি আরো কিছুটা ঘুচে গেল। লঘু সুরে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে ভয় করছিল নাকি?

হাসি মুখে মাথা দোলালো।—তা অবশ্য করছিল না। এখন আর তেমন ভয়-ভাবের ধার ধারি না।

শেষেরটুকু যেন পুরনো দিনের এক মামাল ছেলেকে শোনানোর জন্যেই। বাপী সামনে হাঁটছে, কিন্তু ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। চেয়েই আছে। সেটুকু অনুভব করার ফলে আবার চোখো-চোখি। মিষ্টির ভুরুর মাঝে পলকা ভাঁজ পড়ল একটু।— কি দেখছ?

মিষ্টি।

হেসে উঠল।—তোমার দিকে গিলে খেতে ইচ্ছে করছে?

বাপীর হাসিতে খুশির বিড়ম্বনা। আট বছরের ফারাক এবারে জুড়েই গেল বুঝি। দিনমানের এই ঝলকানো না ভুলে ওর বাড়িতে আগের মতো ওর একখানা হাত ওপর দখল নেওয়াও একেবারে অসম্ভব কিছু হত না।

এবারে মিষ্টি গম্ভীর একটু। কিন্তু হাসির ছোঁয়া লেগেই আছে। বলল, এখানে আমি মালবিকা, এক মা আর দাদু ছাড়া আমাকে মিষ্টি বলে ডাকে।

—দীপুদা ?

—দাদা বিলেতে।

সুদীপ এখানে নেই, সেটুকুই যেন ভালো খবর। তাকে নিয়ে বাপীর মনো নাড়ানোর ইচ্ছে নেই। বলল, আমি মিষ্টি ছাড়া আর কিছু ডাকতে পারব না—

তার দিকে না ফিরে এবারে একটু নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল, তুমি আর তেমন ডাকা-ডাকির চান্স পাচ্ছ কোথায়।

বাপী ভিতরে ভিতরে থমকালো। এই জবাব আশা করেনি। আড় চোখে একবার দেখে নিয়ে হালকা গলায় জবাব দিয়ে বলল, আমি কোনো মানের ওপর নির্ভর করি না, গত আট বছর ধরেই ডেকে চলেছি, কোনো একটা দিনও বাদ পড়েনি।

মিষ্টি ঘাড় ফিরিয়ে সোজা তাকালো এবার। মুখ আরো একটু গম্ভীর। কিন্তু ঠোঁটে হাসির আভাস। চোখের কোণেও। সব বাপীর মনে হল এতক্ষণের সহজ সপ্রতিভতা থেকে ওর যেন একটু ছকাতে পারার চেষ্টা। মন্তব্যের সুরে মিষ্টি বলল, ভালো কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রসঙ্গ সরিয়ে দিল।— কফি খাবে তো বলে শেল, চা পাওয়া যাবে কোথায় ?

বাপী সচিন্তা অপ্রস্তুত।— তাই তো তোমাকে কাছে পেয়ে কেমন দিশেহারা লাগে, ভুলেই গেছলাম।

কাছে পাওয়ার কথাটা এমন নিঃসংকোচে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে মিষ্টি আবারও না ভাবিয়ে পারল না। বাপী বুঝল। কিন্তু বুকের ভিতরটা তার ভয়ঙ্কর এমন, মনে মুখে লাগাম নেই। বরং ওই মুখের বিড়ম্বনাটুকু বাসিয়ে দেখার মতো।

সামনের বড় রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়ল। পাশে মিষ্টি। বাপীর বাদশাই মেজাজ। পর্দা ঠেলে একটা ক্যাবিনে বসল। মুখোমুখি মিষ্টি। বেয়ারা হাজির।

—চায়ের সঙ্গে আর কি খাবে বলো।

দু চোখ মুখের ওপর তুলে মিষ্টি কিছু যেন বুঝতে চেষ্টা করল।— সেই সকাল দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সমস্ত দিনে তোমার খাওয়া হয়েছে কিছু ?

কথাগুলো একটু দরদের স্পর্শের মতো কানের ভিতর দিয়ে বুকের সিলে ওপাশে থাকল। বাপীর বুক ইচ্ছে হল মাথা নাড়ে, বলে হয়নি। বলা গেল না, এই দিনে কোনো মিথ্যের জায়গা নেই। সবই সত্যি জবাবই দিল।—ভাগ্যটাকে ভালো করার ফোঁকে অন্য দিনের থেকে আজ বরং ভালো খাওয়া হয়েছে।

—তাহলে শুধু চা-ই হোক।

—তা কখনো হয়। বাপী সাগ্রহে বেয়ারার মেনু কার্ড দেখতে লাগল। কিন্তু কি ছেড়ে কি আনতে বলবে ছেলে পেল না। আজ কোনো হিসেবের দিন নয়। মেনু কার্ড যা আছে সব আনতে বলাই ঠিক হয়।

কিন্তু চায়ের সঙ্গে মিষ্টি শুধু একটা মফিন ছাড়া আর কিছু নিতে রাজি হল না। অগত্যা দুজনেরই তাই। অর্ডার দিয়ে বেয়ারা চলে গেল। মিষ্টি বাপীর দিকেই চেয়ে আছে। ব্যস্ততা দেখে টিপটিপ হাসছে।

—ছেলেবেলায় তুমি কিন্তু বেশ খেতে ভালবাসতে।

মিষ্টি চট করে জবাব দিল, ছেলেবেলা আর কবিন থাকে।

বাপীর আবারও মনে হল, প্রথমিক উচ্ছ্বাসের পর এই মেয়ে নিজেকে একটু গুটিয়ে নিচ্ছে। কথা কম বলছে। শুনছে বেশি। দেখছে আরো বেশি। শোনা বা দেখাটা নিষ্প্রয়োজন নয় অবশ্য। দেখে শুনে না বুঝে পা ফেলার মতো শুধু নিজের সম্পর্কেই যেন সতর্ক একটু। অস্বাভাবিক নয়। বাপীর ছেলেবেলাটা এই মেয়ের কাছে এক বিষম স্মৃতি বটেই। তাই ছেলেবেলা নাকচ করে ওকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা।

কিন্তু বাপীর কাছে তার ছেলেবেলার জোরটাই সব। সেই জোরেই এ-মেয়ের আট দু-দুটো ক্লাস কামাই। সেই জোরেই আট বছর বাদে মুখোমুখি হবার সঙ্গে সঙ্গে কালো চোখের গভীরে আগ্রহের বন্যা। নিজেকে নিয়ে ও এখন একটু বিশেষী ভাবে উঠছে মনে হতে বাপীর মজাই লাগছে।

বয় বড় ডিশে দুটো ফিশ ফ্রাই এনে দুজনের সামনে রাখল। আনুষঙ্গিক টুকি-টাকি আরো কিছু সাজিয়ে দিয়ে গেল। অভ্যস্ত হাতে মিষ্টি কাটা-চামচ তুলে নিতে সপ্রতিভ মুখে বাপী বলল, আমি এখনো আধাজিই থেকে গেছি—এ দুটো ঠিক চলবে না।

জবাবে অতি আধুনিকভাব বক্তব্যভাস কিছু দেখা গেল না। বরং শুনে এবং বুঝে যা করল সেটুকু আরো মিষ্টি। নিজের কাটা-চামচ ডিশের এক পাশে রেখে বেল বাজালো। বয় আসতে বলল, ওয়াটার বোউল—

হাতের চায়ের পট আর পেয়ালা সমেত টেটা টেবিলে রেখে বয় গেল আর ফিরল আর এক ট্রেতে মাঝারি আকারের দুটো সাদা বাটি। তাতে হাত ধোয়ার গরম জল।

আট বছর বাদে দাক্ষিণ্যের ভরা ডালিসুদ্ধ খসে পড়ার মতোই দিন এটা। বাপীর দুচোখে লোভ চিকিয়ে উঠছে কিনা জানে না। উঠলেও এখন আর বাপী একে ঠিক লোভ বলতে রাজি নয়। সামনে যে বসে তাকে আর নিছক লোভের দোসর ভাবতে চায় না। আরো কিছু। ঢের বেশি কিছু।

মিষ্টি টান হয়ে বসে আছে এখন। পরিপুষ্ট দু হাতের কনুই টেবিলের ওপর, দু হাতের দু জোড়া আঙুলের মাথায় ফ্রাইটা ঝুলছে। অল্প অল্প দাঁতে কাটছে আর টুকটাক এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করছে, বাপী জবাব দেবে, না এই সহজ সুঠাম ভঙ্গীটুকু দেখবে ?

মিষ্টি পিসীর কথা জিজ্ঞাসা করল। তারপর বাবার কথা। কেউ নেই শুনে চাউনি যেন উতলা একটু।— তোমার আর কে থাকল তাহলে ?

কে থাকল বলায় একটা অদম্য লোভ ঠেলে উপর করতে চলল। কিন্তু চোখে গোপন থাকল না বোধ হয়। কারণ, এই চোখে চোখ পড়তে মিষ্টির দুহাতের আঙুলে ঝোলানো ফ্রাইয়ে বড় কামড় পড়ল একটা। চকচকে দাঁতের সারি দেখা গেল। দৃষ্টিও প্লেটের দিকে নেমে এলো।

একটু পরেই ঠোঁটের ফাঁকে আবার চাপা হাসি। তোমাদের সেই কলাবাগান খবর কি ?

প্রসঙ্গান্তর সন্দেহ নেই।— গত পনের-পাঁচ বছরের খবর রাখি না। তার আগে পর্যন্ত বছরে একবার করে সাধ্বী মেয়ের মতো বনমায়া সেই একই পুরুষ হাতিয়ে সঙ্গে শিকল ছিঁড়ে পালিয়েছে আর ওর সময় মতো ফিরেও এসেছে। এখনো সেই রকমই চলছে মনে হয়।

মিষ্টির মুখে লালের ছোপ একটু। সেবে বিড়ম্বনা ঢেকে আনা। তাড়াতাড়ি জিগেস করল, আর তোমার বলল শুধু সেই আবু রববানী ?

বাপী হাসছে মিটি মিটি।—কাঁটায়মান হবার পর সেও আর এফ ম্যাটম্যানের বউয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখেছিলাম। সেই লোকটা মদে বেহুঁশ হয়ে থাকে, আর হুঁশ ফিরলে বউ ঠেঙায়। আবু তার লিভার পচে মরার অপেক্ষায় ছিল, এতদিনে বউটাকে নিজের ঘরে এনে তুলতে পেরেছে বোধহয়।

(ক্রমশঃ)

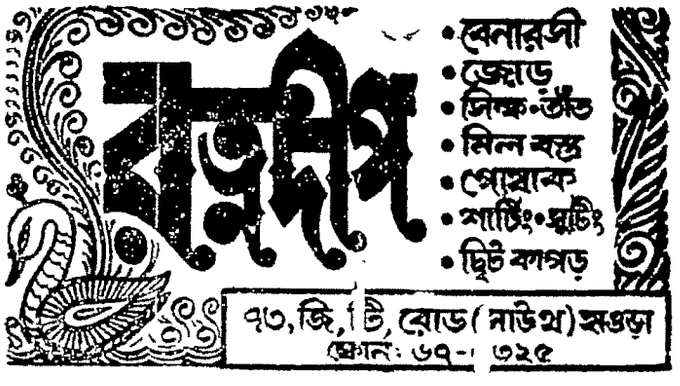

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

চিটকে চলে গিয়েছিল লিলি দূর থেকে।

লিলির সব চিন্তা ভাবনাই যে সেকেণ্ড-সেন্টার্ড, হয়তো সে ধারণা সঠিক নয়। যেমন দীর্ঘদিন পরে সেই সিনটার কথা যখন মনে পড়ছে, তখন শিলির ব্যবহার একটুও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। বরং কণাদ তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল, সেটাই অত্যন্ত অহিংস হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ স্বীকার করতে লজ্জা হয়, লিলির অনুপস্থিতিতে তার ব্যাগ স্যুটকেস, একটা বাচ্চা এ্যানালাইটিক ঘড়ি চুরি করেছিল কণাদ, তার কিছুটা পরেই। খেয়েদেয়ে টেবিল পরিষ্কার করে লিলি তখন বাথরুমে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছিল মাথা। যা হোক হবে বলে ওষুধ খেয়েছিল কণাদ। তারপর মিনিট দশের মধ্যে উপশম হয়েছিল যন্ত্রণার। ঘুমিয়ে পড়েছিল কষ্টের লাঘব হওয়াতে।

ঠিকভাবে বিচার করলে লিলির অনেক ব্যবহারেরই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেগুলোকে তার চারিত্রিক অসঙ্গতি বলে মনে হয়েছে একদা, হয়তো তার অনেক কিছুই নিতান্ত স্বাভাবিক। প্রথার দৃষ্টিতে বিচার করা হয়নি। কণাদের নিজের মনেই যে ছিল কিছুটা খুঁতখুঁতানি। সাঁতার চলমা পরে দেখলে স্বাভাবিক বস্তুবিচার করা চলে কি?

রায়দা, এই দেখুন-বরফ!

চমকে উঠল অনন্ত গোপুর কথায়। এতক্ষণ চড়াই ঠেলে ঠেলে আসছিল একঘেয়ে পাহাড়ের গায়ে সমতলভাবে কাটা পথে এসেছে প্রায় দুশো গজ মত বাস্তা। স্ফূর্তি কোথায়, কষ্ট হয়নি আসতে। নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে পথ চলছিল সে। গোপুর কথায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো সে।

সকলেই দেখছিল গাড়ির দিকে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফুট নিচে বয়ে যাচ্ছে ঝরনা। তার পাশে বিরাট একটা মসৃণ বরফের চাঙড় পড়ে আছে লম্বা-চওড়ায়। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে দেখছে অনন্ত। লম্বা বরফের চাঙড় ঝুলে আছে দু প্রান্তে। দীপু বলল ওপর থেকে গ্লাসিয়ার হয়েছে গতকালকার বৃষ্টিতে।

বাঁদিকের যে পাহাড়ের গা দিয়ে এসে বেরুচ্ছে তার চূড়া দেখতে পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই তার শিখরে বরফ জমে আছে। সেখান থেকে গড়িয়ে পড়েছে ওই মস্ত চাঙড়টা।

শুধু ওই একটা চাঙড় নয়। আরও অনেক বড় বড় বরফের টুকরো দেখতে পাওয়া গেল কিছুদূর যেতে যেতে। একটা টুকরো, ওজনে মনখানেক হবে নিশ্চয়ই, পড়ে আছে একেবারে পথের ধারে, আটকে আছে পাহাড়ের খাঁজে। সেটায় গায়ে হাত দিয়ে দেখছিল সবাই। আইস এ্যাক্স দিয়ে খোঁচা মেরে ভাঙতে চেষ্টা করছিল। পানুর অধ্যবসায়ের তুলনা নেই। সত্যিই সেই বরফের চাঙড়ের একটা প্রান্ত ভেঙে ফেলল সে। আর তখনি একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে গেল অনন্ত। বরফের ভেতর থেকে নীল রঙের একটা আভা বেরুচ্ছে। ঠিক যেন নীলকান্ত মণির আভা।

দীপু বলল, বেশি দাঁড়িও না, এখানে। কখন যায় না, আবার ধ্বস নামতে পারে। তাড়াতাড়ি সেরিয়ে চল এই জায়গাটা।

গোপু বলল, ঠিক। এখানে দাঁড়ানো বিপজ্জনক।

সবে সেতে উঠছে চড়াইটা না সেখান থেকে। অন্তত আধঘণ্টার টানছে বরফের নীচে আভা।

মৃদু হবার মত ঢালু আরও ছিল কাঁচাকাছি। বাঁ দিকের পাহাড় বলে হয়ে আসছিল কমশঃ। সেই পাহাড়ের গায়ে, কত ফার্লং লম্বা লম্বা ঘাস পাওয়া গেছে। সে ঘাসগুলির ডগায় বিচিত্র রঙের ফুল ফুটে আছে। তাদের পাশের নিচু ঢালু জমিতেও তেমনি সব সবুজ ঘাসের ছোট ছোট পাতা তার অন্তরাল কাঁটাযুক্ত এবং ফলের। একটা তাদের ফুলের গাছ ভালোভাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে। কিন্তু তাদের রঙের ভিন্নতা দেখে আশ্চর্য লাগে।

দীপু বলল চলুন আমরা এসে গেছি, একেবারে আর দু দিনেরই। একেবারে ফুলের ওপিচাল দিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবো আপনাকে। দেখে দেখে আশ মিটবে না।

পথ খুব সামান্য নেমে গেছে বলে মনে হয়। সামনে দেখা যাচ্ছে, একটা নিচু সবুজ পাহাড়ের অপর ঢালুতে নেমে গেছে পথটা। এই কি সেই ভ্যালী-অব-ফ্লাওয়ার্স? কিন্তু ফুল কই এখানে? সেকথাই সে বলে ফেলল একবার।

গোপু বলল, এখান থেকে ফুল বোঝা যায় না। ওপর থেকে নেমে তবে বোঝা যায়। আমরা দূর থেকে পাহাড়গুলোকে দেখছি। চলুন গিয়েই দেখবেন।

বাঁদিকের পাহাড়ের একটা বাঁক একেবারে মিশে গেছে উপত্যকায়। সোজা উত্তরে আর একটা অপেক্ষাকৃত নিচু পাহাড় উঠে গেছে ভ্যালীর প্রান্ত থেকে। দ্রুত পা চালিয়ে চলছিল সকলে। আশ পাশে পাহাড়ের গায়ে ফুলের ঝোপ ক্রমশঃ বেড়ে গেছে। নিচে কণাদ দেখতে পেল প্রচুর বাঁধন ফুলের গাছ। এক সময়ে কে যেন বলে উঠল, ভ্যালী-অব-ফ্লাওয়ার্স।

চোখের সামনে তখন সবুজে ঝোপে ঢাকা বিস্তীর্ণ উপত্যকা। পশ্চিম থেকে পুবে, উত্তর থেকে দক্ষিণে ঈষৎ ঢালু হয়ে নেমেছে। নিশ্ছিদ্র সেই সবুজে গালচের এ ধারে ওধারে দু-চারটে বিরাট বিরাট বোল্ডার মাথা জাগিয়ে পড়ে আছে। তার একটার আকার ছোটখাটো একটা একতলা বাড়ির মত। তার ঢেউ খেলানো ছাদে জনা সাত আট বালিত বসতে পারে অনায়াসে।

দীপু বিস্মিত হয়ে বলল, গোপুদা, ওই পাখিটা দেখেছ? ওটা তো আগে কখনো আমরা দেখিনি?

কানু বলল, উত্তরের ওই বরফটা থেকে গড়িয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।

পানু ফুল ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই পাখিটার দিকে। লম্বা লম্বা গাছের ডাটায় তার গলা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। চলমান টুপি পরা মুণ্ডুটা দেখে মনে হচ্ছে, অতিকায় একটা ভোমরা ফুলের বনে ইনস্পেকশান করতে বেরিয়েছে। আইস এ্যাকস দিয়ে দুধারের ঝোপ সরিয়ে যাচ্ছিল সে। পলকা ডাটা হেলে পড়ছিল পাশে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল অনন্ত। ফুল আছে প্রচুর, তবে সতেজ গাছগুলোর, লেলা উঁচু উঁচু ঝোপের আগের ফুল গুলো ভাল চোখে পড়ে না। শুধু উত্তর এবং পশ্চিমের যে পাহাড় দুটো এসে মিশেছে ভ্যালীতে তাদের গায়ে যে ফুল বেশি ঢালু হয়ে নেমেছে সেখানে ফুলের রঙ বাহার চোখে লাগার মত। লাল, হলুদ, জাফরানী লাল, কমলা, মেরুন, ভায়োলেট,

এমন কি নীল রঙের ফুলই বা কত। কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তখনই মনে হয় চালশে ধরা চোখের দৃষ্টির মত, কাছাকাছি এলেই এর সৌন্দর্য আর চোখে ধরবে না।

কসরৎ করে পাথরটার মাথার ওপরে চড়ে বসেছিল পানু। ডাক দিয়ে বলল, ভাইপো, চলে এস এখানে। দেখে যাও, কি বি-বি-বিউটিফুল লাগছে।

গড় গড় করে সকলে সেই পথ ধরে চলল। পানু ওপর থেকে ডিরেকসান দিচ্ছিল, একটু ঘুরে গিয়ে বাঁ দিক দিয়ে ওঠা সহজ। শেষ সিং ছাগল ছানার মত লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল ওপরে। দীপু আতঙ্কে উঠেছিল তার কাণ্ড দেখে। আর একটু হলে ওর গলায় ঝোলানো ফ্লাক্সটা পাথরের কানায় লেগে চূর্ণ হয়ে যেত।

পাথরটার ওপারে এর আগে কারা যেন এসেছিল। পাথরের ওপরে লিখে রেখে গেছে চকখড়ি দিয়ে। ভাল পড়া যায় না। আর রেখে গেছে কিছু টিন মোড়া পাতলা কাগজ একটা পাথরের টুকরো চাপা দিয়ে। ঝড়ে বৃষ্টিতে সেগুলো যে টিকে আছে এখনও, দেখে অবাক হতে হয়। দীপু বলল, কয়েকদিন আগেই এসেছিল হয় তো। গত বছরের নিশ্চয়ই নয়।

দাঁড়িয়েছিল অনন্ত সেই পাথরটার ওপরে। এখান থেকে সমস্ত ভ্যালীটা চোখে পড়ে। তবে কাছাকাছি যেসব ফুলের ঝোপ পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে, কেবলমাত্র তাদের ফুলগুলোই দেখতে পাওয়া যায় ভাল করে। আর দেখতে পাওয়া যায় দূরের পাহাড়ের গায়ে ফুলের কার্পেট। ঠিক যেন মনে হচ্ছে পাড়াগাঁয়ের কোন বয়স্কা কাঁথা-শিল্পী নানা-রঙের পাড়ের সুতো তুলে সবুজ কার্পেটের ওপরে নক্সা বুনেছে। সে নকসার ছিরি-ছাঁদ একটুও সিমেট্রিক্যাল নয়। কিন্তু তাতে সৌন্দর্যের হানি হয়নি। বরং খুব স্বাভাবিকভাবেই মনকে টানে। বিশেষ জ্যামিতিক প্যাটার্নের মধ্যে যে কৃত্রিমতা থাকে, এখানে তার অভাবটাই যেন সৌন্দর্যের উৎস।

কাছাকাছি চারপাশের ফুল এবারে দেখার চেষ্টা করল অনন্ত। একটু বোটানিক্যাল জ্ঞান থাকলে বড় ভাল হত। আমরা একে বলি সিজন্ ফ্ল্যাওয়ার, ভাবছিল সে, অনেক ফুলেই সেই ধরনের। এ বিষয়ে বিশেষ জানার সুযোগ হয়নি কখনো। নিউমার্কেটে ফুল কিনতে হয়েছে অনেক সময়েই, কিন্তু জ্যানিটি আহত হবে বলে নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি। খুব ছোট ছোট, আকারে সাবুদানার মত সাদা রঙের ফুল সরু ডাঁটির মাথায় ঝাঁকড়া হয়ে ফুটে আছে। ডাঁটির গায়ে সরু পাতা। ফুল প্রচুর দেখা যায় দোকানে। কস্‌মস্ ফুল সহজেই চেনা যায়, আর চেনা যায় জিনিয়া। শীতকালে ফ্ল্যাওয়ার শোতে গিয়েছিল একবার লিলির সঙ্গে, তারই আগ্রহাতিশয্যে। ভাল লেগেছিল। কিন্তু খুব বিরক্তি লাগছিল, যখন প্রতিটি ফুলের নাম জানতে চাইছিল লিলি। ফ্ল্যাওয়ার শো করে অথচ তাদের সঙ্গে নামটা দিয়ে দেয় না। তাছাড়া ডালিয়া, কিসান্থিমাম, এই ধরনের ফুলই সেসব জায়গায় বেশি। সে ফুল এখানে নেই। তবে একেবারে নেই বলাও বোধহয় ভুল। কারণ একটু দূরে, দেখতে পাচ্ছিল অনন্ত, ছোটখাটো ডালিয়ার মত ফুল ফুটে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। অবশ্য ডালিয়া না হয়ে সূর্যমুখীও হতে পারে ওগুলি। দূর থেকে ঠিক বোঝা দুঃসাধ্য। সংকোচের মাথা খেয়ে গোপুকে জিজ্ঞাসা করল সে, আচ্ছা, এই যে সব ফুল দেখাচ্ছেন, এদের নাম আপনারা জানেন?

পাগল হয়েছেন দাদা? গোপু হাসল। একটা ফুল চিনি বলুন না আমরা? কানু অবিশ্যি আমাদের মধ্যে সায়েব। ও এসব খবর একটু বেশি রাখে। বাকি আমরা সবাই ইগনোরেন্ট। অবশ্য এখানে দাঁড়িয়ে নাম নিয়ে কচকচি করেই বা কি হবে? মহাজনেরা বলে গেছেন, নামে কি আসে যায়? গোলাপকে যে নামেই ডাকো সে সুগন্ধ বিতরণ করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধরেই ফুলকে চিনে নেওয়া যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়।

দীপু বলল, বাব্বাঃ, তুমি একসঙ্গে অনেক জ্ঞান দিয়ে দিলে যে গোপুদা।

গোপু হেসে বলল, দিতে আর পারলাম কই। অক্ষমতা প্রকাশ করলাম বলতে পার। কানু, রায়দাকে দু-একটা ফুল চিনিয়ে দাও না।

কানু খুব স্মার্টলি ঘাড় দাঁড়িয়ে বলল, ওঃ, আপনি ফুল চিনতে চান? নাম বলে দিতে পারি; তবে কারেক্ট বলছি কিনা সে গ্যারান্টি দিতে পারব না। ওগুলো কসমস, চেনেন নিশ্চয়ই, ওই ওপাশে জিনিয়া, তাও চেনেন? ইনি মেবী গোল্ড, আমাদের গাঁদার সমগোত্রীয়। এখানে বুনো গাঁদা বলতে পারেন। ওইগুলো সম্ভবত প্রীমুলা, ওই ওপাশে পোর্টেনচিলা, তারও পরে, একটু বাঁ ধারে এ্যানিমোন, আর ওই নীলফুলগুলো বুঝতেই পারছেন, বল্-বেল। আর আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, দোহাই, ধরা পড়ে যাব। হাসতে থাকল সে।

না, তারা বৈজ্ঞানিক নয়, সৌখীন পুষ্পবিলাসীও নয় যে বন্ধুদের চা খাওয়াতে ডেকে ছাদের বাগানে ফুলের পরিচয় দেবে গর্বভরে। জানতে ইচ্ছে হয় ঠিকই। তবু সেই অনুসন্ধিৎসা যেন দেখার আনন্দকে ছাপিয়ে না ওঠে।

আচ্ছা কানুবাবু, ওগুলো বাটন হোল না? খুব কাছের একগুচ্ছ ফুল দেখাল অনন্ত। একবার দেখে কানু ঘাড় নেড়ে হুঁ বলে অন্যদিকে মন দিল।

দেখতে থাকল অনন্ত। চেনা ফুল কস্‌মস্ অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। আরও বহু জায়গাতেও আছে নিশ্চয়ই, এখান থেকে দেখা সম্ভব নয়। সেই কস্‌মস্ কত রঙের হতে পারে এখানে যেন তার পরীক্ষা করা হয়েছে। একই ফুলে যেন ছত্রিশ রকমের শেড। মেরুন থেকে ভায়োলেট, সব রঙ আছে। না, দুটো রঙ নেই কালো আর সবুজ। অবশ্য লাইট সবুজ এক ধরনের ফুল দেখা যাচ্ছে। পাপড়িগুলো যেন শঙ্কুর মত আর্কাড আর্কাড। কি নাম ওগুলোর? আর জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় না। হয়তো ওরাও জানে না নাম।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করল অনন্ত, এক রঙের ফুল অন্য রঙের ফুলের সঙ্গে মিশল খানিক, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে নিজেদের। তার ফলে দূরের পাহাড়ের গায়ে চিত্রিত কার্পেটের মত দেখাচ্ছে ফুলের সমাবেশ। এভাবে এক কাছ থেকে দেখে এই ফুল বাগানের শোভা অনুভব করা খুব শক্ত। পাহাড়ের ওপর থেকে যদি দেখা যেত, তবেই বুঝতে পারা যেত, রঙিন গালচের মাঝখানে বসে আছে তারা।

ঘণ্টা দেড়েক বসেছিল তারা সেই পাথরের ছাদে। তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য খাওয়া-দাওয়া হল। কানু বিস্কুট আর চানাচুর এনেছিল কিসের সঙ্গে।

দীপু বলল, চোদ্দ হাজার ফুট হলস্টিচুডে ফুলের বাগানের মধ্যে বসে পিকনিক করছেন। আমাদের একটা ধন্যবাদ দেবেন নিশ্চয়ই?

গোপু বলল, একটা অশোভনো ধন্যবাদ নিয়ে ছোট হবে কেন লীলার?

অনন্ত বলল, ঠিক বলেছেন গোপুদা। ধন্যবাদ দেওয়াটা অত্যন্ত ছোঁদো ব্যাপার। সমস্ত জীবন ধরে এই ছোঁদো ব্যাপারগুলোই বেশি মূল্য পায়। কিন্তু এখানে হিমালয়ের কোলে নাইবা তাকে মূল্য দিলাম? ধন্যবাদ জানানো বলুন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বলুন, সেই মুখের কথায় কি এই পাওয়ার, এই আনন্দের সামান্য ঋণশোধ হবে?

ওরা সবাই চুপ করে গেল। অনন্ত কাদের সঙ্গে খুব কম কথা বলে। একসঙ্গে এতগুলো কথা এর আগে বলেনি। তাই বিস্মিত হয়েছিল ওরা।

দীপু অপ্রতিভ হয়ে বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা আপনার কেমন লাগছে বলুন? ভ্যালী-অব-ফ্ল্যাওয়ার্স সম্পর্কে আপনার ইম্প্রেশন কি?

হেসে অনন্ত বলল, আমি তো ভাল দেখতে পেলাম না।

সেকি? সবাই অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে।

অনন্ত বলল, কোথায় দেখতে পেলাম বলুন? মেঝেয় বড়-বেরঙের কার্পেট পাতা থাকে দেখেছেন তো? আমি একটা খুব দামী কার্পেট দেখেছিলাম দিল্লীতে একটা এক্সহিবিশনে। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দামের কার্পেট। তার পশম খুব সফট্, একটু ঘোলাটে ওটা। সেই কার্পেটটা মনে করুন

বিছোনো আছে মেঝেয়। একটা পিঁপড়ে যদি সেই কার্পেটের ওপর চলাফেরা করে, সে কি করে বুঝবে তার সৌন্দর্য? অবশ্য ধরে নিলাম তার সেই সৌন্দর্য বোধ আছে। আমি কি বলতে চাইছি, বুঝতে পারছেন তো? ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা যদি ওই পাহাড়ের ওধারের হ্যাম্পটার ওপরে গিয়ে বসতে পেতাম, তাহলে এই ফুল বাগানের শোভা ঠিক বুঝতে পারতাম।

গোপু বলল, কারেক্ট্, ভেরি কারেক্ট্। ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ওই রকম জায়গা থেকেই প্রথম দেখেছিলেন এই ভ্যালীটাকে। আর সেই জন্যেই তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন। রায়দা খুব খাঁটি কথা বলেছেন।

সায় দিল ওরা সে কথায়। বিশেষ করে কানুর মাথা নাড়া এবং উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল, অনন্তর মতের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সায় আছে।

দীপু বলল, চলুন এবার আপনাকে আর একটা জিনিস দেখিয়ে আনি। গোপুদা, মেমোরিয়ালটা ওই ধারে না? পুবে যেখানে ভ্যালীটা ঢালু হয়ে মিশেছে স্বর্ণার সঙ্গে, সেই দিকে ইঙ্গিত করল দীপু।

গোপু বলল, মনে হয় ওখানেই হবে। শের সিং, তুম জানতা হ্যায় ক্যাঁহা মেমসাবকা কবর হ্যায়?

জী হাঁ, সোৎসাহে জানাল শের সিং। ঊঁহাই তো হোগা। দীপুর নির্দেশিত জায়গা দেখাল সে।

দীপু বলল, চলো হামারা সাথ। কানু, যাবি নাকি?

কানু বলল, না তোরা দেখে আয়।

গোপু বলল, হুঁ, তুমি বারান্দাকে দেখিয়ে নিয়ে এস। আমরা এখানে রইলাম।

আবার ফুলের গাছ মাড়িয়ে পথ চলা। খুব খারাপ লাগে ফুলে ভরা নরম পলকা ডাঁটাগুলো পায়ে দলতে। তাছাড়া কাদা হয়ে আছে নিচে। জুতোর তলায় স্লথ-কাদা প্যাচ-প্যাচ করতে থাকলে বিরক্তি লাগে।

অবশেষে ঢালু জমির কাছে, ঘাসের ফাঁকে, বেশ কিছু বোল্ডার সাজানো দেখা গেল। নিচে বয়ে যাচ্ছে সেতস্বিনী অবনা। একটা পাথরের ফলকে অস্পষ্ট লেখা, হিয়ার লাইজ মিসেস জ্যোয়ান মার্গারেট নেগী। কিউয়েটার রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন, লন্ডন। ভাল পড়া যায় না সে লেখা। বহু দিনের অবহাওয়া, জীর্ণ লেখার পাঠোদ্ধার করা শক্ত। তাছাড়া খুব কাছে গিয়ে দেখা সম্ভব হল না। হঠাৎ মাটি ধসে গেছে প্রস্তর ফলকটির পাঁচ-ছয় হাত আগে।

ফিরে এল ওরা। দীপু বলল, কটা বাজল দেখুন তো? এবারে ফেরা উচিত, কি বলেন?

ঘড়িতে দেখা গেল সাড়ে চারটে বাজে। দীপু ব্যস্ত হয়ে শের সিংকে নিয়ে ফেরার জন্যে পাহাড়ের গায়ের রাস্তার ওপরে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে পাথরের ওপরে বসে থাকা চারমূর্তিকে কেমন অতিপ্রাকৃত কিছু বলে মনে হচ্ছিল। যতদূর চোখ যায়, এধার থেকে ওধারে সামান্য ঢালু হয়ে নেমে গেছে সবুজ ঝোপ। তাদের আগায় রঙ-বেরঙের ফুল। মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে আছে বেঢপ কয়েকটা পাথর। তারই একটার ওপরে অতিকায় কয়েকটা পোকার মত লাগছে ওদের দূর থেকে।

ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে আসছিল অনন্ত। চেনা রাস্তা, নেমে গেছে ধীরে ধীরে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এখনো এক ঘন্টারও বেশি বেলা আছে। পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য চলে যাবে হয়তো আর আধ-ঘন্টার মধ্যে। তবু আকাশ জুড়ে যে আলোর আভা থাকবে, তার পরমায়ু আরও ঘন্টাখানেক তো বটেই। কালকেই সেটা দেখা গেছে।

গল্প করতে করতে চলেছে দীপুরা। ওদের সামনে শতোপন্থ অভিযানের চিন্তা। ভ্যালী অব-ফ্লাওয়ার্সটা সেই অভিযানের অঙ্গীভূত নয়। একটু প্লেজেন্ট ডায়রিয়েশন মাত্র। অনন্তর যাত্রা এখানেই শেষ। কাল যাবে লোকপাল হেমকুন্ড্। কিন্তু এখনো মনস্থির করতে পারেনি অনন্ত। আটটা দিন হয়ে গেল, নিজের মুখোমুখি বসা হয়নি ভাল করে। একবার খতিয়ে দেখা দরকার, হঠকারিতা করে যে চলে এল সে এতদূরে, কি পেল তাতে, কিই বা হারালো।

খুব একটা প্রত্যাশা নিয়ে সে আসেনি আজ। তাই আশাভঙ্গের কারণ ঘটেনি। বরং বলা যেতে পারে, অতিরিক্ত কিছু লাভ হয়েছে তার। ভাঙা বরফের চাঙড়ের ভেতর থেকে যে নীলচে আভা বেরুচ্ছিল, সেটার স্মৃতি কোনদিন মুছবে না মন থেকে। আর মনে থাকবে মার্গারেট নেগীর সমাধি। ভদ্র-মহিলা কিসের আকর্ষণে এসেছিলেন এখানে, সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়েছিল কিনা, কিছুই জানা নেই। স্বদেশ এবং জন্মভূমির অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে ছুটে এসে-ছিলেন হিমালয়ের এই পুষ্পিত উপত্যকায়। লোকচক্ষের আড়ালে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করার সময়ে আপন হঠকারিতার জন্যে কি অনুশোচনা হয়েছিল তাঁর? না কি যে পথ-যাত্রীর সন্ধানে এসেছিলেন, তার স্বাদ পেয়ে পরিপূর্ণ মনে সেই নন্দনকাননের এক প্রান্তে আত্মোৎসর্গ করার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন?

৩০

পশ্চিমে বারান্দা থেকে আগের দিনের মত তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়ায় পড়ন্ত সূর্য-রশ্মির খেলা দেখা গেল কিছুক্ষণের জন্য। কানুরা চায়ের ব্যবস্থা করছে। গোপু কিছু একটা পড়ছে বিকেলের আলোয়। দীপু এখনো আসেনি।

ঘাংবিয়া নেমে আসার সময়েই দূর থেকে রোশনদের পোর্টারের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। তার কাছ থেকে জানা গিয়েছিল, আর একজন পোর্টারের সঙ্গে আসছে সকলে জলের পথে। খুব কষ্ট হয়েছে ওদের আসতে। বহুবার বিশ্রাম নিয়ে তবে আসতে পেরেছে। এতক্ষণ একসঙ্গে আসছিল সকলে, এখন ছেড়ে দিয়েছে তাকে। গুরুদুয়ারা গিয়ে সংবাদ দেওয়ার জন্য।

দীপু দাঁড়িয়ে গেল। বলল, তোমরা যাও গোপুদা। আমি একটু অপেক্ষা করে দেখা করে যাই। কাল ওরা হেমকুন্ড্ যেতে পারবে কিনা জানা দরকার।

আশু বলল, কাল যদি ওরা যেতে না পারে, তবে আমরা কি এখানে একদিন অপেক্ষা করব?

ঠাট্টা করছিস?

এইরকম সিরিয়স ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করা চলে? রোশনের সঙ্গে একসাথে লোক-পাল হেমকুন্ড যাওয়ার জন্যেই তো এখানে আসা। কি বল গোপুদা?

গোপু কোন উত্তর দিল না। কানু বলল, কেন ঘাঁটাচ্ছিস ওকে। ওর রোশন-কুমারী কত কষ্ট করে চড়াই ভেঙে উঠে আসছে এখানে। এখনো এসে পৌঁছোয়নি। হেসে ফেলল সে।

গোপু বলল, ঠিক আছে, তুমি অপেক্ষা কর। আমরা যাচ্ছি।

ওরা চলে আসবার পর আধ ঘন্টারও বেশি সময় কেটে গেল। চা তৈরী করে সকলকে পরিবেশন করল কানু। দীপুর দেখা নেই। আশু একটু বিরক্ত হয়েছে মনে হল। বিরক্ত হয়েছে কানুও। দীপু সম্পর্কে সকলের মনেই বিশেষ বোধ আছে। তার লীডারশিপ হাসিমুখে মেনে নেয় সবাই। খুব আপত্তিকর না হলে তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানতে চেষ্টা করে। কিন্তু এটা কি করছে সে? নিচু গলায় আলোচনা করছিল আশু আর কানু। মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিল পানু। বারান্দা থেকে ওদের ভাল দেখা যায় না, কথা শুনতে পাওয়া যায় অস্পষ্ট অল্প।

আশু বলছিল, কি ছেলেমানুষী করছে বল তো দীপুটা?

কানু বলল, দীপুর বয়েস হয়েছে। এই অঞ্চলে শিখদের যথেষ্ট হোল্ড। আর কি রকম গোঁড়া ওরা দেখেছিস তো?

পানু বলল, দিন-নিজেও মারধোর খাবে, আমাদেরও খাওয়াবে।

কানু প্রতিবাদ করে বলল, আমি অবশ্য ততদূর ভাবছি না। দীপু মাথে মাঝে অবুঝ হয়ে যায় বটে, তবে একেবারে নির্বোধ নয়। কিন্তু নিজেকে রেসটেন্স না করলে শুধু শুধু অশান্তি পাকিয়ে বসে থাকবে।

আশু বলল, সে কথাই তো বলছি। ওর এই বাড়াবাড়িটা মোটেই ভাল লাগছে না।

পানু বলল, সবাই মিলে বলা হোক ওকে।

[চলবে]

হাওয়া গাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ বাইশ ॥

লতা মঙ্গেশকর আন্ধেরি স্টুডিওতে রেকর্ডিং করে এয়ার কন্ডিশনড্ ভলভো গাড়িতে উঠলো। টাপু দাঁড়িয়েছিল দরজায়। গাড়ি স্টার্ট নিয়েও লতার কথায় থামলো। লতা দরজা একটু খুলে তাকালো।

লতাজী। আপনি আমায় ডেকেছিলেন ?

আপকো ? কিউ ?

আমিই গিটার বাজাচ্ছিলাম—

ও হ্যাঁ। হাতটা সুন্দর। উঠে এসো—

খুব সাবধানে টাপু ভেতরে এসে বসলে লতা নিজেই দরজা টেনে দিলো। তুমিই তাহলে সেই নতুন মিউজিক ব্যান্ড। তোমার স্ট্রোক বড় সুন্দর। গাইবার সময় তোমার স্ট্রোক আমার কানে লেগে ছিলো। আবপরেই তোমার খোঁজ করলাম।

আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

আর কে স্টুডিওতে একটা রেকর্ডিং আছে। সি রামচন্দ্রর সুরে—

ম্যায় ওয়ারি ওয়ারি যাউ—গানটা আপনার গলায় এত সুন্দর।

আমার গলার কথা বাদ দাও। রেকর্ডিংয়ের সময়টায় একটু বসবে। তারপর আমার সঙ্গে বেরুবে—

আর কে স্টুডিওতে ঘন্টা তিনেক বসতে হোল টাপুকে। সন্ধ্যের মুখে দেখা গেল—সে লতা মঙ্গেশকরের লিভিংরুমে বসে আছে। লতা খোঁপা ভেঙে দিয়ে বসলো। সারাদিনে তিনখানা গানের রেকর্ডিং ছিলো মোট। আটোসাটো সুরের ভেতর গলাকে খেলতে দেওয়াই তাঁর কাজ। বিশ বছর এই চলছে। সে বুঝতেই পারছিলো—নতুন হেঁয়ালিটা তার সামনে অস্বস্তিতে পড়েছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। লতা তার ফ্যান মেইল মেলে ধরলো কার্পেটের ওপর। দ্যাখো তো। কলকাতার কোন চিঠি আছে কি না ?

বাংলার লেখা একখানা চিঠিতে চোখ আটকে গেল টাপুর। টাপু চিঠিখানা পড়ে শোনালো লতাকে।

মাননীয় লতাজী,

আমি গত পনেরো বছর আপনার গান শুনিয়া আসিতেছি। আপনার কণ্ঠ আমার কাছে স্বর্গের ঝরনা। এ কণ্ঠস্বর আমাকে পাগল করে। আমি সামান্য গান শিখিয়াছি। আপনি যদি একবার পরীক্ষা করিয়া দ্যাখেন তবে সারা জন্ম কৃতজ্ঞ থাকিব। আমার জীবনের একমাত্র বাসনা—আপনার সঙ্গে একবার একটি রেকর্ডে ডুয়েট গাহিব। আমি আগে বাবে গাহিতাম। তারপর বালি বোঝাই দিয়া লরি চালাইতাম। আবার গান গাহিতেছি। এই ডুয়েট গানখানা রেকর্ড হইলে আশা করি সারা ভারতবর্ষ সে গান চিরকাল স্মরণ করিবে।

আপনি আমার শতকোটি নমস্কার জানিবেন।

ইতি—
বিনীত
গোপাল

পুনশ্চ : ঠিকানা রহিল। আপনার চিঠি পাইলেই দেখা করিব।

টাপু বললো, অনেক চিঠি পান আপনি—

বর্ষাকালেই বেশি চিঠি আসে। বম্বাই অউর গুজরাটসে—। আচ্ছা টাপু, তুমি একদিন বম্বে টি ভি-তে সোলো বাজাও না—

কে আমায় প্রোগ্রাম দেবে। কে আমায় চেনে!

লতা মঙ্গেশকর একথায় একটু হাসলো।

এই সন্ধ্যেবেলার ঠিক একুশ দিন পরে বম্বের টি ভি স্টুডিয়ো নবীন সুরকার টাপু পালিত ইলেকট্রিক গিটারে ওয়েস্টার্ন বাজালো। পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সন্ধ্যে ছটা পনেরো থেকে সাতটা।

গেস্টার বম্বের বাসিন্দারা তাদের টি ভিতে যখন এ-প্রোগ্রাম শুনছিলো, দেখছিলো—ঠিক তখন পাটনায় বসে আরো কয়েকজন একই সঙ্গে টি ভি-তে টাপু পালিতকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিলো।

রাজগৃহ হোটেলের এমারজেন্সি সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে চওড়া মত বসবার জায়গায় বসে। দরবারীলালের মালটি চ্যানেল টি ভি হংকং থেকে আনানো। এ টি ভি-র কোন লাইসেন্স করেনি সে। আন্দাজে নব ঘোরাতে ঘোরাতে বম্বের প্রোগ্রামে টাপুর মুখখানা স্ক্রিনে ফুটে উঠতেই দরবারীলাল চেঁচিয়ে উঠলো এই তো সে। ওহি ছোগরা—লোগোবো পাণ্ডা। ওরাই আমার কাগজপত্র নিয়ে পালিয়েছে। আমার এই হয়রানীর জন্যে ওরাই দায়ী। ওদের আমি এবার কাঁচা খেয়ে নেবো। ভকিলসাব। বুম্বাই মে খবর করিয়ে—

আর্ডার করো—

কলকাত্তাকে পুরা ঠিকানা কা ইন্তেজাম কিজিয়ে—

টাপু এসবের কিছুই জানলো না সে লতাজীর বাড়ি বসে প্রোগ্রাম শুনছিলো। কার্পেটে বসে। মারাঠী ছবির একজন প্রোডিউসার বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে লতাজী আজই তাকে ইন্টেরডিউস করেছে। এই প্রথম টাপু আস্ত একটা ছায়াছবির সুরকার হতে চলেছে।

লতাজীর লিভিংরুমটা বিরাট। একটু পরেই টাপু সুরকার হিসেবে সাইন করবে। মারাঠী ছবি দিয়েই তার শুরু হোলো। আজ যদি দাদু শুনতেন—তাহলে কী খুশীই না হতেন। দিলীপদাকে কাল সকালেই একটা চিঠি লিখবে টাপু। শুরু করবে এইভাবে—তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, আমি একটি মারাঠী ছবির.... চলে আসাব। আগে কী অপমানটাই করেছিল লতাজী আবছা অন্ধকারে বসে আছে—যেন সুরের দেবী। সারা ঘরের দেওয়াল জুড়ে চন্দন কাঠের প্যানেল।

সাউথ ক্যালকাটার চেতলায় তখন লোডশেডিং। দোতলার খুল বারন্দা থেকে মালবিকা দেখলো, মেজদা মানে খোকনদা স্টোপর মাথায় ঘোড়ারগাড়ি থেকে নামছে। সবার অমতে খোকন পালিত বিয়ে করতে গিয়েছিলো। এই এখন নতুন বউ নিয়ে ফিরলো। মালবিকার কোলে খোকন পালিতের ছেলে দুলে উঠলো, পিসি। বাবা—।

মালবিকা বললো, চুপ করো।

ছেলে সুড়ুৎ করে পিসির কোল থেকে নেমে টলে টলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। মালবিকার খুব রাগ হচ্ছিলো। বারণ না শুনে মা পাড়ার ডেকরেটিং দোকান থেকে হ্যাজাক ভাড়া করে আনিয়েছে। বউ বরণ করতে হবে না। বিয়ে করেছে তো বেশ করেছে খোকন। সারাজীবন এইটুকু ছেলে বিবাগী হয়ে থাকবে?

বাবা উকিলবাড়ি। এখন পাকা মামলার ঢিলে দিয়ে কিসীটি পালিত ঘুঁটি কাঁচাতে চায় না। বাচ্চু নিশ্চয় বিশ্বনাথের ল্যাংবোট ছয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সিঁড়িতে কান্না শুনেই ছুটে গেলা মালবিকা। নিশ্চয় নামতে গিয়ে পড়ে গেছে। অতটুকু ছেলেকে একা নামতে দেওয়া উচিত হয়নি তার। বড় তাড়াতাড়ি নামা দরকার—মালবিকা তা পারলো না। অনেক-দিন পরে দৌড় তার দু'পায়ের হাঁটুতেই ভয়ংকর ব্যথা হয়েছে।

মালবিকা যখন সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পৌঁছলো—তখন নতুন বউ নিয়ে মেজদা একদম হ্যাজাকের আলোর নিচে। মা বরণ করছিলো। মালবিকা বাধ্য হয়ে বাচ্চাটাকে গিয়ে কোলে তুলে নিলো।

মা ঘুরে তাকালো মালবিকার দিকে। আজ ওকে একটা নতুন শাড়া পরাতে পারিসনি? আজ খোকনের বে—। যা। নিয়ে যা সামনের থেকে। বাপের বে দেখতে নেই। অকল্যাণ হয় বাপের—

মালবিকা কিছু না বলে ওকে কোলে নিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলা দুম দুম করে। এ-বাড়িতে সে এখন একঘরে আনওয়ান্টেড্। এ বাজারে কোন্ সংসারে বিয়ের পর এক ছেলের মা অ্যাথেলেট্ হবার জন্যে বাপের বাড়ি ফিরে আসে! শুধু বাবা বলেছে মালবিকাকে—কোনো ভয় নেই খুকু। আমি আছি তোর পেছনে। তুই চালিয়ে যা। মন যা বলবে তাই করবি।

কিন্তু সব কথা তো বাবাকে সব সময় বলা যায় না। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার মামলাটা নাকি শেষবার মুখে। এখন এসব কথা বলে বাবাকে ডিস্টার্ব করা যায় না।

মা প্রবল জোরে উলু দিচ্ছিলো। উলুধ্বনিতে মালবিকার মনের ভেতরে সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন দশতলার ওপর আরও ছোট একটি বাচ্চার কথা মনে পড়তেই মালবিকা দু'হাত বাড়িয়ে তার মেজদার ছেলেকে ডাকলো, আয়। কোলে আয়—

মহানন্দার তীরে কোন লোডশেডিং নেই। সেখানে শুকনো বালির ওপর বার বার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গাঁয়ের মেয়েরা এইমাত্র চলে গেল। বালির ওপর দিয়ে আরও অনেকটা হাঁটলে তবে মহানন্দার জলের দেখা পাওয়া যায়। প্রথম যৌবনে বৃন্দাবন পালিত কলকাতা থেকে স্টিমারে এ-নদীতে এসেছে। আর এখন! বর্ষাকাল ছাড়া নৌকো চলে না।

আজ সন্ধ্যে থেকেই বৃন্দাবনের খুব অবাক লাগছে। যেন অন্য কোন একজন মানুষের কথা সে ভেবে আসছিলো। আচমকা সেই মানুষটার সঙ্গে তার নিজের জীবন মিলে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কি আরও একজন বৃন্দাবন পালিত আছে? একটু একটু করে অনেক কিছু তার মনে পড়ছে। এসব এতদিন সে ভুলে ছিলো কি করে? আশ্চর্য! আমার একজন ছেলে আছে। অথচ তার কথা—তাদের কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ছেলে কিরীটী। তার মেজো ছেলে খোকন। খোকন বিপত্নীক। আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতো। একতলার ঘরে। মেঘে জ্যোৎস্নায় সামান্য বাতাস উঠে একটার পর একটা প্রদীপ নিভিয়ে দিচ্ছিলো। সেই আবছা অন্ধকারে বসে বৃন্দাবন পালিত সন্ধ্যার সাজানো মানতের শশা, গুড়, বুনোফল কচকচ করে খাচ্ছিলো। এখন তাকে এ অবস্থায় দেখলে গাঁয়ের মেয়েরা ভয় পেয়ে যেতো। পাকা দাড়িতে অনেকটা গুড় লেগে গেছে। মাথার জট। গায়ের চাদরের সঙ্গে কাদের দেওয়া একটা শার্ট প্রায় চাদরটা হয়ে মিশে আছে। কতকাল চান করেনি—মনে নেই বৃন্দাবন। নদীর পার থেকেই লবঙ্গীর জঙ্গল। সেখান থেকে পাখিদের ঘুমের আয়োজনের শব্দ আসছিলো।

দেশের গাঁ ঘরে বানানো গুড় এমনি গুড়ের চেয়ে কিছু মিষ্টি হয়। বিকেলের দিকে গাঁয়ের মেয়ে বউরা এসেছিলো গান করতে করতে। থালি সাজিয়ে সাজিয়ে পাহাড় করেছে। প্রতি চুড়োয় একটা করে সেই বুনো ফল। লবঙ্গীর জঙ্গল থেকে এ-ফল আসে। [illegible]

সর্বাঙ্গে। পাখিতে খায়। মানুষে খায়। আবার ঘাসের হাত জিনজিরে গরুগুলো। চরতে বেরিয়ে যায়। বাঘালবাও খায়।

ভীষণ খিদের চোটে গুড় দিয়ে পরান্নদের মানতের ফল্লা খেতে খেতে সব মনে পড়ে গেছে বৃন্দাবনের। তখন সব ক'টা গ্রহদীপ নিভে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে দিন কয়েক হোল সে এ তল্লাটে এসেছে। পথে রঘুনাথগঞ্জ স্টেশনে বোধহয় বেলেস লোক-জন তাকে নামিয়ে দিয়েছিল। এর আগে সে আরেকটা নদীর পারে মাস কয়েক গান করেছে। সেখানকার লোকজন রোজ বিকেলে মালশাট করে ভাতভোগ দিয়ে যেত। জায়গা-টার নাম সে জানে না। নদীর নাম তার মনে নেই। তবে অনেক জল। একদিন গান এসে তার গন্ডতলা ভাসিয়ে দিয়েছিলো।

সেই মেটে জোলনার ভেতর আচমকাই বৃন্দাবন উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। গলার সব জোর দিয়ে। কিরীটী। কি-রী-টী—ই—

নদীর খাত এত বড় যে বৃন্দাবনের গলার সবটুকু আওয়াজ অল্পক্ষণের ভেতর বাতাসে ক্ষয় হয়ে গেল। একদম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে হারিয়ে গেল।

ঠিক তখন দূরে নদীর ওপর দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছিলো। গুম গুম করে। তার জানলায় মানুষের মুখ। তাই দেখে বৃন্দাবন পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। এ ট্রেন নিশ্চয় কলকাতায় যায়। দাঁড়াও। দাঁড়াও তোমরা—বলতে বলতে বৃন্দাবন পালিত ছুটলো।

অনেকদিন ঠিকমত ঘুম হয়নি বৃন্দা-বনের। খাওয়া হয়নি। একদিন কি করে যেন সব ভুলে গিয়েছিলো সে। তার কিছুই মনে পড়তো না। সে কোথাকার? কোথায় যাবে? কোত্থেকে এসেছে? এসব কিছুই তার মনের ভেতর হাতড়েও বৃন্দাবন বের করতে পারেনি। পায়ে হেঁটে, বেলে, কুমড়োর লতি ধরে সে যে কতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে সে নিজেই জানে না। বছর, মাস, দিন, তারিখ—কোনো হিসেবেই তার কাছে গরিষ্কার নয়। শুধু জানে—খিদে পেলে খাইতে হয়। গাইলে খাবার জোটে। ছাউনি মেলে। কেউ বা জামা দেয়, কেউ বা পয়সা।

এইমাত্র সব মনে পড়ে যাওয়ায় বৃন্দাবন পালিত চমকে উঠেছে। বেহালার ছড়ের এক টানে তার সারা জীবনের সবটাই গোড়া থেকে মনে ভেসে উঠেছে খানিক আগে। বৃন্দাবন দৌড়োচ্ছিল। নদীর বালির ওপর দিয়ে। ট্রেনের লোকজন ডাকতে ডাকতে। ট্রেনটা বিজ্ঞ ঘুরিয়ে ফেলে এইমাত্র ডাঙায় উঠে গেল। এখন ভীষণ তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। যে করেই হোক ট্রেনটাকে ধরতে হবে।

পায়ে কি বেধে উলটে পড়লো বৃন্দা-বন বালি বলে অতটা বোঝেনি। কিন্তু নিজের পায়ে পা বেধে গিয়ে আর উঠতে পারলো না।

বসে বসেই বৃন্দাবন দেখতে পেলো—চারটে ছায়া চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল বৃন্দাবন। পারলো না। বসে বসেই বললো, কে? কে ওখানে? কে তোমরা?

ছায়াগুলো কোন কথা না বলে সোজা এগিয়ে আসতে লাগলো। কী যেন গোটা-বার ভঙ্গী। এইবার টের পেল বৃন্দাবন। কে? কে তোমরা? কে?

বৃন্দাবন বুঝলো, তার পায়ে কিসের ফাঁস লেগেছে। সে উঠে দাঁড়িয়েছিলো প্রায়। ছায়াদের ভেতর কেউ সেই ফাসের ওদিকটা ধরে টানতেই সে আবার পড়ে গেল। এবার বৃন্দাবন ওদের দেখতে পেল।

জনা চার-পাঁচ পুরুষ। পরণে বোধহয় লেংটি। চ্যাটালো বুক। মাথার চুল কোকড়া বোধহয়। তাই অন্ধকারে বাতাস থাকলেও উড়ছে না।

ওরা কাছে এসে বৃন্দাবনকে দেখলো। তার পর ওদেরই একজন হো হো করে হেসে উঠেই থেমে গেল। শেষে প্রায় পাখির ভাষায় কিচির মিচির করে উঠলো পাঁচ-জনেই।

আমি কলকাতায় যাবো। আমায় ছেড়ে দাও তোমরা—

জবাবে ওরা কোন কথা বললো না। একটু পরেই বৃন্দাবন টের পেল—ওরা তাকে মরা গরুর কাঁধার বাঁশের ওপর দিয়ে চেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। টেনে টেনে। চোখ বাঁচাবার জন্যে বৃন্দাবন এক হাত চোখে দেয় তো—মাথা বাঁচাতে আরেক হাতের আড়াল আগাম অন্ধকারে সাজিয়ে রাখতে হয়।

নদীর বুকে এখন বালি থাকলেও বর্ষাকালে ভেসে আসা কচের গুড়ি, কুচো শঙ্খ, সামুদ্রিক ঝিনুক সব সময়েই থাকে। ভাঙ্গা কলসির কানা তো সব সময়েই থাকে। মাথা, মুখ, চোখ, গা বাঁচাতে বাঁচাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো বৃন্দাবন। সে এবারে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। ওরে আমার মত বুড়োকে দিয়ে তোরা কি করবি? আমায় ছেড়ে দে রে বাবারা। আর কোনদিন ভুলেও ইদিকে মাড়াবো না। আমায় ছেড়ে দে। আমি কলকাতায় ছেলের কাছে যাবো। ছেড়ে দে বাবারা—

কে কার কথা শোনে। একবার বৃন্দা-বনের মাথাটা লাফিয়ে উঠে গেলো শক্ত কি এক জিনিসে। ওরা কিন্তু থামলো না। পায়ের ফাঁস ধরে হেঁচড়ে টেনে চলেছেই তো চলেছে।

বৃন্দাবন একবার কিরীটীরে—বলে ডাক দিয়েই জ্ঞান হারালো।

জ্ঞান এলো যখন—তখন শেষরাতের ফিকে বাতাস। ফিকে আলো। সে তখন মনা চারেক লোকের ঘামে-ভেজা কাঁধে। শুকনো, মরা কোন জন্তুর মাংসের ধারা। ওদের হাটার দুলুনীতে বৃন্দাবনের শরীরটা দুলছিলো। সে চুপ করে থাকলো। যদিও যে কোন সময়ে ওদের পিঠ থেকে পিছলে নিচে পড়ে যাবার ভয় ভেতরে কাঁটা করে রাখলো।

মাথার ওপর গাছপালায় ঝুলে পড়া ডাল। জঙ্গলের লতায় পাতায় গা চুলকোচ-ছিল বৃন্দাবনের। তবু সে চুপ করে থাকলো।

দিন এসে পড়ার মুখে মুখে ওরা এসে এমন এক জায়গায় থামলো—যেখানে সারি সারি মাটির ঘর। মাঝখানটা নিকানো। ছেলে, বুড়ো, গুঁড়ো, মেয়ে, বুড়ি মিলিয়ে প্রায় শ দুই মানুষ যেন তারই অপেক্ষায় চুপ করে ছিলো।

ওই পাঁচজন তাকে ধপাস করে নিচের মাটিতে ফেলে দিয়ে গম্ভীর মুখে বাঁশের চাঁচারি দিয়ে গায়ের ঘাম কাচিয়ে ফেলে দিতে লাগলো। চারপাশের বাচ্চারা তাকে দেখে আনন্দে লাফাচ্ছে। বুড়োদের মুখে তৃপ্তির হাসি। বউ-ঝিরা খুশী মনে তাকে দেখিয়ে নিজেদের ভেতর কথা বলে চলেছে। তখনো আকাশে চাঁদের সামান্য অস্তিত্ব।

নিচে পড়ে মাথা লাগলেও বৃন্দাবন উঠে বসেছে। কারও গায়ে বিশেষ জামা-কাপড় নেই। মেয়ে-পুরুষ সবারই কোমরে খানিক খানিক ঘুনসি পরা লতাপাতা, মেয়েদের গোছো তাঁতিদের বুনোট চট।

এসব দেখতে দেখতে বৃন্দাবনের চোখ একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। কাছের একটা বড় পাথরে অনেকটা সিঁদুর ল্যাপটানো। পাথরের নিচে কয়েকটা বন

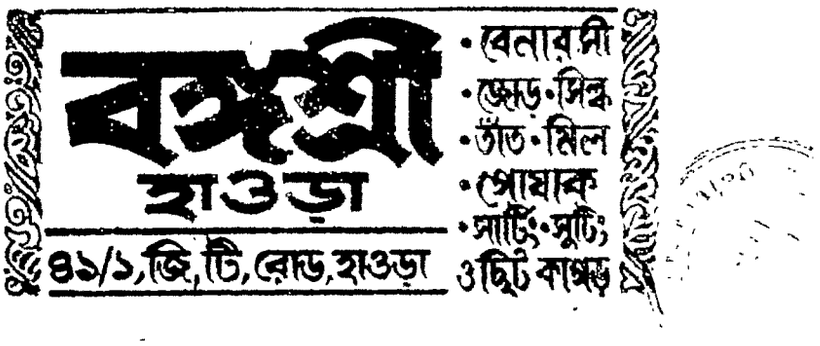

মুর্গির ধড় তখনো ছটফট করছে। মুণ্ডু নেই।

দেখেই বৃন্দাবন পালিত লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠলো গলা চিড়ে। বাঁচাও। বাঁচাও আমাকে। ওরে কিবীটীরে—আমার বাপ কিবীটীরে—। শেষটায় কান্না এসে বৃন্দাবনের গলা দখল করে নিলো।

বাচ্চা, বুড়ো, গুঁড়ো মেয়েরা—সবাই বৃন্দাবনের কান্নায় কুলকুল করে হেসে উঠলো। একজন গুরুগম্ভীর ল্যাংটো লোক এগিয়ে এসে সে কান্না কান ঝুঁকিয়ে শুনলো। যেন কোন পবিত্র শব্দ। বৃন্দাবন লোকটার এ ভঙ্গী দেখে একদম বোবা হয়ে গেল। হয়তো ওদের পুরুত হবে। কানে কী একটা গাছের পাতা-গোঁজা। পুরুতই হবে।

বৃন্দাবন এবার বাবাগো। বলে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লো। পুরুত তার এই কান্না শোনার জন্যে মাথা ঝুঁকে এক-দিকের কান নামিয়ে আনলো।

বৃন্দাবন তাক বুঝে এক লাফে লোক-টার কান কামড়ে ধরার জন্যে তৈরি হোল। তার গালে পাকা দাড়ি। পাকা ভুরু। ছেঁড়া জামার ভেতর দিয়ে গাছপালার কেটে যাওয়া গায়ের রক্ত শুকিয়ে কালচে। দিন ফুটে গেছে। প্রায় তরাক করে লাফ দিচ্ছিলো বৃন্দাবন। কিন্তু পারলো না।

সেই পাঁচজন লোক দিব্যি গম্ভীর চালে ভিড় সরিয়ে কালো পাথরখানার সামনে পাকা বাঁশের হাড়িকাঠ এনে মাটিতে বসাতে লাগলো।

যা ভেবেছিলাম—বলেই বৃন্দাবন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। পুরুতপানা লোকটা তখন কী সব বলে তার গায়ে দুর্গন্ধ একটা তেল ছেটাচ্ছে।

বৃন্দাবন চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। তখনো সেই পাকা বাঁশের হাড়িকাঠ বসানো হচ্ছিল। পাঁচ-পাঁচটা খালি গায়ের মানুষ খুব গম্ভীর পোজে গর্ত করছে। পাথর বানায় আগুনছোঁয়াচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে বৃন্দাবন ডুকরে কেঁদে উঠলো। ওগো বাবারা! তোমরা কারা? আমায় মারবে কেন? আমি কি করিছি? কান্না যে কারও এমন করে ফুরিয়ে আসে তা জানা ছিলো না বৃন্দাবনের। সামনেই একটা বড় সরায় জল ছিলো। বৃন্দাবন হুমড়ি খেয়ে সেই জলে মুখ ডোবালো। তারপর যতটা পারে একসঙ্গে এক চুমুকে খেয়ে নিতে লাগলো।

ওই পাঁচজনের একজন কাজ ফেলে উঠে এসে বৃন্দাবনের গলা ধরে মাটিতে ছিটকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। পড়তে পড়তে বৃন্দাবন দেখলো, লোকটার চোখের জায়গায় দু-খানা ছোট পাথর বসানো।

বৃন্দবন সেই মাটি থেকে আর উঠলো না। কী হবে উঠে। সে গান ধরলো। তখন শ দুয়ের ওপর মানুষ তাকে দেখছে। সে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে গাইতে লাগলো। আলো ফুটে পরিষ্কার সকালবেলা। কাছে-পিঠে সম্ভবত করনা আছে। একটানা জল বয়ে যাওয়ার শব্দ। কিংবা বাতাস।

মাটিতে শুয়ে গাইতে তো বেশ লাগে। চারদিকে গাছপালার ঝালরের ভেতর দিয়ে খানিকটা আকাশ। বৃন্দাবন নিজের গলা শুনে নিজেই অবাক হোল। দরবারী, বজ্জ লাগানো গলা যেন। ভোরবেলা পেয়ে তার গলা যেন বাতাস হয়ে বইতে লাগলো। গানের কথা এখন আর খুব বড়ো কিছু নয়। সুরটাই সব।

সে নিজের দাড়ির ভেতর দিয়ে চন্দনের গন্ধ পেলো। আশপাশের মানুষজন তার কাছে মুছে যাচ্ছিল। শুধু শিশুদের কিচির-মিচির বনের পাখীদের নানা রকমের ডাকের ভেতর, পাখা ঝাপটানির ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে দেখে তার খুবই কষ্ট হোল।

কিরীটী একাই আর কতকাল একা একা সংসার টানছে। পিঠটা বেঁকে গেল ওর। আমি একবারও পাশে দাঁড়াতে পারিনি। ছেলের আমার কোন দোষ নেই। বড় ভালো ছেলে।

ওর গর্ভধারিণীও খুব ভালো ছিলো। অনেককাল আগে—কিরীটী তখন ছোটো—সাবি আমার ধুতী কুঁচিয়ে রাখতে রাখতে বলেছিলো, কী হবে মেয়েমানুষ পুষতে হয়, তা তুমি জানো না।

পোষা—মানে, সাবি বুঝতো—বউকে খেতে পরতে দিয়ে আদর-যত্নে রাখা। বউয়ের মন জেনে নিয়ে চলা। আমি সব সময় তা পারিনি। টম্পার দানা তখন আমার গলায়।

আর ভাবতে পারলো না বৃন্দাবন। পরিষ্কার আকাশে কুটোটি পর্যন্ত নেই। মেঘের ছড়া পড়েছে অনেক দূরে দিয়ে। একদম আকাশের কিনারা দিয়ে। বৃন্দাবন এবার পরিষ্কার বুঝলো, একটু আগে নিজের দাড়ির ভেতর থেকে সে যে চন্দনের গন্ধ পাচ্ছিলো—তা আসলে সদ্য মাড়-গালা ফুরফুরে ভাতের গন্ধ। চারদিকের গাছপালার ভেতর দিয়েও সে গন্ধ বয়ে যাচ্ছে। কোন কচি সর্বাঙ্গ দিয়ে পাতলা করে রান্না টাটকিনি মাছের ঝোল দিয়ে এ ভাত গরম থাকতে থাকতে খেতে হয়। একবার উনিশশো উনিশে ডালটনগঞ্জ ডাক-ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রাঁথ খেয়েছিলাম। এত রস। এত মিষ্টি। খেতে খেতে নেশা ধরে গিয়েছিলো। দাঁতব্যথা করছিল—তবু খেয়ে চলেছি। এখনো মুখে লেগে আছে।

কাল সন্ধেয় লটকানো পায়ের ফাঁসটা এখনো খুলতে পারেনি বৃন্দাবন। সেটা আসলে গাছের বাকল দিয়ে বোনা দড়ি। সে-দড়ির অন্য দিকটা একটা খুঁটোয় বাঁধা। এইটেই খানিক আগেও ভয়ংকর অপমানের লাগছিলো বৃন্দাবনের। এখন আর এ-জিনিসটা তার তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

এই বনজঙ্গল, আলো, অপরিচিত মেয়ে-মদ্দ, কুচো-কাচার কিচির-মিচির, ওদের পুরুতের বড় পাতা গোঁজা কান—পাঁচজন গম্ভীর পুরুষ—যারা সর্বসময়েই কোন না কোন কাজ করে চলেছে —এই সব —সবই বৃন্দাবনের কাছে এখন একটা চলন্ত ছবি মাত্র। কয়েকটা আঁচড়ে আঁকা।

ওই পাঁচজন এবার তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বৃন্দাবনের মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে এলো, এসেছো তোমরা। চলো। বড় বেলা হয়ে গেল কিন্তু।

ওরা বৃন্দাবনকে ধরে পাথরখানার দিকে এগোলো। আশ্চর্য। পাথরের ওপর কোত্থেকে একটা বুনো চিল এসে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। বুনো কথাবার্তায় বোঝাই কিছু আনন্দ, হাসি, চীৎকার। বৃন্দাবন মনে মনে বললো, কাছে-পিঠে তো কোন নদী নেই। মহানদীর জল তো অনেক দূরে: তাহলে?

একটু বাদেই বৃন্দাবনের মুণ্ডুটা গড়িয়ে বন-মুর্গিদের শরভুপে গিয়ে আটকে গেল। অমন গম্ভীর বুনো চিলটাও পাখা মেলে দিয়ে আকাশে উঠে পড়লো। বনভূমি তখন মানুষের কলকণ্ঠে ভরে যাচ্ছিল।

শীতের রাত দশটা মানে আলিপুরের দিকে রাত দুটো। এমনিতেই ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে যেতে রাত আটটাতেও মনে হবে গভীর রাত। অস্টিন ট্যুরার এখন দিল্লীপের পুরোপুরি কবজায়। নতুন ব্যাক

আনন্দ হাট

সাহিত্যের এক নতুন আশ্চর্য!!

কিশোর ও তরুণদের উপযোগী কবিতা/ছড়া/গল্প পাঠান জবাবী কার্ডসহ।

দপ্তর : ৪, দোল গোবিন্দ সিংহ লেন, সালকিয়া, হাওড়া-৬

বি।৬৭৮৭

বাড়ির পাশ দিয়ে ফাঁকা ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরলো দিলীপ। আজ সে একাই চিড়িয়াখানার ভেতরে যাবে। পার্কিং লটের সামনে গাড়ির পোড়ে শিং তুলে তাকানো সারি হরিণগুলোর সঙ্গে আজ সে দেখা করবে। সব ক-টি চোখ একসঙ্গে তার দিকে তাকানো। ওর ভেতর পয়লা হরিণটা মাঝে-মধ্যে আবার ওদের খাচার ভেতর নকল পাহাড়ে উঠে, রাস্তার মোড়ে ঝোলানো বড় বড়-রঙীন বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব সমঝদারের চোখে।

গাড়ি কিন্তু সেণ্ট টমাস স্কুলের পাশে মাহুতের সে-দরজার দিকে গেল না। বরং সোজাই চলতে লাগলো।

রাস্তায় একটাও লোক নেই। দু-একটা পান-বিড়ির দোকান ঝাঁপ খুলে তখনো বসে। দিলীপ পরিষ্কার গলায় বললো, কী হচ্ছে কালুবাবু?

ঠিকই হচ্ছে। চলুন না। ফাঁকা রাস্তা তো। গিয়ার টপে তুলুন—

না কালু। এ কি হচ্ছে?

ঠিকই হচ্ছে। কয়েক দিন—

দিলাম। কিন্তু এভাবে গাড়ি চালানো যায়।

কোন অসুবিধে নেই তো। ঠিকই যাচ্ছেন।

আমাকে তো কিছুই করতে হচ্ছে না। গাড়ি তো আপনিই চলছে।

কে বললো? আপনি তো স্টিয়ারিংয়েই আছেন দিলীপবাবু—

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

বাঁয়ে কাটান। বাঁয়ে কাটান। এইতো। বেশ হাত সেট হয়েছে আপনার। এইতো আমরা এসে গেছি। এবার ডাইনে—

এ তো ওয়াটগঞ্জ।

বেঁকে দিন। ব্যাস্।

থামা গাড়িতে বসে দিলীপ দেখলো, সে একটা বন্ধ ডাক্তারখানার সামনে এসে থেমেছে। সাইনবোর্ডে লেখা—ডকটর জাহিরুল হোসেন। এম বি, বি এস।

রাস্তার দু-ধারে সারি সারি দোকান-ঘর। বস্তি-মার্কা ছাউনি। পাকা বাড়ি। দড় দড় করে একটা ফ্যান জল নষ্ট করে যাচ্ছে। সারা এলাকায় লোডশেডিং। কুপির আলো। মোমবাতি। একটা টিনের ছাউনি সাবানের দোকানে হাজাক। রাস্তার লোকের ভাব নেই এখানে।

কালু বললো, হর্ন দিন না—

শুধু শুধু দেব, কেন? বলতেও বাঁ হাত ডান হাতে গিয়ে ববাবের ভেপু-টিতে তিন তিনবার টিপে ছেড়ে দিল। আর তারপর—

দিলীপ বিশ্বাস করতে পারছিলো না। কি হয়ে গেল।

আশপাশের তিন চারটে ঘরের দরজা খুলে গেল। ছ-সাতটি মেয়ে বেরিয়ে এসে দিলীপকে টানতে লাগলো। একজন বললো, ঘোষবাবু আসেন নি?

একটু ভয় হোল দিলীপের। এখন সে হারমোনিয়মের সঙ্গে কাওয়ালীর সুর শুনতে পাচ্ছিল। হিংসের গন্ধ। কে অনবরত হামানদিস্তায় কী যেন পিষছে।

একটি মেয়ে তার উরুতে টোকা দিয়ে বললো, কালুবাবু কোথায় গেলেন?

দিলীপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, বাবার আনতে গেছে। এক্ষুনি আসবে—

তো আপনি বসে কেন? আসুন।

দিলীপকে টানাটানির হাত থেকে বাঁচালো রাসভারি একজন মোটাসোটা মেয়ে-লোক। এই। এই মারবো এবার তোদের। যা—ঘরে যা। আসুন বাবু। আপনি ভেতরে এসে বসুন। ঘোষ মশাই কেন নিজে খাবার আনতে গেলেন? আমাদের গুস্তাকি কি হোল আ বুঝতে পারছিনে—

ঘর মানে বেটে পায়ার চৌকির ওপর মোটা তোশক। দেওয়ালে লম্বা আয়না। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বললো, সুমিত্রাদি। তোমায় ঘরে যিনাইল আছে?

সেই মোটাসোটা রাসভারি মেয়েলোকটি গম্ভীর গলায় বললো, আমি কি ডাক্তার-খানা—না, করপোরেশন? নিয়ে যা—ওই তো।

সুমিত্রা আঙুল দিয়ে ঘরের কোণে দাঁড় করানো বোতলটা দেখালো।

দিলীপ চমকেও গেল—আমার মনে মনে বললো, এই সেই সুমিত্রা তাহলে? কি কপাকার রে বাবা।

মেয়েটি বোতল নিয়ে যাবার সময় বললো, এসেছিলো তো ভালো। খানিক খাবার পর এমন বমিই করেছে—

অমন লোক ঢোকান কেন ঘরে?

তোমার মত ভাগ্য করে তো আসিনি সুমিত্রাদি।

দরজা খোলাই থাকলো। দেওয়ালে 'রাধে চঃ' লেখা তরকেশ্বরের শিবলিঙ্গের ছবি। ফুলচন্দনে ঢাকা। শীতকাল বলে ঘরের ছোট হ্যাজাক বাতিতে কোন রকম গরম লাগছিলো না। উঠোন ঘিরে সারি সারি ঘর। সে উঠোনে সব ঘর থেকেই খানিক খানিক আলো পড়ে মিশে গেছে। সে উঠোন দিয়ে কারা যেন ঘোরাঘুরি করছিলো।

ঘোষমশাই আমাদের ওপর কি রাগ করেছেন?

একথা বলছো কেন সুমিত্রা?

না। আপনারা তো মানী মানুষ। যেন ঘাট হয়ে থাকলে নিজ গুণেই মাফ তো করে দেবেন। তাই না? আজ চার-পাঁচ মাস প্রায় আসেনই না। এলেও শুনি তিনি ও-ঘরে গেছেন। সে-ঘরে গেছেন। দেখা হয় না আমার সঙ্গে একদম। বেশি রাতে রাস্তায় বেরিয়ে শুধু গাড়িটাকে দেখতে পাই। তাও দেখি না অনেকদিন। কী হয়েছে বলুন তো ঘোষ মশায়ের?

নিজের ভেতরেই কেঁপে উঠলো দিলীপ। মুখে বললো, কী আবার হবে। কই কিছু হয়নি তো। এখুনি এলে জেনে নিও।

তা জানবোখন। আপনি ওঁর অনেক দিনের বন্ধু।

বন্ধু? তা হাঁ। কিছুদিনের তো বটেই—

ঠিক কী হয়েছে বলুন তো ঘোষ মশায়ের? এসেছেন শুনে লজ্জায় মাথা খেয়ে এ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছি। সে-ঘরের দরজায় কান পেতেছি। কোথায়! তিনি তো আসেননি। ছুটে বাইরে এসে দেখি ওর গাড়িটা চলে যাচ্ছে—

অন্য গাড়ি নয়তো?

না না। ও গাড়ি আমরা এখানে সবাই চিনি। আমার মায়ের কাছেও উনি ও গাড়িতে আসতেন। আমি তখন কতটুকু। একটা গান শোনাই আপনাকে—

গোটা কয় বিড় টিপেই আঙুল থেমে গেল সুমিত্রার। আচ্ছা। এখনো আসছেন না কেন বলুন তো?

এসে যাবে।

যাবার সময় কী বলে গেল আপনাকে?

তোমার যে খুব চিন্তা সুমিত্রা। কে হয় তোমার?

সুমিত্রা মাথা নামিয়ে নিলো। আবার আঙুল খেলতে লাগলো হিপে। কেউ না। মায়ের আমল থেকেই দেখছি তো। এসেই ফুর্তিতে চারদিক মাতিয়ে রাখতেন—। কী গান গাইবো বলুন?

তোমার যা ইচ্ছে—

আচ্ছা কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো? উনি যেখান থেকে বোতল নিতেন—সে জায়গাটা কিন্তু উঠে গেছে।

তুমি গান গাও না। এখুনি এসে পড়বে।

সুমিত্রা বেশ দম নিয়ে হু হু করে রিডের ওপর দ্রুত গৎ বাজালো। তারপর ঝনাৎ করে নিজেরই হাতখানা রিডের সারিতে এলোমেলো ভাবে মেলে দিলো। আমার ভয় করবেন। আমি পারছিনে। বলে একদম খোলা চোখে কেঁদে ফেললো সুমিত্রা। শেষবার যখন আসেন—তখন ওঁর শরীরটা ভালো ছিলো না। আপনি একটু দেখুন না বেরিয়ে। এত দেরি হবার তো কথা নয়।

দিলীপ ওপর ওপর ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়ালো মাথা। তার পর সোজা বেরিয়ে এসে স্টিয়ারিংয়ে বসলো।

(চলবে)

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

'কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী'

...দের উপর সংগঠনের দায়িত্ব ছিল অর্থাৎ অস্ত্রগুলো বাড়িভাড়া, মোটরগাড়ি প্রভৃতি খরচ চালাবার তা তারা ইচ্ছে করলেই তখন বাদ দিতে পারে নি। তাই প্রায় সব দায়িত্বগুলোই এসে পড়ল তাদের ঘাড়ে যারা শহর অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই প্রস্তুতির পর্বে টাকা যোগাড় করাটা অতি অবশ্যই তাদের ঘাড়ে এসে পড়ল হাতে তাদের সময় খুব কম তাদের সদস্য ও সংগঠকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে, তখন তাদের সুপরিপূর্ণ প্ল্যান সমাপ্ত করতেই হবে।

এই ভাবের টাকা ও সময় দুরেরই প্রয়োজন আমাদের। গুরুত্ব অসুবিধা ছিল না যে সেখান থেকে এই প্রয়োজন মেটানো যায়। অগত্যা তাদের আরেকটি ছোট ডাকাতি করে লক্ষাধিক টাকা যোগাড় করা প্রয়োজন। সুনিশ্চিতভাবে লক্ষাধিক টাকা অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতি করে পেতে হলে কোন ব্যাঙ্কে ডাকাতির প্ল্যান করতে হয়। সবরকম তথ্য সংগ্রহ করে ছোটখাটো ব্যাঙ্কে ডাকাতি করা অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব ছিল যদি সেইরূপ আমাদের সংবাদ থাকত, কিন্তু তা ছিল না, একমাত্র আমাদের নির্ভরযোগ্য সংবাদ ছিল নিউ আলিপুর গিল্ডলেক্স ব্যাঙ্কে. গিল্ডলেক্স ব্যাঙ্ক নিউ আলিপুরে একটাই ছিল। সেই ব্যাঙ্কে কয়েক মাস আগে আমরা ডাকাতি করেছি, তবু দেখা গেল সেই ব্যাঙ্কের মালিকরা বা পুলিশ কোনরূপ নতুন সন্দেহ করবার ব্যবস্থা করে নি। তাই আমাদের মনে হয়েছিল অল্প সময়ের মধ্যে আবার গিল্ডলেক্স ব্যাঙ্কটি ডাকাতি করা হোক।

খুবই আশ্চর্যের কথা ডাকাতি হয়ে যাবার পর কেন ব্যাঙ্কে কোন নতুন পাহারার ব্যবস্থা করে নি, এই সন্দেহটি আমাদের মনে হয়েছিল, এটা কী এমনি করা হয়েছে ন্যাশানাল গিল্ডলেক্সের মালিকরা ভেবেছিল যে একবার ডাকাতি হবার পর সেখানে আর দ্বিতীয়বার ডাকাতি হবে না। এরূপ ভেবে তারা কোন সুব্যবস্থা না করতেও বা পারেন। আবার এও হতে পারে যে তারা নতুন ব্যবস্থা নিয়েছেন যা আমাদের চোখে ধরা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। ব্যাঙ্কে আমরা ব্যাঙ্কিং আওয়ার্সের ভিতরে যাই এবং কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখেছি নতুন কোন ব্যবস্থা আছে কিনা অর্থাৎ সাদা পোষাকে রিভলভার নিয়ে কেউ পাহারা দিচ্ছে কি না। যতদূর জানতে পেরেছিলাম তা থেকে স্থির বুঝেছিলাম যে তারা সর্বক্ষণের জন্য কোন নতুন ব্যবস্থাই করে নি। তাই পনের দিনের মধ্যে আমরা এই ব্যাঙ্কটি আবার আক্রমণ করে টাকা লুঠ করব মনস্থ করলাম।'

প্ল্যান আগের মতই প্রায় সব ঠিক। কোন্ গাড়ি যাবে, কে গাড়ি চালাবে, নাম্বার প্লেট কে কোথায় চেঞ্জ করে নেবে অর্থাৎ নাম্বার প্লেটে এমন নাম্বার থাকা উচিত নাম্বারে ডুপ্লিকেট নাম্বারযুক্ত অন্য গাড়ি ঠিক সেখানে এসে উপস্থিত হবে না। এই ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া বড় কঠিন আমরা কোন একটি গাড়ি নিয়ে সারাদিন অবজার্ভ করে ভাল করে নিতে পারি যে গাড়ি বিশেষভাবে অবস্থায় পড়ে আছে সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে, সেই সময়টি আমরা

কাল কাগজের ওপরে নাম্বার প্লেটের সাইজে সাদা কালিতে লিখে নিলাম। এই কাগজের ফলস নাম্বার প্লেট ডাকাতির দশ পনের মিনিট আগে নিকটবর্তী কোন একটি গোপন স্থানে ডেসপিলিন্ মাখিয়ে গাড়ির অরিজিনাল নাম্বার প্লেটের উপর আটকে দিতাম। সেইরূপ রাস্তায় কিংবা গলি গিন্ডলের ব্যাঙ্কের সামনে আমরা দেখে রেখেছিলাম। গাড়ির চালক কে হবে তা আমরা ঠিক করলাম, গাড়ির চালক গাড়িটি নিয়ে পাঁচ মিনিট আগে সেই স্থানে উপস্থিত হবে, ডাকাতি শেষ করে এবং আরেকজন যে গেটে ও অন্যজন মোটর গাড়িতে পাহারা দেবে তারা এসে গাড়িতে উঠবে। তারপরের ব্যবস্থা গাড়ি টাকা লুঠ হওয়ার পরে কোন্ পথে যাবে, সেটি ঠিক করা ছিল। কোন একটি পয়েন্টে টাকার ব্যাগ নামিয়ে দিলে, সেই ব্যাগ কোন এক নিরাপদ স্থানে কোন নিরাপদ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গুনে প্যাক করার ব্যবস্থা করা ছিল। সেরূপভাবে আবার আর্মসের বক্স নামিয়ে দিলে তাও নিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। ডাকাতি করার পরে সাওয়ার পথে কোথায় নেমে যাবে এবং কোন্ পথে কোথায় যাবে প্রত্যেকের ওপর এবং পরে কে কোথায় মিলিত হবে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। তারপর এইসব বন্দোবস্ত থাকার পর ডাকাতির স্পটে অর্থাৎ ব্যাঙ্কে হঠাৎ কি ঘটনা ঘটবে এবং সেরূপ ঘটনাকে কিরূপে সমাধান করা যায় তার জন্যে বিশেষ চিন্তা করে কতকগুলো নির্দেশ দেওয়া ছিল। যেমন নাকি আমরা আশংকা করেছিলাম (১) ব্যাঙ্কে যখন তারা ডাকাতি করবে তখন হঠাৎ গেটের সাটারটি টেনে বন্ধ করে দিতে পারে। (২) ব্যাঙ্কের ভিতরে এবার হয়তো সাদা পোষাকে আর্মড পুলিশ পিস্তল, রিভলভার নিয়ে থাকবে এবং তারা হয়তো প্রতি আক্রমণ শুরু করতে পারে। (৩) ভিজিটাররা লম্বা প্যাসেজ যেখানে বসে থাকত সেখানে কোন একজন বা দুজন পুলিশের লোক ভিজিটারস সেজে বসে হয়তো থাকবে এবং যাওয়ার সময় শেষের একজন দুজনকে জাপটে ধরে ফেলবে। বাইরে এসে মোটর গাড়িতে ওঠার সময় বিক্ষুব্ধ পাবলিক মোটর গাড়ি লক্ষ্য করে যেমন আগেরবারে ইঁট-পাটকেল ছুড়েছিল তেমনটি এবারও ছুড়তে পারে। এমন কি এবার ইঁটপাটকেলের আক্রমণ তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। (৪) সবচেয়ে বড় ভাবনা ছিল যদি আমাদের কেউ হঠাৎ আহত হয় বা অ্যাকশনে কারুর মৃত্যু হয় সেরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য আমরা তার পরিকল্পনা করেছিলাম।

মনে মনে পরিকল্পনা থাকলে হয় না সেই প্ল্যানকে কার্যে পরিণত করার জন্য যে চেষ্টা ও ব্যবস্থা থাকা উচিত সেটি ছিল কি না এটাই ছিল প্রশ্ন। সর্বোপরি প্রশ্ন এরূপ দারুণ সমস্যার মুখোমুখি হয়েও মাথা স্থির রেখে কাজ করে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহস কমরেডদের ছিল কি না প্রশ্ন। ব্যবস্থা থাকলেও যদি সাহস না থাকে তবে তা করা সম্ভব নয়। কাজেই সবাইকে এই কথাটি উপলব্ধি করতে বার বার জোর দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে টিম গঠন করে ও সুসজ্জিত করে ব্যাঙ্কে নির্ধারিত দিনে পাঠান হয়। সবাই দৃঢ় সংকল্প হয়ে যাত্রার দিনের টাইম মত ব্যাঙ্ক আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করল।

ব্যাঙ্ক খুলবার পাঁচ মিনিট আগে বিপ্লবীদের যেখানে যার পজিসন নেওয়ার কথা তা তারা নিয়েছিল। তারও কিছু আগে গাড়ীর নাম্বার প্লেটটি চেঞ্জ করে লুঠের টাকা ও আমাদের কমরেডদের নিয়ে সে স্থান থেকে পেরিয়ে যাবার জন্য গাড়ী তৈরী ছিল।

ঠিক সময় দারোয়ান এল এবং ব্যাঙ্কের দরজার সাটার খুলে উপরে তুলে দিল। তখনই আমাদের তিনজন কমরেডও ব্যাঙ্কে ঢোকার জন্য যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের সাটার খোলার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করল। এন সি সি পোষাক পরা কমরেডটি গেটের সামনে যার দাঁড়াবার কথা সে এগিয়ে গিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে পড়ল। আরেকজন ব্যাঙ্কের গেট থেকে রাস্তা পর্যন্ত সিঁড়ি বরাবর করে স্টেনগান নিয়ে দাঁড়াল। নিয়মমাফিক এজেন্টের ঘর থেকে ক্যাশিয়ারবাবু ক্যাশ বাক্স নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে এলেন। আসা মাত্রই যে তিনজন কমরেড এই কাউন্টারে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন কাউন্টারের টেবিলে লাফিয়ে উঠে সমস্ত ব্যাঙ্কটিকে চমকে দিয়ে কমান্ড করলে যে যেখানে বসে আছেন বসে থাকবেন ভয় নেই। আমরা টাকা লুঠ করব। একজন যে উপরে উঠে কমান্ড করল সে নামল এবং ক্যাশ বাক্সটি তুলে নিয়ে যে দুজন কাউন্টারের বাইরে ছিল তাদের হাতে দিল এবং সে কাউন্টারের ভেতর থেকে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হল। তাদের প্রত্যেকের হাতে পিস্তল ছিল। দুজনে বাক্সটি নিয়ে এগোল এবং তৃতীয় কমরেডটি তাদের সঙ্গে সঙ্গে সজাগ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলল। ক্যাশ কাউন্টারের সামনে ব্যাঙ্কের সংকীর্ণ পথ চলার বারান্দাটা দিয়ে তাদের বাইরে চলে যাওয়ার পথ। সেই সরু চলা পথে ডান পাশে যারা ব্যাংকের কাজে এসেছিল তারা কেউ বসা কেউ দাঁড়ান। তাদেরই সামনে দিয়ে তারা সোজা গেটের দিকে চলে গেল, কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করল না। সবাইকে দেখা গেল খুবই সন্ত্রস্ত ও ভীত। তবু কমরেডরা খুবই সতর্ক ছিল, হঠাৎ আক্রমণ হলে আত্মরক্ষা করার জন্য। এই এক মিনিটের মধ্যে তারা তিনজন টাকা নিয়ে সদর দরজার কাছে এসে গেল। তাদের আরেকজন এন সি সি পোষাকে গেটে পাহারা দিচ্ছিল—সে তখন সবাইকে ভয় দেখাবার জন্য উপরের দিকে স্টেনগানের কয়েকটি গুলি ছোঁড়ে। ব্যাঙ্কের কর্মচারী সবাই সচকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভয়ে কেউ নিজেদের আসন ছেড়ে ছোটাছুটি করেন নি। তারা চারজন বাইরে এসে দেখে সিঁড়ির উপর থেকে মোটর গাড়ী পর্যন্ত যে পাহারা দিচ্ছিল সে তখন একটা দুটো ফাঁকা শব্দ করল, বিক্ষুব্ধ লোক যারা সেখানে গণ্ডগোল হচ্ছিল তাদের ভয় দেখানোর জন্য সবকিছু সমাধান করে তারা গাড়ীতে এসে উঠল। ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে তৎক্ষণ সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করছিল। এই গাড়ীটি যে ডাকাতদের গাড়ী তা আন্দাজ করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। অদূরে পেট্রোল পাম্পে ইতিমধ্যেই লোক কিছু জমে গেল। ব্যাঙ্কে যে আবার ডাকাতি হচ্ছে তা তাদের বুঝতে বাকি রইল না তবু তাদের তেমন কিছু এর বিরুদ্ধে করণীয় ছিল না। প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে সবাই বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন খুব সাহসী ব্যক্তি খান ইট নিয়ে গাড়ীর দিকে ছুঁড়ে মারল, ইট কাউকে আহত করে নি, গাড়ী সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের নিজের অন্য একটি গাড়ী দূরে থেকে ঐ গাড়ীটিকে অনুসরণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল পথে যদি তাদের গাড়ী বিগড়ে যায় তবে অনুসরণ করছিল যে গাড়ীটি তৎক্ষণাৎ এসে টাকা ও তাদের নিয়ে উধাও হবে। কিন্তু সেইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নি। নির্দিষ্ট পথে গাড়ীটি বিনা বাধায় এগিয়ে গেল, এবং আর্মস ও টাকা নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে লোক নেমে গেল। আর তারপর মুহূর্তে গাড়ীর নাম্বার প্লেটের উপর যে ফলস নাম্বার প্লেটের কাগজ ছিল তা তুলে ফেলা হল। পরে অরিজিনাল নাম্বার নিয়ে গাড়ীটা নিজেদের গ্যারেজে রাখল। টাকার ব্যাগ নিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়েছিল এবং সেখানে তাদের মধ্যে দুজন এসে টাকা গুনে দেখল কত টাকা, তারপর প্যাক করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রেডিওতে এই দিনদুপুরে ব্যাঙ্ক ডাকাতির সংবাদটি প্রচার

অখিলচন্দ্র নন্দীর

বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ—৮

'স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজে এই জাতীয় গ্রন্থের গুরুত্ব অসীম।' —দেশ

'অখিলবাবু বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ গ্রন্থে সহজভাবে সে যুগের কাহিনী ও ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন।' —যুগান্তর

প্রাপ্তিস্থান :

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫।১বি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

করল। অর্থ লুঠের যে সংখ্যাটি ঘোষণা করল তা এক লক্ষ পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা। এবার কোন টাকা অপসারিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। এই ডাকাতির সময় কোন অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা ঘটে নি। বলতে গেলে কি সাফল্যের সঙ্গে ডাকাতিটি হয়েছিল ও লক্ষাধিক টাকা বিনা রক্তপাতে নিয়ে আসা হয়েছিল। তবুও আজকে সমীক্ষা করে দেখে বলতে হবে এ আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা যে (১) প্রথম পোস্টাল ব্যাংক ডাকাতির পর সব টাকা আনতে না পারার জন্য অর্থাৎ একটি লক্ষাধিক টাকার পোস্টাল থলি ভ্যানের ভিতর ফেলে এসে-ছিল যে তারপর কালাতিপাত না করে আমরা কার্যত কর্মসূচীর রূপ দিতে না পেরে নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করেছিলাম। টেক্‌নিক্যাল প্রস্তুতিপর্বে যে সব কাজ আমাদের হাতে ন্যস্ত ছিল তা সমাধান না করে তর্ক করার আমাদের অধিকার ছিল না। এইভাবে দেরী করাতে আমাদের নিশ্চিত গাফিলতি হয়েছিল, তারই জন্য দণ্ড দিতে হয়—অর্থাৎ আরেকটি ডাকাতির ঝুঁকি নিতে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত করতে হয়। অর্থাৎ এই ব্যাংকে দুতিন চার মাস পূর্বে আমাদের ডাকাতি করতে হয়। (৩) তারপরও আমাদের গাফিলতির শেষ ছিল না, সেই টাকা নিয়েও আমরা দুর্গাপুরে ডাকাতির প্ল্যান সমাপ্ত করতে পারলাম না, তাই আমাদের অনেক গুনগার দিতে হল। সেইজন্য এই দ্বিতীয় ডাকাতিটি করতে হয়। এখন প্রশ্ন হল এত অল্প টাকায়, যেখানে নাকি মাত্র লক্ষাধিক টাকা পেলাম সেই টাকা দিয়ে সীমিত সময়ের মধ্যে দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক ডাকাতি করা কি সম্ভবপর হবে?

ভাববার সময় নেই, তবু প্রাণপণে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করলাম। এই সময় আমাদের দল আগেই বিভক্ত হয়ে গেছে, গ্রাম থেকে শহর যারা ঘেরাও করবে প্রোগ্রাম নিয়েছে সেই কৃষি বিপ্লবের প্রোগ্রাম নিয়ে তারা গ্রামে গেল। আমরা যারা সাংহাই আপ সার্চের মত শহর দখল করব আমরা তাই অন্য ধারায় প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদেরই দুর্গাপুর প্ল্যানটি শেষ করার দায়িত্ব। আমাদেরই শহর অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার জন্য এক কোটি টাকা অন্তত প্রয়োজন। তাই সীমিত শক্তি নিয়েও এই ডাকাতির পর দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক ডাকাতি করার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে লাগলাম। কলকাতা আপ সার্চটি আমাদের প্ল্যানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আমরা ধরে নিয়েছিলাম। কার্যতঃ প্ল্যানটি প্রায় সবটাই বাকি ছিল। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক দ্বিতীয়বার ডাকাতি হওয়ার পর পুলিশ আমাদের দলটিকে সন্দেহ করছিল তা আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে গেল, তা সত্ত্বেও আমাদের কাজ বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। ধীর গতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন পথ ছিল না। মনে হয়েছিল পুলিশ এবার আমাকেও সন্দেহ করছে, এবং তদনুযায়ী আমাকে অনুসরণ করার জন্য যে তাদের এজেন্টদের নিযুক্ত করেছে তা বেশ বুঝতে পারা গেল। আমাকে অনুসরণ করতে হলে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে করা সম্ভব ছিল না কারণ আমি সব সময়ই আমার মোটর গাড়ী করে বের হতাম। আমার গাড়ী অনুসরণ করতে হলে তাদের গাড়ী আমার গাড়ীর দৃষ্টির বাইরে থেকে অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তা কার্যে পরিণত করা তত সহজ ব্যাপার ছিল না। সেই ক্ষেত্রে পুলিশ বেছে বেছে আমাদের ওয়াচ্ করার পোস্ট ঠিক করেছিল, সেইসব স্থানে আমার যাতায়াত হতই, কাজেই আগে থেকে সেখানে এজেন্টদের বসিয়ে রাখা সম্ভব ছিল। এই দুই পদ্ধতিতে পুলিশ মরিয়া হয়ে আমাকে ওয়াচ করার কাজ শুরু করেছিল। আমি কিন্তু ছোটাছুটি একদম করতাম না। আমার গতি তখন খুবই মন্থর করেছিলাম। কেউ দেখলে যেন মনে করতে না পারে যে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে কোন কাজে যাচ্ছি বা নিজে সাবধান হতে চেষ্টা করছি। আমার ভাবটা ছিল এমন যেন আমি কোন গুরুতর কাজ করছি না। কোন কাজেই আমার ব্যস্ততা নেই। নীতিগতভাবে আমি আমার গতিবিধির জন্য এইরূপ একটি বিশেষ প্ল্যান নিয়ে চলেছিলাম।

পুলিশের হঠাৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এইরূপ পথ নেওয়াই আমার প্রথম কাজ ছিল। দ্বিতীয়ত প্রতি আক্রমণকে প্রতিহত করে ভবিষ্যতে পরের প্ল্যানে কার্যকরী করার জন্য প্রস্তুতি হওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়ত এই সময় আমাদের ভিতরে পার্থক্য ও রেষারেষি আরো বেড়ে গেল। সেইজন্য সভ্যদের নিয়ে ঘন ঘন গ্রুপ মিটিং ও জেনারেল মিটিং ডাকা হচ্ছিল। সেইসব মিটিং-এ আমাকেও নানাভাবে অংশ নিতে হয়। আমাকেও সেই সব মিটিং চালাবার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সার্কুলার পাঠাতে হয়। সেই সময় আমাদের সংগঠনের যে টাকা আবার টান পড়বে সে জানা ছিল। প্রতি মাসে সে প্রচুর খরচ:—(১) কমরেডদের থাকা খাওয়ার জন্য, (২) অনেকগুলো বাড়ি ভাড়া, (৩) মোটর গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক খরচ, (৪) হারার পারচেজে ডিউ দেওয়া, (৫) ফার্নিচার প্রভৃতি ভাড়ার জন্য প্রতি মাসে খরচ দিতে আমরা বাধ্য ছিলাম। তাছাড়া দুর্গাপুরে অন্তত্ত কমরেডকে নিয়ে রাখা তার খরচ আর দুর্গাপুরে অত বড় একটি ডাকাতির প্ল্যানকে রূপ দেওয়ার জন্য যা খরচ করতে হত তা অনেক টাকার। এইসব টাকা ম্যানেজ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কাজেই প্রতিটি দিন প্ল্যানটি পিছিয়ে যাচ্ছিল বলে তার জন্য আমাদের অনেক খেসারত দিতে হয়েছিল। আমরা সবার মানসিক অবস্থা যাচাই করে দেখে তখনই গো অবডার দিতে পারতাম যদি বুঝতাম সে ফিল্ড কমান্ডার যেখানে অ্যাকশন করতে প্রস্তুত হয়ে আছে কিন্তু ছোটখাট ডিফেক্টের জন্য—ছোটখাটো ভাবলে চলবে না, ডিফেক্টটি। ডিফেক্ট থাকা সত্ত্বেও অ্যাকশন শুরু করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। যে দিন আক্‌শন হওয়ার কথা ছিল সেদিন করা গেল না যেহেতু শেষ মুহূর্তে টাকা তুলে আনার ট্রান্সারটির স্টিয়ারিং হুইলে একটি মারাত্মক দোষ দেখা দিল। [redacted] থেকে চারটে পর্যন্ত স্পেশাল মিস্ত্রি লাগিয়ে এই স্টিয়ারিং হুইলটি ঠিক করাব, জন্য চেষ্টা চলেছিল। তবু এই চেষ্টা সেইদিন সফল না হওয়ার জন্য প্ল্যানটি স্থগিত থাকে।

দ্বিতীয় দিন সকালে দু তিন ঘন্টার ভিতরে ঐ মোটরের স্টিয়ারিং হুইলের দোষটি সারানো যাবে বলে মিস্ত্রি বলেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সি আর পি পুলিশ কাল-ভার্টের নীচে থেকে ডিনামাইট আবিষ্কার করল। এই ডিনামাইটগুলি রাখা হয়েছিল ঐ কালভার্টটিকে উড়িয়ে দেবার জন্য। এই কালভার্টটি উড়িয়ে দিলে সি আর পি সমস্ত মিলিটারী ভ্যান ও মিলিটারী গাড়ী এই পথে চলতে পারত না। এই পথে ট্রাঙ্ক রোডে আসতে হয়। ওদের পথ অবরোধ করার জন্য আমরা ডিনামাইট দিয়ে আওয়াজে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রেখেছিলাম আরার আরেকটি রাস্তা ব্যাঙ্কের পেছন দিক [redacted] একটখানি গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে সোজা ট্রাঙ্ক রোডে গিয়ে পড়তে পারত। এই রাস্তাটি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ও সি আর পি মিলি-টারী ভ্যান ও গাড়ী বেরিয়ে ট্রাঙ্ক রোডে পড়ার আরেকটি রাস্তা। এই রাস্তাটি ট্রাঙ্ক রোডে মিলিত হওয়ার আগে এই রাস্তার নীচের দিকেও একটি কালভার্ট ছিল। এই কালভার্টটিও যদি উড়িয়ে দেওয়া হত তবে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ও সি আর পি-পথ সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হত। অতএব ব্যবস্থা ছিল এই কালভার্টটিকেও উড়িয়ে দেবার জন্য।

পুলিশ ঐ কালভার্টের নীচে ডিনা-মাইট আবিষ্কার করে বুঝেছিল যে কোন দুষ্কৃতকারী দলের অভিপ্রায়ের জন্য এই ডিনামাইট সেখানে রেখেছে। কিন্তু এই থেকে ব্যাঙ্ক লুঠ হবে তা তারা ভাবতে পারে নি। এবং এই কালভার্টের নীচে ডিনামাইট পাওয়ার সূত্র ধরে আরেকটি কালভার্ট— অন্য পথে আবিষ্কার করে নি।

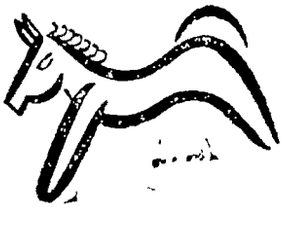

(চলবে)

সমালোচনা

মনোজ্ঞ প্রবন্ধ সংকলন

এই গ্রন্থটি সাহিত্যবিষয়ক সাতাশটি প্রবন্ধের মনোজ্ঞ সংকলন। লেখক ভূমিকায় বলেছেন সংকলিত প্রবন্ধগুলি প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে হলেও, তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী এনে ও অন্যান্য ভাবে সেগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করেছি।' ইংরেজী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বাংলায় প্রায় বিরল। ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি তখনই আমাদের অন্তরের বস্তু হয়ে উঠতে পারে যখন সেই সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের ভাষায় আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারব। গত দেড় বছর ধরে বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যের এবং কিছু পরিমাণে ইউরোপীয় সাহিত্যের চর্চা করছে। সেই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের সাহিত্যকর্ম এবং সাহিত্যচিন্তা অনেক পরিমাণে সঞ্জীবিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউরোপীয় সাহিত্যকে আমরা যেভাবে দেখেছি ও বুঝেছি তার বিশেষ পরিচয় আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্যে নেই। ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা বাংলায় এতই ক্ষীণ যে, মনে হয় বাঙালী-সুধীসমাজ ইংরেজীর মাধ্যমেই সেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চান। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও সর্বোপরি তাঁর রসানুভূতি বাংলায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য। এতে শুধুই যে বাংলার ইউরোপীয় সাহিত্যের আলোচনার পথ প্রশস্ত হবে তাই নয়, বাংলা সাহিত্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতও সুবিস্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

নানা কারণেই আমরা সাহিত্যকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখে থাকি। সাহিত্য যেহেতু একটি ভাবকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, একটি বিশেষ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা নির্ভর করে জন্ম নেয়, অনেকটা সেই কারণেই আমরা সাহিত্যকে একটি বিশেষ ভাষা, বিশেষ জনগোষ্ঠী বা বিশেষ দেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে অভ্যস্ত। এ দৃষ্টি যে নিরর্থক বা ভ্রান্ত একথা বলি না। কিন্তু এ দৃষ্টির মধ্যে পূর্ণতার অভাব আছে। মানুষের চিন্তাধারাকে যেমন একটি অখণ্ড প্রবাহরূপে দেখলে মানুষের চিন্তার রূপ ও প্রকৃতি ও তার বিকাশকে যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করা যায়, মানুষের সৃজন-কর্মের —সাহিত্য তার অন্তর্গত—অখণ্ডতাকে বুঝতে পারলেও তার ভাবজগতের, তার ধর্মিতার, তার কল্পনার ঐক্য এবং ও আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সে দৃষ্টিতে গোষ্ঠী সাহিত্য সম্প্রদায় সাহিত্য, প্রাদেশিক সাহিত্য এমনকি জাতীয় সাহিত্যকে ব্যাপ্ত করে এবং অতিক্রম করে সাহিত্যকে আরো সামগ্রিক ভাবে দেখা চলে। তুলনামূলক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা হল জ্ঞান ও ভাবরাজ্যের প্রাদেশিকতার বাধা উত্তীর্ণ হওয়া। এবং এ কাজে অগ্রসর হতে গেলে নিজের সাহিত্য বা বিশেষ কোন ভাষায় রচিত সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সাহিত্যের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেবে যে আরেকটি সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সাহিত্যের ধর্ম আরো উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয়, স্মরণ করিয়ে দেবে যেকোন সাহিত্যই একটি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্ম হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর সাহিত্য প্রবাহের সঙ্গে অন্তরঙ্গে যুক্ত। সেইজন্যই নিজের সাহিত্যের যথার্থ উপলব্ধির জন্য অন্যের সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা এত প্রয়োজন। আর তার মধ্য থেকেই এই উপলব্ধির জন্ম সম্ভব যে সমস্ত সাহিত্যই অন্তরঙ্গে এক। শেষ পর্যন্ত এই উপলব্ধিই রসিকের উপলব্ধি। 'কবিগুরু দান্তে, পেত্রার্কা ও বেনেসাঁস, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী প্রভৃতির রচনার মধ্যে সেই রসিকের উপলব্ধিকে প্রত্যক্ষ করি। বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় মাইকেলের সনেটে যেমন সৌন্দর্য দেখেন, ডিকেন্সের উপন্যাসে তেমন শিল্পের মহিমা দেখেন। শকুন্তলার মাধুর্যেও শিল্পচারুতে তিনি যেমন মুগ্ধ, ডেসডেমোনার মাধুর্য ও অভীরুতায় তিনি তেমনই চমৎকৃত। তুলনামূলক দৃষ্টি অর্থে তিনি বড়-ছোট বিচার করা মনে করেন না, তিনি মনে করেন, সৃষ্টির বিশিষ্টতার সন্ধান, প্রতিভার বৈচিত্র্য আবিষ্কার। 'সব বড় কবিই জগতের কবি।'—এই 'উক্তিটি তাঁর আলোচনার অন্যতম সূত্র।

বর্তমান গ্রন্থের সমস্ত রচনাগুলি তুলনামূলক-দৃষ্টিতে রচিত নয়। 'সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'শকুন্তলা ও ডেসডেমোনা', 'শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স' 'গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও ত্যাগের আদর্শ" প্রবন্ধগুলি মূলতঃ এই শ্রেণীর। স্বতন্ত্র ভাবে অনেক লেখক সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে, যেমন 'সাহিত্য-শিল্পী বলেন্দ্রনাথ' কিংবা 'চার্লস ল্যাম।' প্রত্যেকটি রচনাই সুরচিত এবং সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, পরিশীলিত মন ও সাহিত্যরুচির পরিচয় ব্যাপ্ত হয়ে আছে। যেহেতু এক একটি প্রবন্ধের রচনার কালের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট এবং বিষয় নানা ধরণের—সমস্ত প্রবন্ধ সম্ভবতঃ প্রত্যাশিত পূর্ণাঙ্গতা বা গভীরতা অর্জন করেনি, কিন্তু সমস্ত গ্রন্থটি পাঠ করলে একজন সুরসিক এবং নিষ্ঠাবান সাহিত্য পাঠকের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিশিরকুমার দাশ

সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুস্তিগৃহ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃঃ ২১০, মূল্য : ১৪-০০ টাকা।

ডালিয়া

একটি ফুলকে বিষয় করে সম্পূর্ণ একটি বই : ডালিয়া।

ডালিয়ার ব্যাপক প্রসার এবং এই ফুলকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় ভিক্ষু বুদ্ধদেবের নিরলস প্রচেষ্টা আজ সর্বজনবিদিত এবং স্বীকৃত। চাষ এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এ যাবৎকাল তিনি উপহার দিয়ে এসেছেন ডালিয়ার উন্নত ধরনের নানান প্রজাতি। সম্প্রতি উপহার দিলেন এই ফুলকে বিষয় করে সম্পূর্ণ একটি বই : ডালিয়া। ডালিয়া নিয়ে লেখা বই বিদেশে আছে। এদেশে একটিও নেই এবং বিদেশের ঐসব বই এদেশের চাষের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয়, তেমন উপকারেও আসে না.—তার কারণ জলবায়ুর ভিন্নতা। বিদেশে কেন, এদেশের শৈলাবাস এবং অন্যান্য প্রদেশে ডালিয়া চাষের যে প্রক্রিয়া, ভিন্ন জলবায়ুর কারণে আমাদের এই সমতল বাংলায় ঐ প্রক্রিয়া প্রয়োগযোগ্য নয়। অথচ এই সমতল বাংলায় ডালিয়া ফোটে পুরো চার মাস ধরে এবং এখানকার 'জলবায়ু ডালিয়ার উন্নত প্রজাতি তৈরী করার পক্ষে একান্ত আদর্শস্থানীয়।' সমতল বাংলার ডালিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে উৎকৃষ্ট তো বটেই, বিদেশের যে কোনো দেশের ডালিয়ার সমকক্ষ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এখানকার ডালিয়ার সমূহ সম্ভাবনা। লেখকের আশা সমতল বাংলায় ডালিয়ার চাষ ভবিষ্যতে বৃত্তি হিসেবে গৃহীত হবে এবং 'এখানের তৈরী নিত্যনতুন ডালিয়া সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে এমন দিন বোধহয় খুব দূরে নয়।

বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডালিয়ার যে অব্যাহত গতি তাতে লেখকের আশা অমূলক নয়। সমতল বাংলার জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে ডালিয়াকে নিয়ে লেখা বাংলা ভাষায় কোনো বই এযাবৎকাল ছিল না তো বটেই, সারা ভারতেও ভারতীয় অন্য কোনো ভাষায় এক মাত্র ডালিয়াকে নিয়ে লেখা কোনো বই ছিল না। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় এই বিষয়ে ভিক্ষু বুদ্ধদেব এবং জগদীশ সেনগুপ্ত পথিকৃৎ।

সহজ গদ্যে জমি এবং টব—উভয় ক্ষেত্রেই ডালিয়া চাষের সকল দিক অতি সরলভাবে করে দেখানো, বলা বাহুল্য সুন্দর হবে, শেখানো হয়েছে এই বইয়ে। উপরন্তু

আছে ডালিয়া সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা। যা লেখকের পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এই সব অতি সহজেই জানার পরিধিকে বিস্তৃত করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ 'ডালিয়ার ইতিবৃত্ত' নামক অধ্যায়টির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ে আমরা জানতে পারি ডালিয়ার আদি বাসভূমি মেকসিকো এবং নাম এককক্কালি বা কবসকোচিংল। পরে সুইডিশ উদ্ভিদবিদ আন্দ্রিয়াস গুস্তাভডাল-এর নামানুসারে নামকরণ করা হয়—ডালিয়া।

উৎকৃষ্ট ছাপা এবং প্রচ্ছদে কালো পট-ভূমির ওপর ব্যবহৃত ভিক্টর বুদ্ধদেব সৃষ্ট এদেশে তৈরী একটি দুর্লভ ডেকরেটিভ ডালিয়া, ভিক্টরজ মাদার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। যাঁরা ডালিয়াপ্রেমী, ডালিয়া চাষ সম্পর্কে যাঁরা অত্যুৎসাহী অথচ অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞজন এবং প্রদর্শনীর বিচারক, সকলের ক্ষেত্রেই এই বই মূল্যবান এবং ডালিয়াকে সম্পূর্ণ করে জানা ও জানানোর দিক থেকে এই বই অপরিহার্য।

নির্মলকুমার দাস

ডালিয়া : ভিক্টর বুদ্ধদেব ও জগদীশ সেন-গুপ্ত। প্রকাশক : সুরজিতচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, নেলিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩। দাম : ১২ টাকা।

খুন করা সহজ

খুন করা সহজ। কিন্তু খুনীকে খুঁজে বের করা কঠিন। গোয়েন্দা মাত্রেই এই অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া। সখের গোয়েন্দা-দের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরও প্রখর। ইংলণ্ডের এক শহরতলীর রহস্যজনক কয়েকটি খুনকে কেমন এক সূত্রে গাঁথা মনে হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার লিউক ফিসেস উইলিয়ামের। তার আবরণ-উন্মোচন করতে গিয়ে গ্রাম জীবনের বিচিত্র মানুষ, লোকাচার সংস্কার আর পারস্পরিক ঈর্ষার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন লিউক। রহস্যের পর রহস্য। ঘটনার পর ঘটনা। লর্ড হুইভ ফিল্ডের বাগদত্তা ব্রিজেট। তারই সাহায্যে লিউক শুরু করেছিলেন রহস্যের অনুসন্ধান। অনেক ঘটনার পর লর্ড হুইড-ফিল্ডের প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকা মিস ওয়েন ফিল্টকে সব হত্যারই কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আবিষ্কার করলেন লিউক। তখন লর্ড হুইড ফিল্ডকে প্রত্যাখ্যান করে লিউককে স্বামী হিসাবে স্বীকার করে নিলেন ব্রিজেট।

আগাথা ক্রিস্টির এই বিখ্যাত রহস্যোপ-ন্যাসটি অনুবাদ করেছেন বিজেন দাস। ক্রিস্টির এই উপন্যাসটিতে কেবল রহস্যই নয় ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনধারার এক বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে। সংযম ও পরিমিতি বোধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে ঘটনার গতি। রহস্য কাহিনীর লেখক হিসাবে ক্রিস্টির স্বাতন্ত্র্য এই বইখানিতেও স্পষ্ট। অনুবাদক বিশ্বস্ত ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিচিত্র প্রতিশোধ (মার্ডার ইজ ইজি)—আগাথা ক্রিস্টি। অনুবাদ : বিজেন দাস। পরিবেশক : শ্রীপ্রকাশনী। ৭ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৯। দাম, সাড়ে বার টাকা।

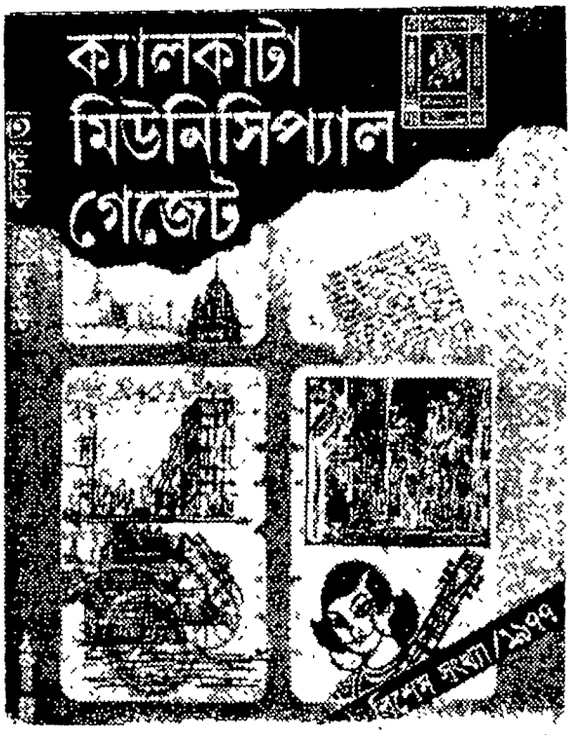

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের দুটি বিশেষ সংখ্যা হতে এসেছে। একটি কলকাতা সংখ্যা, অপরটি 'পুরশ্রী'। ১৯২৪ খৃঃ আত্মপ্রকাশের পর পত্রিকাটির ইতিহাস ছিল গৌরবোজ্জ্বল। স্বাধীনতা পরবর্তী-কালে অবহেলায় পত্রিকাটির সেই অতীত হারিয়ে গেছে। অমল হোম সম্পাদিত গেজেট এখন কিংবদন্তী। একটি বনেদী শহরের পৌরকর্তৃপক্ষের মুখপত্র যে কতখানি মূল্য-বান ও আকর্ষণীয় হতে পারে, পুরোন সংখ্যাগুলি হাতে নিলেই বোঝা যায়।

'কলকাতা ১৯৭৭' সংখ্যাটিতে পুরোন ও আজকের কলকাতার নানান বিষয়ে অনেক-গুলি লেখা আছে। ভবতোষ দত্ত (কলকাতা আজ ও আগামীকাল), কপিল ভট্টাচার্য (কলিকাতা নগরী ও ভাগীরথী-হুগলী নদী এবং ফরাক্কা ব্যারেজ), দেবেশ মুখার্জি (অস্তি ভাগীরথী তীরে কলিকাতা মহা-নগরী) এবং নিরঞ্জন সেনগুপ্তের (কলকাতা ১৯৪৭-১৯৭৭) তিনটি প্রবন্ধে মৌলিক বক্তব্য ও যুক্তি আছে। ইন্দ্র সেন কল-কাতার বেকার আর কল্যাণ মুনশী কলকাতার গাছপালা নিয়ে লিখেছেন। অন্যান্য যেসব লেখা আছে তার অধিকাংশই হল পুরোন কলকাতার নানান প্রসঙ্গ। কলকাতায় রেল সম্বন্ধে হরিপদ ভৌমিকের আলোচনাটি তথ্যসমৃদ্ধ। শ্রীপান্থের লেখাটিও ভাল। রবীন্দ্র সাহিত্যে কলকাতা প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী আর নিত্যপ্রিয় ঘোষ।

'পুরশ্রী'র এই বিশেষ সংখ্যাটিতে আছে কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা, কলকাতার প্রসঙ্গ, স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা এবং আরো অনেক কিছু।

দুটি সংখ্যাই ছবিতে ভরা। ভাল কাগজে ছাপা। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বন্দী ক্ষুদিরামের ছবি এবং ঐ জেল থেকে লেখা দীনেশ গুপ্তের চিঠি 'পুরশ্রী'র অন্যতম আকর্ষণ। কলকাতা প্রেমিক মানুষেই নয়, সাংস্কৃতিক চেতনার মানুষ মাত্রেই পত্রিকা দুটি সংগ্রহ করতে পারেন।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বাংলা ও ইংরেজি দুটি পত্রিকাই নিয়মিত বেরোবে। একটি বিষয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃ-পক্ষ বিবেচনা করতে পারেন। কলকাতা প্রসঙ্গে দৈনিক বা অন্যান্য পত্রিকায় যেসব আলোচনা বেরিয়ে থাকে সেগুলি গেজেটে পুনর্মুদ্রণ সম্ভব কি না। আর পুরোন কলকাতার সবর না খুঁড়ে যে কলকাতা আমরা বাস করছি তার খবর ও আলোচনা পত্রিকায় অগ্রাধিকার দেওয়া।

দুটি সংখ্যারই দাম চার টাকা করে। হুগ বিল্ডিং এবং দেউলার মিউনিসিপ্যাল অফিসে পাওয়া যাবে।

কমল চৌধুরী

খেলা

বিশ্বকাপ ফুটবল

আর্জেন্টিনার মাটিতে একদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল পর্যায়ের আসর বসে তার প্রথম পর্বের লীগের খেলা নিয়ে। এই প্রথম পর্বের লীগের খেলায় ১৬টি দেশ সমান ভাগ হয়ে চারটি গ্রুপে খেলেছিল। প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং রাণার্স-আপ দেশ দ্বিতীয় পর্বের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে। ১নং গ্রুপ থেকে ইতালী ও আর্জেন্টিনা, ২ নং গ্রুপ থেকে পোল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানী, ৩ নং গ্রুপ থেকে অস্ট্রিয়া ও ব্রাজিল এবং ৪ নং গ্রুপ থেকে পেরু ও হল্যান্ড দ্বিতীয় পর্বের লীগে উঠেছিল।

প্রথম পর্বের লীগে প্রতিটি দেশ তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে। মোট খেলার সংখ্যা ২৪ এবং মোট গোলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩। প্রথম পর্বের লীগের খেলায় ১৬টি দেশের মধ্যে এই ৫টি দেশ অপরাজিত থাকে—১ নং গ্রুপে ইতালী, ২ নং গ্রুপে পোল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানী, ৩ নং গ্রুপে ব্রাজিল এবং ৪ নং গ্রুপে পেরু। এই পাঁচটি দেশের মধ্যে ইতালি, পোল্যান্ড, এবং পেরু নিজ নিজ গ্রুপের লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল। অপর দিকে পশ্চিম জার্মানী এবং ব্রাজিল রাণার্স-আপ অর্থাৎ লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েও অপরাজিত ছিল। চারটি গ্রুপের মধ্যে একমাত্র ৩ নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রিয়া অপরাজেয় থাকা লাভ করতে পারেনি। অস্ট্রিয়া পর পর দুটো খেলায় জিতে লীগের শেষ খেলায় ০—১ গোলে ব্রাজিলের কাছে হেরে যায়। প্রথম পর্বের লীগের তিনটে খেলাতেই জিতেছে একমাত্র ১ নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান ইতালী—যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি গোল করে। প্রথম পর্বের লীগের তিনটে খেলাতেই হেরেছে ১ নং গ্রুপে হাঙ্গেরী এবং ২ নং গ্রুপে মেক্সিকো। হাঙ্গেরীর আজ কি শোচনীয় পরিণতি। এই হাঙ্গেরী বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় রাণার্স-আপ হয়েছে দুবার (১৯৩৮ ও ১৯৫৪ সালে)। গতবারের (১৯৭৪) বিশ্বকাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী ২ নং গ্রুপে রাণার্স-আপ হয়েছে। এক পয়েন্ট বেশী পেয়ে এই গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী পোল্যান্ড। পশ্চিম জার্মানী বনাম পোল্যান্ডের খেলাটি গোলশূন্য ছিল। পশ্চিম জার্মানী তিনটে খেলায় ৬টা গোল দিয়ে কোন গোল খায় নি। প্রথম পর্বের লীগের মধ্যে একটাও গোল খায়নি একমাত্র পশ্চিম জার্মানী। তা ছাড়া পশ্চিম জার্মানী আরও একটা রেকর্ড করেছে একটা ম্যাচে সর্বাধিক গোল—৬টা (বিপক্ষে তুরস্কের)। গ্রুপের খেলায় সব থেকে বেশী গোল হয়েছে ৪ নং গ্রুপে—১৯টা এবং সব থেকে কম গোল ৩নং গ্রুপে মাত্র ৮টা।

গতবারের রাণার্স-আপ হল্যান্ড এবারের ৪ নং গ্রুপে রাণার্স-আপ হয়েছে। ৪ নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পেরু পেয়েছে ৫ পয়েন্ট এবং হল্যান্ড ৩ পয়েন্ট। পেরু বনাম হল্যান্ডের খেলাটা গোলশূন্য ছিল। এবারের প্রথম পর্বের লীগের খেলায় মাত্র দুজন 'হ্যাট-ট্রিক' করার গৌরব লাভ করেছেন—হল্যান্ডের রব রেনসেনব্রিঙ্ক এবং পেরুর টিওফিলো কুবিল্যাস। দু জনেই তাঁদের হ্যাট-ট্রিক করেন ৪ নং গ্রুপের সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী ইরানের বিপক্ষে। সর্বাধিক গোলদাতার গৌরব লাভ করেন—টিওফিলো কুবিল্যাস—৫টি গোল (বিপক্ষে স্কটল্যান্ড ২ এবং বিপক্ষে ইরাণ ৩)।

প্রথম পর্ব লীগের খেলায় সর্বাধিক গোল করেছে ৪ নং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পেরু—৭টা। অপর দিকে সব থেকে বেশী গোল খেয়েছে ২ নং গ্রুপের সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী মেক্সিকো (১২টা গোল)।

দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বের লীগের মতই বারটা করে ৮টি দেশ সমান দু ভাগ হয়ে দ্বিতীয় পর্বের লীগে খেলে। দ্বিতীয় পর্বের লীগের এ গ্রুপে খেলেছে হল্যান্ড, ইতালি, পশ্চিম জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া। অপরদিকে বি গ্রুপে আছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পোল্যান্ড ও পেরু। এই আটটি দেশের মধ্যে ইউরোপের আছে ৫টি এবং দক্ষিণ আমেরিকার ৩টি। এ গ্রুপে আছে ইউরোপেরই চারটি দেশ, সুতরাং এ গ্রুপ থেকে ইউরোপেরই একটি দেশ ফাইনালে উঠবে। অপরদিকে বি গ্রুপে আছে ইউরোপের পোল্যান্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও পেরু। ফুটবল খেলার পণ্ডিতদের মতে বি গ্রুপ থেকে ব্রাজিল অথবা আর্জেন্টিনার ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

দ্বিতীয় পর্বের লীগে আটটি দেশেরই একটা করে খেলা হয়েছে। গতবারের রাণার্স-আপ হল্যান্ড, ৫—১ গোলে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে বিরাট চমক সৃষ্টি করেছে। এবারের প্রথম পর্বের লীগের খেলায় অস্ট্রিয়া ১ নং গ্রুপে পেয়েছিল প্রথম স্থান এবং হল্যান্ড ৪ নং গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান। দ্বিতীয় পর্বের লীগের চারটে খেলার পর জুয়াড়িদের বাজির দর তালিকায় ফেবারিট হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয় পর্বের লীগের বি গ্রুপে আর্জেন্টিনা ২—০ গোলে গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী পোল্যান্ডকে হারিয়েছে। তিনবারের বিশ্বকাপ বিজয়ী ব্রাজিল ৩—০ গোলে পেরুকে হারিয়ে বি গ্রুপের লীগ তালিকায় উপরিস্থিত দাঁড়ি

শেষাংশ আছে ১১-৬-৭৮ পৃষ্ঠায়

উত্তেজনা

বিশ্বকাপ ফুটবলের এত গুরুত্ব কেন? অলিম্পিকের পর বিশ্ব ফুটবলই মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস টুর্ণামেন্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড। এ ছাড়াও ফুটবলই বোধ হয় এই মুহূর্তে বিশ্বের সব থেকে জনপ্রিয়তম খেলা। ফুটবল ঘিরে যে উন্মাদনা, উত্তেজনা দেখা যায় তার নজির অন্য কোন খেলায় খুঁজে পাওয়া ভার। এই সব কারণগুলিই বিশ্ব ফুটবলকে এতখানি গুরুত্ব দিয়েছে। ওলিম্পিকে ফুটবলে সোনা জেতার থেকেও বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব পাওয়ার জন্য দলগুলিও বেশী মনোযোগ দেয়। স্বভাবতই এই ধরণের প্রতিযোগিতায় মাঠের চৌহদ্দী ছাড়াও অনেক অনেক ঘটনা ঘটে মাঠের বাইরে, যবনিকার অন্তরালে। রাজনীতিও কখন সখনো অনুপ্রবেশ করে এই বিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যে। এই সব ঘটনাগুলিই বিশ্বকাপ ফুটবলে বৈচিত্র্য এনে দেয়। দিচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের সেই আদিপর্ব থেকে। বিশ্বকাপ ফুটবলের ব্যাপক আয়োজন করতে গিয়ে সংগঠক দেশগুলিকেও হাজার রকমের বঞ্চনাকে সামলাতে হয়। আর্জেন্টিনাতেই তো বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য নতুন স্টেডিয়াম বানাতে হয়েছে, বানাতে হয়েছে ফাইভ স্টার হোটেল আর নতুন নতুন রাস্তাঘাট। সত্যি কথা বলতে কি বিশ্ব ফুটবলের জন্য গোটা আর্জেন্টিনাকেই নতুন সাজে সাজতে হয়েছে।

বিশ্ব কাপ ফুটবলের সব ঘটা অনুষ্ঠানের ঘটনাগুলি নিয়ে একটি বিরাট বই লেখা চলে, বানান যায় পাকুড়ের তিন ঘণ্টার একটি রঙীন ছবি। সব ঘটনা এই স্বল্প পরিসরে বিবৃত করা সম্ভব না হলেও দু একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। এবারের চলতি বিশ্ব কাপের কথাই ধরা যাক। নেপথ্যের এই ঘটনাটি প্রমাণ করে দেয় ফুটবলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার আগুনে নিজেদের বাঙাতে, ঠিক আমাদের মতই ভালবাসেন বিদেশীরাও। এবারের প্রতিযোগিতা শুরু হবার দিনকতক পরে একদিন মারডেল প্লাটা স্টেডিয়ামের কাছাকাছি ডাউন টাউন স্ট্রীটে একটি লাল গাড়ি এসে দাঁড়াল সমুদ্রের কাছাকাছি। গাড়ি থেকে নামলেন তিনজন লোক। তাঁদের হাতে একগাদা হলুদ সোয়েটার। সোয়েটারের পিছন দিকে বড় বড় অক্ষরে ব্রাজিল দলের সমর্থনে স্লোগান লেখা। এই তিন ব্রাজিল অনুরাগী ওই সোয়েটারগুলি বিলোতে আরম্ভ করলেন। নিমেষের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল জন-অরণ্য। কাড়াকাড়ি পরে গেল সোয়েটারগুলি নেবার জন্য। ফাদাকাড়ি থেকে হাতাহাতি অবশেষে মারামারি। সব শেষে বিস্ময়কর ব্যাপার ঠিক বৃষ্টির মতই পড়তে লাগল ওই লালগাড়ির উপরে।

রীতিমত দাঙ্গা। পুলিশ ছুটে এল। লাঠি-বাজি করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে হল।

ফুটবল ফেরে মানুষকে কোথায় নিয়ে আর তার আর একটি গল্প শুনুন। এটিও বিশ্ব কাপ ফুটবলেরই আর একটি অন্তরাল-এর কাহিনী। সেবার বিশ্ব ফুটবলের একটি খেলায় মুখোমুখি হয়েছে পূর্ব জার্মানী আর চিলি। পূর্ব জার্মানী এক গোলে এগিয়ে আছে খেলার শুরু থেকেই। আরো হাজার হাজার দর্শকের সঙ্গে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে খেলা দেখছেন দক্ষিণ আমেরিকার সান্টিয়াগো শহরের ফুটবল অনুরাগী লরেঞ্জ পারস্তো। খেলার একসময় হঠাৎই চিলি গোলটা শোধ দিল। উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন পারস্তো। পাশে ছিল একটি জ্বলন্ত স্টোভ তাতে ফসকালেন এক বিরাট লাথি। পা পুড়ে গেল। সম্বিত নেই পারস্তোর। লাথির পর লাথি মারতে লাগলেন স্টোভে। জানলায় পর্দায় আগুন লাগল। বাড়িতে আগুন ধরে গেল। পারস্তোকে পাঠাতে হল হাসপাতালে।

বিশ্ব কাপ ফুটবলের মাঠের বাইরে নারুন সাড়াজাগানো ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৬ সালে, ইংলন্ডে। সেবার বিশ্ব কাপের আসর বসেছিল ইংলন্ডে। খেলা শুরু হবার দিন-কয়েক আগে বিশ্ব কাপের বিজয়ীর পুরস্কার জুলে রিমে ট্রফিটি চুরি গেল একটি প্রদর্শনী থেকে। আগাগোড়া সোনা দিয়ে তৈরী ট্রফিটি উদ্ধারের জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে-ছেন চারিদিক। দাগী অপরাধীদের পাকড়াও করে আনা হল পুলিশ স্টেশনে। কিন্তু কোথায় ট্রফি? কেউ কোন সন্ধান দিতে পারল না। ব্রিটিশ সরকারের মাথায় হাত। সমস্ত বিশ্বের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে তারা? যাই হোক, মুশকিল আসানের জন্য নামকরা এক জুয়েলারী কোম্পানিকে ট্রফি বানাবার জন্য অর্ডার দেওয়া হল। কিন্তু এরপরই খুব আশ্চর্যজনকভাবে আসল জুলে-রিমে ট্রফিটি পাওয়া গেল। ট্রফি উদ্ধার করল কে? একটি সাধারণ পোষা কুকুর, নাম যার ছিল পিকলস্। পিকলস্ তার প্রভুর সঙ্গে গ্রামের রাস্তায় ঘুরছিল। হঠাৎ গন্ধ পেয়ে কবে সে ছুটে গেল একটি পোড়ো বাড়ির দিকে। তারপর বাড়ির পিছন দিকের জঞ্জাল-কুড় খুঁড়তে লাগল নখ দিয়ে। অল্পক্ষণ খোঁড়াখুঁড়ির পরই বেরিয়ে এল সেই বিশ্ববিখ্যাত জুলে রিমে ট্রফি। পিকলস্-এর প্রভু তখন হতভম্ব। ট্রফিটি নিয়ে তিনি তখনই জমা দিলেন পুলিশ স্টেশনে। ব্রিটিশ পুলিশ পিকলসের প্রভুকে প্রচুর পুরস্কার দিল। আর দিল বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা দেখার দুটো টিকিট। সেবার ওয়েম্বলীতে বাঁশীর পাশে বসে খেলা দেখেছিল পিকলস্ আর তার প্রভু।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

এ আমাদের লজ্জা, এ আমাদের দুঃখ

ভারতীয় ফুটবলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। অতীতের দিকপাল খেলোয়াড় ভেঙ্কটেশ আর নেই। মাত্র একান্ন বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পর-লোকগমন করেছেন। দমদম বোডের হাউজিং এস্টেটে সেদিন বিকেলে তিনি বসে বসে ছোটদের খেলা দেখছিলেন। বিকেল হলেই গড়ের মাঠ তাঁকে টানতো। কিন্তু সেদিন আর যান নি। বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় একটা বেঞ্চিতে বসে তিনি ছোট-দের ফুটবল খেলা দেখছিলেন। যারা খেলছিল তাদের অনেককেই তিনি হাত ধরে খেলা শিখিয়েছেন। তখন সন্ধ্যে হয় হয়। খেলা দেখতে দেখতেই তিনি ঢলে পড়লেন বেঞ্চির ওপর। তাঁকে ধরা-ধরি করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার ডেকে আনা হল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। সাংঘাতিক রকমের হৃদরোগের আক্রমণে তিনি বড় তাড়াতাড়ি কাটিয়ে গেলেন এই পৃথিবীর মায়া।

ভাবতে অবাক লাগে— ভেঙ্কটেশের মত খেলোয়াড় ভারতে কজন জন্মেছেন। আজ যাঁরা চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারের কমে কথা বলেন না তাঁরা তো কোনদিন ভেঙ্ক-টেশের ছায়াও নাগাল পাবেন না। অথচ ফুটবল তাঁদের লক্ষপতি করে দিচ্ছে। আর ভেঙ্কটেশরা দিন কাটাচ্ছেন দারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে। আহা ভেঙ্কটেশরা যদি আরো বেশ কিছু বছর পরে জন্মাতেন।

ভেঙ্কটেশদের মত খেলোয়াড়দের আর্থিক দুরবস্থা যে আমাদের কতবড় কলঙ্ক তা বলে বোঝান যাবে না। একদিন যাঁরা খেলা দেখিয়ে ভারতকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, একদিন যাঁদের খেলার নামে মানুষ পাগল হয়ে উঠতেন—উত্তরকালে তাঁরা কি আমাদের কাছে কিছুই দাবী করতে পাবেন না? আমরা কি একটু সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকাতে পারি না?

তা যদি পারতাম তাহলে ছোনে মজুমদারকে ঐভাবে চরম দুরাবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হত না। ভেঙ্কটেশের জীবনের শেষ কটি মাস টাকা টানাটানি চলত না। শুনেছি মোহনবাগান ক্লাব খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্যে একটা তহবিল গড়েছেন। কিন্তু যাঁরা যথার্থ দুস্থ তাঁরা এখন পর্যন্ত সেই তহবিল থেকে কিছু পেয়ে-ছেন? হ্যাঁ পেয়েছেন ঠিকই।—শুনতে হয়ত খারাপ লাগবে, তাঁরা তা পেয়েছেন পর-লোকে চলে যাবার পর। ছোনে মজুমদারের যখন মরদাহন যাবার পয়সা থাকত না, হেঁটে যেতেন—ঠিক মত খেতে পেতেন না— তখন তাঁর দিকে কেউ সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন নি। দিয়েছেন মারা যাবার পর। ভেঙ্কটেশের ক্ষেত্রেও দেখা গেল একই ব্যাপার ঘটতে।

আমরা বহুদিন থেকেই সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি। আবার জানাচ্ছি—তাঁরা তো স্বাধীনতা সংগ্রামী, দুঃস্থ সাহিত্যিক, শিল্পীদের সাহায্য দিয়ে থাকেন—তাঁদের সেই তালিকায় যদি দুঃস্থ খেলোয়াড়দের নাম তোলা হয় তাহলে ক্ষতি কি? তাতে সরকারের কিছু যাবে আসবে না—কিন্তু বেঁচে যাবেন খেলার মাঠের দিকপালরা।

বেসরকারীভাবে দুস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্য তহবিল গড়ার জন্যে অনেকের মধ্যে কজন সাংবাদিক ও অতীতের খেলোয়াড় চেষ্টা চালাচ্ছেন। এখনো পর্যন্ত তা সফল হয় নি। তবে ভেঙ্কটেশ মারা যাবার পর আই এফ এ ও ভেটারেন্স ক্লাব এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। যদিও এই ব্যাপারে আই এফ এর অনেকদিন আগেই এগিয়ে আসা উচিৎ ছিল। এতদিন বোধহয় আই এফ এ কর্তারা এই সাহায্য তহবিলের গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন নি।

ভেঙ্কটেশ স্মরণ সভায় আই এফ এ সম্পাদক বলেছেন যে প্রত্যেক বছর একটি করে 'চ্যারিটি' খেলার টাকা দুঃস্থ খেলো-য়াড়দের সাহায্য তহবিলে দেওয়া হবে। তা ছাড়া সেই তহবিলে সাহায্য করতে পারবেন সকলেই। সাধু প্রস্তাব। এখন খোপে টিকলে হয়।

আমাদের উচিৎ এখনই ঐ দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্য তহবিলের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ—যাঁরা অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়রা এ ভাবে কষ্ট আর দুশ্চিন্তা মাথা অসময়ে মারা না যান তা দেখা। ভাবতেও কষ্ট হয় যে যদি ভেঙ্কটেশ ঐরকম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে না হত, চাকরী নিয়ে নিশ্চয়ই মধ্যে থাকতে না হত তাহলে তিনি হয়ত এইরকমভাবে অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে চলে যেতেন না...।

শান্তিপ্রি

চিত্রধ্বনি

চলচ্চিত্রে অভিনয়

চলচ্চিত্রের বয়স যত বাড়ছে, ততই সে মাটির কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করছে। সময় বা জীবনের সঙ্গে গভীর সম্পর্কই এখনকার চলচ্চিত্রের মূল কথা। চলচ্চিত্রকে সময় বা জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায় তার বিষয়বস্তু এবং সেই বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার দায়িত্ব তার চরিত্রের। চরিত্রগুলোর প্রধান কথা সে কতটা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, বা কতটা হাওয়ায় ভাসছে। কোন চরিত্রের সঙ্গে যদি জীবনের কোন সম্পর্ক না থাকে, তার কাজকর্মের সঙ্গে যদি সমাজ সমাজের যোগাযোগ না থাকে, তাহলে সেই চরিত্রকে বিশ্বাস করাও কঠিন। অনেক সময় অবশ্য শক্তিশালী শিল্পীরা তাঁদের অভিনয়ে তেমন চরিত্রকেও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। কিন্তু এখানে আমাদের মূল উপপাদ্য সেইসব চরিত্র যারা সমাজ ও জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত। যাদের আমরা মাটির কাছাকাছি দেখতে পাই। এখন প্রশ্ন ঐসব চরিত্র রূপায়ণে শিল্পীরা কি দৃষ্টিভঙ্গী নেবেন। ব্রেশটের নাটকবিষয়ক একটি লেখায় দেখেছিলাম অভিনেতা দর্শকদের সব সময় বুঝতে দেবেন যে তিনি অভিনয় করছেন, চরিত্রের সঙ্গে তাঁর একাত্ম হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে স্তানিস্লাভস্কি ডায়ালেটিকস প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাতে আমরা এর বিপরীত মত দেখতে পাই। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে ব্রেশট যে মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তা তাঁর নাটকের ক্ষেত্রে ছিল এক মহান প্রয়োগ। কিন্তু তিনি যে স্টাইলে নাটক লিখেছেন, চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন, তার বাইরে সম্পূর্ণ অন্য আঙ্গিকে যদি কেউ নাটক করেন, সেখানেও কি ব্রেশটীয় স্টাইল সম্পূর্ণ কার্যকারী হবে? মনে হয় না।

নাটকের কথা বাদ দিন, এখন আসুন চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে নানা মতামত ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যে মতামতই থাক না কেন, চলচ্চিত্রে অভিনয় নির্ভর করে তার বিষয়বস্তু, চরিত্র ও পরিবেশের ওপর। চার্লি চ্যাপলিনের কথাই ধরুন। চ্যাপলিনের সৃষ্টি যে ভবঘুরে চার্লি, তার যে পোশাক, হাঁটা, কথা বলার স্টাইল, তা ঐ পরিবেশে চরিত্রের পক্ষে খাপ খেয়ে যায়। অন্য কোনো পরিবেশে তাকে সম্ভবত মানাত না। তাই চার্লির পরবর্তী ছবি 'গ্রেট ডিক্টেটর' লাইম লাইট', 'মঁসিয়ে ভের্দু' বা মডার্ন টাইমস' ইত্যাদিতে আমরা সেই পরিচিত চার্লিকে খুঁজে পাই না। চার্লির এখানে অরূপ রূপ, যেহেতু বিষয়বস্তু, চরিত্র ইত্যাদি ঐ ভবঘুরের সঙ্গে খাপ খায় না।

আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিনয়ের বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে থাকে আবেগ ও অতিনাটকীয়তা, যেহেতু গল্প সেভাবেই কথা বলে। ভারতবর্ষে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি হয়, যে স্টাইলে ছবিকে বিবৃত করা হয়, সেখানে অভিনয়ের সঙ্গে, এই মাটির সম্পর্ক একান্ত প্রয়োজন। অভিনয় না করাটাই সেখানে অভিনয়। আমাদের শিল্পীরা যদিও এ বিষয়ে সতর্ক, তবু ঠিক স্বাভাবিক নন। অভিনয়ে প্রথম ও প্রধান বিষয় চরিত্রের বিশ্লেষণ। সে চরিত্র কোন্ সমাজ থেকে এসেছে, কি করে, কি ভালবাসে, তার বন্ধুরা কিরকম, তার রুচি চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে শিল্পী যত বেশী জানতে পারবেন, ততই তিনি ঐ চরিত্রের কাছাকাছি আসতে পারবেন। কিন্তু এখানে কোন শিল্পী, তিনি যে চরিত্রেই অভিনয় করেন না কেন, আমরা ঐ শিল্পীকেই দেখি, চরিত্রটিকে নয়। বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের ছবির জমিদার আর তরুণ মজুমদারের রেলকর্মী কিংবা দেবী চৌধুরাণীর নায়িকা ও আলো আমার আলোর নায়িকার চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কিন্তু আমরা দেখতে পাই শিল্পীদের সেই একইভাবে হাসি, কান্না, ক্রোধ, কথা বলা ইত্যাদি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্ত তাঁতী যেভাবে হাসে, কথা বলে, সেভাবে কি শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস হাসতে পারে, না কথা বলতে পারে? যেহেতু দুই ব্যক্তিত্ব চরিত্রই যে আলাদা, তারা এসেছে দুই ভিন্ন সমাজ, পরিবেশ থেকে। এখানে যদি একই শিল্পী এই দুই চরিত্রে অভিনয় করেন, তাহলে তাঁকে পুরোপুরি আলাদাভাবে চরিত্র দুটো ধরতে হবে। আমাদের চলচ্চিত্রের যে মূল ব্যাপার যে স্টাইল আমাদের চলচ্চিত্র অনুসরণ করে, সেখানে অভিনয়ের সময়ে শিল্পীকে তার ব্যক্তিচরিত্রের কথা একেবারেই ভুলে যেতে হবে। বাংলা চলচ্চিত্রে অবশ্য এর বেশী উদাহরণ নেই। উত্তমকুমার প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী অভিনেতা। তিনি অনেক ছবিতে যেমন চরিত্রগুলোর কাছাকাছি গেছেন, তেমনি অনেক ছবিতে শুধু উত্তমকুমারই থেকে গেছেন, ফলে অসাধারণ বা আমি সে ও সখা ইত্যাদির চরিত্রগুলোতে

পরবেশ ছবিতে রত্না ঘোষাল

আমরা আলাদা কোন ভূমিকা দেখতে পাই না। এর জন্য দায়ী যতটা না শিল্পী, তারচেয়ে বেশী দায়ী ঐসব ছবির স্ক্রিপ্ট ও পরিচালক। ঐসব ছবি কখনো তার চরিত্রগুলোকে স্পষ্ট হতে সাহায্য করে না, পরিচালকও অনেক সময় জানেন না কোন্ চরিত্রকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। ফলে শিল্পীর সেখানে আন্দাজে অভিনয় করা ছাড়া উপায় থাকে না। সৌমিত্র চ্যাটার্জি সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যতটা স্বাভাবিক, যতটা চরিত্রানুগ, সে তুলনায় অন্য ছবিতে তার কিছুই দেখা যায় না। মাধবীর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এর কারণ সত্যজিৎ রায় তাঁর চরিত্রগুলোকে শিল্পীর সামনে স্পষ্ট করে দেন। অন্যেরা পারেন না। যেখানে উত্তম সৌমিত্র মাধবীদের এই অবস্থা, সেখানে অন্যদের কথা আর নাই বা বললাম। বিষয়বস্তু ও চরিত্রের গোঁজামিলের জন্য শিল্পীদের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে একই অভিনয় দেখতে পাই। এর শিকার আজকের প্রায় সব শিল্পী। যার জন্য আমরা প্রায় প্রতি ছবিতেই আমজাদ খানকে ঘুরে ফিরে গব্বর সিং হিসেবেই দেখতে পাই।

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনী অতিক্রান্ত!

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টায়

নাটক ও পরিচালনা—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেঃ- বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

অবশ্য অনেক সময় নানা ছবির একই রকম চরিত্রকে শিল্পী শুধু কয়েকটা ভঙ্গী দিয়ে আলাদা করে দিতে সক্ষম হন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ প্রাণ। তিনি যে সময় ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং যখন প্রায় সব ভিলেনের একই রকম কথাবার্তা ছিল, তিনি সেখানে হাঁটা বা হাতনাড়া বা মুখ-ভঙ্গীর বদল করে অন্য ছবি থেকে ঐ চরিত্রকে আলাদা করে দিতে পারতেন—যদিও এটা কেন বিরাট কিছু নয়। আমাদের বাংলা ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকটি বিশেষ ছবির বিশেষ মুহূর্তে চরিত্রের কাছাকাছি যেতে পেরেছেন। অন্যেরা যদিও ভাল অভিনেতা, তবু তাঁরা তাঁদের নিজস্ব, ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি, এইজন্য যে এতদিনেও তাঁরা তেমন কোন স্পষ্ট চরিত্রের মুখোমুখি হন নি। অভিনেতা যত বড় হোন না কেন, তিনি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন, যদি স্ক্রীপ্ট তাঁকে না সাহায্য করে। আমাদের আজকের চলচ্চিত্রে যা হচ্ছে তা শুধু কিছু পৌরুষহীন চরিত্রের লক্ষ্মক্ষম্ফ, যেহেতু ছবিগুলির গতিপ্রকৃতিও সেরকম।

বিমল ভাদুড়ী

নিষ্কৃতি

বাংলা ছবিতে শরৎ কাহিনীর জনপ্রিয়তার কারণ অনেকে অনেকরকমভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভাল সামাজিক গল্প, নাটক ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি বলতে কি শরৎসৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে আমরা আমাদের যেন আরও বেশী করে পাই। আলোচ্য ছবি 'নিষ্কৃতি'-দেখতে দেখতে তাই বারবার মনে হয় যে এর শৈলজা, সিদ্ধেশ্বরী, নয়নতারা বা বাড়ীর ছোটরা—এদের যেন যেভাবেই দেখি। এরা আমাদের আপনজন। এই কারণেই আমাদের দর্শকচিত্তের কাছে শরৎ কাহিনীর আবেদন সবচেয়ে বেশী। নিউ থিয়েটার্সের পরদেবদাস থেকে শুরু করে এখনও যা সমান-ভাবে জনপ্রিয়। কিছুদিন আগে 'দত্তা' সেকথা প্রমাণ করেছে। এখন পুনর্নির্মিত 'নিষ্কৃতি'। সন্দেহ নেই যে এ ছবিও টিকে করবে।

অমর কথাশিল্পীর এই কাহিনী পড়েননি এমন অমৃত পাঠক খুব কমই আছেন। তাই এটুকু জানালেই যথেষ্ট যে ছবিতে কাহিনীর বিশ্লেষণ মোটামুটিভাবে বিশ্বস্ত এবং সুন্দর। যদিও আরও সুন্দর আশা করা গিয়েছিল। আর সুন্দর মুখ্য চরিত্রের শিল্পী-দের অভিনয়। এ ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছেন সন্ধ্যারাণী (সিদ্ধেশ্বরী) সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (গিরিশ), মাধবী (শৈলজা) এবং একদল শিশুশিল্পী। পরের শ্রেণীতে রয়েছেন অনুপকুমার (রমেন) অলকা (নয়নতারা) এবং নির্মলকুমার (হরিশ)। এঁরা চরিত্রগুলোতে প্রাণ এনেছেন। ছবিও পাশ পেয়েছে। তবে এ ধরনের ছবিতে যত জোর দেওয়া দরকার, তা হল একটি মোটামুটি ভাল ডিনোমো। মণি কর্মা সে কাজটা এখানে ভালই করেছেন। পরিচালকও কাহিনীর মূডকে ধরতে পেরেছেন নাটকীয় সংঘাতগুলো এনেছে। ছবি কোনখানে স্থির হয়ে পড়েনি, কিছু দৃশ্য পরিবেশনা, যেমন ধুমের মধ্যে ছোটদের খাইয়ে দেওয়া, রেকর্ডের পিন আটকে যাওয়া, শৈলজার শূন্য ঘর ইত্যাদি সুন্দর। অনুপ-মাধবীর অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোও মনোরম। তবে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মাধবীর কাজকর্ম দেখানো পুরনো ধাঁচের। সুখেন দাসের নাচ-গান উপভোগ্য হলেও একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। শেষের গড়ানো মেরেটির নাচগান ছবির গতিকে ব্যাহত করেছে। 'বল বল বল সবে' গানটির প্রয়োগও বেমানান হয়েছে। মানবেন্দ্রর সঙ্গীত সময়োপযোগী। তাঁর গাওয়া গানগুলোও ভাল। ছবিতে তিনি অনুপ এবং সুখেনের মুখে গান করেছেন। এ ছাড়াও একবার রেকর্ডে মেয়েমহলে গাওয়া তাঁর একটি সুন্দর গান বাজতে শোনা গেছে। পরিচালক এদিকটা একটু নজর দিলে পারতেন। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে একই কণ্ঠের গান মেনে নেওয়া শক্ত। বিশেষ করে পরিচালক যখন ডিটেলের ব্যাপারে এত সতর্কবান।

অসিতবরণ মিত্র

ঝাঁসীর রানী ছবিতে মিঠুন ও সুমিত্রা

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও—এই মুহূর্তে

পুরো যে মাস টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও কর্মব্যস্ততার তুঙ্গে ছিল। ফ্লোর এবং সেকশন—এ দুই বিভাগে তিন-চার শিফ্‌টের বেশী কম হীন ছিল না। অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় 'মা কবুণাময়ী', দিলীপ রায়ের 'দেবদাস', অজিত গাঙ্গুলীর 'রাতভাসী', কমল মুখার্জির 'এই তো সংসার' প্রভৃতি ছবির সুটিং এগিয়েছে পুরোদমে। সেকশন ব্যস্ত ছিল পরিত্র বসুর 'ধনঞ্জয় ভাণ্ডারী', অসীম ব্যানার্জির 'বাঁশরী', পরিমল ভট্টাচার্যের 'দুর্গা' দুর্গতিনাশিনী', অসমঞ্জের ছবি 'ঊনবিংশে' ইত্যাদির কাজ গুছিয়ে আনতে। এডিটিং বিভাগ প্রয়োজনীয় মতামতে প্রতিশ্রুত চাহিদা সৃষ্টিতে যথেষ্ট হলেও এ বিভাগের কাজও হতাশাব্যঞ্জক ছিল না। জ্ঞানেশ মুখার্জির 'বসু পরিবার' বসুবাবুর ছবিতে উত্তমকুমার

ছবির এডিটিং চলছিল এই স্টুডিওতেই। আগাম হিসেব অনুযায়ী জুন মাসও এমনই কর্মব্যস্ত থাকবার কথা। সেকশন পরি-সংখ্যান অনুযায়ী এডিটিং বিভাগের কাজকর্ম অনিয়মিত হলেও ফ্লোর এবং সেকশন ব্যস্ত থাকে গড়ে মাসে যথাক্রমে পনের থেকে আঠারো শিফ্‌ট এবং আঠারো থেকে কুড়ি শিফ্‌ট। বাংলা ছবির বর্তমান পরিস্থিতিতে এ হিসেবের ভিত্তিতে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওকে টালীগঞ্জের ব্যস্ত স্টুডিওগুলির অন্যতম বলা যেতে পারে। ফ্লোর ভাড়া শিফ্‌ট পিছু নশো টাকা, এডিটিং ভাড়া শিফ্‌ট পিছু তিনশো কুড়ি টাকা, সেকশন ভাড়া শিফ্‌ট পিছু নশো টাকা—এই হিসেবের ভিত্তিতে গাণিতিক নিয়মে স্টুডিও-টির বাৎসরিক আয় কম পক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকার কোঠা ছাড়িয়ে যাবে অনায়াসে। কিন্তু বাস্তবে তা আদায় হয় কি? অধিকাংশ প্রযোজক ধারে কাজ করান এবং ছবি মুক্তিতিলক স্থির হলে ফিল্ম ছাড়িয়ে নিয়ে পাবার সময় ধার শোধ করেন। কোন কোন ছবির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরবর্তী পাঁচ বছরেও তা মুক্তিলাভ করেনি এমন নজীরও অলভ্য নয়। ছবির মুক্তি সংক্রান্ত এ অভিশাপের অনেকখানিই বহন করতে হয় বলে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর অনাদায়ী টাকার পরিমাণ এ মুহূর্তে সাড়ে তিন লক্ষের সংখ্যা ছুঁয়ে গেছে। ফ্লোর অগ্রিম বুক করবার পর সময় মত ফিল্ম না পাওয়ার স্যুটিং বাতিলের ঘটনা ঘটে অকাতরে হামে-শাই। এপ্রিল মাসে পনের দিনের স্যুটিং বাতিল হয়েছে প্রয়োজনীয় ফিল্মের অভাবে। স্যুটিং বা সেকশন-এর কাজ বিনা নোটিশে বাতিল করবার পর স্টুডিও কর্তৃপক্ষের কোন রকম ক্ষতিপূরণ দেবার রীতি প্রযোজকরা পর মানেন না। অথচ প্রায় পঞ্চাশজনের ভন নিয়মিত কর্মীর বেতনসহ স্টুডিও পরি-চালনার প্রয়োজনীয় ব্যয় কম পক্ষে মাসিক প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। আয় ব্যয়ের হিসেবে

মুনাফার এ অস্তিত্বহীনতা কেবল আজকের নয়—দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের। উনিশশো বাহান্ন সালে যেদিন ভিন্ন কলাকুশলী সত্যেন চ্যাটার্জি, রামানন্দ সেনগুপ্ত ও আশু-তোষ নাগ প্রায়-অচল কালী ফিল্মসের মালিকানা গ্রহণ করে এই স্টুডিওকে নতুন করে গড়ে তুলবার সংকল্পে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর জন্ম দিয়েছিলেন সেই সেদিন থেকে আজ এ পর্যন্ত একটি বছরের জন্যও লভ্যাংশের ছিটে ফোঁটা জোটেনি কারো ভাগ্যে। তার ওপর এক আর্থিক দুর্যোগপূর্ণ বছরে মালিকগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন আরও চার ব্যক্তি। মালিকানা বাবদ যা আয় তার চেয়ে স্টুডিওর নিয়মিত কলা-কুশলী কর্মী হিসেবে তাঁদের বেতনের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রেই বেশী। হয়ত সেজন্যই এই স্টুডিওর মালিক গোষ্ঠী কলাকুশলী হিসেবে ব্যক্তিগত পরিশ্রমের বিনিময়ে মাসিক বেতন প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন।

এদিকে দিনে দিনে স্টুডিওর বিভিন্ন ক্ষেত্র সংস্কৃত হওয়ার প্রয়োজন একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফ্লোরের সংস্কার হওয়া উচিত শতকরা প্রায় একশো ভাগ। সংস্কারের প্রয়োজন লাইট ও ক্যামেরারও। এখানে ব্যবহৃত অধিকাংশ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত-কারী বিদেশী সংস্থাগুলি বিশ্বের বাজারে চাহিদাহীন 'ব্যাক ডেটেড' যন্ত্রপাতির যন্ত্রাংশ তৈরীর ব্যাপারে উৎসাহহীন। সুতরাং এ ধরনের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করে সংস্কারের কাজে হাত দিতে যে পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন তা মালিকগোষ্ঠীর নিরুৎসাহীতার যথেষ্ট কারণ বলে মনে হয়। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর প্রধান এ্যাসেট সেন্সারিং—যা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সারির অন্যতম, সে বিভাগের সমস্যা হল প্রয়োজনীয় ফিল্ম সময় মত না পাওয়া এবং বিনা নোটিশে রেকর্ডিং বাতিল হওয়া। অভিযোগ আছে মেক-আপ রুম, রেস্ট-রুম সম্পর্কেও। টুকরো টুকরো এমন আরও নানা সমস্যা, সমাধানে অক্ষম স্টুডিও কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছেন। ছিয়াত্তর সালে তদানীন্তন তথ্যমন্ত্রী অবিলম্বে এই স্টুডিওকে সরকারী আওতায় আনবার প্রতি-শ্রুতি দিয়ে এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত কয়েক হাজার শিল্পী ও কলাকুশলীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অনেক-খানি দুশ্চিন্তা দূর করেছিলেন। আজ আটাত্তর সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সে প্রতি-শ্রুতি রাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। অবশ্য ইতিমধ্যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। নতুন তথ্যমন্ত্রীর সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আরও কিছু সময় অতিবাহিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দূর অথবা অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন হয়ত টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর সরকারী অধিগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তবে সেদিন স্টুডিওর অধিকাংশ ক্ষেত্র সংস্কার পর্যায় ছাড়িয়ে 'বাতিল' স্তরে পৌঁছে যাবে কিনা কে জানে।

বড়ুয়া শর্মা

কোয়েল পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠান

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে গান অন্যতম। বলা যেতে পারে সর্বাপেক্ষা সর্বজনবিদিত। সম্রান্তের বিদগ্ধ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে তো বটেই সাধারণ মানুষের কাছেও রবীন্দ্রনাথকে সমুজ্জ্বল করেছে তাঁর গান ও কবিতা।

যে কোন আর্ট বা শিল্প গড়ে ওঠে শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতির মাধ্যমে। শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর এই অনুভূতির যতটা সম্ভব বিশ্বস্ত রূপ দিতে চেষ্টা করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রকাশ যথার্থ হয় না। যার ফলে এইসব সৃষ্টি প্রকৃত শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না। একটি সৃষ্টি তখনই শিল্প হয়ে ওঠে যখন তাতে স্রষ্টার অনুভূতির যথার্থ প্রতিফলন হয়।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যে তথা তাঁর সঙ্গীতে এই অনুভূতির সততা দেখতে পাই। একজন ফোটোগ্রাফার যেমন খুব দ্রুত কোন দৃশ্যকে চিরদিনের জন্য তার ক্যামেরার মাধ্যমে বন্দী করে রাখে, রবীন্দ্র-নাথ যে কোন ছোটোখাটো তাৎক্ষণিক মুহূর্তকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তাঁর অবি-স্মরণীয় কথা ও সুরের মধ্য দিয়ে ধরে রেখেছেন। এবং এটা এত স্বাভাবিকভাবেই এসেছে যে তাঁর সঙ্গীতকে আমরা প্রকৃতির নিজস্ব যে কোন সম্পদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। প্রকৃতির মধ্যে যেমন কৃত্রিমতা নেই, রবীন্দ্রসংগীতও তেমনি তার স্বাভা-বিক নিজস্বতায় উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের এই পৃথিবীকে দেখার জানার মুগ্ধতা বা বিস্মিত জিজ্ঞাসা কখনোই পরিতৃপ্ত হয়নি। তাঁর এই অপার কৌতূহল ও বিস্ময় বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গানের মধ্য দিয়ে। তাই আপাতদৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ঘটনা থেকে শুরু করে অতি বৃহৎ ব্যাপারকে কেন্দ্র করেও তাঁর গান রচিত হয়েছে। এইসব রচনা হয়ে উঠেছে সীমার মধ্যে অসীম, অতি ক্ষুদ্র পরিসরেও তা হয়ে উঠেছে অনন্তের সংকেত-বাহী। তাঁর কারণ তাঁর সঙ্গীত তাঁর সাহিত্যের মতোই কোনরকম দেশ ও কালের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কবি যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশেষভাবে গান রচনা করে-ছেন, তাতেও রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শে একটি বিশ্বজনীন সুর এসেছে। তাই অতি তুচ্ছ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা নিয়ে তিনি যখন তাঁর সুর ও কথার মাধ্যমে প্রাণবন্ত করেছেন সেইসব সাধারণ জিনিসই হয়ে উঠেছে অসাধারণ। যা তার সাধারণ অর্থ ছাপিয়ে দেশকালোত্তীর্ণ মহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের গানই শুনি, গানের উৎসের কারণ বা পটভূমিকা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। যে কোনো সৃষ্টির পেছনে—তা সে যত ছোটো অথবা মহৎই হোক—একটি বিশেষ পটভূমিকা থাকে। আমরা যারা শ্রোতা, দর্শক বা পাঠক তারা খুব কম সময়েই এই সম্বন্ধে জানতে পারি। যদি পারতাম তাহলে প্রতিটি কাজই যে আমাদের কাছে নতুনভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠত, সন্দেহ নেই। এরকমই এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রসোত্তীর্ণ অনুষ্ঠানের অংশীদার হলাম আঠাশে মে, কোয়েল সংস্থা পরিবেশিত, অ্যাকাডেমী মঞ্চে অনুষ্ঠিত এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে। কোয়েল সংস্থাকে ধন্যবাদ এরকম একটি স্বতন্ত্র ধরনের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার আয়োজনের জন্য। এবং এরকম একটি অনুষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সব থেকে বড় কৃতিত্বের প্রাপক হিসেবে নাম করা যেতে পারে অনুষ্ঠানের সংকলক অমিতাভ চৌধুরীর। রবীন্দ্রনাথের গানের পেছনেও, যে তাঁর সাহিত্যের মত একটি বিশাল ও চিত্তাকর্ষক পটভূমিকা আছে তার সঙ্গে সেদিনের শ্রোতারা পরিচিত হলেন অমিতাভ চৌধুরীর তথ্যসমৃদ্ধ সংকলনের মাধ্যমে।

সুরগম

নতুন সংযোজন

রবীন্দ্রসঙ্গীত — পূরবী মুখোপাধ্যায়

খেয়াল : নাসিম আমেদ খাঁ। রাগশ্রয়ী সঙ্গীত : রামকুমার চট্টো, সীমা দাস। নজরুল, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রগীতি : বিমান মুখোঃ। রবীন্দ্রসঙ্গীত : সুশীল চট্টো, কমলা বসু, চিত্তপ্রিয় মুখোঃ। সেতার : প্রখ্যাত বেতারশিল্পী। গীটার : অভিজিৎনাথ, অঞ্জলি দে, প্রণব বন্দ্যোঃ। তবলা : দীপক সেনগুপ্ত, বালক নন্দী। নৃত্য : মণিশংকর, মুকুন্দ চক্রবর্তী। অংকন : শুভাপ্রসন্ন।

।। হাসি খুসির আসর ।।

নাচ, গান, অংকন, পড়াশোনা, নাটক— আড়াই থেকে ছ বছরের শিশুদের জন্য।

৭, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিঃ-৬।
ফোন : ৩৬-১৩৬৫
সাক্ষাৎ ও ফোন : রবিবার সকাল ৯—১২টা। অন্য দিন বিকেল ৫—৮টা।

সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রতিটি গানের আগে সেই গানটির রচনার পরিবেশ, স্মৃতি, ইতি-হাস তাঁর লেখার মাধ্যমে পরিবেশন করে-ছেন। যার জন্যে সেদিন এমনিতে বহুশ্রুত গানগুলিও শ্রোতাদের কাছে এক নতুন ভাব ও ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ধরা দিয়েছে। অমিতাভ চৌধুরী রবীন্দ্রসংগীত প্রেমিকদের কাছে এক অন্যতর দিকের সন্ধান দিলেন। যার মধ্য দিয়ে তাঁরা নানা বিচিত্ররূপী রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেলেন। এই পশ্চাৎপট যে কত প্রয়োজনীয়, তা সেদিনকার শ্রোতারা উপলব্ধি করেছিলেন। অনেক নতুন অজানা তথ্য আমরা জানতে পারলাম। যা প্রতিটি গান শোনার সময়, গান রচনার সেই বিশেষ মুহূর্তটি আমাদের চোখে একটি পরিষ্কার ছবি হয়ে ধরা দিয়েছিল। এই অভিনব প্রচেষ্টার ফলে সমস্ত অনুষ্ঠানটিই প্রচলিত অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে উঠেছিল। অমিতাভ চৌধুরী তাঁর সংকলনের মাধ্যমে যে নতুন দিকটির সন্ধান দিলেন, ভবিষ্যতে যদি এই দিকটি রবীন্দ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিশেষভাবে অনুসৃত হয় তাহলে আমরা শুধু ভালো শিল্পীদের গানই শুনব না, তার অতিরিক্ত কিছু পাওনাও আমাদের লাভ হবে। সেদিনের অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা পাঠের দায়িত্ব ছিল পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ এবং সুনন্দা চৌধুরীর ওপর, তাঁরা তাঁদের এই দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে পালন করে অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

ক্রাউন

টেলিভিসান !!

A/C, D/C or Solid State

স্পষ্ট ছবি

আর মিষ্টি আওয়াজ

"ক্রাউনটিভি"

তাই "টিভি-সরতাজ" !

এছাড়া আমাদের রয়েছে সকমার্শিয়াল রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, ষ্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ—১৩

ফোন : ২৪ ৪৭৯৩

রবীন্দ্রনাথ যে কতবড়ো শিল্পী জীবনের কতো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারও তাঁর রচনায় বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছিল তা আমরা সেদিন আর একবার উপলব্ধি করলাম। সকালবেলায় প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে কবির চোখে একটি ফুলই অসাধারণ হয়ে উঠলো, তিনি লিখলেন 'তুমি উষার সোনার বিন্দু, প্রাণের সিন্ধুকূলে'। কোনো সময় গ্রীষ্মে শান্তিনিকেতনে আমের মুকুল দেখে ভাবলেন আম নিয়ে তাঁর কোনো গান নেই তক্ষুনি রচিত হলো 'মঞ্জরী ও মঞ্জরী'। নিতান্ত ছোটো মুহূর্তকে কেন্দ্র করেই কত না অবিস্মরণীয় গান রচিত হয়েছে যেমন একদিন চিত্তরঞ্জন দাসের বোন এবং কবি পত্নী মৃণালিনী দেবীর নিবিষ্ট মনে গল্প করা দেখে তাঁর এত ভালো লাগল যে তক্ষুনি লিখলেন 'ওলো সই, ওলো সই'। অমিয়া ঠাকুরের কৈশোরের অভিমানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল 'এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে'। কবির কাছে তাঁর লেখার সময় প্রায়ই একটি বাচ্চা ছেলে আসত এবং অনেক কিছু বলে চলে যেত তার দুর্বোধ্য ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ তাকে কেন্দ্র করেই উপহার দিলেন 'অনেক কথা যাও যে বলে'। ট্রেনে করে চলেছেন, ট্রেনের দুলকি চাল তাঁর মনে এনে দিল সুর ও ছন্দ রচিত হল 'চলি গো, চলিগো, যাই গো চলে'। এইসব হালকা মুহূর্তের সঙ্গে জীবনের চরম দুঃখের দিনেও তাঁর কলম থেমে থাকেনি। মেজো মেয়ের মৃত্যুর শোকে তিনি লিখলেন 'কেনরে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়'। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই সমকালীন ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন শান্তি-নিকেতনে যখন জলের ব্যবস্থা ভালো তখন যেমন লিখলেন 'হে আকাশবিহারী নীরদ বারন জল' তেমনি যতীন দাসের অনশন ও মৃত্যু উপলক্ষেও তিনি রচনা করলেন 'সর্ব খর্ব তারে দহে।' সেদিনের অনুষ্ঠানে উল্লেখিত গানগুলি ছাড়াও আরো অনেক গানই শোনা গেল। যাঁরা কণ্ঠসংগীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্বপ্না ঘোষালের নাম করতে হয়। এঁর কণ্ঠের মাধুর্য, সুরের তীক্ষ্ণতা ও ভাব তার পরিবেশিত গানগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। এঁর গান ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব প্রবীণ শিল্পীদেরই এক ভাবের অভাব অনুভব করেছিলাম। এই অভাব অবশ্য পূরণ করেছিল সুপর্ণা ভট্টাচার্যর ভাল পরি চালনা, কিছু ভাল কোরাস গান ও অপেক্ষা-কৃত নবীন শিল্পীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা। ঋণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গান সব সময়ে একটা সমতা রক্ষা করে, সেদিনও তার অভাব হয়নি। 'বাজে করুণসুরে' গানটিতে বাগ সিংহেন্দ্রমধামে কিছু কঠিন দক্ষিণভারতীয় পংকতি দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। অশোকতরু বন্দ্যো-পাধ্যায়-এর প্রথম গানটিতে দু-এক জায়গায় সুরের বিচ্যুতি ঘটলেও পরের গানটিতে সুর ও পজিফেকশান-এর ঘাটতি হয়নি। বনানী ঘোষও তাঁর নিজস্বতা বজায় রেখে-ছিলেন। সুশীল চট্টোপাধ্যায়ও তার স্বাভা-বিক কণ্ঠে ও মসৃণ গতিতে গান সুন্দর-ভাবে পরিবেশন করেছিলেন। গোরা সর্বাধি-কারীর গানে বিশেষভাবে ভাবের অভাব লক্ষ্য করলাম। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে গাইতে হবে বলেই যেন তাকে গাইতে হচ্ছে। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মন্দিরা সেন, তৃপ্তি মিত্র, জয়শ্রী দাস, দীপান্বিতা গুপ্ত, বুলু দে অনিতা সেনগুপ্ত, কমলা সেনগুপ্ত, কল্যাণী গুপ্ত, দীপংকর চক্রবর্তী, নীরেন সরকার, সুনীল ঘোষ, মলয় রায়, জয়প্রকাশ সাহা, শেখর বন্দ্যো-পাধ্যায়, সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়।

সবশেষে একটা কথা বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গানে ভারতীয় সঙ্গীতের সমস্ত রকম অলংকার গিটকিরি, মুড়কী, ছোটো গমক, ছোটো তান, মীড় সমস্তরই প্রয়ো-জনমত পূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়। এবং তাঁর বেশীর ভাগ গানেরই মূল হলো পুরোনো রাগরাগিণীর ধ্রুপদ। এর প্রধান কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে যদুভট্টের প্রভাব। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ভারতীয় সঙ্গীতের অলংকারগুলিকে এতরকমভাবে প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যে মনে একটা প্রশ্ন জাগে যে মীড়, গমক গিটকিরি মুড়কীর পার্ফেক্ট স্বরলিপি আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের নোটেশান সিস্টেমে যখন রাখা অসম্ভব, তখন রবীন্দ্র নাথের গানের স্বরলিপি নিয়েই বা এত তর্কাতর্কি কেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে অন্যের বেশী গুরুত্ব পায় ভাব ও গায়কী। আর তাছাড়া স্বরলিপির এই স্বাধীনতা ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতেও আছে। ইউরোপীয়ান চেম্বার মিউজিকে যেখানে স্বরলিপি সর্বস্ব, সেখানেও লয়ের ব্যাপারে পজ-এর ব্যাপারে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

নোটেশান সিস্টেমকে আমরা সেদিনই সম্পূর্ণভাবে মেনে নেব, যেদিন ভিন দেশের সংগীতজ্ঞ (যিনি রবীন্দ্রসংগীত আগে শোনেননি) তিনি শুধু নোটেশান দেখেই এই গানের যথার্থ ভাব ও গায়কীসহ পদোপযুক্ত ঠিকভাবে গাইতে পারবে। সেদিনই বুঝব স্বরলিপিই শেষ এবং একমাত্র কথা, তার আগে নয়।

সুব্রত রায়চৌধুরী

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬.০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩.৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩.০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩.০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা— ৭০০০০৩।

দে বুক ষ্টোর্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Phone 55-5231 (14 lines)

7 JUL 1978

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুকমী' (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

একটি সংবাদপত্রের ইতিকথা
অমৃত

আসুন
নাম্বার টেন
ফিল্টার
ধরা যাক

স্বাদ পাবেন।
মোলায়েম
মেজাজ পাবেন।
পাবেন ভরপুর
তৃপ্তি—
পছন্দমত দামে।
সত্যি, নাম্বার টেন
ফিল্টার অনেক
বেশী কিছু দেয়।

সর্বাধিক মূল্য
১টাঃ১০টি
স্থানীয় কর অতিরিক্ত

নাম্বার টেন
ফিল্টার

যে স্বাদ দিন রাত মন ভরায়

SAA/FD/10A/8

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর
STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

দিব্যেন্দু গুহর নবতম পূর্ণাঙ্গ নাটক

ল্যাঙ্গুয়েজ ৫

এক সেটে অভিনয়যোগ্য তিনটি নারী চরিত্র সম্বলিত এই নাটক সম্বন্ধে "আনন্দবাজার" পত্রিকার মতামত— "....স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও যাঁরা ইংরেজীয়ানাকে প্রশ্রয় দিয়ে গৌরববোধ করতে চান, বাঙালী হয়েও যাঁরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন— সেই ভ্রান্ত স্নবদের ওপর তীব্র কটাক্ষের এই নাটকটি বহির্বঙ্গে এবং কলকাতায় ব্যাপকভাবে অভিনীত হওয়া উচিত.. ....."

মনোজ মিত্রের সার্থক নাটক

নরক গুলজার ৫

(এক সেটে একটি নারী)

এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণের গৌরবে ভূষিত এই নাটক সম্বন্ধে "আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেন— "....পলিটিক্যাল ড্রামা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায়' তা এই প্রথম মঞ্চস্থ হল। নেতা নয়, মস্তান নয়, সংকল্পে অটল থাকলে পাচনবাড়ি হাতে নিয়ে তুমিই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে ত্রিভুবনের গো-সম্পদকে। নাট্যকারের কলম ও ভাবনা এবং রেখা চিত্রাঙ্কন, পরন্তু বক্তব্য সমস্বরে একটি কথাই বলেছে— হয়তো একদিন ক্ষমতার রাজদণ্ড শ্রমিকের হাতেই শোভা পাবে।"

এই নাট্যকারের

পরবাস (১ নারী) ৫·০০

নেকড়ে (২ নারী) ৪·০০

রতনকুমার ঘোষের কয়েকটি সাড়া-জাগানো পূর্ণাঙ্গ নাটক

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ৫

এক সেটে অভিনয়োপযোগী * ১টি নারী চরিত্র

এ নাটকের মূল বিষয় ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার লজ্জাহীন ভীরুতা আর বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা। ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্র-জীবনে আমরা অহরহ যে-ভুল করে থাকি, যে-অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই, যে-অবিচার আর অত্যাচার নীরবে সহ্য করি—একটু খেয়াল করলেই দেখি, আমরা প্রত্যেকেই সেই ভুল, অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়ানো।

জম্বুদ্বীপের ইতিকথা ৫

এক সেটে অভিনয়যোগ্য নারী চরিত্র বর্জিত।

জরুরী অবস্থায় একদা সেন্সর-বন্দী এই নাটক তথাকথিত ভুয়ো রাজনৈতিক, দেশপ্রেমিক ও জনদরদী বহু নেতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের এক অনবদ্য হাতিয়ার। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই জম্বুদ্বীপই আমাদের সাধের, স্বপ্নের ও ধ্যানের দেবী— জননী জন্মভূমি।

সময়ের রূপকথা (৩ নারী) ৫

সময় বয়ে চলেছে। নিরন্তর, বিরামহীন সেই সময়স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি—কখনো উথাল-পাথাল—কখনো স্বচ্ছন্দ বেগ। সময়ের স্বভাব, আবেগ, গতি মানুষের জাতীয় ঘাত-প্রতিঘাতে নিয়ন্ত্রিত। বিগত দশকের অস্থির, চঞ্চল, উন্মাদ, আবেগময় সময়ের স্রোতে ভাসমান এক করুণ মধুর নাট্য-বিন্যাস।

এই নাট্যকারের অন্যান্য নাটক

সীতাহরণ (২ নারী) ৫, **এই দশকের মঞ্চে** (২ নারী) ৫
ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩, **সিঁড়ি** (১ নারী) ৫
ফেরা (১ নারী) ৩-৫০ **ভূমিকম্পের পরে** (১ নারী) ৫
সকালের জন্য (১ নারী) ৫, **ভোরের মিছিল** (১ নারী) ৫

অগ্নিদূতের নতুন নাটক

নেপো-নটবর কথা ৫

বিষয়বস্তু রাজনৈতিক, কিন্তু নাট্যকারের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার নয় একটি রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের স্বরূপ প্রদর্শন।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে নববর্ষের অমৃতে থাকবে সব চেয়ে সেরা লেখা
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমল শাসমলের সুদীর্ঘ প্রাসঙ্গিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধী : লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার

পিছু হটার পালা : লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীঅধিকা

বাড়তির পথে ভারত : লিখেছেন অতুল সুর

পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ভবতোষ দত্ত
সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী
প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছেন

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ : ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে
শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন : অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা
দাম তিন টাকা ।। রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন।
অথবা লিখুন
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা -৩

অমৃত
১৮ বর্ষ
৯ সংখ্যা
২২ আষাঢ়
১৩৮৫
7th July, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
সমালোচনা ৬
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৮
পর্যবেক্ষক
বেবতীভূষণের কার্টুন ৯
ভাগ্য গণনা ১০
প্রদর্শনী ১১ পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
চিত্র ও দূরদর্শন ১৩
শ্রীতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
হৃদয় নন্দন বনে (উপন্যাস) ১৬
সৌমেন্দ্রনাথ রায়
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ২৩
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৬
শৈবাল মিত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৩২
একটি সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত
সুশান্তকুমার মিত্র
প্রচ্ছদ এঁকেছেন গোপাল সান্যাল

ছাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪১
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
অন্ধকারাময় (গল্প) ৪৬
শৈবাল চক্রবর্তী
যাঁদের দেখেছি ৪৯ অনন্ত সিং
খেলা ৫৪

চিত্রধ্বনি ৫৭

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী

সময় নেই
লিখেছেন নির্মলকুমার দাস
লিখেছেন
জন মাইতি
ত মাহাত্ম্য প্রবন্ধ
সুন্দরবন মেলা

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

রাষ্ট্রসংঘ আগামী ১৯৭৯ সালকে শিশুবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিশুকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘ বহুকাল ধরেই এক-একটি বছরকে এক-এক নামে উৎসর্গ করছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, সেই উপায়ে যদি সারা পৃথিবীর দৃষ্টি সেদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করা যায়। এর আগে এইভাবে নারীবর্ষের কথা শোনা গিয়েছিল। আমাদের দেশেও সে উপলক্ষে নানারকম অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু তাতে নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বা নারীজীবনের অন্যান্য সমস্যার যে কোন হেরফের হয়েছে এমন মনে হয় না। সেজন্যে শিশুবর্ষ উপলক্ষে যাঁরা কার্যক্রম গ্রহণ করবেন তাঁদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে, তাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব কিনা।

আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার এখনো যথেষ্ট বেশি। অপুষ্টি এবং অশিক্ষা—এ দুটিই হল শিশুজীবনের সব থেকে বড় অভিশাপ। শিক্ষিত পরিবারের বেশির ভাগ শিশু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হলেও কিছুটা অন্তত যত্ন ও শিক্ষার সুযোগ পায়। নিরক্ষর ঘরের শিশুরা বেশির ভাগই হয় নিম্ন আয়ের শ্রমিক বা গরিব কৃষকের ছেলেমেয়ে। অতি শৈশবেই তারা এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে কায়িক শ্রমে অর্থ-উপার্জন করতে বাধ্য হয়।

অথচ সকলেই জানেন, অন্যান্য দেশের মতো শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা আমাদের দেশেও আইনত নিষিদ্ধ। শিশুদের পক্ষে কাজে যোগ দেবার বয়স হল ১৪। কিন্তু রাজধানী শহর দিল্লিরই এক খবরে জানা গেছে সেখানে ২১ হাজার শিশুকে চায়ের দোকান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্বল্প বেতনে নিয়োগ করে উদয়াস্ত খাটিয়ে চলেছে—আইনের শাসন তাদের বিন্দুমাত্রও নিরস্ত করতে পারে নি।

সকলেই জানেন, দিল্লির চেয়ে কলকাতায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা চতুর্গুণ বেশি। দিল্লিতে যাঁরা সমীক্ষা চালিয়েছেন সেই ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার যদি কলকাতা ও তার শহরতলিতে সমীক্ষা গ্রহণ করেন তাহলে আসল সংখ্যাটি জানা যাবে। এবং তা যদি হাজার ছেড়ে লাখের ঘর ছোঁয় তাহলেও অবাক হওয়া যাবে না।

শিশুবর্ষ উপলক্ষে কলকাতাতেও একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। শিশুদের অজস্র সমস্যার মধ্যে যদি তাঁরা এই একটি বিষয়েও কোনো কার্যকর পন্থা স্থির করতে পারেন, এবং শিশু শ্রমিক বিষয়ক আইনটি কঠোরভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, একটি সত্যিকারের কাজ হবে।

সাহিত্য ইত্যাদি...

আবৃত্তি এক নতুন শিল্প

এককালে 'উদয়ের পথে' ছবিটির নাম হয়েছিল খুব। জ্যোতির্ময় রায় আগে থেকেই গল্প ও রম্যরচনা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কিছুটা। এ ছবির অভাবিত সাফল্য তাঁকে নতুন ধরনের স্ক্রিপ্ট লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করল।

ছবি করার জন্যে অনেক প্রযোজক এগিয়ে এলেন জ্যোতির্ময়বাবুর কাছে। কিন্তু জ্যোতিবাবুর দাবি ছিল তাঁকে সব ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে হবে।

যাই হোক, অনেক লোক পিছিয়ে গেলেও একজন ভদ্রলোক রাজি হলেন। শুরু হল 'অভিযাত্রী' ছবির কাজ। অন্যান্যের মধ্যে শিল্পী ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, রাধামোহন ভট্টাচার্য বিনতা রায় এবং বিকাশ রায়।

নির্মলেন্দুবাবু এর আগে বোধহয় পৌরাণিক ছবিতে কাজ করেছিলেন একবার। শম্ভু মিত্র তখন গণনাট্যের খ্যাতিমান শিল্পী ও পরিচালক। সদ্য 'ধরতি কি লাল' ছবিতে কাজ করে ফিরে এসেছেন বম্বে থেকে। যদ্দুর মনে পড়ছে, ছবির প্রয়োজনে বোধহয় মাথার চুলে কদমছাঁট দিয়েছিলেন কিছুকাল আগে। তখনো সেগুলো পুরনো দৈর্ঘ্য ফিরে পায়নি। আর রাধামোহন-বিনতা রায় তো 'উদয়ের পথে'র পুরনো জুটি।

কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

গল্পটার বিষয়বস্তু ছিল অন্য ধাঁচের। চলতি ছবির থেকে একেবারেই আলাদা। শিল্পীরা বেশির ভাগই (অন্তত সিনেমায়) একেবারে নতুন। ফলে উৎসাহ ছিল কলের ব্যাপারে। শুটিং হবার অনেক আগে, এমনকি ভূমিকালিপি বণ্টনেরও আগে, প্রায় সকলেই মাঝে মাঝে হাজির হতেন সেই 'অভিযাত্রী'র বাড়িটাতে। এসে গল্প করতেন চা-কফি খেতেন। সময়টা ভালোই কাটত।

স্টেজে নির্মলেন্দুবাবুর নিয়মিত প্রোগ্রাম থাকা সত্ত্বেও তিনিও আসতেন মাঝে মাঝে। চমৎকার ভদ্রলোক। রামতনু লাহিড়ীর ঐতিহ্য রয়েছে পরিবারে, সেটা বোঝা যেত। আর গলার আওয়াজে ছিল চমৎকার একটি সুরেলা মাধুর্য।

নির্মলেন্দুবাবু এলে ঘরের আবহাওয়া একটু অন্যরকম হয়ে যেত। একে তাঁর বয়স ছিল প্রায় সকলের চাইতেই কুড়ি-পঁচিশ বছর বেশি। তারপর শিশিরকুমারের সঙ্গে এক মঞ্চে কাজ করতেন না এবং বরাবর নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন বলে থিয়েটার পাড়ায় তাকে বেশ একটু খাতিরও করে চলত সকলে।

একদিন নির্মলেন্দুবাবু এসেছেন, শম্ভুবাবুও এসেছেন সেদিন, বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙে। প্রথমে কফি খাওয়া হল এক রাউন্ড, তারপর বৃষ্টি কখন ছাড়বে ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চলল কিছুক্ষণ, এবং তাই থেকে আরো অনেক কথা। কিন্তু এতেও সুবিধে হল না। বৃষ্টি যেমন পড়ছিল, পড়তেই লাগল। কথার স্টকও ফুরিয়ে এল ক্রমে। শেষে, জ্যোতিবাবুর অনুরোধেই বোধহয়, আবৃত্তি শুরু করলেন নির্মলেন্দুবাবু। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস'। (বোধহয় এর গ্রামোফোন রেকর্ডও চালু ছিল তখন।) বড় সুন্দর লেগেছিল তার সেই আবৃত্তি। গলার মধ্যে নাটুকে-পনা ছিল না (যা সেকালের মঞ্চের এক অত্যাজ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল), এবং কাহিনী-টিকে দৃশ্যগ্রাহ্য করার মতো ব্যঞ্জনাও ছিল তাতে।

আবৃত্তি শেষ করে নির্মলেন্দুবাবু বলেন, 'মধুবংশীর গলি' কবিতাটির আবৃত্তি যে জনপ্রিয় হয়েছে তা তিনি শুনেছেন। শম্ভুবাবুকে যখন আবৃত্তির পরিবেশে পেয়েছেন, তাঁর আবৃত্তিও না শুনে তিনি ছাড়ছেন না। শম্ভুবাবু, যা তাঁর স্বভাব, সবিনয়ে আপত্তি জানাতে লাগলেন বারবার। পরে, নির্মলেন্দুবাবুর বয়সের কথা ভেবেই হোক বা আমাদের মতো তরুণতর অনুরাগীর মুখের দিকে চেয়েই হোক, শুরু করলেন আবৃত্তি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বড় আকারের ঐ ঘরখানার সমস্ত শূন্যতাকে যেন ভরাট করে ফেলল তাঁর কণ্ঠস্বর। কোথায় যেন পড়েছিলাম, বড় অভিনেতা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি স্টেজে এসে দাঁড়ানো মাত্র পুরো স্টেজটি ভরাট হয়ে ওঠে। আবৃত্তির বেলাতেও দেখলাম তাই। স্বরের বহু বিভঙ্গময় উত্থান-পতন, প্রসঙ্গ অনুযায়ী ছোটো ছোটো ব্যঞ্জনা (যাকে কবিতার ক্ষেত্রে বলা হয়, ন্যূয়ান্স) সুদীর্ঘ ঐ কবিতাটিকে জীবন্ত করে তুলেছিল সেদিন। আরো একটা জিনিস যা বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন, শম্ভুবাবুর আবৃত্তির প্রধান সম্পদ হল শব্দগুলোর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। উপমা দিতে হলে বলা যায়, লিখিত কবিতা যেন কবিতার স্বরলিপি, শম্ভুবাবু আবৃত্তি করে তাঁকে বাজিয়ে তোলেন এবং স্বরলিপির ফাঁকগুলোও ভরিয়ে তোলেন শ্রুতি দিয়ে।

না বললেও চলে, উপমাটি অক্ষরে অক্ষরে মিলবে না। (কোন উপমাই বা মেলে?) কিন্তু আমার যা বক্তব্য তার মর্মার্থ নিশ্চয়ই মরমী ব্যক্তিরা নিজ গুণেই বুঝবেন। আরও এক আশ্চর্য ব্যাপার হল, কবিতাটির আবৃত্তি আমি আগেও অনেকবার শুনেছি (এর লেখক ছিলেন কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আর তিনি ছিলেন আমার নিকট আত্মীয়।) কিন্তু প্রত্যেকবারই শুনেছি আরো দুজনের সঙ্গে সমবেতভাবে। তাতে অন্য ভাইমেন্সন আসত আবৃত্তিতে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেদিন শম্ভুবাবুর গলায় একক্ভাবে শুনে যতোটা ভালো লেগেছিল, সেরকম অনুভূতি আগে কখনো হয়নি।

সেই থেকে আবৃত্তি শম্ভুবাবুর অনুসরণ করে এক নতুন শিল্প হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

এবং এখন রীতিমত টিকিট কেটে আবৃত্তি শুনতে যান রসিক ব্যক্তিরা। খুব সুখের কথা।

একালের কবিদের মধ্যে অ করেন আজকাল অনেকেই। কলকাতায় মফস্বলে কবি সম্মেলনের আয়োজন হ সারা বছরই। একদলের অনেক কবি তা নিয়মিতভাবে আমন্ত্রিত হন। কেউ কে রীতিমত খ্যাতিও অর্জন করেছেন সে আসরে। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের বন্ধু নীরেন্দ্র চক্রবর্তী।

নীরেনের কথায় মনে পড়ল, বছর কুড়ি আগে (প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন আকাশ-বাণীর উপদেষ্টা) রেডিওর এক কবি সম্মেলনে আমার নিন্দকণ্ঠ এক মন্তব্যে নীরেন এমন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠেছিলেন যে, প্রেমেনদা নীরবে এগিয়ে এসে আমাদের দুজনকে দু জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। তখন টেপ করার রেওয়াজ ছিল না, সরাসরি ব্রডকাস্ট করা হত, তাই হয়তো আমাদের জন্যে ছিল প্রেমেনদার এই শিক্ষক সুলভ ব্যবহার।

অন্য আসরে বাম বসুকেও বেশ দক্ষতার সঙ্গে আবৃত্তি করতে শুনেছি রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর প্রতি কবিতাটি। শুনেছি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (তিনি একজন ভালো কবি) এবং তুষার রায়ের গলায় তাঁদের নিজের কবিতা। অপর্ণা সেনের গলায় শুনেছি সুকান্তের কবিতা। আবৃত্তির সঙ্গে বিদেশী বাজনার প্রয়োগে নতুন ব্যঞ্জনা তৈরির চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এ পদ্ধতি চালু আছে অনেকদিন, আমা দেশে সেই প্রথম শুনলাম।

মনে হচ্ছে, আবৃত্তি এক ন যুগের—নতুন সম্ভাবনার সামনে পড়েছে।

মণীন্দ্র

পুনশ্চ, গত সপ্তাহের একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অনবধানতার জন্যে পড়ে গেছে, সে জন্যে দুঃখিত। ম,

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

লোকজনের মনে হোতে পারে নিজের কথা বলতে গিয়ে আমি যা মনে আসছে তাই লিখছি। কোনো অন্তঃসম্পর্ক নেই, কোনো যোগসূত্র নেই আমার কথার। বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলছি, এক কথা থেকে চলে আসছি অন্য এক কথায়। কোনো ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারছি না, কোনো ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে পারছি না। ভালোবাসার রঙিন ছবিকে দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে ঘৃণা—স্বপ্নে যেমন হয়। ঘটনার পরিণতি পাবার আগেই পথ হারিয়ে ফেলছে খানিকটা এলোমেলো শৈশব, খানিকটা ওলটপালট যৌবন আর ভয় আর বিষাদ আর বিপন্ন বিস্ময় নিয়ে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। আশ্চর্য এই যে, আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে। যেন গোটা জীবনটা একেবারে স্বপ্নের মতো, শ্রীলার হাতের স্বেত কমলের ফাঁকে ফাঁকে গোকুর মতো সুমন্তরা হিংস্র-বিজ্ঞি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার হয়ে যাওয়া বাস্তার কোন ঘেঁষে শৈশবের পুকুর খলখল করে উঠছে। সেই ছেলেটা, আলগোছে বাতাস দিলেই যার চোখ দিয়ে জল বেরোতো। যার শরীরের ভিতর থেকে পদ্মফুলের গন্ধ পেতো, সে কখন পুকুর ঘাটের কাছে পৌঁছে গেছে। ঘাট ভেঙে দেওয়া বকুল গাছটা, সন্ধের পর যার নিচে বসা বারণ, সেখানেই সে পৌঁছে গেল নিশ্চিন্তে। হঠাৎ সন্ধ্যা হোলো রাত্রি, আকাশ হোলো নির্মম, জলে ভেসে উঠল অতনুর শরীর। দুয়ো দুয়ো করে সুমন্ত আমায় ছুড়ে পালিয়ে গেল পুকুরের পাড় দিয়ে। আরো দূরে জ্যোতির বাড়ির সামনের এবড়ো-খেবড়ো খোলা মাঠ, মাঠ না ডাঙা কে জানে কি বলা উচিৎ ওটাকে, ওখানে হাওয়ায় বিস্কুটনিবা বিস্কুটের গন্ধ। (বিস্কুট না বিস্কিট? আমি আজো বিস্কুট বলতে ভালোবাসি। শ্রীলা নিজে বিস্কিট বলতো অথচ আমার বিস্কুট যেন ওর কোনো অলৌকিক বিস্কিট, এ-রকমভাবে ও আমার বিস্কুটের গল্প শুনতো)। বিস্কুট-নিমা বিস্কুটের কারখানা ওখানে। জ্যোতি বেচারা গন্ধচুরির মামলার আসামীর মতো চোর চোর মুখ করে থাকতো, আমরা গেলেই। শ্রীলা দাঁড়িয়ে আছে না ওখানে? শ্রীলাই তো। শ্রীলা শাড়ি পরেছে? না না, ওটাতো ছোড়দি!

ঠিক এরকম। কোনো যুক্তির দিয়ে, কোনো শুদ্ধ বিচারে, কোনো আপেক্ষিক তত্ত্বে বোঝানো যায়না এই অসম্ভাব্যতাকে। কোনো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ পাবে না। মানুষ যখন সমাজে, খিদে যখন পায়, জীবন তখন নিবেট। অতএব যুক্তির শুদ্ধ পরস্পরায়। কিন্তু সে যখন ব্যক্তি, ব্যক্তি মানেই একা, একা মানেই অনন্য। যেমন ইলেকট্রন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে অথচ দুরন্ত গতি। যেখানে থাকার কথা সেখানে না থেকে অন্যত্র চলে যায়। কেন যায় নিজেও জানে না, জানলে যেতোনা হয়তো। যেমন বাস্তায় বেরিয়েছিলে নিয়মমতো, নিরাপদ সময়ে। মাথার উপরে আছড়ে পড়লো কারো বাড়ির রেলিং, কারো ভাঙা জানালা। তোমার মৃত্যু হোলো, এ মৃত্যুকে নিয়ে তুমি ভাবোনি। তুমি তৈরী ছিলেনা এর জন্য। তুমি ভেবেছিলে বাস-ট্রামে সাবধানে চলবে, কারো গাড়িকে ওভারটেক্ করবেনা ব্যাংকে থাকবে লেকারিং ইনটারেস্ট। বোঝা গেল তোমার ঘুষিতে মুরোদ। বোঝা গেল মৃত্যুর দাপট। তুমি ক্যালিগুলা নও। অসম্ভাব্যতাকে কখনো চ্যালেঞ্জ করোনা। মনে করোনি এ-সমাজ শাসনের বিরোধিতা করা যায়। তুমি নিরো হতে পারোনি, হিটলার হতে পারোনি, মুসোলিনি হতে পারোনি। হতে চাওনা বলে নয়, হওয়ার ক্ষমতা নেই বলে। আমরা প্রত্যেকেই ক্যালিগুলা হতে চাই। ক্যালিগুলা সেই সম্রাট, যে স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীন, অনিয়ন্ত্রিত। মৃত্যু আমাদের ——— করে, মৃত্যুবোধ আমাদের গোপন অসুখ।

শিয়ালগোতে কার অ্যাকসিডেন্টে শ্রীলা যখন মারা গেল বাহাত্তর সালে সুমন্ত আমার বাড়িতে এসে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিলো। সুমন্ত কোনো বেলেভেনস্ আবিষ্কার করার চেষ্টা করছিলো, যাতে শ্রীলাকে অপরাধী প্রমাণ করা যায়। শ্রীলা ভর্তা অ্যামেচিওনাইজড হয়েছিলো, হাইওয়েতে প্রবল স্পীড গাড়ি চালানোর সঙ্গে কাপিটালিজমের অর্থহীন গতিবাদী সভ্যতার যোগসূত্র কী তা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিলো। আমার কাকীমা স্বাভাবিকভাবে সুমন্তর মুখের কাছে উঠে গেল কখন আমি সুমন্তকে আমার যোগ্য হাতে মত করার জন্যে তাই দিয়ে ঘুঁষি মেরে বসলাম ভাবলে অবাক হই। আমার মধ্যে যে এতোটা নির্ভেজাল ঘৃণা আছে আমি জানতামই না। আমি শ্রীলার কথা রাখতে পারিনি, সুমন্তর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীলা জানতোনা কেউই কথা রাখেনি। জন্মের থেকে আজ পর্যন্ত এতটা-বড়-হওয়া-আমি কাউকে তেমনভাবে কথা রাখতে দেখিনি। ভারতবর্ষের গত তিরিশ বছরের ইতিহাসে কথা রাখার কোনো চিহ্ন নেই। বার্নপুর, তেলেঙ্গানা, তেভাগা আন্দোলনেও অনেক কথা রাখার কথা ছিল। কথায় কেবল কথা বাড়ল। কঠোর পরিশ্রমেও কোনো বিকল্প তৈরী হোলোনা। ভোট দিয়ে দিয়ে ব্যক্তি কেবল জনমতামতে ভেসে গেল। যেমন আজ, তিনশ শো আটাত্তরে পঞ্চননগরে আবার গুলি চললো। এমন তো কথা ছিল না।

একটা ঢালু সবুজ জমির উপর কালো পোষাক পরা মোমের মতো শাদা শ্রীলা কি নিশ্চিন্তে একা দোকা খেলার মতো এক পা দু-পা, এক পা দু-পা করে চলে যাচ্ছে ওর কোনো প্রিয় গান গাইতে গাইতে—শ্রীলাকে আমি এত দূর অবধি ভাবতে চাই। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে মৃত্যুহীন শ্রীলাকে আমি চিনি না। তাকে সুমন্ত চিনুক, আইডেনটিফিকেশন মার্ক খুঁজে বার করুক লাশ-কাটা ঘর। প্রগাঢ় পিতামহী মৃত্যুকে আমি বুঝতে যাবো না। ব্যাবিলন, মিশর, নিউইয়র্ক, রোম, বারাসত, বসিরহাট, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর অবধি ছড়ানো সময়ের এই বিরাট এরিনাতে গ্লাডিয়েটররা খেলায় মাতুক, আমি চুপ করে থাকতে চাই। বেঁচে আছি যখন, এসব দেখতে বাধ্য। অতএব দর্শক আমিও। কিন্তু মতামতহীন, জাত-গোত্র নেই। দলে নেই। হারতেও চাই না, জিততেও চাই না। সময়ের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় প্রতিবাদ আমার জানা নেই। কিছু করতে পারি না, তাই চুপ করে থাকি।

চুপ করে থাকা মানে মেনে নেওয়া নয়, কখনো কখনো তা প্রতিবাদেরও প্রতীক। আমি এরকম বিশ্বাস করি। বাবারা যা সময় সেনের নিরুত্তর স্তব্ধতাকে আমি বুঝি। না জেনে, না বুঝে নয়, জেনেশুনে নিজেকে গুটিয়ে নেয় যারা তাদের কথা না বলার অর্থ পূর্ণ প্রতিবাদ। এবং জীবিত থেকে, আহারে নিদ্রায় শ্বাস-প্রশ্বাসে।

প্রকাশিত হল

রাধু গোস্বামী'র

গমের দানায় কোলাজ

এবং অন্যান্য ৬

১৩টি ভিন্নধর্মী, ব্রীড়ি, আত্মিক ও স্বপ্নদেব ছোটগল্প

বিশ্বজ্ঞান ৯।৩ টেমার লেন ও

পোডিয়ম ২২; মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা)৯।

সমালোচনা

অনুরাগিণীদের চলচ্ছবি

'চাবশ' বছবেও শেকসপীয়াব পুবোনো হননি। ববীন্দ্রনাথও হবেন না। লৌকিকেব ভেতবে অলৌকিকেব উদ্ভাসের মতো তাঁব জীবন। যত দিন যাবে তত বেশি আলোচিত হবেন তিনি, তত বেশি উদ্ঘাটিত হবেন। এরই মধ্যে আমবা দেখতে পাচ্ছি, অনুসন্ধিৎসুর চোখ ভেতরের দিকে উঁকিঝুঁকি মাবছে অহবহ। গহীনের দিকে চলে যাচ্ছে। বাবীন্দ্রিক সময়েব সম্পর্কে-তায় সে-চোখে কৌতূহল আর বিস্ময়েব অন্ত নেই।

এখন মনে পড়ছে, ঝুরিনামা এক প্রাচীন বটগাছেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ নিজেকে তুলনা কবেছিলেন 'জীবনস্মৃতি'ব একটি প্রবন্ধে। বহস্যময় সেই গাছ সুদিন-দুর্দিনেব ছায়াবোদ্দুপাত গণনা কবে ঠাকুরবাড়িব চৌহদ্দী থেকে বহুকাল আগে অন্তর্হিত। বুঝি ববীন্দ্রনাথরূপে পুনর্জন্ম নিয়ে চিবায়ুষ্মান হবাব আশায়? এ-সংবাদ আমরা জেনেছি জীবনস্মৃতিব ঐ প্রবন্ধ থেকে।

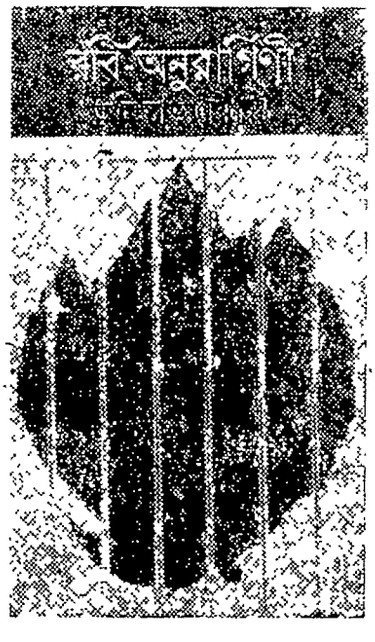

অমিতাভ চৌধুবী তাঁব অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনোদিনই অচেতন ছিলেন না মনে হয়। ছিলেন না যে, তার প্রমাণ তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'ববি-অনুবাগিণী'। এই গ্রন্থের বিষয়-আশয় তিনি কুড়িয়ে এনেছেন ঐ বৃহৎ বৃক্ষেব ছায়া থেকে, অথচ মায়াবলে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেননি। এবং অতি-কল্পনার সাবতাঁয হাতছানিকে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। এই গ্রন্থে, ববীন্দ্রপ্রেবিত তথ্য ও ইঙ্গিতেব ভিত্তিতে, তিনি অনতিস্পষ্ট ববি-অনুবাগিণীদেব দৃশ্যমযী কবেছেন। আর আমাদেব, ছায়া থেকে রৌদ্রে নয়, অসম্ভব এক জ্যোৎস্নার ভেতবে পর্যটনেব সুযোগ কবে দিয়েছেন। এই জ্যোৎস্না ম্লান নয়, উজ্জ্বল। তাতে আমাদেব দৃষ্টি খব হয়েছে।

খবদৃষ্টি নিয়েই আমবা দেখেছি সেই বিস্ময়কব দৃশ্য। 'কবি-কাহিনী'ব কবিতা সংশোধন কবে চলেছেন সতেবো বছবের ববীন্দ্রনাথ টেবিলের ওপব ঝুঁকে। আব পেছন থেকে চুপি চুপি এগিয়ে আসছেন এক যুবতী। এসেই দু'হাত দিয়ে তাঁব দু'চোখ জড়িয়ে ধরে বলেন: 'বলো তো কে?'

কে আবার? চোখ বুজেও ববীন্দ্রনাথ বলতে পারেন তাঁর নাম, আন্না তড়খড়। খিলখিল কবে হেসে ওঠেন আন্না। বলেন, 'আজ কোন কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে তোমার কবিতা শুনব।'

এই আব্দাবেব ওপরে দায়িত্ব ছিল, সাগব পাড়ি দেবার আগে ববীন্দ্রনাথের আড়ষ্টতা ভাঙিয়ে দেবাব। চালাকচতুব, চার্মিং আন্না এ-ব্যাপারে কতটা সফল হয়েছিলেন, ইতিহাসে লেখা নেই। তবে ববীন্দ্রনাথের কাছে বাংলা শিখেছিলেন অল্পস্বল্প, ববীন্দ্রনাথের রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমনকি চুম্বন-প্রত্যাশীও। কতদিন যে টাগ-অফ-ওয়ার খেলাব নাম করে তাঁব বুকে ঢলে পড়েছেন আন্না, তাব ঠিক নেই।

তাঁবই অনুরোধে ববীন্দ্রনাথ তাঁব নাম দেন, নলিনী। এবং লেখেন, 'অনেকের আঁখি পবে, সৌন্দর্য বিবাজ করে, তোব আঁখি পবে প্রেম.—নলিনী গো নলিনী।'

যেন আন্না নয়, নলিনীই উত্তব দেন পদ্মের পাপড়ির মতো তাঁব দুই চোখ মেলে: 'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণদিনেব থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।'

অনেকদিন বাদে, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা আন্নার একটা চিঠি সজনীকান্ত দাস খুঁজে পান বইষেব পাতায়। যাচাই কবাব জন্য ববীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেলে ববীন্দ্রনাথ বলেন: 'তোমরা ববীন্দ্র-জাদুঘব যদি কবতে চাও তো এই পত্রটিকে সর্বাধিক গৌরবের স্থান দিও।'

এইসব ঘটনা, ছবি ও সমকালীনের দলিল দাখিল কবেও অমিতাভ চৌধুবী বারবার আমাদেব নিষেধ করেছেন, তাঁর প্রেম ও অনুরাগিণীদের দিকে ব্যক্তিগত চোখে তাকাতে। আমবা তাঁব নিষেধ অমান্য কবে গত-দৈনিকেব তপ্ততায় প্রবেশ কবেছি। বড় বেশি ব্যক্তিগত বলেই এইসব বড় বেশি পবিত্র মনে হয়েছে আমাদের কাছে।

দেখেছি নিয়ন আলোয় ঝিলিমিলির মতো বেশ কিছু ইয়েজ তবুণীব মুখ—সহসা জ্বলে-ওঠা, সহসা নিভে-যাওয়া। যেন আন্নার ববি নয়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি তাদের বাহুলগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কখনো লন্ডন, কখনো ব্রাইটন, কখনো টার্কি। নেচেছেন, ফ্লার্ট কবেছেন মিস্ এন, মিস্ মুল, মিস্ লং—এমনি আরো অনেকের সঙ্গে। তারা দু' দণ্ডের সহচরী। কিন্তু লুসি স্কট? না, তিনি পাঁচজনের মতো না। তিনি প্রেমে পড়েছিলেন ববীন্দ্রনাথেব এবং আমবণ মিস্ ছিলেন, মিসেস্ হননি।

একুশ বছরের বয়সসীমায় পৌঁছুবাব আগে, যেসব ববি-অনুরাগিণীব ছবি এই বইয়ে পরিস্ফুট হয়েছে, তাদেব মধ্যে আন্না তড়খড় ও লুসি স্কটকে বাদ দিলে, প্রবলভাবে আমাদেব মনে পড়ে কাদম্বিনী দেবীকে। লুসি স্কটও ততটা স্পষ্ট নন, যতটা আন্না তড়খড়। কাদম্বিনী দেবী আরও স্পষ্ট, আরও গভীব এবং সুদূবে সঞ্চারিত।

অমিতাভ চৌধুরীব সতর্কতা মনে হয় মূলত তাঁকে নিয়েই। কেননা, প্রচলিত অর্থে তিনি ববি-অনুরাগিণী নন, স্নেহশীলা বৌদি। ববীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছেন তিনি অশেষ উপায়ে। আব তাঁব সান্নিধ্যে রচিত হয়েছে ববীন্দ্রনাথেব বহু মধ্যাহ্ন, বহু সন্ধ্যা, বহু দিনযাপনের

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• প্রোডাক
• সাড়ি • সুটিং
ও ছিট কাপড়

ইতিহাস। নীলাভ নির্জন সে-ইতিহাসের অস্পষ্ট সুদূরতায় আমাদের যাত্রা করিয়ে নিয়ে অমিতাভ চৌধুরী আত্মসংবরণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন গদ্যের উৎসর্গপত্রে তোমাকে, তোমাকেই ইত্যাদি সর্বনামবাচক শব্দগুলি নামবাচক কাদম্বরী দেবীর পরিবর্তে ব্যবহৃত। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা রবীন্দ্র-জাদুঘরে একজন দক্ষ গাইডের।

দক্ষ গাইডের মতোই তিনি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার উৎস ও তাঁর ভেতরে অনুরাগিণীদের প্রভাবের হদিস দিয়েছেন আমাদের। আরো কিছু রচনার হদিস পাবার জন্য হৃদয় উতলা হয়ে আছে। যেমন **নষ্টনীড়** রুদ্ধগৃহ মৃত্যুশোক— এমনি আরো কিছু কিছু। আশা করি, এসবের হদিস দেবেন তিনি ভবিষ্যতে।

একুশ বছর বয়সের পর, যেসব অনুরাগিণীর ছায়া পড়েছে তাঁর জীবনে, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা তাঁর স্ত্রী ভবতারিণী দেবী, যাঁর নাম নলিনীর সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন মৃণালিনী। তাঁর দিকে বড় বেশি ব্যক্তিগত চোখে তাকাবার উপায় নেই, কেবল একটি ক্ষেত্রে ছাড়া, যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'তোমার সন্ধ্যাবেলাকার মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই। আমি কি কেবল দিনের বেলাকার?'

অন্য তিনজন তাঁর শেষ বয়সের অনুরাগিণী—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, টমি ওয়াডা কোরা আর হেমন্তবালা দেবী। তিনজনের সাক্ষের দরকার নেই। একজনের নিলেই দেখা যাবে, তাঁদের অনুরাগের বং কেমন ছিল—কতটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা কতটা অতীন্দ্রিয়। তেষট্টি বছরের বৃদ্ধ, প্রায় বাবার বয়সী রবীন্দ্রনাথকে দেখে ওকাম্পোর মনে হয়েছিল, 'কোনো দায়িত্বভারই নষ্ট করেত পারে না তাঁর সোনালী শরীরের স্নিগ্ধতা।'

আপনার মতো, রবীন্দ্রনাথ তাঁরও একটা বাংলা নাম দেন, 'বিজয়া'। বিজয়া রবীন্দ্রনাথের শারীরিক সংবাসে নীল হয়ে যাননি। কেননা, তিনি জানতেন, 'একটাই শুধু ইতিহাস আছে, আত্মার ইতিহাস।' জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছনোর জন্য আকুল হয়ে লেখেন : 'ইট ইজ মাই টার্ন নাউ টু বি হোমসিক। আই আম হোমসিক ফর ইউ....।'

স্মৃতির ভেতরে এরকম বহু স্মৃতি, দৃশ্যের ভেতরে দৃশ্য আর মুখের আড়ালে অন্য মুখের আবির্ভাবে আমরা সচকিত হয়েছি বারবার। বইটি শেষ করেও বইয়ের ভেতরে ফিরে গিয়েছি। আবেশের বেশ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ভেতরে পেয়েছি অতীন্দ্রিয়তার আভাস।

স্থিরচিত্র বিশেষ নেই। আমাদের মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সাত থেকে একাশি বছরের অনুরাগিণীদের নিয়ে এ-বই একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। ক্যামেরাম্যান এবং পরিচালক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। অমিতাভ চৌধুরী এডিটার। সেলুলয়েডে যেভাবে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকে জোড়া লাগিয়ে গতিশীল কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়, সেভাবেই তিনি তাঁর অনুরাগিণীদের ভসবির মহল থেকে, স্মৃতি ও চিঠিপত্রের বন্ধন থেকে, মুক্তি দিয়েছেন। দৈর্ঘ আরও বড় হতে পারত। হয়নি। বহু অস্পষ্ট মুখ স্পষ্ট হতে পারত। হয়নি। মনে হয়, অমিতাভ চৌধুরী অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন ইতিহাসের সম্ভ্রম নষ্টের আশংকায়। তাঁকে একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে এখন। জাপানযাত্রী রবীন্দ্রনাথ একটা ছবি এঁকেছিলেন জাহাজে বসে। সে-ছবির কোনো নাম ছিল না। কিন্তু মস্কোয় প্রদর্শিত হয়েছে 'গেটে' নামে। রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট দিকগুলি কি সেজন্যে স্পষ্ট এবং বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করা অসম্ভব?

গৌরী ভৌমিক

রবি-অনুরাগিণী : অমিতাভ চৌধুরী। অনন্যা প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-৭৩॥ আট টাকা।

কলেজ পাঠ্য পুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—(১ম) ৯ম সং ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—(২য়) ৩য় সং ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—৩য় খণ্ড
(বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—১০ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—(আধুনিক যুগ) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-ফাস্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন— (Phi. of Religion) ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান—২য় সংস্করণ ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা— (For B.U.) ৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—(পরিমার্জিত) ৪র্থ সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৪র্থ সংস্করণ ২২-০০

বাংলা সাহিত্য

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা—দ্বিতীয় সংস্করণ ১০-০০

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত

কলীন কুলসর্বস্ব ১০-০০

শিক্ষক-শিক্ষণ (B. Ed and Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পশ্চাদ্ভূমি ও পরিবেশ—(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস—(পরিবর্তিত) ২য় সংস্করণ ১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস— ১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৫-০০

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান ৩য় সং ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—সংশোধিত ৩য় সংস্করণ ১৫-০০
Higher Secondary Philosophy (English edition) 12.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান— ২২-০০

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ঘোষ ও হালদার প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা— ২২-০০

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত প্রণীত

উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা— ১৮-০০

BP

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ কলেজ রো, পিন-৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৭২৩৪

জে পি এখনও জে পি

পাটনা শহরে কদমকুঁয়ার বাড়িতে শয্যাশায়ী জয়প্রকাশের প্রভাব যে এখনও কতো জোরালো, তার পরিচয় পেয়েছেন অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যস্ত জনতা পার্টির মাতব্বর ব্যক্তিরা সম্প্রতি জে পি সমর্থকদের এক অধিবেশনে। দিল্লি থেকে একশ' কুড়ি কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের নরোরা গ্রামে জনতা পার্টির মধ্যে সামিল প্রাক্তন সোস্যালিস্টদের উদ্যোগে সাতদিনের একটি রাজনৈতিক ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জনতা পার্টির শরিকদের মধ্যে জনসংঘ, আর এস এস এবং চরণ সিংয়ের সমর্থক ভারতীয় লোকদলের সদস্যদের বাদ দেওয়া হয়েছিল এই ক্যাম্প থেকে। বাদ দেওয়া হয়েছিল জনতা পার্টির আরও অনেক সদস্যদের এবং জগজীবন রাম ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। জগজীবন রামকে ডাকা হয়েছিল হরিজন নেতা হিসাবে। তবে জগজীবনবাবু নরোরা ক্যাম্পে শেষ পর্যন্ত হাজির হন নি।

জয়প্রকাশের ওপর আস্থা নেই এবং তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের প্রতি পুরোপুরি সমর্থন নেই এমন ব্যক্তিদের নরোরা শিবিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। এ-ব্যাপারে উদ্যোক্তারা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। রাজনৈতিক গণ্ডগোলে তাঁদের এই অধিবেশন বানচাল হয়ে যেতে পারে এমন আশংকা ছিল। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মণিপুর, আসাম ও সিকিম থেকে ৪৫০ জন প্রতিনিধি নরোরা শিবিরে জমায়েত হয়েছিলেন। জয়প্রকাশের আশীর্বাদ নিয়ে এই অধিবেশনের মূল বক্তব্য ছিল যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার একটি তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন বড় করে দেখা দিয়েছে। এই তৃতীয় শক্তি বলতে উদ্যোক্তারা সংগঠিত লোক-শক্তির কথা উল্লেখ করছেন। একদিকে জনতা পার্টি এবং অপরদিকে ইন্দিরা কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পোলারাইজেশনের যে ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এক বিকল্প শক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। নরোরা শিবিরের কয়েকজন তাত্ত্বিক নেতার মতে আন্দোলন ও গণ-চেতনার মাধ্যমে এই লোক-শক্তি ভবিষ্যতে এক রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এমন সম্ভাবনা এখন নেই, তবে আপাততঃ এই লোক-শক্তি জনতা পার্টির ত্রুটি-বিচ্যুতি শোধরাবার

রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি

হত্যায় বিশ্বাসী নয় এমন নকশাল এবং সি পি এম-কে 'র‍্যাডিকালাইজ' করতে চায় এমন সি পি এম সদস্যরা লোক-শক্তি সংগঠনের কাজে এগিয়ে আসবেন। একসঙ্গে কাজ করতে সকলে রাজি হয়েছেন। বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত সব সোস্যালিস্টরা অবশ্য নরোরা আদর্শে এখনও উদ্বুদ্ধ নন। জর্জ ফার্ণান্ডেজ এবং মধু দণ্ডবতের নরোরা শিবিরে অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। তবে জনতা পার্টির অন্যতম সম্পাদক মধু লিমায়ে এবং সভাপতি চন্দ্রশেখর নরোরা শিবিরের বড় পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক। চন্দ্রশেখর ছাপমারা সোস্যালিস্ট নন। তবে জয়প্রকাশকে তিনি রাজনৈতিক গুরু হিসাবে

মানেন। চন্দ্রশেখর তাই এই শিবিরে উপস্থিত কর্মীদের ভাষণও দিয়েছেন।

ছাত্র, যুবক, হরিজন, ছোট কৃষক এবং ভূমিহীন চাষীদের নিয়ে এই নতুন সংস্থা কাজ শুরু করছে। কোন নির্দিষ্ট নাম নিয়ে একটা নতুন পার্টি হিসাবে এঁরা এখনি রাজনীতির ময়দানে উপস্থিত হতে চাইছেন না। তবে সর্বাত্মক বিপ্লব-সংক্রান্ত কাজকর্মের সংযোজনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে নয়াদিল্লিতে একটি দপ্তর খোলা হয়েছে। এই সংস্থার প্রথম গণ-আন্দোলন শুরু হবে আগামী পনেরো দোসরা অক্টোবর নয়াদিল্লিতে একই উদ্দেশ্যে মিছিল যাবে রাষ্ট্রপতি ভবনে।

কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবিরের ছক তৈরি করা হয়েছে। এখানে জনস্বার্থ এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করবার জন্য বসছে রীতিমত 'স্টাডি ক্লাশ'। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এইসব প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম তৈরি করেছেন। জেপির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়াও আন্দোলনের রূপ রেখা সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ মেনে চলবে এই সর্বাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাসী লোকজন। এক কালের লোহিয়া সোসালিস্ট এবং ১৯৭৪ সালে জয়প্রকাশের বিহার আন্দোলনের এক জন নামকরা নেতা ও বর্তমানে জনতা পার্টির সংসদ সদস্য অর্জুন সিং ভাদোরিয়া আপাততঃ এই তৃতীয় শক্তি বা লোক-শক্তি সংগঠনের ব্যাপারে প্রথম সারির উৎসাহী সোসালিস্টদের মধ্যে প্রধান।

নরোরা শিবির থেকে ফিরে জেপির অনুগতরা বলছেন ভারতের মত অনুন্নত সমাজে নানা ষড়যন্ত্রের হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার মত কোন 'বিল্ট ইন' শক্তি নেই। সুতরাং এমন অবস্থায় সর্বত্র গণ শক্তি বা লোক শক্তির শিবির গড়ে তুলতে হবে। এই সব শিবিরের কাজ হবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। এঁরা এখন প্রকাশ্যে বলছেন: আমরা জনতা পার্টির নেতাদের মধ্যে কিছু অশুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। জনতা পার্টি ক্রমশঃ দক্ষিণ পন্থীদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। এই পার্টিকে রীতিমত 'র‍্যাডিকালাইজ' করা দরকার। দেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যার মোকাবিলার জন্য সরেজমিনে প্রগতিশীল কাজকর্ম করতে হবে। কুলাক আর শিল্পপতিদের মুখ চেয়ে থাকার অর্থ সাতাত্তরের নির্বাচনের আশা-প্রত্যাশাকে বিসর্জন দেওয়া।

জরুরী অবস্থার পূর্বে গুজরাট এবং বিহারে জয়প্রকাশ গণ আন্দোলন সম্পর্কে যে সব কথাবার্তা বলতেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে নরোরা শিবিরের উদ্যোক্তাদের বক্তব্যে। এই নয়া প্রস্তুতিকে জনতা পার্টির মধ্যে জনসংঘ আর এস এস ভারতীয় লোকদলের একটা অংশ, এবং সংগঠন কংগ্রেসের সদস্যরা ভালো চোখে দেখছেন না। এ-ব্যাপারে জয়প্রকাশের নাম জড়িয়ে আছে বলে ওঁরা যেমন একটু ভয় পেয়েছেন, তেমনি আবার চটেছেন। আর এস এস দল জয়প্রকাশের অনুগত নরোরা ক্যাম্প-প্রত্যাগত লোকজনদের এখন 'ধ্বংসকারী বিপ্লবীর দল' বলে ব্যাখ্যা করছেন।

রথী ও সারথি

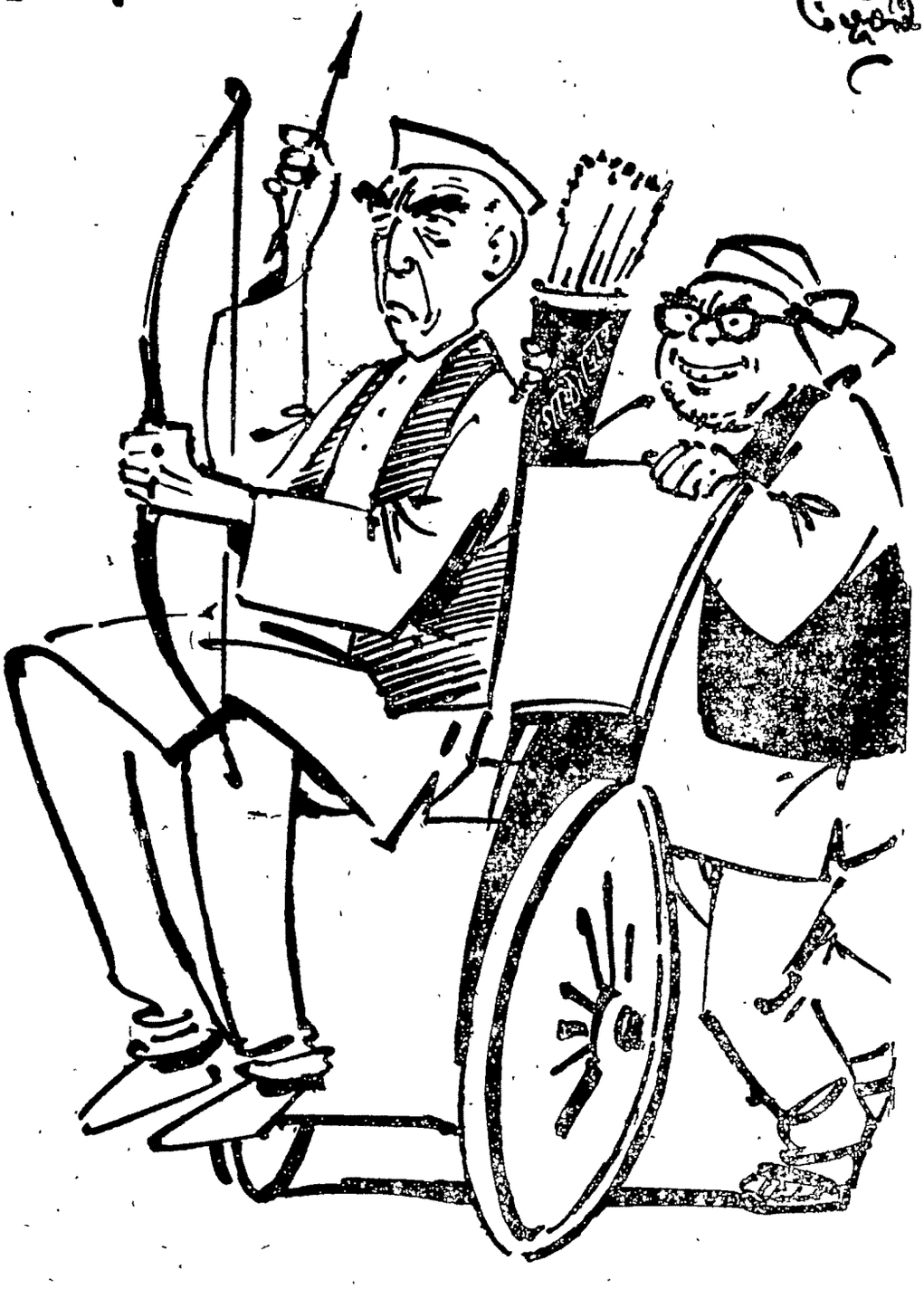

আরও প্রাপ্য আছে

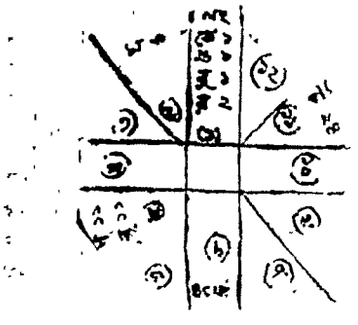

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা
গুনিনঃ সর্বত্র পূজ্যতে।।

গত কয়েক সংখ্যাতে আমরা সার্থক জ্যোতীর্ভিবিদদের রাশিচক্র নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের সুধী পাঠকদের অনুরোধে এবার একজন জ্ঞানী, গুণীর রাশিচক্র নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করছি।

১৯২১ সালের ২রা মে এই গুণী ব্যক্তিটির জন্ম। ইনি সত্যিই একজন গুণী, জ্ঞানী আর বিশ্বে ভারতের গৌরব। সত্যজিৎ রায় কেন এত সম্মানিত—কেন এত পুরস্কৃত তা প্রায় প্রত্যেক পাঠকই জ্ঞাত। আমি সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে চিত্রজগতে সমালোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে—তাঁর পরম সমালোচকও সত্যজিৎবাবুর গুণ এবং জ্ঞানকে এক বাক্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন। শান্তিনিকেতনের স্রষ্টা বিশ্ব কবির ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতনের ছায়াতলে আশ্রমিক কায়দায় জ্ঞান অর্জন করে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ব দরবারে সম্মানিত হবে। বিশ্বের সেবার জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেবে। কুম্ভকারের তৈরি প্রত্যেক কলস যেমন নিশ্চিদ্র হয় না—প্রত্যেক কলস যেমন দেব-সেবার জল বহন করে না, এক একটি কলস এক এক কর্মে নিয়োজিত হয় তেমন শান্তিনিকেতনের এই আর্টের ছাত্রটি আর্টের সত্যিকারের মোহময় গভীরকে এমনভাবে সুনিপুণ কলাকৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন যার মোহজালে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন সম্মানে পুরস্কৃত হয়েছেন। আমাদের দেশে অনেক গুণী আছেন, অনেক জ্ঞানী আছেন, কিন্তু সত্যজিৎবাবু জ্যোতিষ শাস্ত্রের কি কি শুভযোগে এত বড় গর্বের ধন হলেন আজ আমাদের তাই আলোচ্য।

জাতকের কুম্ভ রাশি : শতভিষা নক্ষত্র, মেষ লগ্নোদয়ে জন্ম। জাতক জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ এবং শুভ যোগ প্রাপ্ত হয়েছেন যেমন রাজ-যোগ, কেশরী যোগ, পারিজাত যোগ, সরস্বতী যোগ, মহা-অশ্ব যোগ লক্ষ্মী যোগ ইত্যাদি। আর জাতকের রাশিচক্রে অল্প সংখ্যক ঘরে এমন সুন্দরভাবে গ্রহগুলি বসে আছেন—যেভাবে ইচ্ছা, যে দৃষ্টি কোনে ইচ্ছা রাশিচক্রকে

সত্যজিৎ রায়

বিচার করুন না কেন সেই একই শুভ ফলের বাহক ভাগ্যবানের রাশিচক্র। যেন এক বিধাতার কলাবিদ্যার নিগূঢ় নিপুণতার সৃষ্ট এক কমল। প্রত্যেক রাশিচক্রেই বারটি ঘর থাকে। বারটি ঘরের প্রত্যেকটির এক একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে ১, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০ এই কয়টি ঘরকে কেন্দ্র করে এবং এই কয়টি ঘরের বলাবলকে নিরীক্ষণ করলে রাশিচক্রের গুণাগুণ সহজ-ভাবে ধরা যায়। অর্থাৎ একটা মানুষের যদি সুন্দর স্বাস্থ্য থাকে, বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে, তিনি যদি সুকর্মবিশিষ্ট হন এবং তাতে যদি ভাগ্য লক্ষ্মী পূর্ণ সহায়ক হন তবে যেমন এক কথায় বলা হয় লোকটি "ভাগ্যবান" উপরের রাশিচক্রটি ঠিক তাই, দেহ-তনু, বিদ্যা-বুদ্ধি, মান-সম্মানে, ভাগ্য-কর্মে মিলিয়ে সোনায় সোহাগা। সাধারণতঃ রাশিচক্রের যেই ঘরটিতে "লং" লেখা থাকে সে ঘরটিকে অনুস্থান বলা হয় এবং রাশিচক্র সে ঘরকেই প্রথম কেন্দ্র করেই বিচার করা হয়। ১নং ঘর থেকে নবম ঘরকে ভাগ্য—১০ম ঘরকে কর্মস্থান বিচার করা হয়। আবার ৪র্থ ঘরকে বিদ্যা, সুখ এবং ৫ম ঘরকে বুদ্ধি-যশ, লক্ষ্মীর বলা হয়। রায়বাবুর রাশিচক্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তার ৫ম ঘরে দুটি মহাগ্রহ শনি এবং বৃহস্পতি বসে আছেন এবং ভাগ্যপতি (৯ম) ভাগ্যদশী হয়েছেন। এক কথায় ভাগ্যেশ লক্ষ্মীর ঘরে কর্মেশের সঙ্গে বসে ভাগ্যস্থানকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। আবার অনেকে ক্ষেত্রবিশেষে যে ঘরে "চ" থাকে তাকেও প্রথম কেন্দ্র ধরে বিচার করেন, তাতেও এই রাশিচক্রে "চ" ঘর থেকে ৯ম ঘরের অধীশ্বর "১" নম্বর ঘরে বসে পূর্ণ-দৃষ্টি করছেন। অর্থাৎ এখানেও ভাগ্যদশী হয়েছেন ভাগ্যপতি।

দ্বিতীয়তঃ রাশিচক্রে শ্রেষ্ঠ ঘর ১ম এবং ১০ম ঘর অর্থাৎ ভাগ্য এবং কর্মস্থান। এই স্থান দ্বয়ের অধিপতি যথাক্রমে বৃহস্পতি এবং শনি একই ঘরে সহাবস্থান করে ভাগ্যকে যেমন বলবান করেছে তেমনি যদি ঐ ঘরকে কেন্দ্র করি তবে দেখতে পাই ঐ ঘর থেকে যে আবার ১ম—১০ম ঘর হয় তার অধিশ্বরদ্বয়ও নিজেদের মধ্যে স্থান বিনিময় করেছেন।

তৃতীয়তঃ রাশিচক্রে ১০ম স্থান হলো কর্মস্থান, মানুষ কর্মদ্বারাই ভাগ্যকে জয় করে। তাই জ্যোতিষ শাস্ত্রে কর্মস্থানকে রাশিচক্রে শ্রেষ্ঠ স্থান বলে নিরূপণ করা হয়েছে। আমরা যদি আলোচ্য রাশিচক্রের কর্মস্থানকে (১০) কেন্দ্র করে দৃষ্টি রাখি—তবে ও দেখতে পাচ্ছি কর্মস্থান থেকে ভাগ্য এবং কর্মস্থানের (৬।৭) অধিপতিদ্বয় বুধ এবং শুক্রগ্রহ যাঁরা কলা, গণিত, সৃজনীবিদ্যা, কল্পনা, কাব্য, সঙ্গীতের কারক তাঁরা বৃহস্পতির দৃষ্টে হয়ে ১নং ঘরে বসে যুগ্মভাবে কর্মস্থান থেকে কর্মস্থানে (৭) দৃষ্টি রাখছে। আর "যোগের" দিকে না গিয়ে যদি ভাবি এত সব যোগের ফল লাভ কি, তবে ও রাশিচক্রে দেখতে পাই জাতকের ৪নং ঘর হলো বিদ্যা এবং সুখ প্রতিষ্ঠার ঘর। সেই ঘরের অধিশ্বর চন্দ্র ১১ ঘরে লাভ স্থানে বসে আছেন। আবার যাঁরা ঘরে এবং যাঁর নক্ষত্রে বসেছেন তাঁদের উভয়ের অর্থাৎ যথাক্রমে শনি এবং বাহুর পূর্ণ দৃষ্টি পেয়েছেন।

চতুর্থতঃ গ্রহগুলি রাশিচক্রের ১২টি ঘরের মধ্যে ৫টি ঘরে শুধু "চর" এবং "স্থির" রাশিতে বসে আছেন অর্থাৎ জাতককে কর্মময় জীবনে স্থিরা একাগ্রতার আনয়ন এবং দেশ-বিদেশে ভ্রমণের কারক হয়েছে। কোন গ্রহই দ্বিস্বভাবাপন্ন ঘরে বসে নেই। অর্থাৎ বিধাতা রাশিচক্রটিকে এমন সুনিপুণ কলা-কৌশলে সাজিয়ে একটি বিচিত্র কমলের সৃষ্টি করেছেন যে তার সৌরভ সমস্ত বিশ্বকে মোহময় করে চলেছে। "পথের পাঁচালী" থেকে আরম্ভ করে তিনি 'সত্যবল্ল কি খিলাড়ী' পর্যন্ত এক একটি পুষ্প পাঁপড়ী সৃজনী

চিন্তাধারার প্রয়োগ কৌশলে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে ফল স্বরূপ তিনি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে সম্মানিত, বিভিন্ন পুরস্কারে অলঙ্কৃত। জ্যোতষী দৃষ্টিতে তাঁর রাশিচক্রানুযায়ী তিনি যা লাভ করেছেন তা এক কথায় এহঃবাহ্য। তিনি বর্তমানে বুধের দশা ভোগ করছেন—করবেন '৮৯ সাল পর্যন্ত তারপর কেতুর ৭ বৎসর। কাজেই তাঁর আরও প্রাপ্য আছে। তিনি পাবেন। কিন্তু মন্দের দিকটা একটু দেখি। জাতকের মুখ-মন্ডলে, গলায়, অথবা বক্ষিত দেশে, কিভাবে কোন দুরূহ রোগ দেখা দিতে পারে যাতে জাতক বেশ কিছুদিন কষ্ট পাবেন। অবশেষে আমরা জাতকের আরও সাফল্য, শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশি ফল বলছি।

সপ্তাহটি ইংরাজী ৭ জুলাই থেকে আরম্ভ।

মেষ :—মান-সম্মানে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা। কোন বৈষয়িক ব্যাপারের সুরাহা হতে পারে। ভ্রাতৃ-সুখ পাবেন।

বৃষ :—আয় এবং সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিদের গতিপ্রকৃতি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে। পারিবারিক কারণে বিব্রত হতে পারেন। ভ্রমণ যোগ আছে।

মিথুন :—নিজের প্রভাব বিস্তৃত হবে। ভ্রাতৃ স্থানীয় কারোর ব্যবহার মনের উপর আঘাত দিতে পারে। আঘাত পাবেন সংসার থেকেও।

কর্কট :—অযথা ব্যয় সংকোচ করুন। শরীরটাও বিরক্ত করতে পারে। উর্ধ্বতনের কাছ থেকে হঠাৎ প্রত্যাশিত ব্যবহারে উদ্যম বৃদ্ধি পাবে। ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা সুরাহা হতে পারে।

সিংহ :—হাতে অর্থ হয়তো কিছু আসবে। কিন্তু পূর্বের কোন ভুলে মনস্তাপ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নিন।

কন্যা :—কাজে-কর্মে আগের চাইতে তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। তথাপি হওয়া কাজে বিঘ্ন অসম্ভব নয়। কোন নতুন পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিতে পারে।

তুলা :—প্রত্যেক কর্মে নিজের বৈশিষ্ট্য হয়তো থাকবে। ভাগ্যও সহায়ক হবে, কিন্তু উর্ধ্বতনের ব্যবহার মনে লাগতে পারে।

বৃশ্চিক :—যতই মানসিক চাপ পড়ুক কিছুদিন ধৈর্য রাখুন শুভ ফল পাবেন। কোন পরিবর্তনকে পিছিয়ে নিলে শুভ হবে। মূল্যবান—কিছু হারানো থেকে সাবধান।

ধনু :—ব্যবসাতে উন্নতি হলেও কর্মস্থানে স্বার্থান্বেষীদের চাপ থাকবে। আইন সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে সাবধান থাকা উচিত হবে।

মকর :—কিছু হিতৈষীজনের বৈরীভাব বিব্রত করতে পারে, ফলে মনের দুর্বলতা ক্ষতির কারক হবে। নতুন যোগাযোগ লক্ষ্যণীয়। সপ্তাহের শেষ দিকটা দেখুন।

কুম্ভ :—আর্থিক চাপে বিব্রত হলেও কোন ব্যাপারে নিজ গুণে সম্মান পাবেন। সাংসারিক ব্যাপারে ছোটখাটো ঘটনা-গুলি এড়িয়ে চলুন।

মীন :—কর্মে প্রভাব এবং কিছু বিলাসিতার সপ্তাহ। কোনশত্রু বশ্যতা স্বীকার করতে পারে। কিন্তু ঋণ ব্যাপারে দাম কষাকষি করে ঠকতে পারেন।

শ্রীশাশিকা

আগামী সপ্তাহে প্রফুল্ল সেন

রং-তুলি আর ক্যামেরা

প্রদর্শনী

ব্রিটিশ পেইন্টস জুন মাসের পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত নীতা সরকারের ছবি আর চারজনের আলোকচিত্র দেখাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

নীতা সরকারের ছবির উপর একটা আস্তরণ দেওয়া ছিলো। তা সম্ভবত পলি-থিনের। তাতে সমস্ত ছবিতে একটা তেল-মসৃণতা চাবিয়ে গেছে যা সুফল দেয়নি কোনো দিক থেকেই। নীতা বস্তুকে তুলে ধরেন একটু দানবিক ভঙ্গিতে। বোঝা যায়, তাঁর মেজাজ একটু নাটকীয়। রঙের ব্যবহারেও সেই গাঢ় নাটকীয়তা থাকে সব মিলিয়ে, বর্ষীয়সী ফিল্মস্টারিকের কথা মনে পড়ে যায়। রঙের রুচিকে হয়তো অনভিপ্রেতই বলে বসা যেতো—কিন্তু রঙের আলো যে পলিথিন প্যাকেটের জন্যে একটু অন্য রকম লাগছে, এটা মনে রেখে, এ মন্তব্য করছি না। এটা নিঃসন্দেহ যে তাঁর কাজ একটা টিকলির হার দিতে পারে কিন্তু তার ফরমশ্যুলা আছে কিনা আমি জানি না। পারসেপশনটিও খুব চমৎকার। একটি মহিলা-মুখ থেকে গর্ভবতী পর্যন্ত এর বিষয়। মুখের অর্ধাংশ হিউম্যান নয়। গলায় বড়ো পাথরের মালা। ম্যাকসিমাইজেশন হাতের দীপ্তি, মাংসের লাইন ও বোধবিবর্জিত রমণীর মানবিক উপস্থিতির জাক্সটাপোজিশনের গুণে ছবিটাকে একেবারে আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে।

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, অলোক রায়-চৌধুরী, কে সি মল্লিক ও তপেন ঘোষের আলোকচিত্রমালা দেখা গেলো এরপর। আলোকচিত্রের টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কে আরো বহুজনের মতো বর্তমান ভাষ্যকারও অচেতন। কিন্তু ফটোগ্রাফিকে আর্ট মিডিয়া বলে দাবি করা হলে, হয়তো অন্যভাবেও সমগ্রের প্রতি চোখ রাখা যায়। এবং, ভাঙা বাড়িতে, ঝুলন্ত নড়বড়ে দোতলার সিঁড়ির মাঝখানে শম্ভু ভট্টাচার্যের ছবি ধরে দাঁড়িয়ে থাকাকে সেই চোখ শিল্পবস্তু বলে মেনে নিতে চায় না—অপর্ণা সেন-এর পোস্ট-সর্বস্ব প্রোফাইল-মাত্রকেও নয়। কিন্তু, 'রিবেল' আলোকচিত্রটা—যেখানে একটি যুবকের প্রতিচ্ছবিকে নেগেটিভের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—শুধুমাত্র তার বিদ্রোহী ভঙ্গির প্রকাশভঙ্গিকে ধরে ফেলাই নয় তার শরীরসৌষ্ঠবের সঙ্গে অন্তর্ভেদ্যতা ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে গাছের শিকড়ের ও বেরেঞ্জ-মূর্তির ভাঙ্গের—তাকে শিল্প বলে মেনে নিতে আপত্তি হয় না সেই চোখের। ওই ক্যালকাটা নাম্নী ছবিটিও সে মেনে নিতে পারে—শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে লোড-শেডিং একটি সমকালীন অভিজ্ঞতা। লণ্ঠনের

কিরণ আর রায়

পাশে বসে থাকা বাচ্চাটির মুখ অন্তর্দীপ্তির থেকেও বেশি ফুটেছে উদ্বেগ। সেটা নয়, দার্শনিক উদ্বেগ। ছবিটা যে মুহূর্তকে ধরা হয়েছে তাদায় নৌকা পাওয়ার মধ্যে—নায় অনন্তের দিকে। ছবিটি সুন্দর। কিন্তু এই তিনটি বক্স থেকে যান্ত্রিক

যেসব ছবি তা হয়তো ফটো কিছু কিছু ভালো—কিছু কিছু খারাপ—অন্য তাৎপর্য সেখানে বর্তায়নি।

*

বিড়লা আকাদেমি ব্যবস্থা করেছিলেন পাঁচজন শিল্পীর ড্রইং দেখাবার। ৬ জুন থেকে ১১ জুন পর্যন্ত। শিল্পীরা দিল্লী-বাসী। তাঁদের আমন্ত্রণ কার্ডে লেখা—আ গ্রুপ ডিভোটেড টু ড্রইং। গৌরাঙ্গ ঘোষের ড্রইংএ প্রথম যেটা লক্ষণীয় হয় সেটা প্লাম্পনেস। বেলুন ও নারী শরীরের উপ-স্থাপনার জন্যেই এটা মনে হয়। পরে তাঁর অন্য আবেদন ধরা পড়ে। সেটা যথেষ্ট পেশীর আবেদন। ড্রইং-এ সাধারণত একটা অ্যাসেটিক ভাব এসে যায়—সেটা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই সেন্সুয়াস ড্রইং যে সবসময় উপভোগ্য তা-ও নয়।

এঁদেরই আর এক শিল্পী তড়িৎ মিত্রের কাছ থেকে জানলাম, নীলিমা ওয়ারেরকার চান মৃদুতম আলো ও ছায়ার বিন্যাস। তাঁর উচ্চাশা অনুযায়ী তিনি যে খুব সফল তা নয়। নিতাই মজুমদারের সব ক'টি ছবিতে ব্রাশ করার কায়দায় চক-পেন্সিল চলে গিয়ে একটা ঝোড়ো আব-হাওয়া তৈরি করেছে—যার পটভূমিগুলি আলাদা আলাদা। কোনোটা বাড়ি, কোনোটা দুর্গ, কোনোটা উঁচুনিচু প্রান্তর। কিন্তু এদের সংঘাতে প্রত্যেকটি ছবি প্রত্যেকটির থেকে আলাদা না হয়ে সব স্টিরিওটাইপড হয়ে গিয়েছে। তড়িৎ মিত্র রহস্যময় জগৎ তৈরি করার অভিপ্রায়ে যাঁদের এঁকেছেন, তাঁদের রূপকল্প স্কেয়ারক্রো বা কাক-তাড়ুয়ার। আবহ রচনা কোনো কোনো ছবিতে ভালো এসেছে। গ্রোটেস্কের রস যাঁরা নিতে পারেন, তাঁরা নিশ্চয় দেখবেন—তবে এই গ্রোটেস্ক ঠিক পেইন্টিং-এর টার্মের গ্রোটেস্ক নয়। তাঁর ছবির শেড-এর কাজ দেখলে, বোঝা যায় বিকাশ ভট্টাচার্য তাঁর প্রিয় শিল্পী। সস্মিতা বসুমল্লিক ঘর প্যাসেজ দরজা এঁকেছেন। কখনো কখনো এদের বিবর্ণতা বা নির্বাক ধূসরতাকে কিছু বলিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে, একটি রঙিন ফুল ফেলে রেখেছেন। একটা দাবভূত বা উডেন ইমেজ দেবার চেষ্টা আছে তাঁর এইসব দৃশ্যকল্পে—যা খুব ভালো খাপ খেয়েছে বাইশ নম্বর ছবিতে। ২৩ নং ছবিতেও দুই থামওয়ালা বারান্দায় একজনের বসে থাকার দৃশ্যটি চমৎকার—কিন্তু সর্বত্র ওই উডেন এফেক্ট দেওয়ার পরিকল্পনা খুব কাজে লাগেনি। অতিথি একজন শিল্পী ধীরাজ চৌধুরীর দুটি ছবি আছে। তাতে তাঁর ভালোমন্দ বিশেষ কিছুই ধরা পড়েনি।

*

পনেরোই জুন থেকে বিশে জুন পর্যন্ত আকাদেমি অব ফাইন আর্টস-এর ব্যবস্থা ছিলো—চারজন বাংলাদেশী শিল্পীর কাজ দেখানোর। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ফরিদা

শিল্পী : ফরিদা জামান

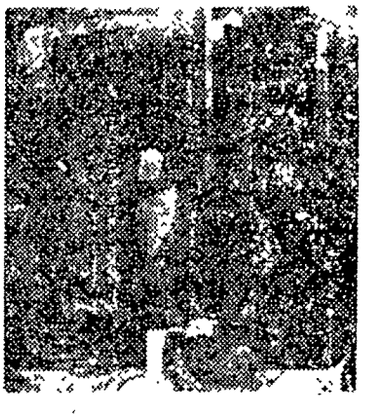

জামান, অলক রায়, আবদুশ শাকুর শাহ এবং এ কে এম আলমগীর।

ফরিদা জামানের তিনটি পেন্সিলের কাজ দেখলেই বোঝা যায়, ড্রইং-এর সম্পর্কে তিনি ততোটা পরিশ্রমী নন। একমাত্র ইন্টেরিয়র ছবিটি, বিষয়ের গুণে, একটু ক্যামেরা ড্রইং হওয়াতে মানিয়ে গেছে। কিন্তু রঙের ব্যবহারে তাঁর রুচি ও বোধ তর্কাতীত।

আবদুশের বৈশিষ্ট্য হলো, জলরঙের মাধ্যমে ছবিটিকে একটা স্লেটের ইলুশন দিয়ে তার উপরে চকখড়ি আঁকা মুখরেখা ফুটিয়ে তোলা। শেষটি হয়তো প্যাস্টেলের সাহায্যে করে থাকেন। বাচ্চাদের ছবির যে আলাদা প্রাণবন্ততা থাকে, তা তিনি ছুঁতে পেরেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সাতটি ছবিই এইরকম হওয়ায় এই ধাক্কাটা বেশি-ক্ষণ থাকে না।

অলক রায় টেরাকোটার উপকরণে নিজেকে এনেছেন। তাঁর বিষয় সেক্ষেত্রে ফিল্ম পোস্টার। ফিল্ম পোস্টারের মধ্যে থেকে এমন কোনো ছবি তিনি বার করতে পারেন নি—টেরাকোটার উপকরণ যাকে অন্য চোখে দেখাতে পারে। কাজেই, এক্স-পেরিমেন্টের দিক ছাড়া এই কাজগুলো ততো উপভোগ্য নয়। তাঁর ড্রইং ভালো—অনেক রকম মুড টেনে আনতে পারে।

এ কে এম আলমগীরের উডকাটের মোরগ ভালো লেগেছে।

*

আকাদেমি অব ফাইন আর্টস বাম-কুমার থান্নাকে সুযোগ দিয়েছেন আঠারো থেকে চব্বিশ জুন পর্যন্ত। সাউথ গ্যালারির ঘরটি তাঁর নানা ধরনের কাজে ভর্তি। রামকুমারকে ঠিক শিল্পী না বলে কলাবন্ত বলা যেতে পারে। ভেলভেট পেপারের ওপর প্যাস্টেলের কাজগুলি আকর্ষণীয়। প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়েও যেমন মূর্তি রচনা করেছে, তেমন ওয়েস্ট-পেপার জমিয়ে তাকে রঙ-করা স্পিরিটে বার্নিশ করেও মূর্তি বানিয়েছে।

তার পাশের ঘরে ছিলো আকাদেমির অতিনবীন শিক্ষার্থীদের কাজ। একদম নতুন এই শিল্পার্থীরা খুব কম বোল্ড রঙ ব্যবহার করেন। প্রচুর ল্যান্ডস্কেপ ও মিমিক্রির ছড়াছড়ি। একজন ফোর্থ ক্লাশ স্টাফ—ততো সময় পান না—একটি টেবিলের রক্তিমবাদামী রঙ খুব চমৎকার নিয়ে এসেছেন। এঁর নাম রামবাহাদুর ছেত্রী। প্রদীপকুমার বসুর পোর্ট্রেইট চমৎকার। সঞ্জয় দাস তাঁর আলেখ্যের বস্তুকে যথেষ্ট খুঁটিয়ে ধরতে চেষ্টা করেন। অমিতাভ রায় নিসর্গদৃশ্য আঁকলেও তাঁর মনে থাকে যে, নিসর্গের হুবহু প্রতিরূপ আমরা ছবিতে দেখতে চাই না। রঙের ব্যবহার অত্যন্ত সমঞ্জস, রেখাতেও কোনো নার্ভাস অবিন্যস্ততা নেই। অঞ্জনা দত্তের একটু চেষ্টা আছে চোখকে বড়ো বেশি খুশি করার, নৌকার চালক-দুটি একটু ক্যালেন্ডার-ঘেঁষা হয়েছে—এতদ্‌সত্ত্বেও এই শিল্পী নৌকাকক্ষের হলুদ আলোটিকে যেভাবে বার করে নিয়ে এসেছেন, তাতে তিনি বিশেষ মনোযোগ পাবার অধিকারিণী হয়েছেন।

*

আকাদমী অব ফাইন আর্টসে ৩ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত রবেন বসুর ছবি দেখানো হলো। চব্বিশটি ছবি এই প্রদর্শনীতে ছিলো। ল্যান্ডস্কেপ চারটি। আলমোড়ার ল্যান্ডস্কেপ ও ২৪নং ছবিটি বিশেষ উল্লেখ্য।

অন্যান্য ছবিতে, রবেন বসুর যে মেজাজকে আমরা সর্বত্র পাই—সে মেজাজ ভারতীয় সংস্কৃতিমুখীন ও অলংকরণপ্রিয়। অলংকরণে তাঁর পারদর্শিতা যে কোনো দর্শকের কাছেই সাধারণভাবে বোধগম্য। আর অধিকাংশ ছবিতেই, এই অরনেট ভাবটা একটু বেশি জড়োয়া। তন্ত্রাচার, তন্ত্রপ্রতীক, শিব, দুর্গা, জটায়ু, রাজস্থানের দম্পতি, কৃষিক্ষেত—এর উপরে তাঁর ছবি। ১৬নম্বর ছবি তাঁর এই ধরনের অভিপ্রায়ের একটি চমৎকার ফসল। ছবিটির নাম 'এনসেস্ট কাল-চার'—এই বিষয়ে তাঁর গূঢ় শ্রদ্ধাই তাঁকে অমোঘ বর্ণসন্নিপাতের দিকে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু রাজস্থান-দম্পতি, ফর্মস উইথ গ্র্যান্ড ফিলড দেখে নিরাশ হতে হয়। কোনো আর্টিস্টিক পরিকল্পনা এই বিষয়গুলি রবেন বসুকে দিতে পারেনি। ফলে, যথেষ্ট যত্ন সত্ত্বেও ছবিগুলি ইলাসটেট্রিভ ধরনে প্রোজেইক। বরঞ্চ, রামায়ণী কথার অনেকটা স্বাদ আছে জটায়ুবধ ছবিটিতে, যে ছবি আঁকতে গিয়ে রবেন বসু সমগ্র অর্থেই এবিরেস্টাল হবার চেষ্টা করেননি। তাঁর মূল মেজাজ অলঙ্করণবহুল, স্বস্তিময় বা আশ্বাসপ্রবণ; এ কারণে 'ইন্ডিয়া' আঁকতে গিয়ে নৃত্যময় জনতা তাঁর বিষয় হতে পারে—কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের নয়। অনেক জায়গায়ই সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা করেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মেজাজের—কিন্তু এই দুই মেজাজ শুধুমাত্র বেখার জ্যামিতিতে নয়, দৃষ্টিভঙ্গীর, যে কারণে ঈষৎ পিকাসো-পন্থীতায় আঁকা ত্রিশূল (৮নং ছবি) স্পর্শ করে না।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

প্রচুর ও দুর্লভ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে প্রসূন ছিল সবচেয়ে শুষ্ক, ভাবালুতাবর্জিত, ইংরাজীতে যাকে বলা যায় ম্যাটার অব ফ্যাক্ট ছেলে। তবে, এইজন্যই ও যে সবার চেয়ে স্পষ্ট এ-বিশটাও ওকে দিতে হোত, মতের যতই অমিল থাক। বয়স কালে বয়োধর্মে সবচেয়ে বড়ো [illegible]চনার কথাটা ধরা যাক। আমি কিছু [illegible]লখতে শুরু করেছি তখন, হেমন্ত [illegible]ওয়ার স্বপ্ন দেখছে, কাজেই ভেতরে [illegible] থাক, ওপরে-ওপরে দুজনকেই ভালবাসা [illegible]নিসটাকে স্বর্গে তুলতে হোত। [illegible]রন্ময়কেও। হিরণ ছিল গোবেচারি গোছের, [illegible]তশত কিছু বুঝত না. তবু তাকে আমাদের [illegible]ই যোগ দিতে হোত। নূতন বিয়ে করেছে. [illegible]টি শুনতাম নাকি কড়া, তার ওপর পাড়াগাঁ [illegible]কে পালাজ্বরের সঙ্গে দুরন্ত জ্ঞান-পাতা [illegible]ধ নিয়ে এসেছে।

আমাদের আলোচনাটা হিরণদেরই বৈঠকখানাতে হোত।

একদিনের নমুনা—

প্রসূন বলল—ভালোবাসা জিনিসটা যে অস্বীকার করি তা মোটেই নয়, তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি বিশ্বাস আমার তার ওপর। তবে পাত্র নিয়ে প্রচুর মতভেদ থেকে যাচ্ছে আমায় তোমাদের সঙ্গে। তোমরা ভালোবাসা বলে যে বস্তুটাকে রামধনুর সাতটা রঙে রাঙিয়ে রাখো, সেটা রামধনুর মতোই অলীক এবং অস্থায়ী। আছে বৈকি ভালোবাসা, না থাকলে জগৎ সংসার চলত কি করে? তবে সেটা মেয়ে-পুরুষের মধ্যে নয়। ভালবাসার একদিকে পুরুষ, অথবা মেয়েই, আর অপর দিকে টাকা। এ ভালোবাসা খাঁটি, সুতরাং পাকসই। তোমাদের ভালোবাসার একটা বড় লক্ষণ বল—না পেলে অতৃপ্তি তো আছেই, পেলে নাকি আবার তার চারগুণ। পুরুষ-[illegible] মধ্যে আমি এটা ফলতে দেখিনি, তবে [illegible]ষের মধ্যে (পুরুষই বলি, মেয়েদের আর [illegible]ব না) বেশ ভালোভাবেই ফলতে দেখেছি [illegible]ময় বেলায়। পুরুষানুক্রমেই; কেন না, [illegible]তের সংগে মিশে এ-ভালোবাসার একটা [illegible]কুড়ো নেমে আসে। আরও অনেক [illegible] আছে. তেমনিও ফলাও করে [illegible]ন্ত। তোমরা গালভারি করে বল—মুগ্ধ [illegible]য় ভালোবাসায় ন্যায়-অন্যায় বিচারের স্থান [illegible]ই. নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লভ এন্ড [illegible]র: এটা টাকার বেলায় যে কত খাঁটি কথা [illegible]র প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্যে বেশি দূরে না গিয়ে আমাদের বাড়িটাই দ্যাখো না। ঠাকুরদাদা টাকার প্রেমে পড়ে প্রায় জেলে যেতে বসেছিলেন, দেউলিয়া নিয়ে রক্ষা পান, রক্ষা পেয়ে আবার সেই প্রাণপণ। সার্থক প্রেমিক, বেশ কিছু রেখেও যান। বাবার ধমনীতেও ঐ একই রক্ত, তবে বাবার সুবিধে, ঠাকুরদাদার অভিজ্ঞতা তো পেয়ে-ছেনই, তার অতিরিক্ত তিনি পলিটিক্স আর কালোবাজারের যুগের লোক; ভালো-বাসার ব্যাপারে চেখে ধুলো দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অন্ধিসন্ধি বেশ জানা আছে। সার্থক প্রেমিক যে তা দেখতেই পাচ্ছ। বালিগঞ্জে ভাড়ার জন্যে তিনতলা ফ্ল্যাট বাড়িটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে এল। এবার আমার পালা। তা আমি যে বাপ-পিতামহের নাম ডুবতে....'

হঠাৎ থেমে গেল প্রসূন। আমার চোখে চোখ পড়তে একটু যেন থতমতও খেয়ে গেল। একটা কথা জানা ছিল আমার; শুধু আমারই। স্পষ্ট করে প্রশ্ন করব কিনা ভাবতে সেকেণ্ড দুতিন লেগেছে, খুব সূক্ষ্ম একটি হাসিও ফুটি-ফুটি করেছে আমার ঠোঁটে, তার মধ্যেই ও নিজেই দিল স্পষ্ট করে—

বলল—ও, তুই সেই কথা বলছিস? .. তা . হ্যাঁ, তোদের কবি আর লেখকের ভিজে হাওয়া লেগে মনটা একটু সাঁৎসেঁতে হয়ে আসছিল বটে, কিন্তু সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছি। এখন শিউরে উঠি ভাবতে গেলে। কম কথা! এদিকে লভ্ এন্ড ওয়ার দু-ই একসঙ্গে। কোর্টশিপের যুদ্ধে রেবাকে জিতেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে! এইটেই কত বড় একটা থ্রিল! তার সঙ্গে আছে নগদ ভালোবাসার জিনিস পঁচিশ...'

হঠাৎ একটু চমকে উঠে ছেড়ে দিল। বলল—'একেবারে ভুলে গেছলাম রে তোদের সঙ্গে বাজে তর্ক করতে করতে। তোরা বুঝবিনি, ঢুকবেই না তোদের মাথায়, অথচ...। আজ ললিতের ওখানে পার্টি। রেবা আসবে, ললিত জিতেনকেও ইনভাইট করেছে।....উঠি ভাই।' বলতে বলতেই উঠে পড়ে বেরিয়ে গেল।

রেবাকে নিয়ে দৈরথে জিতল জিতেন শেষ পর্যন্ত প্রসূনই। বাপের প্রচুর সম্পত্তি, তিনটি সন্তানের মধ্যে ছেলে একমাত্র প্রসূন। সুপুরুষ, স্মার্ট। জিতেন এসব দিক দিয়ে একটু পেছনে থাকলেও একটা বড় দিগন্তের ছবি তুলে ধরে রেবা এবং রেবার পিতা ভৈরব ভাদিড়ীর মন খানিকটা শ্লথাগ্রস্ত করে রেখেছিল, আই এ এস পরীক্ষা দিয়ে। অবশ্য পাস করলে কি হোত সঠিক বলা যায় না. প্রসূনের স্বপক্ষে তখনও অনেক কিছু থেকে যায়, তবে জিতেন নিজেই গড়িয়ে গিয়ে দুজনকে বিষয়ীকৃত করে দিল।

মাসখানেক ধরে প্রসূনের বিয়েই প্রতি-বেশীদের প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে রইল। বিয়ের ঘটা, তারপর বৌ-ভাতে এদিকে প্রসূনের বাবা কি করবেন। বকে-বৈঠকখানায় ও ভিন্ন আর প্রসঙ্গ নেই অন্য।

ছেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে একদিন অপূর্বকাকা আমায় ভাবী বেহাইবাড়ি নিয়ে

যোগানা বিশ্বনাথন অনূদিত

উজ্জ্বল আগামী ৫-০০

চীনের বিপ্লবোত্তর যুগের কৃষি জীবনের পট-ভূমিকায় ওয়াঙ শান্ রচিত চীনা উপন্যাস।

আকর্ষণ ৫-০০

দিল্লীর সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় গুরু দত্ত রচিত হিন্দী-উপন্যাস

তিন মূর্তি ৫-০০

দিল্লীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পট-ভূমিকায় সাহিত্য অকাদেমির সম্পাদক ড, র, শ, কেলকর রচিত মারাঠী উপন্যাস

কল্পনা প্রকাশনী : ৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

বি।৬৭৪০

গেলেন তাঁর মোটরে করে। স্নেহ যে করেন সেইটাই বইল ওপরে, তবে ভেতরের উদ্দেশ্যটা নিশ্চয় সাজিয়ে-গুছিয়ে বন্ধুর কাছে রিপোর্ট দিই। আমি যে পাড়ায় একটা লেখক গজিয়ে উঠছি সেটা তাঁর অজানা ছিল না। ওদিকে লাহিড়ী মশাইয়ের কেনাকাটা অনেক দিন থেকেই চলছিল, এরকম কানিয়েও এসেছে।

একেবারে যাকে বলে ঢেলে দেওয়া তারই ব্যবস্থা করেছেন। দান-সামগ্রীর ওরকম আড়ম্বর আমি আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সব সাহেব বাড়ি থেকে কেনা; আমাদের সে-যুগে সাহেববাড়িরই ছাপ ছিল আভিজাত্যের ফরমান।

এরপর রইল আসল যার সঙ্গে বিবাহ বা ভালোবাসা। প্রসূনের মতে (রেবা নয়, হাজার সুন্দরী হলেও) তার পরিমাণ পঁচিশ হাজার।

প্রসূনকে আমি যে 'সুপুরুষ' বলেছি সেটা বিশেষ করে, এই অর্থে যে, তার চেহারাটা ঢোলে আনাই ছিল পুরুষালি। এবং একটু টীকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অভিমত যে পুরুষের চেহারায় অল্প একটু মেয়েলি ভাব আর মেয়ের চেহারায় অল্প একটু পুরুষালি ভাবের মিশ্রণে থাকলে সৌন্দর্যের দিক থেকে খোসতাইটা বেশ একটু বেশী হয়। তার কারণ হয়তো এই যে, সমস্ত সৃষ্টিটাই অর্ধ-নারীশ্বরের কাণ্ডকারখানা। এটা থাকেও প্রায় সব মানুষের মধ্যে। তবে ব্যতিক্রমও পড়ে চোখে মাঝে মাঝে। একজন ছিল প্রসূন। হাড়-কাঠমোটা, সিধা, ইংরাজীতে যাকে বলে স্কোয়ার বিল্ট, চৌকশ, ওকে দেখলেই মনে হোতে হবে ঐ মানুষের মধ্যে বস্-কশ বা জেনানাতার স্থান থাকতে পারে না। চোখ দুটো ছিল স্বচ্ছ আর সতেজ, ফলে মনে হোত সে দৃষ্টি যেখানে গিয়ে পড়েছে, সেখানেও বস কশ যদি কিছু থাকে তো যেন শুকিয়ে দিচ্ছে।

তবু সুন্দরই ছিল বৈকি প্রসূন। আমি মোর হলে আর সবাকে ছেড়ে ওকেই ভালোবাসতাম, টাকা থেকে মন ঘোরাতে পারি না পারি। ওর মতো ষোল আনা পুরুষ জগতে দুর্লভ বলেই।

দেখছিলাম, যতই দিন এগিয়ে আসছে ততই, যা, যা, যাকে ভালোবাসে তাকে পাওয়ার সুনিশ্চিত প্রত্যাশায় আরও দিন দিন যেন সুন্দর হয়ে উঠতে প্রসূন।

তারপর একদিন বিকেলে হঠাৎ এসে উপস্থিত।

চেনা যায় না যেন, যে প্রসূনকে ওই সাতদিন আগে দেখেছি। চুল উস্কখুস্ক মুখটা শুকিয়ে গেছে, দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত, তবু তার মধ্যে থেকেই একটা চাপা উল্লাস ঠিকরে বেরিয়ে আসছে মাঝে মাঝে।

'আফিস তুই বাড়িতে দেখছি।' বলে অন্যমনস্কভাবে পাশে মোড়াটায় বসে পড়ল।

'ব্যাপার কি?' —বিস্মিত প্রশ্ন করলাম। আরও বিস্মিত হয়েছি ওর চোখের দৃষ্টি দেখে, কোথায় যেন হেরে যেতে যেতে সেই চিরবিজয়ী প্রসূন সামলে-সামলে নিচ্ছে নিজেকে। এরকম অন্তর্দ্বন্দ্বে ওকে কখনও দেখিনি।

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করতে আস্তে আস্তে, মনটা যেন কোথায় প[illegible] রয়েছে। ও ধরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে একটা যে খুব তীক্ষ্ণ গন্ধ মিশে গিয়েছিল ঘরের হাওয়ার সঙ্গে, সেটা একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাট খুলে রুমালটা আমার টেবিলে বিছিয়ে নিলে। তুলসীপি সেলাই করা একটি ধবধবে সাদা রুমাল, তার এক কোণে লাল রেশমী সুতোয় তোলা প্রসূনের নামের আদ্য অক্ষর 'প্র'।

ছেলেবেলা-বাইবে খুবই চঞ্চল প্রসূন এসেছেও ছুটে, বোধহয় গাড়ীর কথা হয়নি, কিম্বা গাড়ী কোথাও বেরিয়ে অপেক্ষা করেনি। একরকম মাথাথান বলল—'একদিন সুপর্ণাকে বললাম 'যতদিন তোমার না পাচ্ছি; একটা কি কিছু আমাদের দুজনের কাছে থাক। কা আমারটা আমি নিয়ে আসব।' সুপর্ণা হেসে বলল—'তা বলে দামী কিছু এনো না আমি তো গরীবের মেয়ে।' আমি কি গিয়েছিলাম একটা ইভনিং-ইন-প্যারিস সুপর্ণা এই রুমালটা তোষেব করে রে ছিল, শিশিটা খুলে একটু ঢেলেই মাথি দিলে বাধা দিতে দিতে। হেসে বলল— 'তা পড়ুক একটু বেশি তোমরা বড্ড বেশি ভালো।' আজ বিষেব বাজার করে এনে বড় ট্যাংকটার গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটা চেনা গন্ধ। ও-ট্রাংকটা তো খোলা হয় না বড় একটা। ওটকাতে ওটকাতে একেবারে নীচে এক কোণে বত্ন করে রাখা রুমালটা। কী সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল শৈল। আমে উঠি!'

রুমালটা হাতে গুটিয়ে নিয়ে উদভ্রান্ত ভাবেই উঠে এগিয়েছে দরজার দিকে, হত-চকিতেই হয়ে গেছি, সামলে নিয়ে বললাম— ওবে, থাকই না প্রসূন এখন আবার ফিরিয়ে দোব।' —আশ্চর্য হয়ে থুতে চাইল প্রসূন। একটু চেয়েও রই। আমার দিকে। তারপর যেন সম্বিৎ পেয়ে ওর মুখটা সহজ, নরম হয়ে এল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে রুমালটা আবার বিছিয়ে বলল—'দ্যাখো, ভুলেই যাচ্ছিলাম। যা বলতে এসেছিলাম। সুপর্ণাকে গি বলছি আমার নামের অক্ষরটার পাশে একটু কোনও চিহ্ন দিয়ে ওর নামের আদ্যাক্ষর তুলে দিক। সুপর্ণা তো কালো, জিগেস করছিলাম, নীলই ভাল হবে।

'আর ওদিকে?' —বলে মায়া যেন ঢুকছে না বলেই নির্বাক হয়ে চে রয়েছি ওর মুখের দিকে। প্রসূন আবা রুমালটা তুলে নিয়ে শরীরে একটা মোচ দিয়ে দরজার দিকে এগুতে এগুতে সজল— 'এসে সব বলছি, যাসনি কোথাও বেরিয়ে।

এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের সঙ্গে **EXHAUSTIVE QUESTIONS**-এ দেওয়া প্রশ্নগুলি মিলিয়ে নিলে বোঝা যাবে এ বইয়ের সার্থকতা কোথায়।

১৯৭৯ সালের পরীক্ষার্থীদের বই এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। দাম ১৫ টাকা। পুরো টাকা **M. O.** করলে রেজিস্টার্ড ডাকে বই পাঠানো হয়। অবশ্য বই ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই টাকা আসা চাই।

B. B. KUNDU & SONS
18L. TAMER LANE. CALCUTTA-700 009

ব্রিটানিয়া
দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া মজাদার মিল্ক বিকিস

সিনটাস-BBC.GLXMB.2-203 B.G

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

ওরা চুপ করে গেল। অনন্ত বুঝতে পারছিল, রোশন সম্পর্কে দীপুর দুর্বলতা ওদের চোখে ভাল ঠেকছে না। কিন্তু সে-কথা স্পষ্টভাবে দীপুকে জানাতেও সংকোচ বোধ করছে। সে নিজে দীপুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা কইবে কিনা এবং কথা বলাটা উচিত হবে কিনা, ভেবে দেখল। এত সামান্য পরিচয় যে এ ধরনের আলোচনা করাটা অধিকার বহির্ভূত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অনন্ত নিজেও দীপুর ব্যাপারটাকে আর সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না। ওই বয়সের একটি ছেলে যখন প্রাপ্তবয়স্কা কোন মেয়ের প্রতি দুর্বলতা দেখায়, তখন তার পরিণতিটা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন ভাবে ঠারে ঠোরে আলোচনাটা তোলা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে। কারণ ওদের সামনে একটা এক্সপিডিসনের প্রোগ্রাম রয়েছে। এই বেড়াতে আসার ব্যাপারেই পারস্পরিক সহযোগিতা আর সহানুভূতি কতখানি প্রয়োজন তা ভালো করেই বুঝে নিয়েছে অনন্ত। শতোপন্থ খুবই দুর্গম লক্ষ্য। প্রতিমুহূর্তে সেখানে প্রকৃতির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সেক্ষেত্রে লীডারের মন যদি দুর্বল হয়ে যায়, টীম-মেটরা যদি লীডারের প্রতি কোন কারণে আস্থা হারায়, তাহলে এত দিনের এত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা এবং প্রত্যাশা, সব ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এমন সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়ে যেতে পারে। ওরা ডাকে না চাইতেই অনেক দিয়েছে। ওদের জন্য কিছু করা উচিত তার।

মিনিট পাঁচ-সাত পরেই এসে পড়ল দীপু। এসেই হৈ-হৈ করে বলল, আমার চা কৈ?

আশু ক্ষুণ্ণ বিস্ময়ে বলল, সেকি? চা খাওয়ায় নি ওরা?

হাতের মুঠিতে সিগারেট ধরা ছিল। মুঠোয় টান দিয়ে দীপু বলল, ওদেরই চা করে খাওয়ালে ভাল হয়। সিংয়ের গিন্নীর পা-টা ফুলে অস্থির।

কানু বলল, একটু টি টি টি-পে দিয়ে এলি না কেন?

দীপু হেসে বলল, বললে না যে, বললে দিয়ে আসতাম। যেটা বামছাগুলে। আমায় চা দে শিগ্গির।

ফ্লাস্কে চা রেখেছিল কানু। ঢেলে দিয়ে বলল, তাহলে এক ফ্লাস্ক চা করে দিই, দিয়ে আয় ওদের।

দীপু বলল, আরে দূর! ওদের লোক আছে পাঁচ-সাতটা। কিন্তু কোনটা কাজের নয়। দেখলাম, ওখানে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক নয়। ভুগছে, ভুগতে দাও। ক্যা, কাল ওরা লোকপাল যেতে পারে।

আশু বলল, তাহলে কি আমরা এখানে আর একদিন থাকছি?

দীপু বলল, ওদের সঙ্গে আমাদের থাকার কি সম্পর্ক?

আশু বলল, সে কি? আমাদের তো ধারণা হয়েছিল, ওদের ওপরেই আমাদের লোকপাল যাওয়া নির্ভর করছে।

ফাজলামি করিসনে আশু। দেখছিস আমি দুশ্চিন্তায় অস্থির হচ্ছি?

কানু বলল, এখনি অধীর হলি যদি, শেষে তোর কি হবে দীপা? চন্দ্রালোকা নৃত্যনাট্য দেখেছিস তো?

না দেখিনি, বলে চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এল দীপু। রায়দা কি ভাবছেন বসে বসে?

অনন্ত বলল, ভাবছি, কালকের দিনটা রেস্ট নিই।

কেন বলুন তো? উদ্বিগ্ন হল দীপু। শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

না, সে রকম কিছু হয়নি। তবে পর-পর কদিন খুব পরিশ্রম হয়েছে তো? অভ্যেস নেই। একটা দিন রেস্ট নিলে ভাল হয়।

কিন্তু তাহলে তো আপনার লোকপাল যাওয়া হবে না। এতদূরে এসে লোকপাল না দেখে ফিরে যাবেন? আমাদের তো বুঝতেই পারছেন, একেবারে শূন্য স্টার্ট সিডিউল। দেরি করার কোন উপায় নেই।

আশু এবং কানু বেরিয়ে এসেছিল। উদ্বিগ্ন মুখে তাকালো অনন্তর দিকে। আশু বলল, কই, কিছু বলেন নি তো এতক্ষণ?

কি বলব? হাসল অনন্ত। শরীর খারাপের কথা বলছেন? না, শরীর কিছু খারাপ হয়নি। এমনি একটা দিন রেস্ট নিতে চাইছি। যা দেখলাম, তার একটু রি-ক্যাপিচুলেট করা উচিত, নাকি? মানে গুরুভোজন হয়ে গেলে হজমের জন্যে সময় দেওয়া উচিত।

অনন্তর সঙ্গে ওদের সম্পর্ক এমন গভীর নয় যে এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করা চলে। তবু গোপু বলল, পনের ষোল হাজার ফুট অলটিচ্যুডে ন্যাচারাল লেক দেখবেন না? তাছাড়া ব্রহ্মকমল ফুল।

ব্রহ্মকমল ফুলের নাম কোথায় যেন শুনেছিল। তাই উৎসুক হয়ে তাকাল অনন্ত।

সুযোগ পেয়ে সকলে মিলে বোঝাতে চেষ্টা করল তাকে। সম্মিলিত বিবরণ থেকে ধারণা হল অনন্তর, পাহাড়ের গায়ে লিলি জাতীয় ছোট ছোট গাছ এবং পদ্মের মত আকৃতির ফুল। পাতলা পাপড়ি, রঙ হালকা গোলাপী। তীব্র গন্ধ। এই হচ্ছে ব্রহ্ম-কমল। এই ফুলে বদরীনারায়ণের পুজো হয়।

হেসে অনন্ত বলল, দেখতে লোভ হয় ঠিকই। তবু আমার কি মনে হয় জানেন, একটুখানি অদেখা থাকা ভাল। পরের বার আসবার আকর্ষণ থাকবে। সব দেখা হয়ে গেলে মনে হবে, আবার কি দেখতে যাব।

দীপু উৎসুক হয়ে বলল, তাহলে আর একবার আসবার ইচ্ছে আছে?

থাকাই তো উচিত। আপনারা কি বলেন?

গোপু বলল, আমরা হিমালয়কে ভালবাসি। আমাদের সংস্পর্শে এসে আরও কেউ যদি হিমালয়ের প্রেমে পড়েন, আমরা তাতে ঈর্ষা বোধ করি না। আনন্দই পাই। কি বল লীডার?

অন্যমনস্ক ভাবে দীপু বলল, হুঁ।

(৩১)

পরেরদিন আর একটু আগে বেরিয়ে পড়ল ওরা। খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা বেশি করেনি। চৌকিদার ডিম এনে রেখেছিল গরম থেকে। কানু রান্না করেছিল চমৎকার। খেয়ে-দেয়ে অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা এগারটা নাগাদ। শের সিং সঙ্গে গেল।

যাবার সময়ে সকলে দুঃখ করেছিল অনন্তর জন্য। একা একা থাকতে হবে।

ছাড়া এতদূরে এসেও লোকপাল লেক দেখলো না।

ওদের সঙ্গে ঝরনা পর্যন্ত গেল অনন্ত। ফিরে আসার সময়ে দেখা হয়ে গেল রোশনের সঙ্গে। ভাইকে নিয়ে আসছিল গুরুদুয়ারা থেকে। অনন্তকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আপলোগ হেমকুন্ড্ যায়েঙ্গে আজ ?

অনন্ত বুঝিয়ে দিল, সকলেই হেমকুন্ড্ চলে গেল এইমাত্র। সে একা থেকে গেল এখানে।

ওই বাবুজী চলে গেল ? দেখা হবে না ?

ওরা ফিরে এলে দেখা হবে।

কখন ফিরে আসবে ?

ঘন্টা চার-পাঁচের মধ্যেই ফিরে আসবে মনে হয়। আগামীকাল বেলা দশটা নাগাদ এখান থেকে চলে যেতে হবে। সুতরাং আজ সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। হাতে সময় পাওয়া চাই। তাই আগে আগে গেল ওরা। ফিরবেও তাড়াতাড়ি।

বাবুজীকে বোলো, রোশন দেখা করতে এসেছিল। সম্ভব হলে যেন একবার দেখা করেন। ওঁর সঙ্গে কিছু কথা আছে।

তাকে আশ্বস্ত করল অনন্ত। চলে গেল রোশন ভাইকে নিয়ে। অনন্তর মনে হল, খুব আশাভঙ্গ হয়েছে মেয়েটির।

ভাবতে ভাবতে আসছিল অনন্ত। ভালবাসা ব্যাপারটা সত্যিই বড় জটিল। জাত, ধর্ম, ভাষা কোন বাধাই বুঝি ভালবাসার কাছে দুরতিক্রম্য নয়। কোথাকার ছেলে দীপু। 'একদা কি কবিযা মিলন হল দোঁহে, কি ছিল বিধাতার মনে।' এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখতে পাচ্ছিল অনন্ত। আগামীকাল নিশ্চয়ই চলে যাচ্ছে দীপু। আর কোনদিন দেখা হবে না ওই মেয়েটির সঙ্গে। তবে কেন এমনভাবে প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়ে গেল দুজনে ? পড়ল কি করে, সেটাও তো একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। কি রকম যেন গোলমেলে লাগছে সমস্ত জিনিসটা। মাত্র কয়েকটা দিন দেখা হয়েছে। হৃষিকেশ থেকে আসার পথে অসুস্থ মেয়েটি উপকৃত হয়েছিল দীপুর চিকিৎসায়। তার জন্যে কৃতজ্ঞতা। যদি জেগে থাকে তার মনে, সেটা অস্বাভাবিক নয়। তারপর সন্ধ্যেবেলা কর্ণপ্রয়াগে কিছু ক্ষণ ওরা গল্প করছিল, লক্ষ্য করেছিল সবাই। রোশনের মা-বাবাও দেখেছিল ব্যাপারটা এবং দীপুর সঙ্গে দু-চারটে কথা-বার্তাও কয়েছিল। সুতরাং সেই আলাপে কোন গোপনীয় হৃদয় বিনিময়ের সংকেত লুকোনো ছিল, তা বিশ্বাস করা শক্ত। দীপু অবশ্য কোন কথাই প্রকাশ করেনি। তবু অভিজ্ঞ অনন্ত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, সাধারণ সৌজন্যমূলক আলাপচারী ছাড়া গূঢ় মন-জানাজানির স্কোপ ওদের ছিল। তারপর কিছু গল্প গুজব করেছে ওরা যোশীমঠে যেদিন পৌঁছোয় সেদিন সন্ধ্যেবেলা। অনেকক্ষণ রোশনদের ঘরে কাটিয়েছিল দীপু। তবু তার পরেরদিন সকালে যোশীমঠ ভেটারনারী হাসপাতালের কম্পাউন্ডে ওরা যেভাবে বসে কথা বলছিল, তাতে সন্দেহ করা যেতে পারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে ওরা গভীর ভাবে। তেমনি তার পর থেকে আর তেমন আলাপের সুযোগ ওরা পায়নি। সুতরাং এই সীমিত সুযোগের মাধ্যমে এতখানি ঘনিষ্ঠতা জমজমাট কি করে, সেটা ভাবতে গেলে বিস্ময় জাগে বই কি।

এই ধরনের প্রেমের সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই কণাদের। জীবনে লিলি ছাড়া আর কারো প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করার সুযোগ হয়নি। লিলির সঙ্গে বিয়ে না হয়ে ডলি-মলি-পলির সঙ্গে বিয়ে হলেও একই মনোভাব হত তার স্ত্রীর সম্পর্কে। প্রাক্ বিবাহ অনুরাগ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তার। বিবাহোত্তর পরকীয়া প্রেম সম্পর্কেই বা কি ধারণা আছে ?

চমকে উঠল অনন্ত। একেবারে নেই বলা ভুল। লিলি আর সহদেবের সম্পর্ক কোনদিন তো খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করেনি কণাদ। দেখার প্রয়োজন মনে করেনি। অল্পবয়সী রোমান্টিক টাইপের ছেলে সহদেব। তার সঙ্গে রঙ্গভামাসা করে সুখ পায় লিলি। বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কণাদ সেই সখ্যতার মধ্যে অবৈধ কিছু সন্দেহ করতে যাবে কেন ?, কোন কারণ তো ঘটেনি এর আগে।

আগামী ৩রা জুলাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের দশমবর্ষ পূর্তিদিবস, সেই উপলক্ষ্যে ঐদিন হইতে ১৮ই জুলাই ৭৮ পর্যন্ত পক্ষকাল আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত নিম্নলিখিত পুস্তক-সমূহের উপর পুস্তক বিক্রেতাগণকে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইবে—আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ঐ সময় ক্রেতা সাধারণও শতকরা ২৫ টাকা হিসেবে ছাড় পাইবেন। অগ্রিম পাঠাবেন।

সুনির্মল বসুর—বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রাপ্ত

সুনির্মল রচনা-সম্ভার তিন খণ্ড ৭০·০০

মহামানবের জীবনকথা চারটি জীবনী ১০·০০

কিশোর উপন্যাস চারটি উপন্যাস ৮·০০

শ্রেষ্ঠগল্প-সংগ্রহ ৬·০০

কবিতা শেখার গোপন কথা ৫·০০

অধ্যাপক মনোমোহন সেনের

কুমার সম্ভব কাব্য ও কবি ২০·০০

সুভাষচন্দ্র বসুর সুভাষ বোস ১৯৩৯-৪০ ১০·০০

শশাঙ্কবিন্দু বেরার লজ্জা নেই ৪·০০

মুছলো যারা মায়ের চোখের জল ৪·০০

শ্যামাপদ ঘোষালের আমার বাংলা আগো ৩·০০

প্রণবকুমার মজুমদারের ইতস্তত আমি ৪·০০

শ্রীপান্থাবর্তের এরা তিনজন ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর রাজাই গল্প ৬·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত
সুমন্ত ৫·০০
গল্পসংগ্রহ ৫·০০

স্বপনবুড়োর
বাবুই বাসা
বোর্ডিং ১২·০০

শশী-শ্যামলের সাঁকো ৬·০০

আমার মায়ের মুখ ৪·০০

বেপরোয়া ৪·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
যুদ্ধে গেলেন গিয়ং ৫·০০

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
নাগিনীর অভিশাপ ৫·০০

ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কনসার্ন
এম টি ৭৩ কলেজস্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

কিন্তু যখন ঘটল? যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল লিলির অবৈধ ভালবাসার? তখন শুধু লিলিব ওপবে রাগ করা ছাড়া অন্যভাবে তো ওই ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করেনি সে নিজের মনে? সবটাই যদি সহদেবের কুৎসিত চক্রান্ত হয়? বদ্ উদ্দেশ্য নিয়ে সে যদি লিলিকে ধীবে ধীবে এনটাইস্ করে তাবপর প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে থাকে শুধু ওকে নষ্ট করবে বলে? কিছুই অসম্ভব নয় সহদেবের মত ব্যক্তিদেব পক্ষে। ওরা ভালবাসা বোঝে না, বোঝে ভোগ করাব আনন্দ। হয়তো লিলি তার মতলব বোঝেনি। হয়তো বিশ্বাস করেছিল সহদেবকে। কারণ, এখন মনে হচ্ছে কণাদেব, এই রকম দুষ্প্রবৃত্তি যদি না থাকতো সহদেবেব, তবে কখনই অফিসের কলিগদের কাছে উদ্দেশ্য বিবৃত কবতে যেত না সে। বলা যায় না, হয়তো বিশ্বাস, স্যানিয়েলরাও উৎসাহ দিয়েছে তাকে এমনিভাবে লিলির সর্বনাশ করতে। লিলিব মনোভাব জানা হয়নি। জানা যাবনি ওই ব্যাপারে তাব নিজস্ব অপবাধ কতখানি। তবে কিছু যে আছে, তাতে সন্দেহ কি? কারণ মিথ্যে কথা লিলি বলেছিল আগেই। বলেছিল বিকেলে ডোভাব লেনে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে। পরের দিন এ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস হলে থিয়েটার দেখাব প্রোগ্রাম আছে। কণাদকেও যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল।

চিন্তাগ্রস্ত মনে বাংলোয় ফিবে এসেছিল অনন্ত। মাহিন্দাব সিং বসে বসে টিল বুনছিল পূবেব বারান্দায়। তাকে ওপাশেব বারান্দায় ইজি চেযাবটা দিতে বলে ঘবে চলে গেল অনন্ত। হ্যান্ডব্যাগটাকে ভেতরে সেই যে রাখা ছিল রাযের এ্যাটাচিটা সেটা খোলা হয়নি এ যাবৎ। দেখতে হবে খুলে, কি সাপ ব্যাঙ আছে তাব মধ্যে।

এ্যাটাচি নিয়ে পশ্চিমের বাবান্দায় এসে গা এলিয়ে দিল সে আবাম চেয়ারে। যে ভাবনাটাব সূত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল, আবার জোড়া দিতে বসল তাকে।

ধরে নেওয়া গেল লিলিব অপবাধ ষোল আনা। তাহলেও বিচার কবাব সময়ে তার দিকটা একবার ভাবা প্রয়োজন। ডকটর শিবদাস চ্যাটার্জিব কথা সে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। ছেলেপুলে না — স্ত্রীলোক অপব পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে, এ কেমন কথা? কখনই তা সর্ব ক্ষেত্রে সঠিক হতে পাবে না। আধুনিক সাইকে-এ্যানালিস্টদের ওসব হচ্ছে পান্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা। শিশু সম্পর্কে আর পাঁচজন স্ত্রীলোকের মত লিলির মনেও সহজাত বাৎসল্য আছে। পাশেব ফ্ল্যাটের বাচ্চা ছেলেটাকে আদব করাব সময়ে ওর মুখে-চোখে যে আনন্দের প্রতিফলন দেখেছে তার ভেতরে বন্ধ্যা-নারীসুলভ ক্ষোভ হয়তো আবিষ্কার করা যেতে পারত। কিন্তু নিজস্ব সন্তান কামনায় লিলি অপর পুরুষের অবৈধ উপভোগের সামগ্রী হয়ে, এতটা বিকৃতি কি তার চরিত্রে আশা করা যায়? তবে কেন সে গেল সহদেবের এ্যাপার্টমেন্টে? কেন অমনভাবে—ভাবতে গিয়ে দুটি পরিচিত নরনারীর অবৈধ মিলনের দৃশ্য ভেসে উঠল চোখে। কুৎসিত, কুৎসিত! নিজের মাথার চুল দুহাতে খামচে ধবল কণাদ। মাথা গরম হয়ে গেল। যে ঠান্ডায় দুটো গরম জামা গায়ে দেবার প্রয়োজন হয় দিনের বেলা, এখন প্রচন্ড ঘৃণায়, দুঃখে, রাগে, অভিমানে সেই ঠান্ডাব সময়েও কপালে ঘাম দেখা দিল তার। সারাজীবন তাকে ওই কুৎসিত দৃশ্যের স্মৃতি তাড়া করে ফিরবে। কিছুতে শান্তি দেবে না।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইল অনন্ত। তাবপর অসাড়, অনিচ্ছুক দেহটাকে তুলে টেনে নিল রাযের এ্যাটাচিটা। খুলতে ভয় হচ্ছিল। কে জানে, নিজের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে কার কি সর্বনাশ করে ফেলেছে।

চারদিকে কোথাও কোন শব্দ নেই। একরকম টোটাল সাইলেন্স, কমপ্লিট এ্যান্ড ওভারপাওয়ারিং ভয়েড অব এনি সাউন্ড, বুকচাপা নৈঃশব্দ শরীর এবং মনের ওপর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ছটোছুটি করে নিজের পায়ের শব্দে নিজেকে জাগাতে ইচ্ছে করে।

তার নর্দনের অনুপস্থিতিতে কি করছে লিলি? অনেক আগেই সে বুঝতে পেরে গেছে, সহদেবের ঘরে তাকে দেখে প্রতিশোধ নেবার জন্যেই সব টাকা নিঃশেষে চুরি করে পালিয়ে গেছে কণাদ। নিঃসংশয় হবার পর লিলির মনের অবস্থা কি হয়ছে? সে কি মর্মান্তিক অনুশোচনায় পীড়িত হয়েছে? নিজের প্রবৃত্তিতাড়িত স্বভাবকে লাঞ্ছিত করেছে? নাকি সে আবও বেপরোয়া চিন্তায় কণাদকে গালাগালি দিয়েছে মনে মনে? ওকে দেখতে পেলে ওর মনের ভাব বুঝতে পারত কণাদ। কোথা থেকে কিভাবে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে দিন কাটাচ্ছে লিলি, কে জানে! ইলেকট্রিকের বিল এসে গেছে নিশ্চয়ই এতদিনে। এসব ব্যাপারে কণাদ খুব পার্টিকুলার। বিলেই খোয়াতে রাজি নয়। বস্তুতঃ, কোন ক্ষেত্রেই অযথা অর্থব্যয় করতে তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। লিলিও ভাল করেই জানে তার স্বভাবের কথা। তবু মাঝে মাঝে বেহিসেবী খরচ করার জন্যে ঝোঁক ধরে সে। সহদেবের অত্যধিক অপব্যয়ের জন্য যখন বকাবকি করেছে কণাদ, অসন্তুষ্ট হয়েছে লিলি। সমর্থন করেছে সহদেবকে। বলেছে, একটু আধটু বাজে খরচ না করা গেল তো টাকা থেকে লাভ কি?

লিলিব অনেক ভঙ্গী মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। আলট্রা মডার্ন হবার ঝোঁক চেপেছিল অল্প কিছুদিন আগে। আপ টু ডেট বলতে পারে না বলে স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে যোগ দিয়েছিল। সিগারেট খেতে অস্বস্তি হত। বাড়িতে খেত না। কিন্তু বাইরে কণাদের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে যখন সেও অফার করত, সাগ্রহে সিগারেট নিয়ে মুখে দিত। অথবা নিজে থেকে ব্যাগ খুলে সিগারেট কেস বার করে অফার করত কণাদের বন্ধুদের। আর একটা বিকৃতি দেখা দিয়েছিল ইদানিং। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে স্ল্যাং ব্যবহার করত। কণাদ বেশ বুঝত, ওই শব্দগুলো সহজে এসে যাচ্ছে না ওর জিভের ডগায়। জোর করে নিয়ে আসছে মুখে। স্ল্যাং ব্যবহার করে নিজের অতি-আধুনিকতা জাহির করতে চাইছে। পার্টিতে যেদিনই দেবল বিশ্বাস উপস্থিত থাকত, সেদিনই যেন লিলি অতি উগ্র আধুনিক হয়ে উঠত। কণাদ পছন্দ করছে না জেনে বিশ্বাস আর স্যানিয়েল বেশি করে তাতাতো লিলিকে। তারপর সহদেব যোগ দিলে তো আর কথাই নেই। একদিন ওদের সঙ্গে বারে বসে প্রায় চার পেগ হুইস্কি গিলেছিল লিলি। তারপর কোনরকমে বাড়ি এসে বমি করে সে কি কান্না!

দীর্ঘশ্বাস পড়ল অনন্তর বুক কাঁপিয়ে। কণাদ নিজেই তো প্রোচিত করেছে একদিন লিলিকে। বছর তিনেক আগে, একটা পার্টিতে কে যেন সিগারেট বাড়িয়ে ধরেছিল লিলির দিকে। বলেছিল, এ্যালাউ মি, মিসেস মিটার, টু অফার ইউ. এ সিগারেট। ইটস্ এ্যান ইম্পোর্টেড ব্র্যান্ড।

হেসে উঠেছিল লিলি খিলখিল করে। কণাদকে বলেছিল, শুনছ, উনি আমাকে সিগারেট অফার করছেন।

কণাদ বেশ গম্ভীর হয়েই বলেছিল, ইটস্ নট সো আনন্যাচারাল। আধুনিক সব মহিলাই স্মোক করে থাকেন। উনি কিছু অস্বাভাবিক প্রস্তাব করেন নি।

তাহলে বলছ আমি সিগারেট খাবো?

নিশ্চয়ই খাবে। অফকোর্স ইফ ইউ ফিল লাইক ইট্।

সেই প্রথম প্রকাশ্যে স্মোক করেছিল লিলি। তার আগে নির্জন ঘরে কণাদের অনুরোধে কখনো দু-চার টান দেয়নি এমন নয়। সে তো শুধু মজা পাবার জন্যে। তার মধ্যে কোন অশোভন লিপ্সা ছিল না।

বারে গিয়ে কিংবা পার্টিতে ড্রিঙ্ক করাব ব্যাপারটাও তাই। কণাদ বহুদিন থেকেই মাঝেমধ্যে ড্রিঙ্ক করে। বন্ধু-বান্ধবরা অফার করলে এ্যাবস্টিনেন্স দেখাবার ইচ্ছা বা ঔদার্য কোনদিনই ছিল না তার। একবার বোম্বে থেকে ভাল ফরেন লিকার এনেছিল দু-বোতল। লিলিকে হাফ পেগ মত দিয়েছিল খেতে। শুধু কৌতূহলবশেই খেয়েছিল লিলি। তারপর থেকে মাঝে মাঝে বাড়িতে বসে খেত দুজনে। প্রকাশ্যে ড্রিঙ্ক করাও হয়ে গেল একদিন। এবং তারপরে বারে বসে থাকে বলে নেশাগ্রস্ত হওয়া, তাও হয়েছে কিছুদিন আগে।

বেসের মাঠে নিয়ে গিয়েছিল সে লিলিকে। নিউইয়ার্স ডে সেলিব্রেট করার প্রোগ্রাম করেছিল ম্যাকমিবিস। সবে বিলেত থেকে এসেছে ছোকরা সাযেব। তাকে তেজা দেবার জন্যে প্রতিযোগিতা চলছে সিনিয়র এবং জুনিয়ার একজিকিউটিভদের মধ্যে। সেলিব্রেশনের একটা আইটেম ছিল সকলে মিলে

বেসবোর্সে যাওয়া। প্রথমে প্রচন্ড আপত্তি করেছিল লিলি। তাকে বুঝিয়েছিল কণাদ, যে সার্কেলে মেলামেশা করে তারা সেখানে এটাকে ট্যাবু বলে দেখে না কেউ। বাধ্য হয়েই গিয়েছিল লিলি। তারপরে গ্র্যান্ড এনক্লোজারে আরও বহু সোসাইটি লেডিকে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল কিন্তুটা। একটা ঘোড়ার পেছনে গোটা পঞ্চাশ টাকা লাগাই করে যখন শ দুই টাকা পেল বুক-মেকারের কাছ থেকে (ঘোড়াটা সেকেন্ড ফেভারিট ছিল) তখন উত্তেজনায় বকুত ছড়িয়ে গিয়েছিল তার মুখেচোখে।

এমনি ভাবে, ভেবে দেখল অনন্ত কণাদ নিজেই লিলিকে ঠেলে দিয়েছে অস্বাভাবিক জীবন যাপনের দিকে। অস্বাভাবিক অবশ্য এ্যাংলো কিংবা লাইক-মাইন্ডেড ধনী অথবা আপ-স্টার্ট বাঙালী মেয়েদের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। কিন্তু, যে পারিবারিক শিক্ষায় এবং পরিবেশে বড় হয়েছে লিলি, যে সংস্কার এবং বিশ্বাসে দীর্ঘদিন লালিত হয়েছে, তার পরে হঠাৎ এই ধনের কৃত্রিম উত্তেজনাকে আশ্রয় করলে ব্যালান্স রাখা সম্ভব হয় না।

সুতরাং আজ লিলির একটা স্খলনকে বড় করে দেখে, তাকে শাস্তি দেবার অভিলাষে আমলমাখা খুলে সব টাকাকড়ি চুরি করে নেয়া বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। কণাদের রোজগারের টাকা হতে পারে, কিন্তু লিলির হাতে সংসার খরচের টাকা তুলে দেওয়ার পর আর নিজের টাকা বলে দাবী করা চলে না, সুতরাং পরের দ্রব্য।) পালিয়ে যে এল সে পরিণত স্বামীত্বের অভিমানে সেটা কণাদের পক্ষেই বা কতটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে? যে সমাজের মহিলাদের অনুকরণ করার জন্যে বিগত কয়েক বছর ধরে প্ররোচিত করেছে সে লিলিকে তারা তো শারীরিক শুচিতাকে বিশেষ মূল্য দেয় না। স্বামীর স্বার্থের আড়ালে অপর পুরুষের কাছে আর্থিক কিনা বা আনন্দ ফুর্তির কিনা আত্মসমর্পণ করাটা সেখানে এথিক্যাল-এ দূষণীয় নয়। তাহলে লিলির স্খলনটাই বা কার চোখে বেশি বড় হয়ে দেখা দেবে? আজ যদি সব কথা প্রকাশ করে দেয় নিরপেক্ষ আদালত সাক্ষীর কাছে দোষী সাব্যস্ত হবে কে?

মাক্স থেকে সেভারা এ নাম (ঈশ্বর জানেন ভদ্রলোকের কি নাম)। শান্তির পেল অনায়াসে। এ্যাপার্টমেন্ট কেসটা প্রথমে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। সুন্দরী মহিলা বিদেশিনীর বাড়ি যাওয়ার কথা অপরিচিত কারুর জানা থাকে, তার সেই যাওয়াটা গোপনে করা উচিত ছিল। বেরোবার সময়েও না হলে অন্তত ফিরে আসবার সময়েও সে মনে মনে সঙ্কল্প নিয়ে ছিল অনন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ক্ষতি তো শুধু তারই হয়নি, ক্ষতি হয়েছে তার নিজের এবং লিলিরও। তার শিক্ষায় গভীরতা, মনুষ্যত্বের ঔদার্য, তার বিচার বিবেচনা এগুলোর জন্যে তার নিজের মনে গর্ব বোধ ছিল। অফিসে আর পাঁচজন কলিগ্ অনেক বিষয়ে তার থেকে নিচু স্ট্যান্ডার্ডের, এইরকম একটা সুপ রিয়রিটি কমপ্লেক্স বরাবরই ছিল কণাদের। এখন তো সম্পূর্ণ ধূলি-সাৎ হয়ে গেল সেই ইমেজ। কোথায় থাকল মেকি আত্মমর্যাদা? এত পলকা, এত ঠুনকো অহমিকাবোধ যে এতটুকু ধা সইল না। লিলির বদলে যদি সানিয়েলের মোটাসোটা গাব্দা-গোব্দা বউয়ের সঙ্গে সহ-দেবের এই এ্যাফেয়ার হত, কি মনোভাব নিয়ে বিচার করত সে সমস্ত ঘটনাটার? খুব মজা পেত। একবারও রাগ হত না সহদেবের ওপরে। বড় জোর মনে মনে ভাবত, ওই বোম্বাই ফিল্মের ভকুত ছেলেটি কি আবিষ্কার করল সেক্সলেস হ্যাগ মিসেস সানিয়েলের মধ্যে? হয়তো তাই নিয়ে লিলির সঙ্গে রসালাপ করত নিভৃত অবসরে। লিলি যদি বলত, ম্যাগো, ওই মোটা মেয়েটার মধ্যে কি দেখল বলত ছোঁড়াটা? এদিকে পোশাকের বাহার, চুলের বাহার তো খুব। তোমাদের অফিসের সিনিয়র একসিকিউটিভের বদলে হিন্দি ফিল্মের নায়ক হলেই মানায়। অথচ রুচিটা দেখ। তখন নিশ্চয়ই উচ্চাঙ্গের হাসি হাসত কণাদ। একটা চোখ টিপে রসিকতা করত, মিসেস স্যানিয়েলের বদলে তোমার প্রতি সহদেবের এ্যাটেনশান ডাইবেকটেড হলেই খুশি হতে। এই তো? নিশ্চয়ই তখন চোখ মুখ লাল হয়ে যেত লিলির। জোর দিয়ে বলত, কখনো না। আমি সে টাইপের মেয়ে নই। অত সস্তায় আমাকে ভোলানো যায় না। কণাদ তখনো হয়ত চালিয়ে যেত রসিকতা। আহা, তোমাকে ভোলাতে না হয় আর একটু বেশি দাম দিত বেচারা। এ কথার উত্তরে, অনন্ত কল্পনা করতে পারে, চোখের দৃষ্টি

দাড়ির গোলমালের প্রথম লক্ষণ

প্লেক (Plaque)
এক জীবাণুর এক অদৃশ্য পর্দা যা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে থাকে। অবহেলা করলে, প্লেক হয়ে শক্ত হয়।

রক্তমল
দাঁতের গোড়ার জমে, ফলে মাড়ি ফোলা ফোলা আর ফুলে ওঠে। পরে মাড়ি আর দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে দাঁত পড়ে যেতে পারে।

মাড়ি থেকে রক্ত পড়া
ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজ করবার সময় দুর্বল আর কোমলীভূত মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে পারে। এতে বাধা না পেলেও ভবিষ্যতে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন:
নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

দাঁতের মাঝের ফাঁকের ভেতর রোজ রাতে আর সকালে মাঝারি ধরনের দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন ফরহান্স দিয়ে। আর, মাড়ি মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ফরহান্স ডবল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করুন।

মাড়ি খারাপ তো স্বাস্থ্যও খারাপ

ফরহান্স টুথব্রাশই দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

180-F-172-BEN

তীক্ষ্ণ হয়ে যেত লিলির। বলত, ধরবদার তুমি এই ধরনের ইঙ্গিত করবে না। আমি পছন্দ করি না। লিলির সেই চেষ্টাকৃত ভণ্ডামী দেখে (ভণ্ডামী ছাড়া আর কি? ভাল করেই চেনে সে লিলিকে।) পরম ঔদার্যের ভাব মুখে চোখে ফুটিয়ে তুলে কণাদ বলত, আহা, রাগ করছ কেন? তোমার যদি একটু আধটু ও রকম এ্যাফেয়ার থাকেই, তাতে আমি তো বরং ইলেটেড ফিল করব। এ্যাটলিস্ট ইউ আর স্টিল বিইং ভিক্টোরিয়াস্ বাই আদার্স। লোকে তোমার জন্যে যদি আমাকে মনে মনে ঈর্ষা করে, সেটা তো আমার পক্ষে একটা কমপ্লিমেন্ট। তখন লিলি কি উত্তর দিত? লিলি হয়তো বলত, থাক, তোমাদের হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। বউরা তোমাদের কাছে পজেসানস্। আর কারো নজর সেদিকে গেলে খ্যাক-খ্যাঁক করে ওঠো তোমরা খ্যাঁকশিয়ালের মত। এ কথায় নিশ্চয়ই চটে উঠত কণাদ। আর পাঁচটা কমন হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে এক ক্যাটিগরিতে তাকে ফেলেছে বলে রাগ করত লিলির ওপরে। এত ছোট মন তার নয়, এ কথাই জোর দিয়ে বলত সে।

হো হো করে হেসে উঠল অনন্ত নির্জন নিস্তব্ধ বারান্দা কাঁপিয়ে। হাসতে-হাসতে চোখে জল এসে গেল তার। কি অসঙ্গতি তার চরিত্রে এবং ব্যবহারে। লিলি যদি ভণ্ড হয়, নিজেকে সে কি বলে অভিহিত করবে? হো-হো-হো-হো করে হাসতে থাকল সে আপন মনে।

মাহিন্দার সিং অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। এ বাবুর মাথার কিছু ঢিলে আছে, এ কথাই হয়তো ভাবছে বেচারা।

তার দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল অনন্ত। কুছ নেহি, ঠিক হ্যায়। তুম যাও।

বাঁ হাত নেড়ে তাকে বিদায় দেওয়ার ইঙ্গিত করতে গিয়ে রিস্টওয়াচের দিকে নজর গেল তার। সাড়ে বারটা বাজে। এক ঘণ্টারও বেশি সময় বসে আছে সে চুপচাপ। না, সময় বেশি নেই। চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে ওরা। তার আগে সব স্থির করে নেবে, এ কথাই সে ভেবেছে কাল থেকে। এ বার নামক ব্যক্তিটির পরিচয় জেনে নেওয়া দরকার। এ্যাটাচি খুলে জিনিসপত্র বার করে আনল কণাদ।

তার টাকাকড়ি সব এতেই রাখা আছে। মনে হয় গুনে দেখার দরকার নেই। একশ টাকার নোটগুলো গুনে দেখল, ঠিক আছে। তখন দশ টাকার নোট গোনার ইচ্ছে হল। তাও ঠিক আছে। আর বেশি না গুনলেও চলবে। এখনো প্রায় চোদ্দশো টাকা আছে তার হাতে। টাকার ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নেই। হিল-কনসেসন টিকেটটা ঠিক আছে। সেদিক দিয়েও নিশ্চিন্ত সে। এখন বাকি আছে শুধু রায় মশায়ের একটা পরিচয় পাওয়া।

যেন তার সেই অনুসন্ধিৎসার উত্তরেই হাতে উঠে এল একখানা খাম। মুখ ছেঁড়া খাম। ঠিকানা লেখা শ্রীঅনুপম রায়। দেখেই চলকে উঠল বুকের রক্ত। নামের নিচে মার্ক রোডের একটা বাড়ির নম্বর। খুবই পরিচিত নম্বর। তাদের পাশের চারতলা বিল্ডিংটার নম্বরই তো ওটা। শ্রীযুক্ত অনুপম রায় তবে তার নেক্সট-ডোর নেবার? আর তারই মালপত্র চুরি করে পালিয়ে এসেছে সে এখানে? বেচারা রায় কিছুতেই চোরের হদিশ করতে পারবে না। প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার। পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটেই থেকে যায় সবথেকে অপরিচিত। কলকাতায় বাস করার এটাও অন্যতম ট্র্যাজেডি।

যাক, তাহলে বায়ের ঠিকানাটা পাওয়া গেল। এবারে আর কোন কাগজ যদি পাওয়া যায়, যা থেকে দেরাদুন যাওয়ার কোন সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারে, তাহলে অনেকটা ঝামেলা চুকে যায়। সব কাগজ-পত্র বার করে ফেলে একটি একটি করে দেখতে থাকল অনন্ত।

মাহিন্দার সিং এসে বলল, লিডার সাব বোলা থা কি আপকো চায় বানায়কে দেনা। ক্যা আভি বানায়েঙ্গে?

চায়ের কথায় হঠাৎ সুগম সিংয়ের মুখটা ভেসে উঠল মনের পটে। মাহিন্দারকে ডেকে বলল, তুমি যাও, কেটলি নিয়ে সুগম সিংয়ের দোকান থেকে চা নিয়ে এস। একটা টাকা বাড়িয়ে দিল সে। দু-কাপ চা নিয়ে আসবে।

টাকা নিয়ে চলে গেল মাহিন্দার সিং। বায়ের কাগজপত্রগুলো আবার পরীক্ষা করতে থাকল অনন্ত। অনেক দরকারী কাগজ রেখেছে লোকটি। কিন্তু কোন কাগজ থেকেই দেরাদুন যাত্রা করার কোন হদিশ খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষকালে ওই খামের চিঠিটাই আবার হাতে তুলে নিল সে। মেয়েলী হাতের ঠিকানা লেখা। সংকোচ হয় পড়তে। মনকে শক্ত করে খাম থেকে বার করে নিল সে চিঠিখানা। লাইন টানা মোটা নীল কাগজে লেখা অনুপমের স্ত্রীর চিঠি। ওপরে ঠিকানা লেখা, কলেজ রোড, দেরাদুন।

অনুপমের স্ত্রী সবিতা স্বামীকে লিখেছে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিতে থাকল অনন্ত। স্বামীকে স্ত্রীরা যে আদর সম্ভাষণ জানায়, তার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। তাই অল্পবয়েসী কৌতূহল জাগে না সে ব্যাপারে। মোদ্দা কথাটা তাড়াতাড়ি জেনে নিতে চাইছিল অনন্ত। সেটা জানতে পারল প্রায় সবখানি চিঠি পড়া হয়ে গেলে। গরমে বৌ কষ্ট পাবে বলে বাবার কাছে পাঠিয়ে-ছিল তাকে অনুপম। কিন্তু বৌয়ের মন টিকছে না এখানে। যতদিন বিয়ে হয়নি, এরকম ছিল না। এখন আর সে থাকতে পারছে না। অবশ্যই যেন এ মাসের মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে অনুপম।

ভাল, অনন্ত ভাবল, তাহলে উদ্দেশ্যটাও বোঝা গেল, খুব গুরুতর কিছু ক্ষতি হয়নি অনুপম রায়ের। কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সেটা অনায়াসে পূরণ করতে পারবে কণাদ। তার আগে অবশ্যই একটা খবর নেওয়া দরকার। নতুন করে টিকেট কেটে অনুপম কি দিন কয়েকের মধ্যে এসেছে দেরাদুনে? নিয়ে গেছে কি সে বৌকে কলকাতায়? যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে জিনিসপত্র দেরাদুনে পৌঁছে দিতে পারে সে। অনর্থক কলকাতায় বয়ে নিয়ে যেতে হয় না।

যাই হোক, এ কিছু একটা জরুরী ব্যাপার নয়। এখনো কদিন একা একা কাটবে তার। নিরিবিলিতে চিন্তা করে নেবার অবসর পাবে। আপাততঃ দুশ্চিন্তা-মুক্ত মনে একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে এই নির্জন শৈল নিকেতনের সৌন্দর্য। কাগজপত্র, টাকাকড়ি সব গুছিয়ে ভরে রাখল অনন্ত এ্যাটাচি কেসটার। এ্যাটাচিটার ওপরে এরই মধ্যে মায়া বসে গেছে। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল সে।

দীপু ফিবল ঠিক সাড়ে তিনটেয়। বাকি সকলে এল আরও মিনিট পনের পরে। দীপুর হাতে ছিল ডাঁটি এবং পাতা সমেত একটা রক্তকমল। নিয়ে এসেছে অনন্তর জন্যে।

খুব ভাল লাগল অনন্তর। এই ছেলে-গুলিকে যত দেখছে সে, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমন নিঃস্বার্থ ব্যবহার, যাকে পরার্থপরতা বলাই সঙ্গত, সচরাচর দেখা যায় না আজকের দিনে। ওদের দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যখন জীবনে এত জটিলতা দেখা দেয়নি। যখন চারপাশের মানুষগুলি ছিল সহজ, সরল, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। যখন পাড়ার কারো বাড়ি টাইফয়েড হলে অনাত্মীয় ছেলেরা এসে সেবার ভার নিত। যখন গরীব বিধবা পাড়ার পাঁচজনের সহায়তায় মানুষ করে তুলতে পারত তার সন্তান। একটা যুদ্ধের দুরাগত প্রতিক্রিয়া, একটা দুর্ভিক্ষ, একটা দাঙ্গা এবং সর্বোপরি একটা সার্বিক দেশ ভাগ, আমাদের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করেছে, বিকৃত করেছে, কুৎসিত করে তুলেছে। এরা যে কি করে সেই কুশ্রীতার প্রভাব এড়িয়ে টিঁকিয়ে রাখল মনের স্বাস্থ্য, সেটাই বিস্ময়! তবে কি এই হিমালয়ের কোন ইনফ্লুয়েন্স কাজ করেছে এদের চরিত্রের ওপরে? ওরা বলছিল, বছর বছর এই হিমালয়ে না এসে পারে না, বিশাল হিমালয়ে কত তীর্থ, কত সৌন্দর্য নিকেতন। এর লোকচক্ষুর আড়ালে কত মনোমুগ্ধকর ফুল-লতা-পাতা, নদী, ঝরনা, হ্রদ। কিছুই নাকি নষ্ট হয় না এই হিমালয়ে। কোথায় যেন রূপকুণ্ড বলে একটা হ্রদ আছে, ওরা বলছিল, সেখানে সাতশো বছর আগে মারা গেছে এমন সব মানুষের মৃতদেহ আজও দেখতে পাওয়া যায়। এই তো অল্প কয়েকটা দিন কাটল দুর্গম হিমালয়ের একটি অংশে। তাতেই যেন চেতনার শুরু হয়েছে আশ্চর্য এক প্রতিক্রিয়া। অনায়াসে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে পারছে কণাদ। স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে নিজের ত্রুটি। শুধু তাই বা কেন? সেই ত্রুটি সংশোধন করার জোরও পাচ্ছে মনে। লোক-নিন্দা, লজ্জা, অপযশ, কিছুকেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বলে মনে হচ্ছে না। সুবিশাল সমুন্নত ওই পাহাড়ের চূড়া, গভীর অরণ্য, উপলাকীর্ণ পাতাল সোতস্বিনী পাহাড়ী নদী, এদের মতই নিজের স্বাভাবিক সত্তার জোরটা অনুভব করছে ভেতরে।

সুবর্ণ সুযোগ ১,০০,০০ টাকা

কোন প্রবেশ মূল্য নেই এবং অন্যান আকর্ষণীয় পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার

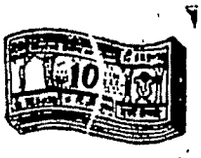

নগদ ১০০০৲

দ্বিতীয় পুরস্কার

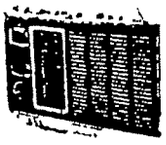

অল ওয়ার্ল্ড চার ব্যান্ডের
ট্রানসিস্টর
মূল্য ২৬০৲

তৃতীয় পুরস্কার

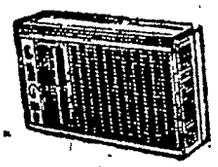

অল ইণ্ডিয়া ট্রানসিস্টর
মূল্য ১৮৫৲

প্রথম ড্র
১০ই জুলাই

দ্বিতীয় ড্র
২০শে জুলাই

খালি জায়গাগুলি উপযুক্ত শব্দ দিয়ে পুরন করুন

(১) ভারতবর্ষের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে .....
ডঃ রাধাকৃষ্ণন
ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
ডঃ জাকির হোসেন

(২) "জয় জোয়ান জয় কৃষান"—এই শ্লোগান প্রথম কে প্রচলিত করেন....
ইন্দিরা গান্ধী
লালবাহাদুর শাস্ত্রী
জবাহরলাল নেহরু

(৩) ১৯৭৭ সালে কোন দুর্ঘটনাটি সবচাইতে মর্মান্তিক ....
রেল অ্যাকসিডেন্ট
কংগ্রেসের পরাজয়
ঝড়-তুফান

(৪) জনতা পার্টির কোন নেতা সবচাইত বিখ্যাত এবং জনপ্রিয়.....
চন্দ্রশেখর
রাজনারায়ণ
অটলবিহারী বাজপেয়ী

(৫) ১৯৭৭ সালে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি .....
জনতা পার্টির জয়
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে মিঃ কার্টারের নির্বাচন
ডি আই আর-এর অবসান

পনেরো দিনের ভেতর হিন্দী অথবা ইংরাজীতে, নিজের নাম ঠিকানা লেখা খামে পাঠান।

নিয়মাবলী :-

(১) প্রতি পরিবার পিছু মাত্র একটি সমাধান গৃহীত হবে

(২) অর্ধমূল্যে উপহারসমূহ দেওয়া হবে

(৩) এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের সভ্যদের ভেতর প্রগতির প্রসার

(৪) উদ্যোক্তাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে

(৫) আইন ঘটিত বিষয়ে দিল্লী কোর্টের একতিয়ারাধীন

(৬) বিজয়ীদের পুরস্কার সংক্রান্ত ডাক, প্যাকিং এবং লাইসেন্সের খরচ বহন করতে হবে।

আপনার প্রবেশপত্র এই ঠিকানায় পাঠাবেন :-

OXFORD INDIA(O-4)
GANDHI NAGAR DELHI-110031

দীপুর হাত থেকে ফুল নিয়ে দেখছিল অনন্ত, কিন্তু সে দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা ছিল না। মন তার ডুবে গিয়েছিল নিজের চিন্তায়। হেসে দীপু বলল, দাদা কি ফুল দেখেই মূর্ছা যাচ্ছেন? বৌদির হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আর স্বস্তি নেই। কি বলেন?

দীপুর কথায় চোয়াল শক্ত হয়ে গেল অনন্তর। সত্যিই বুঝি এই ছেলেটি অন্তর্যামী। এখনকার এই নিভৃত সুষমা, এখনকার শান্তির ফুলটি সে তুলে দিতে চায় প্রিয়তমা লিলিকে। কেন একথা বার বার মনের দরজায় ঘা দিয়ে যায়? একদা ভালবেসেছিল যাকে, জীবন সংগ্রামের নিষ্ঠুর আবর্তে সে যদি তলিয়ে যেতে থাকে, তবে সে রাগ করে আরও ঠেলে দেবে তাকে ঘূর্ণিপাকে? তুলে আনবার চেষ্টা করবে না? একবার চেষ্টা করে দেখবে না, অসুস্থ অভ্যাস কাটিয়ে পুরোনো দিনের অমলিন সত্তাটুকুকে ফিরে পাওয়া যায় কি না?

হাসিমুখ তুলে সে বলল, এখান থেকে ফুল নিয়ে গিয়ে দেওয়ার চেয়ে এখানে ফুলের জন্মে নিয়ে আসব ভাবছি। আপনি কি বলেন?

আমরা আগেই সে কথা ভেবেছি রায়দা। আপনার ব্যাপারটা সবাই আমরা টের পেয়ে গেছি।

এ কথায় নিমেষে রক্তহীন হয়ে গেল অনন্তর মুখ। তার পরিচয় কি জানতে পেরে গেছে ওরা?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দীপু বলল, লজ্জা পাবার কিছু নেই দাদা। আমাদের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। যখনি আপনি লোকপাল যেতে চাইলেন না, তখনি বুঝেছি, বৌদিকে সঙ্গে না এনে খুব অন্যমনস্কতা হচ্ছে আপনার। আপনি ঘাবড়াবেন না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। এ বছরে না হয় আসছে বছরে আসবেন।

এ বছরে আর আসা যাবে না বলছেন?

যাবে না কেন, খুব যায়। ধরুন কলকাতা থেকে সেপ্টেম্বরের ন-দশ তারিখে বেরুলে এখানে এসে পৌঁছুবেন পনের তারিখে। ফুল তখন থাকবে না। তবে লোকপাল গিয়ে আপনারা সত্যিই আনন্দ পাবেন। শের সিং নিয়ে আসছে দেখবেন। বেটার গায়ের কম্বলটা দিয়ে বেঁধে আনছে এক ঝুড়ি ব্রহ্মকমল। কি ফুল ফুটে আছে চারদিকে। সমস্ত পাহাড় যেন হাসছে।

কল্পনা করতে চেষ্টা করল অনন্ত, সপ্তশৃঙ্গ নামক সাতটি পাহাড়ে ঘেরা প্রাকৃতিক হ্রদ। তার চারপাশে শিলায় শিলায় ফুটে আছে ব্রহ্মকমল। মেঘের ছায়া, পাহাড়ের ছায়া প্রতিবিম্বিত হচ্ছে হ্রদের জলে। সংযত করল সে নিজেকে। না কল্পনা করবে না কিছুতে। গিয়ে দেখে আসবে। এবং একা নয়। সত্যিই সে লিলিকে নিয়ে যাবে ওখানে। কলকাতায় গিয়ে ছুটি একসটেণ্ড করিয়ে নেবে। তারপর অনুপম রায়ের ঝামেলাটা মিটিয়ে আর একটি মুহূর্ত থাকবে না শহর কলকাতায় কয়েদখানায়। এখানে নিয়ে আসবে লিলিকে। তারপর নিয়ে যাবে বদরীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, আরও যেখানে যেখানে যাওয়া সম্ভব। দু-টি মাস হিমালয়ে ঘুরে ঘুরে সম্পূর্ণভাবে ঘষে তুলে ফেলবে মনের ওপরে গাঢ় হয়ে লেগে থাকা শহুরে চটক। নতুন মানুষ হয়ে ফিরবে লোকালয়ে। তারপর আবার যে মুহূর্তে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে গণ্ডিবদ্ধ জীবন, তখনই ছুটে পালিয়ে আসবে মহান হিমালয়ের কোলে। ফিরে পাবে অখণ্ড শান্তি।

দীপু একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, গুরুদুয়ারা থেকে কেউ খোঁজ করতে আসেনি, না?

মনে পড়ে গেল অনন্তর। রোশনের কথা জানাল দীপুকে। শুনে আশ্বস্ত হল দীপু। বলল, ওরা আসুক। একটু চা-টা খাওয়া হোক। তারপর গিয়ে দেখা করে আসা যাবে।

এক এক করে ফিরে এল সকলে। শের সিং বারান্দায় এসে ডাঁই করে রাখল ব্রহ্মকমল। দীপু তার কম্বলটা বাইরে নিয়ে গিয়ে ভাল করে ঝেড়ে আনল। বলল, এর কেশরগুলো বিষাক্ত। গায়ে লাগলে দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠবে। গোপুদার হাতটা দেখুন না। দেখাও তো গোপুদা।

গোপুর কব্জির ওপর থেকে কনুই পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে। হাসছিল সে। বলল, প্রথমে খুব কুটকুট করছিল। এখন আর সে রকম করছে না। কানু একটু ভেটল দিয়ে মুছিয়ে দাও না ভাই।

চা-টা খেয়ে দীপু বলল, ধরেন, আমি একটু ঘুরে আসছি গুরুদুয়ারা থেকে।

পানু মুঠো করা হাত মুখের কাছে এনে ফুঁ দিল। আশু বলল, আজ ফিরবি তো?

দীপু ফিরে বলল, না রে শালা। ওখানেই থাকব আজ।

অনন্ত বলল, চলুন, আমিও একটু যাই আপনার সঙ্গে। বেড়িয়ে আসি একটু।

কানু বলল, দাদা, আপনি তো রাখঢাক অভ্যস্ত ব্যক্তি। কেন মিছিমিছি স্পয়েল স্পোর্ট হতে যাচ্ছেন।

অনন্ত বলল, ভয় নেই, আমি সুগম সিং-এর দোকান পর্যন্ত যাব।

আসলে অনন্ত দীপুকে একটু বুঝতে চাইছিল। দীপু আপত্তি করবে কিনা সে কথা না ভেবেই তাই বেরিয়ে এল ওর সঙ্গে। বাংলো ছাড়িয়েই প্রথম কথা তুলল সে: রোশনকে আপনার খুব ভাল লেগে গেছে, না?

হাসল দীপু। বলল, আপনারা যা সন্দেহ করেছেন, আমি তা বুঝেছি। তবে ব্যাপারটা তা নয়। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওদের বলিনি। ওরা হয়তো বিশ্বাস করবে না। কিংবা ঠিক বুঝবে না ওরা। আপনার বয়েস হয়েছে। মনে হয় আপনি বুঝবেন।

রোশন সত্যিই ভাল মেয়ে। মানে, সহজ সরল সাধারণ বলতে যা বোঝায়, তাই। ওর বাবা মেয়ের বিয়ের ঠিক করছেন। এদিকে রোশন একটি ছেলেকে ভালবাসে। ওদেরই মত শিখ সেই ছেলেটি। নাম কিরণ সিং। বর্তমানে থাকে কলকাতায়। খুব ছোটবেলা থেকে ওদের আলাপ। ছেলেটি লেখাপড়ায় বিশেষ ভাল না। বার তিনেক পরীক্ষা দিয়েও স্কুল ফাইনাল পাশ করতে পারেনি। শেষে চলে গেছে কলকাতায়। কিরণ সিং-এর মামার বাস আছে পঁয়তাল্লিশ নম্বর রুটে। গ্যারেজ ডবানীপুরে। বছর তিনেক হল মামার কাছে গেছে কিরণ। সেখানে প্রথমে কণ্ডাকটর, পরে ড্রাইভার, তারপর এখন একটা বাসের মালিক হয়েছে। এখন তার সঙ্গে বিয়ে দিতে রোশনের মা-বাবার বিশেষ আপত্তি নেই। তবে ইদানিং প্রায় বছর দেড়েক হল, চিঠিপত্র খুব কম দেয় কিরণ। বলে যে লেখাপড়া তার আসে না। কিন্তু রোশনের ভয় হচ্ছে, কিরণ হয়তো তাকে ভুলে গেছে। হয়তো অন্য মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছে। তাই আমাকে অনুরোধ করেছে, যেন কিরণের সঙ্গে দেখা করি আমি। সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে বলি। বেশিদিন মা-বাবাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে রাখতে চায় না রোশন। যদি সত্যিই কিরণ ওকে ভুলে গিয়ে থাকে, আর কোন আকর্ষণ অনুভব না করে রোশনের জন্যে, তবে পাঞ্জাবী মেয়ে রোশন তার দয়া ভিক্ষা করতে যাবে না। মা-বাবার পছন্দমত ছেলেকেই বিয়ে করবে। তার আগে শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখতে চায়, এতদিনের মনের মানুষকে নিজের করে পাওয়া যায় কিনা।

(ক্রমশ)

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী
বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁতা ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং
সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক
শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম
২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

—কি বিচ্ছিরি। মিষ্টির মুখ আগ্নেয় লাল। ফ্রাইয়ের শেষের সামান্যটুকু ডিশে ফেলে রুমালে হাত মুছে চায়ের পটসুদ্ধ ট্রেটা কাছে টেনে নিল।

বাপীর আগেই দেওয়া হাত-মোছা শেষ: টেবিল থেকে মিষ্টির মোটা বইটা হাতে তুলে নিল। খুলে দেখল, ইংরেজি ইতিহাস বই। আর একটু কাছে তুলে সন্তর্পণে নিঃশ্বাস নিল। প্রত্যাশিত একটু সুবাস বইটার মধ্যেও ছড়িয়ে থাকতে পারে।

বইটা আবার যথাস্থানে রেখে জিগেস করল, হিস্ট্রি অনার্স পড়ছ?

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে মিষ্টি মাথা নেড়ে সায় দিল।

—থার্ড ইয়ার তো?

—তুমি জানলে কি করে?

—আমার হিসেব আছে। ম্যাট্রিকে তুমি ইতিহাস আর সংস্কৃতে লেটার পেয়েছিলে, আই-এতে শুধু ইতিহাসে। হিংসেয় আমার বুক চড়চড় করেছিল। এখন আনন্দ হচ্ছে।

মিষ্টির দুচোখ এবার যথার্থ বিস্ফারিত।

খুশি মেজাজে রহস্যটা এবারে নিজেই ফাঁস করল বাপী।— তোমার পাশের দু বছরের দুটো গার্বদা গেজেট আমাকে পড়তে হয়েছে—কলকাতার সব কটা মালিকা নন্দীর থেকে ঠিক তোমাকে বেছে নিয়েছি।

এই ছেলের অসাধ্য কি, মিষ্টি যেন নতুন করে আবার তাই দেখছে। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল। নিজের পেয়ালা কাছে টেনে নিল। এখন গম্ভীর গম্ভীর। কেন বাপী আঁচ করতে পারে। আজও ও কত আগ্রহ আর কত কৌতূহল নিয়ে বসে আছে এই মুহূর্তে সেটা বড় বেশি স্পষ্ট।

—গেজেট পড়ে তোমার হিংসে হত কেন? নিজে ওদিক মাড়াওনি?

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে বাপীর নিজেরও বলার তাগিদ। জানানোর তাগিদ, ছেলে-খেলার মতো প্রবৃত্তিসর্বস্ব হয়েই গত আটটা বছর কাটিয়ে দেয়নি। নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির বড়াই কখনো করেনি, আজও করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু এই একজনেরই যেন ওর সব-টুকু জানা দরকার, চেনা দরকার, বোঝা দরকার।

তাই বরাত জোরে নিজের ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করার কথাটা এসেই গেল। পাশের পরে ক্লাসের ছোট কেরানির চাকরি না নেওয়ার জন্য বাবার সঙ্গে মন কষাকষি আর বাড়ি ছেড়ে কলকাতাই পালানোর কথাও। তারপর চার-চারটে বছর টিউশনের জোরে আর কপাল জোরে বি এস সি আর ডিস্টিংশনে বি এস সি উতরে যাওয়ার বৃত্তান্ত।

হালকা চালেই বলেছে। প্রাণান্তকর অনিশ্চয়তা বা অনটনের দিকটাও ফাঁপিয়ে তোলেনি। মিষ্টির অপলক দু চোখ ওর মুখের ওপর। কতটুকু বোঝার বুঝেছে হয়তো।

—তারপর কলকাতায় কি, চাকরি না এম এস-সি?

বাপী হাসতে লাগল।— চাকরি। এখানকার এক বন্ধুর সাহায্যে একটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি যোগাড় করে চলে এসেছিলাম। দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল সেটাও গেছে—

পরের প্রশ্নটা যাতে করে সেই আশঙ্কা নিয়েই বাপী ওরকম হাসছিল।

—চাকরি গেল কেন?

—যুদ্ধের আপিসের টেম্পোরারি চাকরি...তবে আমার গেল অন্য কারণে। হাসিটুকু এখন শুধু চোখে লেগে আছে বাপীর।— সেখানকার বড়বাবুর এক মাত্র মেয়েকে বিয়ে করে গলায় ঝোলাতে রাজি হলে চাকরিতে প্রমোশন হত আর তাদের বাড়িটাও দখলে আসত। রাজি হলাম না বলে সেই মেয়ে যেমন মন-মরা তার বাপের তেমনি রাগ। এই দুইয়ের থাকুনিতে চাকরি খুইয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলাম।

যেভাবে বলল, মিষ্টিও হেসে ফেলার কথা। কিন্তু মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। শোনার পর চোখে মনোযোগ।

পায়ে পায়ে বড় ময়দানের দিকে আসছে দুজনে। ময়দানের অন্য প্রান্তে সেই সভা। গান্ধী প্রয়াণের শোকসভা। আট-চল্লিশের ফেব্রুয়ারির দশ কি এগারো তারিখ এটা। এরই মধ্যে বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। দুজনের কারো সঙ্গেই গরম কিছু নেই। কিন্তু বাপী অন্তত ঠাণ্ডা-গরম কিছুই টের পাচ্ছে না।

এবারে সামনের রাস্তার দিকে এসে মিষ্টি দাঁড়িয়ে গেল। স্বাভাবিক সুরেই বলল, আর দেরি করলে মায়ের বকুনি খেতে হবে।

বাপীও মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ যাবত কেন যেন চিনচিন করছে ভিতরটা। সেটা আরো বাড়ল।— আবার কবে দেখা হবে?

—অনার্স ক্লাস তো বেশি কামাই করা চলে না, ওদিকে ক্লাস শেষ হবার আগেই দাদুর গাড়ি এসে হাজির হয়—

—আমি জিজ্ঞেস করছি আবার কবে দেখা হবে?

মিষ্টির দু চোখ এবারে ওর মুখের

ওপর থমকে রইল।— তুমি থাকো কোথায়?

শিবায় রক্তের তাপ বাড়ছে বাপীর। গড়গড় করে বলে গেল, ভবানীপুরের টালি কোয়ার্টারস-এ। আসলে সেটা একটা টালির বস্তি। পঁচিশ ঘর বাসিন্দা থাকে। চাকরি যাবার পর সে অফিসের পিওন রতন বণিক আর তার বউ কমলা বণিক সেখানে তাদের একটা খুপরি ঘরে আমাকে আদর করে রেখেছে।....শুনে আরো ঘাবড়ে গেলে বোধহয়?

হকচকিয়ে গেল যে তাতে কোনো ভুল নেই। বাপীর দু চোখ তার মুখের ওপর এঁটে বসল আরো। — শোনো মিষ্টি, বেথানিগিরির চাকরির আশায় আমি কলকাতায় ছুটে আসিনি—এসেছি একদিন না একদিন তোমার দেখা পাব বলে। আজই আমি খুব ভালো করে জেনেছি, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হওয়াটা যেমন আমার অদৃষ্ট নয়, রতন বণিকের বস্তিতে থাকাটাও তেমনি আর বেশি দিনের সত্যি নয়। সব বদলাবে, একেবারে অন্য রকম হয়ে যাবে—তুমি চাইলেই হবে।

মিষ্টি শুনছে। চেয়েও আছে। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি ফোটানোর চেষ্টা।— ভালো কথা তো আমি চাইব না কেন..

—তাহলে কবে দেখা হবে, কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ি যাব?

মিষ্টি যেন নিজের সঙ্গেই যুঝছে।— পাড়ার সেই ছেলের দঙ্গল আছে না? বাড়িতে মা আছে না? মায়ের ভাবনা তোমার। যাব?

মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকের আবাসের হাসিটুকু মিলিয়ে যেতে লাগল। আয়ত কালো দুচোখ বাপীর মুখের ওপর স্থির হয়ে বসতে লাগল। দেখছে। দেখছেই। অনড়, অপলক।

—দেখা করতেই হবে?

—দেখা করতেই হবে।

—তাহলে এসো।... ঘর কিন্তু নয়।

—কোথায়?

—লেক চেনো?

ঘাথা নাড়ল। চেনে।

একটা নিশানা বলে দিল।— কাল বিকেল সাড়ে চারটেয় এসো। আমি বাসে চলে যাচ্ছি, সঙ্গে আসার দরকার নেই।

উল্টো দিক থেকে বাস আসছে একটা। হনহন করে রাস্তা পার হয়ে গেল। বাস এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে উঠে পড়ল।

বাসটা ছেড়ে যাবার পরেও বাপী নিশ্চল দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণের একটা দম-বন্ধ নিঃশ্বাস আস্তে আস্তে মুক্তি পেয়ে বাঁচছে।

রাতের খাবার কে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছল বাপী জানে না। সকালে আজও চা-বুটি নিয়ে রতন বণিক ঢুকল। কমলা নয়। অর্থাৎ কমলা বণিকের রাগ হোক বা আর কিছু হোক এই দুদিনেও সেটা তেমনি আছে।

সে না আসার গতকালের থেকে আজ আরো বেশি স্বস্তি।... কমলা বণিকের সামনে সেদিনের সেই হিংস্র লোলুপ মুহূর্তের ছায়াসুদ্ধ মুছে দিতে পারলে বাপী তবফদারের আত্মশুদ্ধি হত যেন। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও কমলার পরের আচরণ ভোলেনি। অন্যের এই দিন বাপী সেই স্মৃতি থেকেও নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে চায়।

রতন বলল, আজ আবার একটু ফ্যাসান হয়েছে বিপুলবাবু, নাইট ডিউটি পড়েছে। ওই দেমাকীকে বুঝিয়ে বললাম আজকের রাতে অন্তত আপনার খাবারটা যেন দিয়ে যায়। কিন্তু বলল না দেবে নিশ্চয়, রাগ করুক আর যাই করুক আপনার ওপর দরদ তো একটু আছেই—

বাপীর মুখে গরম চায়ের ছেঁকা লেগে গেল। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, না-না, তার কিছু দরকার নেই, রাতে আমি খেয়ে আসব।

—তা কি হয়!

বাপী সত্যি বিরক্ত।— কথা শোনো, রাতে আমার এক জায়গায় খাবার কথা আছে, আমি নিজেই তোমাকে বলতাম—ওকে বারণ করে দাও আজ খাবার বাখার দরকার নেই।

—তাই বলুন রতন নিশ্চিন্ত, আমি ভাবলাম আপনিও বুঝি আমার রাগটায় করলেন।

বাপী মিথ্যে বলেনি খুব। সকালে ঘুম ভাঙতেই ভেবে রেখেছে বিকেলের কথাবার্তার পর সন্ধ্যায় মিষ্টিকে কোনো ভালো জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাতের খাবার সারবে। মিষ্টির কোনো ওজর আপত্তি শুনবে না।

বেলা বারোটা নাগাদ একেবারে তৈরী হয়ে বেরুলো। আগে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকা তুলতে হবে। এ মাসের খরচটা হিসেবের মধ্যে থাকবে না। সঙ্গে কিছু বেশি থাকা ভালো। তারপর দুপুরে কোথাও না হোক কিছু খেয়ে নেওয়া। তারপরের সময়টুকু কি করে কাটাবে সে দেখা যাবে।

গাড়ির বাইরে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ওষুধের দাওয়ার সামনে কাউন্টার পাশে ঠেস দিয়ে কমলা দাঁড়িয়ে। একে ঝাঁক খোলা শাড়ি চুল পিঠে ছড়ানো। টান কালিন এখনো।

ওকে দেখে একটুও নড়ল না। চোখ বোঁকিয়ে তাকালো।

বাপী তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে উঠোনে নামল। তারপরেই সহজ হওয়ার তাড়না

প্রকাশিত হল বহু আকাঙ্ক্ষিত তমসা-গাড়োয়ালের এক রোমাঞ্চকর জীবনবেদ

বৈতালিক-রচিত

রূপবতী তমসা ৭

...**বৈতালিক** বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একটি পরিচিত নাম। যমুনোত্রী হিমবাহ, বন্দরপুঁচ্ছ ও স্বর্গারোহিণী গিরিশৃঙ্গ নিঃসৃত অমৃতধারার সম্মিলিত নাম তমসা। গাড়োয়ালের এক উপনদী। এই তমসার তীরে তীরে পদযাত্রা শেষে লেখক এই গ্রন্থে পাঠকদের কাছে তমসা উপত্যকার সরল সুন্দর মানুষ এবং বিচিত্র সমাজব্যবস্থার রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তমসার তীরে এখনও বেঁচে আছে মহাভারতীয় সমাজব্যবস্থা, বেঁচে আছে সত্যবতী, কুন্তী, দ্রৌপদী অনুপ্রাণিত বহুপতিপ্রথা; বেঁচে আছেন কর্ণ, দুর্যোধন —শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে। বহু চিত্রসম্বলিত এবং শচীন বিশ্বাসের মনোরম প্রচ্ছদ শোভিত

পঞ্চকেদার ভ্রমণ করতে হলে একমাত্র তথ্যবহুল সচিত্র সরস রচনা

বৈতালিকের

হিমগিরি তীর্থপথে ৭

বৈতালিকের দুরন্ত প্রেমের কাহিনী

বর্ণালী বালুচরে ৭

জ্যোতি প্রকাশন : ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলি-৯

একটু। না এগিয়ে কমলার দিকে ফিরল।
—রাতে খাবার রান্নার দরকার নেই রতন বলেছে তো?

কমলা জবাব দিল না। মাথাও নাড়ল না। সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। সেই রকমই চেয়ে রইল।

এবারে বাপীর দ্রুত প্রস্থান। ওই চাউনি দিয়েই কমলা যেন সারা গায়ে জল-বিছুটি ছড়িয়ে দিল খানিকটা। আর বলতে চাইল, বড় ভালো মুখ করেই থাকো, তোমার ভেতর দেখা চেনা আর বোঝা আমার হয়ে গেছে।

বাইরে এসে বাপী সেই দিনটার জন্য নিজেকেই চাবকাতে চাইল আর এক প্রস্থ।

অনেক ধৈর্য আর অনেক প্রতীক্ষার সেই বিকেল। ঘড়িতে চারটা পঁচিশ। দূরে দাঁড়িয়ে বাপী দেখল যেখানে থাকার কথা, মন্থর পায়ে মিষ্টি সেদিকে চলেছে। বাপী আরো বিশ মিনিট আগে থেকে একটু আড়াল নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

দু'চোখে খুশি উপচে উঠল। ডাকল না। নিজেও তক্ষুনি এগিয়ে এলো না। এই দেখাটুকু বাড়তি পাওনার মতো। আজ ফিকে বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। মিষ্টি তো জানেও না এই রংটা বাপীর কত পছন্দ।

মিষ্টি বেঞ্চিতে বসল না। পায়ে পায়ে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পিছন ফিরে একবার চারদিক দেখে নিয়ে আবার জল দেখতে লাগল।

বাপী এগিয়ে এলো। হাসিতে খুশিতে উদ্ভাসিত মুখ। মিষ্টি ঘুরে দাঁড়াল। তার ঠোঁটে বা চোখে হাসির ছিটে-ফোঁটাও নেই। কাল বাসে ওঠার আগে যেমন দেখেছিল তেমনি চাউনি। তারপর সামনের রাস্তাটায় দৃষ্টি ফেরালো একবার।

বাপী অবাক একটু।—কি?

মিষ্টি জবাব দিল না। তেমনি চেয়ে রইল। পরক্ষণে দু'চোখ আবার ওই রাস্তার দিকে। কি ব্যাপার ভেবে না পেয়ে বাপীও সেদিকে ঘাড় ফেরাতেই সমস্ত শরীরের প্রচণ্ড ঝাঁকুনি একটা। মাথার মধ্যিখানে আচমকা একটা মুগুরের ঘা পড়েছে যেন।

.... হনহন করে এদিকে আসছে একজন। এসেই গেছে। চেনা মুখ। পরনে ট্রাউজার আর সিল্কের শার্ট। ফর্সা রং। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মিষ্টিদের উল্টো দিকের বাড়ির দোতলার সেই একজন। পাড়ার ছেলেদের অসিতদা।

বিমূঢ় মুখে মিষ্টির দিকে ফিরল বাপী। পরমুহূর্তে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মাথার দিকে ধাওয়া করল। মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকে যেন একটু হাসির আভাস।

সোনালি চশমা হাজির। —এই যে খুকুদার, মালবিকার কাছে তোমার ছেলে-বেলার কিছু কথা আর কালকের অ্যাড-ভেঞ্চারের কথা শুনলাম। সেদিন গলা ধাক্কা খেয়েও শিক্ষা হল না, আজ যে তারা আরো কপাল মন্দ।

মুখের কথা শেষ হবার আগেই কোথা থেকে আরো তিনচারটে ছেলে ছুটে এলো। পাড়ার সেই ছেলেরাই। এসেই একজন জামার বুকের কাছটা মুঠো করে ধরল।

—এই যে চাঁদ, আজ তোমাকে কোন্ বাবা রক্ষা করবে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠল, না অসিতদা, আজ আর তোমার কোনো কথা শুনছি না—চাঁদুকে তুমি আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা ওদিকে নিয়ে গিয়ে যা বোঝাবার বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু পলকের মধ্যে যা ঘটে গেল তার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। যে ছেলেটা জামা চেপে ধরেছিল, মিষ্টির দু হাতের আচমকা ধাক্কায় তার হুমড়ি খেয়ে পড়ার দাখিল। মুখ টকটকে লাল, রুদ্ধ ক্ষিপ্ত গলার স্বর।—এ কি! এদের কে আসতে বলেছে? ও যাতে বুঝতে পারে সেইজন্য আমি তোমাকে আসতে বলেছিলাম—তুমি এদের এনেছ কেন?

সোনালি চশমার ভেবাচাকা মুখ। ছেলে তিনটেরও। ওই তিনজনের দিকে ঘুরে মিষ্টি আবার ফুঁসে উঠল, যাও বলছি এখান থেকে—চলে যাও!

ছেলে তিনটে গুটিগুটি সরে দাঁড়াল একটু। রমণীর মতিগতির যেন কূল-কিনারা পাচ্ছে না তারা।

কিন্তু বাপীর পৃথিবী উল্টে গেছে। মাথার সেই পুরনো আগুন দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে। বুকের পাতালের শূন্য গুহায় সেই আদিম জানোয়ারের দাপাদাপি। সবার আগে ওই মেয়ের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ার কুৎসিত অভিলাষ।

বাপীর গলার স্বর চড়া নয়, কিন্তু সকলের শোনার মতো। মিষ্টিকে বলল, আর বোঝানোর দরকার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি। .... তোমার এই বীরপুরুষেরা যদি মায়ের ছেলে হয়, একে একে আসতে বলো, এই চারজনকেই লেকের জল খাইয়ে আনতে পারি কিনা দাঁড়িয়ে দেখো।

—কি! সোনালি চশমা রুখে এলো।

চকিতে মিষ্টি এগিয়ে এসে বাধা দিল আবার— থাক্, হয়েছে। বাপীর দিকে ফিরল। গলার স্বর তপ্ত। —বুঝে থাকলে চলে যাও। আর এসো না।

রাত অনেক। সেদিনের পুলিশের লাঠির খোঁচা মনে ছিল। এত হৈ-চৈতেও পা দুটোকে অবশ করা গেল না। বাপী তরফদার ঘরের দিকে চলেছে এখন। মুখে আবার আট বছর আগের সেই বয়েসের স্বাদ। ভিতরের জানোয়ারটা অবিরাম ফুঁসছে। গজরাচ্ছে।

টালি এলাকার নিঝুম উঠোন পেরিয়ে নিঃশব্দে দাওয়ায় উঠে এলো। খুপরি ঘরের দরজা ঠেলতে ক্যাঁচ করে সেই পুরনো শব্দ একটু। আজ খাবার ঢাকা নেই, তাই ডিম-কলা হারিকেনও নেই। জামাটা খুলে বুট, ঘড়ি অন্ধকারে দড়ির ওপর ফেলল। তারপর শরীরটা খাটিয়ার ওপর আছড়ে পড়তে চাইল।

কিন্তু এ-কি! এ-কি! এ-কি!

মাথার বিদ্যুৎ তরঙ্গ। ভালো করে বোঝার আগেই অন্ধকারে ওই শয্যা থেকে দুটো হাত অমোঘ নিবিড় বেষ্টনে তাকে বুকের ওপর টেনে নিল। রমণীর হাত। রমণীর বুক। সর্বাঙ্গে তপ্ত স্পর্শের তড়িৎ প্রবাহ। শুকনো দুটো ঠোঁট, বিস্মৃতির উষ্ণ ঘন অধরের গ্রাসে।

(চলবে)

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

রেবা দাঁতে দাঁত ঘসে। বলে—ছোটোলোক।

তপতী আলোকে ডাকে। সে ফেরে না। ওদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

তপতী ফ্যাকাসে মুখে ঘরে ঢোকে।

রেবার হাবাবোবা ভাইটা এতোক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘরের বাইরে আসে। ভ্যাবলা চোখ। মুখ দিয়ে লাল পড়ছে। রেবা আর কিশোরকে এক পলক দেখে। তার পর রবের ওপর পেচ্ছাপ করে। প্যান্ট ভিজে যায়।

দুজনে চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকে। শুরু করার কথা হাতড়ায়। মাসি ডাকতে আসে। কিশোর বোঝে, মাসি খাবার বানিয়েছে। ও ওঠে। রেবাকেও যেতে হয়। মাসি ছাড়ে না।

মেসোমশাই বেরোবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। ঘরের মধ্যে কলাইয়ের থালা ভর্তি হালুয়া। ধোঁয়া উড়ছে। মাসি দুটো ডিশ বার করে।

ছাড়া ছাড়া কথা হচ্ছিলো। কিশোর বোঝাতে চাইছিলো নিজেকে। বহু বছর সে রেবাকে চেনে। ওরা পরস্পরের মন জানে। একদিন ওরা বিয়ে করবে, এটাও ঠিক। কিন্তু প্রেমের কথা কখনো হয়নি। দরকারও পড়েনি। প্রেম ছাড়াও জীবনে অনেক ব্যাপার আছে। সেখানে ওরা অনেক কাছাকাছি। সেখানে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম করার দরকার হয় না। আলো হাওয়ার মতো ভালোবাসা বুকের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। কিশোর তখন কলেজে ঢুকেছে। রেবারা স্কুলে পড়ে। এ বাড়ীতে এলেই কিশোর ওদের পড়াতো। শক্ত অঙ্ক তরতর করে করে দিতো। একটু, আটকাতো না। রেবার মায়ের কলেরার সময়ে প্রায় তিনচার রাত ও জেগে কাটালো। ভাইকে নিয়ে বাবার সঙ্গে কিশোরও কম দৌড়ঝাঁপ করে নি। ফিটের রোগ ধরলো বাবাকে। তখনও কিশোর ডাক্তার, বদ্যি কম করে নি। শুধু রেবাদের নয়, এখানে জানা-শোনা অনেকগুলো পরিবারের সঙ্গে ও জড়িয়ে আছে।

রেবার জীবনের সঙ্গে কিশোর যেন কিভাবে মিশে গেছে। এ শুধু নির্ভরতা নয়। আরো বড়ো কিছু। কিশোরকে দেখলে কি যেন একটা কাজের কথা মনে পড়ে। সেটা করা উচিত। করতে হবে।

বাবা একদিন বেহুঁশ। আলো, জ্যোৎস্না অজ্ঞান। দুজনকে দারুণ ঠেঙিয়েছে। ভাই আছে হাসপাতালে। সারানোর শেষ চেষ্টা। এদিকে অফিসে বাবাকে নিয়ে মহা গণ্ডগোল পাকিয়েছে। কি একটা হিসেবে গরমিল। বাবাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। গোটা বস্তি বোঝে যাতে মাথার ওপর মড় মড় করে। রেবার বুকে একটা বরফ জমে থাকে। গলে না। কিশোর এসেছিল। দুবোনের মুখে মাথায় জল ছড়া দিয়ে গরম দুধ খাইয়ে চাঙ্গা করেছিলো। বাবার নাকে ধরেছিলো স্মেলিং সল্টের শিশি। বস্তির মধ্যে ইলেকট্রিক নেই। নিকষ অন্ধকার। রেবাদের ঘরে হ্যারিকেন জ্বলেনি। কয়লার উনুনের ওপর ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে মা বসে আছে। কোনো বিকার নেই, যেন পাথরের মূর্তি। উনুনের দিকে আলোয় ঘরটা আধপোড়া চিতার মতো দেখায়। বাবার জ্ঞান ফিরেছিলো। শুকনো গামছায় বাবার ভিজে মাথা কিশোর মুছে দিলো। বাবা একবার দেখলো কিশোরকে। দু হাতে কিশোরের হাত বাবা চেপে ধরেছিলো। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলো। গলায় গোঙানি। অনেকক্ষণ কিশোর বসেছিলো। তপতী গিয়েছিলো ছেলে পড়াতে। অন্য বোনেরা ভয়ে টুঁ শব্দ করছে না।

রেবার চোখে জল নেই। শুষ্ক চোখ। বহুকাল জল মরে গেছে। কিশোর বলছিলো—ভয় পেও না। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষের অনেক কষ্ট।

বস্তির রাস্তায় কে যেন কাসে। মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। টুকরো চাঁদ। একঝাঁক তারা। রেবার চোখটা হঠাৎ কেমন সাঁত সাঁত করে। কান্না পাচ্ছে নাকি, ও ভাবে। ঠান্ডা বরফটা যেন গলছে। নিজের অজান্তেই ওর বুকের গভীর থেকে কে যেন বলে—মানুষের এতো কষ্ট কেন?

কিশোর তাকায়। অনেক কথা বলে। ভাগ্যটাগ্য আমি মানি না। মানুষকে সব-চেয়ে বেশী মানুষই কষ্ট দেয়। এর নাম সমাজ, শ্রেণী সমাজ। এটাই সভ্যতার ইতিহাস। যারা কষ্ট পায় তারা জাগবে। এক হবে। সে দিন আসছে।

অন্ধকারে কিশোরের চোখ ঝিকমিক করে। এটা ইতিহাসের নিয়ম। কিশোর বলে—তার সঙ্গে আমাদের শিক্ষক জুড়তে হবে। এ পৃথিবী বেশীদিন টিঁকবে না। না টেকাই উচিত। নতুন পৃথিবী চাই। তার জন্যে লড়তে হবে।

রেবার বুকের মধ্যে চাপবাঁধা বরফটা কখন যেন গলে গেছে। বস্তির বদ্ধ আকাশে কালবোশেখীর ঝড়। বুকটা ভরে আছে। বালিশে মুখ গুঁজে ওর ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিশোরকে ঘিরে একটা অদ্ভুত আলো নাচে। শৈশবের কথা মনে পড়ে। তখনও দেশ ছাড়েনি। সবে জ্ঞান হয়েছে। আবছা মনে আছে সে সব কথা। বাড়ীতে একজন মানুষ এসেছেন। লম্বা, চওড়া শরীর। টকটকে গায়ের রঙ। গেরুয়া পোষাক। একমুখ দাড়িগোঁফ। ঝাঁকড়া চুল। বাড়ীর সকলে তাঁকে ঘিরে বসে আছে। পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে। পেতলের সিংহাসনে নারায়ণ বিগ্রহ। কমন্ডলুতে গঙ্গা-জল। ধূপ, চন্দনের গন্ধে বাতাস ভারী। রেবা বসেছিল মায়ের কোলে। সেই মানুষটা শান্তির জল ছড়াচ্ছিলেন। পা ঢেকে সবাই বসেছিল। এই জন্য প্রণে

পড়লে মহাপাপ। তবু দু ফোঁটা ঠান্ডা জল রেবার পায়ের পাতায় পড়েছিলো। শীত শীত করছিলো। ভয় পেয়েছিলো। মাকে বলেনি।

পরিবারের মন্ত্রগুরু বলছিলেন—সুখের দিন আসবে। তাঁকে ভুলো না। সেই শক্তিমান তোমাদের মধ্যে আছেন। তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করো। আরো অনেক কথা তিনি বলেছিলেন। সব মনে নেই। কিশোরকে হঠাৎ সেই মানুষটার মতো লাগে। তাঁর চেয়েও আরো শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য।

কিশোর বলছিলো—কোনো ভগবান টগবান আমাদের কিছু দেবে না। নিজেদের হাতে নতুন দুনিয়া বানাতে হবে। রক্ত ঝরবে, হয়তো মরতেও হবে। কিন্তু হারবো না।

রেবার বুকের মধ্যে কি এক আবেগ দুরু দুরু করে। সামনে বসা রোগা, শ্যামলা মানুষটার জন্যে কেমন মায়া-জাগে। মাথা-ভর্তি অগোছালো চুল, পাতলা ঠোঁট, অথচ দুচোখে কি ধার, বুকের ভেতরে ছানা দেয়।

কিশোর বলে—এভাবে বেঁচে কি লাভ? কুকুরের মতো বাঁচার চেয়ে মানুষের মতো মরা ভালো। ইজ্জত চাই। খাওয়া পরা চাই। স্বাধীনতা চাই। পৃথিবীর কোথাও মানুষ এভাবে বাঁচে না, বাঁচবে না। পুরোনো সেই সব দিন ওর মাথায় ভীড় করে।

তারপর অনেকগুলো বছর ঘুরে গেছে। রেবা জীবনের অনেক কাছাকাছি এসেছে। পৃথিবীকে নতুনভাবে বুঝতে শিখেছে। স্কুলের পড়া শেষ হয় নি। অভাব, অনটনে অনেক কিছুই মাঝ পথে থেমে গেছে। রেবা কষ্ট পেয়েছে। ভেঙে পড়েনি। বাপ, মা, অদৃষ্টকে দোষ দেয় নি। শুধু বুঝতে চেয়েছে, কেন এমন হয়? কতোকাল এমন হবে? কিশোর বই আনতো। নানারকমের বই। মানুষ কেমন করে বড়ো হলো। ডারবাদ খন্ডন। মজুরি, মুনাফা, শ্রম, মার্কসবাদের অ আ ক খ। আগে এসব বই দেখলে মাথা ধরতো। কাঁটা উপন্যাস গোগ্রাসে পড়তো। কিন্তু মনটা কিভাবে যেন বদলে গেল ধীরে ধীরে। দমবন্ধ করে পড়তো এক একটা বই। কতো অজানা খবর। বুকের মধ্যে তুফান উঠতো। এক একটা বই যেন এক একটা নতুন চোখ। হতাশা, ভয় কেটে যায়। নিজেকে ভীষণ চালা, জীবন্ত লাগে। পৃথিবীটাকে সুন্দর মনে হয়। নারীদের ওপর লেখা লেনিনের বইটা পড়ে ও তিনদিন বন্ধ হয়েছিলো। এই প্রথম যেন ও নিজেকে পুরোপুরি দেখতে পেলো। এখন আর বাবা, মা, বোনেদের ওপর রাগ হয় না। নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্যে ক্ষোভ কম। এক অদ্ভুত মমতায় চুপ করে থাকে। পাশাপাশি এক বুক ঘেন্না জমে। দামী জামাকাপড়, লম্বা-চওড়া বাড়ী, গাড়ী, বিলাসিতা দেখলে বুকে আগুন জ্বলে। মুখ বিস্বাদ হয়। ল্যাংটো লোকের পাশে কেতাদুরস্ত পোষাকের

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা পুরস্কার লাভ করুন

প্রবেশ মূল্য নেই আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

উদাহরণ

মোট ২৪

৫	১০	৯
১২	৮	৪
৭	৬	১১

	১১	
	৯	
	৭	

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন। দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউন্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারান্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ২৭ .. খাড়াভাবে, সমানভাবে, কোণাকুণিভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ৩০ জুলাই, ১৯৭৮

আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

মার্শাল এণ্ড কোং (এম-৫)
গান্ধীনগর
দিল্লী ১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান

MARSHAL & Co (M-5)
Gandhi Nagar
DELHI-31

মানুষটাকে অশ্লীল লাগে। সমাজের সারা দেহে এই অশ্লীলতা, নোংরামির ঘা দেখে ও কষ্ট পায়।

হালুয়ার ডিসটা চেটে কিশোর ঝকঝকে করে দিলো। রেবা এক ফাঁকে কিছুটা হালুয়া দ্যুতিকে দিয়ে এসেছে। কিশোর তার নিজের এলাকার কথা বলছিলো। সেখানকার মানুষ, গাঁগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা। দীর্ঘ দিনের লড়াই। ভল্লা জমি, মিনিমাম ওয়েজ, বর্গাদারী আবো কতো কি। পার্টির সঙ্গে কিশোর বসবে। দ্যুতি গেলো যোগা-যোগ করতে।

কিশোরের সব কথা রেবা শুনতে পায় না। মাথার মধ্যে একটা গনগণে রাগ। আজ সকালে ভীষন রকম বেইজ্জতের হাত থেকে সে বেঁচেছে।

ঘরের মধ্যে একটা ছোটো কুপি জ্বলছে। বাইরে নিথর অন্ধকার। টুপটাপ শিশির পড়ার শব্দ। অজিতকে ঘিরে ওরা বসেছিল। এই ঘরটায় আগে মোতিদের গরু, ছাগল থাকতো। এখন খালি। বাড়ীর পেছনে জীবগুলো অনেক দিন আগে হাটে চালান হয়েছে। ঘরটার কোনো বস্তু নেই। চালের খড় পাতলা। মাটি লাগানো ছিটে বেড়ার দেওয়াল। ফুটো হয়েছে। হু হু ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছিলো।

শিবেন বললো—উঠোনে আগুন জ্বেলে বসলে আরাম হতো।

পাগল নাকি—রঞ্জন আপত্তি করে—গাঁয়ে এখন অনেক চোখ। হল্লা হয়ে যাবে। বাবলু চুপচাপ বসেছিলো। হাতঘড়ি দেখলো। রাত দশটা। বাড়ী ফেরার জন্যে ও দাঁড়ায়। রাতে কোনো কাজ আছে—ও জিজ্ঞেস করে।

না—রঞ্জন বলে।

দরজার ফাঁক ঠেলে বাবলু অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কথা ছিল সন্ধ্যের আগে মোতি রাজনগরে ফিরবে। ফেরা হয় না। বুধন আর লখাইকে দেখে ও বিপদের গন্ধ পেয়েছে। লখাই-এর কাপড়ে রক্তের ছাপ। সন্দেহ আরো ঘন হয়। কিন্তু পরে অজিত আসে। হিসেব মতো ওদের ছাড়া পাওয়ার সময় হয়েছে। দিনটা মোতি জানতো না। অজিতকে দেখে ও ভরসা পায়। কুসুম বসেছে লখাই-এর গা ঘেঁষে। মাঝে মাঝে লাজে নাড়ছে, মাটি শুঁকছে। মোতি সানকি ভর্তি মুড়ি আনে। সঙ্গে পিঁয়াজ। বুধন আর লখাইকে দেয়। বুধন এক মুঠো মুড়ি মুখে ঢোকায়। লখাই সাড়া করে না। বিকেল থেকেই মোতি দেখেছে লখাই কেমন গুম মেরে আছে। মাঝে মাঝে কাঁপছে। জ্বর হলে এমন কাঁপুনি হয়। মোতি কিন্তু জিজ্ঞেস করে নি। রঞ্জন আর শিবেন এসেছিল কিছু পরে। ওদের সামনে বুধনও মুখ খোলে নি। অজিতকে দেখে সকলে মহাখুশী। রঞ্জন বলে—ঝড়ের গতিতে কাজ এগোচ্ছে। ওপাড়ার সব ছেলে আমাদের সমর্থক। এবার আমরা বন্দুক দখলে নামবো।

পার্টির নতুন লাইন নিয়ে আলোচনা হয়। অজিত এসব শোনে নি। সব কিছু ওর পরিষ্কার হয় না। খতম অভিযান শুরু করতে হবে, রঞ্জন বলে—খতম মানে খুন নয়, শ্রেণী ঘৃণার প্রকাশ। খতম দিয়েই গেরিলা যুদ্ধের শুরু। গরীব কৃষকের স্কোয়াড খতমের লড়াই করবে। গরীব, কৃষক, ক্ষেতমজুর আর মধ্যকৃষকের মোর্চা বানাতে হবে।

কুসুম অন্ধকারে ঘুরে আসে। হাওয়ায় নাক উঁচু করে কি যেন শোঁকে।

এ গাঁয়েও শ্রেণীশত্রু আছে, রঞ্জন বলে—চৌকিদার দিবাকর খুড়ো।

মোতির শরীরটা শিউরে ওঠে। সাধুর মুখ মনে পড়ে। রঞ্জন ওকে দেখে। শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই মৃত্যু—ও যোগ করে। তদন্ত করে শত্রু মিত্র ঠিক হবে—শিবেন বলে।

কলকাতায় খতমের লড়াই শুরু হয়েছে—শিবেন বলে—শহর গ্রামে আর ফারাক নেই। ওদের চোখে কথায় নতুন আঁচ। অজিত বোঝার চেষ্টা করে।

কিছু পরে রঞ্জন আর শিবেন চলে যায়।

অজিত বিড়ি টানে। বুধনকে কাছে ডাকে। কি ব্যাপার জানতে চায়।

কুয়াশার মতো অন্ধকার। শুকনো পাতার সরসর শব্দ। লখাই মুড়ি খাচ্ছে না। ভদ্দরলোকের বাড়ীতে কোনো দিন সে ঢোকে নি। নিয়ম নেই। মাকিদের ছুঁলে ওরা চান করে। দাওয়ায় দাঁড়ালে গোবর ছড়া দেয়। তাদের ঘরে, তাদের থালায় খাওয়ার কথা ভেবে ওর বুক কাঁপে। তার ওপর সারা দিনের ধকলে ওর হাত পা পেটে সিঁধিয়ে গেছে। কুমরি তু খাড়া থাক। নিজের মনে ও বিড়বিড় করে। ওদের থালা থেকে অজিত এক মুঠো মুড়ি খায়।

বুধন খোঁচায় লখাইকে—তু বল।

লখাই ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকায়। তারপর বলতে শুরু করে।

সব কথা অজিত বুঝতে পারে না, বুধন ধরিয়ে দেয়। লখাই কখনো কাঁদে, হঠাৎ হাসে। চোখের সামনে দু হাত তুলে দেখে। বলে—আমি গরু করিচি।

মুখচোরা মানুষটা কি এক যন্ত্রণায় ক্যাপার মতো ছটফট করে। কাহিনী শেষ করে ও তাকায় অজিতের দিকে। জিজ্ঞেস করে—তুই বল তো আমি ঠিক করেচি কিনা? ভানের বংশ লিবংশ করেচি কিনা?

অজিত সায় দেয়—ঠিক করেছিস।

লখাই আস্তে আস্তে সহজ হয়ে ওঠে। মুড়ি খায়। অজিতের পাশে এসে বসে। এক মুঠো মুড়ি কুসুমের সামনে ধরে। সে লাজ নাড়ে—মুড়ি চিবোয়।

বুধন বলছে—তার ঠাকুর্দার দু পরসা দেনা দশ বছরে সাড়ে তেরো টাকা হয়েছে। মহাজন সদাশয় সাহা গত হপ্তায় ওর ঘরে চড়াও হয়। কিন্তু পায় নি। দরজার চৌকাঠ খুলে নিয়ে গেছে।

বুধনের হঠাৎ কান্না পায়। এই সদাশয় সাহা একবার তার বাবাকে তেঁতুল গাছে বেঁধে চাবকেছিল। রক্তে শরীর ভেসে যাচ্ছিল। তবু ছাড়ে নি। যেছঁশ শরীর সারারাত একভাবে গাছে বাঁধা ছিলো। সেই থেকেই রোগ, বিমার। ওর বাপ এখন গাঁয়ের মাঝিহারায়। অজিত এ ঘটনা জানে। কিশোরও শুনেছে। তবু সুযোগ পেলেই বুধন বলে। তার গলায় স্বর, চোখের রঙ বদলে যায়। প্রত্যেক বার অজিতের মনে হয়, নতুন কিছু শুনছে। বুধনের শরীর থেকে তখন গনগনে তাপ বেরোয়। রাত বাড়ে। বাইরে সাড়া শব্দ নেই। চারজনে চুপচাপ বসে থাকে। লখাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—তু সাচ কহ আমি ঝুমরিকে মিলবেক কিনা?

অজিত বলে— নিশ্চয়। নিশ্চয়।

কুপিটার তেল কমে আসে। বুধনের শিখার চারপাশে একটা বিরাট ছায়া কাঁপে। অন্ধকারে কে যেন ছুটে যায়। মোতি কান খাড়া করে শোনে—হয়তো দিবাকর কাকা থানায় যাচ্ছে হাজিরা দিতে। কুপির শিখা থেকে অজিত একটা বিড়ি ধরায়। বুধন দেওয়ালে ঠেক দিয়ে ঝিমোচ্ছে। লখাই ঢুলছে।

হাওয়া ঘুরছে। অনেক নতুন মুখ, নতুন মানুষ। জোরদার রাজনৈতিক প্রচার চাই। রাজনীতিই মূল কথা। বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হয় না। তত্ত্ব বুঝতে হবে। বোঝাতে হবে। অজিতের ওইখানে গোলমাল। বোঝাতে পারে না। ও ভাবে, কিশোর আসুক। লখাইকে বোঝাবে। লখাই তো বর্ণফাইটার, জন্ম থেকে যোদ্ধা। এখনো শরীরে রক্তের দাগ। কুপিটা নিভে যায়। মোতিকেও আর দেখা যায় না। ঘন প্রমাট অন্ধকার। বিড়ির আগুন হাতের মধ্যে ধিক ধিক করে।

তত্ত্ব নিয়ে এত্তার কচকচিতে আজকাল অজিতের আর রুচি নেই। অনেক তত্ত্ব হয়েছে। এবার একটু গা গতর নাড়াতে হবে। তত্ত্ব মানেই জোচ্চুরি, দালালি। সাধারণ কর্মী সংগঠক দরদীদের তত্ত্বের গোলক-ধাঁধায়, আটকে রেখে নেতা, মাতব্বররা বেইমানী করে। পঞ্চাশ বছরের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এ ঘটনা বার বার ঘটেছে। যেছনতী মানুষ, মজুর কিষান রক্ত দিয়েছে। পার্টির কর্মীরা জীবন দিয়েছে। বিশেষ কিছু হয় নি। শহীদ বেদী, ফুলের মালা, ভোট, ফাঁকা তর্জন-গর্জনে সব শেষ। তত্ত্ব মানেই বিপ্লব আটকাবার বড়যন্ত্র। প্রতিবিপ্লবী ধান্দা। কাঁধে বন্দুক নিয়ে ফয়সালা হবে। গণ-সংগঠন, গণ-আন্দোলন কম হয় নি। বিপ্লব কতদূর এগিয়েছে। ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক, কৃষক আন্দোলন থেকে কজন কম্যুনিস্ট বেরিয়েছে? কিছু নপুংসক বুদ্ধিজীবী, দালাল শ্রমিকনেতা, আর ছোট স্রোতদার তৈরী হয়েছে। তারাই কম্যুনিস্ট আন্দো-

জনের নেতা। অথচ নীচের তলায় হাজার হাজার সৎ বিপ্লবী কর্মী। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা দেশের নিকৃষ্ট লোকেদের নেতৃত্বে চলছে। ভাবলে কষ্ট হয়।

এখন নতুন পার্টির জন্ম হয়েছে। বিপ্লবী পার্টি। গরীব মানুষের সংগঠন। এবার ঝড় উঠবে। বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়। এবার তত্ত্ববাজরা জব্দ হবে। হাতে বন্দুক নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের ফায়সালা হবে। চুরুট ফোঁকা ইজিচেয়ারের বিপ্লবীদের খেল খতম। বিপ্লব অতো সোজা সরল ব্যাপার নয়। কফি ডুবিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়া নয়। ছবি আঁকা বা সুতোর নকসা তোলা নয়। বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ, শক্তি আর সাহসের কাজ। কালো অন্ধকার। পাথরের মতো ঠান্ডা। হাড়ের মধ্যে হিম ঢুকে যায়। অজিত ঘুমোতে পারে না। বুকের মধ্যে খুশীর ঝড়। জেলের ভেতর সে রোজ ঘুমিয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিন গুনেছে। বদলা নিতে হবে, বদলা চাই। সুযোগ এসেছে। পার্টির নতুন লাইন নিশ্চিহ্নে ভেতরের বরফ ভেঙেছে। হিসাব প্রথম আমরা হিংসা দিয়েই দেবো।

কিশোরের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিশোর খুব গভীরে যেতে পারে। ইতিহাস, রাজনীতির মূলে ওর নজর। বন্দুকের নল রাজনৈতিক শক্তির উৎস, এটা ও জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জোর দেয় রাজনীতির ওপর। রাজনীতিকে আগে রাখতে হবে। বিপ্লবের নেতা কে সৈন্যবাহিনী না পার্টি। সঠিক রাজনীতি আর পার্টি ছাড়া বন্দুক সন্ত্রাস আনে ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। কিশোর পুরোনো বন্ধু। কলেজ জীবনে পরিচয়। আর ছাড়াছাড়ি হয় নি। মাঝে দক্ষিণদেশে ভিড়েছিলো। অজিত সায় দেয় নি, কিন্তু বিচ্ছেদও হয় নি। অজিত ছিলো সংশোধন বাদ বিরোধী কমিটির সঙ্গে। কিন্তু, একসঙ্গে অনেক লড়াই ওরা লড়েছে। ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিছিলে পাশাপাশি হেঁটেছে। কিশোর যুক্তিবাদী, প্রখর বিচার-বোধ। উত্তেজিত হয় না, রাগে না। মতের অমিল হলে হাসে। আবার আলোচনা করে। লাফ ঝাঁপ দেয় না। মেপে পা ফেলে। কিন্তু যখন পা বাড়ায় তখন বোঝা যায় শক্ত, সমর্থ পদক্ষেপ।

কিশোরের সঙ্গে তার চরিত্রের অনেক তফাৎ অজিত জানে। যুক্তি, রাজনীতি সে মানে। কিন্তু সহজেই তেতে ওঠে। ফেটে পড়ে। বুকের মধ্যে একটা ক্ষুধার্ত বাঘ ফোঁস ফোঁস করে। তার দাপাদাপিতে ও বেসামাল হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতায় ভোগে।

তিনজন মানুষের ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ ওরা ঘুমোচ্ছে। বুধনকে এখানে দেখে অজিত খুশী। বুধন ওর প্রথম হাতেখড়ি। ভুল্লী ছেলে। মুখ দেখে বোঝা যায় না। বাটুবী করার কাজ নিয়ে এই এসাকায় আসতে প্রথম আসে। মোতি বুদ্ধি দিয়েছিলো। ঝাঁকা বোঝাই মনোহারী জিনিস। বিড়ি, সস্তা সিগারেট, দেশলাই, রঙীন ফিতে, চুলের কাঁটা, লাল নীল লজেন্স, বেজ-পাতি সিঁদুর। দেশগাঁয়ের ফিরিওয়ালা যা কিছু বেচে সবই ছিল ঝাঁকায়। মোতি নিজে ঘুরে সওদা করেছিল। বুদ্ধিটাও তার। কেউ জানবে না। সন্দেহ করবে না।

অজিত রাজী হয়েছিলো। কিশোরের সঙ্গে কথা বললো। কিশোর তখন দক্ষিণ দেশ ছেড়েছে। পার্টির সঙ্গে বসেছিলো। পার্টির নির্দেশ—এখনি শহর ছাড়ো। গ্রামে যাও। একটা গরীব গ্রাম ধরো। সেখানে কাজ করো। গাঁয়ের বাইরে যাবে না।

কিশোরও কলকাতা ছাড়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে। হাওয়ায় তখন একটাই স্লোগান—গাঁয়ে চলো। ভারতবর্ষ মানে একটা বিরাট গ্রাম। হাজার হাজার বছরের সামন্ত শোষণ, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা, সংস্কৃতিকে ভাঙতে হবে। শতকরা আশীজন ভারতীয় গ্রামে থাকে। তারাই ভারতীয় জনতন্ত্রের মূল অংশ। তাদের জাগাতে হবে। মনে মনে সকলেই তৈরী হচ্ছে। শহর ছাড়তে হবে। শহুরে কর্মীদের নিয়ে এখন হাসা-হাসি হয়। পার্টিতে তারা পাত্তা পায় না।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন

প্রতিবার খাওয়ার পর কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত করার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগ শুরু হয়।

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বছরের প্রমানিত হয়ে গেছে। জীবাণুমুক্ত নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস ও ঝকঝকে সাদা দাঁতের জন্যে সারা পৃথিবীতে লোকে সবচাইতে বেশি কেনে কোলগেট টুথপেস্ট।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা দিনরাত কাজ করে:

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়ের জীবাণু জমার দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ভেতরে গিয়ে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগজীবাণু দুইই দূর করে।

ফল কথা: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধের ভয় থাকে না, বরাবর হেসে বেড়িয়ে যান।

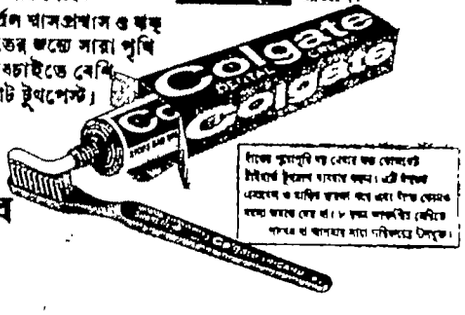

দাঁতের ডাক্তারই এরচেয়েও ভালোভাবে আপনার দাঁতের পরিচর্যা করতে পারেন

DC-GM 84

হীনমন্যতায় মুষড়ে থাকে। গ্রামে যাওয়ার কথা উঠলে তারা বিব্রত হয়। মুখ চুন করে থাকে। গ্রামের কর্মীরা শহরের কর্মীদের ফোপ্‌ঠাসা করলো।

তখনও গণ-সংগঠন, গণ-আন্দোলনের রাজনীতি পার্টি ছাড়ে নি। শ্রমিক-ছাত্ররা সংগঠন গড়ছে। মিছিল, সমাবেশ হচ্ছে। শ্লোগানের ভাষা বদলেছে। মিছিল, সমাবেশের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধের ভঙ্গী। মুখে মুখে প্রচার হয়। হঠাৎ ঝাঁক বেঁধে একটা মিছিল যেন আকাশ থেকে নেমে আসে। মিলিয়ে যায়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার শূন্যে পড়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্যান্ডারা কাহিল। সমাজতন্ত্রে পৌঁছোনোর নিরামিষ বিধবা লাইন মার খেয়েছে। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, এটা বোঝা গেছে। রেজিস্টার্ড বামপন্থী পার্টিগুলো দিশেহারা। ঘর সামলাবার জন্যে তার বিপ্লবীদের গাল পাড়ছে। পুলিশের কাজ করছে। পুলিশকে বলছে, গুলি করো। ওদের খতম করো। তোমাদের বন্দুকে কি নিরোধ লাগানো আছে?

হায়দারের মেসে সন্ধেবেলা কথা হচ্ছিলো। উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছিলো। রোগা, লম্বা চেহারা। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। স্কুলে পড়াতো। হপ্তাখানেক আগে চাকরি ছেড়েছে। এবার শহরের পাততাড়ি গোটাবে। আরো আগেই চলে যেতো। পারে নি। পেটে আলসার ছিল। গত মাসে সেটা অপারেশন হয়েছে। দিন-পনেরো হাসপাতালে ছিলো। এখন ফিট। সেলাইটা পুরো শুকোয়নি। তাতে কিছু যায় আসে না।

বিকেলে ওর বাবা এসেছিলো। পাকা চুল, পাকা দাড়ি একজন বৃদ্ধ মানুষ। শরীরে ডোরাকাটা লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। হাতে বেতের লাঠি। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। দাড়িতে হাত বোলাচ্ছিলো। ঘরভর্তি ছেলে দেখে ঘাবড়ে গেছে।

হায়দারকে নীচু গলায় কি যেন বললো। হায়দার ছিটকে সরে যায়। ওর হাত, পা সবসময়েই কাঁপে। এখনও কাঁপছে।

ওর বাবা ভয় পায়। হায়দার বলে—আমার অনেক কাজ। সময় নেই। তুমি বাড়ী যাও।

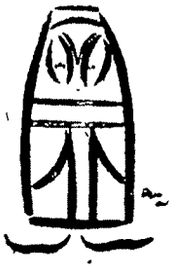

ওর বাবা ফ্যাকা চোখে ছেলেকে দেখে। চিনতে যেন কষ্ট হয়। ঘর বোঝাই বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া। বৃদ্ধ মানুষটির চোখ জ্বলে। হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বাড়ী আসছিস কবে—বাবা জিজ্ঞেস করে।

বলতে পারি না—হায়দার জানায়। ওর বাবা চলে যায়।

হায়দার সিগারেট ধরায়। তিনটে কাঠি নষ্ট হয়। জ্বলন্ত সিগারেট দু আঙুলে কাঁপে।

হায়দার বলছিলো, কলকাতা সন্ধের কথা। শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রীট, শিয়ালদা, হাজরা, বাসবিহারীর মোড়ে পিকেট বসাও। গেরিলা কায়দায় ট্রাম, বাসে আগুন দাও। গোটা শহর কোল্লাপস্ করবে।

কিশোর চুপচাপ শুনছিলো। অস্তিত্ব মনে মনে হায়দারের প্রস্তাবে একমত। শহরের ছাত্রযুবকদের এখন সোজাসুজি এ্যাকশনে যেতে হবে—হায়দার জানায়। কৃষক সংগ্রামের পরিপূরক লড়াই চাই। এটাই বাস্তব।

কিন্তু কলকাতা বন্ধ করে লাভ কি—কিশোর খোঁচা দেয়—ট্রাম পুড়িয়েই বা কি হবে।

হায়দার চটে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ত তন্ত্রকে ঘা দিতে হবে। কিভাবে সেটা হবে? গান গেয়ে? কবিতা সম্মেলন ডেকে? ভিয়েতনামে আমেরিকান বোমাবাজী কি নৃত্যনাট্য দেখিয়ে থামানো যাবে? ধোঁয়া আর নিঃশ্বাসে ঘরের হাওয়া গরম। শহরের কাজ নিয়ে পার্টি এখনো পরিষ্কার কিছু বলেনি। হায়দার পার্টির কাজের লোক। সেও জানে না।

কিন্তু লড়াইটা গাঁয়ে হবে। কৃষকের লড়াই—কিশোর জানায় শহরগুলো প্রতি-বিপ্লবের শক্ত ঘাঁটি। এখানে তাদের অনেক জোর। তবু, শহরে থাকতে হবে, কাজ করতে হবে আমাদের। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে হবে। এটাই লাইন।

তার মানে শহরে আমরা ঘুমোবো—হায়দার প্রান্তটা প্রশ্ন ছোঁড়ে। তা কেন? গণতান্ত্রিক সংগঠন, সংগ্রাম চলুক। গ্রামের লড়াইকে সাহায্য করার সংগঠন তৈরী হোক এখানে আত্মরক্ষার লড়াই আক্রমণের নয়।

প্রতিদিন এই নিয়ে আজকাল তর্ক হয়। জোরালো গলা, ঝাঁঝালো ভাষা। তর্ক শেষ হয় না। কিন্তু ধারধান কমে। মূল ভাবনায় সকলে কাছাকাছি হয়।

গ্রামে যাওয়ার ব্যাপারে পার্টি শুধু নির্দেশ দিয়েছে। যোগাযোগ নিজেদের করতে হবে। পার্টি গড়তে হবে। গ্রামের দরিদ্রতম মানুষের ঘরে থাকতে হবে। গতরে খেটে খেতে হবে। এর নাম পেশাদার বিপ্লবী। বিপ্লবের জন্য সর্বস্ব পণ করা মানুষ। কৃষকের ইস্যু ক্ষমতা দখল। জমির লড়াই নয়। মিনিমাম ওয়েজের দাবী নয়। একটা লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে অনেকে বাড়ী ছেড়েছে। আরো অনেকে তৈরী। অজিত কিছুদিন ধরে উশখুশ করছে। শুধু মন-সভা; মিছিল, বক্তৃতায় ক্লান্তি এসেছে। অথচ শরীর মন সবসময় গনগন করে।

ও হায়দারের ঘনিষ্ঠ। কিশোরেরও অনুরাগী। কিশোরের চিন্তা, মতামত খুব দামী।

কিশোরের ব্যাঙ্কে মোতির সঙ্গে ওর আলাপ। ব্যাঙ্কের ক্যান্টিনে উর্দিপরা মোতি টেবিলে চা দিতো। হরতকি বাগানের এক বস্তিতে থাকতো। মোতির সম্পর্কে পরে আরো শুনেছিল কিশোরের মুখে। বৌবাজারে এক ছানার দোকানে কাজ করতো মোতি। ভিজে ছানার পুঁটলির ওপর পিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নাচতো। এটাই ওর চাকরি। ছানার জল ঝরানো। ছানার জল ঠিকমতো না ঝরলে মালিক খিস্তি করতো। দেড় দু টাকা রোজ। ও তখন মাসে অর্ধেক দিন খেতে পায় না। রোগা শরীর। তাকত কম। ছানার জল ঝরাতে ওর কপালে ঘাম জমতো। পেটে ক্ষনমনে খিদে। আশপাশে সারি সারি মন্ডা, মিঠাই-এর দোকান। ওর মাথা ঘুরতো। মালিক একদিন কোথা থেকে একটা দেড়মণি মুষকো লোক ধরে আনলো। সে মোতিকে পিঁড়ি থেকে নামিয়ে দিলো। তারপর শুরু হলো তার নাচ। আধ ঘন্টায় একমণ ছানা সে শুকিয়ে দিলো। মোতি হাঁটাই হয়ে গেলো।

(চলবে)

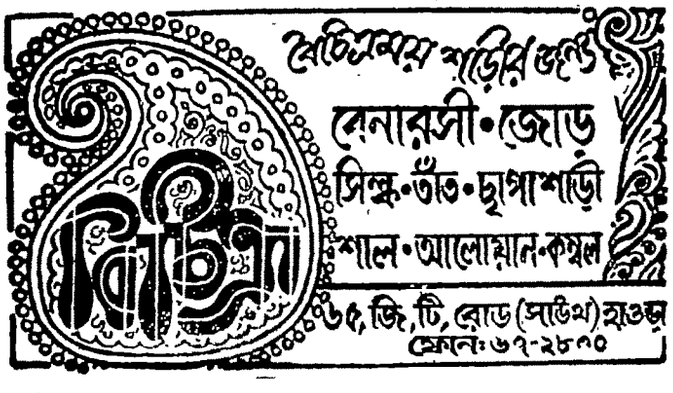

লাভবান তারা ভবিষ্যতের চিন্তা করে যারা

ইউনিট মানে মূলধনের নিরাপত্তা, আকর্ষণীয় লভ্যাংশ, করের রেহাই, ভাঙানো সহজ এবং আরও নানা অপূর্ব সুবিধা। ইউনিট আজকে পুঁজি খাটানোর এমন সুবিধা দেবে যার জন্য কাল আপনি গর্ব করবেন। নিচের চারটি যোজনা খুঁটিয়ে পড়ুন, দেখুন কোনটায় আপনার সুবিধা বেশি।

ইউনিট স্কীম '৬৪ এতে ইউনিট থেকে আসে একটা নিয়মিত রোজগার। গত বছর ৯% লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি ইউনিটের ফেস ভ্যালু বা অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা। ১০-এর গুণিতক সংখ্যায় এগুলো কেনা যায়, তবে ১০-টার কম কেনা যায় না। সম্পূর্ণ নিরাপদ,আকর্ষণীয় লভ্যাংশ আয়কর ছাড়, সম্পদ কর থেকে নিষ্কৃতি, আর ইউনিট ভাঙানোটাও সহজ—এসব হলো এই যোজনার কতকগুলো বিশেষ সুবিধা।

পুনর্বিনিয়োগ প্রকল্প একবার যখন ইউনিট কিনেছেন তখন অথবা পরে—প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে—পুনর্বিনিয়োগ প্রকল্পতে যোগ দিতে পারেন। যাকে বলে সুবর্ণ সুযোগ। এতে প্রত্যেক বছর আপনার লভ্যাংশ দিয়ে আরও ইউনিট আপনাআপনি কেনা হয়ে যাবে জুলাই মাসের দরে—জুলাই মাসেই ইউনিট-এর দর সবচেয়ে কম থাকে।

ইউনিট যুক্ত বীমা প্রকল্প এতে শুধু বেশি লাভ নয়, আবার জীবনবীমার সুযোগ এবং আয়কর ছাড়। এই প্রকল্প ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের ব্যক্তিদের জন্য। তিন হাজার থেকে বারো হাজারের মধ্যে যত টাকা লগ্নী করতে চান তার দশ ভাগের কি বিশ ভাগের এক ভাগ বছরে একবার বা ছয় মাস বাদে বাদে আমাদের দেবেন। যত টাকার জন্য এই প্রকল্পে যোগ দেবেন সেই পুরোটার জন্যই আপনার জীবনবীমা হয়ে থাকল আর সেই সঙ্গে ফসল হিসেবে আপনার ঘরে উঠবে মোটা লভ্যাংশ। অবশ্য আরও আছে—প্রতি বছর যে কিস্তি দিচ্ছেন তার জন্যে আয়কর ছাড় (রিবেট) পাচ্ছেন। তাছাড়া ডাক্তারী পরীক্ষা লাগবে না। এতে দশ বছর পরে কত ফেরৎ পাবেন? বছরে ১০০০ টাকা দিয়ে দশ বছর পর আপনি প্রায় ১৫ হাজার টাকা পেতে পারেন। নির্ভর করবে আপনার বয়স ইত্যাদির উপর। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সমস্ত শাখাতেই আপনার টাকা গ্রহণ করা হবে।

শিশু উপহার যোজনা ১৫ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদেরকে একটা স্নেহের উপহার হিসেবে বড়োরা ইউনিট কিনে দিতে পারেন। কতগুলি কিনে দিতে পারেন? ১০-এর গুণিতক যে-কোনও সংখ্যার ইউনিট—তবে কম-সে-কম ৫০ টা কিনে দিতে হবে। ২১ বছর অবধি টাকাটা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলবে; মেয়েরা ১৮ বছর বয়সে টাকাটা তুলতে পারে। তাহলে উচ্চশিক্ষার বা কোনও জীবিকা গড়ে তোলার কি নিজের সংসার পাতার জন্য, এক কথায় সবচেয়ে বেশি দরকারের সময়, টাকাটা তার হাতে আসবে।

আরও খোঁজ খবরের জন্য
আমাদের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করুন:

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া

8 ক্ষেয়ারলি প্লেস কলিকাতা ৭০০০০১
টেলিফোন : ২৩-৯৩৯১, ২৩-৯৬৩৮, ২৩-৮৮১৮

মুখ্য প্রতিনিধিদের নাম ও ঠিকানা

জে. এম. বিশ্বাস
১০৩ আর. বি. ঘোষ রোড, খোশবাগান
বর্ধমান,

জে. জি. অধিকারী
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং, বিষ্ণুপুর
জামশেদপুর

এইচ. পি. চৌধুরী সি/১৫ নেতাজীনগর
কান্টাটোলী, রাঁচী-৮৩৪০০১

সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলুন একটি একটি ইউনিটে

Sista s-UTI. C/5/78 Bng

বাগবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ কর্তৃক ১৮৭৮ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা

নমুনা মূল্য] ANANDA BAZAR PATRIKA, CALCUTTA, TUESDAY, 16th MAY, 1922 [

বর্ষপর্যায় ১ম বর্ষ] কলিকাতা, অক্ষয়তৃতীয়া, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯, ইং ১৬ই মে ১৯২২

মহাত্মা গান্ধীজী আপেক্ষা গান্ধী ব্রাণ্ড ব্যবহার করুন।

বিজ্ঞাপন

প্রথম বার্ডওয়ালের কর্ণ। দেশলাই

দৈনিক আনন্দবাজারের শিরোনামের শিরোদেশে প্রকৃত ইতিহা

একটি সংবাদপত্রের ইতিকথা

সুশান্তকুমার মিত্র

ঠিক একশো বছর আগে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইংরেজির ১৮৭৮ সালের এপ্রিল-মে) বাংলা সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্ম হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার জন্মদাতা হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ—যাঁরা অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের পত্রিকাবাড়ীর সূতিকা-গৃহেই আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম এবং সে বাড়ী থেকে আজও অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকৃতপক্ষে ছিল বর্তমান ইংরেজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার বাংলা সংস্করণ। কারণ 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' জারির পর বৃটিশ সরকার ও তার প্রবর্তিত আইনকে পাশ কাটিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজি সংবাদপত্রে পরিণত হলে অমৃতবাজারের বাংলা অংশের অভাব পূর্ণ করতে ঘোষ ভাইয়েরা মিলে জন্ম দিলেন বাংলা সংবাদপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'।

কেন এবং কি করে আনন্দবাজারের জন্ম হয়

১৮৬৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম হয়েছিল। নির্ভীক নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্যে সমাজদেশের সর্বস্তরে অমৃত-বাজার প্রবেশ করেছিল ও অসামান্য জনপ্রিয় হয়েছিল। বৃটিশ সরকার ও তার এদেশীয় অনুচরকুলেরা এতে শংকিত হয়ে পড়েন। তাই গত শতাব্দীর আনন্দবাজারের রিপোর্ট থেকেই উদ্ধৃত করি —"লর্ড নর্থব্রুক অমৃতবাজারকে দমন করিবার যত্ন করেন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার নামে সিডিশন অর্থাৎ রাজদ্রোহি আইন অনুসারে রাজদ্বারে অভিযোগ করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সাহস হইল না। লর্ড নর্থব্রুক অমৃতবাজার পত্রিকাকে দমন করার যত্ন করিয়া ইহাই করিলেন যে অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান পদ প্রাপ্ত হইলেন" আনন্দবাজার পত্রিকা, (১ মে ১৮৮২, পৃষ্ঠা ৪ কলম ২)।

রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বড়ো ইংরেজ বলতে চেয়েছেন বঙ্গদেশের প্রধান শাসক স্যার রিচার্ড টেম্পল ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ। তাঁর রাজপ্রাসাদের স্বার শিশিরকুমার ঘোষের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি বোম্বাইয়ের গভর্নর হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন স্যার আশলি ইডেন। ইডেন ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। অমৃতবাজার পত্রিকার স্বাধীন নির্ভীক মনোভাব তাঁর কাছে অসহ্য লাগলো। তিনি শিশিরকুমারকে ডেকে পাঠালেন রাজপ্রাসাদে (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে) এবং বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনায় উষ্মা প্রকাশ করে তিনি প্রথমে স্বয়ং সম্পাদকীয় রচনার এবং অতঃপর পত্রিকা পরিচালনায় সাহায্য করবার প্রস্তাব দিলেন। এই অসম্ভব প্রস্তাব শিশিরকুমার সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলে স্যার ইডেন, পরবর্তী প্রস্তাব করলেন—'আপনি ও আমি দ্বৈতভাবে বঙ্গদেশ শাসন করি।' শিশিরকুমার ঐ প্রলোভনকে জয় করে বললেন, বঙ্গদেশে অন্তত একজন স্বাধীন সম্পাদক থাকতে দিন। (কারণ তখন কৃষ্ণদাস পালের হস্তান্তরিত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকার স্যার ইডেন গোপনে সম্পাদকীয় লিখতেন)। শিশিরকুমারের ঔদ্ধত্যে ইডেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ছমাসের মধ্যে কলকাতা-ছাড়া করবার হুমকি দিলেন। শিশিরকুমার বললেন—"আপনি বাংলার প্রধান শাসক, আপনার যা ইচ্ছা অক্লেশে তা পূর্ণ করতে পারেন; আমি গ্রামে গিয়ে চাষ করে খাবো।' কিন্তু বাংলার শাসকের কাছে এই ধরনের ব্যবহার আমার অপ্রত্যাশিত ছিল।' যাই হোক এটাই আপনার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকার।"

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। নেটিভের ঔদ্ধত্য খর্ব করার দরকার। শিশিরকুমারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া লীগের 'এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স' শিল্প বিদ্যালয়ের আট হাজার টাকা সরকারী সাহায্য সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। এবার অমৃতবাজারের পালা। ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ বড়লাট লিটনের সহযোগে স্যার আশলি অমৃতবাজারকে বন্ধ করতে আর্জি করলেন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট। অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত ও দিবভাষী সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। "এই আইনের ফলে কোন কোন বাংলা সাময়িকপত্রের (যথা 'সোমপ্রকাশ') প্রচার সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।' তখন সরকার অমৃতবাজার পত্রিকার (তৎকালে বাংলা-ইংরেজী সাপ্তাহিক) প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না।' রাজরোষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পত্রিকা-সম্পাদক এক কৌশল অবলম্বন করেন; তিনি পরবর্তী ২১-এ মার্চ হইতে 'অমৃতবাজার পত্রিকাকে পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত করিয়াছিলেন" (বাংলা সাময়িক পত্র, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা ২৫)।

সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকার পাতা থেকেই এই ইতিহাস তুলে ধরি—'স্যার আশলি ইডেন বঙ্গদেশের রাজসিংহাসনে

উপবেশন করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদককে আহ্বান করেন।..... তিনি গমন করিলে স্যার আশলি ইডেন তাঁহাকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা বিপথগামী করিবার যত্ন করেন কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তাহাতে সম্মত হন না। তৎপরে সকলেই জানেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকা বন্ধ করিবার জন্যে স্যার আশলি ইডেন উদ্যোগ করিয়া ৯ আইন বিধিবদ্ধ করেন এবং ৯ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া স্যার আশলি ইডেন অমৃতবাজার পত্রিকার উপকার কি অপকার করেন তাহা ভারতবর্ষীয় সকলেই অবগত আছেন। লর্ড নর্থব্রুক অমৃতবাজারকে দমন করিতে গিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহকের সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়টের গ্রাহক সংখ্যা কমিয়া যায়। আবার ইডেন সাহেব ৯ আইন দ্বারা অমৃতবাজার পত্রিকা বন্ধ করিতে গিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পূর্ণ ইংরাজি হয়।..... অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক যতদিন ধর্মপথে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার পতন নাই।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ মে, ১৮৮২ পৃষ্ঠা ৪ কলম ২)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সে যুগের কট্টর বৃটিশ পত্রিকা 'স্টেটসম্যান'ও দ্বিভাষী (অর্ধেক ইংরেজি, অর্ধেক বাংলা) অমৃতবাজার পত্রিকার সমর্থনে কলম ধরেছিলো। প্রেস আইনবলে ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্রগুলিকে যখন এই আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তখন অমৃতবাজার পত্রিকার ইংরেজি অংশের অমৃতের বাজার থেকে বঞ্চিত হল, আনন্দের হাট থেকে বিতাড়িত হল। তাই অমৃতবাজার পত্রিকার বাংলা অংশের অভাব পূর্ণ করতে জন্ম হল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারির ঠিক এক মাসের মাথায়—বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবত প্রথম সোমবারে (বৈশাখ ১২৮৫=এপ্রিল ১৮৭৮) বাংলা সাপ্তাহিকরূপে আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম দিলেন ঘোষ-ভায়েরা। প্রফুল্লকুমার সরকার সম্পাদিত দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমের ভাষায় বলা যায়—'মুদ্রাযন্ত্র আইন পাশ হইবার পর, 'অমৃতবাজার' ইংরাজী সংবাদপত্রে পরিণত হইলে,১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হেমন্তকুমার; শিশিরকুমার ও মতিলাল—তিন ভাই মিলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাহির করেন।' (দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। ১৮ সেপ্টেম্বরের বিশেষ ক্রোড়পত্রে ঐ একই বক্তব্য ছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকা ও আনন্দবাজার পত্রিকা নামের মধ্যে আশ্চর্য মিল। অমৃতময়ী ছিলেন ঘোষ ভাইদের মা আর মায়ের নামেই অমৃতবাজার পত্রিকা। আনন্দময়ী ও'দের মাসীর নাম আর মাসীর নামেই আনন্দবাজার পত্রিকা। দুই নামকে ও'রা স্মরণীয় করতে চেয়েছিলেন অমৃতবাজার প্রেস থেকে একই মেশিনে, দ্বিভাষী অমৃতবাজারের একই বাংলা টাইপে (পুরনো টাইপ বদল করা হয়নি বলে ২১ মে ১৮৮২ সালে আনন্দবাজারে দুঃখ ও ক্ষমা

আনন্দ বাজার পত্রিকা, সোমবার, ১লা আশ্বিন, ১৩২৯ সাল।

সীর হেমন্তকুমার ঘোষ

দেশমান্য মতিলাল ঘোষ

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ক্রোড়পত্র—১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২২

ওপর কেন কলম চালানো হবে—এটাই ছিল স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমের (২০ মার্চ ১৮৭৮) জিজ্ঞাসা। বৃটিশ পত্রিকা হয়েও স্টেটসম্যানের সে যুগের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রেস আইনের প্রধান লক্ষ্য যে অমৃতবাজার পত্রিকাকে বিনাশ করা তার প্রমাণ শুধু সাপ্তাহিত আনন্দবাজার পত্রিকার পাতাতেই নয়, আছে উবিলিউ এস কেইন-এর ভূমিকায় (ইণ্ডিয়ান স্কেচেস্ গ্রন্থের), অমাথনাথ বসুর 'মহাত্মা শিশিরকুমার' গ্রন্থে, ওয়েফেয়ারার-এর 'লাইফ অব শিশিরকুমার ঘোষ' গ্রন্থে।

অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজী সাপ্তাহিক হয়ে বিটিশ আইনকে ফাঁকি দিল এবং আপন স্বাধীন সত্তা বজায় রাখলো। কিন্তু যারা ইংরেজী জানে না, মাতৃভাষাই যাদের সম্বল, তারা প্রকাশ করা হয়), একই ব্লকে, একই ডিজাইনে, একই মাপের কাগজে (১৭"×১১"), একই মূল্যে আনন্দবাজার প্রকাশিত হতে থাকে। তফাত শুধু অমৃতবাজার প্রতি বেস্পতিবার ইংরেজীতে আর আনন্দবাজার প্রতি সোমবার বাংলায় প্রকাশিত হতে থাকে।

তখন অমৃতবাজার পত্রিকা ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পর্ক শুধুমাত্র বাইরের দিক থেকে নয়, আদর্শ ও নীতিগত দিক থেকেও নিবিড়তর ছিল। পূর্বেই বলেছি ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হয় যেদিন, সেদিনই ছিল দ্বিভাষী অমৃতবাজার পত্রিকার সর্বশেষ (অর্ধাংশ) বাংলা সংখ্যার প্রকাশ (১৪ মার্চ ১৮৭৮)। পরের সংখ্যা ২১ মার্চ থেকে পত্রিকা সম্পূর্ণ ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। কিন্তু একথা কেউই জানেন না যে,

সম্বাদ

—লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহবহুর অনুমতি দিয়াছেন যে নিম্নলিখিত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট সমুদয় প্রাপ্ত হইবেন।

"আনন্দ বাজার পত্রিকা"	কলিকাতা
"বঙ্গবাসী"	ঐ
"বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী"	বর্দ্ধমান
"চারুবার্ত্তা"	বেরপুর, ময়মনসিংহ
"এডুকেশন গেজেট"	হুগলী
"মেদিনী"	মেদিনীপুর
"পরিদর্শক"	শ্রীহট্ট
"ভারত মিত্র (হিন্দী)"	কলিকাতা
"উৎকল দীপিকা(উৎকলদেশীয়)"	কটক

সরকারী সংবাদ প্রাপ্তির স্বীকৃতি। সে যুগের আনন্দবাজারের ১৮৮২ খৃঃ ১৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত।

২১ মার্চ থেকে অমৃতবাজার সম্পূর্ণ ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত হলেও বিজ্ঞাপনগুলি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। এর কয়েক সপ্তাহ পর যেদিন থেকে পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলিও সম্পূর্ণ ইংরেজীতে ছাপা শুরু হয়, অর্থাৎ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পুরোপুরি কার্যকর হয়, ঠিক সেদিন থেকেই দেখা গেল সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় জন্মগ্রহণ করেছে আনন্দবাজার পত্রিকা। বোধহয় এই কারণেই জন্মগ্রহণের চার মাস পর (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) সে যুগের পত্রিকা সাপ্তাহিক এডুকেশন গেজেট লিখেছিল—'অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরাজি হওয়ায়, তাহার স্থলে উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষদিগের প্রতিজ্ঞামতে এইখানি (আনন্দবাজার) প্রবর্তিত হইয়াছে। এখানি নামান্তরিত ভূতপূর্ব বাঙ্গালা অমৃতবাজার পত্রিকা মাত্র' (২২ ভাদ্র ১২৮৫)। সাহিত্যসাধক চরিতের ৮৬ সংখ্যক গ্রন্থের ৩১—৩২ পাতায় এবং বাংলা সাময়িক পত্র ২য় খণ্ডের ২৫ পাতায় এই একই কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, অমৃতবাজারের ১১ বর্ষ ৯ সংখ্যার (১১ এপ্রিল ১৮৭৮) ঠিক পরবর্তী সংখ্যাটি দশম সংখ্যা না হয়ে ১ বর্ষ ১ সংখ্যারূপে (১৮ এপ্রিল ১৮৭৮ বৃহস্পতিবার) হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। দেখা যাচ্ছে আসলে ঐ সপ্তাহেই জন্ম হয়েছিল আনন্দবাজারের। আনন্দবাজারের জন্মদিন থেকেই অমৃতবাজারের শিরোদেশে ইংরেজীতে লেখা শুরু হয় '১ম বর্ষ ১ম খণ্ড।' অর্থাৎ বাংলায় আনন্দবাজারের শিরোদেশে যা লেখা হয়েছিল, ইংরেজীতে অমৃতবাজারের শিরোদেশেও ঠিক তাই দেখা গেল। এ তো শুধু মুদ্রাকর প্রমাদ নয়—এ এক নতুন অধ্যায়। বৃটিশ সরকারের আইনের বিরুদ্ধে নেটিভের সংগ্রামের নব উদ্যম, নতুন অধ্যায়।। বৃটিশ আইন ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষী অমৃতবাজারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় দুই স্বতন্ত্র পত্রিকা রূপায়ণ করে এই দ্বিভাষী সত্তাকেই আসলে বজায় রাখা হল ডিনামাইট এবং ইংরেজ সরকারকেও বুঝিয়ে দেওয়া হল, স্বাধীনসত্ত্ব বজায় রাখতে দাবার চাল কাকে বলে! ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ [illegible] কেমন করে পরিবেশিত হয়।।

আনন্দবাজার পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার ছদ্মরূপ গ্রহণ করে ঘোষ মালিকানার অধীনে ও আদর্শে পরিচালিত হতে থাকে। ঠিক এই সময়কার আনন্দবাজার কাগজের ফাইল কোথাও পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন সংবাদপত্র পত্রপত্রিকা এবং পরবর্তীকালের দৈনিক আনন্দবাজার থেকে যে সব তথ্য উদ্ধার করেছি তা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করতে সহায়ক হবে।

শতাব্দীর বিস্মৃত ইতিহাস

এই সময় ঝিকরগাছার যে বায়ত সভাকে কেন্দ্র করে দেশে হুলস্থুল হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিলেত পর্যন্ত সাড়া পড়ে যায়, সেটি আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদকের কাজ। আনন্দবাজার অমৃতবাজারের মতই অতি অল্প সময়ে এত প্রতাপশালী হয়ে ওঠে যে ইংলিশম্যান ও পাওনিয়ার পত্রিকা এর মত ইংরেজীতে তরজমা করে মন্তব্যসহ কাগজে ছাপতেন। ভার্নাকুলার প্রেস আইন উঠে গেলে ইংরেজ সরকার দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলির মতামত নিয়মমত সংগ্রহ করে ও তার ইংরেজী তরজমা করে ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে পাঠাতেন। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভের অভিমতও এইভাবে নিয়মিত পাঠানো হত। এইভাবে আনন্দবাজার সগৌরবে চলতে থাকে। তখন আনন্দবাজারের বার্ষিক মূল্য ছিল আট টাকা। অমৃতবাজারেরও ঐ একই মূল্য ছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা জন্মের পর প্রথম সম্পাদক কে হয়েছিলেন তা নিয়ে মতদ্বৈত আছে। সে যুগের কাগজে সম্পাদকের নাম ছাপা হত না। তাই প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে থেকে হেমন্তকুমার, না, শিশিরকুমার কে সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন তা সুনিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অমরস্মৃতি' গ্রন্থের ২৮ পাতায় লিখেছেন—'যেদিন আইন পাশ হলো তার পরের বৃহস্পতিবার দেখা গেল অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা নয়, পুরোপুরি ইংরেজী পত্রিকা হয়ে গেছে। কিন্তু শিশিরকুমার ঠিক করলেন, বাংলা কাগজ রাখতেই হবে। তাই তিনি বাংলা অমৃতবাজারের নাম দিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'; সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ।'

—ফেব্রুয়ারি মাসের "ওয়েস্ অফ্ ইণ্ডিয়া" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বাঙ্গালা সম্বাদপত্র সমূহের মধ্যে সোম প্রকাশ, নববিভাকর ও আনন্দ বাজার পত্রিকার কোন কোন অংশ ইহাতে ইংরাজিতে অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সহযোগীর সমধিক বিস্তৃতি সমধিক বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই।

সহযোগী ইংলিশম্যানের অনুকম্পায় আনন্দ বাজার পাত্রিকা সাহেবী মহলে আজ কাল খুব আনন্দ প্রদান করিতেছে। গত সপ্তাহে সহযোগী আমাদিগের দুইটী প্রবন্ধ আশাশোভা অনুবাদ করিয়া তাঁহার পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তজ্জন্য আমরা সহযোগীর নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

সেকালের দুটি ইংরেজি পত্রিকায় সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের সংবাদ অনুদিত হওয়ার খবর।

আবার জনৈক 'প্রত্যক্ষদর্শী' রঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী যিনি সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের জন্ম থেকে আনন্দবাজারের দৈনিকে রূপান্তর পর্যন্ত আনন্দবাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তিনি লিখেছেন—'শিশিরকুমার হইলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং হেমন্তকুমার হইলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। আর মতিলাল ছিলেন উভয় ভ্রাতারই দক্ষিণ হস্ত উভয় পত্রিকারই প্রবন্ধ লেখক দৈনিক আনন্দবাজার ১৮-৯-১৯২২)। যাই হোক পরবর্তীকালে হেমন্তকুমার সাংসারিক কারণে যশোরে গিয়ে সপরিবারে বাস করায় মতিলালের ওপর আনন্দবাজারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। মতিলাল শরৎচন্দ্র রায় ও মৃণালকান্তি ঘোষের সাহায্যে কাগজ চালাতেন। তখনও হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন আনন্দবাজারে।

এই প্রসঙ্গে আরো একজনের নাম স্মরণীয়। তিনি শিশির-কুমারের ছোট ভাই গোলাপলাল ঘোষ। উত্তরকালে দৈনিক আনন্দবাজারে (২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬) তিনি লিখেছিলেন—'আনন্দবাজার পত্রিকা যখন প্রথম সাপ্তাহিক আকারে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কার্যালয় হইতে বাহির হয়, তখন বাঙ্গালাদেশে সংবাদপত্র খুব কমই ছিল। আনন্দবাজার সে সময় নির্ভীকভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করিতে ত্রুটি করে নাই। স্বর্গীয় হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল প্রভৃতি আনন্দবাজারের শৈশব-ধাত্রী ছিলেন। আমি তাহাকে সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।'

আনন্দবাজার ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৮৭ সালের মার্চ পর্যন্ত সগৌরবে চলেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর পরবর্তী কোন এক সময় আনন্দবাজার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল পর দৈনিক আনন্দবাজারে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২) লেখা হয়েছিল—

> 'এই সময় আনন্দবাজারের বার্ষিক মূল্য ছিল ৮ টাকা। কিন্তু ২ টাকা বার্ষিক চাঁদা এবং তাহার উপর উপহারের লোভ দেখাইয়া সস্তা দামের কাগজ বাহির হইল ['সুলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রিকা ? না সাপ্তাহিক বসুমতী ?]। ঘোষ মহাশয়েরা কাগজের মূল্য কমাইতে নারাজ, সুতরাং গ্রাহক সংখ্যা কমিতে লাগিল। দাম কমাইলে কাগজ চলিত কিন্তু তাহাতে কাগজের মর্যাদাহানি হইবে বলিয়া আনন্দবাজার প্রকাশ বন্ধ হইল।... প্রথম পর্যায় 'আনন্দবাজার' বন্ধ হইল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে।'

কিন্তু একথা ঠিক নয়। ১৮৮৭ সালের ২৮ মার্চ (১৫ চৈত্র ১২৯৩ বঙ্গাব্দ) সোমবার, ৯ম ভাগ ৫০ সংখ্যা পর্যন্ত আনন্দ-বাজারের অখণ্ড ধারাবাহিক কাগজের ফাইল আমার সংগ্রহে আছে। ঐ দিন যথারীতি আট পাতার কাগজে আনন্দবাজার বন্ধ করে দেবার কোন লক্ষণও ছিল না। সুতরাং ধরে নিতে পারি আনন্দবাজার আরো কিছুকাল চলার পর (সাপ্তাহিক বসুমতীর জন্মে বন্ধ হয়ে থাকলে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত আনন্দবাজার চলেছিল বলে ধরে নিতে পারি) সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছিল এবং তা কিছুদিনের জন্য (দ্রষ্টব্য—দৈনিক আনন্দবাজার ক্যোড়পত্র ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২)। কিন্তু যোগেশচন্দ্র বাগলের 'হাবড়ের মুদ্রিত-সম্ধানী' গ্রন্থে আনন্দবাজারের এই ইতিহাসটুকুর কোন উল্লেখ নেই। এর পরবর্তী ইতিহাসের উল্লেখ আছে ঐ গ্রন্থের ১৪৪ পাতায়।

১৮৯০ সালের মার্চ মাসে (১ চৈত্র ১২৯৬ বঙ্গাব্দ) শিশিরকুমার 'বৈষ্ণবধর্মের চর্চা ও প্রচার' উদ্দেশ্যে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন পত্রিকা কার্যালয় থেকে। কিন্তু এই পত্রিকার সাহায্যে জনগণের মধ্যে যথেষ্টভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হচ্ছে না দেখে শিশিরকুমার এক নতুন পরিকল্পনা করলেন। তিনি একই সঙ্গে ধর্মবিষয়ক ও রাজনীতিবিষয়ক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে মনস্থ করলেন। তাই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা বন্ধ করে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা' নাম দিয়ে পুনরায় সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার' প্রকাশ করলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'পাক্ষিক 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কিছুদিন পরে মাসিক পত্রে পরিণত হয়। এইভাবে কয়েক বৎসর চলিবার পর সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা' নাম ধারণ করে (সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৮৬, পৃষ্ঠা ৫৮)। এর সম্পাদকীয় ভার ছিল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী ও মৃণালকান্তি ঘোষের ওপর। শিশিরকুমার ও মতিলাল এতে অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসে দুটি পত্রিকা একত্রিত হবার নজির আছে বহু। তবে ধর্ম ও রাজনীতিকে একসূত্রে গেঁথে শিশিরকুমার এক অভিনব নজির সৃষ্টি করে গেছেন।

১৯১৬ সালে আনন্দবাজারের অবৈতনিক সম্পাদক হয়েছিলেন শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

> 'অমৃতবাজারের অফিস থেকে বাংলা সাপ্তাহিক আনন্দ-বাজার পত্রিকা বের হতো। এটি দেখতেন নীহারকান্তি [ম্যানেজার ছিলেন। ইনি তুষারকান্তি ঘোষের অগ্রজ]। সে সময় দৈনিক সংবাদপত্রের ওপর গভর্নমেন্টের কড়া নজর। নীহার আনন্দবাজারে [সম্পাদকরূপে] আমার নাম ছাপলেন (১৯১৬)। এতে সংবাদপত্র জগতে কিছু খাতির হলেও পুলিশ স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চের উৎপাত বাড়ল। সম্পাদকীয় মন্তব্য ও রাজনৈতিক লেখাগুলি প্রথম কয়েক-দিন গোলাপবাবু [গোলাপলাল ঘোষ—শিশিরকুমারের সর্বকনিষ্ঠ ভাই] দেখে দিয়েছিলেন। অমৃতবাজারের লেখার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল। গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তাঁরা লিখতে ভয় পেতেন না; কিন্তু এমনভাবে লিখতেন যে, আইনের প্যাঁচে ফেলা যায় না। এই বিশেষ ভঙ্গী আয়ত্ত করতে আমাকে সাহায্য করেছিলেন পীযূষবাবু' [তুষার-কান্তির বড়দা]। (অমর স্মৃতি, ২৮ পাতা)।

তখন প্রতি শনিবার আনন্দবাজার বের হতো। এইভাবে বহু বৎসর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হবার পর বিংশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আবার আনন্দবাজার বন্ধ হল। অবশ্য শুধু আনন্দবাজার নয়, এই যুদ্ধকালে দেশের অধিকাংশ পত্রিকার ভাগ্যই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।

আনন্দবাজারের জীবন ইতিহাসে শিশিরকুমারের আরো একটি মহৎ কৃতিত্ব—আনন্দবাজারের সম্মান তিনি বাঁচিয়ে-ছিলেন আনন্দবাজারের অস্তিত্ব বজায় রেখেও। কারণ যে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক ৮ টাকা মূল্যের জন্যে বার্ষিক ২ টাকা মূল্যের সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় একরকম পরাজিত হয়েও বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু দাম কমিয়ে নিজেকে ছোট করেনি, সেই আনন্দবাজারকেই বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত করে বার্ষিক ২ টাকা মূল্য ধার্য করে বিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সগৌরবে চালিয়েছিলেন। সুতরাং 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা' শুধু ধর্ম ও রাজনীতির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেনি, সেই সঙ্গে কৌশলে দাম কমিয়ে বাজারের প্রতিযোগিতায় শিশিরকুমার আনন্দবাজারের অস্তিত্বকেও সসম্মানে বজায় রেখেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশে একটা প্রবল রাজনৈতিক ঝড় উঠলো। এই সময় দেশভক্তরা চুপ করে থাকতে পারেন না। সেজন্যে আবার আনন্দবাজার প্রকাশিত হল সাপ্তাহিকরূপে। এ তথ্য আমরা জানতে পাচ্ছি সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের শেষ সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে—

REGISTERED NO ?? Registered No ?? REGISTERED NO ??

অমৃতবাজারপত্রিকা

[illegible]

[illegible] ১১শ ভাগ। | কলিকাতা—২৪ চৈত্র—বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৪ সাল। ইং ১৪ই মার্চ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ। | ৪ সংখ্যা।

অনুকল্প।

ইউরিটোরী নামক বাতরিক এক রোগটী হইতে আপ

অনুকল্প।

ইহা বেদনা উপকরণিক বেদনী এ রোগ কলিকা পরীক্ষায় অনেকটী সংবাদে ইহা প্রকাশ হইয়া এমন অসাধারণ ঔষধির গোপনীয়ক অধিক [illegible] করিয়াছে, যে অনুক ইল উপাদিতে প্রতিটি ঔষধ পাঠকদিক ভরসা করিতে সমর্থ। কি ঔষধী আমাদী চুক, মরা, স্ত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধীয়ে বিশেষজ্ঞ যে কি চমৎকার এর প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার বিষয় বর্ণী লেখে মনীষের বিশেষ থাকিলে তাহাদি তাঁহার সমস্ত লেখকে সাধা প্রকার রোগের বন্ধুরা চীর আম মরা করিতে ইহা ৯৫ বলে প্রকাশে কলমের বন্ধ হইতেও হইত না।

আপনক অনুক ঔষ কি চমৎকার উৎপ্র। ইহা সেবনে অনেক অনেক ছাত্রদের, কর্মকারে ও অন্যান্য রোগ ও আধি হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি অন্ধ, বন্ধ্যা, শূল ও স্থবির শীতলীয়া, অজীর্ণ, ঘাসকাশ, ছাতপা, আনশিক পক্ষ পুঙ্গ, পুরাতন বাত, এজেন, ঘরাজাতিয়, উপদংশ পারদ ঘটিত রোগ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, যকৃদ্বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, বহুৎ ও প্রবী প্রভৃতি মরণ প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা উৎকৃষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের প্রসবজনিত বিশেষ রোগ আছে, এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র প্রতিকার। মূত্রকৃচ্ছ, প্রস্রাব, মূত্রাশ, ঔষধিক রোগ, অঙ্গে অসহ্যবেদনা, প্রভৃতি রোগে অব্যর্থ বিষেয়। বয়াধুকদের প্রস্রাব আসা অঙ্গে যে অসাধিরণে ঔষধ সেবন করিলে মূত্রযন্ত্রণা রোগ থাকিবে না। পরন্তু এমন নির্দোষ ঔষধ যে মূত্রযন্ত্রের শিশুরও সেবা এবং পরমোপকারী।

ঔষাদীদের মত আমার এই অপূর্ব্ব ঔষধীবিক্রয়-[illegible] দাস হইতে প্রচার হইয়াছে। আমার প্রচারের পরে যে কয়ই ঔষধ মলম বাহির হইয়া বাজারে ঔষধা যায়।

প্রত্যেক শিশির অগ্রিম মূল্য ৩৫০ টাকা। ডাকমাসুল আমার ১ টাকা। বাহির বাংলাদেশ এবং ব্রাহ্মণ।

ওলাউঠার অব্যর্থকা অমোঘ ঔষধি।

নানা প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধের ফল, তার ফল প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫ ০ ০ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছে। অতএব ৩০ ঘন্টা রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা ডাকিনী এবং মাদের লোকের পত্র দ্বারা প্রেরণ পাঠান দিয়াছে।

এই ঔষধের ২০ পঞ্চাশ ঘটিকায় মূল্য ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম ৩ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ১৫ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

যে সমস্ত আরোগ্য মহাশয় বর্ত্তমানে আমিয়া হইতে ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন তাহারা এখনে পত্র লিখিলে বিনা মাসুলে ঔষধ পাঠান হইবে।

শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায়।
মিশির ঔষধালয়, বেলিয়াঘাটা।

ব্রাহ্মণদের ২ শিশি অনুকল্প সেবন করিয়া রোগীর যৌবনিক বল, বীর্য্য ও আধী প্রভৃতি অতীব বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকল্পের এত প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমার অনুকল্প এত শিশি সেবন করিলেও আর আরোগ্য হয় নাই। তিনি সেবন করিয়া বন্ধুর অনুরোধে ও মন রক্ষার্থে।

শ্রীরামনারায়ণ দাস। এল ঘোষ,
ডিট্রেক্টিভ ব্রাঞ্চ আফিস।

আমি ২ শিশি অনুকল্প ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহার দ্বারা এত বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে যে, আমার মূত্রাধিক্য ও বারম্বার প্রস্রাব আসিবার বেগ অনেকটা কমিয়াছে। অবশ্য আরোগ্য হইবার পূর্ব্বের আর এত শিশি সেবন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

শ্রীঅনুকূল নাথ ঘোষ,
ব্যবসায়ী।

আমি জন্মে অনুকল্প ও শিশি আনাইয়া একজন মূত্রাঘাতের রোগীকে সেবনার্থ দিয়াছিলাম উক্ত রোগীর অনেক উপকার হইয়াছে।

শ্রীহরকুমার চক্রবর্ত্তী,
পেস্টমাষ্টার, আমার।

আমি বিগত বর্ষে জ্বরাবস্থায় ও কাশির কষ্ট অর্শ রোগের এবং একটী অন্ধ্রবৃদ্ধি শ্রীমতীকে কাশ অনুকল্প আনাইয়াছিলাম তাহারা উহার সেবনে আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হইয়াছেন। শ্রীমতীর পুত্র ৩ টী সন্তান হইয়া ৩টী মৃত হয় এক বর্ষমধ্যে বাচিল, অপর একটীর বয়ঃক্রম বর্ষ হইয়াছিল। অনুকল্প সেবনের পরই তাহার গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়া এখনও স্বাস্থ্যে আছে এ ৮ মাসের হইয়াছে তাহাকে আন দেখা যায় অনুকল্পের চমৎকার ঔষধ তাহা জানা হইয়াছে।

শ্রীনন্দ নিবাস দত্ত, মাষ্টার,
মর্ডাণ্ড আমার।

আমার একমাত্র পুত্র অনেক দিন হইতে জ্বরের ও পুরাতন কাশ রোগে পীড়িত ছিলেন। তিনি ঔষধালয়ে টনিক ও ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ছিলেন কিন্তু তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না। একজন ডিটি শ্রীমন্ত আনা পরিচয়ে করিয়া ঔষধ সেবনে একে বারে নিরাময় হইয়াছিলেন। আপনার অনুকল্প সেবন করাইয়া উক্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছেন।

শ্রীমতি মুক্তা নিবাস
ভবানীপুর, কলিকাতা।

আমার পত্নীর মূত্রকৃচ্ছ পীড়া জন্য যে অনুকল্প [illegible] ঔষধ ব্যবহার দিয়াছেন তাহাতে ঔষধ হইয়াছে।

শ্রীনাথ মুকুন্দ ঘোষাল
পীলখানা, কলিকাতা।

আমি অনেকদিন যাবত অজীর্ণরোগী যে কোন ঔষধী বহু পরীক্ষা করে কোন পীড়া হয়না পরিশেষে অনুকল্প ব্যবহার করিয়া ঔষধ পাইয়াছি এবং আমি কি বলিতেছি এখন কি ঔষধ সেবনে আমি ও আমার [illegible] ঔষধ

আনন্দবাজারপত্রিকা

প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হয়।

মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ৯৲ টাকা। ষাণ্মাসিক ৪৷৷০। ত্রৈমাসিক ২৷৷০। প্রতি সংখ্যা ১০ আনা ভারু মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে না

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য—প্রতি পর্যায়, প্রথম বিজ্ঞাপন, ৫ তৃতীয় বার ৵০ আনা। তদূর্দ্ধ ৫ বারের অধিক স্থলে ৵০ আনা।

৫ম বর্ষ।	কলিকাতা—৯ই চৈত্র, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ শক, ইং ২১শে মে ১৮৯২।	৩ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

বর্ণাধারের চিকিৎসা।

অপূর্ব আবিষ্কার।

অব্যর্থ ও অবিনশ্বর।

মূল্য ১৷৷০ আনা মাত্র মাশুল। ১৷৷০ এক খণ্ড অব্যর্থের পরিবর্ত্তে ৪৷৷০ টাকা অবিলম্বে ফেরত পাইবেন।

চিকাগোবিজয়ী চুরুট উঃ।

জগদ্বিখ্যাত বর্ণাধারের চিকিৎসা আবিষ্কার। সেই পদ্ধতি দ্বারা কবিরাজ ডাক্তার মহাশয়েরা প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ এই ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু তাহা অতিশয় ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইহা অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ ছিল। এক্ষণে ২৫ বৎসরের একান্ত অধ্যবসায় বলতঃ তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, সকল বিষয়ে ইহাতে অধিকতর আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই শ্লোকের নিম্নে লিখিত ভাবানুবাদ করিয়া এই ঔষধের নাম করণ করা হইয়াছে। অতএব পাঠকগণ পূর্ব্বে বলা বাহুল্য পারেন যে এই ঔষধে অধিক প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে বর্ণাধার ব্যক্তির বাঁচিবার আর সম্ভাবনা নাই।

অমৃত ধারার ও আরক ধারার পরিচয় আবিলে পাওয়া যায়।

পুস্তক বিক্রয়	মূল্য	ডাক মাশুল
অমৃতধারা প্রথম খণ্ড	১	৵০
দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র	৵০	৵০
আরকের সমষ্টি	৵০	১০

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্রোপাধ্যায় কৃত
উদ্ভাবিত বঙ্গ পরিচ্ছদ।

অমৃত দুর্গ

এক প্রস্থের (১০ আনার) মূল্য ৫৲ বার। ৩৷ প্রস্থ একত্র লইলে ১৷৷০ টাকা। ডাক মাশুল অতি স্বীকৃত ১০, ৫ প্রস্থ এক সঙ্গে লইলে ১৲ ডাক মাশুল লাগে।

ইহা ব্যবহার অভ্যাসকালে ক্ষুধামান্দ্য অনায়াসে দূর হইয়া ক্ষুধা বোধ হয়। এমন কি অম্ল, বমনকারক মূল, বিড়ালীপত্র, ওয়েলাপ, আম আদা, অম্লবেতস অম্লপিত্ত, অম্লশূল, পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অতিসার, বাত, অর্শ, পুরাতন আমাশয়, উপদংশ, পারদাদিক রোগ, রক্ত বিকার, মূত্র কৃচ্ছ্র, অম্লমূত্র এবং পাকাশয় প্রভৃতির পুরাতন রোগ এতদ্ব্যবহারে ইহা অতি উপকৃত।

শ্রীযোগেন্দ্রবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যার রোগের ইহা অতি প্রতীকার। ঘর্ম্ম স্বাভাবিক, রক্তস্রাব, এবং মূত্রাশয় দৌর্ব্বল্যরোগ, ঘন ঘন মূত্রবেগ ও মূত্রবহনে অসুবিধা রোগে অমৃত বিশেষ। ইহা এমন মিষ্টোপাদেয় ঔষধী যে মুখোপাধ্যায় শিশু ও সধবাগণ ইহা সেবা। হাতে হোম প্রস্তুত হয় বলিয়া বিলম্বে বন্ধ যায়। ইহা ব্যবহার করিলে পরিষ্কার ও সুস্থ হইয়া থাকে এবং অনায়াসে হজম হয়।

ওলাউঠার অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত ইহার আশ্চর্য্য গুণ দর্শনে আজ কলিকাতা ৯৭ জনের অধিক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। ইহা সেবন করাইবার জন্য ঔষধী সেবন না করাইলে, কিম্বাই রোগী আরোগ্য হইবে। ৩টী শিশির মূল্য ৪ টাকা, ডাকের মাশুল অতিরিক্ত। ১টী শিশির মূল্য ৷৷০। ইহা সেবনে অর্শবিনিঃসৃত রক্ত বন্ধ হইয়া অনায়াসে আরোগ্য হয়।

শ্রী দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বীরেন্দ্র বিলিং পোষ্টঅফিস, বেলঘরিয়া।

সাধুগণের বিশেষত্ব কিসে।

অনেক, আমার এক বন্ধু আত্মীয়ের ৭৯ বার অসুখ হইয়াছে। সেবন করাইবে তিনি পুরাতন অম্বেষণ, পাচন—বটীকা বাত ও মল প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি সমূহ বর্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমার উপরোধ মতে সে দিন আমার আত্মীয় ডুমরাওন নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহীনাথ তেওয়ারী অসুখ হইয়া আমাদের আসে ১২ দিন সেবন করাতে মল, ঘাম ও অর্শ রোগের উপশম বোধ করিয়াছেন। আমার অসুখ হইতে এখন এই সেবে এক দিন প্রত্যহিক বমনের বোধ হয় নাই, সেবনকারী দিন সেবা করিলে মুক্তি লাভ করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবেন। আমরা ইহার উপকারিতা সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিতে কষ্ট করি নাই ও করিব না।

শ্রীরাম রাম বসাক।
টালাবিলী, বাঁকুড়া।

ওপ্রবেষু,

মহাশয়, অনেকীয় শ্রেষ্ঠিক ঔষধিগণ অমৃত দুর্গ সেবনে আমার বাতাদির রোগের শান্তি হইয়াছে। ক্ষুধা পায়ের বোধ কম্প নাশী ও, বিড়ালীপত্র, গাজীর বস্ত্র পাচন ভক্ষণান্ত আমিকা দ্বারা নিম্নস্থ হইলে, বোধ করার প্রায় শান্তি হইবে, ও উপরন্তু প্রকৃতি আবাদিত হইল ও পুরাতন আমি হইতে সম্পূর্ণরূপে আমাদের ভবিষ্যতের নজর বোধ প্রাপ্ত অমৃত দুর্গ উত্তর রূপে নিশ্চিন্ত লাভ করিয়াছি। আমি প্রথম সমীপ অবীনতার পূর্ব্বের ভবিষ্যতে যে আমি দুর্গ দিন শ্রীযুক্ত পাচিন ভক্ষণের পর্যন্ত এই পরম ঔষধীর গুণ বিজ্ঞাপন ও সৌহিত্য শ্রীযুক্তের দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতে কর্ত্তব্যই ত্রুটি করিব না। বিশেষতঃ কবি এই মহৌষধীর গুণ বর্ণনাদ্বারা আর বাহিরে কখনই লোক আমি প্রস্তুত হইব। অবশ্যই জ্ঞানের জ্ঞানবশতঃ পতিত হইব না।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
বরাহাটা পোষ্ট; বেলা বন্দোবস্ত।

মহাশয়,

আপনার ডিসপেপসাগারীক ঔষ, বড়ি ও মধু আমার প্রথমে রোগের একটী মহৌষধী আছে। ঐ ঔষধটী সেবন করিয়া আমার প্রকাশ্য আমার বহু রোগের প্রথমে ঔষধ ব্যবস্থা রোগ করেছিলাম বিশেষ হইয়াছে। আপনার এই অমৃত দুর্গ মহৌষধীর গুণ আমার সমুদয়রূপে নিজেই প্রত্যহিক ভবিষ্যে ৫০ বড়ি বা ঔষধাকারে নিজপুর রোগের পত্নী গ্রামে আমার হয় রোগের আমি ঔষধে আমে ৪৷৷০ আনাতেই এই অমৃত দুর্গের গুণ বর্ণনায় নিশ্চিন্ত প্রকাশ করিলাম।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
নব গোষ্ঠী বাজার, গোপালপাড়া বিদ্যালয়।

মহাশয়,

মজাতি অমৃতধারা সেবন যে ঔষধীর রোগের আরম্ভিক অবস্থাতে আপনার ঔষধালয় হইতে এতদ্ব ঔষধাদির ব্যবহারিক যে আমি ইহার অবগত, আমার ও যে কি পর্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। এক পক্ষ আরম্ভিক ঔষ পরিবর্ত্তে এই ঔষধীর দ্বারা চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য করিয়াছি। যেমন একটী রোগী প্রথমে আপনার ঔষধী সেবন করিয়া পরে আমার ঔষধী সেবন ভক্ষণের সুযোগ পাইয়াছিল। যোগ ছাড়া আমার ঔষধী সেবন না করিলে তাহার জীবন রক্ষা হইতে পারিত, সেবন না করাতেই ঔষধীর মূল রোগ অধিক পরিমাণে বিস্তার পাইয়াছিল। রোগ বৃদ্ধির ইহা একটী প্রধান কারণ। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ইহার পরিপূর্ণ দ্বিতীয় ঔষধী ও অন্যান্য আবিষ্কার এই মাত্র এবং বহুপরিশ্রমে এই আমার ঔষধ সেবন হইতে বিমুক্তি লাভার জন্য প্রার্থনা। আপনার এই অমৃত ঔষধী বিস্তার করিয়াছেন। আমি আরও বলিতে পারি যে ওলাউঠা রোগ আক্রান্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিদের অর্থাৎ শেষাবস্থার রোগীদের আপনার এই ঔষধী বিধিমত রূপে সেবন করাইলে মৃত্যুর ভয় থাকিবে না। আমার বিশ্বাসের আপনার ঔষধী সেবন করাইলে আর ঔষধী সেবন করান কখনই আবশ্যক হয়। অমৃত পরের আমাদের একিমাত্রই সার্থক আপনার আপনার ঔষধীর অমৃত অবস্থা দেখিয়া আমাকে অভিমানিদের যে এতদ্বারা বহুমূল্য ঔষধী ব্যবহার কি প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে।

অতীব দুঃখের বিষয় যে এখানকার যেমনি কবিরাজ লোকের আপনার শ্রেষ্ঠিক ও ভিন্ন ব্যক্তির ঔষধী প্রচারের অমৃত হয়ে ও অন্যান্য বিক্রয়ার্থে নহিলে পরিত্যক্ত হয় যাই।

শ্রীহরমোহন মুখোপাধ্যায়।

যেহে ডাক্তার, যেহেতু কবিরাজ আপনি, অন্যান্য ভিন্ন মহাশয়,

গত বৎসর আমার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ বিপদ হইয়া ঐ ভগবতীপিস রোগ পরিত্রাহিবেদন আমি আমাদের মাতৃ উহাকে মহাবোগ বিভাবরী রোগীর উহা ব্যবহার দ্বারা আশা করা বিষয়ের ভার সম্পূর্ণ সমর্থ হইবেক অর্থাৎ রোগের আর আমিবার হইয়াছে। চরিশ ঘণ্টা পরিবর্তে উহা সেবন করান যায়, সমস্তে আরোগ্য লাভ করিবেক পাকস্থলী উহার অলৌকিক শক্তি আমাদিগের যথা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ওলাউঠা রোগের স্বেচ্ছ ব্যবহার ঔষধী আবিষ্কৃত হইয়া থাকে ও ইহা সকলী আমাদের অনেক বিষ্ণু করে। আমি সকলে ও তত্ত্ব মহাশয়দিগকে অনুরোধের অনুরোধ করিতেছি যে এত গীড়ার এই ঔষধী বিশ্ব পরিবারে সকল করিবে

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের লেন ২ নং বাটি হইতে প্রতি সোমবারে শ্রী অমৃতলাল শূর্ণা দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা যেন অমৃতবাজারেরই ঠিক্‌ঠাক লাইন।

শত শতাব্দীর একটি দিনের প্রথম পাতার ছবি (২২ মে ১৮৮২ খৃঃ) অক্ষরে, শিরোনামে, অঙ্গসজ্জায়, পাতার মাপে যেন অমৃতবাজারের ছাঁচে ঢালা।

'অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস থেকে প্রকাশিত শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব ১৯২২ সাল পর্যন্ত ছিল আমার ওপর' (অমর স্মৃতি ৩৩ পৃষ্ঠা)।

এ পর্যন্ত ১৮৭৮ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যে ইতিহাস অতি সংক্ষেপে সংকলিত করলাম তাকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদপত্রের ইতিহাসের ভাষায় বলা যায় 'ইহাই প্রকৃতপক্ষে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ১ম পর্যায়।' এই অখণ্ড ধারাবাহিকতার স্বীকৃতি আছে দৈনিক আনন্দবাজারে।

১৯২২ সালের ১৩ মার্চ (২৯ ফাল্গুন ১৩২৮) এই সাপ্তাহিক আনন্দবাজারই দৈনিক আনন্দবাজারে রূপান্তরিত হয়। শুধু দৈনিক আনন্দবাজারের পাতাতেই সীমাবদ্ধ নয়, স্বীকৃতি আছে বাংলা সাহিত্যের বহু গ্রন্থে, সংবাদপত্রের ইতিহাসে ও সম্পাদকের মূল্যবান স্মৃতিচারণায়।

ESTD 1878 REGD NO C 1080

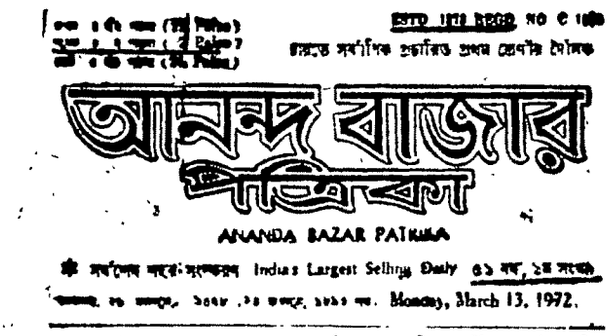
ESTD 1878 REGD NO C 1080

প্রথম প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

ইণ্ডিয়ার সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক India's Largest Selling Daily ৫১ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা

Monday, March 13, 1972.

১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ তথাকথিত ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসবের দিনে কাগজের শিরোনামায় দেখা যাচ্ছে জন্ম ১৮৭৮ খৃঃ।

০ সাহিত্যসাধক চরিতের ৮৬ সংখ্যক গ্রন্থের ৫৮ পাতায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'১৩২৮ সালের ২৯এ ফাল্গুন (১৩ মার্চ ১৯২২) হইতে ইহার (শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার) 'নবপর্যায়'-রূপে বর্তমান 'আনন্দবাজার পত্রিকা'খানি দৈনিক আকারে প্রকাশিত হইতেছে।'

০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িকপত্র' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৫ পাতায় এই একই বক্তব্য আছে।'

০ 'পণ্ডিত বসিকমোহন' গ্রন্থের ৫৬ পাতায় চুণীলাল বসু লিখেছেন—'পত্রিকাখানি হইতে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া'র পবিত্র নাম তুলিয়া দিয়া কেবল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নামে দৈনিক পত্রিকা রাজনৈতিক আলোচনা স্কন্ধে লইয়া অতীব দক্ষতা ও যোগ্যতার সহিত প্রকাশিত হইতে লাগিল।'

০ সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের শেষ সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অমরস্মৃতি'র ২৯ পাতায় যে মূল্যবান বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা আনন্দবাজারের অখণ্ড ধারাবাহিকতা প্রমাণের সহায়ক হবে। শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

তখন 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের মালিক ছিলেন মৃণালকান্তি ঘোষ ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার। সুরেশবাবু দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র বের করবেন; কিন্তু নূতন পত্রিকার জন্য গভর্নমেন্টের অনুমতি নিয়ে গোল বাঁধল।

একদিন মৃণালকান্তি ঘোষের ঘরে সুরেশবাবু ছিলেন। আমি যখন ঘরে যাই তখন তাঁদের মধ্যে পত্রিকার অনুমতি নিয়ে কথা হচ্ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাগজ কবে বের হচ্ছে?'

সুরেশদা বললেন, 'বের আর হচ্ছে কোথায়? পার্মিশনই পাচ্ছি না।'

আমি মৃণালবাবুকে বললাম, 'একটা কাজ করলে এই অনুমতি না নিয়েই কাগজ বের করা যায়।'

মৃণালবাবু বললেন, 'কিভাবে?'

'আমি তো আনন্দবাজার পত্রিকা দেখছি। আপনারা অমৃতবাজার নিয়ে ব্যস্ত; এটির ওপর দৃষ্টি দেওয়ার সময় আপনাদের হয় না। আপনারা যদি আনন্দবাজার পত্রিকার নাম দিয়েই দৈনিক পত্রিকা বের করেন তা হলে নূতন করে অনুমতির দরকার হবে না। তা ছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকার একটা ইতিহাস আছে। শিশিরবাবুর স্মৃতি এর মধ্যে রয়েছে। সুরেশবাবুর হাতে আনন্দবাজারের ঐতিহ্য বজায় থাকবে।'

সুরেশবাবু বললেন, 'সত্যি, এটা যদি হয় তা হলে আর অসুবিধা হবে না।'

মৃণালবাবু বললেন, 'সন্তোষ যা বলেছে ঠিকই; কিন্তু এ সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে কথা কইতে হবে।'

কারও অমত হলো না। ১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন শিশিরকুমারের সাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকার অবসান হলো; তার স্থান নিল দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা।'

সাপ্তাহিকের অবসান ঘটিয়ে দৈনিক তার স্থান গ্রহণ করলো। তাই ১৩ মার্চ ১৯২২ তারিখটি দৈনিকরূপে আনন্দবাজারের পুনঃপ্রচারের প্রথম দিন—আনন্দবাজারের জন্মদিন বা জন্মক্ষণ নয়। কারণ জন্মক্ষণে প্রতিটি পত্রিকা তার আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য ও নীতি ব্যাখ্যা করে থাকে। এটি শুধু প্রথা নয়, সম্ভবত বৃটিশ আমলের লিখিত আইন। ১৩ মার্চ ১৯২২ সালে বা তার পরবর্তীকালে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বা নীতির কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। ছিল না পত্রিকা জন্মগ্রহণ করার খবর। ১৩ মার্চ পুনঃপ্রকাশের দিন বলেই বোধহয় প্রথম সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—'কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম।' সম্পাদক হলেন প্রফুল্লকুমার সরকার।

কুড়াধ্ন আইন পাশ হইবার পর, 'অমৃতবাজার' ইংরাজী সংবাদপত্রে পরিণত হইলে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল —তিন ভাই মিলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' বাহির করেন। প্রধানতঃ হেমন্তকুমার ও মতিলালই "আনন্দ বাজার" পত্রিকা পরিচালনা করিতেন কারণ শিশিরকুমার 'অমৃতবাজার' লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। কিছুদিন পরে হেমন্ত কুমার যশোহরে চলিয়া গেলে মতিলালের উপরই 'আনন্দবাজারের' সম্পাদন ভার পড়ে। সুতরাং "আনন্দবাজার" যে তাঁহার শৈশবকালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র সম্পাদক দেশপূজ্য মতিলালের সেবা পাইয়াছিল একথা স্মরণ করিয়া আজ আমরা আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতেছি।

প্রফুল্লকুমার সরকারের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালের সম্পাদকীয়।

দৈনিক হবার পর দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে দৈনিক আনন্দবাজারের শিরোদেশে লেখা হয়েছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ কর্তৃক ১৮৭৮ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত আনন্দবাজার পত্রিকা'। এর পরবর্তীকাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত (১৯৭৩ সালেও) শিরোভাগের ডানদিকের কোণে রেজিস্টেশন নম্বরের সঙ্গে ব্রাকেট পয়েন্ট বোল্ড টাইপে ইংরেজীতে লেখা হয়েছিল 'এসস্টাবলিশড্ ১৮৭৮'। আবার দৈনিক আনন্দবাজারের প্রকাশকাল থেকে সুদীর্ঘ বছর ধারে কাগজের শিরোভাগের বাঁদিকে 'নবপর্যায়' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

সম্পাদক প্রফুল্ল সরকার ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক আনন্দবাজারকে দৈনিক আনন্দবাজারের 'শৈশবকাল' বলেছেন সুস্পষ্টভাবে ('আনন্দবাজার যে তাহার শৈশবকালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র সম্পাদক দেশপূজ্য মতিলালের সেবা পাইয়াছিল' ইত্যাদি)। এবং ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধেই তিনি বলেন—'১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল—তিন ভাই মিলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাহির করেন।'

দৈনিক আনন্দবাজারের ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতা বিষয়ক 'ক্রোড়পত্রে' লেখা হয়—

'কতকগুলি অনিবার্য কারণে মাঝে দুইবার কিছুদিনের জন্য আনন্দবাজার বন্ধ থাকিলেও, গত ৪৫ বৎসরকাল (১৮৭৮—১৯২২) নানাভাবে ইহা দেশের সেবা করিয়া আসিতেছে। শুভানুধ্যায়ীগণের অনুকম্পা ও স্নেহে অভিষিক্ত হইয়া 'আনন্দবাজার' দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশকল্যাণব্রতে নিযুক্ত থাকুক—ইহাই প্রার্থনা।'

পুরনো টাইপ বদল করতে না পারায় 'আনন্দবাজারে দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ (২৯ মে ১৮৮২ সাল, পাতা-৪, কলম-২)। এই অক্ষর দিয়েই অমৃতবাজারের বাংলা অংশ নিয়মিত ছাপা হত।

গত বৈশাখ মাসে অক্ষর বদলাইবার কথা ছিল কিন্তু অক্ষর ওয়ালার ত্রুটি বশতঃ আমরা এপর্যন্তে বড় লজ্জিত আছি। আষাঢ় মাসে, নিশ্চয়ই অক্ষর পরিবর্ত্তিত হইবে।

বাটী ভাড়া।

দেওঘর একটী স্বাস্থ্যকর স্থান ও বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে অতি সন্নিকট। উক্ত স্থানে মাঠের মধ্যে একটী অতি বৃহৎ বাঙ্গলা বাটী ভাড়া দেওয়া হইবে। মাসিক ভাড়া ২০ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশক শ্রীঅমরনাথ শর্ম্মার নিকট লিখিলে সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সে যুগের আনন্দবাজারের একটি বিজ্ঞাপন

সালতামামি

১৮৬৮ : ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাপ্তাহিকরূপে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম।

১৮৬৯ : ২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বিভাষাশ্রিত (অর্ধেক ইংরিজি, অর্ধেক বাংলায়) রূপান্তর।

১৮৭৮ : ১৪ মার্চ বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি। এই আইন দেশীয় ভাষা ছাড়া অমৃতবাজারকে ক্ষুণ্ণ করতে প্রয়োগ হল দ্বিভাষী সংবাদপত্রের ওপর।

: ২১ মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরিজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়ে বৃটিশ আইনের আওতামুক্ত হল।

: (সম্ভবত) ২২ এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকার বাংলা অংশের অভাব পূর্ণ করতে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাষায় আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম হয়। জন্মদাতা হেমন্তকুমার-শিশিরকুমার-মতিলাল ঘোষ তিন ভাই। হেমন্তকুমার-শিশিরকুমারের পর সম্পাদক হন মতিলাল ঘোষ। তিনি কাগজ চালাতেন শরৎচন্দ্র রায় ও মৃণালকান্তি ঘোষের সাহায্যে।

১৮৮৪ : ১৪ এপ্রিল প্রফুল্লকুমার সরকারের জন্ম।

১৮৮৮ : সুরেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম।

১৮৯৬ : সম্ভবত এই বছরে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পাক্ষিক পত্রিকার সঙ্গে একত্র হয়ে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা' নাম ধারণ করে। সম্পাদক হন :
রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
লতাচরণ শাস্ত্রী
মৃণালকান্তি ঘোষ
সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়
(১৯১৬)

১৯০৬ : প্রফুল্লকুমার সরকার বিবাহ করেন নিস্তারিণী সরকারকে। ইনি শিশিরকুমার ঘোষের ভাগনী সরলাবালা সরকারের মেয়ে।

১৯১১ : শিশিরকুমার ঘোষ মারা যান।

১৯২২ : বছরের শুরুতে প্রফুল্লকুমার সরকার গৃহশিক্ষক ও অস্থায়ী দেওয়ানের কাজ ছেড়ে ঢেঙ্কানল থেকে কলকাতায় আসেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষের অধীনে সহকারী সম্পাদকের কাজ শেখেন দীর্ঘ কয়েক মাস।

: ১৩ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকা সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে রূপান্তর। (উপলক্ষ মহাত্মা গান্ধীর জামা-দণ্ড)। উদ্যোক্তা তিনজন : হেমন্তকুমারের পুত্র এবং শিশির কুমার মতিলালের ভাতুষ্পুত্র মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার।
: ১৭ মার্চ কার্যাধ্যক্ষরূপে মৃণালকান্তি ঘোষের নাম মুদ্রিত হয়।
: ১ জুন সম্পাদকরূপে প্রফুল্লকুমার সরকারের নাম ছাপা হয়।
: ৫ সেপ্টেম্বর মতিলাল ঘোষের মৃত্যু।

১৯২৩ : ৭ অক্টোবর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদক হন।

১৯৩০ : ২৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র সেন সম্পাদক হন।

১৯৪১ : ৭ জানুয়ারি প্রফুল্লকুমার সরকার পুনরায় সম্পাদক হন।

১৯৪৪ : ১৫ এপ্রিল শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদক হন।

১৯৫৯ : ১ ফেব্রুয়ারি শ্রীঅশোককুমার সরকার সম্পাদক হন এবং ইনিই বর্তমান সম্পাদক।

আনন্দবাজারের দৃষ্টিতে অমৃতবাজারের ভূমিকা। ব্রিটিশ সরকারের রুদ্ররোষে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' অস্ত্র প্রয়োগে অমৃতবাজার রাতারাতি ইংরেজি সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার জন্মকে ত্বরান্বিত করল।

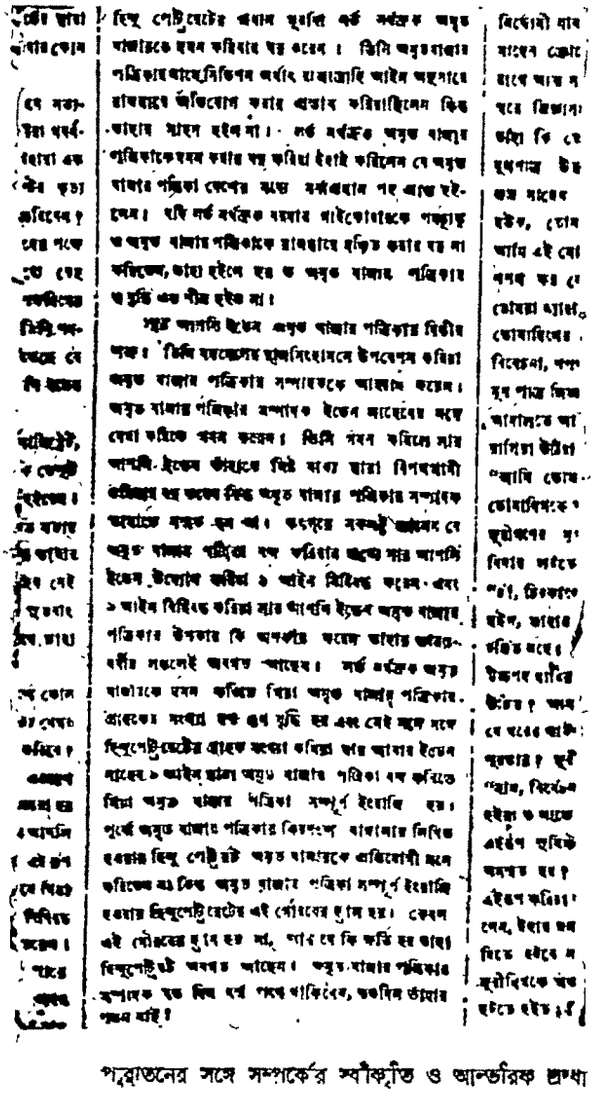

পুরাতনের সঙ্গে সম্পর্কের স্বীকৃতি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দৈনিক আনন্দবাজারের পাতায় প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাদের বিভিন্ন ভঙ্গীতে তোলা নানান বয়সের ছোটবড় ফটো, তাঁদের জীবন কাহিনীর সংকলন, এমন কি সম্পাদকীয় স্তম্ভের শিরোদেশে তাঁদের অমরবাণীও উধৃত করা হয়েছে।

কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পরমশ্রদ্ধেয় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'ইতিহাসে আনন্দবাজার' (অকটোবর ১৯৭৫) গ্রন্থের ভূমিকায় এই ইতিহাসটুকুর কোন স্বীকৃতি নেই। ভূমিকার প্রথম লাইনেই তিনি লিখেছেন—'আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীর দিনে (১৩ই মার্চ) প্রথম প্রকাশিত হয়। লাল কাগজে ছাপা কাগজ।'

১৯২২ সালের বহু আগে গত শতাব্দীতে, যে আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম হয়েছিল এবং নিয়মিত প্রকাশিত হত তার প্রমাণস্বরূপ গত শতাব্দীর একটি দিনের ফটোস্ট্যাট ছাপিয়ে দিলুম। স্মরণ ভূমিকার পাঁচের পৃষ্ঠায় ডঃ মজুমদার আরো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন —'আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম পরাধীন ভারতবর্ষে—মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তখন সবেমাত্র দানা বেঁধে উঠেছে।' সুতরাং

থেকে (১৯২২) ....।' এই তথ্যগত ত্রুটিটুকু ছাড়া আর একটি সামান্য ত্রুটির কথা সবিনয়ে উল্লেখ করছি। ১৩ মার্চ ১৯২২ সালের দৈনিক আনন্দবাজার কাগজের রঙ লাল ছিল না, কাগজের রঙ ছিল সাদা। সাদা কাগজের ওপর লাল কালিতে (প্রকৃতপক্ষে ম্যাজেন্টা বা কাগের রঙে) ছাপা হয়েছিল।

শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার ছাড়া দৈনিক আনন্দবাজারের পুনঃপ্রচারে আরো একজনের বিরাট প্রত্যক্ষ অবদান ছিল, তিনি ঋষিতুল্য মৃণালকান্তি ঘোষ—হেমন্তকুমারেরই সুযোগ্য পুত্র। পূর্বে উল্লিখিত শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণাতেও মৃণালকান্তির প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভূমিকা দেখতে পাই।

যখন দৈনিক পত্রিকারূপে আনন্দবাজারের পুনঃপ্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখন প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার গত, মতিলাল অতি বৃদ্ধ। তাই হেমন্তকুমারের পুত্র ও আনন্দবাজারের প্রাক্তন সম্পাদক মৃণালকান্তি তাঁর পুত্রতুল্য স্নেহভাজন প্রফুল্লকুমার ও সুরেশচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের শুভ আবির্ভাব তিথিতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস থেকে নতুন করে আনন্দবাজার প্রকাশ শুরু করেন। নিজেদের পরিচয় দিলেন 'নূতন সেবক'। এই তিনজনই হলেন দৈনিক আনন্দবাজারের পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী।'

দৈনিক আনন্দবাজারের পঞ্চম দিনের কাগজে (১৭ মার্চ ১৯২২) মৃণালকান্তি ঘোষের নাম মুদ্রিত হয়েছে আনন্দবাজারের কার্যাধ্যক্ষরূপে।

> কিন্তু যে কথা আজ সবচেয়ে বেদনার সেটা এই ঐতিহ্যপূর্ণ অতীত ইতিহাসের বিস্মরণ। ১৩ই মার্চ ১৯৭২ সালে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা যে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করলো তার ক্রোড়পত্রে খুঁজে পাই না এই অতীত ইতিহাসকে, পাই না পার্থিকদের। হয়তো ওটা নবপর্যায়ে প্রকাশিত দৈনিক আনন্দবাজারের সুবর্ণজয়ন্তী। তাই বলে কি অতীত ইতিহাসকে, পূর্বসূরীদের, অস্বীকার করতে হবে?
>
> দৈনিক আনন্দবাজারের সুবর্ণজয়ন্তী ক্রোড়পত্রে হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল, মৃণালকান্তি ঘোষের নাম না থাকলে তাঁদের কিছুই এসে যাবে না, তাঁরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন সংবাদপত্রের ইতিহাসে। শুধু এই সত্যটাই থেকে যাবে পূর্বসূরীদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা জানানো হয়নি আর অতীতের ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসকে স্বীকার করা হয়নি।

আজ শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দৈনিক আনন্দবাজারের ত্রুটিটুকু সংশোধন করে শ্রদ্ধা জানাই হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, মতিলাল, মৃণালকান্তি ঘোষের উদ্দেশ্যে। সমগ্র জাতিকে তাঁরা যে প্রেরণা, যে চেতনা দিয়েছেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে যে উপকার করেছেন, সেই অবিস্মরণীয় কীর্তি যুগ যুগ উজ্জ্বল থাকুক।

দৈনিক আনন্দবাজারের প্রথম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার সরকার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে—'আনন্দবাজার যে তাহার শৈশবকালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র সম্পাদক দেশপূজ্য মতিলালের সেবা পাইয়াছিল' বলে উল্লেখ করেছিলেন সেই কৃতজ্ঞতার কথাই স্মরণ করি আনন্দবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকীতে। আর আশা করব আনন্দবাজারের ১৮-৯-২২ তারিখের আন্তরিক ব্যাকুল প্রার্থনা মূর্ত হয়ে উঠবে আনন্দবাজারের জীবনে —'....আনন্দবাজার দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া—ইহার পূর্বগামী মহাপ্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণের উদ্দেশ্য সফল করুন শ্রীভগবানের চরণে ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।'

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।। তেইশ ।।

আই এ সি-র ডোমেসটিক ফ্লাইট নম্বর তিনশো দুই আধ ঘন্টা লেট ছিল। দিল্লি এলাহাবাদ - লখনই-পাটনা - রাঁচি-কলকাতা। বেলা দশটা দশের জায়গায় দশটা চল্লিশের এসে ডি সি সাতশো সাত থামলো। বোয়িং জেটের দরজায় গিয়ে গ্যাংওয়ে লাগতেই প্যাসেঞ্জাররা নামতে লাগলো। শীতের ভোরে দিল্লির যাত্রীরা ডবল সোয়েটার পরে প্লেনে উঠেছিলো। এখন তারা খুলতে খুলতেই প্লেন থেকে নামছিলো। শেষ প্যাসেঞ্জার এসে যখন গ্যাংওয়ের মাথায় দাঁড়ালো—তখন ডোমেসটিক ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লাউনজে অন্য জায়গায় যাত্রীরা প্লেনের খোলা দরজার মুখে অবাক হয়ে তাকালো।

সরু পাজামা। তারওপর চুড়িদার পাঞ্জাবী, বেলা এগারোটার রোদ পোহানো শীতে শেষ প্যাসেঞ্জারের জামার নিচে যে কোন গেঞ্জীও নেই তা বোঝা যাচ্ছিল। কারণ, ফাইন আদ্দির নিচের শরীরটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির সোস্যালে গানের নেমন্তন্ন পেয়ে গোপাল যাচ্ছিল বাগডোগরা। অশোকতরু, হিমঘর ওদের সঙ্গে এই প্রথম সে একসঙ্গে গাইবে। বোর্ডিং টিকিট বুকপকেটে নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিলো। এমন সময় তার পাশ দিয়ে ঝকঝকে বিশাল চেহারার লোকটি হেঁটে গেল। গায়ে শুধু আদ্দির পাঞ্জাবী। গোটানো হাতের বাইরে ঘন লোমের ঢাকা চওড়া কব্জিতে একটা কালো ডায়ালের ঘড়ি। অন্য হাতে বুগোর চওড়া শেকল জড়ানো। যে-ই দেখছিল—সে-ই এই শীতে অমন পোশাক দেখে অবাক হচ্ছিল। লোকটির কাঁধের ব্যাগে বড় করে লেখা—ডি লাল। গোপাল এক ঝলকে পড়ে ফেললো।

দরবারী লাল এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখলো হাইকোর্টের বাঙালী উকিলসাব তাঁর নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ-গাড়ি সে শহরে পৌঁছেই ছেড়ে দেবে। তখন তার ঠিকানা সে কাউকে জানাতে চায় না।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনুর চেনা হোটেলটায় উঠে দেখলো—তার চেনাশুনো লোকজন সব বদলে গেছে। তাহলে কি মালিকানা বদলে গেল?

বিকেলের দিকে একতলায় চা খেতে নেমে যাব সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো—তাকেই খুঁজতে সে এখানে উঠেছে। হাত তুলে চেনা দিলো দরবারীলাল। আরে গাঙ্গু?

গাঙ্গু সে-ডাক শুনে ফিরে তাকালো। দরবারী? কতদিন পরে! কাছে উঠে এসে বললো, কী মনে করে? তুমি তো অনেক-কাল এদিক মাড়াও না। পাটনা থেকেই উকিল দিয়ে মামলা চালাও। এখন তুমি বড়লোক!

তোমারই খোঁজ করছিলাম। এখন কী করা হয়?

সেই পুরানা ধান্দা—

ওহি পুরানা খেল? সাবাস!

তাছাড়া কী করবো দরবারীভাই। আমি তো আর কিছু জানি না।

ভালো আছো। সাইসী জানবার আদমিই থেকে গেলে। আমরা তো সবাই চোহা। ডরফোক বনে আছি।

দরবারী। তুমি তো ভাই শেঠ আছো। এখন হোটেল মালিক।

এসব কথা ছাড়ো গাঙ্গু। একটা কাজ নিয়ে এসেছি।

এক কিস্তি? শ' কাম করে দুগো। মগর কেয়া কাম?

মামুলী সা' একঠো কাম। সিধা মার্ডার—

ও তো হরবখত্ হো রহে হ্যায়। কিন্তু—

কিন্তু বলে গাঙ্গু গাই গাঁই করছিলো। দরবারীলাল ধমকাতেই গাঙ্গু যা বললো, তা পরপর সাজালে এই দাঁড়ায়—তোমার সঙ্গে ভাই আমার অনেকদিন আলাপ। আমরা এক সময় মহাআনন্দে একসঙ্গে খুন করেছি। মজুরি নিয়েছি। কিন্তু সেসব জামানা আর নেই। এখন বঙ্গালী ছোকরাবাবুরা হামেশা খুন করছে। পুলিশ ভি খুন করছে। খুন অউর বদলা—আজকাল বহুৎ মাহেঙ্গা নেহি হ্যায়—।

দরবারীলাল বললো, আসল কথাটা বলে ফেলো ভাই।

তখন সস্তার দিন ছিলো। আমি তুমি পানশো টাকাতেও লাশ গুম করেছি। কিন্তু সেসব দিন তো আর নেই।

দিনগুলো কোথায় গেল গুংগা?

এখন প্রাইভেট মার্ডার বিশ হাজার টাকা।

বেশি বলছো ভাই। এ বেট হলে তো আমি হোটেল বেওসা ছেড়ে দিয়ে কলকাত্তা চলে আসি। দ্যাখো না আমার জন্যে এরকম অর্ডার জোগাড় করে দিতে পারো কি না।

আমি অর্ডারের সেলস্‌ম্যান নই দরবারী। আমি এখন দিন আনি দিন খাই। যেমন কাজ জোটে—তেমন কাজ করে দিন গুজরান করে যাচ্ছি।

দরটা বড্ডো বেশী বলেছো গুংগা।

কিছু বেশি বলিনি। পলিটিকাল

মার্ডারে তো দো রুপেয়াও খরচা নেই। কিন্তু প্রাইভেট মার্ডারের দর এখন বিশ পঁচিশ হাজার টাকা। শুনেছি কানপুরে পনেরো হাজারেও হচ্ছে। কিন্তু এ তো কলকাত্তা। ইণ্ডিয়ার রাজধানী ছিলো এক সময়।

আমার ভাই মামুলী কেস। গানে বাজানেওয়ালা তিন বঙ্গালী ছোকরা আমার মামলার কাগজপত্তর চোরি করে কলকাত্তা নিয়ে এসেছে।

ঠিকানা ?

নম্বর জানি না। কিন্তু এলাকা জানি।

তাহলে অসুবিধা কিসের দরবারী ?

কুছু না। কাগজ আগে নিতে হবে। তারপর বদলা—

তিন খুন ?

নেহি নেহি। স্লিফ এক। দলকো লিডরকা শির চাহিয়ে—

কোহি ভারি কাম নেহি দরবারী। জানপয়ছানী করদো।

আমিও তো খুঁজে বেড়াচ্ছি ওদের। এই চায়ে। অওর দো কাপ দেও—। কিন্তু গুংগা—তুমি ভাই দরটা বড় বেশি বলছো।

কিচ্ছু বেশি বলিনি। এ সালে এই রেট যাচ্ছে। আমাদের সে আমল তো আর নেই দরবারী। তখন আমরা আসলি ঘি খেয়েছি—ছ' রুপেয়া ভাও। আর এখন। চব্বিশ টাকা—ছাব্বিশ টাকা কিলো। দরটা এমন কি বেশি বলেছি বলো ?

একদম দুবলা বঙ্গালী। গান গায়। বাজায়।

তব তো ফেমাস আদমি দরবারী।

টি ভি-তে বাজায়।

তাহলে আরও চার হাজার দিতে হবে। পুরা চব্বিশ হাজার। খুন করার পর কাগজে ছবি বেরোবে। পুলিশের কুকুর আসবে। রিপোর্টার লোক ভি আসবে। রেট তো বেশি বলি নাই। আগলে সাল সস্তা ছিলো। তখন একটা এম এল এ খুন করেছি মাত্র ষোল হাজারে। তখন যদি আসতে দরবারী—তাহলে রেট কচ্ছু কম হোত।

চায়ে পিও গুংগা। বাদমে বাত হোগা। আজ রাত্তে চলো গান শুনবো লক্ষ্মীর ওখানে।

আজকাল আর গান শুনি না। কান নষ্ট হয়ে গেছে।

ভালো ঠুংরি শোনাবো।

তার চেয়ে চলো দরবারী—আজ রাত্তে দো ভাই এক সাথে মার্ডার করি। কতকাল একসঙ্গে মার্ডার করিনি।

আমি আর পারবো না গুংগা। অনেক দিন হোল নিজের হাতে কোন মার্ডার করিনি। ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছি।

দু ভাই জায়গা মত পড়লে সব মনে পড়ে যাবে!

দরবারীলাল কোন জবাব দিলো না। মাথা নিচু করে চায়ের কাপে মুখ দিলো। তখন খোলা দরজার বাইরেই সন্ধের সঙ্গে কলকাত্তায় শীত ঘনিয়ে আসছিলো। বাতাসে সস্তা আলুর চপের গন্ধ। মিয়মান সব দেওয়ালে গর্ভপাতের অস্পষ্ট বিজ্ঞাপন। বিকসায় মাতাল। দুই সাবি বাড়ির মাঝামাঝি শিয়ালদা বরাবর আকাশে সম্পূর্ণ গোল একখানা চাঁদ। কলকাতা যেমন হয় আর কি! তবু মায়াময়। গাঢ়। সর্বত্র রহস্যের আভাস। অথচ কিছুই এখন ঘটলো না।

দরবারীলাল চা খেতে খেতে মনে করলো—হারানো কাগজগুলো আগে উদ্ধার হওয়া দরকার। নয়তো ছ' ছটা মামলার ভাগ্য অনিশ্চিত। ওরা ছাড়া কেউ ও কাগজ নেবনি। কিন্তু কেন নিতে গেল ? ওদের তো কোন কাজে লাগবে না। তাহলে ? সিরিফ দিল্লাগীর জন্যে ?

খানিক বাদে দেখা গেল—গঙ্গার ঘাটে একটা খোলা ফিটনে চড়ে দুজন অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান পুরুষ সাদা পাঞ্জাবী গায়ে সন্ধেবেলা শীত খেতে বেরিয়েছে। নতুন হাওড়া ব্রিজের ঢালাই খুঁটিগুলোর কাছে গিয়ে ফিটনওয়ালা বললো, ওদিকে আর যাবো না। জায়গাটা বড় অন্ধকার।

গুংগা হো হো করে হেসে উঠলো। তোমার দুই সওয়ারির ওপর কেউ হামলা করতে আসবে না।

এসব কথার সময় ঠিক উল্টোদিক থেকে আরেকখানা খোলা ফিটন বেরিয়ে এলো। তাতেও ধারা বসে—তারা রোগা ভোগা নয়। দিব্যি হ্যাচা সবলের দুজন মানুষ।

তখন গুংগাদের ফিটন অন্ধকারের দিকে চলে গেলো।

নতুন ফিটনের পুরুষটির গায়ে গরম পাঞ্জাবী। কাঁধে শাল। তার পাশে খুবই স্বাস্থ্যবতী একজন মেয়েলোক। তারও গায়ে দামী শাল জড়ানো।

পুরুষটি বললো, বেথা। এই ঠাণ্ডায় আর ঘোরা ঠিক হবে না।

মেয়ে লোকটি বললো, কেন ? তোমার ঠাণ্ডা লাগছে ?

না। তোমাকে নিয়ে চিন্তা।

আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমার বুঝি ভয় হচ্ছে খোলা ফিটনে ?

গোকুল দত্ত ভয় পাবার মানুষ নয়। বলে বাকিটা আর ভাঙলো না গোকুল। বাকি কথাগুলো বেথাকে বলা যায় না। এই কলকাত্তায় কোথায় কখোন কতরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তার যেকোন একটা দেখে বেথার মন তোলপাড় হয়ে যেতে পারে। আর অমনি হয়তো সেবারের মত টপাটপ সিকি আধুলি খেতে শুরু করতে পারে। সেবার নাকি রেখা জগন্নে লোকাল ট্রেনের দুর্ঘটনার খবর দেখে একা একা দমদম জংশনে চলে গিয়েছিলো। ওল্টানো বগি, আকাশের দিকে চাকা তুলে শুয়ে থাকা কম্পার্টমেন্ট দেখেই নাকি রেখার মাথা গরম হতে থাকে। তারপর ওই সিকি আধুলির ব্যাপারটা।

তারপর থেকেই গোকুল অনেক সাবধান। পাছে কোন মোটর অ্যাকসিডেন্ট চোখে পড়ে—তাই কোন রাস্তায় পড়েই গোকুল আগে থেকে অনেকটা দূরে দেখে নিচ্ছিল। মনে কোনো রকম চোট লাগতে পারে—এমন কিছু দেখলেই সে গাড়ি ঘোরাতে বলবে।

রেখা বললো, ভয় তো তুমি পাচ্ছো। পাছে তোমায় ছেলেরা আমার সঙ্গে তোমায় হাওয়া খেতে দেখে ফেলে।

ফিটনখানা ইনডোর স্টেডিয়ামের দিকে এগোচ্ছিল। গাড়ি ঘোরাতে বলে গোকুল খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকলো। তারপর বললো, আমার ছেলেরা খুবই ভালো। তারা তোমায় ছোটো মা মনে করে।

তা মানি। কিন্তু ওদের সামনে পড়ে যাওয়ার অস্বস্তি তো তোমার থাকবেই।

তা তো থাকবেই।

তাহলে আমি বলি কি—আমার একবার মা হওয়াটা দোষের নয় কোন।

তুমি তো মা আছোই। আমার ছেলেরাই তোমার ছেলে।

ওরা তো আমারই ছেলে। কিন্তু ওদের একটা ভাই হোক না কেন—

এরকম জায়গায় কেউ কারও মুখে তাকাতে পারছিলো না। গোকুল দত্ত বললো, আমি তো, আর যুবক নেই। আবার ছেলে হবে—আবার তাকে বড় করা—সে বড় ঝক্কি কার রেখা।

Institute of Banking Services

Announces one-year correspondence course for

Bank Clerkship Examination.
(Clerk, Typist, Cashier, Steno, Godown-keeper etc.)
Qualification : Matric/S.F /H.S./S.S.C /equiv. with good result.
Age : 18-25 (18-30 for SC/ST)

Probationary Officers'/ Trainee Officers' Exam.
(State Bank of India and Nationalised Banks)
Qualification : Graduate with 50% (more pass graduate for SC/ST)
Age : 20-25 (20-30 for SC/ST)

For Prospectus and Admission Form send a self-addressed 40 paise stamped envelope (12 cms × 24 cms) stating in English the exam. (Bank Clerkship Exam or Probationary Officers' Exam.) in which you are interested to the Programme Director.

Institute of Banking Services,
7, Old Court House Street, Calcutta-700001

তুমি তো আর মানুষ করছো না।

কিন্তু আমি তো বাবা। আমি আর ক'দিন বাঁচবো?

ওসব কথা তুললে আর কথা হয় না। এ ছেলে তার দাদাদের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে না।

ও কথা বোলো না রেখা। শুধু করেছিলাম একটা দিশী গাই নিয়ে। সব চলে গেলেও একটা দিশী গাই তো আবার কিনতে পারবো।

তাহলে আর আমার মা হতে আপত্তি কোথায়?

শীতকালের সন্ধ্যায় রেখার এক-একটা কথা পেছনের ফোর্ট—সামনের মেটি—ময়দানের ওপারের হোটেলবাড়ি—সব অন্যরকম করে দিচ্ছিল। গোকুল এ কথারও এখুনি কোন জবাব দিতে পারলো না। জবাবটা মুখের ওপর রেখাকে বলাও যায় না। যদি বাচ্চা হতে গিয়ে তুমি পাকাপাকি পাগল হয়ে যাও? তখন? তখন ও বাচ্চাকে কে দেখবে?

গোকুলকে চুপ করে থাকতে দেখে রেখা বললো, জানি। তুমি ভাবছো—মা হতে গিয়ে আমি আবার পাগল হয়ে যেতে পারি—

গোকুল না শোনার ভান করে কাঁটা হয়ে থাকলো।

রেখা নিজেই বললো, বাচ্চা হতে গিয়ে যদি তো পাকাপাকি সেরে যেতে পারি—একদম ভালো হয়ে যেতেও তো পারি। আমায় ভালো হতে দিচ্ছো না কেন? একবার একটা চান্স দিয়ে দ্যাখো না।

মরেও তো যেতে পারো। এই বয়সে তোমারও কি মা হওয়া ঠিক হবে। হয়তো ভীষণ কষ্ট পেলে। বাচ্চা বাঁচলো না। তখন?

সবই হতে পারে। কিন্তু মা হবার কথা মনে থাকলে আমি কিছুতেই আবার পাগল হবো না। মরে যাবো না। দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াবো। দেখো তুমি।

বাচ্চা কি খুব দরকারী রেখা? বাচ্চা এসে শরীর নষ্ট করে দেয়।

শুধু শুধু শরীর দিয়ে কি করবো।' এক এক সময় শরীরটা নিয়ে ঘেন্না হয়।

দ্যাখো তো মীরাকে কি বলবে ওর প্রায় বিশ বছর যে হয়েছে।

শুধু শরীর দিয়ে শেষ অব্দি কী করবে মীরা। ভিটামিন খায়। ভিটামিন ইঞ্জেকশন নেয়। ভিটামিন তেল মাখে সারা গায়ে। ঠাণ্ডা জলে চোখ-মুখ ধোয়। যোগাসন করে। কিন্তু শেষ অব্দি শরীরটা নিয়ে কি করবে বলতে?

বলতে বলতে খোলা ফিটনেই রেখা গোকুল দত্তর কাঁধে হাত রাখলো। এই শহরের সঙ্গে, এই সন্ধ্যার সঙ্গে এ দৃশ্য মানাচ্ছিল না। এই পোশাক, এই বয়স, এই ফিটন—এই সময়ের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিলো না। মেয়েদের প্রয়োজন না ফুরোলে রেখা বলে যাচ্ছিলো আজ রাত থেকেই তোমার খাওয়া-থাকা আমার ওখানে। কিন্তু গোকুলের মুখ দেখে তা বলতে পারলো না। মুখে বেরিয়ে এলো—কী ভাবছো বলতো এ্যাতো?

দিলীপ অনেক দিন হোল আসে না। রানী আসে না—

কী হয়েছে ওদের বলতো?

দিলীপটা পাগল! যদি সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতো—তাহলে কী ভালোই যে হোত।

খুব আমুদে লোক কিন্তু। যাই বলো তুমি।

কী আর বলবো। হাসি মুখখানা অনেক দিন দেখি না। ঋষি কলকাতায় বদলি হয়ে এলো—তাও আর আসে না দিলীপ। কেউ ওর টিকি দেখতে পায় না।

তোমাদের খাদানের কাছে আসছেন না?

নাঃ। তবে আর কি বলছি এতক্ষণ।

এখন যদি কেউ মানোয়ারী ঘাট থেকে আকাশবাণী বাড়িটার দিকে তাকাতো—তাহলে দেখতে পেতো—একটা খোলা ফিটন কেমন অনাড়ি চালে একবার নতুন হুগলী ব্রিজের খুঁটি আর ইনডোর স্টেডিয়ামের ভেতর শুধু পারাপার করে চলেছে। রাতের সঙ্গে সঙ্গে শীত বাড়ছিলো—আর ফিটনের ঘোড়াটা একটু একটু করে মুছে যাচ্ছিলো।

তিরিশ লিটারের ট্যাংক দুবার ফুল করেছে দিলীপ। একবার হাওড়া থেকে বেরিয়ে লি টি রোডে পড়েই। আরেকবার চাঁপাডাঙার মোড়ে। অস্টিন কোম্পানী কী গাড়িই বানিয়েছিলো। তেল ফুরোবার নাম নেই। বাইরোডে বোধ হয় গ্যালনে পঞ্চাশ মাইল দিচ্ছে।

সেই কোন্ ভোরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে দিলীপ। জল, মবিল, তেল আর চাকায় হাওয়া থাকলে এ গাড়ি তো বিষ্ণুর রেখা থেকে ককটক্রান্তি— ইলি চলে যাবে।

রানী তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। কাল সবে বাথরুমে। রবির ছেলেটা জেগে গিয়ে দিলীপকে দেখে বিছানা থেকেই হাত নাড়ছিলো। একবার ভেবেছিলো—ওটাকে সঙ্গে নিয়েই বেরোই। ভাগ্যিস বেরোয় নি তা।

রেড রোডে তখনো বেশ কুয়াশা। একবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলো। সেলফ নিচ্ছিলো না। সামনে পেছনে কিছুই দেখা যায় না। চোক টানলেই কারবোরেটরে ময়লা এসে যায়।

পেছন থেকে কালু ঘোষ বললো, তুমি স্টিয়ারিংয়ে বোসো। আমি ঠেলছি।

তুমি আমার চেয়ে বড়। তুমি বরং স্টিয়ারিংয়ে বসো। আমি ঠেলছি।

উহু দিলীপ। এটা সিনিয়রিটির ব্যাপার নয়। তুমি বোসো। আমি ঠেলছি। এখুনি স্টার্ট হয়ে যাবে—

স্টার্টিং ট্রাবল্ কি আগেও ছিলো?

না না। হয়তো ফ্যান বেল্ট ঢিলে হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। গাড়ি খানিক চললেই ব্যাটারি চার্জে এসে যাবে। নাও। ঠিক হয়ে বোসো।

অস্টিন ট্যুয়ারের ওজন এমনিতেই কম। কয়েক মিনিটের ভেতর গাড়ি চালু হয়ে গেল। পেছনে মা তাকিয়েই দিলীপ বললো, উঠেছো?

কখনো!

আজ একটু দমকলের হেড কোয়ার্টারটা দেখবো।

ওদিকে আবার কেন? সেন্ট্রাল অ্যাভিনুতে ফেরার পথে ভিড় হয়ে যাবে কিন্তু।

হোক না। তুমি তো আছো।

ভোরবেলায় দমকলের হেডকোয়ার্টারে লোকজন কম। উল্টোদিকের ফুটপাথে গাড়ি

গাড়ি দাঁড় করিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে গেল দিলীপ। বলতে গেলে কোন পাহারাই নেই।

লাল রঙের লম্বা চকচকে সব গাড়ি। টায়ারগুলো ধোয়া হচ্ছিলো। দিলীপ হাত বাড়িয়ে একটা ঘণ্টা টেনে দেখলো। শব্দ করে লাগানো কিনা—কিন্তু ফল হলো উল্টো। ঢং করে বেজে উঠতেই সবাই ওর দিকে তাকালো।

কাকে চাই?

নাঃ। এমনি।

এমনি মানে? এখানে ঢুকলেন কি করে?

খোলা জায়গা। তাই এসে পড়লাম। ঘণ্টাটা তো বেশ। এ কি কিনতে পাওয়া যায়?

এটা প্রোটেকটেড এরিয়া। বাইরে যান।

কোথায় তৈরি হয় ভাই এসব ঘণ্টা? হলে আমি একটার জন্যে অর্ডার দিতাম। দোকানে তো ঠিক এ জিনিস পাওয়া যায় না। পেলে আমি কিনে নিতাম।

পায়ের রবার বুট হাঁটু অব্দি। ছেলেটি বছর চব্বিশের হবে। তাগড়াই চেহারা। লোমা উঠে দিলীপের দিকে ষণ্ড ষণ্ড পায়ে এগিয়ে আসছিলো।

দিলীপ পিছিয়ে যেতে যেতে ফুটপাথে নেমে পড়লো। রাগ করলে ভাই?

কয়েকখানা লরি যাচ্ছিল পরপর। তাদের ফাঁক দিয়ে দিলীপ ওপারে গলে গেল। ভোরবেলায় কলকাতায় ফুটপাথের সঙ্গে চা আর সিঙ্গাড়ার গন্ধ। স্টিয়ারিংয়ে বসে দিলীপ ফাঁকা রাস্তা পেয়ে একদম হাওড়া ব্রিজের মুখে উড়ালপুলে এসে উঠলো। তার বিজ্ঞ পেরিয়ে গঙ্গার গায়ের ফুটপাথে দস্তকৈবিন। ভিড় নেই। স্টিয়ারিংয়ে বসেই দু খুরি চা আর চারটে সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিল।

কালু ঘোষ পেছন থেকে বললো, আমি এখন আর চা খাবো না। তুমি খাও ভাই।

খাও না। সকালের আড়মোড়া কেটে যাবে।

দু খুরি চা এলো। এক খুরি পেছনে রেখে দিলীপ বেশ তারিয়ে তারিয়ে চা খেতে লাগলো। সেই সঙ্গে সিঙ্গাড়ায় কামড় দিতে থাকলো। ইচ্ছে হচ্ছিল, পেছন ফিরে তাকায় একবার। তা না তাকিয়ে দিলীপ বললো, খুব গরম চা। তাই না?

হুঁ। কোন দিন তো এত ভোরে চা খাইনি।

কি খেতে?

কিছুই না। এখন তো আমি ঘুমে। বেলা নটা নাগাদ ঘুম ভাঙলে আমের সময় খেতাম চিল্ড ম্যাংগো। ঠান্ডা রস একদম লিভারে গিয়ে লাগতো।

তাহলে চা ফেলে দিয়ে সিঙ্গাড়াটা খাও।

ওরে বাবাঃ। কতকালের অ্যাসিডিটি আমার। খাই আর মরে যাই।

গঙ্গা থেকে উঠে আসা কুয়াশা তিন হাত দূরের ঠ্যালাওয়ালাকেও ঢেকে ফেলেছে। দিলীপ পয়সা দিতে নেমে গেল। ফিরে এসে দেখলো—তার সিটে শালপাতায় একজোড়া সিঙ্গাড়া। রাস্তায় তার ফেলে দেওয়া খুরির পাশে আর একটা ভাঙা খুরি পড়ে আছে।

প্রায় ভোররাতে বেরিয়েছে দিলীপ। এসব দেখেশুনে সে মনে মনে নিজেকেই বললো, বেশ তো চলছে। চালিয়ে যাও দিলীপ!

কলকাতা ছাড়িয়ে, হাওড়া ছাড়িয়ে রোদ পোহানোর মত পরিষ্কার পুবের মনে দেখা হতে হতে বেলা প্রায় আটটা। হাইওয়ে দিয়ে অল ইন্ডিয়া পারমিটের দশ চাকা লরির আনাগোনা। তাদের পাশ কাটিয়ে অস্টিন ট্যুরার দিব্যি ছুটছিলো।

পথে তেল নিতে হোল। একবার জল দিতে হোল রেডিয়েটরে। জল দিয়ে রাস্তার পাশে পেচ্ছাপ সেরেই স্টিয়ারিংয়ে এসে বসলো দিলীপ। তোমার কি পিপাসা পায় না?

না। জল আর কতটুকুই বা খেলাম জীবনে।

পেচ্ছাপ পায় না?

কি খাই যে পাবে। আমার চামড়ার নিচেই তো রক্তের বদলে হুইস্কি।

সবটাই শরীরে রেখে দিয়েছো?

এখন তো আগের মত আর স্পোর্টস নেই। টেনিস খেলতাম। সুটিংয়ে যেতাম। ঘাম হয়ে সব বেরিয়ে যেতো।

এখন আবার খেললে পারো।

কখোন খেলবো দিলীপ? সব সময় তো তোমার সঙ্গেই আছি।

আমাকে এবার একটু ছাড়ো কালু ঘোষ।

হ্যাঁ। এই গাড়ি দিয়ে ছেড়ে দিই আর কি। কোথায় চারচাকা কার ঘাড়ে তুলে দেবে তার ঠিক কি? তোমার তো আবার লাইসেন্সও নেই।

পেলাম কোথায়? শিখবার আগেই তো তুমি আমার স্টিয়ারিংয়ে বসিয়ে দিলে।

গাড়ি তখন চাঁপাডাঙার মোড় দিয়ে যাচ্ছিল। খানিক গিয়ে বাঁ হাতের ছোট রাস্তায় নেমে পড়লো গাড়ি।

এটা কি হলো কালুদা?

দ্যাখোনা কোথায় যাই। এখানে মোটে আমি দুবার এসেছি।

কথা শুনবে কি দিলীপ। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি লাফাতে লাফাতে এগোচ্ছিল। শীতকালের বুনো ফুল ফুটে আছে গাছ ভরে। কুলতলায় একটা হুলো বেড়াল। বেলা আড়াইটে তিনটে হবে। রাস্তায় কোন লাইট পোস্ট নেই। তাহলে তো এ গাঁয়ে আলো যায় নি এখনো। তবে মাইকের শব্দ গাছপালার ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে কি করে?

প্রথমবার এখানে আসি মায়ের পেট থেকে। এ গাঁয়েই আমার জন্ম।

তাহলে আমরা এখন কালু ঘোষের গাঁয়ে যাচ্ছি।

না না। আমার গাঁ বলো না। আরেক-বার এসেছিলাম—গাঁয়ের উন্নতি করতে। শুনলে হাসবে তুমি—এ গাঁয়ে দিলীপ একখানা খবরের কাগজও যায় না। কয়েকটা ট্রানজিস্টর আছে। আর আছে কয়েক ঘর ফুঁদুলে মানুষ—। সেকেন্ড বারে এসে অটোমোবিল ইন্ডিয়া থেকে কয়েকটা টায়ার দিয়ে গিয়েছিলাম—

টায়ার?

গাঁয়ের একটা হরিসভা আছে। ওদের দুখানা ঠেলা আছে তারকেশ্বর বাজারে। সে দুখানা টায়ারে চললে বেশি কাজ হতে পারে। হরিসভাও দুটো পয়সা বেশি পায়—

তা এখানে আসবে যদি আগে বললে না কেন?

ঠিক ছিলো না দিলীপ। বড় রাস্তার পড়েই মনে পড়লো। এই তো। বেশ হাত

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট
Glitter
কনজিউমার প্রোডাক্টস
২৮এ, এস এন দাস লেন, কলি—৫০
পরিবেশক ঃ
পাপু এন্টারপ্রাইজ
৪৭।৩৭, আর কে মোম রোড, কলি-৫০

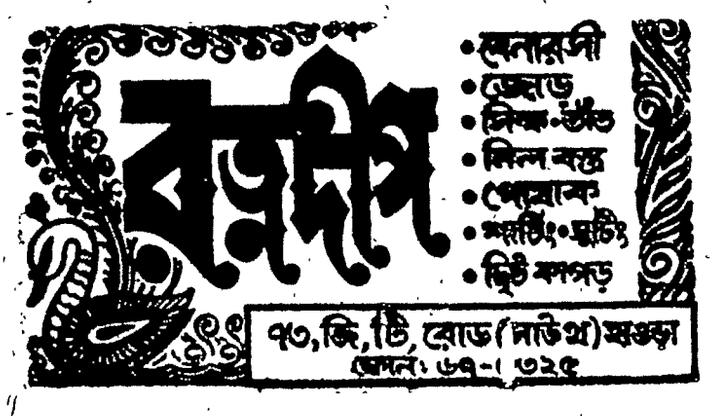

সেট হয়ে গেছে দেখছি। হ্যাঁ—ওই ট্যালির কাছাকাছি থামাবে। দেখো—ফাঁকা জেগে আছে সামনে—

ব্যাটারিতে মাইক বাজছে তাহলে।

তবে না তো কি!

কালুবাবু... লাস্ট কবে এসেছিলে এখানে?

তা বিশ বছর হয়ে গেল। না। তার চেয়েও বেশি।

থেমে থেমে কষতে কষতে গাড়ি দিয়ে একদম কাঁচা ভেতরের গায়ে থামালো। দিলীপ তখনো গাড়ি থেকে নামে নি। সবে স্টার্ট বন্ধ করেছে। আর অমনি ট্যালির চালা থেকে একজন নেমে এসে তার গলায় একটা লম্বা মালা গলিয়ে দিলো। পথে কোন কষ্ট হয় নি তো?

তার কথায় জবাব দেবে কি দিলীপ। কিন্তু বলার আগেই আরেকজন বললো, অনেক দিন পরে আপনাকে দেখছি কালুদা। আমারও চোখের ছানি কাটানো হয় নি। বয়স হচ্ছে—অথচ চেহারা তো পাল্টায় নি এ একদম।

মাইকে তারস্বরে একটি চরণই ঘুরছিলো। ...র কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। হরে রাম। রাম ।

দিলীপ চেঁচিয়ে বললো, আগে মাইকটা থামান তো। কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।

মাইক থামলে দিলীপ বললো, কি বলছিলেন?

মাঠের ভেতর মাইক থেমে যাওয়াতে আচমকা চারদিক একদম নিঃঝুম।

আরেকটা মালা হাতে আরেকজন বয়স্ক লোক, এগিয়ে এসে বললো, প্রায় আট-দশ মাস আগে এ অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে আপনাকে পত্র দেওয়া হয়েছিলো। আপনি যথার্থই জন্মভূমিকে ভালো-বাসেন। ঠিক মনে রেখে চলে এসেছেন।

দিলীপ কি বলতে যাচ্ছিলো। আরেকজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। খালি গা। ন্যাড়া মাথা। চেহারায় কিসের একটা মর্যাদা যেন। বললেন, আপনার দেওয়া সে চারখানা টায়ার আজও আছে—ক্ষয়ে গেছে অবিশ্যি—

এবারে দিলীপ সত্যিই চমকে উঠে তার পেছনে তাকালো। কোথায় কে! পেছনের সিট একদম খালি। একটা গরু এগিয়ে এসে গোটানো হুডের পুরনো ক্যাম্বিস কামড়াচ্ছিল। দিলীপ তেড়ে গিয়ে গরুটাকে সরিয়ে দিলো।

অনেকেই অনেক কথা বলছিলো। কারও বয়স পঞ্চাশের নিচে নয়। তাহলে কি এ গাঁয়ে সবাই বুড়ো? এরা কি খবরের কাগজ একদম দেখে না? নইলে?

একটি ছোট ছেলে কোত্থেকে এসে তার হাতে একটা গন্ধরাজ ফুল তুলে দিলো।

শোনো শোনো। তুমি কে গো?

আমার মা হরিসভায় ভাত রাঁধে।

ও। আমি কে বল তো?

অভয় পেয়ে ছেলেটি বললো, আপনি তো বিখ্যাত কালু ঘোষ। এ গাঁয়ে আপনার জন্ম। আপনি একবার হরিসভায় ঠেলায় জলে বিনি পয়সায় চারটে টায়ার দিয়েছিলেন।

সে ঠেলা তুমি দেখেছো?

চড়েছি। একবার হরিসভার জন্যে এক ঠেলা মুটে এনেছিলাম—

ওঃ!

বিকেলের দিকে গরম কোটিয়ে লোক এলো। কাছাকাছি ইস্কুলের গুটি কয় ছেলে শ্লোগান দিলো, জয়! কালু ঘোষের জয়!!

অনেকেই শুনেছে, কালু ঘোষ ষড়-লোক। একজন তো মাইকে দাঁড়িয়ে বলে গেলো, এ গাঁয়ে ওঁর জন্ম। এ গাঁয়ের কথা উনি ভুলতে পারেন না। এ দেশেই ওঁর বাবা-মা দেহ রেখেছেন। বালক বয়স থেকে কষ্ট করে উনি বড় হয়েছেন। নিজের অধ্যবসায়ের গুনে। তবু মাথা ঠান্ডা আছে। কতদিন আগের নেমন্তন্ন। তবু মনে করে চলে এসেছেন। এই তো মহৎ মানুষের লক্ষণ।

দিলীপ মনে মনে রেগে যাচ্ছিলো। এ কোথায় আমায় ফেলে দিলে কালুদা। এ তোমার জন্মভূমি হতে পারে। কিন্তু আমার কি? আমার তো কোন মায়া নেই এখানকার জন্যে।

ঘোষ মশায়। এবার আপনি কিছু বলুন—

অগত্যা—

মাইক ধরেই দিলীপ বললো, আপনাদের এই ঘোষকাঠি ধন্য। ধন্য আপনাদের জন্মভূমি। ধন্য এই হরিসভা।

বেশ জোর দিয়ে থেমে থেমে বলায় সারা গাঁয়ের মানুষ কী যেন খুঁজে পেলো এই সামান্য কটি কথায়। তারা সবাই এক সঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলো। হরিসভার ন্যাড়া মাথা ভদ্রলোকটি বললেন, সাধু! সাধু!

বোঝাই যাচ্ছিল—এখানে কেউ গত বিশ বাইশ বছরে কালু ঘোষকে দেখে নি।

এই ঘোষ কাঠির আমিও একজন। আমিও একজন ঘোষ। আমার শিরায় শিরায় ঘোষকাঠি রয়েছে। এখানে দিলীপ তার ডান হাতখানা মেলে ধরলো। এই শিরায় রয়েছে ঘোষ কাঠির রক্ত।

সন্ধ্যের অন্ধকারে ধান কাটা মাঠ দিয়ে কুয়াশা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিলো। মাঠের ভেতর দিয়ে গো-গাড়ি বিচালি বোঝাই হয়ে সব মাস্তান উঠছিলো। তাদের ওপর গাড়ির ছেড় লাইট পড়তেই গরু চমকে লাফাচ্ছিল।

গাড়োয়ানরা চেঁচাচ্ছিলো। আলো নেভান। আলো নেভান কালুবাবু—

চাপাডাঙার মোড় ছাড়িয়ে দিলীপ তেতো বিরক্ত হয়ে কলকাতার পথ ধরলো। এটা কি হলো কালু?

আমিও তো এ রকম ভাবি নি দিলীপ।

তোমার মাথায় যে কত মতলব ঘুরে তা কে বলতে পারে। আজ যা হোক ভালো শিক্ষা দিলে আমায় কালুদা—

আমি এ-সব কিন্তু একদম ভাবি নি।

আর কেন। এবার কালুদা আমার পাশে এসে বোসো।

না। পেছোনেই বেশ আছি। কাটিয়ে কাটিয়ে এগোও। লরি ছাড়ার সময় হয়ে এলো।

ওপর থেকে যদি কেউ দেখতে পেতো—তাহলে ছবিটা এখন এরকম। ভারি ভারি লরির সারির ভেতর দিয়ে একটা পুচকে গাড়ি দুলে দুলে এগোচ্ছে। কখনো দুলকি চালে। কখনো—হুড়মুড় করে। লরিগুলিরই যেন ভড়কে যাচ্ছে।

কালু ঘোষ বললো, এবার দিলীপ তুমি একটা লাইসেন্স করাবে।

লাইসেন্স আমায় দেবে না কালুদা—

কেন? বেশ তো চালাচ্ছো।

এ-গাড়ি শুধু চালাতে পারি। অন্য গাড়িতে উঠলে সব গুলিয়ে যায়।

যাঃ। ইয়ার্কি করছো।

সত্যি কালুদা। আমার অ্যাকসিডেন্টের তো আজকাল বেশির ভাগ সময় পড়ে থাকে। ইউজই হয় না একদম।

(চলবে)

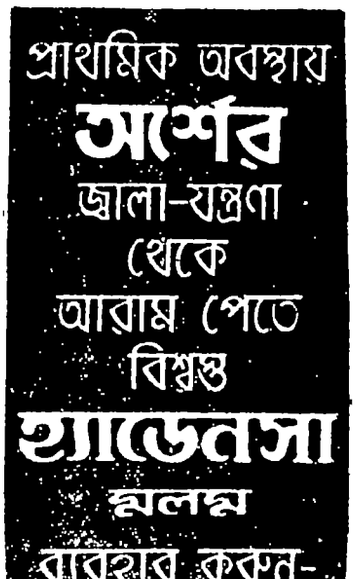

তৃতীয় প্রেমিক

ওরা দুটি শিশু যখন খেলা করে মন্মথ জানলা দিয়ে তা দেখে।

জানলার পর্দা বাতাসে উড়ে গেলে তার ফাঁক দিয়ে নজর পড়ে যায়, চোখে ধরা না পড়লেও তাদের হাসি বা চীৎকার সব সময়ই কানে এসে বাজে তার।

এমন কি অফিসেও বন্ধ কামরায় যেখানে পেডেস্টাল পাখার ভোঁ ভোঁ এবং এক টন ওজনের এয়ার-কন্ডিশনারের গোঙানী ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই সেই নির্জন ঘরে বসে ওদের কলকণ্ঠ শুনতে পায় মন্মথ ঘাড় গুঁজে কাজ করতে করতে।

একসিকিউটিভদের জন্যে বিশেষ কামদার তৈরি চেয়ারে বসে মন্মথ ভাবে তার ঘর পেরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেই কি ওদের দেখতে পাওয়া যাবে। কেমন ভ্রম হয় যে দরজার ওপাশেই হয়ত দুজনেই খেলছে একই রকম আনন্দে মত্ত হয়ে। মন্মথ সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই লজ্জা পেয়ে যে যাবে হয়ত দুদিকে দুজন।

লাল রংয়ের বিসিভারটা তুলে নিয়ে কথা সুরু হয় দত্তচৌধুরীর সঙ্গে। এ আর এক জগৎ। সরকারী লোন, রপ্তানী বাজার ইউ-নিয়নের সঙ্গে পাঞ্জা লড়া। কথা বলতে বলতে মুখের উল্টো দিকে হাত বুলোয় মন্মথ। গাল খস্ খস্ করছে এখনই। মীটিং-এর আগে ইলেকট্রিক শেভারে আর একবার শেভ করে নিতে পারলে ভাল হয়। খানিক আগে থেকে মাথা টিপ টিপ সুরু হয়েছে; বোজ তিনটে নাগাদ মাথা ধরাটা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেয়ারাকে কফি আনতে বলে এ্যাসপিরিনের শিশিটা দেরাজ থেকে বার করে টেবিলের ওপর রাখে মন্মথ।

তার সেক্রেটারী এসে ঘরে ঢোকে। এতক্ষণ বোধহয় বাইরে অপেক্ষা করছিল সুনন্দা। একটা ফাইল এগিয়ে দেয় সামনে; কী নিখুঁত টাইপ। নিজে যেমন পরিপাটি সুনন্দা তেমনি তার কাজ। প্রতিদিন শাড়ি পাল্টিয়ে আসতে ভুল হয় না তার। ব্লাউজের ছাঁটকাটেও আভনবত্ব চোখে পড়ে। লাবণ্য অত্ত ধোপদুরস্ত নয়। সুনন্দা ডিভোর্সী, পাঁচ বছর সংসার জীবন কাটানোর পর ইদানীং স্বামীকে ছেড়ে একা থাকছে। কিন্তু আগে বা পরের অবস্থার মধ্যে কোন তফাৎ খুঁজে পায় না মন্মথ। অন্তত যাইরে থেকে।

পর পর দুটি জটিল বিষয়ের ওপর ডিক্টেশন দিতে হয় মন্মথকে। ফার ইস্টে সার্ভে ইনস্ট্রুমেন্টের চাহিদা বাড়ছে, মন্মথ সেলস্ অফিসারদের অবহিত করে তুলতে চায় সে বিষয়ে। কোম্পানী বাণিজ্যনীতিতে একটা নতুন কারখানা খুলেছে ফাইবার গ্লাসের। এখন জানা গেছে যে সে জমি নিয়ে একটা লিটিগেশনের মামলা ঝুলছে মাদ্রাজ হাইকোর্টে তার ওপর ল অফি-সারের একটা নোট লিখে পাঠাতে হয় তাকে। সুনন্দা মুখ নীচু করে লিখতে লিখতে একবারও মাথা তুলে দেখে না তাকে। মন্মথ প্রায় সর্বক্ষণ তাকিয়ে তাকেই দিকে। লোভ নয়, বিস্ময় সে দৃষ্টিতে। কী

করে এত ফাট ধরে নিজেকে সুনন্দা। এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে যাবার পরেও তুচ্ছ এক্সিকিউটিভিসাইটে একটু চিড় খেল না, গালের তুল তেমনি মসৃণ রয়ে গেল এ মন্মথকে কাছে বড় রহস্যময় মনে হয়।

একা থাকে ও গ্যারেজের ওপর একটা ঘর নিয়ে মন্মথ এই রকম শুনেছে। পাঁচ পাঁচটা বছর বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর একটা মেয়ে কিভাবে তার এই একার জীবনকে মেনে নিতে পারে ভেবে মন্মথ অবাক হয়। একটা ভেবেও ফেলেছিল। সে তার বাবার কাছে থাকে, সুমিত নাকি কোর্টে আপীল করেছিল সুনন্দার কাছে থাকলে ছেলে মানুষ হবে না। সুনন্দা চরিত্রের ওপর কটাক্ষও ছিল সে আবেদনে। এখন সে একা একেবারে। সুনন্দার অনেক বৈশিষ্ট্যের একটি সে অতিরিক্ত চাপা স্বভাবের মেয়ে। মন্মথ না হয় অন্য গ্রহের মানুষ, কিন্তু তার সমগোত্রীয় যারা তাদের কাছেও সুনন্দা তার জীবন বা অবস্থা নিয়ে একটি কথাও না বলে থাকে কি করে এই মন্মথের কাছে অস্বাভাবিক লাগে। এটা কি সুমিতের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের কারণে অশৌচ পালনের ধারা না কি পুরুষ জাতটা সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা থেকে এই নিরাসক্তি— আসল কারণটা ঠিক স্পষ্ট নয় মন্মথের কাছে।

সুনন্দার সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলে লাবণ্যর কথাও মনে আসে তার সঙ্গে সঙ্গে। ওর মুখের অমায়িক হাসি কি তার মনের সব সংশয়কে পরিষ্কার করে দেয়? কোন সন্দেহ জাগে না তার অবচেতনে কি ইচ্ছে চরিতার্থ করছে তা নিয়ে? মেয়েরা কি সত্যি পরস্ত্রীকে তাদের মনের ভেতর এমন নির্লিপ্তভাবে করুণা দিতে? সাকে তারা ভালো বাসতে চায় তাকে নিঃসর্তে দিতে পারে ছিনতাই? কোন গোধূলি বেলায় অসতর্ক লগ্নে মানুষের জীবনের প্রকাণ্ড কি প্রশ্ন পুরুষ তাদের মনের দিগন্তে ঝলকে দেখা দিয়ে তাদের সব সান্ত্বনা বাণান এলো মেলো করে দিতে চায় বিনা ঘোষণায় ইচ্ছে করে মন্মথের। লাবণ্য কতখানি ভালবাসে সহদেবকে? আজ কেন সুনন্দা সবকারের মসৃণ কাঁধ এবং বাহুর কোমলতা অনেক মানুষের স্মৃতি দেখে এই প্রশ্নই পরল হয়ে মনে। তাকে ঘরে নিয়ে আসার প্রথম দিনকার সেই অস্থির উত্তাল দিনগুলোয় যখনই লাবণ্যকে মনে মনে এ প্রশ্ন করত সে তখন সে তার সহজ হাসি মাখা মুখ দেখে বড়ই অসার মনে হয় ও কঠিনটা আমার একেবারেই মাথায় ঢোকে কিছু আর বাকি নেই। এমন কি সুমিতও যেন মনে হয় ও তামাসাই সন্তান।' মন্মথের কটা মন্তব্য মনে করে-আটার মেয়াদ ছিল। সেটা ফুরিয়েছে এখন সে মকতির নিঃশ্বাস ফেলেছে স্বস্তিবোধ এই রকম কথা বলে সে অস্বস্তি করতে চেয়েছে মন্মথকে। হ্যাঁ, আশ্বস্ত, মন্মথ তাই হতে চেয়েছিল, লাবণ্যর তরফে সেটা জানাবার জন্যে কোন কৈফিয়তের দরকার ছিল না এমনি সহজভাবে সে মিশিয়ে দিয়েছিল মন্মথ আর তার নতুন জীবনের সঙ্গে।

বিয়ে তো তারই সঙ্গে হওয়ার কথা ছিল। দু পরিবারের লোকই জানতেন তাদের সম্পর্কের কথা। বিয়েটা না হওয়ার আর কোন কারণ ছিল না যদি না মন্মথ ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা নিতে কানাডা পাড়ি দিত তিন বছরের জন্যে আর লাবণ্যর বাবা অবিনাশ মুখুজ্জের হার্টের অসুখে হঠাৎ হয়ে তাকে পাত্রস্থ করে যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হতেন। মা-বাবা হারা মেয়েকে এতদিন চোখে চোখে রেখে শেষ বয়সে তাকে একা মেয়ে পৃথিবী ছেড়ে যেতে মন সায় দেয় নি অবিনাশের। বিয়েটা তাই ঘটে গিয়েছিল। বাড়ি ভর্তি লোকজনের সোর গোল, সানাইয়ের আলাপের মধ্যে লুকিয়ে কে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল সে খোঁজ নিতে মাথা ব্যথা হয় নি কারো।

তারপর বিদেশ থেকে ফিরে পুরনো অনেক কিছু ভাল লাগার জিনিসকে ঘিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যকে নিজের করে নেওয়ার একটা অস্থির ইচ্ছে দুর্বার করে তুলেছিল মন্মথকে। লাবণ্যও তার বুকে মাথা রেখে সেই একই ইচ্ছের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিল তাকে না পেলে সে বাঁচবে না। তখন নিমিত্ত সহদেবকে না জানিয়ে লাবণ্য দেখা করত মন্মথের সঙ্গে, পার্কসার্কাস ফোন থেকে ফোন করত ভর দুপুরে তার অফিসে। অবিনাশবাবু তার আগেই গত হয়েছেন, বাধা মন্মথের বাড়ির দিক থেকেও নেই। ডিভোর্স পেতে অসুবিধে হয় নি লাবণ্যর। বেস খেলে আর মদ ডুবে সহদেবের অবস্থা তখন চরমে উঠেছে। মোটা টাকা খেসেছিল অবশ্য মন্মথের। ফ্যাক্টরীর ছ' মাসের ভাড়া তা দিয়ে মিটিয়েও ফুর্তি করার জন্যে আরও কিছু রয়ে গিয়েছিল সহদেবের হাতে। এক রবিবারে সে আর লাবণ্যকে তার ফ্ল্যাটে তুলে অনায়াসে চলে এসেছিল সে তার লেক মেসের ফ্ল্যাটে। সব কিছু এত সহজে মিটে যাবে তা ভাবতে পারে নি মন্মথ। সহদেব উবু হয়ে মেজেতে রবিবারের স্টেটসম্যান ছড়িয়ে পড়ছিল। মালপত্র নিয়ে ওরা চলে আসার সময় বারান্দায় এসেও দাঁড়ায় নি লোকটা। লৌকিকতা করার চাইতে মন্মথের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা নেওয়ার লক্ষ্যটাই মাথা নীচু করে রেখেছিল ওর সর্বক্ষণ।

বোর্ড মীটিং সুরু হওয়ার মুখেই বৃষ্টি নেমেছিল। সাড়ে ছটা নাগাদ মীটিং রুম থেকে হলে পা দিয়েই সুনন্দাকে দেখে অবাক মন্মথ। এ কি তখনি যান নি এখনও?

সুনন্দা মুখ তুলে ম্লান হাসে। বোধহয় অফিসের বাঁধা সময়ের পর দেখা বলেই হাসতে পারল অমন করে। 'দেখুন না বৃষ্টির জন্য আটকে যেতে হল। ছাতা আনি নি সঙ্গে। মুকুলকে পাঠিয়েছিলাম, ট্যাক্সি না পেয়ে সে-ও ফিরে এল।'

টাইয়ের নটটা একটু আলগা করে দেয় মন্মথ। ঘানলা দিয়ে দেখে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি তখনও সমান জোরে পড়ে চলেছে। সুনন্দার মত সব-নিভৃতা মেয়েও যে এখনও এমন অসহায় বোধ করে তা যেন সে এই প্রথম জানল। 'চলুন, আপনাকে আমি নামিয়ে দিই। ভবানীপুরে হয়ে তো আমাকে যেতেই হবে।' এমন আন্তরিক প্রস্তাবের জোরে না বলা সম্ভব হয় নি সুনন্দার পক্ষে।

দোরগোড়া থেকে রিটায়ার ফিরে যেতে দেয় নি সুনন্দা। প্রথম বর্ষণে হলে সমস্ত পাড়া এবং বাড়ির যে ওরকম ভাব বাস তা আশ্চর্যভাবে নীরব। তার মেজানাইন ঘরে বসে চারদিক তাকিয়ে সুনন্দার রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারে নি মন্মথ। ওই ঘরটুকুর মধ্যে তার একার সংসার কী সুন্দর গুছিয়ে রেখেছে সুনন্দা। বিচ্ছেদের পরে তার ব্যক্তিত্বে তিনিস অনেক কমে গেছে বলেই এই ঘরে সব সাজিয়ে রাখতে পেরেছে বলে মনে হয় মন্মথের। ইলেকট্রিক হীটারে কফির জল চাপিয়ে ডাগন-ধার পর্দা ওপর দিয়ে যখন শাড়ি পাল্টান সুনন্দা, মন্মথ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখে।

বাইরে বৃষ্টির বেগ কমে আসলেও মন্মথর মনের মধ্যে এটা প্রবল হয়ে যেন বেড়েই চলছিল। আর এভাবে সুনন্দার সঙ্গে তার মধ্যে আসা, তাকে ছোঁয়া পাওয়া, এ বিকেল ইতি যেন স্পষ্ট বুঝিয়ে না তার কাছে। সে কি তার সুনন্দা সম্বন্ধে সব কৌতূহল—যেন টিন থেকে প্রকৃতি আস্বাদন করে সে মেয়েদের ঘরে ঘরে জীবনের স্বাদ ফুরোতে ফিরে জানতে পারে সে-ই মোক্ষম নারী?

মাথা ঘন ঘন নেড়ে, চোখে এমন ঘোরের মত এক ধরনের অস্বস্তিকর ভাব ফুটিয়ে তুলে মন্মথ কফির কাপে মন দিতে চাইছে আর পারছে। পাশে ডিভানে সুনন্দা সবকারের চলাফেরা দেখে মনে মুখ মোছে রুমাল দিয়ে, এই ঘরে ঢোকার সময়ে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে কেন বুঝে উঠতে পারে না।

ঘরের একটিমাত্র চেয়ারে বসে কাগজ এবং পত্র-পত্রিকা। পাশে কফি রাখা ছোট্ট সে সব সরিয়ে টেবিলে ওপর রাখতে গিয়ে চোখে পড়ে কাপের নীচে ছোট্ট-গোল। ঘড়ি একটির ওপর নিচে নাক এবং বন্ধুদের ঠাট্টা করে মত বুঝি হয়েই চোখ। মন্মথ তুলে তাকে এক ঝিলিক চোখে সুনন্দা মুখ নিচু করে নিয়ে ঘরে সে আবার মুখ তোলে নিজের মন্মথের প্রশ্ন তোলে নিজের সুনন্দা মনে তাকে নিয়ে বিব্রত হয়। নিজে ঘরে ঘরে সুনন্দা সবকারের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিয়ে ভয় ভয়

স্কুল স্টুডেন্টের ফ্ল্যাটে চলাচলি ভালবেসে পাড়ায় প্রায় উপকণ্ঠের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সুনন্দা নিজের পেয়ালা রাখে ফোটোগ্রাফের ওপরেই—যেন মন্মথের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছে সে শুধু সুমিতকে নয়, তার এক ভীরু দুর্বলতাকেও। 'ও তো একটা ইতরের মত ব্যবহার করেছিল আপনার সঙ্গে, তার পদের উপযুক্ত গাম্ভীর্য নিয়ে ঘোষণা করে মন্মথ, তার কোন চিহ্নই রাখা উচিত হয় নি আপনার....।' কিন্তু মন্মথকে থেমে যেতে হয়—এ তার চেম্বারে ক্ষিপ্র হাতে নোট নিতে ব্যস্ত সুনন্দা নয়। মুখ তার তেমনি নামানো, চোখের তারায় কি ভাষা লেখা, তা দেখা যায় না সে কারণে; কিন্তু একটি ক্ষীণ জলের ধারা গাল বেয়ে নেমে যেন এই বর্ষণ ক্লান্ত সন্ধ্যার সঙ্গে একটি আশ্চর্য মিল রচনা করতে চায়।

কফি বিস্বাদ লাগে মুহূর্তে এবং মন্মথ স্থির সিদ্ধান্তে আসে যে মেয়েরা স্মৃতিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে—স্মৃতি এবং প্রথম পুরুষ তা সে যত দুর্বল এবং দুশ্চরিত্রই হোক না কেন তাতেই অনড় এবং মগ্ন থাকে তাদের ভালবাসা। অন্য সব মানুষ এবং বস্তু পরগাছার মত বেড়ে ওঠে আশেপাশে। গাড়ি চালাতে চালাতে সে অন্যমনস্ক হাতাজল ছিটিয়ে দেওয়ায় বিষকৃত পথচারীর ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ করে না এই চিন্তায় বিব্রত থেকে সে লাবণ্য সম্ভবত এখনও সহদেবের স্মৃতিকে লালন করে সেই যত্নে যেমন সে আসল মানুষটাকে করত বিয়ের পর—মন্মথ যখন সুদূর বিদেশে। মন্মথের কাছে সে ফিরে এসে ধরা দিতে চেয়েছে হয়ত খেয়ালের বশে কি একটা স্বাদ বদল করবার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু সহদেব যেখানে ছিল সে আসন থেকে তাকে নড়াতে পারে নি না মন্মথ, না লাবণ্য নিজে।

এমন কি তার ঘরে যেদুটি শিশু তাদেরও নিশ্চয় লাবণ্যর স্নেহের ভাগতমা আছে। লাবণ্যের পক্ষে দুজনকে যে সমানভাবে ভালবাসা সম্ভব নয় এটা যেন খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় এখন মন্মথের। অর্থাৎ মন্মথই বহির্বাগত এ সংসারে—যে হৃদয়াবেগের বশে সুনন্দার পক্ষে দ্বিতীয় সঙ্গীকে বেছে নেওয়া সম্ভব হয় নি সেই একই কারণে লাবণ্য তাকে দিতে পারে নি সেই চিরশুদ্ধ প্রেম, যা সে নিঃশেষে দিয়েছে সহদেবকে। নিজেকে বড় দীন এবং নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় মন্মথের—লাবণ্যের সঙ্গে এল বিছানায় কাটানো কিছু রাত, হাসি-আনন্দের দিন এবং তার আলোছায়াময় মুখের নানা ভাব, এখন ছায়াছবির মত গতিশীল হয়ে তার দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে চায়।

গাড়িতে চাবি আটকে প্রায়ান্ধকার গ্যারেজে দাঁড়িয়ে সে কি ভাবে। এখন লাবণ্যের মুখোমুখি হওয়াটা কিছু সমস্যার বলে মনে হয় তার কাছে। লাবণ্য এখনও সহদেবকে ভালবাসে কিনা এ প্রশ্ন মনে জাগলেও মুখ ফুটে তা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ হওয়া স্বাভাবিক তার পক্ষে। এর উত্তর যাই হোক, আজ যে কাঁটা অন্তরে বিদ্ধ হয়ে থাকল তার, সে ক্ষত থেকে জীবনভর রক্তক্ষরণ হতে থাকবে আর মন্মথই শুধু জানবে তার কী জ্বালা। আর যদি সে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে নীরব থাকে, তবে লাবণ্যর প্রতি অবিশ্বাস তার বেড়ে চলবে যার জের সংক্রামিত হতে থাকবে দুটি শিশুর জীবনেও। ঘুমন্ত মৌকে কতদিন লক্ষ্য করেছে মন্মথ, টুসি-টুসির থেকে ওর তফাৎ কতটা আর সহদেবের সঙ্গে মিল ওর কোন্ কোন্ জায়গায়। লাবণ্য শুনে হেসেছে, 'সবাই তো বলে ওর নাকি আমার মুখ বসানো, বাপের কিছু পায় নি বরং ঠাকুমার সঙ্গে মিল আছে খুড়তিনের কাছটা।' এখনও সহদেবই মৌয়ের বাপ, এই কঠিন সত্যটা শুনতে ভাল লাগে নি মন্মথের। অত দূরে থেকেও প্রতি মুহূর্তে এখানে উপস্থিত রয়েছে সহদেব—শুধু সন্তান নয়, লাবণ্যর স্মৃতি বা আর কিছুর মধ্যে সে রয়েছে কিনা, যেমন আজ সুনন্দা সরকারের টেবিলের কাঁচের আড়াল থেকে ভেসে উঠল সুমিতের মুখ—তেমনি কোন দিন লাবণ্যর অসাবধানে রাখা কোন আসবাবের ফোকর থেকে সহদেব মূর্তিমান তার সামনে আবির্ভূত হলে কেমন করে সে তার মুখোমুখি দাঁড়াবে মন্মথ ভেবে পায় না।

তার দেরীতে ফেরা নিয়ে কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে না লাবণ্য। বোধহয় বুঝতে পারে অফিসে কাজ বা সন্ধ্যার বৃষ্টি নামার দরুণ সে আটকে গিয়ে থাকবে। লম্বা ড্রইং রুমটার দোরগোড়ায় পা দিয়ে লাবণ্যর দিকে চোখ তুলে তাকাতে বাধো বাধো ঠেকে মন্মথের। তার দেরীতে আসার কারণ জিগ্যেস করবে লাবণ্য এবং তাই থেকে কথা সুরু হবে এই রকম অনুমান করে চুপচাপ থাকে সে। কিন্তু লাবণ্য কোন কথা পাড়ে না, মন্মথ বাড়ি ফিরলে তার যা যা করার তাই করে যায় নীরবে। করিডর পেরিয়ে মন্মথ বেডরুমে যা দেখে, পেছনে লাবণ্য। দুটি শিশুই ঘুমোচ্ছে পাশাপাশি। একেবারে ডিনার খেয়ে নেবে তো? মৃদু স্বরে শুধোয় লাবণ্য। গলা থেকে ফাঁস খুলে টাইটাকে মুক্তি দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে মন্মথ জবাব দেয়, না। আগে এক পেয়ালা গরম কিছু দাও, তারপর স্নান করবো....

পোষাক বদলিয়ে সে সোফায় গা ঢেলে দিয়ে বসে। কিচেনে লাবণ্য কাজে ব্যস্ত, চীনে মাটির বাসনে তার হাতের রুপোর চামচের শব্দ দূর নদীর জলোচ্ছ্বাসের মত কানে বাজে এবং মন্মথ ভাবে কেন মানুষের পছন্দ মাফিক গড়ে ওঠে না জীবনের প্যাটার্ন। প্রতিমুহূর্তে ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ—এ কি তার নিয়তি? সে নিজে সুখী হওয়ার জন্যে উদ্যম এবং পরিশ্রমের ত্রুটি করে নি। লেখাপড়া শিখেছে নিষ্ঠার সঙ্গে বরাবর মেধা দিয়ে এবং বিদেশে গিয়ে সসম্মানে ডিপ্লোমা আর করে এনে তবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছে। এবং সুখী হওয়ার বাসনাতেই অনেক দ্বিধা কাটিয়ে লাবণ্যকে নিয়ে এসেছে ঘরে। কিন্তু আজ যেন সব হারানোর ভয় তাকে পেয়ে বসেছে, মিথ্যে এক ভালবাসার মোহে এত পরিশ্রম করেছে কেন, সেই আক্ষেপটাই এখন মাথা কুটছে মনের ভেতর।

সামনে টিপয়ের ওপর ফোকোর পেয়ালা রেখে লাবণ্য ওপাশের শান্তি-নিকেতনী মোড়ায় বসে। আজ তার সরল সুন্দর মুখ যেন কিছু করুন। মন্মথ লুকিয়ে সে মুখ দেখে। হয়ত এমন বৃষ্টি থেমে যাওয়া ভিজে সন্ধ্যার ভাব মনে এসে ফেলে সহদেবের ভাবনা। লম্পট হলেও লোকটা তাকেই আঁকড়ে থাকতে চাইতো, সন্দেহ করলো বলেই চোখের আড়াল হতে নিজে আপত্তি ছিল প্রবল। মন্মথকেই বা এখন কতটুকু পায় লাবণ্য। বড় চাকুরেদের সহধর্মিণীদের এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা আটানোর দুঃখ হয়ত লাবণ্যের মনের মধ্যেও ছায়া ফেলে যায় কখনও।

আর কিছুক্ষণ আগে এলে যতীনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, লাবণ্য বলে মন্মথকে ছেড়ে যাবার সময়ে ওর ব্যাডমিন্টন তুলে রাখতে বলছে।

যতীন? প্রশ্ন করেই মন্মথের মনে পড়ে যায় ছেলেটিকে দু একবার দেখেছে সে সহদেবের ফ্ল্যাটে। ভাগ্নেকে নিয়েই বরাবর থাকত সহদেব। বছর দুই আগে দমদমে আলাদা বাসা করে যতীন উঠে যায় সেখানে। হঠাৎ সে এখানে....? একটু কি বেশী রুক্ষ হয়ে যায় মন্মথের প্রশ্নের ধরণটা।

খবর একটা ছিল, তাই দিতে এসেছিল, চোখের পাতা কয়েকবার ওঠানামা করে লাবণ্যের, বিকেল পাঁচটায় মামা মারা গেছে ওর। যতীনের বাসাতেই ছিল শেষের দিকে। মদ খেয়ে খেয়ে তো লিভারের আর কিছু ছিল না। দেহ করে ফেলবার পথে দিতে এসেছিল খবরটা, উঠে দাঁড়ায় লাবণ্য। এবার ডিনারে বসবে তো তুমি? খাবার গরম করি তোমার? আজ চিকেন বানিয়েছি....

শুনে মন্মথ কিছু বলে না। চায়ের পেয়ালা হাতে নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে লাবণ্যের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ আগে সুনন্দা সরকারের আনত মুখখানির দিকে তাকিয়েছিল সে এমনই বিস্ময় ভরে। সুনন্দা এবং লাবণ্য এরা সেই নারী যাদের প্রকৃতিতে ভালবাসাটাই একমাত্র সত্তা, বাকিটা কিছু নয়। নিজেকে তৃপ্ত এবং পূর্ণ করবার প্রয়াসেই সেই প্রবৃত্তিতে নিষ্ঠা, বাকি যা কিছু, সহদেব সুমিত বা মন্মথ নিজে তারা সে শুধু উপলক্ষ্য বা মাধ্যম মাত্র সে শিল্পীকে মূর্ত করার—এ সত্যটা এখন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে মন্মথের চোখে।

কেউ বলে ডাকাত কেউ বলে বিপ্লবী

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

প্রথম দিন আমরা ব্যাঙ্ক আক্রমণ স্থগিত রাখতে বাধ্য হই যেহেতু আমাদের তৈরী আমার গাড়ীর মেরামত কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় দিন এই গোলমাল হওয়াতে অর্থাৎ ডিনামাইট আবিষ্কার করার পর মিলিটারী ও পুলিশ সচকিত হয়ে যায়। তাই দ্বিতীয় দিনও অ্যাকশন্ করা সমীচীন বলে মনে করিনি। ডিনামাইট পুলিশ আবিষ্কার করেছিল সকালবেলার দিকে। প্রায় বারটার সময় পুলিশ মাঠে একটু দূরের জায়গার ভিতর 'গাদা কামান' উদ্ধার করল। গাদা কামান অর্থাৎ পুরু স্টীলের চোঙা যার ভেতর বিস্ফোরক দ্রব্য পোরা ছিল। সেগুলিকে টেন্ড মর্টারের মত ব্যবহার করা হত। এই জংলা জায়গাটি থেকে ট্রাঙ্ক রোডের পাশে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের গুর্খারা পাহারা দিত। যেকটি 'গাদা কামান' ওখানে পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো ঐ সৈন্যদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে বসান ছিল। ঐসব তথ্য আমরা বিচারের সময় সাক্ষীদের বর্ণনায় শুনতে পেয়েছিলাম। আর কোর্ট আদালতে ট্রাইবুনাল জজের কাছে গাদা কামান তারা হাজির করে।

এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি এক কোটি টাকা সহজে ব্যাঙ্ক লুঠ করা যেত না। ব্যাঙ্ক লুঠ হওয়ার পরে সি আর পি, বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার্স রাইফেলসের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই যদি আমরা ডাকাতিটি নিঃশব্দ রজনীতে সারতে পারতাম তবে এই বিরাট প্রতি আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেতাম। সেইজন্য জালিয়াটে 'মা'র পূজা দিয়ে এই কাজ করা সম্ভব নয়। তা সম্ভব করতে হলে আমাদেরই করতে হবে তা বুঝেছিলাম। তার জন্য শক্তি অনুযায়ী আমাদের একটি গেরিলা প্ল্যান বাস্তবে পরিণত করতে যাই। সেই জন্য আমাদের ম্যানেজারের বাড়ির পাশে বহু কষ্টে একটি বাসা ভাড়া করতে হয়। সম্ভাব্য এবং বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখিয়ে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। সেই কমরেডের একটি গাড়ীও ছিল, কমরেডটি তক্কে-তক্কে ছিল। একদিন ম্যানেজারবাবুকে অফিসে যাওয়ার পথে বা অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়ীতে তুলে নেবে। বেশ কিছুদিন এইভাবে চেষ্টা করে সে খুব সাফল্যের সঙ্গে তাকে তাঁর প্রতিবেশী পরিচয়ে গাড়ীতে তুলে নিয়েছিল। ম্যানেজারবাবু তারপর থেকে মাঝে মাঝে তার বাসায় আসতো যেতো। কাজেই ব্যাঙ্ক থেকে তার বাড়ি যাওয়ার পথে কোন এক সময় তার কাছ থেকে চাবিটি জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হবে তা ঠিক ছিল। ক্যাশিয়ারবাবুকেও অনুসরণ করে ও তাঁর প্রতিবেশী হিসাবে ভাব জমানো হল। ডিসিসটি খুবই শক্ত, আবার তেমন শক্ত নয়, যদি প্ল্যান করে সুপরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী চেষ্টা করে যাই। ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজারবাবুকে তাদের অফিস ছুটি হয়ে গেলে বাড়ি যাওয়ার আগে কোন সুবিধামত জায়গায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে বা গাড়ীতে তোলার আগে চাবি নিয়ে নিতে হবে যা প্ল্যান করা হয়েছিল। একই সময়ে একই স্থানে দুজনকে পাওয়া যেত না। দুটি বিভিন্ন স্থানে তাঁদের ধরে নিয়ে চাবি নেওয়া হত এবং তাঁদের নিয়ে মাঠের মধ্যে একটি সুন্দর নতুন পাকা বাড়িতে তোলা হত। মাঠের উপর সুন্দর সুন্দর পাকা বাড়ি তৈরী হচ্ছিল। তার মধ্যে বেছে আমাদের মধ্যে কেউ একটি বাড়ি ভাড়া করে। তার জন্য যা বিশ্বাসযোগ্য এক্সপ্ল্যানেশন্ দেওয়া উচিত তা দেওয়া হত। বাড়িওয়ালার সঙ্গে খাতির করে থাকার সুবিধার জন্য কিছু কিছু ঘরের চেঞ্জ করতে হয়েছিল। তাছাড়া নিজেদের খুচরো মিস্ত্রি এনে কিছু কিছু কনস্ট্রাকশন্ করাতে হয়েছিল। ভিতরে অ্যারেঞ্জমেন্টের প্রধান একটি অ্যারেঞ্জমেন্ট হল একটি লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ঘর তৈরী করা। এর ভিতরে পায়খানা, প্রস্রাবের জন্য দুটি তোলা কোমড পর্দা দিয়ে ঘেরা ছিল। ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজারবাবুকে বন্দী করে এখানে আনার ইচ্ছা ছিল। এখানে তাদের রেখে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলে আমাদের পক্ষে তাদের সহানুভূতিশীল করে তোলার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক কথা তাঁদের সঙ্গে বলতে হবে তা লিখে ফেলা হয়।

কথাগুলি এইরূপ: দেখুন আমরা অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করলাম তার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চাইছি, জানি ক্ষমা চাইলেই ক্ষমা পাওয়া যায় না, এটা অন্তত বুঝি যদি আপনি আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ক্ষমা করা যায় যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারেন তবে অবশ্য আপনার কাছ থেকে তদনুরূপ দাবি করতে পারি। তাই আপনাদের জানাচ্ছি আমাদের জীবন মিলিটারী ও পুলিশের গুলিতে যাবে সেইরূপ আশংকা প্রতি মুহূর্তেই করছি। তবু আমাদের মা, বাবা ও প্রিয়জনদের স্নেহ মমতা বিসর্জন দিয়ে এরূপ একটি জঘন্য কাজে নেমেছি। অন্তর থেকে বুঝেছি আমি নিজে প্রাণ দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, তখন সেই কাজের সমাধানের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হলে অন্যের জীবন নেওয়ার অধিকারও আমার আছে।

'আমরা নিজেরা জানি যে যুক্তির কাজে মাথা নত করে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছি, সেই যুক্তি যদি ঠিকমত বলা যায় ও আপনারা বোঝেন তবে আপনারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারবেন না। আমাদের এই অপরাধ আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।'

দেখুন আমাদের কারুর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া পয়সার অভাব নেই, আমাদের কারুর ডাকাতি করা জীবিকার জন্য প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে এক দেড় কোটি টাকার ডাকাতি জীবিকা অতিবাহিত করার জন্য নয়। আমরা আদর্শের জন্য, নিপীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে ও সংগঠন করার উদ্দেশ্যে এই ডাকাতি করছি। আপনাদের কাছে মিলিত অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা একবার লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনগণের কথা ভেবে দেখুন। এই নিপীড়িত জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতেই হবে, অবশ্য সেই স্বাধীনতা আমরা তাদের ফিরিয়ে দিই বা না দিই তারা তা অর্জন করবেই। সর্বহারার দল যখন নিজ ক্ষমতাগুণে তা অধিকার করবেই তখন তা আমাদের আর কোন কাজ থাকতে পারে না। এইরূপ মনোভাব কোন লেনিনবাদী বিপ্লবী ভাবতে পারে না। আমরা সেই জনগণের সর্বাত্মক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার জন্য ও সংগঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবই, সেইহেতু সেই ব্যাপক কাজে দুর্গোপুর ব্যাঙ্কের এক কোটি টাকা আমাদের নিতেই হবে। যদি চাইলে কেউ আমাদের এই টাকা দিয়ে দিতেন তবে এত হাঙ্গামার ভিতর যেতাম না। চেষ্টার বাহাদুরীতে এই টাকা যে আমরা পাব না তা আমরা জানতাম। তবে চেষ্টা করতে গিয়ে স্টেনগান দিয়ে ব্যাঙ্ক আক্রমণ করলাম, গুলি চালালাম, সর্বাধিকে অতিরিক্তে গুলি করে টাকা নিয়ে এলাম সেরূপ পথ আমরা নিতে চাচ্ছি না। আমরা

প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখব আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকদের পুরো সমর্থন পাওয়ার জন্য সেইজন্য আপনাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভদ্রতা করেও এখানে বন্দী করে এনেছি আমাদের বক্তব্যগুলো আপনাদের বুঝিয়ে বলার জন্য।'

'আপনারা এতদিন সরকারি ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজার ছিলেন, আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের বিপ্লবী ব্যাংকের ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার হয়ে থাকুন, এই সংবাদ কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না, এটা কেবল জানবেন আপনারা ও জানবো আমরা। আপনারা যেভাবে সরকারি ব্যাংকের চাকরি করতেন, সেইভাবে চাকরি করবেন এবং সেই সরকারী চাকরিতে কোনরূপ ফাঁকি দেবেন না, কিন্তু জমাদিতকে আমাদের ব্যাংকের ভল্টের চাবি আপনাদের কাছেই থাকবে। আপনারা আমাদের বিপ্লবী কাজে আমাদের রিকুইজিশন অনুযায়ী টাকা দেবেন। কোন-খানে কোন হিসাব রাখার প্রয়োজন নেই। এই কাজে দক্ষতা নির্ভর করে নিরীহভাবে থাকা ও এই গোপন অংশের কথা কাউকে না জানানো। আমরা বিশ্বাস করি যদি আপনারা সুনিশ্চিতভাবে বোঝেন যে এইরূপ কাজের কথা পুলিশের কাছে প্রকাশ পাবে না তবে আপনাদের আপত্তি না করার কথা ও ভয় না পাবার কথা। আপনাদের বিপদ মাথায় নিয়ে এইরূপ সাংঘাতিক কাজ করার জন্য আপনাদেরও আমরা আমাদের বিপ্লবী দল থেকে প্রতি মাসে সরকার যা বেতন দেয় তার দ্বিগুণ বেতন দেব। এখন কথা হল এই কাজ কী করে গোপনে সম্পূর্ণ হবে এবং কী করেই বা গোপন থাকবে, সেটি সম্বন্ধে আপনাদের নিশ্চিত হতে হবে। প্রমাণ হিসাবে আপনারা যা পাবেন সেটি হচ্ছে এই ব্যাপক পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে শেষ করার মধ্যে, আর পাবেন আপনাদের সঙ্গে এই দুইজনের (যাদের দেখতে পাচ্ছেন) তাদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখবেন, টাকা নেওয়ার জন্য ও কোন সময় আরো টাকা জমা দেওয়ার জন্য। এইভাবে আমরা আমাদের গোপন ব্যাংকের কাজ সম্পন্ন করব মনস্থ করেছি। এখন নির্ভর করে আপনাদের উত্তরের উপর আমরা কী পথ অনুসরণ করব.....।'

যেভাবে তাঁদের আমাদের এই কাজে এইভাবে মত করাবার জন্য ঠিক করেছিলাম তা সম্পূর্ণভাবে ভাল করে লেখা হয়। তারপর কে বলবে সেরূপ একজন কমরেডকে দিয়ে বলাবার কথা ভেবেছিলাম, সেই কমরেডটি আগে থেকে কয়েকবার পড়ে নিয়ে ঠিক হয়ে থাকবে, বলার সময় কাগজ দেখে দেখে বলবে তা নয়। সুন্দর ও বাস্তবানুগভাবে বলার জন্য রিহার্শাল দিয়ে প্রস্তুত হওয়া।

চাবি নিয়ে ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার-বাবুকে বন্দী করে কলকাতা পর্যন্ত যে কাজ তা সম্পূর্ণ ঘরোয়া এভাবে করেছিলাম কিন্তু আমাদের মধ্যে গোপন আলোচনা হয়েছিল দুজনের সঙ্গে একই সময়ে এই নিয়ে কথা বলব কী না। একেবারে একাধারে যদি একজনের সঙ্গে এইভাবে কথা বলা যায় এবং সে যদি বোঝে এই কথাটি তার অন্য কোন সাথী কর্মচারী ঘুণাক্ষরে জানছে না তবে, তার কাছ থেকে একটি পজিটিভ উত্তর পেলেও পেতে পারি। দুজন এক সঙ্গে থাকলে কে আগে মত দেবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা যেত এবং ইচ্ছা থাকলেও দুজনেই এইরূপ প্রস্তাবে না করবে। কাজেই আমরা শেষ পর্যন্ত আলাদা ঘরে আলাদাভাবে এই-রূপভাবে ব্যক্তিগত একজনের সঙ্গে কথা বলব ঠিক করেছিলাম।

যদি এটুকু কাজ সমাধান করতে পার-তাম তবে দ্বিতীয় বাধার সম্মুখীন হতাম, সেটি হচ্ছে বন্দুকধারী দারোয়ান ব্যাংকের অফিসে পাহারা দিত—ভিতরে ও বাইরে, যতদূর মনে পড়ে—ভিতরে দুজন ও বাইরে দুজন বন্দুক নিয়ে থাকত। দিনের বেলা আক্রমণ করলে সবাইকে নিরস্ত্র করতে পারা যায়, যদি রাত্রিবেলা নিস্তব্ধতা না ভেঙ্গে ব্যাংক লুঠ করতে হয় তবে তার জন্য প্রিপারেশন করতে হয় অনেকখানি। আমরা যখন ঠিকই করেছিলাম ব্যাংকের অফিস আওয়ারে ব্যাংক দখল করব না, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে বিনা রক্তপাতে গণ্ডগোল এড়িয়ে ডাকাতিটি সমাধান করব তখনই আমরা আমাদের মাথায় হিমালয় পর্বত-তুল্য সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমাদের টাকার প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল এবং সাহসিকতারও প্রয়োজন ছিল, তাই বলে যে সাহসিকতায় বুদ্ধি কম ও হত্যা অনেক বেশী তা যতদূর সম্ভব পরিহার করা আমরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য মনে করেছিলাম। সেই হেতু রাত্রিবেলা ব্যাংকের দারোয়ান থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকে কী করে ঢোকা যায় সেই পরিকল্পনা আমরা এইভাবে করেছিলাম—

দারোয়ানদের সঙ্গে ভাব করা এবং সেই ভাব জমিয়ে সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিবেলা তাদের কাছে যাওয়া এই কাজটি খুবই সহজ যদি না কী সেখানকার লোক এই কাজের ভার নিক, কিন্তু আমাদের কমরেড সবাই নতুন অজানা জায়গা দুর্গাপুরে বাসা ভাড়া করেছিল বিভিন্ন কাজের অজুহাতে—বিশেষ করে তাদের পক্ষে দারোয়ানের সঙ্গে ভাব জমান খুব সহজসাধ্য কাজ ছিল না। কিন্তু প্ল্যান করে কাজ শুরু করলে তাও সম্ভব হত। তাই বাস্তবিক পক্ষে এ কাজ সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দুজন কমরেড দারোয়ান দের বিশিষ্ট বন্ধু হয় এবং রাত্রিবেলাও তাদের সঙ্গে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করে। ব্যাংকের ঘরে ইলেকট্রিক ফ্যান আছে বলে যাতে শোনার জন্য তাদের আলাও করে।

যখন এটুকু পর্যন্ত প্ল্যান এগিয়ে গেল, তখন আমাদের বাকি কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করলাম। বাকি কাজগুলো কি তা একটু ধারণা থাকা উচিত। ব্যাংকের পিছনে একটি উঠানের মত ছিল এই উঠানের পশ্চিম দিকে ছোট বিল্ডিংস, সেখানে ইঁট দিয়ে বাঁধান উঁচু রাস্তা ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে। আক্রমণ শুরু করার পর এই রাস্তাটিকে টেবিলের সামনে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করে গুলী চালাবার ব্যবস্থা রাখি। ব্যাংকের পিছন দিকের বারান্দার উপর দিয়ে লোক চলাচল করত। পশ্চিম থেকে পূব দিকে আসতে হলে এই বারান্দাটি ব্যবহার করত। দিনের বেলায় একদিন আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে এই স্থানটির টপোগ্রাফীটি দেখে আসি। আমি সেই দিন ব্যাংকের পিছনে একটি লম্বা বেঞ্চির উপরে একজন লোকের সামনে গিয়ে বসি। সেই লোকের সঙ্গে সেদিন ব্যাগ-ভর্তি টাকা ছিল—জমা দিতে এসেছিলেন, আমার সেখানে বসাতে সে কোন অসুবিধা করে নি, তার কারণ ছিল আমার বার্ধক্য। আমি ব্যাংকের কাউন্টার ও ভল্টটি নিরীক্ষণ করার জন্য একশ টাকার নোট কাউন্টারে দিয়ে একসচেঞ্জ চাই, আমাকে আমার নোটের চেঞ্জ দিতে যতক্ষণ তাদের সময় লাগল, তার মধ্যে আমি টাকার ভল্টের পজিশন যেটুকু সম্ভব সেটুকু দেখলাম। ব্যাংক অফিস খুব বড় নয় এবং এমপ্লয়িজও খুব বেশী নয়। ম্যানেজার কোথায় বসেন, ক্যাশিয়ারের সীটটি কোথায় তাও আমি নিজ চোখে দেখে নিলাম। তারপর আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী বুঝে নিলাম, রাত্রিবেলায় ব্যাংকের কোন দরজাটি খোলা থাকে এবং দারোয়ানরা ব্যাংকের ভিতরে ও বাহিরে কোথায় বসে বা ঘুমোয়। ব্যাংকে রাত্রিবেলা নির্ধারিত সময়ে ফাঁকি বিশেষ করে আমাদের প্রথম যে আক্রমণ করবে, আক্রমণকারী পার্টি প্রথম কজন কীভাবে ঢুকবে এবং আগে থেকে বন্ধু সেজে দুজন কমরেড দারোয়ানদের মধ্যে মিশে থাকবে তা ঠিক হল। এরই মধ্যে কোন মুহূর্তে রিভলবার দেখিয়ে বা দারোয়ানের বন্ধু বিশ্বাসী কমরেড তাকে চুপ করে থাকতে বলবে এবং তাদের বন্দুক-গুলো সংগ্রহ করবে তা বলা হয়েছিল এবং বিহার্শাল দেওয়া হয়েছিল। এই প্ল্যান যখন সম্পূর্ণ ঠিক হল তখনই কিন্তু আমরা প্ল্যানটিকে কার্যে পরিণত করতে পারলাম না, তার কারণ ডাকাতির টাকা নিয়ে কোন পথে আমাদের গাড়ী আসবে এবং সেই গাড়ী কোথায় যাবে এই প্রশ্ন বিবেচনা করতে সময় কেটে গেল অনেকখানি। যে ফিল্ডে কমান্ড করছিল তার বিশেষ অভিমত টাকা নিয়ে যেন কলকাতার দিকে আসা না হয়। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য তারা যেন আসানসোলের দিকে বা সেইদিকের অন্য কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার প্রকৃতিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত ভুল বলে মনে হচ্ছিল, কারণ—(১) আসানসোল প্রভৃতি ছোট স্থানে এক কোটি টাকা অনেকগুলো বাকসর নিয়ে যাওয়া বা রাখা প্রভৃতি সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে করা প্রয়োজন। ছোট ঘনবসতিতে রাত্রিবেলা এইরূপ হাঙ্গামা হঠাৎ কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু কলকাতা শহরে ও আমাদের নিজেদের খুব পরিচিত লোকালিটিতে রাত্রি-বেলা টাকার বাকস নামান ও সরান অনেক

করতে পারা যেত বলে আমার ধারণা ছিল. সর্বোপরি সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রতিবছর ডাকাতিতে পরে এক কোটি টাকার বাজারগুলি হতে সতর্ক সম্ভব নিরাপদ স্থানে ডিসট্রিবিউশন করা হয়ে অবশেষে তাদের ফিরে রমাকান্তর বলতে চাইল সোজা বাসনায় এজে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের গাড়ীদের জমায়েত করতে হবে. তাই তাদের আক্রমণে ওর ঘুরে আসতে হবে ভাবে আসানসোলের দিকে কোনরূপ বাওয়ার পরে তারদিকে পরে দুপুরের মধ্যে দিকে যে বাস্তব কলকাতার দিকে গেছে তা দিয়ে এসে তারপর ৬নং গ্রান্ড রোড ধরে। ওই পথে এলে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের কোন পেট্রোল তাদের থামাবে না। তা অবশ্য ঠিক তবে ডাকাতি হয়ে বাওয়ার সমাচারটি হয়তো ইঁড়িয়াবো তারা পেয়ে যেত, কেবল তারা ৪৫ সি আর পি এর বিরুদ্ধে ডিসেন্টারস ফলতোই যে (৪) ৮৭ আসান সোলের দিকে গেছে তাতেই তারা আসান সোলের দিকে খবর পাঠাত কিন্তু বাবাপোস্ত পরে বিছুটা সময়ের মধ্যেই ফলতোই তবে ও তারা তাদের ডিসিপ্লিনারী ব্যবস্থা নিতে দুপ্তত তাই এইরূপ বিবেচনা করে আমি সম্পাদন করাতলাম যত সতর্ক সম্ভব শত্রু, পক্ষের সামনে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই আমাদের সমস্ত গাড়ি ও টাকার গাড়ি সোজা স্ট্রান্ড রোড দিয়ে কলকাতার দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত পরে যে সব মিলিটারী গাড়ি আছে তারে, পরে খবর পাওয়ার আগেই আমাদের একটি সুবিধাজনক দূরত্বে পৌঁছে যাওয়া উচিত। এপথে অন্য কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনাও কম বলে মনে হয়েছিল।

এক কোটি টাকা, ডাকাতি করা বড় নয় সেই টাকা সুনিশ্চিতভাবে পুলিশ ও মিলিটারী ফ্রন্টিয়ার ভেদ করে নিরাপদে আমাদের হাতে তুলে এনে ফেলা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তাই কেবল আক্রমণ করাটাই প্রধান নয়, আক্রমণ করে সফল হতে হলে এক কোটি টাকা অন্তত দশ বারটি গাড়ীর মধ্যে ভাগ করে টাকার বাক্সে নিয়ে আসা এই স্থানের মধ্যে কিভাবে বাস্তবে হবে, তাহলেই এই ব্যবস্থাটার কথা আমাদের ভাবতে করে চিন্তা হয়েছিল

(১) কোন্ কোন্ বাড়িতে কিভাবে টাকার বাক্স রাখব।

২. সেই সেই নির্দিষ্ট বাড়িতে কে কোন্ গাড়িতে বা কিভাবে নিয়ে নিজে টাকা তুলবে তার কথা ঘটছে ব্যবস্থা করতে হবেছিল

(৩) তারপর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে কিভাবে কোন গাড়ি করে টাকার বাক্স নিয়ে আসা হবে।

(৪) প্রতিটি টাকার বাক্সে দশ লক্ষ টাকা, পথে রাস্তায় ইমারজেন্সীর জন্য অন্য রাস্তায় এই ভাবে নির্দিষ্ট হওয়া পড়ন পাইন প্রায় কিনা তাবও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

ট্রাঙ্ক রোড ইজারদারী পুলিশ সাধারণত ট্রাক, লরী, গাড়ি, প্রাইভেট কার চালকের ধরে সন্দেহ করে থাকে। এইরূপ একটি পরিস্থিতে কী করে এড়ান যায় তার কথা ভাবা হয়েছিল, ভেবে ঠিক করা হয়েছিল যদি কোনরূপে বড় গাড়ী আমরা ব্যবহার করতে পারি, যে রূপ গাড়ীকে কোনরূপ সন্দেহ করবে না। তাহলে পুলিশের সঙ্গে একটি মেসের মাস্টারের কথা যাবে সেই রূপ আমরা একটি অলকাতরার ট্রাক কিনি সেরূপ পেট্রোলের ভাল হয়, তেমন আক্রমণকারী ভাল ও দক্ষিণ ভাল, সেটি আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড ও কিনে নিয়ে নিতে পারি। কিন্তু তেমনও সব ঠিক না, কারণ ওটি যে ভাল তাদের কাছে যাবে না পরে তো সেটাকে ভাল কাজের জন্য ধরা, যদি ধরে ঠিক তখনি খুলে ফেলে হবে, পরীক্ষা করে তার আক্রমণকারী বলতে পারে। এইরূপ ভাবে আমরা প্রাক্তন ডাকাতির ভালটিক বিভিন্ন পন্থায় ওটি ভং করে তৈরি করে নিই এই ব্যাপারটি কতখানি ধারণ এইরূপভাবে গাড়িটি তৈরী করতে কতদিন লেগেছিল, তবে বলতে গেলে পর্যন্ত আমাদের একমাত্র এই গাড়িটি প্রস্তুত হয়েছিল নিরাপদে কলকাতার টাকা নিয়ে আসা এটাই ছিল আমাদের প্রধান শত্রুচিন্তা। কারণ পুলিশের দিক থেকে আইডেনটিটি সর্বপ্রকারে সকলের কাছে গোপন রাখা। আমাদের বিপক্ষদলটের চেষ্টা এটার অনুরূপ ট্রাঙ্কের দিকে পি সি সি করবার তারপর আরো ছোট করা ট্রাঙ্কের ভিতর পি সি, আমরাই সকলে একজন এটার জন্য কলকাতায় অর্থাৎ ব্যাঙ্কের কোন কলকাতা দরকার না ট্রাকে গোপনে কারণে হতো তার সেই ট্রাকটি পুরা রেডি হাইল দশ মাইল এসে পরে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঐ পি সি সিতে অর্থাৎ আক্রমণকারী ট্রাকে ঐ কারসপূর্ণ ভরে দেবে। ট্রাকটি সেই রাস্তা থেকে যাবে। নিয়ে এরূপ সর্বদিকে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যাতে স্বাভাবিক অবস্থায় মনে করবে যে তখন পরে নির্দিষ্ট [illegible] ট্রাক ছিল। এই ট্রাকটি [illegible] আমরা প্রাক্তন ডাকাতির গাড়িতে ট্রাকের কাছে নিয়ে কলকাতার দিকে পাঠাব করব, যেখানে এটি করার কথা ছিল, সেটি ট্রাক কোন থেকে নিজেই ছিলেন। [illegible] ট্রাকটি [illegible] যাবে। [illegible] ভাল ভাবপর [illegible] ডাইভার ও একজন তার সহকারী [illegible] হতে দেখে সন্দেহ করবার কারণ না থাকে [illegible] যখন টাকা আক্রমণকারী গাড়িতে তোলা হবে [illegible] একটি গ্রাইন্ডেট [illegible] ট্রাকে [illegible] ট্রাকটি [illegible] ট্রাকটি [illegible] ট্রাকটি

তিনি বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনাদের সঙ্গে ম্যাস-এর কোন যোগাযোগ ছিল না। কৃষক ও শ্রমিকের সংগঠন আপনারা করেন নি, সেইজন্যই ধরা পড়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং রাজসাক্ষীও হয়েছে। দেখুন, আমাদের কাছে পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র সব পার্টি থেকে বেশীই আছে, তবু একটি অস্ত্রও পুলিশ অনুসন্ধান করে আজো পায় নি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের পার্টি জনগণের পার্টি।..... আমাদের কমরেড যখন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই কম্যুনিস্ট নেতার এইসব কথাগুলো আমাকে বলছিল, তখন আমি তার মনোভাব বুঝে বললাম; 'তুমি নিশ্চয়ই তাঁর কথায় কনভিন্সড হয়েছ, যে সত্যিই তো আমাদের পার্টি জনগণের সঙ্গে যুক্ত নয়, এবং সেই জন্যই আমাদের মধ্যে রাজসাক্ষী হওয়া স্বীকারোক্তি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তারপরে তাকে বললাম 'সত্যি কী নয়, তুমি তাঁর কথায় কনভিন্সড্ হয়েছ,' সে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, তার যুক্তিতে আমি তাই বুঝেছিলাম এবং তার প্রতিবাদ করে আমার বলার কিছু ছিল না, সত্যিই তো আমরা 'ম্যাস পার্টি' করে তুলি নি।'

কমরেডটির সততা সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না, তবে এখন খুব ভাল করেই বুঝলাম, তারা আর সি সি আই এর তত্ত্বকথার গভীরতা একটুও হৃদয়ঙ্গম করে নি—মাত্র সুপারফিসিয়ালি বুঝেছিল, এবং তাই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতার ব্যাখ্যায় বুঝল আমাদেরটা গণপার্টি নয়, সেইজন্য আমাদের মধ্যে কন্‌ফেশন কম্পছে ও রাজসাক্ষী হয়েছে। এর জবাব আমাদের কমরেড খুঁজে পেল না, মাত্র চারজন স্বীকারোক্তি দিয়েছে ও দুজন রাজসাক্ষী হয়েছে, বাকি সব তাহলে হল না কেন? আবার তিনি বলেছিলেন, পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী কম্যুনিস্ট পার্টিতে অস্ত্রশস্ত্র সুকান আছে তার একটিও ধরা পড়ে নি, তার কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন, যে তাঁদের পার্টি গণ-পার্টি সেইজন্য। আমার একটি বক্তব্য আছে যদি পুলিশের রিপোর্ট ঠিক হয়ে থাকে যে কম্যুনিস্ট পার্টিতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং তার একটিও ধরা পড়ে নি, তবে কী তা কম্যুনিস্ট পার্টি গণপার্টি বলেই ধরা পড়ে নি? আমার প্রশ্ন হল সেই অস্ত্রশস্ত্র যদি কেউ মাটি খুঁড়ে রেখে দিয়ে থাকে তবে তা ধরা পড়বে কেন? সেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের ক্যাডারকে গোপনে অস্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা করেছেন কী?

তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে পারতাম বা বাহবা দিতাম যে কম্যুনিস্ট পার্টি অন্যান্য পার্টির চাইতে এই বিষয়ে অনেক পারদর্শী। 'আমাদের অনেক অস্ত্র আছে, মাটির নীচে পোতা আছে, কেউ জানে না, কোন কাজেও আসবে না।' আর সেইরূপ অস্ত্র পুলিশ আজো ধরতে পারেনি, তাতে প্রশংসা বা গৌরবের কিছুই থাকে না। আমাদের কমরেডটি এইভাবে সেই কম্যুনিস্ট নেতাকে বলতে পারে নি বা চোখে আঙুল দিয়ে তাঁর ভুলটি বোঝাতে পারে নি।

আমাদের এক কোটি টাকা ডাকাতি করা হবে এটা কেবল ভাবা হয়েছিল তা নয়, এটার সক্রিয় রূপ দেওয়ার জন্য এই যা বললাম, সমস্ত প্ল্যানটি করা হয়। ডাকাতির স্থান থেকে এক কোটি টাকা এনে আমাদের নিরাপদ ভল্টে রাখার পুরো প্ল্যানটি করতে হয়। যেটুকু বললাম, তাতেই কিন্তু সব বলা হল না। কলকাতার উপর দশটি বিভিন্ন বাড়ী ছিল যে প্রত্যেকটি বাড়িতে আনুমানিক দশ লক্ষ টাকা রাখা হবে, তা হলে এক কোটি টাকা রাখার ব্যবস্থা হতে পারে। এই দশটি বাড়ীর ব্যবস্থা আলাদা আলাদা ছিল এবং প্রত্যেকটি একধরনের নয়। যেমন নাকি কারুর বাড়ীতে লোহার আলমারী আছে তেমন বাড়ীতে সুরক্ষিত করে রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। আর কারুর বাড়ীতে ধরুন তুলসীতলার নীচে টাকা রেখে সেই তুলসী গাছ বাঁধান বেদী উপরে থাকবে—তার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ ধরনের দশটি বিভিন্ন বাড়ির ব্যবস্থা করতে হয়। তাও সংগঠনের ছেলেরা তা করতে নিযুক্ত হবেনা। যাদের বাড়িতে থাকবে তাদের সাহায্যে তারাই নিজেরা মিস্ত্রি প্রভৃতি দিয়ে ঠিকঠাক করে নেয়। সেইসব বাড়ির সবাই মিলে এই বিশেষ ব্যবস্থাটি করবে না। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি মিস্ত্রি দিয়ে একজন করবে যার হেপাজতে টাকা থাকবে কনক্রিট প্রত্যেকটি কাজে বিশদরূপে ব্যবস্থা করার মধ্যে অনেক স্তর ছিল, স্তর ভেদ করে লোকদের নিযুক্ত করতে হয়েছিল। ট্রেনে করে যে পরিবার বান্ডিল করা দু লক্ষ টাকার নোট নিয়ে আসবে সেই পরিবারের স্বামী, স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সবাই বিশেষ ক্লাসের অংশীদার ছিল, দুধের শিশুটিও মায়ের কোলে থেকে পুলিশের চোখে বিভ্রান্তি ঘটাতে পেরেছিল। গেরিলা পদ্ধতিকে রাজনৈতিক ডাকাতি বা কোন বৈপ্লবিক অ্যাকশন করার সময় একটি শিশুরও বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে।

কোটি টাকা তুলে নিয়ে আসার মধ্যে কত সব ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব, তার সমাধান করে তবেই প্ল্যান করতে হয়েছিল। এত পরিশ্রমের পরে যখন প্ল্যান সমাপ্ত হল, তখন কিন্তু কম্যান্ডার বললেন যে, তার মনে হচ্ছে সোজাসুজি ডাকাতির পরে কলকাতায় চলে আসার চেষ্টা করতে হবে। কাজেই নিকটতম রাস্তা ধরে আসা উচিত এবং যদি সেই পথে ঐ স্টেনগান হতিয়ার রাইফেলসের কাছ থেকে বাধা আসে তবে তাকে আমাদের পরাস্ত করেই আসতে হবে। এই মতটি ফিল্ড কম্যান্ডার দুমাস আগে দিত তবে তা অনেক সহজে হয়ে যেত। তাহলে আমাদের অবগ্যানাই-জেশনের বৃথা সময় ও শক্তি ক্ষয় হোত না। আসানসোলের পথে গিয়ে তারপর টাকা নিয়ে আসার জন্য যেরূপ পরিকল্পনা করতে হয় তার জন্যে অনেক সময় লেগে-ছিল। ব্যাঙ্ক ডাকাতিটি হয়ে যাবার পর যদি লুঠের টাকা নিয়ে আমাদের আসান-সোলে যেতে হত, আধ মাইল গিয়ে 'টামলার বীজ'টির উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই ব্রীজটির রাস্তা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে। আমাদের এই পুলটি পার হওয়ার আগে সামনে থেকে কলকাতামুখি গাড়ী সব যেন বন্ধ করে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। এবং আমাদের পথ সুগম করার জন্য স্থানে স্থানে ল্যান্ড-মাইন প্রভৃতি রাখার ব্যবস্থাও ছিল। ইতিমধ্যে মানসিক ও শারীরিক দুইভাবে আমরা কমরেডরা টায়ার্ড। তবু প্রয়োজনের খাতিরে যখন করতেই হবে স্থির হল তখন আমরা তাও করেছিলাম। তারপরে সেই ফিল্ড কম্যান্ডার সবটা বিশ্লেষণ করে দেখে বুঝল আমি যে প্ল্যানটি করেছিলাম, অনুসরণকারী শত্রুর গাড়ীগুলোকে পিছনে ফেলে আসার সেই যুক্তিটি মেনে নেয়। আমি যদি আমার যুক্তির জোরে তার মতকে বানচাল করে দিয়ে আমার মতটি গ্রহণ করতাম তবে ফল ভাল হত বলে আমার মনে হয় না। আমি বুঝেছিলাম যে ফিল্ডে কম্যান্ড করবে তার নিজের যুক্তিতে তাকে নির্ভুলভাবে বুঝতে হবে। তার জন্য জোর করে কোন সিদ্ধান্তে তাকে পরিচালিত করা উচিত হবে বলে আমার তখন মনে হয় নি। সেইজন্য তাকে আমি বলেছিলাম, তুমি যা ভাল বুঝছো এবং তুমি যাতে জোর পাচ্ছ সেইভাবেই করো।

আজকে যখন সে তার মত পাল্টাল এবং আমার মতে ব্যাংক থেকে লুঠের টাকা নিয়ে আসার পথ ঠিক করল তখন আমার

আসানসোল ঘুরে তারপর কলকাতা আসার যে নীতি নেওয়া হচ্ছিল তাতে আমার মন কোন মতেই সায় দেয় নি। আমাদের শত্রুর মুখে পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল ঘুরে এলে। সেই জন্য আমি সেটি না হোক চেয়েছিলাম।

যদিও এই প্রশ্নের সমাধান শেষ পর্যন্ত ভালই হয়েছিল, তবু তার জন্য দু' মাস আমাদের দেরি হয়ে যায়। সেই দেরি হওয়ার ফলে ছোট ছোট অনেকগুলো বিভ্রাটের সামনে আমাদের পড়তে হয়, যেমন নাকি কালভার্টের নীচে ডিনামাইট ধরা পড়ে গেল, মাঠের উপরে জঙ্গলের মধ্যে গাদা কামানও আবিষ্কার হল। এইসব বড় বড় আঘাত আকস্মিকভাবে আমাদের বিরুদ্ধে ঘটে গেল, কিন্তু যা আমাদের চিন্তার কারণ হয়েছিল এইসব ঘটনা সত্যিই আকস্মিক না কি তার পেছনে আমাদের মধ্যে কোনরূপ গুপ্তচর আছে? এইসব প্রশ্নে বিলম্বের কারণ ঘটেছিল বটে, তাছাড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ মিলিটারী ম্যানুয়ালের কথা যে প্ল্যানের পর প্ল্যান যদি বদলান হয় তাতে ক্যাডারদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে এবং তাদের মন ভেঙ্গে যায়। আমাদের বিলম্বের জন্য এই ক্ষতিটি সবচেয়ে বেশী হয়েছিল বলে আমার ধারণা। দুর্গাপুরে এক কোটি টাকা লুঠ করার আভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করছিল, তারা ইতিমধ্যেই প্ল্যানের বার বার পরিবর্তন শুনে ও বার বার নতুন করে নতুন প্ল্যানের রূপ দেওয়ার জন্য নিজেদের নিযুক্ত করার জন্য দলের নেতাদের উপর আস্থা হারিয়েছিল। তারপর যখন পুলিশ ও মিলিটারী গাদা কামান ও ডিনামাইট আবিষ্কার করে খুব সজাগ হয়ে প্রহরার ব্যবস্থা করছিল, তখন অল্প শক্তি নিয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গাপুর ব্যাঙ্কের এক কোটি টাকা লুটের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল, কার্যে পরিণত করার মতন তখন আমাদের শক্তি ছিল বলে আমার মনে হয় না। অগত্যা ষড়যন্ত্রমূলক পার্টি টেকনিক্যাল অরগানাইজেশনের যে প্রচুর মাসিক খরচ তা মেটাবার জন্য আর একটি ডাকাতির জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হচ্ছিল।

এই কারণে যদি কোন পলিটিকাল পার্টি বা কেউ আমাদের ডাকাতের দল বলে থাকে তবে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় কী। ডাকাতির পরে ডাকাতি আমরা করেছি কিন্তু সত্যি কারণ দেখাতে গেলে দেখাতে কী পারব যে, সেগুলো আমাদের মারাত্মক গাফিলতির জন্য ছাড়া আর কোন বিপ্লবী প্রোগ্রামের জন্য ঘটেছিল?

কেন আমরা এক লক্ষ টাকার একটা বড় থলি পোস্টাল ভ্যানে ডাকাতি করার সময় ফেলে এলাম? কেন আমরা ডাকাতির করার ইমিডিয়েট পরেই আগে থেকে যা স্থির করা প্রোগ্রাম ছিল তা নিয়ে কাজ শুরু করলাম না? ডাকাতির পরে কেন আমাদের নতুন করে রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হয়েছিল? যদি আমরা সত্যিই—'কেন ডাকাতি করতে যাচ্ছি বা করছি' সেটি না বুঝেছিলাম, তবে ডাকাতির পূর্বে কেন সেই কথা তুলে আগে সমাধান চাই নি। না বুঝে ডাকাতি করার কোন নৈতিক অধিকার কী আমাদের ছিল? তবে কিন্তু কমান্ডার যখন কিসের জন্য ডাকাতি এবং ডাকাতির পরে যে টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম আগে বার বার দেখেছেন ও শুনেছেন, সেসব বার বার ঐ সব কমরেডকে জানান হয়েছে, তখন কেন তিনি তা ভুল বলে বাধা দেন নি। আমি যখন ঐ সব কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করেই টেকনিক্যাল প্রোগ্রামের রূপ দিতে পরিকল্পনা লিখিত ভাবে উপস্থাপিত করলাম তখন সেই প্রোগ্রাম বানচাল করে দিয়ে—'আমি আগে ভাল করে দেখি নি এবং ঐ সব শুনি নি তাই আমাদের এখন নতুন করে সমীক্ষা করে দেখতে হবে কী ভাবে আমরা কী নতুন সময়োপযোগী কর্মসূচী নেব।' এই ভাবে কিন্তু কমান্ডার নতুন করে ডাকাতির পরে পর্যালোচনা করে কর্মসূচী স্থির করতে চাইছিলেন। আমার এটি খুবই খারাপ লেগেছে, আমার মনে সব সময়ই একটি কথা বার বার আঘাত করছিল না বুঝে এবং অতিনিশ্চয় রাজনীতির প্রয়োজন ছাড়া ডাকাতি করার আমাদের অধিকার নেই, তবে কেন তা না জেনে না বুঝে কমরেডরা সমর্থন করল?

এই সভায় আমাকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করেছিল যখন দেখি একজন ছাড়া সবাই কিন্তু কমান্ডারের বক্তব্য সমর্থন করল। আমি একমাস কলকাতার বাইরে ছিলাম চোখ অপারেশনের জন্য। ভাবতে লাগলাম এই একমাসেই কী অঘটন ঘটল যার জন্য সবাই আজ ভাবছে টেকনিক্যাল প্রোগ্রাম যেখানে আছে সেখানেই থাক, সেটিকে সেখানে রেখে আমাদের গণফ্রন্টে গিয়ে কাজ করা উচিত। গণফ্রন্টে গিয়ে কাজ অনেক আগে থেকেই শুরু করতে পারতাম এবং শুরু করতাম আমাদের টেকনিক্যাল অরগানাইজেশনের কাজ গুছিয়ে নিয়ে। আমাদের লাফিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি সক্রিয় স্টিয়ারিং বোর্ড প্রস্তুত করাটা প্রাথমিক কাজ হিসাবে নিয়েছিলাম। এই মূল কথাটি না বোঝার কোন কারণ ছিল না।

বছরের পর বছর আমাদের অতিবাহিত হয়েছে, আমরা তেমন কোন কাজ করিনি। কাজ করতে হলে কোন একটি পার্টির সঙ্গে থেকে গণফ্রন্টে কাজ করতে হত। সমীক্ষা করে আর সি সি আই বুঝেছিল পঞ্চাশ বছরের অধিক সি পি আই এম যে পদ্ধতিতে গণফ্রন্টে কাজ করে এসেছে তার বেজাল্ট যা দেখছি তাই হবে। তার বেশী আর কিছু হবে না। হো চি মিন্-এর মত গণসংগঠন করতে সি পি আই এম-এর নেতৃবৃন্দ কোন কালেই প্রস্তুত ছিলেন না। যখন পিপলস্ ওয়ারের কর্মসূচী নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি চলছিল তখন তাদের কেবলমাত্র পিপলস্ থিয়েটারের কর্মসূচী নিয়ে থাকা কোন মতেই উচিত হয় নি। তাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল পিপলস্ ভলেন্টিয়ার্স গঠন করা। এই কাজটি তারা করেন নি। এই মানসিকতা নিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃবৃন্দ কাজ করে এসেছেন। আজ তবু সে পশ্চিমবাংলার সব চেয়ে বড় ও শক্তিশালী পার্টি তার একমাত্র কারণ জনগণ কম্যুনিজম কে ভালবাসে। অন্ধকারে জনগণ হাতড়ে বেড়াচ্ছে, ভরসা খুঁজে পাচ্ছে না বলে কম্যুনিস্ট নামটা শুনে তারা ভোট দিয়েছে, বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা করে দেখার মত শক্তি জনসাধারণের নেই। জনগণের নেতারা তাদের কাছে কম্যুনিস্ট নামটা খুবই একস্প্লয়েট করতে সমর্থ হয়েছে, এতে অন্যায় কিছুই নেই। তবে ওদের পক্ষে চিন্তা করতে হবে জনগণ ইমারজেন্সীর সময় তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল আর তারা ইমারজেন্সীর সময় নিজের দল বাঁচিয়ে রাখার জন্য সব জায়গায় হাত বাড়িয়েছিল। এটাও কম্যুনিজমের ভুল নীতি নয়। তবে ভুল নীতি হচ্ছে এই জনগণকে যদি সত্যিকার মিলিটেন্ট অবগানাইজিশনে সংঘবদ্ধ করতে হয় তবে পার্টির এক অংশকে সেই মত প্রস্তুত হতে হবে এবং সেইভাবে দূরদৃষ্টি রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্ভাগ্য আমাদের ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী সেই ভূমিকা কোনদিনই পালন করে নি।

(চলবে)

ফলিত জ্যোতিষ—শ্রীহরিহর মজুমদার ২০.০০
বাংলাভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা—ডঃ বিজেন্দ্রনাথ বসু ১২.০০
রূপনারানের কূলে (দ্বিতীয় খণ্ড)—গোপাল হালদার ২২.০০
আধুনিক দর্শন পরিচয়—ডঃ ধীরেন্দ্র শাস্ত্র
এছাড়া দুরন্তধারা-র (বাংলাদেশ) প্রধান পরিবেশক
সুচিপত্র ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

খেলা

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়

বিশ্ব কাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দল

বুয়েনস এ্যার্সের কিভার স্টেট স্টেডিয়ামে ১৯৭৮ সালের একাদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে আর্জেন্টিনা ৩—১ গোলে গতকালের (১৯৭৪ সালের) রানার্স-আপ হল্যান্ডকে পরাজিত করে স্বদেশবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা কানায় কানায় পূর্ণ করেছে। বিজয়ী আর্জেন্টিনা দলের পক্ষে গোল করেন মেরিও কেম্পেস (২) এবং ডেনিয়েল বার্তোনি (১)।

ফাইনালে প্রথমার্ধের ৩৭ মিনিটে আর্জেন্টিনার মেরিও কেম্পেস প্রথম গোল করেন। বিরতির সময় আর্জেন্টিনা ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৯ মিনিট আগে হল্যান্ডের পরিবর্তিত খেলোয়াড় গোল শোধ দিলে খেলার ফলাফল সমান ১—১ দাঁড়ায়। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের মূল খেলা ১—১ গোলে শেষ হলে অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। অতিরিক্ত সময়ের খেলার প্রথমার্ধে কেম্পেস এবং দ্বিতীয়ার্ধে বার্তোনি গোল করেন।

ফাইনাল খেলার আগের দিন হল্যান্ড দলের ম্যানেজার আর্নেস্ট হ্যাপেল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন হল্যান্ড দু গোলে বিজয়ী হবে। হল্যান্ডের খেলোয়াড় জনি রেপ আরও এক ধাপ এগিয়ে খুব উঁচু গলায় বলেছিলেন আমাদের জয় হবে ৩—১ গোলে। বুয়েনস এ্যার্সের একাদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল খেলার ফাইনালে ৩—১ গোলে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে ঠিকই, তবে তা হল্যান্ডের অনুকূলে নয়। এই যা দুঃখ।

ফাইনালের পথে

হল্যান্ড : বাবটি ম্যাচ খেলে ফাইনালে উঠেছিল—ইউরোপীয় জোনের প্রাথমিক লীগের ৪নং গ্রুপে ৬টা খেলা, আর্জেন্টিনার মূল আসরে প্রথম পর্বের লীগে ৩টে এবং দ্বিতীয় পর্বের লীগে ৩টে খেলা। এই বারটা খেলায় হল্যান্ডের জয় ৮, হার ১ এবং খেলা ড্র ৩। ২৫টা গোল দিয়ে ২০টা গোল খায়।

ইউরোপীয় জোনের প্রাথমিক লীগের ৪নং গ্রুপে আইল্যান্ডকে ১—০ ও ৪—১ গোলে, বেলজিয়ামকে ২—০ ও ১—০ এবং নর্থ আয়ারল্যান্ডকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। খেলা ড্র যায় নর্থ আয়ারল্যান্ড দলের সঙ্গে ২—২ গোলে।

আর্জেন্টিনার মূল আসরে প্রথম পর্বের লীগে ইরানকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে। খেলা ড্র করে, পেরুর সঙ্গে গোলশূন্যভাবে। হেরে যায় স্কটল্যান্ডের কাছে ২—৩ গোলে। দ্বিতীয় পর্বের লীগে অস্ট্রিয়াকে ৫—১ গোলে এবং ইতালীকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। খেলা ড্র যায় পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে ২—২ গোলে।

আর্জেন্টিনা : ছ'টি ম্যাচ খেলে ফাইনালে উঠেছিল। উদ্যোক্তা দেশ বলে আর্জেন্টিনাকে প্রাথমিক পর্যায়ের লীগে অংশ গ্রহণ করতে হয় নি। সরাসরি আর্জেন্টিনার মূল আসরে নেমেছিল। লীগের খেলার ফলাফল, দাঁড়ায় জয় ৫, হার ১ ও ড্র ১। গোল স্বপক্ষে ১২ ও বিপক্ষে ৩।

প্রথম পর্বের লীগে হাঙ্গেরীকে ২—১ গোলে এবং ফ্রান্সকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। হেরে যায় ইতালীর কাছে ০—১ গোলে। দ্বিতীয় পর্বের লীগে পোল্যান্ডকে ২—০ এবং পেরুকে ৬—০ গোলে পরাজিত করে। খেলা ড্র করে ব্রাজিলের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে।

ব্রাজিলের তৃতীয় স্থান

তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলায় ব্রাজিল ২—১ গোলে ইতালীকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। ইতালীর ভাগ্যে জুটেছে চতুর্থ স্থান। এখানে উল্লেখ্য, আট বছর আগে, ১৯৭০ সালের নবম বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে ব্রাজিল ৪—১ গোলে ইতালীকে হারিয়ে মোট তিন বার বিশ্ব কাপ জয়ের সূত্রে চিরতরে জুল রিমে কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছিল। এই খেলায় যদি ইতালী জিততো তাহলে ইতালীর হাতেই জুল রিমে কাপ চিরদিনের মত থেকে যেত।

একাদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছিল পৃথিবীর দুই গোলার্ধের দুটি দেশ—ইউরোপের হল্যান্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলাতেও এই রকম অবস্থা দাঁড়ায়—একদিকে উঠেছিল ইউরোপের ইতালি এবং অপরদিকে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল।

এর আগে হল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা একবার করে বিশ্ব কাপ ফুটবল খেলার ফাইনালে উঠেছিল। ১৯৩০ সালের ফাইনালে আর্জেন্টিনা ২—৪ গোলে উরুগুয়ের কাছে এবং ১৯৭৪ সালের ফাইনালে হল্যান্ড ১—২ গোলে পশ্চিম জার্মানির কাছে হেরে রানার্স-আপ হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্বের লীগ

দ্বিতীয় পর্বের লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল 'এ' গ্রুপে হল্যান্ড এবং 'বি' গ্রুপে আর্জেন্টিনা। এবং এই সুবাদেই হল্যান্ড ও আর্জেন্টিনা ফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিল। লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল—'এ' গ্রুপে হল্যান্ড এবং 'বি' গ্রুপে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল। লীগের তিনটে খেলাতেই হেরেছিল একমাত্র পেরু। তাছাড়া পেরু সর্বাধিক গোল খাওয়ারও রেকর্ড করে (গোল ১০)। দ্বিতীয় পর্বের লীগের খেলায় আটটি দেশের মধ্যে একমাত্র পেরু একটাও গোল দিতে পারেনি।

'এ' গ্রুপের লীগের খেলায় প্রথম স্থান পায় হল্যান্ড (৫ পয়েন্ট) এবং দ্বিতীয় স্থান ইতালি (৩ পয়েন্ট)। হল্যান্ড-ইতালির খেলায় হল্যান্ড ২—১ গোলে জিতেছিল। এই দুই দেশের খেলাটা এবারের প্রতিযোগিতার সেরা খেলা হিসাবে আখ্যা লাভ করে। খেলার তিনিশ মিনিটে হল্যান্ড আত্মঘাতী গোল খেয়েও বিন্দুমাত্র দমেনি। দ্বিতীয়ার্ধে হল্যান্ড দুটো অসাধারণ গোল করেছিল। ইতালির বিপক্ষে এই খেলাটা ড্র করলেও হল্যান্ড ফাইনালে উঠতো। অপরদিকে ইতালি এই খেলায় জিতলে ফাইনালে যেত।

গতবারের (১৯৭৪ সালের) বিশ্ব কাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মানি 'এ' গ্রুপে তৃতীয় স্থান পায় (পয়েন্ট ২)। 'এ' গ্রুপের সর্বনিম্নস্থানাধিকারী অস্ট্রিয়ার কাছে পশ্চিম জার্মানি শোচনীয়ভাবে ২—৩ গোলে হেরে যায়। এটা বিরাট অঘটন। কারণ বিশ্ব ফুটবলের আসরে ৪৭ বছর পর জার্মান দলের বিপক্ষে অস্ট্রিয়ার এই প্রথম জয়। দ্বিতীয় পর্বের লীগে পশ্চিম জার্মানি একটা খেলাতেও জিততে পারেনি। প্রথম পর্বের লীগে পোল্যান্ড চ্যাম্পিয়ান এবং পশ্চিম জার্মান রানার্স-আপ হয়েছিল।

'বি' গ্রুপে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল সমান ৫ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছিল। আর্জেন্টিনার গোলের গড় ভাল থাকায় তারা লীগের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। একই দিনে ব্রাজিল বনাম পোল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা বনাম পেরুর খেলা পড়েছিল। ব্রাজিল ও পোল্যান্ডের খেলা প্রথম হয়। ব্রাজিল ৩—১ গোলে পোল্যান্ডকে হারায়। খেলার এই অবস্থায় আর্জেন্টিনার ফাইনালে উঠতে পেরুর বিপক্ষে তাদের ৪—০ গোলে জয়ের প্রয়োজন হয়। পেরু দুর্বল হলেও তার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৪—০ গোলে জয় কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। সেখানে কিনা আর্জেন্টিনা ৬—০ গোলে জিতে গেল। টেলিভিশনে আর্জেন্টিনা বনাম পেরুর খেলা দেখে ব্রাজিলের খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা দারুণ বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, এটা ফুটবল খেলা নয়, বিশ্ব ফুটবলের ওপর পেরুর এক বিশ্বাসঘাতকতা। ব্রাজিলের লীডার অফ ডেলিগেশন কার্লস আলবারটো এবং দলের ম্যানেজার কুটিনহো সাংবাদিক বৈঠকে মনের ব্যথা ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পেরু ফুটবল খেলতে চেষ্টা করেনি, ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথম পর্বের লীগে হল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা তাদের গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হতে পারেনি। হল্যান্ড ৪নং গ্রুপে এবং আর্জেন্টিনা ২নং গ্রুপে রানার্স-আপ হয়েছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের লীগে মোট ৬টা খেলায় হল্যান্ড ১৪টা গোল দিয়ে ৭টা গোল খেয়েছে। অপরদিকে আর্জেন্টিনা গোল করেছে ১২টা এবং খেয়েছে ৩টে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের লীগের খেলায় একমাত্র ব্রাজিল শেষ পর্যন্ত অপরাজেয় আখ্যা লাভ করেছে।

প্রথম পর্বের লীগ
চূড়ান্ত তালিকা

গ্রুপ ১

	খে	জ	ড্র	প	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইতালী	৩	৩	০	০	৬	২	৬
আর্জেন্টিনা	৩	২	০	১	৪	৩	৪
ফ্রান্স	৩	১	০	২	৫	৫	২
হাঙ্গেরি	৩	০	০	৩	৩	৮	০

গ্রুপ ২

পোল্যান্ড	৩	২	১	০	৪	১	৫
পঃ জার্মানী	৩	১	২	০	৬	০	৪
তিউনিসিয়া	৩	১	১	১	৩	২	৩
মেক্সিকো	৩	০	০	৩	২	১২	০

গ্রুপ ৩

অস্ট্রিয়া	৩	২	০	১	৩	২	৪
ব্রাজিল	৩	১	২	০	২	১	৪
স্পেন	৩	১	১	১	২	২	৩
সুইডেন	৩	০	১	২	১	৩	১

গ্রুপ ৪

পেরু	৩	২	১	০	৭	২	৫
হল্যান্ড	৩	১	১	১	৫	৩	৩
স্কটল্যান্ড	৩	১	১	১	৫	৬	৩
ইরাণ	৩	০	২	১	২	৮	১

দ্বিতীয় পর্বের লীগ তালিকা

গ্রুপ 'এ'

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
হল্যান্ড	৩	২	১	০	১	৪	৫
ইতালি	৩	১	১	১	২	২	৩
পঃ জার্মানি	৩	০	২	১	৪	৫	২
অস্ট্রিয়া	৩	১	০	২	৪	৮	২

গ্রুপ 'বি'

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
আর্জেন্টিনা	৩	২	১	০	৮	০	৫
ব্রাজিল	৩	২	১	০	৬	১	৫
পোল্যান্ড	৩	১	০	২	২	৫	২
পেরু	৩	০	০	৩	০	১০	৫

দর্শক

গোলমাল দানা বেঁধে উঠেছে

কলকাতা ময়দানে এবার যে এই ধরণের রক্তারক্তি কান্ড ঘটবে, উশৃঙ্খলতার জোয়ারে মরদান ভেসে যাবে—তার আঁচ বেশ কিছুদিন আগেই পাওয়া গিয়েছিল। ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলকে কেন্দ্র করে সুতারকিন স্ট্রীট আর তার আশপাশের অঞ্চলের পথে ঘরেছিল ক্লাব সমর্থকদের রক্ত। সেই হামলায় আহত হয়েছিলেন নিরীহ পথচারীরা। ঐ অঞ্চলের দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখনই কাগজে কাগজে বিস্তর লেখালিখি হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এখনই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে খেলার সময় কি হবে।

সেই সন্দেহ, সেই আশঙ্কা আজ সত্যি হয়ে ময়দানকে বিভিষিকাময় করে তুলেছে। এক শ্রেণীর দর্শক ও সমর্থকদের হাঙ্গামায় রেফারী মার খাচ্ছেন, ক্লাবের সম্পত্তি ভাঙচুর করা হচ্ছে, শুধু তাই নয় পথে যা পাচ্ছে তাই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তারা। বেহাই পায় নি থেমে থাকা কিম্বা চলতি মোটর গাড়ি কিম্বা বাস, বেহাই পায় নি প্রেস ক্লাব। ভাঙচুর করা হয়েছে চৌরঙ্গীর বেশ কিছু দোকান-পাটও। এবার যে ক'দিন মাঠে গোলমাল হয়েছে সেই ক'দিনই দেখা গেছে যে পুলিশ প্রথম দিকে 'অ্যাকশন' নিয়ে ইতস্তত করেছে। তারপর গোলমাল যখন রীতিমত দানা বেঁধে উঠেছে তখনই তারা লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে এসেছে কিম্বা ক'দানে গ্যাস চালিয়েছে। অথচ প্রথম দিকে তৎপর হলে অবস্থা হয়তো অতোটা খারাপ হতো না।

যাই হোক এই অবস্থার কথা উঠলেই যে প্রথম বিভাগের খেলা বন্ধ করে দেওয়া হোক। কিন্তু এই কথা যে কি করে উঠলো তা বোঝা যায় না। কারণ যে যার দায়িত্ব যদি ঠিক-ঠিক ভাবে পালন করেন তাহলে মেঠো হাঙ্গামা দমন করা, অন্তত কমিয়ে দেওয়া খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়। এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে ক্লাবগুলোকে, এগিয়ে আসতে হবে আই, এফ, এ-কে, সরকারী ভূমিকা নিতে হবে পুলিশ বাহিনীকে, আর তাঁদের দিকে যদি দর্শকরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে মেঠো হাঙ্গামা মাঠেই মারা যাবে।

ফুটবল খেলা বন্ধ করে দেবার কথা ভাবার আগে এই বিষয়ে চিন্তা করা কি যুক্তিযুক্ত ছিল না? খেলা বন্ধ করে দেবার সমর্থক নাকি পুলিশও। কিন্তু কেন? তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকভাবে

পালন করতে পারছেন না বলেই কি? এ বছর কলকাতা ময়দানে যে ক'দিন হাঙ্গামা হয়েছে—তার বিবরণে প্রায় প্রত্যেক-দিনই পুলিশ বাহিনীর সমালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তৎপরতার অভাবে তাঁরা উগ্র ও মারমুখী উশৃঙ্খল দর্শক বা ক্লাব সমর্থক-দের বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। বেশ কিছু ভাঙ্গ-চুর ও ক্ষতি হয়ে যাবার পর তাঁরা 'অ্যাকশান' নিয়েছেন। অথচ তাঁরা যদি কিছু আগে তাঁদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতেন তাহলে হয়তো অতোটা ক্ষতি হতো না।

বিষয়টি নিয়ে এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনা করা হবে। জ্যোতিবাবুর হাতে আছে পুলিশ ও ক্রীড়া—দুটি দপ্তরই। তাই আশা করা যায় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার পর যা হোক একটা সূত্র পাওয়া যাবে। আমরা চাই, ময়দানে সব খেলা চালু রেখেই মেঠো হাঙ্গামা রোখার একটা সূত্র বের করা হোক। কারণ, খেলা বন্ধ করে দেওয়া মানেই হল এক শ্রেণীর উশৃঙ্খল মানুষের কাছে হার স্বীকার করে নেওয়া। এবং সেই পরাজয় হবে সরকার, পুলিশ, আই এফ এ ও ক্লাবগুলির।

কলকাতা ময়দানের খেলার রাজা ফুটবল। বাংলাদেশের মানুষ এই ক'টি মাস মেতে ওঠেন ফুটবল খেলা নিয়ে। ফুটবল ছাড়া এই সময় তাঁদের মুখে অন্য কোন কথাই থাকে না। তাঁরা রেডিওর দিকে কান পেতে থাকেন আগেভাগে খেলার খবরটি জেনে নেবার জন্যে। তাঁদের আনন্দ, তাঁদের হতাশা—এই ক'টি মাস কলকাতা ময়দানের ঐ ক্লাব তিনটিকে কেন্দ্র করেই। খেলা বন্ধ করে তাঁদের সেই উৎসাহ, উদ্দীপনার মুখে জল ঢেলে দেবার নিশ্চয়ই কোন মানে হয় না।

শুধু তাই নয়—কলকাতার এই ফুটবল লীগের দিকে এই ক'টি মাস সারা ভারত তাকিয়ে থাকে। দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ কিম্বা শ্রীনগরের মানুষ মোহন-বাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার ফল জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকেন। কলকাতার খেলা যদি সত্যিই বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে

একালের শক্তিমান গল্পকার
অমর মিত্র-র
মাঠ ভাঙে কালপুরুষ
দাম—ছ' টাকা]
গৌরব প্রকাশনী।
৩৬ডি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-২৬

অন্য প্রদেশের কাছে বাংলার মুখ থাকবে কি? বাংলা কি ছোট হয়ে যাবে না?

খেলা এখন আর নেহাৎ শুধু খেলাই নয়—খেলার অর্থ এখন আরো ব্যাপক, আরো অর্থবহ। কিন্তু সেই অর্থ খেলা-ধুলোর আদর্শের সঙ্গে মানানসই নয়। খেলায় হার আছে, আছে জিত—না হয়তো অমীমাংসিতভাবে শেষ হবে খেলা। কিন্তু জিত ছাড়া অন্য কিছুকে মানব না—এই মনোভাবের প্রভাবেই যত সব অলক্ষণে কাণ্ড ঘটছে মরশুমের শুরুতেই। এসব ঘটনা প্রত্যেক বছরই অল্প-বিস্তর ঘটে। কিন্তু এবারের মত কখনো মারধোর, ইঁট ছোড়াছুড়ি মাথায় করে কলকাতার ফুটবল মরশুম শুরু হয়নি।

তবে তা এতো আগেভাগে হবে তা বোধহয় কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। মরশুমের শুরুতেই ময়দানের থমথমে অবস্থা। রেফারীরা আতংকিত। তার কারণও আছে। সেদিন একটি মাঠে পুলিশের চোখের সামনে রেফারীকে ধরে বাঁশ-পেটা করেছেন এক শ্রেণী উশৃংখল সমর্থক। রেফারী পুলিশের সাহায্য চেয়েও পাননি।

পুলিশের এই মনোভাব অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। বারবার পুলিশের সাহায্য চেয়েও রেফারী তা পেলেন না। সকলের এবং পুলিশের চোখের সামনে মার খেয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাঠে। ইঁট, পাথর ছোড়াছুড়ি, বাঁশ, লাঠির আস্ফালনে সমস্ত মাঠ যখন রণক্ষেত্র, তার জের যখন ছড়িয়ে পড়ল মাঠ ডিঙিয়ে, তখন শুরু হল পুলিশী অ্যাকশান। অথচ তাঁরা যদি সেদিন আর একটু আগে এগিয়ে আসতেন, তাহলে অনেক কিছুই রোখা যেত। নিরীহ রেফারীকে ঐভাবে সকলের চোখের সামনে অসহায়ের মত মার খেতে হত না।

রেফারী খেলার পরিচালনা করেন। মাঠের আইন ও শৃংখলার রক্ষক তিনি। ফুটবল খেলার আইনকানুন মেনেই তাঁকে চলতে হয় প্রতি মুহূর্তে। খেলার মাঠে তিনিই সব। তাঁর নির্দেশমত চলবে খেলা। খেলোয়াড়রা তাঁর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য। তিনিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খেলা পরিচালনা করেন।

কিন্তু হামেশাই দেখা যায় তাঁর ওপরই সকলের আক্রোশ সবচেয়ে বেশি। বিস্তর গালাগাল তাঁকে হজম করতে হয় এ-কারণেই। কোন দল গোল করতে না পারলেও তাও বুঝি তাঁরই দোষে। আর যদি কোন কারণে গোল নাকচ করেন রেফারী তাহলে আর দেখতে হবে না। খেলার মাঠ তখনই ধরবে রণক্ষেত্রের চেহারা। ক'দিন আগে ঠিক যেমনটি ধরেছিল।

কিন্তু এর পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? এইভাবে দিনের পর দিন যদি দর্শকদের অস্থিরতা বাড়তে থাকে, তাহলে কলকাতার ফুটবলের ভবিষ্যৎ রীতিমত অন্ধকার হয়ে উঠবে। সর্বভারতীয় ফুট-বলের আসরে বাংলাকে হারাতে হবে তার শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান।

এবার কলকাতায় জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় আমরা দেখেছি পাঞ্জাব, কেরলা কিভবে এগিয়ে চলেছে। কিভবে ধীরে ধীরে তাব বদলে ফেলছে তাদের খেলার ধারা। কতো তাড়াতাড়ি উন্নতি করছে তারা। ওদেব সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে আমাদের চুপ করে থাকলে চলবে না। কিন্তু দর্শকদের এই রকম অস্থিরতায় যদি পেয়ে বসে এবং মাঠের অবস্থা দিনে দিনে এমনই অরাজক হয়ে ওঠে, তাহলে বলতে বাধা নেই যে, বাংলা-দেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এ-বছর জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শ্রীনগরে হবে আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টো-বর মাসে। কলকাতার আসরের রানার্স-আপ পাঞ্জাব বাংলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেছে। কলকাতার পবাজয়েব শোধ তারা শ্রীনগরে তুলবে। সেই জন্যে তারা হয়তো প্রস্তুতও হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি করছি?

আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি, খেয়োখেয়ি করছি। এবং আমাদের এই আচরণ খেলোয়াড়দের মনে ভয় জাগিয়ে তুলছে। তাঁরা প্রতিদিন অকথ্য গালাগাল হজম করেন, তার ওপর আবার মার খাবার হুমকি। এরপর হয়তো ভয়ে ভয়ে খেলতে যাবেন এবং সেই সঙ্গে হারাবেন তাঁদের স্বাভাবিক কৃতীত্বানৈপুণ্য। আর তার ফল হবে আবো ভয়াবহ। এতে আর যাই হোক খেলার মানের উন্নতি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাই আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। খেলা দেখতে গিয়ে অস্থিব হলে চলবে না। নিজেদেব দল ভালো খেলতে না পারলে, জিততে না পারলে দুঃখ হওয়া, কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্যে খেলার মাঠকে রণক্ষেত্রে পরিণত তোন কোন লাভই হয় না। মিছমিছি খেলোয়াড়দের ওপর আরো বেশি চাপ সৃষ্টি হয়। ভালো খেলতে না পারলে, ধিততে না পারলে খেলোয়াড়দের মনের অবস্থা যে কি হয় তা লিখে বোঝান যাবে না। তাঁদের তখন সব থেকে বেশি দরকার উৎসাহিত করা। দরকাব তাঁদের দিকে সহযোগিতাব হাত বাড়িয়ে দেওয়া। একটু সহানুভূতি, একটু উৎসাহ তাঁদের খেলাব মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রধ্বনি

বি এফ জে-এর মুখোমুখি

কয়েকদিন আগে বি এফ জে এ'র বর্তমান সম্পাদক বাগীশ্বর ঝা মহাশয়ের সঙ্গে চলচ্চিত্র ও ঐপ্রসঙ্গে বি এফ জে এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ঐ মুহূর্তে আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন ছিলেন, ঘরে কেউ ছিল না, দূরে প্যাকিং বাকসের ওপর একটানা হাতুড়ির শব্দ চলছিল; সেই সময় তিনি ঐ সংস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু কঠিন সত্য বলে ফেলেছিলেন।

আমি সেই মুহূর্তেই বললাম, যা আমার আগে বলা উচিত ছিল.

ঃ আমি কিন্তু আপনার ইন্টারভিউ নিচ্ছি।

ঃ একথা তো আগে বলো নি।

আমি হেসেছিলাম।

ঃ তুমি কি ঐসব লিখবে?

ঃ না।

ঃ সেই ভাল. ঘাট পেরিয়ে আর ঝামেলা পোষায় না।

ঃ তাই কি?

ঃ কিন্তু কিভাবে কি করব বলতো? আমার তো অনেক প্ল্যান আছে, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারছি না যে।

ঃ একটা কথা আপনাকে বলি, মানুষ হিসেবে আমার কাছে আপনার গুরুত্ব বা মূল্য আছে, কিন্তু আমাদের পাঠকের কাছে এরচেয়েও বড় গুরুত্ব বি এফ জে এ'র। তাই আপনি আপনার কথা না বলে বি এফ জে এ'র কথা বলুন। আমার মতো অনেক পাঠকের কাছে, অনেক দর্শকের কাছে, বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্ট এ্যাসোসিয়েশন মানেই এক মহান ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্থা। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা, সমালোচনার প্রতিনিধিত্ব করছেন আপন তাই আপনাদের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল; অনেক দাবী ছিল।

ঃ স্বীকার করে নিচ্ছি, আমরা কোন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি নি।

ঃ কেন?

ঃ নানা কারণে, অর্থনৈতিক সমস্যা—

ঃ শুধু কি অর্থনৈতিক সমস্যা?

ঃ না, টাকা হয়তো চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে, কিন্তু.....

এখানে এসেই তিনি থমকে গেলেন। কেননা এর পরে যে সমস্যা, তা বড় বেশী কঠিন। তাঁর কথায় মনে হল, বি এফ জে এ দাঁড়িয়ে আছে সেই রাজার মতো যে রাজার শাসন একদিকে যেমন কেউ মানত না, অন্যদিকে তেমনি রাজা কাউকে শাসনও করত না। আমি মিজেস করলাম বি এফ জে এ'র

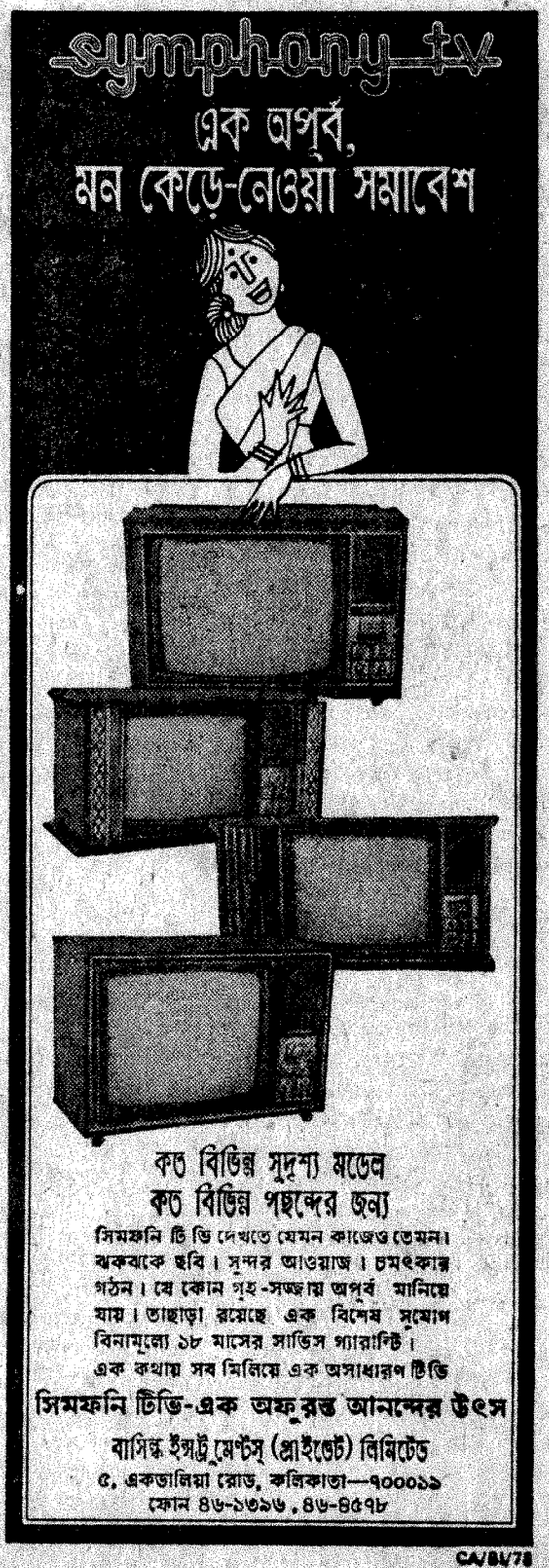

CA/BV/78

মধ্যে যেসব সাংবাদিক সমালোচক আছেন, তাঁদের সংবাদ পরিবেশনের ধারা কি আপনারা নিয়ন্ত্রণ করেন ?

: বি এফ জে এ কারুর ওপর কিছু চাপায় না।

: বেশ তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তির অভিনয় পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সমালোচকেরা তাঁকে সংবাদের শিরোনামে রাখেন তখনো কি আপনাদের কিছু করণীয় নেই ?

: কি করতে পারি আমরা ? কেউ যদি ঐসব নামে লেখে আর সে যদি আমাদের সদস্য না হয়, তাহলে বি এফ জে এ কি করতে পারে ?

: আর যদি সদস্য হয় ?

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন ? তারপর বললেন, দেখো অনেক সময় বিজ্ঞাপনই সংবাদকে নিয়ন্ত্রণ করে।

: কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি তা না করে ?

: সেক্ষেত্রে সেই সাংবাদিক নিজের রুচিমতো যা ইচ্ছে তা করতে পারে। আমি কিছুদিন অমৃতবাজার পত্রিকার সিনেমা পাতায় দেখতাম, কিন্তু কেউ আমাকে গাইড করতে আসেনি, আমার যা ভাল মনে হয়েছে, তাকে ভাল বলেছি, খারাপ মনে হলে খারাপ।

: এব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমিও একমত। এক চিত্রসমালোচক হিসেবে আমার বয়েস ৮।৯ মাস। কিন্তু আমি পেয়েছি অবাধ স্বাধীনতা। আমাদের সম্পাদক এই স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু কথা হল আমি যদি এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করি, যদি সম্পাদকের বিশ্বাস নষ্ট করি, যদি কোন খারাপ ছবি বা নাটককে ভাল বলি, তাহলে সম্পাদক সেখানে কি করবেন ? দোষটা আমার, আর সেখানে কি আপনাদের কোন করণীয় নেই ?

: মনে তো হয় না।

: আমার মনে হয় আছে। আপনারা আমাকে ডাকতে পারেন, আমি মেম্বার হই বা নই, আমার কাছে আমার লেখার কারণ জানতে চাইলেন, এবং সেখানেও যদি আমি সৎ না হই, তাহলে আপনারা আমার সম্পাদককে জানান, আর তারপরেও কিছু না হলে আপনারা এর বিরুদ্ধে প্রচারে নামুন।

: আরে এ সে দীর্ঘ পথ।

: তা না হলে চিত্র সাংবাদিকতা সৎ, সুস্থ ও সাহসী হবে কি করে ?

তোমার কথা ঠিক, আমিও একথা বিশ্বাস করি যে, যে সাংবাদিক তাঁর লেখায় সৎ না হতে পারবেন, তিনি কখনো চলচ্চিত্রের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারবেন না। তিনি তো নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেছেন।

: আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা যাঁরা চিত্র সাংবাদিকতা করছি, আমরা সবাই এবিষয়ে যোগ্য বা আমরা সবাই ছবি বুঝি ?

: না বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার বিশ্বাসে কি এসে যায় ?

: আমি আবার বলছি, আপনার বিশ্বাসের কথা নয়, বলছি বি এফ জে এ'র কথা। বি এফ জে এ যদি তাই মনে করে তাহলে তার প্রতিকারের জন্য কি করেছে ? তিনি চুপ করে আছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, বি এফ জে এর যাঁরা সদস্য, তাঁরা কি সবাই সৎ ও সাহসী ? আপনাদের এই সংস্থার সদস্য হওয়ার মিনিমাম নিয়ম কি ?

: অন্ততঃ পাঁচ বছর চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা দরকার। অবশ্য শর্তসাপেক্ষে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

: ধরুন ৫×৩=১৫ বছর থেকেও আমি ফিল্ম বুঝি না, কিচ্ছু জানি না, তাহলেও কি আমি সদস্য হতে পারব ?

: তোমার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি ?

: বাগীশ্বরদা, আমার মনে হয়, এখানে যে একদিকে ভাল ছবি হচ্ছে না, অন্যদিকে এক আধটা ভাল ছবি যাও বা আসছে, তাও আর্থিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, এর আংশিক কারণ আমরা সাংবাদিকেরা এবং বিশেষ করে বি এফ জে এ।

দেখো বিকাশ আমিও এসব নিয়ে ভেবেছি, আমার অনেক প্ল্যান আছে, বলতে পারো ছিল, ভেবেছিলাম বারবধূ ছবি যেসব হলে হচ্ছে, তার সামনে পথসভা করলে কেমন হয় ? তাছাড়া ডিবেট হোক, সেমিনার হোক, বি এফ জে এর পত্রিকা বেরুক, কখনো ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির লোকেদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা হোক, ইণ্ডাস্ট্রি ও দর্শকদের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠুক, এরকম অনেক কিছুই চাই, কিন্তু হয় না যে।

: কেন ?

আসলে বিশ্বাস করো, কাজের লোকের বড়বেশী অভাব। আমি ষাট পেরিয়ে গেছি, তবু এখনো আমি কাজ করতে চাই, তোমার চেয়েও বেশী করতে চাই, তুমি আমাকে কাজ দাও। কিন্তু একটা কথা, উদ্দেশ্যহীন কোন কাজে আমি আর উৎসাহী নই।

আপনাদের বি এফ জে এ'র বর্তমান কাজ কি ? জবাবে তিনি এক তিক্ত হাসি হাসলেন, যা একমাত্র আত্মসমালোকই পারে। এবছরে একটা অনুষ্ঠান, সাইনবোর্ডটা টিকিয়ে রাখতে হবে তো ? দেখো, আগে কোনো পত্রিকায় তেমন কোন স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু এখন সাংবাদিকেরা অনেক বেশী স্বাধীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা সমালোচনার মান বেশ নিম্নগামী। কেউ সবাইকে খুশী করতে চান, কেউবা বন্ধুদের ব্যাক করতে চান, ফলে দর্শকের কাছে আমরা বিশ্বস্ত থাকতে পারছি না।

এখন যে বাংলা ছবি চলছে না, ভাল ছবি তৈরি হচ্ছে না, নতুন পরিচালক আসছে না, এখন এই মুহূর্তে আপনাদের কি করা উচিত। বি এফ জে এ তো একটি প্রাচীন ও অভিজাত সংস্থা—

: কিন্তু, ভাই বড্ড বেশী প্রাচীন। তোমরা তো প্রায়ই বলো, ইণ্ডাস্ট্রিতে এখন নতুন ব্লাড দরকার। আমাদের এখানেও দরকার নতুন তাজা রক্ত। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় এখন বেশ কিছু ফ্রেশ জিনিস চাই। আমি তো যেকোন মুহূর্তে এই এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের পদ ছাড়তে রাজী। ভুল করছেন, আমি সম্পাদকের পদ নিয়ে কিছু বলছি না, আমি বলছি টোটাল সাংবাদিকতা নিয়ে সমালোনা নিয়ে বি এফ জে এ নিয়ে।

: এবিষয়ে তোমার কি কিছু প্রস্তাব আছে ?

: আছে।

: বলোই না।

: ১। সাংবাদিকতা ও সমালোচনাকে সত্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হতে হবে।

২। কোন সাংবাদিক বা সমালোচকের এমন কোন ব্যক্তি বা বিষয় নিয়ে এমন কিছু লেখা উচিত নয়, যার মধ্যে শুধুমাত্র প্রচার, পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুতা বা বিদ্বেষ আছে।

৩। সাংবাদিকের যোগ্যতা বিচার হবে, তিনি কত বছর বা কোন্ কাগজে যুক্ত ইত্যাদি বিষয় দিয়ে নয়, তাঁর যোগ্যতা বিচার করবে তাঁর সৃষ্ট কর্ম।

৪। গঠনমূলক আলোচনাই হবে সাংবাদিকের প্রধান লক্ষ্য।

৫। যে সাংবাদিক, তিনি যত বিখ্যাতই হোন না কেন, বা যত বড় কাগজেই যুক্ত থাকুন না কেন, তিনি যদি চলচ্চিত্র নাটক ইত্যাদি না বোঝেন, তাঁর নিজের ভাষায় যদি তাঁর দখল না থাকে, অথবা ভাষার ওপর দখল থাকা সত্ত্বেও ও ফিল্ম বুঝেও তিনি যদি কারুর সম্পর্কে অযৌক্তিক প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তাহলে বি এফ জে এ কে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারে নামতে হবে, দরকার হলে তাঁকে বয়কটও করতে হবে। এ না হলে চলচ্চিত্র কেন, কোন শিল্পেরই উন্নতি সম্ভব নয়। কেননা সাংবাদিকরাই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, যাঁরা কোন চলচ্চিত্র, নাটক, গান ইত্যাদিকে পাঠক, দর্শকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন।

৬। প্রয়োজন এখন একটি পত্রিকা, যা একদিকে যেমন ভাল ছবির দর্শক তৈরি করবে, অন্যদিকে তেমনি ভাল ছবি করার পরিবেশ সৃষ্টি করবে, সেই পত্রিকা থেকে আমরা জানব এদেশ ও বিদেশের চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতি, বুঝতে পারব সাংবাদিকতা ও সমালোচনার সঠিক মাপকাঠি।

৭। ডিবেট, সেমিনার, পথসভা ইত্যাদির প্রয়োজন, যা একদিকে যেমন চলচ্চিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বোধ্য হতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে তেমনি ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে দর্শকের এক গভীর যোগাযোগ গড়ে উঠবে।

: আমি তোমার সঙ্গে সমস্তক্ষণ একমত।

তোমার এই কথাগুলো জানাবে তো ?

: জানাবো। সেই সঙ্গে একথাও বলব আমরা পাঠকেরা-দর্শকেরা ভীষণ আশাবাদী। আমরা এখনো আপনাদের কাছে, অনেক কিছু আশা করি, দাবী করি, আপনারা কি আমাদের এই আশার কোন মূল্য দেবেন না?

বিকাশ জানা

সস্তায় গুলমার্গ

মাটি পেলেই তো হল না, শিব গড়া হবে না বানর সেটা নির্ভর করে নির্মাতার ওপরে। এবং বোম্বাইয়ের বাণিজ্য চিন্তা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকার ফলেই পরিচালক শ্রীরমেশ বেহ্‌ল বুঝেছেন বানর প্রস্তুতঃ অনেক বাস্তব ও জনপ্রিয়। সুতরাং কসমে ওয়াদে নাচগান যুক্ত একটি রঙীন বেলুন ছাড়া আর কিছুই ওড়াতে পারল না।

অথচ সম্ভাবনা ছিল। পাঁচটা ছবির চাইতে এই ছবির শরীরে রক্তমাংসের পরিমাণ বেশী। নায়িকার রোদন জন্য বসন্ত বেশ কিছুটা তাৎপর্যময়ও। মৃত প্রেমিকের অনুরূপ একটি পুরুষের আগমনে নায়িকার চালচলন সম্বন্ধে আমাদের মানবিক আগ্রহও ছিল। কিন্তু ওই যা বলছিলাম, টাকার শেষ পর্যন্ত একটা হাসাকর সিমথেটিকম থাকেই। উপরন্তু আছে পরিচালকের ক্ষমতার প্রশ্ন।

কাহিনীটা কি? অভিজাত পরিবারে জনৈক অধ্যাপক (অমিতাভ বচ্চন) প্রেমে পড়লেন একটি ধনী তরুণীর। ধন্যবাদ নায়ককে। সম্ভবতঃ এই প্রথম আমি হিন্দী ছবির পর্দায় এত সংযত ও সম্ভ্রমী অধ্যাপক দেখলাম। হ্যাঁ, নাচানাচি একটু আছে। তবে তাতে, হে পাঠক, আপনার ভুরু কোঁচকাবার কোন দরকার নেই। আছে বলেই তো আপনি এমন সস্তায় গুলমার্গ সফর করে এলেন। তাছাড়া সঙ্গীত পরিচালক রাহুল দেব বর্মনকে প্রদত্ত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব গানও অযৌক্তিক নয়।

নায়ক ও নায়িকার মিলনে একটিই সমস্যা। সে নায়কের অনুজ (রণধীর কাপুর)। স্নেহ, বলাই বাহুল্য, বিষম বস্তু। অতএব কলেজের ছাত্র এই ছোটভাইটি কবে পাশ করে জীবনে স্থিতিশীল হবে, এজন্য দুজনেই অপেক্ষা করছিলেন। ভাইটি কিন্তু, মুখ থেকে দুধের গন্ধ না ছুটলেও, মাস্তানি করে। তারই খেসারত দিতে হল বড়ভাইকে। একদিন ভাইয়ের সঙ্গে অপর এক দুর্বৃত্তের সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন আদর্শ-বাদী প্রফেসর সাহেব।

না, না, আঁতকে ওঠার প্রয়োজন নেই। নায়ক, বিশেষভাবে যদি সে অমিতাভ হয়, মরে গেলে রণধীর কাপুরের দেবর লক্ষ্মণ রূপ দেখতে কেউ হলে থাকবে না, সেটা পরিচালক বিলক্ষণ জানেন। দ্বিতীয়বার অমিতাভ আবির্ভূত হলেন, আদর্শবাদী অধ্যাপকের বিপরীতে, নিরাবেগ সমাজ-বিরোধী হিসেবে। নায়িকা তখন শোকগ্রস্ত।

ভোলাভালা ছবিতে রাজেশ/মৌসুমি

পাষাণ প্রতিমা। এরপরে নাটকের তরঙ্গভঙ্গ আমার জানিয়ে দেওয়া অনুচিত।

শ্রীযুক্ত অমিতাভ বচ্চন তাঁর দুটি ভূমিকাতেই সফল। তবে অধ্যাপক হিসেবে তাঁর গাম্ভীর্য প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। নায়িকা রাখীর অভিনয়ও প্রশংসনীয়। যদিও প্রেমিকের অত খারাপ ছবি না আঁকলেও তাঁর চলত তবু ক্ষেত্রবিশেষে তিনি আবেগকে একটি স্থিরমাত্রা দিয়েছেন। যেমন প্রেমিকের ছবিতে অগ্নিসংযোজনের ঘটনাটি। রণধীর কাপুর সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই; লোকে ভালো বললেই ভালো। বণধীরের প্রেমিকার ভূমিকায় শ্রীমতী নীতু সিং মোটামুটি টমবয় গোছের।

শ্রীরাহুল দেব বর্মনের সুরারোপ দর্শকদের মন কাড়বে। বিশেষভাবে "আতি রহেঙ্গে বাহারে" গানটির সম্ভাব্য জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমি বাজি রাখতে রাজি আছি। আলোকচিত্র গ্রহণের কাজও ভালো।

এক হাতে প্রেমিকা অন্য হাতে ছুরিকা

শশী কাপুর যখন সজোরে ঘোষণা করলেন যে ঘটনাস্থল বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্র আর দস্যু সর্দার তিলক সিং-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি আধুনিক অর্জুন তখন, বলতে কি, একটু সমস্যায় পড়েছিলাম। ইস! এর পরেই তো কত লোক যে পালিয়ে যাবে ভয়ে, কত লোকের মাথা পড়বে ফাটা। এমন নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো মুখ, এমন রমণীমোহন রূপযুক্ত নায়কের যদি বা সে পুলিশ অফিসার—কি এসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া সাজে? তবে পরিচালক হরমেশ মালহোত্রা আমাদের দুশ্চিন্তা দূরীকরণে কালক্ষেপ করেন নি। নায়ক ঘরের খেয়েই বনের তাকাত তাড়িয়েছেন। তদুপরি বনপথ ঠিক ফুলে ফুলে ঢাকা না থাকলেও বিশেষ দুর্গম নয়। তাই নায়িকারও বিশেষ অসুবিধে হয়নি টিফিন কৌটোতে গরম গরম খাবার পৌঁছে দিতে নবযুগের অজ্ঞাতবাসী অর্জুনকে। মধ্যপ্রদেশের ডাকাতির অ্যারিস্টোক্র্যাসি যে আস্তে আস্তে পাড়ার মোড়ের গুণ্ডামিতে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে সেটাও স্বস্তির বিষয় না হলে শশী কাপুর এক হাতে প্রেমিকা অন্য হাতে ছুরিকাকে যুগপৎ কতটা ম্যানেজ করতে পারতেন বলা শক্ত।

বেচারী সুলক্ষণা পণ্ডিত। তাঁর জন্য কষ্ট হয়। ভাবলেশহীন মুখে কান্নাকাটি করে

যতটা অভিনয় কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব ভদ্রমহিলা তা দেখিয়েছেন। দস্যু সর্দারের চরিত্রে রঞ্জিৎ আশ্চর্যরকমভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছেন। তাঁর আচার আচরণে তবু ধরা পড়েছে, নৃশংস প্রতিশোধপরায়ণতার স্বরূপ। আর আছে একটি ঘোড়া। সে প্রমাণ করেছে যে এই সিনেমার অন্যান্য চরিত্রদের মতই সে বুদ্ধিমান। সুরকার লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এ ছবিতে বেশ ম্লান।

এতদিন খবরের কাগজে পড়ছিলাম, এবার এই ছবি থেকে জানলাম ডাকাতদের হৃদয় পরিবর্তন হয়। কিন্তু তার থেকেও আপাতত জরুরী প্রশ্ন এইসব চিত্র-পরিচালকের হৃদয় কবে গলবে? কবে তারা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর এসব ডাকাতি বন্ধ করবেন?

আরেকটু বেহায়া নায়ক চাই

ছবির নাম দেখে বোধ হয় সরলমতি কোন পাঠকের ধারণা হচ্ছে যে কলেজ বা শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলো দেখা যাবে পর্দায়। যদি হয়, আমার কিছু বলার নেই, তিনি ঠকবেন। সেই যে শেকসপীয়ার বলেছেন না—নামে কি এসে যায়, গোলাপকে যে নামেই ডাক ইত্যাদি এবং ইত্যাদি, আমার মনে হয় হিন্দী পরিচালকদের সেটা খুব মনে ধরেছে। আলোচ্য ছবিতে কলেজ নিয়ে কোন কথা নেই, সুতরাং কেন কলেজ গার্ল, কেন বম্বে নাইট না। এসব প্রশ্ন করবেন না। ছবি দেখতে চাইলে ছবি দেখবেন।

কিই বা দেখবেন! বুঝতেই পারছেন কলেজ গার্ল যখন আছে, একটি বানর বয়ও থাকবে। তবে যাকে বলে জমাট প্রেম তা নেই। শচীনের নাচ দেখলে অবশ্য আপনি জানতে পারবেন মানুষ এল কোথা হতে। সে কিশোর-কুমারের সাহচর্যে একটি চমৎকার গানে (প্যার মাংগা হ্যায় তুহী সে) ওর্কদানও করেছে। কিন্তু যে নায়িকা রাস্তায় নায়ককে চড় মারতে পারে, কখনও রেন ওয়াটার পাইপ বেয়ে নেমে আসে, কখনও উকিল হয়ে সওয়াল করে এবং হাসিমুখে কাঁদে। অর্থাৎ

দেশ পরদেশ ছবিতে দেবানন্দ

বিন্দিয়া গোস্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিতে আর একটু বেহায়া নায়ক দরকার ছিল।

দরকার হয়ত অনেক কিছুই ছিল। আমরা তা নিয়ে অভিযোগ করব না। উৎকৃষ্ট ছবির আশাও আমরা করছি না। কিন্তু এমন কি হিন্দী ছবিতেও তো, দুর্বল হলেও, একটা গল্প থাকে। এ ছবিতে সেই গল্পের ভিত্তিটিও অত্যন্ত আলগা। আমরা আদৌ বুঝতে পারি না এমন প্রতাপশালী খলনায়ক (সুধীর) কেন প্রতাড়নার এমন জীর্ণ জাল বিছিয়ে দিল।

বিন্দিয়ার বোনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রীতা ভাদুড়ী। কারুর অভিনয়ই উল্লেখ্য নয়। তবে বাপী লাহিড়ীর সুরে একটি গান সুপ্রচলিত হতে পারে। ছবির নামলিপি প্রদর্শনকালে একটি কাজের কথা দেখা যায়। আসলে কলেজ গার্ল জাতীয় ছবিতে সেই কাজটিরই কোন ভূমিকা থাকে না। এবং কাজটি? বলাই বাহুল্য পরিচালনা।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ব্যবসায়ী ছবির চমক নেই

সম্পূর্ণভাবে প্রচারধর্মী অথচ শিল্প-গুণান্বিত ভারতীয় ছবির ছোট্ট তালিকায় সাম্প্রতিক যে নামটি সংযোজিত হচ্ছে, সেটি 'মন্থন'। পরিচালক শ্যাম বেনিগল।

এই ছবি তৈরির প্রাক্ শর্তই ছিল দুগ্ধ সমবায় প্রকল্পকে উৎসাহদান। চিত্র-নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকর গুজরাটের একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে তাই কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ, সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র, ঘটনার বিন্যাসে রয়েছে শক্ত বাঁধুনি এবং স্বাভাবিক সাবলীল। আর এই সুগ্রথিত চিত্রনাট্যটিকে প্রায় নিখুঁত বাস্তবতার সঙ্গে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন শ্যাম বেনিগাল।

গুজরাটের এই গ্রামে দুগ্ধ ব্যবসায়ী শর্মাজীর (অমরিশ পুরী) একাধিপত্য। দরিদ্র গ্রামবাসীকে দুধের অল্প দাম দিয়ে সে তাদের ঠকায়। শহর থেকে একদল তরুণ এক পশুচিকিৎসকের নেতৃত্বে আসে গ্রামে। সমবায় সমিতি গড়ার উৎসাহ দেয় সকলকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম বাধা আসে শর্মাজীর কাছ থেকে। তারপর শুরু হয় হরিজনদের সঙ্গে সারপঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চায়েত প্রধান ও তার সাকরেদদের সংঘাত। এই দ্বন্দ্বে আহুতি দিতে এগিয়ে আসেন শর্মাজীও। দয়া আর উপকারের মুখোশ পড়ে বহু কষ্টে তৈরি সোসাইটিকে ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করে। এমনকি ডাক্তারের বিরুদ্ধে গাঁয়ের বৌ বিন্দুকে বলাৎকারের ঘৃণ্য অভিযোগ আনে তারা। এক সময় সত্যি সত্যিই প্রায় হার মেনে শহরের ডাকে সকলকে গ্রাম ছাড়তে হয়।

হরিজনদের নেতা ভোলা তখন এগিয়ে আসে। শর্মাজীর কুটিল চক্র থেকে সকলকে বার করে এনে সোসাইটিকে চালাতে শুরু করে।

ছবির সমাপ্তি এখানেই। এই সমাপ্তি থেকেই আরেকটি নতুন ছবি শুরু করা যেতে পারে। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে লড়াই করে দরিদ্র হরিজনরা সত্যিই কি ঐ সমবায় সংস্থাটি চালাতে পারবে? এমন একটা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে শ্যাম বেনিগাল দর্শকের চিন্তাকে থামিয়ে দিয়েছেন। এবং পরোক্ষে 'একতা'ই শক্তি—এই সত্যটিকেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

অঙ্কুর এবং নিশান্তের স্রষ্টার কাছ থেকে 'মন্থন' পাওয়া সাবজেকটিভলি হয়ত কিঞ্চিৎ দুর্বলতার পরিচয়, কিন্তু অব-জেকটিভলি ছবিটি একই পথের পথিক। বলতে দ্বিধা নেই, এই মুহূর্তে বাস্তব সেরা পরিচালক হিসাবে শ্যাম বেনিগাল সমাজ, মানুষ আর মাটির কাছাকাছি আসার চেষ্টায় সবচাইতে সফল।

ছবির চেহারার দিকটায় আসা যাক।

দক্ষিণী

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা—২৬

ভর্তি হবার শেষ তারিখ

দক্ষিণী'র চলতি শিক্ষাবর্ষে নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করবার শেষ তারিখ আগামী ৩১শে জুলাই। দক্ষিণীতে কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্য-কলা শিক্ষাদান করা হয়। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা পরিকল্পিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে বয়স্কদের পাঁচ ও শিশুদের তিন বছরের যে শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট, তার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনার সহিত শিক্ষার্থীদের পরিচয় হবে। নৃত্য-কলায় বয়স্কদের চার ও শিশুদের তিন বছরের শিক্ষাক্রম। শিক্ষা গ্রহণ ও ভর্তির সময় : মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার বিকাল ৪—৮॥, রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ৪—৬॥ এবং বুধবার বিকাল ৪॥—৮॥।

সুদেব গুহঠাকুরতা, কর্মাধ্যক্ষ

গুজরাটের 'সেমলা' নামে একটি স্টেশনের কাছেই মন্থনের গ্রাম। সম্পূর্ণ আউটডোরে তিনি লোকেশনটিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব্যবহার করেছেন। গোবিন্দ নিহলানির ক্যামেরা ঝোপ-জংগল, রুক্ষ রাস্তা, ভাঙ্গা বস্তি, শস্যশ্যামল ক্ষেত সর্বত্র শিল্পীর চোখ নিয়ে ঘুরেছে। কয়েকটি নীরব মুহূর্ত সরযে অভিনন্দনীয়। চরিত্রগুলির পোষাক-পরিচ্ছদ এবং মুখের ভাষাতেও স্থানীয় উচ্চারণকে সযত্নে ব্যবহার করেছেন।

দু-একটি মারাত্মক ত্রুটির কথা তবুও উল্লেখ করতেই হচ্ছে। কারণ, ছবিটি শ্যাম বেনিগালের। যেমন, মহাপাত্র চরিত্রটির হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া এবং দুধ বিক্রীর জন্য অপেক্ষমাণ স্মিতা পাতিলের কলসীটি দুধ নয়, বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ থাকা।

প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। আলাদা-ভাবে কারও নাম করাটা বোধহয় উচিত হবে না। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন গিরিশ কারনাড, স্মিতা পাতিল, নাসিরুদ্দিন শাহ, অনন্ত নাগ, অমৃশ পুরী, ফুলভূষণ কারবান্দা, মোহন আগাসে, সাধু মেহেরা।

ছোট্ট তিন-চার লাইনের লোক-সংগীতটির ব্যবহার যেমন উপযুক্ত, সুর এবং গাওয়ার ঢং (গায়িকা ঃ প্রীতি সাগর) টিও বেশ ভালো। **মন্থন** যে ব্যবসায়িক ছবির চোখ ঝলসানো চমক নেই, গ্রামীণ জীবন ও জীবনের সমস্যা আছে, আছে উত্তরণের পথ—শ্যাম বেনিগালের ছবির এই শিল্পধর্মই আজ তাঁকে 'শ্যাম বেনিগাল করেছে।

মৃণাল সেনের পরশুরাম

জং-ধরা ভাঙ্গা টিন, ছেঁড়া নোংরা কাঁথা, শুকনো নারকেল পাতা ঘুঁটে ভাঙ্গা অ্যাসবেস্টরের টুকরো, কয়লার গুল, আধলা ইঁট, পচা বাঁশের টুকরো, নর্দমা থেকে কুড়নো শতচ্ছিন্ন কাপড়, ভাঙ্গা হাঁড়ি-কুড়ি, টিন - কাঁথা - গুল - ইঁট-বাঁশ - কাপড়.....কি নেই ঘরের দেয়াল আর ছাউনিতে! রাস্তার যত জঞ্জাল সব জড়ো করে তৈরি হয়েছে এই সব ঝোপড়ি-গুলো।

সারা কলকাতা শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এমন হাজারো ঝোপড়ি। কয়েক হাজার নাগরিক-এর বাস এই সকল বাসগৃহে! ভূমিহারা সর্বস্বান্ত গাঁয়ের কৃষক আর শ্রমিকরাই এসে সংসার গড়ে তোলে এইসব ঝোপড়িগুলোয়। আগাছার মত গজিয়ে ওঠে নাগরিক সভ্যতার পাশে প্রাগৈতিহাসিক এক সমাজ, সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি। ছিন্নমূল এই সর্বহারা নাগরিক না পায় সভ্যতার আলো, না ফিরে যেতে পারে আদিম ইতিহাসের পাতায়।

বেলেঘাটার কনভেন্ট রোডে লোরেটো স্কুলের গায়ে এমনি এক সমাজ-সংস্কৃতির

মৃণাল সেন

পীঠস্থান দেখে এসেছি ক'দিন আগে। ঝোপড়ির মানুষগুলোকে চিনে নিতে কষ্ট হয়নি। খোঁড়া হারানখুড়ো, অন্ধ গুরুপদ, রাজমিস্ত্রী নরেন, গুরুপদর স্ত্রী, মেয়ে রাধা, গোষ্ঠর মা আর খুশীতে ডগমগ পরশুরাম—মনে হয়েছে সব্বাই-ই যেন ঐ ঝোপড়ির মানুষ নয়, এই কলকাতার সভ্যতারই একটা অঙ্গ। না খেতে পাওয়া হার জিরজিরে শরীরগুলোয় ঈর্ষা আছে, লোভ আছে, নীচতা আছে, সেই সঙ্গে বুকের মধ্যে রয়েছে বাঁচার উত্তাপ, এই অবস্থা থেকে জেগে ওঠার দৃঢ় চেষ্টা।

কিন্তু সন্দেহ হয়, পারবে কি? পুলিশের অত্যাচারে একদিন তো এই ঝোপড়িগুলো মাটিতে মিশে যাবে। কোন চিহ্ন থাকবে না। তখন, তখন কি করবে ওরা? বাঁ পাশের পোলের ওপর দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় কোন নাগরিক-এর কি মনে পড়বে এই ঝোপড়ি আর ঝোপড়ির বাসিন্দাদের কথা?

না মনে পড়লেও ক্ষতি নেই. পরিচালক মৃণাল সেন রঙিন ফিল্মের কয়েক হাজার ফুট ফিতেয় এদের জীবনকে ধরে রেখেছেন। রীলটা চালালেই চোখের সামনে ফুটে উঠবে সব। গোষ্ঠর মা উঠবে কেঁদে. অন্ধ গুরুপদ অসহ্য চিৎকারে স্ত্রীকে ধমকাবে, রাধা মা-র কাছে স্বীকার করবে নিজের প্রেম-কাহিনী, নরেন হিংসুভাবে খেঁকিয়ে উঠবে বস্তির ছেলেদের, আর কোন বাবু 'সেবা' দিয়েই লাইন করে সেখানে হাজির হবে দাদু আর তার এই ঝোপড়ির দলবল। এমনকি খোঁড়া হারানখুড়োও যাবে পরশুরামের পিঠে চড়ে। ওরা যাবেই, যেতেই হবে ওদের। আবার দার্শনিকের মত খুড়ো হয়ত বলবে—'পাত থেকে হাত উঠোসনি, ঠেকিয়ে রাখ, ঠেকিয়ে রাখ। পাতে যতক্ষণ হাত ততক্ষণ তুই নারায়ণ, হাত তুললেই দরিদ্র।'

মৃণাল সেন সকাল থেকে দুপুর আবার সন্ধ্যে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত একটানা কাজ করলেন ঐ লোকেশনে আটদিন। দুর্লভ সব র-ম্যাটিরিয়াল জোগাড় করে আর্ট ডিরেক্টর সুরেশ চন্দ্র দাস বানিয়েছিলেন ঝোপড়িগুলো। আর চরিত্রগুলোর পোশাক-আষাক সেগুলো যে কোথা থেকে জোগাড় করলেন বুঝতে পারিনি। কি স্বাভাবিক ছেঁড়া তেলচিটে লুঙ্গি, শাড়ি, ব্যাউজগুলো।

স্থানীয় জনসাধারণ আর ইউনিটের সবার সহযোগিতায় একদিন আগেই শুটিং শেষ হয়ে গেল। পরিবেশের সঙ্গে ক'টা দিন সকলেই যেন মিশে গিয়েছিলেন। কাহিনীকার ও অন্যতম চিত্রনাট্যকার মোহিতবাবু (চট্টোপাধ্যায়) সর্বদা থাকতেন ব্যস্ত, শিল্পীদের সংলাপ পড়ানো, উচ্চারণের ত্রুটি সংশোধন করা, পোশাক-আশাক সবদিকেই ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। মৃণালবাবু ব্যস্ত থাকতেন গোটা ইউনিট পরিচালনার কাজ নিয়ে। ক্যামেরা পজিশন, শিল্পীদের অবস্থান, অভিনয়—সবকিছুই দেখতে হতো তাঁকে। এরই ফাঁকে চিত্রগ্রাহক রণজিৎ রায়কে নির্দেশ দিতেন আলো আর লেন্স নিয়ে। অবশ্য মৃণালবাবুকেও সাহায্য করেছেন সবাই, কার

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনীর পথে!
প্রতি শনিবার ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টা
তরুণ থিয়েটারে
নাটক ও পরিচালনা • সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শেষঃ ঃ বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, হীরা, শান্তনু, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, আলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

তুষার তীর্থ অমরনাথ ছবিতে সুব্রতা/কানু

নাম আলাদা করে বলব। কুশলীদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, সৌমেন বাগ, শংকর দাস, দিলীপ, রাজেন কোঠারি, দেবী হালদার। শিল্পীদলে ছিলেন অরুণ মুখার্জি, বিভাস চক্রবর্তী, সন্তোষ রায়-চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, নিমাই ঘোষ, আরতি দাস, অনুরাধা দেব, রাধারাণী বিশ্বাস। এঁরা প্রত্যেকেই অভিনয় করেননি, বস্তি-জীবনের টুকরো-গুলোকে ক্যামেরার সামনে শুধু তুলে ধরেছেন।

পরবর্তী শুটিং দক্ষিণ কলকাতার আর একটি বস্তিতে। সেখানকার প্রধান শিল্পী হবেন শ্রীলা মজুমদার, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত এবং পূর্বোক্ত প্রায় সবাই।

রাজ্য সরকারের প্রয়োজনায় মৃণাল সেনের এই নতুন বাংলা ছবি পরশুরাম বাংলা ছবির জগতে নতুন দিগন্ত খুলবে বলে অনেকের ধারণা, কারণ এমন বিষয় নিয়ে কাহিনীচিত্র এর আগে হয়নি। মৃণালবাবুর পক্ষেই এটা সম্ভব।

এম টি বাসুদেবন নায়ার

: শুনলাম আপনি নাকি স্নেহলতা রেড্ডির ঘটনা নিয়ে হিন্দিতে ছবি করছেন। সত্যজিৎ রায় এই ভাষায় ছবি করার জন্য সময় নিয়েছেন প্রায় পঁচিশ বছর। আপনি নিজের ভাষা (মালয়লম) ছেড়ে হিন্দিতে ছবি করতে যাচ্ছেন কেন?

— বুঝতে পারছি সবই। যেদিন থেকে অফারটা অ্যাকসেপ্ট করেছি, সেদিন থেকেই একটা ভাবি বোঝা যেন চেপে বসেছে আমার ঘাড়ে। ভাষার অসুবিধের কথাটাই ভাবছি বেশি করে। কিন্তু সাবজেক্ট যে দারুণ লোভনীয়। স্নেহলতার জীবনটা ভয়ানক ফ্যাসিনেটিং। উনি নিজেই ছিলেন একটি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠান। বন্ধুরা যখন চন্দ্রপ্রভা ফিল্মস্ নামে একটা কোম্পানী তৈরি করে আমায় কালা ছবিটা করতে [illegible] সুযোগ [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible] শেষ হয়নি, [illegible] দিবা কিছু ছিল, তবুও মত দিয়েছি। এখন বিখ্যাত লেখক ইউ আর অনন্তমূর্তি ছবির পেপার ওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত, উনি আমাকে অনেক সাহায্যও করবেন বলেছেন। তাই একটু ভরসা পাচ্ছি।

তবে ফাইনাল কথা বলেই নিয়েছি— ছবি করার সময় কারও কোন ইন্টার-ফিয়ারেন্স চলবে না। ছবি করব নিজের মত, নিজের ইচ্ছায়। আমি কোন রাজ-নৈতিক ছবি করতে যাচ্ছি না। স্বাধীনতা-প্রেমী একজন মানুষের জীবন নিয়ে ছবি করছি। যিনি জীবনটা উৎসর্গ করলেন আদর্শের জন্য।

: আজকের মালয়ম ছবির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

— আমার তো খুব ভাল মনে হচ্ছে। অর্থনৈতিক ও শিল্পগত দু'দিক থেকেই তাই। এখন অনেকেই পয়সা পাবার জন্য সুপারহিট তামিল, তেলেগু, হিন্দি ছবি-গুলোর ভাষান্তর করে ছবি তুলছে। এটা কি খুব ভাল? দারুণ আত্মধ্বংসী নয় কি? নতুনেরাও তেমন কিছু করছে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখনকার দর্শকরা 'অন্য' ধরনের ছবি দেখতে ভাল-বাসে। ১৯৭৬ সালে ৬৪টা ছবি রিলিজ হয়েছে, ওভারঅল ছবিগুলির কোয়ালিটি, অ্যাপ্রোচও খারাপ ছিল না। অথচ দেখুন, পাণিকরের (ইনস্টিটিউটের এক স্নাতক) 'একাকিনী' রিলিজ পেল না। ব্যবসায়ের দৃষ্টিচক্র, পরিবেশন ব্যবস্থার গলা-টেপা নীতির জন্যই তো এমন হল। সেজন্যই বলছি অবস্থাটা তেমন সুখকর নয়।

: রামু কারিয়াৎ 'চেম্মিন' করেছিলেন প্রায় বছর দশ আগে। ছবিটা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল। তারপর থেকে একাধিক ভালো ছবি তৈরি হয়েছে মালয়-লম ভাষায় : স্বয়ম্বরম, নির্মালাম, উত্তরায়ণম, কোডিয়াট্টম। তবুও সাধারণ মালয়লম ছবি এখনও ফর্মুলার গণ্ডিতে বাঁধা কেন?

— এটা ঠিক বলেছেন আপনি, কিন্তু [illegible] হচ্ছে, [illegible] শেষ হয়নি, দর্শকের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমাদের এখানে বুদ্ধিমান রুচিবান বেশ কিছু সংখ্যক দর্শকও আছেন, যাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি। এবং ওঁদের জন্যই স্বয়ম্বরম থেকে স্বপ্নদানম সব ছবিই পয়সা পেয়েছে—অন্ততঃ আমার ধারণা তাই।

: আপনাদের এই রাজ্যে শুনেছি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন খুব জোরদার। আপনি কি মনে করেন সেই কারণেই এখানকার দর্শকরা বেশি রুচিবান এবং তৈরি?

—নিশ্চয়ই তাই। কেরালাতে ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট খুব কাজ করেছে। কলেজ, ইউনিভার্সিটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ফিল্ম সোসাইটি।

: অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়িক প্রযোজক-পরিচালকরা বলেন 'জনগণের চাহিদা আমরা পূরণ করি।' এবং তাঁরা যে একবারে অধিক নন তার প্রমাণ ওঁদের ছবিগুলোর রৌপ্য-সুবর্ণ-হীরক জয়ন্তী পালন।

—একথার কোন অর্থ নেই। একথা তো চোলাই ভাট, গাঁজা যারা বিক্রী করে তারা বলে। নতুন কথা আর কি হল! এই সব ব্যবসায়ী ছবিকরিয়ের দল সামাজিক দায়িত্বে বিশ্বাস করে না, ওরা চায় শুধু টাকার থলি বোঝাই করতে। ছবি তৈরী করে লাভ করুন তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু শুধুমাত্র লাভ করাটাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তখন সেখানে আসে নোংরামি। আমি সে-দলে নেই।

: আপনি তো এফ এফ সি-র এক বোর্ড-মেম্বার। গত ১৭।১৮ বছর ধরে এফ এফ সি আর্ট ফিল্ম বা প্যারালাল সিনেমা মুভমেন্টকে কিভাবে সাহায্য করেছে বলে আপনার ধারণা? বা আদৌ করেছে কি?

— প্যারালাল সিনেমা, পার্সোনাল সিনেমা, আর্ট ফিল্ম, নিউ ওয়েভ এসব শব্দে আমার বিশ্বাস নেই। আমার ধারণায় মাত্র দু' ধরনের ছবি আছে—ভালো ছবি আর মন্দ ছবি। আপনি আর্ট ফিল্ম করুন বা কমার্শিয়াল ছবি করুন, ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো আলাদা নয় টেকনিক তো একই। ছবির গুণগত মান নির্ভর করে পরিচালকের কাব্য-চেতনার ওপর। শুধু গল্পসার দিয়ে ভালো ছবি হয় না। যে শিল্পবোধ ও চেতনা থাকলে কোন ছবি ভালো; সৎ ছবি হতে পারে, তার ওপরই আমি জোর দিই। এফ এফ সি সর্বদাই এ-ধরনের ভালো ছবিকে মদৎ দিয়ে আসছে.....

: এফ এফ সি তার নীতি থেকে সরে যাচ্ছে এমন সমালোচনায় বাজার ছেয়ে গেছে, বিভিন্ন কাগজে প্রায়ই দেখা যায়, এই নিয়ে আলোচনা.....

— আমি যতদূর জানি এফ এফ সি তার ঘোষিত নীতি থেকে সরে যায়নি, নীতিভ্রষ্টও হয়নি।

: সমালোচনা হচ্ছে বিশেষ করে এফ এফ সি-র এইসব কেন্দ্রিক বয়েজ সিরিজের ছবি আমদানির জন্য.....

— বিস্তৃতভাবে এ-ব্যাপারটা নিয়ে আমি স্টাডি করিনি। কিন্তু ভালো ছবি

তৈরিকে সাপোর্ট দিতে গেলেও তো টাকার দরকার, নাকি? বছর বছর সরকার লাখ লাখ টাকা জলে দিতে পারেন না তো! ভালো ইনভেস্টমেন্ট এবং ভালো টাকা ফেরৎ পাবার আশা করা কি এফ এফ সি-র উচিত নয়? একবার এক পরিচালককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি ছবি করেন কেন? ভদ্রলোক জবাব দিয়েছিলেন—'আই ওয়ান্ট টু মেক এ পার্সোনাল স্টেটমেন্ট।' এটা পাগলামি ছাড়া আর কি। ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য আমি ছবি করি না।

আমার যদি কোন বক্তব্য বলতেই হয়, কাগজ-কলম নিয়ে বসি, কবিতা লিখি, প্রবন্ধ লিখি—খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিই। আপনি ট্যাক্স-পেয়ারদের টাকা নিয়ে, শিল্পীদের প্রতিভা নিয়ে টেকনিসিয়ানসদের পরিশ্রম নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারেন না। আমি সবাইকে তো বোকা বানাতে পারি না। আমার সৎ ঐকান্তিক ইচ্ছা হচ্ছে দর্শকের সঙ্গে কমুনিকেট করার। হয়ত কোটি কোটি লোকের মনোরঞ্জন করতে আমি পারব না, কিন্তু বেশি সংখ্যক লোকের কাছে আমায় পৌঁছুবার চেষ্টা করতে হবে। শুধুমাত্র আত্মতৃপ্তির জন্য পাবলিক মানি নষ্ট করা তো পাপ।

ভালো বারোটা ছবি প্রযোজনা করে এইসব তারকাচিহ্নিত ছবির ভিড়ে মাসে একটির রিলিজ দিতে পারলেই যথেষ্ট। এভাবেই ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসবে, দর্শকের রুচি পাল্টানো যাবে। লোকের সুস্থ রুচি ফিরে আসবে।

আজ যেসব ভালো ছবিকে অনধিকার প্রবেশকারী বলা হচ্ছে, একদিন সেগুলিই হবে গণপ্রমোদ মাধ্যম। গ্রিফিথ যখন প্রথম পর্দায় ক্লোজ আপ শট দেখালেন, তখনও অনেকে তাঁকে টিটকিরি দিয়েছিল। তিনি জোর গলায় বলেছিলেন—'আমি ওদের দেখিয়ে দেব।' আমাদেরও মতো তাই হওয়া উচিত। একাদিক্রমে ভালো ছবি করে যাওয়া। শুধু ছবি ছবি ....আর ছবি.....

নির্মল ধর

বোম্বাই পর্যালোচনা

বোম্বাইএ রোমহর্ষক ছবি তৈরীর উৎসাহ এখন প্রবল। এর আগে প্রেতাত্মা, রূপান্তরবাদ, অপার্থিব ক্ষমতা ইত্যাদি অলৌকিক উপাদানে তৈরী কিছু হিন্দী ছবি বিশেষ সুবিধে করতে না পারলেও 'এয়ারপোর্ট', 'টাওয়ারিং ইনফার্নো', 'দ্য এক্সরসিস্ট' প্রভৃতি বিদেশী 'হরর ফিল্ম' এর অনুকরণে হিন্দী ছবি তৈরীর জোয়ারে ভাঁটা পড়ে নি। যশ চোপড়া, রবি নাগাইচ, বি আর চোপড়া, ফিরোজ খান প্রভৃতি প্রযোজক এ ধরনের ছবি তৈরীতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছেন। যশ চোপড়ার 'কালা পাথর' চাসনালা খনি দুর্ঘটনা-ভিত্তিক ছবি। প্রায় পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এ ছবির কয়লা খনির সেট। বি আর

বাতাসী ছবিতে ঊর্মিলা দত্ত

চোপড়ার ছবি 'দ্য বার্নিং ট্রেন' টাওয়ারিং ইনফার্নো'র অনুপ্রেরণায় তৈরী। জ্বলন্ত ট্রেনের কামরায় মৃত্যু প্রতিক্ষীত যাত্রীদের উৎকণ্ঠা এ ছবির প্রধান উপজীব্য। এ দুটি ছবিই মালটি-স্টারার। জনপ্রিয়তার প্রথম সারির প্রায় ডজন খানেক শিল্পী একেকটি ছবিতে অংশ গ্রহণ করছেন। নির্ণীয়মান ও নির্মিত হিন্দী ছবিগুলির মধ্যে রবি নাগাইচের 'আদম খোর' ও 'খাদু টোনা', ফিরোজ খানের 'কসক', কুমার রামসের 'আউর কৌন', 'দারিন্দা' ইত্যাদি ছবিগুলিও তথাকথিত হিন্দী 'হরর ফিল্ম' এর তালিকাভুক্ত। এ তালিকাভুক্ত যে সমস্ত ছবি এ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছে তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষে 'হরর ফিল্ম'এর ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা এখনই সম্ভব নয়। তবে 'হরর' ফিল্ম তৈরীতে বিদেশী চিত্রজগতের অসামান্য সাফল্যের কারণ হিসেবে যে দুটি কারিগরী উপাদানের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য তা হল ফটোগ্রাফি এবং সাউন্ডট্রাক। ভারতীয় ছবির নির্মাতাগণ এ দুটি উপাদানের ব্যবহারে নতুন কোন ডাইমেনসন সৃষ্টি করতে না পারলে কেবল অনুসরণ বা অনুকরণ দ্বারা 'হরর ফিল্ম' তৈরীতে তাঁরা কতদূর সফল হবেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

অমানুষের শক্তি সামন্ত ছাড়া অন্য কোন হিন্দী চিত্র-পরিচালক এখনও উত্তমকুমারকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি, বা করেন নি। পরিণামস্বরূপ, ক্যারিয়ারগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন উত্তমকুমার স্বয়ং। গুলজার, মনমোহন দেশাইদের ছবি হাতে থাকলেও উত্তমকুমারের পক্ষে এ মুহূর্তে আরেকজন শক্তিমান সামন্তের বড় প্রয়োজন। যিনি খুব শীগগির তাঁকে আরেকবার বক্স-অফিস সফল নায়কের মর্যাদা দান করতে পারেন। না হলে অদূর ভবিষ্যতে উত্তমকুমারকে বোম্বাই চিত্রজগতে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নামতে হতে পারে। 'বন্দী' বা 'কিতাব'এ তিনি বোম্বাইতে তাঁর অপরিহার্যতার কোন কারণ সৃষ্টি করতে পারেন নি। এবং আরেকটি সৎ দুঃসংবাদ, তা হল আনন্দ আশ্রম (হিন্দি) বোম্বাইতে আর্থিক দিক দিয়ে ব্যর্থ। এখানে উত্তমকুমার সম্পর্কে নানা গুঞ্জন শোনা যায়, যা তাঁর প্রতিষ্ঠার পথে বাধাস্বরূপ। দ্বিতীয়ত বাসু ভট্টাচার্য 'গৃহপ্রবেশ' ছবিতে তাঁকে ধার দিয়ে সঞ্জীবকুমারকে নেওয়ায় উত্তমকুমারকে নিয়ে যাঁরা ছবি করার কথা ভাবছিলেন, তাঁরা বেশ চিন্তিত। বোম্বাইতে এখন যে প্রতিসম-তুসম মার্কা ছবি রাজত্ব করছে, সেখানে উত্তমকুমার বড় অসহায়, যদিও অমানুষে তিনি ঐ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এছাড়া আরো যে বড় কারণ, তা হল মেকাপ তাঁর বয়েস আর ঢেকে রাখতে পারছে না। তাই এখানে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে এই মুহূর্তে তাঁকে রোমান্টিক নায়ক থেকে চরিত্রাভিনেতায় চলে আসতে হবে।

কোনমতে শেষরক্ষা

১৯২৭ সনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যেভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারবে না.....তাঁদের জন্যে কি বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না?'

কী উদ্দেশ্যে যে বর্তমান রবীন্দ্র সদন-এর পত্তন এবং তার ভূমিকাই বা কী তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে 'রসবোধ ও কলাজ্ঞান' যে সেখানেও খুব একটা স্বস্তি পায় না তার প্রমাণ মেলে প্রত্যেক বছর রবীন্দ্রনাথ-এর জন্মদিন থেকে শুরু করে পক্ষকালব্যাপী রবীন্দ্র-পূজায়। নাচ, গান, আবৃত্তি, কবিতা পাঠ তাও একরকম; শোচনীয় অবস্থা নাটকের বেলায়। আমাদের নাটকের দুর্বল ঐতিহ্যের মধ্যে একমাত্র শক্তিশালী ব্যতিক্রমকে, রবীন্দ্র-নাথকে, আমরা এখন অবধি আয়ত্তই করতে পারলাম না, এই রূঢ় সত্য দুঃস্বপ্নের মতো প্রায়ই মনে পড়ে যায়। গত ১০ই জুন রবীন্দ্র সদন-এর কর্মীবৃন্দ-র উপস্থাপনায় 'শেষরক্ষা' দেখে আবার তা অন্তর্দাহের মতো জ্বলে উঠল।

অবশ্য এঁদের প্রযোজনা বিচার করা উচিত অফিস ক্লাবের বাৎসরিক বিনোদনের মানদণ্ডে। নাটক শুরুর আগে এঁদের নিজেদের বক্তব্যও প্রায় এই মর্মেই ছিলো। বছরের ৩৬৪ দিন অন্যের শিল্পকর্ম সুষ্ঠু-ভাবে পরিবেশন করতে সাহায্য করার পর এই একদিন মাত্র তাঁদের ভূমিকা পাদ-প্রদীপের আলোয়। নাটক নির্বাচনেও তাঁরা কোন ভাণ দেখাননি। তাঁদের এবারের নাটক ভ্রান্তিবিলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত অমল হাসারসের নাটক 'শেষরক্ষা'। প্রসঙ্গত এটি তাঁদের তৃতীয় প্রযোজনা।

এত সব মেনে নিয়েছিলাম বলেই অভিযোগ করিনি রিভলভিং স্টেজ এর প্রাগৈতিহাসিক ব্যবহারে, আলো (স্বরূপ মুখার্জী)র স্বৈরাচারে, মঞ্চ স্থাপত্যের সীমাবদ্ধতায় এমনকি প্রকৃত অর্থে নির্দেশনার অনুপস্থিতিতেও। কিন্তু অভিনয়! তাও যদি এমন হয়, তো কোথায় যাই। চন্দরবাবুর ভূমিকাভিনেতাই কি 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'র বিবেকানন্দ? বিশ্বাস হয় না। খাস্তু (বিজয়লক্ষ্মী দেবী) হাস্যকর। আবার ইন্দুমতী ও বিনোদ তো যে কোনও নিকৃষ্ট শিল্পীরও কান কেটে নিতে পারেন। মঞ্চে ওঠার প্রাথমিক শিক্ষা দূরস্থান, জিভের আড়ই এখনো ভাঙেনি এঁদের। ছোট ছোট চরিত্রের শিল্পীরাও পাল্লা দিয়ে অসহযোগিতা করেছেন অভিনয়ের সঙ্গে। তবু ওরই মধ্যে ইন্দুমতী ও গদাই এর দুই বাবা ম্যানারিজমের আশ্রয়ে মোটামুটি ভাল আর এত কষ্টের মধ্যেও যে বসে থাকা গেছে তা কেবল গদাই (চন্দন রায়) ও কমল (শুভ্রা বসু)-এর জন্য।

সঙ্গীত বা আবহ, রঙের ব্যবহার বা মঞ্চোপকরণ এসব নিয়ে এ নাটকে লেখার কিছুই নেই। এ যেন কেবল নিয়মরক্ষা কোনমতে শেষরক্ষা।

'মালঞ্চ'র জন্য

বিশিষ্ট শিল্পী, কবি ও চলচ্চিত্রকার পূর্ণেন্দু পত্রী 'মালঞ্চ' চিত্রায়িত করবেন। এই প্রবল হৈ চৈ ভরা সুযোগ শিকারী সময়ে তিনি ছবিটির আবশ্যিক ব্যয়ভার বহন কর-বার জন্য কোনও অসৎ ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হননি। পরিবর্তে তিনি তাঁর আবেদন রেখেছেন আপনার, আমার মতো হাজার হাজার সাধারণ মানুষের কাছে। কিছুদিন আগে একটি ছবির ভূমিকালিপিতে অভিনেতৃ-বর্গের নামের জায়গায় লেখা ছিল 'পিপল'। পূর্ণেন্দুবাবুর ছবিতে ঐ পিপলকেই ডাক দেওয়া হয়েছে, এবারে প্রযোজক হিসেবে।

পূর্ণেন্দুবাবু ছবি তৈরি করছেন। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা বাংলার বিশিষ্ট নাট্য-দলগুলো সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সীমিত সাধ্য নিয়ে তাঁর সহায়তায়, তাঁর পাশে। তাঁদের ভরসার জায়গাও অবশ্য সাধারণ মানুষ, নাটকের দর্শক। গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার একাডেমী অব ফাইন আর্টস মঞ্চে এই উপলক্ষেই উপস্থাপিত হয়েছিল নান্দীকার-এর নতুন নাটক 'খড়ির গণ্ডি'।

সেদিনের যা লক্ষ্য ছিল, তা কিছুটা সফল হয়েছে বৈকি। অভিনয় শেষে বুদ্ধ-প্রসাদ সেনগুপ্ত মঞ্চে এসে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা এই শো থেকে যথাসাধ্য বাঁচিয়ে পূর্ণেন্দুবাবুকে তাঁর মালঞ্চ নির্মাণের জন্য ১০০১ টাকা দিতে পারছেন। তিনি এও বললেন যে, এটা হয়তো খুবই সামান্য, কিন্তু সবকিছুরই শুরু তো এমনি করেই হয়। এরপরে তাঁর অনুরোধে পূর্ণেন্দুবাবু মঞ্চে উঠে এলে উপস্থিত দর্শকদের প্রবল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে নান্দীকার-এর পক্ষ থেকে পূর্ণেন্দুবাবুর হাতে চেকটি অর্পণ করা হয়।

সুরজিৎ ঘোষ

যাত্রার পথে 'যুগযাত্রা'

৮৯'তে যে দলের গাড়ীর চাকা পরি-চালনার দোষে ও প্রকৃতির রোষে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে দলই আজ নতুনভাবে, নতুন সাজে, দর্পের সঙ্গে চিৎপুরে উপস্থিত। এবার বলিষ্ঠ হাতে দলের হাল ধরেছেন বিশিষ্ট দল-পরিচালক মধু বড়াল। ১৩৮৫তে এ দল চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রসাদ ভট্টাচার্যের পৌরাণিক 'মহিষমর্দিণী' ও সমরেশ বসুর 'নেমক-হারাম' পালা দুটি উপস্থাপনা করবেন। অভিনয়ে থাকবেন দক্ষ নট রাখাল সিংহ, অজিত সাহা, বেলা সরকার, রাজশ্রী (পুনা), গৌতমকুমার, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। পালায় সুর দেবেন— গোপাল মল্লিক ও প্রশান্ত ভট্টাচার্য (বড়)। নাটক নির্দেশনায় থাকবেন—চন্দন মিত্র ও অসিত বসু।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দে'র বিখ্যাত যাত্রা সোনাই দিঘী বর্তমানে চিত্রায়িত করছেন পরিচালক অসীম ব্যানার্জি। রঙীন এই ছবিতে বটুক ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয় করবেন উত্তম-কুমার। অন্যান্য চরিত্রে বোম্বাই, কলকাতা ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পীরা অংশ নেবেন।

শংকর গঙ্গোপাধ্যায়

কাবুলিওয়ালা

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৭ই জুন সন্ধ্যায় পূর্ব-সারথীর নিবেদন "কাবুলিওয়ালা" নাটকটি অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প কাবুলিওয়ালার নাট্যরূপ ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হয়নি। সামান্য ত্রুটি সংশোধনের অবকাশ হয়তো আছে, কিন্তু নাট্যগোষ্ঠীর সুষ্ঠ ও সাবলীল অভিনয় গুণে নাটকটি সাফল্য অর্জন করে। বিশেষ করে পাঁচ বছরের "মিনি" রূপী মহুয়া ভট্টাচার্য তার গানে, নাচে, কবিতায় ও অভিনয় রবীন্দ্রনাথের কল্পনার মানস-কন্যা মিনির সঙ্গে মিশে গিয়ে সকলের মন মুহূর্তে জয় করে নেয়। শংকর চক্রবর্তী, সুদীন বসু, সুভাষ বসু ও অর্ধেন্দু দত্তের অভিনয় মনে দাগ কাটে।

না হলো সন্তান হারা
স্ত্রী হলো খুনী, কার পাপে?

ও পদ্মশ্রী (যাদবপুর)

বি/৬৯৬১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ১৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা— ৭০০০০৩।

দে বুক ষ্টোর্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা।

AMRITA

Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুকমী' (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

7 JUL 1979

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২

পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

সময় নেই

অমৃত

সম্পাদক প্রীতীশ বারকা
১৪ জুলাই ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

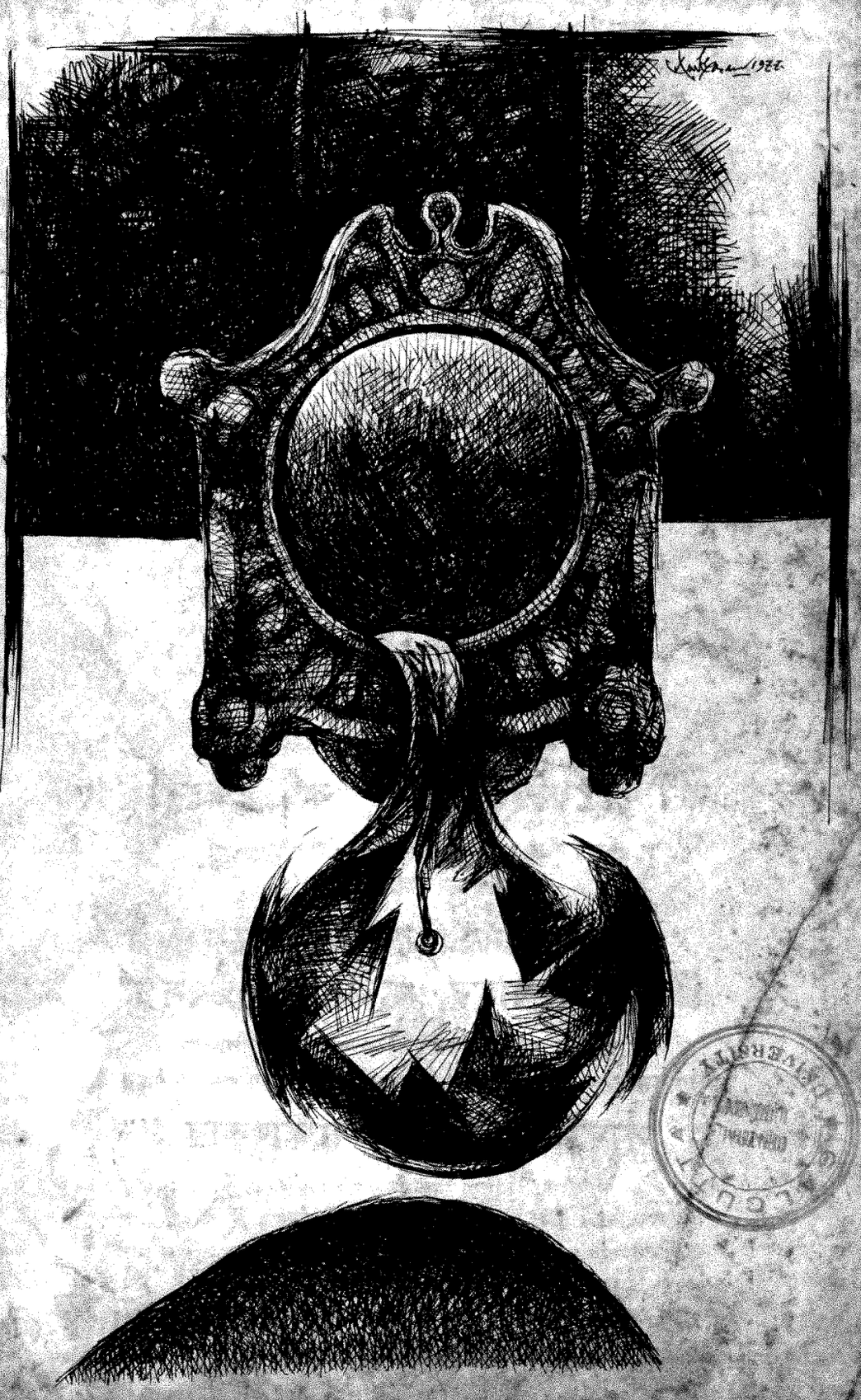

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে নববর্ষের অমৃতে থাকবে সবচেয়ে সেরা লেখা
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমলানন্দ শাসমলের সুদীর্ঘ প্রামাণিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধী : লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার

পিছু হটার পালা : লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীমাণিক্য

বাড়তির পথে ভারত : লিখেছেন অতুল সুর

পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ভবতোষ দত্ত

সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী

প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছেন

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ : ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন : অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা
দাম তিন টাকা ।। রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন।
অথবা লিখুন
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ । কলকাতা-৩

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম উপন্যাস

কীর্তিহাটের কড়চা

তৃতীয় ও চতুর্থ অর্থাৎ শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ৩৫৲

তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর প্রধান স্থানটি অনায়াসে পাননি। কঠোর পরিশ্রমে, বহু লিখে এবং বহু ভাল লিখে তা উপার্জন করেছেন। সেইঅবিশ্বাস্য শক্তিধর লেখকের পরিণত বয়সের রচনা—তাঁর বৃহত্তম ও মহত্তম উপন্যাস "কীর্তিহাটের কড়চা" জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি কূটবুদ্ধি ইংরেজ-শাসকদের বোধকরি কুটিলতম চাল। দুশো বছর ধরে এই এক আশ্চর্য মানবশ্রেণী লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন খুশীমতো খেয়ালমতো। উপকারও করেছেন, অপকারও করেছেন। "কীর্তিহাটের কড়চা"য় সেই দুশো বছরের বাঙালীদের জীবন-যাত্রার সলচ্চিত্র বিধৃত, এটিকে এক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল বলা চলে। একটি বংশের উত্থান-পতনের এই রুদ্ধ শ্বাসপাঠ্য জীবন-উপন্যাসে সমগ্র বাংলা দেশ তথা কলকাতার পট-ভূমিকায় এই জমিদার সমাজের সুকীর্তি এবং কুকীর্তি দুই প্রতিচিত্রিত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যেই এমন ঔপন্যাসিক পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত বিরল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল্য ৩০৲

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ঃ—

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
সরাইখানা ৮৲

নিমাই ভট্টাচার্যের
নাচনী ৭৲

নারায়ণ সান্যালের
হংসেশ্বরী ১০৲

সমরেশ বসুর
সূর্যতৃষ্ণা ৯৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
রঙ্গিন সাঁকো ১০৲

সুমথনাথ ঘোষের
সুদূরের পিয়াসী ৮৲

আবদুল জব্বারের
বাংলার চালচিত্র

"বাংলার চালচিত্র" প্রকৃতপক্ষে বাংলার গ্রাম জীবনের সত্য বাস্তব চিত্র। গ্রামের কৃষক ও খেটে-খাওয়া শ্রমিকদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার এক নির্ভেজাল চিত্র লেখকের কলমে সুচিত্রিত হয়ে ফুটে উঠেছে। বইটিতে সেই সমস্ত মানুষের কথাই লেখা আছে, যাদের তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন। বইটির একটি বিশিষ্ট গুণ গ্রাম বাংলার নিজস্ব খাঁটি ঘরোয়া শব্দে ভরপুর। লেখকের দৃষ্টি সত্যকার সাহিত্য-দৃষ্টি তাই বইটি অনায়াসে সত্যকার সার্থক সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কুড়ি টাকা।

পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ—

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নগরপারে রূপনগর ৪০৲

কালিকারঞ্জন কানুনগোর
রাজস্থান কাহিনী ১৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
কালো ভ্রমর
(৩।৪) **১২·৫০**

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের
জঙ্গলে জঙ্গলে ৯৲

আশাপূর্ণা দেবীর
সুবর্ণলতা ২৬৲

ভৃগুজাতকের
নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন ৩৲

দুইখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস

প্রমথনাথ বিশীর
লালকেল্লা ৩৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
বহ্নিবন্যা ১৩৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩/৩১৮ ৭১১
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯/৩৫৩৮৯২

দারুণ আকর্ষণ !

যুগান্তর এর শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনে
প্রচণ্ড লাভ !

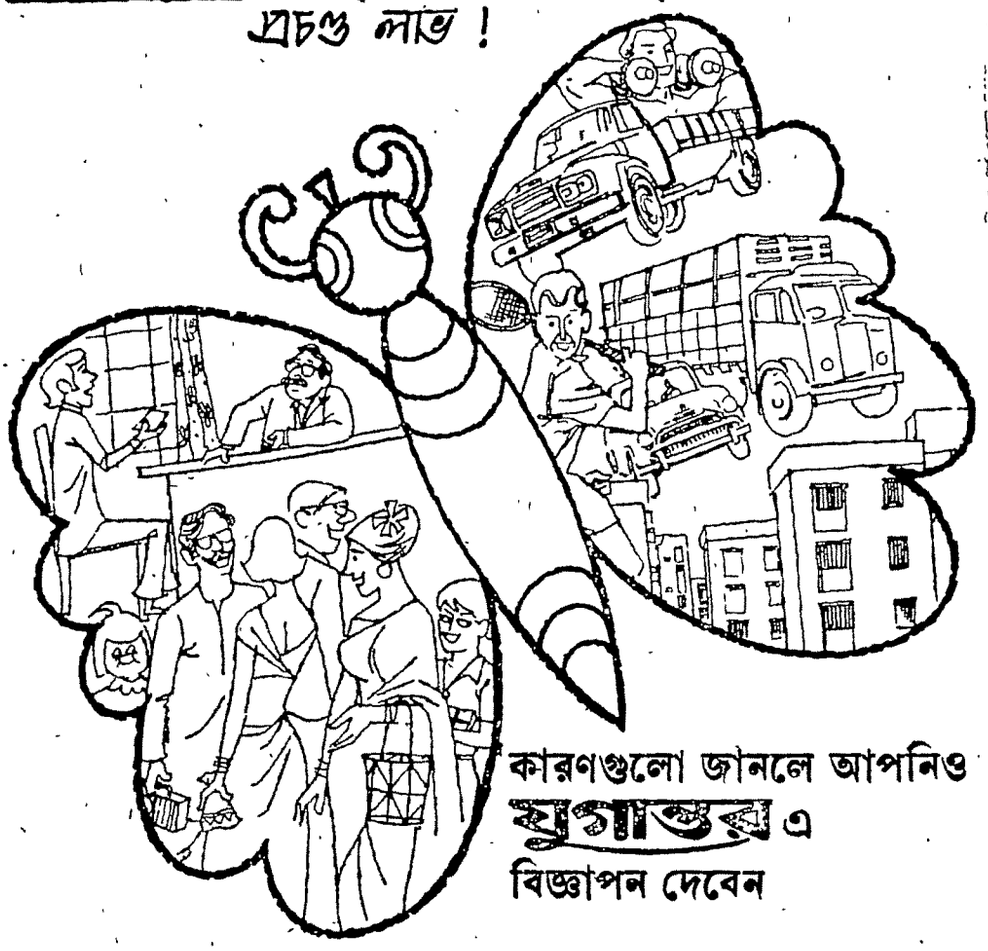

কারণগুলো জানলে আপনিও
যুগান্তরএ
বিজ্ঞাপন দেবেন

- যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিলে আপনি অনেক বেশি উত্তর পাবেন। কম সময়ে আর সবচেয়ে কম খরচে।
- যুগান্তরের বর্তমান কাটতি যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আপনার বক্তব্য সহজেই আরও অনেক বেশি পাঠকপাঠিকার কাছে পৌঁছবে। গত ছ'মাসেই যুগান্তরের দৈনিক প্রচার সংখ্যা বেড়েছে ৮০০০০ এরও বেশি।
- বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন। বিজ্ঞাপনগুলি সহজেই নজরে পড়ে। ভিড়ে হারিয়ে যায় না।

পাত্র-পাত্রী ☐ চাকুরী ☐ জমি-বাড়ী ☐ ব্যবসা-বাণিজ্য ☐ মোটর-গাড়ি
ব্যক্তিগত কিংবা যে কোনও বিষয়ে কম খরচে বেশি জবাব চান তো

যুগান্তরে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের সুযোগ নিন।
অভীষ্ট ফল পাবেনই

অমৃত

১৮ বর্ষ
১০ সংখ্যা
২৯ আষাঢ়
১৩৮৫
14th July, 1978

সম্পাদকীয় ৩

সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়

সাকুল্যে ১৩ ৫ সমীর চট্টোপাধ্যায়

বেবতীভূষণের কার্টুন ৬

ভাগ্য গণনা ৭

চিঠি ৮

প্রচ্ছদ কাহিনী ৩২

সময় নেই
নির্মলকুমার দাস
প্রচ্ছদ এঁকেছেন অনিলবরণ সাহা
কবিতা ১৪ শিশিরকুমার দাশ

সাধনা মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ

লাহিড়ী, সুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

সেই সব ছবি (গল্প) ১৬
গিরিধারী কুন্ডু

সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ২১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৭
শৈবাল মিত্র

নগ-বিহঙ্গ (গল্প) ৩২
চিত্তরঞ্জন মাইতি

হৃদয় নন্দন বনে (উপন্যাস) ৩৮
সোমেন্দ্রনাথ রায়

যাঁদের দেখেছি ৪০ অনন্ত সিং
দিসুম সেন্দরাব যৌবন মেলা ৪৩
পশুপতিপ্রসাদ মাহাত

হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৫০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সমালোচনা ৫৫

খেলা ৫৬

চিত্রধ্বনি ৫৯

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী

একটি সামান্য ভ্রমণ কাহিনী

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

গল্প লিখেছেন

শৈবালরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর উভয় সংকট

বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। জাতির স্বার্থেই ভারত সরকার বিশ্বভারতীর দায়িত্ব গ্রহণ করে ১৯৫১ সালে সেই মর্মে একটি আইন পাশ করেন।

প্রায় কুড়ি বছর পর ১৯৭১ সালে শান্তিনিকেতনে কিছু নকশালী তৎপরতা লক্ষ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার একটি অর্ডিনান্সের মারফৎ বিশ্বভারতী পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটিগুলো বাতিল করে মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত নতুন কতকগুলো কমিটি বহাল করেন।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বোঝা গেল এ ব্যবস্থার ফলে বিশ্বভারতী রাবীন্দ্রিক আদর্শ থেকে দ্রুত সরে গিয়ে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। ফলে ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জাস্টিস মাসুদের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে বিশ্বভারতীকে কী করে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করতে বলেন। পরের বছর, অর্থাৎ '৭৫ সালে মাসুদ কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। এবং তারই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিল তৈরি করেন, যা লোকসভার আগামী অধিবেশনেই আলোচনার জন্যে উপস্থিত করা হবে।

ইতিমধ্যে মাসুদ কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শ্রী কৃষ্ণ কৃপালনী লিখিতভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সুপারিশের সঙ্গে আলোচ্য বিলের সত্যিকারের কোনো মিল আছে কিনা। এবং ঐ বিলে রবীন্দ্রনাথের বহু যত্নে তৈরি বিশ্বভারতীর যা মর্মবাণী তাকে পুরোপুরি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কিনা।

শ্রী কৃপালনী কেবল ঠাকুর পরিবারের এবং রবীন্দ্রনাথের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই নন, তিনি রবীন্দ্র ঐতিহ্যে লালিত একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। কেন্দ্রীয় সাহিত্য অ্যাকাডেমীরও তিনি ছিলেন আদি যুগের সম্পাদক। কাজেই তাঁকে একদেশদর্শী বলা যাবে না। বিশ্বভারতী তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতে যে-রূপে এবং যে-স্বভাবে বর্তমান ছিল, সেইটেই তার স্বধর্ম— তা থেকে তাকে বিচ্যুত করলে সেটা হবে পরধর্ম, এবং তার পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য।

স্বীকার করতেই হবে, তাঁর বক্তব্যে যুক্তি আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শান্তিনিকতনের সেই প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম আর রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার শেষ পর্বের বিশ্বভারতী কি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল ? তা যদি না থাকে তবে '৪১ সালের পর চিরদিনের মতো তার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে কেন ? সেটাও কি রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে অচলায়তন পুজোর মতো হয়ে দাঁড়াবে না ?

জীবন তো কখনো থেমে থাকে না ? তা মানুষেরই হোক আর প্রতিষ্ঠানেরই হোক। এবং কালধর্মকে স্বীকার করেই বাঁচতে হয় তাকে।

এও কি এক বড় সমস্যা নয়!

সাহিত্য ইত্যাদি...

সাহিত্য ও সাংবাদিকতা

অদ্বৈত মল্লবর্মণ পেশার দিক দিয়ে ছিলেন সাংবাদিক। মাঝে মাঝে তিনি গল্প ইত্যাদিও লিখতেন। কিন্তু সাংবাদিক বা লেখক, কোনো দিক দিয়েই তিনি খুব একটি পরিচিত মানুষ ছিলেন না। তারপর লিখলেন সেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' বলে বইখানা। এবং মারা গেলেন।

এ দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা জানিনে, কিন্তু প্রায় রাতারাতি 'তিতাস' জনপ্রিয়তা অর্জন করল। অদ্বৈত মল্লবর্মণ লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। বেঁচে থাকলে তিনি আরো কতো কী ভালো লেখা উপহার দিতে পারতেন, একথা ভেবে বেদনা বোধ করলাম আমরা।

এ বইয়ের গল্পাংশ যাই হোক এর আসল ব্যাপার ছিল লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তিতাস নদীর বুকে নদীর নিজস্ব সন্তান সেই মাছধরা মানুষদের জীবনযাত্রার খুঁটি-নাটি ব্যাপার অদ্বৈতবাবুর কাছে ছিল ঘরের খবরের মতো। বইটি অতি সহজেই হতে পারত বেশ বড় আকারের একটি রিপোর্টাজ। সাংবাদিকতায় ট্রেনিং পাওয়া লেখকের কাছে সেটা সহজও হত। কিন্তু অদ্বৈতবাবু তাঁর চেনাজানা অভিজ্ঞতার টুকরোগুলোকে কয়েকটি জীবন্তস্বভাব নারীপুরুষের আনন্দ-যন্ত্রণার সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দিতে পারলেন। এবং তাই তাঁর লেখাটি হল সাহিত্য। প্রক্রিয়াটি তাই লক্ষ করার মতো।

মনে পড়ছে, বেশ কয়েক বছর আগে 'ভারত-সভা' হল-এ পশ্চিমবঙ্গে একটি সাহিত্য একাডেমি বা বাংলা একাডেমি গড়ে তোলার জন্যে একটি মিটিং হয়েছিল। সেই সভায়, কী প্রসঙ্গে মনে নেই, অন্নদাশংকর রায় বলেছিলেন, চলতি দিনের কোনো ঘটনা নিয়ে, তা যতো বড় ঘটনাই হোক, কোনো বড় জাতের সাহিত্য সৃষ্টি করা শক্ত। টলস্টয় তাঁর 'ওয়ার এণ্ড পীস' লিখেছিলেন প্রায় একশ বছর আগের ঘটনা নিয়ে। আমাদের দেশেও তাই দেশভাগের ঘটনা নিয়ে বড় লেখা যদি এক্ষুনি না হয় তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সেজন্যে সময় দিতে হবে।

অন্নদাশংকরবাবু আসলে যা বলতে চাইছিলেন তা হয়তো ঠিকই। কিন্তু ওয়ার এণ্ড পীসের তুলনা টেনে এনে তাকে জটিল করে তুলেছেন।

যদ্দুর মনে হয়, অন্নদাশংকরবাবুর ধারণা, প্রবল আকারের কোনো সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্যে এত বেশি রকম নাটকীয় উপাদান থাকে যে তার ভিত্তিতে লিখতে বসলে তা অনিবার্যভাবেই হয়ে উঠবে সাংবাদিকতা। সাহিত্য তার থেকে অনেক দূরে। সেজন্যেই তিনি চাইছিলেন সময়ের দূরত্ব, যাতে খুঁটিনাটি বর্ণনা লেখকের পথ আগলে না দাঁড়ায়, তাঁকে সেইকালের পটভূমিতে মানবজীবনের মূল সমস্যাগুলোকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হাজির করেছেন তিনি ওয়ার এণ্ড পীসের উদাহরণ।

ওয়ার এণ্ড পীস অবশ্য একটি চরম দৃষ্টান্ত। কেননা, একালের সাহিত্যে বইখানি বলতে গেলে প্রায় তুলনারহিত। অন্নদাশংকরবাবুর মতের বিপরীতে তাই তুল্য ওজনের বইয়ের নাম করা শক্ত। কিন্তু রুশ দেশেই টুর্গেনিভ লিখেছেন 'ফাদার্স এণ্ড সন্স' এবং গোর্কী লিখেছেন 'মাদার' যা জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু দুটি বইই লেখা হয়েছে সেকালের অতি সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা নিয়ে। প্রথম বইটির বিষয়বস্তু নিহিলিস্টে (সন্ত্রাসবাদী) আন্দোলন। এবং দ্বিতীয় বইটি লেখা হয়েছিল ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায়।

তাছাড়া এই প্রসঙ্গে হেমিংওয়ের 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস', 'ফর হুম দি বেল টোলস'-এর নামও মনে পড়বে অনেকের। প্রথম বইয়ের মূলকেন্দ্র প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় বইয়ের বিষয়বস্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধ।

আমাদের দেশেও শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', তারাশংকরের 'পঞ্চগ্রাম', বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'হারানের নাতজামাই' লেখা হয়েছিল সমকালীন ঘটনা সামনে রেখেই।

কাজেই ইদানীন্তন আর চিরন্তনে সাহিত্যকারের কোনো বিরোধ নেই। আসল বাধা হল ইদানীংকার গন্ধমাদন থেকে চিরকালের মৃতসঞ্জীবনীকে চিনে নেওয়ার অক্ষমতা।

এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্য আর সাংবাদিকতার সীমারেখাটি কতো সূক্ষ্ম। একালে অনেক সাংবাদিক আছেন, যাঁদের লেখার কলম সচ্ছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গিও একেবারে নতুন। একটা ঘটনা বা কোনো নতুন জায়গা কি কোনো মানুষকে দেখে তাঁরা এত নিপুণভাবে তার বর্ণনা দিতে পারেন, যা হামেশাই স্থান পাচ্ছে সাহিত্য আর সাংবাদিকতার মাঝামাঝি একটা জায়গায়। যেমন ধরুন যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'। অনেকেই একে সাহিত্য বলবেন, আর আমিও আসলে তাঁদেরই দলে। কিন্তু তাই বলে কি একে 'পথের পাঁচালি', 'হাসুলিবাঁকের উপকথা' বা 'পুতুল নাচের ইতিকথার' সঙ্গে স্থান দিতে পারব? না বোধহয়।

কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কী? উপন্যাসও তো নতুন শিল্প। কবিতা বা নাটকের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বলছি। কিন্তু এখন তো উপন্যাসই হয়ে দাঁড়িয়েছে সব থেকে জনপ্রিয় এবং সব থেকে কার্যকর সাহিত্যিক মাধ্যম।

সাংবাদিকরা তাই যদি সকলেই না ছোটেন পথের পাঁচালি লেখার জন্যে, কেউ কেউ যদি চেষ্টা করেন দৃষ্টিপাত জাতীয় রচনা লেখার জন্যে, নতুন জাতের নতুন কিছু উপহার দিতে পারবেন।

এবং তাকেও আমরা সাহিত্যই বলব।

মণীন্দ্র রায়

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : অনিলবরণ সাহার জন্ম উনিশশো চৌত্রিশ সালে। কলকাতার 'গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট্স'-থেকে স্নাতক হন উনিশশো পঞ্চান্নয়। কলকাতা, বোম্বাই, এবং দিল্লির অনেকগুলি যৌথ প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন। এ ছাড়া, দিল্লির ললিত কলা একাডেমী, অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফট্স সোসাইটি এবং কলকাতার একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীগুলিতেও যোগ দিয়েছেন। অনিলবরণ সাহার বেশ কিছু শিল্প কর্ম বিভিন্ন অভিজাত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আছে। জলরংয়ে আঁকা সেরা কাজের জন্য উনিশশো ষাট সালে একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর বার্ষিক প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়েছেন। শ্রী সাহা কলকাতার সোসাইটি অফ কনটেমপোরারী আর্টিস্টস-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

সাকুল্যে —১৩

সমীর চট্টোপাধ্যায়

তিনি কবিতা লেখেন। কেউ কেউ বলে, কবি, কেউ কেউ অকবি। তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। তাঁর বয়স অনুমান করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি হতে পারেন যুবক, প্রৌঢ় কিংবা অল্পবয়সী। কারণ তিনি জানেন, কবিতা লেখার কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। যেমন নির্দিষ্ট সময় নেই—কখন কবিতা লেখা যেতে পারে। কেউ অল্প বয়সেই কবি হিসেবে পরিচিত, কেউ শুরুই করেন বেশি বয়সে, আবার কেউ-বা বেঁচে থাকেন আশী বছর—কবিতার উৎস ফুরোয় পঞ্চাশে। ইতিমধ্যে তিনি পড়ে ফেলেছেন বেশ। চেষ্টা করেছেন খোঁজার তন্ন তন্ন করে কোথায় সেই অনাবিষ্কৃত পথ, যে পথে হাঁটা যেতে পারে। বুঝতে চেয়েছেন, কেন সবাই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। কবিতা-শরীরের কোন্ ধমনী স্পর্শ করতে পারলে যথাযথ বেজে উঠবে সুর—একথা জানতে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখেছেন শরীর। কবিতা-রচনার ইতিহাসও তাঁর কাছে স্পষ্ট। যেমন স্পষ্ট কবির ইতিহাস। এতো দীর্ঘ সময় কোনো শিল্পক্ষেত্রের স্রষ্টাকে অপেক্ষা করতে হয় না কখন হাততালি বেজে উঠবে। এতো অল্প দর্শকেও সন্তুষ্ট হতে হয় না আর কোথাও। অথচ কী যন্ত্রণা, কী প্রাণান্তকর মানসিক উদ্বেগ। একটি শব্দের জন্য, একটি শুদ্ধ যথাযথ পংক্তির জন্য কী আকুতি। তবুও অভিজ্ঞতা কিংবা বোধ কিংবা মাথার ভেতরে উল্টোপাল্টা আবোল-তাবোল অনুভূতি এবং কবিতার লিখিত রূপে কী বিশাল ফারাক! অথচ এতো কিছুর পর যা লেখা হলো অর্থাৎ এই সুড়সুড়ির প্রতিক্রিয়ায় পাঠক হয়তো একটু নড়েচড়ে বসবে নিদেন ঘাট কি সত্তর বসন্তের পর। অথবা নিস্পৃহ কফিনে আশ্রয়। এসব তিনি জানেন। জানেন—কবিতা লিখে না আসে স্বচ্ছলতা, না আসে পাড়াতুতো খ্যাতি কিংবা চিত্রতারকার মতো অনুরাগীর ভিড়। বিনিময়ে চাপা হাসি করুণা এবং চরম ঔদাসীন্য অপেক্ষা করে থাকে। তাঁর মনে পড়ে—বাল্যকাল কেটেছে মফঃস্বল বাংলায়, নদীর পাড়ে। ছাত্র হিসেবে ভাল খ্যাতি ছিল, তবু পড়তে হয়েছে গ্রামের পাবলিক স্কুলে। খেলাধুলো, আম চুরি, নদীতে সাঁতার, বন্যার কচুরিপানা উঠে আসে উঠোনে—মোটামুটি এইসব নিয়ে তাঁর শৈশব। বয়ঃসন্ধিকালের শুরুতে কবিতা পড়ার বাতিক এলো কেন, একথা বলতে পারেন একমাত্র সৌরজগতের কোনো দৃষ্টগ্রহ। প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ, প্রিয় বই বলাকা। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ চুরি করে পদ্য বানাতেন চুপি-চুপি। বাড়িতে ছিল পিতামহের কড়া শাসন, দিয়েছিলেন খালের জলে। তবু ধরা পড়তে হয়েছিল একদিন, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার দিন সাতেক আগে। পিতামহ আবিষ্কার করলেন, কোর ম্যাথামেটিকস করার বদলে সেই বইয়ের আড়ালে লেখা হচ্ছে পদ্য। প্রচণ্ড প্রহার আর গালিগালাজের মাঝে পিতামহ বললেন—'পদ্য লেখা হইতাছে, পদ্য? পড়াশুনায় অষ্টরম্ভা। কপি হইব্যা, কপি?' 'কবির' এই বিকৃত উচ্চারণ আজও তাঁর কানে বাজে।

তবু তিনি কবিতাই লেখেন। শুভানুধ্যায়ীরা বলে গল্প কিংবা উপন্যাস লেখার কথা। বলে—'কী সব লেখো ছ' ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি? লেখো চারশ পাতার উপন্যাস। ক্ষমতা বুঝি। পয়সাও আসবে।' তবু তিনি কবিতাই লেখেন। কারণ এছাড়া এখন পর্যন্ত তাঁর কাছে যথেষ্ট কোনো মাধ্যম নেই। বান্ধবী বলেছিল ঠোঁট ফুলিয়ে—প্রেমের কবিতা লেখো না কেন? আমাকে নিয়েও তো লিখতে পারো। যা-সব লেখো অর্ধেক বোঝাই যায় না। আর যত্তো সব নোংরা শব্দ।' তবুও সে অর্থে তিনি প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন নি। কোথাও পলাশ ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে প্রেমিকা আসছে অথবা প্রেমিকার গলায় মাম্‌স, সুতরাং কী দুঃখ,—এসব নিয়ে কবিতা-রচনা তাঁর কাছে মনে হয় বাতিল প্রস্তাব। যেখানে মূলতঃ কিলো-বাটখারার মতো নারীর শরীর, প্রেম একমাত্র তেজারতি, ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রধানত অর্থনৈতিক—সেখানে বিশুদ্ধ প্রেমের মিষ্টি কবিতা লেখা তাঁর কাছে অর্থহীন। সুতরাং তিনি ম্যাদামারা কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। তাঁর কবিতায় স্বভাবতই এলো কন্ট্রাইসিস। এবং যেহেতু তিনি মনে করেন, প্রায় সব প্রয়োগ-প্রধানরাই অনেকাংশে ব্যর্থ, সমাজের মাথাব্যথা দূর করার জন্য কোনো অমোঘ বটিকা নেই এবং তা ব্যবসায়ীর দায়িত্ব তাঁর নেই, অনেক অনেক সিরিয়াস কথাবার্তা হয়ে গেছে—ফলতই তিনি বেছে নিলেন শ্লেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যম। কন্ট্রাইসিস নিয়ে হাসাহাসি করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। তাঁর মাথার সমস্ত চিন্তা যেহেতু অতীব জটিল এবং লেখেন কবিতা, ফলে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তাঁর মনে হয় পাঠকের মানসিক অভ্যাসের অভাব। দীর্ঘ জটিল এবং কম্প্লেক্স ফার্টিলাইজেশন অবিরাম তাঁর মস্তিষ্কে, এ চিন্তাকে ধরে রাখতে তিনি বেছে নিলেন দীর্ঘ অক্ষরবৃত্ত এবং গদ্যছন্দ। বাতিল করে দিলেন মাত্রাবৃত্তের স্কিপিং ন্যাকামি। ফলে কাব্যের জগতে তাঁর শত্রু বাড়লো। অধিকাংশ কবি-নামধারী ব্যক্তিরা মিষ্টি ম্যাদামারা বীর্যহীন কবিতা নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করতে শুরু করলেন সমালোচনা করলেন অশুদ্ধ ছন্দের, মাত্রা ব্যবহারে, শব্দের আতিশয্যে। তিনিও সমালোচিত হলেন।

তিনি জোরে কথা বলেন। পূর্ববঙ্গীয় শব্দমিশ্রিত উচ্চ্বাস প্রকাশ করেন। কোনো ঢঙ্-ঢাঙ্ তিনি মানেন না। জীবনের প্রতিটি ঘাটা-আঘাটা থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহের নেশা তাঁর তীব্র। এ ব্যাপারে কোনো ছ্যুৎ-মার্গীতা তাঁর নেই। ভয়াবহ বোহেমিয়ানিজম তাঁর রক্তে। বিরুদ্ধবাদীরা বললেন—তাঁর কবিতার টীকা-টিপ্পনি প্রয়োজন। চ্যাপলিনস্কিউ এবং গঞ্জা একসাথে নাকি কবিতায় মিলতে পারে না। এতে তাঁর কিছু যায় আসে না। যুথবদ্ধতায় তাঁর বিশ্বাস নেই। তবু কয়েকজন ঘনিষ্ঠ কবিতার জগতের বন্ধু আছে। তিনি বলেন—এঁরা নাকি তাঁর প্রাণবায়ু। মধ্যরাতে জানালার বাইরে অন্ধকারে তিনি দেখেন—একটা বিশাল কলম পড়ে আছে, তিনি লিলিপুটের মতো সেই কলম ধরার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। তাঁর ভয় হয়। জানালা বন্ধ করে ঘুমোনোর চেষ্টা করেন।

প্রায় রোজ রাতে তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন। রেড রোডে গাড়ি চাপা পড়ে এক কবি এগারো ফুট লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। রাতের খবরে ঘোষক তাঁর সমুদ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন কবির মৃত্যুসংবাদ। বাংলা সাহিত্যে কবির অবদান, তাঁর কাব্যগ্রন্থ, কবিতা ইত্যাদি নিয়ে মিনিট দুয়েকের সংবাদ প্রচার হলো। পরদিন সকালে দৈনিক কাগজে পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে নিচের দিকে লাইন আস্টেকের খবর ছাপা হলো। দুপুরে নাগাদ শবযাত্রা বেরুলো কলকাতার রাস্তায়। কোনো ট্রাফিক জ্যাম হলো না, বাস-ট্রামের কোন যাত্রী উঁকিঝুঁকি দিলো না। শুধু যাত্রীর সংখ্যা সাকুল্যে তেরো।

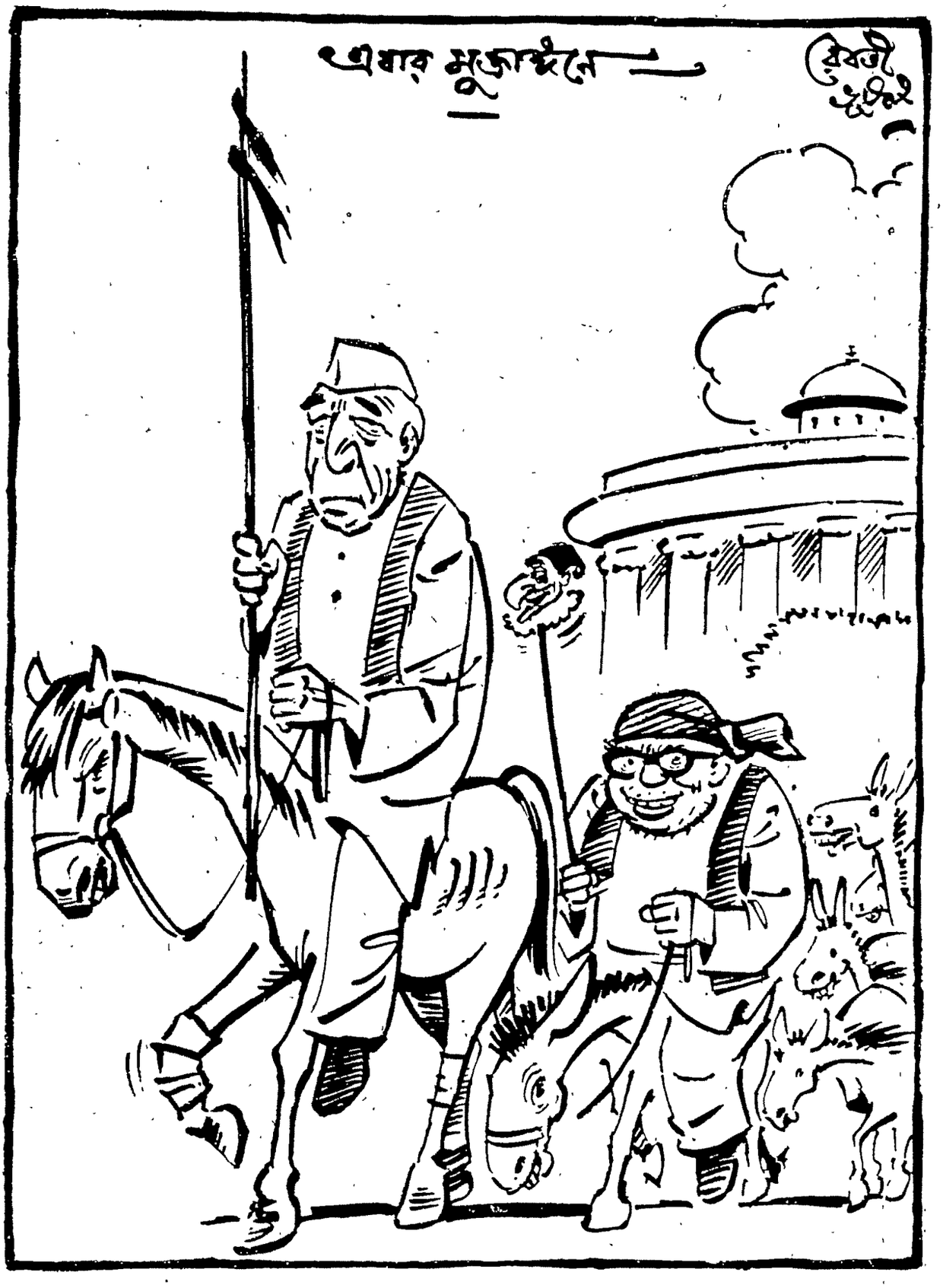
এবার মুক্তাঙ্গনে
রেবতী ভূষণ

উচ্চ সম্মান প্রাপ্তির ইঙ্গিত

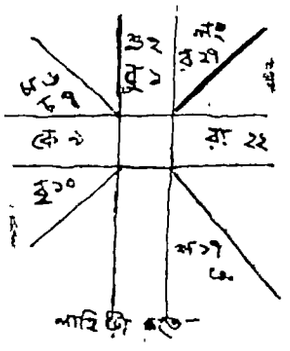

বিং বৃহস্পতিবার দশা ভাগ্য ৪-২-৫ দিন

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বারটি ভাবের মধ্যে কর্মভাব অথবা কর্মস্থানকে শ্রেষ্ঠ এবং সব চাইতে গুরুত্ব স্থান বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ কর্মস্থানই মানুষের সমাজ এবং সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। মানুষের বিদ্যা গুণ, মত এবং চিন্তাধারার বিকাশ ঐ কর্মস্থানই প্রতিফলিত হয়। মানুষের পরিচিতিও ঐ কর্মের দ্বারা। মানুষ যত শ্রেষ্ঠ গুণী অথবা বিদ্বান হউক কর্মহীন হলে তা সমস্ত কিছুই নিষ্ফল হয়। তাই কর্মস্থানই হলো শ্রেষ্ঠস্থান যার উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা, পরিণাম ইত্যাদি—তবে কর্মকে সার্থক করে তুলতে ভাগ্যের সহায়তা পেলে কর্মের বিকাশ সহজসাধ্য হয়। তাই ভাগ্যস্থানকে কর্মস্থানের সহায়ক বলা হয়েছে এবং কর্ম ও ভাগ্যের সমন্বয়কে 'রাজযোগ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে কর্ম করতে এবং কর্মের উপরই গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। এই কর্ম যদি নিরলস-নিষ্ঠা হয় তবে তা একদিন সফলতা লাভ করবেই। বিকাশ হবেই তার মতবাদের, চিন্তাধারার। উপরের রাশিচক্রটি তারই নিদর্শনস্বরূপ। জাতক বর্ষীয়ান নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। মিথুন রাশি পুর্বাষাঢ়া নক্ষত্র, মীন লগ্নের জাতক। স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে এই রাশিচক্রে ঐ কর্মস্থান এবং কর্মস্থানাপতিকে লক্ষ্য করলেই রাশিচক্রের মোটামুটি একটা কাঠামো ধরা যেতে পারে। জাতকের কর্মস্থানে—কর্মপতি এবং লগ্নপতি বৃহস্পতির দৃষ্টি। দৃষ্টিপাত করেছে ভাগ্যপতি মঙ্গল এবং মান-যশ, খ্যাতি বুদ্ধি এবং বিকাশের পতি চন্দ্র। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঐ কর্মপতি বৃহস্পতির উপর দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে শনি। জাতককে কর্মে নিরলস, অক্লান্ত, কঠোর পরিশ্রমী করে রাখতে। দীর্ঘপ্রসারী সাধনা দীর্ঘপ্রসারী সংকল্প অটুট রাখতে শনি গ্রহ অদ্বিতীয়। স্বীয় নক্ষত্রে বসে শনি জাতকের লগ্নেশ তথা কর্মেশের উপর দৃষ্টি দেওয়ায় জাতকের কর্মময় জীবন অক্লান্ত পরিশ্রমীয়। তাই ১৯২০ সালে যখন শনি গোচরে জন্মকালীন বৃহস্পতির সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল জাতক তখন আর এক দীর্ঘপ্রসারী মহাসাধক মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

মহা সাধনায় কঠোর ব্রতে ব্রতী হলেন। ১৯৪৮ সালে শনি যখন বাশিচক্র পরিক্রমান্তে পুনরায় ঐ কর্মপতি বৃহস্পতির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রাক্কালে জাতককে দিল আটাশ বৎসরের নিষ্ঠা সাধনার ফল—জাতক হলেন রাজ্যের মন্ত্রী। তখন আবার জাতকের আরম্ভ হয়েছিল কুড়ি বৎসরের জন্য শুক্রের দশা। সেই দশা জাতকের পঞ্চম দশা, লক্ষ্মীর দশা। যে শুক্র জাতকের অশুভ স্থানের অধিপতি হলেও অত্যন্ত শুভ ফলদাতা। কারণ জ্যোতিষশাস্ত্রে কথিত আছে স্বনক্ষত্রাশ্রিত গ্রহ তুচ্ছ ফলদাতা তথা শ্রেষ্ঠ ফলদাতা হয়। এই শুক্রের কুড়ি বৎসর মহাদশাতে যেমন জাতককে প্রথম মন্ত্রিত্ব লাভ করায় তেমন দশা শেষ হবার আগে সুখেশের অন্তর্দশায় জাতককে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ করায়। আর ঐ সময় কর্মেশ বৃহস্পতি স্বাদশে থেকে জন্মকালীন বৃহস্পতিকে অবলোকন করছিল। দৃষ্টি অবলোকন করছিল বাহু কর্কট রাশিতে থেকে জন্মকালীন বলবান রাহুকে। আর রাহুর ধ্বংসাত্মক, কুরুর প্রতিক্রিয়াকে সীমিত করে রেখেছিল আর এক কুর অথচ মহাযোগী, মহাসাধক গ্রহ শনি। গোচরে শনি তখন মকর রাশিতে চন্দ্রের নক্ষত্রাশ্রিতে ছিল। যে নক্ষত্রে রাহু জন্মকালীন অবস্থাতে বসে আছেন। কিন্তু শুক্রের দশার পর আরম্ভ হলো বৈরীভাবাপন্ন রবির দশা। '৬৪ সালের অক্টোবর থেকে ছয় বছরের জন্য। এই রবি যদিও বর্গোত্তম কিন্তু জাতকের রিপুপতি ৬ষ্ঠ পতি অশুভ ফলদাতা এবং সম্পর্ক করেছে লগ্নেশ বৃহস্পতির সঙ্গে স্থান বিনিময় করে— তাই ঐ রবির ছ বছর জাতককে হতে হয়েছিল প্রবল শত্রুতা বিরোধিতার সম্মুখীন। শনি-এর মধ্যে ৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে লগ্নস্থ রবির সঙ্গে দুঃসম্পর্ক করেছে। আর দশাতে রিপুপতি রবি সহায়ক হিসেবে পেয়েছে কুর গ্রহ রাহুর অন্তর্দশা— জাতকের এনেছে নির্বাচনে পরাজয়। ত্যাগ করালো মন্ত্রিত্বের। ৭১ সালের জুন পর্যন্ত ছিল রবি দশা। যদিও তারপর ১০ বছরের জন্য চন্দ্রের মহাদশা আরম্ভ হয়েছে চলবে ৮০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু ছ বছর পর্যন্ত চন্দ্র অন্যান্য গ্রহের শুভ সহায়তা না পাওয়ায় হয়তো জাতকের জন্য তেমন কিছু করতে পারেনি কিন্তু যেমন সে ৭৭ সালে আবার সেই ৪৮ সালের মত শনি বৃহস্পতি সম্পর্ক পেয়েছে অমনি জাতককে দিয়েছে শুভ ফল—করেছে লোকসভার সদস্য। কিন্তু জন্মকালীন মঙ্গলগ্রহের অবস্থান এবং জন্মকালীন শনি ও বৃহস্পতির বক্রতার জন্য জাতক কখনো স্বীয় মতবাদের বিনিময় আপোষ রফার স্থান না আর প্রমাণ পূর্বেও রয়েছে যা পাওয়া গেছে। তাই একদিকে গোচরে অশুভ গ্রহ অপরদিকে চন্দ্রের দশার কুহেলিকাময় কেতুর অন্তর্দশা ৭৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত জাতকের নিরলস কর্মময় জীবনে কিছুটা অশুভত্বের ছাপ ছিল যেমন রোগ, অশান্তি, সহ-কর্মীদের সাথে মতবিরোধ ইত্যাদি। কিন্তু মে মাস থেকে চন্দ্রের দশায় শুক্রের অন্তর্দশা আরম্ভ হয়েছে যা চলবে ৭৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই শুভ দশাতে গোচরেও শনির এবং বৃহস্পতির শুভ স্থান প্রাপ্ত জাতকের পক্ষে শুভ এবং উচ্চ সম্মান প্রাপ্তির ইঙ্গিত বহন করছে। এই সময়ের মধ্যে জাতক শত্রু জয়, বিরোধী ভাবাপন্নদের বশে আনয়ন এবং উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। বাম্য থেকে কেন্দ্রে যাওয়াও অসম্ভব নয়। যদি কুর, উগ্র এবং ত্রৈদীক প্রতীক মহলের কুপ্রভাবে আয়ত্তে রাখতে পারেন। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বিশ

বৎসর পূর্বে শনিব এই প্রকার শুভ সংক্রমন জাতককে উচ্চাসন দিয়েছিল।

যাক এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশি-ফল বলছি। সপ্তাহটি ১৪ জুলাই থেকে আরম্ভ। ১৮ জুলাই থেকে বাংলা শ্রাবণ মাস। গ্রহের এমনই পরিস্থিতি যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং কেন্দ্রীয় রাজনীতি সপ্তাহের মাঝামাঝি লক্ষ্যণীয়ঃ

মেষ—মানসিক উত্তেজনা থাকবে শরীরও সুবিধের যাবে না। কর্মস্থানে শত্রুবৃদ্ধি তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। ১৪ ১৫ শুভ।

বৃষ—গৃহে সুখ পাবেন, কর্মেও প্রভাব বৃদ্ধি ভ্রাতার উন্নতিতে আনন্দ, কিন্তু সন্তানের জন্য চিন্তা হবে। ১৪—১৬ লক্ষ্যণীয়।

মিথুন—কোন ব্যাপারে ইপ্সিত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি থাকবে। কর্মস্থানেও দুশ্চিন্তা। ১৪, ১৫ অশুভ। ১৭ ১৮ শুভ।

কর্কট—অহেতুক দুশ্চিন্তায় মানসিক দুর্বলতা। সহকর্মীদের মনোভাব কষ্টদায়ক হবে। ভ্রাতৃ স্বাস্থ্যহানি দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে। ১৫, ১৬ অশুভ।

সিংহ—নতুন আশার আলো সপ্তাহের শেষ উদ্যম বৃদ্ধি করাবে। ঢাকুরেদের কর্মস্থানে ঝঞ্ঝাট থাকলেও ১৪, ১৫ লক্ষ্য রাখুন।

কন্যা—গুপ্ত শত্রুদের কাছ থেকে সতর্ক থাকুন। আর্থিক চিন্তা থাকবে। কাউকে বেফাস কথা বলে পরে বিপদে পড়তে পারেন এরই মধ্যে ১৬, ১৭ ভাল ফল দিবে।

তুলা—কোন ব্যাপারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে পারেন। আবার নিজ জন সম্মানও পাবেন। আয় বৃদ্ধি পাবে। ১৮, ১৯ শুভ।

বৃশ্চিক—কর্মস্থানের ঝামেলা অনেকটা কেটে যাবে। পারিবারিক শান্তিও পাবেন দূরের কোন সংবাদ উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ১৭, ১৮ অশুভ।

ধনু—শত্রুদের জব্দ করতে পারবেন আর্থিক ক্ষেত্রেও শুভ ফল দেবে কিন্তু পত্নীর স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ১৬, ১৭ বাদ, ১৮, ১৯ শুভ।

মকর—আর্থিক ক্ষেত্র শুভ ফল পাবেন। নতুন কোন সূত্রে আয় বৃদ্ধি পাবে। কর্মস্থানে কোন ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে। ১৮, ১৯ ছাড়া সপ্তাহটি মন্দ নয়।

কুম্ভ—বিষয় সম্পত্তি অথবা কর্মস্থান চিন্তার কারণ হবে। সন্তান স্থানীয় কারোর জন্য চিন্তাও থাকবে কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা পাবেন। ১৪, ১৫ অশুভ।

মীন—কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মনস্থির করতে অসুবিধেয় পড়বেন মহৎ কাজে কিছু ব্যয়ও হবে। দূরের কোন প্রতীক্ষিত সংবাদ পাবেন। সহকর্মীদের মনভাব ভাবিয়ে তুলতে পারে। ১৫—১৭ চিন্তা।

আগামী সপ্তাহে জনতা পার্টি

চিঠিপত্র

সোমনাথ চক্রবর্তী লিখিত 'পুরুলিয়ার লোকশিল্প। ছৌ নাচের মুখোশ' (১৭ ফেব্রুয়ারী) প্রবন্ধটি এবং জুবলপুর মধ্যপ্রদেশ থেকে সুরেন্দ্রনাথ দাসের লেখা 'ছৌ নাচের মুখোশ' শীর্ষক চিঠিটি পড়বার সুযোগ হয়েছে। সোমনাথবাবু ছৌ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তার প্রতিবাদ স্বরূপ শ্রীদাস বলেছেন, 'ছৌ উৎসব শুধু পুরুলিয়ার অনুষ্ঠান নয় একটি বৃহত্তর ভূখণ্ডের ধর্মীয় শৈব অনুষ্ঠান। তাঁর মতে গাজন শব্দ এসেছে গর্জনদেব, গম্ভীরা এসেছে গম্ভীরানন্দ বা গম্ভীরদের থেকে তেমনি ছৌ এসেছে শিব থেকে যেমন শিব-শৈব-ছৈব-ছৈঅ-ছৌ অথবা ছৌ।

সোমনাথবাবুর বক্তব্য মূলত পুরুলিয়াকে ঘিরে। দীর্ঘদিন গবেষণা-ও ক্লাস স্থাপনের সুযোগে আমি দেখেছি ছৌ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'কাপ' করা বা সংএর মতে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করা যাকে ছলনা করাও বলা যেতে পারে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে লৌকিক-দেশজ-নগরায়ণ-শাস্ত্রীয় ধারার প্রবাহ অব্যাহত। নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থানে শাস্ত্রীয় ধারার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকার জন্য নানা ধরনের কথা লৌকিক সংস্কৃতির উপরে কল্পনা বিলাসীরা বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আরোপিত করার চেষ্টা করেছেন। ছৌ নাচের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দশ বারো বৎসর ধরে আমরা তা লক্ষ্য করেছি।

শ্রীদাসের অবগতির জন্য জানাই যে পুরুলিয়া, সেরাইকেলা ও ময়ূরভঞ্জের যে ছৌ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় তা একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় ময়ূরভঞ্জের ও কেঁওঝোরের গ্রামে মুখোশ ব্যবহৃত হয় (সিবাকুড়ি, চিতোড়া, শ্যামাখুটা, তিলবিলা, আমডুবা, জগন্নাথপুর, টিকরবাঁটি প্রভৃতি ভূমিজ, মাহাতো অধ্যুষিত গ্রাম এবং অসনপাট ব্যতীত উপজাতিদের গ্রাম) সেরাইকেলাতে মুখোশ ব্যবহৃত হয় নাচের সময়। মুখোশগুলি সিম্বলিক। পুরুলিয়াতে মুখোশের ছড়াছড়ি। নাচের কাঠামোগত কিস্বাবাদ স্বভাবতই ছৌ নাচকে তিনটি ঘরানাতে ভাগ করেছে। কিন্তু ঢোল, সেহনাই, বাঁশী, চেড়পেটি, ধমসা (নাগারা) সহযোগে যে রঙ বা নটকী সুর ও তাল বাজানো হয় তা ঝুমুর গানের সুর ও তাল। তাই বলতে পারা যায় একই সাংস্কৃতিক প্রমণ্ডল (ঝাড়খণ্ডী) তিনটি বিভিন্ন বাদ্যের অঙ্গ।

ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেলাতে সরকারী উদ্যোগে চৈত্র পরব উপলক্ষে ছৌ নাচের অনুষ্ঠান হয় বারিপাদা ও সেরাইকেলাতে। পুরুলিয়াতে চৈত্র পরব উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে সুরু করে সমস্ত বৈশাখ মাসে পুরুলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে শিব-গাজন অনুষ্ঠিত হয়। এবং তার সঙ্গে ছৌ উৎসব নয় ছৌ নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের বৈচিত্র্য এত বেশী যে ম্যাক্রো আলোচনাতে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করা যায় না। তাই নৃ-বিজ্ঞানীরা 'মাইক্রো' গবেষণার উপর বেশী আস্থাবান। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমার যা মনে হয়েছে তা হলো ছৌ শব্দটি এসেছে ছই থেকে, যার অর্থ দাঁড়ায় সঙ। মুখোশ বা মুখা বা মহড়া শব্দগুলিও ছৌ নাচের দ্যোতক। কেঁওঝোরের অসনপাট গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির ছৌ নাচের সময় একটি গানের নমুনা দিচ্ছি।

আইলারে একসুত নাবদমুনি
তিন ভুবনের সেত বারতা ঘোষি
ঢোলকুটু বাজেরে, সড়ইকলা ঢোলটা
ঢোলটা বাজিলে, ছো টা নাচে
লাখি বুহে মনটা।

পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো: পুরুলিয়া।

কোন যুক্তি নেই

গত ১৭ মার্চ-এর অমৃতে প্রকাশিত সংকর্ষণ রায় এবং সুধাংশুকুমার ঘোষের লেখা 'পরমাণু শক্তি ভারত ও চীন' প্রবন্ধটি পড়লাম প্রথমেই সময়োপযোগী লেখার জন্য লেখকদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমার বক্তব্য ভারত অংশের লেখক সংকর্ষণ রায়ের লেখা নিয়ে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর যেদিন থেকে ভারত পরমাণু শক্তি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু থেকে আরম্ভ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই পর্যন্ত সবাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, ভারত কখনও পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না। ভারত তার পরমাণু শক্তিকে শান্তির কাজে ব্যবহার করবে। রাদিও

পোখরানে ভারতের প্রথম আণবিক বিস্ফোরণের পর প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের মনে ভারতের পারমাণবিক নীতি সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, তা সত্ত্বেও ভারত তার ঘোষিত নীতি থেকে সামান্যও বিচ্যুত হয়নি।

আমার বক্তব্য হল এই অগ্নিগর্ভ পৃথিবীতে ভারত কতদিন তার শান্তির নীতিতে অটল থাকতে পারবে? আর যুদ্ধ মত্ত এই পৃথিবীতে বিশাল ভারতের ৭৫ কোটি ভারতবাসীর নিরাপত্তা রক্ষা করবে? আগুন জ্বালাতে জানলে এবং আগুন জ্বালাতে পারলেই যে আগুন নিয়ে খেলা করতে হবে এবং আগুন নিয়ে উন্মাদ নৃত্য করতে হবে এর মূলে কোন যুক্তি নেই। আত্মরক্ষা করা যে কোন জীবের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকাটাই নিরাপত্তার একমাত্র ভিত্তি। এই প্রচণ্ড অস্ত্র প্রতিযোগিতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'পরমাণু অস্ত্র তৈরি করব না' এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার মূলে কোন যুক্তি নেই। উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী; জেলা-বোড, শিলং।

স্বাগত জ্যোতির্ময়

অন্যের নিন্দায় পঞ্চমুখ ঘরকুনো আমরা অনেকেই বলতে গেলে যা আমাদের স্বভাব 'মোচার খোলায়' দুরন্ত, মহাসাগর অভিযানকে হিসেবের মধ্যেই আনিনি। তবু যারা দৈনিকের পাতায় এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতাম জ্যোতির্ময় দত্তের দুঃসাহসিক রোজনামচা তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করেছি অভিযাত্রীদের সকল প্রত্যাগমনের আমরা চিরকালই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মত চোখা কলমে ঝকঝকে ভাষায় চিরকালই স্বাগত জানিয়ে যাবো জ্যোতির্ময় দত্তদের। শিহির-রঞ্জন লাহিড়ী, কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজ-পুর।।

নাটকে গ্রাম

বিকাশ জানা অমৃত পত্রিকায় নাটক নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন (১৭বর্ষ ৪৩ সংখ্যা)। নাট্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা আমাদের দেশে অত্যন্ত সীমিত। তাই নাট্য বিবর্তনের রূপরেখায় নাটককে টেনসনের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টের বিচারে সমালোচকদের মাপকাঠি নাটকের ক্ষেত্রে আদৌ প্রয়োগ হয় নি। সম্প্রতি নাটক নিয়ে কিছু মৌলিক প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখা হচ্ছে। সেদিক থেকে বিকাশবাবুর 'নাটকে গ্রাম' রচনাটি গুরুত্ব-পূর্ণ।

গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সে বক্তব্যের সঙ্গে আমিও একমত। ভালো নাটক সত্যিই বিরল বাংলা ভাষায় প্রতিভাবান নাট্যকার যাঁরা আছেন তাদের সংখ্যা গোনা গুণতির মধ্যে আবার

জানান হচ্ছে

যাবতীয় আমন্ত্রণলিপি, সমালোচনার জন্য বই এবং রেকর্ড অমৃত সম্পাদকীয় বিভাগে অনুগ্রহ করে পাঠাবেন।

কিছু কিছু নাট্যকারের রচিত নাটক যেগুলিকে মৌলিক নাটক হিসাবে দাবী করা হয় প্রকৃতপক্ষে তা কতখানি মৌলিক এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও অনেক নাটক অ্যাডাপটেশন তো বটেই। অন্যের সম্পদকে নিজের বলে চালাবার হীনমন্যতাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তা না হলে ভালো নাটক পাওয়া যাবে কি করে? ঐ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশবাবু নাটক সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলো রেখেছেন তার সঙ্গে আধুনিক নাটক মৌলিক কতোখানি এ প্রশ্নটাও যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ইদানিং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলিতে গ্রামের চরিত্র বা পটভূমিকা চিত্রিত হলেও তা যথাযথ বাস্তবধর্মী নয় এ প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠ পাঠক গত ১৮ মার্চের অমৃতে 'বাংলা নাটকে জোতদার' নিবন্ধে সুধী পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি অনেকেই ইউরোপীয় নাট্যান্দোলন সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত। শেখুড থেকে আয়োনেস্কো তাদের হাতে হাতে ফেরে। কিন্তু বাংলার গ্রাম গঞ্জেরও যে রাজনৈতিক সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সে ব্যাপারে তারা সতর্ক নন।

নাট্য প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে একথাও জেনে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি অচলায়তনের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। যদিও তাঁর মুক্তধারা, রক্তকরবী শ্রেষ্ঠ মৌলিক সৃষ্টির সঙ্গে সাধারণের পরিচয় কম অবশ্য তার কারণও বিদ্যমান। আলোচ্য অমৃতে এবিষয়ে মণীন্দ্র-রায়ের সাহিত্য ইত্যাদি বিভাগে (১৭বর্ষ ৪১ সংখ্যায়) মন্তব্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। হিরণ্ময় দাশ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, নাট্য বিভাগ।

সেণ্ট মেরিজ নয়, সেণ্ট ভিনসেণ্টস হবে

১২ মে'র অমৃততে ৫৯ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত আছে যে যাঁর কৃতিত্বাস আসানসোলের সেণ্ট মেরিজ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আমরা খুবই দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে এই সংবাদটি ভুল।

এ সম্বন্ধে প্রথমত আমরা বলছি যে সমগ্র আসানসোলে সেণ্ট মেরিজ নামে কোন স্কুল নেই। তিনি সেণ্ট ভিনসেণ্টস স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

১৯৭৫ সালে সেণ্ট ভিনসেণ্টস স্কুল থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল হকির বড় ম্যাচে যোগ দিতে। এবং তিনি বড় ম্যাচে তো যোগ দিয়েছিলেনই উপরন্তু তিনি কিছু দিন আগে বুয়েনস এয়ার্সে বিশ্ব সেরা হকিতে নিজের স্থান করে নিয়ে নিজের স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন।

আমরা সেণ্ট ভিনসেণ্টসের ছাত্র, তাই আমরা ভাল করে এই তথ্যটি জানি। আমাদের কিছু কিছু বন্ধু বান্ধব সঙ্গে ছাত্রাবাসে থাকত। তাই আমরা বলছি আপনারা যদি দয়া করে এ ভুল সংশোধন করে দেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব।

—অমিতাংশু, সুব্রত, সঞ্জয়, শুদ্ধদেব, দিব্যাংশু ও বিজয়। পানুচেৎ, ধানবাদ।

১৮৯৫ নয়, ১৮৯৪

গত ১৯ মে অমৃতে প্রকাশিত গৌরী-শংকর ভট্টাচার্য লিখিত 'দুই দিকপালের মুখোমুখি' শিবোনামার শেষে এক জায়গায় লেখক লিখেছেন—"১৯৭১ সালের বর্ষা ভেজা যে দিনটিতে তারাশংকর বিদায় নিলেন ১৮৯৫ সালে সেই ২৮শে ভাদ্রেই বিভূতি-ভূষণ পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলেন। কিন্তু ১৮৯৫ সালের ২৮শে ভাদ্র বিভূতি-ভূষণ পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিলেন এই কথাটি ঠিক নয়।

বিভূতিভূষণের জন্ম ২৮শে ভাদ্র ১৩০১ বুধবার সময় বেলা ১০টা ৩০ মিঃ (ইং ১৮৯৪ ১২ সেপ্টেম্বর)। মানস সরকার, শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।।

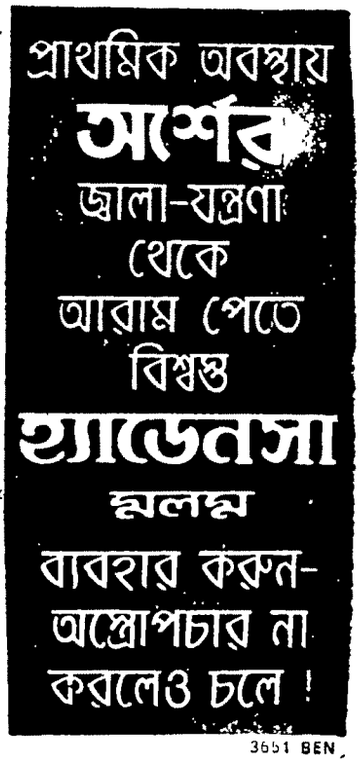

3651 BEN

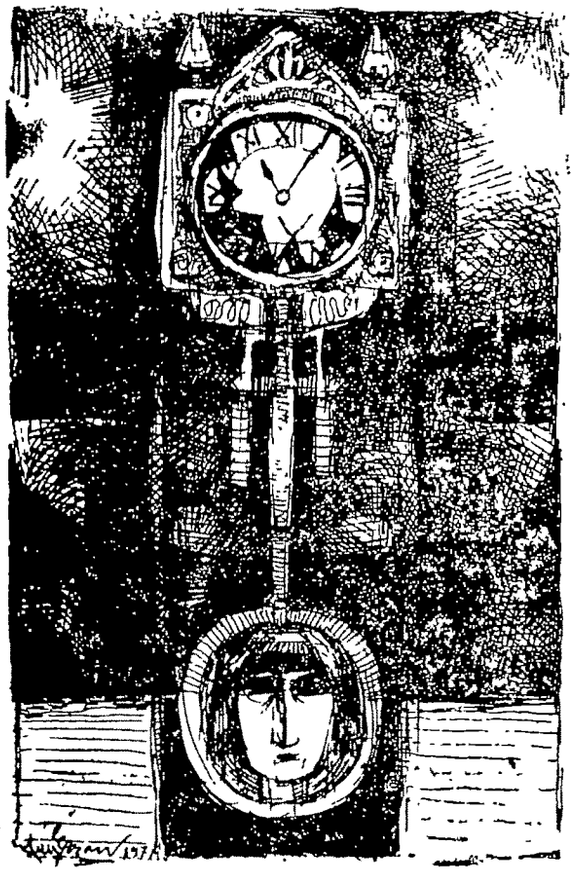

সময় নেই

নির্মলকুমার দাস

এই শহরে একদা এক কিশোর তাদের বাড়ীর বাগানে একটি শিউলি গাছের চারা পুঁতেছিল। সারা রাত ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার পর রাত পোহালেই যখন ভোর হত তখন কিশোরটি একছুটে বাগানে চলে এসে চারাগাছটিকে জল দিত এবং আনন্দও আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করত গতদিনের তুলনায় গাছটির উচ্চতা মাথায় কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। গাছটির তখন বাড়ন্ত সময়। কিশোরটির কাছ থেকে জল এবং প্রকৃতির কাছ থেকে আলো ও বাতাস নিয়ে ও নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।

কিশোরটির মত চারাগাছটিও প্রতিদিন ভোরবেলায় লক্ষ্য করে দ্যাখে,—গত দিনের তুলনায় আজকে তার উচ্চতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। চতুর্দিকে আরো ছড়িয়ে পড়েছে ডালপালাগুলি এবং শিকড় নেমে গেছে আরো গভীরে।

গত দিনের পরিপ্রেক্ষিতে গাছটির এই উন্নতি বৃদ্ধি দেখে কিশোরটি পরবর্তী দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তার সঙ্গে গাছটিও। এবং পরের দিন সকালে দুজনেই আশ্চর্য হয়। আনন্দ-মিশ্রিত এক তীব্র উত্তেজনা সর্বক্ষণ দুজনের ভিতরেই বিদ্যুৎবেগে ছোটাছুটি করে।

কোনোদিকে দৃকপাত না করে গাছটি ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে এবং বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক সময় দুর্দান্ত রকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে সে। বাগানে তার সঙ্গে দুয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে বট, অশ্বত্থ, বকুল। শিউলি গাছটি বাড়তে বাড়তে এদের ছাড়িয়ে ওপরে উঠে আকাশের একেবারে কাছাকাছি চলে যেতে চায়, শিকড় নামিয়ে দিতে চায় আরো গভীরে এবং তার চতুর্দিকে ফাঁকা জায়গা ডালপালা ছড়িয়ে ছড়িয়ে ভরাট করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারে লোভী হয়ে ওঠে।

ক্রমশ বেড়েই চলেছে সে। দেখতে দেখতে একদিন তার মাথা কিশোরটির নাগালের বাইরে ঊর্ধ্বে উঠে যায় অনেকটা। আগে কিশোরটি হাত দিয়ে গাছটির মাথা ছুঁতে পারত। অনেক দিন হল, উচ্চতা বৃদ্ধির জন্যে সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। চতুর্দিকের শূন্যতায় আরো ব্যাপকভাবে ডালপালাগুলি নিজেদের বিস্তার করে দিয়েছে,—যেন গাছটি তাদের নির্দেশ দিয়েছে। যতটা পারো চার-পাশের প্রকৃতির এই যে শূন্যস্থান, নিজেদের ছড়িয়ে ছড়িয়ে বিস্তার করে দখল করে নিজের করে নাও। বলা বাহুল্য সেই নির্দেশ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় ডালপালাগুলি সম্পাদন করে চলেছে। শিকড়ও থেমে নেই। কাণ্ডের দুর্দান্ত ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সমান তালে মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে সে নেমে যাচ্ছে একেবারে পাতালে। কিশোরটির মত তার গাছটিও ভীষণ আনন্দিত। এবং জীবনের কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী কোনো মানুষ যেমন আত্মতৃপ্তিতে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে নিজের গৌরব মেলে ধরে মানুষের কাছে—অনুরূপ পন্থা গাছটিও যেন অবলম্বন করেছে। কী অজস্র ফুল দিয়ে যায় ও সমরমত। এই দেওয়ার মধ্যে কোনো রকম কার্পণ্য নেই। আছে গৌরব অর্জনের চরম সার্থকতা।

অপেক্ষাকালীন সময় কেটে যাবার পর যখন আসে বহু প্রতীক্ষিত সেই ভোরবেলা, তখন কিশোরটির মত গাছটিও গত দিনের তুলনায় নিজের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে এবং গভীর আনন্দে ফুল ঝরায়। চারপাশের অনেকটা জমি নিয়ে যেন শ্বেত-শুভ্র ফুলের একটি বিছানা বিছিয়ে রাখে। সবুজ ঘাসের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না; কেবলি শাদা। দিন যায়।

গাছটি বেড়ে ওঠে এবং একদিন তার আনন্দের পাশাপাশি জন্ম হয় অহংকারের। ধীরে ধীরে অহংকার দানা বাঁধে এবং একটি সে সমস্ত আনন্দকে হত্যা করে। কী ভয়ংকর অহংকারী হয়ে উঠেছে গাছটি। তার এক বদ্ধমূল ধারণা প্রকৃতিকে অস্বীকার করে বাড়তে বাড়তে সে মাথাটি নিয়ে যেতে পারে নক্ষত্রমালার কাছে, চারপাশের অসীম শূন্যতা সে তার ডালপালা দিয়ে দখল করে নিতে পারে এবং যে শিকড় মাটি কামড়ে তাকে সঞ্জীবন যোগাচ্ছে, সেই শিকড় মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে নেমে যেতে পারে পাতালে এবং দখল করে নিতে পারে পৃথিবীর নিম্নভাগ। তার স্থির বিশ্বাস প্রকৃতির চেয়ে সে অনেক অনেক বড়,—ঠিক যে ধারণার বশবর্তী হয় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তার নিজের জীবনের কোনো একটি বিশেষ বয়সে,—তারুণ্যের গর্ব এবং অহংকারে।

অনেক দিন পর একটা বিশেষ দিন আসে, যেদিন এই শিউলি গাছটির সকল অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অহংকারের পরিবর্তে তার হৃদয় জুড়ে স্থান নেয় দুঃখ বিষাদ। প্রকৃতিকে অস্বীকার করে সে স্বতন্ত্রহীনভাবে বেড়ে উঠতে চেয়েছিল, চেয়েছিল প্রকৃতিকে দখল করে নিতে। সব দিক থেকে নিজেকে বিস্তার করে প্রকৃতিকে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলেছে। এই ছিল তার একান্ত ধারণা এবং সে নিজেকে ভেবেছিল প্রকৃতির চেয়ে অনেক বড়,—কিন্তু তার এই সকল ধারণা এবং অহং বোধের অলক্ষ্যে প্রকৃতি তাকে এমন এক জায়গায় অতি দ্রুত টেনে এনেছে, যেখানে পৌঁছে সে অকস্মাৎ দেখতে পেয়েছে সময় ভীষণ কম। সময় একবারে নেই। অথচ চরম বেড়ে ওঠা এখনো হল না।

দিন যায়।

শিউলি গাছটির মত বাড়তে বাড়তে সেই কিশোর এখন কোনো এক বেসরকারি অফিসের উচ্চপদের কর্মচারি এবং সংসারের

একজন আদর্শ গৃহস্থ। অফিস, নিজস্ব পরিবার এবং আত্মীয় পরিজনদের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এই মানুষটি সম্প্রতি জানতে পেরেছেন : সময় নেই। এক-একটি ভূকম্পনে যেমন সকল কিছু ওলটপালট হয়ে যায়, ঠিক সেই রকম তার ভিতর বাড়ী থেকে তাকে সম্পূর্ণ এলোমেলো করে দিয়ে যে মুহূর্তে এই খবরটি জেগে উঠেছিল, সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল এ মিথ্যা কিংবা দুঃস্বপ্ন। সময় গেলেই এর রেশ কেটে যাবে। কিন্তু পারতপক্ষে তিনি দেখলেন সময় আসছে এবং যাচ্ছে কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে রেশ। সময় চলে যাচ্ছে এখন অতিদ্রুত,—এটা টের পাবার পর থেকেই তার ভিতরে ভীষণ রকমের চিন্তা ভাবনার ওলট-পালট শুরু হয়েছিল। অব্যবহিতকালের মধ্যেই তিনি আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলেন,—এই চিন্তা-স্থানটি সম্পূর্ণভাবে দখল করে নিয়েছে ভয়। ভয় তাকে জ্ঞানশূন্য করে তোলে। সময় নেই।। অথচ তার অফিস এবং সংসারের সব কাজ এখনো সারা হয়নি।। যে অফিস ও সংসারকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসেন। কত কাজ যে বাকি পড়ে আছে। কত পরিকল্পনা, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা থেকে যাচ্ছে অপূর্ণ। একদা ভেবেছিলেন সময় মত সব কিছু পালন করে ফেলবেন। সব কাজ সেরে ফেলবেন।। সময় এসেছে এবং গিয়েছে,—কাজ সারা হয়নি।

প্রতিনিয়তই একটি ভয়ার্ত ভাবনা তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তার ভিতরে ক্রিয়া করে। ভীষণ রকমের এক দুর্বলতা জেগে ওঠে। ইচ্ছা থাকলেও, এ বিষয়ে কাউকে তিনি কিছু বলেন না। বস্তুত সাহস হয় না। তার নিশ্চিত বিশ্বাস,—তার সংকটাকীর্ণ অবস্থার কথা কেউ কখনো বুঝতে পারবে না। হয়ত হাসবে।

মানুষজনের মাঝখানে থেকেও সে যেন এখন কোনো নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা। কেউ নেই সেখানে। একমাত্র তিনিই। নিঃসঙ্গ।

মাঝে মাঝে তার মনে হয়, একদিন তিনি ভয়মুক্ত হয়ে যাবেন। অকস্মাৎ তিনি যেমন একদিন দেখতে পেয়েছিলেন সময় নেই,—তার আশা, অপ্রত্যাশিতভাবে সেই রকম আগামী কোনো একটি দিনে দেখতে পাবেন তিনি এই দুঃসংবাদটি মিথ্যা, অলীক। স্বপ্ন।। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সময় আছে। থাকবে।

এই রকম ধারণা, বিশ্বাস যখন তার ভিতরে জন্মায়, তখন তার মনে হয় ভয় বুঝি কেটে গেছে। তিনি এখন মুক্ত। কিন্তু গভীরে ডুব দিয়ে তিনি লক্ষ্য করে দ্যাখেন, ভয় তার শরীর এবং অন্তর দিয়ে বয়ে চলেছে সঙ্গমের সরস্বতীর মত। চকিতে তার মনে পড়ে যায় অফিস এবং গার্হস্থ্য জীবনের অসমাপ্ত কাজগুলির কথা। তিনি কেবলি ভেবে চলেন, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কিভাবে এই অসমাপ্ত কাজগুলি সমাপ্ত করা যায়। সম্ভব এবং কখনো কখনো মনে হয় অসম্ভব।

যখনি অসম্ভব বলে মনে হয়,—তখনি ভয় ভর, যন্ত্রণাবোধ তাকে পাগল করে তোলে। বেদনাহত চোখে আকাশের দিকে চেয়ে একেকদিন তিনি বলেন,—জীবনের তুলনায় জীবনের সময় এত কম কেন ঈশ্বর ?

সময় না থাকার ভাবনার অসুখে আক্রান্ত এই মানুষটি ইদানিং কেমন মনমরা হয়ে গেছেন। খুব একটা বেশী কারো সঙ্গে কথা বলেন না।। ভাল লাগে না। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন, এক অদ্ভুত চোখে সারাটা বাড়ী দ্যাখেন। চোখের সামনে সংসারের কত অসম্পূর্ণ কাজ। অফিসেও। অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পর কোনো কোনো দিন একা তিনি অফিসে চুপ করে চোখ বুঁজে বসে থাকেন। কোনো দিন বেরিয়ে সোজা বাড়ী না গিয়ে এদিক ওদিক ঘোরেন। পথ খোঁজেন। সময় কি অদ্ভুতভাবে তার কাছ থেকে সময় কেড়ে নিয়েছে।—ভেবে তিনি বিস্মিত।। কখনো ক্ষিপ্ত।। অফিস থেকে

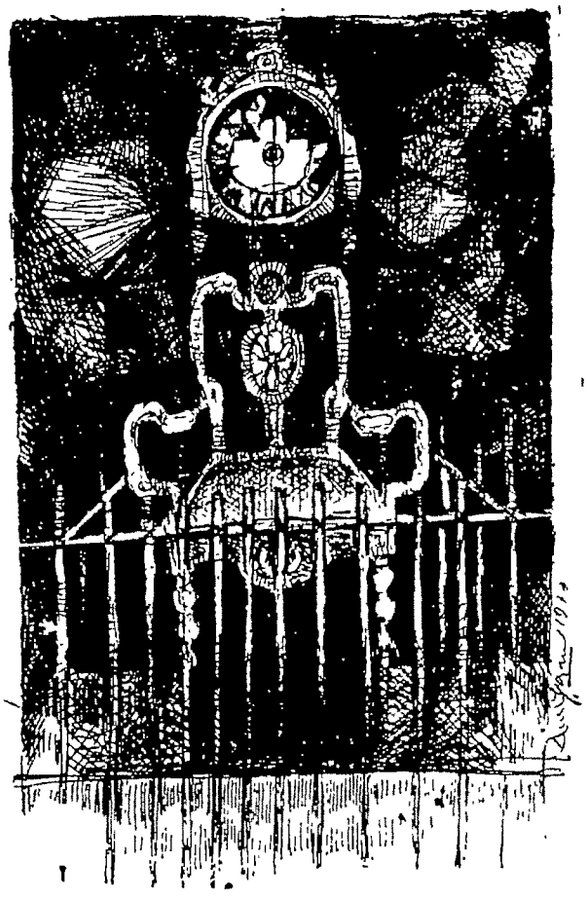

বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একদিন তিনি ময়দানের দিকে চলে আসেন। দরোজা খোলা পেয়ে একটি বড় ক্লাবে ঢুকে পড়েন। এমনিই।। গ্যালারি ঘেরা সবুজ মাঠ। দুই পাশে দু শাদা গোলপোস্ট। মাঠের চারপাশে আউটলাইন। তিনি দেখতে পান সাম্প্রতিককালের অতি-বিখ্যাত এক ফুটবলা খেলোয়াড় দু পায়ের মাঝে একটি বল নিয়ে সারা মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন কী ভীষণ গতি। সম্পূর্ণ ভূক্ষেপহীন। দম ও দক্ষতার গুণে ফুটবলের নিপুণ এবং নিয়ন্ত্রণ এই শিল্পী ইতিমধ্যেই সাফল্যের চরমে পৌঁছে গেছেন। পেয়ে গেছেন অর্থ, প্রতিপত্তি, সামাজিক সম্মান। এর প্রত্যেকটিই তিনি পাওয়ার উপযুক্ত।

নানানভাবে একনিষ্ঠ হয়ে বল নিয়ে খেলোয়াড়টি অনুশীলন করে চলেছেন। কোনো দিকে পলকের জন্যেও তাকাচ্ছে না। যেন তার সময় নেই তাকানোর।

এমনিতেই এই মানুষটির মন সর্বদা বিষাদময়,—খেলোয়াড়টিকে দেখে বর্ষাকালের হঠাৎ হঠাৎ করে ছুটে আসা মেঘের মত কোথা থেকে ছুটে এসে দুঃখ, বিষাদ তার ভিতরে জায়গা করে নিয়ে তাকে নিদারুণ কষ্ট দিতে লাগল।

কী সুখী এবং পরিপূর্ণ ঐ খেলোয়াড়।

চোখের সামনে ছুটন্ত খেলোয়াড়কে দেখে এই মানুষটি ভাবেন, তিনি নিজেও তো হতে পারতেন ঐরকম। দেশবিদেশের বিভিন্ন বড় বড় খেলায় অংশগ্রহণ এবং নির্ভুল দক্ষতায় গোল করে ঐরকম নাম কিনতে পারতেন। কিন্তু পাবেন নি।

—যদিও তার মধ্যে এক সময়ে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। ছিল না কোনো ফাঁক কিংবা রূঢ় কথায় ফাঁকি।

এক সময়ে তিনিও এইরকম একাগ্র হয়ে বল নিয়ে জোটা-ছুটি করতেন। পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে তার বেশ নামও হয়। কিন্তু

সমাপ্তি ঘটে ঐখানেই। ওর ঊর্ধ্বে চেষ্টা করেও আর যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ফুটবলের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা ঐ সীমা পর্যন্তই। ফুটবল নিয়ে ঐ সীমাকে লংঘন করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

ফুটবলকে ছেড়ে, সময়ের অপব্যয় না করে তিনি ঝটিতি অন্য একটি মাধ্যম বেছে নিলেন। অভিনয়। মঞ্চ।

সম্পূর্ণ নতুন দিক। নতুনভাবে শুরু করা।

বেশ কয়েকটা বছর স্বচ্ছন্দে অতিক্রান্ত হবার পর তিনি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, সময়ের তুলনায় তিনি কাজের দিক থেকে খুব একটা অগ্রসর হতে পারেন নি। সময় বেরিয়ে গেছে অনেক। অথচ—

তার নিজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমাকে দেখেন এবং সকল অক্ষমতাকে দমন করার এক তীব্র বাসনায় তিনি 'মঞ্চ' ছাড়েন এবং নতুন মাধ্যম খোঁজেন। কিন্তু দেখতে পান: সময় নেই। নতুন কিছু আর আরম্ভ করা অসম্ভব।

সকল ব্যর্থতাগুলো জীবনের পরিপূর্ণতা পাবার আশায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণাংশে অফিস এবং গার্হস্থ্য জীবনে সমর্পণ করে দেন। এখান থেকেই সারতে চান সকল কাজ: পেতে চান পূর্ণতা:

কিন্তু কত কিছু সম্পূর্ণ থাকতেই তিনি দেখতে পান,—সময় নেই।

কত কম, জীবনের তুলনায় সময় কত যে কম।

সবুজ ঘাস ছাঁটা মাঠে দুপায়ের মাঝে বল নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটন্ত ঐ খেলোয়াড়ের দিকে তিনি আকুল নয়নে চেয়ে থাকেন। তার থেকে কয়েক হাত দূরে বসে আছে একটি ভিক্ষুক। সেও তাকিয়ে আছে ঐ খেলোয়াড়ের দিকে। মাঝে এই গৃহস্থ মানুষটির সঙ্গে তার একবার চোখাচোখি হয়ে যায়। ভিক্ষুকটিকে কি ভীষণ সুখী বলে মনে হয়। ওর কোনো সমস্যা নেই। সময় থাক বা না থাক,—ওর কোনো ভাবনা নেই।

ভিক্ষুকটিও চেয়ে আছে দূর থেকে এই মানুষটির দিকে। ভীষণ সুখী এবং পরিপূর্ণ বলে মনে হয়,—ঠিক যেমন কিছুকাল আগে তার নিজেকে মনে হত।

একটি লাঠি, অসংখ্য টোপ খাওয়া একটি টিনের থালা এবং একটি নোংরা চটের বোঁচকা,—এই নিয়ে তার জীবন। চটের বোঁচকার ভিতরে সযত্নে কি রক্ষিত আছে,—সে ভিন্ন মানুষের কাছে এ এক অতি গূঢ় রহস্য। কেউ কোনোদিন তাকে বোঁচকাটি খুলতে দেখেনি, সে নিজেও বোধহয় বহুকাল খোলেনি।

আজ এখানে কাল ওখানে,—এইভাবে সে তার ঠিকানা বদল করে এবং মরাগাছের পাতাহীন শুকনো সরু সরু ডালপালার মত হাত সে অভ্যাসবশতঃ মানুষের দিকে এগিয়ে দেয়। এইভাবে সে বেঁচে আছে, এবং এযাবৎকাল সুখেই ছিল এই ছিল ধারণা। কোনো ভয়ভাবনা ছিল না। ছিল শুধু একটি দিনের প্রত্যাশা। যেদিন সে তার লাঠি, থালা ও বোঁচকা ফেলে অসংখ্য অভিজ্ঞতা নিয়ে এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারবে।

এক একটি দিন আসে যায়। ভিক্ষুকটি চরম সুখে সময় অতিবাহিত করে ঐ প্রত্যাশিত দিনটির দিকে অগ্রসর হয়।

হঠাৎ একদিন সে জানতে পারে, তার সময় হয়ে এসেছে।

এরই জন্যে ছিল অপেক্ষা। প্রত্যাশা।

আনন্দে লাফিয়ে উঠতে চায় সে, আনন্দিত হবারই কথা,—কিন্তু আচমকা এক প্রচণ্ড নাড়া খায় সে ভিতরে ভিতরে এবং বেলুনের মত চুপসে যায়। সময় হয়ে এসেছে, সময় নেই,—এই খবরটি সহসা এক চরম ধাক্কায় তার এতদিনকার একই স্থানে অবস্থিত মানসিক অবস্থাকে এলোমেলো করে, তাকে চেতনায় ফিরিয়ে আনল। সত্যিই সময় নেই?—হা-হুতাশ ভরা এই প্রশ্নটি তার ভিতরে জেগে ওঠে। যদি সত্যিই হয়, তাহলে? ভীষণ ভয় এবং যন্ত্রণা তার ভিতরে চাগাড় দিয়ে ওঠে।

—কি যেন, কিএকটা যেন বাকি থেকে যাচ্ছে:

কি সেই অসম্পূর্ণ মহৎ বস্তু যার জন্যে জীবনের শেষ প্রান্তে তার এই ভয় এবং যন্ত্রণা, সেটা সে সঠিক করে ধরতে পারে না। কিন্তু সে নিশ্চিত, একটা কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে। এই ধারণাই তার ফেলে আসা জীবনের সুখকে নস্যাৎ করে দেয়। যে সুখে সে দিন কাটিয়ে এইখানে এসেছে, সে বুঝতে পারে ঐ সুখ বড় টুনকো। আসল সুখী হওয়া এখনো হয়নি।

ঐ সুখ কিসে আসবে? —কিছু পাওয়ায়?

ভিক্ষুক জীবনে কি-ই বা পাওয়ার থাকতে পারে। একদিন তৃপ্তি করে খাওয়া। নাকি কনকনে শীতের ধারালো দাঁত চেপে ধরার জন্যে একটি শক্তিশালী গরম বস্ত্র।

—এই জীবনে তার এইসব পাওয়া বাকি থেকে গেছে। অথচ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। এত শীঘ্র কেন? পাওয়ার যে এখনো বাকি।

—শুধুই কি পাওয়া? ভিক্ষুকটি নড়েচড়ে বসে। পাওয়ার ঝুলিতে যতটুকুই থাক সে এযাবৎ শুধু পেয়েই এসেছে। কিন্তু কি দিয়েছে সে?

পাওয়াতে যে সুখ, সেই সুখকে তার এখন অত্যন্ত মূল্যহীন বলে মনে হয়। পাওয়ার চেয়েও বেশী সুখ নিহিত আছে দেওয়ায়। সেভাবে পাওয়ার চেয়েও বেশী করে প্রয়োজন এবং মানুষ হিসাবে তার একান্ত দায়িত্ব পৃথিবীর মানুষকে কিছু দেওয়ার। কিন্তু দেওয়ার মত কি এমন বস্তু তার মত অতি দীন দরিদ্র মানুষের মধ্যে কুলোবে এ নিয়ে সে ঘুনাক্ষরেও ভাবে না।

দিতে হবে, পৃথিবীর মানুষকে একটা কিছু দিতে হবে,—এই ভাবনাই সর্বক্ষণ তার মস্তিষ্কে ছায়া বিস্তার করে থাকে। অন্যথায়—জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে তার ধারণা জন্মায় মানুষ জন্ম বৃথা।

বস্তুত এই যে তার দুটো হাত, দুটো পা, সর্বশরীর,—পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে সকল কিছু অনুভব, পরিলক্ষণ করার আশ্চর্য ক্ষমতা,—এইসব যতটা না তার নিজের জন্যে, তুলনামূলক বিচারে বহুলাংশে নিয়োজিত পৃথিবীর অনাসব মানুষের জন্যে। মানুষের উন্নতিকল্পেই তাকে একদা এইসব ক্ষমতা এবং মানুষের যে সর্বপ্রধান ক্ষমতা সেই চিন্তাশক্তি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।

মানুষের কাজেই মহৎ সুখ। অথচ সে চেতনে কিংবা অবচেতনে সকল দায়িত্ব অবহেলায় এযাবৎকাল উপেক্ষা করে এসেছে। তার অনুতাপ হয়। নিজেকে প্রাধান্য দেওয়ায় নিজের ওপর ঘৃণা জন্মে এবং সময় না থাকার জন্যে হয় প্রবল ভয়।

দিতে হবে, মানুষকে কিছু দিতে হবে—যে দেওয়াটি তার এবং মানুষ জন্মের অবশ্যই কর্তব্য, অতিদ্রুত সারতে হবে সেই কাজ। সময় নেই।

গৃহস্থ এবং ভিক্ষুকটি,—দুজনেই একে অপরকে সমস্যা-বর্জিত বলে মনে করে। তারপর এক সময় চোখ সরিয়ে তাকায় ঐ ছুটন্ত খেলোয়াড়ের দিকে। এবং ভাবে।

খেলোয়াড়টিও ভীষণ রকমের ভাবনায় আবিষ্ট। কিন্তু এদের দিকে তাকাল না। আসলে কোনোদিকে তাকিয়ে থাকবার তার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

ফুটবলকে সঙ্গী করে খেলোয়াড়টি আজ কোথায় পৌঁছে গেছেন। হঠাৎ আবার কেন সে এমন করে পরিশ্রম করতে শুরু করেছে ফুটবল থেকে নতুন করে কি-ই বা সে পেতে পারে? —গৃহস্থ মানুষটির চরম কৌতূহল।

সময়ের অপব্যয়ে না করে খেলোয়াড়টি পায়ে বল নিয়ে ছোটাছুটি করেন। অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে সময় এবং দম। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধরে রাখতেই হবে সময় এবং দমকে। অতি সম্প্রতি আচমকা সে টের পেয়েছেন সময় আর নেই। তার দমও ফুরিয়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি যাচ্ছে? এতদিনের বহু কষ্টে অর্জিত তার দম এতশীঘ্র যাচ্ছে কোথায় এবং কেন? এখনো যে তার নিজের মতে জীবনের শ্রেষ্ঠ গোলটি করা হয়নি। —অথচ এই ধারণা তার আগে ছিল না।

দেশবিদেশের বহু বিখ্যাত খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। অসাধারণ নৈপুণ্যে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়েছেন। গোলও করেছেন অসংখ্য। —যে গোলগুলি মানুষের কাছে অসাধারণ। দুর্লভ। সেই সময়ে তার নিজেরও মনে হয়েছিল,—এই গোলগুলিই শ্রেষ্ঠ। গ্যালারির হাত তালিতে একাধিক বার তার গর্বে ভরে উঠেছিল বুক। কিন্তু ইদানিং সকলই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে,—যখন তিনি জানতে পেরেছেন সময় আর নেই। ইতিপূর্বে যে অসংখ্য গোল করে তিনি মানুষের হাত তালি পেয়েছেন,—আজ তার মনে হয় ঐ গোলগুলি অতি সাধারণ। তার প্রতিভার তুলনায় নগণ্য। কোনো কিছুরই স্বাক্ষর বহন করে না ঐ লোকগুলি। দর্শকের হাত তালি এবং তার নিজের অসংখ্য গোল। কী ভীষণ মূল্যহীন বলে মনে হয়।

সময় নেই,—অথচ তার পক্ষে যে শ্রেষ্ঠ গোলটি করা উচিত, যে গোলটির জন্যে একটি তীব্র আকাংখা, দর্শকের হাত তালি ও অকুণ্ঠ প্রশংসার আড়ালে ছিল এতদিন, যে গোলটি দিয়ে তিনি পেতে চান চরম তৃপ্তি, খেলোয়াড় জীবনের সার্থকতা,—সেই আসল গোলটি করাই বাকি থেকে গেছে।

করতেইহবে, ঐ গোলটি করাই বাকি থেকে গেছে।

করতেই হবে, ঐ গোলটি করতেই হবে,—অদম্য এই আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে তিনি দুর্বার ওঠে ওঠেন।

সময় এবং দম ধরে রাখার জন্যে তিনি দাঁতে দাঁত চেপে পায়ের মাঝে বল নিয়ে মাঠের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে প্রাণপণ ছোটাছুটি করেন। কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, নেই মুহূর্তের জন্যে থেমে থাকার সময়।

ঐ সাদা গোলপোস্টের ভিতরে জীবনের শ্রেষ্ঠ আসল গোলটি তাকে দিতেই হবে। ছুটতে ছুটতে তিনি নিজেকে বলেন—ছোটো, আরো জোরে ছোটো। হরিণের মত ছুটে গিয়ে ঘাড় চেপে ধরা সময়ের। সময় নেই।

॥ ৪ ॥

ঘোড়দৌড় মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একদিন খেলোয়াড়টি মাঠে ঢুকে গ্যালারিতে গিয়ে বসেন। অসংখ্য উত্তেজিত মানুষ। তুমুল হৈ চৈ। একটু পরেই দৌড় শুরু হবে। স্টার্টিং স্টলে দাঁড়িয়ে আছে এক ঝাঁক তেজী ঘোড়া। পিঠে জকি।

স্টার্টার-এর নির্দেশ পেয়ে এক সময় দৌড় শুরু হয়। ফেন্সিং-এর গা ঘেঁষে ট্র্যাকের ওপর দিয়ে টগবগিয়ে ছুটে যায় ঐ ঘোড়াগুলি। একই সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষুর ট্র্যাকে পড়ায়, আওয়াজ উঠছে খটাখট্‌খটাখট্‌। ট্র্যাক থেকে ক্ষুরের দাপটে উড়ছে ধুলো। খেলোয়াড়ী চেয়ে থাকেন ছুটন্ত ঘোড়াগুলির দিকে কী ভীষণ গতি। খেলোয়াড়টি অপার বিস্ময়ে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে দৌড় দ্যাখেন।

যে ঘোড়াটির স্থান ছিল চতুর্থ,—ভীষণ বেগে ছুটতে ছুটতে সে একে একে তার সামনের ঘোড়াগুলিকে অতিক্রম করতে লাগল। চতুর্থ স্থান ছেড়ে প্রথমে তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং বেশ কয়েক মুহূর্ত লড়াই করে সে প্রথম স্থানটি নিয়ে নিল।

গ্যালারিতে চিৎকার। হই হট্টগোল। আনন্দ। বিষাদ।

কী অসম্ভব গতি এবং দম ঐ ঘোড়াটির। খেলোয়াড়টি ভাবেন,—যদি ঘোড়াটির শক্তি, দম তার থাকতো।

ঘোড়াটি ক্ষুরের দাপটে ধুলো উড়িয়ে ছুটছে। কিছুক্ষণ আগেও তার সামনে তিনটি ঘোড়া ছিল। এখন নেই। অনেকক্ষণ হল অনেক পিছনে তাদের ফেলে এসেছে। ওদের নিয়ে এখন আর এই ঘোড়াটির কোনো চিন্তা নেই। কারণ লক্ষ্য নিকটে। কিন্তু সামনে যে ছুটছে?

ঘোড়াটি দেখতে পায়, তার সামনে কোনো ছুটন্ত ঘোড়া নেই। কিন্তু একজন তীব্র গতিতে ছুটছে। কিছুতেই তাকে ধরা যাচ্ছে না। তার নাম,—সময়।

ঘোড়াটির চোয়াল শক্ত হয়। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বসে। চোখে মুখে ফুটে ওঠে জেদ। যেভাবে সামনের ঘোড়াগুলিকে ও পিছনে ফেল এসছে, ঐভাবেই ও সামনে ছুটন্ত সময়ের কাছে ছুটে যেতে চায়,—যে সময় এযাবৎকাল তার সঙ্গে ছিল। এখন নেই।

এক নম্বর হয়েও যেন বাজি জেতা যাচ্ছে না। ঘোড়াটি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওর চোখে বিস্ফারিত হয়। ঐ সময়কে অতিক্রম করার জন্যে কি ওকে খোচা দিচ্ছে না কেন? ঘোড়াটি নিজে থেকেই গতি বাড়িয়ে সময়কে ধরে রাখতে চায়। চোখের পলকে ট্র্যাকে ক্ষুর ফেলে তুলে নেয় ক্ষুর। সে সময় তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সেই সময়কে ধরে রাখতে হবে। সময় নেই। এই কয়েকশ মিটারের বাজি জেতা কিছুই নয়। অতি নগণ্য। ডার্বি জেতা এখনো তার বাকি থেকে গেছে। এই শেষ বয়েস। এরপর আছে ইনভাইটেশন কাপ। সময় নেই। তার সামনে দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে.. ....

এই শহরে আছে আরো অনেক মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু এবং এই শহরের বাইরে আছে আরো অনেক শহর, নিয়ে দেশ,—দেশ-এর বাইরে আছে আরো অনেক দেশ এবং দেশ নিয়ে যে পৃথিবীর সবাই জীবনের একটা সময়ে দেখতে পায় : সময় নেই। পরমবস্তু পাওয়া এখনো অনেক দূরে।

লোকটা

শিশিরকুমার দাশ

ঠেলা গাড়িটার ওপরে বোঝাই অন্ধকার
এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু নীচু যেন কয়লার-ই
রাস্তার মতো, ঠেলতে ঠেলতে চলেছে লোকটা

দূরে পাহাড়ের চূড়োটা জ্বলছে, লেগেলে আগুন
হিংস্র পশুরা তাই ভয়ে ভয়ে লুকোয় গুহায়
শঙ্কা ছড়ায় অরণ্য থেকে ঘুমন্ত সমতলে

শুধু দুনিয়ার সব উঁচুনীচু অন্ধকার
রাস্তায় বেঁধে ঠেলতে ঠেলতে চলেছে লোকটা।

হাউসিং এস্টেটের প্রতি নিবেদিত চতুর্দশপদী

অনির্বান লাহুড়ী

যে ঘর কোথাও নেই, তার অধিকার নিয়ে আজ
প্রবল লটারি চলে। বোঝা যায় মানসমাজ
কতো নিয়মিত সাজ, কতো বেশি দূরদর্শন
মজুত তাদের ঘরে! কোথায় সে ঘর?—ঘোর বন!

পা টিপে, পা টিপে ওঠে প্রৌঢ়টি, জানলায় যায়—
রাস্তার আলোটুকু ধরে নিয়ে হাত-আয়নায়,
ফলিত আলোতে দেখে, কল্পিত মানচিত্রের
ঠিক কোন্ খুপরিতে ডাইনিং স্পেসটির বেড়ে
সুবিধেজনক খুব; কবিতার কতো ফুট ঘেরা—
বিছানায় ঘুম যায় বউ তার, ছেলেরা, মেয়েরা!

কোথায় সে করিডর? সেই ঘর? সে আকর্ষণ,
ফলিত আলোতে যার প্রৌঢ় যুবক?—ঘোর বন-
এখানে ছড়ানো শুধু। কোথায় সেসব শাদা বাড়ি?
ওদিকে কোথায় যেন, শোনা যায়, চলেছে লটারি!

নীড়

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কষ্টে বাড়ে অনুভূতি প্রবণতা
ব্যথা এক পবিত্র দোহদ
রক্ত রঙে কাকলিত
অশোকতরুকে যেন মঞ্জরিত করে
অনেক স্পর্শের বুঝি
ইতর বিশেষ বোঝা যায়
চেতনা আচ্ছন্ন যবে
প্রলাপ বকানো ঘোর জ্বরে

সুখের শিথিল বড় মুঠি
উড়ন্ত পাখিরা যেন
চ্যুত আশ্রয়
কার্নিশে বেঁধেছে ফের নুটি
কথা যা বলার তারচেয়ে
ঢের বেশী অনর্থক
অসম্বন্ধ নানান রকম শব্দ করে
অন্যের বোঝার নয়
বোঝবারও নয়
তাই নিয়ে তৃপ্ত ওরা দুটি

নীড় ছিল কতখানি
উষ্ণতা আবামপ্রদ
তখনই তো বোঝা যায়
দুঃখ টেনে ধরে যবে ঝুঁটি

গাছের সংসার। আমি

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

আমি গাছের মতো সহিষ্ণু নীরব ছায়াদানকারী নার্স হতে পারিনি
শিকড়ের সমূহ কর্তব্য মারক রসে মাখিয়ে
ধমনীতে ফুল ফোটাতে পারি না
আমি জানিনা বর্ষ বর্ষান্তরে নিজেকে কিভাবে
নিরপেক্ষ রাখতে হয়
ঝুলন্ত অর্কিডেও যেটুকু অস্তিত্বশীলতা আছে
আবক্ষ বাহিনী রেখেও
সেটুকু বাঁচাতে পারিনি
চূড়ান্ত ব্যর্থ আমাকে দেখে হাসে গাছের সংসার
থামখেয়ালী বাতাসের হাততালি
আমাকে আরো লজ্জাহীন করে
বেআবরু নগ্নতায় আমি শিরাবহুল হাতে
সবুজ সতেজ প্রাণটুকু ছুঁয়ে দেখি
বড়ো ভালো লাগে
গাছের মতো সহিষ্ণু নীরব ছায়াদানকারী নার্স হতে পারিনি
সবটুকু শুশ্রূষা নিতেই আমার জন্ম
এভাবেই এ জন্মে ফলহীন নিরক্ষর মরু হয়ে আছি।

হেলো শ্যাম্পু—ঠিক আপনার মত চুলের যত্নের জন্যে!

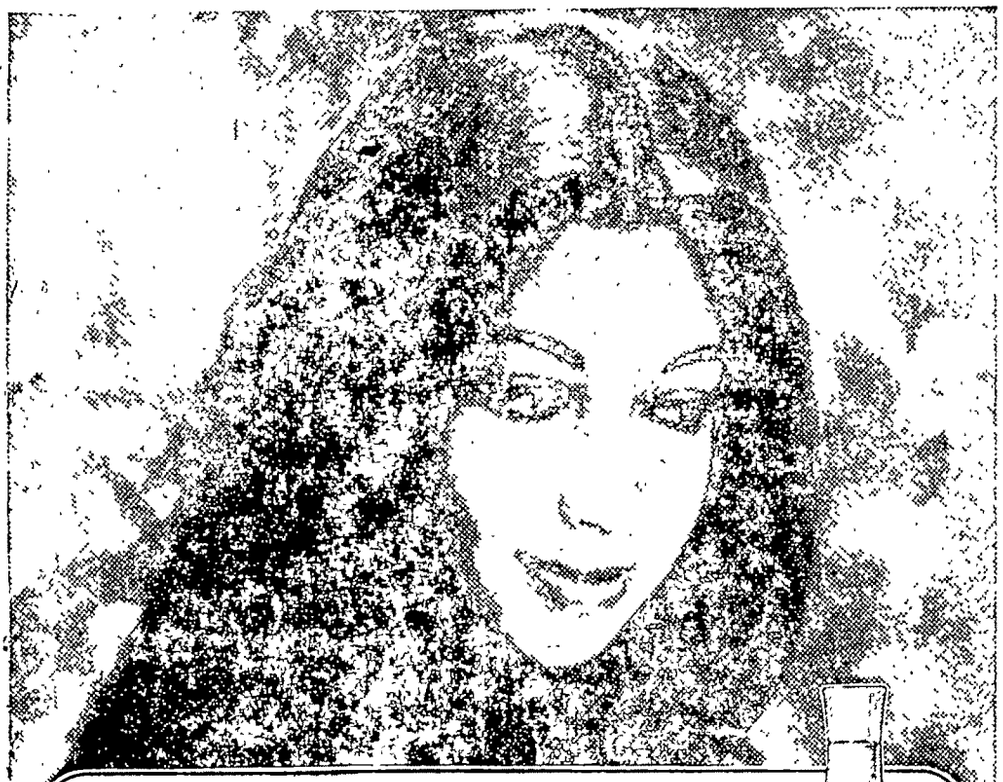

অনেক নরম, রেশমী চিকন চুলের জন্যে হেলো কস্‌মেটিক শ্যাম্পু!

আপনার চুলে আনুন হালফ্যাশানের ঝলমলে রূপ···
হেলো কস্‌মেটিক শ্যাম্পু দিয়ে। এর বিশেষ সুষম ফর্মুলা—
আপনার চুলে ফিরিয়ে আনে সহজাত রেশমী কমনীয়তা!

স্বাভাবিক সুস্থ চুল চান—তো আজই
যত্ন নিতে শুরু করুন হেলো দিয়ে

হেলো এগ্‌ শ্যাম্পু : প্রোটিন সমৃদ্ধ হেলো এগ্‌ শ্যাম্পু দিয়ে আপনার চুলে সঞ্চার করুন প্রাণ আর সৌন্দর্য্য!

হেলো লেমন-ফ্রেশ শ্যাম্পু : তেলা চুলকে করে তোলে সহজাত সৌন্দর্য্য দীপ্ত, ঝকঝকে পরিষ্কার, ঝলমলে উচ্ছল।

হেলো কনসেন্ট্রেট শ্যাম্পু : রাশি রাশি সমৃদ্ধ ফেনার জন্যে একটুখানিই যথেষ্ট। এতে চুল নরম থাকে, আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসে।

কেবল হেলো শ্যাম্পুগুলিতেই আছে নিখুঁত সুষম ফর্মুলা!

সেই সব ছবি/গিরিধারী কুন্ডু

কোথায় থাকেন ?

আপনাদের হাসপাতালের পেছনের বস্তিতে বাবু।

এ আপনার কে হয় ?

কে বাবু ?

কে আবার। যাকে সঙ্গে করে এনেছেন এখানে।

স্বামী লাগে ডাক্তারসাব।

মোট ক'বার রক্ত-বমি হয়েছে ?

রক্ত! সে কি আছে বাবু ?

আরে—খুন, খুন। বমিতে খুন ক'বার পড়েছে ?

কাল রাতসে দুবার।

পেট ফোলা কদ্দিনের ? ফ্যাকাশে মুখ, চোখ ঢুকে গেছে। কদ্দিন ধরে হল ? সব কি একসঙ্গে হয়েছে ?

কাল রাতসে বাবু!

কোনদিন কালো দাস্ত হয়েছে ?

জ্বি। দু' সাল আগে। ফির গত হপ্তা মে।

অসুখটা ত রাতারাতি হয়নি। দু' বছর আগে কালো পায়খানা, সাত বছরের অম্বল, গলা-বুক জ্বালা! কষ্ট পাচ্ছেন কদ্দিন হল, এত দেরি করে এলেন কেন ? সব অসুখ নিয়ে খেয়াল-মর্জি চলে! আরো পরে এলে চলত না!

কি করব ডাক্তারসাব। আমরা গরীব আছি। কোথায় যাব ? ডাক্তার দিখাতে টাকা লাগে, কোথা পাব। বিনা টাকার ওষুধ মিলবে না।

বাঃ ফাইন কথা! হাসপাতাল রয়েছে কিসের জন্য! রোগীকে নিয়ে আসার সময় হয়নি, সে-কথা আগে বলুন। এখন নিয়ে আসতে কে বলে দিল ?

বস্তির লোক বলল, এ-হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তারসাব আছে। এখানে আনলে আমার স্বামী ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তার দিখাসে এলাজ করাতে বলি ত, মানুষটা আমার কোন কথা শোনে না।

কি কাজ করেন আপনার স্বামী?

কাম একটাই। দিনভোর রাস্তায় ফেরি করে—ফেরিওয়ালা। সময়ে খানা খায় না। যো রোজ বেশি রুপায়া মিলবে ত ও চলা যাবে ছাই গিলতে। হাঁ—পেটে ব্যথা বলত মাঝে মাঝে। রাতে নিদ ভি ভেঙে যায়।

এবার একটু চুপ হয় মেয়েটা।

আমার কোই নেই ডাক্তারসাব। ওর আগের বৌটা মারা গেল, আমাকে নিকা করল ফের। কোই বেটা-বেটি নেই। বাপ-মা মুলুক আছে। হায় আল্লাহ্! আপ-লোকই এখন সব। দয়া করুন ডাক্তারসাব। ডাক্তারসাব—

কথা শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ে মেয়েটার ছলছলে চোখ। ভেজা গলার স্বর এত কাছ থেকে ঋষির মন ছুঁতে পারল কিনা, বোঝা গেল না। খর-খরে গলায় বলে সে।

দয়া ? দয়া করার কি আছে ? রোগী এনেছেন একেবারে শেষ মুহূর্তে।

ঋষির কথায় সায় দেয় মেয়েটা।

জী।

একটু থেমে থেকে তারপর করুণ দু-চোখের পাতা মেলে রাখে ঋষির দিকে।

আকুল গলায় বলে।

ডাক্তারসাব, ভাল হবে আমার স্বামী? আল্লাহ্ দোয়া করুক ও ঘর যায়।

ঋষি চুপ থাকল।

টর্চের পেছন দিকে একনাগাড়ে ধাক্কা দিতে কাঁপা আলো স্থির হয়। সে-আলো ছোট হয়ে থাকা শুকনো দু-চোখে ফেলে দেখে নেয় গভীরভাবে। আর উঁচু-হওয়া পেট চার আঙুলের তল দিয়ে টিপে বুঝল, পেট ঠিক কার্ডবোর্ডের মত শক্ত। নাড়ির ভেতর খুব কাঁপুনি, ঠিক যেন অতি দ্রুত রক্তের ঢেউ হেঁটে চলেছে সরু রাস্তা ধরে।

রোগীকে দেখতে রোগা টিং টিং-এ। সাহাদাত নাম ওর। তিনের ঘরে বয়েস। খাড়া দাড়ি দিয়ে ভর্তি দু-গাল। সেই কবে থেকে কাটা হয় নি, কে জানে। চোখের নিচের পাতা টেনে রাখতে সাদা ভাব ফুটে বেরুল অমনি। ভীষন অ্যানিমিক। রক্ত শূন্যতা।

যে মেয়েটা এতক্ষণ কথা বলছিল, কুড়ি-বাইশ বছরের। দেখতে খুব সুন্দরী। মাজা-ঘষা চেহারা নয় কিন্তু। একটু কালোর মধ্যে অবশ্য। চোখ দুটো-ই যা সাংঘাতিক।

টিকিটের বাঁ পাশে রোগীর সব কন্ডের কথা, এছাড়া তলনতল পরীক্ষার পর কি পেল, এসব এবার ঋষি লিখে ফেলে হড়বড় করে।

অসম্ভব উঁচু গলায় কথা বলতে দেখে মেয়েটা, সাহাদাতের বউ ঋষি সম্পর্কে মনে ভাল ধারণা নিতে পারল না। ডাক্তার ত, হয়েছে টা কি। দোষ আছে ওর, ওর স্বামীর। অসুখটা অনেক দিনের, সে-কথাও ঠিক। আরো আগে আসা উচিত ছিল। অসুস্থ লোকের সামনে প্রতি কথায় খোঁচা-মেচি করে কেউ এমন? ভীষণ খিট খিটে মেজাজ। একজন ডাক্তার বলে কথা। সাধে কি ডাক্তারদের ওপর বাইরের লোকের এত রাগ!

এদিকে প্রশ্নের ঝড় থামে না। ঋষি বলে—

শুনুন দাদা, এবার সত্যি বলুন—আপনি নেশা করেন কি? সিগারেট-বিড়ি, তাড়ি, মদ, গাঁজা—কোনটা চলে? খেলে, কবে থেকে খান? শেষ কবে খেয়েছেন বলুন? ডাক্তারের কাছে কোন কথা লুকতে নেই, তাহলে ভাল হতে দেরি লাগবে কিন্তু।

এ-পাশ ও-পাশ বেশ করে মাথা নেড়ে না জানায় লোকটা। তা দেখতে পেয়ে সামনে এগিয়ে দাঁড়ায় বউ।

ও কি বলবে ডাক্তারসাব! মিছা বলে। আমি বলছি ওর কথা।

মেয়েটাকে দেখতে পেয়ে ধমকে দেয় ঋষি। ডান হাতের আঙুলের ইসারায় কাছ থেকে সরে যেতে বলে। ঋষির এ-ও চোখে পড়ল—সাহাদাত মাড়িতে জোরসে দাঁত চেপে রেখে বউয়ের দিকে চেয়ে। একেবারে চোখ পাকিয়ে আছে। এ রকম ভাব করার কি অর্থ। অসহ্য যন্ত্রণার জন্যে, না—বউকে শাসাবার জন্যে, যাতে বেফাঁস কিছু না বলে ফেলে। ঠিক বোঝা গেল না এ মুহূর্তে।

সামনা সামনি উল্টো মুখি চেয়ারে কোট-টাই পরা বড় ডাক্তার বসে। ভিজিটিং সার্জেন। এক পায়ের গিঁটের ওপর অন্য হাঁটু ফেলে দিব্যি পা দোল দিচ্ছেন। কপালে জোড়া দু হাত ঠেকিয়ে মাথা নিচু অবস্থায় শুনছিলেন ঋষির এতক্ষণকার যাবতীয় প্রশ্ন। চোখ তুলে হাসি হাসি মুখে জিগ্‌গেস করেন তিনি।

ঋষি, কি বুঝলে? কি ব্যাপার দাঁড়াল তাহলে?

স্যার, কেসটা পেপটিক্ পারফোরেশন। আমার ত তাই মনে হয়।

কারেকট। পেটের পুরনো ঘা বাস্ট করেছে। পারফোরেশন্ আমরা যাকে বলি। আট ঘন্টার বেশি সময় পেরিয়ে গেছে. আর তাই ভেতরকার জমে থাকা রক্ত পেরিটনাইটিস করেছে। পেটের স্টেট এক্স-রে তুলে ফেলো। সব গন্ডগোল ধরা পড়ে যাবে।

কপালের কাছ থেকে হাত নাবিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ার ঠেলে দাঁড়িয়ে বললেন।

উঠলাম। যাই এবার। এর অপারেশনের ব্যবস্থা করো। ডকটর দাস করবেন। ওকে বলে গেছি। পেট খুললে-ই ভাল রেজাল্ট হবে, এমন বলা যায় না। জিটল হোপ্ টু রিকভারী। তবু অপারেশন করতে হবে। পারফোরেশন যদি ছোট হয়ে থাকে। আর তাছাড়া তোমাদের দেখার জন্যে—পেটে কি ঘটেছে।

এই বলে-ই টিকিটের ওপর সজোরে কলম চালিয়ে রোগী ভর্তির কথা লিখে ঋষির হাতে দিয়ে দিলেন।

কিছু যেন বলতে চাইছে সাহাদাত। স্পষ্ট কোন উচ্চারণ গলা চিরে বেরিয়ে আসে না। গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া। অসম্ভব কাহিল হয়ে পড়েছে মনে হল। এমনও হতে পারে—পেট ফুলে যাওয়ায় ফুসফুসের নিচের অংশে চাপ পড়েছে, তাই শ্বাসকষ্ট। ভারি নিঃশ্বাসও বেরিয়ে আসছে থেকে থেকে। খুব অস্থির চোখের চাউনি।

মেয়েটাকে বাইরে আস্তে ডেকে এনে বলে ঋষি।

শুনলেন সব কথা? আমরা আপনার স্বামীকে ভর্তি করে নিয়েছি। এক্স-রে তোলা শেষ হলে অপারেশন আজই হবে। যতক্ষণ না আমরা কেন্ড বলছি—হাসপাতাল ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। সামনে সামনে থাকুন। কখন কি দরকার হবে, এখন থেকে বলা যাচ্ছে না।

গলার স্বরে দারুণ বিস্ময়। প্রচন্ড চকচকে চোখ দুটো আচমকা আবার ছল-ছল করে উঠল। চোখে জল এসে গেছে কথা শুনতে শুনতে।

অপারেশন!

বাঁকা উত্তর দেয় সে।

তা নয় ত কি! অপারেশন ছাড়া আপনার স্বামীকে বাঁচানোর রাস্তা আর নেই। অন্য কিছু করাটাও সম্ভব নয়।

থরথরিয়ে গলা কাঁপে। হতাশ হল মেয়েটা একটু।

হায় আল্লাহ্! এসব কি হল? ও ঘর যাবে ত ডাক্তারসাব?

চেষ্টা ত করছি। আমাদের দিক থেকে কোন গলতি হবে না। ওপরওয়ালাকে ডাকতে থাকুন।

জী। সব খোদাত আল্লার দোয়া। বলুন না ডাক্তারসাব, আমার স্বামী ভাল হবে ত?

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ওখান থেকে সরে যায়।

সাহাদাতের শারীরিক অবস্থা খারাপের দিকে ক্রমশঃই। আরো ঢুকে গেছে চোখ-মুখ। ফ্যাকাশে। রক্তের চাপ কমছে। পেট ফোলা তেমনই। কমছে না কিছুতে। আগের চেয়ে অনেক শক্ত হয়েছে।

ছবি তোলা শেষ হতে ওয়ার্ডে আনা হল। সেখান থেকে অপারেশন ঘরে যাবার জন্যে ঘড়ির অস্থির কাঁটার মত অপেক্ষা করছে সাহাদাতের শরীর।

ডাক্তাররা কম-বেশি সবাই ব্যস্ত। আপ্রাণ চেষ্টায় আছে। সারাক্ষণ ছুট্ ছুট্ ভাব চারদিকে। সময়টা ভারি মনে হয় ঋষির। খারাপ লাগে সবকিছু। অনেকক্ষণ ওদেরকে আটকে থাকতে হবে, যতক্ষণ না সাহাদাত ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে আরেক রাজ্যে চলে যায়। সত্যি, এ এক অদ্ভুত নিয়ম।

সাহাদাতের রক্তে গ্লুকোজ-সেলাইন দেয়া শুরু হয়েছে একটু আগে থেকে। ডকটর দাসের পায়ের পাতা অস্থির, কোটের পকেটে দু-হাত গলিয়ে করিডোরের এদিক-ওদিক ঘুরছেন। কেবল ছটফট করছেন, আর ভাবছেন কখন অপারেশন শেষ হবে, আর উনিও অন্য কাজে মন ফেলবেন, নয়ত বাড়ি যাবেন। প্রণবকে দেখতে পেয়ে হাঁক দেন।

প্রণব, কি হল তোমাদের অপারেশনের? কন্দুরা হাসান কোথায়? ঋষি, জনকেও দেখছি না যে।

এই ত স্যার। হাসান আর জন আউটডোরে অপারেশন করছে। ও টি-তে আমি খবর দিয়ে এসেছি। ইনস্ট্রুমেন্ট বয়েল করতে দেরি হবে বলল। কারেন্ট নেই, লোড শেডিং। ঋষি ব্লাড ব্যাঙ্কে যাবে। ও ব্লাড নিয়ে এলে পেশেন্টকে ও টি-তে পাঠাব। আপনি আরেকটু থেকে যান স্যার।

ডকটর দাস বিরক্ত গলায় জানায়।

তাড়াতাড়ি করো।

দুপুর কখন গড়িয়ে গেছে, বিকেলের শুরু।

একে-ওকে ডেকে ঋষি সাহাদাতের বউয়ের খোঁজ করে। ছায়া দেখতে পায়নি কেউ, সবারই মুখে এক কথা। রাগ হয় ওর। বেশ মেয়ে ত, ডাক্তারের কাঁধের ওপর রোগী বসিয়ে দিয়ে এখন বেপাত্তা।

রক্ত কেউ না দিলে, রক্ত জোগাড় করা যে কি সাংঘাতিক গোলমেলে ব্যাপার, তা বাইরের কেউ বোঝে না। বুঝতে চায় না। এখানকার নিয়ম আবার—আত্মীয়স্বজনকে রক্ত দিতে হবে অবশ্যই, নয়ত অন্য কোথাও থেকে কিনে এনে দিতে হবেই

কাছে কাছে থাকতে বলেছে, তবু মেয়েটা কথা শুনল না। কি আর করার আছে এখন, আপাততঃ রোজকার মত বিকেলের জলখাবার পর্যন্ত খেতে যাবার কথা ভুলে থাকল।

লিফটের সামনে আসতে লিফট্‌ম্যান জিজ্ঞেস করে।

আপনি কাউকে খুঁজছেন ডাক্তারবাবু?

ঋষি জানায়।

আরে আজ সকালে আউটডোর থেকে যে পারফোরেশনের রোগীটা ভর্তি হল, ওর বউকে থাকতে বলেছি, দেখছি না ত!

ওকে খুঁজছেন এত? এক তলায় বাইরের বেঞ্চে ঘুমিয়ে আছে দেখুন গিয়ে।

ঋষির রাগ চড়বড় করে বেড়ে গেল এ-কথায়। লিফট থেকে গটমট হেঁটে যাচ্ছিল ও। খেয়াল হল, মেয়েটা সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে! গায়ের ছেঁড়া চাদর অনেক কষ্টে গলা পর্যন্ত টানা। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা ও বাইরে! বেঞ্চের তলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হাওয়াই চটি পড়ে।

মুখ খোলা। দুপুরের তেজী হলুদ রোদ কালি মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এতক্ষণ। তাই মুখটা আরো কালো হয়েছে যেন।

ঋষি ডাক দিতে পারে না। ডাকা ত দূরের কথা, কাছে ঘেঁষতে পারে না পর্যন্ত মনে হল এখন, কাল ওর সত্যি খুব টানাপোড়েন গেছে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে। খুব কড়া কথা বলা গেল না। মনের রাগটাও দাঁসিয়ে ওঠে না, মরে গেছে একেবারে।

ঝুল-দরজার দু পাল্লা কাঁধ দিয়ে ঠেলেঠুলে ঘরে পা রাখে ঋষি। অমনি নাক-মুখ বিশ্রীভাবে কুঁচকে উঠল টুলে বসেথাকা ভদ্রলোকের। এক ঝটকায় ব্যান্ড-ফর্ম টেনে নিয়ে পরিষ্কার বলে দিলে, ফিফ্‌ বেডের পেশেন্টের জন্যে পার্টি রক্ত না দিলে সাব-স্টিটিউশন রয়েছে, এক বোতলও দেয়া যাবে না। আপনার ত দেখছি দু দু বোতল প্রয়োজন!

মুখ খোলে ঋষি।

পার্টিকে আমি এখন কোথায় খুঁজতে যাব? রোগীর বউ এসে ভর্তি করে রেখে বাড়ি চলে গেছে নিশ্চিন্ত মনে।

ভদ্রলোক বললে রেগেমেগে।

ধরে রাখতে পারেন নি?

থাকতে বলা হয়েছিল, থাকেনি। সে-দোষ কি আমাদের?

আপনারা মশাই আজেবাজে যত ঝামেলা পাকাতে পারেন। ইনচার্জ নেই, পরে এক-গাড়ি কথা শুনতে হবে আর কি!

এখন-ই ইমারজেন্সি অপারেশন হবে। অ্যাবডোমেন ওপন না করলে পেশেন্ট মারা যাবে যে! ইচ্ছে হলে দিন, না হলে না দিন।

ভদ্রলোক বাগ দেখাতে লাল মোটা পেন্সিলে খেচাং টান দিয়ে দেয় দু-বোতল রক্ত লেখা জায়গায়। জোর করে লাল পেন্সিলেই ওয়ান বটল লিখে বলে।

ধরুন। এর বেশি নেই।

চোখের কাছে এরপরে রক্তের বোতল ওপর নিচ নেড়ে একমনে কি যেন দেখল। দেখা শেষ হতে, ব্লাড-ব্যাঙ্কের সে ভদ্রলোক ঋষির হাতে বোতল আর ছোট এক ছাপা কাগজ এগিয়ে দেয়। খপ করে সে দুটো ধরে নিয়ে ঝড়-পায়ে একতলা থেকে পাঁচতলা অব্দি দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে অপারেশন-ঘরে সোজা ঢোকে।

খালি পায়ে রবারের চটি গলিয়ে ভেতরে ঢুকে এসে দেখে, অপারেশন শুরু হল সবে। ধার ছুরিতে পেটের ওপর নাভির কাছটায় একটান মেরে ডক্টর দাস পৌঁছে গেলেন একেবারে পেটের গর্ভে! এক পেট রক্ত গড়াগড়ি খাচ্ছে সমানে। এর মধ্যে আবার ছেঁড়া পেটটা উল্টে গিয়ে নাড়ি-ভুঁড়িশুদ্ধ জড়িয়ে। সাকার যন্ত্রটা চালু হতে বাবার নল দিয়ে টলটলে সে-রক্ত কাঁচের জারে ফেলা হল।

স্টমাক—পেটের বাঁ পাশের নিচের দিকের এক জায়গায়, যেখানে বিরাট পুরনো ঘা রয়েছে; ওখানটা ফেটে গেছে! একেবারে বার্স্ট। তাই এত কাণ্ড বাঁধিয়েছে।

ঝটপট ছেঁড়া জায়গা সেলাই শেষ। জমা রক্ত বার করে খোলা পেট বন্ধ করলেন ডক্টর দাস। অমনি অন্য ডাক্তারদের ভিড় করা মাথা সরে গেল একের পর এক টেবিলের কাছ থেকে।

সাহাদাতকে ধরাধরির পর ট্রলিতে তোলা হল, সেখান থেকে আবার ওয়ার্ডে। দু হাতে—এক হাতের শিরায় সেলাইন, অন্য হাতে রক্তের দ্রুত ফোঁটা টপটপ পড়ছে দু মুখ খোলা কাঁচ কুপির ভেতর দিয়ে।

পাশাপাশি বিছানার সব রোগীদের চোখে ঘুম নেই। ওরা ওদেরই একজনের মুমূর্ষু অবস্থা দেখতে পেয়ে ভয়-চোখে সেদিকে তাকিয়ে। ঋষি ব্যস্ত চোখ এড়িয়ে যায় না এটা। চেঁচিয়ে ও বলে দেয়।

খাওয়া হয়েছে। এবার শুয়ে পড়ুন। তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখার আছে এত? রাত দশটা বেজে গেছে!

বিছানায় শরীর টান করলেও ঠিকই চেয়ে চেয়ে দেখছে, চার ডাক্তার তিন নার্স মিলে এক রোগীর জন্যে কিছু না কিছু করছে প্রতি মুহূর্তে!

দরজার কাছে কতগুলো এলোমেলো মুখ উঁকি-ঝুঁকি মেরে সরে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। সব সামনে ওই মেয়েটা, সাহাদাতের বউয়ের মুখ। আঁচল টেনে ফোলা নাক আর অর্ধেক মুখ ঢেকে রেখেছে। কান্নার জল, যা নাক থেকে অনর্গল বেরুচ্ছে, কাউকে দেখতে দিচ্ছে না কিছুতে।

ঋষি পায়ে পায়ে বাইরে এল। জোর-গলায় মেয়েটাকে জিগ্যেস করে।

এই যে, আপনি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

কাঁপা কাঁপা গলায় সে উত্তর দেয়।

আমি ত নিচেই ছিলাম। আমার স্বামী এখন কি রকম আছে ডাক্তারসাব?

ঋষি যেন কিছু জানে না, বেমালুম চেপে গেল ওকে দেখেছিল বেশ কিছুক্ষণ আগে নিচেতেই। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা ডাক্তারদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ধমকের সুরে বলে।

আপনি নিচে ছিলেন? কখন! আমরা আপনাকে কখন থেকে তন্নতন্ন করে খুঁজছি। রক্ত চাই। এক বোতল অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি আমরা। এখনও দু-এক বোতলের প্রয়োজন।

বুকটা ধক্ করে ওঠে মেয়েটার। গলার স্বরও সেই সঙ্গে কাঁপে।

রক্ত! আরো?

হ্যাঁ, শুন। আপনাকে দিতে হবে।

বাবু আমি গরীব আছি। খুন কোথায় মিলবে?

তা বললে হবে কেন! রোগীকে বাঁচাতে গেলে রক্ত দেয়া দরকার যে।

আমার কেউ নেই ডাক্তারসাব। আমি গরীব আছি। বিশ্বাস করুন।

বোঝানো হল মেয়েটাকে।

গরীব আছি, গরীব আছি সব কথায় এই বললে চলে সব সময়? আপনি নিজে রক্ত দিন স্বামীর জন্যে।

আমি গরীব আছি ডাক্তারসাব। সত্যি বলছি, আমার শরীরে খুন নেই। গরীবের শরীরে খুন কোথা থেকে আসবে। ভুখা থাকতে হয়েছে কাল সে।

আরে বাবা, বড়লোক গরীব বলে কোন তফাৎ নেই রক্তের। আপনার শরীরে যে খুন ঘুরছে, আমার শরীরেও সেই এক-ই খুন।

গোসা করলেন ডাক্তারসাব? এই দেখুন আমার শরীরে এক ফোঁটা ভি খুন নেই।

বলতে বলতে ছেঁড়া চাদর জড়ানো কাঠ-শরীরের এক অংশ—একটা হাত বার করে রাখে ঋষির চোখের সামনে।

ও বাত পরে শুনব। আপনি যান শিগ্‌গির নিচে ব্লাড-ব্যাঙ্কে। গিয়ে বলুন আমরা পাঠিয়েছি।

মেয়েটা চলে যেতে লোকগুলোকেও আর দেখা যায় না।

কিছু সময় যেতে না যেতে ফোন বেজে চলে কর্কশ শব্দে। ঋষিই দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরে।

আমি ব্লাড-ব্যাঙ্ক থেকে বলছি। বেড নাম্বার ফাইভ ফিফটি টু-র ডোনারের ব্লাড টানা যাবে না।

কেন? কি হল আবার!

মেয়েটার ব্লাড প্রেসার ভীষণ কমের দিকে। রক্ত টানতে গেলে শক্ হতে পারে।

মাথা ঘোরাটাও অসম্ভব নয়। বলুন, কি করব ?

তাহলে ব্লাড নিতে হবে না। ওপরে পাঠিয়ে দিন।

ওপরে এল সাহাদাতের বউ। সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকগুলোও। সমানে বউটার পেছনে ঘুরঘুর করছে।

ঋষি জানতে চাইল ওদের কাছে।

আপনারা এখন এখানে! কি চান ?

বয়স্ক একজন বলে।

আমরা রোগীর বাড়ির আশপাশে থাকি। সাহাদাত আমাকে চাচ ডাকতো। নিজের লেড়কা মাফি প্যার করতাম। আচ্ছা লেড়কা ছিল।

আরেকজন অল্প বয়সী ছেলে বলতে থাকে।

আমার বন্ধুর মত ছিল। কোন নতুন কাজ চালু করার আগে আমাকে বলত করবে, না করবে না।

আবার বয়স্ক লোকটা বলতে লাগল।

ডক্টরসাব সাহাদাতের হালত কি রকম আছে ?

ঋষি।

এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। সবে অপারেশন থেকে রোগী এসেছে। রাতটা, কালকের সকাল কাটুক আগে।

জী। ও বাত ত ঠিক আছে। আপনারা ডক্টরবা সেকেণ্ড গড্ আছেন।

ঋষি ভাবে, আচ্ছা এদেরকে সাহাদাতের জন্যে রক্ত দরকার বলা যায় না? বলে দেখুক না; স্বেচ্ছায় কেউ রক্ত দিলে রোগীর প্রয়োজন মিটবে, আর ওকেও গরু-খোঁজার মত রক্ত-রক্ত কোথায় বলে এ-তার কাছে চাইতে যেতে হবে না। মনে হল কথাটা ঋষির। বলল তাই।

আপনারা সাহাদাতের বাড়ির কাছের মানুষ। আপনজন-ই বলতে গেলে। আচ্ছা, আপনারা কেউ রোগীর ভালোর জন্যে নিজের থেকে রক্ত দেবেন ?

হাঁ হয়ে গেছে সবাই একেবারে। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে একে অন্যের।

প্রথমজন, যে সবচে বেশি ঋষির সঙ্গে কথা বলেছিল, সে মিনমিনে গলায় উত্তর দেয়। ডক্টরসাব, এক হপ্তা আগে টাইফয়েড জ্বর থেকে উঠেছি। প্রাইভেট ডকটর বলেছে, খুন কমতি আছে আমার শরীরে।

পাশের জনের চোখের ওপর চোখ ছোটে ঋষির।

এক মাহিনা সে ঘুসঘুসে জ্বর হয়। মুখ দিয়ে খুন পড়েছে তিন দফে। কম-জোরি আছে খুন। কাম কাজে জোর পাই না। দিল লাগে না পুরা। এক ডাক্তারসাব বলেছে, আমার লাংসে টি বি হয়েছে। কি করে আমার খুন দেব, বলুন ?

এবার চোখ আছড়ে পড়ে পরের জনের দিকে।

বিশ্বাস করুন। রোজ আমি একবার

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা পুরস্কার লাভ করুন

প্রবেশ মূল্য নেই আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

উদাহরণ

মোট ২৪

৫	১০	৯
১২	৮	৪
৭	৬	১১

	১১	
	৯	
	৭	

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন। দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউণ্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারাণ্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ২৭..... খাড়াভাবে, সমানভাবে, কোণাকুণিভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ৩০ জুলাই, ১৯৭৮

আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

জেমিনি ট্রেডার্স (জি-১০)
গান্ধীনগর
দিল্লী ১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান

Gemini Traders (G-10)
Gandhi Nagar
DELHI-31

আধপেটা খেতে পাই। আমার রক্ত ওর কাজে লাগবে না ডাক্তারবাবু।

বাকী সবার কাছ থেকে এরপর জবাব কি আসবে, ঋষি জেনে গেছে। মেয়েটাকে দাঁড়াতে বলে, দুটো টেস্ট টিউবে রক্ত টেনে ফর্ম শুদ্ধু দিয়ে মেডিক্যাল কলেজে যেতে বলল।

মাথার দিক নিচু করে দেয়া হল, খাটের দু পা ইঁট দিয়ে উঁচুতে রেখে। যাতে না সাহাদাতের মাথার ভেতর রক্ত চলা কমে যায়।

নতুনভাবে শুরু হল রক্ত চালানো। রক্ত বাচ্ছে না শিরার ভেতর দিয়ে। ঋষি সিস্টার জনকে সে-কথা জানাতে ছুটল। জন এসে দেখে দু হাত-পায়ের কব্জির কাছটায় মোটামুটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে শেষ। আর সুচ ফোঁড়ার জায়গা নেই। পায়ের গোড়ালির কাছের ভেন কেটে মোটা সুতোয় মত পলিথিনের টিউব ঢোকানো হল। ওর ভেতর দিয়ে রক্ত পাঠাবার চেষ্টা চলল। রক্ত তবু যাচ্ছে না। অনর্গল বেরিয়ে আসছে।

সব দেখে-শুনে আক্ষেপ করল জন।

অবস্থা খুব খারাপ ঋষি। ব্লাড প্রেসার ফল করছে আরো। ভেন কল্যাপ্সড। চুপসে গেছে।

চার আঙুলের তল টেনে টেনে ম্যাসেজ করতে থাকে ঋষি ভেন যাবার রাস্তা ধরে। তবু কিছুতে কিছু হয় না। রোগী বাঁচাবার শেষ ওষুধ টিউব ফুটো করে পাঠানো হল। ওই ওষুধও ভেতর পথে যেতে নারাজ। গলগল করে রক্ত সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে সমানে। অমনি বিছানার চাদর রক্ত মাখা-মাখি। গোটা বিছানা ভেজার পর চাদরটা বীভৎস দেখাল একেবারে।

সাহাদাতের শরীর ফিরিয়ে দিচ্ছে সব রক্ত, যা দেয়া হয়েছে এতক্ষণ।

হাসান বলে।

আমি কি একটু চেষ্টা করব?

ওর চেষ্টাও কাজে লাগল না। কোথেকে এক ঝাঁক মাছি উড়ে এসে রোগীকে ঘিরে দৌড়তে থাকে। হাত নেড়ে সবাই তাড়া দিতেও গেল না।

ডকটর দাস ওয়ার্ড ঘুরতে এসে বলে গেলেন।

কিছুক্ষণ আগে, এই ধরো ঘন্টা দুয়েক আগে পেট খুললে মনে হয়, আরো কিছু সময় বাঁচত লোকটা। দোষ কাকে দেবে? একে-ই বলে কপালের লিখন। লাস্ট-মোমেন্ট এসর্জে। ব্লাড জোগাড় করা কঠিন ব্যাপার, তার ওপর আবার ঠিক সময়ে অপা-রেশন থিয়েটার খালি পাওয়া যায় না সব সময়। আজ গ্যাস নেই, কাল কাবেন্ট থাকবে না। কত প্রবলেম সামনে। কি আর করবে, এ জিনিসটা হবেই। ভীষণ অসহায় আমরা।

ঘড়টা নিচে নেবে গেছে। দরজায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেই। আর জিগ্যেস করতে আসছে না—কি রকম আছে আমার স্বামী? ও ঘর যাবে ত ডাক্তারসাব!।

গভীর রাত নাবল। প্রকাণ্ড এ হাস-পাতালের বাড়ি বাড়ির জানলা দরজা খোলা। ওই সব জায়গা ভবিয়ে আলোর ফুটকি অন্ধকারের ওপর লেপে বয়েছে। মোটা নাদুস-নুদুস দেখতে এক সাদা বেড়াল লিফট থামবার জায়গায় চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে। কোত্থেকে ওর দোসর এসে গেল খানিক পরে। অমনি গরগর শব্দ, শুরু হল একটানা ঝগড়া। নিজেরাই আবার ঝগড়া মিটিয়ে হাঁটা দিল দুদিকে।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে সমানে। সব দিক চুপ। পরিবেশটা এখন বেশ একটু থমথমে। একটা গাড়ি ভেতরে আসবার শব্দ। দুমদাম দরজা খোলার আওয়াজ। বেঞ্চের ওপর উঠে বসে সাহাদাতের বউ। ওর পাশে আরো দুটো মেয়ে মানুষ। ওর দেখল—কজন লোক ধরা-ধরি করে হাত পা ছাড়া অজ্ঞান এক মানুষ-কে ইমারজেন্সির ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। সে-গবে কথা বলাবলি চলল অনেকক্ষণ।... আবার সব চুপচাপ। বেড়াল কাঁদছে কোথায় যেন। কান্নাটা কচি এ বউটার বুকে বাজল। বুকের ভেতরেরও সাহাদাতের কান্না শুনছে।

রাত তিনটে বাজার ঘন্টা পড়ল। ভারি ওই তিনটে শব্দ ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল কানের কাছে। আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না সাহাদাতের বউ। মনের মানুষের শোকার্ত গভীর মুখ নড়েচড়ে ওঠে অন্ধকারের ভেতরেই। আর স্থির হয়ে বসে থাকবে কি করে। তর-তর করে ওয়ার্ডের বারান্দায় উঠে এল। দরজার কোণ থেকে চোখ ফেলে রাখে। কেউ তাকে দেখতে পেয়েও কোন কথা ছুঁড়ে মারল না এ-মুহূর্তে। এসছে, দাঁড়াক, এরকমভাবে সবার চোখের ভাষায়। ঋষিও চেঁচিয়ে বলতে পারছে না—

যান, নিচে গিয়ে বসুন। এত ছটফট করলে কোন কাজ হবে না।

সাহাদাতের বিছানা ঘিরে ডাক্তার-নার্সরা। প্রণব ঋষিকে ডেকে বলে।

তুমি এবার যাও। গা গড়ান দিয়ে এসো ঘন্টাখানেক। আমরা সব আছি। আর বেকার বেকার দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে? পা ব্যথা ত অলরেডি হয়েই গেছে।

ঋষি।

রাত ত ফুরিয়েই গেল। আর দু-এক ঘন্টা বড়জোর আছে। এখন ঘুমতে গেলে আর ঘুম আসবে না। আমিও আপনাদের সঙ্গে থাকি না।

না, না। আমরা বলছি তুমি শুতে যাও।

সিনিয়ারের কথা না রেখে উপায় নেই। ঋষি কোয়ার্টারে চলে গেল তাই।

চোখ বুজে এসেছিল একটু: পাখির ডাকে ঘুম পালিয়ে গেল। বাইরে এখন ছাই বরণ অন্ধকার। সাহাদাতের কথা মনে এল। ওকে একটু তাড়াতাড়ি দেখে আসা দরকার। কি অবস্থায় লোকটা আছে! কোন স্থিরতা নেই। এতক্ষণে মারাও ত যেতে পারে! অন্যদিন এর কাপ চা যতক্ষণ না গলা বেয়ে পেটে পড়ে, আর এক শলা সিগারেট ধরানো হয়, ঋষি ওয়ার্ডের ধার ঘেঁষে না। আজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল কেন যেন।

কয়েকটা চেনা কুকুর ঋষির পা থামিয়ে দিল গেটের কাছে। বেশ ঘেউ ঘেউ করছে। ওরা কি তাহলে বারণ করছে ওয়ার্ডে যেতে। অনাসময় কিন্তু ওকে দেখামাত্র রাস্তা করে দেয় সবে গিয়ে।

তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠে আসে। ওয়ার্ডের ভেতর পা ফেলতেই ঋষির চোখ ভীষনরকম কেঁপে ওঠে। ধবধবে এক সাদা চাদর টান করে সাহাদাতের গোটা শরীর ঢাকা। সেলাইনের উপুড় করা বোতল থেকে টসটস ফোঁটা পড়ে মেঝে পর্যন্ত ভিজে গেছে। রোগী মারা যাবার পর কেউ খেয়াল করে নি এ জিনিসটা। আস্তে পায়ে ও এগিয়ে গিয়ে ক্লিপ এঁটে দেয়। এখন আর সে ওয়ার্ডের বাইকে উঁচু গলায় বকতে পারছে না। বোকা চোখে সবাই ঋষির দিকে চেয়ে।

সিস্টারের কাছে এসে জিগগেস করল নিচু গলায়।

কখন এক্সপায়ার করল?

মিনিট দশ আগে।

হাসানদা, প্রণবদা, সিস্টার জন কোথায় গেল?

ওরাও দশ মিনিট চলে গেছে।

মাথা হেঁট রেখে এক পা এক পা সিঁড়ি ভাঙতে থাকে ঋষি। নিচের সিঁড়ি প্রায় শেষ হয় হয়, পাঁচ-ছটা বাকি, সাহাদাতের বউ, ওই মেয়েটাকে দেখতে গেল। ঋষির মনে হল ঠিক এ মুহূর্তে—যে-জমিনের ওপর দাঁড়িয়ে, সে-মাটি কাঁপছে থর-থরিয়ে। থাক থাক সিঁড়িগুলোর মধ্যে বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে! ঋষি এখ্খুনি পড়ে যাবে যেন!

মেয়েটার শাড়ির আঁচল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। ছেঁড়া চাদরটা দলা পাকিয়ে এক হাতের মুঠোয় ধরা। ঋষিকে দেখে ফেলেছে ও। হাত পা ছুঁড়ছে। বয়স্কা দু মহিলা ওর দু পাশের কাঁধ টেনে ধরল, সামনে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না। তবু ওকে ধরে রাখতে পারে না কেউ। ছুটে গেল ওর কাছে। অমনি চোখ ছিটকে তোড়ে জল বেরিয়ে এসে গাল ভিজিয়ে দিল। তখ্খুনি তীব্রস্বর এগিয়ে যায় ঋষির কানের কাছে।

ডাক্তারসাব, ও চলা গিয়া। আপ লোক বহুত করলেন। দেখা ত, বড়লোকের খুন গরীবের শরীর নিল না।

সাহাদাতের বউয়ের কান্নার শব্দ আবছা অন্ধকার সরিয়ে আকাশ থেকে সকাল নাবিয়ে আনল মাটিতে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

॥ সতের ॥

রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে ট্রেন ছুটেছে। কামরার বেশির ভাগ লোক ঘুমোচ্ছে। জায়গা না পেয়ে কেউ কেউ বসেই ঝিমুচ্ছে। বাপীর কারো দিকে চোখ নেই। দু' চোখ জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে। ভিতরে আরো বেশি দম বন্ধ-করা অন্ধকার।

মা বলে কি কেউ কোথাও আছে? নিজেরই বিষে ভিতর-বার কালি হয়ে গেলেও যার কাছে ছুটে যাওয়া যায়, যার বুকে মুখ গোঁজা যায়, মুখ লুকনো যায়? বুকের জমাট-বাঁধা কান্নার স্তূপ যার স্পর্শে গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়? বাপী জানে না। মা কাকে বলে জানে না। কিন্তু মায়ের মতো করে কেউ ডাকছে ওকে। বানারজুলি ডাকছে। বানারজুলির জঙ্গল হাতছানি দিচ্ছে। এতবড় পৃথিবীতে শুধু সেখানে একটু আশ্রয়। সেখানে একটু মুখ লুকানোর জায়গা।

বাপী তরফদার সেইখানে চলেছে।

সেই রাতের পর আরো দুটো রাত রতন বণিকের খুপরি ঘরে বিনিদ্র কেটেছে। নাইট ডিউটি দিয়ে রতন বণিক সকাল সাতটার মধ্যে খুশি মেজাজে ঘরে ফিরেছিল। সপ্তাহে একদিনের নাইট ডিউটিটা ওর চক্ষুশূল। বাকি ছ'টা দিন নিশ্চিন্ত। কমলা নয়, ও-ই চায়ের গেলাস হাতে করে ঘরে ঢুকেছে। জিগেস করেছে, রাতে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হয়েছিল তো?

নিঃশংক, নিশ্চিন্ত মানুষ। কথাগুলো তাই বিবেকের পিঠে যেন চাবুক হয়ে নেমে এসেছিল। তার থেকে যদি বাপীর মুখের দিকে চেয়ে এই সাদাসিধে ভালো মানুষটার চাউনি ঘোবালো হয়ে উঠত, তাহলেও যেন কিছু সান্ত্বনা থাকত। মুখের দিকে না চেয়ে বাপী বিড়বিড় করে জবাব দিয়েছে, রাতে খাব না বলেই তো রেখেছিলাম—

....সকাল দশটার মধ্যে রাস্তায় নেমে এসেছিল। কিন্তু যাবে কোথায়? দুর্ভর দিন কাটবে কেমন করে? সসেপনের পশুটা প্রাণভয়ে গুহা ছেড়ে উধাও। তখন তার অস্তিত্বও নেই।

কমলা বণিক কোনদিন তার শিকার ছিল না। সেই রাতেও না। দেহ যারই হোক, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শেকল-ছেঁড়া ক্ষিপ্ত আহত জানোয়ার অপটু উল্লাসে যাকে নিয়ে বিস্মৃতির অতলে ডুবে ছিল, সে আর কেউ। আর একজন। তারপর চেতনার কশাঘাতে জেগে ওঠা সেই বুঢ় বাস্তব। বাপী তরফদারের যন্ত্রণা সাবলা।

বিবেকের দিকে কে যেন লেকে টেনে এনেছে তাকে। আগের দিনের সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতের ওপর হিংস্র নখের আঁচড় পড়েছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। মাথায় আগুন জ্বলেছে।

বাপী তরফদার এরই মধ্যে সচকিত। একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ছে। ...জানোয়ারটা ওঁত পেতে ছিল কোথায়। সুযোগ আর সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। গুটি গুটি এবারে তার আশ্রয়ের দিকে এগোচ্ছে। বিবেকের কশাঘাতে বাপী তরফদার ওটাকে ধরাশায়ী করতে চায়, নির্মূল করতে চায়। কিন্তু ওই শয়তান তার সময় জানে। সুযোগ জানে। পায়ে করে তাকে থেঁতলে থেঁতলে বাপী তরফদার হন-হন করে লেক থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু তার পায়ের শব্দ বাড়ছেই, বাড়ছেই। যত বাড়ছে, নিজের ওপর বাপীর ততো দখল কমছে।

....রাত সাড়ে আটটায় কে তাকে ঘরে টেনে এনেছে। হাতের ধাক্কায় নড়বড়ে দরজা দুটো আর্তনাদ করে উঠেছে। এখন ওর কাছে পাশের ঘরের ওই একজন ক্ষমার পাত্রী নয়, দয়ার পাত্রী নয়। কোনো মেয়েই নয়। আগের রাতের তিমির তৃষ্ণার অনুভূতি হাড়ে-পাঁজরে যন্ত্রণা বাষ্প ছড়াচ্ছে।

....ছোট লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকেছিল রতন বণিক। খোশ মেজাজে। টেনে টেনে বলেছিল, ক'দিনের মধ্যে আজই একটু তাড়াতাড়ি ফিরলেন দেখছি।

সকালে যে মানুষটার কথায় বিবেকের চাবুক পড়েছিল পিঠে, এখন তাকে ঠেলে সরানোর তাগিদ। —খেয়ে এসেছি। খাবার আনার দরকার নেই।

—কেন? আমার বউটার ওপর আপনি রেগেই গেলেন নাকি?

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে বাপী বলেছে, কি বাজে বকছ!

—ঠিক আছে, আপনার যেমন সুবিধে।

লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ দুলছিল রতন বণিক। মুখের খুশি কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে চুয়ে পড়ছিল যেন। মাছের মতো চোখ। চার হাত দূরে থেকেও চেনা গন্ধ নাকে আসছিল। মাত্রার ঠিক ছিল না। বোঝা যায়। কিন্তু ওর ঢলো-ঢলো কথা শুনে বিরক্তির বদলে বাপীর দু' কান সজাগ।

—বউটার মতিগতি আজ বদলেছে বিপুলবাবু—বুঝলেন। বোতল নিয়ে আজ আর এ-ঘরে আসতে হল না, ঘরে বসেই খেতে দিলে। আর তোয়াজ করে সেই সঙ্গে এটা-সেটা ভেজে খাওয়ালে। ফুর্তির চোটে একটা গোটা বোতল সাবড়ে দিলাম দেখেও রাগ করল না। শখ করে বিশাল হাঁই তুলল একটা। —আপনার খাওয়ার পাট নেই যখন, যাই শুয়ে পড়িগে—

দুলতে দুলতে চলে গেল। লণ্ঠনটা রেখে যেতেও ভুলেছে।

দুর্বার লোভে দু' চোখ কতখানি চক-চক করে উঠেছিল, বাপী খবর রাখে না। কিন্তু অনুমান করতে পারে। রতনের কথাগুলো শেষ হতে না হতে বুঝেছিল, এই রাতেও কমলা আসবে।

....এসেছিল।

তার পরের রাতেও।

একই আধারে ওই অবুঝ লুব্ধ জানোয়ার আর মানুষ পাশাপাশি বাস করে কেমন করে? নগ্ন উল্লাসে জানোয়ারটা যখন নখ-দাঁত বার করে মানুষটার তখন

অস্তিত্ব নেই। আবার লজ্জায় ক্ষোভে নিদারুণ ধিক্কারে মানুষ যখন যন্ত্রণার মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে নিজেকেই রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে, ওই শয়তান তখন নিখোঁজ। বাপী তরফদার এমন দুটো দুর্বার সত্তা আর কত বহন করতে পারে?

রাতে ঘুম হয়নি। সকালের মধ্যে মনস্থির। ভালো করে ভোর হবার আগে সকলের অগোচরে এখান থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্বল ইচ্ছেটা বাতিল করেছে। অন্য সব বাসিন্দাদের মনে খটকা লাগতে পারে, সংশয়ের আঁচড় পড়তে পারে। রতন বণিকের সেটা প্রাপ্য নয়।

আজও সকালে সে-ই চা-রুটি নিয়ে হাজির। বাপী ওইটুকু ঘরেই পায়চারি করছিল। আসামাত্র বলল, আমি আজ চলে যাচ্ছি রতন।

শুনে রতন বণিক একেবারে হাঁ। যাবার কথা বিপুলবাবু মাঝেসাঝে বলে বটে, কিন্তু কাজকর্মের সুরাহা হবার আগে সত্যি যাবে ভাবেনি। তাই ধাক্কাই খেল যেন। —আজই যাবেন!....আমাদের ওপর রাগ করেছেন?

সামান্য কথায়ও বুকের ভলায় মোচড় পড়ে? বাপী মাথা নাড়ল। বলল, তোমাদের ঋণের কথা ভুলব না, তোমার মতো ভালো মানুষও আমি কম দেখেছি রতন।

রতন বণিক নিশ্চিন্তও, খুশিও।—কি যে বলেন, আপনি ছিলেন; আমাদের কত ভাগ্যি। ....আজই যাবেন কেন, কাজটাজের কিছু খবর পেয়েছেন?

—দেশে যাব, সেখানে একটু তদ্বির-তদারক করতে পারলে চা-বাগানের কাজ কিছু পেয়ে যেতে পারি। বাপী ভেবে বলেনি, কিছু বলা দরকার তাই বলেছে। আসলে বাপী কোথায় যাবে সে ফয়সলাও নিজের সঙ্গে তখন পর্যন্ত হয়নি। এখান থেকে নড়বে এটুকুই স্থির।

রতন বণিক চেয়ে রইল একটু। বলল, কাজ পেতে পারেন না, পেয়ে যাবেন। ক'দিন আগে যা দেখেছিলাম, তার থেকে আপনার কপালের রং অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, দিন ফিরলে ভুলবেন না যেন। বউটাকে বলি, ভালো কিছু রাঁধুক আজ, আমি না-হয় এ-বেলা হাফ-ডে ছুটি নিয়ে ও-বেলা আপিস যাব।

বাপী ব্যস্ত হয়ে উঠল, না-না তার কিছু দরকার নেই, আমি ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব, সকালের দিকে গাড়ি। মুখে হাসি টানার চেষ্টা, খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন, কম খেলাম নাকি এ-পর্যন্ত।

—তাহলে ভালো করে একটু জলটল খেয়ে নিন, আমি চট্ করে দোকান থেকে ঘুরে আসছি।

দু' ঘণ্টার আগেই বাপী বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। চলে যাচ্ছে শুনে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে দেখা করে গেল। রতন তাদের বলেই ফেলেছে, চা-বাগানের মস্ত একটা কাজের খবর পেয়ে বিপুলবাবু চলে যাচ্ছেন। বিপুলবাবু যে মস্ত কেউ হবেন, কপাল দেখে সে তো ঢের আগেই জানা আছে তার, ইত্যাদি।

রতন ট্যাক্সি ডাকতে গেল। খুপরি ঘরে বাপী একা নিষ্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে ....ও-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক-বার কি বলে আসবে, আমি চলে যাচ্ছি?

কমলা নিজেই এলো। দরজা দুটো খোলা। তার এক পাটও বন্ধ করল না। বাইরে থেকে সবাসরি চোখে না পড়ে সেই-ভাবে দেয়ালের দিক ঘেঁষে দাঁড়াল।

কিন্তু কমলার এই মুখ দেখবে বাপীর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। গত তিন রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে লোলুপ সান্নিধ্যের উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্তেও তার মুখ দেখতে পায়নি। নিঃশব্দে এসেছে। নিঃশব্দে চলে গেছে। একটি কথাও বলেনি।

আজ ওকে দেখে বাপীরই বিস্ময়। কমলার এমন চলচলে অথচ প্রশান্ত ক্ষমনীয় শ্যামলা মুখ আর কি কখনো দেখেছে? সংকোচের লেশ নেই, অনুতাপের চিহ্ন নেই, বিবেকের তাড়নার এতটুকু ছায়া মাত্র নেই।

মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু, তুমি চলে যাবে জানতাম, আজই যাবে ভাবিনি.... ভালই হল।

বাপীর খুব ইচ্ছে জিগেস করে, কেন ভালো হল। মুখে কথা সরল না। নির্বাক দু' চোখ ওর মুখের ওপর।

কমলাও দেখছে। বলল, এর পর তুমি কেবল আমাকে ঘেন্নাই করবে জানি। কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে পুজো করেই যাব, আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তোমাকে ভালো রাখে।

ভিতরে ভিতরে বাপী হঠাৎ বড় রকমের নাড়াচাড়া খেল একটা। ..ওর জন্যে, ওর ভালোর জন্যে দু' চোখে এত মায়া বাপী আর কার দেখেছে? মনে পড়ছে কার দেখেছে। বানারজুলির পিসিমার দেখেছে। আর সেই মুহূর্তে যেন সস্তার নাড়িতে টান পড়েছে একটা। পিসিমা নেই। বানারজুলি আছে। মা কাকে বলে বাপী জানে না। মায়ের মতো করে বানরজুলি তাকে ডাকছে। অনেক ডেকেছে। বাপী শোনেনি। এখন আবার ডাকছে।

বাপী চলেছে

জলপাইগুড়িতে এবারে আর দু' ঘণ্টাও ভালো লাগল না। যার টানে এসেছিল, তিনি নেই। ড্রইং মাস্টার ললিত ভড়। তার ঘরে সেই মরচে-ধরা তালা ঝুলছে এখনো। চারদিক আগাছায় ভরে গেছে দু' ঘরের পিছনেরটা পড়ো-পড়ো। বুকের তলায় কারো জন্য এখনো যে একটু দরদের জায়গা আছে বাপী জানত না। এখন টের পাচ্ছে। ভিতরটা টনটন করছে। সপরিবারে একটা মানুষ একেবারে হারিয়েই গেল।

জলপাইগুড়ি থেকে বানারহাট পর্যন্ত টানা বাস ছিল। সেখানে এসে শুনল আরো একটু সুব্যবস্থা হয়েছে। বানারহাট থেকে বাস সার্ভিস চালু হয়েছে বানার-জুলির চা-বাগানের কল পর্যন্ত।

আসতে আসতে বাপী ভাবছিল, তার ঘরদোরেরই বা কি অবস্থা কে জানে। ভেঙে পড়ার কথা অবশ্য নয়। আর বরঞ্চ কেউ থাকলে বে-দখল হবার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু যে মেজাজের মানুষ ও, এখনো বীটম্যানের কাজ নিয়ে পড়ে আছে কিনা কে জানে। থাকলেও খালি পড়ে আছে কি ভাড়াটে বসানো হয়েছে জানে না। বাবা মারা যাবার পর বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় আরুকে বাড়িটা বেচে দিতেই বলে এসেছিল। আরু রাজি না হওয়াতে ভাড়াটে দেখতে বলেছিল। দেড় ঘরের কাঠের বাড়ির পাঁচ সাত টাকা যা ভাড়া জোটে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে বাপী নিজে একটা চিঠি লিখেও খবর নেয়নি। এর মধ্যে কত কাণ্ড। যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়েছে, দেশ দু-খণ্ড হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে। এই তোড়ে তার দেড় ঘরের বসত বাড়ির অদৃষ্ট চোখে না দেখা পর্যন্ত ভরসা করার কিছু নেই।

চা কলের সামনে বাস এসে দাঁড়ানোর আগেই বাপী ভাবনা চিন্তা ভুলে গেল। সেই বানারজুলি। আকাশের গা ঘেঁষা সেই পাহাড়ের সারি। তার গায়ে থাক থাক পেঁজা তুলোর মতো সাদাটে মেঘ। ওই বানারজুলির জঙ্গল। দিনটা ঠিক মেঘলা নয় আজ। কিন্তু জঙ্গলের দিকটা মেঘলা দিনের মতোই লাগছে।

...ওই মাথা উঁচু শাল শিশু অর্জুন আর রুল দেবদারু ইউক্যালিপটাস গাছগুলো যেন সেই আগের মতো বাপী নামে এক দুরন্ত ছেলের পা ফেলার অপেক্ষায় ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বাসের মাথা থেকে টিনের সুটকেস আর বাঁধা বিছানা নামানো হতেই বাপীর ছোটার তাড়া। কিন্তু সোয়া মাইল পথ ওই বাকস বিছানা নিজে বয়ে নিয়ে যাবার মতো এখন আর অত হাল্কা নয়। জিনিস তো কিছু বেড়েইছে।

পয়সা কবুল করে একটা লোক জোটানো গেল। তারপর জুতোর তলা দিয়েও পায়ে সেই পরিচিত পথের স্পর্শ। এ দিকের চা বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই পুরনো দৃশ্য চোখে পড়ল। নানা বয়সের নানা রংয়ের মেয়েরা আড়াই-পাতি তুলছে আর কোমরের সঙ্গে বাঁধা ঝুড়িতে ফেলছে। বাপী একটু না দাঁড়িয়ে পারল না। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কিছুই বদলায় নি, জীবনের স্রোত সেই একভাবেই চলছে।

বদলেছে শুধু বাপী নিজে। আগের মতো ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা আর সে-রকম করে হাসবে না, বন্য কৌতুকে উছলে উঠবে না। ওরা মতলব দেখবে, লোভের ছোবল ভাববে। অথচ সেই চোদ্দ পনের বয়সে যেমন ছিল এই মুহূর্তে অন্তত সেটুকু লোভেরও ছিটে ফোঁটা নেই।

চা বাগানের সাহেব বাংলো কটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর উৎসুক দু চোখ আর এক দিকে ছুটল। বাস্তার ঢালের ওধারে শালগুঁড়ির দিকে। তারপর সেই ছেলে-বেলার মতোই ছুটে যেতে ইচ্ছে করল।

বনমায়া। একটা পা শালগুঁড়ির সঙ্গে শেকলে বাঁধা। সামনে ডাল-পালা ছড়ানো। বনমায়ার খাবার তাড়া খুব নেই। বেছে একটা দুটো তুলে মুখে দিচ্ছে। সঙ্গের লোকটাকে দাঁড়াতে বলে বাপী নেমে গেল। শালের ছায়ার বছর আঠোর উনিশের একটা ছেলে মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

বাপী আট দশ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। এবারে হাতিটা দেখল ওকে। পেল্লায় শরীরের ক্ষুদে চোখ দুটো স্থির খানিক। তারপরেই বিশাল দেহে আনন্দের তরঙ্গ তুলে শুঁড় উঁচিয়ে মস্ত সেলাম। গলা দিয়ে আনন্দের টানা ঘড়ঘড় শব্দে গাছ তলায় ছোকরার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বাপীর গলার কাছে যেন আনন্দের ডেলা আটকেছে একটা। আর তাইতেই চোখের দু কোন শিরশির করছে। এগিয়ে যেতে বনমায়া ওকে শুঁড় দিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরে সোহাগ জানালো। যেন বলতে চায়, এতদিন কোথায় ছিলে, কত খুঁজেছি তোমাকে। ছেড়ে দিতে বাপী ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে আদর করল খানিকক্ষণ। বলল, ছ বছর বাদে দেখেও তুই আমাকে ঠিক চিনে ফেললি। কি করে চিনলি? একবার চিনে রাখলে তোরা আর ভুলিস না?

গাছ-তলার ছেলেটা মুখ উঁচিয়ে এই আদরের মাখামাখি দেখছিল। ভূমিশয্যা ছেড়ে অবাক মুখে উঠে এলো। বাপী দেখে নি। বনমায়ার নাকে মুখে এবার ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ঘুরে তাকালো। মনে হল, এই ছেলেটাকে বনমায়া তেমন পছন্দ করে না।

বাপীর পরণে, পরিষ্কার পা-জামা পাঞ্জাবী। এই এখন সর্বদার পোশাক। কিন্তু বনমায়ার হাবভাব দেখে হোক বা যে কারণেই হোক ছেলেটা হয়তো বিশেষ কেউ ভেবে বসল ওকে। ফিরে তাকাতে সসম্ভ্রমে সেলাম ঠুকল।

—তুমি কে?

—জী লছমন.....

—ওর মাহুত ভীমবাহাদুর কোথায়?

লছমন সবিনয়ে জানালো ভীম বাহাদুর চার বছর আগে এ-জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এখন ওই বনমায়ার মাহুত।

বাপী তক্ষুনি বুঝে নিল এই পালানোর সঙ্গে ওর সেই ভালবাসার মেয়ের কিছু যোগ আছে। কিন্তু চাকরি ছেড়ে বনমায়াকে ছেড়ে একেবারে পালানোর দরকার হল কেন বোঝা গেল না। যতদূর মনে পড়ে, আবুর মুখে শুনেছিল ভীমবাহাদুর পণের টাকা জমাচ্ছে। যে মেয়েকে চায় তাকে পেতে হলে তার বাপকে পণের টাকা গুনে দিতে হবে।

কথার ফাঁকে বাপী বনমায়ার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বনমায়ার হঠাৎ ফোঁস-ফোঁসানি তাইতে থেমেছে ছেলেটা তাও লক্ষ্য করল। একটু আগ্রহ নিয়ে বলল আপনাকে হুজুর এই গোঁয়ার হাতিটা খুব ভালোবাসে দেখছি।

এক প্রেমিকের সঙ্গে পালানো ছাড়া বনমায়া গোঁয়ার এমন অপবাদ বাপীর কানে এই প্রথম। জিগ্যেস করল, কেন, তোমাকে ভালবাসে না?

লছমনের মুখখানা বিষন্ন একটু। মাথা নেড়ে জানালো ভালবাসে না। তারপর ওর কথা থেকে সমস্যা বোঝা গেল। ভীমবাহাদুর চলে যাবার পর চার বছরে একে একে পাঁচজন মাহুত বনমায়ার কাছে লেগেছে। ও ছ নম্বর। গোড়ায় তিন তিনটে মাহুতকে এই জিদ্দী হাতি কাছেই ঘেঁষতে দেয়নি। কাছে গেলে তেড়ে এসেছে। টানা দুটো বছর ওকে দিয়ে হুকুমের কাজ হয়নি। পরের দুটো মাহুতও খুব সুবিধে করতে পারেনি। এখন অবশ্য আগের তুলনায় অনেক ঠান্ডা, কিন্তু এখনো রাগে ফোঁস ফোঁস করে, আর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। কদিন বেশ ঠান্ডা ছিল, আজ আবার মতিগতি সুবিধের নয়।

বাপীর ধারণা, ওকে দেখে বনমায়ার ভীমবাহাদুরকে আজ বেশি মনে পড়ছে। তাই রাগ। জিগ্যেস করল, ও ফি বছর একবার করে পালাতো—এখনো পালায়।

লছমনের হাসি হাসি মুখ। জবাব দিল, সে বেলায় ঠিক আছে। কোনো বছর বাদ যায় না। আবার ফিরেও আসে। ও পালালে সাহেবরা এখন আর বাগটাগ করে না, জানে ফিরে আসবে। কেবল যত দিন না আসে আমার হয়রানি। আমি কাজ নেবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ও পালিয়েছিল।

বাপী ভেবে পেল না, এই মেজাজ যখন, বনমায়া পালিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে কেন? হয়তো ভীমবাহাদুরের টানে আসে। ভাবে ফিরে এলে ওকে দেখতে পাবে। হয়তো বা সভ্যভব্য হাতি জংলি দোসরের সঙ্গ খুব বেশিদিন বরদাস্ত করতে পারে না। আবুর একটা কথা মনে পড়তে বনমায়াকে আর একবার ভালো করে দেখে নিল। ... সেবার ফিরে আসার পর বনমায়াকে একটা বড়সড় আদরের চাপড় মেরে আবু বলেছিল, তিন বছর ধরে পালিয়ে গিয়ে রস করে আসছিস —বাচ্চা-কাচ্চা হবার নাম নেই কেন? তোর মরদটাকে ধরে এনে ডাক্তার দেখা।

বাচ্চা আজও হয়নি বোধহয়। হলে দেখতেই পেত। লছমনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আবু বরবাণীকে চেনো?

সঙ্গে সঙ্গে ও ঘাড় হেলিয়ে জানালো, খুব চেনে। আঙুল তুলে জঙ্গলের দূরের দিকটা দেখিয়ে দিল। ওই জাঙলে থাকে।

আবু এখানেই আছে জেনে বাপী নিশ্চিন্ত একটু। তারপরেই মনে হল সঙ্গে ওই মাল নিয়ে মোজা নিজের ডেরায় গিয়ে কি লাভ। খালি আছে কিনা ঠিক নেই, আর খালি যদি থাকেও ও আসবে বলে কি

প্রকাশিত হ'ল : নটরাজনের

প্রেম অভিসারে ১২·০০

বড়ু চণ্ডীদাসের বিতর্কিত কাব্যগ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" এর ওপর ভিত্তি করে উপন্যাসের রস সম্বলিত বৃন্দাবন লীলার এই আবেগঘন চির নূতন প্রেম-কাহিনী বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অপূর্ব সংযোজন।

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

আত্মচরিতে সমাজচিত্র ১২·০০

গ্রন্থ সিরিজের ভারত খণ্ড (প্রথম পর্ব)
হিন্দুযুগ ও মুসলমান যুগের ভারতীয় সমাজ বিষয়ক আলোচনা।

অসীমানন্দ মহারাজের

নরকে বৈকুণ্ঠের স্বপ্ন ৬·০০

"ওরা বোধ হয় এতটা দুষ্টতা দেখাতে সাহস পেত না, যদি না দেশের নেতাগুলো গুণ্ডা দিয়ে নির্বাচনে জয়ের পথ সুগম করতে চাইত।" "ও তবু বিশ্বাসঘাতক হয়েছে, তোমার বোন বাঁচার জন্য বেশ্যা হবে দেখো।"

আবদুল জব্বারের নতুন সাড়া জাগানো উপন্যাস

অলৌকিক প্রেমকথা ২০·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের ।। গুড্ বাই ক্যালিফোর্ণিয়া ২০৲
নটরাজনের সাড়া জাগানো উপন্যাস ।। প্রমীলা মহল ১০৲

পূর্ণ প্রকাশন ৮এ, টেমার লেন, কলি-৯ ।। ৩৪-১৫৯২

কেউ ঘর দোর খুলে বসে আছে? আবুর সঙ্গেই আগে দেখা হওয়া দরকার।

লক্ষণ এতক্ষণে ভরসা করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে হুজুর?

বাপী হেসেই জবাব দিল, আমি তোমাদের হুজুর-টুজুর কেউ নই। এখানেই জন্মেছি এখানেই বড় হয়েছি। এই পাঁচ ছটা বছর এখানে ছিলাম না——

কোনো ভদ্রলোক এভাবে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সদালাপ করে না হয়তো। খুশি মুখ দেখল। সেই সঙ্গে হঠাৎ কিছু প্রত্যাশাও যেন। আমার একটু উপকার করবেন বাবু?

বাপী অবাক। আমি আবার তোমার কি উপকার করতে পারি।

গলায় আব্দারের জোর ঢেলে লছমন বলল, আপনি একটু চেষ্টা করলেই পারবেন বাবু—ওই জেদী হাতি আপনাকে কত ভালবাসে স্বচক্ষে দেখলাম। এক ভীমরাজাদুরকে এ-রকম ভালবাসতে শুনেছি। আপনি একটু চেষ্টা করলে ও আমাকেও ঠিক পছন্দ করবে—ওরা যাকে ভালবাসে তাদের কথা শোনে, বোঝে। ওকে দিয়ে এখনো জঙ্গলের কাজ ভালো করে করাতে পারি না, না পারলে সাহেবরা বা ঠিকাদার খুশি থাকে না। এ-রকম হলে আগের মাহুতদের মতো আমারও কাজ যাবে—

এমন উপকারের বাসনা বাপী আর শোনেনি। হড়বড় করে এতগুলো কথা বলার পর ছেলেটার কালো মুখ প্রত্যাশায় জ্বলজ্বল করছে। বাপীর হাসি পাচ্ছে। বানারজুলিতে পা দিয়েই একটা কাজের মতো কাজ পেল বটে।

—আবু বরবাণীকে বলো নি কেন, ওকেও তো বনমায়া ভালবাসত।

এবারে লছমনের মুখ দেখে মনে হল এ-যেন অসম্ভব প্রস্তাব কিছু। বলল, সে-তো এখন মস্ত লোক বাবু, অনেককে টপকে জঙ্গলের হেড বীটম্যান হয়েছে, বন্দুক নিয়ে ঘোরে, বড় সাহেব তাকে পছন্দ করে—তার কাছেই তো যেতে সাহস হয় না। কখনো দেখা হয়ে গেলে বনমায়াকে একটু আদর করে, আর আমাকে বলে, ভালো সেবা-যত্ন করে ওকে বশ করে নইলে তোরও সময় ঘনালো বলে। না বাবু, ডাকে দিয়ে হবে না, আপনি চেষ্টা করলেই হবে—আপনাকে ও আবুর থেকেও বেশি ভালবাসে স্বচক্ষে দেখলাম।

....আবু বরবাণী তাহলে এখন হেড বীটম্যান আর মস্ত লোক। একটা বন্দুক বাগাতে পারে নি বলে নিজের বাপকে অকর্মণ্য ভাবত, তাও মনে আছে। কি ভেবে নিয়ে রাস্তার বাল্ব বিছানা মাথায় লোকটাকে ডাকল। অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। লছমনকে বলল, আমার এই জিনিসগুলো তোমার জিম্মায় রাখো, আমি একটু ঘুরে আসছি। আবু রববাণীর ওখানেই যাব—

সভয়ে লছমন বাবু থেকে আবার হুজুরে উঠে এলো তক্ষুনি।—আমার কথা যেন কিছু বলবেন না হুজুর।

বাপী হেসেই আশ্বাস দিল; তোমার কিছু ভয় নেই, বনমায়া যাতে তোমাকে পছন্দ করে আমি নিজেই সে-চেষ্টা করব। বনমায়ার শুঁড় চাপড়ে দিল, লছমনকে ভোগাচ্ছিস কেন, অ্যাঁ?

লোকটার পয়সা মিটিয়ে আবার রাস্তায় উঠে এলো। যত এগোচ্ছে চোয়াল দুটো ততো এঁটে বসছে। ধমণীতে রক্তের স্রোত বদলাচ্ছে। আর খানিক এলোলেই সেই বাংলো। বানারজুলি জঙ্গলের বড় সাহেবের বাংলো।

এলো। রাস্তা ছেড়ে সেই ধাবের গাছটার সামনে দাঁড়াল। যে-গাছের নিচু ডালে বসে মিষ্টিকে নানা কৌশলে ওই বাংলো থেকে টেনে আনত। বাইরের কাঠের বারান্দায় মাঝ বয়সী একজন আধা গোছের কেউ বসে।

আট সাড়ে আট বছর আগে ওই বারান্দায় এই শরীরটা বাবার চাবুকের লুটোপুটি খেয়েছিল। গায়ের চামড়া ফেটে ফেটে যাচ্ছিল। ঠোঁট ফেটে কেটে মুখ রক্তে ভরে গেছল।....ওই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিষ্টি দেখছিল। আর, এই সেদিন বিকেলে লেকের ধারে ভিতরটা যখন তার থেকেও বেশি ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছিল...মিষ্টি দেখছিল।

কিন্তু আশ্চর্য! বাপীর চোয়াল দুটো আরো এঁটে বসছে, একটা ক্ষমা শূন্য অভিলাষ ভিতরে দাপাদাপি করছে, অথচ প্রতিশোধের সেই সাদা আগুন এই মুহূর্তে ঠিক তেমন করে জ্বলছে না। কেন? নিজে ভ্রষ্ট হবার ফল? অপরাধ-চেতনা?

বাপী সামনের ওই বাংলোর দিকে চেয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখছে নিজেকে। আরো কিছু দেখার আছে, যেন, বোঝার আছে। সব-প্রত্যাশার বুকে ছুরি-বসানো আচমকা অপমানের আঘাতে আর আত্মঘাতী ক্রোধে আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে প্রবৃত্তির কুৎসিত উল্লাসে সেই আরো-কিছু-দেখা বা বোঝার ব্যাপারটা দূরে সরে গেছল। বাপীর ভেতর-বাবা এই মুহূর্তে আবার অদ্ভুত ঠান্ডা। এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বনের হাতি বনমায়া সেই ঠান্ডা-প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে।

....পুরনো দিনের অন্তরঙ্গ সঙ্গীকে বনের পশুও ভোলে না। মানুষ ভোলে?.... মিষ্টি কি একেবারে ভুলতে পেরেছিল? সিলপ পাঠানোর তিন-চার মিনিটের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছিল, তার দুচোখে বিস্ময় আর আগ্রহের বন্যা দেখেছিল—সে কি মিথ্যে?...সেই সন্ধ্যায় চলে যাবার আগে ওর জুলুমে পড়ে অমন করে মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি কি দেখছিল? শুধু দেখছিল না নিজের সঙ্গে যুঝছিল? তারপর ভবভাবে বাপীকে অকরুণ কিছু বুঝিয়ে দেবার জন্যেই একই সঙ্গে ওই সোনালী চশমাকেও লেকে ডেকেছিল বটে। আট বছরের ফারাকে কেউ যদি তার মন কেড়েই থাকে, ছেলেবেলার সাথীকে দেখামাত্র তাকে নাকচ করে দেবে এমন আশা বাতুলে করে। ঠান্ডা-ভাবে এটুকুই হয়তো বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল। পাড়ার ভদ্রলোক দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে-আঘাত চার গুণ হবে। বাপীর বুকের ভিতরটা ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছিল সত্যি কথাই। কিন্তু মিষ্টি যে মূর্তিতে ওদের ধাওয়া করে আগলেছিল আর সেই মন-কাড়া সোনালি চশমার ওপর যে-রকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল—সেই সত্যটা কি কম কিছু?

....সেই পুরনো লোভ পুরনো আশা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। ওই মাথমের দলা সোনার চশমা মিষ্টির জীবনের দোসর হতে পারে না। মিষ্টি বাপীর জগৎ থেকে একেবারে মুছে যাবে এমন হতে পারে না। দুনিয়া যত বড়ই হোক, আবার যোগাযোগ হবে, আবার কিছু ঘটবে। ঘটতে বাধ্য। যা ঘটেছে সেটা এখনো শেষ নয়, শেষ কথা নয়।

কিন্তু এই উদ্দীপনার পিছনে বিষাদের ছায়া দুলছে। সত্যর দুর্বার জোরের অনেকখানি কলকাতার সেই টালি এলাকায় খুইয়ে এসেছে। দোষ কমলা বণিকের কি নিজের সেটা কোনো সান্ত্বনা নয়।

অসহিষ্ণু তাড়নায় চিন্তাটা বাতিল করার চেষ্টা বাপীর। ..এখান থেকেই জঙ্গলে ঢুকত মিষ্টিকে নিয়ে। বাপী নেমে এলো। জঙ্গল তেমনি আছে, শুধু অনেকদিন না দেখার ফলেই হয়তো ঘন লাগছে একটু।

..সব যেন সেদিনের কথা, সেদিনের ব্যাপার। এদিকটায় ওরা রঙিন প্রজাপতি আর কাঠবেড়ালি আর খরগোশের পিছনে ছোটাছুটি করত। বাপী তরফদার দেখছে, দাঁড়াচ্ছে, আবার চলেছে।... ওই সেই ছোট গাছটা। বাপী এই ছোট ডালটায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল, দুহাতে দুটো হাত ধরে মিষ্টিকে প্রথমে পায়ের ওপর তুলেছিল, তারপর বুকে জাপটে ধরে পাশে বসিয়ে দিয়েছিল। নামার সময় তেমনি বুকে করে নামিয়েছিল—দশ বারো গজ ওমনি টেনে নিয়ে তবে ছেড়েছিল।

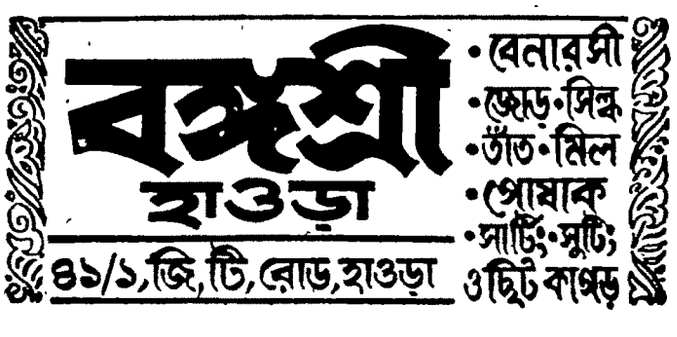

পা দুটো আড়ষ্ট আবার এক জায়গায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ... সামনে সেই শিশু গাছ যার মোটা গুঁড়িতে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল সাদা কালো ছোপের বিশাল ময়াল সাপ, চ্যাপটা মুখটা সামনে টান হয়ে মিষ্টির দিকে। ওটার সোঁ-সোঁ নিঃশ্বাসে মিষ্টির সর্ব অঙ্গ অবশ, নড়াচড়ারও ক্ষমতা ছিল না। ওকে দু চোখে আটকে নিয়ে সাপটা আস্তে আস্তে গাছের গুঁড়ি থেকে নিজের শরীরের প্যাঁচ খুলছিল।... বাপীর আচমকা প্রচন্ড ধাক্কায় মিষ্টি চার-পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল। তারপর পাগলের মতোই ছুটেছিল দুজনে।

বাপীর কপালে ঘাম। সংকট যেন সদ্য কেটেছে।... পুরস্কারও পেয়েছিল। মেয়েকে জঙ্গলে টেনে আনার অপরাধে মেমসাহেব সকলের চোখের সামনে বাপীর কান টেনে ছিঁড়তে চেয়েছে, আর গালাগাল করে ঘাড় ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

সেই বাপী আজ এই মুহূর্তেও ভাবছে যে-মেয়েকে ধরা-বাঁধা মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছে, তার ওপর সব দখল কার? শুধু তার ছাড়া আর কার হাতে পারে?

পা দুটো আরো এক জায়গায় থেমে গেল। যেখানে সেই শেষ কিছু ঘটেছিল। যার ফলে মুখের গা-ঘুলনো রক্তের স্বাদ জীবনে ভুলবে কিনা জানে না। স্থান-কাল ভাল-মন্দ ভুলে, পরিণামের হিসেব ভুলে উন্মাদ লোভে আর আক্রোশে সেই মেয়েকে এখানে এনে ফেলেছিল আর তার সর্বাঙ্গের নরম মাংসে খুবলে নেবার উল্লাসে যেতেছিল। বাপী তরফদারের মুখের রেখা কঠিন। কপালে ভ্রূকুটি। শিরায় শিরায় রক্তের উষ্ণ তাপ। টালি এলাকার খুপরি ঘরে আত্মবিলোপের দাহ বুকে লেগে আছে। কিন্তু এখনকার সেই স্মৃতির কোনো দাহ নেই। অনুতাপ নেই। বরং সেই দখল অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার পরিতাপ। ওই একজনের ওপর তার সত্তার অধিকার। কোথা দিয়ে কেমন করে সেই অধিকার এসেছে, চোদ্দ বছরের বাপী জানত না, আজকের বাপী তরফদারও জানে না। সেই অধিকার নাকচের যন্ত্রণা সেদিনও যেমন, আজও তেমনি।

আবু বরবানীর ডেরার সামনে এসে বাপীর ধোঁকা লাগল বেশ। খুব ভালো জানা না থাকলে চেনা যেত না এমনি ভোল পাল্টেছে। দুখানা ঘরের পাশে এখন আরো একটা ঘর। সামনে পিছনের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। চারদিকের সরটা জুড়ে শক্তপোক্ত বাঁশের বেড়া। সামনে বাঁশের মজবুত গেট। এদিকে পাহাড়ী ফুলের বাগান।

বনমায়ারার ছোকরা মাহুত লছমন সসম্ভ্রমে বলেছিল, আবু বরবানী মস্ত মানুষ একজন। এখন তার ভেতর কেমন কে-জানে। গেট খুলে পায়ে পায়ে ঘরের দিকে এগলো। ঘর থেকে মোটাসোটা তিন-সাড়ে তিন বছরের কালো-কোলো ন্যাংটো ছেলে ছুটে বেরিয়ে এলো। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর হাঁ করে চেয়ে রইল।

রবীন্দ্র সংগীতের নতুন রেকর্ড

এইচ এম ভি রেকর্ডে
রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবর্দ্ধমান তালিকায়
উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন

সুপার-সেভেন রেকর্ড
(স্টিরিও)

ঋতু গুহ
কী ভয় অভয়ধামে;
তারো তারো, হরি দীনজনে;
তোমায় যতনে রাখিব/
শুভদিনে এসেছে, এ কী
ভাবনো; আমার
যাবার সময় হল

কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা
হরষে জাগো আজি;
আমিই শুধু রইনু

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়
আমার আঁধার ভালো,
আমরা দুই আকাশের নেশায়

স্বপ্না ঘোষাল
গাও বীণা, আকাশ
আমায় ভরল

অদিতি সেনগুপ্ত
যিনি সকল কাজের কাজী,
সেজ গো— ফিরিয়ে না

গোরা সরখিকারী
দুয়ারে দাও মোরে; চরাচর
সকলই মিছে মায়া, ছলনা

মঞ্জরী লাল
প্রভু আমার, প্রিয় আমার; যদি
বারণ কর তবে গাহিব না

ই পি রেকর্ড

স্বপন গুপ্ত
কেন রে এই দুয়ারটুকু;
হৃদয়ে হৃদয় আসি/
আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা;
আমার ভুবন তো আজ

গৌতম মিত্র
জানি তোমার অজানা;
অনেক দিনের আমার/
সে আসে ধীরে; আমি যাব
না গো অমনি চ'লে

বাণী ঠাকুর
যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার;
তুমি ডাক দিয়েছ/
ও গান আর গাস নে;
না চাহিলে যারে পাওয়া যায়;

কল্যাণী ঘোষ
আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা;
গ্রাম-ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ/
মলিন মুখে ফুটুক হাসি;
এত দিন যে বসেছিলেম

শৈলেন দাস
হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই;
তুমি যে আমারে চাও/
কাছে ছিলে দূরে গেলে;
হল না, হল না, সই

গীতা ঘটক
লুকিয়ে আস আঁধার রাতে;
যে দিন ফুটল কমল/
কি রাগিণী বাজালে;
ও কেন চুরি ক'রে চায়

সুমিত্রা বসু
জানি হে যবে প্রভাত হবে,
দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও

বিজয়া চৌধুরী
ভুবন-জোড়া আসনখানি;
তোমারি নাম বলব নানা ছলে

সম্প্রতি প্রকাশিত দু'টি
লংপ্লে স্টিরিও রেকর্ড

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
১৩টি রবীন্দ্রসংগীতের
সংকলন

প্রেমের মিলন দিনে
চিরকালের সুমঙ্গলী বধূ ও
বরের সম্মিলনের পরম
লগ্নের জন্য নির্বাচিত কিছু
গান ও মন্ত্রের সংকলন

HMV
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

GC 9771

ছেলেটা নয়, ভেবাচেকা খেয়ে গেল বাপীই বেশি। শুধু বিয়ে নয়, আবুর এর মধ্যে ছেলেও হয়ে গেছে। এরপর যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তাকে দেখে বাপী সত্যি হাঁ। ছট্টু মিত্তির বউ দুলারি। তার কোলে আর একটা আট ন' মাসের বাচ্চা। কিন্তু দুলারি কেন? রেশমা নয় কেন?

বাড়ির আঙিনায় ঢুকে একটা লোককে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুলারি ছেলে কোলে নিয়েই গম্ভীর মুখে আরো খানিকটা এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল কাকে চাই বা কি চাই। কিন্তু হল না। তামাটে মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়তে লাগল।

—বাপী ভাই না?

অবাক চোখে দুলারির দিকে চেয়ে বাপী মাথা নাড়ল। আগে ওকে কখনো বাপীভাই বলে ডেকেছে মনে পড়ে না। তামাটে রঙে এখন আর অতটা কালচে ভাব নেই। ঢ্যাঙা শরীর এখনো প্রায় আগের মতোই আঁটো-সাঁটো। মাথার চুল এলোমেলো লালচে নয় আগের মতো, বরং বেশ সুবিন্যস্ত আর তেল-চকচকে। মুখের সেই রুক্ষভাব আর নেই, চাউনিও তেমন ধার-ধার নয়।

তবে স্বভাব-গম্ভীর মেয়ের আপ্যায়নে উচ্ছ্বাস বেশি ধরা পড়ে না। এত বছর বাদে ওকে দেখে অখুশি নয় এটুকুই বোঝা গেল।

—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, দাওয়ায় উঠে এসো। কত বড়টি হয়ে গেছ, অনেক লম্বাও হয়েছ—আমি হঠাৎ চিনতেই পারিনি। কবে এলে?

—আজই। বাপী খানিকটা এগিয়ে এলো বটে, কিন্তু মাটি ছেড়ে দাওয়ায় উঠল না। কোলের বাচ্চাটা আঙুল চুষছে আর কুতকুত করে তাকাচ্ছে। বড়টাও দুলারির পা ঘেঁষে ভাবভেবে চোখে ওকে নিরীক্ষণ করছে। জিগেস করল, আবু কোথায়?

—খানিক আগে তো তোমার ঘরের দিকেই যাচ্ছে বলে গেল, তুমি ও-দিক থেকে আসছ না?

—না। ব্যাপারটা এখনো বোঝার চেষ্টা বাপীর।—ছট্টু মিত্তির খবর কি?

সামনের আকাশের দিকে একবার একটু মুখ উঁচিয়ে নির্লিপ্ত গলায় দুলারি জবাব দিল, তার খবর তো ওখানে, সেই যেবারে তুমি শেষ এলে সে-বছরই চলে গেল—

বাপী ভাবল, আর কেউ নেই বলে আবু বেশমার সঙ্গে ওকেও ঘরে এনে রেখেছে। তবু কেন যেন বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করল, এরা কার ছেলে?

এত অবাক হতে দেখেই হয়তো তামাটে মুখে হাসি ফুটল একটু।— যার কাছে এসেছ তার, আবার কার?

—রেশমা কোথায়?

জবাব দেবার আগে দুলারি এবারে ওকে ভালো করে দেখে নিল একটু। তারও অবাক লাগছে বোধহয়। সাপ নাচাতো যে মেয়ে সে বাঁকা তাকাতে জানে, বাঁকা কথাও বলতে পারি।—এতকাল বাদে এসেই রেশমার খোঁজ কেন—সে তার ঘরেই হবে।

বাপী এখনো কি শুনছে কি বুঝছে ঠিক নেই যেন।....রেশমা তার ঘরে আর দুলারি আবুর ঘরে। হঠাৎই রহস্যের পর্দাটা উঠে গেল বুঝি। কিন্তু সে-ও তো বিস্ময়ে হাবুডুবু খাবার মতোই ব্যাপার।

বিড়ম্বনার ধকল সামলে বলল, আচ্ছা এখন যাই, আবুকে ধরতে পারি কিনা দেখি। পরে আবার আসব—

তড়িঘড়ি পা চালিয়ে একেবারে আঙিনার বাইরে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নিজের ঘরের পথ ধরেও মাথায় এই বিস্ময়টুকুই ঘুরপাক খাচ্ছে। সাপ খেলানোর ব্যাপারে দুলারি রেশমার থেকেও ঢের বেশি চৌকস ছিল বটে। হতেই পারে, ঘরের লোকের কাছ থেকে সরাসরি শিখেছে। রুক্ষ মুখে পেন্ট-মোটা বাঁশি লাগিয়ে গাল ফুলিয়ে হেলে-দুলে সাপের ফণার সঙ্গে তালে তালে ঝোঁক মিলিয়ে সাপ খেলানোর দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুলারি একি খেলা দেখালো।

আরো একটু ধাক্কা বাকি ছিল বাপীর।

নিজের বাড়ির সামনে এসেও বাপী হাঁ। এরও ভোল বদলে গেছে। ছোট-বড় দুখানা ঘরের পাশের খালি জমিতে লাগোয়া আর একটা বড় ঘর গজিয়েছে। কাঠের বাড়িতে আগে রঙের বালাই ছিল না, এখন ওটার সর্বাঙ্গে রঙের জেল্লা। হালে সংস্কারও করা হয়েছে সন্দেহ নেই। তকতকে ছোট্ট বাংলোর মতো দেখাচ্ছে। সামনের চলতে বারান্দায় বেতের চেয়ার বেতের টেবিল। ধপধপে সাদা টেবিল ক্লথ।

আবু বরবাণী সত্যি কি-রকম মস্ত মানুষ হয়েছে বাপী ভেবে পেল না। সামনের দরজা খোলা দেখে ভাবল আবু ভিতরেই আছে।

পায়ে পায়ে উঠে এলো। তারপর খোলা দরজার ভিতরের দিকে এক পা ফেলে মুখ বাড়াতেই বিষম চমক।

—হু ইজ্ ইট্। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

মহিলা কণ্ঠের ঝাপটা খেয়ে দু' পা পিছনে ছিটকে এলো বাপী। সঙ্গে সঙ্গে উগ্র মূর্তি মহিলাটিও বাইরে। বাঙালীর মতোই শাড়ি পরা, কিন্তু এক নজরেই বোঝা, গায় বাঙালী নয়, নেপালী। চল্লিশ বিয়াল্লিশের মধ্যে বয়েস। ফর্সা মুখে লালিমা কম। এই মুহূর্তে অন্তত উগ্র মূর্তি, রুষ্ট চাউনি। তার পিছনে বছর উনিশের একটি মেয়ে। কমনীয় মুখ, পুষ্ট-পুষ্ট সুডৌল চেহারা। পরনে রঙিন ঘাগরা, গায়ে লম্বাটে সাদা ব্লাউস।

বাপীর অমন বিমূঢ় মুখখানা দেখেও মহিলা সদয় নয়। তেমনি রুক্ষ স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?

বাপীর গলা দিয়ে শুধু বেরুলো, আবু বরবাণী....

ওর আপাদ মস্তক একবার দেখে নিয়ে নেপালী মহিলা এবারও একটু কড়া গলায় কিন্তু পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, আবু বরবাণীর খোঁজে এসে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন কেন? কি দরকার তাকে?

পিছনের সুদর্শনাটি মহিলার মেয়েই হবে হয়তো। দুর্দশা দেখছে। বাপী নিজেকে অথৈ জল থেকে টেনে তুলল এবার। মোলায়েম করেই বলল, দরকার কিছু না....। এতকাল আমি জানতাম এটা আমারই বাড়ি ... বছর কয়েক ছিলুম না এখানে, দরজা খোলা দেখে ভিতরে আবু আছে ভেবে ঢুকতে যাচ্ছিলাম।

এমন জবাব আশা করেনি বোঝা গেল। মহিলার গোল চোখ আর একটু গোল হতে দেখা গেল। মেয়ের চাউনিও বদলেছে।

এর পরেও মচকাবার পাত্রী নয় মহিলাটি। গলার ঝাঁক একটু কমল শুধু।—কি নাম আপনার?

—বাপী তরফদার।

ভুরু কুঁচকে কিছু স্মরণ করার চেষ্টা। স্মরণ হল কিনা বোঝা গেল না। তবে সাফ কথা।—আবু বরবাণী খানিক আগে এসেছিল, চলে গেছে। আপনার কিছু জানার বা বোঝার থাকে তো তার সঙ্গে দেখা করুন।

কথা শেষ হবার আগেই ঘরে চলে গেল। বাপী এবারে কয়েক পলক মেয়েটার মুখোমুখি। ভিতর থেকে আবার একটা তাড়া খাওয়ার সম্ভাবনা মনে আসতেই বাপী তাড়াতাড়ি নেমে এলো।

বিশ বাইশ গজ দূরে এসে সন্তর্পণে ফিরে তাকালো একবার। মেয়েটা দাঁড়িয়েই আছে আর তাকিয়েই আছে। যার ঘর-বাড়ি তারই এমন হেনস্থার প্রহসনটা বেজায় উপভোগ্য যেন।

অগত্যা সামনের সোজা রাস্তা ধরে বাপীর দ্রুত প্রস্থান। (চলবে)

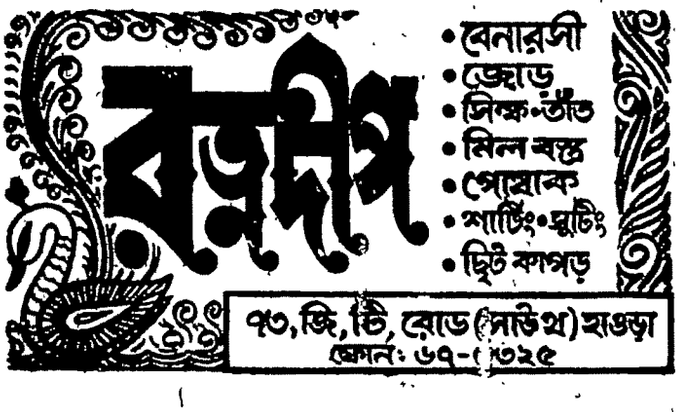

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

পোড়-খাওয়া ছেলে—কিশোর বলে-ছিলো—অনেক দেখেছে। মোতির সঙ্গে অজিতের খাতির জমেছিলো। অজিত অনেকদিন মোতির লিভারের চিকিৎসা করেছে। হোমিওপ্যাথের বাক্স হাতে হর-তুকি বাগানে ওর ঘরে গেছে। অজিতকে দেখে মোতি খুশী হতো। এরকম ভাগড়াই চেহারা তার খুব ভালো লাগে। অজিত সঙ্গে থাকলে তার সাহস দশগুণ বেড়ে যায়। অজিতের হাসি, গলার স্বরে ভূতও চমকে ওঠে। মোতি দেখেছে পাড়ার মাস্তানরাও অজিতকে সমীহ করে। কলকাতা শহরে বাঁচতে হলে বাহুবল কিংবা অর্থবল চাই। পাশাপাশি কিশোরদা বড়ো গম্ভীর, ঠান্ডা। কম কথার মানুষ। নীচু গলা। অনেক সময় আবছা হয়ে যায়। কিশোরের আলাদা জাত। মোতিকে সে বাঁচিয়েছে। নতুন জীবন দিয়েছে। পৃথিবীর ঢাকা খুলে গেছে। এখন সবকিছু কতো সহজে ও বুঝতে পারে। আজন্ম কি এক ভয়, লজ্জা পুষে বসেছিলো। সেটা এখন নেই। ভালো পোশাকের মানুষ দেখে আগে মাথা নুয়ে যেতো। দুহাত কচলাতো। আজকাল আর ওসব ভাবতেই পারে না। শিরদাঁড়া সটান থাকে।

অজিত একটু ঘুমোতে চাইছিলো। কাল থেকে অনেক কাজ। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। ও বিরক্ত হয়। জেলখানায় থেকে এটা হয়েছে। ঘুম ছুটে গেছে। অফুরন্ত অবসর, বিশ্রাম। শরীর কাজ চায়। অনেক কাজ। নিষ্কর্মা লোক অনিদ্রায় ভোগে। অন্ধকারে তিনজন মানুষের ঘুমের শব্দ ও শোনে। বাইরে কীটপতঙ্গ চক্কর মেরে বেড়ায়।

লখাই-এর কাহিনী শুনে অজিতের গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারিফ করেছিল লখাইকে। একা কাজের কাজ করেছো তুমি। ডর নাই। শেষতক লড়তে হবেক। ও লখাইকে বুঝিয়েছিল। অজিতের কথাগুলো বুধন আবার সাঁওতালি ভাষায় লখাইকে শোনাচ্ছিল। লখাই আড়মোড়া ভেঙ্গে বসে। ওর মুখের রঙ বদলাচ্ছে। ম্যাড়-মেড়ে চোখে আলো ফোটে। অজিত বলছিল লড়তে হবে। বিপ্লব চাই। সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নেতা সিধু কানুর ও শোনায়। স্বাধীনতার জন্য তারা জান দিয়েছে। জান-গুরু, মহাজন, দিকু, জমিদাররা একই দলের লোক। তোমাদের দুশমন। নফর জানকে খতম করে তুমি ঠিক করেছিস। তুই সিধু কানুর সন্তান। তবে এখানে থামলে চলবে না। লড়াই শুরু হয়েছে। শেষপর্যন্ত লড়তে হবে। জয় আমাদের হবেই।

অনেকক্ষণ কথা হয়েছিলো। বুধন কাজ করছে। অজিতরা ধরা পড়ার প্রচার থামেনি। নিজেদের বুদ্ধিমতো ওরা এগিয়েছে। অজিতের হোমিওপ্যাথির বাক্সটা বুধনের ঘরেই আছে। খবরটা শুনে অজিত স্বস্তি পায়। দু একদিনের মধ্যে কিশোর ফিরবে। তারপর ওরা বসবে। পার্টি ইউনিট গড়তে হবে। আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। সে আছে ফরাক্কার কাছে। তাকেও ডাকবে।

ফিরিওলা সেজে বিশেষ সুবিধে হয়নি। চা-চা - দুপুর রোদে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছে। ফাঁকা পাথুরে মাটি লালচে রঙ। মাঠের পর মাঠ ছাড়িয়ে এক একটা গ্রাম। মাথায় বোঝা। ক্লান্তিতে জিভ বেরিয়ে আসে। রোজ প্রায় বিশ পঁচিশ মাইল হেঁটেছে। সাঁওতালরা সাবধানী সতর্ক জাত। উটকো লোককে পাত্তা দেয় না। ফিরিওলা মহাজনের একই জাত, দিকু। তেষ্টায় বুক ফাটলে ফটিক নদীর জল খেয়েছে। কখনো নদীর জল। বিশাল মাঠের মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো বন। শাল, সেগুন, পলাশ, মহুয়ার জঙ্গল। তলায় ছায়া। বসে বিশ্রাম করেছে। কিন্তু গাঁয়ে থাকার রাস্তা বেরোয়নি। একটা লাভ হয়েছে। বাংলা বিহার সীমান্তের গাঁগুলো চিনেছে। মনুষগুলোকে আবছা দেখেছে। একদিকে গরীব মানুষের গ্রাম। দূরে বর্ধিষ্ণু সম্পন্ন গ্রাম। আদিবাসী, উপজাতিরা ভদ্রলোকদের সীমানার বাইরে থাকে। সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, কুন্দুলি, ঘাটোয়াল। ঘাটোয়ালরাই সবচেয়ে গরীব। সংখ্যায় কম। ভদ্রপাড়ায় কাছাকাছি নিম্নবর্ণের মানুষ। ডোম, বাউরি, মাল। এরা মহাজন, ধনী চাষীর ঘরে কাজ পায়। মনিষ খাটে। গরু চরানোর রাখাল হয়। মাহিন্দারি করে। আদিবাসী, উপজাতিরা অচ্ছ্যুৎ। তাদের ছায়া মাড়ালে নাইতে হয়।

দুচার বান্ডিল বিড়ি - বেচেছিল। মেয়েরা কাছে এলো না কেউ। পুরোনো ফিরিওলা বেগে টঙ। চৌকিদারকে পেছনে লাগালো। তাকে এক প্যাকেট সিগারেট ঘুষ দিলো। কাজ বিশেষ এগোলো না।

এক রাতের কথা মনে আছে। বাগ-ডোগরা থেকে ফিরছিল। রাজনগর যাবে। ডাক্তারদা, মোতির সঙ্গে কথা বলা দরকার। মাঝেরপাড়া ছাড়াতেই সন্ধ্যে হলো। আকাশে মেঘ জমেছিল। তখনও মাইল দশেক রাস্তা বাকী। বাঁশবনা গ্রাম বাঁয়ে রেখে ও এগোয়। সামনে পেছনে উধাও মাঠ। মনে হলো, রাস্তা ভুল হচ্ছে। মাথার বোঝা। কপালে ঘাম। শাল, কেন্দুর জঙ্গল। তলায় ঘন অন্ধকার। চারপাশে গুমোট। একটু হাওয়া নেই। ঈশান কোণের টুকরো মেঘটা তখন হৈ-হৈ করে গোটা আকাশ দখল করেছে। ঘন কালো জমাট অন্ধকার। জনমনিষ্যির সাড়া নেই। অজিত ভাবে রাতটা গাঁয়ে কাটালেই হতো। গাঁয়ের মধ্যে কোনো গাছতলায় শুয়ে থাকতো। আগেও থেকেছে। নিজের বোকামিতে রাগ হয়। কিছু করার নেই। বেহুনে বাঁশবনা গ্রাম অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। ফেরার পথ বন্ধ। জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে যায়। আকাশে বিদ্যুৎ খেলে। ধারালো তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চারপাশের দুর্ভেদ্য অরণ্য যেন চেপে ধরে। অনেক দূরে গোঁ গোঁ, সাঁইসাঁই শব্দ। একপাল ক্ষেপা জানোয়ার যেন ছুটে আসছে। দমকা ঠান্ডা হাওয়া লাগে। শুকনো দুটো পাতা শরীর ছুঁয়ে যায়।

তখনি একটা প্রচন্ড ঝড় শালবনে আছড়ে পড়ে। মাথার ঝাঁকাটা অজিত আগেই নামিয়ে রেখেছিল। সেটা আঁকড়ে মাটিতে বসলো। এখানে শালগাছগুলো ছোটো। পাঁচ ছ ফুটের বেশী লম্বা নয়। ঝাঁকড়া ডালপাতায় ঠাসা। ঝড়ের দাপটে গোটা

শালবন কাঁপছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সামনে কিছুটা দূরে তিনটে তেঁতুল গাছ। বিশাল লম্বা চেহারা। অন্ধকারে গম্ভীর। হাওয়ায় মাথা নুয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে কে যেন তাদের ঝুঁটি ধরে টানছে। পাতায় পাতায় চাপা গোঙানি। কান ফাটানো বজ্র পড়ে। এমন মস্ত ঝড় অজিত দেখেনি। এত ঘন অন্ধকারও নয়। চারপাশের বন-জঙ্গল মাঠ, যেন উড়ে যাবে। তুমুল বৃষ্টি নামলো। বড়ো বড়ো ভারী ফোঁটা। চোখে দেখা যায় না। অথচ তারা সজোরে আছড়ে পড়ে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মোটা দানার বৃষ্টি। অন্ধকারে সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ আওয়াজ। অন্ধকার ফুটো করে ঝড় বৃষ্টি লড়তে থাকে। অজিতের হঠাৎ কেমন একা, অসহায় লাগে। ঠিক ভয় নয়, এ এক অন্য অনুভূতি। এই অন্ধকার, ঝড়বৃষ্টির রাতে দেশ, কাল আত্মীয় পরিজন একাকার হয়ে যায়। মৃত্যুকে ও ভয় পায় না। বাড়ী বসেও মানুষ মরে। মৃত্যুকে আগলাবার মতো দরজা আজো তৈরী হয়নি। তবু আত্মীয় বন্ধুদের সামনে মরে অনেক আরাম। মুমূর্ষু মানুষেরও একটা অহমিকা আছে। সেটা সকলকে কাঁদাতে আর ভাবাতে চায়। এই অন্ধকার, নিঃসঙ্গ মাঠের মধ্যে অজিতের হঠাৎ এই চিন্তা মাথায় জাগে। হাত দশেক দূরে তেঁতুল গাছের একটা বিরাট ঝাঁকড়া ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ে। কাদামাটি ছিটকে মুখ কপাল ভরে যায়। ও দু পা পিছিয়ে আসে। মনের নেতিয়ে পড়া ভাবটা নিমেষে ছুটে যায়। গোটা পৃথিবী দেখুক আমি মরছি। ও ভাবে। বুক ফুলিয়ে আমি লড়ে যাবো। মৃত্যুর জাত নেই। জীবনেরও জাত নেই। জ্যান্ত মানুষ তাই মৃত্যুকে পরোয়া করে না। প্রায় ঘন্টাখানেক একটানা ও ভিজলো। শরীরের মধ্যে হিম বসে যায়। লুসি গোঁপ্তা শরীরে লেপটে আছে। ও গামছা নিংড়োয় আর মুখ মোছে। আবার গামছা ভিজে ওঠে। চট করে ঘন ঠাণ্ডা নামে। মনে হয় শীতের রাত। হাড়ের মধ্যে শিরশির কাঁপুনি। ইচ্ছে থাকলেও তেঁতুল গাছের তলায় যেতে পারবে না। হয়তো আবার একটা পেল্লায় ডাল ভেঙে পড়বে।

অনেক রাতে বৃষ্টির জোরটা কমে। কালো ঝুল মেঘ। আকাশে উড়ে বেড়ায়। ঘন অন্ধকারে চারপাশে ছলছল কলকল জলের শব্দ। উঁচু নীচু ঢাল বেয়ে জল ছুটেছে নদীর দিকে। অনেক নীচে ফটিক নদী। অন্ধকার মাঠে মাঝে মাঝে পাথরের বড়ো চাঁই। নিকষ কালো রং। বৃষ্টির জলে ধার ক্ষয়ে গেছে। বহু বছর আগে হয়তো এই পাথর কোন পাহাড়ে ছিল। তারপর বৃষ্টি বন্যায় জলের তোড়ে গড়িয়ে এসেছে। সে পাহাড়টা কোথায়, কতদূরে? হয়তো দশ মাইল দূরে ঐ তরণী পাহাড় থেকেই এসেছে। কিন্তু ও দিকটা অনেক ঢালু। এখানে কি কখনো পাহাড় ছিল? কে জানে। চারপাশের নীরবতার সঙ্গে জলস্রোতের বাজনা ছড়িয়ে পড়ে। গায়ে কে যেন ঘুঙুর পায়ে নাচছে। হাওয়ার দাপাদাপি কমেছে। গুমোট নামছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আর বসে থাকা যায় না। অনেক কষ্টে বাঁচানো বিড়ির বান্ডিল থেকে একটা ধরায়। দু হাতের পাতার আড়ালে রেখে টানে। হাতের চেটোয় আগুনের তাত লাগে না। আগুনের ফোঁটা প্রতি টানে গনগনিয়ে ওঠে। অজিত উঠে দাঁড়ায়। রাস্তা খুঁজতে হবে। যে কোন একটা গাঁয়ে পৌঁছোনো দরকার। অনেক বছর আগে এরকম একটা দুর্যোগের রাত ওর মনে পড়ে।

তখন বয়েস কম। মন অনেক নরম, কাঁচা। সে রাত আজকের মতো এতো ভয়ংকর অচেনা ছিলো না। তবু ও ভয় পেয়েছিলো।

জলে ভিজে ঝাঁকার ভার বেড়েছে। সব ফিরিওয়ালার ঝাঁকাতেই একটা চটের ঢাকা থাকে। অজিতেরও ছিলো। চটটাও ভিজেছে। পাশের তলায় শুকনো পেতল মাটি। খালি পা। বুড়ো আঙুল টিপে ও হাঁটে। অন্ধকারে চোরাগোপ্তা পাথরে হোঁচট খায়। ভিজে পাতায় মসমস পায়ের শব্দ। ভালুক নাকি? অজিত কান খাড়া করে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়ায়। শব্দটা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে যায়।

(নয়)

পাঁচ ছ বছর আগের সেই রাতটার কথা মনে হলে বুকের মধ্যে চিনচিন করে। অনেক গভীরে সরু সেতারে রক্তক্ষরণ হয়। কণার মুখ মনে পড়ে। কোনো দুঃখ বা অভিমান নেই। রাগও নয়। একটা ভোঁতা অনুভূতি গলায় আটকে থাকে।

লালবাজারে কটা দিন ঝড়ের মতো কাটলো। বন্দীদের মধ্যে অজিত ছিলো সবচেয়ে কমবয়েসী। তাই খুব খাতির পেলো। লালবাজারে ভ্যান ঢুকতেই ক্যামেরা, নোটবই হাতে অনেক লোক ওদের ঘিরে ধরে। সেখানে তখন ভীষণ ভীড়। বহু লোক ধরা পড়েছে। কারো মুখে ভয়। কেউ দাঁত বের করে হাসছে। অজিতকে বগলদাবা করেছে তীর্থপতি। রোগা, বেঁটে চেহারা। লম্বাদের অজিতের অর্ধেক। সাংবাদিকদের সে বললো ও আমার ক্যাডার। ইয়ংগেস্ট প্রিজনার। পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল। পালায় নি। সাংবাদিকরা সকলেই তীর্থকে চেনে।

'এ যে একেবারে দুধের শিশু'—একজন সাংবাদিক গাল টিপে দেয়। ফটাফট কয়েকটা ছবি ওঠে। নোটবইতে খসখস করে লেখে। সেফটিপিন লাগানো পাজামাটা মুঠোয় চেপে অজিত দাঁড়িয়ে থাকে। ও ভড়কে গেছে। শুকনো মুখ। কণার সঙ্গে চোখাচোখি হয়। মেয়েটা হাসে। অজিতের কান লাল। পেছনে মই দিয়ে তীর্থপতি নেতা বানিয়েছিল অজিতকে। লালবাজারের সেলে সেই সকালটাও অজিতের মনে আছে। সেল বোঝাই বন্দী। চায়ের পর সকালের কাগজ এলো। ইংরিজি বাংলা দুটো কাগজ। কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগে। অজিত অবাক হয়। ওদের বাড়ীতেও একটা কাগজ আসে। অনেক দিন সন্ধ্যে পর্যন্ত সেটা দরজার মুখে পড়ে থাকে। পাট ভাঙে না। শুধু খেলার সময় একটু অন্য রকম।

কাগজ নিয়ে হল্লার কারণ বোঝা যায়। বন্দীর ফর্দ বেরিয়েছে। সকলেই নিজের নাম খুঁজছে। ছাপার হরফে নিজের নাম খুঁজতে অনেকের কপালে ঘাম জমে। বেশীর ভাগ নাম নেই। কয়েক হাজার গ্রেপ্তার হয়েছে। কাগজে জায়গা নেই। তীর্থপতি আর অজিতের জয়জয়কার। দুজনের নাম বন্দীর ওপর দিকে রয়েছে। অজিতের ছবি-সহ তীর্থপতির গল্পটা বেরিয়েছে। হেডিং—যে পালায় নি।

নীচ থেকে কণা ফিরলো। ওর বাড়ী থেকে লোক এসেছিলো। হাতে আলাদা দুটো খবরের কাগজ। সেলের লোকেরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। এখানেও তীর্থপতি আর অজিতের নাম। ধ্যাবড়া কালিতে ছবিটা আবছা।

কণা ওকে একপাশে ডাকে। আঁচলের তলা থেকে দুটো সন্দেশ ওর হাতে গুঁজে দেয়। খাও—সে বলে। নিমেষে অজিত গিলে নেয়।

লক-আপের মধ্যে নানা পার্টির লোক। সকলেই গুজ-গুজ ফুসফুস করে। তীর্থপতি ওকে ছাড়ে না। সঙ্গে লেগে থাকে। কোর্টে তোলা হলো। মেয়েরা জামিন পেলো। বাকীদের লক-আপে ফিরতে হলো। কোর্টে অজিত দেখলো ইতিহাসের স্যার কণকবাবু, রথীনকুমার, বোসবাড়ীর বিবিমণি। পাড়ার ছানু-ন্যাপলা। বাবাকেও দেখলো ভীড়ের মধ্যে। এক রাতের লক-আপে অনেকের মুখ শুকনো। চোখের তলায় কালি। অজিত দমেনি। বরং এই রকম কিছু চেয়েছিলো। জীবনে একটা বড়ো কিছু হোক। ঝাঁকুনি লাগুক। বোডলের সেই দৈত্যটা যেন এবার সত্যি সামনে এসে দাঁড়ালো।

ছাড়া পাওয়ার পর সে কি খাতির। স্কুলে, বাড়ীতে পাড়ায় মহা মাতব্বর হয়ে উঠলো ও। কাগজে ছাপা ছবি, খবর বাবা কেটে রেখেছিলো। বাড়ীতে কেউ এলে পড়াতো। অজিত একদিন নিজের কানে শুনলো। এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডস্যার তুলসী-বাবুর রাগ কমেনি। লালচে চোখে কটমট করে তাকাতো। অজিত হাসতো। খুব হাল্কা-ভাবেই শুরু সব কিছু। অজিত ছাত্রনেতা হয়ে গেল ও মজা পেতো। তবে একটা জিনিস বুঝলো—মেনিমুখো হয়ে লাভ নেই। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। হিম্মত চাই। শক্ত পাল্লা চাই। তীর্থপতি এখন ওকে চালায়। বুদ্ধি দেয়। রাজনীতির কথা বলে। তীর্থপতির সঙ্গে সময়টা মন্দ কাটে না। চপ, কাটলেট, মিষ্টি খাওয়ায় রাস্তায় যেখানে সেখানে তীর্থপতি বাথরুমে যায়। অজিত দাঁড়িয়ে থাকে। দশ বিশ পা অন্তর তীর্থ-

পতিব কাছা খোলে। অজিত তুলে দেয়। কণার সঙ্গে মাঝে বারদুয়েক দেখা হয়েছে।

বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে কণা বারবার বলেছে। অজিত যায়নি। মেয়েদেব সম্পর্কে কোনো আগ্রহ জাগে নি। পাড়ায় এক বাড়ীতে লাইব্রেরি ছিলো। বন্ধুব বাড়ী। বন্ধুর দিদিরা লাইব্রেরি চালাতো। অজিত মেম্বার বই নিতো। শেষদিকে আর যেতো না। লাইব্রেরির পেছনে অন্ধকার সার-দেওয়া বইয়ের আলমারি। দিদিদেব কেউ বই খোঁজায় তাব সঙ্গী হতো। আড়ালে পেলেই আদব কবতো তাকে—অজিতেব অস্বস্তি হতো। লাইব্রেরি যাওয়া কমিয়ে দিলো।

ফাইনাল পবীক্ষার পর প্রথম ও কণা-দের বাড়ী গেলো। বেশ বড়ো বাড়ী। পয়সাকড়ি আছে। অনেকগুলো ভাইবোন ওরা। কণা ওকে ছাতে নিয়ে গেলো। সিঁড়ির মুখে অনেকটা জায়গা। কণার তিন ভাই পুতুল খেলছিলো। দশ থেকে তেবোর মধ্যে তাদের বয়েস। কণার পবের চার বোন ছিল। ছাতে। ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলো। কিকেট খেল-ছিল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠাব সময় কণাব বাবাকে দেখলো। লম্বা চওড়া চেহারা। নিজেব ঘরে লুঙ্গি পরে বসেছিলো। ব্যবসা-দাব লোক।

কণার ভাইবোনেরা খুব মাই ডিয়ার। অজিতেব সঙ্গে জমে গেলো। কেউ পুতুল খেলায় ডাকলো। কেউ বললো—লাটাই ধরুন। কণা হাসছিলো। জ্বলজ্বলে চোখ। শ্যামলা রং। তাঁতের শাড়ি পরেছে। পিঠ-ভর্তি ঘন কালো চুল হাওয়ায় উড়ছে। অজিতের বুকের মধ্যে মখমলেব চামব দোলে। পাঁচিলের ধাবে দুজন দাঁড়ায়। কণা কথা বলে। অজিত শোনে। তাব কিছু বলার নেই। কণার পাতলা ঠোঁট নড়ে। ভিজে চুলে আইসক্রিমের গন্ধ। অজিত থৈ পায় না।

পুলিশেব ইউনিফর্ম পরে বাড়ী থেকে কে যেন বেবোলেন। কণ্য বললো—বাবা। অজিত অবাক। বাবা আজ পুলিশ সেজেছে—কণা জানায়। অজিতের ধাঁধা লাগে। কথা হারিয়ে যায়।

রাস্তায় বেরিয়ে ও কণার ভাইবোনদের নামগুলো বিড়বিড় করে। মনে বাখতে হবে। বুম্বু, তোতোন, চাকমা, তন্দুরি, গোগো আর পমমাল। পুলিশের পোশাক পবা কণার বাবা ওর মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

অন্ধকারে অনেকদূরে মুর্গি ডাকলো। ফিকে আওয়াজ। কাছাকাছি কোনো গাঁ আছে, অজিত ভাবে। জঙ্গল এখনও শেষ হয়নি। বৃষ্টিতে পায়ে-চলা রাস্তা ধুয়ে গেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বাড়ি ছাড়ার সময় কাউকে বলেনি। লাভ নেই। ওর জন্যে কেউ ভাববে না। ওব রাজনীতি, জীবন একান্তই নিজের ব্যাপার। কেউ মাথা ঘামায় না। বাবা হয়তো জানে না যে, সে য়ুনিভার্সিটিতে পড়ছে। তবে কাগজে নাম বেরোলে বাবা খুশী হয়। নামেব মালিক যে তার ছেলে, একথা মনে পড়ে। স্কুলে জন্ম-তারিখ চেয়েছিলো। অনেক খুঁচিয়েও অজিত পায়নি। মা বললো, তোর বাবার নোটবুকে লেখা আছে। পুবোনো কাগজ ঘেঁটে বাবা এক-দিন তারিখটা দিলো। ফাইনাল পরীক্ষার আগের ঘটনা। তারিখটা দেখে অজিতের সন্দেহ হয়েছিলো। তবু স্কুলের অফিসে সেটা জমা দিলো। পরে জানলো, ওই তারিখ অনুযায়ী ছোড়দার থেকে ও মাত্র দু' মাসের ছোটো।

একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্ধকারে ও বসলো, এসব কথা মনে হলে আজকাল ওর হাসি পায়। মজা লাগে।

কণার সঙ্গে দেখা করায় তীর্থপতি চটেছিলো।

শত্রুপক্ষের লোক, তীর্থপতি বলে-ছিলো—বুর্জোয়া। প্রেমিককে কব্জা করার জন্যে আইন অমান্য করেছিলো।

খবরটা অজিতকে ছেঁকা দেয়। কষ্টটা গিলে ও জিজ্ঞেস করে—প্রেমিকটা কে?

এক ডজন আছে। শাড়ি-ব্লাউজের মতো দিস্তে দিস্তে প্রেমিক।

তীর্থপতির গলা তেঁতো। ও প্রসঙ্গ পাল্টায়—পার্টি ভাঙবে। কিছু হঠকারী ঢুকেছে। তোমার সঙ্গে আলোচনা আছে। রাজনীতিতে তীর্থপতি ওর হাতেখড়ি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও তীর্থপতিকে আজ-কাল ও সইতে পারে না। লোকটা শুধু বকে। সকলকে গাল দেয়, সন্দেহ করে। এটা ঠিক নয়। প্রায়ই বলে, অনেক কথা আছে। কিন্তু কিছুই বলে না। কলেজ ইউনিয়নে অজিত তখন সম্পাদক।

পার্টির নাম করে তীর্থপতি টাকা চায়। অজিতকে ইউনিয়নের ফান্ড ভাঙতে হয়। তীর্থপতি চপ, কাটলেট, রাজভোগ খায়। ঘন ঘন বাথরুমে যায়।

কণার সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। কণার বাড়িতে, রাস্তায়, কলেজে। গোগোকে ও অংক শেখায়। কণার পরের বোন। চাপা ফর্সা রঙ। অনর্গল কথা বলে। দরজা বন্ধ করে নাচ দেখায়। অজিত ঘামে। কণার বাড়িতেই অশোকদার সঙ্গে আলাপ হলো। কণার বড়দার বন্ধু। কলেজে ইংরিজি পড়ায়। কণা, গোগোকেও সাহায্য করে।

কণা সারাদিন বাড়ি থাকে না। ইউ-নিয়ন করে। টোটো করে ঘুরে বেড়ায়। এক সন্ধ্যেতে কণা খুব কাঁদলো।

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধার। সূর্য ডুবেছে। ঝাপসা অন্ধকার নামছে। চার-পাশে লোকজন। গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়া বইছিলো। অজিত আমাকে বাঁচাও—কণা বলে।

অজিতের বুকে ভার। ও শব্দ করে না।

বাবা আমাকে মেরে ফেললো—কণা হঠাৎ পিঠের আঁচল সরায়—কাল চাবুক মেরেছে।

ব্লাউজের ঠিক নিচেই চাবুকের লাল দাগ। ফেটে ফুলে আছে।

মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। অনেক দূরে শাঁখের শব্দ।

অজিত চুপচাপ বসে থাকে। কণা ফোঁপাচ্ছে।

অজিত নিজের সঙ্গে কথা বলে। কণাকে আমি বাঁচাবো। আমার বয়েস উনিশ বছর পাঁচ মাস। কণার একুশ। তাতে কিছু যায়-আসে না। ও কি আমায় ভালোবাসে? আরো কিছুদিন সময় চাই। আমি ওকে বিয়ে করবো। কথাটা ভাবতেই ওর বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে। কথাটা জিভের ডগায় হুল ফোটায়। ও বলতে চেষ্টা করে। পারে না।

কণা নিজেকে সামলে নেয়। কোমরের শাড়িতে গোঁজা রুমাল নিয়ে চোখ মোছে। সামনে ঘোলা জল। ছলছল শব্দ। বেলুড়ের দিকে একটা নৌকো যায়। আকাশে কয়েকটা তারা জেগেছে। জলের দিকে তাকিয়ে ওরা চুপচাপ বসে থাকে। কোলাহল কমছে। মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হবে। সেখানে ভিড়। কথার শব্দ। কণা হঠাৎ বলে—আমাকে একটা সাহায্য করবে?

কি—অজিত তাকায়।

একজন আমাকে ঠকাচ্ছে। বিয়ের প্রমিস করেও সরে আছে। তাকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

অজিতের শরীরের নিচে পৃথিবী যেন কেঁপে ওঠে। আকাশ থেকে একটা তারা খসে যায়।

কণা বলে—তুমি আমার প্রেমিক সাজবে। আমার সঙ্গে থাকবে। ও যেখানে

শুধুমাত্র মেয়েদের লেখা নিয়ে
মাসিক বাংলা পত্রিকা

নারীমুক্তির শপথ নিয়ে স্বাধীনতা সংখ্যা হিসেবে ১লা আগস্ট আত্মপ্রকাশ করছে। এতে থাকছে বিশেষ আলেখ্য :
'মহাসন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী'
এবং
'রাজনৈতিক তপশ্চর্যায় ইন্দিরা গান্ধী'
আরও লিখছেন : আশাপূর্ণা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, আশা দেবী, মায়া বসু, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, নবনীতা দেবসেন, সাধনা মুখোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, মহিলা বিচারক পদ্মা খাস্তগীর, মহিলা বৈজ্ঞানিক ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতের অসীমা ভট্টাচার্য, নাটকের শাওলী মিত্র, সিনেমার নন্দিনী মালিয়া, সাঁতারু ইলা পাল, আকাশ-বাণীর মহিলামহল খ্যাত বেলা দে এবং আরও অনেক নবাগতা। প্রতি কপি ১ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১২ টাকা। লেখিকা।এজেন্ট।গ্রাহক এখনি লিখুন : সম্পাদিকা : ৩৩।৩ই চেতলা সেন্ট্রাল রোড কলিকাতা-২৭। অথবা এ, বি, ১৬৭, বিধাননগর, কলিকাতা-৬৫।

যায় আমি জানি। ওর সামনে তোমাকে অভিনয় করতে হবে। নানারকমের অভিনয়।

অজিতের মুখে কথা সরে না। বাঁকা চোখে কণাকে দেখে। কণা হঠাৎ ওর একটা হাত নিজের দু'হাতে ধরে। বলে—কথা দাও, অভিনয়ের সময় তুমি কোনো সুযোগ নেবে না। আমাকে ছোঁবে না।

বেশ রাত করেই অজিত সেদিন বাড়ি ফিরেছিলো।

তারপর ক'টা দিন বড়ো বাজে কাটলো। কণার সঙ্গে সারাদিন অভিনয়। ইডেন গার্ডেন, টিংকাস। এবং আরো সব অদ্ভুত জায়গায়। রেস্টুরেন্টের মধ্যে সবুজ আলো। দ্রুততলে বাজনা বাজছে। এক-টুকরো ফ্লোরে ঘুগলবন্দী মেয়ে-পুরুষ নাচছে। কণা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। অজিতকে ডাকে। নাচতে এসো। অজিত ঘামে। জীবনে নাচেনি। নাচার কথা ভাবেনি। ঠাণ্ডা ঘরেও শরীর ঘামে।

কণা উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর হাত ধরে। কণার হাতের আঙুলগুলো ঠাণ্ডা। অজিত চমকে যায়। কণার মুখে ফিকে হাসি। অজিত বুঝতে পারে না। কণা কি বরফে আঙুল ডুবিয়ে বসেছিল। ঠাণ্ডা আঙুলের টানে ও নাচের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। কণা ওর দুটো হাত অদ্ভুতভাবে ধরে। বলে—পা মেলাও। দুটো শরীর কতো কাছাকাছি। তবু অজিতের মনে হয় কণা অনেক দূরে।

কণার কাপড়ে মাড়ের গন্ধ। ঠোঁটে ফিকে রঙ। কপালে কুংকুমের টিপ। পিঠের ওপর আলগা খোঁপা ফুঁসছে। ওর মুখে কণার হাওয়া।

কণা ফিসফিস করে—চুমু খাও। নকল চুমু। খবরদার ঠোঁটে যেন ঠোঁট না লাগে। কণার চোখে বেদেনীর হাসি। অজিত নিজেকে নিংড়ে অভিনয় করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এটা ঠিক নয়। কেন আমি এমন করবো? কেন করছি? কোনো জবাব পায় না। কিন্তু কণাকে না দেখার কথা ও ভাবতে পারে না। প্রতিপক্ষকে ও চিনেছে। একজন মাঝবয়েসী শক্তসমর্থ লোক। ফর্সা রঙ। পাথরের মতো চোখ। ছুঁচলো চোয়াল। মুখে, কপালে ভাঁজ পড়ে না। সে লোকটার সঙ্গে কথা বললেই কণার হাতের আঙুল তেতে ওঠে। বরফ গলে যায়। অজিত শুকোয়, মুখ-চোখে কালি। সংগঠনের অফিসে, সভায় যেতে পারে না। কলেজে কামাই। অজিতের বদনাম হলো। বাচ্চ ছেতাই সব গল্প রটেছে ওর নামে।

তীর্থপতি ঘুরিয়ে বললো একদিন—কি ব্যাপার, পাত্তা নেই! প্রেম-ফেম করছো নাকি? মেয়েটা কে? ওর মুখে মুচকি হাসি।

অজিতের মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। কৈফিয়ৎ চাইছেন—ও সোজাসুজি তাকায়।

তীর্থপতি ওর গলার স্বরে ঘাবড়ে যায়—না না, মজা করছিলুম।

ঘরে আরো দু-চারজন ছিলো। সকলে শোনে। অজিত গুম হয়ে বসে থাকে কিছু সময়। তারপর চলে যায়।

গোগোর পড়াশুনোয় মন নেই। আগে হপ্তায় অজিত একদিন পড়াতো। এখন রোজ পড়ায়। সন্ধ্যেবেলায় আসে। কণা এই সময়টায় বাড়ি থাকে। দিনের শেষ। সন্ধ্যের শুরু। সরু গলিটা আলো, অন্ধকার, ধোঁয়ায় অচেনা লাগে। কণা বাড়ি নেই। আজকাল কখন ফেরে, কে জানে। রাতে কখন ঘুমোতে আসে অজিত জানে না। বাড়ির লোকেরাও কেউ মাথা ঘামায় না।

আজ বুদ্ধু, তোতোনের পুতুলের বিয়ে। ফুল, চন্দন নিয়ে ওরা পুরুতের জন্যে বসে আছে। ওরা কণার দু'ভাই। অজিতকেই পাকড়াও করে। অজিত কোনো-মতে ওদের কাটায়। চাকমা আর তন্দুরী দোতলার দালানে বক্সিং লড়ছিল। ওরা গোগোর পরের দু' বোনই হঠাৎ ওরা পাশের ঘরে মিলিয়ে গেলো। দোতলার সিঁড়ির মুখে কণার বাবা। লুঙ্গি, সিল্কের পাঞ্জাবি। মাথায় ফেজ টুপি। চোখে কালো কাঁচের চশমা। পায়ে শুঁড়তোলা নাগরাই। হাতে চামড়ার হান্টার। কুণ্ডলি পাকানো। ভদ্র-লোক আস্তে আস্তে নেমে যায়। পড়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গোগো নাচ দেখাচ্ছে নাকি অশোককে? এর আগেও কয়েকবার এমন হয়েছে। দরজায় টোকা দিয়ে পাঁচ-সাত মিনিট অজিত দাঁড়িয়ে থেকেছে। বিনি মাইনের চাকরি। ছাড়তেও পারে না। কিন্তু খারাপ লাগে। গোটা ব্যাপারটাই একটা বিষাক্ত সাপের মতো ওকে জড়িয়ে ধরেছে। কি শক্ত, ঠাণ্ডা চাপ। ভেতরের হাড়-মজ্জা যেন ধুলো হয়ে যায়। তবু এড়াতে পারে না। পরে বুঝেছে, বয়েসটা বড়ো অদ্ভুত। এ-বয়েসে অনেক কিছু করা যায়।

একবার টোক্কা দিতেই গোগো দরজা খুললো। মুখে হাসি টেনে অজিত অপেক্ষা করছিলো। অশোককে দেখবে। অশোক বলবে—পাগলীর কাণ্ড। নাচ না দেখিয়ে ছাড়বে না। হয়তো দরজা খুলেই গোগো ভরতনাট্যমের ভঙ্গিতে স্ট্যাচু হয়ে যাবে। একদম ছেলেমানুষ।

সে-সব কিছুই অজিত দেখলো না। খালি ঘর। অগোছালো বিছানা। টেবিলের নিচে দুটো চেয়ার ঢোকানো। টেবিলের ওপর গোগোর পোষা বেড়াল। কুচকুচে কালো রঙ। কে এক জ্যোতিষী নাকি কালো বেড়ালের দাওয়াই দিয়েছে। কালো বেড়াল শনি তাড়ানোর ওস্তাদ!

খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া অজিতের মুখে লাগে। গোগোকে দেখে ও চমকে যায়। ফ্যাকাসে সাদা মুখ। শুকনো ঠোঁট। চোখের তলায় জমাট আলকাতরা। হাতে-গলায় চাকা চাকা লাল দাগ। মাথার চুল কে যেন খুবলে কেটে নিয়েছে। গতকাল ছিল রোববার। অজিত আসেনি। শনিবার সন্ধ্যেয় ও অংক শিখিয়েছে। তখনও গোগো সুস্থ, স্বাভাবিক। আটচল্লিশ ঘণ্টায় একটা মানুষ এতো বদলে যায় নাকি। আথকলে ও মাড়াই হয়েছে? গোগো কেমন ঘোলা চোখে তাকিয়েছিলো। দাঁড়াতে পারছিলো না। শরীরটা অদ্ভুতভাবে কাঁপছিলো। দালানে পুতুলের বিয়ে হচ্ছে। উলুধ্বনি। শব্দটা হঠাৎ থেমে যায়। খস খস্ পায়ের আওয়াজ।

অন্ধকার দালানে কণার বাবা। মাপা পায়ে এগিয়ে আসছে। হাতে চামড়ার হান্টার। দরজার পাল্লা ধরে গোগো কাঁপছে। অজিতের মাথা কাজ করে না। ঘিলু জমে যায়। গোগোর ঘরের খোলা জানলায় রাস্তার ফ্যাকাসে আলো চুঁইয়ে পড়ছে।

কণার বাবা ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। কালো বেড়ালটা এক লাফে পালায় হাওয়ার চাবুকের শব্দে। বজ্জাত। বাস্টার্ড। অজিতের তলপেটে একটা লাথি পড়ে। কণার বাবা ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকায়। তারপর এলোপাথাড়ি চাবুক চলে। হুইস্ ....হুইস্। বামুন হয়ে চাঁদে হাত। লোকটা বকে যায়। আমার মেয়ের ইজ্জৎ মেরে তুমি বাজি মাৎ করবে। হাওয়ার মধ্যে ভেসে বেড়ানো কয়েক ডজন কালো সাপ ওকে একটানা ছোবল মারে। আমার নাম হিরণ সান্যাল। শয়তানও ভয় পায় আমাকে। য়ু সোয়াইন, সন্ অফ এ বিচ। হুইস্। হু-ই-স্।

পায়ের তলায় মাটি ধড়ফড় করে। ঘরের দেওয়াল, ছাত গলে যায়। অজিত টাল সামলাতে পারে না। গলিতে হাঁক ওঠে—চাই ঘুগনি। গরম। চোখ চেয়ে অজিত দেখে ঘর অন্ধকার। কেউ নেই। ঠাণ্ডা মেঝেতে ও শুয়ে আছে। মাথা ঘুরে যায়। মাটি আঁকড়ে উঠে দাঁড়ায়। বেতাল পায়ে নীচে নামে।

সদর দরজায় ঝাপসা আলো। ঘুগনী-ওলাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বুধু, তোতোন, চাকমা আর তন্দুরী।

অজিতকে দেখে চাকমা বলে—ঘুগনি খাবেন অজিতদা। দারুন টেস্ট।

অজিত শুনতে পায় না। পেছনে হাসির শব্দ। রুমালে মুখ মোছে ও। রুমালে রক্ত। ঘাড়, গলা মোছে। আবার রক্ত। টলমল পায়ে ও হাঁটে। রাস্তার লোকজন ওকে দেখে। গাড়ী ছোটে। ফিবিওলারা খদ্দের ডাকে। কি এক ঘোরে ও হেঁটে যায়। কিছুই ভাবছে না। ভাবতে পারে না। আকাশে যখন মেঘ জমেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া খেলে।

সামনে পেছনে অন্ধকার। অজিত দেখে কখন যেন ও ইডেন গার্ডেনে এসে ঢুকেছে। নিবিড় গাছপালায় থোকা থোকা অন্ধকার। হাওয়ায় সড়সড় শব্দ। তারপর বৃষ্টি নামে।

জলের তুমুল ছলছল শব্দ। অজিত দেখে অন্ধকার হাতড়ে ও কখন যেন ফটিক নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সব খুপন নদী একরাতের বর্ষায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দিগ্বিজয়ী মূর্তি। ঢেউ আর হাওয়ার হা হা শব্দ। এখানে ওখানে ক্ষয়ে

যাওয়া তীরের হা মুখ। অদূরে শ্মশান। ফাঁকা মাঠ। তেকাঁটা আর বনকলমীর ঝোপ। অজিত জায়গাটা চিনতে পারে।

(দশ)

মোতি স্বপ্ন দেখছিল। একটা বরফের তক্তাপোষে সে শুয়ে আছে। তার দুটো হাত, দুটো পা তক্তাপোষের চারটে পায়ার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। নড়ার উপায় নেই। পিঠের নুনছাল বরফে আটকে গেছে। উঠতে গেলে লুচির ফুলকোর মতো ছিঁড়ে যায়। হাড়ে মজ্জায় বরফের ঢেউ। ভীষণ কষ্ট। দম বন্ধ হয়ে আসছে। রক্ত, ঘিলু যেন জমে যাচ্ছে।

ঘুমটা ভেঙে যায়। আকাশে মেটে রঙ। বাইরে বাঁশবন, ঝুনো ঝোপ। সেখানে ফিকে অন্ধকার। শিশিরে ভিজে আছে। গাছ পাতার মিষ্টি গন্ধ। সারারাত শিশির পড়েছে। শিশিরে খেজুর রসের গন্ধ। শীতে শরীর ভারী। শীতের ধাক্কাতেই ঘুমটা ভেঙেছে। লখাই আর বুধন ঘুমোচ্ছে। এক টুকরো চটের ওপর অজিত চিৎপাত। চটের নীচে খড় আছে। খড়গুলো ভিজে লাগে।

গোঁফ দাড়িওলা এই বিশাল চেহারার মানুষটা এখন ছেলেমানুষের মতো ঘুমোচ্ছে। অজিতদার মুখটাও কাঁচা। বিশেষ করে দুটো চোখ। চেহারা দেখে লোকে ভয় পায়। গলার শব্দে চমকে ওঠে। গোড়ায় মোতি নিজেও ডরাতো। এখন হাসি পায়। তবে রাগলে মুস্কিল। মোতির ওপর কখনো রাগেনি।

কলকাতা ছাড়ার মাস ছয়েক আগে ও শেষবার রাগতে দেখেছে অজিতকে। বৌবাজারে হ্যানিম্যানের দোকানে হোমিও-প্যাথির কি একটা বই কিনতে এসেছিলো অজিত। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল। ক্যান্টিনের কাজ শেষ। অজিত পাকড়ালো। চল্ আমার সঙ্গে। পুঁটিরামের কচুরি খাওয়াবো।

যেতে হলো। অজিত দুটো বই কিনলো। চারটের সময় শ্যামবাজারে একটা মিটিং আছে। রূপ সিনেমার সামনে বাস স্টপে ওরা দাঁড়িয়েছিলো। ভ্যাপসা গরম। লোকজন কম। রাস্তার পিচ গলে গেছে। একটা রিকসা সামনে এসে দাঁড়ালো। বুড়ো রিকসাওলা। কপালে দরদর ঘাম। খালি পা। হাঁপাচ্ছে। প্রথমটা ওরা খেয়াল করেনি। সামান্য চেঁচামেচি। দুজন জোয়ান সওয়ারি। ছেলে দুটো ভাড়া দিতে রাজী নয়। মোতি ভালো করে দেখে। মস্তান চেহারা। বুড়োটা অসহায় চোখে হাত জোড় করছিল। একজন ওর কাঁধের গামছা টেনে নিলো। রিকসাওলা রাগে। গামছা নিয়ে ওরা লোফালুফি খেলে। রিকসাওলা দুজনের মাঝখানে ছোটাছুটি করে। জনকয়েক লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। মনে যাই থাকুক, তারা কথা বলছিলো না। মজা দেখছিলো। মোতি দেখে অজিতের মুখের রঙ বদলাচ্ছে। আগে আরো কয়েকবার এই মুখ ও দেখেছে। রিকসাওলার দম শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। এখন তার গলায় গোঙানির আভাস। আকাশে কড়া রোদ। রাস্তায় গলা পীচের ফিকে ধোঁয়া কাঁপে। একটা ট্রাম যায়। অজিত একজনের দিকে এগোয়। দু নম্বর বন্ধুর পাশে দাঁড়ায়। দুজনে অজিতের মুখোমুখি।

অজিত কোনো কথা বলার সুযোগ দেয় না। দুটো বিরাট থাবায় দুজনের মুণ্ডু ধরে জোরে ঠুকে দেয়। ছাল ছাড়ানো দুটো ঝুনো নারকোলে ঠোকাঠুকি হওয়ার শব্দ ওঠে। একটা আর্ত চীৎকার। মোতি শিউরে ওঠে। দেখে একজনের কানের পাশ দিয়ে রক্ত বইছে। অন্যজন সিনেমার পাশে সরু গলিতে ঢুকলো। একটা বাস এসে দাঁড়ায়। এবার পালানো উচিত, মোতি ভাবে। অজিত কিন্তু নড়ে না। রিকসাওলা ভয়ে কেঁচো। গামছা কাঁধে ফেলে গাড়ী নিয়ে চলে যায়। ভীড় হয়েছে। কে একজন বলে—ঠিক করেছেন।

একটা বাস এলো। দুজনে উঠে পড়লো। সারাটা রাস্তা অজিত কথা বলে না। মোতিও চুপ। শ্যামপুকুর স্ট্রীটের মুখে ওরা নামলো বাস থেকে।

অজিতকে এখন অনেক ঝরঝরে দেখায়। জিজ্ঞেস করে—ছেলেটা মরে যাবে না তো। মোতি ভরসা দেয়—দূর। এতো সহজে কেউ মরে না।

বাইরে মুরগীর ডাক। মা উঠেছে। উঠোনে মায়ের পায়ের শব্দ। বড়োবাগানের মেলা থেকে ফিরে ও শুনেছিলো, মাধুর বিয়ে ঠিক। দিবাকর কাকা ভালো পাত্র পেয়েছে। কিছু করার ছিল না। এক গাঁটরি মাল নিয়ে মেলায় বসেছিলো। সে রকম বিক্রি নেই। বাবার মুখ শুকনো। চোখের নীচে কালি। তিরিক্ষি মেজাজ। বাড়ী ফিরে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলো। মা কাঁদছিলো। ইন্দু কাঁদছিলো। ডাক্তার এলো। ভিজিট আট টাকা। বললো—আনস্যাটেন ফিউচার। ফিলিং অব ইনফিউবিটি। অবসেসন থেকে হয়েছে। এপিলেপ্‌সি। একটা ইঞ্জেকশন ফোটালো। ট্যাবলেট লিখলো।

মোতির নিজেকে বড়ো ছন্নছাড়া লাগছিলো। একটা শক্ত ফাঁদে পড়ে গেছে। সেটা কামড়ে ধরছে। হাত পা চিবোতে ইচ্ছে করে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার ইচ্ছে পেয়ে বসে তাকে। আমার কিছু করা উচিত। সেভাবে। একটা পোকা ওকে কুরে কুরে খায়। তারপর একদিন ভোরে দোকানে যাওয়ার নাম করে আর বাড়ী ফেরে না। এক জামা কাপড়ে সিউড়ি চলে আসে।

এই প্রথম সে শহরে এলো। মানুষ-জন, দোকানপাট কি বিরাট পৃথিবী। ওর মাথা ঘুরে যায়। জমানো গোটা পনেরো টাকা পকেটে ছিলো। স্টেশনে, কোর্টের চত্বরে শুয়ে দুদিন দু রাত কাটলো। কোনো কাজ নেই। এতো দোকান, হোটেল, বাড়ী। তবু একটা চাকরের কাজও মেলে না।

রাতে হাড় কাঁপানো শীত। পাতলা চাদর ফুঁড়ে শরীরে কামড়ায়। ঘুম আসে না। মাধুর মুখ মনে পড়ে। কি করছে সে? কেমন আছে? আজও কি সে পুকুরে এসেছিলো? তার জন্যে দাঁড়িয়েছিলো! আসার আগে দেখা করেনি। কিছু বলার নেই। কেমন করে সামনে দাঁড়াবে!

গোটা গাঁ চোখের ওপর কেমন বদলে গেল। জিনিসপত্র বিকোয় না। তাঁতিদের পেটে হাত। হঠাৎ কোথা থেকে একদিন গাঁয়ে এলো ইণ্ডিয়ান টেকসটাইল কোম্পানী। হাবভাবে দাতা কর্ণ ভঙ্গী। অগ্রিম দিল। নাভিশ্বাস ওঠা তাঁতিরা ভীড় করলো কোম্পানীর দরজায়। আবার বস্তা বস্তা তসর এলো। নাটায় ভবলো সোনালী সুতো। দু হাত দু পায়ে জেগে উঠলো কাঠের যন্ত্র—ঠকাচ ঠং। ঠকাচ ঠং।

এখনও তাঁত চলে। শব্দ হয়। কোনো সুর নেই।

গত পাঁচ বছর মোতি গাঁ ছাড়া। ওর চোখের আড়ালে সব কিছু বদলে গেছে। মাঝে মাঝে মোতি ভাবে, কাজটা তখন সে ভালো করেনি। পালিয়ে বাঁচা যায় না। বাঁচলেও সুখ নেই। সিউড়ি ছেড়ে একদিন কলকাতায় পৌঁছোলো। হাওড়া স্টেশনে নেমে ভয়ে কেঁদে ফেলেছে। কোথায় যাবে, খাবে কি তার ঠিক নেই। তবু কি করে যেন সে বেঁচে গেলো। দেশ গাঁ, বাড়ীর কথা এই পাঁচ বছরে একদিনও ভুলতে পারে নি। বাড়ীর কথা ভাবলেই নাই কুণ্ডলীতে এক কষ্ট পাক খায়। হঠাৎ সব কিছু ফেলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। একটা বাড়ীতে চাকরের কাজ পেয়েছিলো। সিঁড়ির নীচে অন্ধকার ঘরে থাকতো। ছেঁড়া সতরঞ্চি, ময়লা বালিশ। রাতে শুয়ে কাঁদতো। চোখের সামনে ভাসতো হাজারী-বাগের জঙ্গল। কোনো এক পোককলাপীর ঘর। পাতার ছাউনি। অন্ধকারে ঢুকুঁড়ো তেলের ঝাপসা চাপা আলো। খাটুলিতে বসে গল্পগুজব হচ্ছে। বিষয় তসর পোকার হালচাল। চাষের ভালোমন্দ। বক্রেশ্বর, দাতাসাহেবের মেলা, ভীড় কেনাবেচা।

বড়োলোকের বাড়ী। দুটো গাড়ী। একটা নিয়ে যায়। অন্যটা থাকে বাড়ীর কাজে। গভীর রাতে কর্তা ফেরে। সজাগ থাকতে হয়। মোতি দরজা খোলে।

(চলবে)

চিত্তরঞ্জন মাইতি

নগ বিহঙ্গ

[৫]

তীব্র উন্মাদনার ভেতর দিয়ে শেষ হয়ে গেছে ফুলেচ উৎসব। কামরূ দেশাং-এর পুষ্প পাগলা কিন্নর কিন্নরীরা তিনটি বিনিদ্র দিন-রাত্রির স্মৃতি এখনও মন্থন করে চলেছে। যে সব যুবক দুর্গম প্রান্তর আর দুরারোহ পর্বতের নিভৃত স্থানগুলি থেকে দুষ্প্রাপ্য সব ফুল সংগ্রহ করে এনে মেলা প্রাঙ্গণের উদাবেতাতে রেখেছিল তারা পূজো শেষে সে ফুল গোপনে এনে দিয়েছে

তাদের বাগ্‌দত্তাদের হাতে। মেলা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সে ফুলের গন্ধ এখনও মিলিয়ে যায় নি।

এ বছর মেলায় ছিল দারুণ উত্তেজনা। প্রায় বিশ বছর পরে প্রজ্ঞাদেবী সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে রাজা উগর সিং এসেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় নিবাস কামরূ প্রাসাদে।

এই প্রাসাদ ছিল রাজপরিবারের আদি বাসস্থান। রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় বর্তমান রাজার প্রপিতামহ মহীন্দর সিং কামরূ থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান রামপুর বুশেহারে। কিন্তু ধৌলাধার আর কিন্নর কৈলাশের মাঝখানে ইন্দ্রলোকের মত কামরূ প্রাসাদটিকে তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই কিন্নর রাজাদের রাজ্যাভিষেক রামপুর বুশেহারে অনুষ্ঠিত হলেও দ্বিতীয়বার কামরুতে সে অনুষ্ঠান না হলে উৎসব সম্পূর্ণ হত না।

কামরূ পাহাড়ের ওপর পাথর ও কাঠের তৈরী পঞ্চতল দুর্গ বা প্রা বহুদূর থেকে কিন্নরবাসীদের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বদরীনাথ, মাহাসু আর মহাকালীর দেওবিং-এ প্রতি সন্ধ্যায় যখন দীপ-সন্ধ্যা আর ঢোল, কন্নাল, রণসিং, ভালকির ঐকতান বাদন শুরু হয় তখন নীচে সাংলা উপত্যকার কিন্নর কিন্নরীরা চলার পথে থেমে দাঁড়ায়। মুক্ত কর কামরূ পাহাড়ের দিকে তুলে দেবতার উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদন করে।

এখন রাজা চলে গেছেন দূরে কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি ফতেরাম শাসন করছেন কামরূ, সাংলা আর তার পার্শ্ববর্তী কতকগুলো এলাকা। রাজার প্রধান কোষাগার এই সুরক্ষিত কামরুতে। ঠাকুর বংশের উজীর পদাধিকারী ফতেরাম অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত। রাজ-পরিবার থেকে তাই ফতেরাম পেয়েছেন খেতাব। কামরুর মহামান্য 'দুদান' নামে তিনি এখন সবার কাছে পরিচিত।

রাজা উগর সিং চলে গেছেন উৎসবের শেষে রাজধানী বুশেহারে। শত্রু চারদিকে সহস্র চোখে চেয়ে আছে। একদিকে কুলু উপত্যকার শক্তিশালী ক্ষেত্রী রাজ-পরিবার, অন্য দিকে তিব্বতের অভিযান-কারীরা। দুর্ধর্ষ গুর্খা সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণের খবরও এসেছে গুপ্তচরের মুখে। রাজা উগর সিং যোগ দিয়েছিলেন ফুলেচ উৎসবে। সব অনুষ্ঠানে নিয়েছিলেন অগ্রণীর ভূমিকা। ভোজে দানে সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করে তাদের অন্তরের আশীর্বাদ কুড়িয়েছিলেন। কিন্তু মন পড়েছিল তাঁর রাজধানীতে।

প্রজারা মহারাজার সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হবার আগেই চলে গেলেন রাজা উগর সিং।

উজীর ফতেরাম রাজার কাছে সমস্ত প্রস্তাব হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, মহারাণী প্রজ্ঞাদেবী অন্তত আরও একটি মাস কামরুতে অবস্থান করে কিন্নর কিন্নরীদের আনন্দ দান করুন। কার্তিকের অমাবস্যা তিথিতে 'দিগ্ দিওয়াল' উৎসবের প্রদীপ নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিন কামরু প্রাসাদে। তারপর রাজার লক্ষ্মীকে আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব রাজধানী বুশেহারে।

রাজা সামান্য সময় কি যেন ভেবে-ছিলেন। হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল, বিয়ের পর তিনি এ বিশ বছর রাণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন নি। তবু উজীরের অনুরোধে এক সময় মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

রাণী প্রজ্ঞাদেবী প্রাসাদ অলিন্দে চোখ পেতে বসে আছেন। অদূরে ধৌলাধারের মাথায় সাদা বরফের শিরোপা। শরৎকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ। পর্বতের মাথায় সাদা এক টুকরো মেঘ থমকে থেমে আছে। এখনও বরফ পড়া শুরু হয় নি, তাই পর্বতের বহু অংশ অনাবৃত। নীচ থেকে বনের সবুজ সমারোহ পর্বত দেহের কিছু দূর অবধি উঠে গেছে। দ্বিপ্রহরের আহারান্তে অলস দৃষ্টিতে প্রজ্ঞাদেবী তাকিয়ে আছেন সেদিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটল।

পাহাড়ের অদৃশ্য একটি বন্ধুপথ দিয়ে যেন সহসা তুষারপ্রবাহ নেমে আসতে লাগল। সাদা ফেনার তরঙ্গ এগিয়ে আসছে। রাণী গভীর দৃষ্টিতে দেখছেন সে দৃশ্য।

পালসেরা নামছিল তরাসিত ভেড়ার পাল নিয়ে। দুর্গম পর্বতের গিরিপথ অতিক্রম করে তারা নেমে আসছিল উপত্যকা লক্ষ্য করে।

তাদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রাণীর চেতনা থেকে ধীরে ধীরে মুছে গেল রাজপ্রাসাদ। লুপ্ত হয়ে গেল মহারাণীর বোধ। প্রজ্ঞাদেবী ছবি দেখতে লাগলেন। ধূসর বিষণ্ণতার ফ্রেমে বাঁধান বড় করুণ জীর্ণ একখানি ছবি।

বিচারসভা বসেছে। কুমারী প্রজ্ঞা দাঁড়িয়ে আছে সেই সভার মাঝখানে। বুকে তার নিটোল চম্বক ফুলের মত একটি শিশু। কুমারী জীবনে এক মুহূর্তের ভুলের খেলায় সে আজ মা।

প্রজ্ঞার একটু দূরে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবক।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন গ্রামমুখ্য, তুমি স্বীকার কর এ তোমার ঔরসজাত সন্তান?

যুবক সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

প্রজ্ঞার চোখ স্থির হয়ে রইল যুবকটির মুখের ওপর। সে চোখে আশার একটা ছবি বর্ষাশেষের আলোর মত ফুটে উঠেছে।

এর পর দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারিত হল, তুমি শিশুসহ এই কুমারী কন্যাটিকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত?

হঠাৎ বুকখানা কেঁপে উঠল প্রজ্ঞার। এই উত্তরের ওপর নির্ভর করছে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ।

যুবকটি কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলেও কোন শব্দ উচ্চারিত হল না।

দ্বিতীয়বার গ্রামমুখ্য আরও তীক্ষ্ণ স্বরে তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন।

যুবকটি তাকাল সভার শেষ প্রান্তের কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে। কঠিন চোখে তার দিকে তখন চেয়েছিল এক প্রৌঢ়। প্রজ্ঞা জানে ঐ মানুষটি যুবকের পিতা। গ্রামের অন্যতম বিত্তবান মহাজন।

হঠাৎ একটা ভয়ের ছবি ফুটে উঠল যুবকের চোখে মুখে। আর সেই মুহূর্তে প্রজ্ঞার কেন জানি না মনে হল, তার সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে।

যুবক মাথা নেড়ে অস্ফুট প্রায় উচ্চারণে জানাল, সে প্রজ্ঞাকে স্ত্রীরূপে পেতে চায় না।

সেই মুহূর্তে বাঁধ ভাঙা বন্যার মত চোখ উপচে জলের স্রোত বইতে লাগল প্রজ্ঞার। পেছন থেকে তার মা এসে দুটি বাহুবেষ্টনে ধরে না ফেললে হয়তো সভাস্থলেই মূর্ছিত হয়ে পড়তে হত তাকে।

কিন্নরের কানুন অনুসারে অনিচ্ছুক যুবকটি নিষ্কৃতি পেল। শুধু তাকে দিতে হল সুনির্দিষ্ট অর্থদণ্ড। কিন্তু সহসা নিষ্কৃতি পেল না প্রজ্ঞা। শিশুটিকে বুকে নিয়ে মায়ের অঞ্চল ধরে সে চলতে লাগল, গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে।

এক সন্ধ্যায় তারা এসে পৌঁছল সাংলা উপত্যকায়। কোন পান্থশালা নেই। নিজেদের পরিচয় দিয়ে কোন গৃহে আশ্রয়ের সন্ধান করাও তখন সম্ভব নয়। শীতের রাত। বাস্‌পা নদীর জল ছুঁয়ে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া চাবুকের মত আছড়ে পড়ছে গায়ে—পিঠে। ক্লান্ত পা দুটো ভেঙে পড়তে চাইছে প্রতি মুহূর্তে। পাহাড়ের কোলে অন্ধকারে কালো হয়ে উঠেছে অবণ্য। থার কখন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে, বিখা এসে সামনে দুটো পা তুলে দাঁড়ায় কালো লোমে ভরা দেহ নিয়ে। প্রজ্ঞা বুঝতে পারল তার সাহসী মায়েরও বুক কেঁপে উঠছে।

দাউ দাউ করে হঠাৎ তাদের চোখের ওপর জ্বলে উঠল আগুন। পরক্ষণেই স্তিমিত হয়ে এল শিখা। পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের ভেতর কেউ আগুন জ্বালিয়েছে। প্রজ্ঞা আর তার মা সেই আগুন লক্ষ্য করে ছুটে চলল।

আগুনের উৎসের কাছে এসে দেখল একদল মেষপালক পালস বৌ-বাচ্চা আর ভেড়ার পাল নিয়ে রাতের ডেরা পেতেছে।

প্রজ্ঞা আর তার মা রাতের মত আশ্রয় আর আহার পেল সেই পালসদের আড্ডায়।

ক্লান্ত প্রজ্ঞা, প্রজ্জ্বলিত আগুন, উত্তপ্ত দেহ। ঘুম নেমে এল প্রজ্ঞার চোখে: বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ মেলে দেখল, মায়ের কোলে তার মাথা। মা তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। প্রজ্ঞা চকিতে উঠে বসল। কোথায় তার শিশু! বিদ্যুতের মত চারদিকে তার চোখের দৃষ্টি খেলে গেল। পালসদের কোন

চিহ্নই নেই। কয়েকটা পোড়া কাঠের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

একটা বুক ফাটা চীৎকার ছড়িয়ে পড়ল অরণ্যে পাহাড়ে। নিষ্ফল কুমারী মায়ের কান্না পাথরে পাথরে মাথা খুঁড়তে লাগল। জলের কলধ্বনির সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু প্রজ্ঞাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে কেউ সামনে এসে দাঁড়াল না।

প্রজ্ঞা দেখল, মায়ের মুখখানা স্থির হয়ে আছে। সে কান্নায় ভেঙে পড়ল মায়ের বুকে। মা শুধু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, নারং পাথোবা শিশুটিকে দিয়েছিলেন, তিনিই তার ভার নিয়েছেন।

কথাগুলো বলে কতক্ষণ মা তাকে বুকে জড়িয়ে রাখল।

এক সময় বেলা বাড়ল। সাংলা দেশাংএর মানুষজনকে দেখা যেতে লাগল পথে প্রান্তরে। প্রজ্ঞার হাত ধরে মা বলল, আমি ঐ পালসদের কাছ থেকে জেনেছি, এই সাংলা দেশাং-এ বৌদ্ধ শ্রমণীদের জন্যে চোমোলিং আছে। তারা অনাথ মেয়েদের আশ্রয় দেয়। চল, তাদের আশ্রয়ে তোমাকে রেখে আসি। ভগবান বুদ্ধের চিন্তায় আজ থেকে নিজেকে সঁপে দাও, শান্তি পাবে।

শিশুটিকে হারিয়ে অশান্ত হয়ে উঠেছিল প্রজ্ঞার মন। সে আর কোন কিছু ভাবতে পারল না। একটুখানি শান্তির আশায় মায়ের হাত ধরে গিয়ে পৌঁছল চোমোলিং-এ।

চিন্তায় ছেদ পড়ল রাণী প্রজ্ঞাদেবীর। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে উজীর ফতেরামের তরুণী মেয়ে মুনাল। মুখে মিষ্টি হাসি।

প্রজ্ঞাদেবী এ কদিন মেয়েটির ব্যবহারে বড় তৃপ্তি পেয়েছেন। ছায়ার মত মেয়েটি রয়েছে তাঁর সঙ্গে। সামান্য প্রয়োজনের দিকেও তার তীক্ষ্ণ নজর। হাসিতে সঙ্গীতে সে ভরে তুলেছে সঙ্গীহীন রাণী প্রজ্ঞাদেবীর মহল।

এই মুহূর্তে মেয়েটিকে সামনে দেখে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রজ্ঞাদেবী। জীবনের যে করুণ ছবিটি এতক্ষণ দেখছিলেন তিনি, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে যেন তাকে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে লঘু হতে চাইলেন।

বললেন, তুমি এত আনন্দ কোথায় পাও মুনাল ?

জোয়ারের মত হাসি ছড়িয়ে দিল মেয়েটি। বুঝিয়ে দিল আনন্দের অফুরন্ত উৎস তার হৃদয়ে। কতক্ষণ মুনালের সঙ্গে টুকরো কথার জাল বুনে বুনে লঘু হল রাণীর ভারাক্রান্ত মন।

এক সময় মুনালকে অন্যমনস্ক মনে হলে তার উড়ন্ত চোখের চাউনি অনুসরণ করে প্রজ্ঞাদেবী দেখলেন, কেল্লার অনেক নীচে যেখানে কনহোর গাছেরা জটলা করে নিভৃতি রচনা করেছে সেখানে একটি তরুণ যুবা দাঁড়িয়ে। একদৃষ্টে যুবকটি চেয়ে আছে কেল্লার রাণীমহলের দিকে।

মুনাল ফিরে দাঁড়াতেই রাণী প্রজ্ঞা দেবী অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তখন অস্ত সূর্যের আলোয় ফাগের রঙ লেগেছে ধৌলাধারে। রাণী প্রজ্ঞাদেবীর সঙ্গে যখন আবার মুনালের দৃষ্টি বিনিময় হল তখন রাণী দেখলেন, ধৌলাধারের ফাগ কে যেন মাখিয়ে দিয়েছে মুনালের সাদা মুখে।

সে রাতে চাঁদ উঠল পাহাড়ের মাথায়। উজীর ফতেরাম কামরু থেকে বিশেষ কাজে গিয়েছেন কাবছাম। দুদিন কামরু প্রাসাদে তিনি থাকবেন অনুপস্থিত। মহারাণীর পরিচর্যার ভার দিয়ে গেছেন কন্যার ওপর। মা-হারা মুনালের ওপর অপার বিশ্বাস তাঁর।

চন্দ্রোদয়ের দিকে চেয়ে ছিলেন রাণী প্রজ্ঞাদেবী। পাশে এসে দাঁড়াল মুনাল।

রাণী হেসে বললেন, বল, কোন চাঁদকে দেখি। পাহাড়ের চূড়ার ঐ চাঁদ, না আমার সামনে দাঁড়ান চাঁদ ?

মুনাল কোন উত্তর করল না, চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হয়েছে মুনাল ? রাণীর গলায় উৎসুক জিজ্ঞাসা।

মুনালের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে, এ যেন তাঁর ভাবনার বাইরে।

মুনাল নীচু গলায় বলল, মহারাণী আজ রাতে শুধু একটি প্রহরের জন্যে আমি আপনার কাছ থেকে ছুটি চাইতে এসেছি; আর যদি অনুমতি পাই তাহলে একটি প্রার্থনা জানাব।

প্রজ্ঞাদেবী বললেন, ছুটি মঞ্জুর। এখন কি প্রার্থনা বল ?

—ছুটির কারণটুকু আমার কাছে জানতে চাইবেন না।

প্রজ্ঞাদেবী বললেন, বেশ, তবে আমিও একটি সর্ত রাখছি। এর পর যখন আমার কাছে ফিরে আসবে তখন ইয়ালু ফুলের পাপড়ির মত একরাশ হাসি ঝরিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

সঙ্গে সঙ্গে মুনালের ঝকঝকে সুন্দর সাজান দাঁতগুলো ফুল ফোটাল।

রাণী বললেন, এসো।

মুনাল চলে গেল। রাণী উঠে গিয়ে দারু প্রাসাদের টোগাং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন।

চাঁদ আরও ওপরে উঠে এসেছে। সাদা পাত্র থেকে উপচে পড়ছে দুধের ফেনা চরাচরে।

হঠাৎ রাণী দেখতে পেলেন আলো-ছায়ায় মাখা কনহোর গাছের তলা দিয়ে চলেছে একটি মেয়ে। দ্রুত পা চালিয়ে সে চলে যাচ্ছে সাংলা উপত্যকার দিকে।

কিছুক্ষণ পরে স্পষ্ট দেখা গেল তাকে। প্রাসাদের সম্পূর্ণ উল্টো দিকের পাহাড়তলি ধরে সে চলেছে। কেবল প্রাসাদের রাণীমহলে কেউ চোখ পাতলে তাকে দেখতে পাবে, নইলে প্রাসাদের অন্য কোন দিক থেকেই তার গতিবিধি লক্ষ্যের মধ্যে আসবে না।

রাণী প্রজ্ঞাদেবী বেশ বুঝতে পারলেন, মেয়েটি আর কেউ নয়, মুনাল। সে চলেছে সাংলার বৌদ্ধ শ্রমণী নিবাস চোমোলিং-এর দিকে।

কেন জানি না রাণী প্রজ্ঞাদেবীর মনে হল, বেলা শেষে যে তরুণ যুবা পুরুষটি কনহোর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে প্রাসাদের দিকে চেয়ে ছিল তার সঙ্গে মুনালের এই নিশীথ অভিসারের কোন যোগ রয়েছে।

পরিচারিকা কখন এসে দীপ জ্বেলে দিয়ে গেছে ঘরে। হাওয়ায় কাঁপছে আলোর শিখা। রাণী বাইরের জোৎস্না-ঝরা রাতের জগৎ থেকে চোখ ফেরালেন ঘরের ভেতর; তন্ময় হয়ে আলোছায়ার যুগ্ম নৃত্য দেখতে লাগলেন।

এক সময় রাণী প্রজ্ঞাদেবীর মন উতল হল। নিশি পাওয়ার মত তিনি

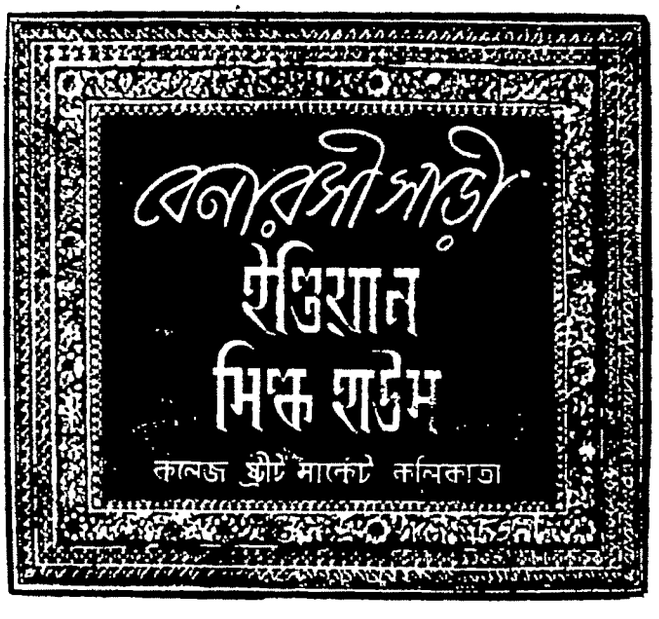

প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে নেমে এলেন সোপান বেয়ে প্রাসাদের পশ্চাদ্ ভাগে। উঁচু নীচু পাহাড় পেরিয়ে মৃনালের মত চলতে লাগলেন তাঁর বহুদিনের পরিচিত চোমোলিং-এর দিকে। কনহোর গাছের প্রান্তর পেরিয়ে এক সময় এসে পৌঁছলেন বৌদ্ধ শ্রমণী-নিবাস চোমোলিং-এ।

কেউ কোথাও নেই। কতকালের প্রাচীন কনহোর গাছটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে শাখাবাহু মেলে। কিন্নর কৈলাশ থেকে বয়ে আসা হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে কাঁপন লাগছে তার পাতায়। চোমোলিং-এর সামনের কঙ্কনীর চিত্রিত আলেখ্যগুলি সংস্কারের অভাবে ম্লান হয়ে গেছে। দু' পাশের স্তম্ভে ধরেছে ভাঙন।

পায়ে পায়ে রাণী প্রজ্ঞাদেবী এগিয়ে গেলেন শ্রমণী-নিবাসের দিকে। জীর্ণ, ভগ্ন পরিত্যক্ত চোমোলিং। রাণী কতক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন তাঁর ফেলে আসা জীবনের আশ্রয়স্থলটিকে।

প্রথম যখন এসেছিলেন এই চোমোলিং-এ তখন সাতজন শ্রমণী এখানে থেকে প্রচারের কাজ করতেন। পাঁচটি বছর যেতে না যেতেই সবাই কাজ নিয়ে একে একে চলে গেলেন ভিন্ন ভিন্ন গুম্ফায়। প্রজ্ঞাদেবী একা পড়ে রইলেন এই নির্জন নিবাসে। কামরূ আর সাংলোকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি দেশাং-এ প্রচারের ভার রইল তাঁর ওপর।

একক জীবন। সারা দিনের পথ-পরিক্রমা আর প্রচারের পর যখন ফিরে আসতেন সন্ধ্যায় তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ত দেহ। আহারের আয়োজনের কোন উৎসাহই থাকত না। ভক্তের গৃহে প্রাপ্ত শুষ্ক ফল ও দুধ গ্রহণ করে তিনি নিশি যাপন করতেন।

কোন রাতে ঘুম ভেঙে যেত। মনে হত কেউ যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই শরীরীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস গায়ে এসে লাগত। কান পাতলে শোনা যেত তার চাপা কণ্ঠস্বর। সে স্বরে দূরে চলে যাবার একটা আহ্বান বাজত। অনেক সময় মনে হত অপ্রতিরোধ্য সে আহ্বান। উঠে বসতেন প্রজ্ঞাদেবী শ্রমণী-শয্যা ছেড়ে। বাইরে এসে উদ্ভ্রান্তের মত কনহোর গাছের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াতেন।

প্রজ্ঞাদেবী ভগ্ন চোমোলিং থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন কঙ্কনীর তলায়। সামনে একটি জ্যোৎস্না ধোয়া শিলাস্তূপের ওপর গাছের ডাল পাতার ছায়া পড়ে এমন আল্পনা আঁকা হয়েছিল, যা দেখে মনে হচ্ছিল চিত্রিত একটি আসন।

প্রজ্ঞাদেবী পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঐ শিলাস্তূপের ওপর বসলেন।

সামনে চন্দ্রালোকিত প্রসারিত উপত্যকা। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন মহারাণী প্রজ্ঞাদেবী তাঁর অস্তিত্ব ভুলে প্রবেশ করলেন তরুণী শ্রমণী প্রজ্ঞার অন্তরের মধ্যে।

সেদিনও ঝিনুকি ফোটা জ্যোৎস্নার আবরণে শরীর ঢেকে এমনি পড়েছিল সাংলো উপত্যকা। অবিকল শায়িত এক নারী যেন। তার সফেদ উন্নত যুগল স্তন, এক-দিকে ধৌলাধার অন্য দিকে কিন্নর কৈলাশের তুষার চূড়া। পাদদেশের অবশ অন্ধকারের আবছায়ায় ঠিক যেন আদিম আচ্ছাদন। মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত বাসপা নদী, অনিঃশেষ কামনার স্রোতোধারা।

সে রাতে প্রজ্ঞা ছিল একা পথিক। চরাচর নিস্তব্ধ। তরুণী শ্রমণী প্রজ্ঞা দূর কোন পাহাড়ী দেশাংএ প্রচারের কাজ শেষ করে ফিরছিল তার চোমোলিং-এ।

সারা পথ প্রচ্ছন্ন একটা যন্ত্রণা বুকের তটে ঢেউ তুলে তাকে অশান্ত করে তুলছিল। কয়েক প্রহর আগে সে ছিল কিলবা গ্রামের একটি বৌদ্ধ লগং-এ বসে। কিলবার কটি মেয়ে তার সামনে ধনুকের মত অর্ধবৃত্ত রচনা করে বসেছিল সে তথাগত বুদ্ধের করুণার কথা বলছিল। কখনো বা শ্রমণী জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনার কথা প্রসঙ্গ সূত্রে এসে পড়ছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল একটি বিবাহিতা মেয়ে, মহাভিক্ষুণী, আপনার মত শ্রমণী জীবন যাপনে আমার সাধ। কিন্তু পাঁচ বছরের একটি শিশু আর স্বামী রয়েছে আমার ঘরে। এখন বলুন, আমার পথ কি? কোন্ পথে আমি পাব শ্রেয়ের সন্ধান?

কথাটা শুনে সারা দেহের রক্ত বুকের মাঝখানে এসে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ে-ছিল প্রজ্ঞার। সে কোন রকমে নিজের উত্তেজনাকে দমন করে বলেছিল, সংসারই নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রম। স্বামী, সন্তান তার পরম ধন। সংসারের কাজে যুক্ত থাকাই হল, সবচেয়ে বড় সাধনা।

এই সামান্য কটি কথা বলার পর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তার গলা। নিজেকে কোন মতে সংযত করে বৌদ্ধ লগং থেকে সে-রাতের মত বেরিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু ঐ মেয়েটির প্রশ্নের হাত থেকে সাময়িক মুক্তি পেলেও নিজের কাছ থেকে মুক্তি পায় নি প্রজ্ঞা। সারা পথ একটা রুদ্ধ কান্নার আবেগে সে ফুলে ফুলে উঠেছিল। কোথায় তার সেই শিশু, যে গেছে কালের স্রোতোধারায় হারিয়ে।

চোমোলিং-এর সংলগ্ন তোরণ কঙ্কনীর তলায় দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞা ভাবতে লাগল, জীবনের পথ থেকে সে পালিয়ে এসেছে। দুঃখ ভোলার জন্যে সে যে পথ বেছে নিয়েছে, সে পথে পদে পদে মাড়িয়ে চলতে হচ্ছে অনন্ত দুঃখের কাঁটা। অতিক্রম করতে হচ্ছে তীক্ষ্ণ পাষাণের বাধা।

হঠাৎ তার মনে হল নীচে বাসপা নদীর পাথরের আড়াল থেকে কে যেন উঠে আসছে।

গভীর রাত। নিশাচর ছাড়া চরাচরে আর কারো জেগে থাকার কথা নয়। সাংলো আর কামরূ পাশাপাশি দুটি দেশাং। পাহাড়ী কিন্নর কিন্নরীরা সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর মন্দিরের সামনে লগ্থং-এ নাচ-গান করেছে। তারপর সবাই মিলে পান করেছে ফাসরু অথবা অঙ্গুরী। ফিরে গেছে যে যার ঘরে। রাত গভীর হবার আগেই ডুবে গেছে গাঢ় নিদ্রায়।

পুরুষটি কঙ্কনীর দিকেই এগিয়ে আসছে।

বৌদ্ধ রীতিতে চিত্রিত তোরণ যা কঙ্কনীর ওপরে ছাতার মত পাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে কনহোর গাছ। সাদা জ্যোৎস্নায় আলোছায়ার আল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কঙ্কনীর স্তম্ভে আর চারদিকের প্রস্তর ভূমিতে সে আল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে।

মানুষটি অনেক কাছে এসে গেছে। নীচের একটি শিলা স্তূপকে অতিক্রম করলেই সে এসে পৌঁছবে কনহোর গাছের তলায়, কঙ্কনীর সামনে।

আকৈশোর নির্ভীক শ্রমণী প্রজ্ঞা। তবু সেই নির্জন নিঃসঙ্গ রাতে হঠাৎ কেঁপে উঠল তার বুক।

মানুষটি শিলাস্তূপ পার হয়ে উঠে এল ওপরে। গাছের তলায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। কয়েক গজ দূরে কঙ্কনীর তলায় দাঁড়িয়ে লোকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রজ্ঞা।

সম্ভ্রান্ত চেহারা। পায়ে দামী পশম। পরণে তাপ্রু-সে-সুতান। তার ওপর অতি মূল্যবান ছুবা। মাথায় ভেলভেটের শেউ। আঙুলে পরা সোনার মুদ্রি থেকে হীরের দ্যুতি ঝলকাচ্ছে। কানে দুলছে সোনার মুরকি।

পুরুষ কথা বলল, আমি উগর সিং। কামরুর প্রাসাদে অভিষেকের জন্যে কয়েক-দিন রয়েছি। আজ এই আশ্চর্য জ্যোৎস্নায় রাজবাড়িতে থাকতে মন চাইল না, তাই বেরিয়ে পড়েছি রাতের জগৎটা দেখব বলে।

আমি ভিক্ষুণী প্রজ্ঞা। এই চোমোলিং-এ নিঃসঙ্গ দিনযাপন করি।

উগর সিং বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন প্রজ্ঞাদেবী। আমি কৌতূহল বশেই এখানে এসে পড়েছি। আশ্চর্য সুন্দর এই কঙ্কনীর চূড়া, দূর থেকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

উগর সিং-এর ব্যবহারে প্রজ্ঞা খুশী হল। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি অনুগ্রহ করে একটুখানি অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

প্রজ্ঞা চোমোলিং-এর ভেতর থেকে একটি থোকম্ নিয়ে এসে কনহোর গাছের তলায় উঁচু মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর পেতে দিয়ে বলল, আপনি আজ আমার সম্মানীয় অতিথি। আসন গ্রহণ করলে খুশী হব।

যুবরাজ উগর সিং বললেন, অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কঙ্কনীর তলায় আর আমি আপনার বিদ্বান আসনে বসব তা তো হয় না।

হেসে বলল প্রজ্ঞা, রাজ পরিবারের মানুষের সম্মান আগে।

তার চেয়েও অনেক বেশী সম্মানিত একজন নারী।

প্রজ্ঞা বলল, আচ্ছা আপনি আসনে বসুন, আমি আসছি।

প্রজ্ঞা ঘরের ভেতর থেকে আর এক-খানা আসন এনে কণ্ককনীর তলার চত্বরে পেতে বলল, কই দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।

উগব সিং আসনে বসলেন। তাঁর মুখোমুখি বসল প্রজ্ঞা। যুববাজ দেখলেন, গৈরিক বসনে পদ্মাসন মুদ্রায় বসে আছে শ্রমণী প্রজ্ঞা। পেছনে নীলকাশেব বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্নর কৈলাশ!

এ দৃশ্য বড ভাল লাগল যুববাজ উগব সিং-এব। বারাণসী ধামেব এক পন্ডিত থাকতেন বামপুব বুশেহারের রাজগৃহে। রাজবাড়িব ছেলে-মেয়েরা তাঁব কাছে সংস্কৃতের পাঠ নিত। যুববাজ উগব সিং তাঁর কাছ থেকে শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের পাঠ নিয়েছিলেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল যুববাজের। তিনি এই পুস্তকগুলিব আদ্যন্ত আবৃত্তি কবতে পারতেন। কিন্নব কৈলাশেব পটভূমিতে শ্রমণী প্রজ্ঞাকে দেখে তাঁব তাপসী উমাব কথা মনে হল। তিনি কুমারসম্ভবেব কিছু অংশ আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা কবে সেই আশ্চর্য চন্দ্রালোকিত রাত্রে শ্রমণী প্রজ্ঞাকে শোনা-লেন। বাত্রি শেস হযে এল। ধৌলাধাবেব ওপবে চন্দ্র লজ্জায় বাঙা হযে উঠল। প্রজ্ঞার বিমুগ্ধ ভাব দেখে যুববাজ উগব সিং পর দিন রাত্রিকালে এসে পরবর্তী অংশ শোনা-বাব প্রতিশ্রুতি দিযে গেলেন।

এমনি কবে সবাব দৃষ্টির অলক্ষ্যে প্রজ্ঞাদেবী আব উগব সিং-এব পাঠ-পর্ব চলল বেশ কযেকটি বিনিদ্র বাত্রি ধবে। কনহোব গাছেব তলায আসন পাতা হল চোমোলিং-এব অভ্যন্তরে।

শেষে অভিষেকেব উদ্দেশ্যে আগমন পবিণতি লাভ করল শ্রমণী প্রজ্ঞাব সঙ্গে উগব সিং-এব পবিণয়ে।

মহারাণী ডন চোমোলিং-এব সামনেব প্রান্তবে বসে অতীতকে স্মরণ কবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হলেন।

এবাব ফিবে যেতে হবে প্রাসাদে। পবিচাবিকাবা দীর্ঘ সময় তাঁকে দেখতে না পেলে বিশেষ চিন্তিত হযে পডবে। এমন কি প্রাসাদ রক্ষীদেরও তারা খবব দিতে পারে।

রাণী প্রজ্ঞাদেবী শিলাস্তূপ অতি-ক্রম কবে কনহোর প্রাঙ্গণ পেরিযে এক সময রাণীমহলে গিয়ে উঠলেন।

দবজাব সামনে দাঁড়িয়েছিল মুনাল।

প্রজ্ঞাদেবী ঘবে ঢুকতে ঢুকতে বল-লেন, বড চিন্তায পড়েছিলে তো? ভেবেছিলে তোমাদের রাণীকে কেউ হরণ করে নিয়ে গেছে!

পঞ্চ প্রদীপেব আলোয মুনালেব মুখ-খানা বড করুণ দেখাল। তার চোখ দুটিতে ধীবে ধীবে জল এসে গেল। সে অন্যদিকে মুখ ফিবিয়ে নিজেব আবেগটুকু ঢাকাব চেষ্টা করল।

রাণী প্রজ্ঞাদেবী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মুনালকে বুকেব মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি আমাকে এত ভালবাস মুনাল! আমার মত একজন রাণী এ সংসার থেকে মুছে গেলে কি যায় আসে তাতে?

মুনাল রাণীর বুকে মুখখানা লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

কতক্ষণ পরে মুনাল শান্ত হলে রাণী তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন রাণী-মহলের টোগাং-এ। সেখানে বাঁধা ঝুলায় নিজের পাশে বসালেন। আস্তে আস্তে দোল খেতে খেতে বললেন, আমার কোন সন্তান নেই মুনাল, তুমি আমার সন্তান।

কথাটা বলেই বুকখানা কেঁপে উঠল রাণী প্রজ্ঞাদেবীর। ক্ষণকালমাত্র। তারপর আবাব বললেন, তুমি আমার অনেক আদবের মেয়ে মুনাল।

রাণীর দুটো হাত টেনে নিযে মুনাল নিজের মুখখানা ঢেকে ফেলল। শৈশবে মা হারানোর দুঃখ সে ভুলতে চাইল রাণীর হাতের উত্তপ্ত ছোঁয়ায়।

কতক্ষণ পরে ঝুলায় বসে মুনালেব দিকে চেয়ে রাণী বললেন, তখন চোমোলিং-এব দিকে তোমাকে যেতে দেখলাম মুনাল। কোন বন্ধুর খোঁজে বুঝি?

প্রথমে চমক লাগল মুখে। অল্প সময চুপ কবে থেকে বলল, আপনি ঠিকই দেখে-ছিলেন। আমার এক কনেশেব সঙ্গে আমি দেখা কবতে গিয়েছিলাম।

তোমাব বন্ধু! কই বন্ধুটিকে তো দেখলে না আমাকে?

আপনি ওকে দেখেছেন।

আমি দেখেছি! কই না তো।

মুনাল বলল, ফুলেচ উৎসবেব দিন আপনি আর মহারাজ যখন মেলাপ্রাঙ্গণে সবার মাঝখানে উঁচু বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে-ছিলেন তখন সারি দিয়ে ফুল সংগ্রহ-কারীরা আপনাদের কাছে ফুলের কুড়ি নিয়ে এসেছিল।

ওরা সেদিন অনেক দুষ্প্রাপ্য ফুল সংগ্রহ কবে এনে আমাদেব দেখিয়েছিল।

মনে আছে, আপনি একটি ছেলেব ঝুড়িতে বড় নীল রঙেব একটি ফুল দেখে জানতে চেয়েছিলেন ফুলের নাম?

ছেলেটি বলেছিল, এটি পাহাড়েব অনেক ওপরের ফুল। এর নাম রোসল। ভারী সুন্দরদর্শন ছেলেটি। আমার হাতে ফুলটি তুলে দিয়ে নমস্কার কবে সবে গিযেছিল।

মুনাল বলল, ওর নাম সঞ্জো। ও আমার কনেশ।

রানী বললেন, ছেলেটিকে দেখে আমাব সেদিন খুব ভাল লেগেছিল মুনাল। কিন্তু মহারাজ যখন শ্রেষ্ঠ সংগ্রহকারীব পুরস্কার নেবার জন্যে ওকে ডাক দিলেন, তখন ও তো কই এল না?

সঞ্জো এ দেশাং-এব ছেলেই নয়। ফুলেচ উৎসবের আগে ও আসে, তারপর তিন-চার মাস সাংলায় কাটিয়ে আবও নীচে নেমে যায়। আবার মাস দুয়েক পবে শাংলায় এসে রূপিন গিরিপথ ধবে পাহাড়ের ওপারে চলে যায়।

তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় হল কি করে মুনাল?

দারুণ একটা ভুলেব ভেতর দিয়ে মহারাণী?

কি রকম?

মুনাল বলল, এক বছর এমনি ফুলের উৎসব হচ্ছে। ঐ সঞ্জো সে বছর প্রথম যোগ দিয়েছে ফুলেচ উৎসবের প্রতিযোগিতায়, পুরস্কারও পাবার কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোলমালে বাঁধালেন মাহাসুব পুরোহিত। তিনি নিজে কোন কথা না বলে তাঁর মনের ভাবটি প্রকাশ করলেন সর্দী গেত্রাকচের কাছে।

পুরোহিতের হয়ে দেবতার গেত্রাকচ বলল, সঞ্জো এ দেশাং-এব ছেলেই নয়, ওকে পুরস্কার দিলে দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন।

(চলবে)

হৃদয় নন্দন বনে

সোমেন্দ্রনাথ রায়

সুগম সিং-এর চায়ের দোকানে বসে কথা বলছিল ওরা। চারদিকের নিস্তব্ধতা যেন ঘেরাটোপের মত ঘিরে রেখেছে সব কিছু। কালো কুকুরটা লেজ নাড়াতে নাড়াতে জ্বল-জ্বল করে তাকাচ্ছিল তাদের মুখের দিকে। বিস্কুট কিনে দিল তাকে অনন্ত। বলল, হঠাৎ এত সব গোপন কথা আপনাকে বলল কি করে রোশন? মেয়েরা তো এসব ব্যাপারে খুব রিজার্ভ।

কি জানি দাদা। আমিও কম আশ্চর্য হয়ে যাইনি। ওর ধারণা হয়েছে আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি বাসে। সুতরাং আমিই ওর মান বাঁচাতে পারব। ওর বাবা মেয়েকে ভালবাসেন। কিরণ সিং-এর সঙ্গে বিয়ে দিতে এখন আর বিশেষ আপত্তি নেই ভদ্রলোকের। বাঙালীদের মত শিক্ষার চটক্‌কে এমন পরম সম্পদ বলে মনে করে না ওরা। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে ওঁর। বলেছেন, কিরণ যদি সত্যিই বাসের মালিক হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর মেয়ের খাওয়া পরার অভাব হবে না। যে ছেলে মামার বাসের কন্ডাকটর হয়ে জীবন আরম্ভ করে তিন বছরের মধ্যে বাসের মালিক হতে পারে, তার সম্পর্কে উনি খুবই আশাবাদী। বলেছেন, আমি যেন একটু ইনটিমেটলি খোঁজ-খবর নিই। উনি জামাইকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে রাজি আছেন। একটি মাত্র মেয়ে। তার জন্যে খরচ করবেন, এ আর বেশি কথা কি? তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড কম্পিটিশান। ওঁর নিজের ছেলেও লেখাপড়ায় তেমন ব্রিলিয়ান্ট নয়। তার ভবিষ্যতের কথাও হয়তো ভেবেছেন ভদ্রলোক। মামা যদি ডাক্তারকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, ডাক্তার-পতি কি আর শ্যালককে পারবে না?

গল্প শেষ করে হাসতে থাকল দীপু।

অনন্ত বলল, আপনার বন্ধুরা কিন্তু ব্যাপারটাকে অন্য লাইটে নিয়েছে।

সে তো আমি বুঝতেই পারছি। তবে এখনি ওদের ভুল ভাঙাতে চাই না। নিজেদের মনে অশান্তি করে মরুক না। পরে সব জানালেই হবে। আপনাকেও আমার রিকোয়েস্ট, এখন ওদের কিচ্ছু বলবেন না।

চা খেতে খেতে সুগমের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বাবু সাহেবরা এই তো পরশু দিন এলেন, ফির কাল চলে যাবেন। এ বছর বেশি যাত্রী এল না। শিখ যাত্রী যারা আসে, থাকে গুরুদুয়ারায়। বেশির ভাগ গরীব লোক। পয়সা খরচ করে তার দোকানে চা খায় না।

দীপু বলল, এই সায়েব আবার আসবেন পনেরো বিশ দিন পরে। তুমি এঁর রান্না-বান্না করে দিতে পারবে?

খুব বিস্মিত হয়ে সুগম প্রশ্ন করল, সাচ্ বোলতোহেঁ সাব?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল অনন্ত।

সুগম উৎসাহভরে জানালো, সে সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারবে। কোন অসুবিধা হবে না। যা খেতে চান, ব্যবস্থা করে রাখবে। একটা খত লিখে দিলেই হবে। চৌকিদার কেশর সিং-এর ঠিকানায় ভুন্দর গাঁয়ে সায়েব যেন চিঠি দিয়ে দেন। কত জন লোক আসবে, কদিন থাকবে, কি কি খাবে এসব লিখে দিলে একেবারে পাক্কা সন্দোবস্ত করে রাখবে সুগম সিং।

দীপু বলল, তাহলে আপনার এখানে থাকার পাক্কা বন্দোবস্ত করে দিলাম। চায়ের দাম এবং বকশিশ দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। দীপু বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি রায়দা। আপনি যেন ওদের বলবেন না—

হেসে তাকে আশ্বস্ত করল অনন্ত।

ফিরে আসবার মুখে প্রথম দিনের মত নির্মল নির্মেঘ আকাশের পটভূমিকায় রুপোর মুকুট পরা পর্বত-শিখরের দ্যুতিময় রূপ ঝক-ঝক করে উঠল চোখের সামনে। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল অনন্ত সেই অসামান্য দৃশ্যের দিকে। সেদিনের মত কান্না ঠেলে এল গলায়। মনে মনে বারবার প্রণাম করল হিমালয়কে। নিবে আসতেই হবে লিলিকে এইখানে, এই অলৌকিক সৌন্দর্যের পাদমূলে। যুগে যুগে এদেশের কবি, দার্শনিক, ঋষি, যার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে এসেছেন, সেই হিমালয় বুলিয়ে দেবে শান্তির প্রলেপ লিলির মনে।

পরের দিন সকালে ফেরার সময়ে অনন্ত ভেবেছিল ওরাও নিশ্চয়ই তারই মত কষ্ট পাবে। তাই খুব বিস্মিত হয়েছিল ওদের ভাবান্তর না দেখে। ওরা শতোপন্থ অভিজ্ঞানের ব্যাপারে অনেক ব্যস্ত। সামনের দিকে ওদের চোখ। পেছনের জন্যে মমতা কম। সেটাই তো স্বাভাবিক।

অনন্তর মনটা বিষণ্ণ। ঘাবরিয়া যেন অচ্ছেদ্য মায়ার বাঁধে ফেলেছে তাকে। চারপাশের বড় বড় ফার গাছ, দূরের পাহাড়, সুগম সিং-এর চায়ের দোকান, বনের মধ্যে দিয়ে আধো প্রকাশিত গুরুদুয়ারার গম্বুজ, আর একটু দূরের ঝরনা, সব মিলে অনবদ্য একটি ছবির মত দৃশ্য জেগে থাকবে তার মনে।

আকাশে অল্প অল্প মেঘ করেছে। বেলা নটা বাজতে বার। খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে এসেছে সকলে পথে। এখন রওনা দিলে বেলা দুটোর মধ্যে পৌঁছোবে ওরা গোবিন্দঘাট। সেখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে ওরা আজ সন্ধ্যার আগেই পৌঁছুবে হনুমান চটি। আগামীকাল ভোরে সেখান থেকে বেরিয়ে বেলা আটটার মধ্যে পৌঁছুবে বদরীনাথ। সারাদিন বদরীনাথে ওরা পোর্টার ঠিক করবে। আরও অনেক কিছু করবার আছে ওদের। সুতরাং যত সকালে বদরীনাথ পৌঁছুতে পারে, ততই মঙ্গল।

অনন্ত ওদের কাছ থেকে বিদায় নেবে গোবিন্দঘাটে। একা একা সে ফিরবে যোশীমঠ। সেখান থেকে বাসে করে হৃষিকেশ। হৃষিকেশে বাস ধরে চলে যাবে সে দেরাদুন। কলেজ বোর্ডের ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ নেবে অনুপম রায়ের। সেখানে কিছু ঝামেলা হতে পারে। তার জন্যে প্রস্তুত সে। যে অন্যায় ঘটে গেছে অনবধানতায়, তার প্রতিকার করার জন্যে যদি কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়, সে জন্যে তৈরী আছে সে মনে মনে। তারপর কলকাতায় ফিরে গিয়ে অফিসের ছুটির ব্যবস্থা আর লিলির সঙ্গে এ্যাডজাস্টমেণ্ট, সেটা করবেই সে যে কোন প্রকারে। শান্ত মনে সব রকম হিউমিলিয়েশন স্বীকার করে নেবে, এই জোর সে পেয়েছে নিজের অন্তরে।

হিমালয় থেকে করুণানির্ঝর নেমে এসে প্লাবিত করেছে সিন্ধু গাঙ্গের সমভূমি। উর্বরা করেছে মাটি। গড়ে তুলেছে সভ্যতা। পালন করেছে বিপুল মানব সমাজ। সেই করুণায় নিষিক্ত হয়েছে কণাদের অন্তর। নতুন মানুষ হয়ে ফিরে যাবে সে লোকালয়ে। সার্থকতায় মাথা নত

কয়ে তুলবে লিলির সঙ্গে তার দাম্পত্য-জীবনের অসঙ্গতি।

পোর্টার দুজন নেমে গেল আগে আগে। চৌকিদারের সঙ্গে হিসেব মিটিয়ে নিল কানু। দীপু বলে রাখল কেশর সিংকে অনন্তর এখানে আসার সম্ভাব্য তারিখ। কদিন বাবুদের মুর্গি এবং ডিম খাইয়েছে চৌকিদার। কাঠের মোগান দিয়েছে। ভালই নাফা উঠিয়েছে সেই বাবদ। তাছাড়াও লিবারল টিপস পেয়েছে। খুব খুশি হয়ে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল কেশর সিং।

সুগম সিং এসেছিল বিদায় নিতে। তার হাতে একটা টাকা দিয়ে দিল অনন্ত। বলল, তুমহারা কাল্লুকো বিস্কুট খিলায় গা।

বেখাঙ্কিত মুখে হাসি ফুটিয়ে সুগম সেলাম জানাল। মুখে বলল, ফির মিলেঙ্গে বাবু সাব।

জরুর, বলে তার সেলামের প্রত্যুত্তর জানাল অনন্ত।

একে একে অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলতে থাকল বনের পথ ধরে। দীপুর মনটা অন্য-মনস্ক। বুঝতে পারছিল অনন্ত, শুধু সেবাব্রতের সাধনাতেই উৎসর্গ করেনি সে নিজেকে। সরল পাঞ্জাবী কুমারী তার মনে ছুঁইয়ে গেছে রঙের পরশ। বিদায় বেলায় সেই দুটি ছোট ছোট চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি হয়তো প্রত্যাশা করছে সে। কিন্তু এ ভাবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা অশোভন। অবশেষে যখন সে কাঁধে তুলে নিয়েছে রুকস্যাক, তখনই দূর থেকে শোনা গেল রোশনের ভাইয়ের চিৎকার। বাবুজি, ঘোড়া ত্যারিয়ে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল দীপুর মুখ। রুক-স্যাক নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেল সে তার দিকে।

ভায়ের পিছনে পিছনে রুদ্ধশ্বাসে আসছিল রোশন। উত্তেজনায় এবং পরিশ্রমে তার ফর্সা মুখ টকটক্ করছে। চোখের কোলে সুর্মার রেখা গাঢ়তর। পানু পেছিয়ে ছিল দলের থেকে। সেও দাঁড়িয়ে গেছে অদূরে। গোপু আর কানু লঘু করল গতি। শুধু আশু এগিয়ে চলেছে একা একা। দীপুর কাছে এসে দাঁড়াল রোশন। দূর থেকে মনে হচ্ছিল, কোন সুদক্ষ রূপ-কারের নির্দেশে ন্যাচারাল সেটিং-এ দাঁড়িয়েছে নায়ক-নায়িকা। বাঁ দিকে বাংলোর ঢালু ছাদ এবং চিমনি। ডান দিকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় গুরুদুয়ারার গম্বুজ। ঠিক পিছনে নীল আকাশের পটভূমিকায় অপরূপ বজতগিরি। মুগ্ধ হয়ে দেখার মত সেই দৃশ্য।

অল্প কয়েকটা কথা হল। বুকের ভেতর থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিল রোশন। সেটা নিয়ে প্যান্টের পকেটে ভরল দীপু। তারপর সম্ভবতঃ গোটা দুই সান্ত্বনার কথা বলে তার পিঠে হাত রাখল আশ্বাসের ভঙ্গীতে। মুখ নিচু করল রোশন। দু-পাট্টা দিয়ে চোখ মুছল। তারপর হাসি-মাখা উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করল দীপুকে এবং উদ্দেশ্যে আর সকলকে। তারপর ভাইয়ের হাত ধরে ফিরে গেল ধীরে ধীরে।

দীপুর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, পা দুটো ওর ভারী হয়ে গেছে। অনন্তর কাছে এসে হাসল সে। সে হাসিতে করুণ, বিষণ্ণ দীপ্তি। কাঁধে তুলে নিল রুক-স্যাক। তারপর স্ট্র্যাপ এ্যাডজাস্ট করে বন্ধু-দের উদ্দেশে বলল, নাউ বয়েজ, লেট্স্ আস স্টার্ট।

ওদের পেছনে পেছনে চলেছে অনন্ত। চলেছে ঘাংরিয়ার গভীর অরণ্য অভিমুখে। নিশ্ছিদ্র হিমালয়ের ভয়াল অঞ্চলের অরণ্যের সব ভয়ালতা আজ অন্তর্হিত। পরিবর্তে চারিপাশের কুমারী প্রকৃতি রোশনের মতই ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছে। অনন্ত জানে, ফিরে আসতেই হবে তাকে।

এখানে ফিরে আসবে কণান, লিলিকে সঙ্গে নিয়ে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দলের পিছু পিছু পা বাড়াল অনন্ত।

(শেষ)

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন
ইনক্রিমিন* টনিক দিয়ে

বাড়তি আহারকে
বাড়তি বৃদ্ধিতে
পরিণত করে

এর উৎপাদন
* আমেরিকার মারনারিল কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

Glaxo-INC-915A/77 BEN.

কেউ বলে ডাকাত কেউ বলে বিপ্লবী

যাঁদের দেখেছি

অনন্ত সিং

জনগণই আমাদের শক্তি। জনগণকে বাদ দিয়ে আমরা কোনমতেই কোন বিপ্লব ভাবতে পারি না। বুর্জোয়ারা তাদের নিজের স্বার্থে কৃষি বিপ্লব সমাধান করবেই, তাই বুর্জোয়াদের এই স্তরের একটি বিপ্লবী ভূমিকা থাকেই। কৃষি বিপ্লব হয়তো বুর্জোয়া নেতৃত্বে সমাধান হয় নতুবা তা সমাধান হয় শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টি নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব অনেক আগে ও ভালভাবে সমাধান হতে পারে। কৃষি প্রধান দেশে যেখানে কৃষি বিপ্লব হবে সেখানে কৃষকদের ভূমিকাই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেটাকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু কেবল কৃষকদের হাতে সেই নেতৃত্ব ছেড়ে রাখলে চলবে না। কৃষকরাই কেবল তার সমাধান করতে পারবে না, তবে সমাধান হবে বুর্জোয়া নেতৃত্বে অথবা সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টি নেতৃত্বে। আর সি সি আই যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে অসাধ্য সাধন করার জন্য এগিয়ে এসেছিল তার মধ্যে তাদের প্ল্যানে কেবল ডাকাতিই ছিল না, ডাকাতিটি তাদের আদর্শ প্রোগ্রামকে রূপ দেওয়ার জন্য একটি 'মিনস' (উপায়) মাত্র ছিল।

প্রশ্ন হল আর সি সি আই-এর আদর্শ প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করার জন্য ডাকাতি ছাড়া কী চলত না? সময়, কাল, পাত্র বিবেচনা করে তবেই কী ডাকাতি করা স্থির হয়েছিল? সমাজ বিজ্ঞানে সংগঠনের জন্য টাকা প্রয়োজন এবং সেই টাকা কী ডাকাতি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করার নজির আছে? এই সব প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে আমরা সময়, কাল, পাত্র বিবেচনা করে সাময়িক ডাকাতির পথ গ্রহণ করা সঠিক মনে করেছিলাম।

বৈপ্লবিক কাজে যে অর্থের প্রয়োজন তা কৃষক ও শ্রমিকের কাছ থেকে চাঁদা তুলে তক্ষুনি হওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি কখনো বৈপ্লবিক কাজের প্রশস্ত প্রস্তুতির জন্য শ্রমিক ও কৃষকের কাছ থেকে চাঁদা তুলতেন না। এতে কম্যুনিস্ট নেতাদের মানসিক জড়তা ছিল। এই কারণে আমাদের পঞ্চাশ বছরের কম্যুনিস্ট পার্টির যে ধরনের অবৈপ্লবিক গতি তাই অনুসরণ করে বসে থাকতে হয় নইলে সেইরূপ অবৈপ্লবিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে আমাদের সক্রিয় বৈপ্লবিক পথ অনুসরণ করতে হয়। এই একটি মাত্র বিশেষ পয়েন্ট নিয়ে আমাদের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করি ও সিদ্ধান্ত করি যে গণ-সংগঠন যেভাবে গড়ে তোলা কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে অপরিহার্য ঠিক সেইরূপ গণ-সংগঠনের ও গণ-অভ্যুত্থানের সফলতার জন্য প্রাথমিক প্রশস্ত বৈপ্লবিক সংগঠনও তাদের হাতে থাকা উচিত। এই কথা আমার নয়, ছত্রে ছত্রে বইয়ের পাতায় পাতায় বিপ্লবী মহানায়ক লেনিন এই কথাটি বার বার জোর করে বলেছেন যে রাতারাতি 'সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগঠন' তৈরী করা সম্ভব নয়। সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগঠন কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে রাখতেই হবে এবং তা ঠিক সময় মত যেন কাজে লাগে সেইজন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। জনগণ বিপ্লবে অংশগ্রহণ না করলে যেমন বিপ্লব সফল হয় না, ঠিক তেমনি জনগণের হাতে ঠিক সময় যদি প্রাথমিক অস্ত্র ও সামরিক সংগঠন না থাকে তবে তাতেও বিপ্লব সফল হওয়া সম্ভব নয়। এই থেকে বুঝতে হবে যে আমাদের দুটি কাজেরই অতি মাত্রায় প্রয়োজন ছিল। একদিকে কম্যুনিস্ট পার্টির গণ-সংগঠন ও অপর দিকে তাদের সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী কোর প্রস্তুত থাকা সর্বতোভাবে উচিত। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটিকে নিয়ে চলা যায় না। 'গণফ্রন্টের উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তাল রেখে সমরোপযোগী কম্যুনিস্ট মিলিটেন্ট আর্মড কোর থাকতেই হবে—এই হচ্ছে লেনিনের দৃঢ় মত।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি সশস্ত্র কোরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কখনো পার্টিতে আলোচনা করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেননি। পার্টির নেতাদের গোপন সিদ্ধান্ত ট্রেড ইউনিয়ন করব, কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন করব, কিন্তু তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম আনতে হবে সেই কথাটি কখনো জানিও না। কৃষক ও শ্রমিকরা যদি পরিষ্কারভাবে জানতো যে তাদের প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতেই হবে, তখন তারা তাদের সংগঠনের বিশেষ রূপ কী নিতে হবে তা তারা ঠিক করার জন্য চেষ্টার থাকত, অন্তত কনসাস ক্যাডাররা প্রয়োজন অনুপাতে সংগঠন করার জন্য চেষ্টা করত। পার্টির নেতারা তাদের সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছিলেন। কৃষক ও শ্রমিকদের যদি ভয়াবহ আধুনিক সমরবিজ্ঞান ও সরকারের সমর-শক্তির কথা জানান হয় তবে তারা ভয় পেয়ে যাবে, এবং সেই কারণে তাদের এ-বিষয়ে কিছু জানান না হোক, এইরূপ ধারণা নিয়ে কম্যুনিস্ট নেতাদের কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন করা আত্মহত্যাতুল্য। আধুনিকতম সামরিক অস্ত্রের ধ্বংস-ক্ষমতা ও সরকারের সামরিক শক্তির প্রবলতা কত ব্যাপক তা গোপন-রাখার কথা ওঠেই না। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর এই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা উচিত এবং তাদের জানা উচিত এই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে আমাদের জয়ী হতে হবে। লেনিনের সমাজবিজ্ঞান সংগ্রাম বলতে কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলেন নি, লেনিন স্বীকার করে নিয়েছেন, সবরকম সংগ্রাম, তাতে অসহযোগ আন্দোলনও বাদ পড়ে না। কোন সময় কী রকম সংগ্রামের নীতি ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে, তা তাদের মার্কসবাদী লেনিনবাদীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে বিবেচনা করে গ্রহণ করতে হবে।

আমি যেমন বললাম, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে গ্রহণ করতে হবে, তেমনি বিভিন্ন নেতা ও বিভিন্ন পার্টি বলে থাকেন, এবং প্রত্যেকেই মনে করেন তিনি যে নীতি ঘোষণা করলেন সেটিই সর্বাপেক্ষা সঠিক নীতি, তিনি যা বুঝেছেন ও যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন সেটিই ভূমণ্ডলের একমাত্র সঠিক নীতি। আমার বিশ্লেষণে এইটুকু দাঁড়ায় যে আমি আমার মানসিকতা দিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করি, তারই প্রভাবে আমি থাকি এবং থাকতে বাধ্য হই। সেই প্রভাব থেকে আমি অন্যের কথায় কোনদিনই মুক্তি পেতে পারি না, কারণ আমার ইগো আমার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। তাই আমাদের ম্যানুয়াল-এ লেখা ছিল :—(১) ভীরুতা ও কাপুরুষতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে, (২) অহম্ ভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে, (৩) চরম স্বার্থ ত্যাগের জন্য চিরকাল প্রস্তুত থাকতে হবে।

অহম্ ভাব ছাড়তে হবে, এই অহম্ ভাবই আমাদের আত্মঘাতী শত্রু, মাও সে তুঙ লিখেছেন প্রত্যেক বিপ্লবী নেতা তাদের স্ব স্ব গন্ডীতে ভাবেন তিনিই যা বুঝেছেন তাই বৈপ্লবিক তথ্যের ধ্রুব সত্য, বিশ্ব-

ব্যক্তাল্ডে তার থেকে আর কেউ বেশী বোঝে না। প্রতিদিন মাও সে তুঙের এই কথা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই—সবাই সবার মত বানান তবু কিন্তু রুশ দেশে সর্বহারা বিপ্লব সফল হয়েছিল, তবু কিন্তু চীন দেশে সর্বহারা ও তার পার্টি নেতৃত্বে বিপ্লব সফল হয়। এই সফলতার গভীরে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে রুশদেশে লেনিনের বৈশিষ্ট্য ও চীনদেশে মাও সে তুঙের কর্ম-ধারার বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের মূল দিকটি হল তারা কেবল মুখে বলেন নি, সেইরূপ একটি সঠিক তথ্য প্রয়োগ করে সফল বিপ্লব নিজের দেশে এনেছেন। রুশ দেশেও বহু পার্টি ছিল, রুশদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিও দ্বিধাবিভক্ত ছিল কিন্তু সেইসব ছোট ছোট উপদল বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু সব বাধা চূর্ণবিচূর্ণ করে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক (কমিউনিষ্ট) পার্টি বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছে। চীনদেশেও বহু ছোট ছোট দল-উপদল ছিল, তারা কখনো একমত হয়েছেন কখনো ভিন্ন ভিন্ন মতে ছড়িয়ে পড়েছেন, তবু তাদের বাধা সত্ত্বেও মাও সে তুঙ-এর

নেতৃত্বে চীনদেশের বিপ্লব জয়যুক্ত হল। লেনিন ও মাও-এর নেতৃত্বে শক্তির বিশেষ উৎস কোথায় ছিল বা সেটি কী তাদের কথায় যা বুঝেছি সেটি হলে মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় লোকও যদি দৃঢ় বৈপ্লবিক নীতিতে সুসংগঠিত নেতৃত্ব দেয় তবে সেই নেতৃত্বও সফল বিপ্লব ঘটাতে পারে।

কোন তথ্যই নির্ভুলভাবে আমাদের দেশে প্রমাণিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবে কোন দল তাদের থিসিস কার্যে প্রমাণ করবে না। আমি যে চেষ্টা আওয়ার স্ট্যান্ড'-এর সময় করেছিলাম বা যে চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম আর সি সি আই সংগঠনে তা প্রমাণ করতে পারিনি, কাজেই আমি আমার কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারার নীতি ও কৌশল যে নির্ভুল তা বলতে পারব না। তাই বলে এটাও নিশ্চয় বলব না যে পঞ্চাশ বছরের অধিক যে কম্যুনিষ্ট পার্টি একই স্থানে দাঁড়িয়ে মার্কা-টাইম করছে সেটাও ঠিক। ময়দানে দশ লক্ষ লোক মিটিং-এ জড় করতে পারে বা পার্লামেন্ট নির্বাচনে তারা বাংলাদেশে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হয়েছেন তাই বলে তাদের বৈপ্লবিক নীতি নির্ভুল তাও আমি স্বীকার করতে রাজী নই। এই থেকে বুঝবেন না যে আমি বলছি তাদের এই জয়ের কোন মূল্য নেই, আমি এও বলছি না যে এই পথে তাদের কাজ করে যাওয়াটা ভুল হয়েছে। এই ধরনের কাজ আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করি কিন্তু, এটাই যে সব নয়, তার পরেও লেনিনবাদ বলেছে আমাদের আশেপাশে সংগ্রামের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে, সেইটির প্রচেষ্টা না দেখলে কম্যুনিষ্ট লেবেল লাগিয়ে গণপার্টি হলে সেই পার্টি বিপ্লব সফল করবে, সেইরূপ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি থাকতে চাই না। বৃটিশ লেবার পার্টি যে পদ্ধতিতে কাজ করে যান, সেই পদ্ধতি লেবার মুভমেন্ট পরিচালনা করার পথ হলেও সর্বহারার বিপ্লব-এর পথ নিশ্চয় নয়। সফল লেবার মুভমেন্ট-এর জন্য যেভাবে শক্তি ও সংগঠন করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন, সেরকম সংগঠনের গোড়াপত্তন হওয়া উচিত।

কেবলমাত্র শক্তিশালী লেবার ইউনিয়নই ক্ষমতা দখলের জন্য যথেষ্ট নয়, অনেক শক্তিশালী লেবার ইউনিয়নকেও সরকার তার আধুনিক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিনষ্ট করতে পারে। কাজেই লেবার ইউনিয়নই আমাদের শেষ লক্ষ্য নয়। আমাদের শেষ লক্ষ্য হল সর্বহারা শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মুক্তি। ডাইরেকটিভ বডির পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই, সর্বশেষ বিপ্লবী রিকোয়ারমেন্টস কী এবং সেই লক্ষ্য রেখে লেনিনের কথা অনুযায়ী তাদের সমস্ত পার্টিকে প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে হবে। তাই লেনিনের কথামত বর্তমানের কাজগুলোকেও এমনভাবে সাজাতে হবে যা ক্রমে ক্রমে অবস্থানুযায়ী কার্যকরী হতে পারে। অর্থাৎ লেনিন বলতে চাইছেন মুখে কেবল বিপ্লব বিপ্লব বলে চেঁচালে হবে না, তার জন্য তোমার বর্তমান পদক্ষেপের সঙ্গে বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা চাই। আমি সেই দেখে যাচাই করি যে সি পি আই এম সত্যি কী লেনিনের স্টেট এন্ড রেভ্যুলিউশন গ্রন্থের শিক্ষাটি গ্রহণ করেছেন। সি পি আই এমের নেতারা কী ভবিষ্যতে অট্টালিকা তৈরী করবেন। আর তাই যদি করেন তবে আজ তাদের কর্মসূচীতে কাঠ খড় কুটো দেখতে পাই কেন, কেন দেখি না লোহার রিম্, বর্গা, ইট, সিমেন্ট প্রভৃতি? মনে দারুণ প্রশ্ন আগে।

গণ-সংগঠনের প্রোগ্রাম সংগঠনেই নিবদ্ধ থাকবে আর তার বিশেষ কোন প্রসপেক্টিভ থাকবে না তা কোন মতেই হতে পারে না। এই গণ-সংগঠন ভবিষ্যতে কী করবে, কোন্ শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে তা সমাক উপলব্ধি থাকলে পরে যে 'অট্টালিকা' তৈরী করতে হবে কুঁড়েঘর তৈরী করতে হলে প্রথম থেকে লক্ষ্য রাখতে হবে লোহার রিম্, বর্গা প্রভৃতির জন্য। লোহার রিম্, বর্গাকে যেসব শ্রমিক সংগঠন অবহেলা করে কেবলমাত্র বাঁশ, কাঠ, খড় কুটো প্রভৃতিতে তাদের কর্মসূচী নিবদ্ধ রাখে তাদের সীমিত পরিধি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা বিপ্লবীদের পক্ষে খুব শক্ত নয়, মনে রাখবেন আমার ছোট্ট এই কথাটি যে-বিপ্লবীদের পক্ষে।

আমরা এইরূপভাবে চিন্তা করেছিলাম এবং বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম বর্তমানের পদক্ষেপ কী রকম হবে। ভাল কথা, তাই বলে কী পদক্ষেপ কেবল ডাকাতি হবে, তা হবে কেন, নিশ্চয়ই তা হবে না। তবে আমরা ডাকাতি ছাড়া আর বিশেষ কোন পরিচিতি অ্যাচিভমেন্ট দেখাতে পারছি না কেন, এই জন্য আমাদের তথ্যকে ভুল বললে চলবে না। নির্ভুল তথ্যের নির্ভুল অ্যাপ্লিকেশন হয়নি, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সেইজন্য আমরা কাকে দায়ী করব? সেইজন্য নিজেদেরই দায়ী করতে হয়। কেন নির্ভুল পদক্ষেপ দিতে সক্ষম হলাম না, কেন ক্যাডাররা নির্ভুল নীতি গ্রহণ করার পরে নির্ভুল নীতি নীতি অনুসরণ করার জন্য নির্ভুল পদক্ষেপ দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করল না। সেইজন্য আমি কী ক্যাডারদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেব? স্বীকার করছি সব দোষটাই আমারই। আমি কেন সৈসব ক্যাডারসকে আমার কাছে সিলেক্ট করে নিয়ে এলাম, তাদের কেন বাদ দিলাম না, আর যদি বাদই দিলাম না তবে তাদের পুরোপুরি তৈরী করা হল না কেন? কেন এই প্রচণ্ড দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কাজেই সব দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি, আমাদের থিসিস্ ভুল প্রতিপন্ন হওয়ার কারণ যেরূপ উপযুক্ততা সম্পন্ন ক্যাডারদের নিয়ে এই সংগঠন তারা হয়েছিল সেইরূপ ক্যাডারস না পাওয়ার আগেই সংগঠন শুরু করা। স্পষ্ট বোঝা উচিত ছিল, অনুপযুক্ততা নিয়ে এই সংগঠনের গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। সেই মারাত্মক ভুলের গুনাগার আমাদের দিতে হয়েছিল, আমাকে দিতে হয়েছিল।

অনুশোচনা করে এখন কোন লাভ হবে না। যা দেখেছি ও যা ঘটেছে তা বলেই এখনকার বক্তব্য শেষ করতে হবে।

দুর্গাপুর স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার ব্রাঞ্চ থেকে এক কোটি টাকার ডাকাতির বিরাট ও ব্যাপক পরিকল্পনা আমাদের পরিহার করতে হল কেবল নিজেদের দোষে। গাফিলতির পর গাফিলতি; দ্বিধাগ্রস্ত মনে ইতস্ততা আর বৈপ্লবিক দায়িত্ব জ্ঞানের উপলব্ধির অভাবই শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনাটি পরিহার করার মূলে ছিল। পুলের নীচে ডিনামাইট, মাঠের জঙ্গলের মধ্যে গাদা-কামান আবিষ্কার হওয়ার পর পুলিশ ও মিলিটারী সচকিত হয়ে উঠল এবং তাদের তৎপরতা যেভাবে বেড়ে গেল তাতে বাধ্য হয়ে আমাদের বিপ্লবী ক্যাম্প সেখান থেকে গোটাতে হয়। কতদিন কত মাস এই ব্যাপারে অতিবাহিত হয়েছে, কত অর্থ এতে খরচ হয়েছে, কত শক্তি এর পেছনে দিতে হয়েছে, তারপর যখন এই প্ল্যানটি পরিহার করা হল তার কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ক্যাডারদের মনে দেখা দিল, সেই অবস্থায় ডিসিপ্লিন রাখা শক্ত হয়ে পড়েছিল। দলের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় ভাব মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল, কোন কোন ছোট গ্রুপে তা অতি তীব্র আকার ধারণ করে। এই দেখেও এর প্রতিকার করার কিছুই ছিল না।' তবে উপরে সামগ্রিক সংগঠনের মধ্যে চাপ উপলব্ধি করি যে প্রতি মাসে অনেক খরচ মেটাতে হবে, অন্যথায় [illegible]

পর ডাকাতি করে ডালহাউসি স্কয়ারকেলে পড়ে গেলাম। যেন এই থেকে আমাদের মুক্তি নেই। কার্যত দাঁড়াল, যেন ডাকাতির জন্য ডাকাতি করে যেতে হবে। সবই বুঝতে পারছিলাম শেষসীমায় এসে মোড় ফেরান সম্ভব ছিল না। সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দুর্গাপুরের আস্তানা থেকে কলকাতায় ফিরে এল। এখন তারা ইচ্ছে করলে যে কোন একটি ডাকাতি কলকাতা শহরে সমান্য প্রস্তুতি নিয়ে করতে পারে।

প্রস্তুতির আগে টার্গেট ঠিক থাকা উচিত, টার্গেট ঠিক হল স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার বাসেল স্ট্রীট ব্রাঞ্চ। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এই ব্যাংকটি দিনদুপুরে ডাকাতি করা খুবই দুষ্কর। তবু সেটিকে লক্ষ্য করার জন্য বিপ্লবীরা প্ল্যান ঠিক করতে লাগল।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার এই ব্রাঞ্চ অফিসে এক কোটি টাকা কোনদিনই থাকত না, মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা থাকত, খুব বেশী হলেও পনের-বিশ লক্ষ টাকার বেশী থাকত না। তা-ও পাওয়া যাবে তেমন কোন ভরসা ছিল না, হয়তো দেখা যাবে পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা মাত্র পেয়েছি। কিন্তু রিক্রুটিং স্পেসেসের জন্য ছয় লক্ষ টাকা হলেও আমাদের সেই ডাকাতিটি সম্পন্ন করতে হবে, নইলে পার্টির ভাণ্ডার শূন্য হতে চলেছে। আমাদের যে প্রত্যেক মাসের খরচ তা বজায় রাখতে হলে এবং সেই সঙ্গে যদি কলকাতা আপ সার্চের জন্য প্রাথমিকভাবেও আমাদের গেরিলা প্ল্যান করতে হয় তবে এক কোটি টাকা অপরিহার্য। তাই দেরী না করে বাসেল স্ট্রীটের ব্যাংকটির উপর আমাদের আক্রমণ চালিয়ে যে কয়েক লক্ষ টাকা পাওয়া যায়, তা নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম।

অফিস টাইমে একবারে পার্ক স্ট্রীটের মুখে যখন সশস্ত্র পুলিশ ভ্যান ক্যামাগত টহল দেয়, তখন নিরাপদে এই ডাকাতিটি করতে হলে প্ল্যানের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল যেন ডাকাতির সময় এই চত্বরে কোন পুলিশ ভ্যান ঢুকতে না পারে। সেই জন্য চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটের মুখে ও সাদার্ণ স্ট্রীটের মুখে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিলে অ্যাকশনের টাইম বোম ও সঙ্গে ল্যাণ্ডমাইন ও ইনসিনদিয়ারী বোম দিয়ে বিস্ফোরণ করে সব গাড়ী আটক করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। আবার পূর্ব দিক দিয়ে যেন কোন গাড়ী ঢুকতে না পারে সেইজন্য একটি ট্রাকটিক্যাল রাস্তার মুখে বোম বিস্ফোরণে গাড়ী আটক করার জন্য ব্যবস্থা রেখেছিলাম। সাদার্ণ স্ট্রীটের দক্ষিণ দিক দিয়ে যেন কোন মিলিটারী গাড়ী বা কোন পুলিশের ভ্যান ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থাও করেছিলাম। সেইজন্য চৌরঙ্গী থেকে যে গাড়ী মিডলটন রোডে এসে ঢুকবে তাকে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরণের সম্মুখীন হতে হবে। আবার মিডলটন রোডে ক্যামাক স্ট্রীট দিয়ে কোন পুলিশ বা মিলিটারী গাড়ী এসে বিভ্রাট ঘটাতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় বিস্ফোরণের ব্যবস্থা আমরা রাখি। এই চারপাশে বিস্ফোরক দ্রব্য ও ল্যাণ্ড-মাইন, ল্যাণ্ড টর্পেডো প্রভৃতি দূর থেকে ইলেকট্রিকের সাহায্যে ফাটাবার ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে এই পার্ক স্ট্রীটের স্থানে যেসব কম্যাণ্ড নিযুক্ত ছিল তাদের সঙ্গে কমিউনিকেশন ও ব্যাঙ্কের সঙ্গে সেই কমিউনিকেশনের যোগাযোগ রাখার ভাল ব্যবস্থা ছিল। ওয়াকি টকি সেট জাতীয় যেন কমিউনিকেশন সিস্টেমটি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা যায়, তার জন্য সিগন্যাল ব্যবস্থা ছিল। আগে আগে দু-একদিন আমরা সেইখানে সিগনাস ও কমিউনিকেশনে ট্রায়াল দিয়েছি। ডাকাতির সময় আমাদের একটি লরী যেটা লোহার বর্ম দিয়ে ঘেরা থাকবে। সেইটি সাদার্ণ স্ট্রীটের ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে থাকার কথা ছিল। যে কমরেডটি সেই 'আর্মড ট্রাকটি' সেখানে নিয়ে যাবে ও চালাবে সে বেশ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় কমরেড। ওরই গাড়ী ব্যবহার করা হত বিপদ সন্ধিক্ষণে, অর্থাৎ যদি পার্ক স্ট্রীট মোড়ে বিস্ফোরণ হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ বা মিলিটারী ভ্যান এদিকে ছুটে আসত তবে এই গাড়ীর লোহার প্লেটের পেছনে থেকে আমাদের কমরেড রাস্তা থেকে লাফিয়ে উঠে পুলিশ ভ্যান ও মিলিটারী গাড়ীকে লক্ষ্য করে ফায়ার করত এবং এই ভ্যান থেকে ল্যাণ্ড টর্পেডো ছোঁড়ার ব্যবস্থাও রেখেছিলাম। সাদার্ণ স্ট্রীটের মুখে যেখানে গাড়ী পার্ক করে সেদিকে লরীটিও রিকসময় গিয়ে পার্ক করার কথা, তাই সে সেভাবে পার্ক করে। কিন্তু তবু পুলিশ সেটাকে সেখানে কোনমতেই পার্ক করতে দেবে না কেননা লরী পার্ক করার জায়গা সেটি নয়। প্রাইভেট গাড়ী সেখানে থাকে এবং সেখানে প্রাইভেট গাড়ীতে ভর্তি ছিল। যে গাড়ীতে ডাকাতি হবে সেই গাড়ীটি একটি পিকআপ ভ্যান জাতীয় গাড়ী ব্যবহার করার জন্য বন্দোবস্ত করে নিই আর দুটি প্রাইভেট গাড়ী সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে তাও ঠিক করে নিই। সময় ঠিক করা ছিল কোন গাড়ীটি কোন সময় কোথায় যাবে। সেই অনুপাতে গাড়ীগুলি ডাকাতির একটু আগে সেইসব জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হল। ঠিক নিরো আওয়ারে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী গিয়ে ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল। ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখ দশটার সময় উপস্থিত হয়, কারণ সেইদিন একটি বিখ্যাত ফুটবল ম্যাচ ছিল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম পুলিশ ও পাবলিক সেই ম্যাচে নিবিষ্ট থাকবে এবং সেইটিই হবে আমাদের বেশী সুবিধার সময়। আক্রমণের দিনক্ষণ আমরা এই ভিত্তিতে ঠিক করি।

দুর্গাপুরে ডাকাতির সময় আমরা আমাদের ঘোষণাপত্র রিলি করতাম এবং ঘোষণাটি রেডিও ট্রানজিস্টারের লাউড স্পীকারের মারফত বলতাম। কিন্তু দুর্গাপুরে ডাকাতিটি যখন হল না তখন আগে আমরা ঘোষণাপত্র দেব না এবং আগে আমাদের মত, পথ ও আদর্শ পাবলিককে জানাব না তা হতে পারে না। সেইজন্য সেই ঘোষণাপত্র আমরা এই ডাকাতিটিতে সম্পাদনা করব বলে ঠিক করেছিলাম। প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে ঘোষণাপত্রে আবার ছাপান হয় এবং সেই ঘোষণাপত্রটি স্বৈতকণ্ঠে রেকর্ড করান হয়—একটি ছেলের কণ্ঠ ও অপরটি মেয়ের কণ্ঠ। এই ডাকাতি চলার সময় এই ঘোষণাপত্র বাজিয়ে শোনাবার জন্য টেপ-রেকর্ডার মেশিনটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। লাউড স্পীকারের মারফত টেপরেকর্ডারটি বাজাবার জন্য টেপরেকর্ডারটি ব্যাঙ্কের দরজায় রেখে সাইচ টিপে দেওয়া হয়। এই টেপরেকর্ডারটি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের উর্ধ্বে বাজে এবং ঘোষণাপত্রটি এই টেপ-রেকর্ডারের মাধ্যমে পুরো শোনা যায়। জাপান ঘোষণাপত্রও তারা সঙ্গে করে নিয়েছিল, যখন ডাকাতি চলবে তখন টেপরেকর্ডারটি বাজবে এবং ঘোষণাপত্র ব্যাংকের বাইরে, ভিতরে এবং রাস্তায় ছড়ান হবে—এই রকম ঠিক ছিল। সেইমত তারা প্রস্তুত হয়ে সেখানে যায়। টেপরেকর্ডারের সাইচটি অন করে দিয়ে তারা ভেতরে ঢুকল। রাস্তার উপরে ব্যাংকের সামনের গেটে যে দারোয়ান ছিল সে গুলি-বিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়, তার বন্দুকটি তারা তুলে নেয়। ভিতরে গিয়ে তারা জমধ্বনি দিচ্ছিল এবং ব্যাংকের সবাইকে চুপ করে বসে থাকার নির্দেশ দিচ্ছিল। গোলমালের মধ্যে নির্দেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছিল না। ভল্টের সামনে ভিতরের দারোয়ান তার বন্দুক হাত থেকে ফেলে দি, অগত্যা সেও গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল, তার বন্দুকটিও তুলে নেওয়া হয়। যাদের ওপর নির্দেশ ছিল তারা কাউন্টারের ভিতরে ঢুকল এবং টাকার বাক্স টেনে বার করে নিয়ে এল। কেউ বাধা দিতে এগিয়ে এল না। সব কাজটি সমাপ্ত করতে তিন মিনিটের বেশী সময় লাগেনি, তারা টাকার বাক্স নিয়ে সামনের ভ্যানে উঠল। কিন্তু বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় কমরেড যে আমাদের আর্মেড করে চালাচ্ছিল তাকে ট্রাফিক পুলিশ প্রাইভেট গাড়ী পার্কিং এর জায়গায় তার গাড়ী পার্ক করতে নিষেধ করায় সেই নিয়ে তার সঙ্গে বচসা হয়। পুলিশ তার লাইসেন্স দেখতে চায়, সে তার লাইসেন্স পুলিশকে দেখাচ্ছিল, এমন সময় পুলিশ তার হাত থেকে লাইসেন্সটি ছিনিয়ে নেয়। ইতিমধ্যে ডাকাতি শুরু হয়ে যায়, রিভলবার পিস্তলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ব্যাংকের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় তাও শোনা যাচ্ছিল। কাজেই পুলিশ সরে পড়ল আর আমাদের কমরেডও ভয়ে শংকিতচিত্তে লরী পরিত্যাগ করে চলে গেল। তারপরে তার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয়নি। অনেক পরে জানা গিয়েছিল সে পাকিস্তানে চলে গেছে।

(চলবে)

রেগড়া টাঁমাকে বোল উঁমছে

দিসুম সেন্দরার যৌবন মেলা

পশুপতিপ্রসাদ মাহাত

কেউ বলে অযোধিষা বুরু, কেউ বলে অযোধ্যা পাহাড়। এই পাহাড়কে ঘিরে বসে চলেছে দামোদর, কংসাবতী, শিলাই, কুমারী। এই পাহাড়কে কেন্দ্র-বিন্দু করে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। দুমকার হিজলা, রাজমহল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া, সিংভূমের দালমা, ময়ূরভঞ্জের সিমলীপাল পর্বতমালা। প্রাচীন গন্ডোয়ানা ভূখন্ডের শাল, পলাশ, মহুয়া, হরিতকী, বহড়া, কেঁন্দু, ধাওকী, গুলঞ্চ ইত্যাদি গাছ-গাছালীর আড়ালে মাঠারবুরু, গোরিষা প্রভৃতি জঙ্গল ঘিরে প্রশান্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে অযোধ্যা পাহাড়। এই বিস্তীর্ণ ভূ-খন্ডের আরণ্যক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মাহলী, মাল, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুদি-কোড়া খেড়িয়া-লোধা, বীরহোর, মুন্ডা, হো-কোল, মাহাতো, আহির, গহ্লা, চিক-বড়াইক, ওঁরাও, সরাক, কুমার, লোহার, অসুর, মালহার, তাঁতী, বোলা প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ।

অস্তিত্ব বোধের কিম্বাবাদের ঐক্য একটা কাঠামোগত রূপ নিয়ে দেশজ ও আঞ্চলিক অস্তিত্বের জন্ম দেয়। তাই দেখি বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে হাজারে হাজারে যে সমস্ত মানুষেরা একত্রিত হন তা বিহারী, বাঙ্গালী, উড়িয়া সংস্কৃতির মধ্যবিত্ত মানসিকতার টানে নয়, তা হলো ঝাড়খন্ডী সংস্কৃতির অরণ্য-আদিম আহ্বানে। বার্ষিক শিকার উৎসব শেষে অযোধ্যা পাহাড়ের শীর্ষ-দেশের সমতলভূমিতে তারা একত্রিত হন। পরিচিত হন একে অপরের সঙ্গে।

সরকারী আইন অনুসারে এই মেলা বেআইনী। তাই শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে সরকারী অফিসারদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি পুরুলিয়া জেলার ডেপুটি কমিশনার আদিবাসী-দের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এই বৎসরেও বর্তমান জেলাধীশ শ্রীকমলকান্তি নস্কর একটি আবেদন করেছিলেন :

'বীর সম্পদ অ বোয়া দিশম বেষা : মারাং সম্পদ। পুরুলিয়া জেলা বেষা : বীর সম্পদ পেরেচ বাঘমুন্ডি থানারে অযোধিষা বুরুতে যত সোমবারে বুদ্ধকুনামী হিলো : যত সেন থেন গে সাঁওতাল আদি-বাসী বীর সেন্দরা পরব পালাও আর মানাও লাগিৎ সেটেন আক। সেন্দরা যখেচ আডি ঘাস্তি, বীর দায়েক উজাড় হতেচ্তে আরো আঃ বীর সম্পদ উজাড় কানা।

দারাষকান ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, ইংরাজী ২২এ মে ১৯৭৮ সোমবার হিলোঃ দ বুদ্ধ-কুনামী। নোষা দিন গে অহিংসা ধর্ম বেয়াঃ পাশ নাওইচ্ ভগবান বুদ্ধদেব এ চানাম লেনা। অহিংসা ধর্ম বেষাঃ ফেড্দ-কাথা হো খোঃ কানা যে, চিলি জিয়ালী গে গচ্ বাং যোগেয়া। ভগবান বুদ্ধদেবঃ নেহর আর মানাও লাগিৎ অনাদিন হিলোঃ দ চিলি জিয়ালী গেগচ্ বাং ঠিকা।

নেশহ ষাঁহাঁয়কো বাইশাখ কুনামী হিলো অযোধিসা সন্দরাবেক সেটেরঃ আ উনকুঠেন নেহর আর মানাও লাগিৎ অনাদিন হিলঃ দ বীর সম্পদ আলোক উজাড় মা।

আরহ্ ভারত সরকার বীর জিয়ালী বাঞ্চাও আইন (১৯৭২) লেকাতে বাযমা লেকান বীর জানোয়ার চেঁড়ে চিপরুং সেন্দরা আর গচ্ সানাম লেকাতে বে আইনী কামিকানা মেনতে লেখাঞ্জা। অনাতে ষাঁহাঁয়কো নোআ সেন্দরা রেপে সেলেদঃ আ উনকুদ বীর জিয়ালীক গচ্ লেকোথান অনাদ নাঁহাঃ আইন লোকাতে দন্ডনীয় হোয়োঃআ।' বাংলাভাষাতেও অনুরূপ আবেদন করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। 'অবশ্য সম্পদ আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পুরুলিয়া জেলার অরণ্য সম্পদপূর্ণ বাঘ-মুন্ডি থানার অন্তর্গত অযোধ্যা পাহাড়ে প্রতি বৎসর বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন নানা দিক হইতে সাঁওতাল আদিবাসীবৃন্দ শিকার পরব উদ্‌যাপনের জন্য মিলিত হন। শিকার কালে প্রচুর বন্যাদি বিনষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের অরণ্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫, ইংরাজী ২২শে মে ১৯৭৮ সোমবার বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র দিনে বিশ্ববন্দিত অহিংসা ধর্মের প্রচারক ভগবান বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অহিংসা ধর্মে প্রাণীবধ নিষিদ্ধ এবং সে কারণে ঐদিন সাহারা উৎসবে যোগদান করিবেন তাহারা যেন প্রাণীবধ হইতে নিবৃত্ত থাকেন এবং অরণ্য সম্পদ নষ্ট না করেন।

উপরন্তু ভারত সরকারের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (১৯৭২) অনুযায়ী বিভিন্ন পশুপক্ষী শিকার সম্পূর্ণরূপে বে-আইনী কার্য বলিয়া পরিগণিত। অতএব যাহারা উক্ত উৎসবে যোগদান করিবেন, তাহারা প্রাণীবধে লিপ্ত হইলে তাহা বর্তমান আইন অনুসারে দন্ডনীয় হইবে।'

এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারী কর্তৃ-পক্ষের একটি বাৎসরিক আচার-অনুষ্ঠান। ঝাড়খন্ডী মানুষেরা এই অযোধ্যা পাহাড়ে একত্রিত হন কিসের টানে? গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপদাহ অগ্রাহ্য করে ভবিষ্যৎ সম্বল কষ্ট স্মরণ করে মৃত্যুর মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন, তাঁরা এক সপ্তাহ আগে থেকে।

শুধু কি অরণ্য-আদিম উন্মত্ততার লোভ না অফুরন্ত আনন্দের রত্নাগার সন্ধান। অথবা কবিকার্য শুরু করার আগে শরীরটা তরতাজা করার দুর্বার আকর্ষণে তারা সমবেত হন শিকার উৎসবে। অরণ্যের কুহেলীময় টাকে অরণ্য সন্তানদের ধমনীতে উষ্ণরক্ত বয়ে যেতে থাকে। দাঁতাল বন-শুয়োরের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তারা। চিত্রিত হরিণের পিছু নিয়ে তাকে তাড়া করার আদিম নেশা, লোবীর, সেন্দরা সিরিং বা কুঁড়িয়ো সিরিং অথবা উধয়াগানের মোহময়ী আকর্ষণ তাদের এত কষ্ট সহ্য করার প্রেরণা দেয়।

সাঁওতালদের একটি গানে সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়—একটি কিশোর তার মাকে জিজ্ঞাসা করছে—

সিং বাঁবরে সিম কোরাককে
মানঝীনরে মারাক হিঁয়োকে
অযোধিয়াবে ঢেঁকী শাড়িয়েম
চেতেরেনা রেগড়া টামাক
দগো আয়োগো, গাডে কান দো—

(সিংগীনের জঙ্গলে জংলী মোরগ ডাকছে। মানবীনের জঙ্গলে ময়ূরের কেকাধ্বনি, অযোধিয়া পাহাড়ে ঢেঁকীর পাড় পড়ছে, মাগো, রেগড়া টামাক বাজছে কেন আজ?)

মায়ের মন। তাঁর একমাত্র কিশোর পুত্রের চোখে সে দেখেছে এক উন্মনা ভাব। তাঁর ভয় করছে বলতে যে কেন 'রেগড়া টামাক' বাজছে? কারণটা জানতে পারলে ছেলে আর তার ঘরে থাকবে না। অজানা আশঙ্কায় মায়ের মন কেঁপে উঠে। কিন্তু তাকে তো মা বাধা দিতে পারে না। রেগড়া টামাক শিকার উৎসবের উন্মাদনা ঘোষণা করে। শিকার উৎসব থেকে ফিরে না এলে ছেলের মেয়ে-বন্ধুরা তাকে পাত্তা দেবে না। কাপুরুষ বলবে। বলবে সে এখনও নাবালক। প্রেম-পিরীতের খেলা মেয়েরা খেলবে না তার সঙ্গে। ঝাড়খণ্ডের প্রবাদ তাকে আনমনা করে দেয়—'যে মরদ অযোধ্যা শিকারে যায় নাই সে মায়ের পেটেই আছে?'

দূরে গ্রামের আখড়ায় আর মাঝি-থানে বেজে চলেছে রেগড়া টামাক। শাল-পাতার মাধ্যমে এসেছে খবর। দিহরীর নিমন্ত্রণ 'শালজম ঢাবওয়া' দিয়ে রেগড়া টামাকে বোল উঠছে চরক-টাট-টাবেটা ডুবং ডুবং ডুবুং। শিকারীদের দল তৈরী হচ্ছে টাঙ্গী, তাবলা, হাবসা, টেঙ্গা, বল্লভ, তলোয়ার, বন্দুক, তীর-ধনুক, ছুরি, লাঠি যার যা আছে বাঁধের ঘাটের পাথরে 'শান' দিয়ে তা তারা নিয়ে আসছে। নেতৃত্ব দেবার জন্য গ্রামসংযোজন অন্যতম মাঝি ওলায়া বেদ্রে নির্চ্ছেন সেইরকম একজন শ্রোসানকে যাঁর গত দু-তিন বছরের শিকার করতে যাওয়ার একটা অভিজ্ঞতা আছে। বাজনদার ও গায়েনরা বানাম ও তিরিয়ো (বাঁশী) নিয়ে দু-তিন দিনের চাল, ডাল মশলা, হাঁড়ি, কড়াই, আলু পেঁয়াজ, তেল, নুন লঙ্কা সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত। বয়স্ক অথচ মনে প্রাণে যুবক নায়েকরা বলছেন নতুন যুবকদিগকে প্রেরণা যৌবনের মাদকতা ও আদিমতা বোঝাবার জন্য সঙ্গে যাচ্ছেন। তাদের হাতে চামর ও খাদ্য-দ্রব্যের পোঁটলা, নাচের সাজ-পোশাক। দূর থেকে দেখছে গ্রামের কিশোরী-যুবতীরা। তারা কেউ-বা শিকারী দলের কারো সদস্যের প্রেমিকা, কেউ বা বোন, কেউ বা বৌদি, কেউ বা মা ও কাকীমা।

রেগড়া টামাকের বাজনা, ঢেড়পেটি আর ধমসার আওয়াজে সেই কিশোরের মন উদ্বেলিত। দোমনা হয়ে মা তাকে বলে আজ শিকার পূর্ণিমা। আজ দিসুম সেন্দরা অযোধিয়া বুরুতে—অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড়ে আজ দেশ শিকার। তাবই জন্য রেগড়া টামাক বাজছে? শিকার পূর্ণিমার কথা শুনতে শুনতে কিশোরের রক্ত ডগবগ করে ফুটে উঠে।

সেও গোঁ ধরে আমিও যাবো। মাকে সে বলে মা তুমি আমার জন্য দাকা পটম, উড়ু পটম আর উল পটম করে দাও (ভাতের পোটলা তরকারীর পোটলা, আম পোড়ার পোটলা)। কিন্তু মা বলে তুমি নাবালক, তুমি কি করে যাবে? কিন্তু পরক্ষণেই মা চিন্তা করে ধিক্ তাকে। 'পুত্রের শুভ কাজে বাধা হলাম' এই কথা ভেবে মায়ের মন অনুশোচনায় ভরে গেল। ততক্ষণে মাঝি-থানে সমবেত শিকারীদের উল্লাস শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে 'কুলকুলি' বাজনার বোলও পাল্টেছে—

দেন সে পটম তাম গিড়গিড়
দেন সে পটমতাম।

রেগড়া টামাক, ধমসা, ঘন্টির সমবেত বাজনার তালে তালে মনে হচ্ছে যেন একদল যোদ্ধা রণক্ষেত্রে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মোষের সিং-এর শিঙ্গা থেকে বোল বেরুচ্ছে—মাব সাট-পাট সার কপিকো, দেনসে পটমতাম। চিরচঞ্চল যৌবনের ডাকে ভুরুখা ইপিল (শকুন্তলা) উঠবার সময় শিকারীরা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে থাকে অযোধ্যা পাহাড়ের অদৃশ্য হাতছানির ডাকে।

২০শে মে যখন হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনটা ছেড়েছিল তখন আমার সাংবাদিক, চিত্র-পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান বন্ধুরা ভাবেনি যে রাত দুটোর সময় কি হবে? চন্দ্রকোণা রোড স্টেশনে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শুনলাম হাজার হাজার লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ট্রেনে উঠতে চায়। ট্রেনের কনডাকটার ভয় পেয়ে সমস্ত জানালা বন্ধ করে দিতে বললেন। আতঙ্কের রেখা মহিলাদের মুখে। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে জনতা প্রায় ক্ষিপ্ত হবার উপক্রম। সকলের অনুমতি নিয়ে ঝুঁকি নিলাম। বাইরে শোনা যাচ্ছে 'সব কামরায় বিহারী'। তাহলে আমরা উঠব কি করে। ভাসো দরজা ভাঙো জানলা'। আমি গিয়ে দরজা খুললাম, আর বললাম আপনারা শান্ত ভবে বসুন, সমস্ত ট্রেনের দরজা খুলে দিতে বলেছি। লোকেরা হুড়মুড় করে উঠলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের কামরা ভর্তি হয়ে গেল দেখি একটি ছেলে আমাকে দেখে জোহার করলো।

আরে চুনকা না(চুনকা ওরফে চন্দ্রমোহন এই এলাকার বিখ্যাত ছাত্র ও খুব কর্মী। আমার অনেকদিনের পরিচিত। ঝাড়গ্রামের অ্যাডভোকেট বিষ্ণুপদ সোরেনের ভাই। বিষ্ণুদের বাড়ীতে আমাকে দেখেছে চুনকা। মন্ত্রবলে সমস্ত উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেলো। পুরুলিয়ার আবগারী বিভাগের কর্তা সস্ত্রীক আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনিও খুব সাহায্য করলেন আমাকে। শালবনীতে ভিড় উপছে পড়লো। গড়বেতা স্টেশনে অবশ্য লোক দাঁড়াবারও জায়গা নেই। হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছে। মেটা মোটা বাঁশের বাঁশী এক সঙ্গে বেজে চলেছে। কিন্তু কি শান্ত এরা। এই শান্ত, সরল ঝাড়খণ্ডী মানুষগুলো একটা বিশেষ ট্রেন তো পেলেই না একদিন, পেলো জংলী, চ্যাড, বুনো উপাধি বাবুদের কাছ থেকে। পরের ট্রেনে বাকীরা যাবে। সকলেই চলছে উর্দ্মা স্টেশনের দিকে। কেউ বা কাঁসাইউদ্দিতে নামছেন, কেউ বা নামছেন পুরুলিয়াতে। উর্দ্মা স্টেশন থেকে অযোধ্যা পাহাড় মাত্র দশ-মাইল রাস্তা। বোহড়া গোড়া, বাজরীপোসী, পোটকা, ঘাটশিলা, কাড়গ্রাম, বিনপুর, জামদা, ঝালগড়, ছাতনা, সিমলাপাল, চাঁড়িল, চক্রধরপুর, কুন্ডু রাহে, তামাড়, মিঠলী, রামগড়, পেটেরবাদ, জয়নামোড়, জামতাড়া চিত্তরঞ্জন, নিবসা, পোখারিয়া, ধানবাদ, টুন্ডি, গোবিন্দপুর থেকে এইভাবে এসেছিল মানুষের দল। কেউ ট্রেনে, কেউ বাসে, কোনো দল বা পায়ে হেঁটে।

সাঁওতালদের উৎপত্তি ও বংশবৃদ্ধির যে কাহিনী তাতে তাতে 'শিকার' বলে একটি অঞ্চলের কথা বারে বারে উল্লেখ করা হয়। আমি নিজে ময়ূরভঞ্জ, মানভূম, আসামের চা বাগান তথা সাঁওতাল পরগনাতে সাঁওতাল দের মুখে 'শিকার দিসুমের' কথা শুনেছি। ডব্লিউ ডব্লিউ আকবার মন্তব্য করেছেন।'

"So the man and the woman increased and multiplied, and the land could not hold all the children that were born. In this time they dwelt in Hihiri Pipiri, but when the land would not hold them they journeyed to Chae-Champa and when Chae-Champa would not hold them they journeyed to Silda; and when Silda would not hold them they journeyed to Sikar and from Sikar they journeyed to Nagpur (Hunter, W.W. 1878)

অরণ্যের সন্তানদের আবনাক জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হান্টার বলেছেন:

"The Santals afford a striking proof of how a race takes its character from the country in which it lives".

যদিও কর্নেল ডালটন, রেভারেন্ট স্কেফসর্ড ও বিজলের মধ্যে সাঁওতাল মাহাতো ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির এই ঝাড়খণ্ড এলাকাতে আগমন নিয়ে মতভেদ আছে। পি সি রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন

"In Champa several races (the Mundas, Birhors, Kurmis and others), separated from what was according to the traditions, till then the common Kharwar race."

তাই শিখর দেশের দামোদর ও সুবর্ণ-রেখা নদী, সিংভূমের বৈতরণী নদী তাঁদের কাছে শুদ্ধতার প্রতীক রূপে দেখা দিলো।

ভারত সরকারের রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইনডিয়া ১৯৬১ সালের লোক-গণনার উপর নির্ভর করে সাঁওতালদের শিকার উৎসব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'যে সমস্ত জেলাতে সাঁওতালেরা বাস্তুত্যাগ করে কৃষি-শ্রমিক হিসাবে বসবাস করছেন সেখানের দেহরী শিকার উৎসবের দিন ধার্য করে সকলকে নিমন্ত্রণ করেন দুটো আমপাতার সাহায্যে। শিকার উৎসবের দেশ-বিচার সভাতে বহু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে বিচার হয়। নাচ ও গান ছাড়াও প্রচুর মদ্যপান করেন তাঁরা।'

অবশ্য সাঁওতাল 'শিকার উৎসব' নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও দু-এক জায়গায় 'হান্টিং' যে সাঁওতালদের অর্থনীতির একটা অংশ সেটা কুরোটোলা সাঁওতালদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন নবেন্দু দত্ত-মজুমদার মহাশয়। ডঃ সুবিজল সিনহা দক্ষিণ মানভূমের ভূমিজ উপজাতি সম্পর্কে গবেষণা করার সময় বলেছেন দালমা পাহাড়ে বাৎসরিক শিকার উৎসবে ভূমিজরা যোগদান করে এবং তাকে 'দেশ-শিকার' বলা হয়: ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আদিম-জনগোষ্ঠীর উৎসব।

কিন্তু সাঁওতালদের বাৎসরিক শিকার উৎসব সম্পর্কে মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন ডব্লিউ জি আরচার। তিনি সামগ্রিকভাবে সাঁওতালদের জীবন ও ভালবাসা তথা কবিতা নিয়ে সাঁওতাল সমাজের যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছেন তাতে বলেছেন যে শিকার উৎসব ও যৌবনের আদিমতা তাদের সামগ্রিক জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

> "When the hot weather arrives, Santals gather in enormous crowds for the purpose of a hunt. This hunt occurs wherever there are hills and thoughout the Santal Parganas, each mountain or patch of jungle provokes a large assembly."

শিকারের সাফল্য এনে দেন যে বোঙ্গা, তাকে বলা হয় পারগানা বোঙ্গা. কিন্তু পারগানা বোঙ্গার ভগ্নী রুংগোরুঞ্জি বোঙ্গার দয়া না পেলে শিকার করা সম্ভব নয়। তিনি কিন্তু যৌনতা ও যৌবনের প্রতীক। আর্চার মন্তব্য করেছেন—

> "This bonga is obsessed with sex and accordingly a stone a stone in the neighbourhood is treated as her 'head' and unique is passed upon it. All who attend the hunt should not have gone to any woman the day before. Simularly no woman should have intercourse while the male members of her family are away. If a woman does so, it is thought that her husband or son will be killed by a bear or a leopard or will cut himself while hacking at a creeper."

দিহরী ও দিহরীর স্ত্রী দুজনেরই ভূমিকা এতে অসামান্য। 'একটা পিতলের জলভর্তি কলসী ঘরের মধ্যে রেখে তারা বিপদের সঙ্কেত বোঝাবার চেষ্টা করে. শিকারের আগের দিন রাত্রিতে জলের পাত্রে দুটো শালগাছের কচি ডাল ঢুকিয়ে দেন। দু-দিকে কেরোসিনের কুপীতে আলো জ্বলে। ভোরবেলা দেহরী দেখেন ডালগুলো তাজা আছে কিনা। যদি সেই ডাল তাজা ও সবুজ থাকে তবে লক্ষণ শুভ। অন্যথায় শিকার ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। শিকারের বাহিনীতে জলের হাঁড়ির দিকে লক্ষ্য রাখেন দেহরীর স্ত্রী, জল সামান্য ঘোলা হলে কোন ছোট জন্তু বা পাখী মারার সংবাদ ঘোষণা করা হয়। যদি জলের রঙ লাল হতে থাকে তবে বাঘ বা ভালুক কিংবা বনশূয়র শিকারের কথা জানতে পারা যায়'—এই লোক বিশ্বাসের কথা আমাকে জানালেন শ্রীপতি মাহাতো, শিবু সোরেন ও গজেন গরাঁই, সকলেই একই গ্রাম লটপদা থেকে এসেছেন শিকারে। দিহরী শিকারের দিন ধার্য করে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাঠান অন্ততঃ ঘরপিছু, একজন করে শিকারে যেন অংশগ্রহণ করে।

নাঙ্গো দিযো বীরদো সেন্দরা
গিবে কুকীকো সেটেরা দিনদো।
দেন তিং কাকীগো পিতল বানাম
দেন তিং কাকীগো পিতল বানাম
ইন্দ দো কাকীগো, নাঙ্গো দিয়ো
বীরদো সেন্দরারে চালাকানা।
লেলে চাঁওরা লেলে চাঁওরা
নে গো বাবু তুয়া তাকা জনবীর।
আঙ্গো দিযো সেন্দরা,
ইন্দ হাতেম, গো, বন্দুক চালাকানা।

শিকার করতে যাবার সময় পিতলের বাঁশী আর পিতলের বানাম নিতে তাঁরা ভোলেনি। যেতে যেতে গল্প মেতে উঠে কিশোরেরা। জনৈক প্রৌঢ় বলছে—পাণ্ডেং-বুরু অর্থাৎ পাণ্ডেং পাহাড়ে একজন প্রেমিককে হত্যা করেছিল সমাজের লোকেরা। প্রেমিকা তাই বিলাপ করে সেই রক্তকে ধুয়ে দিতে বলেছিলো দিনের দেবতা সূর্যকে আর রাতের দেবতা চাঁদকে। বলেছিলো মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ুক।

পাণ্ডেং বুরু নাঁলাং নাঁলাং
গার্তেঞ তিংক মাহকেদে
কিরিহিরি মায়াম লিসিয়াম
সিং চাঁদো দাগমেসে
নিন্দো চাঁন্দো ঞড়িমে

গার্তেঞ তিংগা মায়াম চাঁদো
লিংগি লটম বিন।

সাঁওতালদের লোককথাকে কাদাম ঝরণা কিম্বা ঝরনা বুরু সকড়া, কুদোঘাড়ি প্রভৃতি স্থানগুলো হচ্ছে প্রেমের মুক্তাসন। সাঁওতালদের 'গুতিকোড়া', কৃষ্ণের মতই সর্ববিদ্যা বিশারদ আর 'কাড়মিকুড়ি' রাধার মতই সুদক্ষ প্রেমিকা। গুতিকোড়া আর কাড়মিকুড়ি নিয়ে কত গল্প যে প্রচলিত আছে তার কোন হিসেব নেই।

গল্প এগিয়ে চলে—প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকা গৃহত্যাগ করছে। প্রেমিকা একবার সামনে একবার পিছনে দেখছে, এক পা এগিয়ে গেলেও আর এক পা যেন পিছনে টানছে

মিত পউঁড়ি তাড়াম তাড়াম
বার পউঁড়ি তাড়ামবে ,
তাযম সেতেন কয়স্ বুযাদ
চেলে চেলেকো মেনা কাতাম।

প্রেমিকের জিজ্ঞাসার জবাবে প্রেমিকা বলে—গোমালে কলা আর গায় আছে খাটের উপর ঘুমিয়ে আছে এক খাট এক বীরপুরুষ।

গইয় গোডায়ে গইব মেনাকো
কাডা গোডাবে কাডা মেনাকো
পাবকম পেযেঞ হেবেল মইরিং
বেরেং বাগিরাইদ্

একটি মেয়ের তীক্ষ্ণ অন্তর্জ্বালার চিত্র এর

থেকে আর কি হতে পারে ? গ্রামের মাঝঘরের গুতিকোড়ার প্রেমের টানে একটি পাবানিক বাড়ীর মেয়ের কি অবস্থা হয়েছিল তার গল্প এবার শুরু হয়। একটি অপূর্ব প্রেমের গান শোনা যায় তাদের মুখে।

দুলদুলিবে হায়বে দা ইঁন লালোকান
কঁদোহুড়িবে তিবিয়ো সাডে এন
ঠিলিং বাগায় হডক ররড়া
বাঙ্ সেনরেনা গাতেং আডিস।
হড়ক রড়াদঞ সাহা কেয়া

গাতেঞা আডিসদ ওহোই সাহা পে

অর্থাৎ দুলদুলির ঝর্ণাতে জল আনতে গিয়ে কঁদোহুড়ির জঙ্গল থেকে বাঁশীর শব্দ পেলাম। জলের ঘড়া রেখে আমি যদি সেখানে যাই তবে লোকে এবং সমাজে আমাকে কি বলবে ? আবার না গেলে আমার প্রেমিকের দুঃখ হবে। লোকের কথা সহ্য করা যায় কিন্তু তার গঞ্জনা সহ্য করতে পারবো না।

মেয়েটি সাত ভাইএর একমাত্র বোন। বিরাট ধনীঘরের মেয়ে। ভাইএরা বলে কোন মতেই ঐ গরীব গুতিকোড়াকে বিয়ে করা চলবে না।' তবুও তাদের প্রেম চলতে থাকে। কত মান, কত অভিমান। একদিন নির্দিষ্ট স্থানে গুতিকোড়ার আসতে দেরি হয়ে গেছে। মেয়েটি রাগে ফুঁসছে। আসুক না একবার ? গুতিকোড়া আসতেই মেয়েটি রেগে ফেটে পড়ে বলে—'জানো, আমি গ্রামের পারানিকের মেয়ে। আমার কি কোন ইজ্জত নাই।' গুতিকোড়া তাকে মিনতি করে বলে—'গোয়ালে মোষ-গায় বেঁধে, বাঁশী আর বানাম ঘরে রেখেই দৌড়ে এসেছি।' মেয়েটি বলে—'না তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' গুতি-কোড়া বলে—'তুমি তো জান আমি গরীব, তুমি জানো আমি গুতিকোড়া। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তুমি আমার সঙ্গে মিশেছিলে। যদি সত্যিই তুমি আমাকে ঘৃণা কর তবে বিদায়। আমি চলে যাচ্ছি।' মেয়েটি দেখলো যে, সত্যিই তার প্রাণের গুতিকোড়া চলে যাচ্ছে। তখন সে বলে উঠে—এখন তো যাবেই, আমি যখন কিশোরী, তখন থেকে তুমি আমার। আজ যখন আমি পরিপূর্ণ যৌবনা, তখন তো তুমি ছেড়ে যাবেই। গুতিকোড়া উত্তেজিত হয় সে ফিরে তাকায়

উল বেলএ হবমো তাম হো
বেল সিজো তু-আ তাম হো
নো-আ হরমো, নো-আ তো-আ দো
ওকু-এ লাগাত কান

তোমার শরীরটা যেন পাকা আমের মত রসাল, তোমার স্তন দুটি যেন সুডোল বেল-ফলের বিস্ময়।

কার জন্যে তোমার ওই বুপময় দেহ
কার জন্যে তোমার ওই স্তন-জোড়া

তখন মেয়েটি বলে—

না লো বাবু জাম বোর আছে
না লো বাবু জামবাগ আছে
নো-আ হরমু নো-আ তো-আদো
নো আদো আম লাগাতগে।

হে প্রিয়তম, আমার সম্পর্কে কিছু বলো না, হে প্রিয়তম, আমার দেহ নিয়ে আক্ষেপ করো না। আমার এই কোমল শরীর, আমার এই সুডোল স্তন এ ত কেবল তোমারই জন্য। (আরণ্য জনপদে—আবদুস সাত্তার-১৯৬৬): সাঁওতাল যুবক-যুবতীর কাছে প্রেম যা পবিত্রতার প্রথম ধাপ চোখ ঠারাঠারি এবং তার পরেই গানের মাধ্যমে আবেদন, তার পরই দেহ। দেহ-মিলনকে বাদ দিয়ে তারা প্রেমের কথা ভাবতেই পারে না।

গল্প এগুতে থাকে—বাড়ী ফিরে মেয়েটি জানতে পারে যে গুতিকোড়াকে হত্যা করার জন্য তার সাত ভাই বেরিয়েছে। ছোট ভাই দিদিকে বেশী ভালবাসে। তাই সে বলে দেয় তাদের গোপন অভিসন্ধির কথা। গুতিকোড়া খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। এদিকে এক বড় লোকের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়। দাদারা কন্যা পণের টাকাও নিয়ে নেন। শিকার উৎসবের পর বিয়ে। এদিকে প্রেমিক-প্রেমিকা পালিয়ে গেল। গুতিকোড়া শিকার উৎসব থেকে না ফিরলে বিয়ে করতে পারছে না তার প্রেমিকাকে। মেয়েটি দাদাদের কাছে ফিরে যায়। শিকার উৎসবের দেশ-বিচারের সামনে পাত্রপক্ষ অভিযোগ তোলে গুতিকোড়ার বিরুদ্ধে। দিসুম পারগানাদের সামনে গুতিকোড়া অভিযুক্ত হন। পাত্রপক্ষের অভিযোগ যে পাত্রীর দাদারা কন্যা পণের টাকা নিয়েছে। বিবাহের দিনও ধার্য হয়েছে। কিন্তু এই গুতিকোড়ার জন্য বিবাহ পণ্ড হতে চলেছে। গুতিকোড়া আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে—হে মহামান্য দিসুম পারগানাগণ, আমি মেয়েটিকে ভালবাসি। কিন্তু বিচারে ফল ফললো উল্টো। বহু লোক বরের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বললো যে বর দুশ্চরিত্র ও লম্পট। বহু স্বজাতি মেয়ের সে সর্বনাশ করেছে। দেশ-বিচারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে গুতিকোড়ার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে হবে। তার বরযাত্রী হবে কারা ? সমবেত সমস্ত শিকারীরা, কুটুম্ব ও মিতানেরা। বিয়ের বাজনা বেজে উঠে। এতো বিয়ের বাজনা নয়। এতো ঝড়। মেয়েটি তার ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করে—দেখ তো ওটা কিসের বাজনা, কে আসছে বিয়ে করতে ? আমার মনে হয় দাদাদের পছন্দ করা বর বিয়ে করতে আসছে। ছোট ভাই দূর থেকে দেখে এসে বলে—হাঁ, দিদি আমারও তাই মনে হচ্ছে। মেয়েটি নিজের প্রেমের শপথ নিয়ে বিষ খেয়ে ফেলে। গ্রামের অদূরে বর ও বরযাত্রী যখন এসে পড়লো তখন ছোটভাই এসে খবর দিলো সকলকে যে দিদি বিষ খেয়েছে। গুতিকোড়া তার চৌডুল-পাল্কী থেকে নেমে এসে দেখে সত্যিই তার প্রেমিকা মৃত্যুশয্যায়। প্রেমিকার মাথাটা কোলে নিয়ে গুতিকোড়া অঝোর নয়নে কেঁদে কেঁদে বলে, সমস্ত দেশবাসী আজ আমাদের বিয়েতে মত দিয়েছে। তুমি একবার চোখ খুলে দেখ। মেয়েটি চোখ খুলে, আবছা আবছা চোখে সে চিনতে পারে তার প্রাণের গুতিকোড়াকে। আস্তে আস্তে নিস্তেজ দেহটা তুলবার চেষ্টা করে সে আর বলে ওগো, তুমি, সত্যিই তুমি। বাস, ওইটুকুই, তারপর চিরনিদ্রা। তারপর আর কি, মৃতদেহ কোলে নিয়ে গুতিকোড়ার কি বিলাপ। সাত দিন সাত রাত সে না খেয়ে কাঁদলো আর মরণের সময় বলে গেল তেলকুপীর বাণী ঘাটে আমাদের সৎকার করো।—গল্প শেষ করলেন গড়ুম বাবা যদুনাথ টুডু। বয়সে তরুণ এই সাঁওতাল যুবক যথেষ্ট উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু সাঁওতালদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে খুঁজে বের করার জন্য দলবলসহ সেও গিয়েছিল অযোধিয়া বুরুতে।

'অতমা লালকান, সেবমা মেতুন কান দাবাং দাবাং—সূর্য মাথার উপরে যেন আগুন বৃষ্টি করছে, পৃথিবী যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। জঙ্গলের মুখোমুখি হবে তারা এরপর। একটু জল পেলে ভালো হতো। হনুমাতা আর কুমারী নদীতে স্নান করে তারা চলতে শুরু করেছিলো। মাটি বালি সরিয়ে একটি শুকিয়ে যাওয়া পাহাড়ী ঝর্ণার স্রোত থেকে তারা জল বের করে খেয়ে নিলো। নূতন গল্প শুরু হলো—'একটি যুবক তার অন্তঃসত্বা স্ত্রীকে ছেড়ে শিকারে গিয়েছিল। অনেকেই তার বৌয়ের অবস্থার কথা তাকে স্মরণ রাখতে বলে-ছিলো।'

'রানোপানো বানী এবু হেই হামাল হড়মরে
উতবখানা দক্ষিণ খনাই
সারা বাবু যে সাজাএনা'

কিন্তু শিকার থেকে ফিরে এসে সে দেখে যে প্রসব করতে গিয়ে তার স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেটা আছাড়-পাছাড় করে কাঁদলো। আর মৃতদেহকে নিয়ে গেল সৎকার করতে।

এবার আবার আমরা চলে যাই সেই শিকারের উৎসব শুরু হবার আগে সেই তরুণ কিশোরের গল্পের শেষাংশে। তরুণ কিশোর মায়ের কথা না শুনে জঙ্গলে চলে গেল তার বন্ধুদের সঙ্গে। একদিকে অরণ্য-বনের ভিতরে শিকারীর দল আর ঘরের 'কেন্দালে' বসে, গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছে। এমন সময় 'নিশান পাখী' (পিঁয়ো চেঁড়ে) এনে মায়ের মাথার চুল ধরে টানছে। বোঙ্গা-সংক্রান্ত কোনো দুর্ঘটনার খবর নিয়ে আসে পিয়ো চেঁড়ে। তাই মা আরও ভয় পেলো। দূরে শিকারীদের ফেরার শব্দ। 'ভুড়ি ভুড়ি তাম বাস্কে পটমতাম'। মা দৌড়ে বেরিয়ে এসে দেখে সকলেরই ছেলেরা ফিরলো আর ঘরে ঢুকলো। তাদের মায়েরা তাদের জন্য জল দিল, পা ধোবার জন্য, বোনেরা তাড়াতাড়ি খাবার বের করে দিল। কিন্তু তার ছেলে কোথায় ? মা গ্রামের পূজারী, নাইকি, গ্রামের মাঝি, এদের কাছে গিয়ে আবেদন করলো যে তাঁরা তাঁর পুত্রের খবর রেখেছেন কিনা ?

এহে বাবা নাইকে বাবা
এ বাবা মাঝি বাবা

ইংগ রিনিক বালক
তিংগিন সাঙ্গিনবে।'

যখন কেউ কোন খবর দিতে পারলো না, তখন মা দৌড়ে গেলেন, সুতানটাঙ্গির দিহরীর কাছে। দিহরী দেখছে যে একটা কুকুর চোঁতরা খুব কাঁদছে। দিহরী মানসিক করলো যে কুকুরটা ভালো হয় তবে আমার কাছে আসবে। ক্ষ্যাপা কুকুর হলে পালিয়ে যাবে। বোঙ্গারা দিহরীর মানসিক শুনলো। কুকুরটা দৌড়ে আসে দেহরীর কাছে। তার কাপড়টা ধরে টানতে লাগলো। দেহরী গিয়ে দেখে একটি। 'শারী-শারজম দারে বুটারে' বিরাট শালগাছের নীচে সেই কিশোরকে 'ঝাপুট' করে কোন 'কাল' রূপী বিরাট জন্তু হত্যা করছে। মা কিন্তু বিভিন্ন দেবী দেবতারূপী বোঙ্গাদের উদ্দেশ্যে মানসিক করলেন। পাঁচ দিন আর পাঁচ রাত মা তাঁর ছেলের জন্য কেঁদে, অভুক্ত অবস্থায় সেই অরণ্যবনে আর বিরজবনে ঘুরে ঘুরে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।'

এমনি হাজারো গল্প। যতগুলো দল এসেছিল শিকার করতে তারা অনেক রকমের গল্প করেছে, গান করেছে, নেচেছে আর তরুণদের যৌবনের দীক্ষা দিয়েছে। জঙ্গলের কাছাকাছি শিকারীরা পৌঁছাবার পর দলের দুই ধারে সতর্ক প্রহরী হিসাবে অভিজ্ঞ শিকারীরা থাকবেন। কারণ শিকারীরা জানেন যে, শিকার এমনি ধার দিয়েই পালাবে। মাঝে মূল নেতা। তাদের পিছনে বাজনাদার। নেতার নির্দেশে কোথাই বাজাতে হবে, কোথাই বা বেড়ালের মত চলাফেরা করতে হবে সব কিছু শেখানো হয়। কারণ অরণ্যের একটা ভাষা আছে, যদি কুটরা হরিণ দৌড়ে পালাতে দেখা যায় তবে ধরে নিতে হবে বাঘ কোথাও কাছাকাছি আছে। আবার জঙ্গলের বাঁদরগুলো যদি কোথাও হুপহাপ করে চেঁচামেচি করছে তবে বিপদের সংকেত দেন নেতা। আবার জলাশয়ে বালির উপর 'পা' দেখে অর্থাৎ পায়ের ছাপ দেখে জন্তুর গতি-বিধির কথা জানতে পারা যায়।

এই বছরের শিকারে মোট আটানব্বইটি শিকার জুটেছিল শিকারীদের। অনেক দল তো খালি হাতে উপরে উঠেছে। অবশ্য তাতে তাদের কোনো দুঃখ নেই। শিকার করতে এসে বেঁচে আছে, এটাই তাদের কাছে অনেক। পাঁচটি হরিণ, ছটি বনশূয়র, ষোলটা খরগোষ, বাইশটা তিতির, আঠেশটা বনমোরগ, দুটো ময়ূর আর কাঠবিড়ালী উনত্রিশটা। আরো হয়তো কেউ কেউ পেয়েছিলো।

বনশূয়র শিকারী পুরুলিয়ার হুড়া থানার সহদেব মাহাতোর সঙ্গে কথাবার্তাতে বুঝলাম, যে সে আগে কখনও শিকারে আসেনি। বাজনার উদ্দামতা আর অরণ্যের মাদকতায় সে এসে যোগ দিয়েছিল শিকারী দলের সঙ্গে। দলে মোট চব্বিশ জন যুবক। দলনেতা আলোক মাহাতো বি এ পাশ বেকার যুবক। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সহাদেব মাহাতো বিবাহিত এবং এক সন্তানের পিতা। মহাদেব আগেও শিকারে এসেছেন। জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত বেকার এই লাজুক ছেলেটির হাতে তখনও একটা টাঙ্গি। সহদেবের মুখেই শুনলাম। মহাদেব তার আপন বড়দাদা আর আলোক তার কাকা। সহদেব বলে তার রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী। শিকারীরা একটা 'কচা' ছেড়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে জঙ্গলে ঢুকছে। দেখতে দেখতে তারা গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলো। সহদেব শুনতে পেলো তার দলের লোকেরা চীৎকার করছে 'সামা' 'সামাল' দল এগিয়ে চলেছে। জঙ্গলকে বেড়া দিয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন দল উপরে উঠছে। 'কচা' (একটু ফাঁক করা কোণাকুণি জায়গা) থেকে ভীষণ ঘোঁত ঘোঁত শব্দ। মোটা শাল গাছের গুঁড়ি পার হয়ে সহদেব যেই দাঁড়িয়েছে অমনি সামনেই এক দাঁতাল বনশূয়োর তার দিকে তেড়ে আসে। সহদেবের হাতে একটা টেঁটা। বনশূয়োরটা সামান্য সামনি হতেই সহদেব শকত হাতে চালালো টেঁটা। কিন্তু বনশূয়রের কাঁধের কাছে লেগে টেঁটার লোহা গেল বেঁকে। বনশূয়োরের কাঁধ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সহদেবের বাঁচার কোনো উপায় নেই। বন-বরাহটা তাকে মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে এক আছাড় মারলো। সে পড়লো গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে।

ততক্ষণে আলোক জয়রাম, হেলারাম ছুটে এসেছে। তারও ছোঁড়া চলছে না। মহেশ্বর মাঝি সহদেবকে চেঁচিয়ে বললো যে ছোরাটা চালিয়ে দাও। সহদেব সাহসে ভরপুর। ছুরিটা তার কোমরে গোঁজা ছিল। ছুরিটা বের করলো সে। বনশূয়রটা তখন

ছাতনার হিরো মঙ্গল সোরেন

তার বুকের কাছে। গুঁতোবার জন্য প্রস্তুত। কয়েক মুহূর্ত। সহদেব প্রাণপণ শক্তিতে বনশূয়রের গলাতে ছুরি বসিয়ে দিল। সহদেব গড়িয়ে সরে যায়। বনশূয়রটা তখন গড়াচ্ছে। মরবার আগে সে কি দাপাদাপি। তারপর সবাই মিলে টাঙ্গি, বল্লম দিয়ে আক্রমণ করলো বনশূয়রটাকে। বনশূয়রের মৃত্যু হলো। শান্ত ও লাজুক ছেলে বলে মনে হলেও অসাধারণ মনের জোরে এক দুঃসাধ্য কান্ড করেছে বলে তার মুখে এক গর্বের হাসি। এরপর আরেক বিপদ। ছাতনার একদল সাঁওতাল ও মাহাতো শিকারীরা দাবী করে যে বনশূয়রটা তারা মেরেছে। ভীষণ বাক-বিতন্ডা শুরু হয়। সহদেব, মহাদেব, আলোক, জয়রাম রুখে দাঁড়ায়। তাদের শিকার তারা লুঠ করতে দেবে না। শিকার করতে আসার আগে তারা জেনেই এসেছে যে মৃত্যুও হতে পারে। মরতে তারা ভয় পায় না। তা বলে ন্যায্যতঃ তারা যে শিকার করেছে তা অন্যের হাতে তারা তুলে দেবার আগে বরং মরা অনেক ভালো। শেষে ছাতনার দলের লোকেরা মিনতি করে বলে একটা ফাড়া অর্থাৎ জাঙ্গসহ একটা পা তারা কেটে নিতে চায়। তৃষ্ণায় তখন বুক ফেটে যাচ্ছে আলোকের। আগে জলের সন্ধান করতে হবে। শেষে সে রাজী হয়।

আরও একদল শিকারী শিকারের সন্ধান পেয়ে একটি 'সাতে' (দুদিকে ঢালু খাড়াই মাঝে ঝরনা বয়ে যাবার মত সরু জায়গা) বরাহ ভেবে প্রায় আক্রমণ করে বসে ঘাটশিলা গ্রামের লছকম সিং আর হারু মাহাতো একটি বাচ্চা হাতীকে। কিন্তু হাতীর কান নাড়া দেখে তাদের সন্দেহ হয়। হাতীটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল বলে তারা বুঝতে পারেনি। বাচ্চা হাতীর আর্তনাদে গণেশ

হাতী সাড়া দেয়। সে এক হিমশীতল আওয়াজ। শিকারীরা পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।

গড়বেতার একটি দল যেমন একটি প্রকাণ্ড বনশূয়র মেরেছিলো, তেমনি আবার দু-জন গুরুতররূপে আহত হন। আহত একজন তো গড়ম বাবা যদুনাথ টুডুর সঙ্গে ও আমাদের সহযোগিতায় পুরুলিয়া চলে আসে। ঘাটশীলার গোবর্ধন মাঝির দল মেরেছিলো একটি হরিণ। হাজারীবাগের ডমন মাঝির দল একটি ময়ূরকে তীর দিয়ে গেঁথে ফেলে। চক্রধরপুর আর পোটকার শিকারীরা এক পাল তিতির মেরেছিল। ছোটো বড় সব মিলিয়ে প্রায় দশটার মতো। বাঙ্গারীপোসী, ময়ূরভঞ্জের লুসাই সিং সর্দার আর ধানবাদের রূপু রাজোয়াড়দের দল মেরেছিল দুটো করে খরগোস।

দুপুর থেকেই শিকারীরা সুতানটান্ডি বা যাত্রা টাঁড়ে (উৎসবের জন্য খোলা মাঠে) জমায়েত হতে থাকেন। কেউ কেউ বা সূর্যের প্রচণ্ড তাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য সন্ধ্যা হবার একটু আগে জঙ্গল থেকে বের হন। বেলা তিনটে-চারটে থেকে বিশ্রাম। এরই ফাঁকে অস্ত্রগুলো জড়ো করে নিজ নিজ দলের জন্য শুকনো কাঠ জোগাড় করে প্রৌঢ়রা রান্নার আয়োজন করতে থাকেন। শিকারীদের শিকার করা মাংস নিজ নিজ দলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়। কুকুর থাকলে কুকুরও সমান ভাগ পাবে।

জলের জন্য ব্যস্ততা বেড়ে যায়। কিন্তু পানীয় জল কোথায়? সরকার এদের জন্য মদের ব্যবস্থা করেন প্রচুর, কিন্তু জলের ব্যবস্থা নেই। লুথার্ন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের লোকেরা একটি ঝরণাকে বেঁধেছেন। কিন্তু জল কাদা হয়ে লাল হয়ে গেছে। পানীয় জল নেই। ঝরণার বালী খুঁড়ে, পাথর সরিয়ে জল বের করা হচ্ছে। এ এক অমানুষিক দৃশ্য। কোনো সভ্য দেশে, এরকম ব্যাপার হয়ে পারে সেটা ভাবাই যায় না। অথচ আদিবাসী উন্নয়নের নামে ছাতা পাউরুটি (ফ্যাংগাস যুক্ত পাউরুটি) বিতরণ করার নামে কয়েক বছর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু এই মানুষগুলোর বিরক্তি নেই। কোলকাতার যুব উৎসবে, কিংবা শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলাতে এইরকম ঘটনা ঘটলে কি হতো ভাবা যায় না। সাঁওতালডিহ পাঁচজন তরুণ যুবক এবং একটি নূতন বিবাহিত দম্পতির সঙ্গে আলাপ হলো সেখানে। তাদেরই একজন বললেন— পুরুলিয়া কেন, সর্বত্র আদিবাসীরা এত সহ্য করে বলে চারদিক থেকে মার খাচ্ছে। ভদ্রমহিলা অবশ্য মেলাতে যাননি। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে কয়েকশত উনুনের রান্না শেষ। সেদ্ধ, আধসেদ্ধ, পোড়া, সব মিলিয়ে একটা আদিম পরিবেশ। ক্লান্ত তরুণেরা বিশ্রাম নিচ্ছে। বয়স্করা রান্না শেষ করে সমান সমান খাবার বিতরণ করলেন। আমার আর গড়মবাবার নিমন্ত্রণ ছিলো সহদেবদের দলে। দেখি হরন্যাগড়া, শুগুনি বাসা, ইত্যাদি গ্রামের শিকারীরাও পাত পেড়ে খেলো আমাদের সঙ্গে।

একটি ছোট্ট হাটও বসেছে। হাঁড়ি, চাল, নুন, তেল, পিঁয়াজ, চা, মিষ্টি, পান, বিড়ি, সিগারেটের দোকান। তবে ছোলা ভাজার দোকান বেশী। চোলাই মদের ছড়াছড়ি। টিন-টিন মহুয়ার মদ। মদের নেশায় যেন সারা অযোধ্যা পাহাড় ডুবে গেছে। প্রায় বাষট্টিটা বিভিন্ন দোকানদার জানালেন, তাঁরা কেউ বাঘমুণ্ডী, কেউ বেগুনকোদর, কেউ আড়ষা, কেউ বা উর্মার লোক। তাঁরা জাতিতে কেউ কুম্ভকার, কেউ ময়রা, কেউ বা বেনে। দুজন মাহাতো ও একজন সাঁওতাল দোকান করেছিলেন। তাঁরা পাহাড়ের লোক। সবচেয়ে মজার কথা এই উৎসবে কোনো উচ্চবর্ণের পুরুলিয়ার মূলবাসী বাঙালীদের দেখিনি।

এরপর সেই দীর্ঘ প্রতিক্ষিত রাতের উৎসব। সুবিশাল শিমুল ও বট-গাছের ছায়াঘেরা দু-একটি স্থান ছাড়া সমস্ত প্রাঙ্গণে বৈশাখ পূর্ণিমার চাঁদের আলো অকৃপণভাবে পড়ছে। আকাশ পরিষ্কার। স্থানীয় লোকের ধারণা ও বিশ্বাস যে, রামচন্দ্র বনবাসকালে তিনদিন এখানে অবস্থান করছিলেন। তৃষ্ণার্ত সীতার জন্য লক্ষ্মন এক বানে পাতাল থেকে জলবাহিকে ফোয়ারার মত টেনে এনেছিলেন। সীতা চাটানীর ঘন গাছ-গাছালিতে চুলের মত কালো কালো শিকড়। আদিবাসীদের বিশ্বাস এই চুল প্রেমিকার খোঁপায় দিলে চুল আরো কালো হবে। মেঘের মত কালো। তাই শাল পাতাতে সেই চুল সংগ্রহের হুড়াকাড়ি পড়ে যায়।

রাত্রের অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে অভিজ্ঞ ও কুশলী গাইয়ে ও বাজনদাররা। প্রায় দু-তিনশো গজ দূরে দূরে এক একটা 'আখড়া' তৈরী হয়। নিজ নিজ এলাকার দেহরীরা কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের দেহরীর অনুমতি নিয়ে শাল গাছের ডাল পুতে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কেন্দরী, বানাম আর তুরিষোতে শুরু হয় গানের অনুষ্ঠান। এই গান আদিবাসীদের মনে ও দেহে তীব্র শিহরণ আনে। যৌনতা ও যৌবনের জয়গানে মুখরিত হতে থাকে আকাশ বাতাস। এবারে প্রায় বাইশটি আখড়া তৈরী হয়েছিলো এবং এক একটি আখড়াকে ঘিরে প্রায় পাঁচশো থেকে এক হাজার দর্শক। যাঁরা ঐ সংস্কৃতির লোক। কোথাও কোথাও হ্যাজাকের আলো। কোথাও বা বিরাট অগ্নিকুণ্ডের রোশনাই, কোথাও বা বিনা আলোতেই অর্থাৎ শুধু মাত্র চাঁদের আলোতেই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে এ এক আশ্চর্য পরিবেশ। শিক্ষিত ও বাবু সমাজে এসব গান অশ্লীল। সেখানে লঘু-গুরু জ্ঞান ও ব্যক্তিগত সত্তার অহমিকা খুব বেশী। পিতার মুখ থেকে পুত্র কোনদিন যৌবনের আলোচনা শুনতে পারে না সেখানে। ভদ্রতা ও সভ্যতার এই হলো রীতি। কিন্তু এখানে, ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা মনে করে যত তাড়াতাড়ি কিশোর পুত্র বা ভ্রাতা নাবালক থেকে সাবালক হবে ততই মঙ্গল। জেনারেশন গ্যাপের প্রশ্নই ওঠে না। সংহত গোষ্ঠী চেতনার সামগ্রিক বিকাশের এত সুস্থ পথের খোঁজ ভদ্রলোকেরা বা আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তকেরা ভেবে দেখতে পারেন। যত তাড়াতাড়ি তরুণ কিশোরেরা খাদ্য-উৎপাদনে অংশ নেবে, পরিবার তথা সমস্ত গোষ্ঠীর পক্ষে ততই মঙ্গল। গোষ্ঠীচেতনার এত সমৃদ্ধ মূল্যবোধ, উঁচু নীচু ভেদাভেদ-পুষ্ট, লঘু-গুরু জ্ঞানের চেতনাতে আবদ্ধ ভদ্রলোক বাঙালী, বিহারী ও উড়িষ্যা সমাজের মানুষ চিন্তাই করতে পারে না।

তাই লঘু গুরু জ্ঞানের বেড়া ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এটাই তাদের বিশ্বাস। কারণ সামনে আসছে কৃষিকাজের সময় বা বতর। তেরই জ্যেষ্ঠ রোহিনী পরব। রোহিনীর দিন থেকেই আফবের ধান মাঠে ছড়াতে হবে। সে ধান থেকে হবে চারা। সেই চারাই পরে অন্যান্য ক্ষেতে রোপণ করা হবে।

সেই সোনাঝরা পূর্ণিমার চাঁদ—গান শুরু হয় আখড়া বন্দনা করে।

আখড়া বন্দনা করি
বন্দনা দিহরী বুড়া,
বন্দনা করি পাবগানা
আজরে বৈশাখের পূর্ণিমা রাতি

বৃষ্টি পড়ুক। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ুক। সকলেই কামনা করে মারাংবুরু বড় পাহাড়ের উদ্দেশ্যে—

স্বরগরের হুরু হুরু
পৃথিমিতে ধুলি ছিলো
উড়িলো
ধানের শিষ ছিল মরিলো
মানুষের ছাতি ছিল ফাটিল
পুরবে উনাল মেঘ
পশ্চিমে ডুবিল গো।

এবার শুরু হয় যৌবনের গান—

হাঁড়কা নদীর বান আলবে
জাগ ডুবে নাই মন ডুবে গেলবে

অন্য আখড়াতেও তখন চলছে গান

আমার ডালিম পাকে কাল হলবে
যাকে দি নাই তালেই বাগ হলবে।

গানগুলির সুর ও কথা এমন যে লোকালয়ে এই গান গাওয়া রীতিবিরুদ্ধ। ধান রোপণ করার সময়, ঝমঝম বৃষ্টিপাতের শব্দে কামিনদের গলাতেও শোনা যায় এই উধ্বাগান। অবশ্য সে পরিবেশ আলাদা।

তাঁই হামার মাথার সিঁদুরে
কেন্দ পাকেছে, আসাম গেলিবে।

আসামের চা-বাগানে কুলি চালান করার কথা এই গানটিতে মনে করিয়ে দেয়। খুঁঠোড়ি গ্রামের কদম মাহাতো, মহকম সিং আর কৈলাস মাহাতো গেয়ে ওঠে

ছুঁড়া ছাড়ে দে ভিনসাব হলবে
ভুরখা ইপিল দুয়ারকে আলরে

মহকম সিং-এর মাথায় পাগড়ী। তাতে তিনটে ময়ূর পালক গোঁজা—গান বলছে সে। আর বিভিন্ন যৌন আবেদনের অঙ্গভঙ্গী করে দর্শকদের বিশেষ করে যুবক ও কিশোরদের অংশগ্রহণ করতে বলছে। উকিল সরেন গ্রাম ভালকি, থানা পটকা, জেলা সিংভূম থেকে এসেছিল তার দলবল নিয়ে। সে নিজে

'সিংরাই' নাচ নেচে চলেছে, বানাম সহযোগে গানও গাইছে। সাঁওতালদের আখড়াতে চলছে আদিম উল্লাস। মাঝে মাঝে সে ভাষ্য সহকারে গানের কথা ও তৎসংলগ্ন গল্প বলে চলেছে।

স্মরণ রাখা দরকার এই উৎসবে মেয়েদের যোগদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ডব্লিউ জি আরচার মন্তব্য করেছেন—

> For staging these performances, a special class of Santal is required. He is not, in origin, different from the tribesman and infact any member of any clan may accume this strange exacting role .At the same time the part he plays is full of danger for his stark exposed sex must on no account be witnessed by a woman. If a woman chanced to view his organ and cursed it, he would become impotent for the remainder of his life".

গান আর নাচ যখন উদ্দাম গতিতে চলছে তখন হঠাৎ একটি অর্ধ-উলঙ্গ ব্যক্তি ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে আখড়াতে ঢোকে। যৌনভাব আবেদনে তরুণ ও কিশোররা উদ্দাম হয়ে ওঠে। অনেকেই অনুরূপ ভঙ্গী করতে থাকে। আরচার সাহেবও অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

> A moment later comes a nude joker, moving behind them, leaping stiffly like a frog or gently skipping in their tracks As he bounces round, he losses his penis, jerking it sometimes at the buttocks of the leaders and sometimes in the faces of the audience

অবশ্য ডঃ বঙ্কিম মাহাতো মনে করেন যে সমস্ত রকম গ্রাম্য দেবদেবীর পুজোতে ঝাড়খণ্ডের মেয়েদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। তাপস গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন অযোধ্যার শিকারি উৎসব বা দিসুম সেন্দরা আদিবাসি কিশোরদের যৌবন দীক্ষার দিন।' বিভিন্ন আখড়াকে ঘিরে ওই আদিম অরণ্যের বুক জুড়ে মাটির সবচেয়ে কাছাকাছি দশ-বারো হাজার কিশোর ও যুবকদের যৌবনদীক্ষা শেষ হতে চললো। তারই মাঝে দর্শকেরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন আখড়াতে গিয়ে সমবেত সকলকেই প্রণাম জানাচ্ছে।

কোথাও কোনো দুর্ঘটনা নেই, নেই কোনো বিশৃঙ্খলা। ঝাড়খণ্ডী মানুষের মিলন তীর্থক্ষেত্র এক মাদারী রাতের জন্য অপরূপ হয়ে উঠছে। তারা কেউ বা কারুর সঙ্গে ফুল পাতাচ্ছে, কেউবা নূতন বন্ধু ও আত্মীয়ের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, কেউবা নূতন গান শিখছে। তাপস গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষাতেই বলতে হয়—কিশোর তার দেহ সম্বন্ধে অসচেতন। এতকাল জানতো না সে জীবিকার রহস্যও। সারাদিন বনে বনে ঘুরে শিকারী প্রয়াসে সেই রহস্য এখন তার কাছে পরিষ্কার। এবার তাকে জানানো হচ্ছে জীবনের আদিমতম বর্ণপরিচয়। নাচের অঙ্গভঙ্গীতে গানের ইঙ্গিতপূর্ণ উল্লাসে কিশোররা মাতাল হয়ে উঠেছে। মদ ও মাংসের প্রতিক্রিয়া জেগে উঠছে। এক সময় জ্যোৎস্নাযোয়া অযোধ্যা পাহাড় বনের বাঘের চেয়েও অশান্ত হয়ে উঠল।' ক্লান্ত দেহগুলো এলিয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে নেশার টান আর ঘুমের টানে বাজনার বোল থেমে থেমে বাজে। আর বিছানা? প্রকৃতির সন্তানেরা প্রকৃতির উপর শুয়ে পড়েছে। ভুরখা ইপিল (শুকতারা) উঠবার আগে রেগড়া টামাকে বোল উঠবে। 'ভুড়ি ভুড়ি তাম, বাস্কে পটমতাম।' আধো আধো ঘুম জড়ানো চোখে সবাই উঠে পড়লো। লোক গোনা হলো। এবার নামার পালা। মাটাবুরু, অযোধিয়া বুরুর প্রতি ভক্তিপূর্ণ মোহার জানিয়ে, আলিঙ্গন করে শেষ করে তারা। ভোর হয়ে আসছে। উর্মা ষ্টেশনে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। ঝাড়গ্রামের সবু সর্দার গান শিখেছে তামাড়ের বীরবল মাহাতোর কাছে। লোকালয় পৌঁছবার আগে সে শেষবারের মত গেয়ে নিল গানটা—

> তুঁই মানসিক কর, জোড়া ভেড়া লো
> তবে পাবি শিকারা মরদ লো।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ডব্লিউ জি আরচার, ১৯৭৪, দি হিল অফ ফ্লুটস লাইফ, লাভ অ্যান্ড পোয়েট্রি ইন ট্রাইবাল ইন্ডিয়া, এ পোর্ট্রেট অফ দ্রি সান্থাল—লন্ডন।

২। আবদুস সাত্তার—১৯৭৫: অবহেলা জনপদে আদিল ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ঢাকা।

৩। ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার, ১৮৭৮, দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল, দিল্লি ১১০০০৬

৪। পি সি রায়চৌধুরী, ১৯৬৫, বিহার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, সাঁওতাল পরগণা, পাটনা।

৫। সুরজিৎচন্দ্র সিনহা, ১৯৫৮—চেঞ্জেস ইন দি সাইকস অফ ভূমিজ ফেলটিভাল, জার্নাল অফ সোস্যাল রিসার্চ; রাঁচী।

৬। নবেন্দু দত্ত মজুমদার, ১৯৫৬, দি সান্থাল এ স্টাডি অফ কালচার চেঞ্জ—কলিকাতা।

৭। বঙ্কিম মাহাতো, ১৯৭৮, ঝাড়খণ্ডের লোক সংস্কৃতি, কলিকাতা।

৮। তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ই মে, ১৯৭৩, আনন্দবাজার পত্রিকা।

পশুপতি প্রসাদ মাহাতো
১৯৭৮
(ক) পুরুলিয়ার মানুষের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা
পুরুলিয়া মেলা
পুরুলিয়া, ৭৮ মেলা কমিটি
(খ) দুর্ভিক্ষ, বিদ্রোহ ও আদিবাসী সমাজ (পাণ্ডুলিপি)

আলোকচিত্র নিখিলপতি প্রামাণিক

মৃত হরিণের স্বাদ নিতে ান লেখক

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

॥ চব্বিশ ॥

কোনাব কাছে লরির জট রাস্তা বন্ধ করে ফেলেছে। দিলীপ পিছিয়ে গিয়ে তে-মাথানীব মোড়ে এক ধাওয়ায় ঘসলো। তাবপব গবম গবম মাটন কবিবাজির সঙ্গে দু' বোতল বিয়াব নিয়ে বসলো।

ঘন ছনের ঢালু ছাদ। মাটিব মেঝে। কাঠের বেঞ্চ। তার ভেতরে ফিজ। ইলেকট্রিক। বাইবেই কড়া শীতে জ্যোৎস্নার পাতলা প্রলেপ মাখানো কুয়াশা। লরির রাগী হেডলাইট। মাঠেব ভেতরে হাই টেনশন তার থেকে এখানকার লাইন টানা। বেঞ্চে বসেই ধাওয়াব পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছিলো। যেমন হয় আব কি। নাবাল জমি, ধান কাটা মাঠে কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠা কুয়াশা আর ধোঁয়া। অনেক-দূরে কোথাও বিচুলি বোঝাই গো-গাড়ির গাড়োয়ান লেজ মোচড়ালো। ডব্বা-ডব্বা বার—। সবই ধোঁয়াটে। এর ভেতর চোখের সামনে ধাওযাব গায়ে পার্ক কবাদো অস্টিন টারোবটাই শুধু পরিষ্কার। বাস্তাব আলোর সঙ্গে ধাওয়াব আলো পড়ে পাদানীর ব্রাস চকচক করছে। চাকাব স্পোক অ্যালুমিনিয়ম বংয়েব। আজ সাবাটা দুপুব-বিকেল-সন্ধ্যার অনেকখানি কালু ঘোষ সাজতে চলে গেছে তার। পৃথিবীতে এমনও একটা গাঁ আছে? এখনো তার কানে বাজছে। কালু ঘোষ কি জয়। কালু ঘোষ কি জয়।

বেয়াবা এক প্লেট মাটন কবিবাজি আর দু' বোতল বিয়ার বাখলো নড়বড়ে টেবিলে। আর একটা গ্লাস। ওপেনাব—।

দিলীপ বললো, আরেক প্লেট কবিরাজি দেবে। আবেকটা গ্লাস।

ধাওয়াব ছোকরা বললো, আরেক সাহেব আসবেন?

সে তো তোমার দেখাব দরকাব নেই। যা বলছি তাই দাও।

ছেলেটা অবাক হয়ে ফিরে গেল। একজন খদ্দেব। অথচ ডবল কবিরাজি। ডবল গ্লাস!! এবকম সে কোনদিন দেখেনি।

বড় চুলোয় সুগন্ধী ঘুগনি রান্না হচ্ছিল। বাতাসে তার আন্দাজ পেয়ে মনটা খুশীতে ভরে গেল দিলীপের। বড় তাওয়ায় কাবাব ভাজার চ্যাকছোক ঝোলানো তাবের ব্যাগ ভর্তি লাল টুসটুসে টমেটো। সামনেই চওড়া বাস্তা দিয়ে শুধু যাতায়াত। লরি, মানুষ, গো-গাড়ি, টেম্পো প্রাইভেট—কত কি। জায়গাটাব ভাবটাই হোল—খাওদাও বওনা হও। সামনে চেক পোস্ট। বাম্পঃ বাইপাস। থানা। পোল আছে। সাবধান—শার্প বেন্ড। স্কুল আছে। বাজার এলাকা। লোকালয়। সাবধানে চালাতে হবে। স্পিড্ বাড়ালে চলবে না কিন্তু।

ছোকরা আরেক প্লেট কবিবাজী—স্যালাড্—খাট্টা—আরেকটা গ্লাস টেবিলে রাখতেই দিলীপ বললো, একটা ওয়েস্ট প্লেট দাও।

নিচে ফেলুন। কিছু হবে না।

না। নোংরা করে খাবো কেন? নিয়ে এসো। ঝোল চাইনি। স্যালাড্ চাইনি। একটা একস্ট্রা প্লেট দিতে পারবে না?

ছোকরা গোড়া থেকেই অবাক হয়েছিলো। খদ্দের একজন। আয়োজন দু'জনের। আরেকজনের তো দেখাই নেই। গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট কিনুক—কি পেচ্ছাব ফিরুক—তাতে তো এত সময় লাগার কথা নয়।

ধাওয়ার ভেতবটা উঠোনের সাইজের। ছোকরা ছুটে গিয়ে প্লেট এনে রাখলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চাদ্দিক জুড়ে সোরগোল উঠলো। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার।

একজন বাঙালী ড্রাইভার দূরে বসে ছিলো। সে বললো, বড় লাইন গেছে। ফিরতে দেরি হবে—

দিলীপের সামনে টেবিলের উল্টোদিক থেকে কালু ঘোষ বললো, তাতে কি। এখুনি হ্যাজাক জেলে দেবে খন।

এসে গেছো। নাও। আন্দাজে ঢাললুম কিন্তু। ফুরোলে বলবে—

সে তোমায় বলতে হবে না।

মাটন কবিরাজি দিয়েছে। দেখে খেয়ো।

ওসব আবার কেন? ও তুমি খাও দিলীপ।

সারাদিন খাওনি। খেয়ে নাও কালুদা। এখনো কলকাতা পৌঁছতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে। ফিরে গিয়ে কোন দোকান তো খোলা থাকে না। পেলেও খাবার থাকবে না কিন্তু।

আমার আবার পৌঁছানো। আমার আবার খাওয়া!!

কেন? ও কথা বলছে কেন কালুদা?

আমি তো কোথাও পৌঁছাই না। কোথাও যাই না দিলীপ। কোথাও কিছু যাই না।

তবে এই যে আমরা ঘোষকাঠি পৌঁছলাম। সারা বিকেল—সারা সন্ধ্যে থাকলাম সেখানে?

আমি কোথাও আসি। এই যেমন এখানে এসেছি। কোথাও যাই না। সেখানে শুধু আসি। থাকি।

হেঁয়ালী রাখো কালুদা। ওই তো দিব্যি চো চো করে খাচ্ছো।

ও তো শকত জিনিস নয়। আজ সকালে তো সিঙ্গাড়া খাইনি। খাওয়াতে পেরেছিলে?

কষ্ট করে চেখে দ্যাখো না। ভালো রেঁধেছে মাংসটা।

খেতে পারবো না দিলীপ। গলা দিয়ে নামবে না।

খুব পারবে। মুখে দিয়ে দ্যাখো। চমৎকার রেঁধেছে।

না। গলায় লাগবে। তারচেয়ে বরং আরেকটু ঢেলে দাও। গলা শুকিয়ে কাঠ।

তোমার কেন শুকোবে কালুদা? শুকোবে তো আমার। কেমন লেকচার দিলাম

একখানা। একবারে কালু ঘোষ কি জয় পণ্ডে গেলো ঢেলে দিতে দিতেই কথা বলছিলো। মাংসটা খেয়ে নাও।

পারবো না দিলীপ। গলায় গুলি লেগেছিলো দুটো।

সেই লেভেল ক্রসিংয়ে?

আমি তো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারী লোক। তাই—

কে বলেছে কালুদা?

কেন। যারা গুলি করেছিলো।

দিলীপ আর কথা বলতে পারলো না। মুখ ভর্তি হয়ে গেছে মাংসে। চিবিয়ে ছিবড়ে ফেললো ওয়েস্ট প্লেটে। ওকি? এর ভেতর তোমার গ্লাস খালি? উহু। এত তাড়াতাড়ি ভালো নয়। রয়ে সয়ে খাও।

আমি আর রয়ে সয়ে খেয়ে কি করবো। রোজ তোমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির বেসমেন্টে রাত বাড়লে ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজ পাই। ঘটাঘট করে ইলেকট্রিক ট্রেন এসে পড়ে। লেভেল ক্রসিংয়ে গেট পড়েছে। আটকে গেছি গাড়িতে। গেট খুললেই ক্লাচ খানিক এগিয়ে বাঁ হাতে সুবুদ্ধিপুরে যাওয়ার একটা ভালো রাস্তা পেয়ে যাই।

ওখানেই তো তোমার বাগানবাড়ি? একদিন গেলে হয়—

হ্যাঁ। যেতে পারো। যে কোন দিন গেলেই হয়। এতদিনে আমার বাসানো গাছপালায় ফুল এসেছে। গাছ বড় হয়ে ছায়া দিচ্ছে লোককে। বেড়াতে যেতাম ওখানে। মাছ ধরতাম পুকুরে।

একদিন ধরলে হয়। বড় মাছ আছে?

বুই কাতলা তো বড় হওয়ার কথা। দেড় কেজি—দু কেজি সাইজের হয়েছে হয়তো।

দ্যাখো গিয়ে পাড়ার লোকে তুলে নিয়ে গেছে এতদিনে—

না। তা পারবে না। অনেক জল। অটোমোবিল ইণ্ডিয়া পাহারা বসিয়েছে। দু'জন গুর্খা দরোয়ান। স্টেট ভার্সাস দায়রা কেসে আমার মেয়ে তো সমন পেয়ে এলো বলে। যেদিন আসবে সেদিন এয়ারপোর্টে যাবো আমরা—

চিনতে পারবে দেখে?

তা সত্যি! অনেককাল তো দেখাই হয়নি। আজ টরেণ্টো. কাল লণ্ডন করে বেড়ায়। কী সব ইণ্টারন্যাশনাল না কি।

অনেক খবর রাখো দেখছি।

তা কী করবো? তুমি তো বেসমেন্টে গাড়ি তুলে দিয়ে গুডনাইট করে লিফটে উঠে পড়ো। সারা রাত গাড়িতে বসে কাটানো যায়? তখন একা একা সব ঘুরে দেখি। তত্ত্বতাবাস করি। রাত বাড়লে ইলেকট্রিক ট্রেনের সেই হর্ন আমার মাথা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেয়। আর ঘটাঘট। ট্রেনের আওয়াজের ভেতরেই পরেন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে ওরা আমার গলায়, মাজর খুলিতে গুলি করে। বোঝে রাতে। আমি বাধা দিতে গিয়েও পারিনি। দায়রায় তিন আসামীই বলেছে—আমি নাকি সমাজের ক্ষতিকারী লোক। বোঝে রাতে এই এক বিপিট লোক।

চলেছে তো চলেছে—থামে না—একদিনের জন্যেও বন্ধ হয় না।

চলো তোমার বাগানবাড়িতে একদিন পিকনিক করে আসি।

বেশতো।

জায়গাটাও দেখা হবে। ছিপ নিয়ে যাবো। সারাদিন বড়শী ফেলে বসে থাকবো।

ছিপ নিতে হবে না। আছে ওখানে।

খুব ফূর্তি হোতো বাগানে—

তা হোতো দিলীপ। অটোমোবিল ইণ্ডিয়া তো দেখতেই হোত। তাছাড়া আমি কলকাতার বাছাই সিটিজেনদের একজন। কতগুলো কোম্পানীতে ডিরেক্টর। সুটিং ক্লাবের প্যাট্রন। টার্ফ ক্লাবের মেম্বর। সাতশো জায়গার সভাপতি। একটু রিলাক্স করতে তো যেতেই হোত।

মেয়েছেলে?

কেউ কেউ নিয়ে গেছে—

তুমি কালুদা?

নিয়ে গেছি। সাঁতার। বান্না। গান। হৈ হুল্লোড়। তারচেয়ে বেশি কি আর হবে—

হয়ে থাকলে দোষের কি?

হয়তো হয়েছে কখনো। সবার ভ্যালুজ তো একরকমের নয় দিলীপ। কাউকে তো জোর করে নিয়ে যাইনি ওখানে।

সবই ভল্যান্টারি।

হ্যাঁ দিলীপ।

নট এ ফিউডাল অ্যাড্‌ভেঞ্চার!

ইয়েস।

একদম ওয়ার্কিং উইকএণ্ড।

ঠিক ধরেছো দিলীপ। কিন্তু ওরা আমায় লেভেল ক্রসিংয়ে পেয়ে গুলী করে দিলো। বোঝা আর কাকে বলে। আমি নাকি সমাজে ক্ষতিকারী লোক।

কথাটা শুনলে কোথায়?

পরদিন ওদের কাগজে দেখেছিলাম। আমি খতম হওয়ায় কীর্তিধরদের অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে এক কলম ধিক্কার দেওয়া হয়।

একদম পরদিনই দেখে ফেললে—

কোন কাজ ছিলো না। কি করবো? আমার বডি তো তখন পুলিশ মর্গে।

কর্মী নিয়োগ কমিশন

কেন্দ্রীয় আবগারী, আয়কর ইত্যাদি দপ্তরে ইন্সপেক্টর নিয়োগ পরীক্ষা হবে ২৬ নভেম্বর, ১৯৭৮।

প্রায় ৫৪৫টি ইন্সপেক্টর এবং ১৪২টি আপার ডিভিশন ক্লার্কের শূন্যপদ এই পরীক্ষা থেকেই পূর্ণ করা হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ এবং দরখাস্তের অনুলিপি ৮ জুলাই, ১৯৭৮ তারিখের এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ উইকলি/রোজগার সমাচারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৩ খৃঃ জুলাই থেকে ১৯৬০ খৃঃ ১ জুলাই-এর মধ্যে যাঁদের জন্ম, একমাত্র তাঁরাই দরখাস্ত করতে পারবেন। সিডিউল্ড কাস্ট/সিডিউল্ড ট্রাইব/অবসরপ্রাপ্ত সেনাবিভাগের কর্মী এবং নির্দেশিত অন্যান্য কয়েকটি শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমা কেবলমাত্র শিথিলযোগ্য।

প্রার্থীদের কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বা সমতুল ডিগ্রি থাকা চাই। যাঁরা পরীক্ষা দিয়েছেন অথবা পরীক্ষার ফল বেরোয় নি, তাঁরা দরখাস্ত করার অধিকারী নন।

ফিঃ ২৮ টাকা (সিডিউলকাস্ট ও ট্রাইবদের ক্ষেত্রে ৭ টাকা) দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত সেনাবিভাগের ব্যক্তিদের কোন ফি দিতে হবে না।

সমগ্র দেশের ২৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে এবং প্রার্থীরা যে কোন একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

৮ জুলাই ১৯৭৮ খৃঃ এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ উইকলি/রোজগার সমাচারে পরীক্ষা বিষয়ে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে যেসব বিবরণ চাওয়া হয়েছে, সে সব সাদা কাগজে উল্লেখ করে পাঠাতে হবে।

সম্পূর্ণ দরখাস্ত ৭ অগাস্ট, ১৯৭৮ খৃঃ তারিখের আগেই কমিশনের নতুন দিল্লী / এলাহাবাদ / বোম্বাই / কলকাতা / মাদ্রাজ অফিসে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

ডিএভিপি-৫৬২(৭)।৭৮

রাতারাতি অন্যসব কাজকর্ম একদম ফুরিয়ে গেল।

কথা হচ্ছিলো, আর দিলীপ লক্ষ্য করছিলো—টেবিলের ওপাশ থেকে কালু ঘোষ মটন কবিরাজির পুরো প্লেটটা তার দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। তার জারের গ্লাসের পাশ থেকে প্রায় ফাঁকা বিয়ারের বোতলটা এদিকে চলে গেল।

ধাওয়ার সেই ছোকরা উঁচু টুলে হ্যাজাক বসিয়ে দিয়ে দিলীপের বারোয়ারী টেবিলে তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ বড় হয়ে গেল। দিলীপ দেখতে পেয়ে মনে মনে হাসলো। বাইরে গম্ভীর। ছোকরা টেবিলের কাছে এলো। মুখোমুখি দুটো খালি গ্লাস। গ্লাসের ভেতর বিয়ারের ফেনা। মুখোমুখি দুটো ফাঁকা বোতল দাঁড়ানো। পাশাপাশি দুটো ফাঁকা প্লেট। ওয়েস্ট প্লেটে চিবোনো হাড়ের স্তূপ।

আপকা দোস্ত আয়া থা ?

এসেছিলো। কেন ?

নেহি। কাঁহা গয়া ?

কি দরকার ?

ছোকরা বোকা বনে গিয়ে ধার করা হিন্দিতে বললো। ইউহি।

টেবিল সাফ করো। আর এই টাকা ভাঙিয়ে বাকিটা ফেরৎ দাও।

লোডশেডিংয়ের ভেতরেই অস্টিন ট্যুরার ফের ছুটলো। কিন্তু ছুটবে কি। সারা রাস্তা জুড়ে লরির স্লট। দাঁড় করানো লরির সাইলেন্সার দিয়ে ডিজেলের কালি। কেউ তো স্টার্ট বন্ধ করেনি। একটু একটু করে সবাই এগোচ্ছিল। ত্রিপল ঢাকা বড় বড় লরির গা থেকে কোথাও লোহার রডের ডগা—কোথাও বা কয়লার চাক বেরিয়ে-ছিলো। সেসব লরির নাকের ডগা দিয়ে লোম ঢাকা কুকুরের কায়দায় অস্টিন ট্যুরারটা এদিক সেদিক দিয়ে গলে গলে এগোচ্ছিলো।

এক লরি ড্রাইভার তো চমকেই গেল। সে তার উঁচু সিট থেকে দেখতে পেলো—অস্টিনটার স্টিয়ারিংয়ে বসা এক বাবু গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছে। আবার হাসছেও মাঝে মাঝে। পথ না পেয়ে গাড়িটা তার লরির সামনে দাঁড়ানো। তারও চোখ বড় হয়ে গেল। আজব কাণ্ড। স্টিয়ারিংয়ের বাবু কথা বলে যাচ্ছে। পেছনে ফিরে ফিরে। স্টিয়ারিংয়ে চোখ রেখে। অথচ পেছনের সিটে কেউ নেই। পাশেও কেউ নেই বাবুর।

লরি ড্রাইভার নিজের চোখ ডলে ভালো করে তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে বসে থাকা ঘুমন্ত হেল্পারকে এক ধাক্কা দিয়ে জাগালো। অস্টিনটা ততক্ষণে সামনের লরির পাশ কাটিয়ে আরেকটা ফাঁকের ভেতর গলে গেছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দিলীপের ঘুমে চোখ বুজে আসছিলো। নিউ রোডে পড়তে পড়তে রাত বারোটা। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে কানের দুদিক শিরশির করে উঠছিলো। বেসমেন্টে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে দিলীপ গুডনাইট করলো। অটোমোটিক লিফটে ঢুকতে ঢুকতে সে পরিষ্কার শুনলো, হুডখোলা ট্যুরার থেকে কালু ঘোষের গলা—গুডনাইট।

ডোর বেল বাজতেই দরজা খুলে গেল। রাণী দাঁড়ানো। তার কোলে মাথা দিয়ে রবির ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। এখনো জেগে ?

কার কথা বলছো ?

তোমরা দুজন—

সন্ধ্যে থেকে খেলছিলো বিছানায় বসে। ওর পিসির সঙ্গে। মাথা গরম হয়ে গিয়ে ঘুম আসছিলো না ওর। এই ঘুম পাড়ালাম। গান গেয়ে—গল্প বলে।

ভাগ্যবান বলতে হবে। আমি তোমার গান শুনিনি কতদিন বলতো ?

হাত পা ধুয়ে খেতে এসো।

কটা ?

কখোন ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি একা একা টেবিলে বসে খেতে পারিনে।

কে তোমার জন্যে জেগে বসে থাকবে বল তো?

তুমি বোসো। খাওয়া হয়ে গেছে রাণী ?

না। আমি রাতে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি তো অনেকদিন।

কোনো খোঁজই রাখি না বাড়ির। না খেয়ে খেয়ে শেষে একটা অসুখ বাঁধাবে।

রাতে না খেয়ে বরং ভালো আছি আমি। তুমিও খাওয়া ছেড়ে দাও এক-বেলা। এখন তো বয়স হচ্ছে আমাদের।

পাগল! আমি না খেলে মরে যাবো। এই তো সন্ধ্যেবেলা মাটন কবিরাজি খেলাম।

তাহলে আজ রাতটা উপোষ দাও। কি চেহারা হয়েছে তোমার দেখেছো ? অফিস যাও না কতদিন।

যেয়ে কি হবে। অনেক ছুটি জমে আছে।

ফোন এলে যাও না। ফোন ধরো না। জবাব দাও না। চাকরি থাকবে শেষে ?

পাকা চাকরি। তা অত সহজে যায় না। আর গেলেই বা।

কি হয়েছে তোমার বল তো?

পরে বলবো। খেতে দাও।

ওকে রেখে আসি।

ফিরে এসে রাণী বললো, সনাতনকে ছাড়িয়ে দিলে। ভালো গাড়িটা বসে বসে নষ্ট হচ্ছে। কোত্থেকে একটা বদখদ দেখতে গাড়ি এনে তার পেছনে সারাটা দিন কাটাচ্ছো। কোথাও যাও কেউ জানে না। ফোন এলে আমি বলতে পারিনে—। ভালো কথা। আজ যেন কে একজন ফোন করেছিলেন—

মনে করে দ্যাখো। না মনে পড়লে কাল সকালে ভেবে দেখো। ঠিক মনে পড়বে। খেতে দাও।

খেতে খেতে দিলীপ বললো, রবির ছেলেটা সোহাগ কুড়োনোর একশেষ। রোজ কাঁচা ঠাকুমার গান শুনছে।

আমি আর কাঁচা আছি নাকি!

দেখে কে বলবে—তুমি একজন ঠাকুমা।

তাহলে চেহারা রাখতে জানি বলো!

কোমর সরু রাখতে এমন জোরেই সায়ার দড়ি বাঁধো যে গোল হয়ে কালসিটে পড়েছে। দেখেছো ?

ফিক করে হাসলো রাণী। এত রাতে অত ভাত খেয়ো না। শরীর খারাপ হবে। সেই একই নিঃশ্বাসেই রাণী বললো, দাগ পড়লো। তাতে কি। আমার দিকে তাকাও তুমি ?

সব গান তো প্রবোধের জন্যে গেয়ে রেখেছো। আমার জন্যে তো কিছু আর পড়ে নেই।

বাজে বোকো না। প্রবোধ এসে কখানা গান শিখিয়েছিলো বিয়ের আগে। তারপর আর কি। কোন যোগ নেই।

প্রবোধ তোমায় চুমু খেয়েছিলো ?

রাণীর চোখ অন্যরকম হয়ে গেল। চেষ্টা করেছিলো।

কি রকম ?

এই—গলার কাছে ঠোঁট এনে ঘষতে ঘষতে মুখখানা ওপরের দিকে তুলছিলো।

তুমি কি করলে তখন ?

সরে গেলাম।

ব্যাস্। আর কিছু নয় ?

আর কি করে বোঝাবো তোমায় ? এক-গল্প এ ক' বছরে কত হাজারবার বললাম—তাও তোমার বিশ্বাস হলো না ?

পান দাও একটা। আছে তো ?

ওসব ভুলে হয় না আমার সংসারে।

রাণীর মুখে 'আমার সংসার' কথাটা শুনে দিলীপের ভালো লাগলো। পৃথিবীর সব মেয়েলোক ইচ্ছে করলেই আলাদা করে এক-একটা পৃথিবী বানাতে পারে।

সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে দিলীপ এসে সেই ঝুলবারান্দাটায় দাঁড়ালো। কলকাতার লোকালয়ের মাথায় মাথায় এখন সব জায়গায় একটা করে কুয়াশার টুপি।

রাণী এসে পিঠে হাত রেখে বললো, শোবে চলো। রাত হয়ে গেছে অনেক।

রবি কোথায় খায় ? কোথায় শোয় ? চান করে ? জামাকাপড় ময়লা হলে কি গায়ে দেয় ? বলতে পারো। আমায় ? আমার এক এক সময় খুব জানতে ইচ্ছে করে।

ভেবে কি হবে ? না খেয়ে নিশ্চয়ই নেই। শোবে চলো। ভালো কথা। মনে পড়েছে। তোমায় একজন মেজর জেনারেল সন্ধ্যে থেকে অন্তত চারবার ফোন করেছেন। নম্বর লিখে রেখেছি।

লাইন কেটে দেয় নি এখনো। বিল দিইনি ছ' মাসের—

ভদ্রলোক তোমায় যত রাত হোক রিং ব্যাক করতে বলেছেন।

মেজর জেনারেল বায় তো।

হ্যাঁ।

ও নামে কাউকে আমি চিনিনে হয়তো।

তাহলে নাম জানলে কি করে?

হয়তো স্বপ্নে দেখা হয়েছিলো রাণী।

স্বপ্নের লোক টেলিফোন করে না। নম্বর দিয়েছেন ভদ্রলোক। লিখে রেখেছি। স্টাডিতে থাকবেন।

স্বপ্নের লোক ও রকম আবোল-তাবোল বকে রাণী। মনে রাখতে নেই।

বাজে বকছো কেন? আমি পরিষ্কার কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। খুব জরুরী বললেন।

আমি চিনিই না লোকটাকে। ওরকম কোন লোক আদপেই আছে কিনা জানি না। থাকলেও আমার সঙ্গে শুধু আবছা স্মৃতির ভেতর দেখাশুনো হয়েছিলো হয়তো কিংবা গত জন্মেও দেখা হতে পারে। ঠিক মনে নেই আমার। এর ওপর নির্ভর করে কেউ কি গত জন্মে ফোন করতে পারে রাণী? গত-জন্মে কোন লাইন পাওয়া যায় না।

কী সব বাজে বকছো। ভদ্রলোক তোমায় রীতিমত চেনেন। আমি বলছি—চেনেন তোমাকে। বিলক্ষণ চেনেন।

বিলক্ষণ কথাটা কত দিন পরে শুনলাম রাণী।

তুমি ফোন করো মেজর জেনারেলকে—এক সন্ধ্যাবেলা হয়তো দেখা হয়েছিলো। হয়তো হয়নি। ব্যাপারটাই আমার কাছে গোলমেলে। কিংবা ভৌমিক খাদানের শেয়ার ক্যাপিটালের টোপ গেঁথে তোলার সময় কোথাও দেখা হয়ে থাকবে।

আমি লাইন ধরে দিচ্ছি—বলে রাণী চলে গিয়েই ডায়াল করলো। এই যে ধরুন। মিস্টার বসুকে দিচ্ছি। এসো। এই তো মেজর জেনারেল রায়ের গলা—

অনিচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরালো দিলীপ। কেন শুধু শুধু আবছা সব জিনিস খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলছো রাণী?

রাণী দিলীপের মুখে অবাক হয়ে তাকালো। এরকম কথা সে এর আগে কোন দিন শোনে নি। এ একদম অন্য দিলীপ। ঠিক তার স্বামী নয়। কিংবা যেন রবির ভাবও নয়।

হ্যালো? নমস্কার, জেনারেল—

ওপাশ থেকে ভেসে এলো পরিষ্কার ভারি গলা। উহুঁ। শুধু জেনারেল নয়। মেজর জেনারেল। তাও রিটায়ার্ড। আমি মেজর জেনারেল রায় বলছি। কার্ড দিয়েছিলাম—মনে নেই?

হ্যাঁ। একটু একটু মনে পড়ে বটে মাঝে মাঝে—

কি বলছো দিলীপ? কথা হোলো—বিকাল সাড়ে পাঁচটায় দেখা করবে আমার সঙ্গে—

তেমন তেমন মনে পড়ছে বটে। আচ্ছা একটা কথা বলি। সত্যি সত্যি মেজর জেনারেল রায় বলে কেউ আছেন কি? আপনার কি মনে হয়?

ঠাট্টা ইয়ার্কির জন্যে এত রাত অব্দি তোমার ফোনের আশায় আমি জেগে বসে থাকিনি দিলীপ। এটা নিশ্চয় বোঝো।

বুঝি তো অনেক কিছু। তার আগে একটা জিনিস পরিষ্কার হোক। সত্যি সত্যিই মেজর জেনারেল রায় বলে কেউ আছেন? না, পুরো ব্যাপারটাই ফেক্?

কি বললে? কতটা টেনেছো? বোঝা এমনি বেহেড্ হয়ে বাড়ি ফেরা হয় বুঝি।

আহা চটছেন কেন? সত্যিই কী একদিন রাতে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো?

ক' পেগ টেনেছো। একদম অন দি রক্ ওওয়া ছেড়ে দাও এবারে।

সত্যি বলছি স্যার—আমার একটুও নেশা হয়নি। মাথা একদম পরিষ্কার। সন্ধ্যেবেলা আমি আর কালু ঘোষ দু' বোতল বিয়ার চুক চুক করে খেয়েছি।

কে? কার নাম বললে? কার সঙ্গে খেয়েছো?

চিনবেন আপনি। কালু ঘোষ।

ওঃ। তাহলেই বুঝেছি। একদম বেহেড্ তুমি এখন। লাইন ছেড়ে দিচ্ছি। কাল সকালে কথা হবে তাহলে—

ছাড়বেন না। দোহাই আপনার। একটা জিনিস আগে পরিষ্কার হোক। কালু ঘোষ বলছিলো—

কালু ঘোষ কি বলবে আমার?

কেন? সে মানুষ নয় স্যার?

ছিলো এক সময়। প্রায় বছরখানেক হোল সে মরে ভূত হয়ে গেছে—

সে আপনাদের ভুল ধারণা।

ধারণা কি হে দিলীপ! এ তো ফ্যাক্ট! খবরের কাগজের রিপোর্ট। খুব ফূর্তিবাজ লোক ছিলো কালু।

এখনও ফূর্তিবাজ আছে।

আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারো?

খুব পারি। এখুনি চলে আসুন। চিনে আসতে পারবেন?

ওপাশে মেজর জেনারেল রায় খুব হো হো করে আমির হাসি হাসলো। তারপর বললো, আমি অরিজিন্যালি মারাঠা লাইট ইনস্যানিটির কর্নেল। তোমার বাসিকতা

সেন্ট্রাল স্টাফ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা

[ভারত সরকার; শ্রম মন্ত্রক]

- জার্মাণ ফেডারেল রিপাবলিকের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত
- সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামসজ্জিত ল্যাবরেটরি এবং ওয়ার্কশপ
- জার্মাণ ফেডারেল রিপাবলিকের বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সহযোগিতায় পরিচালিত

তিনটি শাখার মাধ্যমে কর্মপরিচালনা করে

- গবেষণা শাখা : শিল্প ও বৃত্তিগত শিক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা
- উন্নয়ন শাখা : লিখিত নির্দেশমূলক পুস্তিকা, মডেল, স্লাইড, চার্ট এবং অন্যান্য শিক্ষক সহায়ক জিনিসের বিকাশসাধন
- শিক্ষণ শাখা : সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের থেকে নির্বাচিত শিক্ষণ পরিচালকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য নিম্নে বর্ণিত পাঠক্রম :
- শিল্পক্ষেত্রে ট্রেনিং অ্যাপ্রেনটিসশিপস :—সংগঠন ও ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং কার্যক্রম—৪ সপ্তাহ
- অডিও ভিস্যুয়াল যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও পরিচালনায় শিক্ষা ৪ সপ্তাহ
- মডিউল সিস্টেমের ট্রেনিং প্রোগ্রামের ডিজাইনিং ১ সপ্তাহ
- শিল্প সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মূল্যায়ণ ১ সপ্তাহ
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রশিক্ষণ ডিরেক্টরেটের আরও বহু বিষয়
- এসব ছাড়াও অনুরোধের ভিত্তিতে বিশেষ কোন বিষয়ের পাঠক্রম চালু করা হয়, প্রতিটি পাঠক্রমই আবশ্যিক

পূর্ণ বিবরণের জন্য লিখুন :

ডিরেক্টর,
সেন্ট্রাল স্টাফ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট,
কলিকাতা, দাশনগর, হাওড়া ৭১১১০৫.
টেলি : ৬৯-২৫৫৫ এবং ৬৯-২২৪১

বোধের জন্যে আমিতে হলে এখুনি তিনটে গ্রাম পাঠিয়ে দিতে বলতাম মেসকে। যাক্ শোন। স্যার লেজালি তো এখন হোমে। আমাদের কোম্পানীর নাড়ীনক্ষত্র তোমার জানা। নতুন করে আর কি বলবো তোমাকে। তুমি এসে তোমার মনোমত লোকজন নিয়ে ফার্টিলাইজার ডিভিশনটা সামলাও। বিকি যাওয়াও। ইস্টার্ন জোনে মার্কেটিং গ্রুফ এখন শুধু একটা স্টিফ ফল।

কালু ঘোষকে নিয়ে যাই।

ওপাশে মোটা গোঁফ টপকে হো হো হাসি।

কালুদার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু খুব কম লোকের আছে।

ভালো কথা। কিন্তু ওকে পাচ্ছে। কোথায়? ও কি এখন নেমে আসতে রাজি হবে?

নামবে কোত্থেকে?

ধরো স্বর্গ।

না না। ও তো আমার বাড়ির বেসমেন্টে থাকে। একদম প্লেন সিমেন্ট করা জায়গা। ওঠানামার তো কোন ব্যাপার নেই।

হাসালে। খুন হওয়ার পর কালু তোমার ওখানেই থাকছে? আশ্চর্য! এরকম আর কজন আছেন ওখানে?

একা কালুদাই থাকে বেসমেন্টে।

খাওয়া দাওয়া?

বিশেষ ঝামেলা নেই। আমরা একসঙ্গেই থাকি। খাওয়া-দাওয়াও একসঙ্গেই করি।

ফ্যানি। তোমার মতই একজন মজাদার মানুষ আমাদের দরকার। তুমি জয়েন করো আমাদের এখানে।

তা তো করবো। কিন্তু আপনি সিওর?

কি ব্যাপারে দিলীপ?

মেজর জেনারেল রায় বলে সত্যি সত্যি কেউ আছেন?

হাসালে। তাহলে আমি কে?

আপনি হয়তো দৈববাণী। আপনাদের তো কোন বডি থাকে না স্যার। আপনি তো সব জানেন। একটু খুলে বলুন না।

রাতের দিকে অ্যাতো বেশি খাচ্ছো। সকালবেলায় নিশ্চয় হ্যাংওভার পোহাতে হয়।

তা তো হয়ই। কানের পাশে অসেল্ট-মেন্ট। ভোররাতে ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে সেরিডান। তা খুলে বলবেন কি? সত্যি আপনি বলে কেউ আছেন কি?

এ সন্দেহ কেন দিলীপ? আমি তো তোমায় কার্ড দিলাম—

সে কি আমার এই জীবনে দিয়েছেন স্যার?

পাকামো করো না। তোমার আবার আরেক জীবন কি হে। আমরা আর্মি থেকে রিটায়ার করে আবার নতুন জীবন শুরু করলাম—

কিন্তু কালুদা বলছিলো—

কি বলছিলো?

আমি নাকি কোনো কার্ড পাইনি।

একদম যেহেতু তুমি এখন। পরে কথা হবে দিলীপ।' আমরা ক্লাবে একসঙ্গে বসে খেলাম। কথা হোল দুজনে।

কালুদা বললো, আপনার সঙ্গে নয়—তার সঙ্গেই নাকি আমি বসেছিলাম সন্ধ্যে থেকে। আমারই চোখের ভুল—

কালুটাকে যদি পাওয়া যেতো হাতের কাছে—

চলে আসুন না এখুনি। আমি দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

না। থাক। ফাল বরং তুমি একবার আমার ঘরে চলে এসো।

দিলীপ আর কথা বলতে পারলো না। মেজর জেনারেল রায় ফোন নামিয়ে রেখেছেন।

দিলীপও ফোন নামিয়ে রেখে রাণীর দিকে তাকালো। আজকাল আমার কথা কেউ বোঝে না। রাণী। তারপর আচমকাই বললে, একটা গান গাইবে কচি ঠাকুমা—

পাগল। এই নিশুতি রাতে?

শুনলে আমি ভালো হয়ে যেতাম কিন্তু।

তুমি ভালই আছো। কিছু হয় নি তোমার—

সুপ্রিম কোর্টের কবিতর থেকে নেমে রাস্তায় পড়লো কিরীটী পালিত। যাবে আগ্রা হোটেলে। সেখানেই উঠেছে আজ তিনদিন। এইমাত্র বার লাইব্রেরিতে বসে তার উকিল যা বলেছে—তার মানে—সে বাস্ট্রপতির বিরুদ্ধে মামলায় জিতে যাচ্ছে। কন্সটিটিউশন বেঞ্চ এ ব্যাপারে একমত যে, কিরীটী পালিত রেলের দুর্ঘটনা বীমা বাবদে রিজার্ভ মুনাফা থেকে কম করেও এক কোটি টাকা পাবে। তাছাড়া পাবে মামলার খরচ।

পর্লামেন্ট স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিরীটী ফুটপাথে বসে পড়লো। তার মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। বাতাস লাগানো দরকার। এর নাম হাই ব্লাড প্রেসার নয়তো?

শীতকালের দিল্লি। তবু মাথাটা ঘুরছিলো কিরীটীর। রাস্তায় লোকজন গাড়ি। কিরীটী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিড় বিড় করে বলে ফেললো, আজ যদি বাবা থাকতেন—

কী মনে হতে নিজেকে বারেকট্ করলো কিরীটী। বাবা নিশ্চয় আছেন। নিশ্চয় এই বিশাল ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও আছেন। আমি আমার বাবার অক্ষম ছেলে। তাই তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। টাকাটা হাতে পেয়ে ইণ্ডিয়ার সব কাগজে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন করবো। বাবা ফিরে আসুন। ইতি—আপনার অধম পুত্র—কিরীটী।

এসব কথার খানিক সে বিড় বিড় করে বলছিলো। খানিকটা তার মনের ভেতরেই ডুবে ছিলো। ভাগ্যিস নিজের আইডিয়াগুলো এতকাল পেটেন্ট করে করে এসেছে সে। নইলে এ মামলায় তার তো কোন স্ট্যান্ড থাকতো না।

একা একা তিনবার দিল্লির রাস্তায় বাবা কথাটা উচ্চারণ করলো সে। তারপর কনট প্লেসের দিককার একটা ভাগের স্কুটার বিকসার উঠে পড়লো।

এখানে কলকাতার মত রাস্তায় বাচ্চা দের জামা-কাপড় নিয়ে দোকান বসে না। কনটে গিয়ে তার দিশেহারা হওয়ার জোগাড়। ভালো ভালো দোকান। হাল ফ্যাশানের পোশাক। কিন্তু সাইজ তো বলতে পারে না। গুচ্ছের পয়সা দিয়ে একজোড়া হাফশার্ট হাফপ্যান্ট কিনলো। মালবিকার ছেলেটার গায়ে হবে তো। বড় হলে নাহয় কেটে ছোট করা যাবে। কিন্তু ছোটো হলে?

দোকান থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড ভিড়। কোন বাসে উঠতে পারলো না কিরীটী। তখন সে রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে আগ্রা হোটেলের দিকে এগোতে লাগলো।

সে হাঁটতে হাঁটতে বুঝলো, তারই পেটেন্ট করা প্ল্যান মাফিক সারা দেশের গাড়িগুলোর একটা তালিকা হওয়া দরকার। এই তালিক দেখে চলাচলের রাস্তা ঠিক করতে হবে। তারপর মাসিক পনেরো টাকা চাঁদার কার্ড করাতে হবে সবার। মাসে পনেরো টাকা চাঁদা দিলে যে-কেউ তার রাস্তায় ফাঁকা গাড়ি পেলে উঠতে পারবে কার্ড দেখিয়ে। ড্রাইভার, পেটরল, মবিল, ট্যাক্স, রিপেয়ার সবই ওই টাকা থেকে আসবে। রাস্তা বড় করে গাড়ি বাড়াবার সুযোগ থাকলে ওই চাঁদার টাকা থেকেই নতুন গাড়ি আসবে—গাড়ি রিপ্লেস করা যাবে।

কলকাতায় থাকতে সেন্টারে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারকে কিরীটী বোত্রিস্টি করে এই প্ল্যানটা পাঠিয়েছে। প্ল্যানের সঙ্গে তার পরিকল্পনার পেটেন্ট নম্বরটাও লিখে দিয়েছে সে, যদি অ্যাকসেপ্টেড হয় তো সারা দেশে বিপ্লব ঘটে যাবে। মোটরগাড়ি কারখানায় গাড়ি তৈরি বেড়ে যাবে।

হেঁটে ফিরতে ফিরতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। হোটেলের ঘরে ঢুকে কিরীটী দেখলো—তার নামে ইনল্যান্ড খামে চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে।

শ্রীচরণকমলেষু বাবা,

আমি সম্ভবত এবার এশিয়ান গেমসে ইণ্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করছি। মেয়েদের ট্র্যাক রেসে। আমি সাবধানেই তৈরি হচ্ছি। তুমি একবার স্পোর্টস কাউন্সিলে গিয়ে খোঁজ নেবে—বিবাহিতা বলে আমার ডিসকোয়ালিফায়েড হওয়ার কোন বিপদ আছে কি না। এশিয়ান গেমসের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আমি ঠিক জানি না। তুমি দিল্লি লিমখানা লাইব্রেরিতে এ সম্পর্কে বই পাবে। অ্যাসিসটান্ট সেক্রেটারি একজন বাঙালী। শ্রী টি এন দাশ। তাঁকে বললেই তিনি সব বলে দেবেন। তোমায় একটুও ঘুরতে হবে না।

আরেকটা কথা বাবা—লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না আমার ওপর—একটু খোঁজ নিয়ে জানবে—এবার সিঙ্গাপুর যোগ দিচ্ছে কিনা। সিঙ্গাপুর যোগ দিলে আমার কোন চান্স নেই বাবা। ওরা কবছর ধরে ভীষণ তৈরি।

সর্বাঙ্গিবাগান লেন প্রণামান্তে

চেতলা তোমার খুকী

ফাঁকা ঘরে কিরীটী পালিত একা একাই বলে ফেললো, খুব ফেরে পড়ে গেলাম।

(চলবে)

সমালোচনা

লিটল ট্র্যাডিশনের ধারা

সংস্কৃতির ধারা, সমাজ বিজ্ঞানীর মতে, প্রধানত দুটি খাতে প্রবাহিত হয়। একটিকে মিশ্র প্রবাহ, অন্যটিকে অবর প্রবাহ বলা যেতে পারে ইংরেজীতে একেই বলে, গ্রেট ট্র্যাডিশন। ও লিটল ট্র্যাডিশন। আমরা সাধারণত গ্রেট ট্র্যাডিশনের ধারাটির জন্যই গর্ব অনুভব করে থাকি। কিন্তু এও সত্য ও অনিবার্য যে সংস্কৃতির অবর প্রবাহকে অস্বীকার করে কোন জাতি বাঁচতে পারে না। অথচ প্রায়শই দেখা যায়, অবর প্রবাহের প্রতি কী অপরিসীম অবজ্ঞা ও উদাসীনতা শিক্ষিত মানসে শেকড় গেড়ে থাকে। আমরা অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করি না, লিটল ট্র্যাডিশনের কোন কোন উপাদান শক্তিশালী হয়ে ওঠে কোনো একটি গ্রেট ট্র্যাডিশনের প্রাণ-প্রবাহকে কতটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করছে। আমরা হয়ত সাধারণ ভাবে জানি, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি অনন্তর মহাকাব্যগুলো অথবা জাতক কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি মহৎ গ্রন্থাবলীর ভিত্তিভূমি লিটল ট্র্যাডিশনের ধারাকে স্বীকার করে নিয়ে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি বিশ্লিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করি, একজন রবীন্দ্রনাথ বা তারাশঙ্কর সৃষ্ট হতে কতটা লিটল ট্র্যাডিশনের নিরন্তর সাহচর্য প্রয়োজন হয়েছে। গ্রেট ট্র্যাডিশন নিয়েই আমরা বেশি ব্যস্ত।

অবশ্য সকলেই নন। সৌভাগ্যের বিষয় কেউ কেউ লিটল ট্র্যাডিশনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। লিটল ট্র্যাডিশনের অন্যতম উপাদান লোকসাহিত্য তাই কিছু মনস্বী গবেষকের সাধনাকে অতন্দ্র রেখেছে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক ডঃ ভক্তিমচন্দ্র মাহাত এরূপ গবেষক মণ্ডলীর একজন বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

কিন্তু কোন্ পথে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি সমীপে যথার্থ উপগত হতে হবে— এ প্রশ্ন অথবা সংশয়, গবেষককে কখনো কখনো চিন্তিত করে তুলতে পারে। লোক-সাহিত্য প্রথম ভাবে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব অথবা কেবলমাত্র শুধু সাহিত্য হিসেবে গবেষণের পক্ষপাতিত্ব পাবে এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। ডঃ মাহাতর একাগ্রতা কিন্তু এতে ব্যাহত হয়নি। নইলে আধা-খাঁচড়া বৈজ্ঞানিক আলোচনায় (যেহেতু আনথ্রপলজির শিক্ষণ সকলের থাকে না) অথবা কল্পনার উৎকেন্দ্রিক হাস্যকরতা (কেননা সকলেই রবীন্দ্রনাথ নন) প্রকাশে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। স্বস্তির কথা ডঃ মাহাত তা হননি।

আসলে ঝাড়খণ্ডের লোক-সাহিত্য একটি আকর গ্রন্থ। পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঝাড়খণ্ড যার নাম তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। তিনি এ আলোচনার যোগ্য অধিকারীও বটেন। যে অঞ্চলের উপাদানকে তিনি আলোচনার বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন, লেখকের নিজস্ব ঘোষণা অনুযায়ী তিনি 'নিজে ঝাড়খণ্ডের একটি আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এ অঞ্চলের লোকজীবন, সাহিত্য সংস্কৃতি এবং আচার সংস্কারের ঘনিষ্ঠ পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছেন। অবশ্য কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীতে জন্মালেই সে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শেষ ও শ্রেষ্ঠ কথা বলার অধিকার সব সময়ে জন্মায় না, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ডঃ মাহাত এ আত্মঘোষণার যোগ্য বলে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন। বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরণের লোকগীতি—যা আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্গত অথবা স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, রূপকথা, ব্রতকথা, পুরাকথার বিপুল সংগ্রহ ও তাদের আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় আলোচনা এ বইতে ঠাঁই পেয়েছে। অর্থাৎ লেখক যথাসাধ্য মনস্ক থাকতে চেয়েছেন। অন্যথায় অনালোচিত ও অল্প আলোচিত বিষয়ের প্রতি সঠিক আলোক সম্পাতের ইচ্ছা তিনি বোধ করতেন না।

অনেক সময় লেখক সমর্থ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। পাতা নাচ নিয়ে আলোচনার সময় তিনি মন্তব্য করেছেন 'ডঃ সুধীর করণ সাঁওতালী নাচকে পাতা এবং পাঁতা উভয় শব্দ দিয়েই চিহ্নিত করেছেন যা একান্ত বিভ্রান্তিকর' এবং জানিয়েছেন 'পাতার অর্থ সাঁওতালী ভাষায় মেলা বা পরব।... আসলে করম দাঁড, পাতা একই নাচের বিভিন্ন নাম।' অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখক নির্দেশিত প্রচলিত মতের প্রতিবাদ জানাতে তিনি ইতঃস্তত করেন নি। এমন উদাহরণ আরো রয়েছে।

আবার কোনো কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি যেন কিছু সাবধানী। ছো ও ছউ—এর মধ্যে কোন্ উচ্চারণটি সঠিক, এ নিয়ে বিতর্কের যে অবকাশ আছে লেখক যেন তা অনেকটা এড়িয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি 'ছ নাচ' বলার পক্ষপাতী, নিদেন 'ছো নাচ', কিন্তু 'ছ' শব্দের অর্থ অস্ত্র ভঙ্গি সহকারে ঢং করা' এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর পেছনে কি যুক্তি আছে তা বলেন নি।

অথবা ধরা যাক, লাকনাট্য প্রসঙ্গ। আমরা জানি লোকনাট্য লোক সাহিত্যের একটি যোগ্য শাখা। ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোনো কোনো স্থানে লোকনাট্যের আঙ্গিকে বিভিন্ন ধরণের পালা অভিনীত হয়ে থাকে। লেখক সে সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। ছো নাচকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

কিন্তু এই ব্যাহা। এ সব অসম্পূর্ণতা অকিঞ্চিৎকর মনে হয় যখন লেখকের পরিবেষিত অজস্র তথ্যের সম্মুখীন আমরা হই। বেশ কিছু উপাদান নিয়ে তিনিই বোধহয় সর্বপ্রথম আলোচনা করলেন। বহু গান বা ছড়া প্রথম এ বইতেই সংকলিত হল। লেখকের বড় কৃতিত্ব এইটেই।

ছাপা বাঁধাই ভাল। দামও বর্তমান বাজারের তুলনায় খুব বেশী নয়। তবে একটি ইনডেক্স থাকলে ভাল হত

বিষ্ণু বসু

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য—ডঃ বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, পরিবেশনায়—ফা এন লাইব্রেরী, কলকাতা-৬। মূল্য—ত্রিশ টাকামাত্র।

একটি জ্যান্ত চরিত্র

একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে এই উপন্যাসের কাহিনী, তার পরিধি মেলেছে বহুদূরে। প্রথম গণ্ডগোলটা বেঁধেছে এখানেই। একের পর এক কাহিনীতে ভীড় করেছে সুদখোর ব্যবসায়ী, পাড়ার রকবাজ মাস্তান, স্কুলের শিক্ষক, বড়লোক বন্ধু ইত্যাদি আরো অনেকে। এতে আপত্তি ছিল না, উপন্যাসের ধর্মই তো তাই। কেন্দ্রকে অতিক্রম করে বৃত্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া। পথ চলতি চেনা-অচেনা মানুষের পাশাপাশি হাঁটা, আবার কখনও বা তাদের সঙ্গে বসা, একটু জিরিয়ে নেওয়া এবং এইভাবে একটা নতুন অনুভবে পৌঁছে যাওয়া। 'অবক্ষয়' উপন্যাস কিন্তু তা হতে পারেনি।

এই উপন্যাসের একমাত্র জ্যান্ত চরিত্র রুবী। লেখকের অভিজ্ঞতার মধ্যে অবস্থিত বলেই বোধহয়, চরিত্রটিকে কখনও কখনও আমাদের ঘরের মানুষ বলে মনে হয়। অন্ততঃ এই একটি দিক দিয়ে লেখক সার্থক। বিশেষ করে সন্দীপের ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময় অথবা সন্দীপের ইন্টারভিউ পাবার খবর শুনে, রুবীর কথা মনে পড়ে। আমরা জীবন্ত রূপ দেখতে পাই। সেই সব মুহূর্ত আমাদের নাকুতিগত হৃদপিণ্ডকে এমন সোচ্চার ভাবে বেঁধে যে, উপন্যাসটা পড়তে পড়তে অন্ততঃ এক পলকের জন্যে শরীরটা টানটান হয়ে যায়। একটি সাধারণ, প্রতি সাধারণ উপন্যাসে এটুকুর মূল্যই বা কম কি ?

মোটা দাগের প্রচ্ছদ হলেও, ছাপা বেশ ভালো। পাইকা হরফের অক্ষর পড়তে আশা করা যায় কারোরই অসুবিধে খুব একটা হবে না।

নির্মলেন্দু ঘোষাল

অবক্ষয় : সমীরকুমার ঘোষ। পরিবেশক : ময়ূরী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯। দাম : আট টাকা।

খেলা

বিশ্ব কাপ ফুটবল

আর্জেন্টিনার একাদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার যে মূল আসর বসেছিল তার বিবিধ উল্লেখযোগ্য রেকর্ড :

আর্জেন্টিনার এই মূল আসরে ১৬টি দেশের মধ্যে লীগের খেলায় অপরাজিত আখ্যা লাভ করেছিল—প্রথম পর্বের লীগের খেলায় এই পাঁচটি দেশ—ইতালি (গ্রুপ ১), পোল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানী (গ্রুপ ২), ব্রাজিল (গ্রুপ ৩) এবং পেরু (গ্রুপ ৪)। অপরদিকে দ্বিতীয় পর্বের লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল এই তিনটি দেশ—হল্যান্ড (গ্রুপ এ), আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল (গ্রুপ বি)। দুই পর্বের লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল একমাত্র ব্রাজিল। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ব্রাজিল ২—১ গোলে ইতালিকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে। ফলে একাদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল আসরে একমাত্র ব্রাজিল অপরাজিত থেকে যায়।

আর্জেন্টিনার মূল আসরে মোট খেলার সংখ্যা ছিল ৩৮—প্রথম পর্বের লীগ খেলা ২৪, দ্বিতীয় পর্বের লীগ খেলা ১২, ফাইনাল খেলা এবং তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা ১। এই ৩৮টি খেলায় মোট গোল সংখ্যা দাঁড়ায় ১০২—প্রথম পর্বের লীগে ৬০ গোল, দ্বিতীয় পর্বের লীগে ৩৫ গোল, ফাইনালে ৪ গোল এবং তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ৩ গোল।

মূল আসরে সর্বাধিক গোল করার গৌরব লাভ করেন আর্জেন্টিনার ২৩ বছরের খেলোয়াড় মারিও কেমপেস। তিনি সাতটি ম্যাচ খেলে এইভাবে তাঁর ৬টি গোল করেন—দ্বিতীয় পর্বের লীগে পোল্যান্ডের বিপক্ষে ২, পেরুর বিপক্ষে ২ এবং ফাইনালে হল্যান্ডের বিপক্ষে ২। তারপরই উল্লেখযোগ্য গোলদাতা—পেরুর টিওফিলো কুবিলাস (৫ গোল) এবং হল্যান্ডের রব রেনসেনব্রিংক (৫ গোল)। হ্যাট-ট্রিক করেছেন মাত্র দুজন—টিওফিলো কুবিলাস (পেরু) এবং রব রেনসেনব্রিংক (হল্যান্ড)। এঁরা দুজনেই হ্যাট-ট্রিক করেন প্রথম পর্বের লীগের ৪নং গ্রুপে ইরানের বিপক্ষে।

মূল আসরে লীগের খেলায় একটাও গোল খায়নি মাত্র দুটি দেশ—প্রথম পর্বের লীগে পশ্চিম জার্মানী এবং দ্বিতীয় পর্বের লীগে আর্জেন্টিনা।

সর্বাধিক গোল দিয়েছে প্রথম পর্বের লীগে পেরু (তিনটি খেলায় ৭ গোল) এবং দ্বিতীয় পর্বের লীগে হল্যান্ড (তিনটি খেলায় ৯ গোল)।

সর্বাধিক গোল খেয়েছে—প্রথম পর্বের লীগে মেকসিকো (তিনটে খেলায় ১২ গোল) এবং দ্বিতীয় পর্বের লীগে পেরু (তিনটি খেলায় ১০ গোল)।

একটাও গোল দিতে পারেনি—দ্বিতীয় পর্বের লীগে পেরু। উপরন্তু তারা ১০টা গোল খেয়েছিল।

লীগের সমস্ত খেলায় জয়—প্রথম পর্বের লীগে ইতালী (তিনটে খেলায় ৬ পয়েন্ট)। দ্বিতীয় পর্বের লীগে সমস্ত খেলায় জয়লাভের গৌরব কোন দেশেরই কপালে জুটেনি। তিনটে খেলার মধ্যে দুটো জয় এবং একটা ড্র করেছিল এই তিনটি দেশ—এ গ্রুপে হল্যান্ড এবং বি গ্রুপে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল।

আর্জেন্টিনা এবং হল্যান্ড প্রথম পর্বের লীগের খেলায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হতে পারে নি। আর্জেন্টিনা ১নং গ্রুপে এবং হল্যান্ড ৪নং গ্রুপে রানার্স-আপ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। দ্বিতীয় পর্বের লীগে হল্যান্ড এ গ্রুপের এবং আর্জেন্টিনা বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সুবাদে ফাইনালে উঠেছিল। প্রথম পর্বের লীগে হল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনা একটা করে খেলায় হেরেছিল। আর্জেন্টিনা হেরেছিল ০—১ গোলে ইতালির কাছে এবং হল্যান্ড ২—৩ গোলে স্কটল্যান্ডের কাছে। লীগের খেলায় হল্যান্ড ১৪টা গোল দিয়ে ৭টা গোল খেয়েছিল। অপরদিকে আর্জেন্টিনা ১২টা গোল দিয়ে গোল খেয়েছিল ৩টে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পর্বের লীগে আর্জেন্টিনা ৮টা গোল দিয়ে একটাও গোল খায়নি।

সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৮ সালের একাদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত আসরে ১ম স্থান পেয়েছে আর্জেন্টিনা। ২য় স্থান হল্যান্ড, ৩য় স্থান ব্রাজিল এবং ৪র্থ স্থান ইতালি। ১৯৪৭ সালের দশম বিশ্ব কাপ ফুটবল খেলার আসরে প্রথম তিনটি স্থানই পেয়েছিল ইউরোপেরই এই তিন দেশ—১ম স্থান পেয়েছিল পশ্চিম জার্মানী, ২য় স্থান হল্যান্ড এবং ৩য় স্থান পোল্যান্ড। ব্রাজিল ৪র্থ স্থান পেয়ে কোনরকমে লাতিন আমেরিকার মুখ রেখেছিল।

১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্ব কাপ ফুটবল জয়ের ফলে পাঁচটি উদ্যোক্তা দেশ বিশ্ব কাপ ফুটবল জয়ী হল। আর্জেন্টিনার আগে চারটি উদ্যোক্তা দেশ এইভাবে বিশ্ব কাপ পেয়েছে—১৯৩০ সালে উরুগুয়ে, ১৯৩৪ সালে ইতালি, ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড এবং ১৯৭৪ সালে পশ্চিম জার্মানী।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এ পর্যন্ত পাঁচবার বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল আসর বসেছে এবং কোনবারই এখানকার মাটি থেকে ইউরোপ বা অন্য অঞ্চলের কোন দেশ বিশ্ব কাপ নিয়ে যেতে পারেনি।

আর্জেন্টিনার মূল খেলার আসরে ৬টা খেলা গোলশূন্যভাবে ড্র গেছে। এই ছটা গোলশূন্য খেলার মধ্যে গতবারের (১৯৭৪) বিশ্ব কাপ জয়ী পশ্চিম জার্মানী সব থেকে বেশী তিনটে গোলশূন্য খেলা ড্র করেছে—প্রথম পর্বের লীগে তিউনিসিয়া ও পোল্যান্ড এবং দ্বিতীয় পর্বের লীগে ইতালির সঙ্গে।

উইম্বলেডন টেনিস আসর

গত জুন ২৬ তারিখে লন্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ঐতিহাসিক উইম্বলডন শহরতলীর অল-ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাবের কোর্টে ১৯৭৮ সালের ৯২তম উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এই আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় ১৮৭৭ সালের জুলাই ৯ তারিখে। দুটি বিশ্ব যুদ্ধের ফলে ১০ বছর খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে এই উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার জুড়ি নেই। এখানের যে কোন বিভাগের খেতাব জয় টেনিসে বে-সরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয় হিসাবে স্বীকৃত। দেশ-বিদেশের টেনিস খেলোয়াড়দের কাছে উইম্বলডন শহরতলীর অল-ইংল্যান্ড টেনিস ক্লাবের সুরম্য খেলার আসর এক মহা তীর্থস্থান। এখানে খেলার সুযোগ পেলে খেলোয়াড়দের জীবন ধন্য হয় এবং এখানের কোন খেতাব পেলে আকাশের চাঁদ যেন খেলোয়াড়দের হাতে এসে যায়।

১৯৭৮ সালের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা সুইডেনের বিয়রন বর্গ এবং আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং-এর জীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বলাভ করেছে। বর্গ এ বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলে উপর্যুপরি তিন বছর সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সুবাদে এক বিরাট নজির সৃষ্টি করবেন। কারণ ১৯৩৬ সালে ইংল্যান্ডের ফ্রেড পেরীর উপর্যুপরি তিনবার (১৯৩৪-৩৬) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পর অর কেউ উপর্যুপরি তিন বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়নি। ফ্রেড পেরীর উপর্যুপরি তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পর গত ৩৫ বছরের খেলার আসরে উপর্যুপরি দু বছর করে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন এই ৬ জন খেলোয়াড়—আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮) এবং অস্ট্রেলিয়ার চারজন—লুই হোড (১৯৫৬-৫৭), রড লেভার (১৯৬১-

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেতদাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৮৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১, ফোন : ৬৭-২৩৫৯; শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

৮২), রয় এমারসন (১৯৬৪-৬৫) রড লেভার (১৯৬৮-৬৯), জন নিউকম্ব (১৯৭০-৭১) এবং সুইডেনের বিয়রন বর্গ (১৯৭৬-৭৭)। গত ৩৫ বছরের খেলায় আসরে যেখানে একজন পুরুষও উপর্যুপরি তিন বছর সিঙ্গলস খেতাব পাননি সেখানে তিনজন মহিলা উপর্যুপরি তিন বছর করে সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন—লুসী ব্রাউ (১৯৪৮-৫০), মোরিন কোলোনী (১৯৫২-৫৪) এবং বিলি জিন কিং (১৯৬৬-৬৮)। এঁরা তিনজনই আমেরিকার খেলোয়াড়।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং ১৯৭৮ সালের উইম্বলডন আসরে যে-কোন একটা খেতাব পেলেই উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক খেতাব (২০টি) পাওয়ার রেকর্ড করবেন। ইতিমধ্যে তিনি ১৯টি খেতাব (৬টি সিঙ্গলস এবং ১৩টি ডাবলস) জয়ের সূত্রে আমেরিকার কুমারী এলিজাবেথ রায়ান-এর ১৯টি খেতাব জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেছেন।

১৯৭৮ সালের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় গত চারদিনের (জুন ২৬—২৯) খেলায় উল্লেখযোগ্য অঘটন হল দ্বিতীয় রাউণ্ডে ল্যাণ্ডের টম ওকারের কাছে ৪নং বাছাই আর্জেন্টিনার প্রখ্যাত গিলারমো ভিলাসের অপ্রত্যাশিত পরাজয়। এই ফলাফলটা বিশ্ব ফুটবল কাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হল্যাণ্ডের পরাজয়ের বদলা বলা যায়। এবারের প্রতিযোগিতার বাছাই তালিকায় টম ওকারের কোন স্থানই পাননি। ইতিমধ্যেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। বিজয় অমৃতরাজ, আনন্দ অমৃতরাজ এবং জয়কুমার রয়াপ্পা দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় হেরে যান। তিনজন প্রাক্তন উইম্বলডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান—আমেরিকার স্ট্যান স্মিথ (১৯৭২) এবং আর্থার অ্যাশ (১৯৭৫- এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার কোডেস (১৯৭৩) অথ্যাত খেলোয়াড়দের কাছে হেরে গেছেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

কলকাতায় প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা বেশ জমে উঠেছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল তিনটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করেছে উয়াড়ীর কাছে ০—১ গোলে হেরে এবং পোর্ট ট্রাস্ট দলের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে। গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান ৯টা খেলায় পুরো ১৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। এই ৯টা খেলায় ৩৬টা গোল দিয়ে মাত্র একটা গোল খেয়েছে। মোহনবাগান ৮—০ গোলে বাটাকে হারিয়েছে। এখনও পর্যন্ত এটাই একটা খেলায় সর্বাধিক গোল করার রেকর্ড। মহমেডান স্পোর্টিং ০—২ গোলে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে এ মরশুমে প্রথম পয়েন্ট নষ্ট করে। বর্তমানে কলকাতার প্রধান তিন দলের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে—মোহনবাগানের ৯টা খেলায় ১৮, ইস্টবেঙ্গলের ৮টা খেলায় ১৩ এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ৭টা খেলায় ১২।

দর্শক

এবার সুপার স্টার ছিল না

কোম্পেস মারিও

১৯৭৮ সালের একাদশ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেলো। গতবারের রানার্স আপ হল্যাণ্ডকে হারিয়ে বিশ্ব বিজয়ীর বেশে ফুটবলের রাজাসনে বসেছে উদ্যোক্তা দেশ আর্জেনটিনা। সেই সঙ্গে আরো একবার প্রমানিত হলো আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে লাতিন আমেরি আধিপত্য। ইউরোপের কাছ থেকে এবার আবার বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ছিনিয়ে নিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা। কিন্তু এবারের প্রতিযোগিতার পর একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে লাতিন আমেরিকা হারাচ্ছে ফুটবল খেলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। সেই স্থানে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে ইউরোপীয় ঢংয়ে খেলার অন্ধ অনুসরণ। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলও এর ব্যতিক্রম নয়। আরাও ইউরোপীয় ধাঁচে ফুটবল খেলছে।

টোটাল ফুটবল বলতে যা বোঝায় তাই আমরা দেখেছি দূরদর্শনের মাধ্যমে। খেলা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে আক্রমণ চালানো এবং প্রয়োজনে সকলে পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষায় সামিল হচ্ছেন। গায়ের জার্সির নম্বরগুলো শুধু পরিচয়ের জন্যেই। খেলোয়াড়দের স্থান নির্দেশ করে না। একমাত্র গোলরক্ষক ছাড়া নির্দিষ্ট স্থান করো থাকে না। অবশ্য খেলা চলার সময়। তাই দেখা গেছে দু নম্বর খেলোয়াড় এগিয়ে গিয়ে গোল করছেন এবং দশ কিম্বা এগারো নম্বর খেলোয়াড় পিছিয়ে এসে দলের আত্মরক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। বল পাবার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকেন না। বল পায়ে নিয়ে কেউ অহেতুক সময় নষ্ট করেন না। যা করেন চটপট, যা করেন চকিতে।

এবারের বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে আর্জেন্টিনা ও হল্যাণ্ডের খেলার শুরুতে দু দলের খেলোয়াড়রা স্নায়ুর চাপে ভুগলেও মিনিট দশেক পরে তাঁরা টোটাল ফুটবল খেলেছিলেন: পাসের কাজ, বল দেওয়া নেওয়া, দ্রুত গতি, চকিতে স্থান পরিবর্তন, তাৎক্ষণিক সটে যে খেলাটি মনে রাখার মতো হয়ে উঠতো সেই খেলাই জমলো না। খেলোয়াড়দের মারদাঙ্গা মনোভাবের জন্যে। চোরাগোপ্তা পা চালানো, ধাক্কা দেওয়াই শুধু নয় প্রকাশ্য লাথি পা চালিয়েছেন দু দলের খেলোয়াড়রা। রেফারি যদি আর একটু শক্তহাতে খেলার

বার্টনি দানিয়েল

হাল ধরতেন তাহলে হয়তো সত্যি সত্যিই জমে উঠতো।

তবে বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলাটি কারো প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারে নি। বিক্ষিপ্ত লক্ষ ছাড়া খেলাটি কোন সময় জমে ওঠে নি। হেরে গেলেও হল্যাণ্ডের খেলার ধার ও ভার নেহাত কম ছিলো না; তারা জিতলেও কিছু বলার ছিল না। একটা গোল তারা করেছে। নষ্ট করেছে বেশ কয়েকটি সুযোগ। পোস্টে লেগেও ফিরে এসেছে বল। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা পেয়েছেন আশি হাজার স্বদেশবাসীর সমর্থন। তাঁদের চিৎকার খেলোয়াড়দের বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছে। এবং কেম্পেস ও বারতোনি প্রাপ্ত সুযোগ সদ্ব্যবহার করে রাজীমাৎ করেছেন। আর গোল

রক্ষক ফিলোল বারবার হল্যান্ডের আক্রমণ রুখেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে।

ফাইনাল খেলার আগে আর্জেন্টিনার প্রশিক্ষক ম্যানেজার বলেছিলেন লুকেই তাঁর দলের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু লুকে তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। তাঁর চেয়ে অনেক ভালো খেলেছেন দলনায়ক পাসারেলা এডিলেড, বারতোনি, আর গোল করায় তৎপরতা দেখিয়েছেন মারিও কেম্পেস। কেম্পেস এখন স্পেনে থেকে ইউরোপীয় কাপ ফুটবলে খেলেন। বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্বদেশের পক্ষে খেলার জন্যে তাঁকে আর্জেন্টিনায় আনা হয়। তাঁর যোগ্যতা কেম্পেস প্রমাণ করেছেন। এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি সর্বাধিক গোলদাতা: সাতটি খেলায় ছটি গোল দিয়েছেন মারিও কেম্পেস। লুকের খেলায় দেখা গেছে সার্বোক ঢং। বল পায়ে রাখার প্রবণতা তাঁর যেন কিছুটা বেশী। বল নিয়ে দ্রুত ছুটে যেতে চান তিনি. হল্যান্ড দলের কুলই ছিলেন আসল খেলোয়াড়। রক্ষণভাগের খেলোয়াড় তিনি। কিন্তু আক্রমণ হানাতেও তিনি দিয়েছেন সমান দক্ষতার পরিচয়। ভালো খেলেছেন করকফ ভাইয়েরা। বেনে আর উইলি করকফ যমজ ভাই। দেখতে একই রকম। বেনের দাড়ি আছে, উইলির নেই। দুজনেই এগিয়ে পিছিয়ে দারুণ খেলছেন। রেনসেনবিকসের ফাইনাল খেলার দিন ঠিক যেন তত্তোটা সুবিধে করতে পারেন নি।

হল্যান্ড-আর্জেন্টিনার বিশ্ব ফুটবলের ফাইনালের প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে মারিও কেম্পেসের দেওয়া গোলে আর্জেন্টিনা এগিয়ে যায়। হল্যান্ড সেই গোল শোধ করে দ্বিতীয়ার্ধে। খেলার ৮১ মিনিটে। খেলা শেষ হতে তখন আর মাত্র মিনিট দশেক বাকী ছিলো। অতিরিক্ত সময়ে কেম্পেস আর্জেন্টিনাকে আবার এগিয়ে দেন এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হবার মিনিট ছয়েক আগে খেলার ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে যায় আর্জেন্টিনার বারতোনি আর একটা গোল করার সঙ্গে সঙ্গে।

ফাইনালে ওঠার পথে আর্জেন্টিনা প্রথম পর্বের লীগের খেলায় হাঙ্গেরি ও ফ্রান্সকে ২-১ গোলে হারায়। তারপরই তারা ইতালির কাছে হেরে যায় এক গোলে। তবু তারা সেমিফাইনাল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। সেমিফাইনাল পর্যায়ে আর্জেন্টিনা দু গোলে পোলান্ডকে হারাবার পর ব্রাজিলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি শেষ করে গোলশূন্যভাবে। এবং শেষ খেলায় তারা পেরুকে ছ' গোলে পরাজিত করে। হল্যান্ড প্রথম পর্বে ইরাণকে তিন গোলে হারাবার পর পেরুর সঙ্গে গোল-শূন্যভাবে খেলা শেষ করে। তারপরই তারা স্কটল্যান্ডের কাছে হেরে যায় ৩-২। সেমি-ফাইনাল পর্যায়ের লীগের খেলায় অস্ট্রিয়াকে

পেলে

বেকেনবাউয়ার

৫-১ গোলে হারাবার পর পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে হল্যান্ড ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। তারপর ইতালিকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

সেমিফাইনাল পর্যায়ের খ বিভাগের খেলা দারুণ জমেছিল। ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার মধ্যে কোন দল ফাইনালে উঠবে তাই নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না। কারণ দু দলের পয়েন্ট তখন সমান সমান। ব্রাজিলের খেলা বাকী পোল্যান্ডের সঙ্গে আর আর্জেন্টিনার পেরুর বিরুদ্ধে। দু দলই যদি তাদের শেষ খেলায় জেতে তাহলে গোলের গড় হিসেবে যে দল এগিয়ে থাকবে তারাই ফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে। কিন্তু গোলমাল বাধলো খেলার সময় নিয়ে। ব্রাজিলের খেলা বিকেলে আর আর্জেন্টিনার সন্ধ্যের পর। অর্থাৎ ব্রাজিলের খেলার ফলাফল জেনে আর্জেন্টিনা মাঠে নামবে। এ এক মস্ত সুবিধে। কারণ তারা তখন জেনে যাবে ফাইনালে উঠতে হলে তাদের ক'গোলে জিততে হবে।

তাই খেলার সময়ের ব্যাপারে ব্রাজিল প্রতিবাদ জানিয়ে ফিফার কাছে অনুরোধ জানালো একই সময় খেলা দুটি শুরু করতে। পোল্যান্ড সরকারীভাবে প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু ফিফা সেই অনুরোধ ও প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলেন। তাঁদের যুক্তি খেলার সময়সূচী কয়েক মাস আগেই তৈরী করা হয়েছে। সেমিফাইনাল পর্যায়ের লীগের শেষ খেলায় ব্রাজিল ৩-১ গোলে পোল্যান্ডকে হারালো। ব্রাজিলের প্রাক্তন খেলোয়াড় বলের রাজা পেলে একটি কাগজে লিখতেন বিশ্বকাপের রিপোর্ট। ব্রাজিলের খেলার পর পেলে লিখলেন, 'ভগবান, আমি নিশ্চিত, তুমি ব্রাজিলবাসী।' পেলের সামনে ছিল একটি টি-ভি। টি-ভিতে তখন পেরুর সঙ্গে আর্জেন্টিনার খেলা দেখানো হচ্ছিলো। পেলে অবাক হয়ে দেখলেন, আর্জেন্টিনা গুনে গুনে গোল দিচ্ছে পেরুকে। গোলের গড় হিসেবে এগিয়ে যেতে হল আর্জেন্টিনাকে সেদিন কম করেও চারটি গোল করতে হতো। পেলে টি-ভিতে দেখলেন, আর্জেন্টিনা দেখতে দেখতে চারটি গোল দিলো। তখন তিনি লিখলেন, 'ভগবান, তুমি ব্রাজিলের দিকে বেশীক্ষণ রইলে না।' সেই খেলায় পেরুকে ছ' গোলে হারিয়েছিলো আর্জেন্টিনা। সেই সঙ্গে হাতিয়ে নিয়েছিলো ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র।

ব্রাজিল-পোল্যান্ডের খেলার ফলাফল জেনে আর্জেন্টিনার খেলার ব্যাপারটা অনেকেই ভালো চোখে দেখেন নি। তাঁদের মতে, জোর করে ব্রাজিলের কাছ থেকে ফাইনাল খেলার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থানের জন্যে খেললো ব্রাজিল ও ইতালি। এই খেলায় ইতালি এক গোলে এগিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পিছিয়ে পড়ে রুখে দাঁড়িয়ে ব্রাজিল দিলো দু দুটি গোল। ২-১ গোলে ইতালিকে হারিয়ে তারা তৃতীয় স্থান লাভ করলো। এবং এবারের প্রতিযোগিতার একমাত্র অপরাজিত দল হিসেবে দেশে ফিরে গেলো। ব্রাজিলের বোধহয় সেইটাই সব থেকে বড় সান্ত্বনা।

এবারের অর্থাৎ একাদশ বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো একটা বিষয় আছে। এতোকাল বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর-গুলো আলো করে থাকতেন তাবড় খেলোয়াড়রা। জগৎজোড়া তাঁদের নাম। খেলতেন পেলে, ইউসোবিও, বাবি মুর, মুলার, বেকেনবাউয়ার, কুয়েফ প্রভৃতির মতো খেলোয়াড়রা। কিন্তু এঁদের পদাঙ্ক যাঁরা অনুসরণ করবেন তাঁরা কোথায়? এবারের প্রতিযোগিতায় সেই সম্ভাবনার স্বাক্ষর তো কেউই রাখতে পারেন নি। চিন্তার কথাই বটে।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রধ্বনি

ঈশ্বর ও জীবনবীমা

'ভোলা ভালা'—ছবিটি ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত। বেচারি ভগবান। হিন্দী ছবির প্রযোজকরা ভালো করেই জানেন যে, এই ঠুঁটো জগন্নাথকে সাক্ষী রেখে স্বচ্ছন্দে যাবতীয় অপকর্ম চালিয়ে যাওয়া যায়, অন্ততঃ এদেশে। তবে ধরাধামে অন্য এক-দল দেবতা আছেন। তাঁরা মাঝে মাঝে রাগ করেন। এঁরা সরকারী তথ্য ও বেতার দপ্তর। তাই 'ভোলা ভালা' স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে জীবন বীমা প্রচারের মহান কর্তব্য।

এতে মুষড়ে পড়ার কোন কারণ নেই। অন্যান্য ছবিতে আপনি যা যা পান, মানে নাচ-গান-সুন্দরী - নায়িকা সবই আলোচ্য ছবিতে পাবেন। এমন কি পেয়ে যাবেন হেলিকপটারও। তবু কথায় বলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। ভগবান, সরকার, দর্শক—এতজনকে খুশী করার সংকল্প নিয়ে পরিচালক সং পাল কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। অবশ্য, ভুল হল, সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীভেঙ্কটেশ্বরাইয়ার কথা আমি জানি না।

শ্রীযুক্ত রাম ভার্মা (রাজেশ খান্না) বীমা কোম্পানির দালাল। যথারীতি ভোলা ভালা। তাঁর ব্যবসা হয় না। তাতে আমাদের দুঃখ হয়নি। পৃথিবী তাঁর প্রতি নির্দয় হলেও জনৈকা সুন্দরী (মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়) দীনবান্ধবী সেজেছেন এবং গায়ে পড়ে প্রেম করছেন। ছবির এই পর্যন্ত কষ্ট করে মেনে নেওয়া যায়। বীমার দালাল হিসেবে রাজেশের কথাবার্তায় কিছু আকর্ষণীয় উপ-করণও আছে।

কিন্তু সংকটের সূত্রপাত করেন পরি-চালক নিজেই। কেন জানি না, ধারণা হল রাজেশের কোন বিকল্প নেই, প্রতিটি দৃশ্যেই তাঁকে থাকতে হবে। অতএব রাজেশ মঞ্চে এখন থেকে ডাকাত সর্দার নাথিয়ার ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে শুরু করলেন।

"শোলে" প্রভাবিত একটি দৃশ্যের মাধ্যমে বোকাসোকা রামবাবুর সঙ্গে দস্যু-সর্দার নাথিয়ার আলাপ। বীমা কোম্পানির নিয়ম-কানুন ডকে তুলে দিয়ে দুজনের মধ্যে সম্পন্ন হল একটি পাঁচ লক্ষ টাকার জীবনবীমা পলিসি। আশা করি পাঠকের দয়ামায়া আছে। সুতরাং গল্প বলার বৃথা চেষ্টা আর আমি করব না। তবে এই পর্বে আমাদের যন্ত্রণা লাঘবের দায়িত্ব নিয়েছেন রেখা। ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ, তাঁর দেহ সুষমা এমন অকৃপণভাবে উন্মোচিত না হলে প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকাই হয়ত অসম্ভব ছিল।

রাজেশ খান্নাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অতিরিক্ত চাপে তিনি দুটি ভূমিকার কোনটিতেই মনোযোগ দিতে পারেন নি। প্রণয়-পাগলিনী মৌসুমী চলনসই। একবার তিনি শল্য-চিকিৎসায় ব্যস্ত ছিলেন। পরিচালকরা কেন যে সুন্দরী মেয়েদের এত কষ্ট দেন। রেখা তাঁর স্বাভাবিক স্মার্টনেস সহ নৃত্য পটিয়সী। পুলিশবাহিনী আকাশ-যান ব্যবহার করায় সংঘর্ষ ঠিক জমে নি। যেখানে ডাকাতরা নিতান্তই অশ্বারোহী সেখানে, হেলিকপটার, বলাই বাহুল্য, অপ্রাসঙ্গিক।

সরকার বাহুলে দেববর্মন নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

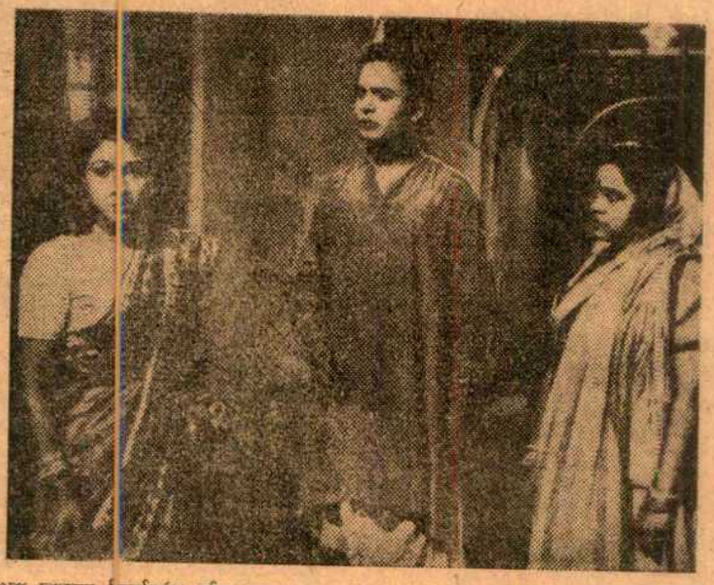

পঞ্চাশ দশকের বিতর্কিত ছবি 'কার পাপে' আবার মুক্তি পেয়েছে। ছবির একটি দৃশ্যে গীতশ্রী দেবী, উত্তম কুমার ও অপর্ণা দেবী।

যা দেখব না সে ছবি করব কেন ?

শ্যাম বেনিগাল

আপনার নতুন ছবি : 'জুনুন' তৈরি হবার ব্যাক গ্রাউন্ডটা কি যদি বলেন...

—পঁচাত্তর সালের নভেম্বর সংখ্যার 'ইমপ্রিন্ট' পত্রিকায় রাসকিন বণ্ডের 'এ ফ্লাইট অফ পিজন্' লেখাটি প্রথম বেরোয়। 'জুনুন' এই গল্প নিয়েই তৈরি। গল্পটা বেরোনর পর পার্ল পদমশী আমায় বইটা পাঠিয়ে দেন পড়ার জন্য। উনি হয়ত ভেবে-ছিলেন আমি ছবি করব। তখন কিন্তু ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। গত বছর একদিন শশীকাপুর বলল ও একটা ছবি করবে। অনেক গল্পটল্প পড়লামও আমরা। হঠাৎ মনে পড়ল রাসকিনের এই গল্পটার কথা। শশীকে বলতেই ও রাজী হল। ব্যাস্।

: এই ধরনের পিরিয়ড ফিল্ম করা নিশ্চয়ই খুব সহজ নয়, তাই না ?

—স্ক্রিপ্টের খসড়া লেখার আগে কয়েক মাস কেটেছে আমার পড়াশুনো আর গবেষণায়। ছোটখাট অনেক ডিটেলের কাজে নজর রাখতে হয়েছে। অবশ্য অনেকে আমাদের সাহায্যও করেছেন। দিল্লী, জয়পুর, শাহজাহানপুর, লক্ষ্ণৌ সব জায়গার আর্কাইভ থেকে অনেক কিছু পেয়েছি আমরা। গত বছরের অনেকটা সময়ই গেছে এইসব সংগ্রহের কাজে। তবে এই খাটুনিতে আনন্দও আছে। ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে ছবি করতে গেলে কোন ত্রুটি রাখা যায় না তো !

: আপনার ছবির কস্টিউম, ব্যাক-গ্রাউন্ড, হিন্দী-উর্দু-ইংরেজী সংলাপ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'র সঙ্গে 'জুনুন'এর কোন তুলনা করা যায় কি ?

—না, কখখোনো না। আমাদের দেশের লোকদের বড় বদ্ অভ্যেস কারও সঙ্গে কারও তুলনা করার। দুটো ছবি সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের। তুলনা কোন কারণই নেই, সিমিলারিটি থাকলে তবে তো তুলনা করবেন !

: আপনি ব্যবসায়িক ছবি তৈরির বিরুদ্ধে কেন ?

—সোজা কথা, ওটা আমার আসে না। সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ছবি তৈরিতে আমার আগ্রহ নেই, টেমপারামেন্টও নেই। যেটা আমার ভালো লাগে না, সেটা করব কি করে ! যে ছবি নিজেরই দেখে ভালো লাগবে না, সে ছবি করব কেন বলুন ? সবার আগে, ছবিটা আমার ভালো লাগা দরকার। আপনি

ঘুরিয়ে বলতে পারেন—আমি প্রথমতঃ নিজের জন্যই ছবি করি।

ঃ আপনি কি বলতে পারেন যে আপনার শিল্পীদের বিশেষ কোন গুণ থাকে বলেই আপনি তাঁদের নেন?

—কাজ পাগল যেকোন পরিচালকের মতই আমিও চাই শিল্পীদের প্রফেশন্যাল অ্যাটিচুড থাকবে। তা বলে তাঁরা গ্ল্যামারের স্বর্গ রাজ্যে থাকবেন তা নয়, আমি বলতে চাইছি. ইউনিটের সঙ্গে তাঁরা সবাই একাত্ম হয়ে যাবেন, একটা ফ্যামিলি তৈরি করবেন সবাই মিলে। অবশ্য সেই সঙ্গে পরিচালকেরও দায়িত্ব হবে তেমন ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাঁর ব্যবহার, তাঁর আচার-আচরণ সবাইকে যেন আপন করে নেয়।

ঃ আচ্ছা, এটা শেষ প্রশ্ন। আপনার এই 'জুনুন' দর্শকরা কেমনভাবে নেবে আশা করছেন?

—ছবির পরিচালক হিসাবে ছবিটা দর্শককে দেখাবার আগেই আমি কোন বক্তব্য দর্শকের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। একটা ব্যাপার আমি স্থিরনিশ্চিত যে 'জুনুন' আকারে, আকৃতিতে, চরিত্রে একটি বিরাট ছবি হতে চলেছে—যা আমি কল্পনাও করিনি। আদর্শ-বিপ্লব-নির্যাতন-প্রেম সব কিছুই আছে ছবিটিতে, কিন্তু অন্যভাবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রগুলো সব অসুবিধের মুখোমুখি হয়েও এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়, দাঁড়াতেই হয়। আর অভিনয়ও করেছে সবাই দারুন। এক কথায় 'জুনুন' দেখার মত ছবি হবে এটা আমি বলতে পারি।

নির্মল ধর

ছবির খবর

সন্ধি

ধীরেশকুমার চক্রবর্তী প্রযোজিত ডি কে ফিল্মস এন্টারপ্রাইজের দ্বিতীয় নিবেদন ইস্টম্যানকলার বাংলা ছবি 'সন্ধির' (কাহিনী: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) শুটিং এগিয়ে চলেছে। স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন অমল দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির নায়ক-নায়িকা ঃ দীপঙ্কর-মিঠু। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করছেন; বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা মুখোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও আলপনা গোস্বামী। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সঞ্জীব সেন ও রমেশ যোশী।

অগ্নিশুদ্ধি

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে চলছে কেদার সারিণ প্রযোজিত রাধা ফিল্মস রূপো-

জয়-পরাজয় 'ছবিতে নন্দিনী মালিয়া

রেশনের 'অগ্নিশুদ্ধি' ছবির শুটিং। ইলা অধিকারীর কাহিনী থেকে স্বরচিত চিত্রনাট্য ছবিটি পরিচালনা করছেন শচীন অধিকারী। সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, অনুপকুমার, বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যারাণী, কুমারী টিঙ্কু এবং নবাগতা শকুন্তলা বড়ুয়া ছবিটির বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে আছেন পুনা ফিল্মস্ ইনস্টিউটের স্নাতক কমল নায়েক।

দৌড়

শান্তিলতা পিকচারসের ব্যানারে নির্মিয়মাণ বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রযোজিত 'দৌড়' (কাহিনী/সমরেশ মজুমদার) ছবির একপ্রস্থ শুটিং হয়ে গেল নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে। নায়কের ভূমিকায় রূপদান করছেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, মহুয়া রায়চৌধুরী, বিমল দেব, বিকাশ রায় এবং নবাগতা রুবী সেন আছেন। স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন শংকর ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুধীন দাশগুপ্ত। ধ্রুবজ্যোতি বসু, সুনীতি মিত্র ও গঙ্গাধর নস্কর আছেন যথাক্রমে চিত্রগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনায়।

হীরে মানিক

ছোটদের ছবি 'হীরে মানিক'-এর শুটিং প্রায় শেষ। মদনমোহন পিকচার্সের ব্যানারে নির্মীয়মাণ এ-ছবির চিত্রনাট্যকার-পরিচালক ঃ সলিল দত্ত। কাহিনীকার সমীর ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালক ঃ মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। হীরে মানিকের চরিত্রে বাপ্পা ও সোম্য অভিনয় করছে। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর ঘোষাল, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার এবং চিন্ময় রায়। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন

যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যেন রায়-চৌধুরী এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়।

করুণাময়ী

রত্না ফিল্ম কর্পোরেশন নিবেদিত ভক্তিমূলক শ্রদ্ধার্ঘ রঙিন ছবি 'করুণাময়ী'র শুটিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বারি দেবীর কাহিনী থেকে বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যে ছবিটি সম্পাদনা ও পরিচালনা করছেন অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, ছায়া দেবী, তপতী ঘোষ, কালীপদ চক্রবর্তী এবং ঝুমুর গাঙ্গুলী। ছবিটির পরিবেশক আর ডি বি অ্যাণ্ড কোং।

মান অভিমান

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত প্রতিমা পিকচার প্রোডাকসন্সের 'মান অভিমান' ছবিটি মুক্তির প্রতীক্ষায়। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুখেন দাস। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অজয় দাস। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, শিশির বটব্যাল, শিপ্রা বসু, নবাগত রাজকুমার ও অনিল চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির পরিবেশক প্রতিমা মুভীজ।

গোলাপ বৌ

চিত্রসেবী নিবেদিত বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রযোজিত 'গোলাপ বৌ' ছবিটি অনতিবিলম্বে মুক্তি পাচ্ছে। কাহিনী চিত্রনাট্য, চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নীতা সেন। বিভিন্ন চিত্রে রূপদান করেছেন সন্ধ্যা রায়, সমিত ভঞ্জ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সুলতা চৌধুরী, অরুণকুমার, নিমু ভৌমিক ও আরতি ভট্টাচার্য। ছবিটির পরিবেশক নারায়ণী চিত্রম্।

স্টাইকার

কেয়া ফিল্মস নিবেদিত ফুটবল পাগলদের জন্য রঙিন ছবি 'স্টাইকার' রাধা, পূর্ণ, প্রাচী প্রভৃতি চিত্রগৃহের পরবর্তী আকর্ষণ। মতি নন্দীর কাহিনী থেকে পরিচালনা করেছেন অর্চন চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন প্রবীর মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চিত্রে রূপদান করেছেন সমিত ভঞ্জ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, রুমা গুহঠাকুরতা, সন্তু মুখোপাধ্যায়, রমেন রায়চৌধুরী, চিন্ময় রায়, নিপু মিত্র, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় এবং উৎপল দত্ত। এছাড়া কলকাতার অনেক নামী দামী ফুটবল খেলোয়াড়। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন বর্ণাভিমা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।

চামেলী মেমসাহেব ছবিতে রাখী ও জর্জ বেকার

স্বর্ণ মৃগয়া

ভোলা ময়রার পর পশুপতি গাঙ্গুলীর পরবর্তী চিত্র প্রয়াস মঞ্জুশ্রীর প্রযোজিত রঙিন ছবি স্বর্ণ মৃগয়া। জীবন বোধের এক গভীরতম প্রেম ও বেদনার সংবেদনশীল গল্প স্বর্ণ মৃগয়া। কাহিনী ও চিত্রনাট্য শক্তিপদ রাজগুরু।

এক নাটক : দুই চোখে

(১)

মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনী অবলম্বন করে নির্মিত হয়েছে থিয়েটার এজ-এর বিদ্রোহী প্রযোজনা দ্রৌপদী। গল্পটি নিঃসন্দেহে গত কয়েক বছরে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ বাংলা গল্পগুলোর একটা। অথচ এর মঞ্চপ্রয়োগ এককথায় ব্যর্থ হয়ে গেল প্রযোজনার ত্রুটিতে।

থিয়েটার এজ-এর নাটক দেখতে দেখতে (১৫ জুন শিশির মঞ্চে) যে-কথা কেবল মনে হচ্ছিল, তা এঁদের কল্পনাবিন্যাস ও অভিজ্ঞতার অভাবের কথা। বিপ্লবী রীতি-নীতি সম্বন্ধে বেশ কিছুটা থিয়োরিটিক্যাল পড়াশোনা আছে নাট্যরূপকার তথা পরিচালক শশধর নস্কর-এর, একথা ঠিক। কিন্তু মঞ্চে তার সফল রূপায়ণ করার মতো ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই তাঁর এখন অবধি তৈরি হয়নি। তাই সংলাপ ও বিজনেস-এর মাঝে বড়ো বড়ো ফাঁক সৃষ্টি হয় প্রত্যেক চরিত্রের ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক অভিনয়ে। তপন লণ্ঠনের আলোয় কবিতা পড়া শুরু করে, কিন্তু অন্যান্য কমরেডরা আসতেই মঞ্চে ডে-লাইট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এদিকে লণ্ঠনও জ্বলতেই থাকে। আবহে প্রথমবার রেডিও বাজে অর্জুন সিং-এর উইংস এর ধারে নিয়ে রেডিও খোলার অভিনয়ে, প্রথমবার বন্ধও হয় সেইভাবে, তারপর কিন্তু বারবার আবহে রেডিও বাজে এবং বন্ধ হয় আপনাআপনি। সতীশ, যিনি এই নাটকের একজন প্রধান বিপ্লবী, এবং সেই সঙ্গে সূত্রধারের কাজ করেছেন (ভূমিকালিপিতে অবশ্য লেখা ছিল সূত্রধর) তিনি সূত্রধার হিসেবে কখনও এমন সব ঘটনা বলেছেন যা পরে অভিনয়ে দেখানো হয়েছে, কখনও বা হয়নি। ফলে অনেকগুলো জট পাকিয়ে গেছে। প্রথমত একই ব্যক্তি দুটি অভিনয় করেছেন কি শিল্পীর সংখ্যা কম বলে? আবার আলাদা কেউ সূত্রধার করলে, এ-নাটকে সূত্রধারের চরিত্রে নির্লিপ্ত বিবরণ দানে বদলে শোষকদের প্রতি যে বিদ্রূপ আরোপিত হয়েছে, তা যথার্থ হতো কি? অথচ সতীশ-এর সূত্রধার ঠিক অ্যালিয়েনেশনও করে না। আবার সব সময় সময় ও ঘটনা-প্রবাহের মাঝখানের ফাঁকটুকুও ভরাট করে

গোলাপ বৌ ছবিতে সমিতা সন্ধ্যা

না। যেমন আগেই বলেছি যে, তার বর্ণিত কিছু কিছু ঘটনা পরে অভিনয়ে দেখা যায়। তা আবার সর্বত্র হয় না, ফলে সে যে আমাদের সহজে নাটকের বিষয়বস্তু বোঝানোর অগ্রিম মেড-ইজি তাও সবসময় নয়। এরকম সমস্ত গণ্ডগোলেরই পিছনে আছে ঐ কল্পনা ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা। নৈপুণ্যের কথা তুলছি না, তাহলে তো আবহে টেপ চালানোর ব্যর্থতা, প্রম্পটারের সরব আত্মপ্রচার, গেরিলা-যুদ্ধের দৃশ্যে বিপ্লবীদের কানের পাশে টুনি জ্বলা, এইসব কিছু নিয়েই কথা বলতে হয়। কিন্তু গভীর জঙ্গলের ঐ অপরূপ মঞ্চবিন্যাস কি করে এলো পরাশর সরকারের মাথায়।

এই নাটকের আবহ খুব চড়া ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়। রূপসজ্জায় শচীন আঢ্য অবশ্য তাঁর কাজ মোটামুটি বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। আলোর ব্যবহারে দিলীপ মিত্র অকৃপণ ছিলেন, কিন্তু সেই প্রাচুর্যে নাটকের লাভ হয়নি কিছুই। নির্দেশনা প্রসঙ্গে এ-নাটকে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। শুধু শেষ দৃশ্যে এবং দুঃখী ঘড়ারীকে হত্যার দৃশ্যে বাংলার নাটকে ফ্রীজ-এর পুনরাবৃত্তি ছাড়া। অবশ্য দ্রৌপদীর উপর অত্যাচারের পর ভূলুণ্ঠিতা দ্রৌপদীর চোখের সামনে পিছনের পর্দায় নীল আলো ও নেপথ্যে কাব্যময় ভাষণ-এর পরিকল্পনাটি সম্ভাবনাময়।

অভিনয় প্রায় কেউই এখনও শিখে উঠতে পারেননি। তবু শশধর নস্কর (দীপক), ভাস্কর নস্কর (দুলনা) এবং কল্যাণী মণ্ডল (দ্রৌপদী) অনেকটা সপ্রতিভ, চেঁড়া দেওয়ার দৃশ্যে আহম্মদ গাজীকেও ভালো লাগে। বটকৃষ্ণ রায় সাফই যখন দুঃখী ঘড়ারী, তখন তিনি ম্যানারিজমের আশ্রয়ে বাঁচতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেননি।

দ্রৌপদী নাটক হিসেবে দুর্বল, কিন্তু থিয়েটার এজ যে সহজের দিকে লোভ না দেখিয়ে একটা শক্ত ব্যাপারে হাত দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এটাই আশার লক্ষণ।

সুরজিৎ ঘোষ

।।২।।

মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত গল্প 'দ্রৌপদী' একটি মেয়ের গল্প, সেই সঙ্গে একটি সময়ের দলিল। সামাজিক বিবর্তনের বক্ষ মুহূর্তগুলির বিশ্লেষণ। সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করার স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা রক্ত ঢেলেছিলেন, দোপদী মেঝেন স্বপ্নদেখা সেই যৌবন।

'থিয়েটার এজ'-এর শিল্পীরা প্রথম ধন্যবাদ পাবেন এই গল্পটি অবলম্বন করে নাটক মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাট্যরূপ দানে শশধর নস্কর সার্থক হতে পারেন নি। নাটক বেশ একঘেঁয়ে। যা কিছু অল্প কথায় সারা যেত, তা অনাবশ্যক দীর্ঘায়িত হয়েছে। এ কারণেই নাটকটি কখনই জমাট বাঁধে নি।

অভিনয়ে কল্যাণী মন্ডলের দোপদি অত্যন্ত সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ। অভিনয়ের মূল ব্যাকরণটা তাঁর আয়ত্তাধীন কিন্তু নির্দেশনা আরও উন্নততর হলে তিনি হয়ত আরও ভালো অভিনয় করতে পারতেন। এছাড়া সাধারণভাবে অভিনয়ের মান উঁচু নয়। দুলাল মন্ডল সূত্রধারের ভূমিকাটি ঠিক মতন ফোটাতে পারেন নি। উচ্চারণে ত্রুটি আছে। তাছাড়া বীণা মহাপাত্র, দুলাল ঘোষাল, গোবিন্দ নস্কর, শশধর নস্কর, ভাস্কর নস্কর, পরাশর সরকার সকলের অভিনয়ই সাধারণ মানের।

নির্দেশনা, আলোর ব্যবহার, শব্দ প্রয়োগ কিছুই উন্নত মানের নয়। তবু 'থিয়েটার এজ'-এর শিল্পীরা এমন একটি কাহিনী নিয়ে নাটক করার পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য আমাদের সাধুবাদ পাবেন।

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

এইভাবেই কাটিয়ে যাব হা হা

আটই জুনের হাতে-গরম সন্ধ্যায় মুক্তাঙ্গনে সন্দীপন-এর প্রযোজনায় 'এই ভাবেই কাটিয়ে যাব হা হা' নাটক শুরু হল। শুরুতে একটা মেজাজ থাকে, মেজাজ তৈরি করার দায়। যা সন্দীপনগোষ্ঠী বয়স্ক তৎপরতায় সমাধা করতে কিছুটা অসফল থেকে গেছেন। কিন্তু এই ঝুলে থাকা মেজাজ অ্যালকোহলিক কীক্ পেয়ে যায় মাত্র আধঘন্টা সময়ের ব্যবধানে, অর্থাৎ নাটক কিছুটা এগোনোর পর। চুম্বকের অদৃশ্য ফাঁসে দর্শকমন বাঁধা পড়ে গেছে ততক্ষণ। নিবিষ্ট থাকতে হয় দর্শকদের—কেননা নাটকের ঘটনা, সংঘাত এবং পরিপক্ক অভিনয় কৌশল অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরেছে মনোযোগ। নাটকের কাহিনী সামাজিক, উপকরণ সাম্প্রতিক অবক্ষয়। অবক্ষয়ের বিষ কিভাবে রক্তে মিশে গিয়ে পঙ্গু করে দিচ্ছে সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিক রুচি—তার বিধৃত রূপায়ণ নাটকে দেখা গেল। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যাপক তোড়জোড় থাকলেও, উপকে যাওয়ার কঠোর জেদ প্রকাশ পায়নি। কেমন যেন তার মানের অসহায়তা থেকে গেল শেষপর্যন্ত। প্রগতিশীল বক্তব্যধর্মী নাটকে এ-ধরনের পর্দা-টানায় নাটকের সাহিত্যরস খুন হয়ে যায় বিস্তর। সন্দীপন গোষ্ঠীর বহু ঐশ্বর্য

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনী অতিক্রান্ত !
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টা
তরুণ থিয়েটারে
নাটক ও পরিচালনা · সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শেষাংশে : বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

তার অভিনয়-নৈপুণ্য। তাঁদের অভিনয় দীর্ঘকাল মনে রাখার মত। মলয় অধিকারী, তপন নাথ, মুকুল চ্যাটার্জি, কাজল চক্রবর্তী, উৎপল ভট্টাচার্য এবং তপন মুখার্জি শক্তিমান অভিনেতা। বিশেষ করে ষষ্ঠিপদ এবং সুবল ও উকিলের ভূমিকায় যথাক্রমে মুকুল চ্যাটার্জি এবং উৎপল ভট্টাচার্য অসামান্য অভিনয় করেছেন। নাটকের কয়েকটি দৃশ্য অনবদ্য। যেমন—বিচার দৃশ্য, ব্রজমোহন খুনে হওয়ার দৃশ্য এবং অরুর শালীতাহানির দৃশ্য। দৃশ্যগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ উজ্জ্বল এবং নির্ভুল। তবে একটা দৃশ্যে নান্দীকারের তিন পয়সা পালার অংশবিশেষ অনুকরণের ঝোঁক ছিল প্রত্যক্ষ। সেটা প্ল্যাকার্ড দৃশ্য। প্ল্যাকার্ডে লেখা বিভিন্ন শ্লোগানের প্রবেশ প্রস্থানে। দৃশ্যটা দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার দরুণ দর্শকদের বিরক্ত করে। নাটকের বড় ব্যাপার মঞ্চপরিকল্পনা। তার সামান্য ভুলচুক নাটকের শরীরে অসুখ ছড়ায়। কিন্তু সন্দীপন প্রযোজিত নাটকের মঞ্চপরিকল্পনার পেছনে বাহাদুরি মগজ বজায় থেকেছে সারাক্ষণ। নাটকে কয়েকটি গান আছে, সেগুলো নাটকের শেকড়বাকড়—প্রয়োজনে অমোঘ। আলোর কাজ ভাল। সন্দীপন নাট্যগোষ্ঠী বয়েসে কচি হলেও প্রচুর সম্ভাবনাময়। তাঁদের 'এই ভাবেই কাটিয়ে যাব হা হা' নাটক দর্শকদের খুশি করবে বেশ।

অমল আচার্য

সম্বর্ধিত মুনাবার

সম্প্রতি গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে ফিলিপস কোম্পানীর উদ্যোগে একটি আকর্ষণীয় সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের ভাগ্নে পাকিস্থানী গজল এবং ঠুংরী গায়ক গফ্ফার হোসেন খাঁর অনুষ্ঠান করা ও ইউরোপ সফরের আগে মুনাবার আলী খাঁকে সম্বর্ধনা জানানো। অনুষ্ঠানে দুই শিল্পীই শ্রোতাদের সংগীত পরিবেশন করে শোনান। রাজ্যপাল শ্রীভিভুবন নারায়ণ সিংও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার পক্ষ থেকে সফদার হোসেন খাঁকে একটি রেকর্ড চেঞ্জার উপহার দেওয়া হয়।

ত্রিসপ্তক

গত ১৭ জুন প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার হলে 'ত্রিসপ্তক' সঙ্গীত সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন সংস্থার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক।

ছোট্ট মেয়ে শ্রাবণী ঘোষ তার অনায়াস নাচ দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। বিরাট দর্শক যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে শ্রাবণী ঘোষাকিরা করেছে। সামান্য জড়তা ছিল না আচরণে। সঙ্গে ছড়ার গানটিও নিঃসন্দেহে ভালো গেয়েছেন পার্বতী ঘোষ। গানটি রচনা এবং সুর সংযোজনার কৃতিত্ব নেপাল রায়ের। নেপালবাবু সংস্থার শিক্ষক। ভারত নাট্যম এবং কথাকলি নাচের অনুষ্ঠান দুটিও দর্শকদের ভালো লেগেছে। বিশেষ করে ভালো লেগেছে ছোটদের নাচ গানের অনুষ্ঠান—'মণিমালা মুক্তামালা'। প্রিয়াঙ্ক মৈত্রের সুর দেওয়া গানগুলিও শুনতে ভালো লাগে। পার্বতী মিত্রের গ্রন্থনায় ছোটদের অনুষ্ঠানের মেজাজ ছিল। নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনায় আরতি গড়াই নিঃসন্দেহে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। একক অনুষ্ঠানে শিক্ষক প্রিয়াঙ্ক মৈত্রের কয়েকটি গান ভালো লেগেছে।

সম্মেলক গানের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের দুটি গান 'আগুনের পরশমণি' এবং 'আকাশ ভরা সূর্যতারা' হতাশ করেছে। সঙ্গের যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগিতা আরও মর্মান্তিক। 'আধুনিক কবিতার গীতিরূপ' অনুষ্ঠানটি মোটের ওপর ভালো। অন্তত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ফেঁচটা কবিতাটি মহিলা শিক্ষার্থীরা সম্মেলক কণ্ঠে ভালো গেয়েছেন। ঋষিণ মিত্রের সুর ভোলা যায় না। বিদ্যুৎ বসুর গীটার শ্রোতাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। তার বাঁ দিকে সহযোগী বাজিয়ের অশালীন প্রায় নৃত্য প্রয়াস অনুষ্ঠানের রুচিবোধের অনুকূলে ছিল না।

দিগ্বিজয় দিক্‌পতি

সফদর হোসেন খানের ঠুংরি

কলকাতা মিউজিক সারকেলের মাসিক অধিবেশনে সফদর হোসেন খানের ঠুংরী শুনলাম। ইনি পাতিয়ালা ঘরানার শিল্পী বিখ্যাত ঠুংরী গায়ক বরকত আলী খাঁর পুত্র। বরকত আলী খাঁ সাহেবের ঠুংরী গায়কীতে কিছু বিশেষত্ব ছিল যা পাতিয়ালা ঘরানার অন্য গায়কদের কাছে পাওয়া যেত না। এমন কি দাদা বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, এই প্রভাবকে তিনি সব সময়েই নিজের ছাঁচে ফেলে একটি স্বতন্ত্র রূপ দিতেন, ঠুংরী ও গজল গায়কীর মধ্যে পাঞ্জাবী লোক-সঙ্গীতের কিছু অলংকার প্রয়োগের ব্যাপারেও বরকত আলী খাঁ সাহেবের দান অসামান্য।

সফদর হোসেন খান 'খাম্বাজ'-এর একটি ঠুংরী দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন ও পরে 'পিলু' ও 'পাহাড়ী' ঠুংরী গেয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। সফদর হোসেনের গলা মিষ্টি ও সুরেলা। জটিল গিটকিরীর ও মুরকীর কাজেও কখনও সুরের বিচ্যুতি ঘটে না। কিসের পর কি অলংকার সাজাতে হবে সে বিষয়ে ইনি যথেষ্ট ওয়াকিফহাল এবং এজন্যই সেদিন সুর লাগানোর দুই এক মিনিট পরেই ইনি আসর জমিয়ে দিয়েছিলেন। আরও একটি জিনিস সেদিন লক্ষ্য করলাম যে বিভিন্ন রাগে ঠুংরী পর পর গাইলেও শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই খুব সহজে অনেক কঠিন অলংকারের প্রয়োগ করছিলেন। এতে ওর রেওয়াজ, সুরের উপর দখল, সুরবোধ ও কণ্ঠ দক্ষতার পরিচয় পাই।

কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র

মেট্রোপলিটন কলেজ

পরিচালনা ও শিক্ষাদানে

শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

সুযোগ্য পুত্র

গোলাম সবীর খাঁ

ও

শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিশিষ্ট বেতারশিল্পী

২৪১/১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা

ফোন : ৪৫-০৯৩৯

কয়েকদিন পরেই আরেকটি আসরে ওর গাওয়া কয়েকটি গজল শুনে বিশেষ তৃপ্তি পেলাম। এর গজল সাধারণ গজলের মত সস্তা অলংকারের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। ভাল রাগসঙ্গীতের ভিত আছে বলে কখনও মনে হয়নি একই স্বরলিপির কাঠামোর ওপর শুধু কথা পাল্টানো হচ্ছে—যা অনেকের ক্ষেত্রেই মনে হয়। মেহেদী হোসেনকে নিয়ে আমরা বোধ হয় একটু বেশী বাড়াবাড়ি করেছিলাম।

কলকাতা মিউজিক সারকেলের সেদিনকার অধিবেশনে সমাপ্ত ঘটে ইস্তিয়াফ হোসেন খাঁর খেয়াল দিয়ে। ইস্তিয়াক হোসেন রামপুরের বিখ্যাত গায়ক মোস্তাক হোসেন খাঁর পুত্র। মোস্তাক হোসেন খাঁর তালিমের বেশী ভাগ গোয়ালিওর ঘরানা এনায়েৎ হোসেন খাঁর কাছে হলেও উনি আগ্রা ঘরানার মেহেবুব হোসেন খাঁর কাছেও শিখেছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় ইস্তিয়াক হোসেনের গানের বেশীর ভাগ গোয়ালিওরের হোদ্দু-হোসু খাঁর ধাঁচে হলেও আগ্রা ঘরানার ছায়াও মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছিল। কামোদের মতন একটি ছোট রাগ ইনি এক ঘন্টার উপর গাইলেও তাতে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে নি। সময় সময় মুস্তাক হোসেন খাঁর অপূর্ব কণ্ঠ মাধুর্যের কথা মনে পড়ছিল। খুব ভাল শিক্ষা না পেলে এ ধরনের গান গাওয়া যায় না। এই শিক্ষার সুযোগ ইস্তিয়াক হোসেনের পুরো দস্তুর হয়েছিল কারণ দীর্ঘদিন পিতার সঙ্গেই থাকতেন ও পিতাকে তানপুরা বাজিয়ে গান গেয়ে সহযোগিতা করতেন। একক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নি বললেই চলে। অতএব পিতার খাঁটি সঙ্গীত ধারায় হাত তালির মোহে ভেজাল মেশানোর প্রয়োজন ওর কখনও হয়নি। গোয়ালিওর সেনী ঘরানার আদি গায়কী আমরা একমাত্র ইস্তিয়াক হোসেনের মধ্যেই খোঁজবার চেষ্টা করতে পারি। এই ঘরকে অনেকে রামপুর ঘরানা ভুল করে বলে থাকে। রামপুর দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা অবশ্যই ছিল। তাতে এই সব গায়করা বৃটির কথা না চিন্তা করে সঙ্গীত সাধনা করতে পেরেছে। কিন্তু তাতে তো ঘরানার নাম পাল্টায় না, কারণ যে সঙ্গীত তারা পরিবেশন করতেন সেটা তাদের পূর্বপুরুষদের ধারায়—যে ধারায় পূর্ণ বিকাশ একদিন ঘটেছিল গোয়ালিওরের তানসেন পাঁড়ের হাতে যিনি সম্রাট আকবরের দরবারে ধর্ম বদল করে মিয়া তানসেন নামে ভারতীয় সঙ্গীতে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

রবীন্দ্রসংগীত

সারথীর আমন্ত্রণে শিশির মঞ্চে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান 'ওগো কিশোর আজি' দেখতে গিয়ে অপেক্ষাকৃ কিছু নবীন শিল্পীর গান শুনে ভাল লাগল। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলে শ্রীমতী বনানী গোয়েঙ্কা। দী দি শৈলজাবাবুর কাছে শিক্ষা নেবার ফ শ্রীমতী গোয়েঙ্কা রবীন্দ্রনাথের প্রচলি গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে কিছু টপ্পা অঙ্গে কঠিন গানও আয়ত্ত করেছেন। এই শিক্ষা ভাল বুনিয়াদ তিনি পুরোপুরিভাবে কা লাগান সেদিন সংগীত পরিচালনা ক বিশেষ করে নাম-না-জানা কিছু শিল্পী নিয়ে কি রকম পরিশ্রম করলে এই ধরনে অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা য তা একমাত্র যারা দিনের পর দিন রিহের্সা করায় তারাই বুঝতে পারবে। সন্দী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য পরিচালনা ও অর ভট্টাচার্যের গ্রন্থনা অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করতে সাহায্য করে। কণ্ঠসংগীতে যাঁ অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিবাণী কুণ্ডু, গৌতম গুপ্ত, মলয় বা সুবীদ ঠাকুর ও সুমিত ভট্টাচার্য বিশে প্রশংসার দাবী রাখে। নৃত্যে পার্থ সে মধুমিত ভট্টাচার্য, সীমা চক্রবর্তী, সুপর্ণ বসু, সৌমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয় পাল শুভাশিস ভট্টাচার্যের সম্বন্ধেও একই ক বলা যায়।

রবীন বর্মা

আর একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রবী বর্মার রবীন্দ্রসংগীত শুনে ভাল লাগ রবীন বর্মার কণ্ঠ বলিষ্ঠ। আওয়াজে জোয়ারিও ভাল। কঠিন অলংকারের সময় কোথাও সুরের বিচ্যুতি ঘটেনি। এর কা বোধহয় রবীনের মার্গসংগীতের তালিম রবীন্দ্রসংগীত শেখার আগে আগ্রা প্রসিদ্ধ গায়ক বসির খাঁর পুত্রের কাছে দী সাত বছর সংগীতশিক্ষা করেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা সন্তোষ সেনগু ভারতী মিত্র ও সুচিত্রা মিত্রের কা নিচ্ছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্য রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করলে আরও ভ গাইবেন।

রবীন বর্মাকে আরও প্রশংসা কর কারণ, ইনি বাঙ্গালী নন। তার ও জীবনের বেশির ভাগই বাংলার বাই কেটেছে—রাঁচী, মিরজাপুর ও আগ্রায়। সত্ত্বেও বাংলা কথার উচ্চারণে কো জড়তা নেই। ভারতীয় বিমানবাহিনী একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পনেরো ব বিমান উড়িয়েও যাঁর গানের প্রতি এ ভালবাসা, তাঁর ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সুব্রত রায়চৌধু

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা— ৭০০০০৩।

দে বুক স্টোর্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা।

একটি সামান্য ভ্রমণ কাহিনী

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
২১ জুলাই ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

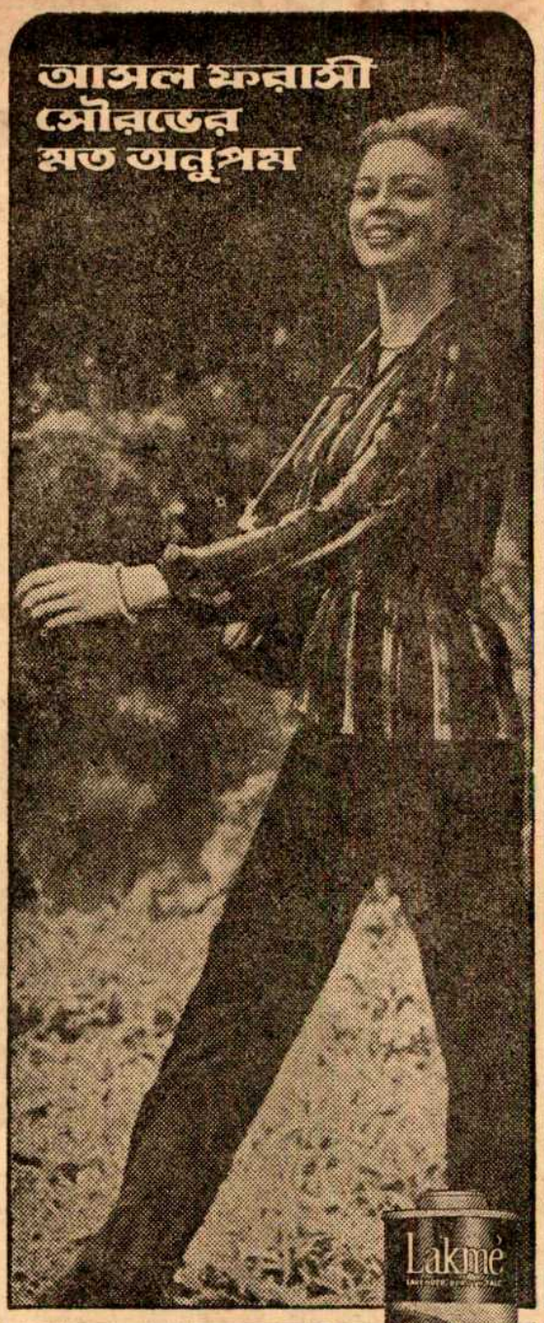

লোক্মে

ল্যাভেণ্ডার ট্যাল্ক

একেবারে আসল ফরাসী ল্যাভেণ্ডারের মত এর মন-মাতানো সুরভি আপনাকে সারাক্ষণ আবেশে বিভোর করে রাখবে—যে সুরভির রেশ কখনো ফুরোয় না।

ল্যাক্মে—
সৌন্দর্য সাধনায় যাঁরা সবার সেরা

লোক্মে

লোক্মে

ভ্যানিশিং ক্রীম

কত কোমল ...
কত স্বাভাবিক—মেক-আপের মূল বুনিয়াদের এক আদর্শ উপাদান। ল্যাক্মে ভ্যানিশিং ক্রীম।

ল্যাক্মে—
ত্বকের পরিচর্যায় যাঁরা সবার সেরা

লোক্মে

deCunha/L-VC/LT/3 h Ben.

দিব্যেন্দু গুহর নবতম পূর্ণাঙ্গ নাটক

ল্যাঙ্গুয়েজ ৫

এক সেটে অভিনয়যোগ্য তিনটি নারী চরিত্র সম্বলিত এই নাটক সম্বন্ধে "আনন্দবাজার" পত্রিকার মতামত— "....স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও যাঁরা ইংরেজীয়ানাকে প্রশ্রয় দিয়ে গৌরববোধ করতে চান, বাঙালী হয়েও যাঁরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন—সেই ভ্রান্ত স্বদেশের ওপর তীব্র কটাক্ষের এই নাটকটি বহির্বঙ্গে এবং কলকাতায় ব্যাপকভাবে অভিনীত হওয়া উচিত.. .."

মনোজ মিত্রের সার্থক নাটক

নরক গুলজার ৫

(এক সেটে একটি নারী)

এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণের গৌরবে ভূষিত এই নাটক সম্বন্ধে "আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেন— "....পলিটিক্যাল ড্রামা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় তা এই প্রথম মঞ্চস্থ হল। নেতা নয়, মস্তান নয়, সংকল্পে অটল থাকলে পাচনবাড়ি হাতে নিয়ে তুমিই তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে ত্রিভুবনের গো-সম্পদকে। নাট্যকারের কলম ও ভাবনা এবং রেখা চিত্রাঙ্কন, পরন্তু বক্তব্য সমস্বরে একটি কথাই বলেছে— হয়তো একদিন ক্ষমতার রাজদণ্ড শ্রমিকের হাতেই শোভা পাবে।"

এই নাট্যকারের

শিবের অসাধ্য

(২ নারী) ৫·০০

নেকড়ে (২ নারী) ৪·০০

রতনকুমার ঘোষের কয়েকটি সাড়া-জাগানো পূর্ণাঙ্গ নাটক

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ৫

এক সেটে অভিনয়োপযোগী * ১টি নারী চরিত্র

এ নাটকের মূল বিষয় ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার লজ্জাহীন ভীরুতা আর বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা। ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্র-জীবনে আমরা অহরহ যে-ভুল করে থাকি, যে-অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই, যে-অবিচার আর অত্যাচার নীরবে সহ্য করি—একটু খেয়াল করলেই দেখি, আমরা প্রত্যেকেই সেই ভুল, অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়ানো।

জম্বুদ্বীপের ইতিকথা ৫

এক সেটে অভিনয়যোগ্য নারী চরিত্র বর্জিত।

জরুরী অবস্থায় একদা সেন্সর-বন্দী এই নাটক তথাকথিত ভুয়ো রাজনৈতিক, দেশপ্রেমিক ও জনদরদী বহু নেতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের এক অনবদ্য হাতিয়ার। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই জম্বুদ্বীপই আমাদের সাধের, স্বপ্নের ও ধ্যানের দেবী— জননী জন্মভূমি।

সময়ের রূপকথা (৩ নারী) ৫

সময় বয়ে চলেছে। নিরন্তর, বিরামহীন সেই সময়স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি—কখনো উথাল-পাথাল—কখনো স্বচ্ছন্দ বেগ। সময়ের স্বভাব, আবেগ, গতি মানুষের জাতীয় ঘাত-প্রতিঘাতে নিয়ন্ত্রিত। বিগত দশকের অস্থির, চঞ্চল, উন্মাদ, আবেগময় সময়ের স্রোতে ভাসমান এক করুণ মধুর নাট্য-বিন্যাস।

এই নাট্যকারের অন্যান্য নাটক

সীতাহরণ	(২ নারী) ৫	এই দশকের মঞ্চে	(২ নারী) ৫
ভূমিকম্পের আগে	(১ নারী) ৩	সিঁড়ি	(১ নারী) ৫
ফেরা	(১ নারী) ৩-৫০	ভূমিকম্পের পরে	(১ নারী) ৫
সকালের জন্য	(১ নারী) ৫	ভোরের মিছিল	(১ নারী) ৫

অগ্নিদূতের নতুন নাটক

নেপো-নটবর কথা ৫

বিষয়বস্তু রাজনৈতিক, কিন্তু নাট্যকারের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার নয় একটি রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচারের স্বরূপ প্রদর্শন।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে নববর্ষের অমৃতে থাকবে সব চেয়ে সেরা লেখা
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমল শাসমলের সুদীর্ঘ প্রামাণিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধী ঃ লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার

পিছু হটার পালা ঃ লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীমাণিক্য

বাড়তির পথে ভারত ঃ লিখেছেন অতুল সুর

পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ভবতোষ দত্ত
সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী
প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছেন

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ ঃ ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে
শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন ঃ অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা
দাম তিন টাকা ।। রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন।
অথবা লিখুন
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা -৩

অমৃত
১৮ বর্ষ
১১ সংখ্যা
৪ শ্রাবণ
১৩৮৫
21 JULY, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
কেন ঋত্বিক। ৫ সমীর চট্টোপাধ্যায়
সমালোচনা ৬
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৮
বেবতীভূষণের কার্টুন ৯
ভাগ্য গণনা ১০
চিঠিপত্র ১১
প্রচ্ছদ কাহিনী ১২
একটি সামান্য ভ্রমণকাহিনী
অভিজিৎ সেনগুপ্ত
প্রচ্ছদ এঁকেছেন শৈবাল ঘোষ
কবিতা ৮ কমল তলাপাত্র, শান্তি সিংহ,
পার্থসারথি রায়, ঈশ্বর ত্রিপাঠী
নগ-বিহঙ্গ (গল্প) ১৯
দিব্যরঞ্জন মাইতি
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৬
শৈবাল মিত্র
অথবা মন্তব্যসহ একটি ক্ষুদ্র জীবন
কাহিনী (গল্প) ৩২
শৈবালরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩৭
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
যাঁদের দেখেছি ৪২ অনন্ত সিং
সমস্যা ও পর্ণিমা ৪৭ চিত্রিতা দেবী
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪৯
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ধোকরা ঝালং বিস্তান ৫৩
শিশির মজুমদার
খেলা ৫৫
চিত্রধ্বনি ৫৮

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
ঘুষ খাবেই
লিখেছেন সুমন্ত সেন
সোমক দাশের গল্প
ভারতী পত্রিকা সম্পর্কে
পশুপতি শাসমল ও গৌর সাহার
সচিত্র প্রবন্ধ

'দূরদর্শনে' দূর-দর্শন

ভারত কল্যাণকামী রাষ্ট্র। সাধারণ নাগরিকদের মঙ্গলই তার একমাত্র লক্ষ্য। আধুনিক জীবনযাত্রার সমস্ত রকম চাহিদা যাতে দ্রুত মিটে যেতে পারে, সেজন্যে প্রায় তিন দশক ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ চলছে দেশে উৎপাদনের কতকগুলো দিকে পশ্চিমের উন্নত দেশের সমকক্ষতাও অর্জন করেছি আমরা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে পশ্চিমী জীবনযাত্রার কুফলগুলোও এসে পড়ছে সেই সঙ্গে। আমাদের নিজস্ব জাতীয় চরিত্র এবং মূল্যবোধগুলো বিপন্ন হয়ে পড়ছে. আমরা সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক থেকে নিজ বাসভূমিতে পরবাসী হয়ে উঠছি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই আমাদের দূরদর্শন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা থেকেও এ সমস্যা সুস্পষ্ট।

আমাদের দেশের দূরদর্শন পশ্চিমী ধাঁচে চালানো শুরু হলে ভারতীয় জীবনাদর্শ ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এবং তা যদি হয়, তবে সে কাজে সমর্থন জানানোর আগে দ্বিতীয় চিন্তার দরকার হবে।

প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের ওপর পশ্চিমী জগতের দূরদর্শন যে বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তার কথা। পশ্চিমের দেশগুলোতে শিশু-অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে যাবার একটা প্রধান কারণ দূরদর্শনের মারফৎ অপরাধমূলক ছবি দেখা। কাজেই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করলে তার ফল ভয়াবহ হতে বাধ্য। আমাদের উচিত, এমনভাবে দূরদর্শনকে চালিত করা যাতে তার প্রোগ্রামের ফলে ভারতের নিজস্ব জীবনাদর্শ এবং মূল্যবোধগুলো থেকে দর্শক-শ্রোতারা বিচ্যুত না হন। প্রধানমন্ত্রীর এই সাবধানবাণী খুবই সমোচিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

জনরুচিকে আবিল এবং অপরিণত বয়সীদের মনে বিকৃত মূল্যবোধ সৃষ্টি করার ব্যাপারে ভারতের এক বিশেষ শ্রেণীর সিনেমা যে কী ভয়াবহ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা সকলেরই জানা। সমাজ ও স্বদেশের প্রতি দায়দায়িত্বহীন উচ্ছৃংখল জীবনের ছবি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপথচালিত করবে তাতে আশ্চর্য কী! মারদাঙ্গা, খুনোখুনি, অর্থহীন প্রমোদ-উল্লাস ইত্যাদি জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা তৈরি করে তা আগাগোড়া অবক্ষয়ের দ্বারা আক্রান্ত— তা থেকে নতুন কিছু গড়ে তোলা যাবে না। আগামী দিনের নাগরিকদের তার সংস্পর্শ থেকে যতো দূরে রাখা যায় ততোই মঙ্গল।

কিন্তু সিনেমা তবু অনেক মেহনৎ করে দেখতে হয়, কেননা তার প্রদর্শনী হয় হল-গুলোতে। অন্য পক্ষে, দূরদর্শন একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার। তার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সে জন্যে আরো সংযতভাবে স্থির করা দরকার।

আশা করি দূরদর্শনের যারা পরিচালক তারা সমস্ত প্রসঙ্গটিকেই আবার নতুন করে ভেবে দেখবেন।

সাহিত্য ইত্যাদি...

গুণীন্দ্র রায়

সাহিত্য ও অরণ্যপ্রকৃতি

হেমিংওয়ে ছিলেন আমাদের কালের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। যেমন তার বিষয়-বস্তু, তেমনি তাঁর বর্ণনারীতি। সত্যি, বলতে কি, তাঁর গদ্যভাষা প্রায় অনন্য-করণীয়। অস্কারওয়াইল্ডের কথা মনে পড়িয়ে দেয় অনেক সময়।

সেদিন কলকাতার সাম্প্রতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল দেখতে গিয়ে কিউবার এক ছবিতে হেমিংওয়ের বাড়ি দেখলাম। অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে দেয়ালে টাঙানো রয়েছে আফ্রিকী হরিণ ও বাইসনের ঠাসাই-করা মুন্ড। সঙ্গে সঙ্গে ধারাবিবরণীর মতো শোনা যাচ্ছিল, হেমিংওয়ের ব্যক্তিগত জীবনের নানা তথ্য। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধে রিপোর্টার হিসেবে যোগ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ লাইনে যোগ দেওয়া। স্পেনীয় গৃহ-যুদ্ধের বিষয়ে উৎসাহ। পশুশিকার। আফ্রিকায় বিমান দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়া। এবং আরো অনেক কিছু।

বর্ণনাকারী বলছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রের বোমা ও বুলেট, স্পেনীয় মাতাদোরদের ষাঁড়ের লড়াই, গভীর জঙ্গলে বাঘ-সিংহের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো, এসবই ছিল হেমিং-ওয়ের নিজস্ব ব্যক্তিগত সংকট থেকে পরি-ত্রাণের পথ খোঁজা। সেই সংকট হল মৃত্যু-চিন্তা। যৌবন থেকেই মৃত্যু তাঁর পথ আটকে দাঁড়িয়েছে বারবার। মৃত্যু কী বা কেন, এটা না জেনে জীবনকেও যেন পুরো-পুরি বুঝতে পারছিলেন না। এবং বারবার ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তিনি তা থেকে অব্যাহতি পেয়ে জীবন যে কি ভয়ানক শক্তিশালী সেটাই যেন উপলব্ধি করতে চাইছিলেন। এ হল মৃত্যুর প্রতি জীবনের একটা চ্যালেঞ্জের মতো। কিন্তু শেষপর্যন্ত এ খেলায় মৃত্যুও পেয়ে গেল একটা মোক্ষম সুযোগ। তিনি আত্মহত্যা করলেন।

ছবিতে অবিশ্যি এতগুলো কথা ঠিক এইভাবেই বলা হয়নি। কিন্তু যেটুকু যা বলা হয়েছে তা থেকে এরকম একটা ব্যাখ্যা অতি সহজেই করা যাচ্ছিল।

সেই থেকে আমার মনে হচ্ছিল, বন্য-জীবন এবং শিকার-সাহিত্য হিসেবে যেসব লেখা পড়েছি আমরা, এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, সেগুলোর তাৎপর্য কী?

এক নম্বর প্রশ্ন হল, লেখকরা এসব কাহিনী লেখেন কেন? কিংবা আরো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, তাঁরা শিকার করতে আনন্দ পান কেন?

এবং দোসরা প্রশ্ন, সেসব লেখা পড়ে আমরাই আনন্দ পাই কেন?

না বললেও চলে, আমার কাছে এধরনের প্রশ্নের সদুত্তরের কোনো জবাব নেই। যাঁরা সমাজতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁদের কাছে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। তবে খানিকটা উত্তর পেয়েছি আমি জিম করবেটের বই পড়ে। দেখেছি, করবেট সাধারণ পল্লীবাসীর নিরাপত্তার জন্যে বাঘ মেরেছেন। অনেক বাঘ ছিল নরখাদক। কিন্তু অনেক সময় মনে হয়েছে, বন্যপ্রাণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব খেলা, তার শারীরিক সৌন্দর্য, এসবও তিনি উপভোগ করতেন ভালোভাবেই।

একালের খ্যাতিমান লেখক বুদ্ধদেব গুহও শিকারকাহিনী লিখেছেন অনেকগুলো। বন্যপ্রাণী আর অবশ্য প্রকৃতি তাঁর অনেক উপন্যাসেরই একেবারে প্রাণকেন্দ্রে আসন পেতে রয়েছে। সত্যি বলতে কি, বিভূতি-ভূষণের পর বনজঙ্গল এবং তার গাছপালা টিলা-ঝরণা এত সজীব এবং স্পর্শগ্রাহ্যভাবে আর কারো লেখায় স্থান পেয়েছে বলে চোখে পড়েনি। কিন্তু ইদানীং বেশ কিছুকাল ধরে শহুরে জীবনের জটিল নানা টানাপোড়েন নিয়ে উপন্যাস লেখার সঙ্গে সঙ্গে বনজঙ্গলের পরিবেশ নিয়েও তিনি লিখছেন বটে, তবে শিকারকাহিনী আর লিখছেন না।

কেন? একদিন বুদ্ধদেববাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেকথা।

বুদ্ধদেববাবু যা বললেন, তা থেকে বোঝা গেল, শিকারে এখন আর তিনি উৎসাহ বোধ করেন না। বরং প্রাণীগুলোকে টিকিয়ে রাখাই তিনি জরুরী মনে করেন। বিশেষ করে বাঘ গণ্ডার ইত্যাদি কয়েকটি প্রাণী যে হারে কমে আসছিল তাতে উদ্বেগ বোধ করাই স্বাভাবিক। হাতি এবং হরিণের অবস্থাও ছিল প্রায় একই রকম আশংকাজনক।

কথা বলে বোঝা গেল, শিকার না করলেও বন্যপ্রাণীর বিষয়ে আগ্রহ এখনও তাঁর অপরিসীম। আরো জানা গেল, বন-জঙ্গল আর বন্যপ্রাণীদের কাছাকাছি থাকতে পারবেন বলে পালামৌ অঞ্চলে তিনি একটি আস্তানাও তৈরি করেছেন। শিকারী ছিলেন বলে বনজঙ্গল আর বনের পশুপাখিদের চলা-ফেরা আর ধরনধারন তাঁর আগে থেকেই জানা ছিল। সেই জ্ঞান এখন পরিণত হয়েছে ভালোবাসায়।

অনিবার্যভাবেই মনে পড়েছে তাই বিভূতিভূষণের কথা। তাঁরও ছিল এই ভালোবাসা। স্বাভাবিকভাবেই ছিল। আর সে ভালোবাসার চেতনা এমনভাবে প্রভাব ফেলেছে তাঁর রচনায় যা মাঝে মাঝে চলে গেছে প্রায় অলৌকিক বা অতিলৌকিক পর্যায়ে।

অবিশ্যি গাছপালা বা অরণ্যপ্রকৃতির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসাও মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। কিন্তু তাঁর ভেতর ফিলোজফাইজিং-এর অর্থাৎ দার্শনিক ব্যাখ্যা নেওয়ার ঝোঁক এসে গেছে মাঝে মাঝে। ('ছিন্নপত্র' দ্রষ্টব্য) কিন্তু বিভূতিবাবুর ছিল স্পর্শগ্রাহ্য ভালোবাসা, অনেকটা জীবনা নন্দ দাশ বা কীটস-টব মতো। অলৌকিক ব্যাপারটা অবিশ্যি তাঁর নিজের বোধ থেকেই এসেছে।

কিন্তু এসব তো পুরনো কথা। একালের লেখকরা কি অরণ্যপ্রকৃতি আর বন্যপ্রাণীর বিষয়ে নিরুৎসাহ?

এটা অবিশ্যি ঠিকই যে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশে জীবন-যাত্রার পুরনো ছকের মধ্যে বিপর্যয় ঘটেছে ভয়াবহরকম। দৃষ্টিভঙ্গিও যাচ্ছে দ্রুতচালে বদলে। প্রাণ রাখতেই এখন প্রাণান্ত, বনজঙ্গল বা বন্যপ্রাণীর কথা ভাববে কে?

বরং বন কেটে বসত, আর বাঘ কুমিরের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোই যেন এখন আসল সমস্যা। এবং সাহিত্যেও মোটামুটি তারই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিফলন।

কিন্তু, একোলজি বা প্রকৃতির ভার-সাম্য—তাকে টিকিয়ে রাখাও তো একটা প্রাণান্তকর সমস্যা। হ্যাঁ আক্ষরিক অর্থেই প্রাণান্তকর। গাছপালা ও বন্যপ্রাণীদের টিকিয়ে রাখতে না পারলে পৃথিবীও আর বাসযোগ্য থাকবে না মানুষের পক্ষে।

অতএব মানুষের স্বার্থেই বোধকরি একালের লেখকদের মাঝে মাঝে এখন চোখফেরানো দরকার অরণ্যপ্রকৃতি আর মনুষ্যেতর প্রাণীর দিকে।

যেমন দেখা গেছে কখনো কখনো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমরেশ বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। আর বুদ্ধদেব গুহের কথা তো আগেই বলেছি।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী—বিমলিনাথ রায় ২৫.০০
সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য—বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪.০০
শয়তান (টলস্টয়)—অনুবাদ—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১০.০০
জাভন নদীর তীরে—ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩.০০
এছাড়া মুক্তধারা-র (বাংলাদেশ) প্রধান পরিবেশক
পুস্তিকা ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

কেন ঋত্বিক!

সমীর চট্টোপাধ্যায়

মদের দোকানে দেখেছি অনেকেই ঋত্বিক ঘটকের আলোচনায় সরব হতে ওঠেন। তার কারণ এই নয় যে তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন, মদ্যপায়ী হিসেবে কেউ তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। তাঁর চলচ্চিত্র, জীবন ইত্যাদি বিষয়েই বেশ সিরিয়াস উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি। শুধু মদের দোকানেই নয়, অন্যান্য অনেক জায়গায় সম্প্রতি ঋত্বিক-আলোচনার একটা পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ আলোচনার সবই যে খুব কনস্ট্রাকটিভ, ঠিক তা নয়, বেশ অনেকটাই 'হাওয়া'। অনেক প্রৌঢ় অথবা প্রায়-প্রৌঢ় ভদ্রলোকও কথায় কথায় এখন ঋত্বিকের নাম উচ্চারণ করেন। এইসব ভদ্রলোকেরা যখন যুবক ছিলেন তখনই ঋত্বিক ছবি করেছেন। ছবি বেরুচ্ছে। এবং ফ্লপ করছে। এবং প্রায় সেই সময়ই আমাদের দেশে ফিল্ম-ক্লাবের রমরমা। দেখতে দেখতে তাও তিন দশক পেরুতে চললো। তখন ডেকে ডেকে এইসব ক্লাব সভ্য সংগ্রহ করতো। বিদেশী মহান মহান সব ছবিও আসতো প্রায় নিয়মিত। বামপন্থী রাজনীতিও বেশ জোরদার। পত্র-পত্রিকা এবং বামপন্থী প্রকাশনারও বেশ রমরমানি। চাঙ্গিদকে একটা পজিটিভ পরিবেশ। তিনি প্রথম ছবি করলেন। কো-অপারেটিভ বেসিসে। ছবি সম্পূর্ণ। অথচ বেরুলো না। বেরুলো তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭৭-এ। তারপর কতো ছবি সম্পূর্ণ হলো, বেরুলো এবং ফ্লপ্। কতো ছবি প্রশংসিত, অথচ ফ্লপ। কতো ছবি অকারণে নিন্দিত হলো, যেমন 'কোমল গান্ধার' সুতরাং অবশ্যম্ভাবী ফ্লপ্। কতো ছবি শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত হলো 'এবানডন্ড প্রোজেক্ট' এই শিরোনামে। অথচ আজ যাঁরা প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই অথবা চল্লিশোর্ধ, অর্থাৎ তখন যাঁরা নবীন তাঁরা ছবি দেখলেন না কেন? কর্তব্য পালন করলেন না কেন ঠিক সময়ে? পরিবেশনা ইত্যাদি ব্যাপারে চিরকালই এক অদৃশ্য কালো হাত কাজ করেছে। কিন্তু কালো হাত গুঁড়িয়ে দেবার দায়িত্ব তো কাউকে না কাউকে নিতেই হয়। কেন কেউ কখনো নেন নি? যাঁরা ছিলেন তাঁর আজীবন বন্ধু অথবা আশ্রয়স্থল সেই কম্যুনিস্ট পার্টি? নিজের দেশে বিদেশের ছবি দেখিয়ে ছবি দেখার রুচি উন্নতির প্রচেষ্টায় নিবেদিত ফিল্ম ক্লাবেরা? অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উজ্জ্বল বুদ্ধিমান যুবকেরা? যথাসময়ে কেউ কোনো দায়িত্ব পালন করেন নি। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। যেমন পৃথিবীর অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার, একজন চলচ্চিত্র সৃষ্টার মতো সর্বক্ষেত্রে পরাধীন অন্য কেউ নেই: ছবি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এ কোনো সাহিত্যরচনা নয় যে, দুটো মলাটে বন্দী হবে ছাপার অক্ষরে কোনোদিন প্রকাশিত হলে, একদিন না একদিন সংগ্রহ করে ঘরে বসে তার রস আস্বাদন করা যাবে। সাহিত্য পড়ার জন্য কোনো প্রেক্ষাগৃহ লাগে না, অথবা কোনো প্রোজেক্টার। ছবি-নির্মাতাদের মহত্ব প্রমাণ করতে গেলে তা জনসমক্ষে ব্যবস্থা করে দেখাতে হবেই। শুধু ছবি ছেপে বা আলোচনা ছাপিয়ে বা টেবিল ফাটিয়ে 'মহান মহান' চিৎকার করলেই হবে না। আজও শুধুই গর্জায় বেশি, বর্ষায় না।

ভালো লেগেছিল যখন শুনলাম সম্প্রতি শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত ঋত্বিক চলচ্চিত্র উৎসবে বেশ কিছু ছবি দেখবার জন্য অনেকে সারা রাত টিকিটের জন্য লাইন দিয়েছে। যেমন দেখ সাধারণতঃ কোনো ক্রিকেট কিংবা ফুটবল-ম্যাচের জন্য। এদের বয়সের ক্লাশ-চন্টারভ্যাল একুশ থেকে সাতাশ। ভালো লেগেছিল শুনে। যিনি জীবদ্দশায় পাননি প্রায় কিছুই, তিনি মৃত্যুর সময়ে এইসব যুবকের বুকের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর তেজস্ক্রিয় ভস্ম। ভালো লেগেছিল। এদের কয়েকজনকে আমি ব্যক্তিগত চিনি। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। খুব বুদ্ধিমান এবং সংহত। কিন্তু তবুও সারা সারারাত লাইনে জেগেছিল টিকিটের জন্য তাদের সংখ্যা কত? তিনশো কি চারশো। ভালো লাগতে পারে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো কিছু নেই। কলকাতার যুবকদের তুলনায় এরা কত শতাংশ? কোনো হিসেবে আসে কি? আর একথাও মনে রাখা দরকার, যদি ঋত্বিকের সমস্ত ছবি কমার্শিয়াল নিয়মিত চলতো, তাহলে কি এ-অদ্ভুত ঘটনা ঘটতো? এসব অপ্রিয় প্রশ্নই করেছিলাম এক বন্ধুকে যিনি দীর্ঘকাল ফিল্ম-ক্লাবের সদস্য এবং মনে করেন, খুব আশাব্যঞ্জক চলচ্চিত্র-ধারণার নাকি উন্মেষ ঘটেছে। এতটা অপ্টিমিস্ট হবার কোনো কারণ নেই। প্রায়-প্রৌঢ় হতে চললো ফিল্ম-ক্লাবগুলো। কতো সদস্যসংখ্যা? জানি প্রায় সব ক্লাবই সদস্য নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ, স্পেস-প্রবলেম। এ যুক্তিতর্কগ্রাহ্য। কিন্তু ফিল্ম-ক্লাবগুলোর কার্যকলাপ সার্বিকভাবে সাধারণ দর্শকদের আজ পর্যন্ত কীরকম প্রভাবিত করতে পেরেছে? শুধু সদস্যরা ছাড়া কেউ কি খোঁজ রাখে কী কী ছবি দেখানো হচ্ছে বা দেখানো হতে পারে। তিন দশক পেরুতে চললো যার বয়স, পাত-কুয়ো ঢিল ছোঁড়া ছাড়া আর কোনো এচিভমেন্ট নেই। আর কর্ণধার হয়ে বসে আছেন যাঁরা এইসব ক্লাবে তাঁরা অনেকেই কবি জীবনানন্দের 'সমস্যুন' কবিতার বৃদ্ধ সমালোচকের মতো। এঁরা না করেন ফিল্ম, না তোলেন ছবি, না আছে র স্টকের কারবার। এঁরা শুধুই দর্শক কিংবা ভাবী সমালোচক। পরেন চুড়িদার পায়জামা, পাঞ্জাবি, সাইড-ব্যাগ এবং চোখে পুরু-ফ্রেমের চশমা। আলোচনা করেন অবিরাম বিদেশী মহান পরিচালক এবং তাঁদের ছবি নিয়ে। অশ্লীল, অবাস্তব হিন্দী ছবির এবং অক্ষম বাংলা ছবির মহামারীতে বসে এরা নিরবধি অমৃত পান করে যাচ্ছেন। একে ডোবাচ্ছেন, ওকে তুলছেন। তবু, এইসব ক্লাবের কল্যাণেই বেশ কিছু অসাধারণ বিদেশী ছবি আমরা এ-শহরে বসে দেখার সুযোগ পেয়েছি। যে সেন্স ছিল প্রথমে, আজ তা অনেক নিষ্প্রভ। যাঁদের নিয়ে আরো আরো সরব হওয়া উচিত ছিল, যেসব বিষয় নিয়ে একটা সার্বিক আন্দোলন তৈরী করার প্রয়োজন ছিল, তা করা যায় নি। ফলতঃ বাংলা তথা ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাণে টোটাল কোনো রূপান্তর এলো না। ব্যতিক্রম হয়ে এঁরা কয়েকজন। এর দায়িত্ব ছিল ফিল্ম ক্লাবের।

একথা অনস্বীকার্য, আমাদের দেশের ফিল্মে যদি অভিনব কিছু ঘটে থাকে তা ফর্মে নয়, কনটেন্টে। আমাদের নিজস্বতা বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তা বিষয়ে। চলচ্চিত্র ধারণাই ধার করে আনা সাগর পেরিয়ে। কী ক্যামেরা, কী এডিটিং, কী শট-টেকিং অথবা চিত্রনাট্য-তৈরী অথবা ক্যারেক টার-স্টাডি—সবই প্রভাবিত। আমাদের দেশে এমন কোনো পরিচালক নেই যিনি এইসব ব্যাপারে কোনো বিদেশী প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। এবং হয়তো সম্ভব নয়। ঐসব দেশের ফিল্মের বয়স আমাদের চেয়ে বেশি। কলাকৌশলি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপকরণ অনেক বেশি উন্নত। ফিল্ম-এপ্রিশিয়েশনও অনেক বেশি গঠনমূলক। ফলতঃ টিকে রইলো কনটেন্ট। এবং এ বিষয়ে এক এবং অদ্বিতীয় ঋত্বিক। উনিও অনেক বেশি প্রভাবিত আইজেনস্টাইন অথবা বুনুয়েলে। কিন্তু যে বিষয় তাঁর পরীক্ষাগারের মৌল উপাদান, তা এতো বেশি নিজস্ব, এতো বেশি মর্মান্তিক যে জিত ওঁর সেখানেই। আসলে তিনি জানতেন, অস্ত্র শুধু শাণিত হলেই হয় না, আঘাতের মোক্ষম স্থানও চিনে নিতে হয়। এবং শুধু শিল্পের জন্য শিল্প অর্থহীন। অপোলোটিকাল বলে কোনো শব্দ নেই। তিনিই বড় শিল্পী এবং যুগকে অতিক্রম করতে পারেন সহজে যিনি সমসাময়িক আর্তি, হাহাকার, সমস্যাকে শিল্পচিহ্নিত করে প্রকাশ করতে পারেন। তিনি তা পেরেছেন। এবং একমাত্র তিনিই যিনি সমসময় থেকে কখনো পিছিয়ে পড়েন নি, কন-টেন্টের মহার্ঘতায় একমাত্র স্থায়ী আসন চিনিয়ে নিয়েছেন। ফলে স্বভাবেই হোক, ঋত্বিক-সম্পর্কিত আলোচনা হলে ভালো লাগে। এভাবেই উচ্চারিত হতে হতে একদিন আসল কাজটা হয়ে যাবে। যা যে-কোনো শিল্পীর বেঁচে থাকার প্রধান শর্ত।

সমালোচনা

বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের মাইলস্টোন

বাঙালীর গ্রীকচর্চার ইতিহাসে বোধ-হয় প্রথম নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার স্মরণীয় উক্তি—আমি গ্রীকদের অনুকরণ করি না, আমি গ্রীক—আধুনিক সাহিত্যের এক রহস্যময় উক্তি। আমাদের নতুন সাহিত্যের প্রথম কবি শুধু বিদেশী সাহিত্যের ভক্ত নন, তিনি বিদেশী প্রাচীন সাহিত্যের ভক্ত। বাঙ্গালী কবি মাইকেলের গ্রীক প্রীতির সংবাদ বঙ্গদেশের বাহিরে পৌঁছায় নাই। বঙ্গদেশেও ইহার তাৎপর্য আর কয়জন বুঝিয়াছেন। মাইকেলের গ্রীকমুখিতা বাঙালী কবি বা কাব্যপাঠককে গ্রীকমুখী করে নাই, আর আমরা যদি গ্রীকমুখী হইতাম তাহা হইলে আলোচ্য গ্রন্থখানির মত এক-খানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের উৎকৃষ্ট বাংলা অনুবাদ অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইত।

আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের অমর এক-খানি সুষ্ঠু বঙ্গীয় সংস্করণ বাহির হইতে যে এত বিলম্ব হইল তাহার প্রধান কারণ এই যে আমরা গ্রীক-ল্যাটিনকে বাদ দিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টা বড় সার্থক হয় নাই। অরবিন্দ, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ক্ষিতিমোহন মুখোপাধ্যায়, তার্কিকনাথ সেন, অমল ভট্টাচার্য গ্রীকভাষা শিখিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের উৎসস্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের গঙ্গাবতরণ দেখিয়া লইয়াছেন। সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্য এই দৃষ্টিতে একটি অখণ্ড প্রবাহ। সেই প্রবাহের উৎস-সন্ধানের পথশ্রম স্বীকার করিয়া শিশিরকুমার দাশ আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব গ্রন্থখানিকে বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা যাহারা কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র আমাদের দুঃখ এই যে তিনি এই গ্রন্থখানির অনুবাদ করিলেন না। তবে অনুমান করিতে পারি তিনি ভাবিতেন বাঙালী পাঠক আরিস্টটলের তত্ত্ব বুঝিতেন না। গ্রীকসাহিত্যের রসগ্রহণ করিবার মত জ্ঞানবুদ্ধি তাহার নাই। আজও যে আমাদের সেই জ্ঞানবুদ্ধি বড় হইয়াছে এমন মনে করি না। পশ্চিমবঙ্গের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বাংলা বিভাগে অসংখ্য বাংলার অধ্যা-পক ছাত্রছাত্রী এবং এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের বাহিরেও দেশি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা এমনকি গবে-ষণাও চলিতেছে। এম-এ ক্লাশে কাব্যতত্ত্বের

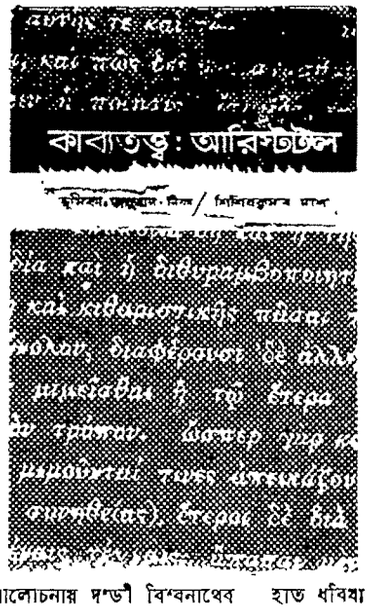

আলোচনায় দণ্ডী বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া আরিস্টটলও আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসিতেছেন এবং সুপণ্ডিত অধ্যা-পকগণ তাঁহাদের দিয়া নানা কথা বলাইয়া লইতেছেন। কিন্তু সন্দেহ হইতেছে এই যে আমরা ক্লাশে তাঁহাদের দিয়া যাহা বলাইলাম তাঁহারা ঠিক সেই কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন কিনা।

দণ্ডীর কাব্যাদর্শের সারকথা বুঝিতে হইলে কেবল সংস্কৃত ভাষা জানিতে হইবে না তাহার সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। সুশীলকুমার দে, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্তের বই পড়িয়া সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আমরা বলিতে শিখিয়াছি। আর আমাদের মুখের উপর কথা বলিবার লোকও বড় নাই। আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আরও সহজ। তিনি বঙ্গীয় পাঠকের কাছে এতই অস্পষ্ট যে তাঁহাকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা এড়াইয়া আমরা বুচার ও বাইওয়াটারের টীকা-টিপ্পনীর এক বঙ্গীয়রূপ ক্লাশে, রিসিসে, প্রবন্ধে গ্রন্থে উপস্থিত করিতেছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে গ্রীক সাহিত্যের সার্থক গভীর চর্চার পূর্বে আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের সার্থক গভীর চর্চা সম্ভব কিনা। শিশিরকুমারের এই গ্রন্থখানি এই প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়া-ছেন গ্রীক সাহিত্যের এই বিশালতা গভীরতা ও অসামান্য শ্রীর উপলব্ধি ছাড়া আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের মর্ম-কথা বুঝা যাইবে না। শিশির-কুমার গ্রীকসাহিত্যের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আরিস্টটলকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ছত্রিশ পৃষ্ঠার ভূমিকাটি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। কটে বিষয়ের এমন স্বচ্ছ ব্যাখ্যা বহুকাল পাই নাই। পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছে আরিস্টটলের ইংরেজ বা ফরাসী ছাত্রেরাও এই প্রবন্ধটি পড়িয়া লাভবান হইবেন। শিশিরকুমার কতগুলি কোটেশন, ফুটনোট দিয়া এই প্রবন্ধটিকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। তিনি আরিস্টটলের মূল কথা-গুলি বুঝিয়া তাহা সরল বাংলায় বুঝাইয়া-ছেন। কোথাও আরিস্টটলের মুখ দিয়া নিজের কথা বলেন নাই।

আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব বইখানি এক-খানি বই হিসাবে লিখিত হয় নাই। ইহার উক্তিগুলি লেকচার নোটস হিসাবে লিপি-বদ্ধ হইয়াছিল। অনেক তত্ত্বকথা সূত্রাকারে উপস্থিত করা হইয়াছে। তাহার বিচার বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাই নানা মুনির নানা মত। বইখানির পাঠ লইয়াও কম তর্ক হয় নাই। কাব্যতত্ত্ব-ব্যাখ্যার এই দীর্ঘ বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে শিশিরকুমার পরিচিত। কিন্তু সে ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি পাঠককে ক্লান্ত করেন নাই। তিনি বইখানির একটি বিশেষ পাঠ গ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 'আমি মূলত বাইওয়াটারের গ্রীক পাঠ অবলম্বন করেছি। তাঁর টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদের সাহায্যে গ্রন্থটি পড়েছি এবং অনুবাদ করেছি।' বাই-ওয়াটারের অনুবাদ তিনি অন্যান্য ছয়টি অনু-বাদের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিয়া লইয়াছেন।' অনুবাদকর্মের মূলনীতি সম্বন্ধে শিশির-কুমারের কথা পাঠককে আশ্বস্ত করিবে—'অনুবাদে আমার প্রধান লক্ষ্য মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা, বক্তব্যের দিক থেকে। দ্বিতীয় লক্ষ্য বাংলাভাষার প্রতি আনুগত্য, ভাষা-রীতির দিক থেকে।' আরিস্টটলের এই গ্রন্থ-খানির মূল লইয়াই বড় গোল। শিশিরকুমার সেই গোল দূর করিতে যাইয়া নতুন গোলের সৃষ্টি করেন নাই, সর্বক্ষেত্রে তিনি মূলকে অবলম্বনই করিয়াই মূলের মূলে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিন নম্বর পরিশিষ্টে শিশিরকুমার কাব্যতত্ত্বে ব্যবহৃত কতগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ গ্রীক হরফে বসাইয়া তাহার বাংলা প্রতিরূপ ও প্রতিশব্দ উপস্থিত করিয়াছেন। চার নম্বর পরিশিষ্টে কাব্যতত্ত্বে উল্লিখিত নানা ব্যক্তি গ্রন্থ ও চরিত্রগুলির নাম গ্রীক অক্ষরে উল্লেখ করিয়া তাহার বাংলা ও প্রচলিত ইংরাজি প্রতিরূপ দেওয়া হইয়াছে। গ্রীক নাটকের কাহিনী এক বিশেষ রীতিতে বিন্যস্ত। কাব্যতত্ত্বের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আরিস্টটল গ্রীক নাটকের এই অঙ্গ সংস্থান বুঝাইয়াছেন। এই গঠনরীতিটি বুঝাই-বার জন্য শিশিরকুমার প্রথম পরিশিষ্টে সোফো-ক্লেসের আন্তিগোনে নাটকখানির গঠন পংক্তি গণিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় পরি-শিষ্টে গ্রীক ছন্দের মূল সূত্রটি অল্প কথায় বোঝানো হইয়াছে। এই চারটি পরিশিষ্টের

বস্তু আয়ত্ত করিলে এই গ্রন্থখানি সহজভাবে পড়া যাইবে। কোন শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ বা গ্রীক নাটকের গঠন ও ছন্দ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকে না।

কাব্যতত্ত্বের এই অনুবাদ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি মাইলস্টোন হিসাবে গণ্য হইবে। এতকাল আমরা যেন এই গ্রন্থখানিকে দূর হইতে দেখিয়াছি। ইহার নানা কথার অর্থ বিদেশীর মুখে শুনিয়াছি। আরিস্টটলকে বাদ দিয়া, গ্রীক সাহিত্যের ধার না ধারিয়া এই কাব্যতত্ত্বের কতগুলি কথা ভাঙাইয়া পণ্ডিত সাজিয়াছি। এই সাজের অহংকার আমাদের বড় কম নাই। কিন্তু আজ যেন আমরা আরিস্টটলকে ঘরে আনিলাম। তাঁহার কাব্যতত্ত্ব এখন আমাদের কাব্যমীমাংসার সঙ্গে একত্র বসিল। একটি সাহিত্য যেমন সার্বভৌম, সাহিত্যতত্ত্ব তেমন সার্বভৌম। শিশিরকুমারের অনুবাদ ও তাঁহার ভূমিকা পড়িয়া আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য যেমন বুঝিয়াছি, আহার সার্বভৌমত্ব তেমন উপলব্ধি করিয়াছি।

প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রদত্ত আরিস্টটলের নানা শব্দ ও উক্তির বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের মূল্য ও মর্যাদা বাড়াইয়াছে। আমাদের দেশে ইংরাজীর ছাত্রছাত্রী কাব্যতত্ত্ব ইংরাজীতেই পড়িয়া থাকেন। শিশিরকুমারের এই অনুবাদগ্রন্থের পাদটীকা পড়িয়া তাঁহারা লাভবান হইবেন। কাব্যতত্ত্বের পাঠক হিসাবে আমাদের এক বড় বিপদ এই যে যেখানে মনে হয় বুঝিয়াছি সেখানে আসলে বুঝি নাই। শিশিরকুমারের টীকা পড়িয়া এখন বুঝিতেছি যে এতকাল যে শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ছিল না সে শব্দটির অর্থ আসলে বুঝি নাই।

উদাহরণ হিসাবে ৫৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় পাদটীকার উল্লেখ করিতে পারি। আরিস্টটল লিখিয়াছেন বিশেষ্যগুলি হয় পরিচিত শব্দ, অথবা রূপক অথবা অলংকৃত' ইত্যাদি। এখানে অলংকৃত বিশেষ্য পদ বলিতে কি বুঝায় শিশিরকুমার বড় সুন্দর বুঝাইয়াছেন। 'এই শব্দটি পরের পরিচ্ছেদে আবার ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি কিন্তু আরিস্টটল ব্যাখ্যা করেন নি। ইসোক্রাতেস রূপক অপ্রচলিত শব্দ এবং সৃষ্ট শব্দ এই তিনটিকেই 'কোস্‌মোই' বলেছিলেন। আরিস্টটল তাঁর ভাষণ-কলা গ্রন্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং সেখানে খুবই ব্যাপক অর্থে যে কোন অলংকৃত উক্তিকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু এখানে নিশ্চয়ই বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। রাইওয়াটারের অনুমান যে এ হল এক ধরনের সমার্থক শব্দ, মহাকাব্যে চরিত্রের নামের পরিবর্তে যেমন বিশেষণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আখিলেস-এর জায়গায় পেলেইদেস্‌ বাংলায় যেমন রাবণের পরিবর্তে লংকাধিপ, লক্ষ্মণের পরিবর্তে ঊর্মিলা-বিলাসী।'

কাব্যতত্ত্ব লইয়া পাশ্চাত্যে টীকা-টিপ্পনী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অন্ত নাই। নব্য আরিস্টটল পন্থী বলিয়া আবার এক সমালোচক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা কত নতুন কথা শুনাইতেছেন। এই আসরে বাঙালীর কোন স্থান দেখি না। শিশির-কুমারের এই অনুবাদ টীকা-টিপ্পনীর বস্তু যদি কোন দিন ইংরাজী, ফরাসী বা জার্মান ভাষার মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছায় তাহা হইলে আরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের চর্চায় বাঙালীর একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হইবে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল। অনুবাদ : শিশির-কুমার দাশ। আশা প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৭৭। পৃ পৃঃ ৪৫+৯৭ : মূল্য। শোভন ১৪-০০ টাকা, সুলভ, ১০-০০ টাকা।

রাজধানীর কবিতা

এই প্রথম, দিল্লি থেকে বাংলা কবিতার সংকলন বেরুল পূর্ণাঙ্গ ঐতিহ্যে। যারা দিল্লির বাঙালী বাসিন্দা, উপরন্তু কবি, তাঁদের কবিতা নিয়েই 'রাজধানীর কবিতা'। সম্পাদক হিমাদ্রি দত্ত এবং কল্লোল বিশ্বাস সম্পাদনার ক্ষেত্রে নির্মম বোঝা যায়। দিল্লির একাধিক কবিকে তাঁরা এ সংকলনে স্থান দেননি। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা কবিকে নয়, কবিতাকে দেখতে চেয়েছি। আমাদের কাছে কবির চেয়ে কাব্যগুণই বড়'। —কথা ঠিক। কোন কিছু সম্পাদনার জন্যে এ ধরনের মনোভাব প্রশংসনীয়। ফলে আলোচ্য সংকলনে অনেক কবিই অনুপস্থিত।

'রাজধানীর কবিতায়' মোট বাইশজন কবি স্থান পেয়েছেন। প্রবীণ এবং একেবারে হাল আমলের কবিকেও এই গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি। বাইশজন কবির ৬৭টি কবিতা পত্রস্থ হয়েছে। কবিদের সম্পর্কে পরিচয়-ভূমিকা আছে। কবিদের ব্যক্তিগত কাব্যাদর্শনও আলোচিত।

গ্রন্থে বেশ কিছু ঝরঝরে কবিতা পাচ্ছি, যা আমার কাছে দ্বিতীয়বার পাঠ যোগ্য। হিমাদ্রির কবিতায় আছে সমাজ-সংসারচিত্র, আছে কবির বেদনা ভালোবাসা এবং ছন্দের, শব্দের অলৌকিক ঝংকার। আশীষ ঘোষের কবিতায় এক ধরনের দূরান্বিত প্রত্যায়নুগামীর সাক্ষাৎ সুস্পষ্ট। আশিষের কবিতায় আমেজের সঙ্গে মিশেছে লিরিক্যাল শিল্পিত কণ্ঠ। অমিতকুমার দত্তর কবিতায় পাই প্রেমের, দেশের, অতীতের অনুভূতি পাই কবির স্বচ্ছল মনোবেদনা: শিশিরকুমার দাশ, লোকনাথ ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এই সংকলনের পরিচিত কবি। এঁদের কবিতা সম্পর্কে পাঠকেরা ওয়াকিবহাল। সংকলন-ভুক্ত কবিতাগুলোর মধ্যে শিশির দাশের কবিতাই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। তরুণদের মধ্যে গৌতম দাশগুপ্ত এবং তড়িৎ মিত্রের কবিতা [illegible]

টানবেন। এদের হাতে কবিতা আছে বোঝা যায়। তবে আরেকটু পরিশ্রমী হতে হবে।

রাজধানীর কবিতা একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলন। এবং সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাও বটে, কেননা, বাংলার বাইরে থেকে এই ধরনের কবিতা সংকলন খুব একটা চোখে পড়ে না। সংকলনটি আমাদের সংগ্রহে থাকা একান্ত জরুরী। থাকলে আমরা প্রবাসী বাঙালীদের কাব্য-ভাবনা সম্পর্কে একটি দলিল অনায়াসে পেয়ে যাবো। বইতে অতকগুলো স্কেচ রয়েছে। স্কেচগুলো বইটির সম্মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্বাইপ দ্বায়দার

রাজধানীর কবিতা : সম্পাদনায় : কল্লোল বিশ্বাস/হিমাদ্রি দত্ত : প্রকাশক হিমাদ্রি দত্ত, সি-৫৭২ চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়াদিল্লি। দাম : আট টাকা।

নির্মোহ আত্ম-সমীক্ষা

সাংবাদিকের সংবাদ আর পাঁচটা বাংলা বইয়ের মত নিরুত্তাপ ও নিস্পৃহ নয়। এর বক্তব্য জোরালো। বলার ভঙ্গীটিও আক্রমণাত্মক। প্রথম পাতা থেকেই পাঠককে নড়ে চড়ে বসতে হবে। লেখক পেশায় সাংবাদিক। সাংবাদিকতার পেশা এবং স্বাজাত্যবোধ-পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন একজন ভিতরের মানুষ হিসেবে। সাংবাদিকের পেশায় অনেক মজা আছে। মধ্যবিত্ত উচ্চ-লোকশ্রেণীর মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত অনেক আয়োজন আছে। এসব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে লেখক সত্যকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে তাঁর এই সত্য দর্শনের অভিজ্ঞতা বিশিষ্টতা আছে।

বইটির বেশীর ভাগ রচনাই কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনীতি নিয়ে। স্বাধীনতার পর থেকেই নাগাল্যাণ্ডে, মিজোরামে আমাদের সেনাবাহিনীর মোতায়েন। লেখকের প্রশ্ন এই সেনাবাহিনী কার স্বার্থে ?

এ-সব অগ্নিগর্ভ প্রশ্ন কেউ সচরাচর করেন না। সরকার তো নয়ই। কোন দলের কোন রাজনৈতিক নেতারাও করেন না। অথচ ভারতীয় জনগণের কাছে এর গুরুত্ব হয়ার সম্ভাবনা আছে।

নির্মোহ দৃষ্টিতে আত্মসমীক্ষায় পুণ্য আছে। লেখক সে পুণ্য অর্জন করেছেন। এমন একটি সংগ্রহ যত্নবান হলে তিনি আমাদেরও ধন্যবাদের পাত্র হয়ে রইলেন।

সৌরীন্দ্র ঘোষ

সাংবাদিকের সংবাদ। শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ণালী, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। সেপ্টেম্বর ১৯৭৬। [illegible]

কংগ্রেসীরা একত্র হবেন?

জনতা পার্টির পক্ষে সব শরিকদের নিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি সুসংবদ্ধ পার্টি হতে না পারার সম্ভাবনাই এখন প্রবল। আর এর মূল কারণ হল, কোন শরিকদলই আন্তরিকভাবে একাজে মন দেন নি। সাতাত্তর সালের মে মাসে সাংগঠনিক নির্বাচন এড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লোক-সমক্ষে পার্টির একটা ধাঁচা পেশ করা হয়েছিল। আর তখন উচ্চকণ্ঠে শরিকদলের নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা নিজেদের দলীয় অস্তিত্ব গুটিয়ে বিলীন হয়ে যাবেন জনতা পার্টিতে। এই ঘোষণার পরই সব শরিকরা আদা-জোলা খেয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে গোপনে গোপনে শুরু করে দিলেন শলা-পরামর্শ এবং গোষ্ঠীস্বার্থে সাংগঠনিক কাজ-কর্ম। নিজেদের দল ভারী করবার রাজনৈতিক কৌশলে যতদিন পর্যন্ত না কোন শরিকের স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে কেউ বিবাদভাবে বাদ সাধছিল ততদিন একে অপরকে সহ্য করে আসছিলেন। কিন্তু সহোরও সীমা আছে। আর সেটা এখন ভাঙতে শুরু করেছে। মজার ব্যাপার যে এই অসহ্য পরিস্থিতির কারণ এটা নয় যে গত চোদ্দ মাসের গোপন কাজকর্মের ফলে এক বা একাধিক শরিকের শক্তি সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে গিয়ে বিরাট এক দানবের মূর্তি নিয়ে আর সকলকে গিলতে আসছে। আর যাদের শক্তি বাড়েনি তারা চোখে সরষে ফুল দেখে অগত্যা শেষ কোপ মারতে উদ্যত।

জনতা পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় পরস্পরকে শেষ কোপ মারবার সময় এখনও আসেনি। তবে কোন শরিক কার সঙ্গে যাবে আর কে পাঁচ করবে কার বিরুদ্ধে তার সময় এসে গিয়েছে। পার্টির অক্টোবর মাসের সাংগঠনিক নির্বাচন এই সময়টাকে এগিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য পার্টির এই নির্বাচন হেলাফেলার ব্যাপার নয়। যে গোষ্ঠীর যত বেশী প্রার্থী নির্বাচিত হবে সেই গোষ্ঠীর হাতেই ক্ষমতা আসবে। সুতরাং শরিকরা মনে করছে ভবিষ্যতে তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে আগামী সাংগঠনিক নির্বাচনের ফলাফলের ওপর। এমন চিন্তা-ভাবনা শরিকদের মধ্যে পারস্পরিক পুরোন বোঝা-বোঝিকে নীতিমত তুঙ্গে তুলেছে। কিছুই আর গোপন থাকছে না। হাটে-বাজারে সব ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। আগামী কয়েক মাসে আরও অনেক কিছু প্রকাশ পাবে কেননা দলকে কব্জা করতে সকলেই উঠে পড়ে লেগেছে। বাঘ-বাঘ ঢাক-ঢাক ভাবটা ইদানীং আর নেই। সুযোগ পেলেই একে অপরের সমালোচনায় মশগুল হয়ে পড়ছে। এমনটা হোত না যদি সাংগঠনিক নির্বাচন নানা ছল-ছুতোয় বানচাল করা যেতো। মোরারজী-চন্দ্রশেখর গোষ্ঠীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও এটা করতে পারেন নি। নির্বাচন হলে জনসংঘ-ভারতীয় লোকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংগঠনে মোরারজী-চন্দ্রশেখরের মত লোকজনের প্রভাব-প্রতিপত্তি যতটুকু আছে তাও শেষ হয়ে যাবে এমন একটা ভয় আছে ওঁদের। সেই ভয়ের তাড়নায় এখন থেকে ওঁরা ক্রমশঃ কট্টর ভাবমূর্তি নেবেন বলে স্থির করেছেন। বিপক্ষদলও যথাসম্ভব কট্টরভাবেই তার মোকাবিলা করবেন। তবে এই রকম সম্মুখ সমরে যে কৌশল নেওয়া হবে আগামী অক্টোবর মাসের নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেটা যুগপৎ 'অফেনসিভ' এবং 'ডিফেনসিভ'। এই কৌশলের সৃষ্টা হলেন আর এস এস দলের উচ্চতম পর্যায়ের কয়েকজন নেতা। আর প্রকাশ্যে এমন কৌশলকে খেলিয়ে তোলবার জন্য মুখ্য দায়িত্ব পড়েছে অটলবিহারী বাজপেয়ীর ওপর। এই নীতির সমর্থক হিসাবে উনি খানিকটা কাছে পেয়েছেন চরণ সিং গোষ্ঠীকেও। জনসংঘ এবং ভারতীয় লোকদল সাংগঠনিক নির্বাচনের পূর্বে পার্টির মধ্যে গোলমাল এমন স্তরে তুলতে চায় না যাতে বর্তমান বাধাটা নষ্ট হয়ে যায়। মোরারজী-চন্দ্রশেখর গোষ্ঠীর সঙ্গে যে ভিক্তভাটা মাঝখানটায় দিয়ে উঠল কয়েক মাসের মধ্যে সেটা আরও ভালোভাবে দানা বাঁধবে। ভারতীয় লোকদল এটা চায়। চায় জনসংঘও। তবে বয়ে সয়ে। একটা দল খানিক দূর এগিয়ে যাবে। সংঘর্ষ হবে। অপর দল তখন সালিশির ভূমিকা নেবে। জনসংঘ-ভারতীয় লোকদলের এই রোখ খেলা শুরু হয়েছে জনতা পার্টির অন্দরমহলে। এই কৌশলের ফাঁদে পা কোন না কোন সময় দিতেই হবে অন্য শরিকদের। আপাততঃ যেমন পা দিচ্ছেন মোরারজী দেশাই-চন্দ্রশেখর-জর্জ ফার্নান্ডিজরা। ভারতীয় লোকদলের আক্রমণে জনসংঘ কতদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে এটা এখন বুঝতে হবে মোরারজী-চন্দ্রশেখর ফার্নান্ডিজদের। এই ন্যা কৌশলের ফলে বিভ্রান্তি বাড়ছে বই কমছে না।

এই বিভ্রান্তিকে যথাসম্ভব জিইয়ে রেখে একটা নতুন উপসর্গ এরই সঙ্গে খোলিয়ে তোলা হচ্ছে। প্রাক্তন গৃহমন্ত্রী চরণ সিংয়ের লোকজনের গোপন গতিবিধি এবং আলাপ-আলোচনার খবরাদি সংগ্রহের একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। এই সুবিধার দৌলতে

রাজধানীর ইনসাইড ষ্টোরি

পর্যবেক্ষক

ওঁনি এবং ওঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা মোটামুটি একটা আন্দাজ করেছেন জনতা পার্টির মধ্যে কারা আসলে কংগ্রেস-দরদী আর তার ফলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কারা 'সফট লাইন' নেবার পক্ষপাতী। সিং গোষ্ঠীর কাছে জনতা পার্টির মধ্যে রকম নামের তালিকায় তিনটি বড় নাম আছে। সেই তিনটি নাম হল : মোরারজী, জগজীবন রাম এবং চন্দ্রশেখর। জনসংঘের লোকজনেরও এই রকম অনুমান। জনসংঘ এবং ভারতীয় লোকদলের আশঙ্কা হল যে জনতা পার্টির মধ্যে কংগ্রেসদরদী এবং জনতা পার্টির বাইরে কংগ্রেসীদের মধ্যে তলায়-তলায় দল পাকাবার চেষ্টা ক্রমশঃ প্রবল হবে। আর পিছনের দরজা দিয়ে কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা হবে।

এমন সব কথাবার্তা—অনুমান—আশঙ্কা এখন আর গুজোবের পর্যায় নেই। মোরারজী-চন্দ্রশেখর বিরোধীরা এই অভিযোগকে জনতা পার্টির মধ্যে রীতিমত রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট। এঁদের মতে এমন মানসিকতার জন্য জনতা পার্টি উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারছে না। কংগ্রেস রাজত্ব আবার ফিরে আসবে এমন কল্পনা জনতা পার্টির মৌলিক প্রেরণার পরিপন্থী। জনতা পার্টির মধ্যে কংগ্রেস-দরদীদের বিরুদ্ধে আগামী দিনে যারা এক-কাট্টা হতে চলেছে তাদের মধ্যে আছে জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল এবং মধু লিমায় গোষ্ঠী সমেত সোস্যালিস্টদের কয়েকটি উপ-দল। জনতা পার্টির সাংগঠনিক নির্বাচনে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে এই নয়া জোটের শ্লোগান হবে কংগ্রেসদরদীদের পাত্তা দিয়ে সর্বনাশ ডেকে এনো না। অপরপক্ষও আস্তিন গোটাচ্ছে। তারা অবশ্য বুঝে এখনি বলতে শুরু করেছে : প্রমাণ করো আমরা কংগ্রেস-দরদী। একটা ওলোট-পালটের জন্য জনতা পার্টির অন্দরমহলে সাজ সাজ রবটা বেশ স্পষ্ট।

ওলোট-পালোটে সিদ্ধহস্ত রাজ-নারায়ণ। নির্বাচনের বৈতরণীতে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক নৌকো ফুটো করেছেন রাজনারায়ণ। একথা নতুন করে আওড়াচ্ছেন রাজ নারায়ণের বন্ধুবান্ধব ও সাকরেদরা। এই রাজনারায়ণকে দিয়ে ভারতীয় লোকদল ও জনসংঘের মতে জনতা পার্টির মধ্যে কংগ্রেস দরদীদের ঘায়েল করা যাবে কিনা সেটা আগামী কয়েক মাসে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে। রাজ নারায়ণকে কাজে লাগাবার একটা বড় সুবিধা আছে। তাঁর 'সিরিও-কমিক্যাল' কথাবার্তার ধাক্কা আঘাত করলেও নিমেষে সব কিছুকে খান-খান করে দেয় না। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে এই পদ্ধতি যেমন 'ইন্টারেস্টিং' তেমনি 'ইনটিলিজিং'।

"চরণ ধরিতে দিয়োগো —
নিয়োনা, নিয়োনা
সরায়ে"
স্বৈরতন্ত্র
একচেটিয়া

জনতার বিপত্তারণ বৃহস্পতি

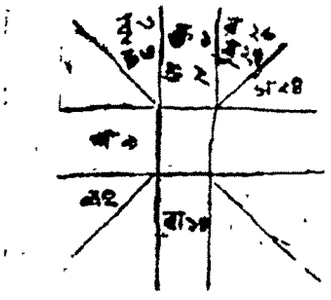

ঠিক ষোল মাস গড়াতে না গড়াতে কেন্দ্রীয় জনতা সরকার এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল যার ফলে এই ষোল মাসের মন্ত্রিসভার ভবিষ্যত এবং পরিণাম সম্বন্ধে প্রায় সকলেই উদ্বিগ্ন ছিল। আর তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের এই আলোচনা। জ্যোতিষী দৃষ্টিতে রাজনীতিগত বিচারকালে 'শনি'র প্রভাবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়—বিশেষ করে মকর রাশির অন্তর্গত ভারতের বিচারকালে। দৈব-দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজনীতির উত্থান-পতন, রদ-বদল, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শোকাদি, অশুভ ঘটনাগুলির ব্যাপারে শনির প্রভাব প্রধান বিচার্য। এই শনির সঙ্গে রাহু এবং মঙ্গলের সংযোগ উপরোক্ত ঘটনাগুলিকে অনিষ্টার্থের দিকে দিতে সাহায্য করে। কর্কট রাশিতে শনির আড়াই বছর সংক্রমণ ভারতের পক্ষে বিশেষ করে মকর রাশির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পক্ষে যেমন খুবই উল্লেখযোগ্য তেমন উল্লেখযোগ্য হয় ঐ শনি যখন 'বৃষ' রাশিতে থাকে। কর্কট রাশিতে শনি আনে ভারতের উপর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যখন করে এক বিপ্লবের বীজ ধীর পরিণামের গতিতে ধীরে ধীরে মহীরুহের আকার। উনিশশো সাতাত্তর সালে কর্কট রাশির শনি ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যকে প্রমাণ করেছে। শনি রাশিচক্রের এক-একটি ঘরে আড়াই বছর থাকেন। অর্থাৎ বারটি ঘর-বিশিষ্ট রাশিচক্র পরিক্রমা করতে শনিগ্রহের ত্রিশ বছর সময় লাগে। কর্কট রাশিতে যেমন শনিগ্রহ ত্রিশ বছর আগে ছিলেন তেমন ত্রিশ বছর পর আবার তিনি ঐ কর্কট রাশিতে আসবেন। বৃষ রাশির বেলাতেও তাই। উনিশশো সাতাত্তর সালে পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে শনি ভারতের যে নতুন বীজ বপন করেছিল তার সম্ভাব্য পরিণতি অথবা ভবিতব্য ভাবতে গেলে আমাদের সেই সময়কার রাশিচক্রটি অনুধাবন করা উচিত—যে সময় নতুন বীজের অঙ্কুর উদ্ভাসিত হলো। উপরের রাশিচক্রটি সেই নতুন অঙ্কুর জন্মতা সরকারের। সিংহ লগ্ন, বৃশ্চিকরাশি, কৃত্তিকা নক্ষত্র, রবির মহাদশা মঙ্গল, বৃহস্পতিবার।

উপরের রাশিচক্রে যেমন কতগুলি শুভ যোগে প্রধানমন্ত্রী শপথ নিয়েছিলেন তেমন কিছু অশুভতর দোষ যে ছিল না তেমন বলা যায় না। রাশিচক্রে দশমে বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ এবং চন্দ্রযুক্ত হয়ে জীবযোগের সৃষ্টি করেছেন। সিংহ লগ্নের পক্ষে রাজযোগকারক গ্রহ মঙ্গল সপ্তমে রাহুর নক্ষত্রে। যেই রাহু রাশিচক্রের লগ্ন থেকে তৃতীয়ে স্বীয় নক্ষত্রে বলবান। দশমপতি শুক্রগ্রহ বক্রী অবস্থায় নবমে অবস্থিত কেতুর সঙ্গে। চন্দ্রগ্রহ দশমে বৃহস্পতির সঙ্গে তুঙ্গ হওয়ায় রাশিচক্রটি বলবান। কিন্তু লগ্নেশ অর্থাৎ রবিগ্রহ লগ্নপতি হয়ে অষ্টম ঘরে শনির মকরক্ষেত্রে যেমন রাশিচক্রকে দুর্বল করেছে তেমন খণ্ডিত করেছে স্বাদশস্থ বক্রী শনিগ্রহ। আবার যদি চন্দ্রকে লগ্ন চিন্তা করি তবে রাশিচক্র বহুলাংশে বলবান বলে মনে হবে। কারণ চন্দ্র থেকে তৃতীয়স্থানে শনি থাকছে, মন্ত্রস্থানে রাহু এবং একাদশ স্থানে বুধের সঙ্গে রবি। কিন্তু এখানে একটা খণ্ডিত থাকছে চন্দ্র যে ঘরে, সেই ঘরের অধিপতি শুক্রগ্রহ বক্রী অবস্থায় স্বাদশে। উভয় প্রকার লগ্ন থেকে বিচার করলে এই লগ্নেশদ্বয় রবি অষ্টমে এবং শুক্র বক্রী অবস্থায় স্বাদশস্থানে থাকাতে রাশিচক্রকে বহুলাংশে দুর্বল করেছে।

সিংহ লগ্নে শনিগ্রহ কর্কট থেকে প্রবেশ করেছে উনিশশো সাতাত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জ্যোতিষী দৃষ্টিতে লগ্নে এই শনির অবস্থান শুভপ্রদ বলে প্রতীয়মান হয়নি। আমরা তখনই শংকা করেছিলাম এই শনিগ্রহ ক্ষতিকারক হবে—হয়েছেও তাই,—অন্ধ্রের ঝড়, লোকক্ষয়, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। সিংহরাশিস্থ শনির দিকে মঙ্গল যতই এগিয়ে গিয়েছে ততই জ্যোতিষী মতে চিন্তার কারণ ছিল। তার পর শনি ও মঙ্গলের এই মিলন; যার পরিণাম গত জুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভায় সংকট দেখা দিল। এই সংকটের পূর্বাভাষ আমরা আমাদের এই পত্রিকার ৯ জুনের সংখ্যার প্রধানমন্ত্রীর রাশিচক্র বিচারকালে দিয়েছিলাম। রাষ্ট্রের বিচারকালে তার কর্ণধারদের রাশিচক্রও অনুধাবন করা উচিত। আমাদের এই ভরসা ছিল যে এই শনি ও মঙ্গলের যোগে তেমন মারাত্মক কোন অঘটন হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ মঙ্গল রাজযোগকারক গ্রহ। আর গুরু তুঙ্গমুখী। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সিংহ রাশি। অতএব, মন্ত্রিসভা এবং প্রধানমন্ত্রীর শুভাশুভ প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যাক, এখন বিচার্য—আগামী দিনগুলি। নভেম্বর মাসে সিংহ রাশিতে শনির সঙ্গে রাহুর মিলন এবং বৃশ্চিক রাশিতে ঐ সময় মঙ্গলগ্রহের অবস্থান জ্যোতিষী মতে মোটেই শুভপ্রদ মনে হয় না। বিশেষ করে লগ্নপতি রবিও তখন নীচস্থ থাকবেন। ঐ সময় যদিও লগ্নপতি রবির মহাদশা চলবে কিন্তু বুধের অন্তর্দশা থাকবে। এই দশাপতি রবি এবং অন্তর্দশাপতি বুধ উভয়েই রাশিচক্রে অশুভ স্থানে বসে আছেন। অর্থাৎ অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাস উনিশশো উনআশি পর্যন্ত আমাদের দিল্লির দিকে উৎসুকভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে আগস্ট মাস থেকে বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে এক বছরের জন্য তুঙ্গ হয়ে ঐ রবি বুধকে দেখবেন এবং রাষ্ট্রের পক্ষেও বহুলাংশে শুভ ফল দেবেন। উনিশশো উনআশি সালের প্রথম ভাগে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ এপ্রিল এই কয়মাস দিল্লির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কোন ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব নিতে পারেন। ঐ সময়েও আবার তিনি কোন জটিলতার সম্মুখীন হতে পারেন। ঐ সময় কোন রাজ্য নিয়েও চিন্তা হতে পারে। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে মঙ্গলগ্রহের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গতিপথ ভারতের পক্ষে শুভদায়ক নয়। রাজনীতি, প্রাকৃতিক অবস্থা, প্রশাসনিক অবস্থায় অনেক চাঞ্চল্য আনতে চেষ্টা করবে এই মঙ্গল। আগেও বলেছি রক্ষা কবচ মাত্র তুঙ্গ বৃহস্পতি। যাক, এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশিফল বলছি। সপ্তাহিক ২১ জুলাই থেকে আরম্ভ—২৫ জুলাই মঙ্গলগ্রহ সিংহ রাশি থেকে কন্যারাশিতে যাবেন।

মেষ : সপ্তাহ শুরু হতে কোন ব্যাপারে কথা রাখতে না পারার জন্য মানসিক উদ্বেগ হবে। সন্তানের জন্যও চিন্তা হতে পারে। কিন্তু আর্থিক উন্নতি হবে। মঙ্গল বুধবার অশান্তি।

বৃষ : বহুদিনের কোন অসম্পূর্ণ কাজ এবার এগোবে। রবিবারের পর থেকে অনেক কাজও এগোবে। কোথাও ভ্রমণে যাওয়াও অসম্ভব নয়। বৃহঃ শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহটি মন্দ নয়।

মিথুন : ব্যয়ের চাপ থাকলেও আর্থিক ব্যাপারে নতুন আলোকপাত হবে। গৃহের ব্যাপারে সমস্যা মিটে যাবে। শনি, রবিবার কোন বিপদ, বিরোধ থেকে দূরে থাকা ভাল।

কর্কট : নতুন কর্মক্ষেত্র অথবা চিন্তাধারা সাফল্য আনবে। কোন সূত্রে আয়ের পথ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পুরনো দেনা-পাওনায় বিব্রত হতে পারেন। শনি, রবি অশুভ। বৃহস্পতিবার শুভ।

সিংহ : স্বাস্থ্যের উপর চাপ পড়বে। সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে কাজকর্মের ব্যাপারে সাফল্য আনবে। চাকুরেদের সুসংবাদ থাকবে। সোম, মঙ্গলবার অশুভ।

কন্যা : জমানো অর্থে হাত পড়তে পারে। কিন্তু কি চাকুরেদের কি ব্যবসায়ীদের কোন সুযোগ আসবে যার ফলে মানসিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। বৃহঃবার ছাড়া সপ্তাহটি উল্লেখযোগ্য।

তুলা : যদিও বৃহস্পতি এখন শুভ। ফলদাতা কিন্তু কার্যকারণে আর্থিক টানাটানি

বিব্রত করবে, বিব্রত হতে পাবেন কোন ভাইকে নিয়েও। শনি রবিবার অশুভ।

বৃশ্চিক : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে প্রভাবে এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে। নতুন সঙ্গপ্রীতি বৃদ্ধি করাবে। কিন্তু বুকের ব্যাথা-বেদনা কষ্ট দিতে পারে। সোম থেকে বুধবার দুঃশ্চিন্তা থাকতে পারে।

ধনু : সাপ্তাহিক কর্মসূচীতে কিছু বিঘ্ন থাকলেও আপনার উদ্যমে ভাঁটা পড়ছে না। যার ফলে সপ্তাহের প্রথম দিকেই কোন নতুন প্রচেষ্টায় নামতে পারেন। বুধ, বৃহঃ অশুভ।

মকর : কারোর সান্নিধ্যে এসে নতুন আলোক-পাত, ফলে উৎসাহ বৃদ্ধি, নিজ গুণে খ্যাতি বাড়বে। কিন্তু আর্থিক চাপ থাকবে। ভ্রমণ যোগ আসতে পারে।

কুম্ভ : পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে। কোন বস্তু বা দ্রব্য লাভ অসম্ভব নয়। অসম্ভব নয় বিলাস ভ্রমণের। কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। বৃহঃ শুক্রবার সাবধান থাকুন।

মীন : প্রীতি সঙ্গ, বৈরীভাবাপন্ন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সুযোগ আসতে পারে। অহেতুক ব্যয় সংকোচ করা

শ্রীমানিক্য

আগামী সপ্তাহে বাবুজী

চিঠিপত্র

গত মার্চ মাসে রবীন্দ্র সদনে এক স্মরণসভায় পঙ্কজকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে, শান্তিদেব ঘোষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর সেই বক্তৃতার বিবরণ কিছু কাগজেও ছাপা হয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শান্তি-দেব বাবু কিছু ভুল তথ্য নিবেদন করেছেন। যেমন নিউ থিয়েটার্সের 'পরিচয়' ছবির সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিক নন। শ্রীরাইচাঁদ বড়ালই পরিচয় ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন। পঙ্কজবাবু সদলবলে শান্তিনিকেতনে উক্ত ছবির গানের জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে যান নি। এবং ঐ ছবির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কও ছিল না। গিয়ে ছিলেন রাইচাঁদবাবুর সহকারী স্বর্গীয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত সারেঙ্গীবাদক মুন্সিজী। 'পরিচয়' গল্পটি হরিপদবাবু, কবিকে শোনান। আশা ছিল সিচুয়েশনগুলি শোনার পর হয়ত নতুন কোন গানের সৃষ্টি হবে। কবি বললেন—'সব রকম গানইতো লিখেছি। তোমরা তার থেকে বেছে নিও।' এই হচ্ছে আসল ঘটনা। অথচ শান্তিদেববাবু কি করে বললেন—'পঙ্কজবাবু, গুরুদেবকে 'পরিচয়' গল্পটি মুখে শুনিয়েওছিলেন। গল্পটি শোনার পর গুরুদেব আমাকে খবর দিয়ে আনিয়ে পঙ্কজবাবুকে বলেছিলেন, গল্পের উপযোগী গান কটি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে এবং আমার কণ্ঠে গানগুলি শুনে তাঁদের পছন্দমত, তাঁরা যেন তা বেছে নেন। গুরুদেবের নির্দেশমত আমরা উভয়ে এক সঙ্গে বসি এবং পঙ্কজবাবু গীত বিতানের তিন খণ্ড থেকে, নানা প্রকার গান আমার কাছে শুনে, তার থেকে মোট ১০টি গান তিনি চলচ্চিত্রের জন্যে নির্বাচন করেন।' ঘটনাটি ঠিক নয়।

শ্রীশান্তি দেব ঘোষ আর একটি তথ্য ভুল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'গুরুদেবের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটিতে সুর যোজনা করে, পঙ্কজবাবুকে শিখিয়ে দেবার জন্য, যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে বলেন তখন আমার মনে হয়েছিল, পঙ্কজবাবু কি আমার

পঙ্কজ কুমার স্মরণে

দেওয়া সুরে গান রেকর্ড করবেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।" সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের জায়গায় রথীন্দ্রনাথ হবে। রবীন্দ্রনাথ তো তখন পরলোকে।

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' গানটিরও একটি নেপথ্য-সত্য কাহিনী আছে, যার সাক্ষী আমি, চির-পরিচালক স্বর্গত হেম-চন্দ্র, চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গত পঙ্কজকুমার মল্লিক। নিউ থিয়েটার্সের ১৯৪৭ সালে 'প্রতিবাদ' নামে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একটা ছবি করতে আরম্ভ করে। ছবিটি পরিচালনা করেন—হেমচন্দ্র। পঙ্কজবাবু ছিলেন ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক। তিনি 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটিতে সুর দিয়ে আলোচ্য চিত্রের 'থিম-সং' হিসেবে ব্যবহার করবেন বলে মনস্থ করেন। তখন আমরা বললাম, কিন্তু আপনি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুর দিলেন এটা অনুমোদন করবে কে? আপনার দেওয়া দিনের শেষের কবিতার সুর তো সব ডিঙ্গিয়ে গুরুদেবকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে-ছিলেন—এখন?' পঙ্কজবাবু বললেন, 'আমি শান্তিদেব ঘোষকে বলব, এই দুরূহ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি যদি এই কবিতার সুর করে দেন।' আমরা সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'আমাদের তো আপনার সুরটা পছন্দ হয়েছে। শান্তিদেববাবুর দেওয়া সুর যদি ভাল না লাগে।' পঙ্কজবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আহা দেখই না, একটিং-টা কি করে। শান্তিবাবু হাঁ করলেই আমি ওর মধ্যে ঢুকে পড়ব।' হলও তাই। শান্তিদেব-বাবু সেই সুরের ওপর একটু-আধটু বদল করবার চেষ্টা করায় পঙ্কজবাবু আমাদের ইশারা করে, চুপ করে থাকার নির্দেশ দিলেন। গান রেকর্ডের সময় পঙ্কজবাবু নিজের সুরই রাখলেন। বিশ্বভারতী যাতে কিছু গোলমাল না করে সেইজন্যে পঙ্কজবাবু সুরটা শান্তিদেব ঘোষের নামেই চালিয়ে দিলেন।

আমি উক্ত ছবি দুটির ('পরিচয়' ও 'পরিবাদ'), চিত্র-সম্পাদক তো ছিলামই, উপরন্তু এই ছবি দুটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। আমার সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে আমি শুধুমাত্র স্বর্গত পঙ্কজকুমার মল্লিকের সতীর্থ ছিলাম না। তিনি আমার আত্মীয় অধিক ছিলেন। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কিছু ভুল বললে, আমি নিজে আঘাত পাই এবং সেইজন্যে এই প্রতিবাদ জানালাম। —সুবোধ মিত্র

লেখক ক'জন?

গত ২৮ এপ্রিল আপনাদের সাপ্তাহিকে প্রকাশিত 'প্রাথমিক শিক্ষককে কি দিয়েছি' লেখাটি পড়ে ভীষণ ভাল লাগল। লেখাটি সত্যিই খুব বাস্তবসম্মত ও প্রামাণ্য হয়েছে। কিন্তু লেখাটির লেখক ক'জন, সে-ব্যাপারে মনে খটকা জেগেছে। সূচী-পত্রে দেখলাম—দুজনের নাম। অমল আচার্য ও বিকাশ জানার। অথচ ভেতরে লেখার শেষে শুধু বিকাশবাবুর নাম রয়েছে। লেখাটি দুটি সংখ্যায় বিভক্ত—এক এবং দুই। এটাকি ধরে নেওয়া যায়, এক নম্বর লেখাটি অমলবাবু ও দ্বিতীয়টি বিকাশবাবুর? একটা ভ্রম নিশ্চয়ই এতে আছে।

সুব্রত ঘোষ,
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬।

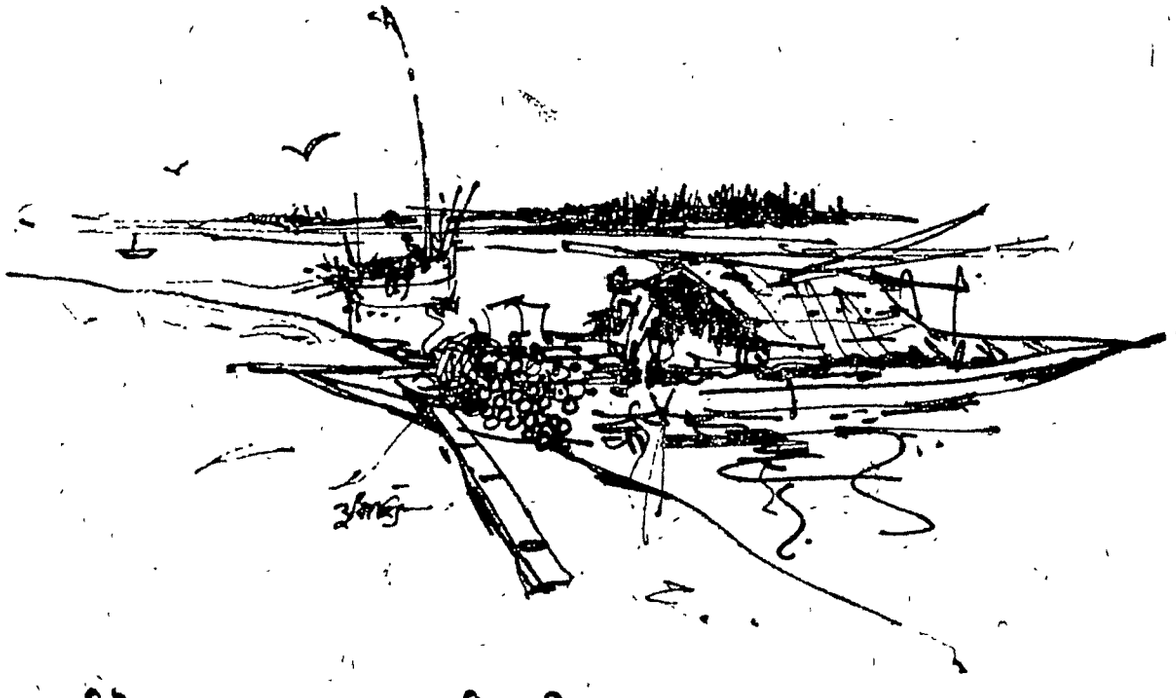

একটি সামান্য ভ্রমণকাহিনী

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

শশী ঠিকেদার প্রায় আভূমি নুয়ে পড়ে বিদায় জানাল আমাদের। তারপর অচিন্ত্য দাঁড়ী যখন প্রায় বানরের দক্ষতায় তরতর করে গাছ (মাস্তুল) বেয়ে উঠে গিয়ে মাথায়-আটকানো লোহার আংটায় পালের দড়ি পরিয়ে দিল আর লম্বা বাঁশের এক মাথা প্রবল শক্তিতে টেনে নামাতে গিয়ে প্রায় ঝুলে পড়ল নয়েন দাঁড়ী, সেই-সঙ্গে নিচ থেকে সামাল সামাল শব্দে আপ্রাণ চেঁচিয়ে উঠল ছোকরা দাঁড়ী বিজয় কাণ্ডার আর তৎক্ষণাৎ পালে জোরালো উত্তরা হাওয়া লেগে প্রায় কাৎ হয়ে পড়ল একদিকে সেই পাঁচশো মনী হাউস-বোট, বাসন কোসন ঝন্‌ঝন্‌ করে গড়িয়ে পড়ল সব একদিকে তখন সত্যি সত্যি মনে হোলো আমরা যেন শুধুমাত্রই সুন্দরবন রওয়ানা হচ্ছি না, বিজয় নয়েন অচিন্ত্য এরা যেন বাদার জন্যে হাওয়ায় মানুষ বোলে, আনা অনার্য বাঙালি নয়, পর্তুগীজ নাবিক ওরা এবং আমিও মধ্য-বিত্ত বাঙালিবাবু নই—ক্যাপ্টেন কুক কিংবা ভাস্কো-ডা-গামা, আর পাঁচশো মনী নৌকা যেন নয় এটা—ছোটোখাটো পাল-খাটানো জাহাজ একটা। চলেছিল সেন আমেরিকা আবিষ্কারে।' বস্তুত যাত্রার প্রথম প্রস্তুতিটা হয়েছিল প্রায় এরকমই জমকালো।

বুকটা ধড়ফড় করছিল আমার। একটু ভয়ে ভয়েই জিগগেস করি—ব্যাপারটা কী হোলো অচিন্ত্য?

ততক্ষণে গাছের মাথা থেকে নেমে এসেছে অচিন্ত্য। নৌকোটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরনের খাটো ধুতি ঠিকঠাক করতে করতে অচিন্ত্য খুব শান্ত স্বাভাবিক গলায় বলে—ও কিছু না স্যর, পালের দড়িটা ছিঁড়ে গিয়েছিল।

এমনভাবে বলে যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। আমি স্পষ্ট চোখে তাকাই একবার ওর দিকে। শরতের বেলা দশটার সোনালি রোদ এসে পড়েছে ওর কালো পালিশ-করা শরীরের উপর। শক্ত মজবুত শরীর। চ্যাটালো তক্তার মতো দুখানা হাত। একফোঁটা চর্বি নেই কোথাও। একপলকে তাকালেই বোঝা যায় দীর্ঘদিন ধরে এক অতন্দ্র শিল্পী তিলে তিলে পাথর কুঁদে রচনা করেছে ওই শরীর। এবং পরিশ্রমেই হোলো সেই শিল্পীর নাম।

নৌকোটা এতক্ষণ ধরে অবশ্য শামুকের মতো গুড়ি মেরে চলছিল কাকদ্বীপের কালনাগিনী খাল ধরে। নামটা কেন এরকম তা অবশ্য জানি না কিন্তু মনে মনে আঁচ করে নিই একটা। লোহার বাসর-ঘরে ঢুকেছিল সুতোর মতো সরু যে-কালনাগিনী তারই মতো সরু বলেই হয়তো বা খালটার এই নাম। অবশ্য এ নিতান্তই অনুমান। তবে খালটি খুবই ঘরোয়া ও নিরীহ। দুই পাশে সারি সারি কাঠের গোলা, ব্যবসায়ীদের গুদাম আর আড়ত। লগি ঠেলে ঠেলে চালানো হচ্ছিল নৌকোটা। ঠিক বড় নদীতে এসে পড়বার মুখেই বিদায় নিল শশী ঠিকেদার,. হৈ হৈ করে টাঙিয়ে দেওয়া হোলো পালটা আর তখনই ঘটল ওই বিপত্তিটা। যাই হোক; নৌকোটা সোজা দাঁড়িয়ে গিয়েই ভরা বাতাসে ছুটে চলল তীরের মতো। আর আমাদের সামনে মিনিট কয়েক বাদেই এক অবিশ্বাস্য মনোরম দৃশ্য। বৃক্ষজ্ঞান যার লাভ হয়নি তার পক্ষে যেমনি শুধুমাত্র বর্ণনা শুনে বৃক্ষের স্বরূপ বোঝার উপায় নেই, তেমনি চাক্ষুষ যে না এ-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে তাকে শুধু ভাষার সাহায্যে এ-সৌন্দর্যের সহস্রভাগের এক-ভাগও উপলব্ধি করানো সম্ভবপর নয়।' কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, যেন ওয়াশে আঁকা চীনা চিত্রকরের একটা নিখুঁত ছবি আমাদের সামনে। হাল্কা মোলায়েম একটা ভিবিডিয়ান গ্রীন তুলির পোঁচ টানা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সামনে ঝকঝকে রুপালী জলের সরু রেখা। কাঁচের মতো স্বচ্ছ নির্মল। তারও সামনে নতুন গজানো ঘাসের একটি কোমল ধূসর জমিন।' কাদার উপর ঘাস গজিয়েছে আশ্চর্য সরস আর সবুজ। ফলে মনে হচ্ছে ধূসর রংয়ের ভেজা জমিনের উপর সবুজ রংয়ের একটি নরম তুলির টান। অনেক দূরে দিগন্তের নীল গাছের শ্রেণী, তার উপরে ঝুঁকে পড়েছে বকের পাখার মতো ধবধবে সাদা মেঘ। এই ধূসর সবুজ রুপালী বর্ণমালার উপর আর একটি নীলাঞ্জন ছায়ার পোঁচ পড়েছে মেঘের। সব নিয়ে কোনো এক আশ্চর্য কল্পনাপ্রবণ স্রষ্টার খেয়ালে-রচিত ছবি।

বড় নদী ধরে নৌকো চলেছে। এমনিতে মনে হয় নৌকো থেমে আছে বুঝি। দুধারের তটভূমির গাছপালা, কুঁড়েকোঠা, বাঁধের উপর চরে-বেড়ানো গোরু কিংবা উবু-হয়ে-বসে-থাকা মানুষজনের বিপর্যস্ত অভিমুখীনতা চোখে প্রায় মালুমই হয় না। কিন্তু কাছাকাছি চোখ পড়লেই এই ভুল ভাঙে। ফাকদ্বীপ স্যান্ডের কাছে দুটো জালের বাঁশে শাদা বাটানপাখি বসে আছে। খুব দ্রুতবেগে তারা উলটো মুখে ছুটে যাচ্ছে। নৌকোর গতি সম্বন্ধে তখন একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। বোঝা যায় পালে বাতাস পড়লে নৌকো কতজোরে ছুটতে পারে। তবুও নিঃসংশয় হওয়ার জন্য কথাটা আমি জিজ্ঞাসা করি অচিন্ত্য মাঝিকে। জবাবে অদ্ভুত একটা সরল খুশির হাসি হাসে অচিন্ত্য। ছোট বাচ্চাকে প্রশংসা করলে যেরকম হাসে এ সেই ধরনের হাসি। যেন একটু লাজুকে স্বরেই বলে অচিন্ত্য—তা নৌকা ছুটছে বাবু। পালে ঠিক মতো হাওয়া লাগলি লঞ্চও পাববে নি বাবু এ-নৌকাব সাথে।

কথাটা এমনভাবে বলে যেন নৌকো ছোটার সম্পূর্ণ কৃতিত্বটা তার। আর একবার অচিন্ত্যকে আমি দেখি এবং বুঝতে

চেষ্টা করি এই নৌকো আর জলেব সঙ্গে কী গভীরভাবে মিশে আছে তার অর্থাৎ এই দাঁড়ি মাঝিদের জীবন।

আমাদের ডানদিকে টানা চলেছে সেই ভিরিডিয়ান গ্রীন রংয়ের তুলির পোঁচ ১৯২২ সালেব সার্ভে ম্যাপে যার নাম দেখানো হয়েছে—কাকদ্বীপ স্যান্ড। গোটা সুন্দরবনে নদীর মোহানায় যে শত শত বদ্বীপ ছড়িয়ে আছে এটাও সেরকমই একটা বদ্বীপ। গেঁয়ো গরান বাইন আরো হাজার রকমের ম্যানগ্রুভসের নিঃসুম জঙ্গল গোটা চরটাতে। কেউকী গাছের হাল্কা নীল ফুল ফুটে আছে জলের ধারে ধারে। আর জলেরা গায়ে যেখানে নবোদ্গত মাটি প্রায় শিশুর ত্বকের মতো কোমল সেখানে উঠেছে সরস সবুজ ঘাসী ঘাস—করাতেব মতো ধাবালো যার পাতা।

কাকদ্বীপ ফিশ-ফার্মের কাছে নদীতে বেশ চড়া পড়েছে। একটা নৌকো আটকে আছে চড়ায়। অনতিগভীর জলে গলা অবধি ডুবে গুণ টেনে চলেছে দুটি লোক। শীতের ঠাণ্ডা জলে ডুবে তারা পরস্পরের প্রতি চেঁচিয়ে যে-বিষয়ে আলোচনা করছে তা নিস্তব্ধ নদীর জলেব উপর দিয়ে টুকরো টুকরো ভেসে আসছে আমার কানে। আলোচনাব বিষয়বস্তু বুঝতে পারছিলাম, কেউ কারুর কাছ থেকে হাজার টাকা ধার নিয়ে আর ফেরৎ দেয় নি। সেই কথাটাই তারা হাজারবার বলছে। অর্থাৎ নিসর্গ শোভা যতই মন ভোলাক, এরকম স্নিগ্ধ শীতের দুপুরে এরকম শান্ত নদীর উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে যতই মনে হোক, যে সমস্ত জগতে এক গভীর শান্তি ও সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই বিরাজ করছে না তবুও সভ্যতার প্রায় সমানবয়সী সেই চিরকেরা অর্থচিন্তা এখানেও দুটি মানুষের মস্তিষ্কে ঠিক তার কাজ করে চলেছে। বেলা পৌনে বারোটা নাগাদ বেশ বড় নদীতে এসে পড়া গেল। ডাইনে সাগরদ্বীপের তটরেখা। মাঝিকে জিগগেস করাতে জায়গাটার নাম বলল কয়লাপাড়া। এবার খুব জোর বাতাস লেগেছে পালে। বাঁয়ে অবশ্য নদীর পাব ঘেঁষেই চলেছে নৌকো নৌকোব সামনে এখন আর কোনো তটরেখা দেখা যায় না। সামনে ধুধু করছে জল। কুচি কুচি রোদ ভেঙে পড়েছে জলের মাথায়। পিছনে সাগরদ্বীপের দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তটরেখা। হঠাৎ আবাব একটা 'গেল গেল' 'সামাল সামাল' রব। নৌকোর মুখেব দিকে বসে নবেন দাঁড়ি সুড়ঙ্গিতে জাল বুনছিল। চিৎকারটা করে উঠল সে-ই। মুহূর্তে লক্ষ্মণ মাঝি প্রায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হালিস-এর (হালের) উপর ঝুঁকে পড়েছে দেখলাম, এই বুড়োবয়সেও তার মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠেছে লোহার মতো। কিসের থেকে কী হোলো বুঝতে না বুঝতেই দেখি নৌকোর মুখটা হাওয়ার-মুখে-পাক-খাওয়া চিলের মতো ঘুরে গেল একদিকে আব তৎক্ষণাৎ একটা কালো মতো কী বস্তু বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতবেগে চলে গেল একেবারে নৌকোব বগ ঘেঁষে। কী জিনিস ওটা? নিচু কেবিন থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। দেখি কালো বস্তুটা ইতিমধ্যেই অনেকটা পিছনে পড়ে গেছে। লক্ষ্মণের সঙ্গে কথা বলে জানলাম ব্যাপারটা। ওটা আর কিছুই নয়। বেশ বড় আকারের টিনের ড্রাম। আর এতক্ষণে চোখে পড়ল আমার অনেকটা নদী জুড়েই এরকম বেশ কয়েকটি আলফাতরা-মাখা কালো টিনের ড্রাম ভাসছে লাইনবন্দী হয়ে। ওগুলি আসলে হচ্ছে জেলেদের পেতে-রাখা বেড়জালের ফ্লোট্। অর্থাৎ জালকে ভাসিয়ে রাখার একটা ব্যবস্থা। মেদ ভেটকী ভোলা ইত্যাদি নানা জাতেব মাছ স্রোতের মুখে গেঁথে যাবে ওই জালের ফাঁসে। তা না হয় হোলো। কিন্তু খসে-পড়া উল্কার বেগে ওগুলো ছুটে যাচ্ছে কোথায়? লক্ষ্মণকে জিগগেস করাতে লক্ষ্মণ হেসে বলল—ওগুলো তো কোথাও যেতিছে না বাবু, আমাদের নৌকো এগুচ্ছি কী না সুতরাং এরকম মনে হচ্ছি—

কথাটা শুনে রীতিমতো চমকে উঠি। বলে কী লক্ষ্মণ? সত্যিই আমাদেব নৌকোটা এমন প্রচণ্ডবেগে ছুটে চলেছে নাকি? অথচ জানালাব কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে জলেব উপর মৃদু ঢেউয়ের খেলা দেখতে দেখতে এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন 'তরণী ভাসিল রঙ্গে'। কিন্তু এই কী সাংঘাতিক রঙ্গ! ওই অনড টিনেব ড্রামটা যদি নৌকোর তলাটা শুধুমাত্র ছুঁয়ে যেতে পারত তাহলে যে-কাণ্ডটা ঘটত তাকে আর নেহাৎই শুধু রঙ্গ বলা চলে না।

যাই হোক লক্ষ্মণ একেবারে শাদামাঠাভাবে কথাটা বললেও আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বটা এই একটি ঘটনাতেই যেন একেবারে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে ফেলি। না বলে দিলে কে বুঝবে যে সত্যিই ওদেব মধ্যে গতিশীল কে? আমরা না ওই কালো টিনেব ড্রামগুলো। এক যদি স্থির হয় তাহলে অপরে অস্থির।

প্রায় আধ ঘণ্টা আরো এরকম স্থির অথচ গতিশীল অবস্থায়

ভাসার পর টের পেলাম গোটা নৌকোটাই বেশ জোরে জোরে দুলছে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি নদীর সেই একই চেহারা কিন্তু ঢেউগুলি এখন মস্ত বড়। সাপের ফনার মতো মাথা তুলে একের পর এক এসে তারা আছড়ে পড়ছে নৌকোর উপর। নৌকোর এবাপ ফেনায় ফেনায় শাদা হয়ে গেছে। কঠিন স্থির হাতে হাল ধরে আছে লক্ষ্মণ। এটাই কি তাহলে দাড়িমাঝিদের সেই কিংবদন্তীর জায়গা? এটা কোন জায়গা জিগগেস করাতে লক্ষ্মণ জবাব দ্যায়—আজ্ঞে এটা মাদাভাঙা বাবু।

যা ভেবেছি তাই। এই তাহলে সেই নাদাভাঙা যা বিখ্যাত অথচ কুখ্যাত দুই কারণে। এক, মৌলা (ঢেউ), দুই, ডাকাত। ডাকাতির গল্প আগেই শুনেছি এইসব দাঁড়িমাঝিদের মুখে। যেমনি বিবর্তনহীন এদের জীবন তেমনি বিবর্তনহীন আবহমানকাল-থেকে-চলে-আসা সেইসব ডাকাতির গল্প। সেই অমাবস্যার নিশকাশো রাত। কিছু দেখা যায় না কিন্তু কান পাতলেই শোনা যায় যাত্রী নৌকোর পিছন পিছন শিকারী বেড়ালের মতো এগিয়ে চলেছে একটা ছিপ নৌকো একেবারে সমানদূরত্ব রক্ষা করে। সে-দূরত্ব বাড়েও না কমেও না। দুধু পাখির ডানার মতো ছিপের দুপাশে সমানে বৈঠার ওঠানামা ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্। ঠিক মোক্ষম জায়গায় এসে পড়ামাত্রই হঠাৎ ছিপের গতি হয়ে যাবে দ্রুত। কমে আসতে থাকবে দুটি নৌকোর দূরত্ব আর ছিপ নৌকোর মাঝিটি খুব নিরীহ ও যথাসম্ভব ভালো-মানুষের মতো গলায় জিগগেস করবে—একটু আগুন দিতে পারবা মাঝি—তামাক খাবু—বড্ড জ্বর পড়িছে—সামান্য অনুরোধ। কিন্তু অনুরোধের অর্থ সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের তাবৎ মাঝি-মাল্লারই জানে অন্ধকার রাতে নৌকোর পিছু নিয়ে যারা তামাকের আগুন চাইতে আসে তাদের স্বভাবচরিত্রটা কী প্রকারের। এ-ক্ষেত্রে সরাসরি আগুন নেই বলার এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর গতি বাড়িয়ে দেওয়াটাই হোলো প্রকৃষ্ট নিয়ম। তবে তাতেও সর্বদা যে শেষ রক্ষা হবে তারও কোনো স্থিরতা নেই। রক্ষা পাওয়ার একমাত্র সহজ সরল উপায় হোলো অবশ্য একা একা না গিয়ে জোট বেঁধে যাওয়া। এবং ভিন্‌দেশী যেসব মাঝি এ-সত্য জানে না তাদের কথা আলাদা। কিন্তু এ-তল্লাটের সব মাঝি যারা মালের নৌকো নিয়ে যাতায়াত করে কাকদ্বীপ থেকে ফেরারগঞ্জ তারা সবাই মেনে চলে জলের বুকের এই অলঙ্ঘ্য নিয়ম; রাতবিরেতে নাদাভাঙা-পেরোতে হয় যাদের তারা সবাই অবশ্যই জুটিয়ে নেয় যাত্রার সঙ্গী।

এর কতটুকু সত্যি কতটুকু মিথ্যা কে জানে। কিন্তু যা সত্যি তা হোলো চারদিকের এই অকূল জলরাশির মধ্যে এখন আমরাই একা। এবং আর কোনো নৌকা আমাদের কাছেপিঠে নেই। নিশ্চয়ই এখন আমাদের তাহলে আশ্বান্বিত হওয়ার কথা। কথাটা লক্ষ্মণকে বলাতে লক্ষ্মণ অভয় দিয়ে বলে—না বাবু, দিনেদুপুরে কোনো ভয় নাই। রাতেই বেরোয় ওরা।

জিজ্ঞাসা করলাম—লক্ষ্মণ, তুমি কতদিন ধরে নৌকো চালাচ্ছ? উত্তরা বাতাসে অল্প একটু শীতের আমেজ। লক্ষ্মণের গায়ে এমন কী একটা গেঞ্জি অবধি নেই। ধুতির খুঁটটা কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে, লক্ষ্মণ বলে—একেবারে অল্পবয়স থেকেই নৌকা চালাচ্ছি বাবু—

—বয়স কত হোলো তোমার?

এ-প্রশ্নের জবাবে লক্ষ্মণ চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সামনে যেখানে রোদ লেগে রূপকথার চুনী-পান্নার গাছের মতোন ঝক্‌মক্ করে জ্বলছে ছোট কাঁকড়ামারি চরার ঝোপ-ঝাপালি, কিংবা তারো পিছনে যেখানে আকারহীন আকাশ গোল হয়ে মিশেছে আকারহীন জলের সঙ্গে। ওইখানে তাকিয়ে কী খুঁজছে লক্ষ্মণ? তার সমানবয়সী কাউকে যে উঠে এসে তার বয়সের কথা মনে করিয়ে দেবে তাকে?

দিগন্ত থেকে চোখ সরিয়ে এনে লক্ষ্মণ আমায় দিকে ফিরে লাজুকে হেসে বলে—তা ঠিক বলতি পারবু নি বাবু, তবে ওই যে কাঁকড়ামারি চর দেখতিছেন ও চর তখনো গজায় নি, সাগর অবধি এই গোটাটা তখন বড় গাঙ ছিল। নৌকা লিয়ি আমরা সিধা মেদিনীপুর চইল্যে যেতাম। আমাদের চোখের সম্মুখে তো গজাল ওই চর। প্রথমে ছিল শুধু ধানীঘাস, এখন তো কতরকমের গাছ হইছে এখানি।

জিগগেস করলাম—এর মধ্যে তুমি কবার ডাকাতের হাতে পড়েছ লক্ষ্মণ?

—তা জোয়ান বয়সে দুবার পড়িছি বাবু। নাদাভাঙায় নয়, কসাবলীর ওদিকি।

—কসাবলী? সে কোথায়?

—ওই উড়িষ্যার ওদিকি বাবু। তখনো মাঝি হই নি আমি। সন্তোষ দাসের মাল্লের নৌকায় দাঁড়ির কাজ করতাম। কসাবলী থেকেই নৌকায় মাল লিয়ি আসতাম কাকদ্বীপ। আড়াই দিনের রাস্তা। খুব ডাকাতের ভয় ছিল ও দিগরে। মহাজনী নৌকা দেখলিই গিরি চড়াও হবে।

—তা তোমরা কী করলে ডাকাতের হাতে পড়ে?

—কী করবু বাবু? সন্তোষ দাস মাছ কেনার হাজার পাঁচেক

নগদ টাকা দিয়ি যেতেছিল। সব দিয়ি দিতি হোলো ডাকাতের হাতে। না দিলি তো মহা মুস্কিল।

—কেন?

—নৌকায় চড়াও হয়ি তারপর যদি দ্যাখে যে নৌকায় সত্যি সত্যি টাকা নাই তাহলে রাগের চোটে ভীষণ মার্ মাবে তারা বাবু। মাবতে মাবতে একেবারে বেহুঁশ কইর‍্যে দিবে নৌকার মানুষগুলাকে; বড় কড়া জান বাবু, নৌকার এই ডাকাতদের। একবার টাকা কিতি দেরি হয়িছিল বলে এক চালানদারের চোখ উপড়ি নিয়িছিল।

নরেন দাঁড়ি এসে জিগগেস করল নৌকো কোথায় রাখবে? নামখানা খালের মুখে এসে গেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম দূরে পাখির মতো অনেকগুলি নৌকোর জটলা। ওইটাই নামখানা খালের মুখ। বাঁপাশে নদীর পারে লম্বা কাঠের খুঁটির উপর একটা শাদা কালো রঙে আঁটা কাস। ওটা হোলো দিশারু। আগে এখানে পূর্ব-বাংলা ও আসাম যাওয়ার ডেসপ্যাচ স্টীমার সার্ভিস চালু ছিল। ওগুলো সেই সার্ভিস রুটেরই দিক্‌জ্ঞাপক চিহ্ন। পনেরো-কুড়ি

মাঝিরা খেয়ে উঠতে উঠতে বেলা একটা। খেয়ে উঠেই আবার নৌকা ছেড়ে দিয়েছে ওরা। এই ভাঁটায় যতটা দূরে যাওয়া যায়। আসলে কিছুতেই যেন শান্তি নেই ওদের। কাজের এই জড়পদার্থটিকে সবসময়ে ব্যতিব্যস্ত না করে রাখতে পারলে কি শান্তি পায় না ওরা? যদিও এই ঘটনাহীন নিস্তব্ধ জগতে মনে হচ্ছে সময় বলে কিছু নেই তবুও ঘড়িতে এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। জোয়ার লেগে গেছে। নৌকো আর যাবে না। নামখানা থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে আবার নোঙর ফেলা হোলো।

সকাল ছটা। সেচবাঁধের উপর দিয়ে ডিঙি মেরে উঠে আসছে লাল টকটকে সূর্য। জলের রং পরিষ্কার নীল। পালে জোর হাওয়া লেগে আমরা ছুটে চলেছি তমলুক আর সুবনি চরার দিকে। সুবনিস চর উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা টানা চলে গেছে। নিচে তমলুক চড়া। মধ্যে একটা প্রণালী যা যোগ করেছে সপ্তমুখীর পূর্ব-ধারাকে পশ্চিমধারার সঙ্গে। তিনটি লোক একটি মাছ ধরার ডিঙিতে জাল টানছিল সুবনির চর আর তমলুকের মাঝখানে। বিরাট বেড়-জাল। অজস্র চিংড়ি আর রুপোর চ্যাপ্টা ফিতের মতো রূপোলী

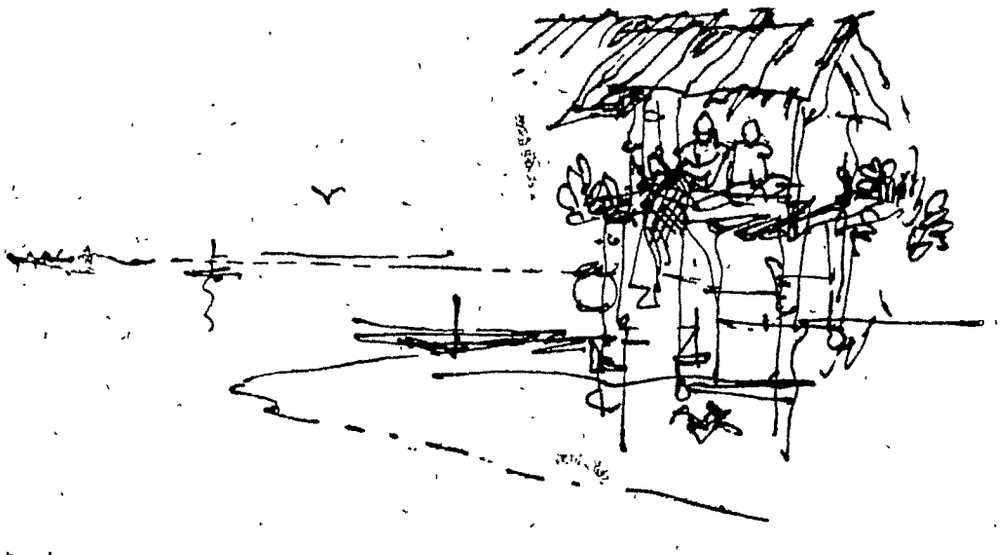

মিনিটের মধ্যেই নৌকো একেবারে নামখানা খালের মুখে এসে গেল। মনে হোলো প্রাণহীন ভাষাহীন জলের জড়ত্বরাজ্যের একযুগ কাটাবার পর আমরা আবার মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার উষ্ণ জগতে ফিরে এলাম। এ-এক আশ্চর্য মধুর অভিজ্ঞতা। এতক্ষণ আমাদের চারপাশে কোথাও একটা নৌকো ছিল না, কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর ছিল না। খালি জল জল আর জল। এখন আমাদের চারপাশে নৌকো, নৌকো, নৌকো। মানুষের কথাবার্তা গান হাসি ঝগড়া। মাত্র আড়াই ঘণ্টা ব্যবধানেই যে সমগ্র মনুষ্যজাতিটাকে এত প্রয়োজনীয় এত আকাঙ্ক্ষিত লাগতে পারে তা আড়াই ঘণ্টা আগে কে জানত?

নামখানা বস্তুত একটা ছোটো গঞ্জ। এখান থেকে বিভিন্ন নৌকা বেরিয়ে যাবে বিভিন্ন দিকে। হাওয়া এখন খুব নেই। অতএব মাঝিকে বললাম আবার ভাঁটা না পড়া অবধি নৌকাটাকে নামখানাতেই নোঙর করে রাখতে। নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নৌকাটাকে খালের একপাশে লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়ে নোঙর ফেলে দিল। লক্ষ্মণের সেই মুখ যা এতদিনের জল আকাশ চর মাটির শান্ত সাহচর্যে থাকতে থাকতে প্রায় এই প্রকৃতির মতোই নির্বিকার নিরুদ্বেগ হয়ে গেছে তা দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না বটে কিন্তু আপাতত ঘণ্টা তিন-চারেকের জন্য ছুটি পাওয়ায় নিশ্চয়ই যে তার খুব খুশি হওয়া উচিত এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, এই আড়াই ঘণ্টা ধরে আমি দেখছি লোকটা একেবারে ঠায় হালে বসে দাঁড়িয়ে আছে।

মাছ। সকালের রোদ পড়ে ঝকমক করছে। এবার আমরা ঢুকলাম সুবনি আর তমলুকের মধ্যবর্তী প্রণালীতে। নৌকো চলল তমলুকের গা ঘেঁষে। বৃটিশ আমলের ম্যাপে যাকে দেখানো হয়েছে লোথিয়ান বলে তারই স্থানীয় নাম তমলুক। ভিতরে ঢুকতেই মনে হোলো আসল সুন্দরবনে এসে গেছি। বেশ বড় বড় ঘন গাছ মাথা উঁচু করে নিঃঝুম দাঁড়িয়ে আছে। যেন থ হয়ে দেখছে আমাদের। সব গাছের গোড়াই প্রায় আধা-আধি জোয়ারের জলে ডুবে গেছে। শুনেছিলাম কুমীর আছে এসব অঞ্চলে। বাইনোকুলার দিয়ে নজর রাখতে রাখতে চললাম। জংগলের মধ্যে চোখ পড়ল ভস্ম একটা অফিস দিশারু। দিশারুর পাশে আর একটা ছোট নৌকোয় মাছ ধরছে আর কিছু লোক। আমাদের নৌকোর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করা হোলো—মাছ পচ্ছ?

—এজ্ঞে বাবু।

—বাড়ী কোথায়?

—নামখানায়।

—এখানে মাছ ধরতে এসেছে, কুমীর নেই?

—নেই আবার বাবু? এই তো দু' খানা কুমীর তখন থেকেই আমাদের পিছু ধরিছে। কুমীরের ভয়ে আমরা কাজ করতে পারি না। বাবুরা কিছু ব্যবস্থা করেন যদি—

শেষের দিকে কথাগুলি শোনায় অসহায় শিশুর মতো।

অসহায় শিশুর মতোই যেন দুরন্ত কুমীরের বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছে আমাদের কাছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল। শিকারী-টিকারী ভেবেছে আর কি আমাদের। কুমীর শিকার করতে নৌকো নিয়ে বেরিয়েছি। এখানে কুমীর সত্যি আছে কি না সে-বিষয়ে একটু সংশয় প্রকাশ করছি নিজেদের মধ্যে, হঠাৎ একটা চিৎকার—কুমীর, কুমীর। মাঝির আঙুলের দিকে চোখ রাখতেই দেখি—একটা চকচকে রোদের রশ্মি ফলা জলের উপর দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তার কালো গায়ের কাঁটা।

বেলা দশটা। নৌকা এবার প্রায় সপ্তমুখীর মোহানায় এসে পড়েছে। কিন্তু তমলুক চরার অনেক দূর দিয়ে আমরা যাচ্ছি কেননা দ্বীপের পূর্বদিকটায় বিরাট চড়া পড়ে আসছে। এমনিতে মনে হচ্ছে অকূল অথৈ জল অথচ বিলয় লগি ফেললে দেখা গেল মোটে পাঁচ ছ' ফিট জল। মিনিটে মিনিটে জল মেপে খুব হুঁশিয়ার হয়ে চালাতে হবে নৌকো। না হলেই বিপত্তি। নৌকো গেঁথে যাবে চরায়। আর তাতে জীবন্ত সলিল সমাধিও বিচিত্র নয়। বাঁয়ে অনেক দূরে বুড়োবুড়ীর তট অজানা কোনো পৃথিবীর রহস্যময় আভাসের মতো। বাইনোকুলার দিয়ে দেখলাম অনেক দূরে বকখালির দক্ষিণ-পশ্চিম তটরেখায় শাদা ফেনা মাথায় ঢেউসের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে। অথচ আমাদের সামনে ঠাণ্ডা নিস্তরঙ্গ জল। ভাঙা কাঁচের ধারের মতো নীলচে সবুজ আভা সেই জলে। মাঝিরা একে বলে 'হালি জল'। এই জলে নাকি ইলিশ মাছ হয়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আসল সমুদ্রে এসে পড়লাম। পিছনে চুলকাঠির ধূধূ চক্রচালরেখা, বাঁয়ে একেবারে কূলহীন জলরাশি, সামনে সম্বুদ্বীপের নীল টানা পাড়, ডাইনে বকখালির ঝাউবীথি মেঘের ছায়া পড়ে গাঢ় নীল। মাঝখানে আমি ভাসছি সেই ইস্কুলের ভূগোল-বইয়ে-পড়া বঙ্গোপসাগরে। নৌকো আড়াআড়িভাবে সমুদ্র কেটে চলেছে। সামনে বকখালির ঝাউগাছগুলি নিশানা। বেলা আড়াইটায় তমলুক একটু কাছে এল। দূরবীনে দেখলাম চরায় দুটো ডিঙি বাঁধা তাকে ঘিরে শাদা পাখির ঝাঁক। সেখানে শাদা পাখি সেখানে মাছ। নিশ্চয়ই কোনো মাছের ঝুঁটি আছে ওখানে।

নৌকো কাছে এল। পাখিগুলো সাড়া পেয়ে উড়ে গেল খানিকটা দূরে। দুজন দাঁড়ি সঙ্গে নিয়ে আমি দ্বীপটায় নামলাম। কুমীরের ভয় যে ছিল না তা নয়। কিন্তু বীরপুরুষের মতো সেটাকে উপেক্ষা করা গেল। জঙ্গল ঠেলে একটু ভিতরে এগিয়ে গেলাম আমরা এবং তখন সপ্তমুখী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল তমলুক চরের এই দক্ষিণতম বিন্দুতে দাঁড়িয়ে এমন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম যাকে শুধু অভিনব বললে ভুল হবে, একাধারে তা নিষ্ঠুর ও বিবর্ণ। নৌকো থেকেই চোখে পড়ছিল জঙ্গলের সীমানায় বালির চরার উপর গাছের মাচায় দু'একখানা ঘর। ভেবেছিলাম ঝুঁটি পাহারা দেবার মাচা গোছের কিছু একটা ব্যাপার। কাছে গিয়ে দেখি গাছের গুঁড়ির উপর বাঁশের পাটাতন বাঁধা, তার উপর পাতা-কাঠে ছাওয়া নৌকোর ছইয়ের মতো চাল। পাপুয়া নিউগিনি অথবা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা যেমন মাটি থেকে অনেক উপরে গাছের উপর মাচা বেঁধে বাস করে হুবহু দেখতে লাগছে তেমনি। ভূগোল বইয়ের নিরীহ পাতা থেকে তারা এই সপ্তমুখীর মোহানায় উঠে এল কী করে? ছইটি খুবই নিচু। একটা মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে কোনোক্রমে ঢুকতে পারে তার মধ্যে। দুজন লোক টঙের উপর বসে জাল মেরামত করছে। শেষ বিকেলের বাঙা রোদে সুন্দরবনের অরণ্যানী নিশ্চুপ, নিঃঝুম। একটু এগিয়ে গিয়ে ওদের মাচায় উঠবার ছইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জিগগেস করলাম—

—কোথাকার লোক তোমরা?

—হাসনাবাদ বাবু, বসিরহাট হাসনাবাদ।

—সে তো অনেকদূরে।

—আজ্ঞে, অনেকদূরে। ছ'সাত জোয়ার লাগে।

—এখানে কী কর তোমরা? শীতকালে মাছ ধরতে এসেছ বুঝি?

—না বাবু, গোটা বছরই মাছ ধরি।

—গোটা বছর? সবিস্ময়ে আমি টঙের উপর পাতা কাঠে ছাওয়া ছইয়ের দিকে তাকাই—যার দরজা নেই, জানালা নেই, আকার মধ্যে আছে খালি একটা খোঁকশিয়ালের গর্তের মতো মুখ যার ভিতরে একটা বয়স্ক লোক অতি কষ্টে ঢুকতে পারে। জিগগেস করলাম—কদিন আছ এখানে?

—তা বাবু ন-দশ বছর ধরিছি এখানে।

—ন-দশ বছর? মাথা প্রায় ঘুরে যায় আমার, কিন্তু সামলে নিয়ে খুব সহজভাবে বলি—কোটালের সময় অসুবিধা হয় না তোমাদের?

—তা একটু হয় বাবু। এই গত কোটালেও ঘরের এক হাত নিচ দিয়ে বাব কোটালের জল বইয়ি গেছে।

দাভিমাঝিরা অপেক্ষা করছিল। নৌকোর উঠতেই নৌকো ছেড়ে দিল। আবার আমাদের যাত্রা সমুদ্রের দিকে। অস্তগত সূর্যের চাপা আলোয় আঙা স্থির জলে পড়ে দেখাচ্ছে যেন সদ্যবিধবার সিঁদুর-ল্যাপ্টানো কপালের মতো। ক্রমে অন্ধকারে তাও মিলিয়ে এল। তমলুক চরা থেকে অনেকদূরে চলে এসেছে আমাদের নৌকো।

হাওয়া নেই। জোয়ারও প্রায় পুরোনির মুখে। খুব ধীরগতিতে চলেছে আমাদের নৌকো বকখালি খালের দিকে। বিনয় এসে বলল নৌকো আর যাবে না। কী ব্যাপার? না, জেলেরা সামনে জাল পেতেছে অনেকদূর অবধি। যেতে চাইলে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে নৌকোকে। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী কি পঞ্চমী তিথি। এখনো চাঁদ ওঠে নি। একটা গাঢ় ভারী অন্ধকার বাদুরের ডানার মতো ঝুলছে আকাশ থেকে জল অবধি। সেই বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন অন্ধকারের মধ্যেই রচিত হয়েছে একটি অভিনব দৃশ্য। অন্ধকার জলের উপর ভাসছে জোনাকির মত মিটমিটে ক্ষীণ আলোর মালা। কারা যেন লাইন দিয়ে প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়েছে জলে। কে ভাসাবে আলোর প্রদীপ শীতের রাতের এই অকূল কালো সমুদ্রের জলে আমবাংলাতে মেয়েরা প্রদীপ ভাসায় জলে জানি কিন্তু এখানে এ আলো কে জ্বালাবে? লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করাতে ও বলল ওগুলো আসলে ইলিশজালের সঙ্গে বাঁধা জালের নিশানা। ভাসমান কাঠের তক্তায় কাঁচের চিমনিতে ঢাকা কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে রাখে জেলেরা যাতে বিদেশী নৌকো এসে না পড়ে জালের গায়ে।

লক্ষ্মণ শেষ অবধি অবশ্য জালের উপর দিয়েই কৌশলে চালিয়ে নিয়ে যায় তার নৌকো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। শীতের কামড়ে খুম ভেঙে গেল মাঝরাতে। বেশ শীত শীত করছে। একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে কোথায় এলাম তাই দেখতে কেবিনের বাইরে পা দিয়েই স্তব্ধ-মুখের মত স্থির হয়ে গেলাম। ভূতে-পাওয়া, দানোয়-পাওয়া অথবা পেঁচো-পাওয়া বলে যদি কোনো কথা হয় তাহলে জ্যোৎস্নায়-পাওয়া কিংবা রাত্রিতে-পাওয়া বলে কোনো শব্দও নিশ্চয়ই বাংলাভাষার থাকা উচিত ছিল। না হলে মাঝরাত্তিরে নদীর উপর জ্যোৎস্নার রূপ দেখে মনের যে দশা হয় তাকে আর কোন্ শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব? সে-রাতে সত্যি সত্যি যেন আমাকে জ্যোৎস্নায় পেয়ে বসল। তমলুকের মাথার উপর দিয়ে সাঁতরে শেষরাতের চাঁদ উঠে এসেছে প্রায় মাথার উপরে। জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণ। চাঁদের ছায়া পড়েছে পাতিবুনিয়া খালের স্থির টলটলে জলে। সব কিছু কী গভীরভাবে নিঃশব্দ। নিঃশব্দ খালের জল, জলের উপর কিরণপ্লাবিত আকাশ, খালের পারে সারি সারি মাছ ধরার নৌকা। জলের ধারে পেঁতা ট্যাংরা মাছ ধরার শুকনো গাছপালা তারাও আকাশের দিকে ঘাড় তুলে চুপচাপ। শব্দহীন মাছ আর শিকারী পাখিরা। খালি নরম মাটির ভাঙা

বেয়ে জোয়ারের জমে থাকা জল কুলকুল শব্দে নেমে যাচ্ছে। সর্বত্রই প্রাণ বয়েছে ঘুমিয়ে, কেবল খালের জলের নিথর ঘুম মাঝে মাঝে ভেঙে যায় মাছের ঝাঁকের আবছা চলাচলে। জলেই নাকি প্রথম প্রাণের সৃষ্টি—জলেই এখনো খাঁটি জেগে আছে প্রাণ।

শীত পড়েছে বেশ। জন্মদ্বীপের দিকে একটা ঘন কুয়াশার চাদর রঙ্গমঞ্চের পর্দার মতো আস্তে আস্তে নেমে আসছে আকাশ থেকে জলের উপর। জলের উপর থেকে একটা কুয়াশা উঠে একাকার হয়ে যাচ্ছে জল আর আকাশ। মনে হচ্ছে অচিরেই বিশ্ব-চরাচর লুপ্ত হয়ে যাবে এই সর্বদৃশ্যলোপকারী নিরঞ্জন কুয়াশার অন্তরালে।

এর মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মণ। যতক্ষণ না কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে সব কিছু ততক্ষণ যেন সে সামনে তাকিয়ে থাকবে এভাবে। দেখবে যতক্ষণ অবধি দেখা যায় কিছু।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—লক্ষ্মণ, এখনো জেগে আছো তুমি?

—আজ্ঞে বাবু, অল্প টান আছে, এই খালের ভিতরি চুকে যাবু।

বললাম শীত করছে না তোমার? গায়ে কিছু দাওনি কেন? কেন?

বললাম—আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন ঘুমোও তো।

বলে আমি শুতে যাই। সে শোয় না। ঘুমের মধ্য সারা-রাত ধরে যেন টের পাই নদীর জলে, নৌকোর গায়ে কুয়াশা ঝরছে। বিষণ্ণ... আবছা... নরম। যেন ফিসফিস স্বরে কথা বলছে কেউ।

ভোর হোলো। অদ্ভুত দৃশ্য। শাদা কুয়াশার ভিতরে গিজগিজ করছে কালো কালো নৌকো। পাতিবুনিয়া খালের মুখ ভরে গেছে হাজার হাজার ডিঙি আর ছোট নৌকোয়। কেউ কেউ উঠে নোঙর খুলে সমুদ্রে যাওয়ার আয়োজন করছে, কেউ কেউ বা এখনো কুয়াশায়-ভেজা চট মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। নৌকোগুলির ছই বলতে কিছু নেই। এই পৌষের পুরো শীতের রাতটাই ওরা উদোম নদীর বুকে খোলা আকাশের নিচে কাটিয়ে দিয়েছে। দিতে হবে কেননা, এই ওদের জীবিকা। ওরা জেলে। এরং কোথায় যেন পড়েছি ভারতবর্ষের জেলেরাই নাকি সবচেয়ে বেশি গরীব ও অনুন্নত সম্প্রদায়।

এডওয়ার্ড কর্নিক (বৃটিশ আমলে তৈরি সার্ভে ম্যাপে পাতি-বুনিয়া খালের এই নামই আছে) ধরে আমরা প্রায় একক্রোশ পথ উত্তরে উজিয়ে গিয়ে নোঙর করলাম। এখানে দেখা হোলো একজন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে। চরে নামতে যাবো ডোঙ্গাবাজির মতো,

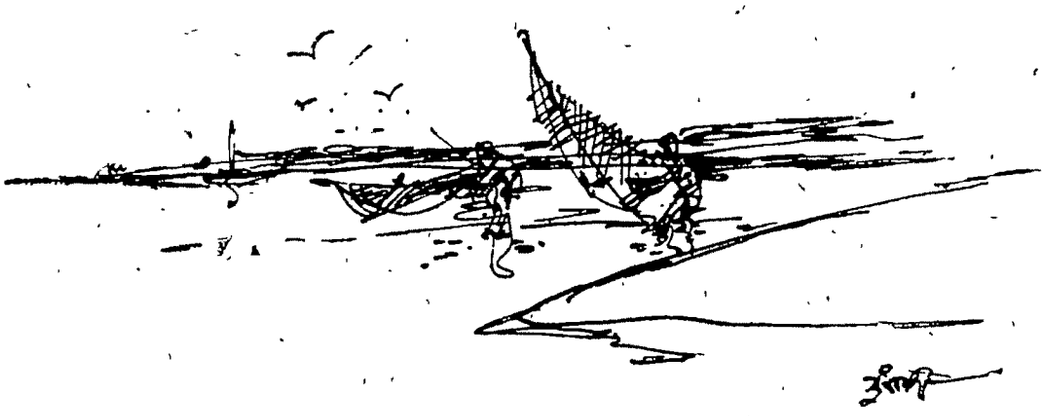

একজন বুড়োমতো লোক নৌকোর পাশে কাদার উপরে কোথেকে আবির্ভূত হোলো। চেহারায় ও পোষাকে-আসাকে চাষাভুষোর মতোই প্রায় কিন্তু চোখে অত্যন্ত মোটা কাঁচের চশমা। চোখ দেখাই যায় না। নৌকোর কাছে দাঁড়িয়ে সে কিছুটা শুদ্ধ ভাষায় একটানা যা বলে গেল তার মর্মার্থ হোলো এই যে, সম্মুখে যে-স্বীপ আমরা দেখছি আমরা তা যদিও আসলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জমি তবু এখানকারই কিছু স্থানীয় বদমায়েশ দালাল বিভিন্ন লোকের কাছে ওই সরকারী জমি বিক্রী করার আশা দেখিয়ে আগাম টাকা নিচ্ছে। বাঞ্ছসখালি পাথরপ্রতিমা থেকেও নাকি দলে দলে ভবঘুরে লোক আসছে এখানে সস্তায় জমি কিনতে পাবে সে-আশায়। এমন কি কিছু কিছু লোক এসে জঙ্গল অবধি কেটে নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। তিনি ফরিদপুরের লোক। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ অর্থাৎ পার্টিশন হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি এখানে ওই নদীর পাকে ঘর বেঁধে আছেন। এখন জমিজমা নিয়ে এসব অনাচার তাকে চোখের সামনে দেখতে হচ্ছে বলেই তিনি আমাদের এসব কথা জানালেন।

আমি লোকটিকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একটু রহস্যের সুরে জিজ্ঞেসা করলাম—কেন, আপনাকে জমি দেয় নি?

কেমন একটু বিমূঢ়ভাবে ভদ্রলোক তাকালেন আমার দিকে তারপর হাত উল্টে বললেন—আমি জমি চাই না স্যার। আমার জমি আছে। পঁয়ত্রিশ বছর এখানে আছি, ওই পাতিবুনিয়া চর নিজে গজাতে দেখলাম আমি। কটা মানুষ ছিল তখন এখানে? তা সরকারী জমি নিয়ে এমন শয়তানি করতে আগে কখনো দেখি নি। আপনাদের বললাম যদি শয়তানির কোনো প্রতিকার হয় এই আশায়।

এ-কথায় অল্প একটু হেসে চুপ করে রইল লক্ষ্মণ। আবছা লাজুক একরকমের হাসি। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে—গত বছর পুজোয় মালিক গোটা জামা কিইন্যি দিয়িছিল বাবু ...তা সিই জামা... কথা শেষ না করেই চুপ করে যায় লক্ষ্মণ। যেন সে ভাবে আমি অন্তর্যামী, তার অসমাপ্ত বাক্য মনে মনে পূরণ করে নেবো আমি। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। কুয়াশার হিম শাদা পাখনা খুব ধীরগতিতে উড়ে আসে জলের উপর দিয়ে। কাঁচ করে একটা শব্দ তুলে পাতিবুনিয়ার খালে বাঁক নেয় নৌকোটা আর তখনি একবার অফুরন্ত আকাশ একবার অফুরন্ত জল, একবার ডাইনে দিগন্তবিস্তৃত ঝাপসা নীল রেখা, আর একবার বাঁয়ে পাতি-বুনিয়ার শাদা ধবধবে বালির চরার দিকে তাকিয়ে, এবং যেহেতু এখন এই কুয়াশায় চরা চরাচরে জলের নিচে মাছ এবং জলের উপরে জাগে শুধু একজন মানুষ সুতরাং তার কথা শুনবার মতো তৃতীয় প্রাণী আর কেউ কোথাও নেই—প্রায় স্থির এই সত্যে পৌঁছে গিয়ে খুব নিচু গলায় নামতা মন্ত্র পড়ার মতো বলে সে—আগের শীতের জন্য একটা জামা কিইন্যি দিবেন বাবু আমারে। খুব শীত পড়বে এ-বছর।

একটা বাটাং পাখি মাটির গর্তে কোথায় ডেকে উঠল টিটিটির টিটিটির শব্দে। আবার সব চুপচাপ। কুয়াশায় ইতিমধ্যে ঢেকে ফেলেছে প্রায় সবকিছু। আর কিছু দেখা যায় না সেই কুয়াশায়, শুধু এই নৌকো আর নৌকোর উপরে ওই লোকটা ছাড়া। মনে হয় যেন এই কথাটি শোনাতেই এই সমস্ত রাত জেগে ছিল ও আর এই শুনতেই আমি জ্যোৎস্নায়-পাওয়া মানুষের মতো উঠে-এসেছিলাম এই শান্ত রাতের আকাশের নিচে।

নেতা

কমল চক্রবর্তী

ঝোল ঝাল অম্বল খেয়েছিলেন দুপুরে
বিকালে কেক পেস্ট্রি কিছুটা সোমরস গেছে পেটে
তারপর নেমেছেন সভায়
যা খেয়েছিলেন তারই ঢেকুর চাউর করেন বাতাসে,
নীরেট বোকা শ্রোতাদের বোঝান ব্যক্তিবাদ
কোন্ জন স্বপদে না থাকলে দেশের সমূহ বিপদ।

তাই বলছিলাম ঐক্য চাই
নেতার পিছনে সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়ুন
ঘেরাও করবেন না, পিছে পিছে দাঁড়ান
দু-একটা পোড়া রুটি, উড়ো খই
ছুটে আসবে পিছনের দিকে।
নেতারা সহসত্রয়ু হোন। বক্তৃতা শুনছেন? আগে
বক্তার দাঁতগুলি নকল না আসল দেখে নিন।

নীল পাখী

শান্তি সিংহ

ভালোবাসা চৈত্র শেষে মহুয়ার ফুল
শালিখের মুখে-আনা কুটোকাটা খড়
অব্যর্থ বিশল্যকরণী
কিংবা আকন্দ শিকড়।

ভালোবাসা গ্রীষ্মের সকালে আনে
মেঘভেজা ছায়া
মাইল মাইল ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ প্রান্তরে
বট কিংবা শিরিষের মায়া।

নীল পাখি লেজঝোলা তীব্রতম সুখ
হাতে আসে, তবু বাড়ে মনের অসুখ।

তুমি আসবে বলে টাটানগর

পার্থসারথি রায়

কথা ছিল নীল খাম ইস্পাতনগরী থেকে, কবিতার বই,
দামী লাইটার; আরো যেন কি কি দেবে কথা ছিলো?
ভুলে গেছো টাটানগর? নাকি সব দুবের ব্যাপার।

আর বুঝি দেখাটেখা হবে না কখনো, চিঠিপত্রে সুখ,
ঘাসে পা ডুবিয়ে মখমল আরাম হবে না টাটানগর
আর কোনদিন, কিম্বা ফুটপাথ ধরে চুপচপ সন্ধেবেলায়;

আমাদের কতো পাত্র খালি পড়ে আছে, ইচ্ছার জল
সেভাবে থাকে না ঢালা গ্লাসেতে গ্লাসেতে, ভরে নিতে হয়
নিজেদের শ্রমে; এসো না টাটানগর একদিন সকালের ট্রেনে।

সাদা বঙ শাড়ী ভালবাসো; এতো অহংকারী তুমি, তাও বাখো
এক জাহাজ শীতলতা ও-চোখের হরিণী মায়ায়।
তুমি তো ভালোই জানো কি প্রতীকে হেসে ওঠে বুদ্ধক্ষুব্ধ মাঠ

তখন পরিধি ছিলো ছোটো; তাই তুমি বিদ্রূপভরে
ছুটে যেতে সমুদ্রের কাছে। আজ বোঝো, তৃষ্ণা মেটে কিসে?
তুমি আসবে বলে টাটানগর দাঁড়িয়ে আছি স্টেশনের ধারে।

খেলা

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

শিশুরা খেলা করে বুড়োরা দেখে যায়
বুড়োরা খেলা করে শিশুরা মজা পায়
শিশুরা খেলা করে বুড়োরা খেলা করে
খেলার মধ্যেই খেলাকে ভাঙে-গড়ে
এ-ওকে কামড়ায় এ-ওকে ভালোবাসে
সকলই চাতুরী, প্রিয়, চতুর সম্প্রদায়।

চিত্তরঞ্জন মাইতি

নগ-বিহঙ্গ

মেলার সকলে কিন্তু ছেলেটির জন্যে খুব দুঃখ জানাতে লাগল, তবে দেবতার কোপের কথা ভেবে কেউ সঞ্জোকে পুরস্কার দেবার কথা উচ্চারণ করল না।

তখন বাবা বললেন, লোকচের কথাকে লঙ্ঘন করে আমি আপনাদের বিশ্বাসে ঘা দিতে চাই না, তবে কাজটা ন্যায়সঙ্গত হল না। আমরা যখন তাকে ভিন দেশাং-এর মানুষ জেনেও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দিয়েছি তখন তার ন্যায্য প্রাপ্য তাকে দেওয়া উচিত ছিল।

অনেকে বাবার কথায় মাথা নেড়ে সায় দিল, কিন্তু পুরস্কারটা আর সঞ্জো পেল না।

এরপর মেলা ভাঙতে সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেল কিন্তু আমি কামরু প্রাসাদে সেই মুহূর্তে যেতে পারলাম না। আমি ওর ডেরা জানতাম। সন্ধ্যায় সেখানে গেলাম। ও আগুন জ্বালিয়ে একটা পাহাড়ী গুহায় হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিল। ওর পাশে দেখলাম ওরই সংগ্রহ করা সেই ফুলের ঝুড়ি।

আমাকে দেখে ও যেন বন থেকে বেরিয়ে আসা কোন অপদেবতার মুখোমুখি হয়েছে এমনি ভাব দেখাল।

আমি বললাম, আমার নাম মুনাল আর তোমার নাম আমি জানি। আজকের পুরস্কার তোমারই পাওয়া উচিত ছিল।

ও বলল, ঐ সামান্য কথাটা জানাতে এই সন্ধ্যায় তুমি বসন্তপা নদীর [illegible] পেরিয়ে এত পথ এসেছ।

বললাম, না, কথাটা সামান্য ছলে আসতাম না, কথাটাকে অসামান্য ভেবেছি বলেই এসেছি।

এর পর সেদিন দুজনে বসে বসে অনেক গল্প করেছিলাম। উঠে আসার সময়ে ও আমাকে ওর সংগ্রহের সব সেরা ফুলগুলিই দিয়ে দিয়েছিল।

প্রজ্ঞাদেবী বললেন, বুঝেছি, সেই থেকে দুজনের ঘনিষ্ঠতা।

মুনাল বলল, শুধু তাই নয়, আমি ওকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। ও বাবার কাছে পরের দিন এসেছিল। বাবা ওর সঙ্গে কথা বলে খুব খুশি হয়েছিলেন। একদিন একটা জরুরী কাজের ভার দিয়ে ওকে পাঙ্গীতে পাঠিয়েছিলেন। ও সরকারী রাস্তায় না গিয়ে পাহাড়ী ওম্ পথে ওর যন্ত্রের ওপর চড়ে কাজটা সেইদিনই শেষ করে সন্ধ্যার ভেতর বাবার কাছে ফিরে এসেছিল। বাবা শুধু আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, এ তল্লাটে সঞ্জোর মত বাহাদুর ছেলে আর একটিও নেই।

সঞ্জোকে বাবা কামরুতে রেখে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ও কোন বাঁধনের ভেতর নিজেকে বাঁধতে চায়নি।

রাণী প্রজ্ঞাদেবী এবার সোজাসুজি বললেন, তুমি কি সঞ্জোকে বিয়ে করতে চাও?

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে এক-সময় মুনাল বলল, তা সম্ভব নয় মহারাণী।

সম্ভব নয় কেন?

ও বেরু মহারাণী। বাবা জীবন থাকতে ওর হাতে আমাকে তুলে দিতে পারবেন না।

চিন্তার ছায়া ঘনাল রাণীর মুখে। একসময় বললেন, সঞ্জো অসভ্য, কিন্তু সে তো মানুষ। সুন্দর মন আর বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী সে। এর চেয়ে বড় পরিচয় মানুষের কি হতে পারে।

মুনাল বলল, সঞ্জো যেমন জেদী তেমনি আবার আত্মসম্মানবোধ তার। পুরস্কার সে পায়নি, কিন্তু প্রতিযোগিতার প্রতি বছর যোগ দিতেও সে ছাড়েনি। ওর সঙ্গে কামরু আর সাংলার ছেলেরা পারবে কেন? ধৌলাধার আর কিন্নর কৈলাশ ও চম্বা বেড়িয়েছে। ফুল লতাপাতা গাছপালা, গুহা-গহ্বর নদীনালা সবই ওর নখদর্পণে। বাবা ওকে প্রতিযোগিতার বাইরে বিশেষ পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, সমস্ত দেশাং-এর লোকের তাতে সমর্থনও ছিল কিন্তু, ও সে প্রস্তাব হাসিমুখে ফিরিয়ে দিয়েছে।

রাণী বললেন, আমি কি এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারি-মুনাল?

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি ভাবল মুনাল। একসময় মাথা নেড়ে বলল, না মহারাণী। রাজপরিবারের ওপর আমার বাবার যেমন শ্রদ্ধা তেমনি আকর্ষণ। আপনি যদি বাবাকে আমার হয়ে কোন অনুরোধ করেন তাহলে তা তিনি ফেলতে পারবেন না, কিন্তু মনে মনে দারুণ আঘাত পাবেন। আমি চাই না মহারাণী, আমার সুখের জন্যে বাবাকে আঘাত করতে।

প্রজ্ঞাদেবী বললেন, তাহলে সঞ্জোর ওপর তোমার আকর্ষণকে দিনে দিনে তীব্র হতে দেওয়া ঠিক নয়। ধীরে ধীরে তোমরা পরস্পর সরে যাও, নইলে দুঃখ পাবে।

মুনাল রাণীর মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে গভীর দৃষ্টি ফেলে বলল, সরে এলেই কি আকর্ষণ চলে যায় মহারানী? স্মৃতির আকর্ষণ কি তীব্র নয়।

কোন কথার উত্তর দিতে না পেরে স্থির হয়ে বসে রইলেন প্রজ্ঞাদেবী। নিজের অতীত জীবনের দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হচ্ছিল। বর্তমানের সুখের স্রোতে কি তিনি মুছে ফেলতে পেরেছেন তাঁর অতীত দিনের সব স্মৃতিকে। না, স্মৃতির চিহ্ন শিলা-লিপি, তা সহজে মুছে ফেলা যায় না।

রাণী মুনালের একখানা হাত নিজের দুটি হাতের পাতায় চেপে ধরে বসে রইলেন। দূরে উপত্যকা, নদী, বন, পর্বত চন্দ্রা-লোকের আবছায়ায় যেন হাজার হাজার বছরের দুঃখ-সুখের স্মৃতি মন্থন করে চলেছে।

।। ২ ।।

রাত হয়েছে, তবু একটিও দীপ জ্বলেনি কামরু প্রাসাদে। শুধু কামরু নয়, সারা সাংলা উপত্যকা অন্ধকারের কালো যবনিকায় ঢাকা। একটা আতঙ্ক সমস্ত কিন্নর-কিন্নরীদের স্তব্ধ রুদ্ধশ্বাস করে রেখে দিয়েছে।

কারছামে ফতেরাম গিয়েছিলেন রাজ-কোষের অর্থসংগ্রহের কাজে। সেখানে গিয়ে তিনি শুনলেন, পার্থীরা রামপুর বুশে-হারের দিকে না গিয়ে কামরু লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

গুর্খারা রাজা উগর সিং-এর চোখে একরকম ধুলো দিয়েই এগিয়ে আসছে। দূর থেকে গুর্খাদের আসার খবর পেয়েছিলেন উগর সিং। প্রস্তুতও হচ্ছিলেন শত্রুর সঙ্গে পাল্লা লড়বার জন্যে, কিন্তু গুর্খাদের কিছু সৈন্য দিনের আলোয় পশ্চাদপসরণের ভান করলে রাজা উগর সিং-এর সৈন্যরা তাদের তাড়া করে নিয়ে যায়। এই উন্মাদনার ভেতর রাতের অন্ধকারে গুর্খাদের মূল বাহিনী কিন্নরের দিকে ঢুকে আসে। তারা গোপন সংবাদ নিয়ে জেনেছিল, রামপুর বুশেহারের রাণী এখন রয়েছেন কামরু প্রাসাদে। আর রামপুর রাজের দ্বিতীয় কোষাগার এই কামরুতেই। সুতরাং একবার কামরু পৌঁছতে পারলে দুটি কাজ সিদ্ধ হবে। প্রায় বিনা যুদ্ধে কামরু অধিকার করে রাজকোষের সঞ্চিত রত্ন হস্তগত করা যাবে, আর রাজা উগর সিং-এর রানীকে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে বুশেহারের রাজা অতি সত্বর সন্ধির প্রস্তাব না পাঠিয়ে পারবেন না।

ফতেরামের পক্ষে গুর্খাদের মনোভাব জানা সম্ভব ছিল না। তবে কারছামে এসে যখন তিনি শুনলেন গুর্খা বাহিনী তাপ্রি অবধি নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে তখন তিনি স্থানীয় পাহাড়ীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। এদিকে বিশ্বস্ত একটি লোকের মুখে বিপদের খবরটি পাঠিয়ে দিলেন কামরু প্রাসাদের কেল্লাদারের কাছে।

সারা সাংলা উপত্যকার মুহূর্তে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। কামরুর কেল্লা থেকে বিপদসূচক ঢোল, কর্নাল, রণসিঙ্গার শব্দ ঘন ঘন শোনা যেতে লাগল। পাহাড়ে পাহাড়ে উঠল তার ভয়াবহ প্রতিধ্বনি।

বিহ্বল রাণী প্রজ্ঞাদেবী। মুনালের মুখে ভাষা নেই। শুধু প্রাসাদরক্ষীরা কামরু পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় শিলাখণ্ড জড়ো করতে লাগল। তাদের নিঃশব্দ সঞ্চরণের ছবি দেখা যেতে লাগল রাণীমহল থেকে।

পরদিন ধৌলাধার আর কিন্নর কৈলাশের চূড়ার দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠল মুনালের বুক। সাদা তুষার চূড়ায় প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে। আলো নয় যেন রক্তের প্রবাহ। মুনাল এসে জড়িয়ে ধরল রাণী প্রজ্ঞাদেবীকে।

সারা রাত্রি নিদ্রাহীন কেটেছে প্রাসাদের প্রতিটি মানুষের। ভোরে দেখা গেল পরিচারিকাদের অনেকেই অনুপস্থিত। তারা শেষ রাতের স্বল্প জ্যোৎস্নায় পা ঢাকা দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেছে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী রাস্তা ধরে স্রোতের মত চলতে লাগল জনপ্রবাহ। ভীত ত্রস্ত পাহাড়ীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে ঘরবাড়ী ফেলে চিটকুলের দিকে। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল চিটকুল। সেদিকে শত্রুসৈন্যের অকারণ অভিযানের সম্ভাবনা নেই। সাংলা-বাসীর শেষ আশ্রয়। দ্বিপ্রহরের দিকে কোন মানুষের মুখ আর কোথাও দেখা গেল না।

সঞ্জো কখন দুঃখসংবাদ পেয়ে নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। যোগ দিয়েছে কেল্লার রক্ষীদের সঙ্গে। সারারাত পাথর সাজিয়েছে পরিকল্পনামত। তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর নতুন নতুন পরিকল্পনার ক্ষমতা দেখে কেল্লার প্রধান রক্ষী প্রতিটি বিষয়ে তার পরামর্শ নিতে আরম্ভ করেছে।

একসময় সঞ্জো এসে দাঁড়াল রাণী-মহলের সামনে। টোগাং থেকে তাকে দেখতে পেয়ে পঞ্চতল প্রাঙ্গণ সিঁড়ি বেয়ে মুনাল নেমে এল স্রোতের মত। ইসারায় তাকে ডেকে নিয়ে গেল অন্দরমহলের নিভৃতে।

দুজনের কথা হল। কেল্লা রক্ষার নানা পরিকল্পনার কথা। সঞ্জো সাহস দিয়ে বলল, যতক্ষণ সঞ্জোর দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ সে কেল্লা রক্ষা করবে মুনাল।

মুনাল বলল, আমি নিজের জন্যে ভাবি না সঞ্জো। তেমন বুঝলে কেল্লার তলায় অন্ধকূপে ঝাঁপ দিয়ে আমি সব জ্বালা জুড়াব। কিন্তু আমার ভাবনা মহারাণীকে ঘিরে। তাঁর সম্মান কি করে রাখতে পারি সেই চেষ্টাই আমাদের করে যেতে হবে।

সঞ্জো বলল, তুমি জান মুনাল, সে ভাবনা শুধু তোমার নয়, আমারও। এখন পরিস্থিতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে আমাদের চলতে হবে। সামান্য উত্তেজনাও মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। স্থির বুদ্ধিতে কেল্লা রক্ষার জন্যে শেষ চেষ্টা করে যাব আমরা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় নিদারুণ খবর এল কামরু প্রাসাদে। কারছামের অতি দুর্বল প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে গুর্খা সৈন্যের দল। যারা প্রতিরোধ রচনা করে দাঁড়িয়েছিল তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উজীর ফতেরাম পুরোভাগে থেকে পাহাড়ী-দের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। তিনি সবার আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর শেষ অনুরোধ ছিল, তিনি নিহত হলে খবরটা যেন পৌঁছে দেওয়া হয় কামরু প্রাসাদে তাঁর একমাত্র মেয়ের কাছে। আর মেয়েকে যেন বলা হয় শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মহারাণীর সম্মান রক্ষা করতে।

মুনালের চোখে জল নেই। পাশে দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে সঞ্জো। তেমনি নিবন্ধ অন্ধকার রাত্রি। অদূরে সাংলা উপ-ত্যকার কোন কিম্ থেকেই একবিন্দু আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে না।

মুনাল একসময় কথা বলল। ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর, সঞ্জো, আমার বাবা বীরের সদ্গতি লাভ করেছেন। তাঁর আত্মার সন্তোষের জন্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। তিনি কথা দিয়েছিলেন মহারাণীকে বুশেহারাতে পৌঁছে দিয়ে আসবেন বলে, কিন্তু তাঁর সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারলেন না। এখন মহারাণীর সম্মান রক্ষার ভার আমাদের ওপর এসে পড়েছে। তাঁর শান্তির ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

সঞ্জো বলল, আমাকে নির্জনে একটু ভাবতে দাও মুনাল। তুমি শুধু আমার পাশে থেকে প্রেরণা দাও। নিশ্চয় আমরা আমাদের কাজে সফল হতে পারব।

কামরু অবরুদ্ধ হয়ে আছে। ভারত-তিব্বত পথে একটি মক্ষিকারও আসা-যাওয়ার উপায় নেই। গুর্খা সৈন্যাধ্যক্ষ কামরু কেল্লায় দূত পাঠিয়েছিল। দূতের মুখে শোনা গেল, অকারণ রক্তপাতে অভি-রুচি নেই তাদের। শুধু রাজকোষের রত্ন আর মহারাণীকে পেলেই তারা কিন্নর ছেড়ে চলে যাবে। মহারাণীর কোন অসম্মান তারা করতে চায় না, কেবল উগর সিং-এর আত্মসমর্পণের জন্য রাণীকে তারা বন্দী করে রাখতে চায়।

সঞ্জো এ পক্ষের দূত হয়ে গেল গুর্খা সেনাপতির কাছে। সে বলল, আমাদের কেল্লাদার অত্যন্ত বিবেচক মানুষ। তিনিও অকারণ লোকক্ষয় চান না। রাজকোষের সমস্ত রত্ন বোঝাই পেটিকা গুর্খা বাহকেরা এসে নিয়ে যেতে পারে। তবে সব পেটিকাই তালা বন্ধ হয়ে আছে। তালার চাবি বুশেহারের রাজগৃহে রক্ষিত। আর মহা-রাণীকেও নিয়ে যেতে পারে, যদি তাতে লোকক্ষয় নিবারণ সম্ভব হয়।

সঞ্জোর কথা শুনে সেনাপতি-শিবিরে উল্লাস পড়ে গেল। রত্নপেটিকাগুলি পেলে দেশে নিয়ে গিয়ে তালাগুলো ভেঙ্গে ফেলা কোন শক্ত ব্যাপারই নয়। আর তাছাড়া তাদের রাজার কাছে বুশেহার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন মহারাণীকে তাঁরা উপহার দিতে পারবে। তখন বিনা যুদ্ধে বুশেহারের রাজা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু গুর্খা সেনাপতির কাছে কর-জোড়ে একটি প্রার্থনা জানাল সঞ্জো, মহারাণী প্রজ্ঞাদেবী এক মাস ধরে ব্রত অনুষ্ঠান করছেন। আজ কৃষ্ণা নবমী তিথি। সামনের অমাবস্যায় 'বিগ দিওয়ালি' উৎসব। মহারাণী ঐ দিনটিতেই ব্রত উদ্‌যাপন করে যাত্রা করতে চান। এই কটি দিন তাঁকে কামরু প্রাসাদে অবস্থিতির অনুমতি দিতে হবে।

অবশ্য প্রতিদিন মেষপালক পালসেরা প্রয়োজন মত ভেড়ার জোগান দেবে সৈনাদের। এ ব্যবস্থা চলবে কিন্নরের সীমা-রেখা অতিক্রম করে সৈন্যদের চলে না যাওয়া পর্যন্ত। পালসেরা ভেড়ার পাল নিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। এ শুধু বিজয়ীর প্রতি সম্মান দেখানর জন্য।

সম্মত হল গুর্খা সেনাপতি। দুর্গম পথ অতিক্রমে ক্লান্ত অবসন্ন সৈন্যের বিশ্রামের কিছু সুযোগ পেলে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহ লাভ করবে।

গুর্খা শিবির থেকে ফিরে এল সঞ্জো। এখন তার ওপরই কেল্লা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সঞ্জোর সব কিছু পরিকল্পনাই চূড়ান্ত। মুনালের পরামর্শে রাণী প্রজ্ঞাদেবী ঘোষণা করে এ ভার অর্পণ করেছেন সঞ্জোর ওপর।

রাতে আবার পরামর্শে বসল মুনাল

আর সঙ্গে। গভীর রাত অবধি দুজনে স্থির চিন্তায় সবকিছু পরিকল্পনা তৈরী করল।

পরদিন প্রাতরাশ সেরে ধৌলাধার আর কামরু পাহাড়ের মাঝে ভাঙা চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে আছে সাংলা উপত্যকা। চাঁদের অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোয় চরাচর রহস্যময়। বাসপা নদীর তীরে গুর্খা সৈন্যদের সারি সারি শিবির কৃষ্ণ ভল্লুকের মত দাঁড়িয়ে আছে। দু-এক টুকরো তাঁবুর শিখা রহস্যময় অন্ধকার ভেদ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে নিশাচর কোন হিংস্র হায়নার চোখ।

রাণীমহলের প্রধান দরজায় কে যেন আঘাত করল। ভেতর থেকে দরজা খুলে গেল। মৃনালের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সব তৈরী।

একটি মেষপালক যুবক ঢুকে গেল রাণীমহলের অভ্যন্তরে। রাণী প্রজ্ঞাদেবী প্রস্তুত ছিলেন। ক্ষীণ দীপ বর্তিকা জ্বলছিল গৃহকোণে। রাণী প্রজ্ঞাদেবীকে চেনা যাচ্ছিল না। পালস রমণীর ম্লান জীর্ণ পোশাক তাঁর পরিধানে। মৃনাল তাঁর পাদস্পর্শ করামাত্রই তিনি তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন। কিছু পরে পালস যুবকটিকে অনুসরণ করে রাণী-মহলের পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে এসে নামলেন বন্ধুর পার্বত্যভূমিতে। সামনে একটি কনকচাঁপার গাছ। তার শক্ত ডালে পাহাড়ী ঘুন্টু বাঁধা ছিল। রাণী সেই ঘুন্টে আরোহণ করলেন। পালস যুবকটি লাগাম ধরে রাণীকে তরঙ্গিত পাহাড় অতিক্রম করে নিয়ে চলল।

সামনেই সাংলা উপত্যকার সেই চোমোলিং। ঐ চোমোলিং-এর পাশের ওম পথ ধরে নামলে বাসপা নদীর সেতু পর্যন্ত সবার দৃষ্টির আড়ালে নির্বাঞ্ঝাটে নেমে যাওয়া সম্ভব।

ঘুন্টু এসে দাঁড়াল চোমোলিং-এর সামনে। রাণীর মনে বিদ্যুৎ ঝলকের মত দুটি ছবি জেগে উঠল। যেদিন মায়ের হাত ধরে তিনি শিশুটিকে হারিয়ে এখানে শান্তি পেতে এসেছিলেন, আর যেদিনটিতে যুবরাজ উগর সিং তাঁর হাত ধরে এখান থেকে কামরু প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ রাণী দেখলেন, পালস যুবকটি কৃষ্ণনীল তলার ভূমি স্পর্শ করে মাথায় ঠেকাল। রাণী তার দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে যুবকটি মৃদু গলায় বলল, এখানে একদিন আশ্রম ছিল। জননীরা ছিলেন। এ ভূমি বড় পবিত্র, মহারাণী। এখানে প্রণাম করে গেলে সব বিঘ্ন কেটে যাবে। আমরা যখন ভেড়ার পাল নিয়ে দুর্গম পাহাড়ে উঠি তখন দূর থেকে এই চোমোলিং-এর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাই।

রাণী প্রজ্ঞাদেবী বললেন, এখানে শ্রমণীরা বুদ্ধ তথাগতের বাণী স্মরণ করতেন, তাই এ স্থান পবিত্র।

বাসপা নদীর কাঠের সেতু অতিক্রম করে ওরা এসে পৌঁছল মূল ধৌলাধারের পাদদেশে। এখানে কেলমং গাছের নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করল পাহাড়ী ঘুন্টু। প্রজ্ঞাদেবীর সমস্ত চিহ্ন মুছে গেল কামরু প্রাসাদ আর সাংলা উপত্যকা থেকে।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার অনেক আগেই ওরা এসে পৌঁছল পাহাড়ের কোলে এক চিলতে সমতলভূমির সামনে। কাঠ জ্বলছে। চিড় চিড় শব্দ উঠছে তার থেকে। আগুনের চারদিকে ঘিরে শুয়ে বসে আছে প্রকদল পালস নারী-পুরুষ। পাল পাল ভেড়া পেঁজা তুলোর মত পড়ে আছে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে।

ওদের দেখে হৈ-হৈ করে সবাই উঠে পড়ল। পালস যুবকটি ওদের সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলল। ওরা সকলে নত হয়ে নমস্কার করল মহারাণীকে। একটি বৃদ্ধা পালস রমণী এগিয়ে এসে যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। তারপর প্রজ্ঞা-দেবীর কাছে এগিয়ে এসে বলল, আগের

"প্রথম মিয়-মিলন অভিলাষী
কতই কথা কত যে রাশি রাশি-
কিন্তু এই কলি...!"

ভোকাসিল
সবসময়ে কাছে রাখুন
কাশি-গলাব্যথা থেকে-নিমেষে
আরাম পাওয়ার জন্যে
ছ'টি প্রয়োজনীয় উপাদানে
তৈরী সবুজ, চারকোনা বড়ি।

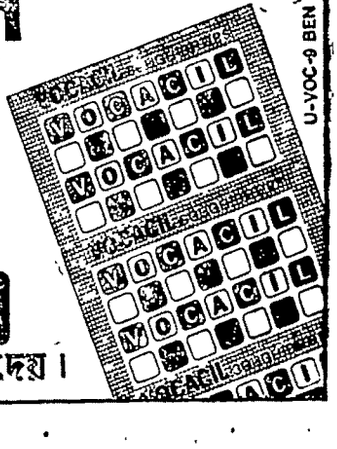

ভো কা সি ল
স্বাদও ভাল, আরামও দেয়।

খেলায় কখনো সাজতে হয় মহারাণী কখনো বা পালস রমণী।

যুবকটি জোর গলায় এবার বলল, সব ঠিক আছে ?

একসঙ্গে অনেকগুলো গলা বেজে উঠল, সব ঠিক।

তাহলে আর দেরি নয়, নেমে যাও উপত্যকায়।

এবার সবাই মিলে ভেড়া তাড়ান খচ্ উঁচিয়ে মুখে সিসবং দিতে দিতে সালং-এর পাল নিয়ে নেমে চলল সাংলা উপত্যকার দিকে।

কিন্নরের পথ অতি দুর্গম। দু শ্রেণীর পর্বতের কোল ঘেঁষে এইসব ভাঙা-চোরা পথ দূর-দূরান্তে চলে গেছে। আদিম প্রস্তর নির্মিত পর্বত দৈত্যপুরীর সুউচ্চ প্রাসাদের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে আদি যুগের প্রচন্ড তাপের চিত্র-লেখা। এই সব পর্বতের রূপ ভয়ংকর কিন্তু এগুলি সহসা পথচারীর ওপর স্খালিত হয়ে পড়ে না। দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর পর্বতদেহ অত্যন্ত ভঙ্গুর ও বিপজ্জনক। হাজার হাজার বছর আগে এক-সময় হিমবাহ নেমে আসছিল এই পথে। তার দেহ সংলগ্ন মৃত্তিকাস্তূপ ও বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড দুই পার্শ্বে সঞ্চিত হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করেছে। মাঝখানে বয়ে চলেছে খরস্রোতা বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত নদী শতদ্রু।

কোন সময় যখন খরবেগে বায়ুপ্রবাহ চলতে থাকে তখন ঐসব মৃত্তিকা সৃষ্ট পাহাড়ের বন্ধুর পথে বায়ু প্রবেশ করে চূর্ণ ধূলিকণা ঝরিয়ে দিতে থাকে। ঐ ধূলিতে এক এক সময় মেঘের মত অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠে। চূর্ণ ধূলির রাশি ঝরে পড়া মাত্র তার গায়ে সংলগ্ন বিরাট বিরাট শিলাখণ্ড নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকে। শিলার সঙ্গে শিলার আঘাতে অজস্র শিলা-খণ্ড স্থানচ্যুত হয়ে বৃষ্টিধারার মত নেমে আসে। তখন তাদের সেই পতন পথে কোন কিছু এসে পড়লে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শত-দ্রুত গভীর তলদেশে পাক খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে যায়। পথ-ঘাটের আর কোন চিহ্ন থাকে না। স্তূপাকার শিলাখণ্ডে পাহাড় সৃষ্টি হয়ে যায়। আবার বহু দিনের চেষ্টায় শিলাস্তূপ সরিয়ে পথের চিহ্ন খুঁজে বের করতে হয়। কেবল বাতাস নয়, যদি কোন প্রাণীর চলাচলের ফলে ঐ পাহাড়ের ধূলিরাশি ঝরে পড়ে তাহলেও অনুরূপ ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে।

অতি সাবধানে এই সব পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে চলতে লাগল রাণী প্রজ্ঞা-দেবী ঘুন্টু। সামান্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেলে চলল পালস যুবটি।

মধ্যাহ্নে পাহাড়ের ওপর গাছের তলায় বসল দুজনে। পোটলা খুলে আহার্য দ্রব্য মুনালটির হাতে তুলে দিতে গিয়ে রাণী চমকে উঠলেন। পালসের বেশে এত পথ তার সঙ্গে চলেছে কে। এতক্ষণ তাকে চিনতেই পারেননি মহারাণী।

তুমি সঞ্জো না ?

হাঁ মহারাণী, আমি পালস। আমার নাম সঞ্জো।

তোমাকে আমি একেবারেই চিনতে পারিনি সঞ্জো। কিন্তু দুর্গবিক্ষার ভার তুমি বার হাতে দিয়ে এলে ?

স্বয়ং বদরীনাথের হাতে।

আমি এমন জানলে মুনালকে ছেড়ে আসতাম না সঞ্জো। বদরীনাথ তাকে রক্ষা করুন।

আপনার অশেষ করুণা মহারাণী। মুনাল আপনার ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে। তার সৌভাগ্যের জন্যে ঈর্ষা হয়।

প্রজ্ঞাদেবী বললেন, তুমি নিতান্তই পরোপকারী। তাই তুমি সকলের ভালবাসা না চাইতেই পেয়ে যাবে।

ঈশ্বর আমাকে স্নেহ-ভালবাসা ভোগের ভাগ্য দেননি মহারাণী।

এ তোমার অভিমানের কথা সঞ্জো। তুমি জান না, তুমি সবার কতখানি প্রিয়।

মহারাণী ভাবলেন, অন্তরের ঘরে জন্ম বলে সঞ্জো গভীর অভিমানে কথাগুলি উচ্চারণ করছে। আর তাছাড়া মুনালকে ভালবেসেও না পাওয়ার দুঃখ রয়েছে ওর তরুণ হৃদয় জুড়ে।

মহারাণী এই অভিমানী ছেলেটির হাত ধরে খাবার পরিবেশন করলেন।

রাণীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত সঞ্জো খাবারগুলি খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে পাশের ঝর্ণা থেকে মহারাণীর জন্যে নির্দিষ্ট পাত্রে জল নিয়ে এল। সঞ্জোর অঞ্জলিবদ্ধ হাতে প্রজ্ঞাদেবী সেই জল ঢেলে দিলে সে গভীর তৃষ্ণার্তের মত তা পান করল।

রাণী আহার শেষ করে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে লাগলেন। সঞ্জো অদূরে বোঁচকা বাঁধা ঘুন্টুর পরিচর্যায় লেগে গেল।

আবার পথ চলা। এখনও সামনে অনেক পথ চলতে হবে। দুরন্ত কমাবার জন্য পালসদের দুর্গম পরিচিত পথই বেছে নিয়েছে সঞ্জো। পাহাড়ী পথ অতিক্রমের ক্ষেত্রে ঘুন্টুর মত নির্ভরযোগ্য প্রাণী আর নেই। সঞ্জো চলেছে সামনে হেঁটে অবলীলায় চড়াই উৎরাই ভেঙে।

রাত নামল, কক্ষা দশমীর রাত। দূর পাহাড়ের কোলে মাঝে মাঝে আগুনের শিখা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কোন পাহাড়ী দেশাং-এ রাতের আগুন জ্বলছে।

সেদিনের মত যাত্রা থামায় সঞ্জো। সব পথ তার পরিচিত। সকল পাহাড়ের সন্ধি-সন্ধি তার জানা।

গুহার ভেতর খোকম্ পাতা হল। শয্যা করে রাণীকে তার ওপর বসাল সঞ্জো। চকমকি জ্বেলে পথ থেকে সংগ্রহ করে আনা ডালপাতায় আগুন ধরিয়ে গুহার ভেতরটা গরম করে তোলা হল। গুহার মুখে বসে রইল সঞ্জো।

ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। কোলা থেকে কুয়েকুটা সেব বের করে তাই খেল দুজনে। ঘোড়ায় চড়ে পথ চলার অভ্যেস নেই রাণীর, তাই সারা দেহ ব্যথায় কাতর। থোকমে পা এলিয়ে দিতে না দিতেই ঘুম এসে গেল। গুহা মুখের আগুন বহু রাত অবধি ধিক্-ধিক করে জ্বলতে লাগল। পাথরে হেলান দিয়ে বসে রইল সঞ্জো। মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠা আগুনের আভায় দেখতে লাগল ঘুমন্ত রাণীর মুখ।

ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সঞ্জো। আগুন নিভে গেছে কখন। বরফের পাহাড় থেকে কে যেন ছুঁড়ে মারছে হাওয়ার ছুরি। শন শন শব্দে সে ছুরি ছুটে এসে বিঁধে দিয়ে যাচ্ছে হাড় পাঁজর।

ঘুম ভাঙল। রাণী গুহার ভেতর জেগে বসে দেখলেন, বাইরে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে সঞ্জো। ঘুমে একেবারে অচেতন। রাণীর অন্তরের গভীর থেকে উঠে এল একটা স্নেহের তরঙ্গ। এই নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ ছেলেটিকে সেই তরঙ্গে প্লাবিত করে দিতে ইচ্ছে হল।

রাণী নিজের গায়ের মূল্যবান ছাল্‌লি খানা আস্তে আস্তে টেনে দিয়ে দিলেন পালস ছেলেটির গায়ে।

ভোর হতেই ঘুম ভেঙে গেল সঞ্জোর। উঠে বসতেই গায়ের থেকে খসে পড়ল রাণীর দেওয়া ছাল্‌লিখানা। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইল রাণীর মুখের দিকে। পোটলার ভেতর থেকে সে নিজের হাতে বের করে দিয়েছে মহারাণীর মূল্যবান এই গায়ের কাপড়খানা। কি করে এ বস্তু এল তার গায়ে। সে ঘুমের ঘোরে শীতের তাড়ায় ভুল করে টেনে নেয়নি তো রাণীর এই ছাল্‌লিখানা। সংকোচে লজ্জায় সে গায়ের কাপড়খানা কুড়িয়ে ঝেড়ে নিয়ে সযত্নে পাট করে রাণীর দিকে এগিয়ে ধরল।

রাণীর চোখে সঞ্জোর সংকোচের ছবিটা এড়াল না। তিনি বললেন, সারা রাত বাইরে শীতের ভেতর পড়ে রইলে সঞ্জো, তাই ভোর রাতে এটা তোমার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলাম।

রাণীর কথা শুনে সঞ্জো বলল, এ দুনিয়ায় সব থেকে বড় উত্তাপ হল মায়ের বুকের কাছের উত্তাপ। সে উত্তাপ নেবার ভাগ্য যখন আমার নেই তখন মূল্যবান ছাল্‌লিতে আমার কতটুকু শীত ঘুচবে।

রাণী প্রজ্ঞাদেবী বুঝলেন এখনও সঞ্জোর অভিমান যায় নি। মুনালের ওপর তাঁর যে ভালবাসা, তারই অংশ সে পেতে চায়।

অভিমানী অন্তরে ছেলেটির দিকে চেয়ে প্রজ্ঞাদেবী বললেন, মুনাল আর তোমার ভেতর কোন তফাৎ নেই সঞ্জো। মুনালের মত তুমিও আমার সন্তান।

কথাটা শুনে আবেগে বাকরুদ্ধ কেঁপে উঠল সঞ্জোর। সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে মহারাণীর চরণ স্পর্শ করল।

পরদিন আবার যাত্রা। কারছামের সেতু পার হয়ে উঠল এবার ওপারের পাহাড়ে।

যদি আপনার বাচ্চা কেবলই উল্টে-পাল্টে অসুখে ভোগে, তাহলে আপনার উচিৎ এই বিজ্ঞাপনটি খুঁটিয়ে পড়া, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জল-বাহিত দূষিত রোগের হাত থেকে কিভাবে আপনার বাচ্চাকে রক্ষা করবেন!

বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের বাপ-মা হিসেবে আপনাদের মনে সবচেয়ে আগে এই প্রশ্নই জাগবে, "পানীয় জলে এই দূষিত রোগ সংক্রমণ কি করে সম্ভব?" পানীয় জল ভাল করে ফুটিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও সেই জল খেয়ে বাচ্চার কি করে অসুখ হতে পারে? হ্যাঁ, তা কিন্তু হতে পারে! কথাটা অসম্ভব মনে হলেও, এটাই কিন্তু খাঁটি সত্যকথা! একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, ১৯৭৭ সালের ৪ঠা মে তারিখে টাইমস অফ ইণ্ডিয়া'র দৈনিক সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের সংক্ষিপ্ত খবরটি জানাচ্ছি,

"জল-বাহিত রোগ সংক্রমণের ফলে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ঠিক যে কত যদিও তা জানানো সম্ভব নয় তবে, প্রকৃত ঘটনা এই যে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা যদিও মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ, কিন্তু প্রতি বছরে শিশু মৃত্যুর হার মোট মৃত্যুহারের শতকরা ৪০ ভাগ।"

আপনি জানেন কি? আপনার বাচ্চারা সবসময়ে জল-বাহিত রোগের শিকার!

এটা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রমাণিত যে পানীয় জল ফোটানো সম্পূর্ণ নিরাপদ পদ্ধতি নয়

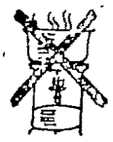

আজ এটাই প্রমাণিত যে পানীয় জল ফুটিয়ে নেওয়াই সম্পূর্ণ নিরাপদ পদ্ধতি নয়। জল ফোটালে জীবাণুগুলি মরে যায় ঠিকই, কিন্তু জল সম্পূর্ণ নির্বীজ হয় না। আপনার এমন একটা কিছু দরকার যা এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করে। ফোটানো জলের তলানিতে যে পলি জমে থাকে তার সঙ্গে রোগ জীবাণুগুলি মিশে থাকে। তাই এমনকি, ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে (যে তাপে জল ফুটতে থাকে) জল ফোটালেও সত্যিকারের কোনও কার্যকরী জল পাওয়া যায় না। জল ফোটানোর কয়েক ঘণ্টা পরে যখন জল ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন এই রোগ জীবাণুগুলি কার্যকরী হয়ে ঐ ফোটানো জল আবার দূষিত করতে থাকে।

এই সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই আছে!

দুশ্চিন্তা করবেন না! সমস্যাটা যতই জটিল, সমাধানটা ঠিক ততই সরল। সারাদেশে অভিজ্ঞ বাপ-মায়েরা কিন্তু পিউরিটাস ওয়াটার ফিল্টার ব্যবহার করেন। সঙ্গে যে ওয়া ফিল্টারের চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছেন যে, ফিল্টারের ডেটরের অংশে ২টি ভাগে ফিচক্স ও চারদিকে একটি চীনামাটির নল (কোয়েল) ও একটি কল আছে। ফিল্টারের ওপরে অংশে জল ভর্তি করলে নলের মধ্যে দিয়ে জল পরিষ্কারভাবে ফোঁটা ফোঁটা অল্পটি ফিল্টারের নীচের অংশে জমা হতে থাকে।

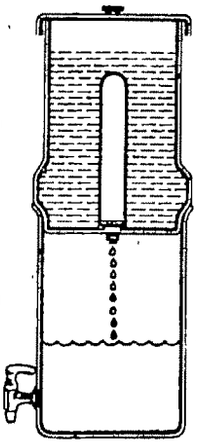

এই ক্যাণ্ডেলের গোপন ইতিহাস

পিউরিটাস ক্যাণ্ডেলের অন্তর্নিহিত গোপন ইতিহাসটি এই যে, এই ধরণের ক্যাণ্ডেল তারাই এই সর্বপ্রথম। প্রত্যেকটি পিউরিটাস ক্যাণ্ডেল ল্যাবরেটরিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা আর এগুলি প্রশাসন প্রধান পৌরপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত। এই ক্যাণ্ডেলগুলি এক বিশেষ ধরণের মাটি দিয়ে তৈরী যার নাম 'কিসেলগুড'। এতে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র আছে যার ফলে জল পরিষ্কার করে ঠাকবার জন্যে এই একটি আদর্শ উপাদান। সহজ কথাতে কি এই মলের সাহায্যে সবরকম রোগজীবাণু ও বীজাণু পরিষ্কার করে ছেঁকে বার করে দেয়া যায় বার ফলে, ফিল্টারের নীচের অংশে আপনি পাবেন ১০০% ভাগ বিশুদ্ধ, নির্মল পানীয় জল।

পিউরিটাসের সাহায্যে ১০০% ভাগ বিশুদ্ধ পানীয় জল পাচ্ছেন তার প্রমাণ কি?

প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। সারাদেশে আমাদের যে কোনও অফিসে আমরা অনুরোধ করছি, কারণ সেখানে আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারবেন ল্যাবরেটরির আসল টেস্ট রিপোর্টের ফটোস্ট্যাট কপি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের অফিসে এসে আসল রিপোর্টও পরীক্ষা করতে পারেন — যে রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে যে পিউরিটাস ওয়াটার ফিল্টারে সবরকম রোগজীবাণু ও বীজাণু সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়। যার ফলে আপনি পাচ্ছেন ১০০% ভাগ রোগজীবাণু ও বীজাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল যা আপনার ও আপনার পরিবারের বাড়ন্ত ছেলেমেয়ের জন্য ১০০% ভাগ নিরাপদ।

মাটির কলসী থেকে সাবধান!

আপনার যেকোনও বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করুন, তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন। মাটির হাঁড়ি বা কলসীতে রাখা ফোটানো জল পরীক্ষার পক্ষে বিপদজনক। মাটির হাঁড়ি বা কলসীর অসংখ্য রন্ধ্র থেকে লক্ষ লক্ষ রোগজীবাণুর সৃষ্টি হয়। এমনকি, ফুটিকের মত পরিষ্কার নির্মল জল মাটির পাত্রে রেখে পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাতে অসংখ্য রোগজীবাণু আছে যার ফলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশা, পেটিস, হুপিং কাশি ও অন্যান্য আরও সাংঘাতিক মারাত্মক রোগ হয়।

সাবধান!

আপনার পরিবারের নিরাপত্তার জন্যে আসল পিউরিটাস ওয়াটার ফিল্টার কিনুন।
ফিল্টারের ওপরের অংশে পিউরিটাস লেবেলটি ভাল করে পরীক্ষা করুন।
ক্যাণ্ডেলের মেটাল বেস-এ পিউরিটাস নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৯৮৪০১ আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখে নিন।

আপনার প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের যত্ন করুন।

বালসারা
পিউরিটাস
বালসারা
স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার আধুনিক সহায়ক

BALSARA বালসারা আণ্ড কোম্পানী (প্রা:) লি.
৪৩, বাঁধনদাস মাঙ্কার রোড, পোর্ট, বোম্বাই ৪০০ ০২৩

CHAITRA-ELS-138 BEN

কারছাম দেশাং-এর কেউ রাণী প্রজ্ঞাদেবীকে সন্দেহ করল না। গুর্খা সেনাপতি কারছামের প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে কামরুর দিকে চলে যাবার সময় একটি পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। সন্দেহজনক কোন লোক দেখলেই তারা জিজ্ঞাসাবাদ করত। কিন্তু ছেলে তার মাকে ঘুন্টে বসিয়ে লাগাম টেনে পাহাড়ের ওপর উঠছে দেখে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। আর তাছাড়া ওরা জাতিতে সহজ সরল পালস। নইলে লোক চলাচলের পথ ছেড়ে ওরা পালসদের পাথে চলা দুর্গম পাহাড়ী পথটাই বা বেছে নেবে কেন।

তাপ্রিতে এসে পৌঁছল ওরা অপরাহ্নে। উঁচু পাহাড়ের মাথায় একটা পরিত্যক্ত বাড়ি। তার সামনে ডালপাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে একটা কেলুগাছ। ওরা আশ্রয় নিল সেই কাঠের পরিত্যক্ত কিমের মধ্যে।

তাপ্রির পাহাড়ী বাজার থেকে সঞ্জো সওদা করে আনল। আগুন জ্বলল উনুনে। সে রান্নার আয়োজন করতে যাচ্ছিল, রাণী প্রজ্ঞাদেবী তাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, এ কাজ তোমার নয় সঞ্জো।

সঞ্জো বলল, কোন কাজই আমার অজানা নয় মহারাণী।

তা হোক, ঐটুকু কাজ আমাকেই করতে দাও।

আপনি কি নিজের হাতে রাজবাড়িতে খাবার তৈরী করেন মহারাণী?

প্রজ্ঞাদেবী বললেন, না তা করি না ঠিক কিন্তু এ কাজ আমার অজানা নয়। আমি যখন শ্রমণী ছিলাম তখন নিজের হাতেই প্রতিদিন রান্না করতে হত।

আপনি কি সাংলার চোমোলিং-এ শ্রমণী-জীবন যাপন করতেন?

তুমি কি মুনালের কাছ থেকে এ খবর জেনেছ?

সঞ্জো মাথা নেড়ে জানাল, মহারাণীর অনুমান ঠিক নয়। বলল, আমার মা আমাকে এ খবর দিয়েছে। ঐ মাকে আসার দিন পালসদের ভেতর আমাকে লুকিয়ে ধরে আদর করতে দেখলেন।

রাণী বললেন, জানা কিছু অসম্ভব নয়। আমি সাংলার চোমোলিং থেকেই মহারাজ উগবি সিংকে বিয়ে করে রামপুর বুশেহার চলে যাই। সাংলাবাসীদের কাছে এ খবর অজানা নয়।

রাণী এবার রান্নার আয়োজনে লাগলেন। পাশে বসে দেখতে লাগল সঞ্জো।

প্রজ্ঞাদেবী ক্ষিপ্র হাতে কাজ করে চলেছেন। তার মনে হচ্ছে তিনি রামপুর বুশেহারের মহারাণী নন, তিনি এক সামান্য ঘরের মেয়ে। মায়ের কাছে থাকার সময়ে মাকে কত সাহায্য করেছেন দৈনন্দিন কাজে। মা কত সময় বলতেন, এখন কাজ করতে হবে না তোমাকে। বসে বসে দেখ, কেমন করে গুছিয়ে কাজ করতে হয়।

প্রজ্ঞাদেবী কাজের ভেতর তাকালেন সঞ্জোর দিকে। এমনি একটা ভাঙা ঘরের দাওয়ায় তাদের রান্না হত। সে ঐ সঞ্জোর মত বসে বসে তার মায়ের নিপুণ হাতের কাজকর্ম দেখত।

একটা কুপ্‌পো পাখি পাশের কেলু-গাছে বসে কুপ্‌পো, কুপ্‌পো করে ছাতি ফাটিয়ে ডেকে উঠল। কান খাড়া করে সে ডাক শুনতে লাগল সঞ্জো। প্রজ্ঞাদেবী কাজের ফাঁকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন, তার পাশে বসে থাকা ছেলেটি উদাস হয়ে গেছে। ভারী ভাল লাগল এই পালস ছেলেটির মুখখানা।

এক সময় রাণী কাজের ফাঁকে কথা বললেন, কি ভাবছ সঞ্জো? মুনালের কথা?

না মহারাণী, কুপ্‌পোর ডাক শুনলেই আমার কেন জানি না মায়ের জন্যে মন কেমন করে ওঠে। মাকে কেবলই কাছে পেতে ইচ্ছে করে।

রাণী বললেন, আমি বেশ বুঝতে পারি সঞ্জো, তুমি মনে মনে কষ্ট পাও। কিন্তু পরের উপকার করা তোমার স্বভাব-ধর্ম বলে তুমি হাসিমুখে সব সহ্য করে যাও।

সঞ্জো কৃতজ্ঞতায় মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, একটুও না মহারাণী। আমি তো আমার মায়ের কাছেই রয়েছি।

কথাটা যেন শতদ্রুর জলতরঙ্গের মত বুকে এসে বাজল। প্রজ্ঞাদেবীর বুকখানা জুড়িয়ে গেল। সন্তানহীন মহারাণীর চোখে জল এসে পড়তেই তিনি হাতের পাতায় তা মুছে নিলেন।

সামান্য রান্না একসময় শেষ হল। রাণী সঞ্জোকে পাত্র ভরে পরিবেশন করলেন। সঞ্জো তৃপ্তির সঙ্গে প্রতিটি গ্রাস মুখে তুলছে আর রাণী অসীম আগ্রহে বুভুক্ষু ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, সঞ্জোর মত যদি তাঁর একটি সন্তান থাকত তাহলে প্রতিদিন তাকে তিনি নিজের হাতে খাওয়াতেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য থেকে তিনি চিরদিন বঞ্চিত রইলেন।

সঞ্জোর খাওয়া শেষ হলে রাণী তার দিকে এগিয়ে দিলেন নিজের ব্যবহৃত জল-পাত্রখানা। বললেন, দুর্যোগের পথ দোষ নেই। ঐ পাত্র থেকেই তুমি পান কর।

সঞ্জো কিছুক্ষণ তাকাল মহারাণীর দিকে। রাণীর চোখে সে দেখল এক অলৌকিক আলো। মাতৃমমতার আশ্চর্য একটি ছবি ফুটে উঠেছে রাণী প্রজ্ঞাদেবীর মুখে।

পরের দিন নাচার দেশাং পেরিয়ে খানিক পথ আসতে না আসতেই শুরু হল গোয়েনিং। তীব্র বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় থেকে বয়ে এল কড়ো হাওয়া। পাহাড়ের নীচে উছলে ফুঁসে উঠল গারং। শতশত নালং সাপের মত এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে নদীর দিকে নেমে চলল।

ঘুন্টে থেকে সঞ্জোর সাহায্যে নামলেন প্রজ্ঞাদেবী। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে তাঁর সর্বাঙ্গ। সঞ্জো মনে মনে ধিক্কার দিল নিজেকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তার সাব-ধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ ভুল তার হল কেন। রাণীর কথা শুনতে শুনতে সে পথ চলছিল। সে এমনি তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে আকাশের পরিবর্তনের খবরই সে পায়নি।

ঝড়ের দমকা হাওয়ায় পাহাড়ী ওম্ পথ থেকে ছিটকে বহু নীচে নদীগর্ভে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই সঞ্জো শক্ত করে ধরে রইল রানী প্রজ্ঞাদেবীকে। হাতের লাগাম খুলে দিল সে। ঘুন্টুকে সামলে রাণীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না একার পক্ষে। লাগাম মুক্ত হয়ে ঘুন্টু হেঁচো বব তুলে কিছুক্ষণের ভেতরেই দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বর্ষাধারায় ভিজে প্রবল শীতে কাঁপতে লাগলেন মহারাণী। দমকা হাওয়ায় শীত অস্থিমজ্জার ভেতর ঢুকে বিপ্লব ঘটিয়ে দিলে। সঞ্জো খর হাওয়ার দিকে পেছন করে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাণীকে রক্ষা করতে লাগল।

পাহাড়ী ঝড়ের ঝাপটা দীর্ঘস্থায়ী নয়। বাতাস বন্ধ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও থেমে এল। আকাশ ঝকঝকে হয়ে উঠতে বিলম্ব হল না। রোদ্দুরে চরাচর উদ্ভাসিত। সঞ্জো বলল, রাণীমা আপনাকে আমি পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাব। আমার কাছে যে বড় কোটিংখানা রয়েছে তাতে উঠে বসুন। আমি গাছের দিয়ে তা দেহের সঙ্গে বেঁধে নেব।

রাণী শীতে কাঁপতে কাঁপতেই বল-লেন, তুমি আমাকে বইবে কি করে বাবা। সারা পাহাড় দেখছ না কেমন পিছল হয়ে উঠেছে।

সঞ্জো বলল, পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভালই আমাদের কাজ। মসৃণ সমতল তো মা আমাদের জন্যে নয়।

রাণীকে কোটিংএ উঠতে হল সঞ্জোর পীড়াপীড়িতে। বেশ কিছু পথ অতিক্রম করে সঞ্জো একটি বিরাট গুহার সামনে এসে কোটিং নামাল। রাণী সঞ্জোর মাথায় সার পথ হাত রেখে চলছিলেন। এই তরুণটির হৃদয়ের পরিমাপ তিনি কোন রকমেই করতে পারছিলেন না। তাঁর অন্তরের সমস্ত শুভ কামনা ঝরে পড়ছিল পরোপকারী নিঃস্বার্থ যুবকটির মাথায়। তাঁর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মাথার ওপরের ঐ আকাশ হয়ে গেছেন আর তাঁর কোলে খেলা করছে সূর্যের মত এক আলোর শিশু।

কোটিং থেকে নেমে গুহার ভেতর প্রবেশ করলেন মহারাণী। অবাক হয়ে বললেন, এখানে বেশ কিছু আধপোড়া কাঠ রয়েছে দেখছি।

সঞ্জো উঁকি দিয়ে দেখে বলল, আয়তনে অনেক বড় গুহা। তাই মেষপালকরা এখানে দল বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে গেছে আমা-[illegible] সুবিধেই হল [illegible]

[illegible]

[redacted]রণটা প্রজ্ঞাদেবীর কানে এসে বাজল। কোমল গলায় মনের সব স্নেহ ঢেলে বললেন, আমাকে এখন থেকে মা বলে ডেকো সঞ্জো, আমি তোমার মা।

মুহূর্তে সঞ্জো দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলে প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

কি হল সঞ্জো, আমি তোমার মা নই?

না, আপনি মহারাণী। এই পাহাড়ের বাঁকে খানিক পরে আমরা যখন গিয়ে দাঁড়াব তখন আপনি দেখতে পাবেন রামপুর বুশেহারের উজীর মঙ্গল সিং-এর প্রাসাদচূড়া। ওখানেই আপনাকে আজ রাতের অন্ধকারে আমি রেখে আসব মহারাণী। শুধু সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে ওঠার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তার ভেতর ঐ কাঠে আগুন জ্বালিয়ে ভেজা পোশাকগুলি শুকিয়ে নিন।

[redacted]দেবী রামপুর বুশেহারের প্রান্তে পৌঁছে গেছেন জেনে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এই মুহূর্তে আর তাঁর চোখের সামনে কিছু নেই। মহারাজ উগর সিং-এর সঙ্গে তিনি এতখানি কষ্টের শেষে মিলিত হতে যাচ্ছেন ভেবে অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রশ্ন আর সঞ্জোর উত্তর ধীরে ধীরে কখন চিন্তার থেকে মিলিয়ে গেল।

চকমকি ঠুকে রাণী গুহার ভেতর আগুন জ্বালালেন। পোটলা থেকে মূল্যবান পোশাক বের করে আগুনের উত্তাপে সেগুলি শুষ্ক করে নিলেন। পোশাকগুলো শুকনো হলে রাণী শরীর থেকে পালসরমণীর জীর্ণ বেশবাস খুলে ফেলে একটি একটি করে সেগুলি পরে নিলেন। সংগোপনে রাখা মহামূল্য তিরমূল দুলিয়ে দিলেন গলায়। দুটি কানে পরলেন সাংকালাং। নাকে তিলিল পরে বসে রইলেন মহারাণীর মহিমায়। গুহা থেকে বাইরে দিয়ে দেখলেন, সামনে কেউ নেই। দেখলেন, উঁচু পাহাড়ের মাথায় তখনও বিদায়ী সূর্যের সোনালী উত্তরীয়ের প্রান্ত জড়ান রয়েছে। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার দ্রুত আগমনের জন্য বদরীনাথের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার আড়ালে বেজে উঠল একটি করুণ কণ্ঠ। রানী উৎকর্ণ হয়ে কান পাতলেন।

সঞ্জো একটি রোহণী গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে আপনমনে গান করছিল। পালসদের অতি পরিচিত মন কেমন করা গান। কিন্নরের অনেক উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে পালংএর পাস নিয়ে পালসরা চলে গেছে অনেক অনেক দূরদেশে। সেখানে থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় পাচ্ছে ঋতু বদলের গন্ধ। অমনি উদাস হয়ে গেছে মন কিন্নরে ফেরার জন্যে। শাদা ইয়লু ফুল ফুটেছে। আর কি থাকা যায় বিদেশে। মায়ের প্রেমে মন যে কেঁদে উঠেছে।

গানের প্রতিটি শব্দে চাপা একটা ব্যথার সুর বাজছে।

গরমি দোয়ারা
ইয়ালুচি উ উ।
নিওমাজোন সারগেও।
কিন্নোরি বিমু চলসে।
মনবনসুন চেয়াসে।

গান শুনতে শুনতে কখন মহারাণীর চোখ দুটি জলে ভরে এল। দূরপ্রবাসী সন্তান কাঁদছে তার মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্যে। রাণীর শূন্য বুকখানা জুড়ে কার যেন হাহাকার বাজতে লাগল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। রাণীর সেদিকে আর দৃষ্টি নেই। কি যেন হারানোর দুঃখে তিনি কাতর। কাকে যেন তাঁর শূন্য বুকে ফিরে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ উন্মুখ।

সঞ্জো এসে দাঁড়ালো গুহার সামনে। বলল, আমি তৈরী মহারাণী। এখন লোক চলাচলের পথেই আমরা নেমে চলব।

রাণী বেরিয়ে এলেন। সঞ্জো দিনের শেষ আলোয় দেখল মহারাণীর ঐশ্বর্য-মূর্তি।

ওরা যখন উজীর মঙ্গল সিংএর প্রাসাদ সীমানায় এসে পৌঁছল তখন মন্দিরে সন্ধ্যা-বাতির ঘন্টা বেজে চলেছে। প্রাসাদের অলিন্দে অলিন্দে জ্বলছে সন্ধ্যার দীপ।

মহারাণী বললেন, সঞ্জো আজ নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছলাম রাজধানীতে। গুর্খাদের পরিকল্পনা মত আজ আমাকে বন্দী হয়ে চলে যেতে হত তাদেরই রাজ্যে। তুমি আমার সম্ভ্রম, সম্মান, আমার প্রাণ, সবকিছুই রক্ষা করেছ। তোমাকে মহারাজের অদেয় কিছুই থাকবে না।

সঞ্জো ম্লান হেসে বলল, আমি সামান্য পালস মহারাণী। ধনরত্ন খ্যাতি প্রতিপত্তি নিয়ে আমি কি করব!

রাণী বললেন, কোন কিছুতে তোমার প্রয়োজন না থাক আমার আছে। তোমাকে কিছু দিয়ে আমি শান্তি পেতে চাই। এ আমার কিছু পরিমাণে ঋণ শোধ সঞ্জো।

আমি আপনার কাছে ঋণী মহারাণী। সে ঋণের শোধ এ জন্মে হবে না।

তুমি ঋণী! বিস্মিত হলেন মহারাণী।

হাঁ ঋণ আমি করেছি আপনার কাছে।

কি ধরনের ঋণ সঞ্জো?

জন্মসূত্রে ঋণী। আমার এ জীবন আপনারই কৃপায় পেয়েছি মহারাণী। এ দেহ আপনারই দান।

রানী মুহূর্তাহতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক সময় অন্ধকার পথের ওপর সঞ্জোকে জড়িয়ে ধরে বন্যার মত ভেঙে পড়ে বললেন, সঞ্জো, আমার হারানো সন্তান, আমার বুকের ধন।

সঞ্জো স্থির নিশ্চল। একটি পাথরে খোদাই মূর্তি যেন। এক সময় বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সঞ্জো স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমি একদিন অসহায় এক কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম। জ্ঞান হলে আমার পালিতা মা একদিন এক শ্রমণীকে দূর থেকে দেখিয়ে বলেছিল, ঐ তোর সত্যি-কারের মা।

মনে আছে, আমি সক্রোধে সেই পালস মায়ের বুকে আঘাত হেনে বলেছিলাম, তুই আমার মা।

আমার ক্রুদ্ধ কান্নায় ভরা মুখখানা বুকের মাঝে চেপে ধরে পালস মা বলেছিল, আরে পাগল, আমিই তো তোর মা। ও যদি মা হত তাহলে তোকে ফেলে অমনি করে পালিয়ে বেড়াতে পারত।

তারপর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার সব খবরই পেয়েছি। বিশ বছর পরে ফুলেচ উৎসবে আবার আপনাকে দেখলাম। মহারাণী প্রজ্ঞাদেবীকে। আপনি আমার সংগ্রহ করা ফুলটি তুলে নিলেন। আমার মনে হল, আমি ফুল দিয়ে মহারাণীকে প্রণাম জানালাম। আজও চলে যাবার সময় বুশেহারের মহারাণীর চরণ বন্দনা করে চলে যাব। চিরদিন স্মৃতির কান্নার মাঝে থাকবে আমার কুমারী মা। আমার ক্লান্ত দেহ থাকবে আমার পালস মায়ের বুকে। আর মহারাণী প্রজ্ঞা-দেবী জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত পেয়ে যাবেন আমার ভক্তির প্রণাম।

সঞ্জো, বাবা, একবার আমাকে মা বলে ডাক।

সঞ্জো ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল, মা, মহারাণী মা, আমি পুগলাং আমি কুমারী মায়ের সন্তান। আমি পুগলাং, আমি অন্তাজ। বুশেহারের মহারাণীর সন্তান হবার যোগ্য আমি নই।

দ্রুত পা চালিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল সঞ্জো। নিস্তব্ধ পাহাড়ে হঠাৎ প্রতিধ্বনি হাহাকারের মত বাজতে লাগল,—আমি পুগলাং, আমি পুগলাং। আমি কুমারী মায়ের সন্তান।

চমকে উঠল গুহাগহ্বরের অন্ধকার। [illegible]নহোর আর কেলমং গাছের ডালে ডা[illegible] নিশাচর পাখিরা পাখা ঝাপটাতে লাগল। বহু নীচে আদিম পাথরে ধাক্কা খেয়ে শত-দ্রুব যে জলোচ্ছ্বাস বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত লাফিয়ে কাঁপিয়ে ছুটেছে, অন্ধকারের এই কটি শব্দকে সে বুকে নিয়ে চলে গেল দূরে—বহু দূরে।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

কর্তার বয়েস বছর চল্লিশ। কালো রঙ। খেঁটে, মোটা চেহারা। বেসামাল পায়ে সিঁড়ি ভাঙে। দোতলায় উঠে দুরস্ত হওয়ার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে ওপরে অশান্তি হয়। মোতি একদিন দেখেছিল। সারা বাড়ী অন্ধকার। শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। গিন্নীমা চেঁচাচ্ছে—ছোটলোক, ইতর। কর্তা একটা খিস্তি করলো। নেটের মশারি ধরে টান মারলো। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লো। মশারির মধ্যে ডবলু ঘুমোচ্ছিলো। বছর পাঁচ বয়েস। কর্তার একমাত্র ছেলে। সে কেঁদে উঠলো। মশারি ছিঁড়তে ছিঁড়তে কর্তা মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়লো। রাঁধুনি ছিলো, ড্রাইভার ছিলো। মোতি বাজারহাট করতো। ঘরদোর সাফ করতো। ডবলুর সঙ্গে খেলতো। এই সময়টুকু বড়ো ভালো কাটতো।

গিন্নীর ফিটের ব্যামো ছিল। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতো। দাঁতকপাটি লাগতো। কর্তা বাড়ী নেই। মোতি সেবা-যত্ন করতো। জল ঢালতো মাথায়।

এক দুপুরের কথা মনে আছে। চারপাশ নিঝুম। বাইরে ঘন রোদ। কাক ডাকছে। রাঁধুনি ঘুমোচ্ছে। সকালে গিন্নীমার ফিট হয়েছিলো। এখনও কাহিল। দু চোখ লাল। বিছানায় শুয়ে ছিলো। এলো চুল খাটের বাজু টপকে মাটিতে লুটোচ্ছে। হাতভর্তি গয়না। মোতিকে নীচু গলায় ডাকলো। একটা কাজ করতে হবে—গিন্নীমা বললো—কেউ যেন না জানে। মোতি বুঝতে পারে না। কেমন ভয় করে। গিন্নীমা একটা সিনেমার নাম বলে। বিকেল পাঁচটার সময় ওখানে দাদাবাবু আসবে। তুই দূর থেকে নজর রাখবি। দাদাবাবু কতোক্ষণ দাঁড়ায়, কি করে আমায় জানাবি। গিন্নীমা ওর কাঁধে হাত রাখে। মোতির শরীর কাঁপে। সাবধান। দাদাবাবু যেন না দেখে।

মোতির হাতে গিন্নীমা একটা টাকা দেয়। কিভাবে যেতে হবে জানায়। মোতি সেই প্রথম এস্‌প্ল্যানেডে এলো। মেট্রো সিনেমা দেখলো।

সিনেমার তলায় গিজগিজ করছে লোক। গাড়ীতে ছয়লাপ। ডাইনে, বাঁয়ে হুসহাস্‌ শব্দ। আকাশের বোদ তখন মোলায়েম হয়ে আসছে। লালচে রঙ। পশ্চিমের আকাশটা কেমন ময়লা। পিচকিরিতে ধোঁয়া ছিটোচ্ছে কেউ। মোতি কোথায় লুকোবে ভেবে পায় না। রাস্তা পার হয়। রাস্তা পেরোতে ভয় করে। গাড়ীর মিছিল। কোনো খাতির নেই। যে কোনো সময়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে। মোতি ভাবে, মা, ইন্দু কলকাতায় এলে হার্টফেল করবে। মাধুকে নিয়ে যদি একবার আসা যেতো। মাধু কোথায়।

রাস্তার এধার থেকে সিনেমার তলাটা পরিষ্কার দেখা যায়। মুস্কিল হয় গাড়ীর লাইন দাঁড়ালে। সামনেটা ঢাকা পড়ে। লোকজন অদ্ভুতভাবে ঘুরছে। মুখ চাওয়াচায়ি করছে। কি যেন বলার বা শোনার আছে।

মোতির পায়ের নীচে ছায়াটা মুছে গেল। সূর্য কি ডুবলো! গাছপালার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। আলোর টোপর মাথায় কলকাতা। পাঁচটা বেজেছে। মোতি হঠাৎ দেখে সামনের ফুটে কর্তা। ঘনঘন দেখছে। হাতে দামী সিগারেটের বা চোখে রঙীন চশমা। মোতির বুক ধড়ফড় করে। জলঘরটার পাশে ও গা ঢাকা দেয়। আবার সামনে বাসের মিছিল। খাঁ খাঁ প্যাঁ প্যাঁ শব্দ। হর্ন টিপে ঝগড়া করছে। মোতির অস্বস্তি হয়। ধীরে ধীরে সামনেটা খালি হয়। মোতি দেখে কেউ নেই। কি আশ্চর্য! উবে গেল নাকি। রাস্তার ওপাশে যেতে হবে। ও এগোয়। হঠাৎ কর্তার মুখোমুখি। কর্তার সঙ্গে একজন সুন্দরী দিদিমণি। যেমন রূপ, তেমনি সাজসজ্জা। মোতির চোখ ঝলসে যায়।

কর্তা ওকে দেখেও দেখে না। কথা বলে না। রাস্তার ধার ঘেঁসে কর্তার গাড়ী। দুজনে ওঠে। ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দেয়। মোতি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তায় ভিড় বাড়ে। চাপ চাপ মানুষ। বাসের দিকে মোতি যায় না। ভয় পা লাগিয়ে দেয়। পায়ে হেঁটে বাড়ী। রাস্তার আলো জ্বলেছে। ধোঁয়া ও অন্ধকার। দুপাশের বাড়ীঘর ছায়ায় ডুবে আছে। আলো জ্বালার সময় হয়নি। সারা পথ মোতি ভেবেছে, গিন্নীমাকে কি বলবে। সত্যি বলাটা কি ঠিক। কর্তা লোকটা খারাপ নয়। কিন্তু তাকে চিনলো না কেউ। জুট পাকিয়ে যায় সব।

বাড়ীতে গিন্নীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাফ মিথ্যে কথা বললো, কিছু দেখেনি। যা ভিড়। দেখা যায় না।

গাঁইয়া ভূত—গিন্নীমা রাগ করে—তোকে দিয়ে কিসসু হবে না।

মোতি মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। কর্তা দশটার মধ্যে বাড়ী ফেরে। মুখ, মেজাজ পরিষ্কার। শিস বাজায়। মোতিকে দেখে। ডবলুর পড়ার বই ঘাঁটে। গোটা শরীর দিয়ে কিছু শোঁকার চেষ্টা করছে। অশান্তি হয় না।

দিন সাতেক পরে আবার সেই ঘটনা। ভরদুপুরে। গিন্নীমা ওকে ডাকে। আজ তিনটেয় মেট্রোর নীচে দাঁড়াতে হবে। মোতি তখনি বাস ধরে।

সিনেমার উল্টোদিকে ফুটপাতে মোতি দাঁড়িয়ে আছে। চনমনে রোদ। সিনেমার তলায় কিছু মানুষের গুলতানি। রাস্তায় লোকজন কম। মোতির পুরো কাজটা কেমন খারাপ লাগে। অন্য মানুষকে লুকিয়ে দেখা খারাপ। এসব পুলিশ সি আই ডির কাজ। মাথার ওপর গনগনে বোদ। আড়াল নেই। চাঁদি তেতে ওঠে। বাস, মোটর ছোটে। লোকজন যায়। একটা গাড়ীর আড়ালে ও দাঁড়ায়। বোদটা কম লাগে। কালো রঙের প্রাইভেট গাড়ী। বনেটে ঠেস দেয়। পাশা-পাশি উল্টো ফুটপাথে নজর রেখে মোতি দাঁড়িয়ে থাকে। গাড়ীর হাতলে ওর হাত। সামনের বনেটের ওপর মাথা।

হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে দুজন ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শালা, শুয়োরকা বাচ্চা। চোর। দুই রদ্দা পড়ে। মোতি চোখে অন্ধকার দেখে। জনা তিনেক উর্দি পরা

পুলিশ ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। বিটকেল চেহারার একটা ছেলেকে একজন পালোয়ান গোছের লোক ধরে আছে। সে মোতিকে দেখায়—এই ওস্তাদ স্যার। মোতি বোঝে না। ফ্যালফ্যাল তাকায়। কোমরের নীচে একটা জোর লাথি পড়ে। গাড়ী চুরির অভিযোগে মোতি লালবাজারে চালান হয়। মারাত্মক অভিযোগ। ইন্টার স্টেট গাড়ী চোরদের একটা বিরাট গ্যাং আছে। মোতি ইস্টজোনের একজন মাতব্বর।

লালবাজারে ওর নাম ঠিকনা লিখলো। ছবি তুললো। হাতে শেকল, কোমরে দড়ি লাগিয়ে পুলিশ একদিন কর্তার বাড়ীতে আনলো। তখন সকাল। কর্তা, গিন্নী ভয়ে অস্থির। মোতিকে না চিনলে বাঁচে। একজন ইন্সপেক্টর বললো—গাড়ী চোর। দাগী [illegible]। হতে পারে। কর্তা সায় দেয়। খুব [illegible]দিন কাজ করেছে এখানে। তাছাড়া [illegible]দূরে মেট্রো পাড়াতেই বা ওর কি কাজ! গিন্নী বলে—ঠিক তো। বাড়ীর চাকর।

মাথা নীচু করে মোতি দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে দু-চারজন বন্ধু হয়েছিলো। তারা মজা দেখে। চুটকি ছোঁড়ে। সদর দরজায় ডবলু দাঁড়িয়ে। চোখে অবাক চাউনি। জিজ্ঞেস করে—তোমার কি হয়েছে মোতিদা?

ভেতর থেকে গিন্নী হাঁকে—ডবলু, এদিকে এসো।

লালবাজারে দিন দশেক কাটলো, দুনিয়াটা সম্পর্কে কেমন বেন অরুচি লেগেছে মোতির। পুলিশের হাতে বেজায় ঠেঙানি খেয়েছে। গা-হাতে ব্যথা হয়েছিল। এখন কম। অনেক চোর ছ্যাঁচোরের সঙ্গে চেনাজানা হলো। দু' একজন ঠিকানা দিলো। তাদের মুখে অনেক গল্প শুনলো মোতি। নেশা ধরানো গল্প। অন্ধকারে পাইপ বেয়ে ছাতে ওঠা। সারা গায়ে তেল। মুখে কালি। মাঝরাতে চিৎপুর ইয়ার্ডে ওয়াগন ভাঙ্গার কাজ। লোহার শক্ত তালা চিনেবাদামের খোসার মতো ভেঙ্গে যায়। তারপর লে দনাদ্দন, দে দনাদ্দন। সাবাবাত জানলপ বিল্ডের তলায় ভর্তি লরি আর বান্ডিল বান্ডিল দামড়ির লেনদেন। মোতি অনেক কিছু শিখলো। দামড়ি মানে একশো টাকার নোট। কথাটা ওর ভালো লাগে।

বাইরে তখন কি যেন আন্দোলন লেগেছে। ট্রাম বা খাদ্যের লড়াই। পিলপিল করে লোক আসছে। লক আপ বোঝাই। বেশির ভাগ ছাত্র। স্কুল কলেজে পড়ে। মোতির লক আপেও ঢুকলো এক ঝাঁক। কিশোরের সঙ্গে আলাপ হলো। কিশোরই কথা শুরু করেছিলো। দিন তিন-চার লক আপে ছিলো ওরা। আজও ভাবলে মোতির বুক কেমন ভিজে ওঠে। নিজের ঘর-বাড়ীর বাইরে এতো ভালোবাসা, দরদ ছড়িয়ে আছে, এটা ও জানতো না। সেই প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টির নাম শুনলো। দুচারজন কম্যুনিস্টকে দেখলো। এই অচেনা শব্দটা ওর নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেলো।

প্রায় জনা তিরিশেক ছিলো এক ঘরে। কম্যুনিস্ট দশ-বারোজন। অন্য দলের ছেলেও আছে। তারাও চমৎকার। ওরা রাজবন্দী। বাড়ীর লোক আসে। খাবার দাবার দেয়। বিড়ি, সিগারেট আনায়। এন্তার ফোঁকে। মোতি খাবারের ভাগ পায়। সিগারেট বিড়ি ও খায় না। কিশোর ওর সঙ্গে লেগে থাকে। অনেক কথা বলে। আশ্চর্য সব কথা। মোতি জীবনে শোনেনি। কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না। সোজা সরল ভাষা। ভাঁড়ামি নেই। ওর ঘর-বাড়ীর কথা কিশোর জানতে চায়। মা, বাবা ভাইবোনের হদিশ করে। বেশম তৈরীর ইতিহাস শোনে। গাঁয়ের অবস্থা, গাঁটি সংগ্রহের কাহিনী শুনে অবাক হয়। নরম হাতে মোতির বুকটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব কিছু বার করে। তাঁত চাষীরা শুকিয়ে যাচ্ছে। দালাল ফোড়েদের বাজত্ব। ইণ্ডিয়ান টেকস্টাইল, খাদি কমিশন, হ্যাণ্ডলুম ডেভলেপমেণ্ট কেমন করে দাদন ধরিয়ে তাঁতিদের শুষছে, মোতি বলে যায়। তার মনে হয় কিশোর নিজেই যেন তার জিভে কথাগুলো বলছে। একই লোক বলছে আর শুনছে। পর পর এমন সাজিয়ে এসব কথা সে আগে বলেনি। বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় অনেক নতুন ভাবনা এসে জমে। ঘটনাগুলোর ভেতরে গভীরতর কিছু একটা যেন জড়িয়ে আছে। তাকে খোঁজা দরকার। সেই শুরু। সাতদিনের মধ্যে লক আপ খালি হয়ে গেল। মোতিকে জেলে পাঠানো হলো। জেলে দুবার কিশোর দেখা করেছে। মাস দেড়েক পরে ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিলো। কিশোর জামিনদার হোগাড় করলো। টাকা দিলো। ও তখন ব্যাঙ্কে চাকরি করছে।

মোতির খিদে বাড়ে। জ্ঞানার খিদে। দুনিয়াটার খোসা ছাড়িয়ে হজম করতে হবে। রোজ একটা করে রঙীন পর্দা সরে যায়। শহর কলকাতার সঙ্গে দেশ গাঁ মিশে যায়। সবটা মিলিয়ে একটা গোটা আদল ফুটে ওঠে। তাঁতিপাড়ার বাইরে একটা দেশ আছে। সেটা তার মাতৃভূমি। নাম ভারতবর্ষ। এখানে ষাট কোটি মানুষ আছে। শতকরা আশিজন তার মতো গরীব গেঁরো মানুষ। বাঁচা মরা দুটোই এখানে সমান কষ্টের। জীবনের কোনো মানে নেই। কি এক দুঃখে ভেতরটা কাঁপে। বাগ হয়। জেল থেকে বেরিয়ে মোতি কিছুদিন কাঁচা আনাজের ব্যবসা করলো। শিয়ালদার মাল শ্যামবাজারে বিক্রী করতো। রাত তিনটেয় জাগতো। শেষ হতে সন্ধ্যে গড়াতো। মাঝে দু-এক ঘণ্টা নাওয়া খাওয়া। শরীরপাত খাটুনি। দু'চার পয়সা জমলো। বৌবাজারের এক বস্তিতে থাকতো। একদিন ফিরে দেখে দরজা হাঁ করে খোলা। ভাঙ্গা তালা বাইরে গড়াচ্ছে। একটা টিনের সুটকেশ ছিলো। সেটা উধাও। দু' একটা পুরোনো জামা কাপড় দড়িতে ঝুলছে। মোতির বুকটা লাফিয়ে ওঠে। বুঝতে পারে, আবার ডুবলো। দেখে আশপাশের ঘরের দুচারজন জুটলো। দুপুরে বস্তিতে লোক কম। মেয়েরা ঘুমোয়। বাচ্চারা রাস্তায় ঘোরে। তখনই কেউ কাজ সেরেছে। পড়শীরাই এসব শোনায়।

দু'একজন মাঝবয়সী মাতব্বর আসে। বলে—পুলিশ এনে আর ঝামেলা কোরো না। কাজ কিছু হবে না। বস্তির লোকেরা ভুগবে। মোতি চুপচাপ শোনে। অন্ধকারে আবছা মানুষগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। রাতে সামান্য খেয়ে শুয়ে পড়ে। রাত তিনটেয় আর স্টেশনে ছুটতে হবে না। তবু রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। চার্চের ঘড়িতে তখন তিনটে বাজলো।

কিশোর অনেক পরে দেখেছিলো। মোতি তখন ডালহৌসিতে ডাব বেচে। দু দশ টাকা কোমরের ঘুনসিতে দিনরাত বাঁধা। ডাবের ব্যবসাতেও চোট। হল্লা গাড়ী একদিন বমাল সমেত ওকে তুলে নিয়ে গেলো। একশো ডাবের আটানব্বইটা তখনও বিক্রী হয়নি। এলো লালবাজারে। দু একজন ওকে চিনলো। গাড়ী চোর না? শালা পুরোনা চোর। এসব কথাও মোতি শুনলো। কাঠফাটা গরম। দুপুর নেমেছে। অনেক পুলিশ জমলো। গোঁফ দাড়ি, বুক ভিজিয়ে প্রায় সকলেই একটা করে ডাব খেলো। লম্বা নিঃশ্বাস ফেললো। খেতে বড়ো কষ্ট।

দুচারদিন মোতি ফ্যা ফ্যা ঘুরলো। পুঁজি শেষ। খাওয়া নেই। চোখে ধুতরো ফুল দেখে। কিশোরদের সঙ্গে বসে। সভায় যায়। দু চারখানা বই পড়ে। কিন্তু কিছু জানায় না। এসব বলতেও লজ্জা লাগে। তাছাড়া শুকিয়ে থাকার অভ্যেস আছে তার। তখনই বৌবাজারে ছানার দোকানে একটা কাজ জুটলো।

চোখের দুটো পাতা ফের ভারী হয়ে আসে। বুধন আর লখাই জেগেছে। ওরা দাঁড়ায়। মোতির চটকা ভাঙ্গে বাইরে মায়ের গলা। ইন্দুর সঙ্গে কথা বলছে।

মোতিও ওঠে। ওদের নিয়ে গাঁয়ের বাইরে যাবে। সেখানে বিলিফের ঝিল। গাঁয়ের দীঘিতে মাঝিরা নামে না। ভদ্রলোকের পাড়া। মোতিও সাহস পায় না নিয়ে যেতে। কেউ যদি ওদের চেনে তো মুস্কিল।

রাস্তার দুপাশে বনকলমি, তেলাকুচার ঝোপ। দু একটা আশশ্যাওড়া গাছ। সরু মেঠো পথ। দু চাবটে কাঁচ ছড়িয়ে আছে। লাল কালোয় কি জৌলুস। দেখতে বেশ লাগে। লরির শব্দ ওঠে। ইণ্ডিয়ান টেকস্টাইলের গাড়ী। যাবে হেড অফিস ভাগলপুরে। সেখানে বিলিতি মেসিনে ধোলাই হবে সব কাপড়। হাজার হাজার শিল্পীর ঘাম আর চোখের জলের দাগ বেমালুম সাফ হয়ে যাবে। কাপড়গুলো আর চেনা যাবে না। ঝকঝকে চকচকে পালিশ, আলাদা জেল্লা। নতুন কোম্পানীর তকমা এঁটে জাহাজে চাপবে। ইউরোপ আমেরিকার দোকান বাজার আলো করবে। দুচার টুকরো দেশী পয়সাওলা বাবুদের শরীর উঠবে।

তাঁতিদের মজুরী কমেছে জিনিস-

পত্রের অসম্ভব দাম। বাঁদিকে ভক্ত বুড়ির পোড়ো বাড়ী। মাথার চাল নেই। দেনার দায়ে কোম্পানী টিনের চাল খুলে নিয়েছে। বাড়ীটা যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোম্পানীগুলো আজকাল এক কাহন গুটিতে বারোশো গ্রামের বদলে চোদ্দশ গ্রাম সুতো চাইছে। তাঁতিদের রাজী না হয়ে উপায় নেই। গুটি দেওয়া বন্ধ হবে। না খেয়ে মরতে হবে। বারো মিটার থানের মজুরী বিয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। তিনজনের তাঁতি পরিবার মাসে তিনটের বেশী থান বুনতে পারে না। তার মানে মাসিক রোজগার একশো সাতাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। খরচ পনেরো টাকা। এসব হিসেব মোতি জানে। আবো জানে তাঁতিপাড়ার তিনজনের পরিবার একটাও নেই। গরীব ঘরে ছোটো পরিবার হয় না। কাজের লোক চাই।

ক্যান্টিনের চাকরি ছেড়ে অনেক আগেই সাঁওতাল গাঁয়ে বসার কথা। একটু গড়গোল হয়ে গেলো। তনুপদ্দা রাজনগর হাসপাতালে চাকরি পেলো। ও ডাকতার। বীরভূমে বাড়ী। কিশোরদা আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। হায়দারদার মেসে এক সন্ধ্যায় অনুপদ্দা বললো, তুমি চলো আমার সঙ্গে। ভালো হবে। হঠাৎ গাঁয়ে হাজির হলে, নানাকথা হবে। তার চেয়ে আমার কম্পাউণ্ডার সেজে গেলে বহুৎ সুবিধে। গরীব গাঁয়ে যোগাযোগ পাবে।

কিশোর, অজিত সেখানে ছিলো। অজিত সায় দিলো। মোতি অন্যরকম ভাবছিলো। সে তার দেশ গাঁকে চেনে। কম্পাউণ্ডারও সেখানে ডাক্তার। খাতিরের লোক। গরীব মানুষেরা ঘেঁষবে না। ভয় পাবে। বরং চাকর হওয়া ভালো।

কথাটা বলতেই অনুপদ্দা হাঁ হাঁ করে উঠলো। কমরেডকে চাকর বানাবো, আমি পাগল নাকি? কিশোর চুপচাপ বসে-ছিলো। হায়দার বললো—গিয়েই দেখো না।

প্রায় পাঁচ বছর পরে মোতি দেশে ফিরলো। বুকের মধ্যে সে কি উত্তেজনা আর দাপাদাপি। হাসপাতালের বাইরে একটা ঘর নিয়ে ডাক্তারখানা চালু হলো। রাজনগরে আসার প্রায় হপ্তাখানেক পরে মোতি বাড়ী গেলো। গাঁয়ের রাস্তায় পা দিয়েই বুকটা দুলে ওঠে। কি ভীষণ চুপচাপ। গ্রামটা যেন হঠাৎ ভীষণ পুরোনো আর জীর্ণ হয়ে গেছে। লোকজন নেই। মহামারীতে উজাড় হয়ে গেল নাকি! কিছুটা এগোতেই চেনা শব্দ পায়—ঠকাচ চং। ঠকাচ চং। তাঁত চলছে।

আরো খানিকটা এগিয়ে নতুন স্তূপ। সুতো টানা হাঁটা করছে দুজন। ছেষট্টি হাত সুতো বেড়ে প্রায় পঁচাত্তর হাত হবে। কেউ ওকে চিনতে পাবে না। একটা চেনা মুখ নাটায় লাথা গুটোচ্ছিলো। সে মোতিকে দেখে। বোঝার চেষ্টা করে। মোতি চিনতে পারে ওপর পাড়ার শিবু।

বাবা তাঁতে ছিলো। দাওয়ায় বসে মা পাকানির কাজ করছিলো। ময়লা, তেলচিটে শাড়ী। ফ্যাকাসে, রোগা শরীর। বাড়ীটা যেন বুড়ো হয়ে গেছে। মোতি ডাকে—মা। পাকানি থামে। মা চমকে তাকায়। একপলক দেখে। মোতি কাছে এসে দাঁড়ায়। মা কেঁদে ওঠে। দুহাতে মোতিকে জড়িয়ে ধরে।

বাড়ীতে হৈহৈ লেগে যায়। পাড়ার লোকেরা দেখতে আসে। ভক্ত বুড়ি বলে—ধন্যি ছেলে। মাকে ইভাবে কাঁদালি কেনে?

বিকেলের দিকে ভিড় পাতলা হয়। বাড়ীতে আরো দুটো নতুন মুখ এসেছে। কি রোগা জিরজিরে চেহারা। ইন্দু কতো বড়ো হয়েছে। মোতির সব কিছু নতুন লাগে। ঢেঁকিশালের পাশে চট লাগানো সেই ঘর। বাবার পুরোনো কাপড় পরে মা ওখানে এক সন্ধ্যেতে ঢুকলো। মোতি তখন খুব ছোটো। ঠাকুমা বেঁচে। রাতে ঠাকুমার পাশে ঘুমোলো। পরদিন সকালে দেখে একটা ছোট পুতুল কোলে মা বসে আছে। সেই মেয়েটা ইন্দু। মেজোজাই কদম হওয়ার ছবি পরিষ্কার মনে আছে। দু বছর বয়েসে সে ভাইটা মারা গেলো।

বাবা দাওয়ায় বসে একনাগাড়ে হুঁকো টানছে। বিশেষ কথা বলছে না। আড়চোখে মোতিকে দেখছে। মোতি বোঝে, বাবা আনন্দে ফুঠছে। ছেলে ফিরেছে। শক্ত সমর্থ ছেলে। বাবার পায়ের তলার মাটি এখন সিমেন্টের চেয়ে শক্ত।

বুধন আর লখাই হাত মুখ ধোয়। ওরা এখন কিছু সময় মাঠেই কাটাবে। অজিত উঠলে একসঙ্গে বাহেঙ্গায় যাবে। মোতির ইচ্ছে সেও যায়। কিন্তু ডাক্তার দাকে খবর দেওয়া নেই। আজই রাজনগর ফেরার কথা। ডাক্তারদা হয়তো ভাববে।

অজিত তখনও ঘুমোচ্ছে। বাইরে ফিকে রোদ। কুয়াশার সর মাখানো লালচে সূর্য। সবে উঁকি দিচ্ছে। ফলে অনেক রাত পর্যন্ত অজিত জেগেছিলো। ঘুমের ঘোরে অন্ধকারে বারদুয়েক মোতি বিড়ির আগুন দেখেছে।

দাওয়ায় বসে দিবাকর ভাবছিলো, ওরা গেলো কোথায়? থানা থেকে ফেরার সময় দূর থেকে ও মোতিদের দেখেছে। চারজন মানুষ উত্তর পশ্চিমে যাচ্ছে। গতকাল ওরা তিনজন ছিলো। মোতির বাড়ীতে রাত কাটিয়েছে। দিবাকর ভাবে মাধবকে ডেকে মোতির খবর নেবে। কিন্তু পারে না। অবিনাশ খুড়ো শুনছে। লোকটা হয়তো ভয় পাবে। আজকাল সকলেই তাকে ডরায়।

খনখনে গলায় কে যেন ডাকে—দিবাকর ঘরে আছিস? সুমতি বামনীর গলা। দিবাকর গলায় ভক্তি মিশিয়ে জবাব দেয়—হ্যাঁ বামুনমা, যাই।

খুব সাবধানে পা ফেলে সুমতি উঠোনে আসে। ঘেন্নায় ব্যাঁকা মুখ। নরকে হাঁটছে যেন। দিবাকর সামনে দাঁড়ায়।

বামনী ভাঙ্গা কাঁসার শব্দ ছড়ায়—দ্যাখ দিবাকর, বলে বলে আমার মুখে পোকা গেলো। ঘরটা খানিক জুৎ করে দে। তোর বউকে তো কদিন থেকেই বলছি। বোজ বলে, কাল যাবে। তারপর লক্ষ্মীবার। সকাল হতে বসে আছি, এই আসে এই আসে, তা মানুষের পাত্তা নাই। যখন তোদের দরকার থাকে, তখোন তো বেশ চাঁদ পারা মুখ করে যাস। আর এখন আমাকেই আসতে হচ্ছে তোদের দরজায়। এখানে আমার না আছে ছেলে, না আছে কেউ। দিবাকর হাত কচলায়। সরু গলায় বলে—না বামুনমা, কাল দেখবেন, সুকালেই হাজির হ'য়ে গেঁইছি। আপনি সাধে সাধে চলে যান। সুমতি বিশেষ খুশি হয় না। তোদের পাড়ায় আসা যে কতো ঝামেলা। এখন চান করে ঘরে ঢুকতে হবে। সারা দিন টপকে টপকে বুড়ি ফিরে যায়।

মাধু ডাকে—বাবা ঘরকে এসো।

চান করার কথা দিবাকর ভুলেই গিয়েছিলো। মাধু মনে করিয়ে দিলো।

গামছা কাঁধে দিবাকর পুকুরে যায়। শরীরটা খারাপ হয়েছে। মাধু বললো।

হবেও বা। ও নিজের আদুল শরীরটা একচমক দেখে। শরীরের আর কি দোষ। একলহমা বিশ্রাম নেই। কদিনে সুখ আসবে দিবাকর ভেবে পায় না।

স্বাধীনকে কলেজে পড়াচ্ছে। এ গাঁয়ে এরকম ঘটনা কম। সে নিজেও ভাবেনি কোনোদিন। আর দুচার বছর কষ্ট করলে ছেলেটা মানুষ হবে। এই কাল-কাসুন্দা, এ্যাসসেওড়া, ভ্যারেণ্ডার ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ছেলেটা জিয়ল গাছের মতো মাথা তুলে দাঁড়াবে। অনেকদূর থেকে তখন দেখা যাবে। লোকে চিনবে দিবাকর মালের বেটা। তখন আর চাকরী করতে হবে না।

শরীরটা আজকাল সত্যিই কাহিল লাগে। মেয়েটা মিছে বলেনি। মনের মধ্যে একটা ভয় আর কষ্ট দোলে। আর বছর দুচার যুঝতে হবে। পারবে কি! ওঃ প্রথম ছেলেটা যদি বেঁচে থাকতো! কতো বড়ো হতো এ্যাদ্দিনে? হয়তো চাকরী করতো। দিবাকর বসে বসে খেতো তার টাকায়। কিংবা মাধুটা যদি মেয়ে না হতো। মাধুর জন্যে দুঃখ হয়।

কাজ থেকে ছুটি নিলেও দিবাকর এই কাজকে ঘেন্না করবে না। এই চাকরী তাকে বাঁচিয়েছে। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। বড়োবাবু একটু তদ্বির করেছিলো।

বিনা মাইনেতে স্বাধীন পড়তে পায়। হোস্টেলে থাকার খরচা নেই। তবু জল-খাবার, হাতখরচ তো জোগাতে হয়। মাস-মাইনে চল্লিশ টাকা। পঁচিশ টাকাই ছেলেকে পাঠায়। তাতে কোনো কষ্ট নেই। ছেলেকে সে মানুষ করবেই। কেউ যেন আর ছোটোলোক না বলতে পাবে।

খেতে বসে দিবাকর শুধোলো—তুর

ব্রিটানিয়া
দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্লাক্সো মিল্ক বিকিস

লিনটাস-BBC.GLXMB.2-203 BG

মা কোথায়? মাধু ভাতের থালাটা এগিয়ে দেয়। বলে—তাঁতি পিসির ঘরে চাল ধাঁড়তে গেলো।

দিবাকর থালাটা দেখে বলে—অতোগুলান ভাত আমি খেতে পারবো। তুলে রাখ আদেদক। মাধু আপত্তি জানায়—যা পারো খাও ক্যানে। আমি তো এ-খুনো খাই নাই। মেয়েকে ভালো করে দিবাকর দেখলো। মাধুর অতো সুন্দর চেহারা কালি হয়ে গেছে। বড়ো ভালো দেখতে ছিলো মেয়েটা। হাসি লেগে থাকতো মুখে। যমুনাই ঠিক বলেছিলো। মোতির সঙ্গে বিয়ে দিলেই ভালো হতো। সুখ পেতো মেয়েটা। দুজনের মধ্যে ভাবসাব ছিলো। মোতি প্রায়ই আসতো তাদের ঘরে। দুজনে খেলতো। খুনসুটি করতো। কিন্তু তা হবার নয়। তারা যে মাল। নামো জাত। দেখেশুনে পাপ ও করতে পারে না। মোতি তাকে মানতো খুব। কাকা ডাকতো। ঘরের কেনা বেশগের কাপড় দিয়েছিলো। ভালো মেছেল ছিল। ছিপে মাছ ধরতে ওস্তাদ। প্রায়ই এক-আধটা মাছ আসতো তার ঘরে। দিবাকর জানে, এসবই মাধুর জন্যে। তবুও জোর করে মেয়ের বিয়ে দিলো ছোটো সাংডায়। তাছাড়া মোতিটাও পালালো। তখন অবশ্য বিয়ে পাকা। তবু বুকের মধ্যে একটা উশখুশ ছিলো। মোতি পালাতে বুকটা হালকা হলো। অতোটুকু ছেলেকে জামাই করতে হলে আরো দুপাঁচ বছর মাধুকে ঘরে রাখতে হতো।

দিবাকর ভেবেছিলো, বিয়ে হলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। মাধু ভুলে যাবে। কিন্তু তা হলো না। সবই অদেষ্ট। মাধুর বিয়ের পর ও মনে মনে হেসেছিলো। জেতার হাসি। আজ তার মনে হয় সে হেরে গেছে। মোতি গাঁয়ে ফিরেছে। কি টগমগে জোয়ান চেহারা। এখনো কাকা বলে। মাথা নোয়ায়, হাসে।

আবার ভাবে, না হারেনি। সবটাই নিয়তি। এই যে বামুনপাড়ার নিবারণ খুড়োর মেয়ে মিনতি বিয়ের দু মাস না ফিরতেই হাতের নোয়া কপালের সিঁদুর খুইয়ে ফিরে এলো, সে কার দোষ?

কি হলো বাবা খাও। আর খানিক শাগ দেবো।

দিবাকর না না করে—আজ খেতে বড্ডো অবেলা হয়ে গেলোরে। তেমন খিদে নাই। আরও দু গরস ভাত মুখে গুঁজে দিবাকর উঠে দাঁড়ায়।

আজকাল মাথায় বড়ো বেশী চিন্তা-ভাবনা। আগে দিবাকরের কখনো এরকম হয়নি। চেষ্টা করেও তাড়াতে পারে না। দুনিয়াটা দিনদিন কেমন বদলে যাচ্ছে। আজকালকার ছেলেছোকরারা একদম উল্টো ধারার। বড়োদের খাতির করে না। ইজ্জত দেয় না। উদ্ধত বেপরোয়া ভাব। সবকিছুর ব্যাখ্যা চায়, পুরনো সবকিছুই তাদের চোখে খারাপ। বড়োলোক ভদ্রলোকদের হিংসে করে। নিজেকে তার ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ লাগে। মনে হয় এই খাকি পোশাক পরে সে আর এখানে বাস করতে পারবে না। আগে ভয় ডর ছিল না। মাঝরাতে গাঁয়ের কুলি কুলি টেমি লণ্ঠন আর লম্বা লাঠি নিয়ে হাঁক দেওয়ার সময় গর্ব লাগতো। গ্রামবাসীদের সজাগ রাখতো। গোটা মহল্লার সে পাহারাদার। তার ওপর নির্ভর করেই এতোগুলো মানুষ আরামে ঘুমোচ্ছে। এটা কম কথা নয়। আজকাল কি রকম ভয় করে। মনে হয় কুলিতে কুলিতে অন্ধকারে কারা যেন লেপটে আছে। হঠাৎ ভাব ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিছুদিন আগেও এ ভয় ছিলো না। সে রাতেই গাড়ী এসে তুলে নিয়ে গেছে। টিঙ্কু, হাবুল আর মনাকে। শিবেন, রঞ্জন আর বাবলুরা পালিয়েছিলো।

রঞ্জন কেমন করে যেন জেনেছিলো। দিন দুই আগে দিবাকর দোকান থেকে ফিরছিলো। কুলির মুড়োয় আঁধার জমেছে। হঠাৎ রঞ্জনের সামনে পড়ে গেলো। দিবাকর ভয়ে আঁতকে উঠেছিলো। রঞ্জন পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলো। দিবাকর নড়তে পারে নি।

কাজটা ভালো করো নি দিবাকরদা—রঞ্জন বলেছে। দিবাকর চুপ করে ছিলো। কোনো আওয়াজ নেই কোথাও।

তুমি তো আমাদের শত্রু নও। তুমিও খেটে খাও। আমাদের বন্ধু। আমাদের শত্রু জমিদার, জোতদার, সুদ খোর মহাজন। তবে তুমি কেন.....একটানা অনেকগুলো কথা রঞ্জন শোনালো।

তারপর শাসালো—ফল খারাপ হবে। দালালী শব্দটাও যেন দিবাকর শুনেছে। শেষদিকে দিবাকর না, না ছাড়া আর কিছু বলতে পারেনি। রঞ্জন চলে যাওয়ার পরও সে অনেকটা সময় অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলো। রাতে ঘুম আসছিলো না। মাঝরাত পর্যন্ত জেগেছিলো।

সে কি সত্যি ভুল করছে? এই প্রশ্নটা মাথার পাক খাচ্ছিলো। কাজটা যদি ঠিকই হয়, তবে সে ভয় পাচ্ছে কেন? রঞ্জনের মুখের ওপর একটা কথাও সে কেন বলতে পারলো না? ব্রিটিশ আমলেও থানায় খবর দিয়েছে। গাঁয়ের অমরবাবু জেল থেকে ফিরে একদিন বলেছিলো—তুইই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিস। আর কটা দিন বাক, মজা বুঝবি। দিবাকর ঘাবড়ায় নি। বরং হাসতে হাসতে বলেছে—এক্ষে আপনারা যখন দেশ চালাবেন, তখন ঠিক এইরকম করেই দিবাকর আপনাদের সেবা করবে। কই, সে কথা তো আজ সে রঞ্জনকে বলতে পারলো না। ওরা কি তাকে খুন করবে? কথাটা ভাবতে তার গা শিউরে ওঠে। মনে হলো সে আগুন নিয়ে খেলছে। তার ঘরের চালেও আগুন লেগেছে। হাওয়ার নানা খবর আসে। থানার মধ্যেও আজকাল কেমন থমথমে ভাব। বড়োবাবু গম্ভীর। হাসিঠাট্টা ভুলে গেছে।

দিবাকর ঠিক করে যেভাবেই হোক ওদের ধরাতে হবে। গাঁ খালি করবে। তাহলে খানিকটা নিরাপদ, নিশ্চিন্ত। মোতি, রঞ্জন, বাবলুদের ফাটকে ঢোকালেই গাঁয়ে শান্তি আসবে। মা মরা রঞ্জন কেন এমন হয়ে গেলো। আর মোতি কম্পাউণ্ডার সেজে ভেতরে ভেতরে ও কি করছে!

স্বাধীনের কথা মনে পড়ে। স্বাধীনও কি লুকিয়ে এইসব করছে! ফি বছর পুজোর ছুটিতে আসে। এবার আসেনি। মাঝখানে দিন কয়েকের জন্যে জনা তিনেক বন্ধু নিয়ে এসেছিলো। সব সময়ে কি সব ফুসফুস করতো! অজানা ভয়ে দিবাকরের বুক কাঁপে। দু হাত জোড় করে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকে—আমার স্বাধীন যেন মোতি, রঞ্জন, বাবলুদের মতো না হয়। যে যাই করুক, তার ভালোমন্দ মাপার কোনো দরকার নেই। স্বাধীন যেন এসব নিয়ে মাথা না ঘামায়। তাকে বড়ো হতে হবে। মানুষ হতে হবে। চাকরি করতে হবে। তখন দিবাকরের বিশ্রাম, ছুটি। সেই সুখের দিনটা তাড়াতাড়ি চাই।

(১৩)

একটা ভাঙা কাল্সচে ধোঁয়া এই সময়ে বস্তির মধ্যে জমে থাকে। ইলেকট্রিক নেই। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় মনে হয় এক টুকরো কালো আকাশ ঘরে নেমে এসেছে। চাঁদ, তারা ওঠে না। হঠাৎ কখনো ভিজে লাগে।

রেবা মুখ গুঁজে বসেছিল। কিশোরও চুপ। কিছু বলার নেই। রেবার বুকে এক অসহায় কষ্ট দোলে। সেই লম্বা চওড়া কালো লোকটার মুখ অন্ধকারে জেগে থাকে।

আজ সকালে নিউ আলিপুরে রেবার ডিউটি ছিল। তখন দুপুর বারোটা। চারপাশ তাতছে। অনেক সকালে ও বেরিয়েছে। অথচ এতক্ষণে মাত্র তিনটে টেলিফোনের কাজ হলো। এক মহিলা বাড়ীতে ঢুকতেই দিলো না। কি মেজাজ!

আগে খবর না দিয়ে আসবে না।

রেবা বলে—অফিস থেকে আপনাদের জানিয়ে রাখার কথা। খবর পাননি?

মিথ্যে কথা বলছি আমি? গলায় ছুরির ধার।

না না, আমি সেটা বলিনি—রেবা ঘাবড়ে যায়। ও জানে এক টেলিফোনে এই মহিলা ওর চাকরি খেতে পারে।

পরে আসবো—ও পালায়।

রাস্তায় নেমেই হঠাৎ ওর মনে হয় চটার ভান করে মহিলা কি একটা লুকোতে চাইছিলো। সেইজন্য ঢুকতে দিলো না।

এরকম রোজই হয়। অনেকে মুখের ওপর ফ্ল্যাট বন্ধ করে দেয়। ফ্ল্যাটের বাইরে আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখে। কেউ বলে—ঘুরে এসো। দুঘণ্টা পরে।

প্রায় সকলেই তুমি বলে। আপনি বলে দু একজন। তারা মাথাভারী সরকারী কর্মচারী। বিজ্ঞ, বিদ্বান চেহারা। সাতবার ঘুরিয়ে পাঁচ টাকা বিল দেয়।

রাস্তায় লোকজন কম। শীতের দুপুর। চারপাশ ঝিমোচ্ছে। রেবা দরজার বেল টেপে। ভেতরে আবছা শব্দ। একটা পাখীর ডাক। কেউ আছে কিনা বোঝা যায় না এ পাড়ায় রেবা আগে কাজ করেনি। সবটাই অচেনা। ভেতরে কোনো সাড়া নেই। আবার বেল টেপে।

একটু পরে দরজা খুলে যায়। একজন কমবয়েসী চাকর দরজা খোলে। ফোন পরিষ্কার করতে এসেছি, রেবা বলে।

সে একদৃষ্টে রেবাকে দেখে। ভেতরে যায়। কথার শব্দ। এক মিনিট পরেই সে ফেরে। আসুন—সে ডাকে।

রেবা ঢোকে। ছেলেটার বয়েস বড়জোর বারো। সে দরজা বন্ধ করে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠে। বেশ বড়ো এ্যাপার্টমেন্ট। আধুনিক কায়দায় সাজানো।

ডানদিকে একটা ঘর। ছেলেটা বলে, এখানে ফোন আছে। ঘরের দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। রেবা পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। শোয়ার ঘর। বেশ বড়ো। লোকজন নেই। বেড সাইড টিপয়। কাশ্মীরী কাজ করা। তার ওপর টেলিফোন। সবুজে রঙ। লাক্সচ ইন্টারকম সেট।

রেবার হঠাৎ মনে হয়, ঘরের মধ্যে কেউ আছে। ওর গা ছমছম করে। ভয় নয়। ফিলে অস্বস্তি। বাড়ীর মালিক মিঃ ও. পি বিলানি। কোন জাত কে জানে। ঘরের হাওয়ায় সিগারেটের গন্ধ। বিছানার ওপর নজর পড়তেই ও থমকে যায়। আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। চাদরে নিঃশ্বাসের ওঠানামা। বড়ো খাট। সাদা ধপধপে চাদর। ও এক পলক থমকে দাঁড়ায়। তারপর টেলিফোনের পাশে যায়। বিসিভার খোলে। কিস লাগায়। ঘসে ঘসে পরিষ্কার করে। নিঃশ্বাসের শব্দ এখন পরিষ্কার শোনা যায়। চাদরের নীচে আবছা নড়াচড়া। হঠাৎ মেয়েলি গলার খিলখিল হাসি। রেবা চমকে ওঠে। চাদরের তলায় একজন মেয়েও আছে। তার বয়েস কম। হাসির ভঙ্গীতে বোঝা যায়। একটা ধারালো ভয় ওর বুক কাঁপে। কোনদিকে তাকানোর সাহস পায় না।

চাদর ফাঁক করে একজন মুখ বাড়ায়। দরজাটা একটু বন্ধ করুন—সে হিন্দিতে বলে—বেয়ারা বাথরুমে যাবে। রেবা তাকায়। কালো জগদ্দল এক মুখ। চওড়া গুতনি। সরু গোঁফ। আবার পাঁচ লাগানো মেয়েলি হাসি। রেবার কপালে ঘাম ফোটে। ও চোখ বোজে। হাল্কা পায়ে কে যেন খাট থেকে নামে। একছুটে চলে যায়। চারপাশ নিঝুম। ঘরটা দোলে। রেবা সামলে নেয়। প্রায় দু মিনিট সে অন্ধ সেজে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখের পাতা ভারী। ঝাপসা অন্ধকার। মনে হয় পেছনে একটা বাঘ ওৎ পেতে বসে আছে।

চোখ খুলুন—হুকুম হয়।

রেবা তাকায়। চড়া আলো চোখে ঝাপটা মারে। চোখে জল আসে। অদ্ভুত এক রাগ আর ঘেন্না শরীরে দাপায়। বড়ো অপমান লাগে। চটপট কাজ শেষ করে। ব্যাগ গোটায়। কোনো কথা না বলে বেরিয়ে আসে। চাদর ঢাকা বিছানা তখনও কাঁপছে।

আগে অফিস পাড়ায় ডিউটি ছিল। অনেক লোক, নিয়মমাফিক কাজ, কোনো ঝামেলা ছিলো না। দু মাস না ঘুরতেই এরিয়া বদলালো। শেফালী বলেছিলো—এটাই নিয়ম। এর নাম মারোয়াড়ী মালিক না। শাটদের অগাধ বুদ্ধি। সুশ্রী, ফুটফুটে মেয়েদের সব সময়ে বড়োলোক পাড়ায় ডিউটি দেয়। রাস্তায় নেমে রেবার মাথা ঘুরছিল। বার বার ইচ্ছে হয়, এই কাজটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু হয় না। নতুন কাজ চাই। একটু ভদ্র, ভিমহাম। সংসারের দায় কখোন যেন অনেকটা তার ওপর চেপেছে। সে বুঝতে পারে নি। এখন পেছোনো মুস্কিল। কিশোরের ওপর অভিমান হয়। বহু দিন পাত্তা নেই। গুরুর সে পার্টি ছেড়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে কেটে পড়েছে। কখন, পেয়েছিল তার গণপতি সান্ত্বনা দিয়েছিলো—ভেবো না। পথ পেরবে। জীবনটা অনেক বড়ো। গণপতির কথা কিছুই সে বোঝেনি। কিশোর বলেছিলো তাকেও গ্রামে নিয়ে যাবে। মেয়েদেরও সেখানে কাজ আছে। দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ। রেবা পার্টির বাইরের লোক। গাঁয়ে যেতে সে পিছপা নয়। নানা চেহারায় দুঃখ কষ্ট দেখেছে। ভয় পায় না। কিশোর কি সেকথা ভুলে গেছে। রেবা বেরিয়েছিল। ভুল বুঝেছিল কিশোরকে। নিজের ধান্দায় সে শহর ছাড়ছে না। রাজ-নীতি আর আদর্শকে সে কিশোরের চেয়ে কিছু কম ভালোবাসে না। কারো চেয়ে সাহসে সে খাটো নয়। মৃত্যু পর্যন্ত সে লড়তে পারে।

কলেজ, য়ুনিভার্সিটিতে সে পড়েনি। সেখানকার মেয়েদের মতো সে চটপটে নয়। কথা বলতে পারে না। হঠাৎ হেসে গম্ভীর হওয়ার কৌশল সে শেখে নি। তবুও তার মুখটা ফুটছে। এটা যেন কিশোর বোঝে না!

মুখচোরা মেয়ে। চুপচাপ বসে থাকে। কিশোর বলে, তার ধরা পড়ার কাহিনী। কিভাবে তারা কাজ করছে। গাঁয়ের গরীব সাঁওতালরা জাগছে। এর ফাঁকে সংগঠন তৈরী হয়েছে।

কিশোর ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে কথা বলে। দুটো বড়ো শক্তি কিভাবে পৃথিবীতে মাতব্বরি করছে, সেকথা শোনায়। তৃতীয় বিশ্বের ছোটো বড়ো দেশ-গুলোর মানুষকে এক হতে হবে। তাছাড়া উপায় নেই।

কিশোর কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো কথা বলে না। রেবার গাঁয়ে যাওয়ার কথা ও যেন ভুলে গেছে। রেবা ভাবে, এই এক অদ্ভুত মানুষ। জীবন আর রাজনীতি মিলে গেছে। আমার এরকম হয় না কেন। এই লোকটা আমাকে তৈরী করতে পারে। আমিও ব্যক্তিগত কথা আর রাজনীতিকে মিশিয়ে দেবো। আমিও অনেক স্বপ্ন দেখি। নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। সেগুলোকে বাঁচাতে চাই। বিপ্লবী লড়াইয়ে আমার জায়গা কোথায়? তার গাঁয়ে যাওয়ার কথা অন্য কারো মনে নেই। তাহলে কথাটা কিশোর কেন বলেছিল? কিশোর মন ভোলাবার ছেলে নয়। সে নিশ্চয়ই এক সময় বলবে।

রেবা মহিলা সমিতি করে। ওদের সংগঠনের কয়েকজন গাঁয়ে গেছে। খোলা মাঠ আর পুকুর। মাঠে, নদীর ধারে মেয়ে পুরুষ উল্টোমুখো বসে যায়। চোখে পড়লে না দেখার ভান করে। এমন জায়গা যে একটা জঙ্গল পর্যন্ত নেই—ললিতা বলেছিল। সাত দিনের বসদ পেটে নিয়ে বাপ বাপ বলে কলকাতায় ফিরেছে। চারটে মিলকে অব ম্যাগনেসিয়া ট্যাবলেট খেতে হয়েছিল তাকে।

বীণা কিন্তু টিকে গেছে। ও বিভাসের বৌ। য়ুনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে। অসুবিধেগুলো ও পেরিয়ে করে নি। তবে মাথায় সিঁদুর দিতে হয়েছে। হাতে শাঁখা নোয়া পরেছে। কলকাতায় ফিরবার সময় এগুলো ছোঁয় নি। গাঁয়ের লোক সন্দেহের চোখে দেখতো। ভাবতো খুব পালানো মেয়ে। জায়গা দিতে চায় নি। বিপদ বুঝে বীণা মত বদলেছে। রেবা জানে। বিপ্লব ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সাধারণ মানুষের চেতনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে। তাতে চেতনার মান কম না। বরং আরো পরিষ্কার হয়। দুচারজন পাকা মাথার মানুষ নিজেদের খেয়ালখুশি মতো এগিয়ে যেতে পারে না। যাওয়া উচিত নয়। তাতে পেছনের সারির হাজার হাজার মানুষের মনে ধাক্কা লাগে। তারা ভয় পায়। আরো পিছিয়ে যায়। পুরোনো ধ্যানধারণা আচার আচরণগুলো জরুরদস্ত মুড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। হাতে শাঁখা, মাথায় সিঁদুর পড়তে রেবার তাই কোনো লজ্জা নেই।

(চলবে)

২০৲ টাকার বই মাত্র ৫৲ টাকায়
ডাঃ সন্তোষ মুখার্জীর
ভগবদ্ গীতা ····· ৫৲
[সহজ সরল বাংলায় গীতার সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত • পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৮]
সৃষ্টি ভগবান ও সাধনা ···১০৲
অমর স্মৃতি ····· ১০৲
[নজরুল • রবীন্দ্রনাথ • শরৎচন্দ্র • মোহনানন্দ প্রভৃতির জীবনের অন্তরঙ্গ দিক]
কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী ·· ১০৲
এস. মুখার্জী এণ্ড কোং
৪৪, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

একটি বাল্যবন্ধুর প্রকৃত জীবনকাহিনী

শৈবালরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

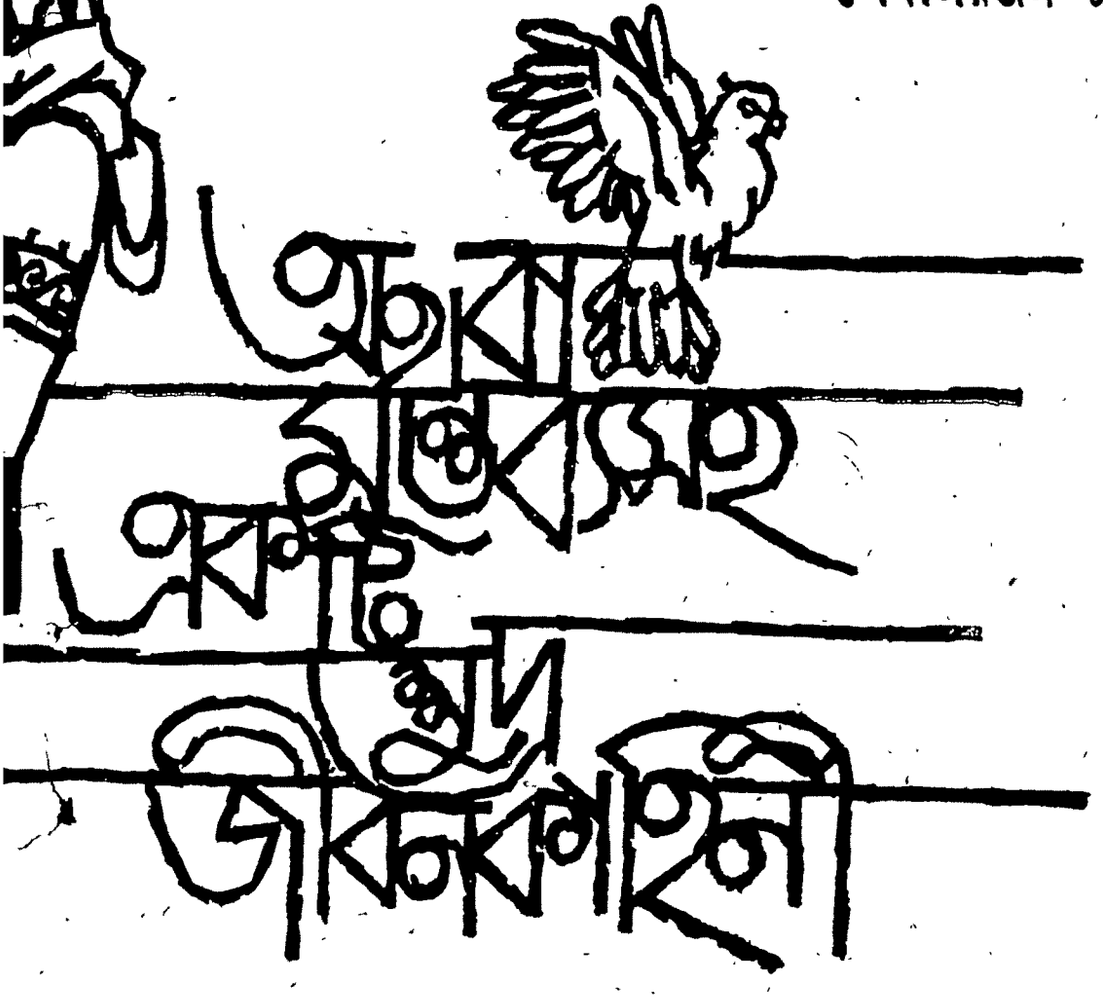

(বর্তমান লেখক এককালে কাহিনীর নায়কের পাড়ায় বসবাস করিত, সেই সূত্রে এই কাহিনী রচনা করিবার অধিকার আছে। বর্তমানে সে এই পাড়ায় নাই এবং যেখানে আছে, তৎপার্শ্বস্থ। ব্যক্তিসমূহ তাহার অতীত সম্পর্কে অবহিত নহেন, হইলেও তাহাদের পক্ষে লেখনী ধারণ সম্ভব নহে। লেখক ঠিক সময়ে এই রচনা প্রকাশ করিতে পারেন নাই বলিয়া ক্ষমা-প্রার্থী, কেননা তখন তিনি এমত মানসিকা-বস্থার ছিলেন না যে, তাহা কাহিনীর কেন্দ্রের চরিত্রের আত্মিক রহস্য এবং যে অদ্ভুত আলোক তাহাকে ঘিরিয়া অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্বরূপ অনুধাবন করিতে পারেন। লেখক তৎকালে একমনে ব্যাকরণ অধ্যয়নে রত ছিলেন। এই ঘটনা দুই বৎসরের পুরানো।)

তাহার পিতাঠাকুর শ্রীযুক্ত শিবচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সওদাগরী আফিসে করণিকের কর্ম করেন। করণিক বলিতেই দারিদ্র্যের যে চিত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, গৃহে তাহা নাই। শিবচরণ-বাবুর মালিককুল এক পৃথিবী-বিখ্যাত বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন কর্ম করিবার সূত্রে মাসান্তে যে অর্থ তিনি উপার্জন করেন, তাহা অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকটও ঈর্ষণীয় ঠেকে। ইহা ভিন্ন কলিকাতা শহরের দক্ষিণাঞ্চলে তাহার একটি সুগঠিত শিবতল বাটী আছে, ইহার নিম্ন-তলে দুই ঘর ভাড়াটিয়া অবস্থান করে। শিবতল ও ছাদসহ স্থান শিবচরণবাবু, তৎপত্নী ও সন্তানদিগের আবাসস্থল। নায়কই তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ, তৎকনিষ্ঠাটি একটি কন্যা এবং সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটিও পুরুষ জাতীয়। এই কাহিনী রচনাকালে নায়কের বয়ঃক্রম চব্বিশ, তাহার ভগ্নীর এগারো এবং ভ্রাতার নয় বৎসর। নায়ক বড় ভালো ছেলে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিসমূহের নিকট কোন কিছুকে ভালো বা মন্দ বলিতে বড় ভয় হয়, কেননা, তাহারা আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত। যাহাই হউক, বর্তমান লেখক ভালো বলিতেছেন কতক-গুলি সাধারণ বিষয়ের ওপরে নির্ভর করিয়া। সে নমঃ, কদাপি পড়াশোনায় অবহেলা করিত না, বিড়ি-সিগারেট খাইত না, কেবল পৌষ ও মাঘ এই দুই মাসে ঊষাকালে এক রূপ করিয়া গরম চা সেবন

করিত, কদাপি খেলাধূলায় তাহার মন ছিল না, পরিবর্তে ব্যায়াম করিয়া প্রত্যূষে ছোলা গুড় ভক্ষণ করিত, পৈতার পর হইতে নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করিত, সামবেদীয় সন্ধ্যা-পদ্ধতি বইখানি তাহার মুখস্থ। তাহার অসাধারণত্ব এইখানে যে, সে সমবয়স্ক অন্যান্যদের ন্যায় কখনোই জীবনকে হালকাভাবে গ্রহণ করে নাই। সমসাময়িক রাজনীতিতে তাহার কোন উৎসাহ নাই, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের বিশ্বযুদ্ধ লইয়া কখনোই মন্তব্য করে না, কোন বারোয়ারী পূজায় চাঁদার খাতা হস্তে ঘুরিতে দেখি নাই। সঙ্গীরা তাহাকে সমীহ না ভয় করে প্রশ্ন করি নাই।

সে যেইবার চারিটি লেটার সহ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আত্মীয়কুল যাহাদের কথা ' অদর্শন হেতু প্রায় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল, অকস্মাৎ আসিয়া গৃহের শান্তি কলকল ধ্বনিতে মুখর করিয়া তুলিলেন এবং রক্তের গভীর সম্পর্কের জোরে শিরচরণ-বাবুকে ছেলের বর্তমানে কি করা উচিত ও অনুচিত ইত্যাকার বিষয়ে অযেচ জ্ঞান বিতরণ করিলেন। কাহারও সহিত কাহারও মত মিলিল না। যুক্তি তর্ক চলিতে লাগিল এবং কূটতর্কের সেই অন্ধকার ধূম ভবিষ্যৎ জীবন যখন প্রায় ধূম্রাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে—সৌভাগ্যক্রমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল।

১। সাধারণ পড়াশুনা মুখেরাই করিয়া থাকে। বর্তমান যুগে অর্থাগম ভিন্ন নাকি দ্বিতীয় অর্থ নাই, ২। নব্য বাস্তুকারগণ চাকুরিবিহীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, ৩। চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ নির্দিষ্ট হইল।

সে এই সিদ্ধান্ত বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইল। (লেখক যে তাহাকে মিথ্যাই ভালো ছেলে বিশেষণে ভূষিত করেন নাই তাহা পুনর্বার প্রমাণিত হইল।)

।। ২ ।।

পরবর্তী পাঁচ বৎসরে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটিল না। কোন বছরে কলিকাতায় বর্ষণ বড় বেশি হইল। পলতাঘাট ভাসিয়া গেল। গ্রামাঞ্চলে ধানগাছ ডুবিল। শহরে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। খবরের কাগজে ইতালীতে ভূমিকম্পের সংবাদ প্রকাশিত হইল। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ থামিয়া গেল। ওয়াটারগেট কেলেংকারীর জল বহুদূর গড়াইয়া নিক্সন সাহেবকে নাকানি-চুবানি খাওয়াইল। সি এম ডি এ গঠিত হইল। চোর চুরি করিতে লাগিল। সাধুগণের দাড়ি আরও বৃদ্ধি পাইল। কিছু নূতন এই পৃথিবীতে আসিল, কিছু পুরাতন ছাড়িয়া গেল। দেশে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইল। এইসব ঘটনা ও দুর্ঘটনার মাঝখানে কাহিনীর নায়ক মনোসংযোগ করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিল। প্রতি বছর সে মেধার জন্য জলপানি লাভ করিত এবং সকলেই এই বিষয়ে শঙ্কাতুর হইলেন যে, নির্বিরোধী শিবচরণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি না কেউকেটা হইয়া উঠে! সে প্রণয়ে লিপ্ত হইল। কন্যাটি তাহার সহিত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তাহার নীরব প্রতিভা নায়িকার হৃদয়স্থিত ঘুমন্ত প্রণয়কে সরব করিয়া তুলিল। দেবীকা তাহার সযত্নে রক্ষিত প্রণয়কুসুমটি নায়কের পদে সমর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিল। তাহার সম্মুখে নূতন অভিজ্ঞতার দুয়ার খুলিয়া গেল—সে চুম্বনে অভ্যস্ত হইল (এরপর হইতে আমরা তাহাকে 'আপনি' বলিব, কেননা, নারী সংসর্গে আসার পূর্ব অবধি পুরুষমানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হয় না।)

।। ৩ ।।

ফাইনাল পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে একদিন দ্বিপ্রহরে বৈদ্যুতিক পাখার ঘূর্ণন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইল, সবাই ভাবিল বিদ্যুৎাভাবকাশ। কিন্তু দেখা গেল, অপর সকল প্রতিবেশীর গৃহে বিদ্যুৎপ্রবাহ বর্তমান। কারিগর আসিয়া জানাইল বাটীস্থ সংযোগে কিছু গোলযোগ হইয়াছে এবং নূতনভাবে তার সংস্কার করিলে ভালো হয়। গৃহ পাঁচ দিবস অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিল। তিনি চিলেকোঠার ঘরে বসবাস করিতেন। তখন শুক্ল পক্ষ। তিনি মোমবাতি জ্বালাইলেন, না, চন্দ্রালোকে গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। শিবচরণবাবু বলিলেন, 'তোর চক্ষুপীড়া হইবে।' তিনি বলিলেন, 'চিন্তার কারণ নাই আমার ভিসন ৬/৬'। এইরূপে দুই দিবস কাটিয়া গেলে একদিন মধ্যরাত্রে তিনি একমনে ছাদে দাঁড়াইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে মনে দাদামহাশয়ের স্মৃতি জাগরূক হইল। তিনি পুরানো আমলের আই সি এস ছিলেন। তাঁহার সাজে-পোশাকে, হাঁটাচলায় ঔনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজদের ছবি এত স্পষ্ট ফুটিত যে লোকে তাহাকে অদ্ভুত সম্ভ্রমমিশ্রিত ভীতির চক্ষে দেখিত। তিনি যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে খুবই ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। দিদিমা তাঁহার এই দুই গুণের প্রতি এরূপ বিরূপ যে, একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে ব্যস্ততাবিহীন করিবার ও নৈকষকুলীন সন্তান শিবচরণ বাবাজীবনের হস্তে সমর্পণ করেন। শেষ বয়সে দাদামহাশয়ের আর কোনো ব্যস্ততা ছিল না। লোকজনও কাছে আর আসিত না। তিনি নির্জন ছিলেন। এমতাবস্থায় জীবনের শেষ দুইটি বছর দশ বৎসরের নাতীটিকে কাছে টানিয়া লন। বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, নাতীটিকে তিনি দীর্ঘদিন করণিক-সন্তান বলিয়া ঘৃণায় দূরে রাখিয়াছিলেন। হয়তো উপলব্ধি করিয়াছিলেন মানুষকে পেশায় নির্ণয় না করিয়া করিতে হয় তাহার অন্তরলোক আহরণের দ্বারা অথবা তিনি নিঃসঙ্গতার দ্বারা এতই ক্লান্ত ছিলেন যে, এই বালকের আসন বানপ্রস্থের মরুভূমিতে নন্দনকাননের ন্যায় বোধ হইত। তিনি তখন কি বলিতেন, নায়ক তাহার বেশীর ভাগই বুঝিতেন না কিন্তু ভালো লাগিত। তিনি চোখ বুজিলেই অনুভব করিতেন, দাদুকে যেন এক অলৌকিক রশ্মি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি দাদুকে যেন স্পষ্ট দেখিতে পান না। দাদুর শেষ এক বছরের বলা অনেক কথা সম্পর্কেই তার এইরূপ ধারণা হয় যে, সেইগুলি ঢাকনার দ্বারা আবৃত। একদিন ঢাকনা খুলিয়া আসল অর্থ উদ্ভাসিত হইবে। তিনি মাঝে মাঝে বোধ করি সেকারণেই মাতামহের কথা ভাবিতেন। বোধহয় কিছু কিছু আভাসে বুঝিতেন (এর কোনো প্রমাণ লেখকের কাছে নাই, কেবল অনুমান মাত্র।) সেদিন বিশেষ করিয়া একদিনের কথা মনে পড়িতে লাগিল। মাতামহ তখন এস ডি ও-র কর্ম করেন। একদিন অধীনস্থ গ্রাম পর্যটনে বাহির হইয়া গ্রামস্থ মোড়লের বাড়িতে গিয়া চাকুরীর আইন অনুযায়ী গ্রামের চাষা-ভুষাদের সহিত আলাপ করিয়া লইবার মানসে ইংরাজী কায়দায় আবহাওয়া দিয়া আলোচনা শুরু করিলেন, 'এই বছর শীতকাল হইতে টুক্ করিয়া কখন গরম পড়িয়া গেল বুঝিতেই পারা গেল না।' এস ডি ও সাহেবের এই কথার উত্তরে অতি নিরীহ, নিরক্ষর, ভূতো নামে এক ভিক্ষুক-তুল্য ব্যক্তি, গ্রামবাসীরা যাহাকে আহার আসক্তির কারণে গেঁজেল ভূতো বলিয়া ডাকে, অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল; তাইতো হয় বাবু। তাইতো হয়। দিনের শেষে কখন টুপ্ করিয়া আলগা পায়ে সন্ধ্যা নামিয়া আসে বুঝিতে পারেন।' তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন, তাহার চক্ষু এই কথা বলিবার কালে অশ্রুসিক্ত হইয়া অতি দূর নভে কোথাও গিয়া পতিত হইত। তিনি বলিতেন, 'বলতো দাদুভাই অমন কথাটা ওই গেঁজেল কেমন করিয়া বুঝিল আর আমার বুঝিতে কেন এক বিলম্ব হইল। আরও অনেক কথাই বলিতেন, যেমন, 'দাদুভাই কখনো বৃদ্ধ হইও না। বৃদ্ধ হইয়া গেলে মানুষ বড় একা হয়। অভিজ্ঞতার ভার সবাই বহন করিতে পারে না।' কখনো বা বলিতেন, 'সব আত্মারাই পক্ষীস্বরূপ, ডানাকে ব্যবহার করিয়া উঠিবার আনন্দ উপভোগ্য।' নায়ক মধ্যরাত্রে নির্জন নক্ষত্রমণ্ডিত চন্দ্রাতপ প্লাবিত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া যেন দাদুর সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন, হৃদয় এক আশ্চর্য আনন্দে ভরিয়া যাইতেছে। তিনি স্পষ্টতঃ বাস্তব, ধর্তব্য, দাহ্য, নশ্বর বা অবিনশ্বর কিছুই পাইলেন না, শুধু বুঝিলেন, দূরে কোথাও কানন আছে, পুষ্প ফুটিয়াছে আর এই নির্জন নিশীথের বুকে সুগন্ধ আসিয়া লাগিতেছে। এইরূপে কিছুক্ষণ অন্তরে এক অনাস্বাদিতপূর্ব ছায়া আলোকের খেলা চলিল। ক্রমে ঘুম আসিল। ঘরে ঢুকিয়া খাটের ওপরে গুটিশুটি হইয়া শুইয়া পড়িলেন। আবেগকম্পমান অথচ নিথর হৃদয়ে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলেন নিজেই বুঝিতে পারিলেন না।

।। চার ।।

পরদিবস শেষ রাত্রির নিঃসঙ্গতাকে সরব করিয়া যখন প্রথম ট্রাম যাত্রা করিল, তখন তিনি আধো ঘুম আধো জাগরণে। প্রত্যুষের সূর্যালোক বাতায়ন পথে আসিয়া তাহার মুদিত চক্ষুপল্লবের উন্মীলন ঘটাইল। উঠিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি আর তিনি নাই 'অন্য কেউ' হইয়া গিয়াছেন। এই গোপন পরিবর্তনের কথা কাহাকেও জানাইলেন না। তবু সকলেই আঁচ পাইল। তাহার কথায় ঘুমের ঘোর লাগিল। প্রতিটি কথা ও আচরণ অমোঘ-ভাবে বাহির হইতে থাকিল। পালে বাতাস লাগিল। ভিতর হইতে সেই 'অন্য কেউ' আপন কেরামতী দেখাইয়া চলিল। ঝড় উঠিল। বন্ধুবান্ধব তাহার কথাবার্তায় এক নূতন সুর শুনিল। খানিক বুঝিল। খানিক বুঝিল না। তবে এইটুকু বুঝিল তিনি আজকাল বড়ই অন্তর দিয়া কথা বলেন। মানুষকে ভালোবাসিবার, সাহস করিয়া কথা বলিবার জোর কোন অজ্ঞাত কারণে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলেন 'আমার ঘুম ভাঙিয়াছে। আমি জাগা লোক খুঁজিতেছি।' কাহার মধ্যে ভালো কিছু দেখিলে যার পর নাই খুশী হন এবং অহেতুক বার বার প্রশংসা করিতে থাকেন। তিনি আনন্দবাহী। মলয় পবনের ন্যায় শীতল স্বাদে সকলকে উতলা করিয়া নিজে বাহির হইবার পথ খুঁজেন। দেবীকার সহিত সম্পর্ক একদিন চরমে উঠিল। তিনি কয়েক দিন হয় দেবীকাকে স্পর্শাদি করিতে চাহিতে ছিলেন না উপরন্তু তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা চালাইতে ছিলেন যে ইন্দ্রিয়াদি সুখ আসলে আমিত্ব হইতে উদ্ভূত হয়। পিতা শিবুবাবুর আজ কাল যেন কি হইয়াছে অফিস হইতে ফিরিয়া খান দুই কালীকীর্তন না গাহিলে তাহার কেমন শূন্য শূন্য ঠেকে। পুরানো রীড ভাঙ্গা হারমোনিয়ম হইতে ধুলা ও মাকড়সার জাল দূরীভূত হইয়াছে। তিনি পিতার সঙ্গীত দৈনিক শ্রবণ করেন। এক-দিন ভাতখন্ডের একখানি গ্রন্থ পিতার জন্য কিনিয়া আনিবার পর মনে পড়ে পিতা হিন্দী ভাষা জানেন না। উক্ত গ্রন্থ সযত্নে আপন বাক্সে রাখিয়া দেন। মাতা প্রভাবতী দেবীর দীর্ঘ সাতাশ বৎসর সংসার জীবনে এই প্রথম অবহেলা দেখা যায়। অর্ধেক দিন ব্যঞ্জন আলোনা হইয়া যায়। অর্ধেক দিন স্বামীর টিফিন বাক্স গুছাইয়া রাখিতে ভুলিয়া যান। বেশীর ভাগ দিন রন্ধনের বিলম্ব হেতু অফিসে বিলম্ব হইয়া যায়। মাঝে মাঝেই ছোট গীতাখানি হস্তে পুত্রের কাছে ছুটিয়া আসিয়া প্রশ্ন করেন, 'খোকা এ জায়গাটার মানে কী রে' তিনি মাতাকে বলেন, 'মানুষের দুইটি জিনিসের বড় প্রয়োজন ১। সাধারণ জ্ঞান ২। মনস্তত্ত্ব। ইহার একটিও বই পড়িয়া লাভ করা যায় না। নিজেকে জানিলেই সব প্রশ্নের উত্তর আপনা হইতে মিলিয়া যায়।'

নজরুল গীতির নতুন রেকর্ড

পপুলার এল পি রেকর্ড

দাম ৩২ টাকা, কর অতিরিক্ত

দি জিনিয়স অব কাজী নজরুল

ফিরোজা বেগম
গানগুলি মোর,
জানি জানি প্রিয়,
হাসি মুখে বাসি ফুল,
মুসাফির, মোছরে আঁখি জল
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বাগিচায় বুলবুলি তুই,
কেন কাঁদে পরান,
অরুণকান্তি কে গো,
দাঁড়ালে দুয়ারে মোর
অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
দক্ষিণ-সমীরণ সাথে,
কে নিবি ফুল,
ফুলের জলসায়,
থই থই জলে
অনুপ ঘোষাল
সাজিয়াছ যোগী,
বসিয়া বিজনে,
আমি চির তরে দূরে,
চাঁদ হেরিছে

এল পি-৪৫ রেকর্ড (স্টিরিও)

দাম ২৬ টাকা, কর অতিরিক্ত

ভক্তিমূলক গান

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মালো চিন্ময়ী রূপ,
মাস নে মা ফিরে,
তোর নামেরি কবচ,
আমার আর কেনোনা ঙপ,
বাঁশী বাজাবে কবে,
আমি নতুন করে গড়বো,
হে মাধব, হে মাধব,
হে গোবিন্দ রাখ চরণে

সুপার সেভেন (স্টিরিও)

অনুপ ঘোষাল
গাঙে জোয়ার এলো,
গুঞ্জমালা গলে,
তুমি প্রত্যুষের সকরুণ,
শ্মশান কালীর নাম,
মেঘবিহীন খর বৈশাখে,
তুমি শুনিতে চেয়োনা

ঈপি রেকর্ড

অধীর বাগচী
তুমি সুন্দর তাই,
রসঘন শ্যাম,
দোলন-চাঁপা বনে,
শিউলি ফুলের মালা
নীতিশ দত্তরায়
হংস-মিথুন ওগো,
মহাকালের কোলে
মীরা দত্তরায়
তোমার বিনা তারের,
পালিয়ে তুমি বেড়াবে
আরতি মুখোপাধ্যায়
মোর না মিটিতে আশা,
পথহারা পাখী, বসন্ত মুখর,
কার বাঁশরী বাজে

আবৃত্তি

কাজী সব্যসাচী
বালাশোর—
বুড়ী বালামের তীর,
নব-জীবনের নব-উত্থান,
বারে বারে যথা কাল-বৈশাখী,
নতুন পথের যাত্রা-পথিক,
ওঠরে চাষী, ওরে ও শ্রমিক,
বন্ধু গো সাকী,
রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী

এস পি রেকর্ড

সমরেশ রায়
আগুন জ্বালাতে আসিনি,
তোমার হাতে সোনার রাখী

HMV

হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

GC 9772

।। পাঁচ ।।

শুধু এইটুকু মাত্র হইলে কোনো ক্ষতি ছিল না. কিন্তু তাহার চরিত্রে একটি বিপদজনক ব্যাধি দেখা দিয়াছিল—তিনি অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার গম ভাঙ্গানো কলের মালিক মানিক সাহা তেজারতী ও বন্ধকী কারবারে বেশ দুই পয়সা করিয়াছে। সে নাকী আটায় তেঁতুল বিচি গুঁড়াইয়া দেয় এ খবর তাহার কানে যাওয়ার পর হইতে তিনি তক্কে তক্কে থাকিলেন। হাতে নাতে ধরিবার পর অকারণে তাহার মুখে দেওয়ালে এমন নিষ্ঠুর ভাবে রগড়াইয়া দিলেন যে স্ত্রীর পক্ষেও স্বামীকে চেনা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। একদিন বৈকালে রাস্তার মোড়ে দন্ডায়মান থাকার সময় একজন শান্তিরক্ষক এক জুতা পালিশওয়ালার নিকট হইতে একটি সিকি পকেটস্থ করিতেছে এই রূপ অবলোকন করিয়া উক্ত শান্তিরক্ষককে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া সোজা থানায় লইয়া গেলেন। সেই স্থানে বিশেষ আমল না পাওয়ায় টিফিনের জমানো পয়সায় থানার বড়বাবুর নামে মোকর্দমা ঠুকিয়া দিলেন। স্থানীয় বিধানসভা সদস্য নিজ এলাকার বেকার যুবকদের চাকরী দিবার প্রলোভন দেখাইয়া আড়কাঠির মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করিতে ছিল। সেই ভয়ংকর দিনটি ছিল রবিবার। কাল প্রভাত। তিনি তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিবার ঘরে স্ব-পারিষদ সদস্য মশাইকে এমন যারপরনাই মানহানি করিলেন যে ঐ বিখ্যাত ব্যক্তিটিও তাহার বহু আয়াসে রক্ত মুখের বৈরাগ্যময় হাসি হাসি ভাবটি ধরিয়া হাসিতে সক্ষম হইল না। মৌচাকে ঢিল নিক্ষেপ করা সহজ কিন্তু সামলানো কঠিন। গণ্য মান্য ব্যক্তিরা নায়কের এই রূপ আচরণ সহ্য করিতে সম্মত কারণেই রাজী ছিলেন না। তাহারা প্রমাদ গনিলেন। সভা ডাকিলেন। সভায় সভাপতি হইলেন বাবু শ্রীযুক্ত মানিক সাহা মহাশয়, তাহার নাকের ব্যান্ডেজ তখনও খুলা হয় নাই। বিধানসভার মাননীয় সদস্য মহাশয় সভায় মানিকবাবুর সততা ক্ষমা ও সহনশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিল কিন্তু নায়কের এই বর্বরোচিত হিংসত্রতার বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা প্রস্তাব গৃহিত হইল না কারণ সিদ্ধান্ত এ হইল 'পড়াশুনার চাপে ছেলেটার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।' রায় বাহির হইল, 'এই ভয়ংকর ও হিংস্র প্রকৃতির উন্মাদ বাহিরে থাকা বিপদজনক অতএব তাহাকে উন্মাদাশ্রমে পাঠানো হউক।' তাহার দাদা মহাশয়ের শেষ বয়সের উন্মাদ হইবার সংবাদ দাখিল করায় সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন কেন না পাগলামী রোগটি নাকি বংশানুক্রমিক। জনৈক নিরীহ শিবুবাবুকে ডাকিয়া সিদ্ধান্ত জানানো হইল। চোখের জলে ভাসিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন কবনিকের কর্ম করিবার হেতু তিনি প্রতিবাদের ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নীরবে আদেশ মানিয়া লইলেন। এই খবর যখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জানিতে পারিল (কাহিনীর নায়ককে আমরা আবার তুমি বলিয়া সম্বোধন করিব কেন না বাতুলকে আপনি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন নিরর্থক।) তাহার মুখের একটি রেখাও কম্পিত হইল না, যথানিয়মে তাহার পড়াশুনা ইত্যাদি দৈনিক কার্যাদি করিয়া যাইতে লাগিল। সহবাসী মানুষদের দৃষ্টি তাহাকে দর্শন করিবামাত্র কেমন শঙ্কাতুর হইয়া উঠিতেছে, যেন সে দেখিয়াও দেখিল না। আজকাল তাহার বর্তমানে উপস্থিত ব্যক্তিসমূহ তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া যেসব চাপা চোখের ইশারা ও মন্তব্য করে সেগুলিকে সে উপেক্ষার অতলে রাখিল। এদিকে আর এক সমস্যা বাধিল। পাগল হইলেই তাহাকে পাগলা গারদে দেওয়া কঠিন। ভয়ংকর পাগল হওয়া চাই। এদিকে মানিকবাবু প্রহৃত হওয়ার পর থানায় যান নাই (তেঁতুলবিচি রহস্য ফাঁক হইয়া যাইবার ভয়ে কি?) কিন্তু জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব যাহাদের লইতে হয়; তাহারা জানেন, উক্ত কর্ম সমাধা করিবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ শাস্ত্রে দোষণীয় নহে। তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে কর্ম করিলেন। স্থানীয় থানায় এই মর্মে ডাইরী লিপিবদ্ধ হইল যে, সে নাকি উন্মত্তাবস্থায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া পথচারীদের ইষ্টক নিক্ষেপ করিতেছিল। সাক্ষীর অভাব হয় নাই। গেস্তারকালে সে শুধু একবার মাতার দিকে বিবর্ণ চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল। ভ্রাতা ভগ্নীকে খুঁজিয়াছিল কিন্তু জানিত যে, তাহারা আজকাল ভয়ে তাহার নিকটে আসা বন্ধ করিয়াছে। সে রাগ করিল না। কেন জানি ভয়ও পাইল না। সে জানিত, একদিন ভোরবেলা হইতে 'সে' 'অন্য কেউ' হইয়া গিয়াছে।

।। ছয় ।।

শিবুবাবুর বাড়িতে কিছুকাল স্মরণ-জনিত অশ্রুপাত ঘটিল। ক্রমে ক্রমে সব শোকই ঔজ্জ্বল্য হারায়। যাহারা তাহাকে ভালবাসিত, তাহাদের মন হইতে একটানা বর্ষণ কাটিয়া গিয়া মাঝে মাঝে রূপালি রেখাদের রেখা দেখা যাইতে লাগিল। গমে তেঁতুলবিচি মিলিতে থাকিল। শান্তি-রক্ষকগণের উৎকোচ গ্রহণ চলিতে থাকিল। আড়কাঠিরা যথারীতি অর্থ সংগ্রহ করিয়া চলিল। সে যাহাদের বুকের ভিতর হইতে 'অপর কাহাকে' বাহির করিয়া আনিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তাহারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গেল। নিজেদের খুঁজিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনেকেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আবার হারমোনিয়মে ধুলা জমিল। রান্নাবান্নার সুস্বাদ পুনর্বার ফিরিয়া আসিল। ভাগবতগীতা স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল।

সে যে স্থানে প্রেরিত হইয়াছে, তথায় কিছু ব্যক্তি নিয়ত তাহাকে ঘিরিয়া আর্তনাদ বা নৃত্য করে, নখর বা দংশনাঘাত তাহার শরীরকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। কেহ বা দিনভর নিশ্চুপ বসিয়া থাকে। কেহ বা ছায়ার সাথে কথা কয়। শুনিয়াছি এই সকল স্থানে কিছুকাল বাস করিলে সুস্থ ব্যক্তিও অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাহারও মনের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে সে আনন্দে আছে। বসিয়া বসিয়া ভাবে, কারাগারসমূহ একদিন উন্মুক্ত হইবে। বাহিরের লোক ভিতরে আসিবে। ভিতরের মানুষেরা বাহিরে গিয়া খোলা আকাশের নীচে শ্বাস লইবে। সে কখন পাতিলে জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কম্পন-গুলিকে অনুভব করে। চোখ বুজিলে বৃহৎ ধ্যানমগ্ন বরফাচ্ছাদন পর্বতশিখর দেখিতে পায়।

(তুমি একি করিলে! তোমার ভবিষ্যৎ গঠিত হইতে চলিয়াছিল। এই দেশের পাঠ শেষ করিয়া তুমি উপাধিধারণ হেতু সমুদ্রপারে যাইতে পারিতে এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মধ্য কলিকাতা অঞ্চলে চেম্বার বসাইয়া বত্রিশ টাকা দক্ষিণার চিকিৎসক হইতে কোন অসুবিধা ছিল না। তোমার মাথায় কেন এই 'অন্য কাহার' ভূত চাপিল। আর যদি চাপিলই, কেন তাহা অঘোষিত রাখিলে। তুমি কি অবিরাছিলে ভালো এবং সত্য মানুষ বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লয়।)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। আঠের ।।

হাসি আর থামেই না। হাসির দমকে জঙ্গলের গাছপালাকে সুদ্ধু যেন তাক লাগিয়ে দিচ্ছে আবু রববানী। অদূরের নতুন চারা বেডে-এ যে তিন-চারটে লোক কাজ করছে তারাও মাঝে মাঝে এদিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে। আবু রববানী জঙ্গলের অনেক-গুলো খেটে খাওয়া লোকের মুরুব্বি এখন। দস্তুর মতো কড়া মানুষ আর দাপটের মানুষ। সেই লোকের এত ফূর্তি আর এমন হাসি ওদের কাছেও নতুন কিছু।

একটু সামলে আবু বলল, তুমি বাপীভাই সেই আট বছর আগে থেকে ধরে নিয়ে বসে আছ আমি বেশমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি! এত চৌকস হয়েও তুমি ভাবলে কিনা বেশমার জন্য আমার কলজে পুড়ছে! বোশো, ঘরে ফিরি আগে, দুলারি শুনলেও হেসে গড়াবে।

বোকা বনলেও বাপীও হাসছে। নিজের এমন বিতিকিচ্ছিরি ভুলটা স্বীকার করতে আপত্তি নেই। ওর এত হাসি আর এত আনন্দ দেখে স্বস্তিও বোধ করছে। বাইরে যত হোমরাচোমরা হয়ে উঠুক ভিতরের মানুষটা খুব বদলায়নি।

নিজের ঘর-বাড়িতে অমন একখানা ঝাপটা খেয়ে তিক্ত মেজাজে বাপী আবার জঙ্গলে ঢুকেছিল। বাড়তি ঘর তুলে সাজিয়ে গুছিয়ে ওই নেপালিনী সে-রকম ফাঁকিয়ে বসেছে, তাতে নিজের ডেরার ঠাঁই মেলার আশায়ও জলাঞ্জলি। ভরসা আবু রববানী। কিন্তু সেও নাকি মস্ত মানুষ এখন, তার মতি গতি কেমন দেখবে কে জানে।

জিগ্যেস করতে আঙুলের নিশানায় একটা লোক বলে দিল, ওদিকে নয়া চারা বেড় হচ্ছে, আবু রববানী সেদিকে আছে—

নিশানা ধরে এগোতে এগোতে বাপীর মনে হল জঙ্গলটার কিছু যেন উন্নতি হয়েছে। বড় বড় গাছগুলোর সাদা রং মাখানো গুঁড়ির ওপর কালো কালো নম্বর-গুলো বেশ চকচকে লাগছে। পড়ন্ত বেলাতে এদিক সেদিকে দুই-একটা করে লোক কাজ করছে। রাবারের নল দিয়ে কেউ গাছে জল দিচ্ছে, কেউ আগাছা পরিষ্কার করছে। কাগজে-কলমে কাজের লোক আগেও ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ সময় তাদের খুঁজে-পেতে বার করতে হত। বাপীর মনে হল জঙ্গলটা কিছু যত্নের ছোঁয়া পেয়েছে।

পিছন ফিরে থাকলেও দূর থেকে আবুকে চিনতে অসুবিধে হল না। পরনে খাকি ফুল প্যান্ট, গায়ে চকচকার মোটা আঁট গেঞ্জি। চওড়া কাঁধ, আগের থেকেও কিছু লম্বা লাগছে ওকে। কালো সুপুষ্ট দুই বাহু। এক হাতের কব্জিতে দড়ি অন্য হাতে ছোট মোটা ছড়ি। ছড়ি দেখে ওর হাতের সেই লম্বা শক্ত পোক্ত লাঠিটার কথা মনে পড়ে গেল, যার একদিকে ইস্পাতের ঝকঝকে ধারালো ফালা গোঁজা আর তার ওপরে লোহার ক্যাপ। ওই লাঠি আবুর চোখের মণি ছিল একদিন। মস্ত মানুষ হয়ে এখন কি সেটা বাতিল করেছে? দেখলে মনে হবে জঙ্গলের কোনো ছোটখাট অফিসার বুঝি লোক দিয়ে কাজ করাচ্ছে।

—হেঁজিপেঁজি ব্যাপার নয়, এ চন্দ্রার বেড ইয়াদ রেখো সাঙাতরা—বড় সাহেবের স্পেশাল অর্ডারের জিনিস। চাবা গন্ধালেই সাপে ছুবলোনো বেজির উৎপাত হবে—খুব হুঁসিয়ার, নষ্ট হলে কারো কাঁধে মাথা থাকবে না!

পিছন থেকে আলতো করে বাপী বলল, কাঁধের ওপর নিজের মাথাটা তো খুব টান দেখছি—এদিকে ফেরাও।

ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়াল। আর তার পরেই খুশিতে আনন্দে দুই চক্ষু বিস্ফারিত একেবারে। ঠিক দেখছে কিনা তাই সন্দেহ যেন।

—বাপী তুই! মা-মানে বাপীভাই তুমি!

দেমাক না বেড়ে থাকলে এই উচ্ছ্বাসই প্রত্যাশিত। বাপী হাসছে। —আবার তুমি কেন!..

লাঠিসুদ্ধু দু হাত বুকের সঙ্গে জাপটে ধরল ওকে। সঙ্গের লোক কটা হাঁ মেরে গেছে দেখে ছেড়ে দিল। কপট গাম্ভীর্যে ইশারায় ওদের কাজে মন দিতে হুকুম করল। তারপর আবার বে-সামাল খুশির উচ্ছ্বাস। —আরে বাপরে বাপ, এখন তুমি কত বড় আর কত বিদ্বান মানুষ—আর এখানে থাকলে তো কবেই আমার মুরুব্বি হয়ে বসতে—আনন্দে মুখ ফসকে ওরকম বেরিয়ে গেছল—এবার থেকে বাপীভাই-ই বলব। কিন্তু তুমি আজ কোত্থেকে? তোমাকে কত খুঁজেছি, তোমাদের কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখেছি—চার-পাঁচ মাস আগে তোমার খোঁজে জলপাইগুড়িও চলে গেছলাম। শুনলাম প্রায় দেড় বছর আগে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তুমি নিপাত্তা—

কাঁধ ঝাঁড়িয়ে ধরে পানব বিশ গজ সরে এসে ওকে নিয়ে বসল এক জায়গায়।—পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে একটা চিঠি নেই, একটা খবর নেই—ভাবলাম বানারজুলির এই জংলিটাকে ভুলেই গেছ। কবে এলে? আজই?

হাসি মুখে মাথা নেড়ে বাপী বলল, এসেই পর পর দুটো বাম ধাক্কা।

—সে আবার কি, কোথায়?

—প্রথমটা তোমার বাড়িতে।

—গেছলে বুঝি? তা ধাক্কা কেন, দুলারিকে দেখে?

বাপী হাসতে লাগল। লজ্জা লজ্জা মুখ করে আবু বলল, ওকে যখন ঘরে আনি তোমার কি কোনো পাত্তা ছিল যে খবর দেব!

—সে জন্যে নয়, আমি বরাবর জানতাম বেশমাকে নিজের ঘরে এনে তোলার জন্য তুমি হাঁ করে আছ।

আবু রববানীর এবারে আকাশ থেকে পড়া মুখ। —রেশমাকে! এ আবার তোমার মাথায় গজালো কি করে?

অবাক বাপীও কম নয়। কারণ তখনো ধারণা বিশেষ কোনো ঘটনার ফলেই রেশমার বদলে দুলারি তার ঘরে। কিন্তু আবুর মুখ দেখে আর কথা শুনে মনে হচ্ছে তাও না। কি মনে পড়তে বাপী বলল, বাবা মারা যাবার পর বানাবজুলি ছাড়ার আগে তোমার বিয়েটা কবে হবে, জিগ্যেস করতে বিরক্ত মুখ করে তুমি, বলেছিলে, শালার মরদ ঘরে থাকতে তার বিবিকে বিয়ে করা এত সোজা! ....সে তবে কার কথা বলেছিলে?

—কেন, সেই ছটু মিঞার কথা! তুমি কি ভেবে বসেছিলে রেশমার মরদ কাঁদনা?

বাপী বোকার মতো মাথা নাড়ল। এতদিন সেই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল বটে।

তাই শুনে আবুর সেই হাসি। এমন হাসি যে আশ-পাশের ওই লোকগুলোও সচকিত। তারপর বলল, তোমার দোষ নেই, বলতে গেলে তো ছেলেমানুষই ছিলে তখন: তাছাড়া আধ-মরা মরদের সেবা যত্ন করলেও আমার ভিতরের মতলবখানা দুলারি টের পেয়ে গেছল। তাই কড়া ভাব দেখাতো আর ছুবলোতে আসত। রেশমা আঁচ পেয়েছিল দুলারির কাছ থেকে—ননদ-ভাজে ভাবী ভাব তো—তাই রেশমা আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত। এই সব দেখেই তুমি উল্টো-পাল্টা ভেবে বসে আছ।

চওড়া বুক চিতিয়ে আর এক দফা হাসল। —আরে আমি হলাম গিয়ে জঙ্গলের সেই অপদেবতা আবু রববানী—আমার স্বর্গিয় বিবি তামাম বানারজুলিতে দুলারি ছাড়া আর কেউ আছে নাকি। ছটু মিঞা মারা যাবার তিন দিনের মধ্যে দুপুরের নিরিবিলিতে ছোঁক ছোঁক করে যখন গিয়ে হাজির হলাম, দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর বলল, ফাল-কেউটের ঝুপড়িটা এনে খুলে দেব? দুদিন বাদে আবার গিয়ে হাজির হতে বলল, একটা চেলা কাঠ ঠিক করি আগে, তারপর এসো।

বাপী উৎসুক। —তারপর?

—আমিও সেই ছেলে পর দিন দুটো লোকের মাথায় দেড়-দেড় তিন মণ চেলা কাঠ এনে ওর উঠোনে ফেললাম আর গাঁট হয়ে ওদের দাওয়ায় বসলাম। আবুর প্রাণ-খোলা হাসি। —দুলারির তখনকার মুখ-খানা যদি দেখতে!

আবুর এখন সবদিক থেকে সুদিন আর সুখের দিন চলছে বোঝা গেল। বাপী পর পর দুটো রাম-ধাক্কা খাওয়ার কথা বলেছিল মনে পড়তে জিজ্ঞেস করল, একটা ধাক্কা তো দুলারি আর একটা কি?

—তোমাকে না পেয়ে নিজের ঘরে গেছলাম। সেখান থেকে এক নেপালী মহিলার তাড়া খেয়ে বেরুতে হয়েছে।

—এই রে! এবারে কিছু সত্যিকারের সমস্যার ঘা পড়ল মগজে। —তোমার ঘর-বাড়ি তো বেদখল! চার-পাঁচ মাস আগেও যদি একটা খবর পেতাম তাহলে ছাড়ি? তোমার খোঁজে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত গেছলাম—

বাপী শঙ্কিত। —বেচে দিয়েছ নাকি?

আবু এটুকুতেই আহত যেন।—আমি যেমন লোকই হই, তোমার সঙ্গে বেইমানি করব বাপী-ভাই? আমাকে জিম্মাদার করে গেছ আর আমিই খেয়ে নেব।

বাপীর তাড়াতাড়ি সামাল দেবার চেষ্টা। —খেয়ে নেবার কথা বলিনি, সুবিধে পেলে বেচে দেবার কথা তো আমিই লিখেই দিয়ে গেছলাম তোমাকে।... তাহলে কি ভাড়া দিয়েছ?

—ভাড়াই বলতে পারো, তবে তার মধ্যেও প্যাঁচ ঘোঁচ আছে। মওকা পেলে আমি তোমার ভালই করতে গেছলাম, বাড়ির চেহারাখানা কেমন হয়েছে ভালো করে দেখেছ?

বাপী মাথা নাড়ল। দেখেছে।

—গেল মাসে আবার ইলেকট্রিক লাইটও আনা হয়েছে। ও তল্লাটে এখন কেবল তোমার বাড়িতেই বিজলির আলো জ্বলে—অনেক খরচা করে চা-বাগানের কোয়ারটারস থেকে লাইন টানা হয়েছে। তা কে তাড়া করল, নেপালী মেম-সাহেব মানে গায়ত্রী রাই নিশ্চয়?

—নাম কি করে জানব, যা বয়েস বেশি।

—হ্যাঁ গায়ত্রী রাই। তার মেয়ে উর্মিলা রাই। মেয়েকে দেখেছ?

—হুঁ।

একটা চোখ সামান্য ছোট করে আবু হাসল একটু। —বেশ খাসা না?

আগের দিনের মতো এ চটুল প্রসঙ্গ বাপীর ভালো লাগল না। তার বুকের তলার ক্ষত আবু জানে না। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভালো আর বং ফর্সা হলে বয়েস-কালের সব নেপালী মেয়েরাই মোটামুটি সুশ্রী। যে তপ্ত নিঃশ্বাস মুচড়ে বেরিয়ে আসছে সেটা গোপন করার তাগিদ। ...ওই মেয়েকে খাসা বলছে, মিণ্টিকে দেখলে কি বলত?

হালকা সুরেই জবাব দিল, মারের তাড়া খেয়ে আর অত দেখা হয়নি।

আবুর এতেও হাসি। —দেখতে গেলে আরও বেশি তাড়া খেতে—মাটি ছাঁদাবেন মেয়ে মানুষ। সব বলবখন—তা তোমার সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে?

এ প্রসঙ্গও সংক্ষেপে সারল বাপী। তারপর বলল, এখানে থেকে যার বলেই এসেছিলাম, যা হোক কিছু করে চালিয়ে নিতাম তাও হবার নয় দেখছি।

আবু প্রায় আগের মতোই তিরিক্ষি।—আমি থাকতে তোমার এখানে থাকার জায়গার অভাব হবে? চলে যেতে হবে? তুমি কিছু ভেব না, সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। এই আবু রববানী এখন খোদার দয়ায় অনেক কিছু পাবে—বুঝলে?

বোঝা যায় কি যায় না এখন একটি শ্লেষ মাখিয়ে বাপী বলল, এখানে পা দিয়েই শুনেছি তুমি এখন একজন মস্ত লোক এখানকার—

—কোন শালা—। বেফাঁস শব্দটা মুখ দিয়ে বার করেই জিভ কাটল আবু রববানী। —তুমি এখন অনেক পাশটাশ করা ভদ্রলোক মনে থাকে না, আমি শালা সেই জংলিই আছি—

বাপী বলল, জংলিই ভালো, মনে রাখার দরকার নেই।

আবুর হৃষ্ট মুখ। —আসলে কি জানো বাপীভাই, দাপটে না চললে সককলে ঘাড়ে পা দিতে চায়, তা বলে তুমি মস্ত লোক বলবে?

—আচ্ছা বলব না। কিন্তু আমাকে থাকতে দেবে কোথায়, নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলবে?

নিরীহ মুখে আবু ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তুললে অসুবিধে হবে?

—তা হয় না...।

আবু হেসে উঠল। —আমি মস্ত লোক হয়েছি না তুমি ভদ্দর লোক হয়ে গেছ বোঝো তাহলে। কিছু ভেব না, তোমাকে আমি জঙ্গলের ঘরে রাখব না। উঠে দাঁড়াল। —কিন্তু আমার ঘরে গিয়ে এখন কিছু মুখে দিতে আপত্তি নেই তো?

বাপীও উঠে পড়ল। আবুর ওর মনের অবস্থা বোঝার কথা নয়। জঙ্গলের ঘরে কেন একেবারে গহন জঙ্গলে সেঁধিয়ে যাবার মতোই ভিতরের তাড়না। একা থাকতে চায়। নিরি-বিলিতে থাকতে চায় দিন-কতক। গুলি-বিদ্ধ বাঘও হিংস্র আক্রোশে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তারপর ক্ষত শুকোনোর তাড়নায় নিরিবিলি আড়াল খোঁজে। সামনে দিয়ে তখন হরিণ নেচে গেলেও মুখ ফিরিয়ে থাকে।

—চলো। খিদের চোটে অন্ধকার দেখছি।

যত খুশিই হোক, আবুর কাজে গাফি-লতি নেই। নতুন চারা-বেড়টার দিকে এগিয়ে গেল। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লোক কটাকে বলল, রাতে এরপর দুজন দুজন করে পাহারা দিতে হবে মনে থাকে যেন, নইলে বেজিতে শেষ করে দেবে।

যেতে যেতে বাপী বলল, বড়সাহেবের স্পেশাল অর্ডারের চন্দ্রা না কিসের বেড বললে ওটা, জঙ্গলে ফুলের চাষ-টাষও হচ্ছে নাকি আজকাল?

আবু মিটি মিটি হাসতে লাগল। —দুদিন সবুর করো, সব জানবে। চন্দ্রা

কোনো বাহারী ফুল নয়, ওর আর এক নাম সর্পগন্ধা—অ্যালোপাথি কবরেজি হোমিও-প্যাথিএই তিনেতেই এর দারুণ কদর। এছাড়া হাতুড়েবাও পাগলা-দাওয়াই বানাবার জন্যে এর ফুল ফল পাতা শেকড় বাকড় সব কেনে।

সর্পগন্ধা নাম বাপীরও জানা। কিন্তু বীটম্যান আবুর এত-সব জানার কারণ কি, আর ওর মুখেই বা এরকম হাসি কেন? জিগ্যেস করল, বড়সাহেবের হুকুমে জঙ্গলে ওষুধের গাছ-গাছড়াও চাষ হচ্ছে এখন?

—হচ্ছে না, আমি হওয়াচ্ছি। আর একটু কায়দা করে বড়সাহেবের হুকুমটা কখনো-সখনো আদায় করে নিতে হচ্ছে। খুশিতে টইটুম্বুর মুখ আবুর। —বললাম তো, কটা দিন সবুর করো, সব জানবে সব শুনবে। তুমি এখানেই থেকে যাবে শুনে আমার বুকের ছাতি ডবল হয়ে গেছে—তুমি যা-হোক কিছু করে চালিয়ে নেবার কথা বলছিলে—এখানে পয়সার ছড়াছড়ি বুঝলে দোস্ত—শুধু মাথা খাটিয়ে তুলে নিতে জানলেই হয়।

আবু রববানী মাথা খাটাচ্ছে আর পয়সাও তুলছে এটুকু বোঝা গেল। সেটা যে চাকরির পয়সা নয়, বাড়তি কিছু, তাও স্পষ্ট।

আরো একটু এগিয়ে বাপী দাঁড়িয়ে গেল। —বাক্স-বিছানা এদিকে রেখে এসেছি, নিয়ে নিলে হত।

—কোথায় রেখেছ?

বাপী ইচ্ছে করেই লছমনের নাম করল না। হেসে বলল, বনমায়ার জিম্মায়।

—বনমায়া! আমাদের বনমায়া?

সায় দিয়ে বাপী বলল, এখানে এসেই তো সবার আগে ওর সঙ্গে দেখা করলাম।

—তোমাকে চিনল?

—খুব। শুঁড় উঁচিয়ে আগের মতো সেলাম বাজালো, শুঁড় পেঁচিয়ে আদর করল।

শুনে আবুও খুশি। বলল, এক ভীমবাহাদুর ছাড়া বনমায়ার কদর এখানে কেউ বুঝলই না। ভেবে নিল কি একটু। —বাক্স বিছানা ওখানেই থাক এখন.. আপাতত ওদিকেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। লছমন দেখে রেখেছে তো?

সায় পেয়ে ঘরের দিকেই চলল আবার। আবু বলল, ভীমবাহাদুর নেই, বনমায়ার খেজাজেরও ঠিক নেই· তবে ফি-বছর মরদের সঙ্গে পালানোটা ঠিক আছে।

—বনমায়াকে ছেড়ে ভীমবাহাদুর পালালো কেন?

শুনল কেন। না পালালে ভীমবাহাদুরকে জেলে পচতে হত। এখনো ওর নামে হুলিয়া বহাল আছে। ভালবাসার মেয়েকে ঘরে আনার আধা-আধি টাকার যোগাড় হয়ে গেছল। সেই টাকা জমানোর নেশায় ভীমবাহাদুর ভালো খেত না পর্যন্ত। চা-বাগানের এক উঠতি বয়সের দাপটের বাবু ওই পাহাড়ী মেয়েকে ছলাকলায় ভুলিয়ে নিজের বাংলোয় নিয়ে এসেছিল। তারপর যা, তাই। মেয়েটা বাবুর গায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল বলে সে তাকে চাবুক দিয়ে মেরেছে পর্যন্ত। আর দরজায় পাহারা মোতায়েন রেখেছে।

মাঝরাতে ভীমবাহাদুর বাংলোয় ঢুকে তার বুকে ছুরি বসিয়েছে। আধ ঘুমন্ত পাহারা-অলা ওর সেই মূর্তি দেখে পালিয়ে গেছে। বাবুটি তখন নেশা করে ঘুমোচ্ছিল। সে ঘুম আর তার ভাঙেনি। সেই রাতেই ভীমবাহাদুর তার ভালবাসার মেয়েকে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

বাপী মুখ বুজে চলেছে। কিন্তু ভিতরে নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। দক্ষিণ কলকাতার কোনো এলাকার সাতাশি নম্বর বাড়ির উল্টো দিকের দোতলা ঘরবন্দার সোনালি চশমা রাঙামুখো একজনের কলজে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবার সুযোগ পেলে তার নিজের হাত একটুও কাঁপত কি? নাকি রাতের অন্ধকারে খুপরি ঘরে ঢুকে বতন বণিক আর বউ কমলা বণিকের আর বাপী নামে এক বেইমানের বুকে ওমনি ছুরি বসিয়ে গেলে খুব অন্যায় হত?

কথায় কথায় আরো কিছু খবর জানালো আবু রববানী। ....ওর বাবা কালু তিন বছর আগে মারা গেছে। শেষের দিকে ছেলের ওপরেও তার অভিমান, যেন ওকে হটিয়ে ছেলে তার জায়গাটা জুড়ে বসেছে। অথচ শেষ সময় পর্যন্ত আবু তাকে নেশার জিনিস জুগিয়ে এসেছে—শহর থেকে সেবা জিনিস এনেও খাইয়েছে। আর গেল বছর রেশমার মরদ কাঁদনাও মাটি নিয়েছে। ওর আর পেট বলে কিছু ছিল না, হেজে পচে গেছল। ও মরে বেঁচেছে, রেশমারও নিষ্কৃতি।

বাপী জিগ্যেস করল, বেশমা একাই সাপ খেলা দেখাচ্ছে এখন?

—ছোঃ! তার থেকে ঢের ঝাঁকের খেলা দেখাচ্ছে। আবু হাসতে লাগল, বেশমা আর সে-রেশমা নেই, বুঝলে? এখন বুকের পাটা কত, বিষাক্ত সাপগুলোর থাবাথপ টুঁটি টিপে ধরা দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে।

বাপী ভেবে নিল সাপ ধরে রেশমা এখন অন্য সাপুড়েদের কাছে বেচে দেয়। আবুর কথায় আর হাব-ভাবে কিছু রসের ছোঁয়া থাকলেও বাপী আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ চলতে লাগল। রস তুলোয় থাক।

আবু হঠাৎ উৎসুক চোখে ঘাড় বেঁকিয়ে ওকে দেখে নিল। —আগে তোমার কথা শুনি বাপীভাই, অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়?

—কলকাতায়।

—চাকরির চেষ্টায়?

—মাস কয়েক যুদ্ধের আপিসে টেম্পোরারি চাকরি করেছি।

—তারপর বেকার বসে ছিলে?

বাপী মাথা নাড়ল। তাই। এ নিয়েও কথা বাড়াতে চায় না। কিন্তু আবু খুশিতে ডগমগ। —খোদার খেল দেখো, তার মর্জি না হলে টান পড়ে না—এখানে কাজই উল্টে তোমার জন্যে হাঁ করে আছে! আমি কতদিন তোমার কথা ভেবেছি, দুলারিকেও বলেছি, এ-সময় বাপীভাই এখানে থাকলে কত ভালো—নেপালী মেমসাহেবকে ওই বাড়িটা দেবার সময় তোমার কথা তো খুব হত—

আবু রববানী এ কবছরে আরো কত চতুর হয়েছে বাপীর ধারণা নেই। বাড়িটা হাত ছাড়া হয়েছে বলে এমন আশার কথা শোনাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বাপী ভিতরে উৎসুক একটু, বাইরে প্রায় নির্লিপ্ত। —কি কাজ, চাকরি-টাকরি?

—চাকরি করলে চাকরি, নয়তো চুক্তিতে রফা হলে চুক্তি—ধৈর্য ধরে সব দেখে শুনে যা তুমি ভালো বুঝবে। বললাম না পয়সার ছড়াছড়ি এখানে, মাথা খাটাও, দিল লাগাও আর কড়ি তোলো। তোমার মতো ভদ্দরলোকের চামড়া গায়ে থাকলে আর বিদ্যের জোর

থাকলে এই আবু রববানীকে আজ দেখতে হত! নেপালী মেমসাহেবের ওই প্যাঁচামুখো লাটসাহেবকেই লাট খাইয়ে দিতাম না!

এও দুর্বোধ্য। শুধু নেপালী মেমসাহেব যে ওর স্বার্থের কোনো বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে, এটুকু স্পষ্ট।

আবু আর একবার ঘাড় ফেরালো, তারপর বলল, তুমি একটু বদলে গেছ বাপীভাই.....

—কেন?

—আগে আমার সব ব্যাপারে তোমার কত আগ্রহ ছিল, উৎসাহ ছিল—প্রায় ছ'বছর বাদে দেখা, আর তুমি যেন আমার কাছ থেকে ছ'হাত দূরে দূরে হাঁটছ।

আবু চালাক বলেই একটু ঘুরিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করল। নইলে সাদা সাপটা বলে বসত, আগে তো আমার চেলাগিরি ছিল, আমাকে গুরু ঠাওরাতে—এখন সে-রকম দেখছি না। বাপী হাসল একটু, জবাব দিল, আধ-হাত দূর দিয়েও তো হাঁটছি না।

হঠাৎ আগের মতোই সন্ধানী চাউনি আবুর। কথার ধরনও তেমনি চাঁছাছোলা —সাহেব বাংলোর তোমার সেই মহারাণীর মেয়ের খবর কি, আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে?

আবুর সঙ্গে দেখা হলে এ-কথা উঠবে জানত। আর যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত মুখে এ-প্রসঙ্গ ধামা-চাপা দেবার চেষ্টাই করবে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে আবুকে আগের মতো সেই কাছের মানুষ মনে হতে বুকের তলায় মোচড় পড়ল। জবাব না দিয়ে একবার তাকালো শুধু।

আবু লক্ষ্য করছে। উৎসুকও।—দেখা হয়েছে তাহলে! কেমন এখন? বহুত খুবসুরৎ?

—ভালোই।

খপ করে শিকার ধরে তোলার মতো চকচক করছে আবুর দু চোখ। —কত দিন আগে দেখা হয়েছে?

বাপী কি হঠাৎ জোর গলায় ওকে ধমক লাগাবে একটা? পারা গেল না। কিন্তু চাউনি খরখরে। বিড়বিড় করে বলল, বেশি দিন নয়।

বন্দুকের আঁচ আবু কতটা পেল সে-ই জানে। সব ঝেড়ে ফেলার মতো করে বলল, গুলী মেরে দাও বাপীভাই, আমি তো সেই জন্যেই বলে রেখেছিলাম ও-মেয়ে বেশি দিন বাপ-মায়ের সিন্দুকে বসে থাকবে না। যেতে দাও—নিজের দুটো পায়ের ওপর শক্ত করে দাঁড়ালে অমন কত হুরী-পরী এসে গড়াগড়ি খাবে!

বাপী সন্তর্পণে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। আবু ধরে নিয়েছে মিশি অন্যের হেপাজতে চলেই গেছে আর সেই মনস্তাপেই কলকাতা ছেড়ে ও আজ বানারজুলিতে। একেবারে সত্যি না হলেও কত আর ভুল....?

ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবুর আর এক মূর্তি। ঘরে ঢুকল না তো একখানা দুরন্ত খুশির ঢেউ আছড়ে পড়ল যেন। হাতের লাঠি একদিকে ছুঁড়ে ফেলল। সাড়ে তিন বছরের ছেলেটা ছুটে এসে তার সাধ্যমতো একটা লাফ দিয়ে দু-হাতে বাপের কোমর জড়িয়ে ধরে ঝুলতে লাগল। ওদিকে দুলারির কোলের আট নয়মাসের ছেলেটাও দু-হাত তুলে বাপের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যগ্র। হাত বাড়িয়ে আবু আগে ওকে নিয়ে লোফালুফি খেলল খানিক। ছেলেটার ভয়-ডর নেই, খিক-খিক হাসি। তারপর একটু দূরে থেকেই ওটাকে মায়ের কোলে ছুঁড়ে দিয়ে আবু বড়টার সঙ্গে ছোটাছুটি আর মেকি মারামারি ঘুষোঘুষি শুরু করে দিল। বাপীকে বলল, কালে দিনে এ দুটো আমার থেকেও কড়া অ্যালসেসিয়ান হয়ে উঠবে দেখে নিও—

ছেলেটাকে উসকে দেবার জন্য আবু একটু জোরেই ঘা বসাচ্ছে এক-একবার, আর ওটা দ্বিগুণ গোঁ-ভরে বাপের ওপর চড়াও হচ্ছে। দুলারির তামাটে মুখ প্রসন্ন, কিন্তু ধমকেই উঠল, আঃ থামবে। বাপীভাই কে কাণ্ড দেখে হাঁ হয়ে গেল!

মায়ের ধমকেই ছেলের দৌরাত্ম থামল। কি মনে পড়তে আবুর হাসিমুখ বিপরীত গাম্ভীর্যে ঘোরালো করে তোলার চেষ্টা; গলায় কপট শ্লেষ মিশিয়ে বলল, রেশমার বদলে তোমাকে আমার ঘরে দেখে বাপীভাই তার থেকে ঢের বেশি হাঁ হয়েছে—বুঝলে? আমি রেশমার জন্য পাগলা হয়ে গেছলাম দেখে গেছে আর আজ ঘরে এসে দেখে বিধি বদল।

দুলারির হাসছে না ঠিক, তামাটে মুখে হাসির আভা ছড়াচ্ছে। বলল, বাপীভাইয়ের তখন চোখ কানা ছিল বোধহয়।

আবু হা-হা শব্দে হেসে উঠল। হাসছে বাপীও। আর মনে মনে সায় দিচ্ছে, কানা যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবু বলল, দুজনেরই খিদে পেয়ে গেছে, কি আছে জলদি দাও—বাপীভাইকে নিয়ে এরপর আবার নেপালী মেমসাহেবের কাছে যেতে হবে।

সুপটু গৃহিণীর মতো পাঁচ মিনিটের মধ্যে একরাশ জলখাবার নিয়ে দুলারি হাজির। বাপী আসবে ধরেই নিয়েছিল বোধহয়। খুশি মুখে আবু টিপ্পনী কাটল, এতসব আজ তোমার খাতিরে, আমার অত জোটে না।

দুলারিরও সমান জবাব। —বেইমানি কথা শুনলে জিভে গরম ছেঁকা লাগাব।

আবু সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকালো। —আমার জিভে ছেঁকা লাগালে আখেরে কে পস্তাবে?

সাপুড়ে মেয়ের তামাটে মুখে সরমের রং। কটাক্ষের চাবুক হেনে চটপট সরে গেল। আবু হাসতে লাগল।

বাপী সুখের ঘর দেখছে।

জলখাবারের পাট শেষ হতে আবু আয়েস করে বিড়ি ধরালো একটা। বাপীকে বলল, সিগারেটও আছে—চলে?

বাপী মাথা নাড়ল, চলে না। নিজের বাড়ির খবর জানাব তাগিদ। জিগেস করল, নেপালী মেমসাহেবের কাছে যাবে এখন?

—যাব খন। হাসল।—ওই ঠাকরোনটির কাছে যেতে হলে এমনিতেই বেশ করে দম নিয়ে যেতে হয়—তার ওপর আজ বাড়ির মালিককে দেখে ক্ষেপেই আছে কিনা কে জানে।

—কেন?

—কেন আর, নতুন ঘর তুলে তোমার বাড়ির ও-রকম ভোল পাল্টাতে এক কাঁড়ি টাকা খরচ হয়েছে—আমাকে হিসেব দেবে বলছিল। ... লাইট-ফাইট জল-কলসুদ্ধু কম করে পাঁচ হাজার হবে—সে বাজার কি আর আছে।

বাপীর দুকান খাড়া। বাড়ির দায় ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়ে গেছল। ভাড়া আর বিক্রীর দুটো পরোয়ানা ওকেই লিখে দিয়েছিল। বেচে যে দেয়নি সেটা আবু আগেই বলেছে। আবার ভাড়া নিয়েও কি প্যাঁচ-ঘোঁচের ব্যাপার আছে বলছিল। কি শর্তে নেপালী মেমসাহেব ওই বাড়ির পিছনে অত টাকা ঢেলেছে আবু এখন পর্যন্ত সেটাই বলেনি।

সে বাড়ির মালিক শুনে মহিলা থমকেছিল বেশ বাপীর মনে আছে। জিগ্যেস করল, তা আমাকে দেখে ক্ষেপবে কেন?

হাতের বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলল আবু রববানী। —মেমসাহেব জানে বাড়ির মালিক বে-পাত্তা। কোন দিন ফিরবে কি ফিরবে না তারও ঠিক নেই। আর জানে, আমি বাড়ির জিম্মাদার, আমি সর্বে-সর্বা—তাই নিশ্চিন্ত মনে ঘর তুলেছে আর বাড়ি সাজিয়েছে—আমার সঙ্গে এখন পর্যন্ত সই-সাবুদটা পর্যন্ত হয়নি, তার মধ্যে খোদ মালিক হাজির দেখলে কি আহ্লাদে আটখানা হবে?

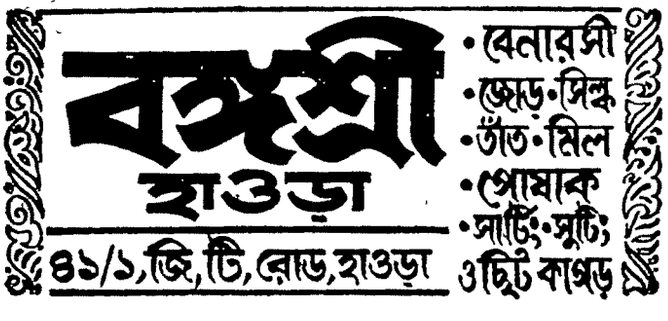

বাপী ভিতরে ভিতরে স্বস্তি বোধ করল একটু। —বাড়ির ব্যাপারে এত-সব তোমার পারমিশন নিয়ে করা হয়েছে?

—হুঁ, সেই মেয়ে। পারমিশন-টারমিশনের ধার ধারে না, তাঁর মর্জি মাফিক কাজ—ম্যানেজারকে দিয়ে তোমার বাড়ির খোল-নলচে পালটানোর পর চুক্তির কথা ভুলেছে—আমিও মওকা ভেবে চুপ মেরে ছিলাম—

—নেপালী মেমসাহেবের আবার ম্যানেজারও আছে নাকি?

—নেই আবার—হেঁজিপেঁজি মেমের মানুষ নাকি! সে শালাই তো তার প্যাঁচা-মুখো লাটসাহেবকে লাট খাইয়ে দিত।

জঙ্গল ভেঙে ঘরে ফেরার পথে আবু বলেছিল বটে বিদ্যেবুদ্ধির জোর থাকলে নেপালী মেমসাহেবের কোন্ প্যাঁচামুখো লাটসাহেবকে লাট খাইয়ে দিত।

বাড়ি আর চুক্তির ব্যাপারটা বাপী আর একটু বিশদ করে শুনে নিল। গায়ত্রী বাই পাশের জমিসুদ্ধু বাড়িটা কিনেই নিতে চেয়েছিল। যুদ্ধের পর জায়গা-জমির দাম এ-দিকেও হু-হু করে বাড়ছে দেখে আবু রাজি হয়নি। তাছাড়া দোস্ত-এর পৈতৃক ভিটের ওপর তারও কম মায়া নয়। গরজের দায়ে গায়ত্রী বাই চড়া দামের লোভ দেখিয়ে চাপাচাপি করছিল, মিনমিন করে আবু তখন একটা মিথ্যে কথাই বলেছে। ও বাড়ির জিম্মাদার, ইচ্ছে করলে ভাড়া দিতে পারে, বেচতে-টেচতে পারে না।

গায়ত্রী বাইয়ের দাপটের ম্যানেজারের নাম রণজিৎ চালিহা। আসামের মানুষ। ধরাকে সরা ভাবে। বাড়ির মালিক পাঁচ বছর বাবত নিখোঁজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে ওটা জবর-দখলের মতলব দিয়েছিল মেমসাহেবকে। বলেছিল, সব নিজের ভেবে তুমি যা-খুশি করে নাও, কেউ দাবী ফলাতে এলে আমি আছি। কিন্তু গায়ত্রী বাই যত লাঁদরেল মেয়েমানুষই হোক, অমন কাঁচা ঠকবাজি পছন্দ করে না। তাছাড়া বেগতিক দেখে মেমসাহেবের কাছে আবু বাপীর মরা বাপকে এই জঙ্গলের অফিসার বানিয়ে দিয়েছে। বলেছে, এখানকার সরকারি ছোট অফিসার ছিলেন ভদ্রলোক—আর মস্ত ধার্মিক মানুষ ছিলেন, সকলে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তাঁর ছেলের সঙ্গে এ-রকম করাটা ঠিক হবে না, তাছাড়া বাড়ির দলিলপত্র মালিকের কাছে আছে—নিখোঁজ হলেও সে সব তো আর হাতছাড়া হয়নি।

গায়ত্রী বাই হাঁ-না কিছুই বলেনি। কারো উপদেশ বরদাস্ত করার মেয়ে নয়—আবুকে ধমকে যে ওঠেনি তাতেই বোঝা গেছে বড় দরের অন্যায় কিছু করবে না। বাড়ির ভোল বদলানোর পর আবুর ডাক পড়েছে। গায়ত্রী বাই জানিয়েছে সব ঠিক-ঠাক করে নিতে পাঁচ হাজার টাকার মতো খরচ পড়েছে। হিসেব তার ম্যানেজারের কাছে আছে। এ-টাকাটা ভাড়ার টাকা থেকে কাটান যাবে—সব শোধ হলে তবে মাসের ভাড়া হাতে আসবে।

এই মওকা ছাড়ার পাত্র কি আবু রববানী? ভিজে বেড়ালের মতো মুখ করে ভাড়ার ফয়সলায় নামল। শুধু বসত বাড়ি তো নয়, বাড়তি দরখানা তোলা হয়েছে ব্যবসার কাজে লাগানোর জন্য। তাছাড়া যুদ্ধের সময় থেকে এই বানারজুলিতেও সেলামীর ভূত নেমেছে—ইজেবাদার ঠিকেদারদের কল্যাণে এখন একখানা ঘর পেতে হলে আগে নজরানা গুনে দিতে হয়। আবুর রবাত ভালো ম্যানেজার তখন টুনুরা। গায়ত্রী বাইয়ের পায়ের কাছে বসে অনেক কথা নিবেদনের সুযোগ পেয়ে গেল। যেমন বাড়ির মালিক বাপী তরফদার তার প্রাণের দোস্ত—আর তার বাপের দয়াতে ওর এখানকার জঙ্গলের চাকরি, সেই দোস্ত ফিরে এসে যদি ওকে বেইমান ভাবে তাহলে খোদার বজ্র ওর মাথায় নেমে আসবে। তাই বাড়ির ব্যাপারে আবুর মুখে না চেয়ে হকের ফয়সলাই করতে হবে—কারণ, পাঁচ হাজার ভাড়া থেকে কাটান গেলে এখন যা হয়েছে তার সবটাই তো বাড়ির মালিকের। তাই পাঁচ হাজার থেকে প্রথমেই হাজার টাকা সেলামী বাবদ কাটান যাবে। আর একশ টাকার নিচে এই দিনে এরকম বাড়ির ভাড়া তো হতেই পারে না।

ফলে পড়লে নেপালী মেমসাহেবের দরাজ হাত। এ নিয়ে খুব একটা ঝকাঝকি করেনি। সেও আবু রববানীকে সেয়ানা জানে কিন্তু বেইমান ভাবে না। ভাববেই বা কেন, আবু তাকে বলেছে, সেলামী বাদ দিয়ে বাকি চার হাজার টাকা থেকে একশ টাকা করে কাটান দেবার চুক্তি সে-ই করবে—ততদিনে বাড়ির মালিকের দেখা নিশ্চয় মিলবে, আর না যদি মেলে তো মেমসায়েব যেন তার পরের টাকা বানারহাটের সরকারি দপ্তরে বাড়ির মালিকের নামে চেকে জমা করে দেন। ও তো আর হাত পেতে একটি পয়সাও নিচ্ছে না!

হাজার টাকা সেলামী আর একশ টাকা ভাড়া শুনে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা নাকি আবুকে ধরে এই মারে তো সেই মারে। কিন্তু গায়ত্রী বাইয়ের জবান খসলে পাকা ব্যাপার। তাঁর কথা মতো কাগজপত্র তৈরি। কিন্তু হচ্ছে হবে করে এই চার মাসেও সেই সাবুদ-এর ফুরসৎ মেলেনি। ম্যানেজার মাসের অর্ধেক সময় বাইরে বাইরে ঘোরে, নেপালী মেমসায়েবও হুট হুট করে তার পাহাড়ের বাড়িতে চলে যায়। আর দুজনেই যখন এখানে তখন এত কাজের চাপ আর এত রকমের প্ল্যান-প্রোগ্রাম হিসেব-নিকেশ যে এই সামান্য ব্যাপারটা হয়তো মনেই থাকে না।

এবারে তিন নম্বর বিড়িটা আবু বাইরে ছুঁড়ে ফেলে হিসেব দাখিল করল, খরচের মোট পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হাজার টাকা সেলামী বাদ দিলে থাকল চার হাজার। তার থেকে গত চার মাসের চারশ টাকা ভাড়া আর তার আগের চার মাসে পঞ্চাশ টাকা করে ধরে মোট ছশ টাকা তোমার শোধ হয়েই গেছে। হেসে উঠল, হাঁ হয়ে গেলে যে—মওকা পেয়ে আবু রববানী দোস্ত-এর ভালো করেছে কি খারাপ করেছে?

বাড়ির ব্যাপারে বাপী অন্যরকম ভাব-ছিল বলে নিজেরই খারাপ লাগছে। বলল, এটার থেকে ভালো আর কি হতে পারে—

আবু এতেই খুশি। দুনিয়ার অনেক-খানি যেন হাতের মুঠোয় এমনি সুরে বলে উঠল, ভালোর এখনো ঢের বাকি, সবে এলে, এখন তোমার আমার দু মাথা এক হলে কি যে হবে দেখো!

ওকে পেয়ে আবুর মাথায় কিছু মতলব গজিয়েছে আগেই সেটা বোঝা গেছে। ঘরে ঢোকার পথে ওর মুখে ফুর্তি উপচে পড়ছিল। কলকাতায় বাপী বেকার বসেছিল শুনে বলেছিল, খোদার মরজি না হলে টান পড়ে না—এখানে কাজই উল্টে তার জন্যে হাঁ করে আছে। দুলারিকেও নাকি কত সময় বলেছে, এ-সময় বাপীভাই এখানে থাকলে জমত ভালো। ....আর বলছিল, পয়সার ছড়া-ছড়ি এখন এখানে—মাথা খাটাও, দিল্ লাগাও আর কড়ি তোলো। ওকে পেয়ে আবুর মাথা খাটানো দিল্ লাগানোর জোর আর কড়ি তোলার আশা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এ-দিকটা বাপীর কাছে দুর্বোধ্য এখনো।

(চলবে)

কেউ বলে ডাকাত কেউ বলে বিপ্লবী

অনন্ত সিং

যাঁদের দেখেছি

আমরা কমিউনিস্ট, ডাকাতি করছি সর্বহারাদের অর্থনৈতিক বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য। আমরা আমাদের ঘোষণাপত্র দিয়ে যাচ্ছি, টেপ-রেকর্ডে লাউডস্পীকার মারফত সেই ঘোষণাপত্র ব্যাংকের সামনে বাজিয়ে শোনাচ্ছি।

ঘোষণাপত্রে আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী বিশদভাবে লেখা ছিল। সেই ঘোষণাপত্র ডাকাতির দিনই দিল্লিতে পার্লামেন্টে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ঝড় উঠেছিল জানবার জন্য কারা এই ডাকাতদল। কী তাদের উদ্দেশ্য। ঘোষণাপত্রে কী আছে। অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হয় ঘোষণাপত্র ব্যাংকের ভিতরে না বাইরে ছড়ান হয়েছিল। সংবাদ পড়ে মনে হয়েছিল সরকার পক্ষ যথেষ্টভাবে চেষ্টা করছিল ঘোষণাপত্রের অস্তিত্ব না রাখার জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মোটামুটি জানা গেল যে বাংলায় ঘোষণাপত্র ছড়ান হয়েছিল। টেপরেকর্ডারে এই ঘোষণাপত্রটি বাজান হয়েছিল তা কিন্তু খুব কম উল্লেখ ছিল। কলকাতার বিশিষ্ট কাগজগুলো এই ঘোষণাপত্রের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করেছিল, কিন্তু টেপ-রেকর্ডার সম্বন্ধে তারা একেবারে চুপ হয়ে গেল। যা সূচনাতে টের পেলাম, তা শেষপর্যন্ত দেখেছি, সরকার পক্ষ এই টেপরেকর্ডারকে সুযোগ মামলার প্রোসেডিংস থেকে বাদ দিতে পারলে খুশী হত। সেইভাবে তারা একনাগাড়ে চেষ্টা করছিল। এর অস্তিত্ব যেন ডিফেন্স লইয়ার না জানে, এবং শেষপর্যন্ত জানলেও যেন তাদের নিউট্রালাইজ করে রাখা হয়। তারজন্য প্রসিকিউশন নানা-ভাবে চেষ্টা করেছেন। মোদ্দা কথা ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর পুলিশ এসে অনুসন্ধান করার সময় যেসব জিনিস সীজ করেছে তার মধ্যে এতবড় একটি জিনিস টেপরেকর্ডারটি ছিল না। তবে কী করে শেষপর্যন্ত এক্‌জিবিট হিসাবে স্থান পেল। মজার কথা কোন প্রেস রিপোর্টারের রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর খবরটি যে ডাকাতির সময় ব্যাংকের সামনের গেটে ডাকাতরা একটি টেপরেকর্ডারের মারফত তাদের ঘোষণাপত্র লাউডস্পীকারে বলেছে, এই অভিনব চাঞ্চল্যকর খবরটি প্রেস জানাল না। জানতে পারলেও প্রেস সেই খবরটি সংবাদ হিসাবেও খবরের কাগজে সরবরাহ করতে পারল না। সেইটি আজ কোর্টের ডকুমেন্ট। এই ডকুমেন্ট সবাই পেতে পারে। আমার ইচ্ছে সেই ডকুমেন্টের সবটি বা কিছু কিছু অংশ এখানে লিখে জানাব। যে পোর্সান যার দেয় সেটি ইংরাজী পোর্সান।

এই ঘোষণাটি টেপরেকর্ডে কোর্টে জজের সামনে ও সমস্ত লইয়ারদের উপস্থিতিতে বাজান হয়। তারপর জজসাহেব এই টেপরেকর্ডারের অংশগুলি টুকরো টুকরো করে নম্বর দিয়ে নথিভুক্ত করেন। টেপরেকর্ডারটি ডবল স্পীডে বাজান হয়। একটি মেয়েকণ্ঠ আরেকটি ছেলের কণ্ঠে। নথিতে ছেলের কণ্ঠ ও মেয়ের কণ্ঠ নম্বর দিয়ে লিখে যান।

ভারতের বিপ্লবের পথে আমি সনে করি এই টেপরেকর্ডারটি ও তাদের ঘোষণাপত্রটি এক মহামূল্য দলিল। এইটিকে সরকার পক্ষ সযত্নে চেপে রাখতে চেয়েছে. আর আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারের এই চক্রান্ত বুঝেও বুঝতে চাইনি। কেন? তার একমাত্র কারণ এই দলিল ও অভিনব পন্থায় তাদের দলের আদর্শ, পথ ও কর্মসূচী বিশেষভাবে ও বিশেষ সময়ে প্রচার করার মধ্যে যে বৈপ্লবিক সংকেত নিহিত আছে, তার প্রচার সরকার কোন মতেই চাইছিল না। তাই সরকার নিউট্রালাইজ করল ও হাত করল সংবাদপত্রগুলিকে। তারা হাত করল বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির নেতাদের হয়তো আমার লেখা পড়ে আমার উপরে রেগে যাবেন। পলিটিক্যাল পার্টির নেতাদের সরকার কীভাবে হাত করল? কোন পলিটিক্যাল নেতা ও ভারতের পার্টি কোন দল উপদল কেউ আর সি সি আই-এর মত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাননি। এরূপ পরিকল্পনা করা যে একটি সাংঘাতিক ব্যাপার এবং তা সহজে যে করা যায় না, তা সবাই অন্তরের মধ্যে উপলব্ধ করেছিল। কাজেই সরকারের পুলিশ যখন বলল এইসব অরাজনৈতিক কাজ অরাজনৈতিক দলের স্বারা সংঘটিত হয়েছে, তখন পলিটিক্যাল দল উপদল সবাই মনে মনে খুশী হয়েছে, কারণ তাদের দল রাজনীতির দল আর, আর সি সি আই-এর দলঅরাজনৈতিক দল। সরকার এইরূপ মনস্তত্ত্বের সুবিধা গ্রহণ করবেনই ও

আমাদের কমরেডরা ব্যাংকের ভিতর থেকে লুটের টাকা নিয়ে এসে ভ্যানে উঠল। ব্যাংকের ভিতর তারা ঘোষণাপত্র বিলি করেছে, লাউডস্পীকারে তখনো ট্যানজিস্টারে ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্য শোনা যাচ্ছিল। ব্যাংকের গেটের দারোয়ান আত্মরক্ষার জন্য আহত অবস্থায় কোথাও চলে যায়, ভেতরের দারোয়ানের সেখানেই মৃত্যু হয়েছিল। সবাই এসে ভ্যানে ওঠার পরে ভ্যানটি দুটি প্রাইভেট গাড়ী নির্দেশ অনুসারে সার্দান স্ট্রীটের দক্ষিণ দিকে গিয়ে মিডলটনে পড়ে। তারপর বামদিক ঘুরে ক্যামাক স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে সেটি উধাও হল। পুলিশ বা মিলিটারী কোন গাড়ীর সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয়নি।

পথে এক স্থানে কেবল টাকা নিয়ে দুজন উডবাইন্ড রোডে আমাদের একটি প্রাইভেট গাড়ীতে গিয়ে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়ার সময় নার্ভাসনেসের জন্য দশ হাজার টাকার একটি বাণ্ডিল পথে ফেলে দিয়ে গেল, তুলে নেওয়ার ভরসা হয়নি যদি দেরী হয় এবং তাড়া করে পুলিশ বা মিলিটারী বাহিনী এসে ধরে ফেলে, সেই ভয়ে পড়ে যাওয়া টাকার বাণ্ডিলটি তুলে নেয়নি। না নিয়ে চম্পট দেওয়া সাব্যস্ত করেছিল। টাকা সরানোটাই কেবল কথা ছিল তা নয়, যতসব অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয় তাও তিনভাগে ভাগ করে তিনজন কমরেডের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, প্রাইভেট গাড়ী রিকসা ও হেঁটে যাওয়া পথ নির্দেশ দেওয়া ছিল। মোটামুটিসাব নিলে দেখা যায় আশাহত হয়ে দুর্গাপুরের শিবির গুটিয়ে এসে যে ব্যাংক ডাকাতিটি করা হল তাতে একজন দারোয়ান গুরুতর আহত হল এবং আরেকজন ব্যাংকের সশস্ত্র দারোয়ান নিহত হয়। আমরা নিয়ে আসি মাত্র সাড়ে চার লাখের মত টাকা। দুটি দোনলা অরাডিনারী কার্তুজ, ব্যবহার করার মত বন্দুক, এই হল আমাদের মোট লাভ।

বিখ্যাত কিকেট ম্যাচ কলকাতা পুলিশকে সেখানে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। লালবাজারের স্পেশাল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পুলিশ স্পটে ছুটে এল। তবে অবশ্য সেখানে ডাকাতি অনেক আগে হয়ে গেছে। পুলিশ কমিশনার, আই-বি ও এস-ডি পুলিশের কর্তারাও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাদের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞরা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে উপস্থিত হয় ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান শুরু করে। বিভিন্ন ফটোগ্রাফ নেয়, বিভিন্ন ছাপ নেয় আর পুলিশ বিভিন্ন জনের স্টেটমেন্ট নিতে থাকে। তাদের স্টেটমেন্ট থেকে তারা জানল স্টেনগান, রিভলবার ও পিস্তল নিয়ে ডাকাতেরা ঢোকে। উচ্চকণ্ঠে চিৎকার দিয়ে বলেছিল—কাজ করে যাও, ভয় পেও না।

সাংবাদিকরা সরকারের প্রচারের ফাঁদে পড়বেন। তাঁরাও দুর্ধর্ষ ব্যাংক ডাকাতিগুলিকে অরাজনৈতিক আখ্যা দিয়ে প্রচার করতে শুরু করলেন। আমার প্রশ্ন, সাংবাদিকদের ঐরূপ প্রশ্নের বিরুদ্ধে নয়। আমার প্রশ্ন রাজনৈতিক দলের মানসিকতার বিরুদ্ধে। তাঁরা কী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে এই ঘোষণাপত্র তাঁরা তাঁদের অফিসে তাঁদের প্রেসে বা নেতারা আগেই ডাকে পাননি? আমি খুব ভাল করেই জানি কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ও তাঁদের সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার অফিসে পাঠান হয়েছিল। সেগুলি না পাওয়ার কোন কথাই নয়। যখন ব্যাংকে ও ব্যাংকের বাইরে এই ঘোষণাপত্র সকলে পড়ছিল, সেইরকম সময়ে এই ঘোষণাপত্র তাদের অফিসে ও নেতাদের কাছে পোস্ট করা হয়। তারপর কথা হচ্ছে কোর্টে কমিউনিস্ট ধনঞ্জয়রা উকিল ছিল, তাদ্ধ জানত ডাকাতির পরদিন স্টেটসম্যান প্রভৃতি কাগজে ঘোষণাপত্রের উল্লেখ ছিল এবং ঘোষণাপত্র থেকে কিছু উদ্ধৃতও ছিল। সেই দিনই দিল্লীতে পার্লামেন্টে সংবাদ প্রচার করেছে। সেখানে উল্লেখ ছিল এই ঘোষণাপত্রের কথা। তবু কেন বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘোষণাপত্রের কথা জানতেন না এবং তাঁরা কোন দলের এইসব ডাকাতি এবং কী তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিলেন না:

আমার ইলেকশনের সময় লেফট ফ্রন্ট যখন আমাকে সমর্থন জানাতে আসে, তখন আমার ইলেকশন অফিসে সি পি আই-এর জনৈক নেতা বলেছিলেন, "তা রাজনীতি। তিনি কোন পার্টির সঙ্গে কাজ করছেন কিনা বা তা কোন পার্টি আছে কিনা আমরা তা জানি না। এইসব কাহিনী জানাতে হবে..." সি পি আই এমেরও সেইরূপ একই কথা আর 'তার' কোন পার্টির সঙ্গে এফিলিয়েশন আছে কী না। তিনি কোন পার্টিতে বিলং করেন না তার নিজের কোন পার্টি নেই। সেইরূপ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে চলা খুবই মুশকিল।

পার্টি হতে হলে কী পঞ্চাশ বছর ধরে মার্কটাইম করে যেতে হবে? যদি পার্টি একদিন আগে গঠিত হয় তবে কী সেটি পার্টি হবে না? অতি অধুনা শ্রীজগজীবন রামজীর কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী পার্টি দিনে দিনে গঠিত হল আর সেটি রেকগনেশন্ পেল, তবে অস্ত্রের সংঘাতের মধ্যে যদি কোন দল তার ঘোষণা দেয় তবে কী সেটি দল বা পার্টি হতে পারে না—তার কী তবুও পঞ্চাশ বছর ধরে রাজনৈতিক নাম মার্কটাইম করতে হবে?

আমাদের সেই ঘোষণাপত্রে ঐতিহাসিক মূল্য আমি কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না। সেইজন্য আমি সেই ঘোষণাপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করব। এই ঐতিহাসিক দলিলটি সব বিপ্লবী দলের কাছে মুক্ত করে দেওয়া আমার কর্তব্য মনে করছি। তারা এইটিকে সমালোচনা করুন। সমালোচনা করে তাঁদের দৃঢ় মত ব্যক্ত করুন সেটিকে আমরা স্বাগত জানাব। কিন্তু যারা সশস্ত্র সংগ্রামের এই থিসিসটি পড়া মাত্রই অর্থ করে নেবেন এটি অ-মার্কসীস্ট, অ-লেনিনবাদী তাদের কাছে আমাদের বলা, আপীল আপনাদের থিসিসটিকে কী বিপ্লববাদী বলেন না কী সংস্কারবাদী?? আমরা আপনাদের মার্কসবাদী ও বিপ্লববাদী, বিপ্লবী থিসিসটি জানতে চাই। নিজে সংস্কারবাদী হয়ে যদি মুহূর্তে আমাদের থিসিসকে নস্যাৎ করে দেয় কেউ তবে সেটিকে প্রশংসনীয় বলতে পারি না এইরূপ স্বন্দর মোকাবিলা করার জন্য আমাদের মিনিমাম অর্থাৎ ঘোষণাপত্রটি সবার কাছে উন্মুক্ত করে দিলাম—

ঘোষণাপত্রে প্রথম দু পৃষ্ঠা জুড়ে ইংরাজীতে লেখা ছিল, সেই লেখা এখানে আমি বাদ দিলাম, তারপরে যা ছাপান ছিল সেটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি।)

ঘোষণাপত্র

ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট দলের ঘোষণা

সেন্ট্রাল কমান্ড—

ক্ষুদ্র কমউনিস্ট দল, ডিসেম্বর ১৯৬৯

সফল জনযুদ্ধের পথে অস্ত্রের সংঘাত

আমাদের ক্ষুদ্র বন্দুক শত্রুর বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠেছে। আজ বন্দুকের মুখে আমরা আমাদের আদর্শ ও রাজনৈতিক মত ঘোষণা করছি।

শত্রুধার সঙ্গে চীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বীর কমিউনিস্ট সেনাবৃন্দ যাঁরা নকসালবাড়ী, শ্রীকাকুলাম, গোপীবল্লভপুর, ডেবরা ও ভারতের অন্যত্র শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের দৃঢ় মুষ্টি হস্তে লাল সেলাম।

মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিস্তীর্ণ জ্ঞান সমুদ্রের উপকূলে আমরা সত্যি এখনও নুড়ি কুড়োচ্ছি মাত্র। তবু নমতার সাথে দাবী রাখি মার্কসীয় শাস্ত্র আপোষহীন সশস্ত্র বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা অধ্যয়ন করছি। আর সাম্রাজ্যবাদের চিরসমাধি রচনা করার জন্য কামানের অনল উদ্গীরণে শক্তির ভিত্তিতে মাও-র চিন্তাধারাসমূহকে অন্তরের নিষ্ঠা দিয়ে বুঝেছি।

আমরা ঘোষণা করছি মাও, লিনপিয়াও এর জনযুদ্ধের নীতি ও কৌশল আমরা বৈপ্লবীক সততার সঙ্গে পালন করব। আমাদের ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট দল বিশ্বাস করে যে জনযুদ্ধের কর্মসূচী তুরান্বিত করার জন্য বিপ্লবী সংগঠনের উপযুক্ত পরিমান অর্থের একান্ত প্রয়োজন আছে। সেইহেতু আজ আমরা সরকারী একটি শক্তিশালী ঘাঁটি আক্রমণ করেছি। প্রধান নগরীতে সামরিক ঘাঁটি, পুলিশ ও ফৌজের বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে আমাদের বিশদ সংবাদ আছে। তাই সামরিক প্রয়োজনে শত্রু সৈন্যের ও পুলিশের যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ ও নিশ্চল করে দেওয়ার জন্য কয়েকডজন ডিনামাইট ও নতুন ধরনের শক্তিশালী বোমা বিভিন্ন রাস্তার গুপ্তস্থানে আমরা স্থাপন করেছি, আর বিশেষ প্রয়োজনে শত্রুর সৈন্যবাহী গাড়ীর গতিপথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আমাদের তৈরী খুব সাধারন লৌহ বর্মাকৃত গাড়ীর ব্যবস্থা রেখেছি। আমাদের ঝটিকা বেগে অতর্কিতে আক্রমনের মুখে শত্রুর ঘাঁটি বিধ্বস্ত হবেই। আক্রমন চলাকালীন আমরা চাই শত্রু ফৌজ দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের মুক্তাঞ্চলে যেন কোনমতেই প্রবেশ করতে না পারে।

আমরা মনে করি আমাদের আজকের এই ক্ষুদ্র অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা নকসালবাড়ীর নিরবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচীর আর একটি প্রয়োজনীয় সামরিক অভিযান।

কমঃ কানু সান্যালের জয়ী নেতৃত্ব ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মাঃ লেঃ) প্রতি আমাদের লাল সেলাম।

সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক।
বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক।
চীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এক
বিপ্লবী নীতি ও কৌশল

আমরা বিপ্লবী কমিউনিস্ট দল, আমরা মাও সে তুং, লিনপিয়াও-এর নেতৃত্বে চীন কমিউনিস্ট পার্টির সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-বিপ্লবের নর্ভুল নীতি ও কৌশলের সমর্থনে এবং জনযুদ্ধের নীতি ও কৌশল বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আমরা একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট সৈন্য।

আমরা বিশ্বাস করি, ভারত একটি আধা উপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ। ভারত রাষ্ট্র বড় জমিদার এবং মুৎসুদ্দি ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের রাষ্ট্র এবং

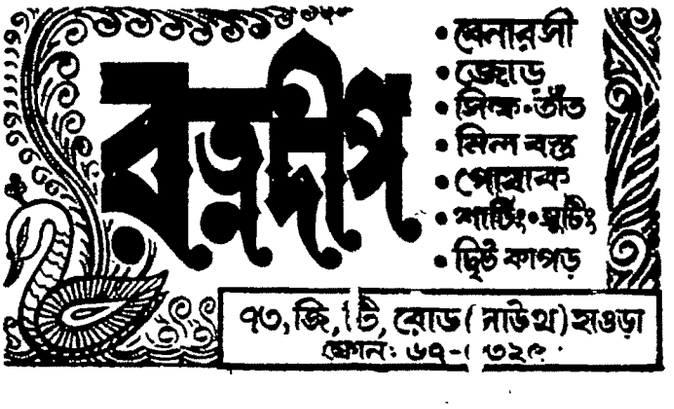

ভারত সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী ভৃত্য মাত্র। তাই বর্তমান পর্যায়ে ভারতের বিপ্লব হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। যার মূল সারবস্তু হবে কৃষি বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাও সে তুং এর চিন্তাধারার ভিত্তিতে সঠিক বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর বিপ্লবী ঐক্যের ভিত্তিতে অন্য সকল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী শ্রেণী ও শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পথে এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি মাও সে তুং-এর জনযুদ্ধের পথই একমাত্র পথ—যে পথে আপাত শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে, আপাত দুর্বল বিপ্লবী শক্তি সার্বিকভাবে লড়াই শুরু করতে ও দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে বিজয়লাভে সক্ষম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও নির্ভুলভাবে আমরা জনযুদ্ধের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দুটি অধ্যায় সম্পর্কে জেনেছি। বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন হবে, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক, কৃষকের নেতৃত্বে জনসাধারণকে নিয়ে। আর দ্বিতীয় স্তরে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন হবে শ্রমিক ও ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের সুদৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে এবং তখনই শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে। আমরা ঘোষণা করছি মাও সে তুং-এর গভীর ও নির্ভুল চিন্তাধারা অনুসরে চীন কমিউনিস্ট পার্টির এই বৈপ্লবীক নীতি ও কৌশল সর্বান্তকরনে ও অবিচলভাবে গ্রহণ করছি। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভারতের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে বলে আমরা কখনই বিশ্বাস করি না।

আমরা বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রগতির পথে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এবং আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে পর্যবশিত বলে স্থির বিশ্বাস করি।

মাও এবং লিনের জনযুদ্ধের রণনীতি ও কৌশল আমরা অনুসরণ করব। ভারতবর্ষের কৃষি বিপ্লবের বর্তমান অধ্যায়কে অস্বীকার করার অধিকার কোন বিপ্লবী কমিউনিস্টদের নেই বলে আমরা মনে করি। এই কৃষি বিপ্লব বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সম্পন্ন হবে।

লিনপিয়াও রচিত জনযুদ্ধের নীতি ও কৌশল :—

শ্রমিক শ্রেণী ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বাস্তবে কাকে বলে, তার কি রূপ, তার সংগঠনের কি পদ্ধতি ও কতখানি শক্তি থাকা উচিত তা আমরা সম্যক উপলব্ধি করছি। সেই গুরুদায়িত্ব বাস্তবে স্কন্ধে তুলে নিতে আমরা বদ্ধপরিকর। মাও-সে তুং ও লিনপিয়াও জনযুদ্ধের যে রণনীতি ও রন কৌশল অনুসরণ ও প্রয়োগ করতে বলেছেন তা আমরা সফলভাবে সঙ্গে প্রয়োগ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

মাও ও লিনপিয়াও-এর শিক্ষা অনুযায়ী প্রবল শত্রুর আধুনিক ও বিশাল সমরসজ্জা ও আমলাতন্ত্রের কঠোরতম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অকটোবর বিপ্লবের ধারায় প্রথম আকস্মিকে নগর ও সহর চূড়ান্তভাবে অধিকার করে নিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী সম্পন্ন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি না।

কৃষি বিপ্লবের অধ্যায়ে দূর দুরান্ত গ্রামাঞ্চল থেকে যখন যেভাবে সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যায় সেখানেই কৃষকদের নিয়ে সশস্ত্র অভিযান শুরু করতে হবে। সশস্ত্র কৃষকরা সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে একের পর এক মুক্ত এলাকা গঠন করে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাক। এইভাবে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে সহর ও নগর প্রভৃতিকে ঘেরাও করে রাখতে হবে। বহুদিন গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করে সরকারী ফৌজকে দুর্বল ও বিধ্বস্ত করতে হবে।

লিনপিয়াও তার গভীর, মিষ্টি ও বাস্তব সম্মত অভিজ্ঞতা দিয়ে বলেছেন যে —সরকারী সৈন্য সাধারণতঃ বড় রাস্তা ও রেল লাইন যোগে যাতায়াত করতে সমর্থ হয়। দূর-দুরান্ত বন্ধুর এলাকা জুড়ে কৃষকদের মুক্ত অঞ্চলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও কবলিত করার জন্য কোন সরকারেরই অত সৈন্যবাহিনী থাকতে পারে না। তাই সুদীর্ঘ ১৫, ২০ বছর ধরে লড়াই চলতে থাকবে। এই সুদীর্ঘ বছরের পর বছর লড়াইতে সরকারী শক্তি ক্রমেই ক্ষয় ও দুর্বল হবে। আর সেই সুযোগ ও সময়ের মধ্যে আমাদের কৃষক মুক্ত অঞ্চলে দুর্ধর্ষ লাল সেনাবাহিনী তৈরী করতে হবে ও চূড়ান্ত বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই রণনীতি ও রন কৌশলের প্রথম বাস্তব সত্যতা কোন বিপ্লবী কমিউনিস্টই অস্বীকার করতে পারে না।

এখন আমরা দ্বিতীয় বাস্তব সত্যতার ব্যাখ্যা করে বলতে চাই একে অস্বীকার করার ক্ষমতাও কারোর নেই।

বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিকে শহর ও নগরের শ্রমিক, ছাত্র, যুবকদের বৈপ্লবীক দায়িত্ব ও কর্মসূচী পালনের জন্য স্বার্থহীন ও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিতে হবে। যে সুদীর্ঘ ৫—১০ ১৫—২০ বছর ধরে সংগ্রামী কৃষকরা মুক্তাঞ্চল গঠন করে শহর ও মহানগরীকে ঘেরাও করে রেখে শত্রুকে বিধ্বস্ত শক্তিহীন ও দুর্বল করে ফেলেছে, সেই সময়ে শহরের অগণিত শ্রমিক, ছাত্র ও যুবকদের কি বৈপ্লবীক দায়িত্ব ও কর্মসূচী আছে? তারা কি এই সুদীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে শোধনবাদীদের একছত্র নায়কত্বে কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও ধর্মঘটের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে? নাকি তারাও সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য বাস্তবে প্রস্তুত হবে?

আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি যুবকেরা শহরে প্রস্তুত ও সংঘবদ্ধ হবে এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারাও শহর ও নগরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার সুযোগ পেলে কখনও পেছনে পড়ে থাকবে না। এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় বাস্তব সত্যতা।

কোন বিপ্লবী কমিউনিস্টই বলতে পারে না যে, গ্রামাঞ্চলে ১৫, ২০ বছর গ্রামী কৃষকেরা লাল সৈন্যবাহিনী গঠন করে যতদিন পর্যন্ত না শহর, নগর ও রাজধানী অধিকারের চূড়ান্ত বিজয় অভিযান শুরু করেছে, ততদিন পর্যন্ত শহরে ও নগরে শ্রমিক, ছাত্র ও যুবকেরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে বা কেবল অর্থনৈতিক আন্দোলন করেই ক্ষান্ত হবে। এভাবে বিশ্লেষণ অত্যন্ত অবাস্তব ও দ্বিতীয় বাস্তব সত্যতাকে অস্বীকার করা।

শহর ছেড়ে এক্ষুণি কলকাতার শ্রমিক ছাত্র ও যুবকদের কৃষি বিপ্লব করার জন্য গ্রামে যাও বলে নির্দেশ দেওয়া অবাস্তব। আমরা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলি রণভাবে বিপ্লবী পরিস্থিতি বর্তমানে ভারতবর্ষে বিরাজ করছে। তবু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের প্রভাবে বিক্ষুব্ধ ও ব্যাপক গণজাগরণ বর্তমানে হয়নি, আ অবস্থায় আছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নি বুঝতে পারি যদি চৌ-এন লাইয়ের নেতৃত্বে সাংহাই অভ্যুত্থানের মত আমাদের দেশেও শহর, নগর ও মহানগরীতে অভ্যুত্থান না ঘটে তবে শহরাঞ্চল থেকে বা কলকাতা ছাত্র ও যুবকেরা গ্রামাঞ্চলে যুবকের সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে যা

প্রকাশিত হ'ল।।

কিরীট-এর

দুর্গম গিরি তীর্থে

(সুন্দর প্রচ্ছদে জ্যাকেট মোড়া)।

তথ্যবহুল এই গ্রন্থে রয়েছে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, কেদার ও বদ্রীনাথ ভ্রমণের স্বাতন্ত্র্য স্বাদ (১২ 00)

সাহিত্যলোক ৩২।৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

তা ভাবা অবাস্তব। কিছু সংখ্যক বাছাই করা শ্রমিক, ছাত্র, যুবককে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের লড়াইতে সামিল হতে পাঠান। পার্টির শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী যতদূর সম্ভব গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক, ছাত্র ও যুবকদের পাঠাতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির যতবেশী বিপ্লবী লোক লড়াইতে সামিল হতে পাঠান যায়। পার্টির বল, অর্থবল ও অস্ত্রবল আছে বা থাকা সম্ভব, তবু বাস্তব সত্য থেকেই যাবে যে শহরের অগণিত শ্রমিক, ছাত্র, যুবশক্তি তখনও বিরাজ করবে। দ্বিতীয় বাস্তব সত্যতার এই সত্য স্বীকার করতেই হবে। এবং এই ক্ষেত্রে নগর ও শহরের শ্রমিক, ছাত্র ও যুবকদের সশস্ত্র অভিযানের জন্য বাস্তবে প্রস্তুত করতে হবে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের নিদারুণ প্রভাবে, যদি ব্যাপক গণজাগরণ শহর ও নগরে ছড়িয়ে পড়ে সেই ক্ষেত্রে জনগণকে সংগঠিত করে সেখানে সশস্ত্র অভ্যুত্থান না করার অর্থ হোল কমরেড মাও এবং লিন পিয়াও-এর বিপ্লবী শিক্ষাকে অস্বীকার করা। শহর ও নগরে সেইরূপ বিপ্লবী পরিস্থিতির সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব হোল শ্রমিক ছাত্র ও যুবককে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সংঘবদ্ধ করা ও সর্বতোভাবে প্রস্তুত রাখা।

আমাদের এই কথাকে বিকৃত করার সুযোগ আমরা কাউকে দিতে চাই না, তাই আবার বলছি সাংসাইয়ের মত ভারতবর্ষের নগরে ও শহরে কয়েকটি অভ্যুত্থান যদি ঘটে সেই পথে অক্টোবর বিপ্লবের ধারায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ভারতবর্ষে হওয়া সম্ভব নয়।

জনযুদ্ধের প্রধান রণনীতি 'কৃষক যুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করে শহর ঘেরাও করা বহু বছর সশস্ত্র সংগ্রামের পর অবশেষে রাজধানী দখল করে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হওয়ার' অভ্রান্ত রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাসী এবং ঐ রাজনীতিকেই বাস্তবে রূপ দিতে আমরা প্রধানত চেষ্টা করে যাবো। শহরে জনসাধারণকে নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত হলেও এবং সাময়িক বিপ্লবী সরকার গঠিত হলেও তারা বহুকাল ধরে প্রাথমিক অবস্থায় প্রবল শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহরে টিকে থাকতে পারে না। তাই সেই ক্ষেত্রে শহরে সাময়িক জয়ের পর লক্ষাধিক শ্রমিক, ছাত্র, যুবকের সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হলেও আবার সেই শক্তি নিয়ে দুরান্তের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি সৃষ্টি করে বাঁচতে হবে ও সম্ভব হলে সেইসব জায়গায় সাময়িক বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করে আরও শক্তিশালী হতে হবে। গ্রামাঞ্চলের মুক্ত এলাকাগুলির সঙ্গে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। তাই বলছি এই বাস্তব সত্যকে আমরা কোনমতেই উপেক্ষা করতে পারি না। ৫, ১০, ১৫, ২০ বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরেও সাংহাই অভ্যুত্থানের মত বহু অভ্যুত্থান ঘটবে। এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে লিন পিয়াওয়ের রণনীতিকে অস্বীকার করা। কারণ সাংহাই এর মত কোন শহরে চূড়ান্ত জয়ের আগে গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হলেও লিন পিয়াওয়ের রণনীতি অনুসারে অগত্যা অসমান যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করে গ্রামাঞ্চলে তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য। এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় বাস্তব সত্যতা যার পরিবর্তন নিজের মনস্তুষ্টির জন্য, কখনও করা যায় না।

উপরের বিশ্লেষণ অনুযায়ী তৃতীয় বাস্তব সত্যতা হচ্ছে কৃষি বিপ্লবের অধ্যায়েও বর্তমান শত্রুর আধুনিক শক্তির বিরুদ্ধে যদিও সাংহাইয়ের মত কোন কোন নগরে ও শহরে অভ্যুত্থান হয়ও বা তবু তা অক্টোবর বিপ্লবের ধারায় স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবে না। এই সত্যতা চীন কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণ ও নির্দেশের মধ্যে আমরা পেয়েছি এবং তার সত্যতা আমরা নির্ভুলভাবে গহণ করেছি।

'লিন পিয়াওয়ের জনযুদ্ধের সামগ্রিক নীতি ও কৌশল'—

লিন পিয়াও-এর জনযুদ্ধের নীতি ও কৌশল খণ্ড খণ্ডভাবে বিক্ষিপ্ত বা ছড়ান বলে আমরা মনে করি না। তাঁর রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিক অর্থ হোল : —

১। কৃষকদের দূর দূর গ্রাম থেকে সশস্ত্রসংগ্রাম শুরু করাও বিচ্ছিন্ন মুক্ত অঞ্চল গড়ে তোলা এবং এইভাবে শহর ও নগরকে ঘেরাও রাখা।

২। সরকারের আধুনিক সৈন্যবাহিনী সাধারণতঃ রেল লাইন ও বড় বড় সড়ক ব্যবহার করে থাকে। এদের পক্ষে গেরিলা বাহিনীর মত ছোট ছোট অংশে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আক্রমণ চালান সম্ভব নয়। কারণ তাতে তাদের স্ট্র্যাটেজিক স্টেটনথ্ বিনষ্ট হয়। আর কোন সরকারেরই এত সৈন্যবাহিনী নেই যাতে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র কৃষকবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

৩। প্রয়োজন অনুসারে ৫, ১০, ১৫, ২০ বছর শহর ঘেরাও রেখে শত্রুকে বিধ্বস্ত করতে হবে ও অবশেষে চূড়ান্তভাবে শহর জয় করে চূড়ান্ত বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে। রাতারাতি শহর ও নগরে বিপ্লবী শক্তি গড়ে উঠতে পারে না এই সুদীর্ঘ বছরগুলি শ্রমিক এবং ছাত্র যুবকেরা অর্থ-

ও কৃষিবিপ্লবের স্তরে ৫, ১০, ১৫ বছরের লড়াইয়ের পথে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪। এই কৃষি বিপ্লব, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। এই নেতৃত্বে যথার্থ ও বাস্তব রূপটা কি তা বুঝে নিয়ে বিপ্লবী বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির পথ নির্দেশ দিতে হবে ও তার জন্য বৈপ্লবিক সাংগঠনিক উপযুক্ততা অর্জন করতে হবে।

৫। লিন পিয়াও বলেছেন, 'আমাদের হাতে এখন পৃথিবীর সব রেভলিউশনারীর ইতিহাস আছে, এখন কথা হচ্ছে যদি আমরা ভাল করে সেইসব ইতিহাসকে হৃদয়ঙ্গম করে, কার্যত ইনটিগ্রেট করে প্রয়োগ করি তবে তার ফল কেবল ভালই হবে তা না—তা অত্যন্ত সন্তোষজনক ফলপ্রসূ হবে।' লিন পিয়াও কোন কারণে খেয়ালবশতঃ ক্রিয়েটিভলি ইনটিগ্রেট কথাটি জুড়ে দেন নি। লিন পিয়াও কোন কঠোর নির্দেশ দিয়ে পৃথিবীর বিপ্লবী শক্তিকে পঙ্গু ও খর্ব করে দিতে চান নি। মাও, লিন পিয়াও তাদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা দিয়ে বিপ্লবী শক্তিকে ক্রিয়েটিভলি ইনটিগ্রেট করার অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু এই অধিকার দায়িত্বহীনভাবে ও না বুঝে গ্রহণ করে, যদি কেউ অক্টোবর বিপ্লবের নীতি ও কৌশল প্রচার ও প্রয়োগ করতে চায় তবে মহা ভুল করবে। জনযুদ্ধের অভ্রান্ত রণনীতি ও রণ কৌশল গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও করে রেখে সুদীর্ঘ বছরের পর বছর সশস্ত্র লড়াই করে চূড়ান্ত জয়ের পথ সুনিশ্চিত করার—এই পথ যাঁরা গ্রহণ করবেন কেবল তাঁদেরই অধিকার আছে ক্রিয়েটিভলি ইনটিগ্রেট করে জনযুদ্ধকে যুদ্ধকে বাস্তবে আরও শক্তিশালী করবে।

আমরা ঘোষণা করছি সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন বিপ্লবের শিক্ষা থেকে আমরা বৈপ্লবিক জ্ঞান অর্জন করব, সেই জ্ঞানকে লিন পিয়াও-এর সার্বিক নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার অভিপ্রায়, আমাদের ক্রিয়েটিভলি ইনটিগ্রেট করতে হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লিন পিয়াও-এর জনযুদ্ধের সাধারণ নির্দেশ গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষি বিপ্লব শুরু করা ও শহর ঘেরাও করার রণনীতিতে আমাদের কর্মসূচীতে সর্বপ্রাধান্য দিয়েছি ও দিয়ে যাবোই।'

'প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শক্তির প্রচণ্ডতা'

অধুনাকালে পাকিস্তানে যে জঙ্গী জনজাগরণ ঘটেছে ও যার প্রভাবে প্রেসিডেন্ট আয়ুবশাহীর পতন হয়েছে, সেইরূপ প্রবল জনজাগরণের ইতিহাস ভারতে ও পাকিস্তানে

[redacted]

ছাড়েই আবার দেখতে ও বুঝতে হবে কি করে পাকিস্তানের এই প্রবল গণবিক্ষোভকে সামরিক আইনের জোরে তিন দিনের মধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ নিশ্চল, নিরীহ ও নিস্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব হল ? এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জিজ্ঞাসা ভারতের তথাকথিত কমিউনিস্টরা এমন কি নকশাল-বাড়ী বিপ্লবী কমিউনিস্ট দলরাও এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শক্তির প্রচণ্ডতা সম্বন্ধে বাস্তব বিশ্লেষণ করতে উদাসীন কেন ? পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় এবং অধুনা পাকিস্তানের ইতিহাসে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখেছি যে নিরস্ত্র জনসাধারণকেও মুহূর্তের মধ্যে সামরিক ক্ষমতার জোরে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। ভবিষ্যতেও ভারতে এইরূপ জনজাগরণের বিরুদ্ধে ভয়ংকর ইয়াহিয়া খাঁর আবির্ভাব হবে। ইতিপূর্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও এইরূপ শোচনীয় নজীর আছে। ভারতের তথা জনজাগরণকেও সামরিক শক্তির জোরে বিধ্বস্ত করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'ম্যাসেস আর পোটেনসিয়ালি রেভলিউশনারী' 'হ্যাভ ফেথ অন দ্য ম্যাসেস' ইত্যাদি কতগুলি মার্কসবাদী, লেনিনবাদী উদ্ধৃতির আড়াল থেকে সক্রিয়ভাবে জনগণকে সশস্ত্র করার দায়িত্ব উপেক্ষা করার অবৈপ্লবিক মানসিক জড়তাকে পরিহার করে আমাদের চলতে হবে। যদি সক্রিয়ভাবে জনসাধারণকে সশস্ত্র করে তোলার দায়িত্ব আমরা না নিই এবং সেইরূপ ক্ষেত্রে যদি বিরাট জনজাগরণ আমাদের দেশেও নিস্তব্ধ হয়ে যায় তখন কি আমরা সি পি আই এম-এর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এইরূপ একটি কড়োয়া দিয়ে ক্ষান্ত থাকব—'তোমরা বিপ্লবী পরিস্থিতির সুযোগ নাও নি। জনসাধারণের অভূতপূর্ব বিক্ষোভকে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য—নেতৃত্ব না দিলে জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ'। এভাবে ক্ষতাদা দেওয়ার অর্থই হবে যেন আমাদের বিশ্বাস আছে—সি পি আই এম কোন কালে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হবে ও জনগণকে ডাক দেবে। আমাদের সি পি আই এম সম্বন্ধে সেইরূপ কোন ধারণা নাই।

বিপ্লবী শক্তিকে খর্ব করার জন্য ভারতে ও 'জেনারেল সুহার্তো', 'ইয়াহিয়া খাঁর মত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনাকে উদাসীনোর চোখে দেখা এবং উপযুক্তভাবে তার মোকাবেলা করার জন্য বিপ্লবী সংগঠন নিয়ে প্রস্তুত, না থাকার মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করতে হবে। সুদূরপ্রসারী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেইরূপ পরিস্থিতিতেও বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার অভিপ্রায়ে উপযুক্তভাবে সংগঠিত হতে হবে। এই দায়িত্ব বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিকে বহন করতে হবে। আমরা ঘোষণা করছি সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা সর্বশক্তি নিয়ে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাবো।

অর্থনৈতিক সংগঠন ও সংগ্রাম

আমরা ঘোষণা করছি, যেহেতু আমরা এতক্ষণ কেবল সংগ্রামের কথাই বলে এসেছি তা থেকে যদি কেউ মনে করেন, আমরা চাই না যে, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুবকদের নিয়ে অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে হউক বা সেই দাবীদাওয়া নিয়ে ধর্মঘট ও সংগ্রাম চলুক তবে আমাদের ভুল বুঝবেন। আমরা অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া নিয়ে সংগঠন গড়ে উঠুক ও সংগ্রাম চলুক তা মে চাই শুধু তাই নয় বর্তমানে যেভাবে চলছে তার থেকে আরও সহস্র গুণ জোরদারভাবে চলুক তাই আমরা চাই, আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া ও সুখ-সুবিধার ভিত্তিতে গণসংগঠন গড়ে উঠবে ও যেখানে আমাদের পক্ষে সম্ভব সেখানে স্বতন্ত্রভাবে আমরাও সেইরূপ সংগঠন গড়ে তুলব ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে সংগ্রামও চালাব। তবে কোন প্রকার ঘোর প্যাঁচ ও শোধনবাদের প্রভাব না রেখে বা আগে থাকতে পরিষ্কার করে বলতে চাই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবকদের সংগঠনগুলিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংগঠন ও সংগ্রামের গণ্ডিতেই নিবদ্ধ রাখা হউক তা আমরা কোন মতেই চাই না ও কখনও করব না আমরা জনসাধারণের অর্থনৈতিক সংগঠনের ও সংগ্রামের গণ্ডিকে অতিক্রম করে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে তাদের নিয়ে যেতে চাই। যারা সংগ্রামের নামে মিথ্যা মুখোস পরে শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণকে ভাওতা দিচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের গণ্ডিতেই তাদের নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করছে তাদের প্রবঞ্চনামূলক জনস্বার্থবিরোধী অবৈপ্লবিক কর্মকৌশলের জন্য খুপশে আমরা জনসাধারণের বিপ্লবী দরবারে উদ্ঘাটন করতে চাই, আর আমরাও বিপ্লবী কমিউনিস্টরা, শোধনবাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেই ক্ষান্ত থাকব না সক্রিয় সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের দিকে শ্রমিক কৃষক, ছাত্র, যুবকদের বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাব।

আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট, ৪০ বছর ধরে সি পি আই এম-এর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। এই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামে নিবদ্ধ থাকার অনড় ও অচল অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। তাই যেখানে সম্ভব ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, ছাত্র যুবক সমিতির অভ্যন্তরে ছোট ছোট গেরিলা দল সৃষ্টি করব এবং যেখানে সম্ভব অর্থনৈতিক সংগ্রামের গণ্ডি অতিক্রম করে রাজনৈতিক সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে মোড় ঘোরাব।

বিপ্লবী থিয়োরী ও প্র্যাকসন

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্মসূচী হবে কেবলমাত্র নীতিগত প্রচার নয় তার সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা বাহিনীকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। কেবলমাত্র নীতির ব্যাখ্যা ও প্রচারের যুগ শেষ হয়েছে। ভারতের বর্তমান বিপ্লবী পরিস্থিতি দাবী করে আর্মড এ্যাকসন এণ্ড থিয়োরী—কেবল থিয়োরী বা কেবল আর্মড এ্যাকসন তা নয়, চাই এ কম্বিনেশন অফ বেভলুশনারী থিয়োরী এণ্ড কন্টিউনিয়াস আর্মড এ্যাকসন যথেষ্ট থিয়োরী বা আলোচনা হয়েছে। বিপ্লবের অভ্রান্ত নীতি ও কৌশল সম্বন্ধে আমরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব থেকে জেনেছি। নতুন করে থিয়োরী কপচানোর কি আছে?—আর যারা নতুন থিয়োরী দিচ্ছেন বলে মনে করছেন তারা কি তা দিতে পারছেন? অভ্রান্ত বিপ্লবী থিয়োরীকে গুপ্ত সড়ঙ্গ পথে শোধনবাদী থিয়োরীতে রূপান্তরিত করার জন্য কোন কোন বিপ্লবী কমিউনিস্ট বন্ধুরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন ও আবহমান কাল পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাউটস্কী ট্রটস্কী, জিনোভিয়েভ, কামনভ লিউ শাওকি; ডাঙ্গে, বাসবপুন্নায়া প্রমুখের, বার বার—বিপ্লবী নীতি ও কৌশলকে ধ্বংস করার জন্য জন্ম হয়েছে ও ভবিষ্যতে ও তাদের জন্য অব্যাহত থাকবে—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেই দুরভিসন্ধিমূলক অবৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর।

আমাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা বিপ্লবী থিয়োরীর অভাবে আমরা ভুগছি না—আমরা ভুগছি আমাদের নিষ্ক্রিয় ও পঙ্গুমনের ব্যাধিতে ও স্নায়বিক দৌর্বল্যে। মৃত্যুভয় ছেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে তারপর দেখবো থিয়োরী আমাদের কাছে খুব সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। থিয়োরীর গণ্ডিতেই নিবদ্ধ থেকে আর কাল অপচয় করার জন্য আমাদের সময় ও শক্তির অপব্যয় করতে হবে না। সেই ব্যাধি মুক্ত হয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকেই শুরু করতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ।

আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার অবকাশ রাখতে চাই না। থিয়োরী মাস্ট গাইড প্র্যাকটিস' এই মার্কসিস্ট প্রিন্সিপাল আমরা কখনও পরিত্যাগ করতে পারি না। বিপ্লবের গতি সুনির্দিষ্ট পথে সুপরিচালিত করার জন্য বিপ্লবী কমিউনিস্টদের ইনভিসবল (দুর্ভেদ্য) বিপ্লবী থিয়োরী থাকবেই। সেই নীতি ও কৌশলের দুর্ভেদ্য থিয়োরী চীন কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। তাই বলছি নতুন করে থিয়োরী কপচাবার অধিকার বিপ্লবী কমিউনিস্টদের নেই। সেই থিয়োরীকে কার্যে পরিণত করার জন্য বর্তমানে 'মাস প্র্যাকটিস অফ গেরিলা এ্যাকসন'-এর প্রয়োজন —তাই আমাদের বক্তব্য বর্তমানে চাই আর্মড এ্যাকসন থিয়োরী নয়।

(চলবে)

সরমা ও পণিরা

চিত্রিতা দেবী

সে কোন দেশ কে জানে। তারিখের হিসেব নেই, ইতিহাসের সীমানা নেই। তাই ভূগোলেরও ঠিকানা মেলা ভার। তবু কল্পনা করতে বাধা নেই, পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজের মেলা। স্নিগ্ধ কোমল নয়না-ভিরাম। এইখানে এই সবুজ পাহাড়ের উপত্যকায় পণিদের গ্রাম; আর ঐ পাহাড়ের গায়ে, যেখানে আম, জাম, আর শাল তমালের জঙ্গলে বনলতায় বুনো ফুল ফুটছে স্বর ঝরছে, সেইখানে ওদের গোচারণ গোষ্ঠ। ঘন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় গাভীরা। হাজার হাজার গাভী, হয়ত বা লক্ষ লক্ষ। কালো, সাদা, পাটকিলে, মিশ্র তাদের গায়ের রং। মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট বিরাট তাদের চেহারা। অঢেল তাদের দুধ। ওরা হাম্বারবে গর্জন করতে করতে পাহাড়ের এদিক থেকে ওদিকে ছোটে। ওদের সেই গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দূরদূরান্তে। সিংহেরা ভয়ে পালিয়ে যায় গভীর জঙ্গলে।

গাভীদের সঙ্গে থাকে গোপালক রক্ষীর দল। তাদের হাতে পাথরের বর্শা, আর কাঁধে বেতের ধনুক। তাদের তূণে তামার তীক্ষ্ণ ফলক রোদ লেগে রক্তের মত লাল দেখায়। জঙ্গলের সীমানায় ওরা লক্ষ্য রাখে। যদি কোন সিংহ অথবা বুক (নেকড়ে বাঘ) দল ছাড়া কোন গাভীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওরা বর্শা ছুঁড়ে তাকে হত্যা করার ক্ষমতা রাখে। যদি কোন দস্যু দল হঠাৎ এসে কৌশলে গাভী দখল করতে চায়, ওরা লড়াই করে গাভী দখল করতে জানে। —ওরা রক্ষক, —তাই রাখাল।

ওদের খাদ্য হয়ত ঘরের ছাতু, বনের মধু আর গরুর দুধ। —যত ইচ্ছে খাও। মাঝে মাঝে ওরা হরিণ শিকার করে। সেদিন বনভোজন হয়। হরিণ মেরে চামড়া ছাড়িয়ে মাংস খণ্ড খণ্ড করে নদীর জলে ধুয়ে নেয় ওরা। একদল ব্যস্ত থাকে শকুন তাড়াতে। তারপরে তামার শিকে গেঁথে গেঁথে আগুনে ঝলসে রান্না হয় মাংস।

সেদিন মহোৎসব হয়। গরুর চামড়ার তৈরী কোন এক ধরনের ঢাক বাজিয়ে ওরা গান করে আর নাচে। হয়ত বাজে বাঁশের বাঁশী। হয়ত চুপি চুপি মেয়েরা আসে অভিসারিকার মত। পরবর্তী যুগের বৃন্দাবন লীলার অভিনয় যে সেই আদি যুগের পণিদের গোষ্ঠেও হোত না, তাই বা কে বলতে পারে। সেই গাভী, সেই বন, সেই তরুণ রাখাল আর তরুণী গোপিনী। ইতিহাস যে প্রায়ই পুনরাবৃত্তি করে থাকে এ তো জানা কথা।

মোটামুটি এইটুকু বোঝা যায় যে, পণিরা তাদের পাহাড়ঘেরা গোষ্ঠভরা গোধন নিয়ে শান্তিতেই বাস করছিল।

ভোর না হতেই হয়ত পণিকন্যারা আসত মাথায় কলসী নিয়ে, দুগ্ধ দোহন করে ভরা ঘট নিয়ে ফিরে আসত গ্রামে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ওদের কারো গলায় হয়ত ঝুলতো তামার চাকতি, অনাবৃত বক্ষের মাঝখানে। কারো বা গলায় বনফুলের মালা, হয়ত কোন যুবক বন্ধুর দেওয়া।

সেদিনো এমনি করেই ফিরে আসছিল ওরা পাহাড়ের গা বেয়ে সারি সারি ফুলের মালার মতন। এমন সময়ে হঠাৎ দেখে, কে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের গ্রাম চত্বরে? গ্রামের বয়স্ক পুরুষরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কারণ তরুণেরা তো সবাই গেছে গোষ্ঠে গ্রামে আছে শুধু বৃদ্ধ, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের দল,—আর রমণীরা।

কৌতূহলে ছুটে এল পণিকন্যারা। সে এসেছে সেও যে একজন তাদের মতই নারী। কিন্তু এ কেমন নারী! তার দুই কাঁধ ও বক্ষ আবৃত করে আছে সোনা ও তামার মিশ্রিত একটা বর্ম। তার হাতে খড়্গ, পায়ে চর্ম পাদুকা, শক্ত লতাতন্তু দিয়ে বাঁধা। সঙ্গে দুই বিশাল কুকুর। সবসময় সঙ্গে সর্বদা কুকুর থাকত বলেই কুকুরের এক নাম সারমেয়। তার উরুতে ঝুলছে তামজাল, পরনে কার্পাসের বস্ত্র। সে এসে দাঁড়িয়েছে যেন সিংহবাহিনী দেবী। প্রভাতসূর্য তার মুকুটে নানা বর্ণে প্রতিফলিত হচ্ছে। তার সোনালী চুল চূড়ো করে বাঁধা। তার গায়ের রঙের সঙ্গে স্বর্ণমুকুটের রঙ মিশে গেছে। সে মেয়ে বটে তবু যেন মেয়ে নয়।

গ্রামের বয়স্কা মেয়েরা কেউ তার সামনে আসতে ভরসা পায় নি। পিছনে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। পুরুষরা এগিয়ে গেছে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

বিপাশ পরুষ্ণী ও শতদ্রীর তীরে তীরে আর্য বসতি। তাদের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন গ্রাম, বিভিন্ন যজ্ঞক্ষেত্র। সেখানে সর্বত্রই ব্রাহ্মণের রাজত্ব। বৈশ্যরা চাষ করে, তাঁত বোনে। যা কিছু শিল্পদ্রব্য ওরাই তৈরী করে। ওদের শ্রমিক হয়ে কাজ করে শূদ্ররা। গ্রামের ধারে ধারে বহু শূদ্রের বাস। যেসব দস্যু জাতিকে পরাজিত করে আর্যরা দাসত্বে নিযুক্ত করেছিল, তাদেরই শূদ্র নাম দিয়ে নিজেদের বর্ণগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। আর্য জাতির সেবা করাই ছিল তাদের কাজ।

সেদিনের সেই বিপাশা শতদ্রু কি আজকের এই নদীরাই? সেদিনের বহু চিহ্নহারা নামের মধ্যে মাত্র কয়েকটিকেই আজো খুঁজে পাওয়া যায়। কে জানে কোথায় ছিল বর্চীবন্ত বাল্লা কোথায় ছিল মুঞ্জবন্ত পাহাড় যেখানে বসে ভরদ্বাজ সোমলতারা লতিয়ে থাকত? কোথায় ছিল আর্যদের আদিবাসভূমি? কেউ বলে দক্ষিণ রাশিয়ার কোন জায়গায়, কেউ বলে মধ্য প্রাচ্যের কোন ভূখণ্ডে। কেউ বা আবার বলে এই ভারতেই, কিন্তু এ মতটা অবশ্য আজকাল কেউ মানে না। আর্যরা যে বহিরাগত এইটেই আজকের যুগে সিদ্ধ ঐতিহাসিক তত্ত্ব। কিন্তু তাঁদের বেদ যে হিমালয়ের নীচে উত্তর পাঞ্জাবের পাহাড়ে পাহাড়ে গাঁথা, নদীতে নদীতে ঘেরা শস্য-সম্পদে পূর্ণ কোন অঞ্চলেই (ব্রহ্মর্ষি দেশ) রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয় থাকার কোন কারণ দেখা যায় না।

আর্যরা বহিরাগত হলেও বৈদিক সূক্তগুলির মধ্যে কোথাও তাদের সেই আদি বাসভূমির স্মৃতির পরিচয় নেই। যারা এত কল্পকথা এত পুরান কথা এত কবিতার সৃষ্টি করল, তারা তাদের মাতৃ-ভূমিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হোল কেন? মাতৃভূমির গৌরব তারা করল না,—করল খালি আর্যত্বের গৌরব।

আর্য ছাড়া আরো বহু জাতি তখন এখানে বাস করত। তাদের মধ্যেও বেশীর ভাগই শূনি বাইরে থেকে এসেছিল। সেই জন্যেই বোধহয় আজো পর্যন্ত দেশটা কারো নিজের হতে পারল না। আর্যরা এদের প্রত্যেকের উপরেই প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইল, কারণ বোধহয় সেই একই,—সেই আজকের মতই বর্ণবিদ্বেষ। আর্যরা ছিল গৌরবর্ণ। অন্যদের সকলের রঙেই ছিল কৃষ্ণতার তারতম্য।

তখনো ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে তফাতটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ব্রাহ্মণের বাহুতেও ক্ষত্রিয়ের মতই বল। সে যজ্ঞও করে যুদ্ধও করে। তাছাড়া কোন কোন ব্রাহ্মণের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। সে কথার সঙ্গে কথা জুড়ে ছন্দ রচনা করতে পারে। তাই তাদের ঋষি বলা হয়। ছন্দে গাঁথা কাব্যের দ্বারা ঋষিরা দেবতার বন্দনা করে। বৈদিক কবিতাগুলির নাম সূক্ত। এই আকাশে বাতাসে জলে স্থলে, প্রভাতে সন্ধ্যায়, এই অগ্নিতে আর আকাশের সূর্যে তাঁরা দেবতাদের বিচিত্র লীলা দেখতে পায়। শুধু তাই নয়, এই ওষধি বনস্পতি, এই সোমলতা,—সোম নিষ্কাশনের পাথর সবই তাদের কাছে আশ্চর্য দেবতাময়। তাই সোম পেষণের পাথরের গাঁতার উপরেও তারা কাব্য রচনা করে।

আর্যজগতে ইন্দ্র একজন প্রধান দেবতা। ইন্দ্রস্তুতি করে আর্য ঋষিরা শক্তির প্রেরণা লাভ করতেন, এবং শক্তি-মান হয়ে তাঁরা শত্রু বধ করতেন।

আর্যদের নিজেদের মধ্যে তো লড়াই মারামারি লেগেই থাকত। তাছাড়া আর্যেতর বিভিন্ন জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যেও তাদের প্রায় সব সময় প্রস্তুত থাকতে হোত। এইসব জাতিদের প্রায় সকলকেই দস্যু অথবা অনার্য বলে বলা হয়েছে।

কিন্তু 'পণি'দের সাধারণ অনার্যদের তালিকাভুক্ত করা হয় নি। যদিও মাঝে মাঝে তাদেরও দস্যু বলা হয়েছে। পণিদের সঙ্গে আর্যদের বিরোধের কথা আরো কয়েক জায়গায় রয়েছে। এই সূক্তে তাদের অসুর

বলা হয়েছে। তাতেই মনে হয়, তাদের রঙ হয়ত তেমন কালো ছিল না। এদের উপরে আর্যদের ঘৃণা সেদিন প্রবল হয়ে উঠেছিল। কারণ তারা ছিল ধনী। তখনকার দিনে ধনের পরিমাপ হোত গরু দিয়ে। তাই নাম গোধন। মহাভারতের আমল পর্যন্ত আমরা গোধনের কথা শুনে আসছি।

এই পণিরা কারা এই নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা বক্তব্য। কেউ কেউ বলেন, মধ্য এশিয়ার প্রাচীন ফোনেশিয় জাতি যারা জলপথে নৌকা নিয়ে সে যুগের পৃথিবীর সর্বত্র কেনাবেচা করে ফিরত, তাদেরই কোন কোন দল এখানে এসে বাসা বেঁধেছিল, আর ফিরে যায় নি। একটা কথা অবশ্য প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে, পণিরাই পথে বণিক নাম ধারণ করেছিল। পণ্য ও বিপণি, এই দুটি কথার মধ্যেও বোধহয় ঐ পণিদের নামটাই লুকানো আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে পণিরা প্রচুর গোধনের অধিকারী ছিল। দুগ্ধজাত দ্রব্য দিয়েই হয়ত প্রথম বাণিজ্য শুরু হয়েছিল। ভারে ভারে দুধ, পনীর নিয়ে হয়ত ওরা বিক্রী করত আশেপাশের গ্রামে। হয়ত আর্য বসতিতেও যেত। কে জানে কেমন ছিল ওদের দিনযাপনের রঙরেখা।

এই সূক্তে পণিদের অসুর বলা হয়েছে। যে অর্থে দেবতাদেরও মাঝে মাঝে অসুর (অর্থাৎ মহাবলশালী) বলা হোত। নিশ্চয়ই সে অর্থে নয়। কারণ এদের অত্যন্ত হীনভাবে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কৃপণ, এদের পাপদেহ। —ধনের ব্যবহার এরা জানে না। অথচ এদের ব্যবহারে আমরা মহত্ত্বই দেখতে পাচ্ছি। কেউ কারো উপরে দ্বেষবশে দোষারোপ করে বইতে লিখলেই সেটা সত্য হয়ে যায় না। ঋগ্বেদের মত বইতে লিখলেও না। সত্য প্রমাণ হয় মানুষের ব্যবহারে। 'মিথ্যাময়ী' ইতিহাস চিরকালই কিছু কিছু মিথ্যে বলে থাকে।

যাইহোক পণিরা ফোনেশিয়া থেকেই আসুক কিংবা অসুরদের দেশ এসেরিয়া থেকেই আসুক, সে আরো আরো বহুকাল আগের কথা। এই সূক্ত রচনাকালে তারা পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। এই সূক্তে দেখা যাচ্ছে, পণিরা চিরপরিচিত ভারতীয়দের মতই বহিরাগতের প্রতি নম্র বিনীত ও শোভন ব্যবহার করেছে। এবং সরমা ভারতীয়দের প্রতি চিরাচরিত বিদেশীদের মতই গর্বিত, দুর্বিনীত ও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেছে।

সরমাকে দেখে পণিরা ছুটে এসেছিল অভ্যর্থনা জানাতে—'তুমি কে গো? কত দূরদেশ থেকে তুমি এসেছ? এলে কেমন করে? কত রাত কাটল তোমার এ দুর্গম পথে? নদী পার হলে কেমন করে?

সরমা বলল,—'আমি ইন্দ্রের দূতী। ইন্দ্রই আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি এসেছি তোমাদের গাভীগুলি নিয়ে যাব বলে। আমরা জানতে পেরেছি, এই পাহাড়ে তোমরা গোধন লুকিয়ে রেখেছো।

বিস্মিত পণিরা বললে,—'ওগো ইন্দ্রদূতী, বল তোমাদের ইন্দ্র কেমন দেখতে, কেমন তার রূপগুণ? তাকে নিয়ে এস এখানে। আমরা তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করব, এমন কি আমাদের গাভীগুলিও তাকে দিতে রাজী আছি।

হুঁ, হেসে উঠল সরমা,—'আমি যাঁর দূতী, তাঁর সঙ্গে লড়াই করে পারবে কে? সবার উপরে তাঁর জয়। এইসব কলনাদিনী নদীরাও তাঁর গতিরোধ করতে পারে না। ইন্দ্রের হাতেই তোমাদের শেষ শয়ন পাতা হবে সন্দেহ নেই।'

পণিরা কিন্তু ক্রোধে অধীর হয়ে উঠল না ক্ষত্রিয়ের মত। তারা ধীরভাবে মৃদু হাস্যে বললে—তুমি স্বর্গের সীমানা পার হয়ে আসছ, তোমাকে বিমুখ করতে মন চায় না। কতগুলি গাভী তুমি চাও, বলো। আমরা তোমাকে দেব। বিনাযুদ্ধে এসব গাভী কেউ তোমাকে দিত কী? আমরাও একেবারে ভীরু নয়। অনেক অস্ত্রশস্ত্র আমাদেরও আছে। অনেক তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র। বীর পণি যুবকরা এই গোধন রক্ষা করছে। আমাদের এই পাহাড় দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত বন গাভী, অশ্ব ও অন্য আরো সম্পদে পূর্ণ। তোমরা কোথা থেকে খবর পেয়ে এসেছ কে জানে? বোধহয় দূর থেকে গম্ভীর গাভী গর্জন শুনতে পেয়েছিলে।

সরমা বললে—'ওগো পণিদল, বোঝাই যাচ্ছে তোমাদের শরীরে পাপ আছে। তোমাদের সেই পাপ শরীর ধ্বংস করবার জন্যে আয়াস্য ঋষি ও অঙ্গিরাপুত্র প্রভৃতি বীরগণ আসছেন। পালাও পণিগণ, ভালো চাও তো শীঘ্র পালাও।'

পণিরা বললে,—'ওগো সুন্দরী, বুঝেছি দেবতারা তোমাকে পাঠিয়েছে আমাদের ভয় দেখাতে। কিন্তু তোমাকে আমাদের ভালো লেগেছে। তুমি আর ফিরে যেও না, এখানেই থাক। আজ থেকে তুমি আমাদের সহোদরা।'

গর্বিতা সরমা বললে—'ওসব ভাই-বোনের ব্যাপার কিছু শুনতে চাই না। ইন্দ্র ও অঙ্গিরার সন্তানেরা গাভীর জন্যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তোমরা যে পাহাড়ের জঙ্গলে গাভী লুকিয়ে রেখেছো, সে খবর সবাই টের পেয়ে গেছে। বেচারা গাভীরা তোমাদের কাছে কষ্টে আছে। আমাদের ধর্মের আশ্রয়ে তাদের ছেড়ে দিয়ে তোমরা ভিটেমাটি ছেড়ে শীঘ্র পালাও। নইলে তোমাদের রক্ষা নেই।'

এ সূক্ত এখানেই শেষ। শেষ পর্যন্ত আর্যরা তাদের দেবতাদের অনুগ্রহে পণিদের কাছ থেকে গাভী কেড়ে নিতে পেরেছিল কিনা সে খবর অবশ্য জানা গেল না।

(ঋগবেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্ত অবলম্বনে লেখা।)

কবিরাই কবিতার পাঠক!

আমি অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। গত ৩ মার্চ ১৯৭৮-র সংখ্যাটিতে প্রকাশিত 'সাহিত্য ইত্যাদি' বিভাগে কবি মণীন্দ্র রায় 'কবিতার কথা' লেখাটি পড়ে কিছু মন্তব্য না করে আর পারলাম না।

কবি মণীন্দ্র রায় কবিতা কিভাবে হয় এবং কি ধরনের কবিতায় কবি সত্তা ধরে রাখেন তার সুন্দর কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রত্যেক সৎ কবিরই তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত। তবে একথা ঠিক, কবি এখানে আধুনিক কবিদের সমালোচনার মধ্যে না গিয়েও কবিতার সূত্র হিসেবে গ্রহণীয় কয়েকটি মতবা করেছেন।

আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয় তাঁর এই মূল্যবান রচনাটি সম্পর্কে নয়। আমার কয়েকটি প্রশ্ন মাঝে মাঝেই মন থেকে ভীষণ-ভাবে আন্দোলন তোলে—কবিতার সূত্র কি? আধুনিক কবিতা কাকে বলব কিংবা প্রতি-দিন হাজারটা কবির পাঠক কেন তৈরী হচ্ছে না? আসলে কবিরা তাঁদের সৃষ্টি বড্ড বেশি দুর্বোধ্যভাবে প্রকাশ করছেন। পাঠক-এর মনে কোনো পংক্তি আন্দোলিত হয় না। আবৃত্তির ধ্বনি খুঁজে পান না। সম্ভবত এ কারণেই একটি বিষয় লক্ষ্য করছি, কবিরাই কবিতা লেখেন তাঁরাই কবিতার পাঠক। কবিতায় তাঁরা কি যে বলতে চান কোন অনুভূতি জাগাতে চান বোধ করি তাঁরা নিজেরাই জানেন না।

আমার হাতের সামনে মণীন্দ্র রায়ের একটি কবিতার বই 'আমি তোমারই ঘরে বাংলাদেশ'। প্রত্যেকটি কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে আমার মন বার বার ফিরে যায়। কেন জানেন? বোধ করি অনেক আধুনিক কবিই এর উত্তর দিতে পারবেন না। আসলে এই কবিতাগুলিতে আছে একটি দেশ-কাল এবং তার মানুষের মনের ছবি—বাইরের এক বিশ্ব প্রকৃতির অনুভূতি। আর আছে আবৃত্তি করার মতো একটি বিশেষ ছন্দ। যেগুলো পড়তেও ভালো লাগে, দুর্বোধ্যও নয়। কবিতা সম্পর্কে আরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলে খুশি হব।

প্রসাদ, আলিপুরদুয়ার
কোর্ট, জলপাইগুড়ি

অমৃত আরও প্রিয় হবে

আমি অমৃত পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকাটি আমার খুব প্রিয়। কারণ এই পত্রিকার গল্প, উপন্যাস, খেলা, সমালোচনা চিত্রধর্মিতা সব দিক দিয়ে এই পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু আমার মনে হয় এই পত্রিকাটি আরও সুন্দর হয়, যদি এর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে 'ছবিতে গল্পের' ব্যবস্থা করা হয়। আমার মনে হয় 'ছবিতে গল্পের' ব্যবস্থা করলে অমৃত পত্রিকার সৌন্দর্য যেমন বাড়বে তেমনি অন্যান্য পাঠক-পাঠিকার কাছে অমৃত পত্রিকা আরও প্রিয় হয়ে উঠবে এবং অনেকে এই পত্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

দেবাশীষ মজুমদার,
৫৪৩।৪ অশোকনগর, ২৪ পরগণা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।। পঁচিশ ।।

আবুধাবি থেকে চিঠি এসেছে। ভোরের পদ্মলা কাপ চা দিয়ে চিঠিখানা কাগজের ওপর রাখলো রাণী।

খবরের কাগজ সরিয়ে দিয়ে দিলীপ বললো, কই? দেখি। হরিদার চিঠি?

শীতকালের সকালে রোদে বসে সাগরের দুয়ের পাতা দেখছিলো দিলীপ। স্টীরিও, ফিল্ম, মোটর গাড়ি, কার্পেট, এয়ারকুলার, বাইসকুকার, মালটিচ্যানেল টি ভি—কত কি বিকি আছে। সবই ব্র্যান্ড নিউ। স্পেয়ার সুদ্ধু বিকি। ইমপোর্টেড। সবাই কি বিকিবাটা করে দিয়ে সংসার তুলে সাধু হয়ে যাচ্ছে? সবারই এক মুকতি—ডিউ টু চেঞ্জ ইন স্টেশন।

হরিদা লিখেছে—এখানে এখন প্রচণ্ড শীত। গরমে প্রচণ্ড গরম।

চিঠির কাগজখানা মযলা। গোড়া থেকে পড়তে লাগলো দিলীপ।

তুমি তো জানো দিলীপ—কোন দিনই আমি ডাক্তার হিসেবে নিয়মের মধ্যে থাকি নি। এখানে বাতাসে টাকা। বলিতে টাকা। কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ। এই হঠাৎ রাজার দেশে ডাক্তারখানা মানে জেলুসিন আর ভিটামিন বি কমপ্লেকস। আর ভাল ভাল ওষুধ বলতে সবই বড় কর্তাদের জন্যে। কাহাতক রোগী ঠকিয়ে দিন কাটাই। মুখ ফকসে কিছু কথা বলে ফেলায় আজ আমি হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত। সে-মেয়েটির সঙ্গে আট মাসের চুক্তিতে বিয়ে হয়েছিল — চুক্তির মেয়াদ ফুরোতেই সেখান থেকে আমায় পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে।

এখন আমি দেবদত্ত নামে হরিয়ানার এক ঠিকেদারের কনস্ট্রাকসন কুলিদের সঙ্গে তেরপলের বস্তিতে থাকি। এদের বড় কষ্ট। ভাল মত থাকার জায়গা নেই। চানের জল নেই। ছায়া নেই যে একটু জিরিয়ে নেবে। সেই রাত বাড়লে তবে স্বস্তি।

অবশ্য এখানে এখন প্রচণ্ড শীত। গরমে প্রচণ্ড গরম। আমি গরমকালের কথা বলছিলাম।

আরেকটা জিনিসের অভাব খুব। মেয়েমানুষের। টাকার লোভে বিদেশে কাজ করতে এসে আমার দেশের এতগুলো পুরুষমানুষ মেয়েমানুষের অভাবে আস্তে আস্তে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছে। ওদের নাড়ী দেখেছি আমি। বিট গোলমাল করছে। প্রেসারেও গোলমাল। কালেভদ্রে হোমবাচোমবাদের বাচ্চাদের দেখাশুনো করতে আনা আয়াগোছের ইণ্ডিয়ান মেয়ে-ছেলে যাও বা ওরা পায়—তার জন্যে আয়াটির পায়ে ওদের এক হস্তার মজুরি—সব কটি ডলার গুণে দিয়ে আসতে হয়। উপরি-পাওনা শিরের অসাধ্য রোগ। সে-রোগের ডাক্তার আমি এখন এখানে। ওরা ভিজিট দেয়। খেতে দেয়। থাকতে দেয়। বেশ আছি। এখানে তুমি কনট্রাসেপটিভ পাবে না। ফ্যামিলি প্ল্যানিং বেআইনী।

এমবারকেশন কার্ড পেয়ে গেছি। যে-কোন দিন এখানকার সরকার আমাকে দেশে ফেরৎ পাঠাবে। ওদের হিসেবে আমি সি ক্যাটাগরির লোক। হয়ত কোস্টাল ভেসেলে নিয়ে গিয়ে কাণ্ডালায় ছেড়ে দেবে। সেখান থেকে থার্ড ক্লাশে মিটার গেজ বগি গেজ করে কলকাতায় পাচার করবে আমাকে। তার চেয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার ফ্লাইটে একখানা টিকিট দিলে কত ভাল হত। শেখদের আমি যে খুব মদালিসেছি। এখনকার ইণ্ডিয়ান কনসাল জেনারেল একজন মারাঠী। আমায় দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেন। কী শয়তানী। তোমার বিরুদ্ধে হোম মিনিস্ট্রিতে চিঠি লিখছি আমি।

আমার চেম্বারের খবর কি? তোরা খাস? গোকুলদার একখানা চিঠিতে জানলাম—তুই আর খাদানে নেই। কি ব্যাপার? হোল কি? এই এত ভাল-বাসাবাসি। তারপর একদম কাটান-ছাঁটান? না না। এ ভাল করিস নি দিলীপ। ঋষি তোকে খুব ভালবাসে। একদম বয়ে দেখাই নেই ভোদের। এটা ঠিক নয়। ঠিক করিস নি দিলীপ। তোর খুব কষ্ট হবে পরে। এসব তোর পক্ষে নরমাল নয়।

একটা জাতির বয়স হলে তবে তার মর্যাদাবোধ আসে। এদের সেসব বালাই নেই। সবে তো দেশটা জন্মাল—সবে অবস্থা ফিরছে। হামবুর্গে দেখেছি—রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। গায়ে কিছু নেই। খেয়েদেয়ে একদম টং। আমি যেতেই রিফিউজ করল। গোড়ায় ভেবে-ছিলাম—আমি কালা আদমী বলে—

কিন্তু তা নয়। মেয়েটি বলল, আজ শুধু জার্মান দিয়ে বউনী করব। আমাদের আজ ন্যাশনাল ডে। তুমি খানিকক্ষণ ঘুরে-ঘেরে ফিরে এসো। তখন আদর করে বসাব। আগে জার্মান দিয়ে বউনীটা করেনি।

এখানে পেঁয়াজের সঙ্গে কিছু মেয়ে-মানুষ পাঠাতে পারলে ইণ্ডিয়া অনেক ডলার কামাতে পারত। গোকুলদাকে বল না—। আমায় রেজিষ্ট্রি করেকিছু ডলার চিঠির ভাঁজে লুকিয়ে পাঠাতে পারিস। তাহলে আমি এখনি ফিরে আসতে পারি। শুভ দিন কলকাতা দেখি না। শনেছি, মিউ মার্কেটের কোন্ গলিতে ডলার কিনেও পাওয়া যায়।

ফোন তুলে সব বলল ঋষিকে। ঋষি বলল, পাণ্ডবেশ্বর থেকে আবার কল-কাতায় ফিরে এই প্রথম তোর গলা শুনলাম। কোথায় কোথায় থাকিস? অফিসে আসিস না কেন?

গিয়ে কি হবে! আর ছুটি তো আমার অনেক জমে আছে। হরিদার জন্যে কিছু করা যায় না?

কি করতে চাস? ল্যাণ্ডরুট থাকলে—সব দেশের ভিসা পরপোর্টে থাকলে হরিদা লরি ধরে ধরে ফিরে-আসত।

তা অবিশ্যি।

কোন চিন্তা নেই হরিদাকে নিয়ে দিলীপ। মানুষটা তো ওরকমই। কোথাও তো শেকড় নামায় না। থাকুণে। তুই আসিস না কেন?

ওসব কথা থাক ঋষি। আমি অন্য একটা কথা বলছি। আয়না? তুই আজ

আমি স্যার লেজলির ফার্টিলাইজারে জয়েন করব।

কেন? কোল ইণ্ডিয়া কী দোষ করল।

তোর বাসি লাগে না?

তা লাগবে কেন? অবিশ্যি বেশি দিন আমি আর চাকরি করব না। আমার পিয়ার-লেসগুলো কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমি রিজাইন দেব। আর ছ বছর।

তারপর কি করবি ঋষি?

জমান টাকার সুদে খাটে শুয়ে শুয়ে পা নাচাব। অনেক দিন তো চাকরি হোল। তার চেয়ে চল না — আবার সেই অল্প বয়সের নতুন জীবনের মত করে নতুন চাকরি শুরু করি দুজনে। স্যার লেজলির ফার্টিলাইজারকে গড়ে তুলি আয়।

ওসব ইচ্ছে আমার একদম নেই। তুই কেন আসিস না? তুই কি আর খাদানের জন্যে মাথা ঘামাবি না?

তোরা তো ঘামাচ্ছিস।

তোর মত তো আমরা কেউ পারি না।

আমি আর আগের মত পারি না ঋষি। তুই, গোকুলদা—অনন্ত—সবাই আছিস।

তুই না এলে জমে না দিলীপ।

তোর কোম্পানি আমার ভাল লাগে ঋষি। ভীষণ ভাল লাগে।

সে তো আমারও লাগে।

একদিন নির্জন মাঠে গিয়ে তোর সঙ্গে আমার কথা হবে ঋষি।

আমার মেয়েলোকের স্পর্শ শুধু ভাল লাগে। পুরুষের স্পর্শ অসহ্য।

এ জিনিস তুই জানিস না। তুই মূর্খ। এ কোন মেয়ে-পুরুষের ব্যাপারই নয়। ও লাইন ছাড়া তুই কিছু ভাবতেই পারিস না। তোর আত্মবিশ্বাসই তোর অভিজ্ঞতা আয়ের পথে প্রধান বাধা। তুই যা পাচ্ছিস—তুই ভাবছিস—তা তোরই পাওয়ার কথা—হওয়ার কথা। এ জিনিস-টাই তোকে কিছু হয়ে উঠতে দিল না। নির্জন মাঠে আমি কিছু কথা বলতে চাই তোর সঙ্গে।

কী কথা দিলীপ।

এমনি। একটা ভথাই। আমি কোল ইণ্ডিয়ায় যাই না। কোল ইণ্ডিয়া তোর কেমন লাগে?

লাগালাগির কি আছে? একটা অফিসে গেলে যেমন লাগে — ঠিক তেমন লাগে।

দিলীপ কথা বাড়াল না। নিজেকেই মনে মনে বলল, আমি কোন দিনই ঋষিকে বোঝাতে পারব না।

তোর নতুন পোস্ট কেমন লাগছে?

কি আর লাগবে। কয়েকটা টাকা মাইনে বেড়েছে শুধু।

তবু তো একটা অনার তো। আচ্ছা হরিদাকে ফিরিয়ে আনতে পারি আমরা?

কেন পরব না। কিন্তু প্রবলেম তো সেই থেকে যাচ্ছে। ফ্রাস্ট্রেশন। ফ্রাস্ট্রে-শন। তার দাগ তো জীবন থেকে অন্য লোক মুছে দিতে পারে না।

ফোনটা ধর ঋষি। কে যেন এসেছে দরজায়।

এখন রাখছি ফোন। পরে করিস আবার। দুপুরে অফিসে চলে আয় না। সেদিন অনাদা তোকে খুঁজছিল।

দেখি যদি পারি যাব।

কী এত কাজ তোর দিলীপ? শুনলাম, বিতিকিচ্ছিরি দেখতে একটা গাড়িতে চড়ে টং টং করে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াস—

বিতিকিচ্ছিরি নয়। ভাল গাড়ি।

কি গাড়ি?

অস্টিন ট্রাবর। নাইন্টিন টোয়েন্টি-এইটের।

ও তো ভিন্টেজ। চলে?

দিব্যি চলে। দরজাটা খুলতে হবে—

ফোন রেখে দরজায় এসে দেখল, গোপাল দাঁড়িয়ে। চেহারায় বেশ চেকনাই দিয়েছে।

আসব স্যার।

স্যার স্যার কোরো না গোপাল, তুমি তো এখন সব জায়গায় গাইছো।

পুরনো অভ্যেস। দেখা করতে এলাম আপনার সঙ্গে—

কি ব্যাপার গোপাল? তালিম নিচ্ছো না আজকাল?

কেউ মন দিয়ে তালিম দেয় না স্যার—

আবার স্যার?

সরি। নিজেই ভোরবেলা দু ঘণ্টা গলা সাধি।

বেশি স্ট্রেইন কর না। খবর-টবর কি?

বোম্বে যাচ্ছি। নতুন মিউজিক ডিরেক্টর টাপু পালিত—

হ্যাঁ। টাপুর কি হয়েছে?

চেনেন নাকি স্যার?

খুব চিনি।

তা আপনি একখানা চিঠি লিখে দিন না। আমার চিঠি পেয়ে আমায় ডেকে-ছেন। ভয়েস টেস্ট নেবেন।

চিঠির দরকার হবে না। টাপু এমনিতে ভাল ছেলে। অল্প দিনে বেশ নামও করেছে।

ইয়ং ডিরেক্টরদের ভেতর বাগাশ্রী সুরের সঙ্গে একমাত্র উনিই পপ মিউজিক ভাল পাঞ্চ করেছেন।

কটা বাজল গোপাল? আমায় যে একটু বেরুতে হবে।

সাড়ে নটা।

ওরে বাবা। এয়ারপোর্টে যেতে হবে। এগারোটার ভেতর পৌঁছতে পারব?

খুব পারবেন।

তাহলে তুমিও বোস। তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাব। কোনদিকে যাবে এখন গোপাল?

আমি উল্টোদিকে যাব। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর ওখানে—চিন্ময় সাহিড়ীর ওখানে যাব।

তাহলে এসো।

ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ট্রানজিট লাউঞ্জের মুখে মহিলাকে দেখেই চিনল দিলীপ। আপনি শেফালী।

ইয়েস।

আমি মিস্টার ঘোষের পুরনো ড্রাইভার। কাল ঘোষের শেখান কথা গড় গড় করে বলে গেল দিলীপ। কোম্পানী থেকে আপনার জন্যে আমায় পাঠিয়ে দিল।

অটোমোবিল ইণ্ডিয়া?

হ্যাঁ।

বাবার গাড়ি চালাতেন আপনি? তাহলে বাবার মৃত্যুর সময় আপনি ছিলেন?

সেদিনই আমি কাজে আসি নি। সাহেব নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কল-কাতার বাইরে—

অ্যাকচুয়ালি কোন্ জায়গাটায় ঘটে-ছিল সব—

সুবুদ্ধিপুরের কাছে। ওঁর একটা বাড়ি আছে ওদিকে। আপনাদের সবার ছবি আছে ঘরে ঘরে।

সেই ছবি দেখেই তো চিনলাম আপনাকে।

শেফালী চোখ তুলে তাকাল। সে বাড়িটা কেমন? গিয়ে থাকা যায়?

খুব থাকা যায়। সাহেব যে আপনার কথা কত বলতেন।

ট্রাউজারের ওপর ভ্যালিস ধরনের ঢোলা ব্লাউজ। হাতের ব্যাগে তিন টুকরো কাগজে ইংরিজিতে লেখা—কুইবেক, লণ্ডন, বোম্বে—

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে গাড়ি দেখে তো শেফালী প্রায় চিৎকার করে উঠল। বছর বত্রিশ-তেত্রিশ বয়স হবে। বিয়ে হয়েছে কিনা বুঝতে পারছিল না দিলীপ। খুব নরম করে বলল, ঘোষ সাহেব এ গাড়িতেই চড়তেন। কোম্পানী থেকে মেইনটেনান্স হোত। বড় আদরের গাড়ি ছিল সাহেবের।

শেফালী চোখের কালো চশমা খুলে জল করে তাকাল গাড়িটার দিকে। চলো।

আপনি সামনে বসুন। ব্যাগটা দিন—পেছনে রাখছি।

ডি আই পি দিয়ে কলকাতায় ঢুকে দিলীপ তাকাল শেফালীর দিকে। ভাবখানা—কেমন কিনা! বলেছিলাম না! এ-গাড়ি সাহেবের আদরের গাড়ি।

শেফালী বলল, ভালই চলে দেখছি। বাবা এই ভিন্টেজ কারে চড়তেন?

হ্যাঁ। খুব ভালবাসতেন গাড়িটাকে। আপনি আসবেন বলে অন্য গাড়িও তো পাঠান যেত। অনেক ভেবে-চিন্তেই এ-গাড়ি পাঠিয়েছে কোম্পানী। সাহেবের স্মৃতি—

শেফালী বলল, কতদিন পরে কল-কাতায় এলাম। রাস্তাঘাট অনেক পাল্টে গেছে।

আপনি কোথায় উঠবেন?

আজকের দিনটা পার্ক হোটেলে তো আছি। কাল সারাদিন কোর্টে যাব। তোমার নাম কি?

আমি দিলীপ।

আচ্ছা দিলীপ—বাবার সেই সুবুদ্ধি-পুরের বাড়িতে একবার যাওয়া যায়?

একশোবার যাওয়া যায়। সবই তো আপনার সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা আছে।

আচ্ছা দিলীপ খদ্দের পাওয়া যাবে রাতারাতি ?

নিজের অত ভাল সম্পত্তি কেন তাড়াহুড়ো করে বেচতে যাবেন। আপনার একটি মেয়ে বিয়ে হবে। যা হবেন। ছেলেমেয়েরা ছুটির দিনে দাদুর বাগানে বেড়াতে যাবে—

শেফালী কড়া করে তাকাল।

দিলীপ চোখ নামিয়ে নিজের ঠোঁট একদম শেলাই করে ফেলল। আজ যেন অস্টিন টুয়েলভটা বেশি ভাল চলছে। এক-বারও স্টার্টিং ট্রাবল হয় নি।

কালু ঘোষের বুদ্ধিমত দিলীপ গাড়িটা ডালহৌসি দিয়ে নিয়ে গিয়ে রেড রোডে পড়ল। শীতকালের দুপুরবেলা। ময়দানের ওপারে পর পর সব মাল্টি-স্টোরিডের আকাশছোঁয়া বাড়ি। পাতাল রেলের কেন্দ্র। মাসিভ ভিকটোরিয়া।

শেফালী বলেই ফেলল, এদিকটা তো চেনাই যায় না। এখানে কলকাতার ল্যান্ড-স্কেপ একদম অন্য রকম।

দিলীপ এখন ড্রাইভার। তাই এমন ভাল ভাল সাবজেক্ট নিয়ে শেফালী কথা বললেও দিলীপ তাতে জয়েন করল না।

বাবা নিজেই গাড়ি চালাতেন ?

সব সময় নয়।

তুমি কত বছর আছ ?

তা দশ বছর হয়েগেল।

ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল ?

দিলীপ বোকাসোকা সাজার পথটাই বেছে নিল। লোকের মনে হিংসা। আর আমাদের সাহেব দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বুঝতেই পারেন নি—ভাবতেই পারেন নি—তাকে কেউ গুলী করতে পারে।

আচমকা গুলী করে দিল ?

পলিটিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার। সব তো আমরা বুঝিও না।

দিলীপ চুপ করে থাকল। শেফালীও। অস্টিন টুয়েলভের ইঞ্জিন নিঃশব্দে সব বোঝা কাঁধে নিয়ে অরবিন্দ স্ট্যাচুকে ডাইনে রেখে প্ল্যানেটোরিয়ামের পথ ধরল।

পর দিন বেলা দশটায় সিটি সেসন কোর্টে অস্টিন টুয়েলভ এসে থামল—ঠিক বেলা দশটায়। কবোনার এজেন্ট সওয়া দশটায়। জজসাহেব আগেই হাজির ছিলেন। কোর্টের ভেতরকার হাল অনেক উঁচু। হোটেল আর্কেডিয়ান কাল সন্ধেবেলা এক-খানা শান্তিপুরী শাড়ি কিনেছিল শেফালী। সেখানাই পরে এসেছে আজ। কোর্টের ভেতর মানুষগুলোর মুখ দেখে শেফালীর ভালই লাগল। বেশ ওয়েলমেনিং। কলকাতা বলে একটা জায়গা এক সময় যে তার জীবনে ছিল—সেকথা একদম ভুলে গিয়েছিল। নিজের মনে মনেই বলে ফেলল—ইণ্ডিয়া তো বেশ জায়গা।

তার নিজের বাবার মুখখানা ভাল মনে করতে পারছিল না শেফালী। বালিকা বয়সে মায়ের সঙ্গে সাগরপাড়ি দিয়েছিল। কারগোশিপে। তখন টুরিস্ট ক্লাস এক পিঠের ভাড়া বোধের টু লণ্ডন ছিল মাত্র তিরিশ।

দিলীপ বাইরে পার্কিং লটে গাড়ি ব্যাক করে রাখতে যাচ্ছিল। সাদা কোর্ট এলাকা জনসমাট।

কালু ঘোষ ব্যাক সিট থেকে বলল, তুমি একবার ভেতরে গেলে পারতে দিলীপ। কোনদিন তো আদালতে যাও নি।

দুনিয়া টহল দিচ্ছে।

যাও না দিলীপ একবার ভেতরে। গেরেটার চোখে আমার চেহারাই মনে নেই।

আমি ভেতরে যাই — আর কেউ তোমার মেয়ের সামনে দিলীপবাবু বলে ডেকে উঠুক! তাহলেই তো চিত্তির। তোমার কেসও ক'াচিয়ে দিয়ে মেয়ে বিদেশে উড়ে যেতে পারে। তখন ?

যাও না ভাই একটু ভেতরে। হাজার হোক মেয়ে তো আমার। সরকারী উকিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

দিলীপ গাড়ি ব্যাক করে স্টার্ট বন্ধ করল। তারপর রাগে রাগে কোর্ট ঘরে ঢুকতে গিয়ে অন্ধ হয়ে গেল। আগেকার বাড়ি। দেওয়ালের অনেকটাই—বিশেষ করে ছাদের কাছাকাছি—ঘসা ক'াচে ঢাকা। নরম সূর্যের ছড়ানো আলো সেই ক'াচের ভেতর দিয়ে সোজা এসে দিলীপের চোখে ঝ'াপিয়ে পড়ল।

বেলা এগারোটা হতে পারে। সামনেই শেফালী তার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে। শেফালীর মুখোমুখি কাঠগড়ায় যে দ'াড়িয়ে সেও সোজাসুজি দিলীপের চোখে এইমাত্র তাকালো।

দিলীপ চোখ বুজে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে বেরোবার জন্যে ঘুরে দ'াড়ালো।

বাবা—

দিলীপ ঠুক করে বন্ধ দরজা পার হয়ে স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের কাঠের বাকসের পাশে সরে গেল। কোথায়! কেউ তো তাকে ডাকেনি। ঘসা ক'াচের ওপারের আলো এপাশে এসে তার চোখ ধ'াধিয়ে দিয়েছিল। তবু খুব সাবধানে গলাটা বাড়িয়ে সে ভেতরে তাকালো।

বুক খোলা শার্ট। চিবুকে এক ছোপ দাড়ি। এবড়ো-খেবড়ো গোঁফ। মাথাটা অনেকদিনের চুলের ভারে ছোট্ট মত। দিলীপ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে একদম পার্কিং লটে।

হ'াপাতে হ'াপাতে ফিরে সে স্টিয়ারিংয়ে বসল।

ভেতরে ঠিকমত সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছো ?

হুঁ।

বসবার জায়গা পেয়েছে শেফালী ?

হুঁ।

কি হোলো দিলীপ। কথা বলছো না কেন একদম ?

আচ্ছা কালুদা। একটা কথা বলবে ? তুমি যখন খুন হলে— মানে হচ্ছিলে— তখন একদম সামনে কে ছিলো।

নাম জানবো কি করে। আর ওরা তো আমার মেয়ের চেয়েও অনেক ছোট। ছেলেমানুষ সব।

নাম জানতে চাইনি। দেখতে কেমন ছিলো ?

তখন কি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু দেখা যায়—

তবু মনে করে দ্যাখোতো কালুদা।

সেসব মনে করে আজ আর কি হবে।

তবু দ্যাখো না। একদম সামনে যে ছিলো। যার হাতে পিস্তল।

সিভলবার হাতে ছোকরার চিবুকে তো একছোপ দাড়ি ছিলো।

দিলীপ আর শুনতে পেলো না। যে বাজ পড়লে শুধু একজনই শুনতে পায়— ঠিক সেরকম একটা শব্দ দিলীপের কানে তালা লাগিয়ে দিলো। তার হাত থেকে ঘামল ভিজে ভাব এই শীতের দুপুরে স্টিয়ারিংয়ের খানিকটা স্লিপানি করে ফেললো।

কালু তখনো একা একা বলে যাচ্ছিলো বুক খোলা শার্ট। একটাও বোতাম নেই। মাথায় অনেককালের চুলের ভার—

চুপ করো প্লিজ কালুদা—

ভড়কে খেয়ে গেলো কালু ঘোষ। খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না। আশপাশের ভাজাওয়ালা, মুচি, পানওয়ালা মুখ তুলে একবার তাকালো। কিরে বাবা। পাগল হয়ে গেলো নাকি। একা একা ধমকাচ্ছে—

ভাজাওয়ালা নরম গলায় বসে বসেই জানতে চাইলো, কাকে বকছেন বাবা ?

দিলীপ কোন জবাব দিলো না।

কালু ঘোষ তো তো করে বলল, তোমার কি শরীর খারাপ দিলীপ ?

দিলীপ কথা না বলে আচমকা নিজের মাথাটা ঘাড়ভাঙ্গা পাখির চেয়েও তাড়াতাড়ি ভাঁজ করে স্টিয়ারিংয়ে ঠুকে ফেললো।

ওকি ? কাঁদছো কেন দিলীপ ? কি হোল।

দিলীপ কোন জবাব দিতে পারলো না। ভরা দুপুরে আদালতপাড়া। উকিল, হাকিম, হেকিম, ফকির—সবরকম জিনিস দিয়ে সাজানো জায়গাটা গমগম করছিলো। তার ভেতর দিলীপ একা একা তার নিজের কপালটা স্টিয়ারিংয়ে ঠুকে যাচ্ছিলো।

কী হোল দিলীপ ? ওরকম করছো কেন ? কী কষ্ট হচ্ছে তোমার ? আমায় বলো।

দিলীপ কোন কথা বললো না। শুধু একবার মুখ তুলে তাকালো। তারপর খুব পরিষ্কার গলায় বললো, তোমার ঠিক মনে আছে কালুদা ?

কি ?

বুকখোলা শার্ট। একটাও বোতাম নেই—

আর ?

চিবুকে এক ছোপ দাড়ি—

হ্যাঁ। এটা আমি ভুলতে পারিনি। বেঁচে থাকতে এই আমার শেষ স্মৃতি। বলতে পারো এই পৃথিবীতে সবচেয়ে শেষে যা দেখেছি। ভুলি কি করে ?

তোমার তো ভুলও হতে পারে কালুদা—

ভুলে যেও না দিলীপ—আমিও একজন মার্কসম্যান ছিলাম। ঘোড়া টেপার আগে স্যুটাবরা যা একবার দেখে কখনো তা ভুলতে পারে না।

ছোকরার বয়স ছিলো কেমন ?

খুব কম বয়স। কচি মুখ একদম। পিস্তলটা এমন করেই ধরেছিলো—কব্জির হাড় জেগে উঠেছিলো। হয়তো প্রথমবার। আমিই হয়তো প্রথম টারগেট। হয়তো হাত কাঁপছিলো।

তুমি বাধা দাওনি কেন ?

আমি তো বুঝতেই পারিনি দিলীপ। ওই বয়সের ছেলে ছোকরাদের নিয়ে তো আমি সুটিং ক্লাবে মাতামাতি করে বেড়াতাম। ভাবতেই পারিনি—একদম আনরেডি অবস্থায় স্টিয়ারিংয়ে বসে সঙ্গে আরেকজন—সেও খতম হোল আমার / সঙ্গে। শুধু শুধু ! একদম শুধু শুধু ! !

দিলীপকে একদম চুপচাপ দেখে কালু ঘোষ বললো, হঠাৎ এসব জানতে চাইছো কেন ? আজকের এই মামলা দেখে ?

তবুও দিলীপ কোন কথা বললো না।

খানিক চুপচাপ থেকে কালু ঘোষ বললো, সরকারী উকিল এ মামলা দাঁড় করাতে পারবে না।

কেন ? কেন কালুদা ?

আমি জানি দিলীপ। এ মামলা টিকবে না। জিনিসপত্তরগুলো তো অন্য জায়গায়।

কি জিনিস কালুদা ?

কী দিয়ে ভাত খাও ভাই ! ভোজালি, রড পায়ের স্যাণ্ডেল—সেসব তো কিছুই পায়নি পুলিশ। তাহলে কাঠগড়ায় তুলবে কি করে ?

দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে। সিওর হয়ে গেলে তো এ কেস কোর্টেই উঠতো না। কবে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দিতো।

তুমি এতসব জানলে কি করে কালুদা ?

আমি তো ঘুরে বেড়াতাম। বারাসত। ঠাকুরপুকুর। শীল ঠাকুরবাড়ির মঠ। শিবপুর। কত দেখেছি। যাঃ। পালা বলে ছেড়ে দিয়ে পেছন থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক-গুলি।

পায়ের স্যাণ্ডেল কোথায় কালুদা ?

সে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ জানবে না।

দিলীপ স্টিয়ারিংয়ে বসেই দেখলো, বুকখোলা—একটা বোতাম নেই শার্টের চিবুকে এক ছোপ দাড়ি—মাথায় অনেক-কালের চুলের ভার—মধ্যখানা ছোট্ট মত—এক ছোকরাকে পুলিশ কসটোডিয় লোকজন ছোট ভ্যানে নিয়ে তুলছে।

দিলীপ মুখ ফিরিয়ে জি পি ও বাড়ির ডোমটা দেখতে লাগলো। শেফালী এসে বসলো বেলা সাতিনটেয়। সামনের সিটে বসেই বললো এখুনি হোটেলে

বেশ তো। সাহেবকে নিয়েও তো ঘুরতাম। এতদিন পরে কলকাতায় এলেন।

দিলীপ শাকা/ডুাইভারের কামরায় ডালহৌসি পার হয়ে গেল।

আচ্ছা। এত কম বয়সী ছেলেরা সব খুন করেছে ?

দিলীপ রাস্তার মাঝখানে ঘচ করে ব্রেক কষলো। ব্রেক সু বোধহয় গেল।

কি বলছেন ?

এতটুকু ছেলেরা সব খুনী ?

কাদের কথা বলছেন ?

এই যে রবি না কি নাম—ভুলে গেলাম ছাই—

শেফালীর কথা শেষ হওয়ার আগেই দিলীপ এক দমকায় গাড়ির স্পীড তুলতো অন্তত ষাটে। প্রায় ঝাঁকুনী দিয়ে অস্টিন ট্যুয়ারটা রওনা হোল।

ফাঁকা রাস্তা সেই আকাশবাণীর সামনে। ম্যান অবওয়ার জেটির কাছে এসে গাড়ি একদম থামিয়ে ফেললো দিলীপ।

ওরকম জোরে চালালে কেন ?

আপনি খুনীর কথা বললেন তো। অনেক রকমের খুনী আছে।

শেফালীর মন্দ লাগছিলো না এই ড্রাইভারকে। ভদ্রলোক ক্লাশের চেহারা কইবেকে এক পিসানো টিচারের ঠিক এরকম চেহারা। শেফালী প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে দিলীপকে বললো কত রকমের খুনী।

এই ধরুন একদম চুপচাপ থেকেও খুন করা যায়।

যেমন ?

সাহেবের গাড়ি চালাবার আগে এক জায়গায় ছিলাম। সাত বছর। তা সেখানকার ফোরম্যান তো আমার দিকে তাকালোই না সাত বছরে। তার ইচ্ছে ছিলো—একই জায়গায় আরও সাত বছর আমি বসে বসে পচি। এটাও একরকমের খুন নয় ?

তা তো বটেই।

তারপর ধরুন সেখানে যদি আপনার একটা বন্ধু থাকে—বন্ধুটাকে শুধু যদি টেবিল পালটে পালটে ওপরে তোলে ফোরম্যান—লেদ থেকে ভাইসে—এভাবে ফোরম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট করে তোলে—তাহলে সেটাও কি একরকমের খুন নয় ?

এখানে কে খুন হচ্ছে ?

দুজনই। আপনি। আপনার বন্ধুও। অধিকাংশ বন্ধু কিছুই টের পাচ্ছে না।

তুমি শুধু ড্রাইভার নও। তুমি দেখছি আমলে একজন দার্শনিক।

না না। ওকথা বলবেন না দিদি। আমি আপনার বাবা ঘোষ সাহেবের খেয়ে মানুষ।

বাবা তোমায় খুব ভালবাসতো।

আপনাদেরও বাসতেন। কাল তো যাচ্ছেন সুবুদ্ধিপুরে। আপনার ছোটবেলার ছবি দেখবেন। চিনতে পারবেন না।

মায়ের ছবি আছে ?

অনেক।

পরদিন সকাল সকাল বেসায়েট থেকে

আসতে বললো, খানিকক্ষণের জন্যে বেঁচে উঠতে পারো কালুদা ?

কেন ?

তোমার বউ—মেয়ে তাহলে বুঝতে পারতো—তুমি আসলে কী ভীষণ ভালোবাসতে তাদের।

কি হবে আর বেঁচে। আমি তো চলেই যেতে চাই।

ওরে বাব্বাঃ। কার ওপর এত অভিমান ?

কারও ওপর নয়। তবে কাল থেকে তুমি বড় আনমনা হয়ে গাড়ি চালাচ্ছো। এই ব্রেক কষছো। এই স্পিড তুলছো। দিলীপ তোমার কি হয়েছে ?

কিছু না।

ভুলে যেও না। তোমার লাইসেন্স নেই। তোমার পাশে আরেকজন মৃত মানুষ বসে ছিলো কাল।

অত চিন্তা করতে নেই মেয়ের জন্যে। বুঝলে কালুদা—

সুবুদ্ধিপুরের বাগানে যাবার রাস্তা ইটে বিছানো। পাথরটার মাথার ওপর পাতা ভর্তি জামরুল ডাল। তার ভেতর দিয়ে নরম রোদের চৌকোগুলো টুপটাপ সুরকির রাস্তার ওপর পড়ে ছিলো। বাতাসে জামরুল ডাল দুলে উঠতেই রোদের চৌকোগুলো জায়গা পালটাচ্ছিলো। তারই ভেতর দিয়ে অস্টিন ট্যুয়ার বাগানের গেটে এসে দাঁড়াতেই গুর্খা সেপাই দুজন চমকে উঠে সেলাম দিলো। তারা অটোমোবিল ইণ্ডিয়ার পুরনো কর্মচারী। কালু ঘোষকে অনেকবার দেখেছে। মামলার সুবিধের জন্যে—নানারকম একজিবিট তৈরি রাখার জন্যে—আগারগাড়া এভিডেনসিয়াল সিচুয়েশনের ওপর কেস ফেম করার জন্যে সরকারী স্টাণ্ডিং কাউন্সিল বিকোয়েস্ট করার অটোমোবিল ইণ্ডিয়া তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাগানবাড়িটা পুরো দস্তুর মেইনটেইন করছে। চেম্বার অব কমার্সগুলো একসঙ্গে সরকারের ওপর চাপ দিয়েছে—কালু ঘোষের মত মানুষ খুন হলে যে অ্যাণ্ড অর্ডার আছে কোথায় ? যে করে হোক কালপ্রিটের শাস্তি চাই।

গাড়ি থেকে আগে নেমে গিয়ে দিলীপ সেপাইদের বললো, ঘোষ সাহেবের মেয়ে এসেছে। দরজা খুলে দাও। বাংলোর চাবি কোথায় ?

এক সেপাই দরজা খুললো। মোরাম বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে ক্যাচকোচ শব্দ করে লোহার দরজা খুলে গেল। আরেক সেপাই ধুপধাপ করে ছুটে গেল—বাংলোর দরজা জানলা খুলে দিতে।

গাড়িতে বাগানের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে শেফালী বললো, এসব কবে বানালো বাবা।

আপনি ছোট থাকতে জায়গাটা কিনে-ছিলেন। পরে সাহেব আস্তে আস্তে গড়ে তোলেন।

গাড়ি থেকে নেমে শেফালী একা একাই বাংলোর বারান্দায় উঠে গেল।

[redacted]

কেন? আমি কি তোমার কেনা চাকর?

রাগ করছো কেন। আমার ওই একটাই মেয়ে মোটে—

তাও যদি তোমার খবর নিতো! সব ব্যবস্থা আছে। খাবারের প্যাকেট ট্রেনে এসে একজন দিয়ে যাবে।

কী দিতে বলেছো?

এই ভাজাভুজি। শুকনো খাবার। মাছ ধরার ছিপগুলো কোথায় বলতো কালুদা।

সোজা বাংলোর বারান্দায় উঠে গিয়ে ডাইনে সারু মত একফালি ঢাকা জায়গা পাবে। ওখানে ছিপ আছে। সাঁতার কাটার টিউব আছে। সব পাবে।

দিলীপ বারান্দায় উঠে দেখলো— খোলা ঘরের দরজার মুখোমুখি দেওয়ালে একখানা ছবি শেফালী মুখ তুলে দেখছে। ফটোতে একজন সুন্দরী মহিলা—তার কোলে বছর আড়াইয়ের একটি ফুটফুটে মেয়ে।

দিলীপের মনে হোল—ইস। এ সিন যদি কালুদা দেখতে পেতো দিলীপ খানিক দাঁড়িয়ে ফটোর মহিলাকে দেখলো। বেশ বড় করে বাঁধানো। এই মহিলার সঙ্গেই কালুদার ডিভোর্স হয়ে যায়। সে কোন আদিকালে—

এক জোড়া ছিপ নিয়ে হাত ছয়েকের তফাতে দুটো ফাৎনা পাতলো দিলীপ। বেশ বড় পুকুর। বাঁধানো ঘাট। পাশেই আম-গাছ। তার ছায়ায়। কাঁটাতার আর ঘন করে বসানো রাংচিতের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। অন্তত বিশ-পঁচিশ বিঘের। কিছু পাখি আসে। শীতের বেলা। ভীষণ নির্জন। সব গাছের নিচেই শুকনো পাতার ডাই। মাটি খুঁড়ে একটা মোটা কেঁচো জোগাড় করতে বিশেষ বেগ পেতে হোল না দিলীপের। সেটাই দু টুকরোয় টোপ করে জোড়া ছিপের ফাৎনা ভাসালো দিলীপ।

(চলবে)

দেশী রমণী পাটের নড়ো থেকে ধোকরা বোনার সুতো বার করছে

ধোকরা-ঝালং-বিছান

শিশির মজুমদার

আপনি যদি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গ্রামে কোন দেশী সম্প্রদায়ের বাড়িতে কখনো গিয়ে উপস্থিত হন, তবে দেখবেন অতিথিবৎসল এই সম্প্রদায়ের বাড়ির লোকজন আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে না, তাঁরা সাদরে আপনাকে নিয়ে তুলবেন তাঁদের 'মান্ডুয়াঘরা' অর্থাৎ বৈঠকখানায়। আপনি ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যাবেন, এরই মধ্যে তারা মাটির 'ধাপে' অথবা বাঁশের মাচায় ফালা (তকতোপোশ) এ বিছিয়ে দিয়েছেন সুদৃশ্য মোটা সতরঞ্জি ও চাদর। এখানকার গ্রামের ভাষায় ধোকরা-ঝালং অথবা বিছান।

ধোকরা এবং ঝালং পাটের তৈয়ারী। আর সুতোয় তৈয়ারী বিছান। আপনি মান্ডুয়াঘরায় প্রবেশের সময় লক্ষ্য করেন নি দাওয়ার দিকে। লক্ষ্য করলেও পাশাপাশি দুটো বাঁশের খুঁটি দেখে গুরুত্ব দেন নি কিছু। আসলে, ওই ধোকরা ঝালং-বিছান বয়নের ওই দুটিই মূল যাদুদন্ড। নাম তার তাঁতপোই। যদি একটু কৌতূহলী হন, তবে বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখুন, একটু উঁকি মেরে শুতপা ঘরা (শোবার ঘর)র ধাপে (দাওয়ার) তাকান, সেখানে নিশ্চয়ই তাঁতপোই জোড়া আছে এবং তাতে চড়ে আছে কোন ধোকরা ঝালং বা বিছানের কোন ফাটি। অথবা নিজেদের পরিধেয় দোসতি ছেওটা (বস্ত্র)। এই দোসতি ছেওটা মেয়েদের লজ্জা নিবারণ করে। বুক ঢাকে, কোমর ঢাকে আজানু। এরই এক ফাটি দিয়ে মেয়েরা সন্তান পিঠে বেঁধে নেয়। তার নাম ফাটিয়া। একেকটা তাঁতপোইতে মাত্র দেড় হাত চওড়া, সাড়ে চার হাত থেকে পাঁচ হাত লম্বা একটা ফাটি তৈয়ারী সম্ভব। তিন ফাটি জোড়া দিলে তৈয়ারী হয় একেকটা ধোকরা, ঝালং বা বিছান। এই তাঁতের শিল্পী দেশী সম্প্রদায়ের মেয়েরা যদি দৈহিক লম্বা হতো আরো কিছু বেশি, তবে ফাটি লম্বায় বাড়ত তদনুযায়ী। এই ফাটি দিয়ে তৈয়ারী হয় এ অঞ্চলের হাতঝোলা, কাঁধঝোলা। বলা যেতে পারে এর নাম দিনাজপুরী ঝোলা।

এখন সুতোকলের কল্যাণে ঘরের ধাপিতে তাঁতপোইতে চড়ছে নানা ফাটি। গায়ের জন্য চাদর। পরনের জন্য দোসতি ছেওটা। বাচ্চা ছেলে-মেয়ে পিঠে বাঁধার জন্য ফাটিয়া আর ফালার (তকতোপোশ) জন্য বিছান। সুতো কলের সুতো কেন, স্থলোজাত কোন সুতোই আগে এ অঞ্চলে আমদানী হত না। তখন চলত কি করে? কেন, জমিতে জমিতে হেঁউতি (হেমন্তী) পাটা আছে না! তার গা থেকে সযত্নে ছাল বা খোয়া ছাড়িয়ে দেওয়া হত। তাই দিয়ে তাকুরের সাহায্যে তৈয়ারী হতো যে পাটা সুতো, সেই সুতো চড়তো তাঁত-পোইতে। বেরিয়ে আসত পাটের সুতোর ফাটিয়া দোসতি ছেওটা, আর ধোকরা।

পরে, হেঁউতি পাটার অভাব হল: এল, নানা বিদেশী পাটা। আর সেই সঙ্গে এল হাট-গঞ্জের কলের সুতো। তখনো ফাল্গুনে শিমুলগাছ লালে লাল আর চৈত্রে গাঁয়ের মাঠ পথ সাদা করে ঝরতো শিমুল তুলো। সেকালে কেউ এর দিকে ফিরে চায়নি। একালেও তেমন নয়।

খেলা

উইম্বলেডন টেনিস

১৯৭৮ সালের ৯২তম উইম্বলেডন টেনিস আসরে মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে ২নং বাছাই মারটিনা নাভ্রাতিলোভা (আমেরিকা) ২-৬, ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে ১নং বাছাই ক্রিস এভার্টকে (আমেরিকা) হারিয়ে সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। নাভ্রাতিলোভার বয়স ২১ এবং এভার্টের ২৩বছর। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী-কালের (১৯৪৬ থেকে ১৯৭৮) এই আসরে এ রকম উত্তেজনাপূর্ণ মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলা আগে হয় নি। উল্লেখ্য, এই আসরে এটা নাভ্রাতিলোভার প্রথম ফাইনাল খেলা। অপর দিকে এভার্টের চতুর্থ। এভার্ট সিঙ্গলস খেতাব জিতেছেন দুবার—১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালে। চেক তরুণী নাভ্রাতিলোভা স্বদেশ ছেড়ে আজ বছর তিনেক হল আমেরিকায় বসবাস করছেন। আমেরিকার নাগরিকত্ব না পেলেও নাভ্রাতিলোভা নিজের নামের পাশে আমেরিকা যোগ করে খেলার আসরে নিয়-মিত অংশ গ্রহণ করছেন। উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পর তিনি বলেছেন, আমি সর্বদাই একজন চেক এবং আমার আজকের এ জয় চেকোশ্লোভাকিয়ারই জয়। তাঁর দেশের সংবাদপত্র এবং রেডিওগুলি কিন্তু তাঁর খেলা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছে। নাভ্রাতিলোভার আগে কোন চেক উইম্বলেডন টেনিস আসরে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পান নি। তাঁর আগে একজন চেক মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলেছিলেন ১৯৬২ সালে। নাম ভেরা সুকোভা। পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন দুজন চেক — ১৯৫৪ সালে জরোস্লাভ ড্রবনি (ইজিপ্টের পক্ষে) এবং ১৯৭৩ সালে কোডাস।

উইম্বলেডন টেনিস আসরে পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সম্মানই অন্য খেতাবের তুলনায় খুব বেশী। বিগত ৩৩ বছরে (১৯৪৬ — ৭৮) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ১৪ বার, আমেরিকা ১২ বার, সুইডেন ৩ বার এবং একবার করে ফ্রান্স, ইজিপ্ট, স্পেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া। এই সময়ে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে আমেরিকা ২৩ বার (এর মধ্যে একটানা ১৩ বার—১৯৪৬—৫৮), অস্ট্রেলিয়া ৪ বার, ব্রাজিল ৩ বার এবং গ্রেট বৃটেন ৩ বার।

টেনিসের পণ্ডিতদের তৈরী খেলোয়াড়-দের নামের বাছাই তালিকা খেলার ফলা-ফলের সঙ্গে প্রায় পুরোপুরি এ বছর মিলে গেছে। পুরুষদের সিঙ্গলস সেমিফাইনালে

বাছাই তালিকার প্রথম তিন বাছাই খেলোয়াড় উঠেছিলেন। ফাইনালে ওঠেন ১নং বাছাই বিয়রন বর্গ (সুইডেন) এবং ২নং বাছাই জিমি কোনর্স (আমেরিকা)। অপর দিকে মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে বাছাই তালিকার প্রথম চারজনই খেলেছিলেন। ফাইনালে উঠেছিলেন ১নং বাছাই ক্রিস এটার্ড (আমেরিকা) এবং ২নং বাছাই মারটিনা নাভ্রাতিলোভা (আমেরিকা)।

পুরুষদের একদিকের সেমিফাইনালে এবারের ১নং বাছাই ও গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান বিয়রন বর্গ (সুইডেন) ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে অবাঙ্গই খেলোয়াড় টম ওক্করকে (নেদারল্যান্ডস) পরাজিত করেন। অপর দিকের সেমিফাইনালে ২নং বাছাই জিমি কোনর্স (আমেরিকা) ৯-৭, ৬-২ ও ৬-১ গেমে স্বদেশের ভিটাস গেরু-লাইটিসকে পরাজিত করেন। এই নিয়ে কোনর্স চারবার ফাইনালে উঠলেন। আগে সিঙ্গলস খেতাব পান একবার ১৯৭৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়ালকে হারিয়ে।

মেয়েদের সিঙ্গলসের একদিকের সেমি-ফাইনালে ১নং বাছাই ক্রিস এভার্ট (আমেরিকা) ৯৫ মিনিট লড়াই করে ৮-৬ ও ৬-২ গেমে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ৪নং বাছাই ভারজিনিয়া ওয়েডকে (বৃটেন) পরাজিত করেন। গত বছরের সেমিফাইনালে ওয়েডের কাছে এভার্টন যে হেরেছিলেন এবার জিতে তার শোধ নিলেন। অপর দিকের সেমিফাইনালে ২নং বাছাই মারটিনা নাভ্রাতিলোভা ২-৬, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে ৩নং বাছাই ইভন গুলাগং কলিকে (অস্ট্রেলিয়া) হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। গুলাগং কলি অস্ট্রেলিয়ার আদি-বাসী সমাজের মেয়ে। তিনি এর আগে ৪ বার মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলে এক-বার চ্যাম্পিয়ান হন (১৯৭১ সালে)।

পুরুষ ও মহিলা—এই দুই বিভাগের সিঙ্গলস ফাইনালে ওঠেন বাছাই তালিকার ১নং ২নং বাছাই খেলোয়াড়। যাঁরা বাছাই তালিকা তৈরী করেছিলেন এ বছর তাঁদের জয়জয়কার। এ রকম মিল খুব কমই হয়; তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী খেটে গেছে।

বিবিধ রেকর্ড

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার ১০১ বছরের ইতিহাসে যে-সব অসাধারণ নজির এবং রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীচে দেওয়া হল :

সর্বাধিক খেতাব

মোট খেতাব জয় : ১৯টি—কুমারী এলি-জাবেথ রায়ান (আমেরিকা)—মহিলাদের ডাবলস খেতাব ১২টি এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব ৭টি। কুমারী রায়ান প্রথম খেতাব পান ১৯১৪ সালে এবং শেষ ১৯৩৪

খেতাব ১৯৩৪ সালে। ১৯৭৫ সালে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে আমেরিকারই শ্রীমতী বিলি জিন কিং পূর্বের রায়ান প্রতিষ্ঠিত মোট ১৯টি খেতাব জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন।

মোট খেতাব জয় (পুরুষদের পক্ষে) : ১৪টি উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)—৭টি সিঙ্গলস এবং ৭টি ডাবল খেতাব (যমজ ভাই আর্নেস্ট রেনশ-র জুটিতে)।

সিঙ্গলস খেতাব জয় : ৮টি—আমেরিকার শ্রীমতী হেলেন উইলস মুডী রোয়ার্ক। ১৯২৭ সালে প্রথম খেতাব এবং ১৯৩৮ সালে ৮ম খেতাব জয় করেন।

সিঙ্গলস খেতাব জয় (পুরুষদের) : ৭টি—উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)। ১৮৮১ সালে প্রথম খেতাব এবং ১৮৮৯ সালে ৭ম খেতাব জয়ী হন।

সর্বাধিক উপর্যুপরি পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় :
৬বার (১৮৮১-৮৬)—উইলিয়াম সি রেনশ (ইংল্যাণ্ড)

সর্বাধিক উপর্যুপরি মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয় :
৫ বার (১৯১৯-২৩)—মাদমোয়াজেল সুজান্ লংলঁ (ফ্রান্স)

সর্বাধিক পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয় :
৮টি—দুই সহোদর আর এফ এবং এইচ এল ডোহার্টি (ইংল্যাণ্ড)

সর্বাধিক মেয়েদের ডাবলস খেতাব জয় :
১২টি—এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)

সর্বাধিক মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় :
৭টি—কুমারী এলিজাবেথ রায়ান (আমেরিকা)

সর্বকনিষ্ঠা চ্যাম্পিয়ান : কুমারী চারলোট ডড্ (জন্ম ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর ২৯)। ১৮৮৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি সিঙ্গলস খেতাব পান। পুরুষ এবং মেয়েদের মধ্যে তিনিই সব থেকে কম বয়সে উইম্বলেডন খেতাব জয় করেছেন।

সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ চ্যাম্পিয়ান : উইলফ্রেড ব্যাডলি (ইংল্যাণ্ড) ১৮৯১ সালে তাঁর ১৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন বয়সে সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন।

স্বামী স্ত্রীর মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় :
১৯২৬ সালে এল এ গর্ডন্ফি এবং তাঁর স্ত্রী মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে দুই বোন :
১৮৮৪ সালে লিলিয়ান এবং মাউড ওয়াটসন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেন।

উপর্যুপরি দুবার 'গ্রিমকুট' সম্মান :
১৯৩৭-৩৮ সালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেন।

উইম্বলেডনের আসরে প্রথম যোগদানের বছরেই 'গ্রিমকুট' সম্মান লাভ : ১৯৩৯ সালে আমেরিকার বব রিগস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একমাত্র নজির সৃষ্টি করেন।

বিদেশী খেলোয়াড়ের প্রথম খেতাব জয় : পুরুষদের সিঙ্গলসে—১৯০৭ সালে নর্ম্যান ব্রুকস (অস্ট্রেলিয়া) মেয়েদের সিঙ্গলসে—১৯০৫ সালে মে সাটন (আমেরিকা)

সিঙ্গলসে বর্গের 'হ্যাট্‌ট্রিক'

উইম্বলডন টেনিস আসরে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই বিয়রণ বর্গ (সুইডেন) ৬-২, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে ২নং বাছাই জিমি কোর্নসকে (আমেরিকা) হারিয়ে একটানা তিনবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হওয়ার দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের ফ্রেড পেরীর একটানা তিনবার (১৯৩৪-৩৬) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পর সুদীর্ঘ ৪১ বছর বাদে পুরুষদের সিঙ্গলসে 'হ্যাট্‌ট্রিক' হল বর্গের সাফল্যে।

দর্শক

ফুটবলার কেম্পেস

বিশ্ব ফুটবলের ফাইনালের শেষে বুয়েনস এয়ার্সের রিভারপ্লেট স্টেডিয়ামের বাইরে "মেন অ্যাভিনুতে" হাজার হাজার আর্জেন্টিনা অনুরাগী যে খেলোয়াড়টিকে শুধুমাত্র একটু চোখের দেখা দেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নাম মেরিও আলবারেটো কেম্পেস। ফাইনালে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটির মধ্যে দুটি গোল করে কেম্পেস সেই মুহূর্তে আর্জেন্টিনা বাসীদের নয়নের মনি। হুডখোলা গাড়িতে করে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা স্টেডিয়ামের সাবওয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, প্রথম গাড়িতে কোচ মিনেট্টি, অধিনায়ক প্যাসারেলা, এবারের বিশ্ব কাপে সর্বোচ্চ স্কোরার সুদর্শন মেরিও কেম্পেস। জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "কেম্পেস, কেম্পেস"। আরো আগে, আর্জেন্টিনা-হল্যাণ্ডের খেলা চলার সময়ও তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে শব্দের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন,—"কেম্পেস, নো সী ভা" অর্থাৎ কেম্পেস তুমি আর্জেন্টিনা ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে যেও না।"

কেম্পেসকে কিন্তু যেতেই হবে। এত সম্মান, এত জনপ্রিয়তা সব ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে স্পেনে। স্পেনের ভ্যালেনসিয়া ক্লাবের সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ। ১৯৭৬ সালে এক লক্ষ ডলারেরও বেশী দাম দিয়ে ভ্যালেন-সিয়া ক্লাব কিনে নিয়েছে কেম্পেসকে। ১৯৭৩ সালে রোজারিও এনট্রাল ক্লাব মেরিও কেম্পেসকে চুক্তিবদ্ধ করেছিল তাদের ক্লাবে খেলার জন্য।

একমাথা ঝাঁকড়া চুল, গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর মত সুদর্শন মেরি ও কেম্পেসের জীবনের শেষ কথা ফুটবল। কেম্পেসকে যদি কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করেন,—"কোনো তরুণী কি তোমায় কখনো ভালবেসেছে?" কেম্পেস স্প্যানিস ভাষায় যে উত্তরটি দেয় তার ইংরাজী অনুবাদ করলে দাঁড়ায়,—"সকার ইজ মাই ফার্স্ট লাভ।"

ফুটবলের সঙ্গে কেম্পেসের এই ভাল-বাসা শৈশব থেকেই। ওর মা শ্রীমতী এলগিস কেম্পেস বিশ্ব কাপ ফাইনালের দিন রিভার প্লেট স্টেডিয়ামের দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান,—"ছোটবেলা থেকেই ফুটবলে ওর অনুরাগ, সময় পেলেই বল পিটতে লাগত মেরিও। তেমন কোন সঙ্গীসাথী না থাকলে আমাকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে খাড়া করে ড্রিবলিং করত। বাঁ পাটাই বেশী চলত ওর। বলের ছাড়ে বল না থাকলে মিনিমুদ্রে বা কিছু থাকত তাতেই বাঁ পা দিয়ে লাথি কষাত।"

রোজারিওর বেলভিল প্রদেশে ১৯৫৫ সালে কেম্পেসের জন্ম। বেলভিল প্রদেশের মানুষদের পাস্ট টাইম ফুটবল। সুতরাং ফুটবলের পরিবেশেই কেম্পেস বেড়ে উঠেছে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফুটবলকে ভাল-বেসেছে। প্রথমে জুনিয়ার লীগে এবং পরে সিনিয়ার লীগে খেলার সূত্রে কেম্পেসের নাম ছড়িয়েছে। ফুটবলের জহুরীরা সাচ্চা রত্নকে চিনতে ভুল করেন নি। প্রফেশন্যাল ফুটবলে টেনে নিয়ে গেছেন তাঁরা বাচ্চা ছেলেটিকে। তারপর থেকে মেরিও কেম্পেসকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। গোলগেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নাম ছড়িয়েছে কেম্পেসের। প্রথম শ্রেণীর ফুটবলে -পর্যন্ত একশোরও বেশী গোল করেছে কেম্পেস। স্পেনে মাত্র আড়াই বছর খেলার ফাঁকে ওর করা গোলের সংখ্যা ছাপ্পান্ন। অসম্ভব ভদ্র আর বিনয়ী কেম্পেসকে বিশ্ব কাপের সময় সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ কি?" কেম্পেস কি উত্তর দিয়েছিল জানেন, 'আমার সট বিপক্ষের নেটে জড়িয়ে যাওয়ার মুহূর্তটাই আমার সব থেকে প্রিয়।'

রাজু চক্রবর্তী

ক্যামেরা জানুসির হাতে মাইক্রোস্কোপ

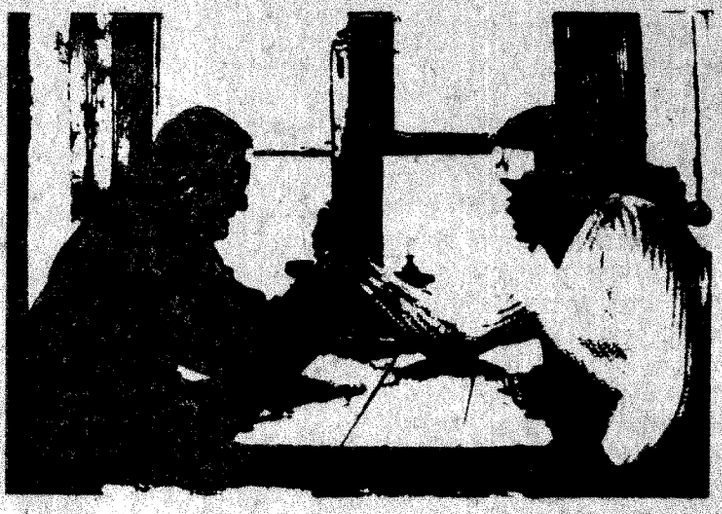

একটা আইরিশ প্রবাদ আছে 'নারীর সতীত্ব শয়তানের চোখের বালি।'

ক্ষিপ্ত শয়তান ডন জুয়ানকে নরক থেকে মর্তে পাঠায় যাজককন্যা বিট্রি মারী, যে এখনো অক্ষতযোনি, তাকে প্রলুব্ধ করতে, তাকে চরিত্রভ্রষ্ট করার জন্য। কিন্তু সে পরাজিত হয় যখন মারী বলে তার জন্যে মারীর করুণা হয়। অকস্মাৎ ডন জুয়ান অনুভব করে সে মারীর পাণিপ্রার্থনায় সনির্বন্ধ মিনতি জানাচ্ছে, ডন তার দৌত্যকার্য পরিত্যাগ করে। বিয়ের রাতে মারী তার স্বামীকে বলে, তার ঠোঁটে অন্য কোনো পুরুষের চুম্বনের দাগ নেই। মারী আসলে মিথ্যে কথা বলে, কারণ সে ডন জুয়ানকে আলিঙ্গন করেছিল। এই মিথ্যেই শয়তানের চোখের অসুখ সেরে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

১৯৬০ সালে তৈরি 'ডেভিলস, আই' বার্গম্যানের ২২ নম্বর ছবি। ছবির মূল ভাষ্যকার, যাঁর ব্যবহার অধ্যাপকসুলভ ও বিদ্রূপাত্মক, তিনিই ছবির ঘটনাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করান এবং ক্রমাগত ছবির ঘটনাপ্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। করেন এই-জন্যে যে, তাঁর কাজ আমাদের সর্বক্ষণ সচেতন রাখা, আমরা একটা ছবি দেখছি মাত্র। তিনিই জানান, যা আমরা দেখছি তা আসলে একটা 'কমেডি'। তথাপি দু' একবার শীতলতম বিচ্ছিন্নতা থেকেও উঠে আসে যন্ত্রণা। ছবিতে নরকের অর্থ নিরূপিত হয়েছে অনুভূতির অক্ষমতা, অভিজ্ঞতা লাভের অক্ষমতা। জন ডোনার বলেছেন, এটা বার্গ-ম্যানের সবচেয়ে কম মূল্যবান ছবিগুলোর একটা। অন্তর্মুখ শৈল্পিক সিদ্ধির কথা ভাবলে অবশ্য স্বীকার করতেই হয় এই ছবিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ব্যাখ্যা করার প্রেরণা আমরা অনুভব করি না। ডোনার বলেছেন, 'নীরস ছবি, দক্ষ কারিগরি আছে, তার বেশি কিস্যু নেই।' খুব ভুল বলেন নি।

৩০ জুন থেকে এক সপ্তাহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং ফেডারেল অফ ফিল্ম সোসাইটিজ-এর যৌথ উদ্যোগে একটি চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হোলো।

'জেড্', 'বয়' এবং ট্রিমিং ইয়ুথ' ৭৫-এর উৎসবে এখানে, দেখানো হয়েছে। এই ছবি তিনটি এবারেও ছিল। 'মেমরান্স অফ আন্ডার ডেভলপমেন্ট', 'অ্যামেন্ডমেন্ট টু দি ডিফেন্স অফ স্টেট অ্যাক্ট। কিউবা, বুলগারিয়া, পূর্ব জার্মান, ঈজিপ্ট, যুগো-শ্লাভিয়ার এই 'ডেসপাইট এভরিথিং', 'আর্থ' 'আইডিয়ালিস্ট'। ছবিগুলো ইতিপূর্বে কোলকাতায় বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির শোয়ে দেখানো হয়েছে। জানি না একটা চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য এই ছবিগুলো আবার বাছাই করা হোলো কেন। এর একটিও ভালো ছবি নয়। যেমন আর একটি বিরক্তিকর ছবি 'অন্ এ সিলভার প্লাটার', ফরাসী দেশের '৩৬লা গ্রান্ডটুনামেন্ট একটি ডকুমেন্টারি ফীচার, নিউজরীল থেকে তৈরি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। নির্বাক চলচ্চিত্রের শেষ বছরে তৈরী 'টেন ডেজ দ্যাট শুক দি ওয়ার্ল্ড' ওভার এশিয়া উৎসবের যথেষ্ট দামী একটা ছবি।

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা কি, সভ্যতার অভিজ্ঞান কি, কিশ্চিয়ানিটি না কমিউনিজমে, এই তিনটি প্রশ্ন ছিল পিপলস কলেজের একশ বছরের-দলনেতারা। তারা পিপলস্ কলেজকে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে চায়। তারা ভুল ইতিহাসের স্তূপীকৃত বই-গুলো পুড়িয়ে দিতে চায়, কারণ, তারা বলে, আমরাই তো ইতিহাস তৈরী করব। বিপ্লবী ছাত্র দল ক্রমাগত নাচ ও গানের মধ্যে তাদের উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেয়। তরুণ নেতা ক্যাথলিক ছাত্রদের বলপ্রয়োগের দ্বারা জয় করতে চায় না। পরিবেশ বদলে যায় যখন প্রতিক্রিয়া-শীল আগ্রাছাগুলো উপড়ে ফেলার জন্য একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে আসে। যুবক নেতাটি এতে রাজী হয় না বলে তাকে সেক্রেটারি পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় কিন্তু দল থেকে বিতাড়িত করা হয় না। তার জায়গায় যে মেয়েটি নির্বাচিত হয় তার কার্য পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ, সে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে। শেষ পর্যন্ত এই মেয়েটিও তার উধ্বতনদের দ্বারা পদচ্যুত হয়। তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, একটা সময় আসবে যখন সে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে। মেয়েটি বলে, তবু আমি তোমাদের দয়া ভিক্ষা করি না।—এই মিকোলাস জানশোর ছবি, 'কনফ্রন্টেশন'।

এই বিপ্লবী তরুণ দলের ছোট ছোট বিরোধ, উল্লাস, ব্যাচাল, স্ফূর্তি, তাদের প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, তাদের কঠিন প্রতিজ্ঞা, এক আশ্চর্য আধুনিক নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে চিত্রায়িত হয়। হ্যাঁ, ক্যামেরার ভাষাই সিনেমার প্রধান ভাষা। বিবৃতি সর্বদাই সঙ্গীতে। কনফ্রন্টেশান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি।

প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক চেতনার উজ্জ্বল উদাহরণ জানুসির 'স্ট্রাকচার অফ ক্রিস্ট্যালস'। বিজ্ঞানের ছাত্র দুই বন্ধু মারেক ও ইয়ানের মিলনে জীবনের প্রতি তাদের দুজনের সম্পূর্ণ ভিন্ন মৌলিক দৃষ্টিকে পরিচালক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা জানুসির প্রথম ছবি। ওয়াজাদা পর-বর্তী পোলিশ সিনেমার দুই শক্তিমান চলচ্চিত্রকার পোলানস্কি ও জানুসি। এই ছবিতে বৈজ্ঞানিকের নৈতিক দায়িত্ব ও পেশাদারী সততার দ্বন্দ্ব ও সমস্যা নিখুঁত সংলাপ ও আশ্চর্য চলচ্চিত্র ভাষায় বর্ণিত। অসাধারণ চিত্রনাট্য অসামান্য ফটোগ্রাফি ছবিটিকে যেন স্ফটিকে পরিণত করে। কেউ যখন ক্যামেরাকে কলমের মত ব্যবহার করছেন জানুসি তখন ক্যামেরাকে মাইক্রো-স্কোপের মত দেখছেন।

ডকুমেনটেশানের দিক থেকে রেনের স্টাডিক্যাল সফল ছবি, মুগ্ধ করার মত ডিটেলেরও অভাব ছিল না, তবু মারিয়েন-বাদ বা হিরোশিমার তুলনায় তাৎপর্যহীন।

এ উৎসব যদি প্রতিযোগিতা মূলক হত তাহলে এই ফেস্টিভালের শ্রেষ্ঠ ছবি জেড, শ্রেষ্ঠ পরিচালক কিস্তভ জানুসি, ক্রিটিকস এওয়ার্ড—মিকোলাস জানশো।

উদ্বোধন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও মৃণাল সেনের বক্তৃতার পর চীনের ছবি হাই-হিলা দিয়ে উৎসব শুরু হয়।

—প্রসন্ন শুর

চিত্রধ্বনি

স্নানপুণ্য ও রাজদর্শন

আমি এক সামান্য চলচ্চিত্র প্রেমিক—দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে—তেমনভাবেই দেখতে গিয়েছিলাম গ্রেগরি কোজিনেৎসেভকৃত কিং লিয়ার। এবং রাজদর্শনের পুণ্যে আমি ধন্য, আমি চরিতার্থ। অত্যন্ত বিনীতভাবে মেনে নেব কিং লিয়ার কোন চলচ্চিত্রায়িত নাটক নয়, একান্তভাবেই চলচ্চিত্র। এক্ষেত্রে রাজা লিয়ারের প্রতিমা নির্মাণে আক্ষরিক অর্থে অবশ্যই উইলিয়াম শেকসপীয়ার কোজিনেৎসেভের উত্তমর্ণ কিন্তু চক্ষুদানের কৃতিত্ব তবু দ্বিতীয়জনের। নির্বিধায় আমি বলব হ্যামলেটের (১৯৬৪) তুলনায় লিয়ার (১৯৭০) এই রুশ শিল্পস্রষ্টাকে অনেক প্রবীণ ও পরিণত করেছে। যদিও ব্যক্তিগত বিচারে আমি এখনও হ্যামলেটের পক্ষপাতী. ডেনমার্কের যুবরাজের ভূমিকায় স্মকটুনোভস্কি আমাকে অনেক বেশী অভিভূত করেন লিয়াররূপী ইয়ুরি জারভেতের চাইতে, তবু তা ট্র্যাজেডির গভীরতর জন্যই. চলচ্চিত্র ভাষার অবদান সেখানে লিয়ারের মত তীব্র ও সকিয় নয়।

অর্থাৎ গ্রেগরি কোজেনেৎকেভ বোনিয়মের পথিক। তাঁর লিয়ার মাত্রই এক বৃদ্ধ রাজা নন যিনি কন্যাদের হৃদয়হীন স্বার্থপরতায় স্তম্ভিত, কাতর ও ক্রুদ্ধ। (পাঠক, ভুল বুঝবেন না, শেকসপীয়ার নিশ্চয়ই বহু স্তরসমন্বিত কিন্তু আমি সাধারণ ধারণা ও কোজিনেৎসেভের প্রভেদ প্রসঙ্গে চিন্তিত)। কর্ডেলিয়া যখন পিতার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে—আই লাভ ইয়োর ম্যাজেস্টি-আকর্ডিং টু মাই বণ্ড, নর মোর, নর লেস....।—তখনই কোজিনেৎসেভ ট্র্যাজেডির সূচনা ঘটান না। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি ইয়ুরি জারভেতের চেহারায় কোন সম্রাটোচিত সম্ভ্রম নেই, অধিকাংশ সময়েই তাঁকে দেখা গেল দুর্গের বাইরে। প্রজারা এখানে দীর্ণকায়, বঞ্চিত ও রুগ্ন। আর প্রকৃতি ধূসর ও রুক্ষ। একেই হয়ত মার্কসবাদীরা বলেন প্রোলেতারীয়করণ। রাজনৈতিক পরিভাষ এড়িয়ে অন্যভাবে দেখলে মনে হয় পরিচালক, এমন কি বুর্জোয়া নন্দনতাত্ত্বিক অর্থেও, আধুনিকতার। স্থানাংক সঠিকভাবেই নির্ণয় করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত রচনা সিসিফাসের ভিংবদন্তীতে আলবিয়ার কামু দাবী করেছেন যে ধ্রুপদী মনোভাব প্রধানত অধিবিদ্যা নিয়েই ভাবিত অন্যদিকে আধুনিকতার মূল সমস্যা নৈতিকতা। আর আমরা এখানে দেখব শেকসপীরীয় ট্র্যাজেডিসমূহের মধ্যে যে কিং লিয়ারকে অনেকেই কোজিনেৎসেভ তাকে নৈতিকতার প্রেক্ষাপটেই স্থাপন করেছেন। অপর এক রুশী চিন্তানায়ক বেলিনস্কির সাহায্য নিয়ে আমরা বুঝতে পারি এই চলচ্চিত্রে লিয়ারের বিকাশ মোটামুটি এই রকম : প্রথমে ন্যায়াল ইনফ্ল্যান্সি, যখন লিয়ার রাজত্ব ভাগ করতে চলেছেন। তিনি ক্ষমতা গর্বে গর্বিত ও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। তারপরে আসে ডিসইনটিগ্রেসন। সব মোহ চূর্ণ হয়। উন্মাদ রাজা পৃথিবীর পাঠশালায় পাঠ নিতে শুরু করেন। অবশেষে কনশ্যাস হারমনি। কর্ডেলিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলনের পর লিয়ার ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রজ্ঞানে পৌঁছে যান।

আমাদের আরও তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া জরুরী। প্রথমত গ্রেগরী কোজিনেৎসেভের দার্শনিক আনুগত্য মার্কসবাদের প্রতি। দ্বিতীয়ত তিনি ছবি আঁকার জগৎ থেকে চলচ্চিত্রে এসেছেন। তৃতীয়ত তাঁর শিল্পচেতনা গভীরভাবে রুশ সংস্কৃতির অতীতকে অনুধাবন করে।

এ জন্যই লিয়ারে প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্ত মানতার প্রতীক। কোজিনেৎসেভ বিশ্বাস করেন ব্যাখ্যা করার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদলে দেওয়া। আত্মজ্ঞানী লিয়ার তাই নীরব হয়ে যান না, উপলব্ধি করেন—দ্যাট থিংস মাইট চেঞ্জ অর সিজ্ঞ। অতএব বিদ্রোহ করেন। অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে শহীদ হিসেবে উত্তর পুরুষের কাছে সাক্ষ্য রেখে যান।

স্বয়ং কোজিনেৎসেভ কিং লিয়ার সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রণয়নকালে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির একটি উদ্দেশ্য স্মরণে এনেছেন — বক্তাক্ত পাদচিহ্ন ছাড়া আর কোন মসৃণ ভূমি থাকবে না। রাজা লিয়ারের পটভূমি প্রকৃতই অসম ও বন্ধুর। একমাত্র প্রথম দিকে রাজসভার বর্ণনায় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি স্থিতিশীল অচলায়তনের ইলিউশন উপস্থিত করেছেন,

এই তো সংসার ছবিতে মহুয়া রায়চৌধুরী

আমরা লক্ষ্য করি অভিনেতাদের বিন্যাস। তারপর থেকে সব কিছুই দ্বান্দ্বিক পরিবর্তন চিন্তার ফলশ্রুতি। কিন্তু আমরা পরিচালকের উল্লেষকালীন শিল্পী জীবনের কথা স্মরণে এনেছি নেচার শটসগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। ঝড়, আকাশ ও সমুদ্র তাঁকে বারংবার শব্দহীন শূন্যতায় আশ্রয় দিয়েছে। অথচ, ঝড়ের প্রশ্ন স্বতন্ত্র, আকাশ ও সমুদ্রের দূরপ্রসারী সংযম তো

ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জিডিআর

কার্ল মার্কসের ১৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা।

বিশেষ প্রবন্ধ : রিচার্ড স্পেলের মার্কস জীবনপঞ্জী (অনুঃ—অমল মুখোপাধ্যায়), আর ল্যাণ্ডর-এর কার্ল মার্কসের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার, ১৮৭১. (অনুঃ—রবীন্দ্র মজুমদার), মার্কস প্রসঙ্গে (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), মার্কস ও আজকের মার্কসবাদের কিছু সমস্যা (দিলীপ বসু), আমরা এর সব পূর্বেই শুনেছি (আলবার্ট নর্ডেন, অনুঃ বিশ্বনাথ বসু), মার্কসবাদ ও বলপ্রয়োগের ভূমিকা নয়ে বিকৃতি (শান্তিশেখর সিংহ), কার্ল মার্কস ও সাহিত্য (অনিলেন্দু চক্রবর্তী), হাইনে ও মার্কস (অনুঃ সুনীতা মুখোপাধ্যায়), মার্কসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবোধ (বাসব সরকার) ভারত প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস, বাংলা দেশে মার্কস চর্চা (পঞ্চানন সাহা), জার্মান ভাষা থেকে অনূদিত দীর্ঘ গল্প, হাইনের কবিতা (মণীন্দ্র রায়), জার্মান ভাষা শিক্ষা পাঠ প্রভৃতি।

বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রশোভিত দশফর্মার পত্রিকাটির মূল্য—এক টাকা।

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ : জুলাই—আফ্রিকা সংখ্যা, আগষ্ট—স্বাধীনতা সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর—বর্ধিত কলেবরে শারদীয়া ও জি ডি আর-এর ২৯তম প্রতিষ্ঠা সংখ্যা

বিশেষ সংখ্যা সহ বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা—দশ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : মনীষা, পাতিরাম ও ইণ্ডো জি ডি আর

২৫জি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

কোজিনেৎসেভের আয়ত্তে থাকার কথা নয়, তিনি যৌবনে 'স্টিল লাইফ' অংকনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন না। বিশেষত ঝড়ের আগে নগ্ন, নিরাবরণ আকাশ ও কর্ডেলিয়ার ফাঁসির পর সমুদ্র! না পাঠক, আমার ক্ষমতা নেই সেই অনুভবকে ভাষায় চিত্রিত করা।

এবার উল্লেখ করা যেতে পারে আকিটাইপীয় রীতির কথা যা একান্তভাবেই সম্পাকে জাতীয় সংস্কৃতির শরীরে যুক্ত করে। আমাদের পরিধি ছোট তবু বলা যায় ঝড়টি এখানে প্রতীকী ও যুগ যুগ ধরে ইয়োরোপীয় সংস্কারে প্রোথিত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পশ্চিমী নই যে বুঝতে পারব লবণের রূপকথা কিং লিয়ারের অন্তরালে থেকে কিভাবে চেতনার অজস্র জট খুলে দেয়।

যেমন আমরা অসুখী যে, আমরা রুশ জানি না। বরিস পাস্তেরনাকের অনুবাদের তাৎপর্য তাই কানের ভেতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করল না। শোনা যায় এই অনুবাদটি নাকি নেরুদার গোটে অনুবাদের মতই অবিশ্বাস্য সফলতার স্বাদ পেয়েছে।

আর সঙ্গীত পরিচালনা? শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্ত গভীরে! কেননা তার দায়িত্বে রয়েছেন স্বয়ং শস্তাকোভিচ ঃ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অন্যতম শেষ ধ্রুপদী মহিমা। ঝড়ের আগে সেই বাঁশির প্রয়োগ কি আমরা ভুলতে পারব কোনদিন?

একটি কথা, অপ্রাসঙ্গিক যদিও, বলা হয় নি। হ্যামলেটের বিখ্যাত স্বগতোক্তিসমূহ স্মকটুনোভস্কির মুখনিসৃত নয়। এখানে কিন্তু ইয়ুরি জারভেত যথেষ্ট সবাক।

বাল্লা লিয়ার যখন কলকাতা বেতাতে এলেন, কলকাতা তখন উন্মাদ গন্ডালিকা প্রবাহের যাত্রী, বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে ভাবিত। তিনি প্রাপ্য সম্বর্ধনা পেলেন না। লিয়ার বাণিজ্যিক অর্থে সফল হল না। কি আর করা যাবে? মহান শেকসপীয়ার তো বলেই গিয়েছেন ঃ দি ওয়েট অফ দিস স্যাড টাইম উই মাস্ট ওবে।

মুকান্দারের মোকদ্দমা

পরিচালক শ্রীরবি ট্যান্ডনের খুব দুঃখ। দেশবাসী অজ্ঞ। দেশবাসী অবুঝ। তারা পুলিশ বাহিনীর নীরব আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ জনসেবা সম্পর্কে কোন খোঁজ-

ডাঃ এস.কে.মুখার্জী, এম.বি.প্রণীত
সচিত্র নতুন সংস্করণ
শরীর বিজ্ঞান ···১২·০০
(বাংলায় অ্যানাটমী ও ফিজিওলজি)
আধুনিক চিকিৎসা (অ্যালো) ২২·৭৫
(মানুষের রোগ, ওষুধ ও চিকিৎসা)
শিশুপালন ও চিকিৎসা (অ্যালো) ১৩·০০
(শিশুর রোগ, মায়ের যত্ন, ওষুধ ও চিকিৎসা)
MODERN TREATMENT ···· 27·00
(DISEASES, ITS MEDICINE & TREATMENT)
PROSTITUTION IN INDIA···60·00
এস. মুখার্জী এণ্ড কোং
৪৪ বিপ্লবী পুলিন দাশ স্ট্রীট • কলিকাতা ৯

রেখা/মুকান্দর

খবর রাখে না। তাই তিনি পুলিশের কর্মযজ্ঞের একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করেছেন যাতে অজ্ঞানের তমসায় আচ্ছন্ন ভারতবাসীর হৃদয়মন্দির আলোকিত হয়। আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা জানতামই না উর্দিপর একজন সাধারণ পুলিশ ইন্সপেকটর একাই একশো দক্ষযজ্ঞ ঘটাতে পারেন।

শুনেছিলাম সঞ্জীবকুমার বোম্বাইয়ের দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। ইনি নাকি সার্ত্র পড়েন। হায় সার্ত্র। আমি তো দেখলাম লাফালাফিতে ইনি কারুর চাইতে কম যান না পুলিশ অফিসার বেশে তিনি আইনকে নিজের হাতে নিয়েছেন। আর আক্ষরিক অর্থেই নিয়েছেন। তাঁর প্রবল মুষ্টাঘাতে অপরাধীরা যেভাবে ধরাশায়ী হচ্ছিল তাতে, আমি হলফ করে বলতে পারি, তারাই বরং অস্তিত্ববাদী হয়ে উঠতে বাধ্য হবে এর পর থেকে।

এ হেন সঞ্জীবকুমারকে আমরা একটি চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখলাম। মার্কসবাদীরা দ্বন্দ্ব, বিপরীতে মিলন—এ জাতীয় অনেক বড় বড় দার্শনিক বুকনি ঝাড়েন। মুকান্দার নিশ্চয়ই তাদের মাজা ভেঙে দেবে। আহা, পরিচালকের কি অদ্ভুত কল্পনাশক্তি। একই পরিবারের বড় ভাই (পরিক্ষিৎ সাহানি) সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রমিক নেতা এবং ছোট? ভাই (শশী কাপুর) শহরের শ্রেষ্ঠ সমাজবিরোধী। একই সংসারে ভাই যখন শিল্পপতি-কাম-স্মাগলার (আমজাদ খাঁ) বোনের (রেখা) সুরেলা কণ্ঠ তখন শ্রমিক সমাবেশে মধুবর্ষণ করে। হয়ত এদের মধ্যে কেউ অভিমান করে ভাতের থালা দূরে ঠেলে দেন কিন্তু তাই বলে সামান্য আদর্শের জন্য বিচ্ছেদ ছিঃ। তাও হয় নাকি? বরং দশেরা উৎসবে নিজের গুন্ডা ছোট ভাই ও মালিকের মিষ্টি ছোট বোনকে নাচতে দেখে নাচের তালে তালে অন্তর্যামীর মত মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন শ্রমিক নেতা। সাধু! সাধু!

এ রকম বৃন্দাবন বেলীক্ষণ স্থায়ী হলে সমাজ চেতনা প্রমাণিত হয় না। অতএব খুন হলেন শ্রমিক নেতা। তার পরেই হুলুস্থুলু কান্ড। অবশেষে সঞ্জীবকুমার দস্যু দমন করলে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভ্রাতৃহীনা রেখা, বলাই বাহুল্য, ততক্ষণে শশী কাপুরের মধ্যেই অভাগীর স্বর্গ খুঁজে পেয়েছেন।

ট্রেড ইউনিয়ন লীডারের ভূমিকায় আছেন পরিক্ষিৎ সাহানি। তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে কথা না বলাই ভাল কিন্তু ভদ্রলোকের চোখে-মুখে তাঁর প্রয়াত পিতার মতই একটি মার্জিত ছাপ আছে।

মনে হয়েছিল শ্রমিক নেতার ছোট ভাই শশী কাপুর না জানি কি সাংঘাতিক গুন্ডা হবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল তিনি নিয়মমাফিক বৌদি (বিদ্যা সিনহা) পালিত দেওর মাত্র। সঞ্জীবকুমারের বস্তুত ওই কাগুজে বাঘকে অত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার ছিল না।

তবে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে রেখাকে। অত্যন্ত নরম গলায় তিনি মজুরদের সামনে মদ্যপানের কুফল ও পরিবার পরিকল্পনার সুফল সংক্রান্ত সারগর্ভ ভাষণ রেখেছেন। ক্ষমতা থাকলে এক্ষুনি আমি তাঁকে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতাম। উপরন্তু কি লক্ষ্মী মেয়ে দেখুন—প্রেমিকের নাম রামু হলে যে কেন সুন্দরীরই মন খারাপ হয়ে যায়, রেখা এতে আদৌ বিচলিত তো হন নি বরং অন্যান্য নায়িকাদের মত বাড়াবাড়ি না করে প্রেমিকের একটি লোমহর্ষক মোটর অভিযানে হার মেনেছেন।

আমজাদ খাঁ ও বিদ্যা সিনহা তেমন উল্লেখ্য কিছু নয়। সঙ্গীত নিষ্প্রভ। আলোকচিত্র গ্রহণে কারিকুরি সকলেরই নজরে পড়বে।

দেব আনন্দের ইংলন্ড বিজয়

ইতিহাস না পড়লেও জানা যায় যে ভাকরবর্ষ প্রায় দুশো বছর পরদেশী ইংরেজদের পদানত ছিল। ইংরেজদের ওপর আমাদের রাগ আছে। ঠিক সে-কারণেই দেশ-পরদেশ আমার দেশপ্রীতির পাত্রে এমন হাওয়া দিয়েছে যে এই শীর্ণ বুক ফেটে চৌচির হওয়ার জোগাড়। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কেন? আমার জবাব—(ক) আংরেজী হটাও আন্দোলন বিলেতে সম্পূর্ণ সফল। সাহেবরা সকলেই আজকাল হিন্দীতে কথা বলে এবং ইংরেজী প্রায় ভুলেই গেছে। (খ- দেব আনন্দ লন্ডন শহরে উপস্থিত হওয়ার পর থেকেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বৃটিশ সিংহ ঠান্ডা ভারতীয় যুবকটির পায়ের কাছে বসে চিঁচিঁ করেছে।

যাক, আমি হিন্দী সিনেমার আদার ব্যাপারী, দেশপ্রেমের জাহাজে চড়ে আমার দরকার নেই। ছবির কথায় আসি। একটা জিনিস আমার খুবই ভাল লাগল যে, দেব আনন্দজীর বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয় নি, অন্তত কিশোরী টিনা পিতৃপ্রতিম দেব আনন্দের সঙ্গে কোন ফুল বাগিচায় বসে দোল খান নি।

দেব আনন্দের ভক্তদের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। সোজা না হয়ে হাঁটা, হঠাৎ হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে আনা,—

সোজা কথায় যাকে 'আর্ট', মতান্তরে ভড়কি বলে তা এখানেও সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

দেখলাম সাহেবরা ঘরের মধ্যে টুপী পরে ঘোরাফেরা করছে। তবে আমি তো খারাপ লাগার সমুদ্রেই শয্যা পেতেছি, এখন এই টুপীরূপী শিশিরে ভয় পেলে কি চলে?

এই ছবির প্রযোজক, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা দেব আনন্দ স্বয়ং। সঙ্গে আছেন প্রাণ, অজিত, সুজিতকুমার, আমজাদ খাঁ ও টিনা।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

একজন ভালো সম্পাদক চাই

সিনেমার ক্ষেত্রে যেমন একজন সম্পাদক থাকেন, অবিলম্বে বাঙলা থিয়েটারেও সেরকম সম্পাদক প্রয়োজন। বাংলা থিয়েটার এ ক্ষেত্রে এতদিন সে কাজ মোটের উপর পরিচালকই করে আসছেন। অভিনয় শিক্ষা এবং সামগ্রিক প্রযোজনার খুঁটিনাটি সম্পাদন সবই তাঁর নির্দেশনায় হয়ে থাকে। জানি যে নবান্ন নাটকে বিজনবাবু ও শম্ভু বাবু এই দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত বর্তমানে দুর্লভ। কাজেই নির্দেশকের পাশে সম্পাদক চাই। না হলে 'অনুভব এর নাটক' তিন বিজ্ঞানী'তে পরিচালক এবং নিউটন-এর ভূমিকাভিনেতা রতন চক্রবর্তীরা যথেচ্ছাচার করে যাবেন বাংলা মঞ্চে। এ একটা সংশোধন জরুরী।

ডুরেনমাট্-এর নাটক অবলম্বনে রচিত 'তিন বিজ্ঞানী' নাটকটি অসম্ভব শক্তিশালী। মূল নাটকটি তো বিস্ময়কর ভালো, নীহার ভট্টাচার্য-র বাংলা রূপান্তরও দু-এক জায়গার কাব্যি বাদে ভালো। পিন্টু বসু মঞ্চকে অবশ্য শুধুমাত্র বিশ্বাসা করে তুলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আলোকে ব্যবহার করেছেন ভিন্নতর মাত্রায়। চিত্র ভাদুড়ির রূপসজ্জাও যথাযথ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নির্দেশকের নিজের অভিনয় এবং তাঁর নির্দেশিত অন্যান্য অভিনয় সব আয়োজন পণ্ড করে দিল। নাটকের প্রধান উপকরণ অভিনয়ই সেখানে অনুপস্থিত অথবা হাস্যকর ভাবে উপস্থিত (আইনস্টাইন ঃ আরতিরুদ্র পাল চৌধুরী। সেখানে মহলার অভাব যে ফুটে উঠেছে তা অনেকটা গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত। ফোঁড়া ঢাকতে গিয়ে দেবাশিস দাশগুপ্তকে যেসব সাংকেতিক আবহসৃষ্টি করতে হয়েছে তাতে টনটনানি আরও বেড়েই গেছে, লাভ হয় নি কিছুই। ক্রিমিনাল ইন্সপেক্টর বেশী বিবেক সেনগুপ্তকে তাঁর সরল নির্বুদ্ধিতার জন্য যদি বা ক্ষমা করা যায়, দিলীপ ভট্টাচার্যর 'ডাক্তার' বা শান্তিদিং সেনগুপ্তর 'পাদ্রী' তার যোগ্য নয়। আর অরিন্দিত রায়, সুবীর গাঙ্গুলী এবং সোমনাথ সেন-এর গান শোনা তো একটি কঠিনতম ধৈর্য পরীক্ষা। মেট্রন-এর ভূমিকায় নিন্দিতা দত্ত সবকটি দোষেই মৃদু নাটকের স্বপক্ষে কিছু বলতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য আমরা শুনতে পাইনি। তবে দুঃখ হয়েছে ডাঃ স্যার ভূমিকায় শ্রীমতী ব্যানার্জীর জন্য (ডাঃ স্যা মহিলা অভিনেত্রীর নামের বানান চরিত্রলিপি অনুযায়ী লিখেছি, আমি দায়ী নই)। তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁকে ঐ চরিত্রে সাহায্য করেছিল, যেমন করেছিল তাঁর চোখ। কিন্তু কথায় অদ্ভুত একটা সুরের টান এবং খারাপ নির্দেশনা তাঁকে উপযুক্ত মহিমা অর্জন করতে দিল না। দিল না শেষের সেই বিখ্যাত দৃশ্যেও যেখানে তিনি নিজের গোপন পরিকল্পনার কথা বলেন।

নাটকে প্রথম গভীরতা এসেছিলো স্বপ্না রায় (মিসেস রোজ)-এর প্রবেশের পর, তাঁর সংযত বাচনভঙ্গীর গুণে। তারপর অভিনয়ের তাণ্ডব এবং ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একলা দাঁড়িয়েছিলেন তাপস দত্তগুপ্ত (মফিজ)। আর নার্স 'মণিকা'র ভূমিকায় শিখা রায় তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার পর অল্পক্ষণের জন্য নিষ্প্রাণ নাটকে গতি এসেছিল। এঁরা দুজনে মিলে প্রথম অঙ্কের বিরতি পর্যন্ত নাটককে টেনে নিয়ে গেছেন। মণিকা খুন হয়ে যাবার পর একা মফিজকেই ঐ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে পুরো দ্বিতীয় অঙ্কে। সত্যি কথা বলতে শিখা রায় এবং প্রধানত তাপস দত্তগুপ্ত না থাকলে ঐ নাটক বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়ে যেতো, অন্তত ২৩শে জুন, যে অভিনয় আমরা দেখেছি 'মুক্তঅঙ্গন' মঞ্চে।

বিভিন্ন দৃশ্যের সংস্থাপনের মধ্যে বড় বেশী ধীরতা ছিল, অনাবশ্যক মৌন নাটককে সাহায্য করে না। চরিত্ররা মাঝে মাঝেই চুপচাপ মঞ্চে বেড়িয়েছেন, যেন বাগানে হাঁটছেন। দুবার পর্দা ওঠার পর স্টেজে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি, শুধু মৃত নার্স-এর জায়গা বদল সহ, এটা জানা চমক, তবে সুপ্রযুক্ত। এই দৃশ্য কিন্তু মুহূর্তে অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যখন স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। মঞ্চে এত জিনিস থাকে যে এই জটিল ধীর ও ধাক্কাধাক্কিময় পদ্ধতিতে সবাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং নাটকের সমস্ত সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। এতসব সত্ত্বেও নাটক শেষ অবধি দেখা গেছে এর আসল কৃতিত্ব ডুরেনমাট্-এর। মানুষের কল্যাণের জন্যই সব জানা ভালো নয় বিজ্ঞানের, কিন্তু একবার জেনে ফেললে তা আর অপ্রকাশ রাখাও

তুফান নাটকে মানসী দাশগুপ্ত

চলে না; সভ্যতার এই তীব্র সংকটের মধ্যেই তো বাস করছেন আমাদের নাট্যকাররাও। কই, তেমন করে ভাবতে পারছেন কেউ!

সুরঞ্জিৎ ঘোষ

তুফান

গত বিশে জুন যোগেশ মাইম হলে নবারুণ থিয়েটার গ্রুপের নাটক তুফানের কেন্দ্রবস্তু জমি ধান ইজ্জত আর অধিকার। নাগরিক জীবনের অনেক কচলানো প্রেম, বিরহ, ট্রাম, ঘিনি, মানতে হবে, মানবো না, রাইটার্স, বিধানসভা বহু দিন আগেই তেঁতো হয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষ্যামা দাও বললেই বা কে ছাড়ে? পাঁচ লক্ষ গাঁয়ের মানুষ বারশ' শহরের নাগরিকদের কেরামতি দেখে দেখে তাই ক্লান্ত। অথচ চল্লিশ কোটি কৃষক অধ্যুষিত ভারতবর্ষের বিশাল জনপদে সেই জমি, ধান চাষ, উৎপাদন, বণ্টন, রক্তারক্তি সংকট নয়া ঔপনিবেশিক খরণ্যেসের বাচ্চাদের দাপট আজও অব্যাহত।

তুফান নাটকে এই সংকট সংঘর্ষ সমূহ তীব্রতা নিয়ে হাজির হয়েছে।

কালি সাহা জোতদার এবং মহাজন। টাকা এবং লাঠির জোরে সে নিজের অধিকার রাখতে ব্যস্ত। সেই সঙ্গে ঝাড়ফুঁক, তাগা-তাবিজের বুজরুকিও সে কাজে লাগায়। কিষাণসভার নেতৃত্বে গাঁয়ের চাষীরা জমি

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনী অতিক্রান্ত!
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬॥টা
তরুণ থিয়েটারে
নাটক-পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শেষঃ ঃ বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, ঊর্মীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

আর ফসলের দাবীদার। নাটকের এটাই মূল বন্দ্ব। মাঝে অনেক দৃশ্য আর ঘটনা। রাষ্ট্রযন্ত্র আর পুলিশের সাহায্যে কালি সাহা চেয়েছে প্রবেশ, জিলাল, কেস্টদের লড়াইকে গুঁড়িয়ে দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি।

নাটকের কাহিনীতে অনেক দুর্বলতা আছে। কৃষকদের চরিত্র স্টিরিওটাইপ একঘেয়ে। আলাদা করে চেনা যায় না। পরেশ তার গান এবং মাতলামির জন্যে এবং জিলাল তার ছাগুলে দাড়ির জন্যে একটু স্বতন্ত্র। অবশ্য পরেশের ভূমিকায় নির্মল দে ভালো অভিনয় করেছেন। কার্তিক আর মানিক—বাপ-বেটা। কালি সাহার দুই লাঠিয়াল। অভিনয়ে স্মরণ চ্যাটার্জি আর দুলাল সর্বজ্ঞ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কার্তিকের চরিত্রের পরিণতি কি?• শেষ পর্যন্ত সে কোথায় গেল? কালি সাহার নায়েবের ভূমিকায় চুনীলাল মোদক জোরালো অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাকে দু মিনিট ধরে স্টেজে হেনস্থা করার কি খুব দরকার ছিলো? কালি সাহার ভূমিকায় বিমল দাশগুপ্তের অভিনয় যথাযথ। তবে তিনি এখনও একটি বিশেষ ঘরানার অভিনয়ে অনুরাগী। হাস্যরসের জন্যে পাছা শব্দটা বহু ব্যবহারে জীর্ণ। এই নাটকের প্রধানতম আকর্ষণ সুন্দরীর চরিত্রে মানসী দাশগুপ্তের অভিনয়। অভিব্যক্তি, বাচনভঙ্গী এবং সাবলীলতায় তিনি যে কোনো প্রথম শ্রেণীর নায়িকাকে টেক্কা দিয়েছেন। আগামীকালের এক সম্ভাবনাময়ী অভিনেত্রীকে যোগেশ মাইমে দেখা গেছে।

নবারুণ গোষ্ঠীর টিমওয়ার্ক ভালো অভিনয়েরও একটা মান আছে। শুধু সমবেত গানের বেলায় তেলে জলে মিশ খায়নি। আরো একটু চর্চা করা দরকার। নাটকটিকে পরিপাটিভাবে সম্পাদনা করলে আরো উন্নত হবে। নির্দেশনায় বিমল দাশগুপ্তের শ্রমের ছাপ আছে। আর একটু শিল্পবোধ দরকার। আলো, মঞ্চ, শব্দযোজনা প্রয়োজন মিটিয়েছে।

এ নাটক জনপ্রিয় হবে। শুধু উদ্যোক্তাদের একটা অনুরোধ যোগেশ মাইমে এই গরমে আর অভিনয় করবেন না। আলো হওয়াহীন ওই গুদোমঘরে ভালো জিনিসও বিস্বাদ লাগে।

শৈবাল মিত্র

কালিন্দী

গত ১৫ জুন রঙ্গনাতে অনুষ্ঠিত হলো বসুমতী রিক্রিয়েশন ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব। সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরু হবার মিনিট দশেকের মধ্যে লোড-শেডিং—তখন ভাষণ দিতে উঠেছিলেন দৈনিক বসুমতী পত্রিকার প্রধান সম্পাদক গোপাল ভৌমিক। প্রচণ্ড সোরগোল। কিন্তু ধৈর্য ও উদ্যোগ ব্যাপারটা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথার্থই ছিলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হ্যাজাক-বাতির আলোয় মিলনোৎসবের পুনরারম্ভ ঘটলো। বিনা মাইকেই ভাষণ দিতে উঠলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য-মন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য। খুবই সাঙ্ক্ষিপ্ত বক্তৃতা।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ, সবারই সৌভাগ্য বলতে হবে, লোড-শেডিং-এর আয়ু ফুরোয়। শুরু হয় শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর কাছে ভীষণ আদরণীয় নাটক—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী'। সিনেমার কায়দায় ভেসে-যাওয়া মেঘখণ্ডের ওপর পর্দায় দেখানো হলো অভিনেতা-অভিনেত্রী তথা অন্যান্য কলাকুশলীদের নাম—প্রয়োজনের থেকেও অনেক বেশি সময় ধরে। অতঃপর কালিন্দীর চরে সাঁওতাল তরুণ-তরুণীদের মাদল নৃত্য সমাহারে নাটকের প্রথম দৃশ্য। নাচ সত্যি ভালো। কিন্তু সাঁওতাল তরুণী-দের কাপড়ের তলা দিয়ে সাদা উঁকি মারার ব্যাপারটা একটা দমিয়ে দেয়। সঙ্গীতাংশ প্রশংসনীয়, আলোকসম্পাতও চমৎকার। কিন্তু টেপ রেকর্ডে ঢালানো গানের সঙ্গে সারীর লিপের গরমিল ঘটতে দেখে দর্শকরা উচ্চ-হাস্য করে ওঠেন। তবে, সে হাসি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ফলশ্রুতি নয়, কৌতুকের। একই কথা বলা চলে কালিন্দীর চরে বন্দুক নিয়ে মহীন্দরের সাপ-শিকারের দৃশ্যটি সম্পর্কে। যেদিকে বন্দুক বাগিয়ে ধরা হয়েছিলো—পটকা ফাটলো তার উল্টো দিকে, সে-দিক থেকেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী এসে মঞ্চের মধ্য-ভাগে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলো। মজার ব্যাপার নয়?

নাট্য নির্দেশক রাসবিহারী দাসকে ধন্যবাদ হতশ্বাস এবং একঘেয়ে দৈনন্দিনতার মধ্যে বসুমতীর তৃতীয় বার্ষিক মিলনোৎসবে তিনি এমন অঢেল 'কমিক রিলিফ'-এর হাট বসালেন—ভাবতে অবাক লাগে, 'কালিন্দী' নাট্যাভিনয়ের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কথাটা আদৌ ব্যঙ্গ করে বলছি না।

শুভশংকর ভট্টাচার্য

রইল বলে রাখলে কারে

এবারের রবীন্দ্র জয়ন্তীর রেকর্ড-গুচ্ছের মধ্যে যে দুটি ডিস্ক বারবার শুনেও তৃষ্ণা মেটে না তার মধ্যে একটি হল সুচিত্রা মিত্রর কণ্ঠে "রইল বলে রাখলে কারে"। এই ধরণের বাউল ভাবের ছোঁয়া লাগা ফোক ক্যারেকটারের গান তাঁর কণ্ঠে যেন সুরে, ভাবে, ছন্দে, অনুভবে ভরপুর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গানে কাব্যে ও নাটকে যে মুক্ত প্রাণের বাউল গানের প্রথম চরণের মতই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছেন। তাঁর স্বচ্ছ জীবনদর্শন জীবনমুক্ত ছন্দেই আনন্দচঞ্চল। কিন্তু এই চাঞ্চল্যের মধ্যে কোথাও কোনো অসংযত উচ্ছ্বাস নেই। আছে শুচি স্নিগ্ধ বৈরাগী মনের উত্তরণের প্রসন্নতা আর স্নিগ্ধ কৌতুক। এই জীবনবিবাগী অথচ জীবন-রস-রসিক কথা বলে ওঠে যখন শ্রীমতী মিত্র গান দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে হয় না যেটা সেটাই হবে। শুধুমাত্র এই গানটি দিয়েই সুচিত্রা মিত্রর গায়কীকে চিনতে পারবেন যে কোনো দেশের যে কোনো কালের সংগীত রসিক। তাঁর কণ্ঠে 'ফিরবনা আর', 'আরো আরো প্রভু', 'হৃদয়ের একুল ওকুলে'র মতই 'অসামান্য' আবেদন সৃষ্টি করেছে এ গান।

আমার অনুরোধ যতদিন তিনি এই ফর্মে থাকবেন গ্রামোফোন কোম্পানী যেন কোন তরুণেতর শিল্পীকে দিয়ে এ-গান না রেকর্ড করেন। 'দিনের শেষে' হেমন্তবাবু গেয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক সম্ভব পেরোবার পর। কানন দেবী গান ছেড়ে দেবার পরে কণিকা রেকর্ড করলেন 'আজ সবার রঙে'। এই ডিস্কের অন্য গান, 'ফাগুন হাওয়ায়,' 'খাঁচার পাখী,' 'বেলা গেল,' 'ডাকে বারবার ডাকে' ও 'আমার কর জীবনদান'।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্দিরে মম কে আসিলে' আড়ানার আকুল-মধুর সুরের পথ বেয়ে যেন এক মধুর আত্মসমর্পণ। তাঁর অলংকার সমৃদ্ধ ভাবগভীর কণ্ঠে 'সুধাসাগর তীরে' 'এরে ভিখারী সাজায়ে', 'সকরুণ বেণু কিংবা 'এসো ফিরে এসো' সুরের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় মনকে পৌঁছে দেয় এক অন্য সাম্রাজ্যে। এই গানগুলি শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যথার্থ সংগীতের মহৎ সুরে মিলিয়ে যায় দুঃখ আর সুখের প্রভেদ, মুছে যায় দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্যের স্বাতন্ত্র্য। আর মনে হয় এসব গান যেন আমারই।

নীলিমা সেনের কণ্ঠে যেন প্রার্থনা হয়ে বেজেছে বল দাও মোরে তুমি বন্ধু তুমি নাথ', 'আমার না বলা বাণীর' স্তব্ধতাতেও রয়েছে শিল্পীর পরিমিত সঙ্গীতবোধের শালীনমোহর। বাকী গান : তোমার নয়ন আমার বারে বারে হায় মানা হায়' 'কোন সুদূর হতে।'

মায়া সেন তাঁর গানে যথামানে ত আছেনই। এছাড়াও লক্ষ্য করবার মত তাঁর নির্বাচন। কারণ যেসব গান তিনি নির্বাচন করেছেন সে গান সাধারণত শোনা যায় প্রতিদিনের সকাল সন্ধ্যায় অসর, লে অথবা রেকর্ডে গানগুলি হল হৃদয় গগন তলে', 'হে মহাজীবন, হে মহ 'আজি মম জীবনে নামিছে সন্ধ্যা'।

ঠিক রাবীন্দ্রিক ধাঁচে পরিবে নয় চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গান, তবু শ

খুবই ভাল লাগে। কারণ প্রথমতঃ কণ্ঠ মাধুর্য। দ্বিতীয়তঃ আবেগ্যালা প্রাণময়তা। 'তার হাতে ছিল' (বহুদিন আগে শুভ গুহঠাকুরতার রেকর্ড) কার চোখের চাওয়ার ভরা থাক স্মৃতিসুধায় এই তিনখানি গানই বেশী মনিয়েছে তাঁর গলায়। এ ছাড়াও আছে খর বায়ু বয় বেগে (অনেকদিন আগে পংকজ মল্লিকের রেকর্ড) আপন হতে বাহির হয়ে, একি গভীর বাণী। আর একটি সুপার সেভেন ডিস্কে শ্যামল মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন ছ'খানি গান। 'একটি নমস্কারে প্রভু'—ভাল লাগে গম্ভীর কণ্ঠের অনুরণনে একটা পুজো পরিবেশ গড়ে ওঠার।

সাগর সেনের কণ্ঠে তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, কিংবা আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'—একেবারেই বেমানান। আকাশ ভরা সূর্যতারা' 'প্রখর তপনতাপে' —বরং অনেক স্বাভাবিক লেগেছে।

আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের রবীন্দ্র সঙ্গীত এই সিরিজে বৈচিত্র্য এনেছে। রাবীন্দ্রিক স্টাইল নয়—কিন্তু ঝরঝরে মধুর কণ্ঠে ওগো আমার চির অচেনা বিদেশী, ঐ মালতী-লতা, মনোমোহন, গহন যামিনী শেষে —সরস ও প্রাঞ্জল। কারণ ইনি আধুনিকী ছাঁচে না ফেলে এ-সব গানের সুরের নকসাকে অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করেছেন।

ঋতু গুহঠাকুরতার উচ্চগ্রামী, অলংকৃত এবং আত্মবিভোরতায় পরিবেশিত ছটি গানের সুপার সেভেন ডিস্ক এক আকর্ষণীয় সংকলন। এই ডিস্কেই আছে তাঁর সুবিখ্যাত "এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ"।

এই দ্বিতীয় গুচ্ছের রেকর্ডগুলির মধ্যেই মনে বেশি ছাপ রাখে স্বপনা ঘোষালের কণ্ঠের দুটি গান : 'গাও বীণা, বীণা গাওরে' ও 'আকাশ আমার ভরল আলোয়'। সহজ কণ্ঠ। যাকে বলা যায় ন্যাচারাল টোন কিন্তু ভাবে রঙে ও সূক্ষ্ম কারুকলায় রয়েছে অন্তহীন ব্যঞ্জনা প্রথম গানটি তুলে ধরে যেন বীণাবাদন অন্তরের গোপন সম্পদ, সেইসব সুরের টান যা অসীম সত্যের সংগে বাঁধা। দ্বিতীয় গানটির সঞ্চারীতে 'নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নূপুর বাজে-তে পাতায় মাঝখানের ছোট মাঁড়ের সোনার পর বাজে'-র ঘাতিতে ঝলকে উঠল অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত একরাশ আলো কিন্তু আবার লাগল দেখে যে এত উঁচুমানের শিল্পীর জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র দুখানি ডিস্ক, তাও আবার অন্য দু'জনের মাঝখানে।

?

পূরবী মুখোপাধ্যায়, পূর্বা দাম— নিজস্ব ঢংয়েই গেয়েছেন চারখানি গান। ই পি ডিস্কে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'এ শুধু অলসমায়া' ও 'কেন রে এই দুয়ারটুকু' (পূরবী) 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে' ও 'না বুঝে কারে তুমি' (পূর্বা)।

শৈলেন দাসের চারখানি গান শুনতে ভালো লাগে কণ্ঠলালিত্য ও গায়কী

সুচিত্রা মিত্র

আন্তরিকতায়। বিশেষ করে ভাল লেগেছে 'হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।

কেনোরে এই দুয়ারটুকু পূরবীর কণ্ঠে যদি অনুরণিত হয়ে থাকে নিঃসংকোচ, স্পষ্টতায় স্বপন গুপ্তর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিনম্র আত্ম জিজ্ঞাসায়। স্বপনের গাওয়া অন্য গান, 'আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা', 'হৃদয়ে হৃদয় আসি' সুন্দর।

অদিতি সেনগুপ্ত ও গোরা সর্বাধিকারী শুনিয়েছেন নতুন ধরণের চারখানি গান যিনি সকল কাজের কাজী গেল গো ফিরিলনা', 'দুয়ারে দাও রাখিয়া', 'চরাচর সকলই মিছে মঞ্জরীলাল গেয়েছেন প্রভু আমার প্রিয় আমার।

গীতা ঘটকের চারখানি গানেই পরিব্যাপ্ত হয়েছে তাঁর উচ্চাংগ সঙ্গীত দীক্ষিত কণ্ঠের দীপ্তি। এই ডিস্কেই আছে 'লুকিয়ে আসে আঁধার রাতে' ও 'ও কেন চুরি করে চায়'।

বাণী ঠাকুরের চারখানি গানের মধ্যে

স্বপনা ঘোষাল

তাঁকে যথার্থভাবে পাওয়া যায় 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে ও না চাহিলে যারে।

গৌতম মিত্রর ই পি-ডিস্কে 'সে আসে ধীরে' ও 'আমি যাব নাগো অমনি চলে'—পরিবেশনার লাবণ্যে শ্রুতিমধুর। রণো গুহঠাকুরতার স্বপ্নময়তায় মধুর 'সে যে পাশে এসে', 'খেলার ছলে'।

এ ছাড়াও আমাদের কাছে এসেছে কল্যাণী ঘোষের একখানি ই পি ডিস্ক। আর একখানি ই পি ডিস্কে আছে সুমিত্রা বসু ও বিজয়া চৌধুরীর দুখানি করে গান। কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা ও শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গানগুলি সু-নির্বাচিত।

এল, পি ডিস্কে

রবীন্দ্র সঙ্গীতের তিনটি এল পি ডিস্কের মধ্যে একটি হল প্রেমের মিলন দিনে। পরিচয়লিপি লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা সন্তোষ সেনগুপ্তর এ ডিস্ক শুনে মনে পড়ল কবির গান নিছক শুধু পারফরমেন্স নয় পার্টিসিপেনসও আনন্দ বেদনা, মিলন বিরহর ব্যাখ্যা ও এ গানের বিষয়। সু-নির্বাচিত আটখানি গানে চিরকালের বাববধূ মিলনলগ্নকে অভিনন্দিত করা হয়েছে, জীবনদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে। প্রথমাংশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। অনেক পরিচিত জনপ্রিয় গান এঁদের কণ্ঠে রসরূপে উত্তীর্ণ।

দ্বিতীয়াংশের ভূমিকায় আছেন গোবিন্দ গোপাল, মাধুরী মুখোপাধ্যায়, ও সমবেত কণ্ঠের শিল্পীরা। —এঁরা হলেন বাণী ঠাকুর, সুমিত্রা রায়, সংঘমিত্র গুপ্ত, কৃষ্ণা মিত্র, অর্ঘ সেন, গৌতম মিত্র, গোরা সর্বাধিকারী, পূর্বা দাম, নমিতা ঘোষাল ও বেলা মুখোপাধ্যায়।

শিল্পী দম্পতির কণ্ঠে বেদমন্ত্রের সুর এবং সমবেত কণ্ঠের গান মিলে সর্বনিয়ন্তার চরণে প্রণাম নিবেদন মুখর হয়ে উঠেছে। এই সব গানের মধ্যেই আছে 'প্রেমের মিলন দিনে', 'ওগো বধূ সুন্দরী', 'সুমঙ্গলী বধূ' ও 'শুভ মিলনলগ্নে', প্রযোজক বিমান ঘোষ।

একখানি মিনি এল পি ডিস্কে সুমিত্রা সেনের কণ্ঠের বারখানি গানে তার নিজস্ব গায়কীর রূপটি মেলে। অনলংকৃত, কিন্তু স্বচ্ছ বলেই প্রাণস্পর্শী তাঁর গাওয়া 'ওগো সাঁওতালি ছেলে', 'আজ প্রথম ফুলের পাব কিংবা বিমল আনন্দে।

আর একখানি এল পি ডিস্কে হেমন্ত মুখোপধ্যায়ের বারখানি গানের মধ্যে তাঁর কণ্ঠেই জনপ্রিয় হয়েছে এমন অনেক গানের সংগে সংগে আছে অনেক নূতন গানও। যেমন, 'নব আনন্দে জাগো আজি', 'এ কী সুধারস আনে', 'আমার ব্যথা যখন আনে আমায়, আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্যপানে চেয়ে আছে' আর 'শ্যামার সেই বিখ্যাত সমাপ্তি সংগীত ক্ষমিতে পারিলাম না যে। গানগুলি পরিবেশিত তাঁর সেই অনাড়ম্বর সহজ ভঙ্গিতে যাকে একান্তভাবেই হেমন্ত

মুখোপাধ্যায়ের গায়কীরূপে চিহ্নিত করা যায়।

আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ

আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ মেগা-ফোন কোম্পানীকে ধন্যবাদ ছোটদের মধ্যে একটি ভাল এল, পি, ডিস্ক উপহার দেওয়ার জন্য। আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ শুনতে শুনতে আমরা বড়রাও যেন ছোট-বেলায় হারিয়ে যাওয়া সেই আরব্যরজনীর দিনগুলি ফিরে পাই।

রচনা সুর ও আবহ সংগীত সৃষ্টির দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন যথা-ক্রমে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখো-পাধ্যায় ও দিলীপ রায়। কাহিনী রচনায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় মূল কাহিনীকে অবিকৃত রেখেও এমন বিশ্বাসযোগ্য এমন অনেক ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার অবতারণা করে-ছেন যা নাটারূপকে উপভোগ্য করে তুলেছে। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গানের সুর ঘটনা ও চরিত্র চিত্রনের সংগে সংগতি রেখেছে। কাহিনী ও সুরের ভাবপর্যায়ে রাবীন্দ্রিক ছাপ একটুও বেমানান নয় বরং ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য ধারাবাহী। কারণ প্রতিটি যুগের মানসিকতা সে যুগের শিল্প সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে রবীন্দ্র সংগীতের ধারাই প্রবল, আধু-নিক গান দুর্বল।

শিশু কিশোর ও যুবক আলাদিনের বিভিন্ন পর্বে রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে জয়ন্ত ব্যানার্জী, কুমার নাসের ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। সুলতানের কন্যার ভূমিকায় নমিতা রায় চরিত্রকে রমনীয় বিনম্রতা, আকর্ষণ ও লালিত্যে রমণীয় করে তুলে-ছেন। কণ্ঠসঙ্গীতে কামাল নাসের, প্রণব ঘোষ, নমিতা রায়, শৈবাল মজুমদার, রবীন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রধান চরিত্রগুলির সংগীত সংলাপ। কিছুটা পদ্যে কিছুটা গদ্যের সংলাপে কাহিনী রচিত হওয়ায় রূপকথার আবহাওয়াটি সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হল এর সম্পাদনা। একটি অক্ষর একটি সুরও বাহুল্য হয়নি। সব মিলিয়ে এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর শিশু নাট্য ইদানিং হয়নি।

সন্ধ্যা সেন

সুবিনয়বাবু তখন শিক্ষক

রবীন্দ্রসদনে সদ্যসমাপ্ত রবীন্দ্র-সম্মেলনোৎসবে গান্ধীবর্ষীর অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল—তাল ও ছন্দবৈশিষ্ট্য। আলোচনা সহযোগে এই আসর পরিচালনা করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রদ্ধেয় শিল্পী সুবিনয় রায়। পাঁচ মাত্রা থেকে আঠারো মাত্রা পর্যন্ত রবীন্দ্রসৃষ্ট সমস্ত তালের বিবরণ এবং উদাহরণ সহ এমন শিক্ষামূলক গানের আসর পরিবেশনার জন্য প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ।

সুবিনয় রায়

আমরা জানতে পারি—সংগীতসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছন্দকে গানের ছন্দে রূপান্তরিত করে কী ভাবে নতুন নতুন তালসৃষ্টিতে মেতেছিলেন।

সংগীতসৃষ্টির প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় নিয়ম ও অনুশাসনকে মেনে নিয়ে গানের তালসংগতে প্রচলিত তালে নিয়ম-কেই মেনে নিয়েছিলেন। পরে তিনি এই বন্ধনকে অস্বীকার করলেন। 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'অনেক দিন থেকেই কবিতা লিখছি, সেই জন্য ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ নিয়েই গান লিখতে বসলাম। কারণ কাব্যে ছন্দের যে কাজ গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে—তাল সেই নিয়মে গানে চলবে।

আসরে সুবিনয়বাবু শুধু এইসব আলোচনাই করেন নি। উদাহরণও দিয়েছেন। শুরুতে ছিল দুই। দুই ছন্দের দুটি গান। সম্মেলকভাবে 'যায় নিয়ে যায়' ও 'আজি ঝরো ঝরো'। এরপর পাঁচ মাত্রার ঝম্পক (তিন।দুই)। যে তালে সুবিনয়বাবু অনবদ্য-ভাবে গেয়েছেন আমারে তুমি অশেষ করেছ।'

রবীন্দ্রনাথ ঝাঁপতালকে ভেঙ্গে নতুন তাল সৃষ্টি করেছিলেন—পাঁচ মাত্রার অর্ধ ঝাঁপ (দুই।তিন)। এতে অনেক বিখ্যাত গান আছে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' গান একটি। পুরো ছয় মাত্রার গান একটুকু ছোঁওয়া লাগে গেয়েছেন সন্তোষ ঠাকুর। শিল্পীর দরদী-কণ্ঠে যা বেশ উপভোগ্য হয়েছে। এই গানে ব্যবহৃত তালের বিশেষত্ব হল—দাদরায় যেমন সোম-ফাঁক আছে, এতে ওসবের কোনো বালাই নেই। দাদরায় বাঁধা কত যে তুমি মনোহর' গানটিতে একটি বিশেষ ঝোঁক আছে। জয়তী চক্রবর্তীর গাওয়ার গুণে যা পরিষ্কার বোঝা গেছে। ছয় মাত্রার তালকে ভেঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও দুটি নতুন তাল সৃষ্টি করেছেন। দুই।চার ছন্দের ষষ্ঠী ও চার।দুই ছন্দের উল্টো-ষষ্ঠী। এই নামকরণ-গুলো পরে হয়েছে। উল্টো ষষ্ঠীতে সুবিনয়-বাবু গেয়েছেন 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল', যা আসরের শ্রেষ্ঠ গান। গানটির সঞ্চারী পর্বে শিল্পীর গায়কী এবং ভাবপ্রকাশ অতুলনীয়। সাত মাত্রার তালকে আমরা তেওড়া বলে জানি যার মাত্রাবিভাগ তিন।দুই।দুই। এখানেও রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্য এনেছেন। যেমন তিন।চার ছন্দ। উদাহরণ—খাঁচার পাখি ছিল'। রূপকড়া তালে সুজিত চক্রবর্তীর গাওয়া 'কেন সারা দিন' শুনতে ভালো লেগেছে। এরপর একে একে এসেছে আট-মাত্রার ভিন্ন ছন্দ, নবতাল, নয় মাত্রার বিভিন্ন ছন্দ, দশ মাত্রার ছন্দ, এগারো মাত্রার একা-দশী ও অন্যান্য ছন্দ এবং আঠারো মাত্রার একদশী ও অন্যান্য ছন্দ এবং আঠারো মাত্রার নবপঞ্চতাল। শেষোক্ত তালের 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' গানটি সম্মেলক-ভাবে গাওয়া হয়েছে।

সুপরিকল্পিত এই আসরের দুর্বল অংশ ছিল এর নাচ এবং নেপথ্য যন্ত্রানুষঙ্গ। সম্মেলক গানগুলোতেও যোগাপড়ার কিছু অভাব ছিল। তবে সব মিলিয়ে এই অনুষ্ঠান সন্দেহাতীতভাবে রবীন্দ্রসংগীতের তাল ও ছন্দবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়িয়েছে।

অসিতবরণ মিত্র

'সুরমা'র বাল্মীকি প্রতিভা

গত ১৮ জুন অ্যাকাডেমী মঞ্চে সুরমা গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা উপহার দিলেন। পরিচালনা এবং বাল্মীকির ভূমিকায় ছিলেন সুপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অমল নাগ।

'সুরমা' নবগঠিত একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা। আহ্বায়করা জানিয়েছেন রাবীন্দ্রিক চিন্তাধারার কেন্দ্র হিসাবেই 'সুরমা'র প্রতিষ্ঠা। অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা পূর্ণাঙ্গ একটি সঙ্গীত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন।

নবগঠিত সংস্থা 'সুরমা'র 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রথম প্রয়াস। অল্প কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই আছে। অনুমান সে বিচ্যুতির অনেকটাই পর্যাপ্ত অনুশীলনের অভাবে। এসব বাদ দিলে এবং 'প্রথম প্রয়াস' কথাটি মনে রাখলে 'সুরমা'র 'বাল্মীকি প্রতিভা' শ্রোতাদের ভালো লেগেছে বলেই বিশ্বাস। আশা করব পরবর্তী প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' আরও পরিণত প্রযোজনা হিসেবেই আমাদের সামনে আসবে।

'বাল্মীকি প্রতিভায়' অমল নাগ, বীণা সরকার, কমলিকা নাগ, মিতা দত্ত প্রশংসা পাবেন তাঁদের ভূমিকার জন্য। কনিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত এবং জান দে-র নৃত্যপরিচালনা ভালো।

দিগ্বিজয় পিকর্ড

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক ষ্টোর্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 21st July, 1978
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র 'কুকমী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

31 JUL 1978

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

মন থাকবেই

অমৃত

সম্পাদক প্রীতিরঞ্জন গু
২৮ শ্রাবণ ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

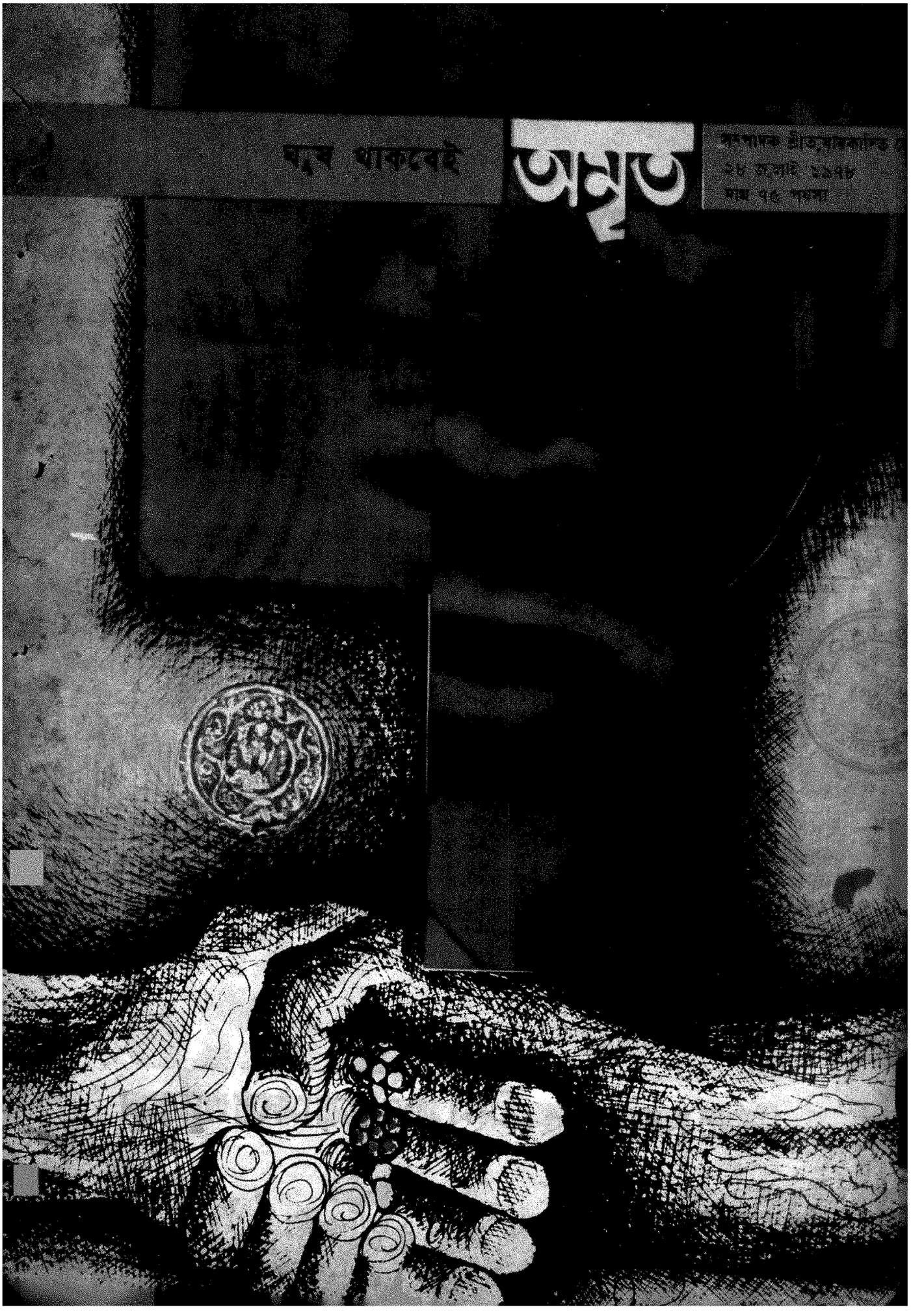

রূপের প্রকাশ চুলে...

আর সেখানেই কেয়ো-কার্পিনের
কথা ওঠে।
এক অতুলনীয় কেশ তৈল···
চুল চটচটে হয় না
জামা কাপড়ে দাগ লাগে না
মনোরম গন্ধ

দে'জ
মেডিকেলের
তৈরী

PX/DM/KB-2/78

নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখুন-চুলের সৌন্দর্য্য অটুট রাখুন

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অখণ্ড সংস্করণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অখণ্ড সংস্করণ প্রথম মুদ্রণ (১০৫০০ কপি) ও দ্বিতীয় মুদ্রণ (১৫৫০০ কপি) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত হওয়ায় সকল ক্রেতাকে সরবরাহ করা যায় নাই। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে তৃতীয় মুদ্রণে বৃহত্তর সংখ্যক বই শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

—শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে—

বিমল মিত্রের

নবতম উপন্যাস

জন গণ মন ১৬

প্রমথনাথ বিশীর

শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন

কাব্য গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড-৭, ২য় খণ্ড-১০, ৩য় খণ্ড-১৮, ৪র্থ খণ্ড-১০

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে :—

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের **মণিমহেশ ১২**

শংকরের **সীমাবদ্ধ ১০**

নীহাররঞ্জন গুপ্তর **বহ্নিশিখা ১৮**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **লগরপারে রূপনগর ৪০**

প্রমথনাথ বিশীর **বঙ্কিম সরণী ১৬**

বিমল মিত্রের **একক দশক শতক ৩০**

আশাপূর্ণা দেবীর **বকুল কথা ২৬**

নলিনীকান্ত সরকারের **দাদাঠাকুর ১২**

কালিকারঞ্জন কানুনগোর **রাজস্থান কাহিনী ১৬**

— নতুন মুদ্রণ বেরিয়েছে —

প্রমথনাথ বিশীর **শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ** (৩য় মুদ্রণ) ৩

বিমল মিত্রের **ফুল ফুটুক** (৩য় মুদ্রণ) ৩

সুমথনাথ ঘোষের **মরণের পরে** (১ম মুদ্রণ) ৩

সদ্য প্রকাশিত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

নতুন উপন্যাস

বিভ্রান্ত ৮

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩/ ৩৪৮৭৯১

৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৯/৩৪৩৪৯২

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে নববর্ষের অমৃতে থাকবে সব চেয়ে সেরা লেখা
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমল শাসমলের সুদীর্ঘ প্রামাণিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধী ঃ লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার
পিছু হটার পালা ঃ লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়
ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীমাণিক্য
বাড়তির পথে ভারত ঃ লিখেছেন অতুল সুর
পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ভবতোষ দত্ত
সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী
প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছেন

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ ঃ ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে
শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন ঃ অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা
দাম তিন টাকা ।। রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেণ্টকে এখুনি বলে রাখুন।
অথবা লিখুন
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা -৩

অমৃত

১৮ বর্ষ
১২ সংখ্যা
১১ শ্রাবণ,
১৩৮৫
28 July, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
আমি কেমন আছি ? ৫ দীপঙ্কর চক্রবর্তী
প্রচুর ও দুর্লভ ৬
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
কবিতা ৭ অনীশ ঘোষ, গৌরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাসকুমার সরকার, মুকুল গুহ
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৮ পর্যবেক্ষক
বেরতীভূষণের কার্টুন ৯
প্রচ্ছদ কাহিনী ১০
ঘর থাকবেই
সুমন্ত সেন
প্রচ্ছদ শিল্পী ধর্মানারায়ণ দাশগুপ্ত
ভারতী ১৩ পশুপতি শাসমল, গৌরচন্দ্র সাহা
প্রদর্শনী ১৮
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
নগ-বিহঙ্গ (গল্প) ২০
চিত্তরঞ্জন মাইতি
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২৩
শৈবাল মিত্র
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ২৯
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
মায়ের সঙ্গে হাসপাতাল অব্দি (গল্প) ৩৫
সোমক দাশ
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৪১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
আমার দাদা (গল্প) ৪৬
কানাইলাল চক্রবর্তী
ভাগ্য গণনা ৫২
চিঠিপত্র ৫৩
খেলা ৫৫
ব্রেকফট : ৮০/৫৯
চিত্তরঞ্জন ঘোষ
চিত্রধ্বনি ৬১

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
বাঁশিওয়ালা
লিখেছেন একরাম আলি,
শিশিরকুমার দাশের গল্প

আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সম্প্রতি দেশের জাতীয় শিক্ষানীতি কী হবে তা স্থির করার জন্যে দিল্লিতে এক আলোচনা-সভা ডেকেছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তাতে যোগ দিয়ে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীও ঐ সম্মেলনে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শিক্ষানীতি নিয়ে যে জাতীয় পর্যায়ে এইভাবে পর্যালোচনা করে দেখা হল তা অনিবার্যই ছিল বলা যায়। কেননা, দীর্ঘকাল থেকেই শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য কী এবং কীভাবেই বা শিক্ষা দেওয়া হবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিচ্ছিল। গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্রই এই অব্যবস্থা। গত তিরিশ বছরে কতোভাবে যে এই শিক্ষা-পদ্ধতিকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা হল তার তালিকা তৈরি করাই শক্ত। কাজেই দেরিতে হলেও এ-বিষয়ে বেশ কয়েক বছরের মতো সময় হাতে নিয়ে একটি সুসংহত শিক্ষানীতি চালু করা এখন খুবই জরুরী হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে একটি এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন যা আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার পটভূমিতে খুবই জরুরী। তিনি বলেছেন, অতি অল্প বয়স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু পরিমাণে শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করা দরকার। কেননা নিজের হাতে কাজ করার দিকে আগ্রহ তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা নিজের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয় নিজেরাই সংগ্রহ করতে পারবেন।

কথাটি খুবই মূল্যবান। এবং কেবল ছাত্রজীবনেই নয়, কাজ করার অভ্যাস তৈরি হলে তা কর্মজীবনেও সাহায্য করবে। আমাদের দেশ প্রযুক্তিবিদ্যায় এত অগ্রসর হয়েও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এত বেশি কেন তার একটা কারণ, নিজের হাতে কাজ না করার অভ্যাস। সকলেই চান নিরাপদ একটি চাকরি, যেখানে সমস্ত অধীত বিদ্যাই তাঁরা টেবিলে বসে উদ্‌গীরণ করতে পারবেন। মেকলে সাহেব কোন এক মান্ধাতার আমলে সেই যে কেরানী তৈরির মেশিন হিসেবে চালু করেছিলেন আমাদের ইস্কুল-কলেজগুলোকে, এখনো তা থেকে শুধু যেন কেরানীই বেরিয়ে আসছে। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কেরানীকর্মে ব্যাপৃত নন, যাঁরা যন্ত্রবিদ্যা বা চিকিৎসা বা অন্য কোনো বৃত্তিমূলক বিদ্যায় শিক্ষিত হন, তাঁদের মনের মধ্যেও থেকে যায় ঐ কেরানীসুলভ মনোভাব।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে অন্য অনেক মূল্যবান দিকে আলোকপাত করার সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষার্থী জীবনের শুরু থেকেই কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত করে তোলার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন তা খুবই আশ্বাসের বিষয়। আশা করা যায়, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মিলিত প্রয়াসে আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি প্রকৃতই ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

সাহিত্য ইত্যাদি...

সবই কি জেনারেশান গ্যাপ ?

নিজের জীবনকে মানুষ সব থেকে বেশি ভালোবাসে। আর জীবনের সেরা পর্ব যেহেতু যৌবন, সেজন্যে যৌবনের স্মৃতিগুলো মানুষের কাছে এত বেশি প্রিয়।

অনেক সময়েই দেখবেন, বয়স্ক লোকেরা কথা বলার সময় বলছেন 'ওঃ সে একটা সময় ছিল। কিম্বা আমরা যা করেছি তুলনা হয় না।' অথবা আরো যাঁরা উন্নাসিক তাঁরা বলছেন, 'কী সব হচ্ছে এখন ? যাচ্ছে তাই'। আসলে এসব মন্তব্যে যা বোঝায় তাহল, বক্তা নিজেই ক্রমে হয়ে যাচ্ছেন অতীতের মানুষ—চলতি সময়কে বোঝবার মতো মেধা বা হৃদয় কিছুই আর তাঁর অবশিষ্ট নেই। এবং লক্ষণ মিলিয়ে এমন ভায়েগনোসি করে বলি 'জেনারেশন গ্যাপ'।

ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিক্ষের বিষ। আমার কথা হল, শরীরের নিয়মে একটা বয়সে যৌবন আসে এবং চলেও যায়। তাতে কী? যে বয়সেই বেঁচে থাকি, সেটাইবা খারাপ কী? সে বয়সের যা কিছু সম-সাময়িক তাইবা আমি নিজের মনে করতে পারব না কেন? তাকে বুঝতে পারব না কেন? আর ভালোই বা না বাসব কেন?

এইরকম ধারণা আমি বরাবর পোষণ করেছি মনে। কিন্তু সেদিন একটা ধাক্কা খেলাম।

মণিশংকর মুখোপাধ্যায় মানে আমাদের খ্যাতনামা লেখক শংকরের সঙ্গে দেখা হবে গিয়েছিল, সেদিন এক প্রকাশকের আপিসে। সকলেই জানেন জনপ্রিয়তায় শংকর শীর্ষ-স্থানীয়দেরও একেবারে ওপরের দিকে। কিন্তু অনেকেই এটা জানেন কিনা জানি না, নিরহংকার বিনয়ে তিনি তার চাইতেও এক ডিগ্রি বেশি। আর তেমনি তাঁর কথার উইট। কাজেই মিনিট কয়েকের মধ্যেই আড্ডার আমেজে মজে গেলাম।

শংকর কথা বলেন তাড়াতাড়ি, কিন্তু মাঝে মাঝে থেমে অন্যকেও বলার সুযোগ দেন। এবং অন্যেরা যখন যা বলেন তা শুনতে শুনতে তাঁর মুখে প্রসন্ন অনুযায়ী আলো বদলাতে থাকে। বিষাদের কথায় মুখের ওপর আসে আপন করে নেবার মতো আন্তরিকতা, সামান্য রসিকতায় ঝিকিমিকি আলো, মোরালো ঠাট্টায় সশব্দ হাসির ফ্ল্যাড-লাইট।

কিন্তু একটা ব্যাপারে শংকর বেশ একটু অন্যরকম। কিছু লেখে ঢেকে কথা বলেন না। যা উনি পছন্দ করবেন না, তা মেনে নেবেন না। এবং অপছন্দের কথা, মার তার কারণ শুদ্ধু জানিয়ে দেবেন সঙ্গে-সঙ্গে। অবিশ্যি সকলের সঙ্গেই যে এরকম করেন তা হয়তো নয়। কিন্তু যাঁদের উনি আপন মনে করেন তাঁদের কাছে উনি অকপট। বেশির ভাগ সাহিত্যিকের থেকে এদিক দিয়ে তিনি আলাদা।

এসব কথা জানা ছিল আমার। তাই সেদিন যখন সেই প্রকাশকের আপিসে বসে শংকর আমার এই লেখাগুলোর বিষয়ে প্রাথমিক একটু প্রশংসা জানিয়ে সরাসরি অভিযোগ আনলেন, আমি নাকি বেশির ভাগ লেখাতেই হয়ে পড়েছি অতীতমুখী, বর্তমানকে আমি গুরুত্বের মধ্যেই আনছি না, অবাক হলাম না। বরং ভালোই লাগল। একটু আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া গেল।

শংকর আরো যা বললেন তা থেকে বোঝা গেল, তিনি এতটুকু দুঃখিত নন যে আমি অতীত নিয়ে লিখছি। তাঁর আপত্তি, বর্তমান নিয়ে লিখছি না বলে এবং তারো চেয়ে যা গুরুতর, প্রায় সব লেখাতেই আমি নাকি বলেছি, ভালো যা কিছু সবই ঘটত আগেকার দিনে, এবং এখনকার প্রায় সব কিছুই হল অলসো র‍্যান-এর পর্যায়ে।

না বললেও চলে, এরপর কোমর বেঁধে লাগতে হল।

অবিশ্যি গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো, শংকরের একটা কথা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। বক্তব্যটি হাজির করেছিলেন তিনি দৃষ্টান্ত-সহ। কিছুকাল আগে একটি অল্পবয়সী ছেলে তার হাওড়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ছেলেটি স্কাল্পটার, শংকরের একটি মূর্তি তৈরি করতে চায়। শংকর তাকে বলেন, তাঁর চাইতেও অনেক বরীয়ান সাহিত্যিক বর্তমান রয়েছেন কলকাতায়, তাঁদেরই কারো (যেমন, বন-ফুলের) মূর্তি তার আগে তৈরি করা ভালো। সেটাই যোগ্য কাজ হবে। ছেলেটি তাঁর কথা শোনে, এবং বনফুলের কাছে গিয়ে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরি করে। এবং বন-ফুলের পরামর্শে শিবরামবাবুর কাছে গিয়ে তাঁরো একটি মূর্তি করে।'

কাহিনীটি আমার আগেই জানা ছিল। কিন্তু শংকর তা থেকে যা সিদ্ধান্ত টানলেন তা নতুন। শংকর বললেন, ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত নয়, পণ্ডিতও বলা যাবে। সে তার সময়, সঞ্চয় এবং মেহনৎ দিয়ে মূর্তি দুটো তৈরি করে দিল, সেটা কোন প্রেরণায় ? সেকি নিছক সাহিত্যপ্রীতি থেকে নয়? এ ব্যাপারগুলোর দিকে নজর পড়বে না কেন ? কেবল নেই নেই বললে যেটুকু যা আছে তাও তো যাবে। আমাদের কি উচিত নয় ভালো জিনিসকে ভালো বলে চিনিয়ে দেওয়া, তাকে তারিফ করা।

অবশ্যই উচিত। শতকরা একশো ভাগ একমত আমি এব্যাপারে। তা যদি না-ই হব তবে লিখছি কেন? কাদের কথা ভেবে লিখছি? সব মনই যদি পাথর হয়ে গেছে বলে ভাবতাম, নিশ্চয়ই তাহলে ফসলের স্বপ্ন দেখতাম না। অনেক হৃদয়ই এখনো সজীব, অনেক হৃদয়ে কাঁকুরে মাটির দাপট শুরু হলেও ভালো কবে যত্ন করলে সে মাটিতেও সোনা ফলানো যায়। তাদের জন্যেই তো লেখা। তাদের সামনে তুলে ধরা, যেখানে যেটুকু ভালো ছিল তার ছবি, তার জন্যে মমতা জাগানো—যাকে আমরা ঐতিহ্য বলি, (এবং বলে, সসম্মানে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখি!) তাকে আপন করে জানা—এইজন্যেই তো এত কথা বলা।

এটা ঠিকই যে অতীতের মহৎ দৃষ্টান্ত-গুলোর সঙ্গে আমাদের বর্তমানকে যখন তুলনা করি, অস্বস্তি বোধ করি—দুঃখ পাই। সকলেই জানেন, এখন এটা প্রায় বাঁধা গতের মতো হয়ে উঠেছে, সমাজের মধ্যে ভয়ানকরকম সব ওলটপালট চলছে। কিন্তু বাঁধা গতের যা বেওয়াজ, প্রায় না-ভেবে চিন্তেই উগড়ে দেওয়া যায়, তার পুরো মানেটা কী সেটা ভেবে না দেখলেও চলে—আমরাও আমাদের ওলটপালটের কথা বলার সময়, নিজেকে বেশ আলগোছে দূরে রেখেই তা বলি। যেন ভাবখানা এই—এইসব ব্যাপার-স্যাপার ঘটে যাচ্ছে এখন, খুবই পরিতাপের বিষয়, ভয়েরও বটে, তবে আমি এর দায়ী স্পষ্ট নই, আমি এসবের ঊর্ধ্বে।

আমার শুধু নিবেদন, এধারণা ঠিক নয়। সমাজজীবনে আমরা কেউই বায়ুরোধক কক্ষে বাস করি না, করতে পারি না। অর্থ-নীতির সেই গোড়ার তত্ত্বের মতো এব্যাপারেও শেষ পর্যন্ত খারাপ টাকা ভালো টাকাকে চলতি জীবন থেকে লোপাট করে দেয়। সুস্থ জীবনযাত্রাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, তাকে এগিয়ে নেবার জন্যে যা কিছু ধ্যানধারণা, যাকে আমরা বলি মূল্যবোধ, তাও হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত। সাহিত্যের আসল কাজ তো তাকেই টিকিয়ে রাখা, তার জন্যে ভালোবাসা জাগানো। না হলে আর 'আয়লা অলি কুসুম কলি' লিখে লাভ কী!!

কিন্তু এত কথা ঠিক এইভাবেই সেদিন বলিনি। বলার দরকার বোধ করি নি। কারণ আমার ধারণা, শংকর নিজেও এসব জানেন। না জানলে জন অবশ্য লেখা যায় না।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, এই বইয়ের চলচ্চিত্ররূপ দেখে সে সময়কার একজন উচ্চ রাজপুরুষের স্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, খুবই ভিক্টোরিয়ান। শংকর উত্তর দিয়েছিলেন, আমি কী করব বলুন। আমাকে তো বলতেই হবে।

কেন বলতে হবে ? নিশ্চয়ই 'অরণ্য' থেকে বার করে মানুষকে লোকালয়ে পৌঁছে দেবার জন্যে, তাই না।

—অমলেন্দু রায়

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

যা বলতে চাই তা বলতে না পারার দুঃখ আমার মন ছেড়ে কখনো যাবে না। আমি কখনো কোনোদিন ঠিক সময়ে ঠিক কথা বলতে পারি নি। বলতে পারি নি, এবং সে না বলার ব্যক্তিগত দুঃখ আমাকে তিল তিল করে শাসন করেছে আমার গোটা জীবন। যারা বলতে পেরেছে তাদের নিজের কাছে নিজের একটা জিং থেকে গেছে। শব্দ বা অনুভূতি সম্পর্কে আমি এতটাই খুঁত খুঁতে যে ঠিক শব্দ খুঁজে না পাবার কারণে আমার অনেক সময়েই কোনো কথা বলা হয়নি। অথবা যে কথা একটা বা দুটো শব্দে শেষ করা যেতো তার জন্য হাজারটা শব্দ খরচ করেছি, তবু আসল কথাটা বলা হয়নি। অথচ কেউ প্রশ্ন করলে ক্ষমতা ও সামর্থ অনুযায়ী তার একটা উত্তর দেওয়া সাধারণ ভদ্রতা। মানুষ প্রশ্ন করে উত্তর পাবার আশায়। উত্তর না পেলে তারা পাছে আমাকে অহংকারী বা বোকা বা ভীতু ভাবে এই ভয়ে আমি সব সময়েই লোকে যে উত্তরটা পেলে খুশী হবে বলে মনে করেছি সেটাই বলেছি। এর জন্য যত বিরুদ্ধ ব্যবহার করার দরকার পড়ুক আমাকে তা করে যেতে হয়েছে। কোনো কোনো দিন গভীর রাতে নিজের মনে যখন কোনো একটা প্রশ্ন এসেছে, নিজেকে নিয়ে যখন খুব গোলমালে পড়ে গেছি তখন এই অন্যকে খুশী করা প্রশ্নগুলো আমায় সমস্যায় ফেলেছে। নিজের প্রশ্নের উত্তরে নিজেকে কখনো তখন আরাম দিতে চেয়েছি, জেরা করি নি। অচেতনে। শুধু-মাত্র কয়েক ঘন্টার আরাম ছোঁয়া ঘুমের জন্য। নিজেকে এ রকম ভাবে চিনতে ভালো লাগে না আমার। কোনো একটা আড়াল থাকা দরকার মানুষের। নিজের কাছে নিজের আড়াল। যার পরে মানুষ আর নিজেকে চিনতে পারবে না এমন কোনো সীমানা। ওটাকেই আমি প্রিভেসি মনে করি। অন্য কোনো গোপনীয়তা নেই। আমি নিজেকে বড্ড বেশী চিনি। অন্যকে খুশী করার জন্য আমাকে অনেক সময় নগ্ন প্রায় হয়ে যেতে হয় কিন্তু যতই অন্যকে খুশী করি ততই মনে মনে ভেঙে যাই। পরের আমি আর নিজের আমির ব্যবধান ক্রমশ ক্রমশ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছি।

এমন তো হতে পারে যে কোনো উত্তর নেই। অনেক কিছু করার ছিল, অনেক জিনিস কেনার ছিল, অনেক মানুষের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, অথচ করতে ইচ্ছে হোলো না। কোনো কারণে নয়, এমনি এমনি। প্রশ্ন করলেও বোঝা যাবে না এই সব।

কারো সঙ্গে দেখা না করে কয়েক ঘন্টা বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে হোলো। একদিন দাড়ি না কামিয়ে অফিস যেতে ইচ্ছে হোলো, একদিন শূন্যের দিকে বহুক্ষণ চোখ মেলে বসে থাকতে ইচ্ছে হোলো। সুসময়ের টেলিগ্রাম লোকের সাড়া না পেয়ে ফেরৎ চলে গেল, তবু খেয়াল হোলো না। এমনি এমনি একদিন কেউ গভীর রাতে বউ ছেলেপুলে ফেলে রেখে সংসারের দিকে একেবারে না তাকিয়ে, একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের ডালের আড়ালে গিয়ে গলায় ফাঁস দিলো। কড়ি বছর বয়েসে আমি একবার এরকমভাবে মরতে চেয়েছিলাম। বেহালা থেকে তখন সবে ডোভার লেনে চলে এসেছি। সময় আমার তখন নিষ্ফলা। কলেজের পাট চুকে গেছে। কেবল চাকরির বিজ্ঞাপন দেখি আর চিঠি ছাড়ি। যতবার উত্তর আসে, ততবার উদ্বেগ হয়। আমি চাকরির যোগ্য নই, চাকরি পাবার ক্ষমতা আমার নেই— এ-ধরনের হীনমন্যতা আমার কোনোদিনও ছিল না। এখনও নেই। চাকরি পাবার আমি এতোটাই যোগ্য যে, অনেক চাকরির প্রতি আমার ঘেন্না আছে, অনেকের প্রতি নিছক করুণা। আমি কোনো তোষালে-তৈরিকরা কোম্পানীর ম্যানেজমেন্ট ট্রেনী হতে চাইনা। কোনো চা-তামাক অফিসের, কোনো হাফ-বিলিতি ব্যাংকের মেজ অফিসার বা কনিষ্ঠ কেরাণী কোনোটাই আমি হতে চাই না, চাইনি কোনোদিনও। অথচ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের কাছে তো চাকরি বলতে, উঁচুদরের বলতে, এদেরই বোঝায়। কারো ক্ষেত্রে কেরাণী, কারো ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনী হলেও মোটামুটি ব্যাপারটা তো এই-ই। পাজামা আর হাফ-শার্টপরা মধ্যবিত্ত বেকার যুবক তার স্বিপ্রাহরিক ভাত-ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে এসব চাকরিই স্বপ্ন দেখে। দেখে, আর হতাশ হয়। আমি দেখতাম না বলে পাড়ার নিম্নমধ্যবিত্ত ছেলেদের চোখে চালিয়াৎ আর উচ্চবিত্তদের কাছে স্নব—এ দু-ধরনের সম্ভাষণই আমার প্রাপ্য ছিল। তবে চাকরির চিঠি এলে আমার উদ্বেগ হবার কারণটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ইন্টারভিউ বোর্ড আমার কাছে চিরদিন একটা ভয়ের জিনিস। কেননা, সঠিক উত্তর দেবার একটা ব্যবস্থা সেখানে চালু। এবং এদেশে এখনো সঠিক কথাটার অর্থ মন-রাখা উত্তর। অর্থাৎ ইন্টারভিউ বোর্ডের সদস্যরা যদি মনে করেন ভারতবর্ষের ডিফেন্সকে আরো বেশি জোরদার করার দরকার, তবে ওটাই খাঁটি উত্তর। বোর্ড যদি মনে করেন ডিফেন্স নয়, এডুকেশনটাকেই বেশি গুরুত্বের, আমাকে সেই জবাব-ই দিতে হবে। কি রেভলিউশন সম্পর্কে কিছু বলতে বলা হলে অনেক কঠিন শব্দ (যেমন ফ্রিডম অব স্পিচ, পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি, অ্যাকটিভ পার্টিসিপেশন, অ্যানার্কিজম, গান্ধী বনাম মাও) দিয়ে তৈরি সিদ্ধান্তবিহীন এমন কোনো বক্তব্য রাখতে হবে যাতে প্রমাণ করা যায় যে, সমাজতন্ত্রে আমার পূর্ণ বিশ্বাস, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষা-অর্থনীতির বিকাশের পথে (?) বাধা না ঘটিয়ে (অর্থাৎ হাঁসজারু বা কচ্ছপ ধরনের সমাজতন্ত্র আর কি। এতে রক্তপাত হওয়া বারণ, কেননা ভারতবর্ষের মহান ট্রাডিশন নাকি রক্ত-পাতের পরিপন্থী নয়। অথচ, বিপ্লব আসতে বাধ্য।)। এইসব কথাগুলো আমি তখনো পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পারিনি, গ্রুপ ডিসকাসান টেস্টে পাঁচ মিনিটে ইন্ডিয়ান ইকোনোমি সিন্স ইন্ডি-পেন্ডেন্স সম্পর্কে কিছু বলার ক্ষমতা আমার তখনো জন্মায়নি। তাই ইন্টার-ভিউ-এর চিঠি মানেই উদ্বেগ, অশান্তি। তবু যেতাম। বহুদিন ইন্টারভিউ না দিয়ে বহুদিন উদ্ধত স্বরে উত্তর দিয়ে অথবা একেবারে উত্তর না দিয়ে আমি প্রায় ততটাই ক্লান্ত, যতটা আমার বাবা-মা, বাড়ির অন্যান্যরা আমাকে উপদেশ দিয়ে দিয়ে। এই দিনগুলোতে, এ-সময়ে, মনমরা ছাইরঙা বিকেলবেলায় আমি ছাদে (দশতলা বাড়ি, যার প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট আমার কাছে ঘড়ির কাঁটার মতো অনিঃশেষ ক্রান্তিকর ত্রি-মাত্রিক পুনরাবৃত্তি, দালির ট্র্যাঙ্গলাম আওয়ার ছবির নীলরঙের মতো স্নায়ুর বিষাদ) প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যেবেলায় একা একা ঘুরে বেড়াতাম। একদিন সন্ধ্যের হাওয়ায় ছাদের উপরের আকাশ, আমার থেকে অনেক নীচের কলকাতা, সমস্ত আলো জ্বলে-ওঠা কলকাতা, নেমে-আসা ঘন কুয়াসায় কলকাতা—এসবের মধ্যে হঠাৎ আমার মরার সাধ হোলো। কার্নিসের এপার থেকে ওপারে চলে আসছি, আমার শরীর হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হঠাৎ মনে হোলো শরীরের আরো একটা ভাষা আছে। একেবারে নিজস্ব। শরীর ইচ্ছেমৃত্যু চায় না। শরীর বললো, না। আমি আবার ফিরে এলাম স্বাভাবিক মনে। কোনো কারণে নয়, এমনি এমনি সেদিন মরতে গিয়েছিলাম। বাবা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মন কেমন করে উঠল, মনে হোলো যেন আমি সত্যিই মরে গেছি। যেন আমার মৃত শরীরটার দিকে তাকিয়ে আছি আর কান্না পাচ্ছি, আর কান্না পাচ্ছে। বাবা-মার 'বাবু', লীলার দীপন, কলেজের দীপু—সবার 'আমি' নিজের কথা ভুলে গিয়ে কেবল তাদের জন্য কেন যেন কান্নায় ভেসে পড়লাম। মা কী বুঝে-ছিলেন কে জানে, হয়ত ধরে ফেললেন আমার অস্তিত্বের এই ব্যথার, যে-ব্যথা অর্থহীন তবুও অনেক অনেক, তার কথা। বললেন, 'বোকা নাকি, এত বড় ছেলে, এরকমভাবে কাঁদতে হয়

প্রচুর ও দুর্লভ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সভায় একমাত্র সভাপতিরই চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম হয়েছিল, আর সবার কথা না বলাই ভালো, কিন্তু না বললেও কারও বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

শোকসভা এবং সভাপতি আমি নিজে। শোকসভার সভাপতিত্ব অনেক করতে হয়েছে, সভার প্রকৃতি হিসাবেই খানিকটা উচ্ছ্বাস ব্যবহৃত করতেই হয়, তবে চোখ ফেটে জল আসবার কথা যে বললাম তা এ-সভায় তার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্যেই।

যদিও খানিকটা প্রস্তুতই ছিলাম।

লোকনাথ মজুমদার প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ এর গোড়া-পত্তন করে যান; কৃপণ ছিলেন, একটি-একটি করে পয়সা জমিয়ে লগ্নী কারবারের মারফতে ছোটখাট একটি জমিদারি দিয়ে যান পুত্রের হাতে। শেষ বয়সে এসে কিছু যশ-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে, শহরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে 'রায়সাহেব' খেতাব অর্জন করেন সেকালের ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে। অনগ্রসর অঞ্চলের ছোট শহর। এরকম পরিবেশ-পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কিছু একটা করলেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেত, স্বীকৃতি পাওয়া যেত।

পিতার মৃত্যুর পর লোকনাথ জমিদারির সঙ্গে পিতার বৈষয়িক গুণাবলিরও উত্তরাধিকারী হলেন। লগ্নী কারবার আর জমিদারি হু হু করে বেড়ে যেতে লাগল। ঋণের ফাঁসে পাশাপাশি জমিদারের গোটাতিনেক নামকরা মহাল নিলামে ডেকে নিলেন। তখন স্ত্রীশিক্ষার ধুয়া নূতন উঠেছে, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটা খুব বড় কাজ বলে গণ্য হতে আরম্ভ হয়েছে, লোকনাথ নিজ শহরে একটি প্রতিষ্ঠা করে পিতার চেয়ে একধাপ উঠে গেলেন। ঠিক স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য তাঁর যে বিশেষ মাথাব্যথা ছিল এমন নয়, যার জন্যে ছিল সেটা করায়ত্ত হোল, পিতা রায়সাহেব হয়ে ছিলেন, উনি রায়বাহাদুর হলেন। এই লোকনাথের মৃত্যুতে শোকসভা ছিল।

লোকনাথের পুত্র গৌরীনাথ। গৌরীনাথ পিতা-পিতামহের বৈষয়িক গুণাবলির আর সবই মোটামুটি পেয়েছিলেন, তবে কৃপণ ছিলেন না। এক পুরুষে বড় মানুষের ছেলেরাই কৃপণ হয় না, উনি আবার দু'পুরুষের সঞ্চিত অর্থের একেশ্বর মালিক, পিতার জীবিতাবস্থাতে ভোগ-সুখে নিরত তো ছিলেনই, তাছাড়া, (নিতান্ত স্বাভাবিক-ভাবেই) পিতার লোকান্তরের পর মুক্ত একাধিপত্যে ভোগের বাসনাটাও বেশ প্রবল ছিল। এইখানে পিতার কাছ থেকেই তিনি প্রবল বাধা পেলেন। বিশ্বনাথ খুব স্বল্পায়ু না হলেও ভদ্রগোছের মাঝামাঝি আয়ু নিয়ে জন্মেছিলেন, উনষাট বৎসরে মারা যান; লোকনাথ বিরাশি বৎসর পর্যন্ত বেঁচে পুত্রের পথ আগলে থেকে যেন নিতান্ত আর না পেরে, বা চক্ষুলজ্জায় সরে দাঁড়ালেন।

গৌরীনাথের বয়স এখন পঞ্চান্ন।

প্রবল বেগে আরম্ভ করতে হোল গৌরীনাথকে। ভোগের সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিক থেকে বংশধারানুযায়ী গৌরীনাথের দৃষ্টিটা আরও উচ্চস্তরের ছিল। সেকালে 'রায়-বাহাদুরের' পর ইংরাজ সরকার তিনটে অঙ্কুর দিতেন—সি, আই, ই, বেশি আগ্রহ হলে 'রাজা' পর্যন্ত। গৌরীনাথ গোড়া থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকার সামনে শামিয়ানা খাটিয়ে শোকসভার আয়োজন হোল। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত শোক বা শ্রদ্ধার জন্য নয়, অতিরিক্ত আয়ুর অধিকারী হয়ে লোকনাথ তার সম্ভাবনাটুকু জীবিতকালেই কমিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু বাইরে কানাঘুষায় যা শোনা গেল তা এই যে, সভার শেষে গৌরীনাথ অনাহিতের জন্য পিতা পিতামহের অপেক্ষা আরও বড় কিছু একটা সংকল্প ঘোষণা করবেন পিতৃস্মৃতি রক্ষার জন্যে।

আমায় সভাপতি করে জেলা শহর থেকে নিয়ে গেলেন একজন সাহিত্যিক বলে। অন্য-ভাবে সমাজে নিষ্প্রয়োজন হলেও তারা নাকি সভা জমাতে পারে ভালোরকম।

আমি কিন্তু যে চোখ ফেটে জল আসবার কথা বলছিলাম তা সাহিত্যেরই অত্যাচারে। চৌদ্দটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা, শোকগাথা বলাই ভালো, ফুলস্কেপ কাগজের কোনটি তিন পাতার কম নয়। সাতটি প্রবন্ধ। গৌরীনাথের অধীনে দুটি স্কুল, মনে হোল কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা বাদ যায়নি। বাইরেরও কিছু নাথ পরিবারের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী নিশ্চয় আছে। এছাড়া ভাষণে লোকান্তরিতের স-শোক গুণকীর্তন। কমতে চায় না। শোকের সভা, বেল টিপে শোকসেন্সরের মধ্যে সময় সম্বন্ধে ইঙ্গিতও করা যায় না। প্রত্যেক কবি-প্রাবন্ধিক-বক্তার কাজ শেষ হলে যে তালির ঘণ্টা—হোক না কেন শোকসভাই—সেগুলোকে জুড়লেও আধ ঘণ্টার কাছাকাছিই যায়। সভাপতির মঞ্চে বসে ঝাড়া আড়াইটি ঘন্টা আমায় সাহিত্যিক হওয়ার দণ্ডভোগ করতে হোল অসহায়ভাবে। মনে মনে দুর্গা-নাম জপছি, স্বয়ং শোকাহত গৌরীবাবু উঠে তাহলে কি করবেন।

গুরুবল, উনি সেদিক থেকে অব্যাহতি দিলেন। আমার পাশে বসে মাঝে মাঝে কাশছিলেন, পরে টের পেলাম, গলাটাও ধরা গলায় দাঁড় করাবার চেষ্টাতে। ওদিকের তালিকা শেষ হলে আমার গলায় দাঁড় করাবার চেষ্টাতে। ওদিকের তালিকা শেষ হলে আমার অনুরোধে ধরা গলাতেই বললেন—তিনি একেবারেই অভিভূত, কিছু বলবার ক্ষমতা নেই, শুধু তাঁর একটি সংকল্প সবার সামনে উপস্থাপিত করবার জন্যে উঠেছেন; তিনি 'লোকনাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' নামে এই শহরে পিতার পুণ্যস্মৃতিতে একটি কলেজ স্থাপন করবেন অতি শীঘ্র।

এরপর যে করতালির লহর উঠল তার মাঝে ইচ্ছা থাকলেও তিনি আর কিছু বলতে পারতেন বলে মনে হয় না।

সেদিনকার মতো কলান্ত অবসন্ন শরীরে কোন সভার কার্য শেষ করে ফিরেছি বলে মনে পড়ছে না।

বাড়ি ফিরে দেখি দুটি খাম আর একটি পোস্ট কার্ড রাখা রয়েছে আমার লেখার টেবিলে। খুবই পরিশ্রান্ত, ঐ সভা, তারপরে মোটরে দীর্ঘ পথের ঝাঁকানি, সদ্য সদ্য চিঠি পড়ার মতো সামর্থ্য বা উৎসাহ নেই, মৃতা মামা ছেড়ে সোফায় গাটা এলিয়ে দিতে যাব, খামের ওপরের মোহরের ওপর দৃষ্টি পড়ে যেতে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। গোলক-কাকা অসুস্থ ছিলেন। দেশে আমাদের পাড়ার মানুষ, স্কুলে তাঁর কাছে পড়েছি; তাঁর বিদ্যার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারিনি, তবে প্রচুর স্নেহ পেয়েছি, যেন যে স্থানটুকুতে তাঁর বিদ্যাদ্বারা অল্প কিছু সঞ্চয় করে রাখতে পারতাম সেটুকুতে স্নেহ দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিলেন।

কম্পিত হস্তে খাম খুলতেই প্রথমে চিঠির নীচে নামের ওপর নজর পড়ল। লিখেছে তাঁর তের বছরের ছোট নাতনী ঝুমা। আর সবার ওপর থেকে ওপচানো স্নেহ তিনি শেষ বয়সে এইটির ওপর ঢেলে দিয়েছেন।

ছেলেমানুষ, বেশি লিখতে পারেনি, জানেও না এ-ধরনের চিঠি গুছিয়ে লিখতে। অনেক কাটাকুটি, তার খানিকটা অশ্রুতেও ধুয়ে গেছে, তারই মধ্যে বাদ দিয়ে কোনরকমে পড়তে পারলাম—"শৈল কাকা.. দাদু আমাদের ছেড়ে গেছেন.. বাবা কেমন যেন... তুমি শিগগীর এসো.."

কিছুক্ষণ ধরে মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল, মনে হোল যেন এই একটু আগের শোকসভার মাঝখানে বসে চিঠিটা পড়ছি; মানেটা ঠিক ধরতে পারছি না।

সৃষ্টা

অনীশ ঘোষ

একতাল মাটি থেকে খাঙুলের চাপে
ঘট, কলসী, হাঁড়ি—
ইটের উপর ইট সাজিয়ে কেমন
বানিয়েছো মানুষের স্বপ্নময় বাড়ি।

মুঠোর মধ্যে আজ কেঁপে ওঠে তাঁত।
সুতো থেকে অভিপ্রেত শাড়ি কিংবা ধুতি।
এ-হেন নির্জন শিল্পে সবে এসো মন—
হাত রাখো এই হাতে। দিব্য অনুভূতি।

ডাক

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ, বায়ু, অন্তরীক্ষ ও পঞ্চগব্যের পাত্র ইন্দুকে দিয়ে এলাম।
এখানে আসতেই পিছনে পিয়ন এসে—'বাবুজী সেলাম'
বলে দাঁড়ালো। নদীতীরের হাওয়া আর চিঠি
স্বর্গত বাবার নামে—অনাদায়ে আমি জ্যেষ্ঠ। গুটি
পোকার মত আঁকাবাঁকা অঙ্ক। সমস্ত ব্যবসার গুপ্তকথা
এবং দেনার দর্দ—মহাজন, সুদ, শৌখীনতা
দিয়ে মোড়া। তাতে লেখা, 'আমার আশীর্বাদ। প্রথমেই
নিজেকে পাচিলে ঘিরবি। পা অবধি বেড-কভার। এই
আমার শেষ কামনা। ইতি—'

এখানে ওখানে চতুর্দিকে

বিভাসকুমার সরকার

আছে সে কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে
এদেশে ওদেশে গঞ্জে বাজারে
ঐ যে শুকর পুড়ছে আগুনে
জ্বলছে খিদের বাঙা যত চোখ
নিরন্ন দেশে হাজারে হাজারে।

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

হৃদয় অনতিদূরে ভালবাসা ব'লে
দীর্ঘকাল পথের কিনারে একা ব'সে আছি

ওগো অন্তঃসত্ত্বা রমণীরা ধন্যবাদ, সুবাতাস
হে পাখি তুমিও—ভালবাসা দেবে তার জন্য
কিছু সংগ্রহের বালি নিয়ে গড়ে তুলি পেইন্টেড ডেজার্টস্

শুভদিন শুভদিন শুভদিন সুসময় তার জন্য
দীর্ঘকাল তোমাকে সৃজন ক'রে ব'সে আছি
সময় বয়েছে বেশ সকলেরই, আমাদের তাড়াতাড়ি নেই

হৃদয় অনতিদূরে ভালবাসা ব'লে দীর্ঘকাল
মৃত্যুর চোখের উপরে চোখ রেখে বসে আছি

জাতীয় কংগ্রেস হাত মেলাবে

জগজীবন রামের বুদ্ধিতে এবং মোরারজীর হাত ধরে চবন কংগ্রেসের দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে ঢোকবার জন্য এখন দিন গুনছে। কংগ্রেসকে নিয়ে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে যোগ-বিয়োগের অঙ্ক। সংসদের গত বাজেট অধিবেশনের পর জনতা পার্টির তিন শরিক : সংগঠন কংগ্রেস, কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী এবং বিদ্রোহী কংগ্রেসের সঙ্গে বাইরের জাতীয় কংগ্রেসের লোক-জনদের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। কেন্দ্রে ক্ষমতা ভাগ-বাঁটোয়ারা নতুন ছকে জাতীয় কংগ্রেসকে শরিক হিসাবে আমন্ত্রণ জানাবার পরিকল্পনা তৈরী করেছেন জগজীবন রাম। আর তাঁর উপদেশ মত পা ফেলছেন মোরারজী দেশাই। আগে যাঁরা কংগ্রেসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে নতুন সাড়া পড়েছে জগজীবন রামের উৎসাহে। সমভাবাপন্ন লোকজনদের সংযুক্ত করবার দায়িত্ব নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি রামচন্দ্রন। রামচন্দ্রন সংগঠন কংগ্রেসের সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত। কংগ্রেস-ঘেঁষা সোসালিস্টদেরও সমর্থন পাবার জন্য চেষ্টা চলছে।

সংসদের গত বাজেট অধিবেশনের শেষের দিকে চরণ সিং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার আগে কট্টর কংগ্রেস-বিরোধী চরণ সিংয়ের সজাগ দৃষ্টি ও সতর্কতা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাক্তন কংগ্রেসের নানা দল-উপদলের রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে রীতিমত বাধা সৃষ্টি করত। গৃহমন্ত্রী হিসাবে খবরাদি সংগ্রহে তাঁর বিশেষ সুবিধা ছিল। তাঁর অসুস্থতার ফলে এই রকম ভিজিলানসে ভাঁটা পড়ে। এর ফলে জগজীবন রাম গোষ্ঠীর কাজকর্ম নির্বিঘ্নে এগোতে থাকে। জনসংঘের দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং আদবাণী কোন রকম ভিজিলানস রাখতে পারেন নি। তাঁরা এ কাজে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতার সুযোগে পুরোন তিন বন্ধু ও সহকর্মী মোরারজী, চবন ও জগজীবন রামের মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ এবং মতামত বিনিময় হয়েছে।

নয়াদিল্লির হাসপাতাল থেকে সুব্রত কুন্ডুর আরোগ্য নিকেতনে পৌঁছে চরণ সিং তাঁর দপ্তরের কাজকর্ম শুরু করেন। আর সেই সময় তিনি কংগ্রেসীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারটি অনুমান করেন। খোঁজ-খবর নিতে কয়েক দিন দেরিও হয়। যমুনার জল তখন বেশ খানিকটা গড়িয়ে গিয়েছে। দেরি হলেও ধুরন্ধর রাজনীতিক হিসাবে উনি পাল্টা পদক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন ঘনিষ্ঠলোকজনের মধ্যে। এই শলা-পরামর্শে মুখ্যত অংশ নিয়েছিলেন দেবী-

রাজধানীর ইনসাইড ষ্টোরি

লাল এবং রাজনারায়ণ। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে রাজনারায়ণের কৈফিয়ৎ দাবীর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তটি চরণ সিংকে জানাবার দায়িত্ব পড়ে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং জর্জ ফার্ণান্ডেজের ওপর। কিন্তু যেদিন রাজনারায়ণের কৈফিয়ৎ দাবীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সেই দিনই জর্জ ফার্ণান্ডেজ বোম্বাই পাড়ি দিলেন। সুতরাং অটল-বিহারী বাজপেয়ী একাই চবণ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। চবণ সিংয়ের সঙ্গে বাজপেয়ীর সেই উপলক্ষে একাধিক লম্বা বৈঠক বসে। আর তখন এককাট্টা হয়ে কংগ্রেসীদের কেন্দ্রে ক্ষমতার সিংহাসনের দিকে গুটি গুটি পা ফেলে এগোবার পরিকল্পনাটি চরণ সিং প্রকাশ করেন বাজপেয়ীর কাছে। ভারতীয় লোকদলের কোন কোন সূত্রের মতে চবণ সিং নাকি বাজপেয়ীকে বলেন : কি করছেন আপনারা? সর্বনাশ হতে চলেছে।

চবণ সিংয়ের এই মন্তব্যের গুরুত্ব হজম করতে না করতে এবং জনসংঘের কৌশল কী হবে সে সম্বন্ধে দলের উচ্চ মহলে বিস্তৃত আলোচনা করার আগেই দ্রুততালে ঘটনা-ঘটতে থাকে। জনতা পার্টির মধ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে শরিকদের শলা-পরামর্শে মশগুল নয়া-দিল্লির সেই পরিস্থিতিতে চরণ সিংয়ের দল বুঝতে পারেন রাজনারায়ণের পক্ষে যেহাই পাওয়া মুস্কিল। কৈফিয়ৎ দাবী করা ছাড়াও তাঁকে পদত্যাগ করতেও বলা হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে। চবণ সিং তাহলে কি করবেন এই সমস্যায় পড়ে তাঁর অনুচরেরা। রাজনারায়ণের পদত্যাগের প্রতিবাদে চরণ সিংয়ের পদত্যাগের সিদ্ধান্তে তেমন রাজনৈতিক জোর থাকে না। সুতরাং তাঁর এমন একটা ভাবমূর্তি নেওয়া দরকার যার রাজনৈতিক ধার ও তাৎপর্য এবং সেই সঙ্গে সর্বভারতীয় আবেদন থাকবে। তাড়া-তাড়িতে হাতের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই বলে বিবৃতি দিয়ে বসলেন। এই বিবৃতি মারফৎ তিনি সকলকে এই কথাটি বলতে চাইছেন যে, তিনি ইন্দিরা-বিরোধী কিন্তু মোরারজী দেশাই কোন-ক্রমেই ইন্দিরা-বিরোধী নন। এইভাবে নিজের একটি পৃথক ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর যে অধি-বেশনের পর চরণ সিং এবং রাজনারায়ণের পদত্যাগ করবার জন্য চিঠি পাঠালেন মোরারজী সেই বৈঠকেই জনসংঘ চরণ সিংয়ের আশঙ্কার ও সন্দেহের সমর্থন

পায়। ভারতীয় লোকদলের দুই নেতার বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-মণ্ডলীতে প্রধানমন্ত্রীর এই উচিত কংগ্রেস বিরোধী শরিকদের কাছে পরোক্ষ থ্রেট হিসাবে কাজ করে।

এমন অবস্থায় জনসংঘ এবং কিছু সোসালিস্ট ও বি এল ডি মন্ত্রীরা মধ্যপন্থ অনুসরণ করতে থাকেন। এঁরা হলেন : অটলবিহারী বাজপেয়ী, আদবাণী, বিজু পট্টনায়ক, ফার্ণান্ডেজ, এইচ এম প্যাটেল ও মধু দণ্ডবতে। চরণ সিংয়ের পদত্যাগ এঁরা চান নি। এঁরা বলেছিলেন বিবৃতির জন্য চরণ সিংয়ের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া হোক। কিন্তু এঁদের সকলের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী ভালমত অঙ্ক কষে মোক্ষম বাণ ছুঁড়লেন চবণ সিং ও রাজনারায়ণকে লক্ষ্য করে। চবণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী যে চিঠি পাঠান তার খসড়া চার বার করা হয়েছিল। চতুর্থ বারের যে খসড়াটি তাঁর পছন্দ হয় সেটি তৈরী করেন সংগঠন কংগ্রেস ও বিদ্রোহী কংগ্রেস দলের দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যথাক্রমে পি রামচন্দ্রন এবং মোহন ধারিয়া।

নানা দল-উপদলে বিভক্ত ভারতীয় লোকদল এবং সোসালিস্ট মন্ত্রীদের মতা-মত হয়ত উপেক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত সংগঠিত এবং ৮৭ জন লোকসভার সদস্য নিয়ে কেন্দ্রে জনতা সরকারের বৃহত্তম শরিক জনসংঘের বক্তব্য ও অনু-রোধ এড়িয়ে চরণ সিং সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলেন কোন শক্তির জোরে? যদি ধরে নেওয়া যায় সংগঠন কংগ্রেসের ৫২জন সংসদ সদস্য তাঁর সঙ্গে আছেন তবু সেই ভরসায় বিচক্ষণ রাজনীতিক হিসাবে তিনি এমন পদক্ষেপ নিতেন না। প্রধানমন্ত্রীর এই নতুন জোরের উৎস হল জাতীয় কংগ্রেসের ৬৭জন সংসদ সদস্য। প্রয়োজন হলেই সরকারে যোগ দিতে এঁরা প্রস্তুত। আর শোনা যাচ্ছে এমন অবস্থায় ইন্দিরা কংগ্রেসের ৭৬ জন সদস্য বাইরে থেকে মোরারজী সরকারকে আপাতত সমর্থন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্ভাব্য নতুন ধাঁধা সম্বন্ধে এই সব পরিকল্পনার পাশাপাশি চলছে ছোট-বড় দলে বিভক্ত কংগ্রেসীদের এককাট্টা করার প্রয়াস। কয়েকজনের ভুল-ত্রুটির জন্য কংগ্রেসের মত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সংস্থা নষ্ট হতে পারে না এমন সব কথা ইদানীং নানা মহলে নতুন করে শোনা যাচ্ছে। ১৯৬৯ সালের আগে কংগ্রেসের যে ঐক্যবদ্ধ রূপ ছিল তারই পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টায় অবশ্য ইন্দিরা কংগ্রেসের বিশেষ উৎসাহ নেই। তবু কংগ্রেসীদের মহামিলন যাঁরা চান তাঁদের স্লোগান হল : জাতীয় পতাকার তলায় সবাই সামিল হও।

ঐক্য
জোট
জোট

ঘুষ থাকবেই

সুমন্ত সেন

ললিতনারায়ণ মিশ্র তখন ভারতের রেলমন্ত্রী। সময়টা ইন্দিরা কংগ্রেসের শাসনকার্যের স্বর্ণযুগ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিরা প্রত্যেকেই একেকজন ছোটা নবাব। এবং যেমন চিরকাল হয়ে এসেছে প্রত্যেক নবাবেরই নিজস্ব পারিষদগোষ্ঠী আছে, যে গোষ্ঠীভুক্তদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিরাজ করতেন (যা এখনও করেন) কিছু সাংবাদিক। বাবু ললিতনারায়ণ মিশ্রর গোষ্ঠীও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

কিছু দুর্মুখ থাকে এবং থাকবেই। তৎকালীন দিল্লীতেও ছিল এবং বিশেষ কোন কারণে এঁরা ললিতনারায়ণের পিতৃদত্ত নাম পালটে করেছিলেন "নগদনারায়ণ"। কারণ মন্ত্রীমশাই নাকি নগদ-বিদায় ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। এই "গুজব" ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবুর সচিবেরাও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন. শুরু হল ছোটা-ছুটি এবং কিছুদিন পরে রাজধানীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে ললিত-নারায়ণজীর প্রশস্তি কোন না কোন ভাবে ছাপা হয়ে গেল— অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ না করে পারছি না যে তখন দেশে জরুরী অবস্থা ছিল না এবং সাংবাদিকদের জোর করে কেউ কিছু লেখাতে পারত না।' অবশ্য অনুরোধে কী না হয় এবং সেই অনুরোধ কী রূপে প্রযুক্ত হত সেইটাই এই কাহিনীর মূল কথা।

প্রশস্তি ছাপা হল এবং কিছু কিছু সাংবাদিকদের কাছে কিছু উপহারও এসে গেল যদিও একজন অপরের উপহারের কথা জানলেন না। সেটা জানাজানি হল কিছুদিন পরে যখন ওই মন্ত্রী-মশায়ের বাড়ীতেই এক সন্ধ্যায় উক্ত সাংবাদিকেরা একত্রিত হন।' দেখা গেল প্রত্যেকেই একই রঙের এবং একই কাপড়ের স্যুট পরে এসেছেন। সৎ ও স্বাধীন সাংবাদিকরা নাকি এতে খুবই বিরক্ত বোধ করেন এবং শোনা যায় ললিতবাবুকে প্রশ্ন করেন, "কেয়া সাব হুঁ অপ কেয়া শোচা কী অপ হামকো খরিদ কর সকতে হোঁ" ? তবে মন্ত্রীমশাই ধান চালের হিসাব ভালই বুঝতেন কাজেই তিনি নাকি এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেন নি শুধু ব্যক্তিগত সচিবকে বলে দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে যেন বিভিন্ন রঙয়ের স্যুট কেনা হয়।'

অবস্থাটা বুঝুন। সাংবাদিকরা বলে থাকেন এবং সাধারণের ধারণাও তাই যে সংবাদপত্রগুলি সমাজের অতন্দ্র প্রহরী রূপে দাঁড়িয়ে আছে কোথাও কোন অন্যায় কোন বেচাল কোন অবিচার দেখলেই তা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে এই অন্যায়কে তুলে ধরার স্বাধীনতা সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা মানে শত প্রলোভন এড়িয়ে দোষীকে দোষী বলে চিহ্নিত করা। অথচ সেই সংবাদপত্রের কিছু সাংবাদিক যদি এই উপহার গ্রহণ করেন তাহলে কোথায় থাকে সেই স্বাধীনতা সেই নিরপেক্ষতা? কারণ এই উপহার আসলে সেই ছোট দু অক্ষরের শব্দটি ছাড়া আর কিছুই নয় যে শব্দটি অতিশয় ঘৃণ্য কিন্তু যার প্রভাব মানব সভ্যতার বিকাশের

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। শব্দটি হচ্চচ্ছে "ঘুষ" সা দেওয়া বা নেওয়ায় কোন কর্মতি নেই ভারতসহ সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাদ দিচ্ছি কারণ সেখানকার ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাধরণের সমালোচনা শুনলেন সেখানে যে ঘুষের আদান প্রদান হয় এ কথা আজ অবধি কোথাও শুনিনি বা পড়িনি।

সর্ষের মধ্যে ভূত কী শুধু সংবাদপত্র জগতেই? ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া দুই সমান অপরাধ কিন্তু সেই দন্ডবিধির সম্মান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত সেই আদালতসমূহের অবস্থাটা কী?

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিচারমন্ত্রী হাসিম আবদুল হালিম আমকে বলেন যে সরকারের একটা প্রধান কাজ হবে "আদালতে ঘুষ নেওয়া বন্ধ করা"। বামফ্রন্টের এক বছর রাজত্বকালের পর সেদিন হাসিম সাহেবকে প্রশ্ন করলাম দুর্নীতি দমনে তিনি কতদূর এগিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে মন্ত্রী বললেন গত একবছরে তাঁরা মোটে একজন পেশকারের চাকরী খেতে পেয়েছেন। তিনি বললেন, "দেখুন আদালত যদি কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন একমাত্র তাহলেই সরকার তা নিতে পারেন অন্যথায় নয়। দুঃখের কথা গত এক-বছরে শুধুমাত্র ওই একটি কেসই সরকারের কাছে পাঠান হয়"।

তার মানে কী আদালতে ঘুষ খাওয়া হয় না। প্রাক্তন আইনজীবী হাসিম সাহেবের মতে আদালতে ঘুষ ছাড়া এক পাও আপনি এগুতে পারবেন না। মামলা উঠল ত পেশকারের ঘুষ নেওয়া শুরু হল। কত রকমের আশ্বাস—"তারিখ পালটে দেব, কজ লিস্ট (মোকদ্দমার তালিকা)-এ আপনার আগের দিকে করে দেব" ইত্যাদি। এগুলি যে এরা করে না তা নয় তবে এমন অনেক আশ্বাস দেয় যা কিনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়।

কিছুদিন আগে এক মহিলাকে মহাকরণের বিচার দপ্তরে দেখা যায় উদভ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়াতে। কী ব্যাপার না তিনি এক সম্পত্তির মামলায় ফেঁসে গেছেন। তিনি একলা, মামলা তাঁকে নিজেকেই চালাতে হচ্ছে। বাস পড়ে গেছেন পেশকারের খপ্পরে যে প্রথমদিন থেকেই তাঁর বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে বলতে শুরু করেছে, "আপনি চিন্তা করবেন না, মামলা আপনি জিতবেনই শুধু হুজুরকে কিছু খাওয়াতে হবে তার ব্যবস্থা করুন"। যেহেতু মহিলা হুজুরকে চেনেন না সেইহেতু পেশকারই মধ্যস্থ হতে রাজী হন এবং কয়েক দফায় বেশ কিছু টাকা রেডিও ইত্যাদি হস্তান্তরিত হয়। এদিকে মামলার নিষ্পত্তি দূরের কথা তারিখেরই দেখা নেই। কিছুদিন পরে মহিলার সন্দেহ হওয়াতে তিনি খোঁজ নিয়ে জানেন, যে পেশকার লোকটির ওইটিই হচ্ছে আসল ব্যবসা। তখন তিনি মহাকরণে মন্ত্রীর সামনে এসে কেঁদে পড়েন। এ ঘটনার শেষ অবশ্য জানা নেই।

তবে হুজুর কী ঘুষ খায় না, খায়। মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে শিয়ালদহ কোর্টের এক ম্যাজিস্ট্রেটের এই অপরাধে সাজাও হয়েছিল। আদালতে দুর্নীতি যদি একটা বড় রকমের সমস্যা না হত তাহলে কী আর প্রধান বিচারপতি মহাশয় এই নিয়ে মাথা ঘামাতেন? কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে তিনি দুর্নীতি বন্ধের ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়েছেন এবং দুই তরফে আলোচনা হচ্ছে। নিশ্চয় ঘুষের বহর খুবই বেড়ে গিয়েছে না হলে এত আলোচনা কেন?

শুধু কী সংবাদপত্র বা আইন জগৎ? শিক্ষাক্ষেত্রে কী চলছে? গত পাঁচ সাত বছরে এই নিয়ম দাঁড়িয়েছে যে ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করতে হলেও কোন বিশেষ দলের যুব গোষ্ঠীর কিছু নেতাকে "খাওয়াতে হবে"। বুঝুন অবস্থা, ছয় সাত বছরের শিশু জানছে যে ঘুষ না দিলে শিক্ষার ব্যবস্থা হবে না। এরপর আপনি তার কাছে কী আশা করেন? অসুস্থ সমাজে সুস্থ নাগরিক গড়ার পরিকল্পনা কোন উন্মাদও করে না, করে শুধুমাত্র আমাদের কতিপয় চেতনাহীন, জড়পদার্থ বিশেষ সমাজপতি যাঁরা নিজেদের স্বার্থেই গাছের গোড়ায় পোকা লেগেছে দেখেও অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে অথবা বুজে, গোল্যাপ চাষের স্বপ্ন দেখেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঘুষ প্রসঙ্গে জনৈক সহকর্মীর পিতৃদেবের কিছু অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। সহকর্মীর কাছেই শোনা। ভদ্রলোক বিহারের একটি শহরে অধ্যাপনা করতেন একটি কলেজে যেটি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ছিলেন ইংরেজির পরীক্ষক। একদিন ভাগলপুর থেকে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এসে হাজির তাঁর বাড়িতে। পরিষ্কার প্রস্তাব করলেন যে তাঁর ছেলেকে পাশ করিয়ে দিতে হবে কারণ ছেলে পাশ না করলে তার সঙ্গে এক মন্ত্রীর মেয়ের বিয়ে হবে না আর ওই বিয়ে না হলে, "আমার বেওসার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে"। এর পরিবর্তে তিনি অধ্যাপক মহাশয়কে যা দেবেন বললেন তাতে তাঁর বাকী জীবন আর চাকরী না করলেও চলবে। বলা বাহুল্য ভদ্রলোক এই অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি।

তিনি পারেন নি কিন্তু অন্যান্যরা পারতেন। তাঁর সহ-কর্মীদের মধ্যে এমন লোক কমই ছিলেন, যিনি অন্তত একটি বাড়ি ও গাড়ী করেন নি। তাঁরা নাকি প্রকাশ্যেই এই ভদ্রলোকের সততা নিয়ে হাসাহাসি করতেন। করবেনই কারণ নিজের আখের বোঝে না এমন মূর্খ বিংশ শতাব্দীতে আছে? আর এই মূর্খরাই ত অপরের হাসির খোরাক জোগায়।

ঘুষ নেওয়ার প্রথা কবে থেকে শুরু হল তা বলা কঠিন। এক কথায় বলা চলে আদি যুগ থেকে। ইংরাজী "ব্রাইব" শব্দের মূল কী তা কোন ডিক্সনারী দিতে পারে না, বাঙলা "উৎকোচ" শব্দও নিশ্চয় হালে তৈরি হয় নি। মহাভারতের কথাই ধরা যাক। যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে সেই সময় :

"মহারাজ শল্য তাঁর বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর পুত্রদের নিয়ে পাণ্ডবদের নিকট যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে দুর্যোধন পথিমধ্যে তাঁর সংবর্ধনার উদযোগ করলেন। তাঁর আদেশে শিল্পি-গণ স্থানে স্থানে বিচিত্র সভামণ্ডপ, কূপ, দীর্ঘিকা, পাকশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলে। নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং খাদ্য পানীয়েরও আয়োজন করা হয়। শল্য উপস্থিত হলে দুর্যোধনের সচিবরা তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। শল্য বললেন, যুধিষ্ঠিরের কোন কর্মচারিগণ এই সকল সভা নির্মাণ করেছে? তাদের ডেকে আন, যুধিষ্ঠিরের সম্মতি নিয়ে আমি তাদের পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করি। দুর্যোধন অন্তরালে ছিলেন, এখন শল্যের কাছে এলেন। দুর্যোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার কি অভীষ্ট বল আমি তা পূর্ণ করব'।

দুর্যোধন বললেন আপনার বাক্য সত্য হবে, আপনি আমার সমস্ত সেনার নেতৃত্ব করুন। শল্য বললেন, তাই হবে, আর কি চাও? দুর্যোধন বললেন, আমি কৃতার্থ হয়েছি, আর কিছু চাই না।'

এর পর শল্য যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে যা ঘটল তা এই :

"পাণ্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য যুধিষ্ঠিরাদিকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপের পর দুর্যোধনকে কি বর দিয়েছেন তা জানালেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি দুর্যোধনের প্রতি তুষ্ট হয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ভালই। এখন আমার একটি উপকার করুন, যদি অকর্তব্য মনে করেন তথাপি আমাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপনি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান, কর্ণ আর অর্জুনের যখন দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে তখন আপনি নিশ্চয় কর্ণের সারথি হবেন। আপনি অর্জুনকে রক্ষা করবেন এবং যদি আমার প্রিয়কার্য করতে চান তবে কর্ণের তেজ নষ্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হলেও এই কর্ম আপনি করবেন।

শল্য বললেন, আমি নিশ্চয় দুরাত্মা দুর্যোধনের সারথি হব। সে আমাকে কৃষ্ণতুল্য মনে করে, যুদ্ধকালে আমি তাকে এমন প্রতিকূল ও অহিতকর বাক্য বলব যে তার দর্প ও তেজ নষ্ট হবে এবং অর্জুন তাকে অনায়াসে বধ করতে পারবেন। বৎস তুমি যা বলেছ তা আমি করব এবং তোমার প্রিয়কার্য আর যা পারব তাও করব'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা বড় একটা ধর্মের ধার ধারতেন না অথবা স্ব-ধর্মে অটল থাকতেন না মার সঙ্গে কি না বর্তমান মননের খুব একটা তফাৎ নেই। শল্য আসছিলেন পাণ্ডব শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য, মাঝ রাস্তায় দুর্যোধন ঘুষ দিয়ে তাঁকে দলে টেনে নিলেন। তবে ঘুষ খাওয়ার অপরাধে কিন্তু তিনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের কাছে তিরস্কৃত হলেন না উল্টে যুধিষ্ঠির এমন ভাব করলেন যে ঘুষ খাওয়াটাই নিয়ম। বরঞ্চ তিনি শল্যকে "অকর্তব্য" জেনেও কৌরবদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে বললেন এবং মদ্ররাজও তাতে কোন আপত্তি করলেন না। অতএব দেখা যাচ্ছে সেই মহাভারতের সময় থেকে ঘুষ দেওয়া-নেওয়া এবং কার্যসিদ্ধির জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা এই সবই অতি সাধারণ বলে গণ্য হয়ে এসেছে এবং আজও তাই চলছে।

পুরানো বাঙলার পল্লীজীবনের কথাই ধরা যাক। যে কোন গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপের একটা বিশেষ স্থান ছিল সমাজজীবনে। ও যে শুধু তামাক পুড়িয়ে সময় কাটানোর জায়গা ছিল তাই নয় ঝগড়া বিবাদে মীমাংসার জায়গাও ছিল ওই চণ্ডীমণ্ডপ, যে মীমাংসার ভার থাকত গাঁয়ের মোড়লস্থানীয় কতিপয় বৃদ্ধের উপর।

এনারা কী করতেন? দুই পক্ষের কথা শুনে, একপক্ষের থেকে প্রচুর ঘুষ নিয়ে মামলা মিটিয়ে দিতেন। বিভূতিভূষণের এক উপন্যাসে আছে এইরকম এক বৃদ্ধ এক তরুণকে বকছেন কারণ সে "জুচি পাঠা" না নিয়ে মামলা মিটিয়ে দিয়েছে এবং যে পক্ষ জিতেছে তার থেকে দু টাকা নেয় নি যে টাকার অর্ধেক যাবে ব্যবোয়ারী ফণ্ডে আর অর্ধেক আসবে "তোমার পকেটে"। উত্তেজিত বৃদ্ধকে বলতে শোনা যায় যে এই হচ্ছে আরেক চাল, এ চাল বজায় না থাকলে সমাজ বজায় থাকবে না।

ঘুষের কথায় আসতে হয় কলকাতা শহরের কথায়। ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এই শহর বেড়ে উঠল এবং এখানকার বনেদী পরিবারগুলির বেশীর ভাগের ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল ঘুষের পয়সায়। এই নানাবিধ অন্যায় কাজের জন্য ইংরেজের কাছ থেকে ঘুষ এবং একবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই সাহেবের কাছে দু কথা বলে দেওয়ায় প্রতিশ্রুতির বদলে স্বজাতিদের কাছ থেকে ঘুষ। আর সেই ঘুষেরই বা কত রকম ফের। ইছামতী উপন্যাসের দেওয়ান রাজারাম রায় "কারো কাছে ঘুষ নেবার পাত্র ছিলেন না, তবে কার্য অন্তে কেউ একটা রুই মাছ, কি বড় একটা মানকচু কিংবা দুভাঁড় খেজুরের নলেন গুড় পাঠিয়ে দিলে ভেট-স্বরূপ তা তিনি ফেরত দেন বলে শোনা যায় নি"। ঠিক এই এক-ভাবেই কলকাতার বাবু ব্যবসায় আরও উন্নতির জন্য গোরা সাহেবকে যে ঘুষ দিতেন তা সে সর্বদাই সিক্কা টাকা হত তা নয়, তার চেহারা সময় সময় আরও মনমুগ্ধকর হত এবং উত্তরের কিছু কিছু বাড়িতে এখনও ছেলেমেয়েদের কটা অথবা নীল চোখ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া দুর্গোপুজোয় সাহেবদের ডেকে মদ্য-যুবতী সহযোগে বাঈ নাচ অথবা বড়দিনে ডালি পাঠান ত ছিলই। পরন্তু মনে হয় চতুর বাঙালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হিন্দুস্থানী জাগ্রত হয়ে উঠত কেবল মুসলমানদের বেলায়, ইংরাজ মনিবের সঙ্গে ওঠাবসা করতে তার বাধত না।

এই ইংরাজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আরও পাঁচটা পরিবর্তনের সঙ্গে জন্ম নিল মধ্যবিত্ত সমাজ; যে সমাজ আর পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভরশীল নয় যে সমাজে অর্থ উপার্জনের আরেকটি পথ হল সরকারী দপ্তরে চাকুরী করা। কিন্তু কোন শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে সৃষ্ট না হওয়ার ফলে এই সমাজের মূল রয়ে গেল তার সামন্ততান্ত্রিক, গ্রাম্য অতীতে যার ফলে শহুরে মধ্যবিত্ত বলতে দাঁড়াল একটি দ্যে আঁশলা জীবে যার আধুনিক আবরণের তলায় রয়ে গেছে একটি বহু জীর্ণ, সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি মন। ভারতবর্ষে এই অবস্থাই আজও অনেকাংশে বিদ্যমান।

মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। উন্নতিকামী অথচ কর্মবিমুখ এই সমাজ যে কোন প্রকার অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত যদি কি না সেই অন্যায়ের ফলে দুটো পয়সা ঘরে আসে। এই কিছুদিন আগেও ছেলে চাকরী পেলে আত্মীয়স্বজন প্রশ্ন করতেন উপরি আছে কি না অর্থাৎ ওইটি না থাকলে আবার চাকরী? চাকরীতে উপরি সর্বকালে সব থেকে বেশী হচ্ছে পুলিশে। পুলিশ ঘুষ খায় না একথা শুনতেও অদ্ভুত লাগে। আজও বড়বাজার অথবা পার্ক স্ট্রীট থানা পুলিশের মক্কা একবার কিছুদিন ওই দুই জায়গায় ডিউটি দিতে পারলে আর নাকি চিন্তা নেই। জানতে ইচ্ছা করে এই ঘুষখোর (এবং অধিকাংশই তাই) পুলিশ কর্মচারীদের স্ত্রীদের কথা, তাঁরা কী কিছুই বোঝেন না, অথবা সব বুঝেও না বোঝার ভান করেন? নাকি স্বামীর গরবে গরবিনী এই ঘুষ নেওয়াটাকে ন্যায্য বলেই মনে করেন? এঁরাও কী আর অন্য দশজন মায়ের মতন সন্তানকে সৎপথে থাকার উপদেশ দেন? হয়ত এঁরা সকলেই 'ভুবন সোমের' সেই সরল মেয়েটির মতন যার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এই খবর পেয়ে যে তার স্বামী বদলী হয়ে এমন এক স্টেশনে কাজ পেয়েছে যেখানে উপরির সুযোগ অনেক বেশী।

ইংরাজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল ঠিকাদারী প্রথা যা আজও চলছে এবং চলবেও কারণ ঘুষ খাওয়ার এ এক সুন্দর পন্থা। ধরুন সরকারী খরচে কোন কাজ হবে। যে ঠিকাদার সেই কাজের ভার পেল আর প্রথমেই সেই সব সরকারী আমলাদের ঘুষ খাওয়াতে হল যাদের উপর এই কাজ বন্টনের দায়িত্ব ছিল। তারপর কাজ করার সময় তার ফাঁকি না দিলে চলবে না কারণ অন্যথায় লাভ থাকে না। অতএব ঘুষ দাও কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য যে ব্যক্তি আছে তাকে। এরপর বিল নেওয়ার সময় আবার আরেক প্রস্থ ঘুষের ব্যাপার। এত খরচ করেও যখন ঠিকাদারের লাভ থাকে তখন এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না কাজটা সে কীভাবে করেছে। এটা যদি রাস্তা হয় তা ৬ মাসের মধ্যে ভেঙে পড়বে এবং তাতে আমলা ও ঠিকাদার দুজনারই লাভ কারণ আবার কাজ বেরুবে, আবার চলবে ঘুষ দেওয়া ও লাভ করার খেলা। সকলেই সব জানেন কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঠিকাদারী প্রথার বিলোপ এখনও দূর অস্ত।

সামগ্রিকভাবে বলা চলে ঘুষ নেওয়া বন্ধ হবে না যতদিন এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা বর্তমান থাকবে। ঘুষ নেওয়া বা দেওয়ার পিছনে যে মানসিকতা কাজ করে তা এই সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি, একে বিনা অপরের বিনাশ সম্ভব নয়। ঘুষ নেওয়ার মানসিকতা শুধুমাত্র হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা থেকে জন্ম নেয় না, চরম নৈরাশ্য ও সরবরকমের মূল্যবোধ লোপ পাওয়ার মধ্য দিয়েও এই মানসিকতা জন্মায়। কোন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক কোন মার্চেন্ট আপিসের দরোয়ানের থেকে কম মাইনে পেলে যে সমাজ প্রতিবাদ করে না সেই সমাজের কোন অধিকার নেই চীৎকার করার যদি দেখা যায় ওই শিক্ষক ভদ্রলোক দু পাঁচ টাকা ঘুষ খেয়েছেন কোন ছাত্রের কাছ থেকে। একদিকে অবিচার চলতে থাকবে অবিরত আর একদিকে অন্যায়ের প্রতিকার চাইব এ হয় না। অতএব ঘুষ বন্ধ করতে হলে আগে সমাজ বদলানো দরকার। মনে রাখা দরকার জীর্ণ কাঠামো বজায় রেখে তার মধ্যে ইন্দ্রপুরী বানানো যায় না। কাঠামোটাই বদলানো দরকার।

ভারতীর বিভিন্ন সম্পাদক

পশপতি শাসমল

চারদিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। বুঝে দেখার চোখ যেন কারও তেমন করে খোলেনি। সদরে-অন্দরে একই মেজাজ। জোড়াসাঁকো বাড়ির তেতলার ঘরে আলাপ চলছে সরু-মোটা গলায়। জ্যোতিরিন্দ্রের ঝোঁক হয়েছে সাহিত্যের নতুন একটা মাসিক পত্র প্রকাশ করার, তারই পরামর্শ-সভা। স্ত্রী কাদম্বরী তো আছেনই, সহপাঠী বাল্যবন্ধু অক্ষয়-চন্দ্রও এসে গেছেন। প্রান্তে তু ষোড়শ বর্ষের অনেক আগে থেকে ছোটো ভাই রবীন্দ্রের সঙ্গে তিনি মিত্রের মতো আচরণ করে আসছেন, রয়েছেন তিনিও। বাইরের ছাদে টব দিয়ে পরিপাটি সাজানো নন্দনকাননে তখন খেয়ালী হাওয়ার মাতা-মাতি, ভেতরেও তাই। আপাতত ঠিক হল কাগজ বেরোবে, তার দরকার আছে।

যেমন কথা অমনি কাজ। জ্যোতিরিন্দ্র এলেন বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রের দরবারে। তাঁর কিন্তু ততো ইচ্ছে নেই। তিনি চাইলেন, বাড়ির তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেই ভালো করে জাঁকিয়ে তোলা যাক। না, তত্ত্ববোধিনীর মতো নয়, পুরোপুরি একটা সাহিত্য পত্রিকা চাই, অনেকটা বঙ্গদর্শনের মতো, তবে কেবল পাকা হাতের কাগজও নয়, কাঁচা-পাকা সকলের জায়গা হবে ওর মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অনুকূল মত দিলেন দ্বিজেন্দ্র, এমনকি সম্পাদক হতেও রাজি হলেন। কিন্তু শুধু উৎসাহ থাকলেই তো আর পত্রিকা বেরোয় না, মূলধন কোথায়? নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলা সাব্যস্ত হল। দিলেনও কেউ কেউ। টাকা-পয়সা রাখা হল একটা হলদে রঙের বাক্সে, সেটাই এর ভাণ্ডার, রইল জ্যোতিরিন্দ্রের জিম্মায়। পরে কোনো এক সময় বাকসটা রাখা থাকত অক্ষয়চন্দ্রের মানিকতলার বাড়ির একটা ঘরের তাকে।

এখন কাগজের নাম কি হবে তা নিয়ে ভাবনা। দ্বিজেন্দ্রই প্রস্তাব করলেন, সুপ্রভাত। কেমন একটু স্পর্ধার ভাব আসছে না? দ্বিজেন্দ্র এবার বললেন, ভারতী। সকলের মনে ধরল। চার দিকে ভারত ভাবত, বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। সেই ভারতের অধিষ্ঠাত্রী হলেন ভারতী, এথেন্সের যেমন এথেনি, বৃটেনের যেমন বৃটানি। তাই এ রকম নাম রাখা হল। আরও অনেক বাসনা লুকিয়ে আছে এর মধ্যে 'ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই স্ব-প্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যা স্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং ভাবস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের

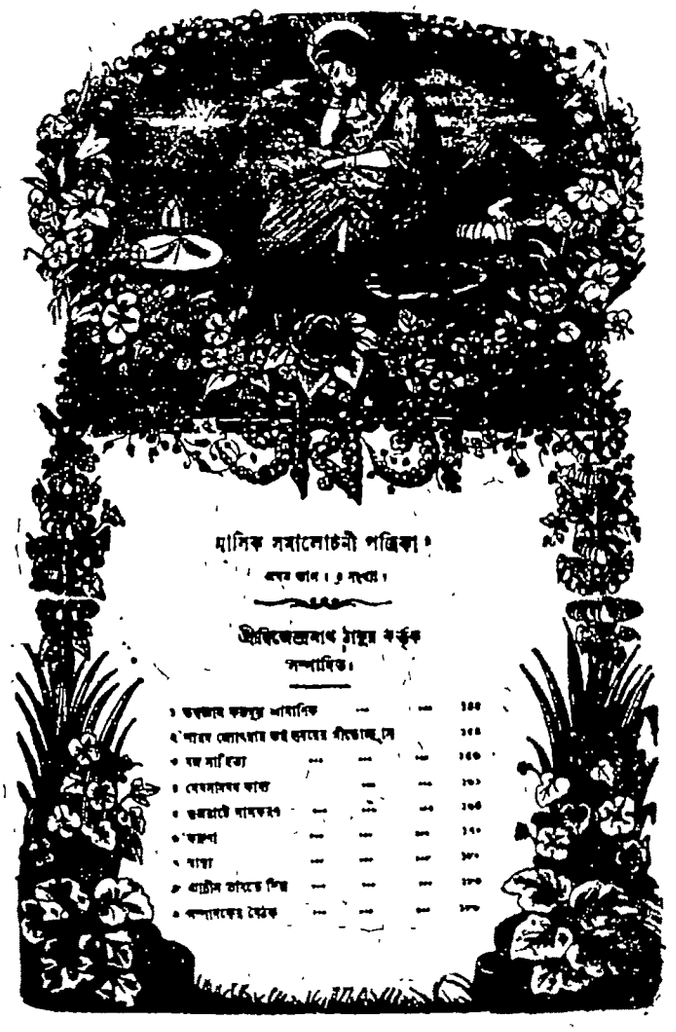

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখানে হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব।' এই ভাবনায় প্রাণিত হয়ে দ্বিজেন্দ্র এঁকেছিলেন কাগজের মলাটের নকশা, কিন্তু তা দেওয়া সম্ভব হল না। তখন অনেক গবেষণার পর আর্ট স্টুডিওর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে তৈরি হল মলাটের ব্লক। গোড়ার দিকে সেটাই ব্যবহার করা হত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালের শ্রাবণে, আজ থেকে এক শ' বছর আগে। সূচনা থেকেই পত্রিকাটির মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা লক্ষ করা যায়। 'তখন জ্ঞানাঙ্কুরের চিহ্নমাত্র ছিল না, বঙ্গদর্শন-মধ্যাহ্ন আকাশ হইতে ঢলিয়া পড়িয়াছে আর আর্যদর্শন ধূমকেতুর মতো বোধহয় ছয় মাস বা নয় মাস অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত।' এমন সময় ভারতী ভাবনার সমুন্নত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পত্রিকাটি যখন নিয়মিত প্রকাশিত হতে লাগল তখন সাহিত্য সমাজে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। লগ্ন মুহূর্ত থেকে ভারতী পেয়ে এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা ও বর্ধমান প্রতিষ্ঠা, আশাতীত চাহিদা মেটাতে গোড়ার দিকে প্রথম সংখ্যা ছাপতে হয়েছিল অন্তত দুবার। এই সাফল্যের মূলে ছিল মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা এবং সুদক্ষ সম্পাদকমণ্ডলীর মার্জিত রুচি ও প্রবল উৎসাহ। সুষ্ঠু পরিচালনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ছিল জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের উপর। উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলকে নিয়ে গঠিত হয় সম্পাদকচক্র যার মধ্যে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতি লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। সম্পাদক হিসেবে এঁদের অনেকের নাম ভারতীর পৃষ্ঠায় কখনো মুদ্রিত হয়নি সত্য, তবে এ কাজে তাঁদের প্রাণ ছিল সমর্পিত এবং মন ছিল এক সূত্রে বাঁধা।

ভারতীর সম্পাদক ভাগ্য অসাধারণ,

এই সূত্রে জড়িত রয়েছেন পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সেকালের কয়েকজন স্বনামধন্য মানুষের নাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ (শ্রাবণ ১২৮৪-৯০), স্বর্ণকুমারী দেবী (১২৯১-১৩০১), হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী (১৩০২-০৪), রবীন্দ্রনাথ (১৩০৫), সরলা দেবী (১৩০৬-১৪), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৩১৫-২১), মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৩২২-৩০), সরলা দেবী ১৩৩১-আশ্বিন ১৩৩৩) পর্যায়ক্রমে ভারতী সম্পাদনা করেন। দেখা যাচ্ছে একটানা প্রায় পঞ্চাশ বছর প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকা। কিন্তু যাত্রা পথ সব সময় মসৃণ ছিল না, মাঝে মাঝে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে পত্রিকাটিকে, তবে শেষ পর্যন্ত তা সে অতিক্রম করতেও পেরেছিল।

অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রথম সাত বছর সম্পাদনার পর তত্ত্ববোধিনীর মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন, 'ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।' কারণটা সম্পূর্ণ পারিবারিক। ভারতী ছিল নিঃসন্তান কাদম্বরী - জ্যোতিরিন্দ্রের মানসকন্যা। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী কাদম্বরীর অপমৃত্যুতে বাড়ির সমস্ত ভারসাম্য যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, পত্রিকা প্রকাশেও দেখা দেয় অচল অবস্থা। ভারতীর এই দুর্দিনে নারীর বিধিদত্ত পালনশক্তির প্রেরণায় প্রবল আত্মবিশ্বাসে ভর করে এগিয়ে আসেন স্বর্ণকুমারী। সম্পাদিকা হিসেবে তাঁর লক্ষ্য ছিল পত্রিকার অর্জিত মর্যাদা রক্ষা করা এবং তার দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করা। পাঠকের চিত্তবিনোদন, ভারতীয় ভাবনার প্রচার ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ সাহিত্যের মাধ্যমে 'জনসাধারণের মানসিক সৌষ্ঠব বিধান' এবং 'সহজ ভাষায় বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার' উপর বিশেষ জোর পড়ল। রচনা নির্বাচনের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারিত হল তার গুণ বা উৎকর্ষ। স্বভাবত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের পাশাপাশি স্থান পেতে লাগলেন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন অনামী লেখক। দীর্ঘকালের উপেক্ষিত লেখিকাদেরও তিনি আহ্বান জানালেন, তাঁরাও প্রমাণ করতে থাকলেন নিজেদের যোগ্যতা। এভাবে ভারতীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল এক উজ্জ্বল সারস্বত বৃত্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথের সময়ে সূচিত হয়েছিল প্রখর মর্যাদামণ্ডিত ভারতীগোষ্ঠী নির্মাণের আকৃতি, স্বর্ণকুমারীর নেতৃত্বে এখন তা ক্রমশ সুস্পষ্ট রূপ লাভ করতে লাগল। উত্তরকালের সাহিত্যসমাজ প্রধানত এঁদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

দুটি পর্যায়ে স্বর্ণকুমারী সম্পাদনা করেন মোট আঠারো বছর, এতো বেশি দিন আর কেউ এ-দায়িত্ব বহন করেননি। তাঁরই সময়ে- সত্যেন্দ্র-পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিত পরিবারের আর একটি কাগজ বালক যুক্ত হয়ে যায় ভারতীর সঙ্গে। এই উপলক্ষে স্বর্ণকুমারী ঘোষণা করেন, পূর্ব বৎসর পূর্বে ভারতীর জীবনে একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আজ আর একটি পরিবর্তন—সেদিন তিনি বালিকা বেশে গৃহ হইতে গৃহান্তরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি বালক-কেন্দ্রড়ে আর নতুন বেশে দেখা দিলেন। আজ হইতে বালক ভারতীর সহিত মিলিত হইল।' বালক ইতিমধ্যে বয়স্ক পাঠকের উপযোগী হয়ে উঠেছিল বলে এই মিলনে তেমন অসংগতি বা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়নি, এর ফলে কাগজের কলেবরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। নব পত্রিকার নাম রাখা হয় ভারতী ও বালক (১২৯৩-৯৯)। তেরশ সাল থেকে পুনরায় ভারতী নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে।

অসুস্থতার কারণে স্বর্ণকুমারী প্রথমবার অবসর গ্রহণ করলে সম্পাদনার ভার পড়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যাদ্বয়ের উপর। সুদূর মহীশূরে থাকা সত্ত্বেও সরলা এ-ব্যাপারে দিদিকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছেন। তাঁদেরই পরবর্তী সম্পাদক পরিশীলিতবুদ্ধি তরুণ রবীন্দ্রনাথ। ভারতীর প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম সেই মানুষটি প্রথমাবধি সম্পাদকচক্রের মধ্যে থেকেও এতোদিন সকলের নেপথ্যে নিজের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন, এবার তিনি মঞ্চে আবির্ভূত হলেন উজ্জ্বল দেবদূতের মতো। ইতিপূর্বে বালক হিতবাদী, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ব্যাপারে তিনি যুক্ত ছিলেন প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, সে-অভিজ্ঞতা এখন কাজে লাগল। এবং মার্জিত সাহিত্যরুচির সঙ্গে ব্যাপক অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটায় ভারতীও লাভ করল সমুন্নত গরিমা ও ব্যক্তিত্ব। তাঁর কার্যকাল মাত্র এক বছর। এতো অল্পদিন আর কেউ এ-কাজ করেননি, তবু ভারতীর জন্য ঐ বারো মাসে তেরো পার্বণের আয়োজন করতে সমর্থ হয়েছিলেন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ।

সাময়িক পত্রিকার, বিশেষত ভারতীর উদ্দেশ্য এবং তার উপযোগী রচনা নির্বাচনের উন্নত মান সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন তিনি। পত্রিকার কাজও আলাদা করে তা বলা হয়নি ঠিকই, কিন্তু সম্পাদকের লেখায় বিভিন্ন বিভাগীয় মন্তব্যের মধ্যে এসব কথা ছড়িয়ে রয়েছে দেখা যায়। সাময়িক বিভাগে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আমাদের বিবেচনায় ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থ প্রকাশ

ভারতীর যুগে রবীন্দ্রনাথ

সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য নহে। সাময়িক পত্রে বিচিত্র খণ্ডপ্রবন্ধ এবং সাময়িক বিষয়ের আলোচনায় পাঠকের চিত্তকে নানান দিকে সজাগ করিয়া রাখে। কোনো শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বিস্তৃত বিষয়কে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা স্বভাবতই ইহার কাজ নহে। কারণ বৃহৎ বিষয় অখণ্ড মনোযোগের দাবি রাখে, একক সমগ্রতাই তাহার প্রধান গৌরব, নানা বিচিত্র বিষয়ের মাঝখানে তাহাকে টুকরা করিয়া বসাইয়া দেওয়া অসংগত।....বৃহৎ গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রের মধ্যে এস্টা সীমা নির্দিষ্ট থাকা কর্তব্য।' সম্ভবত সেই কারণে তাঁর সম্পাদিত ভারতীতে কোনো উপন্যাস প্রকাশিত হয়নি, এমনকি কোনো রচনাই, তা সে যতো বড়োই হোক না কেন, ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়নি।

ভারতী সম্পাদনায় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত সম্পাদকের বিদায় গ্রহণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'য়ুরোপীয় পত্রের আদর্শে আমরা কাগজ চালাইতে চাই, অথচ অবস্থা সমস্ত বিপরীত। আমাদের সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্তই অল্প, অথচ চাল বিলাতি, নিয়ম অত্যন্ত কড়া; সেই বিভ্রাটে হয় কাগজ, নয় কাগজের সম্পাদক মারা পড়ে।..একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয়, এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়।' এছাড়া ছাপাখানার গোলযোগের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু এসমস্ত বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তিনি কিছু পরিমাণে। হয়তো ভারতীকে মনের মতো করে সাজাতে পারেননি, তবে জৌলুসের অভাবটা ঢেকে দিয়েছিলেন মস্ত মাপের ইল্লত দিয়ে। সারাজীবন এই ইমানদার মানুষটি সবকিছুতে সেটাই করে গেছেন।

সমসময়ের ঘটনা বা বিষয় নিয়ে তাঁরই লেখা তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সামাজিক আলোচনা এবং কয়েকটি উজ্জ্বল সাবলীল গল্পসহ অন্যান্য লেখকের উৎকৃষ্ট মানের রচনায় প্রসাধিত হয়েছিল এই বছরের ভারতী। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখা গেছে পত্রিকার যাবতীয় রচনার প্রায় অর্ধেক তাঁরই লেখনীপ্রসূত, সাধারণভাবে এর অনুপাত ১২ঃ৫৬। গ্রন্থ সমালোচনা এবং সাময়িক সাহিত্য বিভাগ দুটিতে পাওয়া যাবে তাঁর তৎকালীন সাহিত্য ভাবনার তাত্ত্বিক ও ফলিত দিকের সন্ধান। প্রধানত এরই নিরিখে অপরের রচনাও যে মনোনীত হত তা ধরে নেওয়া যায়, আবার কোনো কোনো লেখক যে সম্পাদকের দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল, তাতেও সংশয় নেই। স্বভাবত তাঁর সময়ে ভারতী অর্জন করেছিল আভিজাত্যের দুর্লভ দ্যুতি।

প্রকাশের শেষ দিনটি পর্যন্ত মণিলাল সৌরীন্দ্রমোহন সরলা প্রমুখ পরবর্তী সম্পাদক পত্রিকার এই ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও স্পর্শকাতর।

[বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অনুমোদনক্রমে যাবতীয় উপকরণ ব্যবহৃত]

রবীন্দ্রনাথের আমলে

গৌরচন্দ্র সাহা

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা বিষয় স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়, যে তাঁর সাহিত্যিক-মনীষা সাময়িক পত্রিকাকে অবলম্বন করেই পূর্বাপর বিকশিত হয়েছে। এর কারণ অনুধাবন করা খুব কঠিন নয়। সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে লেখকের মনে যে ইচ্ছা কিম্বা ক্রিয়া করে তা হল আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা। সহৃদয় পাঠকের প্রবল উৎসাহ অনেক সময়েই লেখককে প্রেরণা জোগায়। আর সাময়িক পত্রিকা ছাড়া বিকাশোন্মুখ লেখকের পক্ষে অতি দ্রুত পাঠকদের চোখে পড়বার, মনে ধরবার উপায় কোথায়? পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যাপারটা শুধু যে আর্থিক সংগতি সাপেক্ষ তাই নয়, সময়-সাপেক্ষও। পুরো একখানি বই ছাপার মত উপাদানও দু চার দিনে সৃষ্টি হয় না—তার জন্য দীর্ঘ সময় দরকার। কিন্তু আত্মপ্রকাশে উন্মুখ নবীন কবি, গল্পলেখক বা প্রবন্ধকারের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে বসে থাকা কষ্টকর, তাঁরা চান তৎক্ষণিক প্রকাশ আর সেখানেই সাময়িকপত্রের উপযোগিতা। লেখকের নূতন সৃষ্টিকে অতি দ্রুত প্রকাশের পথ করে দেওয়া একমাত্র সাময়িক পত্রিকার পক্ষেই সম্ভব। এই কারণেই লেখকের, বিশেষত তরুণতর লেখকের সাহিত্যিক-সাফল্য অনেকখানিই সাময়িক পত্রিকা-নির্ভর।

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"....নূতন পত্রিকা নূতন প্রেমের ন্যায়ই তাঁহাকে (অর্থাৎ কবিকে) টানে এবং তাঁহার সাহিত্যিক-প্রতিভা এই নূতন আকর্ষণে শতদল পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া ওঠে।" ১ সাধনা, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলিই সাক্ষ্য দেবে যে জীবনীকারের মন্তব্যে কোনো অতিশয়োক্তি নেই। যখনই একটি নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তখনই রবীন্দ্র-প্রতিভা নূতন করে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, নূতন বেগ লাভ করে নূতন পথে চালিত হয়েছে এবং নব নব সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা উন্মেষের এক গুরুত্বপূর্ণ লগ্নে ভারতী পত্রিকার প্রকাশ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে—আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে যখন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়েস ছিল মাত্র ষোলো,—গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে,—ষোলো বছর বয়েসের কিশোর রবীন্দ্রনাথের গৌরবচ্ছটা তখনও প্রায় অস্পষ্ট, তাঁর কাব্য-সৌরভ বাঙ্গালী পাঠকের বসেন্দ্রিয়কে তখনও চঞ্চল করে তোলে নি। এমন কি খোদ ঠাকুর বাড়িতেও তাঁর পৃষ্ঠপোষকদের সংখ্যা ছিল দুই তিন জন মাত্র। এ হেন সময়ে—যখন তরুণ কবিকে প্রায় কেউ জানে না, চেনে না তখন তাঁর পক্ষে আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত একটা পত্রিকার আশ্রয় পাওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। বাংলা ভাষায় তখন ভাল পত্রিকার সংখ্যা নগণ্য। এক ছিল সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন। কিন্তু সাহিত্যের রথী-মহারথী পরিবৃত তার প্রবেশপথ অনভিজ্ঞ কিশোর-কবির পক্ষে সুগম ছিল না। আর প্রকাশিত হতো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এটি ঠাকুর বাড়িরই কাগজ— কিন্তু সাহিত্য-পত্রিকা নয়, ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মীয় মুখপত্র। এ রকম পরিবেশে নির্ভেজাল একটা সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে ভারতীর আবির্ভাব ঘটল, অস্ফুট রবীন্দ্রপ্রতিভার নির্ভরযোগ্য ধাত্রী এবং পালয়িত্রীরূপে বহুদিন ধরে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব বহন করেছে পত্রিকা-খানি। ভাবুক রবীন্দ্রপ্রতিভাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে তাকে সারস্বত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে ভারতী কিশোর কবিকে যৌবনের দীক্ষা দিয়েছে ভারতী। তাই সমগ্র রবীন্দ্রপ্রেমী পাঠক-সমাজের কাছে ভারতী এক পরম তাৎপর্যমণ্ডিত পত্রিকা।

জীবন স্মৃতিতে কবি বলেছেন '...ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ ছিল যে বাড়িতে দিনরাত সাহিত্যের আবহাওয়া বহিত।' ২ সে সময় জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘরে ঘরে ছিল সাহিত্যের মজলিশ। এক এক জন কর্তার এক একটি আসর, এক একটি গোষ্ঠী। কবির বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের আড্ডাটি ছিল দোতলার দক্ষিণের বারান্দায়। সেখানে নিয়মিত আসতেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও অনেকে। তবে প্রবীণদের এ আসরে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ তেমন অবাধ ছিল না।

ঠাকুরবাড়িতে আর একটি আড্ডার মজলিশ ছিল তিনতলার ছাদে—সেটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। নানারকম বাহারী গাছপালা লাগিয়ে তিনি ছাদের উপর তৈরি করেছিলেন এক কৃত্রিম নন্দনকানন। নানা-রকম গায়ক-পাখি—কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া, শ্যামা প্রভৃতিও ছিল সেখানে। এই নন্দনকাননের নিয়মিত সভ্য ছিলেন আরও দুজন—তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও উদাসিনী কবিরের লেখক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের এই আসরে কিশোর কবির অনুপ্রবেশে বিস্ময়ের কিছু নেই। বাল্যে রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে একমাত্র যাঁর কাছে অকুণ্ঠ প্রশ্রয় পেতেন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—'...সরোজিনী প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সম-শ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সাহিত্যচর্চাতে আমরা হইলাম তিনজন—অক্ষয় (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী), রবি ও আমি।' ৩ তিনতলার ছাদে এই তরুণ সাহিত্যচর্চা কবির বিলেতযাত্রার পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই তিনতলার

ছাদের কথা আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই ছাদেরই একটি ঘরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানসকল্পনায় জন্ম নিয়েছিল তাঁর মানস-কন্যা ভারতী।

কিভাবে—কোন্ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতী প্রকাশের পরিকল্পনা হঠাৎ তাঁর মাথায় এল, তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখছেন — '....আমি তেতালায় যে-ঘরটিতে বসতুম, সেখানে একটা গোল টেবিল, তার চারিধারে খান-কতক চৌকি। আর দেয়ালের গায়ে একটা পিয়ানো ছিল। রবি আমার নিত্য সঙ্গী, আর এক কবি অক্ষয় এসে জুটতেন।....পাখির গানে যেমন ছাদটা মুখরিত হত, এই দুই কবি-বিহঙ্গের গানে ও কবিতা পাঠে বৈঠকখানাও তেমনি প্রতিধ্বনিত হত।.... একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করচি—কি শুভক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল, এই দুই কবি-বিহঙ্গ কেবল আকাশে আকাশেই উড়ে বেড়াচ্চে—ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্চে। লোকালয়ের কোন কুলুঙ্গিটিতে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটা নীড় বাঁধতে পারে, তাহলে কত লোক ওদের স্বর-সুধা পান করে কৃতার্থ হয়।..'৪

দ্বিজেন্দ্রনাথের পরামর্শ চাওয়া হলে নতুন পত্রিকাটির প্রকাশে সম্মতি তো দিলেনই, নামকরণও তিনিই করলেন, প্রথমে নাম দিলেন সুপ্রভাত, সে-নাম সবার পছন্দ না হওয়ার পরে নাম করলেন ভারতী।

ভারতীর আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শতধারায় প্রকাশিত হবার পথ খুঁজে নিল। ভারতীর প্রথম সংখ্যাটির মুখ্য লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। প্রথম সংখ্যাতেই কবির 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রসঙ্গে সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি বের হয়। ভারতীতে এটাই প্রথম গদ্য রচনা। কবির প্রথম ছোট-গল্প লেখবার হাতেখড়িও ভারতীতে। প্রথম সংখ্যাতেই 'ভিখারিণী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার একমাত্র কবিতাটিও (ভারতী) সম্ভবত কবিরই রচনা, কারণ লেখাটি অপেক্ষাকৃত কাঁচা এবং ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীর প্রথম দুই বছরে কবির অনেক লেখাই একটু দুর্বল রচনা। কবি নিজেও অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করেই লিখেছেন '....ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্য-লীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবল কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।....'৫

ভারতী একেবারে পারিবারিক পত্রিকা হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ যেমন খুশি লেখবার সুযোগ নিয়েছেন। অন্য লেখকদের বেলায় যেমন হয়, মমতাহীন সম্পাদকের প্রত্যা-খ্যানেদলিত ধিক্কার-পীড়নে রবীন্দ্রনাথ জর্জরিত হননি একেবারেই। তার ফলে তাঁর মনে এসেছে আত্মবিশ্বাস, নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থা—সফল লেখক হতে গেলে নিজের লেখনীর উপর যে আস্থা আর বিশ্বাস একান্ত অপরিহার্য।

ভারতীতে কবি লিখেছেন বিপুল পরিমাণে। সেই বিপুল লেখার পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেবার অবকাশ আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিসরের প্রবন্ধে নেই। তবু এ-কথা না বললে অন্যায় হবে যে, মাত্র ২৪ বছরের কাল-সীমায়—১৯০০ সাল শেষ হবার পূর্বেই ভারতীতে ছোটো-বড় নানা প্রবন্ধ ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে প্রথম সামাজিক উপন্যাস করুণা, কবিকাহিনী কাব্যোপন্যাস, 'য়ুরোপ যাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে এখনকার য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ভগ্নহৃদয়ের কয়েকটি সর্গ, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, ভানুসিংহের পদাবলীর অনেক কবিতা, বিবিধ প্রসঙ্গের ৩৮টি রচনা এবং বউঠাকুরাণীর হাট। এগুলি মুখ্য রচনা, এছাড়া আরও অনেক গদ্যরচনাও আছে।

ভারতী পত্রিকার সূত্রে কবির জীবনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে-ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবে ছিলেন লাজুক এবং ঘরকুনো। মূলত এই পত্রিকার জন্য লেখক এবং গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি কলকাতার সারস্বত সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। বিহারীলাল চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ লেখক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে ভারতী পত্রিকার সূত্রেই কবির যোগাযোগ এবং ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। শরৎকুমারী চৌধুরানী লিখছেন, '....সে সময়ে প্রাণ রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার (অর্থাৎ সংগৃহীত রচনা ইত্যাদি) লইয়া আসিয়া ভারতী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাহাকে' (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী) লইয়া 'বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন।....'৬ এইসব বিদ্বজ্জনদের সংসর্গে এসে কবির মনের পরিধি প্রসারিত হল। দেশী-বিদেশী নানা নতুন নতুন বইপত্রের সন্ধান পেলেন, ইউরোপীয়, তথা কন্টিনেন্টাল সাহিত্য সমালোচনা-রীতি, পাশ্চাত্য রীতি, পাশ্চাত্য সংগীত ও আর্ট সম্পর্কে কবি সম্যক অবহিত হলেন। জর্মন ও ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কেও কবির বিশেষ আকর্ষণ দেখা দিল। এই আকর্ষণের কিছু নিশানা যেমন আছে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিগুলিতে তেমনি, তারও পূর্ব-ইতিহাস আভাসিত রয়েছে বিভিন্ন সময়ে ভারতীতে প্রকাশিত স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংগ্লো স্যাক্সন সাহিত্য (শ্রাবণ ১২৮৫), নর্মান জাতি ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য (ফাল্গুন ১২৮৫) বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য (ভাদ্র ১২৮৫) পিত্রার্কা ও লরা (আশ্বিন ১২৮৫), গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িণীগণ (কার্তিক ১২৮৫)—এই কবটি প্রবন্ধে।

ভারতীর জন্য নানা কাজের দায় বহন করলেও, অনেকবার অনুরুদ্ধ হয়েও কবি এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাননি। ১৩০৫ সালে মাত্র এক বছরের জন্য তিনি এর কর্ণধার হয়েছিলেন—প্রধানত ভাগিনেয়ী হিরণ্ময়ী দেবীর প্ররোচনায়। এ-প্রসঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবী লিখছেন—'...তিন বৎসরকাল আমরা দুই ভগিনী (তিনি এবং সরলা দেবী) ভারতীর সম্পাদক ছিলাম। আমি কিন্তু ইহার মধ্যে একটি দিনও মাতুল মহাশয়কে ভারতী গ্রহণের জন্য ভজাইতে ছাড়ি নাই। কস্মাগত জল ঢালিলে পাথরও ক্ষয় হয়—মামা মহাশয়েরও আমার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল। তিনি ভারতীর সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।....'৭ ১৩০৫ সালে নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কবি ভারতীর ভার গ্রহণ করেন। অনিচ্ছার কারণ নানা কাজের চাপ—জমিদারীর এবং সংসারের। তবু নতুন সম্পাদক এক পত্রে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনকে আশ্বস্ত করছেন '....ভারতী যাহাতে আপনাদের সমালোচনার যোগ্য হয়, তৎসম্বন্ধে আমার চেষ্টার ত্রুটি হইবে না—কেবল আশঙ্কা এই যে, নানা কাজের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পাছে সম্পাদকের মনের মত আদর্শ রক্ষা করা অসাধ্য হইয়া পড়ে।....'৮

রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন '...১৩০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীর সম্পাদকত্বভার গ্রহণ করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত কার্যে ব্রতী হইলেন।....'৯ অবশ্য এই সম্পা-দকীয় বছরটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গদ্য রচনার বছর, উল্লেখ করবার মতো কোনো কাব্য-কবিতা এ-বছরে সৃষ্টি হয়নি। এক বছর পরে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলেও ভারতীকে ত্যাগ করেননি কবি। যখন চোখের বালি লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন ভারতীর সম্পাদিকা সরলা দেবী। তার লুব্ধদৃষ্টি ছিল উপন্যাসটার দিকে। কবি দুঃখ করে প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন —'....বিনোদিনী (চোখের বালি) লিখতে আরম্ভ করেচি..ভারতী প্রত্যহই তাঁর ভিক্ষার পাত্রটি আমার কাবে ফেরাচ্চেন—এমন করলে আমি তো আর বাঁচিনে।'১০ চোখের বালি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভারতীতে মুদ্রিত হয়নি, হয়েছিল নব-পর্যায় বঙ্গ-দর্শনে।

কখনও শারীরিক জন্য, কখনও বা সাংসারিক কাজের জন্যও কবি ভারতীতে নিয়মিত লিখতে পারেননি। পূর্ববঙ্গে জমিদারী দেখাশুনার ভার নিয়েছেন, পরে বঙ্গদর্শনের ভারও কবির ঘাড়ে চেপেছে, তাছাড়া ছোটোখাটো আরও অনেক পত্রিকার অস্তিত্ব বজায় থাকত রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে। কবি তাই কখনো কপট ক্রোধ প্রকাশ করেছেন—'....আমার কাছ থেকে কত আদায় করতে চাও? আমি প্রদীপ ওস্কাব, প্রভাতকে উজ্জ্বল করব, ভারতীকে অর্ঘ্য দেব, নিজের কাব্যলক্ষ্মীকে মালা-চন্দন পরাব—এদিকে গৃহস্থাশ্রমও রক্ষা করতে হবে...এসবগুলি কি হিসাবের মধ্যে আনবে না?....'১১

পরের পাতায় — ছবির পরিচয় : ভারতী ও বালকের প্রচ্ছদ

ভারতীর সম্পাদিকা সরলা দেবী কিন্তু কবির ভ্রান্তিকে ক্ষমা করতে পারেননি। বহুদিন পরেও তাঁর ধারণা ছিল বঙ্গদর্শনের সম্পাদকত্ব নিয়েই কবি ভারতীর প্রতি বিমুখ হয়েছেন—'...কোথাও কিছু নাই, অকস্মাৎ ভারতীর প্রতি স্নেহ-বিমুখ কবিয়া শৈলেশ মজুমদার তাঁহাকে বঙ্গদর্শনে ভুলাইল। কাঁহা য়ুসুফ, কাঁহা জুলেখা হ্যায়া, কোথায় বঙ্কিম, কোথায় তাঁহার বঙ্গদর্শন! নতুন বঙ্গদর্শন টিঁকিল না। শুধু আমার মামাটি (রবীন্দ্রনাথ) পরকে আপন করে, আপনাকে পর—আমার বুকের মধ্যে একটা মস্ত চিরা দিয়া দিলেন।....' ১২

বলা বাহুল্য—এসব কথাবার্তা কবিকে প্রীত করেননি—বরং ক্ষুব্ধই করেছিল। তাই ১৩২২ সালে কবিকে আরও একবার ভারতীর সম্পাদকীয় হাল ধরতে অনুরোধ করলে কবি সে-অনুরোধ শিরোধার্য করেননি, বরং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখছেন—'...ভারতী সম্পর্কে আমার কি বক্তব্য আছে সে একদিন তোমাকে বলব। নইলে তুমি ভুল বুঝবে।... তোমরা আমাকে বিজ্ঞাপনের জালে বেঁধো না। আমি মনকে মুক্ত রাখব বলেই সম্পাদক হতে চাইনে।....' ১৩

পরিণত বয়েসে পৌঁছে ভারতী পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারটাকে কবি নিতান্তই একটা আকস্মিক, কারুতলীয় ব্যাপার বলে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ভারতী যখন প্রকাশিত হয় '....দৈবক্রমে আমার বয়স ছিল ষোলো এবং সেই সময় দৈবাৎ আমার গুরুজনদের খেয়াল গেল তাঁরা ভারতী বাহির করিবেন। দৈবক্রমে সমস্তই অন্য রকম হইতে পারিত—দৈবক্রমে সে-সময়ে আমি না জন্মিতে পারিতাম, দৈবক্রমে ভারতী সেদিন বাহির করিবার কথা কাহারো মনে না আসিতে পারিত।...' ১৪

অবশ্যই দৈবক্রমে আরও অনেক কিছু ঘটতে পারত এবং বাংলা সাহিত্যের ভাগ্য ভালো যে তেমন কিছুই ঘটেনি। ভারতী দৈবক্রমে ওই সময়ে প্রকাশিত না হলে নিশ্চয়ই রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ কত কাংশে ব্যাহত হত, বিলম্বিত হত। ভারতী যথাসময়ে প্রকাশিত হোক্ এটা যেন ঈশ্বরের একটা অভিপ্রায় ছিল—নইলে এতোগুলি 'দৈবাৎ' কিভাবে একত্রিত হয়? ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়, প্রতিভাবানের পক্ষেই দৈবানুকূল্য সুলভ হয়ে থাকে। বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে এর প্রমাণ বহুবার মিলবে।

যার সৃষ্টি আছে তার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী,—ভারতী পত্রিকার বেলাতেও হয়নি। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'-তে পাঠক সমাজের উৎসুক-চিত্তকে ঝলমলিয়ে দিয়ে ভারতীর আবির্ভাব। তারপরে আবার একদিন তার দিন শেষ হয়েছে। এতে দুঃখের কিছু নেই। বস্তুত ভারতী যদি রবীন্দ্রনাথের প্রকাশকে সাধনা-বঙ্গদর্শনের বিশেষ কাল-সীমায় পৌঁছে দিয়েও লোপ পেত, ক্ষতি ছিল না, ভারতীর গৌরব বা গুরুত্ব তাতেও তেমন কমত না।

ভারতীতে কবির প্রথম দু' বছরের লেখার মধ্যে হয়তো কিছু অপরিপক্বতার সাক্ষ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, '....যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে-একটা বিস্ফার সঞ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে-কালটাতে ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল।....' ১৫

বস্তুত ভারতী আমাদের কাছে যে এত মূল্যবান তার কারণ উদয়োন্মুখ কিশোর-কবির বিশ্বাস, আশা, আকূতি, ভাব, অনুভাব আর উল্লাসের পরিচয় ভারতীতে যেভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে, তেমনটি আর কোথাও নেই।

উল্লেখপঞ্জী :

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ১৩৭৭, পৃ ৩১৫
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবন-স্মৃতি, ১৩৬৬, পৃ ৬৫
৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন - স্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩২৬, পৃ ১৫১
৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবির নাড়ি। দ্রঃ ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৩, পৃ ৭
৫। জীবন-স্মৃতি, পৃ ৮৪
৬। শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতীর ভিটা। দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১, পৃ ১১২
৭। হিরণ্ময়ী দেবী, কৈফিয়ৎ। দ্রঃ ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৩, পৃ ১৮-১৯
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১০ম খণ্ড, ১৩৭৪, পৃ ১
৯। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৬৭
১০। চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড, ১৩৭০, পৃ ১৭৪
১১। তদেব, পৃ ৯৩
১২। সরলা দেবী চৌধুরাণী, জন্মস্মর। দ্রঃ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ১৬০
১৩। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। দ্রঃ শারদীয় দেশ ১৩৭৩, পৃ ২৮
১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তখন ও এখন। দ্রঃ ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩, পৃ ৮
১৫। জীবন-স্মৃতি, পৃ ৮৫

প্রদর্শনী

চব্বিশ থেকে তিরিশে জুন পর্যন্ত ভারতী চৌধুরীর একুশটি ছবি আকাদেমি অব ফাইন আর্টস দেখাবার বন্দোবস্ত করেছেন। ভারতী চৌধুরীর একটা প্রশংসা আগেই করে রাখছি—কোনো নাটকীয়তা-সর্বস্ব, তথাকথিত অর্থে সমাজসচেতন ধরণের থীম-উপকরণ তিনি বাছেননি। তাঁর তাঁর ড্রইং বেশ ভিগরাস। তেলরঙের ছবি বারোটি। চার নম্বর ছবি 'হেন রেস্টিং মুড'-এ গাছগুলি একটু পার্টি। কিন্তু বিশ্রামরত রমণীর বিলাসী ভঙ্গির সঙ্গে ম্যানিয়ে গিয়েছে। রঙ সমস্ত ছবিতে একই সঙ্গে স্বপ্ন আর গাম্ভীর্য ছড়িয়েছে। গ্রীনি-ল্যান্ড দেখে মনে হলো এ হয়তো সেই বরফের দেশেরই ছবি। যার সম্পর্কে সন্দিহানী, দূরবর্তিতা ছবিটির বিষয়। সাত নম্বর ছবি-কম্পোজিশন উইল দিতে সবুজ রংটি ক্ষিপ্র বন্যতার সঙ্গে মাঝে মাঝে মাছের আকার নিয়ে চলাফেরা করেছে। আট নম্বর, ভিউ ফ্রম এ ফরেস্ট ছবিতে একটা কাঁচের বেলজারের রেখাকে বারবার অনুসরণ করে অনবদ্য এফেক্ট এসেছে। আবার, এই জ্যামিতিকতার কাছে ঋণ নয় নম্বর ছবিকে একটু নামিয়ে দিয়েছে। ছবির নাম ফিল্মপ্লাফিকেশন হলেও বেলুনের অবয়বকে বারবার ব্যবহার করা খুব জমে ওঠেনি। সতেরো নম্বর ছবিটি হলে ঢুকবার সময়ই দেখা যায়। খুব দূর থেকে মনে হয় ছবির বাঁদিকে একটি স্কেচ্-কুটির—সা ভাঙা, জীর্ণ—ডানদিকে একটি বর্ণাঢ্য কুটির। কাছে নিয়ে দেখা যায়, অকল্পিতভাবে কলম কালি চলেছে—নানা বিভঙ্গ অবয়বকে ফুটিয়ে তুলতে গেলেও, একজন প্যান্টালুনা পরা ঝড়ের উল্টোমুখে দাঁড়ানো ছেলে, একটি গোলকধাধা ও গুহার ছবি স্পষ্টত আগে। ছবিটির নাম ফ্রম মাই ইনার ফীলিং। টুকরো চিত্রের আবেগে-আক্ষেপে ভাঁড়। ভারতী চৌধুরীর রেখানির্মাণের শক্তি কতোদূর তা এই ছবির সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায়।

আর্ট গ্যালারিতে ছিলো বার্মিজ পেইন্টিং। ২৪ জুন পর্যন্ত। ফর্ম মিনিমেচার ও ন্যারেটিভ ঘেঁষা। রাজা চলেছেন, পাশে পারিষদরা, হাতীরা। প্রত্যেকটি মানুষকে পুতুল করে দেখার ঝোঁক—সব মিলিয়ে বাচ্চাদেরও খুব নতুন কিছু দেখার আনন্দ দিতে পারে না। রূপকথার দূরত্বও নেই। একটু খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয় অবান্তর প্যারাডি, যদিও ক্যারফট আছেই।

প্রণব মুখার্জি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোটো-গ্রাফার। পঁচিশে জুন পর্যন্ত তাঁর অল্প সংখ্যক আলোকচিত্র দেখানো হলো আকাদমি অব ফাইন আর্টস-এ। নানা বিষয় তাঁকে নাড়া দেয়। তার মধ্যে যেমন অধুনিক হিপি আছে, তেমন আছেন ইন্দিরা জ্যোতি মুক্তির সত্যজিৎ উত্তম সুচিত্রা ও মাদার টেরেসা, তেমন বাটার দোকান, অপারেশন, দুর্গা-প্রতিমা, মৃত যোদ্ধা, গ্যাসবিলিফ। কিন্তু এসব ছবির কথা উঠে না। কথা ওঠে যখন তিনি ফটোর আমাদের দেখান কভাইশটি ঢাল করে রাখা—প্রত্যেকটির প্রাণ আছে মনে হয়; কয়েকটি জন্তুকে আলাদা জীব বলে হঠাৎ চিনতে পারা যায়। বৃত্ত থেকে উল্টে থাকা লরির দৃশ্যে সময়হীনতা ও অপেক্ষা সুন্দর মিলে যায়। দুপুরের গ্রামে ঝিমন্ত গরুরা শুধুমাত্র ছবি নয়, এক একটি বিশেষ মুহূর্তের হয়ে ওঠে। দুটি আড়াআড়ি বেলচায় এস এম ই আর টা টা হঠাৎ বাঙ্ময় করে ওঠে। গ্রামপথে একাকী রমণীর মধ্যে মধ্যদিন ফুটে ওঠে। বৃন্দাবন ফুল তুলতে আসার মধ্যে হয়তো শৈশব ধরা পড়ে।

বেকেটের নাটকের ছবি

বিড়লা আকাদেমিতে পঁচিশে জুন পর্যন্ত কল্যাণকুমার বসুর শিশু ছাত্রদের ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত ছিলো। কল্যাণ-কুমার বসুর সংখ্যা উত্তরোত্তর। সংখ্যাটির বয়েস কুড়ি। ছাত্রদের উৎসাহ দেবার জন্যেই বাঁধা। বলা বাহুল্য যে তাদের আঁকাআঁকি অনেকটাই এডিটেড। নীটনেসএর দিকে মাস্টারমশাইদের ঝোঁক যে প্রবল তা বোঝা যাচ্ছিল সবকটি আলেখ্য থেকেই। তবু নন্দিনী বসুর সুদীপ্তকালীন সনোবরে চড়া বেগুনী লেগে আবহাওয়া তৈরি হয়ে ওঠে, সুমন শর্মার গাড়িগুলি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কতকগুলো পাথরখণ্ড হয়ে যায়, বাস-গুলো মন্তুর মতো অপেক্ষা করে। এটুকুই যা লাভ।

এর বাঁপাশের ঘরেই ফালগুনী দাশগুপ্তের আঠাশটি ছবি। তাঁর ড্রইং কিছু মজা থাকলেও আর্টিনেস প্রখর। চার নম্বর ছবিতে পুরুষের আর্ত কল্পনাবিহ্বল হাতকে গাছের কাণ্ডের সাহায্যে নিয়ে আসা ভালো—কিন্তু অতি রমণীয় ফুল পল্লব প্রজাপতি ছবিটিকে একসপ্লেন করে ছেড়েছে। চব্বিশ নম্বর ছবি এই ছবিকেই রঙে ও একটু ভিন্ন

শিশু আর মাদার তেরেসা। ফটো : প্রণব মুখার্জি

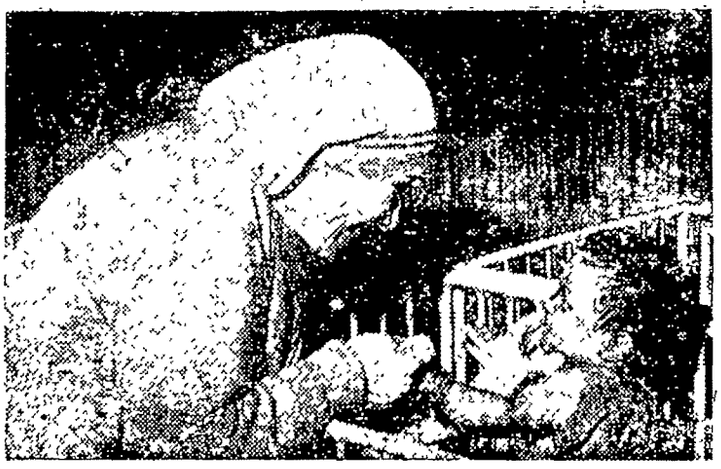

পরিবেশে পরিবেশন করা হয়েছে। সব থেকে চমৎকার ছবি তিনটি একটি সিরিজ। নাম কিত্রেয়েশন। সাত নম্বর ছবিতে পৃথিবী থেকে একটু উপরে শূন্যে এক পুরুষ ও এক রমণী আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের পুরুষটি পতনশীল, মৈথুনটিকে উড়িয়ে নেওয়া লাগতে পারে। একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় দুজনে দুজনের থেকে আলাদা হয়েও মৈথুনভঙ্গিমায়—মেয়েটি একটি হাঁটু তুলে, পুরুষটি জানু ভেঙে। পৃথিবীতে, একটি ছোট সাপ। আট নম্বর ছবিতে তারা দুজনে মাটিতে পড়েছে, লজ্জাবনত, চৈতন্যপ্রহৃত। ইন্দ্রিয়ভ জানবৃক্ষ ফলটি খানিকটা খাওয়া, সেই অংশটি প্রায় দাঁত বার করে আছে। আকাশে উঠে গেছে কালো সাপ। নয় নম্বর ছবিতে, ঐ পচা নষ্ট ফলটি হৃদয়ের দুকূলে গড়াচ্ছে, ঊর্ধ্বমুখ নরনারী দেখছে প্রবল বিস্ফোরণের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎবর্ণ সাপ। ঝড় ও ফিগার নিখুঁত এসেছে। এই ছবি অতি-নাটকীয় হবার ভয় ছিলো, কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে।

কিন্তু অন্যান্য ছবিতে ফালগুনী খুবই হতাশ করলেন। কাছাকাছি, একটি ন্যুড সুন্দর। তারপর ঘুরে ঘুরে যে সব ছবি দেখলাম তা অমূলভাবে ইবর্টিক্—অথবা, একটি অতিসরলীকৃত ধারণার ফসল।

শেষ আঠাশ নম্বর ছবিটি আবার ভালো লাগে। জলতল, জলের উপর জেগে থাকা পাথরখণ্ড ও চাঁদ। জলের নিচে নানারাবী, রক্তকমল, গুল্ম, পল্লব, দুর্গভাষা, প্রত্যেকটি বস্তুই যে জলাবদ্ধ, জলে অবস্থিত, জলের চরিত্র তাদের মধ্যেও সংক্রামিত—এটা ধরতে পারা যায়। যে চাঁদটুকু জলের ওপরে থাকে সেটা পাণ্ডুর; যে চাঁদ জলের নিচে তা উজ্জ্বল, মাঝখানে সংযোজকে বক্রতিমা। জলের ঘনতা ও তরলতা একই সঙ্গে চমৎকার এসেছে। এদেশের কোনো একটি বিখ্যাত ঔপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়।

বেকেট-এর একটি নাটকের তিনটি বাংলা প্রযোজনা একসঙ্গে কলকাতায় চললেও,

তথ্যবেত্তা খুব বেশি ভিড় হয়নি। ব্রেখট্ সোসাইটি এবং ভারত-জার্মান মৈত্রী সমিতি তাঁর নাটকের সটোগ্রাফ দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ২৬শে থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত।

ম্যানফ্রেড ওয়েকওয়ার্থ, ব্রেখট এর একজন বিশিষ্ট সহকর্মী হিসেবে একটি লেখায় জানিয়েছিলেন, 'নাইভিটি' নিয়ে ব্রেখট্ বেশি কথা বলতেন। এখন, নাইভ জিনিষটা কি? ব্রেখট্ বলতেন, দা অপোজিট অব নাইভ প্রেজেন্টেশন ইজ ন্যাচারালিজম। 'আমাদের পালাগুলোয় আমরা মূল গল্পটা বলি-বলবো।' 'দেয়ার কান বি অব দেয়ার শ্যাড বি আর্টিস্টিক অ্যাক্টস আইডিয়াজ, বাট দা মেইন থিং ইজ দা টেলিং অব আ নোটেবল ইভেন্ট।'

আমরা যাঁরা অভিনয় করি না কিংবা পরিচালনা করার আশা রাখি না, তাঁদের কাছে প্রদর্শিত ছবিগুলির মূল্য অন্য জায়গায়। ঐ নাইভিটি, যা নিয়ে অনবরত তর্ক বাধতো— নানাভাবে ব্রেখটকে নিরূপণ করতে হতো, তা কেমন আসছে বা আসছে না। ডেজ অব দা কম্যুনএর স্টিল দেখে, যে কেউই বুঝতে পারবেন যে ব্রেখট যখন বলতেন বুর্জোর সমস্ত মমতাকে সার্টিন চিত্রে নিয়ে এসে নাটক করাই নাইভ—তখন শুধুমাত্র কোনো আবেগচালিত উদ্দীপনা থেকে বলতেন না।

যদিও, এইসব আলোকচিত্রের নামকরণ নিয়ে যে অসুবিধে হবেই তা হচ্ছে ব্রেখটের জীবিতাবস্থায় সংক্রান্ত ঘটনাক্রম-গুলিকে ধরার অসুবিধে। অবশ্য এটা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র নাটকগুলির আলোকচিত্র-মালাই যথেষ্ট। ব্রেখটসঙ্গীতের স্কেচ, ড্রয়িংও এই সঙ্গে দেখানো হয়েছে। ছবিতে

প্রায়ই আপনি মিষ্টি আর শ্বেতসারপদার্থ খান তাতে আপনার দাঁতে দন্তক্ষয় রোগের ভয় থাকে আর আপনি দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পান।
এর হাত থেকে বাঁচার একটিই উপায়—বিনাকা ফ্লোরাইড* ব্যবহার ক'রে, দাঁত সুরক্ষিত রাখা।
পৃথিবীময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, টুথপেস্টে ফ্লোরাইডই হল একমাত্র উপাদান যা দাঁতের এনামেলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিশে দাঁত মজবুত বানায় আর ক্ষয় হতে দেয় না। বিনাকা ফ্লোরাইডের স্থায়ী গুণ দন্তক্ষয়ের জীবাণু

চিত্তরঞ্জন মাইতি

নগ-বিহঙ্গ

।। ৩ ।।

রাণীর সাজে সাজল মৃনালিনী আজ বুশেহারের মহারাণীর ছদ্মবেশে সাজতে হয়েছে তাকে। সর্ত অনুযায়ী আজ তাকে যেতে হবে গুর্খা সেনাপতির কাছে। সেখান থেকে গুর্খাদের মুলুকে। সঙ্গে থাকবে তার বিশ্বস্ত কজন পরিচারিকা। তারা বয়ে নিয়ে যাবে রাজকোষের বহুমূল্য রত্নপেটিকাগুলি। আগেই জানান হয়েছে, রত্নাধারগুলি দৃঢ়ভাবে অর্গলিকাবদ্ধ। তার থেকে ঝুলছে দক্ষ কারিগরের তৈরী সুদৃঢ় তালা। কিন্তু সমস্ত পেটিকার চাবিই রয়েছে বুশেহারের মহারাজের জিম্মায়। এটি মহারাজের গোপন রত্নাগার। গুর্খা সেনাপতি পেটিকাগুলিই চায়। সেগুলি তারা বুশেহারের মহারাণীর সঙ্গে নিয়ে যাবে তার দেশের মহারাজের কাছে উপঢৌকন হিসেবে। সেখানে তালা গুলি ভেঙে বের করা হবে রত্ন।

মৃনালের তদারকীতে কাট বিশ্বস্ত পরিচারিকা ক্ষিপ্রহাতে করে চলেছিল একটি জরুরী কাজ। তারা রত্নপেটিকাগুলির তালা খুলে মূল্যবান রত্নাবলী বের করে নিয়ে তার ভেতর ভরে রাখছিল ভারী ভারী শিলাখন্ড। তারপর পেটিকাগুলিতে শিলা পূর্ণ হয়ে গেলে তারা সেগুলিকে তালাবন্ধ করে একে একে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছিল।

সঞ্চোর সঙ্গে পরিকল্পনামত সব কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করল মৃনাল। করুণা করতেন আজ থেকে আপনিও তাই করবেন। আমি চললাম ভাগ্যের স্রোতে ভেসে। আজ আমার সান্ত্বনা এই, বাবা মহারাজকে যে বাক্য দিয়েছিলেন তা আমি রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। মহারাণী এতদিনে বাবা বদরীনাথের ইচ্ছায় আশাকরি নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন রাজধানীতে।

কেল্লাদারের চোখে জল। সে বলল, আমি যুদ্ধ করে প্রাণ দিতাম মা তবু তোমাকে ঐ গুর্খাদের হাতে তুলে দিতাম না। কিন্তু সব পরিকল্পনা তো তোমরাই করেছ। আমার এখানে কিছু বলার নেই।

মৃনাল বলল ভয় ছিল আমার মহারাণীকে নিয়ে। এখন কোন কিছুতেই ভয় নেই। কামদার মাহাসু রইলেন মাথার ওপর। তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

পাহাড়ী অজগর সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলেছে গুর্খা সৈন্যদের দীর্ঘ সারি। মাঝে সুসজ্জিত ডুলিতে চলেছেন ছদ্মবেশী মহারাণী। মনে হচ্ছে অজগরটা সদ্য একটি হরিণীকে গিলে উদরের ভেতর ভরে নিয়ে হেলতে দুলতে চলেছে।

ওদের একটু ওপরের পথে চলেছে পালসেব দল। সঙ্গে ভেড়ার পাল। সর্ত মত কিন্নরের সীমারেখা অতিক্রম না করা পর্যন্ত ওরা যোগান দিয়ে যাবে সৈন্যদের প্রয়োজনমত মাংস।

ভেড়াদের জন্যে চাই পাহাড়ী ঘাস পাতা। তাই পালসেরা চলেছে জন চলাচলের পথের ওপরে তাদের নিজস্ব ওম্ পথ ধরে।

সন্ধ্যার কিছু আগে রাণী পরি-

এখন তাঁরা যে দেশাং-এর ওপর দিয়ে চলেছেন সেখানকার দেবতা, নাগ। নাগ দেবতাকে পুজো দিলে পথের বিপদ কেটে যাবে।

রাণীর অভিপ্রায়ে খুশী হয়ে উঠল গুর্খা সেনাপতি। সারি সারি তাঁবু পড়ল খরস্রোতা শতদ্রুর তীরে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে আদিম পাহাড় শুঁড়ঝোলা ঐরাবতের মত। তার ঠিক প্রলম্বিত শুঁড়ের অগ্রভাগে নাগ দেবতার মন্দিরের ধ্বজা দেখা যাচ্ছে।

রাণী সেনাপতির অনুমতি নিয়ে ধাপে ধাপে পাহাড় বেয়ে উঠলেন নাগ মন্দিরে পুজো দিতে। সঙ্গে রইল পরিচারিকার দল।

রাণী মন্দিরে পৌঁছে পুজো দিলেন। ঘন্টাধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। পুজো শেষে রাণী নেমে এলেন নির্দিষ্ট তাঁবুতে। সেনাপতির শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন প্রসাদ ও প্রসাদী ফুল। পুজোর দ্রব্যসামগ্রী পেয়ে খুশী হল সেনাপতি।

পরদিন সন্ধ্যার বেশ কিছু আগে সৈন্যদলের চলা বন্ধ হল সেনাপতির আদেশে। মহারাণীর সেই একই ইচ্ছা, মহাকালীর মন্দির দেখা যায়, সুতরাং সেদিনের মত যাত্রা বিরতি।

সৈন্যদের শিবির পড়ল পাহাড়ের কোলে। খরস্রোতা শতদ্রু তেমনি নিত্য সঙ্গী হয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে চলেছে।

ভোজন আর প্রয়োজনীয় কর্মের আয়োজনে মাতল সৈন্যদল। রাণী পরিচারিকাদের নিয়ে মহাকালীর মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন। সেনাপতি নিজের শিবির থেকে চেয়ে চেয়ে দেখল মহারাণীকে। দামী আংলাকের অবগুণ্ঠন মাঝে মাঝে সরে সরে যাচ্ছিল রাণীর মুখ থেকে। চকিতে মুখের অংশবিশেষ উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল বেলা শেষের ছলছল আলোয়। সেনাপতি যেন আর চোখ ফেরাতে পারছিল না সেই সুন্দর মুখখানার ওপর থেকে।

রাণী পুজো সাঙ্গ করে মন্দিরে দীপ জ্বালিয়ে ফিরে এলেন। সে রাত্রি সেই দেশাংএই অতিবাহিত করল বিশাল বাহিনী। ঠিক তাদের ওপরের পাহাড়ে রইল পালসের দল। সারারাত শোনা যেতে লাগল তাদের গান। প্রজ্বলিত আগুনের চারদিক ঘুরে ঘুরে তারা নাচতে লাগল সেফ্ গিয়াচা। নীচ থেকে তাদের নাচ দেখে আর গান শুনে গুর্খা সৈন্যরা হৈ হৈ রব করতালি দিতে লাগল।

রাণী সঙ্গে এনেছিলেন কামরূপের বিখ্যাত মদ অঙ্গুরী। সেনাপতির কাছে তাই পাঠিয়ে দিলেন। এমনি রাণীর মুখের অংশবিশেষ দৃষ্টিপথে এসে পড়ায় বুকের ভেতর ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল সেনা-

আবার পরদিন প্রভাতে যাত্রা। বিশাল পল্টন চলল এগিয়ে। এই পার্বত্য পথটি অতীব দুর্গম। কখনো মৃত্তিকা সংলগ্ন বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডসঙ্কুল পাহাড়। কখনো বা আদিম আগ্নেয় শিলার দৈত্যাকৃতি মূর্তি। অতি ধীরে অতি সাবধানে পথ অতিক্রম করে চলছিল সৈন্যদল। নদী ধারও এখানে বহু নিম্নে। একটা ভয়ঙ্কর গোঙানির আওয়াজ উঠে আসছিল নদীগর্ভ থেকে। ওপরে চূর্ণ মৃত্তিকার গাত্র সংলগ্ন বড় বড় শিলাখণ্ড। যেন চলমান বাহিনীর মস্তক লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উদ্যত। নীচে গভীর গিরিখাদ এই কটি উদ্ধত প্রাণীকে মুহূর্তে গ্রাস করে নেবার জন্যে বুভুক্ষু চোখে তাকিয়ে আছে। কারো মুখে কথা নেই। শুধু পায়ে চলার সম্মেলক শব্দ। কখনো বা পায়ের ধাক্কায় সরে যাওয়া নুড়ির লাফাতে লাফাতে নিচের দিকে গড়িয়ে চলার দৃশ্য।

মধ্যাহ্ন গড়াল অপরাহ্নে। সূর্য ডুবল পাহাড়ের আড়ালে। পশ্চিমে দোখাংএর তুষার চূড়ায় চূড়ায় লাগল রক্তের রঙ। সে রক্তস্নাত হিমবাহের গতিপথ ধরে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে। মন্ত্রপূত শাণিত অস্ত্রের মত ধৌলাধারের ঠিক মাথার ওপর সংলগ্ন হয়ে আছে।

সেনাপতি আদেশ করেছিলেন শিবির স্থাপনের জন্য কিন্তু মহারাণী বিশেষ একটি অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পরিচারিকার হাতে খবর দিয়েছিলেন, এই স্বপ্নী দেশাং-এ পাশাপাশি দুই জাগ্রত দেবতা রয়েছেন। একজন নাগেশ আর অন্যজন বাথরসুনা। এই দুই দেবতার পূজো আজ সন্ধ্যায় দিতে হবে। সামান্য কিছু পথ অগ্রসর হলেই পর্বতগাত্রে তাঁদের মন্দির দেখা যাবে। বিশেষভাবে বাথরসুনা হলেন অঘটনের দেবতা। তিনি ক্রুদ্ধ হলে এই মৃত্তিকাময় পর্বত থেকে পাথর ফেলে ধ্বংস করে দেবেন তাঁর অবমাননাকারীদের। তাই আর একটুখানি অগ্রসর হয়ে যাত্রা বিরতি হোক।

সেনাপতি ভেবে দেখল, কথাটা ঠিক। আজ রাত্রিবাস করতে হবে এই ভঙ্গুর মৃৎ-শিলাময় পর্বতকোলে। সুতরাং রাণীর কথামত পর্বত-দেবতাদের পূজোয় সন্তুষ্ট করাই সমীচীন।

চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় এক সময় সমস্ত পল্টন এসে পৌঁছল নির্দিষ্ট স্থানে। ক্লান্ত সৈনিকেরা প্রয়োজনীয় শিবির সংস্থাপন ও রন্ধন প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত হয়ে গেল।

রাণী সেনাপতির কাছে আঙ্গুরী পাঠিয়ে দিলেন। পরিচারিকার মুখে বলে পাঠালেন, রাতে চন্দ্র যখন অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে থাকবে তখনই পূজার যথার্থ লগ্ন। পূজা দিয়ে রাণী পরিচারিকাদের সঙ্গে অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠার আগেই নেমে আসবেন। পাহাড়ী পথ বিপদসঙ্কুল বলেই অনেক সাবধানতার সঙ্গে ওঠানামা করতে হবে।

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা পুরস্কার লাভ করুন

প্রবেশ মূল্য নেই আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

উদাহরণ

মোট ২৪

৫	১০	৯
১২	৮	৪
৭	৬	১১

	১২	
	১০	
	৮	

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউণ্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারাণ্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ৩০....খাড়াভাবে, সমানভাবে, কোণাকুণিভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ২৫শে আগষ্ট, ১৯৭৮ আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

ওয়ারলেস কর্পোরেশন (এ সি)
গান্ধীনগর,
দিল্লী ১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান

Wireless Corporation
(AC)
Gandhi Nagar
DELHI-31

সেনাপতি আঙ্গুরী সুরা গ্রহণ করল। পরিচারিকার মুখে বলে পাঠালেন, কয়েকজন মশালধারী রাণীকে পথ দেখিয়ে পাহাড়ের ওপর মন্দিরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য রাণী যদি প্রয়োজনবোধ করেন।

মহারাণী খবর পাঠালেন, মশালধারীর কোন প্রয়োজন নেই। তবে কয়েকটি মশাল যদি মহামান্য সেনাপতি পাঠিয়ে দেন তাহলে তাঁর পরিচারিকারাই তা বহন করে নিয়ে যাবে। মহিলাদের এই পূজো অনুষ্ঠানে পুরুষদের উপস্থিতি কিছু পরিমাণে অস্বস্তির সৃষ্টি করতে পারে।

সেনাপতি মহারাণীর কথামত কতকগুলি মশাল রাণীর শিবিরে পাঠিয়ে দিল।

চাঁদ ম্লান হয়ে এসেছে। সেনাপতি তার শিবির থেকে একসময় দেখল, কতকগুলি মশাল পাহাড়ের চড়াই পথে উঠে চলেছে। পাণ্ডুর চাঁদের অস্পষ্ট আভায় মশালধারিণীদের চেনা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, একটা অগ্ননাগ যেন উঠে চলেছে পাহাড় বেয়ে।

একসময় পাহাড়ের আড়ালে মশালগুলো অদৃশ্য হল। কিছু পরেই শোনা যেতে লাগল ঘণ্টাধ্বনি। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘণ্টাধ্বনি উঠল। অন্ধকারের বুকে সে শব্দ পুরাণকথিত কোন অতিমানবের ধনুকের টঙ্কার ধ্বনি বলে মনে হতে লাগল।

সেনাপতি রাণীর পাঠান আঙ্গুরী আকণ্ঠ পান করে প্রায় হতচেতন অবস্থায় পড়েছিল। তার কানে ঐ ঘণ্টাধ্বনি মনে হচ্ছিল যেন একদল নর্তকীর নূপুরের আওয়াজ। নর্তকীমণ্ডলীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বুশেহারের মহারাণী। তার ভুবনী চোখের চাহনি তীরের মত বিঁধে রয়েছে সেনাপতির বুকে। গুর্খা সেনাপতির মনে হচ্ছে, এই দীক্ষাশাষকে তার যদি মৃত্যু হয় তাহলে তা হবে তার কাছে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু।

মৃত্যু নামল। একেবারে অভাবনীয় মূর্তিতে নেমে এল মৃত্যু।

ওপরের শিলাস্তরের সংলগ্ন মৃত্তিকা বহুদূর পর্যন্ত ধসিয়ে ফেলেছিল পালসের দল। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছে সারাদিন ধরে সঙ্গো। এই স্থানটি ছিল শত্রু তৃতীয়ায় সম্মেলনের নির্দিষ্ট স্থান। একদল পালস আগে এসেই সঙ্গোর সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছিল। তারপর এল সেনাবাহিনীর সহযাত্রী পালসের দল। ওরা এখন তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সৈন্যদের শিবিরের দুই প্রান্তে দুটি দল। মাঝে একটি বৃহৎ দল সামান্য ব্যবধানে বসে রয়েছে শিলাস্তূপের অন্তরালে আত্মগোপন করে।

সব ঘণ্টা একসময় থেমে গেল। হঠাৎ নাগেশ আর বাঘরসুনার, জয়ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করে বেজে উঠল। এতগুলি পুরুষ আর নারী কণ্ঠের ঐকতানে পাহাড় যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠল। ভীতি-বিহ্বল সৈন্যরা বেরিয়ে এল তাঁবুর বাইরে। কেউ বা ছুটল সেনাপতির শিবিরের দিকে মশাল হাতে নিয়ে। এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুর দিকে ভয়ার্ত প্রশ্নবোধক ডাক-হাঁক শুরু হয়ে গেল।

ভংকর শব্দ তুলে গড়িয়ে আসতে লাগল বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড। পালসেরা ওপরের প্রস্তর স্তূপে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল নীচে। আর সেইসব পাথরের ধাক্কায় ধাক্কায় সেতারের মত নামছিল ছোট-বড় শিলাখণ্ডগুলি। একটি পাথর স্থানচ্যুত করছিল শত শত প্রস্তর খণ্ডকে। অন্ধকারের সঙ্গে সমস্ত স্থানটিকে আবৃত করে দিচ্ছিল ধূসোর মেঘ। মশালের আলোতেও পথ চেনা দুষ্কর। তাছাড়া পালাবার সব পথই বন্ধ। সামনে গভীর খাদ আর ভীম প্রবাহিণী শতদ্রু অন্ধকারে হাঁ করে রয়েছে। পাহাড়ের ওপরে ওঠার প্রশ্ন তো দূরের কথা, সেদিকে দৃষ্টিপাত করাই অসম্ভব। এদিকে সৈন্যবাহিনীর দুই প্রান্তের পথ প্রস্তর স্তূপে আকীর্ণ

অর্ধ প্রহরও অতিক্রান্ত হল না সব আর্ত কোলাহল নীরব হয়ে গেল। জুড়ে ছয়ে গেল পথের চিহ্ন। শুধু ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়ে রইল লুণ্ঠনকারী গুর্খাদের বিরাট বাহিনী।

মুনাল বলল, চলো কামরুর পথে যাত্রা করি।

সঙ্গো বলল, চলো। তোমাকে প্রাসাদে রেখে আসি।

মুনাল বলল, এখনও কি তুমি তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে সঙ্গো?

সঙ্গো কিছু না বলে গভীর আবেগে মুনালের হাতখানা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে চুম্বন করল। অন্ধকারে সে দৃশ্য কেউ দেখল না, শুধু দুটি হৃদয় তা অনুভব করল।

ভোরের সূর্য যখন সোনা ছড়িয়ে দিল বরফের পাহাড়ে পাহাড়ে আর নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়াতে লাগল বরফানি পাঁখির দল তখন সঙ্গো চলতে চলতে মুনালকে বলল, আমার দলের পালসেরা সাংলার দিকেই চলেছে। তারা তোমার পরিচারিকাদের কামরু প্রাসাদে রেখে আসবে। কিন্তু তোমার কি ওখানে না গেলেই নয় মুনাল?

মুনাল একটু চিন্তা করে বলল, রাজকোষের সমস্ত রত্নই আমি তোমার পরিকল্পনা মত কেল্লাদারের জিম্মায় রেখে এসেছি। মহারাজ কামরুতে ফিরলে তাঁর সব রত্নই ফিরে পাবেন।

তবে তোমার যাবার প্রয়োজন?

আমি উজীরের মেয়ে সঙ্গো। আমারও কিছু সোনা, মণিমাণিক্যের সঞ্চয় আছে। সেগুলি আনতেই আমার যাওয়া।

সঙ্গো বলল, কি হবে ঐ সোনা, হীরে, মণিমাণিক্য মুনাল? দেখছ না ধোঁয়াধারের পা বেয়ে গড়িয়ে আসছে সোনা। শতদ্রুর জলের কণায় হীরের ঝলকানি। আর আমার হৃদয়ের পেটিকা খুলে দেখার মতের অন্ধকারে। তুমি সেই অগণিত উজ্জ্বল ভাবা-রত্নগুলিকে গুনে গুনে শেষ করতে পারবে না। এতদিন তো প্রাসাদের ঐশ্বর্যের মাঝখানে কাল কাটিয়েছ মুনাল, এখন উন্মুক্ত পাহাড়ে প্রান্তরে আমার বুকে মাথা রেখে দেখ নতুন কোন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাও কিনা।

মুনাল চলার পথে সঙ্গোর হাতখানা চেপে ধরে বলল, আমাকে তোমার ঐ রাজ্য নিয়ে চল সঙ্গো, আমি আর কোথাও যেতে চাই না।

শেষ

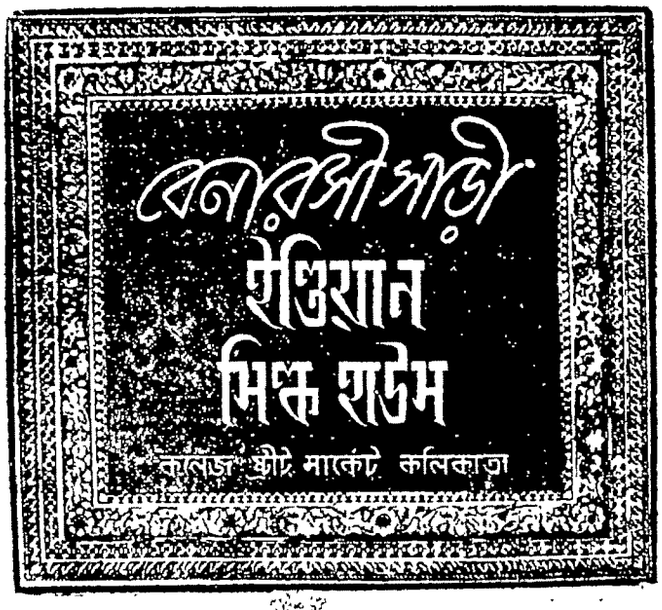

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

অনেক কথাই সে ভাবে। কিন্তু বলতে পারে না। রাজনীতি করার সময়েও সে বোঝে, সে বস্তির বাসিন্দা। স্কুলের গন্ডী পেরোয়নি। কোনো সভা বা আলোচনায় নন্দিতা কিংবা ভারতীয় মতামত তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। তারা পাকা বাড়ীতে থাকে। ময়লা লাট খাওয়া শাড়ী। কিন্তু দামী। অগোছালো রুক্ষ চুল। কিন্তু শ্যাম্পু করা। কোনো জায়গাতেই সে পাত্তা পায় না। বড়ো খেলো মনে হয় নিজেকে। তখন কিশোরের ওপর রাগটা আরো বাড়ে। গা'য়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা ধারালো হয়। লড়ায়ের মাঠে নন্দিতা, 'ভারতীদের সঙ্গে ও মোকাবেলা করতে চায়। পুরুষ জাতটাও অদ্ভুত। এখানে বাম ডানে কোনো ফারাক নেই। কথায় বক্তৃতায় মেয়েদের মাথায় তোলে। কাজের সময় সিঁটিয়ে যায়। অধিকার ছাড়তে হাত কাঁপে। তখন মনে হয় এইসব আদর্শ, তত্ত্ব ফাঁকা বুলি। সাজানো ব্যাপার। পার্টি মেয়েদের গাঁয়ে যেতে বলেছে। সেখানে তাদের অনেক কাজ। গাঁয়ের মেয়ে আর শিশুদের বানাতে হবে। আদর্শ প্রচার করতে হবে। কিন্তু কোনো মেয়ে যেতে চাইলেই টালবাহানা করে, এড়িয়ে যায়। কিশোরও তাই করছে। বাবা আজকাল ঘন ঘন বেহুঁশ হয়। জ্বর আসে। মাথার কোষগুলো নাকি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছে, লক্ষণ ভালো নয়। একদিন হয়তো ঘুম ভাঙবে না। অফিসেও প্রায় কামাই। শরীর, মন দুটোই অচল। বোনগুলো পড়ছে। রুনু ভাই। রেবা ভীতু নয়। তবু পায়ের তলায় মাটি কাঁপে। এই বস্তি, সংসার, চার পাশের মানুষজন সবাই যেন একদিন তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। ও ভাবে আমি যেন শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী থাকতে পারি।

।। চোদ্দ ।।

দ্যুতি এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। পার্টি দেখা করবে। এখনি চলুন। ও নাচায়। কিশোর তৈরী ছিল। উঠে পড়ে। বেরা ঘরে যায়। বাস্তায় অন্ধকার ঘন নয়। সব বাতি জ্বলেছে।

সামনে হৈ চৈ কান্ড। একটা ছোটো জটলা। আলোর হাত ধরে ঘোষাল কাকা টানছে।

আলোর আর একটা হাত বিশুর দখলে।

'ছেড়ে দিন বলছি'—বিশু তড়পায় —'মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলে কিন্তু খুব ঘড়াৎ কেস্ হয়ে যাবে।'

রাগে ঘোষাল কাকার চোখমুখ লাল। কথায় তোতলামি—আলো বাড়ী আয়। দুজনের টানাটানিতে আলোর নড়ার শক্তি নেই। বস্তির ছেলেমেয়েরা মজা দেখছে। পথচলতি দু একজন থমকে দাঁড়ায়। ছোটোলোকের কান্ড ভেবে সরে যায়। বিশুর চেলারা চেঁচিয়ে ওঠে—চামেলি চুলকে দে।

আমাকে জামাই করতে হবে—বিশু তম্বি করে। সঙ্গীরা হাসে। দ্যুতিকে দেখে হঠাৎ গোটা ভিড়টা কেমন খাপছাড়া হয়ে যায়। কিশোরও ঠিক বোঝে না। বিশু আলোর হাত ছাড়ে। চেলারা ছিটকে যায়। গোটা ছবিটা নিমেষে রঙ বদলায়।

দ্যুতি হিম চোখে ওদের দেখে। ঘোষাল কাকা মেয়েকে নিয়ে চলে যায়। বিশু চায়ের দোকানে ঢোকে। কিশোর আর দ্যুতি দাঁড়ায় না।

খালপারের এই ঘরটায় কিশোর আগে আসেনি। ফাঁকা রাস্তা। [illegible] ময়লার বাজরুট। বাঁশ আর খড়ের স্তূপ। খালে জল প্রায় নেই। ঘন কালো রঙ। দু'একটা নৌকো রয়েছে।

কিছুটা এগিয়ে দ্যুতি বলে, এসে গেছি। ডানদিকে একটা সরু গলি। বাঁদিকে কয়েকটা বাড়ী। দ্যুতি একটা বাড়ীর বন্ধ দরজায় টোকা দেয়। ভেতরে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। দরজা খুলে যায়। আবছা অন্ধকারে গণপতিকে কিশোর দেখতে পায়। গণপতির মুখ গম্ভীর। গণপতি আবার দরজা লাগায়। ওরা দুজন গণপতির সঙ্গে চুপচাপ সিঁড়ি ভাঙে। ভেতরদিকে দোতলায় একটা ঘর। তিনদিকের দেয়াল জুড়ে অনেকগুলো কাঁচের আলমারি। ঠাসা বই। ঘরে আলো জ্বলছে। চেনা অচেনা আটদশটা মুখ। কিশোরকে দেখে তমাল এগিয়ে আসে। একজনকে দেখিয়ে তমাল বলে, অশ্বিনী মুর্মু। গুরুদাস মুখুর্জ দাদা। সুদেব, শশী, গুরুদাস ডেবরায় কাজ করতো। ঠ্যাঙাড়েরা তাদের খুন করেছে। তমাল আছে গোপীবল্লভপুরে। খাটের ওপর সূর্যদা বসে আছে। সূর্যদা নেতা। খাটের পাশে অক্সিজেন সিলিন্ডার। রোদে-বৃষ্টিতে জ্বলে যাওয়া সূর্যদার শুকনো চেহারা। কিশোর নেতাকে আগে দেখেনি। ছবি দেখেছে। চিনতে অসুবিধে হয় না। গেরিলা যুদ্ধের নীতি ও কৌশল নিয়ে কথা হচ্ছিল। খতম মানে খুন নয়, শ্রেণীঘৃণার চরম প্রকাশ। চেয়ারম্যানের নাম করে যারা আজ খতম অভিযান আটকাবে, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। কথার শেষে সূর্যদা হাঁপায়। দু চোখ বুজে দম নেয়। কিশোর ঘরের সকলকে দেখে। একজন মাঝবয়েসী মহিলা ঘাড় পর্যন্ত চুল, ঠোঁটে ঘন লাল রঙ, সোফায় বসে আছে। মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ীটা আলোয় ঝক-ঝক করে। তার ডান পাশে একজন সাদা চামড়ার মানুষ। বোধহয় ইংরেজ।

তমাল বলে ওরা দুজন ব্রিটিশ পার্টির প্রতিনিধি। সূর্যদার কথাগুলো মহিলা ইংরিজিতে অনুবাদ করে। সাদা-চামড়া মন দিয়ে শোনে। মাথা নাড়ে। নীচু গলায় কি যেন বলে। মহিলা ফিসফিস করে জবাব দেয়। কিশোর শোনে—ভারতবর্ষে এছাড়া পথ নেই। ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ ধীর, স্থির বুদ্ধিমান। আলোচনার নোট রাখছে। যুবকই প্রশ্ন তুলছে। খতম মানে কি? সে জানতে চায়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দাপট শেষ করা। তাই কি? সূর্যদা তাকায়। মুখে, চোখে ক্লান্তির ছাপ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তারী টেস্টের মতো সূর্যদার চোখ জ্বলে। জবাব দেয়—নিশ্চয়ই। দরকার হলে শারীরিকভাবেও শেষ করা।

পুণ্যদা আবার থেই ধরে। ছোটো-খাটো চেহারা। পঞ্চাশ পেরিয়েছে। পরনে প্যান্ট আর বুশশার্ট। পকেটে তিনটে কলম। চশমার আড়ালে চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। [illegible] ডিরিশ

বছরের বেশি কম্যুনিস্ট আন্দোলনে আছে। কিশোরের সঙ্গে আগে কয়েকবার দেখা হয়েছে। মাইডিয়ার লোক। তাজা, টগবগে। বয়েস হেরে গেছে।

আসল কথা হচ্ছে শ্রেণীঘৃণা। দেশের চল্লিশ কোটি গরীব মানুষ রাগে, ঘৃণায় ফেটে পড়ছে। তারা বুঝছে মারের বদলা মার। তাছাড়া উপায় নেই। এতোকাল শত্রুরা মেরেছে। এখন আমরা মারছি। পাল্টা মার খেয়ে ওরা চেঁচাচ্ছে। খুন, জখম বলে হুল্লা তুলেছে। শ্বেত সন্ত্রাসের জায়গায় লাল সন্ত্রাস শুরু হলেই এটা হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটা মনে করে না। শ্রমিক কৃষকের ইজ্জত বোধ জেগেছে। শাসক শ্রেণীগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ঘৃণায় ফুটছে। পুণ্যদা চুপ করে।

সাহেব কিছু বলতে যায়। তার আগেই সূর্যদা শুরু করে, সারা দেশ জুড়ে পার্টির কর্মীরা জীবন দিচ্ছেন। অনেকে মারা গেছেন। তাদের মৃত্যু হাজার হাজার বিপ্লবীর জন্ম দেবে। সত্তরের দশক মুক্তির দশক হবে। হঠাৎ কি যে অলৌকিক হাওয়ায় নেতার মুখের ক্লান্তি কষ্ট মুছে যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস, রাজনীতি, বিপ্লবী যুদ্ধের ব্যাখ্যা শুরু হয়।

ইংরিজিতে। ঘরের সকলে চুপ। কিশোরের বুক ভরে যায়। অনেক বাঁধা, জটিলতা কাটে। নিজেদের অস্তিত্ব ফলকে আমরা যেন ছোট করে না দেখি। সূর্যদা শেষ করে। দুচোখে জল। চোখের পাতা উপচে মুখ ভেসে যায়। বাবুলাল, পঞ্চাদিং, সুদেব, শশী, গুরুদাসের সঙ্গে আরো হাজারো কমরেডের আত্মত্যাগের কাহিনীতে গলা ভিজে। ঘরের হাওয়ায় হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেছে। কি এক রোমাঞ্চ চারপাশে থমথম করে।

বব চুল মহিলা কাঁদছে। পালিশ করা মুখের ওপর মুক্তোলী জলের সোত পরিষ্কার দেখা যায়। ফোঁপানির শব্দ। রুমালে চোখ মুছে বলে—আমি দেশে ফিরতে চাই। এখানের লড়ায়ে আমায় নেবেন কি? মহিলার ভাঙ্গা গলা। ঠোঁটের তলায় লিপস্টিক নেমেছে।

সূর্যদা একপলক দেখে। জবাব দেয়—আপনি য়ুরোপে যাও সে তার এর চিন্তা-ধারা প্রচার করুন। সেখানেও গরীব মানুষ আছে। শ্রমিকশ্রেণী আছে। তাদের সঙ্গে থাকুন। তারাই দেশঘর। বিদেশী কমরেডরা একটু পরেই উঠলো। পুণ্যদা অপেক্ষা করছিলো। সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ট খুলে ফেললো। তলায় লুঙ্গি। আঃ একটু আরাম হলো। পুণ্যদা লম্বা শ্বাস ফেলে।

মানুষের ঘৃণা কোন স্তরে গেছে ভাবলে অবাক লাগে—পুণ্যদা শুরু করে—ভবানীপুরে একটা দেওয়ালে লেখা হয়েছে—শুয়োরের বাচ্চা ধরমবীর ও তার জারজ সন্তান বি, বি, ঘোষের মুণ্ডু চাই। খুশীতে পুণ্যদার মুখ ঝলমল করে। এসব কথা পার্টি শেখায়নি। অনেক দুঃখ, যন্ত্রণার এগুলো বেরিয়েছে। নাক কুঁচকোলে চলবে না। এর নাম অভ্যুত্থান। পুণ্যদা নামকরা সাংবাদিক। এক সময় ভালো কবিতা লিখতো। কিশোর ভাবে, গলামন্দ না করাই ভালো। বলতে সাহস হয় না। সকলে হয়তো অবাক চোখে তাকে দেখবে। ঘরের ভিড় পাতলা হয়। তমাল ওঠে। বলে—আবার দেখা হবে। বাড়ীর ভেতর থেকে একজন প্লেটভর্তি সন্দেশ আনে। গণপতির হাতে দেয়। সূর্যদার সামনে টেবিলের ওপর গণপতি প্লেট রাখে—আপনার জন্য শিবুদা পাঠিয়েছে, গণপতি বলে।

তামাক কোথায়? সূর্যদা বলে—সন্দেশের চেয়ে তামাক এখন বেশী দরকার। সূর্যদা এতোক্ষণে কিশোরকে দেখে। পুণ্যদা পরিচয় দেয়, বীরভূম পার্টি। সূর্যদা সন্দেশের থালা এগিয়ে দেয়। বলে-খাও। বাঙ্গে তাকে কিশোরকে।

তোমাদের খবর পেয়েছি—সূর্যদা বলে—লড়াই-এ সুফল-পরাজয় আছে। কিশোর বোঝে, তাদের ধরা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

শহরে যাবে না। সূর্যদা শুরু করে। জোতদার, ধনী কৃষকদের এলাকাতেও নয়। দরিদ্র আর ভূমিহীন কৃষককে চেনো, বোঝো, তাঁদের গুরু বলে মানো। বিপ্লবের স্বপন দেখাও ওদের। চেয়ারম্যানের তিনটি লেখা পৌঁছে দাও ওদের কাছে।

কিশোর এই প্রথম সূর্যদাকে দেখলো। মুখোমুখি কথা বললো। পার্টি গড়া, দু' লাইনের লড়াই, গেরিলা স্কোয়াড নিয়ে আলোচনা হলো। গেরিলা যুদ্ধ চালানোর জন্যে চেয়ারম্যান মাওয়ের চারটে নীতি কিভাবে মানতে হবে, সূর্যদা প্রায় ছক করে বোঝালো। কিশোরের বুকে খুশীর ঝড় বইছিলো। সূর্যদার মতো নেতা চাই।

এখন অনেক কাজ বুক ফুলিয়ে করা যায়। উৎসাহে ও টগবগ করছিল। বিন্দু ভাঙ্গাই এই মুহূর্তের কাজ—সূর্যদা বলে—একটা গ্রাম, একটা স্কোয়াড একটা খতম। অর্থনৈতিক লড়াই নয়। মজুরী, জমি ফসলের আন্দোলন করলে গোড়ভায় পড়বে। খতম শব্দটা কিশোরের কানে খোঁচা লাগায়। যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ। দুটো বিরুদ্ধ বাহিনী লড়বে। সেখানে একজন মানুষকে জবাই করার কি দরকার? সূর্যদা ওর মুখের দিকে তাকায়। খতম হলো গেরিলা যুদ্ধের বীজ, জনযুদ্ধের সূচনা। গরীব কৃষকের উদ্যোগ জাগাতে এছাড়া উপায় নেই। প্রতিবিপ্লবী হিংসার একচেটিয়া অধিকারের নাম গান্ধীবাদ আর বিপ্লবী হিংসা দিয়ে তাকে মোকাবিলা করার নাম মাও সে তুং চিন্তাধারা।

মারার সময় বেশী কষ্ট দেবে না। দীনুদা বলে। গোড়ালির ঠিক ওপরে একটা কার্টারির কোপ লাগালেই, ব্যস, খেল খতম। জোতদার ব্যাটা আর উঠতে পারবে না। এ নিয়ে আমরা গবেষণা করছি।

অনেক বছর আগে দীনুদা শরীর-তত্ত্বের ওপর একটা চটি বই লিখেছিলো। নাম বোধহয়, দেহ মন প্রাণ। দীনুদার কথাটা ভাই ফ্যালনা নয়। দীনুদা ইংরেজিতে এম-এ।

চারপাশে এখন কোনো শব্দ নেই। এমনিতেই এ পাশটা নিরিবিলি। মানুষজন কম। রাত বাড়তে সবাই গর্তে ঢুকেছে। বাইরে বেশ ঠান্ডা। ধোঁয়া আর কুয়াশায় জড়াজড়ি।

একমাত্র গেরিলা যুদ্ধই পারে জনগণের সৃজনী শক্তির দরজা খুলতে—সূর্যদা যোগ করে। কনভেনশনাল আর্মস ব্যবহার করবে। প্রচলিত হাতিয়ার। কাটারি, কুড়ুল, কাস্তে। বন্দুক টন্দুক এখন নয়। গরীব কৃষকদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার আশা দেবে না। বিপ্লব ছাড়া আর কিছু পাবার নেই। খতমের তালিকা গরীব মানুষেরাই বানাবেন। জমি বা সম্পত্তির পরিমাণ দিয়ে শোষক ঠিক হয় না। অত্যাচারী বদ লোক-দের গাঁয়ের মানুষ চেনেন। তারাই খুঁজে বার করবেন। কিশোর আর যুক্তি পায় না। সব কিছু কেমন গুলিয়ে গেছে। খতম মানে খুন নয় শ্রেণীঘৃণা, গেরিলা যুদ্ধের শুরু। এই কথাটা মাথায় বিঁধে থাকে। সূর্যদা আন্তানায় ফিরবেন। একজন ট্যাক্সি ধরতে যায়। অক্সিজেন সিলি-ন্ডারটা গণপতি দরজার কাছে রাখে। একটা প্রশ্ন এখনও করা হয় নি। সামান্য উশখুশ করে কিশোর কথাটা তোলে। রেখা গানে যেতে চায়। সূর্যদা ওর দিকে তাকায়। বলে না। মেয়েদের এখন আর গাঁয়ে যাওয়ার দরকার নেই। অনেকগুলো কেস আমরা দেখলাম। এখন গাঁয়ে ওদের থাকা মুস্কিল। এটা সংগঠন তৈরীর সময়। ওরা বোঝা বাড়াবে। মুক্ত এলাকা হলে ওরা যাবে। ওদের কাজ শুরু হবে। বরং শহরে ওরা এখন ভালো কাজ করতে পারবে—গণপতি ফোড়ন কাটে—শহরেও আমরা খতম অভিযানে নামবো।

ঠিকই—সূর্যদা সায় দেয়—গ্রাম, শহর এখন একাকার। সব জায়গাতেই আমরা আক্রমণ চালাতে পারি। এটা মুক্তির দশক। অনেক তাড়াতাড়ি লড়াই শেষ হবে।

শেষ কথাগুলো কিশোর বোঝে না। আলোচনারও সময় পায় না। ট্যাক্সি এসে গেছে। গণপতির কাঁধ ধরে সূর্যদা এগোয়। কিশোর ভাবে, প্রথম রাউন্ডেই গণপতি জিতলো। শ্রেতার কথা নয়। হঠাৎ উদয় হয়েই গণপতি নেতা সেজেছে। কোথা থেকে এলো, কার হাত ধরে ঢুকলো, কিশোর ভেবে পায় না। গণ আন্দোলনের দিনে কিশোর কোথাও ওকে দেখে নি।

ঘরে এখন পুণ্যদা ছাড়া কেউ নেই। কিশোর বসে থাকে। দুর্গতি এলে উঠবে। পুণ্যদা বলে—গাঁয়ে মেয়েদের না নিয়ে যাওয়াই ভালো। এই মেয়েদের লোভে জোতদার, মহাজনরা পেছনে লাগবে। ওরা মেয়েমানুষের গন্ধ পায়।

পুণ্যদার সঙ্গে খোলামেলা কথা হয়। শহরে গেরিলা যুদ্ধ প্রসঙ্গে পুণ্যদা বলে, অতো ভেবো না। নেতা আঁকড়ে ধরো। এও

বিনামূল্যে!

卐 স্বস্তিক
নিম সাবান

卐 স্বস্তিক
ডিটারজেন্ট পাউডারের
১ কিলো প্যাক
কিনলে

তাড়াতাড়ি আসুন!
স্টক সীমিত!

স্বস্তিক ডিটারজেন্ট কাপড় ধোওয়ার পাউডার
হাতে কম সময় চেয়ে... কাজে ভাল দেখুন ধুয়ে

একটা সাধনা। তপস্যাসাধনার মতো। সূর্যদাব কাছে আমি নাড়া বেঁধেছি।

পুণ্যদাব কথায় কিশোব মজা পায়। মনেব ভাব হালকা হয়। পুণ্যদা নিজেব জীবনেব কথা বলে। তখন কাগজেব অফিসে চাকবি কবি। অফিসে স্ট্রাইক শুরু হলো। সাবাবাত অফিস গেটে পাহাবা দিয়ে বাড়ি এলুম। তাবপব গায়ে হলুদ হলো। বাতে বিয়ে করতে গেলুম। মাথার মধ্যে একটাই চিন্তা, হবতাল কেমন চলেছে। মন্ত্রফন্ত্র শুনতে পাচ্ছি না। পরদিন বাড়ী ফেরাব পথে গাঁটছড়া খুলে অফিসেব সামনে নেমে গেলুম। পবনে বিয়েব জরিপাড় ধুতি, সিল্কেব পাঞ্জাবি। ধর্মঘটিবা আমাকে দেখে অবাক। তাবপব সে কি হল্লা! ফুলশয্যার বাতে তোদেব বৌদি খুব কেঁদেছিল। প্রায় ত্রিশ বছব আগের এই গল্প বলতে গিয়ে পুণ্যদাব গলাও কেমন অচেনা হয়ে যায়।

দুটো কবিতা লেখছি শুনবি—পুণ্যদা জিজ্ঞেস কবে। জলচৌকির ওপর বাশি বাশি কাগজ। পাশে ছোট্ট সেলফ্। বোগামোটা কয়েক ডজন ফাইল। এটা পুণ্যদাব দপ্তব। কাগজেব গোপন আস্তানা। কিশোবেব জন্যদেব জন্য পুণ্যদা অপেক্ষা কবে না। কাগজেব স্তূপ থেকে দুটো কবিতা বাব কবে। পড়তে শুরু কবে। ফাঁকা ঘব। বাইবে মোষেব চামড়াব অন্ধকাব। পুণ্যদাব গলা গমগম কবে। বৈশাখেব মধ্যদিনে অগ্নিদাহে মূর্ছাতুব আমি/নাহি জল চাহি ছায়া চাহি বৃষ্টি ধাবা/সকলি আনিবে বহে মহামেঘ কালবৈশাখীব/পাতাব কুটিবে আমি উৎকণ্ঠায় হব দিশাহারা/পুণ্যদার গলায় অন্ধকার, হাওয়া পাক খায়।

কিছু পবে দ্যুতি আসে। একটু দেবি হলো—ও বলে।

কোথায় গেছলে—কিশোব জানতে চায়।

ফার্স্ট এড ট্রেনিং নিতে। ওটা শিখে বাখছি। খুব দবকাব।

কিশোব কথা বলে না। বেবাদি কবে যাচ্ছে—দ্যুতি জিজ্ঞেস কবে।

বেবাব যাওয়া হবে না—কিশোব বলে—পার্টিব নিষেধ। কাজেব ক্ষতি হবে। বেবাকে খববটা জানিও।

দ্যুতি অন্ধকাবে কিশোবের মুখটা দেখতে পায় না। হাওয়ায় পাঁকের গন্ধ। দুপো পাহাড় প্রমাণ মেঘ অন্ধকারে গা ডুবিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওরা দুজন বড়ো রাস্তায় পৌঁছোয়।

কিশোব সোজা বাড়ীতে যায়। চেনা, পুবোনো পাড়া। সকলেই জানাশোনা। কেউ না দেখে। কিশোব সতর্ক হয়। বাস্তাব অন্ধকায় ধরে হাঁটে।

বাড়ীতে কলে জেগে আছে। বাবা মা দাদা ভাই বোন। কিশোবকে দেখে ওরা আকাশ থেকে পড়ে। ভয় পায়। কিশোবের খোঁজে এর আগে বাব দুই বাড়িতে পুলিশ এসেছে। ও বাড়ীতে অনেক ভাড়াটে। সকলেই দেশঘব ছাড়া, উদ্বাস্তু। নানা ধান্দায় ঘোবে। একটা বা দুটো ঘব নিয়ে থাকে। রাস্তার ধুপোরি ঘর। জয়েন্টে অন্ধকার। নোনালাগা দেওয়াল। সারামো হয় না। বঙ পড়ে না। বেশীরভাগ ভাড়াটেই ডিফল্টার। ভাড়া দেয় না। মালিক বাড়ীটা প্রায় খরচের খাতায় লিখে দিয়েছে। দোতলায় কিশোরদের দুটো ঘর। ওর বাবা মাসের পয়লা তারিখে ভাড়া দেয়।

ছাতে একটা ঘর আছে। সেখান থেকে হৈ চৈ, হাসির আওয়াজ আসে। অনেক লোকের গলা। কিশোর বুঝতে পারে না।

দাদা ব্যাপারটা খোলসা করে। ঘরটা এতোকাল বন্ধ ছিল। মাস তিনেক আগে বাড়ীওলা ওখানে নতুন ভাড়া বসিয়েছে। বাসিন্দার নাম পল্টন দাস। নামটা কিশোরের চেনা। পল্টন এই এলাকার মস্তান। খুব কংগ্রেসের নেতা। ক্ষুদিরাম-বাবু বাড়ীটা খালি করাতে চায়—দাদা বলে—বাড়ীটা ও বেচে দেবে। ভালো দাম পাচ্ছে। ক্ষুদিরামবাবু বাড়ীওলা।

কি করছে ওরা—কিশোর জিজ্ঞেস করে।

মাসফিল—দাদা বলে—মদের আড্ডা।

কিশোর দেখে দাদাকে। আগে রোগা হয়েছে। শুকনো মুখ। বাবা পাশের ঘরে পরীক্ষার খাতা দেখছে। স্কুলে বাবার এখন একসাটেনশান পিরিয়ড। আর মাস দুই-তিন চাকরি আছে।

ঘরের মধ্যে কেরোসিনের মিটমিটে আলো। এ বাড়ীতে ইলেকট্রিক নেই। অনেককাল আগে কোম্পানী লাইন কেটে দিয়েছে।

কিশোর দেখে ঘরদোর আগের চেয়ে আরো ময়লা কাহিল। ওর চাকরি ছাড়ায় সংসারটা খুব গরীব হয়ে গেছে। বেণু দু কাপ চা আনে। বেণু ছোট বোন। কলেজে পড়ে। চায়ের কাপ দিয়ে ও বলে, দুধ নেই কিন্তু। কিশোর হাসে। তোর পরীক্ষা কবে—জানতে চায়।

মাসতিনেক বাকী—বেণু বলে—কিচ্ছু লেখাপড়া হচ্ছে না। বেণু মাথায় বেড়েছে। মুখটা আরো সুন্দর হয়েছে। নম্র, বিনয়ী মেয়ে। সংসারের কাজ, কলেজ, লেখাপড়া একসঙ্গে চালাচ্ছে। ওর মুখের নরম হাসি তবু সরে নি। ছোটো ভাই তরুণ ফিবলো টুইশানি থেকে। ছমাস হলো ওর বি-এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। রেজাল্ট বেরোয় নি। কিশোরদের পার্টির সমর্থক।

হ্যারিকেনের চারপাশে অনেকদিন পর ওরা একসঙ্গে বসলো। বড়দা সরকারী চাকুরে। অফিসের কথা বলছিল। কোনো কাজ হয় না। শুধু ফাঁকি আর দুষ। দাদাকে নিয়ে সহকর্মীরা হাসি-ঠাট্টা করে। গোবেচারা নিরীহ মানুষ। সবসময়েই ভয়ে ভয়ে আছে।

বেণু একসময় বললো— তোদের পার্টির ছেলেরা আমাদের কলেজ লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়েছে।

কিশোর কথা বলে না। এটা না করলেই পারতো—বেণু যোগ করে—সাধারণ ছেলেমেয়েরা চটেছে। লাইব্রেরী কি দোষ করলো?

আমারও অনেক কথা আছে, তরুণ বলে—মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

মা ওদের তাড়া লাগায়—এখন ওকে জ্বালাস নি। হাত মুখ ধুয়ে আগে দুটো ভাত খাক।

একতলায় গঙ্গা, জলের কলে জল পড়ছে। একটানা শব্দ। কলতলা কবে যেন চুবি হয়ে গেছে। নতুন একটা কেউ লাগায় নি। গঙ্গায় জোয়ার এলে শুকনো পাইপটা জেগে ওঠে।

মা জিজ্ঞেস করে—জেলে খেতে দিতো? মাবধোর কবে নি তো?

এই বাড়ীটা এক সময় বদলাবার কথা হয়েছিল। সেকথা কেউ তোলে না? ছাতের ওপর ঝনঝন শব্দে কি যেন ভাঙলো। হাসির হুররা উঠলো।

নাচ শুরু হলো—তরুণ বলে।

অন্ধকার বাড়ীটায় প্রায় পঞ্চাশ জন লোক থাকে। কেউ সাড়া করে না। পল্টনের ভয়ে সকলে মুখ গুঁজে আছে। ও ঘরে মরে গিয়ে শাসাচ্ছে। এক মাস সময় দিয়েছে। তার মধ্যে বাড়ী ছাড়তে হবে।

কোথা থেকে অত টাকা পায়—মা ফিসফিস করে।

দেওয়ার লোকের অভাব নেই—তরুণ বলে—লোহাপট্টির কালোয়াররা দেয়। বাজার থেকে তোলা আদায় করে। থানার সঙ্গে বন্দোবস্ত। দাদা চুপচাপ বসে থাকে। ও এমনিতেই কম কথা বলে। বেণু বলে—মেজদা আমি গ্রামে যাব। বেণুর মুখটা কেমন করুণ দেখায়। ও যেন কি ভাবছে। মা নীচু গলায় বলে—পল্টা ওর বিনুনি ধরেছিল একদিন। দাদা উঠে যায়। তরুণ ঠোঁট কামড়ে বসে থাকে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর কিশোর বাবার সঙ্গে কথা বলে। তখন সকলে শুয়ে পড়েছে। এক চিলতে অন্ধকার বারান্দার মা ধোয়ামোছা করছে। বাবার মাথায় সাদা চুল। অনেককাল পেকেছে। বাবার কালো চুল কিশোর দেখে নি।

বাবা ধীরে ধীরে কথা বলে। অনেক কথা। স্বাধীনতার লড়াইএ বাবা ছিল। পাঁচ-সাত বছর জেল খেটেছে। কিন্তু, কি করলুম আমরা—বাবা নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করে—এ স্বাধীনতার জন্যে আমরা লড়ি নি। এখন আমার মনে হয়, স্বাধীনতা জিনিসটা একটা কল্পনা। ওটার কোন বাস্তব চেহারা নেই। আজ বলতে লজ্জা করে, এক সময় আমরা দু টাকা মণ চাল খেয়েছি। টাকায় পাঁচ-সাতটা ইলিশ। এক সের খাঁটি ঘি আট আনা। গরীব লোকেরাও দুবেলা দু মুঠো ভাত পেয়েছে। তখন নিজেকে মানুষের মত লাগত। বুকের ভেতর একটা কষ্ট ছিল, আমরা পরাধীন, চাকরের জাত। সেটা নিছক মনের কষ্ট। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। ইংরেজদের হামবড়াও সহ্য হতো না। স্বাধীনতার ভূত মাথায় চাপলো। দেশের মানুষকে বোঝালুম, স্বাধীনতা খাদের চেয়ে বড়ো। সকলের আগে চাই স্বাধীনতা। আজ মনে হয় ভুল করেছি। বাবা চুপ করে। ঘরের দেওয়ালে আবছা ছায়া কাঁপে। ডাঙ্গা নকসায় হাঁদা

বাবা তাকিয়ে থাকে। কি যেন মেলাতে চায়। নীচে জল পড়ার শব্দ। কোথায় যেন একটা জলপ্রপাত বইছে।

মা ঘরে ঢোকে। মায়ের মুখটা হঠাৎ যেন চুপসে গেছে। হাওয়া খোলা বেরুন। কিশোর বুঝতে পারে না। মা হাসে। বলে, সব দাঁত তুলে ফেলেছি। এখন বাঁধান দাঁত। জলে ভিজিয়ে এলুম। মা বসে। কিশোরের গা ঘেঁষে। কিশোর জানে, মা তাকে ছাড়তে চাইছে না। একটু গল্প করতে চায়। তক্তাপোষে বাবার বিছানা। মেঝেতে মা আর রেণু শোয়। রেণু ঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওপরতলায় হল্লা কমেছে। অন্ধকারে কারা যেন নেমে যায়। বাবা কান খাড়া করে শোনে।

এর নাম স্বাধীনতা—বাবা বিড়বিড় করে—গোটা দেশটা ভিখিরী হয়ে গেল। অন্ন নেই, বাসস্থান নেই। ছেলেগুলো চোখের সামনে গুণ্ডা বদমাস হয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হয়, ওরা কিছুই পেল না। স্বাধীনতাও নয়। সুখ, শান্তি নয়। ওরা একদম ফাঁকা, দেউলিয়া।

আলোটার তেল কমছে। দেওয়ালের নকসাগুলো লাফাচ্ছে। জায়গা বদলাচ্ছে।

দেশ ভাগ মেনে নিয়ে সবচেয়ে বড় পাপ করেছি। একটা ধিক্কার দিন-রাত কুরে কুরে খায়। মার চোখ ভারী হয়। মুখ গম্ভীর। দেশের কথা উঠলেই মা যেন কি রকম অস্থির হয়ে পড়ে। চোখের পাতায় শ্রাবণের হাওয়া লাগে।

মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা উত্তর-পুরুষের সঙ্গে বেইমানী করেছি — বাবা বলে — নিজেরা ভুল বুঝেছি। তাদের ভুল বুঝিয়েছি। ছোঁদো অহমিকা বাঁচাতে সত্যকে চেপে গেছি। তখনও জানতুম, এভাবে স্বাধীনতা আসে না। আসবে না। তবু মেনে নিয়েছি। নিজেদের ভুলকে এখন স্বীকার করতে ভয় পাই। ভুলকে ঠিক বলে প্রচার করি। ভাবালুতা দিয়ে স্বাধীনতা, মুক্তি আসে না। সামনে জলের গ্লাস। বাবা জল খায়।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলে—না বুঝে কিছু করবে না। যুক্তি আর জ্ঞান বড় কথা। ভাবের গাড্ডায় পা দিলে মরবে।

কিশোর বোঝে, বাবা ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। বলে—তুমি শোও।

ঘুম হয় না, বাবা জবাব দেয়—কি করলুম। এই প্রশ্নটা আজকাল ভীষণ খোঁচা দেয়। অস্থির করে। সব কিছু যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।

নীচে গঙ্গাজলের শব্দ। ঝরঝর করে যায়। কিশোরের ইচ্ছে হয়, বাবাকে জিজ্ঞেস করে—সেই জলপ্রপাতটা কি তুমি দেখেছ? যেটা শুকোয় না, মরে না। চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে এক বুক পলি আর নুড়ি নিয়ে সে ছুটছে আর ছুটছে।

মা বলে—তুই শুয়ে পড়। সকালে উঠতে হবে।

কেউ দেখে নি তো—বাবা জানতে চায়।

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা লাভ করুন পুরস্কার

প্রবেশমূল্য নেই আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

উদাহরণ

মোট ৩০

৭	১২	১১
১৪	১০	৬
৯	৮	১৩

	১৪	
	১২	
	১০	

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন। দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউণ্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারান্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ৩৬ খাড়াভাবে সমান ভাবে, কোণাকৃণি ভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ১০ আগষ্ট, ১৯৭৮

আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

জেমিনি ট্রেডার্স (এ-২)
গান্ধীনগর
দিল্লী-১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান।

Gemini Traders (A-2)
Gandhi Nagar
DELHI-110031

না।

মার পাশেই একটা সতরঞ্চি পেতে কিশোর শোয়। অনেক জমান খবর মা শোনায়। বাবাকে নাকি বিল্লি থেকে তামপত্র নিতে ডেকেছিল। বাবা যায় নি। বরং কড়া ভাষায় লিখেছে ওই তামাব টুকবোয় কোন দরকাব নেই। পেন্সনও চাই না। এই স্বাধীনতা আমি চাই নি। এর জন্যে আমি লজ্জিত।

কিশোর জানে, বাবা কোন রাজনীতি চায় না। অন্যান্য বয়স্ক লোকদের সঙ্গে তবু বাবার অনেক তফাৎ আছে। বাবা কখনও পুরনো দিনের সমৃদ্ধির কথা শোনায় না। বই মাছ আর বাবড়িব গল্প বলে না। এই সময় আর এখনকার ছেলে-মেয়েদের বিরুদ্ধে বাবাব কোন অভিযোগ নেই। শুধু নিজেব ভেতবে একটা দুঃখ আব লজ্জা নিয়ে বাবা চুপ কবে থাকে। সব রকমেব অধঃপতন আব নোংরামিব জন্যে বাবা নিজেকে দায়ী কবে। হারিকেনের আলো নিভে গেছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকাব। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কিশোর কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নেয়।

মা নিজের মনে গল্প করে। দেশেব বাড়ীর পেছনে ছিল নদী। গবমেব দিনে জল থাকত না। নিবীহ, ভালমানুষ চেহাবা। বর্ষায় ফুলে ফেঁপে উঠত। তখন কি পাগলের মত চেহাবা। তেমনি হাকডাক। তোরা খেলতে বেবুলে সাবাক্ষণ আমার বুক কাঁপত। নদীব গর্জন ছাড়া তখন কানে আব কিছু ঢুকত না। কলকাতায আসাব পর থেকে সেই আওয়াজ দিন-বাত শুনতে পাই। অথচ এখানে কোন নদী নেই। আমার কানে বোধহয় কোন রোগ হয়েছে রে।

।। পনেবো ।।

প্রায় পবেনো দিন হল কিশোর ফিবেছে। প্রথমে তাতলুই এল। এটাই ওর জায়গা। রবি ছিল। আগে খবর পেয়েছে সে। কিশোরকে দেখতে গাঁ ভেঙ্গে পড়ল। রাতে ভোজ। শুয়োরের মাংস আর গরম ভাত। গাঁয়ের মোস্তাগীর লোকজনদের নিয়ে কুলিতে জড় করে। সভা হয়। তার-পর খাওয়া-দাওয়া। হাঁড়িয়া চলে। অনেক রাত পর্যন্ত গান-বাজনা হয়। এখন ধান উঠেছে। ঘরে ঘরে এককাড়া চাল আছে। মাঝি পাড়ায় এখন দিন-রাত মাদল বাজে। খুশী আর গানেব ঢেউ বয়। এখানে-ওখানে রোজ মেলা বসে। দল বেঁধে সকলে মেলাতে যায়। সঙ্গে থাকে মাদল, লাগড়া, বাঁশি।

রাতে ববির সঙ্গে কথাবার্তা হয়। কাল ভোবে যাবে বাহেদায়। অজিতের সঙ্গে কথা বলবে। এক সময় মাদল থামে। চার পাশ নিঝুম। ঘন জমাট অন্ধকারে পৃথিবী ডুবে যায়। হাড় কাঁপান শীত পড়েছে। মাটিব দেওয়াল ফুঁড়ে ঠাণ্ডা ঢোকে। খড়ের বিছানা। পিঠের তলার শুকনো খড়ের শব্দ। ববি ঘুমিয়ে পড়েছে। এখানে এসে প্রথমে উঠেছিল মংলু সোরেনের ঘরে। মোতিব যোগাযোগ।

এলাকাটার তিন দিকে পাহাড়। এক দিকে মশানজোড় বাঁধের জল। শাল মহুয়াব জঙ্গল, কেঁদু কুসাব ঝোঁপ। নানা জাতের মানুষ আছে। বেশীর ভাগ আদি-বাসী। সাঁওতালদের সংখ্যা বেশী। সাঁওতালদেব কিছু কিছু জমি আছে। জমি বিক্রীর অধিকার নেই। বিহারে আদি-বাসীদের জমি বিক্রী আইনত নিষিদ্ধ। মহাজনেব কাছে জমি ভন্না দেয়। এটাও এক ধবনেব বন্ধকী। দু-দশ বছরেব দীর্ঘ-মেয়াদী লিজ। ধারে ধাব বাড়ে। ভন্নার জমি আব ছাড়ান হয় না।

সাঁওতাল গাঁয়ের পাশাপাশি পাহাড়িয়া আর মহলিয়াদেব বসতি। দুটো সম্প্রদায়ের কাবও জমি নেই। মহুলিয়ারা বাঁশেব কাজ কবে। ঝুড়ি, চুপড়ি বানায়। সৌখিন জিনিসও তৈরী করে। কলকাতায় গৃহ-শিল্পেব দোকান থেকে সেগুলো বিক্রী হয়। বিদেশে একসপোর্ট হয়। এ ছাড়া আবও এক গোষ্ঠী আছে, ঘাটোয়াল। এরাই বোধহয় সবচেযে গরীব। শিকাবীর জাত। জঙ্গল সাবাড হচ্ছে। এরাও মরছে। ডোম, বাড়রি, মালরাও ভূমিহীন, গবীব। তাদের সংখ্যাও কম নয়। এলাকাটা চিনতে জানতে কিশোবের মাসখানেক সময় লেগেছিল। প্রথম দিকে মুস্কিল হয়েছিল। আনকোবা নতুন জায়গা। কেউ কথা বলত না তার সঙ্গে। ভাষা বুঝত না। গাঁয়ের মেয়েরা তাকে দেখলে লুকোত। তার ভয়ে দিনেব বেলা জঙ্গলে যেত না। দিন দশেক কিশোর

যোগ। বাঘা একটু-আধটু বাংলা জানে। ডাক্তারের কাছে এসেছিল। ওব মায়ের দু হাত জোড়া ঘা। জড়িবুটিতে সারে না। মোতি দু-তিন দিন ওকে দেখেছিল। তাগড়া, পাথবে কোঁদা চেহারা। হাতে এক-গাছা থেঁটো লাঠি।

মোতি একদিন বলল—তোর ঘবে যাব। তোব মাকে দেখব।

বাঘা অবাক হয়েছিল — তু আমার ঘরকে যাবি কেনে?

তোর মাকে দেখতে।

বাঘা বিশ্বাস করে নি। তার কাছে মোতিও একজন ডাক্তার। ভদ্রলোক, দীখু। মাঝিপাড়ায় ওরা যায় না। বাঘা বিশ্বাস করে নি। পবের বাব এক হাঁড়ি মহুয়া আনল। বলল, তোকে আব আমাব ঘরকে যেতে হবেক লাই। মহুয়া এনেছি। বাঘা চোখ মারে। ও ভেবেছিল মহুয়ার জন্যে মোতি গাঁয়ে যেতে চায়। মোতি মহুয়া ছোঁয় নি।

আমি ওসব খাই না—সে বলেছিল।

বাঘা এবার ঘাবড়েছিল। মহুয়াব হাঁড়িব লোড সামলাতে পারে এ রকম ভদ্রলোক সে বেশী দেখে নি।

তোর মতলব কি—সে জিজ্ঞেস কবেছিল মোতিকে।

তোর গাঁয়ে গিয়ে বলব — মোতি জানায়।

আচ্ছা, দেখি—বাঘা চলে যায়।

তাবপর প্রায় মাসখানেক পাত্তা নেই। একদিন সাত সকালে বাঘা এল।

তু চল আমার সাথে—সে বলে।

মোতি এল তিলাবুনিতে। রাস্তায় বাঘা বলল, গাঁয়েব মাঝিহারাম আর মানুষজনদেব মত করাইচি। তারা বলেছে—নিয়ে আয়।

তারপর আবও দু-চার বাব মোতি এসেছে। রাজনীতি চলেছে। কিন্তু এই কম্পাউন্ডারেব আসাটাই ঝামেলা পাকিয়েছে। ওরা কিছুতেই তাকে নিজেব লোক ভাবতে পারে নি। মোতির কাছেই এসব কিশোর শুনেছে। বাঘাব মায়ের দু হাতে কুষ্ঠেব ঘা। সারবে না। সারা দিন ঘরেব কাজ করে। জঙ্গলে যায় কাঠ আনতে। বাইরে ঝা ঝা বোদ। গোটা গাঁ ঘুমোচ্ছে। দিগন্ত জোড়া লাল পাথুরে জমি। উঁচু-নীচু, ঢেউ খেলান। পাগল হাওয়ায় লাল ধুলোর ঘূর্ণি নাচে।

বাঘা কাজে যায়। ওর বাড়ীর দাওয়ায় কিশোর বসে থাকে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

ছাব্বিশ

কালু ঘোষ রেগে উঠলো। এ কি করেছো দিলীপ। এখানেও একজোড়া ছিপ বসিয়েছো? এ কি তোমার জি টি রোডের ধাওয়া। শেফালী তো দেখলে চমকে যাবে। সন্দেহ করবে তোমাকে।

এখন তো তুমি মাছ ধরতে বোসো। ওই দ্যাখো ঠোক্‌রাচ্ছে—

না না। এ একদম ভালো করোনি। লোক একজন। ছিপ দুটো। দেখলেই কি মনে করবে?

অত ভাবছো কেন কালুদা। বলবো, আপনার জন্যে পেতে রেখেছি। শুনলে চাই কি খুশি হতে পারে। এত বড় বাগান। কে তোমার এই ফাঁকা সৌন্দর্য সামলাতে আসবে। তার চেয়ে মাছ ধরতে বসিয়ে দিলে ভালো হবে না?

আইডিয়াটা ভালো।

নাও। তুমি এখন ছিপ ধরে বসে যাও তো। মাছ আছে?

অনেক মাছ আছে। ফি বছর ছাড়া হোতো। ধরা হয়নি তো বিশেষ।

দুজন পাশাপাশি বসে। একজনকে দেখা যায়। অন্যজন অদৃশ্য। তার কথা শুধু দিলীপ শুনতে পায়। ফাৎনা ডুবে গেল। দিলীপ বসে ছিলো। ছুটে গিয়ে ছিপে টান দিলো। মুগেল হবে। তার আগেই কেঁচোটুকু খেয়ে নেমে গেছে। টান দেবে তো কালুদা—

আমার এখন আর ওসব আসে না—।

ভালো মাছ আছে তোমার পুকুরে। বলতে বলতে দিলীপ কালু ঘোষের জন্যে পাতা ছিপের বঁড়শি তুলে আবার তাতে কেঁচো গেঁথে দিলো। দিয়ে ফাৎনা ভাসালো। বেশ দামী ছিপ। নাইলন সুতো।

নিজের ছিপে বসলো দিলীপ। দুপুরের ওপারটায় ঘন কচুবন। গাবগাছ। তার পেছনেই ধানক্ষেত। রায়গাটা লোকালয়ের শেষপ্রান্তে।

কালু ঘোষ আপনা-আপনি বললো, পূর্ণিমা রাতে এখানে টিয়ার ঝাঁক নামে। আশপাশে তখন পাকাধান। এই ঠিক লক্ষ্মী-পুজোর পরেপর—

তোমার তো সব খেয়াল থাকে।

এখন তো অনেক আগের কথা সব মনে পড়ে। সেবারে শেফালীর মা সব পাট চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পরের বছর ধান করেছি। সখ করে। একদম প্রানপ্রাণ নিচেই হলুদ রঙের পাকা ধান। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে তাকিয়ে দেখি—এ-কি বিকেল-বেলা এখন? সূর্যখানা নরম হলুদ রঙের। তখনো ডোবেনি। লাইট জেলে হাত-ঘড়ি দেখে ভুল ভাঙলো। রাত সাতিনটে। আকাশে চাঁদখানা তখন প্রমাণ সাইজের থালা।

কালুদা। আবার তোমার টোপ খেয়ে [illegible]—

দিলীপ একটা কাতলা তুললো। দেড় কিলোর মত। সেটাকে আছাড় মেরে ধুলো মাখালো। বড়শী টেনে খুলতে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে ধুলোর সঙ্গে মাখামাখি। দুপুর বেলার শীতে রোদের আরাম। তার ভেতর মাছটা মরে গেল। চোখের মণিতেও ধুলো। শুকনো পাতার ভেতর শুয়ে।

খাবার এলো না তো এখনো। শেফালী খাবে কি দিলীপ।

এসে যাবে এখুনি। বলে দিলীপ নিজের ছিপ বসালো। তারপর কালু ঘোষের বড়শীতে আবার টোপ দিয়ে ছিপ পেড়ে দিলো। এবার কিন্তু ঠোকরালে টান দিতেই হবে তোমাকে। ঠিক সময়মত। তুমি ইচ্ছে করলেই পারো কালুদা। তোমার ডিরেকশনে আমি কেমন গাড়ি চালাতে শিখে গেলাম।

এবার একটা লাইসেন্স করো দিলীপ। আচ্ছা এই যে লোকে ভালোবাসা বলে একটা জিনিসের কথা বলে প্রায়ই। জিনিসটা কী। তোমার কোন আইডিয়া আছে?

ওসব কচকচানি পরে শুনবো। এখন তো মাছ ধরি।

আমার মনে হয় দিলীপ—কাছাকাছি থাকার ইচ্ছেটাই আসলে ভালবাসা।

মাছ ধরোতে মন দিয়ে—। ওই তো খাবার এসে গেছে। পাক্কা লোক। ঠিক বাংলো বাড়িতে গিয়ে প্যাকেট রাখলো।

কালু ঘোষ বললো, ভালোবাসা মানে দখল। আকড়ে ধরে অধিকার রাখা। এর ফলে কেউ সুখী হয়। আবার অনেকে দম ফেলতে পারে না। নিঃশ্বাস আটকে আসে অনেকের। তারা সংসার করে না।

তাহলে মেশামেশি কী জিনিস কালুদা?

ভালোবাসার ঠিক আগে—যা পরের একটা কন্ডিশন। তখন মানুষ বুকের ভেতরের গন্ধ পেতে শুরু করে।

আমি যে তোমার সঙ্গে মিশি—তার গন্ধ পাও কালুদা? আমার বুকের ভেতর-কার—

তোমার কথাতেই সে-গন্ধ ছড়ান থাকে দিলীপ।

তাহলে বন্ধুত্বর কি জিনিস কালুদা? কাকে আমরা বন্ধুত্ব বলবো?

কাউকে না দেখলে যদি কষ্ট হয়—তবে সেই কষ্টের নাম বন্ধুত্ব। তার মুখখানা দেখার ইচ্ছে হলে—এই ইচ্ছের অন্য নাম বন্ধুত্ব।

তুমি ছিলে তো কালুদা অটোমোবিল ইন্ডিয়ায়। এতসব জানলে কোত্থেকে।

সব জানতাম না। এখন একদম উঠে গিয়ে সব পরিষ্কার দেখতে পাই। জলের মত।

আসলে তুমি একজন সৌভাগ্যবান মানুষ কালুদা। কটা লোক অমন একটা বড় কোম্পানীর কর্তা হয়? এই সৌভাগ্যের মানে কি?

তোমার ফাৎনা ডুবে গেল দিলীপ—

যাশিগগির। এই সৌভাগ্যের পেছনে কি আছে কালুদা?

আমার পরিশ্রম। আমার মাথার ঘিলু। আমার দূরদৃষ্টি।

হোলো না কালুদা। একদম ভুল। এভরি ফরচুন হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং।

কালু ঘোষ একদম চুপ করে গেল। দিলীপ বড়শি তুলে দেখলো—টোপ আর নেই। কালু ঘোষের ছিপেও সেই দশা। দিলীপ পাকা মাছমারার স্টাইলে ছায়া দেখে এক জায়গার মাটি খুরপি তুলে ফেললো। মোটা মত দুই কেঁচো দিলীপের হাতে পড়ে পাঁচ-সাতবারের টোপের টুকরো হয়ে গেল।

দিলীপ। সৌভাগ্য আর পাপ খুব কাছাকাছি—একথা তোমায় কে বললো?

কেন। বাপী বাপী লাগছে?

আমি তো কোন বিলেসন খুঁজে পাচ্ছি না।

মনে মনে আর একটু চেষ্টা করো কালুদা। ঠিক পাবে। আমি যে কোন বড় বাড়ি দেখলেই চোখ বুজে ফেলি। তখনি একখানা তামার থালা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাতে গাঢ় নীল দাগ। কেমন পাপ পাপ। সেই থেকে বসেছি। একটাও তো মাছ ধরতে পারি নি।

শেফালী এতক্ষণ নিশ্চয় ওর ছোটবেলার ছবি দেখছে দেওয়ালে। ওর মায়ের ছবি। আমার যৌবনের ফটো।

দিলীপ কোন জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালো জায়গায় তার ফাতনাটা ফেলছিলো। ওদিকে কালু ঘোষের ফাতনায় কাঁপুনি। কোন বুদ্ধিমান মাছ বঁড়শি বাচাই করে জলের নিচে কেঁচোর শরীরের টুকরোটা ঠুকরে দেখছে।

এই যে। এখানে বসে মাছ ধরছো। আমার একার জন্যে এত খাবার কেন?

অনেকটা পথ কলকাতা থেকে এলেন তো।

তাই বলে এতগুলো? তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। খেয়ে নিও।

একটা চেয়ার এনেছি?

নাঃ! এই তো আমি ঘাটের বেঞ্চে বসেছি। ও কি? তুমি দুখানা ছিপ নিয়ে বসেছো?

একখানা আপনার জন্যে পেতে রেখেছি। যদি মাছ ধরতে ইচ্ছে হয় আপনার—

মাছ আছে?

ওই তো একটা ধরেছি।

শেফালী মানুষটাকে দেখলো মন দিয়ে। কতলা। বাবা এতসব দিয়ে কি করতেন?

শখ সাহেবের। কখনো মাছ ছাড়ছেন। কখনো ধরছেন। কখনো ধান লাগাচ্ছেন।

শেফালী চুপ করে থাকলো। কালু ঘোষ শেফালী আসতেই একদম চুপ করে গেছে। ফাতনাটা ডুবে যেতেই দিলীপ টান দিলো। সাবধানে। কোন বড় মাছ হবে। বেশ ভারি। শেফালী তার আগ্রহ লুকোতে পারেনি। সোজা হয়ে বসলো।

কালু ঘোষ বললো, সাবধানে টেনো। এ নিশ্চয় তিন-চার কেজি-র মাছ হবে।

শুনতে পেলো শুধু দিলীপ। তবু তার জবাব দেওয়ার উপায় নেই। এখন যদি শূন্য একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে দিলীপ কথা বলে যায়—তাহলে শেফালী ভয় পেয়ে ভাবতে পারে—বাবার ড্রাইভারটি আসলে পাগল। খুটখুটে দিনের বেলাতেই নির্শি-পাওয়া সোকের অবস্থা।

মাছের বদলে ডাঙায় উঠে এলো—এক-পাটি স্যাণ্ডেল। চামড়ার। ভিজে ভাবি, কাদা মাখানো। রং গলে গিয়ে চামড়া বংরের। মাছ হয়তো গেঁথেছিলো। পালাতে গিয়ে ওই স্যাণ্ডেলের ভেতর গলে যেতেই হয়তো বেঁচে গেছে।

একপাটি স্যাণ্ডেল দেখেই কালু ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলো। এ তো সেই স্যাণ্ডেল—

শুনতে পেলো শুধু দিলীপ। সে কাণ খাড়া করে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ থেকে বড়শি ছাড়াতে লাগলো। কালু ঘোষ বলে যাচ্ছিলো, ওটাই তো সবচেয়ে বড় এভিডেন্স দিলীপ। তাহলে বুঝেছো এবার! আমাকে খুন করে আমারই পুকুরঘাটে ওরা পা ধুতে এসেছিলো। এসে একপাটি পুকুরে ফেলে যায়। হয়তো হুড়কে গিয়ে জলে পড়েছিলো।

দিলীপ শুনছিলো, আর বুঝতে পারছিলো, এ স্যাণ্ডেল খুনীর পায়ের নয়। আসলে এ স্যাণ্ডেল খুনীর বাবা পায়ে দিতো। বাবার স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে সেদিন রবি বেরিয়েছিলো। তাই—

তাই আরেক পাটি যে পেয়েছে পুলিশ—তাতে পায়ের ছাপের সঙ্গে রবির পায়ের ছাপ মেলেনি। কারণ ও ছাপ তো দিলীপের। সেদিনই হয়তো ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমার স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো।

ও দিলীপ। স্যাণ্ডেলটা নিয়ে চলো কলকাতায়—। সরকারী উকিলের হাতে দিয়ে বলতে হবে—এগারিবিট তালিকার এটাও দিতে হবে স্যার—

দিলীপ বলতে যাচ্ছিলো, মরে গিয়েও সাধ মেটেনি। ওসব করলে কি আবার বেঁচে উঠবে? তাতো নয়। তাহলে?

কিন্তু এসব না বলে দিলীপ চুপ করেই থাকলো। তারপর বঁড়শি ছাড়িয়ে ভিজে ঢোল স্যাণ্ডেল পাটিটা যত জোরে পারলো ছুঁড়ে মারলো। ভিজে বেশ ভারি। ওপারে গিয়ে কচুবনে পড়বে কি! পুকুরের মাঝামাঝিও পৌঁছতে পারলো না। গপ্‌সস্‌ করে ডুবে গেল।

এ কি করলে দিলীপ?

'কালুর গলা ফাঁকা শীতের দুপুরে সারা বাগানটাকে দু টুকরো করে ফেললো। জলে ভেজা মানুষও অমন করে শেষবারের মত ভাসতে চায় না। কিংবা পারে না। কালু ঘোষের গলার স্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারাটা বাগান একরকমের আক্ষেপে ভরে গেল। একটা বুড়ো গলা সর্বক্ষণের জন্যে বলে যাচ্ছিলো—আহারে।—আ-হা-রে—

তবে এসব শুধু দিলীপই বুঝতে পারছিলো। সে কালুকে নিরস্ত্র করতে তার ছিপে শেফালীকে বসিয়ে দিলো। টোপ গেঁথে দিয়েছি—হাত ঘুরিয়ে ফেলুন। এই তো ফেলেছেন।

আমার মাছ ধরা অভ্যেস আছে। তুমি বরং খাবারটা খেয়ে এসো। ঢাকা আছে। তার পড়ে থাকলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অগত্যা—

বাংলোবাড়ির বারান্দায় বসে প্যাকেটের ভাজা মাংস চিবোতে চিবোতে দিলীপ দেখতে পেলো—পুকুর পাড়ে শেফালীকে পেছন থেকে শাদা কাপড়ের মত একটা ঢোলা ফোলা জিনিস ঢেকে ফেলছে। তাতে শেফালীর কিছুই হয়নি। সে দিব্যি মন দিয়ে ছিপ তুলে অন্য জায়গায় ফাতনা ফেলছে।

দিলীপের মুখ দিয়ে নির্জন বারান্দায় বেরিয়ে এলো, বাবা তাহলে পুলিশ কাসটোডিতে—

সন্ধ্যেবেলা দিলীপ শেফালীকে তার পাশে বসিয়ে পার্ক হোটেলে ছেড়ে দিয়ে এলো। পেছনের সিটে বসে কালু ঘোষ একটা কথাও বললো না।

ফেরার পথে কালু ঘোষ বললো, শেফালী তো কালই চলে যাবে। কে পৌঁছে দেবে এয়ারপোর্টে।

তোমার ভাবতে হবে না। রাত তিনটে দশে ফ্লাইট। ওদেরই গাড়ি এসে নিয়ে যাবে—

অ।

ড্রাইভার সেজে থাকা বড় কঠিন কাজ। কটা দিন বড় ধকল গেল কালুদা—

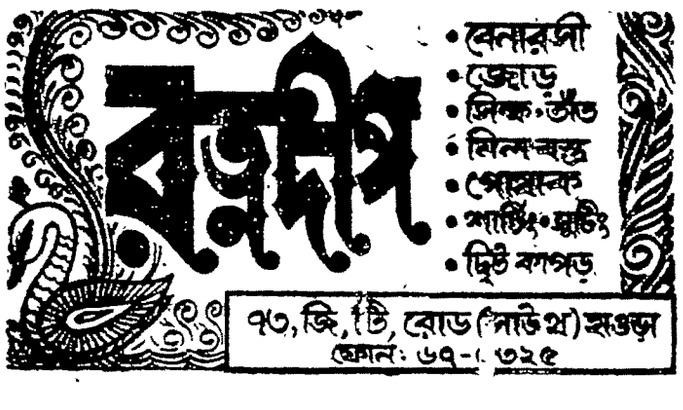

হ্যাঁ।

কথা বলছো না কেন?

এমনি।

জলে থাকতে থাকতে পচে যাওয়া স্যাণ্ডেল সেসনসে কোন এগজিবিট হতেই পারে না। আদালতে যা জমা দেবার তা একবারই দিতে হবে।

তবু তো ওটা একটা ভাইটাল প্রমাণ।

প্রমাণ করে এখন কি হবে তোমার? ফের কি বেঁচে উঠবে?

তা উঠছি নে আর। কিন্তু তাই বলে কি চেষ্টা একটা করবো না?

অন্যদেরও একটু বাঁচতে দাও না জালুদা। বে—কটা দিন ছিলে খারাপ তো বাঁচোনি। এখন আর যারা আছে তারাও একটু একটু বাঁচুক।

কালু ঘোষ আর কোন কথা বললো না। বেসমেন্টে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে অন্যদিনের মত দিলীপ লিফটে উঠবে বলে এগোবার মুখে বললো, গুড্ নাইট। হাতে সেই কাতলা মাছটা।

কালু প্যান্টা গুড্ নাইট বলতে বলতে পাবলো না। তার চোখের সামনে তখন আরেকটা জিনিস হচ্ছিলো। পরিষ্কার গিলে করা পাঞ্জাবী গায়ে এক দশাসই জোয়ান দিলীপের পার্ক করানো অ্যামবাসাডর থেকে বেরিয়ে এলো। সবু পাজামা। সোজা দাঁড়িয়ে পেছন থেকে দিলীপের আন্দাজ নিচ্ছিলো লোকটা। মতলব কি?

আলো-জলা লিফট নেমে আসতেই দরবারীলাল অন্ধকারে সরে গেল। সে খবর করতে করতে সন্ধ্যে নাগাদ এই বেসমেন্টে এসে ঢুকেছে। তার মামলার ফাইলগুলো যে কোথায়—তার এখনো কোন হদিশ পায়নি।

দিলীপ ওপরে উঠে যেতেই দরবারীলাল বন্ধ অ্যামবাডরের দু' ধারের দরজা খুলে ফেললো। তারপর ভেতরের আলোটা জেলে সিটগুলো তুলে ফেললো। কোথায় যে রাখতে পারে ফাইলগুলো। খবর যা—তা হোল—ওই লাফাঙ্গা ছোকরাদের দাদা গোছের লোক এই মানুষটা। সাত পুরনো গাড়ি দারবে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো এর কাছেই ফাইলগুলো জমা রেখেছে। কত দরকারী মামলার ফাইল। কেন যে ওগুলোর ওপর নজর পড়লো ছোকরাদের।

কালু ঘোষ কোন বাধা দিতে পারলো না। দরবারীলাল এগিয়ে এসে অস্টিন ট্যুরারের সিট তুলে ফেললে। সামনে। পেছনে। নাঃ! কোথাও সে ফাইল নেই।

অনেকদিন হয়ে গেল অফিসে যায় না দিলীপ। তা মাস দুই তো হবেই। পাড়ার ডাক্তারটি সময়ে সময়ে সার্টিফিকেট সাপ্লাই করে দিলীপকে অফিসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে আসছিলো। মাস মাইনে আসছিলো অফিস থেকে রেগুলার চেকে।

এবার চেকের বদলে এলো চিঠি। লিভ পোজিশন জানিয়ে এস্ট্যাবলিশমেন্টের চিঠি। আর ছুটি নেই। অনেকদিন পরে দিলীপ অফিসে গিয়ে হাজির।

শীতকালে বৃষ্টি—সে এক বিচ্ছিরি জিনিস। ঘরে ঘরে এয়ারকুলার এখন প্রায় গত জন্মের স্মৃতি। আচমকা থর থর করে কেঁপে উঠে কোন শব্দ করে না।

দিলীপ দেখলো, তার বসবার জায়গাটায় কোন টেবিল নেই। সেখানে এখন বেয়ারাদের টুল। কাঠের পার্টিশনে অনেক নতুন নতুন কিউরিকেল্ হয়েছে। দিলীপ দেখলো—তার টেবিলটা বাইরের জানলা দুটো বাদ দিয়ে কোণে বসানো হয়েছে।

অনেকেই অবাক হচ্ছিলো। এ কি চেহারা হয়েছে আপনার? কেউ বা বললো, কোথায় ছিলেন এতদিন? একজন শুধু বললো, আপনার ছেলের জন্যে উকিল দিয়েছেন?

দিলীপ বুঝলো, কোর্টকেস তাহলে কাগজে উঠছে। নইলে বুঝবে কি করে—আমারই ছেলে। আস্তে বললো, নাঃ! দেওয়া হয়নি। দিয়ে আর হবেই বা কি?

ইন্টারকমে দিলীপের টেবিলের ফোনটা বেজে উঠলো। হ্যালো—

দিলীপ এসেছো শুনলাম। একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে—

এখন? আসবো অনাথদা?

না। ঘন্টা দেড়েক বাদে এসো।

আজ কিন্তু আমি সই করিনি। এখনো আমি ছুটিতে—

একটু দেখা করে যেও।

এই দেখা করতে যাওয়াটা গোলমেলে হয়ে দাঁড়ালো। ঋষি ওদের ঘর অনাথ চক্কোত্তির ঘরের মুখোমুখি। সমবয়সী গিয়ে দেখলো, অনাথ বেরিয়েছে কোথায়। ফেরেনি তখনো। ঋষি কাজ করতে করতে কথা বলছিলো দিলীপের সঙ্গে। দিলীপ বলছিলো, চল না—তুই আর আমি স্যার লেজলির ফার্টিলাইজারে চলে যাই। তিনটি বছর একসঙ্গে খাটবো দুজনে—তখন দেখা যাবে—আমি একজন মিলিওনিয়ার। তুইও একজন মিলিওনিয়ার। আর আমাদের নরমাল হওয়ার উপায় নেই!

তুই বুঝি মিলিওনিয়ার হওয়া ছাড়া কিছু বুঝিস না দিলীপ—

মিলিওনিয়ার ব্যাপারটা খুব মন্দ। কিন্তু একটা বড় করে গড়ে তুলতে চাই—

সব সময় বড় কেন? ছোট কিছু ভাবতে পারিস না—

দিলীপ কোন কথা বললো না। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলো—যদিও সে অনেকদিন এখানে কাজ করে আসছে—তবু সে আসলে এখানে একজন বাইরের লোক। কোল ইন্ডিয়া এখন তার কাছে একদম বাইরের একটা অফিস আর সেই বাইরের অফিসে ঋষি এখন একজন ভেতরের লোক একথা ভেবেই বোধহয় আমি আরও বেশি কষ্ট পাই। কোল ইন্ডিয়ার ওপর আমার রাগ তাই আরও বাড়ে। একথা ভেবে দিলীপ দেখলো, দেড় ঘন্টা মত সে বসেই আছে—তবু অনাথ চক্কোত্তির দেখা নেই।

অনাথ যখন এলো—তখন প্রায় চারটে।

এই যে দিলীপ—

আমি তো সেই থেকে বসে আছি।

থাকবেই তো বসে।

কথাটা বসিকতা? না ধমক? কোনোটাই বুঝে উঠতে পারলো না দিলীপ। এখানে যে-বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো—সে বাতাসের ওযান খার্ড ভাজা ভাজো। তাতে বিড়িপাতার গন্ধ। এই বাতাস পুলিশ কাসটোডিতে বসে রবি নিঃশ্বাসে নিচ্ছে। ও আমাকে দালালীর পয়সায় আরাম করার জন্যে খেপা করেছিলো।

তা কেন থাকবো? আমি আজ জয়েন করিনি।

এসব কথা রাখো। আমি তোমাকে চিনি। দিল্লিতে পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে কোল ইণ্ডিয়ার কেস ডুবিয়ে এসেছো।

সেজন্যে তো আপনি হুমকি দিয়েছিলেন! বলে একদম মুখোমুখি দিলীপ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

অনাথ চক্কোত্তি চটাপট তিন চারটে চড় কষালো দিলীপের গালে। চড় খেয়ে দিলীপ বুঝলো, অনাথ স্থির নেই। চড়ের জন্যে তোলা হাত তার গালে এসে ধপাস করে পড়েছে।

দুপুরবেলা জিন খেলে যা হবার তাই হয়েছে অনাথের। দিলীপ আলগোছে অনাথের হাত ধরে সরিয়ে দিলো। এতগুলো লোকের সামনে এখন এমন চড় মারা—দিলীপ নিজের অজান্তেই ক্ষেপে উঠছিলো।

বেয়ারাবাবা ছুটে এসেছে। ঋষি তার চেয়ার সরিয়ে দাঁড়ালো। অনাথ চক্কোত্তি হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে ধমকানোর গলায় বললো, আমি দেখবো—তুমি এখানে থাকো—না, আমি এখানে থাকি।

দিলীপের কানের ভেতর দিয়ে শব্দ গুলো দলা পাকানো কাগজের কুণ্ডলী হয়ে ঘুরছিল। তার একটায় আগুন ধরে গেল। সে পরিষ্কার চেঁচিয়ে বললো, আমি এখানে থেকে গেলে বাইরে করে খেতে পারবো।

তোমাকে এখান থেকে বের করে দিলে কুকুরেও টেনে দেখবে না।

তুমি তুমি করবে না বলে দিলাম—

কেন? কি বলতে হবে জেমাকে? অনাথবাবু! আপনি!!

ইউ সোয়াইন—

সোয়াইন মানে কি জানো তুমি? এখুনি উইথড্র করো। নয়তো ব্যথা পাবে—

একশোবার বলবো। সোয়াইন! সোয়াইন। সোয়াইন।

দিলীপের ডান হাত একখানা ধারালো কুড়োল হয়ে অনাথের গালের দিকে ছুটে গেল।

অনাথ মেঝেতে। কিউবিকেলের কাঁচ ভেঙে গেছে। কোল ইণ্ডিয়ার ফিফথ্ ফ্যোরের প্রায় সবাই চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে—

অনাথ মেঝেতে পড়ে ব্যথায় কাঁদছিলো। দিলীপ এগিয়ে গিয়ে তুললো। কোথায় লেগেছে, আপনার? করিডরে একগাদা লোক। দিলীপ কারও মুখ আলাদা করে দেখতে পাচ্ছিলো না। তার কাঁধে ভর দিয়ে অনাথ চক্কোত্তি নিজের কিউবিকেলে এলো। তখনো ব্যথায় কাতরাচ্ছিলো।

নিজের ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দেওয়ার আগে অনাথ চক্কোত্তি চটাং করে দিলীপের গালে আরেকটা চড় মারলো।

দিলীপ হেসে ফেললো, আরেকটা মারুন।

অনাথ হু হু করে কেঁদে উঠলো। ব্যথা করছে। হাড়ের ভেতর: ডান হাতখানা দেখালো অনাথ।

দিলীপ বেরিয়ে গিয়ে এক বেয়ারাকে আয়োডেক্স আনতে দিলো। আয়োডেক্স এলে খানিক হাতে নিয়ে দিলীপ অনাথের শার্টের হাতা গুটিয়ে ওপরে তুললো। গলার টাই খুলে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলো। আয়োডেক্স বোলাতেই অনাথ হু হু করে কেঁদে উঠলো। আমি তো তোমায় সোয়াইন মিন করিনি। মুখে এসে গেছে—তাই—

আমি জানি অনাথদা। দোষ আমারই—

আবার কেঁদে উঠলো অনাথ চক্কোত্তি। হু হু করে। হাতের ভেতর ভয়ংকর যন্ত্রণা হচ্ছে—

আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন। বলে দিলীপ বেরিয়ে এলো। উল্টোদিকের ঘেরা ঘরের দরজা খোলা। ঋষি কলম হাতে শিলিংয়ে তাকিয়ে। দিলীপকে দেখে ঋষি তাকে একটুও বসতে বললো না। তবু দিলীপ ঋষির মুখোমুখি উল্টোদিকের চেয়ারে বসলো। বসেই বললো, এই ডামাডোলে কে আমার হাতঘড়িটা খুলে নিয়েছে—

সত্যি! এই অফিসের ভেতর?

হুঁ। আমাকে যারা জাপটে ধরেছিলো—তাদের ভেতরে কেউ।

আশ্চর্য! এই অফিসেরই কেউ তাহলে।

দিলীপ ঋষির দিকে না তাকিয়ে বললো, চল একটু ঘুরে আসি।

ঋষি 'না' বললো না। বরং আগ্রহ নিয়েই বললো, যাবি? চল্—

হেঁটে গিয়ে ওরা দুজনে অ্যাম্বেনটিনে বসলো। মুখোমুখি। দুটো করে একসঙ্গে অর্ডার দিলো। এরকম তিনবার রাম এলো। ততক্ষণে দিলীপের আটোসাটো নার্ভগুলো ঢিলে দিয়েছে। সে ঋষিকে বললো, তুই, অনন্ত, গোকুলদা—তোরা তোদের মাইনিং শেয়ার আমাকে বেচে দে—

তা কি বেচা যায়? ভৌমিক ট্রাস্ট আপত্তি করবে না?

খাদানের মালিকানা তো পাল্টাচ্ছে না। পাল্টাচ্ছে কয়লা তোলার শেয়ারের ওনারশিপ।

তাহলে আর অসুবিধে কোথায়। কিন্তু অত শেয়ার তুই কিনবি কি করে? অত টাকা?

আমার একটাও টাকা নেই। কয়লার অর্ডার নেব বড় বড়। তারই আগাম টাকা দিয়ে তোদের মাইনিং রাইট কিনে নেবো।

তুই পারিসও বটে। কিন্তু এতসব করতে যাবি কেন?

কিছু লোককে শিক্ষা দিতে।

কিন্তু দিলীপ—কোল ইণ্ডিয়ার মত কোম্পানীর সঙ্গে কোন ব্যক্তি—আই মিন ইনডিভিজুয়াল পারে?

জেদ। কল্পনা। ইচ্ছেশক্তি থাকলেই পারে। পাণ্ডবেশ্বরে আমি কি করেছিলাম? মনে নেই? কোল ইণ্ডিয়ার বিজনেসের একটা বড় অংশ ভৌমিক খাদান কেড়ে নিয়েছিলো।

কিন্তু আমাদের বয়স বেড়ে গেছে। আগের মত শরীর নেই কারও। এতবড় ঝুঁকি নিতে পারবি!

কেন পারবো না ঋষি? তোর মাইনিং রাইট বেচে দিয়ে তুই আমাদের খনিতে চলে আয়। কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ে বেশি মাইনে পাবি। কলকাতার খোলা খাতা আমাদের সামনে। শুধু তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া একবার—

এত টাকা-পয়সা কোত্থেকে পাবি দিলীপ?

কেন? যেভাবে পয়লাবারে খনি করতে গিয়ে পেয়েছিলাম।

এরারও যে পাবি—তার সিওরিটি কোথায়?

সেবারও তো সিওরিটি ছিলো না কোন।

তুই একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছিস দিলীপ। ভৌমিক খাদান এখন ইতিহাসের বিষয়। বাঙালীর কয়লাখনির ইতিহাস লিখতে গেলে ভৌমিক খাদানের নাম আসবেই। যেমন নুনের ইতিহাস লিখলে কয়েকটা নাম আসবেই। ঠাকুর অ্যান্ড কার কোম্পানী। টাকের কথা, কয়লার কথা লিখতে গেলে দ্বারকানাথ আসবেনই—তেমনই আসবে ভৌমিকদের নাম।

দিলীপ মনে মনে নিজেকে বললো, ঋষি! তোর মাথায় এই মিউজিয়ম বোধ কবে এলো? কিন্তু তা না বলে অন্য কথা বললো। ইতিহাস তো বটেই। কিন্তু ভৌমিক খাদান—আসলে তো একটা ব্যবসা।

শুধু ব্যবসা নয় দিলীপ। ব্যবসা প্লাস সামথিং।

সেই সামথিংটা কি?

ঐতিহ্য। ইতিহাসের [illegible]

টি আই মিলার ডায়নামো

- ১২ ভোল্ট ও ৬ ভোল্টের— পছন্দ তো আপনার।
- যেকোনো মেঘলা আবছা আবহাওয়াতেও... সোজা তীব্র আলোর রেখা।
- আপন শক্তিতেই আলো জ্বলে— কোনো ব্যাটারী সেলের দরকার নেই— তার মানেই আর কোন খরচ নেই।
- ছিমছাম সুন্দর গড়ন, সম্পূর্ণ ক্রোম করা, আর চুরি হবার সম্ভাবনাও নেই।

আজই মিলার ডায়নামো কিনুন। এটি হল সব আবহাওয়াতেই আলো জ্বালানোর ল্যাম্প, যা' আপনার জীবনভোর কাজে আসবে।

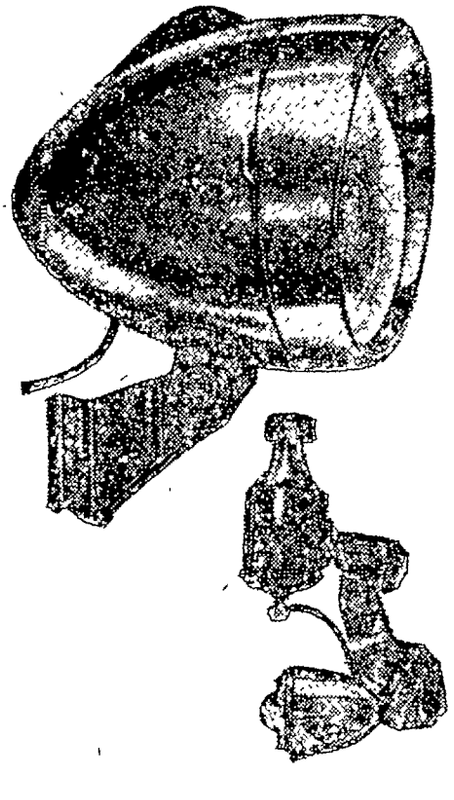

মিলার—অন্ধকার পথে আলোর রশ্মী

MILLER

টি আই মিলার লিমিটেড রাজ্যাঘ ৩০০ ৪৫৩ (টিটর ইনভেস্টমেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি পরিপূরক সংস্থা)

পাবিস। এসব সাবধানে নাড়াচাড়া করার জিনিস।

একটা লোকের চেয়ে ঐতিহ্য বড়ো?

কখনো কখনো। বলে ঋষি গ্লাসে চুমুক দিলো।

আজ বিকেলে ঋষির সঙ্গে এভাবে বসে খাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। রবি পুলিশ কাসটোডিতে। অনাথদা ঘর অন্ধকার করে ইজিচেয়ারে শুয়ে। আমি দিলীপ—পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় একটা প্রায় সারফেস মাইনিংয়ের খনি—ভৌমিক খাদানে কয়লা তোলার রাইট কিনতে চাইছি। আমার বন্ধু ঋষি—ইতিহাস, ঐতিহ্যের দোহাই দিচ্ছে। কাচের দরজার বাইরেই শীতের কলকাতা।

দিলীপ বুঝলো, তার আর বেরোবার রাস্তা নেই। সময়টাই শত্রু।

অনাথদার গায়ে হাত দেওয়া তোর উচিত হয়নি।

আমি দিতে চাইনি।

তুই অ্যাডয়েড করলে পারতিস।

সব সময় করা যায় না ঋষি। জানি—ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে।

দুজনে আবার কোল ইণ্ডিয়ার ফিফথ্ ফ্লোরে এলো। এখন সন্ধেবেলা প্রায়। টেবিলে টেবিলে আলো। ঋষি তার কিউবিকেলে গিয়ে বসলো। অফিস বন্ধ হওয়ার মুখে।

দিলীপ অনাথ চক্কোত্তির ঘরে গিয়ে দেখলো, ঘর অন্ধকার। ইজিচেয়ার খালি।

তখন দিলীপ নিজের টেবিলে ফিরে এসে বসলো। যদিও সে আজ সই করেনি—তবু টেবিলে বসলো।

একজন বললো, অনাথ চক্কোত্তি সাহেব তো নার্সিং হোমে যাওয়ার জন্যে গাড়িতে ওঠার আগেও বলে গেছেন—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—দিলীপকেও প্রোমোশন দেওয়া উচিত ছিলো। আই রেকমেণ্ড হিজ প্রোমোশন—

কথাটা শুনে অবাক লাগলো দিলীপের। অফিসে তখনো যারা ছিলো—তারা সবাই বললো, চক্কোত্তি সাহেব কিন্তু আপনাকে খুব ভালোবাসেন।

দিলীপ অফিসের প্যাড নিয়ে কোল ইণ্ডিয়ার এম-ডি'কে অ্যাড্রেস করে চিঠি লিখতে বসলো। সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে—শেষে লিখলো—

অমি খুবই দুঃখিত। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীই আমাকে এ-অফিসে এনেছেন এবং নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছেন। কিন্তু অপমানকর অবস্থায় এ-ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিলো না।

এসটাবলিশমেণ্টের কণকবাবু এসে বললেন, করছেন কি?

দোষ স্বীকার করে সবটা জানাচ্ছি ম্যানেজমেণ্টকে।

খবদার। ও-কাজ করবেন না। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে সব করবেন। এলোপাথাড়ি কিছু করবেন না।

কেন?

ওরা আপনার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেবে। বুঝলেন না—নার্সিং হোমে যাওয়ার সময়েও কী চাল চেলে দিয়ে গেল।

কিরকম? আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনে—

বলে গেল—আপনার প্রোমোশনের জন্য রেকমেণ্ড করবেন। অর্থাৎ?

কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে কণকবাবু। একটু খুলে বলুন দয়া করে।

শীগগির কার প্রোমোশন হয়েছে! ঋষি সাহেবের। কার হয়নি? আপনার! তাই আপনার জন্যে উনি রেকমেণ্ড করবেন।

করলেন। তাতে কি হোল?

অ্যাজ ইফ প্রোমোশন পাননি বলে ওঁকে আপনি অ্যাসল্ট করেছেন।

ধ্যুস! একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু চক্কোত্তি সাহেব তা করিয়ে ছাড়বেন। মোক্ষম সময়ে ও-কথাটি তিনি চাউর করে দিয়ে ভালোমানুষ হলেন। আর লোকেও ভাববে ঋষি সাহেবের প্রোমোশনে আপনি এনভিয়াস হয়ে এ-কাণ্ডটি করেছেন।

এ-সব পাগলের গল্প মশাই। এ-বাজারে মানুষ এসব বিশ্বাস করতেই বেড়ি হয়ে থাকে। আমি তো চক্কোত্তি সাহেবকে কর্মদিন দেখছিনে—।

বলতে বলতে কণকবাবু চলে গেল। এ ফ্লোর প্রায় ফাঁকা। একা একা ভাবতে লাগলো দিলীপ—অনাথদা কেন হঠাৎ—বিশেষ করে এই সময়—ও-কথা বললেন? আমার প্রোমোশনের জন্যে রেকমেণ্ড করবেন। এ-কথা তো আগে বলতে পারতো। পরেও বলতে পারতো।

কিন্তু তখন তখনই অনাথ ওকথা কেন বললো?

খানিক বাদে দিলীপ নিজেই নিজের লেখা চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়লো। তারপর লিফ্‌ট্ ছাড়াই একা একা নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। আশ্চর্য! কে আমার হাত-ঘড়িটা খুলে নিতে পারে। এটা একটা অফিস!

দিলীপ বাড়ি ফিরে পুরো ব্যাপারটা বিত্তশালি রাণীকে বললো। রাণী আদ্যন্ত বললো, কাজটা ভালো করোনি। হাজার হোক তিনি তোমার চেয়ে বড়।

দিলীপ শুধু একবার তাকালো। আকাশে মেঘ জমেছে। ঝড় উঠবে। ঝড়ের আগে ঝড়ের গন্ধ পাচ্ছে। রাণী বুঝলো, এ রমণীকে কিছু বুঝিয়ে বলে লাভ নেই। সব শুনে হয়তো বলবে—যেখানে তোমার সঙ্গে ক্লাশ হতে পারে কারও সঙ্গে—সেখানে যাও কেন?

তখুনি দিলীপ নিশ্চয় বলে উঠতো, আমার ওইসব জায়গায় যেতেই ভালো লাগে সবচেয়ে। দেখিনা কেন? কি হয়।

শীতকালে অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছিলো। ঠাণ্ডা হাড়কাঁপানো। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছিলো। তার ভেতরেই কালু ঘোষকে ডাকলো দিলীপ। চলো যাই। ঘুরে আসি কোথাও।

এই বৃষ্টিতে? সর্বাঙ্গ ভিজে যাবে।

তোমার আবার ভেজা না-ভেজা কি? সবই তো সমান।

ঠাণ্ডা লাগতে পারে তো।

ঠাণ্ডা লাগে না কি তোমার? চলো ঘুরে আসি একটু।

চলো। ভালো কথা দিলীপ। শেফালী তোমার কোন চিঠি দিয়েছে?

কার্ড পাঠিয়েছিলো ক্রিসমাসের। খুব সুন্দর কার্ড।

অ।

অস্টিন ট্যুবারটা কমাণ্ড হসপিটালের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চিড়িয়াখানায় এসে পড়লো। দিলীপ তাকাতেই সেই হরিণটার সঙ্গে চোখাচোখি। দিব্যি নকল পাহাড়ে উঠে মন দিয়ে দেওয়ালের বাইরের পৃথিবী দেখছে।

কালু ঘোষ ফসন দিলো। রাস্তা দেখে চালাও। আরেকটু হলেই তো অ্যাকসিডেণ্ট করতে।

ওই হরিণটাকে দেখেছো কালুদা?

ওটাই তো। আমি বেঁচে থাকতে ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হোত আমার। কতদিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে ওকে খাবার দিয়ে এসেছি।

ওকে আমাদের সঙ্গে নেবে কালুদা?

এখন যাবে কোথায় আগে বলো?

দিলীপ বললো, গোকুলদা, ঋষি আর অনন্তর বাড়ি।

সে তো শহরের তিন জায়গায়। তার চেয়ে বাড়ি ফিরে ফোন করে দ্যাখো ওনারা বাড়ি আছেন কি না?

মন্দ বলোনি। দিলীপ ফিরে এসে ডায়াল করলো। তিনজনের কেউ বাড়ি নেই। তাহলে তিনজন কোথায়?

দিলীপ আবার গিয়ে গাড়িতে বসলো। কালু দোষ বললো, আবার বেরোবে? গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

চলো একটুখানি। অর্ডিনান্স ক্লাবে যাবো আর আসবো।

রেসকোর্স ফেলে হেস্টিংসের দিকে যেতে খানিক গিয়েই দেওয়াল ঘেরা ক্লাবে দিলীপ ক্লাবের ভেতরে গেল না। বাইরে পার্ক করানো গাড়িগুলো দেখে তার ভেতর পর পর দাঁড়ানো তিনখানাকে চিনতে পারলো। পেছনে ঋষির গাড়ি। মাঝখানে অনন্তর। শেষে গোকুলদার।

(চলবে)

দুঃসাধ্য রোগ

একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত, রক্তদোষ, বাতরক্ত, ফুলা, শ্বেত-দাগসহ আরও অনেক কঠিন চর্মরোগ হইতে স্থায়ী মুক্তিলাভের জন্য ৬৪ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্র চিকিৎসিত হউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া-১, ফোন: ৬৭ ২৩৫৯: শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড (হ্যারিসন রোড), কলিকাতা-৯

মায়ের সঙ্গে হাসপাতাল অব্দি

সোমক দাস

সকালবেলা বাবা বলেছে, খুব রাগী আর বোকা মানুষের মত মুখ করে, বলেছে—'জানি না, জানি না।' তারপরে, সন্তু যখন জানলায় বসে বাইরের ছোট বাবোয়ারি মাঠের ওপারে ডালমিলের মাথার চিমনিটা দিয়ে অনবরত ধোঁয়া ওঠা দেখছিল, দেখছিল ধোঁয়াগুলো চিমনি দিয়ে বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই, ছোট ছোট মেঘ হয়ে যাচ্ছে, কতরকম ছবি হয়ে যাচ্ছে আকাশে—বাবা ঘরের কোণে হেলান দিয়ে রাখা ক্যাচটা নিয়ে বোকা আর রাগী মুখ করে বেরিয়ে গেছে। ডালমিলের দেয়ালে ফাটা ফাটা দাগ, অশ্বত্থচারা, ম্যামিথের এক্সস্ট্যার মতন শেকড়, মাঝখানে একটা ছিরাট জানলা যেটা বন্ধ করা যায় না কখনো কারণ পাল্লাফাল্লা কিছু নেই, গরাদ বলেও কিছু নেই। আরো অনেক প্রিয় ভাবনার মধ্যে সন্তুর একটা প্রিয় ভাবনা হল যে একদিন ওই জানলাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে ডালমিলের কালো কালো লোকগুলোকে দেখে আসবে, ছুঁয়েও আসবে। কেন যে এত কালো কালো দেখায় লোকগুলোকে এই জানলা থেকে—সন্তু জানলা দিয়ে সেইসব দেখছিল যখন, ঘরের বাইরে সরু বারান্দার ওপারে আড়াল করা যেখানটায় রান্না করে মা, বৃষ্টি এলে চটের থলের আড়াল ভেঙে সব ভেসে, যায়, সেখান থেকে তারস্বরে কত কি যে বলে যাচ্ছে মা সন্তু শুনতে পাচ্ছিল! খানিকটা বাবাকে খানিকটা বিধাতা-পুরুষকে উদ্দেশ করে, সন্তু তার অনেক-কিছুই শুনতে চায় না, শুনছিল না সে। জানলায় বসে এখান থেকে দেখতে পেল, মাঠের এপাশে, যেখানে একটা টিউকল আছে, যেখানে বেঁকে গেছে গলিটা বাবা বেঁকে যাচ্ছে—দুবগলে লাগানো ক্যাচ, বা-পায়ে মাটিতে ঘষে ঘষে যাচ্ছে। জানি না, জানি না বলে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাবা, রাগে আগুন জ্বলে উঠেছিল মাথায়, দাউ দাউ করে উঠেছিল. শরীর—সে জানবে? জানি না মানে? অথচ এখন, টিউকলের পাশ দিয়ে গলির মোড়ে যখন বেঁকে গেল বাবা, বগলে ক্যাচ, তার মনে হল যেন বাবা নয়, যেন অন্য কেউ, একটা খুব বোকা রাগী আর দুঃখী লোক যেখাও চলে যাচ্ছে। খুব ময়লা, নোংরা একটা পাজামা আর ফতুয়া তার গায়ে। পাজামাটার রং প্রায় ওই ডালমিলের চিমনির ধোঁয়ার মতন। একমাস আগেও ওই লোকটা এই ঘরের এক কোণে আলাদা বিছানায় শুয়ে পড়ে থেকে চেঁচাতো— বারোরে-মারে-মারে গেলুম রে, আর খিস্তি—সন্তু জানতোই না তার বাবা এত খিস্তি জানে। সেই বাবা, দেশের বাড়ি থেকে দাদার হাত ধরে কলকাতায় বাবার দোকানে আসতো সন্তু। দোকানে কত সুন্দর সুন্দর তাক, কত সুন্দর গাড়ি, কত সুন্দর জিনিস, হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেই কি-রেন হয়ে যেত তার। কত

লোক, কত গাড়ি, কত মজার মজার জিনিস তার চারদিকে। এ সবই সে দেখতে পাচ্ছে বিনা পয়সায়, ভাগ্যিস বায়না ধরেছিল তিনদিন ধরে কলকাতা যাবে বলে। মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল দাদার, আর শুনতে পেয়ে সন্তু নাছোড়বান্দা, কলকাতা সে যাবেই দাদার সঙ্গে। দোকানে উঠেও সেই কি যেন হয়ে যাওয়া সন্তু তার বাবাকে অন্য চোখে দেখতো, তিনজন কর্মচারী ছিল দোকানে—দিলীপকাকা, বেচোকাকা, আর একজনকে সে চেনে না। কি সুন্দর একটা বড় তখলনা হাতী ঝুলছিল দোকানের সামনেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোকানে পা দিয়েই সেটা চোখে পড়তো, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল সন্তু কিন্তু এত উঁচুতে ছিল যে—। দিলীপকাকার হাতে কাউন্টার ছেড়ে দিয়ে বাবা যখন কথা বলছিল দাদার সঙ্গে, সন্তু হাঁ করে শুধু দেখছিল হাতিটাকে। শেষ পর্যন্ত হাতিটা না নিয়ে দোকান থেকে নামতে চায়নি সন্তু 'না, যাবো না' বলে বাবার জামা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। শেষে, কেন যাবে না সে, অনেকবার জিগ্যেস করার পর সেই কি যেন হয়ে যাওয়া সন্তু আঙুল দিয়ে ঝোলানো হাতিটাকে দেখাতে পেরেছিল শুধু। বাড়ি ফেরার সময় তার মনে হয়েছিল সে সঙ্গে করে একটুখানি কলকাতা নিয়ে যাচ্ছে যেন। দেশের বাড়িতে মায়ের আলমারির নিচের তাকের বাঁদিকে হাতিটা এখনো আছে। সন্তু ঠিক করেছিল ওটা বাড়িতে গিয়ে শিখা, মানে বুলবুলকে দিয়ে আসবে। তখন তার এইট ক্লাশ চলছে, মনে আছে স্পষ্ট—এখনো সন্তুর, শংকর যখন তেঁতুলবিচি নিয়ে গচ্চি খেলতে খেলতে তাকে বলেছিল কথাটা, মানে কিপ্টে বুড়ো সতীশ চাটুজ্জে তার আদরের নাতনিকে নিয়ে চলে যাবে আঁটপুর থেকে, এখানে আর পড়াবে না—তখন সন্তু ঠিক করেছিল ওই দুন্দর হাতিটা সে বুলবুলকে দিয়ে আসবে লুকিয়ে লুকিয়ে। লুকিয়ে, কারণ লোকের সামনে বুলবুলের সঙ্গে তখন তার কথা বন্ধ। ওই বয়সেই। ওঃ, সেকি কাণ্ড এখনো মনে আছে সন্তুর, স্পষ্ট। ক্লাশ ওয়ান থেকে তারা একসঙ্গে পড়তো তবু কিছুই হয়নি কোনদিন। একদিন পড়া বলতে পারতো না বুলা। আর সন্তু ক্লাশের ফার্স্ট বয়। কি করে যে ফার্স্ট হয়ে যেতো সন্তু নিজেও জানে না। বাবা তখন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি। লালমোহন স্যার লাস্ট পিরিয়ডে জেনারেল সায়েন্স পড়াতো, ক্লাশ এইটে—সিকসথ পিরিয়ডে ছিল জ্যামিতি, জ্যামিতির তরুণ স্যার আসেননি বলে সবাই খুব হৈ-চৈ চিৎকার গোলমাল করে যাচ্ছে, পাশের ঘরে ক্লাশ ফাইভের ছুটি হয়ে গেছে বলে ফাঁকাই ছিল ঘরটা, সন্তু এক ফাঁকে সেখানে গিয়ে দেখে নিচ্ছিল পড়াটা—সাইফন কাহাকে বলে আর আর্টেজীয় কূপ। মনে আছে স্পষ্ট এখনো সন্তুর। লালমোহন স্যার বড্ড বোকা আর রাগী লোক ছিল—হুবহু মুখস্থ না বললে হাত চালিয়ে দিত কিংবা নীলডাউন, স্ট্যান্ড-আপ অন দি বেঞ্চ, পাশে ঘরে একা চুপচাপ তাকে পড়া করতে দেখে কখন যে বুলা নিঃশব্দে এসে তার পেছনে খুব ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সন্তু জানতেই পারেনি— হঠাৎ কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস পড়তে ফিরে তাকাতে গিয়ে, পিঠ সোজা করতে গিয়ে বলার বুকে তার ঘাড়-মাথা-কান ঠেকে গিয়েছিল আর বুলা গাল লাল করে, 'ইস, ভালো ছেলে, খুব পড়া হচ্ছে, এত ভালোলাগে তোর বই পড়তে, আমার একদম ভালোলাগে না' বলে ঘচ্চাচ্ছিল। ঠিক তখনই দরজায় সুনীলের মুখটা দেখা গেল একবার আর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। বুলার একটা ডোন্ট-কেয়ার ভাব এমনিতেই ছিল, ফুটফুটে সুন্দর মেয়েদের যেমন থাকে। পাশে বসে পড়ে মাথাটা কাঁধের বাঁদিকে এলিয়ে দিয়ে বলল, 'কাল থেকে আমি কতবার পড়েছি জানিস, কিছুতেই তৈরি হচ্ছে না, পড়াটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারিস আমায়—তাহলে বুঝবো তুই সত্যিই ভালো ছেলে।' তখন, সন্তুর মনে আছে স্পষ্ট, সে বলেছিল—'তুই বুকে বুঝে, ভালো করে পড়িস না তাই মনে থাকে না'। তারপর বুলা একটা করে শব্দ পড়ে আর একটু করে চুপ করে থাকে আর্টেজীয়। কূপ। হইল। সন্তু বেগে গিয়ে উঠে চলে এসেছিল। লালমোহন স্যার ততক্ষণে ক্লাশে এসে গেছে। লাস্ট পিরিয়ড। পড়া বলছিল দুখিরাম। ফার্স্ট বেঞ্চ ভর্তি। সন্তু সম্ভবত সেই প্রথম একদম লাস্ট বেঞ্চে গিয়ে বসল, একা। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে এসে বুলাও বসল মেয়েদের দিকের লাস্ট বেঞ্চে। তারপর দুজনে যখন দুজনেরই অজান্তে দুজনকে সব ভুলে গিয়ে দেখছে শুধু, গালে হাত দিয়ে তার দিকে ফিরে বড় বড় চোখে কি যে চেয়ে ছিল বুলা, মনে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তুর সেই চেয়ে-থাকা মনে থাকবে। হঠাৎ লালমোহন স্যার 'তোমাকে এক চড় মারবো সুশান্ত' বলে উঠলে সন্তু যখন 'কেন স্যার' বলল তখন ক্লাশসুদ্ধু সবাই হো-হো করে হেসে উঠেছিল। পরদিন স্কুলে গিয়ে দেখল ক্লাশময় সারা দেয়ালে আর ব্ল্যাকবোর্ডে সুশান্ত প্লাস শিখা, সুশান্ত প্লাস লেখা, আর বুলা বিকেলে যখন বাড়ি ফিরছে তখন সবাই মিলে পেছন থেকে সুর করে তাকে সু-শা-ন্ত সু-শা-ন্ত বলে খেপালো অনেক। ব্যাপারটা সেখানেই মিটে যেতো। কিন্তু দুপুরবেলা একদিন সন্তু শংকরকে জোটকাকার ঘরে বলে ফেলেছিল—আমি বুলাকে বিয়ে করবো, কারণ শংকর তার আগেই বলেছে সে মিনতি চোংদারকে বিয়ে করবে। 'আর তুই?' জিগ্যেস করলে সন্তু ওরকম বলে দেয়। শংকর আর বুলা কাশী বোসের কাছে পড়তো। শংকর কাশী বোসকে বলে দেয় কথাটা আর কাশী বোস সতীশ চাটুজ্জেকে। কাশী বোস বুলাকেও ছাড়েনি, খুব বকে দিয়েছিল। আর সন্তু হুস হুস খেলতে খেলতে চোর দেবার সময় যেমন সে চুপচাপ বাড়ি চলে যেতো চিরকাল, কারণ সারা গাঁয়ে কে কোথায় লুকিয়েছে খুঁজে দেখার তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, যতক্ষণ সে চোর না হচ্ছে ততক্ষণ খেলাটা খুবই ভালো লাগে তার, কালীপুজোর রাতে সারারাত খেলা হত, একবার রাত আড়াইটের সময় দূর থেকে তাকে দেখে ফেলেছিল দুখিরাম আর হুস হুস সন্তু বলে দিয়েছিল আর পরের দানে চোর দিতে গিয়ে, বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্তু—সকালবেলা, সে যাকগে—হুস হুস খেলতে খেলতে একবার সে বুলাদের বাড়ির পেছনের টগরগাছটার নিচে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। বাড়ির পিছন দিকে একটা পরিত্যক্ত সিঁড়িতে বসে কতদিন গল্প করেছে সে আর বুলা, সেখানে তখন একা একা বসে ছিল বুলবুল, তাকে ছুটে যেতে দেখে ডেকে উঠেছিল—সন্তু, এই সন্তু শোনো। শোনো—শুনে থমকে থেমেছিল সন্তু। বুলা তাকে তুমি করে বলছে। কি ব্যাপার! বলতে যাচ্ছিল, এখন সময় নেই পরে শুনবো, কিন্তু গুটি গুটি এগিয়ে গেল সে বুলার দিকে। তখনো কিছুই জানে-না-শোনে। বুলার চোখ লাল.

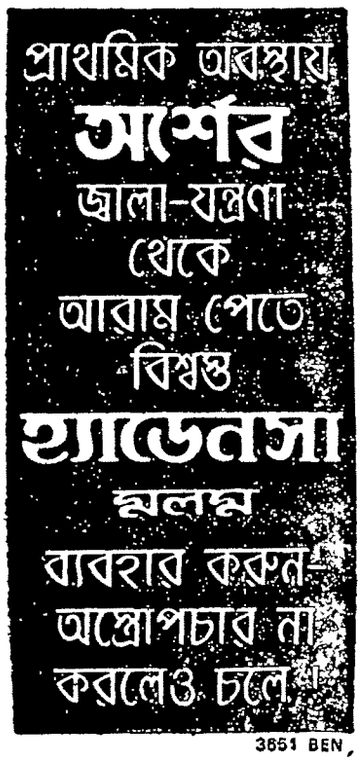

3651 BEN

যেন কেঁদেছে খুব। গাল লাল, যেন সন্তুকে ডেকেছে বলে লজ্জা। বুলাকে খুব নতুন লাগল সন্তুর। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কি'। তখনো মনে আছে স্পষ্ট—বুলার চোখে ছিল দুঃখ, অভিমান, আর অনেক রাগ। বুলা বলেছিল—'তুমি কি বলেছো আমার নামে'? আবাস থেকে পড়া ভাবটা হজম করতে করতে কোমর কষে সন্তু বলেছিল, কই কিছু বলিনি তো'। বুলা তখন তার দিকে অনেকক্ষণ লাল দুঃখী চোখে চেয়ে থেকে বলেছিল—'আমাকে বললে না কেন, শংকরকে বলার কি দরকার ছিল'। আর যখন, সন্তু অর্ধেক বুঝে অনেক কিছু না বুঝে, মানে বুলা কি করে জেনে গেল, ইতিমধ্যে কি কি ঠিক ঘটে গেছে, সেসব বুঝতে না পেরে চুপ করে চলে আসছিল—বুলা বলেছিল, 'শোনো, তুমি এখন থেকে সবার সামনে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।' তো, সন্তু আর কোনদিনই কথা বলে নি বুলার সঙ্গে। তার আগেই বুলাকে আঁটপুর থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁকা ক্লাশঘরে বুলার সঙ্গে তার কিছুক্ষণ থাকা নিয়ে কথা রটেছিল। কথাটা রটতে রটতে ফেঁপে যায়, ফুলে যায়। আর সন্তু তখনো সত্যি সত্যি ভালো ছেলে, ফার্স্ট বয়, জন্মরহস্যও বোঝে না। বুঝিয়েছিল দুখে, দুখিরাম। খেলার মাঠে সন্ধেবেলা ফুটবল খেলার পর সন্তুর সঙ্গে দারা সিং-এর কায়দায় কুস্তি লড়তো দুখে। সেই তাকে শিখিয়েছিলো শনিবার ছুটির পর বাড়িতে বই-খাতা ফেলেই দৌড়ে গিয়ে কিভাবে দুটো চোদ্দোর মার্টিন ট্রেনে লাগিয়ে ওঠা যায় মাঝ রাস্তায়, তারপর ভ্রিঙ্গিপাড়া, ভোলানাউলির তেপ্পলের সিনেমা হলে উনিশ পয়সার টিকিট কেটে চটে বসলেই দারা সিং ওটা মমতাজ—চিনিয়েছিল দুখে। আর সন্ধেবেলা খেলার মাঠে তাকে নিয়ে কুস্তি লাগাতো দুখে, কোনদিনই তার সঙ্গে পেরে ওঠেনি সন্তু। আসলে সে লড়তেই চাইতো না। খামোকা লড়ালড়ি তার আসলে পছন্দ নয়, তেমন। রোগা-পাটকা দুখে সেই বয়সেই বেঁড়ে ওস্তাদের মতন বড় বড় কথা বলতো, মাথা দুলিয়ে বকবক করার একটা ভারিক্কি ভঙ্গি ছিল তার, যেটা সন্তুর মনে হয় দুখে তার দাদুর কাছ কাছ থেকে পেয়েছে। আর একটা গুণ ছিল দুখের, গলা খুলে গান গাইতো খুব। 'কোকিলা তোরে শুধাই রে, সবারই তো ঘর রয়েছে কেন রে তোর বাসা কোথাও নাই রে। কিংবা অলির কথা শুনে বকুল হাসে, কই তাহার মত তুমি আমার কথা শুনে ইত্যাদি। সন্তুর মনে পড়ল গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে গানটা তখন তাকে ভাবিয়েছিল খুব। স্টেশনের বড়পুকুরের পাড়ে মন্দিরতলায় ব্যায়াম খেলা হত সন্ধেবেলা, বিশাল বড়পুকুরের ওপার থেকে ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসতো মাইকের সুদূরে সুর—গানে ভুবন...! তো অন্য কথা ভাবছিল। মানে ভাবছিল, তার তার নিজের জন্মের পেছনেও এই একই কারণ? তখন দুখেকে আর কিছু বলতে দেয় নি সন্তু। খেলার মাঠে কুস্তিতে সে কোনদিন পারতো না দুখের সঙ্গে। কিন্তু সেদিন, সেই একদিনই— কি যে মার খেয়েছিল দুখে তার হাতে। বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎই আচমকা হাত চালিয়ে দিয়েছিল সন্তু। আর থামেনি। এখন ভাবলে হাসি পায়।

*

হাতির কথা হচ্ছিল, কলকাতা থেকে হাতিটা নিয়ে চলার সময় মনে হয়েছিল সন্তুর সে একটুখানি কলকাতা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। আঁটপুর থেকে চলে আসার আগে ঠিক করেছিল সন্তু সে তার ওই প্রিয় হাতিটা দিয়ে দেবে বুলাকে। দেওয়া হয়নি। সন্তু কখনো ভুলতে পারে না যে শুধু তার জন্যেই বুলাকে চলে আসতে হয়েছিল আঁটপুর থেকে। হাতিটা আঁটপুরের বাড়িতে মায়ের আলমারির নিচের তাকে একা একা দাঁড়িয়ে আছে। আজ হঠাৎ সন্তুর মনে হল, ওটাকে সে কলকাতায় বাবার দোকান থেকে নিয়ে গিয়েই ভুল করেছিল। না নিয়ে গেলে দোকানটা আলো থাকতো, হাতিটা ওই ঝকঝকে দোকানের মাঝখানে ছবির মত ঝুলতো। মনে হল সন্তুর। সেন সে এটাকে নিয়ে গিয়েছিল বলেই দোকানটা উঠে গেছে। আজ হাতিটা খুব দুঃখে একা একা আলমারির নিচের তাকে অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। অত অন্ধকারে নিশ্চয়ই তার খুব কষ্ট হচ্ছে। অবোস নেই তো। হিসেব করে দেখল সন্তু, প্রায় চার বছর পরেও হাতিটার ওপর তার মমতা একইরকম আছে। এখানে এই ঘরে খাটের নিচে একটা ব্যক্তিগত টিনের বাকস আছে তার। সেখানে আছে মায়ের কম বয়সের একটা ছবি, বিয়ের পরে তোলা— ঠোঁটের নিচে একটুখানি জায়গা পোকায় কেটেছে, শাদা মতন দাগ হয়ে গেছে, তবু মাকে যে কি সুন্দর দেখায় সেখানে। মায়ের কাছে গল্প শুনেছে সন্তু, বিয়ের পর সারা আঁটপুরে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল। এত সুন্দর বৌ এ তল্লাটে নেই। দাস বাড়ির বড় বৌ বলে যত খাতির ছিল মায়ের তা শুধু ওই বড় বৌ হিসেবে নয়। সন্তুর মনে হয় ভালো দেখতে হওয়ার একটা বিরাট দাম আছে। দেখতে যেমন বিদঘুটে হয়ে গেছে বলেই কি আর মাকে তার ততটা ভালো লাগে না? মনে হয় সন্তুর। তার টিনের বাকসে মায়ের ওই সুন্দর ছবিটার সঙ্গে একইরকম বুপোলি ফ্রেমে আঁটা বাবারও একটা ছবি আছে, বোধহয় দার্জিলিং-এর ম্যালে দাঁড়িয়ে আছে বাবা, পাহাড় দেখছে, গায়ে গলাবন্ধ কোট। তখন কি সুন্দর চেহারা ছিল বাবার। চার পাশের পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা বাবার ওই ছবিটা সন্তুর খুব পছন্দ। তবে মায়ের ছবিটার মতন নয়। মায়ের ছবিটা সন্তুর অন্য কারণে ভালো লাগে। এই মাকে সে চিনতে পারে না। টগর ফুলের মতন গায়ের রঙ, বড় বড় চোখে ছবির মা তার দিকে চেয়ে থাকে। আর সন্তু ভাবে, তার এখনকার মায়ের যসে চাওয়া গাল, রুক্ষ চুল, রক্ত কম বলে

আবদুল মতলেব (বাণীনিন্দন) রচিত

সঙ্গীতাঞ্জলি—১০

ইহাতে ভক্তি, মধুর ও বিবিধভাবের উচ্চ আদর্শ ও সাহিত্য রস-সমৃদ্ধ, "আকাশবাণী"তে গাওয়ার জন্য লং-টাম-কন্টানুযুক্ত ২৬০ খানি হৃদয়গ্রাহী নূতন গান আছে, যাহা ভাবের গভীরতায়, মাধুর্যে, সুন্দর বাণী-বিন্যাসে, সুর-সুরের বৈচিত্র্যে অপূর্ব, অনবদ্য। রবীন্দ্র-নজরুল-গীতির পর বাংলার এরূপ গীতি-সম্পদ বিরল।

প্রাপ্তিস্থান :-(১) গ্রন্থকার, আর/কিউ-১, গভঃ হাউসিং এস্টেট, ও, টি, আর, সি, বেহালা, কলিকাতা-৩৮। (২) মে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ এবং অন্যান্য পুস্তকালয়।

বি/৭১২৭

CALCUTTA
CENTRAL LIBRARY

গায়ের রঙ বাসি গোলাপ ফুলের মতন দেখায়, এই মাকেই তার পছন্দ। ছবির মাকে সে চেনে না। তার এই টিনের বাকসে আরো অনেক কিছু আছে। পুরোনো চিঠি: সুকুমারের চিঠি। সুনীল, চন্দ্রা গৌরী, ঝর্ণা, রতনের চিঠি। শুধু বুলার চিঠি নেই। বুলা তাকে চিঠি লেখেনি। বুলাকে হাতিটা দেবার তার খুব ইচ্ছে ছিল। হাতিটা ওই টিনের বাকসে করে নিয়ে এলেই হত আঁটপুর থেকে। থাকতো। মাঝে মাঝে বের করে দেখতো সন্তু।

দেখতো, একটুখানি কলকাতা সঙ্গে করে কলকাতা থেকে নিয়ে যাবার কত সুখ ছিল তখন। এখন, এই এঁদো গলির মধ্যে জানলা দিয়ে ডালমিলের চিমনির ধোঁয়া দেখা যায় এই ঘরটাতে—সত্যিকারের কলকাতার মধ্যে চিরকালের জন্যে থাকতে এল সন্তুরা, কি বিচ্ছিরি, কি একঘেয়ে এই গলির কলকাতা; সন্তু, হাতিটা থাকলে—তার ছোট্ট বেলার ভালো লাগার কলকাতাকে তারিয়ে তারিয়ে দেখতো।

ডালমিলের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সন্তুর মনে হল, অশ্বত্থ গাছের লম্বা লম্বা জ্যামিতির একস্টার মত শিকড়গুলো এক সঙ্গে উঠে আসছে দেয়াল থেকে, স্কুল মাঠে—ভলি খেলার আগে মন্টুদা জুট পাকিয়ে যাওয়া নেট খুলতে খুলতে সন্তুকে বলতো, জট খুলতে শেখ, সরল অঙ্ক করতে পারবি ভ্যালো—একটা খুঁট সন্তুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিপুণ কায়দায় জট ছাড়িয়ে যেতো মন্টুদা—সেইরকম জালের মতন হয়ে যাচ্ছে শিকড়গুলো। শেকড়ের একটা শিরাট জাল দেখছে সন্তু, ওইটা কি হাত, আর ওইটা বোধহয় তার পা—হাতপা ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে। মাথা নেই, চোখ নেই, শরীর নেই—শুধু লম্বা লোগা কঙ্কালের হাত-পায়ের মতন শেকড়।

কণ্ঠসঙ্গীত, বন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র

মেট্রোপলিটন কলেজ

পরিচালনা ও শিক্ষাদানে

শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

সুযোগ্য পুত্র

গোলাম সবীর খাঁ

ও

শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য বিশিষ্ট বেতারশিল্পী

২৪১/১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা

ফোন : ৪৫-০৯০৯

বড় পুকুরের পাড়ে ছোট্ট মাচার ওপর বসে থাকতো অসীম সরকার, কপালে বুকে নাবকেল ভাঙতে—যৌবনে সে বিখ্যাত ডাকাত ছিল। চোখ দুটো মড়ার মত ঠাণ্ডা আর লাল, সব সময় আফিম খেয়ে থাকতো। বুলা আঁটপুর থেকে চলে যাবার পর বিকেল বেলা খেলার মাঠে আর যেতো না সন্তু—একা একা ঘুরতে ঘুরতে একদিন জলের ধারে মাচার ওপর—অসীম সরকারকে দেখে সন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দীঘির কালো জল, শালুক ফুল, হাঁস আর বিকেলবেলার আকাশের দিকে লাল চোখে চুপ করে চেয়ে ছিল অসীম সরকার। কি ভেবে সন্তু তার কাছে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। অসীম সরকার তার মোলাটে চোখে সন্তুর দিকে তাকাতেই চোখ বুজে ফেলেছিল সন্তু। চোখ বুজেই সন্তু পরিষ্কার দেখেছিল—গন্ধমাদন পর্বত হাতে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে হনুমান। মাস্টারমশাই পড়াতে এলে বাড়িতে ক্যালেন্ডারের ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে পড়া বলতো সন্তু। অসীম সরকার পাহাড়ের মতন ভারী গলায় বলেছিল, 'ভয় পাস কেন এত? তোরও তো হাত আছে। পা আছে। সোজা দাঁড়িয়ে থাকবি। মাথা নোয়াবি না। মা ছাড়া কারো কাছে মাথা নোয়াতে নেই।'

পাতলা কঞ্চিকে হাতে নিয়ে বেঁকিয়ে দিলে যেরকম বেঁকে যায়, সেইরকম বেঁকে যেতে যেতে বাবান্দা থেকে নেমে এসে নীচু তক্তপোষের ওপর বসে পড়লো মা। ডানদিকের কোমরে একটা হাত রেখে মা কসরৎ পিছন দিকে হেলে যাচ্ছিল। এলোমেলো গোড়ানির মধ্যে থেকে, সন্তু যখন বাগ দুঃখ আর অসহায়তার চোখে মায়ের দিকে চেয়ে আছে—মা বলল, বিকশা ডাক সন্তু, বিকশা। জামাটা হাতে তুলে নিয়ে গায়ে না গলিয়েই সন্তু দৌড়ে বিকশা ডাকতে চলে গেল। গলির ভেতরে বিকশা আসে না। কোথায় যেতে হবে সন্তু তাও জানে না। তবু 'হাসপাতালে' বলে রিকশা পেয়ে গেল চট করে। গলির মুখে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার ছুটে ঘরে এল সে। মা ইতিমধ্যে অন্য একটা কাপড় পড়ে ফেলেছে। দরজাটা ধরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, যন্ত্রণা সামলাবার চেষ্টা করতে করতে, সন্তুর কাঁধে একটা হাত রেখে মা বলল—চল্। সিঁড়ির কাছটা অন্ধকার মতন; সেখানে দিয়ে সাবধানে নেমে পিছল কলতলা, খুব সতর্কতার সঙ্গে সন্তু মাকে ধরে ধরে নিয়ে গেল। গলি দিয়ে যেতে যেতে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল সন্তুর। সবাই বিরকম চোখে যেন তাকিয়ে আছে। ব্যথার জন্যে মায়ের সে সব খেয়াল নেই। শুধু কুমাগত ছোট ছোট যন্ত্রণাকাতর শব্দ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

এখান থেকে খুব কাছেই ঘুর্ণিপাড়া মেয়ে হাসপাতাল। রিকশায় সন্তু খুব শক্ত করে মাকে ধরেছিল। হাতে টানা কলকাতায় রিকশা সন্তুর একদম ভালো লাগে না।

মেয়ে হাসপাতালে গিয়ে কি যে লাগে না। সন্তু কাছাকাছি গিয়ে একবার শুধু বলেছিল, যদি জায়গা না থাকে? ছেড়ে নুয়ে যেতে যেতে মা কোনরকমে বলল—জানি না, আমি কিছু জানি না। সন্তুর মনে পড়ল বাবাকে যখন সকালবেলা মা খুব যা-তা বলছিল—বাবাও তখন এইরকম করে বলেছিল, 'জানি না, জানি না'। বগলে ক্রাচ নিয়ে পা ঘষতে ঘষতে কোথায় যেন চলে গেছে। বাবাকে তখন কেমন বোকা: আর রাগী মানুষের মন্থন দেখাচ্ছিল। মাকে একদম সেরকম দেখাচ্ছে না। মায়ের এখন ঠিক কতটা কষ্ট হচ্ছে খুব বুঝতে চাইছিল সন্তু। কিন্তু একদম বুঝতে পারছিল না বলে নিজের ওপর রেগে উঠছিল ক্রমশ।

বাবা কিন্তু এরকম ছিল না। সন্তু তো ভালোইবাসতো বাবাকে। কি করে যে কি-সব হয়ে গেল—দোকানটা বিক্রি হয়ে গেল, এগারো মাস বিছানায় শুয়ে রইল বাবা, বাতের ব্যামো সহজে নাকি সারে না। একবার সারে তো কিছুদিন পরে আবার হয়। তখন বাবা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইচ্ছে করে নোংরা করতো সব—মায়ের দিকে একদিন থুক থুক করে থুথু ছুঁড়ে মেরেছিল। বলেছিল, আমি মরে গেলে তুই আমার মাংস খাবি, আমি জানি। থুথু খা—তুই আমার থুথু খা। একটু যখন ভালো হয়ে উঠছে, কি একটা কবিরাজি তেল মালিস করতো পায়ে, কেউ মালিশ করে দিত না বলে, ডাকলে কেউ সাড়া দিত না বলে, সে কি রাগ বাবার। কাশ্মীর থেকে কিনে আনা একটা সুন্দর খুব লম্বা মাফলার দিয়ে তার কবিরাজি তেল মাখানো হাঁটুতে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধেছিল বলে মায়ের সে কি রাগ। বাবা নাকি ছেলে-মেয়ের জন্যে সংসারের জন্যে কোনদিন কিছু করেনি—শুধু নষ্ট করেছে। সন্তুর মনে হত, বাবা যে এতদিন এত এত টাকা রোজগার করেছে। পুজোর সময় কত জামা কিনে দিয়েছে, বাবিবারে সিনেমা দেখিয়েছে, কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছে—মা সেসব ভুলে গেল কি করে!

বাবার কাছে কেউ কিছু চাইলে বাবা এক কথায় সব দিয়ে দিত—সন্তু দেখেছে দিতে না পারলে বাবার একটা কষ্ট হতো কি রকম। গলির মুখে একটা ইস্কুল আছে সেই ইস্কুলের একজন বুড়ো মাস্টারমশাই বাবার সঙ্গে গল্প করতে আসতো। তাকে দেখতে ছিল একদম রবীন্দ্রনাথের মত। সন্তু ছেলে থাকতো হাঁ করে, শাদা চুল, শাদা গোঁফদাড়ি—বুক অব্দি ঝুলে আছে,

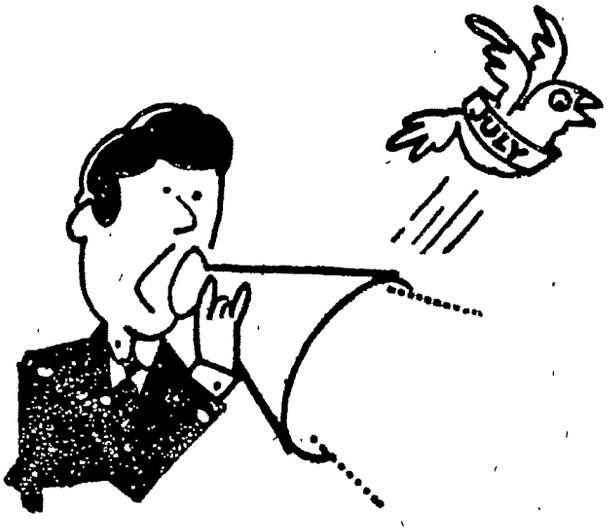

সময় কম।
এখনই ইউনিট্
কিনুন।
সবচেয়ে বেশী লাভ
করুন!

জুলাই মাস

ইউনিটের দাম এখন সবচেয়ে কম (১১,২৫)।

সুতরাং কিনবার এটাই উপযুক্ত সময়।

জুলাই মাসের এই বিশেষ সুযোগই একমাত্র আকর্ষণ নয়। অন্যান্য অপূর্ব সুবিধাগুলিও লক্ষ্য করুন ঃ

* মূলধনের নিরাপত্তা
* ট্যাক্সে ছাড়
* সকলেরি উপযুক্ত পছন্দসই অপূর্ব প্ল্যান এবং স্কীম।

দেরী করবেন না। সত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

* আকর্ষণীয় লভ্যাংশ
* সহজেই ভাঙ্গানো চলে

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

8; ফেয়ারলি প্লেস (দোতলা),

কলিকাতা—৭০০০০১।

ফোন ঃ ২৩-৯৩৯১, ২৩-১৬৩৮ এবং ২৩-৮৮১৮।

ইউনিটের পর ইউনিট কিনে—আপনার সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলুন

এসআইএসটিএস-ইউ টি আই।সি।৮।৭৪

আর কি শান্ত নরম দুটো চোখ। সন্তু খুব বেলায় ঘুম থেকে উঠতো বলে সেই মাস্টার-মশাই তাকে একবার বলেছিল—ভোর-বেলাটা সারাদিনের মধ্যে সব থেকে বেশী দামী, জানো? তুমি ঘুমিয়ে থাকো বলে সেটা বুঝতে পারো না। এরকম কথা সন্তুকে কমবেশী সবাই বলে কিন্তু গা করে না সন্তু। কিন্তু ওই মাস্টারমশাইয়ের মুখে শুনে খুব লজ্জা পেয়েছিল সে। বোধহয় তাঁর শাদা গোঁফদাড়ির জন্যে...। সেই মাস্টারমশাইকে বাবা একবার একটা বিস্কুট রঙের চাদর দিয়ে দিয়েছিল। সাত দিনও হয় নি সেটা কিনে এনেছিল বাবা আর রঙটা খুব পছন্দ হয়েছিল বলে সন্তুই সেটা গায়ে দিতো বেশী।

বোধহয় অকারণে মানুষের উপকার করার এত ঝোঁক ছিল বলেই দোকানটা বাবা রাখতে পারলো না। 'দিলীপ, দোকানটা বন্ধ করে দিস' বলে দিলীপকাকা আর বেচোকাকার হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে বাবা নাইট শো-রে সিনেমা চলে যেত। কর্মচারীর হাতে কেউ দোকান ছেড়ে দেয়? এখন বেচোকাকা দিলীপকাকা দুজনেই আঁটপুরে কি সুন্দর বাড়ি করেছে। একবার সারা রাত গানের প্রাংশান শুনে এসে বাবার শখ হয়েছিল গান শিখবে। সত্যি সত্যি বিখ্যাত একজন গায়কের বাড়ি গিয়ে গান শেখা শুরু করে দিয়েছিল বাবা আর বাড়িতে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড হারমোনিয়াম কিনে এনেছিল। বাবা যখন হারমোনিয়াম বাজাতো সন্তুরা তখন বাবাকে ঘিরে বসে থাকতো। পরে অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে মা বেচে দিয়েছিলো হারমোনিয়ামটা। তারপরে—! সে এক বিরাট ঝামেলা। থাকগে।

মামার বাড়িতে ছোটমামা সারাদিন বাড়িতে বসে বসে উকিলের কাগজপত্র টাইপ করে। মেশিনের ওপর ছোটমামা ঝড়ের বেগে আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে আর শাদা কাগজ বড় বড় করে টাইপ হয়ে যাচ্ছে —সেই দেখে বাবার ইচ্ছে হল টাইপ শিখবে। দোকান ছেড়ে রোজ সন্ধেবেলা বাবা টাইপ ইস্কুলে যেতো। কিছুদিন পরেই ছেড়ে দিয়েছিল অবশ্য।

বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে রাতে ভুলে ভুগে বাবা রিকম যেন হয়ে যাচ্ছিল। কেউ বাবার কথা শুনতো না। মাকে কিছু বললে মা তো কাঁই নাই করে রেগে উঠতো। অথচ নিজের কাজটা বাবা কোনদিনই নিজে করে নিতে পারে না। চান করার সময় গামছা খুঁজে পায় না কোনদিন। চুল আঁচড়াবার সময় চিরুনি। কেউ কথা শোনে না বলে বাবা কিন্তু রেগে যেতো না খুব একটা। দুঃখ করতো, কাকুতিমিনতি করতো। রাগ দেখিয়ে কাজ আদায় করার চেয়ে কাকুতি-মিনতি করে কাজ আদায় করতে বাবা ভালো-বাসতো বেশী। তারপর একদিন—

না সন্তু সেই দৃশ্যের কথা ভাববে না।

রাগ হয় নি তার। দুঃখও হয় নি। কোনদিন জলপ্রপাত দেখেনি সন্তু। তার শব্দ শোনে নি। অথচ মনে হয়েছিল মাথার মধ্যে সেরকম শব্দ হচ্ছে। খুব মনে পড়ে-ছিল দুখিরামকে, এই সত্যি কথাটা বলার জন্যে তাকে একদিন খুব মেরেছিল সন্তু। রাগে, লজ্জায়, অপমানে। আর, তখন সে খুব ছোট ছিল।

আর মনে হয়েছিল, যদি, যদি কোন-দিন আবার কোথাও কখনো বুলবুলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়, যদি বুলবুল শোনে তার সব কথা, যদি বুলা সারা জীবন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে—তাহলে, কোনদিনও সন্তু বুলবুলের সঙ্গে এইভাবে ওইসব করবে না! কোনদিন না।

আর তখন হঠাৎ সন্তুর মনে হয়েছিল, বাবা বোধহয় মায়ের ওপর দুনিয়ার ওপর প্রাণপণে প্রতিশোধ নিচ্ছে। অসুখে ভোগার দেড় বছরের উপেক্ষা আর অপমানের প্রতি-শোধ। আর, কি নিষ্ঠুরের মতন দেখাচ্ছিল বাবাকে। তখন।

না। সন্তু সেইসব আর ভাববে না।

হাসপাতালে বেঞ্চির ওপর বসে মা যখন কুঁকড়ে যাচ্ছিল, শাদা কাপড়-পরা একজন বিধবা মাঝবয়সী মহিলা সন্তুকে জিগ্যেস করে করে নাম-ঠিকানা লিখে নিচ্ছিল খাতায়। লিখতে লিখতে 'ডেট?' বলে মহিলাটি নিরুত্তর সন্তুর দিকে তাকিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—'ও'। তারপর মায়ের দিকে তাকাতেই মা বিড়বিড় করে কি যেন বললো। সন্তুর কান লাল হয়ে উঠলো আর হঠাৎ বাবার ওপর খুব রাগ হল তার। এই সময় কি বাবার থাকা খুব দরকার ছিল না মায়ের কাছে? বাবাকে হাতের কাছে পেলে সন্তু এখন....।

মাকে ভেতরে নিয়ে যাবার পর সন্তু বাইরের দিকে রাস্তার ধারে একটা ঘরে বসে রইলো অনেকক্ষণ। বেলা গড়িয়ে এসেছে অনেক। জানলা দিয়ে রোদ পড়েছে ঘরের মেঝেতে। একটা লোক বসে বসে মন দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলো। জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া রোদ্দুরের মধ্যে ধোঁয়া ছাড়লো এক-মুখ। রোদ্দুরের মধ্যে ধোঁয়ায় ঘর কিরকম নীল হয়ে গেল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বেঞ্চিতে বসে থাকতে থাকতে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল সন্তু। শাদা শাড়ি পরা সেই বিধবা মহিলাটি তাকে ঠেলা দিয়ে ডেকে তুলছেন। কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে। ঘরে এখন অনেক বেশী রোদ দেখে সন্তুর মনে হল অনেক দূপুর হয়ে গেছে। সেই মহিলা হাসি হাসি মুখে সন্তুকে বললেন—যাও, তোমার মাসি-পিসিদের খবর দাও, সঙ্গে তো কেউ আসে নি, তোমার বোন হয়েছে—

সন্তু ছুটে মায়ের কাছে যেতে চাই-ছিল। মহিলাটি তাকে যেতে দিলেন না; ছেলেদের নাকি এখন যেতে নেই। সে মেয়ে নয় বলে সন্তুর খুব দুঃখ হল একবার। মা ভালো আছে শুনে আশ্বস্ত হল একটু। দৌড়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। মামার বাড়ি যাওয়ার দরকার আগে।

বাইরে, রাস্তায়, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। এই প্রথম সন্তুর মনে পড়ল সকাল থেকে খাওয়া হয়নি কিছুই। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট।

হন হন করে হাঁটতে যাচ্ছিল সন্তু। হঠাৎ কাঁধের কাছটা খামচে ধরল একটা মোটা হাত। ঘাড় ঘুরিয়ে সন্তু দেখল,— ময়লা ফতুয়া, নোংরা হলদে হয়ে যাওয়া পাজামা, বগলে ক্রাচ, ঘামে জ্যাবজ্যাব করছে মুখ কয়দিনের না-আঁচড়ানো চুল, চোখে গভীর উৎকণ্ঠা—বাবা তাকে বলছে, 'কি হলরে, সন্তু? ভাই না বোন? মা ভালো আছে?'

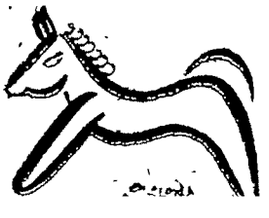

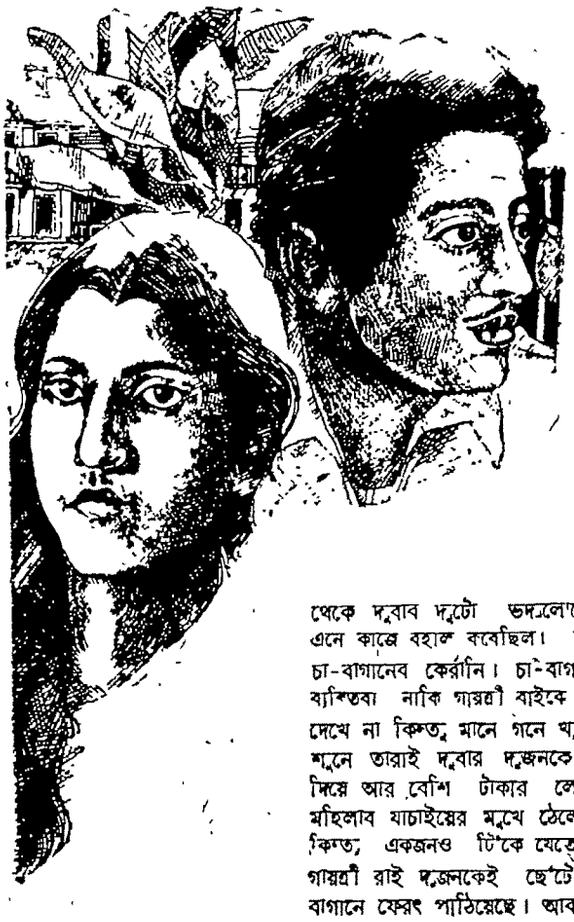

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

।। উনিশ ।।

আবু বরবাণীর জিভের লাগাম আবো ঢিলে এখন। খুশি-ঝরা দু চোখ বাপীর মুখের ওপর। দেখছে কিছু। তরল, গলায় বলল, তোমার মুখখানা এখন আগের থেকে ঢের মিষ্টি লাগছে। বাপীভাই—দেখলেই মনে হয় ভেতর-বার সাফ—নেপালী মেমসাহেবের ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে।

সোনার কঙ্কন খাড়া, তেমনি হাল্কা সুরে ইন্ধন জোগালে, কেন—মেয়ের জন্য পাত্রটাত্র খুঁজছে।

রসের কথায় আবু আর চাঁচাছোলা মানুষ নয় আগের মতো। হেসে উঠে জবাব দিল, মেয়ের জন্য কেন, নিজের জন্যেই খুঁজছে—ঠাকরোন বিধবা জানো তো?

নেপালিনীদের কি দেখে সধবা কি বিধবা বোঝা যেতে পারে বাপীর, ধারণা নেই। পাত্র খোঁজার রহস্যটা আবু আর একটু বিস্তার করল। নিজের কাজের জন্যেই খুব একজন বিশ্বাসী আর লেখাপড়া জানা চৌকস লোক খুঁজছে নাকি গায়ত্রী রাই। ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে চা-বাগান থেকে দুবার দুটো ভদ্রলোকের ছেলেকে এনে কাজে বহাল করেছিল। দুজনেই তারা চা-বাগানের কেরানি। চা-বাগানের কর্তা-ব্যক্তিরা নাকি গায়ত্রী রাইকে চোখে বড় দেখে না কিন্তু মানে গনে খুব। দরকার শুনে তারাই দুবার দুজনকে লম্বা ছুটি দিয়ে আর বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে মহিলার যাচাইয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু একজনও টিঁকে যেতে পারে নি। গায়ত্রী রাই দুজনকেই ছেঁটে দিয়ে চা-বাগানে ফেরৎ পাঠিয়েছে। আবুর মতে ওই দুজনের একজন অন্তত বেশ শিক্ষিত আর চালাক-চতুর, আবু ধরে নিয়েছিল সেই লোকটা টিঁকেই যাবে। রসের ছোঁয়া পেলে আবুর এক চোখ এখনো একটু ছোটো হয়ে যায়। মুচকি হেসে বলল, আমার ধারণা ওই লোকটার ঘাড়ে ঠাকরোনের খাঁড়া নেমেছে অন্য কারণে, নইলে কাজকর্ম ভালই করছিল, আর পরে ম্যানেজারও তাকে ভালো চোখেই দেখছিল।

মুখ দেখে বোঝা না গেলেও রস-টস কানে নেবার মন নয় বাপীর। সাদাসিধে-ভাবেই জিগেস করল, আমার মুখ দেখে আর ভেতর-বার সাফ ভেবে তোমার নেপালী মেমসাহেব এখন আমাকে সে জায়গায় নিয়ে নেবে ভাবছ?

—নিশ্চয় নেবে। আবুর গলার জোর বাড়ল।—একে তোমার বাড়ির সে ভাড়াটে, তার ওপর ওই বাড়ির ব্যাপারেই তোমার সম্পর্কে আমি একবাশ গুণ গেয়ে বেখেছি না! যেমন লোকই হই, ঠাকরোন আমাকে দারুণ বিশ্বাস করে—লেখাপড়া জানা এক-জন ভালো অথচ চালাক-চতুর মানুষ তার খুব দরকার একথা নিজে আমাকে বলেছে। চাকরি না পোষায় চুক্তিতে কাজ করতে পারো, তবে আটঘাট সব বুঝে নিয়ে মেম-সাহেবের গলায় দাঁত বসাতে হলে চাকরিতে লেগে যাওয়াই ভালো। হেসে উঠল, ভেবো —না, দাঁত বসানোর মওকা আমিই কবে দেব—

বাপীর চোখে বা মুখে উৎসাহের চিহ্ন নেই। ওর মিষ্টি মুখের ছলনার ওপর আবু কিছুটা নির্ভর করছে মনে হতে খারাপই লাগল। বলল, আমার ভেতর-বার সাফ ভেবে নেপালী মেমসাহেবের পছন্দ হলে তোমার কি লাভ — ভাঁওতাবাজীর ব্যাপার কিছু?

এবারে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল আবু ববরানী। মেজাজী পুরুষ।—দেখো বাপীভাই, আমি লোক যেমনই হই আর যা-ই করি নিজেকে খোদার গোলাম ভাবি। তুমি লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ছেলে, আমার দোস্ত—তোমাকে নোংরামির মধ্যে যেতে বলব কেন, আর তুমিই বা তা বর-দাস্ত করবে কেন? তোমাকে ওই মেম-সাহেবের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই নিজের কেরামতি দেখিয়ে একদিন ওই চালিয়াৎ ম্যানেজারকে টিট করার জন্য, আর আমাদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা ঠিক-ঠিক পাইয়ে দেবার জন্য। এবই নাম দাঁত বসানো, নইলে তো ওই আধবয়সী মেয়েমানুষের বদলে তার মেয়েকেই দেখিয়ে দিতাম!

উষ্মার মুখেই হেসে ফেলল আবার। —খবরদার, মেয়ের দিকে তাকিয়েছ কি কেস গড়বড় — এ-ব্যাপারে মা-টি যাকে বলে বাঘিনী একটি। মেয়ের পিছনে একটু ছোঁকছোক করতে দেখেই চা-বাগানের সেই চৌকস লোকটিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছে।

ঘরে বাতাসের অভাব না বুঝে? দুনিয়ায় কি এমন, জায়গা নেই যেখানে মেয়ে নেই? বাপী বিড়বিড় করে বলল, মেয়ের কথায় কাজ নেই, মায়ের কথা বলো।

গায়ত্রী রাইয়ের মেজাজ বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বাপীর মিনিট কয়েকের পরিচয়। একটা উটকো মানুষ অন্দরে ঢুকে পড়ছে ভেবে তার ঝাঁঝ দেখে আর ঝাপটা খেয়ে চলে এসেছিল। ওটুকু দিয়ে মহিলার বিচার সম্ভব নয়। তবু বাপীর মনে হয়েছিল, তার রমণীসুলভ কোমলতার দিকটায় কিছু ঘাটতি আছে।

কিন্তু আবুর প্রগলভ বিস্তারের সার থেকে ওই রমণীর যে ছবিটা পেল তেমনটি হাজার গণ্ডা মেয়েছেলের মধ্যে একজনেরও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

....বানারজুলির এই জঙ্গল ভারত সীমার মধ্যে। কিন্তু জঙ্গলের পরিধি ভুটান পর্যন্ত জুড়ে আছে। ভুটান স্বাধীন। এখান থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে সেই স্বাধীন ভুটানের বাসিন্দা গায়ত্রী রাই।

সেখানে একটা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় তার নিজস্ব বাড়ি। বাড়িটা করেছিল তার স্বামী বীরেশ্বর রাই। হিমালয়ের নিচের দিকে অমন ছোট ছোট অজস্র পাহাড় আছে। যারা অবস্থাপন্ন তারা নামমাত্র টাকায় সেই সব পাহাড় ইজারা নিয়ে তার ওপর ঘরবাড়ি তোলে। বীরেশ্বর রাই টাকার মুখ দেখার পরেই পাহাড়ের ওই বাড়ি করেছিল, কিন্তু সেই বাড়ির চেহারা এখন যা দাঁড়িয়েছে তার বারো আনা গায়ত্রী রাইয়ের কৃতিত্ব। সে-এলাকায় অমন বাড়ি এখন

খুব বেশি নেই। পাহাড়ের সেই বাড়িতে আবু বাব কয়েক গেছে। গায়ত্রী বাইয়ের হুকুমে তাব কাজ নিয়েই যেতে হয়েছে। গায়ত্রী বাইয়ের নিজের ভ্যান আছে একটা। স্বামীব আমলে জিপ ছিল। সেই জিপ বেচে দেওয়া হয়েছে। এখন ভ্যানেই যাতায়াত চলে।

আবুব যাতায়াত ভ্যানেই। ভ্যানে পাহাড়েব তলা থেকে উঠে একেবাবে পাহাড়েব ডগায় বাংলোব কম্পাউণ্ডে পৌঁছে যেতে পাবে। তলা থেকে লাল কাঁকরেব রাস্তা পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে। গায়ত্রী বাইয়েব স্বামীব আমলে রাস্তাটা ভাল ছিল না। সেই রাস্তাব সংস্কাবও গায়ত্রী বাই কবিয়েছে আর শুবু থেকে শেষ পর্যন্ত পোলা দিবে অর্থাৎ পাহাড়েব দেয়ালের উল্টো দিকে তাবেব বেড়া লাগিয়েছে।

কাবণ তিন বছব আগে কিছুটা স্বামীর দোষে আব কিছুটা বা ওই রাস্তাব দোষে গায়ত্রী বাইয়েব কপাল ভেঙেছিল। জিভেব লাগাম-খসা আবু ববরানীব অবশ্য ধাবণা সেই থেকে তাব নেপালী মেমসাহেবেব কপাল খুলে গেছে।

গায়ত্রী বাইয়ের ওই পাহাড়েব ঘর-বাড়ি দেখার জন্য একজন লোক প্রায় একটা মালী আছে। আব সেখানে তাব পেশাব কাজে সাত-আটজন নানা জাতেব পাহাড়ী লোক বহাল আছে। এদের সকলেব মাথাব ওপব যে তাব নাম ঝগড়ু। দেশ বিহারে। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে এদিকেব জঙ্গলে আর পাহাড়ে বাস। তাব বউ বুনো হাতির পায়েব তলায় চিড়ে-চাপ্টা হয়ে মরেছে। দু-দুটো জোয়ান ছেলেব একটাকে সাপে কেটেছে আব একটাকে ভালুকে মেরেছে। কিন্তু আবু সে-জন্যে লোকটাব বড় রকমেব শোক-পরিতাপ কিছু দেখে নি। কেবল সাপেব গলা টিপে বিষ নিঙড়ে বাব করাব সময় তাব চোখ দুটো সাপের থেকেও বেশি জ্বলতে দেখে, আর ভালুক শিকারের গন্ধ পেলে এই বয়সেও যে অস্ত্র সামনে পায় হাতে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে। এই বয়সে বলতে লোকটাব বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। এখনও গাথরে কোদা মজবুত শরীর। বীরেশ্বর বাইয়েব ব্যবসাব শুবু থেকে তাব সঙ্গে আছে। এখন তো মেমসাহেব না থাকলে ও-ই পাহাড়েব বাড়িব সর্বেসর্বা।

বয়েসের অনেক ফারাক সত্ত্বেও এই ঝগড়ুর সঙ্গে আবুর গলায় গলায় ভাব এখন। ভাব দু-তিন কারণে। স্বয়ং কর্ত্রীব যে বিশ্বাসেব পাত্র ঝগড়ুর কাছে তাব কদর বেশি। তা ইদানীং তো কর্ত্রীর অনেক রকমেব জরুরী কাজে আবুর ডাক পড়ে। সে হেড বীটম্যান হবাব পর ঝগড়ুর মনিবানির আয়-পয় আরও বেড়েছে। দ্বিতীয় কারণ, আবুকে সত্যিকারের মরদ ভাবে ঝগড়ু। পাহাড় থেকে নেমে এ-পর্যন্ত তিনটে ভালুক শিকার করেছে ওরা। আবুর বন্দুক আছে এখন, কিন্তু বন্দুক দিয়ে শিকার করাটা কি এমন মরদের কাজ। দুজনে মাথা খাটিয়ে ফাঁদবেল ভালুককে নাজেকাল করে হাতের অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করতে পারলে তবে তো কথা। তাই করছে। আর সে-সময় আবুর সাহস আর বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে ঝগড়ুর তাক লেগে গেছে। গলায় গলায় ভাবের তৃতীয় কারণ —কারবার। অর্থাৎ সরাব। ভুটানে এই জিনিসটি অঢেল। বাজারে অনেক রকমের শস্তার মাল মেলে। আরও দামী বিলিতি জিনিসও এন্তার পাচার হয়ে আসে। দামী হলেও অন্য জায়গায় তুলনায় ঢের শস্তা। কিন্তু গরিব মানুষ ঝগড়ুকে কম পয়সার দিশী মালই গিলতে হয়। অথচ সে বিলিতি বা দামী সরাবের ভক্ত। গন্ধ পেলে জিভে জল গড়ায়। ভাল জিনিসের স্বাদ জেনেছিল মনিব অর্থাৎ বীরেশ্বর বাই বেঁচে থাকতে। তখন দিশী জিনিসের দিকে ফিরেও তাকাত না ঝগড়ু। মনিবটি একদিকে যেমন দিল-দরিয়া মানুষ ছিল, অন্যদিকে তেমনি সরাব রসিক ছিল। কত রকমের দামী মাল ঘরে মজুত রাখা হত তখন। সাহেব দরাজ হাতে তার ভক্তকে প্রসাদ দিত — সিকি বোতল আধ-বোতল যা অবশিষ্ট থাকত ঝগড়ুর ভোগে আসত। ঝগড়ুর সেই সব সুখের দিন গেছে। ভাল জিনিস আর মেলেই না। কর্ত্রী ঘরে থাকলে এখন কত লুকিয়ে-চুরিয়ে আর মেহনত করে তাকে একটু-আধটু দিশী মাল খেতে হয়। টের পেলে এত পুরনো খাতিরের লোককেও ওই মনিবানি খাতির করবে না। যা-ই হোক, মেমসাহেবের ফরমাশ মত আবু পাহাড়ে গেলে বেশি দামের ভাল মালই ঝগড়ুকে খাওয়ায়। এরই ফলে দোস্তি জমজমাট। সেই দিলখুস নেশার সময় ঝগড়ুর মুখ থেকে এই পরিবারের নাড়িনক্ষত্র জেনেছে আবু বরবানী।

ওষুধের বনজ কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবসা ফেঁপে উঠেছিল বীরেশ্বর বাইয়ের। অ্যালোপ্যাথী, কবিরাজি আর হোমিওপ্যাথী ওষুধের কারখানায় যে-সব শিকড় বাকড় লতাপাতা বীজ ফলমূল গাছগাছালির বিশেষ চাহিদা। আশপাশের হরীতকী আমলা হাতুড়ে বদ্যিরাও এ-সবের খদ্দের। ভেষজ-গুণের দামী আর দুষ্প্রাপ্য মাল সংগ্রহের দিকে বেশি ঝোঁক ছিল বীরেশ্বর রাইয়ের। এ ব্যাপারে দারুণ পরিশ্রমী ছিল নাকি মানুষটা। নিজে পড়াশুনা করত, ওষুধের গাছ-গাছড়া লতাপাতা চেনে এমন লোকদের খুঁজে বার করত, তাদের নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এই করে ওষুধের গাছ যোগাড় করা আর চাষ করার একটা দলই তৈরি করে ফেলেছিল। তারা এখনো আছে, নতুন লোককেও শেখাচ্ছে। পাহাড় আর জঙ্গলের মানুষেরা বেশির ভাগই ভীষণ গরিব। পয়সার মুখ দেখলে তাদের উৎসাহের অভাব হয় না, জঙ্গলের বাঘ-ভালুকেরও পরোয়া করে না। ওষুধের গাছ, লতাপাতা, বীজ, দানা চেনার ব্যাপারে সব থেকে চৌকস হয়ে উঠেছিল ওই ঝগড়ু। মনিব এ-জন্যে ওকে সব থেকে বেশি ভালবাসত। বয়েস হয়েছে, এখন আর যোগাড়ের কাজে বেরোয় না। পাহাড়ের বাংলোর পিছন দিকে কিছু দামী ওষুধ গাছের চাষের বাগান আছে, সেটা দেখাশুনা করে আর অন্য লোকদের তালিম দেয়।

বীরেশ্বর বাইয়ের এই সব কাঁচা মালের পসরা ভুটান সিকিম ছেড়ে আসাম আর উত্তর বাংলার দিকেও ছড়িয়ে গেছল। ও-সব দিকে তখনও কবিরাজি চিকিৎসার প্রাধান্য। অশিক্ষিত বা গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষেরা আগে হেকিম বা কবিরাজের কাছে ছুটত। ফলে ছোট-বড় কবিরাজি ওষুধ তৈরির কারখানাও গজিয়ে উঠছিল। তা ছাড়া ছোট-বড় কবিরাজেরা নিজেরা তো ওষুধ তৈরি করেই। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য দফায় দফায় লম্বা টুরে বেরুতো বীরেশ্বর বাই। ফলে সুনাম আর তার কাঁচা মালের কদর দুই-ই বেড়েছে।

এই ব্যবসা সামনে রেখে কাঁচা টাকা রোজগারের আর একটা দিকও হাতের মুঠোয় এসে গেছল বীরেশ্বর রাইয়ের। পাহাড়ী বন জঙ্গলে ওষুধের গাছ-গাছড়া ছাড়া নেশার জিনিসও কত রকমের গজায় তার ঠিক নেই। আফিম গাঁজা ভাঙ তো আছেই, আরও অনেক রকমের ছোট-বড় নেশার জিনিসের হদিস মেলে। এ-ব্যাপারেও যেটুকু জ্ঞানগম্যি থাকা দরকার বীরেশ্বর বাইয়ের সেটুকু ছিল। এ ব্যবসা সে বাইরে চালাত না। এই সব নেশার জিনিস ভুটানের রাজধানী থিম্পু আর পারোর মত দুই একটা বড় শহরে চালান দিত। তাইতেই অনেক টাকা ঘরে আসত।

ব্যবসা ফেঁপে উঠতে বীরেশ্বর বাই একা আর পেরে উঠছিল না। রণজিৎ চালিহা তখন চা-বাগানে চাকরি করে। তার বন্ধু আর এক গেলাসের ইয়ার। চালাক-চতুর চৌকস মানুষ। টগবগ করে অসমীয়া বাংলা হিন্দী ভুটানী নেপালী আর ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। রণজিৎ চালিহার ওপর আগে থাকতেই চোখ ছিল বীরেশ্বর বাইয়ের। আসামের মানুষ, তবে পেলে আসামের রাজারটা ভল মত কব্জায় আসতে পারে। তাছাড়া অতগুলো ভাষা জানা একটা চৌকস লোককে হাতে পেলে সব-দিক থেকেই সুবিধে। হাতে পওয়ার ব্যবস্থা ওপরঅলাই করে দিলে। হঠাৎ কি গোলযোগে চা-বাগানের চাকরি নিয়ে টানা-টানি রণজিৎ চালিহার। সেই সুযোগ রে-ইজ্জত হবার আগেই বীরেশ্বর বাই আরও কিছু বেশি মাইনের টোপ ফেলে ব্যবসায় টেনে নিল। সেই থেকে সে ম্যানেজার।

বন্ধু আর এক গেলাসের ইয়ার হলেও ব্যবসার কাজকর্ম আর টাকা-পয়সা লেন-দেনের ব্যাপারে কড়া মানুষ ছিল বীরেশ্বর রাই। সব-দিকে তার চোখ ছিল। রাতে গেলাস নিয়ে বসলে বা মেয়ে-বউ নিয়ে তার সঙ্গে কোন ফুর্তির সফরে বেরুলে তবে বন্ধু। অন্য দিকে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহাও চতুর কম নয়। মনিব-বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে মন বুঝতো আর চটপট সেই মত কাজ সেরে ফেলত। ফলে দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়ু ভুল বোঝাবুঝি

কখনও হতে দেখে নি। এক সঙ্গে চার বছর কাজ করেছে তারা, ততদিনে ব্যবসা আরও চাঙা হয়ে উঠেছে। মালিক তার ওপর খুশী ছিল. আর ফুর্তিবাজ কাজের মানুষটার ওপর মালকানও অখুশি ছিল না। মালিক বেঁচে থাকতে ম্যানেজার কত মাইনে আর উপরি পেত বা এখন কত মাইনে পায় ঝগড়ু বা আরুর কোন ধারণা নেই। মাইনে এখন আরও বেশি পায় নিশ্চয়, কিন্তু আরুর ধারণা, ইদানীং তার বাড়তি রোজগার মাইনের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। যতই হোক মাইনের টাকায় এত মদ খাওয়া ফূর্তি করা বা এমন চালের ওপর থাকা সম্ভব নয়। আরুর আরও ধারণা, তার বাড়তি রোজগারের ব্যাপারটা গায়ত্রী বাইও জানে কিন্তু কিছু বলে না। বলবে কি করে, ব্যবসার অনেকখানি তো বলতে গেলে এখনও তারই হাতে।

যতখানি সম্ভব গায়ত্রী বাই নিজেই ব্যবসার হাল ধরেছে আর ধরে আছে। বীরেশ্বর বাই মারা গেছে তিন বছর আগে। আচমকা অঘটন, আচমকা মৃত্যু। পাহাড়ের রাস্তায় ওঠার পথে বেসামাল জিপ নিচে পড়ে যায়। জিপ চালানোর ব্যাপারে মানুষটা বেপরোয়া হলেও পাকা হাত। তখনও বর্ষা শুরু হয়ে যায় নি। বর্ষাকালে পাহাড়ের রাস্তায় থাকাই যায় না। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। ধ্বস নামে। রাস্তা বন্ধও হয়ে যায়। প্রতি বছর বর্ষা নামার আগে সপরিবারে পাহাড় থেকে নেমে আসতে হয়। ওই সময়টা কাছাকাছির কোন শহরে বা চা-বাগানের বাংলো ভাড়া করে থাকে তারা। বর্ষা শুরু না হলেও সেদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, আর পাহাড়ী রাস্তাও বেশ খারাপ হয়ে গেছল। তাছাড়া তখনকার সেই রাস্তাও এখনকার মত ছিল না। সেই অঘটনের ফলেই এক কোটি টাকা খরচ করে এখনকার এই রাস্তা বানিয়েছে গায়ত্রী বাই। যা-ই হোক, বৃষ্টিতে রাস্তা খারাপ থাকলেও বীরেশ্বর বাইয়ের মত অমন পাকা হাতে এই গোছের অ্যাকসিডেন্ট হবার কথা নয়। আসলে একটা মস্ত কাজ হবার ফলে মনের আনন্দে এন্তার মদ গিলে দুই বন্ধু বাড়ি আসছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে সেটা বোঝা গেছে। বণজিৎ চালিহারও সেই রাতে পাহাড়ের বাংলোতেই খাওয়া আর থাকার কথা। কিন্তু কিছু টুকিটাকি কাজ সারার জন্য সে আগেই নেমে গেছল। কাজ শেষ করে ঘন্টা দু ঘন্টার মধ্যে ফিরবে। এক-কথায় আরুর জোর ছিল লোকটার। নইলে এক সঙ্গে দুজনেই শেষ হয়ে যেত।

সেই থেকে মদ দু চোখের বিষ গায়ত্রী বাইয়ের। তার কাজের লোকদের কারও মদ খাওয়া বরদাস্ত করে না। একমাত্র বণজিৎ চালিহারকেই কিছু বলে না। স্বামী বেঁচে থাকতে ব্যবসার হিসেবপত্র রাখা আর পার্টির কাছে চিঠিপত্র লেখার কাজ গায়ত্রী বাই করত। কিন্তু সে মারা যাবার দু মাসের মধ্যে মহিলা এমন শক্ত হাতে ব্যবসার হাল ধরবে কেউ ভাবে নি। প্রখর বুদ্ধিমতী তো বটেই, এই তিন বছরে ব্যবসা ডবল ফাঁপিয়ে তোলার ব্যাপারে কম সাহস দেখায় নি। অবশ্য এই সাহসও বণজিৎ চালিহাই জুগিয়েছে। একটু বেপরোয়া হতে পারলে কত সহজে আরও কত বেশি টাকা রোজগার করা যায় সে-পথ সেই গোড়ায় দেখিয়েছে। না, টাকার গন্ধ পেলে মহিলা পেছু পা হবার মেয়ে নয়। ভুটান সিকিম উত্তর বাংলা আর আসামের নানা জায়গায় বনজ ওষুধের কাঁচা মাল মজুতের পাকাপোক্ত ঘাঁটি করা হয়েছে। সেই সব জায়গার কাজ চালানোর জন্য লেখাপড়া জানা স্থানীয় এজেন্ট বাছাই করে বহাল করা হয়েছে। তাদের বেচাকেনারা জায়গায় জায়গায় গিয়ে অর্ডার বুক করে। কমিশন পায়। এই নির্ভরযোগ্য লোক বাছাইয়ের কাজও মহিলা নিজেই করেছে। এ-সব কাজেও ম্যানেজার চালিহা তার ডান হাত—সে সঙ্গে থাকত। এ-রকম ঘাঁটি করার ফলে কারবারের মাল এখন ওদিককার বড় বড় অনেক শহরেই পৌঁছে যাচ্ছে।

এদিকে নেশার কারবারটি আগের থেকে চার গুণ জমজমাট। গায়ত্রী বাইয়ের বাছে নেশা করাটা চক্ষুশূল, কিন্তু নেশার জিনিস বিক্রী করে ঘরে টাকা তুলতে আপত্তি নেই। ভুটানের গিলপু বা পারো ছেড়ে বর্ডারের কাছাকাছি বড় শহর ফুন্টশোলিও পর্যন্ত নেশার মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর সে-সব জায়গা থেকে এখানে আসছে ভাল ভাল মদ। বানারজুলি আর আশপাশের অনেক চা-বাগানের সাহেব-সুবোরা এই মদের এখন বড় খদ্দের। হবে না কেন, ও-সব জিনিসের এখানে অনেক দাম—আর আনাও সহজ ব্যাপার নয়। সুবিধের দামে হাতের কাছে মজুত পেলে তারা ঝুঁকবে না কেন? সুবিধের দামে দিয়েও গায়ত্রী বাইয়ের মোটা লাভ থাকে।

ব্যবসার আরও একটা বড় শাখা বিস্তার করেছে গায়ত্রী বাই। সাপের ব্যবসা। এ-দেশ থেকে বহু সাপ বিদেশের নানা জায়গায় চালান যায়। আমেরিকা ইংল্যান্ড পশ্চিম জার্মানি হল্যান্ড জাপান সকলেরই সাপের চাহিদা। বিষাক্ত সাপ তো বটেই, নির্বিষ সাপও চাই তাদের। এখানে এত খবর কে রাখত? সাপুড়ে আর বেদে-বেদেনীদের কাছে দালালদের আনা-গোনা বাড়তে ব্যাপারটা বোঝা গেছে। তারা তো খবর রাখেই। এই বানারজুলি থেকে শুরু করে বিশাল তরাইয়ের জঙ্গলের সর্বত্র বিষধর আর নির্বিষ সাপ কেচোর মত কিলবিল করছে। সাপের কি শেষ আছে এ-সব দিকে! গায়ত্রী বাইয়ের এই ব্যবসা শুরু করার পিছনে আসল কৃতিত্ব আরু বরবানীর। এদিককার জঙ্গলের সে হেড বীট-ম্যান। দালালরা তার কাছে আসত, তার পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে অনুরোধ করত লোক লাগিয়ে জ্যান্ত সাপ ধরে দাও। এমনি সাপ হলে কম পয়সা, বিষাক্ত সাপ হলে বেশি। যে ধরে দেবে তাদেরও এক-একটা সাপের জন্য আট আনা থেকে দেড় টাকা পর্যন্ত দিত তারা। পাইথন পেলে

প্রকাশিত হয়েছে

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের

লোকসঙ্গীত সমীক্ষা

বাংলা ও আসাম

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান লোক-সঙ্গীতের ধারাগুলি (যথা, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, বাউল, ভাওয়াইয়া, বিহু, ইত্যাদি) সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা এবং লোকসঙ্গীতের বিশুদ্ধি, বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণভঙ্গী, স্বরক্ষেপ-প্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত হয়েছে। —১২.০০

সুবিনয় রায়ের

রবীন্দ্রসংগীত সাধনা

৩য় সং ৮.০০ টাকা

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ভারতের সঙ্গীতগুণী

ভারতবর্ষের বিগতকালের একাধিক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পীর জীবন ও কৃতি আলোচনা করা হয়েছে। বইখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

প্রথম খণ্ডের দাম ১৫ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ

সঙ্গীত সম্বন্ধে আরো যে-কখানি বই সঙ্গীতজগতে সমাদর লাভ করেছে

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস ১৫.০০

নারায়ণ চৌধুরীর

কাজী নজরুলের গান

নজরুল-গীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা। মূল্য ৫ টাকা

সংগীত পরিক্রমা ১৮.০০

সুকুমার রায়ের

বাংলা সংগীতের রূপ

৪.০০

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের

বাংলা লোকসঙ্গীতের এনসাইক্লোপিডিয়া

বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর

৪ খণ্ডে প্রকাশিত প্রতি খণ্ডের

মূল্য ১৫ টাকা

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গীতসূত্রসার

বইখানি মূলে পড়বার জন্য প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকোবিদ ভাতখণ্ডেজী বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। মূল্য ২০ টাকা

এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭৩

দশ-পনের টাকা দিতেও রাজি। তাজ্জব ব্যাপার।

কিন্তু সরকারি চাকুরে আবু দালাল-দের খুশি করে কি করে? তারা এলে তখন সাপের খোঁজ। সে-তো আর সাপ মজুত করে রাখতে পারে না, বা আগে থাকতে লোক লাগিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে সাপ কিনে রখতে পারে না। কথায় কথায় এক-দিন দালালদের চাহিদার ব্যাপারটা সে গায়ত্রী রাইকে বলেছিল। মেমসাহেবের একটা মজা আছে, নিজে কথা বেশি বলে না, কিন্তু সকলের সব কথা শোনে। শোনার পর ম্যানেজারকে ডেকে বলল কি ব্যাপার খবর নিতে। এ-সব ব্যাপারে রণজিৎ চালিহা তৎপর খুব বলতেই হবে। আট-দশ দিনের মধ্যে সমস্ত খবর তার ঠোঁটের ডগায়। শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ সাপ বিদেশে যাচ্ছে। বাকি পাঁচ ভাগ দেশের গবেষণার কাছে লাগছে। বাইরে সাপ চালানের প্রতিষ্ঠান আছে এ-দেশে। দালালদের হাত ঘুরে সেই সাপ প্রতিষ্ঠানে পৌঁছয়। দালালরা তো লাভ করেই, খোদ কারবারীরাও তার ওপর মোটা লাভ করে সাপ বিদেশে চালান দেয়। প্রতিষ্ঠান বড় দালালদের কাছ থেকে কোন্ জাতের সাপ কি দরে কেনে শুনে মেমসাহেব পর্যন্ত হাঁ একেবারে। বিষাক্ত সাপের দাম ছয় থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত ওঠে। তার মধ্যে একটা শংখচুড়ের দাম একশ থেকে তিনশ সাড়ে তিনশ পর্যন্ত হয়। যত বড় হবে তত দাম চড়বে। আর নির্বিষ সাপের মধ্যে পাই-থনের দামও একশ থেকে আড়াইশ-তিনশ হতে পারে।

ব্যস, আবুর ওপর হুকুম হয়ে গেল বেদে সাপুড়ে বা জঙ্গলের লোকের কাছ থেকে একটা সাপও যেন দালালরা না পায়। সাপের খোঁজে এলে তাদের গায়ত্রী রাই অথবা ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। আর সকলকে জানিয়ে দিতে হবে জ্যান্ত সাপ ধরে আনলে দালালদের থেকে অনেক ভাল দামে তারা সেগুলো কিনে নেবে। বিয়ের আগে দুলারিরা যে ডেরায় থাকত সেটা এখন নানা জাতের আর নানা রকমের সাপের গুদাম। মাস গেলে দুলারি এখন কড়ি টাকা কষে ডেরার ভাড়া পায়। আর আরও পঞ্চাশ টাকা পায় এই ব্যবসা দেখাশুনা করার জন্য। দেখাশুনা বলতে সাপ ধরার লোকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আর দালালদের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেলে মালকান বা ম্যানেজারের নির্দেশ মত তাদের হাতে সাপ জিম্মা করে দেওয়া। দুলারির নামে এই দেখাশুনার ব্যাপারটা সব আবুই করে। দু-দুটো বাচ্চা নিয়ে তার তত সময় কোথায়। দুলারি এখন পাকা সংসারী হয়ে গেছে।

সাপের বিষও যে সোনার দরে বিকোয় তাই বা কে জানত? কিন্তু গায়ত্রী রাই ঠিক জেনেছে। সাপের বিষের চাহিদা অবশ্য সামান্যই সে-সময়। কিন্তু যেটুকু আছে তাতেও কম লাভ নয়। বাছাই করা কিছু বিষাক্ত সাপ গায়ত্রী রাইয়ের পাহাড়ের বাংলোয় চলে যায়। সেখানে একটা সাপের ঘরই করে দেওয়া হয়েছে। ওদিকটার ভার ঝগড়ুর। ওর হাতের টিপুনির চাপে সাপগুলো গলগল করে বিষ ঢেলে দেয়। সাপের বিষ পেতে হলে খদ্দেরদের সেই পাহাড়ের বাংলোয় যেতে হয়।

গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহার অবনিবনা কেউ কখনও দেখে নি। বরং এই একজনের সঙ্গেই শুধু মেমসাহেব হাসি মুখে কথাবার্তা বলে, আর বেশির ভাগ ব্যাপারে তার সঙ্গেই পরামর্শ-টরামর্শ করে। কিন্তু একবার মেমসাহেবের সঙ্গে তার মনকষাকষি একটু হয়েছিল সে-খবর শুধু ঝগড়ু রাখে। আবুকে এই গোপন কথাও সে-ই বলেছে। সাহেব মারা যাবার বছরখানেকের মধ্যে রণজিৎ চালিহা নাকি গোটা ব্যবসাটা তিনজন পার্টনারের নামে চালাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। একজন গায়ত্রী রাই, একজন তার মেয়ে ঊর্মিলা রাই আর একজন সে নিজে। সাদা কথা, তিন ভাগের এক ভাগ মালিক হতে চেয়েছিল। মেয়ের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব ঝগড়ুর। এ খবর সে-ই চুপি চুপি ফাঁস করেছে তার কাছে। মেয়ে তখন নাবালিকা। মেমসাহেব সে-প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। ম্যানে-জারের তখন নাকি মেজাজ বিগড়েছিল। মেমসাহেব কোন্ কায়দায় তাকে ঠাণ্ডা করেছে, ঝগড়ু জানে না। তবে মাইনে যে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ঝগড়ু লক্ষ্য করেছে, তারপর থেকে বাড়িতে লোকটার আদর-আপ্যায়নও বেড়েছে।

রণজিৎ চালিহার বউ ছেলে মেয়ে আছে। আগে বছরের বেশির ভাগ সময় তারা আসামেই থাকত, মাস-কতকের জন্য বানারজুলিতে আসত। গত দু বছরের মধ্যে আর আসেই নি তারা। ফলে দেড়-দু মাস অন্তর ম্যানেজারের আসামে টুর প্রোগ্রাম পড়ে। অবশ্য ব্যবসার বাজারও সেখানে ভালই জমে উঠেছে। আগে মেম-সাহেবের কাছে লোকটার খাতির কদর দেখে আবুরা ভাবত লটঘটের ব্যাপার কিছু আছে। অমন কড়া মালকান এই লোকের কাছে শুধু নরম নয়, হাসি-খুশিও। প্রেমের আবার বয়েস বলে কিছু আছে নাকি? মেমসাহেব পাহাড়ের বাংলোয় থাকলে ম্যানেজার সেখানে মাঝে-সাজে গিয়ে উপস্থিত হয়, খানাপিনা করে, রাতে থাকেও। ও-দিকে ম্যানেজারের বউ ছেলে মেয়ে এ-দিক মাড়ায় না। কিন্তু দু-দুটো বছর একভাবে কেটে গেল, নানা কারণে আবুর আর এখন সে-রকম কিছু মনে হয় না। তাছাড়া সে-রকম হলে ঝগড়ু নেশার মুখে ঠিক বলে দিত। ম্যানেজার লোকটাকে ঝগড়ু খুব একটা পছন্দ করে না। পছন্দ কোন কর্মচারীই করে না। লোকটার এমন হাব-ভাব যেন সে-ই সব-কিছুর হর্তা-কর্তা বিধাতা। নিজে কত দিকে কতভাবে টাকা কামাচ্ছে ঠিক নেই, অন্যকে হকের পয়সা দেবার বেলায় বাঁকি করে মালিককে খুশি করার চেষ্টা। নেশার মুখে ঝগড়ু বরং বলেছে, তেমন দরকার পড়লে মালকান গাল বাড়িয়ে ব্যাঙের লাথি খেতে পাবে, আবার দুশমন টিট করতে জানে। দরকার হলে যত লায়েকই হোক ওই ম্যানেজারকেও টাইট দিতে ছাড়বে না। কেন বলতে পারবে না, আবু এখন তার মেম-সাহেবের এই চরিত্রটাই বেশি বিশ্বাস করে।

আবুর সঙ্গে তার যোগাযোগ দু বছরেরও বেশি। আর বছর খানেকের ওপর হল ও তার একজন বিশ্বস্ত লোক। বর্ষায় তো পাহাড় থেকে নেমে আসতেই হয়, আবার কড়া শীতেও নেমে আসতে হয়। এই জন্য মেমসাহেব পাকাপোক্ত ডেরার খোঁজে ছিল। ইদানীং বানারজুলির দিকে কাজ বেশি, আবার এখানে থাকলে যোগাযোগের সুবিধেও বেশি। আট মাস আগে আবু বাপীর বাসাটা তার জিম্মায় ছেড়েছে। দুলারিও এই পরামর্শই দিয়েছিল। মেম-সাহেবের নেকনজরে পড়ার আরও কারণ আছে। ও কাজের লোক কেমন তা তো দেখেছেই। তার ওপর ও এ-জঙ্গলের হেড বীটম্যান হবার দরুন সুবিধেও কম পাচ্ছে না। যেমন, জঙ্গলে আজ বাপী স্বচক্ষে যে চন্দ্রা বা সর্পগন্ধার বেড দেখে এলো, সেটা ওখানে হচ্ছে কার জন্যে? হচ্ছে কি করে? হচ্ছে ওই মেমসাহেবের জন্যে, খরচ এক-রকম নেই-ই বলতে গেলে। আর হচ্ছে আবুর দৌলতে। মাথা চুলকে বড় সাহেবের কাছে আর্জি পেশ করল, কিছু ভাল ওষুধ-গাছের বীজ তার হাতে এসেছে, জঙ্গলের মধ্যে একটু জায়গা নিয়ে চাষ করতে দিলে অনেক গরিব লোকের উপকার হয়। নি-খরচায় লোকের উপকার করে নাম কিনতে পারলে বড়সাহেবই বা আপত্তি করবে কেন? জঙ্গলে তো আর জায়গার টানাটানি নেই। তাছাড়া আবুর কল্যাণে জঙ্গলের কম জিনিস কি তার বউয়ের হেঁসেলে বা ভাঁড়ারে যায় যে আর্জি নাকচ হবে?

গল্পে গল্পে কখন সন্ধ্যা পুরে রা কখন দুলারি ঘরে হারিকেন রেখে গেছে দুজনের কেউই তেমন খেয়াল করে নি। এই সমাচার আরও কতক্ষণ চলত কে জানে। বাধা পড়ল।

আবু এ-দিক ফিরে ছিল, ঘরে যে ঢুকল, তাকে দেখে বাপীই প্রথমে সচকিত। দুলারি নয়।

রেশমা।

অন্দরে একজন বাইরের লোক দেখে ভিতরে ঢুকে ও থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত তারপরেই মুখে বিস্ময় ভাঙল।—বাপীভাই মনে হচ্ছে—অ্যাঁ?

আবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তারপর কিছু একটা রসিকতা করতে গিয়েও বাপীর মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। মজা দেখছে।

কারণ বাপীর মুখে কথা নেই। চেয়েই আছে। সেই রেশমাই বটে, অথচ অনেক তফাৎ যেন।....বছর দুই বড় হবে আবুর থেকে, বছর চব্বিশ-পঁচিশ হবে বয়েস

এখন। কিন্তু এত দিনেও মেয়েটার বয়েস বাড়ে নি, শুধু চেকনাই বেড়েছে। আগের থেকে অনেক তাজা আর পুষ্ট লাগছে। পরনের শাটো ঘাগরা আগের মত মলিন নয়। গায়ের আঁট জামাটাও চকচকে। মাথার সেই উস্কো-খুসকো চুল মিশ কালো এখন—পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। সুর্মা টুর্মা কিছু লাগানোর দরুণ চোখ দুটো গভীর টানা দেখাচ্ছে।

বাপীর এই গোছের দেখার জালে পড়লে বেশমা আগে খিলখিল করে হেসে উঠত। এখনও হাসছে বটে, কিন্তু এখনই যেন সত্যিকারের সাপের খেলা দেখান-মেয়ের হাসি।

পরের মুহূর্তে মেয়ে গম্ভীর। একটু এগিয়ে এসে আবুর মুখোমুখি দাঁড়াল। দু হাত দু দিকের কোমরে উঠে এলো। চোখে ভুরুকুটি।

কপট যন্ত্রণায় আবুর মুখ কুঁচকে গেল।—অমন করে চোখ দিয়ে বিঁধিস না মাইরি, বাপীভাই এসেই আমার ঘরে তোর বদলে দুলারি কেন জিগেস করে বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে।

খেদ শেষ হবার আগে দুলারিও ঘরে। আবু এখন কোনদিক সামলাবে। মেকি ত্রাসে পিছিয়ে বসল একটু।—মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, বাপীভাই বাঁচাও।

বেশমা ফিরে দেখল দুলারিও মুখ টিপে হাসছে। তাকে নিয়ে রসের কথা কিছু হয়েছে বুঝেও তেমন কৌতূহল দেখাল না। আবুর দিকে ফিরে শাসনের সুরে বলল, এই জন্যেই তোমার পাত্তা নেই — বুকে বসানোর জন্য মালকান ওদিকে ছুরি হাতে অপেক্ষা করছে — যাও। ম্যানেজারও আছে—

—শালার খেলে দেখছি। রস ভুলে আবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।—বাপীভাই চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বাপীর দু চোখ তখনও বেশমার মুখের ওপর। বেশমা কটাক্ষে এ-দিকে তাকালো একবার। ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দিল।—আবু সাহেব তুমি একলাই যাও, বাপীভাই এখন আমাকে দেখতে ব্যস্ত।

পিছন থেকে দুলারি একটা থাপ্পড় বসালো তার পিঠে। আত্মস্থ বাপী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। আবুকে বলল, চলো।

(চলবে)

বাঙলার বাইরে বাঙালী

লিখতেই বেশী ভাল লাগে

একই ব্যক্তিতেব মধ্যে শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সার্থক সমাবেশ বড় একটা চোখে পড়ে না। মিলন মুখোপাধ্যায় এমনি একটি চরিত্র যাঁর মধ্যে এই তিন ধারার ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে। রবিশালে জন্ম। বড় হয়েছেন কলকাতায়। ১৯৬২ সালে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেছেন।

কস্তুরীর সুবাস মৃগকে চঞ্চল করে কিন্তু সে জানে না যে, নিজের গন্ধই তাকে পাগল করছে। মিলনবাবুর শিল্পী সত্তাও তেমনি তাঁকে মাঝে মাঝে চঞ্চল করত, তিনি অস্থির হয়ে কি খুঁজে বেড়াতেন। এমনি ভাবেই একবার তিনি হিমালয়ে চলে গিয়েছিলেন, গুহায় বসে তপস্যাও করেছিলেন। পরে বুঝেছিলেন এ পথ তাঁর নয়। এই অভিজ্ঞতার আলোয় লিখলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'এইসব দিন রাত্রি'।

হিমালয় থেকে ফিরেও তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হয়নি। কিছু খুঁজেছেন, তাই বোধহয় বার বার কর্মপরিবর্তন। পাশ করার পর মোটরভেহিকল্‌স্ অফিসে চাকরি নেন অল্পদিন কাজ করার পর সে কাজ ছাড়েন। ১৯৬৩র জুনে বোম্বাই আসেন। এখানে প্রথম চাকরি অজন্তা অ্যাডভার্টাইসিং-এ। কিছুদিন কাজ করার পর ছাড়লেন এই সংস্থা। আট মাস বেকার জীবন যাপন করলেন। কেরিয়ার কোম্পানীতে কাজ করলেন পাঁচ মাস। তারপর ফ্রিলান্সার বোম্বাই-এর সংবাদদাতা। সঙ্গে চলে সাহিত্যসাধনা।

১৯৬৯ সাল থেকে তিনি জীবনের চাকাটা ঘুরিয়ে উঠলেন। এই বছর জানুয়ারী মাসে সরস্বতী পূজোর দিন টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় শিল্প বিভাগে যোগ দেন।

তাঁর প্রথম একক শিল্প প্রদর্শনী হয় কলকাতায় ১৯৬২ সালে, এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। ১৯৭০ সালে তাঁর দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল শিশব-হীন শিশু। মিলনবাবুর চিত্রে আকৃষ্ট হন

মিলন মুখোপাধ্যায়

আমেরিকান মিঃ জেবিওপিস। তিনি শিল্পীকে প্যারিসে চিত্রপ্রদর্শনী করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর প্যারিস যাবার সব ব্যবস্থা করেন। ১৯৭১ সালে ১ জানুয়ারী তিনি প্যারিস রওনা হন। মে মাসে চিত্রপ্রদর্শনী হয়।

ফলাফল কেমন হয়েছিল প্রশ্ন করলে মিলনবাবু বলেন—মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কারণ আমার বিষয়বস্তু ছিল হাঙ্গার (ক্ষুধা), যেটা সকলের পছন্দ হয়নি। ওদেশের লোকেরা ভারত সম্বন্ধেই আগ্রহী— সেদেশের আলপনা, বাটিক সম্বন্ধেই আগ্রহ বেশী। ভারতীয় দূতাবাসের কালচারাল এ্যাটাচি মিঃ শিবাল আমার চিত্রের বিষয়-বস্তু দেখে প্রদর্শনীতে আসেননি এবং অন্য কোন দূতাবাসে নিমন্ত্রণও পাঠাননি। এরপর প্রদর্শনী করেছেন সুইডেনে।

লেখক-জীবনের শুরু বৈশাখেই। যখন তিনি ক্লাস সেভেনে পড়েন তখনই তাঁর লেখা যুগান্তরের ছোটদের পাতাতাড়িতে বেরিয়েছিল। বম্বেবাসী কলেজে পড়ার সময় তাঁর লেখা গল্প 'নেশা' প্রথম পুরস্কার পায়। 'ভ্রমণ কাহিনী' নামে তাঁর লেখা একটি গল্প ভারতীয় কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কোলাপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐ গল্পটি কলেজে পাঠ্য করেছে। রাশিয়াতে 'ইণ্ডিয়ান' নামে রাশিয়ান ভাষায় পত্রিকায় এই গল্পটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্যারিসের অভিজ্ঞতা 'মুখ চাই মুখ' উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের উপহার দিয়েছেন।

অভিনয়ের নেশাও অনেক দিনের। আর্ট কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই জোহন দস্তিদারের 'রূপান্তর' গোষ্ঠীতে নিয়মিত অভিনয় করতেন (১৯৫৮-৬২)। বোম্বাই-এর নাটকে মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখা যায়। কয়েক মাস আগে অলোক ধরের রূপায়িত কোরেল গল্পের প্রধান চরিত্র লিওপোল্ডের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, হতাশা ইত্যাদি এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন যা প্রতিটি দর্শকের বহুদিন মনে থাকবে।

বর্তমান যুগের শিল্পীদের মধ্যে— হুসেন, সুনীল দাস, প্রকাশ কর্মকার, সুবোধ দাশগুপ্তর শিল্প তাঁর ভাল লাগে। লেখকদের মধ্যে সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর বক্ষিতের লেখা ভাল লাগে।

মিলন মুখোপাধ্যায় ছোট ছোট ভূমিকায় ছায়াচিত্রেও অভিনয় করেছেন। 'ছোটি সি বাত' এবং 'সফেদ ঘাট'—বাসু চ্যাটার্জি পরিচালিত দুটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। শিল্পের তিনটি ধারার মধ্যে কোনটি তাঁর বেশী প্রিয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: আমার সবই ভাল লাগে, তবে লিখতেই বেশী ভালো লাগে, যদিও আমি খুব কমই লিখি।

মল্লিকা গঙ্গোপাধ্যায়

আমার দাদা

কানাইলাল চক্রবর্তী

মা-র কাছে শুনেছিলাম আমার জেঠাইমা আছেন। আমার জেঠতুতো দাদাও আছেন একজন। তাঁদের আমি কোনো দিন দেখি নি। জেঠাইমা মারা যাবার পর জেঠাইমা আমাদের সংসারের জিনিসপত্র ভাগ করে নিয়ে তাঁর ছেলেকে নিয়ে তাঁর বাবার বাড়ি চলে যান। সেই থেকে তাঁরা আর আমাদের বাড়ি আসেন নি। জেঠাইমা তাঁর বাবার বাড়িটাও নাকি পেয়েছিলেন ওয়ারিশ সূত্রে। সে-বাড়িটা বেশি দূরে নয়। নদী-নালার পথ আর যাতায়াতের অসুবিধা বলে তাদের সঙ্গে আমাদের আর যোগাযোগ নেই। কথাটা শুনে কেমন অবাক লাগত। এমন আপনজন এতো কাছে থেকেও অচেনা হয়ে আছি—ভাবা যায় না।

আমাদের বাড়ি থেকে জেঠাইমার চলে যাবার একটা কারণ মা বলেছিলেন। ঠাকুরদার আমল থেকেই দানে-ধ্যানে পরোপকারে আমাদের একটা সুনাম ছিল। পাড়া-পড়শী বিপদে-আপদে আমাদের বাড়ি এলে বড়ো একটা বিমুখ হত না। জেঠা-মশাই মারা যাবার পর সে ক্ষমতাটা আমাদের সীমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা না থাকলেও প্রবৃত্তিটা ছিল বলে বাবা কষ্ট করেও সে সুনামটুকু বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন।

একদিন নাকি বাবা জেঠাইমাকে বলেছিলেন, হারাধনের মেয়ের বিয়ে, কটা টাকার জন্য এসেছিল।

জেঠাইমা কোনো দিনই এটা পছন্দ করতেন না। বললেন, দেবে কোত্থেকে, এখন তো নিজেদেরই চলে না।

—তা ঠিক বউঠান, কিন্তু একেবারে না-ই বা বলি কী করে। কোনোদিন তো ফেরাই নি কাউকে।

জেঠাইমা চুপ করে রইলেন। বাবা আবার বললেন, বরং দুর্গাপুজোর তহবিল থেকে কিছু দিই না। পুজোয় তো এখনো অনেক বাকি।

—যা ভালো বোঝো করো, আমি কী বলব। বলে জেঠাইমা সেখান থেকে চলে যান।

এই ঘটনার পর থেকেই জেঠাইমা বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানে থাকলে মান রাখতে গিয়ে প্রাণ রাখাই দায় হয়ে উঠবে। তাই তাড়াতাড়ি তাঁর জিনিসপত্র ভাগ করে নিয়ে তিনি চলে গেলেন তাঁর বাবার বাড়িতে। এবং সেই থেকে তিনি আর আসেন নি আমাদের বাড়িতে। কোনো খোঁজ-খবরও রাখেন নি আমাদের।

জেঠাইমা ছিলেন বিচক্ষণ এবং সাংসারিক বিষয়ে বেশ বুদ্ধিমতী। বাবা ছিলেন উদার প্রকৃতির। লাভ লোকসানের চুলচেরা হিসেব তিনি কোনো দিনই করতেন না। সাংসারিক ব্যাপারেও অনভিজ্ঞ। আমার মা-র বয়স ছিল কম। আমরাও সব ছোটো। জেঠামশাই মারা যাবার পর জেঠাইমার বুদ্ধি পরামর্শ নিয়েই সংসার চালাতেন বাবা। তাই জেঠাইমার হঠাৎ চলে যাওয়ায় বাবার খুব কষ্ট হত সংসার চালাতে। এরপর আমার আট বছর বয়েস হতেই বাবাও চলে গেলেন চিরদিনের মতো। বড়দা অল্প বিদ্যে নিয়ে চাকরি করতে গেলেন। মেজদাকেও ওই কাজে ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মাকে অল্প বয়সেই সংসারের মুরুব্বি হতে হল।

পরে অবিশ্যি অবস্থাটা একটু পাল্টে গেল বড়দা মেজদা দুজনেই চাকরি করেন। আমি সর্বকনিষ্ঠ, কলেজে পড়ি। বি-এ পার্ট ইয়ার চলছে। আমাদের জেলার সহরে পিসেমশাই মোক্তার। তাঁর কাছে থেকেই পড়াশুনা করছি। পিসেমশাই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বলতেন—এই ছেলেটাই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আর কেউ ইস্কুলের চৌকাঠ পেরোয় নি। তাই আমার প্রতি পিসেমশাই-এর আদর যত্নের সীমা নেই।

পিসেমশাই বলতেন—শুধু বিদ্যেই সব নয়, চরিত্রটিও সুন্দর হওয়া চাই।

কথায় কথায় তাঁর উপদেশ, পদে পদে নির্দেশ। আমার চুল ছাঁটাতেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। কোনো রকম ফ্যাশন-ট্যাশন করা চলত না। পিসেমশাই আমাকে আচার-আচরণ শেখাতে গিয়ে বলতেন, 'গুরুজনের সঙ্গে জোরে কথা বলতে নেই। কথায় উদ্ধত্য প্রকাশ পাবে না। তাদের সামনে দিয়ে চলা-ফেরা করার সময় সসম্ভ্রমে করতে হয়। তাঁদের সামনে ডাকা না বললে চেয়ারে বসতে নেই। বসা থাকলে গুরুজন সামনে এলে উঠে দাঁড়াতে হয়। এক কথায়, পিসেমশাই আমাকে তাঁর রুচি মতো তৈরি করতে খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁর উপদেশ মানতে গিয়ে আমি বেশ শান্ত সভ্য এবং নম্র স্বভাব নিয়ে উঠেছিলাম। আঠারো বছরে পড়েছি। গোঁফের রেখা কালো হয়ে উঠেছে। পিসে-মশাই-এর ডিরেকশনে চুল ছাঁটা, বেশ রুচি রুচি দেখাত আমাকে। একটু লাজুকও ছিলাম। সকলেই ভালোবাসত।

একদিন কলেজ থেকে ফিরছি, পিসে-মশাই-এর সামনে দিয়ে আমার ঘরে যাচ্ছি, দেখি, কে একজন পিসেমশাই-এর সঙ্গে কথা বলছেন আরেকটা চেয়ারে বসে। বছর চল্লিশ বয়স। মাঝারি গড়ন। আমাকে দেখে নিলেন এক পলক।

একটু পরেই পিসেমশাই ডাকলেন আমাকে। বই রেখে তাঁর কাছে যেতেই বললেন—বস এখানে। চিনিস্ একে? তোর জেঠতুতো দাদা।

নতুন দেখা দাদার মুখের দিকে এক পলক চেয়েই চোখ নামালাম।

আমার স্বপ্নের জেঠতুতো দাদা এক দৃষ্টে চেয়েছিলেন আমার দিকেই। ঝট্ করে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন আমারই পাশে।

পিসেমশাই আফশোসের সুরে বলতে লাগলেন—একই ধরের মানুষ, কেউ কাউকে চিনিস নে।

দাদা এতক্ষণ কথা বলেন নি। এবার পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলেন। তারপর বললেন—'কলেজে পড়ো?' তাঁর গলাটা মোটা শোনাল।

ছোটো করে বললাম—হুঁ।

—এখন তো এখানেই থাকবে—যেয়ো আমাদের মেস-এ, কেমন?

দাদার বুকের মধ্যেই মুখ রেখে বললাম—চিনি না যে।

পিসেমশাই বলে দিলেন—একদিন নিয়ে যেয়ো, তাহলেই যেতে পারবে।

হ্যাঁ, আমিই এসে নিয়ে যাব, কেমন' বললাম আচ্ছা।

এর পর দাদা পিসেমশাইকে বলতে লাগলেন—মা সেই করে আমাকে নিয়ে চলে এসেছেন, তারপর আর যান নি কোনো দিন। আমি তো ছোটো। এর পর কাজে করে লেগে, গেলাম। ভুলে গেলাম সব। আমার যে এরকম ছোটো ভাই আছে তাই মনে পরল না। আমাকে বললেন—চলো বেড়িয়ে আসি।

দাদা উঠে দাঁড়ালেন। পিসেমশাই বলে দিলেন—যাঁ না, বেড়িয়ে আয় গে।

পাড়ার দোকান থেকে দাদা আমাকে মিষ্টি কিনে দিলেন। মতিবাবুর দোকান থেকে একটা ফাউন্টেন পেনও কিনে দিলেন। সেই প্রথম আমার জীবনে ফাউন্টেন।

দাদা প্রায়ই আসতেন আমার কাছে কলেজ ছুটির পরে। যেদিন আমার ফিরতে দেরি হত, দেখতাম দাদা এসে বসে আছেন, দাদা জিজ্ঞেস করতেন এতো দেরি হল যে?

—সেভেন্থ্ পিরিয়ডে ক্লাস ছিল।

—ব্রেক থাকে না বুঝি?

—না।

—ইস্কুলের মতো এক সময় ছুটি হয় না তোমাদের?

—না।

দাদা আর কিছু না বলে একটা কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আপেল, আঙুর, বাছাই করা কমলা লেবু। দুতিন রকমের মিষ্টি। কথা বলতে বলতে কমলা লেবুর খোসা অনেক সময় দাদাই ছাড়িয়ে দিতেন, একদিন খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দাদা বললেন,—কাল তোমা-দের কলেজে গিয়েছিলাম, তোমার ক্লাসটা খুঁজেই পেলাম না। কেউ দেখিয়েও দিতে পারল না।

—আমাদের ক্লাস তো এক জায়গায় হয় না।

—সে কী! একটা কোনো ঘর নেই তোমাদের?

—না। একেক ক্লাস একেক রুমে হয়। অনেক সময় আলাদা বিল্ডিং-এও হয়।

—বোঝো কী করে?

—রুটিন দেখে। রুটিনে রুম নম্বর লেখা থাকে।

—ও দাদা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না কলেজ সম্বন্ধে।

সংসারের প্রয়োজনে ইস্কুলের নিচু ক্লাসে থাকতেই দাদাকে পুলিশের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন জেঠাইমা। তখনকার দিনে ওসব চাকরি অনায়াসেই পাওয়া যেত। এখন দাদা প্রমোশন পেয়ে ওপরে উঠেছেন। দাদার স্বাস্থ্য ভালো। দক্ষতাও ছিল। কিন্তু বিদ্যেটা আর বাড়াতে পারেন নি। কলেজের পঠন-পাঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো ধারণাও নেই দাদার। আমি কলেজে পড়ি এটাও আমার প্রতি দাদার স্নেহ-মমতা উছলে পড়বার একটা কারণ। আমার জন্য দাদার কতোই না গর্ব! এরই মধ্যে তাঁদের বাড়িতে, তাঁর মেস, সব বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমার কথা বলা হয়ে গেছে।

একদিন আমাকে দাদা তাঁদের মেস-এ নিয়ে গেলেন, মেস-এর বন্ধুবান্ধবরা

আমাকে উৎসুক হয়ে দেখছিল। দাদা বললেন—কটা গান শোনাও। সকলে শুনতে চেয়েছে। পিসেমশাই বলেছেন, তুমি ভালো গাইতে পার।

দাদার কথা শেষ হতে না হতেই একটা হারমোনিয়াম আর তবলা এসে গেল। মেস-এর ঠাকুর এক প্লেট খাবার রেখে গেল। দাদা বললেন—খেয়ে নাও, তারপর গান করো। রাতেও এখানে খাবে। পিসে-মশাইকে বলে এসেছি।

অনেকগুলো গান গাইতে হল সেদিন। সকলের ভালো লেগেছিল—বুঝতে পারলাম। যে তবলা বাজিয়েছিল সে বলল—ভাইকে গান শেখাও বেণীদা, ভালো গাইয়ে হবে।

দাদার চোখে-মুখেও আনন্দের আভাস। বললেন—এবার পুজোর সময় একটা ভালো হারমোনিয়াম কিনে দেব, কেমন ?

মাথা ঝাঁত করে সায় দিলাম। গান-বাজনা যা শিখেছি পরের যন্ত্রপাতির সাহায্যে। এবার নিজের একটা হারমোনিয়াম হবে জেনে মনটা সেদিন খুশিতে ভরে গেল। গ্রীষ্মের ছুটিতে দাদা আমাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে যাবেন। পিসেমশাই-এর সম্মতি মিলেছে। স্টিমারে চড়ে যেতে হয়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। কোনো দিন স্টিমারে চড়ি নি। এবার চড়তে পাব ভেবে খুব স্ফূর্তি লাগল।

দাদা জামা কিনে দিয়েছেন। ধোলাই ধুতি কিনে দিয়েছেন। তখনকার দিনে হাফ-প্যান্ট পরার বয়স পেরোলে কাপড় পরতে হত। প্যান্টের চল ছিল না। প্যান্ট পরত বড়ো বড়ো অফিসাররা, উকিল-মোক্তাররা।

পিসেমশাই প্যান্ট পরতেন। কাপড়-জামাগুলো মাঝে মাঝে খুলে খুলে দেখতাম। খুব ভালো লাগত।

যাবার দিন এল। হঠাৎ দাদা এসে পিসেমশাইকে বললেন—দেখুন তো পিসে-মশাই, কী বিপদ! ওকে নিয়ে বাড়ি যাব, হঠাৎ জরুরি ডিউটি পড়ে গেল। কে এক মন্ত্রী না কে আসবে।

শুনে পিসেমশাই বললেন—কী করবে। চাকরি তো করতেই হবে—না হয় কাল খেয়ো।

—তারও উপায় নেই, মন্ত্রী যদ্দিন থাকবে, তদ্দিন স্টেশন ছেড়ে যাবার যো নেই। রেকর্ড খারাপ হবে। অথচ বাড়িতে খবর দিয়ে দিয়েছি, না গেলেই বা হবে কী করে ?

পিসেমশাই ভাবছিলেন। দাদাই আবার বললেন—যাগ গে, ওকে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরতি স্টিমারেই চলে আসব।

দাদার প্রোগ্রাম ঠিক রইল। আমাকে নিয়ে দাদা বিকেল পাঁচটায় পৌঁছলেন তাঁদের বাড়িতে। জেঠাইমা, বউদি (দাদা বিয়ে করেছিলেন অনেক আগেই) লাগোয়া বাড়ির বউ ঝি ছেলে-পুলে সবাই এসে ঘিরে ধরল আমাকে। খবর পেয়ে পাড়ার প্রায় সবাই এল আমাকে দেখতে। আগে থাকতে এমনভাবেই প্রচার হয়ে পড়েছিল আমার সম্বন্ধে।

সবার আগে জেঠাইমা আমাকে কোলে করে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বারবার চোখ মুছতে লাগলেন। যে একজনকে মন্তব্য করতে শুনলাম—আহা একই ঘরের মানুষ, তো দেখা শুনা নেই বলেই আজ অচেনা হয়ে আছে।

একটু পরে স্বাভাবিক হয়ে জেঠাইমা আমাদের বাড়ির সব খবর, মা—দাদাদের খবর সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

দাদা বসেছিলেন বাবান্দায় পাড়ার কড়োদের নিয়ে। কেমন করে আমার পরিচয় পেলেন, পিসেমশাই কী কী বলেছেন আমার সম্বন্ধে এই সবই ছিল তাঁর মুখ্য প্রসঙ্গ। যেন এক নতুন আবিষ্কারের আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এছাড়া গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ, অশান্তি-উপদ্রব দাদাকেই মেটাতে হয়। ওই সময় পুলিশের খুব দাপট। দাদা পুলিশের চাকরি করেন বলে গ্রামে ক্ষমতাবান পুরুষ। নায়েব মাঝি থেকে জমিদারের গোমস্তা পর্যন্ত সকলেই দাদাকে শুধু ভয়ই করে না খাতিরও করে যথেষ্ট। দাদা সর্বত্র সম্রাটের মেজাজ নিয়ে চলাফেরা করেন। কার পুকুরের মাছ কে ষোল আনাই ধরে নিয়ে গেছে—আট আনার অংশীদার হয়ে, কার খেতের ফসল কার গরু ছাগলে খেয়ে গেছে, কার সীমানায় কে গাছ পুঁতেছে এ-সবের মীমাংসা দাদাকেই করতে হয়। এদিন সময় খুব কম বলে আর সে সব নালিশ তুলতে দেন নি কাউকে। দু-একজন মুখ বন্ধ করতেই দাদা তাদের থামিয়ে দিয়েছেন।

রাত অনেক হল। জেঠাইমা সকলকে তাড়া দিলেন—এবার সব বাড়ি যাও, কাল আবার এসো—রাত হয়েছে।

এক এক করে সবাই যেতে লাগল। জেঠাইমা বউদিকে বললেন—আয় তো দুলু, ওর কাছে একটু বস। আমি দেখি ওদিকে কন্দুর কী হল।

সুযোগের অভাবে বউদি এতক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারছিল। এবার এসে বসল আমার কাছে। হাতে পাখা। কথা বলতে লজ্জা করছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে চাইছিল আমার মুখের দিকে। লাজুক আমিও। প্রসঙ্গ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বোকার মতো বসে থাকতে অস্বস্তি লাগছিল দুজনেরই। সিচুয়েশনটা সেভ করল বউদি-ই। বলল—আসতে কষ্ট হয় নি ?

—না।

—আর কখনো স্টিমারে চড়েছ ?

—না।

—তোমাদের বাড়ি থেকে শহরে যেতে স্টিমার লাগে না ?

—না ?

—যাও কী করে ?

—নৌকোয়।

বউদি যেমন আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছিল আমি তেমন করে উত্তর দিতে পারছিলাম না। লজ্জার ভাবটা তখনও কাটে নি আমার। ভিড়ের মধ্যে জেঠাইমাকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এবার আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে উঠে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলাম। জেঠাইমা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। বউদি বলল—অতো ছটফট করছ কেন ? ও-রকম ছোটাছুটি করলে কি হাওয়া করা যায় ?

—হাওয়া করতে তো বলি নি।

—বাবাঃ, উনি বললে তবে হাওয়া করব। আমি কে বলো তো ?

—জানি না বুঝি ? দাদার বউ।

—দাদার বউ। দাদার বউ কে হয় ?

উত্তরটা বোকার মতো হয়েছে বুঝতে পেরে এবার নিজেই হেসে ফেললাম। বউদিও হাসতে লাগল। (জেঠাইমাকে কার কাছে যেন মন্তব্য করতে শুনলাম—দুজনেই প্রায় এক বয়সি তো)।

দাদার যাবার সময় হল। দাদা বলে গেলেন—ছুটিটা এখানেই থাকবে। কাকিমাকে চিঠি লিখে দেব।

দাদা চলে গেলেন। বউদির তত্ত্বাবধানে হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসলাম। পদ দেখে দস্তুর মতো ভড়কে গেলাম। পিসে-মশাই-এর বাড়িতে আমাদের দৈনিক বরাদ্দ ছিল ডাল, ঝোল, আবেকটা তরকারি। তাও উড়ে ঠাকুরের হাতের গুণে কোনোদিন ঝালের চোটে চোখের জলে নাকের জলে, আবার কোনোদিন বা আল মসলা বিনে অখাদ্য—যেন ভাতের স্বাদ। ঝালে ঝোলে

প্রকাশিত হল—
শ্রীবরুণ ভট্টাচার্যের
জগজ্জননী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র
অমিয়বাণী সম্বলিত
পুস্তক "অনুরণন"।
(১ম খণ্ড)
মূল্য—৩৲
প্রকাশক— আনন্দ, আনন্দময় চন্দননগর
প্রাপ্তিস্থান — শ্রীসুবীরবরণ সরকার, ১৬৫, জি ব্লক, নিউ আলিপুর, ফোন : কলিকাতা-৭০০০৫৩, ফোন : ৪৫-২৩৫৭
বি।৭১৫৩

২০৲ টাকার বই মাত্র ৫৲ টাকায়
ডাঃ সন্তোষ মুখার্জীর
ভগবদ্গীতা····৫৲
[সহজ সরল বাংলায় গীতার সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গর বিজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত • পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৮]
সৃষ্টি ভগবান ও সাধনা···১০৲
অমর স্মৃতি ·····১০৲
[নজরুল • রবীন্দ্রনাথ • শরৎচন্দ্র • মোহনানন্দ প্রভৃতির জীবনের অপ্রকাশিত দিক]
কিচেনগার্ডেন শিক্ষাপ্রণালী····১০৲
এস. মুখার্জী এণ্ড কোং
৪৪, বিপ্রবী পুলিন দাস স্ট্রীট-কলিকাতা-৯

[illegible] আমাদের চাকর মোহনা সংকাকান্ড [illegible]। সেদিন ঠাকুর আমার কাছেই সাবান [illegible]—এক মুঠো, লংকা দিনু তো ঝালস [illegible] আবার সেদিন চোখের জলে [illegible] মতো হতাশ সেদিন বলত—একটা লংকা দিনু তো আজ বাগুন. হইল। [illegible] খেলে অভ্যস্ত হয়েছি. কাজেই বেশি [illegible] দেখলে ভাবনা ধরে যায়।

তখনকার দিনে হাতের কাছে হাট-বাজার থাকত না। রাত বিকেলে আত্মীয়-কুটুম বা অতিথি-অভ্যাগত এলে মোটামুটি আপ্যায়িত করবার ব্যবস্থা প্রায় সব গৃহস্থেরই থাকত। এ-সব ব্যাপারে রান্না-সামগ্রীর চেয়েও বি-বউদের বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করতে হত বেশি। এক ডাল দিয়েই তিন পদ করতে জানত তারা—ডাল, বড়া আবার ওই বড়া দিয়েই একটা ডালনা। কারুর বাড়িতে মাছ হিসেবে থাকত—শিং মাগুর বড় মাছের ঝোল, মাছ ভাজা, দরকার হলে চচ্চড়ি একটা রান্নাও হত। ডিম থাকত। ডিমের ঝোল, ডিম ভাজা। এর পর দুধ। যাদের বাড়ি দুধের গাই থাকত না তারা নারকেল আর বাতাসা বা গুড় দিয়ে পায়েস করত। এ-রকম না হলে গৃহস্থের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত।

বউদি কাছে বসে খাওয়াতে লাগল। কিন্তু কতো আর খাবো? অপারগ দেখে বউদি নিজেই সক্রিয় হয়ে উঠল। মাছটা ডিমটা নিজেই ধরে ধরে এগিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত একান্ত অপারগ দেখে বউদি নিরস্ত হল। বলল—থাক তবে, দুধটুকু খাও।

—তেনা বাপ রে! খালে মরে যাচ্ছি, তবু পেট খাচ্ছি না—আবার দুধ!

—তবে সবটুকু খাও। বউদি বড়ো বাটির মুখ ঢাকা মোটা সরটি তুলে ধরল আমার মুখের কাছে। খেলাম, আমি দুধের বাটিটি মুখের কাছে ধরে বলল—এক চুমুক খেয়ে নাও।

—পরব না বউদি। সত্যি বলছি আর না।

—এক চুমুক।

বউদিকে নিরস্ত করতে দেখলাম।

—আর একটু।

—উঁহু—আর একটুও না—বাপ রে।

—আর একটু—অল্প করে।

না খেলে নিস্তার নেই ভেবে আরেক চুমুক খেলাম। কিন্তু দুধের বাটি সরল না আমার মুখের কাছ থেকে। বউদি বলল—দু চুমুক নেতে নেই। কথা রাখ। বাটিটা তেমনি ধরে রাখল মুখের কাছে।

মুখে দুধ. মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে লাগলাম। বউদি ছড়া কাটল—এক নই তিন/তিনে হয় মিল। দুধ মুখেই দিল করে হেসে ফেললাম বউদির ছড়া শুনে। দারুণ বিষম লাগল। আমার মাথায় আস্তে আস্তে চাট দিতে দিতে বউদি বলল—দেখলে তো গুরুজনের কথা না শুনলে কী হয়?

—গুরুজন! গুরুজন তো জেঠাইমা, দাদা—তা বলে তুমিও গুরুজন? এ বাড়ির সবাই গুরুজন?

—গুরুজন বুঝি বুড়ো-বুড়িরাই হয়। বয়সে বড়ো না আমি?

তোরালো দাঁত বউদির। বললাম—ও, আচ্ছা।

জেঠাইমার তাড়ায় তাড়াতাড়ি রান্না ঘরের পাট চুকল সেদিন।

—ঠাকুরপো কোথায় শোবে মা? বউদি জিজ্ঞেস করল জেঠাইমাকে।

—তোমার সঙ্গেই শুক। তোমার বিছানাটা পরিষ্কার আছে।

বউদি তার বিছানাটা আরেকটু বেড়ে-ঝুড়ে আমাকে শুইয়ে দিয়ে গিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকল।

এতদিনের অচেনা আপনজনকে চির-পরিচিতের মতো ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল না আমার। মনে হচ্ছিল এ-ও এক বিস্ময়।

একটু পরে বউদি ফিরে এসে বলল—ঘুমোও নি এখনো?

—ঘুম পাচ্ছে না।

'না ঘুমোলে শরীর খারাপ করবে। ঘুমোও'—বলে বউদি আমার কাছে শুয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আরেক হাতে পাখা। এতক্ষণের জল খাটা বউদির হাতটা বেশ ঠান্ডা লাগল।

একটু পরে বউদি বলল—কাল কিন্তু গান শোনাতে হবে। রাখাল হারমোনিয়াম নিয়ে আসবে।

—ভালো গাইতে পারি না।

—পারো কিনা কাল দেখা যাবে। এখন ঘুমোও। বলে বউদি আরও কাছে এগিয়ে শুয়ে হাত বুলোতে লাগল।

পরদিন ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই পাড়ার ছেলেপুলের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। একটা সিঙ্গল রিড্ হারমোনিয়াম প্যাঁ প্যাঁ করে বাজছিল বাবাখানায়। হাত মুখ ধুয়ে আসবার সময় দিচ্ছিল না আমাকে। বউদির প্রহরায় জরুরী কাজগুলো সেরে এসে বসলাম। সিঙ্গল রিড্-এর সুরে গলা মিলিয়ে গান গাইতে লাগলাম। সকলে হা করে শুনতে লাগল। জেঠাইমার বসে শোনবার অবকাশ ছিল না। এঘর ও-ঘর করার পথে যেটুকু শুনছিলেন তাতেই খুশি। একবার একটা ফরমাশও দিয়ে গেলেন—একটা রামপ্রসাদী গা।

পর পর গোটা দুই রামপ্রসাদী গাইলাম। আরেকজন বলল—একটা খেয়াল গান করো।

খেয়াল শিখি নি। বললাম—খেয়াল জানি না।

—কেন, বেশ তো গাইছিলে। ওই গানটা করো না—খেলা খেলা সারা বেলা—

বুঝলাম—ভদ্রলোক 'খেয়াল' বলতে সাধারণ গানকেই 'খেলো' অর্থে খেয়াল বলেন। বেলা অনেক হল। জেঠাইমা বলে গেলেন—এবার সব বাড়ি যাও। আবার সন্ধেবেলা এসো—চরিত্র স্পষ্ট হবে।

সাবান গামছা নিয়ে বউদি আমাকে স্নান করাতে নিয়ে গেল পুকুর ঘাটে। বউদি পাড়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি নাইছিলাম। আমার নাওয়াটা বোধহয় বউদির মনঃপূত হচ্ছিল না। নেমে এসে বলল—দেখি সাবানটা দাও তো আমার হাতে।

পিঠে আরেকবার সাবান মাখিয়ে নিয়ে বেশ জোরে জোরে রগড়ে দিতে লাগল। থেকে থেকে মন্তব্য করছিল—ইস্ কী ময়লা!

—ছাল চামড়া যে তুলে দিলে দেখছি!

—ভালো করে না নাইলে গায়ে গন্ধ হয়।

—গন্ধ বুঝি তোমাদের গায়ে নেই? বাক্তিরে বেশ ভক্ ভক্ করে গন্ধ বেরোচ্ছিল।

—সে গন্ধ আর এ গন্ধ!

—তবে বলো সেটা সুগন্ধ আর এটা দুর্গন্ধ।

—অত শক্ত করে বলতে পারি না—তোমাদের মতো তো আর কলেজে পড়ি নি।

—ও কথা বললে কিন্তু সাত দিন কথা বলব বউদি।

—যাও, আরেকটা ডুব দেলে এসো। ভীষণ শীত ধরে গেছে যে।

—বোশেখ মাসে শীত! আর তোমার কোনো বোধে পড়ে কী হয়েছি দেখো তবে।

দেখলাম, বউদির ফর্সা মুখটুকু লাল হয়ে গেছে। সারা মুখে ঘাম ফুটেছে। বললাম—সত্যি ভারি কষ্ট হচ্ছে তো তোমার!

পুস্তক পর্ষদের বই

ইমানুয়েল কাণ্ট

হুমায়ুন কবির ৫.০০

দুর্বোধ্য কাণ্টের দর্শনের বিষয়ে সাধারণের বোধগম্য একটি সরল আলোচনা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা—৭০০০১৩

সুতী, পশম, সিল্ক, টেরিন
কাচার লিকুইড ডিটারজেন্ট

Glitter

কনজিউমার প্রোডাক্টস

২৮এ, এস এন দাস লেন, কলি—৬৩

পরিবেশক :

পাপু এন্টারপ্রাইজ

১৭।৩৭, আর কে ঘোষ রোড [illegible]

—থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না—তাড়াতাড়ি করো।

'যাচ্ছি'—জলে নামতে নামতে বললাম, গুরু বাক্য অলঙ্ঘনীয়—তুমি তো আবার সম্পর্কে গুরু—বাব্বা! মা মানলে হাতে হাতে ফল।'

বউদি হাসি লুকোবার চেষ্টা করল।

বাঁধা প্রোগ্রাম দাদার বাড়িতে। সকালে জলযোগ, তারপর গান-বাজনা। দুপুরে স্নানাহার। তারপর একটু গড়াগড়ি, কোনোদিন বা বউদির সঙ্গে গল্প-গুজব। এটা কদাচিৎ। বিকেলটা ফাঁকা। বউদি বিকেলের রুটিন মাফিক তার কাজকর্মে লেগে যায়। জেঠাইমার অভ্যেস মতো পাড়ায় চক্কর। এই অবসরে আমিও স্টিমার ঘাটে খানিকক্ষণ বেরিয়ে আসি। স্টিমার ঘাট বাড়ির একেবারে কাছে। একটা সুপুরি বাগান পেরোলেই নদী। বাগানটার গায়ে এসে স্টিমার নোঙর করে। স্টিমারের সরু মাথাটা পাড়ের মাটির ভেতরে খানিকটা ঢুকে যায়। প্রায় মিলিয়ে যাওয়া দাগগুলো দেখে বুঝতে পারি কোনখানটায় কতদিন আগে স্টিমারটা লেগেছিল। আমার আসার দিনের দাগটা চিনে নিতে চেষ্টা করি।

স্টিমার রোজ চার বার আসে। শহরে যাবার সময় সকাল ন'টায়। ফেরার পথে বেলা পাঁচটায়। ওই সময় আমি এসে-ছিলাম। আবার রাত এগারোটায় শহর-মুখো। দাদা ওই স্টিমারে গিয়েছিলেন। শেষ রাতে চারটেয় সহর থেকে শেষ ফেরা।

স্টেশনে ঘরদোর কিচ্ছু নেই। পাড়ার সাতকড়ি পাঠক একটা বস্তার টিনের সুটকেসে করে টিকিট নিয়ে এসে জামগাছটার তলায় বসে। যাত্রীরা তার কাছে টিকিট কেনে। স্টিমার ছেড়ে গেলে সাতকড়িও বাড়ি যায়। রাত্রে একটা বাড়তি ডিউটি। স্টিমার আসবার সময় হলে তার ভোঁ শুনে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে নেড়ে নেড়ে স্টেশনের নিশানা জানাতে হয়।

ওপারে একটা বন্দর। সন্ধ্যা হলে খানিকটা জায়গায় আলো জ্বলে। এক ঝাঁক জোনাকি।

স্টিমার ঘাটের সুপুরি বাগানটার পরেই চোখে পড়ে ছোটো একটা বাড়ি। ও-রকম ছিমছাম সৌখিন বাড়ি সহরেও কম দেখেছি। জামগাছটার তলায় দাঁড়ালে ভালো করে দেখা যায় বাড়িটা। আমি রোজ দেখি। কেমন অবাক লাগে। লোকজনের সাড়া নেই। লতা পাতায় সীমানা ঘেরা। দিশি ফুলের সঙ্গে যুনো ফুলের সমাবেশে সেজে থাকে বাড়িটা। আমার চেয়ে বয়সে খানিকটা বড়ো ধবধবে সাদা থান পরা একটি বউকে মাঝে মধ্যে এ-ঘর ও-ঘর করতে দেখি। সন্ধের দিকে ফুল তোলে সীমানার কাছে এসে। দেখে দেখে কৌতূহল জাগে। বাড়িটার রহস্য কী?

একদিন জেলেরা মাছ ধরছিল ওই বাড়িটার কাছেই। গুটি গুটি এগিয়ে গেলাম। নদীর দিকের সীমানা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছ ধরা দেখছিলাম। বউটি ফুল তুলছিল। আমাকে কাছে পেয়ে আচমকা জিজ্ঞেস করল—জেঠাইমার বাড়ি বেড়াতে এসেছ বুঝি?

পরিচিত পড়শীর মতো আলাপ। বললাম—হ্যাঁ।

—আর কোনোদিন আসো নি?

—না। চিনতাম না।

—পড়াশুনো করছ?

— হ্যাঁ।

—কী পড়ো?

—বি-এ থার্ড ইয়ার।

—কী নিয়ে পড়ছ?

—হিস্টি, ফিলজফি—

—হিস্টি বেশ ইনটারেস্টিং সাবজেক্ট, না? একটু যা পড়তে হয়—কেমন, না? ফিলজফি তোমার কেমন লাগে?

একটু থেমে আবার বলল—নদী দেখতে ভালোবাসো বুঝি—?

—নদী কার না ভালো লাগে? আমাদের সহরেও নদী আছে। রোজ ছুটির পরে বেড়াতে যাই।

—নদী, আকাশ, সমুদ্র এসব দেখতে দেখতে মনে হয় এরা যা দেখেছি তার চেয়েও বেশি বাকি আছে। তাই না?

—হ্যাঁ। আপনাদের খুব মজা, নদীর পাড়েই বাড়ি—সব সময় দেখতে পান।

'তা পাই'—একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বউটি নদীর দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ বিমর্ষ দেখাল ওকে।

ওপারে আলো জ্বলে উঠল। বউটি বলল—রাত হল, বাড়ি যাও। কাল আবার এসো, কেমন?

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বউদির কাছে বললাম বউটির কথা। শুনে বউদি আৎকে উঠল। বলল—খবরদার, ওর কাছে যেও না। বউটা রাক্ষসী!

—রাক্ষসী! এসব এখনো বিশ্বাস করো তোমরা।

—না হলে লোকে বলবে কেন? রাক্ষস না হলে স্বামী, ছেলে শাশুড়ী এক সঙ্গে শেষ হয়ে যায় কারো?

অটুট বিশ্বাস, বৌদির কুসংস্কার আর কাকে বলে। কী বলব ভাবছিলাম, বউদি আবার বলল—আর কী রূপ দেখেছ বউটার। অনেক বলে ও পরী।

—পরী?

—হ্যাঁ,

—হ্যাঁ, শোনো নি, ফুল বাগানে ঘুরে বেড়ায় গায়ে ফুলের গন্ধ।

অদ্ভুদ লাগছিল বউদির কথা শুনে। বউদি আবার বলল—কেউ কেউ ওকে ডাইনিও বলে। কারোর ছেলেমেয়ে ওর কাছে যেতে দেয় না। খবরদার, ওর কাছে একদম যাবে না।

—কিন্তু ওকে যা যা বললে তার একটাও কেউ দেখেছে বলে শুনি নি। রামায়ণে পড়েছি, রাক্ষস স্থিল ত্রেতা যুগে। রাবণের সঙ্গে সব নিঃশেষ হয়েছে রাম। অবিশ্যি নামটা এখনো আছে। যারা বেশি বেশি খায় তাদের অনেকে রাক্ষস বলে, আর পরী—! হ্যাঁ, বউটি খুবই সুন্দরী। খুব সুন্দরী মেয়েদের কেউ কেউ বলে, মেয়েটি পরীর মতো দেখতে। তা বলে আসল পরী তো রূপকথার দেশে। যা নিতুক ছেলে ভুলোনো অলীক কাহিনী। তারপর ডাইনি। অবিশ্যি ডাইনির কথা মাঝে মধ্যে খবরের কাগজে বেরোয়। ও-সব গ্রাম গাঁয়ের ঘটনা। শিক্ষিত সমাজে ও রকম ঘটেই না। মুখ্যু-সুখ্যুদের যেমন ধারণা—তেমনি কথা।

—অত সব জানি না—সবাই যখন বলছে, তখন অবিশ্বাসই বা করব কেমন করে?

—ও সব তোমাদের ভুল ধারণা বউদি। সবাই তো বলে বর্ষাকালটা খুব বিশ্রী। জল, কাদা, প্যাচ প্যাচ করে। চলা-ফেরার অসুবিধে। কিন্তু বর্ষা না হলে যে পৃথিবীটাই মরুভূমি হয়ে যেত। সুজলা-সুফলা আর থাকত না। আবার রবীন্দ্রনাথ তো বর্ষার আনন্দে নেচে উঠতেন, কোন্‌টা সত্যি বলো তো?

'ও সব জানি না, তোমাদের মতো তো আর লেখাপড়া করি নি—' বউদি মনে হল বিরক্ত।

—আবার সেই কথা! এবারে কিন্তু সত্যি রাগ করব বউদি।

'তবে তর্ক করছ কেন? বারণ করছি ওর কাছে যেতে—যাবে না—ব্যস্।' প্রসঙ্গটার ছেদ টানতে চাইছে মনে হল।

পাশের ঘরে জেঠাইমা একপ্রস্থ নাক ডাকা শেষ করে পাশ ফিরছিলেন। বললেন—এখনো ঘুমোস নি তোরা? ঘুমো। রাত চড়ে যাবে।

দুজনেই চুপ করে গেলাম। বউদির হাতের পাখাটা শুধু জোরে জোরে নড়তে লাগল।

কিন্তু বিষয়টা অমীমাংসিতই রয়ে গেল। বউটি সম্বন্ধে এদের আর আমার ধারণার মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান। মতৈক্য কোনো রকমে সম্ভব নয়। কথায় কথায় যেটুকু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছি তাতেই বউদি বিরক্ত। অতএব আমাকে চুপ করে যেতে হল।

পরদিন বিকেলটা বাড়িতেই কাটালাম। রাত থেকেই বউদির আনকটা অসহযোগের ভাব লক্ষ্য করছিলাম। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, একা একা আর ভালো লাগছিল না। ধীরে ধীরে স্টিমার ঘাটে গিয়ে জামগাছটার তলায় দাঁড়ালাম। সন্ধে হয়ে গেছে। ওপারে বন্দরের মাথায় প্রায় পূর্ণাঙ্গ চাঁদটা নদীতে মুখ দেখছে। নদীর জলে রুপোলি রং। সুপুরি বাগানেও টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না। তিথিটা মনে করবার চেষ্টা করছি। হঠাৎ বউটির গলা—কাল তোমার গান শুনছিলাম। বেশ মিষ্টি তোমার গলা।

একটা সুপারি গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল বউটি। পান পরা।

চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম—জেঠাইমা রোজ ঠাকুরের গান শুনতে বলেন।

—ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করো?

—করি।

—আমার ঘরে গোবিন্দ আছে। দেখবে?

হ্যাঁ, না বলবার আগেই ও আবার বলল—গোবিন্দের প্রসাদ রেখেছি তোমার জন্যে। নেবে না?

—প্রসাদ?

—হ্যাঁ। তোমাকে তো আসতে বলে দিয়েছিলাম: এলে না কেন?

বউদির কথাটা আমার জিভটাকে প্রায় আটকে ধরেছিল। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না বললাম—আপনাদের বাড়িতে আর কেউ নেই?

—ওই তো বললাম—গোবিন্দ আছে। কেন, ভয় করছে?

না, ভয় কী!' নির্ভীক সাজতে চাইলাম।

—তবে এসো। রাত হল যে।

বউটির এই অকপট আহ্বানের মুখে বউদির নিষেধ বাণী কোনো কাজেই লাগল না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলতে লাগলাম ওর পিছু পিছু।

বউটির ঘরে গোবিন্দের বিগ্রহ। অপূর্ব মূর্তি গোবিন্দের। আমাদের ফিলসফির প্রফেসর গিরীশবাবুর লেখা ভারতের নানা দেব-দেবীর বিগ্রহের রূপ বর্ণনা পড়েছি। কিন্তু এরকম মনোহর মূর্তির বর্ণনা দেখি নি। এ যেন পরমপুরুষোত্তম নিজে এসে সশরীরে বসে আছেন বউটির নিম হাতে পাতা আসনটিতে। চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

—দেখলে আমার গোবিন্দকে? এর কাছে এলে কি আর দুঃখ শোক থাকে কিছু!

—সত্যি, ভারি সুন্দর!

—ওই সুন্দরের ছোঁয়া লাগলে সবই সুন্দর হয়ে যায়। দেখছ না, এই পৃথিবী সুন্দর, এর মানুষ সুন্দর, জীব-জন্তু পশু-পাখি কীট পতঙ্গ এমন কি পথের পাশের তুচ্ছ গুল্মলতাটিও কত সুন্দর!

একটা থালায় প্রসাদ সাজাতে সাজাতে বউটি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—বলতে পারো এর কারণ কী?

ও কী জানতে চাইছে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না। চুপ করে আছি দেখে ও-ই বলল—এর কারণ একটাই। মানে, তিনি সৃষ্টির সব কিছুতেই মিশে আছেন। এই সত্যের সন্ধান পেলে তার কি আর কোনো অভাব থাকে?

চুপ করে শুনছিলাম। ওর জ্ঞানের সীমা-পরিসীমা অনুমান করতে চাইছিলাম।

ও আবার বলল—এর পরেও কি জানতে চাও, আমার আর কেউ আছে কিনা?

প্রসাদের থালাটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নাও, প্রসাদটুকু খাও। পুর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শোনালাম, না?' মিষ্টি হাসি দেখলাম ওর মুখে।

শুদ্ধতায় শুচিতায় বউটির দেওয়া গোবিন্দের প্রসাদে অমৃতের স্বাদ লাগল।

বউদি আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিল। চুপি চুপি উঠোনের আম গাছটার তলায় পৌঁছোতেই এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

'আজও আবার গিয়েছিলে ওই বউটার কাছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বউদির।

অপরাধীর মতো বললাম—ও আমাকে ডেকে নিয়ে গেল যে।

'আর আমি যে বারণ করেছিলাম, সেটা কিছু নয়?' বিক্ষোভে কেঁপে উঠেছিল বউদির গলাটা।

'ওর কথাটাই বড়ো হয়ে গেল তোমার কাছে। বেশ, আমি আর কখনো কিছু বলব না তোমাকে। ঝড়ের বেগে চলে গেল বউদি আমার সামনে থেকে।

ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানেই। জেঠাইমার নজরে পড়তে বলে উঠলেন—কী রে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা না খা গে, দুলুর আজ উপোস। খেয়ে-দেয়ে শো গে—

একা একা ঘেমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম. বউদি সেই যে ঠাকুর ঘর গিয়ে দরজা বন্ধ করেছে, আর খোলে নি।

বউটিকে কেন্দ্র করে গত চব্বিশ ঘন্টার ঘটনাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠছিল বউদির নিষেধ করার কথাটা। আমার প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখেই সে বারণ করেছিল আমাকে ওই বউটির কাছে যেতে। কিন্তু আমার কাছে তার এতটুকু মূল্য থাকবে না তা-সে ভাবতেও পারে নি। আমার এই অবহেলা তার বুকে নিশ্চয় আঘাতের মতো বিঁধেছিল। অফুরন্ত অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা নিয়ে বউদি আমাকে একান্ত আপন করে টেনে নিয়েছিল। আমি সজোরে তার কোল থেকে বেরিয়ে গেছি। এমনি করে তাকে দুঃখ দেওয়ার দুঃখটাই আমাকে দগ্ধ করছিল বেশি। অনুতাপে আমার কান্না পাচ্ছিল। কোঁদেও ফেলেছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে।

জেঠাইমা টের পেয়ে বলে উঠলেন—কী রে, কাঁদছিস নাকি? কেন, মন জন্যে মন কেমন করছে?

বউদির ঠাকুর ঘরের দরজাটা একটুখানি ফাঁক হয়ে থেকে আবার বন্ধ হল।

কেঁদে কেঁদেই বললাম—আমি বাড়ি যাব।

—বেশ তো যাবি। এখন ঘুমো কাঁদিস নে। এতো বড়ো ছেলে, মার জন্য কাঁদছিস!, লোকে কী বলবে।

কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি যেন দিবাকান্তি সেই মনোহর মূর্তি গোবিন্দ আমার সামনে এসে বসেছে। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছে। কী শীতল সে স্পর্শ। কী আনন্দ সে স্পর্শে! চোখ মেলে চাইলাম। দেখি আমার পাশে শুয়ে দাদা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এক পাশে বউদি।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে দাদা বললেন, দুঃস্বপ্ন দেখছিলে বুঝি? ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছিলে—

—তুমি কখন এলে?

—এই তো, শেষ রাতে। মার কাছে শুনলাম তোমার মন কেমন করছিল। তোমার বউদিটার কোনো কাণ্ডজ্ঞান হল না। তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ, ও দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

পুস্তক পর্ষদের নই
খাদ্য ও পথ্য
ডঃ সমর বাগচীচৌধুরী
১৫.০০
ডায়েট ও ডায়েটিং-এর উপর একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বাঙলা গ্রন্থ। শিক্ষাপ্রার্থীদের অধ্যয়নরত ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের চাহিদার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক তাঁর সাবলীল আলোচনায়।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
৬এ, বাঙ্গা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা—৭০০০১৩

সামনেই সৌভাগ্য

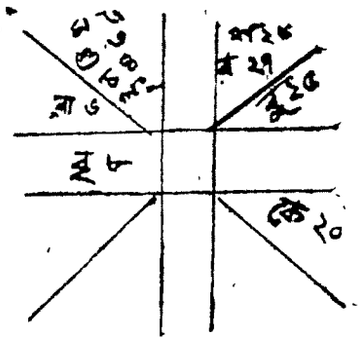

আমরা ইতিপূর্বে যে কজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের রাশি-চক্র নিয়ে আলোচনা করেছি তাতে একটা জিনিষ প্রায় প্রত্যেক রাশি-চক্রেই স্পষ্ট ছিল বা পাওয়া গেছে যে, প্রায় প্রত্যেকের জীবনে কোন না কোন সময় অশুভ গ্রহের প্রকোপেই হউক আর কালের প্রভাবেই হউক, কিছু না কিছু বিভ্রাটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল যা নেহাৎই স্বাভাবিক। কেউ বা রাজনীতিতে বিলম্বে সাফল্য পেয়েছেন, মন্ত্রিত্ব লাভে বঞ্চিত—কেউ বা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন কারোর বা মন্ত্রিত্বে ছেদ পড়েছে। এবার আমরা এমন একজন রাজনীতিবিদের রাশি-চক্র নিয়ে আলোচনা করবো যাঁর রাজনীতি জীবনের প্রথম থেকেই সাফল্য আর এমন সাফল্য—যে সাফল্যে ফাটল নেই, ছেদ নেই। সাধারণত দেখা যায় 'প্রধান' অথবা 'মুখ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই ভাগ্যে বিড়ম্বনা আসে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য রাশিচক্রের জাতকের তেমন কিছুও ঘটেনি। জাতকের আরও অভিনবত্ব যে কোন প্রধান এসে যে কোন দায়িত্ব দিয়েছেন জাতককে—জাতক এমন সুন্দরভাবে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেছেন যাতে জাতকের প্রতি আস্থা এবং শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। রাজনীতি খেলার আসরে যে কেউ অধিনায়কত্বে এসেছেন জাতককে ঠিক দলভুক্ত করেছেন শুধু তাই নয় নতুন নতুন অধিনায়ক জাতককে যে স্থানের দায়িত্ব দিয়েছেন—জাতক সে স্থানেরই দায়িত্ব সুনিপুণভাবে পালন করে দলকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সে দায়িত্ব কি রাইটের কি লেফটের ফরওয়ার্ডের কি ডিফেন্সের। এক কথায় যেন অল স্কোয়ার। এই অভিনবত্বের অধিকারী জাতক কি কোরে হলেন রাশিচক্রে আমরা জ্যোতিষী দৃষ্টিতে তারই অনুধাবন করতে চেষ্টা করবো।

অনেকে রাজনীতিতে বাবু জগজীবন রামকে ক্যালকুলেশন মাষ্টার বলেন, অর্থাৎ রাজনীতি জীবনে যে বস্তুনিষ্ঠ প্রধান প্রয়োজন সেই দূরদৃষ্টি ধৈর্য, স্থির এবং কার্যকরণের উপর গভীরত্ব বাধা আর সঙ্গে মমতা স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক দক্ষতা সমত্ববোধ, অথচ কর্মে নিষ্ঠা প্রয়োজনে কঠোরতা এই সমস্ত গুণগুলি

উপরে বাবু জগজীবন রামের রাশিচক্র স্পষ্ট, রাশিচক্রে চন্দ্র গ্রহ তুঙ্গী। তুঙ্গ স্থান পেয়েছেন বৃহস্পতি এবং রাহু। জ্যোতিষ শাস্ত্রে কেউ কেউ বলেন, স্বীয় নক্ষত্রে কোন গ্রহ অবস্থান করলে সে তুঙ্গ ফলদাতা। উপরের রাশিচক্রে দেখা যায়—রাজযোগ কারক বক্র শনি—মীন রাশিতে স্ব-নক্ষত্রে আছেন। স্ব-নক্ষত্রে আছেন রাহু মিথুন রাশিতে। বাবু জগজীবন রামের পক্ষে শনি গ্রহ একাই রাজযোগকারক। সেই শনির নক্ষত্রে বসে আছেন বৃহস্পতি। আর প্রজ্ঞা—প্রশাসনিকের কারক বৃহস্পতির নক্ষত্রে বসে আছেন বিদ্যা-বুদ্ধি, লক্ষ্মী, মান, যশ এবং বিকাশের কারক গ্রহ বুধ। আবার এই বুধের নক্ষত্রে বসে আছেন রাজ কারক গ্রহ রবি। যিনি জাতকের প্রতিষ্ঠা এবং সুখেশ। এই সুখেশ রবির নক্ষত্রে বসে আছেন স্বয়ং লগ্নেশ লগ্নপতি শুক্র এবং সংগ্রামী গ্রহ মঙ্গল। আর বিজ্ঞ-জ্ঞানী, অংকবিশারদ, শাস্ত্রজ্ঞ রাজনীতিবিদ গ্রহ শুক্রের যিনি জাতকের লগ্নপতি তাঁর নক্ষত্রে বসে আছেন কুহেলিকাময় কেতু গ্রহ। তাই বোধহয় রাজনীতির দাবাতে বাবুজী এত সুন্দর হিসাবের চাল খেলেন যা সাধারণের বোধগম্যের অতীত। যে হিসেব অনেকেই আগে ভাগে করতে পারেন না যার জন্যে বাবুজীকে ক্যালকুলেশন মাষ্টার বলা হয়। শুধু যে নক্ষত্রের গুণে জাতক এমন সাফল্য অর্জন করেছে তা নয়—জাতক প্রথম জীবন থেকেই পেয়েছেন দশা-মহাদশার আনুকূল্য। মানুষের সাফল্য লাভে যেই দশা অন্তর্দশার সহায়তা একান্ত অপরিহার্য। জাতক জন্মেছেন চন্দ্রের মহাদশায় চন্দ্র গ্রহ তুঙ্গী, তারপর মঙ্গল, রাহু বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহের পর পর দশাগুলি জাতকের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ছিল। এর মধ্যে রাহু বৃহস্পতি তুঙ্গ ফল দাতা, আর শনি গ্রহ রাজযোগকারক গ্রহ অর্থাৎ রাজযোগ ফলদাতা। ফলে গোচরে কখনো অশুভ গ্রহের প্রকোপ পড়লেও দশা-মহাদশার বলে জাতক ভারসাম্য রক্ষা করে সাফল্যের সাথে এগিয়েছেন। বর্তমানে বাবুজীর বুধের মহাদশা চলছে, এই বুধ যদিও ষষ্ঠ দশা বিষয়ে অশুভ কিন্তু যেমন শুভ স্থানের অধিপতি তেমন বসে আছেন শুভ স্থানে সুতরাং বুধের দশাও জাতক শুভ ফল পাবেন।

কিন্তু পূর্বে যেমন গোচরে সিংহ রাশিতে শনি গ্রহের সঙ্গে মঙ্গলের অশুভ মিলনের কথা ভাবছিলাম এবং তার ফলও পেয়েছি তেমন এই রাশিচক্রে ও ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ঐ সিংহ রাশিতে শনি এবং রাহুর [illegible] উদ্বেগের ইঙ্গিত বহন করে। প্রত্যেক রাজনীতিবিদের রাশিচক্রে এই শনি মঙ্গলের মিলন এ বছর নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে আগামী ইংরাজী বছরের মে-জুন পর্যন্ত ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ অশুভতের ইঙ্গিত বহন করছে। যেমন দেখেছি প্রধানমন্ত্রীর। তেমনি দেখেছি মহামান্য রাষ্ট্রপতির আবার তেমন দেখা যায় মকর রাশির অন্তর্গত ভারতের পক্ষেও তেমন দেখা যায় ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে স্বাধীন ভারতের রাশিচক্রে। তবে শনি এবং মঙ্গলের গত অশুভ মিলনে যেমন বাবুজীর পক্ষে কোন শংকার কারণ হতে পারেনি তেমন শনি-রাহুর বেলায়ও বাবুজীর ক্ষতির আশংকা কম, তা রাজনীতিতে যতই ডামাডোল বাজুক। কারণ ঐ সময় গোচরে বৃহস্পতি তুঙ্গ হয়ে বাবুজীর ভাগ্য স্থান এবং ভাগ্যপতিকে দৃষ্টি করবেন। ফলে বরং বাবুজীর আরও সাফল্য আরও উন্নতির ইঙ্গিত থাকছে। তথাপি কিছুটা স্বাস্থ্য কিছুটা বিভ্রাটের জন্য বাবুজীর পক্ষে এবার আগষ্ট থেকে আগামী বছর মার্চ মাস পর্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন। কোন সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে।

যাক এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশি ফল বলছি ঃ

সপ্তাহটি ইংরাজী ২৮ জুলাই থেকে আরম্ভ। মঙ্গল গ্রহ গত দেড় মাস সিংহ রাশিতে শনির সাথে সহাবস্থান করার পর এখন আবার দেড় মাস অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাহুর সঙ্গে অবস্থান করবে। রাহু, মঙ্গলের এই মিলন যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমন দৈব দুর্ঘটনা প্রাকৃতিক বিপর্যয় আইন-শৃংখলা ইত্যাদিতে দেশের পক্ষে হানিকর।

মেষ—আপনি যে কাজই করুন না কেন কর্মস্থানে কোনভাবে উত্তেজিত হওয়া ঠিক হবে না। ছোটখাটো ঝামেলাগুলি এড়িয়ে চলুন কিছুদিনের মধ্যে ঝঞ্ঝাট কেটে যাবে। আয় ক্ষেত্রেও কিছু বাধা-বিঘ্ন থাকবে। কোন ভ্রাতার স্বাস্থ্য

সমস্যা সমাধানে সহায়তা পাবেন। মঙ্গল, বুধবার শুভ।

বৃষ—আর্থিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন মিটে যাবে। বিচক্ষণ বাক পটুতায় অনেক দূরূহ সমস্যার সমাধান হবে। প্রেম-প্রীতিতে শুভ ফল পাবেন। কর্মে পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। শনি থেকে সোমবার পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

মিথুন—হয়তে অহেতুক কিছু দুশ্চিন্তা আপনাকে ব্যাতিব্যস্ত করতে পারে। ব্যস্ত অথবা অশান্তি হতে পাবে কোন ভাই এবং সন্তানকে কেন্দ্র করে। কিন্তু নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। গৃহ সমস্যাও মিটে যেতে পাবে। ব্যয় সংকোচ করুন। মঙ্গল, বুধবার শুভ।

কর্কট—স্বাস্থ্য বিশেষ করে দাঁতের রোগে কষ্ট পেতে পারেন। কোন ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত পরে ক্ষতির-কারক হতে পারে। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার পাবে। অর্থ-ভাব গতানুগতিক। শুক্র থেকে মঙ্গল-বার পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

সিংহ—কোন না কোন সূত্রে আয় বৃদ্ধি পাবে। শত্রুদেরও জয় করতে পাববেন। যার ফলে রাজনীতিতে আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ যেতে পারে। শনি থেকে বুধবার পর্যন্ত সময়টাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন।

কন্যা—কর্মস্থানে উন্নতি অথবা কোন যোগাযোগ উৎসাহিত করবে। বৈরী-ভাবাপন্নবা বশে আসবে। কিন্তু আয়-ব্যয়ে সমতা বাধা মুস্কিল হতে পাবে। বুধ, সোম অশুভ।

তুলা—সাংসারিক ক্ষেত্রে অশান্তিগুলি আপনার কাজ-কর্মের পক্ষে ক্ষতিব-কারক হতে পাবে। কিন্তু কোন ব্যাপারে আপনাব ভাগ্য সহায়ক হতে পারে এবং যার শুভ ফল নিকট ভবিষ্যতে পাবেন। মঙ্গল, বুধবাব অশুভ।

বৃশ্চিক—সপ্তাহটিতে বেশী সময় ব্যস্ত থাকতে হতে পাবে কিন্তু শ্রমানুযায়ী ফল লাভে বাধা আছে। প্রিয়জন পাবেন। রাজ্ঞ খাতে কিছু ব্যয় দেখা যায়। বুধ, বৃহস্পতিবাব অশুভ।

ধনু—ব্যবসাতে পসার বৃদ্ধি পাবে। কোন মধ্যস্থতামূলক কাজে সাফল্য পাবেন। আইনগত ব্যাপারে চিন্তার কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শেষভাগ থেকে প্রথম ভাগটা ভাল।

মকর—গুপ্ত শত্রুদেব তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মস্থানে ও কোন ব্যাপাবে হতাশা থাকতে পারে। ফলে সংসাবে মত-বিরোধ অসম্ভব নয়। বুধ, বৃহস্পতি-বাব অপেক্ষাকৃত শুভ।

কুম্ভ—যদিও নিজ গুণের মর্যাদা পাবেন। দূরের কোন সংবাদ উৎসাহিত করতে পাবে। কিন্তু বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপাবে দুশ্চিন্তা থাকবে। কোন বন্ধুর সাথে মতবিরোধ অসম্ভব নয়। মঙ্গল, বুধ-বাব অশুভ।

মীন—উচ্চ স্থানীয় প্রভাবশালী কোন ব্যক্তির সাথে মতবিরোধ ফলে মনে চাপ পড়তে পারে। আয় ক্ষেত্রে ও ন্যায্য প্রাপ্তিতে বাধা দেখা যায়। কিন্তু স্বীয় গুণের মর্যাদা এবং কর্মে প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। শনি, রবিবার লক্ষ্যণীয়।

শ্রীনাগিক্য

আগামী সংখ্যায়
প্রমোদ দাশগুপ্ত

চিঠিপত্র

সাহিত্যিক নই লেখক মাত্র

গজেন্দ্রকুমার মিত্র মশাই-এর 'আশ্চর্য লেখক আশ্চর্য মানুষ' স্মৃতিচারণে 'অবধূতকে কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখায় সুন্দর-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে ওই মানুষটি এমনই বিচিত্র যে এত অল্প পরিসরে তাঁকে ধরা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে 'অমৃতে'ও মন্তরঞ্জ, বিভূতি-তারাশংকর নিবন্ধে তাঁর বাংলাসাহিত্যে প্রবেশ সম্পর্কে দু-একবার ছুঁয়ে গেছি মাত্র। গজেনবাবু ওই লেখাটি একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতেন যে, তারাশংকর মুখ্যতঃ একটি আশ্রম বিক্রি আছে খবর পেয়েই চুঁচড়োয় গিয়েছিলেন। ওই আশ্রমের মালিক অবধূত স্বয়ং। প্রায় মশাইদের বাড়িতে সকালের দিকেই মরুতীর্থ হিংলাজের প্রথমাংশ শুনিয়েছিলেন লেখক, তাঁর জোড়া ঘাটের বাড়িতে অর্থাৎ 'আশ্রমে' আরও খানিকটা শোনান। বিকেলের দিকে অবশ্য ছোটখাট আসর রায়বাড়িতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় উনি লিখেছেন গৌরীশংকর তখন মিত্রালয়ের মালিক—তাঁরও এটার ওপর ঝোঁক ছিল, তখন জানতাম না।' তাঁর এই উক্তির কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।' প্রথমতঃ, মিত্রা-লয়ের মালিক তখন এবং এখনও আমি আছি, তবে এটা ঠিক যে, তখন মিত্র ও ঘোষের দোকান থেকে মিত্রালয়ের বই বিক্রি হত—কেননা ওঁরা মিত্রালয়ের সোল এজেন্ট ছিলেন। বর্তমানে মিত্রালয় স্বতন্ত্র দোকান করেছে, তাও তো বিশ বছর হয়ে গেল, আমি যতদিন মিত্র-ঘোষের দোকানে ছিলাম বাইরে থেকে কেউ টেরই পেত না যে মিত্রালয় ও মিত্র-ঘোষ পৃথক কারবার। উভয় তরফের ব্যবহারিক ও আন্তরিক সম্পর্কে ফাঁকি ছিল না। অবধূতও গোড়াতে এই ভুলটি করে-ছিলেন। কেন না যেদিন মিত্র-ঘোষের সঙ্গে বই প্রকাশের চুক্তি করলেন সেদিনই আমাকে বলেছিলেন—'বইটা আপনাদেরই দিলাম'। আমি একটু হেসে সায় দিয়েছিলাম 'বেশ ত ভালোই হল।' জানতাম একদিন আপনা থেকেই ত ভুল ভাঙবে। আমার যদি বিন্দুমাত্র 'ঝোঁক' থাকত তাহলে চুঁচড়োর বাড়িতে হাজির হওয়ার জন্য অন্যের কাছে ঠিকানা খোঁজার দরকার পড়ত না। আগে পাওয়া আমার পক্ষে সহজতর ছিল। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বকে আমি ব্যবসায়ের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিই, তাই মিত্র-ঘোষের আগ্রহের তীব্রতা লক্ষ্য করে অবধূতের কাছে ইচ্ছে করেই কোনো বই প্রকাশের প্রস্তাব করিনি, পাছে গজেনদারা ভাবেন আমি কাড়াকাড়ি করতে চাইছি। তবুও এক সকালে অবধূত পাইকপাড়ার বাড়িতে হঠাৎ হাজির হলেন—খুব অবাক হয়ে গেলাম। সে-ই প্রথম তিনি পায়ের ধুলো দিলেন। তখতে-তাউসে বসে অনেক গল্প। নিজে থেকেই বললেন—'এ বেলা এখানেই...'। আমার প্রস্তাব করলেন 'আমি চাই আমার একখানা বই আমার স্যোরী ভাই প্রকাশ করবেন।' মনে মনে কে না খুশি হবে।

তখন অবধূতের বাজার তুঙ্গে। কিন্তু আমার পক্ষে তখনই রাজি হওয়া সম্ভব নয়। জিজ্ঞাসা করলাম,—'গজেনদাদের জিজ্ঞাসা করেছেন?' উনিও মুখের ওপর কথা ছুঁড়ে মারলেন—'কেন? আমি কি কারও কেনা? জিজ্ঞেস করার কি আছে? আমার বই আমি যাকে খুশি তাকে দেবো। তাছাড়া ওঁদের তো পরপর চারখানা বই কথা মত দেওয়া হয়ে গেছে।' আমার কথা থাক, আপনি প্রকাশ করতে রাজি আছেন কিনা সেটা ভেবে বলুন।'

'আমার রাজি না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু গজেনদাদের না জানিয়ে কিছু করা উচিত হবে কিনা তা-ই ভাবছিলাম।

অবধূত বললেন—'ঠিক আছে, আপনি তৈরি হোন, ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা এখন কওয়ার দরকার নেই, যা বলবার আমিই বলব।' টাকা-পয়সা? সে ত বই বিক্রির পর। এখন একশ টাকা চাই।'

একেবারে সাফ কথা। তাঁর বই প্রকাশের ঝামেলা ছিল বিস্তর। বিশেষ তিথিতে প্রেসে যাবে পাণ্ডুলিপি। এবং বিশেষ তিথিতে ভোরবেলায় কালীঘাটে পুজো দেওয়া হবে। উনি বোধহয় ব্রাহ্ম মুহূর্তেই চুঁচড়ো থেকে ভাড়া তাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। কেন না সকালেই ঘুম

ভাঙালেম। গাড়িতে তুললেম এবং মায়ের মন্দিরে টেনে নিয়ে গেলেন বই সমেত।

যেদিন বই বাজারে বেরুবার কথা সে-দিন বই-এর সব দোকান বন্ধ। অবধূত হো হো হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিতে পারতেন। সেই অট্টহাসি হেসে বলেছিলেন—'অব-ধূতের বই যেদিন বেরুবে সেদিন দোকান খোলা থাকার দরকার নেই আপনার দোকান খোলা রাখবেন তাহলেই চলবে।' হয়েছিলও তাই। দোকানপাট বন্ধ তৎসত্ত্বেও দুশো বই বিক্রি হয়ে গেল বন্টা দেড়েকের মধ্যে।

বিশেষ তিথিতেই 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' প্রকাশের স্বত্ব বাবদে একশ টাকা আগাম নিয়ে তিনি রসিদ লিখে দিলেন। কিন্তু অল্প কয়েক দিন যেতে না যেতে মত পরি-বর্তন করলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে ও বই লিখে নামানো যাবে না। চুক্তিপত্র হল 'শুভায়ু ভবতু'র এবং মিত্রালয় থেকে অব-ধূতের ওইটিই প্রথম প্রকাশিত বই। এর পর অবশ্য 'দুরি বৌদি' ছেপেছিলাম। একদিন চাঁচড়োতে দুজনে গঙ্গা স্নান করছি সেই অবস্থায় তিনি 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। কেন, তা জিজ্ঞাসা করিনি। আমি তাঁর অনুরোধে সম্মত হয়ে-ছিলাম বলেই দীর্ঘকাল পরে সেই কাগজটি ছিঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলাম।

'কলিতীর্থ কালীঘাট' বইখানিও আমার ইচ্ছাতেই ত্রিবেণী প্রকাশন থেকে বেরিয়ে-ছিল। বইটির সম্ভাব্য প্রকাশক ছিলেন ত্রিবেণী। কোনো কারণে অবধূত ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশকদের চিঠি দিয়ে জানালেন, অবিলম্বে পাণ্ডুলিপি মিত্রালয়ে জমা দিবে দেবেন। এই বই প্রকাশের চেষ্টা করলে আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে—উভয়ের মঙ্গলার্থে দেখা করার চেষ্টা করবেন না এক বছরের মধ্যে ইত্যাদি। যথারীতি ত্রিবেণীর প্রতিনিধি ছিলেন আমাদেরই এক বন্ধুর হাতে অব-ধূতের চিঠিখানি পাঠিয়ে দিলেন কানাইলাল সরকার মশাই। প্রশ্ন—এখন কি করা?

ওদিকে একই সময়ে চাঁচড়ো থেকে অবধূত-পুত্র অমল পিতার চিঠি নিয়ে হাজির। অবধূত লিখছেন, মিত্রালয় থেকে কলিতীর্থ কালীঘাট প্রকাশিত হবে। আপনার কাছে ত্রিবেণী পাণ্ডুলিপি দিয়ে যাবে। আপনার কাছে তা রেখে দেবেন। প্রস্তুত হোন। রবিবার সকালে চলে আসুন, সামনাসামনি সব কথাবার্তা ও ধাওয়াদাওয়া হবে।'

দুই পক্ষই হাজির। আমি প্রথম পক্ষকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললাম—কানাইদাকে গিয়ে বলুন, এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মাথা ঠাণ্ডা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অমলকে বললাম—'দাদার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওঁকে গিয়ে বলো, এ বই মিত্রালয় কেন ত্রিবেণী ছাড়া অন্য প্রকাশককে ছাপতে দিলে প্রকাশক জাতকে তিনি অপ-মানিত করবেন। আমি রবিবার যাবো। সামনা-সামনি সব কথা বলব।'

অবধূত আর ভৈরবী আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। ভৈরবীর কাছেই আমি খয়ের-ছাড়া পান খাওয়া শিখি।

মানুষ হিসেবে বলিষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত পুরুষ বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তা-ই। নিজে জ্যোতিষ চর্চা করতেন এবং ভদ্রমন্ত্রের প্রতি আন্তরিক নৈষ্ঠিকতা ছিল তাঁর। সে অন্য রাজ্য, আমার আলোচনার অধিকারের বাইরে। কিন্তু একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। মিত্রালয়ের দোকান সেদিন খোলা ছিল, দুরি বৌদি বেরুবে, সেদিনও বই-এর দোকান সব বন্ধ। মিত্রালয়ের সামনে অবধূত বসে। আর তিনি থাকতে থাকতেই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং তাঁদের সঙ্গে পরিচিত এক ভদ্রলোক হাজির হলেন। ইনি বণিক মুখোপাধ্যায়। এঁর গণনা নাকি অভ্রান্ত। অবধূতের পীড়াপীড়িতে তিনি অবধূতের ঠিকুজিকোষ্ঠী দেখলেন কিন্তু ফলাফল বলতে আপত্তি করলেন। দুজনে খুব বাগ-যুদ্ধ চলল। রণজিৎ বাবুর এক কথা—আপনি নিজেই ত সব জেনে বসে আছেন তবে আমার মুখ থেকে কেন অপ্রিয় সত্য শোনার এত আগ্রহ? অবধূতকে যখন কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না তখন রণজিৎবাবু বললেন — আপনাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এত প্রসাব-প্রতিপত্তি সব ঘুচে যাবে। আর ছেলের যদি মৃত্যু না হয় তাহলে সে দূরে সরে যাবে।

রণজিৎবাবুর এসব কথায় উপস্থিত সকলেই গম্ভীর ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু অবধূত হাসি মুখেই এই কঠিন কথাগুলি হজম করলেন। তারপর কণিকাকে গাইতে অনুরোধ করলেও তাঁর কণ্ঠস্বর অকম্প্র ছিল কিন্তু কণিকা গাইতে পারেন নি, মানসিক অবস্থা তাঁর এমন বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

লেখার কথা বলব না। তিনি আপন সৃষ্টি সম্পর্কে যে উক্তি করতেন তার কিছু নমুনা বরং দিই। যদি কেউ তাঁকে সাহিত্যিক অ্যাখ্যা দিত তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতেন—না আমি সাহিত্যিক নই, লেখকমাত্র। লিখি তাই লেখক। বই ত কম বিক্রি হলে চলবে না। বাটার, ফেনাকসের জুতো বিক্রির সমান বিক্রি চাই। জুতো ত পরে মানুষে আর বই পড়ে। যারা জুতো পরে অন্তত তারা সবাই বই পড়বে। যদি তা না হয় তবে সে বই লিখে কি হবে?

যখন দুহাতে বোজগার করতেন তখন সবাইকে তার ভাগ দিয়ে শূন্য হাতে আনন্দ করতেও তাঁকে দেখেছি। হঠাৎ কোন সকালে সেই ভাঙা-করা মোটর কার থামিয়ে গলা বাড়িয়ে হাঁক দিলেন—আরে জলদি করো। আমার সময় নেই। এক জোড়া ইলিশ পড়ল আমাদের উঠোনে। ব্যস তখনি যাবেন। চা? সময় নেই। এখন এগুলোর গতি করতে হবে। গাড়িতে কত যে ইলিশ কে জানে। বিলোতে বিলোতে ঢাকুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। এমনি আরও কত। তিনি যেন রাজসূয় ব্যাপারে কারবারী, ছোট মাপের কোন কিছুতেই তাঁর মেজাজ শরিফ নয়।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য,
১৩ পাইকপাড়া রো,
কলকাতা-৩৭

ওরা ও আমরা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা দূরদর্শনে বিশ্ব কাপে দুটি খেলা দেখেছি। আর প্রায় রোজই দেখি কলকাতা ময়দানের তা-বড় সব দলগুলোর খেলা। বিশ্বের সামনের সারির খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের নামী দামী খেলোয়াড়দের কতো তফাৎ। খেলার কথায় বলছি না। কারণ খেলার দিক দিয়ে ওঁদের ধারে কাছে পৌঁছতে আমাদের কয়েক দশক লেগে যাবে। তাও বোধহয় ঠিক নয়। খেলার কায়দা-কানুন, আধুনিক ফুটবলের কলা-কৌশল প্রয়োগ-প্রকরণে দক্ষতা, অফুরন্ত দম এবং তাৎক্ষণিক তৎপরতায় ভয়ংকর হয়ে ওঠা ঐ সব খেলোয়াড়দের ধারে কাছেও আমরা বোধহয় কোনদিন পৌঁছতে পারবো না। তার পেছনে অবশ্যই নানা কারণ আছে।

কিন্তু মানসিকতার দিক দিয়ে আমরা তো ওঁদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারি? তার জন্যে তো বাড়তি কোন মেহনতের দরকার হয় না। বিশ্ব কাপের খেলা দুটিতে দেখেছি চারটি দলের খেলোয়াড়দের প্রাণপণ সংগ্রাম। বিশেষ করে ফাইনালে আর্জেন্টিনা ও হল্যান্ডের খেলোয়াড়রা বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করার জন্যে সত্যিকারের লড়াইয়েই যেন মেতেছিলেন। দু দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেই দেখা গেলো মারদাঙ্গা মেজাজ। সেই চড়া মেজাজের খেসারত দিতে আর্জেন্টিনার ওডিলেডকে মাঠ ছেড়ে যেতে হলো। লুকে মার খেয়েছেন। অধিনায়ক পাবলো আঘাতের যন্ত্রণায় মাঠে ছটফট করেছেন। অন্যদিকে হল্যান্ডের, কুলের লেগেছে, লেগেছে উইলি ফরকফের, চোট লেগেছে আরো অনেকের। একেবারেই আঘাত লাগে নি দু দলের মধ্যে এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা খুবই কম ছিলো।

কারণ দু দলের খেলোয়াড়রাই যেমন চোরা গোপ্তা হাত-পা চালিয়েছেন, তেমনি প্রকাশ্যেও আঘাত হানতে ছাড়েন নি। এমন অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছিলো যখন রেফারি সহজেই বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে পারতেন। তিনি তা দেন নি। আসলে তিনি সেদিন অত্যন্ত হাল্কা মেজাজে খেলিয়েছেন। আর একটু শক্ত হাতে খেলার হাল ধরলে খেলোয়াড়দের ঐভাবে অহেতুক মারামারি করতে হতো না।

ফাইনাল খেলায় দু দলের খেলোয়াড়রা আহত হয়েছেন—যাঁরা পেরেছেন চটপট উঠে পড়েছেন, যাঁরা তা পারেন নি তাঁরা উঠেছেন প্রাথমিক শুশ্রূষার পর। আর্জেন্টিনা খেলছিলো স্বদেশের মাঠে। খেলোয়াড়রা জানতেন তাঁদের পেছনে আছে আশি হাজার দর্শকের সমর্থন। কিন্তু তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও সে কথা মনে আনেন নি। দর্শকদের দিকে ভ্রূভঙ্গি করে তাঁদের মেজাজ চড়িয়ে দিতে চান নি। কেনই বা দেবেন? সবই তো খেলার মধ্যে। বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে বাধা দিতে বলপ্রয়োগ হবেই। এ কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

এইখানেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের তফাৎ। আমাদের তা-বড় খেলোয়াড়রা কোন সময়ই ভুলতে পারেন না যে তাঁদের পেছনে আছে হাজার হাজার দর্শক। তাই আঘাত পেলেই—তা সে ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃতই হোক, তাঁরা অঙ্গভঙ্গি করে গ্যালারির দর্শকদের তাতিয়ে দিতে চান। তাঁদের সেই দৃষ্টি আকর্ষণে সাড়া দিয়ে গ্যালারি তখন তপ্ত কড়ার মত টগবগ করে ফুটতে থাকে। দর্শকদের মেজাজের লাগাম ঢিলে হয়ে যায়। খুলে যায় মুখের আগল। অভিধান বর্জিত কথার ফুলঝুরিতে লজ্জায় মাথা কাটা যায় ভদ্র-সংযত, সুস্থ চিত্তের দর্শকদের। এখানেই শেষ নয়—সেই গালাগাল ধাওয়া-বিবরণীর সঙ্গে ইথার তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে। বিভিন্ন বক্তব্যের ভাষা হয়তো আমরা জানি নে। কিন্তু গালাগালের ভাষা সর্বজন বোধ্য। সেই অশ্লীল শব্দগুলো ভারতের দিকে দিকে কলকাতা ময়দানের সুনাম নিশ্চয়ই ছড়ায় না। শুধু তাই নয়, বাড়িতে মেয়েরা, (খেলার মাঠেও মেয়েরা যান, তাঁদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম) ছোটরা বেডিওর পাশে বসে থাকেন—তাঁদের কানে যখন ঐ অশ্লীল শব্দগুলো ঢোকে তখন কি বাংলার তরুণ ও যুবকদের লজ্জায় মাথা কাটা যায় না?

ব্যাপারটা খেলোয়াড়দের কাছেও দারুণ দুঃখের। আমি একজন খেলোয়াড়ের কথা বলছি—নাম বলবো না, তার মা ছেলের খেলা দেখতে চান। খেলার মাঠে ছেলের এতো নাম। কাগজে কাগজে নাম বেরোয়, ছবি ছাপা হয় অথচ মা হয়ে তিনি কোনদিন ছেলের খেলা দেখেন নি। তাই ছেলেকে রোজই বলেন মাঠে নিয়ে যাবার জন্যে। শুনে ছেলে যেন আঁতকে ওঠে। আঁতকে ওঠারই কথা। মা যদি মাঠে গিয়ে ঐ গালাগাল শোনেন তাহলে আর দেখতে হবে না। খেলোয়াড়দের বাবা-মা তুলে গালাগাল রোজই হজম করতে হয়। আর সেই ভয়েই খেলোয়াড়রা বাবা-মা, ভাই-বোনদের কোনদিন মাঠে নিয়ে যেতে চান না।

একজন নামকরা খেলোয়াড়ের বাবা চুপি চুপি একদিন মাঠে গিয়ে দীর্ঘ সময় লাইন দিয়ে টিকিট কেটে মাঠে ঢুকেছিলেন ছেলের খেলা দেখবেন বলে। দুঃখের বিষয় ছেলেটি সেদিন ভালো খেলতে পারছিলো না। ফলে গ্যালারির হাজার হাজার কণ্ঠ তার বাবা-মা ছেড়ে চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করছিলো। ভদ্রলোক সেদিন কানে আঙুল দিয়ে, মাথা নীচু করে কোনরকমে মাঠ থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিলেন। আর কোনদিন তিনি কলকাতা ময়দানের আশে-পাশেও ঘেঁষেন নি। এ যে কতো বড় দুঃখের কথা, এ যে কতো বড় লজ্জার কথা তা বলে বোঝানো যাবে না।

খেলার মাঠে দর্শকদেরও যে একটা ভূমিকা আছে। আলাদা দায়িত্ব আছে—একথাটা কিছুতেই যেন আমাদের মনে থাকে না। আমরা, দর্শকরা, মাঝে মাঝে এমন আচরণ করি যা ভালো ফুটবলের পথে মস্তো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। খেলোয়াড়রা যদি নিশ্চিন্ত মনে, খুশী মেজাজে খেলতে না পারেন তাহলে তাঁরা খেলবেন কি করে, কিন্তু একথাটা কেউই মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। ফলে খেলার মাঠ আনন্দের জায়গার বদলে হয়ে দাঁড়ায় আমাদের এক মস্তো লজ্জা। ভদ্রতার মুখোস খুলে সেখানে বেরিয়ে আসে আমাদের আসল রূপটি। কিন্তু বিদেশের দর্শকরা তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা জানেন এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে ভালো খেলার পেছনে তাঁদের বড় ভূমিকা আছে, নৈতিক দায়িত্ব আছে।

আমাদের দেশের সঙ্গে বিদেশের দর্শকদের পার্থক্য এইখানেই। ও দেশের খেলোয়াড়রা অঙ্গভঙ্গি করে স্টেডিয়ামের দর্শকদের তাতান না। বিশ্ব কাপের ফাইনালে তার প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া গেছে। তবে কি বিদেশের দর্শকরা চড়া মেজাজের পরিচয় দেন না কখনো? নিশ্চয়ই দেন। রাগে অন্ধ হয়ে গুলিও করে বসেন। খেলা নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। তাতে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে।

বিশ্ব কাপের খেলার আয়োজন ছিলো সুন্দর। মাঠের ধারে কাউকে বসতে দেওয়া হয় নি। প্রশিক্ষকরা ছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায়। বদলি খেলোয়াড়ের কানে কানে তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন। মাঠের ধারে বসে হাত-পা নেড়ে, কখনো কপাল চাপড়ে তাঁরা আমাদের দেশের প্রশিক্ষকদের মতো সার্কাসের ক্লাউন বানিয়ে তোলেন নি। দু দলের দুই প্রশিক্ষক—আর্জেন্টিনার মিনোটি ও হল্যান্ডের হ্যাপেল বসেছিলেন আলাদা আলাদা জায়গায়। স্ট্যাণ্ডের নীচে। আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রাও ছিলেন নির্দিষ্ট জায়গায়। ফলে মাঠের ধারে ভিড় বাড়াতে কেউই ছিলেন না। বল যখন পর্যন্ত আড়ালে আড়ালে ছিলো। এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে করা তো মোটেই কঠিন কিছু নয়। আই-এফ-এ স্বকীয় হলেই তা হতে পারে। তাহলে খেলার মাঠ অন্তত কিছুটা শান্ত থাকবে। কারণ অনেক সময়ই প্রশিক্ষকদের চেঁচামেচি এবং অঙ্গভঙ্গির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে গ্যালারির দর্শকদের মধ্যে। তারাও হঠাৎই হারিয়ে বসেন মেজাজের লাগামটি। খেলার মাঠ তখন ধীরে ধীরে রণক্ষেত্রের রূপ নেবার পথে এগিয়ে যায়। অথচ সহজেই এই দিকটার দিকে নজর দেওয়া সম্ভব।

ট্রফি হাতে বিরল বর্গ

৬-২ ও ৬-৩ গেমে জিমি কোনর্সকে পরাজিত করেন।

সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৮ সালের উইম্বলডন টেনিস আসরে যে পাঁচটি প্রধান বিভাগের ফাইনাল খেলা হয় তার চারটিতে খেলেছিল আমেরিকা। একটি করে খেতাব জয়ী হয়েছে সুইডেন (পুরুষদের সিঙ্গলস), আমেরিকা (মেয়েদের সিঙ্গলস) এবং অস্ট্রেলিয়া (মেয়েদের ডাবলস)। দক্ষিণ আফ্রিকা পুরুষদের ডাবলস খেতাব এবং নেদারল্যাণ্ডের সহযোগিতায় মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ী হয়েছে। দুটি খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্রু ম্যাকমিলান (পুরুষদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস)। এবার নিয়ে বব হিউইট (দক্ষিণ আফ্রিকা) মোট ৬টি ডাবলস খেতাব পেলেন —৫টি পুরুষদের ডাবলস এবং একটি মিক্সড ডাবলস। তাঁর পাঁচটি পুরুষদের ডাবলস খেতাব জয়—ফ্রেড স্টোলের সঙ্গে দুটি এবং ফ্রু ম্যাকমিলানের সঙ্গে তিনটি।

খেলা

নগদ ১৯,০০০ পাউণ্ড

১৯৭৮ সালের উইম্বলেডন টেনিস আসরে সুইডেনের বাইশ বছরের বিরল বর্গ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেছেন। তিনি এবার নিয়ে পরপর তিন বছর (১৯৭৬-৭৮) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। এ এক দুর্লভ গৌরব। বর্গের ঠিক আগে এই সম্মান শেষ পেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের ফ্রেড পেরী সেই ১৯৩৬ সালে। উপর্যুপরি তিনবার (১৯৩৪-৩৬) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব দিতে। তারপর ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে এই পাঁচজন প্রখ্যাত খেলোয়াড় উপর্যুপরি দু বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়ে লক্ষ্যের দোরে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত বিফল হন—আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮) অস্ট্রেলিয়ার চারজন লুই হোড (১৯৫৬-৫৭), রড লেভার (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৮-৬৯), রড এমারসন (১৯৬৪-৬৫) এবং জন নিউকম্ব (১৯৭০-৭১)। ১৯৭৮ সালের আসরে বর্গের সিঙ্গলস খেতাব জেতার পর সেন্ট্রাল কোর্টে বর্গকে অভিনন্দন জানাতে উপস্থিত হন ১৯৩৬ সালের রেকর্ড সৃষ্টা ইংল্যাণ্ডের ফ্রেড পেরী। এ এক ঐতিহাসিক মর্মস্পর্শী মিলন লগ্ন। বিরল বর্গ তাঁর এই বাইশ বছর বয়সেই পৃথিবীর সর্বকালের সেরা টেনিস খেলোয়াড়দের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে জমা বড় আসরের ৮টি পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব—তিনটি উইম্বলেডন সিঙ্গলস, তিনটি ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস এবং দুটি ইতালীয় সিঙ্গলস।

১৯৭৮ সালের উইম্বলেডন সিঙ্গলস ফাইনাল খেলার জিতে বর্গ সেন্ট্রাল কোর্টের তৃণাচ্ছাদিত মাটিতে নতজানু হয়ে তাঁর এই বিরাট সাফল্যের জন্য ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ১৯৭৮ সালের পুরুষদের উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সুবাদে বর্গ ১৯,০০০ পাউণ্ড নগদ পুরস্কার লাভ করেছেন। এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য দুর্লভ 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়—একই বছরে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলডন এবং আমেরিকান—পৃথিবীর এই সেরা চারটি টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস খেতাব জয়। এই খেতাব খুবই দুর্লভ এই কারণে যে, এ পর্যন্ত এই 'গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ী হয়েছেন মাত্র এই চারজন টেনিস খেলোয়াড় —পুরুষ বিভাগে ১৯৩৮ সালে জেনাল্ড বাজ (আমেরিকা) এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৯ সালে রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)। অপরদিকে মহিলা বিভাগে ১৯৫৩ সালে আমেরিকার কুমারী মোরীন ক্যাথেরন কনোলী (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী নরম্যান ব্রিংকার) এবং ১৯৭০ সালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট।

উইম্বলডন সিঙ্গলস ফাইনালে বিরল বর্গের উপর্যুপরি তিনবার খেতাব জয় :

১৯৭৬ সাল : ৪ নং বাছাই বর্গ ৬-৪, ৬-২ ও ৯-৭ গেমে ৩ নং বাছাই ইলি নাস্তাসেকে পরাজিত করেন।

১৯৭৭ সাল : ২ নং বাছাই বর্গ ৩-৬, ৬-২, ৬-১, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে ১ নং বাছাই জিমি কোনর্সকে পরাজিত করেন।

১৯৭৮ সাল : ১ নং বাছাই বর্গ ৪-৬, তাঁর একটি মিক্সড ডাবলস খেতাব—১৯৭৭ সালে জি স্টিভেন্সের সঙ্গে।

এবার নিয়ে জিমি কোনর্স (আমেরিকা) পাঁচ বছরে চারবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেললেন। তাঁর আগে পাঁচ বছরে চারবার পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে শেষ খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্ব (১৯৬৭-৭১)। নিউকম্ব ৫ বছরে চারবার ফাইনালে খেলে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হন তিনবার (১৯৬৭, ১৯৭০-৭১)। অপরদিকে জিমি কোনর্স সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন মাত্র একবার (১৯৭৪ সালে)।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) ১৯৭৮ সালের উইম্বলডন টেনিস আসরে একটাও খেতাব সংগ্রহ করতে পারলেন না। ফলে ইংল্যাণ্ডের এলিজাবেথ রাথনের এবং তাঁর উইম্বলডন টেনিস আসরে সর্বাধিক খেতাব জয়ের যে যুগ্ম রেকর্ড (১৯টি খেতাব) আছে তার আর ভাঙ্গা হল না। ১৯৭৮ সালের উইম্বলডন টেনিস আসরে শ্রীমতী বিলি জিন কিং মেয়েদের সিঙ্গলস ও ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে পরাজিত হন। ফলে শ্রীমতী কিংয়ের আশা অপূর্ণ থেকে গেল।

উপর্যুপরি তিন বা তার বেশী সিঙ্গলস খেতাব জয়ের তালিকা :

পুরুষ বিভাগ

৬ বার (১৮৮১-৬) উইলিয়ম রেনশ
৪ বার (১৮৯৭-১৯০০) আর্থার ডোহার্টি
৫ বার (১৯০২-৬) এইচ ডোহার্টি
৪ বার (১৯১০-১৩)এ উইলডিং

৫ বার (১৯৩৪-৩৬) ফ্রেড পেরী
৫ বার (১৯৭৬-৭৮) বিয়ন বর্গ

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১ নং বাছাই বিয়ন বর্গ (সুইডেন) ৬-২, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে ২ নং বাছাই জিমি কোনর্সকে (আমেরিকা) পরাজিত করে পরপর তিনবার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ১ নং বাছাই বব হিউইট এবং ফ্রু ম্যাকমিলান (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬-১, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে পিটার ফ্লেমিং এবং জন ম্যাকেন্রোকে (আমেরিকা) পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : ২ নং বাছাই মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (আমেরিকা), ২-৬, ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে ১ নং বাছাই ক্রিস এভার্টকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : কেরি রিড এবং ওয়েনডি টার্নবুল (অস্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ৯-৮ ও ৬-৩ গেমে মিসা জাসোভিক (যুগোশ্লাভিয়া) এবং ভার্জিনিয়া রুজিকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : শ্রীমতী বেটি স্টোভে (নেদারল্যান্ডস) এবং ফ্রু ম্যাকমিলনস (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৬-২ ও ৬-২ গেমে শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং বব বাফেলসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

রাজা-রাণী

ফ্রেড পেরি বললেন, তুমি যদি আমার রেকর্ড ছুঁতে পারো তাহলে আমি তোমার ডিনার খাওয়াবো। কিন্তু শুধু তুমি আর আমি। আর কেউ সেখানে থাকবে না। তোমার বান্ধবীও নয়। সাংবাদিকরা তো নয়ই।

বর্নবর্গ বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। আর আমি যদি হারি তাহলে আমার এই শখের চুল কেটে ফেলবো।

ফ্রেড পেরি আর বর্নবর্গের মধ্যে কথা হচ্ছিলো এবারের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার আগে। ইংলণ্ডের ফ্রেড পেরি এককালের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৩৪, ৩৫ আর ৩৬ সালে পরপর তিনবার উইম্বলেডন টেনিসের পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হয়ে যে রেকর্ড গড়েছিলেন সেই নজির আজো কেউ ডিঙিয়ে যেতে পারেন নি।

এবারের উইম্বলেডন ফাইনাল তাই সুইডেনের বনবর্গের কাছে দারুণ এক পরীক্ষা ছিলো। ১৯৭৬ ও ৭৭ সালে উইম্বলডনের রাজাসনে বসেছিলেন বর্গই। এবার ১৯৭৮ সালের প্রতিযোগিতায় তিনি যদি জিততে পারেন তাহলে তিনি ছুঁতে পারবেন পেরির রেকর্ড। ঐ নজির ডিঙিয়ে যাবার প্রশ্ন আসবে ১৯৭৯ সালের প্রতিযোগিতায়।

উইম্বলেডন ফাইনালের আগে একালের আর সেকালের দুই সেরা টেনিস তারকার মধ্যে ঐ রাজির কথা কিন্তু চাপা থাকে নি। জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো। তারপর টিভিতে খাবারাভাষা দিতে বসে ফ্রেড পেরি দেখলেন, কতো সহজে আমেরিকার জিমি কোনর্সের মতো খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিলেন বর্ন বর্গ। সেই সঙ্গে ছুঁলেন তাঁর পরপর তিন বছর উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন করার নজির। আর জিতলেন বাজিও।

কোনর্স 'পাওয়ার টেনিস' খেলেন। তাঁর হাতের জোর দুরন্ত। বল ছোটে প্রায় দুশ কিলোমিটার গতিতে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃত তিনি। উইম্বলেডন সহ একাধিক খেতাব তিনি জিতেছেন। সেই কোনর্সকে বর্গ দাঁড়াতেই দিলেন না। হেলায় হারালেন সরাসরি ৬-২, ৬-৩, ৬-৩ সেটে।

খেলার শেষে নিজের হুড় অলঙ্করের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বর্গ বললেন, এ-যাত্রায় এবা বেঁচে গেলো।

কিন্তু পেরি আর ডিনার খাওয়াবার সময় পেলেন না। দুজনেরই দারুণ তাড়া ছিলো। পেরি বললেন, ডিনারটা সামনের বছরের জন্যে তোলা রইলো।

আমেরিকার ক্রিস এভার্ট আর চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিতা মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার দারুণ ভার। দুই বন্ধুই এবার উঠেছিলেন উইম্বলেডন টেনিসের মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে। মার্টিনা এর আগে কখনো ফাইনালে ওঠেন নি। এভার্ট কিন্তু আগেই উইম্বলেডনের রানী হয়েছিলেন। বিশ্ব জোড়া খ্যাতি তাঁর। সকলেই এক ডাকে চেনেন তাঁকে। সে তুলনায় মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা নেহাৎই নবাগতা।

কেউই যা ভাবেন নি, শেষ পর্যন্ত তাই হলো। দুই বান্ধবীর খেলা একেবারেই জমলো না। অভিজ্ঞা এভার্ট দাঁড়াতেই পারলেন না নাভ্রাতিলোভার সামনে। হেরে গেলেন।

জেতার পর মার্টিনা বললেন, আমি ভাবতাম জেতার কথা। স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতাম, ব্যাপারটা কেমন হবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ব্যাপারটাই যখন ঘটে গেলো তখন মনে হলো—ভাষায় এখনকার মনোভাব ব্যক্ত করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ইভার্ট বললেন, জেতার ইচ্ছে এখনো পুরোপুরি আছে। চেষ্টা চালিয়েও যাবো। কিন্তু ব্যাপারটা আগে যতোটা সহজ ছিলো এখন আর ততোটা নয়। এখন লড়াই আরো তীক্ষ্ণ, আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দ কিন্তু মার্টিনা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন নি। তাঁর মন তখন চলে গিয়েছিলো অনেক দূরে—যেখানে আছেন তাঁর বাবা-মা, আছে ছোট বোন। ওঁদের নিজের কাছে আনার জন্যে সেই কবে থেকে মার্টিনা চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁদের চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে আনতে পারছেন না। মার্টিনা এখনো আমেরিকার নাগরিকত্ব পান নি। তবু তিনি চাইছেন, তাঁর বাবা-মা ও ছোট বোনকে তাঁর কাছে এনে দেবার জন্যে আমেরিকা চেষ্টা করুক। মার্টিনার হাতে উইম্বলেডনের পুরস্কার তুলে দেবার সময় কেন্টের ডাচেস তাঁর বাবা মাকে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে আনার জন্যে চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা যে খুব সহজ হবে না তা কয়েকটা ঘটনা থেকেই বোঝা গেছে। চেক টি-ভি থেকে উইম্বলেডন ফাইনালে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা ও ক্রিস ইভার্টের খেলাটি দেখানো হয় নি। অথচ অন্য খেলাগুলি দেখানো হয়েছে। মার্টিনার বাবা-মা জার্মান সীমান্তের কাছাকাছি শহরে বসে জার্মান টি-ভি থেকে মেয়ের খেলা দেখেছেন। শুধু তাই নয়, চেকোশ্লোভাকিয়ার কাগজগুলি মার্টিনার জেতার খবরও ভালোভাবে প্রকাশ করে নি। মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যেই উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ফাইনাল খেলার রিপোর্ট শেষ করেছে। কিন্তু অন্য খেলাগুলির খবর ফলাও করে প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয় মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার নামটাও তারা পুরো ছাপেনি।

তার মানে মার্টিনার ব্যাপারে চেক সরকার বেশ কঠোর মনোভাবই গ্রহণ করেছেন। মার্টিনা কিন্তু বলেছেন যে তিনি মনে প্রাণে চেকই আছেন। ঠিক যেমনটি ছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত আর এক খেলোয়াড়?

তিনি ১৯৫৭ সালে উইম্বলেডন টেনিসের পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনিও চিরকাল মনে প্রাণে চেকই রয়ে গিয়েছিলেন।

সে যাই হোক মার্টিনা ভবিষ্যতের মস্ত খেলোয়াড় হিসেবে নিজের সম্ভাবনা ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠা করেছেন উইম্বলেডনের কোর্টে। এবছর তাঁর সাফল্যের খতিয়ানটাও দারুণ। মোট ৬২টি খেলায় অংশ নিয়ে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা জিতেছেন ৫৯টিতে। এই হিসেবেই তো তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি।

মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা চাইছেন বিশ্বের সেরা মহিলা খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করতে আর বর্ণ বর্গের লক্ষ্য গ্র্যান্ড স্লাম। ফরাসী মুক্ত টেনিস, উইম্বলেডন, আমেরিকার মুক্ত টেনিস ও অস্ট্রেলিয়ার মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতায় জিতলেই গ্র্যান্ড স্লাম লাভ করা যায়। বর্ণ আগেই ফরাসী টেনিসে জিতেছেন, আর এবার চ্যাম্পিয়ন হলেন উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায়। বাকি রইলো আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতা। ঐ দুটিতে জিতলেই বর্ণের লক্ষ্য পূর্ণ হবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত তা হয় কিনা .. !

প্রসূন ব্যানার্জী

অনেকদিন আগের কথা। রোম অলিম্পিকে খেলতে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবল দল। কলকাতার খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন পি কে ব্যানার্জিও। সেদিন বিমান-বন্দরে সকলের সঙ্গে দাদাকে সি-অফ করতে এসেছিল ছোট ভাই গোপালও।

দাদা মস্ত খেলোয়াড়। ভারতজোড়া নাম। তাতে কি হবে, গোপালের ফুটবল খেলতে একদম ভালো লাগে না। তার চেয়ে রামায়ণ, মহাভারত, রামকৃষ্ণদেবের ওপর লেখা বই পড়তে ওর অনেক ভালো লাগে। কথামৃত পেলে তো আর ও কিচ্ছু চায় না।

সেদিন দাদাকে প্লেনে উঠতে দেখে গোপালের মনের মধ্যে বিপর্যয় ঘটে গেল। ইচ্ছে হল ও-ও ফুটবল খেলবে। দাদার মত নাম করবে। দেশ-বিদেশে খেলে বেড়াবে। মুখে কিছু বলল না। চুপচাপ বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়ি এসে খুঁজে-পেতে দাদার একটা ছেঁড়া বুট জোগাড় করল সে। তারপর সেই বুট পরে বাড়ির পাশে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের মাঠে নেমে পড়ল [illegible]

প্রসূনের আজ ভারতজোড়া নাম। ভারতীয় দল গড়তে হলে প্রসূনকে বাদ দেবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। ভারতের সামনের সারির লিংকম্যান বলতে যে দু-চারজন খেলোয়াড় আছেন—প্রসূন তাঁদের অন্যতম।

ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মত প্রসূনের কতকগুলো সংস্কার আছে। খেলার দিন সে একটি বিশেষ রাস্তা দিয়ে মাঠে যাবে। খেলার আগে একটা বিশেষ বেঞ্চির ওপর সে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেবে। কথা-টথা বিশেষ বলবে না। কিন্তু খেলতে নামলে

প্রসূন একটু সেন্টিমেন্টাল ছেলে। একটু ইমোশনালও বটে। ভালো খেলতে না পারলে মনে মনে বড় কষ্ট পায় সে। আর জিততে না পারলে ও এতো দুঃখ পায় যে তা বলার কথা নয়। সেবার ইস্ট-বেঙ্গল যখন গুণে গুণে মোহনবাগানকে পাঁচ গোলে হারাল, সেদিন প্রসূন বাড়ি ফেরেনি। গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চির ওপর সারারাত শুয়েছিল। বাড়ির সকলে তো ভাবনা-চিন্তায় অস্থির। চারদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেছে। পুলিশে খবর দেবার কথা যখন সকলে ভাবছেন, তখনই ভোর-বেলায় বাড়ি ফিরে এল সে। সারারাত একটা ফোঁটা ঘুমোয়নি। গঙ্গার ধারে বেঞ্চির ওপর শুয়ে শুয়ে শুধু ছটফট করেছে। দুঃখে, কষ্টে অস্থির হয়ে উঠেছে।

সেই প্রসূন ব্যানার্জি এবার মোহন-বাগানের অধিনায়ক। তার নেতৃত্বে মোহনবাগান ইতিমধ্যেই ঘরে তুলেছে নাগজী ট্রফি। ফেডারেশন কাপে যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছে। এখন লক্ষ্য লীগ ও শীল্ড। তারপর রোভার্স, ডুরান্ড এবং আরো অনেক ট্রফি.....!

প্রতিযোগিতা

[illegible] উইম্বলেডনের [illegible]

বেশ্‌ট্‌ঃ ৮০

পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবার পর একজন বিদেশী নাট্যকার আমাদের হৃদয়মন হরণ করে দীর্ঘকাল বসেছিলেন এবং এখনও আছেন। সেই নাট্যকারের নাম শেক্‌স্‌পীয়র। নিজের গুণেই তিনি আর দশটা দেশকে জয় করেছিলেন, বাংলাকেও জয় করেছিলেন। কিন্তু বাংলা তথা ভারত জয়ের ব্যাপারে অন্য বিদেশীদের তুলনায় বাড়তি একটা সুবিধে ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন রাজার জাতের নাট্যকার, রাজার ভাষা ইংরেজীতে নাটক লিখেছেন। সে-রাজভাষা স্কুল-কলেজে সব বাঙ্গালীকে তখন ডাবডাঁষকে পড়তে হোতো। আর সেই পাঠ্যসূচীতে শেক্‌স্‌পীয়র ছিলেন অবশ্য পাঠ্য। সাধারণ শিক্ষিত লোকের কাছে পৌঁছাতে তাঁর কোনো অসুবিধেই হয় নি।

স্কুল-কলেজের দেওয়াল ভেঙ্গে ক্রমে শেক্‌স্‌পীয়র আমাদের মঞ্চকেও বিশেষভাবে অধিকার করেছিলেন। কোনো কোনো সময় প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি স্বনামে তাঁর মঞ্চাবির্ভাব, বেশির ভাগ সময়ই অবশ্য বেনামীতে নানা ছদ্মবেশে তাঁর রঙ্গমঞ্চ-অধিকার।

শেক্‌স্‌পীয়রের পরে আর কোনো বিদেশী নাট্যকারই বাংলা মঞ্চকে এতটা অধিকার করতে পারেন নি। কিন্তু খুব সম্প্রতি একজন বিদেশী নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়রকে সিংহাসন-চ্যুত করেছেন বলব না, কিন্তু তাঁর পরেই হয়তো দ্বিতীয় স্থানটি ধীরে ধীরে দখল করছেন, এই বিদেশী নাট্যকারের নাম বেরটোল্‌ট্‌ ব্রেশ্‌ট্‌। আশি বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন জার্মানিতে।

এই দ্বিতীয় স্থানও তিনি অধিকার করেছেন দ্রুত। অন্যদিকে ব্রেশ্‌টের রঙ্গমঞ্চ জয় করা শেক্‌স্‌পীয়রের তুলনায় অনেক শক্ত ছিল, কারণ তিনি নাটক লিখেছেন জার্মান ভাষায়, ইংরেজীতে নয়। তিনি স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত লেখক নন। তা সত্ত্বেও সম্প্রতিকালের বাংলা নাট্যজগতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উপস্থিত বিদেশী নাটকার তিনি। আলোচিত, বিতর্কিত, অনূদিত, অভিনীত, এক কথায় বাংলা মঞ্চে তিনি জীবন্ত ব্যক্তিত্ব।

শুধু বাংলা মঞ্চেই নয়, সম্প্রতি কালের বিশ্ব-মঞ্চেই ব্রেশ্‌ট্‌ অত্যন্ত বিশিষ্ট একটি নাম। তাঁর প্রভাব ব্যাপক। প্রভাব প্রধানত দুটি দিকে কার্যকরী ঃ (১) তাঁর নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রভাব; (২) তাঁর নাট্যপ্রয়োগরীতির প্রভাব।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া তাঁর নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্যকে গুরুত্ব বেশি দিয়েছে। আর ধনতান্ত্রিক দুনিয়া যেন বেশি দৃষ্টি দিয়েছে তাঁর নাট্যকৌশলের দিকে। আমাদের বাংলা ধনতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু নাট্যদলগুলি অধিকাংশই সাম্যবাদে বিশ্বাসী। এখানে ব্রেশ্‌ট্‌কে নানা লোকে নানাভাবে নিচ্ছে।

বাংলা নাট্যজগতে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব—নাটকের ফর্ম এবং চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে, ট্র্যাজেডি-চিন্তায় ও নাট্য-পরিস্থিতির উপস্থাপনে। কিন্তু প্রয়োগ-রীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব নেই। এই ক্ষেত্রটিতে ব্রেশ্‌টের বিশেষ প্রভাব আছে।

তাছাড়া, সাম্প্রতিক বাংলা মঞ্চের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের যোগ খুবই সামান্য। ঐতিহ্যগত এক শক্তি হিসেবে তিনি আমাদের নাট্যজগতের মধ্যে একভাবে অবশ্যই মিশে আছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক রঙ্গমঞ্চে ব্রেশ্‌টের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। গত পনের-বিশ বছর ধরে ব্রেশ্‌টের নাটক ও কবিতার অনুবাদ-অনুসরণ, ব্রেশ্‌ট্‌ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন, ব্রেশ্‌টের নামে লাইব্রেরী ও সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, ব্রেশ্‌ট্‌-নাটক প্রযোজনা, ব্রেশ্‌ট্‌কে নিয়ে বিতর্ক ও বিবাদ, ব্রেশ্‌ট্‌-নাটক প্রযোজনা, ব্রেশ্‌টকে নিয়ে বিতর্ক ও বিবাদ, ব্রেশ্‌ট্‌-সঙ্গীত পরিবেশন, রেকর্ড প্রচার, একই সঙ্গে ব্রেশ্‌ট্‌-নাটকের একাধিক প্রযোজনা, পত্রিকার ব্রেশ্‌ট্‌ সংখ্যা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ—এসব যত হয়েছে অন্য কোনো নাট্যকার বা প্রযোজককে নিয়ে তার সিকিও হয় নি।

ব্রেশ্‌টের আশি বছর পূর্তি হচ্ছে এই বছরে—১৯৭৮-এ। ব্রেশ্‌ট্‌ সম্পর্কে ইদানীং প্রতি বছরই কর্মতৎপরতা থাকে, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আশি বছর পূর্তির বিশেষ কর্মোদ্যোগ। সব মিলিয়ে কর্মকাণ্ড নেহাৎ ছোট হচ্ছে না। এর মধ্যেই যা হয়ে গেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

ইন্দো—জি ডি আর ইন্সটিটিউট ফোরাম ব্রেশ্‌টের 'মা' নাটকটি (গোর্কির উপন্যাসের নাট্যরূপ) দু'বার অভিনয় করলেন—ডিসেম্বরে ('৭৭) বেকার লেবরেটরি হলে এবং ১৭ এপ্রিল গোর্কি সদনে।

কলেজ স্ট্রিটে ইন্দো-জি ডি আর হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি একটি সভা ও ব্রেশ্‌ট্‌-কবিতা পাঠের আসর হয়। সভাপতিত্ব ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিভিন্ন কবি তাঁদের অনূদিত কবিতা পাঠ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ ব্যাপারে কিছুটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন। সরকারের তথ্য ও জন-সংযোগ দপ্তর (ইন্দো-জি-ডি-আর ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি ও ব্রেশ্‌ট্‌ সোসাইটির সহযোগিতায়) একটি ব্রেশ্‌ট্‌-আলোচনাসভা করেন শিশিরমঞ্চে, এবং আলোচনান্তে ব্রেশ্‌টের 'মাদার কুরেজ এ্যান্ড হার চিলড্রেন' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ব্রেশ্‌ট্‌ প্রদর্শনী ও ব্রেশ্‌ট্‌-নাট্যোৎসব করার কথাও ভাবছেন।

পশ্চিম জার্মানি দূতাবাসের সংস্কৃতি-কেন্দ্র ম্যাক্স মুলার ভবনও বিভিন্ন কর্ম-সূচী গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে ৩১ মার্চ ম্যাকসমুলার ভবনের লাইব্রেরীতে কয়েকজন নাট্যকর্মীকে নিয়ে ভবন কর্তৃপক্ষ বসে-ছিলেন। এখানে নাট্যকর্মী উপস্থিত ছিলেন ঃ (১) অরুণ মুখোপাধ্যায় (চেতনা), (২) অভিজিৎ দত্ত (দি ডেভিলস-এর পরিচালক), (৩) শেখর চ্যাটার্জি (থিয়েটার ইউনিট), (৪) হিমাংশু চ্যাটার্জি (নাটুয়া), (৫) বাদল সরকার, (৬) ধরণী ঘোষ (স্টেটসম্যানের সাংবাদিক)।

এই সভা থেকে এঁরা একটি বিস্তৃত কর্মসূচীর খসড়া করে বিভিন্ন নাট্যদলকে পাঠিয়েছেন এবং তাদের ব্রেশ্‌ট্‌-উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন। কোনো নাট্যদল যদি কোনো প্রযোজনা করেন, তবে তাদের খরচ কত লাগবে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

'ভারত ও সমাজতান্ত্রিক বি ডি আর' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ যুগ্ম সংখ্যা ব্রেশ্‌ট্‌ সংখ্যা হিসেবে বেরিয়েছে। এতে ব্রেশ্‌টের নাটক 'সেনোরা কারারের রাইফেল' মূল জার্মান থেকে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রেশ্‌টের গল্প জীবনবন্দী এবং জীবনীপঞ্জী আছে এই সংখ্যায়। আর লেখা আছে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অশোক মিত্র, অরুন্ধতী সান্যাল প্রভৃতির। বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শাঁখ ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—এঁদের অনূদিত কবিতা আছে।

'অনুষ্টুপ' পত্রিকা তাদের বর্তমান সংখ্যায় একটি ব্রেশ্‌ট্‌ বিষয়ক ক্রোড়পত্র ছেপেছেন। এই ক্রোড়পত্রে উৎপল দত্ত ও দীপেন্দু চক্রবর্তীর 'ব্রেশ্‌ট্‌ প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর' এবং সোমেন গুহ সংকলিত দুটি তালিকা। একটিতে আছে বাংলা পত্রিকায় ব্রেশ্‌ট্‌ আলোচনার বিবরণ। দ্বিতীয়টিতে ব্রেশ্‌ট্‌-অনুবাদ বা রূপান্তরের বিবরণ। এ তালিকা দুটি পরবর্তী কালের উদ্যোগী পাঠকদের কাজে লাগবে।

এর আগেই ব্রেশ্‌ট্‌-এর কাহিনী নিয়ে যাত্রা-পালা করা হয়েছে। কিন্তু ততটা সফল হয়নি। এবার মঞ্চসফল 'তিন পয়সার পালা' যাত্রায় করছেন কলিকাতা যাত্রা সমাজ। রূপান্তর, গীত রচনা ও সুর ও নির্দেশনা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম তিনি স্বনামে যাত্রায় এলেন। এর আগে নটরাজ ছদ্মনামের আড়ালে তিনি যাত্রা পালা পরি-চালনা করেছেন।

আর সবচেয়ে বড় খবর ব্রেশ্‌টের 'ককেশিয়ান চক্‌ সার্কেল' তিনটি দল একই সঙ্গে অভিনয় করছেন। নান্দীকার (নির্দেশক মুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত) এবং শতাব্দী (নির্দে-শক বাদল সরকার) চরিত্রগুলিকে ও ঘটনা-

স্থলকে ভারতীয় করে নিয়েছেন। থিয়েটার ফ্রন্ট (নির্দেশক সুব্রত নন্দী) হুবহু অনুবাদে করছেন। নান্দীকারের মূল চরিত্রগুলি সব মুসলমান, শতাব্দীর সব চরিত্র হিন্দু। মুসলমান চরিত্রে অবিশ্যি একটা বিশেষ সুবিধে হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ সহজ হয়েছে।

এই ব্রেশট্-চর্চায় নাট্যদলগুলি উপকৃত হচ্ছে। বক্তব্য ও প্রয়োগরীতি উভয় ক্ষেত্রেই সেউপকার আছে। উপকার মৌলিক নাটকের ক্ষেত্রেও বর্তাচ্ছে। নাট্যকাররা ব্রেশটের লিখনভঙ্গীর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাচ্ছেন। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে কোন উপকার আসছে না। সেটা হচ্ছে ভাষার ক্ষেত্রে। ব্রেশট্ বড় কবি ছিলেন। কল্পনা-শক্তি ছাড়াও বিশেষ এক ধরনের আয়রনি তাঁর ভাষার প্রাণ। ভাষাশক্তিধর ব্রেশটের পরিচয় অধিকাংশ অনুবাদেই পাওয়া যায় না। বাংলার নাট্যভাষার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার একটি অবলম্বন হিসেবে ব্রেশট্কে কাজে লাগাতে পারলে ভাল হোতো। তা হয় নি। অধিকাংশ অনুবাদকই নিছক নাটকের লোক, সাহিত্যের লোক নন, কাব্যের নন। ব্রেশটের কবি-নাট্যকার পরিচয়টা ধারণ করবার চেষ্টা করা উচিত তাঁর এই আশি বছর পূর্তির বিশেষ মুহূর্তে।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

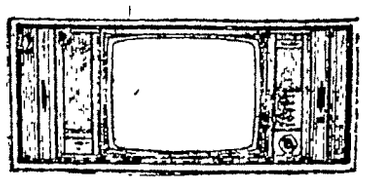

অদূরদর্শী

আমাদের শৈশবে 'রামায়ণ', 'মহাভারতে' আঁকা বিভিন্ন চরিত্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভয় বহুদিন পর্যন্ত স্মৃতি কোঠায় জমা হয়েছিল—বং তুলিতে সে সব ছবির রূপ দিয়েছিলেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, জন্ম ১৯০৩ সালে। তুলি এবং বং শিল্পীর হাতিয়ার—এরই সাফল্যে দর্শক মনে রাখেন শিল্পীকে। তাঁর আঁকা ছবির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ছবির অনেক মিল—এ রকম মন্তব্য মনস্ক দর্শকদের কাছে আজও শোনা যায়। পুঁথিপত্রের বাণিজ্য সফল প্রচ্ছদ ও ভিতরের অঙ্গ সজ্জা—এ জিনিস কতটা চরিত্রানুগ হলে পাঠক ঐ চরিত্রটিকে নিজের মত ভাবতে পারেন—এবং শিল্পীকে মনে রাখেন—এর চরম দৃষ্টান্ত পূর্ণচন্দ্রবাবু। বিজ্ঞাপনের কাজ সেকালে যেটুকু জনপ্রিয় হয়েছিল তাতে চক্রবর্তী মহাশয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি। 'শিল্পীচক্র' নামে একটি গোষ্ঠীও তিনি তৈরী করেন সে সময়ে। একবার 'বিচিত্রা' ভবনে আয়োজিত প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল—মূলতঃ রঙ ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য ও মিল কি ধরনের হওয়া উচিত।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী আধুনিক প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার জনক। তাঁর প্রসিদ্ধ অঙ্কন শৈলীর সুনাম বিদেশে গিয়ে পৌঁছয় তাঁর ছবির খাতির সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর একখানি ছবি সসম্মানে বাকিংহাম মিউজিয়ামে ও ইংলন্ডের রাণী বুইনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আজ সযত্নে রাখা আছে। শ্রীচক্রবর্তীর সঙ্গে করুণা সাহার কথাবার্তায় আমরা এগুলো জানলাম—দূরদর্শনের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' অনুষ্ঠানে।

* * *

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় একজন পুলিশ ইন্সপেকটর। তাঁর মেয়ে নিলুদেশ। ফলে সেরকম কোন সূত্রো হাতে না থাকায় মেয়েরই সহপাঠী কয়েকজন ছেলেকে পুলিশ থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়েছে, মাঝে মধ্যে জ্ঞানেশবাবুর মেয়েকে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন যদি পাঞ্জাবী পরা অন্য এক যুবকের সঙ্গে—দর্শকরা উঁকিঝুঁকি বিস্তর দিলেন তবুও প্রেমিক যুবকের চেহারা স্পষ্ট হোল না কিছুতেই, দর্শকরা টান টান বসে রইলেন আশায় হয়তো শেষের দিকে দেখা যাবে। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেছিল। মোটামুটি বনফুলের 'নব সংস্করণ' গল্পের নাট্যরূপ দূরদর্শনের জন্য এ রকম। নাট্যরূপ জোছন দস্তিদারের। বিভিন্ন চরিত্রে দূরদর্শনের দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন। মঙ্গলবারে প্রচারিত একটি নাট্যানুষ্ঠান এটি।

* * *

ছোটদের জন্য অনুষ্ঠান চিচিং ফাঁক। বিদেশে সম্প্রতি এদেশেও একটি কথা প্রচলিত নতুন প্রতিভার সন্ধান প্রসঙ্গে 'ক্যাচ দেন ইয়ং'। ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনালো। চোখ বন্ধ করে ইন্দ্রাণীর গান শুনলে কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর গান শুনছি বলে মনে হতে পারে।

* * *

এ সপ্তাহে দূরদর্শন কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক গোলযোগ-এর জন্য কিছু কিছু অনুষ্ঠান পুরোটা শোনা যায় নি।

* * *

'দর্শকের দরবারে' অনুষ্ঠানটির পরিচালক ও উত্তরদাতা পংকজ সাহা। পংকজ, চিঠিপত্রগুলি কি আপনারা যে রকম উত্তর দেন সে রকমই পান? নিতান্তই মামুলী? কোন না কোন চিঠি তো একটু বুদ্ধিদীপ্ত হতে পারে? চিঠিগুলি উত্তর দেওয়ার আগে আরও একটু বেছে নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ১৪১তম জন্মবার্ষিকীতে—'বাবু' রূপের অপ্রচলিত সংজ্ঞা শোনা গেল শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্যের সুন্দর সাবলীল প্রবন্ধপাঠে। 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকা সম্পাদনা ও তার গুরুত্ব তখন কেমন ছিল তা বিশদভাবে আলোচনা করলেন শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম স্থান ও তাঁর জীবন সম্বন্ধে উজ্জ্বলবাবু যখন বলছিলেন—তখন তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গি দুঃখজনক।

'ভাবতবর্ষের থেটে খাওয়া মানুষ' ও 'মাতৃরূপের দর্শন' ইত্যাদি প্রবন্ধের আজও যে প্রয়োজনীয়তা খুবই—একথা বলা বাহুল্য। শোভা সেন, অমর গঙ্গোপাধ্যায় পাঠ করে শোনান অংশবিশেষ। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, আনন্দ মঠ ইত্যাদি থেকে নির্বাচিত অংশ দর্শকদের একান্ত করেছিল বঙ্কিম ভাষা ও প্রয়োগ রীতির কৌশলে।

'নবকুমার লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন—তরঙ্গবীথির অন্ধকারে অতল গভীরে তলাইয়া গেলেন'—এখানে শেষ না হয়ে অনুষ্ঠানটি আরো এক ধাপ এগোলে ক্ষতি কি ছিল? 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' অনুষ্ঠানে এটি প্রচারিত।

বুদ্ধদেব বসু 'চোর চোর' নাটকটি লিখেছিলেন বহুকাল আগে ছোট গল্পের আকারে। তার নাট্যরূপ দুর্বল। অভিনয়ে নিলীমা দাস প্রশংসা পেয়েছেন। নাট্যকার শ্যামল সেন। আসেকের আঠারো-উনিশের যুবক অত ক্যাবলাকান্ত হয় না। যদি শ্যামলবাবু রচনাকালের যুবককে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে আলাদা কথা।

'কলকাতা কলকাতা' অনুষ্ঠান কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশবিশেষে। ঐ পর্যায়ে ওস্তাদ সাফদার হুসেন ও ওস্তাদ সুনাম্বর আলী খাঁর ঠুংরী ও গজল এর অনুষ্ঠান স্বল্প পরিমাণে শোনা গেল। এ ধরনের অনুষ্ঠান সবাসরি প্রচার করলে সঙ্গীত প্রিয় মানুষরা খুশী হতেন একথা নিশ্চিত।

বড়ে গুলাম আলী খাঁর ভাগে[redacted] হুসেন সাহেব। এঁনার গানে ছিল স্বল্প-শ্রুত—ওস্তাদ করকত আলী খাঁর গায়ন শৈলীর বৈশিষ্ট্য। সঙ্গে ছিল বড়ে গুলামের কাসদার সঙ্গে সূক্ষ্ম পার্থক্য। দুই নিষাদ ও ঝিঁঝোটি অঙ্গের ব্যবহার ছিল পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধে ভরপুর।

ওস্তাদ মুনাম্বর খাঁর ঠুমরি ও তৎসং পুরোপুরি না শুনলে ভালোই লাগবে না। দূরদর্শনের দর্শকরা নিশ্চয়ই এর স্বরূপতা অনুভব করেছেন।

১১পাউন্ড, ২০ ইঞ্চি, ১৮ ক্যারেট সোনার পরীর জন্য ২৫ দিন ব্যাপি বুদ্ধদেব শেষ দুই দিনে ফুটবল পাগলরাও নিশ্চয় নিজেদের বক্তাক্ত করেছেন দূরদর্শনের সামনে। সেমি ফাইনালে ছিল ব্রাজিল ও ইটালী ও ফাইনালে আর্জেন্টিনা ও হল্যান্ড। শেষমেশ আর্জেন্টিনাতেই থেকে গেছে গেছে সোনার পরী। দূরদর্শন কুড়িয়েছে অসংখ্য প্রশংসা ও বাহবা-এ লড়াইয়ের শ্রুতিগোচরতার জন্য।

অজয় সেন

সত্যম শিবম সুন্দরম ছবিতে শশীকাপুর/জীনৎআমান

চিত্রধ্বনি

ভগবানের ফ্যাসাদ

হাঁরা আউর পাথর ছবির নামলিপিতে যদিও লেখা আছে পরিচালক শ্রীযুক্ত বিজয় ভাট। আসলে ভগবানের নায়েব। কলি-যুগে ভক্তির বাজার খুব মন্দা। দেবদ্বিজে জনসাধারণের তেমন মন নেই, তারা ট্রেড ইউনিয়ন করে। ভগবান শালগ্রাম শিলা, সুতরাং তাঁর কিছু এসে যায় না। কিন্তু বিজয়বাবু তো মানুষ, ভগবানের বিপদে তাঁর রক্ত গরম হয়ে গেছে ও তিনি কয়েক লক্ষ টাকা বাজে প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে মা মারা গেলে কান্নার কিছু নেই ভগবানের আশীর্বাদ থাকলে, লাসাময়ী প্রেমিকা মেলে। ঠাণ্ডা মাথায় এখন আমরা প্রার্থনা করি তাঁর এই ভক্তি সংগ্রহ বড় সফল হোক।

নায়ক যখন শিশু তখন মন্দিরের টাকাকে যে নয়-ছয় করে এমন এক সুদখোর মহাজনের চক্রান্তে সে মাতৃহারা হয়। আমার জানা নেই যে ছোটবেলাতেই সে শ্যাম বেনেগালকৃত অংকুর দেখেছিল কিনা, পরিচালক অবশ্য দেখাচ্ছেন দুঃখে রাগে, সে পুকুরে ঢিল ছুড়তে শুরু করল ও এইভাবে বড় হয়ে শশী কাপুর হয়ে গেল। শশী কাপুরে নাস্তিক ও ধর্মের সঙ্গে কোন রকম সংস্রব না রেখে ষাঁড়ের মত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

এরপরে শংকর অর্থাৎ শশী কাপুর ঠিক করে যে আত্মসম্মানের চাইতে চক্ষু লজ্জা বড়। বাপ-কাকার মত দর্শনার্থীদের ডুলিতে বয়ে মন্দিরে না নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার শহরে গিয়ে রোজগারের ধান্ধা করা উচিত। সে, বস্তুত ট্রেনেও চড়ে বসেছিল। তবে তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। কলির কেষ্টর কানে তখন এসে পৌঁছেছে রাধার বাঁশি। প্রেমে পড়লে পঙ্গু পর্যন্ত পর্বত লংঘন করে শংকর যে ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পুনর্মূষিক হয়ে ফিরে আসবে। এতে আর আশ্চর্য কি! রাধাটি এক্ষেত্রে শাবানা আজমি, মন্দিরের কেয়ার-টেকারের কন্যা।

আমরা একটু নড়েচড়ে বসেছিলাম নিশ্চয়ই ডুলি বওয়ার পরিশ্রমে ক্লান্ত নায়ক একটু নাচবে, নায়িকা আঁচল দিয়ে তার ঘাম মুছিয়ে দেবে, চাঁদ উঠবে আর ফুল তো ফুটবেই। সে সব অবশ্য আছে তবে লোকে যে শান্তিতে প্রেম করবে তার কি উপায় রেখেছে শয়তানের দল? সুতরাং প্রথমে বেশ্যাবাড়িতে খুন তারপর ছিঃ! ছিঃ! ঠাকুর দেবতার গয়না চুরি হল। এবং যত দোষ, উল্লেখ বাহুল্য, নন্দ ঘোষ শংকরের কাঁধে চাপল। আইনশৃংখলার সেই উদ্বেগ-জনক অবনতিতে বুদ্ধিমতী শাবানা আজমী মন্দিরে খবর না দিলে পুলিশ কতটা কি করতে পারত বলা মুস্কিল।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একক অনুষ্ঠান

মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা : শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর

সঙ্গীত পাঠ : গৌরী ঘোষ, দিলীপ ঘোষ পার্থ ঘোষ। যন্ত্রসঙ্গীত : রমেশ মিশ্র রূপেন ঘোষ; রমেশ চন্দ্র, অশোক ঠাকুর

২২শে শ্রাবণ (৮ আগস্ট) মঙ্গলবার

সন্ধ্যা ৭টা। কলামন্দির (বি)

১০ ৫ ৩ ঐ দিন হলে

অশোককুমার এখানে নামে ডাকতার, কাজে নরর্পী ভগবান, সবসময়ই মুচকি হেসে নাস্তিক বালকটিকে লীলা খেলায় উৎসাহ দিয়ে গেছেন। সুরারোপ কল্যাণজী আনন্দজীর। ছবি শেষ হওয়ার পর আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক সহসা রবীন্দ্রনাথকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করলেন— শুধু কি প্রোডিউসারের বাক্য শুনেছ দেবতা। শোন নি কি দর্শকের অন্তরের কথা।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

স্টুডিও খবর

ফ্লোরের ভেতরে বাইরে বৃষ্টি চলছে

এই মুহূর্তে 'দেবদাস' জ্বরে বেহুঁস! যন্ত্রণার শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে, চোখ বোজা তাঁর। ঠোঁট শুকনো হয়ে উঠছে, প্রায় জ্ঞান নেই।

আর চুনীলাল খাটের ওপর বসে দেবদাসের গালে হাত রাখছেন। তাপটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন। আরে বাব্বা, এ যে গা পুড়ে যাচ্ছে একবারে। বলেই পাশে দাঁড়ানো গঙ্গা নামে একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে চুনীলাল বললেন—এই গঙ্গা শিগগির ডাকতার ডেকে নিয়ে আয়তো!

শুকনো বিষণ্ণ মুখে অজানি ছুটল গঙ্গা। আর শোন, ম্যানেজারবাবুকে একবার ডেকে দিবি। —আচ্ছা বলে গঙ্গা সাঁ করে বেরিয়ে যায়।

পরিচালক দিলীপ রায় গলায় রাখা তোয়ালে দিয়ে ঘামটা মুছতে মুছতে শব্দ-যন্ত্রীর উদ্দেশে বলে উঠেন দাদা সাউণ্ড ঠিক আছ তো?

ব্যুমের মধ্য দিয়ে ঘর ঘর শব্দে উত্তর আসে 'ও-কে।'

দৃশ্যগ্রহণের আগে ফাইনাল মিনিটস হয়ে গেল। দপদপ করে নিভে গেল আলোগুলো। খালি টপ লাইটটা নিভল না।

ক্রাউন টেলিভিসান!!

A/C, D/C or Solid State

চপ্পট ছবি

আর মিষ্টি আওয়াজ

"ক্রাউনটিভি"

তাই "টিভি-সরতাজ"!

এছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ষ্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ—১৩

ফোন ঃ ২৪-৮৭৯৩

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের দূরত্ব ছবির একটি দৃশ্য

জ্বরে বেহুঁস সৌমিত্র চ্যাটার্জি হাতের সিগারেটটা প্রায় শেষ টান দিতে লাগলেন।

উত্তমবাবু চুপচাপ। ক্যামেরাম্যান গুপীদাকে শুধু বললেন—'আমার পজিশন ঠিক আছে তো!'

হ্যাঁ।

ট্রলির লাইন ধরে এগিয়ে এল ক্যামেরা। আবার জ্বলে উঠল লাইটগুলো। সবাই যে যার পজিশন নিলেন। মেক-আপের শেষ ছোঁয়া লাগানো হল সবার মুখে। সৌমিত্রবাবু সিগারেটটা ফেলে দিলেন।

দিলীপ রায় এসে দাঁড়ালেন ক্যামেরার বাঁ দিকে। কখন ক্যামেরা ট্রলি ব্যাক করবে সে নির্দেশ তিনিই দেবেন।

স্টার্ট সাউণ্ড—রানিং ক্ল্যাপস্টিকের শব্দ অ্যাকশন—আবার শুরু হল সেই দৃশ্য। এবার গুপীদার ক্যামেরার ইমালশান লাগানো আনএকসপোজড ফিল্ম ঘুরছে।

ছবি উঠছে, ফিল্ম ঘুরছে। ছবি উঠছে উঠছে....

ফ্লোরের বাইরে বেরিয়ে দেখি ছবির প্রযোজক মশাই কয়েকজন জলের ঝাঁঝরি পরখ করতে ব্যস্ত। অনেকগুলোই বাতিল হল লীক করছে বলে।

ওখানে দাঁড়াতেই আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন এখুনি বৃষ্টি হবে ফ্লোরে, তারই ব্যবস্থা করছি।

পায়ে পায়ে স্টুডিওর বাইরে যখন বেরিয়ে আসছি তখন ফ্লোরের বাইরে সারা কলকাতার ফ্লোরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বাস-ট্রাম বন্ধ।

তবুও ফ্লোরের মধ্যে নকল বৃষ্টিই দরকার, কয়েকজন ঝাঁঝরি দিয়ে প্রকৃতিকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন পরিচালক দিলীপ রায়। দেবদাস ছবির স্যুটিং চলছে।

শতরূপ রাহুমুক্ত

সত্যজিৎ রায়ের ছবি শতরূপ কে খিলাড়ির মুক্তি নিয়ে কি কাণ্ডটাই না ঘটেছে। অথচ সবাই নীরব। দর্শকরা শুধু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন কবে দাব খেলোয়াড়দের দেখবেন তাঁরা।

মে মাসে দিল্লি আর লক্ষ্ণৌয়ে ছবিটি রিলিজ হয়েওছিল। ছবির ব্যবসায়িক রিপোর্ট তেমন আশাপ্রদ নয় বটে, কিন্তু দর্শকরা ছবি বুঝতে পারেন নি—এ অভিযোগ শোনা যায়নি। চোস্ত উর্দু সংলাপ হিন্দীভাষীদের পক্ষে বোঝা এক-বারেই অসম্ভব নয়, বলে একাধিক হিন্দী ছবি সারা ভারতব্যাপী ব্যবসা করতে পারত না।

কলকাতা আর বম্বের রিলিজ নিয়েই গণ্ডগোলটা অনেকদিন জিইয়েছিল। কোন কোন পরিবেশক নাকি আবদার করে-ছিলেন ছবিতে হেলেনের নাচ নেই কেন? গানগুলোই বা অমন চটকদারি নয় কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং ছবির মুক্তি হয়ে উঠল অনিশ্চিত। প্রযোজকরা পড়লেন চিন্তায়। বাক-বিতণ্ডায় কাটল প্রায় একটা বছর। ইউরোপ-আমেরিকায় সমাদৃত হলেও স্বদেশের পরিবেশকদের কাছে শতরূপ হয়ে রইল অচ্ছুৎ।

এখন শোনা যাচ্ছে একজন তরুণ বাঙালী পরিবেশক নাকি সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছেন শতরূপ পরিবেশনার দায়িত্ব নিতে। প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তিও হয়েছে। সত্যজিৎবাবু এই তরুণের উৎসাহে আনন্দিত, আশীর্বাদ করছেন তাঁকে।

সত্যজিতের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা তাঁর বহু দিনের, এবার কিঞ্চিৎ আশা পূরণ হল। পরে হয়তবা ছবিই করাবেন ও'কে দিয়ে। ঐ তরুণের নাম ধীরেশ চক্রবর্তী ডি কে ফিল্মস এন্টার প্রাইজের ব্যাপারে। শতরূপ সম্ভবত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লাইট হাউস ছবিঘরে মুক্তি পাবে। সত্যজিৎবাবু বলেছেন অন্তত কলঙ্কমুক্তায় ইংরেজী সাবটাইটেল দেওয়া প্রিন্টটা যেন দেখানো হয়। ধীরেশবাবু জানিয়েছেন 'হবেও তাই।'

নির্মল বসু

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি জয় বাবা ফেলুনাথ, কাশীর বহির্দৃশ্যে সত্যজিৎ, ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় ও সৌমিত্র চ্যাটার্জি

ছবির খবর

আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র

চন্দ্রিমা পিকচার্সের প্রযোজনায় আশুতোষ মুখার্জির বহুপঠিত উপন্যাস আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্রকে চলচ্চিত্রায়িত করছেন প্রবীণ পরিচালক সুশীল মজুমদার। সম্পূর্ণ রঙীন এই বাংলা ছবিটির প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করছেন—উত্তমকুমার ও তনুজা। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সলিল সেন। মানবেন্দ্র মুখার্জি ছবিটির সুরকার। ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে।

দূরত্ব শেষ হয়েছে

প্রতিশ্রুতিবান তরুণ চিত্র-পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'দূরত্ব' ছবির কাজ শেষ হয়েছে। ছবিটি এখন মুক্তির অপেক্ষায়। অনেকেই অপেক্ষা করে আছেন এ ছবিটির জন্য অশেষ আগ্রহের সঙ্গে। সময়কালের আকলে আক্রান্ত বাংলা চলচ্চিত্রের মাঝখানে 'দূরত্ব' ছবিটি যে একটি স্বতন্ত্র উজ্জ্বল নিয়ে হাজির হবে এ ধারণা অনেকের। আমরা হয়ত বহু দিন পর খুঁজে পাব আর একজন যশস্বী পরিচালককে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত তরুণ কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রথম বড় ছবি 'দূরত্ব'। এর আগে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্যচিত্র পরিচালনা করেছেন। তাঁর 'ঢোলের রাজা' শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রের সম্মান পেয়েছিল। দূরত্বের মূল ভূমিকাগুলিতে আছেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, মমতাশংকর, বিজন ভট্টাচার্য, প্রভাস সরকার, স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ সেন, নিরঞ্জন রায় এবং আরও অনেকে। কাহিনী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন রণজিৎ রায় ও মৃন্ময় ভট্টাচার্য এবং সঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছেন আয়ান রশিদ।

বিবর্ণ পলাশ

সৈনিক ও ঝড় খ্যাত তরুণ চিত্র-পরিচালক অঞ্জন দাসের পরিচালনায় সুভাষণ চিত্রের বিবর্ণ পলাশ ছবির চিত্রগ্রহণ বাংলার গ্রামে-গঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক অঞ্জন দাস স্বয়ং। সুভাষ দত্ত ও অনিল পাল প্রযোজিত এই অসাধারণ ছবিটির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন—নন্দিনী মালিয়া, সন্তু মুখার্জি, প্রদীপ মুখার্জি, তপন চৌধুরী, নিখিল রাহা ও সুভাষ দত্ত।

নবাগত সুরকার অনাথবন্ধু দাস ছবিটিতে সুরারোপ করছেন। কমল নায়েক ছবিটির চিত্রগ্রহণ করছেন।

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটক—৫০০ রজনী অতিক্রান্ত !

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬।টায় ও রবিবার এবং ছুটীর দিন ৩টা ও ৬।টা

তরুণ থিয়েটারে তরুণ

নাটক-পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেঃ ঃ বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্ত্বনা, গিরীশ, রবীন, মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, উশীনর, শৈলেন, মধু, গণেশ, স্বপন, অলোক, তিমির এবং রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

মা কল্যাণেশ্বরী

গত ২০ জুন স্নানযাত্রার পুণ্য লগ্নে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওতে নিতাই চিত্রমের রঙীন বাংলা ছবি 'মা কল্যাণেশ্বরী'র শুভ মহরৎ ও নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। মহরৎ অনুষ্ঠানে চিত্র, মঞ্চ ও সংগীত জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্টুডিওর ফ্লোরে 'মা কল্যাণেশ্বরী'র পূজারতি হবার পর মহরৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। মহরৎ শিল্পী ছিলেন নবাগতা সুশ্রী ভট্টাচার্য ও নবাগতা দেবিকা দাশগুপ্ত। এর পর সারাদিন ধরে চিত্রগ্রহণ চলে।

সোনায় সোহাগা

চঞ্চল পটুয়ার কাহিনীতে রঞ্জন মজুমদার পরিচালিত চয়ন চিত্রের 'সোনায় সোহাগা' ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ। বর্তমানে বোম্বাই-এর ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে ছবিটির কয়েকটি বিশেষ টেকনিকের কাজ চলছে। লাবেল হার্ডি কর্মোত্ত খাঁচে এই ছবিটি নির্মিত হয়েছে। সত্য ব্যানার্জী ও তরুণকুমার জুটিতে। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন—রবি ঘোষ, মহর রায়, হরিধন মুখার্জী, মন্মথ মুখার্জী, গীতা কর্মকার, গীতা দে, সুশীল ব্যানার্জী, বৈদ্যনাথ বানার্জী, মান্না দে, তপন দত্ত, নবাগত নায়ক-নায়িকা চিরাজিৎ ও তনিমা ছাড়া আরও অনেকে। পুলক ব্যানার্জী রচিত গানগুলিতে সুরকার অজয় দাসের সুরে কণ্ঠদান করেছেন—শ্বিজেন মুখার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, হৈমন্তী শুক্লা, পিন্টু ভট্টাচার্য, তরুণ ব্যানার্জী ও সমীর মুখার্জী।

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার

রুমা গুহঠাকুরতা সম্প্রতি (১৫ জুলাই) সদলে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন কোপেনহেগেনের পথে। আন্তর্জাতিক যুব উৎসব কমিটির আমন্ত্রণে এই শুভেচ্ছা সফরকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্যও দিয়েছেন। শুধু কোপেনহেগেন নয়, ওখান থেকে তাঁরা যাবেন লণ্ডনে। সেখানে লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের উপস্থিতিতে ওয়েস্টমিনিস্টার সেন্ট্রাল হলে দুটি সন্ধ্যায় নাচ-গান ও বিভিন্ন আইটেম মঞ্চস্থ করতে হবে। দুটিই স্থানীয় ভারতীয়দের জন্য চ্যারিটি শো।

যাবার প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রুমাদেবী বলেছেন—আমাদের কাছে এটা আনন্দের খবর যে ঠিক এই সময়েই মস্কোয় আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবং সেই মেলায় ভারতীয় কমিটি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রায় একমাসব্যাপী মস্কোর বিভিন্ন প্রোগ্রাম করতে।

সুতরাং লণ্ডন ছেড়ে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার উড়ে যাবে মস্কো। এবং মস্কো থেকে কলকাতা ফিরতে প্রায় সেই আগস্টের শেষ।

রুমা দেবীর এই তৃতীয় বিদেশ সফরে তাঁর দলে রয়েছেন সাধন গুহ, পলি গুহ, অচ্যুত নারায়ণ, পিনাকী রায়, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জি, তরুণ দাস, সুনিতা ঘোষ, মুলা ব্যানার্জি, সুপ্রিয়া রায় প্রমুখ একত্রিশজন সদস্য।

১০০ রজনী অতিক্রান্ত

বিশ্বরূপার পাশে বয়েজ ওনে/অপরাজিতা নর্থের

বর্ধমানের কড় বিশালের কড়

রচনা—সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। আলো—ভানু বিশ্বাস।
আবহসঙ্গীত—ভবানীশঙ্কর। মঞ্চ—গৌর পাল।
নৃত্য পরিকল্পনা—উৎপল ভট্টাচার্য। নেপথ্য কণ্ঠ — কুমকুম দীক্ষিত।
সাজ— ফণ ব্যানার্জি। প্রচার—নিতাই ভট্টাচার্য।
গান/সুর/নির্দেশনা—শ্যামল চট্টোপাধ্যায়।
প্রতি বৃহ ও শনি ৬॥ রবি ৩ ও ৬॥/কলশোর বুকিং চলছে।

নতুন বক্তব্য নেই

বক্তব্যের দিক থেকে কেতনের প্রথম প্রযোজনা অগ্নিগর্ভ লেখনি নতুন কোন দিক উন্মোচন করে নি বটে, কিন্তু অতিব্যবহৃত এই বিষয় বস্তুটিকে নাট্যকার শ্যামাকান্ত দাস যে প্রেক্ষিতে নিয়ে ফেলেছেন সেখানে রয়েছে ইতিহাসের কয়েকটি পাতা। শুধু কল্পনার জাল বুনে তৈরি হয় নি নাটকটি, অতীতের কয়েকটি পাতাকে তিনি বাস্তবায়িত করেছেন কল্পনার শক্তিতে। এই বৈশিষ্টই নাটকটিকে অন্য নাটক থেকে আলাদা করে দেয়। সাইবেরিয়ার লেনা স্বর্ণখনি নাটকের পটভূমি। জারের পরোক্ষ সমর্থনে রুশ-বৃটিশ খনি মালিক শ্রমিকদের ওপর চালাচ্ছে অত্যাচার। আর ওদের ধর্মঘট রুখতে পাঠান হয়েছে এক সামরিক অফিসার টেরেসচেঙ্কোকে। ইতিমধ্যে লেনিনের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে শ্রমিকেরা, স্টালিন তাদের প্রেরণা জোগাচ্ছেন। চোরা পথে তাদের প্রচারপত্র আসছে। অন্য দিকে ট্রটস্কির মরোসভ দুই বামপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হাত মিলিয়েছে শোষক-শ্রেণীর সঙ্গে। কিন্তু জয় শ্রমিকেরই।

পরিচালকদ্বয় (শংকরপ্রসাদ ঘোষ, দুর্গাশংকর চক্রবর্তী) মঞ্চটিকে কখনও তিনটি স্তরে ভাগ করে নিয়েছেন, কখনও বা সারা মঞ্চই ব্যবহার করেছেন। শুরুতে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রমিকদের যে ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়ে শুরু হয়েছিল, শেষে নাটকটিকে তাঁরা একবারে অন্য উত্তরণে নিয়ে যেতে পেরেছেন। ধীর অথচ স্বাভাবিক গতিতে সেই পরিণতির দিকে এগিয়েছে নাটক। তাঁদের কাজে পরিচ্ছন্নতার দিকটাই নজরে পড়ে সবার আগে। তবুও দু-একটা জিজ্ঞাসা থেকে যায়—শেষ দৃশ্যে টেরেসচেঙ্কোর সামনে মৃত শ্রমিকগুলোকে অমন নুইয়ে না রেখে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলে কোন ক্ষতি ছিল কি? তাতে বোধ হয় বক্তব্যটা আরও জোরদার হতে পারত। দু নম্বর জিজ্ঞাসা—টেরেসচেঙ্কোর মুখে ক্রমাগত অনাগত অকটোবর বিপ্লবের কথা আসবে কেন? নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচনা বলেই এ প্রশ্ন তোলা হল?

আরও একটি প্রশ্ন : ইসাককে অত্যাচারের দৃশ্যে হঠাৎ আলতন সেখানে এল কেন, এবং ইসাকইবা সকলের সামনে শ্রমিক নেতা ইরিয়ানা-কেমেনভের উচ্চারণ করল কোন্ সাহসে?

অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই ভাল করেছেন। দু-একজনের উচ্চারণে কি ত্রুটি আছে।

নির্মল

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পাইকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা
শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত
ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক ষ্টোর্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 28th July, 197
Phone 55-5231 (14 lines)

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার সময় দেখে নেবেন— 'কুকমী'র প্যাকেটে কেবলমাত্র কুকমী (Cookme) ছাপই আছে,— অন্য কোন ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নেই।

31 JUL 1970

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২
পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

iaa 590

পাঞ্চজন্য
অমৃত
৬ অগাস্ট ১৯৭৮
দাম ৭৫ পয়সা

মাথা ধরেছে?
এক গ্লাস জল খান

Saridon

আর কেবল একটি

সারিডন

ট্রেডমার্ক 'রোশ'

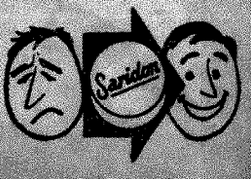

RP.2158A

নটরাজন-এর চাঞ্চল্যকর রচনা

লালবাজার ২০.

থানার মাটি নোনা ১৬.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সার্থক উপন্যাস

শেষ বিচার ১৮.

স্বাতী ও দীপু ১২.

শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা এবং দ্বারকা ও বেট-দ্বারকার কৃষ্ণলীলা-স্থল পরিক্রমা অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণ কাহিনী

শঙ্কু মহারাজ-এর

মন-দ্বারকায় ১২.

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোর লীলা এবং বিশ্বের প্রাচীনতম পদ-যাত্রা ব্রজ-পরিক্রমার ওপরে রচিত বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম ভ্রমণকাহিনী, এই লেখকের

মধু-বৃন্দাবনে

তিন শ' পৃষ্ঠার তিনটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বে সমাপ্ত। প্রতিটি পর্ব আলোকচিত্র, মানচিত্র, পথপঞ্জী ও বিষয়সূচীসমৃদ্ধ। মূল্য প্রতি পর্ব বারো টাকা।

এই লেখকের

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে ১৫.

শৈলেশ দে'র অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

গান্ধীজী ও নেতাজী ২০.

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

ত্রিভুবনের বাইরে ১৮.

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অনুসন্ধান ১৫.

কাশীকান্ত মৈত্রের

গণতন্ত্র

মুখোশ ও মুখশ্রী ২৫

নারায়ণ সান্যালের

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

গজমুক্তা ১০.

সুবোধ ঘোষের

গল্প মনিঘর ১৪.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আকাশে আয়না ১৫.

একাল চিরকাল ১০.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

গোমুখীর পথ ১৬.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্নশীরি ২০.

নিখিলচন্দ্র সরকারের

সজনে নির্জনে ১২.

দুঃখেসুখেবাঁচা ১০.

কলহনের

খবরে প্রকাশ ১০.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮.

শ্রীহংস-এর

লাস্ট ওয়ার্ড ৮.

গাইনিক ওয়ার্ড ৮.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

সম্পূর্ণ ক্যাটলগের প্রয়োজন হলে লিখুন।

অমৃত

আমরা বলেছিলাম

সবচেয়ে কম দামে, নববর্ষের অমৃতে থাকবে সব চেয়ে সেরা লেখা
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেছে
অনেকে পাননি
তাই আগে থেকে জানিয়ে রাখছি

এবারের
অমৃত স্বাধীনতা সংখ্যাও পাবেন অবিশ্বাস্য কম দামে
থাকবে সেরা সেরা লেখা
স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত এ-সংখ্যায় থাকছে

বিমল শাসমলের সুদীর্ঘ প্রামাণিক রচনা

ভারত কী করে ভাগ হোল

মহাত্মা গান্ধী : লিখেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার

পিছু হটার পালা : লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের ভাগ্য গণনা করেছেন বিশিষ্ট জ্যোতিষ শ্রীমাণিক্য

বাড়তির পথে ভারত : লিখেছেন অতুল সুর

পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ভবতোষ দত্ত
সরকারী বিপ্লবী নিকেতন নিবাসী
প্রাক্তন বিপ্লবীরা বলতে চেয়েছেন

কী চেয়েছিলাম / কী পেয়েছি

দেশ বিভাগ : ২৪ পরগণা ও নদীয়ার রূপান্তর
লিখেছেন কমল চৌধুরী

স্বাধীনতা পেতে গিয়ে
শ্রীহট্ট, যশোহর, খুলনাকে উৎসর্গ

লিখেছেন : অমিতাভ চৌধুরী ও শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী বিশিষ্ট প্রতিভার

সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার

স্বাধীনতা বিষয়ে নির্বাচিত বইয়ের তালিকা
দাম তিন টাকা ।। রেজিস্ট্রি ডাকে অতিরিক্ত দু টাকা

আপনার কপির জন্য হকার বা এজেন্টকে এখুনি বলে রাখুন।
অথবা লিখুন
সার্কুলেশন ম্যানেজার, অমৃত পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ । কলকাতা-৩

অমৃত
১৮ বর্ষ
১৩ সংখ্যা
১৮ শ্রাবণ
১৩৮৫
4 August, 1978

সম্পাদকীয় ৩
সাহিত্য ইত্যাদি ৪ মণীন্দ্র রায়
কবিতা ৫ শম্ভু বক্ষিত, অজয় সেন
অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজধানীর ইনসাইড স্টোরি ৬ পর্যবেক্ষক
বেবতীভূষণের কার্টুন ৭
রাজনীতি : কলকাতা স্টাইল ৮
বেদব্যাস বৈদ্য
আমি কেমন আছি ? ৯
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
চিঠিপত্র ১০
প্রচ্ছদ কাহিনী ১২
বাগানওয়ালা/একবাম আলি
প্রচ্ছদশিল্পী সুনীলমাধব সেন
সংসারটাই একটা ধাঁধা ১৬
পবিতোষ সেন লিখিত ও চিত্রিত
তরণী পাহাড়ে বসন্ত (উপন্যাস) ২০
শৈবাল মিত্র
দমন চক্র (গল্প) ২৬ সুধা অরোরা
সোনার হরিণ নেই (উপন্যাস) ৩১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সমালোচনা ৩৭
একটি কুকুর ও কয়েকজন মানুষ (গল্প)
৪০ শিশিরকুমার দাশ
হাওয়া গাড়ি (উপন্যাস) ৪৬
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ভাগ্য গণনা ৫১ শ্রীমাণিক্য
দর্শকের চোখে দূর দর্শন ৫২
রাজা চট্টোপাধ্যায়
খেলা ৫৫
চিত্রধ্বনি ৫৭

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ কাহিনী
কলকাতা বন্দর
লিখেছেন নীরদ ভট্টাচার্য
গল্প লিখেছেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিজন সমস্যা ও তার সমাধান

সম্প্রতি বিরোধীপক্ষের নেতাদের সঙ্গে হরিজন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সমস্যাটির সমাধানের জন্যে জাতীয় ঐকমত্য অনুসন্ধান করাই ছিল ঐ সভার উদ্দেশ্য।

মাত্র নব্বুই মিনিটের আলোচনায় সমস্ত প্রশ্নেরই যে মীমাংসা হয়ে গেছে তা হয়তো নয়। কিন্তু দেশের যে কোনো জায়গায় হরিজন নির্যাতন ঘটলে সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের দিয়ে তদন্ত করানোর যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

প্রথমত, হরিজন হত্যা বা হরিজন নির্যাতন ঘটলেই আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে একাধিক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তা থেকে রাজনৈতিক সুবিধা উশুল করার চেষ্টা চলে আসছিল দেশে। সে বিশৃঙ্খলা বন্ধ হবে এতে।

দ্বিতীয়ত, হরিজন নিগ্রহের বিষয়টি রাজ্য সরকারের আওতায়। এবং তার প্রতিবিধানের দায়িত্বও রাজ্যের হাতে। কিন্তু ভারতে যেহেতু বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেজন্যে হরিজন নিগ্রহের প্রতিকার কোনো কোনো সময় বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা ছিল। বর্তমান সিদ্ধান্তের ফলে সে আশঙ্কা বন্ধ হবে। সর্বদলীয় অসন্তোষ ও ঐকমত্য যে প্রকৃতই ফলপ্রসূ হতে পারে তা আগ্রার হরিজন-হত্যার বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কমিশন নিয়োগ থেকেও সুস্পষ্ট।

হরিজন সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। ভারতের কোনো রাজ্যে এ সমস্যার তীব্রতা বেশি হলেও মোটামুটি সর্বত্রই এর অস্তিত্ব রয়েছে। এবং প্রায়ই দেখা যায়, শহরের থেকে গ্রামের দিকে এ সমস্যার প্রবলতা বেশি। তার প্রধানতম কারণ হল অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। হরিজন নিগ্রহের ছদ্মবেশে দেখা দিলেও আসলে যে সমস্যাটি অর্থনৈতিক তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্যে সত্যিকারের সমাধানের জন্যে শিক্ষা বিস্তার ও দারিদ্র্য দূর করার পরিকল্পনা অপরিহার্য। রাজ্য সরকারগুলো যদি সেদিকে দৃষ্টি দেন অসন্তোষের একটি মূল কারণ দূর হবে। কিন্তু যতোদিন তা না হয় ততোদিন আইনের শাসন যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে অতন্দ্র দৃষ্টি রাখা দরকার।

দিল্লির ঐ পূর্বোক্ত অধিবেশনের সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্য সরকারগুলো ভবিষ্যতে অনেক বেশি সজাগ ও সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

প্রচ্ছদের নেপথ্যে : সুনীলমাধব সেনের জন্ম ১৯১০ সালে পাবনা জিলায়। দেশী ও বিদেশী চিত্রশৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দর সংমিশ্রণ সুনীলমাধবে। শিল্প চেতনার প্রাণ। ১৯৬৭ সালের পর তাঁর চিত্রধারীতিতে ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মূর্ত থেকে বিমূর্তের পথে পদচারণা—অথচ পুরোপুরি অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়। সত্তর দশকের কাছাকাছি এসে সুনীলমাধব পিকাসোর কিউবিক ফর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। সুনীলমাধবের শিল্প প্রেরণায় সব থেকে বেশি ছায়া ফেলেছে ভারতের সনাতন শিল্পের ঐতিহ্য ও বাংলার প্রাচীন লোকশিল্প। তবে সব কিছুর মধ্যেই আছে সুনীলমাধবের নিজস্বতা।

সাহিত্য ইত্যাদি...

আসল লেখা আর অভ্যাসের লেখা

সেটা বোধহয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একেবারে গোড়ার দিকে। 'পরিচয়' পত্রিকার দায়দায়িত্ব তখনো হস্তান্তরিত করেননি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। হিরণকুমার সান্যালকে সঙ্গে নিয়ে তিনিই সম্পাদনা করতেন তখনো।

কিছুকাল আগে তিনি হাতিবাগানের সেই পৈতৃক বাড়ি থেকে হাজরা রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছিলেন। একা থাকতেন। কাজেই আমরা যারা দক্ষিণ কলকাতার মানুষ তাদের পক্ষে যাতায়াত অনেক সহজ ও স্বচ্ছন্দ ছিল। আর সুধীনবাবুও নিজের আভিজাত্য পুরোপুরি বজায় রেখেও মিশতে পারতেন লোকের সঙ্গে।

যাই হোক একদিন এইরকম গেছি। সদ্যপ্রকাশিত পরিচয়ের একটি কপি ছিল হাতের কাছে। সংখ্যাটা আমি পাইনি তখনো। কথা বলতে বলতে নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। হঠাৎ একটি পাতায় থমকে যেতে হল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কাগজখানার মাঝামাঝি একটা পাতায়, প্রথমে নয়। অথচ সেকালে ঐটেই রেওয়াজ ছিল। এবং সেটা সঠিকও বটে, কেননা রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সংস্কৃতি-জীবনের সেই পিতামহতুল্য ব্যক্তির লেখা যে প্রথমে থাকবে এতো না বললেও চলে।

তাছাড়া সুধীনবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল গভীর। আর পরিচয়ের রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যায় সুধীনবাবু কবির বিষয়ে তাঁর লেখাটি শুরুই করেছিলেন এই বলে যে, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া মানে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা। কাজেই আমার বিস্ময়ের কথা চাপতে পারলাম না আমি, সরাসরি প্রশ্ন করে বসলাম, কবিতাটি কী পেতে দেরি হয়েছিল? সে জন্যেই প্রথমে দেওয়া যায়নি, পরে দিতে হয়েছে?

সুধীনবাবু মাথা নেড়ে জানালেন তা নয়, মুখে বললেন, ইচ্ছে করেই দেওয়া হয়েছে পরে। উনি তো আর লিখতে পারছেন না।

বলে বোঝানো যাবে না, কী ভয়ানক রকম অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সুধীনবাবু আমার হতভম্ব ভাব দেখে জুড়ে দিলেন আবার, কিছুকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া উচিত লেখা। না পারলেও লিখতে হবে তার কোনো মানে নেই।

আমরা তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম।

ঐ বিশেষ কবিতাটি ভালো কি খারাপ সে বিচারের ভার অন্যদের ওপর থাক। আমি ভাবছি সুধীনবাবুর ঐ মন্তব্যটির কথা, লেখা খারাপ হলে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, সেই মাত্রাবোধের কথা।

সাহিত্যের ব্যাপারে কৌতূহলী ব্যক্তিরা জানেন, সুধীনবাবু তাঁর এই মতটি কঠিনভাবেই প্রয়োগ করেছিলেন নিজের জীবনে। অনেককাল তিনি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর তার পরেও যা লিখেছেন তা যৎসামান্য। এক সংবর্ত কবিতাটি ছাড়া ভালো কিছু খুব একটা লিখতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুধীনবাবু তাঁর সীমারেখাটি প্রায় যথাসময়েই টেনে পেরে গিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর শেষ জীবনে গল্প উপন্যাস লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বইগুলোর সংস্করণ হলে তার পরিমার্জনা করতেন, রদবদল করতেন, কখনো-বা বাড়িয়েও দিতেন কলেবরে—যেমন 'ইন্দিরা'। কিন্তু নতুন কিছু লেখেননি। 'প্রচারে'র কাজে মন দিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন।

লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন শেক্সপীয়রও। নাট্যসরস্বতীকে নমস্কার জানিয়ে, মঙ্গলক্ষ্মীর আশীর্বাদ নিয়ে পকেটে পুরে দেশের বাড়িতে গিয়ে অবসর যাপন শুরু করে দিয়েছিলেন। 'টেম্পেস্ট' নাটকেই তিনি আপন সীমা টেনে পেরেছিলেন। এবং মেনে নিয়েছিলেন।

বাইরের উদাহরণ আরো চমকপ্রদ। বোদলেয়ারের পর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কবি, সিম্বলিস্ট কবিতার একজন আদিগুরু বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। কিন্তু ক' বছর লিখেছেন তিনি? ১৯ বছর বয়সেই লেখার পাট চুকিয়ে দিয়ে আফ্রিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন ভাগ্যান্বেষণের জন্যে। আর কখনো কলম হাতে নেননি। যদিও বেঁচেছিলেন তিনি তার পরেও ১৮ বছর।

আমাদের মাইকেল মধুসূদনেরই বা সত্যিকারের সাহিত্যজীবন ক' বছরের? বছর চারেকের বেশি নয় বোধহয়। অবিশ্যি ইংরেজি কবিতাগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না।

সাহিত্যের আসল রহস্য হল পরিমিতিবোধ। শুধু রচনায় নয়, রচয়িতার নিজের আচরণেও। লেখা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখনো তাকে চালিয়ে যাওয়া কালের কথা নয় মোটেই। কারোই তাতে কোনো লাভ হয় না। পাঠকেরও নয়, লেখকেরও নয়। আর এ ব্যাপারে বয়স নয়, আসল নির্ণায়ক হল লেখার ক্ষমতা। যে বয়সেই লেখা বন্ধ হোক, থামাতে হবে সেই বয়সেই।

আমাদের কালের একজন শক্তিমান কবি সমর সেনেরও ছিল এই পরিমিতি বোধ। মোটামুটি বছর দশেক লিখেছেন বোধহয়। ৪৬ সালের পর আর নতুন কবিতা লেখেন নি। অন্তত আমার চোখে পড়েনি। এবং না লিখে ভালোই করেছেন। শেষের দিকে তাঁর কবিতা ক্রমেই খুব নীরস হয়ে উঠছিল এবং কিছুতেই আর তাকে কবিতা বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না। অথচ তার প্রতিভার তুঙ্গ মুহূর্তে কী আশ্চর্য সব কবিতাই না উপহার দিয়েছেন।

সমরবাবু কথা কম বললেও সরস মানুষ। সমালোচনা করেন বেশ ঠাট্টা মিশিয়ে। একালের কোনো কোনো লেখক সারা বছর চুপচাপ থেকে হঠাৎ পুজোর সময় ডজনখানেক কবিতা লিখে ফেলেন, সমরবাবুর কাছে এটা বেশ মজার ব্যাপার মনে হয়েছিল এক সময়। বলেছিলেন পুজো পোয়েটস্।

তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ কবিবন্ধু, যিনি মারা গেছেন, কয়েক বছর হল, তাঁকেও ঠাট্টা করেছিলেন সমরবাবু ঐ বলে। সে লোক জবাব দিয়েছিলেন, না লিখলে কপিগুলো পাব কী করে? ছুটি কাটাব কী নিয়ে! তাছাড়া না লিখলে তো ভুলেই যাবে সকলে, তাই না!

ঐ শেষ কথাটিই মোক্ষম। না লিখলে ভুলে যাবে। ক্রমাগত লিখতে হবে। না পারলে মাঝে মাঝে। লিখে যাওয়া চাই।

কথায় কথায় মনে পড়ল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নানা প্রকাশককে তিনি বই দেন কেন? একটি সংস্থাকে সব বই দিলে ক্ষতি কী? যেমন বিলেতের লেখকরা করেন অনেক সময়?

নারায়ণবাবু বলেছিলেন, সব বই কি আর একজনে ছাপতে পারে? পারলেও সেটা তো মনোপলির দিকে চলে যেত। তাছাড়া লেখকের ক্ষতি হত তাতে। এক-একজন প্রকাশকের বই তালিকায় কত বই ভাবুন তো? সব বইয়ের তো একবারে বিজ্ঞাপন দেন না, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেন। কাজেই বিশেষ এক প্রকাশককে সব বই দিলে আমার 'কোটা' আসতে মাস কয়েক লাগতে পারে। তাহলেই হয়েছে আর কি। পাঠকরা ভাববে লোকটি লোপাট হয়ে গেছে! বলে, হাসতে হাসতে জুড়ে দিলেন আবার, এ তো কবিতা নয় মশাই, এ হল উপন্যাস। বিক্রির কথাটাও ভাবতে হয়। কাজেই সব সময় জানান দিতে হবে। দশটা প্রকাশকের মধ্যে বইগুলো ছড়িয়ে রাখলে, প্রতি সপ্তাহেই কারো না কারো বিজ্ঞাপনে নাম থাকবে। ভোলবার সময় পাবে না পাঠকরা।

রসিকতায় এঁটে ওঠা যেত না নারায়ণবাবুর সঙ্গে। তাঁর স্যাটায়ারের ধরণটা ছিল এইরকমই। হাসির ছলে হয়তো তিনি একটা সত্যি কথাই বলেছেন সেদিন। অর্থাৎ গদ্য যেহেতু এখন অর্থকরী ব্যাপার, লেখকদের সেজন্যে বাজারের দিকে নজর রাখতে হয়। খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু এটাই বোধহয় ক্ষমতা ফুরিয়ে যাওয়া গদ্য লেখকের ক্রমাগত এনিমিয়াগ্রস্ত উপন্যাস উপহার দেবার মূল রহস্য। কিন্তু কবিরা? তাদের তো সে সমস্যা নেই। তারা কেন হাত থেকে কলম নামলে পড়া পর্যন্ত লিখে চলেন?

সকলে তো রবীন্দ্রনাথ নন। সুধীনবাবুর চিহ্নিত ঐ 'নীরস' কবিতা লেখার পরও একেবারে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি উপহার দিয়েছিলেন চিরস্মরণীয় কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

তাঁকে নকল করা কি সকলের মানায়!

অরুণেন্দ্র রায়

অদৃষ্ট

শম্ভু রক্ষিত

অন্তর্গূঢ় প্রত্যাদেশ অন্ধকার সজীব হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করো
সূর্যের অপরিহার্য তেজ গোক্ষুরা সাপের বিষের মত
কর্কশ হয়ে উঠেছে
অরণ্যের প্রতীকী ত্যাগ করে চলে গেছে কারা যাদুকালে
সুশৃঙ্খল জলের তলে পাশে কি ওপরে
মহাশূন্যের দুস্তর সমুদ্রে ভেসে ডানাওয়ালা পরী
আজ কুটীরের ধ্যান করে
গ্রহ তারা সৌরমণ্ডল ছায়াপথ সব কিছুই ঘুরন্ত
ও চলমান অবস্থায় থাকে
বৌদ্র জ্যোতি নারী গৃধ্নু নিয়াদ জ্যোৎস্না তুরপুন
র‍্যাঁদার বা তাঁতের মত বেজে যায়
হৃদরোগবিদরা লম্বা চেনে বাঁধা পড়ে
নির্বাসিত মানবাত্মা শূন্যে কেঁদে মরে না আর
তারা আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে আজ
পৃথিবীর চকমিলান মেঝে আর পরিষ্কার করে না
অশ্রুহীন পৃথিবীতে এখন বিষণ্ণতার শব্দ ওঠে
মিশনারী গির্জার পথে বন্য নহুর শানাই আর বেহালার বাজনা শোনে

অলৌকিক জড়াবিশ্বের রূপ হয়ে ঝরে ধর্মীয় চেতন
নিষ্কিধমদে জীবাশ্ম মরাল উড়তে থাকে
মনে হয় একা আমি
সপ্তঋষি সাক্ষী বন্ধু নিয়ে চিরন্তন
শান্তির জগতের দিকে চেয়ে আছি
কাচের আকাশ ছাড়া আজ অনাগত সুন্দরীদের
দেখার-যোগ্য যেন কিছু নেই
অন্তর্গূঢ় প্রত্যাদেশে আজ থরথরিয়ে কাঁপে নির্বাক মানুষ বট
নক্ষত্র সাগরের বুকে আঁকা থাকে রূপালী ফিতার মত
আমাদের ছায়াপথ
ছায়দৃষ্টি আকাশের পানপাত্র সৃষ্টির রহস্যে ভরে ওঠে
নিরুদ্দেশ কোন লোক হতে অর্ধদেবতা অগ্নিসংযোগ করতে আসে
মহাকাশের ক্ষয়ে পৃথিবীর বয়স বাড়ে
ঊর্ধ্বগামী সোপানের ধ্বংসধ্বনি স্তূপ নিঃশব্দে সমুদ্র পার হয়
নিস্তৈল দীপের মত আকাশ যেন প্রাদেশিক বর্ণের মতন ফেরে ঘরে
আমার অনুপস্থিত-আত্মা মৃতদেব মত যেন
আলিঙ্গন থেকে উঠে আসে
আমার নিঃশব্দ সর্বিৎ হতে থাকে অচ্ছিন্ন শৈশব

তুমি ও তোমার কুকুর

অজয় সেন

গত বছর শীতের আগে তুমি একটা কুকুর পুষেছিলে
তার কথা আমাকে চিঠিতে, দেখা হলে বলেছো অনেকবার,
রোগা, লম্বাটে শরীর ছিল তার, লাফাতো,
ডাকতো তোমার স্বর শুনলে
তুমি তাকে দিয়েছো গোপন চুম্বন, যেভাবে ভালোবাসিস্ট দেয় সবাই
কৃপন হাতের কারিকুরিতে।
লাজলজ্জাহীন অভ্যাস তার, যেন বা পথ খোঁজে অন্ধদের মূল দুয়ার
বোকা, ভারী মাথা নিয়ে কুকুর স্বপ্ন দেখে তোমার বসন্তের—
আহা—ভ্রূবিলাস;
আজীবন সে ছিল নিশ্চিন্তে পদপ্রান্তে তোমার
চেটে নিয়েছে শ্লেষ্মা ও ঘৃণা, করুণ স্বরে বলে যেন
দয়া করো, করুণা কর ওগো,
তুমি তাকে দয়াদাক্ষিণ্য দিয়েছো, তাই কুকুর ভুলেছে সম্মান
ভুলেছে যে সে প্রকৃতই কুকুর, উঠেছে মাথায়—আর
তাকে আদর করে, এ'টোকাটা দিয়ে, দু'চোখের প্রশ্রয়ে
বুকে রেখেছেন তোমার মা;
এতকাল মসৃণ চেন ছিল তার গলায়
এই বসন্তে সান্ধ্য ভ্রমণে তুমি তার বাঁধন খুলে দিলে
কুকুর তাই পিছু পিছু ফেরে, আড়মোড়া ভাঙে, আদর সোহাগে
মৃদু মন্দ ডাকে।

যদি আবার নতুন কিছু পোষো, লিখো আমাকে।।

শব্দ-সংকল্পিত

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)
কোন্ রাজ্যে কোন্ দেশে শুরু
রুমাল স্মৃতির মত প'ড়ে থাকে, পুড়ে যায় গন্ধের অগুরু
এমন মর্মের কান্না, বাসনার সারাৎসার ছুঁয়ে
আগের মতই তুমি এখনো শয্যায় পড়ো নুয়ে
মাঝে জলাঙ্গীর চাঁদ।

(২)
ছুঁয়নি সে এমন হঠাৎ
জটাজলে ছিন্ন হ'তে লেগেছিল তার-ও কিছুদিন
গাছ থেকে ডাল ভাঙে, শুকনো ডাল, আঘাতে মড়ার
শব্দ ওঠে, ঝরে জল, জলেরই মতন বাড়ে কবিতার আত্মময় ঋণ

জনসংঘের স্ট্র্যাটেজী বদল

জনসংঘ, সোসালিস্ট এবং ভারতীয় লোকদল মাস ছয়েক হল ছাড়াছাড়াভাবে থাকার পর আপাততঃ কর্মভিত্তিক সমঝোতায় আসছেন। পার্টির মধ্যে আবার শরিকদের সঙ্গে কংগ্রেসের এবং এমনকি ইন্দিরা কংগ্রেসেরও কিছু লোকজনের আঁতাত হতে চলেছে এই আশংকা কংগ্রেস-বিরোধী শরিকদের রীতিমত পেয়ে বসেছে। এই অবস্থায় চরণ সিং গোষ্ঠীর 'আলটিমেটাম' দেওয়া রাজনীতিতে প্রমাদ গুণল জনসংঘ। চিন্তায় পড়ল সোসালিস্টরা। দেখা দিল গুরুতর সংকট। মুখে বলে রাজনৈতিক কৌশলের সংকট। দিল্লীতে ছুটে এলেন আর-এস-এস'র প্রধান বালাসাহেব দেওরস। জনসংঘের নেতাদের নিয়ে তাঁর গোপন বৈঠক বসল। নানা শলা-পরামর্শের পর স্থির হল কেন্দ্রে ক্ষমতার মসদ থেকে কংগ্রেসের লোকজনদের দূরে রাখার পালটা প্যাচ। এই উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তার দুপক্ষ দুটো দিক লক্ষ্য করবার মত। প্রথমতঃ এমন কিছু এখনি করা হবে না যাতে নতুন করে সমস্যা বাড়ে, দ্বিতীয়তঃ সোসালিস্ট ও ভারতীয় লোকদলের সঙ্গে মিলে সম্মিলিত চাপের যথাসম্ভব পরোক্ষে মোরারজী দেশাই-জগজীবন রাম চন্দ্রশেখর-দের নিবৃত্ত করা।

অর্থাৎ জনসংঘের কৌশল হঠাৎ বদলে গেলো। এই সিদ্ধান্তের কিছুদিন আগে মোরারজী যখন বিদেশ সফরে যান সেই সময় দিল্লিতে জনসংঘ গোষ্ঠীর নেতাদের এক বৈঠকে স্থির হয় যে মোরারজী দেশাইকে তাঁরা এখন পুরো সমর্থন দিয়ে যাবেন। চরণ সিং এবং তাঁর অনুগতদের এই সিদ্ধান্ত মোটেই মনঃপূত হয়নি। এঁরা মোরারজী এবং তাঁর সমর্থকদের ওপর সর্বদা একটা চাপ সৃষ্টি করবার পক্ষপাতী ছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে মোরারজীর ভাবমূর্তির নাকি কিছু পরিবর্তন হয়েছে এমন কথা বলছেন জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল এবং সোসালিস্ট শরিকরা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে চরণ সিং ও বাজনারায়ণ ইস্তফা দেবার কয়েক দিন পর মোরারজীর কর্তৃত্ব যখন তুঙ্গে তখন অটলবিহারী বাজপেয়ী মারফৎ জনসংঘ মহলে চালু হল এই কথাটি : এরপর আক্রমণ হবে আমাদের ওপর। এই উক্তি সোসালিস্টদেরও সজাগ করল। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন জর্জ ফার্ণান্ডিজ, মধু লিমায়া ও সুরেন্দ্রমোহন। নানা উপদলে বিভক্ত সোসালিস্টদের ঘন-ঘন মিলিত বৈঠক বসল। জনসংঘ সদস্যদের নিজেদের মধ্যে শুরু হল আলাপ আলোচনা।

রাজধানীর ইনসাইড ষ্টোরি

আর তারপর জনসংঘ-সোসালিস্টদের যুগ্ম বৈঠকে স্থির হল চরণ সিং গোষ্ঠী সম্বন্ধে তাঁদের নতুন ভাবমূর্তি। এ ব্যাপারে ভারতীয় লোকদলের বিজু পট্টনায়কের অবদানও কিছু কম নয়।

বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিদিন যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে তখন বাস্তবক্ষেত্রে এই নয়া কৌশলের মূল কথা ছিল পার্টিকে এখন কিছুতেই ভাঙতে দেওয়া হবে না। ভাঙলে বিপদ সকলের। সুতরাং পার্টির বর্তমান আদল বাঁচাবার জন্য যুগপৎ আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ যখন যেমন প্রয়োজন নিতে হবে। একই উদ্দেশ্যে কাজ করা হবে এবং তাই ভুল বোঝাবুঝির কোন কারণ থাকবে না। আর চরণ সিং গোষ্ঠীর সন্দেহ দূর করে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে।

শরিক হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারে এবং পার্টিতে জনসংঘের ভূমিকা সম্বন্ধে গত কয়েক সপ্তাহ হল খুব চটে ছিলেন স্বয়ং চরণ সিং। তাঁকে প্রশমিত করবার জন্য প্রাক্তন গৃহমন্ত্রীর বেসকোর্স রোডের বাড়িতে বৈঠক বসল জনসংঘের তিন নেতার। এঁরা হলেন : অটলবিহারী বাজপেয়ী, লাল-কৃষ্ণ আদবানী এবং এবং নানাজী দেশমুখ। এই বৈঠকের পর চরণ সিং এবং কর্পূরী ঠাকুর, রাজনারায়ণ, শ্যামনন্দন মিশ্র ও রবি রায়ের কথাবার্তার সেই অতি পরিচিত ঝাঁঝালো আক্রমণাত্মক ভাবটা কমতে থাকে। জনসংঘ নেতারা চরণ সিংকে অবশেষে এই সার কথাটা বোঝাতে পেরেছিলেন যে : আমরা যতদূর সম্ভব মোরারজীর সঙ্গে চলেছি। এরপর বেশীদূর এভাবে আর যাওয়া সম্ভব হবে না। জনসংঘের সঙ্গে আলোচনা করেই চরণ সিং প্রস্তাবিত কিষাণ মিছিলটি বাতিল করেন। এই মিছিলটি ছিল মোরারজী সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে যোগ দেবার উদাত্ত আহ্বান। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের অনুমান ছিল লাখ পাঁচেক লোক নাকি চরণ সিং জিন্দাবাদ বলে হাজির হত রাজধানীতে। চিন্তায় পড়েছিলেন মোরারজীর অধীনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের লোকজন। কিষাণ মিছিলের পরিকল্পনাটি চরণ সিং গোষ্ঠীর কাছে তুরুপের তাস হিসাবে খানিকটা কাজ করেছে। আর ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্রীর পদ পূরণের ব্যাপারে জনসংঘ নিলো একটি ছোট্ট পদক্ষেপ। জগজীবন রাম যাতে এই পদ না পান তার জন্য মোরারজীকে চাপ দিলেন এবং আপত্তি তুললেন জনসংঘ গোষ্ঠী। এই চালে এখনকার মত সফল হয়েছে জনসংঘ।

এরপর মুখ খুলল সোসালিস্টরা। বিশেষ করে সোচ্চার হলেন মধু লিমায়া। মধু লিমায়ার বক্তব্য হল : মোরারজী দেশাই এমন ঢং-এ চলছেন যেন উনি একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। জনতা পার্টির শরিকরা একমত হয়েছিল বলেই সকলের সমর্থনে উনি প্রধানমন্ত্রীর পদটি পেয়েছিলেন। এটা 'কনসেনসাসের' ফল। সুতরাং সব সময় 'কনসেনসাস' অনুযায়ী তাঁর কাজ করা দরকার। এই মন্তব্য বিভিন্ন শরিক মহলে ভালোমত সমর্থন পায়। সর্বব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পাশে এমন লোকজনরাও মধু লিমায়ার কথা যুক্তি দিয়ে খণ্ডাতে পারেন নি।

অন্যরা যখন কথা বলতে শুরু করলেন ক্রমশঃ মুখে প্রায় কুলুপ আঁটলেন চরণ সিং গোষ্ঠীর লোকজন। চরণ সিং এখন বলছেন : দলের ঐক্য রক্ষাই প্রধান কাজ। কোন মন্তব্য নয়। কর্পূরী ঠাকুর দলের ঐক্য রক্ষার জন্য সকলের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা কামনা করছেন। আর অন্যদিকে বিজু পট্টনায়ক কিংবা জর্জ ফার্ণান্ডিজের বাড়িতে পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে চলছে আলাপ আলোচনা এবং তৈরী হচ্ছে নানা ফরমুলা।

এইরকম একটি ফরমুলা অনুযায়ী চরণ সিংয়ের জাতীয় পরিষদ ও সংসদীয় বোর্ডের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেবার পত্রটি যাতে গৃহীত না হয় সে ব্যাপারে সফল হলেন জনসংঘ, সোসালিস্ট এবং ভারতীয় লোকদলের সদস্যরা। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকদের ব্যাপারটার এতো সরল সমাধান মনঃপূত হয়নি। কিন্তু জাতীয় পরিষদের বৈঠকে দেখা গেলো অপরদিকের পাল্লা ক্রমশঃ ভারী হচ্ছে। জর্জ ফার্ণান্ডিজ এই লেখককে বলেন : যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে। চরণ সিংয়ের অনুগত এবং জনতা পার্টির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রবি রায় মন্তব্য করলেন : অপর পক্ষ 'সারেন্ডার' আপাততঃ ছেড়ে দিয়েছে।

সোসালিস্ট, জনসংঘ ও ভারতীয় লোকদল যা চেয়েছিলেন তাই হল বটে। চরণ সিং দলে থাকলেন। কিন্তু বেষারেষি ও সন্দেহে আবহাওয়া ইতিমধ্যে বেশ দূষিত হয়ে উঠেছে। এখনকার মত বিবৃতি যুদ্ধের অবসান হলেও জনতা পার্টিতে চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে বর্তমান পাঁচ শরিকদের মধ্যে পুরোন হৃদ্যতার বাতাবরণ ফিরিয়ে আনা সহজ হবে না। পারস্পরিক খেয়োখেয়ির ফলস্বরূপ একটা বিভেদ রেখা দেখা দিয়েছে।

পর্যবেক্ষক

আন-অভিমান লীলার পালা
বুড়োতে আর 'বুড়ী'তে
দরকারী সব কাজের ইতি
বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

নিভৃতে চা পান

রাজ্যপাল ত্রিভুবননারায়ণ সিং এবং বর্ষীয়ান নেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকার নিয়ে বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির মধ্যে যুগপৎ ক্ষোভ-বিস্ময়, আর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আচমকা এবং অবিশ্বাস্য এই মেলবন্ধন ফ্রন্ট নেতাদের ঠাণ্ডা লড়াইকে প্রায়ও জোরদার করেছে। আপাত দৃষ্টিতে ঘটনাটা সামান্য মনে হলেও একাধিক ফ্রন্ট নেতা বিশেষ করে সি পি আই এম-এর একটা অংশ এর সুদূর প্রসারী পরিণতি নিয়ে চিন্তিত। তারা মনে করেন, এই সাক্ষাৎকারের পেছনে পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর বেশ কিছুটা অবদান আছে এবং তাও বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

ঠাকুরতীর্থ হুগলীর কামারপুকুরে পরমহংসদেবের সড়ক উদ্বোধনের জন্য পূর্তমন্ত্রী রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ করেন। আমন্ত্রিত হন প্রবীণ নেতা প্রফুল্লবাবুও। তীর্থ দর্শন ও সরকারী কাজ শেষে রাজ্যপাল ত্রিভুবননারায়ণ সিং প্রোটোকলের অপেক্ষা না করেই সোজা মবাগের মায়াপুরী চলে করেন। এবং সরাসরি প্রফুল্লবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁদের মধ্যে প্রায় আধ ঘন্টা আলাপ আলোচনা চলে। পূর্তমন্ত্রী যতীনবাবু অবশ্য ভিন্ন কাজের অছিলায় তখন সেখানে হাজির ছিলেন। ত্রিভুবননারায়ণ এবং প্রফুল্লবাবুতে সেখানে নিভৃতে কী আলোচনা হয়েছে, কেউই তা প্রকাশ করেননি। তবে প্রফুল্লবাবু খোস মেজাজে শুধু জানান, চাচকে বসে রাজ্যপালের সঙ্গে খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজ্যপাল ত্রিভুবননারায়ণ যে তাঁর মত প্রতিদিন সকালে বসুন সেবন করেন সেকথাও প্রফুল্লবাবু বলেছেন। বলা-বাহুল্য প্রফুল্লবাবুর এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফ্রন্ট নেতাদের মধ্যেও যথেষ্ট আশঙ্কা আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ফ্রন্টের বড় শরিক সি পি আই এম দলের একাধিক নেতা মনে করেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আর এস পি দলের সঙ্গে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মাত্রাটা বেড়ে চলেছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতেই আর এস পির ঐ মন্ত্রী কৌশল হিসাবে ত্রিভুবননারায়ণ-প্রফুল্ল সেনের এই বৈঠকের সুযোগ করে দেন।

রাজ্যপাল ত্রিভুবননারায়ণ সিং এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মধ্যে গত এক বছর ধরে যে খুব একটা হৃদ্য সম্পর্ক চলছিল না তা রাজনৈতিক মহলেরও অজানা নয়। বস্তুত ফ্রন্টের অন্যতম শরিকদল সি পি এম নেতাদের সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্কটা এক

রাজনীতি

কলকাতা ষ্টাইল

বছরে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে। চলতি বছরের গোড়ায় রাজ্যপালের সুন্দরবন সফর নিয়েও বিতর্কের ঝড় ওঠে। বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা কাশীকান্ত মৈত্র অভিযোগ করেন সুন্দরবন সফরের সময় ক্যানিং শহরের এক সভায় রাজ্যপালের মঞ্চ থেকে সি পি আই এম নেতারা জনতা দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের নগ্ন সমালোচনা করেন। রাজ্যপালকে তাঁরা দলীয় রাজনীতির প্রচারে ব্যবহার করেন। এই অভিযোগে বিরোধীরা একদিন বিধানসভার কক্ষ পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এমন কি শেষ অবধি রাজ্য জনতাদলের পক্ষ থেকে দিল্লির নেতাদের কাছেও এর প্রতিবাদ জানানো হয়। রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে তখন থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে অবিশ্বাস্য বকমের বিতর্কও সৃষ্টি হয়।

এই সেদিনও প্রফুল্লচন্দ্র সেন অভিযোগ করেন, রাজ্যপালের মাধ্যমে তিনি কম করেও পাঁচ হাজার অভিযোগ পত্র সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে দুশোর বেশী অভিযোগের কোন তদন্তই হয়নি। রাজ্যের আইন-শৃংখলার অবনতির অভিযোগ নিয়ে লেখা তাঁর ঐ সব পত্রের যথার্থ প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয়নি। এই প্রশ্নে রাজ্যপালের নীরব ভূমিকায় প্রফুল্লবাবুও খুব একটা খুশী ছিলেন না। রাজ্যপাল, রাজ্য জনতা দল ও প্রফুল্ল সেনের মধ্যে মানসিক দূরত্ব ক্রমে বেড়ে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই অস্বস্তি ও অসহায় বোধ করছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাশ্মীর সফরে গিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ঘোষণা করেন : কোনও রাজ্য সরকার গণতন্ত্র বিরোধী অথবা সংবিধান বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হলে, সেই সরকার বাতিল করে কেন্দ্র নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর রাজ্যপালের মানসিকতায়ও কিছুটা পরিবর্তন হয়ে স্বাভাবিক। কারণ রাজ্যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারও জনতা দল পরিচালিত। আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রফুল্ল-বাবুর সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

শরিক নেতা এবং আর এস পি দলের প্রতিনিধি পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর রাজনৈতিক দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। রাজ্যপাল রাজ্য জনতাদল এবং প্রফুল্লবাবুর মধ্যেকার এই মানসিক ব্যবধান তাঁরও দৃষ্টি এড়ায়নি। সময় এবং সুযোগ বুঝে সুকৌশলে যতীনবাবু তাই রাজনৈতিক ঘটকের ভূমিকা নিয়েছেন। জনতা দল বা

বেদব্যাস বৈদ্য

প্রফুল্লবাবুকে সাহায্য করার জন্য নয়, রাজ্যপাল-প্রফুল্ল সেনের মধ্যে একটা একান্ত বৈঠকের সুযোগ করে দিয়ে পূর্ত-মন্ত্রী বামফ্রন্টের বড় শরিক সি পি আই এম দলের উপর একটা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছেন।

কেন এই চাপ? ফ্রন্ট গড়ার জন্ম-লগ্ন থেকেই আর এস পির সঙ্গে সি পি এম দলের একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তা আরও তুঙ্গে। ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদে এই দুই শরিক দলের মধ্যে একাধিক সংঘর্ষও হয়ে গেছে। তার ঢেউ এখন বামফ্রন্ট হয়ে মন্ত্রিসভায় গিয়ে আছড়ে পড়েছে। সি পি এম দলের বেনামী প্রচার মাধ্যমগুলি ইতিমধ্যে আর এস পি দলের বিরুদ্ধে একটার পর একটা তথ্য ফাঁস শুরু করেছে। আর এস পির বিরুদ্ধে যেভাবে সি পি আই এসের প্রচার মাধ্যমগুলি মুখর তাতে যতীন চক্রবর্তী প্রমুখ নেতারা বিব্রত এবং রাজনৈতিক দিক থেকে কোণঠাসা হতে চলেছেন।

অপর পক্ষে আর এস পির কেন্দ্রীয় দপ্তর লেনিন সরনির বিবাট বাড়িটি নিয়েও চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ, কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত প্রায় চার কাঠা জমির উপর অবস্থিত বাড়িটি সম্প্রতি আর এস পি কিনে নিয়েছে। মূল দলিলে বাড়ির দাম এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার উল্লেখ থাকলেও, কালো টাকায় তার লেনদেনের পরিমাণ ছয় লক্ষ। এই অর্থ সংগ্রহকও নাকি দলের এক মন্ত্রী। এনিয়ে পুলিশ মহলেও সম্প্রতি ফাইল চালাচালি শুরু হয়েছে।

প্রফুল্লবাবু অথবা জনতা দলকে সাহায্য করা নয়, বামফ্রন্টের রাজনীতিতে প্রকারান্তে চাপ সৃষ্টি করাই এখন আর এস পি দলের লক্ষ্য। তাদের ধারণা, এই চাপ সৃষ্টির ফলে সি পি আই এম যেমন, তাদের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধে বাধ্য হবে, তেমনি বামফ্রন্টেও তাদের কদর বাড়বে। সেই কৌশলগত দিকে লক্ষ্য রেখেই ঠাকুর-তীর্থ কামারপুকুর ছুঁয়ে আবামবাগের গান্ধীর নিরালা বাসভবনে নিভৃত বৈঠকের এই ব্যবস্থা।

বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক আর এস পি দলের কূট চালের খেলার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়—রাজ্য রাজনীতির মোড়লদের সতর্ক এবং কৌতূহলী দৃষ্টি এখন সেদিকে।

আমি কেমন আছি ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

ঠাকুর্দা আমার নাম রেখেছিলেন অতীশ দীপংকর। ঠাকুর্দার এরকম চমক লাগানো নাম রাখার অভ্যেস ছিল। উনি আমার নাম রেখেছিলেন অতীশ দীপংকর, দাদার নাম হিমালয় নিঝর। এরকম লম্বা চওড়া নাম আমার দাদামশাইয়ের খুব খারাপ লাগতো। তার উপর অতীশ মানে যে ঈশ্বরের উপরে থাকা—এব্যাপারটা তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। তবুও ঠাকুর্দার জেদের কাছে তাকে হার মানতেই হয়েছিলো। ঠাকুর্দা পুরুষকারে বিশ্বাসী ছিলেন, বারবার নানা ঘটনার হার হওয়া সত্তেও তাঁর অতুবিশ্বাস চিড় খায়নি। উনিশশো সাত-চল্লিশ সালের পনেরোই আগাস্টকে দাদু যেমন মনে মনে মেনে নেননি। দিনরাত সব সময়ে নারায়েতকদির লডকে বলছে পাকিস্তান' শুনতে শুনতে একদিন আমার বাবা কাকা ভিটে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই দুঃস্বপ্নের সীমনা পার হয়ে, ওপার থেকে এপার চলে এলেন। ফেলে আসতে হোলো তাঁদের অনেক কিছু। যেমন রূপসার চর গোয়ালন্দপুরের স্টিমারের ভোঁ, রবিশালের বজমোহন কলেজ (যেখানে তাঁদের লেখাপড়া, স্বপ্ন-আশার রঙিন স্মৃতি)—তবুও তাঁরা ইতিহাসের দিকে, সময়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকেন নি। নিজের ছেলেদের নামের আগে 'উদ্বাস্তু' বিশেষণটা যোগ হওয়ায় ঠাকুর্দা মনে আঘাত পেয়েছিলেন খুব বেশি। আজো বাবাকে যে লিয়ন উবিসের বই খুব মন দিয়ে পড়তে দেখি তারও কারণ বোধহয় এই উদ্বাস্তু শব্দটা এক সময়ে লিয়ন উবিসকে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগতো। ভীষণ ডান-ঘেঁষা লেখক বলে হোতো আমার লিয়ন উবিসকে, তা সে যতই তিনি ঘরছাড়া ইহুদির কথা লিখুন না কেন। বাবাকে সে কথা একদিন বলতে বাবা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে আমায় ধমকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন দুদিনের পড়া বিদ্যেকে অত সহজে চূড়ান্ত বলে যেন মেনে না নি'। বলেছিলেন, খবা, মহামারীর অত্যাচারকে যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া যায়, কেননা সেটা মানুষের উপর নির্বোধ প্রকৃতির অত্যাচার। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার যখন মানুষকেই ভিটে-মাটি ছাড়তে বাধ্য করে তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। সে মানুষের কাছ থেকে আর কোই আশা করো, মনুষ্যত্ব আশা করো না—বাবার গলায় এত জোর আমি আগে কখনো শুনিনি। লিয়ন উবিসের পক্ষ নেওয়াটা যেন বাবার কাছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতো ব্যাপার! দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিলো বলে বাবার মনের গভীর কোণে কোথায় যেন একটা বাগ ছিল। একটা গুণা। তবুও আশায় বুক বেঁধে আবার তিনি ঘর তুলেছিলেন। রিফিউজি-লোনের টাকায় পাওয়া ওই সামান্য জমিতে তাই নতুন করে সব শুরু করতে চাইলেন, যেমন মানুষ আজীবন চায়। ঠাকুর্দা বারণ করেছিলেন, বলেছিলেন ক'দিন অপেক্ষা করতে। তাঁর মনে আশা ছিল হয়তো সব আবার ঠিক হবে যাবে। না হলে যেন তখন ঠাকুর্দার টাকায় বাবা বাড়ি বানান। অপেক্ষা করে করে আরো তের বছর কাটল। আমি আট বছরে পা দিতে বাবা আর দেরী করতে চাইলেন না। কেননা ততদিনে বাংগাল, রেফিউজি, ছোটোলোক,—এ ধরনের অশ্রাব্য শব্দগুলো তাঁর কানে অনেকবার শোনা হয়ে গেছে। বেহালার বাড়িটা বাবার কাছে হয়ে উঠল অনেকটা যুদ্ধের গড়ের মতো। যে সমাজ তাঁকে আশ্রয় দিতে আগ্রহী নয়, যে সমাজের চোখে, যাদের মনের অবচেতনে, তিনি ভাগের অন্ন কেড়ে নেওয়ার অপরাধে অপরাধী, তাদের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে এর চেয়ে ভালো আর কোনো উপায় তাঁর জানা ছিল না। আমরা ভাইবোনেরাও যতটা সম্ভব নিজেদের মধ্যে নিজের থাকার চেষ্টা করতাম। প্রতিবেশী কারো সঙ্গে মেলামেশা করার চেষ্টা করতাম না, কেননা আমাদের বাড়ি থেকে তাই শেখানো হয়েছিল। মা তখনো তার গলার থেকে খুলনার সুর মুছে ফেলতে পারেন নি। বিকেল বেলায় ও বাড়িতে আসার পর প্রথম দিকে দাদা, ছোড়দিভাই, বড়দি আমি সামনের মাঠে ছোটাছুটি করতাম। মা কখনো কখনো একতলার বারান্দা থেকে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় আমাদের ডাকতেন, বন্টুরাবু, বুনু বলু দুধ খাবো যা—যেভাবে ডাকলে সমস্ত পৃথিবীর লোক বাড়ি ফিরে যায়। সেই নরম আলোয়, সেই বিকেলের আলোয় ছোটাছুটি করা বোদমাখা চারজন অপাপবিদ্ধ তখন ঘরে ফিরে যেতো হাত ধরাধরি করে, ছোটাছুটি করে, এখন যাদের হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। যেমন বাবা।

একদিন পাঠকপাড়ার আদি বাসিন্দে-দের কোনো বাড়ি থেকে কেউ মার ডাক নকল করে উঠল পশ্চিমবঙ্গীয় টানে, ছ্যাসানোর মত করে। দাদা সেদিন অঝোরে কেঁদেছিল ওই ঠাট্টা শুনে, বাবা সেদিন দাদুর ইজি-চেয়ারের কাছে গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। তারপর হালকা গলায় হেসে উঠেছিলেন। অথচ আমি বাবার চোখ কেমন যেন অস্বাভাবিক, কেমন যেন ভিজে ভিজে দেখেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম পাঠক-পাড়ার পুরোনো লোকেরা আমাদের বুঝতে পারে না, বোঝার চেষ্টাও করবে না কোনো দিন। ওরা মার গলা নকল করেছিল, তার ছন্দ, তার মাত্রা, তার উত্তাপ কোনোটাকেই নকল করতে পারেনি।

ক্লাস এইটে পড়ার সময় আমাদের ক্লাসের ঘনশ্যাম চট্টোপাধ্যায় (বয়সে সে আমার থেকে অনেক বড়, ক্লাস এইটেই তার ঘন কালো দাড়ি, আর গেঞ্জির উপর থেকে বুকের চুল দেখা যেতো) থার্ড বেঞ্চের বিকাশ সাহার (বিকাশ বরাবর দুটো একই বিষয়, অঙ্ক আর ইংরেজিতে ফেল করে ক্লাসে উঠত—ওর মার্কশীটেও বরাবর ওই একই কথা লেখা থাকত—প্রোমোটেড উইথ ওয়ারনিং) সঙ্গে অফ পিরিয়ডে কি সব কথা বলতে বলতে দাঁত বার করে হাসছিল। বিচ্ছিরি হলুদ দাঁত। আর মাঝে মাঝে আমায় চোরা চাউনি ছুঁড়ে দিচ্ছিল। আমার কেমন যেন মনে হোলো ওরা আমার বিষয়েই কথা বলছে। অন্যদিকে তাকিয়ে ওদের কথার আড়ি পেতেছিলাম। বোধা গলার এক সময় ঘনশ্যাম খ্যাক-খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলে বলে ফেলল কাজল রুদ্রর মায়েদের রূপ দেখেছিস। আমি মার-পিট করতে কখনো পারিনি, আর ঘন-শ্যামের সঙ্গে তো মারপিটের প্রশ্নই আসে না, চেহারায়—বয়সে ও ছিল ক্লাসের মধ্যে সবার বড়। কিন্তু আমার মনের

হাওড়ায় সর্বাধুনিক বস্ত্র বিপণী

বেনারসী ০ জোড় ০ তাঁত ০ সিল্ক ০ মিলবস্ত্র ০ সার্টিং

সুটিং ০ ছিট কাপড় ও তৈরী পোষাক

শ্রীরাম টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম

২৭।২, জি টি রোড (সাউথ) হাওড়া

মধ্যে তখন সারাক্ষণ বড়দি ছোড়দি ভাইয়ের চেহারা ভাসছিল। আমি কোনো দিনই মানসিপট করতে পারতাম না। কারণ আমি ছিলাম দুর্বল, আমি ছিলাম ভীতু। তাই ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময়, পিছন থেকে ঘনশ্যামকে ঘ-ন-শ্যা-ম ছো-ঢো-লো-ক' বলে দৌড়ে পালিয়েছিলাম। পরের দিন ইস্কুলে যাইনি। তার পরের দিনও নয়। ততদিনে ঘনশ্যামের রাগ কমে গেছে। কেবল কয়েকটা গাট্টা মেরেছিলো ও আমাকে।

উনিশ শো পঞ্চাশ সালের পর (অর্থাৎ আমার জন্মের বছর দুয়েক আগে) থেকেই পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছিলো। বাঘাযতীন, গড়িয়া, যাদবপুর, বেহালা অঞ্চলে, এদের একটা বড় অংশ ডেরা বাঁধলো। বাবিটা গেল শিয়ালদা, হালতু, কসবা, দমদমবাগান। এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ল বাস্তুহারা মানুষেরা। যাদের পয়সা ছিল খানিকটা, অথবা প্রভাব প্রতিপত্তি, তারা দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে গিয়েই গাড়ি করলো আগে, বাড়ি, করলো পরে। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, জেদী। তাদের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেয়, ক্রমকালো জামাকাপড় পরে। আরেকটা দল যারা উপর-তলায় উঠতে পারলো না, তার নামলো যতটা নীচে নামা যায়। তাদের মেয়েদের শ্যাপলা-শ্যালুক শরীরে কবরীচা বং, বুনো-গন্ধ। বাজারে তখন অঢেল ইমিটেশন শাড়ি, আর ইমিটেশন গয়না। বাঘা যতীন, গড়িয়া, যাদবপুর, লেক ক্যাম্পের বাস্তব বাঙাল মেয়েরা সেই লোভে রাতারাতি 'কলেজ গার্ল' হয়ে উঠতে লাগলো গড়ের মাঠে, লেকের হাওয়ায়, সিনেমা হলের পাশে। লেক ক্যাম্প, বাঘা যতীন, গড়িয়ার কলোনি এলাকার পুরুষেরা তখন ভাঙাচে রাজনীতি গুণ্ডামী, চাল লুঠ, হিন্দি সিনেমা, ওয়াগান ভাঙা আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে জীবন কাটাতে ব্যস্ত। ঠাকুর্দা আমাদের বেহালার বাড়ির একতলার কখনো থাকতে চাইতেন না। ওটা যে উদ্বাস্তু লোনের টাকায় করা, সে-কথা উনি জীবনে কখনো ভুলতে পারেন নি। দোতলা তৈরী হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে ঠাকুর্দার নিজের পয়সায়। যখনি এদেশে আসতেন দোতলাতেই থাকতেন উনি। আকাশে যে ঘর বাঁধা যায় না, মাটিতেই থাকে তার ভিৎ যে ভিৎ আমাদের ধার করা, নিজেদের নয়—ঠাকুর্দা তা জানতেন না তা নয়। কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল ঘটনার বিপরীতে যাওয়া ঘটনাকে অস্বীকার করা। আমার নাম অতীশ দীপঙ্কর যাথার মূলেও তাঁর ওই একই অহংকার কাজ করেছিলো বোধ হয়।

চিঠিপত্র

মোনা চৌধুরীর ফটো—ক্রিয়েটিভ

শ্রীমোনা চৌধুরীর চিঠিতে জানা গেল, অমৃত পত্রিকায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিটি শুভাপ্রসন্ন তাঁরই তোলা আলোকচিত্র থেকে কপি করেছেন এবং এ জন্য কোনো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়নি। শ্রীচৌধুরীর প্রতিবাদ সংগত এবং উনি নিজেও একটি বিশেষ মাধ্যমে দক্ষ ও প্রতিভাবান বলে এ ধরণের অ-শিল্পী-জনোচিত ব্যবহারে ক্ষুব্ধও। শুভাপ্রসন্নর উত্তর কিন্তু আমাকে বোঝাতে পারেনি। তার শিল্পসংগত কতগুলো কারণ আছে।

প্রথমত শ্রীচৌধুরী কার্বন কপি কথাটি ব্যবহার করেছেন চলতি ভাষায়' ব্যবহারিক অর্থে। যেহেতু শুভাপ্রসন্নর হাতে কোনো বস্তুকৃতি নেই—তাই উনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে সেন্টিমেন্টাল ও একেবারে ভাবালু হয়ে বলে ফেলেছেন, আত্মহত্যা করবেন। শ্রীচৌধুরী ওঁকে এঁকে দেখাবেন কেন? উনি তো ঠিকই বলেছেন, শুভাপ্রসন্নর আঁকাটি একেবারে সাদা বাংলায় নকল লাইন-ড্রইং।

স্বিতীয়ত কোনো ক্ষোভই থাকত না, যদি শুভাপ্রসন্ন শ্রীচৌধুরীর ছবিটিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করতে পারতেন। তা তো উনি করেননি। শুভাপ্রসন্ন একেবারে শ্রীচৌধুরীর প্রত্যক্ষ ব্যবহার করেছেন। ছবিটির একটি নিজস্ব মাত্রা আছে যা শ্রীচৌধুরীর প্রতিভারই গুণে আলোকচিত্র-শিল্পী হিসেবে, ছবিটির কৌণিক সংস্থাপন আলো-আঁধারের সমন্বয় একটি শিল্পী-সত্তার ভেতরের টেনশন অবধি ছেনে বের করে আনে, এমন কি কপালের ফুলে ওঠা শিরায় ক্যামেরার অসামান্য প্রক্ষেপে ছবিটি জীবন্ত, ক্রিয়েটিভ আলোড়ন-ক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। আর শুভাপ্রসন্ন তো এই কৌণিক সংস্থাপন, এই আলো-আঁধারের বৈপরীত্য আর কপালের শিরার ঐ অসামান্য টেনশনকেই চলকোল ড্রইং-এ ব্যবহার করেছেন মাত্র। কোনো নতুন মাত্রা তো ফুটে বেরোয়নি। তাহলে শুভাপ্রসন্ন যে বিদেশী উদাহরণ দিয়েছেন, তা তো নিজেই শিল্পী হিসেবে পালন করেননি। আমি নিজে শ্রীশর্বরী রায়চৌধুরীকে দেখেছি, গোলাম আলি সাহেবের পোর্ট্রেট করেছেন, পরিচিত ছবিও ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর সেই মুখাবয়ব সেই সব কিছুকে ছাড়িয়ে অন্য একটি মাত্রা ছুঁয়ে যায়। নামকিংকর তো অনেক এঁকেছেন—তাতো সেই বাস্তব অবলেকটে আটকে যায়নি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়—সেই শিল্পকর্ম তার তথ্যসীমা ছাড়িয়ে গেছে। শুভাপ্রসন্নর আঁকা কিন্তু সেই মাত্রা ছোঁয়নি। কিছুতেই না। শিল্পগতভাবেই নয়। শিল্পগতভাবে শ্রীচৌধুরীর ছবিটির ক্রিয়েটিভ ফোটোগ্রাফ, শুভাপ্রসন্নর দক্ষ ক্যাফটসম্যানের স্বাক্ষর রেখেছেন ভালো নকল করে।

শ্রীমোনা চৌধুরীর ছবিতে একটা শিল্পিত মনের পরিচয় থাকে, উনি নিজের মাধ্যমে যথেষ্ট প্রতিভাবান। শুভাপ্রসন্নও তাই। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি শুভাপ্রসন্নর যুক্তি মানতে পারলাম না। নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পসম্মত রুচিবোধে তিনি শ্রীচৌধুরীর কাছে পরাজিত।

সিদ্ধার্থ রায়
কলকাতা—২

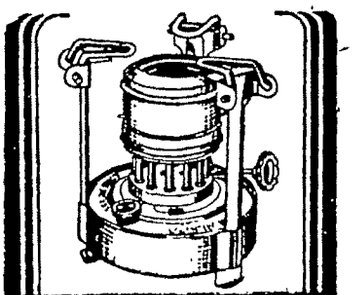
নির্ঝঞ্ঝাটে রান্না সারতে
লাক্সটেক্স
নীল শিখার কেরোসিন কুকার
১) স্টোভ ফাটবার কোনো সম্ভাবনা নেই।
২) তৈয়ারীর গুণাগুণ সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
৩) প্রতিটি অংশই আলাদা পাওয়া যায়।
পরিবেশক:
ভেনাস এজেন্সীজ
৬, আমড়াতলা স্ট্রীট • (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০১ • ফোন: ৩৪-৬৫৭৩

শিল্পীসত্তার দেউলিয়াপনা

১২ মে ১৯৭৮ তারিখের অমৃতর পাতায় প্রখ্যাত আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীমোনা চৌধুরী এবং বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীশুভাপ্রসন্নর মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক বাক-বিতণ্ডা সত্যিই পীড়াদায়ক। শ্রীশুভাপ্রসন্নর ছবি একাধিক প্রদর্শনী ও সাময়িকীর পাতায় শ্রীচৌধুরী নিশ্চয়ই দেখে থাকেন এবং শুভা-প্রসন্নর মৌলিকত্ব ও অনুভব করেন। যখন তিনি ব্যক্তির সূত্রে বলেন বিদেশের বিভিন্ন দেশে যখন উনি গেছেন তখন

নিশ্চয়ই বড় শিল্পী' তখন শ্রীচৌধুরীর শিল্পী সত্তার দেউলিয়াপনা নগ্নরূপ ধারণ করে।

অমৃতে আঁকা প্রচ্ছদ শুভাপ্রসন্নবাই, তিনি শ্রীচৌধুরীর সযত্নে সংরক্ষিত নেগেটিভ কিংবা তারাশংকর বচনাবলীর ফোটোগ্রাফীর কাটিং কোনটাই ব্যবহার করেননি।

ক্যামেরার দক্ষতা এবং কাঠকয়লার প্রতিকৃতি আঁকা (ফটোগ্রাফী দেখে হলেও। অনুশীলন আর প্রতিভার দুটি ভিন্ন ব্যাকরণ। তাই এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা না বাড়িয়ে তিক্ততা এড়ানোই ভালো।

সুদর্শন দলুই
৪৪।১। শ্যামনগর রোড,
কলকাতা-৭০০-০৫৫

শিল্পীর পক্ষে বেমানান

অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকার ৯ জুন ১৯৭৮ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে আলোকচিত্রশিল্পী মোনা চৌধুরী ও চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্নর দুটি চিঠি পড়ে অমৃতের নিয়মিত পাঠক ও একজন শিল্প প্রেমিক হিসাবে, সংক্ষেপে দু-চার কথা লিখলাম।

মোনা চৌধুরী ছবিটি ক্যামেরায় তুলেছেন এবং সেই ছবি দেখেই অবিকল তেমনি একটি ছবি কাঠকয়লায় এঁকেছেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। আঁকার প্রয়াস কিভাবে তিনি পেয়েছেন তা তাঁর শিল্পী মনই জানে, সেখানে কারও আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু খারাপ লাগছে এটা বেনে যে উনি সহজ মনে সোনা চৌধুরীর যুক্তি (ক্ষোভও বলা যায়) মেনে নিতে পারলেন না। উপরন্তু জটিল বাক্যের অবতারণা করে আপন পান্ডিত্য প্রকাশ করেছেন—যেটা একজন সহজাত শিল্পীর পক্ষে একেবারেই বেমানান মনে হয়। মোনা চৌধুরী তাঁর চিঠিতে এক জায়গায় বলেছেন, চলতি ভাষায় যাকে বলে লাইন ধরে কার্বন কপি। এ বিষয়ে শুভাপ্রসন্ন-বাবু একেবারে ধৈর্যহারা হয়ে বাগাড়ম্বর করে ফেলেছেন। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীর কলম থেকে এটা বেরিয়ে আসা মানে কি শিল্পের অবমাননা করা নয়?

অসিতবরণ পাল
বালসী, বাঁকুড়া।

নিজেই হেয় হয়েছেন

অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি বিষয়ক প্রতিবাদও প্রতিবাদ খন্ডন (৯ জুন সংখ্যা) বেশ মজা করে উপভোগ করা গেল। এটা আসলে আলোকচিত্রশিল্প বনাম চিত্রাঙ্কন শিল্পের লড়াই। এই বাক-বিতন্ডাটিতে যতখানি অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য আছে, ততখানি গুরুত্ব আছে কিনা সেটাই লক্ষণীয়।

মোনা চৌধুরীর নতুন দক্ষ আলোক-চিত্রীর তোলা ফটো নিখুঁত হবেই। কিন্তু

আমাদের প্রচ্ছদ

প্রতিকৃতিটি কার, তারাশংকরের তো? তাহলে অপর একজন চিত্রশিল্পী যদি স্মৃতির দুর্বল পুঁজি সম্বল না করে, নিখুঁতভাবে তারাশংকরের প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে আলোকচিত্রটির সাহায্য নেন তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে? মোনা চৌধুরী ওই ফটোগ্রাফটির নেগেটিভটির মালিক হতে পারেন, কিন্তু একটি বিশেষ ভঙ্গিমা এবং প্রকৃত অবয়বের মালিকও তিনি এটা ভাবছেন কি করে। উত্তেজিত হয়ে কার্বন কপি বলে ফেলে শুভাপ্রসন্নকে হেয় করতে গিয়ে নিজেই অনেকটা বিব্রত হয়ে পড়েছেন।

শুভাপ্রসন্নের-এর উত্তর দেওয়ারই কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা তাঁর বিনয়। আলোকচিত্রের লাইন ধরে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকৃতি আঁকা হয়ে থাকে, হচ্ছে হবেও। এটা স্বাভাবিক। জানতে ইচ্ছে করে, আলোকচিত্রীর নাম স্বীকার করে চিত্রাংকন করার দু-একটা উদাহরণ মোনা চৌধুরী দিলেন না কেন? সমীরণ ঘোষ, ৩৯, সূর্য-নগর, শিলিগুড়ি।

বিচারের ভার পাঠকের হাতে

গত ১২ মে ৭৮ অমৃত পত্রিকার প্রচ্ছদে কাঠকয়লায় আঁকা স্বর্গত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছবিটির জন্য আমার প্রতিবাদের উত্তরে শিল্পী শ্রীশুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় ৯ জুন ৭৮ সংখ্যার অমৃতে অনেক কথার ফাঁকে ফাঁকে স্বীকার করেছেন—ছবিটি তারা-শংকর রচনাবলীতে মুদ্রিত একটি হাফটোন ছবি থেকে আমি কাঠকয়লায় আঁকি। তাতে আপনার মনের মাধুরী মিলিয়ে অন্য কিছু করা মনে করিনি। 'পরে জেনেছি ছবিটি পত্র লেখকের ক্যামেরায় তোলা।' ইত্যাদি।

আমার প্রশ্নের জবাব তো পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার ন্যায্য স্বীকৃতি না দেবার যুক্তি তাও মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু কার্বন কপি কথার অর্থে বিদ্রূপ-পূর্ণ বাক্যটির জন্যই এই চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি, না হলে চিঠি লেখার সময় ও ইচ্ছা আমার ছিল না।

শিল্পী শুভাপ্রসন্নবাবুকেই সোজা-সুজি উত্তর দিচ্ছি—হ্যাঁ আপনার ভাষায় কার্বন কপির অর্থ আমি জানি না, অথবা আমি কার্বন কপি অর্থে যা বলেছি তার অর্থ বোধহয় আপনি পরিষ্কারভাবে বোঝেন নি। আচ্ছা শুভাপ্রসন্নবাবু শুধুমাত্র কার্বন পেপার অথবা টেসিং পেপার চাপিয়ে কপি করলেই কি কার্বন কপি বলা হয়? লাইন ধরে কোন প্রতিকৃতি কপি (প্রয়োজন মত ছোট-বড় করে করা কে কি আমরা চলতি কথায় কার্বন কপি বলি না? এই কথাটার ওপর আপনার এত অভিমান হোল কেন? আপনি যে কাঠকয়লায় অমৃতের ১২ মে ৭৮-এর প্রচ্ছদে যা এঁকেছেন তার প্রতি তো আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই—কারণ সেটাতো আমার তোলা ফটোগ্রাফেরই লাইন ধরে কাঠকয়লায় আঁকা ড্রইং। কার্বন কপি কথাটা? সেটা বিচারের ভার না হয় তুলে দিলাম অমৃত পত্রিকার সহস্র সহস্র পাঠক-পাঠিকাদের হাতে যাঁদের অনেকেই হয়ত মিত্র-ঘোষ প্রকাশিত তারাশংকর রচনাবলীর ২য় খন্ডে আমার তোলা আর্ট পেপারে মুদ্রিত ছবিটি দেখেছেন অথবা দেখবেন। কারণ ৯ জুন ১৯৭৮ অমৃতে ছবিটি নিম্নশ্রেণীর প্রিন্ট-এ ছাপা হওয়ায় ছবির চরিত্রটি যথা-যথ বুঝতে পারেননি সবাই।

মোনা চৌধুরী
কলকাতা—৭০০০০৫

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক
• তাঁত
• মিল
• পোষাক
• সার্টিং
• সুটিং
ও ছিট কাপড়

বাঁশিওয়ালা

একরাম আলী

[এক]

এখনও কোনো তরুণী যদি হঠাৎ গুন গুন করে ওঠে 'কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল', তাহলে অন্ততঃ একমুহূর্তের জন্যও এই দুরন্ত কলকাতা শহরে বসেই যাঁর কথা আমার মনে পড়ে, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মতো সফল বংশীবাদক পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেই-বা আছেন। বাঁশের তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রটির চিরকালীন সর্বস্বও তাঁরই। আর, সেই ছোটবেলায়, গ্রামে থাকার সময়, বাড়ির লোক-জনদের লুকিয়ে আমরা যে-গান সর্বদা গাইতাম, সেটা ছিল 'যাবলাবনের ধারে ধারে বাঁশি বাজায় কে।'

আমাদের ছোটবেলায় পরপর তিন বছর ভয়ংকর অনাবৃষ্টির ফলে বীরভূমে হাহাকার দেখা দিয়েছিল। খাবার সময় তরকারী পছন্দ না-হলে কথায় কথায় মায়েরা বলতেন, 'লোকে ভাতই খেতে পায় না। তোরা তো তরকারী-ও পাচ্ছিস।' আবার 'ভালোমন্দ ?'

গাঁয়ের বহু লোকজন কোথায় কোথায় চলে গেল। যারা রইলো, তাদের চলাফেরায় বেশ সতর্কতা ফুটে উঠতো। অবশেষে না-পেরে ক্ষ্যাপা সমেদ আলিও চলে গেল বর্ধমান জেলায়। তারপর বৃষ্টি পড়তে একে-একে ফিরে এলো সবাই। কেউ এক বছর, কেউ দু' বছর, কেউ আরো তারও বেশীদিন দূর জায়গায় কাটিয়ে যখন গাঁয়ে ফিরলো, তখন গল্পগুজব আর শেষ হতে চায় না। হঠাৎ এক দুপুরে সমেদ আলিও ফিরে এলো। চেহারাই পাল্টে গেছে। মাথায় বাবরি চুল। পায়ে কেথা থেকে জোগাড় করা চটিজুতো। গায়ে নতুন কেনা হাত-কাটা গেঞ্জি। পরনে ধোলাই ধুতি। আর, ডান হাতে ধরা একটি তেল-চকচকে বাঁশি। সেই যে বাঁশি হাতে গাঁয়ে ঢুকেছিল সে, তারপর সেটা আর ছাড়ে নি। সে-ই আমাদের জীবনের বাঁশিবাদক।

আক্ষরিক অর্থে পাগল ছিল বলে তার নামই হয়ে গিয়েছিল ক্ষ্যাপা। অকৃতদার এই মাঝবয়সী মানুষটি বাঁশি-হাতে গাঁয়ে আসার পর, বাঁশি-সংক্রান্ত নানা গল্প আমরা সেই ছেলেবেলাতেই শুনতে পেয়েছিলাম। বাঁশি নাকি ঠিকমতো বাজাতে পারলে, কতো কি হয়ে যেতে পারে। কোথাকার এক বাগ্‌দী যুবক শুধুমাত্র বাঁশি বাজিয়েই নাকি এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে ভরসন্ধ্যায় বাড়ি-ছাড়া করেছিল। মোটকথা, সেই বয়সেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, বাঁশি শুনলে নায়িকা-তুল্যা মেয়েরা আর স্থির থাকতে পারে না। তবে, সেরকমভাবে বাজানো চাই।'

আমাদের ক্ষ্যাপা বাজাতো সন্ধ্যাবেলায়। বিকেলে স্নান করে গায়ে-মাথায় বেশ করে তেল মাখত সে। বাঁশিকে-ও মাখাত। তারপর গাঁয়ের বাইরের পুকুরপাড়ে বসে বাঁশিতে ফুঁ দিত। গ্রীষ্মকালের অনেক সন্ধ্যায় তার বাঁশি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের শুনতে হয়েছে। একটি সুর তার আয়ত্তে ছিল। এখন বুঝতে পারি, সেটা ছিল কীর্তনের সুর।

আমরা প্রায়ই মনে করতাম, এবার বোধহয় ক্ষ্যাপার একটা কিছু হয়ে যাবে। কিন্তু, কোনোদিনই তার কিছু হয় নি। গাঁয়ে এতো যে ঝুমুর ও লোটা গান হত, কেউ তাকে ডাকত না। সে নিজেই শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকত সব সময়। তখনও তার হাতে বাঁশি। পুরো ব্যাপারটা এখন অবিশ্বাস্য মনে হয়।

বাড়িতে তার একমাত্র মা ছাড়া, আর কেউ ছিল না। পরে, প্রতিবেশীদের আত্মীয়সুলভ পীড়নে তাকে বিয়ে করতে হয়। এরকম ঘোরপ্যাঁচে পড়েও কোনোদিন তার বাঁশি বাজানো বন্ধ হয়নি। কোনো গানের আসরে তার জন্য স্থান ছিল না। নায়িকাতুল্যা কোনো তরুণীও তার বাঁশি কোনোদিন শুনবে না। তবু প্রতি সন্ধেবেলা কেন সে ও-রকম করে বাজাতো ?

যে বছর ক্লাস ফোরে উঠলাম, সেবছর বাবা কোনো কাজে কলকাতা এসে আমার জন্য একটা চমৎকার টিনের রথ কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটাকে জাহাজ ভেবে পুকুরে ভাসাতে গিয়ে দেখি, বড়বড় করে তলিয়ে যাচ্ছে। অনেকটা জল। তখনো ভালো সাঁতার জানি না। এরকম আনকোরা একটা সাঁতা খেলনা চোখের সামনে ডুবে যাচ্ছে দেখে প্রবল চেঁচামেচি করা স্বাভাবিক। কিন্তু শীতকালের

দুপুর বলে সবাই ধানের কাজে ক্ষেতে-খামারে ব্যস্ত। হঠাৎ কোত্থেকে ক্ষ্যাপা এসে ব্যাপার দেখে হুড়মুড় করে জলে নেমে পড়ল। যখন উঠে তার হাতে-ধরা বর্ণবহুল রথ থেকে টুপ টুপ করে জল ঝরছে। সে দাঁড়িয়ে চুলের জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'সিউড়ির মেলাতে একটা বাঁশি কিনব। পয়সা দিও।'

একদিন সকালে ক্ষ্যাপাদের বাড়ি থেকে প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। গিয়ে দেখি, হুলুস্থুলু কাণ্ড। সারা গাঁয়ের লোক ঐ ছোট উঠোনে ধরছে না। কোনোমতে সামনে গিয়ে ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে একছুটে পালিয়ে এসেছিলাম। পরে, সমস্ত ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শুনতে পাই। গত রাতে ওদের বাড়িতে খাবার হয়নি। গোঁক গোঁক করতে করতে ক্ষ্যাপা কিছু না বলেই শুয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে মুড়ি চাইতেই মা এবং বৌ দুজনেই বকতে শুরু করে। সারাদিন টই-টই করে ঘুরে বেড়ালে যে খেতে পাওয়া যায় না, বুঝতে গিয়ে, না-পেরে, ক্ষ্যাপার মাথা গরম হয়ে যায়। তারপর, যা হবার তাই হয়েছে।' মা এবং বৌকে প্রচণ্ড মারধোর। অবশেষে, হাতের কাছে একটা ভাঙা কুড়োল পেয়ে, সেটাকে মায়ের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। প্রচণ্ড রাগ ছিল বলে ঠিকমতো ছোঁড়া হয়নি। মাথার বাঁ-দিক ঘেঁষে বেশ-কিছুটা চামড়াসহ কুড়োলটা বেরিয়ে যায়। ফলে রক্তারক্তি।

এই বীভৎস দৃশ্যটি দেখার পর বেশ কিছুদিন লোকটার দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারিনি। দেখলেই ভয় পেতাম। তখন সে বাস্তবিকই স্বাস্থ্যবান ছিল। অথচ, গাঁয়ের বাইরে যখন সবাই মিলে তালপাতার বেড়া দিয়ে লোটোগানের আসর তৈরী করত, তখন দূর থেকে ঐরকম স্বাস্থ্য নিয়েও কাঙাল-সে দাঁড়িয়ে থাকত বাঁশি হাতে। খালি গা, খাটো ধুতির ওপর তার কোমরে হতকুৎসিত মাফলার বাঁধা। অসহযতার প্রতিমূর্তে সে কোনোদিন আসরে বসে বাঁশি বাজানোর সুযোগ লাভ করে নি।

।। দুই।।

এতোদূর অব্দি লিখে আমারই সন্দেহ হচ্ছে যে, ব্যাপারটা উপন্যাস হয়ে যাচ্ছে না তো। পাশেই তমালের হ্যাবিসন বোড। মধ্য-রাতেও দু-ধারের বাড়ি কাঁপিয়ে ছুটে যায় কর্পোরেশনের লরী। সকালেই হয়তো রাস্তার ওপার থেকে হেমন্ত এসে কোনো বিদেশী ছবি দেখার প্রস্তাব রাখবে। বা, দিনকয়েক আগেই ধ্রুবকে দেখলাম কলেজ স্ট্রীট এলাকায়। চমৎকার পালওভারের দৌলতে আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে। হেসে বলেছিল, 'আলাপ করিয়ে দিই, এ-হচ্ছে বেবা।' বলে বেশ চতুর মুখে সিগারেটে টান দিয়েছিল সে। ধ্রুব সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে। কখনো চটি পরে না। তার চুল কখনো ছোট-বড় হতে দেখিনি। সবসময় একইরকম। বেবার বাবা দিল্লীতে থাকেন। কলকাতার দাদার কাছে থেকে লেডি ব্রাবোর্নে আর্টস পড়াটা তার উপলক্ষ্য। আমাকে বিদায় দিয়ে তারা খলবল করে হেঁটে গেল বাস স্টপের দিকে। তখন রাত সাড়ে আটটা। এরই মধ্যে শেয়ালদা পর্যন্ত সারা ফুটপাত লোকের বিছানা হয়ে গেছে। আমার মেসের দরজা বন্ধ হয় বারোটার পর। অথচ, আমাদের গ্রামটা ততক্ষণে দুটো ঘুম পার হয়ে তৃতীয় ঘুমের দিকে ঢলে পড়েছে। সকাল হলেই সেখানে আরম্ভ হবে নানা কচকচি। কারো জমি থেকে ধান চুরি গেছে। কারো গমক্ষেতে অসময়ে জল ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। বাসাধনিক সার কেনার জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে কী-করে ঋণ বের করা যায়, তাই নিয়ে সারা সকাল চিন্তা করবে আমারই সমবয়স্ক কোনো তরুণ। এসবের সঙ্গে ক্ষ্যাপা সমেদ আলির যোগসূত্র খুঁজে বের করা কঠিন। যদিও কখনো কখনো সে ক্ষেতে কাজ করত হালের বুড়ো গরুটা কখন কিনিং করা উচিত—সে জানত, তবু সে ছিল অন্যরকম। তার হাতে ছিল ধ্বংস-নামক সর্বনাশা হাওয়া।

তখন আমাদের মতো যারা গ্রামের ছেলে, শহুরে অর্থে তাদেরকে ন্যালাক্ষ্যাপা বলা যায়। কিন্তু জীবন আমাদের শুরু হয়েছে খুবই কম বয়সে। আমার বয়স যখন আট-নয়, বন্ধুদের অনেকেই তখন ক্ষেতের কাজে কারাকে সাহায্য করত। যে-ছেলে দৈহিক পরিশ্রম করে দুবেলা খায়, তার বয়স আট বছর হলেও, অনেক ব্যাপারেই সে বয়স্ক হতে বাধ্য। ফলে, সেই বয়সেই আমাকে বিড়ি খাওয়া শিখতে হয়েছে। বাড়ি থেকে পয়সা চুরি করে কোনো-কোনোদিন বন্ধুদের সিগারেট খাওয়াতাম। প্যাকেটের ওপর একটা সাহেবের ছবি থাকত। মাথায় টুপি। মুখে আধপোড়া সিগারেট। তার ধোঁয়ায় আমাদের ছেলেবেলার অনেকখানি দেখা যায় না।

আমাদের গাঁ থেকে পুরন্দরপুর দু মাইল দূরে। একটা ছোট্ট বাজার। তখন শুধু একটা হাই স্কুলই ছিল পুরন্দরপুরের নতুন আভিজাত্য। কিন্তু, আসল ব্যাপারটা ছিল অন্য জায়গায়। মাঘ মাসে সেখানে একটা মেলা হত। নাম, গোঁসাই মেলা।

গাঁ থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা বটগাছ পড়বে, সেখানে ডানদিকে ঘুরে আবার বাঁদিকে এগোলে সাঁওতাল পাড়া। তারপর সোজা গেলেই ছোট্ট নদী। সেখান থেকে সোজা উঠে গিয়ে প্রথমে ডানদিকে, তারপর বাঁদিকে ঘুরে অল্প বেঁকে গেলেই পুরন্দরপুর। তখন আমরা এতোই ছোট যে, ফাঁকা মাঠের ওপর পাড়-খাকা পুরন্দরপুর যাবার ধুলো-ভর্তি একমাত্র রাস্তাটা এভাবেই চেনার চেষ্টা করেছি।

দিনের বেলায় বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের গুণে গুণে একটা গোবরের গাড়িতে ভরে মেলায় এক-চক্কর ঘুরিয়ে আনা হত। ঘোরা শেষে একটা খাবারের দোকানে বসিয়ে বাশি বাশি রাজভোগ, লাপচা খাওয়ানোর সরকারী অনুষ্ঠান পালন করতেন বড়ির বড়বা। তারপর সন্ধের আগেই গুণে গুণে আবার গাড়িতে তুলে বাড়ি। সারা গোবরের গাড়ি তখন কলরব করত। বাঁশি, ঢোল, পুতুল—এ-জাতীয় খেলনার শব্দে বড়রা একেবারে হারিয়ে যেতেন।

ছোটদের মেলা দেখার এ-ছিল সরকারী ব্যবস্থা। সে-কারণে এ-ব্যবস্থায় আমাদের খুশি থাকার কথা নয়। সকাল সকাল খেয়ে সন্ধের পরই আমরা বুকিয়ে বেরিয়ে যেতাম। বুঝতে পেরে, বাধ্য হয়ে, কাউকে ডেকে মাঝেরা আমাদের অভিভাবক নির্বাচন করে দিতেন। একটা কি দুটো টাকাও জুটে যেত প্রত্যেকের।

সেবার মেলা বেশ সরগরম। দু দলের প্রতিযোগিতামূলক লোটো গান। বড়রা বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এ-নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। সেখান থেকে দু-একটা নামও আমাদের কানে এসেছিল। এবার নাকি দু দলেই বিখ্যাত সব গাইয়ে-নাচিয়েরা আসছে। আবুল, বাচি, কেরামত, সাহেব—লোটো গানের সব সুপার স্টার। বিড়িটা নির্ভাবে সাজঘরের ভেতর থেকে 'নাইবা রে' বলে টান দিয়ে একদমে আবুলকে আসতে আসতে পরে অনেকবার দেখেছি। পরণে ধুতি আর হাফ-হাতা সার্ট। কোমরে লাল রঙের নাইলনের ওড়না গামছার মতো বাঁধা। নাচের তালে ঘুরলেই মাথার বাবরি চুলে দোলা লাগত। আবুল বাস্তবিকই তখন একনম্বর গায়ক। এবং তারপর আর কেউ একনম্বর গায়ক হতে পারেনি। কেননা, সেটাই ছিল লোটো গানের স্বর্ণ ও শেষ যুগ। অনেক পরে আমরা তা জানতে পারি।

মেলায় ঢুকে প্রথমেই আমরা গেলাম লোটো দলের সাজঘরের দিকে। দু-মাইল হাঁটার ক্লান্তি আমাদের একেবারেই কাবু করতে পারেনি। তালপাতা-ছাওয়া সাজঘরের দরজায় প্রচণ্ড ভিড়। কোনোমতে একে তাকে কাটিয়ে ভেতরে ঢুকেই অবাক। পেট্রোম্যাক্সের উজ্জ্বল আলোর সামনে ছোট আয়না ধরে একটা মেয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক ঘসছে আর মাঝে-মাঝেই টিনের সুটকেসের ওপর থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে টান দিচ্ছে। লাল শাড়ি,

লাল ব্লাউজ, অকারণে মাথায় লাল ওড়না। সারা শরীরে পাউডারের ছুটোছুটি। কোথাও বেশি, কোথাও কম। গা-সম্পর্কে আমার এক দাদা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ব্যাটাছেলে।'

কান না দিয়ে আমি তখন সেইদিকেই চেয়ে আছি। ব্লাউজ, শাড়ি, ওড়না—সবেতেই অজস্র চুমকি বসানো। বিলিতি আলোর সামনে তার আগুন ঝকমক করছে।

ওদিকে একটা লোক তখন লুঙ্গি ছেড়ে সায়া পরছে। আমাদের দিকে পেছন করে। তার পাশে বসে একজন একটা ছোট্ট কলকে থেকে আগুন বের করার কাজে ব্যস্ত। বাইরে প্রচণ্ড লোকজনের ভিড়। হৈ-চৈ। আসর থেকে শ্রোতাদের ধৈর্যহীন চিৎকার। একটু পরই একটা লোক ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে 'কেরামত কই, কেরামত' বলে একটা বড় টিনের বাক্সের ওপর বসল।

সাজঘরের পেছনে পুকুর। সেইদিকে একটা ছোট্ট দরজা। সেদিক দিয়ে এক তরুণ ঢুকতেই লোকটা বলল, 'এই যে, লোকজন হৈ-চৈ জুড়েছে। এবার তো আসরে বসতেই হয়।'

তরুণ টি বলল, 'আমাকে নিয়ে অস্থির হতে হবে না। আর সব রেডি?'

একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে সে তার বাঁশি বের করল। দুটো খণ্ডকে জোড়া দিয়ে বেশ লম্বা হয়ে গেল বাঁশিটা। নাম, ফ্লুট। আমরা বলতাম ফ্লুটবাঁশি। ওটার যে আরও ভয়ংকর সাহেবী নাম আছে, তা কি আর জানতাম! অনেক পরে ক্লারিওনেট শব্দটা শুনি। কোনো অন্যায় করিনি বলেই তো মনে হয়।

লোটোগানে কোনো মেয়ে থাকে না। যেসব ছেলেরা মেয়ে সেজে নাচত-গাইত, তাদেরকে বাঈ বলার চল ছিল। যে-দলে যত বেশি বাঈ, সেই দল তত বড়। সেবার দুই দলেরই সাতটা করে বাঈ ছিল। বেশ বড় দল।

তার মধ্যে একটা দলের সাত-সাতটা ধুমসো জোয়ানকে নাচানো-গাওয়ানোর প্রধান দায়িত্ব ছিল কেরামতের বাঁশি। সেটা একটু পরই বুঝতে পারি।

॥ তিন ॥

এই কেরামত আলিকে তারপর থেকে বরাবর দেখে আসছি। বাঁশিবাদক হিসেবে। একটু বেঁটে। গায়ের রঙ চাপা। বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে নিচের ঠোঁটটা সাদা হয়ে গেছে। তাঁকে যখনই দেখি, তখনই তিনি ধুতি, ফুলহাতা শার্টের ওপর কোট ও গলায় মাফলার জড়িয়ে আছেন। প্রকৃতপক্ষে, শীতকালেই তাঁকে দেখা যায়। বাইরে থেকে দেখে তাঁকে খুবই উদ্‌ভ্রান্ত বলে মনে হয়। যেন, ঠিক কী করা উচিত—তিনি বুঝতে পারছেন না। সে-কারণে, একদার পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল সর্বদা এলোমেলো।

লোটোগানের জগতের শ্রেষ্ঠ বাঁশিবাদক হিসেবে ঐ অঞ্চলে তাঁর ঘোরাফেরার মধ্যে কোনোরকম সংশয় ছিল না। আমাদের গাঁয়ের ক্ষ্যাপা সমেদ আলিরও স্বপ্ন ছিলেন তিনি। কতো কি হওয়ার কথা ছিল তাঁর! অন্ততঃ, সেইরকম আমরা মনে করতাম তখন।

তার কিছুদিন পরই আমি ক্লাশ ফাইভ-এ ভর্তি হয়ে হোস্টেলে ঢুকে পড়ি। যাকে বলা হয় উচ্চশিক্ষার্থে, তাই। পড়াশোনা করে যাচ্ছি আর তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা পাই কেরামতের। এ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষে হয়তো মামাবাড়ি বেড়াতে গেছি, পাশের গাঁয়ের ছেলেরা তখন নাটক করছে 'ক্ষয় রোগ'। বাঁশিবাদক হিসেবে কেরামত হাজির। মাসতুতো দাদা একবার [illegible] থেকে 'নাচঘরে'-এর পার্ট আওড়ে মাচ্ছে সমস্বরে। 'কোতল করব' কথাটা খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে শেখার জন্য কতো কসরৎ করতে হচ্ছে তাকে। নিশ্চিত যে, অভিনয়ের দিন কেরামত গায়ে হাজির হবেনই।

এসবের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গুজব শুনি যে, বেডিওতে কেরামত ঢুকে পড়ছেন। এবার ওঁর বাঁশি 'আকাশবাণী কলকাতা' থেকে নিয়মিত শোনা যাবে। বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কখনো তিনি এ-বিষয়ে কিছু বলেননি। তার ফলে, আমরা সহজেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছিলাম। অবশ্য, মনে মনে চাইছিলামও যে, বেডিওতে বাজালে বড় ভালো হয়।

এই গুজবটি সযত্নে আমিও বহু জায়গায় ছড়িয়েছি। ছড়াতে ছড়াতে নিজেই একদিন বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম যে, হয়তো উনি বেডিওতে বাজাচ্ছেন।

এই সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসীমামী' নামক একদা-বিখ্যাত গল্পটি আমি পড়ি। তার কিছুদিন পরই কেরামত আলির সঙ্গে দেখা। সাইকেলে চড়ে সিউড়ি এসেছেন কিছু কেনা-কাটা করতে। রাত জেগে বাঁশি বাজিয়ে শরীরের তারুণ্য আর নেই। পোষাক কিছুটা মলিন। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। সিগারেট ধরিয়ে সাইকেল নিয়ে সেই যে চলে গেলেন, তারপর থেকে আর কখনো তাঁকে কোনো আসরে দেখিনি। ততদিনে সিউড়িতে বসেই বাংলাদেশের বহু বিখ্যাত সংগীত-শিল্পীকে আমি দেখে ফেলেছি।

॥ চার ॥

শুনেছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে বসে বাঁশি বাজাতেন। বাঁশের বাঁশি। 'দিবারাত্রির কাব্য' যখন লেখেন, তখন তাঁর গালে প্রচুর মাংস। আস্তে আস্তে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তাঁর শরীর। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুসুম যখন শশীর ছোট্ট জানালায় তার সংসার-ছাড়া মুখটি তুলে ধরে, তখনও কি বাঁশিটি মানিকের হাতের কাছে ছিল! কেন বাজাতে পারেননি? এর উত্তর একটাই হতে পারে যে, প্রতিভাই তাঁকে বাধা দিয়েছিল।

এই কয়েক মাস আগে কেরামতের সঙ্গে দেখা। পুরন্দরপুরে। আরো বয়সের ছাপ পড়েছে। কাঁচাপাকা চুলে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। বললেন, 'এখন আর বেশিক্ষণ বাজাতে পারি না। হাঁফ ধরে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে কোনোরকম আশাভঙ্গের সুর ছিল না। খুবই সহজে হাত নেড়ে বলতে বলতে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলেন। সেই ব্যস্ততা। উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুখ-চোখ। যেন, পেছনে অনেক লোকের ছায়া তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

সাজঘরে আঁচল দুলিয়ে বাঈরা ঘোরাফেরা করছে। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বয়্যাল পোষাকের সিরাজদ্দৌলা টিনের তোরঙ্গের ওপর বসে চা-পাউরুটি খাচ্ছে। কচিবাঈ আসরে ঘুরে ঘুরে হাত-পা নেড়ে গাইছে 'মধুমালতী ডাকে আয়।' আমাদের গাঁয়ের একটা লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে আবুল। ভুলেই গেছে, তার আসরে ঢোকার কথা। হঠাৎ কেরামতের বাঁশি বিচিত্র সুরে বেজে উঠল। আবুলের টনক নড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেইখান থেকেই গলা ছেড়ে ধরল, 'মনভ্রমরা রে.....।'

এই ছিল কেরামতের জগৎ। এর বাইরে যখনই কেরামতকে দেখেছি, তখনই তিনি একটু অন্যরকম। ছেলেকে জেলা স্কুলে ভর্তির জন্য চেষ্টা করছেন। প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। বা, বাজারে এসেছেন কিছু কেনাকাটার জন্য। কিছুটা মলিন। হাতে সাইকেল। যেন এই মুহূর্তে ঠিক জায়গায় না-পৌঁছুতে পারলে বিরাট একটা কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে।

অথচ, অমলের বোনের কথা ধরা যাক। পাকে চ্যান্সডাঙনে। যেদিন ওদের বাড়িতে আড্ডা মারতে মারতে সন্ধ্যা হয়ে যায়, সেদিন ওদের দরজায় বিরক্তি থামতে দেখি। প্রকাণ্ড সেতারটা হাতে নিয়ে কোনোমতে ঘরে ঢোকে দাঁড়ায়। রাসবিহারী

এ্যাডেন্যার কোথায় যেন শিখতে যায়। ঘরে ঢুকেই লজ্জায় একটু হাসে। সেতারটা বেখে বলবেই, 'বাব্বা, এখনো তোমরা আড্ডা দিয়ে যাচ্ছো!' কিম্বাপদে ও-কার যোগ করে বলাই ওর অভ্যাস। একটু পরই চা নিয়ে এসে বলবে, 'এই শেষ রাউন্ড। চটপট খেয়ে উঠে যাও।'

শোনা যাচ্ছে, দীপ্তি দু-বছরের মধ্যেই মণ্ডে বসবে। তার ফলেই হয়তো ওর চমৎকার বিয়ে হয়ে যাবে। পরে, ওর ছেলেমেয়েরাও মায়ের জন্য কি একটুও গর্ব করবে না?

এর একটা বিপরীত ঘটনার কথা বলা যাক। একবার এক মাসিমার বাড়ি গেছি বেড়াতে। তখন, আমি স্কুলের প্রথমদিকের ছাত্র। মাসতুতো দাদা সদ্য কলেজ শেষ করে বাড়িতে বসে আছেন আর নিজের গাঁয়ের সবদিকটা ঘুরেফিরে দেখছেন। তাঁর মাথায় ঘুরছে, কী করে গ্রামে একটা ভালো ক্লাব করা যায়। ছোটখাট একটা লাইব্রেরীও খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। খেলাধুলো, নাটক করা—এসবের কথা ভেবেই বাড়ির অন্ন ধ্বংস করছেন। অর্থাৎ, গঠনমূলক কাজে তখন তাঁর খুবই উৎসাহ। অতিদ্রুত লোকের মুখে ক্ষ্যাপা-প্রসিদ্ধি লাভ করে ফেলেছেন তিনি। আমি যখন যাই, তখন নাটকই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। নানা জল্পনা শেষে ঠিক হল 'মুকুট' নাটকটি আমাদের যোগ্য। খুবই অনুপযুক্ত কারণে আমি পাই ছোট রাজকুমারের ভূমিকাটি।

যথারীতি আমাদেরকে চুরির পথে নামতে হল। এই ভাবে গাঁয়ের বাইরে খুবই নড়বড়ে মণ্ড তৈরী করে আমরা নেমে পড়লাম। বলা বাহুল্য উইংসের আড়ালে কেরামতের বাঁশিও ছিল। নাটকে যুদ্ধক্ষেত্রের একটা দৃশ্য আছে। হতাহত সৈন্যদের মাঝে বসে ছোট রাজকুমার হিসেবে কিছুটা কাঁদার প্রয়োজন ছিল আমার। আগে থেকে হাতে একটু পিপারমেন্ট রেখেছি। চোখে দিলেই দরদর করে প্রকৃত অশ্রু ঝরতে সুরু করবে। এদিকে আমার কাজটুকু শেষ করে আমি দিব্যি কেঁদে যাচ্ছি। কিন্তু আমার মাসতুতো দাদা এটা জানতেন না। অভিনয় যাতে আরও বাস্তবিক হয়, তার জন্য তিনিও উইংসের আড়াল থেকে অবিরল পিপারমেন্ট ছড়াতে লাগলেন। লক্ষ্য আমার চোখ। ফলে, একটু পরই হাত-পা ছুঁড়ে আমার প্রবল চেঁচামেচি সুরু হল। অবস্থা ঘোরতর খারাপ। ড্রপ সিনটা পর্যন্ত ঘৃতমত খেয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না। দ্রুত, কেউ খবর দিয়ে এসেছে মাসিমাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাসিমা হাজির। একেবারে রণচণ্ডী মূর্তিতে। তখন, কে কোথায়! একা মাসতুতো দাদা লড়ে গেল তার মায়ের সঙ্গে। অবশেষে নাটক ভণ্ডুল। আমাকে ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে মাসিমা চোখে আচ্ছা করে জলের ঝাপটা দিতে সুরু করলেন। পরদিন সারা গাঁয়ের লোক মিলে আমাদের যা হেনস্থা করল, বলার নয়।

এর ফাঁকে, কেরামত আলির মতো লোকও যে কখন কেটে পড়েছেন, কেউ খেয়াল রাখিনি। রীতিমত টাকা নিয়ে রাজাত এসেছিলেন।

॥পাঁচ॥

ছেলেবেলায় আমাদের গান-বাজনা শোনার যা-কিছু সুযোগ ছিল, তার বেশির ভাগই নিষিদ্ধ। এমন কি 'মুকুট' নাটকের জন্য নিজেদের তৈরী তীর ধনুকও মাসিমা বাড়িতে ঢোকাতে দেন নি। ক্ষ্যাপা সমেদ আলি আর কেরামতকে এ-কারণে আমরা সেই জায়গাতেই ফেলে এসেছি। সঙ্গে আনতে পারিনি।

কেরামত আলির ছেলে-মেয়েরাও বাবার জন্য কোনো গর্ব করতে পারবে না। বড় হয়ে তারা রেডিও-র দৌলতে কোনো কোকিল কণ্ঠী গায়িকার ভক্ত হয়ে পড়বে। কেউ হয়তো 'ও কেন হেসে চলে যায়' গেয়ে তৃপ্ত হবার চেষ্টা করবে। আর, দেশে গেলেই সমেদ ক্ষ্যাপার সঙ্গে আজও দেখা হয়। কাছাকাছি কেউ না থাকলে মাঝে মাঝেই সে বলে, 'এবার আসার সময় কলকাতা থেকে বাঁশি এনে দিও তো। বেশ ভালো বাঁশি। চনমন করে যেন বাজে।'

আবার কখনো বলে লেখাপড়া করে কী হবে? বাঁশি বাজানো শেখো। তোমার মতো ছেলে বাজাতে পারলে কি হবে বলো তো?

তখন টর্চলাইটের মতো তার মুখটা জ্বলে ওঠে। যেন, হাত চাপা দিলে হাতের ভেতরের লাল আভা দেখা যাবে। 'কাজ আছে' বলে কোনো রকমে কেটে পড়াই তখন আমার উদ্দেশ্য।

গ্রাহক হোন! গ্রাহক হোন! গ্রাহক হোন!

৩৬ টাকার বই গ্রাহক মূল্য মাত্র ২৫ টাকা

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন

তন্ত্রকন্যা

দুই খণ্ডে সমাপ্য। প্রথম খণ্ড মহালয়ার দিন প্রকাশিত হবেই। গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর। প্রতি খণ্ড ১৮·০০। দুই খণ্ডের গ্রাহক মূল্য মাত্র ২৫·০০। ১০·০০ দিয়ে গ্রাহক হোন।

বেদ, বেদান্ত, পুরান, তন্ত্র, আত্মারহস্য ও সামাজিক উপন্যাসের এক আশ্চর্য সমন্বয়। লেখক জিতেন্দ্রনাথ ভৌমিক সুদীর্ঘকাল তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যুক্ত। তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বগুলি সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন চমকপ্রদ এক সুখপাঠ্য কাহিনীর মাধ্যমে। তন্ত্র ও আত্মারহস্য বিষয়ক এতাদৃশ উপন্যাস-এর আগে প্রকাশিত হয়নি। আজই গ্রাহক হোন।

মণিঅর্ডার; ব্যাঙ্কড্রাফট ও গ্রাহক হবার ঠিকানা—

দেবকণ্ঠ পাবলিশার্স

(শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে)
১০৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

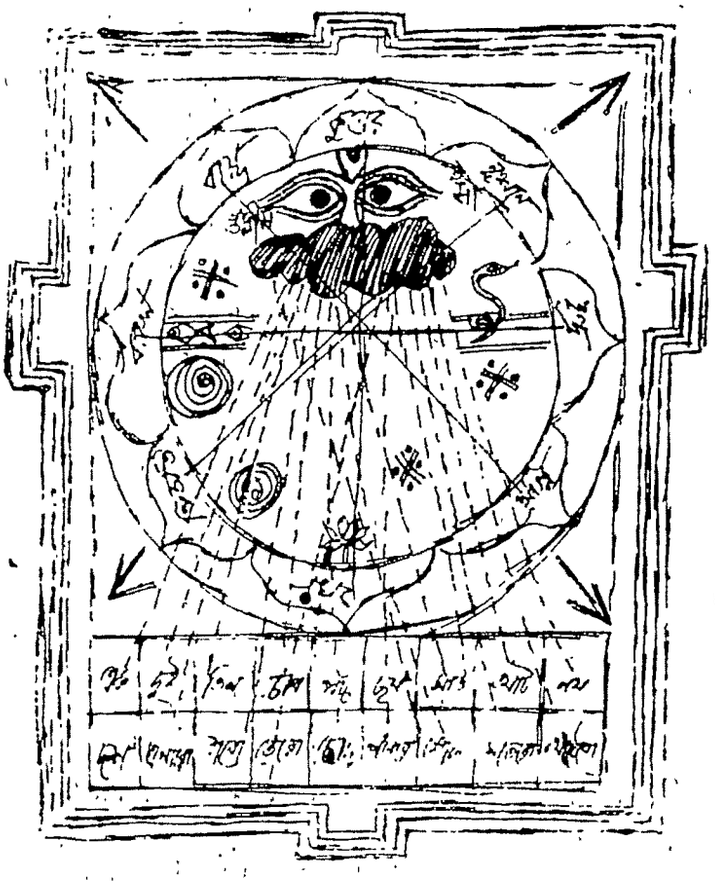

সংসারটাই একটা ধাঁধা

পরিতোষ সেন লিখিত ও চিত্রিত

অঘ্রাণ মাস। খানিকক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও গুমোট ভাবটা এখনো কাটে নি। রাত প্রায় সাড়ে দশটা হবে। এক বাল্যবন্ধুর বন্ধুত-জ্বলন্তী বিবাহোৎসবের নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ী ফিরছি। বাস থেকে বাড়ী অব্দি সাত-আট মিনিটের পথ। দেশপ্রিয় পার্কে নেমে ল্যান্ডস্ ডাউন রোডের ফুটপাথ ধরে হাটছি। দু একটি পান-সিগারেটের দোকান ছাড়া বাকী দোকানপাট সব বন্ধ। বর্ষার সাঁতসেতে আবহাওয়া বামচরণ ধোবার ক্বলার উনুনের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে বাস্তার ওপর জমাট হয়ে আছে। অনেকটা শীতের হাওয়াবিহীন কুয়াচ্ছন্ন সন্ধ্যের মত। একটু ভেতর দিয়ে টুংটাং আওয়াজ করে ছায়ার মত একটা রিক্‌শা ছুটে সাদার্ন এভেনুার দিকে এগিয়ে গেল। পানের দোকানটি থেকে ট্যানজিস্টারে হিন্দি ফিল্মি গীত ভেসে আসছে। বাস্তার ধারে পর পর তিন-চারটি নিভে যাওয়া বাড়ির অন্ধকারের সঙ্গে গাছের ঘন কালো ছায়া মিশে অর্ধেক খোঁড়া ফুটপাথটি এ রাত্রিতে, হাঁটাচলার পক্ষে বেশ একটু বিপজ্জনকই বলা যায়। তাছাড়া কাদা-পাঁক তো আছেই। কয়েক গজ দূরে মাঝারি সাইজের একটি ঘটগাছ; তার তলায় একজন ছাতুওয়ালা ফাঁচা লংকা পেঁয়াজ আর লেবুর চাটনি সহ দিব্যি-ওরাজাদের ছাতু পরিবেশন করছে। একটু এগিয়ে যেতেই আরেকটি গাছের তলায় একমাত্র শুকনো জায়গাটিতে, সাদা, কালো বাদামী এবং ধূসেরী রঙের সাত-আটটা নেড়ি কুত্তা এলোপাথাড়িভাবে শুয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। যেন এ জায়গাটি কর্পোরেশনের তৈরী, তাদের জন্যে একটি রিজার্ভেশন। সারা ফুটপাথটি তারা এমনভাবে দখল করে আছে যে, তাদের ডিঙিয়ে যাবার বাস্তাটুকু পর্যন্ত ছাড়ে নি। ফুটপাথ ছেড়ে বাস্তায় পা ফেলব, এমন সময় একটি দৃশ্য দেখে থেমে গেলাম। বছর চল্লিশেক বয়সের একটি বোগা-পাট্‌কা লোক। মাথায় এক ঝাক খাড়া চুল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বাঁশের ডগায় ঝুল ঝাড়বার পাটের গোলাকার বস্তুটি। কানের দু পাশের চুলে সামান্য একটু বুপোলি রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে মালকোচা মারা ধুতি আর হাট অব্দি পাঞ্জাবি। কাঁধে শান্তিনিকেতনি লম্বা ব্যাগ। দেখতে অনেকটা আমার কবি বন্ধু বিভাসের মত। লোকটি কুকুর গুলোকে না ডিঙিয়ে, তাদের মাঝি দিয়ে পার হবার জন্য বাস্তা খুঁজছে। একটি-দুটি চক্ষু প্রশ্ন ছোড়ে, আর এগুতে স্থল পেয়ে পেছনে ফিরে এল। অন্য দিক দিয়ে ঘুরে সাদা-বাদামী ছোপ্ দেয়া কুকুরটিকে ডাইনে রেখে, একটি পা মাটিতে ফেলে, দ্বিতীয়টি ফেলতে গিয়ে তার মাথাটাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল আর কি! ভয় পেয়ে তিড়িং করে এক লাফে পেছনের দিকে সরে এল। তার কান্ড দেখে মনে হল যে, যেমন করেই হোক্ নিদ্রারত কুকুরদের না জাগিয়ে, না ডিঙিয়ে, তাদের মাঝখান দিয়ে ফুটপাথ পার হতে সে বদ্ধপরিকর। এ চ্যালেঞ্জ তাকে কে দিল এবং কেনই বা সে গ্রহণ করল তা জানবার অবশ্য কোনো উপায় ছিল না।

দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ডান-দিক-বাঁদিক, কোনাকোনি—বস্তুতঃ প্রত্যেক সম্ভাব্য দিক থেকে কুকুরের দঙ্গলের ভেতর সে প্রবেশপথ খুঁজল। দু একটি দিক থেকে যদিও বা খানিকটা পথ পেল, তা অগ্রসর হতে না পেরে মূল পয়েন্টটিতে ফিরে আসতে বাধ্য হল। লোকটির মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট্ আছে না কি, এমন কথা ভাবছি এমন সময় তার কাঁধে ঝোলানো সাদা নীল ডোরাকাটা ব্যাগটা থেকে বাইটিং প্যাডের আকারের একটি ছোট্ট নোট খাতা বের করল; যে ধরনের খাতা সাংবাদিকদের হাতে দেখা যায়। পাঞ্জাবির বোতামের মাঝে মাঝে দু তিনটি কলম গোঁজা। তার থেকে সট্ করে টান দিয়ে একটি বল-পয়েন্ট বের করে খাতার ওপর ধরল। সংলগ্ন দোতলা বাড়ীর জানলা দিয়ে ফ্লুরোসেন্ট বাতির একফালি চৌকো সাদা-নীল আলো ফুটপাথে এসে পড়েছে। সে আলোতে খাতাটি ধরে খশ্‌খশ্ করে আবোল-তাবোল সব রেখা টানতে আরম্ভ করল। বিশেষ কৌতূহলী হয়ে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার কাঁধের ওপর দিয়ে একটু উঁকিঝুঁকি মারতেই দেখি যে, নোট বই-এর পাতায় এদিক ওদিক ডিম্বাকৃতি কতগুলো আকার এবং প্রত্যেকটির তলদেশে চারটি করে দেয়াশলাই কাঠির মত রেখা। প্রত্যেকটি ফিগারের গায়ে এক, দুই, তিন নম্বর বসিয়ে ভদ্রলোক তাদের চিহ্নিত করে দিল। তারপর কুকুরগুলোর দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে সেগুলোকে, তার আঁকা ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বললো, 'ব্যাস্, সব ঠিক হ্যায়'। কলমটি রেখে দিয়ে আরেকটি বল্ পয়েন্টের সাহায্যে লাল রেখায় ওই ফিগার-গুলোর মাঝখান দিয়ে লাইন কাটল। মাঝপথে এসে থেমে গেল। পাতাটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেকটি পাতায় আগের মতই নক্সা কাটল। এভাবে তিন-চারটি পাতা বাতিল করে দিয়ে, নতুন করে আরেকটি লাইন ড্রইং করল। তারপর লাল কলমটির থেকে এঁকে-বেঁকে কতগুলো তীরের মত সংকেত কালো রেখার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে কাগজের ওপরের দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে এমন জোরে হো হো করে হেসে উঠল যে, কুকুরগুলো জেগে ওঠে আর কি! হাসি

আর কিছুতেই থামে না। কি যে পেল লোকটি, তাও বোঝা গেল না। সংলগ্ন বাড়ীটির তেতালার বারান্দায় লুঙ্গী পরা এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। কয়েক মুহূর্ত নীচের দিকে তাকিয়ে থেকে 'যত্তোসব পাগল' বলে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন।

লোকটি এবার নোট খাতাটি বগলে চেপে ধরে ব্যাগ থেকে সিগারেট বানাবার কাগজ আর একটা ছোট্ট পোট্‌লা বের করল। পোট্‌লাটির থেকে তামাকের মতো কিছু পদার্থ তুলে হাতের তালুতে রেশ কষে ডলে নিয়ে একটি সিগারেট পাকালো। সেটিকে ধরিয়ে নিয়ে, দুহাত দিয়ে মুঠো করে ধরে, চোখবুজে, সজোরে চারপাঁচটি ঘনঘন দম নিল। মুখ থেকে ভক্‌ভক করে ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে বেরিয়ে রামবচন ধোবার উনুনের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু গন্ধটি আমার নাকে যেতেই বুঝতে দেরি হল না যে, এ গন্ধ সিগারেটের নয়। আরো কয়েকটি জরুরদস্ত দম নিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল। হাঁটু ভাঁজ করে ডান পাটি তুলে কুকুরদের দিকে এগিয়ে দিল। সে অবস্থায় খানিকল নটরাজের ভঙ্গীতে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল। বগল থেকে নোটখাতাটা বের কোরে কালো-লাল বেখায় আঁকা নক্সাটির অনুসরণে গভীর নিদ্রারত চতুষ্পদীগুলোকে না ডিঙিয়ে, না মাড়িয়ে, না জাগিয়ে হুড হুড করে বেরিয়ে গেল। লোকটির মজাদার জম্প দেখে আমারও মনে হাসির ফোয়ারা ছুটল।

হঠাৎ আমার টাক্ মাথায় দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। একটা পুলিশ-ভ্যান হর্ন বাজাতে বাজাতে উত্তরের দিকে ছুটে গেল।

লোকটি আমাদের বাড়ীর দিকেই এগুচ্ছে। এমনভাবে পা ফেলছে যেন পদে পদে কিছু ডিঙিয়ে যাচ্ছে, যেমন করে আমাদের পুরুতমশাই শ্রীশ্যামাচরণ তর্কালঙ্কার অশুচির ভয়ে রাস্তা পার হতেন। লোকটা কি ফুটপাথে আবার একদল ঘুমন্ত কুকুর দেখতে পেল না কি। বৃষ্টির ফোঁটা আরেকটু বাড়তেই সে আবার থেমে গেল। অন্ধকারে ফোটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। তর্জনী উঁচিয়ে শূন্যে কী সব রেখা টানে। তারপর 'কুছ পরোয়া নেই,' বলে তাড়াতাড়ি নোট খাতাটি বের করল। ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ কোরে কোনাকোনি কয়েকটি লাইন ফেলে আগের নক্সাটারই মত কয়েকটি মোটামোটা তীরের সংকেত আঁকলো। একটি সিগারেট পাকিয়ে ধরিয়ে নিল। হাতের তালু দুটি কচলিয়ে ঠাশ্ করে একটা হাততালি দিল। জয় বোম্ ভোলানাথ,' 'জয় শংকর কি জয়' এই বলে সাঁই করে তিন চারটি পদক্ষেপ নিয়ে আবার থেমে যায়। একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, এমনভাবে পা ফেলতে থাকল যে, ঠিক যেন গাদি খেলার মতো, এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে যাচ্ছে। দৃষ্টি ওপরের দিকে। লোকটা করছে কী, জানবার জন্যে আমার এতই কৌতূহল হল যে, অগত্যা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন না করে পারলাম না। 'হ্যাঁ মশাই, অন্ধকারে কি দেখছেন? বলি, এমন করে হাটছেন কেন?' লোকটি আমার দিকে মুখ ফেরাল। চোখের ওপর ভ্রু দুটি ধনুকের মত বাঁকিয়ে উঠেছে। তারপর নোট খাতাটি বের করে আমার চোখের সামনে নক্সাটি তুলে ধরলো। সিগারেটে এমন একটা দম দিল যেন পৃথিবীর তাবৎ সিগারেটের ধোঁয়া তার বুকের খাঁচাটির মধ্যে বন্দী করবার চেষ্টা করছে। বললো, 'মনোযোগ দিয়ে দেখুন।' বলা বাহুল্য সমস্ত মনোনিবেশ সত্ত্বেও আমার নিতান্ত মস্তিষ্কে তার মাথামুন্ডু কিছু প্রবেশ করল না। তবুও বললাম, 'এটা তো মশাই একটা ধাঁধা।' লোকটি সেই আগের মতোই হো-হো-হো করে হেসে উঠল। 'আরে মশাই, সমস্ত সংসারটাই তো একটা ধাঁধা।' ওরেঃ বাবা। রাত বেরাতে কোনো পাগল দার্শনিকের পাল্লায় পড়লাম না কি। আতঙ্কিত হয়ে 'তাইতো, তাইতো,' বলে এগিয়ে যাবো আর কি, ঠিক সেই মুহূর্তে, খপ্ করে আমার হাত ধরে বললো, 'আমাদের বেঁচে থাকাটাইতো একটা ধাঁধা।' আমি বলি 'তাইতো, তাইতো।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার 'আর মশাই, বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব, সবই তো ধাঁধা। আর আমার স্ত্রী কল্পনা, সে তো ধাঁধার ধাঁধা। এই দেখুন না,' বলে হাতের কয়গুনতে আরম্ভ করেছিলো। 'হ্যাঁ, এই দেখুন না, আজ পনেরো বছর ধরে একসঙ্গে ঘর করছি। সে যে কী চায়, আর কী যে চায় না আজ পর্যন্ত তার কি কোনো হদিশ পেলাম? সিগারেটটা ততক্ষণে তার জবরদস্ত দমের চোটে শুধু একটা লাল বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে। আর তাতে ছ্যাঁকা লাগছে না দেখে আমি অবাক। তাকে আমার পৌরুষ আর স্নেহাগের উপঢৌকনের পর উপহার দিয়ে যাচ্ছি—তাতে সে কতটা খুশী হল তা কি আর জানলাম মশাই। আমার যৌবনের জাগ্রত প্রেম দিয়ে তাকে জাগাতে পেরেছিলাম কি না তাই বা কে পেল্লাম কই। কখনো কোনো দাবী-দাওয়া ফাই ফরমাশ নেই—যা দিই তাই সে বিঁধেছে। 'মশাই, আমার মরমের জ্বালার কথা আপনাকে আর কতো শোনাবো। আমার অতৃপ্ত প্রেম, শূন্য হৃদয়ের পথে পথে কেঁদে বেড়ায়। বিশ্ব ঘটনায় সে যে কি রহস্য সে শুধু এ অধমই জানে' বলে নিজের দিকে তর্জনি নির্দেশ করল। ওরে বাবাঃ। এযে স্বয়ং সক্রেটিস্।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে লোকটি আবার শুরু করল 'তার বেতফলের মতো কালো চোখ দুটি যেন অবিশ্বাস তমিস্রা।' সেরেছে। আবার কবিতা-টবিতা আওড়াবে না কি। জীবনানন্দ দাশের চ্যালা-ফ্যালা নয় তো। আমি বলি, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু অমন করে হাটছিলেন কেন?' আরে মশাই, সেসব কথা পরে হবে। এই যে আজ নক্ষত্রহীন আষাঢ়ের বর্ষণ মুখরিত রাতে আপনার সঙ্গে ল্যান্ডস্ডাউন রোডের ভাঙা ফুটপাথের বাধাচুড়া গাছটির তলায় দেখা হল, এও কি কম রহস্য!' আমি বলি, 'তাতো বটেই। কিন্তু অমন কোরে হাটছিলেন কেন?' আমার কথায় সে কোনোই কান দিচ্ছে না। তারপরেই গলার স্বরটা বেশ নাটকীয়ভাবে কাঁপিয়ে, 'অতীতের কোন এক নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে, নির্জনে বাসকক্ষের স্মিমিত দীপশয্যায়, এক প্রাচীন কবির, নীলমেঘের মতো দৃশ্যমান, মযূর নিনাদিত, দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের বর্ষণে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি?' আমি বাধা দিয়ে বলি, 'না, তেমন আর কি?' সাদার্ন এভেন্যুর দিক থেকে একটা লম্বা-চওড়া পুলিশ, বৈঠনি ডলতে ডলতে উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে এল। একটু থেমে আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল; 'কা হইল্ বা?' আমি চটপট জবাব দিয়ে বললাম; 'কিছু না, কিছু না, একটু আপোষমে গপ্পো করতা হ্যায়।' একথা শুনে পুলিশটা দেশপ্রিয় পার্কের দিকে এগিয়ে গেল। যাই হোক আমি লোকটার মুঠো থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিতে সামান্য একটু টান দিতেই সে আরো চেপে ধরল। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি তো। তাহলে তারাপদর বারান্দার লুঙ্গী-পরা বুড়োটাই কি ঠিক ধরেছিলেন! আজ রাতে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়। একথা ভাবতে ভাবতেই লোকটা আবার আরম্ভ করল, 'সে বিস্মৃত শুভযামিনীর বন্দনা মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। আর আমার তো মশাই, মাত্র পনেরো বছর হল।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

অধ্যাপক করুণানিধান রায়

প্রবন্ধকার, অর্থনীতিবিদ ও জীবনধর্মী রাজনীতিবিদ অধ্যাপক করুণানিধান রায় (এম, এস, নিউইয়র্ক) তাঁর জীবন সেত্রাতে একান্ত করে দেখা আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড এবং ভারতের সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু মূলতঃ ভারতকে কেন্দ্র করে প্রেম, জীবন, সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতির মূল সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রবন্ধ সংকলনে যার নাম—

বিভর্কিত পুরুষ

শুধু মূল সমস্যাই নয়, পোড় খাওয়া জীবনের বহু সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীপিনাকী প্রসাদ রায় (সত্যযুগ ও অন্যত্র) এ সংকলনকে সম্পাদনায় করেছেন আরো বাস্তবধর্মী। রবীন্দ্রনাথের প্রপৌত্রী শ্রীমতী পিয়া মুখার্জী এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখার্জী, কুমারী গীতিকা চক্রবর্তী ও মিস থারে এই সংকলনে আঙ্গিক জুগিয়েছেন। এই সংকলনের ইংরাজী ও হিন্দী অনুবাদ **আই ওয়ান্ট টু লিভ** এবং **নেতৃত্ব কা ইসারা**—নিউইয়র্ক/লন্ডন ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হবে। মূল্য দশ টাকা ৩০এ আগষ্ট '৭৮ পর্যন্ত গ্রাহক মূল্য—৭,

ধরল। 'আরে গুডনাইট কি মশাই, আপনার প্রশ্নের জবাবটা শুনে যান।' এই বলে বগল থেকে নোট খাতটা বের করে আমার সামনে ধরল। তার জটিলতা দেখে আমি আরো ঘাবড়ে গেলাম। লোকটা আবার তন্ত্রমন্ত্র জানে নাকি। তাহলে ত গেছি। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।

'এই নক্সাটার দিকে এবার ভালো করে নজর দিন। এই দেখুন। বৃষ্টির ফোঁটা ইশান্ কোণ থেকে তাবছাড়াভাবে নিড়তির দিকে পড়ছে, ঠিকত। দুটো ফোটার মধ্যে দূরত্ব দেখুন গড়পরতা প্রায় দু'বিঘত। আমি নিড়তির থেকে ঈশান্ কোণের দিকে এগুচ্ছি কারণ, ওদিকেই আমার হ্যাদিনি দরজা খুলে আমার প্রতীক্ষমানা হয়ে আছে। এবার এক নম্বর বৃষ্টির ফোঁটাটা বরুণের দিকে রেখে কুবেরের দিকে এগোলাম। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফোঁটার মাঝে যে সামান্য ফাঁকটা আছে, আমি সেখান দিয়ে চল্লিশ ডিগ্রীর এ্যাঙ্গেলে কাত্ হয়ে বেরিয়ে, চতুর্থ ও পঞ্চম ফোঁটার মাঝখানটায় গিয়ে দাড়ালাম। এবার দেখুন, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ফোঁটা দুটি এতই কাছাকাছি যে ওখান দিয়ে ছুঁচ গলাবারও জায়গা নেই। তাই এখন আমাকে বায়ুকোণ থেকে বুরে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ফোটাকে এড়িয়ে অগ্নিকোণের দিকে ঘুরে যেতে হবে। সেখানে অষ্টম ও নবম ফোঁটার মাঝে দূরত্ব কম হলেও, আমার মত রোগাপটকা লোক আড়াআড়িভাবে অনায়াসে গলে বেরিয়ে যেতে পারবে।' আমি বলি, 'এত দ্যাখামা করছেন কেন। নাক বরাবর হেঁটে গেলে আরো সহজ হয় নাকি।' ভদ্রলোক নক্সাটার ভেতর আঙুল চালিয়ে বললেন, 'হ্যাখামা। হ্যাখামা কিসের।। দেখুন এইভাবে কত সহজে, এক ফোঁটা জল না লাগিয়ে, দিব্যি খটখটে গায়ে, বাড়ী ফিরে গিয়ে আমার হ্যাদিনিকে জাক লাগিয়ে দেব।' তারপর আমার দিকে ঘুরে অসীম আত্মবিশ্বাসে বললেন, এর চাইতে সহজ আর কিছু হয়?' এদিকে শুকনো আগাছার মত তার চুলগুলো ভিজে যে একেবারে নেতিয়ে গেছে, সেদিকে তার একটুকুও হুঁশ নেই। তেতলার লুঙ্গি পরা বুড়োটাই ঠিক চিনতে পেরেছিলেন এই লোকটিকে। কি করে এর খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচাই, মনে মনে নানারকম ফন্দি করছি, ঠিক এমন সময় আমাদের পেছন ব্যানার্জি রোডের মোড় থেকে কে চ্যাঁচালো, 'অবে, পরিতোষদা না। কার সঙ্গে গপ্পো করছেন? বৌদিকে দেখলাম বারান্দায় পায়চারি করছেন।' দেখি আমাদের পদ্মার শ্যামল এগিয়ে আসছে। 'আচ্ছা, আবার দেখা হবে' এই বলে হ্যাঁচকা টানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, এক দৌড়ে উল্টোদিকের ফুটপাথ পার হয়ে, হনহন্ করে আমাদের বাড়ীর দিকে এগুলাম। ভদ্রলোক পেছন থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'মনে রাখবেন, সংসারটাই একটা ধাঁধা। তার চাইতেও বড় ধাঁধা ঘরের লোকটি।'

কচি বয়েসে দন্তক্ষয়ের দরুন দাঁত পড়ে গেলে সেখানে যে শক্ত দাঁত বেরোয় তা টেরা-বাঁকা হয়ে গজিয়ে উঠতে পারে। তাতে মিষ্টি হাসির শ্রী চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে যায়। এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার একটিই উপায়—বিনাকা ফ্লোরাইড* ব্যবহার ক'রে দাঁত সুরক্ষিত রাখা। পৃথিবীময় পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে যে, টুথপেস্টে ফ্লোরাইডই হল একমাত্র উপাদান যা দাঁতের এনামেলের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিশে দাঁত মজবুত বানায় আর ক্ষয় হতে দেয় না। বিনাকা ফ্লোরাইডের দীর্ঘস্থায়ী গুণ দন্তক্ষয়ের জীবাণু জন্মাতে দেয় না আর দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত হতে দেয় না।

* এতে আছে সবচেয়ে কার্যকর ফ্লোরাইড কম্পাউণ্ড সোডিয়াম-মোনোফ্লোরোফস্‌ফেট।

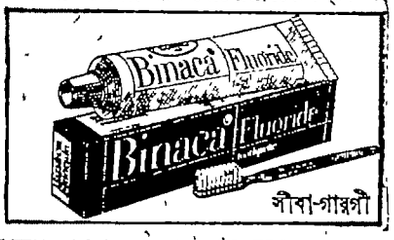

জীবা-গারগী

বেশী মজবুত দাঁতের জন্যে, দন্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে—

বিনাকা ফ্লোরাইড

ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম ফ্লোরাইড টুথপেস্ট।

U-BF 7/7 ben

শৈবাল মিত্র

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

হুই হুই হুই! র‍্যাখলেবা মাঠে গরু সামলাচ্ছে।

সারা দুপুর খালি দাওয়ায় বসে কিশোরের কয়েকটা দিন কাটল। ফাঁকা পাড়া। মেয়ে-মরদেরা কোন ভোরে কাজে বেরোয়। কিশোর ভাবে, কোন পথে এগোবে। দিনে বাড়ী থেকে বেরোয় না। আশপাশে ভদ্রলোকের বসতি। তারা দেখলে বিপদ। নানা সন্দেহ করবে।

তিলাবুনির লোকদের সঙ্গে তিনটে বৈঠক হয়েছে। অনেক কথা ও বলেছে। অন্ধকার কুলিতে পাথরে ঢালাই মুখগুলোয় কোন দাগ পড়ে নি। সবচেয়ে বড় বাধা ভাষা। তার কথা বাঘা সাঁওতালিতে তর্জমা করে। তখন সে নিজেই বোঝে না, বাঘা কি বলছে। অনেক রাতে বৈঠক শেষ হয়। তখন শরীর ক্লান্ত, মাথা ঘোরে। সারা দিন হয়ত খাওয়া হয় নি। বাড়ী ফিরে এক মুঠো চাল নিজের হাতে ফুটোয়। নুন দিয়ে গরম ভাত খায়। ভাবে, একটা লংকা বা পেঁয়াজ পেলে ভাল হত।

বাঘার মা কিছুতেই তার ভাত রাঁধবে না। সে নাকি ভাবতেই পারে না, কোন দীখু তার রান্না ভাত খাবে। তাদের ছায়া মাড়ালে ভদ্রলোকেরা চান করে। দরজায় দাঁড়ালে গোবর ছড়া দেয়।

অন্ধকার উঠোনে কাঠের আগুন জ্বলে। লালচে আলোয় অন্ধকার ফুটিফাটা হয়। কিশোর ভাবে, কি করে একাত্ম হওয়া যায়? জনযুদ্ধ হলো জনগণের ব্যাপার। তাদের জাগাতে হবে, জড়ো করতে হবে।

অজিত নাকি বাহেম্মায় জমিয়ে ফুটবল খেলে। হোমিওপ্যাথির বাকস বাজিয়ে গান গায়। দু-চারজন গোদা রোগীকে সারিয়েছে। সকালে লাঙ্গল কাঁধে মাঠে নামে।

অজিত যেটা পারে, সে পারবে না কেন? অবশ্য অজিতকে অনেকটা সাঁওতালদের মত দেখতে। এটাই ওর সুবিধে। কিন্তু অজিতও ভাষা জানে না। হয়ত শিখছে। এই প্রথম কিশোর নিজের গায়ের রঙের জন্যে দুঃখ পায়। এই রকম ফ্যাকাসে, ফর্সা চেহারা নিয়ে বিপ্লব করা যায় না। এক নজরেই বোঝা যায়, সে সাঁওতাল নয়, ভিনদেশী। অনেক বছর কপালের ঘাম ঝরিয়ে ইংরিজি শিখেছে। এখন মনে হয়, ফালতু। ইংরিজি ভাষা কোন কাজেই লাগে না। বরং সাঁওতালী, ভোজপুরী বা গরুমুখী জানলে আজ লাভ হত। যে ভাষা দেশের মানুষের কাছে যেতে সাহায্য করে না, সে ভাষার দরকার কি! আপশোস হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা জেদ চাপে—এদের ভাষা শিখতেই হবে।

অজিতের ওপর একটু হিংসে হয়। বিনা পরিচয়েই ও বাহেম্মায় গিয়েছিল। একদম উটকো লোক। মাঝিপাড়ার লোকেরা ভয় পেয়েছিল। পাত্তা দেয় নি। ও কিন্তু নাছোড়। গাছতলায় পড়ে রইল। খাওয়া নেই। দিনের পর দিন উপোস। তবু হাল ছাড়ে নি। দু-একজন গাঁয়ের ছেলেছোকরা ভাব করল ওর সঙ্গে। এক-আধ দিন নুন ভাত জুটত। টি-বি গোদ আর কুষ্ঠ গাঁয়ে ছড়াছড়ি। অজিত সুযোগ পেল। হোমিওপ্যাথিক বাকসটা বার করল। ম্যাজিক হয়ে গেল। প্রথমে দু-একজন ওষুধ খেল। তারপর রোগীর কমাই নেই। অনেকে সেরেছে। এখন ও প্রায় জনগুরুর সমান। দুমকা জেলে অজিত বলছিল, আমি বেগে গিয়েছিলুম। শালা মুনি-ঋষিরা যদি তপস্যা করে স্বর্গ কাঁপাতে পারে, তবে আমি পারব না কেন? জায়গা না মিললে আমি হয়ত সত্যি মরে যেতুম। কিন্তু সেটা হবার নয়। পাথর গলেছে। বুধনের ঘরে ঢোকার দিনটা ভাবলে আজো ওর গায়ে কাঁটা দেয়। এখন আমি ওদের চেয়ে বড় সাঁওতাল। সাতপুরুষে সাঁওতালের বেটা। বেহুন্দ মাঝি।

।।ষোলো।।

দাওয়ার খুঁটিতে পিঠ দিয়ে কিশোর ঝিমোচ্ছিল। আজ সারাদিনে প্রায় পনেরো-বিশ মাইল হেঁটেছে। সকালে দুমঠো মুড়ি আর ছোলাভাজা জুটেছিল। ফটিক নদীর জল খেয়েছিল আঁজলা ভরে। খিদেতে এখন পাকস্থলী মোচড়াচ্ছে। কিছুটা সময় এরকম হয়। তারপর আর সাড় থাকে না।

রাতে জোর খাওয়া-দাওয়া। গাঁয়ের লোকজন আজ শিকারে গিয়েছিল। কয়েকটা খরগোশ আর দুটো বনমোরগ মেরেছে। মোট তেরোটা সমান ভাগ হয়েছে। দশজন মানুষ, তিনটে কুকুর। রবি এক ভাগ পেয়েছে। ওর বাড়ীতে পেড়ু মেহমান আসবে। তাই ভাগটা একটু বড়ো। হৈ হৈ করে কয়েকজন ভেতরে ঢুকলো। বুধন, মোতি, বাঘা। পেছনে রবির সঙ্গে বজ্রদা। বজ্রদা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক। বজ্রদাকে দেখে কিশোর হাসে। বজ্রদার মুখ গম্ভীর। ঘন গোঁফ দাড়িতে ঢাকা। কোনো রেখা ফোটে না। সন্ধ্যে হয়েছে। তরণী পাহাড়ের শরীর জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া আলো। লাল মাটির গায়ে আলোর দাগ অনেক সময় লেগে থাকে। অন্ধকার দেরিতে নামে।

অজিত কোথায়—কিশোর জিজ্ঞেস করে।

কুলিতে। নাচের দলে—বুধন বলে।

বজ্রদার মুখ আরো গম্ভীর হয়। কিশোর ভাবে, কি ঝামেলা! নেতাদের সামনে এসব না করলেই পারে। গাছপালা থেকে আলো ঝরে যায়। অন্ধকার জমছে। ঘন শীত। রবির বৌ পুঁইশা চুলো ধরায়। মাটিতে শুয়ে লম্বা ফুঁ দেয়। গলগল ধোঁয়া। ওর চোখে জল করে। হঠাৎ দপ্ করে আগুন জ্বলে যায়। চুলো ঘিরে ওরা বসে। পুঁইশা তিরেশা হাঁড়িতে জল বসায়। পরিষ্কার উঠোন। মনে হয় সিমেন্টের তৈরী। কোথাও এক কণা কুটো ময়লা নেই। পোষা মুরগি ছাগল-গুলো পর্যন্ত উঠোন নোংরা করে না।

পুলিশ তোলপাড় করেছে বাহেম্মা গ্রাম। লখাইকে পায় নি। গাঁ শুধু জঙ্গলে পালিয়েছিল। বুড়োবুড়ি বাচ্চারা ঘর ছিল। কুঞ্জ মাঝিকে দারোগা ধরে নিয়ে গেলো। বুধনের বাপ মাঝিহাবাম। সে দাঁড়িয়েছিল কুলির ওপর। দলবল নিয়ে দারোগা চলে গেলো। সঙ্গে ভবতরাম মহাজন। মাদারপুর, কালকাপুর, টোংবাতেও দারোগা তল্লাশ করেছে। এ গাঁগুলো বাহেম্মার লাগোয়া, থানা রানীশ্বর। মাঝখানে সিদ্ধেশ্বরী নদী। লোকমুখে সিধু বুপোগঞ্জা ঠান্ডা জল।

দারোগা খুব চটেছে। এসব সেই উগ্র-পন্থী বদমাসদের কাজ। ওদের জন্যেই খুন-জখম। ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেছে।

কিশোর গিয়েই খবরটা শুনেছিল। বুধন বললো—গাঁয়ের লোক খুশী। ঐ শালা জ্ঞানের ওপর গুণ্ডা গাঁ চটেছিল। লখাই এখন অজিতের সঙ্গে ঘুরছে। অজিত বলেছে, সামনের হপ্তায় রুমেরীর সঙ্গে লখাই-এর সাঙ্গা দেবে।

অন্ধকারে মাদলের শব্দ। সমবেত গলায় গান শুরু, হয়—সিদাই দয়েম সেনকেদা সোনা কমই সাকো কমই ময়রি হো
তকোর ময়রি চি এম এমাদিএ হো ময়রি...
হো ময়রি....হো ময়রি
সোনা শাঁখা দেবে বলেছিলে। দিলে কোথায় হে?

হাওয়ায় গানের সুর ওড়ে। বজ্রদা বলে—সভা শুরু হোক। চুলোর আগুন তাপ ছড়ায়। হাঁড়িতে মাংস ফোটে। মশলা বলতে নুন, গোলমরিচ আর হলুদ। বুলেট, বাবিন আর শশাং। গন্ধ নেই। তবু নিঃশ্বাসে কিশোরের বুক ভরে যায়। বাঁহাতি ছোট ঘরটায় ঢোকিন শব্দ। রবির বৌ চাল কুটছে। এককাড়া চাল রাঁধার আগে দ্বিতীয় দফা কুটে নেয়। ভাত মিষ্টি হয়।

অজিতকে নিয়ে রবি ঢোকে। এই শীতেও অজিত ঘামছে। গায়ের চাদরে মুখ মোছে। বিড়ি ধরায়। বজ্রদা বলে—বিপ্লব ভাঙো। খতম মানে খুন নয়, শ্রেণীঘৃণার চরম প্রকাশ।

বজ্রদা খতম অভিযানের তাৎপর্য বোঝায়। গাঁয়ের অত্যাচারী, ঘৃণিত মানুষটাকে বেছে নাও। গরীব কৃষকদের স্কোয়াড বানাও। শত্রুকে নির্মূল করো। দুটো কাজ হবে। গরীব মানুষ জাগবে। নিজের ক্ষমতার স্বাদ পাবে। দ্বিতীয়, শ্রেণীশত্রুরা গাঁ ছেড়ে পালাবে। তার রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ধ্বসে পড়বে। তখন তৈরী হবে গরীব মানুষের কমিটি, তাদের শাসনব্যবস্থা। মুক্ত এলাকার শুরু। অজিত মন দিয়ে শোনে। চিমনজান মরার পর বাহেঙ্গা গ্রামে সাড়া জেগেছে। লখাইকে সকলে সাবাস দিচ্ছে।

সে বলে—ঠিক ঠিক। ওর মুখে হাড়িয়ার গন্ধ।

আবছা অন্ধকারে বজ্রদার মুখ কিশোর দেখতে পায় না। অজিত ওর গা ঘেঁসে বসে। পকেট থেকে কটা ঠোঙ্গা বার করে। বলে চা আছে। বুধন তবু গরম জল লাগা। একটু গুড় জোগাড় কর।

চায়ের নামে বজ্রদা খুশী হয়। বলে—তোফা। কে আনলো?

ওই বুধন। মাসখানেক আগে মশান-জোড় গিয়েছিল। তখন কিনেছে। আমার জন্যে রেখেছিল।

বুধন হাসে। ওর সাদা দাঁত চুলোর আগুনে ঝিকঝিক করে। বাইরে গমগমে গানের সুর। অন্ধকার দুলছে। ছায়ার মতো কে একজন ঢোকে। অজিতকে ডাকে—তু চল, ধামসা বাজাবি।

রবি তাড়া করে। একটা কমবয়েসী ছেলে ছুটে পালায়। বজ্রদা বিপ্লবী যুদ্ধের রাজনীতি বলে।

প্রাইমা গরম জল দেয়। পেতলের কাঁসিতে মোতি চা বানায়। গুড় মেলে না। নুন চা হয়। ঢোঁকিঘরে রবির বুড়ো ঠাকুর্দা এতোক্ষণ হাড়িয়া খাচ্ছিল। অন্ধকারে সে বাটি বাজিয়ে গান ধরে—পান দিলি বিড়ি দিলি—দেশলাই দিলি না। কোলকাতায় যাবো ও মন হাওয়া গাড়ী মেলে না।

বুড়ো বুঝেছে বাঙালী যেটারা এসেছে। তাই বাংলা গান। এই একটা বাংলা গানই বোধহয় ও জানে। অজিতরা এলেই শোনায়। একটু বাদে বুড়ো হাজির হয়—একটা বিড়ি দে। অজিত বিড়ি দেয়। মুখের মধ্যে বিড়িটা দেয় বাঘাকে। বাঘা দুটো টান দিয়ে মোতির হাতে গোঁজে। কিশোর কলকাতার রিপোর্ট দেয়। সূর্যদার নির্দেশ শোনায়। শ্রীকাকুলাম, গোপীবল্লভপুরে লড়াই চলছে। দিল্লী কাঁপছে। বিদেশী কমরেডরা এসেছিল। তারা বলেছে—ভারতবর্ষের কৃষকদের যুদ্ধের খবর ইউরোপে পৌঁচেছে। টাইমস কাগজ সম্পাদকীয় লিখেছে। প্রবাসী ভারতীয়রা সব সাহায্য দেবে। ইউরোপের

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা পুরস্কার লাভ করুন

উদাহরণ
মোট ২৪

৫	১০	৯
১২	৮	৪
৭	৬	১১

	১২	
	১০	
	৮	

প্রবেশমূল্য নেই
আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউণ্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারাণ্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ৩০....খাড়াভাবে, সমানভাবে, কোণাকুণিভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ ব্যয় বহন করবেন।

খেলার তারিখ ৩০ আগষ্ট, ১৯৭৮
আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—
উইলফোর্ড ওয়ারলেস ইণ্ডিয়া (এ-ডব্লু) গান্ধীনগর, দিল্লী ১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান

WILFORD WIRELESS INDIA (AW)
Gandhi Nagar
DELHI-31

বি / ৭২০১

শ্রমিকরা বহু জায়গায় ভারতীয় কৃষক যুদ্ধের সমর্থনে সভা মিছিল করেছে।

বুধন, বাবি, বাঘা অবাক চোখে শোনে। সব ব্যাপারটা এখনো স্পষ্ট নয় ওদের কাছে। এখনো আবছায়া আছে। তবু বুঝতে পারে।

পৃথিবীর তিন ভাগ জল, একভাগ স্থল। স্থলের তিনভাগ গ্রাম একভাগ শহর। আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা গ্রাম। ইউরোপ শহর। একভাগ শহর তিন-ভাগ গাঁকে আজ পাঁচশো বছর শুষছে। এইভাবে ইউরোপ বড়লোক। আর তিন মহা-দেশ গরীব, ভিখিরী, খেতে পায় না। যুগ বদলাচ্ছে। পুবের হাওয়া বইছে। ইউরোপ, আমেরিকার দিন শেষ। পৃথিবীর তিনভাগ গ্রাম একভাগ শহরকে ঘিরছে। এটা বিশ্ব বিপ্লবের যুগ। তিন মহাদেশ মুক্ত হবে। ইউরোপের শ্রমিকরাও মুক্তি পাবে। অনেক সহজ করে এসব কথা কিশোর এখানে বুঝিয়েছে। বাঘা, রবিকে বোঝাতে খুব কষ্ট হয়নি। কিন্তু গ্রুপ বৈঠকে বিপদ হতো। এই তরণী পাহাড় বাহেঙ্গা, তাতলাই, তিলা-বুনির ওপাশে যে পৃথিবী আছে, সেটা বোঝাতেই ঘাম ঝরতো। দুমকা, ভাগলপুরের নাম শুনেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ। সে কেমন দেশ। কলকাতার নামও কেউ কেউ জানে। কিন্তু সেটা তো আকাশের কাছাকাছি একটা জায়গা। ঝুলন্ত শহর। বজ্রদা পার্টির মিলিটারি লাইনের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। বেশ শক্ত ব্যাখ্যা। খতম থেকে গেরিলা স্কোয়াড। গেরিলা স্কোয়াড শুরু করবে এ্যামবুশ। এটা হলো গেরিলা যুদ্ধের প্রথম স্তর। তখন চলবে বন্দুক দখল। অস্ত্র কাড়ো, বাহিনী গড়ো। এখন হবে সাত্রিক্সের যুদ্ধ। সামরিক দিক দিয়ে যাকে বলে ওয়ার। দুধরনের যুদ্ধ হবে—পোজিশানাল ওয়ারফেয়ার আর মোবাইল ওয়ারফেয়ার। শত্রুর মুখোমুখি বড়ো বাহিনী নিয়ে মোক্ষম মার দিতে হবে। দরকার মতো জাল গুটিয়ে পেছন থেকে চোরাগোপ্তা আক্রমণ হবে। একই সঙ্গে জাল ফেলা এবং জাল গুটোনো। দুভাবেই শত্রুর ক্ষতি হবে। শ্রীকাকুলাম, গোপীবল্লভপুরে যুদ্ধ চলছে। তাকে ছাঁচাতে হবে। আর অপেক্ষা করার সময় নেই। চিমনজনকে কেটে শুরু হয়েছে। সেও একজন শোষক, অত্যাচারী। ধর্মীয় শোষক। তাকে মারা ভুল হয়নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সবসময়েই ন্যায়সঙ্গত।

শেষদিকে সভা জমে ওঠে। গনগনে চুলো। চারপাশে ভাতা মাটি। রক্তের স্রোতে উত্তেজনা।

কে কাটবে? বুধন বলে, আমি। বাঘা বলে, আমি। রবি কমণ্ডার। সে চুপ করে থাকে। তার ভঙ্গী, আমি থাকতে তুরা কেনে?

হঠাৎ মোতি ছিটকে ওঠে। আমি কি মধ্যবিত্ত? আমিও তো গরীব। তাকে বন্ধ। সংসার চলে না। মা বাবা ভাইবোনেরা উপোস দেয়। আমি কেন গেরিলা স্কোয়াডে থাকতে পারবো না?

ভাত, মাংস তৈরী। পুঁইসা বলে—তুরা খেয়ে নে।

শালপাতা সাজিয়ে ওরা উঠোনেই বসে যায়। চুলোয় কাঠ পড়ে। ধিকিধিকি আগুন। এখানে কেরোসিন নেই। আলো জ্বলে না। চুলোর আলোতেই সব কাজ শেষ করতে হবে।

শালপাতায় গরম ভাত। ধোঁয়া ওড়ে। পেতলের কাঁপিভর্তি আধসেদ্ধ মাংস। মসলাহীন ফ্যাকাসে ঝোল। তবু কি স্বাদ আর গন্ধ। কিশোরের মনে হয়, এতো ভালো রান্না সে জীবনে খায়নি।

সকলেই পাহাড়প্রমাণ ভাত খায়। গরম ভাতের সঙ্গে কাঁচা শালপাতার গন্ধ মাখামাখি।

আকাশে এতোক্ষণে এক টুকরো চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না শীতল। গত বছর এই সময়ে কিশোর তিলাবুনি এসেছিল। বাঘার ঘরে খাওয়া নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি। বাঘার মা কিছুতেই বাঁধবে না। কিশোর উঁচু জাতের লোক। তার পাপ লাগবে। বোঙ্গা রাগবে।

কিশোর ছাড়বে না। চাপ রাখে। বুঝতে দেরি না। প্রথমদিকে বাঘা ওকে একটা আলাদা হাঁড়ি দিয়েছিল। সঙ্গে চাল, নুন। কিশোর নিজের ভাত ফুটিয়ে নিতো। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে উপোস দিতো। বাঘার মা কিন্তু নজর রাখতো। বাঘাকে বলতো। শেষপর্যন্ত মা রাজী হলো। মেহমান। তার ওপর কচি ছেলে। না খেয়ে আছে। চোখ বুজে থাকা যায় না। কোনো পাপ হবে না তুর—বাঘা বোঝালো।

সাতগাঁ ঘুরে রাতে কিশোর ফিরে-ছিল। সঙ্গে বাঘা। তখনও চুলো জ্বলছে। পাশাপাশি দুটো শালপাতা। বাঘার মা ভাতের হাঁড়ি আনলো। উনুনের আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখা যায় না। হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বাঘার মা ভাত তোলে। প্রথমে কিশোরকে দেয়। পরে বাঘাকে। হঠাৎ নজর পড়ে। বাঘার মায়ের ডান হাতের তিনটে আঙুলে লাল দগদগে ঘা। কুষ্ঠ। মাথায় ছলাৎ করে রক্ত ওঠে। বাঘা নির্বিকার। তার মাও বোঝে না। বাঘা গপাগপ খায়। তেঁতুলের কাই, নুন আর ভাত। কিশোরের পেটে পাক দেয়। পরিষ্কার শাদা ভাত। ধোঁয়া ছাড়ছে। মিষ্টি গন্ধ। বাঘার মা দু আঙুলে আরো খানিকটা তেঁতুলের কাঁই ওর পাতে দেয়। কিশোরের গোটা শরীর ঘামে। তবু খায়। এক কণাও ভাত ফেলে না। সেদিন মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙেছিল। দারুণ বমির চাপ। অন্ধকারে জঙ্গলে ছুটেছিল। বাঘা টের পায় নি। তার মাও নয়। গোটা তিলাবুনি গাঁ আজ ঘুমে বেহুঁশ। নাকমুখ দিয়ে কুলকুল করে বমি বেরোচ্ছে। দাঁত টিপে কিশোর শব্দ আটকেছিল। কেউ যেন না জাগে। এতো লজ্জার খবর যেন পাঁচকান না হয়। ওই একদিন। তারপর আর কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু ওই একদিনেই ও ঘরের ছেলে হয়ে গেলো। তিলাবুনি ছেড়ে আসার সময় বাঘার মা কি কান্না। এই বেটা, তু কথা যাবি? এখানে থাক। অনেক কষ্টে কিশোর শান্ত করেছিল।

খাওয়া শেষ হয়। ওরা দাওয়ায় এসে বসে। আর এক দফা আলোচনা আছে। বজ্রদাকে ভোররাতে উঠতে হবে। মশান-জোড় হয়ে ও যাবে ফরাক্কায়। কাল রিজিও-নাল কমিটির সভা শুরু হচ্ছে। পুঁইসা উঠোন মুছে নিকিয়ে দেয়। বাসন ধোয়। বিশ-বাইশ বছরের জোয়ান মেয়ে। চকচকে কালো রঙ, মজবুত শরীর। সারাদিন মাঠে খেটেছে। মাটি কাটার কাজ। কিন্তু কোনো ক্লান্তি নেই। এতোক্ষণে ওর কাজ শেষ। পরিপাটি খোঁপা। হাতে কাচা ফরসা শাড়ি। খোঁপায় একগোছা বাসফুল। ও দাওয়ার ওপর বসে। রবির দিকে তাকায়। হাসে। ওর চোখে মৌমাছির গন্ধ। আলোচনা চলছে। বজ্রদা বলে—এলাকার দুশমন কে কে? বন্ধুই বা কারা? শ্রেণীবিশ্লেষণ শুরু হয়। কিশোর অজিত আর মোতি প্রচারের কাজটা আগেই করেছে। জোরদার, ব্যাপক প্রচার। বুধনই জবাব দেয়—বড়ো জোতদার মহাজন এখানে নাই। তবে বহুৎ বদমাশ লোক আছে। কিশোরও জানে, ওখানকার বেশীর-ভাগ জোতদার একশো দেড়শো বিঘে জমির মালিক। এক ফসলী জমি, শোষণের দিক থেকে তারা খুব বড়ো নয়। সামাজিক অত্যাচারটাই শোষণের প্রধান দিক। মহাজনী করে। বেগার খাটায়। পুলিশের সঙ্গে দহরম মহরম। জেল, জরিমানার কামাই নেই।

প্রচার চালাও। এ্যাকশনের প্রচার। তা না হলে বিন্দু ভাঙবে না। বজ্রদা বলে। মনে রেখো, এটা জমির লড়াই নয়, ফসল বা মজুরীর লড়াই নয়, এ হলো ক্ষমতাদখলের লড়াই। বিপ্লবী যুদ্ধ। কৃষকের ইস্তেহারবোধ জাগাতে হবে। অনেকদিনের অপমান, লাঞ্ছনার ক্ষতগুলো উসকে দাও। সে জাগবে। জ্বলে উঠবে। এখানে প্রথম লড়াইয়ের ঘটনা কিশোরের মনে পড়ে।

তিলাবুনিতে খবর এলো তাতলাই আর আশপাশের গাঁয়ের মানুষ রাতারাতি জমা জমির ধান কেটেছে। ফসল দখলে রেখেছে। হৈহৈ উত্তেজনা। জোতদাররা কৃষি উন্নয়ন সমিতি গড়েছে। পুলিশ মদত দিচ্ছে। যে কোনো সময়ে লাঠালাঠি হবে। রক্ত ঝরবে। প্রতি বছরই হয়। মাঠের ফসলে সোনালী রঙ ধরলে গোটা এলাকা সজাগ হয়। লাঠিতে তেল মাখায়। শরীরের শিরা স্নায়ু ফোঁস-ফোঁস করে। জমির মালিকানা, ফসলের ভাগ নিয়ে দাঙ্গা বাধে। দু-চারটে লাশ পড়ে। মাঠে রক্তের পলি জমে। এলাকার লড়াইয়ের ইতিহাস আছে।

বাঘাই খবরটা আনলো। তাতলাই-এর ধনি হাঁসদা মরদের বাচ্চা। জমা জমির ধান কেটেছে। মহাজনের জমির ধান কেটেছে। গরমগোলা বানিয়েছে। আশপাশের সব মাঝিপাড়ার তামাম মাঝি তার পেছনে দাঁড়িয়েছে। ঘাটোয়াল, মহুলিরাও এগিয়ে এসেছে। বাউড়ী মালপাড়াতেও শলা-পরামর্শ হচ্ছে।

কিশোর তাতলাই গ্রামটা চেনে। বার-দুয়েক গিয়েছে। ধনি হাঁসদার সঙ্গে পরিচয় আছে। আলোচনা হয়েছে। তাতলাই-এর খবরটা তিলাবুনিতেও ঝড় তোলে। পুরোনো

হেলো শ্যাম্পু–ঠিক আপনার মত চুলের যত্নের জন্যে!

প্রোটীন সমৃদ্ধ
হেলো এগ্ শ্যাম্পু দিয়ে আপনার চুলকে অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল ক'রে তুলুন।

বাড়তি গুণে সমৃদ্ধ এগ্ প্রোটীন যুক্ত এই ফর্মুলা— আপনার চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগায়, চুলকে সম্পূর্ণ আয়ত্বে আনে। ঝরঝরে ঝলমলে সহজাত সৌন্দর্য্য এনে আপনার চুলকে করে তোলে প্রাণবন্ত।

স্বাভাবিক সুস্থ চুল চান—
তো আজই যত্ন নিতে শুরু করুন হেলো দিয়ে

হেলো কসমেটিক শ্যাম্পু: এই বিশিষ্ট সুষম ফর্মুলা ব্যবহার করে দেখুন— আপনার চুল কত বেশী নরম, রেশমের মত চিকন হয়ে ওঠে।

হেলো লেমন ফ্রেশ শ্যাম্পু: তেলা চুলকে করে তোলে সহজাত সৌন্দর্য্যে দীপ্ত, ঝকঝকে পরিষ্কার, ঝলমলে উজ্জ্বল।

হেলো কনসেনট্রেট শ্যাম্পু: রাশি রাশি সমৃদ্ধ ফেনার জন্যে একটুখানিই যথেষ্ট। এতে চুল নরম থাকে, আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসে।

কেবল হেলো শ্যাম্পুগুলিতেই আছে বিশুদ্ধ সুষম ফর্মুলা!

HSLG.3 BN

দিনের গল্প শুরু হয়। সিধু কানুর কাহিনী। পূর্বপুরুষরা বীর ছিল। স্বয়ং বোঙ্গা তাদের জন্মদাতা। ইংরেজদের তারা ঘায়েল করেছিল। সাঁওতালদের বন্ত চলন করে। হাওয়ায় কড়ানাকাড়া বাজে। মাদলের দিমদিম শব্দে নতুন ইঙ্গিত চলকায়।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাইরে অন্ধকার। কয়েকজন মানুষের নীচু গলার কথা। এতেই হো—কে যেন ডাকলো। চুলিতে খস্‌খস্‌ পায়ের শব্দ। কুকুরগুলো একনাগাড়ে চেঁচাচ্ছে।

সজাগ ঘুম। কিশোর জেগে ওঠে। বাঘাকে ধাক্কা দেয়। বাঘা জাগে। কান খাড়া করে শোনে। এতেই হো—গলাটা বাঘার চেনা লাগে। জিজ্ঞেস করে কে কৈ বানা?

ইএ্‌ রবি হাঁসদা।

ওরা বাইরে আসে। নিশুত অন্ধকার। মোতি টর্চ জ্বালে। সবু ডাক্তারী টর্চ। ধারাল আলো। কিশোর দেখে মোতি, অজিত আর রবি হাঁসদা।

তোর সঙ্গে আলোচনা করতে চায়—রবিকে দেখিয়ে অজিত বলে।

ওরা ভেতরে আসে।

আজ দুপুরে গাঁয়ের লোক জোতদারের দু গাড়ি ধান লুঠেছে।

রবি জানায়— আমিই বলেছিলুম।

পুলিশ তাতলুই ঘিরেছে। অনেককে ধরেছে। মেরে হাত-পা ভেঙ্গেছে। রবি সরে ছিল। বাহেঙ্গায় অজিতের সঙ্গে দেখা করে। মোতি কি একটা খবর নিয়ে বাহেঙ্গায় গিয়েছিল। মোতিই ওদের এখানে আসার বুদ্ধি দিয়েছে।

রবির হাতে পাকানো লাঠি। ও বলে—সাতষট্টিতে আমরা বন্ধকী জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছি। ক্যানে লিব না? পাঁচ বছরে দু পয়সায় হয় সাড়ে বার টাকা সুদ। মহাপ্রসাদ সাহা এলাকার মরুব্বি। আমার ঘরের কাঠের চৌকাঠটা খুলে নিয়ে গেল।

রবি বলে—তু বল, আমরা কি দোষ করেছি? অন্ধকার রাত। রবির নিরীহ চোখ দুটো দেখা যায়।

কিশোর বলে—কোন ভুল হয় নি। বরং খুব ভাল কাজ হয়েছে। এটাই হওয়া দরকার।

রবি দু হাতে কিশোরকে জড়িয়ে ধরে। আমি জানতুম তুই একথা বলবি। তুই আমাদের দোস্ত।

মাঝি পাড়ার লোকেরা তীর হাতে তৈরী। তারা লড়বে। পুলিশকে শিক্ষা দেবে। রবি জানায়।

লড়ুক। কিশোর সায় দেয়—এক-তরফা মার কেন খাবে?

রবি ওর কথা শোনে। এর আগেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কাজ এগোয় নি। লড়াইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রবি বোঝে, একটাই পথ। লড়তে হবে।

তু আমাদের গাঁয়ে চল ক্যানে—রবি বলে—আমার ঘরকে থাকবি।

বোদ উঠলে ওরা চলে যায়। সাত দিন পরে রবি এসে কিশোরকে নিয়ে যাবে।

বজদা বলে—শোণীশগ্রু বেছে নাও। গরীর কৃষকের কানে কানে বল — ওই লোকটা কেমন? ওকে খতম করলে কেমন হয়? তারা ভাববে। পরে নিজেরাই বলবে, কে শত্রু আর কে বন্ধু। এটা হল গেরিলা যুদ্ধের কায়দা। একটা ছাপা পুস্তিকা অন্ধকারে ও কিশোরকে এগিয়ে দেয়। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি কথা। এটা পড়। কাজে লাগাও। কিশোর বইটা নেয়। পাশে রাখে। হিসাব নিয়ে লড়ো। জয় হবেই।

ফসল আর ধান দখলের সেই লড়াই কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ হয় নি। তাতলুই গাঁয়ের চুয়ান্নজন কোর্টে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল। কেস কাছারিতে জড়িয়ে পড়ল। কিশোরের সঙ্গে আলোচনার পর রবি দুমকায় গিয়েছিল তাদের নেতার সঙ্গে দেখা করতে। সে লোকটা উকিল। সি পি আই করে। সেই পরামর্শ দিল। রবিরা কোর্টে গেল। গ্রেপ্তার হল। পরে জামিনে বেরুল। কিশোরের নাম কিন্তু ওরা গোপন করল। নেতাকেও জানাল না।

তারপর রবি এল কিশোরকে নিতে। সেই থেকে কিশোর রয়েছে তাতলুইতে। এখন ও এ গাঁয়ের একজন।

বজ্রদার ঘুম পেয়েছে। বাইরে নাচ-গান থামে নি। পাঁহুশা চাল বাটছে। সামনে সবহাই পরব। পৌষের শেষ পাঁচ দিন। সাকরাদের দিন (পৌষ সংক্রান্তি) জোর খাওয়া-দাওয়া। মাস জুড়ে উৎসবের হাওয়া। অজিত বেরুল। ও এখন ধামসা বাজাবে।

।।সতেরো।।

আজকাল রাতেও বড় হুজুত, ঝামেলা হচ্ছে। যমুনাও সব জেনেছে। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। যমুনা ভয় দেখায়—চাকরি না ছাড়লে গলায় দড়ি দেব। দিন-রাত বলে—তুমি কোনদিন মরে রাস্তায় পড়ে থাকবে। কথা শেষ করতে পারে না। গলা বুজে যায়। অশান্তি বাড়ে।

থানার বড়বাবুও আজকাল বিশ্বাস করে না। চোখ কুচকে তাকায়। বলে—দিবাকর খবর আন। কি খবর সে দেবে? সে কিইবা জানে। খবর তো বানান যায় না। গলাটা গুলিয়ে ওঠে। বলে—জানি না বড়বাবু।

বড়বাবুর চোখে সন্দেহ জমে—তুই চেপে যাচ্ছিস। রঞ্জন ওই গাঁয়ের ছেলে, আর তুই জানিস না।

বড়বাবুর চোখ দুটো ওর মুখের ওপর ঘুরতে থাকে। এখনি অন্ধকার হবে। গাছপালায় ছায়া নামছে। বড়বাবুর চোখ দেখে দিবাকরের অস্বস্তি হয়। আমার কাছে খবর ছিল সেই খুনেটা লখাই মাঝি তেঁদের গাঁ দিয়ে গেছে। সঙ্গে আরও এক-জন ছিল। হয়ত এখনও তোদের পাড়াতেই ঘাপটি মেরে আছে। কথার সঙ্গে বড়বাবু পা নাচায়। দিবাকরের কপাল ভিজে ওঠে। সেই দুজন লোক কে? এক বিকেলে মোতিদের ঘরে ঢুকল? তারাই কি লখাই সর্দার আর সঙ্গী।

দিবাকরের কেমন শীত শীত করে। তার পাড়ার সব খবর বড়বাবু জানে। মোতি পাড়াতে আসে। রঞ্জনরা ঘুরে বেড়ায়। এমন কি গাঁয়ে দুজন মাঝি আসার খবরও বড়-বাবু জানে।

মোতিকে চিনিস—বড়বাবু জিজ্ঞেস করে। দিবাকর কেমন ঘাবড়ে যায়। বড়বাবু উত্তরের অপেক্ষা করে না। অবিনাশ তাঁতির ছেলে। বাড়ী থেকে ভেগেছিল। বছর খানেক আগে ফিরেছে। কম্পাউন্ডার। দিবাকর বলে। ওটাই নন্টের গোড়া। বড়-বাবু জানায়—ওকে চাই। ও ডাক্তার-খানাতে যাচ্ছে না কেন?

দিবাকর কোন জবাব দিতে পারে না। রাত ভোর সে গাঁয়ের গলিতে হেঁকে হেঁকে বেড়ায়। চোর-ডাকাত ঘোরতে দেয় না। এত খবর সে জানবে কোথা থেকে? চেনা নামগুলো শুনে সে ধিতিয়ে যায়। লোকে জানে দিবাকর চৌকিদার ইবরকমার; রঞ্জনরা বলে—দালাল।

যমুনা বলে—গলায় দড়ি দেব। এ সংসারে কেউ দিবাকরকে বিশ্বাস করে না। বুঝতে চায় না। তার কথার কোন দাম নেই। কিন্তু সে জানে, সে খাটি। কর্তব্যে গলতি নেই। রঞ্জনদের যতটুকু দেখেছে, বড়বাবুকে জানিয়েছে। বড়বাবু খুশি নয়। ওদের হাড়ির খবর চাই। দিবাকর সে সব কোথা থেকে জানবে।

রঞ্জনরা ভাবে, ও তাদের পেছনে ছায়ার মত লেগে আছে। এর পর রঞ্জনরা হয়ত একদিন তাকে মারবে। মারুক। সে মরবে। ভাল কাজের জন্যে মরতে সে রাজি। আগে পাড়ার লোক তাকে খাতির করত। ছোটরা শ্রদ্ধা করত। গাঁয়ের তাঁতি, বামুন, কায়েত সবাই ভালবেসে কথা বলত। বড়লোকদের ঘরে গেলে কোচড় ভরে চাল দিত। আজকাল সকলে এড়িয়ে চলে। ছেলে-বুড়ো কেউ পাত্তা দেয় না। তার কাজের কোন প্রশংসা নেই। নরেন মাইতি, জগাই তিলিরা মধ্যবিত্ত। তাদের চোখে সে দালাল। বড়লোকেরা ঘরে ডেকে নীচু গলায় বলে—দেখিস দিবাকর, ঠিকমত খবর দিয়ে প্রাণে বাঁচাস। গাঁটাকে শান্ত কর। রঞ্জন কোথায়? ওদের মাথাটা কে? আজ কোন পাড়ায় পুলিশ আসবে?

শুকলাল বলে—এখন মাইনে ছাড়া আর কত পাচ্ছ দাদা?

বামদয়াল ফুট কাটে—কবে দফাদার হবে? প্রাণগোপাল জুড়ে দেয় — তোফা আছ। দু হাতে কামাচ্ছো। আমাদের হয়েছে মুস্কিল। দু নৌকোয় পা। দিবাকর কারও কথার জবাব দেয় না। শুধু ভাবে—সুখ আসবে কবে? সুখের পুরীটা কতদূর? সে যে আর হাঁটতে পারে না। এই পৃথিবীতে বহু দিন কাটল। অনেক কামড়, জ্বালা সে সয়েছে। তার কষ্ট কেউ বোঝে না। তার সঙ্গী নেই। সে একা হাঁটছে। একাই হাঁটবে। যমুনা যতই গাল দিক, একদিন বুঝবে—দিবাকর কিছু খারাপ করে নি। সংসারের ভালর জন্যে সে ভেবেছে। কারও ক্ষতি চায় নি। কর্তব্য করেছে।

মোতি আজকাল তার ঘরে আসছে। কখন যে আসে দিবাকর টের পায় না। তবু তার ভেতর থেকে যেন মোতির আসাটা জানান দেয়। মাধুকে একদিন খুব বকেছিল। শেষে যমুনার কথায় তার নিজেরই দুঃখ হল। যমুনা মা। সেও চায় মাধু ঐ তাঁতির ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে যাক। কিন্তু বেঁচে থাকতে দিবাকর এটা মানবে না। সমাজে সে হেয় হবে। লোকে তার দিকে তাকিয়ে হাসবে, চুটকি ছুঁড়বে। মোতিকেও একদিন কড়া কথা শুনিয়েছে। মাধু কাঁদে। দিন দিন শুকিয়ে যায়। যমুনা গঞ্জনা দেয়। এ সংসারে দিবাকরের আর থাকতে ভাল লাগে না। থানাতেও যেতে ইচ্ছে করে না।

হাওয়ায়-আগুনের হল্কা। একটা ঘন উত্তেজনা ছুটে বেড়াচ্ছে। ভূমিহীন, গরীব কৃষকদের নিয়ে গেরিলা স্কোয়াড তৈরী হয়েছে। বাংলা বিহার সীমানা জুড়ে তাদের অবাধ গতি। কিশোর বোঝে একটা নতুন সময়ের জন্ম হচ্ছে।

বজ্রদা মূর্খ নয়। এখনও এ্যাকশন ছয় নি। লড়াই উঠছে না। এই লেখাটা পড়েছ—বজ্রদা একটা পুস্তিকা দেয়। প্রথম লেখা—নতুন বছর আসছে আরও বড় জয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। চার পাতার রচনা। এখানে ওখানে লালকালির আন্ডার লাইন। জীবন দেওয়ার প্রতিযোগিতা, শ্রেণীশত্রু ধ্বংস, বিপ্লবী জোয়ার, শব্দগুলো ওর মাথায় লেগে থাকে।

পরের লেখাটা — বজ্রদা বলে— সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন। এই লেখাটার সারা পাতায় লাল কালির দাগ। শ্রীকাকুলামে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম। পিকিং রেডিও রোজ সাহায্য করছে। বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান মাল-মশলাই হচ্ছে মানুষ।

তার পরের লাইনটার তলায় লাল কালির দাগটা বেশ গভীর আর ঘন। বজ্রদা এই জায়গাটাই দেখাতে চায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রুপগুলি যারা চেয়ারম্যানের নাম করে আজ খতম অভিযান প্রতিরোধ করার কাজে ঐক্যবদ্ধ তাদের সে প্রচেষ্টাও ইতিহাসের নিয়মে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কি বলছেন আপনি — কিশোর তাকায়।

দু লাইনের লড়াই চালাতে হবে। আটকাচ্ছে।

প্রচার তো চালাচ্ছি কিশোর বলে— কানে কানে ফিসফিস প্রচার। মুখিয়া নির্বাচনে আমাদের সাঁওতাল বন্ধুরা সব জায়গাতে জিতেছে।

তোমরা কি প্রচার করছ আমি জানি না। কিন্তু আঞ্চলিক কমিটি খুশী নয়। উদ্দেশ্যহীন রাজনৈতিক প্রচার। তুমি আগে দক্ষিণ দেশ গ্রুপে ছিলে না?

কিশোর অবাক হয়। এতদিন পরে এই কথা কেন। ও অকায়। বজ্রদা যোগ করে, বোলপুরের কমরেডরা বলছিল। কি বলছিল বোলপুরের কমরেডরা?

কিশোর কথা বলে না। পার্টির বাইরে কয়েকটা গ্রুপ খতমের বিরোধিতা করছে। সেই জন্যে কি কিশোরের পুরোন পরিচয় নিয়ে আলোচনা উঠেছে? কি আশ্চর্য?

তোমরা মুখিয়া নির্বাচনে নামলে কেন?

আদিবাসী বন্ধুরা চেয়েছেন— কিশোর বলে।

এটা পার্টি লাইনের বিরোধী।

কিশোর পুরোন একটা দেশব্রতীর পাতা ওল্টাচ্ছিল। বজ্রদাই এনেছে। প্রায় মাস তিনেক আগের কাগজ। তারিখ তেইশে এপ্রিল উনিশশো সত্তর। হেড লাইনগুলোতে ও চোখ বোলায়। নকশালবাড়ি এলাকার ঘৃণিত জোতদার খতম। ডেবরায় এক সঙ্গে আরও দুজন জোতদারের মুন্ডচ্ছেদ। খড়গপুরে বিপ্লবী ছাত্রদের হাতে পুলিশ খতম। য়ুনিভার্সিটির ছাত্ররা লাইব্রেরীর বই পুড়িয়েছে। একাত্তর নম্বর ব্লক কংগ্রেস কমিটির অফিস তছনছ। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় শ্রেণীশত্রু খতমের কাহিনী।

শুনলাম অজিত নাকি বোলপুরে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল—বজ্রদা জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ—কিশোর জবাব দেয়। আদিবাসী ভাইদের দলে ও ছিল। কেউ বুঝতে পারে নি। ভেবেছে সাঁওতাল।

এসব ছেলেমানুষী ঠিক নয়—বজ্রদা দাড়িতে আঙুল চালায়। কাগজ হাতে কিশোর বসে থাকে। সব কিছু কেমন বদলে গেছে। কাগজের ভাষা পর্যন্ত। পুণ্যদা কি আজকাল কাগজ দেখে না। পুণ্যদা তো কবি। কলমে তরোয়ালের ধার। হাতে তরোয়াল থাকলে মানুষ গাল দেয় না।

অজিত নাকি প্রেম করছে—বজ্রদা কথাটা পাড়ে।

কিশোর জবাব দেয় না। চুপচাপ বসে থাকে।

এভাবে একাত্ম হওয়া যায় না। রাজনৈতিকভাবে এক হওয়া শক্ত ব্যাপার।

দিন-রাত চাষ-আবাদ, মাটি কাটা নিয়ে থাকলে অজিত পার্টির কাজ করবে কখন? ও কি এখানে জমিজমা কিনে সংসার পাতবে?

এসব কথা কিশোর ভাবে নি। জানতেও চায় নি। অজিত ওকে বলেছিল লালমুনির কথা। বুধনের বোন। মেয়েটাকে কিশোর দেখেছে। কাল ছিপছিপে চেহারা। মাপা শরীর। কম কথা বলে। খাটতে পারে। লাগাতর দশ ঘন্টা মাটি কাটার রেকর্ড আছে। নাচের আসরে সারা রাত চক্কর দেয়। দু হাঁড়ি হাঁড়িয়া খেয়েও টলে না। গায়ে সাজিমাটির গন্ধ।

।।আঠারো।।

চেপে বর্ষা নেমেছে। সিধু নদীর জল দিন-রাত ফুঁসছে। কখনও সারা দিন বৃষ্টি হয়। শক্ত লাল মাটি। কাদা কম। কিন্তু দারুণ পিছল। ভাঙাচোরা রাস্তা, লুকোন গাড্ডা। জল জমে থাকে। বোঝা যায় না। দিন কয়েক আগে বাগডোগরা থেকে অজিত আর মোতি ফিরছিল। মাঝ রাত। সভা সন্ধ্যে নাগাদ শেষ হয়েছে। তারপর খাওয়া-দাওয়া। নাচগান। বেলেঘাটার বরুণ ওখানে আছে। মাস দুয়েক হল ও এসেছে। অজিতের বন্ধু। খুব ভাল ছাত্র। হায়ার সেকেণ্ডারীতে স্ট্যান্ড করেছিল। এম-এ পরীক্ষা দেয় নি। বলল — পথ খুঁজছে। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী দিয়ে শুরু করেছিল। তারপর একটা গাঁজার আড্ডায় কিছু দিন কাটল। সিমলা স্ট্রীটের কাছে একটা সরু গলির অন্ধকার ঘরে ওরা কয়েকজন গাঁজা খাওয়ার ক্লাব খুলেছিল। নাম ব্যাঙাচি। জনাদশেক সদস্য। বেশীর ভাগ পয়সাওলা। গরীব, বড়লোক কোন বাছবিচার নেই। ক্লাবে সকলে এক। ক্লাবে ঢুকেই ওরা জামা-কাপড় খুলে ফেলত। শরীরে তখন সেফ একটা জাঙ্গিয়া বা আন্ডারওয়ার। ছিলিম ঘুরত হাতে হাতে। চারমিনারের মধ্যে গাঁজা পুরে টানত। চেনা দোকানী দিত গাঁজা ঢোকান স্পেশাল বিড়ি। ছোট ঘরটা ধোঁয়া আর বিড়ির গন্ধে আরও ছোট হয়ে যেত। তাস, আর দাবা খেলা হত। মোড়ের চা-ওলা গরম দুধ পাঠাতো। বরুণের সঙ্গে অজিত ক্লাবে এসে ছিল। বেশীর ভাগ চেনা মুখ। কপার বাবার চাবুকের দাগ এখনও শরীর থেকে মিলোয় নি।

(চলবে)

শ্রেষ্ঠনীয়র — ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৩০.০০
মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য — ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র ২০.০০
শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা - (সংকলন) — ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত ২৫.০০
• এছাড়া মুক্তধারা-র (বাংলাদেশ) প্রধান পরিবেশক
পুথিপত্র ৯ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

সুধা অধোরা (১৯৪৬) কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দীতে এম-এ। প্রথম রচনা সম্ভবতঃ ১৯৬৪। সুধা অধোরা খুব কম লিখেছেন এযাবৎ, তবুও তাঁর গল্প সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। কারণ, গল্পে সর্বদা আজকের জীবনের জটিলতা এবং তার উত্তরণের চেষ্টা করে এসেছেন। পরম্পরার প্রতি এক তীব্র আক্রোশ তার গল্পে পাত্র-পাত্রীর মাঝে দেখা যায়। সুধার গল্পে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা এবং তা থেকে মুক্তির অন্বেষণের আস্বাদ পাওয়া যায়।

দামনকা/সুধা অরোরা

শৈশবের অনেক কম ঘটনাই আমার মনে আছে। বাবা বলতেন, আমাদের শৈশব বাড়ীর চেয়ে বেশী এই পার্কেই কেটেছে: সকাল - দুপুর - সন্ধ্যা, সবসময় বাড়ী থেকে নিখোঁজ—আমাদের দুজনকে সর্বদা পার্কেই দেখা যেতো। আমার শুধু এই-টুকু মনে আছে যে তখন আমার মায়ের প্রচন্ড রাগ ছিল এবং যখন তখন আমি দামুকে মারতাম। মার খেয়েও দামু মা-বাবা-ঠাকুমা, কারো কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতো না, চুপচাপ কুণ্ঠিতভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকতো। তার শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা-যন্ত্রণা হত, তবুও আমার পেছনে লেগে থাকত। শুরু থেকেই সে একটা বোগা-পটকা, হাড্ডিসার ছেলে ছিল। চশমা নেবার পরে তাকে আরও রুচি-সবল দেখাত। এখনও তার ঐ ভাবভঙ্গী, ঐ কাঠামো। কিন্তু সব কিছু সহসা পাল্টে যায়। এই কাঠামোর থেকে দামু হঠাৎ একেবারে রুঢ় ও জেদী ছেলে হয়ে পড়ে। আমাকে 'দিদি' ডাকা তখন থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল, যখন তার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ পরিবর্তন শুরু হয় এবং ফাটা বাঁশের মত খরখরে কণ্ঠস্বরে কথা বলত, যা শুনে আমার প্রচন্ড রাগ হত। সম্বোধন ছাড়াই সে আমার সঙ্গে কথা বলে।

জানি না কবে, কেমন করে, আমাদের দুজনের মাঝে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে পড়েছিল। তার সরু, উঁচু হয়ে ওঠা চোয়াল, ভাঙ্গা গালে ঠেলে আসা হাড় ও মোটা ফ্রেমের চশমা—সব কিছু আমার সহ্যের বাইরে ছিল। বেগে কথা বলার সময় মুখ থেকে যখন থুথুর ছিটে ছড়াতো, ইচ্ছে করতো, কলার ধরে তাকে দরজার বাইরে ঠেলে ফেলি। সেও আমায় পছন্দ করত না, এটা বোঝাই যেত। কোন কারণ ছাড়া, সে যেই আমাকে গিলে খাবার দৃষ্টিতে দেখত, আমি অমনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

...কিন্তু তিনদিন যাবৎ সে বাড়ীতে না ফিরে আসায়, কেন জানি, অতীতের সমস্ত ঘটনা সময় অসময়ে আমার সামনে উঠে এসে দাঁড়ায় যদিও প্রতি বছর দুর্গা-পুজোর সময় সপ্তাহখানিক বাড়ী থেকে নিখোঁজ থাকা তার কাছে সামান্য ব্যাপার ছিল। বাবাও এই তিনদিন একবারও জিজ্ঞাসা করেননি, দামু কোথায়। কিন্তু এই পার্ক হয়ে রোজ যাবার সময় আমি খিতিয়ে পড়ি। জানি কোন লাভ নেই, তবুও ইচ্ছে করে একবার অতীত ঘটনার নক্সা ছড়িয়ে খুঁজে দেখি, কোথায় সবকিছু এভাবে ভুল হয়ে পড়েছে।....

পার্কের গেটের বাইরে বেরোলেই সামনের ফুটপাথে আমাদের বাড়ীর দরজা। পার্কের ভেতর দিয়ে গেলে রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়। শুধু এই শর্টকাটটা পাল্টায়নি, সেই সঙ্গে বাড়ীটাও। বাবা বিয়ে করে, তাঁর নব-পরিণীতা বধূকে এই দরজা দিয়েই ভেতরে নিয়ে গেছিলেন। শুনেছি, এই পাড়ার বাসিন্দারা প্রতি শনিবার সকালে তাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতেন কেননা আনন্দ চক্রবর্তীর স্ত্রী পুজো দিতে কালী-তলায় যাবেন। ঠাকুমা তার ফর্সা গৌর সুন্দরী বৌমাকে বাড়ীর বাইরে বেরোতে দিতেন না বছর দুয়েক আগে যখন মা'র মৃতদেহ এই দোর থেকে বেরোয়, খাটুলীর ওপর কেবল হাতের খাঁচা পড়েছিল, চাদরের ভাঁজের ফাঁকে বেরিয়ে আসা ঘাড়, কোলে বসে পড়া চোখ ও ঠেলে বেরিয়ে আসা দাঁত। মাকে দেখে কেউ একজন মন্তব্য করছিলেন—কর্তা তো সারাজীবন কেরানী থেকে গেল। তিন-তিনটে মেয়ের আয়ে বুড়ি সংসার চালিয়েছে। তিনটে মেয়েই মা-বাবাকে দেনাপাওনা পণ-টণ থেকে রক্ষে করেছে, ইচ্ছে মতো বিয়ে করে এই দোরগোড়া থেকে সেই যে বেরিয়ে গেছে, আর পেছনে ফিরে দেখেনি। ভালই করেছে, মা তারপরেই চলে গেছেন, চতুর্থ মেয়ের আয়ে সংসার চালনার লজ্জা তাঁকে আর পেতে হয়নি। এমনকি তার একমাত্র, সবচেয়ে আদরের ছেলে দামুর স্মার্টনেসের মুখোমুখিও তাঁকে হতে হয়নি। যা তার ঘোলাটে চোখের শেষ আশা ছিল।

মার মৃত্যুর পর বাবা আরও বুদ্ধিমান হয়ে পড়েছিলেন। রোগের প্রতি এখন তাঁর কোনো বিরক্তি নেই, বরং সমস্ত বস্তুর প্রতি তাঁর একধরনের উদার দৃষ্টি এসে পড়েছিল। কোন কথা নিয়ে তিনি আমাকে নানান যুক্তিতর্কে বোঝাতেন, দামুকেও এবং শেষে দুজনকেই কৃত ভুল সম্পর্কে অবহিত করে দিতেন। কিন্তু তিনি কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন—বিছানার শুয়ে শুয়ে উদাস ও পরাজয়ক্রান্ত।

তালা খোলার সময় আজ আমার হাত কাঁপছিল। না, বাবার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা নয়। প্রথম দিকে আমার এই ব্যাপারটা খুব নৃশংস, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, মনে হতো, অসুস্থ বাবাকে তালাবন্ধ করে রেখে মেয়ে চাকরী করতে যাব। তখন, ফেরার সময় আমি মনে

মনে প্রার্থনা করতাম, দরজা যেন খোলা থাকে, দাদু যেন ফিরে এসে থাকে। দাদু তখন এতটা দায়িত্বহীন ছিল না। এই তালার অন্য চাবিটাও এখন সে তার ক্লাবের দুর্গাপুজোর মহোৎসবে, পুজোর সাজ-সরঞ্জামে কোথাও হারিয়ে ফেলেছে হয়তো। এখন বাড়ী থেকে বেরোবার সময় আমার মনে হয়, ছ-সাত ঘন্টায় বাবার কোন জিনিসের প্রয়োজন হবে না। দরজা খোলার মুহূর্তে আগেকার মত এখন আর আশঙ্কা হয় না যে বাবার ঠোঁট হয়তো উন্মুক্ত নয়, চোখ কড়িকাঠের দিকে নিবদ্ধ নয়। দরের কোণের দিকে বেশ ভয়ে ভয়ে আমি তখন দেখতাম। এখন দরজা-খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পাই, তক্তপোষ-এ মিশে থাকা নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে।

বাবা ঘুমোচ্ছেন। সারা রাত তার চোখে ঘুম আসে না। এখন এটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমার যাবার পরেই তিনি ঘুমোন। এই সময়টায় তাঁর ঘুমিয়ে থাকা আমার পক্ষে সুবিধাজনক। কে জানে, তিনি আমার সময়ানুসারেই এই অভ্যেস করেছেন কিনা, কিংবা বাস্তবিক রাত্রে তিনি ঘুমোতে পারেন না। এই বয়সে, রোগভোগে মানুষ খুব বদমেজাজী, খিটখিটে হয়ে পড়েন। কিন্তু বাবা আগের বেশী সহিষ্ণু ও অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছেন। কেবল, তার একটা অভ্যাস, যা শুনে আমি রেগে উঠি। উঠেই বলবেন—ও বাড়ী থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে আয় তো, একটু পড়ে শোনা। নইলে, ট্রানজিসটারটা খুলে দে, খবর শুরু হয়েছে। তার মাথায় যেন একটা ঘড়ি আঁটা আছে। খবরের সময়টা ঠিক মনে থাকে। যতক্ষণ আকাশবাণী থেকে খবর প্রচারিত হয়, আমার কপালের শিরা ছিঁড়ে আসতে চায়। মনে হয়, ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরি জ্বলছে, এক্ষুনি ফেটে পড়বে। সব কিছু অসহনীয় হয়ে ওঠে —খবর, খবর, খবর। পরমাণু বিস্ফোরণ, ক্রিকেটের টেস্টম্যাচ, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর —এসব খবরে বাবা, যিনি জানলার বাইরেও উঁকি মেরে দেখতে পারেন না, আশ্চর্য মানসিক শান্তি পান। হ্যাঁ, একবার অবশ্য কি জঘন্য হীন ভাবনা আমার মগজে উঠে-ছিল, বাবাকে ভুল ওষুধ দিয়ে দিই, কিংবা চায়ে স্লীপিং ট্যাবলেটের গোটা শিশি উজাড় করে দিই। তার বেঁচে থাকার কোন অর্থ আমার বোধগম্য হয় না। কিন্তু, পরে এই ভাবনা পালটে গিয়েছিল। কেননা, তাঁর নিজস্ব জীবনই যখন ভারস্বরূপ মনে হয় না, তাহলে আমার কি অধিকার আছে তাঁর জীবন শেষ করি—শুধু কি তাঁকে দু-বেলা শুকনো খেতে দিই? রোজ সকালে জমাদারকে দিয়ে তার কমোড পরিষ্কার করার জন্য বাইরে রেখে দিই! কখনও তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাই, কখনও বা পাশের বাড়ী তালাবন্ধ বা মিথ্যে বলে দিই খবরের কাগজ পাইনি... এখন তার থাকাটাই যেন খুবই প্রয়োজন মনে হয়। তিনি এখন আর কিছু বলেন না বা শোনেন না, বোঝেন না, কিন্তু তাঁর এই জীবনশক্তিহীন শরীরের উপস্থিতি নিজের মনেই একটা ধারণা এনে দিয়েছে—আমার ও দাদুর মাঝে একটা সেতু। বাবা না থাকলে, জানি না, এই ঘরে আমাদের দুজনের মাঝে কে থাকবে—আমি, অথবা দাদু।

নিজের জন্যও সেটাই ভেবেছিলাম। নইলে, আমার এই তেইশ বছরে জীবনের কোন অর্থই বা আমি বুঝতে পেরেছি। প্রতিদিন অসুস্থ বাবার সেবা-শুশ্রূষা করা এবং বাউন্ডুলে, নিষ্কর্মা ভাইয়ের দু-চারটে রুক্ষ কথা শোনা। কাজের নামে কখনও এই কোম্পানী, কখনও অন্য কোম্পানীর জিনিসের স্যাম্পেল ব্যাগে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানো এবং মুখস্থ করা একই কথা সবার কাছে আওড়ানো। কখনও কোন দোর থেকে শোনা যায়, মাপ করবেন, এ সময় বড় ব্যস্ত আছি, কখনও বা কারুর অভদ্র ইঙ্গিত শোনে,

অন্যকোন কাজ যদি করতে চাও... কিন্তু না, এই অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় এটা ভাবাও বাতুলতা, সত্যি কোনদিন হয়তো একজন মানুষের সাক্ষাৎ ঘটবে এবং আমার তিন দিদিদের মতো যারা এই চৌকাঠ থেকে বেরিয়ে গেছে এখন তারা সুখীই বটে...

ঘরের সমস্ত জিনিস পরিপাটি পড়ে আছে। পরিপাটি করে রাখা জিনিসপত্র দামু আগোছালো করে দেয়। কিন্তু তার ঐ আগোছালোপনায় অন্তত মনে হতো যাক, এ ঘরে লোকজন বাস করে। টেবিল থেকে হাত সরাতেই সেখানে আঙুলের ছাপ পড়ে। এত ধুলো।—কেমন ভুতুড়ে মনে হয় এই ঘর। এই একটাই ঘর মা কত সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। পরিষ্কার রাখা একটা নেশা ছিল তাঁর। প্রায় সময়ে তাঁর হাতে ঝাড়ন থাকত, প্রতিটি শিশি ভাল করে মুছতেন। এখন এই ঘরে কিই আর জিনিস-পত্র আছে। বাবার তক্তাপোশের ধারে তেপায়ায় ট্রানজিসটার ছিল, এখন তা নেই। মনে হয়, ঘরের একজন বুঝি চলে গেছে। বিশ্বাস করতেও মন চায় না, কিন্তু দামু এখন সব কিছু করতে পারে। তার এই অসহায়ত্ব কখনও আমার বোধগম্য হবে না যে সে ট্রান-জিসটার বিক্রি করে দিয়েছে। দু বছর ধরে যে নিজের ছেঁড়া জুতো ঘষটে ঘষটে হেঁটেছে তার এমন কি টান অবশেষ ছিল যার জন্য ট্রানজিসটার বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে? এই ঘটনাই ছিল আমাদের দুজনের মাঝে ঝগড়ার চরম মুহূর্ত, কিন্তু, আমি তা ভুলে গেছি। সম্ভবত, দামুও ভুলে গেছে। তিন-দিন ধরে তার খবে না ফেরাটা হয়তো ব্যস্ততা...

এখন ভাবলে মনে হয় ব্যাপারটা তেমন কিছু নয় ক্ষতটা আমি গুরুত্ব দিয়েছি। সেদিন দুপুরে, সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিবেশে খুব শিথিল হয়ে শুয়েছিলাম, এমন সময় কেউ এত সশব্দে শিকল নেড়ে ওঠে যে শব্দের আঘাত হাতুড়ির মত মাথায় এসে পড়ে। দরজা খোলা ছিল, সাট-টাই পরা একজন—লোক সেখানে দাড়িয়ে—দমন চক্রবর্তী এখানে থাকে? রাগে কাঁপছিল সে।

—তার বাবা ঘরে আছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনার যা কিছু বলার আমাকে বলুন। বাবা অসুস্থ, উঠতে পারবেন না।

—আপনি তার দিদি? সে দাঁত চাপে।—শুনুন, আপনার ভাইকে একটু বুঝিয়ে দেবেন। দুর্গাপুজোর জন্য পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা চেয়ে বেড়াচ্ছে। দমদমের যুগ, যার যেমন খুশী চাঁদা দেবে। ইচ্ছে না হলে কি জোর করে কেউ চাঁদা আদায় করবে? চাঁদা দিইনি বলে শালা চোখ দেখাচ্ছিল। নীচে নেবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শাসিয়ে গেছে, মনে রাখবেন, আমার নাম দমন চক্র, আপনারা বাড়ীর ছেলেদের শাসন করেন না কেন? ওকে বলে দেবেন, কোনো ঝুটঝামেলা পাকালে জানেন তো আমার বড় ফ্যাকটরী, গুণ্ডা লেলিয়ে শালাকে এমন ধোলাই দেবো, বুঝতে পারবে মজাবাগুন্ডুর। হুঁ, মনে রাখবেন, আমার নাম দমন চক্র...

আমি আর কি বলবো। পাড়া-প্রতিবেশী লোকেরা সকলে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনের বাড়ীর মাসীমা চশমা সামলাতে সামলাতে আসেন—দামুকে কি বলেছিল? দামু তো সাক্ষাৎ ঠাকুর। লোকেরা মিছিমিছি তার পেছনে লেগে বিরক্ত করে। আহা, কত ভালই ছেলে ছিল আমাদের দামু...

হ্যাঁ, এখন দামু ভালোর পরিভাষা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছিল। একটা সময় ছিল—যখন আমরা দুই চক্রবর্তী ভাই-বোন স্কুলের বার্ষিক উৎসবে বহু পুরস্কার ঘরে আনতাম। নিজেদের ক্লাশের নাম ডাকলেই দীপ্তি চক্রবর্তী এবং দমন চক্রবর্তীর নাম সর্বোচ্চ থাকতো। লেখাপড়ায়, স্পোর্টস-এ, এমনকি নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতিতেও অসংখ্য বই, মেডেল ঘরে জমা হয়ে পড়েছিল। এখন সেই ধুলি-ধূসরিত মেডেল, এবং উই ধরা বই পুরনো আলমারীতে লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে আছে, সেদিন স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারীর ফাইনাল পরীক্ষা। বায়োলজির পেপার ছিল এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলমাল ঘটে। বহি-স্কৃত ছাত্রদের মধ্যে একটা নাম ছিল দমন চক্রবর্তী। ব্যস, সেদিন থেকেই দামুর পৃথিবী একেবারে পালটে গেল। বন্ধুদের কাছ থেকে নোংরা বিশ্রী গালাগাল শিখে ফেলেছিল। পরের বছরে হায়ার সেকেন্ডারীতে কোন রকমে পাশ করেছিল এবং যথারীতি কলেজেও নাম লিখিয়েছিল, অথচ পড়ায় তেমন মন ছিল না। নিজেকে তখন শিল্পী ভাবতে শুরু করেছে, ফলে আঁকা শুরু করে। কিন্তু সেটা তো দামী সখ। পয়সাওলা এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে ইলেকট্রিক গীটার শিখছিল, ঠিক সেই সময় সেশ্রাদ্ধ একদিন হঠাৎ বাড়ী থেকে নিখোজ হয়ে পড়ে। দামু বাবার কথায় রাজী হয়ে একটা বড় কোম্পানীতে সেলসম্যানের চাকরী জুটিয়ে নেয়। শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সে মগজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে। সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত, রাতে একটা ক্লাবে মেম্বার হয়। ধীরে ধীরে সেই ছ-সাতজন মিলে শুরু করা ক্লাব বেশ বড়-সড় হয়ে পড়ে, অভিনয়, সঙ্গীত, জলসা অনুষ্ঠান হতে থাকে। পরে, সেই ক্লাবে বেশ কিছু অর্থবান ছেলে আসে এবং দামুর মতো ছেলেদের তখন চাঁদা আদায় করা ও অন্যান্য কাজের ভার দেয়া হত। দামু সে সময় খুবই অস্থির, চঞ্চল ঘুরে বেড়াতো, একবার আমি ওকে তিন চারদিন ক্রমান্বয়ে সকাল-দুপুর রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখে, রাত্রে জিজ্ঞেস করি, আজকাল কি কাজে যাস না? সে বেশ সহজভাবে উত্তর দেয়—দিন সাতেক হলো আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

আমার আগেই মনে হয়েছিল সে বেশী-দিন এই চাকরীতে টিকতে পারবে না। বাবা তার অহংকার খুইয়ে ফেলেছিলেন—তোমার কাছ থেকে একরকমটি আশা ছিল। আড়াইশো টাকা আনতে, তা থেকে একশো-সোয়াশো ক্লাবে, বাকীটা হাত খরচে উড়িয়ে দিতে। যাক, এখন চাকরীও ছেড়ে দিয়েছো। হয়ে-ছিল কি?

—ওদের ধারণা, আমি এক ঘন্টার কাজ চার ঘন্টায় করি। কারে বেড়ানো লোকেরা জানবে কি করে কলকাতায় বাসে ধাক্কা খাওয়া কি চীজ।

—ব্যস, সামান্য এই কথা, আর তুমি কিনা চাকরী ছেড়ে এলে। বাবা গরম হয়ে ওঠেন—ওরে, আমার সরকারী চাকরী ছিল, তবুও কি কম কথা শুনতে হতো। আজকালকার ছেলেরা কেবল কথা তৈরী করতে পারে। এই তো, সপ্তাহ আগে তুমি দিদিকে বলছিলে, আমি যদি বাংলার নেতা হই সর্বপ্রথম কাজ হবে হাত-রিকসাওয়ালাদের সাইকেল রিকসা দেয়া, যেমনটি অমুক সরকার করেছে। ওরে, নেতা হবার আগে কত কিছু সহ্য করতে হয়, কত গালাগাল খেতে হয়, তা কি জানো? যেই দুটো কথা শুনেছি, অমনি চাকরী ছেড়ে এলাম।

শুধু দুটো কথা নাকি? শালা আমাদের জাত তুলে গালাগাল দিয়েছিল, তোমরা শুধু আর্টিস্ট হতে পারো, কিংবা ভিক্ষে চাইতে পারো। তোমার বাপ-ঠাকুর্দা কি কখন পরিশ্রম করেছে? এক ঘন্টা দেরী করে আমার দশ হাজার টাকার ক্ষতি করেছো। আমিও পরিষ্কার বলে দিয়েছি, রইলো তোমার চাকরী। দমন চক্রবর্তী এমন চাকরী করে না।

হ্যাঁ, বাবার স্বর কাঁপছিল—দমন চক্রবর্তীর মাথায় শিং গজিয়েছে তো। তাই ভাবলে না আড়াইশো টাকা সে দেয়, আর আড়াইটে কথা তুমি শুনতে পারো না। ওসব কথা শুনে তোমার সম্মান কমে গেছে? নিষ্ঠা সহকারে কাজ করলে, নিজেই সে...

এবারে দামুর চেহারা শক্ত হয়ে ওঠে। —বাবা, আপনার দিনকাল গেছে। লাথিঝাঁটা খেলেও চুপ করে থাকতেন, কেননা মাসের পয়লা তারিখে কাগজের দু-টুকরো খয়রাতী পেতেন। দামুর মুখ থেকে থুথুর ছিটে বেরোয় —শুনেছি আপনি খুব নিষ্ঠাভরে কাজ করেছিলেন, তাতে কি দিতে পেরেছেন আমাদের? এই একটাই বাড়ী, রংহীন ফ্যাকাশে একটা ঘর- সকালে উঠে আধঘন্টা পেচ্ছাব থামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তলায় ততক্ষণে কিউ পড়ে আছে, আর আপনার সহকর্মীদের দেখুন, যারা বেইমানী করেছে, আজ তারা বালীগঞ্জ-টালীগঞ্জে দোতলা বাড়ী হাঁকিয়ে গাঁট হয়ে বসে আছে, তাদের ছেলে-পিলেরা বড় বড় সুপারিশ নিয়ে এমন সব চাকরীতে নিযুক্ত যার যোগ্যতায় তাদের কাছে ভিগ্রীও নেই...

সেটাই তার প্রথম ও শেষ চাকরী। তার-পর আর দামুর চাকরী জোটেনি। এখন সে হেরে গিয়ে চেষ্টা করাও ছেড়ে দিয়েছে। যখনই দ্যাখো, ভাড়ার সাইকেল নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্লাবের জন্য চাঁদা উসুল করছে, প্যাণ্ডেল সাজানোর লোকেদের নিজেই সমস্ত ডিজাইন বোঝাচ্ছে, লাউড-স্পীকার বেঁধে আধুনিক গান ও রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড বাজাচ্ছে—প্রতিটি দিক থেকে সে এই চেষ্টাই করছে, যেন তাদের পাড়ার পুজো সবচেয়ে আলাদা, সবচেয়ে

শিল্পপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠুক। দুর্গাপুজো শেষ হবার পর মাসাধিককাল সে এত উদাসীন ও বেওয়ারিশ ঘুরতে থাকে যেন কোন স্বজনের মৃত্যু ঘটেছে। এবার সে একটু জাঁড়য়ে ছিল—না খাবার চিন্তা, না পড়ার। চাকরী যাবার পর থেকে বাবার আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাবা নিজেও তাকে এখন কিছু বলেন না, তবুও সে বাড়ীতে ঠিক মত খায় না, শান্তিতে ঘুমোয় না। একদিন সকালে কাজে বেরোবার আগে সে কাছে এসে দাঁড়ায়—আমার পঁচিশটা টাকার দরকার। সে এক-তলায় ঝুঁকে দেখছিল, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, সারা রাত ঘুমোয়নি।

—কি জন্যে?

—পুজোর জন্য চাঁদা চাই।

—চাঁদা? বাঃ! এখন দেখছি বাড়ীর লোকেদের কাছ থেকে চাঁদা চাইছিস।

—এ বছর লোকেরা আগের মত চাঁদা দেয়নি। চার হাজার টাকার জোগাড় করতে হবে। সকলেই, বাড়ী থেকে কম করেও পঁচিশ টাকা করে দিচ্ছে।

—বাড়ী থেকে নয়, নিজস্ব আয় থেকে। কেবল আমার আয়-এ এই সংসার কত ভাল-ভাবে চলছে, তুই হয়তো দেখতে পাস না। কোথায় তুই আয় করে আমাদের সকলকে ভরণপোষণ করবি। তা নয়, উল্টে আমার কাছে পঁচিশ টাকা চাইছিস?

—হ্যাঁ, আমি নিজের ইচ্ছে মত বাড়ীতে বসে আছি কিনা। দাও না একটা কাজ জুটিয়ে। যাকগে, আমি লেকচার শুনতে আসিনি। পঁচিশ টাকা এক্ষুনি দরকার। সে আমার ব্যাগ ধরে।

—টাকা আমার কাছে আছে, কিন্তু আমি তোর ঐ ক্লাবে দেবো না—তোর মত যত সব অকর্মা, কুঁড়ে, আড্ডাবাজরা এসে জুটেছে। আর জুটেছে ঐ সব পয়সাওলাদের ছেলে, কালো টাকা যাদের পকেটে উপচে পড়েছে। তুই তো নিজের জীবন, ওঠা-বসা সব ঐ ক্লাবের নামে লিখে দিয়েছিস। আমার কাছে কেন আর...

—দ্যাখো, বেশী বাজেলা ঝেরো না বলছি। দু বেলা দুটো খেতে দাও তাতেই মনে করো অনেক উপকার করছি। আমার ইচ্ছে মত একটা পত্রিকা কিনেও পড়তে পারি না, নিজের পছন্দসই বাড়ীর জন্য একটা জিনিসও আনতে পারি না, এদিকে তুমি প্রতি মাসে তিন টাকা শুধু আইব্রো শেপ করতে খরচ করো—সেটা খুব দরকারী খরচ, তাই না! আমার মুখ খোলানোর চেষ্টা করো না। ভ্রু তৈরী করার পর তোমাকে এত কৃত্রিম ও বিশ্রী দেখায়, মনে হয় মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে এসেছো....

—দামু, বেরিয়ে যা তুই এখান থেকে। কথা বলার ভদ্রতাটুকুও তোর মাঝে আর নেই।

—আমি যাবো না। ইচ্ছে হলে তুমি চলে যাও। তোমার উপার্জনের সব কিছু সঙ্গে নিয়ে যাও। মনে রেখো, আমি বাবাকে কখনও অভুক্ত রাখবো না। আমাদের জন্য তোমাকে নিপাত করতে হবে না। বড়দি যেমন গিয়েছে, তুমিও তো রোজ বাড়ী বাড়ী ঘুরছো, এখনও একটা জুটিয়ে নিতে পারোনি? কিন্তু মনে রেখো, পঁচিশটা টাকা আমি আজ নিয়েই যাবো, এটা আমার প্রেস্টিজ ইস্যু।

কোন কথা না বলে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে ছিলাম। হ্যাঁ, ওরা যে কত 'প্রেস্টিজ', আমার চেয়ে বেশী কে আর জানে? হঠাৎ দামুর ওপর আমার করুণা জাগে। ভুল জায়গায় এই ছেলেটি তার সমস্ত প্রতিভা খরচ করছে, কিন্তু বাড়ী ফিরতেই দামুর প্রতি জাগ্রত করুণা ঝরে পড়ে। কাছেপিঠে থাকলে ওকে আমি দু-চারটে চড় কষিয়ে দিতাম। ঘর থেকে ট্রানজিসটার গায়েব—দেড়শো টাকার ট্রানজিসটার নিশ্চিত ত্রিশ-চল্লিশ টাকায় বিক্রী করেছে। ঘরে কেবল এই একটামাত্র জিনিস, যা তার কাজে লাগতে পারত। কিন্তু দামু এও জানত, বাবার কাছে ট্রানজিসটার প্রয়োজন বড় বেশী। একা একা তার মন সর্বদা ট্রানজিসটার জুড়ে থাকে। দামু এত নির্মম হতে পারে, আমি ভাবতেও পারি না—ও আমার কোনও জিনিস বিক্রী করতে পারত, কিন্তু বাবা, বাইরের লোকেরা এই কারণেই আমাকে উপদেশ দিয়েছিল, নিজের ভাইকে সামলে রাখুন। রাত্রে দামু বাড়ী ফিরে এসেছিল, চেহারা একেবারে উদ্ধত—এসেই বাবার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, তার মাথায় হাত রেখে।

—খাবার টাকা আছে, আমি বলি।

—আমি খেয়ে এসেছি।

—তোর চোখমুখ বলে দিচ্ছে, তুই কত খাস। এই দু মাসে সে প্রায় 'অর্ধেক হয়ে গেছে। শরীর এমন রোগা, হাড্ডিসার হয়ে গেছে, যে মুমূর্ষু মায়ের বসে যাওয়া চোখ ও ঠেলে বেরিয়ে আসা চোয়ালের কথা মনে পড়ে যায়।

—বাবা ভাল আছেন? সে জিজ্ঞেস করে।

—তোর তাতে কি? বাবা দিনে চারবার ট্রানজিসটার শুনতেন, সেটাও তুই বেচে এলি।

—তুমি কি কোন কথা সোজা উত্তর দিতে পারো না? টাকা আমায় দিতেই হতো। ট্রানজিসটার তোমার ছিল না, তোমার উপার্জনেও নয়। আমি তোমার জিনিস নিইনি। তোমাকে আমার কিছু বলার নেই।

—কিন্তু আমার বলার আছে। আজ সামনে বাড়ীর হিলোক ভবন থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিল, দমন চক্রবর্তীর খোঁজ করছিল। তোর তো নিজের নাম পছন্দ নয়; এখন যার তার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে তুই নিজের নামের ঢাক পেটাস, মনে রাখবেন আমার নাম দমন চক্র।

—তুমিও কি এইসব কথা বলতে চাও ঐ লোকটা যা যা বলে গেছে। হুঁ, আমার এর বিপক্ষে কিছু বলার নেই।

—তোকে কিছু বলতেও হবে না। শুধু এটুকু জেনে রাখ, কোনদিন ওরা তোকে গুণ্ডা লেলিয়ে মার খাওয়াবে। বড়লোক হাজার হাজার হাত রয়েছে, ওদের সঙ্গে শত্রুতা করে পারবি না।

—ঠিক আছে, আমাকে খুন করলে তুমি বরং মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এসো। ফিরে এসে বাবার কপালে ফুল ঠেকিও। বুঝলে।

—এবার চাঁদা ওঠেনি বলে তুই অচেনা লোকেদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাচ্ছিস। তারা কি দুর্গোপুজো করার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে? এখন দুর্গোপুজো, তারপর লক্ষ্মীপুজো, তারপর কালীপুজো, তারপর জগদ্ধাত্রী পুজো, তারপর সরস্বতী পুজো—কত আর চাঁদা দেবে। সকলেরই নিজের ক্যাপাসিটি আছে।

—হুঁ, দেখা আছে কার কত ক্যাপাসিটি। প্রত্যেক শনিবার পাঁচ-সাতশো টাকা তারা কেবল রেসেই উড়িয়ে আসে, প্রত্যেক মাসে তাদের ওখানে মদের পার্টি হয়, আর আমাদের দশ টাকা দিতে পারে না? না দিক, তা বলে চাঁদা না দিয়ে

এত লম্বা-চওড়া উপদেশ দিতে আসে কেন, কাজকর্ম করো, চাঁদা চেয়ে বেড়াও কেন, তোমাদের বসে বসে খাওয়ার অভ্যেস গড়ে উঠেছে, চাঁদার টাকা অর্ধেক পুজোয় যাবে, অর্ধেক সারা বছর বসে খাবে। আমি ওকে ছাড়বো না বলে দিলাম ও শালা আমাকে মার খাওয়াবে ..

—চাঁদা চাইতে গেলে এসব শুনতেই হবে। আশ্চর্য, এই ছোটখাট পাড়ায় দশ-দশটা প্যাণ্ডেল বেঁধেছে, দশটা ক্লাব থেকে চাঁদার জন্য হাজির হয়। আমি বুঝে উঠতে পারি না, যে পাড়ায় এত অভাব, সেখানে হাজার টাকা শুধুমাত্র লাইট আর ডেকো-রেশানে খরচ করে কি লাভ। এইসব এনজয় তারাই করে যারা ছুটি উপভোগ করার জন্য বেড়াতে বেরোয়। ক্ষুধার্ত মানুষ এসব সাজ-সজ্জায় পেট ভরাতে পারে না। দুর্গো-পুজো কথা প্রোগ্রাম-ফাংশান করা এইসব হবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাঁপা ব্যাপার। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। এত পয়সা জড়ো করে ওদের বিলিয়ে দিস না কেন? সত্যি ওদের প্রয়োজন আছে।

—দুদিন হয়তো ওরা ভাল খাবে-দাবে তারপর সেই তো অভাব। এই অভাব থেকে, দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার শক্তি এখান এখান থেকেই আমরা সঞ্চয় করি। আমরা মানসিক শান্তি পাই। কিন্তু এসব তোমার বুদ্ধিতে কুলোবে না।

—সত্যি তোরা মানসিক শান্তি পাস? আমার জানা ছিল না, তুই এত বড় আস্তিক হয়ে পড়েছিস। তুই তো ঈশ্বর, পুজো, মন্দির—কিছু মানতিস না।

দামু কোন জবাব দেয় না। বাইরে বেরোবার সময় আমি জিজ্ঞেস করি—ট্যানজিস্টার কি তুই সত্যি সত্যি বিক্রী করে দিয়েছিস? কত টাকা পেয়েছিস?

—আমি বাচ্চি। কালও খাবার খাবো না।

—তাহলে ঘরে ফেরার দরকার কি?

তখন আমি ভাবিনি, সে আমার শেষ কথাটা শুনেছে। অথচ তিনদিন ধরে সে বাড়ি ফিরছে না। আজ চতুর্থ দিবস। আমি বাবাকে একথাও বলিনি যে ট্যান-জিস্টার বিনু নিয়ে যায়নি, দামু বিক্রী করে এসেছে। বাবা কিছুই বলবেন না, কেবল শূন্য ভেজা চোখ একদিকে স্থির করে রাখবেন।

—দী-ই-ই-পু। বাবা বুঝি দ্বিতীয়-বার ডাকেন। তাঁর ডাক প্রথমবারে শোনা যায় না।

—এসে পড়েছিস মা? কখন এলি? তাঁর কণ্ঠস্বর অদ্ভুতভাবে কাঁপতে থাকে—মাইনে পেয়েছিস?

—আজ আঠাশে বাবা। পরশু পাবো।

—সামনের মাসটা যাবে? জানি না তাঁর কণ্ঠস্বরে কি হয়েছে। এক-একটি শব্দ উচ্চারণে তাঁর যেন সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। বাবা উঠে বসার চেষ্টা করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে বস্তুত ভয় ধরে। মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌঁছলে মানুষের কণ্ঠস্বর কি এত শূন্য অসহায়, এত ভরাবহ হয়ে পড়ে?

—কিছু চাই বাবা?

—খবরের কাগজ আছে?

তখনই দরজার কড়া নাড়া সশব্দে বেজে ওঠে। আবার হয়তো কোন নতুন লোক আবার কোন নতুন সমস্যা। কিংবা, হয়তো দামু এসেছে। আমি দ্রুত দরজা খুলে দিই। না, দামু ফেরেনি। তার বন্ধু। সেরকমই হাড়গিলে চেহারা। আঠারো-উনিশ বছরের যুবক এবং সকলেই যেন একই ছাঁদে গড়া। আমি বলতে যাচ্ছিলাম দামু বাড়িতে নেই। তার আগেই সে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে—দামু হাসপাতালে—সকাল থেকে।

—কি-ই! আমি চমকে উঠি। একটা না একটা তামাসা দাঁড় করানো তার অভ্যেস। দামু, তুই আমার শান্তিতে থাকতে দিবি না।

—দামু পি জিব এমারজেন্সী ওয়ার্ডে আছে। কাল রাত্রে ওর পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়েছিল। বলছিল ডাক্তার ডাকার দরকার নেই, সেরে যাবে। সকালেই হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যাই। ফুড পয়জনিং হয়েছে সম্ভবতঃ। আপনি একা যেতে পারবেন? আমার একটু কাজ আছে; অবশ্য দামুর কাছে আমাদের দুজন ছেলে রয়েছে।

আমার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। না, এমন ঘটতে পারে না। আমি বন্ধ করে তালা এঁটে দিই, তারপর বাইরে এসে রিকসা করি। সেই হাতরিকসা। এই ম্যানপুলিং রিকসায় দামু অদ্যাবধি চাপেনি.. দামু যদি কিছু খেয়ে থাকে? না এমন কাজ সে কখনও করতে পারে না। আমি রিকসা-অলাকে জোরে চালাতে বলি, কিন্তু হঠাৎ দমু করে থেমে পড়ে। সামনে দীর্ঘ মিছিল এবং রাস্তা খুবই সংকীর্ণ। এত কোলাহল, এত ব্যাণ্ড-বাদ্যি—আজ দশমী, দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন। রিকসঅলা একজনকে অনুরোধ করে—বাবু একটু রাস্তা দিন, হাসপাতালে যেতে হবে, কিন্তু রাস্তার দু পাশে দর্শকদের প্রচণ্ড ভিড়। না দামু, তুই যেতে পারবি না, আমাকে পৌঁছতে দে আমি সব সামলে নেবো. তুই এত সহজে মরতে পারবি না .. ওফ। একি মিছিল রে। প্রথমে লাল পাগড়িওলা ব্যাণ্ড পার্টি, তারপর আরোহী সংস্থান-এর নীল ড্রেস-অলা ছেলেরা বাঁশি বাজিয়ে চলেছে, তাদের পেছনে আরো একটা রঙিন ব্যাণ্ড, তার পেছনে ঢাক-ঢোল পেটানোর দল, তারপর বকসিং ক্লাবের ছেলেরা এক লাইনে তরো-য়ারের কিছু একটা বাজিয়ে সেই সুসজ্জিত লরি এখনও কতদূরে। এরপর দুইদিকে মোটর সাইকেল সারি সারি যাতে চেপে আরোহীরা কখনও এক হাত কখনও বা দুহাত ছেড়ে নানারকম কসরৎ দেখিয়ে চলেছে। তার পেছনে কয়েকজন মস্তান ধরনের ছেলে হাতে রাঁধা রুমাল উঁচিয়ে ভাংরা নাচতে নাচতে চলেছে....এর পেছনে টিউব লাইটে সুসজ্জিত লরি লরি সামনে এগিয়ে আসতেই ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেলি—শুধু অসুর আছে—ত্রিশূল বুকে বিদ্ধ রক্তে মাখামাখি, একে নিয়ে যাবার জন্যই কি এত সাজ-সজ্জা? এর পেছনে সিল্কের পোশাক পরা একটা আরো দীর্ঘ ব্যাণ্ড পার্টির মিছিল—উফ একি তামাশা! কিভাবে গোটা রাস্তা জুড়ে আছে ...এত হৈ-চৈ কান ফেটে পড়ছে....এবং সবশেষে সবশেষে নানাধরনের ডিজাইনে ফুটে ওঠা বালবের আলোয় সুসজ্জিত গাড়ি, যার ওপর দুর্গার প্রতিমা অবস্থিত। প্রতিমার মুখে এক বিচিত্র ঔজ্জ্বল্য, পশ্চাতে রঙিন ঘূর্ণমান চক্র—লাল, হলুদ, নীল, সবুজ রং বারবার চক্রাকারে ঘুরছে, চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে আমার....

রিকসা গলি দিয়ে বেরিয়ে এক অন্ধকার রাস্তায় সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে—হাসপাতাল এসে পড়েছে। নামুন। কিছুই দেখা যায় না। এত আলো, এত হৈচৈ-এর পর সহসা হাসপাতাল এর বাইরে এসে দাঁড়াতে কেমন অন্ধকার মনে হয়। কিন্তু এখানেও তেমন ভিড়। বাইরে-ই কোঁচকানো চামড়ার একটি হাত থরথর কণ্ঠস্বরে রাস্তা আটকায়—দিদিমণি, খালি শিশি-বোতল নিয়ে যাও ওষুধের জন্য। দশ পয়সা করে মা। আমি তাকে এড়িয়ে ভিড় চিরে ভেতরে গিয়ে ঢুকি।

এমারজেন্সী ওয়ার্ডের সামনে লাল বাতি জ্বলছে। কোন শব্দ নেই। ভেতরে প্রবেশ করা নিষেধ। না-না। এসব থেকে তুই এত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাবি। না দামু। আমার ভেতরে অস্থিরতা শান্ত হয়ে পড়েছে—তুই এত সহজে মরতে পারিস না। এ হতে পারে না ...আমার মাঝে স্থৈর্য আসে। বাবা খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করছেন, আর আমি কত মিছিল, কত বাধা অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছি

আমার পাশে একটি ছেলে, সম্ভবত দামুর বন্ধু সে তার চেহারায় চিন্তিতভাবে এক আশ্বাস দেখা যায়, আমি এগিয়ে বেঞ্চের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে বসি। ভেতর থেকে বাঁশির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এই শব্দ কেবল দামুরই হতে পারে। ডাক্তারদের অস্পষ্ট ফিসফিসে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। এইমাত্র ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে যান্ত্রিক স্বরে খবর দেবেন—হি ইজ আউট অব ডেঞ্জার।

বাইরে কবিডোবের জানলার দিকে মৃদু কোলাহল। সেই মিছিলটা সম্ভবত ঘুরে এদিকেই আসছে। নানান ধ্বনির মিশ্রিত আওয়াজের কোলাহল কতখানি হাস্যাস্পদ লাগে ..

অনুবাদ : সুবিমল বসাক

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সোনার হরিণ নেই

॥ কুড়ি ॥

চারদিকের আবছা অন্ধকারের মধ্যে শুধু বাপী তরফদারের বাড়িটাই আলোয় ঝলমল করছে। লাইন ধরে কাছে-দূরের আর সব ঘরে লণ্ঠন কুপী মোমবাতির টিমটিম আলো। ওই বাড়িটা এখন চোখ টানার মতোই ব্যতিক্রম। নেপালী মহিলার রুচির প্রশংসা করতে হয়। দিনের বেলায়ও বাপী বাড়িটার ছিমছাম চেহারা দেখে গেছে।

সামনের বারান্দায় আরো চড়া আলো জ্বলছে। টেবিলের দুদিকের শৌখিন বেতের চেয়ারে গায়ত্রী রাই আর তার ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা বসে। হাসিমুখে কথাবার্তা চলছে।....আবু বলছিল, ওই ম্যানেজার ছাড়া মেমসায়েবকে আর কারো সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখে না ওরা। কথা বেশি রণজিৎ চালিহাই বলছে। গায়ত্রী রাই অল্প অল্প হাসছে, এক-একবার মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছে বা কিছু বলছে। দূরে থেকে এ-দৃশ্য দেখেই আবুর পিত্তি জ্বলে গেল। চাপা ঝাঁঝে বলে উঠল, শালা ঠিক গাঁট হয়ে বসে আছে, আর মেমসাহেবকে কিছু লাভের রোশনাই দেখাচ্ছে। ও-ব্যাটা এখন ওখানে না থাকলেই ভালো হত, মেমসাহেবের ওপর দিয়ে কথা কইবে।

কি ভেবে মৃদু গলায় বাপী বলল, বাড়ি নিয়ে কথা উঠলে তুমি চুপ করে থেকো, আমি এসে যাবার পরে আর তোমার কোনো দায়িত্ব নেই।

এতেই আবু ঘাবড়ে গেল একটু।—তুমি কি গোলমেলে কথা কিছু বলবে নাকি? মেমসাহেবের মেজাজ খারাপ করে দিও না বাপী ভাই, আর ওই ম্যানেজারও একটুও সাদা মনের লোক নয়।

বাপী আশ্বস্ত করল তাকে, ঠিক আছে।

বারান্দায় জোরালো আলো, বাইরের দিকটা অন্ধকার। তাই একেবারে দাওয়ার কাছে আসার আগে বারান্দার দু'জন ওদের লক্ষ্য করল না। দু'জন নয়, তিনজন। বারান্দা-লাগোয়া ঘরের দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে গায়ত্রী রাইয়ের মেয়ে ঊর্মিলা রাই বই পড়ছে। এদের আড়ালে দূর থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

ভিতরে ঢুকে পড়তে বারান্দার দু'-জনের ওদের দিকে চোখ গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেরই খুশি মুখ গাম্ভীর্যের মুখোশের আড়ালে সেঁধিয়ে গেল। কাছে এগোবার ফাঁকে প্রথমে রণজিৎ চালিহাকেই এক নজর দেখে নিল বাপী। পরনে দামী স্যুট, দামী টাই, ধপধপে ফর্সা রং, চওড়া উঁচুনো কপাল সে-তুলনায় ছোট চোখ। আসামের মানুষ দেখলেই বোঝা যায়। বয়েস বেশি হলে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ।

ওরা কাছে আসার ফাঁকে গায়ত্রী রাই নেপালী ভাষায় চাপা গলায় রণজিৎ চালিহাকে বলল কিছু। চালিহা অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে আবুকে ছেড়ে বাপীকে ভালো করে দেখে নিল। বাপীর ধারণা, ও যে বাড়ির মালিক মেমসাহেব তার ম্যানেজারকে সেটাই জানান দিল।

এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবু রববাণীর অন্য মুখ। বিনয় উপচে পড়ছে। আবুকে মেমসাহেবকে সেলাম জানালো। আবার মুখেও বলল, গুড্ ইভনিং মেম-সায়েব। তারপর ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে আরো বিনীত অভিবাদন।—গুড্ ইভনিং সার।

মনে মনে বাপী আবুকে তারিফ না করে পারল না। ও উন্নতি না করলে কে করবে।

বাপী দু হাত জুড়ে কপালে ঠেকালো, কিন্তু মহিলা ওর দিকে তাকালোই না। ফলে বাপী ম্যানেজারের দিকে আর না ফিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মেয়ে ঊর্মিলা বিকেলে বাড়ির মালিকের হেনস্থা দেখেছে, আবার সে এসে দাঁড়াতে তার বই পড়ার মনোযোগ গেল। এবারে মায়ের সঙ্গে আংকল চালিহা, লোকটার কপালে দুর্ভোগ আছে ভাবছে হয়তো।

বাড়ির মালিকের অস্তিত্ব স্বীকার করারও দায় নেই যেন গায়ত্রী রাইয়ের। ঈষৎ রুষ্ট স্বরে আবুকে বলল, বিকেল থেকে তোমার খোঁজে লোক পাঠানো হয়েছে—কোথায় ছিলে?

আবু রববাণীর অপ্রস্তুত মুখ, কিন্তু জবাবটুকু সপ্রতিভ। এত কাল বাদে দোস্তকে কাছে পেয়ে ভুলে গেলাম—

আবু রববাণীর মতো একজনের সঙ্গে এত দোস্তির কারণে কিনা বলা যায় না, বাপীকে এখনো কেউ বসতে বলছে না। আবুর জবাবও গায়ত্রী রাইয়ের কাছে তেমন খুশি হবার মতো নয়। আরো গম্ভীর।—বাড়ির ব্যাপারে কাগজ-পত্র করেই সই হবার কথা ছিল, এখনো হয়নি কেন?

আবুর বিনীত জবাব, ম্যানেজার সায়েব জানেন—

রণজিৎ চালিহা বলল, সব রেডি আছে, কালই হতে পারে।

জবাবের আশায় আবু এবার বাপীর দিকে তাকালো। কিন্তু বাপীর এমন মুখ যেন মাথায় ঢুকছেই না কিছু; অগত্যা আবু মেমসাহেবের দিকে ফিরল। বলল, ঘরের মালিক এসে গেছে, এখন যা করার সেই করবে—তাকে বলুন।

গায়ত্রী রাইয়ের এই উক্তিও পছন্দ হল না।—আমি মালিক-টালিক জানি না, তোমার সঙ্গে আমার কথা পাকা হয়েছে, তাকে যা বলার তুমি বলো—কনট্রাক্ট কালই সই হওয়া চাই।

নিরুপায় আবুর দু' চোখ আবার বাপীর দিকে। দোস্ত সব জেনে শুনে ওকে এমন ফ্যাসাদে ফেলছে কেন?

অগত্যা এবারে বাপীর জিভ নড়ল। দু' চোখ মহিলার মুখের ওপরে।—কোন্ বাড়ির কথা হচ্ছে...এই বাড়ি?

গায়ত্রী রাইয়ের বিরূপ চাউনি।—সেটা এতক্ষণে বুঝলেন?

বাপীর এই মুখে কৃত্রিমতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। বলল, আপনাদের কথা-বার্তা আমি ঠিক খেয়াল করিনি....বিকেল থেকে এই ক' ঘণ্টার অর্ধেক সময় আবুর মুখে কেবল আপনার প্রশংসা শুনেছি, তাই আমি ভাবছিলাম একজন ভদ্রলোকের

ছেলেকে আপনি বসতেও বলছেন না কেন. .।

ধাক্কাটা শুধু সামনের মহিলা নয়, রণজিৎ চালিহা, দরজার ও-ধারের চেয়ারে বই হাতে উর্মিলা, এমন কি আবুর ওপরেও গিয়ে পড়ল।

—সীট্ ডাউন প্লীজ। বলা বাহুল্য, শিষ্টাচারের খোঁচা খেয়ে মহিলার মুখভাব আরো অপ্রসন্ন।

বাপী চেয়ার টেনে বসল। উর্মিলা উঠে ঘর থেকে একটা মোড়া এনে আবুর সামনে রেখে আবার নিজের চেয়ারে ফিরে গেল। ইশারায় ওকেও বসতে বলে, গায়ত্রী রাই বাপীর মুখোমুখি।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, বলুন, বাড়ির কি হয়েছে?

কি হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

কি হয়েছে দেখার জন্যেই যেন বাপীর দু'চোখ বারান্দার চারদিকে আর উর্মিলা রাইকে ছাড়িয়ে ভিতরের দিকেও একবার ঘুরে এলো। মেয়েটার চাউনিতে কৌতুকের ছায়া।

এদিকে বাপীর তুষ্ট পর্যবেক্ষণেও ভেজাল কিছু নেই। অকপট প্রশংসার সুরেই বলল, দিনের বেলা দেখে গেছলাম, রাতে আরো ভালো লাগছে....ঘর বেড়েছে, ইলেক্‌ট্রিক লাইট এসেছে....নিজের সেই বাড়ি বলে চেনাই যায় না।

গায়ত্রী রাই তেমনি গম্ভীর, কিন্তু গলার স্বর নরম একটু। —এর জন্য আমার অনেক টাকা খরচ হয়েছে, নট্ লেস্ দ্যান ...ফাইভ থাউজ্যান্ড। এ-টাকাটা ভাড়া থেকে কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা হবে সেটা আবুর সঙ্গে সেটল্‌ড হয়ে আছে। আপনি জেনে নেবেন... এগ্রিমেণ্ট রেডি আছে। চালিহার দিকে ফিরল, গেট্ ইট সাইনড্, টুমরো—

বাপী পাশের দিকে অর্থাৎ ম্যানেজারের দিকে ফিরেও তাকালো না। তার আবেদন খোদ কর্ত্রীর কাছে। মুখখানা ফ্যাকাসে পড়ার মতো। বলল, আপনি আমার ভাঙা বাড়ির চেহারা পাল্টে যা করেছেন মিসেস্ রাই, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। এরকম করার সামর্থ্য আমার কোনদিন হত না, সই-টইয়ের জন্যেও কিছু আটকাবে না. কিন্তু একটু মুশকিল হল আমি থাকব কোথায়?

মুখের কথা শেষ হতে না হতে চালিহা বলে উঠল, দ্যাটস্ নট্ আওয়ার লুক আউট।

বাপীর ভেবাচাক্কা খাওয়া মুখ। চালিহাকে একবার দেখে নিয়ে সংকোচ আর সম্ভ্রমের সঙ্গে জিগেস করল, ইনি?

চালিহা থমকালো। ধৃষ্টতা দেখছে। গায়ত্রী রাই জবাব দিল, ইনি মিস্টার রণজিৎ চালিহা, আমাদের বিজনেসের চিফ এক্‌সিকিউটিভ।

আমার বিজনেস বলল না বা ম্যানেজার বলল না বাপীর কানে সেটুকু ধরা পড়েছে। সবিনয়ে তাকে নমস্কার জানিয়ে আবার মহিলার দিকে ফিরল।—বাড়ির এগ্রিমেণ্ট আপনার সঙ্গে, না আপনার ফার্মের সঙ্গে?

—আমার সঙ্গে।

—তাহলে কথাবার্তাও আপনার সঙ্গে হোক।....বাড়ি নিয়ে আপনাকে আমি কোনো ট্রাবল্ দেব না, আবুর সঙ্গে যা সেটল্ করেছেন তাই হবে। কিন্তু আমার প্রবলেমটা আপনিও এ'র মতো এক কথায় নাকচ করে দেবেন আমি আশা করছি না।

রণজিৎ চালিহার ফর্সা মুখ লাল। সবাসরি কারো দিকে না তাকালেও বাপীর অগোচর কিছু নেই। মোড়ায় বসা আবুর উতলা মুখ। আর দরজার লাগোয়া চেয়ারে বসা ওই মেয়ের চোখের কোণে কৌতুক আরো বেশি জমাট বেঁধেছে। অর্থাৎ, কর্ত্রীর সামনে বসে প্রকারান্তরে তার ম্যানেজারকে তুচ্ছ করাটা নতুন কিছু।

কিন্তু বাপী তরফদারের ষষ্ঠ অনুভূতি ওকে বড় ঠকায় না। আবুর মুখে গায়ত্রী রাই আর তার এই ম্যানেজারের সম্পর্কে আদ্যোপান্ত শোনার পর থেকেই একটা সম্ভাবনা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। এখন এই কথার পরে মহিলারও গম্ভীর চাউনিতে যদি পলকের প্রশ্রয়ের আভাস সত্যিই মিলিয়ে যেতে দেখে থাকে, তাহলে অঙ্ক হিসেবের সঙ্গে মেলে।

মনে হল দেখেছে।

গায়ত্রী রাইয়ের কথায় অবশ্য সেই প্রশ্রয়ের ছিটেফোঁটাও নেই। কথাগুলো বিরক্তি-ছোঁওয়া। —আপনার প্রবলেম শুনে আমি কি করতে পারি?...বড়জোর পুরো ভাড়া একশ' টাকার জায়গায় মাসে পঞ্চাশষাট টাকা করে কমটা যেতে পারে।

মহিলা চতুর কত বুঝতে একটুও সময় লাগল না বাপীর। টাকা তার কাছে কোনো সমস্যা নয়। পঞ্চাশ-ষাট ছেড়ে পঁচিশ-তিরিশ টাকা করে কাটতে বললেও হয়তো রাজি হয়ে যাবে। কারণ, তাতে বাড়ির ওপর দখলের দাবি অনেক বছর ধরে কায়েম থাকবে। কিন্তু ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা এই কূট চালের ধার দিয়েও গেল না। অসহিষ্ণু ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, তাহলে আবার ফ্রেশ এগ্রিমেণ্ট করতে হয়—এমনিতেই ওই আবু রববাণী যতটা পারে স্কুইজ করেছে।

বাপী এবার তার দিকে ফিরল। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, ওই এগ্রিমেণ্টের আমি কানাকড়িও দাম দিই না।

রণজিৎ চালিহার ফর্সা মুখ তেতে ওঠার বা সামনের মহিলার দু'চোখ ঘোরালো হয়ে ওঠার আগেই বাপী একই সুরে আবার যা বলল, সেটা কেউ আশা করেনি। চোখে গায়ত্রী রাইকে দেখিয়ে ম্যানেজারকেই বলল, আমার বন্ধু আবু রববাণী যাকে এত শ্রদ্ধা করে আর বিশ্বাস করে, আমারও তাকে তেমনি শ্রদ্ধা করতে আর বিশ্বাস করতে অসুবিধে নেই। ওই এগ্রিমেণ্ট আপনি ছিঁড়েও ফেলতে পারেন, ও'র মুখের কথাই যথেষ্ট। ধীরে-সুস্থে গায়ত্রী রাইয়ের দিকে ফিরল।—সত্যিই যদি স্কুইজ করা হয়েছে মনে করেন, তাহলে বলবেন, যা উচিত বিবেচনা করবেন তাই হবে। কিন্তু আমার সমূহ প্রবলেম অন্যরকম—

কথার ফলে পড়ে চালিহার মেজাজ আরো তিরিক্ষি। আবারও আগ্ বাড়িয়ে গজগজ করে উঠল, সেটা আমাদের বলে লাভ কি—আপনার প্রবলেম মাথায় রেখে আমরা বাড়ির রিনোভেশনে হাত দিইনি বা এত টাকা ঢালিনি।

বাপীর নিরীহ দু'চোখ প্রথমে মা, পরে দরজার ওধারে মেয়ের মুখের ওপর ঘুরে এলো। অত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার কথা বলার পর ম্যানেজারের এই মেজাজ তাদের কাছেও সুশোভন লাগছে না। বাপীর স্নায়ুগুলো আরো যেন নিজের বশে এখন। মেডায় বসা হতবাক মূর্তি আবুর দিকে ঘুরে তাকালো।—ঘর বাড়ানো বা এত সব করার পরামর্শ তুমি দিয়েছিলে?

আবুর হাঁসফাঁস দশা। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। পাশ থেকে রণজিৎ চালিহাই খেঁকিয়ে উঠল আবার।—ও পরামর্শ দেবে কি? এই ঘর-বাড়ি ও'র মতো মহিলার বাসযোগ্য ছিল? যেটুকু দরকার করে নেওয়া হয়েছে।

বাপীর ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি যেন আপনা থেকেই এসে গেল। বলল, বাড়ির হাল দেখে ছেলেবেলায় আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগত, আর তখন চা-বাগানের বড় বড় বাংলোগুলো দেখে ভাবতাম বড় হয়ে ওখানে ও-রকম একটা বাংলো তুলব।...তা এই গরিবের কুঁড়ে ঘর নিয়ে টানা হেঁচড়া না করে আপনিও চা-বাগানের কোনো জমিতে ও'র উপযুক্ত একখানা হাল ফ্যাশানের বাংলো তুলে দিলে পারতেন?

এই বানারজুলির জঙ্গলেই বাপী দেখেছে, তৈরি মৌচাকে ঢিলের যৎসই ঘা পড়লে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি তাড়া করে আসে আবার চাক থেকে টসটস্ করে মধুও ঝরে। আবুর দিকে বাপী তাকায়নি, তার দিশেহারা অবস্থাটা আঁচ করতে পারে। বাকি তিন জোড়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টি প্রথমে ছেঁকে ধরল তাকে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া আর ততটা গরম মনে হল না। উর্মিলা রাইয়ের চোখের সামনে বই। গায়ত্রী রাইয়েরও বাইরে রুষ্ট মুখ কিন্তু ভিতরে তরল কিছু তল করার চেষ্টা।

....খোঁচাটা শেষ পর্যন্ত একজনেরই দম্ভের চাকে গিয়ে লেগেছে। সম্ভাবনার সেই অনুভূতিটা ভিতরে আর এক দফা নড়া-চড়া করে গেল—বাপীর হিসেব মিলছে।

রণজিৎ চালিহা চেয়ার ছেড়ে উঠেই দাঁড়াল এবার। ক্রুদ্ধ দু'চোখ গায়ত্রী রাইয়ের দিকে। এই একজনকে এরপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করা হবে কিনা এই জিজ্ঞাসা যেন।

জবাবে রমণীর পলকা ভ্রূকুটি। গলার স্বরে হালকা শাসন, ডোন্ট বি ইম-পেশেন্ট ম্যান! বোসো—। তারপরেই রসকষশূন্য গম্ভীর দু চোখ বাপীর মুখের ওপর চড়াও হল। গলার স্বরে ঠান্ডা ঝাপটা।—ওকে ও-কথা বলার অর্থ কি, এ বাড়ি আমরা জবর-দখল করে খুশি মতো রেনোভেট করে নিয়েছি?

বাপীও ঠান্ডা মুখেই মাথা নাড়ল। —না। যা করেছেন একটু আগে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি, আর ভাড়া-টাড়ার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই হবে বলেছি।

ঘরে বসে আবু বলছিল, বাপী-ভাইয়ের মুখখানা আগের থেকে ঢের মিষ্টি লাগছে, দেখলে মনে হয় ভেতর বার সাফ—নেপালী মেমসাহেবের ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে। আবুর সে-আশায় এখন ছাই পড়েছে কিনা জানে না, কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে ওর মেমসাহেবের এখন ভিতর দেখার চোখ।

—ঠিক আছে। থাকার জায়গার প্রবলেমের কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা কি করতে পারি?

এ-প্রশ্নের জন্য বাপী প্রস্তুতই ছিল। জবাব দিল, বাড়ির জন্য আপনি অনেক খরচ করেছেন আরো কিছু খরচ করলে সমস্যা মেটে।....পাশের খালি জমিতে সেপারেট আর এক্সকুসিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট সুদ্ধু আমার জন্য একখানা ঘর তুলে দিন।

প্রায় কর্কশ স্বরেই গায়ত্রী রাই বলে উঠল, অ্যাবসার্ড। এখানে আমি থাকি আমার মেয়ে থাকে—আমাদের অসুবিধে হবে।

দরজার কাছে সেই মেয়ে তেমনি বসেই আছে। বাপীর সহিষ্ণুতায় এবারে চিড় খেল একটু। সব মেয়েই মেয়ে। হয়তো ওকে করুণাপ্রার্থী ভাবছে এবার। তবু সংযত স্বরেই বলল, অসুবিধে আমারও খুব হবে মিসেস রাই .নিজের নিরিবিলি শান্তির ঘরে একটু আশ্রয় পাব বলে কল-কাতা থেকে চলে এসেছিলাম। যাক, আপনি যেমন খুশি পার্টিশন দিয়ে নিতে পারেন, আর সব সুদ্ধু যা খরচ হবে তাও ওই ভাড়ার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন।

মায়ের পিছনে মেয়ে যেন উসখুস করে উঠল একটু। অসুবিধে তারও হবে শুনে হয়তো মজার ছোঁয়া লেগে থাকবে। বাপী তাকালো না। সব থেকে বেশি অবিশ্বাস আর ঘৃণা নিজের ওপর।

গায়ত্রী রাই মাথা নাড়ছে। চাউনিও সদয় নয়। বলল, আই ডোন্ট লাইক দি আইডিয়া।

এবারেও বাপীর নরম মুখে কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট।—টাকা সংগ্রহ করে নিজের জমিতে যদি সেপারেট ঘর তুলি আপনি আটকাবেন কি করে?

এবারে যথার্থ হাসি ছাড়া কর্কশ মুখ মহিলার। এদিকটা ভাবে নি। তার দাপটের ম্যানেজার এতক্ষণে হয়তো ধৈর্যের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল. কিন্তু এ-কথার পর সেও আর দাপট দেখালো না। ঘাড় বেঁকিয়ে নেপালী ভাষায় কি দুই-এক কথা বলল তাকে।

কি বলল তক্ষুনি বোঝা গেল। গায়ত্রী রাইয়ের দু' চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর এঁটে বসল। বলল পাশের জমি সুদ্ধু বাড়িটা যদি আমি কিনে নিতে চাই? আই উইল পে ফেয়ার প্রাইস, পাঁচ হাজার টাকা আমি অলরেডি খরচ করেছি,, আরো আট হাজার টাকা দিতে পারি। এগ্রিড?

বলা নেই কওয়া নেই একটা মুখের কথায় আট হাজার টাকার মালিক হয়ে বসতে পারে—ভাবলেও বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠার কথা। আট হাজার টাকা একসঙ্গে কখনো চোখে দেখেনি। কিন্তু বাপীর তা করছে না। গরজ দেখছে। গরজ বুঝছে। ঘরে-সরে ফিরে জিগেস করল, আপনার বিবেচনায় সব মিলিয়ে এই বাড়ি আর জমির দাম তাহলে তেরো হাজার টাকা?

—টেন থাউজ্যান্ড? ঝাঁঝালো গলায় দর চড়িয়ে গায়ত্রী রাই বলল, কিসের কি দাম আমার জানা আছে, আমার দরকার তাই এই দাম—কিন্তু আর বাড়বে না। এগ্রিড?.

ঘাড় ফিরিয়ে একবার আবুর মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছে বাপীর। কিন্তু বেচারা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার টালিগঞ্জের বুকলিন পিওন রতন বণিকের কথা মনে পড়ে গেল। আসার দিনও বলেছিল, কপালের রং বদলাচ্ছে, এবারে দিন ফিরবে বলে। কয়েকশ' টাকা পুঁজির বৃত্ত থেকে একেবারে দশ হাজার টাকার বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল? কিন্তু বুকের জ্বালায় যে বৃত্তে পৌঁছনোর তৃষ্ণা এখন, সেটা দশ হাজারের দশ বিশ গুণ হলেও কিছু নয়। আবুর

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন:

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করুন আর মাড়ি মালিশ করুন, তাহলে মাড়ির গোলমাল আর দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারবেন।

যাঁরা ফরহ্যান্স ব্যবহার করেন, তাঁরা জানাচ্ছেন

"...আমার দাঁতে কোনো গোলযোগ নেই..."

"...করহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে শুরু করে অবধি আমার দাঁতে কোনো গোলযোগ বা দাঁতের ক্ষয় হয়নি...

আপনাদের করহ্যান্স টুথপেষ্ট আর করহ্যান্স ডেন্টাল-অ্যাকশন টুথব্রাশের জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো..."

(শ্রী) পি. নারেশ কামাথ, আন্ধেরী, বম্বে

(এতদ্সঙ্গে এই বয়সের আমার চিত্রির ফোটোগ্রাফটি দেখি ক্লেক্তি ম্যামার্স এণ্ড কোং লি-র রেফোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

উজ্জ্বল কমলা রঙের প্যাকে

"...প্রায় দশ বছর আগে আমার মাড়িতে গোলযোগ ছিল..."

"প্রায় দশ বছর আগে আমার মাড়িতে গোলযোগ ছিল, আর তখনই আমি টুথপেষ্ট বদলে করহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করি...এখন আমি মজবুত আর সুন্দর দাঁতের এক গর্বিত অধিকারী। এই অপূর্ব কোয়ালিটির টুথপেষ্ট তৈরীর জন্যে আপনাদের অভিনন্দন জানাই।"

(শ্রী) বি. এস. জয়ন্তী, মৌলালী, হায়দ্রাবাদ

দাঁতের সঠিক যত্নের জন্যে রোজ রাত্রে আর সকালে নিয়মিতভাবে দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন করহ্যান্স দিয়ে। আর, মাড়ি মালিশ করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা করহ্যান্স ডেন্টাল-অ্যাকশন টুথব্রাশই ব্যবহার করুন।

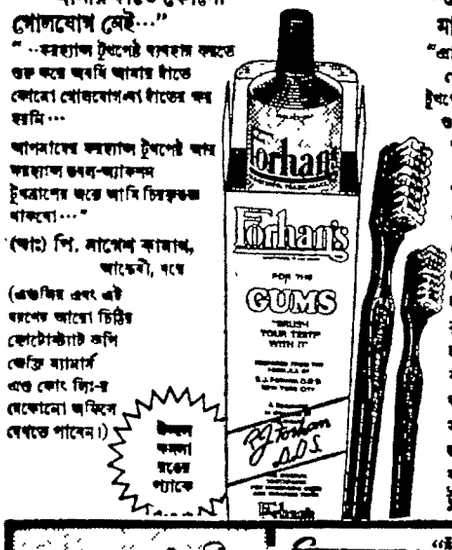

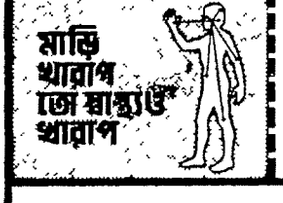

বিনামূল্যে! "দাঁত আর মাড়ির যত্ন" সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বুকলিট পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ২০ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন:
করহ্যান্স ডেন্টাল এডুকেটিভ ব্যুরো, পোস্ট ব্যাগ নং ১১৪৬৩, ডিপার্ট নং T 129-179 বম্বে ৪০০ ০২০।
যে ভাষায় চান জানাবেন

ফরহ্যান্স দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

179F-162 BEN

কথা আর উচ্ছ্বাস সত্যি হলে এই একটি রমণীর সঙ্গে তেমন যোগ-নির্বন্ধে ভাগ্যের পাশায় তার থেকে ঢের বড় দান পড়তে পারে। দশ হাজার টাকা, হাতের মুঠোয়, যে-কোনো সময় হাত বাড়ালেই পাবে, কিন্তু এক্ষুনি হাত বাড়ানো মানেই এই যোগের শেষ। বাপী তবফদার আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, দশ হাজার টাকা কেন, এই জীবনটাকেও মুহূর্তের আসরে, নামাতে আপত্তি নেই।

রমণীর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। দু' চোখের অকরুণ ঝাপটায় ওর মুখের জবাব টেনে বার করবে মতো। বাপী বলল, না, আর বড়াতে হবে না, মন থেকে সায় পেলে ওতেই হবে। পেলে বলব।

মহিলা চেয়েই আছে। দশ হাজার টাকার টোপ না গেলার মতো জোরটা কোথায় বোঝার চেষ্টা। এবারে ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, সায় পেতে কতদিন লাগবে?

এত বড় একটা লোভের থাবা থেকে এমন অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পেরে বাপীর ভিতরটা হালকা লাগছে। সেই সঙ্গে নিজের একটা জোরের দিকেরও হদিস মিলছে। মুখে বিপন্ন হাসি।—সায় এক্ষুনি পাচ্ছি না যখন, কতদিনের মধ্যে পাব বলি কি করে... কিন্তু আপনার এত তাড়া কিসের, আমি সত্যি বাড়ি নিয়ে আপনার সঙ্গে কোন রকম বোঝাপড়া করতে আসিনি। আপনাকে দেখতে এসে নিজের সমস্যার কথাটা বলে ফেলাই হয়তো অন্যায় হয়েছে।

গায়ত্রী রাইয়ের বাইরেটা দেখে ভেতর বোঝা কারো দ্বারা সম্ভব কিনা বলা যায় না। এ-কথার পরেও মুখে কোনো নরম রেখা দেখা গেল না। তবু বাপীর কেমন মনে হল, বোঝাপড়ার চেষ্টা বাতিল করে মহিলা এবারে শুধুই ওর ভেতর দেখছে।

এ-দিকে ম্যানেজার রণজিৎ চালিহা ঘড়ি দেখল তারপর অনেক-ক্ষণের একটা অসহ্য বিরক্তি ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

গায়ত্রী রাইও সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকালো। বাড়িতে ঢোকার আগে আবছা অন্ধকার থেকে মহিলার হাসিমুখ দেখা গেছল। এখন হাসি নেই মুখে, কিন্তু চাউনিটা অন্তরঙ্গ। —যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, সাড়ে আটটায় ক্লাবে সেই পার্টির সঙ্গে মিট্ করার কথা।

—ঠিক আছে। কাল সকালে আসছ?

মাথা নাড়ল, আসছে।

সে পা বাড়াবার আগে গায়ত্রী রাই আবার বলল, ক্লাবেই যাচ্ছ যখন একটা কাজ কোরো তো, সেখানকার ম্যানেজারকে দিন-কতকের জন্য এঁকে একটা ঘর ছেড়ে দিতে বলো...আন্টিল উই ফিচ্ সাম-হয়্যার।

রণজিৎ চালিহা বাপীর দিকে একটা উষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিল। বাড়ির দর দশ হাজার টাকা তুলে ফেলার জন্যেই হাব-ভাবে জ্বলতে দেখা গেছে লোকটাকে। এখন এই কথা। জবাব দিল, কোথাও রিচ্ করার জন্য তোমার এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার আছে?

সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে আবার সেই হালকা-গম্ভীর ভ্রূকুটি। যার একটাই অর্থ, যা বলছি করো, এ-রকম জল-ভাত ব্যাপার নিয়ে মেজাজ গরম কোরো না।

রণজিৎ চালিহা বারান্দা থেকে নেমে অন্ধকারে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে হল অনেকক্ষণের একটা কৃত্রিম গুমোট কেটে গেল। সামনের মহিলা এখনো গম্ভীর বটে, কিন্তু মুখের শুকরুণ টান-ভাবটা গেছে। ওদিকে তার মেয়েও বেতের চেয়ার তুলে এনে মায়ের পাশে বসল। লালচে ঠোঁটের ফাঁকে টিপ-টিপ হাসি। যেন আরো কিছু মজার খোরাকের প্রত্যাশা।

বাপী তাকাতে চায় না। দেখতে চায় না। সব মেয়েই মেয়ে। ওর জীবনে শনি। শনির দৃষ্টিতে সব জ্বলে, সব পোড়ে। ভিতরের ক্ষতবিক্ষত সত্তা কাউকে যেন চিৎকার করে নালিশ জানাতে চাইছে, এখানেও আবার একটা মেয়ে কেন? কেন?

ঘাড় বেঁকিয়ে একবার মেয়েকে দেখে নিয়ে আবার এদিক ফিরে গায়ত্রী রাই হঠাৎ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, ইউ বাসকেল, কম হিয়ার।

বাপী হকচকিয়েই গেছল। কিন্তু না, এই আচমকা সম্ভাষণ বা আহ্বান ওকে নয়, আরুকে। কিন্তু আরুও এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঝাঁঝালো গলায় গায়ত্রী রাই আবার হুকুম করল, মোড়াটা এনে এখানে বোসো।

নিজের বাঁ পাশটা দেখিয়ে দিল। আরু শশব্যস্তে হুকুম তামিল করল। ঘাড়ে কি অজানা কোপ পড়ে ভেবে পাচ্ছে না।

গায়ত্রী রাইয়ের দুই সাদাটে ভুরু কুঁচকে জোড়া লাগার দাখিল।—কমাস আগেও বাড়ির মালিকের সম্পর্কে তুমি আমার কাছে গদ্গদ প্রশংসা করে গেছ—সে এই মালিক?

এবারেও আরুর হতচকিত মূর্তি। জবাব দিল, জি মেমসাহেব।

সোজা হয়ে বসে নাক দিয়ে ফোঁস করে গরম বাতাস ছাড়ালো যেন এক ঝলক।—তুমি একটা গাধা, হি ইজ্ ডেনজারাস ম্যান!

—জি মেমসাহেব—না মেমসাহেব না। ভুল শুধরে ব্যস্তমুখে আরু উঠে দাঁড়াল একেবারে।—খোদার কসম খেয়ে বলছি বাপীভাই খুব ভালো লোক—আমার থেকে সাচ্চা লোক। ওই ম্যানেজার সরের খামোখা গরম হয়ে উঠতে ওর মেজাজ খারাপ হয়েছিল —বাপীভাই মেমসাহেবকে তুমি বুঝিয়ে বলো না।

এই আরু ঢিল নিয়ে বা শুধু লাঠি হাতে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে মোকাবিলা করে ভাবা শক্ত। কিন্তু বাপীর স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জেগেছে আবার। ভিতরে আবার সেই অনুভূতির আনাগোনা। যে অনুভূতি আগে থাকতে কিছু ইশারা পাঠায়, কিছু বলে দেয়। আবছা সবগুলই বটে। সত্যিই ডেনজারাস ভাবলে ওর মেমসাহেব এমন ঘটা করে সেটা বলত না, ভাবল না।

ওর হাঁসফাঁস দশা দেখে মেয়েটা হাসছে। বাপীরও চোখে হাসি, মেমসায়েবকেই দেখছে।

—ইউ শাট্ আপ অ্যান্ড সীট ডাউন। গায়ত্রী রাইয়ের দু চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর আটকালো। ঘনিষ্ঠ আদৌ বলা যাবে না, কিন্তু সেরকম তপ্তও নয়।

—কি নাম বলেছিলে—বাপী তবফদার?

সোজা তুমি করে বলল। এতক্ষণে যেন একটা বাড়তি সৌজন্যের লাগাম ধরে বসে-ছিল। এ-ও বাপীর হিসেবের সঙ্গে একটু বেশিই মিলছে যেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আই থিংক ইউ আর নট এ স্টেট ম্যান—আর ইউ?

চোখে চোখ রেখে বাপী হাসল একটু। —খুব স্টেট বলেই তো মিস্টার চালিহা আর সেই সঙ্গে আপনিও একটু বেগে গেছলেন। আমি কি একটাও বাঁকা-চোরা কথা বলেছি?

নিজে না চাইলে ওই মুখে নরম দাগ পড়েই না বোধহয়। কিন্তু জবাব শুনে অখুশি মনে হল না। জিগেস করল, পড়া-শুনা কতদূর করা হয়েছে?

বলল।

—অনার্স ছিল?

—আজ্ঞে না, অনার্সের বই কেনার মতো সঙ্গতি ছিল না। ডিসটিংশন পেয়ে-ছিলাম।

আরু খরখরানির মুখে যেন একটা বড় আশার বাতি জ্বলে উঠেছে। তড়বড় করে বলল, দারুণ ভালো ছাত্র ছিল মেমসাহেব, আমার সঙ্গে মিশে আর দিনরাত জঙ্গল চষে অঙ্কের জন্য স্কলারশিপ মিস করেছে। হাই ফার্স্ট ডিভিশনে—

মেমসাহেব ওকে ধমকে থামালো, তোমাকে কিছু জিগেস করা হয়নি।

বাপীই যেন হাঁপ ফেলে বাঁচল উৎসাহের ঝোঁকে আরো কত বেমক্কা ফাঁপিয়ে তুলত ঠিক নেই।

—বয়েস কত?

বাপীর মনে পড়ে বন্ধুকল্পিমের বড়বাবু মন্মথ সোম খাঁটি বয়েস জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর মনে কিছু ছিল, এঁর মনে কিছু থাকা অবশ্য সম্ভব নয়। তবু পাশে এই বয়েসের একটা মেয়ে বসা বলেই নিজের বয়েস দশটা বছর বাড়িয়ে বলতে, পারলে স্বস্তি বোধ করত। কিন্তু পারা গেল না, সত্যি কথাই বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।—এবারে তেইশ হবে।

এত কাঁচা বয়েস মহিলারও খুব মনঃপুত হল না যেন। কারণটাও বাপী হয়তো আঁচ করতে পারে। কিন্তু তলিয়ে ভাবার আগেই পরের প্রশ্ন।—কলকাতায় কি করা হত?

—মুদ্রণের আপিসের টেম্পোরারি চাকরি।

—গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভিতরে ভিতরে কেন যেন এখন আবার মেয়েটার পাশে বসে থাকা পছন্দ হচ্ছে না বাপীর। এখন কিছু মজার কথা হচ্ছে না, উঠে গেলেই তো পারে।

—এখন এখানে থাকা হবে?

বাপীর মনে হল প্রত্যেক কথার ফাঁকে মহিলা ওকে যাচাই করে নিচ্ছে।

—সুযোগ সুবিধে হলে সেইরকমই ইচ্ছে।

—কিরকম সুযোগ সুবিধে?

চাকরির কথা ইচ্ছে করেই মুখে আনল না। বলল, ছোটখাটো কোনো ব্যবসা যদি করতে পারি . .।

—এই জঙ্গলে আবার কি ব্যবসা?

বাতাস অনুকূল। বাপী হেসেই জবাব দিল, সে-তো আমার থেকে আপনি ভালো জানেন।

এবারে চাউনিটা আবার রুক্ষ করেক নিমেষের জন্য।—যা জানি সে-চেষ্টা করতে গেলে আমিই তোমাকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব। .. চাকরি করবে?

আবার আর সরল সইল না।—কেন করবে না মেমসাহেব, আপনার মুখের কথা খসলে বাপীভাইকে আমি আর ছাড়ি। ওর থেকে সেবা লোক আপনি এই তামাম বানারজুলিতে আর পাবেন না—এ আমি হলপ করে বলতে পারি। জঙ্গলের নাড়ি-নক্ষত্র জানে, গাছ-গাছড়াও কম চেনে না—

—এরপর তোমাকে আমি এখান থেকে বার করে দেব।

সঙ্গে সঙ্গে আবার উচ্ছ্বাসের গলার রূপান্তর। কিন্তু মেমসাহেবের এরকম ঠান্ডা দাবড়ানি খেয়েও অভ্যস্ত বোধহয়। হেসেই নিজের দুকানে হাত দিয়ে সামাল দিল।

বাপীর দিকে ফিরল গায়ত্রী রাই।—আমি প্রথমে তোমাকে ছমাসের জন্য ট্যাবেল দেব—ইট উইল বি এ বিগবাস ডর্ব, বাট দেয়ার ইজ ফিউচার—এই ছমাস কি পারে না পারে সেটা পরে ঠিক করব।

ভাগ্যের পাশায় দান পড়েছে, শুরুতেই সেটা জোরালো করে তোলার মতো জুবাড়ীর

বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি পরীক্ষা

অবশ্যই একটা লাভ করুন পুরস্কার

প্রবেশমূল্য নেই আপনি অবশ্যই একটি পুরস্কার জিতুন

প্রায় এক হাজার পুরস্কার দেওয়া হবে

উদাহরণ.

মোট ২৪

৫	১০	৯
১২	৮	৪
৭	৬	১১

১৪	১২	
	১০	
	৮	৯

(১) রাজদূত মোটর সাইকেল নতুন মডেল বা টেলিভিশন। দ্বিতীয় পুরস্কার (২) ওয়ার্ল্ড সাউন্ড মার্শাল ট্রানজিস্টার গ্যারান্টেড হাই মিডিয়াম ওয়েভ দাম ২৬০ টাকা। তৃতীয় পুরস্কার (৩) সর্বভারতীয় হেভি ডিউটি ট্রানজিস্টার দাম ১৮৫ টাকা। পুরস্কারগুলি আর্ধেক দামে দেওয়া হবে। উদ্যোক্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করুন যার যোগফল হবে ৩০....খাড়াভাবে, সমান ভাবে, কোণাকুণি ভাবে যোগের সময় কোন সংখ্যা দুবার ব্যবহার করা যাবে না।

পুরস্কৃত ব্যক্তি পোস্টেজ, প্যাকিং ও লাইসেন্স ফি বাবদ যার বহন করবেন।

খেলার তারিখ ৩০ আগস্ট, ১৯৯৪

আপনার প্রবেশপত্র পাঠাবার ঠিকানা—

জেমিনি ট্রেডার্স (ডব্লু - ৫১)
গান্ধীনগর
দিল্লী-১১০০৩১

হিন্দী বা ইংরেজি নিজের ঠিকানা লেখা খামসহ প্রবেশপত্র পাঠান

Gemini Traders (W-51)
Gandhi Nagar
DELHI-110031

খেল দেখানোর এই মওকা। বাপীর এখন দৃঢ় ধারণা, আবুর মুখে সব শোনার পর যে অনুভূতিটা মনের তলায় আনাগোনা করে গেছে তাতে কোনো ভুল নেই। ভুল হলে একটা মানুষ এখান থেকে চোখের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস এমন বদলে যেত না।

বাপী চুপ। কিছুটা নির্লিপ্তও।

—ও-কে?

—তবে আপনাকে জানাব।

জবাব শুনে আবু তড়াক করে মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

না, মহিলাও এই জবাব আশা করেনি। ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটু। —ভাবার কি আছে?

বিড়ম্বনার ধকল সামলাবার চেষ্টাতেই যেন সময় নিল একটু। বলল, যে-রকম লোক চাইছেন, ছ মাসের টায়েলে সেটা সম্ভব কিনা আপনিই জানেন।....তাছাড়া মিস্টার চালিহার জন্য আমাকে কিছুটা ফ্রী-হ্যান্ড দিতে আপনারই হয়তো অসুবিধে হবে।

এটুকুতেই ঠিক বোধগম্য হবার কথা নয়, হলও না। কিন্তু এতেই চোখ-কান সজাগ। মনে আরো কিছু আছে তাও যেন আঁচ করতে পারছে। কোনো ব্যাপারে অস্পষ্টতা বরদাস্ত করার মেজাজও নয় মহিলার।

—কারো যোগ্যতা বুঝতে ছ'মাস যথেষ্ট সময়। ফ্রি-হ্যান্ড দেবার কথা এখনই আসছে কোথা থেকে? আর তোমার জন্যে মিস্টার চালিহাকে নিয়ে আমার কি অসুবিধে হবে? হি উইল বি ইয়োর বিগ বস্....অবশ্য তোমার সম্পর্কে তিনি ভালো ইমপ্রেশন নিয়ে যাননি, তোমাকে প্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করবেন বলে মনে হয় না। আই উইল ট্রাই—

বেশ স্পষ্ট অথচ নরম গলায় বাপী বলল, মিস্টার চালিহা আমাকে খুব প্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করবেন মনে হলে আপনি কি অনেক আগেই আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতেন না?

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল গায়ত্রী রাই। এই মুখ আর এই চাউনি দেখে ওদিকে উর্মিলা রাই আর এদিকে আবু রবানীও চকিত বিমূঢ়।

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

বাপী চুপ। একেবারেই জবাব দেবার ইচ্ছে নেই।

ফলে মহিলার আরো ফ্যাকাসে গলা। —কাম স্টেইট, হোয়াট ডু ইউ মীন?

বেশ সহজ অথচ শান্ত মুখে বাপী বলে গেল, আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পারছি, মনে যা আসে বলে ফেলে আমি অনেক সময় একরকম মুশকিলে পড়ি। ....আবুর মুখে আপনার আর আপনার ব্যবসার গল্প শুনে আমার কেমন মনে হয়েছিল, এতবড় অর্গানিজেশনে বাইরের কোনো একজন সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে এটা আপনি চান না। আর এই জন্যেই মিস্টার চালিহার মতোই যোগ্য হয়ে উঠতে পারে এমন একজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী লোক আপনার দিক থেকে আপনি চাইছেন। এ যদি ঠিক না হয়, ছ' মাসের টায়েল দেবার দরকার নেই—নিজেকেই আমি বাতিল করছি।

মাত্র দু-চার মুহূর্তের জন্য বাপী যা দেখে উঠল সে কি ভুল? বুকের তলার গোপন কিছুর ছবিটা কেউ যদি আচমকা চোখের সামনে তুলে ধরে, সে-কি চকিতের জন্য এমনিই ধড়ফড় করে ওঠে না? কিন্তু সে-শুধু ক্ষণ পলকের জন্য। গায়ত্রী রাইয়ের পালিশ-করা সাদাটে মুখে আলগা রক্ত জমাট বাঁধছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। হিসহিস স্বরে বলল, ইউ আর বিহেভিং ইমপার্টিনেন্ট। আমার সামনে বসে আমারই চিফ একজিকিউটিভ সম্পর্কে তুমি এমন কথা বলো? এত সাহস তোমার? শুধু গলায় নয়, চোখেও আগুন ঝরছে।—ইউ মে গো নাও!

বাইরে পা দিয়ে আবুর হতাশা একটা আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। —একেবারে পারে এসে এভাবে ডোবালে বাপীভাই?

এদিকটায় রাস্তায়ও আলো নেই। বেশ অন্ধকার। চা-বাগানের কাছাকাছি হলে তবে রাস্তায় আলো। আবুর হাতে টর্চ। সন্ধ্যার পর ঘরের বার হলে এখানে সকলের হাতেই টর্চ বা হ্যারিকেন থাকে।

টর্চের আলোটা পায়ের দিকে রাস্তার ওপর। পাশাপাশি চললেও আবু ভালো করে দোস্ত্-এর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বাপী হাসছে একটু একটু। নিজেকে নিয়ে খুব একটা ভাবনা-চিন্তা আর নেই। কারণ খুব বড় কিছু খোয়াবারও যেন নেই আর।

বলল, তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন?

আবু মর্মার্থই বেজার। একটু হয়তো বিরক্তও। —এরপর ওই মেমসায়েব আমাকেও ছাড়বে না। তোমার ওইসব কথা ফাঁস করে দিলে ওই শালা ম্যানেজার ছাড়বে?

নির্লিপ্ত সুরে বাপী বলল, তাহলে তুমি আমাকে ছাড়ো। আমাকে ক্লাবে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গিয়ে তোমার মেমসায়েবকে বলো, পাঁচ বছরে আমি এত বদলে গেছি তুমি জানতে না।

আবুর হাতের টর্চ আস্তে আস্তে বাপীর মুখের ওপর উঠে এলো। ঠোঁটে হাসি দেখে রাগই হল।— তুমি সত্যি বেশ বদলেছো তাহলে? আবু রবানী মওকা খোঁজে কিন্তু আসলে কোন্ শালার পরোয়া করে? দশ হাজার টাকা বাড়ির দাম পেলে—নিলে না। সেধে চাকরি দিতে চাইল তার জবাবের ওপর-পড়া হয়ে ওই কথা বলে এলে —তোমার মতলবখানা কি?

—টর্চ নামাও।... বাড়ির দাম মজুতই আছে। দরকার হলে বেচে দেব, আর তুমি সঙ্গে থাকলে ওই টাকায় নিজেরাই কিছু করতে পারব। কিন্তু তোমার কি মত, মেমসায়েবকে যা বলেছি, সত্যি নয়?

আবু তবু ক্ষুব্ধ।—গায়ে পড়ে অত সত্যি কথা বলার দরকার কি ছিল!

বাপী আর কিছু বলল না। বলার আছেই বা কি। আবু যা ভাবছে তা হতেই পারে। গায়ত্রী রাই বাপীকে হয়তো ছেঁটেই দিল।....কিন্তু তা যদি হয়, ভাগ্যের হাতে তেমন কোনো বড় দান পড়েনি বুঝতে হবে। ছেঁটে দিলেও বাপীর খেদ থাকবে না। কিন্তু মন সে-কথা বলছে না। দেখা যাক....।

আর কিছু ভাবতে ভালো লাগছে না। বাজোর ক্লান্তি। কাল সমস্ত রাত ঘুম হয়নি। ঘুম ফরাস ধরেই নেই। আজও সকাল থেকে এপর্যন্ত ধকলের মধ্যেই কাটল। এখন নিরিবিলির তৃষ্ণা। একলার কোটরে সেঁধিয়ে যাবার তাড়না।

জিগেস করল, ক্লাবে আলাদা ঘর-টর একটা পাব তো?

বুক ঠুকে বলার মতো করে আবু জবাব দিল, এজন্যে ওই ম্যানেজারকে বলার কিছু দরকার ছিল না—সে-ব্যবস্থা এ-শর্মাই করতে পারত। (চলবে)

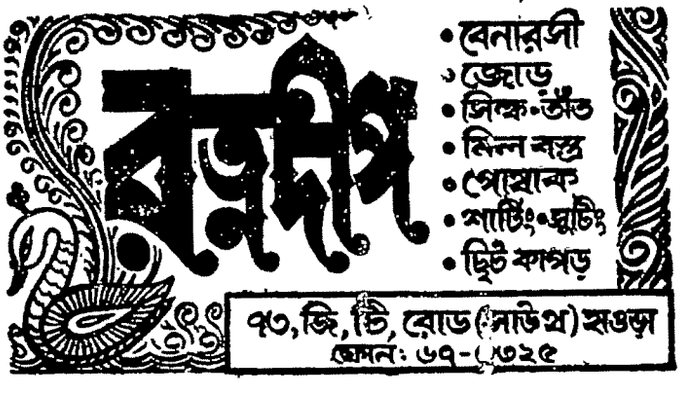

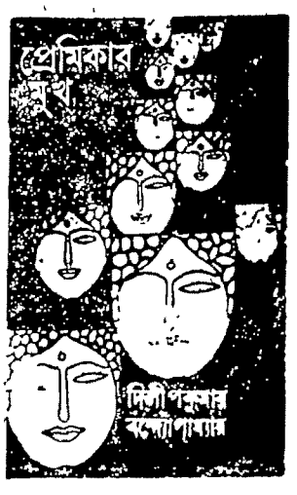

অমল আচার্য

গল্পের দর্পণে তিনজন

ডুমুরের দিনরাত অমল আচার্যের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। ইতিপূর্বে 'বর্ণ-বিবর্ণ' নামে তাঁর আর একখানি গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এ-সংকলনে আছে মোট বারোটি গল্প। প্রতিটি গল্পই অল্পবিস্তর অমলবাবুর শক্তির পরিচয় দেয়। সংকলনের দ্বিতীয় গল্প 'ডুমুরের দিনরাত' নামেই সংকলনের নামকরণ করা হয়েছে।

ঊনিশশো তিয়াত্তর থেকে সাতাত্তরের সময়সীমার ভেতর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, 'ডুমুরের দিনরাত'-এ মোটামুটি তাদেরই জায়গা দেওয়া হয়েছে। প্রায় সবক'টি গল্পেরই একটা নিজস্ব টান আছে। ফলতে দ্বিধা নেই, পাঠক হিসেবে অনেকগুলি গল্পই ভালো লেগেছে। তবে আমার নিজের মনে হয় গ্রাম পটভূমিকায় লেখা গল্পগুলির ক্ষেত্রে অমল আচার্য অনেকখানি বাড়তি দক্ষতা দেখাতে পারেন—অন্তত সাপ, উঠোনে শকুন গল্প দুটিতে এ-ধারণার সমর্থন রয়েছে। অবশ্য শহরের একটা অন্য এলাকার ছবি নিয়ে 'ডুমুরের দিনরাত' গল্পেও অমলবাবু যথেষ্ট অনায়াস। প্রতিটি গল্পেই সংশ্লিষ্ট জীবন, পরিবেশ এবং মানসিকতার পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণে তিনি যথেষ্ট আন্তরিক এবং সহানুভূতি-শীল। এই প্রসঙ্গে ডুমুরের দিনরাত গল্প থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, 'ডুমুর দাস দাওয়ায় বসে দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে কানের খোল বার করছিল। একটু একটু করে কাঠি ঢোকাচ্ছে, ফর-ফর করে ঘোরাচ্ছে, টেনে বার করছে কাঠি। কাঠির মাথায় এঁটেল মাটির মতো কালো খোল আটকে ধরছে। ডুমুর দাস বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে চিমটি দিয়ে তুলে নিচ্ছে ময়লা। পরনের ছেঁড়া খাকীর ফুল-প্যান্টে আঙুল মুছছে। প্যান্টের পাছায় বড় বড় তালি নীল কাপড়ের। দরজির দোকানের ছাঁট কাপড়। পাণ্টের ফোল্ড ছেঁড়া। সুতো ঝুলঝুল করছে সেখানে। হাঁটুর কাছে ফেঁসে গেছে কাপড়। ফাঁকা জায়গা দিয়ে মালাইচাকি বেরিয়ে পড়েছে। গায়ে হাফ-হাতা হ্যাণ্ডলুমের ঢোলা জামা। কাঁধের দু'পাশে তালি। বুক-পকেটের মুখের কাছে পুরু ময়লা। বেশি ব্যবহারের কালো দাগ'—ডুমুরের চেহারাটি সুস্পষ্ট করতে এমনই পর্যবেক্ষণের নিষ্ঠা তিনি দেখিয়ে-ছেন। ডিটেলের কাজ এতখানি না হলেও চলত—এমন কথা হয়তো কেউ কেউ বলবেন কিন্তু মনে হয় ডিটেলের এই কাজটুকুতে ডুমুরের চেহারাটি যথেষ্ট খাঁটি মনে হয়েছে। শুধু চেহারাটিই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তার দিনরাত, তার চার-পাশের পরিস্থিতি এবং তার অন্তর-সমস্যা সবকিছুই একেবারে নির্ভেজাল মনে হয়েছে।

সাপ গল্পে হরিমতীর সন্তান প্রাপ্তির অবৈধ প্রয়াস, পচা কুমড়োবের মানসিক প্রতিক্রিয়া, হরিমতীর অপরাধবোধ সব-কিছুই জীবন্ত হয়ে উঠেছে গ্রাম পট-ভূমিকায় প্রায় নিখুঁত উপস্থাপনায়।

উঠোনে শকুন গল্পটি সংকলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প। আকালের ছবি দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন অমলবাবু। গল্পের শেষটিও বেশ ধারালো দেয়। 'গল্প শেষ হওয়ার পরেও শেষ লাইনটি বারবার স্মৃতিতে ঘোরাফেরা করে।

এছাড়া সংকলনে আরও কয়েকটি ভালো গল্প রয়েছে। যেমন, সান্নিধ্য, নাড়ির স্পন্দনে জলতরঙ্গ, সংহত ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা, মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব এইসব গল্পে শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে ডুমুরের দিনরাত ভালো লেগেছে। শুধু জায়গায় জায়গায় অমল-বাবু একটু বেশি সাধু শব্দ ব্যবহার করে-ছেন। মনে হয়েছে গল্পের মেজাজ সামলাতে সেখানে আরও চলতি শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হত। প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। ছাপাও মোটামুটি।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডুমুরের দিনরাত। অমল আচার্য। র
স্বাক্ষর পাবলিকেশনস্। ৭বি, ধ
ধর সরণী, কলকাতা-১২। দা
টাকা।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ ফুলের মত ভাল
প্রেমের গল্প ইদানীং ঢোখে
অনেকের ধারণা প্রেমের নক্স
সহজ, কিন্তু গল্পলেখকমাত্র
কত কঠিন। প্রেম গাণিতিক
নয়, যেমন নয় প্রেমের গল্প
প্রেমের গল্প লিখতে বসে
হন, তিনি নিঃসন্দেহে
ওঠেন পাঠকের কাছে। পা
পড়ে বিশ্ব ও — বিস্তর।
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু
গেছে ইতোমধ্যে। ভালই
তাঁরই পাঁচটা প্রেমের
'প্রেমিকার মুখ' গল্প
পেয়েছে সম্প্রতি। প
প্রেমের কাহিনী। 'আ
নায়িকা বিণাখা ছাড়
নায়িকারা নায়কদের সোজা
এ-পোড়া সংসারে অধি
বাবা-মার বশ। প্রেম
বেশ চটপটে, কিন্তু আ
ভয়ে সঙ্গীন। তাই বদমে
একখানা চিঠি ধরিয়ে
প্রেমিককে। সেই স্মৃতি,
ভালবাসার হাট গল্পের

আচরণই দেখা গেল। অথচ গল্পের প্রায় প্রতিটি নায়িকাই পড়াশোনায় ভাল, কলকাতার নামী নামী কলেজে ইতিহাস বা বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করে। গান গায় ভাল। স্মার্ট—টুপ করে প্রেমে ফেঁসে যেতে দ্বিধা নেই। কিন্তু সবই হয়, হয় না শুধু একটা—প্রেমিকের গলায় মালা পরানো। তাদের এই নির্দয় আচরণ ছেঁদো কারণে, আধুনিক পাঠকদের কাছে কৃষ্ণেন্দু কনডিসিং নয়। অবশ্য এর পেছনে অন্য একটা কারণ থাকতে পারে, যা দিলীপ হয়ত সচেতনভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন প্রতিটি গল্পে : 'লড এ্যাট ফার্স্ট সাইট' তত্ত্ব দিলীপ হয়ত বিশ্বাস করেন না। যে-প্রেম হঠাৎ চাগিয়ে ওঠে, তা হঠাৎ-ই চুপসে যেতে কতক্ষণ? কিন্তু যে-প্রেমের ঘনঘটা গভীর অনুধ্যানের মাধ্যমে তিল তিল করে আকাশ ছেয়ে ফেলে, যার ব্যাপ্তি সমগ্র চেতনা জুড়ে—সেই প্রেম ব্যর্থ হলেও তার হাহাকারই আলাদা। পাঠকদের মনে বিঁধে থাকে নির্ভুল। দিলীপের নায়ক-নায়িকারা প্রথম দর্শনেই প্রেমের জন্যে বিদ্ধ। কতগুলো বাহ্যিক ঘটনা-পরম্পরায় তার বিস্তার এবং ক্ষয়। তাই ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা নেই কোথাও। এটা যদি বুকের ভেতর থেকে উঠে আসত, মনোজগতে তার শেকড়-বাকড় ছড়িয়ে দিত—, অহলে অন্য কথা হত। আর এক সমুদ্দুর নায়িকা বিশাখার ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। সংসারের অনিবার্য সংকটের জন্য তার প্রেম [illegible] হয়ে যায়। তাই রবিতোষ যখন বলে, [illegible] জেনে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। [illegible] চ্ছা, ইচ্ছে করলে কি আমরা আর্থার [illegible] ত পারি না'—বিশাখাকে বলতেই [illegible] রবিতোষ, আজ আর তা হয় না। [illegible] সংলাপের মধ্যে বিশাখার [illegible] মহাশূন্যতা ঝিলিক দিয়ে যায়। [illegible] মুখ' গল্পগ্রন্থের নায়কেরা হয় [illegible] কাজ করে, নয়তো ভূ-[illegible] পাহাড় বা জঙ্গলে তারা বা [illegible] জে বেড়ায়। নিঃসঙ্গ জীবন [illegible] নে-জঙ্গলে থাকতে থাকতে [illegible] টাইপ। নিঃসঙ্গতা কাটানোর [illegible] ন্ত্র বা হাড়িয়া খায়, [illegible] ড়, শিকার করে, বা সাঁওতালি নাচ দেখে। তারা একজনে অনেকেই কবিতা লিখত, কবিতার পাঠক। তারা জীবনানন্দ দাশের ফ্যান, সুযোগ পেলেই জীবনানন্দ আওড়ায়। একজনায় রোমান্টিক নায়ক তারা। প্রেমে ঠোক্কর খেয়ে হয়ত বিয়ে-সাদি করেছে কেউ কেউ, কিন্তু পুরনো প্রেমিকাদের মুখ ভুলতে পারছে না কিছুতেই। নির্জন একাকীত্বে তা বাঘের মত হানা দেয় অতর্কিতে।

গল্পগুলো একই রকমে শুরু হয়েছে। নির্জন সমুদ্রতীরে বা বাংলোয় বসে আছে নায়ক। সামনে পাহাড়, অথবা সমুদ্দুর। হাতের কাছে পত্র-পত্রিকা কিংবা গল্পের বই। কাল—সন্ধ্যে কিংবা সূর্যডোবা সময়। নায়ক একাকীত্বে বিষণ্ণ। বিষণ্ণতার জাল ছিঁড়ে প্রেমিকার মুখ উঁকি দিচ্ছে, যারা এখন পরস্ত্রী। তাদের মুখ ভেসে উঠতেই গল্প শুরু হচ্ছে ফ্ল্যাশ-ব্যাকে। মোটামুটি এই আঙ্গিকে গল্পগুলো রচিত। দিলীপ পাহাড়ী জঙ্গল প্রকৃতিকে গল্পের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এ-ব্যাপারে তাঁর হাতের পাঁচ আঙুল নিপুণ খেলোয়াড়। ভাষাটা তেমন খোলেনি। প্রচ্ছদ ভাল।

অমল আচার্য

প্রেমিকার মুখ : দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মৌসুমী প্রকাশনী। কলকাতা-৯ ॥ দাম : ছয় টাকা।

অমর মিত্র

সম্প্রতি প্রকাশিত অমর মিত্রের গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো মানুষের কথা। মানুষগুলো দেহাতি নিরক্ষর মানুষ, নিতান্তই গ্রাম্য মানুষ— 'প্রত্যন্তর', 'অরণ্যপর্ব', 'খাঁচার মানুষ' ছাড়া। ভগ চাষী, মজুর, সাঁওতাল, ছিন্ন মূল গাঁয়ের লোক ভিড় করে আছে গল্পগুলিতে। তাদের জীবনে নানান সংকট। পেটে রাক্ষুসে ক্ষুধা, অথচ সংস্থান নেই এক মুঠো অন্ন জোটানোর। কাজের জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরে, যে কোনো কাজ—অথচ কাজ নেই। ক্ষুধার অনিবার্যতায় তারা মেয়েকে ডোবা কাটা শাড়ি পরিয়ে বেচতে নিয়ে যায় হাটে, হাটে অবিকোনো মরা যুবতীর মাংস দাঁতে কেটে গোগ্রাসে খায় তার পেটের ধান্দায় ভাবুকচরণ দৈব ফেরি করে হাটে। বনগাঁর দরিদ্র স্কুলে শিক্ষক প্রকৃতন ছাত্রদের লিস্টি বুক পকেটে রেখে কলকাতার এ-পাড়া ও-পাড়া কুপিয়ে চলেন কিছু টাকা সংগ্রহে, তাঁর মেয়ে দুজনের পাত্র পাওয়া গেছে অবশেষে —অথচ মুখ ফুটে বলতে পারেন না টাকার কথা। গাঁও বুড়ো মাঠ ভাঙে, চৈত্রের আগুন মাঠ, বড়বাবুর গা নিরিখে গোধে—বড়বাবু মানুষের রোগ ভোগ শোক দুঃখ সারিয়ে দিতে পারেন যে। কিন্তু বড়বাবুর সাক্ষাৎ মেলে না তার। শহুরে বাবুরা অরণ্যে যায়, সঙ্গে থাকে সুরা। মদ আর মুরগীর চাটে শরীর গরম করে নারী-মাংস খাবলায় রাতভর। তার তোড়-জোড় শুরু হয় অপরাহ্নে, অপরাহ্নর যুবকরা আঙুলে শিকার বিঁধিয়ে বন থেকে বেরিয়ে আসে চওড়া বুক, তাদের সামনে মোহময় রাত। মফস্বল শহরে গুটিকতক মেসবাসী চাকুরে নিঃসঙ্গ রাতে বাগান থেকে উঠে আসতে দেখে পাথর মূর্তি রমণী, কিন্তু সুকুমারের ফাঁকা বেড়ে চোখ ফেলতে ভুল করে না তারা। রমানাথ তার প্রত্যুতাত্ত্বিক গবেষণা চালায় কলকাতার খাঁজে খাঁজে, তবুও সন্ধান পায় না সময়ের মাটি খুঁড়ে চাপা পড়া বাল্যবন্ধু অঙ্গিবালালকে। 'ধনু' ভাসন্ত তরুণীর শব থেকে গয়না, পচা স্তন থেকে উপড়ে আনে সোনার হার, অথচ তার লোভী হাত পাথর হয়ে যায়—বড় মায়া, হায় অতঃপর সালঙ্কারা দেবী-ভাসান তার হাতেই ঘটে যায়। এ-ভাবেই অমর তাঁর প্রতিটি গল্পে অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ, মানুষের বিচিত্র জীবন-যাপন, চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনোযোগী শিল্পীর মত ফুটিয়ে তুলেছেন, মানুষের স্ব-পক্ষে তিনি মহাজীবনের ইংগিত দিয়েছেন।

দুটি ছাড়া বাকি ন'টা গল্পের পট-ভূমি গ্রাম গঞ্জ। গল্পকারের কাল্পনিক গ্রাম নয়, ভারতীয় ভূগোলের আসল গ্রাম। দু চোখ ভরে গ্রাম দেখেছেন অমর, হিসেব করে দেখেছেন আধুনিক সভ্যতায় তার ক্ষয় ক্ষতি। গ্রাম তার মাঠ-ঘাট, কাঁচা রাস্তা, দেবতার থান, অশিক্ষা, অভাব-অনটন, সংস্কার, মানুষজন, ভরা আশা-স্বপ্ন সব কিছু নিয়ে প্রবেশ করেছে অমরের গল্পে—অমরের গল্পে তা জীবন-দর্শনে মাখামাখি হয়ে জ্বলজ্বলা ধরিয়েছে।

গল্প বলার ঢংটাও বেশ। শুরুতেই চুম্বক, শেষ না হলে স্বস্তি নেই। শেষ মুড়োয় না গেলে কৌতূহল মেটে না। সাসপেন্সের ছোঁয়া থেকেই যায়। একটা সামান্য, কখনো তুচ্ছ ঘটনা বেশ সহজেই গল্প হয়ে যায় অমরের হাতে। আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে তিনি নিপুণ, দখল না থাকলে এমনটা হয় না। তাঁর গদ্যের মধ্যে নতুনত্ব আছে, ভাল লাগে। তবে কিছু শব্দ ব্যবহারে (যেমন: মৈমনসিং, হা-হা, হাঁই-হাঁই, গহীন, বেশ-বা, বুঝি-বা) অমরের বিস্তর দুর্বলতা ক্ষমা করা গেল,

বাংলা গল্পের ঐতিহ্যে নতুন সংযোজন

অমর মিত্র-র

ভাঙে কালপুরুষ

দাম : ছ' টাকা

বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স; নবগ্রন্থ কুটীর

৬৬বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলিকাতা - ২৬

প্রতিটি গল্পে তো বটেই—এমনকি একই গল্পে অন্তত সাত আট বার জায়গা বদ্‌লে বসে হই হট্টগোল বাধিয়েছে। 'গল্পে একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার পাঠককে বিরক্ত করে, আমার ধারণা। প্রচ্ছদ, বাঁধাই ভাল। 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' পড়ার মত গল্পগ্রন্থ।

মাঠ ভাঙে কালপুরুষ : অমর মিত্র। গৌরব প্রকাশনী। দাম : ছ' টাকা।

সমকালীন সাত কবি

রবীন সুরের তৃতীয় কবিতার বই রাবণের সিঁড়ি। চোদ্দ বছরের কবিতা এই বইতে আছে। শাল মহুয়ার গেরুয়া নির্জনে, দুঃসহ আঁধার, বুকের ভিতর টেপরেকর্ডারে—মগজি কবিতা করতে যান রবীনবাবু এ ধরনের কয়েকের চলে আসে। ছন্দ ভুল করেন না। কবিপ্রসিদ্ধিগুলো তাঁর হাতে অন্যরকম হয় না, যেমন, ভাগীরথী উদ্ধারের উজ্জ্বল সংবাদ, পীড়িতের মর্মান্তিক আর্তনাদ বা তিনিই কবি যাঁর পিঠে চাবুকের দাগ পড়ে না। কিংবা, কলেজয়ী শিকড়ের বিপুলা বিস্তারে লিখতে তিনি কোথাও অস্বস্তি বোধ করেন না। টেক্সটবুক পদ্যে যা বালক-বেলায় জেনেছিলাম, তা আবার জানি তাঁর কাছ থেকে : অলৌকিক মন্ত্রে না, পেশীর ভাস্কর্যে জাগে অর্চনার যথার্থ বিগ্রহ! ইন্টারজেকশনটিও দিতে রবীনবাবু ভুলে যাননি। সাহিত্য বিষয়ে যাঁরা বিশেষ সেন্টিমেন্টাল, তাঁদের তাঁর কবিতা ভালো লাগতেই পারে, মনে হয়।

বেণুকা নাথের কবিতার বইটির নাম ফসিল নায়ক। যে-কোনো সিনেমা পত্রিকার কমার্শিয়াল নভেলেটের নাম হতে পারতো। কবি খুবই সমসময়সচেতন। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'তোমরা আমরা চকিবাজির মতো / ধুরপাক খাচ্ছি / নিজেদের পথকে পিচ্ছিল করছি / ছিটকে পড়ছি কক্ষচ্যুত হয়ে / একের অন্যের ল্যাং খেতে খেতে / কে জানে কোথায় / কোন বসাতলে।'

প্রশান্ত রায়ের নতুন কবিতার বই রং নাম্বার। ভূমিকায় জানাচ্ছেন, 'সমাজ —যখন একটা ফাঁকা শব্দ, যার কোল থেকে জীবন বা বিশ্বাসের মূল্যবোধ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে-ঝরে বিলীয়মান, তখনো কোনো কোনো শব্দ এসে ধাক্কা মারে—'। সমসময়ের রূঢ়তায় তাঁকে আহত লাগলেও একটা প্রশ্ন থাকে। আগেকার সমাজ কী এমন একটা হৃদ্‌বহরণ ছিলো যে আজ সামাজিক প্রবঞ্চনা এতো বেশি গায়ে লাগছে? কবিদের সমাজকাতরতা এতো বেড়ে গেছে কেন, ভাবতে ভাবতে তাঁর একটি কবিতার প্রথম দু'লাইন দেখি : 'চন্দননাথ, আমি আবার নূতন করে বাঁচতে চাই।' কবির দু-একটি বিশেষণ ব্যবহার তুলে দিচ্ছি : কর্কশ কর্কশ চিত্রালী দুপুর, ভাঙা ডিসের মতো চাঁদ।

নির্মল বসাকের দ্বিতীয় কবিতার বই নৈঃশব্দ্যের অনুভব। যথারীতি, এর মধ্যেও পাই তীব্র অহংকার, বিবেকে ধিষণ নদী শুধু নিয়মমাফিক বহে যায়, আর অনুভববাদী কবি বলেই হয়তো জীবনানন্দকে মনে করিয়ে দিতে হয় লিপিমালা ঘুমে যায় শংখচূড় ঘুমে, আরো পাই দৃঢ় মাংসপেশী, বেদনার মধ্যে স্তব্ধ নক্ষত্র, এক বুক শব্দ নিয়ে একি হায় যন্ত্রণা আমার।

সুধীর মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন রেখেছেন, 'বাক্ষসীর বুকে কি কোনদিন মা আছে, না, ছিলো?' আত্মঘাতী যৌবন, গর্ভের গভীর কেন্দ্র, শ্মশানে পদ্মের হাসি

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও তার মূল্যায়ন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যোগাযোগের ঠিকানা (সকাল ৭—৯ এবং সন্ধ্যা ৬টা—৯টা) সম্পাদক, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি, ৪১, হরিশ মিয়োগী রোড, কলিকাতা-৭০০০৬৭, ফোন ৫৫-৭৮৫৮।

বাক্ষসী সরমা, মৃত্যুপ্রণয়ী হাসি—এর থেকেও ভালো জিনিস পাই তাঁর শেষ কবিতায়—'দুর্ধর্ষ কল্পনা যার লাম্পট্যে অনীহা নেই, ভিটে মাটি চাটি করে দিক।'

অতন্ত অভিনব কাণ্ড ঘটিয়েছেন অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বই জীবনের উদ্বর্ত পত্রর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এর পরের পাতায় জীবনের একটি ব্যালান্স শীট আছে। যেমন বিষয়—যৌবনে প্রেম, লাভ—কাল্পনিক সুখের বিস্তার, ক্ষতি—মরীচিকা তৃষ্ণায় জ্বালা। হিসেবটি পুরো-পুরি করা, তবে এমন অনেক লোক থাকতেই পারেন যাঁরা শৈশবে চপল ছিলেন না, যৌবনে প্রেমও করেননি। এঁদের জন্যে অশেষবাবু কোনো প্রভিশন রাখেননি। অশেষবাবুর একটি কবিতার অংশ : 'প্রাণের নিয়মে বিয়োগের পরে / অবশিষ্ট তবু কিছু থাকে। / তাই নিয়ে জীবনের বিস্তৃত সময়ে / পরম সন্তোষে সাধ্যমত কাজের ভেতরে / মগ্ন থেকে চলে যাব / একমাত্র পরিপূর্ণ ঈশ্বরের দিকে।' এরকম লেখার সমর্থক হতে পারা যায়, পাঠক হতে পারা যায় না।

উদয়ন ভট্টাচার্য কাজেই অনেক ধন্য-বাদার্হ হয়ে ওঠেন 'যে কিশোরের মাথার ঝিঁঝেছিল বহুবর্ণ আকাশ / তাকে তুমি স্থিরধাময় করেছিলে' লিখে। আবার ছন্দ ও পয়ারের সন্ধি যদিও তাঁর প্রিয় বিলাসিতা, তিনি জানেন কিভাবে কবিতার প্রাথমিক আবহ তৈরি করে নিতে হয়। কিন্তু মনে হওয়া, কাকে কেমন, কেন, আবার—এসবের ওপর বড্ড বেশি নির্ভর করেছেন। এগুলোর আপাতবহস্যময়তা কেন তিনি বরদাস্ত করলেন, বুঝলাম না। বিশেষণ ব্যবহার তাঁর পথ নয়, তাহলেও, রামেশ্বরম সন্ধ্যাবেলা আলাদাভাবে ছুঁয়ে যায়। প্রথিতযশ পঞ্চাশদশক বাংলা কবিতার অনেকটাই যে আজ কবিপ্রকিল্প, এটা তিনি ধরে উঠতে পারলেই তাঁর সৌন্দর্যসচেতন নিজস্বতাকে আমরা আরো বেশি করে পাবো।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

রবীন সুর ।। রাবণের সিঁড়ি ।। অবনি প্রকাশন ।। পাঁচ টাকা। বেণুকা নাথ ।। ফসিল নায়ক ।। প্রকাশক দেবাশিস নাথ ।। তিন টাকা। প্রশান্ত রায় ।। রং নাম্বার ।। মাঝি প্রকাশনী ।। চার টাকা। নির্মল বসাক ।। নৈঃশব্দ্যের অনুভব ।। প্রকাশক অনিলকুমার ভৌমিক ।। চার টাকা। অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। জীবনের উদ্বর্ত পত্র ।। প্রকাশক ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড ।। দাম দশ বা ছয় টাকা। সুধীর মুখোপাধ্যায় ।। বিপন্ন বোদ্দেরে পাশে ।। প্রকাশক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ।। দাম সাড়ে তিন টাকা। উদয়ন ভট্টাচার্য ।। বাদামী ঘোড়ার শেষ অশ্বারোহী ।। বিশ্বজ্ঞান ।। দাম তিন টাকা।

রুচিতে আধুনিক

নবপর্যায়ে প্রকাশিত খেয়ালী পত্রিকায় রুচি এবং যত্নের ছাপ আছে। কাগজের নামটা পুরোনো আমলের কিন্তু রুচিতে আধুনিক। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে। ভালো গল্প কবিতাও প্রায় এক ডজন।

মুখবন্ধে সম্পাদিকা জানিয়েছেন, সাহিত্য তাঁদের ভালোবাসার জিনিস। সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে প্রায়ই তাঁদের ঘরোয়া আসর, আলোচনা সভা বসে।

সাহিত্য নিয়ে এই ছেলেখেলার যুগে এমন একটি সুসংবাদ এজন প্রবীণা সম্পাদিকার কাছে পেয়ে মন ভরে যায়।

শৈবাল মিত্র

খেয়ালী : ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র। ১৩১।১এ বিধান সরণি। সম্পাদিকা : মায়া দেবী।

শিশিরকুমার দাশ

এটা ইস্কুল না খোঁয়াড়? এই প্রশ্ন নিয়ে উত্তেজিত সতীশ ভাটিয়া কমনরুমে ঢুকে হাতের বইখাতা এবং ডাস্টারটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন। ডাস্টারের থেকে কিছুটা চকের গুঁড়ো ওমপ্রকাশের চায়ের পেয়ালায় পড়ল। ওমপ্রকাশ তাঁর গোল চোখদুটো পাকিয়ে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, এই প্রশ্নের উত্তর কি আমাকেই দিতে হবে?

সতীশ ভাটিয়ার মাথা দেহের অনুপাতে বড়। মাথাটি শুধু বিরাট নয়, বিকটও। চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। তবে একটি শুন্টকার টিকি আছে সেই বিপুলকায় মাথায়। টিকিটা প্রবল বেগে নাড়িয়ে সতীশ ভাটিয়া আরো উত্তেজিত গলায় বললেন, যখন বললুম ইস্কুলের মধ্যে কুকুর রাখা চলবে না, তখন তোমরা হেসে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু আজ? আজ কি বলতে চাও শুনি?

ওমপ্রকাশ যদি ছাত্র হতেন তাহলে ভাটিয়ার উগ্রমূর্তি দেখে ভয় পেতেন। ভাটিয়া ছাত্রদের অত্যধিক প্রহার করে থাকেন। গত সপ্তাহে এক ছাত্রের নাকের ওপর ঘুঁষি মেরেছিলেন। চাঁদনী-চক পুলিশ স্টেশানের সাব-ইন্সপেক-টারের ছেলে। তার হাতে পায়ে ধরে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন। ওমপ্রকাশ কিছু বলার আগেই বলবীর সিং নাকি সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, হয়েছে কি ভাটিয়া সাহেব, কুকুর কামড়েছে নাকি?

ভাটিয়া চেয়ারের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, কুকুর কামড়েছে নাতো কি আমি কামড়েছি?

আবার নাকি সুরে বলবীর সিং জানতে চাইলে, কাকে কামড়ালো, ভাটিয়া সাহেব। ভাটিয়া বলবীরকে চড় মারতে পারলে খুশি হতেন। সামলে নিয়ে বললেন, কাকে কামড়ালো? আপনাদের যে কামড়ায়নি সেতো বুঝতে পারছেন। আপনাদের কামড়লে এখানে বসে চা আর বেড্ড পকৌড়া সাটাতেন না।

ওমপ্রকাশ সহানুভূতির সুরে বললে, তাহলে কি আপনাকে—

খেঁকিয়ে উঠলেন ভাটিয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে কামড়েছে। কিন্তু জানতে চাই এর প্রতিকার কি।

দূরে বসে খলিদ সাহেব দাঁতের ভেতর থেকে সুপুরির টুকরো বার করার জন্য খড়কে কাঠি দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁত খুঁচো-চুচ্ছিলেন। শান্তশিষ্ট মানুষ, ইতিহাস পড়ান, ক্লাশ ম্যানেজ করতে পারেন না। ভাটিয়ার চীৎকার শুনে থতমত খেয়ে বললেন, তাহলে কুকুরটা আপনাকে কামড়েছে। আমি তাই কাল বলছিলাম—

ভাটিয়া কথা শেষ করতে দিলেন না: আমি তাই কাল বলছিলাম—ভেংচি কেটে ভাটিয়া বললেন, কাল আপনি কিছুই বলেননি। কাল আমি যখন প্রিন্সিপালের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম, তখন আপনি আমাকে একটুও সাপোর্ট করেননি। আপনারা সবাই প্রিন্সিপ্যালের ভয়ে কেঁচো হয়েছিলেন। আর আজ যখন আমাকেই কুকুরটা—ওমপ্রকাশ চায়ের পেয়ালাটা দূরে সরিয়ে রেখে বলল, কুকুর কোথায় কামড়ালো—পায়ে?

ভাটিয়া বললে, কেন, আপনি কি ডাক্তার? কুকুর কোথায় কামড়ালো, কুকুর কোথায় কামড়ালো? কুকুর কি মাথায় কামড়ায়?

ওমপ্রকাশ বললে, তা কামড়াতেও পারে। আপনার মাথা তো আর অর্ডিনারি মাথা নয়।

ভাটিয়া কটমট করে তাকিয়ে বললেন, ওসব রসিকতা থাক, আমি জানতে চাই, আপনারা আমার সাপোর্টে কিনা? বাজে কথা অনেক শুনেছি। আর আপনারা সাপোর্ট না করলেও কেয়ার করি না। আমি সব ঠান্ডা করে দোব। মিনিস্টারের কাছে যাব। বুঝিয়ে ছাড়ব যে এটা ইস্কুল, এটা কুকুর পোষার জায়গা নয়।

খলিদ সাহেবের দাঁতের ফাঁক থেকে সুপুরির কুচিটা ইতিমধ্যে বেরিয়ে যাওয়ায় প্রসন্ন মনে ইংরেজিতে বললেন, দিস্ ইজ হাইলি ইমপ্রপার।

ভাটিয়া চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসে প্রশ্ন করলেন, মানে, কোন্‌টা ইমপ্রপার।

খলিদ সাহেব ভয় পেয়ে বললেন, মানে, সত্যিই তো এটা কুকুর পোষার জায়গা নয়। কাউকে তো কামড়ে দিতে পারে।

ভাটিয়া লাফ দিয়ে উঠলেন। 'কামড়ে দিতে পারে। আর দিতে পারে? কি বলছেন আপনি? ইযোর সেন্স্ অব্ রং। দিতে পারে কি? দিয়েছে—দিয়েছে, বুঝেছেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট। ঐ বিচ্‌টা কামড়ে দিয়েছে—

বলবীর নাকি সুরে বলে উঠল ইযোর সেন্‌সাব ইজ রং। ওটা মোটেই কুত্তী নয়, ওটা কুত্তা।

খালিদ সাহেব অনেকটা সাহস পেলেন, আমিই তাই ভাবছিলাম। ইজ দ্যাট্ এ বিচ্ অর—

ভাটিয়া ওমপ্রকাশের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, বেশী পেঁয়াজী করবেন না, বুঝলেন।

এটা ইয়ার্কির সময় নয়। আমি জানতে চাই এটা ইস্কুল-না—

বলবীর বাকীটা শেষ করলেন—না খোঁয়াড়।

ভাটিয়া সম্ভবত বলবীর সিং-এর দাড়ি ধরে টান দিতেন যদি না হবিবিফ্ আগরওয়াল চীৎকার করতে করতে ছুটতেন। আগরওয়াল কুকুর, কুকুর বাঁচাও, বাঁচাও চীৎকার করতে করতে কমনরুমে ঢুকলেন। খলিদ এবং ভাটিয়া লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বলবীরও উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু যখন কোন কুকুরের আবির্ভাব ঘটল না বলবীর আপন মনে পাঞ্জাবীতে বলে উঠল, আজ সকলের হল কি, সবাই কুত্তার মত চেঁচাচ্ছে কেন?

ভাটিয়া পাঞ্জাবী বোঝেন, তিনি সত্যিই কুকুরের মত চেঁচিয়ে বললেন, কি বললে, আমি কুত্তার মত চেঁচাচ্ছি—এতো হিমমৎ।

বলবীর বললেন, আপনাকে বলিনি।

ভাটিয়া চীৎকার করে উঠলেন, আমাকে বলোনি তো কাকে বলছ, আমি একজন সিনিয়ার টিচার, আমাকে কুকুর বলছ।

আগরওয়াল এমনিতে শান্ত লোক। ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ধতমত খেয়ে ভাটিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি দুঃখিত, আমি একটু বেশী চেঁচিয়ে ফেলেছি। কুকুর তাড়া করেছে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কুকুরটা বাঁধা আছে, কোন ভয় নেই।

কিন্তু বাঁধাই বা থাকবে কেন? ভাটিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললেন, প্রিন্সিপ্যালের ঘরে কুকুরই বা বাঁধা থাকবে কেন? কেনই বা আমাদের তাড়া করবে? আমি জানতে চাই এটা ইস্কুল না— মৃত্যু-সেই শব্দ খুঁজে না পেয়ে ভাটিয়া বাক্যটা শেষ করলো না। কিন্তু হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল। বিকৃত গলায় বলে উঠলেন, ঐ যে আসছে।

বলবীর জিজ্ঞাসা করল, কুকুর নাকি?

আগরওয়াল কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললেন, প্রিন্সিপ্যাল।

ভাটিয়া চেয়ারে বসতে গিয়েও বসলেন না। প্রিন্সপ্যাল হিশ্বর কমনরুমে ঢুকলেন। হিশ্বর সাহেব বেশ লম্বা চওড়া লোক। পরণে লংকোট, সুরু গোঁফ, নিখুঁত ভাবে দাড়ি কামানো। হাতে বেঁটে লাঠি। প্রয়োজনে ছাত্রদের ওপরে ব্যবহার করেন। সবাই চুপ করে গেলেন। খলিদ সাহেব আবার দাঁতের ভেতরে খড়কে কাঠি ঢুকিয়ে দিলেন। আগরওয়াল ঘরের বাগজের দিকে হাত বাড়ালেন। বলবীর আর ওমপ্রকাশ চা-য়ে চুমুক দিতে লাগলেন। ভাটিয়া সাহেব চেয়ারের ধারে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হিশ্বর সোজা আগরওয়ালের সামনে এসে বললেন, একটু আগে যে আর্তস্বর শুনলাম সে কি আপনার? আগরওয়াল একটু অপমানিত মুখে প্রশ্ন করলেন, আর্তস্বর মানে—

হিশ্বর বললেন, চাপরাশীটা ছুটে গিয়ে বলল যে আপনি চীৎকার করতে-করতে—

খালিদ সাহেব কথা শেষ করতে দিলেন না, ওঁকে কুকুর তাড়া করেছিল তাই—

হিশ্বরও কথা শেষ করতে দিলেন না, কুকুর তাড়া করেছিল কোথায়, কোন কুকুর?

ভাটিয়া এবার মুখ ফেরালেন, মুখটা রাগে ফেটে পড়ছে তাঁর। কুকুর কোথায়, কোন কুকুর? এইসব আপনি জানতে চাইছেন? কুকুর আপনার ঘরে, কুকুর আপনার। বেআইনীভাবে ইস্কুলের মধ্যে আপনি কুকুর পুষছেন। আবার জিজ্ঞাসা করছেন, কুকুর কোথায়?

হিশ্বর সাহেব ভাটিয়ার কথায় এতটা স্পষ্টতা আশা করেননি। ভাটিয়া সাধারণতঃ তাঁর কথ্যরীতির অস্পষ্টতার জন্য বিখ্যাত।

যখনই তিনি না বলে হঠাৎ ইস্কুল থেকে চলে যান, এবং পরে হিশ্বর সাহেব যখন তাঁর হঠাৎ চলে যাবার কারণ জানতে চান তখন ভাটিয়া সাহেবের কথার মানে বোঝা কঠিন। এই তিনচারদিন আগেই তিনি বলেছিলেন হঠাৎ ঝড় আসতে পারে ভেবে তিনি হঠাৎ চলে যান। অবশ্য রাস্তায় গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে ঝড় হবে না, কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি কারণ তাঁর মনে হয় স্ত্রীর জন্য ওষুধ কিনতে হবে ভান্ডারীর দোকানে, অবশ্য স্ত্রী আলিগড় গিয়েছেন কয়েকদিনের জন্য, তবে যদি সন্ধেবেলায় ফিরে আসেন তাই। হিশ্বর সাহেব সতীশ ভাটিয়ার এধরনের কথাবার্তার সঙ্গে খুবই পরিচিত। কিন্তু এত স্পষ্টতায় তিনি আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু সে কুকুর তো আমার ঘরে বাঁধা আছে। সে আগরওয়াল সাহেবকে তাড়া করল কিভাবে?

আগরওয়াল বিনীত সুরে জানালেন, না স্যার, না স্যার,, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। আমি ভেবেছিলাম যে একটা কুকুর, মানে আপনার কুকুর মানে যে কোন একটা কুকুর, আমাকে তাড়া করেছে।

হিশ্বরের চোখ দুটি ঝক্‌ঝকে এল। বলবীর সিং একটু কাশলেন। খলিদ সাহেবও উসখুশ করতে লাগলেন। হিশ্বর সাহেব চোখ বন্ধ করেই বললেন, আপনি ভাবলেন যে আপনাকে একটা কুকুর তাড়া করেছে, অথচ কোথাও কোন কুকুর দেখতে পেলেন না। আপনি সুস্থ আছেন তো?

আগরওয়াল অপ্রতিভ মুখে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করলেন। আমি আপনার ঘরে ঢুকেছিলাম, যেই আপনার টেবিলের কাছে, মানে একটা ফাইলে হাত

প্রাথমিক অবস্থায়
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রণা
থেকে
আরাম পেতে
বিশ্বস্ত
অ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন-
অস্ত্রোপচার না
করলেও চলে !
3051 BEN

দিয়েছি, মানে, হাত লেগে গিয়েছে, হঠাৎ ঐ কুকুরটা তেড়ে এসেছে। আমি জানতাম না যে ওটা বাঁধা আছে ভেবেছিলাম তাড়া করতে পারে, তাই ভয়ের চোটে চেঁচিয়েছি, মানে একটু বেশী চেঁচিয়ে ফেলেছি আমি —আই অ্যাম সরি।

ছিব্বরের মুখে হাসি ফুটল। হ্যাঁ, চীৎকার শুনে মনে হয়েছিল যে কেউ আমার টেবিলের ত্রিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, কুকুরটা আমার নয়। ভাটিয়ার দিকে তাকিয়ে ছিব্বর বললেন ভাটিয়া সাহেবকে একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

ভাটিয়া জবাব দিলেন, আমাকে কুকুরটা কামড়েছে যে।

ছিব্বরকে চিন্তিত মনে হল, সেকি কিছু বলেন নি তো। কখন কামড়ালো?

ভাটিয়া কথা না বলে ডান হাতটা প্রিন্সিপ্যালের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আঙুলের ওপর সাদা ন্যাকড়া দিয়ে পটি বাঁধা। এতক্ষণ, কারো চোখ পড়েনি সেদিকে। ভাটিয়া হাতটা তুলে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন তিনি নাটকের নায়ক। ওমপ্রকাশ, বলবীর, আগরওয়াল ঝুঁকে পড়লেন। ছিব্বর বললেন, কি লাগিয়েছেন।

লংকার গুঁড়ো আর সর্ষের তেল। জবাব দিলেন ভাটিয়া, সেই সঙ্গে জুড়ে দিলেন, আশা করি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন।

আবার সেই দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট ভাষণ। সতীশ ভাটিয়ার স্বভাব কি বদলে গেল একদিনে। খলিদ সাহেব চুপচাপ বসেছিলেন। ছিব্বর সাহেবের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই তিনি মুখ নীচু করে বললেন, সত্যিই, ইস্কুলের মধ্যে কুকুর পোষাটা—

ছিব্বর শান্তগলায় বললেন, আমি এক্ষুনি ডাক্তার ডাকছি। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, খলিদ সাহেব, এটা আমার কুকুর নয়। আপনাদের আমি বলেছি যে সাতদিন আগে বিকেলে এই কুকুরটি হঠাৎ ভয়ে দৌড়ে ইস্কুলের মধ্যে ঢোকে। আমি মাঠে দাঁড়িয়েছিলাম। বোধ হয় রাস্তায় কোন লোক কুকুরটাকে পাথর দিয়ে মেরেছিল। আমার কাছে এসে কুকুরটা মাটিতে শুয়ে পড়ে। আমি চাপরাশীকে ডেকে ওকে জল দিই। কুকুরটা সুস্থ হবার পর আমার পেছনে পেছনে অফিসঘরে ঢোকে। সন্ধ্যেবেলা আমি যখন বাড়ি যাই তখনও অফিসের সামনে শুয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম কিছুক্ষণ পরে চলে যাবে। পরের দিন সকালে ফিরে দেখি কুকুরটা আমার বলের দরজার সামনে বসে আছে। আমার তখন কি করা উচিত ছিল? কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেওয়া? আমি তাড়াইনি, আমি ভেবেছিলাম যে ও নিজেই সুস্থ হয়ে গেলে চলে যাবে।

ওমপ্রকাশ বলল, কিন্তু স্যার, আপনি ওকে যে ভাবে খাওয়াচ্ছেন—

ছিব্বর চুপ করে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর স্বগতোক্তির মত বললেন, হ্যাঁ, দুপুরে আমার জন্য যে দুধ আসে তা পশুটাকে খেতে দিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ও এখনও অসুস্থ। এখনও বাইরে বেতে ভয় পাচ্ছে—

ভাটিয়া যেন এতক্ষণে সুযোগ পেলেন —ভয় পাচ্ছে, ঐ কুত্তার বাচ্চা। ও মোটেই অসুস্থ নয়, সারা দিন স্কুলের মাঠে দৌড়েছে।

হ্যাঁ, তা দেখেছি। দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে খেলছে, কাউকে তেড়ে যাচ্ছে না, কাউকে কামড়ানোর কোন লক্ষণ দেখিনি। তাই ভেবেছি ও যখন ইচ্ছে তখন চলে যাবে। আমি ওকে ডেকে আনি নি। আর কারো ক্ষতি যখন করছে না, তখন আমি ওকে তাড়াব না। ছিব্বর দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ভাটিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি। চলে যাবেন না যেন।

ছিব্বর চোখের আড়াল হতেই ভাটিয়া চেঁচিয়ে উঠল, মেজাজ দেখাচ্ছে। আমার হাতে কামড়ালো তার জন্য ক্ষমা নেই, অনুশোচনা নেই। ডাক্তার ডাকছি, ডাক্তার ডাকছি। আমার যদি কিছু হয়, কে আমার পরিবারের দায়িত্ব নেবে শুনি।

আগরওয়ালেরও মেজাজটা গরম। অফিসঘরের মধ্যে কুকুর। বেআইনী। আমি এডুকেশন ডিরেকটরেট-এ রিপোর্ট করব।

ওমপ্রকাশও ব্যাপারটায় খুশী নয়। দয়া, মায়া দয়া। তা বাপু কুকুরটাকে বাড়িতে নিয়ে যাও।

খলিদসাহেব শুধু বললেন, দিস্ ইজ হাইলি ইমপ্রপার।

ভাটিয়া তাঁর ত্রিনিসপত্র নিয়ে বাইরে বেরুতে যাচ্ছিলেন, বলবীর সিং বললেন, ডাক্তার আসছেন যে। ভাটিয়া জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে ইস্কুলের অ্যাসেমব্লীতে হৈ-চৈ। প্রত্যেক দিন সকালে অ্যাসেম্বলীতে প্রিন্সিপ্যাল বক্তৃতা দেন। ইস্কুলের দরকারী সব নোটিশ এখানে দেওয়া হয়। ছাত্ররা প্রার্থনা করে। আজ প্রিন্সিপ্যাল কিছু বলার আগেই জগদীশ মার্তণ্ড নামে হিন্দীর শিক্ষক এগিয়ে এলেন। তিনি স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতা, সম্প্রতি মেট্রোপলিটান কাউন্সিলে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন। শুদ্ধ হিন্দীতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ইস্কুলে সবাই তাঁকে ভয় করে। ছিব্বর সাহেব অবশ্য তাঁকে স্কুলে না এলে ক্যাজুয়াল লীভের আবেদন করতে বাধ্য করেন। একবার চার দিনের জন্য সাসপেণ্ড করেছিলেন। সেই মার্তণ্ড এগিয়ে এলেন, আমি কিছু বলতে চাই।

ছিব্বর বললেন, বেশ, কিন্তু আমার বলার পর। আজ আগে কয়েকটা জরুরী ঘোষণা আছে পরীক্ষার ব্যাপারে।

মার্তণ্ড উচ্চস্বরে বললেন, আমার কথাও খুব জরুরী। আমি আগে বলব।

ছিব্বর বিরক্তির স্বরে বললেন, ছাত্রদের সামনে গোলমাল করবেন না। প্লীজ্ ওবেট।

মার্তণ্ড একলাফে মঞ্চের ওপর উঠে পড়লেন, আমার পক্ষে দেরী করা সম্ভব নয়। আমি এডুকেশন মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এক্ষুনি।

ছিব্বর এতটা বেয়াদপি আশা করেন নি। খুব তীক্ষ্ণভাবে কারো দিকে তাকালে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসে। মার্তণ্ডের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। কি বিষয়ে বলতে চান?

কুকুর। মার্তণ্ড জবাব দিলেন।

কুকুর? এখানে কুকুর বিষয়ে বক্তৃতা? ছিব্বরের বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রিন্সিপ্যালের দপ্তরে যদি কুকুর থাকতে পারে, এখানে কুকুর প্রসঙ্গ উঠতে বাধা কেন।

বাধা আছে। ছিব্বর বললেন। এখানে আপনার কিছুই বলার দরকার নেই।

আলবৎ আছে। মার্তণ্ড মাথা নাড়িয়ে জানালেন।

বলবীর সিং মার্তণ্ডকে শান্ত করার জন্য বললেন, মার্তণ্ডজী, কেন গোলমাল করছেন, নেমে আসুন। ছেলেরা কি ভাবছে।

মার্তণ্ড চেঁচিয়ে বললেন, আমি তোমার মত প্রিন্সিপ্যালের চামচা নই। জানো আমি ফ্রীডাম ফাইটার।

ওমপ্রকাশও কি একটা বলতে চাইছিল, মার্তণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন তাকে। ওমপ্রকাশ ঘাসের ওপর ছিটকে পড়ল। মার্তণ্ডকে ছিব্বর সাহেব নীচে নামতে অনুরোধ করলেন। মার্তণ্ড হাত উঁচু করে শ্লোগান দিলেন, ইস্কুলে কুত্তা রাখা চলবে না। প্রিন্সিপ্যালের জুলুম চলবে না। ছাত্ররা অবাক হয়ে দেখছিল। বলবীর এবার মার্তণ্ডকে নীচে নামাবার চেষ্টা করতে

পুস্তক পর্ষদের বই

আধুনিক প্রস্তর বিদ্যা

ডঃ অনিরুদ্ধ দে ১২·০০

পেট্রোলজির উপর স্নাতক পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা গ্রন্থ যেখানে শীলাবীক্ষণ শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্লেষিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ~ ৭০০ ০১৩

লাগল। এক এক করে খলিদ সাহেব, সতীশ ভাটিয়া, আগরওয়াল সবাই ছুটে এল। মার্তণ্ড বলবীরের মুখের ওপর একটি ঘুঁষি লাগালেন। চাপরাশীরা দৌড়ে গিয়ে বলবীরকে ধরতে চাইল। উঁচু ক্লাসের ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে মঞ্চের দিকে ছুটল। ফিজিক্সের শিক্ষক বাগী মেহরা সাহেব, 'সাইলেন্স' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। মার্তণ্ড ছিব্বর সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করে ঘোষণা করলেন। শালা কুত্তাকে মুক্তিয়ে তাড়াব। মার্তণ্ড প্রিন্সিপ্যালের অফিসের দিকে ছুটলেন। ছিব্বরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। চাপরাশীরা চেঁচিয়ে বললেন, মার্তণ্ডজী, কুত্তা বাঁধা নেই, ওদিকে যাবেন না।

মার্তণ্ড কারও কথা শুনলেন না, ছিব্বর সাহেব তার হাতের লাঠি তুলে, মার্তণ্ডজী, মার্তণ্ডজী বলে ডাক দিলেন, কিন্তু মার্তণ্ড ক্ষেপে গেছেন। অ্যাসেম্বলীর ছেলেরা সবাই ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এমন বিশৃঙ্খলা অনেক দিন ইস্কুলে কেউ দেখেনি।

মার্তণ্ড প্রিন্সিপ্যালের অফিসের সামনে গিয়ে খুব জোরে লাথি মারলেন দরোজার ওপর। দরোজা খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল বিরাট একটা কালো কুকুর। মার্তণ্ড চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাগ্, ভাগ্। পেছনে ছেলেরা হল্লা করছে, শিক্ষকরা চেঁচামেচি করছেন। কুকুরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ মার্তণ্ডের দিকে তাকিয়ে কুকুরটা লাই তুলল। তার সরু সরু লম্বা দাঁত, লকলকে জিভ, লাল লাল চোখের দিকে তাকিয়ে মার্তণ্ড দু পা সরে দাঁড়ালেন। কুকুরটা একবার চাপা আওয়াজ করল, কান দুটো তার খাড়া হয়ে উঠেছে, নাকের ডগা দুটো কাঁপছে। সামনের পা দুটো এগিয়ে শরীরের আড়ষ্টতা ভেঙে নিল। আবার তাকাল মার্তণ্ডের দিকে। একটা কিছু শুঁকলো মাটিতে। ইতিমধ্যে চাপরাশীরা এগিয়ে এসেছে। মার্তণ্ডের কাছাকাছি আসার আগেই কুকুরটা লাফিয়ে উঠল বিদ্যুতের গতিতে। মার্তণ্ডের কাঁধের ওপর তার দুটো নখ বেরিয়ে আসা পা। মার্তণ্ডের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মাড়িটা শুকিয়ে গেছে, মুখের ওপর গরম নিঃশ্বাস পড়ছে কুকুরটার। তার লাল জিভটা সাপের ফণার মত কাঁপছে। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখছে। ছিব্বর চেঁচিয়ে উঠলেন, রুস্তম্।

কুকুরটা মার্তণ্ডের কাঁধ থেকে তার পা দুটো সরাল না, কিন্তু তার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল। ডাক শুনতে পেয়েছে।

আবার ডাকলেন ছিব্বর, রুস্তম্, এদিকে আয়। তাঁর কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় বিকৃত। কুকুরটা এক দৌড়ে ছিব্বরের সামনে এসে তার পায়ের ওপর মুখ ঘষতে লাগল। ছিব্বর লাঠিটা দিয়ে কুকুরটাকে মারলেন জোরে। আর্তনাদ করে উঠল কুকুরটা। কিন্তু আবার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। ছিব্বর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সবাই ঠিক জায়গায় দাঁড়াও। অ্যাসেম্বলী শুরু হবে।

পরের দিন আড়াইটের সময় প্রিন্সিপ্যালের ঘরে জরুরী বৈঠক। সব শিক্ষকেরা এসেছেন। এডুকেশন ডিরেক্টরেট থেকে টেলিফোন এসেছে, তাঁরা খবর পেয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল একটা হিংস্র পাগলা কুকুর পুষেছেন ইস্কুলের মধ্যে। ইতিমধ্যে কেউ এনিয়েছেন যে, দশজন ছাত্রকে এবং দু-তিনজন সম্মানিত শিক্ষককে কুকুর কামড়েছে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য এবং সরজমিন্ তদন্তের জন্য একজন অফিসার যাচ্ছেন। পনেরজন শিক্ষকের সইকরা একটি দরখাস্ত পেয়ে এডুকেশন ডিরেক্টরেট চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। মেট্রোপলিটান কাউন্সিলের দুজন কাউন্সিলার এই ব্যাপারে প্রিন্সিপ্যালকে ফোন করেছেন। মার্তণ্ড প্রথমে উঠে দাঁড়ালেন। একটু আগে তিনি কয়েকটি চাপাটি এবং আলুর তরকারী দিয়ে তার মধ্যাহ্ন ভোজন সেরেছেন। জীভ দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে করতে বললেন, গতকাল সকালের আচরণের জন্য তিনি অনুতপ্ত, তবে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবেরও অনুতপ্ত হওয়া উচিত। তাঁর উচিত অখিলেশের ক্ষমা চাওয়া।

ছিব্বর বললেন, আপনি বসুন। আমার যা বলার এক্ষুনি বলব। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির আওয়াজ হল। জীপ থেকে নামলেন এডুকেশন অফিসার নিখিল সরকার। তাঁর হিন্দী উচ্চারণ শুনে স্কুলের সবাই হাসেন এবং আড়ালে তাঁর উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা। আজ অবশ্য তাঁকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। ছিব্বর চেয়ার এগিয়ে দিলেন। নিখিল সরকার রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে একটু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন ছিব্বরকে, কুকুর নিয়ে এত হৈ-চৈ। ব্যাপারটা কি বলুন তো। কাদের সব কামড়ে দিয়েছে।

ছিব্বর বললেন, কাউকেই কামড়ায় নি। সতীশ ভাটিয়া প্রতিবাদ করার আগেই ছিব্বর বললেন, পরশুদিন ভাটিয়া সাহেবকে আঁচড়ে দিয়েছিল, কিন্তু ডাক্তার বলছেন—

কথা শেষ করতে না দিয়ে নিখিল সরকার বললেন, কিন্তু এই যে দরখাস্তে বলা হয়েছে যে সতীশ ভাটিয়াকে কুকুর ভীষনভাবে কামড়েছে, তিনি শয্যাশায়ী—

ভাটিয়া অস্বস্তির সুরে বললেন, হাঁ, আমি তাই লিখেছি কারণ ভেবেছিলাম যে কুকুরটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে, তাই আমি—

নিখিলবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, আপনি ভেবেছিলেন, আঁ, কামড়ানো কি ভাবার জিনিষ মশাই। সিগারেট বার করে ছিব্বরকে এগিয়ে দিলেন। ছিব্বর ধূমপান করেন না, সিগারেট ধরিয়ে নিখিলবাবু বললেন, কিন্তু আপনি লিখেছেন কুকুর দুটো দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, রক্ত বেরুচ্ছে প্রচুর, ডাক্তার—

হাঁ, ডাক্তার কি বলছে? ছিব্বর বললেন, ডাক্তার বলছেন ভয়ের কিছু নেই, শুধু স্যাঁচড় লেগেছে নখের। কিন্তু আমি দশদিন কুকুরটিকে আন্ডার অবজারভেশনে রাখতে চাই। ইচ্ছে হলে ভাটিয়া সাহেব নিজেই রাখতে পারেন।

ভাটিয়া বললেন, ওরে বাবা, আমি ওসবের-মধ্যে নেই। আমি আমার বক্তব্য উইথড্র করছি।

মার্তণ্ড লাফিয়ে উঠলেন, উইথড্র করছি মানে।

মার্তণ্ডের রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে নিখিলবাবু পরিচিত। তিনি বলে উঠলেন, কেন শোর মাচাতা ভাই। অন্য সময় হলে তাঁর হিন্দীতে একটা হাসির ঢেউ উঠত। আজ মার্তণ্ড রসিকতা না করে জিজ্ঞাসা করলেন, কুকুর কাকে কামড়েছে, সেটা বড় কথা নয়, আমাদের মূল প্রশ্ন হল ইস্কুলের মধ্যে একটা কুকুর কেন থাকবে।

খলিদ সাহেব বললেন, এটা ইল্লিগাল।

বলবীর সিং বললেন, এর মধ্যে লিগালিটির কথা কেন তুলছেন। ইস্কুলের মাঠে যে সব প্রজাপতি আসে পিপুল গাছে অন্তত তিরিশটা কাক থাকে, লাইব্রেরীর ভেতরে প্রায় সাতাশটা পায়রা থাকে— সেটাও তো ইল্লিগাল।

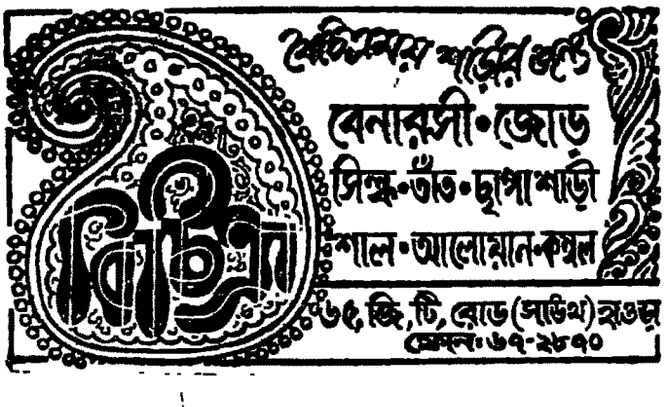

আগরওয়াল বলে উঠলেন, আপনি কি ঐসব কাক, পায়রা গুণে দেখেছেন।

বলবীর উত্তর দিলেন, সংখ্যাগুলো ভুল কিনা প্রমাণ করুন। কথা হল, ঐসব কাক, পায়রা, প্রজাপতি, বোলতা, ফড়িং— যারা ঐ ইস্কুলে থাকে তারা কি লিগালী থাকে? এ বিষয়ে এডুকেশন ডিরেকটরেটের আইন কি?

নিখিল সরকার চিন্তিতভাবে স্বীকার করলেন, এ ব্যাপারে ঠিক, মানে আইন আছে কিনা জানি না। তবে পশুপাখিরা সাধারণত ইস্কুলে থাকে না বোধহয়—

ভাটিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, না, থাকে না। এ ব্যাপারে আবার আইন কি। কেউ কি ইস্কুলে সাপ পুষতে পারে। খুব একটা প্যাঁচের যুক্তি দিয়েছেন এই জন্যই ভাটিয়া ছিন্ধরের দিকে তাকালেন।

মার্তণ্ড ক্ষেপেছিলেন, রেগে চীৎকার করে বললেন, বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ কি?

পায়রা কি কাক যদি ইস্কুলে থাকেও আমরা কেউ তাদের ডেকে আনিনি, এবং আমরা তাদের দুধ খাওয়াই না—

কাক বা পায়রা কি দুধ খায়? আমি যতদূর জানি—খলিদ সাহেব গম্ভীরভাবে বলতে চাইছিলেন কিছু। মার্তণ্ড থামিয়ে দিয়ে বললেন, এঁড়ে তর্কো করবেন নাতো। কথা হচ্ছে, কাক পায়রা থাকে থাক কারো ক্ষতি করে না।

বুড়ো লাইব্রেরীয়ান হঠাৎ বলে উঠলেন, কী যে বলেন স্যার, লাইব্রেরীর টেবিল চেয়ারগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন পায়রা-গুলো—

মার্তণ্ড টেবিলের তলা দিয়ে লাই লাইব্রেরীয়ানের পায়ে লাথি মারলেন। বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলেন, সত্যি কথা বললে আপনারা রাগ করেন স্যার।

ভাটিয়া বললেন, কথা হচ্ছিল কুকুর নিয়ে অথচ—

নিখিলবাবু এতক্ষণে সম্বিৎ পেলেন। ঠিকই ত, কথা হচ্ছিল কুকুর নিয়ে, কিন্তু কাক পায়রা টায়রা এনে আপনারা সব গুলিয়ে দিলেন। যাকগে ছিন্ধর সাহেব, কি কুকুর পুষেছেন।

খলিদ সাহেব বলে উঠলেন লাব্রাডার।

আগরওয়াল বললেন, না না, স্যার ওটা একটা নিউ ফাউন্ডল্যান্ড।

ওমপ্রকাশ বললেন, হোয়াইট চাউ চাউ বোধহয়।

মার্তণ্ড দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, মোষের মত কালো কুত্তাকে হোয়াইট চাউ চাউ। চাউ চাউ তো উপাদেয় বস্তু।

নিখিল সরকার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, আপনারা কুকুর সম্বন্ধে একসপার্ট মনে হচ্ছে। ছিন্ধর সাহেব বললেন, মিস্টার সরকার। আমি কোন কুকুর পুষিনি। কি জাতের কুকুর তাও আমি জানি না। আপনাকে ফোনে বলেছি কুকুরটা কিভাবে এসেছে। আজ সাত আট দিন হল এখানেই আছে। কাউকে কামড়েছে এমন প্রমাণ পাইনি। তবে কেউ বিনা অনুমতিতে এই ঘরে ঢুকে আমার কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে চাইলে কুকুরটা তেড়ে গেছে।

নিখিলবাবু, বললেন, আই সি, আই সি। কুকুরটা তাহলে আপনার নয়। বাইরে থেকে একদিন চলে এসেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। সংক্ষিপ্ত জবাব প্রিন্সিপ্যালের।

ভেরী স্ট্রেঞ্জ। ভেরী স্ট্রেঞ্জ। কুকুরটা বাইরে থেকে এল। মানে আপনার সঙ্গে কুকুরটার কোন রিলেশন নেই। নিখিলবাবুর সহাস্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত জিজ্ঞাসায় ছিন্ধর সাহেব অস্বস্তি বোধ করবেন।

না, কুকুরের সঙ্গে আমার কোন রিলেশান নেই।

আগরওয়াল হঠাৎ বলে উঠলেন, তাহলে ওর নাম যে রুস্তম তা আপনি জানলেন কি করে? ছিন্ধর বললেন, ওর নাম যে রুস্তম একথাটা কুকুর অবশ্যই আমাকে বলেনি। সাধারণত কুকুররা ওরকম কথা বলে না। আমি ওর নাম দিয়েছি রুস্তম।

নিখিল সরকার হঠাৎ খুশী হয়ে উঠলেন। বাঃ বাঃ রুস্তম। সোরাব রুস্তমের রুস্তম। সেই ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতা পড়েছেন তো। ভেরী গুড পোয়েট। হ্যাঁ, কথা হচ্ছিল যে কুকুরটা হঠাৎ এল—

মার্তণ্ড বিকৃতির সুরে বললেন, হঠাৎ যে এল তা আমরা জানি, কিন্তু যাবে কখন?

ছিন্ধর বললেন, ওর যখন ইচ্ছে। আমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছি, ও চলে যাক। আমি ওকে লাঠি মেরে এবং দিল মেরে তাড়িয়ে দিতে পারব না। এ বিষয়ে সরকার সাহেব আমার বক্তব্য এডুকেশন দপ্তরে জানাতে পারেন।

নিখিলবাবু দ্বিধায় পড়লেন। মহা-ঝামেলা, কুকুর সম্বন্ধে কোন আইন আমার জানা নেই। ইস্কুলে কুকুর—কুকুরটা তো বড় ইররাশনাল মশাই। যাই হোক হোয়্যার ইজ দি ডগ? এখন কুকুরটা আছে কোথায়?

এতক্ষণ কারো খেয়াল হয়নি সে কথাটার। সাধারণত প্রিন্সিপ্যালের চেয়ারের পাশেইতো বাঁধা থাকে। ছিন্ধর বললেন, পাশের ঘরে আটকে রেখেছি। আসুন, মিস্টার সরকার। ছিন্ধর বললেন, ভয় নেই, আসুন। ছিন্ধর দরজা খুলে ডাকলেন, রুস্তম। নিখিল সরকার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন অবশ্য ছিন্ধরের পেছনে পেছনে।

ঘরের মধ্যে কুকুর নেই। জানালা খোলা, ছিন্ধর বললেন, না, নেই।

মার্তণ্ড অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, নেই মানে।

ছিন্ধর বললেন, বোধহয় চলে গেছে।

ভাটিয়া, আগরওয়াল, মার্তণ্ড সবাই যেন হতাশ হলেন, চলে গেছে।

নিখিল সরকার আবার খুশী হয়ে উঠলেন, যাকগে চলে গেছে। তাহলে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলি। যাক। গুড, গুড।

নিখিল সরকারের জীপটা ছেড়ে দিল। সুরকি বাঁধানো রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় ভীড়ে মিশে গেল।

মার্তণ্ড খলিদের দিকে চেয়ে হাসলেন, কেমন হল আজ ছিন্ধর সাহেবের। আরো দেখুন, কি হয়। চেয়ারম্যানের কাছেও খবর গেছে। আর কালকের কাগজে দেখবেন, প্রিন্সিপ্যালের কুত্তা। ভাটিয়ার মুখে হাসি। ওমপ্রকাশ বললেন, এবার আঙুলের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলুন।

ভাটিয়া বললেন, মানে আপনার সন্দেহ যে আমার কিছু হয়নি।

ওমপ্রকাশ বললেন, আমি কিছুই বলতে চাই না, চলুন মার্তণ্ডজী, প্রিন্সিপ্যালের ঘরে আমাদের ছাতা আর টিফিন বাক্স পড়ে আছে।

সবাই প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দিকে চললেন। ভাটিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকেই চীৎকার করে দুপা পিছিয়ে এলেন।

মার্তণ্ড বললেন, চেঁচাচ্ছেন কেন?

ক্যালিক্স® স্যানিটারী ট্যাম্পুন

প্রতিমাসের অস্বস্তিকর পাঁচদিন আপনাকে সহজ ও নিরিম্ন রাখবে।

বৈশিষ্ট্য :
★ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত।
★ ব্যবহারের-পদ্ধতি খুবই সহজ, বেল্ট বা পিন লাগে না।
★ অভ্যন্তরে থাকাকালীন কোন অস্বস্তিকর অনুভূতি থাকে না।
★ প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক ভাবণে পরিবর্তন অনাবশ্যক।
★ অথচ সাধারণ ন্যাপকিনের মতই কার্যকর।
টিউবে এবং বিনা টিউবে পাওয়া যায়।

ফেয়ারওয়ে ট্রেডিং কোং
৩৯, শীতলাতলা লেন, কলিকাতা-৭০০০১৯
ফোন : ৩৫-৪১৪৫

এজেন্ট চাই

ভাটিয়া বিকৃত স্বরে বললেন, ঐ যে ঐ—যায়নি।

ওমপ্রকাশ আর মার্তণ্ড একসঙ্গে পর্দা তুলে দেখলেন ছিম্বর সাহেব জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। দূরে জামা মসজিদের একটা মিনার দেখা যাচ্ছে, ছিম্বর সেই দিকে চেয়ে আছেন। জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিরাট টেবিলটার নীচে। শুয়ে আছে বিরাট কুকুরটা।

মার্তণ্ড প্রশ্ন করলেন, লুকিয়ে রেখেছিলেন।

না। ছিম্বর উত্তর দিলেন। ও নিজেই লুকিয়ে ছিল বোধহয়। আপনারা চলে যাবার পরই বেরিয়ে এল।

মার্তণ্ড ঘরের মধ্যে রাগের চোটে থুথু ফেললেন। ঠিক আছে দেখা যাবে।

ছিম্বর কিছু একটা বলতে চাইলেন। রাস্তায় প্রচণ্ড জোরে একটা গাড়ি ব্রেক কষল। সেই শব্দে ছিম্বরের কোন কথা শোনা গেল না।

ক্লাশে যাবার আগে ছিম্বর ঘরে ঢুকে দেখলেন বুস্তম এক কোণে ঝিমুচ্ছে। তাঁকে দেখে বুস্তম উঠে দাঁড়ালো। একটা পা উঁচু করে আছে। নিশ্চয়ই কেউ পায়ের ওপর মেরেছে। বিকেলের দিকে একটা ক্লাশ নেন ছিম্বর। হঠাৎ ক্লাশে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যানের কাছে কি তোমরা কোন দরখাস্ত পাঠিয়েছ?

ছেলেরা চুপ করে রইল।

চেয়ারম্যান ছিম্বরের কাছে সেই দরখাস্তের কপি পাঠিয়ে কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। ইস্কুল প্রিন্সিপ্যাল আইনবিরুদ্ধভাবে একটা হিংসা কুকুর পুষেছেন, কুকুরটি ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর ইত্যাদি কথা বিশুদ্ধ হিন্দীতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

তোমাদের কোন বক্তব্য থাকলে প্রথমে আমাকে বলা উচিত ছিল।

ছেলেরা চুপ করে রইল। ছিম্বর সাহেব আবার বললেন, সত্যি কথা বল।

একটি ছেলে বলল, মার্তণ্ডজী আর ভাটিয়া সাহেব ওদের একটা কাগজে সই করিয়েছেন।

সেই কাগজে লেখা ছিল যে—

ছিম্বর বিরক্তির সঙ্গে বললেন, অল রাইট, অল রাইট।

চাপরাশী এসে ক্লাশের দরোজার সামনে দাঁড়াল। ছিম্বর ক্লাশের সময় চাপরাশীদের আনাগোনা পছন্দ করেন না। কড়া সুরে জানতে চাইলেন কি চাই?

চাপরাশী বিনীতভাবে নিবেদন করল, চেয়ারম্যান সাহেবের ফোন এসেছে, খুব জরুরী।

ছিম্বর লাঠিটা তুলে নির্দেশ দিলেন, এখন যাও।

ক্লাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের কিছু বলার থাকলে আমাকে জানাবে। না বুঝে কোন কাগজে সই করবে না। এখন তোমরা এক এক করে যাও।

ছেলেরা বেরিয়ে যাবার পর ছিম্বর নীচে তাঁর ঘরে এসে দেখলেন টেবিলের ওপর টেলিফোন রাখা, টেলিফোন তুলে বুঝতে পারলেন যে ওদিকে কেউ নেই। ছেড়ে দিয়েছে। চেয়ারম্যান কি বলবেন তিনি জানেন। কুকুর সম্বন্ধে বলবেন। তবে কুকুর উপলক্ষ্য মাত্র। কুকুরটাকে তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রবল আপত্তি। বলেছেন রাস্তার কুকুর রাস্তায় বিদেয় কর। খবর দিলেই লোক এসে নিয়ে যাবে।

ছিম্বর ডাকলেন বুস্তম।

বুস্তম ছিম্বর সাহেবের হাঁটুর ওপর পা দুটো তুলে দাঁড়ালো। ছিম্বরের চোখ পড়ল। টেবিলের ওপরের খবরের কাগজটায়। এ কাগজ তাঁর স্কুলে আসে না। কেউ রেখে গেছে। তাঁকে দেখানোর জন্য। একটি ইস্কুলে প্রিন্সিপ্যালের নানা অন্যায়ের কাহিনী। সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবে কুকুর। ছিম্বর কাগজটা সরিয়ে রাখলেন। টেলিফোন বাজল। ছিম্বর ক্লান্ত হাতে টেলিফোন তুলে প্রিন্সিপ্যাল ডি এম হায়ার সেকেণ্ডারী—শেষ করতে পারলেন না। ওদিক থেকে আওয়াজ এল চেয়ারম্যান লকষমন কোঠারীর।

: আপনাকে আগেও ডেকেছিলাম।

: আমি ক্লাশে ছিলাম তাই।

বিরক্ত কোঠারী বললেন, আমি ব্যস্ত লোক, আপনার ক্লাশ থেকে নীচে নেমে আসতে কতক্ষণ লাগে। ছিম্বর উত্তর দিলেন না। কোঠারী বলে চললেন, নানা অভিযোগ আসছে আপনার সম্বন্ধে রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে, ডিসিপ্লিন খারাপ হচ্ছে, ছাত্র সংখ্যা কমছে। হিসাবপত্র গোলমাল হচ্ছে—

ছিম্বর বললেন, কিন্তু এসব কথা হঠাৎ টেলিফোনে বলছেন, এতো গত মিটিং-এ ডিসকাসড্ হয়েছে আমি তো স্যার গভর্ণিং বডির মিটিং-এ

আপনি অত্যন্ত আরগুমেনটেটিভ, মিষ্টার ছিম্বর কোঠারী জানালেন। আমার হাতে সময় নেই। কিন্তু অনেক জরুরী ব্যাপারে কথা বলার আছে, আপনি অনেক-দিন ধরেই—

ছিম্বর কথায় বাধা দিয়ে বললেন, আমার ওপর যদি আপনার কনফিডেনস না থাকে তাহলে আমি অবশ্যই রেজিগনেশান—

উঁহু উঁহু-টক অ্যাবউট এভরি থিং। আপনি আজ সন্ধ্যেবেলায় আমার সঙ্গে দেখা করবেন। ভেরী আর্জেন্ট। লকষমন কোঠারী ফোন ছেড়ে দিলেন।

স্কুল ছুটির পর অনেক সময় কেটে গেছে। সন্ধ্যে হয় হয়। চাপরাশীটি এসে জিজ্ঞাসা করল, চা খাবেন স্যার।

ছিম্বর মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, বুস্তমের জন্য দুধও আনো। আর শোন একটা স্কুটারও ডেকে আনো। বুস্তমকে নিয়ে যাব। স্কুটারওয়ালাকে দু টাকা বেশী দিলে কুকুর নিতে আপত্তি করবে না।

চাপরাশী বিস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করল, কুকুর মানে—

ছিম্বর বললেন, হ্যাঁ ওকে স্কুল থেকে বিদেয় করার কথা ভাবছি। যাও তাড়াতাড়ি চা আর দুধ আনো। মিনিট পনেরোর মধ্যে ছিম্বর চা খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। স্কুটারটা বিকট শব্দ করে সামনে এসে থামল। ছিম্বর ডাকলেন বুস্তম।

বুস্তম একলাফে বাইরে এল, তারপর স্কুটারের ওপর উঠে পড়ল। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, কিধার হ্যায়। ছিম্বর বললেন, কোন ভয় নেই। চলো। যমুনার ওপারে।

ভীড়ের রাস্তা কাটিয়ে যমুনার ধারে পৌঁছল স্কুটার। এখন অন্ধকার এসেছে আকাশে। রাস্তায় অজস্র আলো, অজস্র শব্দ। সাইকেল, ট্রাক, বাস, ট্যাকসি, জরীব অযিবাম ছোটাছুটি। শব্দে শব্দে থাকো, আলোয় আলোয় থাকো, শকতিতে শকতিতে থাকো। সেই থাকোয় সমস্ত শহরটা কখনও গোঙাচ্ছে, কখনও অট্টহাসি হাসছে, আবার কখনও পরাজিত দস্যুর মত ছুটে পালাবার চেষ্টা করছে গুপ্ত গুহায়। দুটো সাইকেল কাটিয়ে, একটা জরীর সঙ্গে ধাক্কা বাঁচিয়ে ছিম্বরের স্কুটার ব্রীজের ওপর দিয়ে ছুটে চলল যমুনার ওপারে।

কিছুটা গিয়েই ছিম্বর স্কুটারকে থামতে বলে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। বুস্তম দাঁড়িয়ে রইল ছিম্বরের পাশে। স্কুটারওয়ালা বিড়ি ধরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তায় আস্তে আস্তে চলে গেল। ছিম্বর হাঁটতে লাগলেন। ডান দিকে মোড় নিলেন। রাস্তার পাশেই আর একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। ডানদিকে ঢালু হয়ে গেছে যমুনার পাড়, নীচে বিস্তীর্ণ চড়া, মধ্যে মধ্যে কাঁটা ঝোপ, কাদা-জল। একটা তেঁতুল গাছের তলায় দাঁড়ালেন ছিম্বর। ওপারে যমুনার পারে লালকেল্লার প্রাচীনটা অন্ধকারের মধ্যেও হঠাৎ দেখা গেল। রিং রোডের ওপর দিয়ে অসংখ্য দ্রুতগামী গাড়ি ছুটছে, কখনও তাদের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে উঁচু বাড়িগুলো। এপারে অন্ধকার অসভ্য জগৎ আখের ক্ষেতের মধ্যে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে, গাড়ির আলো যমুনার জলের ওপর প্রজাপতির মত নেচে নেচে হারিয়ে যাচ্ছে এবড়ো-খেবড়ো মাটির বুকে। এখানে দাঁড়িয়ে ছিম্বর বললেন, বুস্তম, তুই যা।

বুস্তম দাঁড়িয়ে রইল। দূরে কোন কুকুরের ডাক শোনা গেল। বুস্তমের কান খাড়া হয়ে উঠেছে। ছিম্বর সাহেব তেঁতুল গাছ ছাড়িয়ে আবার যমুনার পুলের দিকে এগুতে থাকলেন। পেছন ফিরে দেখলেন, না বুস্তম আসছে না, দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হলেন ছিম্বর। সেই সঙ্গে দেখলেন তাকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে যমুনা পারের নেড়ী, মোটা, খোঁড়া, নানা ধরনের কুকুর। বুস্তমকে তারা এ এলাকায় ঢুকতে দেবে না। ছিম্বর সাহেব ডাকলেন বুস্তম! একসঙ্গে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বুস্তমের কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল। কিন্তু আত্মরক্ষার সহজ আশ্রয় আর বোধহয় সে চায় না। ছিম্বর সাহেব যেতে যেতে আবার পিছনে ফিরে তাকালেন, অন্ধকারে বুস্তমকে কুকুরগুলো ক্রমশ ঘিরে ফেলছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাওয়া গাড়ি

।।সাতাশ।।

আজ সরস্বতী পুজো। হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে অকালে বৃষ্টি। গুঁড়ি-গুঁড়ি। কেউ কোন ফোন করে তার খোঁজ করেনি। বরং দিলীপ নিজেই খুশির বাড়ি গেল। দুটো তিনটের সময়। আজ অফিস ছুটি। চারদিকে মাইক।

আমি বসার ঘরেই ছিলো। দিলীপকে দেখে বললো, বেরিয়ে পড়েছিস? এখন এত ঘোরাঘুরি করিসনে। বাড়ি গিয়ে বরং খাওয়া-দাওয়া কর। ঘুমো। মাথাটা ঠাণ্ডা হোক। তোর বিশ্রাম দরকার।

দিলীপ অবাক হোল। আমার তো অসুখ করেনি।

তোর নার্ভের রেস্ট, দরকার। ঘুমিয়ে ক্লান্ত হ' আগে।

কেন?

তোর শরীর এখন ঠিক নেই—অনাথদা তোর সঙ্গে দেখা হলে, বলতে বলেছে তুই যেন এখন নার্সিংহোমে গিয়ে হাজির না হোস—

—কেন?

ওঁর আত্মীয়-স্বজন থাকবেন। তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন তোকে দেখে—

ও! কেমন আছেন এখন?

প্ল্যাস্টার করা হয়েছে।

দিলীপ খানিক সময় চুপ করে থেকে বললো, আমার কেউ বন্ধু হয় না কেন বল তো?

কেন! আমিই তো তোর বন্ধু দিলীপ। ছাই কথা শুনবি না। মাথা গরম করবি। বাইরে ঠিক এই সময় কালানো বাতাসে বৃষ্টির গুড়ো। সরস্বতী পুজোর মাইক

আমার সমধর্ম কেন বন্ধু পাই নি জানি।

কেন? আমার বন্ধুত্ব পাসনি তুই?

দিলীপ কি বিড়বিড় করলো। তারপর বললো, চল।

চললি? সেই কিম্ভূত গাড়িতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

দিলীপ বললো, হুঁ।

বাইরে রাস্তায় নেমে দিলীপের মনে পড়লো, অনাথ চক্কোত্তির আত্মীয়স্বজন আমায় দেখলে ক্ষেপে উঠতে পারে? অনাথদা যখন চড় মারছিলো আগে—সোয়াইন বলছিলো—সে সময়টা যদি ওরা দেখতে পেতো—তাহলেও কি এখন আমায় দেখে ক্ষেপে উঠতে পারতো। ঋষি আমায় লম্বা ঘুম দিয়ে শান্ত হতে বলছে। আমি তো কোন পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসিনি। অহলে?

জিনের ট্রাউজারের ওপর কালো টুইড। বুকের ওপরের দিককার দুটো বোতাম খোলা। মাথার চুলগুলো বৃষ্টিতে, বাতাসে ন্যাতানো আর উসকোখুসকো। স্টিয়ারিংয়ে ডান হাতখানা রেখে দিলীপ তার মাথার চুল ঠিক করতে যাচ্ছিলো বাঁ হাতের আঙুল চালিয়ে। আঙুল থামিয়ে কালু ঘোষকে বললো, কোথায় যাওয়া যায় বল তো?

বাড়ি চলো। এই বেয়াড়া ওয়েদারে কোথায় যাবে? তাছাড়া তোমার ফ্যামিলি আছে। তাদের সঙ্গেও তো সময় দিতে হয়। নাতিটি দিব্যি স্টিয়ারিংয়ের পাশে বসে থাকে। তাকে নিয়ে বেরোলে পারো।

বেবোই তো। ও বেটা তোমার আমার মত এ গাড়িটাকেই ভালোবাসে। চলো একটু ঘুরে আসি।

চলো। তোমার অফিসে কী হয়েছে?

কিচ্ছু না।

একদম যে যাচ্ছো না অফিসে—চাকরি থাকবে?

এমনিও থাকবে না। ওপরওয়ালাদের চড় মারলে চাকরি থাকে!

তাও মেরেছো। ছিঃ।

উপায় ছিলো না কালুদা।

রায়ে কাটাও। বায়ে কাটাও। ফুটপাথে চাকা তুলে দিচ্ছিলো। এমন কি হয়েছিলো দিলীপ?

হয়ে গেল! লোকটা যে কি ভালো ছিলো—দশ বছর আগেও—তা তুমি ভাবতে পারবে না। কী সুন্দর।

এখন?

ঠিক উল্টো।

ইউ এস আই এসের কাছাকাছি এসে জ্যাম। সুরেন বাড়ুজ্যে রোডে একটা বড় বাড়ির গলিপথটা ফাঁকা দেখে দিলীপ সেখানে গাড়িটাকে রাখলো। মাটিতে নেমে বললে, জ্যাম খুলতে দেরি আছে। একটু সিগারেট নিয়ে আসি—গাড়িটা দেখো কালুদা—

সিগারেট ধরিয়ে ফেরার পথে দিলীপের চোখ ইউ এস আই এসের শো উইন্ডোতে আটকে গেল। বিরাট ফটো ডিসপ্লে। আগেকার একখানা ফোর্ড টি দৌড়চ্ছে। তার পাশে এক ঘোড়সওয়ারও ঘোড়া ছোটাচ্ছে। কোন মার্কিন খামারবাড়ির আগেকার ছবি। কাঠের ফেনসিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে একদল আমেরিকান চাষী—তাদের বউ ছেলে-মেয়েরা ঘোড়াটাকে জিতবার জন্যে চিয়ার-আপ করে যাচ্ছে—হাত পা তুলে।

দেখতে দেখতে দিলীপের মনে হোল, টি ফোর্ড গাড়িটার চাকা চারটে খুলে গিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার চারখানা পায়ের জায়গায় ফিট হয়ে গেল।

আশপাশে রাস্তার লোকজন হঠাৎ দেখলো—ইউ এস আই এসের শো উইন্ডোর সামনে একটা লোক ধপাস করে পড়ে গেল। গায়ে কোট-প্যান্ট। দিলীপকে যখন রাস্তার লোক তুলে ধরলো—তখন দিলীপ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কী লজ্জার কথা! চেনাশুনো কেউ দেখতে পায়নি তো। একজন লোক বললো, কোথায় যাবেন?

কোথাও না।

যেতে পারবেন—

ট্যাক্সি তুলে দেবো।

না। না। ধন্যবাদ। বলে বেঁকে পা এগিয়ে দিলীপ দেখলো—সে একা। ভিড়ের ভেতর একদম একা। ঠিক তখনই তার মুখ

দিয়ে অচমকা বেরিয়ে এলো—বিড়বিড় করে—চড়টা মারা উচিত ছিলো সাধন গুপ্তর গালে। ভুল জায়গায়—। ভুল জায়গায়—একদম ভুল জায়গায়—

দিলীপ গাড়ি পেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখে কালু ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলো। এইযে দিলীপ। এখানে। সিগারেট কিনতে এত সময় লাগে?

ভিড় ছিলো দোকানে—

দিলীপ ফাঁকা রাস্তায় চালাতে গিয়ে বেল ভিউ নার্সিংহোমের কাছাকাছি নির্জন রাস্তাগুলো পরেপর পেয়ে যাচ্ছিল। আরে। এখানেই তো গোপালকে গান শেখাতে এনেছিলাম। একটু গান শুনবে কালুদা? আমার বন্ধুর গান। ভালো গায়।

গান-ফান আমার ভালো লাগে না।

চলো না কালুদা—

না। তুমি যাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে—

কেন? একা থাকতে ভয় করে।

আজকাল আমার আর একা ভালো লাগে না।

বলো ভয় লাগে। তা তোমাদের তো ভয় পাওয়ার কথা নয়—

যাও! দেখে এসো। বন্ধু আছে কিনা সন্দেহে—বলে কালু ঘোষ মতিলাল নেহরু রোডের সবকটা বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে একটা পাক খেয়ে এসে অস্টিন টুয়ারের পেছনের সিটে বসলো।

দোতলায় উঠে দেখলো, সেই গান শেখানোর বন্ধুটি বাড়ি নেই। ফিরেই আসছিলো। পাশের ফ্ল্যাট থেকে স্বাতী বেরিয়ে এলো। কত দিন খোঁজ করছি তোমার। অফিস বলে বাড়িতে। বাড়ি বলে অফিসে। ডায়াল করে করে আঙুল ব্যথা হয়ে গেছে।

দিলীপ এতদিন পরে স্বাতীকে দেখে অবাক হয়ে তাকালো একি ড্রেস। লাল-পেড়ে গরদ। কপালে সিন্দুর?

হ্যাঁ। পরেছি। ভেতরে এসো।

দিলীপ ভেতরে বসতেই স্বাতী বললো, আমি যার সঙ্গে ছিলাম—তিনি ফ্ল্যাটটা আমায় দিয়ে পাটনায় চলে গেলেন।

তাই বুঝি।

তোমার পায়ের নীচে কার্পেট দেখেছো?

হ্যাঁ। তাইতো! কি ব্যাপার স্বাতী? আমি বিয়ে করেছি।

কোথায়? কবে? একবারও আমি বাদ পড়লাম। সুধীরের সঙ্গে সেপারেশন?

দাঁড়াও। একসঙ্গে অত কথা বলতে পারবো না। তুমি কিছু খাবে?

না। শুধু কফি চলতে পারে। দু' কাপ নাও—

আমি এখন খাবো না। সন্ধ্যে করা হয়নি—

সন্ধ্যে?

হ্যাঁ। ও আর আমি পুজো করি। ওই তো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

দিলীপ চমকে সামনে তাকালো। বিরাট ছবিতে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। হাসিমুখে তাকিয়ে।

এখন জ্যোতির্ময় অফিসে। আমাদের বিয়ে হয়েছে তা প্রায় ছ' মাস হয়ে গেল। সুধীরের সঙ্গে ডিভোর্স কমপ্লিট।

তোমার ছেলে নন্দন যাব। ডাকছে জ্যোতির্ময়কে?

না। তবে আর কিছুদিন পরে হয়তো ডাকবে। নন্দনকে ভীষণ ভালোবাসে জ্যোতির্ময়। খুব ডিগনিফায়েড মানুষ।

সেটা কি জিনিস স্বাতী?

হায়দ্রাবাদ স্টাফ কলেজে টেক্সনিয়ে ছিলো। খুব সিমপ্যাথেটিক মানুষ। তা বয়স এই পঞ্চাশ।

বিয়ে ছিলো?

না। আমার মত নয় দিলীপদা। ওর বিয়ে করাই হয়নি এতদিন। খুব মাতৃভক্ত ছেলে।

মাকে বউ দেখাবে বলে তোমায় বিয়ে করলেন?

না। তা কেন? আমার শাশুড়ি মারা গেছেন বছর দুই। আমি ফিরে বাড়ি সাজিয়েছি। জ্যোতির পছন্দ মত। চলো। তোমায় ঘুরে দেখাই।

বাড়িটা একদম পাল্টে গেছে। বেড-রুমে জোড়া খাট। ঘরের কোণে ঠাকুরের জন্যে সাজানো জায়গা, একটা কুকুর—লোমে ঢাকা—বিছানায় শুয়ে ছিলো। তাকে দেখে স্বাতী ডাকলো, এই নবাব। বিছানায় শুয়েছো কেন? এ্যাঁ? নাবো বলছি। এখুনি দুষ্টু করে দেবে।—এসব বলে দিলীপের দিকে তাকিয়ে বললো, ও আমার বডিগার্ড। দ্যাখো তো—কেমন স্কিন রেখেছি—

দিলীপ তাকিয়ে দেখলো। ঘিয়ে আভার সেন চামড়া। বসন্ত এসে ঢুকতে এখনো অনেক দেরি। মাথার কালো চুল।

এ বারান্দায় এসো। এখানে না এলে তোমার কিছুই দেখা হবে না।

দিলীপকে বারান্দায় নিয়ে এলো স্বাতী। সেখানে পার্টিশন দিয়ে সুন্দর চেম্বার। একখানা গদিমোড়া চৌকি। একটি টেবিল চেয়ার। তার উল্টোদিকে বসবার জন্যে কয়েক খানা চেয়ার। দেয়ালে বিরাট আয়নার সামনে গাদাখানেক লোশন আর গুচ্ছের ক্রিম।

কেমন হয়েছে?

চমৎকার! জ্যোতির্ময়বাবু তোমাকে সত্যিই ভালোবাসেন।

কেন! তোমার কষ্ট হচ্ছে?

তা কেন? একথা বলে দিলীপের মনে হোল—আমার সত্যিই তো কষ্ট হচ্ছে। আমি কি সব দিকেই শুধু হেরে যাচ্ছি।

এটা আমার চেম্বার। এখানে অনেকে এসে সিটিং নেয়।

হোসপাইপ নিচ্ছে লোকে?

অনেক বাড়ির মেয়েরাই আসে।

সেই পঁয়ত্রিশ টাকাই রেট?

না। এখন চল্লিশ করেছি। রাউন্ড ফিগার একদম। বৌদিকে একদিন নিয়ে এসো। ফ্রি করে দেব।

তোমার তো পরিশ্রম আছে।

তা আছে। ঘণ্টাদেড়েক খাটতে হয়।

বড় চাকরি করেন তোমার স্বামী। এখন আর এত খাটছো কেন?

বাঃ! এটা আমার একটা স্বাধীন ব্যবসা। ছাড়বো কেন?

তোমার তো আর দরকার নেই স্বাতী।

জ্যোতি বলেছে—বসে থাকবে কেন শুধু শুধু। এই ঘরটা আমার ডিসিপ্লিনের স্কুল। এখানে আমি এটিকেট শেখাই।

কি রকম! ধরো কোন মেয়ের চা-বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে বিয়ে হবে। কিংবা পাত্র বিয়ে করেই বিলেতে তার কাজের জায়গায় চলে যাবে। তখন পাত্রীকে আমি হাঁটা, চলা, ওঠাবসা, দু-চারটে রান্না, বাসিকর্ম, বুমারের ইউজ, পোশাকের স্টাইল—সবই শিখিয়ে দেব।

মন খারাপ হলে কি করবে স্বাতী?

মন খারাপ?

ধ্যো বাড়ির জন্যে মন খারাপ হলো তার। তখন সে কী রকম রিঅ্যাকশন করবে?

এভাবে ভাবিনি কখনো দিলীপদা। মানুষ তো—অবশ্য বুঝে ব্যবস্থা নেবে। এসব জিনিস শেখানোর অপেক্ষা রাখে না কেউ।

ধরো কোন জিনিস দেখে খুব আনন্দ হোল। আনন্দ প্রকাশ করবে কি ভাবে?

কেন? আমরা তো শেখাই। তখন কী ভাবে হাসতে হবে—টুথপেস্ট প্রকাশের সময় কতটা চেপে দিলে ওঠা ঠিক হবে—তাও ধামরা থার্ড লেসনেই বলে দিই। মোট চোদ্দটা লেসনের কমপ্লিট কোর্স।

দিলীপ আচমকাই ঝুলে দাঁড়ালো।

ওভাবে তাকাচ্ছো কেন? কী হয়েছে তোমার দিলীপদা?

কিছুই হয়নি।

না। কিছু হয়েছে। তোমার মাথাটা অমন উসকো খুসকো কেন?

দিলীপ দু হাতে শক্ত করে স্বাতীর

পুস্তক পর্ষদের বই

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান

কালিদাস রায় ৬·০০

এযাবৎ অনালোচিত দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা-গানের একটি চমকপ্রদ মূল্যায়ণ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

৬এ, কাঁজী নজরুল ইসলাম সরণি

কলিকাতা - ৭০০ ০১৩

দুই কাঁধ ধরলো। তোমার বডিগার্ড তোমায় এখন বাঁচাতে পারবে ?

চমকে গিয়ে ঝাঁকুনির মাথায় স্বাতী বললো, বডিগার্ড ?

কেন ? তোমার ওই কুকুরটা। নবাব ! এইতো আমি তোমায় জড়িয়ে ধরলাম। বাঁচাক তো।

ছাড়ো। ছাড়ো বলছি। আমি এখন বিবাহিতা।

আগেও তো বিবাহিতা ছিলে। তখনো তো তোমায় আমি চুমু খেয়েছি। তুমিও খেয়েছো।

ছাড়ো। জ্যোতি আমায় ভীষণ বিশ্বাস করে। ছাড়ো। আঃ ! লাগছে দিলীপদা।

আমি খারাপ। আমি আরও খারাপ হবো।

দিলীপকে এগিয়ে আসতে দেখে স্বাতী মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে নিলো। কি হয়েছে তোমার বলতো ?

দিলীপ ধপাস করে স্বাতীর টেনেআনা চেয়ারটায় বসে পড়লো। বসে এমন করেই হাঁপাতে লাগলো—যে জন্যে স্বাতী নিজে থেকেই পাশের ঘরে গিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে এলো। খাও।

দিলীপ খানিকটা খেতে না খেতে হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটা পড়ে ভেঙ্গে গেল।

কিচ্ছু হয়নি। আমি ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছি।

ভাঙ্গা কাচ সরানো হলে দিলীপ আস্তে আস্তে বললো, এই নিয়ে দুবার—

কি দিলীপদা ?

এবারও তুমি ফসকে গেলে।

তা কি করবো। তুমি বিবাহিত। বউদি মানুষটা খুব ভালো।

এরপর যদি আবার তোমায় একা দেখি—মোড় বাঁধোনি—আমি কিন্তু তখন তোমায় জোর করে বিয়ে করবো।

বেশ তো। কোরো। সেবারে আমি কোন আপত্তি করবো না। বলে স্বাতী এগিয়ে গিয়ে একটা টুল নিয়ে এলো। তারপর দিলীপের জোড়া পা দু-হাতে জড়িয়ে প্রায় বুকের কাছে তুলে আলগোছে টুলের ওপর রাখলো। পা ছড়িয়ে আরাম করে বোসো। কি হয়েছে তোমার ? এমন তো কোন দিন দেখিনি তোমায়।

কিচ্ছু হয়নি।

কিন্তু একটা হয়েছে দিলীপদা। জানি। তুমি কিছুতেই বলবে না।

কিছু বলার নেই আমার।

জ্যোতিকে তোমার কথা বলেছি। থাকলে খুব গল্প করা যেতো।

তাহলে আরেক দিন আসবো স্বাতী।

স্বাতী দরজা অব্দি এলো। বাইরে শীতের বিকেলে পার্কের মাথায় একটা একখানা মেঘ। এরকম ল্যান্ডস্কেপে মেঘখানার ঢুকে পড়ার কথা নয়। রাস্তায় নেমে দিলীপ বুঝলো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বড় হয়ে গেছে।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই পেছন থেকে শুনলো, দাঁড়াও। দাঁড়াও দিলীপ।

কি ব্যাপার ? কোথায় ছিলে ?

বৃষ্টি দেখে গাড়ি বারান্দার নিচে গিয়ে বসে ছিলাম।

দেশপ্রিয় পার্কের পাশ দিয়ে মোড় ঘোরার সময় দিলীপ বললো, তোমার গায়ে আবার জল লাগে নাকি !

আমার বুঝি শীত গ্রীষ্ম—ঠাণ্ডা গরম নেই ?

দিলীপ কোন কথা বললো না। অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিলো।

অত জোরে চালাচ্ছো কেন ? তারপর ব্রেক কষলে ব্রেক-স্যুগুলো ফেল করবে—

দিলীপ সাদার্ন অ্যাভিনুতে পড়ে স্পীড কমিয়ে আনলো। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না কালুদা।

কি হোল তোমার ? চলো না বাড়ি ফিরে যাই। বউ রয়েছে ঘরে। নাতি—

দিলীপ আবার স্পীড তুললো। আশে পাশে ইদানীংকার গাড়ি। তারা পিছিয়ে পড়তে পড়তে এই বুড়ো খোকার টলোমলো দৌড় দেখে আরও আস্তে চালাতে লাগলো। শোকন অ্যাকসিডেণ্ট করলো বলে—এমন একটা আশঙ্কায় বেশির ভাগ গাড়ি পিছিয়ে পড়লো।

গড়িয়ার ব্রিজ পেরোতে অস্টিন ট্যুরার বেশি সময় নিলো না। দেখতে দেখতে ফাঁকা মাঠ, ইটখোলা, সামান্য বসতি, বাগানবাড়ি—এসব দু-পাশ থেকে সরে যেতে লাগলো।

কালু ঘোষ পেছন থেকে আস্তে বললো, কোথায় যাবে দিলীপ ?

জানি না। চালিয়ে তো যাই। তেল আছে ?

ট্যাঙ্ক ফুল।

তাহলে আর চিন্তা কিসের ? বলতে না বলতে মাঝ রাস্তায় একটা লাল আলো দেখে দিলীপ অনেক আগেই স্পীড কমিয়ে দিলো।

রাস্তা খুঁড়ে ফেলেছে। এবার গাড়ি ঘোরাও দিলীপ।

খোঁড়া রাস্তার মুখে মাটির উঁচু ঢিবি। সেই অব্দি গাড়ি নিয়ে গিয়ে ব্রেক কষেই নেমে পড়লো দিলীপ। প্রায় সন্ধ্যে রাস্তার বাঁয়ে কড়াইয়ের চাষ। লতানো চারার মাথায় কড়াইভর্তি ডালি—শীতে, শিশিরে—নিজের ওজনে নুয়ে পড়েছে। দিলীপ দিব্যি তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোতে লাগলো।

পিচ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কালু ঘোষ চেঁচাচ্ছিলো। থামো দিলীপ। কী হচ্ছে। এসব পাগলামো কেন ?

দিলীপ আর এগোতে পারলো না। তেওড়ে কলাইয়ের লতায় হোক—আর বাবলা কাঁটার শুকনো ডালেই হোক—পা জড়িয়ে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে। সন্ধ্যে রাতের বৃষ্টি মাখানো—শিশির মাখানো ভিজে মাটির টানা ঠাণ্ডা দিলীপের কোট, শার্ট ফুঁড়ে বুকে ঢুকে যাচ্ছিলো। চোখে কড়াই চারার লতার রোঁয়া। কপালে ভিজে মাটি। ডান হাতখানা শুকনো বাবলা কাঁটার ডালে। অন্ধকার বলে হাতের কেটে যাওয়া জায়গার রক্ত দেখা গেল না।

দিলীপ। ও দিলীপ।

কোন সাড়া না পেয়ে কালু ঘোষ এবার ঝুঁকে পড়লো একদম। সে কোনদিন দিলীপকে ছুঁয়ে দেখেনি। দিলীপের পিঠে আলগোছে হাত রাখলো কালু। উঠে পড়ো দিলীপ। বুকে ঠাণ্ডা বসে যাবে। নির্ঘাৎ নিমোনিয়া হবে। ওঠো। কী কষ্ট তোমার দিলীপ।

দিলীপ এই প্রথম পিঠে এক রকমের ভীষণ ঠাণ্ডা পেল। সে ঠাণ্ডা একদম হাড় ছুঁয়ে যায়। বলতে গেল, হাত সরাও কালুদা।

মুখে ভিজে মাটির গুঁড়ো দলা ঢুকে যাওয়ায় কোন কথাই সরলো না। আরেকবার চেষ্টা করলো দিলীপ। কোঁচো তোলা মাটি সর্বত্র। লতানো আর গোলা, তার খানিকটা এবারও তার দাঁতে, মাড়িতে—নিচের ঠোঁটে মাখামাখি হয়ে গেল। তার ভেতরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, আঃ। হাতখানা সরাও না কালুদা। কী ভীষণ ঠাণ্ডা—

কালু ঘোষ তার কিছুই বুঝলো না। সে একা একাই বলে ফেললো, এখন কি করা—

অন্ধকার মাঠ। তার ভেতরে দূরে গোলপাতায় ছাওয়া মাটির ঘর। কাছাকাছি পাখি তাড়ানোর পেটাই টিনের দড়ি ধরে টানাটানি করলো কালু ঘোষ। আর অমনি টিনটা বেজে উঠলো।

একটু বাদেই লণ্ঠন হাতে দুই জোয়ান এসে হাজির। এ কি রে বাবা ! আস্ত একটা ভদ্দরলোক যে—

অন্যজন বললো, বাগানবাড়ি ফেরতা বাবু। একদম বেহুঁস। ওইতো গাড়ি দাঁড়ানো।

কালু ঘোষ দেখলো, দুজনে মিলে কিসের সলাপরামর্শ করছে।

ওদের ভেতর ঢ্যাঙাজন বললো, এখানে মরে পড়ে থাকলে তো হ্যাংগামা। পুলিশ ঝামেলা।

বেঁটেজন বললো, তাহলে গাড়িতে তুলে দি চ।

তাই করলো দুজনে। দিলীপ স্টিয়ারিংয়ের সামনে মাটি মাখা ভিজে শরীরে শুয়ে। পা বেরিয়ে পড়েছিলো। হাতও একখানা গাড়ির বাইরে বেকায়দায় ঝুলে।

ঢ্যাঙাজন পা দুটো ভাজ করে গাড়িতেই ভরে দিলো। বেঁটেজন বেকায়দায় ঝুলে-পড়া হাতখানা আরও বেকায়দায় স্টিয়ারিংয়ে রেখে দিলো। নিশ্চয় ব্যথা লাগলো দিলীপের। কালু ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলো। করো কি ? লাগলো যে—

কালু ঘোষের কথা ওদের কানে গেল

না। যেমন তাড়াহুড়োয় দিলীপকে চ্যাংদোলা করে এনে গাড়িতে ফেলেছিলো—সেই তাড়াহুড়োতেই দুজনে গোলপাতার ঘরখানায় ফিরে গেল। আবার সেই অন্ধকার। এটা কি কোন বাতিল বাইপাস? অন্য কোন গাড়ি তো এ-পথে এলো না আর। কোন লোকজনও আসে না। না একখানা গরুর গাড়ি। কি ফেরে পড়লাম রে বাবা!

কলু ঘোষ অনেকদিন পরে স্টিয়ারিং ধরলো। গাড়ি ব্যাক করে মুখ ঘোরালো। সবটা পেট্রল পুড়ছে না। তাই ইঞ্জিন খানিকটা ব্যাক ফায়ার দিচ্ছিলো। দুটো হাইড্রলিক—দুটো মেকানিকাল ব্রেক। ফার্স্ট গিয়ারে দিলো। কতকালের চেনা গাড়ি।

গাড়িয়ার কাছাকাছি ফিরে আসতেই দিলীপ জেগে গেল। ভালোই চালাচ্ছো—

উঠে বসে স্টিয়ারিংটা ধরো। নইলে মুশকিল। এবার তো কলকাতা এসে গেল।

দিলীপ উঠে বসলো।

কি হয়েছিলো?

কিচ্ছু না। ডান হাতটা বড্ড ব্যথা করছে।

দেখে চালাও দিলীপ—

পরদিন অফিস যাওয়ার আগে ভালো করে দাড়ি কামালো দিলীপ। চান করে বেরোলে রাণী বললো, কোথায় কোথায় ঘোরো বল তো? গায়ে কাদা। কোটে কাদা। ওই কিম্ভূত গাড়িটা ছাড়বে কবে?

কেন। বেশ তো চলছে। তেল খায় কম। চলে জলের মত। পৃথিবীর ওপর দিব্যি ঘুরেফেরে বেড়ায়—

যত্তো বাজে কথা। তোমার অ্যামবাসাডরটি তো নষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

কেন? চালিয়ে দেখেছো নাকি?

আমি চালাবো কেন? গাড়ি পড়ে থাকলেই তো নষ্ট হয়। নাও একটু সেন্ট লাগাও গায়ে। খোকা তোমার সঙ্গে যাবে বলে টেবিলে বসে আছে।

টেবিলে বসতে পারে!

দিব্যি পাবে। খাইয়ে দিতে হবে। আচ্ছা রবির কোন খোঁজ জানো? কোথাও শোনো কিছু?

নাঃ!

একবার নিজের ছেলেটাকেও দেখতে আসে না। পুলিশে গুলি করে মেরে ফেলেনি তো।

ফেললে ফেলেছে—

ওমা। কিভাবে কথা বলছো।

মেরে ফেললে তো আর কিছু করার নেই। ওরাও তো অনেক পুলিশ মেরেছে—

দিলীপের খাওয়ার সময়টুকু প্রায় দু বছরের খোকাটি টেবিল আলো করে রাখলো। অফিস যাবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিলীপকে পেছন থেকে রাণীর ভীষণ ভালো লাগলো। অনেক দিন পরে একদম অফিসবাবুদের মত সময়মত অফিসে যাচ্ছে দিলীপ। তাই আজ আর ফ্ল্যাটের লাস্ট রিমাইন্ডার নোটিশ দিলীপকে সে দেখালো না। থাকগে। দেখলে মন খারাপ হবে। একেই তো অনাথদাকে চড় মেরে বসে আছে। কাজটা কিন্তু ভালো করেনি। কিছুতেই না। কিছুতেই না। রাণীর বুকটা অনেকদিন পরে থরথর করে কেঁপে উঠলো।

সময়মত অফিসে যাওয়ায় অনেকে দিলীপের দিকে তাকিয়ে থাকলো। গতকাল সরস্বতী পুজোর ছুটি ছিলো। আজ ফার্স্ট আওয়ারে অফিসের ক্লাইমেট যেন অঞ্জলী দেওয়ার ভোবেলো।

টেবিলে বসতে না বসতেই এসট্যাবলিশমেন্টের বেয়ারা এসে একখানা খামে-আটা চিঠি দিলো।

সই করে নিতে হোল চিঠিখানা। দিলীপ যখন চিঠি খুলছে—তখন সবাই তার দিকে তাকিয়ে।

যা আশা করেছিলো তাই। ইংরিজিতে লেখা। টাইপ করা লাইনগুলোর ভেতর একটা শব্দই বড় করে চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সাসপেনডেড্।

দিলীপ চিঠিখানা ভাঁজ করে সেভেন্থ ফ্লোরে এম্-ডির ঘরে গেল। এম-ডি তাকে দেখে ভ্রু কুঁচকে তাকালো। দিলীপের শরীরের ভেতর দিয়ে শীতের দুপুরে গরম হাওয়া পাস করছিলো। চোখের ফুটো, নাকের ফুটো, কথা বলার সময় মুখের ভেতরে নিচের পাটির মাড়ি—সবই একটা শো শো গরম হলকা বাতাসে আপনা-আপনি সেক দিচ্ছিলো। তার মনে হলো—এরই নাম বোধহয়—তীব্র অপমান—ডিপ হিউমিলিয়েশন।

কি চাই?

এই চিঠিখানা দেখুন।

আমারই সই করা। না পড়ে সই করেছে কেন? আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতর জবাব চাওয়া হয়েছে।

এ চিঠিখানা ফেরৎ নিন আপনারা। তাহলে সব মিটে যাবে—

সে আমরা বুঝবো। অফিসে ডিসিপ্লিন বলে তো একটা জিনিস আছে।

সে তো বটেই। কিন্তু তাহলে অনাথ চক্রবর্তিকে এরকম চিঠি দিয়েছেন?

সেটা অফিস বুঝবে। আর তিনি তো এখন নার্সিং হোমে।

একা আমিই চিঠি পাবো?

সিচুয়েশন তো তাই।

চিঠিখানা ফেরৎ নিলে সব মিটে যেত। অনাথবাবুর কাছে পার্সোনালি রিগ্রেট জানাতে আমার কোন লজ্জা নেই। তিনিই আমাকে এখানে এনেছেন। পরশু আমি সই করিনি। এর ভেতর কোন ইণ্ডিয়া নাক না গলালেই সব মিটে যায়—

আমরা তো ওই চিঠিতে সবই আপনাকে জানিয়েছি।

চিঠি আপনি ফেরৎ না নিলে আমাকে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

করবেন। বলে এম-ডি সামান্য হাসলেন। কয়লার এই কর্মকাণ্ডে এই মানুষটি একদম আনকোরা। অনাথ চক্রবর্তি, সাধন গুপ্তর সেই কোল কোম্পানীর আমলের খাটাখাটনির ভিত্তের ওপর আজকের এই

ত্রিবৃত্ত প্রকাশনের বই

হরিশ্চন্দ্র পাল সংকলিত

গোসাণী মঙ্গল মঙ্গলকাব্য

উত্তরবাংলার পল্লীগীতি বিষয়ক দু'খানি গ্রন্থ প্রকাশের পর উত্তরবাংলার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের ব্রতে এটি লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ। ভূমিকায় মূল্যবান আলোচনা করেছেন, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী। [৭-০০]

সমীর চট্টোপাধ্যায়-এর

কবিতার বই

সূর্য প্রদক্ষিণে তোমার ছায়া

গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা উপাদান থেকে বিভিন্ন প্রতীক সংগ্রহ করে কবিতার যে পংক্তি তৈরী হয়েছে—তা কবিতার জগতে বিরল। এই গ্রন্থে তরুণ কবি শব্দ চয়ন ও চিত্রকল্প ব্যবহারে বৃহৎ ক্ষেত্র রচনায় নতুন উদ্যোগী [৪-০০]

রণজিৎ দেব-এর

লোক-সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থ

উত্তর বঙ্গের চিঠি

উত্তরবাংলার লোকসংগীত, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, মন্দির, মন্ত্র, মেলা, শিল্প, উপজাতি, ভাষা ও রাজবংশাবলীর বিস্তৃত তথ্যে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। [১০-০০]

ত্রিবৃত্ত প্রকাশন : ৩, ত্রিবৃত্ত সরণি, কুচবিহার-৭৩৬১০১

কোল ইণ্ডিয়ার শেভড় নেমেছে। নতুন লেজিশলেশনের দৌলতে আনকোরা এই মানুষটি এখন এম-ডি।

দিলীপ বেরিয়ে এলো। আর অনেক-দিন পরে সে সময়মত অফিসে এসেছিলো। দাড়ি কামিয়ে। চান করে। অফিসের পোশাকে। অফিসে অনেকদিন পরে। নিজের টেবিলে অনেকদিন পরে গিয়ে বসলো। টেলিফোন, চেনা ফাইল-ট্রে, ওয়েস্টপেপার বাসকেট, প্লাসটপ। এই ফ্লোরটা তার কাছে সেই প্রথম যৌবন থেকে একেবারে বাবানসী। এখানেই সারা দিনের অনেকখানি জুড়ে কাজ, আড্ডা, হাসিঠাট্টা, তর্কাতর্কি, টেলিফোন—কত কি।

দিলীপ মন দিয়ে চিঠির জবাব লিখতে বসলো। সে বলতে চাইলো, আমি যে গোলাগালি খেলাম—আমি যে আগে কটি চড় খেলাম—সেসব কিছু নয়? আর এক চড়ে পড়ে যেতেই টাইপ করা চিঠি দিয়ে সাসপেণ্ড। বাঃ!

কে একজন পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর বিড়বিড় করে বললো, এভাবে জবাব দিতে নেই মিস্টার বসু।

তবে?

বাড়ি গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করুন। তারপর সন্ধ্যেবেলা ভালো উকিলকে বলে চিঠি ড্রাফট্ করান। এসব ডিসিপ্লিন কেয়ারলেসলি বেশি কথা লিখতে নেই।

দিলীপ যা লিখেছিলো ছিঁড়ে ফেললো।

কাল থেকে আপনি আর এ-অফিসে ঢুকতে পারবেন না।

কেন?

সাসপেনসনের তাই নিয়ম। যা-কিছু চিঠি-চাপাটি ডাকে পাঠাবেন। নয়তো কাউকে দিয়ে রসিদ করে পাঠাবেন।

দিলীপ মুখ তুলে তাকালো। এই লোকটির সঙ্গে তার আগে কোনদিন মন দিয়ে কথা বলা হয়নি অফিসে। অথচ আজ নিজে থেকেই ভদ্রলোক কত সিমপ্যাথি নিয়ে কথা বলছেন। আমি তাহলে এতদিন কাদের সঙ্গে মিশতাম।

দিলীপ চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঋষির টেবিলে গেল। আমি সাসপেণ্ড হয়েছি।

তাই নাকি? সাসপেণ্ড করলো?

চিঠিখানা দেখালো দিলীপ। হাতে নিয়ে পড়ে চিঠিখানা ফেরৎ দিল ঋষি। কি করবি এখন?

জানি না। কোনো দিন তো হইনি আগে। তবে দরকার হলে কোর্টে যাবো।

অনাথদা তোর কথা খুব বলছিলো। নার্সিং হোমে।

দিলীপ চুপ করে থাকলো।

ঋষি বললো, তোকে খুব ভালো বাসে—

তোকেও—

আমি বলি কি—মিটিয়ে নে—

এই চিঠিখানা না দিলেই মিটে যেতো।

ওটা তো অফিসের নিয়ম।

অফিস কি রক্তমাংস? অফিস তো তোকে আমাকে নিয়েই।

দিলীপ আবার নিজের টেবিলে ফিরে এলো। তারপর স্বাতীর নতুন জীবনে নতুন আমদানী টেলিফোনটার নম্বর মন থেকে খুঁজে পেয়েই ডায়াল করলো, জ্যোতি ফেরেনি এখনো অফিস থেকে?

কে? দিলীপদা? নম্বর পেলে কোত্থেকে?

তোমার ঘরে বসে থাকতে থাকতে নম্বরটা চোখে লেগে গিয়েছিল।

মুখস্তও রাখতে পারো বাবা! আর খানিক বাদেই ফিরবে জ্যোতি। কেন? তুমি আসবে? তাহলে আমরা বেরোবো না আজ।

না না। আজ যেতে পারবো না। ভীষণ কাজের চাপ আজ অফিসে।

তাহলে কাল এসো।

কাল টুরে বেরিয়ে যাচ্ছি। কলকাতার বাইরে—

কবে ফিরছো দিলীপদা?

লম্বা টুর। ঠিক নেই কবে ফিরি। জ্যোতি ফিরলে আজ একটা কথা বলবে তাকে। বলবে—দিলীপ বসু বলেছে—আমার স্বামী শুধু তুমি নও। তুমি আর একজন। সে হোল দিলীপ।

বেশ তো! বলবো'খন। শুনে খুব খুশী হবে জ্যোতি। ও তোমার কথা সব শুনেছে।

বোলো কিন্তু।

নিশ্চয়ই।

দিলীপ লাইনটা আচমকা কেটে দিয়েই বুঝলো, সে একদম অকারণে এই ফোনটা করেছিলো। রিসিভার তুলে যেমন বলা উচিত শুধু তেমন বলে যাচ্ছিলো। এই বলাবলির সঙ্গে তার আসলে এখন কোন যোগ নেই। থাকার কথাও নয়। এমন সময়ে কেউ প্রেমালাপ করে না। খেজুরে আলাপও করে না।

জানলার বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের ভেতর অকালে বৃষ্টি। ফোঁটাগুলোর সঙ্গে সন্ধ্যের মুখে মুখে খানিক খানিক অন্ধকার গুলে গিয়ে মিশে যাচ্ছিলো। দিলীপ অনেক দিন পরে গুডবয়টি হয়ে তব নিজের টেবিলে চুপচাপ বসে থাকলো। মাথা না তুলেই সে বুঝতে পারছিলো—অফিস আওয়ার্স পার হয়ে যাচ্ছে। আশপাশের টেবিলগুলো একে একে খালি। রেলইয়ার্ড থেকে ওয়াগন মুভমেণ্টের যেসব ফোন আসছিলো—সে-গুলো সে থার্ড ফ্লোরে ইয়ার্ড অ্যাকাউণ্টসে ট্রান্সফার করে দিচ্ছিলো।

সারা ফ্লোরটা যখন ফাঁকা—দিলীপ তখন উঠলো। ঋষিদের দিককার কিউবিকল্-গুলো অন্ধকার। নিচে নেমে অস্টিন ট্যুরারে বসতেই কালু ঘোষ বললো, অফিসে তোমার এত কি কাজ থাকে ভাই? সবাই চলে গেল—আর তুমি বসে বসে কি করছিলে?

আমি সাসপেণ্ড হয়েছি।

কালু ঘোষ বললো, কি?

দিলীপ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো। রেড রোডে পড়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো। ভিজে বাতাসের সঙ্গে কথাগুলো কালু ঘোষ পেছনে বসে হু-হা করে বেশ লুফে নিচ্ছিলো। ডিটেলে সব শোনার পর কালু ঘোষ বললো, অফিস তো ঠিক করেছে। আমি একটা কোম্পানীর এম ডি ছিলাম। আমি হলেও তোমাকে এই চিঠিই দিতাম। কোন্‌দিকে যাচ্ছো? দিলীপ?

দিলীপ কোন কথা বললো না। বিশ মিনিটের ভেতর দিলীপরা এসে একটা বড় ভ্যানের সামনে দাঁড়ালো। ভ্যানের গায়ে বড় করে লেখা—গোকুলস্ পিওর ঘি অ্যাণ্ড বাটার।

গাড়ি থেকে নেমে দিলীপ ভ্যানের পেছন দিয়ে রাস্তা ক্রস করলো। বসবার পরে গোকুল দত্তর চেয়ার ফাঁকা। লাগোয়া খাটাল থেকে একটা বিলিতি গাই বেয়াড়া ভাবে ডেকে উঠলো।

গোকুলদা কোথায়?

এইতো ছিলেন। খানিক আগে অমৃত-বাবু, ঋষিবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

কোথায়?

হাওড়া স্টেশনে যাবেন। হরিপালের ট্রেন ধরতে হবে।

ঘরের বেয়ারার সামনেই দিলীপ প্রায় বলে ফেলেছিলো, কোথায়। হরিপাল যাও-য়ার কথা তো আমি জানি না। সে বুঝলো, এখন ওদের প্রোগ্রাম করার সময় হিসেবের ভেতরে আমি পড়ি না। এখানেও কোল ইণ্ডিয়া এসে পড়ছে।

(চলবে)

শেষ তারিখ এসে পড়ল বলে!

* আপনার ট্যাক্স রিটার্ন জমা দিতে দেরী করবেন না।

* রিটার্ন দাখিল করার আগে মনে করে স্বনির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী পদেয় কর জমা দিয়ে দিন।

দি ডিরেকটোরেট অফ ইন্সপেকশান
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স অ্যাণ্ড পাবলিকেশান)
ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট
নিউ দিল্লী-১১০০০১

ডিএভিপি ৭৮।১৪২।বেঙ্গলী।এডি ও অং ১০।৭।৭৮

প্রমোদবাবু পদমর্যাদা চান না

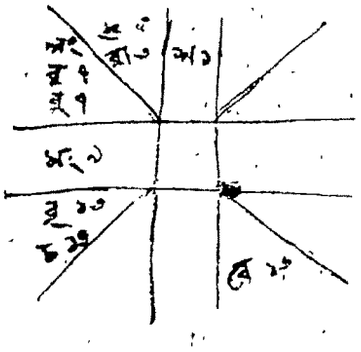

আমরা এতদিন পাঠকদের সঙ্গে শুভস্থান শুভপতি এবং তার সম্ভাব্য শুভ-ফল নিয়ে রাশিচক্রের পরিচিতি দিয়েছি। এবার আমরা দুঃস্থান অথবা দুঃস্থানপতি অথবা পাপ গ্রহ কিংবা অশুভ গ্রহ ও যে জাতককে কতটা শুভ ফল দিতে পারে তেমন একটি রাশিচক্র নিয়ে আলোচনা করব। যদিও উপরের রাশিচক্রটিতে কিছু শুভ যোগ যে নেই এমন নয়—যেমন কন্যারাশিতে চন্দ্র বৃহস্পতির অবস্থানে জীবযোগ এবং লগ্নে রবি বুধের সমন্বয়ে বুধাদিত্য যোগ। এ-যোগগুলির শুভ ফল যে জাতক লাভ করেনি এমন নয়। জীব যোগের ফলও জাতক লাভ করেছে জাতক জীব যোগের ফল স্বরূপ ভাগ্যনিয়ন্তা, কর্মে সর্বদা সজীব, সতর্ক বহু লোকের আশ্রয়দাতা। বহু লোকের এবং গভীরতের ভরা। অপরকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি। আবার বুধাদিত্য যোগে জাতক নিজের কাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সম্মানিত, প্রখ্যাত এবং বংশতিলক হয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে এবার দুঃস্থান নিয়ে।

উত্তরকলামৃতে আছে :—

দুঃস্থাশ্চৈব ভবন্ত্যেতে তদা তে নৈব বাধকাঃ
কেন্দ্র কোন স্থিতাশ্চৈব বাধকাশ্চাত্র লগ্নজাঃ।

উপরোক্ত প্রমাণের বিশদ বিবরণ দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। তাই আমরা এক কথায় উপরোক্ত শ্লোক থেকে এটুকু বুঝতে পারি যে—দুঃস্থান পতি দুঃস্থান-গত হলে শুভ ফল দাতা হয়। কেউ কেউ এটাকে বিপরীত রাজযোগ বলে থাকেন। অর্থাৎ এটাও এক ধরনের রাজ যোগ ফলদাতা। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের রাশিচক্র আমরা উপরোক্ত প্রমাণের ফলাফল পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

আলোচ্য রাশিচক্রে ষষ্ঠপতি মঙ্গল গ্রহ লগ্নের দ্বিতীয়ে নীচস্থ হয়েছেন। অষ্টম পতি শনিগ্রহ একাদশে নীচস্থ এবং দ্বাদশপতি দ্বাদশ স্থানে বাহু বৃহস্পতি। আবার ষষ্ঠস্থানে অর্থাৎ দুঃস্থানে পাপগ্রহ কেতুর অবস্থান। মোটামুটি আমরা এই কটা বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি রাশি চক্রটির

ওপর চোখ রাখি তবে দেখতে পাই জাতক যে কাজই করুক না কেন, কর্মস্থানে জাতক নিজের প্রতিভার জোরে সর্বোচ্চ সম্মানের অথবা উচ্চ ক্ষমতাশীল পদের অধিকারী। জাতকের লগ্নে রবি গ্রহ বুধের সঙ্গে সহা-বস্থান করেছে। ঐ রবি গ্রহ জাতকের তৃতীয় পতি বিধায় 'পরাক্রমেশ'—তাই জাতক যেমন তেজী, পরাক্রমশালী, ঔদ্ধত্য-শীল, গতিসম্পন্ন, তেমন বিচক্ষণ বক্তিও বটে। মিথুন লগ্নের জাতকের স্বাভাবিক ফলের বহুলাংশ আমরা জাতকের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাই। যেমন মিথুন লগ্নের জাতক সাধারণতঃ দ্রুত কাজ সারতে ভালবাসে এবং বালক সুলভ চপলতাও থাকে। এই লগ্নের জাতকের কথাবার্তায় চলাফেরায় একটা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য থাকে এবা পরের দুঃখে দুঃখী এবং সমবেদনশীল, আবার হঠাৎ রেগে যান। আবার পরক্ষণেই সংযমী। এদের বিদ্যার ব্যাপারটা অত গুরুত্ব পায় না এরা নিজ বুদ্ধি বলেই বংশতিলক, দশের এক হতে পারেন। অপরের ছড়ি ঘোরানো এদের অসহনীয় হয়। এরা দৈবে বিশ্বাসী না হয়ে পুরস্কারে বিশ্বাসী হন। জাতকের বাচন ভঙ্গিতে নীচস্থ মঙ্গল গ্রহের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। জাতকের উদাত্ত কণ্ঠের ডাকে যুবশক্তিতে যেমন হয় প্রাণ সঞ্চার, তেমন আনে সুশৃঙ্খল আনুগত্য। জাতকের রাশিচক্রে একাদশ স্থানে নীচস্থ শনি—তৃতীয় দৃষ্টির দ্বারা লগ্নকে দেখায় জাতক নিরলস কর্মী। কর্মই জাতকের মাতা-পিতা। জাতকের লগ্নের দু পাশে পাপ গ্রহ থাকাতে জাতকের কর্ম প্রথম জীবনে মাটির মানুষের সঙ্গে। সাধারণ নিপীড়িত মানুষের সঙ্গ করে জাতক তাদের দুঃখকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে কর্মজীবনে প্রথম সারিতে এসেছেন। মিথুন লগ্নের জাতকের জীবনে শুভ ফল সাধারণতঃ ৪০-৪৫ বছর পর লাভ হয়। এই রাশিচক্রে সে প্রমাণ যথেষ্ট। '৫৭ সালের বর্ধমান কনফারেন্সে জাতক ৪৭ বৎসর বয়সে পার্টির উচ্চপদ প্রাপ্ত হলেন। লক্ষ্য করার মত যে, তখন শনিগ্রহ গোচরে বৃশ্চিক রাশিতে অর্থাৎ পাপগ্রহ শনি দুঃস্থান গত ছিলেন এবং দশা ভোগেও জাতক তখন শনির মহাদশা ভোগ করছিলেন। সাধারণতঃ রাজনীতি-বিদ্দের সাফল্যের পরিণতি উচ্চ রাজ-প্রশাসনিক পদলাভ অথবা পদ মর্যাদার দ্বারা বিবেচিত হয়। কিন্তু আলোচ্য রাশিচক্রের জাতক কখনও পদমোহে অথবা ঐ জাতীয় মর্যাদার প্রত্যাশা করেন না তিনি জানেন কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্মে নিষ্ঠা থাকলে উচ্চপদকে খুঁজতে হয় না—উচ্চ পদই জাতকের পদ খুঁজে বেড়ায়। জাতকের নবাংশ চক্রে কর্মেশ মঙ্গল গ্রহ স্বাদশে 'তুঙ্গ' স্থান প্রাপ্ত হয়েছে। ঐ শনি গ্রহ ১৯৬৭ সালে গোচরে জাতকের কর্মস্থানে থেকে বৃহস্পতিকে দেখায়—জাতক তাঁর দলকে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সংগঠনিক ক্ষমতার। কিন্তু ঐ গোচর শনির মেষ রাশিতে জন্মকালীন শনির সঙ্গে মিলন শুভ ফল দেয়নি। অথচ ঐ শনি গোচরে যখন '৭৭ সালে কর্কট রাশিতে জন্মকালীন মঙ্গলের সঙ্গে মিলিত হলো জাতককে দিল এবং নিরলস কর্ম-সাধনার যোগ্য ফল। তিনি সংগঠনকে সুদৃঢ় শ্রেষ্ঠ ফল পাইয়ে দিলেন। যাই হোক, জন্মকালীন মঙ্গলের সঙ্গে কর্কট রাশিতে বৃহস্পতির আগস্ট মাসে এক বছরের জন্য মিলন জাতককে যেমন আরও ক্ষমতা, বিচক্ষণ বুদ্ধি এবং রাজনীতিতে সাফল্য দেবে তেমন বর্তমানে সিংহরাশির শনি ১৯৭৯ সালের শেষ ভাগে কন্যা রাশিতে গিয়ে বৃহস্পতির সঙ্গে আড়াই বছর সম্বন্ধ অত্যন্ত শুভ ফল দাতা হবে। কিন্তু উপরোক্ত সময়গুলির মধ্যে কোন স্বজন-গুরুজন হানি হওয়া অসম্ভব নয়।

যাক এবার সম্ভাব্য ব্যক্তিগত রাশি ফল বলছি। সপ্তাহটি ইংরাজী ৪ আগস্ট শুক্রবার থেকে আরম্ভ। এ সপ্তাহে বৃহ-স্পতি এক বছর মিথুন রাশিতে থাকার পর শনিবার সকাল ১০টার পর কর্কট রাশিতে যাবেন। ফলে কর্কট, বৃশ্চিক এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকা বিশেষ শুভ ফলের আশা করতে পারেন।

মেষ : আয় ক্ষেত্রে হঠাৎ বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে। কোন বিশেষ আস্থা-ভাজনের উপর অবিশ্বাস আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু চাকুরেদের পক্ষে বহুলাংশে

শুভ ফল দেখা যায়। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কার্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

বৃষ : আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক প্রফুল্ল থাকবে। কোন ব্যাপারে সৌভাগ্যের ইঙ্গিত পেতে পারেন। দূরে যাওয়ার আমন্ত্রণও আসতে পারে। কর্মস্থানে কারোর সাথে বিবাদ থেকে সতর্ক থাকুন। মঙ্গল, বুধবার অশুভ।

মিথুন : কর্মে মর্যাদা এবং দায়িত্ব বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যও উন্নতি হবে। ব্যক্তিগত কোন সমস্যা পূর্ণ হতে পারে। লেখক সাহিত্যিকদের পশার বৃদ্ধি পাবে। কোন ব্যাপারে দৈবের উপর আস্থা হারাতে পারেন। শনি থেকে সোমবার পর্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

কর্কট : কোন না কোন কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও প্রয়োজনে অর্থ সংকুলান হয়ে যাবে। সমাজ ক্ষেত্রে কিছু শত্রুতার জন্য মানসিক চাপ থাকবে। দাম্পত্য সুখ পাবেন। মাথায় আঘাত পাওয়া থেকে সাবধান। মঙ্গল, বুধবার শুভ।

সিংহ : যদিও কার্য কারণে মনের উপর চাপ থাকবে। কিন্তু নতুন লগ্নীতে আয় বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে সময়টা অনুকূলে নয়। কাউকে বেফাঁস কথা বলে আত্মমর্যাদায় আঘাত পেতে পারেন। মঙ্গল, বুধবার অশুভ।

কন্যা : বিরোধীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের বশে আনতে সক্ষম হবেন। নিজগুণে সম্মান পেতে পাবেন। কর্মেও সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। পরিবর্তনের ইঙ্গিতকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করুন। রবি, সোম ব্যয়। বুধবার শুভ।

তুলা : এমন কোন কথা বলা উচিত হবে না যাতে পরে মনস্তাপ পেতে পাবেন। কোন সন্তানের জন্যও চিন্তা হতে পারে। আবার সপ্তাহের মাঝামাঝি কর্মসংস্থানের কোন সংবাদ কৌতূহল সৃষ্টি করবে।

বৃশ্চিক : আগেও বলেছি সময়টা এখন কিছুটা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে চলতে পারে। মনের দুর্বলতা ত্যাগ করুন। বৃহস্পতি শুভ হতে চলেছে। পারিবারিক অশান্তি এড়িয়ে চলুন। শুক্র, শনি অশুভ।

ধনু : ব্যবসাতে নতুন আশার আলো দেখতে পাবেন। ফলে মনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। হাতে কিছু টাকা-পয়সা আসবে। বিলাস-ব্যসনে কিছু ব্যয় অসম্ভব নয়। পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। রবি, সোম অশুভ।

মকর : শত্রুরা যতই চেষ্টা করুক আপনার প্রতাপের কাছে নতি স্বীকার করবে। কিছু ঋণ যোগ দেখা যায়। কোন সহ-কর্মীর দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা-কার্যে কিছু ব্যয় হতে পারে। মঙ্গল, বুধবার অশুভ।

কুম্ভ : যদিও আপনাকে পুরো সপ্তাহ কর্মক্লান্ত দেখা যায়। কিছু নীচু শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিবাদও হতে পারে। কিন্তু মনের কোন বিশেষ কামনা পূর্ণ হতে পারে। বুধ, বৃহস্পতিবার অশুভ।

মীন : ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। কর্মস্থানে কোন কোন সহকর্মীর মনোভাব বিরক্তিকর হলেও—ধৈর্যের ফলে কর্মে সুখ এবং মর্যাদা দুই-ই পাবেন। কোন শত্রু বশ্যতা স্বীকার করতে পারে। শুক্র, শনিবার ছাড়া সপ্তাহটি মন্দ নয়।

শ্রীমাণিক

আগামী সংখ্যায়
মহারাষ্ট্রের পাওয়ার পলিটিক্স

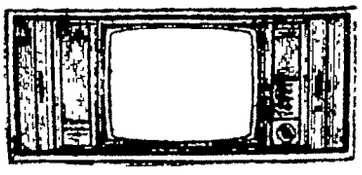

দর্শকের চোখে দূরদর্শন

বৃষ্টি পড়ছিলো। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হলো না। যদিও লেক গার্ডেনস-এ বাড়ির নম্বরগুলো একটু এলোমেলো। ডাঃ সেন ওপরে ছিলেন তাই কথা হচ্ছিল ডাঃ সেন-এর স্ত্রী মাধুরী সেনের সঙ্গে। ওনার দেশবিদেশের খবর শুনতে, বাংলা সিনেমা দেখতে ভালো লাগে। তবে বোজ টি-ভি দেখা হয়ে ওঠে না বা ভালোও লাগে না। ভালো প্রোগ্রাম থাকলে তবেই দেখতে ইচ্ছে করে। বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের প্রতিদিন নিয়মিত টি-ভি দেখা চাই। ওনারা খুব একটা বাড়ির থেকে বেরোন না। ডাঃ সেন-এর পুত্রবধূ জোনাকি সেন কসমিক থেরাপি নিয়ে গবেষণা করছেন। তাছাড়া তাঁর নানা ধরনের হবি আছে। তাই তাঁর সময়ের খুব অভাব। তাছাড়া টি ভি দেখতে তাঁর খুব একটা ভালো লাগে না। আর টি-ভিতে তেমন কোনো আকর্ষণীয় প্রোগ্রামও দেখানো হয় না। তবুও যখন যা একটু বা টি-ভি দেখেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে টি-ভির অনুষ্ঠানসূচীর কখনো কোনো প্রভাব ইন্টেলেকচুয়াল থাকে না। এবং অনুষ্ঠানগুলি খুব ডিসঅর্গানাইজড্। জোনাকি মনে করেন না টি-ভি সিনেমা শিল্পের পুরোপুরি বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। তাঁর অভিযোগ কলকাতা দূরদর্শনের ইংলিশ উচ্চারণ অসম্ভব রকমের হাস্যকর। টি-ভিতে কি ধরণের অনুষ্ঠানসূচী দেখানো যেতে পারে একথা জিজ্ঞাসা করলে উনি ওয়ার্ক এডুকেশানের ওপরে জোর দিলেন।

অসুস্থ শরীর নিয়েও নেমে এলেন ডাঃ অমিয় সেন। একবছর যাবৎ তাঁর বাড়িতে টি-ভি আছে। টি-ভি কেনার ব্যাপারে তাঁর নিজের খুব উৎসাহ ছিলো না। বর্তমান টি-ভির অনুষ্ঠানসূচীর বিষয়ে তিনি একেবারে সন্তুষ্ট নয়। কেননা কয়েকটি অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই অসম্ভব সস্তা ধরনের। উন্নত-মানের অনুষ্ঠানসূচী তখনই প্রচার করা সম্ভব যখন সত্যিকারের জীবনকেন্দ্রিক ভাবনা-চিন্তাকে মদত দেওয়া সম্ভব হবে। দর্শকের রুচি ও শিক্ষার দিকে নজর রাখতে হবে। বিভিন্ন বয়সের দর্শকের জন্য সংবেদনশীল অনুষ্ঠান করতে হবে। এমন অনেক বিষয় আছে যা টি-ভির মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জানানো যেতে পারে। আর এই জানা ও জানানোর ভিতর দিয়ে টি-ভি আমাদের সুস্থ সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে।

কলকাতার একটি স্কুলের ছাত্রী আত্রেয়ী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট বেরুনোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। টি-ভির কথা উঠতেই হৈ-হৈ করে উঠল। টি-ভি তার অসম্ভব ভালো লাগে। কত কিছু জানা যায়, দেখা যায়। শনিবার রবিবার সিনেমা দেখি তাছাড়া স্কুইজ, টি-ভিতে সবে বসে বসে নানারকম খেলা দেখা যায়। সময় কেটে যায়। তবে গুরুগম্ভীর আলোচনা ভালো লাগে না। এছাড়া ওয়ার্ক এডুকেশানের ওপর অনুষ্ঠান, চিত্রমালা, যোগব্যায়াম, ব্যায়ামের অনুষ্ঠান ভারি খুব ভালো লেগেছে। তবে টি-ভিতে সিনেমা দেখা আর সিনেমা হলে সিনেমা দেখা এক নয়। কেননা সিনেমা হলে নতুন ছবি, তাছাড়া সবাই মিলে বাইরে যাওয়ার আনন্দ। আত্রেয়ী বললো যদি শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে নানারকম পড়াশুনোর আলোচনা টি-ভিতে করা হয় তবে ছাত্রছাত্রীদের খুব সুবিধা হয়। টি-ভিও দেখা হবে পড়াশুনোও হয়।

প্রাক্তন সেরিফ প্রখ্যাত ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নামজাদা কয়েকটি কোম্পানীর

...পরিচালকপ্রধান পুষ্পভূষণের সম্মানিত ...শ্রীবিশ্বজিৎ রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ...তুলেই তাঁর নিউ আলিপুরের ...টি-ভি আছে। নামান কাজের ...র মধ্যেও টি-ভি দেখতে তাঁর ভুল ...না। কলকাতা দূরদর্শনের পরিচালনা ...র সঙ্গেও সুরেশবাবুর যোগাযোগ ...। টি-ভি বিষয়ে তিনি আশাবাদী। ...র শিক্ষামূলক ভূমিকা ও চিত্র-বিনোদন ভূমিকা দুটোর ওপরই তিনি ...দিলেন। পরিবারের সবাই টি-ভি ...র পর থেকে বাইরে যাওয়া একটু ...। যে সমস্ত অনুষ্ঠান তাঁর ...লেগেছে তার মধ্যে যোগব্যায়াম, ...লাইফ সিরিজ ডকুমেন্টারি, স্কুইজ ...কারবার। তিনি মনে করেন কলকাতা ...র্শন ধীরে ধীরে অনেক সংগঠিত হয়ে ...করে টি-ভি প্রতিদিন দেখা ছোট ...ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষতি করতে ...। তাই তাদের জন্য যদি শিক্ষামূলক ...ন প্রচার করা যায় তবেই ক্ষতি ...করতে পারে। তিনি মনে করেন ...টি-ভি সিনেমাশিল্পের বিকল্প হয়ে ...বরং তা সিনেমাশিল্পের পরিপূরক ...হিসেবেই কাজ করবে।

...চাঁদ বোডের বাসিন্দা শিক্ষিকা ...আচার্য ও তাঁর অধ্যাপক স্বামী ...আচার্য জানালেন তাঁরা চার পাঁচ ...হলো টি-ভি নিয়েছেন। সাজসী ...টি-ভি দেখেন। অরুণবাবু ...র ও রবিবার দেখেন। মালবী পছন্দ ...সিনেমা ও চিত্রমালা অনুষ্ঠান ...বেশী। অরুণবাবুর পছন্দ খেলা-...ও বিজ্ঞান প্রসঙ্গ। টি-ভি কেনার ...মালবী ও তাঁর স্বামী খুব একটা ...বিবেচনা করেননি। টি-ভি কেনার পর ...ছাড়া চলেই নয়। সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা ...আগে করেছে। তাঁদের তিন বছরের বাচ্চাও টি-ভি দেখতে ভালোবাসে।

...কাতার প্রাক্তন মেয়র ডাঃ পি কে ...শুকী জানালেন টি-ভি-কে যারা ...বক্স বলে তারাই হটুগোল। ...তাদের টি-ভির উপকারিতা সম্বন্ধে ...ন ধারণা নেই। টি-ভি গোটা বিশ্বকেই ...বার্তা এনে দিচ্ছে। শুধু বড়রা না ...ও টি-ভি দেখে আনন্দ পায়। ...ভি কখনোই চলচ্চিত্রের বিকল্প নয় ...না টি-ভির অনুষ্ঠানসূচী ব্যাপক ও ...। ডাঃ হালদারের বাড়ির ...ই প্রতিদিন টি-ভি দেখেন। কিন্তু ...র দায়িত্বপূর্ণ পেশার জন্য অতটা সময় ...দিতে পারেন না। তিনি আরও ...ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়া-...ক্ষতি হবে যদি না অন্য সময় সেই ...ব্যবস্থা করা হয়। ঘরে বসে ...সিনেমা সত্যি ...। ...সিনেমা

তাছাড়া বয়স্ক ও শয্যাশায়ী অসুস্থ ...দের কাছে টি-ভি আশীর্বাদ... ...মাক্সমেশান ..টি-ভি দেখলে চোখের ...ক্ষতি হয় না, ঘরে ভালো ...টি-ভি দেখা উচিত। চার বছর হলো টি-ভি বাড়িতে আছে।

...বালিগঞ্জ রোডের অশোক ...র সঙ্গে দূরদর্শন নিয়ে কথা ...তেই তিনি বললেন, আমার বাড়ির সকলেই টি-ভি দেখতে ভালো-বাসে সিনেমা ও চিত্রমালা বিশেষ করে। তবে আমার মতে টি-ভি আনসোশাল। কেননা টি-ভি বাড়িতে থাকার জন্য সামাজিক যোগাযোগের প্যাটার্ন বদলে যায়। নানা অসুবিধা থাকলেও আশ-পাশের বাড়ির লোকজনদের বাড়িতে এসে টি-ভি দেখার সুযোগ দিতে হয়। অনেক সময়েই কলকাতা দূরদর্শনের একটিমাত্র চ্যানেল থাকার জন্য অসুবিধাও রয়েছে। প্রোগ্রাম ভালো না লাগলে টি-ভি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যাঁরা টি-ভি দেখতে ভালোবাসেন তাঁদের বাধ্য হয়েই টি ভির সামনে বসে থাকতে হয়। ভালো না লাগলেও ভালো লাগিয়ে নিতে হয়। তার এইভাবে টি-ভি দেখা একটা এডাস ও টি-ভি ডাইরুম ডেথের হার বাড়ে। টি-ভি সিনেমার বিকল্প হতে পারে না। তবে অনেকে টি-ভিতে সিনেমা দেখার অভ্যাসে হয়ে উঠতে পারেন। টি-ভি র প্রোগ্রাম অবশ্যই চিত্তবিনোদনমূলক হওয়া উচিত। দেশী বিদেশী অনেক ভালো চলচ্চিত্র টি-ভিতে দেখানো উচিত। এবং টি-ভির আরো কয়েকটি চ্যানেলের কথাও ভাবা উচিত।

মদন মিত্র লেনের ডঃ শর্মিলা চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল চট্টোপাধ্যায় জানালেন টি-ভি তাঁদের বেশ ভালো লাগে। হিন্দুস্থান করে বাংলা হিন্দি সিনেমা ও চিত্রমালা অনুষ্ঠান। টি-ভি কেনার পর তাঁরা বিকেলে খুব একটা বাড়ি থেকে বার হন না। তাঁদের মতে টি-ভি অবসর বিনোদনের সত্যিকারের সঙ্গী।

গোপাল লাগার লেনে কথা হচ্ছিল অটো সার্ভিস স্টেশনের ছোট্ট কাউন্টার অফিস ঘরের মধ্যে বসে। খুব কম দামে তিনি একটা বিদেশী টি-ভি কিনেছিলেন। তারপর থেকেই হানিবার রবিবারের সিনেমা,

ফুড-এর চেয়েও ভাল
দুধেভরা সয়াবীন

পন্থনগরের সয়াবীনে শতকরা ৪২ ভাগ অর্থাৎ খাঁটি দুধের চেয়ে দশগুণেরও বেশী প্রোটিন আছে। এ জিনিস বাজারে আর কোথাও নেই। ডায়েবিটিস রোগীদের একান্ত নির্ভরযোগ্য পথ্য। খেলোয়াড ও ব্যায়ামবিদদের একমাত্র শক্তিবর্ধক খাদ্য। শিশু, বৃদ্ধ, সুস্থ ও রোগী সকলের পক্ষেই পরম উপকারী, অতি সহজে দুধ, দই, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি মিষ্টান্ন ও চপ, ফ্রাই, ঘুগনী প্রভৃতি মুখরোচক খাবার করা যায়। প্রস্তুত-প্রণালীসহ ৫০০ গ্রাম প্যাকেটে পাবেন। পন্থনগরের এক কেজি সয়াবীনে ছয় কেজি খাঁটি দুধ হয়। যে কোন ফুড-এর তুলনায় এখনো খুবই সস্তায় দেওয়া হচ্ছে। সম্ভ্রান্ত ডাক্তারখানা, স্টেশনারী, মুদিখানা এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের স্টকিস্ট করা হচ্ছে। ৫০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠালে স্টকিস্ট হবার নিয়মাবলী ও সয়াবীনের খাদ্য প্রস্তুত-প্রণালী বিনামূল্যে পাঠান হয়।

ডিসট্রিবিউটরস— (সারা পশ্চিমবাংলা)

পশুপতিদাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
— কৃষি বিভাগ —

৩৭এ,৪৩/২, এস, এন, ব্যানার্জি রোড, কলিঃ ৭০০০১৪
টেলিফোন: ২৪-৪৩৮৯,৮২ - টেলিগ্রাম: ব্রাইসকিংস

চিত্রমালা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দেখেন। তাঁর কাছে টি-ভি সময় কাটানোর একটা মেশিন। টি-ভি কে পুরনো ছবি দেখানো হয় তাছাড়া ছোট স্ক্রীন টোটাল ভিসুয়াল পাওয়া যায় না। তাই টি-ভি কখনোই সিনেমার বিকল্প হয়ে উঠতে পারে না। ইদানিং অনেক বেশী স্কুইজের প্রোগ্রাম তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। দাগা সাব দিল্লির টি-ভিতে দেখা কয়েকটা প্রোগ্রাম বিষয়ে বলছিলেন। যেমন সিভিক ট্রাফিক সেন্সের ওপর ডকুমেন্টারি। শহর পরিষ্কার রাখা, হাসপাতাল হোটেলের আদবকায়দা ইত্যাদির ওপরে টি-ভি অনুষ্ঠান, তাঁর মতে শিক্ষামূলক বিষয়ে যদি কিছু করা হয় তাহলে সেইরকম কিছু করা উচিত যাতে কমনসেন্স ডেভালপ করে।

সি এম ডি-এর পদস্থ কর্মী দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর স্ত্রী জানালেন তাঁর স্বামী ও তাঁর মেয়ে টি-ভি দেখতে ভীষণ ভালোবাসেন। তাঁদের টি-ভিতে তাঁরা বাংলাদেশেরও প্রোগ্রাম দেখেন। তাঁদের মতে ইন্টারেস্টিং ফালচাবাল প্রোগ্রাম টি-ভিতে অনেক বেশী করে দেখানো উচিত।

সাউথ পয়েন্টের ছাত্রী বৃন্দার টি-ভি ভালো লাগে। বৃন্দা ও তার দিদিমা প্রতিদিনই টি-ভি দেখেন। কিন্তু বৃন্দার দাদু (কবি সমর সেন) তিনি একদম টি-ভি পছন্দ করেন না। টি-ভি যখন শুরু হয় তখন দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকেন।

শ্রীমতী গৌরী রায় জানালেন তিনি ও তাঁর স্বামী দুজনেই টি-ভি দেখতে ভালোবাসেন। ছেলেরা চাকরির সুবাদে বাইরে থাকে তাই তাঁরা নিঃসঙ্গ। টি-ভি দেখে সময় কাটে। নাতি-নাতনিরা কলকাতায় এলেই টি-ভিতে নানা অনুষ্ঠান দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাঁর মতে টি-ভি দূরের সব কিছুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছে। নাটকের ক্রমশ প্রচার অনেক সময় লোডশেডিংএর জন্য ফলো করা যায় না।

বারীদ মুখার্জি পেশায় একজন জিয়োলজিস্ট। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সিনেমা, স্কুইজ, নাটক, স্পোর্টস রাউন্ড-আপ টি-ভি-তে দেখতে ভালোবাসেন। তাঁরা টি-ভি-তে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওপর প্রোগ্রাম আরো বেশী করে দেখতে চান।

বেলগাছিয়ার ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের গোপীনাথ ব্যানার্জি ও সিন্ধ্যা ব্যানার্জি জানালেন কলকাতার যানবাহনের যা অবস্থা তাতে কোথাও যাতায়াত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই বাড়িতে বসে টি-ভি দেখে সময় কাটানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সার্কাস বেঞ্চের কিশোর করিম টি-ভি রেগুলার দেখেন না। তাঁর পছন্দ হিন্দি গানের চিত্রমালা অনুষ্ঠান ও সিনেমা। টি ভি-তে কোনো ভালো প্রোগ্রাম থাকলে তিনি বিকেলের দিকে বেরোন না।

লবসেন অ্যান্ড টুবরোর আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি মিঃ কে পি পলতার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি টি-ভি'র এন্টারটেনমেন্ট বা চিত্ত-বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের ওপর জোর দিলেন। ওঁর মতে টি ভি ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড। তবে বর্তমান কলকাতার দূরদর্শনে সংবাদ পড়ার অনুষ্ঠানটি তাঁর একেবারেও পছন্দ নয়। তিনি বললেন সংবাদ পড়ার সময় আরো অনেক বেশী করে ভিসুয়াল দেখানো উচিত। আর লক্ষ্য রাখা উচিত বেডিয়ো নিউজপেপার ও টি-ভি-র মধ্যে যেন সংবাদের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। টি-ভি-র সংবাদ পরিবেশনার প্যাটার্ণ অন্যরকম হওয়া উচিত। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানসূচী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন নানা বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখানো যেতে পারে। আমাদের চার পাশের ঘটনা সম্বন্ধে মানুষকে ওয়াকিবহাল করা যেতে পারে।

ফিক লেনের মাইকেল ডিসুজা জানালেন দূরদর্শনের অনুষ্ঠানসূচী চিত্ত-বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে শিক্ষামূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং যে সমস্ত কিছু সংবাদপত্র বা রেডিও বা অন্যান্য মাধ্যম করতে পারে না সেই সমস্ত অনুষ্ঠান দূরদর্শন প্রচার করতে পারে। দেশের এমন অনেক কিছুই আছে যা আমরা জানি না এবং সে সমস্ত কিছুই দূরদর্শনের মাধ্যমে জানানো যেতে পারে।

রামমোহন রায় রোডের স্বারিক ব্যানার্জি জানালেন টি-ভি-র নানান বয়সের নানান মানসিকতার দর্শক আছে। এবং দূরদর্শনের অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে তাই ভ্যারাইটির দরকার। গতানুগতিকতা দর্শকদের মধ্যে একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে।

কালচাঁদ প্রতিদন্দ্বি লেনের মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, দুপুরবেলায় সত্যি কিছু করার থাকে না। সেই সময় যদি টি ভি'র অনুষ্ঠানসূচী প্রচার করা সম্ভব হয় তাহলে বিশেষ করে অনেক মেয়েরা উপকৃত হবেন।

রিটায়ার্ড মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার প্রভাংশু রায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই বিষয়ে। তিনি বললেন, টেলিভিশন অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ভারতবর্ষের যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর টুরিস্ট স্পট আছে তার ওপরে ডকুমেন্টারি ছবি দেখালে খুবই ভালো হয়—সময় সুযোগের অভাবে কজনই বা ঘুরে বেড়াতে পারে। তাতে করে দেশ-ভ্রমণের মেজাজ বা আনন্দ দর্শকদের মধ্যে অপার আনন্দের সৃষ্টি করতে পারে। টি-ভি'তে জ্ঞানগর্ভ কচকচানি যত কম করা যায় ততই মঙ্গল। দেশ বিদেশের কত কিছুই না আমরা টি-ভি'র ভেতর দিয়ে জানতে পারি। ফিতে কাটা ধরনের নিউজ ডকুমেন্টারি না করে গোটা দেশটায় কি হয়েছে বা কি হতে চলেছে তার ওপরে ডকুমেন্টারি প্রচার করা হলে গোটা দেশটা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান আরো বেড়ে-যাবে। টি-ভি দেখতে দেখতে গোটা দেশটার স্বাদ পাওয়া যাবে ঘরের কোণায় বসে।

পি জি হাসপাতালের পেছনে বস্তি রামপেয়ারি থাকে। যে বাড়িতে সে কাজ করে সে বাড়িতে টি-ভি আছে আর বস্তিতে টি-ভি আছে। সময় সুযোগ পেলে সেও টি-ভি দেখে। টি-ভি তার কাছে এক আশ্চর্য বিস্ময়। তার জানাবোঝার খামতি সে যেন টি-ভি দেখে একদিন না একদিন পুষিয়ে নেবেই।

রাজা চট্টোপাধ্যায়

খেলা

পাক ক্রিকেট কর্তার পদত্যাগ এবং...

এবার ইংলন্ড সফরে গিয়ে পাকিস্থান ক্রিকেট দল শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তিন টেস্ট সমশ্রমের প্রথম টেস্টেতে তারা গো-হারা হেরেছিল। সেই সঙ্গে হারিয়েছিল রাবার। ইংলন্ড ও পাকিস্থানের শেষ টেস্ট ম্যাচটি বৃষ্টির জন্যে ধরতে গেলে হতেই পারে নি। এবার ইংলন্ড সফরে গিয়ে পাক দল যা খেলেছে অতো খারাপ তারা আর কখনো খেলে নি।

অবশ্য তার যথেষ্ট এবং সঙ্গত কারণও আছে। পাকিস্থান দলের সামনের সারির কজন খেলোয়াড় এখন প্যাকার সাহেবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তারা পাকিস্থানের পক্ষে খেলতে পারেন নি। ওঁদের বাদ দিয়ে গড়া দলটি তাই অতি-সাধারণ একটি দলে পরিণত হয়েছিল। লড়াই চালাবার, ধৈর্য্য এবং উচ্চাঙ্গের ক্রিকেট খেলার যে নজীর এতোকাল আমরা পাকিস্থানের কাছ থেকে দেখে আসছিলাম—তার ছিটেফোঁটাও এবার দেখাতে পারে নি ভাঙ্গা দলটি।

আসলে দলের হাল ধরার মত কেউ ছিলেন না। ছিলেন না ব্যাটিং ও বোলিংয়ের ও কুশলী খেলোয়াড় কজন। তাই ইংলন্ড প্রথম দুটি টেস্টে হেলায় হারিয়েছিল পাকিস্থান দলকে। পাকিস্থানের খেলোয়াড়রা প্রথম দুটি টেস্টে লড়াই বাধাবার মত পরিস্থিতিই গড়ে তুলতে পারেন নি।

তাই দু দলের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে পাকিস্থান চেয়েছিল কেরি প্যাকারের দলে যেসব খেলোয়াড়রা নাম লিখিয়েছেন তাদের মুক্ত করতে। তাহলে পাকিস্থান দলটি ই দারুণ শক্তিশালী হয়ে উঠতো।

কিন্তু বেঁকে বসলেন ইংলন্ডের কারাডরা। তাঁরা সাফ জানিয়ে দিলেন, যে কেরি প্যাকারের দলের খেলোয়াড়রা যদি পাকিস্থানের হয়ে টেস্ট খেলতে নামেন তাহলে তারা খেলবেন না। তৃতীয় টেস্ট বয়কট করবেন। সেকথা বলার অধিকার ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের অবশ্যই আছে। এক বছর আগে পাক-খেলোয়াড়রাও ঠিক একই কথা বলেছিলেন।

স্বদেশে তখন তাঁরা টেস্ট খেলছিলেন খেলায় অংশ নেবার জন্যে কেরি প্যাকারের লের খেলোয়াড়দের ক্রিকেট বোর্ড ডেকে নিছিলেন। কিন্তু তখন সেই প্রস্তাবে রাজি লেন পাকিস্থানের অন্য খেলোয়াড়রা। বলেন, পাশ্ব দলে প্যাকারের খেলোদের নিলে তাঁরা খেলবেন না। ওঁরা ষ্ট বলে দিলেন। কেরি প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ পাক খেলোয়াড়রা যে দিকে সেই 'ফল্লদা' নড়বেন তা চলবে না। ওঁরা খাবেন, ভাতারও কুড়োবেন—এ আবার কেমন কথা।

পাক খেলোয়াড়দের সেই জোরদার প্রতিবাদে সায় না দিয়ে পাকিস্থান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের উপায় ছিল না। ফলে পাকিস্থানে এসেও প্যাকার সাহেবের দলের পাক খেলোয়াড়রা স্বদেশের পক্ষে খেলতে পারলেন না।

গাদা গাদা টাকার লোভে কেরি প্যাকারের দলে ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর পাকিস্থান দলের যেসব খেলোয়াড়রা নাম লিখিয়েছেন তাঁরা কেউই আর স্বদেশের পক্ষে খেলার সুযোগ পাবেন না। সব থেকে বেশীদিন পর্যন্ত ঐ সুযোগ পেয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা। এবারের শীতের মরশুমেও তাঁরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে খেলেছিলেন। তারপরই বাধলো গোলমাল।

এই শীতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসছে। কেরী প্যাকারের দলেরও তখন খেলা। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড চিঠি দিয়ে জানতে চাইলেন কোন কোন খেলোয়াড় মনোনীত হলে দলের সঙ্গ ভারতে যেতে পারবেন। খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। দলনায়ক লয়েড সহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের নামকরা প্রায় সব খেলোয়াড়ই প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তাঁরা যদি যেতে না পারেন তাহলে নতুনভাবে দল গড়তে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। নতুন খেলোয়াড় খুঁজে বের করতে হবে।

তাই তৃতীয় টেস্টে দুজনজন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে তাঁরা নতুন খেলোয়াড়দের দলে নিলেন। যাঁরা বাদ পড়লেন তাঁরা সকলেই প্যাকারের দলের। ফলে ব্যাপারটা অনেকটা আগুনে ঘি পড়ার মত হয়ে দাঁড়ালো। দলনায়ক লয়েড সহ বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় সরে দাঁড়ালেন। প্যাকারের দলের খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া হলে তাঁরা খেলবেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট কর্তারাও তাঁদের গোঁ ছাড়লেন না। বলে দিলেন, তোমরা আগে জবাব দাও দলের সঙ্গে ভারত সফরে যেতে পারবে কিনা। খেলোয়াড়দের পক্ষে সে কথা দেওয়া সম্ভব নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট কর্তারাও এই ব্যাপারে কেরী প্যাকারের সঙ্গে কোন কথা বলতে পারবেন না। কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সে ঠিক হয়েছিল কোন দেশই প্যাকারের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করবে না। যা করার করবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলন। ফলে লয়েড সহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনের সারির খেলোয়াড়রা দল থেকে বাদ পড়লেন। কালীচরণ হলেন দলের অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল আসছে নভেম্বর মাসে ভারত সফরে আসবে।

তাই ইংলন্ড সফরে গিয়ে প্রথম দুটি টেস্টে হেরে যাবার পর তৃতীয় টেস্টে পাকিস্থান যখন চাইলো কেরী প্যাকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের দলে নিতে তখন বেঁকে বসলেন ইংলন্ডের খেলোয়াড়রা। পাকিস্থান চেয়েছিল, অন্তত তৃতীয় টেস্টে কিছুটা খেলে মুখ রাখতে। কিন্তু তাদের সে ইচ্ছে পূর্ণ হল না। গো-হারা হেরে পাকিস্থান ক্রিকেট দল ইংলন্ড সফর শেষ করে দেশে ফিরে গেল।

ওদিকে পাকিস্থান দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করলেন পাকিস্থান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি। তিনি বলেন, আরো যোগ্য ব্যক্তি যিনি দক্ষতার সঙ্গে বোর্ড চালাতে পারবেন তার হাতে দায়িত্ব তুলে দেবার জন্যেই তাঁর এই পদত্যাগ। তাঁর পদত্যাগের পর সরকার পুরো পাক-বোর্ডটাকেই খারিজ করে দিলেন। বাতিল করে দিলেন সংবিধান। পাকিস্থান ক্রিকেট বোর্ডের কাজকর্ম চালাবার জন্যে একটি অ্যাড-হক কমিটি তৈরী করে দিলেন। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটাই এখন রুদ্ধদ্বার হয়ে আছে।

ওদিকে আগামী অক্টোবর মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্থান সফরে যাবার কথা। দীর্ঘদিন পরে দু দেশের মধ্যে আবার ক্রিকেট সম্পর্ক হতে চলেছে। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্থান সফর কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ মাঝে আর মাত্র দুটি মাস আছে। এর মধ্যে যদি সব ঠিকঠাক না হয় তাহলে নির্ধারিত সময়ে ভারতীয় দলের পক্ষে পাকিস্থান সফরে যাওয়া সম্ভব হবে কি?

অবশ্য পাকিস্থান থেকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে খবর এসেছে যাতে ভারতের কর্তারা আগস্ট মাসেই পাকিস্থানে গিয়ে ভারতীয় দলের সফরের সব কিছু চূড়ান্ত করে ফেলেন। ভারত পুরো দু মাসের জন্যেও পাকিস্থানে যাবে না। অক্টোবরে গিয়ে, নভেম্বরেই ফিরে আসবে। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের পূর্ণাঙ্গ সফর ততদিনে শুরু হয়ে যাবে।

তবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাক-

স্থান সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক কারণে সেই কবে দু দেশের ক্রীড়া সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্থান দল ভারত সফরে এসেছিল। দু দেশের মধ্যে সেই শেষ টেস্ট খেলা। তারপর আর হয়নি। এ বছর থেকে হকিকে ঘিরে এই দু দেশের ক্রীড়া সম্পর্ক আবার পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্থান হকি দল এসেছিল ভারত সফরে আর ভারত গিয়েছিল পাকিস্থানে। কয়েক মাস আগে বিশ্ব কাপ হকি প্রতিযোগিতার আগে দু দেশের মধ্যে খেলা হয়েছিল। এই অক্টোবর মাসে ক্রিকেটের সম্পর্ক জোড়া লাগার কথা। প্রথমে ভারতই যাবে পাকিস্থান সফরে, তারপর কোন এক সময়ে ভারত সফরে আসবে পাকিস্থান।

যে যাই হোক পাকিস্থান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি দলের পরাজয়ের সব দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করে এক নজির সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশের খেলাধুলোর কর্তারা—যাঁরা বছরের পর বছর গদি আগলে বসে থাকেন, দলের পরাজয় সম্পর্কে যাঁরা চিরকালই উদাসীন—পাকিস্থান ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির পদত্যাগ তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে সুখবর নয়। খবরটা যে তাঁদের মোটেই ভালো লাগে নি একথা হলপ করে যে কেউই বলতে পারেন। কারণ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না যে অমরবাবু কিংবা ভারতীয় খেলাধুলো জগতের জোন বাবু দলের ব্যর্থতার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করেছেন। তা করলে যে খেলাধুলোরই উপকার হতো একথাটা তাঁরা কোনদিনই বুঝবেন না।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনট্যার টেবল টেনিস

কটকে আয়োজিত জুনিয়ার এবং সাব-জুনিয়ার ইনট্যার কাপ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় আসাম বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেয়। আসাম সাতটি বিভাগের ফাইনালে খেলে খেতাব জয়ী হয় তিনটিতে—জুনিয়ার বালিকাদের ডাবলস এবং সাব-জুনিয়ার বালকদের সিঙ্গলস ও ডাবলস। অপরদিকে দিল্লী এবং মধ্যপ্রদেশ দুটি করে খেতাব জয় করে।

ফাইনাল ফলাফল : জুনিয়ার বিভাগ

বালকদের সিঙ্গলস : জাতীয় চ্যাম্পিয়ান মনমিত সিং (দিল্লী) ২৪-২৬, ২১-১১, ২১-১৭ ও ২১-১৪ পয়েন্টে ফারুফিউ রায়কে (আসাম) পরাজিত করে।

বালিকাদের সিঙ্গলস : স্নিগ্ধা মেহতা (এম পি) ২১-১৯, ২১-১১ ও ২১-১৫ পয়েন্টে মোনালিসা বড়ুয়াকে (আসাম) পরাজিত করে।

বালকদের ডাবলস : মনমিত সিং এবং পি ভাসর (দিল্লী) ১৭-২১, ২১-১৩ ও ২১-৮ পয়েন্টে স্নিগ্ধা মেহতা এবং উজ্জ্বলা মোহাবিককে (এম পি) পরাজিত করে।

বালিকাদের ডাবলস : মোনালিসা বড়ুয়া এবং এম হাজারিকা (আসাম) ২১-১৩ ও ২১-৮ পয়েন্টে স্নিগ্ধা মেহতা এবং উজ্জ্বলা মোহাবিককে (এম পি) পরাজিত করে।

সাব-জুনিয়ার বিভাগ

বালকদের সিঙ্গলস : গৌতম হাজারিকা (আসাম) ২১-১৫, ১৬-২১, ২১-১১ ও ২১-১৬ পয়েন্টে সুধীর ভোরাকে (এম পি) পরাজিত করে।

বালকদের ডাবলস : গৌতম হাজারিকা (আসাম) এবং ডি দত্ত (মেঘালয়) ২৬-২৮, ২১-১০ ও ২১-১৬ পয়েন্টে আর ভ্যাস এবং আর শিবানীকে (দিল্লী) পরাজিত করে।

বালিকাদের সিঙ্গলস : উজ্জ্বলা মোহাবিক (এম পি) ২১-১৭, ১৬-২১, ২১-১৭ ও ২১-৮ পয়েন্টে মিতালি হাজারিকাকে (আসাম) পরাজিত করে।

এখানে উল্লেখ্য, কটকে আয়োজিত ফেডারেশন কাপ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় আসাম পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ৫-০ খেলায় বিহারকে এবং মহিলা বিভাগের ফাইনালে ৩-২ খেলায় মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করেছিল।

জাতীয় জুনিয়ার বাস্কেটবল

রাজস্থানের ভিলওয়ারাতে আয়োজিত জাতীয় জুনিয়ার বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার মহারাষ্ট্র বালক ও বালিকা বিভাগের খেতাব জয়ের সূত্রে 'শিবমুকুট' সম্মান লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, গত বছর মহারাষ্ট্র বালক বিভাগে রানার্স-আপ এবং বালিকা বিভাগে খেতাব জয়ী হয়েছিল। রাজস্থানের বালক বিভাগের অধিনায়ক মহম্মদ ইকবাল প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করে।

ফাইনাল খেলা

বালক বিভাগ : মহারাষ্ট্র ১১৬-৮৪ পয়েন্টে রাজস্থানকে পরাজিত করে।

বালিকা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৭৪-৭৩ পয়েন্টে কর্নাটককে পরাজিত করে।

মিনি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার বালক বিভাগে পাঞ্জাব প্রথম স্থান এবং বাংলা দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। অপরদিকে বালিকা বিভাগে প্রথম স্থান পায় পাঞ্জাব, দ্বিতীয় স্থান মহারাষ্ট্র এবং তৃতীয় স্থান গোয়া।

ডেভিস কাপ

১৯৭৮ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইউরোপীয় অঞ্চলের সেমি-ফাইনাল খেলায় নিষ্পত্তি হয়েছে।

ইউরোপীয় জোনের 'এ' বিভাগের সেমি-ফাইনালে বিটেন ৩-২ খেলায় ফ্রান্সকে পরাজিত করে 'এ' গ্রুপের ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ইতালীকে হারিয়ে 'বি' গ্রুপের জোন-ফাইনালে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপের আসরে ইতালীর বিপক্ষে হাঙ্গেরীর জয়লাভ এই প্রথম।

কমনওয়েলথ গেমস

কানাডার এডমন্টনে আগামী আগস্ট ৩ তারিখে একাদশ কমনওয়েলথ গেমসের শুভ উদ্বোধন হবে। আসর ভাঙবে আগস্ট ১২ তারিখে। কমনওয়েলথ গেমসের (পূর্ব নাম এম্পায়ার গেমস) সূচনা ১৯৩০ সালে। প্রথম আসর বসেছিল কানাডার হ্যামিলটনে। তারপর বসে লন্ডন, সিডনি, অকল্যান্ড, ভ্যাঙ্কুভার, কার্ডিফ, পার্থ, কিংস্টন, এডিনবরা এবং ক্রাইস্টচার্চে।

একমাত্র 'কমনওয়েলথ' সংস্থাভুক্ত দেশগুলি এই 'কমনওয়েলথ গেমসে' যোগদানের অধিকারী। ১৯৭৪ সালের দশম কমনওয়েলথ গেমসে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ৩৮। ১৯৭৪ সালের কমনওয়েলথ গেমসের পদকজয়ের চূড়ান্ত তালিকায় অস্ট্রেলিয়া ১ম স্থান, ইংল্যান্ড ২য় স্থান এবং কানাডা ৩য় স্থান পেয়েছিল। ভারত পেয়েছিল ৬ষ্ঠ স্থান (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ৮ ও ব্রোঞ্জ ৩)। প্রতি চতুর্থ বছরে, কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসার কথা।

আসন্ন ১৯৭৮ সালের একাদশ কমনওয়েলথ গেমসে ভারত এই ১টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করবে—অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, সাঁতার (কেবল ডাইভিং), জিমনাস্টিকস, সাইক্লিং, সুটিং, বকসিং, ওয়েট লিফটিং এবং ব্যাডমিন্টন। ভারতীয় দলের সদস্য সংখ্যা ৬৫ এর মধ্যে ৪৭জন প্রতিযোগী এবং বাকিরা কোচ, ম্যানেজার এবং পর্যবেক্ষক ইত্যাদি।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭৮ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা বেশ জমে উঠেছে। কলকাতা মাঠের তিন সেবা—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যেই লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইটা শেষপর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

বর্তমানে মোহনবাগান লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে—তাদের ১৫টা খেলায় ৩০ পয়েন্ট উঠেছে। ৬০টা গোল দিয়ে মাত্র ২টো গোল খেয়েছে।

তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল। তারা ১৪টা খেলে ২৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ৭০টা গোল দিয়ে গোল খেয়েছে ৫টা। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ১৪টা খেলায় ২৩ পয়েন্ট উঠেছে। গোল দিয়েছে ২০টা এবং গোল খেয়েছে ৬টা।

এপর্যন্ত খেলায় 'হ্যাটট্রিক' করেছে এই পাঁচজন—মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মঈনুল সাজ্জাদ (বিপক্ষে বাটা), উয়াড়ীর উত্তম চক্রবর্তী (বিপক্ষে পুলিশ), ইস্টবেঙ্গলের মিহির বোস (বিপক্ষে বাটা), মোহনবাগানের

চিত্রধ্বনি

শেষ হয়েছে শুরুর মত

শুরুতে ছোট্ট মেয়ে টুসির মিষ্টি মুখের বিভিন্ন স্টীলের পাশে পাশে টাইটেলের ব্যবহার অনেকের মত এই সমালোচককেও বেশ বেকায়দায় ফেলে। টুসিকে দেখব, না নামগুলো পড়ব? তবু দু-একটি বড় অক্ষরের নামের ওপর চোখ বোলাতেই হয়। যেমন, কাহিনী—সমরেশ বসু, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—গুরু বাগচী, অভিনয়—অনিল চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। শেষের স্টীলটি জীবন্ত হয়ে উঠলে ছবি শুরু হয়। তাকে আমরা ওর মায়ের সঙ্গে রিকসায় চড়ে যেতে দেখি। ওরা চলেছে চৌধুরীবাড়ী। যা টুসির নিজের বাড়ি। যে বাড়ির পলাতক কুলাঙ্গার ছোট ছেলে (সন্তু) ওর বাবা। ওর মাকে পাপের পথে ঠেলে দিয়ে যে পালিয়েছে। টুসিরা এই প্রথম ওই বাড়িতে চলেছে। মেয়ে-বৌ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে। শেষে অবশ্যই তারা সফল হয়েছে। কিভাবে হয়েছে ছবিতে তা দেখতে সত্যিই ভাল লাগে।

টুসি দারুণ ছবি, চলচ্চিত্রের সমস্ত গুণ এতে মেলে এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে এটি একটি ভাল ছবি। মিষ্টি কাহিনীর পারিবারিক ছবি। যা ছোটবড় সকলের ভাল লাগবে। বিশেষ করে স্নেহপরবশ মায়েদের। বাংলা ছবিকে বাঁচাতে হলে এই ধরনের ছবির খুবই দরকার। ভাল লাগবার মত অনেক কিছু এ ছবিতে রয়েছে। যেমন টুসিকে ঘিরে কাহিনী। তাই যারা তাকে ঘিরে রয়েছে, অর্থাৎ ওর বাবা-মা, জ্যাঠা-জেঠী, ভায়েরাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। টুসিরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকত সেখানকার ঘুপ্তি আবহাওয়া এবং লোকেদের চরিত্রও বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে কিছু আকশন দৃশ্য রয়েছে। বাংলা ছবি যে ব্যাপারে বরাবর দুর্বল। কিন্তু অনিল চট্টোপাধ্যায় এখানে যেভাবে গুণ্ডাদের শায়েস্তা করেছে তা বেমানান লাগেনি। ছবিতে ফ্ল্যাশব্যাকে কিছু নির্মম দৃশ্য দেখানো হয়েছে। সেখানেও বাড়াবাড়ি নেই।

তবে সবচেয়ে ভাল এ-ছবির শিল্পী নির্বাচন। সকলে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। প্রথমেই বলতে হয় টুসির জ্যেঠার চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের কথা। এই গুণী শিল্পীর ইদানিংকার অনেক ভাল অভিনয় ছবিগুলোর গুণগত দোষে মার খেয়েছে বা তেমন প্রচার পায়নি। আশা করব, এ ছবিতে

টুসি ছবিতে সুমিত্রা/সোনালী

তিনি তাঁর যোগ্য মর্যাদা পাবেন। তাঁর মার্জিত এবং আন্তরিক অভিনয় সকলকে নির্মল আনন্দ দেবে। চরিত্রটিতে তিনি যে কত স্বাভাবিক, তা না দেখলে বোঝানো কঠিন। বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাঁর কথা বলার ভঙ্গী বা স্বর নিয়ন্ত্রণ। অনিলবাবুর পর একে একে আসেন সুমিত্রা (টুসির মা), অনুপ, সুব্রতা, দিলীপ, জ্ঞানেশ, গীতা দে, পদ্মা দেবী, সন্তু, গৌতম এবং অবশ্যই কুমারী সোনালী গাঙ্গুলী। বাকী ব্যাপারগুলো সংক্ষেপে বলি। ছবির গান টিভিতে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছে। ক্যামেরাকে ঘরের বাইরে বিশেষ দৌড়তে হয়নি। সম্পাদনা মোটামুটি। ডিটেলের কাজ রিকসাওয়ালার বেশভূষা ছাড়া একরকম ভালই।

আর ছবি শেষ হয়েছে শুরুর মত টুসির মুখের একটি ক্লোজ-আপকে ফ্রিজ করিয়ে। যা দেখে দর্শকরা খুশী হবেন।

অসিতবরণ মিত্র

ভদ্রলোক বেনেগাল

ভূমিকা আবার প্রমাণ করল যে শ্রীযুক্ত শ্যাম বেনেগাল একজন ভালো পরিচালক। কিন্তু বড় বা মহান হওয়ার মত কোন লক্ষণ আজ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। অঙ্কুর থেকে ভূমিকা, এইসব ছবিতেই বেনেগাল একটি নরম, লিরিক্যাল, অনপরাধযুক্ত ও নাতিশীতোষ্ণ নন্দনতত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। অস্বীকার করার কিছু নেই যে আমরা পরিচ্ছন্ন গল্প শোনার নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছি। তবু পরিচালক কি কোথাও তাঁর সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রবোধকে প্রথম স্তরের বাস্তবতা উত্তীর্ণ করাতে পেরেছেন? মনে হয় না। যতদিন পর্যন্ত তিনি বাস্তবতার কোন নিজস্ব প্রদেশে প্রবেশ না করবেন ও দর্শককে প্ররোচিত না করবেন অনালোকিত চোরাবালিতে ডুবে যেতে, ততদিন আমরা তাঁকে প্রশংসা করব, কিন্তু শ্রদ্ধা জানাব না। অবশ্য এও হতে পারে বেনেগাল খুব উচ্চাশী নন; তিনি প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের কুশিলব রূপে একজন ভদ্রলোক হিসেবেই পরিচিত হতে চান।

ভূমিকা জনৈকা অভিনেত্রীর জীবনানুসন্ধানের ইতিবৃত্ত। কাহিনীর অন্তরালে রয়ে গেছে চল্লিশ দশকের বিখ্যাত মারাঠী অভিনেত্রী হংস ওয়াড়েকরের আত্মজীবনী। সে প্রসঙ্গ আপাতত তুলে রেখে বলা যায়, বেনেগাল তাঁর সামাজিক পরিধিকে এই ছবিতে ঈষৎ সংক্ষিপ্ত করেছেন। জমিদারের আচরণের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি পরিচালকের তিক্ততা উপযাচিত হলেও ভূমিকা মোটামুটিভাবে শ্রীমতী স্মিতা পাতিলের জীবনপ্রবাহ।

নায়িকা স্মিতা অবিশ্বাস্য সফল। তাঁর অসুখী, বেপরোয়া ও অসহায় অভিব্যক্তিসমূহ দর্শককে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করে। এবং ভূমিকা প্রসঙ্গে একথা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে এখানে নায়িকা প্রায় পরিচালকের কৃতিত্বের সমানুপাতিক অংশীদার। স্মিতার জীবনে বিভিন্ন পুরুষের ভূমিকায় যারা এসেছেন তাদের মধ্যে দালালির চরিত্রে অমল পালেকারকেই সর্বাধিকভাবে সংবেদনশীল মনে হয়। আসলে স্মিতার ট্র্যাজেডী এখানেই যে সে পুরুষশাসিত পৃথিবীর রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি; বোঝেনি যে মানুষের হৃদয়ের আয়তন সচরাচর খুব বড় নয়।

পরিচালকের বিশেষ কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাশব্যাকগুলির চমৎকার প্রয়োগ। সঙ্গে সঙ্গে বলার থাকে বোম্বাই স্টুডিওর নিখুঁত কারুনুবর্তী উপস্থাপনার কথা। তবে স্থির মাত্রার এই গল্পটি হয়ত ছোট হতে পারত কিছুটা।

ছবিটি দেখবার পর আমার বেশ খানিকটা অপ্রয়োজনীয়ভাবে মনে পড়ছিল

পূর্ণেন্দু পত্রীর মালঞ্চ ছবিতে ধ্রুব মিত্র/মাধবী

ধ্রুপ্তাভ ফ্লোবেয়ারের সেই বিখ্যাত উপন্যাস ম্যাদাম বোভারির অনুষঙ্গ উল্লেখ করলাম এ-কারণে যে পাঠক এবার দয়া করে অনুমান করে নিন 'ভালো' কোন্ গুণে 'মহৎ' হয়; হতে পারে।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

স্টুডিও থেকে

সরকারী সাহায্য নিয়ে টালিগঞ্জ পাড়ার ছাওয়া এখন কিঞ্চিৎ উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণও বলা যেতে পারে। এই নিয়ে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরির ক্যান্টিনঘরে চায়ের কাপে তুফান উঠছে এখন অনবরত।

সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত জমা পড়েছে প্রায় একমাস হল—যতদূর জানা গেছে, এ পর্যন্ত সরকার নিযুক্ত লোন-কমিটির কোন সভাও হয়নি।

ইতিমধ্যে আবেদনপত্র বাছাইপর্ব নাকি শুরু হয়েছে। আবেদনকারীর সংখ্যা পাঁচশো।

শোনা যাচ্ছে আবেদনকারীদের মধ্যে নাকি ব্যবসায়িক সফল একাধিক প্রযোজক-পরিচালকও আছেন। গুঞ্জন উঠেছে তাঁদের টাকা পাবার যোগ্যতা নিয়ে। যে পরিচালকের পেছনে টাকার থলি নিয়ে ফাইনান্সার ঘুরছেন তাঁকে আবার সরকার টাকা দেবেন কেন? আবেদনকারীদের দাবী, সরকারী টাকা তরুণ পরিচালকদেরই শুধু দেওয়া হোক।

আমাদেরও আবেদন তাই নবীনদের ছবি করার সুযোগ দিয়ে নতুন প্রতিভাকে বিকশিত হবার সুযোগ দিন, ব্যবসায়ীচক্রের ফাঁদে না পড়ে আন্দোলন শুরু হোক ভালো ছবির, সুস্থ চলচ্চিত্রের, স্বাস্থ্যবান সংস্কৃতির

রাজ্য সরকারই সেই আন্দোলনের পুরোধা হতে পারেন এই আর্থিক সাহায্য বিতরণে একটু চোখ কান খোলা রাখলে।

কলকাতায় ভোজপুরী ছবি

একটা সময় এই শহরে একাধিক ভোজপুরী ছবি তৈরী হয়েছে। তরুণ গিরিশ রঞ্জন ভোজপুরী ভাষায় ছবি করেছেন।

হঠাৎ সেদিন দু নম্বর স্টুডিওর কাঁচা-পাকা দাড়িতে ঢাকা মুখ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। পরিচয় দিলেন জ্ঞান কুমার বলে।

উনি নাকি কলকাতায় একটি ভোজপুরী ছবি করছেন। আগে একটি হিন্দী ছবি করেছেন—নাম 'আরম্ভ'। ছবিটি দেখেছি। অবশ্যই সেটি কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম চরিত্রের ছবি।

জ্ঞান কুমারের নতুন ছবিটির নাম 'টিকুলি কি লাজ'। কলকাতা থেকে তৈরী প্রথম রঙ্গিন ভোজপুরী ছবি এটি।

বিহার এবং ইউ-পির বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বালাবিবাহ ও পণপ্রথা অস্বস্তিকর-ভাবে রাজত্ব করে যাচ্ছে। 'টিকুলী কি

টিকুলী কি লাজ/উষা শর্মা

লাজ' (কাহিনী-চিত্রনাট্য-সংলাপ-গান জগদীশচন্দ্র)। এই দুটি অবস্থার বিরু সোচ্চার বক্তব্য নিয়ে নাকি হাজির হ

জ্ঞান কুমার বললেন, 'আমার এই বিশেষ একটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ ফিল্মের শিল্পগুণ এবং ব্যবসায়িক মূল আমি এড়িয়ে যাইনি।'

আরও আনন্দের বিষয়, জ্ঞান বম্বের গ্ল্যামারের মুখাপেক্ষী না হয়ে কলকাতা শহরেরই অভিনয় পাগল কয়েক তরুণকে নিয়েছেন, যেমন উষা শর্মা, অ কুমার, ত্রিলোচন ঝা। ছবিটির সঙ্গীত প চালনার দায়িত্বেও আছেন একজন বাঙালী অনুপম মুখার্জি। তাঁর ইতিমধ্যেই 'ছ' গান রেকর্ড করা হয়েছে নবীন মুকেশ আরতি মুখার্জির গলায়।

গত সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন ইন সুটিং করার পর বাকি রইল শুধু আ ডোরের কাজ।

'উপলব্ধি'র ফ্লোরে

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওর দু ন ফ্লোরটায় ঢুকে দেখি মিঠুন চক্রবর্তী হাত নিয়ে বিছানায় শুয়ে। কপালে ব্যাণ্ডে বাঁধা। সামনে বিছানার ওপরেই বসে অ মহুয়া চক্রবর্তী।

পরিচালক তপন সাহা খাটের একপ দাঁড়িয়ে ক্যামেরাম্যান গণেশ বসুকে নি দিচ্ছেন দৃশ্যটা কিভাবে কোন্ পজি থেকে পিকচারাইজ করা হবে।

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে গনেশ শুরু করলেন আলো ঠিক করতে। এ আলো সিলিং থেকে সরে গেল, ডাই পাঁচশোটা জ্বলে উঠল। পেছনের 'স নিভে গেল....ইত্যাদি ইত্যাদি করে স যোগী নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ভাঙ্গা হাত গলায় ঝুলিয়ে মি মস্করা শুরু করলেন মহুয়ার সঙ্গে। আ শিল্পী মৃনাল মুখার্জি তখন চুপ দাঁড়িয়ে, চোখে-মুখে সুবোধ বালক ছাপ।

তপনবাবু বললেন—ছবিতেও ন মৃনালবাবু উজ্জ্বল নামে একটি সৎ চ অভিনয় করছেন। ক্যামেরা সামনে বো বোধহয় তিনি হালকা রসিকতায় 'মু নস্ট করতে চাননি।

হঠাৎ ফু-উ-উ-উস করে কি কিলো-ওয়াটের আলোগুলি গেল নি এমনকি রাবনের চিতা টপ্ লাইটটাও।

অর্থাৎ লোড্ শেডিং। বিদ্যু বোঝা হালকা হচ্ছে। কাজ বন্ধ।

মিঠুনের ভাঙ্গা হাত ঠিক হয়ে গে একটু বাদে মেকআপ রুম থেকে চেহারায় তিনি বেরিয়ে এলেন। রূপা ব্যান্ডেজটিও নিরুদ্দেশ। সুটিং ক সিরিয়াস মেজাজটিও নেই।

আধঘন্টা বাদেও আলো এল স্টুডিওর লনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ত বৈকালিক আড্ডার মৌতাত।

পরিচালক মৃনাল সেন ক'দিন আ উড়ে গেলেন চীনের পথে। চীন থে

ণ পেয়ে সস্ত্রীক মৃনালবাবু পনের
সফরে গেল্লেন চীনে। তাঁর সফর
ই শেষ নয়। যাবার আগে তিনি
ছেন চীন থেকে ব্যাংকক হয়ে তিনি
র আটলান্টিক পেরিয়ে চলে যাবেন
এঞ্জেলসে। ওখানে বিশ্ববিখ্যাত
জন ফিল্ম পরিচালকদের নিয়ে একটি
চনা সভার ব্যবস্থা হয়েছে। বিষয়—
চত্র ও সমাজ। অংশ নেবেন জাপানের
া ওশিমা, সেনিগালের ওসমান
নে, কিউবার টমাস গুহিতেরেজ
া প্রমুখ এবং মৃনালবাবু তো
ই।

ওখান থেকে ফিরে সেপ্টেম্বর মাসে
জাপান, তারপর আফ্রিকার তিউ-
য়ায়। কার্থেজ ফিল্ম উৎসবের অন্যতম
ক তিনি। তারপর স্বদেশ কলকাতায়,
কিছুদিন বাদেই লাইপজিগ চলচ্চিত্র
ব, সেখান থেকে লন্ডন।

এতসব ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকেও
'পরশুরাম' এর সম্পাদনা, মিউজিক
ং এবং রিলিজ ব্যবস্থার তোড়জোড়।
া করলাম এ বছর 'পরশুরাম'-র
পাওয়া যাবে তো ?'

টেলিফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে জবাব
চেষ্টা তে করছি।'

নির্মল ধর

-সরল

সহজ বস্তুর ওপর আমাদের একটা
জ আকর্ষণ আছে এবং সেই আকর্ষণ
প্রসারী। আবাল্যবার্ধক্য এবং প্রজন্মের
জন্ম চলে তার শাসন। গুপী গাইন
বাইন এমনি এক সহজ কাহিনী।

কিন্তু সহজ কথা যায় না বলা
, যেমন, তেমন সহজকে সরলভাবে
দেখানোও কঠিন। গুপী গাইন বাঘা
নএর ক্ষেত্রে তা আরও বেশী করে
া। তার কাহিনী সহজ, সে
কাহিনীতে নাটকও আছে, কিন্তু সে নাটক
করা প্রয়োগ কৌশলের দিক দিয়েই শক্ত,
তাছাড়া রূপকের ভূত তো আছেই। এই
নাটকের ভিতরে কিছু তত্ত্বের মালমশলা
রূপকের মাধ্যমে গুঁজে দেওয়ার ইচ্ছার
হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুব সহজ কথা
নয়। কিন্তু এই সবগুলোই সম্ভব হয়েছে
নাট্যায়নের প্রযোজনায়। মঞ্চের ভাষা
বোঝবার এবং বলবার যোগ্যতা যে তাঁদের
আছে. সে প্রমাণ তাঁরা নিপুণ নিষ্ঠায় রেখে
গেছেন এই নাটকে।

নাটকটির নাট্যরূপ ও নির্দেশনার
দায়িত্বে ছিলেন অনিল দে। মঞ্চে ভূত
নাচান ও পিছনের সাদা উইংসে ছায়া ফেলে
মানুষ ওড়ানোর মধ্যে তাঁর সহজ কল্পনা-
শক্তির পরিচয় আছে। কিন্তু তা আরও
সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় বাঘা-গুপীর
ভূতুড়ে জুতো পায়ে দেবার পরেই পা
সুড়সুড়ের পরিকল্পনায়, কিংবা শুণ্ডি-
রাজার ঘুমকাতুরে প্রহরীটির হাত থেকে
প্রথমবার বাঘার নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার
দৃশ্যে। এছাড়া সমস্ত নাটকটাই ছিল
সুবিন্যস্ত। বয়সনির্বিশেষে জনপ্রিয় একটি
কাহিনীকে সার্থক রূপ দেওয়ার ব্যাপারে
যা সবচেয়ে জরুরী সর্ত।

আখ্যান বস্তুর দাবীতেই এ নাটকে
গান একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে
থাকে। দেবাশিষ দাশগুপ্ত, যিনি বর্তমান
বাংলা নাটকের সঙ্গীত পরিচালনায় একজন
বহুলশ্রুত ব্যক্তি, তিনি সেই গুরুদায়িত্ব
নিপুণ যোগ্যতা ও আন্তরিক নিষ্ঠায় পালন
করেছেন। আবহে তাঁর গাওয়া গেরাম
ছেড়ে চলল গুপী অনেক দূরে, থেকে শুরু
হয়ে মঞ্চে গুপীর প্রত্যেকটি গানেই পাওয়া
যায় তার প্রমাণ। গুপীর ভূমিকায় শক্তি
ঠাকুর গেয়েছেনও চমৎকার। তাঁর অভি-
নয়ের কিছুটা খামতি তিনি গানে আমাদের
পুষিয়ে দিয়েছেন। গানের কথা অবশ্য সব
সময় সুপ্রযুক্ত নয়। কিন্তু সুর তা ঢেকে
দেয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ কিংবা ঘুমপাড়ানি
মাসিপিসী সুরের এবং গায়কীর সম্পূর্ণ-
তার উদাহরণ। হাল্লা রাজদরবারে গুপীর
গলায় ঘুমপাড়ানি মাসিপিসীর ব্যবহারটিও
সুচিন্তিত, যেমন সুন্দর পরিকল্পনা রয়েছে
ঐ আসরের অন্য তিন দেশীয় শায়কদের
গানের বৈচিত্র্যে। পাশ থেকে যে গানগুলো
অবশ্য গেয়েছেন দেবাশিষবাবু নিজে।

অভিনয় মোটের ওপর সবাই পরিচ্ছন্ন
করেছেন। তবে পরিচালক অনিল দেব
বাঘাই সবচেয়ে প্রাণবন্ত। সুপান্থ ভট্টাচার্য
দলপতি ভূত ও ভাষ্যকার দুটি চরিত্রেই
অনবদ্য, বিশেষত ভাষ্যকারে। গীতেশ
চক্রবর্তীও যখন বদ্যি তখন খুবই ভাল।
অন্যান্য ভূমিকায় দিলীপ ঘোষ, দেবব্রত
ভট্টাচার্য, রথীন ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রায়
সকলেই যথাযথ। শুধু শেখর দাশগুপ্ত
(কানকাইন এবং মন্ত্রী), ও সুব্রত ঘোষ
(কোতোয়াল)-এর অভিনয়ে এখনও প্রচুর
অনুশীলনের প্রয়োজন।

সব মিলিয়ে নাট্যায়ন একটি সহজ
কাহিনী সরল নাটকে দেখিয়েছেন। অনা-
বশ্যক কায়দা করেন নি। দর্শকদের তৃপ্তি
দিয়েছেন। আর এই সামগ্রিক দৃষ্টিতেই
নাটককে দেখা উচিত। কাজেই, যে অভিনয়
সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলাম তাতে নাচতে
গিয়ে কোন্ ভূতের কাষ্ঠশরীর উল্টে গেছে,
তা নিয়ে খুঁৎ-খুঁৎ করার কোন অর্থ হয়
না। তবে প্রযোজনার স্বার্থেই পর্দায় মানুষ

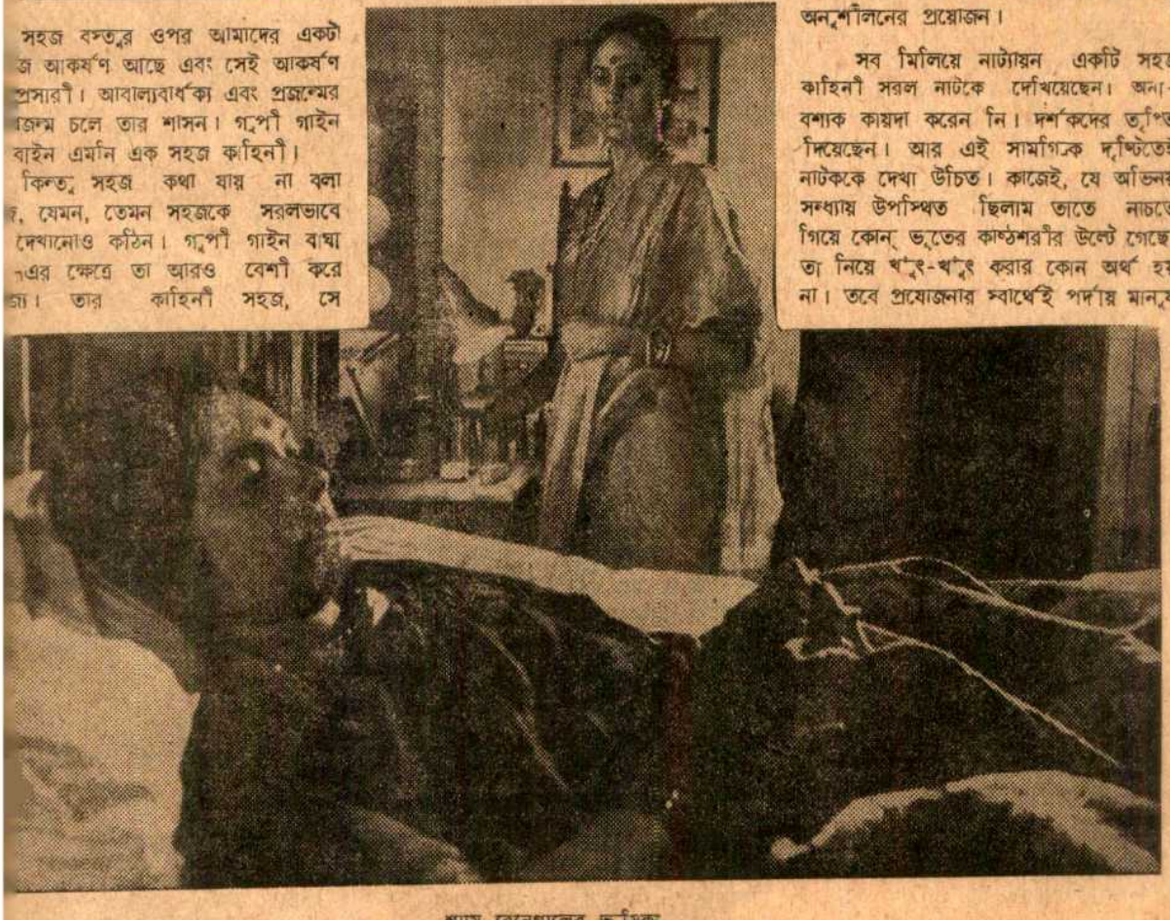

শ্যাম বেনেগালের ভূমিকা

ওড়ানোর দৃশ্যে ইনভিজিবল থ্রেড ব্যবহার করা ভাল এবং সিংহাসনের উপর দিয়ে আলো ফেলে পেছনের সাদা পর্দায় কারু-কাজ দেখানোটাও বাদ দেওয়া দরকার।

গোর্কির রবীন্দ্রায়ণ

সম্প্রতি প্রাসঙ্গিক-এর প্রযোজনা 'নীচুতলা' দেখে মনে হল ম্যাকসিম গোর্কির অনবদ্য মূল রচনার যদি এরকম তথাকথিত রবীন্দ্রিক রূপ দেওয়া হয় তো যাই কোথায়।

বিভ্রান্ত রূপান্তরেও যাঁর রচনার মাহাত্ম্য পুরোপুরি খর্ব হয় না, তাঁর নাম ম্যাকসিম গোর্কি। এ ক্ষেত্রেও তাই আমাদের শেষ পর্যন্ত বসে থাকতে হয় মূল কাহিনীর টানে। প্রচণ্ড রাগ হতে থাকে তাঁর উপর, যিনি রূপান্তর করেছেন। আর দুঃখ হয় নির্দেশক 'সমরেন্দ্রনাথ'-এর জন্য যিনি স্বকল্পিত 'শশাংক' চরিত্রে বিশ্বস্ত থেকে-ছেন আগাগোড়া, অপূর্ব দৃশ্যকাব্য রচনা করেছেন বিভিন্ন দৃশ্যের সংস্থাপনে, প্রায় সঠিক নিয়ন্ত্রণ করেছেন বিভিন্ন চরিত্রের ওঠা-পড়া। অরুণ ঘোষের মঞ্চ ও পোশাক সারাক্ষণ সাহায্য করেছে তাঁর পরিকল্পনাকে। শুধু নাটকের ভাষা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ি-য়েছে। সেই আবেগসম্পন্দিত কাব্যের মধ্যে গোর্কি হারিয়ে গেছেন বারে বারে। আবার কাহিনীর স্থান, কাল, সংকট তাকে রবীন্দ্র-নাথও হতে দেয়নি। অথচ ঐ ভাষার মোহে তপন পাল (পবিত্র বড়াল) সারাক্ষণ রবীন্দ্র-নাটকের শম্ভু মিত্র হতে চেয়েছেন, দীপক রায়চৌধুরীকে (অম্বর) সাজতে হয়েছে বিখ্যাত 'চাকদা', এটা ঠিক নয়। বরং 'প্রীতিলতার' চরিত্রে শিখা রায় যে বৈরিণী-টিকে এনেছেন সে অনেক বেশী জীবন্ত ও বিশ্বাস্য। বিশেষ করে যে দৃশ্যে সে সে পবিত্র বড়ালকে বুকের উপর টেনে এনে স্বামীকে খুন করার পরিকল্পনা দেয়, সেই মুহূর্তে হাসি, বেদনা, লাস্য, হাট,

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
'অঙ্কুর' এবং 'নিশান্ত' ছবির
প্রযোজক ব্লেজ ফিল্ম এন্টারপ্রাইজ
(প্রাঃ) লিমিটেড এখন উপহার দিচ্ছেন
শ্যাম বেনেগালের
ভূমিকা
রঙীন ছবি
ভূমিকায় : স্মিতা পাতিল - অমল পালেকর - অনন্ত নাগ - অমরিশ পুরী - নাসিরউদ্দিন শা - সুলভা দেশপাণ্ডে
মেট্রো প্রত্যহ : ২।, ৫।, ৮।টায়

নীচুতলা ছবিতে শিখা রায়

ভেঙে শরীর বাঁকিয়ে দাঁড়ানো, সব মিলিয়ে তার চরিত্র একটা অন্য মাপ পেয়ে যায়। আবার সবিতার (সুজাতা বসু) সঙ্গে পবিত্রর সম্পর্ক জানবার পর থেকে তার মুক্তি নিপুণভাবে জটিল বাঁক নেয় মঞ্চে। 'সমরেন্দ্রনাথ'-এর শশাংকও তেমনি অম্বর-এর কাছে নিজের পুরনো কথা বলে ফেলতে গিয়ে যখন চকিতে সামলে নেয় নিজেকে, তখন মুহূর্তের জন্য ছিটকে বেরিয়ে আসে আর একটা অপরিচিত চরিত্রের আভাস। নীচুতলার মানুষগুলোকে সঠিক চেনাতে গেলে অন্যদেরও এমনিভাবে তৈরি হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

অবশ্য ভাষা তাদের সাহায্য করেনি আগেই বলেছি। তাছাড়াও ঊর্মি ঘোষ, তপন ভট্টাচার্য, রাজকুমার মল্লিক এঁরা এমনিতেই তাঁদের চরিত্রের ভিতরে ঢুকতে পারেননি। অন্তত তাঁদের অভিনয় দেখে তাই মনে হয়। তবে রবীন্দ্র-কীর্তনীয়া (সন্তোষ) কিংবা মালতী চৌধুরী (মোক্ষদা) চেষ্টা করেছেন আপ্রাণ, সহজ সরলভাবে নিজেদের দায়িত্ব-টুকু পালন করতে।

এ নাটকে মঞ্চের যা কাজ মঞ্চ তা করেছে, বরং বলা উচিত, খুবই ভালভাবে করেছে। কিন্তু আলো বা আবহ কল্পনাও প্রয়োগের দিক থেকে আরো সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল। প্রযোজনা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত। আর উপসংহারে বলি ম্যাকসিম গোর্কির এই তথাকথিত রবীন্দ্রায়ণে গোর্কি ও রবীন্দ্রনাথের কি ক্ষতি হয় জানি না, তবে থিয়েটারের ক্ষতি হয় প্রচণ্ড।

সুরজিৎ ঘোষ

ছায়াঘন বসন্ত

সম্প্রতি লাবণি নাট্য সংঘের প্রথম নিবেদন রণিত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নির্দেশিত, সংলাপ ও সুর সংযোজিত ছায়াঘন বসন্ত নাটকটি দেখার সুযোগ হল। ...মঞ্চের পূর্ব মুহূর্তে করা হয়েছে, এই নাটকে কামু বা স অস্তিত্ববাদের প্রয়োগ করা সংক্ষেপে নাটকের কাহিনীটা দেখা য

পরাধীন ভারতবর্ষে বেণুদা একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন। নেতৃত্বে এক দল ছেলেমেয়ে স সংগ্রামের অসমসাহসী ব্রত গ্রহণ ক মিঃ এমার্সন বলে এক ইংরেজ গাড়িতে বোমা মারা তাদের প্রথ হিসেবে নির্দিষ্ট। এই সূত্রে নানা দুর্ঘটনা — পুলিশের গুলিতে ব বিপ্লবীর আত্মাহুতি। অতঃপর এ —সুদর্শনের ওপর এই মহতী কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রাণের মূল্যে কর্যোদ্ধারে সে সফল। আছে—সুদর্শন-গোপার। এবং সু মৃত্যুর পর গোপার অবরুদ্ধ প্রেম উ হল দেশোদ্ধারের ভাবগম্ভীর ক্ষ গোপা ও অন্য স্বাধীনতাব্রতীরা লক্ষ্যসাধনে দায়িত্বপূর্ণ দক্ষতার এগিয়ে চলে এবং খাঁটি অ বাদীদের (!) মতই ভাবে—ঠিক এটাই ? নতুন ভারতবর্ষ কি এই প ইত্যাদি।

এই কাহিনীর চৌহদ্দিতে নি প্রয়োগকর্মের উদাহরণ, যা পাওয়া তার অতিসংক্ষেপিত একটি তালি বিখ্যাত ইংরেজ ব্যক্তির পত্নী এমার্সন ময়লা, কোঁচকানো এবং ছ পোশাক পরে মঞ্চে হাজির, বিপ্লব গোপা : লিপস্টিক চর্চিত রক্তবর্ণরঞ্জিত চাকচিক্যময় মু সংগ্রামী সূর্যের কালিমাখা বিপ্লবী কবি সুদর্শনের স-স সমন্বিত উচ শৈলী, পাঁচালির সুরে সুদর্শনের গাওয়া, বিপ্লবীদের ডেরা ও কার পার্থক্যহীন পশ্চাৎপট, বৈপ্লবিক স্পি বেণুদার হঠাৎ চুল পেকে যাওয়া.....

মূল নাটকের স্থূল সূত্রের মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত প্রভৃতি বি কাজকর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। আ তাই। তবে সূর্যরূপী শিবপ্রসাদ ব্যা পাধ্যায় একটু যেন বেমানানভাবে দর্শ

স্মৃতি থেকে

আরউইন, শ'র 'বেবী দা অবলম্বনে রূপচক্রের এই নাট্য নি স্মৃতি থেকে। ভাবানুবাদ করেছেন রায়। নাটকটির সুর বড্ড চড়া, কিছুটা স্টেটমেন্ট ধর্মী। যেখানে-যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার ভালো লাগে নি, হয়তো নাটকে বিষয় স্থাপনার সঙ্গে কোথাও এর যোগ সূত্র থেকে থাকবে ?

স্বাধীনতা দিবস উৎসব উদ্‌যা প্রস্তুতি শেষ। তিনজন শহীদের স্ শ্রদ্ধার্ঘ্য বেদী স্থাপন করা হ হঠাৎ দেখা তিন শহীদ মাটি ফুঁড়ে

সংযোগ ছবিতে অমিতাভ বসুন এবং রেখা

পাশি তিন স্তম্ভে দাঁড়িয়ে গেছেন—হৈ-হৈ কান্ড। তাঁদের বক্তব্য: যে জীবনের স্বপ্নে তাঁরা জীবনোৎসর্গ করেছিলেন সেই আনন্দময় জীবন আসে নি এখানও, সুতরাং অসমাপ্ত লক্ষ্য সাধনের পথে এগিয়ে যেতে তাঁরা আবার এসেছেন। বিদেশী শাসন থেকে দেশ মুক্তি পেলেও স্বদেশী ভন্ডামি—শোষণ এখনও পরিব্যাপ্ত ইত্যাদি।অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী থেকে পুলিশ কমিশনার, ছদ্ম সমাজ সেবী থেকে ভোটের উমেদার—সবার টনিক নড়ে যায়, আইন-শৃংখলা ইত্যাদি প্রশ্নে। 'ভিক্ টিম' এক-দল তরুণ এমত পরিস্থিতিতে একেবারে বিমূঢ়, পরিশেষে মরিয়া—শহীদদের বক্তব্য তাদের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে। পরিশেষে দেখা যাচ্ছে: শহীদদের হাত এবং তাঁদের হাত নৈকট্য পিপাসায় প্রায় পরস্পর সংলগ্ন, মঞ্চে তখন লাল আলো জ্বল জ্বল করছে—কমিউনিস্ট ইনটার-ন্যাশনালের সুরে সুরে।

এই হলো অতি সংক্ষেপে গল্পাংশ। স্টেটমেন্ট ধর্মিতার দোষ থাকলেও—কতোগুলি ব্যাপার 'সিমবলাইজ' করার ক্ষেত্রে নাটকার সফল, বিশেষত যেসব ক্ষেত্রে ব্যঙ্গের অবকাশ রয়েছে। শহীদদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ এবং শহীদদের সঙ্গে তাঁদের প্রাক্তন নেতার (যিনি বর্তমানে ক্ষয়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক) সংলাপাংশ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। উচ্ছলনে-যাওয়া পুত্রের সঙ্গে এক-শহীদের কথাবার্তার দৃশ্যটি যথেষ্ট বাস্তব বোধ সঞ্জাত—কিন্তু ভাষাকে এ-ক্ষেত্রে এতো বেশী উঁচু গ্রামে বাঁধা হয়েছে যে, একটা মেলোড্রামার ঝাঁঝ দর্শকদের গ্রহণ শক্তিকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আর একজন শহীদ এবং তাঁর জীবিত ধর্মান্বেষী পিতার কথাবার্তা পরিমিতি বোধের সীমা রেখা অতিক্রম না করার ফলে ঐ দৃশ্যটি অনেকাংশে জীবন্ত, কিন্তু শহীদ পূর্ণচন্দ্র ও তাঁর প্রণয়িনী (বর্তমানে কর্পোরেশন ইস্কুলের দিদিমণি) যখন কথাবার্তা বলছিলেন—আবেগের আতিশয্যে, অভিনয়ের আড়ষ্টতায় নাটকটির মান যেন হঠাৎ খানিকটা ঝুলে পড়ে। উল্লেখ্য, এতো সাজ যোজ করা হলুদ রঙের 'ম্যাচিং' শাড়ি ব্লাউজ, ঠোঁটে লিপস্টিকের চড়া প্রলেপ) কর্পোরেশন ইস্কুলের দিদিমণি আমরা সাধারণতঃ দেখি না। পরিচালকের এটা খেয়াল করা উচিত ছিলো। আর একটি কথা: পশ্চিম-বঙ্গের কলকাতা নামক শহরে বসে নাটক দেখার সময়ে নাট্যমঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীকে 'চার-মিনার' সিগারেট ধরাতে দেখলে খানিকটা অবাক হতেই হয়—যদিও জোরালো আপত্তি এখানে করা যায় না, তা আমি করছিও না—ব্যাপারটি মৃদু অনুভবের একটি চকিত প্রশ্ন।

মিউজিকের প্রয়োগ খানিকটা সংযত হলে ভাল লাগত। আলোকসম্পাত যথাযথ। অভিনয়ে গৌরকৃষ্ণ ভদ্র (বিজয়দা), প্রভাত বসু (কিমশনার), সঞ্জয় দত্ত (হীরালাল), সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (তর্ক-তীর্থ), বিভাস চট্টোপাধ্যায় (ইন্সপেক্টর)

সফল। ইন্দুরূপিনী রত্না সিন্ধুদেবের আড়ষ্ট অভিনয়—বলতে বাধা নেই—নাটকটির উৎকর্ষ সিদ্ধির পথে একটি অন্তরায়। অবশ্য চরিত্রটির উপস্থাপনাই যেন অনেক দূর পর্যন্ত সম্ভাব্যতার পরপারে।

নাটকটিতে সম্ভাবনা আছে। গতানুগতিকতার ত্রুটিগুলি নিষ্ঠুর হাতে দমন করতে পারলে এই অবরুদ্ধ সম্ভাবনা ভবিষ্যতে সফল হবে বলে মনে করা যায়।

প্যান্টোমাইম

দিব্যেন্দু পালিতের কাহিনীসূত্র অবলম্বন করে 'ক্যান্তিকাল' গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা—'প্যান্টোমাইম'। মূল গল্পের বৈচিত্র্যটুকুমাত্র ব্যবহার করে নবেন্দু সেন নাট্যরচনা তথা নির্দেশনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

মফঃস্বল বাংলার একটি মাইম অপেরা—মূকাভিনয়ের মাধ্যমে যারা নানারকম পণ্যদ্রব্যের প্রচার করে গ্রাম-বাংলার হাটেগঞ্জে। এই সংস্থার সঙ্গে কয়েকটি মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। অসাম্যদীর্ণ সমাজে যা হয়—কোনো সংস্থার একজন মালিক থাকে, ব্যক্তিগত মালিকানার বিষবৃক্ষে উৎপাদিত হয় শোষণ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি কিছুঃ পণ্য-

তপনকুমার দে সম্পাদিত ১২ বছরের ঐতিহ্যবাহী
সাহিত্য/সিনেমা/যাত্রা/সংস্কৃতির প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা

তুলি

বর্তমান সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক লিখছেন সুদূর লামডিং-এর তরুণ উদীয়মান সাহিত্যিক

"শিবপ্রসাদ লোধ"

শ্রী লোধের "হারিয়ে গেলাম" গল্পটির মাধ্যমে পাঠকরা খুঁজে পাবে একটি নতুন ধরণের স্বাদ এবং এই গল্পটির মাধ্যমে শ্রী লোধ বাংলা সাহিত্যের জগতে নিজের আসন দখল করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শিবপ্রসাদ লোধের "বিখ্যাত বড় গল্প" "মধুচক্রের মবুকরী" যা তুলির সারা ভারতের পাঠক সমাজ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

পূজার লেখা পাঠাতে শুরু করুন। নমুনা copy আমরা পাঠাই না। প্রতি সংখ্যা ১-৫০ গ্রাহকের মূল্য ১৮/-

যোগাযোগের ঠিকানা :—তুলি পত্রিকা, ৭৩জি, আলিপুর রোড, কলিকাতা-২৭।

• আগামী বিজ্ঞাপনে লক্ষ্য রাখুন •

বাতাসী ছবিতে নিরঞ্জন রায়

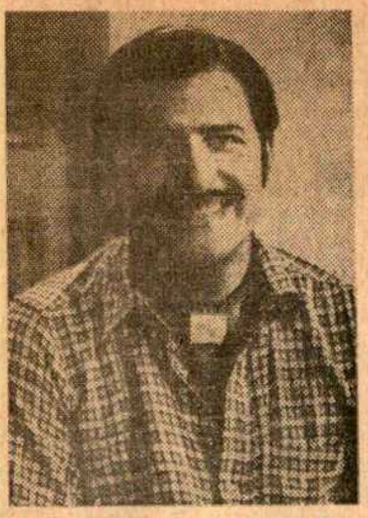

প্রচার সংস্থার মালিক গণেশ মানকড়ের শোষণের সাঁড়াশিচাপে এর সমস্ত কুশীলববৃন্দ বোবা না হয়েও একবাকহীন, অন্ধ নীরবতার ঘেরাটোপে আটক হয়ে রয়েছে। মানুষগুলোর অস্তিত্ব বোধহীন যন্ত্রের সঙ্গেই তুলনীয়। নিছক উপার্জনের মাধ্যম হিসেবেই তারা ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, গণেশ মানকড়ের শোষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মঞ্চে উপস্থাপিত হচ্ছে গ্রাম-বাংলার সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অন্য এক প্রতিভূ—দিকপতি। এসবের বিরুদ্ধে কি প্রতিবাদ গড়ে উঠছে না? উঠছে। কিন্তু বারবারই দেখা যাচ্ছে, এই শ্রমজীবি মানুষগুলোর কোনো উল্লেখযোগ্য বিজয় নেই, প্রতিবাদের স্পন্দন ফেটে পড়তে চায়—তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায় অভ্যস্থ দাসত্বের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায়। এই সামাজিক অভিজ্ঞতারই নাটকোচিত প্রতিফলন দেখি 'প্যান্টোমাইম' নাটকে। নাটকের শেষ দৃশ্যে তাই ঐ নির্বাক মানুষগুলো মরীয়া লড়াইয়ে নেমে তাদের উত্তোলিত বাহুগুলো অস্ত্রহীন দেখে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়। ভবিষ্যতে পরাজয়ের গ্লানি অতিক্রম করে তারা বিজয়ী হবে—এই আশাবাদের প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত অবশ্য লক্ষণীয়।

নাটকের 'থীম' যথেষ্ট জোরালো। সাহসিক। এবং চটিল। সংলাপ অংশ সাবলীল। সঙ্গীতের প্রয়োগ ও আলোকসম্পাতেও পরিমিতিবোধের অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, 'ক্যান্তিকাল' শ্রেণীর নাট্যগোষ্ঠী শহরতলী ও মফস্বলের অতি সাধারণ সামাজিক মঞ্চেই সাধারণতঃ অভিনয় করেন—যেখানে দৃশ্যসজ্জার নিপুণ ব্যবস্থা আশা করা যায় না, আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও সাজসরঞ্জামের বহুবিধ অভাব থাকে—অনানা সাংগঠনিক দুর্বলতা তো আছেই। 'প্যান্টোমাইম' নাটকটিতে—সম্ভবত সেই কারণেই 'ডোকুমেন্টাল অ্যাকটিং'-এর পাশাপাশি 'ফিজিক্যাল অ্যাকটিং' এবং অভিনেতাদের মঞ্চে অবস্থানগত সৌষম্যের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ

দেওয়া হয়েছে। 'কম্পোজিশন' ও 'কোরিয়োগ্রাফি'র ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে—একই কারণ। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য সাফল্যের নজীর রেখেছেন। অবশ্য অবস্থানগত সৌষম্যের পরিপন্থী একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে : মৃত বিজয়প্রসাদের বুকের ওঠানামা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দীর্ঘক্ষণ থাকা যায় না ঠিকই, কিন্তু চেষ্টা করলে অভিনেতা আরো অনেক বেশিক্ষণ নিঃস্পন্দ থেকে দৃশ্যটিকে যথাযথ জীবন্ত অবয়ব দিতে পারতেন।

অভিনয়াংশ সত্যি ভালো। হিমাংশ্যু গুহ (গণেশ মানকড়), দুলাল চক্রবর্তীর (বিজয়প্রসাদ), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (বেচনী), পাথস চট্টোপাধ্যায় (কেষ্ট), বিমল দত্ত (দিকপতি) তাঁদের দায়িত্বপালনে সফলতার সপ্রতিভ। ছোটোখাটো দু-একটা ত্রুটি অবশ্য আছে। নাটকের একমাত্র নারীচরিত্রে রাধারূপী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় খানিকটা আড়ষ্ট। অবশ্য ঐ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগও তেমন কিছু নেই।

স্বীকার করতে বাধা নেই—'ক্যান্তিকাল' গোষ্ঠীর 'প্যান্টোমাইম' ইদানীংকালের কালের একটি পরীক্ষামূলক বলিষ্ঠ নাট্যপ্রযোজনা।

শুভশঙ্কর ভট্টাচার্য

বিবেকানন্দ শিশু সংসদ

শিশুদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখাই 'বিবেকানন্দ শিশু সংসদ'এর বিশেষত্ব এবং দায়িত্ব বলে মেনে নিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানে। শৈশব পেরিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের পা এখন কৈশোরে।

তিয়াত্তর সাল থেকে প্রতি বার্ষিক উৎসবে এই সংসদ বিভিন্ন গুণীজন, কৃতি ছাত্রছাত্রী, শিশুশিল্পী প্রভৃতিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে আসছেন। সম্প্রতি রঙ্গনা প্রেক্ষাগৃহে সংসদ-এর তিনদিনব্যাপী দশম বার্ষিক পূর্তি উৎসবেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সম্বর্ধনা জানিয়ে মূলত যাদের উৎসাহিত করা হল তাদের মধ্যে আছেন কৃতি ছাত্রছাত্রী, ফুটবল খেলোয়াড়, শিশু চলচ্চিত্র শিল্পী সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, যে শিশুটি আধো-আধো কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'লুকোচুরি' কবিতার সঠিক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আবৃত্তি করে আমাদের অবাক করে।

সঞ্চিতার পরে সাত বছর বয়সী পৃথিবীর সর্বকনিষ্ঠ যাদুকর পিটার প্যানের আশ্চর্য যাদুকৌশল তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সকল সংশয় দূরীভূত করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র পিটার অতি অনায়াসেই দু-মুখ খোলা চোঙ থেকে রাশি রাশি কাগজ এবং সেই কাগজ থেকে ফুলের তোড়া বের করে আমাদের মুগ্ধ করে। বুমালের সাইজের দুটি ভিন্ন রঙের কাগজ ছিঁড়ে সে হাতের মুঠিতে ভরে। এবং যখন খোলে, দেখা যায় আশ্চর্য সুন্দর একটি রঙীন টুপী। আমরা শুনেছি। দশম বার্ষিক পূর্তি উৎসবের সর্বপ্রধান আকর্ষণ—নাট্যোৎসব। সংস্থা

বিজ্ঞাপনের জন্যে এই স্থানটি সম্পূর্ণ খালি রাখুন

আড়গুবী চাল, বেঠিক বেচাল এবং
ীপ।

চ-গান এবং সুসংবদ্ধ অভিনয়ে
সফল এবং বর্ণাঢ্য প্রয়োজনা। বড়-
াশাপাশি শিশুরাও অংশ গ্রহণ করেছে
তারা কোনো অংশেই কম না। উদাহরণ-
'বোনটি পাবুল' নাটকের সাত ভাই-
অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নিঃসন্দেহে বলা
শিশুদের জন্যে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান
ভবিষ্যতে আমরা বেশ কিছু শিল্পী
যাবো এবং তারাও নিশ্চয়ই এইভাবে
দের গড়ে তুলবে, যেভাবে তাদের গড়ে
ছেন এই প্রতিষ্ঠান। **নির্মলকুমার দাশ**

শিল্পী রামকুমার

সেদিন ডক্টর পার্থ ঘোষ আয়োজিত
ষ্ঠানে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গান
লাম। রামকুমারবাবু প্রকৃত গুণী
। ঠুংরী, টপ্পা, পদাবলী কীর্তন ও
ন সমান দক্ষতার সঙ্গে গেয়ে থাকেন।
শত বৎসর আগে বাংলাদেশে জমিদার
ড়ির আসরগুলিতে কি ধরণের অনুষ্ঠান
তার একটা সম্পূর্ণ ছবি এঁর গানে
ওয়া যায়। তালিম এবং সেই যুগে
ভিন্ন গুণী শিল্পীদের গায়কীইনি যত
লভাবে আয়ত্ত করেছেন যে তাদের কঠিন
লংকার খুব সহজভাবে গাইতে পারেন।
এবং সুর লাগানো কিছুক্ষণের মধ্যেই
শ্রোতারা চোখ বুঝলে জলসাঘর যুগে
পৌঁছে যায়। এবং পরিষ্কার দেখতে পায়
ঝাড়-লণ্ঠন ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝের
ওপর ফরাস, মোহর, বাঈজি, জুড়ি গাড়ি
এবং বাঙ্গালী বাবুদের কুঁচি দেওয়া ধুতি
এবং গিলেকরা পাঞ্জাবী। এতরকমের গান
এত রকমের সুরের আমি কাউকে পরিবেশন
করতে দেখিনি। টপ্পাতে ওনার যেমন দখল
ঠুংরী অঙ্গেও সেইরকম দখল। আবার
কীর্তন গান যখন মনে হয় ইনি কীর্তন
গায়ক। তালিমের বুনিয়াদ ও কণ্ঠের ওপর
দখল সুধু থাকলেই এইরকম করা যায়
না। এতে প্রয়োজন হয় চিন্তার ওপর
সম্পূর্ণ দখল! সুরের জগতে প্রচুর
অভিজ্ঞতা থাকলে এবং প্রচুর সাধনা
থাকলে মনকে প্রয়োজন মত ঠুংরী, টপ্পা
ও কীর্তনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়।

রামকুমারবাবুর শিক্ষা প্রধানতঃ
ামরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে হলেও
ই ঘরাণার কোন বিশিষ্ট শিল্পির প্রভাবেই
নি ওঁর সঙ্গীত পিপাসু হৃদয়কে এড়িয়ে
যেতে দেননি। বিপ্লবী ও জটিল স্বর
বিস্তারের সময় বাদল খাঁ ও ভীষ্মদেব
াট্যজীর প্রভাব পরিষ্কার ভাবে পাওয়া
যায়। কারণ রসের বিস্তারের সময় আর
াবদুল করিম খাঁ সাহেব মনের কোনে
কি দেন। মুড়কির সময় পাঞ্জাব পাতি-
লার গায়কীর প্রভাব আর গানের
রকিতগুলি যখন রসিয়ে রসিয়ে ভাঙ্গেন
খন পরের আকাশে সঙ্গীতের অফতাস।
তাদ ফৈয়াজ খাঁর রঙ্গিলা আলোক আমরা
দেখতে পাই।

দুশ বছরের প্রাচীন একটি কীর্তণ
শ্রোতারা বিশেষভাবে উপভোগ করেছিল।
ব্রিটিশ আমলের এ কীর্তন সাহেবদের জন্যে
অর্ধেক ইংরাজী কথা দিয়ে রচনা হয়েছিল।
এই ধরনের গানের সঙ্গে আরো কত যে
অপ্রচলিত গান রামকুমারবাবুর সঙ্গীতের
ভান্ডারে আছে তাঁর গান শুনলে ও বুঝলে
কিছুটা আন্দাজ করা যায়। রামকুমার
চট্টোপাধ্যায়ের গান সৌন্দর্যবোধ কল্পনা,
সুর, রস ও কণ্ঠ মাধুর্যের একটি অপূর্ব
মিশ্রন। আর সব থেকে বড় কথা হল ইনি
লেবু কচলে তো'তো করেন না। জানেন
শ্রোতাদেরদ সুর ও রসে ভরিয়ে দিয়ে
তাঁদের পিপাসা জাগিয়ে হঠাৎ কি রকম-
ভাবে শেষ করে দিতে হয়। শ্রোতাদের এই
মুগ্ধ হয়ে অথচ অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে তিন
ঘন্টা গান শোনার পর বাড়ি ফেরা হল
শিল্পীর সর্বথেকে বড় কৃতিত্ব। রামকুমার
বাবুর পুত্র শ্রীকুমার সুন্দর কণ্ঠের
অধিকারী। আগাগোড়া ওঁকে সেদিন শুধু
কণ্ঠেই সহযোগিতা করেননি অপূর্ব সঙ্গত
করে আবহাওয়ায় চাঞ্চল্য ও পুলক এনে-
দিয়েছিলেন।

বিমলভূষণ

উত্তরপঞ্চাশ বিমলভূষণের জন্ম এই
কলকাতা শহরের ভবানীপুরে। তারিখটা
ঘোলই ভাদ্র। বাবা স্বর্গতঃ নরেন্দ্রনাথ
মুখোপাধ্যায় (ডকটর নরেন নামে সমধিক
প্রসিদ্ধ) ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক যিনি
স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার তৎকালীন কর্ণধার ও
সম্পাদক স্যার পল্ নাইটের চিকিৎসা করতে
বিলাতে গিয়েছিলেন।

বাবা গাইয়ে-বাজিয়ে ছিলেন না বটে,
তবে সঙ্গীতপ্রেমী যে ছিলেন তাতে আর
সন্দেহ কি? বিশেষ করে রবিবাবুর গান
ছিল তাঁর প্রমাণ।

গান বাজনাটা এল মা-র কাছ থেকে।
মা গান গাইতেন। অবশ্য তখন তো ওস্তাদ
রেখে শেখার রেওয়াজ ছিল না। বিমল-
বাবুর মেজোমামা শিখেছিলেন করমতুল্লা
খাঁর কাছে। মেজোমামাই তাঁর ছোট বোনকে

বিমলভূষণ

শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই বিমল-
ভূষণের গান শেখার হাতেখড়ি মা-র কাছেই।
শুধু তাঁর একার নয়; ভাইদের বা দিদিরও।

অবশ্য পরবর্তীকালে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ
গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, যামিনী গঙ্গো-
পাধ্যায়, কেশব গণেশ ঢেকনে, জান মহম্মদ
প্রভৃতির কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং কাজী
নজরুল ইসলাম, পঙ্কজকুমার মল্লিক,
শচীন দেববর্মণের মত গুণীজনের কাছ থেকে
প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভের দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর
হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ বোধহয়
তখনকার দিনে এমন কোনো সঙ্গীত প্রতি-
যোগিতা ছিল না যাতে যোগদান করে তিনি
প্রথম না হয়েছেন।

পড়াশুনায়ও বরাবরই মেধাবী। তবে
সেটাও ঘটেছে অদ্ভুত পরিবেশে। আশ্রম
পদ্ধতিতে সব ভাইকে ছ'জন শিক্ষক বিভিন্ন
বিষয়ে পড়াতেন রোজ। এছাড়া বাবা নিজে
পড়াতেন সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ও দর্শন।
এক বাড়ীতে থেকেও সপ্তাহে শনিবার
বিকেলে এবং রবিবার পুরো দিনটা মা-র

অবিস্মরণীয় নাটকের অসাধারণ্য জনপ্রিয়তা!
৫০০ রজনী অতিক্রান্ত ০ প্রতি বৃহঃ ও শনি—৬॥টায়/রবিবার—৩ ও ৬॥টায়

নাটক/পরিচালনা-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেঃ বিকাশ, সত্য, প্রদীপ, ইরা, সান্তনা, গিরীশ, রবীন,
মিহির, সুনীল, নিখিল, শংকর, অরুণ, দীপংকর, ঊশীনর,
শৈলেন, মধু; গণেশ; স্বপন, অলোক, তিমির এবং
রত্না ঘোষাল ও তরুণকুমার

সঙ্গে বা আর সবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ মিলত। তখন থিয়েটার, জলসা বাড়ীতেই হত।

রেডিও, রেকর্ড বা ফিল্মে যখন প্রথম গাইতে আসেন তখন তিনি 'টিন্ এজার'-এর প্রথম ধাপে। তাই প্রডিজি খ্যাতি ছিল।

ঐ বয়সেই গল্প প্রতিযোগিতায় চুপি চুপি গল্প পাঠিয়ে প্রথম পুরস্কার পান। মৌলিক রচনা ছাড়াও বায়রন, শেলী, ফিট্‌জেরাল্ড প্রভৃতির বহু কবিতার অনুবাদও করেছেন যা বহু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিমলভূষণের সংস্কৃতপ্রীতির কথা অনেকের জানা নেই। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে মুগ্ধ হয়েই স্বর্গত ডঃ যতীন্দ্র-বিমল চৌধুরীর বহু সংস্কৃত গান তাঁকে গাইতে এবং সংস্কৃত নাটকে অভিনয় ও গানে মঞ্চাবতরণও করতে হয়। আর তা শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে। মঞ্চাবতরণ অবশ্য তাঁকে তাঁর নিজের (ছদ্ম-নাম—শুভ্রাভরণ) লেখা 'রামপ্রসাদ'-এর বাংলা জীবনীনাট্যে নামভূমিকায় বহুদিন করতে হয়েছে সকলের অনুরোধে। এছাড়া বেতারবিখ্যাত বাণীকুমার রচিত 'মহিষাসুর-মর্দিনী'র হিন্দী সংস্করণ যা সারা দেশের অবাঙালীদের জন্য দিল্লীসহ বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় মহালয়ার উষালগ্নে তারও পরিচালক বিমলভূষণ।

তাঁর আর যে গুণের কথাটা অবশ্য উল্লেখ্য সেটা হল জ্যোতিষ বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ অধিকার।

এখন তিনি আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের মিউজিক কম্পোজার রূপে কর্মরত। প্রতি শনিবার পূর্বাঞ্চলীয় অনুষ্ঠানে রাত সাড়ে দশটায় তাঁর পরিচালিত নজরুলগীতির সঙ্গীতশিক্ষার আসর এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

সুব্রত রায়চৌধুরী

রঙ্গনায় 'সোনাই দীঘি'

সম্প্রতি রঙ্গনা মঞ্চে যাত্রা জগতের মহারথীরা সমবেত হয়ে উপহার দিলেন 'সোনাইদীঘি'। পলা সম্রাট বজেন দে'র সোনাইদীঘি বাংলার দর্শকের কাছে বহু পরিচিত এবং প্রশংসাধন্য।

এ পালার প্রধান চরিত্রে ছিলেন দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। ভাবনা কাজীর চরিত্রে তাঁর অভিনয়, দর্শকরা নিশ্চয়ই ভুলবেন না শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু প্রয়োগ—চোখের আর মুখের এমন নিখুঁত অভিব্যক্তিবোধ হয় একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

মাধব-এর চরিত্রে তপনকুমারের অভিনয় দর্শককে অভিভূত করেছে। তবে নাম ভূমিকায় জ্যোৎস্না দত্ত কিছুটা বেমানান। আরও প্রাণবন্ত হওয়া উচিৎ ছিল। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ও পান্না চক্রবর্তীও প্রশংসা পাবেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রে—ভোলা পাল, গুরুদাস ধাড়া, নীলমণি বিশ্বাস, বীনা ঘোষ ও বন্দনা দেবীকে ভাল লেগেছে।

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

তবলাশিল্পী অনিন্দ্য

দেশের তরুণ তবলাশিল্পী অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুযোগ্য শিষ্য। ১৯৭৩ সালে আকাশবাণী সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তবলা বাদনে সারা ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান পান ও 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার' পান। ভারত সরকার এঁকে দুই বৎসরের জন্য জাতীয় বৃত্তিও দেন। ভারতের প্রায় সর্বত্রই ইনি বহু খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে তবলা সহযোগিতা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই দ্বিতীয়বার বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। এ বৎসরও বিখ্যাত সেতারবাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপ সফরে রওনা হচ্ছেন। আমেরিকার কালিফোর্নিয়া শহরে মিউজিক্যাল ট্রাডিশন্স নামক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও বিভিন্ন দেশে তবলা সহযোগিতা করবেন।

গীত ছন্দমের চণ্ডালিকা

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করলেন সাংস্কৃতিক সংস্থা গীতছন্দম শিল্পীরা। রীতালি চক্রবর্তী পরিচালনা এবং মিতালি চক্রবর্তী পরিচালনা নৃত্যনাট্যের মূল দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া করলেও কিছুটা দুর্বল টীমওয়ার্ক পরিপূর্ণ সফল হওয়া যায়নি। রীতালি চক্রবর্তী, রিঙ্কু চক্রবর্তী বসু, নীলিমা ভট্টাচার্য ও গো এবং সঙ্গীতাংশে মিতালি চৈতালী চক্রবর্তী, রূপক রা মিত্র কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গো আলো এবং রঞ্জিত দত্তের মোটামুটি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরু অনুষ্ঠানে চঞ্চল মুখোপাধ্যায় এ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

নৃত্যে 'জয়দেব'

গত ৭ জুন কলকাতার সে একাডেমীতে 'কবি জয়দেব' সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন ভারতীয় কলামন্দিরের ছাত্রছাত্রী জয়দেবের' জীবনী অবলম্বনে এই নৃত্য-পরিকল্পনা একটি সুন্দ এ প্রচেষ্টা সার্থক রূপ লাভ ক গোপীনাথের যোগ্যশিষ্য নৃত্য গোপাল রায়ের সৃষ্টিধর্মী পরিচালনায়।

শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় তরুণ রায় এ ভূমিকায় মীরা গাঙ্গুলীর নৃত্য-ই অনুভূতির ব্যঞ্জনা প্রশংসা করার

কবি জয়দেবের 'গীতগোবি পালে মানভঞ্জন অংশে রাধাদেবে মঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং বুঝতে না দিয়ে, কাব্যের অস যথাযথ—'দেহি পদপল্লব মুদা শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন দৃশ্যটি নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেছে। ভূমিকায় লীলা চৌধুরী, পরাশরে বাবু রায়, শ্রীরাধার সখী বৃন্দা দীপালি রায়-এর নৃত্য প্রশংস জয়দেবের মূখ্য ভূমিকায় গো যথেষ্ট প্রশংসা করিয়েছেন. স গানটি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

মূল্য ৭৫ পয়সা। ত্রিপুরায় অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১৫ পয়সা। ভারতের অন্যত্র অতিরিক্ত বিমান মাশুল ২০ পয়সা।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

প্রণীত

কয়েকটি অমূল্য লোক-চরিত ও কাব্য-গাঁথা

এই অপূর্ব রচনাগুলি পাঠক-পাঠিকাদের
দেবে অমৃত পানের আনন্দ। তৃষিত শোকসন্তপ্ত
হৃদয়ে আনবে পরম শান্তি।

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত ১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড ২৬·০০

শ্রীনরোত্তম চরিত ৩·৫০ পঃ

শ্রীকালাচাঁদ গীতা ৩·০০

Lord Gouranga (Eng. Vol. 1) ৩·০০

গ্রন্থগুলি জনপ্রিয় হলেও এর মূল্য বৃদ্ধি করা হয়নি।
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৩।

দে বুক ষ্টোর্স, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ও
নাথ ব্রাদার্স, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা।

...6. WB/NC-T3
MRITA Calcutta-700003
AMRITA
Phone 55-52
7 AUG 1978

বিশুদ্ধ 'কুকমী' গুঁড়া মশলার ক্রেতারা

সাবধান!

'কুকমী' গুঁড়া মশলার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কলকাতার কয়েকটি গুঁড়া মশলা কোম্পানী তাদের নিজস্ব নিকৃষ্টমানের ব্রাণ্ডের সংগে জনপ্রিয় কুকমীর নাম জুড়ে হুবহু কুকমী (Cookme) নামের স্টাইল নকল করে আসল কুকমী গুঁড়া মশলা বলে বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে।

কেনার
দেখে নে
'কুকমী'র
কেবলমাত্র
(Cookme)
আছে,—
কোন ব্র
নাম যু

প্রস্তুতকারক :

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লি

২৩৫ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৭০ ● ফোন : ৩২

পোস্ট বক্স নং : বড়বাজার ৬৮৮৫ ● ফ্যা

iaa 590